॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩৮ বর্ষ ১৩৭৭

(১ম হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হালুয়া

(পাঠিয়েছেন মিসেস লক্ষ্মী গণপতি, এফ ১৩৮, রোয়াবাজার, দিল্লী)

ব্রাউন এণ্ড পলসন

পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে তৈরী

মিসেস লক্ষ্মী গণপতি

ব্রাউন এণ্ড পলসন কর্নফ্লাওয়ারে দিব্যি মচমচে কড়কড়ে সামোসা ও প্যাটিস্‌ তৈরী হয়। (১ বড়চামচ থেকে ২ কাপ সাধারণ ময়দা মিশিয়ে নিন)। আপনার সুপ বা গ্রেভী (ঝোল) আরও ঘন মোলায়েম ও সুস্বাদু করে তোলবার জন্যও ব্যবহার করবেন। **ব্রাউন এণ্ড পলসন** কর্নফ্লাওয়ার শিশু ও রোগী ব্যক্তিদের পক্ষে বেশ পুষ্টিকর। **ব্রাউন এণ্ড পলসন** সবচেয়ে সেরা কর্নফ্লাওয়ার কেননা সেরা-সেরা উপাদানে তৈরী এবং অতি সযত্নে প্রস্তুত।

কাগজের বাক্সেও পাওয়া যায়

উপকরণ :
১-১½ কাপ — চিনি
½ কাপ ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার
½ কাপ ঘি
২ বড় চামচ রেক্স রোজ সিরাপ
১ ছোট-চামচ করে আলাদাভাবে কাজু ও বাদাম (কুচি করা)

১। চিনি দিয়ে এক পাত্র জল ৫ মিনিট ধরে গরম করুন।
২। ½ কাপ ঠাণ্ডা জলে ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করুন; এবার চিনির রস আস্তে আস্তে ঢালুন, দেখবেন যেন তাপমাত্রা বেশি না হয়।
৩। যখন কর্নফ্লাওয়ারটি ভালভাবে তৈরী হয়ে যাবে, একটু একটু করে ঘি মেশান; ক্রমাগত গুলে যেতে থাকুন যতক্ষণ না পাত্রের গা থেকে মিশ্রণটি আলাদা হয়ে আসে ও ঘি আলাদা হয়।
৪। এবার রেক্স রোজ সিরাপ দিয়ে বেশ ভাল করে ফেলান। যখন মিশ্রণটি পাতলা হয়ে আসবে ও পাত্রের গায়ে লেগে থাকবে না, তখন কুচিকরা বাদাম মিশিয়ে নিয়ে তৈলাক্ত প্লেটে ছড়িয়ে দিন।
৫। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোনাকুনি কাটুন।

বিনামূল্যে! নতুন পাকপ্রণালীর বই নং ৩

আজই এক কপির জন্য লিখুন বিনামূল্যে এক সেট পাকপ্রণালী পাঠাবেন—
ইংরাজী / হিন্দী / বাংলা / তামিল / তেলেগু / মালয়ালম / গুজরাটি / মারাটি / কন্নাড়া

নাম ——————————

ঠিকানা ——————————

——————————

এই কুপনটি ভ'রে ডাকে পাঠিয়ে দিন : পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট কর্নপ্রোডাক্টস্‌কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই ১ বি আর

DF-2

আপনার পরিবারের সবার মনের মত এ রকম আরো নানা খাবারের জন্য এই পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি রাখুন

কর্ন প্রোডাক্টস্‌ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই-১ বি. আর

একমাত্র মল্টটনিক যাতে আছে ৬টি ভিটামিন—ভিটামিন বি-১২ সমেত

প্রেমিক
মনোজ বসু ॥ দাম ৬·০০

যদুবংশ
বিমল কর ॥ দাম ৭·০০

তুঙ্গভদ্রার তীরে
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দাম ৬·০০

দুই অরণ্য
সমরেশ বসু ॥ দাম ৬·০০

রাঙা ভাঙা চাঁদ
প্রতিভা বসু ॥ দাম ৪·০০

ময়ূরী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ দাম ৩·০০

সারারাত
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ দাম ৫·০০

তিন দিন তিন রাত্রি
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ দাম ৬·০০

শতকিয়া
সুবোধ ঘোষ ॥ দাম ৮·০০

প্রকাশিত হল

শিবরাম চক্রবর্তীর
হাসির গল্পের নতুন বই

শিব্রামের
বারো আড়ি

শিবরামের সঙ্গে আড়ি কার না!—বাঘের, ট্রেনের, খুনের, চারের, চক্তের, ভূতের, রেডিওর, বড়দিনের, চক্রবর্তীদের, বিজ্ঞাপনের, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের, এমন কি হর্ষবর্ধনেরও। এই আড়ির,—নাকি আড়াআড়ির, কে জানে,—ফলে কখনো শিবরামের প্রাণ নিয়ে টানাটানি, কখনো স্রেফ ফাঁকতালে হস্তাখানেকের হাজতে প্রাপ্তি, কখনো নিজে বুদ্ধু বনা, কখনো বা অপরকে বানানো, আরও কত কি। কিন্তু পাঠকের ফলশ্রুতি একটিই—হাসি, কেবলই হাসি; প্রাণখোলা, দিলখোলা হাসি। যে হাসি দৈনন্দিন অজস্র উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার জগৎ থেকে ক্ষণকালের জন্যও মুক্তি দেয়, নিষ্কলুষ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল করে তোলে চিত্তাকাশ।

দাম ৫·০০

● এই লেখকের অন্যান্য বই ●

হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন	৪·০০
ভালোবাসার অনেক নাম	৬·০০
ঘরণীর বিকল্প	৩·০০
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন	২·৫০
ইতুর থেকে ইত্যাদি	৩·০০

বেণীসংহার
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দাম ৪·০০

সেতুবন্ধ
মনোজ বসু ॥ দাম ১২·০০

পরিচয়
বিমল কর ॥ [illegible] ৪·০০

জনম জ[illegible] হম
প্রবোধকুমার সান্যা[illegible] দাম ৪·০০

রং বদলায়
বিমল মিত্র ॥ দাম ৩·৫০

পঞ্চশর
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ দাম ৩·০০

রূপসী রাত্রি
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ দাম ৬·০০

বহু যুগের ওপার হতে
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দাম ৩·০০

ভারত প্রেমকথা
সুবোধ ঘোষ ॥ দাম ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১
শনিবার ২১ কার্তিক ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫১
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 7 Nov. 1970

আমাদের নববর্ষ

দেশ পত্রিকার আরও একটি বছর [illegible]: সাঁইত্রিশ বছর পূর্ণ করে এবার তার আটত্রিশের শুরু। [illegible] নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা আমাদের পাঠক, লেখক, [illegible], বিজ্ঞাপনদাতা এবং অন্যান্য সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা সম্বল করে আমাদের পত্রিকার ক্রমোন্নতি ও সাফল্য, আশা করি তাঁদের সেই সহযোগিতা থেকে ভবিষ্যতেও আমরা বঞ্চিত হব না।

বাংলা দেশে পত্র-পত্রিকার একটি পুরাতন ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্য অনেকেই জানেন, যে-কোনো আঞ্চলিক ভাষার পক্ষে তো বটেই, এমন কি সমৃদ্ধ, বহু অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার পক্ষেও কম গৌরবজনক নয়। বাংলা পত্র-পত্রিকার পুরাতন ইতিহাসে অতি উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা ও অতি দক্ষ সম্পাদকদের নজিরও তেমন কম নয়। সেই ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত না হয়েও আধুনিক ধারায় যেসব পত্র-পত্রিকা বাঙালী পাঠকের মনোরঞ্জন ও সেবা করে চলেছে আমরা আমাদের পত্রিকাকে তারই অন্তর্ভুক্ত মনে করি। 'দেশ' পত্রিকা তার জনপ্রিয়তায় এ-কথা প্রমাণ করেছে যে, বাঙালী জীবনের সঙ্গে তার কোথাও একটি মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে, নয়তো সর্বজনের কাছে এর প্রচার ও প্রসার সম্ভব ছিল না।

আমাদের বঙ্গভাষায় যে কয়েকটি পত্রিকা একদা উচ্চমানের বলে গণ্য হত, লক্ষ করলে দেখা যাবে তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাহিত্য বাদেও এই পত্রিকাগুলি স্বদেশের এবং স্বজাতির সংস্কৃতি-চিন্তা ও সামাজিক সমস্যাকে যথোচিত গুরুত্ব দিতেন। তথাকথিত রাজনৈতিক আলোচনার স্থান এ ক্ষেত্রে না থাকলেও রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা, দেশের মানুষের নানা সমস্যার আলোচনা সেখানে থাকত। অর্থাৎ আমাদের পত্র-পত্রিকার ঐতিহ্য ছিল সাহিত্য ও সমাজচিন্তা। জনসাধারণের সমস্যাবলী সংক্রান্ত রচনারও অভাব থাকত না। 'দেশ' পত্রিকার সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে এই বিশেষ গুণগুলি বরাবরই বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, 'দেশ' পত্রিকা মূলত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। তবু আমরা দেশের নানান ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে গুরুত্ব দিতে কার্পণ্য করি না। রাজনীতি আমাদের বিষয় নয়, তথাপি কী রাজনীতি, কী অর্থনীতি, কিংবা দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যাপারেও রচনাদি প্রকাশে আমাদের আগ্রহ হয়ত পাঠক লক্ষ করবেন। ইদানীং বাংলা দেশ এবং ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে আলোড়ন এসেছে তার স্পন্দনও আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়।

'দেশ' পত্রিকার নিজস্ব একটি নীতি নিশ্চয় আছে। কোন্ পত্রিকারই বা না থাকে! আমাদের নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা যথাসম্ভব সহিষ্ণু ও উদার রাখার চেষ্টা করি। এখানে কী সাহিত্য বিষয়ে, কী রাজনীতি বিষয়ে তেমন কোনো সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার রেওয়াজ নেই। এ-কথার অর্থ অবশ্য এমন নয় যে, আমরা আমাদের নীতিকে বর্জন করব। মুক্ত মনে, স্বাধীনভাবে এখানে মতবৈষম্য ও মতপার্থক্য বিনিময় করা চলে, আমরা সেখানে কোনো হস্তক্ষেপ করি না। প্রসঙ্গত বলা যায়, আমাদের কয়েকটি নিয়মিত বিভাগে যে ধরনের রচনা প্রকাশ পায় তাতে বিশেষ কোনো দলীয় প্রীতির নিদর্শন হয়ত পাঠক পাবেন না।

সাহিত্য বিষয়ক রচনা প্রকাশের ব্যাপারেও আমরা প্রবীণ ও নবীনের প্রতি সমান আগ্রহী। উভয় শ্রেণীর লেখকদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয় এক নয়, কিন্তু আমাদের কাছে দুয়েরই মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে। আরও বলা দরকার, সাহিত্যে এবং চিন্তায় যে আধুনিক সাবালক মানুষের বহু বক্তব্য নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে তা আমরা মনে করি না। হয়তো এ-কারণে কোনো কোনো পাঠক কখনো-সখনো কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেন। সে অস্বস্তি আশা করি স্থায়ী হবে না।

আমাদের সাধ অনেক, কিন্তু সে তুলনায় সাধ্য কম। পত্রিকাটিকে আরও পরিচ্ছন্ন করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারলে, আরও রচনাসংখ্যা বৃদ্ধি করলে, নবীনদের আরও স্থান করে দিতে পারলে আমরাই খুশী হতাম: দুঃখের বিষয়, নানা বাধাবিঘ্ন, স্থানাভাব, যান্ত্রিক খেয়ালে সে সাধ আমাদের পূরণ হয় না। তা সত্ত্বেও যে আমরা আমাদের পত্রিকার অনুরাগীদের সমর্থন পেয়ে চলেছি—এ আমাদের সৌভাগ্য! ভবিষ্যতেও তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা ভরসা রাখি।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু এন এ পাল
বালা ব্যারিসটার বাহাদুর
মহোদয় বরাবরেষু

মহাশয়, যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং অত্র ওকালতনামা পত্র মিদং কার্যঞ্চাগে অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, মহাশয় যেরূপ সাহসের সহিত রাজন্যভাতা বিলোপের মোকদ্দমায় বাদীদের পক্ষ হইয়া বিবাদী রাষ্ট্রপতি বাহাদুর, সাকিন রাষ্ট্রপতি ভবন থানা ও সাব রেজিস্টারি নয়াদিল্লি, জিলা দিল্লি এবং ভারত সরকার বাহাদুর গয়রহের বিরুদ্ধে লড়িয়া যাইতেছেন তাহা দেখিয়া অধীনের হতাশ প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার হইয়াছে এবং এই ভরসা হইয়াছে যে, আমার বাবুর কেসটিও মহাশয়ের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলে, বাবুর পক্ষ লইয়াও মহাশয় এসপার ওসপার একটা ফাইট দিতে পারিবেন। রাজন্যভাতার মামলাটি আদতে যেরূপ ক্ষতিপূরণ গাপ করিবার সরকারী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার মামলা, আমার বাবুর কেসটিও অবিকল তাহাই। অত্র মোকদ্দমায় এক নং বিবাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সাকিন ও মোকাম রাইটারস বিল্ডিংস, থানা হেয়ার স্ট্রীট ও সাব রেজিস্টারি কলিকাতা এবং ২নং বিবাদী দারজিলিং-এর জেলা শাসক বাহাদুর, সাং ও মোকাম কালেকটারি, থানা, সাব রেজিস্টারি ও জিলা দারজিলিং এবং ৩নং বিবাদী জলপাইগুড়ির জেলা শাসক বাহাদুর, সাং ও মোং কালেকটারি, থানা, সাব রেজিস্টারি ও জিলা জলপাইগুড়ি।

মহাশয়, উক্ত তিন বিবাদী স্বেচ্ছাপূর্বক ষড়যন্ত্র করিয়া আমার বাবুর হক্কের কড়ি প্রায় তিরিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি বিলোপ আইনের সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ধারা মোতাবেক যাহা আমার বাবুর ন্যায্যত প্রাপ্য, তাহা

গাপ করিয়া দিবার ফিকিরে আছেন। এবং আমার বাবুর ন্যায্য পাওনা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করার জন্য আমার বাবুর বিরুদ্ধে নরহত্যা, রাজদ্রোহ ইত্যাদির মামলা সাজাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে হুলিয়া বাহির করিয়া তাঁহাকে ভিটা ছাড়া করিয়া ছাড়িয়াছেন।

কেহ বলিতেছে তাঁহার যক্ষ্মা হইয়াছে, কেহ বলিতেছে তাঁহার পক্ষাঘাত, তিনি চলচ্ছক্তিও রহিত। এমতাবস্থায় তাঁহার অসহায় পরিবারবর্গের কথা চিন্তা করিলেই মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, এই মামলাটি মহাশয়ের হস্তে তুলিয়া দিবার জন্য অধীন কেন এত ব্যগ্রতা দেখাইতেছে।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যুক্তফ্রন্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল আমাদিগের পরম-প্রিয় দোদোদার হাতেই বাবুর কেসটি সঁপিয়া দিব। কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণ পাইয়াছি, আমরা দোদোদাকে আপনজন ভাবিলে কি হইবে, উনি আমাদের তেমন আপন ভাবেন না। দাদার পাকিস্তানস্থ ভিটায় পৈতৃক শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবটি বন্ধ হইয়া গেল বলিয়া দাদা এবার তদীয় আলিপুরস্থ মারকসবাদী ভবনে আমাদের কাহাকেও কিছু না জানাইয়াই চুপেচাপে পূজা সারিয়া দিলেন। আপন ভাবিলে দাদা কি আর আমাদিগকে ডাকিতেন না! তাহা ছাড়া কেহ কেহ বলিল, অরিজিন্যাল সাইডে দাদার মাথাও না কি তেমন খোলে না। দাদার পসার ক্রিমিন্যালে। তাই মহাশয়কেই আমার বাবুর পক্ষ হইতে অত্র ওকালতনামা প্রেরণ করিতেছি। অধীনকে বিমুখ করিবেন না ইহাই মিনতি।

এই মামলার বাদী, আমার বাবু, শ্রীচারু মজুমদার, পিতা বীরেশ্বর মজুমদার, সাং মহানন্দ পাড়া, থানা ও সাব রেজিস্টারি শিলিগুড়ি, জিলা দারজিলিং পেশা জোতদারী/গৃহস্থালী/কৃষি বিপ্লব—কোনও রাজা মহারাজা নন বটে, একজন জোতদার মাত্র। তাহা হইলেও তাঁহার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দিগ্বিজয়ী সেকন্দার শাহেরও উপরে বস্তু। উনি আমার বাবু বলিয়াই এ-কথা বলিতেছি না। মহাশয় খোঁজ লইলেই ইহার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইবেন।

বাদীর মাতামহ চাঁদমোহন রায় ...-দেশ হইতে আসিয়া নিজ বুদ্ধি ও ... বলে কিছু বিষয় সম্পত্তি করেন ... তদীয় কন্যা উমাশংকরীর জন্য ... পিতা বীরেশ্বরকে ঘরজামাইরূপে ...নেন। বাদী আমার বাবু শ্রীচারু মজুমদার ইঁহাদের সন্তানরূপে ওয়ারিশ সূত্রে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি সাব রেজিস্টারির অধীন ১০৪ একর ৯৫৮ ডেসিমেল খাস জমি এবং ১৫১ একর ৩৩৪ ডেসিমেল প্রজাস্বত্বের মালিক হন। তদবধি ১৯৫৩ সালের ৫ই মে জমিদারি গ্রহণ আইন গেজেট করার দিন পর্যন্ত আমার বাবু সুস্থ শরীরে, সরলান্তঃকরণে ও শান্তিপূর্ণভাবে এই সমুদয় সম্পত্তি স্থিতিবান স্বত্বে ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন। শিলিগুড়ি সাব রেজিস্টারির অধীন আমার বাবুর খাস তালুকসমূহের বিবরণ এই : মৌজা ডাকিনীকাটা (জে এল নং ১০৫), জোত নং ৪৫৩, খতিয়ান নং ২, পরিমাণ ৩৭ একর ৭৬ ডেসিমেল, মৌজা পলাশ (জে এল নং ৪৩), জোত নং ৫১৩, খতিয়ান নং ৪, পরিমাণ ৬৭ একর ৮৬ ডেসিমেল: মৌজা চম্পাসারি (জে এল নং ৩৬), জোত নং ৫১২, খতিয়ান নং ৫, পরিমাণ ৩২ একর ৭৫ ডেসিমেল+৪ একর ৮০ ডেসিমেল। মৌজা খাপরাইল (জে এল নং ১৪), জোত নং ৭২, ৭৫ এবং ৭৬১, খতিয়ান নং ৫ এবং ৪৬, পরিমাণ ১৬ একর ৩১ ডেসিমেল +৪ একর ৪৫ ডেসিমেল। মৌজা রাজপাইরি (জে এল নং ২৬), জোত নং ৭৫৫, খতিয়ান নং ৫, পরিমাণ ১৩ একর এবং জোত নং

৭৬৬, খতিয়ান নং ৭ ও ৭/১, পরিমাণ ১৮ একর ৭৬ ডেসিমেল। মৌজা বউনিভিটা (জে এল নং ৭২, জোত নং ৫৬৭, খতিয়ান নং ২, পরিমাণ ৩৭ একর ৪৭ ডেসিমেল। মৌজা শিলিগুড়ি (জে এল নং ১১৬), তৌজি নং ৩ জে-এ. এবং ২৩৪৩, ২০৯৫, ২১৩৮ ও ৬২৪ খতিয়ানভুক্ত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩ একর ৩১ ডেসি, ৪ একর ১৩ ডেসি, ৭ একর ৫১ ডেসি এবং ৬০ ডেসি। এতদ্ব্যতীত জিলা ও সাব রেজিস্টারি জলপাইগুড়ির অধীন থানা রাজগঞ্জ, মৌজা দেবগ্রাম (জে এল নং ২), মধ্যস্বত্ব বৈকুণ্ঠপুররাজ, খতিয়ান নং ২৪ জোতের পরিমাণ ১০ একর ৭৫ ডেসি। আমার বাবুর মোট খাস তালুকের বিবরণ ইহাই।

মহাশয়, সন ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখের আগ পর্যন্ত কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই। আমার বাবু দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে ভাগচাষ মারফত সুস্থ শরীরে, সরলান্তঃকরণে ও শান্তিপূর্ণভাবে উক্ত বিষয় সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছিলেন। এবং দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খাজনা, কর, সেস ইত্যাদি নিয়মিতভাবেই জমা দিয়া আসিয়াছেন। কখনোই ইহার ব্যত্যয় হয় নাই বলিয়া বাবুর জমিজমা বাকি খাজনার দায়ে কখনোই লাটে উঠে নাই।

ইতোমধ্যে বুর্জোয়া কংগ্রেস সরকার ১৯৫৩ সালে ৫ই মে আইন গেজেট করিয়া জোতের সীমা ২৫ একর বাঁধিয়া দিল। আমার বাবু কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া ৩১-৭-১৯৫৩ সালে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে ও সরলান্তঃকরণে বাবুর দুই ভাগিনেয়ী নীলিমা ও উষার নামে চম্পাসারি মৌজা (জে এল ৩৬) দানপত্র করিয়া দেন। এখন বিবাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিদারি গ্রহণ আইনের ৫ ক ধারার এক ফ্যাকড়া তুলিয়া বলিতেছেন, ৫-৫-৫৩ সালে উক্ত আইন পাস হয় এবং ১৫-৪-৫৫ সালে উক্ত আইন চালু হইয়াছে, এই দুই তারিখের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্পত্তির যাহা কিছু হস্তান্তর তাহা বেনামী হস্তান্তর বলিয়াই গণ্য হইবে। মহাশয় নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, ইহা আর কিছু নহে, আমার বাবুর ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার জন্য বুর্জোয়া সরকারের আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক ঘৃণ্য কৌশল মাত্র। ঘৃণ্য জনবিরোধী জোতদারেরাই জমি বেনামী হস্তান্তর করার অপকৌশল গ্রহণ করিয়া থাকে।

অথচ আমার বাবু যে একজন সৎ ও ভাল জোতদার ছিলেন তাহা সরকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণই বারবার বলিয়াছেন। রাজাপাল বাহাদুরকে চাপ দিয়া রেকরড তলব করাইলেই ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বাবুর বর্গাদারেরা বাবুর তালুকে যেন রামরাজত্বে বাস করিত। মহাশয়কে এমন অনেক দৃষ্টান্ত এই অধীন সংগ্রহ করিয়া দিবে, যাহার দ্বারা মহাশয় আমার বাবুর প্রতি তাঁহার বর্গাদারগণের [illegible] গভীরতার সংশয়াতীত প্রমাণ দাখিল করিতে পারিবেন। মহাশয় বোধ হয় অবগত আছেন যে, বর্তমান বর্গাদার আইনে বর্গাদার ও জোতদারের ফসলের হিস্যা ৬০ : ৪০ এইভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধীন একথা ঘোষণা করিতে গর্ববোধ করিতেছে যে গত মরসুমে পর্যন্তও বাবুর ৭৫ বিঘা খাস তালুকের বর্গাদারেরা স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, বিনা প্ররোচনায়, সুস্থ শরীরে ও সরলান্তঃকরণে বুর্জোয়া সরকারের বর্গাদার আইন অমান্য করিয়া বাবুর বাড়িতে ৫০ ভাগ অর্থাৎ ১০ ভাগ বেশী ফসল তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। আমার বাবু বাড়িতে থাকিলে ওই বাড়তি দশ ভাগ ফসল দিয়া যে কৃষি বিপ্লবের জন্য 'ফাইটিং ফণ্ড' খুলিতেন, সে বিষয়ে আমি হলফ খাইতে পারি।

পত্তনীদার হিসাবেও আমার বাবু যে কত ভাল, সে-কথা, রায়কত পরিবারের ওয়ারিশ যুক্ত ফ্রন্টের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বাহাদুর মহামান্য জ্যোতি বসুর জ্যেষ্ঠা প্রাতৃজায়া রানীমাতা ঠাকুরানীই হয়ত ভাল বলিতে পারিবেন।

মহাশয়, অধীন সব কিছুই অত্র ওকালতনামার সহিত বিবৃত করিল। আপনি এই মামলা গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিবেন না। আপনার যাহা ন্যায্য ফিস্ তাহাই দেওয়া হইবে। এ অধীন স্বয়ং গ্রান্টি।

আমার বাবুর ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য ৩০ হাজার টাকা সরকারের ঘরেই পড়িয়া আছে। এতদ্ব্যতীত বাবুর হিস্যার বাদছাদ দিয়াও খাসে যে ৭৫ বিঘা জমি থাকিবে তাহা সবই উত্তম রূপালি ১নং জমি। বিঘা প্রতি হাজার টাকা হইলেও ৭৫ হাজার টাকা ভেল্যু হইবে। এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা তো এইখানেই আছে। আমার বাবুর মাথার দাম ১০ হাজার টাকা না-হয় আপাতত ছাড়িয়াই দিলাম।

পত্রপাঠ আপনার ফিস, ঘর খরচা ও রাহা খরচ ইত্যাদি বাবদ কত পড়িবে জানাইলে টেলি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিব। আপনার ফিস বাবদ দেয় টাকা দু'জন কি তিনজন ঘৃণ্য জোতদার/অত্যাচারী মহাজনের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেই উঠিয়া আসিবে। এবং এই মোকদ্দমা বাবদ আপনার রাহা খরচ + কলিকাতা ও শিলিগুড়ি মোকামে থাকিবার ঘর খরচা ইত্যাদি ইত্যাদি বাবদ দেয় টাকা দুটি পোস্ট অফিস/গোটা কয়েক রেস্তোঁরা/মনোহারি দোকান/তেমন তেমন এক সওদাগারি অফিসের বেতন লুঠ করিলেই উঠিয়া আসিবে। অলমিতি

বাবুর বিশ্বস্ত গোমস্তা

জোট বাঁধায়

আগামী ফেব্রুয়ারি ... নির্বাচন হওয়ার ... এন এ ... দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ... রাজনৈতিক মহলে বেশ একটা কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে। জোট বাঁধার আলোচনা, নেতাদের জেলা সফর, সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে কথা-বার্তা, টাকা পয়সার চিন্তাভাবনা সবকিছুই এখন বেশ একটু দ্রুততালে এগোচ্ছে।

অবশ্য আগামী বছরে এখানে নির্বাচন হবেই এমন খবর এখনও বোধ হয় সঠিক কেউই জানেন না। দিল্লি থেকে নানা সূত্রে যে সব খবর আসছে তা থেকে সবাই মোটামুটি ধরে নিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি-মারচে এখানে নির্বাচন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সে নির্বাচন হলে নাকি শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য হবে না! হবে লোকসভারও অন্তর্বর্তী নির্বাচন এবং এই লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলেই নাকি পশ্চিমবঙ্গেরও অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে।

এই প্রসঙ্গে যেসব খবর দিল্লি থেকে এসেছে রাজনৈতিক মহল তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন অজয় মুখার্জি এবং ভূপেশ গুপ্তের কথাবার্তার উপর। অজয়বাবু দিল্লি গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও দিল্লির অন্যান্য সরকারী বড় কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফিরে এসে কলকাতায় তাঁর দলের সহকর্মীদের এবং বিভিন্ন বন্ধু রাজনৈতিক দলের নেতাদের জানিয়েছেন যে, আগামী বছরই লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন হতে পারে। তিনি এই সঙ্গে এমনও মন্তব্য করেছেন: ইন্দিরা, জগজীবন এবং চ্যবন তিনজনই আমাদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের জন্য নব কংগ্রেস নেতাদের অজয়বাবুকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বলতে গেলে তাঁরা পুরোপুরি অজয়বাবুর ওপর নির্ভরশীল। তাঁদের তিনজনেরই ধারণা, অজয়বাবুকে সামনে না রাখা গেলে, সঙ্গে না পেলে পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমকে ঠেকানো যাবে না। সুতরাং, এই অজয়বাবুকে তাঁরা নিশ্চয়ই অহেতুক নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন নি।

ভূপেশ গুপ্ত প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যখন তাঁরা দুজনেই লণ্ডনে পড়াশুনো করতেন তখন থেকেই পরিচিত। এখন রাজনৈতিক কারণে দুজনের ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থে দুজনেরই দুজনকে প্রয়োজন। তাই রাজনৈতিক প্রয়োজনে একে অপরকে অনেক গোপন কথা জানান।

এহেন ভূপেশ গুপ্তও কলকাতা ছুটে এসেছিলেন দলকে এবং দলের বন্ধু বান্ধবদের তাড়াতাড়ি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে বলতে। নির্বাচন ফেব্রুয়ারি-মারচে হবেই—এমন কথা অবশ্য ভূপেশবাবুও বলেন নি। তবে, তিনিও জানিয়েছেন ফেব্রুয়ারি-মারচে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তিনিও এ কথা বলেছেন যে চলতি মাসেই প্রধানমন্ত্রী লোকসভা ভেঙে দিতে বাধ্য হতে পারেন।

রাজ্যপাল ধাওয়ানের সঙ্গে ভূপেশবাবুর আলোচনাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোচনার যেটুকু বিবরণ জানা গিয়েছে তাতেও এটা স্পষ্ট যে নির্বাচনের খুব বেশী সম্ভাবনা রয়েছে। নির্বাচনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন ব্যবস্থা কীভাবে চললে ভাল হয় ভূপেশবাবু নাকি সে কথাও বলে গিয়েছেন। রাইটার্স বিলডিংসে কোন অফিসারকে কোন্ পদে রাখলে সুবিধা ভূপেশবাবু সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন বলে শোনা যায়।

ইতিমধ্যে আরও একটা খবর বেরিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে কলকাতা এসে নব কংগ্রেস সভাপতি বাবু জগজীবন রাম কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীকে বলেছিলেন যে আগামী বছর নির্বাচন হবে। বাবুজী তাঁদের কাছে নব কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলের জন্য টাকাও চেয়েছিলেন। এ খবরটা এতদিন বেশ চাপাই ছিল। এবার জানাজানি হয়ে গিয়েছে।

*

কিন্তু তবু সবাই এখনও পুরোদমে নামতে ভরসা পাচ্ছেন না। যতক্ষণ না নির্বাচনের দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় ততক্ষণ কেউ নামবেনও না। সকলেরই ভয়, শেষ পর্যন্ত যদি ৭১-এ নির্বাচন না হয়!

নির্বাচন হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রকাশের আগে মূল জিনিসটা পরিষ্কার হবে না। মূল জিনিসটা, অর্থাৎ জোট বাঁধবার রাজনীতিটা। কে কার সঙ্গে জোট বাঁধবে, কে কার সঙ্গে রফা সমঝোতা করতে ইচ্ছুক—নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে কেউই তা পরিষ্কার করে বলবেন না। কারণ, নির্বাচনী জোট বা আঁতাত গড়তে প্রত্যেকেরই কতকগুলি অসুবিধা আছে। যতক্ষণ না নির্বাচন নিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসছে ততক্ষণ কেউই সেই অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতে চাইবেন না।

প্রথমেই আসা যাক বাংলা কংগ্রেসের প্রশ্নে। যাঁদের নিয়ে বাংলা কংগ্রেস তাঁদের কারুরই নীতিগতভাবে নব বা আদি কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করতে আপত্তি নেই। গত তিন বছরের বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতায় তাঁরা এটাও বুঝেছেন যে তাঁদের নীতি ও স্বার্থ রক্ষার জন্য এটা একান্তই প্রয়োজন। বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা এও দেখেছেন সব কমিউনিস্টরাই তাঁদের চেয়ে কত দূরে—যে-কোনও কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে তাঁদের কত তফাত। এমন যে অজয়বাবু, যিনি কংগ্রেসকে ধ্বংস করার, নির্মূল করার সংকল্প বার বার ঘোষণা করেছিলেন তিনিও কিছুদিন আগে আক্ষেপ করে কয়েকজন বন্ধুকে বলেছেন: ওদের তো এত সমালোচনা করেছি, এত খারাপ কথা

ওদের সম্পর্কে বলেছি, কিন্তু একসঙ্গে কাজ করে দেখলাম, ওরা এদের তুলনায় ভদ্রলোকমানুষ। টাকা পয়সার ব্যাপারে বল, আর অন্য যে কোনও ব্যাপারেই বল, ওরা এদের চেয়ে অনেক ভাল। 'ওরা' অর্থাৎ কংগ্রেসীরা—বিশেষ করে অতুল্যবাবু, প্রফুল্লবাবুরা। 'এরা' অর্থাৎ কমিউনিস্টরা—বিশেষভাবে সি পি এম।

বাংলা কংগ্রেসীরা তাই তিন কংগ্রেসের ঐক্য চান। বাংলা কংগ্রেসীরা তাই মনে প্রাণে চান, মূল কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসুক। কিন্তু তাঁরা জানেন, তিন কংগ্রেসের ঐক্যের কথা বলার সাধ্য নেই। কারণ, তাহলে নব কংগ্রেসীরা, বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী ভীষণ চটবেন। প্রধানমন্ত্রী সে প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হবেন না। তাই, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলা কংগ্রেস নেতারা তিন কংগ্রেসের ঐক্যের প্রস্তাব নিয়ে এগোতে পারছেন না। কারণ এখনও পর্যন্ত আদি কংগ্রেসের চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের বেশী প্রয়োজন।

বাংলা কংগ্রেসীরা সি পি আইকে মোটেই পছন্দ করেন না। যে জেলায় বাংলা কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি সেই মেদিনীপুরেই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আইর সবচেয়ে খারাপ সম্পর্ক। মেদিনীপুরের বাংলা কংগ্রেসীদের অভিযোগ, ওখানে সি পি আই বন্ধুত্বের সুযোগে তাঁদের সংগঠনকে গ্রাস করতে চাইছেন। ওঁদের আরও অভিযোগ, মেদিনীপুরে জমি দখল প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁরা দেখেছেন মূলত সি পি এমের সঙ্গে সি পি আইর তফাৎ নেই। সি পি আইও লাইন মারদাঙ্গা, অত্যাচার, জুলুম, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে দল বাড়াচ্ছে। মজঃফর, চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি জেলার বাংলা কংগ্রেসীদেরও তাই অভিযোগ।

সুতরাং, সাধারণভাবে বাংলা কংগ্রেসীরা সি পি আইর সঙ্গে ঐক্য চান না। কিন্তু তাঁদের দলের নেতারা বোঝেন, সি পি আই এবং অন্যান্য কয়েকটি বামপন্থী দলের সাহায্য ছাড়া সি পি এমকে হারানো কঠিন। শুধু নব কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে তা হবে না। নেতাদের কাছে এবং সাধারণভাবে বহু কর্মীর কাছেও সি পি এমই এক নম্বর শত্রু। তাঁরা সকলের আগে সি পি এমকে হারাতে চান। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের সি পি আইর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার কথা ভাবতে হচ্ছে

কিন্তু বাংলা কংগ্রেস তা বলে আট পারটির জোটের অধিকাংশের ইচ্ছা মত নব কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করে আসতে রাজী নন। বাংলা কংগ্রেসের নেতাদের, বিশেষ করে অজয়বাবুর মনে এ ব্যাপারে খুব বেশী সন্দেহ নেই যে, আট পারটির সঙ্গে বাংলা [illegible] মিলিত হলে নির্বাচনে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন। কিন্তু অজয়বাবু এটা জানেন যে তাহলে তারপর তিনি আবার আট পারটির তিন বড় শরিক, অর্থাৎ সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক এবং এস ইউ সির খপ্পরে গিয়ে পড়বেন। তখন তাঁকে হয় প্রধানত তাঁদের চাপমত সরকার চালাতে হবে, না হয় আবার সরকার ছাড়তে হবে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যদি বেশ কিছু এম এল এ নিয়ে নব কংগ্রেস থাকেন তাহলে তিন বামপন্থী দল অতটা চাপ দিতে সাহস পাবেন না।

সুতরাং অজয়বাবু, নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস এবং আট পারটির নির্বাচনী সমঝোতা চান।

*

এমনি, প্রত্যেকেরই বহু সংকট। ধরুন, রাজ্যের নব কংগ্রেসীদের প্রশ্ন। তাঁদেরও অধিকাংশ সি পি আই প্রভৃতির সঙ্গে সমঝোতার ঘোরতর বিরোধী। তাঁদের কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে সি পি আই প্রভৃতির সাহায্য ছাড়া শুধু অজয়বাবুকে সামনে রেখে এবং বদরুদ্দোজা সাহেবকে সঙ্গে নিয়েই তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমকে হারাতে পারবেন।

কিন্তু তাঁদের বড় অসুবিধা, প্রধানমন্ত্রী এবং অজয়বাবু তাঁদের এই হিসাবে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা দুজনেই মনে করেন, সি পি এমকে হারাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হলে সি পি আই সহ কয়েকটি বামপন্থী দলকেও সঙ্গে চাই। রাজ্যের সি পি আই বিরোধী নব কংগ্রেসী নেতাদের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী এবং অজয়বাবুর ইচ্ছা বিরোধী কোনও কাজ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং, তাঁরা যেভাবে যত সি পি আই বিরোধিতার চেষ্টাই করুন না কেন, মানসিকভাবে তাঁদের সি পি আই প্রভৃতির সঙ্গে সমঝোতা করার জন্যই প্রস্তুত হতে হচ্ছে।

কিন্তু [illegible] আইর সঙ্গে সমঝোতা [illegible] পোষণ করলে এ রাজ্যে [illegible] ভীষণ চটবেন [illegible] তাঁরা যত [illegible] সম্ভব সেই ঘোষণা আটকে রাখতে চান।

সি পি আইর আরও সংকট। তাঁদের জাতীয় নীতি নব কংগ্রেসের সঙ্গে যথাশীঘ্র সম্ভব আঁতাত করা। কিন্তু এখানে দলের অনেকে তাতে যেমন রাজী নন, তেমনি ফরওয়ারড ব্লক, এস ইউ সি প্রভৃতি তাঁদের আট পারটি জোটের শরিকদেরও তাতে ঘোরতর আপত্তি। আবার এখানের নব কংগ্রেসীরাও এখনও পর্যন্ত তাঁদের পক্ষে উৎসাহব্যাঞ্জক কোনও কথাই বলছেন না। এ অবস্থায় সি পি আই কী বলবেন! সুতরাং যতক্ষণ না বাধ্য হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁরাও প্রকাশ্যে কিছু বলতে রাজী নন।

ফরয়ারড ব্লক, এস ইউ সিরও তেমনি সংকট। তাঁদেরও প্রধান শত্রু সি পি এম। কিন্তু সি পি এমকে হারাবার জন্য তাঁদের পক্ষে নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানো সম্ভব নয়, অথচ বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি আই নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে আগ্রহী। এই দুই দল যদি তাঁদের ছেড়ে চলেই যান তাহলে ফরোয়ারড ব্লক ও এস ইউ সি কী করবেন? সি পি এমের সঙ্গে যাবেন? তাও সম্ভব নয়। কারণ তাঁদের অভিজ্ঞতা, সি পি এম ক্ষমতা হাতে পেলে শত্রু মিত্র সবাইকেই পিটিয়ে বৃন্দাবন দেখায়।

সুতরাং, তাঁরা চাইছেন চাপ দিয়ে এ রাজ্যে সি পি আইকে নব কংগ্রেসের কাছ থেকে দূরে রাখতে এবং ভাবছেন সি পি আই না এগোলে, জোটে বসে থাকলে বাংলা কংগ্রেসও সবাইকে ফেলে নব কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে পারবেন না।

১-১১-৭০।

নবারুণ গুপ্ত

নাসেরোত্তর মিশর

দেবরাজ

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি গামাল আবদেল নাসেরের মৃত্যু হয়েছে চল্লিশ দিন আগে সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর। সে মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে হলেও তামাম আরব দুনিয়ায় এমন অস্বাভাবিক ঘটনা আর কিছু ইদানীং ঘটেনি। নাসের মারা গেছেন মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে—তিনি রাজা ফারুককে তাড়িয়ে আর জেনারেল নজিবকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন যখন তাঁর বয়েস মাত্র চৌত্রিশ। আঠারো বছরের বেশী তিনি গদিতে ছিলেন না। কিন্তু ওই আঠারো বছরেই তিনি কেবল মিশরের ইতিহাসে নয়--কেবল আরবদের ইতিবৃত্তেও নয়—সারা দুনিয়ার বৃত্তান্তে যে ছাপ রেখে গেছেন তা কোনও দিনই মুছে যাবে না। নাসের ছিলেন শুধু মিশরের নয়, সমস্ত আরব দেশেরই প্রাণপুরুষ। আরবদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনিই, তাঁর চেষ্টাতেই আরব দেশগুলির মধ্যে একটা ভাবগত একতা দেখা দিয়েছে যার মূলে আছে ধর্মীয় গোঁড়ামি নয়, দেশাত্মবোধ। সব আরব জাতের লোকদের নিয়ে একটা অখণ্ড রাষ্ট্র গড়ে তোলবার সংকল্প তাঁকে অনেক আগে ছাড়তে হলেও তাদের মধ্যে মিল আনার চেষ্টা তিনি আমৃত্যু করে গেছেন।

নাসেরের সঙ্গে দোস্তি ছিল রুশিয়ার আর সেই বাবদে সব কম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গে। অথচ কম্যুনিস্ট তিনি ছিলেন না, যদিও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। সে সমাজতন্ত্র মস্কো কিংবা পিকিং মার্কা নয়। কম্যুনিস্ট পার্টিকে তিনি বেআইনী দল বলে দেশ থেকে উৎখাত করে ছিলেন। তবুও তিনি যে রুশিয়ার সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন তার কারণ তিনি চেয়েছিলেন পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কম্যুনিস্টদের অবনিবনার সুযোগ নিয়ে নিজের দেশের উন্নতি করতে। মস্কোর কাছে দরবার করতে কোনও দিন তিনি যেতেন কিনা সন্দেহ যদি ওয়াশিংটন তাঁর দাবি মেটাতে পারতো। সে দাবি মেটানো ওয়াশিংটনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেন না তা হলে তার আশ্রিত ইস্রায়েলের অবস্থা হয়ে উঠতো শোচনীয়। তাই মিশর আর ইস্রায়েলের মধ্যে আমেরিকা বেছে নিয়েছিল ইস্রায়েলকে। তখন রুশিয়ার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া মিশরের গতি ছিল না। পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে আরবদের সঙ্গে রুশীদের আর ইহুদিদের সঙ্গে আমেরিকানদের জোট বাঁধা।

নাসেরের আকস্মিক মৃত্যুতে আরব দুনিয়ায় শুধু বিষাদের ছায়াই নেমে আসেনি, এসেছে উৎকণ্ঠা আর ভয়ের ছায়াও। নাসেরের বিরাট ব্যক্তিত্ব তো আরব দুনিয়ায় আর কারুর নেই--মিশরেও নয়, মিশরের বাইরেও নয়। আরব একতা তা হলে কী আর টিকবে না? রেষারেষি আর ঈর্ষার ঘূর্ণীপাকে তা কী তলিয়ে যাবে? এক হয়ে আরবরা কী আর ইস্রায়েলের মহড়া নিতে পারবে? রুশিয়া নাসের-ছাড়া মিশরে কোন্ মূর্তি ধারণ করবে? তারা আরবদের বন্ধু থেকে তাদের যেমন সাহায্য দিচ্ছিল তেমনই দিয়ে যাবে, না এই সুযোগে ও অঞ্চলে কম্যুনিস্টদের প্রভাব বাড়াতে চাইবে? ৬ নভেম্বর পর্যন্ত যে অস্ত্রসংবরণের করার দু' পক্ষ করেছে তা কী ইস্রায়েল মেনে চলবে, না আরবরা এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে এই মনে করে হঠাৎ ইহুদিরা আবার অতর্কিতে আক্রমণ চালাবে? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নাসেরের শূন্য আসনে যিনি বসবেন তিনি দেশেই বা কতটা শান্তি বজায় রাখতে পারবেন আর দেশের শত্রুদেরই বা কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন? নাসেরের পর কী আরব দুনিয়ায় দেখা দেবে ঘোর বিপর্যয়? দারুণ অশান্তি?

দেখা যাচ্ছে নাসেরের পর আরব দুনিয়ার ভবিষ্যৎ ভেবে যাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন তাঁরা যেমন ভুল করেছিলেন তেমনই যাঁরা উল্লসিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে ইস্রায়েলের এবার পোয়া বারো তাঁরাও তেমনই। শোকে দুঃখে মুহ্যমান হলেও মিশর ভেঙে পড়েনি, সে দেশে অরাজকতা দেখা দেয়নি। এককালে রাজা মারা গেলে তাঁর সিংহাসন নিয়ে কুকুর বেড়ালের যে লড়াই শুরু হতো তা কায়রোতে দেখা যায়নি। শোকের প্রথম ধাক্কাটা সামলেই মিশরীরা নতুন নির্বাচনের পালা সাঙ্গ করে ফেলেছে। নির্বাচন হয়েছে নাসেরের মৃত্যুর আঠারো দিন পরে, তার দু' দিন পরে হয়েছে নতুন রাষ্ট্রপতির অভিষেক। যাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন নাসেরের হঠাৎ মৃত্যুতে মিশরের রাজনীতিতে দেখা দেবে অনিশ্চয়তা, শুরু হবে ক্ষমতার লড়াই, যার ফলে দেশটা ছারখার হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, তাঁদের কোনও কথাই ফলেনি। মিশরে নির্বাচন হয়েছে আর পাঁচটা দেশের মত সুশৃংখলভাবে, সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী। মারামারি কাটাকাটি হয়নি, পুলিশ গোলাও চালায়নি। লোকে শান্তভাবে ভোট দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে নতুন রাষ্ট্রপতি তাদের মনের মত কিনা।

মিশরের প্রেসিডেন্ট এখন আনওয়ার সাদাত। নাসের তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করেছিলেন গত বছর ডিসেম্বর মাসে। নাসেরের তিনি সমবয়সীও। দু'জনে অনেক দিনই এক পথের পথিক। ক্ষমতা হাতে নিয়েই তিনি যে বলেছেন নাসেরের পথই তাঁর পথ সেটা নেহাত কথার কথা নয়। তাঁর ওপর নাসেরের অগাধ বিশ্বাস না থাকলে তাঁকে নাসের কখনই এই ডামাডোলের দিনে ভাইস প্রেসিডেন্টের গদিতে বসাতেন না। প্রজাতন্ত্রী আরবের একমাত্র রাজনৈতিক দল আরব সোস্যালিস্ট ইউনিয়ন তাঁকেই রাষ্ট্রপতির পদের জন্য বেছে নিয়ে নাসেরের ইচ্ছেই পূর্ণ করেছেন বলে মনে হয়। শতকরা নব্বইটি ভোটও যে তাঁরই বাক্সে পড়েছে তাতে প্রমাণ হয় লোকের ধারণাও তাই। শোনা যাচ্ছে নাসের নাকি চুপি চুপি কাকে বলে গেছেন তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন ডঃ জাকারিয়া মহীউদ্দিন। এসব আসলে গুজব মাত্র। লিখিত কোনও প্রমাণ ও দাবির পক্ষে নেই। সাদাতকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকলে নাসের নিশ্চয়ই তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্টের আসনে বসাতেন না।

অনেকের ধারণা সাদাতকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন কোসিগিন মিশরী নেতাদের চাপ দিয়ে। এও বোধ হয় নিছক কল্পনা। মিশরের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি রুশ বিরোধী যদিও কম্যুনিস্ট দলের ওপর তাঁরা কেউ প্রসন্ন নন। তাঁরা সকলেই জানেন এখন রুশিয়াকে চটানো আত্মহত্যার শামিল—রুশ সামরিক সাহায্য না মিললে ইস্রায়েলের সঙ্গে পেরে ওঠা আরবদের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই সাদাত রাশিয়ার ভক্ত হোন আর নাই হোন রুশবিরোধী তিনি হতে পারেন না। তাঁর নির্বাচনে রুশীদের কোনও হাত আছে এ নেহাতই রটনা। নাসেরের পথ ধরেই তিনি চলবেন এ প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। তার মানে রুশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য তিনি নেবেন, আরব সংহতি বজায় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন আর চেষ্টা করবেন ইহুদিদের জিত করতে। নাসেরের মৃত্যুতে আর যাই হোক, পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতির রূপ একটুও বদলায়নি, তার সম্ভাবনাও আপাতত নেই।

সুনন্দর জার্নাল

'অসুস্থ শরীরের ভাবনা'

অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানায় পড়ে আছি। উঠে বসতে গেলেই মাথা ঘুরছে। এরকম অবস্থায় আশংকার চেহারাটা খুবই ছোট—'ধন নয়, মান নয়'—কিছুই নয়—কেবল নিজের বিছানায় খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকতে পারা।

কিন্তু জো কী! কাল সারাদিন কেটেছে অ্যাম্প্লিফায়ার আর 'পটকা'র (সবগুলোকে পটকা বলা যায় কিনা জানি না—এক-একটার আওয়াজে তো গোটা পাড়ার ভিত নড়ে উঠছিল) দানবিক [illegible] তানে—রাত দেড়টা নাগাদ সাময়িক বিরতি, ভোর চারটে থেকে আনন্দ-রঙ্গ আবার শুরু। অ্যামপ্লিফায়ার সম্পর্কে একটা আইন-টাইন যেন আছে বলে শুনেছিলুম, হাড়ে হাড়ে বুঝছি ও-সব গুজব মাত্র। আজও সারাদিন—বিরতিহীন সঙ্গীত-তরঙ্গ বয়ে চলেছে, হিন্দী আর বাংলা গানের সে কি প্রেততাণ্ডব! হয়তো আরো কিছুকাল পৃথিবীর অন্ন-জলের বরাদ্দ আছে, তাই দুর্বল শরীরেও আমার হার্টফেল ঘটছে না। এত অদ্ভুত ধরনের অশ্রাব্য গান লেখা যেতে পারে, সেইসব গানে এত রকম জান্তব আওয়াজ করা যায়, আর উৎকট সে সমস্ত রেকর্ডগুলোকে এতবার করে যে বাজানো যায়—আমার তা কল্পনারও বাইরে ছিল।

এই এক ঘণ্টার মধ্যে বার আষ্টেক শুনেছি: 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল।' অকালমৃত পান্নালাল ভট্টাচার্যের দুর্ভাগ্য (না-না, আমারই) এমন দরদ দিয়ে গাওয়া গানটিও আমার মর্ম-যন্ত্রণা হয়ে উঠেছে। যতদূর খবর পেয়েছি শ্যামাপুজোর পরম উৎসাহী যুবকবৃন্দের দুর্দিন এই আনন্দের বন্যায় সাধও মেটেনি, আশাও পোরেনি; তাঁরা আরো দিন তিনেক প্রতিমা প্যাণ্ডেলে রেখে দেবেন এবং এই সঙ্গীতের মহোৎসব সমানে চালিয়ে যাবেন। তার ফল কী হবে জানি না। আপাতত এই মুহূর্তে বুক ভাঙা আর্তনাদে আমার গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে: 'আমি জনমের শোধ ডাকি মা তোমারে—' ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং পরের সংখ্যা 'দেশ'-এ যদি 'সুনন্দর জার্নালের পাতা অদৃশ্য হয়—আশা করি তা হলে আপনারা কেউই বিস্মিত হবেন না।

আসলে আমাদের মতো কোন কোনো কমনম্যান এখনো একটা মধ্যযুগীয় মনো-ভাবের মধ্যে বাস করছি। চারদিকের পৃথিবী, মানুষ এবং মেজাজ যে-রকম বৈদ্যুতিক গতিতে বদলে যাচ্ছে—সেটা আমরা ভালো করে ধরতেই পারছি না। চাঁদার সঙ্গে সঙ্গে যখন থেকে ছোরা বেরুতে আরম্ভ করেছে, [illegible] থেকেই আমাদের উৎসবেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন সবটাই প্রবল, বলিষ্ঠ, প্রায় প্রলয়ংকর। কালীপুজোর বাজী-পটকা বরাবরই ছিল, পকেটভর্তি আছাড়ে-পটকা যে আমাদেরও থাকত না, তা নয়—কিন্তু আজকের এই গগনবিদারী বোম-পটকা? এমন শব্দব্রহ্মের কথা আমরা ভেবেছি নাকি তখন? এবং এই অ্যামপ্লি-ফায়ার?

আজকে সারা ভারতবর্ষে লাল ত্রিকোণের প্রবলতম ঘোষণা। হিমালয়ের নির্জন পাহাড়ীপথের বাঁকেও চোখের সামনে ধক্ করে ওঠে: 'দো ঔর—!' তা ভালো। জন-সংখ্যার অতিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যদি বিজ্ঞান-সম্মত অভিযান চলে তো চলুক। কিন্তু আমার ধারণা, এই সঙ্গে আর একটি আন্দোলনও জুড়ে দেওয়া যাক: 'আরো বেশি অ্যাম্প্লিফায়ার চালান, প্যাণ্ডালে অন্তত এক মাস করে প্রতিমা রেখে দিন, উৎসবের দিনে আরো বেশি শব্দময় বোম-পটকা ফাটাতে থাকুন।' ত্রিকোণ-টিকোণে কাজ যাই হোক, এর অব্যর্থ ফল অচিরাৎ পাওয়া যাবে, লোকক্ষয় ঘটাবার জন্যে এমন অমোঘ উপায় আর নেই।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে এল: বিভক্ত বাংলা দেশে বাঙালীর সংখ্যা কত এখন? তিন কোটি? চার কোটি? ঠিক জানি না—আমার কেবল অবিভক্ত বাংলাকেই মনে আসে। সংখ্যাটি আপনারাই ঠিক করে নিন। কিন্তু চার কোটি-তিন কোটি—যাই হোক, এই বিশাল লোকসংখ্যা যদি আর না থাকে, অর্থাৎ এই বাঙালীরা যদি লুপ্ত হয়—তা হলে ভারতের খাদ্য-সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয় কি না, জনগণের সমৃদ্ধি অনেকটা এগিয়ে যায় কিনা?

নিশ্চয়ই যায়। এবং "মহামতি গোখলে (অথবা গোখেল) যেরূপ বলিয়াছিলেন"—ভারতের 'অগ্রগামী' বাঙালী আত্মধ্বংসের পথে আজও পায়োনীয়র হয়েছে।

সবিনয়ে আবার বলি, রাজনীতির ঘোর-প্যাঁচে আমি নেই। আশৈশব কুশিক্ষার ফলে নিতান্তই বিমূঢ়ের মতো নিজের দেশটাকে কিঞ্চিৎ ভালোবেসে ফেলেছি—ত্যাগে, দুঃখে, সাধনায়, মনীষায় যাঁরা আমাদের পরিচয় আর ইতিহাস গড়ে তুলেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আমার কিছু শ্রদ্ধা আছে। আজ নির্বিচারে তাঁদের ছবি আর মূর্তির কল্পনাতীত অবমাননা দেখে ধারণা জন্মেছিল—এ সমস্ত ডাহা পাগলের কাণ্ড, কোনো রাজনৈতিক [illegible] বিপ্লবী [illegible]রা হোন না কেন, যে-ডালে বসে আছেন, সেই ডালের গোড়ায় কুড়ুল বসাবেন—এমন কাঠালে বুদ্ধি তাঁদের থাকতেই পারে না। কোনো দেশে, কোনো কালে, এমন পরমাশ্চর্য বৈপ্লবিক কর্মনীতির উদাহরণ পাওয়া যাবে না।

এখন বুঝতে পারছি, আমিই নির্বোধ। এ হল আমাদের উজ্জ্বলতম আত্মত্যাগের সূচনা—আত্মলুপ্তির 'অয়মারম্ভ'। প্রথমে ইতিহাস এবং পরিচয়ের নিপাতন—তারপরে পরমানন্দে পারস্পরিক বিঘাতন। শেষে শ্মশানের শান্তিতে বাঙালী চিরনিদ্রিত, ভারতবর্ষ তিন কোটি বা চার কোটির একটা বিরক্তিকর বাড়তি বোঝা থেকে মুক্ত—আগামী দিনের ইতিহাসে আমাদের এই মহান "আত্মত্যাগ"—যাকে বলে "স্বর্ণাক্ষরে" লেখা থাকবে।

এক দিনের পুজোর পাঁচ দিন ধরে হৃৎস্পন্দনরোধকারী এই পৈশাচিকপ্রায় উৎসব, এই সঙ্গীতের বিভীষিকা, এই পাড়া-কাঁপানো কান-ফাটানো হার্ট-অ্যাটাক জাগানো বোম-পটকা, এই মূর্তিভাঙার বিপ্লব—একটু তলিয়ে দেখলে সব একটিই কর্মনীতির অংশ—সমস্তই একসূত্রে গাঁথা। বাঙালীর নাভিশ্বাস ঘনিয়ে আসছে। কিংবা—আরো স্পষ্ট ভাষায়, ঘনিয়ে আনা হচ্ছে। এরা সবই লাল ত্রিকোণের পরিপূরক।

আমাদের গৃহের অদূরে যে সংগীত সুধা এবং বোমাধ্বনি উৎসারিত হচ্ছে, তা নাকি আরো তিন দিন চলবে। সুতরাং অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় সুনন্দের পাতাটি যদি না থাকে, তাহলে জানবেন, আর একটি কমনম্যান বাঙালীর অবলুপ্তি বা আত্ম-বিসর্জন ঘটল।
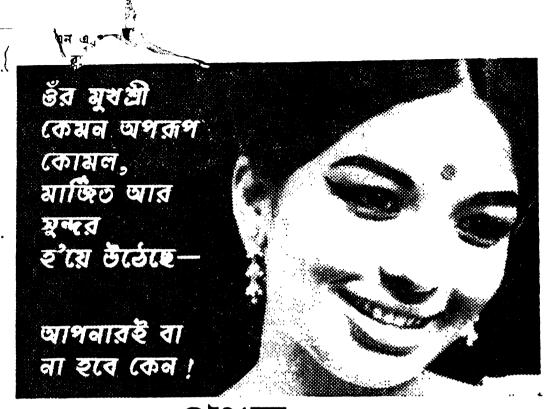
শুধু চাই পণ্ডস কোল্ড ক্রীম আর
পণ্ডস-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা!

আপনার মুখশ্রী
খুবই তাড়াতাড়ি আরো কোমল,
মার্জিত আর লাবণ্যময়
ক'রে তুলতে চান—তাই না?
পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মাখলে
তাই হবে—মাত্র ৭ দিনে!

এই পরিকল্পনা কিভাবে কাজ করে

এক সপ্তাহ ধ'রে রোজ রাতে দুবার ক'রে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মুখে মাখুন। প্রথমবার মাখার ফলে ওপরকার ময়লা ও গোড়াকার মেক-আপ উঠে যাবে। তারপর কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলুন। আবার ক্রীম মাখুন। দ্বিতীয়-

দ্বিতীয়বার মাখাটাই হচ্ছে রূপসী হওয়ার রহস্য!

বার মাখার ফলেই রূপ ফুটে ওঠে, ত্বকের ভেতরকার লুকানো ময়লা বেরিয়ে যায় যা সাবানে ধুলেও হয় না। ত্বক নির্মল, স্নিগ্ধ-সতেজ হয়ে ওঠে।

আট দিনের দিন ঘুম ভেঙে জেগে দেখবেন আপনার মুখখানি কতো কোমল, মার্জিত আর সুন্দর হ'য়ে উঠেছে!

এর পর থেকে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম রোজ রাতে দুবার ক'রে নিয়মিত মেখে যান—আপনার মুখশ্রী বরাবর অপরূপ সুন্দর দেখাবে।

চীজব্রো-পণ্ডস ইনকরপোরেটেড
(সীমিত দায়ে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম—এই মুখশ্রী নির্মলকারী ক্রীমই দুনিয়ায় কাটতিতে সবার ওপরে

হনুমানের জীবন ও মৃত্যু

তাকে পার হ'তে হবে—এ-ই প্রত্যাদেশ।
কিন্তু এসে দ্যাখে :
না তরণী, না কোনো সেতুর চিহ্ন,
না কোনো বপুষ্মান তিমিঙ্গিল, সন্তরণে ক্লান্তি নেই যার,
কিংবা মহাবিহঙ্গম—দূরযাত্রী,
কিংবা যোগসিদ্ধ মুনি, জলে যিনি পা ফেলে চলেন।
সমুদ্র—সমুদ্র শুধু :
সুবিস্তীর্ণ নিষেধ, চক্ষুর সীমা, শ্রবণে আহ্বান
নিস্বনিত তরঙ্গে প্রবহমান।
আর দিন-রাত্রির সন্ধির লগ্ন—ধূসর, ধবলস্পৃষ্ট,
উৎকণ্ঠিত যেন অপেক্ষায়।
—ভয়। অনিশ্চয়তার কুণ্ঠা। যেন অসম্ভব।
তবু পার হ'তে হবে, এই সে পেয়েছে প্রত্যাদেশ।

কিন্তু সে—কে?
যোদ্ধা, বীর, মন্ত্রবেত্তা—কিছু নয়,
এমনকি মনুবংশে জন্ম নয় :
অনেক বানরমাত্র, হয়তো বা কিঞ্চিৎ মানব,
অন্তত বুকের তলে আছে এক ইচ্ছুক হৃদয়,
কোনো অনির্দেশ লক্ষ্যে—আশায় তন্ময়।
—অন্য কিছু নেই।

কিন্তু আছে। এক সূক্ষ্ম, গোপন সংকেত।
কোনোখানে কোনো-এক রাজকন্যা
একদা, ক্ষণিক-দৃষ্টা, অস্পষ্ট—স্বপ্নের মতো পলাতক।
...সেই শৈলশৃঙ্গে, সেই বিশাল মধ্যাহ্নজ্যোতি,
ক্রীড়াশীল তারা পঞ্চ বানর সেদিন।
অকস্মাৎ
গতির সংঘাতে কাঁপে জম্বুবন; কাক, চিল চীৎকৃত অস্থির।
আনমুক্ত বাণের মতো ত্বরান্বিত রথে
অন্তরীক্ষ দীর্ণ ক'রে চ'লে যায় লৌহকান্তি বিরাট পুরুষ,
আর অন্য একজন :
স্রস্ত কেশ, ঈষৎ কপোল,
একটি দুঃখিনী বাহু, যার প্রান্ত থেকে
যেন মাতা-মাধবীকে অভিজ্ঞান-প্রণাম জানাতে
খ'সে পড়ে উত্তরীয়, কেয়ূর, কঙ্কণ।
তারা পাঁচজন
দেখেছিলো সেটুকু সময়মাত্র, পরস্পর যাতে বলা যায় :
'কে? কারা? কোথায়?'
তারপর আকাশ আবার শান্ত, পক্ষীরা নীরব।
কিন্তু সেই মধ্যাহ্নের অন্তরালে
জ্যোতি হ'য়ে ওঠে গান, বেজে ওঠে স্তব্ধতার মর্মভেদী সুর,
বেদনায় অভিষিক্ত, ক্রন্দনে বিজয়ী,
মনোলীন মূর্ছনায় আশ্চর্য মধুর।
অন্তত তা-ই শুনেছিলো।

শুনেছিলো—এখনো ভোলেনি।
অন্যেরা—ভ্রাতৃব্য তার—অব্যাহতভাবে
ফিরে গিয়ে বানরস্বভাবে
রাজ্যের মদস্রাবে হয়েছিলো সর্বাঙ্গে সিক্ত।
মগ্ন হ'য়ে পায়সান্নে, মদিরায়, কামিনীকোটরে
টেনেছিলো স্মরণে গুণ্ঠন।
ততক্ষণ
সে ছিলো অন্যত্র, দূরে, অরণ্যের সুস্নিগ্ধ নির্জনে,
অথচ বিশ্রান্ত নয়—চিন্তান্বিত।
যেহেতু সে ইতিমধ্যে
হারিয়েছে পশুদের আত্মীয়তা, অন্য কোনো ইচ্ছার পীড়নে।
যেহেতু জান্তব দেহে
হ'য়ে গেছে আরম্ভ নূতন ছন্দে হৃদয়স্পন্দন।
যেহেতু—ভোলেনি।

তাই, শুধু তারই জন্য এই প্রত্যাদেশ।

এবং এখন
কম্পমান ধূসর-ধবলে
যখন দিগন্তের অবরোধ মাঝে-মাঝে ঈষৎ-উন্মীল,
সমুদ্রের মুখোমুখি, নিরুত্তর সৈকতে দাঁড়িয়ে
সে ভাবে :
'আমি কি দেখেছিলাম? শুনেছিলাম?
না কি ভ্রান্তি? প্রতিভাস? কর্ণের কুহক?'
—ভয়। অনিশ্চয়তার কুণ্ঠা। নিপট সংশয়।

আর সেই মুহূর্তেই কেটে গেলো অপেক্ষার পাণ্ডুর মণ্ডল।

যেন দীর্ণ ফলত্বক থেকে
দাড়িম্বের উজ্জ্বল বিকীর্ণ বীজ,
সেইমতো উষার অরুণবিন্দু প্রস্ফুটিত হ'লো
আকাশে, আনীল জলে, তরঙ্গফেনায়।

আর তাকে নিয়ে গেলো তুলে
তার সদ্যজাগ্রত নিয়তি, যেন দুর্বার বাতাস।

আর তার হ'লো অনুভব
সে যেন পুরন্ত, পূর্ণ বন্দনীয় বদান্য বাতাসে।
নিখিল মরুৎগণ, প্রেরণায় প্রসিদ্ধ পবন
যেন তার অন্তরে প্রবিষ্ট হ'য়ে,
স্নায়ুতন্ত্র হৃৎপিণ্ডের কন্দরে ছড়িয়ে,

[illegible] দিকে চেয়ে [illegible]
[illegible]
[illegible] জড়িয়ে
তাকে ক'রে তো[illegible] [illegible]ত—অতিকায়,
যেন প্রায় মহান,
নিশ্বাসে পশুর মতো অতি লঘু,
বিশ্বাসে শিশুর মতো নিতান্ত সরল।
সঙ্গে-সঙ্গে তার
সর্বান্তঃকরণ যেন বুঝে নিলো পথের নির্দেশ,
শিখে নিলো দক্ষতা, গতির লক্ষ্য, আক্রমণ, আত্মসমর্পণ—

এবং হঠাৎ শূন্যে উঠে গেলো, অবিশ্বাস্যভাবে।

ঊর্ধ্বে,
দূরে,
আরো দূরে—
বেগবান, আরো বেগবান,
পুষ্পকরথের চেয়ে তীব্রতর,
যন্ত্রের চেয়েও আরো নির্ভুল-সক্ষম,
আনন্দিত, চেষ্টাহীন, সংকল্পে ও সম্পাদনে অব্যবধান—
সাবলীল সামঞ্জস্যে ধাবমান
যেন যূথবদ্ধ ঊনপঞ্চাশ বাতাস।
সূর্য
তরুণ, আরোহমাণ, এখনো রক্তিম,
অক্ষয় ফলের মতো তাকে প্রতি মুহূর্তে জোগায় পুষ্টি।
ব্যোম
যেন স্বচ্ছ বিশাল স্ফটিকভাণ্ড,
তার কণ্ঠে ঢেলে দেয় অসিবর্ণ ওজস্বী মদিরা।
চক্ষু
দ্যাখে এক দেশান্তর, রমণীয় ভীষণ কানন,
রাজকন্যা—অপহৃতা—চিরন্তনী,
দুঃখিনী মুখের রেখা, রুক্ষ কেশ, পিঙ্গল বসন।
শ্রুতি
শোনে শুধু শব্দহীন বিলাপগুঞ্জন,
যেন মর্মাহত প্রকৃতির
অন্তর্লীন বেদনার অনুতক্ষরণ।
প্রাণ
অন্তরালহীন এক নবজন্মে পায় তার নিজের সন্ধান।
আর সিন্ধু
বেগের ঝঞ্ঝায় বিবসন,
পরাজিত নিম্নে প'ড়ে থাকে
বিস্তীর্ণ কাঁথার মতো, যার সূক্ষ্ম সীবন-চিত্রণে
উদ্ঘাটিত শঙ্খ, মুক্তা, মকর, শুশুক।

এইভাবে উত্তীর্ণ হ'লো সে—
যার মাতা বিশিষ্ট বানরী, কিন্তু যার পিতৃপরিচয়
এতদিনে প্রমাণিত—এইমাত্র।

বহু ~~বর্ষ বহু~~ তূর্যনাদ,
আবাহন, বিসর্জন, রটনা, ঘটনা,

তারপর সমতল দৈনন্দিন, অতি দীর্ঘ অর্থহীন গতানুগতিক—
এই সব যখন অতিক্রান্ত :
একদিন
নিঃস্রোত পম্পার তটে, বৃক্ষতলে—
ক্লান্ত,
বৃদ্ধ,
ক্ষুদ্রকায়,
পরাঙ্মুখ ভঙ্গিতে শয়ান—
সে ভাবে :
'আমি কি করেছিলাম? পেরেছিলাম?'
চেষ্টা করে নিজেকে নাড়াতে, কিন্তু দেহ দেয় না উত্তর,
বাহুল্য বোঝার মতো প'ড়ে থাকে বিখ্যাত লাঙুল।
চেষ্টা করে স্মরণ জাগাতে, কিন্তু সব যেন ধূসর, ধূসরতর—
যেন তার সমস্ত জীবন
বিন্দুসার ভঙ্গুর মুহূর্তমাত্র, যার মধ্যে যুদ্ধের হুংকার,
দর্পিত নগরশীর্ষে লেলিহান অগ্নির গর্জন—
তাও হ'লো যার
অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গের অস্ফুট গুঞ্জন।

আর, এইভাবে
না-বুঝে অনেক দিবা, যামিনী কাটিয়ে,
হৃৎস্পন্দ
ক্রমশ দুর্বলতর,
নিশ্বাসে
ক্রমশ আরো কষ্টভোগী,
চক্ষুপল্লবের
উন্মীলন-পতন আরো বিলম্বিত,
কখনো বা যন্ত্রণায়,
কখনো বা তন্দ্রায় বিবশ,
তিলে-
তিলে,
ধীরে-
ধীরে,
নিস্বপ্ন,
আতঙ্কহীন,
বিনা আকাঙ্ক্ষায়,
বিকারে,
বিভ্রমে,
বিস্মরণে—
যে-কোনো জন্তুর মতো মৃত্যু হ'লো তার।

কিন্তু আরো পরে,
বিপুল দূরত্ব-পারে আরো একবার
বর্ধিত বাতাস তাকে তুলে নিয়ে
ক'রে দিলো বিকীর্ণ দেশে ও কালে, যেন শস্যকণা,
যেন অন্ন, অজস্র, আবহমান,
স্বল্পবল ক্ষুধিতের উৎসব, সান্ত্বনা,
সর্বভূতে অর্পিত সম্মান।
সে—
অর্ধ-পশু, অর্ধেক দেবতা,
মৃত্তিকার গর্ভজাত স্বর্গের সন্তান।

টেলিফোন বেজে উঠল।

বৃষ্টিটা এক নাগাড়ে ঝরছে কি না, ঘরের মধ্যে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বন্ধ জানালায় বৃষ্টির ছাট লাগছে। শব্দে বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে। জানালায় শব্দ না হলে মনে হচ্ছে, বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। আসলে থামছে না হয় তো। বাতাসটা মাতালের মত টাল খাচ্ছে। যখন যেদিকে হাওয়া বইছে, বৃষ্টির ছাট সেদিকেই ঝাপটা মারছে। একেই সম্ভবত ইলশেগুঁড়ি ছাট বলে। নাগাড় বৃষ্টি, বাতাসের ঝাপটা। মুষলধারে না, এ বৃষ্টিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও বলা যায় না। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস তার সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। মাঝে মাঝে বিজলি হানাহানি। রীতিমতো খারাপ আবহাওয়া। কয়েকদিন ধরেই এই রকম দুর্যোগ চলছে।

টেলিফোনটা বাজছে। অফিস ঘর থেকে শব্দটা আসছে। দূর থেকে শব্দটাকে এক ধরনের মিষ্টি ঝংকারের মত লাগছে। শীতলের অন্তত সেইরকমই মনে হল। আবার মনে হল, না, মিষ্টি ঝংকারের মত না, মেয়েলী গলায় আদুরে মিউ মিউ শব্দের মত লাগছে। যত সব বাজে কল্পনা। কোন মেয়ে আদুরে গলায় ওরকম যান্ত্রিকভাবে মিউ মিউ করে না। আদপে মেয়েরা ওরকম আদুরে গলায় মিউ মিউ করে কি না শীতল তাই জানে না। তথাপি কথাটা মনে হল। টেলিফোনটা এখনও বাজছে। বদরী বোধহয় কাছে পিঠে নেই। থাকলে এতক্ষণ টেলিফোন ধরত। না-ই ধরুক। বাজুক। এখন অফিসের সময় না। বদরীর নিজের অনেক কাজ আছে। এখন হয়তো সে বাজারে গিয়েছে। অফিসের দরোয়ান বলে সব সময়ে তাকে অফিসের কাজ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। টেলিফোন ধরার তো কোন প্রশ্নই নেই। অফিসের সময় দশটা পাঁচটা। সরকারী অফিস। পাঁচটার পরে অফিস খালি। তারপরে আর এ অফিসে টেলিফোন করার কোন দরকার হয় না। সবাই জানে অফিসে কেউ থাকে না। এটা সরকারী অফিসের এমন একটা বিভাগও না, জরুরী প্রয়োজনে চব্বিশ ঘণ্টাই যোগাযোগের দরকার হতে পারে।

টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। জানালায় আবার বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগল। শারসিতে শন শন বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছাটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঝোড়ো মাতাল বাতাসটা এবার এদিকে টাল খেয়েছে। বৃষ্টি ধরেনি, নাগাড়ে চলছেই। এরকম অবস্থায় শীতলের মনে হয় মেঘ ঝড় বৃষ্টি একটা জেদের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। থামব না, দেখি কে কী করতে পারে এরকম একটা ভাব।

শীতল পাশ ফিরে শুল। মনে মনে বলল, 'থামার দরকার নেই। দেখা যাক কতক্ষণ চালিয়ে যেতে পারে।' শীতল বিছানার মধ্যে শরীরটাকে আরও জোরে গুঁজে দিতে চাইল। পাশ ফিরে কুঁকড়ে বেঁকে নিজেকে ছোট করে ফেললো। গলার নিচে একবার হাত দিয়ে উত্তাপ দেখল। জ্বরটা কি বাড়ল নাকি। বোধ হয় না, একরকমই মনে হচ্ছে। আধঘণ্টা আগেই থার্মোমিটারে জ্বর মেপেছে। জিভের নিচে নিরানব্বুই। ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ওর লিভার খারাপ, দাঁত খারাপ, চোখও সুবিধার না, নাকের ভিতরে কী একটা গোলমাল। পেটটা তো নাকি একটা অসুখের আস্তাকুঁড় হয়ে আছে। তব ওপরে চামড়া খারাপ। পাঁজরার পাশে দু তিনটে অদ্ভুত কালচে দাগ দেখা দিয়েছে। ডাক্তারকে সেটা দেখিয়েছে। ডাক্তার প্রথমে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে সেখানে খুব আলতো করে বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন স্পর্শ টের পাওয়া যাচ্ছে কি না। শীতল টের পাচ্ছিল। টের পাবে না কেন, ওর বেশ হালকা সুড়সুড়ি লাগছিল। ডাক্তারের তাতেও সন্দেহ ঘোচেনি। একটা পায়রার পালক

তখন হতাশ আর বিরক্ত হয়ে কেউ টেলিফোনটা ছেড়েই দিয়েছে। শীতলের বাড়ি থেকেই ডাকছিল নাকি—ওর হাত পা সোজা হল, উপুড় হল। দু হাত দিয়ে রেডিওকভারটা খামচে ধরল। হয়তো ওরই টেলিফোন এসেছিল। বড়দা বা মেজদা বা সেজদা বা নদা, কেউ হয়তো টেলিফোন করেছিল, কিংবা বউদিরা কেউ। হয়তো মায়ের শরীরটা খারাপ হয়েছে অথবা বউদিদের দিয়ে টেলিফোন করিয়ে মা কিছু বলতে চেয়েছিল। কথাটা মনে হতেই ভাবল, তাহলে ওকে এখন কলকাতায় টেলিফোন করতে হবে। ওকেই টেলিফোন করে জানতে হবে, বাড়ি থেকে টেলিফোন করেছিল কি না। সব থেকে খারাপ যে কোন সংবাদই ও চিন্তা করতে পারছে। সেজন্য ও তেমন উদ্বেগ বোধ করছে না। অথচ নির্বিকারভাবে চুপচাপ শুয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এরকম ক্ষেত্রে শীতলের মনে হয় না কিছুই ভাবে, ও যেন নিজের অধীনে নেই। ধরা যাক যদি মায়ের সম্পর্কে কোন দুঃসংবাদ জানাবার জন্যই টেলিফোনটা এসে থাকে...।

ঠক ঠক ঠক, ভেজানো দরজায় শব্দ হল। শীতল উঠে বসতে বসতে বলল, 'হ্যাঁ, কে?'

দরজাটা খুলে গেল। শীলা সিনিয়র সুপারভাইজার নিখিল দত্তর স্ত্রী। কিছু বলবার আগে শীলা শীতলকে একবার দেখে নিল। শীতলও একবার নিজেকে দেখল। চটকানো পায়জামা আর জামা। সেই তুলনায় এরকম দুর্যোগের দিনেও শীলা যথেষ্ট ফিটফাট। কত বয়স হবে কে জানে। পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যেই হবে। স্বাস্থ্য ভাল। তবে একটু ভারি হওয়ার দিকে ঝোঁক। বিশেষ করে কোমরের দিকে আর বুকে। তাতে খুব খারাপ দেখায় না। চোখ নাক ঠোঁট মিলিয়ে মুখের ছাঁদটা খারাপ না। চেহারায় একটা চটক আছে। এমন বর্ষার দিনেও কাজল পরেছে, পাউডার মেখেছে। বেশ ঝরঝরে আছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে একটা ভঙ্গি শীলার খারাপ। নতুন ব্যায়াম শুরু করা ছেলেদের মত একবার নিজের বুকের দিকে দেখে নেয়। শীতল এটা প্রায়ই লক্ষ করেছে। শীলা কেন এরকম করে কে জানে। তার বুক তো বেশ ভরাট। যাদের নেই তাদেরই এরকম করার কথা।

শীলা বলল, 'আপনার টেলিফোন।'

শীলা তা হলে টেলিফোনটা ধরেছিল। শীতল ব্যস্ত হয়ে খাট থেকে নেমে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কোথা থেকে? নাম বলল?'

শীলা ঠোঁট দুটো টিপে কেমন একটা ভঙ্গি করল যেন। শীতলের দিকে চেয়ে বলল, 'কলকাতা থেকে। নাম বলল দুদু।'

'দুদু?'

হাসত। ম্যানেজারের সম্মান বজায় রাখার জন্য বোধ হয় কম হাসত। বলল, 'হ্যাঁ, সেরকমই তো বললেন যেন। আপনার নাম করে বলতে বললেন, "বলুন, বালিগঞ্জ থেকে দুদু বলছি, বিশেষ দরকার।"'

দুদু কেন টেলিফোন করছে? শীলা একটু অবাক হয়ে বলল, 'মহিলাকে আপনি চেনেন না?'

শীতল বলল, 'মহিলা? হ্যাঁ, মানে দুদু, আচ্ছা আমি যাচ্ছি।'

শীলা বেরিয়ে গেল। শীতলের মনে হল, শীলার ঠোঁটের কোণে কেমন একটা হাসি লেগে রয়েছে যেন। কিন্তু দুদু হঠাৎ এ সময়ে এতদিন পরে শীতলকে টেলিফোন করছে কেন। তার এতক্ষণ ধৈর্য ধরে। ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে একটা ঢাকা বারান্দা পেরিয়ে অফিস ঘরে ঢুকল। টেলিফোনটা ম্যানেজারের ঘরে। কাঠের পার্টিশনে আলাদা চেম্বার। শীলা আলো জ্বালিয়েই রেখেছিল। শীতল গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে মেয়েলি গলায় প্রশ্ন এল, 'শীতলবাবু, আছেন?'

'বলছি।'

'উহ্, বাব্বা বাব্বা! এতক্ষণে সময়

থেকে ... হয় চলে আসত। কী করছিলে। ... ছিলে নাকি?'

দুদুর গলাটা স্পষ্টই চেনা যাচ্ছে। শীতল তখনও সোজাসুজি কিছু বলতে পারল না। বলল, 'না, ঘুমোইনি, বৃষ্টি আর ঝড়ে কিছু শোনা যাচ্ছে না। আপনি—'

ওপার থেকে কথা ভেসে এল, 'আমি দুদু বলছি।'

কেন সেটাই তো শীতল ভেবে পাচ্ছে না। দুদুর চেহারাটা তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। দুদুও শীলার মতই একটি বছর চারেকের সন্তানের জননী। তবে শীলার থেকে আর একটু লম্বা, বুকটাও বোধ হয় একটু বেশি। কাঁপানো করা চুল খোলা। দুদুর গরম বেশি, তাই মাথার ওপরে বোধ হয় পাখাটা খোলা আছে। দুদুর চুল উড়ছে।

দুদুর স্বরে উদ্বেগ, 'চিনতে পারলে না?'

শীতল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পারছি বই কি। অবাক লাগছে, তুমি হঠাৎ এতদিন পরে—।'

কথাটা শেষ করল না। মনে মনে ভাবল, কী কারণে দুদু ওকে টেলিফোন করতে পারে। বর্ষায় হঠাৎ শীতলকে মনে পড়ে গেল নাকি। সেরকম ভাবালুতা তো দুদুর নেই। যত আবেগ তো শুধু দুদুর নামেই। ওপার থেকে দুদুর উচ্ছল স্বর শোনা

গেল, 'শোন শীতল, বিশেষ বিপদে পড়ে তোমাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে।'

দুদুর বিপদ, শীতলের শরণ, এতো খুব আশ্চর্যের কথা। কিন্তু বিরক্ত করতে হচ্ছে কেন। জিজ্ঞেস করল 'কী ব্যাপার?'

দুদু ওপার থেকে বলল, 'অসীমের শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়েছে।'

অসীম—মানে দুদুর স্বামী। অসীমের শরীর খারাপের সঙ্গে শীতলের বিরক্ত হওয়ার কী সম্পর্ক। ও জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

দুদু বলল, 'ডাক্তাররা অবিশ্যি বলছে, তেমন কিছু না। তবে টেম্পারেচারটা খুবই হাই। জান তো, কী রকম অত্যাচারী, একটা কথা শোনে না...।'

দুদুর গলায় এখন যে সুর বাজছে, তাকে বোধ হয় মমতা ভালবাসা বলে। তার সঙ্গে উদ্বেগ। অত্যাচারী মানে অসীম অতিরিক্ত পানাসক্ত। সে কথাই বোধ হয়, বলতে চাইছে। কিন্তু তাতেও শীতলের কী করবার আছে।

দুদু বলেই চলেছে, 'এরকম অবস্থায় আমি চুপ করে থাকি কেমন করে বল। ওদের বাড়িতে একবার জানানো দরকার।'

শীতলের মনে পড়ে গেল, অসীমদের বাড়ি এ শহরেই, মাইল তিনেক দূরে। আর কিছু শোনবার নেই, এখন শীতল নিজেই বলে দিতে পারে, দুদু কী বলতে চায়। শীতলকে গিয়ে সেখানে খবর দিতে হবে। দুদুর গলা শোনা যাচ্ছে, 'তোমার কথা ছাড়া আর কার কথা মনে পড়বে। এও আমার ভাগ্য, তুমি ওখানে আছ। বুঝলে শীতল—।'

'বল।'

'বিরক্ত হচ্ছ?'

'না না, তুমি বল না।'

কারণ শীতলের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে, ও কিছুই করবে না। তবে সবই শুনতে হবে, কথাও দিতে হবে। এ অবস্থায় যা যা বলা উচিত, সবই বলবে। দুদু বলছে, 'ভেবেছিলাম, কাল সকালে তোমাকে টেলিফোন করে বলব। অসীমদের বাড়িতে তো টেলিফোন নেই, তুমি ছাড়া ওখানে আমার আর কেউ জানাশোনাও নেই। কিন্তু কাল সকাল পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। আজ রাত্রেই অসীমদের বাড়িতে খবরটা দেওয়া দরকার...।'

যেটা একেবারেই অসম্ভব, শীতল মনে মনে ভাবল। দুদুর গলা, 'আমার শ্বশুর মশায়ের শরীর ভাল না। আমার শাশুড়ি যেন তাঁর এক ছেলেকে নিয়ে আজ রাত্রেই চলে আসেন, এ খবরটা দিতে হবে। তুমি তো দু একবার অসীমদের বাড়িতে গেছ, চেন। কোনরকম ভাবে যদি একটু সংবাদটা পৌঁছে দেওয়া যায়...।'

দদু তাড়াতাড়ি বলে উঠল,'মনের অবস্থা মেন তোমার কথা জিজ্ঞেসই করলাম না। তুমি ভাল আছ তো।'

শীতল বলল, 'এই আছি একরকম।'

কী হবে নিজের অসুস্থতার কথা বলে। দদুর কথা শীতলকে আরও অসুস্থ করছে। স কথা দদুকে বলা যায় না। দদু আবার লল, "নিরুপায় হয়ে তোমাকে বললাম বরটা—।'

'আমি দেখছি।'

'বিরক্ত হচ্ছ না তো?'

'আরে না না, এতে আবার বিরক্ত হওয়ার ী আছে।'

দদু টেলিফোন ছেড়ে দেবার আগে, হবার বলল, 'তা হলে আমি নিশ্চিন্ত লাম। বলবে ওদের বাড়ি থেকে কেউ ন নিশ্চয়ই আসে. আজ রাত্রেই। আমি ভয় পাচ্ছি।'

শীতল বলল, 'ঠিক আছে।'

দদু তবু বলল, 'ছাড়ছি তা হলে। র তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'আচ্ছা।'

দদু বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই যেন রিসিবার রেখে রাখল। শীতল নির্বিকারভাবে সভার নামিয়ে আলো নিবিয়ে ওপারে ঘর থেকে চলে এল। সাসপেন্ডেলটা খুলেই লাম। খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, এই গের মধ্যে তিন মাইল ঠেঙিয়ে কোথায় কোন গলি খুঁজিতে অসীমের খবর য়েতে হবে। শীতলকে কে দেখে, ঠিক নেই, দদুর স্বামী অসীমের দিতে যাবে ও। একমাত্র কারণ, এক দদুর সঙ্গে শীতলের খুবই বন্ধুত্ব। প্রেমও বলা যায় সেটাকে। শীতল ত তাই বিশ্বাস করত। পরিণতি কী সঠিক কিছু আন্দাজ করে উঠতে নি। কারণ দদুকে বিয়ে করতে চায়, য অনেক ছেলে ছিল। দদু নিজেও ট সচেতন ছিল।

সীম এই মফস্বল শহর থেকে তায় পড়তে যেত। তখন থেকে দের সঙ্গে পরিচয়। তারপরে অসীমের। সব ছেলেদের কাছেই দদুর একটা আকর্ষণ ছিল। শীতলের ধারণা, ংশ মেয়েই মনে মনে বেশ ভাব এবং গপ্রবণ। যে কোন বিষয়েই। বিশেষ ছাত্রাবস্থায় কাব্যিক ভাবও অনেকেরই। দদুর সে সব ছিল না। ও খুব স্বচ্ছন্দে ছেলেদের সঙ্গে মিশত। বন্ধু ওর অনেক ছিল। ছেলেদের শ ভাল বুঝত। শীতলের সঙ্গে যে প্রেম হয়েছিল এরকম ধারণার অনেক আছে, অনেক ঘটনা আছে। দদু কথা প্রায়ই ওকে বলত, 'তুমি এত ভাব কর কেন। এত নিরীহ হলে মত বউকে নিয়ে তুমি সামলাবে

দেয়ে চেয়ারে [illegible]

গোবেচারা [illegible] কথা কি না, কে জানে। ত[illegible] কো[illegible]রেই খুব কইয়ে বলিয়ে [illegible] না। দুদু ওকে বুঝেছিল ঠিকই। দুদুকে বিয়ে করার কথা মনে মনে ভাবত। কথাটা সেভাবে ও কখনও মুখ ফুটে বলেনি। যা বলবার দুদুই বলত। একটু হাসি ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলত। সেটা দুদুর সব সময়েই ছিল। দুদু মেয়েটাই হাসিখুশি ছিল। দুদুকে শীতল বিয়ে করবে একথা ভেবে ওর মনটা ভিতরে ভিতরে টগবগ করত। দুদুর সাহসেরও শেষ ছিল না। শীতলের সঙ্গে এমন ভাব করত, মনে হত বিয়ের আগেই ও সব কিছুতে রাজী। যেমন একদিন...।

থাক গিয়ে কী হবে সেসব দিনের, সেসব ঘটনার কথা ভেবে। দুদু শেষ পর্যন্ত অসীমকেই বেছে নিয়েছিল। শীতল যখন জানতে পেরেছিল, তখন হঠাৎই যেন ওর ভিতরে একটা ঝাঁকুনি লেগেছিল, আর ওর মনটা অন্য একদিকে বাঁক নিয়েছিল। ভাবনা চিন্তাগুলো ভেঙেচুরে কেমন একটা অবসাদের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। ঠিক কষ্ট পেয়েছিল কি না বুঝতে পারেনি। নিজের বিরুদ্ধে একটা ধিক্কার জেগে উঠেছিল।

সেই সঙ্গে একটা ক্ষোভ আর অবিশ্বাস। কোনটাই আজ অবধি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সেজন্যে দুদুকেই এ-যাবতকাল ধরে দায়ী করে আসছে, তা ঠিক না। দুদুর অসীমকে বিয়ে করা শীতলের জীবনে একটা মোড় ফেরা। তারপরেও শীতল অন্য মেয়ের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করেছে। মিশেছে বন্ধুত্ব করেছে এবং এমন কি প্রেম পর্যন্ত করেছে, কিন্তু সব সময়েই দুদুর কথা মনে পড়েছে। দুদু পর্যন্ত ঠিক ছিল। দুদুর পরে আর যারা ওর এই ছত্রিশ বছরের জীবনে এসেছে, সবগুলোর পরিণতিই খানিকটা আধখ্যাচড়া, অস্পষ্ট অবস্থা। কখনো কখনো তিক্ত অপমানকর।

শীতলের জীবনে অনেক কল্পনা ছিল। ও যত কম কথা বলেছে, ভেবেছে তার চেয়ে বেশি। ভেবে ভেবে, জীবনকে একটা সুখের আকর হিসাবে ধারণা করেছিল, আর সেই আকরের মধ্যে ও খুবই আবেগপ্রবণ আর প্রাণচঞ্চল ছিল। বাইরে থেকে সেটা কখনোই বোঝা যেত না। এখনো অবিশ্যি কিছুই বোঝা যায় না। সুখের ধারণা গিয়েছে। দুঃখ বলতে যা বোঝায়, সেটাও ওর বোধের মধ্যে তেমন নেই। এখন ও নিজেকে নানা দিক দিয়ে আক্রান্ত মনে করে। অফিস, বাড়ি, অসুখ, মেয়ে, সব দিক দিয়েই। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়েদের দেখলে ওর মনে হয়, ও যেন একটা নির্জীব ঘেয়ো কুকুর, আর ওর নাকের ডগা দিয়ে সুপক্ক সুগন্ধ মাংস ঠেকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কী হবে এসব কথা ভেবে। পেটের ডান দিকটা যেন ব্যথা করছে। জিভটা তো সব সময়েই ময়লা লাগে। পাঁজরার কাছে দাগের জন্য ডারমটোলজিস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার উপদেশ আছে। ক্ষতের মত জায়গাগুলো যখন অসাড় হয়ে যায়নি, তখন আর উপদেশ মানবার দরকার কী। কুষ্ঠ তো হয়নি। চর্মরোগের জন্য চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কোন রোগের জন্যই চিন্তা করে কিছু হয় না। কিন্তু পেটের ডান দিকে আর বুকের বাঁ দিকে দুটো জায়গায় ব্যথা করছে। এখন তো কোন ওষুধ খাবার সময়ও না। জ্বরটা কি বাড়ল?

শীতল হাতের পিঠ দিয়ে গাল গলা ছুঁয়ে দেখল। গরম লাগছে। আবার থার্মোমিটার মুখে গুঁজবে কী না ভাবল। থার্মোমিটারটাও জেদী। এখন সে বাড়বে, তবু কমবে না। না হলে দেখা যাবে পারদের রেখা ঠিক এক জায়গায় ঠেকে আছে। দরকার নেই। জ্বর আছে, রাত্রে কোন এক সময়ে ছেড়ে যাবে। সকালবেলা অফিসে গিয়ে বসবে। আবার বেলা গড়িয়ে যেতে যেতে, কাজ করতে করতে, জ্বরটা আসবে। এ ব্যাপারে এখন মনে হয়, ডাক্তারও ফেড আপ। শীতলও ফেড আপ হতে চায়, কিন্তু......

দুদুর কথাগুলো আবার মনে পড়ে গেল। অসীম অসুস্থ। বোধ হয় দুদু খুব খারাপ একটা কিছু আশঙ্কা করেছে, তাই আজ রাত্রের মধ্যেই খবরটা পেঁৗছে দিতে চায়। যেন আজই কেউ, অসীমের মা বা দাদারা কেউ যায়। অসম্ভব। খবর দেওয়া যাবে না।

শীতল পাশ ফিরে গুটিয়ে শুল। যেন খবর দেবার প্রসঙ্গটাকে পিছনে ফেলে রেখে, মনটাকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে চাইল এবং ভাবল, বদরীকে অসীমদের বাড়িতে খবর দেবার জন্য কিছুতেই পাঠানো যায় না। এই দুর্যোগে তিন মাইল দূরে গিয়ে বদরীর পক্ষে অসীমদের সেকালের প্রকাণ্ড বাড়িটা খুঁজে বের করাই কঠিন। তারপরে বাইরের [illegible] কারোর [illegible]ব। অনেকখানি ঢুকে না গেলে, ডাক[illegible] করলেও, বাড়ির কেউ শুনতে পাবে না। বদরীকে পাঠালে, শীতলকে আবার একটা চিঠি লিখে সব জানাতে হবে।

না না না, অসম্ভব। এটুকু স্বাধীনতা শীতলের আছে। দুদুর টেলিফোনে পাওয়া খবর অসীমদের বাড়িতে পেঁৗছে না দেবার অধিকার ওর আছে। এখন খুবই খারাপ লাগছে ভেবে, কেন শীতল অসীমদের বাড়ি গিয়েছিল। কখনো না গেলে, চেনবার কোন সুযোগ থাকত না। অতএব যাবারও কোন প্রশ্ন থাকত না। দুদুই এই গোলমালটা

[illegible] দিয়ে চেয়ারে [illegible] [illegible] [illegible]র বাড়িতে আসবার আগেই এ[illegible] শীতল এখানকার রাস্ত[illegible]রি হয়ে এসেছে। এসে দেখা করেছিল, জোর করেই অসীমদের বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। একদিন না, দু-তিন দিন। একদিন রাত্রে খেতেও হয়েছিল। তাও অনেক কাল হল, প্রায় দু বছর আগে। শীতল প্রথম যখন এখানে বদলী হয়ে এসেছিল।

কিন্তু তার মানে এই না, শীতলকে এখন যেতে হবে। দুদুর সঙ্গে সেই সব দিনের কথা মনে করেও না, যে-সব দিনের কথা মনে করলে দুদুর গোটা শরীরটা ও দেখতে পায়। শীতল উপুড় হয়ে বিছানার মধ্যে নিজেকে আরো ঠেসে ধরল। যেন তা না হলে, কেউ ওকে জোর করে টেনে তুলবে। কদরী যদি বাজারে গিয়ে থাকে, এখন ফিরে এসে রান্না করবে। তা ছাড়া, কদরীকে পাঠাবার কোন কথাই আসে না, কারণ কদরীর পক্ষে অসীমদের বাড়ি খুঁজে বের করে, ডাকাডাকি করে সংবাদ দেওয়া সম্ভব না। দুদুর শীতলকে মনে পড়ে গেল, আর টেলিফোন করে উদ্বেগের সঙ্গে অনুরোধ করল, তাতেই শীতলের অধিকার শেষ হয়ে যায় না। তাতেই শীতল এখন এই দুর্যোগে, মফস্বল শহরের জঘন্য রাস্তা ধরে তিন মাইল ঠেঙিয়ে যাবে না। দুদু এটা আশা করে কী করে। আর দুদু আশা করলেই বা কী যায় আসে। দুদু অনেক কিছুই আশা করতে পারে, তেমনি না যাবার স্বাধীনতা শীতলের নিজস্ব। ও যাবে না।

শীতল একটা পাক খেয়ে, আবার অন্য দিকে ফিরল। ব্যথা করছে, ঠিক পেটের ডান দিকে, যেখানে লিভার আছে, আর বুকে, বাঁ দিকের উঁচুতে। নিশ্বাস আরো গরম লাগছে। জ্বরটা নিশ্চয়ই বেড়েছে। এ অবস্থায় শীতলের কোথাও যাবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। দুদু যে অসীমকে বিয়ে করেছিল, তার জন্য একদিনও শীতলের কাছে দুঃখ বা অন্যায় স্বীকার করেনি। বরং আলাদা চিঠিতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিল, 'শীতল, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে তুমি ঘনিষ্ঠতম। বিয়েতে তুমি না এলে ভীষণ কষ্ট পাব। ইত্যাদি......।' ঠিক দুদুর কথার মতই, চিঠিটা সহজ সরল আর সচ্ছন্দ। শীতল গিয়েছিল দুদুর বিয়েতে। দুদু কনের বেশে সকলের সামনে শীতলের হাত ধরে একটা খালি ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো?' শীতলের স্পষ্ট মনে আছে, ওর গায়ে তখন জ্বর, আর নিজেকে কেমন বিভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। ও দুদুকে বুঝতে পারছিল না। বলেছিল, 'ভাল।' দুদু হেসে শীতলের গালে টোকা মেরে বলেছিল, 'সেই নিরীহ ভাব। তোমার দ্বারা কিছু হবে না। আমাকে যখন পিঁড়িতে করে ছাদনাতলায় ঘোরানো হবে, তখন তুমি পিঁড়ি ধরো, আমি তোমার কাঁধে হাত দিয়ে ব্যালান্স রাখব, কোন শুভদৃষ্টির সময়েও আমি তোমার কাঁধে হাত রাখব।'...আরো অনেক কথা বলেছিল, শীতলের সব মনে নেই। শীতল দুদুকে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

কিন্তু এসব কথা এখন ভাববার কোন কারণ নেই। দুদুর টেলিফোনের কাতর অনুরোধের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। মনে পড়ল মাত্র। এ সব কথা মনে পড়ছে বলে যে শীতল খবর দিতে যাবে না তা নয়। আবহাওয়া খারাপ। শীতলের শরীরে অসুখ। ও যাবে না, যেতে ইচ্ছে করছে না। এই ইচ্ছার স্বাধীনতা ওর আছে। দুদুর কথায় যদিও এরকম একটা আশঙ্কাও যেন ফুটেছিল অসীম মারা যেতে পারে। তা আর কী করা যাবে। শীতলও মারা যেতে পারে। শীতল অন্য পাশে ফিরল, মনে হল বুকের মধ্যে বেশ জোরে ধকধক করে বাজছে। নিশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। মনে হল এ-ভাবে পাশ ফিরে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। শীতল উঠে বসল, কাশল খুক [illegible]ক করে, জোরে জোরে নিশ্বাস নিল। শরীর [illegible] আরো খারাপ লাগছে। আবহাওয়া [illegible] থাকলে, লিভক অ্যান্ড হাচিনসনের [illegible] যাওয়া যেত। একটু তাস খেলা [illegible] সেখানে কয়েকজন ওর চেনাশোনা অ[illegible] মনে পড়ল, বেশী অস্থির লাগলে, এক [illegible]ড়ির আধখানা ভেঙে খেতে দিয়েছে ডাক্তার।

শীতল উঠে ঘরের কোণে টেবিলের কাছে গিয়ে, সেই ট্যাবলেট খুঁজে বের করল। আধখানা ভেঙে জল দিয়ে খেল। থার্মোমিটারটা মুখের মধ্যে জিভের তলায়

নিভিয়া ক্রীমের "কথা ও ছবি" প্রতিযোগিতায় যোগ দিন !

প্রথম পুরস্কার: দুজনের দুসপ্তাহ ব্যাপি ইউরোপে ছুটি যাপন (অথবা নগদ ২০,০০০ টাকা)

দ্বিতীয় পুরস্কার: দুজনের ১০ দিন ব্যাপি কাশ্মীরে ছুটিযাপন (অথবা নগদ ৪,০০০ টাকা)

তৃতীয় পুরস্কার: লেনার্ড রেফ্রিজারেটর (২৮৬ লিটার)

চতুর্থ পুরস্কার: কসমিক্ রেকো স্টিরিও গ্রামোফোন

পঞ্চম পুরস্কার: গোদরেজ স্টোরওয়েল

২০০টি সান্ত্বনা পুরস্কার: বাজাজ পপ-আপ টোস্টার

স্মিথ অ্যাণ্ড নেফিউ'-এর এক উৎপাদন

স্মিথ অ্যাণ্ড নেফিউ (ওভারসীজ) লিমিটেডের অতিথি হিসাবে দুই সপ্তাহের জন্য ইউরোপে ছুটি যাপনের এই তো মস্ত সুযোগ! আপনাকে কেবলমাত্র, প্রবেশপত্রে প্রদত্ত ছয়টি ছবির সঙ্গে ছয়টি উক্তি যথাযথভাবে মেলাতে হবে এবং "আমি নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করি কারণ…" এই বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে হবে, কিন্তু দশটির বেশী শব্দ যোগ করতে পারবেন না।

আজই যোগ দিন!

তাড়াতাড়ি করুন! প্রবেশপত্র ১৯৭০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছানো চাই!

প্রতিযোগিতার পূর্ণ বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য আপনার নিভিয়া ডীলারের কাছথেকে প্রবেশপত্র চেয়ে নিন!

AIYARS-JLM 50 BN

কিছু ভাবছে। শীতল পিছন ফিরে যেতে যেতে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে, আমি বেরোচ্ছি।'

ফ্ল্যাটের যাওয়া আসার দরজা আর অফিসে যাবার দরজা দুদিকে। বদরী অফিসের দরজা আগলায়। ফ্ল্যাটের দরজা নিজেদেরই খোলা বন্ধ করতে হয়। শীতল শীলার গলা শুনতে পেল, 'আপনি কি বেরিয়ে যাচ্ছেন?'

শীলার গলায় যেন উদ্বেগের সুর। শীতল বলল, 'হ্যাঁ।'

শীলা শীতলের পিছন পিছন এল। এবার স্পষ্ট উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফিরবেন?'

শীতল বলল, 'কেন বলুন তো?'

শীতল ফিরে তাকাল। শুধু গলায় না, শীলার চোখে মুখেও উদ্বেগের ছায়া। সব মিলিয়ে শীলাকে এখন খানিকটা ভয় পাওয়া একটি বয়স্কা মেয়ের মত মনে হচ্ছে। বলল, 'উনি আজ কলকাতায় গেছেন। ওঁর বোনের খুব অসুখ, নাও ফিরতে পারেন। আমি একলা রয়েছি। উনি বলছিলেন 'মিঃ মুখার্জি আছেন, তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

দীপক দত্ত সে কথা শীতলকে বলে যায়নি। অনেক সময় অনেক কথা যেমন বলে, তেমনি বলে যেতে পারত, 'আমি কলকাতায় যাচ্ছি, আজ রাত্রে হয়তো নাও ফিরতে পারি।' কোন কথাই বলে যায়নি। শীলার কথার কোন জবাব না দিয়ে ঢাকা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে শীতল বাইরের দরজার ছিটকিনি খুলল। শীলার গলা আবার শোনা গেল, 'আপনি কি কলকাতায় যাচ্ছেন?'

কলকাতা? শীতলের ভুরু কুঁচকে উঠল। কলকাতায় যাবে কেন শীতল। পর-মুহূর্তেই মনে পড়ল, শীলা দুপুরের টেলিফোনের কথা ভাবছে। দুপুরে কলকাতা থেকে টেলিফোন করেছিল। শীতল বলল, 'না, আমি কলকাতায় যাচ্ছি না।'

শীতল দরজাটা খুলতে গিয়েও থামল, বলল, 'আমাকে একবার বেরোতে হচ্ছে। আমার খাবারটা নিয়ে আসবে।'

শীলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি নিয়ে রেখে দেব।'

শীতল দরজাটা খুলতেই বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটা এসে গায়ে লাগল। ও তাড়াতাড়ি টুপিটা কপালের সামনে নামিয়ে দিয়ে কোমরের বেল্ট বাঁধল। রাস্তার ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। শীতলের দাঁতে দাঁত চেপে বসল, অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, 'বিচ্!'

জিবে রক্তের স্বাদ লাগাতে থুথু করে ফেলল।

নিঝুম ঝড়ো বৃষ্টির প্রলয় ক্ষেত্র রাস্তাটার ওপরে এসে যন্ত্রণাকাতর অসহায়তার বদলে শীতলের ভিতরে যেন একটা রাগের ঝড় বইতে লাগল। তার সঙ্গে যন্ত্রণাটাও আছে। যন্ত্রণার চেয়ে জ্বালা বলা যায়। হাত দুটো নিচের দিকে তাড়াতাড়ি যেন কোটের পকেটে ঢোকাল। শুধু মনে হচ্ছে গাটা যেন জলে ভিজে যাচ্ছে। চামড়ার জুতো মোজা পরা পা শুকনো রাখতে পারবে না। একটা রিকশা দরকার। খানিকটা হেঁটে গেলে সাইকেল রিকশার আড্ডা পাওয়া যাবে। কিন্তু রিকশাওয়ালারাও মানুষ। এ দুর্যোগে কেউ রিকশা চালাবে না বলেই মনে হয়। তবু বেশি টাকার বিনিময়ে যদি রাজী করানো যায়। কী কুক্ষণে যে এই শহরে শীতলের পোস্টিং হয়েছিল। কথাটা এর আগে কোনদিন মনে হয়নি। আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবারই থুথু ফেলল। অসীম মরে গেলেই বা শীতলের কী। অসীম শুধু বা পৃথিবীতে আরও অনেকের কারোর বাঁচা মরার জন্যই কি শীতলের কিছু যায় আসে। শীতল মরে গেলে কি কারুর কিছু যায় আসে। এর পরে নিশ্চয় জ্বরটা বাড়বে। রেন কোটের নিচে প্যান্ট জামা ভিজতে আরম্ভ করেছে। একটা কুকুরও রাস্তায় নেই। [illegible] বলল বলেই কেন যাচ্ছে শীতল। ওর কি স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। অথচ শীতল কার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কিন্তু একটা ফুঁসে ওঠা রাগে যেন ও ভিতরে ভিতরে ফুলছে। মনে হচ্ছে, এত রাগে ওর চোখে জল এসে পড়বে।

কয়েকটা ছিটে ঢাকা ঘরের সামনে গোটা কয়েক রিকশা গায়ে জড়াজড়ি করে আছে। একটা ঘরে টিমটিমে আলো ছাড়াও উনুনের আগুন দেখা গেল যেন। ছায়া মূর্তির মত দু একটা মানুষের অবয়বও। শীতল এগিয়ে গেল, জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়া যাবে?'

একটু পরে শোনা গেল, 'কোথায় যাবেন?'

শীতল জায়গাটার নাম বলল। খানিকক্ষণ কোন জবাবই পাওয়া গেল না। বেশ খানিকক্ষণ পরে একজন দরজায় দাঁড়াল। শীতলকে জানিয়ে দেবার জন্যই যেন সে বলল 'পাঁচ টাকা লাগবে।'

এক টাকা পঁচিশের জায়গায় পাঁচ টাকা চাইছে। না চাওয়াটাই আশ্চর্য। তবু যাতে লোকটা পাঁচ টাকাতেই থাকে সেইজন্য বলল, 'খুব বেশি বলছ।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'মোটেই না। দেখলাম আপনি বটতলা অফিসের ম্যানেজারবাবু, তাই বলছি। এই হাওয়ায় গাড়ি টানাই মুশকিল।'

অফিসটাকে এরা বটতলার অফিস বলে। সামনে একটা বড় বট গাছও আছে। শীতল ইচ্ছা করেই খানিকটা অনিচ্ছার সুরে বলল, 'চল।'

যেখান[illegible] থার টাকা দে[illegible] খানি [illegible] এল। কে[illegible] বাঁধা। [illegible] দিয়ে রিকশাটার ভিতরে ঢুকল। যদিও তাতে কিছুই আসে যায় না। এ বৃষ্টিতে রিকশার ভিতরে শুকনো রাখা যায় না। সীটটা ঘরের ভিতর থেকে এনে পেতে দিল। সামনে একটা পাতলা প্লাস্টিকের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে ডাকল, 'বসুন।'

শীতল রেনকোটটা না খুলেই রিকশার মধ্যে জবুথবু হয়ে বসল। বলল, 'আমি কিন্তু আবার ফিরে আসব।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'সে যা হয় দেবেন। আমাকে তো ফিরে আসতেই হবে।'

রিকশার ভিতরে যেন একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। বাইরে এলোমেলো বাতাস, বৃষ্টির ঝাপটা, পর্দাটা উড়ে যেতে চাইছে। তবু মনে হচ্ছে একটা কিছুর মধ্যে আশ্রয় পাওয়া গিয়েছে। বাইরের খোলা বাতাসের থেকে একটু নিশ্চিন্ত। অসীম মরুক তাতে শীতলের কী। শুধু কি সারা জীবনটাই নিজের ইচ্ছাকে এভাবে কাজে লাগিয়ে যাবে। কখনো। এটা একটা ইতরতা, নোংরামি। কিন্তু সেই নিয়ামকটি কে, যে শীতলকে তার ইচ্ছা মত চলতে দেয় না। কোন কিছুতেই কি মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। অফিস বাড়ি অসুখ মেয়েরা এ সব তো আছেই, তার ওপরে এই কদর্য আক্রমণ সহ্য হয় না। এরকম অবস্থায় সব মানুষই নিজেকে আক্রান্ত ভাবে। শীতলও নিজেকে ভাবছে এবং এই আক্রমণের কাছে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

শীতল আহত আর পরাজিত একটা পশুর মত রিকশার মধ্যে অন্ধ আক্রোশে যেন ফুঁসতে লাগল। রিকশাটা বেশ জোরে চলেছে। বাঁকা রাস্তা। শীতল টাল সামলাতে পারছে না। ডালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কোথা দিয়ে কীভাবে যাচ্ছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পর্দার ভিতরে সমানে জল আসছে। শীত করছে, দাঁতে দাঁত লেগে যাবার মত।

অসীমদের বাড়ির কাছে এসে রিকশা থামল। পোড়ো বাড়ির মত নিঝুম, সেকালের দেউড়ি পেরিয়ে ঠাকুর দালানওয়ালা বাড়ি। শীতল ভিতরে ঢুকল। দোতলায় আলো দেখা যাচ্ছে। ও গলা তুলে ডাকল, 'বাড়িতে কেউ আছেন। শুনছেন, বাড়িতে কেউ আছেন?'

মনে মনে বলল, 'সবাই মরে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না।' কিন্তু ওপরের দরজা খুলল, আলো দেখা দিল, জীবিত মানুষের গলা শোনা গেল, 'কে?'

'আমি শীতল।'

'কে, শীতল?'

শীতল মনে মনে খেঁকিয়ে উঠল, 'তোর বাবা।' মুখ তুলে বলল, 'আমি অসীমের বন্ধু (শুয়োরের বাচ্ছা), কলকাতা থেকে টেলিফোনে একটা খবর এসেছে...।'

শীতলের কথা শেষ হবার আগেই ওপর থেকে শোনা গেল, 'ও বুঝেছি। নিচে যাচ্ছি।'

দোতলার বারান্দায় আরো কয়েকজন এসে দাঁড়াল, মহিলা মেয়ে এবং পুরুষ। নিচে আলো জ্বলে উঠল। চকমেলানো দালান ঘেঁষে ঘরের দরজা খোলা হল। অসীমের এক দাদা এগিয়ে এসে ডাকল, 'এস এস। কী খবর বল তো?'

ঘরে ঢুকে জবাব দেবার আগেই আরও দু তিনজন নেমে এল। তার মধ্যে অসীমের বুড়ি মাও আছে। তার চোখে গভীর উদ্বেগের ছায়া। দাদা বউদিরা কিছুটা কৌতূহলিত, ত্রস্ত। শীতল ব্যাপারটা একটু হালকা করার জন্য বলল, 'অসীমের স্ত্রী ফোন করেছিল। এমন কিছু না, অসীম একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সেই খবরটা দিতে বলল।'

অসীমের মা উদ্বেগে যেন ভেঙে পড়ল, 'কী ধরনের অসুখ বাবা। কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটে নি তো?'

শীতল বলল, 'না না, সে রকম কিছু না। ওর স্ত্রী বলছিল, কলকাতায় কেউ গেলে ভাল হয়। মানে ও তো একলা, তাই আপনারা কেউ গেলে একটু বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়।'

অসীমের মা বলে উঠল, 'আমি যাব, আমি যাব। এখন কি ট্রেন আছে?'

সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। টাইমটেবল দেখতে ছুটল কে যেন। বাড়ির সবাই তখন নিচের বসবার ঘরে এসে ভিড় করেছে। সকলেরই খানিকটা চমকে যাওয়ার ভাব, মা ছাড়া।

অসীমের মা আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ঠিক করে বল বাবা, সেরকম কিছু নয় তো।'

শীতল একটু হেসে যেন ভরসা দিতে চাইল, মনে মনে বলল, এর পরে অসীমটার মরাই উচিত। বলল, 'না না সেরকম কিছু না। দাদু একলা একলা, তাই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। আজ রাত্রেই যাবার দরকার নেই, কাল সকালে গেলেও হবে।

অসীমের মা জিজ্ঞেস করল, 'বউ মা কি তাই বলেছে।'

'ঠিক তা না তবে ওইরকমই যেন বলল, কেউ গেলে ও একটু আশ্বস্ত হয়। অসীমের হাই টেম্পারেচারের কথা বলছিল।'

এক দাদা বলল, 'হিপাটাইটিস না তো?'

আর কে দাদা, 'হতে পারে, হিপাটাইটিস উইথ জন্ডিস। লিভারটার আর কিছু

অসীমের মা বলল, 'না, আমি যাব। একথা শুনে আমি বাড়িতে বসে থাকতে পারব না। আমার সঙ্গে তোরা কেউ চল।'

তার মানে? শীতল ভাবল, রিকশা তো একটাই। তার মধ্যেই সব যাবে নাকি? অসীমের মা বলে উঠল, 'তুমি যে বাবা এ দুর্যোগে এসেছ, এই যথেষ্ট।'

এ সব কথা শুনতে আরও খারাপ লাগে। শীতল ইচ্ছা করে আসেনি। সে যদি বুঝতে পারত, কে ওকে ঘাড় ধরে নিয়ে এসেছে, তাহলে তার সঙ্গে একটা লড়াই বেধে যেত। অসীমের মা আবার বলে উঠল, 'মানুষের উন্নতি কি আর এমনি হয়। দায়িত্ব বোধ না থাকলে—।'

শীতল পায়ের গোড়ালিতে আর দাঁতে দাঁত চাপল। কথাগুলো যেন দু'পাতে পায়ে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। বলল, 'আচ্ছা, আমি তা হলে চলি।'

অসীমের মা হা হা করে উঠল, 'না না শেতল বাবা, তুমি চলে গেলে হবে না। এখন কোথাও রিকশা পাওয়া যাবে না। তোমার রিকশাতেই আমরা যাব। তোমার একটু কষ্ট হবে জানি, কিন্তু বিপদের সময়ে—।'

শীতল ভাবতে পারছে না, একটা রিকশাতে তিনজন কেমন করে যাবে। কিন্তু মুখে বলল, 'তা তো বটেই। কষ্ট আর এমন কী।'

অসীমের এক দাদা বলল, 'মানুষ এমনি বড় হয় না। এই দুর্যোগে এতখানি পথ এসে খবর দেওয়া কি কম কথা।'

যেন শীতল ফোন পাওয়া মাত্রই খবর দেবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। আর সেটা বড় মানুষ হবার জন্য। এই লোকটা যা লোকগুলো কী বলতে চায়। নিজেকে তো ওর কুকুরের চেয়ে বেশি কিছু মনে হচ্ছে না। সব সময়েই একজন মনিবের ইচ্ছায় ওকে চলতে হচ্ছে। আর সেই চলার জন্য তারিফ করার ভাষাগুলো কি এইরকম হয়। কিন্তু এ সব কথা ভাববার সময় নেই, রিকশার কথাটাই ভাববার। সবাই মিলে শীতলের সঙ্গে ঠাট্টা করছে না নিশ্চয়ই। এই দুর্যোগে রিকশার সেই খোলের মধ্যে তিনটে মানুষ ধরবে কোথায়। একলা অসীমের মা-ই তো তার শরীরটা নিয়ে রিকশায় ধরবার মত না। তার ওপরে অসীমের যে কোন দাদাই শীতলের ডবল। একমাত্র শুয়োরদেরই ওভাবে চার পা বেঁধে নিয়ে যাওয়া যায়।

অসীমের সেই দাদাটিই আবার বলল, 'আচ্ছা শেতল, ছোট বউমার কথা শুনে তোমার কী মনে হল। আজ রাত্রেই যেতে হবে?'

শীতল লোকটার মুখের দিকে চেয়েই মনের ভাবটা বুঝতে পারল। এই সাংঘাতিক

উঠল, 'না না [illegible] কিছু বলেনি। ও জাস্ট একটু [illegible] দিয়েছে। এ[illegible] একলা তো, তাই এ[illegible] ভয় টয় পেয়েছে।'

অসীমের মা বলে উঠল, 'ছোট বউমা সহজে ভয় পাবার মেয়েই না। নিশ্চয় সেরকম বুঝেছে, তাই ডাক্তার রেখে বলেছে। যাই আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি। তোমরা একজন কেউ আমার সঙ্গে চল।'

অসীমের মা ওপরে চলে গেল। অসীমের তিন দাদা চুপচাপ। বউদিরাও কথা বলতে পারছে না। একজন নিবিষ্ট হয়ে টাইম-টেবল দেখছে। শীতল বেশ বুঝতে পারছে, কারোরই যাবার ইচ্ছা নেই। অথচ শীতলকে এই শরীর নিয়ে দুর্যোগে খবর দিতে, আসতে হয়েছে। ইচ্ছা করে আসেনি। অনেকটা ঘাড় ধরে নিয়ে আসার মত কেউ নিয়ে এসেছে।

অসীমের এক দাদা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, 'জানি আমাকেই যেতে হবে। মা ঠিক আমাকেই যেতে বলবে।'

বলেই সে দুপদাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই সঙ্গে একজন বউদিও। যে টাইমটেবল দেখছিল সে বলল, 'দশটা উনত্রিশে গাড়ি।'

শীতল বুঝতে পারল, সকলেরই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ছে। শীতল জানে ভাইদের মধ্যে অসীম সব থেকে বড় চাকরি করে। কলকাতায় মস্ত বড় ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। গাড়ি টেলিফোন ফ্রিজ সব নিয়ে তার আধুনিক জীবন। এই বাড়ির সঙ্গে কোথাও খাপ খায় না। সে যাই হোক গিয়ে, অসীম হয় তো এতক্ষণে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে, যেন তাই করে থাকে। কিন্তু একটা রিকশায়...?

শীতলের ভাবনা শেষ হবার আগেই অসীমের মা আর এক দাদা নেমে এল। দাদার হাতে একটা ছাতা। অসীমের মা ব্যস্তভাবে বলল, 'আর দেরি না, চল বেরিয়ে পড়া যাক। গিয়ে যে কী দেখব তা ভগবানই জানেন।'

এক দাদা বেশ অমায়িকভাবে বলল, 'এত ভাবছ কেন। ভালই দেখবে। কাল সকালে কিন্তু একটা খবর দেবার চেষ্টা করো, তা নইলে আমরা ভাবব। শিকুলের কাছেই খবর দিও।'

লোকটা শয়তান না কী? কী বলতে চায়? তখন থেকে এক একটা কথা ছোঁড়া যাচ্ছে। ইচ্ছা হচ্ছে টুঁটিটা চেপে ধরে চুপ করিয়ে দেয়। শীতল বলল, 'আপনারা দুজনে রিকশায় যান, আমি হেঁটেই চলে যেতে পারব।'

অসীমের মা খপ করে শীতলের একটা হাত টেনে ধরে বলল, 'তা হয় না বাবা। তুমি আমার কোলে চেপে যাবে। মায়ের কোলে ছেলে যাবে, এতে আর লজ্জা কী।'

অন্নদাশঙ্কর রায়

রত্ন ও শ্রীমতী

৩য় ভাগ

রত্ন ও শ্রীমতী : প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের চুম্বক

রত্ন বলে একটি ছেলে মনে মনে মালাদিকে পুজো করত। সম্পর্কটা কামগন্ধহীন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তার বন্ধু প্রভাতের মুখে শ্রীমতী বলে একটি মেয়ের নাম শোনে। রূপবর্ণনাও। কিন্তু প্যাশনের উল্লেখ শুনে ভয় পেয়ে যায়। বছরখানেক বাদে যখন শ্রীমতীর প্রসঙ্গ একেবারেই ভুলে গেছে তখন হঠাৎ একদিন পায় অচেনা হাতের চিঠি। লিখেছেন যিনি তাঁর নাম শ্রীমতী।

রত্ন ও তার বন্ধুরা—সাত ভাই চম্পা—একদা সোনালী বলে একটি মেয়েকে ধর্ষকদের কবল থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিল। শ্রীমতী সেটা জানতে পেয়ে সাত ভাই চম্পার পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রস্তাব হলো ওরা যেন রূপালী বলে আরেকজনের উদ্ধারের জন্যেও চেষ্টা করে। রূপালীকে অর্থাৎ শ্রীমতীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যার সঙ্গে তার সঙ্গে সে ঘর করতে নারাজ। সে চায় তার বিবাহকে অঘটিত করতে। এমন কথা অভিজাত হিন্দু সমাজে কেউ কোনোদিন শোনেনি। আজ থেকে আধ শতাব্দী আগে এটা ছিল একটা বৈপ্লবিক আইডিয়া। শ্রীমতীর পেছনে যারা ছিলেন সেইসব সন্ত্রাসবাদী বা অসহযোগী দাদারাও তার মুক্তির প্রশ্নে পেছপাও। একজন বাদে। সে জ্যোতি। দূর সম্পর্কের আত্মীয়। শ্রীমতী কিন্তু জ্যোতির সঙ্গে যাবে না। জ্যোতিকে সে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে না।

শ্রীমতীর মুক্তির প্রশ্নে সাত ভাই চম্পা সাড়া দেয় না. একটি বিবাহিত মেয়ে তো আর ধর্ষিতা নারীর সঙ্গে সমান নয়। সাড়া দেয় একমাত্র রত্ন। যেখানে প্রেম নেই সেখানে পুরুষের ইচ্ছাই জয়ী হবে এটা তার মতে অন্যায়। হিন্দু সমাজে ডিভোর্স নেই বলে কি আর কোনো প্রতিকার নেই? রত্ন কথা দেয় সে মুক্তির জন্যে যথাসাধ্য করবে। কিন্তু চিঠিপত্রে একটু একটু করে ব্যক্ত হলো কেবল নীরস মুক্তিই কাম্য নয় শ্রীমতীর। ও চায় প্রেমের বিনিময়ে প্রেম। আর প্রেম বলতে যা বোঝায় তা বিশুদ্ধ নিরামিষ নয়। রত্ন তো মালাদিকে মন থেকে দূর করতে পারে না. প্যাশনকেও তার বড়ো ভয়। কিন্তু নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করাও তার অসাধ্য। পত্রপ্রেম জমে ওঠে। বোন থেকে প্রিয়া।

দীর্ঘকাল বিবাহিত হয়েও যশোবাবুর পুত্রকামনা মেটেনি, যদিও অপর কামনার জন্যে অন্য ব্যবস্থা ছিল। তাঁর বিধবা বউদি সুধার সঙ্গে তাঁর প্রণয় বিবাহপূর্বের। যশোবাবু পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা-র আভাস দিলে শ্রীমতী দোটানায় পড়ে যায়। আর সময় নষ্ট করা সমীচীন নয় বলে জ্যোতি একটা পলায়ন পরিকল্পনা করে। রেঙ্গুনে পালাবে জ্যোতি সহ রত্ন ও শ্রীমতী। যার ডাকনাম গোরী। ধার্য দিনের দিন কয়েক আগে হঠাৎ রত্নর বন্ধু কানন এসে ওকে ধরে নিয়ে যায় জ্যোতির আশ্রমে। সেখান থেকে শ্রীমতীর শ্বশুরবাড়ি। রত্ন ও শ্রীমতী নিভৃতে কথা বলে।।

॥ এক ॥

আহা, সেই দুর্লভ ক্ষণটি যদি অনন্তক্ষণ হতো। আর সেই নিভৃত কক্ষটি নিকুঞ্জবন। তা হলে কি প্রেমের দেবতার কাছে ওদের/দুজনের আর কোনো বরপ্রার্থনা থাকত।

আরতির যেন বিরতি নেই। ক্লান্ত হয়ে আসে দু' জোড়া অনিমেষ নয়ন। যার আগে পলক পড়বে তারই হার হবে। গোরী হার মানবে তেমন মেয়েই নয়। রত্নও কি সহজে হার মানত? কিন্তু তার যে সারা রাত জাগরণে কেটেছে।

আরতির পর ভোগ। গৃহদেবতা মাধবের প্রসাদ রত্নর সামনে রেখে পাখা হাতে বাতাস করে গোরী। নিজের ভাগটা সরিয়ে দেয় এক কোণে। রত্নর অনুযোগ কানে তোলে না। কে জানে কেন ওর দুটি চোখে বাদল [illegible]। হয়তো বিদায়ের কথা ভেবে।

আর একটু বাদেই তো রত্ন অদর্শন হয়ে যাবে।

ও ছেলে জানত না কেন অসময়ে ওকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আর কয়েকটা দিন গেলেই তো ইলোপমেণ্ট। গোরীকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা। জ্যোতিদাও সাথী হতো। হঠাৎ কী এমন ঘটল? কেউ ওকে খুলে বলছে না কেন? কানন নীরব। জ্যোতিদার বদনে বিষাদের ছায়া। গোরীর ভাবটাও কেমন থমথমে।

তবে কি সমস্ত জানাজানি হয়ে গেছে? ইলোপমেণ্ট বন্ধ? রেঙ্গুন দূর অস্ত?

"কই, খাচ্ছিসনে তো?" গোরী পীড়াপীড়ি করে।

"আমি যে ঠাকুরদেবতা মানিনে। প্রসাদ সেবা করা কি ঠিক হবে?" রত্ন হাসে।

"মুখপোড়া। আমার যেখানে অসম্মান সেখানে তুই জলস্পর্শ করবি কী করে? তা হলেও, লক্ষ্মীটি, মাধবের অমর্যাদা করিসনে। তুই না মানিস আমি তো মানি।" বলতে বলতে গোরীর গলা ধরে আসে। ওর চোখের এক ফোঁটা জল রত্নর পাতে পড়ে।

"ও কী! তুই কাঁদছিস! কেন, কী হয়েছে? একটু পরে চলে যাচ্ছি বলে? আচ্ছা, আবার তো ক'দিন বাদে দেখা হবে।" রত্ন এক টুকরো মালপোয়া ভেঙে নিয়ে মুখে দেয়।

গোরী তা দেখে হেসে ওঠে। "দেখছি আমাকেই খাইয়ে দিতে হবে। নয়তো ওটুকু শেষ করতেই এক ঘণ্টা লেগে যাবে মহাপ্রভুর।"

দরজা জানালা খোলা। কে কখন উঁকি মেরে লক্ষ করবে! কথাবার্তাও যে কেউ আড়ি পেতে শুনবে না তা নয়। এই নির্বান্ধব পুরীতে রত্ন পুরোমাত্রায় হুঁশিয়ার।

এমন ভাগ্য কজনের হয় যে, মালপোয়াতে পায় লবণাক্ত স্বাদ। প্রিয়ার অশ্রুর মাধুর্য আস্বাদন করে। অপূর্ব! অপূর্ব!

ও ছেলের স্বভাবটাই এমন যে, কাউকে কাঁদতে দেখলে ওরও কান্না পায়। কোনো মতে আত্মসংবরণ করে গোরীকে বলে, "ছি! কাঁদতে নেই। এটা তো আমাদের বিদায় নয়, এটা পুনর্দর্শনায় চ।"

গোরী এবার দু' হাতে দু' চোখ চেপে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বারবার মাথা নেড়ে, ইঙ্গিতে বোঝায় যে, তা নয়। তা নয়। রঞ্জুর মনে খটকা বাধে।

"আমার কাছে তোর তো কিছু গোপন নেই। গোরী, বল কী হয়েছে। আমি তো তৈরী। আমি পিছিয়ে যাব না।" রঞ্জু আশ্বাস দেয়।

গোরী কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়। মাটির দিকে মুখ করে থেমে থেমে বলে, "আমরা দুটি স্রোতের ফুল ভাসতে ভাসতে এক ঠাঁই হয়েছি আজ। কাল আবার ভাসতে ভাসতে দূরে থেকে দূরে সরে যাব। এই দেখাই আমাদের শেষ দেখা, মানিক।"

"সে কী!" রঞ্জু ভীষণ শক পায়। প্রথম দেখাই শেষ দেখা।

"তোর কাছে আমার কোনো কথা গোপন নেই, তাই বলছি। আমি ও'র কাছে হেরে গেছি, মানিক। ও'র বাণ আমার বুকে বিঁধে রয়েছে। তারই জ্বালায় মরে যাচ্ছি আমি। মরে যাব শুনে ও'রা তোকে ডেকে পাঠান। যদি তোর মুখ চেয়ে আমি বাঁচি। কিন্তু বাণবিদ্ধ হরিণ কি বাঁচে!" গোরী করুণ চক্ষে তাকায়।

এর হয়তো কোনো সাঙ্কেতিক অর্থ আছে। কিন্তু রঞ্জুর কাছে প্রহেলিকা। কানন বা জ্যোতি ওকে আভাসটুকুও দেয়নি। গোরী যদি মরে যায় রঞ্জুও কি বেঁচে থাকবে!

"আমি যে বুঝতেই পারছিনে কী হয়েছে, মণি। কী করলে তোর প্রাণ রক্ষা হয়?" রঞ্জু কাতর কণ্ঠে সুধায়।

"আমি কি জানতুম এরকম অঘটন ঘটবে!" গোরী কাঁপতে কাঁপতে বলে। "এর আর কোনো কাটান নেই। একে অঘটিত করা যায় না। পালিয়ে গিয়ে এর হাত থেকে মুক্তি নেই। আমার মুক্তির আশা ফিরিয়ে গেছে। তাই আমার পরমায়ুও ফুরি[illegible]। আমি আর বাঁচব না, মানিক।"

"তা হলে আমারও দিন ফুরিয়ে এল।" রঞ্জুর অন্তর থেকে উঠে আসে।

"না, না। ও কী বলছিস, ধন! তোর কত বড়ো ভবিষ্যৎ। তোর জীবনে আরও কত প্রেম আসবে। আর পুরুষমানুষের জীবনে প্রেমই কি সব! তোকে কীর্তি রেখে যেতে হবে। আমার মুক্তি তো হবার নয়। এখন দেশকে মুক্ত কর। তোর কাছে এই আমার অন্তিম বাণী। আমার শক্তি আমি তোকে দিয়ে গেলুম, ধন।" গোরী ওর খোঁপা থেকে একটি মল্লিকা খুলে রঞ্জুর হাতে দেয়।

রঞ্জু তখনও অর্থভেদ করতে পারেনি। বিহ্বল বোধ করে। বলে, "দেশের আরও কোটি কোটি সন্তান রয়েছে। দেশকে তারাই মুক্ত করবে। তোর আর কে আছে, গোরী? আর কে তোকে মুক্ত করবে? আমি তো এখনও ব্যর্থ হইনি। তবে কেন তুই ছেড়ে দিচ্ছিস মুক্তির আশা?"

"তা হলে তোকে আরও খুলে বলতে হয়। আমার ধারণা ছিল তুই বুদ্ধিমান। তুই যে এমন নিরেট তা আমি কী করে জানব!" বলতে গিয়ে গোরী রেগে ওঠে। "তোকে লিখব ভেবেছিলুম। হাত ওঠেনি।

"এমন কী কথা যে, হার্ট ফেল করত। যেমা ধরে যেত!" রত্ন বিমূঢ় হয়।

"আচ্ছা, তোর তো চমৎকার সূক্ষ্মদৃষ্টি। কত কী তোর চোখে পড়ে যা আর কারও চোখে পড়ে না। তোর চিঠিপত্রে তার পরিচয় পেয়েছি। আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক দেখি। কিছু দেখছিস যা ফোটোতে দেখিসনি?" গোরী রহস্যপূর্ণ-ভাবে বলে।

অস্বাভাবিক পাণ্ডুর। কিন্তু তার তো কত রকম কারণ থাকতে পারে। রত্ন ঠাহর করতে অক্ষম হয়। বলে, "আমি কি ডাক্তার, না বদ্যি?"

"তোর সঙ্গে," গোরী আস্তে আস্তে বলে, "আমার বিনি সুতোর ডোর। সেইজন্যে মনে করেছিলুম তুই বিনে কথায় টের পাবি। আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে কেন? আর এ কি মুখে বলবার মতো কথা?"

"তা হলে আমি জানব কেমন করে কী হয়েছে? কী বৃত্তান্ত? কী ব্যাপার?" রত্ন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলে। "তবে এটুকু আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইলোপমেণ্ট হবার নয়। কিন্তু কেন হবার নয় সেটা আমার কাছে একটা হেঁয়ালি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর গোরী বলে, "আচ্ছা, আমি তোকে চিঠি লিখেই জানাব। তখন তোর সামনাসামনি হতে হবে না।"

"কেন, আমি কি বাঘ, না ভালুক?" রত্ন অভয় দিয়ে বলে, "তোকে খাব না।"

"লেডী ডাক্তার যেদিন ওঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যান সেইদিনই আমি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে চেয়েছিলুম। সবাই মিলে ধরে আটক করে রাখে। নইলে কি তোর সঙ্গে এ জন্মে দেখা হতো, মানিক?" গোরী ঝরঝর করে চোখের জল ঝরায়।

একচক্ষু হরিণের মতো রত্ন কেবল একটা দিকই দেখেছে। ভাবতেই পারেনি যে, আরও একটা দিক আছে ও সেই দিক থেকে বাণ এসে তাকেও বিদ্ধ করবে। ক্ষণকালের জন্যে তার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সপ্রতিভভাবে বলে, "ওঃ, এই কথা! অভিনন্দন আমারও। তোকে।"

গোরী ওর কাছে অভিনন্দন আশা করেনি। আশঙ্কা করেছিল বিরাগ, বিতৃষ্ণা, হেয়জ্ঞান। পরাজিতা নারীকে কেই বা শ্রদ্ধা করে বা ভালবাসে! অভিনন্দিত হয়ে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন মেঘের কোলে রোদ।

"কিন্তু কেন? অভিনন্দন কেন? আমাকে কেন? এ যুদ্ধে আমি তো জানি আমার হার হয়েছে। ধারণ করে আর ও কথা মুখে আনতে পারব না। আর এ প্রাণ রাখব না। হায়, হায়, কেন যে এমন হলো!" গোরীর দুই গাল জুড়ে প্লাবন।

"আমার চোখে তো তুই অপরাজিতা।" রত্ন আন্তরিকতার সঙ্গে বলে।

"তোর চোখে সব কিছু সুন্দর। এ জগতে কোথাও কিছু অসুন্দর নয়। তুই মরমী। তুই মিস্টিক। তুই মিণ্টি। তুই মধুর।" গোরী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে।

রত্ন তা শুনে আশ্বস্ত হয়ে ভাবে, যাক, গোরী তা হলে বাঁচবে। কিন্তু ভবী ভোলে না। গোরী কাঁদতে কাঁদতে বলে, "কিন্তু আমার জীবনে সৌন্দর্য কোথায়? আমি তো কালো ছাড়া আলো দেখতে পাইনে। এই কদিন আমি অন্ধকার দেখেছি। তুই কীভাবে নিবি। বজ্রাহত হবি কিনা। হেয়জ্ঞান করে ত্যাগ করবি কিনা। আর কোনোদিন আমি মুক্তির সুযোগ ও সাথী পাব কিনা। যিনি আসছেন তিনি কোনোদিন যেতে দেবেন কিনা। যিনি জিতলেন তিনি আমাকে পদে পদে অপমান করবেন কিনা। এই সমস্ত ভেবে ভেবে আমার জীবনের সাধ লোপ পেয়েছিল, মানিক। ভাগ্যে তোর সঙ্গে দেখা হল। এক ঝলক আলো এসে চোখে লাগল। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?" রত্ন অধীর হয়ে সুধায়।

"মুক্তি হতে হতে ফসকে গেল। উড়তে উড়তে পড়ে গেলুম ব্যাধের পাতা ফাঁদে। বাঁচতে বলিস তো বাঁচব। কিন্তু তোকে হারাব না তো?" গোরী সলজ্জভাবে বলে।

"না, না, তা কি কখনও সম্ভব? তোর এই বিপদে আমি কি তোকে ছাড়তে পারি? মনে রাখিস, মণি, আমি হচ্ছি মধ্যযুগের নাইট। আর তুই হলি লেডী ইন ডিসট্রেস। তোকে পাশমুক্ত করাই আমার ব্রত।" রত্ন কথা দেয়।

গোরী যেন এরই প্রতীক্ষায় ছিল। এই বাগদানের। সেও তেমনি বাক্য দিল, "তোর জন্যেই বাঁচব, মানিক। তোর হাতে শাপমোচনের জন্যেই বাঁচব।"

দুজনে দুজনের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বিদায় তো নয়, পুনর্দর্শনায় চ। কিন্তু কোথায়, কবে, কতকাল পরে সবই অনিশ্চিত। নিশ্চিত শুধু এই যে, গোরীর জীবনের আশঙ্কা কেটে গেছে। ও বাঁচবে।

॥ দুই ॥

ডাক্তার যখন রুগীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তখন রুগীর আত্মীয়স্বজন তাঁকে ঘিরে ধরেন। ভাবখানা এই যে, কেমন দেখলেন, ডাক্তারবাবু, আশা আছে তো?

এও কতকটা সেইরকম। বৈঠকখানা এলেন তার দিকে। বস্তোবাবু মানী ব্যক্তি, তিনি তো মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করবেন না, আর জ্যোতিও স্বভাবত স্বল্পভাষী। কাননই ওঁদের হয়ে জানতে চাইল, "মুশকিল, না আসান?"

"আসান।" শুনে কানন ওর হাতে ঝাঁকানি দিল। জ্যোতিও তাই করল। তাতাদাও রত্নর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। রত্ন হাতে হাত রেখে অনুভব করল যে, তাঁর হাত কাঁপছে।

এই অবিশ্বাস্য সুসমাচারে ভদ্রলোকের যা উল্লাস। তিনি জনে জনে সাধতে লাগলেন, "আসুন, একটু সেলিব্রেট করা যাক।"

সে কথার অর্থ কী তা অনুমান করে রত্ন সভয়ে মাফ চেয়ে নেয়। সে এইমাত্র প্রসাদ পেয়েছে। এবার সকাল সকাল শুতে যেতে চায়। অনিদ্রায় ও পথ চলায় সে অবসন্ন।

পানভোজনে কাননের অনুৎসাহ ছিল না। তার চেয়ে আরও উৎসাহ তাতাদার বেহালা শ্রবণে। সে তখনকার মতো থেকে গেল। জ্যোতি হলো তাতাদার আত্মীয় তথা বন্ধু। কিন্তু কখনো পান করে না। ভোজন তার চাষাভুষার মতো, শোষক শ্রেণীর মতো নয়। রত্ন আশ্রমে ফিরতে উদ্যত দেখে সেও তার সঙ্গে চলল।

বেশ কিছু দূর নীরবে হাঁটার পর কথা বলল জ্যোতিই প্রথম। "ওর অবস্থার খবর আমরা তোমাকে দিইনি বলে তুমি কিছু মনে করনি তো, রতন?"
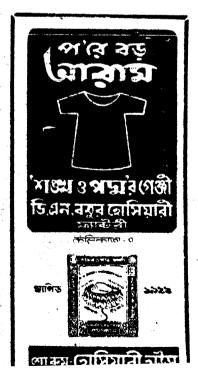
"না, মনে করব কেন ?" রঞ্জু পাল্টা প্রশ্ন করে।

"আগে থাকতে জানতে পেলে তুমি খুবই বিরক্ত বোধ করতে। তোমার প্রথম দর্শন আনন্দের হতো না। আশা করি আনন্দের পর নিরানন্দ এসে ছায়াপাত করেনি। কিন্তু আগে থেকে ছায়াপাত করলে ফল খারাপ হতো।" জ্যোতি দরদের সংগে বলে।

জ্যোতি একটু একটু করে জেনে নেয় ওরা দুজনে মিলে কী স্থির করল। পাঁচজনে যে রেঙ্গুন যাচ্ছে কি হচ্ছে না। জ্যোতিকেও তো সেই অনুসারে কাজ করতে হবে।

"আশ্চর্য! এ নিয়ে তো একটি কথাও হয়নি!" অপ্রতিভ হয় রঞ্জু।

"কথা বলতে চাও তো কাল আবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করব।" জ্যোতি প্রস্তাব করে।

"না, না। আর আমি ও বাড়ির ছায়া মাড়াব না। আমার আত্মসম্মানে বাধবে। গৌরী যদি আশ্রমে এসে দেখা দেয় তো কথা হবে।" রঞ্জু পাল্টা প্রস্তাব করে।

"তাতে আবার ওঁদের মর্যাদায় বাধবে।" জ্যোতি জবাব দেয়।

রঞ্জু মনে মনে জানত যে, পঁচিশে সে রেঙ্গুনযাত্রা হবার নয়। নতুন আবির্ভাবের আলোয় সব কিছু নতুন করে ভাবতে হবে। পঁচিশে সে ওদের যথেষ্ট সময় দেবে না।

বলে, "কাজ কি আর দেখাসাক্ষাৎ করে? বলা তো ওই একই যে, পঁচিশে সে বাতিল। পরে ভেবে চিন্তে আবার দিন ফেলা যাবে।"

জ্যোতি এ কথায় সায় দেয়। "রেঙ্গুন-যাত্রার জরুরির আর নেই। যখন দিন ধার্য করেছিলুম তখন এই ভেবে করেছিলুম যে, সম্ভবতো ওকে না সরালে ও সন্তানসম্ভবা হবে। দেখা গেল দু' মাস দেরি হয়ে গেছে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এখন আর রেঙ্গুনযাত্রায় তাড়া কিসের? ধীরেসুস্থে গুছোলেই চলবে। যদি আদৌ যাওয়া হয়।"

"না, না, যাওয়া বাতিল হবে না। শুধু পঁচিশে তো বাতিল হবে। আমি ওকে কথা দিয়েছি যে, ওকে মুক্ত করবই। সেই কথা শুনেই ও বাঁচতে রাজী হয়েছে। এর পরে কি পিছিয়ে যাওয়া চলে? দিন পিছিয়ে দেওয়া অন্য কথা।" রঞ্জু তার অভিমত জানায়।

"আচ্ছা, তাই হোক। ওর সঙ্গে আমার দেখা হলে ওকে বলব যে, এ যাত্রা নয়, কিন্তু হবে একদিন রেঙ্গুনযাত্রা। তার আগে সন্তানের কথাটিও ভাবতে হবে। জেটানিটি কেস থাকে কয়ে পথে বেরয় যারা তাদের সম্বল আরও বেশী হওয়া উচিত। তা ছাড়া ঝুঁকিটিও তো কম নয়। এ শুধু একজনকে বাঁচানো নয়, দুটি প্রাণকে বাঁচানো।" জ্যোতি বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে ওঠে।

পঁচিশে তাই অমনি করে পরিত্যক্ত হয়। ধরে নেওয়া হয় যে, গৌরীও একমত হবে।

রঞ্জু মনে করেছিল বিছানায় গা মেলে দিলেই ঘুম আপনি আসবে। দু' রাতের ঘুম। কিন্তু চোখ বুজে কেবল গৌরীর রূপ দেখতে থাকে। কী রূপ! প্রিয়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ কত বড়ো সৌভাগ্য! অথচ কোথায় অবিমিশ্র আনন্দ! কী অদৃষ্ট ওই মেয়েটি! এর পরে আর বলতে পারবে না যে, ও কুমারী। আত্ম-প্রবাদ এখন ওর বিরুদ্ধে যাবে। বেচারি! পাঁচ বছরের প্রতিরোধ একটি দিনেই ব্যর্থ।

অভিমানের আরও একটা কারণ ছিল। কথাটা এমন নয় যে, জ্যোতিদাকেও বলা যায় না। গৌরীকেও না। কাননকে তো নয়ই, কাউকেই না। রঞ্জু তার সেই গোপন ব্যথাটি গোপনেই বহন করে। তার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। এই প্রথম গৌরীর কাছ থেকে সে কিছু আড়াল করল!

রঞ্জু ও শ্রীমতীর শুভদৃষ্টির আগে দুজনাতে একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। পুরুষ পরীক্ষা ও রমণী পরীক্ষা। রঞ্জুর অন্তরাত্মা অনুভব করল যে, প্রেমিক হিসাবে সে পাস করলেও পুরুষ হিসাবে ফেল। গৌরীর চাউনিতে সেই দীপ্তি ছিল না যা এক মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠে তারই আলোয় জানিয়ে দিয়ে যায় যে, তুমি পুরুষ আমি নারী।

এটা হলো ইনটুইশন বা ইনস্টিংকটের ব্যাপার। যুক্তি দিয়ে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। গৌরী ওকে ভালোবাসে নিশ্চয়। অমন ভালোবাসা আর কেউ ওকে বাসেনি। কিন্তু ও ভালোবাসা হাতে রেখে ভালোবাসা। এমন কিছু হাতে রেখেছে যা পেলে পুরুষ জয়ী হয়, না পেলে প্রত্যাখ্যাত।

এটি ওর যেমন গোপন ব্যথা তেমনি একটি গোপন আশ্বাসও ছিল। গৌরীর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে প্রভাতের মুখে অপরিচিতার যে বর্ণনা শুনেছিল তা রঞ্জুকে আতঙ্কিত করেছিল। ও মেয়ে নাকি প্যাঁকাল দিয়ে গড়া। যার সঙ্গে পরিচয় কোনোদিন হবে কিনা অজানা তার সম্বন্ধে এ আতঙ্ক সম্পূর্ণ অযৌক্তিক? পত্রযোগে পরিচয় হতে হতে প্রেম, প্রেম থেকে প্রথম দর্শন। রঞ্জু যা আশঙ্কা করেছিল তা নয়। এতখানি সময় ওর সঙ্গে নিরালায় কাটিয়েও প্যাশনের নামগন্ধ পায়নি ওর চেহারায় বা চোখে। রঞ্জু আশ্বস্ত হয়েছে। প্রভাতের ওটা হয়তো দৃষ্টিবিভ্রম। এমনও হতে পারে যে, নতুন আবির্ভাবের পর পুরাতন প্যাশন অন্তর্হিত হয়েছে। প্রকৃতি ওটা দিয়েছিল মাতৃত্বের প্রস্তাবনা রূপে। কিংবা পরাজয়ের বিষাদ ওকে আচ্ছন্ন করেছে বলে ওর সেই মোহিনী রূপ খুলছে না।

পরের দিন কানন ফিরল আশ্রমে। তাঁর হাতে গৌরীর কয়েক ছত্র চিঠি। লিখেছে—

"কাল সারা রাত এ বাড়িতে বিজয়োৎসব হয়েছে, জানিস। এমন হই-হল্লা আমি জীবনে শুনিনি। আর এমন অপমানও আমি জীবনে পাইনি। এরই জন্যে কি তুই আমাকে বাঁচিয়ে রেখে গেলি। এই রাক্ষসপুরীতে? সেই রাজকন্যার মতো? তোর উপর আমি বিষম রাগ করেছি, মানিক। আমার বুঝতে বাকী নেই যে, তুই আমাকে ওঁর হাতেই তুলে দিতে চাস। ওঁরই কাজে এসেছিলি। তোর নিজের বলতে কোনো কাজ ছিল না। আমাকে বাঁচানো তোর নিজের জন্যে নয়। উনি এই ভেবে নাচছেন যে, বিজয়ীর মতো পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করবেন। কিন্তু ততদিন যদি আমি না বাঁচি!"

কাননের মুখে শোনা গেল বাবামশায় গৌরীকে একটি কথাও বলেননি। এমন কি অন্দরমহলেই যাননি। সারা রাত সদর-মহলেই কাটিয়েছেন। কাননের অনুরোধে বেহালা বাজিয়েছেন, বন্ধুদের অনুরোধে বিলিতী গ্রামোফোনের রেকর্ড দিয়েছেন। আর পানভোজনের তো কথাই নেই। রাজ-পক্ষীর সঙ্গে গঙ্গাজল। পীরতাং নীয়তাং।

"তুমিও পান করেছিলে নাকি?" রঞ্জু চেপে ধরে।

"করব না কেন? বিশুদ্ধ গঙ্গাজল। বোতলটা শুধু স্কটল্যাণ্ডে তৈরি।" কানন কবুল করে।

"গন্ধ থেকে টের পাওনি?" জ্যোতি জেরা করে।

"গন্ধটা কি জলের, না বোতলের?" কানন অম্লানবদনে বলে।

"আর স্বাদটা?" জ্যোতি হাসে।

"সেটাও বোতলের সংসর্গে।" শুনে সকলে গড়াগড়ি যায়।

একটা ওই বিলিতী গ্রামোফোনের রেকর্ডের একতানে জয়বাদ্য বাজনা ছিল। সৈনিকরা যার সঙ্গে মার্চ করে যায়। কাননের তো ওটা অপূর্ব ঠেকেছিল। ওরই সনির্বন্ধ অনুরোধে ওটা বারবার বাজানো হয়।

সকালে যখন গৌরীর কাছ থেকে বিদায় নিতে যায় তখন দেখে ও মেয়ে অভিমানে কথা বলতেই চায় না। কেন বলবে? এত বড়ো অপমানের পরে কথা বলতে কার না গা জ্বালা করে! "কথা বলব কোন ছলে? কথা বলতে গা জ্বলে।"

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোঝা গেল যে, বাবামশায় রাত্রে অন্দরমহলে পা দেননি আর সদরে বসে যা করেছেন তা বিজয়োৎসব। যেন যুদ্ধ জিতেছেন। গৌরী অবশ্য খুলে বলেনি যুদ্ধটা কার সঙ্গে ও কী নিয়ে। কানন ঘুণাক্ষরেও জানে না। বোধ হয় শিকার অভিযানে সফল হয়েছেন। শিকারের নামে প্রাণিবধ গৌরী একেবারেই দেখতে পারে না। গৌরীর মুখেই কানন প্রথম শুনল যে, ও যা উদরস্থ করেছে তা রাজপক্ষী নয়, চখা চখী। তা শুনে অবধি কানন মুসলমানের মতো তওবা তওবা করছে। কিন্তু গঙ্গাজলের জন্যে নয়।

এই স্থির হলো যে, জ্যোতি গিয়ে গৌরীকে শান্ত করবে। রঞ্জু এক টুকরো চিঠি লিখে জ্যোতির জিম্মা দিল। লিখল, "আমারই উচিত ছিল আনন্দ উৎসব করা। তোর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা কি সেলিব্রেট করবার মতো নয়? আর তোর ওই বাঁচতে রাজী হওয়া তো হাজারটা 'মার্চ' সঙ্গীতের যোগ্য। কল্পনা করা যাক যে, ওটা আমাদের দুজনেরই উৎসব। তবে ওই নিরীহ পাখিগুলি বাদে। আর ওই তথা-কথিত গঙ্গাজল।"

রঞ্জুর মনে কিন্তু আনন্দের লেশ ছিল না। বাণ যেন ওর বুকেও বিঁধেছে। নিষ্ঠুর বাস্তব ওর স্বপ্নভঙ্গ করেছে।

(ক্রমশ)

পশুপালকদের প্রতি।

আপনি কি জানেন, প্রচুর খড়, খোল-ভূষি প্রভৃতি খাইয়েও কেন আপনি আপনার গোরুগুলির স্বাস্থ্য ফেরাতে পারছেন না? উন্মুক্ত প্রান্তরে সজীব সবুজ ঘাস খেয়েও কেন আপনার গরুর গলগণ্ড হয়? মাঝে মাঝে দুই একটি গরু বা মোষ হঠাৎ কেমন যেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, তাতেও কাজ হচ্ছে না। একদিন আপনার চোখের সামনেই কেমন অসহায়ের মত ধপ করে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল। অবশেষে মৃত্যু! শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই নয়, যাঁরা নিয়মিত পশুপালন করেন, তাঁরা জানেন, এ ধরনের মৃত্যু কী দারুন শোকাবহ ব্যাপার।......অথবা, যাঁরা নিয়মিত ভেড়া বা ছাগল পালন করেন, কখনও কখনও তাঁরাও লক্ষ করে থাকবেন, তাঁদের কিছু কিছু পশু ঠিকমত পুষ্ট হয়ে উঠছে না। সেই সঙ্গে তাদের গায়ের লোম কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে লোম উঠে গিয়ে চামড়ায় খোস জন্মাচ্ছে, ইত্যাদি। অনুরূপ দৃশ্য হাস-মুরগীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য! কিন্তু কেন? যথাযথ কারণেই ইদানিং ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকে গোরু, মোষ, ভেড়া বা হাসমুরগী পুষে থাকেন। ওদের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্যে চেষ্টাও বড় কম করছেন না। তবু।

যদি আপনি মনে করেন আপনার গৃহপালিত পশু সত্যিই কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়নি, অথচ দিন দিন তাদের স্বাস্থ্য অবনতির দিকেই যাচ্ছে, তাহলে তাদের খাদ্যবস্তুর ওপর একটু নজর দিন। দৈহিক পুষ্টি এবং শারীরিক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্যে শুধু মানুষই নয়, অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যেও উপযুক্ত পরিমাণ খনিজ থাকা দরকার। যেমন ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস। এরা প্রাণীর অস্থি এবং দাঁতকে পরিপুষ্ট করে এবং শরীরে অপরাপর রাসায়নিক পদার্থের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করে। এ ছাড়াও নিয়ম মাফিক বিপাকীয় ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্যে আরও কিছু কিছু পদার্থের প্রয়োজন। এদের বলা হয় 'ট্রেস এলিমেন্টস' বা প্রভাবক পদার্থ। পরিমাণে অতি নগণ্য হলেও দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় এদের ভূমিকা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক বছর ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে পশু-বিশেষজ্ঞরা এখন একমত : পশু-পাখির পুষ্টির ব্যাপারে ওদের উপেক্ষা করা চলে না। যখনই কোন গরু, ভেড়া প্রভৃতির মধ্যে বিরূপ স্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখা দেয়, আমাদের উচিত, ঠিক যে ধরনের খাবার তারা খাচ্ছে, তাদের পরীক্ষা করে নেওয়া। দেখা দরকার, ঐ খাবারে বিশেষ কোন প্রভাবক পদার্থের অনুপস্থিতি ঘটছে কি না?

পরীক্ষা করে দেখা গেছে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে মুখ্যত যে সমস্ত প্রভাবক পদার্থের ভূমিকা অপরিহার্য, তাদের মধ্যে পড়ে, তামা, কোবল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, আইওডিন, মলিবডেনাম এবং সেলেনিয়াম। আগেই বলেছি, শরীরে এদের পরিমাণ খুবই নগণ্য। তবু শারীরিক প্রয়োজনে এদের প্রত্যেকটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এদের যে কোন একটির অভাব পশুকে রোগাক্রান্ত করতে পারে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও। এদের প্রধান ভূমিকা, শরীরকে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক যোগ তৈরি করতে সাহায্য করা, যাতে করে শরীরের সমস্ত যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক কাজ করতে পারে, এনজাইমস বা বিপাকীয় প্রভাবকদের সক্রিয় করে এক এক ধরনের রাসায়নিক যোগকে ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যোগে পরিবর্তিত করা, ইত্যাদি। যেমন ধরুন, শরীরে যদি তামার অভাব ঘটে, তাহলে এক ধরনের রক্তাল্পতা রোগ দেখা দিতে পারে। কারণ সে ক্ষেত্রে শরীর তার খাদ্য বস্তুর লোহাকে রক্তের লোহিত কণিকা তৈরির কাজে লাগাতে পারে না। মলিবডেনামের কথা ধরুন। এই বস্তুটির কাজ জানাইথন অকসিডেজ নামে এক ধরনের এনজাইমকে উদ্দীপ্ত করে তোলা। এই এনজাইমটি নিউক্লেয়িক অ্যাসিডের বিপাকীয় ব্যবস্থাপনায় ইউরিক অ্যাসিড সংশ্লেষণে সাহায্য করে। ইত্যাদি।

প্রাচীন কাল থেকেই উপযুক্ত প্রভাবক পদার্থের অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে অনেকেই সচেতন রয়েছেন। গৃহপালিত পশু-পাখির বিভিন্ন রোগের কথা পৃথিবীর নানা দেশে নানা রকম উপকথার সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান তখনও শুরু হয় নি। ওঁরা জানতেন, পশু-পাখির মধ্যে বিভিন্ন রকমের রোগ হয়। সেটা যে ঐ বিশেষ পদার্থগুলির অভাবে, সে কথা ওঁরা জানতেন না। ব্যাপারটা ওঁদের

তামার অভাবে এই বাছুরটির শরীরে নিয়মিত লোম গজাতে পারে নি। পেছনের পা দুটিও খুব দুর্বল। 'বসে পড়া' রোগের পূর্বাবস্থা

তাম্রঘটিত ওষুধ খাইয়ে সেই বাছুরটিকেই কেমন শক্তসামর্থ্য করে তোলা গেছে, লক্ষ করুন। এবার পেছনের দিকটা এবং লেজে প্রচুর লোম গজিয়েছে

কাছে রহস্যের মত মনে হত। ও'রা ভাবতেন, হয়ত বিশেষ বিশেষ চারণভূমিতে কোন কোন আদিম দেবতার অভিশাপ ভর করে থাকে। ফলে সেখানকার গাছপালা বিষাক্ত হয়ে যায়। আর তাদের খেয়ে পশুপাখিরাও দুর্বল হয়ে পড়ে বা মারা যায়। কেউ কেউ ভাবতেন অপদেবতার স্পর্শে তাদের গরু বাছুরের মধ্যে মড়ক লাগে, প্রভৃতি। তার জন্যে নানা রকম ওঝা লাগিয়ে ঝার-ফুঁক করতেও তাঁরা কসুর করেন নি। ও'রা পশুর রোগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, শুধু যথাযথ কারণটি জানতেন না।

এখন জানা গেছে, নিয়মিত পশু খাদ্যের মধ্যে কিছু পরিমাণ প্রভাবক-পদার্থ থাকা দরকার। যে সমস্ত চারণভূমির ঘাস বা খড় তারা খেয়ে থাকে, সত্যিই তাদের মধ্যে প্রভাবক পদার্থ আছে কি না, পশুর পক্ষে সে কথা বোঝা শক্ত। মুশকিল হল, ঐ চারণক্ষেত্রের গাছপালার মধ্যে ঐ সমস্ত বস্তুর অভাব থেকে যায়। ফলে কিছুদিন সেখানকার গাছপালা উদরসাৎ করার পর পশুরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ব্যাপারটা লক্ষ করার সংগে সংগে পশুপালক যদি সাবধান না হন এবং সংগে সংগে তাঁর পশুদের সেখান থেকে সরিয়ে না নেন, তা হলে বড় রকমের একটা ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে।

আমার কথাই ধরুন। পৃথিবীর বহু চারণক্ষেত্রের মাটিতেই অতিপ্রয়োজনীয় এই পদার্থটির ঘাটতি দেখা যায়। পশু খাদ্যের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হিসেবে এই বস্তুটির ভূমিকার কথা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৩৭ সালে, অস্ট্রেলিয়ায়। আবিষ্কারক দুজন পশুবিজ্ঞানী। ওরা লক্ষ করলেন, একদল ভেড়া অদ্ভুত এক রকমের রক্তাল্পতা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রোগটির প্রাদুর্ভাব যেন বাচ্চাদের মধ্যেই বেশি। এই রক্তাল্পতার দরুন তাদের স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত পেছনের পা দুটির পেশী পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে পড়েছে। ও'রা লক্ষ করলেন, অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় যদি কোন স্ত্রী ভেড়াকে কিছুটা করে তাম্রঘটিত ওষুধ খাওয়ান যায়, তাদের বাচ্চাদের মধ্যে এ ধরনের রোগ আর দেখা যায় না। ও'রা এটাও দেখলেন, যে সমস্ত ভেড়ার মধ্যে জন্মের ছয় মাসের মধ্যে ঐ ধরনের রোগ প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে, তারাও তাম্রঘটিত ওষুধ খেয়ে রীতিমত সুস্থ হয়ে উঠেছে।

এ ধরনের রোগ শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই নয় ভারত, সোভিয়েত দেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা যায়। এর আবির্ভাব অত্যন্ত ধীর গতিতে। পুরোপুরি রোগের লক্ষণ প্রকাশ হতে অনেক সময় কয়েক মাসও লেগে যায়। নিয়মিত চারণক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অথচ দিন দিন কেমন তারা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একদিন পেছনের পা দুটি মুড়ে যেমন মাটির উপর বসে পড়ল। কেন পড়ল, অনভিজ্ঞের যাচ্ছে তা অস্পষ্টই থেকে যায়। অথচ এর দরুন যে ক্ষয় ক্ষতি হয়, তা উপেক্ষা করা চলে না।

বৃটেনে এর নাম 'বসে পড়া' রোগ এবং অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে এর প্রাদুর্ভাব সেখানে ব্যাপক। রোগটির প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত, শিশু-ভেড়ার সেখানেও মৃত্যু হার ছিল শতকরা এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত। অবশিষ্ট যারা বেঁচে থাকত তাদের মধ্যে অনেকে বয়েস বাড়ার সংগে সংগে অন্ধ হয়ে যেত, দাঁড়াতে বা চলাফেরা করতে পারত না। যারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হত, তাদের অনেকেই জন্মের পরই মারা যেত। কম আক্রান্তরা দুর্বল দেহ নিয়ে কোন প্রকারে কালাতিপাত করত। তবে অদ্ভুত, এদের বাচ্চারা কিন্তু অনেক সময় স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নিয়েই জন্মাত। আবার কোন কোন

ক্ষেত্রে বাচ্চাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলেও, আপাত দৃষ্টিতে মায়েদের শরীরে কোন লক্ষণই প্রকাশ পেত না। এ থেকে কেউ কেউ ভাববে, হয়ত এ ধরনের রোগের পেছনে প্রজননগত কোন ত্রুটি কাজ করে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে বলা হয়, 'জেনেটিক ডিফেকট।' কিন্তু গবেষণার পর দেখা গেল, শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ তামার অভাবই যত অনর্থের মূল।

শুধু শারীরিক ক্ষতিই নয়। শরীরে তামার অভাব ঘটলে ভেড়ার লোমও স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, সেই সঙ্গে উৎকর্ষও হারায়। অথচ দেখা গেছে কৃত্রিম উপায়ে যে মুহূর্তে এই অভাবটিই দূর করা গেছে, ওদের স্বাস্থ্যও যেমন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে লোমের বাড়ও হয়, উৎকর্ষতাও বাড়ে।

গরুর ব্যাপারেও তামার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। প্রয়োজন মত তামার অভাবে, তাদের শরীরেরও নানা ধরনের রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। গরুর মধ্যেও 'বসে পড়া' রোগ হতে দেখা যায় এবং তার অন্যতম কারণ যে তামা, সেটা প্রথম ধরা পড়েছিল ১৯৪০ সালে, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়। ব্যাপারটা প্রকটভাবে দেখা দেয়, কতকগুলি দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের গরুর মধ্যে। ওঁরা লক্ষ করেন, যে সমস্ত গোচারণ ক্ষেত্রে তাদের গরুগুলি পাঠান হয়, সেখানে ঘাস ছাড়াও এক ধরনের রসাল গাছের পরিমাণ অনেক বেশি। ঐ সমস্ত গাছপালা খাওয়ার ফলে অল্পদিনের মধ্যে গরুগুলির স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ে। এক একটি দলে শতকরা চার থেকে চল্লিশটি গরুর অকাল-মৃত্যু ঘটে। এবং বেশির ভাগই মারা যায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অথবা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তামার অভাবজনিত রোগে। এদের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। সেই সঙ্গে গর্ভসঞ্চারের অভাব। বাচ্চাগুলি দারুণ রুগ্ন এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অপুষ্টও। পরে ইনজেকশনের সাহায্যে শরীরে তামাঘটিত ওষুধ ঢুকিয়ে এবং তামাঘটিত পদার্থ খাইয়ে ভয়াবহ এই রোগটিকে নিয়ন্ত্রিত করা গেছে। কখনও কখনও কপার সালফেটের দ্রবণে স্নান করিয়েও সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা ভেড়াদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পশুবিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, গোচারণ জমিতে তামার যৌগ জলীয় দ্রবণের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলেও কাজ হয়। এতে করে ঐ জমির মাটি তামার-যৌগে সিক্ত হয় এবং সেখানকার ঘাসের মধ্যে তামার পরিমাণ বেড়ে যায়। তবে এ ধরনের ব্যবস্থাপনার সবচাইতে বড় বিপদ হল এর ফলে কিছুটা তামা এমনিতেই ঘাসের গায়ে লেগে থাকে। অতিরিক্ত এই তামা গরুর যকৃৎ-এ জমতে শুরু করলে,

আজ্ঞে না, ইনি কোন ম্যাজিসিয়ান নন। এঁর কাজ মাটির নিচে বসান টেলিফোন বা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের হারিয়ে যাওয়া কেবল-লাইনগুলিকে খুঁজে বের করা। আধুনিক জীবনযাত্রার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব দিন বেড়ে যাচ্ছে। বাইরের ভীড়ের হাত থেকে বাঁচানর জন্যে ইদানিং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা যাবতীয় সংযোগ ব্যবস্থা মাটির নিচেই বসিয়ে থাকেন। কোথায় কী ভাবে তাদের বসান হচ্ছে তার এক একটি ছক অবশ্য তাঁদের কাছে থাকে এবং যে সমস্ত জায়গার নিচে দিয়ে বিদ্যুৎবাহী তারগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে মাঝে মাঝে সংকেত ফলকও বসান হয়। কিন্তু গোলমাল বাধে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যকোন কারণে যখন ঐ ফলকগুলি হারিয়ে যায়, তখন। খোঁড়াখুঁড়ি না করে তাদের খুঁজে বের করার জন্যে কিছু কিছু যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ছবিতে ঐ ধরনের একটি যন্ত্র দেখান হল। এটি তৈরি করেছেন পোল্যাণ্ডের ক্রাকওস্থিত ইনসটিটিউট অব জিওডেসি অব দি অ্যাকাডেমি অব মাইনিং অ্যাণ্ড মেটালারজি। যন্ত্রের প্রধান অংশ একটি সংকেত প্রেরক যন্ত্র। ঐ যন্ত্রের সঙ্গে জোড়া থাকে একটি তাড়িৎশক্তি উৎপাদক যন্ত্র এবং বেতার গ্রাহক। মাটির নিচে ছয় মিটার গভীরেও যদি কোন তাড়িৎ-বর্তনী প্রোথিত থাকে, এই যন্ত্র তাকে খুঁজে বের করতে পারে। এ ব্যাপারে প্রচলিত যন্ত্রপাতির চেয়ে এর কার্যক্ষমতা অনেক বেশি। এর উদ্ভাবক ঐ ইনসটিটিউটেরই ইঞ্জিনিয়ার জারাস রডজিনকিয়েউশ। যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করে, জারাস নিজেই তা দেখিয়ে দিচ্ছেন

ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে ভেড়ার ব্যাপারে এ সম্পর্কে কিছুটা সতর্ক হওয়া দরকার।

এ ছাড়াও কিছু কিছু পদার্থ আছে, যারা শরীরকে প্রয়োজন মত তামাকে কাজে লাগাতে বাধা দেয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে, উপযুক্ত পরিমাণ তামা খাইয়েও সুফল পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। যেমন মলিবডেনাম। ইংল্যাণ্ডের কোন কোন চারণ জমিতে, যেমন সোমারসেট, গ্লোচেস্টারসায়ার প্রভৃতি অঞ্চলে, দেখা গেছে জমিতে মলিবডেনামের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী সাধারণত যেখানে এক লক্ষ ভাগের তি

এই সমস্ত জমির ঘাসে সে তুলনায় প্রতি লক্ষ ভাগে ঐ বস্তুটির পরিমাপ কুড়ি থেকে একশ ভাগ পর্যন্ত দেখা যায়। ফলে ঐ অঞ্চলের চারণরত গরু, ভেড়া প্রভৃতির শরীরে মলিবডেনামের মাত্রাও বেড়ে যায় এবং অবশেষে খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজন মত তামা গ্রহণ করেও বিপাকীয় ক্ষেত্রে সেই তামা কোন কাজেই করার ব্যাপারে ঠিক অনরূপ বাধা সৃষ্টি করে অতিরিক্ত দস্তা এবং সিসেও।

কোন কোন চারণ ক্ষেত্রের মাটিতে কোবল্টের মাত্রাও কম দেখা যায়। কখনও এই অবস্থাটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে চোখে পড়ে। আবার কোন কোন দেশে কোবল্টের ঘাটতি অত্যন্ত প্রকট। তামার মত কোবল্ট-অস্ট্রেলিয়াতেই। ওঁরা লক্ষ করেন, যে সমস্ত ভেড়ার পাল সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘাস খেয়ে বেড়ায়, কিছুদিন পর তারা অহেতুক যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং অবশেষে মৃত্যু। এ ধরনের ঘটনা, এক-আধটা নয়, অনেক। বিরাট এই ক্ষতির সম্মুখে পড়ে প্রথম দিকে ওঁদের মাথা
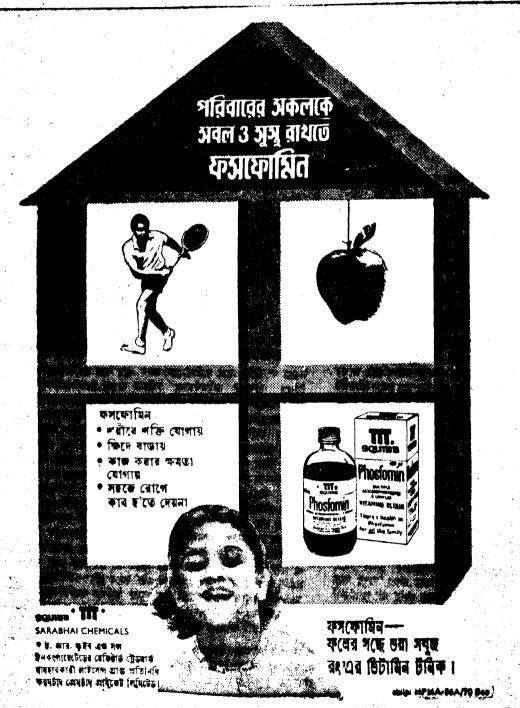
উপকূলবর্তী প্রায় সব জায়গাতেই একই ব্যাপার। রোগটির ও'রা নাম রাখলেন 'কোস্ট ডিজিস' বা 'উপকূল-রোগ'। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেল, ঐ সব অঞ্চলের ঘাসে কোবল্টের অভাব রয়েছে। তামার পরিমাণও খুব কম। পরে প্রয়োজন মত কোবল্ট এবং তামা ঘটিত ওষুধ খাইয়ে ঐ ধরনের রোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র কোবল্টজনিত রোগের চিকিৎসা ব্যাপারে অনেকেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পরীক্ষা করে জানা গেছে, কোবল্ট কিন্তু আসলে প্রত্যক্ষভাবে শরীরের কোন প্রয়োজনে লাগে না। তবে পরোক্ষভাবে প্রাণীর পাকস্থলীর মধ্যেকার এক ধরনের জীবাণুর সাহায্যে শরীরে ভিটামিন বি-১২ উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। শরীরে কোবল্টের মাত্রা কমে গেলে ঐ জীবাণুর সংখ্যাও কমতে শুরু করে। ফলে ভিটামিন বি-১২-র উৎপাদনও কমে যায়। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যে শরীরের অন্যান্য কোষকলায় সংরক্ষিত ভিটামিন বি-১২র উপর তখন টান পড়ে। অবশেষে সেই সঞ্চয় যতই সীমিত হয়, প্রাণীদেহ ততই দুর্বল হয়ে পড়ে। কোবল্ট-জনিত এ ধরনের রোগ গরু বা ভেড়ার মধ্যেই বেশি দেখা যায়। অনেক সময় ছাগলও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে শিশুপশুর ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনেক বেশি মারাত্মক। এ ধরনের রোগ নিরাময়ের জন্যে অনেক সময় ভিটামিন বি-১২র সাহায্য নেওয়া হয়। তবে এতে খরচ পড়ে বেশি। তাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, জমিতে কোবল্ট-ঘটিত লবন ছড়িয়েও কাজ সারা হয়। কোন কোন দেশ সরাসরি কোবল্টঘটিত বড়ি খাইয়েও সুফল পেয়েছেন।

প্রভাবক বস্তু হিসেবে আইওডিনের ভূমিকাও উপেক্ষা করা চলে না। প্রাণী দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় আইওডিনের পরিমাণ খুবই কম। এক লক্ষ ভাগের দশমিক ছয় ভাগ মাত্র। কিন্তু থাইরক্সিন নামক অতি-প্রয়োজনীয় এক ধরনের হরমোনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে এই থাইরক্সিন নির্গত হয়ে থাকে।

প্রাণীর খাদ্যে যদি আইওডিনের পরিমাণ কম থাকে, শরীরে থাইরক্সিনের মাত্রাও কমে যায়। ব্যাপারটা বোঝা খুব শক্ত নয়। এ সময়ে গলার কাছে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থিটিও স্ফীত হতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত গলগণ্ডের মত ফুলে ওঠে। তখন ঐ স্ফীতভাব দেখে বাইরে থেকেই বলে দেওয়া সম্ভব, সত্যিই কেউ আইডিনের অভাবজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কি না। থাইরয়েড গ্রন্থি যথাযথ কাজ না করতে পারলে প্রজনন ক্ষমতা কমে আসে এবং সে ক্ষেত্রে গরু, ভেড়া প্রভৃতি যে সমস্ত বাচ্চা প্রসব করে তাদের গায়ে লোমের অভাব দেখা দেয়। কখনও অত্যন্ত দুর্বল। কখনও বা মৃত অবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ হয়ে জন্মায়।

গলগণ্ড রোগ দেখা দিলে পশুখাদ্যে সাধারণত সোডিয়াম বা পটাসিয়াম আইওডাইড মিশিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও সমুদ্রজাত উদ্ভিদও ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ ঐ সমস্ত উদ্ভিদে আওডিন থাকে প্রচুর, পরিমাণে কখনও কখনও দশমিক দুই শতাংশ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, মানুষের ক্ষেত্রে মাছ এ ব্যাপারে একটি বড় রকমের সম্পদ। মাছেও প্রচুর আইওডিন থাকে।

এর পর আসে ম্যাঙ্গানিজের কথা। প্রাণী খাদ্য রূপে শর্করা, প্রোটিন এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করে। এদের শরীরের পক্ষে গ্রহণীয় পদার্থরূপে পরিবর্তিত করার জন্যে দরকার বিশেষ কয়েকটি এনজাইম বা জীব-রাসায়নিক অনুঘটক। এই সমস্ত অনুঘটককে সক্রিয় রাখার অন্যতম ভূমিকা ম্যাঙ্গানিজের। এছাড়াও ম্যাঙ্গানিজের অভাবে পশুর পালক, লোম প্রভৃতি বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে, হাড় কমজোর হতে পারে এবং কখনও কখনও পশুর মধ্যে বন্ধ্যাত্ব দানা বাঁধতে পারে। অবশ্য সাধারণ অবস্থায় এ ধরনের রোগ খুব কমই দেখা যায়।

মানুষের দেহকোষের প্রায় সর্বত্রই আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাবক-পদার্থের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এর নাম দস্তা। দেহ কোষ থেকে এই দস্তা অন্যান্য ধাতুর মতই শরীরের অস্থিতে গিয়ে সঞ্চিত হয়। চারণ ক্ষেত্রে ঘাসপাতার মধ্যেও উপযুক্ত পরিমাণ দস্তা পাওয়া যায়। অতএব পশু খাদ্যে দস্তার অভাব থাকার কোন কারণ নেই। তবে যদি কখনও ঘটে, সে ক্ষেত্রে কিছু কিছু চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে শূকরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মারাত্মকও হতে পারে। দস্তার অভাবে শূকরের পেটে বড় বড় লাল দাগ ফুটে ওঠে। স্ফোটকও দেখা দিতে পারে অথবা খোস-রোগ।

সম্প্রতি আরও একটি ধাতুর কথা শোনা যাচ্ছে, যার নাম সেলেনিয়াম। পৃথিবীর কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই শুধু এই পদার্থটির দর্শন মেলে। উদ্ভিদে এর পরিমাণ বেশি থাকলে শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে, এতদিন এটাই ছিল এর পরিচয়। কোন কোন জায়গায় অতিরিক্ত সেলেনিয়াম ঘটিত গাছপালা বা ঘাস খেয়ে পশু-পাখিদের মধ্যে বিষক্রিয়া হতে দেখাও গেছে। কিন্তু ইদানিং গবেষকরা বলছেন, শরীরে সেলেনিয়ামের ঘাটতি হলে এক ধরনের পেশীর রোগে (হোয়াইট মাসল) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রোগটি প্রতিরোধ করার ব্যাপারে বিশেষ এই ধাতুর সত্যিকারের ভূমিকা কী, সে কথা এখনও পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। তবে এ বিষয়ে গবেষণার কাজ চলছে।

পশুবিজ্ঞানীরা আরও বিভিন্ন ধাতু নিয়েও পরীক্ষা চালাচ্ছেন। ও'দের বক্তব্য : পশুপালন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে এবং পশুদের রোগমুক্ত রাখতে হলে, সাধারণ খাদ্য ছাড়াও প্রভাবক-পদার্থগুলি সম্পর্কে সকলেরই সচেতন হওয়া দরকার।

সমরজিৎ কর

NCR MICROFORM HOLY BIBLE

বিশেষ শিল্প চর্চা? না, দশ সেন্টিমিটার চওড়া এবং পনের সেন্টিমিটার লম্বা এক-খণ্ড প্লাস্টিকের উপর পবিত্র বাইবেলের ১২৪৫ পৃষ্ঠার ছবি পাশাপাশি কেমন ছাপান হয়েছে, লক্ষ করুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল মাইক্রোফিলম অ্যাসোসিয়েশনের অভিমত, এই ভাবে প্লাস্টিক-কার্ডের উপর কোন পাঠাগার তার যাবতীয় বই-এর ছবি তুলে ছোট্ট একটি ড্রয়ারের মধ্যে সংরক্ষিত করতে পারবেন। অবশ্য মোট বই-এর সংখ্যা যদি ৬০০০০-এর বেশি না হয়।

ভালো
তামাক
থেকেই হয়
ভালো
সিগারেট

পানামা

সত্যিই ভালো সিগারেট

বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাক নিপুণভাবে মিশিয়ে তাদের টাটকা স্বাদগন্ধ বজায় রেখে তৈরী হয় আপনার পানামা। নিজে খেয়েও আরাম পাবেন, অন্যকে দিয়েও ভাল লাগবে।

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং, প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT (P)-671 Ben. Greens' Advt.

প্রতিভা বসু

উজ্জ্বল উদ্ধার

২৭
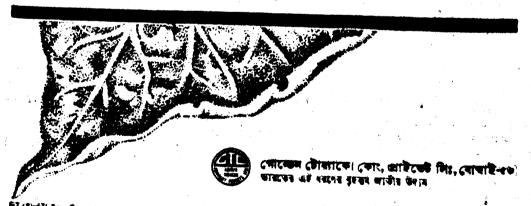
সীতেশদা চিঠি লিখল, অঞ্জু, আমি কাল প্লেন ধরছি। কলকাতা থেকে এসে পর্যন্ত কী ভয়ানক উৎকণ্ঠা এবং ব্যস্ততার মধ্যে আমার সময় কেটেছে বলবার নয়। দিল্লী গিয়ে রীতাকে ছুটি করাতে পারিনি। ও ছুটি নিয়ে পরে, মাত্র কাল রাত্রিবেলা এসে পৌঁচেছে। দিদি জামাইবাবুও এসেছেন। বাবা এখন অনেকটাই ভালো। বরাবরের মতো চলাফেরা করার অবস্থা হয়ত বাকী জীবনে আর হবে না, কিন্তু ঘরের মধ্যে চলাফেরা করার মত শক্তি যে তাঁর শেষ পর্যন্ত হ'ল সেটাই অনেক ভাগ্য। প্রায় দু বছর তিনি একেবারে পঙ্গু হয়ে বিছানায় ছিলেন।

আমাদের বাড়িটা যেমন তেমন ক'রে শেষ হয়েছে। একেই ছোটো বাড়ি, তাকে ছোটোতম ক'রে মা একজন মারাঠি বৃদ্ধাকে একখানা ঘর ভাড়া দিয়েছেন। বাকি অংশে নিজেরা চলে এসেছেন, বললেন, তুই যাবার আগে, আয় তোকে নিয়ে আমরা তিনরাত বাস করি।

নতুন বাড়িটাতে এসে বেশ ভাল লাগছে। মা ধীরে ধীরে আগেই গুছিয়ে রেখেছিলেন। আমি চলে গেলে বাড়ি ভাড়া চালান অসুবিধে হবে ভেবেই ঊর্ধ্বশ্বাসে সমাপ্ত করেছেন বাড়ি। অবশ্য যদি তাকে সমাপ্ত বলা যায়। কাজ অবশ্য আরও অনেক বাকি, তবু বাস করার যোগ্য হয়েছে সেটা ঠিক।

এবার রীতার কথা। তোমার বুদ্ধিমত আমি সে সংবাদ তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা, মানে দিদির সাহায্যে পরিবেশন না করে নিজেই বলেছিলাম। বললাম, পরিচয় দু'বছরের, মনোস্থির করেছি এক বছর, তবে তোমরা যদি দুঃখ পাও আমি অপেক্ষা করতে রাজী আছি। কেননা আমি জানি আমিও যেমন তোমাদের দুঃখ দিতে পারি না, তোমরাও তেমন আমার কষ্ট সইতে পার না।

মা বাবা দুজনেই চুপ করে রইলেন। অনেক পরে মা বললেন, তুমি যে অপেক্ষা করতে রাজী তাতো বুঝতেই পেরেছি, নইলে এক বছর আগে মনোস্থির করে আজ পর্যন্ত কীভাবে চুপ ক'রে আছো? কিন্তু মেয়েটি কদ্দিন রাজী থাকবে সেটাই কথা। ধরো, আমাদের কোনদিনই মত হ'ল না, তখন কী করবে?'

বললাম, 'তাতো ভাবিনি। শুধু ভেবেছি, আমি যাকে ভালবাসি তাকে তোমরা একটা জাত নামক পাপের অন্ধকারে চিরকাল ঠেলে রাখতে পারবে না, কোন না কোনদিন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে।

বাবা খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ছিলেন, বললেন, 'ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল সীতু।'

আমি বললাম, 'কী?'

'মারামারির সময়ে ওদের সবাই, মানে ওদের কমিউনিটির সবাই কিন্তু আমার বিপক্ষে ছিল না, ধরা যায় আধাআধি, এমন কি আমাকে যিনি টপ করে অত উঁচুতে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তিনিও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানই ছিলেন। কিন্তু ওদের প্রতি আমাদের একটা জন্মগত বিতৃষ্ণা থাকার দরুণ আমি প্রত্যেককে দায়ী করেছিলুম, ঘৃণা করেছিলুম এবং যাকেই হাতের নাগালে পেয়েছিলুম, পরিচয়ের সম্মান, বন্ধুতার সম্মান, উপকারের সম্মান সব ভুলে উন্মাদের মতো পিটিয়েছিলুম। যখন রাগ পড়ে গিয়েছিল, কষ্ট হয়েছিল মনে, সামান্য অনুতাপও অনুভব করে-ছিলুম। প্রকাশ করিনি, কিন্তু একটা অপরাধ বোধের বেদনা লেগেছিল কোথায়। তা ভালই হ'ল, তোমার স্ত্রীকে ভালোবেসে সে দুঃখ ভোলা যাবে।'

অতএব আমার অবস্থা বুঝতেই পার। বাচ্চা বয়সের মত লাফাবো না ডিগবাজি খাবো সেটাই ভাবছিলুম। সংগে সংগে ট্রাঙ্ক-কল গেল দিল্লীতে, খবর শুনে শ্রীমতী একেবারে লক্ষ্মীসীতার মত লাল পেড়ে তাঁতের শাড়ি পরে এসে বম্বেতে উপস্থিত শুধু সিঁদুরের টিপটিই যা বাকী ছিল, কাল রাত্রে হোটেলেই উঠেছিল, আজ মা বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।

লোকজন ডেকে সামান্য একটু পাকা দেখার অনুষ্ঠানও হয়েছে, বউয়ের দুধে আলতায় রং দেখে দেখে মা আর চোখ ফেরাতে পারছেন না, দিদি দিনে রাত্রে তাকে সাজাচ্ছে, আর বাবা আগের মতই হাঁক ডাক ক'রে কেবল মাছ মাংসের অর্ডার দিচ্ছেন।

আপাতত এই পর্যন্ত ঠিক হ'ল যে, রীতা যেমন কাজ করছে করবে, মাঝে মাঝে ছুটিতে এসে আমার সাবস্টিটিউট হিসেবে ভাবী শ্বশুর শাশুড়িকে দেখে যাবে, খবরা-খবর করবে, তারপর আমি ফিরে এলে তোমাদের সকলকে সাক্ষী রেখে সানাই টানাই বাজবে।

সুদর্শনের যাবার সময় হ'য়ে এল। তুমি কিন্তু বিচলিত হয়ো না। গড়ে পিটে মানুষ হয়েছে, পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে, মন শান্ত রেখে মাস্টার মশায়ের অনুগামী হয়ে ঠিকমত পড়াশুনো কর। আজ এই থাক। আমি পথে পথে তোমাকে চিঠি লিখে যাব। যখন যা দরকার আমাকে লিখো। জেনো তোমার দাদা সব সময়ে তোমার পাশে আছে।

সুদর্শনকে আলাদা লিখলাম। ভালবাসা নাও।

সীতেশদা

চিঠি পেয়ে আনন্দে অধীর হ'ল অঞ্জলি। মামা-মামী যে এত সহজে এমন সুন্দরভাবে সীতেশদার মনোনীতাকে গ্রহণ করবেন তা কিন্তু সে ভাবেনি। মনোরমা বললেন, 'সীতেশ এত কী সুখের কথা লিখেছে যে কাজকর্ম ফেলে কেবল চিঠিই পড়ছ।'

অঞ্জলি সব বিরোধ ভুলে ছুটে এল কাছে, উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'সীতেশদার বিয়ে ঠিক হয়েছে, খুব সুন্দর বউ, মামা-মামীরা খুব খুশি।'

'খুশি!'

'কতদিন থেকে সীতেশদা এই মেয়েকে ঠিক ক'রে রেখেছে, এতদিনে—'

'প্রেমের বিয়ে বুঝি?' মুখ বাঁকালেন মনোরমা। যেন প্রেমের বিয়ে একটা ভীষণ ঘৃণার ব্যাপার। দুশ্চরিত্র স্ত্রী-পুরুষের কাণ্ডকারখানা। অথচ এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে নিজে প্রেম ক'রে বিয়ে করেছেন।

আশ্চর্য মানুষের মন।

'কোথাকার মেয়ে?' আয়না দিয়ে দেখে

ফেলছিলেন।

'এই কলকাতারই।' উৎসাহ নিবে গিয়েছিল অঞ্জলির, সে চিঠিটা খামে ভরতে ভরতে ভাবছিল কখন দেখা হবে সুদর্শনের সঙ্গে। কখন সুখবরটা দিয়ে তাকে অবাক ক'রে দেবে।

মনোরমা আবার বললেন, 'কী জাত? বৈদ্য, কায়স্থ না ব্রাহ্মণ?'

'জানি না।'

'জানি না মানে? বিয়ে হচ্ছে আর জাত জান না?'

'সীতেশদা জাত মানেন না।'

'তার মা বাপ তো মানে '

'ও'রা তা নিয়ে কথা তোলেননি।'

মনোরমা রেগে গেলেন, পাকা চুল তোলা রেখে ঘচ্‌ঘচ্‌ ক'রে সরু চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন, 'তা তুলবেন কেন? যাদের নিজেদেরই জাতজন্মের ঠিকানা নেই, তাদের কাছে আবার জাতের মূল্য। যতো সব হয়ে হ'য়েছে—'

অঞ্জলি একবার তাকিয়ে ঢুকে গেল নিজের ঘরে।

বাড়ীটা তখন শান্ত ছিল। বাবা আপিসে চলে গিয়েছিলেন, টুকু বকু ইস্কুলে গিয়েছিল, সকাল বেলাকার কাজকর্মের ঝড়ঝাপটা বোঝা যাচ্ছিল না কিছু। এবার তার নিজের কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। আজ দেরিতে কলেজ।

কিন্তু এখন এই চিঠি পড়বার পরে মনোরমার মুখোমুখি বসে যাদের জাতজন্মের ঠিক নেই তাদের নিয়ে আলোচনা করতে মন বিমুখ হ'ল। জানালায় দাঁড়িয়ে চুলের লম্বা বেণীটা সামনে টেনে এনে ক্ষিপ্রহাতে খুলতে শুরু করল। মনে হ'লো তার চেয়ে স্নান ক'রে খেয়ে বেরিয়ে পড়া ভাল।

কিন্তু কোথায় যাবে? এই সময়ে কাকে পাবে সে? অন্তত যাকে পেতে চায় তাকে তো নিশ্চয়ই নয়।

চুলের বেণীর উপর হাত শিথিল হ'ল। কী লম্বা চুল। বিরক্ত লাগছিল অতক্ষণ ধ'রে খুলতে; মনে হচ্ছিল খানিকটা বেণী কেটে দেয় তক্ষুনি।

বাইরে থেকে কথা ছুঁড়লেন মনোরমা, 'তোমার তো আজ বারোটায় ক্লাস, বিকেলের পরোটা ক'খানা তৈরি ক'রে রাখতে পারবে নাকি? না কি আমাকেই আবার হেঁসেলে ঢুকতে হবে?'

আধখোলা বেণীতে আবার খোঁপার পাক দিল অঞ্জলি, কিছু না বলে চলে এলো রান্নাঘরে, কাঠের বারকোষ বার ক'রে ময়দা মাখতে বসল।

কলেজের রুটিন সবই মনোরমা জানেন। ভর্তি হবার পরে প্রথমেই সেটা জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়েছেন। সুতরাং তার মনে না দেরি হ'লে কথা শোনান, তাড়াতাড়ি গেলে রাগারাগি করেন। অবশ্য তাড়াতাড়ি যাওয়া বা দেরি ক'রে ফেরা দুটোর একটাও করে না অঞ্জলি। দরকার হয় না। তার জীবনের বৃত্ত হয়ত বা অস্বাস্থ্যকরভাবেই মাত্র তিনটি মানুষের মধ্যে সুসম্পূর্ণ ছিল। এক, তার সীতেশদা, দুই, মাস্টার মশায়, তিন, সুদর্শন।

খুব আলাপী বা মিশুকে না হবার দরুন, এখানে এসে তেমন গাঢ় বন্ধুত্ব কারো সঙ্গেই গড়ে ওঠেনি। যখন সুধাগঞ্জে ছিল, আবাল্য স্কুলে পড়ে সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে সে সহজ ছিল, সমকক্ষ ছিল, অসংকোচ ছিল, তাই একাত্ম ছিল।

কিন্তু একটু বেশী বয়সে কলকাতা এসে মফঃস্বলের শ্যাওলা তুলে ফেলে শহরের হালচালের সঙ্গে সমগোত্র হ'তে বড় বেশী সময় অতিবাহিত হ'লো। আসলে সীতেশদাকে পেয়ে গিয়ে অভাববোধটা কমে গিয়েছিল। যে দুঃখ নিয়ে সে বড় হয়ে উঠেছে, তাতে বন্ধুতার চেয়ে সহানুভূতির প্রয়োজন ছিল বেশী। সখ্যতার চেয়ে সান্ত্বনার, সান্নিধ্যের চেয়ে সাহায্যের। তার পারিপার্শ্বিক তাকে যে অবরোধের কূপে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল, তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সীতেশদাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। যে তার একাধারে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় এবং স্বজন।

আর সীতেশদাকে পাবার পরে সে যখন আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, পারিবারিক রণক্ষেত্র থেকে বাইরের ঠাণ্ডা মাটিতে পা রেখে সামান্য শীতল হ'ল, তক্ষুনি তো দেখা হ'য়ে গেল তার সঙ্গে, মুহূর্তে যে তার ধ্যানজ্ঞান এক ক'রে বিরাজমান হ'লো হৃদয়ে, অক্ষুধা অতৃপ্তি নিঃশেষে মুছে দিল জীবনের।

'জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, তুমি জানো নাই তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই তার মূল্যের পরিমাণ।'

২৮

না, সে মূল্যের পরিমাণ জানা, তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না সুদর্শন। যে আমি 'গোষ্পদে বিম্বিত' আকাশ দেখেই আকাশের পরিমাপ জেনেছিলাম, তাকে তুমি সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলে।

আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমার দুঃসাহস দেখে প্রথমদিনই আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে অন্ধকারে ডেকেছিলাম, 'সুদর্শন সুদর্শন।' তারপর নিজেই নিজের মুখ চেপে ধরেছিলাম।

কিন্তু তুমি কী দেখেছিলে সুদর্শন? সেই কিছু না জানা কিছু না বোঝা মফস্বলের এক দুঃখিত বঞ্চিত মেয়েটির ছিল?

সে কথা কিন্তু আজও ভেবে পান না অঞ্জলি দেবী। এতদিন পরেও না। রূপ? যৌবন? রূপ যৌবন কি সে আর দেখেনি? দেখেছে, অনেক দেখেছে। তথাকথিত সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ সে, উঁচুদরেরও মানুষ, দর নিরূপণ করতে কলকাতা শহরের রুই কাতলা মেয়েদের পিতামাতারা কে না অগ্রবর্তী ছিল?

সুদর্শন বলেছিল, 'দেখব আবার কী? আমি কি পাত্রী খুঁজছিলাম যে, দেখার প্রশ্ন ওঠে। বলতে পার দেখা হ'য়ে গেল। যার সঙ্গে যে বিদ্যুতের সংঘর্ষে আলো জ্বলে, সব সময় তো তারা পরস্পরকে খুঁজে পায় না? জীবন মোটামুটি একটা জোড়াতালির উপরই চলতে থাকে। তারি মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কোনো ভাগ্যবান তার দুর্লভ পরশমণিটি পেয়েও যায়। আমি পেয়েছি, বাস, আর কোনো অন্য ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।'

সীতেশদার চিঠিটা যেদিন পেল অঞ্জলি, সেই বিকেলে দেখা হতেই সুদর্শন বলল, 'জানো অঞ্জু, বরাবরই দেখে আসছি যা ভাবা যায় ঠিক তার উল্টোটি ঘটে জীবনে।'

'বর্তমানে কিছু উল্টো হ'য়েছে নাকি?'

'সীতেশের চিঠি পেয়ে থেকেই—'

'ও, তুমিও পেয়েছ?'

'তুমিও পেয়েছ?'

'আমি তো সকাল থেকেই ছটফট করছি, কখন দেখা হবে, কখন তোমাকে সুখবরটা দেব।'

'আমিও ঠিক তাই। আর তারপর থেকেই মনে পড়ছে, ছেলেবেলায় যখনি কোনো দেরি টেরি ক'রে ভয়ে চোর হ'য়ে বাড়ি ফিরেছি, মা দেখতাম কক্ষনো বকতেন না। না। আবার যখন ভেবেছি এক্ষুনি আবার বকাবেন কেন, তক্ষুনি বকার ধুম পড়ে যেতো। তোমার হয়নি?'

'আমার!' একটু হাসল অঞ্জলি। বকা ছাড়া আর কি কিছু জানত নাকি অঞ্জলি যে তা ব্যতীতও অন্য কিছু ঘটবে জীবনে?

'না, তুমি ভেবে দ্যাখো, এ নিয়ে কত ভয় ছিল সীতেশের, কত সংকোচ ছিল, কিন্তু কত সহজে সব সমাধান হ'য়ে গেল। আর আমি? আমি তো ভাবতেই পারিনি, অন্তত আমার বাবা এই ধরনের একটা বিরোধিতা করতে পারেন। অথচ তিনি উচ্চশিক্ষিত, কত দেশবিদেশে ঘুরেছেন, উপরন্তু নিজে বিয়ে করেছিলেন প্রেম ক'রে, তিনি তাঁর ছেলের বিষয়ে কী উদ্ভট রকমের রক্ষণশীল।'

বোঝা গেল, চিঠিটা পেয়ে একদিকে যত

আনন্দ হ'য়েছে, নিজের বাবার জেদের কথা ভেবে ততই দুঃখ বেড়েছে।

অঞ্জলি বলল, 'তুমি ভেবো না, তোমার বাবাও একদিন সব মেনে নেবেন।'

'কখনো নিতে পারেন কিন্তু এখন তো নেননি।'

'কী আর করা যাবে। আমার জনাই তোমাকে এই কষ্টটা সহ্য করতে হচ্ছে, নিজের উপর আমার রাগ হয়।'

'নিজের উপর রাগ হয়, না? যা অন্যায় তা নিয়ে দেখছি তোমার কোনো মাথা ব্যথা নেই।'

'অন্যায় কিসের?'

'এর চেয়ে অন্যায় আর কী ভাবা যায়? নিজের ইচ্ছে অপরের উপর এভাবে চাপানোর চেষ্টা রীতিমতো অসৌজন্য। আমার ভাবতে লজ্জা করে, সেই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক আমাকে তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দেখাতে চান। কী অডাসিটি। বাবার সামনে বসে বললেন, 'তুমি রেজিস্ট্রি ক'রে ইরাকে নিয়ে চলে যাও, তোমাদের দু' জনের প্লেন-ভাড়া, গিয়ে অন্ততঃ ছ' মাস থাকার খরচ সব আমি এখানে জমা দিয়ে দিচ্ছি।'

অঞ্জলি ভাবছিলো ব্যারিস্টার ভদ্রলোক কে? এখন বোঝা গেল তিনি ইরার বাবা। ইতস্ততঃ করে বললো, 'ইরা কী বলছে?'

'আমি কী করে জানবো, আমার সঙ্গে কি ইরার দেখা হয় নাকি?'

'এমন তো হতে পারে ইরার ইচ্ছেতেই ইরার বাবার এতো আগ্রহ।'

'কিন্তু ইরাকে যে বিয়ে করবে সে যখন সরবে ঘোষণা করেছে সে আর একজনকে পছন্দ করেছে, তখনও কি এসব কথা ওঠে?'

'ওঠে! যদি ইরা তোমাকে ভালোবেসে থাকে।'

'না, অত ভালোবাসা-টালোবাসা কারো নেই আমার উপর।'

'কী করে জানো?'

'কেন জানবো না? কেউ আমাকে প্রেম করবে আর আমি তা টের পাবো না, বা রে!'

অঞ্জলি চুপ করে রইলো।

সুদর্শন বললো, 'আমাকে বাবা ডেকে পাঠালেন কাল তাঁর শোবার ঘরে।' বললেন, 'তুমি তা হলে যাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

বাবা বললেন, 'তা হলে আমার কথা তুমি রাখছো না?'

আমি বললাম, 'কী কথা?'

'জানলে তো নিশীথ কী বলে গেল। নিশীথের মেয়েই নিশীথের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী।'

'তাতে আমার কী?'

'তাকে বিয়ে করলে, তুমিই তার মালিক হবে।'

'আমার উপার্জন ভোগ করার কোনো স্বাদ নেই আমার।'

'আমার কথারও কোনো দাম নেই, না?'

'কী তোমার কথা?'

'আমি চাই তুমি ইরাকে বিয়ে করো।'

'আমি তো তোমাকে সব বলেছি।'

'আমিও বলেছি, এতে আমার মত নেই।'

'আমি যখন যা করতে চেয়েছি, সব সময়েই তুমি তার বিরোধিতা করেছ—'

'এবং তুমিও করেছ। আমার কথা মান্য করা তুমি কখনোই কর্তব্য বলে বোধ করনি।'

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম—

'শিশু বয়সে মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি বিদ্যা থাকে না, গুরুজনরাই তাদের মঙ্গল অমঙ্গলের নিয়ন্ত্রণকারী হ'য়ে রক্ষা করেন, আমি নাবালক, নির্বোধ নই, একটা প্রতিষ্ঠানে উপার্জন যাই হোক, সসম্মানে কাজ করছি, ন্যায় অন্যায় বোধ জন্মেছে, এখানে কী ক'রে তুমি আশা কর, তোমার সব ইচ্ছে এবং আদেশ আমি নির্দ্বিধায় মেনে নেবো। তা হয় না।'

ক্ষেপে গিয়ে বাবা বললেন, 'যদি তা নাই হয়, তোমার সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্ক রাখব না।'

বললাম, 'সেটা তোমার অভিরুচি।'

'একটি পয়সা আমি তোমাকে দেব না।'

'দিও না।'

'এ বাড়িতেও আমি তোমাকে থাকতে দেব না।'

'দিও না।'

'ঠিক আছে, আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না।' এই বলে পাশ ফিরে শুলেন। আমার কেমন কষ্ট হ'ল, বললাম, 'তুমি শুয়ে রয়েছ কেন? তোমার কি শরীর খারাপ হ'য়েছে?'

বললেন, 'সে কথা তোমার কাছে বলতে আমি বাধ্য নই।'

'আমার তখন মনে হ'ল, আমার জন্য খুব মন খারাপ হ'য়েছে, প্রমাণ তাঁর এলো-মেলো, কী বলতে কী বলেন, অকারণে অসম্মানকর কথা বলে রাগারাগি করেন, পারেন না। একটু মাথা ধরলে সারা বাড়িতে হুলস্থুল বাধিয়ে দেন। আমি যে যাব এটাই বাবাকে আরও ক্ষিপ্ত করেছে। ঐ বিয়েটিকে কিছু না, একটা ছুতো ধরে কেবল গালাগালি। কী করি বল? এরকম ছেলেমানুষী করলে পারা যায়?'

সুদর্শন হাসল, কিন্তু কান্নার মত। বাবার আগে বাবার জন্য সেও বিচলিত হয়েছে।

একটু পরে অঞ্জলি বলল, 'একটা কথা রাখবে?'

'বল।'

'রাগ করবে না?'

'না।'

'আমাকে নিয়ে চল একবার।'

'অসম্ভব।'

'অসম্ভব কেন?'

'তোমাকে আমি অপমানিত হ'তে দিতে পারি না।'

'অপমান কিসের? তিনি গুরুজন, আমার কোন অপমান হবে না।'

'যদি কোন অন্যায় কথা বলেন?'

'কী হবে?'

সুদর্শন চুপচাপ ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, যাব, আমার কর্তব্য আমি করি।'

'কী কর্তব্য?'

'চলে যাচ্ছি, তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাই।'

'হয়ত রেগে যাবেন।' এতক্ষণের সাহস সত্ত্বেও মুখোমুখি এসে অঞ্জলির ভয় হচ্ছিল। সুদর্শন হাত ধরে তাকে তুলে নিল, বলল, 'কত আর রাগবেন, বড় জোর বলবেন, বেরিয়ে যাও, সইতে পারবে না?'

'পারব।'

'তবে চল।'

পাশাপাশি হেঁটে তারা বড় রাস্তায় এল। (ক্রমশ)

ভারতের আণবিক আয়োজন

অরুণ ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষে সব কিছুরই একটা নতুনত্ব আছে। তাই পৃথিবীর কোন দেশ যা করেনি আমরা তা করার চেষ্টা করি। আণবিক বোমার ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমেরিকা থেকে শুরু করে রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও সর্বশেষ চীন কেউই ঢাক ঢোল পিটিয়ে, চিৎকার করে আর হাতের আস্তিন গুটিয়ে লোকসভায় বসে স্থির করেনি বোমা তৈরী হবে কি হবে না। আমরা করেছি এবং আজও করছি। বোমা হবে কি হবে না তা নিয়ে আজ পনের বৎসর ধরে আমাদের নেতারা বাদানুবাদ করে চলেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে, এঁরা কেউ কোন দিন তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন নি যে সত্যিকারের আমাদের আণবিক বা হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর ক্ষমতা বা উপায় আছে কিনা।

রূঢ় সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, বোমা তৈরীর ক্ষমতা থাকলেও আমাদের উপায় নেই। তার কারণ অনেকটা টেকনোলজিক্যাল আর বাকীটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপ। যদি আণবিক রিঅ্যাকটর থাকলেই বোমা তৈরী করা যেত তা হলে ভারত আজ থেকে ১৮ বৎসর আগেই আণবিক শক্তি বলে পরিগণিত হতে পারত। তা হয়নি। কেন? এ কথা কি আমাদের বিরোধী পক্ষের নেতারা কোনদিন চিন্তা করে দেখেছেন? এটা অত্যন্ত রূঢ় সত্য যে পাঁচটি আণবিক রিঅ্যাকটর থাকা সত্ত্বেও আমাদের বোমা তৈরীর মত এক গ্রামও ইউরেনিয়াম-২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম-২৩৯ নেই। কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার। যে পশ্চিমী শক্তিগুলি আমাদের আণবিক রিঅ্যাকটর তৈরীতে সাহায্য করেছেন তাঁরা লক্ষ্য রেখেছেন যাতে আমরা কোনও দিনই তাঁদের পর্যায়ে উঠতে না পারি। যে ফ্রান্স নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি সেও পশ্চিমী শক্তিগুলি—আমেরিকা ও ব্রিটেনকে আশ্বাস দিয়েছে যদি তার তৈরী রিঅ্যাকটর থেকে ভারত ফিসনেবল দ্রব্য বা বোমা তৈরীর মশলা তৈরী করার চেষ্টা করে তবে ফরাসী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর ওপরে আছে ভারতের আন্তর্জাতিক ঋণ ও সাহায্যের প্রশ্ন। বোমা তৈরী করলেই ভারত পশ্চিমী শক্তিগুলি ও রাশিয়ার কাছ থেকে সকল রকম অর্থনৈতিক সাহায্যের সুযোগ হারাবে।

তবে কি ভারত কোনও দিনই তার নিজস্ব আণবিক অস্ত্র তৈরী করতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। তবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। নিজের আণবিক রিঅ্যাকটর ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্যে তৈরী করে। এবং তাও আজ নয়। আজ থেকে প্রচেষ্টার শুরু হলে আট থেকে ৯ বৎসর পরে ভারত তার প্রথম পরমাণু বোমা তৈরী করতে পারবে। চীনের পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা চিন্তা করলে এ কথাগুলি অত্যন্ত ডিমরালাইজিং মনে হবে। তাই আমাদের নেতারা এটা স্পষ্ট করে দেশের লোকের সামনে তুলে ধরতে চান না। নানা কথার ও বিতর্কের জালে সত্যকে যাতে না খুঁজে পাওয়া যায় তারই চেষ্টা করেন।

ভারতে বর্তমানে পরমাণু সম্পর্কে দুটি লবি কাজ করছে। একদল বোমা চান। অন্য দল বোমার বিরুদ্ধে। যাঁরা বোমার বিরুদ্ধে তাদের দলটির মধ্যে আছেন কম্যুনিস্টরা, রাশিয়াপন্থী ও চীনপন্থী, এবং বেশ কিছু অন্য লোক যাঁরা কম্যুনিস্ট নন—হয়ত মার্কিনপন্থীও হবেন। আর আছেন একদল ভারতীয় অর্থনীতিবিদ যাঁরা মনে করেন ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পরমাণু বোমা তৈরীর অনুকূলে নয়।

যে দলটি বোমা তৈরী করার পক্ষে তাঁরা বলেন যে, কয়েকটি বোমা তৈরী করে ভারতের এখনই মজুত করা উচিত এবং প্রয়োজন হলে কিনে বা সাহায্য হিসাবে নিয়ে কয়েকটি ১০০০ থেকে ১৫০০ মাইল পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের মুখে এগুলিকে সজ্জিত করে চীনের মোকাবিলার জন্য তৈরী থাকা উচিত। এ ছাড়া ভারতের ক্যানাডা ও ব্রিটেনের সঙ্গে আণবিক রিঅ্যাকটর থেকে বোমা না তৈরীর যে চুক্তি আছে তা এখনই বাতিল করে দেওয়া উচিত। এঁরাও একটা কথা জানেন না। ভারতের রিঅ্যাকটরগুলি পাওয়ার রিঅ্যাকটর অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী রিঅ্যাকটর। এতে তৈরী হয় প্লুটোনিয়াম-২৪০; বোমা তৈরীর প্লুটোনিয়াম-২৩৯ নয়। কাজেই আমাদের দেশের প্রথম রিঅ্যাকটর তৈরী করে চলেছে প্লুটোনিয়াম-২৪০। আজ পর্যন্ত এক গ্রাম প্লুটোনিয়াম-২৩৯ বম্বের রিঅ্যাকটর থেকে তৈরী হয়নি। দ্বিতীয়ত প্লুটোনিয়াম-২৩৯ থেকে কখনও ফিসন বোমা বা থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা তৈরী হয় না। তার জন্য প্রয়োজন ইউরেনিয়াম-২৩৫। তা ছাড়া ভারতের ইউরেনিয়াম ধাতুসম্পদ অত্যন্ত কম। আমাদের জিওলজিক্যাল সার্ভের মতে যে ইউরেনিয়াম ভারতের আছে তাতে খুব বেশী হলে ৩০০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন রিঅ্যাকটরকে কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তার জন্য ৮০ থেকে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ইউরেনিয়ামকে ভেঙে ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈরী করার কারখানা বসানোর যৌক্তিকতা নেই। এই জন্যই ভারতের পূর্বতন পরমাণু বিজ্ঞানী ডাঃ হোমি ভাবা ভারতকে দুটি ধাপে অগ্রসর হতে বলেছিলেন। তাঁর মতে আমরা প্রথমে প্লুটোনিয়াম-২৪০ তৈরী করে যাব এবং যখন এর পরিমাণ যথেষ্ট হবে তখন ব্রিডার রিঅ্যাকটরে এই প্লুটোনিয়ামকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ তৈরী করব। এখানে একটি কথা আছে। আগেই বলেছি প্লুটোনিয়াম দিয়ে হাইড্রোজেন বোমা হয় না। অথচ যে পাঁচটি দেশ পরমাণু শক্তিতে বলীয়ান্ তাদের প্রত্যেকেই থার্মোনিউক্লিয়ার বা হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী। যাঁরাই হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের ফিসন পদ্ধতিতে ইউরেনিয়াম-২৩৫কে ট্রিগার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এখন দেখা যাক ইউরেনিয়াম-২৩৫ কিভাবে পাওয়া যায়। সাধারণত ধাতু অবস্থায় এই জিনিস ইউরেনিয়ামে ১৪০ ভাগে এক ভাগ থাকে। একে পৃথক করতে হয় দুই উপায়ে—বায়বী ডিফিউসন প্রথায় অথবা সেন্ট্রিফিউজ প্রথায়। এ ছাড়াও ইউরেনিয়াম-২৩৩কে অবিকিরণ প্রথায়

পরিশোধিত করে ট্রিগার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

কিন্তু ভারতের যখন প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম নেই তখন কি উপায়ে এ সমস্যার সমাধান হবে। দেখা গেছে, ভারতের প্রচুর পরিমাণে থোরিয়াম আছে এবং থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৫ তৈরী করা যায়। এর ভেতরে একটু কিন্তু আছে। এ পথটি পরিশ্রম ও গবেষণাসাপেক্ষ। যে দেশগুলি থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা তৈরী করেছে—চীনকে ধরে—তাদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট পরিমাণে ধাতব ইউরেনিয়াম ছিল, তাই তারা এ পথে অগ্রসর হয়নি। আমরা কি তাই বলে পিছিয়ে যাব? পন্থাটি নতুন কিন্তু এ পন্থায় যে করা যায় তা প্রমাণিত হয়েছে গবেষণাগারে পরীক্ষায়।

এইখানে ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর বা দ্রুত পরমাণু তৈরীর রিঅ্যাক্টর সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বর্তমানে ফ্রান্সের সঙ্গে এক চুক্তির বলে আমরা ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে কল্পক্কম রিঅ্যাক্টরটি তৈরী করছি। ইচ্ছা করলে এ থেকে আমরা ইউরেনিয়াম-২৩৩ অর্থাৎ যাকে থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার ট্রিগার বা ঘোড়া হিসাবে ব্যবহার করা যায়; তা তৈরী করতে পারি।

বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী ডাঃ বিক্রম সারাভাই গত ২৫ শে মে তারিখে ভারত সরকারকে যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন তাতেও তিনি এই পন্থাতেই অগ্রসর হতে বলেছেন। পন্থাটি কি? ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর প্লুটোনিয়াম তৈরী করে বটে কিন্তু তা থেকে বেশী বোমা তৈরীর শলা বা ফিসাইল দ্রব্য তৈরী করে এবং তার পরিমাণ এর প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। এখন সব কিছু নির্ভর করবে কি ধাতু দিয়ে একে ঢাকা হবে অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে ব্ল্যাংকেটিং মেটিরিয়াল। যদি ইউ-রেনিয়াম ব্যবহার করা হয় তবে প্লুটোনিয়াম তৈরী হবে, আর আমাদের যা আছে সেই থোরিয়াম ব্যবহার করলে ইউরেনিয়াম-২৩৩ তৈরী হবে। ডাঃ সারাভাই আমাদের পরমাণু বিষয়ে একটি দশবর্ষব্যাপী পরি-কল্পনা নিয়ে করেছেন এবং এই ধরনের ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর তার অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন। তার কারণ আগেই বলেছি—ক্যানাডা, ব্রিটেন বা ফ্রান্স তাদের সাহায্যে তৈরী রিঅ্যাক্টর থেকে এক গ্রাম ফিসনেবল দ্রব্যও তৈরী করতে দেবে না। কাজেই বোমা তৈরীর জন্য যে রিঅ্যাক্টর প্রয়োজন তা আমাদের নিজেদেরই তৈরী করতে হবে। যদি আমরা চুক্তি ভঙ্গ করে ইউরেনিয়াম-২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম-২৩৯ তৈরী করি তবে কি হবে? এই রিঅ্যাক্টরের জ্বালানি হেভী ওয়াটার বা ভারী হাইড্রোজেন যা আমাদের আমদানি করতে হয় তা এরা বন্ধ করে দেবে।

ডাঃ সারাভাই যে ৫০০ মেগাওয়াটের

[illegible] প্রয়োজন। সেটা আসবে যদি ৩০০০ মেগাওয়াট আকরিক ইউরেনিয়াম প্লান্টটি আমরা চালু করতে পারি। তবে আমাদের এত জ্বালানি হবে যে প্রতি দু' বৎসরে আমরা একটি করে ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব কেবলমাত্র স্বদেশে তৈরী জ্বালানি দিয়ে। তখন আর তারাপুর রিঅ্যাক্টরের জন্য বিদেশ থেকে দামী ইউরেনিয়াম জ্বালানি আমদানি করতে হবে না। আমাদের পক্ষে তখন হাইড্রোজেন বোমা তৈরী অত্যন্ত সহজ হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে আমাদের রাণাপ্রতাপ সাগর রিঅ্যাক্টরটি অবশ্য অ্যাটম বোমা তৈরীর মত কিছু প্লুটো-নিয়াম তৈরী করতে পারে কিন্তু তার মূল্য হবে খুব বেশী—অর্থনৈতিক এবং রাজ-নৈতিক দিক থেকে। কারণ আগেই আলোচনা হয়েছে।

এখন দেখা যাক যে ২৫শে মে তারিখে ডাঃ সারাভাই-এর প্রস্তাবগুলি কি? একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের পক্ষে কোনও ধরনের শর্টকাট সম্ভব নয়। তার কারণ আমরা খুব বেশী পর-নির্ভরশীল হয়ে আছি প্রথম থেকেই।

ডাঃ সারাভাই বলেছেন ঃ

(১) ১৯৮০ সালের পূর্বেই ভারতে অন্তত ২৭০০ মেগাওয়াটের রিঅ্যাক্টর কার্যকরী হওয়া উচিত। এর অর্থ হল ১৭০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন অন্তত ৪টি আণবিক বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র খোলা উচিত এবং তার কাজ এই চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যেই আরম্ভ করতে হবে।

(২) অন্তত ৫০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন উঁচুদরের একটি থারম্যাল রিঅ্যাক্টর ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা তৈরী হওয়া উচিত। এতে মূল ব্যয় কমে যাবে অথচ ভবিষ্যতের ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টরের জন্য প্লুটোনিয়ামও তৈরী হতে থাকবে।

(৩) এই ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর তৈরীর অভিজ্ঞতা, প্লুটোনিয়াম জ্বালানির ব্যবহার এবং থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৩ তৈরীর জ্ঞান আমাদের ভবিষ্যৎ পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে।

(৪) বৎসরে অন্তত ৩০০ টন হেভী ওয়াটার প্রস্তুতির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে আকরিক ইউরেনিয়ামের ব্যবহার সম্ভব হয়।

(৫) ৫০০ মেগাওয়াট শক্তির একটি পরীক্ষামূলক ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়রদের দ্বারা নির্মাণ।

(৬) বায়বীয় সেন্ট্রিফিউজ কারিগরির উন্নতি ও ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তুত।

(৭) নরওয়ানাহার ইউরেনিয়াম খনির উন্নতি বিধান এবং নিম্নমানের আকরিক ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন ও তামার খনি থেকেও অতি প্রয়োজনীয় ধাতু নিষ্কাশন।

(৮) এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্য নিউক্লিয়ার জ্বালানি তৈরী অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত দ্বারা আমাদের আণবিক শক্তি বৃদ্ধি করা।

(৯) রেডিও আইসোটপসের বহুল ব্যবহারও পরীক্ষা করা। খাদ্য সংরক্ষণ থেকে শুরু করে ঔষধপত্র ও গবেষণার ক্ষেত্রে এর বহুল ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজন।

ডাঃ সারাভাই-এর এই প্রস্তাবগুলি কার্য-কর করতে হলে প্রয়োজন এই পরি-কল্পনার মধ্যেই কল্পাক্কমে একটি রিঅ্যাক্টর গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা এবং আমাদের পরমাণু পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তৈরী করা। শুধু বিজ্ঞানী তৈরী করলেই হবে না। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরও বিশেষ ধরনের স্টীল ও ধাতব অ্যালয় প্রভৃতি তৈরীর দায়িত্ব দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন। সারাভাই প্রস্তাব অনুযায়ী চতুর্থ পরিকল্পনার সময়েই আমাদের পর-মাণু শক্তি কমিশন প্রায় ৩৫ কোটি টাকার দ্রব্যাদি তৈরী ও বিক্রয় করে মূলধন সঞ্চয় করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চতুর্থ পরি-কল্পনায় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের বরাদ্দ ভীষণ ভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে পরমাণু শিল্পাদি, আকরিক ধাতু নিষ্কাশন ও মহাকাশ সম্পর্কিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ সংকুলান সম্ভব হবে না। যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে হয় তবে চতুর্থ পরিকল্পনায় শেষ তিন বৎসরে কমিয়ে দেওয়া বরাদ্দের টাকা আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে একদিকে যেমন ইচ্ছা রয়েছে, অপরদিকে তেমনি আবার অর্থের সংকুলান সম্ভব হচ্ছে না। এতো গেল পরমাণু বিষয়ক গবেষণার দিক। এবার দেখা যাক মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে ডাঃ সারাভাই কি বলেছেন। তাঁর মতে আমাদের মহাকাশ গবেষণা—যা না হলে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী অসম্ভব—কি ভাবে হবে ঃ

(১) ভারতের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং মহাকাশ বিজ্ঞান ও কারিগরি [illegible]

করে সংযোগ স্থাপনকারী বা কম্যুনিকেশন উপগ্রহ নিক্ষেপ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরীক্ষা।

(২) মহাকাশ বিজ্ঞান ও কারিগরি কেন্দ্রে ক্ষেপণাস্ত্র কন্ট্রোল ও গাইড বা নির্দেশক কম্পিউটার তৈরী করা।

(৩) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা ক্ষেত্র তৈরী, উঁচুদরের রেডার যন্ত্র তৈরী ও পরীক্ষা এবং উপগ্রহ পাঠান।

(৪) শক্ত জ্বালানি তৈরী এবং তার পরীক্ষা কেন্দ্র।

(৫) ত্রিবান্দ্রামে রকেট ফ্যাব্রিকেশন ও তার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপন।

(৬) রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্রকে স্বচালিত করার জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ার।

(৭) ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে একটি "স্কাউট" ধরনের ক্ষেপণযন্ত্র তৈরী। এই ক্ষেপণযন্ত্রের পর্যায় হবে চারটি—প্রথমটি শক্ত জ্বালানি বা সলিড প্রপেল্যান্টকে জ্বালাবে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের পে লোড্ নিয়ে রকেটটি এই ছোট উপগ্রহটিকে কক্ষপথে প্রেরণ করবে এবং তাকে ঠিক পথে চালাবে। তার পরের পর্যায়ে আরও শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে ১২০০ কিলোগ্রামের একটি উপগ্রহ আরও উঁচু কক্ষপথে প্রেরণ।

(৮) ১৯৭৫ সালের মধ্যেই কম্যুনিকেশন উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরণ ও তা তৈরী করার ক্ষমতা অর্জন।

(৯) শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের মুহূর্তে মধ্যেই তা বুঝবার মত যন্ত্র তৈরী এবং নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্রকে পরিচালনা করার "সেন্সার" প্রস্তুত।

মহাকাশ বিষয়ক গবেষণা ও এর সার্থক পরিকল্পনার প্রথম প্রয়োজন হল উপযুক্ত বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়র। দেখা গেছে, যদি আমাদের উন্নতির গতি ৫০ থেকে ১০০ ভাগ থাকে তবে তিন বৎসর পরে আমরা কোন মতে আমাদের প্রয়োজনীয় মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রয়োজনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারব।

অনেকের মনেই একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, ১৯৭৪ সালে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন যে ৩০ কিলোগ্রামের উপগ্রহটি পাঠাচ্ছেন সেটি আমাদের ১০০০ থেকে ১৫০০ মাইল পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীর স্টেজে পৌঁছে দেবে। তা নয়। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন বলেছে যে ১৯৭৪ সালে তারা ঐ রকেটটির (রকেটটি অবশ্য বিদেশী) প্রটোটাইপ বা অনুরূপ রকেট তৈরীতে সক্ষম হবে। তার অর্থ এই নয় যে আমরা মিসাইল যুগে পৌঁছে গেলাম। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করতে হলে এবং তাকে সার্থক পরিচালনা করতে হলে প্রয়োজন বুস্টার বা শক্ত জ্বালানি, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশকালে নিজেকে সংরক্ষণের জন্য হীট্ শীল্ড বা তাপ নিরোধক ঢাকনা এবং ইনার্শিয়াল গাইডেন্স বা একে পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়ে এনে পরিচালনা করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানর যন্ত্র। এ ছাড়া আরও যন্ত্রপাতি আছে। কাজেই শুধু একটি প্রটোটাইপ্ তৈরী হলেই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী হয় না।

তবে কি ভারতের আণবিক বোমা তৈরী বা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীর পরিকল্পনা কোনগুলিই সার্থক হবে না? তা নয়। আমাদের নেতাদের মধ্যে যাঁরা আজ বিরাট বদস্বর দোহাই নিয়ে একে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছেন এঁরাই আবার ১৯৬২ সালের আগে অস্ত্র তৈরীর পরিকল্পনাকে বাধা দিয়েছেন। আর চীনের কাছে ভারতের পরাজয়ের পরে সর্বপ্রথম গলা ফাটিয়ে আমাদের পরিকল্পনাকে গালাগালি দিয়েছেন।

হয়ত ইউরেনিয়াম হেভী ওয়াটার পরিকল্পনার জন্য ১৭০ কোটি টাকা ব্যয় একটু বেশী মনে হবে, কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে এই ব্যয়ে ভবিষ্যতের ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টরের মশলা পাওয়া যাবে এবং পরবর্তী কালে ব্যয় একদম কমে যাবে তখন এতে ভীত হবার কারণ কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, থোরিয়াম নিয়ে কেউ গবেষণা করেনি বলেই আরও বেশী করে ভারতের সেদিকে যাওয়া উচিত, কারণ তাতে ব্যয়ের পরিমাণ কমবে এবং হয়ত সহজে পরমাণু বোমা তৈরীর জন্য প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম-২৩৩ বা ২৩৫ পাওয়া যাবে।

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রতিরক্ষামূলক আণবিক গবেষণা এবং নিত্যকার প্রয়োজনের জন্য আণবিক গবেষণার মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত অল্প। ভারত তাই তার আণবিক রিঅ্যাক্টরগুলি

[illegible] পারে। আগেই বলেছি, চীন ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে এক ধাপ বাদ দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। আজ পশ্চিম জার্মানী ও জাপান তাই করতে চলেছে। এরা আণবিক শক্তিতে চালিত ইঞ্জিন তৈরী করেছে এবং জাপান আকাশে উপগ্রহ নিক্ষেপ করেছে। যদিও আণবিক শক্তি চালিত ইঞ্জিন দিয়ে জাপান তার মাল-বাহী জাহাজ চালাবে বলছে। নিউক্লিয়ার সাবমেরিন বা ডুবো জাহাজের পক্ষে এই ইঞ্জিন অবশ্য প্রয়োজনীয়। কাজেই জাপান যে কোনওদিন এ জিনিস তার ডুবো জাহাজে লাগাতে পারে। জার্মানীও এ জিনিস করতে পারে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আণবিক শক্তি পরিকল্পনার ব্যয় কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা-মূলক ব্যয় নয়। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ সারাভাই যে ভাবে পরিকল্পনাটিকে উপস্থাপনা করেছেন তাতে আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির আপত্তি তোলবার কোনও যুক্তি নেই। তার কারণ নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে আবদ্ধ জার্মানীও ঠিক এইভাবে তার আণবিক পরিকল্পনাকে ধীরে ধীরে রূপ দিতে চলেছে। জাপানও তাই করছে। এবার আসা যাক মূল ব্যয়ের প্রশ্নে। আমাদের এয়ার ফোর্স বা বিমান বাহিনীর কথাই ধরা যাক প্রথমে। সময়ের ও প্রতিরক্ষার খাতিরে যেমন আমাদের পিস্টন ইঞ্জিনের যুগ থেকে জেট বিমানের যুগে যেতে হয়েছে তেমনি বর্তমান সাবসনিক যুগ থেকে আমাদের বিমান বাহিনীকে সুপারসনিক যুগে যেতে হবে ১৯৮০ সালের পূর্বেই। অর্থাৎ আমাদের বিমানের গতি হবে তখন শব্দের গতির চেয়েও বেশী। বর্তমানে বিমান বাহিনীর জন্য আমরা ব্যয় করি প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। ১৯৮০ সালে ব্যয় হবে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। অথচ আমাদের পরমাণু বোমা-বিরোধী বন্ধুরা এ ব্যয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। কিন্তু পরমাণু বোমা তৈরীতে বা ভারতের পরমাণু ও ক্ষেপণাস্ত্র পরিকল্পনাতে যদি ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয় হয় তবেই তাঁরা নার্ভাস হয়ে পড়েন। ডাঃ সারাভাই প্রদত্ত প্রস্তাবগুলি যদি কার্যকর হয় তবে ভারত এমন এক স্থানে পৌঁছবে যে ১৯৭০ দশকের শেষে তার পক্ষে পরমাণু বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করা বিন্দুমাত্র সমস্যা সৃষ্টি করবে না। আমাদের প্ল্যানিং কমিশন কিন্তু এখনও এ বিষয়ে ইতস্তত করছেন। এবারে পরিকল্পনা কমিশন সারাভাই পরিকল্পনার বাজেট থেকে ১২৯·১৭ কোটি টাকা কমিয়ে দিয়েছেন। অথচ যদি সারাভাই পরিকল্পনা কার্যকর করতে হয় তবে চতুর্থ পরিকল্পনায় এ অর্থের প্রয়োজন আছে। ১৯৫০ সালে ডাঃ ভাবা যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তা থেকে সারাভাই পরিকল্পনা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ ডাঃ ভাবার ওপরে ছিল প্রধান-[illegible] টেকনলজিতে সব হাতেখড়ি নিচ্ছি। হয়ত সারাভাই যে এত বলিষ্ঠভাবে তাঁর বক্তব্য ও পরিকল্পনা পেশ করতে পেরেছেন তার কারণ ভারতের জনমত ও চীনের দ্রুত আণবিক অগ্রগতি।

পরমাণু অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হতে ও তাকে রক্ষা করতে একটি দেশের ব্যয় কত হতে পারে এ বিষয়ে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র সংস্থা একটি পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। তাদের মতে সুষ্ঠু ও কার্যকর একটি ছোট পরমাণু অস্ত্র সজ্জিত দেশের কেবলমাত্র পরমাণু অস্ত্রের জন্য ব্যয় হওয়া উচিত ৫৬০ কোটি টাকা। যুক্তরাষ্ট্রে পরিসংখ্যান অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিমাণ থেকে স্থির করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন আমেরিকার ব্যয় একটু বেশী, কারণ তার দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং যে সমস্ত শিল্প এই অস্ত্র তৈরীতে সাহায্য করে তারা নিজেদের মুনাফা ও সাব-কনট্রাক্টরের মুনাফা বাদ দিয়ে রাখে বলে দাম বেশী হয়। এটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অস্ত্র তৈরীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অস্ত্র পিছু ব্যয়ের পরিমাণও কমে আসে। যেমন ফ্রান্স মাত্র ৪০টি শক্ত জ্বালানি বা সলিড্ ফুয়েল রকেট তৈরী করেছে। সেখানে আমেরিকা করেছে ১০০০টি ক্ষেপণাস্ত্র। ঠিক সেই হিসাবেই ফরাসী দেশের ৪৮টি ডুবো জাহাজ থেকে ছাড়বার ক্ষেপণাস্ত্রের দাম মাথাপিছু আমেরিকার ৬৫৬টির থেকে বেশী। রাষ্ট্রপুঞ্জের আণবিক অস্ত্রসজ্জার ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয়ে তাঁরা কেবলমাত্র আমেরিকার ব্যয়ের খতিয়ানের ওপরেই নির্ভর করেন নি। তাঁরা ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য সূত্র ও পরি-সংখ্যানের ওপরে নির্ভর করে তাদের ব্যয়ের খতিয়ান তৈরী করেছেন।

লোকসভায় বিভিন্ন নেতাদের উপস্থাপিত তথ্য থেকে ভারতীয় জনগণের মনে আর একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেঁথে আছে। এরা মনে করেন যে ১৬ থেকে ১৭ লক্ষ টাকাতেই একটি অ্যাটম বোমা তৈরী করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ ভাবা কি বলে-ছিলেন এ বিষয়ে? ১৯৬৪ সালের ২৪শে অক্টোবর আকাশবাণী থেকে একটি আলো-চনায় বলেছেন:

"দুশো থেকে ২৫০ বা ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি সম্পন্ন বহু নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর আজ পৃথিবীর বহু দেশে তৈরী হচ্ছে। এ থেকে অনেক বড় রিঅ্যাক্টরও তৈরী হতে চলেছে। যে কোনও অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর তার প্রাত্যহিক কাজের মাধ্যমে জ্বালানি হিসাবে প্লুটোনিয়াম তৈরী করে এবং ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী যে কোনও আণবিক রিঅ্যাক্টর বছরে ২০ থেকে ৩৫টি অ্যাটম বোমা তৈরীর মশলা উৎপাদন ১০ বৎসরের মধ্যে বহুদেশ পরমাণু বোমা তৈরী করতে সক্ষম হবে, না হয় তৈরী করার মত অবস্থায় পৌঁছবে।"

দাম সম্পর্কে ডাঃ ভাবা যা বলেছেন তাও তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের ও আমেরিকা এবং ফরাসী দেশের ব্যয়ের পরিমাণ থেকেই হিসাব করেছেন। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভায় আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিয়ে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় আমি তার রিপোর্ট থেকে আপনাদের সামনে খরচের খতিয়ান তুলে ধরছি।

এই সভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রবন্ধ পড়ে। এতে আণবিক বিস্ফোরণের ব্যয়ের একটা হিসাব ছিল। এতে বলা হয়েছে "১০ কিলোটনের অর্থাৎ ১০,০০০ টন টি এন টি বা বিস্ফোরকের সমান শক্তিসম্পন্ন আণবিক বিস্ফোরণের ব্যয় ৩৫০,০০০ ডলার বা সাড়ে সতের লক্ষ টাকা। এর শক্তির পরিমাণ হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার সমান। একটি ২ মেগাটন অর্থাৎ ২০ লক্ষ টন টি এন টি এর সমান বিস্ফোরণ শক্তির বোমার জন্য ব্যয় হবে ৬ লক্ষ ডলার বা ৩০ লক্ষ টাকা (ডিভ্যালুয়েশনের আগের হিসাব। বর্তমানে ১ ডলারের মূল্য ৭·৫ টাকা)। আর যদি আমরা টি এন টির দাম ধরে ব্যয়ের হিসাব করি তবে দেখব ২০ লক্ষ টন টি এন টি এর দাম হবে ১৫০ কোটি টাকা। ছাড়া এত ওজনের টি এন টি একসঙ্গে ব্যবহার করার মত জাহাজ বা উড়ো জাহাজ আজও তৈরী হয়নি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে আণবিক বিস্ফোরণের ব্যয় সাধারণ বিস্ফোরণের ব্যয়ের ২০ ভাগের এক ভাগ। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে যে ৫০টি অ্যাটম বোমার ব্যয় হবে মাত্র ১০ কোটি টাকা এবং ২ মেগাটন শক্তির হাইড্রোজেন বোমা যদি ৫০টি আমরা মজুত করি তার ব্যয় হবে ১৫ কোটি টাকা। অন্যান্য দেশের সামরিক বাজেটের তুলনায় এ ব্যয় অতি সামান্য। ইচ্ছা থাকলে এ ব্যয় ভারতের পক্ষে খুব বেশী নয়।"

এই কিন্তু শেষ কথা নয়। ঐ প্রবন্ধটি পড়ার সময় ধরে নেওয়া হয়েছে যে দেশটি শান্তিপূর্ণ কাজে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে। তার হেভী ওয়াটার প্ল্যান্ট ও ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর কাজ করছে এবং তার যথেষ্ট পরিমাণে প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম মজুত আছে। কেউ যদি এক কটি ওয়ারহেড্ থাকবে ক্ষেপণাস্ত্রে তাই দিয়ে গুণ করে দাম হিসাব করতে চেষ্টা করেন তবে তিনি আবার ভুল করবেন। কুড়িটি আণবিক বোমা প্রতি বৎসর তৈরী করতে গেলে অন্তত ৩০০ মেগাওয়াটের রিঅ্যাক্টর চাই এবং তার ব্যয় হবে প্রায় ৬০ কোটি টাকা। এ ছাড়া তার পরিচালন ব্যয় আছে। এই ব্যয়ও বোমা তৈরীর খরচের

কাছাই থেকে ৩৫ লক্ষ ডলার। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বিভিন্নের দাম ৪টি ওয়াকয়েজের দামের সমান।

তবে কি ভারতের এদিকে অগ্রসর না হওয়াই উচিত? তা নয়। ২০০০ কোটি হোক আর ৮০০০ কোটি ব্যয় হোক যদি ক্রমান্বয়ে এ ব্যয় হবে, না বলা হয় তবে এর কোন মূল্য নেই। যে কোনও মধ্যবিত্তের শিক্ষা খাতে ব্যয় প্রায় ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা। এ টাকা সমস্ত জীবন ধরে সন্তানদের শিক্ষায় ব্যয় হয়। একদিনে বা এক বৎসরে হয়ত এত টাকা ব্যয় করা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

১৯৫৪ সাল থেকে অ্যাটমিক এনার্জি বিভাগ প্রতি বৎসর ১২·৮ কোটি টাকা ব্যয় করার মত অবস্থায় পৌঁছেছে। এতে তার লেগেছে সুদীর্ঘ ২২ বৎসর। প্রতি বৎসর ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ের অবস্থায় পৌঁছতে এই বিভাগের হয়ত আরও ৩ থেকে ৪ বৎসর লাগবে। আরও ৪ থেকে ৫ বৎসর পরে হয়ত ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে প্রতি বৎসরে। এটা এমন কিছু বেশীও নয় এবং এতে নতুনত্বও কিছু নেই। ফরাসী দেশ ১৯৫০ দশকে ব্যয় করেছে ২৬ কোটি ডলার। তারপরেই না সে ৮০ থেকে ১০০ কোটি ডলার ব্যয়ে সক্ষম হয়েছে পরবর্তী ১০ বৎসরে। ১৯৭০ সালের মূল্য অনুযায়ী হিসাব করলেও ভারতের মোট উৎপাদন আজ থেকে ১০ বৎসর পরে বর্তমানের শতকরা ৬০ ভাগ বেশী হবে। তখন ৫০০ কোটি টাকা হয়ত আমাদের মোট উৎপাদনের মাত্র শতকরা ১ ভাগ হবে। তাকেই মূল্যায়নে মোট ব্যয় না দেখে আনুপাতিক ব্যয়ের হিসাব ধরাটাই যুক্তিযুক্ত। সবচেয়ে বড় কথা এর প্রায় সবটাই যাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে, বৈজ্ঞানিক [illegible], সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও ইলেকট্রনিকস্-এর গবেষণায়। আজও আমরা প্রকৃতপক্ষে ভারতে তৈরী ও আবিষ্কৃত কোনও সূক্ষ্ম যন্ত্র নিয়ে গর্ব করতে পারি না। মজুরী কম হলেও বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিসের যা মূল্য পড়ে তা থেকে কম খরচে জিনিস তৈরী করতে পারি না। বিদেশী শিল্পপতিদের [illegible] এর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে [illegible]।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে [illegible] ১৯৮৫ সালের [illegible] তৈরী করতে সক্ষম হবে [illegible]। গবেষণার কাজে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করতে হবে। বিদেশে গবেষণায় নিযুক্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যাতে আমলাতন্ত্রের ধাক্কায় আবার বিদেশে ফিরে না যান তা দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে বিদেশে

হবে। এ ছাড়া বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার প্রথা চালু করতে হবে। এদের ওপরে এ সকল গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে ন্যস্ত করতে হবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিটি জিনিসের কোয়ালিটি বা মান পরিমাপ করতে হবে। ভুল প্রচারের দ্বারা জনমতকে বিভ্রান্ত না করে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে হবে। আবার অশিক্ষিত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জনমতের চাপে কোনও সিদ্ধান্ত চট্ করে নেওয়া চলবে না। যদি আমাদের নিজস্ব আণবিক অস্ত্রসজ্জায় আমরা খুব শীঘ্র তৈরী

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকেও নজর দিতে হবে। সেটি হল স্ট্র্যাটেজিক। ভারত যদি পরমাণু বোমার অধিকারী হয় তবে চীন ভারত শক্তিশালী হবার পূর্বেই আক্রমণ করে বসতে পারে বা ভারতের গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সে বিপদের ভয় যে একেবারে নেই তা নয়। আর সেই বিপদের জন্যই চীন আজ তার সমস্ত আণবিক কেন্দ্রগুলিকে ভূগর্ভস্থ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। তবে ভারত যদি পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত হয় এবং তার উপযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র থাকে তবে সে বিপদই সমান

[illegible]ের সঙ্গে চীনের মোকাবিলা করতে পারবে।—যুদ্ধ না করেই। তাছাড়া এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির চোখে সে আবার নিজের সম্মান ফিরে পাবে।

অবশ্য এ সম্ভাবনা সব সময়েই থেকে যাবে যে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ হলে এত ব্যয় বৃথা যাবে। তা হয়ত যাবে কিন্তু যে আণবিক রিঅ্যাক্টরগুলি তৈরী হবে সেগুলি তখন বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজে লাগবে, জাহাজ ও ইঞ্জিন তৈরীর জন্য ব্যবহার হবে এবং অন্যান্য গবেষণার সাহায্য করবে। এ কথা সত্য যে আমেরিকা থেকে ডাক্তাররা এসে আমাদের হাসপাতালে রেডিও আইসোটোপস এর সাহায্যে কলেরা রোগ নিরোধ করা যায় কিনা সে পরীক্ষা করছেন। যখন এর ঔষধ বের হবে তখন বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে আমরা কলেরা নিরোধের জন্য ঐ ঔষধ কিনে আনব। আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে থাকলে বোমা তৈরী করি অথবা সেগুলিকে নষ্ট করি সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। সামর্থ্য যখন আছে তখন এদিকে না যাবার অর্থ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে এই নেতৃত্বে বা এই ব্যুরোক্র্যাসির মধ্যে এত বড় কাজ সম্ভব হবে কিনা তার উত্তরে শুধু এই বলা চলে যে আণবিক গবেষণা, রিঅ্যাক্টর, মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণা ও ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ এ সব পূর্ণভাবে সরকারী আওতায় না থাকা উচিত। এ সকল ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদেরই প্রাধান্য থাকা উচিত। এই কারণেই কোনও ব্যুরোক্র্যাটের হাতে না দিয়ে আমেরিকার অ্যাটম বোমা তৈরীর ভার ছিল ওপেনহাইমারের হাতে। আজও রকেট তৈরীর ক্ষেত্রে ওয়ারনার ভন ব্রাউন বা ডাঃ স্টুলিংগারের ওপরে কেউ কথা বলে না। রাজনৈতিক নেতাদের উচিত শুধু বলা যে তারা কি করবেন বাকীটা ছেড়ে দেওয়া উচিত এই সব বিজ্ঞানীদের ওপরে। তাঁরা সামরিক বাহিনীর সেনানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবেন। এই গবেষণার ক্ষেত্রটিকে অন্তত আই এ এস বা আই সি এস-দের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত।

আমাদের গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে যেমন আমরা চীনের হাতে মার খেয়েছি তেমনি আবার প্রতিদিন বোমা তৈরী করব না বলে এমন জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করেছি এখন তা থেকে পেছিয়ে যাওয়া কষ্টকর। আগেই তাই বলেছি যে বোমা তৈরী করা হবে কিনা এটা পৃথিবীর কোন দেশ এত ঢাক ঢোল বাজিয়ে আলোচনা করেনি।

ভারতের পক্ষে আজ সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে চুপ করে কাজ করে যাওয়া। গবেষণা জোরদার করা এবং [illegible] [illegible] অর্থ [illegible] করা। বোমা যখন কি করব না বলে লাভ কি? সাত আট বৎসর পরে যদি বোমা তৈরী করার মত অবস্থায় কখনও ভারত পৌঁছতে পারে সিদ্ধান্ত তখন নিলেই চলবে। তবে ১৯৬২ সালের মত যেন চোখ বুজে সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়। তবে আবার মার খেতে হবে। নয়াদিল্লির আইভরী টাওয়ারে বসে সিদ্ধান্ত না নিয়ে যারা এ বিষয়ে জানেন এবং কাজ করে চলেছেন সে সকল বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সবদিক আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেই দেশের পক্ষে মঙ্গল। ততদিন যদি নেতারা অন্তত মুখ না খোলেন তবেই কাজ ভালভাবে অগ্রসর হবে। রাজনীতির দোহাই দিয়ে এ সব কাজ করার হটকারিতা না করাই শ্রেয়—সে যে দলই ক্ষমতায় আসুন না কেন। যতদিন না পর্যন্ত ভারত পরমাণু শক্তির অধিকারী হতে পারছে ততদিন প্রয়োজন হলে মূল্য দিয়েও চীনের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসা উচিত। এর সঙ্গে অবশ্য তার পতানুগতিক সৈন্য সজ্জার প্রোগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। হয়ত বিমান বাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যয় কিছু কমতে পারে কিন্তু সৈন্য বাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েই যাবে। আজ থেকে দশ বৎসর আগে এ বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিলে আজকের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব এতটা হত না। যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে এসব সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক কিন্তু এক্সপার্টদের ও সৈন্য বাহিনীর মতামত না নিয়ে নয়। আশা করা যায় আমাদের নেতারা এই সকল দিক বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেবেন, ১৯৬২-এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন না।

সাজা
মজলিশ
জমিয়ে তুলবে!
খুশির আমেজ
ছড়িয়ে দেবে
নেস্‌কাফে!
(মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে তৈরী!)
দক্ষিণ
ভারতের
কফিদানা থেকে
তৈরী ১০০% খাঁটি
কফি
NESCAFÉ
instant
coffee
নেস্‌কাফে খেয়ে দেখুন—
উৎকৃষ্ট কফির স্বাদে-গন্ধে
মন ভরবে, মনমেজাজ
চাঙ্গা হবে!
নেস্‌লের তৈরী
NESCAFÉ
coffee
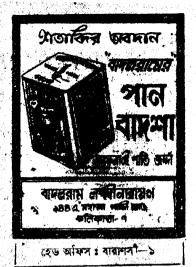
রবীন্দ্রসদন-এর সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা

রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহ

'রবীন্দ্রসদন' যখন নির্মিত হতে দেখি তখন মনে হয়েছিল এই প্রেক্ষাগৃহ কি জনপ্রিয় হবে? এমনি একটা মাঠের মাঝখানে—উত্তর এবং দক্ষিণ দুই পাড়া থেকেই দূরে অবস্থিত একটা খাপছাড়া রঙ্গমঞ্চ খুব সুবিধাজনক হবে বলে আমার মনে হয়নি। অনেকেরই বোধ করি এইরকম সন্দেহ ছিল। নিউ এম্পায়ারের সুবিধা অনেক, মহাজাতি সদনের সুবিধা আরও বেশী। অতএব এই জায়গাটা নির্বাচিত হল কোন বিবেচনায়? রবীন্দ্রসদন-এর নির্মাণ প্রায় শেষ হয়ে এল। এমন সময় একদিন এই নবনির্মিত হলে আয়োজন করা হল তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রার। সেদিন কিন্তু বুঝতে পারলুম আমাদের সন্দেহ অমূলক। এই হলের স্টেজ, আসন, অপরাপর অবস্থান এবং শ্রুতিগোচরতার গুণে সুন্দর লাগল। একজন সরকারী কর্মী জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন শুনলেন আপনারা? বললুম—"চমৎকার"। তিনি বললেন—"হল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই অনুষ্ঠান করে পরীক্ষা করছিলুম শুনতে পাবার ব্যবস্থা আশানুরূপ হয়েছে কিনা—আমার তো মনে হয় ভাল হয়েছে। দেখবেন এই হল আর সব হলকেই টেক্কা দেবে।" সত্যি কথাই বলেছিলেন তিনি। এর পরেও দু একবার গেছি। প্রতিবারেই উন্নততর মনে হয়েছে। তারপরে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৬৬ সালে এই প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন হল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এর পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হলেন। কাগজে এই গৃহের পরিকল্পনা ও পরিচালনা নিয়ে অনেক বাদানুবাদও চোখে পড়ল। সে বিষয়ে অবশ্য আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। কানে আসতে লাগল নানা অনুষ্ঠান এই গৃহে সম্পাদিত হচ্ছে। ক্রমে শুনলাম রবীন্দ্রসদন খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অবশেষে একদিন এই অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করবার সুযোগ হল। সেদিন পরিবেশটি সত্যিই পরিচ্ছন্ন মনে হল। জনকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন উন্মুক্ত স্থানে এই মনোরম অট্টালিকা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। সামনের ফোয়ারাটিও চিত্তকে মুক্তি প্রদান করে। বিংশ শতাব্দীর এই যুগে ফোয়ারার সমারোহ আর তেমন চোখে পড়ে না, কিন্তু সেকালে প্রায় ধনী গৃহেই ফোয়ারার জলধারা উল্লাস জাগিয়ে তুলত। এই প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে যথেষ্ট পরিসর এবং সর্বত্রই রুচির পরিচয় সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রসদনের জমির আয়তন নয় বিঘা। প্রেক্ষাগৃহের প্রথম তলের আয়তন ৪,৮০০ বর্গফুট, আসন সংখ্যা ৭৮৪। দ্বিতীয় তলের আয়তন ২,৫৫০ বর্গফুট, আসন সংখ্যা ৩৬৭। অর্থাৎ সর্বসমেত ১,১০১টি আসন এই প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে। এ ছাড়া এতে রয়েছে দুটি বিদ্যুৎচালিত ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। এই বাতানুকূল ব্যবস্থা সমন্বিত মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহে সর্বাধুনিক আলোকব্যবস্থা ও অপরাপর সব বন্দোবস্তই আছে। যতদূর জানি এইরকম প্রেক্ষাগৃহ ভারতবর্ষে আর নেই এবং এশিয়াতেও কমই আছে।
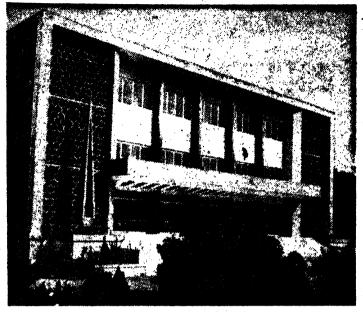
কিন্তু এইটিই আমার বক্তব্য নয়, এটি অনেকেরই জানা। যেটা অনেকেরই জানা নেই সেটি হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র মঞ্চ ও নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থা ছাড়াও ব্যাপকভাবে আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এটি যথার্থ উন্নতিবিধায়ক পরিকল্পনা। কেবলমাত্র প্রমোদ উপভোগ ছাড়া শিক্ষা, গবেষণা বা অপরাপর বিদ্যার্জনের কাজেও এখানে যাতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ আত্মনিয়োগ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে তাঁরা তৎপর হয়েছেন। এর জন্য রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে তাঁরা যে এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন তার উপসত্বই কাজে লাগাচ্ছেন। এ পর্যন্ত এর জন্য অন্য গ্রান্ট পাওয়া সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে এঁরা একটি গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করছেন। গ্রন্থসংখ্যা হাজারেরও অধিক। এর মধ্যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বইও রয়েছে দেখলাম। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসাহিত্যের সম্পর্কীয় সমগ্র গ্রন্থ তো এই গ্রন্থাগারে থাকবেই, এ ছাড়া থাকবে নানা জাতীয় বই এবং বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণের রচনা। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্র-সদন গ্রন্থাগারের সভ্য হবার জন্য আবেদন-পত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহের প্রতি সব চেয়ে গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। শ্রীগৌরদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাই ৩৫৪টি পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড প্রদান করেছেন বলে জানা গেল। এর মধ্যে দু-একটি রেকর্ডও শুনলুম। চমৎকার অবস্থায় রয়েছে এই রেকর্ডগুলি। এ ছাড়া এঁরা নিজেরাও পাঁচ হাজার টাকার বহু রেকর্ড কিনেছেন। অবশ্য এইসব রেকর্ডের ব্যবহার বুঝে শুনে করতে দেওয়া হবে—তবে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের কোনক্রমেই নিরাশ করা হবে না।

এঁরা দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাচ্ছেন যে তাঁরা যেন গ্রন্থ ও রেকর্ড উপহার দিয়ে এই সংগ্রহকে পরিপূর্ণ করে তোলেন। অনেকেই ইচ্ছা থাকলেও দান করতে ইতস্তত করেন। কারণ, প্রায় প্রতিষ্ঠানই দেখা যায় প্রথমটা খুব উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে নিরতিশয় অবহেলায় এইসব উত্তম সংগ্রহ বিনষ্ট হয় বা পরহস্তগত হয়। অনেক চালু প্রতিষ্ঠানেই এইসব ব্যাপারে অনেক দুর্নীতি

ঘটতে দেখা যাচ্ছে। অতএব আমরা আশা করব রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ যেন কোনও দুর্নীতি প্রবেশ করতে না দেন। প্রত্যক্ষভাবে দেখে আমার মনে হল এঁরা বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন। এই আদর্শ বজায় থাকলে এঁরা নিশ্চয়ই দেশবাসীর সহায়তা লাভ করতে সমর্থ হবেন ও শ্রদ্ধা অর্জন করবেন। অনেকের গৃহেও তো এমনিতেই বহু প্রাচীন রেকর্ড নষ্ট হচ্ছে। সৌখিন এই প্রতিষ্ঠানে উপহার দিলে কাজে লাগতে পারে।

বর্তমানে এঁদের স্থানাভাব। জানা গেল পাশেই একটি গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা হচ্ছে। সেটি হলে এইসব গ্রন্থ ও রেকর্ড রক্ষা করা সহজ হবে। এঁরা পুরাতন গানের রেকর্ডগুলি টেপ করে রাখতে চান এবং সাধারণত এই টেপই কাজে লাগানো হবে। রবীন্দ্রসদনের পিছন দিকে যেখানে এই গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে সেখানে একটি পানাভরা পুকুর দেখা গেল। এটি নাকি কিশোরীর অধিকারে। এতে কর্তৃপক্ষের মৎস চাষ হয় জানি না, তবে রবীন্দ্রসদনের মত প্রেক্ষাগৃহের পশ্চাদপটে এটি অত্যন্ত বিসদৃশ। এটিকে পরিষ্কার করে

একটি উত্তম সংগ্রহালয়ে পরিণত করাই বোধ হয় শ্রেয় ও শোভন।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণা হয়। রেকর্ডের বড় সংগ্রহ তো আর কোথাও পাবার আশা নেই। এখান থেকে যদি এ সম্পর্কে কাজের সুবিধা পাওয়া যায় তাহলে সেটাও খুব ভাল কথা। এ ছাড়া বড় বড় লাইব্রেরীও রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসদন যেটা চাইছেন সেটা হচ্ছে এই যে, সাধারণ ব্যক্তি এখানে এসে তাঁদের ইচ্ছাপূরণ করতে পারবেন। গবেষণা করুন বা নাই করুন, তাঁদের কৌতূহল মেটাতে পারবেন। এই-ভাবে স্বাভাবিক উপায়ে একটি সাংস্কৃতিক আবহাওয়া তৈরি হবে। এই পরিবেশটিই একান্ত কাম্য। রবীন্দ্রসদনের সম্মুখভাগে ত্রিতলে একটি চমৎকার প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। উপদেষ্টাদের মধ্যে একজন জানালেন: এইটির কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করে, আলোচনাচক্র, গানের আসর বা চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা তাঁদের রয়েছে। বাস্তবিকই এই নিরিবিলি জায়গায় এইরকম একটি ব্যালকনি এইসব কাজের বিশেষ উপযোগী বলে মনে হল। আর একজন বললেন, আজকাল শিল্পীরা ইচ্ছা থাকলেও স্বাভাবিকভাবেই এক সঙ্গে জমা হবার সুযোগ পান না। এইখানে তাঁরা মিলিত হতে পারেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। সত্যি এইরকম জায়গায় দিব্যি সাহিত্য, শিল্প বা সংগীত নিয়ে মিলেমিশে আলোচনা হতে পারে। পরিকল্পনাটিতে বোধ করি অনেকেরই সমর্থন থাকবে।

রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে নজরুল এবং জসীমুদ্দীনের সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। প্রতি রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সদনের বিস্তৃত প্রাঙ্গন ছাড়িয়ে আরও বহুদূর পর্যন্ত জনসমাগম ঘটে এবং তাঁরা সংগীতে পরিতৃপ্ত হন। আর যেসব উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন তাঁরা করেছিলেন তার মধ্যে আছে পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য, দার্জিলিঙের পার্বত্য জাতি-সমূহের নৃত্যগীত, শিশু উৎসব, যাত্রা উৎসব এবং নাট্য উৎসব। এঁরা বোধ হয় পাঁচ টাকার অধিক টিকিট বিক্রি করতে অনুমতি দেন না যাতে স্বল্প খরচে এই অনুষ্ঠানগুলি উপভোগের সুবিধা হয়। জানা গেল রবীন্দ্র সংগীতে "শ্রাবণ সন্ধ্যায়" নামক তাঁদের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের পরিকল্পনায় আছে জেলাভিত্তিক ও প্রদেশ-ভিত্তিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের পরীক্ষামূলক বিবিধ অনুষ্ঠান এবং হাস্যকৌতুকের নূতন ধরনের পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রসদনের উপদেষ্টা ... ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় ধারণা হল এই

রবীন্দ্রসদনের গ্রন্থাগার
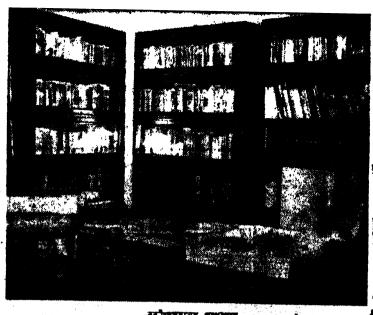
প্রতিষ্ঠানটিকে তাঁরা সর্বদিক দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিণত করতে চান, কেবলমাত্র প্রেক্ষাগৃহটি এর আকর্ষণ হবে এটি তাঁদের অভিপ্রেত নয়। কবিগুরু নিজেও প্রমোদ এবং শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে গেছেন সারা জীবন। কলকাতার নাগরিক জীবনে রবীন্দ্রসদনের প্রচেষ্টায় যদি এটি সার্থক হতে পারে তবে তাঁরা নিশ্চয়ই সাধুবাদের যোগ্য।

(আলোকচিত্র শ্রী এন, সমীরণ প্রদান করেছেন।)

বাংলা খেয়াল

মহাশয়

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর দেশ পত্রিকায় আপনার বক্তব্য "আবার বাংলা খেয়াল" এ অধমের নজরে পড়েছে একটু দেরীতে। কিন্তু তার আগেই ১৬ই সেপ্টেম্বরের বেতার জগতে আকাশবাণীর ঐ ঘোড়াঘোড়া কাণ্ড দেখেই মেজাজ গেছলো খিঁচড়ে। ফলে গত ২৫।৯ তারিখে আমার একটা বক্তব্য পাঠিয়েছি এ সম্পর্কে। সম্ভবতঃ ভাষার বল্গা বিচ্যুতির অপরাধে তা সাধারণ্যে প্রকাশ পাবে না।

আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, বেতার জগৎ সম্পাদক এরকম হাতুড়ে জনোচিত দাওয়াই বাতলালেন কোন সংবাদে। স্পর্ধারও একটা সীমা আছে শাস্ত্রাদির। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের রচনা বা রচনাংশকে তাঁর খেয়াল খুশীমত খেয়াল গানের ছকে ফেলতে চেয়ে খোদার ওপর খোদকারী করার অধিকার দিয়েছেন কোন সুবাদে? জানতে ইচ্ছে করে এহেন স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার উল্লিখিত মনীষিরা তাঁকে দিয়ে গেছেন কোন উইলের ধারায় লিপিবদ্ধ করে?

মোদ্দা কথা, আকাশবাণীর একটি আধুনিক বাংলা খেয়াল দেখা দিয়েছে এবং আমরা ইতরজনেরা তাকে খুব একটা সুনজরে দেখতে পারছি না। নেহাৎ অকারণে নয়। কারণ কি গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ উদ্দেশ্যে এই সাধু প্রচেষ্টার অবতারণা সেটাই এখনও মগজে ঢুকছে না আমাদের। শুধু জিজ্ঞাসা করি, আকাশবাণীর এ প্রেরণার উৎস কোথায়? সে কি কেবল নেহাৎই ভাষাগত কারণে? কাঠামো থেকে কেবলমাত্র হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী বা পুস্তু ভাষার বুলিগুলি তুলে নিয়ে কেবল গুটি কয়েক বাংলা কথা বসিয়ে খেয়াল তৈরীর কাজটা রাজমিস্ত্রীর—সংগীতশিল্পীর নয়। স্বকীয়তা এবং বৈশিষ্ট্য বর্জিত হলে তা আর যাই হোক, অন্তত বাংলা খেয়াল নয়।

কিন্তু আপনার প্রশ্নটি ঠিক বোধগম্য হলো না। ওই যে বলেছেন—"বাংলার চিরায়ত রাগসঙ্গীত যাতে সংরক্ষিত হয় তার জন্য তাঁরা কি বিশেষ কিছু করেছেন?"

এর উত্তরে বলব—হ্যাঁ করেছেন এবং বিশেষ কিছুই করেছেন। বাংলার চিরায়ত রাগসঙ্গীতকে রেডিও স্টেশনের ত্রিসীমানা থেকে তাড়িয়ে প্রাগৈতিহাসিক যাদুঘরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করেছেন। আরও করেছেন—বাংলা রাগপ্রধানের মুণ্ডুপাত করে তাকে সুরেলা আধুনিকে পর্যবসিত করেছেন।

বাংলার খেয়াল তথা বাংলার রাগসঙ্গীত এখনও ইতিহাসের পচা পাতায় ধামা চাপা পড়েনি। তথাপি বাংলা খেয়ালের মেড-ইন-আকাশবাণী সংস্করণ যেভাবে মৌলিকত্বের দাবী নিয়ে এগোচ্ছে তাতে মনে হয় আর কিছুদিন পরেই আকাশবাণী দাবী করবেন বাংলা গান তথা বাংলা ভাষা সৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁদেরই। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি

(অধ্যাপক) অশোক মুখোপাধ্যায়
১১।১০।৭০
ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক স্যামুয়েলসন

এ বছর অর্থশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক স্যামুয়েলসনকে। যোগ্যতম অর্থনীতিবিদকেই যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে স্যামুয়েলসনের নাম বহুল পরিচিত। কারণ, ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর লিখিত বই অবশ্যপাঠ্য। শুধু ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র অর্থশাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যে নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয় তা হচ্ছে অধ্যাপক পল্ এ. স্যামুয়েলসন। ১৯১৫ সালে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন জন্মগ্রহণ করেন; ১৯৪০ সাল থেকে তিনি ম্যাসাচুসেট্স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে চল্লিশ বছর বয়সের নীচে আমেরিকার অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় স্যামুয়েলসন জে. বি. ক্লার্ক পুরস্কার লাভ করেন; তারপর ১৯৭০ সালে পেলেন নোবেল পুরস্কার।

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, অধ্যাপক স্যামুয়েলসন হচ্ছেন বর্তমান বিশ্বের একমাত্র অর্থনীতিবিদ যাঁর অর্থশাস্ত্রের সব বিভাগেই মৌলিক অবদান আছে। তাত্ত্বিক অর্থশাস্ত্র—তা ব্যষ্টিগত-ই (Micro) হউক আর সমষ্টিগত-ই (Macro) হউক, সর্বত্র তাঁর সমান অবদান। Theory of Revealed Prefernce তত্ত্বের সাহায্যে তিনি যেমন ক্রেতার আচরণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি Multiplier Accelerator-এর ঘাত-প্রতিঘাত ব্যাখ্যা করে আয় ও নিয়োগ তত্ত্বে নতুন গবেষণার পথ প্রশস্ত করেছেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বে যেমন আমরা দেখতে পাই উপাদান-মূল্য সমতা (Factor Price Equalisation) সম্পর্কে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা—তেমনি Input-Output Analysis এবং Linear Programming এ ক্ষেত্রে পাই তাঁর মৌলিক বিশ্লেষণ। Samuelson substitution Theorem যেমন তাঁর প্রবর্তন, তেমনি অপর দিকে ফলিত অর্থবিজ্ঞানের বাইরে তাত্ত্বিক অর্থবিজ্ঞানের বিশ্লেষণেও তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁর "Foundations of Economic Analysis", —অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; আবার অধ্যাপক সলো (Solow) এবং অধ্যাপক ডর্ফম্যানের (Dorfman) সহযোগিতায় তাঁর "Linear Programming and Economic Analysis".—পরিমাণবাচক অর্থশাস্ত্রের (Quantitative Ecnomics) একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। বর্তমানে অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের বিভিন্ন

মৌলিক প্রবন্ধ "Scientific Essays of Professor Samuelson"—গ্রন্থে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করার সময়ে পুরস্কার কমিটি তাঁর অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এবং পুরস্কার প্রদানের কারণ দেখিয়েছেন "the scientific work through which he has developed static and dynamic theory and actively contributed to raising the lend of analysis in Economic Science."

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মান উন্নয়নে অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের অবদান অসীম। আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, অনগ্রসর দেশের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ অথবা সরকারী আয়-ব্যয় নীতি নির্ধারণ—প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের বিশ্লেষণের অবদান আমরা দেখতে পাই। তাঁর এই পুরস্কার লাভ নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি।

আগামী 'ব্যস্ত' ঋতুতে মুদ্রা নীতি কী হওয়া উচিত

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গভর্নর শ্রী এস্ জগন্নাথন বলেছেন, আগামী 'ব্যস্ত' ঋতুতে (Busy Season) ব্যাঙ্ক ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের যে নীতি অনুসৃত হবে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানত বাড়ানোর জন্য আরও যত্নবান হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় মুদ্রা সরবরাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের উপর নির্ভর না করে ব্যাংকগুলির উচিত আরও আমানত বাড়ানোর চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে নতুন টাকা সৃষ্টি করার ইচ্ছা রিজার্ভ ব্যাংকের আদৌ নেই। শ্রী এস্ জগন্নাথন আশা প্রকাশ করেন যে, খাদ্যশস্য এবং চিনি সংক্রান্ত ব্যবসায়ের অর্থসংস্থান করা সত্ত্বেও মন্দা ঋতুতে রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে টাকা ফিরে আসবে এবং সেই টাকার পরিমাণ ১৭২ কোটি টাকার বেশী হবে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর জোরের সঙ্গে বলেন, ভারতীয় মুদ্রার পুনরায় বহির্মূল্য হ্রাসের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নেই। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন আগেকার চেয়ে অনেক ভাল। বর্তমানে আমদানি-রপ্তানির মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণও অনেকটা কমতির দিকে। কিন্তু আরও উঁচু পর্যায়ে আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য বজায় রাখতে যেয়ে উৎপাদন বাড়ানোর দিকে আরও দৃষ্টি দিতে হবে যাতে ৭ শতাংশ হারে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়।

বিভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য সুদের হার তারতম্যমূলক হবে কিনা এ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি সমীক্ষা চালাচ্ছে বলে শ্রীজগন্নাথন জানিয়েছেন। ভারত সরকারের অর্থ দপ্তরও এ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করছেন। সমস্যা হচ্ছে, যদি কৃষিক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুদের হার কম ধার্য হয়, তবে যদি কোনও কারণে (বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, অথবা ঝঞ্ঝা) কৃষকদের পক্ষে সময়মত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তবে শাস্তিমূলক সুদের হার (Penal interest rate) কতটা ধার্য করা হবে। ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়েও যদি কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে সেই ক্ষতির বোঝা রিজার্ভ ব্যাংক বহন করতে পারবে না বলে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর জানিয়েছেন। অর্থাৎ, সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে ঝুঁকি নিয়েই কৃষকদের অল্প সুদে ঋণ প্রদান করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি কি এই ঝুঁকি নিতে রাজী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। সুতরাং আগামী 'ব্যস্ত' ঋতুতে তারতম্যমূলক সুদের হার (differential interest rates) ধার্য করা হবে কি না এই প্রশ্নটির মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি।

সুব্রত গুপ্ত

তাঁর সঙ্গে আমি দাদা পাতিয়েছিলাম : তিনিও আমাকে দাদাজি বলে ডাকতেন, আমিও তাঁকে। এ-তর্পণে আমি তাই তাঁকে দাদা বা দয়ালদা নামেই চিহ্নিত করব। দয়ালদা নামটিই ভালো—এমন দয়াল দীনবন্ধু আমি জীবনে বেশি দেখি নি। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সাহেবকে জানতাম বটে, কিন্তু সে শুধু চোখের দেখার জানা। দয়ালদা তাঁকে পেয়েছিলেন অন্তরঙ্গ রূপে, তাই তাঁর নামকরণ করেছিলেন সি এফ এণ্ডরুজ—ক্রাইস্টস্ ফেথফুল অ্যাপসল্। দয়ালুতায় উভয়েই ছিলেন সমধর্মী।*

দয়ালদার জন্ম ডেরা ইসমাইল খাঁ শহরে, সীমান্ত-প্রদেশে—কাবুল পেশোয়ার লাহোর থেকে প্রায় সমান দূরে। জন্ম তারিখ—৭ই মে ১৮৯৫। ৭ই মে তারিখে দয়ালদার মার মৃত্যু হয়—তাই তিনি এই দিনটিতে কখনো নিজের জন্মোৎসব করতেন না, মাতৃতর্পণেই মনকে নিয়োগ করতেন। তাঁর পিতৃদেবের কথা আমি তাঁকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি না মনে নেই, তবে মাতৃদেবীর সম্বন্ধে তিনি আমাদের বলেছিলেন—তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের গোড়াপত্তন করেন তাঁর জন্মদাত্রী এই তিনটি সূত্রে তাঁকে শৈশবেই দীক্ষা দিয়ে :

(১) সাধু দেখলেই নির্বিচারে প্রণাম করবে।

(২) সাধুকে কখনো জেরা করবে না।

(৩) নারী মাত্রকেই মা বলে বরণ করবে।

দয়ালদা জীবনে অজস্র দুঃখ শোক পেয়েছিলেন—সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের বেশী। "আর এমনিই ঠাকুরের বিধান"—বলতেন শ্রীঅরবিন্দ—"যে যত বড় আধার তার সামনে বাধাও হয় তেমনি দুরতিক্রম।" সাবিত্রীর মন্ত্রময়ী ভাষায় :

He measured the difficulty with
the might
And dug more deep the gulf that
all must cross.

(যাহার যেমন শক্তি—সেই অনুপাতে কাটে বিভু খনন গভীর খাত—যাকে তার হতে হবে পার।)

দয়ালদা বলতেন না আত্মকাহিনী। কিন্তু ভারত বিভাগের সময় যে তাঁকে বহু দুঃখ পেতে হয়েছিল সর্বস্বান্ত হয়ে (ডেরা ইসমাইল খাঁ আজ পাকিস্তানে) এটুকু অনুমান করতে বিশেষ কল্পনার দরকার হয় না। হয়ত এই সব দুঃখ শোক সর্বস্বান্তিই তাঁর কাছে শাপে বর হয়ে উঠেছিল—যার ফলে তিনি উঠেছিলেন নির্বিচারের উপরে—বদ্ধজীবের থাক থেকে জীবন্মুক্তের স্তরে দীক্ষা নিয়েছিলেন আকুমার ব্রহ্মচর্যব্রতে। এ-ও "যে পারে সে আপনি পারে"—আর যে পারে কেবল সে-ই গাইবার অধিকারী (রবীন্দ্রনাথ—গীতিমাল্য) :

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে॥

কিন্তু উচ্ছ্বাসের রাশ কষা ভালো—(যদিও দয়ালদার বেলায় রাশ ছেড়ে দিতেই মন চায়)—বলি আগে কী ভাবে আমার প্রথম পরিচয় হয় তাঁর সঙ্গে।

১৯৪৭ সালে কলম্বোয় শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জন্যে গান গেয়ে কয়েক হাজার টাকা তুলে আমি শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়ার নিমন্ত্রণ পেয়ে যাই ব্যাঙ্গালোরে তাঁর অতিথি হতে। তখন দয়ালদাকে প্রথম দেখি। তিনিও ছিলেন এই যশস্বিনী শ্রীমতিনীর অতিথি। ফলে দিনের পর দিন আহারে বিহারে তাঁর মধুসঙ্গ পেতাম।

দয়ালদার মুখকান্তি আমার মন টেনেছিল প্রথম দর্শনেই। মার্লোর বিখ্যাত উক্তি আমি অন্যত্র বহুবার উদ্ধৃত করেছি, তবু ফের করি :

"Who ever loved that loved not at first sight?"

আমাদের মধ্যে প্রীতির ভিত পাকা করে গাঁথার সহায়তা করেছিল—এক, দয়ালদার সৌম্য মুখের কান্ত দীপ্তি, দুই, আমার গান—ভজন। দয়ালদা গান ভালোবাসতেন আর পাঁচজনের মতন নয়—নানা ভাগবতী উপলব্ধিতে তিনি গানের পর গান বাঁধতেন তাঁর পিতৃভাষা উর্দুতে। (মাতৃভাষা ছিল তাঁর পঞ্জাবী কিন্তু তিনি উর্দু বলতেন নিখুঁত ও অনর্গল বাগ্‌বিন্যাসে। শুধু উর্দু কেন—হিন্দী, পুশতু, ইংরাজী, গুজরাতী ভাষায়ও তিনি ভাবের লেনদেন করতে পারতেন অনায়াসে। (গুজরাতীতে "প্রভুকী কৃপাকিরণ" নাম দিয়ে একটি বই লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজি সম্বন্ধেও একটি তর্পণ লিখেছিলেন। পরে শান্তিনিকেতনে বাংলাও শিখেছিলেন। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে।) সময় সময়ে ফার্সী ভাষা থেকে তিনি নানা শ্লোক উদ্ধৃত করতেন, যথা, হাফিজের।

মুতরিবে খুশ নবা বেগু তাজা
বতাজা নও ব নও।
বাদয়ে দিলকুশা বেজু তাজা
বতাজা নও ব নও॥

আমি এ-গানটি তাঁর মুখে শুনে টুকে সুর দিয়ে গাই ভৈরবীতে—পরে অনুবাদও করি—(আমার সাঙ্গীতিকী দ্রষ্টব্য ৮২ পৃষ্ঠা—গানটি গাওয়া চলে দয়ালদার উদ্দেশে) :

তোমার কলকণ্ঠে গুণী যেন শুনি
নিতুই-নব গান।
ঢালো তোমার নিতুই-নব রঙিন সুধা,
উছল করো প্রাণ॥

কিম্বা

অগর আঁ তুর্কি শিরাজি—
বদস্ত আরদ দিল মারা।
বখালে হিন্দুইশ বখ্শম—
সমরখন্দ ও বুখারারা।

আমি এর অনুবাদ করি অবিকল এই ছন্দ মিল বজায় রেখে (সাঙ্গীতিকী ৮০ পৃষ্ঠা) :

আমার কেউ) অন্তরের কান্তার
মিলন আজ) চায় উছল মন প্রাণ।
তিলের তার) করতে বন্দন দেই
সমরকন্দ) আর বুখারায় দান।

দয়ালদা অত্যন্ত ভালোবাসতেন মীরা তুলসীদাস সুরদাস-বর্গীয় মরমিয়াদের হিন্দী

* C. F. Andrews—Christ's Faithful Apostle.

ভজন। আমিও এমন গ্রহিষ্ণু শ্রোতা পেয়ে গান গেয়ে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিতাম। বলতে কি, আমাদের মধ্যে প্রীতির যোগসূত্র গাঢ় উঠেছিল বিশেষ করে এই গানেরই প্রসাদে চোদ্দ পনেরো বৎসর পরে ইন্দিকর ভজন মালিকা গেঁথে তাঁকে বরণ করি আমাদের হরিকৃষ্ণ মন্দিরে, পুনায়। সে কথা পরে আসছে।

দয়ালদা ছিলেন স্বভাবে সংযমী : মিতাহারী তথা মিতবাক্। নিজেকে সর্বদা পিছনে রাখতেই ভালোবাসতেন—হায়-পড়া হাঁকডাকে মানুষের ছন্দ তাঁর কাছে ছিল পরধর্ম। তাই শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়ার ভোজনকক্ষে বা তারপরে গল্পালাপের সময় দয়ালদা কেউ ডাক না দিলে নিজে থেকে এগিয়ে আসতেন না। অন্তর্মুখী ছিল তাঁর দৃষ্টি দেখলেই মনে পড়ত উপনিষদের উপাধি—"আবৃত্তচক্ষু"।

কিন্তু তা বলে তিনি যে আলাপী ছিলেন না তা নয় মোটেই। সবার সঙ্গেই তিনি থাকতেন সহযাত্রী, সর্বসাথী, অথচ চাইতেন না ভুলেও আত্মবিজ্ঞপ্তি। শান্ত সমাহিত, অথচ মজ্জুবাক তথা রসিক। যেখানেই তাঁকে ডাক দেওয়া হত তিনি সাড়া দিতেন তৎক্ষণাৎ,
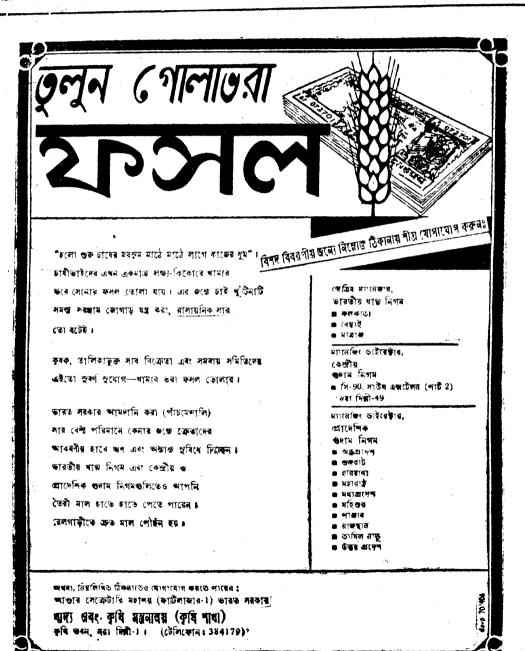
... হাসতে ও হাসাতে তিনি কারুর চেয়েই কম ছিলেন না, অথচ—ঐ যে বললাম—মুখরতা বা ফাজলামির ধারপাশ দিয়েও যেতেন না। অনেকেই আঁচ পেয়েছিল—তিনি সন্ত। কিন্তু কেউ তাঁকে প্রণাম করতে এক পা এগিয়ে এলে তিনি দশ পা পেছিয়ে যেতেন, তা সত্ত্বেও কোনো নাছোড়বান্দা তাঁকে প্রণাম করলে প্রতিপ্রণাম করতেন তিনি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।

মুখে তাঁর ছিল আলো। গৌরকান্তি, তার উপর বালব্রহ্মচারী। একটা আন্তর আভা তাঁর মুখকে যেন স্বচ্ছ গুণ্ঠনের মতন ঘিরে থাকত। লোকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত বিশেষ করে এই আভায়। শাস্ত্রে পড়েছি—* ব্রহ্মচর্যের একটি অবদান হল মুখের পরে সৌম্য "বর্ণপ্রসাদ"।

কিন্তু শুধু ব্রহ্মচর্যের দীপ্তিই নয়, সেই সঙ্গে ছিল বিনম্রতার শান্ত প্রভা—মুখর বিনম্রতার সস্তা বিনয় নয়, যে সরবে ঘোষণা করে "আমি কিছুই নই"—মনে মনে জেনে "আমি একটা কেউ-কেটা নই।" দয়ালদার একটি গানের অনুবাদ দিয়ে এ কথার ভাষ্য করা মন্দ কি?

জগতের যশোমান-মুকুট-তিলক নয়—করে
গর্বিত কতিপয়ের গৌরবের মোহতর্পে ভরা
আমার বিভ্রান্ত—বুনি অভিমান আমার অন্তরে।
মুকুট মণিকামালা পরকে পরিতে চায় যারা :
আমি চাই শুধু—ধন্য দীনতারে হৃদয়ে বরিতে,
যাহারা সবার নিচে তাদের বাসিতে চাই ভালো।
যে-স্নেহ একতাতারে বাঁধে জনে জনে ধরণীতে
তার কমনীয় দীপ্তি জ্বালুক আমার পথে আলো।
প্রেমের আনন্দ যাঁর অবদান তিনি ভগবান—
প্রেমরূপে জয় তাঁর যুগে যুগে—চয়ন, মহান।

তাঁর মূল হিন্দী গানটি তিনি ইংরেজী 'ফ্রী ভার্স'-এ তর্জমা করেছিলেন, আমি সে-তর্জমাটিকে ঢেলে সাজিয়েছি ছন্দে মিলে চলতি পঞ্চপদিক আয়াম্বিক ছন্দে :

Nor will I the worldly decorations win
They inflate me, with the pride of the elect,
Raising a man-made barrier between
My self and others. So I'd fain reject
The crowns and badges. They are sirens I
Must ever repudiate. Oh, let me acclaim
The blessed apparel of humility,
So, one with the lowliest, I may love them.
Whatever promotes spontaneous unity
Is Love and Love is God, everlastingly.

---

* বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

নয়, জীবনেও বরণ করেছিলেন প্রতি পদে। তাই দুঃখব্যথাও রসে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর বিকাশকে এত স্নিগ্ধ সুন্দর করে তুলেছিল যেমন চাঁদের আলো করে দরিদ্রের কুটিরকেও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বলাকা"-র ... দিয়েছিলেন :

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাকো,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখো,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

[illegible] কলুষ কোতো নাহি করো মনে,
আদর করিতে জানো অনাদৃত জনে।

দয়ালদার সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে সকল উপাধির সমান অংশীকারে। বলা চলে—কেননা তিনি ছিলেন নীতিনিষ্ঠ সাধু, তাঁর দৈনন্দিন প্রতিটি আচরণে, শুধু মৌখিক সততা ন্যায়শীলতা তাঁর আদর্শ ছিল না।

১৯৪৭ সালে—যখন ব্যাঙ্গালোরে তাঁর সঙ্গে প্রথম আমার মিতালি হয় তখন আমি অবশ্য জানতাম না এ কথা। কিন্তু তাঁকে দেখামাত্র মনে হয়েছিল বইকি যে, তিনি গড়পড়তাদের দলে নাম লেখান নি—তাঁর সৌম্য কান্তি, উদার ললাট, স্নিগ্ধ হাসি—সবই তাঁর ব্যক্তিরূপের নিত্য পরিচয় দিত। খাঁটি সাধু সন্ত আমার মন টানত—যেমন চুম্বক টানে লোহাকে, প্রকাশ্য রসে রক্তজ্ঞাসমূদ্রকে, আকাশ পাখিকে। এ-মহাজন এ থেকে থেকে আলো করে না এলে আমাদের পার্থিব জীবন তুচ্ছ ম্লান অধন্য হয়ে উঠত, মন গাইত বিষণ্ণ কণ্ঠে :

We dwindle down beneath
the skies
And from ourselves we pass
away :

"ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধু মঞ্জরী"

কিন্তু ঠিক এইরকমটি ছিলনা। কিছুদিন আগেও আজকের এই সুন্দরী বধূ সুচেতার মুখশ্রী অবাঞ্ছিত ব্রণতে ভরা ছিল।

সুচেতা জানতো প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তার সেই কিশোরী বয়সে মুখে ব্রণ উঠবেই। সেই সঙ্গে এও জানতো সুচেতা নিয়মিতভাবে ক্লিয়ারাসিল্ ব্যবহার করলে ব্রণ নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু থাকবে না। তাই প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে সাবান ও অল্প গরম জলে মুখটি পরিষ্কার করে সুচেতা ক্লিয়ারাসিল্ লাগাতো ব্রণর মুখ গুলিতে ও তার আশেপাশে। তারপর সময় মতো মিলিয়ে যেতো মুখের ব্রণ কিম্বা তার কোনো চিহ্ন। কেরাটোলিটিক্ ওষুধের গুণে ক্লিয়ারাসিল্ ব্রণর মুখ গুলোকে কাটিয়ে দিয়ে ত্বকের ভেতরে অণুপ্রবেশ করে বলেই এতো তাড়াতাড়ি কাজ হয় এতে। আজকের সুন্দরী বধূ সুচেতার নিত্য প্রসাধনীর অন্যতম ছিল ক্লিয়ারাসিল্। সময় মতো যত্ন নিয়েছিল সুচেতা—ক্লিয়ারাসিল্ লাগিয়েছিল ঠিকমতো—তাই বিয়ের দিনে তার সুন্দর মুখশ্রী নববধূর বেশে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

ক্লিয়ারাসিল এইভাবে কাজ করে:

১। ব্রণগুলিকে কাটিয়ে দেয়
কেরাটোলিটিক ওষুধী থাকার ফলে ক্লিয়ারাসিল লাগাবার পরই ব্রণ'র মুখটী) আপনা থেকেই খুলে যায়—তাতে ওষুধী মুখোমুখি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

২। ব্যাক্টেরিয়া রোধ করে
জীবাণু নষ্ট করবার ক্ষমতা থাকার জন্যে ক্লিয়ারাসিল্ ত্বককে বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ থেকে বাঁচায়।

৩। ব্রণগুলিকে পরিষ্কার করে
লোমকূপগুলির মুখে তেল-জাতীয় কিছু জমলেই তার থেকে ব্রণ'র উৎপত্তি হয়। ক্লিয়ারাসিল্ সেই অবাঞ্ছিত তৈলাক্তভাবে শুষে নিয়ে লোমকূপ) গুলিকে পরিষ্কার রাখে।

ক্লিয়ারাসিল্ আমেরিকার সবচাইতে ভালো পিম্পল ক্রীম্

Benson 2851-A Ben

ভাইভা ভোস

আমাদের ছাত্রজীবনে যাবতীয় পরীক্ষা ছিল লৈখিক নয়, মৌখিক। কোনো প্রশ্ন কঠিন হলে টেবিল-চেয়ার চুরমার করার আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম, পরিদর্শককে একটু ঘুরে আসতে আদেশ দিয়ে বই-খাতা খুলে টোকার সুযোগও

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবেন...

আমাদের ছিল না। তবে হাঁ, লাভও ছিল বটে।

এই ধরুন, অধ্যাপক মহাশয় জিগ্যেস করেছেন কেরল দেশে কফি-উৎপাদনের কথা। ক্লাসে যেদিন কেরলীয় পানীয়টির বিষয়টা বোঝানো হয়েছিল আপনি সেদিন টেস্ট-ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন; লৈখিক পরীক্ষায় উপায় নেই, মৌখিক পরীক্ষায় উপায় আছে। বলবেন : ভারতীয় কফির অর্থ-নৈতিক সমস্যা বুঝতে হলে আগে ভারতীয় চা বিষয়ে কিছুটা বুঝে নেওয়া দরকার। ব'লে শুরু করবেন দার্জিলিঙ ও আসামের চা-বাগানের তুলনাত্মক বিচার : রোদ ও বৃষ্টিপাত, শ্রমিকদের বেতন, কুলিদের মেজাজ...অধ্যাপক মহাশয় মোহিত হয়ে শুনতে থাকবেন, আর শুনতে শুনতে বেমালুম ভুলে যাবেন আপনার এই মনোহর ভাষণের আদি উৎপত্তিবিন্দু।

কিংবা ধরুন : প্রশ্নটা ছিল সিপাইদের তথাকথিত বিদ্রোহ। ঐ ব্যাপারটার আপনি মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেন না; বলবেন, "মোড় ফিরেছে...ঠিক এক শো বছর আগে যা ঘটেছিল, বিদ্রোহটা স্পষ্টই তার এক সুন্দর পরিণাম..." তারপর আপনি পলাশীর ভৌগোলিক পরিবেশের কথা বলবেন, মীরজাফরের মনঃসমীক্ষণের প্রসঙ্গ তুলবেন, ফরাসী ঔপনিবেশিকদের উল্লেখ করতে ভুলবেন না...অধ্যাপক মহাশয় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবেন; এত বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর পেয়ে ভাববেন, উনিও বুঝিবা কতই বুদ্ধিদীপ্ত এক প্রশ্ন করেছিলেন।

সেদিন 'মহারাষ্ট্র ভবনে' কোন এক বাঙালী নাট্য-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ চলছিল নির্বিঘ্নে, চলে যেমন ঢেউহীন স্রোতে ভাটা বেয়ে, উত্তুরে হাওয়ায় পাল মেলে সমুদ্রগামী বজরা। হঠাৎ সাজঘর থেকে সংবাদ এল : "আজ শিবাজীর জন্মদিন, শিবাজীর গৌরবার্থে সভাপতি মহাশয় অনুগ্রহ করে যদি..." শিবাজীর সঙ্গে ভদ্রলোকটির পরিচয় ক্ষীণ; "নির্ভীক শিবাজী...সাহসী, শিবাজী...বীরপুরুষ শিবাজী..." তোতলাতে তোতলাতে তিনি ভাষণটায় ইতি টানলেন। মৌখিক পরীক্ষায় অভ্যস্ত হলে তিনি বলতেন : যে-দেশে শিবাজীর জন্ম সে-দেশেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম সম্ভব। ব'লে তিনি সুভাষায়ই গুণকীর্তন শুরু করতেন।

ধান ভানতে শিবের গীত

...পরশুদিন বলাকা সঙ্ঘের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্রের সার্ধশতবার্ষিকী পালিত হয়। বিশিষ্ট অতিথি হলে কি হবে, সাহেব তো বটে; বঙ্গদেশের চূড়ামণির মাহাত্ম্য বোঝাব কোন্ সাহসে?... রঙ্গমঞ্চে উঠলাম, দ্বিধা না করে অম্লান বদনে বললাম ফরাসী কবি লা ফোঁতেনেরই কথা।

লা ফোঁতেনের জীবৎকাল [১৬২১-১৬৯৫] বিদ্যাসাগরের [১৮২০-১৮৯১] দু শত বৎসর-পূর্ববর্তী। এদিকে শুধু স্থান ও কাল কেন, চরিত্র ও লেখন-শৈলীতেও দুজনের স্বভাববৈপরীত্য দুর্লক্ষ্যনীয়। তবে? তবে মজা এই যে দুজনেই একটি 'কথামালার' রচয়িতা।

বিদ্যাসাগরীয় কথামালায় নাকি ঈসপের গল্পগুলি "অনুবাদিত" হয়েছে [অশুদ্ধ(?)

সাহসী শিবাজী...বীরপুরুষ শিবাজী

কথাটা লেখক নিজেই পুস্তকটির বিজ্ঞাপনে' দশ লাইনের মধ্যে তিনবার ব্যবহার করেছেন]। তবে "রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে" ফ্রিজিয়া দেশে যাঁর জন্ম, তিনি বোধ হয় 'বিধবা ও কুক্কুটী' গল্পে 'দরিদ্র মুসলমান বিধবার' প্রসঙ্গ তোলেননি, 'চালক ও চক্র' গল্পে "রেল স্টেশনের" উল্লেখ করেননি, 'উল্লুক ও শৃগাল' গল্পে "শ্মশানভূমিতে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহের" কথা লেখেননি।

বাংলা পুস্তকটির ৮৫টি গল্পের মধ্যে ৪৭টি আখ্যায়িকা লা ফোঁতেনের সঙ্কলনে মেলে—তবে শিরোনামের কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে বটে : বাংলায় যেখানে পড়ি পক্ষী, সর্প, দুঃখী বৃদ্ধ, ফরাসী লেখক সেখানে বিশিষ্টরূপভাবে লিখেছেন বুলবুল,

couleuvre কাঠ্‌রিয়া। তিনি আবার যাদের খেঁকশেয়াল ও নেকড়ে বাঘ বলেছেন, বাঙালী গ্রন্থকার তাদের শুধু শৃগাল ও (সাধারণত) বাঘই বলেন। cigogne-এর অনুবাদ বক কিংবা সারস, corbeau-র অনুবাদ কাক কিংবা দাঁড়কাক। 'সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার' না ব'লে লা ফোঁতেন বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে দেন : বংসতরী, ছাগী ও মেষী; 'অশ্ব ও বৃষ্ণ কৃষকের' জায়গায় দেখি 'শস্যপেষক, তার পুত্র ও গর্দভ'।

লা ফোঁতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর গল্পগুচ্ছের শিরোনামে কুশীলবের পূর্ণতর উল্লেখ করেন : 'পীড়িত সিংহের' সঙ্গে তিনি যোগ দেন খেঁকশেয়ালটিকে, 'সারসী ও তাহার শিশু সন্তানদের সঙ্গে যোগ দেন ক্ষেত্রস্বামীকে; 'জলমগ্ন বালক' হল 'বালক ও শিক্ষক মহাশয়', 'পিপীলিকা ও তৃণ' হল 'উচ্চিংড়ে ও পিঁপড়া'। এদিকে 'কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল' না লিখে তিনি শুধু লিখেছেন 'কুকুর ও খেঁকশেয়াল।'

তিনি আবার অনেক গল্পের নামের মধ্যেই বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত করেন : ছায়া-মোহিত শিকারবঞ্চিত কুকুর [কুকুর ও
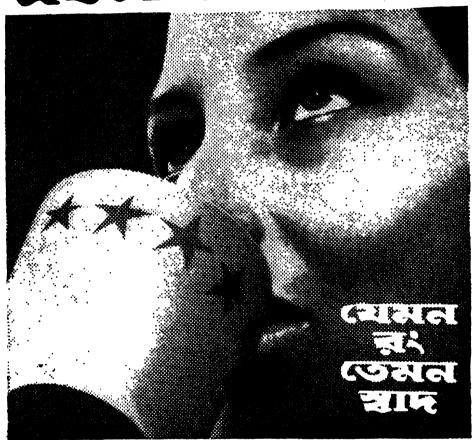
হরিণের উপর প্রতিশোধলিপ্সু অশ্ব [অশ্ব ও অশ্বারোহী]; ঈগলের অনুচিকীর্ষু কাক [ঈগল ও দাঁড়কাক]; জলে আত্মপ্রতিবিম্বদর্শী হরিণ [হরিণ]; কূপে পতিত জ্যোতিষী [জ্যোতির্বেত্তা]।

সাহিত্য বিচারে বলতে হয় : গ্রীক গল্প [ধরুন 'কাঠুরিয়া ও হের্মেস্'] এবং বাংলা আখ্যায়িকার ['কুঠার ও জলদেবতা'] তুলনায় ফরাসী কবিতাটা ['কুঠারিয়া ও মের্কু্যর] সরসতর। দৈর্ঘ্যে বাংলা রচনাটি গ্রীক গল্পের দেড়গুণ, ফরাসীটি গ্রীক গল্পের দ্বিগুণ। পাঠক নিজেই বিচার করুন :

এক কাঠুরিয়া নদীর ধারে কাজ করতে গিয়েছে—কুঠারটা জলে পড়ল; তীরে ব'সে কি করবে ভেবে না পেয়ে লোকটি বিলাপ করছিল...ঈসপ]

এক দুঃখী নদীর তীরে গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ কুঠারখানি তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া গিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। কুঠারখানি জন্মের মত হারাইলাম, এই ভাবিয়া সেই দুঃখী অতিশয় দুঃখিত হইল এবং কি হইল বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিল...[বিদ্যাসাগর]

কাঠুরে হারাল তার রুজি—তার কুড়ুল। হৃথাই খুঁজল, বিলাপ করতে শুরু করল। সরঞ্জাম বলতে আর কিছুই তার ছিল না, ওটাই ছিল তার সম্বল। কি উপায় হবে বুঝতে না পেরে অশ্রুপ্লুত বদনে সে চীৎকার করে বলে উঠল : ওরে কুড়ুল আমার, দুর্ভাগা কুড়ুলটি আমার... দেবাদিদেব, ফিরিয়ে দাও তাকে, আমাকে বাঁচাও...[লা ফোঁতেন]। এদিকে লা ফোঁতেনের দেবতা মিথ্যাবাদী লোভী কাঠুরেদের শুধু যে বঞ্চিত করলেন এমন নয়, প্রত্যেকের মাথার উপর তিনি সোনার কুড়ুলের এক এক কোপ মেরে ছাড়লেন।

আর নীতি? নীতিতেও পার্থক্য লক্ষণীয় : দেবতা ন্যায়পরায়ণের প্রতি সদয় হন, দুর্বৃত্তদের শত্রুতা করেন [ঈসপ]; "আমার যেমন আচরণ, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম" [বিদ্যাসাগর]; মানুষের যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই নিরাপদ [লা ফোঁতেন]।

দুই কথামালা

বিদ্যাসাগর ও লা ফোঁতেনের গল্পমালার পার্থক্যগুলি অনেক ক্ষেত্রে গৌণ, যেমন—'শশকগণ ও ভেকগণের' জায়গায় ফরাসীতে আছে 'শশকটি ও ভেকগণ', 'লবণবাহী বলদের' জায়গায় আছে 'লবণবাহী গাধা ও স্পঞ্জবাহী গাধা'; 'ব্যাঘ্র ও মেষশাবক' গল্পে মেষশিশুটির বাপ নয়, ওর দাদাই নাকি নেকড়েটির নিন্দা করেছিল।

পক্ষী শাকুনিককে বলে, "আমি অন্য অন্য পক্ষীদিগকে ভুলাইয়া আনিয়া তোমার ফাঁদে ফেলিয়া দিব।" লা ফোঁতেনের বুলবুল কিন্তু এত ধূর্ত নয়, সে চিলকে তার মাংসে নয়, গানেই পরিতৃপ্ত হ'তে বলে। চিলটা সী প্রবাদ উদ্ধৃত ক'রে উত্তর দেয় : ...ধিত উদরের কর্ণ নাই..."

কেন? "ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে, প্রখর রৌদ্রে ... শরীর দগ্ধপ্রায় ও গলদঘর্ম হইতেছে..." আর ফরাসি কাঠুরিয়া? "তার অন্ন নেই, ছুটি নেই, আছে শুধু বউ, সন্তান, সৈন্যদের উপদ্রব, করমাশুল, মহাজন, বেগার খাটুনি...।"

কোনো কোনো গল্প কিছুটা সদৃশ হলেও আসলে দুটি পৃথক ঈসপীয় গল্পের অনুকরণ, যেমন—বিদ্যাসাগরের 'বৃষ ও মশক' এবং লা ফোঁতেনের 'সিংহ ও মশক'। বৃষ মশককে বলে, "তুমি এত ক্ষুদ্র যে, তুমি আমার শৃঙ্গে বসিয়াছ, এ পর্যন্ত আমার সে অনুভবই হয় নাই"; সিংহকে কিন্তু মশক সত্যি সত্যি অতিষ্ঠ ক'রে তোলে —আর শেষে প্রাণ হারায় এক মাকড়সার জালে। তুলনা করতে গিয়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন গল্প একই নামে আখ্যাত; 'অশ্ব ও গর্দভ' নামে বিদ্যাসাগরের দুটি গল্প আছে, 'নেকড়ে বাঘ ও খেঁকশেয়াল' নামে লা ফোঁতেনের দুটি গল্প আছে।

একাধিক গল্পে মনে হয় লা ফোঁতেনের নিষ্ঠুরতা অপেক্ষাকৃত অল্প : যে হরিণটি তার পাগুলিকে নিন্দা করেছিল, তাকে তিনি মরতে দেননি [দ্রঃ বাংলা 'হরিণ'], শস্য-পেষকের গর্দভকেও তিনি মরতে দেননি [দ্রঃ বাংলা 'অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক']। তাঁর অশ্বারোহী অশ্বকে পোষ মানাল ঠিকই, কিন্তু তা করার আগেই অশ্বশত্রু হরিণকে শাসন করতে ভুলল না; বিদ্যাসাগরের মতে কিন্তু "হরিণের দমন করিতে না গিয়া সে অশ্বকে আপন আলয়ে লইয়া গেল।" বাঙালী শৃগাল ছাগলটিকে ছলে কৌশলে কুয়োতে আকর্ষণ করে; ফরাসী খেঁকশেয়াল ও রামছাগল উভয়েই নিজ থেকে নেমেছিল কুয়োতে।

লা ফোঁতেন কিন্তু মৃন্ময় পাত্রটিকে বাঁচাতে পারেননি; ওর কাংস্যময় বন্ধুটা বুঝিয়েছিল, সে নিজেই ওকে রক্ষা করবে।... রওনা হল, একশো গজ যেতে না যেতেই মৃন্ময় পাত্রটি বন্ধুর আঘাতেই ফেটে চুরমার হয়ে গেল। 'বৃদ্ধও তাঁর পুত্রগণ' [বাংলায় 'গৃহস্থ ও তাহার পুত্রগণ'] গল্পও বিচ্ছেদাত্মক : মুমূর্ষু বৃদ্ধের কাছে শপথ করলেও পুত্রেরা তাঁর শেষ ইচ্ছা পালন করতে পারেনি, উত্তরাধিকার নিয়েই ঝগড়া মামলা ক'রে পৈতৃক সম্পত্তি খোয়াল।

মেষপালক ও নেকড়ে

ঈসপীয় সংকলন ও বাংলা কথামালার মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য থাকুক না কেন, বিদ্যাসাগর অনুবাদই করেন; লা ফোঁতেনের কাছে কিন্তু ঈসপের রচনা এক উপলক্ষমাত্র। কথামালার 'মেষপালক ও নেকড়ে বাঘ' নামক গল্পে নেকড়েটা এক রাখালকে মেষের মাংস খেতে দেখে বলে, "যদি আমায় ঐ মেষের মাংস খাইতে দেখিতে তাহা হইলে তুমি কতই হাঙ্গামা করিতে।" আর লা ফোঁতেনের নেকড়ে?

একদিন ভারি মানবতাপূর্ণ এক নেকড়ে (আছে কি এমন নেকড়ে গোটা ব্রহ্মাণ্ডে?) নিজের নিষ্ঠুরতার কথা—কিন্তু বাধ্যতাপ্রসূত যদিও সেই নিষ্ঠুরতা —গভীরভাবে ভাবতে লাগল : আমি তো সবারই ঘৃণাভাজন, বলল সে, সার্বজনীন শত্রু। আসে কুকুরেরা, আসে শিকারীরা, আসে গ্রামবাসীর দল—সবাই মিলিত হয় নেকড়ের বিনাশে। ঊর্ধ্বলোকে দেবাদিরাজ পর্যন্ত তাদের চিৎকারে স্তম্ভিত; তাই আজ দেখুন ইংলণ্ড নেকড়েশূন্য : আমাদের মস্তক-ছেদনই সেখানে পুরস্কৃত। এমন তালুকদার নেই, আমাদের বিরুদ্ধে নিষেধাত্মক ঘোষণা থেকে সে বিরত থাকে; এমন কাঁদুনে ছোকরা নেই, মা যাকে নেকড়ের ভয় না দেখায়!...আর আমাদের লাভ? এক মার্মাড়-পড়া গাধা, পাঁচড়াওয়ালা ভেড়া, কিংবা খেঁকী এক কুকুর—ওতেই করেছি উদরপূর্তি ক্ষুন্নিবৃত্তি!...না, জ্যান্ত আর কিছুই স্পর্শ করব না, খাব ঘাস, চরব মাঠে, বুভুক্ষায় মরব...তা এমন শক্তটা কি? বিশ্বজনীন বিদ্বেষের পাত্র হওয়ার চেয়ে তাই কি শ্রেয় নয়?

কথাটা বলছে মাত্র, এমন সময় দেখল, একদল রাখাল খেতে বসেছে মেষশাবকের মাংসের শিক-কাবাব। ওহো, বলল সে, ওই জাতের খুনের জন্য আমি নিজেকে দোষী বলতে যাচ্ছি, আর দেখ, ওদের রক্ষকই—আর তাদের কুকুর—ওদের মাংস ভোজন করছে!...আর আমি কিনা সংকোচ বোধ করব? না!...দেবদেবীদের দিব্যি, হাস্যাস্পদ আমি হব না : মেষশিশুরা অধঃস্থলে যাবেই—শিকের বালাইও রাখবে না; আর শুধু তারা নয়, সঙ্গে তাদের দুগ্ধদা গর্ভধারিণী, আর জন্মদাতা বাপ!

[ক্রমশ]
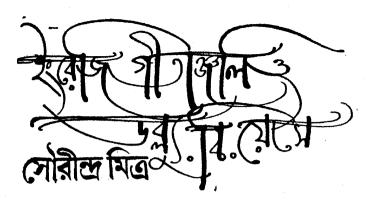
"We poets should be good liars..."
—W. B. Yeats

॥ ১ ॥

অসাধারণ কোনো ঘটনা বা কীর্তির পিছনে-পিছনে কিম্বদন্তীর আবির্ভাব প্রায় অনিবার্য বলা যায়। মানুষের স্বভাবই এই. বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের মানুষের : অসাধারণকে কিম্বদন্তীর কুয়াশার দ্বারা আবৃত করে না দেখলে তার সঙ্গে যেন কোনো রকম লেনদেনের সম্বন্ধ স্থাপন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সেই জন্য, হয় বীরপূজা-জনিত কিম্বদন্তীর সৃষ্টি করে অসাধারণকে অসাধারণতর প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস দেখা যায়, অথবা দেখা যায় অক্ষমের ঈর্ষাজনিত কুৎসা-প্রচারের দ্বারা, যা অসাধারণ তা যে মোটেই অসাধারণ নয়, এমন কি তার মধ্যে যে অনেকটাই ফাঁকি সেটা সূক্ষ্ম চাতুরীর সঙ্গে বিজ্ঞাপিত করার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনব্যাপী তাঁর নানা কীর্তির পিছনে এই দুই জাতীয় কিম্বদন্তীই যে নানাভাবে জালবিস্তার করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে তা আজ আর কারো অবিদিত থাকবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি রচনা, লণ্ডনে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে পুস্তকাকারে তার প্রকাশ এবং তার সাত মাসের মধ্যে তাঁর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি এমনি একটি অসাধারণ কীর্তি যার চার পাশে উভয় প্রকার কিম্বদন্তী ব্যূহরচনা করতে বিলম্ব করে নি। নোবেল পুরস্কার হয়তো তদানীন্তন রবীন্দ্র-উপাসকদের (সংখ্যায় তাঁরা কোনোকালেই কম ছিলেন না) কখনো-কখনো ঈষৎ বেসামাল করে থাকবে। কিন্তু, সকলেই জানেন, রবীন্দ্র-নিন্দুকের অভাবও এ দেশে কখনো হয়নি। এইবার নোবেল পুরস্কারকে উপলক্ষ করে তাদের কশ বেয়ে নতুন ক'রে বিষের ঝোরা নামলো। দেশ-ব্যাপী জয়ধ্বনির তলায়-তলায় একটা অস্পষ্ট নিন্দার, একটা চোরা সন্দেহের চাপা গুঞ্জন কোনো কোনো চতুর মহলে শোনা যেতে লাগলো : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এমন কী ইংরেজী বিদ্যার সম্বল ছিল যে তিনি কলম ধ'রেই এমন একটি অনবদ্য ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ লিখে ফেললেন যা ইংরেজি সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হল এবং, তার চেয়েও বড় কথা, সেই গ্রন্থ আবার নোবেল পুরস্কারে অলংকৃত হয়ে বিশ্বসাহিত্যে আসন লাভ করলো? অতএব এ-কীর্তি নিশ্চয়ই তাঁর একক শক্তিতে সম্ভব হয় নি, নিশ্চয়ই তাঁর রচনা সংশোধন করবার জন্য—হয়তো বা পুরোটাই লিখে দেবার জন্য—কোনো এক প্রচ্ছন্ননামা ব্যক্তি নেপথ্যে ছিলেন। কে সেই ব্যক্তি? কেউ অনুমান করলে এণ্ড্রুজ, কেউ বা বললেন ডব্লু বি য়েট্‌স। য়েট্‌সের দিকেই যেন পাষাণটা ঈষৎ ভারী, কেননা সে-সময় য়েট্‌সের যথেষ্ট কবিখ্যাতি ছিল। তাছাড়া, যিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলির এতোবড় একটা উচ্ছ্বসিত ভূমিকা লিখে দিয়েছেন তিনি কি আর রবীন্দ্রনাথের 'অপটু' ইংরেজিটা শুধরে দেন নি? যাই হোক, অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, অসাধারণকে তার প্রাপ্য সম্মান দেবার কষ্টকর দায় থেকে মুক্ত হলেন। এবং সেই সঙ্গেই একটা কিম্বদন্তীও এদেশে চালু হয়ে গেল যে ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথের যে কবিখ্যাতি অন্তত তার সবটাই তাঁর নিজের প্রাপ্য নয়।

গোড়াতেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অজ্ঞাতসারে এবং পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কিম্বদন্তীটিকে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছেন। 'আমি স্কুল পালানো ছেলে, ইংরেজি কোনো দিন শিখিই নি, ব্যাকরণে আমি একেবারেই কাঁচা' ইত্যাদি বিস্ময়কর কথা স্বদেশে-বিদেশে তিনি যার-তার কাছে যখন-তখন এত বেশী বলেছেন যে এটা তাঁর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলা যায়। বস্তুত, 'আমি ইংরেজি জানি না' এমন কথা প্রচার করবার কোনো সুযোগই যে তিনি হাত ফসকে যেতে দিতেন না, স্বদেশে এবং বিদেশে নানা ব্যক্তিকে লিখিত তাঁর অজস্র চিঠিপত্রে তার অত্যাশ্চর্য নিদর্শন আছে। ইংরেজি ভাষার মর্মজ্ঞ কেউ কেউ সবিস্ময়ে এ-কথার প্রতিবাদ করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনীকার আর্নেস্ট রীজ। ইংরেজি ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর দখল এবং উক্ত ভাষার ব্যবহারে 'how delicate is his touch and his feeling for the salient phrase and the live word', সে বিষয়ে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন :

'No one who at any time discussed with him matters of style, and the business of verse and prose, could mistake his feeling for English, although he often confessed to a fear that something of its ease and finesse of style escaped him (**Rabindranath Tagore : A Biographical Study.** দ্রষ্টব্য।) ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্রচারিত অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আর্নেস্ট রীজ-এর মতো ইংরেজ যাই ভাবুন আর যাই বলুন, কবির স্বদেশবাসীদের মধ্যে ঐ স্বীকারোক্তিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করবার জন্য অনেকেই অতিমাত্রায় লালায়িত ছিলেন এবং হয়তো এখনো আছেন। বিদেশীদের মধ্যেও যে কেউ কেউ এই স্বীকারোক্তিকে কখনো কখনো বিশেষ

উল্লেখ করে, নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন সেটা বর্তমান প্রবন্ধেরই বিষয়ীভূত এবং যথাস্থানে তা উল্লিখিত এবং আলোচিত হবে।

যাই হোক, ইতিমধ্যে কিম্বদন্তীটি তো চালু হয়ে গেল এবং নেপথ্যচারী, অনামিক অপযশচর্চার স্তরে, প্রমাণ-অপ্রমাণের বাইরে, অপরিশীলিত পাঠক সমাজের কুৎসা-লোলুপতার গোকুলে আজ পর্যন্ত নিরাপদে বর্ধিতই রইল এবং হয়তো বংশবৃদ্ধিও করতে লাগলো, বলা চলে। অন্ততঃ, কবির জন্মশতবর্ষ পূর্তির বৎসরেও অনেক জড়-বুদ্ধি ভারতীয় সাংবাদিক বিদেশী কাগজে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে পূর্বোক্ত জনশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে বুদ্ধি ও রুচির দিক থেকে তাঁরই সমগোত্রীয় পাঠকদের তাক্ লাগাবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। কাজটা কিছুই কঠিন ছিল না। কেননা, হাততালির লোভে কুৎসাপ্রণোদিত কিম্বদন্তীর প্রতি-ধ্বনি করতে হ'লে জানবার বা বুঝবার বা সত্যাসত্য যাচাই করবার কোনো দায়িত্বই থাকে না। যারা এই ধরনের কথা শুনতে চায় তারাও কস্মিনকালে সাক্ষ্যপ্রমাণ দাবী করে না, কেননা তাতে রসভঙ্গ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, কিম্বদন্তীর তো কোনো বালাই নেই, ভূতের মতো সে অশরীরী। সে অনায়াসে লোকের কান মুখে দিয়ে যেতে পারে, অথচ তাকে কোনো দিক থেকে রূপে ধরা যায় না, হাত ফসকে পালিয়ে যায়। ভূতের মতোই সে মরেও না, ছাড়েও না।

তবে সম্প্রতি সেই অশরীরী শরীর ধারণ করেছে—১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রকা-শক ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির কর্মকর্তাকে লিখিত য়েট্‌সের একখানি চিঠির আকারে। দেখা যায়, এই চিঠিখানিতে য়েট্‌স নিজ-মুখে পূর্বোক্ত কিম্বদন্তীটির একেবারে হুবহু প্রতিধ্বনি করেছেন এবং সেই সঙ্গে তদতিরিক্ত এমন কিছু খুঁটিনাটি দাবী আনছেন বা মন্তব্য করছেন যা এক্ষুনে আমাদের স্বদেশী কিম্বদন্তীটিকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালে এই চিঠিখানি প্রকাশিত হলে কেউ কেউ উল্লসিত হন, অনেকে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হন কিন্তু এই রকম ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মূল্য যাই হোক, য়েট্‌সের এই চিঠিখানি প্রকাশিত হওয়ার কিম্বদন্তীটি এইবার প্রকাশ্য দিবালোকে যুক্তিতর্কনিষ্ঠ বিচারের আওতায় এসে গেছে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে যুক্তির আতস কাচ দিয়ে কিম্বদন্তীটিকে অথবা সংশ্লিষ্ট দাবীকে খুঁটিয়ে বিচার ক'রে দেখার সুযোগ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমুদয় ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানির মহাফেজখানায় বিখ্যাত এবং অনতিখ্যাত লেখকদের যে সব চিঠিপত্র সংরক্ষিত আছে কোম্পানি নিযুক্ত সাইমন নোয়েল-স্মিথ নামক এক ব্যক্তি তার থেকে কিছু নির্বাচিত চিঠি সংকলন ক'রে **Letters to Macmillon** নামক গ্রন্থে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ করেছেন। য়েট্‌সের যে চারখানি চিঠি বা চিঠির অংশ ঐ বইটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, পূর্বোল্লিখিত চিঠিটি তাদের অন্যতম। ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির কর্ণধারকে ১৯১৭ সালের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে লিখিত এই চিঠিখানি একটু দীর্ঘ হলেও এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন, কেননা বর্তমান প্রবন্ধটি ঐ চিঠিটিরই একটি দীর্ঘ টীকা হিসেবে পরিকল্পিত। সেই জন্য বর্তমান আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ এই চিঠিখানি যেভাবে উক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত আছে সেইভাবেই তুলে দিচ্ছি :

18, Woburn Buildings,
W. C. 28 Jan. 1917.

I send A Lover's Knot [sic]. It is rather an embarrassment. I hope you will not mind if I write to Tagore that you have asked me to make as few alterations as possible as American publication hurries us. I can add from myself that his English is now much more perfect. You probably do not know how great my revisions have been in the past. William Rothestein will tell you how much I did for Gitanjali and even his

all one wanted to do 'was to bring out the author's meaning', but **that meant a continual revision of vocabulary and even more of cadance.** Tagore's English was a foreigner's English and, as he wrote to me, he 'could never tell the words that had lost their souls or the words that had not ye got their souls' from the rest. **I left out sentence after sentence,** and probably (,) putting one day with another (,) **spent some weeks on the task.** It was a delight and I did not grudge the time, and **at my request Tagore has made no acknowledgement.** I knew that if he did so his Indian enemies would exaggerate what I did beyond all justice and use it to attack him. Now I had no great heart in my version of his last work **Fruit Gathering.** The work is a mere shadow. **After Gitanjali** and **The Gardenar** and **The Crescent Moon (exhaustively revised by Sturge Moore),** and a couple of **plays** and perhaps **Sadhana,** nothing should have been published except the long autobiography which has been printed in **Modern Review,** a most valuable and rich work. **He is an old man now and these later poems are drowning his reputation.** I told this to Rothenstein and he said 'we must not tell him so for it would put him into the deepest depression.'

I am relieved **at** your letter though I would not like to tell Tagore so. I merely make ordinary press revisions for there is nothing between that and **exhaustive revising of all phrases and rhythms** that 'have lost their soul' or never had souls. Tagore's English has grown better, that is to say more simple and more correct, but it is still often very flat.

Excuse my writing so much unasked criticism' but **I have been deeply moved by Tagore's best work and that must be my excuse.**

I am still prepared to make the old exhaustive revision if you wish it, but it would take time and I shall hope that you do not wish it.

য়েট্সের এই চিঠিখানি যে শুধু দীর্ঘ তাই নয়, এটির বক্তব্য এবং মনোভাবে যথেষ্ট জটিলতা আছে, সেই জন্য এটির একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথমেই পত্রটির **Context-টি লক্ষ্য করতে** হবে : Lover's Gift বইটিকে (য়েট্স এটিকে যে **A Lovers Knot** বলে উল্লেখ করছেন সেটাও লক্ষণীয়) মুদ্রণযন্ত্রে চড়াবার পূর্বে য়েট্সকে দিয়ে একটু দেখিয়ে নেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন ম্যাকমিলান। তাঁর যে চিঠির উত্তরে য়েট্স আলোচ্য চিঠিখানি লিখেছিলেন সেটা আমাদের হস্তগত না হলেও য়েট্সের নিজের ভাষা থেকেই তার সারমর্ম অতি সহজেই বোধগম্য হয় : ম্যাকমিলান পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন **'to make as few alterations as possible, as American publication** hurries us', অর্থাৎ তাঁর উপর নির্দেশ ছিল 'ordinary press revision'—এরই।

এই নির্দেশ যে য়েট্সের মনঃপূত হয় নি তা স্পষ্টভাবে চিঠিখানির রুক্ষ, ক্ষুব্ধ এবং অসহিষ্ণু tone-এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে। এই Context-টি স্মরণ রেখে চিঠিতে য়েট্সের বক্তব্যগুলিকে এখন বিশ্লেষণ করা দরকার।

প্রথমত,—য়েট্স দাবী করছেন যে তিনি বিশেষভাবে ইংরেজি গীতাঞ্জলির এবং সাধারণভাবে (প্রায় 'ফাউ' হিসেবে, বলা [illegible]) ('even his Ms. of **The Gardener'**) পাণ্ডুলিপি [illegible] সংশোধন করে দিয়েছেন। বিশেষ করে গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে এই সংশোধনের অর্থ হল :

'a continual revision of vocabulary and even more of cadence'

য়েট্সের এই দাবী অনুযায়ী দেখা যায়, প্রথমত, তিনি শব্দপ্রয়োগের এবং শব্দবিন্যাসের 'নিরন্তর', অর্থাৎ অনবরত, পরিবর্তন করেছেন; দ্বিতীয়ত, 'তার চেয়েও বেশী করে' ছন্দমাত্রার আনুপূর্বিক সংশোধন এবং পুনর্বিন্যাস করেছেন অর্থাৎ মূল বাক্যগুলিকে ভেঙে নতুন করে সাজিয়েছেন। এই দুটিকে একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা হল এক কথায় রবীন্দ্র রচনার 'পুনর্লিখন'। প্রকাশক ম্যাকমিলানের পক্ষে এই সব খুঁটিনাটি জানার কথা নয়, সেই জন্য য়েট্স সাক্ষী মানছেন রোটেনস্টাইনকে : **'William Rothenstein will tell you how much I did for Gitanjali and even his Ms. of The Gardener'.**

শব্দের এবং ছন্দোবিন্যাসের এইরূপ আমূল পরিবর্তন কেন প্রয়োজন হয়েছিল তার কারণ ব্যাখ্যায় য়েট্স জানাচ্ছেন যে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজীটা ছিল বিদেশীর ইংরেজী : 'Tagore's **English** was **a** foreigner's English'।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং পত্রযোগে তিনি য়েট্সকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি

'could never tell the words that had lost their **souls** or the words that **had** not **yet got their souls** from the rest'.

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, ১৯১৩ সালের ৫ই জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ঐ একই মর্মে এজরা পাউন্ডকে যে চিঠিখানি লেখেন তার ভাষা একেবারে অভিন্ন (চিঠিখানি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত নোয়েল স্টক সম্পাদিত Ezra Pound ; Perspectives নামক স্মারকগ্রন্থে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত আছে)। রবীন্দ্রনাথ নিজমুখেই, বলেছেন তিনি ইংরেজী ভাষা জানেন না, সেই জন্যই য়েট্সকে কয়েক সপ্তাহ পরিশ্রম করে ইংরেজী গীতাঞ্জলির ভাষা আগাগোড়া পরিমার্জন করে দিতে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা থেকে লাইনের পর লাইন তাঁকে বর্জন করতে হয়েছে : **'I left out sentence after sentence.'**

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও 'গীতাঞ্জলি' অথবা 'গার্ডেনার' এই দুটি বইয়ের কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিকট এই ঋণ কেন প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি তার ব্যাখ্যাচ্ছলে য়েট্স লিখেছেন যে, তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ নীরব ছিলেন কেননা এই রকম কোনো স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হলে স্বদেশে রবীন্দ্রনাথের শত্রুপক্ষ এটিকে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে পারে সেকথা তাঁর জানা ছিল :

'**at** my request Tagore **has made** no acknowledgement. I knew if **he** did so his Indian enemies would exaggerate what I did **beyond all** justice and use it to attack him.'

দ্বিতীয়ত,—য়েট্স খুব সংক্ষেপে একটি খাঁটি সংবাদ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী অনুবাদ **The Crescent Moon** নামক বইটিও নাকি স্টার্জ মুর কর্তৃক আগাগোড়া সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে : **'exhaustively revised by Sturge Moore'**

কিন্তু স্টার্জ মুরকেই উৎসর্গিত হলেও, বইটিতে কোনো জায়গায় স্টার্জ মুরের নিকট কোনো প্রকার ঋণ কেন স্বীকৃত হয় নি, অর্থাৎ য়েট্সেরই মতো স্টার্জ মুরও ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের বিপন্ন খ্যাতিকে বাঁচাবার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপের অনুরোধ জানিয়ে মহানুভবতা দেখিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে য়েট্সকে সম্পূর্ণ নীরব দেখা যায়।

তৃতীয়ত,—একটি বিজ্ঞপ্তি যাকে য়েট্স নিজেই 'অযাচিত সমালোচনা' বা unasked criticism' বলেই উল্লেখ করেছেন। সেটি হল এই যে, পূর্ববর্তী বইগুলির তুলনায় রবীন্দ্রনাথের অধুনাতম রচনার, বিশেষ করে Lover's Gift-এর, ইংরেজি অনেক বেশী নিখুঁত :

'his **English** is now much **more** perfect' . . . 'Tagore's **English has** grown better, that **is** to say more simple and more correct, but it **is** still often very **flat.**'

অতঃপর ঐ বিজ্ঞপ্তির অনুষঙ্গেই একটি খুব স্পষ্ট ইঙ্গিত। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি **'more perfect'** হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ইদানীন্তন ইংরেজি রচনা কাব্যগুণ-বর্জিত এবং অপকৃষ্ট এবং তার ফলে তিনি কবিখ্যাতি খোয়াতে বসেছেন : **'these later poems are drowning his reputation.'**

অর্থাৎ পূর্ববর্তী 'গীতাঞ্জলি', 'গার্ডেনার' ও 'ক্রেসেন্ট মুন' রবীন্দ্রনাথের 'বিজাতীয় ইংরেজি' সত্ত্বেও য়েট্সের এবং

স্টার্জ মুরের পরিমার্জনার জাদু-স্পর্শে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁর ইংরেজির যথেষ্ট উন্নতি হলেও শুধুমাত্র তার দ্বারাই পূর্বোক্ত বইগুলির কাব্যমান আয়ত্ত করতে রবীন্দ্রনাথ সক্ষম হবেন না। Fruit Gathering সম্বন্ধে এই সূত্রে য়েট্‌স মন্তব্য করছেন : 'The work is a mere shodow'। তার কারণ সেটির সংশোধনে তাঁর নিজের বিশেষ গরজ ছিল না :

'I had no great heart in my version of his. last work Fruit Gathering.'

অর্থাৎ 'গীতাঞ্জলি' ও 'গার্ডনার' যে ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন তিনি করেছিলেন, Fruit Gathering-এর বেলাতেও যদি তাই করতেন বা করতে পারতেন তাহলে এই বইখানিও অনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করতো। অতএব Lover's Gift-এর বেলায় প্রকাশক যে শুধুমাত্র press revision করতে বলছেন তাতে য়েট্‌সের নিজের কিছুই যায় আসে না, কিন্তু ঐ বইখানিরই সমূহ ক্ষতি এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিরও। এই সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ভাষায় একটি আভাস দিলেন য়েট্‌স : প্রকাশক নিজে যাই ভাবুন

এবং বললেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যেন য়েট্‌স-কৃত এবং পূর্বে বিজ্ঞাপিত 'পুনর্লিখনের' জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, এবং প্রকাশকের নির্দেশ-অনুযায়ী য়েট্‌স যদি তা না করেন বা না করতে পারেন, তবে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিরাশ এবং মনঃক্ষুণ্ণ হবেন :

'I am relieved at your letter though I would not like to tell Tagore so.'

Fruit Gathering-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত my version' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর অর্থ হ'ল এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের 'বিদেশী' অথবা পরবর্তী পর্যায়ের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ইংরেজিতে তাঁর রচনাগুলি বরাবর য়েট্‌সের নিকট পেশ করে এসেছেন এবং য়েট্‌স যখন সেগুলির পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধন করেছেন, অর্থাৎ এক কথায় নতুন করে রচনা করে দিয়েছেন তখন সেগুলি যেন একেবারে তাঁর নিজের version হয়ে গেছে—একরকম য়েট্‌সেরই রচনা ব'লে ধরা চলে। এই রচনাগুলির মধ্যে অবশ্যই গুণগত তারতম্য ঘটেছে, তার জন্য সংশোধক য়েট্‌সের নিজের মর্জিগত জোয়ার-ভাঁটাই মুখ্যত দায়ী। যখন পূর্বোক্ত 'স্বকীয় version' প্রণয়নে তিনি রস বা উৎসাহ পেয়েছেন (যেমন 'গীতাঞ্জলি' ও 'গার্ডনার'-এর বেলায়) তখন কবিতাগুলি অপূর্ব কাব্যগুণে মণ্ডিত হয়েছে কিন্তু যখন বিশেষ আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেন নি (যেমন Fruit Gathering-এর বেলায়) তখন ফল হয়েছে নিতান্তই মধ্যম রকমের। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নিজের কৃতিত্ব যৎসামান্যই।

চতুর্থত,—একটি পরোক্ষ এবং 'অযাচিত' উপদেশ। য়েট্‌স রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশ-সম্পর্কে ম্যাকমিলানকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে, 'গীতাঞ্জলি', 'গার্ডনার', (স্টার্জ মূর কর্তৃক আদ্যন্ত পরিমার্জিত) 'ক্রেসেণ্ট মুন', গুটি দুয়েক নাটক এবং সম্ভবত 'সাধনা'—এগুলি ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করা সমীচীন হয়নি। ভবিষ্যতে একমাত্র জীবনস্মৃতির ইংরেজি তর্জমা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থ, বিশেষ করে কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশ করা যে খুবই অবিবেচনার কাজ হবে সে বিষয়েও য়েট্‌সের ইঙ্গিতটি খুবই স্পষ্ট। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে যেগুলি য়েট্‌স আদৌ অনুমোদন করছেন না সেগুলি The king of the Dark Chamber, Hungry Stones and other stories, One hundred Poems of Kabir, Fruit Gathering, এবং Stray Birds।

উপযাচক হয়ে প্রকাশককে এই উপদেশ দেবার কারণ হিসেবে য়েট্‌স বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ অথর্ব হয়ে গেছেন এবং সেই জন্যই তাঁর রচনা শক্তিও নিঃশেষিত :

'He is an old man now and these later poems are drowning his reputation.' । আবার রোটেনস্টাইনকেই তিনি

সাফ। মানছেন। ... জানিয়েছিলেন এবং তিনিও নাকি তাঁকে উত্তরে বলেন,

'we must not tell him so for it would put him into the deepest depression.' । এই সব 'অযাচিত' সমালোচনার এবং উপদেশের সাফাই হিসেবে য়েট্‌স লিখেছেন,

'I have been deeply moved by Tagore's best work and that must be my excuse.' । তারপর চিঠির উপসংহারে, প্রকাশকের অনুমতি পেলেই Lover's Gift-এর কপিটিও যে তিনি পূর্ববৎ আদ্যোপান্ত পরিমার্জন করতে তখনো প্রস্তুত আছেন সে কথাও জানিয়ে দিলেন :

'I am still prepared to make the old exhaustive revision if you wish it, but it would take time and I shall hope that you do not wish it.'

অতএব দেখা যাচ্ছে চিঠিখানিতে কয়েকটি কতকগুলি দাবী, তার মধ্যে ইংরেজি গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে য়েট্‌সের নিজের হস্তক্ষেপের দাবীটিই প্রধান এবং সব চেয়ে সরব। আর আছে রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক ইংরেজি কবিতার সমালোচনা, য়েট্‌স নিজেই যাকে 'অযাচিত' বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আছে কিছু সংবাদ যথা 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এ স্টার্জ মুরের সার্থক হস্তক্ষেপ এবং রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক রচনার অপকর্ষ সম্বন্ধে রোটেনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর আলাপের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশনা সম্বন্ধে ম্যাকমিলানকে ঈষৎ পরোক্ষ উপদেশ। য়েট্‌স নিজমুখে না বললেও, ঐ শেষোক্ত সংবাদ এবং উপদেশও যে সম্পূর্ণ

এখন প্রশ্ন হ'ল, এর মধ্যে সত্য কতটুকু আছে? আদৌ আছে কি? এই প্রশ্নেরই যথাসম্ভব তথ্যভিত্তিক বিচার ও আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার সূত্রপাত থেকে শুরু করে সেইসব রচনার প্রকাশ এবং প্রচার এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনা ও তথ্যের কালক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবৃতির প্রয়োজন—প্রস্তাবিত বিচারের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠাভূমি হিসেবেই। এই বিবৃতির অনুসরণে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, য়েট্‌স চিঠিখানি লিখেছিলেন প্রকাশক ম্যাকমিলানকে এবং চিঠির তারিখটা ছিল ২৮শে জানুয়ারী, ১৯১৭ সাল।

(ক্রমশ)

ব্রু'র স্বাদ!
নতুন স্বাদ!

প্রতিটি 'জার' থেকে অনেক বেশী কাপ কফি তৈরী হয়।

ব্রু'র চাহিদা তাই বেড়েই চলেছে দিনকে দিন। স্বাদে গন্ধে ব্রু'র মতো কড়া অথচ আমেজভরা ইন্‌স্ট্যান্ট্ কফি আর নেই। ব্রু আপনাকে অনেক, অনেক বেশী তৃপ্তি দেবে। কফির জগতে এক নতুন আলোড়ন এনেছে ব্রু। তাছাড়া পরিমাণেও বেশী—অন্য যে-কোনও ইন্‌স্ট্যান্ট্ কফির তুলনায় অনেক বেশী কাপ কফি পাবেন ব্রু'র প্রতিটি 'জার' থেকে।

একমাত্র ব্রু'ই পাওয়া যায় সুলভে এবং সুন্দর কাঁচের জার-এ— যা পরেও ব্যবহার করা যায়।

ব্রু-কফির এই নতুন স্বাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে লোকের মুখে মুখে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মোটমাট ১৬টি প্রবন্ধ পাওয়া গেল। দুটি পৃথক ভূমিকা লিখেছেন মৈত্রেয়ী দেবী এবং অন্নদাশঙ্কর রায়।

১৯৬৫ সালে সরকারীভাবে দু' দেশের লড়ালড়ির পর পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বইপত্রর আদানপ্রদান বন্ধ, যাতায়াত মেলামেশার তো সুযোগই নেই। কিন্তু এর বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সীমান্তের রেখা যথেষ্ট গভীর—দেশ ভাগ হলেও, সং প্রতিবেশীসুলভ বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখনো হয়নি। দেশ ভাগের সময় অনেক অভিমান, ক্রোধ ও তিক্ততা ছিল—পরবর্তীকালে রাজনৈতিক উস্কানিতে সেগুলো উভয় দেশেই জিইয়ে রাখারই চেষ্টা হয়েছে—মনোভাব বদলাবার কোনো ব্যাপক উদ্যোগ দেখা যায়নি।

যাই হোক, এই তেইশ বছরের ব্যবধানে—মানসিকতার দিক থেকে আরও দূরে সরে যাওয়াই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে প্রথম প্রথম ধর্মের ব্যাপারে একটু বেশি গোঁড়ামি তো দেখা দেবেই। এবং সেই ধর্মের ভিত পাকা করার জন্য—ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়েও দলাই মলাই চলবে—কেননা ইসলামের সঙ্গে আরবী সংস্কৃতি ও উর্দু ভাষার সম্পর্ক একটু মাত্রাতিরিক্তভাবে দেখানো হয়। পাকিস্তানের কর্তারা গোড়ার দিকে এই রকম ভাষা ও সংস্কৃতির দলাই মলাইয়ের জন্য কম চেষ্টা করেননি—যদি সার্থক হতেন, তাহলে, এই তেইশ বছর বাদে আমরা পরস্পরের কাছে সত্যিই অপরিচিত হয়ে যেতাম।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত—কিছুতেই বাংলা দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রীয় খাঁড়ার নিচে বলি দিতে চাননি—বরং এ দুটিকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা লড়াই করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন পর্যন্ত। এবং অকপটে স্বীকার করা ভালো, বাংলা ভাষার মর্যাদা তাঁরা যতখানি উঁচু করেছেন, সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে আমরা কিছুই প্রায় করিনি। আজ বিশ্বের কাছে বাংলা ভাষার পরিচয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে—ভারতবর্ষে নিছক একটি আঞ্চলিক ভাষা মাত্র।

উর্দুর হাত থেকে বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানীরা শুধু যে বাঁচিয়েছেন, তাই নয়—পৃথক দেশের জন্য তাঁরা পৃথক ধরনের বাংলাও তৈরী করেননি। অত্যন্ত সুস্থ মস্তিষ্কে তাঁরা 'হিন্দু বাংলা' বা 'পশ্চিমবঙ্গের বাংলা'—এই ধরনের কোনো বিভেদ সৃষ্টি না করে গ্রহণ করেছেন—সেই একই বাংলা ভাষা, দুশো বছর ধরে যা আস্তে আস্তে তৈরী হয়ে উঠেছে—যা পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গ কারুর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, বাঙালী মাত্রেরই। আজ আমরা এখানে যে ভাষায় কথা বলি বা লিখি, পূর্ব বাংলার বেতারে, সংবাদপত্রে ও সাহিত্যে সেই একই ভাষা। তাই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য আজও অবিচ্ছেদ্য। এই ভাষা নির্ণয় সম্পর্কে মহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, "চলতি উচ্চারণকে যাঁরা কলকাতা, শান্তিনিকেতন, তথা পশ্চিম বাংলা-ভিত্তিক বলে বর্জন করতে চান, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। এ উচ্চারণ পশ্চিম বাংলা-ভিত্তিক হলেও প্রাক-আজাদি যুগের বহু জিনিসের মতো আমরা এর উত্তরাধিকারী। এই উচ্চারণই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ আদর্শ উচ্চারণ গড়ে তোলার ভিত্তি।"

পাকিস্তান সরকার পশ্চিমবঙ্গের বইপত্তর ওদেশে যাওয়া বন্ধ করেছেন এই যুক্তিতে যে, তাতে "হিন্দু সাহিত্যের" কু-প্রভাব পড়বে ওখানকার সংস্কৃতিতে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সেই কারণেই নিষেধাজ্ঞা ছিল। এ সম্পর্কে ডক্টর আহমদ শরীফ খুব নির্ভেজালভাবে বলেছেন যে, "আমাদের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান থেকে ইসলামী শাস্ত্র অবধি সব বিদ্যাই দান করা হয় বিদেশী, বিজাতী ও বিধর্মী য়ুরোপীয় বিদ্বানদের গ্রন্থ পড়িয়ে। চীন রাশিয়ার নাস্তিক্য সাহিত্যই আজ পাকিস্থানে জনপ্রিয় পাঠ্য। আমেরিকার যৌন গোয়েন্দা সাহিত্যে আজ বাজার ভর্তি। বিদেশীর, বিজাতির ও বিধর্মীর সাহিত্য অনুবাদের জন্যে দেশে গড়ে উঠেছে সরকারী প্রতিষ্ঠান। খৃষ্টান য়ুরোপের আদর্শে জীবন রচনার সাধনায় আজ সারাদেশ উন্মুখ। য়ুরোপীয় আদলে জীবনযাপন করে অসংখ্য লোক কৃতার্থমন্য (পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেও

কথাগুলি মর্মে মর্মে সত্য!)। য়ুরোপ আজ কামনার স্বর্গলোক। তাছাড়া ইমরুল এস থেকে হতেমতাই এবং দারান ও-শিরোয়াঁ থেকে রুস্তম অবধি সব আরব-ইরানী কাফেরই আমাদের শ্রদ্ধেয়। এতসব উপসর্গবেষ্টিত হয়েও আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিলোপের আশঙ্কা করিনে। কেবল দেশী কাফের রাম থেকে রবীন্দ্র-নাথকেই আমাদের ভয়। অথচ এই রাম দ্রনাথের দেশেই তাঁদের জ্ঞাতিরাই বরণ ছে ইসলাম। হাজার বছরের পুরোনো ম, লমান সন্তানদের ধর্ম সংস্কৃতি হারানোর এই ভয় কেন?—অতএব, রবীন্দ্র বিরোধিতার মূলে সংস্কৃতি ধ্বংসের আশঙ্কা নয়, রয়েছে অন্য কিছু।"

এই বইতে আছে বদরুদ্দিন উমর-এর প্রবন্ধ "বাঙালী সংস্কৃতির সংকট"। এই লেখকের বই পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়েছে। এ'র রচনাটি মুক্তবুদ্ধির স্পর্শে সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে প্রবন্ধ আছে তিনটি তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগলো, "ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ"—সারওয়ার মুরশিদ-এর লেখা। "প্রাচীন বরেন্দ্রীয় মা ও শিশুমূর্তি" এবং "লালন শাহের জীবন কথা" গবেষণা-মূলক নিবন্ধ।

প্রবন্ধগুলির প্রধান গুণ, আকর্ষণীয় ঝরঝরে সাবলীল ভাষা। খটোমটো ভাষা কোথাও নেই, বরং তির্যক বাক্যবিন্যাস ও বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। দেখে শুনে মনে হলো, প্রবন্ধ শাখায় পূর্ব পাকিস্তান বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে।

প্রবন্ধগুলিতে শুভবোধ এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে সাহিত্যকে বিচার করার যে মনোভাব ফুটে উঠেছে, তা দেখে আমি আশ্চর্য হইনি। এটাই তো স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যিকের মনো-ভাবই এই রকম। ব্যতিক্রম দেখলে অবাক হতাম বরং। যারা ব্যতিক্রম, তারা কলম কণ্ডূয়ন করলেও, লেখক নয়। সব দেশেই ওরকম দু' চারজন থাকে—তাদের কথা দু' চার বছর বাদেই লোকে ভুলে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নিষ্পেষণ অত্যান্ত প্রত্যক্ষ—তাই ওখানকার লেখক-বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদও সোচ্চার এবং মর্মস্পর্শী। এখানে চলছে স্লো পয়জনিং—(যেমন রেডিওর একটি চ্যানেলে প্রায় সর্বক্ষণ নিম্নস্তরের হিন্দী গান) তাই প্রতিবাদের চেতনা জাগেনি। কিন্তু ভূমিকায় মৈত্রেয়ী দেবী দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসঙ্গ টেনেছেন, না টানলেও চলতো। লেখকরা দাঙ্গা বাধায় না, দাঙ্গা নিবারণের ক্ষমতাও তাঁদের নেই। দাঙ্গা যারা বাধায় ও ,করে, তারা কেউ বইটই পড়ারও ধার ধারে না—তারা হলো, কুপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যবসায়ী, দরিদ্র নিষ্পেষিত মানুষ ও রাজনৈতিক নেতা। কবির নির্দেশে সমাজ চলবে—এ প্রায় রিলকে কল্পিত পৃথিবীর মতনই স্বপ্নময়।

এবার আমার নিজের একটা কথা বলি। হিন্দু সংস্কৃতি, ইসলাম সংস্কৃতি, সাম্প্র-দায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ—এই সব কথাগুলো শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে। হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—এমন কিছু বাঙালী লেখকের কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করে। অর্থাৎ, একালে যে এক ধরনের মানুষ দেখা যায়—যাদের নাম ও পদবী শুনে হিন্দু মনে হতে পারে —কিন্তু যারা প্রায়শই প্যাণ্ট-শার্ট পরে, রামায়ণ-মহাভারত পড়ে নিছক কাব্য হিসেবে, যাদের আচার ব্যবহারে পৃথিবীর কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ছাপ নেই, যে-কোনো রকম খাদ্য জিভে ভালো লাগলেই খায়—যাদের লেখার মধ্যে কোনো রকম ধর্মের কথাবার্তাই নেই—এমনকি কোনো ধর্মকে আক্রমণ করারও প্রবৃত্তি নেই—এমন লেখক এখন,—পৃথিবীর সব দেশের মতন—পশ্চিম-বঙ্গেও আছেন। পূর্ব পাকিস্তানেও সে রকম লেখক কেউ কেউ আছেন—এরকম বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। তাঁদের কিছু কিছু লেখা পড়তে পারলে বেশ হতো।

সনাতন পাঠক

কবিতা
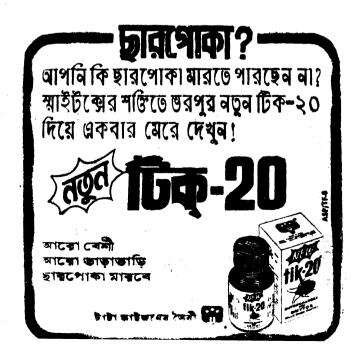
স্বদেশ, আমার স্বদেশ। কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত। শুকসারী প্রকাশক. ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-১৪। দাম আট টাকা।

"তাহলে তোমরা অন্ধকারে বসে আছ
কেন?
তাহলে তোমরা নিচু গলায় কথা
বলছ কেন?
এসো, তোমরা এই পথের উপর এসে
দাঁড়াও।
এসো, তোমরা এই রোদ্দুরে এসে
দাঁড়াও।
এসো, তোমরা এই হাওয়াকে একবার
ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে বলে
ওঠো—
মা আমার! মা আমার!"

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'নিজের মা' কবিতাটির উদ্ধৃতাংশ এই মুহূর্তের বাংলা দেশের বিপন্ন অস্তিত্ব ও বোধকে চূড়ান্তভাবে যেন বিম্বিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ চেতনার স্পষ্ট ও স্পর্শযোগ্য প্রকাশ ঘটেছে গত শতকের গোড়ার দিক থেকেই। সন্দেহ নেই যে. তৎকালিক রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসন এবং উৎপীড়নের সঙ্গে এই চেতনার উন্মেষের বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। আরও একটু এগিয়ে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বাগে এসে দেখি, দেশমাতৃকার বন্দনাগানে নতুন করে মুখরিত বঙ্গকবিকুল। (বাংলা দেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গান এই সময়েরই রচনা।) সাধারণভাবে জননী জন্মভূমিকে ভালবাসার কবিতা যেমন একদিকে, অন্যদিকে তেমনই বিশেষ যুগের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে বারবার কবিতা রচিত হয়েছে। তাই গত শতকের আরম্ভ থেকে এ-যাবৎকাল পর্যন্ত রচিত বাংলাদেশ-বিষয়ক কবিতাবলী অনুধাবন করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ তার রক্তমাংসের চালচিত্র নিয়ে এক জীবন্ত প্রতিমা রূপেই এর মধ্যে চিত্রিত। কবি কৃষ্ণ ধরকে ধন্যবাদ, 'স্বদেশ, আমার স্বদেশ' নামক সংকলনের দুই মলাটের মধ্যে তিনি এমন একটি ইতিহাসকে ধরে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। আজকের বাংলাদেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন নির্মমভাবে মুণ্ডহীন হয়ে পড়ছে, এমন একটি সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তখন নতুন তাৎপর্যে অন্বিত হবে, সন্দেহ নেই। এখন সত্যিই দরকার 'মা আমার! মা আমার!' বলে ভীষণভাবে হাওয়া-কাঁপানো চীৎকার। দ্বিজেন্দ্রলালও তো একই উত্তরণের আশ্বাস দিয়ে গেছেন:

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের
লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে
যখন—"আমার দেশ।"

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক বারবার পাল্টে যায়। কিন্তু লক্ষণীয় যে. বাংলা দেশকে বিষয় করে রচিত কবিতার ক্ষেত্রে ভাবনা কালোত্তীর্ণ, বক্তব্যের ক্ষেত্রে আশ্চর্য আত্মীয়তা এবং সাযুজ্য। 'বঙ্গবিভাগ' নিয়ে কতকাল আগে রজনীকান্ত সেন লিখেছেন:

"এদের একই ভাষা, একই রীতিনীতি
একই রুচি, একই স্বভাব, প্রাণে
এক প্রীতি
এরা একই ঘরে বসত করে রে,
এদের পরস্পরের দুঃখসুখ
সমান।

দুই সীমানা করলে কি হবে?
হাত বাঁধিবে, পা বাঁধিবে,
মন বাঁধিবে কে?"

এর পাশাপাশি অচিন্ত্যকুমারের 'পূর্ব-পশ্চিম' কবিতা :

"আমরা এক বৃন্তে দুই ফুল, এক
মাঠে দুই ফসল
আমাদের খাঁচার ভিতরে একই অচিন
পাখির আনাগোনা।...
আমাদের এক সুখ এক কান্না এক
পিপাসা,
ভূগোল-ইতিহাসে আমরা এক
এক মন এক মানুষ এক মাটি এক
মমতা।...
কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা,
আমাদের রক্তের কবিতা
আমাদের হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন?"

তরুণতর কবি সুনীলকুমার নন্দীর কণ্ঠেও একই সুর :

"দুই বুকে বয় একই আগুন, এক
আকাশের স্বপ্ন
উথাল-পাথাল, তালতমালে একই
মাটির রঙরূপ
এপার ওপার আছড়ে মরে, কাকতালীয়
দায়ভাগ
ভুলে নিয়ে পাপাপুণ্যে, উড়িয়ে
দিতে হবেই।"...

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট কণ্ঠেই উচ্চারণ করেছেন—

ঘর ভাগ হোক,
ভাগ হতে দেব না দেশটা, প্রাণটা!

বাংলা প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে অনন্য এক প্রতিমা নির্মাণ করেছেন জীবনানন্দ। তাঁর 'রূপসী বাংলা' যথার্থই এক অপরূপ বাংলার চিত্রণ, যেখানে কাঁঠাল পাতা ঝরে ভোরের বাতাসে, বকের ডানায় শালিখের সন্ধ্যা নামে, হিজল গাছ, খই রঙা হাঁস, কলমী দাম, কুয়াশা, ডুমুরের গাছে বসে থাকা দোয়েল, শিমুলের ডালে লক্ষ্মী পেঁচা, সোনালী ধান, বেহুলার উপাখ্যান, পুরাণকথার গন্ধ আরও নানা অদেখা অচেনা রহস্য। তিনি বলেন : "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর"। এবং তাই প্রার্থনা করেন :

"আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির
তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খ-
চিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই
কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব
এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর
ঘুঙুর রহিবে লাল পায়..."

ফিরে-আসতে চেয়েছেন দিনেশ দাশ এবং কবিতা সিংহও। দিনেশ দাশ লিখেছেন :

"বারে বারে যেন ফিরে আসি এই
বৃষ্টি সবুজ কোলে,
খেলা করি যেন তোমার চোখের

কবিতা সিংহ ঃ

"আবহমানের এক মাতৃকোল ক্ষুধিত বাঙালী
ফিরে এসে তোরই পায়ে মুখ ঘষড়াবো
বাংলা দেশ, বাংলা দেশ সর্বস্ব আমার।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দূরে গেলেও ভুলতে পারেন না বাংলাদেশের অনুষঙ্গঃ

"আমি যত দূরেই যাই
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকানো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা..."

উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করলে পুরো সংকলনটিই এরপর তুলে দিতে হয়। তাই সে চেষ্টা না করাই ভাল। আশা করা যায়, বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে সংকলনটি নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে। তবে দু-একটি প্রশ্ন করার আছে। প্রথমত, 'স্বদেশ, আমার স্বদেশ' নামকরণের ব্যাপক ব্যঞ্জনা বাংলাদেশ বিষয়ক কবিতা সংকলনের পক্ষে যথার্থ নয়। তাছাড়া, শুধু বাংলাদেশই যে বিষয় সে কথা বলি কেমন করে! সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতাটি তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা। এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সংকলিত 'কালপুরুষ' কবিতাগ্রন্থে ইতিপূর্বে মুদ্রিত। তৃতীয় আপত্তি বহু কবিতার তলায় ছাপা হয়েছে এবং তার উল্লেখও আছে। কিন্তু সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটল কেন? ১৯৭।৭০

নিজেকে পরাজিত বা বঞ্চিত ভাবতে পারছে না। তার জীবনের যেটা আসল চাওয়ার বস্তু—কলকাতায় যা সে খুঁজে পায়নি—সেই পাখির ডাক সে ফিরে পেয়েছে বাইরে গিয়ে। ছবির শেষে সিদ্ধার্থর কথা আমরা জানি তার পত্রের ভাষায়—কেয়াকে লেখা, নেপথ্যে উচ্চারিত। পত্রশেষের শুধু দুটি শব্দ আমাদের পাঠ্য—"ইতি সিদ্ধার্থ"; ছবি শেষ। ছবি শেষ করার চমৎকার টেকনিকটিই যে এখানে মুগ্ধ হয়ে দেখার মত তা নয়, এই মুহূর্তে অন্তরে গ্রহণ করার মত গভীর অনুভূতির স্পর্শও আছে। চলচ্চিত্রকার এখানে বুঝি মুহূর্তের জন্য দার্শনিক। সিদ্ধার্থ হোটেলের উপরে দাঁড়িয়ে, নীচে শবযাত্রার সঙ্গের কথাটি শোনা যাচ্ছে—রাম নাম সত্য হ্যায়। সকল যাত্রার, সব চাওয়া-পাওয়ার অমোঘ লক্ষ্যবস্তুটির কথাটিই কি সিদ্ধার্থের তখন মনে পড়েছে?

ছবির আরম্ভ ও শেষের অসাধারণ পদ্ধতি ছাড়াও সারা ছবিতেই প্রয়োগের বিচিত্র কর্ম ছড়িয়ে রয়েছে। সিদ্ধার্থর অতীতস্মৃতি মুহূর্তের মধ্যে জাম্প-কাট ফ্ল্যাশব্যাকে রূপ নিচ্ছে, সিদ্ধার্থ যা করলেও করতে পারত অথচ করছে না (বোনের 'বস'কে খতম করা) তাও ঝটিতি ভয়ঙ্কর শব্দে ও দৃশ্যে দেখানো হয়েছে দর্শককে। ছবিতে দেখবার মত এত বস্তু আছে যার তালিকা তৈরি করে লাভ নেই। সেসব দেখবার জন্য দর্শককে প্রতি মুহূর্তে সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে, কান খোলা রাখতে হবে; কারণ এমন দ্রুতগতির ছবি এর আগে সত্যজিৎবাবু তৈরি করেননি, এ যেন একালের জীবনের প্রচণ্ড বেগেরই দ্যোতক। গতির দ্যোতনা ছবির দৃশ্যে দৃশ্যে, ক্যামেরার অনুসন্ধানের বস্তু কলকাতার পথে-ঘাটে। পরিচালক এ ছবি তৈরি করার সময় নুভেল ভাগ পরিচালকদের মতই ক্যামেরা নিয়ে কলকাতার রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন—রেস্তোরাঁয়, চলন্ত বাসে, দোকানে ছবি তুলেছেন। কিন্তু নুভেল ভাগের মানদণ্ডে "প্রতিদ্বন্দ্বী"-র

বিচার করলে ছবিটিকে খর্ব করা হয়, নভেল ভাগের বাহ্যিক বহুবর্ণ খোলস ছাড়িয়ে "প্রতিদ্বন্দ্বী" ভিতরের বস্তুকে অন্বেষণ করেছে। সত্যজিৎবাবুর এই বিশেষ এক্সপেরিমেণ্ট-এ মিউজিক—বিশেষ করে এফেক্ট মিউজিক বা ধ্বনির ভূমিকা অনেক বড়। যে-কোন মুহূর্তের যে-কোন শব্দ অর্থপূর্ণ—একালের জীবনের সঙ্গে ঐকতান সৃষ্টি করেছে। সংগীত পরিচালক হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের এক বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চিহ্নিত এই ছবি। ক্যামেরার ভূমিকাও সামান্য নয়—সেটা অসম্ভব দক্ষতায় পালন করেছেন সৌমেন্দু রায়। আলাদা করে কোন্ দৃশ্যের কথা বলব, প্রতি দৃশ্যেরই মুড, গল্পের মুড অদ্ভুতভাবে ক্যামেরায় রক্ষিত। এ দেশের ছবিতে ক্যামেরার এমন উঁচুদরের কাজ দেখা যায় না। এডিটিংয়ের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ (দুলাল দত্ত-কৃত)। ছবির গতি এবং নানা ধরনের শট কোন কিছুই সম্ভব হত না যদি এডিটিং নিখুঁত না হত।

ক্যামেরা, সাউণ্ড এবং এডিটিং—এই তিনের প্রকৃত সম্ব্যবহার সত্যজিৎবাবুর জানা আছে বলেই কয়েকটি ফ্যাণ্টাসি বা স্বপ্ন-দৃশ্যের ভিতর দিয়ে সিদ্ধার্থর ভয়, ভাবনা আতঙ্ক এবং এক কথায় তার অবচেতনের এমন অপূর্ব বিশ্লেষণ দেখা গেল। ওই দৃশ্যগুলি (ফরাসী বিপ্লবের সমকালে ফাঁসি, টেবিলে গুলিবিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি) হয়ত আপাতকঠোর, বেশি নির্মম। এত বড় দুঃস্বপ্নের হয়ত দরকার ছিল না, যদিও অবচেতনের আতঙ্কের কোন লজিক নেই। কিন্তু নায়কের মানসিকতাকে জানবার দিক থেকে এই স্বপ্নদৃশ্যের মূল্য অনেক। এই দৃশ্যগুলিতে যেমন মনোজগৎসংক্রান্ত তেমনি পরিচালকের ক্যামেরা শহরের বুকে বস্তু-জগতের এমন অনেক কিছু দেখিয়েছে যার মধ্য দিয়ে আজকের জীবনধারার এবং শহুরে প্রকৃতির চিহ্নগুলি একের পর এক ফুটে উঠেছে—তা বাসের ভিড়েই হোক, কিংবা ফুটপাথে। সত্যজিৎবাবুর ছবিতে প্রচ্ছন্ন হিউমার থাকে—এখানে যেমন একজন হিপি ডাক্তারের স্টেথেসকোপ দিয়ে করতালের আওয়াজ শুনছে, কিংবা গরু দেখে একজন হিপির "হাও ডিলাইটফুল" বলে চেঁচিয়ে ওঠা। অন্য দিকে, রাস্তা পার হওয়ার সময় এক যুবতীকে দেখে কিংবা কেয়ার মাসির মাথা ধরার বড়ি খাওয়ার সময় সিদ্ধার্থর একদা মেডিকেল কলেজে শেখা বিষয় স্মরণ করার মধ্যেও হিউমার আছে। তবে সিদ্ধার্থর ক্ষেত্রে হিউমারই সব নয়। অর্থাৎ, আগে যা বলেছি, সত্যজিৎবাবু অভাবনীয় সব প্রয়োগরীতির মধ্য দিয়ে ভিতরের ও বাইরের সম্পূর্ণ মানুষটাকে—তাঁর নায়ককে—আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। সিদ্ধার্থ যে যখন-তখন মেডিকেল কলেজের সচিত্র লেকচার স্মরণ করেছে

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" (পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়) ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও শমিতা বিশ্বাস ফটো—দেশ

তাতে হিউমার যত নয় তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে তার আশাভঙ্গের অথবা বড় হতে না পারার ব্যথা। সিদ্ধার্থর উষ্মা, বিরক্তি ও কল্পনাপ্রবণতার পুরো পরিচয়টা যে আমরা পেলাম তাতে যেমন পরিচালকের অসামান্য প্রয়োগ কৃতিত্ব, তেমনি ওই চরিত্রে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের গুণের কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই নবাগত অভিনেতা ফিল্মে একটি চরিত্র হয়ে ওঠার এবং তার সঙ্গে ওই চরিত্রের জটিল প্রতিক্রিয়া ও পরস্পর বিরোধী ভাবনা প্রকাশের এমন স্বচ্ছন্দ ক্ষমতা পেলেন কী করে? সত্যি কথা, চরিত্রটির অনেক দিক পরিচালকই দেখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার শক্তিও তো সামান্য নয়। আত্মসর্বস্ব সুতপাকেও পরিচালক সামান্য ঘটনায়, ইঙ্গিতে, আভাসে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। বিলাতি নাচ শেখার পর সে যে ছন্দে দাদাকে নাচ দেখাচ্ছে তাও যেন উচ্চাশার তালে তালে নেচে যাওয়া। সুতপা, কেয়া, আদিনাথ ও টুনু পরিচালকেরই সৃষ্টি, অর্থাৎ অল্প অবকাশে সম্পূর্ণ চরিত্র প্রতিষ্ঠা পরিচালকই করেছেন। কিন্তু ওইটুকু অস্তিত্বের মধ্যে যে শিল্পীরা—যথাক্রমে কৃষ্ণা বসু, জয়শ্রী রায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ও দেবরাজ রায়—নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন সেটা কম কথা নয়। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়কে তো আগেও ফিল্মে দেখেছি, এত স্বাভাবিক তাঁকে আগে কখনও দেখিনি। স্বাভাবিক প্রত্যেক শিল্পীই, প্রত্যেকেই এক একটি চরিত্র—যেমন, ভাস্কর চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী, শোভেন লাহিড়ি, শেফালি, ধারা রায়, পিসু মজুমদার, মমতা চট্টোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যে শিল্পীদের স্বাভাবিক মনে হয় সেটা অনেকটা সংলাপের গুণে। আমরা বাস্তবে যেমন কথা বলি, রায়ের ছবির সংলাপও তেমনি—কেতাবি নয়। যেমন, কেয়ার বাবার কথাগুলি—সংলাপটাই সুন্দর তা নয়, এর মধ্য দিয়ে অস্থির তরুণদের ক্রিয়াকলাপে আগের জেনারেশনের প্রতিক্রিয়াও সত্যজিৎবাবু দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্য দিকে সিদ্ধার্থ ও কেয়ার এমন সুন্দর অনুরাগের সম্পর্ক যে দেখানো হল তাতেও ফিল্মী প্রেমের কথা নেই, যা আছে রোমান্টিসিজমের স্বপ্ন ওরা। তা অতি সহজ, সরল—অনুরাগের প্রকাশ যেসব কথায় তাও কৃত্রিম মনে হয় না। ছবিতে সিদ্ধার্থর কথা এমনিতেই কম, ভাবনা বেশি। তার ভাবনাগুলির প্রকাশ বিশেষ করে সত্যজিৎবাবু ভিস্যুয়াল ক্রিয়াকর্মে, যার ভিতর দিয়ে কল্পনাবিলাসী সিদ্ধার্থর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই—যে সিদ্ধার্থ দুঃসহ নাগরিক জীবনে অতিষ্ঠ, যার মন অতীতের পাখির ডাক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য উন্মুখ। সিদ্ধার্থর ভাবুকতা বা চাপা উষ্মা বা "অ্যাংরি মুড" কি অপুকে মনে করিয়ে দেয়? ঠিক, তবু সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থই। সে এ যুগের বিক্ষুব্ধ ও আপসহীন (যে চাকুরির ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে অপমানের জ্বালায় অফিস লণ্ডভণ্ড করে) তরুণের খাঁটি প্রতিনিধি, নিম্ন মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ অথবা "মিডল ক্লাস মর‍্যালস"-এর প্রতীক—তার এই আসল পরিচয় মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। সিদ্ধার্থর এই প্রকৃত পরিচয় দিতে গিয়ে আপসহীন পরিচালক নগরজীবনের নির্দয়তা, পাপ ও প্রলোভনের সব দিকগুলি দেখিয়েছেন (অধিকাংশই সিদ্ধার্থর চোখ দিয়ে)। শহরজীবনের রূঢ়তা এবং মধ্যবিত্ত জীবনধারার যাতনার সঙ্গে

ফ্ল্যাশব্যাকে নিরুপমাদেবী ও সিদ্ধার্থর ছোটবেলার টুকরো টুকরো মধুর ঘটনাগুলি যে দেখানো হয়েছে সেগুলিকে নিছক লিরিক বা রুমান্টিসিস্ট রচনা হিসাবে দেখতে গেলে ভুল হবে। অতীত ঘটনার ফ্লাশব্যাক অনিবার্যভাবে এসেছে নায়কের মানসিক রূপ উন্মোচনের তাগিদে। সেদিক থেকে "প্রতিদ্বন্দ্বী" ছবিতেও মানবসম্বন্ধ এবং নরনারীর মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনের অন্তর্মুখী অনুশীলন সমানশক্তিতে বিদ্যমান—সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে বিদেশের সমালোচকরা এতকাল ধরে যা দেখে বিস্মিত। অন্যদিকে "প্রতিদ্বন্দ্বী" সমসাময়িক জীবন ও সমস্যার এক জ্বলন্ত, মহৎ ছবি—কী কথাবস্তুর বিন্যাসে, কী সিনেম্যাটিক প্রয়োগে। এই কারণে মনে হয় "প্রতিদ্বন্দ্বী" সত্যজিৎ রায়ের চিত্রতালিকায় বুঝি সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সংঘাত

পঙ্কজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় শঙ্কর মুভিজ-এর 'সংঘাত' ছবির মহরত হয়েছে গত ১৮ অক্টোবর টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। সংগীত পরিচালক শান্তিনাথ গাঙ্গুলি। সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, কমল মিত্র, জহর রায়, ছায়া দেবী, হরিধন, অনুভা, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ শিল্পীরা এ ছবিতে অভিনয় করবেন বলে জানানো হয়েছে।

বোম্বাই বিচিত্রা

আজ থেকে কয়েক বছর আগেও হরিহর মানে সঞ্জীবকুমার ইনসমনিয়ায় ভুগতো। এখন সে ঘুমোবার সময় পায় না। সেদিন ফিল্মিস্থান স্টুডিওয় সঞ্জীবের শুটিং দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা। আটটায় নাগাদ সঞ্জীব পৌঁছোলো। ওর চোখের পলক ধরে ঝুলে রয়েছে ঘুম! শুটিং করতে হবে সুতরাং চোখের পাতায় ঘুমকে বসতে দিচ্ছে না সঞ্জীব। পাশের রেকর্ডিং থিয়েটারে "এক থী রীতা"র ডাবিং হচ্ছে। সেখানে তনুজা এবং আই এস জোহর ডাবিং করছেন। ঘুমের হাত থেকে রেহাই পেতে সঞ্জীব সেখানে ঢুকে পড়ল। তনুজা জিগেস করলো : "কি রে হরি, তোর শুটিং নেই?" সঞ্জীব উত্তর দিলো, "আছে, তবে এখনো নায়িকা এসে পৌঁছোয়নি, তাই মেকাপ করতে যাচ্ছি না।" চুপি চুপি বললো "মেকাপ রুমে চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ব, আজ চার দিন ঘুমোতে পারিনি, রোজ তিন সিফট করে শুটিং করছি।" আই এস জোহর কান খাড়া করে ওদের কথা শুনেছিলেন, বললেন, "এখন যে ছবির শুটিং করবে তাতে ঘুমোবার সীন নেই?" মৃদু হেসে সঞ্জীব জবাব দিল, "আমাদের ছবির নায়করা কি ঘুমোবার সময় পায়, হিন্দী ছবিতে ঘুম মানেই তো কমিক সীন, নাক ডাকা। অন্য কোন ঘুমোবার সীন মানেই বেডরুম-সেকস, সেখানে ঘুম নেই। সত্যি সত্যি ঘুমোবার সীন সেরা বলে হিন্দী ছবিতে থাকে না।" জোহর বললেন, "তুমি চাইলেই থাকবে!" সবাই হেসে উঠলো। এমন সময় একজন প্রোডাকসন বয় এসে খবর দিল যে সঞ্জীবের শুটিং ক্যানসেল, নায়িকা আসছেন না, তাঁর শরীর খারাপ। সঞ্জীব বাচ্চা ছেলের মত খুশী হল। তারপর ধপ করে বসে পড়লো নরম সোফায়। জোহর সাহেব গল্প ফাঁদলেন। সঞ্জীব চোখ বুজে গল্প শোনার অছিলায় ঘুমোতে লাগলো। "এক থী রীতা"র ডাবিং হতে লাগলো। ভাগ্যিস সঞ্জীবের নাক ডাকে না। ডাকলে সঞ্জীবের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন পরিচালক রূপ কে শোরী।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে ডাবিং শেষ হোল। সঞ্জীবের কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঠিক হোল সঞ্জীবকে চ্যাংদোলা করে ঘুমন্ত অবস্থাতেই গাড়িতে তোলা হবে। আইডিয়াটা শ্রীজোহরের। কিন্তু সঞ্জীবকে ছুঁতেই সে জেগে গেল এবং চোখ খুলেই বললো, "ইয়েস স্যার, রেডি ফর টেক"—হো হো করে হেসে উঠলো সবাই। জোহর

চাপা গলায় বললেন, "বেচারা!" কয়েক গজ ঝাঁ ঝাঁ রোদের রাস্তা পার হয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইম্পালায় ওঠা গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিল্মিস্থান স্টুডিও পিছিয়ে যেতে লাগলো ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে। শ্রীজোহর বললেন, "আর কয়েকদিনের মধ্যে, তোমাদের যাতে তিন সিফট করে কাজ করতে না হয় তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই তোমরা ঘুমোবার সময় পাবে।" শ্রীজোহরের কথা শুনে নায়ক সঞ্জীবকুমার চোখ মেলে নড়েচড়ে বসলো। শ্রীজোহরের কথা শুনে জানা গেল যে, হিন্দী ছবির নায়ক-নায়িকারা একসঙ্গে ছটির বেশী ছবিতে কাজ করতে পারবেন না এরকম একটি আইন পাস করা হচ্ছে। সমস্ত কথা শুনে "বাঁচে গেছি" বলে আবার চোখ বুজল সঞ্জীব। তনুজা বললো, "আইন যারা মানবে না তাদের ফাইন করার অধিকার আছে তো আপনাদের?" ইম্পার প্রেসিডেন্ট শ্রীজোহর নিঃশব্দে স্বরে বললেন, "হ্যাঁ।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ সৌজন্যের জন্য করে জোহরকে জিজ্ঞেস করলাম, "আজকাল নিজে ছবি করছেন না কেন?" উত্তরে জোহর বললেন, "অনেকদিন বোকা ছিলাম অতদিন ছবি করেছি, এখন বুদ্ধিমান হয়ে গেছি, তাই শুধু অ্যাকটিং করছি আর দেখছি।" বললাম, "তার মানে এখনো যাঁরা ছবি করছেন আপনি কি তাঁদের বোকা বলছেন?" ছোট্ট কথায় উত্তর দিলেন জোহর, "হ্যাঁ।" তারপর একটু ব্যাখ্যা করলেন, "তারা শুধু বোকা নয় অন্যোপায়।" জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু একথা কেন বলছেন?" তাতে তিনি বললেন, "কারণ ভারত নামক দেশের প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নেই, আঞ্চলিকতার ভবিষ্যৎ কিছু থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু পুরো ভারতের ভবিষ্যৎ ফটোগ্রাফারের ডার্করুমের মত অন্ধকার।" বললাম, "তার মানে সেখানে কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, ঐ ডার্করুম থেকে একদিন ভারত নিশ্চয়ই বেরুবে।" একটু হেসে জোহর বললেন, "আপনি টিপিক্যাল দেশী লোক, সেজন্যে এত হতাশার মধ্যেও আশাবাদী, কিন্তু আমার ওসব ভড়ং নেই। যে দেশ দারিদ্র্য নিয়ে বড়াই করে, কেঁদে এবং কান্না দেখে আনন্দ পায়, দুঃখবিলাস যে দেশের জন্ম-জন্মান্তরের দর্শন, যে দেশে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য ভ্যারাইটি এন্টারটেনমেন্ট করতে হয়, যে দেশের ছবিতে সরকারী কর্মচারী বা মন্ত্রীদের কর্যাপশন নিয়ে আলোচনা করা যায় না, যে দেশের জনতার নেতারা রোজগার করে অথচ ইনকামট্যাকস দেয় না, যে দেশ এক যুগ ধরে স্মল কার ম্যানুফ্যাকচার করার কথা জানে অথচ করতে পারে না, যে দেশে ভ্রাই এলাকায় সবচেয়ে বেশী লোক মাতাল, যে দেশ ধর্মনিরপেক্ষ, জাতিভেদে অবিশ্বাসী, তবু ধর্ম ছাড়া ইলেকশন লড়ে না, আর সিডিউল কাস্টদের জন্য সব জায়গায় বিশেষ বন্দোবস্ত রাখে, সে দেশে বুদ্ধিমান লোক যদি ছবি করতে নামে তাহলে তা ছবি হবে না, হবে তাই—যা আমি এতদিন করেছি। আই হেট অল মাই ফিল্মস।" সঞ্জীব ঘুমিয়ে পড়েছে। তনুজা রেডিও টিউন করছে। গাড়ি তখন আমার বাড়ির দরজায়। "আচ্ছা চলি" বলে নেমে পড়লাম। গাড়ি চলে গেল।

সরল শর্মা

'মস্তানা' (পরিচালনা : এ সুব্বা রাও) ছবিতে মেহমুদ ও পদ্মিনী

প্রতিবাদ

বিশ্বজিৎ নিবেদিত আর্ট মুভিজের 'প্রতিবাদ' ছবিটি রাধা, পূর্ণ এবং অন্যত্র অচিরেই মুক্তি পাবে। এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলি। পরিচালক তপেশ্বর প্রসাদ এবং সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলি, সুলতা চৌধুরী, তরুণকুমার প্রভৃতি।

অপর্ণা

সরকার প্রোডাকসন্সের 'অপর্ণা' ছবির শুটিং গত ২৬ অকটোবর থেকে শুরু হয়েছে। জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' ৩য় পর্ব অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। পরিচালক রথীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন তনুজা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, অরুণ মুখোপাধ্যায় গীতা দে, গীতা নাগ, রতন চট্টোপাধ্যায়, মিণ্টু চক্রবর্তী, শ্রীমান অরিন্দম প্রভৃতি।

যোগেশ দত্তর মূকাভিনয়

আমাদের দেশে মূকাভিনয় শিল্পের বর্তমান জনপ্রিয়তার পিছনে শ্রীযোগেশ দত্তর অবদান যে অনেকখানি সে-কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। স্বীয় প্রচেষ্টায় শ্রীদত্ত মূকাভিনয়ে যে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছেন সেই কথাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গত ২৫ অক্টোবর পদাবলী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত আড়াই ঘণ্টাব্যাপী এক অনুষ্ঠানে তাঁর বিখ্যাত মূকাভিনয়ের ৮টি বিষয় প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানটি যে দর্শকদের বিশেষ ভাল লেগেছে প্রেক্ষাগৃহে মুহুর্মুহু করতালিই তার প্রমাণ।

'ওয়াকিং', 'এ বাস প্যাসেঞ্জার অফ ক্যালকাটা', 'এ থিফ', 'ফোটোগ্রাফার', 'সীতা অ্যান্ড হনুমান', 'সোসাইটি লেডি',

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত

অরণ্যদেব ☆ লী ফক

লোকটা ভণ্ড। দেবদূত হলে ওর শরীর থেকে নিশ্চয়ই রক্ত বেরুত না। রক্ত-মাংসের মানুষ ছাড়া ও আর কিছুই নয়!
মারো ওকে!

দাঁড়াও। আমাদের মা-মেয়ে ওঁকে মারতে পারবে না।

গা দিয়ে রক্ত ঝরছে! মারো, মারো ওকে!
দাঁড়াও, যা করবার আমিই করছি।

হ্যাঁ, আমার শরীরে রক্ত আছে। কিন্তু দেবদূতের শরীরে যে রক্ত নেই, তা তোমরা জানলে কী করে? এর আগে কি আর কখনো দেবদূত দেখেছ?
???

সবাই বিভ্রান্ত। সেই সুযোগে পিস্তল বার করে নিলেন অরণ্যদেব। অব্যর্থ তাঁর নিশানা!
!!

আর তারপরেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সোনালী সেনাদের উপরে.....
!!!
5/15

মার খেয়ে চোখে সর্ষের ফুল দেখতে লাগল সবাই!

মুহূর্তে সব ঠাণ্ডা!
কী? আরও মার খেতে চাও?

এ-কাজ একমাত্র দেবদূতের পক্ষেই সম্ভব।
১৪

উচ্চতম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনে অদল-বদল এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। গত ২৮ অকটোবর রাজভবনের এক প্রেস নোটে ঘোষণা করা হয় যে পোরট কমিশনারস-এর বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্তকে রাজ্য সরকারের চিফ সেকরেটারি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমান চিফ সেকরেটারি শ্রীসুকুমার মল্লিককে শ্রীকরুণাকেতন সেনের পরিবর্তে রাজ্যপালের অন্যতম উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। শ্রী সেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়েরও উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রীকরুণাকেতন সেনের হাতে ভূমি, ভূমিরাজস্ব এবং শিক্ষা সংক্রান্ত দফতর ছিল। শ্রীসুকুমার মল্লিক যখন ওই উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করবেন তখন তাঁর হাতে শুধু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরই থাকবে। শিক্ষা সংক্রান্ত দফতরটি রাজ্যপালের নিজের হাতে থাকবে। বর্তমানে কোল কমিশনার শ্রীকে কে রায়কে শ্রীসেনগুপ্তের শূন্য পদে পোরট কমিশনারস-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার কথা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে। কলকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার পর্যায়ের কয়েকজন অফিসারকেও বদলি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিসের কাজ আরও জোরদার করার জন্য নাকি এই ব্যবস্থা। কেন্দ্রের ধারণা গত সাত মাসে রাষ্ট্রপতির শাসনে প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নতি তো হয়ই নি বরং অবনতি ঘটেছে।

দেশী সংবাদ

২৬ অকটোবর—আজ মহাকরণে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের সভাপতিত্বে জেলা শাসক ও পুলিস সুপারদের এক বৈঠকে রাজ্যের আইন শৃংখলার পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য নিবারক নিরোধ আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই একমত হন। রাজ্যপাল বৈঠকের মতানুসারে নিবারক-নিরোধ বা আটক আইনের জন্য কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানাবেন।

আজ রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মূর্তির শিরচ্ছেদ করা হয়। এক অকটোবরের পর বিদ্যাসাগরের মূর্তির এই দ্বিতীয় লাঞ্ছনা। সোমবারের এই ঘটনার জন্য কারা দায়ী তা পুলিস বলতে পারেন না।

২৭ অকটোবর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মনে করেন যে, ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎকারের ঘটনাই চীনের মনোভাবের পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ। তবে সেই সঙ্গে তিনি বলেন, আমি জানি না যে, দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হওয়াটাই চীনের সঙ্গে মীমাংসার পক্ষে যথেষ্ট কিনা।

আজ সন্ধ্যায় দুর্গাপুরে পনের মিনিটের ব্যবধানে দুইটি পৃথক ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর দুইজন লোক এবং রাজ্য পুলিসের একজন কনস্টেবল ছুরিকাহত হন। এ সম্পর্কে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

২৮ অকটোবর—রাশিয়া কেবলমাত্র পছন্দ মত ভারতীয় এজেনটদের মারফত ভারতে মাল রফতানি করছে এবং কমিশন বাবদ যে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে শ্রীতারকেশ্বরী সিংহ সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়েছেন তৎসম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আদি কংগ্রেস সভাপতি বলেন—রাশিয়া থেকে যেভাবে ভারতে অর্থ আসছে তৎসম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত।

সি পি আই-এর একজন নেতা আজ আট পার্টির বৈঠকে মন্তব্য করেন যে, লোকসভার আগামী অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করতে পারেন।

২৯ অকটোবর—১৯৬২ সালে ভারত চীন সংঘর্ষের সময় ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কিছু তথ্য লনডন টাইমস-এর সংবাদদাতা শ্রীনেভিল ম্যাকসওয়েলের হস্তগত হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, জানা গিয়েছে প্রতিরক্ষা দফতর সে সম্পর্কে গোপন তদন্ত করছেন।

পূজোর শেষ রাত থেকে বৃহস্পতিবার কালী পূজোর রাত পর্যন্ত 'সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীদের' মোকাবিলায় কলকাতা পুলিস টালিগঞ্জ, শ্যামপুকুর, বেলেঘাটা, মানিকতলা, বালিগঞ্জ ও চিৎপুরে ছয় জায়গায় গুলি চালায়। এর ফলে ৬ জন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়।

৩০ অকটোবর—ভারতের বহির্বিষয়ক সচিব শ্রী টি এন কল রাশিয়া থেকে ফিরে এসে দিল্লীতে বলেছেন যে, রাশিয়ার উপরাষ্ট্রমন্ত্রী মসকোতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন—পাকিস্তানকে আরও অস্ত্র সাহায্যের কোন প্রতিশ্রুতি রাশিয়া দেয়নি এবং তাদের সে বাসনাও নেই।

বিহারে পাকচক্রের রাজনৈতিক সংকট কেটেছে। এই সংকটের ফলে দারোগা রাই মন্ত্রিসভার পতন ঘটার উপক্রম হয়েছিল। নব কংগ্রেস আইনসভা দলের বিক্ষুব্ধরা—যাঁরা দলের নেতৃত্বের পরিবর্তন চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মত পার্থক্য ঘুচিয়ে ফেলতে রাজি হয়েছেন।

৩১ অকটোবর—কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলায় নিবারক নিরোধ আইন পুনঃ-প্রবর্তনের প্রস্তাবটি পশ্চিম বাংলা সংক্রান্ত সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। পশ্চিম বাংলা কমিটির বৈঠক বসবে আগামী ১৭ নবেম্বর।

৩৪ দিন পরে আজ রাতের শিফট থেকে দুর্গাপুর ইসপাত কারখানার স্টিল মেলটিং শপ-এ কাজ শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর ইসপাত কারখানা কর্তৃপক্ষ ও আই এন টি ইউ সি নিয়ন্ত্রিত হিন্দুস্থান স্টিল ওয়ারকারস ইউনিয়নের মধ্যে এক চুক্তি হয়েছে। ওই চুক্তির পরেই ওয়ারকারসদের ইউনিয়ন তাদের প্রভাবাধীন কর্মীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন।

১ নবেম্বর—শনিবার রাত থেকে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতকারীদের মোকাবিলায় কলকাতা পুলিস কড়েয়া, জোড়াবাগান, বহুবাজার থানা এলাকায় ছ' জায়গায় মোট ১৭ রাউনড গুলি চালায়। ফলে দুজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আরও অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগাপ্রসাদ রাই তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে রক্ষার জন্য দ্বিমুখী অভিযান শুরু করেছেন বলে জানা গিয়েছে। একদিকে তিনি কোয়ালিশনে বিক্ষুব্ধদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছেন, আর একই সঙ্গে তিনি তাঁর পক্ষে জনতা দলের সমর্থন লাভের চেষ্টাও করছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৬ অকটোবর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ জেনিভা থেকে কায়রো এলে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। পরলোকগত প্রেসিডেনট নাসেরের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাবার ও তাঁর উত্তরাধিকারী প্রেসিডেনট আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে আলোচনার জন্যই শ্রীমতী গান্ধী কায়রো এসেছেন।

২৭ অকটোবর—এ বছর পদার্থ বিজ্ঞানে দুজনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এঁদের একজন হচ্ছেন ফ্রান্সের লুই নীল ও অন্যজন সুইডেনের হ্যানস আলফভেন। দুজনেই অধ্যাপক। নোবেল পুরস্কারের মোট টাকাটা (প্রায় ৬ লক্ষ) এঁদের দুজনার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।

২৮ অকটোবর—পাকিস্তান অবজারভার আজ বলেন গত ২২ অকটোবর পদ্মা নদীতে একটি লঞ্চ উলটে যাওয়ার ফলে শতাধিক যাত্রী জলমগ্ন হন। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন স্ত্রীলোক ও শিশু। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারের দিক থেকে কোন সমর্থন মেলেনি।

২৯ অকটোবর—জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাতো এই নিয়ে চতুর্থবার জাপানের শাসক দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পুরোপুরি ৮ বছর কাজ করবেন। আধুনিক জাপানের ইতিহাসে এটা হবে অভূতপূর্ব ঘটনা।

৩০ অকটোবর—প্রেসিডেনট হওয়ার পর নিকসন ক্যালিফোর্নিয়ায় গত রাতে তাঁর বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় রকমের বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। প্রায় ৯০০ যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভকারী গতকাল প্রেসিডেনটের মোটর লক্ষ্য করে ডিম, ইট ও বোতল ছোড়ে। প্রেসিডেনট এখানে এক সভাগৃহে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন।

৩১ অকটোবর—ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের মূলধন উন্নয়ন তহবিলে ১০৫ লক্ষ ডলার চাঁদা দিয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ওই তহবিলের মোট অর্থের পরিমাণ বর্তমানে ২৭ লক্ষ ডলার। এর মধ্যে ভারতের চাঁদা হচ্ছে ১০ লক্ষ ডলার।

১ নবেম্বর—আজ করাচি বিমানবন্দরে বিমান যাত্রীদের লটবহর বইবার একখানি লরি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর এসে পড়ে তাদের উপর দিয়ে চলে যায়। ফলে পোল্যানডের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিগফ্রিড ওলনিয়াক ও অন্য তিনজন নিহত হন। অল্পের জন্য পোল্যানডের প্রেসিডেনট মারিয়ান স্পাইকালস্কি বেঁচে যান। বিমানবন্দরের অফিসারদের উক্তি অনুযায়ী ওই লরির চালক 'কমিউনিসটদের যমের বাড়ি পাঠাও' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে লরি নিয়ে একেবারে সম্বর্ধনা জানানোর জায়গায় গিয়ে ঢুকে পড়ে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীমদন সরকার

ঠোঁটেতে পেয়ালা জোটে, কি না জোটে—
না আঁচালে নাই বিশ্বাস মোটে !

অঘটন ঘটে। বাচ্ছার হাত থেকে দুধ পড়ে যায়। দুধের বোতল ভেঙে যায়। দুধ উতলে পড়ে। দুধ টকে যায়। দুধ পুড়ে যায়। দুধের গাড়ী খারাপ হয়ে যায়। বেড়ালে দুধ খেয়ে ফেলে।

কিন্তু হাতের কাছে আমূল মিল্ক পাউডার থাকলে ভাল দুধের কখনও অভাব হয় না

যে দুধ প্রতি দিন না হ'লেই নয়—তা নিয়ে কেন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাবেন কেন? আমূল মিল্ক পাউডার থেকে সব সময় ভাল, স্বাস্থ্যকর দুধ পাবেন—এ একেবারে সুনিশ্চিত। চা, কফি, পানীয় ও খাদ্য—সবেতেই ব্যবহার করতে পারেন। এর ব্যবহার যেমন সহজ, তেমনি চমৎকার এর গুণ। অসময়ে হঠাৎ দরকার পড়লে কিনে আনার চেয়ে, এখনি একটিন এনে—সব সময় হাতের কাছে রেখে দিন।

আমূল মিল্ক সহজে মেশে

১০ টেবিলচামচ আমূল মিল্ক পাউডার-এ একটু অল্প-গরম জল মিশিয়ে, ফেটিয়ে মোলায়েম লেই-এর মত করুন। তারপর গরম জল মিশিয়ে ১ লিটার দুধ করে নিন। এক কাপ দুধের জন্য ২-১/২ টেবিলচামচ আমূল মিল্ক পাউডার ব্যবহার করবেন।

জমাট ননীর মত দৈ তৈরী করুন

আমূল মিল্ক পাউডার-এ তৈরী দুধ, গরম করুন। ফুটে উঠলে, নামিয়ে ঠাণ্ডা হ'তে দিন। অল্প গরম থাকতে থাকতে ১/২ বা ১ চায়ের চামচ জাম দৈ মেশান। দই বসতে দিন।

মিষ্টি আর পুডিং-এর মেলা

হালুয়া, ক্ষীর, মিল্ক শেক, গোলাপজাম, কেক, চকোলেট ফাজ, পুডিং, কাস্টার্ড আর আপনার পছন্দমত যাবতীয় মিষ্টি তৈরী করুন — আমূল মিল্ক পাউডার থেকে। এর খরচও তেমনি কম। জল মিশিয়ে দুধ তৈরী করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন কিম্বা সোজাসুজি পাউডার মিশিয়ে—যেমন, কেক, প্যানকেক আর গোলাপজামে। কাস্টার্ডে দু' এক চামচ মিশিয়ে দেখুন, কেমন চমৎকার, ননীর মত সুস্বাদু খেতে হয়।

বাড়ীতে **আমূল** মিল্ক পাউডার থাকা
আর গোরুমোষ থাকা প্রায় সমান,

ASP/AMP-6

খেটে খাই - ষোল-আনা তৃপ্তি চাই!
SCISSORS
Diamond Jubilee
MADE IN INDIA
সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা
সর্বাধিক দাম
৫৮ পয়সায় ১০টি

5911-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২
শনিবার ২৮ কার্তিক ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮০৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়
বার্ষিক ... ২৫.০০
ষান্মাসিক ... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ... ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষান্মাসিক ,, ... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক ,, ... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষান্মাসিক ,, ... ১৫.০০
ত্রৈমাসিক ,, ... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক ... ৫২.০০
ষান্মাসিক ,, ... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,, ... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... ৩৯.০০
ষান্মাসিক ... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক ... ১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 14 Nov., 1970

সন্ত্রাসের মধ্যে

কলকাতা শহর এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় এখন যে অবস্থা চলছে তাকে অনায়াসেই সন্ত্রাসের রাজত্ব বলা যায়। এই রাজত্ব আজই হঠাৎ শুরু হয়ে যায় নি, আগে থেকে শুরু হয়ে যুক্তফ্রন্টের অশেষ কৃপায় তা বেশ পাকাপোক্ত হয়ে যায়। মানুষ মারার খেলাটাকে একরকম এ'রাই জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তারপর ফ্রন্ট গেল, রাষ্ট্রপতির শাসন এল, কিন্তু সেই হত্যা-লীলার অবসান ঘটল না। বরং এখন তা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে এসেছে; খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রোজই কিছু নৃশংস হত্যার বিবরণ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আমাদের প্রাতঃকালেই পাঠ করে নিতে হচ্ছে। সাধারণ, শান্তিপ্রিয়, সামাজিক মানুষের এখন এইমাত্র প্রশ্ন, এটা থামবে? না চলবে? অথবা আরও ভয়াবহ অবস্থা হবে?

রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হবার পর সাধারণ মানুষের মনে আশা জেগেছিল, নরহত্যা, লুটপাট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাতারাতি না হোক, ক্রমেই কমে আসবে, আর শেষ পর্যন্ত তা থেমে যাবে। এ আশা, আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বিন্দুমাত্র মেটে নি: এতদিনেও অবস্থার উন্নতি দেখছি না। জানি না, কোন্ হিসেবে দিল্লির কর্তাব্যক্তিরা মনে করছেন, এখন কলকাতা শহরে মানুষ নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে। আমরা অবশ্য তা মনে করি না। উপরন্তু দুটি সাম্প্রতিক ঘটনা এখানে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। একটি ঘটনায় দেখা যায়, স্কুলের মধ্যে থেকে একটি কিশোরকে টেনে এনে হত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনায় দেখছি, মেয়ে স্কুলের মধ্যে ঢুকে একদল ছেলে জনৈকা শিক্ষিকার বুকে ছোরা মেরেছে। এই দুটি ঘটনাই জলজ্যান্ত সত্য, কাজেই কর্তৃপক্ষের বলার সুযোগ নেই যে, এ-সব সংবাদ রটনামাত্র। নয়ত, প্রত্যহ কলকাতার রাস্তা-ঘাটে, ট্রামে-বাসে যে-সব জিনিস আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়, যে-সব সংবাদ শুনতে হয় তাতে মনে হয়—বাস্তবিক পক্ষে আমরা কোনো সভ্য শাসনের মধ্যে নেই, অরাজকতা, সন্ত্রাস এবং গুণ্ডাদের মরজিতেই বেঁচে আছি।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন এবং পুলিসকে এই বেয়াড়া যুদ্ধে লড়বার জন্যে নানারকম পরামর্শ দিয়েছেন, তূণে নানান অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন, কিন্তু সেই সব পরামর্শ বা অস্ত্র এখন পর্যন্ত তেমন কোনো কাজে আসে নি। শোনা যাচ্ছে, এবারে নাকি নিবারক নিরোধ আইনের মতন একটা-কিছু তুলে দিয়ে দেখতে চান অবস্থার উন্নতি হয় কী না!

পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন এবং পুলিস অনেক দিন ধরে এই আইনটি চাইছেন: আর অধিকাংশ বাম রাজনৈতিক দল এটি চাইছেন না। পুলিসের ধারণা, এই আইনের বলে তাঁরা সব ঠাণ্ডা করে আনতে পারবেন: রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই আইন চালু হলে যথেচ্ছভাবে তা প্রয়োগ করা হবে। এ কথা বলাই বাহুল্য, পুলিস একটি বিশেষ ক্ষমতা চাইছে, আর রাজনৈতিক দলের অনেকেই সে-ক্ষমতা দিতে নারাজ। অথচ এই রাজনৈতিক দলগুলি আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের এমন ভয়াবহ অবস্থা প্রতিরোধ করতে কেউ এগিয়ে আসেন নি। এ'রা যে কোনো ছোট-বড় ব্যাপারে কলকাতার রাস্তায় দীর্ঘ মিছিল বের করে ফেলেন রাতারাতি। সি আর পি তুলে নাও, পুলিসী জুলুম বন্ধ করো—ইত্যাদি স্লোগানও অল্প কিছুদিন আগে মিছিলে শোনা গেছে। কিন্তু এই যে, নিত্য হত্যা—যেখানে নারী, শিশু, বৃদ্ধ কোনো ভেদাভেদ নেই, যেখানে গুণ্ডামি, রাহাজানির পরিমাপ নেই, যেখানে মনস্বীদের মাথা কাটা যাচ্ছে, স্কুল কলেজ পুড়ছে, আরও অজস্র পাপকার্য প্রত্যহ ঘটে যাচ্ছে—কই সেখানে তো এ'দের কোনো আন্দোলন নেই, মিছিল নেই, প্রতিরোধ নেই। কেন নেই? কোন্ স্বার্থে? আর পুলিস—? হাতে আইনের দেওয়া ক্ষমতা থাকলেই কি পুলিস আমাদের নিরাপত্তা দিতে পারে? যদি তা পারত, তবে আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে এত গুণ্ডা বেড়ে ওঠার কারণ কী? কেন আজ কলকাতা শহরের প্রতিটি অঞ্চল আঞ্চলিক গুণ্ডাদের রাজত্ব হয়ে উঠেছে? কোন্ প্রশ্রয়ে নিয়ত গুণ্ডারা মালগাড়ি ভাঙা থেকে যাবতীয় দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেও মহানন্দে জীবন যাপন করে যাচ্ছে! আমাদের তো মনে হয়, আজকের এই অবস্থার জন্যে দায়িত্ব কারও কম নয়। নিজ নিজ স্বার্থ ও অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্যেই এই অরাজক অবস্থা ঘনিয়ে এসেছে; এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন। সামাজিক মঙ্গল ও শান্তির চেয়ে আপন আপন স্বার্থরক্ষাই যেখানে বড় সেখানে ভবিষ্যতেও কিছু সুফল ফলার আশা দেখছি না

সাম্প্রতিক নৃশংসতম ঘটনার নিদর্শনের একটি হচ্ছে স্কুল-ভর্তি ছাত্র ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে হালতুর এক স্কুলের ছাত্রকে তার ক্লাস-ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে স্কুলের কাছেই তাকে খুন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বেলেঘাটার এক স্কুলের শিক্ষিকা, সি পি এম নেতা শ্রী কে জি বসুর স্ত্রী শ্রীমতী পারুল বসুকে তাঁর ক্লাসের মধ্যেই ছোরা মেরে মারাত্মকভাবে জখম করা এবং তাঁর চুল কেটে দেওয়া। দুটি ক্ষেত্রেই দুর্বৃত্তরা সংখ্যায় কম ছিল এবং সকলের চোখের সামনে এই নৃশংসতম কাজগুলি সংঘটিত হলেও, কেউ দুর্বৃত্তদের বাধা দিতে এগিয়ে আসেননি। বেশ কিছুকাল আগে, যুক্তফ্রন্টের রাজত্বে বর্ধমান জেলার এথোরার এক স্কুলের ভিতরে সি পি এমের সমর্থকরা ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। যত দূর মনে পড়ে কোনও এক বীরাঙ্গনা কমরেড এই ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—শিক্ষকনিধন যজ্ঞের উদ্বোধন করেছিলেন। শ্রীমতী পারুল বসুর উপর আক্রমণে এক জঘন্য নৃশংস কাজের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল।

রক্তপিপাসী রাজনীতির কাপালিকগণ! আর কত শবসাধনা করবেন?

সত্যের খাতিরে এ কথা উল্লেখ করতেই হবে, নকশালপন্থীরা একা নন, সি পি এম, সি পি আই, এস ইউ সি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি—আজ আর কারোর হাতই শুকনো নয়। অনুগ্রহ করে নিজ নিজ করতল দুটি চোখের সামনে মেলে ধরুন, দেখবেন, আপনাদের প্রত্যেকের হাতই রক্তলিপ্ত।

যুক্তির আশ্রয়, বিবেকের আশ্রয়, নীতি ও ন্যায়ের আশ্রয়, আদর্শের আশ্রয় ত্যাগ করে যেদিন থেকে আপনারা পেশী ও পশুবলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, যেদিন থেকে মানবীয় মূল্যবোধসমূহকে উপহাসের সঙ্গে জলাঞ্জলি দিয়ে সংকীর্ণ লোভ পূরণের আশায় সুবিধাবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন, মহাশয়গণ, একবার ভেবে দেখুন তো, সেই-দিন থেকেই কি আপনারা নরকের দরজা খুলে দেন নি? আজ তবে একটি পাপকর্ম অনুষ্ঠানের জন্য অপরকে তারস্বরে দোষারোপ করে কী লাভ?

হে মহাবলী সি পি এম! বামপন্থী রাজনীতির বামাচারের শ্রেষ্ঠ কাপালিক! আজ কেন মৃত্যুভয়ে এত অস্থির? আজ কেন আপনাদের লোকাল নেতাদের সাধের ফ্ল্যাট পরিত্যাগ করে 'সেফ জোনে' বাসা বাঁধার জন্য এত তাড়া? হে সি পি আই, এস ইউ সি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি আর উদভ্রান্ত নকশাল! বিজয়কেতন উড়িয়ে **সেই মদগর্বী পদক্ষেপ আজ কোথায় গেল!**

হে পেশীবাজ কমরেডগণ! আপনারা এত খেলা এত ভাল জানেন, কিন্তু একটা খেলার পরিণাম ভেবে দেখেননি, তাই আজ আপনাদের এই শোচনীয় পরিণতি। কেউ কি আপনাদের এ কথা বলে দেয়নি, প্যানডোরার

পাটিরা কখনও খুলো না! এমন কি খেলার ছলেও নয়। গোঁয়ার্তুমি করে, ওই নিষিদ্ধ খেলাটি আপনারা খেলেছেন, প্যানডোরার সর্বনাশা পাটিকার ডালাটি খুলে দিয়েছেন, এবং তারই পরিণাম হিসেবে আপনারা আজ কুম্ভীপাকে সাঁতার কাটছেন।

একবার ভেবে দেখুন, হে উদভ্রান্ত রাজনৈতিক, একবার ভেবে দেখুন, কী মহৎ প্রতিশ্রুতি নিয়ে আপনারা যাত্রা করেছিলেন! আপনারা অন্যায়, অবিচার, শোষণ থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করে তাকে ন্যায় ও সাম্যের সমাজে বসতি দেবেন, এই ছিল আপনাদের অঙ্গীকার। আর আজ আপনারা কোথায় এসে পড়েছেন! আজ আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পিছনে ধাওয়া করেছেন পাইপ গান, বোমা, লোহার রড আর ধারাল তলোয়ার নিয়ে। এ তো আদিম সেই গুহা-মানুষদের কাজ। ইতিহাসের সেই আদি লগ্নে, মানুষের বুদ্ধি যখন অপরিণত ছিল, বিচারশক্তি ও বিবেচনাবোধ এবং বিবেক যখন তার অন্তরে জাগ্রত হয়নি, তখন সেই পেশী-নির্ভর মানুষ সব সমস্যার সমাধান করত মুগুর-লগুড় আর পাথর আর ডাণ্ডা দিয়ে।

কিন্তু আপনাদের চেহারা দেখে তো মনে হয়, আপনারা এ যুগের মানুষ। তবে? তবে এত আদিম সংস্কারের দ্বারা চালিত হচ্ছেন কেন? মানুষ কি বহু অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সত্যে পৌঁছায়নি যে, বাসযোগ্য সমাজ গঠনের সব থেকে নির্ভরযোগ্য উপাদান পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ নয়, হিংসা নয়, হিংস্রতা নয়, পরস্পরের প্রতি আস্থা, নির্ভরতা এবং সহনশীলতা। সমস্যা সমাধানের নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার পেশীর আস্ফালন নয়, পাইপ গান নয়, লোহার রড নয়, বোমা নয়, যুক্তি, বিচারবোধ, বিবেচনাশক্তি এবং শুভবুদ্ধি।

আপনাদের হঠকারী ক্রিয়াকলাপ কি এই শিক্ষা এখনও দেয়নি যে, হত্যা হত্যাকেই ডেকে আনে, নৃশংসতা নৃশংসতাকে এবং সন্ত্রাস সন্ত্রাসকেই?

এবার তবে ফিরুন। এখনও সময় আছে। এথোরার শিক্ষকের, মধুসূদনপুরের ও বর্ধমানের সাঁইবাড়ির হতভাগ্যদের, হালতুর ছাত্রের, বেলেঘাটার পারুল বোসের এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় খ্যাত ও অখ্যাত যাবতীয় নিহত ও আহতদের রক্ত সংগ্রহ করে, আসুন, আমরা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখি, এই রক্তের হোলি খেলা আর নয়। এবার আমরা সুস্থতায় ফিরি।

আসুন লিখি: মানুষের জন্যই সমাজ। মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

আসুন লিখি: মানুষের সমাজে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং মীমাংসার হাতিয়ার যুক্তি, বিচার, বিবেচনা এবং আলোচনা।

আসুন লিখি: সমাজ পরিবর্তনের অধিকার সকলেরই আছে, তবে হিংসার পথে সমাজের পরিবর্তন মানুষকে ধ্বংস ছাড়া কোথাও নিয়ে যায় না।

আসুন লিখি: আত্মমর্যাদাবিহীন মানুষ মানুষের খোলস মাত্র। তা আবর্জনার সমান। মানুষের মর্যাদা ধুলোয় লুটোবার অধিকার কারও নেই।

আসুন লিখি: মানুষের শক্তি পেশী নয়, মস্তিষ্ক।

আসুন লিখি: মানুষের সার্থকতা তার সৃজনে। উদ্ভাবন, উদ্যম এবং সহযোগ মানুষের ধর্ম।

আজ কে আছেন জাগ্রত অমাবস্যায় আচ্ছন্ন এই বাংলা দেশে? কে আমার নিবেদন শুনেছেন? তিনি যেই হোন, তাঁকে আহ্বান জানাই, এখনই তৎপর হোন। শেষ ঘণ্টা বেজে ওঠার আগেই আমরা যেন দলে দলে নেমে পড়তে পারি এই চিন্তাহীন বিবেকহীন এই পাইকারী নৃশংসতার প্রতিরোধে। **কিন্তু কেউ কি শুনছেন? জেগে কি আছেন কেউ?**

সুনন্দ আর আমাদের মধ্যে নেই। এই লেখাটিই তাঁর শেষ রচনা। গত শুক্রবার রাত্রে আকস্মিক অসুস্থতার পর তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। গত রবিবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আমাদের সুনন্দ—বাংলা দেশের অতিখ্যাত, সর্বজনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—পরলোকগমন করেছেন। তাঁর পরলোকগমন আমাদের পক্ষেই শুধু নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ণের স্থান এটা নয়, তবু গত ত্রিরিশ বছর যিনি সাহিত্য রচনার দ্বারা বাঙালী পাঠকের প্রিয় লেখক হয়ে বিরাজ করেছেন তাঁর সাহিত্য বাঙালী সমাজের অবশ্যই অন্তরের সামগ্রী ছিল। আমাদের আরও বেদনা এই, আজ থেকে ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর আগে 'দেশ' পত্রিকার একেবারে গোড়ায় ১৯৩৪ সালে ৩ নভেম্বর তারিখে নারায়ণবাবুর প্রথম কবিতা 'অবরুদ্ধ' প্রকাশিত হয়। সেইটেই, যতদূর জানি, তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। আর ছত্রিশ বছর পরে—১৯৭০ সালে সেই নভেম্বর মাসেরই একটি দিনে তাঁর শেষ রচনা প্রকাশের বেদনা আমাদের অনুভব করতে হল। ১৯৬৩ সাল থেকে দেশ পত্রিকার পাঠক যে-'সুনন্দ'র সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন, আগামী সংখ্যা থেকে তাঁকে আর খুঁজে পাবেন না—এ দুঃখ সকলেরই। পরলোকগত শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

'আমি খ্যাতির রাস্তায়'

এই সংখ্যার জন্যে যে জার্নালটি লেখা হয়েছিল, সেটি সম্পাদকের দপ্তরে পৌঁছোয়নি, পথেই চুরি হয়ে গেছে।

চুরি হয়ে গেছে অবশ্যই নিজগুণে নয়। পৃথিবীতে এমন নির্বোধ চোর নিশ্চয় কোনো জন্ম নেয়নি যে, সুনন্দর জার্নাল তার কাছে বিন্দুমাত্র লোভনীয় বোধ হবে। চুরি গিয়েছে কিছু অর্থকরী জিনিসের সঙ্গে। আশা করা যায় এতক্ষণে সেটি টুকরো টুকরো হয়ে কোথাও আঁস্তাকুড়ে জায়গা পেয়েছে।

আপনারা কেউ যে সেই অকালবিলুপ্ত অমূল্য সাহিত্যটির জন্যে এতটুকুও শোকার্ত হবেন, এমন আশঙ্কা করি না। কিন্তু আমাকে যে আর একবার লিখতে বসতে হল সেটাও খুব সুখের ঠেকছে না। তবু, নিজের পাঁঠাটির মাথা কাটানো শক্ত, তার সঙ্গে সাপ্তাহিক [illegible] ও সুড়সুড়ি দিচ্ছে। যে নিয়েছে দেখার দায়িত্ব, তার পরামর্শ লাভ হোক, 'তাঁর উপদেশ' চেয়ে থেকে লাভ নেই: ফিরবে না, তা আমি জানি। চেষ্টা করে দেখি, স্মৃতি থেকে সেই লুপ্ত রত্নটিকে উদ্ধার করতে পারি কিনা।

একটা ক্ষীণ আশা অবশ্য মনের ভেতরে উঁকি দিচ্ছে বৈকি! মাঝে মাঝে খবরের কাগজে এক আধজন হৃদয়বান পকেটমারের 'দিলদার-মার্কা' বিবরণ পাঠ করি। তাঁদের কেউ কেউ লুণ্ঠিত-পকেট বাবুটির লেটার-বক্সে তাঁর ট্রামের মান্থলি-খানা রেখে আসেন, পৌঁছে দেন অফিসের চাবি, কেউ বা পোস্ট-অফিস মারফৎ রেজিস্ট্রি করে দরকারী কাগজপত্রও পাঠিয়ে দেন। যদিও তাঁরা অন্যের পকেট থেকেই নিজেদের [illegible] নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁরা বিবেচক, প্রয়োজনের বাইরে অন্যকে বিব্রত করাটা তাঁরা পছন্দ করেন না।

আশা করতে দোষ কী, আমার হারানো জার্নালটি এইরকম কোনো সদাশয়ের হস্তগত হয়েছে, তিনি ভাবছেন, এই 'অপূর্ব বস্তুটি' থেকে 'দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের বঞ্চিত করে কী লাভ—অতএব যথাস্থানেই এটি ফেরৎ পাঠানো যাক। সেই শুভযোগ হয়তো এসেও যেতে পারে, এখনো ভরসা রাখা যাক, কিন্তু তার আগে আর একটি জার্নাল অনিবার্যভাবেই আমাকে লিখতে হচ্ছে।

লেখাটাকে স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করতে চাইলুম, মন সায় দিল না। আরো একটি নিবিড় চিন্তার দ্বারা আমি আবিষ্ট হলুম। অধ্যাপক সেই দুর্মুখ বন্ধুটি আমার জার্নাল সম্পর্কে যাই বলুন, একটি [illegible] মাঝে মাঝে আমাকে বলে, এতদিন ধরে এই যে লেখনী-প্রলাপ চালিয়ে চলেছ, তাতে করে—ধোপাদের সেই কলসীটির মতো—তুমিও কি 'প্রায়-সাহিত্যিক' হয়ে ওঠোনি? লেখকদের তো বহু ভক্ত-টক্ত থাকে, আমার কি 'প্রায়-ভক্ত'ও বাংলা দেশে তৈরী হয়নি দু-একজন? 'সুনন্দদা, একজন লেখক'—কেউ কি এরকম কমপ্লিমেন্ট আমাকে কখনো দেন না?

তা হলে ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। এই আত্মতোষণের ধৃষ্টতা আপনারা ক্ষমা করবেন, আমি কল্পনাটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে ভাবতে পারি: অর্ধপথে আমার জার্নালের এই যে অপঘাত—এ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, এর নেপথ্যে আমার কোনো 'বিমুগ্ধ ভক্তের' (নাকি হাফ-ভক্তের?) কিঞ্চিৎ পরিকল্পনা আছে, আমার অপ্রকাশিত জার্নালটিকে অতি মূল্যবান 'সুভেনির' হিসেবে সে আত্মসাৎ করেছে। এর পরে ওটিকে সে পরম যত্নে সাজিয়ে রাখবে, মধ্যে মধ্যে মাথায় ঠেকিয়ে কৃতার্থ হবে কিনা কে জানে। তারপরে অনেক বৎসর পার হয়ে যাবে, আমি ভবলীলা সাঙ্গ করব, আমার এই জার্নালীয় কীর্তিস্তম্ভ সাহিত্যের ইতিহাসে 'সোনার অক্ষরে' (ব্রোঞ্জের অক্ষরে হলেও আপত্তির কারণ দেখছি না) লিখিত হবে, আর তখন—আমার সেই 'ঘোর ভক্ত' কিংবা 'প্রায়-ভক্তে'র কোনো উত্তরাধিকারী সেটি বিক্রী করে দিয়ে—বিদেশে যেমন ঘটে থাকে—পাঁচ-দশ-বিশ হাজার টাকার ব্যবসা করে নেবে।

দোহাই, আমার এই আল-নশকরী স্বপ্নের চেহারা দেখে আপনারা চটে উঠবেন না। আপনারা না হয় আমার লেখাকে পাত্তা দিতে চান না—কেন দেবেন তাও জানি না, কিন্তু আমি যদি এই ফাঁকে—জার্নাল চুরির এই ব্যাপারটাকে, একটুখানি আত্মপ্রেমে রঙীন করে তুলি, আশা করি সেটাকে অসহ্য ধৃষ্টতা বলে গণ্য করবেন না।

কিছুদিন আগে কোনো সভাগৃহে বাংলা দেশের একজন প্রবীণ এবং প্রধান লেখক তাঁর নতুন জুতো জোড়া খোয়ালেন। তাঁর ব্যথাতুর মুখ দেখে আমার সমবেদনা জাগল, তাঁকে বললুম, দুঃখ করবেন না—কোনো ভক্ত নিয়ে গেছে, ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করবে—মানে সেই রামের পাদুকার ব্যাপার আর কি!' তিনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'ইয়ার্কি দিয়ো না, একেবারে নতুন জুতো!'

তাঁর পুজোর আর নতুন করে দরকার নেই, তিনি তো অলরেডি নিজগুণে 'জনানাং হৃদয়ে' সন্নিবিষ্ট হয়েছেন। সুতরাং চটবারই কথা। কিন্তু আমি তো তাঁর মতো দিগ্বিজয়ী লেখক নই, জার্নাল লিখে বরং মধ্যে মধ্যে লোক চটিয়ে থাকি বলেই আমার সুনিশ্চিত ধারণা, নতুন জুতো চুরি গেলে আমি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কাতর হতুম তাও ঠিক—তবু, তবু—আমার জার্নালটির এই আকস্মিক অপঘাত—হঠাৎ আমাকে শিহরিত করছে। বড়ো-

না। কত নিদ্রাহীন রাত্তিরে যে-লেখকের বই আমার সঙ্গী, সেই লেখক নিজে আমার সঙ্গে কথা বলবেন, এ কি বিরাট সৌভাগ্য!

ধপধপে ফর্সা গায়ের রং, তখন অত্যন্ত রূপবান পুরুষ ছিলেন। ওঁর স্বভাবে কোনো ভারিক্কী ভাব ছিল না, অথচ ক্লাসে কেউ কোনোদিন কোনো বিঘ্ন ঘটায়নি, ছাত্রদের আপন করে নিতে জানতেন, সবাইকে করে নিতেন এক আলোচনার অংশীদার। পড়াশুনোয় কোনো নীরস কঠোরতা ছিল না—সাবলীল আবহাওয়ায় সাহিত্য পাঠ হতো। মনে আছে, উনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ পড়াতেন, মুক্তধারা নাটকটির আলোচনা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। আমার মতো ক্লাস-পালানো ছেলেও পারতপক্ষে ওঁর ক্লাস ফাঁকি দেয়নি।

প্রথম প্রথম যখন ওঁর ক্লাসের এক কোণে বসে থাকতাম, তখন মনে হতো, উনি জানেনও না, ওঁর ক্লাসের একটি ছেলে ওঁর সব লেখা পড়েছে, এমন কি অনেক লেখা দুবার তিনবার পড়েছে! কথাটা অতিরঞ্জিত নয়—আমার যখন কোনো লেখকের লেখা ভালো লাগে তখন তাঁর সমস্ত লেখা যেখান থেকে হোক ঠিক খুঁজে পেতে পড়ে ফেলি। তখন আমি ওঁর লেখার দারুণ অনুরাগী, উপনিবেশ পড়ে মুগ্ধ হবার পর একে একে পড়ে ফেলেছি সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, বৈতালিক, মহানন্দা, ট্রফি, শিলালিপি। সেটা উনিশ শো তিপান্ন চুয়ান্ন সালের কথা, কোনো পুজো সংখ্যায় বেরিয়েছে ওঁর গল্প, 'অবাদ', কতবার যে পড়েছিলাম সেই গল্পটা! স্পষ্ট মনে আছে, তখন একটা লঘু দায়িত্বজ্ঞানহীন পত্রিকায় ওঁর শিলালিপি বইটার নিছক বিদ্বেষপ্রসূত বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছিল—তখন শিলালিপি আমার হট ফেভারিট, সেই সমালোচনা পড়ে আমি এমন রেগে গিয়েছিলাম যে হাতের কাছে পেলে সেই সম্পাদককে হয়তো মেরেই বসতাম।

কিছুদিন ক্লাস চলার পর উনি যখন আমাকে চিনলেন, তখন কিন্তু ওঁকে এইসব কথা কিছুই বলিনি। ওঁর লেখা নিয়ে কোনোদিন ওঁর সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। বস্তুত, কোনো লেখকের সঙ্গে তাঁর লেখা বিষয়ে কিভাবে আলোচনা করতে হয়, তা আমি এখনো জানি না। শিলালিপি বইটা বন্ধুবান্ধবদের ধরে ধরে পড়াচ্ছি তখন, কিন্তু সেই বইয়ের লেখকের সামনে সে বিষয়ে একটা কথাও বলতে পারিনি।

অন্যান্য বই নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কয়েক বার গেছি ওঁর পটলডাঙ্গার বাড়িতে। ঐ বাড়িতে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি বড় হয়ে কি হবে? লেখক হবে নাকি? লেখক হবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার তখন ছিল না। আমি বলেছিলাম, না, স্যার, আমার ইচ্ছে করে নানা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে।
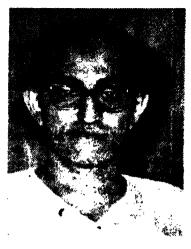
উনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তারপর বুঝি ফিরে এসে ভ্রমণ কাহিনী লিখবে? দেখো, লেখক হতে হলে কিন্তু অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। লেখকের জীবন বড় কষ্টের!

আমি ওঁর প্রিয় ছাত্রদের অন্তর্গত ছিলাম না। লেখাপড়ায় আমি কোনোদিনই ভালো ছাত্র নই, তাছাড়া ফোর্থ ইয়ারে উঠে অন্যান্য ব্যাপারে এমন মত্ত হয়ে উঠি যে কলেজের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কই চুকে যায়। এখন অবশ্য আপসোস হয়, কেন আর একটু মন দিয়ে লেখাপড়া করিনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির কথা অনেকেরই জানা। বইয়ের রেফারেন্স, বা কবিতার লাইনই যে শুধু মনে থাকতো তাই নয়—মানুষের মুখ ও নাম মনে রাখারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কলেজ ছাড়ার পাঁচ ছ' বছর বাদে ওঁর সঙ্গে এক জায়গায় দেখা। আমার দৃঢ় ধারণা, উনি আমাকে চিনতে পারবেন না। মাত্র বছর দেড়েক ওঁর ছাত্র ছিলুম, পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসেও পড়িনি—আমাকে চিনতে পারার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—কিন্তু উনি ঠিক আমাকে দেখেই এক নিমেষও চিন্তা না করে বললেন, কি সুনীল, কেমন আছো? তারপর আমাদের ব্যাচের অন্যান্য ছেলে—ফণিভূষণ আচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল প্রভৃতির কথাও জিজ্ঞেস করলেন। আমি স্তম্ভিত!

তিন বছর আগে জলপাইগুড়ির বন্যার পর ওঁকে আর এক ভূমিকায় দেখেছিলাম। উত্তরবঙ্গের বন্যার পর কলকাতায় সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে পথ-শোভা যাত্রা করে কিছু সাহায্য ও জামা কাপড় সংগ্রহ করার প্রস্তাব উঠেছিল। শ্যামবাজার থেকে শোভাযাত্রা বেরুবার কথা। গিয়ে দেখি বিশেষ কেউ আসেননি, কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবী ঠিক উপস্থিত। উত্তরবঙ্গে উনি অনেকদিন কাটিয়েছেন, ওখানকার প্রতি ওঁর ছিল আন্তরিক টান। সেদিন ছিল প্রচণ্ড রোদ—সেই রোদের মধ্যেই ঘণ্টা চারেক পায়ে হেঁটে ঘুরে সেদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবী শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

"দেশ" পত্রিকায় উনি সুনন্দর জার্নাল লিখছিলেন প্রায় সাত বছর ধরে। দেশের সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে উনি বিশেষ সজাগ ছিলেন, অত্যন্ত স্পর্শ কাতর ছিল ওঁর মন, তাই এই দীর্ঘকালেও ওঁর কখনো বিষয়বস্তুর অভাব হয়নি। এতদিন ধরে এমন আজীব রচনা অব্যাহত রাখার কৃতিত্ব কতখানি তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু গত সংখ্যার সুনন্দর জার্নাল পড়ে রীতিমতন চমকে উঠতে হয়। রচনাটি আগাগোড়া বিষণ্ণ হাহাকারের মতন। আজকের বর্বরতা ও রুচিহীনতায় তিনি ব্যথা বোধ করেছেন, তা ছাড়াও লেখাটিতে নিজের মৃত্যু-চিন্তা বড় বেশী উপস্থিত। একাধিক জায়গায় নিজের অস্তিত্ব বিলোপের কথা উল্লেখ করলেন কি করে? এক জায়গায় লিখছেন "আপাতত এই মুহূর্তে বুক ভাঙা আর্তনাদে আমার গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে: 'আমি জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে—ইত্যাদি ইত্যাদি।" এবং পরের সংখ্যা 'দেশ'-এ যদি সুনন্দর জার্নালের পাতা অদৃশ্য হয়—আশা করি তা হলে আপনার কেউই বিস্মিত হবেন না।" এবং রচনাটি শেষ করতে গিয়ে আবার লিখেছেন, "অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় সুনন্দর পাতাটি যদি না থাকে, তাহলে জানবেন, আর একটি কমনম্যান বাঙালীর অবলুপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল।"

মৃত্যুর আগে কি মনের ভিতর তার কোনো বার্তা আসে? জানি না। এটা ভাবতে ভালো লাগে, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অসুস্থ শরীরে অনেক সময় মৃত্যু চিন্তা আসে, হয়তো এটা তারই প্রকাশ। সেই অসুখ থেকে তিনি সেরে উঠেছিলেন, শুক্রবার সকালে বাড়িতে আমাকে বলেছিলেন, ভালো আছি।

কিংবা শরীরে অসুখের প্রকোপ বোধহয় তিনি টের পেয়েছিলেন। মৃত্যুকে অনুভব করেছিলেন অবচেতন ভাবে। কিন্তু তিনি হার মানতে চাননি। মৃত্যুকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গত সংখ্যায় ঐ জার্নালের পরেও তিনি আবার লিখেছিলেন, ওইটাই শেষ লেখা নয়। এবং গাড়িতে একটু জোর দিয়ে বলেছিলেন, এখন ভালো আছেন।

তাই রবিবার রাত্রে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি।

নির্বাচনই হোক না

দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা দ্রুত বেড়ে চলেছে—এতই দ্রুত যে তার সঙ্গে তাল রাখা কঠিন। অবস্থা আজ যা আছে কাল বা পরশু তার চেয়ে একেবারে ভিন্ন পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে। যে কোনও বড় ঘটনা সব ওলটপালোট করে দিতে পারে এবং যে কোনও ঘটনা যে কোনও সময় ঘটতে পারে। যে পটভূমিকায় আজ লিখছি সাতদিন পরে অর্থাৎ যখন এই লেখা প্রকাশিত হবে তখন হয়ত দেখা যাবে পরিস্থিতি একেবারে পাল্টে গিয়েছে—অবস্থা একেবারেই অন্যরকম।

১৯৬৭ সনের পর থেকেই দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এসেছে। সেই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই। তারপর কখনও ধীরে কখনও খুব দ্রুত ঘটনা প্রবাহ এগিয়েছে। কখনও কোনও রাজ্যে, কখনও বা কেন্দ্রে। কিন্তু ১৯৬৯ সনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও কংগ্রেস ভাগাভাগির পর থেকেই অবস্থাটা বেশ খারাপ। তারপর থেকে খাস দিল্লিতেই একটা চরম ডামাডোল। তাও একটু সামলে আসছিল। কিন্তু উত্তর প্রদেশের ধাক্কার পর থেকে আবার এল প্রচণ্ড অস্থিরতা। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁরা ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য মরিয়া। যাঁরা ক্ষমতাচ্যুত বা সিংহাসন থেকে অনেক দূরে তাঁরাও ক্ষমতা পাওয়ার জন্য যে-কোনও মূল্য দিতে রাজী।

এর উপর এসেছে আবার রাজন্যভাতা ও অধিকার বিলোপের মামলা। দিল্লির কর্তারা এবং প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েছেন, এই মামলায় সরকার হারবেনই—সুপ্রীম কোর্ট আদেশটি বাতিল করে দেবেনই। এবং সেই অনুমানের ওপরেই আবার আরও বড় অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

শোনা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এবার ক্ষমতা হারাবার ভয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন চাইছেন। এও শোনা যাচ্ছে যে তিনি নতুন সংবিধান রচনার ব্যবস্থা করতে চান। কোনটা আগে করবেন, নির্বাচন না নতুন সংবিধান, তা এখনও পরিষ্কার নয়। হয়ত এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন ব্যাপারটা অনেকটা খোলাখুলি বোঝা যাবে। ইতোমধ্যে সংসদের অধিবেশনও আসর গরম করে তুলবে।

প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কী করবেন তা এখনও সবাই স্পষ্ট না জানলেও লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া এবং নতুন সংবিধান রচনার সংবাদে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বেড়েছে। সবাই বুঝতে চাইছেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যটা কী? প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সততা সম্পর্কে

অধিকাংশ দলই খুব খারাপ ধারণা পোষণ করেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর সব কাজকেই তাঁরা প্রচণ্ড সন্দেহের চক্ষে দেখেন। এই সন্দেহটা দিন দিনই বাড়ছে। ব্যাপারটা অনেক দলের পক্ষেই এখন আতঙ্কের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এই আতঙ্কের ধাক্কায় তাঁরা যে কোনও সময় যে কোনও কাজ করে বসতে পারেন।

*

একদিকে যখন সংসদীয় ও প্রশাসনিক অস্থিরতা, অন্যদিকে তখনই সৃষ্টি হয়েছে আর এক বিস্ফোরক পরিস্থিতি—যার নাম নকশালপন্থী বিপ্লব। এই বিপ্লবের খতম অভিযানের ধাক্কায় সমাজ জীবনে কোনও মৌলিক পরিবর্তন আসুক না আসুক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে ভীষণ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ আতঙ্কিত ও ভীত এবং গোটা আরও স্তম্ভিত। প্রশাসন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁরা খুনের পর খুন করেও খুনোখুনি থামাতে পারছেন না!

শোনা যাচ্ছে, আরও কিছুদিন সরকার দেখবেন। পুলিসের হাতে আরও কিছু ক্ষমতা দেবেন এবং তারপরও কাজ না হলে গোটা পশ্চিমবঙ্গকে সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেবেন। নকশালপন্থীরা কখন কীভাবে খতম অভিযান চালাবেন তা কেউই জানেন না। সুতরাং তার প্রতিক্রিয়া কখন কী হবে তাও অজানা। পুলিসই বলুন, বিরোধী পার্টির লোকজনই বলুন—শহরাঞ্চলে এখনও পর্যন্ত তাঁরা "অ্যাকসান" নিম্ন পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ব্যবসায়ী খতম অভিযানও এখনও পর্যন্ত অর্থাৎ এই প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত নীচু স্তরেই রয়েছে।

হঠাৎ যদি উঁচু পর্যায়ে ওঠে যায় খতম অভিযানটা তাহলে তার ধাক্কা দিল্লির সিংহাসন এবং পার্লামেন্টেও গিয়ে পড়বে। টাকার থলির প্রভাব, পদমর্যাদার গুরুত্ব সমাজতন্ত্রী নব কংগ্রেসের ওপরও যে খুব বেশী! পার্লামেন্টও দৈনিক দু পাঁচজন সাধারণ মানুষ খুনের ধাক্কা বেমালুম সামলাতে পারছে। কিন্তু কোনও সপ্তাহে জনা পাঁচেক রাঘব বোয়াল খুন হলে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে তখন এম পিরা বা নেতারা চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন?

এর ওপর শোনা যাচ্ছে শীতকালে নকশালপন্থীরা একটা লং মার্চ শুরু করবেন। খতম অভিযান চালাতে চালাতে

কয়েক শ মাইল এগিয়ে যাবেন। তার ধাক্কাই বা দিল্লিতে কিভাবে পড়তে পারে?

যেখানে এমনিতেই রাজনৈতিক অস্থিরতা, যেখানে সাধারণ পরিস্থিতিতেই কারও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেখানে বড় কোনও ধাক্কা এলে কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারবেন? পদ, ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যতের লোভ দেখিয়ে শ দুয়েক লোকসভা সদস্যকে সঙ্গে রাখা এক জিনিস, আর বড় কোনও বিপর্যয়ের সামনে তাঁদের ধরে রাখা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

*

ভারতের যতটুকু অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছিল এই রাজনৈতিক অস্থিরতা তার প্রচণ্ড ক্ষতি করছে। এবং ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট আরও বাড়ছে। এই রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর না হলে এখন থেকে পাল্লা দিয়ে দুটো জিনিস এগোবে—যত রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে ততই অর্থনৈতিক অধোগতি হবে এবং যতই অর্থনৈতিক সংকট বাড়বে ততই রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে আসবে।

এই জিনিসটা আজ চরমভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রকট। কংগ্রেস রাজত্বে শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও অনেক কাজ হয়েছিল। কলকারখানা, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি। প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই হয়নি। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেও হয়নি। কিন্তু তবু কাজ অনেক হয়েছিল। বড় লোক তার বেশিটা ভোগ করলেও সাধারণ মানুষও কিছুটা উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা এল, তখন কমিউনিস্টরা, সমাজতন্ত্রীরা, প্রগতিশীলরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও কাজ বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৬৭ সাল থেকে সেই অবস্থা চলছে পশ্চিমবঙ্গে। নতুন রাস্তাঘাট, নতুন স্কুল কলেজ হাসপাতাল, নতুন কলকারখানা হওয়া ক্রমে ক্রমে কমে আসছে। ফলে বেকারী বাড়ছে, অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে। এতে বড় লোকেরা যত অসুবিধায় পড়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী অসুবিধায় পড়েছেন গরীব মানুষ। একটা কারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও কোনও বড় মালিকের তেমন অসুবিধা হয় না। সবগুলি বন্ধ হলেও তাঁর মোটামুটি খাওয়া পরার অভাব হয় না। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ বেকার হলে গোটা পরিবারটাই না খেয়ে মরে—আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষেরই যে এক সপ্তাহ বসে খাওয়ারও সম্বল নেই! রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অস্থিরতা সমস্ত মানুষকে কিভাবে নাস্তানাবুদ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তা বুঝিয়ে বলার কোনও প্রয়োজন নেই।

এই জিনিস এখন ক্রমে ক্রমে দিল্লিকেও গ্রাস করছে।

এর ফলাফল সমগ্র দেশের পক্ষেই ভয়ানক হতে বাধ্য। কারণ দিল্লির শাসন সর্বত্র চালু। দিল্লির নীতিতেই সমগ্র দেশের অর্থনীতি চলে। ভারতের যেসব রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিরতা আছে সেখানেও এর প্রচণ্ড প্রভাব পড়বেই। দিল্লি যদি ঠিক না থাকে তাহলে সব বিগড়ে যাবেই।

রাজনৈতিক স্থিরতা, সে যে মতবাদেরই স্থিরতা হোক, তাই আজ দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক অস্থিরতা অরাজকতা ডেকে আনে এবং অরাজকতা যে কোনও সমৃদ্ধশালী দেশকেও ধ্বংস করে দিতে পারে। ভারতের মত দরিদ্র দেশ, বিরাট দেশকে শেষ করে ফেলতে তো অরাজকতার সামান্য সময়ও লাগবে না।

*

কংগ্রেসের ভাগাভাগিটা টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী আজ এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যেখানে (বর্তমান লোকসভায়) কোনও রাজনৈতিক স্থিরতা আসা সম্ভব নয়। কোনও দলেরই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। এক মত ও পথের কয়েকটি দল মিলে যে স্থিরতা আনবে তেমনও অবস্থা নেই।

অনেকেই আজ ইন্দিরা-সরকারের পতনের জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই সরকারের পতন ঘটলে বিকল্পই বা কী? এই লোকসভায় কোনও সুষ্ঠু বিকল্পের সম্ভাবনা আছে? একটা হতে পারে যে দুই কংগ্রেসের কিছু নেতা সরে যেতে বাধ্য হবেন এবং তারপর দুদলের মিলনে আবার বড় একটা কংগ্রেস হবে। কিন্তু সবাই যে পুনর্মিলিত হবেনই তারই কি কোনও গ্যারান্টি আছে? সব মিলিয়ে জনা চল্লিশেক বাইরে থেকে গেলেই তো, আর সে দলেরও সংখ্যাগরিষ্ঠতা রবে না!

অথবা যদি দিল্লিতেও এস ভি ডি গোছের একটা কিছু হয়। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের এস ভি ডি দেখে কি মনে হয় যে ঐরকম কোনও জোট দিল্লিতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থিরতা আনতে পারবে? যাঁরা একটা রাজ্যেই জোটের একতাসের মধ্যেই হিমসিম খাচ্ছেন তাঁরা দিল্লিতে কী কিছু করতে পারবেন বলে ভরসা হয়?

আরও একটা জিনিস, প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই তাঁর হাতের সরকারী ক্ষমতা ছাড়তে চাইবেন না। এই লোকসভা যদি চলতেই থাকে তাহলে এর মধ্যেই পারমুটেশন কম্বিনেশনের মাধ্যমে তিনি যেনতেন-প্রকারেণ একটা সরকারের প্রধান থেকে যেতে চাইবেন। অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা তাতে আরও বাড়বে।

তার চেয়ে বরং নির্বাচন হওয়া ভাল। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক না, কেউ বা কোনও একমত ও পথের দৃঢ়সংবদ্ধ জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান কিনা। যদি ইন্দিরা গান্ধী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান ভাল। যদি অন্য কেউ পান তাতেও দেশের ক্ষতি হবে না—অন্তত এখন যা চলছে তার চেয়ে অনেক ভাল হবে।

আর যদি দেখা যায়, না তাতেও হল না, স্থিরতা ও নিশ্চয়তা তারপরও এল না, তখন বাধ্য হয়েই ভিন্ন পথে এগোতে হবে।

৭-১১-৭০।

নবারুণ গুপ্ত

একমাত্র মল্টটনিক যাতে আছে ৬টি ভিটামিন—ভিটামিন বি-১২ সমেত
সুস্বাদু
অস্টোমল্ট
বিশুদ্ধ কমলার রসে ভরা
যোগায় বাড়তি উৎসাহ
যোগায় বেশী ক্ষিদে
যোগায় সুস্থ রক্ত
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন এ উজ্জ্বল চোখের জন্য (ওর উজ্জ্বল চোখ এখন দুষ্টুমিতে ভরা)
অস্টোমল্টে আছে আয়রণ,—যা সুস্থ রক্ত গ'ড়ে তোলে (ওর গাল এখন আর আগের মত প্যাংশুটে নয়)
অস্টোমল্টে আছে রিবোফ্লাবিন আর বি-১২—যা ক্ষিদে বাড়ায়. বি-১ হজমে সাহায্য করে (ইদানিং ও দু'বার ক'রে চেয়ে খাচ্ছে)
অস্টোমল্টে আছে মল্ট উৎসাহ আর শক্তি বাড়াতে (ও এখন কত বেশী প্রাণবন্ত, আগের চেয়ে ওর ঘুমও ভাল হয়)
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-ডি—সুস্থ সবল দাঁত আর মজবুত হাড় গ'ড়ে তুলতে (ওর এখন একটি সাইকেল চাই ই! ও খুব তাড়াতাড়ি বড়সড় হয়ে উঠছে)
অস্টোমল্টে আছে নিকোটিনামাইড,—যা মুখে স্বাভাবিক এক সুস্থ দীপ্তি ফুটিয়ে তোলে (নাবিকের পোশাকে ওকে ছবির মত সুন্দর দেখায়)
Ostomalt
গ্ল্যাক্সোর
অস্টোমল্ট
পুষ্টি আর শক্তির জন্য সত্যি অতুলনীয়!
ASP/G/0-2
গ্ল্যাক্সোর তৈরী

মহাকাশ, মানুষ, রুটি

দিনেশ দাস

একদিন আকাশের উল্টো দিকে
মহাকাশের মঞ্চ থেকে পৃথিবী শাসিত হবে :
মানুষ ভুলে যাবে পৃথিবীর ঝড়, বৃষ্টি
সূর্যের আলো পড়বে আকাশচারীর পায়ের নীচে
ছায়া পড়বে উপরে তার মাথার দিকে,
সে-ছায়া মিলিয়ে যাবে শূন্যে, মহাশূন্যে।
মহাকাশ যাত্রা যেন সার্কাসের খেলা :
সময়ের মাপে রকেটের কাঁধে সঠিক পা ফেলে
ক্রমশ ওপরে উঠে-যাওয়া,
তারপর ভারমুক্ত হয়ে সূর্যালোকে পরিণত হওয়া।

মহাকাশ-মঞ্চের নীচে ভাসবে ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবী :
তখন সময়, ঘণ্টা হবে অর্থহীন
ঘড়িগুলো অকারণে টিক্‌টিক্ করবে,
গতকাল আগামীকাল শব্দগুলো শোনাবে হাস্যকর,
অবতারেরা পাঁজিপুঁথি নিয়ে হবেন অদৃশ্য,
স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও হয়তো বেকার হয়ে থাকবেন :
এতে কি দূর হবে পৃথিবীর দুঃখ,
মানুষের ভাত-রুটির কান্না!

হয়তো একদিন মানুষ পৌঁছোবে দূরে দূর-গ্রহান্তরে
সেখানে যদি কীট-পতঙ্গও থাকে
তারা প্রথমে অবাক হয়ে অন্য গ্রহের জীবকে দেখবে
শেষ পর্যন্ত চিনবে তার খাবার,
হয়তো খুঁটে খুঁটে খাবে
মানুষেরই চোখের জলে গড়া রুটির গুঁড়োগুলো।

জানি, মানুষ একদিন এত উঁচুতে উঠবে
যেখানে দেশ-কাল স্থির—
হরগৌরীর মত এক দেহে লীন :
সেখান থেকে সে কি দিতে পারবে এক টুকরো ছায়া
সেই চাষীর মাথার উপর
যে মেরুদণ্ডে ক্লান্ত সূর্যকে টেনে নিয়ে চলেছে?
সে কি দেবে মহাশূন্য হতে এক মুঠো সোনালী বৃষ্টি
মরুভূমির মত শুকনো মাটিতে
যেখানে অঙ্কুরিত হয় প্রীতির ফসল?
মানুষের ভালবাসা কবে এক বাটি দুধ হয়ে
চাঁদের মত আকাশে ভাসবে!

স্বদেশী আন্দোলনের কথা

চিত্তরঞ্জন দাশ

আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক মুষ্টিমেয় লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবনসঞ্চার যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশ-ব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায়, এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতির অধঃপতনের অঙ্গমাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে এবং এ কথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কিন্তু এই যে নবজীবন সঞ্চারিণী আশা যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্যবিনাশের কারণ। ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদিগকে চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না। ইহা কি সমস্ত বাঙালী জাতির শ্রবণবিবরে এক আশ্চর্য অপূর্ব স্বাধীনতা সঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না? আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মূলত বাঙালী জাতির আত্মনির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই কারণেই আমার দৃঢ় ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে।

জগতের ইতিহাস বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে অন্য কোনো জাতি হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তি আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হইবে। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না।

> দেশবন্ধুর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁহার একটি অপ্রচলিত রচনা, তাঁহার রাষ্ট্র চিন্তার দ্যোতকরূপে মুদ্রিত হইল। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রে (পৌষ ১৩১২) প্রকাশিত হইয়াছিল; তৎপূর্বে ১৬ অক্টোবর (১৯০৫) 'দার্জিলিং হিন্দু হলে পঠিত' হয়।
>
> শ্রীপুলিনবিহারী সেন প্রবন্ধটি আমাদের সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। —সম্পাদক, দেশ।

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখা- ... হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ... আমাদিগের সকল দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ ...ব এবং আমাদিগকে হাতে ধরিয়া ...ষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে, একদিন আমরা ইংরাজের বাক্‌চাতুরিতে মুগ্ধ হইয়া শুধু মাত্র তাহার মুখের কথার উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম।

তাহার যথাযথ কারণও ছিল। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানাকারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চির পুরাতন চির-শক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম, কেবলমাত্র মৌখিক মন্ত্রের আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিবশক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপরদিকে যে অপূর্ব প্রেম-ধর্মবলে মহাত্মা চৈতন্য সমস্ত বাংলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবল মাত্র মালা ঠোকাইতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল; আর আমাদের সমগ্র ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম-শূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্তিময় জ্ঞান গৌরব কেবল মাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী; বাঙালীর জীবনের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্মে কি জ্ঞানে বাঙালী তখন সর্ববিষয়ে প্রাণ-হীন মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, বাঙালীর বলবীর্য পর্যন্ত তখন নিতান্ত কুঠারের মত সমস্ত বাঙালী জাতির গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে ব্যস্ত ছিল।

এমন সময়ে—সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিকবেশে আগমন করিয়া আমাদেরই জাতীয় দুর্বলতাকে আশ্রয় করিয়া দুই একদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন-পূর্বক আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দান করিল, আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্বলতানিবন্ধন আমরা শুধু ইংরাজের রাজত্বকে নয়, সমগ্র ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই দুর্বলতার জন্যই বোধ হয় আমাদের চক্ষু ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সম্যকভাবে ধারণ করিতে পারে নাই। আমরা একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। অন্ধকারাক্রান্ত বিভ্রান্ত পথিক

যেমন বিস্ময় ও মোহবশত আপনার পদ-প্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহু দূরে দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হয়; আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্মকর্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া আমাদের নিজের সাহিত্যের প্রতি একেবারে দৃকপাত না করিয়া, আমাদের নিজের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ধাবমান হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের ইতিহাস আমাদের ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কোনো নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমরা মোহ-মুগ্ধ হইয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজেরই জাতীয় জীবনের প্রতিমা, আমাদের নহে; ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজেরই জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারে, তাহার সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের কোনো সম্বন্ধ নাই; ইংরাজের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে আমাদের মাতার দৈন্য কিছুতেই ঘুচে না ও ইংরাজের গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুতেই নিবারণ হয় না, ইহা অতি সোজা কথা—অত্যন্ত সরল সত্য; কিন্তু সমস্ত জাতীয় জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হইলে বোধ হয় এমনই করিয়া অতিশয় সরল সত্য অত্যন্ত দুর্বোধ হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজের ক্ষমতা দেখিয়া আত্মজ্ঞান হারাইতে ছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়তই প্রতারিত হইতেছিলাম, ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। যে Proclamation লইয়া আমরা এত গর্ব করি, এবং কথায় কথায় যাহার দোহাই দেই, তাহার মধ্যে যেকোনো অন্ধকার কোণে আমাদের সকল আশা ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য "So far as it may be" এই বাক্যের শাণিত ছুরিকা লুক্কায়িত ছিল, তাহা একেবারে অনুভব করিতে পারি নাই। Curzon বাহাদুরকে ধন্যবাদ দি, তিনি সেদিন আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন—তস্করের গুপ্ত ছুরিকা সেই অন্ধকার কোণ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আমরাও ভালো করিয়া Proclamation-এর গূঢ় তত্ত্ব মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। জগদীশ্বর আমাদের সহায় হউন, এই সত্য জ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

আর আমরা ভুলিয়াছিলাম ইংরাজের Pax Britanica-র ইংরাজ রাজনীতি হইতে উৎপন্ন এক [illegible] অনির্বচনীয় মহাশান্তি। এই মহাশান্তির প্রসাদে আমরা গ্রামে গ্রামে গোয়েন্দা-পুলিশ পাহারা দেখিতে, শহরে শহরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শান্তি রক্ষা [illegible], জেলায় জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের দল আমাদের শান্তির উপায় অন্বেষণ করিতে সদা সর্বদা ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং ডিভিসনে ডিভিসনে কমিশনারবৃন্দ এই অদ্ভুত শান্তি পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছেন, আর রাজধানীতে—কখনও বা শৈলশৃঙ্গে—ইঁহাদের সকলের হর্তাকর্তা বিধাতা অতিশয়শ্রমক্লান্ত বড় ভাবনা-কাতর ঘর্মাক্ত-কলেবর আমাদের ছোটোলাট বাহাদুর দ্বিতীয় নেপোলিয়নের ন্যায় নৃত্যসভায় পর্যন্ত সংগীতের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে কি করিয়া যে এই বাঙালী জাতির শিরায় শিরায় এই মহাশান্তির আফিম প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, সেই ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছেন। হায়রে ব্রিটিশ রাজত্বের শান্তি, হায় আমরা অভাগা! আমরা এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে, এই দেশব্যাপী নিষ্ক্রিয় শান্তি আমাদের জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিবার উপায় মাত্র। ইহা যদি শান্তি হয়, ইহা যে মৃত্যুর শান্তি, ইহার উপরে কোনোদিন কোনো কালে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না।

আজ ভগবৎপ্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণজন্মায়রূপী এই মহামায়া-কুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছে। এই নবোন্মেষিত জাতীয়ত্বের প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর—পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তর-বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণনেত্রে ও প্রার্থনা-পূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরাজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তমরূপে চুষিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয়, এমন কিছুই দিবে না। আর বিধাতা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি না দাঁড়াইতে পারিলে কোনোদিন আমাদের মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে না। সেইজন্যই আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই নব আন্দোলন আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, কারণ ইহাই আমাদের আত্ম-নির্ভরের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ।

কিন্তু আমাদের চিরকালের ভাগ্যহীনতা এইক্ষণেও আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। আমাদের দেশে এক সময় তর্কশাস্ত্র আশ্চর্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং যদিও এখন আর তর্ক-শাস্ত্রের সেই উন্নত অবস্থা নাই, তথাপি আমাদের দুরদৃষ্টবশত নিষ্ফল তার্কিকের কোনো অভাবই পরিলক্ষিত হয় না। উপহাস-রসিকেরও প্রাদুর্ভাব কম নহে। তাহাদের শুষ্ক স্বদেশপ্রেম-বর্জিত হৃদয় হইতে দুই একটা শাণিত বাক্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অতিশয় বিজ্ঞতার ভান করিয়া আপনার সুখে অস্থির হইয়া উঠেন। কিন্তু সে তর্ক ও সেই উপহাস মাতার আহ্বানকে কিছুতেই ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। আজিকার দিনে এই দেশ-ব্যাপী আন্দোলনে শত-লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দে মাতরং' ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্তই হতভাগ্য! আর যে ডাক শুনিয়াছে, কিন্তু শুনিয়াও আপনার ছোটোখাটো স্বার্থগুলিকে সম্মুখে ধরিয়া আপনার মস্তিষ্ক হইতে আকৃষ্ট বৃথা তর্করাশি এবং আপনার করুণাবর্জিত হৃদয়জাত শুষ্ক তুচ্ছ উপহাসের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সে সরকারী উকিলই হউক, বা ছোটো কি বড়ো রকমের সরকারী জজ্‌ই হউক, কি সামান্য কেরানি কি সামান্যতর ক্লার্কই হউক—সে মাতা ও বিধাতার অপমান করিতেছে—সে মাতৃদ্রোহী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (১৮৭০-১৯২৫)

গত ৫ নভেম্বর দেশবন্ধুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীরমেশ পাল নির্মিত ৮ ফুট উঁচু ব্রোনজমূর্তিটি আকাশবাণীভবন ও রাজভবনের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়

—ঈশ্বরদ্রোহী। তুষানলেও তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

তার্কিকেরা ও উপহাস-রসিকেরা যাহাই বলুক, তাহাতে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার কোনো কারণ নাই। আমরা মায়ের ডাক শুনিয়া অগ্রসর হইয়াছি, আমরা কি দুটি নিষ্ফল তর্ক ও নিষ্ফলতর উপহাস শুনিয়া ফিরিয়া যাইব? বিধাতার অমোঘ বাণী আমাদের অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে, আমরা শত তর্ক শত যুক্তি শত সহস্র উপহাস অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া বিধাতার বাণীকে শিরোধার্য করিয়া বিধাতৃ-নির্দেশ

পথে অগ্রসর হইব। আর অধিক পরিষ্কার দেখিতেছি যে, অচিরে আমাদের এই নব আন্দোলন ফলবান হইয়া তার্কিককে লজ্জিত করিবে ও উপহাস-রসিককে উপহাস-যোগ্য করিয়া তুলিবে।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে Boycott বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন; সুতরাং ইহার উপর আমাদের জাতীয় উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্বদেশীয়তা স্বদেশ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, তদ্দ্বারা জাতীয় জীবন পুষ্টিলাভ করিবে। ইঁহারা স্বদেশী আন্দোলন চান, কিন্তু Boycott চান না। ইহা শুধু বুঝিবার ভুলমাত্র আর কিছুই নহে। আমি কখনই স্বীকার করিব না যে Boycott বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। Boycott ও স্বদেশীয়তা এ দুই-ই স্বদেশ-প্রেম-ভাবাপন্ন। বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় বলিতে গেলে Boycott পূর্বরাগ, স্বদেশীয়তা মিলন। মাতার আহ্বান শুনিয়াছি বলিয়াই বিদেশী বিলাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কুলটা রমণীর ন্যায় বিলাতী বিলাস তাহার শত সহস্র ছলা-কলা বিস্তার করিয়া তাহার অধরের হাস্যে, তাহার নয়নের ভঙ্গিমায়, তাহার সুন্দর হস্তের কোমল পরশে আমাদিগকে একেবারে মোহমুগ্ধ করিয়া তাহার বাহুবন্ধনের মধ্যেই আমাদের সুখনিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। সেই বাহুবন্ধন হইতে আমাদিগকে একেবারে মুক্ত না করিলে কেমন করিয়া আমাদের সেই চিরদেবশীলা চির-কল্যাণময়ী মাতা—যিনি এতদিন ধরিয়া তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে কল্যাণ প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার অকৃতজ্ঞ সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—তাঁহার পবিত্র কল্যাণময় প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিব? [illegible] এই যে বিলাতীদ্রব্য বর্জন করিতেছি, ইহাতে কি প্রতিদিন আমরা সংযমশিক্ষা করিতেছি না? সংযম ব্যতীত কখনও কি প্রেম স্থায়ী হয়? প্রতিদিনই কি বিলাতী জিনিস বর্জন করিবার সময়ে স্বদেশের কথা স্মরণ হয় না? প্রতি প্রভাতেই কি আমাদের কোনো জিনিস ক্রয় করিবার আবশ্যক হইলে স্বদেশের কথা ভাবি না। এই জিনিস ক্রয় করিব, কারণ ইহা স্বদেশজাত, ইহা আমরা কিনিব না, কারণ ইহা আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় নাই; প্রতি-দিন আমরা এইরূপ ভাবিয়া থাকি এবং প্রতি দিনই আমাদের এই বর্জনের মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম সজীব হইয়া উঠিতেছে।

আবার অর্থশাস্ত্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে Boycott নিতান্ত আবশ্যকীয়। ইংরাজী অর্থশাস্ত্রে যাহাকে Production বলে, তাহার জন্য demand আবশ্যক। আমরা বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিয়া সেই demand-এর সৃষ্টি করিতেছি। একবার যদি Boycott-এর দ্বারা আমরা স্থায়ী

demand দাঁড় করাইতে পারি, আমাদের দেশের লুপ্ত ও নষ্ট বাণিজ্য মাথা তুলিবেই তুলিবে।

আমাদের দেশে আর এক দল আছেন—যাঁহারা Boycott চান, কিন্তু স্বদেশীয়তা চান না। তাঁহারা বলেন Boycott একটা রাজনৈতিক চাল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু স্বদেশীয়তা অর্থশাস্ত্রবিরুদ্ধ, আমরা কি জগতের সহিত আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দিব? ইত্যাদি। হে অর্থশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত! আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষ আগে না তোমার অর্থশাস্ত্র আগে, মানুষ বড় না তোমার অর্থশাস্ত্র বড়? আগে, আমাদের মানুষ হইতে দাও। আমরা মানুষ হইলে জগতের সহিত আদান-প্রদান করিব। আগে আমাদিগের ক্ষুধার অন্ন লজ্জানিবারণের বস্ত্র নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে দাও। এই যে প্রতিদিন Manchester-জাত ইংরাজের পদাঙ্কিত নামাবলী গাত্রে ধারণ করিয়া মানব-কলঙ্কস্বরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এই মহালজ্জা হইতে জাতীয় জীবনকে উদ্ধার কর। তার পর যখন ধীরে ধীরে এই আত্মনির্ভরের পথ অবলম্বন করিয়া জাতীয় চেষ্টায় জাতীয় শক্তি ও প্রভাবে বিশ্বমানবের ক্রোড়ে আমাদের বিধাতৃ-নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিব, তখন জগতের সহিত আদান-প্রদান জাতীয় জীবনকে পুষ্ট করিবে—তাহাতে লজ্জার কারণ থাকিবে না।

আর বৃথা তর্ক করিবার সময় নাই। এই যে স্বদেশী আন্দোলন ইহাকে যেমন করিয়াই হউক জাগাইয়া রাখিতে হইবেই হইবে। ইহারি উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে এমন অনেক উপহাসরসিক আছেন, যাঁহারা বলেন, "তোমরা কি করিতে চাও?—তোমরা কি Company-র রাজত্ব উল্টাইয়া দিবে?" এ কথার উত্তর অতি সহজ। আমরা আর কিছু চাই না—আমরা আমাদিগকে মানুষ করিতে চাই। ইংরাজের সহিত আমাদের শুধু রাজাপ্রজা সম্বন্ধ। ইংরাজের আইন গণ্ডির বাহিরে, ইংরাজের সহিত আমাদের যে ক্ষেত্রে সম্বন্ধ, তাহারও বাহিরে বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা সেইখানে আমাদের মাতার বিজয়-নিশান উত্তোলিত করিব। আমরা সেইখানে বাঙালীর কলঙ্ক ঘুচাইব। আমরা সেইখানেই আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিব। তারপর যে অনন্ত মহান পুরুষ আপনাকে সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, সকল মানবের মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে, সকল জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি কিভাবে কিরূপে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিবেন, তাহা তিনিই জানেন—শুধু তিনিই জানেন।

আন্তরিকতা
ও উষ্ণতায়
ভরে দিন
Dhruva
fingering
ধ্রুব
উল দিয়ে
ধ্রুব হচ্ছে একমাত্র উল যার সবরকম বুনট ও রঙের উলের গায়ে উলমার্ক আছে। উলমার্ক হচ্ছে কড়া উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ অনুসারে তৈরি ১০০% পিওর উলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক প্রতীক।
ধ্রুব রকমারি আকর্ষণীয় রঙের হয়—সর্বদা পাওয়া যায়। কখনও ফিকে হয়না। অনেকদিন টেঁকে। সহজেই ধোয়া যায়।
ধ্রুব উলেন মিলস প্রাঃ লিঃ, বম্বে
সোল সেলিং এজেন্টস্:
জে. অ্যাণ্ড পি. কোটস্ (ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট লিমিটেড
বম্বে • দিল্লী • কানপুর • কোলকাতা • গৌহাটি •
মাদ্রাজ • হায়দ্রাবাদ • ব্যাঙ্গালোর • কোরাট্টি (কেরালা)
PURE NEW WOOL

॥ তিন ॥

ফিরতি পথে কানন আবার সাথী হয়। বন্ধুকে একান্তে পেয়ে বলে, "এতদিন মৌন থেকেছি বলে তোমার কাছে মাফ চাইছি, ভাই।"

"মাফ চাইবার কী আছে?" রত্ন আশ্বাস দেয়।

"তোমাকে আগে থাকতে বলতে পারতুম। কিন্তু তা হলে তোমার প্রথম দর্শনের সমস্ত রোমান্স মাটি হতো। সেই জন্যে জ্যোতিদা আমাকে বারণ করে দিয়েছিলেন। আশা করি রোমান্সটা সানন্দে উপভোগ করেছ।" কানন অকপটে বলে।

"রোমান্সের পরপৃষ্ঠায় ট্র্যাজেডী। উপভোগ করতে পারে কেউ?" রত্ন অতি দুঃখে বলে। বিষাদ গোপন করতে পারে না।

"না, না, ট্র্যাজেডী নয়। ট্র্যাজেডী হতে পারত। হতে হতে হলো না। মনে কর পারুলদি যদি ওই আবিষ্কারটা বেগমপুরে না করে রেঙ্গুনে করত তা হলে কি সেই মুহূর্তে ইরাবতীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত না? পারতে কি তোমরা তখন ওকে বাঁচাতে? তোমরাও পড়ে যেতে বিপদে। কেউ বিশ্বাস করত না যে তোমাদের একজন ওর মাতৃত্বের জন্যে দায়ী নয়। এক তাতাদা বাদ।" কানন বলে ভীত স্বরে।

রত্নও ভয় পেয়ে যায়। "তা হলে সত্যি ট্র্যাজিক হতো তা মানছি, ভাই কানন। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই।"

ও-কথা ও ছেলেবেলায় মার কাছে শিখেছিল। ওই ছিল তাঁর জীবনদর্শন।

"ভগবান আছেন কি না তাই আমি জানিনে। থাকলে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে আমি পঞ্চমুখ। পঁচিশে মে তোমাদের রেঙ্গুন-যাত্রা একটা অযাত্রা হতো, যদি না-জেনে না-বুঝে তোমরা তিনজনে মিলে আঁধারে ঝাঁপ দিতে।" কানন মন্তব্য করে।

"কিন্তু ওটা তো আমার আইডিয়া নয়। জ্যোতিদার আইডিয়া। ওর মতে গোরীকে সরানো জরুরী। না সরালে প্রকৃতি যা চাইত তাই হতো। মানুষ পরাস্ত হতো। আহা, বেচারি কতকাল ধরে প্রতিরোধ করে এসেছিল!" রত্ন আপসোস করে।

"প্রকৃতিই জয়ী হলো। কিন্তু আমি হলে বলতুম, প্রকৃতি নয় নিয়তি।" কানন বলে।

"নিয়তি আমি মানিনে। প্রকৃতিই মানি। কিন্তু প্রকৃতি জয়ী হলো এটা আমি স্বীকার করব না। গোরী আমার চোখে অপরাজিতা।" রত্নর আনন উদ্ভাসিত হয়।

"তা হলে আর কী। ট্র্যাজেডী ভেবে কাতর হচ্ছ কেন!" কানন সান্ত্বনা দেয়।

"না, কাতর হব কেন? ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই।" রত্ন পুনরুক্তি করে।

চলতে চলতে কানন বলে "তুমি যদি চার পাঁচ দিন আগে ওর সঙ্গে দেখা করতে। তা হলে দেখতে কত তেজ ও মেয়ের। কী স্পিরিট। সে পারুলদি কি আর আছে। যাকে দেখলে সে ওর ছায়া। বেচারি একেবারে চুপসে গেছে।"

রত্নর চোখে গোরীর যে রূপ আঁকা হয়ে গেছে তাতে আলো আছে, আগুন নেই। মাত্র চার পাঁচ দিনের মধ্যেই এত বড়ো তফাতটা ঘটেছে। ও কী করে জানবে!

"লেডী ডাক্তার যেদিন সদর থেকে এসে কনফার্ম করে যান তার আগে থেকেই ওর ভাবান্তর লক্ষ করা যাচ্ছিল। আমি সে সময় ছিলুম না। শোনা কথা। কনফার্ম করার একদিন পরেই জ্যোতিদাকে খবর দেওয়া হয়, তার পরের দিন আমাকে। কখনো কেউ শুনেছে সন্তানসম্ভাবনাকে এত ভয়? যেখানে আপনার স্বামীর। পরপুরুষের তো নয়।" কানন তাজ্জব বনে যায়।

"ও যে ওর স্বামীকেই পরপুরুষ জ্ঞান করে। ও যে কুমারী।" রত্ন সলজ্জভাবে বলে।

"হা হা। হো হো।" কানন হেসে অস্থির হয়।

"তোমার বিশ্বাস হয় না?" রত্নর খটকা বাধে।

"বিশ্বাস হবে না কেন? সেই সঙ্গে বেশ কিছু গোলমরিচ মিশিয়ে দিতে হয়। আর লবণ।" কানন তামাশা করে।

"তুমি দেখছি বদলে গেছ। আগে তো সরলভাবে বিশ্বাস করতে।" রত্ন অনুযোগ জানায়। তার বন্ধু তো আগে এমন ছিল না।

"তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ যে আমি তাতাদার সঙ্গেও মিশি। তাঁকেই বা আমি অবিশ্বাস করতে যাই কেন, যখন তিনি বলেন ওটা ন্যাকামি?" কানন কৈফিয়ত দেয়।

"ন্যাকামি!" রত্নর মনে লাগে।

"আমি হলে বলতুম বোকামি। আজকাল কতরকম প্রিকশন হয়েছে। ওই লেডী ডাক্তারকেই আগে কল দিলে উনিই শিখিয়ে দিয়ে যেতেন।" কানন ইঙ্গিত করে।

রত্ন রাগ করে বলে, "তুমি দেখছি সীনিক হয়ে উঠেছ।"

"আরে, না, না। আমি জানি কোনটা কার পক্ষে স্বাভাবিক। পারুলদি যোগিনী ঋষিণী নয়। সেই জন্যেই তো ওকে সময় মতো সরানোর কথা উঠেছিল। আর ওর স্বামীকেও ও ঠিক পরের স্বামী মনে করে না। সেই ভয়েই তো ও মলো। তাতাদা আবার বিয়ে করবেন বলে ভয় দেখিয়ে-

ছিলেন। ফোটো দেখছিলেন পাত্রীদের।" কানন বর্ণনা করে।

"থাক, ভাই, আর ভালো লাগছে না শুনেতে।" থামিয়ে দেয় রত্ন।

অন্যান্য দু'চার কথার পর গোবীর প্রসঙ্গ পুনরায় ঘুরে ফিরে আসে। কানন বলে, "ও সত্যি তোমাকে ভালোবাসে। তুমি ভিন্ন আর কেউ ওকে ওর নিজের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না। তুমিই হয়তো একদিন ওকে ওর স্বামীর অধীনতা থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু মুক্ত হলেই যে ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে এ কথা কি ও তোমাকে বলেছে, না তুমি ওকে বলেছ? মুক্তি যে মিলনান্ত হবেই এমন কোনো কথা আছে কি?"

রত্ন স্বীকার করে যে, তেমন কোনো কথা নেই। কেউ কাউকে তেমন কোনো কথা বলেনি। মুক্তির পরে কী হবে সেটাকে মুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছে।

"পারুলদির সঙ্গে কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে। ওর সঙ্গে কথাও হয়েছে এই নিয়ে। ও বিবাহ নামক বন্ধনটার হাত থেকেও মুক্তি চায়, কেবল স্বামীর অধীনতার হাত থেকে নয়। ও আবার

নতুন করে বিয়ে করবে বলে আমার মনে হয় না। তোমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা ও নিজেই জানে না। আপাতত তোমরা হবে কমরেড। কিন্তু কমরেড যারা হয়, তারা একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। যেমন ইউ-রোপের কমিউনিসটরা। শুনেছি এদেশেও কমিউনিস্ট দেখা দিয়েছে।" কানন ভয়ে ভয়ে বলে নিচু সুরে।

"হাঁ, সেদিন ভ্যানগার্ড বলে একটা পত্রিকা দেখলুম। হাতে হাতে ঘুরছিল। কিন্তু খুব গোপনে।" রঞ্জুও তেমনি শঙ্কিত।

"পারুলদি কিন্তু কমিউনিসট নয়। ও হতে চায় ঝাঁসীর রানী। রানী যা অসমাপ্ত রেখে গেছেন ও তাই সারা করবে। ও কাজে ওর যে কমরেড নেই তা নয়। তুমি যদি হও তবে অধিকন্তু।" কানন তার ধারণা ব্যক্ত করে।

"না, আমি ওর কমরেড হতে পারব না। ঝাঁসীর রানীর অসমাপ্ত কাজ আমার জীবনের কাজ নয়। ও আমাকে ভালো-বাসে। আমি ওকে ভালোবাসি। ওর পরাধীন অবস্থায় পরকীয়া প্রেম আমার সহ্য হয় না। ও যাতে স্বাধীন হয় তার জন্যে আমি ওকে সাহায্য করতে রাজী। স্বাধীন হয়ে ও যদি আমার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কটাকে পূর্ণতা দিতে চায় তা হলে আমি ধন্য হব। আমার মতে সেই পূর্ণতার নাম পরিণয়। লোকচক্ষে যাই হোক না কেন।" রঞ্জু আবেগের সঙ্গে বলে।

"আমার মতেও তাই। তবে লোকে তা মানবে না। মন্ত্র না পড়ে এদেশে কারো বিয়ে হয় না। মন্ত্র পড়াতে তোমার আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু পারুলদি এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য লঙ্ঘন করবে না। কিন্তু গোড়ায় গলদ, ডিভোর্স পেলে তো?" কানন ঘাড় নাড়ে।

"ওদিক থেকে ভাবিনি। তা ছাড়া আমিও স্বাধীন থাকতে চাই।" রঞ্জু বলে।

ঘুরে ফিরে আবার সেই পর্দাপ্রথা মেব প্রসঙ্গই ওঠে। কানন বলে, "ওটা একটা ফলস স্টেপ হতো। কেন যে জ্যোতিদা তোমাকে অমন যুক্তি দিয়েছিলেন! সন্তান-সম্ভাবনার কথা বাদ দিলেও আপত্তির আরো কারণ ছিল। পারুলদি কখনো লক্ষ্মী মেয়েটির মতো লেখাপড়া নিয়ে থাকত না। বাহাদুর শার কবরে গিয়ে রোজ লক্ষ্মী-বাঈকে স্মরণ করত। ওখানেও ওর একটা বাহিনী জুটে যেত। একবার মুক্তির স্বাদ পেলে কি ও দেশের মুক্তির দিকেই ঝুঁকত না? তোমরা কি পারতে ওকে আটকে রাখতে। প্রেমের জন্যে যারা ঘর ছাড়ে পারুলদি তাদের একজন নয়, ওটা তোমার ভুল। ও যদি ঘর ছাড়ে তবে কর্মের জন্যেই ছাড়বে।"

রঞ্জু এর প্রতিবাদ করে না। কে জানে হয়তো কাননের বক্তব্যটাই ঠিক। কিন্তু তাই যদি হয়ে থাকে তবে তো ওটা ইলোপমেন্ট নয়।

"ইলোপমেন্ট!" কানন হেসে ওঠে। "ভাই রঞ্জন, ইলোপ যারা করে তারা দুজনে মিলে করে। তিনজনে মিলে নয়। তিন-জনে মিলে প্রবাসে যাত্রা করলে ওর অর্থ দাঁড়াত ওটা ইলোপমেন্ট নয়। লোকের সন্দেহ দূর হতো। অপর পক্ষে কেউ বিশ্বাস করত না যে তোমরা নিঃস্বার্থ দুটি পুরুষ। অথবা নিষ্কাম।"

রঞ্জু মরমে মরে যায়। এবার প্রতিবাদ করে বলে, "কী অন্যায়! আমরা মনে মনে সংকল্প করেছিলুম যে গোরীকে সম্পূর্ণ প্রোটেকশন দেব। যেমন পরের হাত থেকে তেমনি নিজেদের হাত থেকে। আগে তো ও স্বাবলম্বী হোক, দাঁড়িয়ে যাক, তারপরে যদি আমার সঙ্গিনী হতে চায় তো আমি ওর সঙ্গী হব। সঙ্গী সঙ্গিনী, মনে রেখো। কমরেড নয়। কমরেড হয় তো জ্যোতিদা।"

"বুঝেছি, তোমরা মনে মনে ভূমিকা ভাগ করে নিয়েছিলে। তুমি হতে সঙ্গী, জ্যোতিদা হতেন কমরেড। অবশ্য গোড়া থেকেই নয়। মাঝখানে যেত একটা সময়ের ব্যবধান। ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে লায়েক করে দেওয়া হতো। চমৎকার একটি রূপ-কথার মতো শুনতে। আমেরিকায় ওরকম

হয় কি না জানিনে। [illegible] পুরাতন [illegible] মধ্যে হতো। জ্যোতিদার দুটি গরু, কিনা। কোন্ গরুর শিক্ষা কে জানে! কিন্তু সেটা যে ভারত। আর মেয়েটি যে পারবেদি। আর তুমিও যে জ্যোতিদার মতো সংস্কারমুক্ত তা নয়। তুমি একটি রোমান্টিক প্রেমিক। শেলীর দেশের। অবিকল ইংরেজী কবিতার থেকে নেওয়া। কিন্তু ওরাও বিবাহিতা নায়িকাকে ভরায়।" কানন মন্তব্য করে।

॥ চার ॥

জীবনদেবতা যা করেছেন ভালোর জন্যেই করেছেন। তবু শ্রেয় কখনো প্রেয়র পরিবর্ত হতে পারে না। এ যেন মিষ্টিমুখ করতে ডেকে পথ্য তিক্ত কষায় খাওয়ানো।

বাড়ি ফিরে গিয়ে বন্ধু কোনো কাজে মন দিতে পারে না। মুখটা যেন তেতো হয়ে রয়েছে। ও কি কোনোদিন প্রেমে পড়তে চেয়েছিল? ও কি কোনোদিন বলেছিল, আমার সঙ্গে ইলোপ কর? না। ওর প্রাণে একপ্রকার শঙ্কা ছিল। নারীকে ও গোরীকে।

একেই কি বলে গাছে উঠিয়ে দিয়ে

মই কেড়ে নেওয়া? বিশ্বাস করা শক্ত যে জীবনে দ্বিতীয়বার এমন সুযোগ আসবে।

কিন্তু ওটা কি সুযোগ না দুর্যোগ? ঘর থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ বর্তে যায় তাকে বরঞ্চ দুর্যোগই বলতে হয়।

দেখতে দেখতে গোরীর চিঠি এসে পড়ল। চিঠিতে সে একবার তার স্বামীর উপর রেগে টং। একবার লেডী ডাক্তারের উপর। ও বিশ্বাস করতে পারছে না যে ওর সত্যি কিছু হয়েছে। ওর সন্দেহ লেডী ডাক্তার যশোবাবুর টাকা খেয়ে ওঁর মন রাখা কথা বলেছে। ও এখন ধুয়ো ধরেছে যে ওকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে।

"আমি যদি কলকাতা যাই তুই আসবি তো? চেষ্টা করছি যাতে পাঁচশে মে তোর সঙ্গে দেখা হয়। রেঙ্গুনযাত্রার আশা নেই যদিও। এমন অনিশ্চিত অবস্থায় কি শুভযাত্রা হয়? বেঁচে আছি এইটেই আমাকে প্রতিদিন আশ্চর্য করছে। কে বলে ভগবান আছে! নেই। নেই। সব মিথ্যে। সব শূন্য।"

পরে ওর আরেক রকম মেজাজ। "আমি গোড়া থেকেই বলেছি যে দুনিয়ায় আরো ঢের ঢের জায়গা আছে। রেঙ্গুন। সেখানকার লোক পচা মাছ খায়। ওই যে বলে, বর্মার ঙাপ্পিতে বাপ রে কী গন্ধ!" ও গন্ধ আমি এখানে বসেই নাকে শুঁকতে পাচ্ছি। তোমরা অন্য কোনো জায়গার সন্ধান কর। যেখানকার মানুষ অমন ম্লেচ্ছ নয়।"

রঞ্জুর হাসি পায়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও হয়। কে বলবে যে গোরী মেয়েটি সীরিয়াস! মুক্তি চায় যে তার কাছে রেঙ্গুনের মতো মুক্ত নারী আর কোথায়? বর্মার মেয়েরা ভারতের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী মুক্ত। বর্মায় না গিয়ে বিলেতে গেলেও তো সেই একই প্রশ্নই উঠবে। সেখানকার মানুষও তো ম্লেচ্ছ। বীফ ওদের খোরাক।

কিন্তু লেখে না ওসব কথা গোরীকে। আশা দেয় যে কলকাতায় দেখা করবে। এমনিতেই ও কলকাতায় যেত ললিতকে বিদায় দিতে। সে জাপানযাত্রী।

চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ ভিড়েছে দেখে ললিতের যা আনন্দ রঞ্জুর তার চেয়েও বেশী। ওটা যেন ওর জন্যেই ওসাকা থেকে এসেছে। ওকে রেঙ্গুনে নামিয়ে দিয়ে জাপানে ফিরে যাবে। ওর জন্যে আর ওর প্রিয়ার জন্যে আর ওদের দু'জনার বন্ধুর জন্যে। কিন্তু কী আপসোস। জ্যোতিদা ইতিমধ্যে প্যাসেজ ক্যানসেল করে দিয়েছে।

ললিতকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানানোর পালা শেষ হয়নি, এমন সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ি কোনখান থেকে এসে দাঁড়ায়। দুই পাল্লার মাঝখান থেকে উঁকি মারে একখানি মুখ। ও কে! গোরী। রঞ্জু তো হতবাক। আর ললিতের আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি। ওর বৌও ছিল ওই গাড়িতে। তা ছাড়া আরো কয়েকজন পর্দানশীন।

রঞ্জু তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সাহস হয় না যে এগিয়ে গিয়ে গোরীর সঙ্গে আলাপ করে। লোকচক্ষে ও কে। ললিতের একজন সহপাঠী বই তো নয়। এমন সময় নবনীর আবির্ভাব। "আরে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? সন্ধ্যার আকাশের তারা!"

জাহাজটা রাত্রে একসময় ছাড়বে। ততক্ষণ কেউ অপেক্ষা করবে না। ললিতকে বলা হয়েছে জাহাজেই ডিনার। সে ঘোড়ার গাড়ির কাছে গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে। গোরীর সঙ্গেও। কিন্তু রঞ্জুকে ডেকে নিয়ে যায় না।

তখন ললিতই করুণা করে ওকে নিয়ে গিয়ে যথারীতি পরিচয় করিয়ে দেয়। যেন অপরিচিতার সঙ্গে অপরিচিতের পরিচয়।

অথচ এটা তো ওদেরই স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী।

অত লোকের সামনে বেশী কথা বলা যায় না। গোরী বলে, "আপনাদের সাতভাই চম্পার সব খবর আমার জানা। আপনিও আমার অচেনা নন। ললিত আমার কাছে প্রায়ই আপনার গল্প করত। আচ্ছা, আপনার কি সময় হবে কাল দুপুরে? খাবেন আমাদের এখানে?"

ললিতকেও আগে থেকে তালিম দেওয়া হয়েছিল। সে বলল, "সাত ভাই চম্পার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমরা দুজনে মিলে আলোচনা করলে আমিও সুখী হব।"

নবনীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার চিন্তা ছিল রঞ্জুর মনে। ও এমন লাজুক যে পরের বাড়ি যেতে ভয় পায় একজন সঙ্গী না হলে। কিন্তু গোরীর কটাক্ষ থেকে অনুমান করে যে, সাক্ষাৎটা শুধু ওদের দুজনাতে। নবনীকে কেউ পরিচয় করিয়ে দিল না গোরীর সঙ্গে। যদিও ওরা অপরিচিত নয়। পর্দানশীনদের গাড়ির দিকে ঘেঁষতেই সাহস হলো না নবনীর।

গোরীদের গাড়ি চলে যাবার পর নবনী বলে রঞ্জুকে, "ভদ্রমহিলাটি কে, বল তো? ললিতের কেউ হন?"

রঞ্জু ওর কানে কানে বলে, "শ্রীমতী।"

রঞ্জু ও শ্রীমতীর ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে, এ সম্বন্ধে নবনী একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিল না। ও হয়তো মূর্ছা যেত যদি শুনত যে ওই জাহাজেই ওরা পালাতে যাচ্ছিল।

"আমাকে কেন আলাপ করিয়ে দিলে না, ভাই?" নবনীর খেদ।

"আমি আলাপ করিয়ে দেবার কে? উনি তো ললিতের আত্মীয়। আমার কেউ নন। আর তুমি যে একজন বিবাহিত পুরুষ। তোমার স্ত্রী শুনলে কী মনে করবেন?" রঞ্জুর টিপ্পনী।

"হুঃ! উনি বিবাহিতা নারী নন! ও'র স্বামী শুনলে তোমার উপর কিছু মনে করবেন না!" নবনীর পরিহাস।

রঞ্জু এর পর ধরাছোঁয়া দেয় না। নবনী যাতে জানতে না পায় যে ওরা দু'জনে ওই জাহাজে করে পালাবার কথা ভেবেছিল। জানতে পেলে নবনী অনুমোদন করত না।

দুই বন্ধু পরস্পরকে অসীম শ্রদ্ধা করত। ওদের প্রীতির সম্পর্কও নিখাদ। কিন্তু নবনীর মতে বিবাহিত নারীর সঙ্গে সাহিত্যিক সহযোগিতা যদিও প্রগতির লক্ষণ তার চেয়ে একটি পা এগিয়েছ কি মরেছ। নবনী মরতে চায় না, তার বন্ধুকেও মরতে দেবে না। হিতোপদেশ দিয়ে রক্ষা করবে। মেয়েটি যে দুঃখিনী, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহিতা ও বন্দিনী, নবনীর কাছে এ যুক্তি মূল্যহীন। সে নিজেও তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহিত ও গুরুজনের দ্বারা শাসিত, তা বলে কি বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবে? না পরকীয়া প্রেমে পড়বে।

নবনী তার অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে। তার স্ত্রীও তাই। সুখে না হোক স্বস্তিতে আছে ওরা। সুখেই বা নয় কেন? নবনী বলত, "প্রেমে পড়ে কেউ কখনো সুখী হয়নি। প্রেম নয় সুখের জন্যে। ওর স্বাদই আলাদা।"

রঞ্জুর এখনো সে শিক্ষা হয়নি। ওর ধারণা প্রেমেই পরম সুখ। প্রেমে যারা পড়েনি তারা সুখ বলতে যা বোঝে তা নিতান্তই গার্হস্থ্য সুখ। গার্হস্থ্যের উপর সমাজ দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সঙ্গীত বা কাব্য, কাহিনী বা নাটক যদি দাঁড়ায় তবে তার বাড় থেমে যায়। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ যেটুকু হয়েছে সেটুকু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের জন্যেই। ইংরেজী সাহিত্য ওর তুলনায় শতগুণ বিকশিত।

সাতভাই চম্পার দৃষ্টি যদিও ইংরেজী বা কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যের উপরে তবু ওদের পদক্ষেপ তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার মতো নয়। বদ্ধ জলাশয়ে স্নান করে এরা সমুদ্রের গান লিখবে। নবনী এদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত, সংযত, শুদ্ধশীল অথচ লিপিকুশল। শুধু তাই নয় সৌন্দর্যের উপরেও তার একটা সহজাত অনুরাগ। প্রকৃতিটিও উদার। কিন্তু সমাজকে ঘাটাতে চায় না। নিরাপত্তা আগে। সমাজ যাকে যা দিয়েছে তাই নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এই হচ্ছে নবনীর সামাজিক দর্শন। স্বামী বা স্ত্রী হাজার অসুখী হলেও বিবাহ হচ্ছে পবিত্র এক বন্ধন। তার হাত থেকে মুক্তি চাইতে নেই। তবে তারই ভিতরে থেকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দাবি করা মন্দ নয়। শ্রীমতী যদি চলাফেরার স্বাধীনতা, আলাপ করার স্বাধীনতা চান সে সমর্থন করবে। দেশের জন্যে কাজ করার স্বাধীনতা চান তো তাও সমর্থনযোগ্য।

"আমার মনে পড়েছে, তুমি তো ললিতের বিয়েতে ওকে দেখেছিলে।" রঞ্জু বলে।

"হ্যাঁ, উনিও আমাকে দেখেছিলেন। সেই জন্যেই তো চেয়েছিলুম আলাপটা ঝালিয়ে নিতে। সেবার কথাবার্তা বিশেষ কিছুই হয়নি। যেই শুনলেন যে আমি রঞ্জু নই অমনি নমস্কার করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।" নবনী বলে।

"চেহারায় কোনো তারতম্য দেখলে?" রঞ্জু সুধায়।

"দেখলুম বইকি। সে কী চোখ ঝলসানো রূপ! চাইলে চোখ নুয়ে আসে। যেন সূর্যের দিকে চেয়ে আছি। এ তা নয়। এ যেন শরতের শশী।" নবনী উত্তর দেয়।

তা হলে সত্যিকার গৌরীকে তো কোনোদিন আমি চোখে দেখতে পেলুম না। রঞ্জু মনে মনে দুঃখ করে।

ঘোড়ার গাড়ি অনেক দূরে চলে গেছে। ওদিকে জাহাজ ছাড়ার যদিও দেরি আছে, যাত্রীদের সবাইকে জাহাজে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। রঞ্জু আর নবনী ধীরে ধীরে গড়ের মাঠের অভিমুখে যায় ও কথাবার্তায় আরো কিছুক্ষণ কাটায়।

নবনী কেমন করে জানতে পেরেছিল যে শ্রীমতীকে রঞ্জু ভালোবেসেছে ও সে ভালোবাসা একতরফা নয়। নিছক অশরীরী প্রেমে ওর আপত্তি ছিল না। যদি ওটা ওই স্তরেই নিবদ্ধ থাকে। যেমন লছিমা দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রেম। কবিতা তো ওইভাবেই প্রেরণা পায়। কিন্তু যেখানে বিয়ের আশা নেই, বিয়ের কথা ভাবাই যায় না, সেখানে মন দেওয়া নেওয়ার একটা সীমা আছে। সে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া অসামাজিক, সুতরাং অনুচিত।

এই তত্ত্বটা একটু মোলায়েম করে রঞ্জুকে শুনিয়ে দিতেই ও ছেলে বিদ্রোহ করে ওঠে।

"সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াই মানুষের স্বধর্ম। যে প্রেম সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত থাকে সে প্রেম সমাজের ভয়ে আপনাকে আপনি অপমান করে। তার চেয়ে সমাজের হাতে মার খাওয়াও ভালো। মার আমাকে মহৎ করবে, নবনী।"

"কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমাদের সমাজ পুরুষকে যতটুকু মারে নারীকে মারে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। সেই জন্যে নারী হয় বহুগুণ ভীরু। প্রেম সীমা ছাড়াবার আগেই থেমে যায়।" নবনী বলে তার অধিকতর বয়সের অভিজ্ঞতার জোরে।

(ক্রমশ)

ঘামে বীজাণু থাকে। আর বীজাণুর জন্যে শরীর থেকে গন্ধ বেরোয়। সুগন্ধিত নাইসিল এই বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে চারভাবে : ১। নাইসিল অনেক বেশীক্ষণ শরীরে লেগে থাকে। ২। নাইসিল ঘাম শুষে নেয়। ৩। নাইসিলে, ক্লোরফেনেসিন এন্টিসেপটিক থাকায় গন্ধ সৃষ্টিকারী বীজাণু নাশ করে। ৪। নাইসিল স্নিগ্ধ কোমল, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। আপনার ত্বককে রক্ষা করতে আজই নাইসিল পাউডার ব্যবহার করুন।

নাইসিল গ্ল্যাক্সোর তৈরী দেহরক্ষী পাউডার

পাখির চোখ

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

একতলার বৈঠকখানা ঘরে বসে কিছু লেখালেখির কাজে লিপ্ত ছিলাম, জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি পাশের বাড়ির হরেনবাবুর নাতি বাচ্চু সামনের পড়ো জমিটুকুতে ঘুর ঘুর করছে। তার কাঁধে খেলনা ধনুক, হাতে রাংতা লাগান তীর। অবাক হলাম। বাড়ন্ত বেলার রোদ ক্রমেই চড়ে উঠছে। এই টা টা রদ্দুরে বাপ-মরা ছেলেটা ওখানে একা একা করছে কি! জানলার কাছে গিয়ে কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ গ্রামে তুলে ডাকলাম, "বাচ্চু। এই বাচ্চু।"

ডাক শুনে বাচ্চু জানলার দিকে ফিরল। আমাকে দেখেই সে একটু অপ্রতিভ লজ্জিত হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বরে কিছু দৃঢ়তা ও একটু ধমকের সুর এনে বললাম, "এই রদ্দুরে ওখানে কি করছ? এদিকে এস—"

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বাচ্চু জানলার কাছে দাঁড়াল। রোদের প্রখর তাপে কচি ছেলেটার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। মায়া হল। কণ্ঠস্বর আপনি কোমল হয়ে উঠল, "তীর ধনুক হাতে নিয়ে ওখানে কি করছিলে?"

প্রশ্রয় পেয়ে বাচ্চু সাহসী হয়ে উঠল। দীপ্ত মুখে বলল, "পাখি খুঁজছিলাম।"

"পাখি! পাখি কেন?"

বাচ্চু হাতের তীর তুলে ধরে বলল, "পাখির চোখে লক্ষ্যভেদ করব। তাই—।"

ব্যাপারটা বুঝলাম। পাড়ার ছেলেরা সম্প্রতি কয়েকদিন আগে 'পান্ডব কৌরব' থিয়েটার করেছে। তাতে দ্রোণাচার্য কর্তৃক শিষ্যদের ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষার একটি দৃশ্য ছিল। সেই দৃশ্যটি ওর শিশুচিত্তে গভীর প্রভাব ফেলেছে নিশ্চয়। একে একে সকলেই ব্যর্থ হল, কিন্তু অর্জুন যখন বলল সে পাখির চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তখনই বোঝা গেল তার শিক্ষাই সার্থক। অর্জুনের নিক্ষিপ্ত শর পাখির চোখ বিদ্ধ করল। ঐ দৃশ্যটি নিশ্চয়ই বাচ্চুর শিশুকল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলে তাকেও ভাবতে শিখিয়েছে, সেও এক অর্জুন। সেই ভাবনারই পরিণতি হল এই খেলনা ধনুক বাণ নিয়ে দুপুর রোদ্দুর মধ্যে পড়ো জমিতে পক্ষী সন্ধান। সস্নেহে হেসে বললাম, "পাগল ছেলে। তা, পাখি পেলে?

বাচ্চু হতাশ ভাবে পাশাপাশি মাথা নড়ল, "না।"

ওর হতাশা দেখে একটু আমোদ অনুভব করলাম, "কেন? কি হল?"

বাচ্চু কচি টুকটুকে ঠোঁট দুটি গোল করে বলল, "ধুস! কোথাও কিছু পাখি নেই। শুধু কাক আর চড়ুই।"

"কেন, কাক আর চড়ুই কি পাখি নয়?"

বাচ্চু বলল, "ও পাখি ভাল না। বেশ সুন্দর ভাল পাখি হলে ভাল হত!"

দুঃখী বাচ্চুকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম, "তেমন পাখি আর এখানে এই শহরে কোথায় পাবে বাচ্চু! যাও, এখন বাড়ি

যাও। রোদে ঘুরো না। জ্বর হবে—" তারপর বাচ্চুর মুখে সুপরিস্ফুট দুঃখ ও বেদনা দেখে ওকে একটু মিথ্যে আশা দিলাম: "বরং বিকেলে খুঁজো। বেলা পড়ে এলে অনেক রকম পাখি টাখি দেখা যায়।"

বাচ্চু চলে গেল। ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসতে বসতে বাচ্চুর জন্য একটু সত্যিকারের কষ্ট বোধ করলাম। বেচারা এমন এক সময় এই শহরে জন্মেছে, যখন ইট কংক্রিট সিমেন্ট শহরের প্রায় সবটুকু শ্যামলতাকে গ্রাস করে নিয়েছে। এখানে কি আর এখন কাক আর চড়ুই—এই দুই শহুরে শঠ প্রতারক ও কুৎসিত পাখি ছাড়া অন্য কোনো সুন্দর উজ্জ্বল রঙিন পাখি পাওয়া যায়। আমাদের ছেলেবেলাতেও ছিল। তখনও শহর এতটা সম্প্রসারিত হয়নি। তখন শহরে কিছু গাছপালা ঝোপ জঙ্গল বাগান পুকুর ছিল। সেই সব গাছপালায় নানান পাখিদের বাসা ছিল। নানা বর্ণের সুন্দর পাখিরা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে উড়ে বেড়াত, গাছ থেকে ঝুলন্ত পরগাছা লতার প্রান্তে বসে পাখিরা দোল খেত। তারপর অর্ধশতাব্দীরও

বেশী কেটে গেল। নাগরিক সভ্যতার অভ্যুত্থান ও অগ্রগতি সব গাছ-গাছালিকে নির্মূল করে দিল, সব পাখিরা কোথায় দূরে উড়ে গেল!

বাচ্চু এত দেরীতে জন্মেছে বলে ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হতে লাগল।

লেখার কাজে সবে মগ্ন হয়ে গেছি, জানলা দিয়ে আবার চোখে পড়ল পাড়ার তরুণ ছেলেরা সদর দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে শংকিত হয়ে উঠলাম। আবার কি চায়! নিশ্চয়ই চাঁদা। কিন্তু কি বাবদে! এই ত সেদিন পাঁচ টাকা নিয়ে গেল অভিনয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে। এইসব তরুণ ছেলেরা—সব কুড়ি বাইশের মধ্যে বয়স—কেউ বি-এ কেউ বি-কম্ পাস করেছে। কেউ বা স্কুল ফাইনাল পাস করেই 'পড়াশুনো করে আর কি হবে' ভেবে ও পাট চুকিয়ে দিয়েছে। কেউই চাকরী বাকরী পাচ্ছে না, পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। নিজেরাই নানারকম উত্তেজনার সৃষ্টি করে নিজেদের অফুরন্ত উদ্বৃত্ত সময়কে কাজে লাগাচ্ছে। কখনও আধুনিক গানের জলসা, কখনও থিয়েটার, কখনও বা পাড়ায় পাড়ায় রেষারেষি মারা-মারি—এই সব নিয়ে বেশ মেতে আছে। কিন্তু ধকলটা সইতে হয় আমাদের। এটা ওটা উপলক্ষে চাঁদার দাবীটা সর্বাগ্রে আমাদেরকেই মেটাতে হয়। না মেটালে চলে না। কারণ পাড়ায় বাস করতে হবে ত। সুতরাং বাড়ির সামনে ওদেরকে জটলা করতে দেখে মনে মনে কাঁটা হয়ে উঠলাম।

ওদের মুখপাত্র ভোম্বলের সংগে চোখা-চোখি হতেই সে বলল, "এই যে দাদু, দরজাটা খুলুন ত—"

তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম, "কি ব্যাপার?"

"আগে খুলুন না। পরে বলছি—"

দরজা খুলে দিতেই ওরা হুড়মুড় করে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে এল। কোনো ভূমিকা না করেই ভোম্বল বলল, "পাঁচটা টাকা ছাড়ুন ত দাদু।"

"পাঁচটা টাকা! কি ব্যাপার? এই ত সেদিন নিয়ে গেলে পাঁচ টাকা থিয়েটার বাবদে—"

পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল, "এবারে আর থিয়েটার নয় দাদু। তার চেয়ে ঢের ঢের সিরিয়স ব্যাপার।"

ভয়ে ভয়ে বললাম, "সিরিয়স ব্যাপার! কি হয়েছে?—"

এবারে ভোম্বল এগিয়ে এল, "শুনুন দাদু। কুন্তলকে চেনেন ত?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কুন্তল। মানে যে ছেলেটি তোমাদের থিয়েটারে অর্জুনের পার্ট করেছিল—"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ। বোমা তৈরী করতে গিয়ে কুন্তলের হাতে বোমা বার্স্ট করেছে। খুব খারাপ অবস্থা। হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হেভি ব্লিডিং হচ্ছে। ডাক্তার বলেছে ট্রিটমেন্টের জন্য অনেক টাকার দরকার। তাই—"

খবরটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কুন্তল—মিষ্টি লাজুক ধরনের ছেলে, ভাল অভিনয় করে—সে বোমা তৈরী করতে গেল কেন? আমার মাথায় কিছু আসছিল না। খানিক বিভ্রান্ত ভাবে আমি ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভোম্বল তাড়া দিল, "টাকাটা দিয়ে দিন দাদু। আমাদের আরো দশ জায়গায় যেতে হবে।"

সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম, "তা দিচ্ছি। কিন্তু—কিন্তু কুন্তল বোমা তৈরী করতে গেল কেন?"

ভোম্বল উদ্ধত ভঙ্গীতে বলে উঠল, "তবে কি করবে?"

থতমত খেয়ে বললাম, "কেন—কুন্তল অভিনয় করবে। সে ভাল অভিনয় করে—"

ভোম্বল তিক্ত ভাবে হাসল, "দাদু, আপনাদের সে দিন আর নেই। এখন এমন একটা সময় পড়েছে, যখন অভিনেতা, গায়ক, লেখক, কবি, খেলোয়াড়—সবাইকেই সব কিছু ছেড়ে কেবল বোমাই তৈরী করতে হবে।"

আমি টেবিলের ড্রয়ার থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট বার করে ভোম্বলের হাতে দিলাম।

ওরা টাকা পেয়ে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। কিন্তু আমার মনটা যথেষ্ট খারাপ করে দিয়ে গেল। কুন্তল ছেলেটিকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। বছর দুই হল বি-এস-সি পাস করে বেকার বসে আছে। ভাল অভিনয় করে, সুতরাং
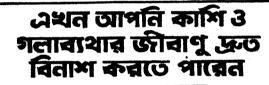
এখানে ওখানে খিয়েটার করে বেড়ায় আর রকে বসে গুলতানি করে। ভোটের সময় স্থানীয় এম-এল-এ বিজুবাবুর হয়ে প্রাণপণে খেটে তাকে জিতিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে দেখি বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে মিছিল করে ধ্বনি দিতে দিতে চলে যায়ঃ চলবে না, চলবে না। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

দিন কয়েক আগেই সে আমার কাছে এসেছিল একবার, "দাদু, আপনার কাছে এলাম একটু—"

"কি ব্যাপার কুন্তল?"

কুণ্ঠিত ভাবে কুন্তল বলল, "আপনি ত মার্চেণ্ট ফার্মে চাকরী করতেন দাদু?"

"তা করতাম।"

"শুনেছি অনেককে আপনি চাকরি করে দিয়েছেন আপনার আপিসে। আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিন না।"

বুঝলাম নিমজ্জমান মানুষের কুটো আঁকড়ে ধরার মনোভাব নিয়েই কুন্তল আমার কাছে চাকরীর উমেদারী করতে এসেছে। ছেলেটার জন্য দুঃখ হল। কিন্তু আমার আর কতটুকু ক্ষমতা। বিষণ্ণ ভাবে একটু হেসে বললাম,—"কুন্তল, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সে সব দিন চলে গেছে। এমন একদিন ছিল যখন শুধু হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেই হত। জানই ত, এখন সব জায়গাতেই শুধু ছাঁটাই আর লে-অফ। নতুন লোক নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া, যতক্ষণ তুমি সিংহাসনে বসে আছ ততক্ষণই তুমি রাজা। সিংহাসন থেকে নামলে কি তুমিও যে রাম শ্যামও সে। এখন আমাকে কে চেনে আপিসে! মাসান্তে একবার যাই, চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকি এক পাশে, ভিখিরির মত হাত পেতে পেনসনের টাকাটা নিই—"

হতাশায় কুন্তলের মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু আমি কি আর করতে পারি! তবু ওকে একটু পরামর্শ দিতে চাইলাম,—"তা তুমি বিজুবাবুর কাছে একবার যাও না! ভোটের সময় খেটে খুটে তোমরাই ত তাকে দাঁড় করাও। এখন বলে দেখ না, যদি কিছু করতে পারেন।"

কুন্তল চাপা স্বরে বলল, "গিয়েছিলাম।"

"গিয়েছিলে? তা কি বললেন বিজুবাবু?"

"যা বললেন ঠিকই বলেছেন। বিজুবাবু বললেনঃ দেখ হে আমি রাজনীতি করি তাতে ঐ সব কলকারখানার মালিকরা আমাকে তাদের চক্ষু শূল বলেই মনে করে। সুতরাং বুঝতেই পারছ আমার রেকমেণ্ডেশনে তোমার চাকরী ত হবেই না, বরং হয়ে আসা পাকা ঘুঁটিও কেঁচে যেতে পারে।"

বললাম, "কথাটা বিজুবাবু ঠিকই বলেছেন।"

কুন্তল বিষণ্ণ বদনে চুপ করে রইল। আমি ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। অগত্যা কিছু বলার জন্যই বললাম, "তার চেয়ে তুমি অভিনয়টাকেই পেশা করে নাও কুন্তল।"

কুন্তল আমার দিকে তাকিয়ে তিক্তভাবে হাসল, "আপনিই বললেন না দাদু, সে দিনকাল আর নেই। সব পাল্টে গেছে। সর্বত্রই এখন ভীড়, সর্বত্রই নো ভ্যাকান্সী।"

আরো কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে এক সময় কুন্তল উঠে চলে গিয়েছিল। ওরা সারাদিন কি করে, কি ভাবে অফুরান সময়টা কাটিয়ে দেয়, কি ভাবে চিন্তা করে, নিজেদের এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই বা ওদের কি ধারণা—এ সব পরিষ্কার ভাবে আমি কিছুই জানি না। সুতরাং ঐ নিরীহদর্শন রোগা

রোগা ফর্সা মিষ্টি চেহারার ছেলে কুন্তল বোমা বাঁধতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী—এ সংবাদটা আমাকে পীড়া দিতে লাগল। আমার মনের সাম্য এবং শান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কাজে এত বিপদ এত ভয় এত শংকা—তা ওরা এত সহজে কেন করতে যায়। আমার পিছিয়ে পড়া ধ্যান ধারণা নিয়ে সমস্যার কোনো তল খুঁজে পেলাম না। জীবন সম্বন্ধে গভীর হতাশা ও অনীহা বোধই কি এর মূলে? না, খুব বড় কোনো আদর্শবাদ, যা প্রাণকে অনায়াসে তুচ্ছ করতে প্রেরণা দেয়?

বৈকালিক ভ্রমণান্তে বাড়ি ফেরার পথে দুঃসংবাদটা পেলাম।

আসতে আসতে দেখি ভোম্বল হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে। আমাকে দেখেই ভোম্বল থমকে দাঁড়াল, "এই যে দাদু আপনাকে আরো পাঁচটা টাকা দিতে হচ্ছে।"

সভয়ে বললাম "আবার কি হল?"

"জানেন দাদু—" ভোম্বল খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল "আমরা কুন্তলকে নিয়ে একটা খুব সুন্দর, খুব জমকালো, মানে—বেশ একটা আড়ম্বরপূর্ণ শোক মিছিল বার করতে চাই।"

"কুন্তলকে নিয়ে? কেন? কি হয়েছে কুন্তলের?"

সবিস্ময়ে ভোম্বল বলল, "সে কি দাদু! আপনি এখনও জানেন না! সমস্ত পৃথিবীর লোক জেনে গেল—" সহসা ভোম্বলের কণ্ঠস্বর একটু আর্দ্র ভারী হয়ে উঠল, "হাসপাতালে কুন্তল মারা গেছে দাদু—"

"কুন্তল মারা গেছে!" হঠাৎ আমার ভিতরটা যেন জমে পাথর হয়ে গেল। খবরটা অপ্রত্যাশিত না হলেও অপ্রার্থিত। বুকের মধ্যে জমা পাথর যেন আবার ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল। কুন্তল! সেই সুন্দর মুখ ফর্সা রোগা ছেলেটা! মরে গেল!—

ভোম্বল বলল, "ঠিক আছে দাদু। আপনার বাড়ি গিয়ে টাকাটা নেবখন।"

সামনে থেকে ভোম্বল সরে যেতে আমি অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। চোখের সামনে কুন্তলের সেই তরুণ করুণ মুখখানা ভাসতে লাগল। আর কোনোদিন দেখতে পাব না ওকে। কেন ও বোমা তৈরির মারাত্মক কাজে হাত দিল! অথচ কি সুন্দর অভিনয় করত ছেলেটা!

চোখের সামনে পান্ডব কৌরবের সেই অস্ত্র পরীক্ষার দৃশ্যটি যেন পুনরভিনীত হতে লাগল। ঐ দৃশ্যে অর্জুনের ভূমিকায় কুন্তলের সেই অপূর্ব অভিনয় ভোলা যায় না। দর্পের সঙ্গে বিনয়ের, তেজের সঙ্গে নমনীয়তার, তারুণ্যের সঙ্গে পরিণতির এমন সমন্বয় ঘটানো কোনো সুপটু ও [illegible] নয়। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম পরীক্ষাভূমিতে অর্জুন এসে দাঁড়িয়েছে। গুরু দ্রোণাচার্য শিষ্যর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে বললেন, "তুমি প্রস্তুত অর্জুন?"

তরুণ শালের মত উন্নত উদ্ধত অর্জুন বলল, "না গুরুদেব।"

তারপর অর্জুন ধীর স্থির পায়ে এগিয়ে এল দ্রোণাচার্যের দিকে। তার সামনে নতজানু হয়ে অর্জুন ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা গুরুর পদবন্দনা করল। আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়াল পরীক্ষাভূমিতে, "এবারে আমি প্রস্তুত গুরুদেব।"

দ্রোণাচার্য উইংসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "ঐ দেখ অরণ্যভূমি। অরণ্যের অন্তর্গত ঐ শাল্মলী তরুশাখাতে ঐ দেখ এক বিহঙ্গ উপবিষ্ট।"

অর্জুন ধনুকে শর আরোপ করে জ্যা আকর্ষণ করল।

দ্রোণাচার্য বললেন, "ঐ বিহঙ্গের অক্ষিকোটর তুমি শরবিদ্ধ কর।"

অর্জুন কর্তৃক আকৃষ্ট ধনুকের জ্যা আকর্ণ বিস্তৃত হল।

দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করলেন, "তুমি এখন কি নিরীক্ষণ করছ অর্জুন?"

অর্জুন দৃষ্টি অচঞ্চল রেখে বলল, "গুরুদেব, কিছু পূর্বে আমি আপনাকে এবং ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখছিলাম। তারপর আমি দেখলাম বিপুল অরণ্যে এক বিশাল শাল্মলী তরু। তারপর তরু শাখা ও বিহঙ্গ অবশেষে বিহঙ্গ মাত্র। এবং এখন আমার নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত কেবল মাত্র একটি অক্ষিকোটর—তরল গভীর, অচঞ্চল হ্রদের ন্যায় সজল ও নিষ্পাপ—"

"সাধু, সাধু, অর্জুন!" আনন্দে বৃদ্ধ দ্রোণাচার্যের কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল, "অর্জুন, তোমাকে শিষ্যরূপে পেয়ে আজ আমি ধন্য। তোমাকে অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত করে আমার সকল বিদ্যা সার্থক। তুমি পারবে। লক্ষ্য ভেদ কর।"

সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের জ্যা মুক্ত শর বিদ্যুৎ চমকের মত উইংসের দিকে ছুটে গেল।

যতক্ষণ আমার চোখের সামনে এই দৃশ্যটি অভিনীত হল ততক্ষণ আমি বুঝতে পারিনি যে আমার দু চোখ জলে ভরে গেছে। মন কিছুতেই মানতে চাইছিল না যে ঐ অর্জুনকে আমি আর দেখতে পাব না।

বাড়িতে ঢোকার মুখে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেখি সেই পড়ো জমিতে কে যেন বসে আছে। কৌতূহলী হয়ে কাছে এগিয়ে দেখলাম বাচ্চু। বসে আছে বিমর্ষ ভাবে গালে হাত দিয়ে। তার ধনুক বাণ সামনেই মাটিতে শায়িত।

বললাম, "কি হল বাচ্চু? এখানে এই সন্ধেবেলা একা একা বসে আছ কেন? পাখি পেলে না?"

বাচ্চু উপর দিকে মুখ তুলে আমার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করল, "পেয়েছিলাম—"

একটু অবাক হয়ে বললাম, "কাক আর চড়ুই ছাড়া আবার অন্য কি পাখি পেলে বাচ্চু?"

"চন্দনা—"

"চন্দনা! চন্দনা পাখি কোথায় পেলে?"

"বিপ্লবদের বাড়িতে।"

"বিপ্লব কে বাচ্চু?"

"বিপ্লবকে চেন না? —বাচ্চু অবাক হল, "বিজুবাবুর ছেলে। আমাদের সঙ্গে পড়ে ত। ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি খাঁচায় চন্দনা পাখি ঝুলছে—"

"তা, লক্ষ্য ভেদ করলে?" একটু হেসে প্রশ্ন করলাম।

"না!—" বাচ্চু গভীর হতাশার সঙ্গে বলল, "জান দাদু, পাখিটা না সারাক্ষণ শুধু এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুল। একবারও চোখ খুলল না। কি করে লক্ষ্যভেদ করব! পাখিটা বোধ হয় অন্ধ দাদু।"

আর পাখি মানেই ত মুক্তি, মুক্তি আর অসীম আকাশ, সীমাহীন আকাশে শুধু ক্লান্তিহীন উড়ে যাওয়া। সুতরাং অন্ধ পাখি যে বাচ্চুকে হতাশ করবে সে আর বিচিত্র কি!

বললাম, "তুমি এখন বাড়ি যাও বাচ্চু। রাত হল, এখানে এখন সাপ খোপ বেরুতে পারে—"

বলে আমি বাড়ি ঢুকে গেলাম।

পরের দিন সকাল থেকেই পাড়াতে খুব হই চই।

হরেন বাবুর নাতি বাচ্চুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় হারিয়ে গেছে। থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। এখনও কোথাও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

মনে মনে ভাবলাম, কি জানি, ছেলেটা বোধ হয় কোনো দিব্যবর্ণ পাখির তরল আতঙ্কশান্ত চোখের খোঁজেই তার ধনুক বাণ সঙ্গে নিয়ে কোথাও চলে গেল।

চিকিৎসকরা বলেন, কে সঠিক কোন রোগে ভুগছেন যদি যথাযথভাবে সেটা জানা যায়, তাহলে উপযুক্ত ওষুধ বা ব্যবস্থাদির সাহায্যে তার নিরাময় তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু মুশকিল হল, সারা পৃথিবীতে ঠিক সময়মত ঐ সঠিক রোগ-নির্ণয়টাই আজও বড় রকমের একটি সমস্যা। সম্প্রতি কেউ কেউ এই কঠিন দায়িত্বটি স্বনিয়ন্ত্রিত যন্তের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। নতুন এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে বেশ সাড়াও জাগিয়েছে। ডাক্তাররা বলছেন, রোগটার কারণ কী, ওরা বলে দিক, আমরা চিকিৎসা করব।

বিস্ময়কর। কিন্তু......

অক্টোবরের বিকেল। ঘড়িতে তখন পাঁচটা। তেরো বছরের একটি ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় ভর্তি করা হল প্যারিস হাসপাতালে। কিছুক্ষণ আগেও তার সারা দেহে একটা ছটফটানি ভাব আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। এখন শান্ত, নিঃস্পন্দ।

হাসপাতালের কর্মীদের কাছে তরুণ এই রোগীটি অপরিচিত নয়। হাসপাতালের ফাইলে তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১২,৫০৮। এ ধরনের অসুস্থতার দরুন নিয়মিত চার থেকে পাঁচ মাস অন্তর এখানে তাকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে আসা হয়। এবং তা চলছে, যখন তার বয়েস আট, তখন থেকে। চিকিৎসকদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, 'সে মৃগী রোগে ভুগছে। রোগটি বংশগত সূত্রে পাওয়া।' দীর্ঘকাল তাঁরা পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন। রোগটি নির্ধারণের ব্যাপারে প্রচলিত প্রায় সবগুলি পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়েছে। তবু সংশয় কিছুটা থাকলেও, সিদ্ধান্ত ও'দের অপরিবর্তিত। যেটুকু সপ্রশ্ন ভাব বা দ্বিধা, সেটা একমাত্র জিন-বিষয়ক বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ রোগটি যদি বংশগতই হয়, তাহলে তার সংকেত থাকতে গেলে রোগীটির বংশ ধারার অন্যতম, প্রধান বাহক 'জিন'-এর মধ্যেই আবিষ্কার করার কথা? কিন্তু মৃগী রোগের ক্ষেত্রে 'জিন' পরীক্ষা করে তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া এখনও সম্ভব হয়নি। কীভাবে ছেলেটির মস্তিষ্ক কোষের তড়িৎ স্পন্দন কাজ করছে সেটা জানার জন্যে 'ইলেকট্রোগ্রাফ' বা তড়িৎ সম্পর্কীয় ছবিও তোলা হল। দেখা গেল, সে স্পন্দন স্বাভাবিকও নয়। তবে এমনও নয়, যা দেখে বলা চলে, সে সত্যিই মৃগী রোগে ভুগছে।...স্কুলের সে একজন সেরা ছাত্র। সাধারণের চেয়ে তার বুদ্ধিও অনেক বেশী।

অর্থাৎ ছেলেটির সঠিক রোগ কী তা জানার জন্যে যাবতীয় আধুনিক পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়। সেই সঙ্গে সারিয়ে তোলার ব্যবস্থাও। শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

এবার কিন্তু ডাক্তাররা ভিন্নতর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। এর আগের বার যখন ছেলেটিকে ঐ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে সেখানে বসান হয় 'সিকোএনশেল মালটিপল অ্যানালাইজার।' অতি আধুনিক স্বনিয়ন্ত্রিত এই যন্ত্রের কাজ দক্ষ গবেষকের মত রোগীর রক্ত এবং রক্তরসের মূল উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী পরীক্ষা করে জানিয়ে দেয়া। জানিয়ে দেয়া, রক্তে কম করেও পঁচিশ রকমের দূষিত রাসায়নিক যৌগের মাত্রা এবং স্বরূপ। যারা কোন না কোন রোগের একমাত্র কারণস্বরূপ। এ ছাড়া রক্তে অস্বাভাবিক কণিকার আকৃতি এবং সংখ্যা এবং প্রোটিন কণার অসামঞ্জস্যতা। শুধু একবারের মত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীর দেহ থেকে মাত্র তিন কিউবিক সেন্টিমিটারের মত রক্ত বের করে নিন। তারপর যন্ত্রটির সাহায্য নিন। খুব কম সময়ের মধ্যেই রোগীর জীব-রাসায়ন-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি পেয়ে যাবেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই ছেলেটির দায়িত্ব এবার অর্পণ করা হল ঐ যন্ত্রটিরই ওপর। আর মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে ছক-কাগজের উপর নানা রকম বাঁকা-সোজা রেখা টেনে যে

পশ্চিম জার্মানির পক্ষীবিজ্ঞানীরা বিশেষ জাতের এই সারসগুলি সম্পর্কে ইদানিং বেশ খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ঋতুর পরিবর্তনে প্রতি বছর বাসা ছেড়ে দূরাঞ্চলে এরা চলে যায়। যখন ফেরে, তখন তাদের সংখ্যা যায় অনেক কমে। ১৯৫০ সালেই যেখানে ১০০০টি বাসা এদের ভীড়ে জমজমাট হয়ে থাকত, এ বছর তাদের অর্ধেক প্রায় শূন্য। ও'দের ধারণা, প্রবাসে থাকার সময়, এই সমস্ত পাখির কিছু শিকারীদের হাতে প্রাণ হারায়, কিছু নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে। পশ্চিম জার্মানিতে এদের হত্যা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু অনেক দেশেই এ ধরনের কোন আইন নেই। হ্যানোভার-এর সরকারী সংরক্ষণশালার কর্তৃপক্ষ এদের রক্ষা করার ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। ও'রা নিয়মিত পাখির গায়ে পরিচয় এবং ঠিকানা চিহ্নিত করে দেন। বৎসর অন্তে মিলিয়ে দেখেন, কে ফিরে এল, কে এল না। ডান পাশে জনৈক কর্মী ফিরে আসা একটি অসুস্থ সারসের শুশ্রূষা করছেন। নিজেদের মধ্যে দুরন্তপনায় এটি আহত হয়েছিল। বাপ-মা ছাড়া পাখিদের প্রতিও ও'রা দৃষ্টি দেন।
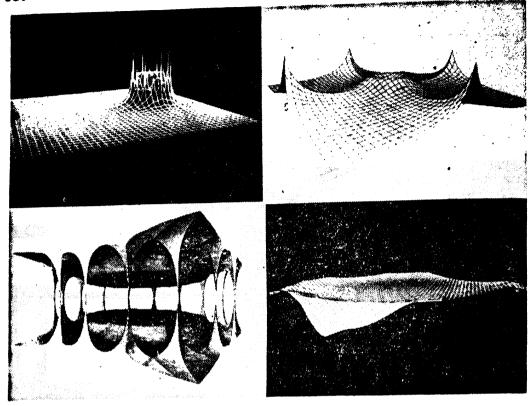
ছবি আঁকা মানে শুধু রঙের বিন্যাস নয়, চিরায়ত চিত্রকলার মধ্যে ধরা পড়ে শিল্পীর কল্পনা, গভীর অনুভূতি এবং কালাতীত আবেদন। তুলির আঁচড়ে কিভাবে শিল্পীরা কল্পনাকে অমন বাঙময় করে তোলেন, বক্তব্যকে অমন হৃদয়ের কাছাকাছি টেনে আনেন, মনোবিজ্ঞানীদের কাছে আজও সে এক বিরাট রহস্য। সম্প্রতি যন্ত্রগণক বা কমপ্যুটারের সাহায্যে অনুরূপ কাজকর্ম করা যায় কি না, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। সংগে সঙ্গে প্রশ্নও উঠেছে, সত্যিই কী তা সম্ভব? তার উত্তর দিয়েছেন পশ্চিম জার্মানির ড্রামসটাড-এর অটোমেটিক ইনফরমেশন প্রোশেসিং উপরের চারখানি ছবির মাধ্যমে। এদের শিরোনাম : 'সসীম মহাশূন্য'। শিল্পী যন্ত্রগণক। হ্যানোভারে অনুষ্ঠিত 'যন্ত্রমগজের শিল্প নামক চিত্র প্রদর্শনীতে এগুলি প্রদর্শীত হয়

সমস্ত তথ্য সে পরিবেশন করল, বাঘা বাঘা ডাক্তারদের তা দেখে-শুনে রীতিমত মাথায় হাত দেবার মত অবস্থা। ভুল, একেবারে ভুল। গত পাঁচ বছর ধরে মৃগী-রোগ সন্দেহ করে ও'রা যে সমস্ত দাওয়াই বাতলেছেন, সব ঝুটা। যান্ত্রিক পরীক্ষক মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রমাণ করে দিল, ছেলেটি মোটেই মৃগী-রোগী নয়!

ছক-কাগজে বারোটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গের ছাপ। দুটি রেখা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ছেলেটির রক্তে অস্বাভাবিক ধরনের ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। ক্যালসিয়ামের মাত্রা খুবই কম। ফসফেট অনেক বেশী। এর অর্থ হল, ছেলেটির সংজ্ঞা লোপের কারণ মুখ্যত মৃগী-রোগ নয়। কারণ পড়ে রয়েছে ছোট ছোট চারটে গ্রন্থির মধ্যে। বিশেষ ধরনের এই চারটে গ্রন্থি জোড় বেঁধে থাইরয়েড গ্রন্থির দু'পাশে অবস্থান করে। আকারে মসুর ডালের মত। অথচ এরাই মানবদেহে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট সংক্রান্ত বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। এরা যদি অতি মাত্রায় সক্রিয় হয়, শরীর অস্থির-অধিক-বৃদ্ধিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। সক্রিয়তার অভাব ঘটলে মাংস-পেশীতে আক্ষেপজনিত রোগ দেখা যায়। কখনও কখনও জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এর দরুন মৃত্যুও ঘটতে পারে। থাইরয়েড-এর দু পাশের এই চারটে গ্রন্থির অস্বাভাবিকতা অনেক সময় বংশগত কারণেও হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণ ঐ রোগীটির চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। ওকে দেওয়া হল ক্যালসিয়ামঘটিত ওষুধ, ভিটামিন-ডি এবং ফসফেটের বিপজ্জনক মাত্রা কমিয়ে আনার জন্যে বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক যোগ। যে যে ওষুধ দিয়ে এতদিন মৃগী-রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছিল সেটা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হল। কারণ ডাক্তাররা জানতেন, দীর্ঘকাল ঐভাবে চিকিৎসা করার ফলে তার কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলের মধ্যে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে হঠাৎ পুরনো পদ্ধতি বন্ধ করে দিলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

আর সত্যিই, যাকে মৃগী-রোগী ভেবে এতদিন ভুল চিকিৎসা করা হচ্ছিল, নতুন ব্যবস্থাপনায় মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তার যাবতীয় উপসর্গ দূর হয়ে গেল! ইলেকট্রোগ্রাফে ধরা পড়ল, তার মস্তিষ্কের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। পরবর্তী কয়েক মাসে স্কুলের পড়াশুনাতেও সে যথেষ্ট উন্নতি করে।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য : মৃগী নয়, ছেলেটি আসলে যে রোগে ভুগছিল তার ডাক্তারী নাম, হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম। বাইরে থেকে পরীক্ষা করলে মৃগী রোগের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ, জীব-রসায়নের দিক থেকে বিচার

করলে একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের যে সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার, এই রোগে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে মাত্র দুটি বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া, তার সমস্ত ধর্মই অটুট থাকে। অতএব যথাযথ রোগটি কী, তা বুঝে নেওয়া যথেষ্ট কঠিনই বলা চলে।

না, এ তো গেল একটিমাত্র উদাহরণ। উদাহরণ আরও আছে। এর চেয়েও জটিল অনেক রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে হামেশাই ডাক্তাররা ভুল করে থাকেন। শরীরের বিপাকীয় ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরও কত রকমের বস্তু। কখনও প্লুকোজের আধিক্য, কখনও বা ঘাটতি, ইউরিয়া, কোলেস্টেরিন, ক্লোরাইড বিশেষ করে সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামের, প্রোটিন, ফসফর, পিত্ত কণিকা বিলিরুবিন প্রভৃতি আরও কত জটিল সব নাম। এদের যে কোন একটির অস্বাভাবিক কাজকর্মই জটিল রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কখনও তাদের প্রতিক্রিয়া এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, যত দ্রুত সম্ভব যদি সঠিক রোগটিকে নির্ণয় করা না যায়, মৃত্যুও ঘটতে পারে।

প্রশ্ন উঠেছে, শারীরিক অস্বস্তির জন্যে তো অনেকেই আজকাল হাসপাতালে গিয়ে অথবা ব্যক্তিগত চিকিৎসকের কাছে এসে সাধারণভাবে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে হাজির হন, অনেক ক্ষেত্রে সত্যিই কী তাঁদের যথাযথ সংবাদ যোগান সম্ভব হয়? আপাতত যে সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাতে শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই অভিজ্ঞ চিকিৎসকদেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। বিশেষ করে জীব-রসায়নগত সমস্যা যদি কিছু থাকে, তাকে খুব কম সময়ের মধ্যে আবিষ্কার করাও শক্ত। আর দৈনন্দিন যে হারে জটিল রোগীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে করে প্রতিটি রোগীর পেছনে অতিরিক্ত সময় দেওয়াও সব সময় সম্ভব হয় না। জীব-রসায়ন শাস্ত্রে বিগত এক দশকে একটা বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। এক সময় রোগের উপসর্গগুলি দেখা হত বাইরে থেকে। চিকিৎসার বড় হাতিয়ার ছিল শুধু ভেষজ সামগ্রী। যারা মুখ্যত বিশেষ বিশেষ ধরনের রাসায়নিক উপাদান। উত্তরকালে জীবাণু সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়ে উঠল। এল বিভিন্ন ধরনের টিকা, পেনিসিলিন প্রভৃতির যুগ। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞের তখন ধারণা, মানুষের রোগের যাবতীয় হেতু চারপাশেই পড়ে আছে। বিষাক্ত সামগ্রী বা বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণই রোগের অন্যতম কারণ।

উত্তরকালে বংশগতির উপর নিত্য-নতুন আবিষ্কার হতে লাগল। আর সে সমস্ত আবিষ্কারকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করল বিজ্ঞানের অভিনব এক শাখা, জীব-রসায়ন। ধরা পড়ল, বাইরে থেকে সংক্রামণ না ঘটলেও মানুষ অসুস্থ হতে

সরাসরি গ্র্যাফাইট থেকে এই হীরকখণ্ডগুলি তৈরি করেছেন সেনেকটাডির জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির বিজ্ঞানীরা। ঠিক যে আকারে ছবিতে এদের দেখছেন সেই ভাবেই এদের তৈরি করা হয়। পরে অবশ্য খানিকটা পালিশ করা হয়েছিল। ও'দের বক্তব্য, গুণাগুণের দিক থেকে প্রকৃতিজাত হীরের চেয়ে এরা নাকি অনেক বেশি উৎকৃষ্ট

পারে, কখনও কখনও সর্বনাশা ব্যাধিগ্রস্তও। জন্মসূত্রেই সে হয়ত বিকৃত রক্ত কণিকা নিয়ে জীবন শুরু করল। অন্তঃক্ষরণিক গ্রন্থি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ হরমোন নিঃসরণকারী প্ল্যান্ড, যেমন পিট্যুটারি, থাইরয়েড প্রভৃতি হয়ত শিশু বয়েস থেকেই তার অকেজো। শরীরে প্রয়োজনমত হরমোনের অভাবে অনেক যন্ত্রপাতিই ঠিকমত কাজ করতে পারে না। ফলে বিপাকীয় ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যতিক্রম ক্রমে নানা রকম জটিল রোগের সূত্রপাত করে। বিশেষ করে নানা রকমের স্নায়বিক ব্যাধি, মানসিক রোগ, বহুমূত্র রোগ, এমন কি একদল মনে করেন, 'প্রজননগত' ত্রুটি নিয়েই ঐ সমস্ত রোগীরা জন্মায়। শৈশবে তাদের প্রভাব অব্যক্ত থাকে। পরে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং অনুকূল অবস্থায় তারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অতএব যে রোগী আজ 'নিতান্ত মাথা ধরা' নামক উপসর্গটি নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসে হাজির হলেন, আজকের দিনে চট করে ভাসা ভাসা পরীক্ষা চালিয়ে বলে দেওয়া শক্ত সত্যিই ব্যাপারটা সাধারণ। কারণ মাথা ধরা এমন একটি ব্যায়রাম যা অনেক কিছু থেকেই ঘটতে পারে। নিয়মিত যদি আপনি আবদ্ধ জায়গায় বাস করেন যেখানে বায়ু-চলাচলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনার মাথা ধরতে পারে। হঠাৎ ঠান্ডা বা গরম লেগেও অমনটি হতে পারে। সাময়িক স্নায়বিক দৌর্বল্যের দরুনও মাথা ধরা অসম্ভব নয়। অথবা...। অথবা...। উদাহরণের শেষ নেই। কে জানে ঐ মাথা ধরা ভবিষ্যৎ কোন বিপজ্জনক ব্যাধির নিশানা কি না?

ফলে আজকের দিনে ডাক্তারী পরীক্ষা, যাদের আমরা বলে থাকি 'চেক আপ', খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। ঈশ্বর না করুন, ব্যাধি আপনার অল্পতেই সারুক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যদি কখনও দুর্ভাগ্যজনক কিছু আপনার শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়, বিপদ সেখানে।

স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যাধি নিরূপক যন্ত্রের সাফল্য এখানেই। এই যন্ত্রটি কয়েক মিনিটের মধ্যে রোগসম্পর্কীয় মূল্যবান তথ্যাদি পরিবেশন করে দ্রুত রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। যন্ত্রের মধ্যে আছে সূক্ষ্ম ধাতব দাঁত। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাবতীয় তথ্য সে একখণ্ড কাগজের উপর লেখচিত্রের মত এঁকে দিয়ে যায়। পরে যন্ত্রগণক এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই তার যাবতীয় পাঠ উদ্ধার করে মেলে ধরে চিকিৎসকের সম্মুখে।

সম্প্রতি কার্লস্রুহ্-তে চিকিৎসাবিদদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা রকম যন্ত্রপাতির মধ্যে সেখানে টেকনিকন প্রতিষ্ঠানের তৈরি একটি স্বনিয়ন্ত্রিত রোগনির্ণায়ক যন্ত্রও স্থান পেয়েছিল। শুধু দেখান নয়, ডাক্তাররা যাতে নেড়েচেড়ে এটি পরীক্ষা করতে পারেন, তারও ব্যবস্থা করা হয়। ঠিক হয় স্বাস্থ্যবান

ডাক্তারদের রক্তই যন্ত্রটির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখান হবে। এর জন্যে এক একটি টিউবে এক একজন ডাক্তারের রক্ত সংগ্রহ করা হয়। পরে একের পর এক, এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটি সেই রক্ত নিজের জঠরে শুষে নিল। সমস্ত ব্যাপারটা দেখা শোনার ভার রইল পাঁচজন ডাক্তার এবং নার্সের উপর। যন্ত্রটিকে তার আগে জীবাণুমুক্ত রাখার জন্যে প্লেক্সিপ্লাস নামে বিশেষ এক ধরনের কাচের আবরণীর সাহায্যে ঘিরে রাখা হয়।

রীতিমত চমকপ্রদ কাণ্ড!

রক্তের নমুনাগুলি বাতাসের বুদবুদের সাহায্যে পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। একের পর এক তারা এগিয়ে গেল গোলকধাঁধার মত বিরাট এক নলের মধ্যে। তারপর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়তে শুরু করল পরীক্ষা-নলের মধ্যে। আর যেই পড়া, তার সঙ্গে এসে মিশে গেল কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ।

চলল, অতিদ্রুত অথচ অব্যর্থভাবে প্রতিটি খুঁটিনাটি পরীক্ষা। একের পর এক রক্তের নমুনা এসে উপস্থিত হল স্পেকট্রো-ফটোমিটারের সান্নিধ্যে। বর্ণালীর আলোকের

সাহায্যে কিছু কিছু গুণাগুণ এখানে পরীক্ষিত হল। এর পর ক্যালোরিমিটারে। মাপা হল উত্তাপ। ফ্লুওরিমিটার এবং আরও অসংখ্য আলোক এবং বিদ্যুৎসংক্রান্ত পরিমাপক যন্ত্রে। আর একই সঙ্গে চলতে লাগল লাল রঙের সূক্ষ্ম কলমের কাগজের উপর আনাগোনা। হ্যাঁ, একান্ত বিশ্বস্তের মত তারা রক্তের যাবতীয় জীব-রসায়নগত গুণাবলী লিপিবদ্ধ করে চলেছে।

মাত্র কয়েক মিনিট। তারপর প্রত্যেকের সামনে নিজ নিজ পরীক্ষালব্ধ কার্ড উপস্থিত। না, ও'দের পরীক্ষার ফলগুলি অনিবার্য কারণে প্রচার করা সম্ভব হয় নি। তবে চমকে গেছেন সকলেই। এত কম সময়ে অমন নিখুঁত শারীরিক পরীক্ষার কথা যেন ভাবাই যায় না?

ও'রা বলেছেন, রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে প্রয়োজন মত হাসপাতাল, চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ যোগান আজকের পৃথিবীতে সব দেশেই একটা বড় রকমের সমস্যা। ইদানীং চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নততর ওষুধের চল গেছে অনেক বেড়ে। এতে লাভও যেমন হয়েছে, সেই সঙ্গে কিছু কিছু জটিলতাও দেখা দিচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত, আজকের দিনে রোগ সারাতে গেলে আমাদের সব চাইতে বেশী জোর দেওয়া দরকার, জীব-রাসায়নিক অস্বাভাবিকতা, এনজাইম বা জীব-রাসায়নিক অনুঘটক প্রভৃতির উপর। আমাদের উচিত এদের দুষ্ট-প্রতিক্রিয়া পুরোপুরি সক্রিয় হওয়ার আগেই সংশোধন করে নেওয়া।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের বাইরে থেকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলে মনে হয়, তাদের অনেকই আজ কোন না কোন জৈবিক ত্রুটি নিয়ে বেঁচে রয়েছেন। সুইডেনের ভার্মাল্যাণ্ড অঞ্চলে ৬০,০০০ ব্যক্তির উপর সমীক্ষা চালিয়ে শতকরা মাত্র পাঁচজনের মধ্যে এ ধরনের ত্রুটি দেখা গিয়েছিল। পরে আরও সতর্কতার সঙ্গে মাউন্ট সিনাই অঞ্চলে ২১৩৭ জনের উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে, জনসাধারণের শতকরা আটজন অস্বাভাবিক জৈবিক গঠন নিয়ে জন্মেছেন। সতর্কতা যত বাড়ানো যাবে, রোগের বিভিন্ন জৈবিক কারণ আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা যাবে। আর এ ব্যাপারে অভিনব এই যন্ত্রটির ভূমিকা নিঃসন্দেহে আরও বেশী কার্যকররূপে বিবেচিত হবে। রোগের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এতে সময় বাঁচবে, সেই সঙ্গে অর্থও। বলা হয়েছে, সাধারণ চিকিৎসকের দ্বারা এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে যদি ব্যয় হয় ৫০০ টাকা, এই যন্ত্র মাত্র দশ থেকে পঁচিশ টাকা পারিশ্রমিকেই কাজটি সেরে দিতে পারবে। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও
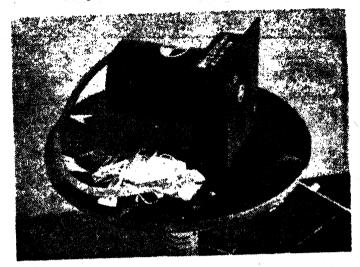
রেট-গাইরোস্কোপ বা আবর্তনশীল বস্তুর গতি বিষয়ক এই যন্ত্রটি তৈরি করেছেন ভোলিগারির মহাকাশ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। উদ্ভাবক ভারতীয় বিজ্ঞানী। স্বনিয়ন্ত্রিত বিমান এবং রকেট চালনায় এই যন্ত্রটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইনার্সিয়াল বা স্বতঃস্থানিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কোন মহাকাশযান বা বিমানের কৌণিক গতিবেগ নির্ণয়ে যন্ত্রটি সাহায্য করে থাকে। এ ধরনের কৃতিত্ব ভারতে এই প্রথম

নিয়মিত কেউ যদি শরীর পরীক্ষা করাতে চান, খরচ পড়বে অনেক কম। এবং সেই সঙ্গে সীমিত সময়ের মধ্যে শরীরে যদি নতুন কোন উপসর্গ দেখা দেয়, সেটা যত নগণ্যই হোক সেটাও সময়মত জেনে নেওয়া অসম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে পশ্চিম জার্মানির পঞ্চাশটি হাসপাতালে যন্ত্রটি চালু করাও হয়েছে।

একদল চিকিৎসক এতে কিছুটা শঙ্কিত। ও'রা মনে করছেন, শেষ পর্যন্ত যন্ত্রই যদি ঐ সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নেয়, তাতে ও'দের পসারে যে হাত পড়বে? অবশ্য প্রতিপক্ষও সরব। তাঁদের বক্তব্য, একমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা খানিকটা সজ্ঞাত-চিন্তার উপর নির্ভরশীল সাধারণ গবেষণাগার থেকে পাওয়া দু একটি পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের উপর নির্ভর করে রোগের আরও শতেক কারণ উপেক্ষা করা কি যুক্তিযুক্ত হবে?

জলের সন্ধানে ভারত

পুসার কৃষি-গবেষণাগার জল-প্রযুক্তি-বিদ্যার উপর এবার হাত দিচ্ছেন। ভারতে এ ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। সাম্প্রতিক কালে নতুন ধরনের গম এবং ধানের চাষ করে এ দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ অকল্পনীয়ভাবে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উন্নত ধরনের মাটি এবং জল-প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় এই পরিমাণ আরও বেশি বাড়ানো সম্ভব। নতুন এই কেন্দ্র মুখ্যত কাজ করবেন জলের নতুন উৎস সন্ধানের উপর, জল সংরক্ষণ এবং যথাযথভাবে সরবরাহের উপায় আবিষ্কারে। এ ছাড়াও বৃষ্টি বা নদীর জল কীভাবে কৃষি কাজে ব্যবহার করা যায়—তার উপরও অনুসন্ধান চালাবেন, সঙ্গে জল-নিকাশী ব্যবস্থাও। ও'রা মনে করেন ও'দের গবেষণা ভারতের ভূগর্ভস্থ জল-সম্ভারকেও কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে আছে পতিত জমি উদ্ধারের কাজ। বিশেষ করে এ দেশের কয়েকটি অঞ্চলের লবণাক্ত মাটিকে যদি চাষের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়, তাহলে একটি মোটা রকমের কৃষিজ সম্ভার আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে। গবেষণা কেন্দ্র এর উপরও কাজ করবেন। আসলে ও'দের মূল উদ্দেশ্য হল : এক, বর্তমানের আবাদী জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা; দুই, পতিত জমি উদ্ধার; তিন ভূ-ত্বকের ওপরকার এবং ভূ-গর্ভস্থ জলের যথাযথ ব্যবহার; চার, নিকাশী ব্যবস্থাকে উন্নততর করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং ঐ জলকে কৃষি কাজে লাগানো। এবং এর সমস্তই ও'রা করবেন অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। এর জন্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে অনুদান পাওয়া গেছে ৪৪০৭৫০ ডলার। উপদেষ্টা হিসেবে সাহায্য করবেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আশিজন বিশেষজ্ঞ।

সমরজিৎ কর

সুদর্শনের বাবা দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় একটি এলানো চেয়ারে বসেছিলেন। পাশের বেতের টেবিলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মাসিক ষান্মাষিক ইংরাজি বাংলা মিলিয়ে কিছু কাগজপত্র পড়েছিল। একটি বড় শেডেড ল্যাম্প স্ট্যান্ডের তলায় তাঁকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একখানা বই পড়তে দেখা যাচ্ছিল।

সুদর্শন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল, ক্ষুব্ধ হয়েছে, 'বেরোননি।'

অঞ্জলিকে সে নিয়ে এলো সেখানে। কোনো ভূমিকা করল না, ডাকল, 'বাবা।'

মুখ না তুলেই তিনি নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলেন, 'কেন?'

'ওকে নিয়ে এসেছি।'

'কাকে!' চকিতে বইয়ের ভাঁজে, আঙুল রেখে ঘুরে তাকালেন। তারপর অবাক হয়ে তাকিয়েই রইলেন।

বোধ হয় ছেলের এই দুঃসাহসে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

বেপরোয়াভাবে সুদর্শন বলল, 'ওর কথাই আমি তোমাকে বলেছি। ইচ্ছে হলে আলাপ করে দেখতে পার, নয়ত তাড়িয়ে দাও, যা তোমার খুশি। আমি নীচে যাচ্ছি।'

'শোনো, শোনো—'

সুদর্শন শুনল না। অঞ্জলিকে বিপন্ন করে যেমন এসেছিল, তেমনি নেমে গেল।

বিপন্ন সে শুধু অঞ্জলিকেই করল না, তার বাবাকেও করল। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থমকে থেকে, কী যে করবেন ভেবে পেলেন না।

অঞ্জলির বুকের মধ্যে ধক ধক করছিল। সে ভিতরে ভিতরে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করছিল। ভীরু পায়ে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল।

তিনি কোনো সম্ভাষণ করলেন না, পা নাচাচ্ছিলেন, সেটা থেমে গেল, পরিবর্তে চুল টানতে লাগলেন। বোঝা গেল উত্তেজিত হয়েছেন। দেখতে অনেকটাই সুদর্শনের মতো, মুদ্রাদোষগুলো হুবহু এক রকম।

এ অবস্থায় অঞ্জলি যে কী করবে, দাঁড়িয়ে থাকবে, না চলে যাবে, কিছু বুঝতে পারছিল না।

হঠাৎ গলা খাঁকারি দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বসো।'

কয়েকখানা হালকা বেতের চেয়ার ছড়ানো ছিটোনো ছিল, তারই একটাতে সে সন্তর্পণে বসল।

আবার পা নাচালেন ভদ্রলোক, বেশ কড়া গলায় বললেন, 'তুমি তো আমার মতামত নিশ্চয়ই শুনেছ।'

অঞ্জলি মাথা নোওয়ালো, 'শুনেছি।'

'তবে এলে কেন?'

অঞ্জলি নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, 'আপনাকে দেখতে।'

এক পলক দৃষ্টিক্ষেপ করলেন তিনি, ফস করে একটা সিগারেট ধরালেন, 'আমাকে দেখতে?'

'আমিও যে একজন মানুষ, সে কথাটাও জানতে চাই।'

তিনি তাকিয়ে থেকে বললেন, 'জানো বোধ হয়, আমি একজন চিকিৎসক। মানুষের জীবন নিয়েই আমার কারবার, মানুষকে অমানুষ বলে ভাবি এ খবর তোমাকে কে দিলে?'

'আপনার ছেলে।'

'আমার ছেলে? সে কী বলেছে তোমাকে?'

'আমার বাবা অর্থবান নন, সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা নেই, সেই কারণেই আপনার কাছে আমি নগণ্য, পরিত্যাজ্য। এবং আপনার বিবেচনায় আমরা, দু পেয়ে কোনো এক ধরণের জীবমাত্র। অসুখ করলে, মরে বেঁচে ভিজিট দিতে পারলে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণরক্ষা করবেন, কিন্তু মেলামেশার যোগ্য বলে ভাববেন না।'

তিনি তাঁর হাতের সিগেরেট অ্যাসট্রেতে ঘষলেন। চড়া গলায় বললেন, 'বেশ! তা হলে তাই। তারপরে আর তোমার কী বলবার থাকতে পারে?'

'আপনার মতো একজন প্রতিভাবান ডাক্তার, শুনেছি লোকেরা আপনাকে বিধাতার সম্মান দেয়, রোগীরা ঈশ্বর জ্ঞান করে, আমি বলছিলাম, সেইরকম একজন উঁচুদরের মানুষের কাছে আমরা এটাই আশা করব, তিনি আর যাই করুন, মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়েই বিচার করবেন, তার অর্থ বিত্ত জাত গোত্র খ্যাতি নিয়ে নয়।'

'ও', ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে তিনি হাত বুলোলেন।

এবার অঞ্জলি উঠে দাঁড়ালো, 'কিন্তু আমি এভাবে, একটা খবর বার্তা না দিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত ছিলাম না, সুদর্শন শুনলো না।'

'সুদর্শনের কারো কথা শোনাই অভ্যেস নয়।'

'তা ছাড়া আমি জানতাম না আপনি অসুস্থ। আপনার কি জ্বর হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ডাক্তারদেরও অসুখ বিসুখ করে।' কী যেন খুঁজলেন তিনি।

স্বভাবগতভাবেই অঞ্জলি মনোযোগী হয়ে উঠে বলল, 'কিছু চাইছেন।'

এখানে জলের গ্লাস ছিল একটা—'

তিনি এদিক ওদিক তাকালেন।

হাতের কাছেই জলচৌকিতে রাখা ঢাকা গ্লাসটি অঞ্জলি তুলে দিল হাতে। আস্তে বললো, 'জ্বর হলে কিন্তু বারান্দায় বসা উচিত নয়।'

জল খেয়ে গ্লাসটা অঞ্জলির হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তাই নাকি?'

'এখনো তো তেমন গরম পড়েনি, রাত্তিরে হিম হয়, বাতাস ভেজা থাকে—'

'হুঁ।'

'বরং পায়ের উপর একটা চাদর চাপা দিয়ে—'

'নন্দ!' আচমকা প্রচণ্ড গলায় ডেকে উঠলেন তিনি। অঞ্জলি প্রায় কেঁপে উঠেছিলো।

কোথা থেকে ছুটে একটি লোক এসে পিছনে দাঁড়ালো।

বললেন, 'ভালো ভালো খাবার নিয়ে এসো, চা আনো, যাও।'

নন্দ চলে গেলে অঞ্জলি বিদায় নিল, 'আমি তাহলে আজ যাই?' সে আবার প্রণাম করতে গিয়েছিলো, ধমকে উঠলেন, 'যাবে মানে? আমি কি এতোই অভদ্র যে একজন অতিথি এলে এভাবে তাকে বিদায় দেব? বোসো।'
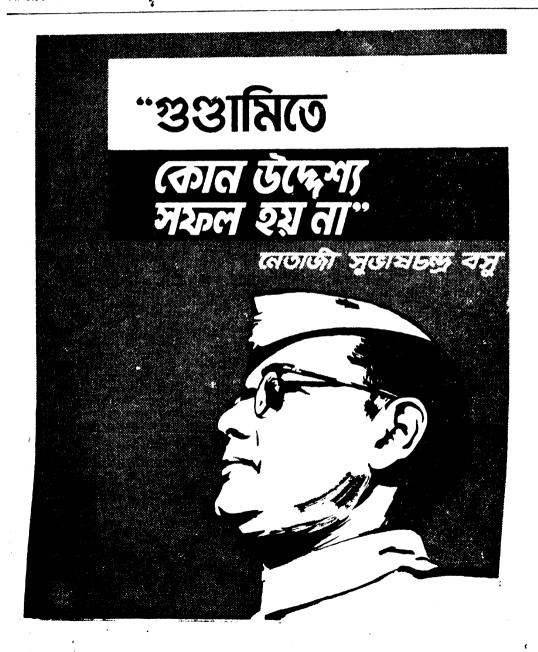
ভয়ে ভয়ে বসলো অঞ্জলি।

এবার একটু হাসলেন, 'হ্যাঁ, কী বলছিলে? বাতাসে হিম থাকে, মা? চাদর চাপা দেয়া উচিত, না? আর কি কি করা উচিত?'

অঞ্জলি লজ্জা পেলো।

'কী খাবো বলো দেখি? সেটাও শুনে রাখি। সাধারণত আমিই তো সকলকে বিধান দিয়ে থাকি, আমাকেও বিধান দিতে পারে এমন লোকের দেখা তো সচরাচর পাই না?'

এই মানুষের কাছে এই সহাস্য পরিহাস অঞ্জলি আশা করেনি। একটু পরে বললো, 'ঠাট্টা কী? নিজের চিকিৎসা কেউ নিজে করতে পারে না।'

'আমিও তো তা অস্বীকার করছি না। আমার টেম্পারেচারটাও তো আমি দেখিনি।'

অঞ্জলি সাগ্রহে বললো, 'আমি দেখবো?'

'দেখবে? দ্যাখো।'

'থারমোমিটার?'

'নিয়েসো, ঘরে আছে। কর্নার টেবিলে।'

ঘরে গিয়ে অঞ্জলি কর্ণার টেবিল খুঁজে থারমোমিটার আনলো, খাটের উপর ছড়ানো একটা বালাপোষ দেখতে পেয়ে সেটাও নিয়ে এলো। পায়ের উপর ছড়িয়ে দিল এনে।

টেম্পারেচার দেখে চোখ কুঁচকে বললো, 'ভাল নয়, রাটি।'

'ওষুধ বিষুধ?'

'আপাতত দরকার নেই, যদি ডাকেন তো কাল এসে বলবো।'

পরিহাসের বদলে পরিহাস করে সরল চোখে তাকিয়ে হাসলো সে।

'ডাকবো কেন?' তিনিও হাসলেন, 'তোমার নিজের দায়িত্ব নেই?'

'আমার দায়িত্ব।'

'অবশ্যই তোমার দায়িত্ব। নিজে থেকেই তুমি নিয়েছ সেটা।'

'আমি নিলেই কি আপনি দেবেন?'

'এতো বড়ো একজন ডাক্তার, ডক্টর সুরেঞ্জন রায়চৌধুরীকেও যে প্রেসক্রিপশন দিতে পারে, তাকে একবার পেলে কি আর ছাড়া যায়?'

নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে খুব জোরে জোরে হাসলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, 'বেশ ঠিক আছে, দেখা যাবে তোমার হাতযশ, কেমন তুমি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পার।'

চোখে মুখে আনন্দ বিচ্ছুরিত হলো অঞ্জলির। চুপ করে থেকে আস্তে বললো, 'আপনার কাছে না এলে চিরকাল আমি একটা ভীষণ ভুলের মধ্যে বাস করতাম।'

'কী ভুল?'

'ভয়ানক ভয় পেতাম আপনাকে। ভাবতাম কী না কী—'

'এখন বুঝি ভাবছো না?'

'এখন? না।'

'এখন কী মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে মায়ের মৃত্যুর পরে যে অভাববোধে আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম, তা আর আমায় ফিরে পাওয়া হতো না।' আবেগের মুখে কথাটা বলে ফেলেই খুব সংকুচিত হয়ে বললো, 'মানে, আমি বলছিলাম যে আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।'

ডক্টর চৌধুরী একথার পরে চুপ করে দূরে তাকিয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ, বললেন, 'ও,, তোমারও বুঝি মা নেই?' গলার স্বর কোমল শোনালো।

মুখ নিচু করে অঞ্জলি বললো, 'না।'

আবহাওয়াটা সহসা একটু করুণ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ঝেড়ে ফেললেন সুদর্শনের বাবা, হাসিমুখে বললেন, 'শোনো আমি যে একটা রাক্ষস খোক্কস নই, আমাকেও যে কারো কারো ভালো লাগতে পারে সে কথাটা আমার ছেলেকে একবার বলে দিও। সে তো ভাবে তার বাবার মতো খারাপ মানুষ বুঝি দিন দুনিয়ায় নেই।'

'নিশ্চয়ই বলবো।' অঞ্জলিও গলার স্বর সহাস্য করলো।

'এবার বুঝেছ তো কে কেমন লোক?'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'আপনি খুব ভালো।'

'আর ঐ অপদার্থটা?'

'সেই, আপনি যা বললেন?'

'কী বললাম?'

'অপদার্থ না কী যেন?'

আরে, এ দেখছি মহা চালাক মেয়ে, অ্যাঁ—খোকা খোকা—'

খোকা এলো না, চা নিয়ে নন্দ বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে চটে গেলেন তিনি। মিষ্টি কথা মুহূর্তে অন্তর্হিত। লোকটিকে এই মারে কি সেই মারে, 'তুই এলি কেন? আমি কি তোকে ডেকেছি? বেরোও, বেরোও এখান থেকে। গেট আউট। আমি তোমাকে স্যাক করলাম। যাও, এক্ষুনি চলে যাও তোমার কাপড়-জামা নিয়ে।'

'অঞ্জলি প্রায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, তারপরেই বুঝে নিয়ে শান্ত গলায় বললো, 'আপনি বসুন, সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি, এরা কেউ কিছু বোঝে না, তাই এরকম করে। আর এর তো কোন দোষ নেই,

ওকে আমরাই চা আনতে বলেছি, আসল দোষ যার, সে এখানে নেই তাকে বরং ডেকে দিক।'

'অ্যাঁ। হ্যাঁ। যাও দাদাবাবুকে ডেকে আন।' যেভাবে চটে উঠেছিলেন, সেভাবেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন তিনি, সহর্ষ দৃষ্টিতে পর্বত প্রমাণ খাদ্যের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ অন্য গলায় বললেন, 'বাঃ, নন্দ দেখছি বেশ এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে। পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম তোমার।'

ডাকতে হলো না। সুদর্শন নিজেই উঠে এসেছিলো বাবার চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে। এসেই দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তখন হেসে হেসে বলছিলেন, 'বুঝলে, আসলে ছেলেটা একটু ক্ষ্যাপা, ওর মা না থাকাতে কিছুই ওর মনোমত হয় না কিনা, তাই চ্যাঁচামেচি করে। আমাকে দ্যাখো, আমি তো সব মেনে নিয়েছি, চ্যাঁচামেচি করে কী লাভ বল? তা ও বুঝবে না। এবার তুমি যদি একটু মেজাজ মর্জি ঠাণ্ডা করতে পার।'

অঞ্জলিও হাসছিলো, হেসে বলছিলো, 'আপনার মতো শান্ত মেজাজ কি সকলের হয় নাকি? চায়ে চিনি দেব তো? আপনি এই সঙ্গেই রাত্তিরের খাবারটা খেয়ে নিন। প্লেটে করে সাজিয়ে দিচ্ছি। সব কিছু কিন্তু দেব না। জ্বরের মধ্যে সব খেলে গুরুপাক হবে। রাধাবল্লভী দুখানা দিচ্ছি, দুটো রাজভোগ, দুটো কাঁচাগোল্লা সন্দেশ আর একটা পান্তুয়া এই দিলাম, কেমন?'

'দাও যা খুশি দাও। কড়া ডাক্তারের হাতে পড়েছি যখন।' প্লেট টেনে নিয়ে ভোজনপটু বাবাকে সুদর্শন পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে দেখে দাঁড়িয়ে থেকেই মুচকি হাসলো সিঁড়ির মুখোমুখি বসে থাকা অঞ্জলির দিকে চোখ ফেলে তার-পরেই গলা খাঁকারি দিয়ে সামনে এসে হন্তদন্ত হয়ে বলল, 'চলো, চলো এবার দিয়ে আসব তোমাকে।'

'এই যে এসেছেন শ্রীমান।' ছেলের দিকে তাকালেন তিনি, খুব প্রসন্ন মুখে। চায়ের পেয়ালা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, 'জীবনে তো একটাও ভালো কাজ করতে দেখলাম না, তবু যা হোক এই ব্যাপারে একটু বুদ্ধি সুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। এসো, দয়া করে বসে কিছু খাও, দ্যাখো পরিবেশন পছন্দ হয় কিনা, সবটা নিয়েই তো তোমার সারাদিন কেবল খচখচি।'

বাবার চাইতে দ্বিগুণ প্রসন্ন মুখে চেয়ার টেনে বসে গেল সুদর্শন, অঞ্জলি তাকেও চা দিল, খাবার দিল, ছেলে আর বাবা দেখতে দেখতে বন্ধু হয়ে উঠে ভুলে গেলেন অতিথি তাঁরা নন। আতিথেয়তাটা আজ তাঁদেরই কর্তব্য ছিল। আর অঞ্জলির দুটি পুরুষকে যত্ন করতে করতে মাতৃ-স্নেহ অনুভব করল হৃদয়ে, বুঝতে পারল

দুটি শিশু যে কারণে একত্র হলেই মারামারি বাধায় এ'রা দুজনও ঠিক তাই। সুদর্শনের ভাষায় এই দুটি উৎকৃষ্ট বৃক্ষ উন্মূলে হয়েছে মাটি থেকে। 'আমিই এ'দের মাটি হবো, ভক্তিতে ভালোবাসায় সেবায় স্নেহে এ'দের আমি আবার সিক্ত করব।' মনে মনে যেন মন্ত্রের মতো এই ক'টি কথা উচ্চারণ করল অঞ্জলি। এই প্রথম সে তার নারী জীবনকে সার্থক মনে করল।

এরপরে কয়েকটা দিন বড় সুখে কেটেছিল, বড়ো শান্তিতে কেটেছিল। বাবার সঙ্গে বিরোধ মিটোতে পেরে সুদর্শনও যেমন আনন্দে ভাসছিল, তার নিজের বুক থেকেও একটা পাথর নেমে গিয়েছিল।

শেষে একদিন চোখ ভরা জল নিয়ে চলে গেল সুদর্শন। পথে পথে চিঠি লিখতে লিখতে গেল। গিয়ে সান্ত্বনা দিল, 'সোনামণি, মন খারাপ করো না। আমি এখানে কলকতার দিকেই জানালা খুলে বসে আছি সারাক্ষণ, সারাক্ষণ তোমাকে ভাবছি, সারাক্ষণ আমার প্রিয়তমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দিন কাটাচ্ছি। যেদিন যে মুহূর্তে কাজ শেষ হবে সেদিন সেই মুহূর্তেই জাহাজ ধরব। সম্ভব হলে উড়বো। তুমি আমাকে ততোদিনে ভুলে যাবে না তো? সীতেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে। খুব ফূর্তিতে আছে, কেননা তার সাথীটিরও আগামী বছর আসবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট পড়বে এই রকম একটি পরিকল্পনা আছে তার, আপাততঃ টাকা জমাচ্ছে প্রাণপণে।

বাবার সঙ্গে দেখা হয় কি? যেয়ো মাঝে মাঝে। তুমিই তো আমাদের সেতু, নইলে দুজনেই ডুববো। পড়াশুনো কেমন চলছে? তোমার মাস্টার মশায়ের খবর কী? সীতেশ বলছিল, মাস্টারমশায় আছেন বলেই তোমার জন্য তার ভাবনা কম। তোমার শরীর কেমন আছে?'

এই সব চিঠি সম্বল করেই সুখে দুঃখে কেটে গিয়েছিল বারো মাস। কিন্তু বারো মাসে কাজ শেষ হলো না তার, এখানকার অসমাপ্ত কাজ নিয়েই চলে গিয়েছিল, সমাপ্ত হলো ষোলো মাসে। তরপর পকেটে ডিগ্রি নিয়ে, হাতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা নিয়োগপত্র নিয়ে চলে এলো লাফাতে লাফাতে।

কিন্তু তার আগেই আই এ পাশ করল অঞ্জলি, বি এতে ভর্তি হলো। মাস্টার মশায়ই সব করলেন। নিজের বিষয়ে অনার্স নেওয়ালেন।

তাঁর আশা সফল করে অঞ্জলি সত্যিই কিছু দশজনের একজন হলো না, কোনোরকমে ফার্স্ট ডিভিশনে গিয়ে মুখরক্ষা করল।

কিন্তু একটু খটাখটি হলো সেই স্টাইপেণ্ডের ব্যাপার নিয়ে। এবারেও মাস্টারমশায় বললেন, 'কোনো খরচ লাগবে না তোমার।'

অঞ্জলি বলল, 'আমি খুব একটা ভালো ছাত্রী নই, যারা বৃত্তি পায় তারাই এ রকম সাহায্য পেতে পারে, তাও চেষ্টা চরিত্র করে। কিন্তু আমি—'

মোটা কাচের চশমার ফাঁকে মাস্টারমশায় এমনভাবে তাকালেন, চুপ হয়ে গেল সে।

অনেক পরে জলদ গম্ভীর গলায় বললেন, 'এসব ব্যাপার নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও সেটা আমি চাই না। আমি চাই তুমি তোমার কাজে মনোযোগী হও।'

অঞ্জলি তখন সীতেশকে স্মরণ করল। সীতেশ থাকতে তাকে কী পরামর্শ দিত সেটা ভাবলো, তারপর আর তা নিয়ে কথা বলল না।

মাঝে মাঝে মাস্টারমশায় সীতেশদার খবরও নিতেন। জিজ্ঞেস করতেন, 'চিঠি চিঠি পাও?'

'পাই।'

'কী লেখে?'

'এই পড়াশুনোর কথা—'

'আর?'

'ওখানে কেমন লাগছে, কী করছে—'

'আর?'

'আর কী লিখবে?'

'কবে ফিরে আসবে, কী করবে—'

'হ্যাঁ তা-ও লেখেন।'

'আর তারপরে সব ব্যক্তিগত কথা, কী বলো?'

অঞ্জলি চোখ তুলে তাকায়। কেমন এক রকম হাসেন তিনি, হেসে হেসে বললেন, 'সে সব গোপন কথা বলা যায় না, না?'

কী অদ্ভুত। অঞ্জলি গুম হয়ে যায়। ভীষণ রাগ হয় তার। এমনিতে মাস্টারমশায় কত শান্ত সংযত একজন ভদ্রলোক, বাজে ব্যাপারে কখনো কোনো কৌতূহল নেই, অথচ সীতেশের কথা উঠলেই তিনি কেমন হয়ে যান।

এতো খারাপ লাগে! তখন যেন ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সব উবে যেতে চায়। তা বলে সীতেশকে যে তিনি ভালোবাসেন না তা-ও নয়। কত সময় কত প্রশংসা করেন, উদ্বিগ্ন হন খবরের জন্য।

মাস্টারমশায়ের নিষ্ঠা অধ্যবসায়, ছাত্রছাত্রীর প্রতি তাঁর মমতা, মনোযোগ, অধ্যাপক হিসেবে সাফল্য, সবই উল্লেখযোগ্য। কলেজে সবাই মান্য করে তাঁকে, সবাই নিঃসংশয়ে জানে তাঁর তুল্য আদর্শবাদী সৎ মানুষ খুব বিরল।

কিন্তু এই একটা ব্যাপারে তিনি তাঁর আসন থেকে অনেকখানি নেমে যান অঞ্জলির চোখে। অঞ্জলি ভেবে পায় না বয়স্ক মানুষটির এই ধরনের ছেলেমানুষীর অর্থটা কী?

তার রাগও হয়, দুঃখও হয়।

একদিন বললেন, 'সীতেশের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী রকম আমি যেন মাঝে মাঝে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।'

সেই একই প্রশ্ন।

অঞ্জলি পেন্সিল দিয়ে মনোযোগ সহকারে কী লিখতে লাগলো খাতার উপরে। এই প্রসঙ্গ সে সব সময়েই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

মাস্টারমশায়ও বইয়ের পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করে একটা কিছু বোঝালেন। তারপরে আবার বই বন্ধ করে দিয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি কী বল?'

'কী বিষয়ে?'

'তোমাদের সম্পর্কটা কি খুব সরল?'

এক পলক চোখ তুলে থমথমে গলায় অঞ্জলি বলল, সরল বা বাঁকার কথা নয়, আপনি জানেন সীতেশ আমার দাদা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা তো বটেই, তবে দাদাটি বস্তুতই দাদা আছে কি না সেটাই প্রশ্ন।'

'আপনার কী মনে হয়?'

'স্পষ্ট করে বললে কি সইতে পারবে?'

'আপনি স্পষ্ট করেই বলুন না।'

'না।'

'দেখুন, আমি আপনার ছাত্রী, আপনাকে আমি ভক্তি করি, কিন্তু এসব আলোচনা আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি কি আমার শুধুই ছাত্রী?'

'না, তা আমি বলছি না।'

'তা হলে কী বলছ?'

'আমি জানি, আপনি আমাকে কত স্নেহ করেন, ভালোবাসেন, কিন্তু—'

'না, এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই অঞ্জলি, আমরা যে এতদিনে আর শুধুমাত্র মাস্টার আর ছাত্রীর মধ্যেই আবদ্ধ নেই তা অবশ্যই তুমি বুঝতে পেরেছ?'

'আমি বলছিলাম—'

'আমি কি আমার ব্যবহার খুব অস্পষ্ট রেখেছি?'

'আমি বলছিলাম—'

'তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, বরং বাড়ি গিয়ে ভেবো একটু। পড়, কী পড়বে আজ। কাননবাবু কাল তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন, বলছিলেন মনোযোগ দিলে যত্ন নিলে তুমি হয়তো খুবই ভালো ফল পাবে। যত্ন নিতে আমার তো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মনোনিবেশ করাটা তোমারই হাতে। বই খোলো—'

(ক্রমশ)

ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা

ফাদার দ্যতিয়েন

ভালো মানুষ লা ফোঁতেন্

ফরাসীরা তাঁকে 'ভালো মানুষ লা ফোঁতেন্' আখ্যা দিয়েছে। ভালো মানুষ বটে, মোটেই তিনি বীরপুরুষ নন— যদিও অবশ্য তাঁর ভূতপূর্ব পৃষ্ঠপোষক পদচ্যুত কারারুদ্ধ সেই অর্থমন্ত্রী ফুকের পক্ষ তিনি নির্ভয়ে নিয়েছিলেন।

ছাব্বিশ বছর বয়সে পিতৃদেবের হাত থেকে তিনি গ্রহণ করেন মারীয়া মাক্রী চৌদ্দ বছরের এক পত্নী— আর শাঁপাঞিয়েতে জলপথ পরিদর্শকের এক চাকরি; দুটোকেই অবহেলা করতে তাঁর বেশী সময় লাগল না। একদিন আপন ছেলেকে রাস্তায় চিনতে না পেরে ভদ্রভাবে তিনি নমস্কার জানান; পরে নিজের ভুল বুঝে স্বীকার করেন, যুবকটিকে তিনি যেন আগে কোথাও দেখেছিলেন বটে! কেউ তাঁকে সাবধান করে বলে, অমুকজন তাঁর স্ত্রীর পিছু পিছু ঘোরে; লা ফোঁতেন্ উত্তর দেন: "ঘুরুক না! দেখবেন, ওর একদিন ক্লান্তি লাগবে— আমার নিজের যেমনটি লেগেছিল।"

কবুল করেন, সব কিছুই তিনি ভালোবাসেন— "খেলা, প্রেম, বই আর গান।" স্বামীর এই ব্যক্তিগত ঔদাস্য মারীয়কে মর্মাহত করে: "হপ্তা তিনেক উনি ভুলে যান উনি বিবাহিত।" পঁচিশ বছর ধরে তিনি ওঁকে আটকে রাখতে চেষ্টা করেন, তারপর, মনে হয়, তিনিও ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন!

দেশভ্রমণে গিয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে লা ফোঁতেন্ লেখেন: "জায়গাটা এত মনোহর যে, আদিরসাত্মক কিছু একটা ঘটে গেলে বেশ লাগত!" কিংবা "যামিনীদেবী গৃহস্থের কন্যাকে আমার কাছে পাঠালে প্রত্যাখান করতাম না: পাঠান নি, একাই রাত কাটালাম..." কিংবা "এক কাউণ্টেসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে: বয়স অল্প, গড়ন চলনসই, বৈদগ্ধ ঢের; ছদ্ম নামেই নিজের পরিচয় দেন, বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা চলছে — সুলক্ষণে ইঙ্গিত বটে, কিন্তু হায়, সৌন্দর্যের যেখানে অভাব, আমি সেখানে নিরুপায়।"

ঐ ভালোমানুষের রচনার মধ্যে লুকিয়ে আছে তীক্ষ্ণতম পরিহাস। মলিয়েরু, লা ব্রুইয়েরু, বয়ালো প্রভৃতি লেখক রাজারই পৃষ্ঠপোষী ছায়ার আড়ালে অবশিষ্ট সকলকে উপহাস করেন; লা ফোঁতেনের উপহাসের পয়লা লক্ষ কিন্তু রাজা নিজেই। সেই উপহাস অবশ্য কাউকে আঘাত করে না, সকলকেই আমোদ দেয়। তাঁর ইয়ারের সংখ্যা অত্যধিক, আর তবু অলঙ্ঘ্য আত্ম-

এইটুকু তো সময় তারপরই আমি ফিরে আসব

কেন্দ্রিকতার দরুন সত্যকার প্রেম যেমন, প্রকৃত বন্ধুত্বও বোধ হয় তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে কোনো দিনই উপলব্ধি করেন নি। প্রেম আর বন্ধুত্বের কথা তিনি অবিনশ্বর ছন্দে গেয়েছেন— অনুশোচনা-প্রণোদিত উদ্বেগে। যেমন ধরুন 'দুটি কপোত' নীতি গল্পে:

'দুটি কপোত'

দুটি কপোত মধুর ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ ছিল। একটি—মূঢ়তা দেখুন! —মনস্থ করল, দূর দেশে পাড়ি দেবে।

অপরটি বলল, "সে কি কথা? আপন ভাইটিকে বুঝি ত্যাগ করবেন? বিরহই সকল দুঃখের আকর—কথাটা মানেন না, বুঝি, নিষ্ঠুর?...অন্তত যাত্রার বিঘ্ন, বিপদ আর দুর্ভোগের ভাবনাই আপনার মন যেন ফিরিয়ে আনে.....ঋতু তবু যদি অনুকূল হত!...বসন্ত সমীরণের অপেক্ষা করুন; তাড়া কিসের? এইমাত্র একটা কাক ঘোষণা করছিল পাখির আসন্ন দুর্যোগের ইঙ্গিত...। আমি স্বপ্নে দেখব শুধু অলক্ষুণে কাণ্ড— বাজ ও ফাঁদ; বলব, হায়, বৃষ্টি তো এল, ভাইটির কি প্রয়োজনীয় সব আছে—সুস্বাদু খাদ্য, নিরাপদ আশ্রয় ইতি সব?..."

শুনে হঠকারী যাত্রীর মন টলল; আর তবু দর্শনলিপ্সা ও চিত্তচাঞ্চল্য জয়ী হল শেষে। "কাঁদবেন না, বলল সে; বড় জোর তিনটি দিন, তাতেই সাধ মিটবে। এইটুকু তো সময়, তারপরই আমি ফিরে আসব, ভাইটির কাছে অভিযানের বিবরণ দেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; ঘোচাব তার নির্বেদ...। যে কম দেখে, বলার পুঁজিটিও তার কম। আমার যাত্রার বর্ণনা আপনাকে অতিশয় আনন্দ দেবে। বলব, ওইখানটিতেই ছিলাম, অমনটিই ঘটল আমার; আপনি ভাববেন, নিজেই সেখানে আছেন!" এই বলে দুজনে দুজনের কাছে অশ্রুপূর্ণে বিদায় নিল।

অগ্রসর হল যাত্রী; হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ তাকে এক আশ্রয়ে শরণ নিতে বাধ্য করে। ছিল একটিমাত্র গাছ; তার শাখার আড়ালেও ঝড়ের ঝাপট পীড়িত করল কপোতকে। রোদ এলে চলে যায় সে, লজ্জানত হয়ে; বর্ষাভারাক্রান্ত দেহটিকে যথাসাধ্য শুকিয়ে নেয়। হঠাৎ দেখে, এক নির্জনক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে শস্য, কাছে এক পায়রা। দেখে লোভ হয়, উড়ে যায় সেখানে, ধরা পড়ে: শস্যের আড়ালে লুকোনো ছিল মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতক এক ফাঁদের মোহিনী জালিকা।

ফাঁদটা ছিল জীর্ণ; ডানার, পায়ের, ঠোঁটের দাপটে পাখিটি তাকে ছিঁড়ে ছাড়ে —নষ্ট হল একগাছা পালক। কিন্তু বিধি বাম, নিষ্ঠুরনখর এক শকুনি দুর্ভাগাকে দেখতে পায়, জড়িয়ে-থাকা দড়ি ও জালের

টুকরোগুলি টানতে টানতে চলেছে, পলাতক এক কয়েদী যেন। শকুনি ছোঁ মারতে যাচ্ছিল, হঠাৎ আকাশ থেকে সোঁ করে নেমে আসে প্রসারিত পক্ষ এক ঈগল। তস্করদের সংগ্রামের সুযোগে উড়ে যায় কপোত, নামে এসে এক কুটিরের পাশে। ভাবল, এবার বুঝি দুর্যোগের অবসান...। এক দুরন্ত বালক কিন্তু [বাল্যকাল দয়াহীন!] ফিঙ্গে টিপ করে এক ঢিল ছুঁড়তেই হতভাগ্য পাখি হল বিনষ্টপ্রায়। নিজের কৌতূহলকেও অভিশাপ দিয়ে পা টেনে টেনে, ডানা হেঁচড়ে অর্ধমৃত অর্ধপঙ্গু কপোত সিধে বাসায় ফিরল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পোঁছল বিনা কোনো বিপর্যয়ে। সম্মিলিত হল দুটি প্রাণ : বুঝুন এবার, কত আমোদেই পরিশোধিত হল দুঃখ।

প্রেমিক, সুখী প্রেমিক, যদি যাবেই ভ্রমণে, যেয়ো তবে অদূরবর্তী নদী তীরে; পরস্পরই পরস্পরের কাছে হয়ে উঠ চিরসুন্দর, চিরবিচিত্র, চিরনূতন এক বিশ্ব...।

'ফাব্‌ল্‌' ও ভারত

লা ফোঁতেনের 'ফাব্‌ল্‌' তাঁর রচনাবলীর একপঞ্চমাংশ মাত্র। গ্রন্থটির শিরোনাম : "মনোনীত নীতিগল্পাবলী—লা ফোঁতেনের দ্বারা ছন্দে সজ্জিত"। রচিত নয়, সজ্জিত। প্রকৃতপক্ষে এই ২৪৪-টি নাতিদীর্ঘ কবিতার মধ্যে [গড়পড়তায় ৩৫-টি ক'রে পংক্তি; ক্ষুদ্রতম ও দীর্ঘতম ফাবলের পদসংখ্যা যথাক্রমে ৮ আর ৯২] তাঁর নিজের উদ্ভাবনা হল কুড়িরও কম। চতুর্দশ লুইয়ের ছ' বছরের পুত্রের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট প্রথম খণ্ডের কবিতাগুলি [১৬৬৮] প্রধানত গ্রীক ঈশপ আর লাতিন ফেদ্রুস্‌-এর নীতিগল্পের এক সমৃদ্ধতর সংস্করণ। নিজেকে তিনি বলেন পূর্বসূরীর অনুসারী, অনুকারী ও বিশ্বস্ত শিষ্য! "নিজস্ব যদি কোথাও কিছু যোগ দিয়ে থাকি, তা করি আমাদের সমাজ-চিত্রণের উদ্দেশে, ঈর্ষাবশত নয়।" দ্বিতীয় খণ্ডে [১৬৭৮-৭৯] রাজনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রবেশ লাভ করে; ভারতীয় প্রভাবও সুস্পষ্ট। ১৬৬৯ সালে স্বদেশে প্রত্যাগত ভারতপর্যটক বের্নিয়ে-র কথাবার্তা-ই ভারতের প্রতি লা ফোঁতেনের এই কৌতূহলের উৎস। অবলম্বিত গ্রন্থটির নাম : 'আলোক-গ্রন্থ, ওরফে নৃপতি-ব্যবহার—ভারতীয় প্রাজ্ঞ পিল্‌পে রচিত, ইরানের রাজধানী ইস্‌পাহানে ফরাসিতে অনূদিত, ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে'। বলা বাহুল্য, লা ফোঁতেন্‌ সেই সব ভারতীয় গল্প সংক্ষিপ্ত করেছেন।

'দুটি কপোত' কবিতাটির একাধিক তথ্য [ঝড়, বাজ ও ঈগল, শষ্য ও ফাঁদ, ফিঙ্গে ও বালক] সেই 'আলোক-গ্রন্থ' থেকে গৃহীত। অনেক তথ্য আবার, অবান্তর বলে, বর্জিত। আর বর্জিত—অবশ্যই 'প্রেমিকের' কাছে 'প্রেমাস্পদের' ভাষণ : "বিজ্ঞেরা বলে গিয়েছেন, যে-জ্ঞান আমাদের নেই, সেই-জ্ঞান অর্জন করার এক উপায় হল যাত্রা। খড়্গ যদি খাপেই থাকে, তার প্রতাপ প্রকাশ পায় না; পৃষ্ঠায় লেখনী যদি না ছোটে, তার বাগ্মিতাও প্রদর্শিত হয় না। অবিরত গতির জন্যই আকাশ সর্বোপরি বিরাজমান; পৃথিবী কিন্তু অচল বলেই সর্বজীবের পাদপীঠ। বৃক্ষ যদি নিজেকে স্থানান্তরিত করতে পারত, তবে তো,
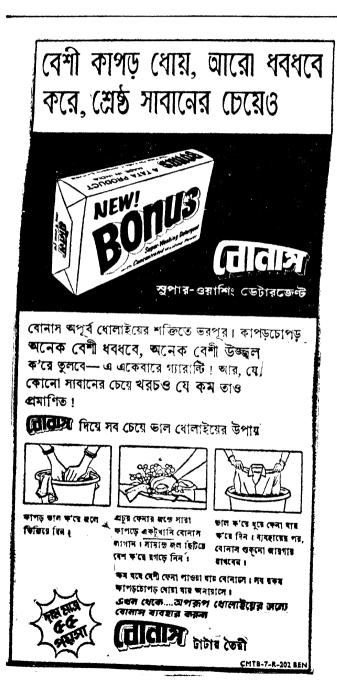
করাত ও কুড়ুল সে ভয় পেত না...।" ভারতীয় উপসংহারও ফরাসী গল্পে পরিবর্তিত; আলোক-গ্রন্থে ছিল: "এই দৃষ্টান্ত দিলাম, মহারাজ যাতে বোঝেন, যে-বিশ্রাম তিনি আজ উপভোগ করেন, যাত্রার অসুবিধার চেয়ে তা শ্রেয়"।

কোনো কবিতায় [যেমন 'দুটি বন্ধু'] লা ফোঁতেন আলোক-গ্রন্থকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছেন। অন্যত্র তিনি বিনা কারণে, যেন কৌতুকচ্ছলে, নিজের এই গল্পকে পিলপে-র গল্প বলেছেন: "ঘটনাটা ঘটল—পিলপের মতে—সেই গঙ্গাতীরে, যেখানে কোনো মানুষ, এমন কি রাজা পর্যন্ত, কোনো পশুর রক্তপাত করে না। তারা বলে, নর ও পশুর রূপ বদলে যায়: একদিন হয়তো আমরা মানুষ, একদিন হয়তো পাখি..." ['চিল, রাজা ও শিকারী']। লা ফোঁতেন 'মোগল' কথাটা একাধিকবার ব্যবহার করেছেন—উভয় দেশের ও দেশবাসীর অর্থে; তাঁর একটা কবিতার শিরোনাম: "মোগল দেশের এক ব্যক্তির স্বপ্ন" "সুরাটে নাকি ভাগ্য-দেবীর মন্দির আছে"; এদিকে "ব্রাহ্মণেরা বিশ্বাস করেন, মানুষের আত্মা রাজার শরীর ছেড়ে কীটাণুর দেহে প্রবেশ করে...।"

লা ফোঁতেন্ ও মধুসূদন

ফ্রান্সে প্রবাসী মধুসূদন যেমন পেত্রার্কের সনেটের অনুকরণে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' লিখেছিলেন, লা ফোঁতেনের ফরাসী ফাবলের আদর্শেও তিনি নীতি-গল্প লিখতে চেষ্টা করেছিলেন: ময়ূর ও গৌরী [তুলনীয়: জুনো-র কাছে অভিযোগকারী ময়ূর], কাক ও শৃগালী [কাক ও খেঁকশেয়াল], রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা [ওক্ ও খাগড়া], অশ্ব ও কুরঙ্গ [হরিণের উপর প্রতিশোধলিপ্সু অশ্ব], কুক্কুট ও মণি [মোরগ ও মুক্তা], পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু [পীড়িত সিংহ ও খেঁকশেয়াল], সিংহ ও মশক [সিংহ ও মশক]। 'গদা ও সদা' গল্পটিও লা ফোঁতেনের একাধিক কবিতার অনুসরণে রচিত।

ময়ূর পাশ্চাত্য বৃহস্পতিভার্যা জুনো-র উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পাখি—সুধী পাঠকমাত্রই তা জানেন বলে লা ফোঁতেন্ কোনো ব্যাখ্যা না করে লেখেন: "ময়ূর জুনো-র কাছে নালিশ করল: দেবী, বলল সে, অকারণ নয় আমার অভিযোগ: আমায় যে কণ্ঠ-তুমি দান করেছ, তা, হায়, সর্বজীবের অপ্রীতিভাজন..." মধুসূদনের কবিতা দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বিগুণ: "ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে, কৈলাস-

গাও গীত গাও সখে করি এ মিনতি
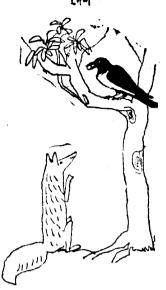
ভবনে: অবধান কর দেবি, আমি ভৃত্য নিত্য সেবি প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে। রথী যথা দ্রুত রথে, চলেন পবন-পথে দাসের এ-পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি; তবু, মা গো, আমি দুখী অতি..." বাঙ্গালী পাঠকের ধৈর্য আছে বলতে হবে! এদিকে গৌরী যেখানে "সুমধুর স্বরে" উত্তর দেন, জুনো সেখানে পাখিটার আবেদনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন; কবিতার শেষ পংক্তিতে পড়ি: "অভিযোগ থেকে বিরত না হলে, তোমার ডানা-বাহার পর্যন্ত তুলে নেব!"

'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কবিতা-ও 'ওক্ ও খাগড়া' ফাবলের প্রায় দ্বিগুণ। তাতেও সেই একই ভারতীয়করণ [উরু-ভাঙ্গা কুরুরাজে বধিলা যেমতি ভীম যোধপতি..."] তথ্যবাহুল্য ["কেহ অন্ন বাঁধি খায়, কেহ পড়ি নিদ্রা যায় এ রাজ চরণে..."] আর অসহ্য দীর্ঘতা।

কাক ও খেঁকশেয়াল

'কাক ও খেঁকশেয়াল' হল আমাদের 'বীরপুরুষ'। ঐ নীতি গল্পটিকে মুখস্থ করেনি, ফ্রান্সে এমন কোনো বালকবালিকা নেই—কবিতাটা যদিও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। এবার শুনুন আমার বন্ধু অমলের অকৃপণ ও উৎসাহিত সাহায্যে রচিত এক আক্ষরিক অনুবাদ। লা ফোঁতেনের দ্বাদশাক্ষর পংক্তিকে আমরা করেছি ছ-মাত্রিক তিন পদ, শেষে দু মাত্রা; দশাক্ষর—ছ-মাত্রিক দু পদ, শেষে পাঁচ মাত্রা; পঞ্চমাক্ষর-যতি অষ্টাক্ষর—ছ-মাত্রিক দু পদ, শেষে দু মাত্রা; তৃতীয়াক্ষর-যতি অষ্টাক্ষর—ছ-মাত্রিক দু পদ।

শ্রীকাকেশ্বর, সমারূঢ়-ঠ্যাং বৃক্ষ-'পরে,
পনিরখণ্ড নিয়ে চঞ্চুর ফাঁকে।
শ্রীখেঁকশেয়াল, গন্ধে লুব্ধ লালসাভরে,
এবম্প্রকারে সেলাম জানাল তাকে:
"প্রাতঃপ্রণাম, কাক-মহোদয়,
কি-কান্তিমান ভবতি ভবান, লাবণ্য দেহময়।
মিছে নয়, যদি ভবদীয় স্বর
হয় ও-ডানারই সমসুন্দর,
আপনিই তবে বিহঙ্গপতি যত বনচরদলে।"
এ-কথায় কাক আটখানা হয়ে আহ্লাদে গিয়ে গলে

যেই তার মধুকণ্ঠ শোনাবে বলে
খুলেছে, চঞ্চুপুট, হায় লুঠে পপাত ধরণীতলে।
খপ্ করে সেটা লুফে নিয়ে বলে শেয়াল, "বন্ধুবর,
তোষামুদে যারা—জেনো এর পর—
শ্রোতারই কড়িতে ক'রে খায় তারা এ-পৃথিবীতে:
পনির খুইয়ে আচ্ছা শিক্ষে, সন্দেহ নেই ইথে।"
কাক, লজ্জায় শরমে নাচার
হলফ করল—হায় বিলম্বে—পস্তাবে না সে আর।

মাইকেলীয় সংস্করণের প্রথম কয়েকটি পদ উপাদেয়:

একটি সন্দেশ চুরি করি
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি
কাক হৃষ্টমনে:
সুখাদ্যের বাস পেয়ে
আইল শৃগালী ধেয়ে;
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে:
অপরূপ রূপ তব, মরি...

পরবর্তী পদগুলিতে কিন্তু মধুসূদন লা ফোঁতেন্-সুলভ সংযম রাখতে পারেন নি:

তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা?...কহ গুণমণি!
হে নব নীরদ-কান্তি,
ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি,
যুড়াও এ কান দুটি, করি বেণু-ধ্বনি!
পুণ্যবতী গোপ-বধূ অতি,
তেঁই তারে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি—
মোহ হে মদনে তুমি. কি ছার যুবতী?
গাও গীত, গাও, সখে করি এ মিনতি।

তারপর? 'কাক ও শৃগালী' যে-গ্রন্থে—একটিবার মাত্র—প্রকাশিত হয়েছিল, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' দুষ্প্রাপ্য সেই প্রথম সংস্করণে, মাইকেলীয় এই অসংযমে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উইপোকা-ই নীতি গল্পটির অবশিষ্ট পংক্তিগুলিকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

॥ ২ ॥
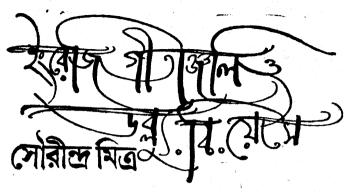
পঞ্চাশোর্ধে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই যে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি এবং অন্যান্য কাব্যের ইংরেজি অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন তা সকলেই জানেন। এ বিষয়ে এবং এর পরবর্তী বিস্ময়কর ঘটনাবলী সম্বন্ধে তিনি স্বদেশে বিদেশে অনেকের নিকট পত্রযোগে এবং নানা প্রসঙ্গে নানা রচনায় অথবা মৌখিক আলাপে বারবার মন্তব্য করেছেন। তার মধ্যে লণ্ডন থেকে ১৯১৩ সালের ৬ই মে তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একটি পত্রে (চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য) সূচনাপর্বের যে ইতিবৃত্ত আছে সেটা স্পষ্ট বিবৃতির জন্য মূল্যবান। সেই চিঠির অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, ১৯১২ সালের মার্চ মাসেই কবির ইংলণ্ড যাত্রার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু যাত্রার ঠিক পূর্বরাত্রে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়, মালপত্র জাহাজে চলে গেলেও, কবির বিদেশযাত্রা তখনকার মতো স্থগিত হল। ডাক্তারের পরামর্শে মাস দুই বিশ্রাম নিতে কবি একা চলে গেলেন শিলাইদহে। এই সময় অনুবাদের 'অনাবশ্যক' কাজটি কবি হাতে নিলেন। কবি চিঠিতে লিখেছেন :

'যদি বলিস কাহিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মায় কেন—কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় এ কাজে লাগিনি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে উঠেছিল সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্য কেমন একটা তাগিদ এল একটি ছোট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখনই উসখুস করে উঠবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জমা করতে বসব। ঘটলও তাই। একখানা খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পেঁছিন গেল। রোটেনস্টাইন আমার কবিযশের আভাস পূর্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথা প্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিত মনে তাঁর হাতে খাতাটি সমর্পণ করলুম।'

১৬ই জুন কবি ইংলণ্ডে পেঁছলেন। পেঁছেই অবিলম্বে যে খাতাটি রোটেন-স্টাইনকে সমর্পণ করেন সেটি হল সেই প্রথম খাতাটি যেটিতে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন শিলাইদহে। সমুদ্রযাত্রাকালে এই খাতাটি শেষ হয়ে যাওয়ায়, দ্বিতীয় একখানি খাতা তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েছিল সেকথা চিঠিতেই তিনি লিখেছেন। প্রথম খাতাখানিই কবি রোটেনস্টাইনকে দেন, দ্বিতীয়টি তাঁর কাছেই থাকে এবং ইংলণ্ড-বাসকালে এবং পরে আমেরিকা সফরকালে সেটিও ক্রমে নতুন রচনায় ভরে উঠতে থাকে। রোটেনস্টাইনকে প্রদত্ত সমগ্র খাতাটির ফোটোস্টাটিক কপি শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। সেটি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তার মধ্যে ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত ৮৩টি কবিতা এবং খাতার শেষ কয়েকটি পাতায় সংখ্যাচিহ্নহীন চারটি কবিতা আছে। খাতাখানিতে মোট কবিতার সংখ্যা দাঁড়ালো ৮৭। প্রকাশিত ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে কবিতার সংখ্যা আছে ১০৩। তুলনা করলে দেখা যায় রোটেনস্টাইন-খাতার ৮৭টির মধ্যে ৪টি কবিতা পরিত্যক্ত হয়েছে, বাকি কুড়িটি অবশ্যই দ্বিতীয় খাতাটির অন্তর্গত পরবর্তী রচনা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেহেতু প্রকাশিত গ্রন্থের ৪/৫ অংশই রোটেনস্টাইন-খাতা থেকে নেওয়া, এটিকেই ইংরেজি গীতাঞ্জলির আদিম আকর-গ্রন্থ বলা যায় এবং সেই জনাই অতঃপর এটিকে 'রোটেনস্টাইন-পাণ্ডুলিপি' অথবা শুধু 'পাণ্ডুলিপি' বলেই উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, খাতাখানিকে ঠিক আক্ষরিক অর্থে পাণ্ডুলিপি বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এটি নিতান্তই একটা প্রাথমিক খসড়া। হয়তো প্রথম দিককার কোনো কোনো কবিতায় খানিকটা পরিমার্জনের এবং হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু' একবার পুনর্লিখনের সুযোগ কবি পেয়ে থাকবেন কিন্তু পরবর্তী এবং অধিকাংশ কবিতা তিনি প্রথম প্রয়াসেই যেমনটি লিখেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই—অর্থাৎ প্রাথমিক খসড়ায় যে ধরনের ছোটো-খাটো অসংগতি বা স্খলন বা ভাষাগত শৈথিল্য অনিবার্য তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সমেত—ঐ খাতাখানিতে যে বিধৃত আছে, ফোটোস্টাট কপি পরীক্ষা করলে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিটি তো এইভাবে রোটেনস্টাইনের হস্তগত হল। কিন্তু তারপরে যা ঘটলো তার বর্ণনা রোটেনস্টাইন তাঁর **Men and Memories** নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে যেভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন তার মধ্যে একটু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। তিনি লিখছেন :

"That evening I read the poems. Here was poetry of a new order which seemed to me on a level with that of the great mystics. Andrew Bradley, to whom I showed them, agreed.....I sent world to Yeats,•who failed to reply; but when I wrote again he asked me to send him the poems, and when he had read them his enthusiasm equalled mine." বিবৃতিটির মধ্যে I showed them, 'he asked me to send him the poems.' এই কথাগুলি

অস্পষ্ট কেননা কথাগুলি পড়লে যেন মনে হয় রোটেনস্টাইন বলছেন যে, ঐ পাণ্ডুলিপিটিই তিনি একবার ব্রাড্‌লীকে 'দেখিয়েছিলেন' এবং পরে য়েট্‌সের নিকট 'পাঠিয়েছিলেন'। এটা কিন্তু একেবারেই ভুল এবং তারই ফলে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। সে দিক থেকে ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকেই যে চিঠি লেখেন তার মধ্যে আমাদের জ্ঞাতব্য তথ্যের স্পষ্টতর উল্লেখ আছে। রোটেনস্টাইন তাঁর স্মৃতিকথার Since Fifty নামক তৃতীয় খণ্ডে চিঠিখানির দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করেছেন। তার থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

"I am sure you remember with what reluctant hesitation I gave up to your hand my manuscript of **Gitanjali**, feeling sure that my English was of that amorphous kind for whose syntax a schoolboy could be reprimanded. The next day you came rushing to me with assurances which I dared not take seriously and to prove to me the competence of your literary judgment **you made three copies of these translations and sent them** to Stopford Brooke, Bradley and Yeats. The letter which Bradley sent to you in answer left no room for me to feel diffident about the merit of those poems and Stopford Brooke's opinion also was a corroboration....then came those delightful days when I worked with Yeats."

কবির এই স্মৃতিচারণের মধ্যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ অবশ্যাই নেই. তার কারণ স্বভাবসিদ্ধ বিনয়-বশতই অনেক আত্ম-প্রশংসাসূচক ঘটনা তিনি চেপে গেছেন, সেই জন্যই পরে যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ আমাদের করতে হবে আলোচ্য প্রসঙ্গের খাতিরেই। কিন্তু কবির চিঠিতে নির্দেশিত ঘটনাক্রমের নির্ভুল পারম্পর্যটা স্পষ্ট। পাণ্ডুলিপি পাঠ করবার পর রোটেনস্টাইন তিনটি টাইপ-কপি প্রস্তুত করান এবং এণ্ডরু ব্রাড্‌লী স্টপফোর্ড-ব্রুক এবং য়েট্‌স, এই তিন জনের নিকট মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তার পূর্বে পাণ্ডুলিপিতে যে সব ছোটোখাটো slip-এর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি সেগুলো এবং সেই সঙ্গে আরো সামান্য কিছু সংশোধন বা পরিবর্তন যে কবি করে দিয়েছিলেন তার নজির আছে। যাই হোক, এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে কৃষ্ণ কৃপালনী ১৯৬২ সালে প্রকাশিত **Rabindranath Tagore : A Biography** গ্রন্থে যে মন্তব্যটি করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। রোটেনস্টাইন সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

'he had not only read the original manuscript before sending it to Yeats but the final manuscript as it emerged from Yeats's hand was with him and should still be in his family'.

রোটেনস্টাইন পাণ্ডুলিপিটি কোনোকালেই হাতছাড়া করেননি, অতএব য়েট্‌স কর্তৃক পাণ্ডুলিপি সংশোধনের প্রশ্নই ওঠে না। সেটি অদ্যাবধি অক্ষত অবস্থাতেই আছে। রোটেনস্টাইন যে তিনটি টাইপ কপি প্রস্তুত করিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি তিনি য়েট্‌সের নিকট পাঠিয়েছিলেন, এই পর্যন্ত।

অতঃপর কবিতাপাঠান্তে তিনজন পৃথকভাবে যে মত ব্যক্ত করেছিলেন ইতিপূর্বে তার যথেষ্ট প্রচার হওয়ায় অনেকেই তা জানেন। ব্রাড্‌লী রোটেনস্টাইনকে পত্রযোগে জানালেন :

'It looks as though we have at last a great poet among us again'

স্টপফোর্ড ব্রুক লিখলেন :

'I send back the poems I have read them with more than admiration, with great gratitude, for their spiritual help and for the joy they bring and confirm, and for the love of beauty which they deepen far more than I can tell. I wish I were worthy of them.'

য়েট্‌স যখন টাইপ কপিটি পান তখন তিনি গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডিতে শ্রীমতী মড্ গনের অতিথিরূপে তাঁরই বাড়িতে। তাঁর কী প্রতিক্রিয়া? রোটেনস্টাইন স্মৃতিকথায় সংক্ষেপেই লিখেছেন: 'when he had read them his enthusiasm equalled mine'.

য়েট্‌সের তৎসাময়িক প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষদর্শী একজন ঐ নরম্যাণ্ডিতেই শ্রীমতী মড্ গনের বাড়িতে তাঁরই অতিথি হিসেবে তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন জেম্‌স কাজিন, আইরিশ কবি এবং নাট্যকার হিসেবে তিনি সেকালে য়েট্‌সের এবং লেডী গ্রেগরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, পরবর্তী কালে অবশ্য থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির এবং রাজনীতির সূত্রে শ্রীমতী আনি বেসান্টের সহযোগী হিসেবে ভারতবাসীই হয়ে গিয়েছিলেন। সস্ত্রীক তিনি **We Two**

Together নামক যে গ্রন্থ স্মৃতিকথা লিখেছেন তাতে একটি অবিস্মরণীয় রাত্রিতে য়েট্স স্বরচিত কবিতাপাঠের অনুরোধ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কী রকম মুগ্ধভাবে গীতাঞ্জলির টাইপ কপি থেকে পাঠ করেছিলেন তার বর্ণনা তিনি করেছেন : "That night, after dinner, he read, as only he could read, a number of poems from a manuscript that he had in his suitcase, and of which he had, Madame Gonne told us, an extraordinarily high opinion ... From poem to poem Yeats went from hour to hour, annotating, expatiating, rejoicing till we were all afire with a new revelation of spiritual beauty".

ইংরেজি গীতাঞ্জলির আদিম টাইপ কপির উপর এই হল ব্র্যাডলী, ব্রুক এবং স্বয়ং য়েট্সের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। রোটেনস্টাইনকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ যে লিখছেন, 'then came those delightful days when I worked with yeats,' তার এখনো কিছু বিলম্ব আছে। তার পূর্বেকার যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ কবি সংকোচবশত করেননি, এখানে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রয়োজন।

জুন মাসের শেষের দিকেই য়েট্স লণ্ডনে ফিরলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ২৭শে জুন তারিখেই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে ফ্লোরেন্স ফারকে (মিসেস এমেরি) ঐ তারিখেই লিখিত একটি চিঠিতে তার প্রমাণ আছে। য়েট্স লিখছেন : 'I do not think I can get to you this afternoon ..... at 7-30 I dine with Rothenstein to meet Tagore the Hindu poet' (ক্লিফোর্ড বাক্স সম্পাদিত Florence Farr, Bernard Shaw, W. B. Yeats : Letters. দ্রষ্টব্য)। তার দুই দিন পরে অর্থাৎ ৩০শে জুন তারিখে রোটেনস্টাইনের গৃহে আর্নেস্ট রীজ, এলিস মেনেল, মে সিনক্লেয়ার, ইভলীন আণ্ডারহিল, এজরা পাউণ্ড, নেভিনসন, এণ্ডরুজ প্রভৃতি সুনির্বাচিত শ্রোতৃগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে য়েট্স উক্ত টাইপ কপি থেকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করে শোনান। শ্রোতাদের বিস্ময় ও উচ্ছ্বসিত আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায় এণ্ডরুজের একাধিক স্মৃতিচারণে (Modern Review পত্রিকার ১৯১২ সালের আগস্ট সংখ্যায় এবং ১৯১৩ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত এণ্ডরুজের 'An Evening with Rabindra' এবং 'With Rabindra in England' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য) এবং ৮ই জুলাই তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত মে সিনক্লেয়ারের একটি পত্রে। পত্রটি রথীন্দ্রনাথের On tha Edges of Time গ্রন্থে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত আছে। মে সিনক্লেয়ার লিখেছেন :

'It was impossible for me to say anything to you about your poems last night, because they are of a kind not easily spoken about. May I say now that as long as I live, even if I were never to hear them again, I shall never forget the impression that they made. It is not only that they have an absolute beauty, a perfection as poetry, but that they have made present for me for ever the divine thing that I can only find by flashes and with an agonizing uncertainty.'

এণ্ডরুজ এবং মে সিনক্লেয়ারের উচ্ছ্বসিত এবং সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন আরো অনেকের কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়। কিন্তু

এখানেই শেষ নয়। ১০ই জুলাই (১৯১২), ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁয় ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত একটি সভায় রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধিত করা হয়। এই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সভায় এইচ জি ওয়েল্‌স, অধ্যাপক জে ডব্লু ম্যাকেল, ই বি হ্যাভেল, অধ্যাপক অ্যাণ্ডারসন, আর বি কানিংহাম গ্রেহাম, হার্বার্ট ট্রেঞ্চ, টি ডব্লু রোলস্টন প্রভৃতি জ্ঞানীগুণী, কবি-সাহিত্যিক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং য়েট্‌স। প্রশস্তিভাষণ করতে উঠে য়েট্‌স সেদিন যা বলেছিলেন মোটামুটি তারই সম্প্রসারিত রূপ হল স্বল্পকাল পরে প্রকাশিত গীতাঞ্জলির ভূমিকা। য়েট্‌সের সেই বক্তৃতার যে রিপোর্ট ১২ জুলাই তারিখে 'টাইমস' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার থেকে একটা অংশ তুলে দিচ্ছি। য়েট্‌স বলছেন:
'I know of no man in my time who has done anything in the English language to equal these lyrics. Even as I read them in these literal prose translations, they are as exquisite in style as in thought.'

এই যে শ্রদ্ধার্ঘ্য সেদিন য়েট্‌স সভায় নিবেদন করেছিলেন সেটা ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনার অবিকৃত প্রথম খসড়া প্রতিই উদ্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজীকে যদি তিনি তখনও 'foreigner's English' বলে চিনে থাকেন, তাহলে বলতেই হবে যে সেটা তিনি অত্যাশ্চর্য কৌশলে সম্পূর্ণ গোপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। য়েট্‌স ছাড়াও এযাবৎ গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপির উপর মতামত প্রকাশ করেছেন রাডলী, ব্রুক, মে সিনক্লেয়ার প্রভৃতি অনেকে—এণ্ডরুজ এবং রোটেনস্টাইনের কথা না হয় নাই ধরলাম। গীতাঞ্জলির ইংরেজীতে বিজাতীয়তার গন্ধ এঁরা কেউই পান নি অথচ ইংরেজীর ইংরেজীত্ব সম্বন্ধে এঁরা সকলেই আইরিশ-ম্যান য়েট্‌সের চেয়ে কম সচেতন ছিলেন এমন কথা অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, ঐ সময়ে তাঁরা সকলেই মানতু য়েট্‌সের সঙ্গেই একমত:
'I know of no man in my time who has done anything in the English language to equal these lyrics.'

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনায় অতুলনীয় বাকসিদ্ধির যে প্রশস্তি য়েট্‌স নিবেদন করেছিলেন তার যদি প্রতিবাদ সেদিন কেউ করে থাকেন তবে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর প্রত্যাভিভাষণে তাঁর ইংরেজী সম্বন্ধে য়েট্‌সের অজস্র প্রশংসাবাক্য সবিনয়ে এবং অপূর্ব শালীনতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যা বলেছিলেন 'টাইমস'-এর রিপোর্ট থেকে তার একটা অংশ তুলে দিচ্ছি:

'I have a speaking acquaintance with your glorious language; yet I can but feel in my own. My Bengali has been a jealous mistress, claiming all my homage and resenting rivals. Still I have put up with her exactions with cheerful submission: I could do no other.'

সভায় যখন তাঁর ইংরেজী নিয়ে ধন্য ধন্য হচ্ছে, কবি তখন তাঁর নিজের বাংলা ভাষার প্রতি অন্তহীন আনুগত্যের কথাই ঘোষণা করছেন। এর থেকেই বোঝা যাবে, ইংরেজী গীতাঞ্জলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বেই যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল কবিকে তা স্পর্শ করে নি, তিনি অপ্রমত্তই ছিলেন। শুধু তাই নয়, সেপ্টেম্বরের গোড়ায় যখন য়েট্‌সের সবারচিত প্রশস্তিমূলক এবং উচ্ছ্বাসময় ভূমিকাটির টাইপকপি কবির হাতে পড়ে, তিনি সেটি পড়ে শান্তিনিকেতনে কোনো আশ্রমবাসীকে এক পত্রে (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২) লেখেন: 'এটা আমার বহুমূল্য অলংকার সন্দেহ নেই, কিন্তু যাকে বলে অতিশয়োক্তি অলংকার'।

যাই হোক, সেই ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁর সম্বর্ধনাসভায় কবি তাঁর প্রতিভাষণ শেষ করে তিনটি কবিতা পাঠ করেন। তার মধ্যে দুটি ১২ই জুলাই তারিখে 'টাইমস' ও অন্যান্য পত্রিকায় রিপোর্টের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই দুটি কবিতা নানা ঐতিহাসিক কারণে মূল্যবান। প্রথমত, এই দুটি কবিতাই পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা। দ্বিতীয়ত, রোটেনস্টাইন পাণ্ডুলিপির তিনটি টাইপ কপি প্রস্তুত করান, সেগুলি পাঠাবার পূর্বে কবি যে তার সামান্য সংশোধন করে দিয়েছিলেন তা নিতান্ত স্বাভাবিক বা অনিবার্য বলেই আমরা ধরে নিচ্ছি যে তা নয়, উক্ত কবিতা দুটির মুদ্রিত পাঠের মধ্যেই তার সুস্পষ্ট সমর্থন আছে। কবিতা দুটি হল পাণ্ডুলিপির ৭০ এবং ৯ সংখ্যক কবিতা। ইণ্ডিয়া সোসাইটির এবং ম্যাকমিলানের প্রকাশিত গ্রন্থে কবিতা দুটির ক্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে ৯৫ এবং ২২। কবিতা দুটির সঙ্গে পাণ্ডুলিপির পাঠ এবং প্রকাশিত সংস্করণের পাঠের তুলনা করলে দেখা যায়, দু'একটি সামান্য লিখন-প্রমাদ অথবা লিখন-শৈথিল্য সংশোধিত হয়েছে (যেমন প্রকাশিত গ্রন্থের ২২নং কবিতার পাণ্ডুলিপিতে যে পাঠ আছে অর্থাৎ 'In the deep shadow of the rainy July', এই লাইনটির মধ্যে 'shadow' কথাটির পরিবর্তে 'shadows' কথাটি বসেছে এবং ৯৫নং কবিতার পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত 'the inscrutable power'-এর 'power' শব্দটি বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে।) কিন্তু এ ছাড়া কবিতা দুটির পাঠ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অভিন্ন। সংহত, অবিচ্ছিন্ন প্যারাগ্রাফ-বিন্যাসও পাণ্ডুলিপিরই অনুগামী, প্রকাশিত গ্রন্থের নয়। তা ছাড়া প্রকাশিত সংস্করণে যে সামান্য কয়েকটি ভাষাগত পরিবর্তন করা হয়েছে, এই কবিতা দুটিতে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত দেখা যায়। অতএব আদি পাণ্ডুলিপি এবং প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী এই কবিতা দুটি যে বিশেষ কারণে অতীব মূল্যবান তা হল এই যে, এটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের সংশোধন আছে কিন্তু য়েট্‌সের কোনো হস্তক্ষেপ নেই এবং থাকার কোনো সুযোগও ছিল না। সুযোগ যে ছিল না তা কয়েকটি তারিখের দিকে লক্ষ করলেই বোধগম্য হবে: কবি ইংলণ্ডে পৌঁছন ১৬ই জুন, ২৭শে জুন য়েট্‌সের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, ৩০শে জুন য়েট্‌স কর্তৃক কবিতাপাঠ, ১০ই জুলাই ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁয় কবিসম্বর্ধনা এবং ১২ই জুলাই রিপোর্টের সঙ্গে কবিতা দুটির প্রকাশ। সেই জন্যই নানা দিক থেকে এই কবিতা দুটিকে একটি নিশানা হিসেবে বিশেষ মূল্য না দিয়ে উপায় নেই। এর অব্যবহিত পরেই ইণ্ডিয়া সোসাইটি গীতাঞ্জলির একটি সীমিত সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব কার্যকরীভাবে গ্রহণ করে এবং তখনই কবিতাগুলিকে সর্বতোভাবে প্রকাশযোগ্য রূপ দেবার জন্য পাণ্ডুলিপি-সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়, তার পূর্বে নয়। এই সংস্কারের কাজেই যে য়েট্‌স রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজে, ইংরেজী গীতাঞ্জলির একটা অভূতপূর্ব প্রাক্‌-প্রকাশনিক খ্যাতি তার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা হয়েছিল কবির স্বকৃত গৌণ সংশোধন সহ সেই আদিম পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতেই। সেই খ্যাতিতে যে য়েট্‌স স্বয়ং যথেষ্ট ফুৎকার দিয়েছিলেন তা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যেও স্পষ্ট প্রতিভাত। এই সময় ইংরেজী ভাষায়

রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতি যে য়েট্‌সকে সম্পূর্ণ-ভাবে অভিভূত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই. এবং সেই জন্য ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে প্রবাসী পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩১৯) "ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা" শীর্ষক যে অনামিক রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে কিছু খবর ছিল যার উৎস সম্বন্ধে কোনো হদিস না থাকলেও তা অবিশ্বাস্য অথবা অসংগত মনে হয় না। খবরটি এই : "এই অনুবাদগুলি কবির স্বকৃত। তিনি কবি য়ীট্‌সকে (য়েট্‌সকে) ঐগুলি মার্জিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে কবি য়ীট্‌স বলিয়াছিলেন যে. 'এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করিয়া মার্জিত করিয়া তুলিতে পারা যায়. যদি কেহ এমন কথা বলে তবে সে সাহিত্য কি তাহা জানে না'।" লেখক হয়তো মৌখিক সূত্রে খবরটি পেয়ে থাকবেন, কিন্তু তাই বলেই খবরটিকে অমূলক মনে করা যায় না, বরং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয়। কেননা. এই ধরনের স্তুতিবাদ য়েট্‌স পরেও করেছেন। যেমন পাঞ্জাবের সাংবাদিক সন্ত্‌ নিহাল সিং তাঁর এক স্মৃতিচারণে (Calcutta Municipal Gazette ; Tagore Memorial Supple-

ment 1941 দ্রষ্টব্য) লিখেছেন: **During one of my visits to Dublin Yeats, talking to me at his house in Merrion Square, close to which I then resided for the best part of the year, spoke to me thus of Rabindranath's writings:** 'Most persons write so that if you were to detach a sentence from the context, it would have no meaning. With Tagore's writings, however, it is just the other way about. Almost any sentence will stand by itself—almost any clause. The more you study his compositions, the more significant do they become. They grow upon you."

লেখক সন-তারিখ কিছু দেন নি কিন্তু য়েট্‌সের ডাব্‌লিনস্থ ঠিকানা ঐ মেরিয়ন্ স্কোয়ারের উল্লেখ দেখে মনে হয় আলাপটি ১৯২২ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে কোনো সময়ে হয়ে থাকবে—অর্থাৎ ম্যাকমিলানকে লিখিত য়েট্‌সের পত্রের বেশ কিছু পরে।

ইংরেজী গীতাঞ্জলির সংস্কার কার্যে একমাত্র য়েট্‌সকেই কবির সঙ্গে সহযোগিতা করতে দেখা যায়, তার কারণ তখন পর্যন্ত ইংলণ্ডের সাহিত্যিক মহলে কবির বিস্তৃত ঘনিষ্ঠতা বা পরিচয় হয়নি। কিন্তু অব্যবহিত পরেই দেখা যায় অন্যান্য বই-গুলির প্রকাশিত পাঠ নির্ণয়ে তিনি নানা সময়ে স্টার্জ মুর, আর্নেস্ট রীস, ইভ্‌লীন আণ্ডারহিল, মে সিন্‌ক্লেয়ার প্রভৃতি অনেকেরই সানন্দ ও সাগ্রহ সহযোগিতা পেয়েছেন।

যাই হোক, অতঃপর ১৭ই জুলাই তারিখে দেখা যায় য়েট্‌স পত্র দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করছেন তাঁর তৎকালীন লণ্ডনস্থ আবাসস্থল য়োবর্ন বিল্‌ডিংস-এর নিকটবর্তী এক হোটেলে এবং প্রস্তাব করছেন আহারান্তে 'we can come in here afterwards and go through the mss."

রোটেনস্টাইনকে লিখিত পত্র থেকে যে উক্তিটি পূর্বে উদ্ধৃত করেছি: ('then came those delightful days when I worked with Yeats.') তার মধ্যে য়েট্‌সের সঙ্গে একযোগে যে কাজের উল্লেখ আছে, তার সূত্রপাত হল এইখানেই। অর্থাৎ সেই ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁয় সম্বর্ধনা ইত্যাদির পরে। এর পরেও কয়েকটি চিঠিতে দেখা যায় য়েট্‌স কবির সঙ্গে সাক্ষাতের দিনক্ষণ নিয়ে আলোচনা করছেন এবং প্রায় প্রতিবারেই 'we shall go through the mss. together' অথবা সমার্থক প্রস্তাব করছেন। যখন কোনো কারণে দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের বাধা হয়েছে, যেমন 'গার্ডনার'-এর প্রেসকপি তৈরির সময় (য়েট্‌স তখন কিছুদিন আয়র্ল্যাণ্ডে ছিলেন), তখন দেখা যায় য়েটস তাঁর প্রস্তাব টাইপ কপির মার্জিনে লিখে কবির বিবেচনার জন্য পাঠাচ্ছেন: 'I am making a few suggestions in pencil on the margin' (২১শে মে, ১৯১৩)। এর তাৎপর্যটা মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এই পাণ্ডুলিপি-সংস্কারের প্রসঙ্গে যত্রতত্র 'correction', 'revision' প্রভৃতি শব্দ নির্বিচারে ব্যবহার করলেও এই সংস্কার য়েট্‌স (অথবা অপর কোনো ব্যক্তির) একক সংশোধন কোনো কালেই ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাবিত suggestion-গুলি আলোচনা করে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করেছেন। যেখানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে মৌখিক আলোচনার দ্বারা প্রস্তাবিত সংস্কারের যাচাই করে নিতে পারেন নি, সেখানে দেখা যায় লিখিতভাবে প্রস্তাবগুলি তাঁর নিকট পেশ করা হয়েছে এবং সেগুলির গ্রহণ-বর্জন ছিল তাঁরই বিবেচনাধীন। এর মধ্যে য়েট্‌স অথবা অপর যে কোনো ব্যক্তির সহযোগিতায় পাণ্ডুলিপি-সংস্কারের যে একটা বিশেষ প্রণালীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে (এবং পরবর্তী কয়েকটি উদ্ধৃতির দ্বারা যা সমর্থিত হবে), তার তাৎপর্যটাও লক্ষণীয় এবং স্মরণীয়। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি সংস্কারের কাজে এই যে collaboration, তাতে য়েট্‌সের যেটুকু ভূমিকা ছিল সেটা correct করারও নয়, revise করারও নয়, শুধুমাত্র suggest করার। এই collaboration কতদিন চলে? ম্যাকমিলানকে লিখিত পত্রে য়েট্‌স অস্পষ্টভাবে লেখেন 'I spent some weeks on the task'। কবি রোটেন-স্টাইনকে লেখেন 'those delightful days'। কবিকে লেখা য়েট্‌সের যে কয়খানি চিঠি আমাদের হস্তগত হয়েছে তার থেকে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছন না গেলেও পরোক্ষ উপায়ে এই collaboration-এর আরম্ভ ও শেষ এই দুই কালসীমা মোটা-মুটি নির্ধারণ করা যায়। ১৯১২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে রোটেনস্টাইনকে লিখিত এক চিঠিতে (Men and Memories, ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত) য়েট্‌স জানাচ্ছেন যে প্রকাশিতব্য গীতাঞ্জলির ভূমিকাটি তাঁর লেখা হয়ে গেছে, টাইপ করতে পাঠিয়েছেন। সকলেই জানেন সেই ভূমিকায় গীতাঞ্জলির text থেকে ছয়টি অংশ তিনি উদ্ধৃত করেছেন। অতএব অন্তত ৭ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে গীতাঞ্জলির প্রকাশিতব্য পাঠের সংস্কার সমাধা হয়ে গিয়েছিল এটা ধরে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না। তাহলে ১৭ই জুলাই এবং ৭ই সেপ্টেম্বর, এই দুই তারিখের মধ্যেই উক্ত সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ধরা চলে। কিন্তু এই দেড় মাসের মধ্যে যে কয়বার তাঁদের মিলিত হওয়া সম্ভব ছিল এবং প্রতিবারে যে কয় ঘণ্টা তাঁরা উক্ত কাজে ব্যয় করতে পেরেছিলেন মনে করা যায়, তার যোগফল 'some weeks' হয় কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ থেকে যায়।

যাই হোক, এখন প্রশ্ন হল এই যে, অপরের প্রস্তাবগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী যাচাই করে নিলেও, এই জাতীয় suggestion গ্রহণের পরিমাণটা কতখানি, এবং তার প্রকৃতিটাই বা কী? তার চেয়ে বড় কথা, এই সংস্কারের ফলে, আদি পাণ্ডুলিপির তুলনায় প্রকাশিত গ্রন্থের গুণগত হ্রাসবৃদ্ধি কতখানি হয়েছে বা হওয়া সম্ভব ছিল? এগুলিই অবশ্য মূলগত প্রশ্ন এবং এগুলির বিচার শুরু করতে হবে ইংরেজী গীতাঞ্জলি দিয়েই, যেহেতু, আমরা পূর্বেই দেখেছি, গীতাঞ্জলি সম্বন্ধেই (এবং তারপর 'ফাউ' হিসেবে 'গার্ডনার' সম্বন্ধেও) য়েট্‌সের দাবির বহরটা সবচেয়ে বড় এবং সেই দাবি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এবং সশব্দে উচ্চারিত। এই দাবিটিকেই সর্বপ্রথম বিচার করে দেখতে হবে একটা test case হিসেবেই। এই বিচারের আলোকে অন্যান্য দাবির এবং মন্তব্যের বিচার সহজতর হবে। মনে রাখতে হবে, য়েট্‌স তাঁর দাবির সূত্রে সাক্ষী হিসেবে রোটেনস্টাইনের নাম একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য বিষয়ে সাক্ষী হবার যোগ্যতা অবশ্যই রোটেনস্টাইনের ছিল। কিন্তু রোটেনস্টাইন ছাড়াও ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের এবং য়েট্‌সের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আরো কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা রোটেনস্টাইনের মতোই ইংরেজী গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি-সংস্কারের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দেবার অধিকারী ছিলেন। সর্বোপরি দেখতে হবে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কী বলেছেন কেননা অপর যে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্যের চেয়ে তাঁর সাক্ষ্যের মূল্য বেশী ছাড়া কম নয়। অতএব এঁদের সকলের মতামত বা সাক্ষ্যের বিবৃতি দিয়েই বিচার শুরু করতে হবে।

(ক্রমশ)

সর্দি, শ্লেষ্মা, মচকানি, যন্ত্রণার জন্যে জোরালো ওষুধ—৮৫ বছর ধরে নির্ভরযোগ্য !

একমাত্র বিতরক : জে. এল. মরিসন সন অ্যাণ্ড জোনেস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, বোম্বাই · কলিকাতা · মাদ্রাজ · দিল্লী · ব্যাঙ্গালোর

ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী — কয়েকটি ভাববার কথা

ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে ১৯২০ সাল থেকে; ঐ বছরেই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়। বর্তমান বছরে এই প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল ১৮৭৫ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। তখন কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিক সমিতি গঠিত হয়েছে; মালিক পক্ষ এবং সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা স্বীকার করেননি। শ্রমিকরা কয়েকটি সীমায়িত দাবি আদায়ের জন্য তখনকার মত সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাঁরা একটি সুসংহত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তখনও গড়ে তুলতে পারেননি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়, অপরদিকে তেমনি যুদ্ধের ভয়াবহতায় শিল্প-মন্দা, মুদ্রা-স্ফীতি, বেকার সমস্যা প্রভৃতি সমস্যায় শ্রমিক-সমাজ জর্জরিত ও বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। একদিকে বিশ্বের সর্বহারাদের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা এবং অপরদিকে শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য চেতনা—উভয় প্রভাবের ফলেই ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে এবং তার পরিণতি হিসাবেই আমরা দেখতে পাই ১৯২০ সালের নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (All India Trade Union Congress) প্রতিষ্ঠা।

বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বহু পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির মতবাদ ও ক্রিয়া-কলাপের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত জোড়াতালি দিয়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একক শ্রমিক সংঘ হিসাবে কাজ করে গিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র বসু, ভি ভি গিরি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকেই এই শ্রমিক সংঘের মধ্যে উপদলের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাবেই এই উপদলীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একটি উপদল বেরিয়ে এসে ভারতের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (I N T U C) গঠন করে। আবার জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে

সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একটি শ্রমিক দল বেরিয়ে এসে হিন্দ মজদুর সভা গঠন করে। ১৯৪৯ সালের মে মাসে অধ্যাপক কে টি শাহ আরেকটি শ্রমিক সংঘ গঠন করেন এবং তার নাম হয় United Trade Union Congress. সবশেষে, সম্প্রতি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল দ্বারা প্রভাবিত বহু সংখ্যক শ্রমিক A I T U C থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা একটি শ্রমিক সংঘ গঠন করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এখন যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে। সরকারী কর্মচারী, ব্যাংক ও ইনসিওরেন্সের কর্মচারীগণও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আওতায় এসেছেন।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী যে বহু ক্ষেত্রে নিজেদের দাবি আদায় করতে পারেননি তা নয়। বরং খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলন এখন পর্যন্ত বহু দাবি-দাওয়া পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। সরকারী দপ্তর, ব্যাংক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান এবং সব কল-কারখানায় আজ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জোরদার হচ্ছে—এটা খুবই আশার কথা। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ত্রুটিবিচ্যুতি-গুলিও উপেক্ষণীয় নয়।

একটি শিল্পে বহু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন থাকায় এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাবে শ্রমিক সংঘগুলি চালিত হওয়ায় ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনে যেমন অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, অপর দিকে শ্রমিক সংঘগুলির আর্থিক সংকটও ইউনিয়নগুলিকে অনৈক্যের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য করেছে এবং তার পরিণতি হিসাবে শুধু শ্রমিক-স্বার্থই অবহেলিত হয়েছে। শ্রমিকদের শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নিয়ম-কানুন অনুসরণে অনীহা, এবং একই কারখানায় কাজে লেগে থাকার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহের অভাব—সব কিছু মিলিয়ে শুধু ট্রেড ইউনিয়নের গতিবেগই প্রতিহত হয়েছে তা নয়, ট্রেড ইউনিয়নগুলি অনেক ক্ষেত্রে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিগত পঞ্চাশ বছরের শেষে আমরা তার যে পরিণতি দেখতে পাচ্ছি তা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অনুকূল নয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলিরও যে একটি কল্যাণ-কারক ভূমিকা আছে অনেকেই তা আজ চিন্তা করতে চান না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। শ্রমিকদের নিরক্ষরতা দূর করা, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়ানো, শ্রমিকদের সবরকম স্বার্থ পুরোপুরি বজায় রেখে তাদের কর্মনৈপুণ্য বাড়ানো এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান যাতে হয় সেজন্য শ্রমিকদের সঞ্চয় বাড়ানোর চেষ্টা—সব কিছুই ট্রেড ইউনিয়নের কাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন-গুলি তাদের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এখন

শুধু শ্রমিকদের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির যে অন্য ভূমিকাও আছে, তা বিবেচিত হচ্ছে না। শ্রমিকদের 'সংগ্রামী' চেতনা বজায় রাখা এবং কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা ট্রেড ইউনিয়নগুলির অন্যতম কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই চেতনার পরিণতি যদি এই হয় যে, উৎপাদন না বাড়িয়েও কারখানা বজায় রাখতে হবে এবং শ্রমিকদের বেশী মজুরি দিতে হবে, তবে শুধু মুদ্রাস্ফীতিরই সৃষ্টি হবে, স্থিতিশীলতা হবে তখন 'দূরে অস্ত'! বর্তমান শ্রম-অশান্তি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। বহু ক্ষেত্রে কল-কারখানায় শ্রমিকদের দিক থেকে ধর্মঘট এবং মালিকদের দিক থেকে লক-আউট চলছে। এ ধরনের শিল্প-অশান্তির পরিণতি কোথায়? এই প্রশ্নের জবাব হয়ত একমাত্র রাজনীতিজ্ঞদেরই জানা আছে। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের পক্ষে এর জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে এই কথাগুলি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।
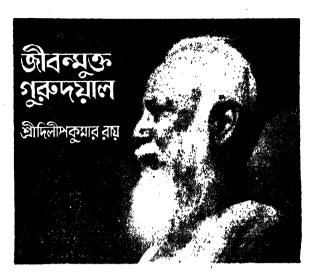
সুব্রত গুপ্ত

দুই

দয়ালদা ছিলেন স্বভাবে যাকে ভাগবত বলেছে "একান্তী"। অর্থাৎ তিনি যা-ই ধরতেন আঁকড়ে ধরতেন—গাঁড়মসি করার ধাতু তাঁর কোনোদিনই ছিল না। তাই একদিকে যেমন তাঁর প্রথম গুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন আত্মসংস্কৃতির তেমনি অন্যদিকে গান্ধিজির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন জীবসেবার—সর্বসাথী হয়ে। তাঁর জীবনসাধনা সফল হয়েছিল এই দুই ব্রতের যোগফলে। তাই রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর তিনি গান্ধিজির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন আর্ত ও নিঃস্বদের সেবায় পরার্থনিষ্ঠা বরণ করে—থাকতেন খাঁটি দরিদ্রদেরই মতন গান্ধিজির হরিজন আশ্রমে, আমেদাবাদে। কীভাবে গান্ধিজির সেবাব্রতী জীবন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাঁর "দিল কী বাত"-এর নানা গান্ধিতর্পণেই ফুটে উঠেছে তাঁর একনিষ্ঠতার স্বর্ণপ্রভায়। "বাপু কে চরণো মে" তর্পণটি থেকে আমরা কিছু উদ্ধৃতি দিই তাঁর ঐকান্তিকতার ছবিটি আর একটু ফুটিয়ে তুলতে। মূল হিন্দির অনুবাদই দেই—এ-তর্পণটির কায়া সংক্ষেপ করতে। উদ্ধৃত শ্লোকটির পরেই লিখছেন:

'আমি যখন গান্ধিজির আগামী জন্মোৎসবের কথা ভাবি তখন আমার মন আমাকে টোকে: 'গান্ধিজি তোমার হৃদয়ে জন্ম নিয়েছেন তো?...আর তখন মন আমার বলে যে, গান্ধিজিকে ভালোবাসার পরীক্ষায় পাস করতে পারব কেবল তখন যখন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমার স্বার্থের সমস্ত দাবি ছেড়ে মানুষের প্রতি আমার কর্তব্যকেই বড় করে দেখতে শিখব......যখন প্রতিটি নিশ্বাসে এই সত্য ঝংকার দিয়ে উঠবে:

সকলই তোমার হে চিরন্তন স্বামী।
কিছুই আমার নয়, অন্তরযামী।"

এ-মন্ত্র তাঁর কাছে মন্ত্রচৈতন্য হয়ে উঠেছিল, যেমন সত্যিকার জাপকদের জীবনে জপ হয়ে ওঠে জাগ্রত হয়ে। তাই তিনি ভিক্ষাজীবী হতে কুণ্ঠিত হন নি—ভিক্ষার প্রতিদানে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন বলে। ভিক্ষা নিতে কুণ্ঠা জাগে কার?—যে করে নিত্য আমার আমার। তিনি আমার বলে কোনো পুঁজিই রাখেন নি তো কালকের জন্যে—কেউ কিছু জোর করে উপহার দিলে নিয়ে বিলিয়ে দিতেন—"জো খোয়া সো পায়া" ইন্দিরার এই ভজনমন্ত্রটি ছিল অতি প্রিয় এ-ভগবৎপ্রপন্ন অকিঞ্চনের। তাঁর এক সিন্ধি বন্ধু শ্রীগুর্বক্সানি তাঁর তর্পণে লিখেছিলেন সোচ্ছ্বাসে—কোনো এক ভক্তিমতী তাঁকে ধরেছিলেন আট হাজার টাকা প্রণামী তাঁকে নিতেই হবে। (সম্ভবত দয়ালদার আশীর্বাদে তাঁর কোনো সঙ্গিন ফাঁড়া কেটে গিয়েছিল) কিন্তু দয়ালদা কিছুতেই রাজী হন নি, বলেছিলেন তাকে: "এখন থাক, পরে যদি আমার কখনো দরকার হয় তখন দেখা যাবে।"

মুখে মুখে এমন কথাও রটে গিয়েছিল যে, কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতিতেই এর ওর তার অসুখ সেরে যেত—নিরাশার আঁধারে আশার অরুণোদয়ে মানস ব্যথার লাঘব হত। আমি তাঁকে একথা বললে তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলতেন সেই একই কথা: যে, তিনি শুধু প্রার্থনা করেন, বাকি যা করবার করেন ঠাকুর। আমি হেসে বলতাম: "কাকে

ধোকা দিচ্ছেন দাদা? ঠাকুরই কর্মকর্তা মানি। কিন্তু প্রতিটি কর্মই করেন সংরাচর তাঁর কোনো না কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমেই নয় কি? সুদর্শন চক্রে মুণ্ডপাত করেন বটে শিশুপাল প্রভৃতি অসুরদের, কিন্তু কালেভদ্রে। তাই বলব—মানুষকে তিনি রোগমুক্তিও দেন কখনো কখনো নিজে অঘটন ঘটিয়ে, কিন্তু সাড়ে পনেরো আনা ক্ষেত্রে তিনি ক্রিস্টকে নিরাময় করেন ডাক্তারের ওষুধের মধ্যে উঁকি মেরে। এ যে আমার কথার কথা নয় তার প্রমাণ অর্জুন। ঠাকুর ইচ্ছে করলে চক্রধারী হয়ে শিশুপালের মত দুর্যোধন-চমূকেও নির্মূল করতে পারতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু করেন নি—কারণ তিনি চেয়েছিলেন অর্জুনই তাঁর এজেন্ট হয়ে কুরুক্ষেত্রের কাজটি হাসিল করে। তাই গীতায় বললেন সঘনে 'ময়ৈবৈতে নিহতা পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্!' অর্থাৎ আমিই এদের ফাঁসি দেব বটে, কিন্তু ফাঁসিকাঠ হও তুমি।"

এ কথায় দয়ালদা আরো কুণ্ঠিত হয়ে বলতেন তিন সত্যি করে যে তিনি তাঁর আশীর্বাদের জোরে কাউকেই নিরাময় করেন না, করেন না, করেন না, শুধু আর্তের ডাকে

আমি একবার বলেছিলাম প্রখ্যাত বাংলা দাবাড়ুর গল্প। দাবা খেলাতে তিনি মত্ত, এমন সময়ে চাকর এসে বলল : "বাবু, বাবু! আপনার ছেলেকে সাপে কামড়েছে।" বাবু প্রতিপক্ষ দাবাড়ুকে "কিস্তি" বলেই শুধালেন দাবার ছকের দিকে ঠায় তাকিয়ে : "সাপ? কাদের সাপ?" (এ গল্পটি আমি প্রথম শুনি আমার কৈশোরে পিতৃদেবের মুখে)।

দয়ালদা বললেন : "শোনো ওহে—তুমি বললে দাবাড়ুবাবুর কথা, আমি বলি প্রেমচন্দের গল্প—এক দাবাড়ু রাজার কথা। রাজা সাহেব দাবা খেলায় বিশ্ব ভুলে গেলেন—মন্ত্রী এসে বলল : 'মহারাজ শত্রু, শত্রু! এলো বলে!' রাজা সাহেব দাবা খেলতে খেলতে বললেন : 'আসতে দাও!' খানিক বাদে মন্ত্রী ফের হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল : 'মহারাজ, তারা আধ মাইল দূরে—ঘোড়শোয়ার, ঘোড়শোয়ার ছুটেছে।' রাজা-সাহেব প্রতিপক্ষকে কিস্তি দিয়ে বললেন : 'ঘোড়শোয়ার, বেশ তো, ছুটতে দাও!' খানিকবাদে মন্ত্রী এসে বললেন : 'মহারাজ, শত্রুদের সেনাপতি ঢুকেছেন প্রাসাদে ঐ যে তিনি!' রাজাসাহেব মুখ তুলে সম্মুখীন সেনাপতিকে বললেন : 'আসুন, বসুন—হোক আর এক বাজি।'"

বলে সে কী হাসি দয়ালদার! হাসতেন যখন মনে হত যেন সরল শিশুর প্রাণকাড়া হাসি! এমন দিলখোলা আনন্দময় পুরুষ জীবনে কমই দেখেছি।

কিন্তু রসিক হলেও তিনি ছিলেন সত্যিই স্বভাব-লাজুক, তাই তাঁকে কেউ মহাত্মা বা মহাপুরুষ বলে মান দিলে তিনি সঘনে প্রতিবাদ করতেন, কেউ প্রণাম করতে এক পা এগিয়ে এলে দশ পা পেছিয়ে যেতেন। সবচেয়ে বেশি কুণ্ঠিত হতেন—তাঁকে মহাসন্ত বা His Holiness উপাধি দিয়ে চিঠি লিখলে। তাঁকে এভাবে কোণঠাসা করে আমি মজা লুঠতাম। ওঁর প্রতিবাদে : "আমি holy নই নই নই ভাই—লক্ষ্মীটি দাদা আমার! আর কোরো না এমন ফাজলামি।" কিন্তু কে শোনে? আমি ক্রমশ শুধু চিঠিতে নয় খামের শিরোনামায়ও বসিয়ে দিতাম তাঁর উপাধি : His Holiness Sri Gorudayal Mullick।

তিনি তিনচার বার আমাকে কাকুতি মিনতি করে লিখলেন এ অপকর্ম থেকে বিরত হতে। কিন্তু তিনি যতই বলেন "না না না না" আমি ততই বলি "হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ"। তখন তিনি প্রতিশোধ নিতে আমার নামের আগে ১০৮ শ্রী-কে ফাঁপিয়ে তুললেন কোটির কোঠায়। লিখলেন—তখন তিনি উটকামণ্ডে শ্রীশীতলাবাদের অতিথি (চিঠিটি লিখেছিলেন তিনি হিন্দীতে নয়, ইংরাজীতে, এখানে তার অনুবাদ পেশ করছি) :

C/o শ্রীশীতলবাদ — ২৭ মে
উটকামণ্ড — ১৯৬৯

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী (কোটি শ্রী)

বৃন্দাবনের ভজনবাদশা ওরফে দাদাগো! বিলিতি ছড়ায় (nursery rhyme-এ) পুষি পুষি মেনি রানীর দিকে তাকাতে পারে। তাহলে হুলো বেড়াল কেন রাজার দিকে তাকাতে পারবে না শুনি?

তোমার সুন্দর শ্মশ্রুল ছবির জন্যে বহু ধন্যবাদ যদিও সেই সঙ্গে শরাঘাত করেছ আমাকে "Your Holiness" সম্বোধন করে। ছবিটিতে ফুটে উঠেছে মুরলীধরের পরম ভক্তের আলো তথা হলিউড এর মাদকতা। সম্ভবত হলিউডের কোনো স্টুডিয়োতে এ ছবিটি তোলা হয়েছিল যার ফলে এ নটভঙ্গি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। শুধু আমার মনে হয় কেবলই—"আহা, যদি এ-স্টুডিয়োটির নাম হত হোলি উড!"

যাহোক তোমার এ-কৃপার অবদানের জন্যে আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কোরো। তুমি অনেকদিনই আমাকে হার মানিয়েছ
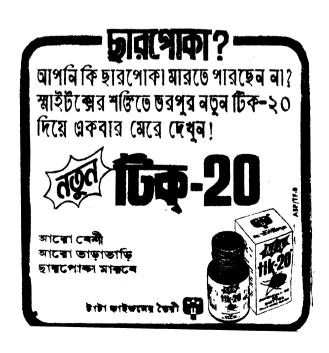
মনীষার তথা ভগবদ্ ভক্তিতে। এবার হার মানালে—তুষারশুভ্র দাড়ি গজিয়ে। জয়তু নারায়ণঃ।

আমার যদি থাকত তোমার সাহিত্যিক প্রতিভা তাহলে আমি অনেক আগেই লিখে ফেলতাম—তোমার Sri Aurobindo Come To Me বইটিকে হার মানিয়ে—কেমন করে "দিলীপদা ও ইন্দিরা মা আমার কাছে এলেন"। কিন্তু হায় রে...

প্রসঙ্গত, মাগো, ইন্দিরা বলো দেখি—এখনো কি সময় হয়নি তোমার ফতোয়া জারি করবার ঃ দাদাজি যেন আমাকে আর না মহাসন্ত (His Holiness) বলে ডাকেন? শুধু যদি তিনি নাছোড়বান্দা হন তবে না হয় আমার নামকরণ করুন His Hollowness ঃ কারণ বিশ্বাস কোরো মা, আমি সত্যিই চাই ঠাকুরের হাতের বাঁশির মতো hollow (ফাঁকা) হতে যাতে করে মুরলীওয়ালা ইচ্ছামত তাঁর সুরে আমাকে বাজিয়ে চলতে পারেন।

আমার গভীর প্রীতি নিও তোমরা দুজনে।

ইতি তোমাদের স্নেহধন্য গুরুদয়াল

পুনশ্চ। বায়ুযানে আমি পুণার উপর দিয়ে উড়ে এসেছি উটকামণ্ডে হনুমানের মতন এক লাফে। ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় তবে ফিরতি পথে হয়তো মাস খানেক বাদে আমার কেশরীকেশর দুলিয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব কে বলতে পারে?

আমি এ-চিঠিটির আদ্যন্ত অনুবাদ পেশ করলাম দুটি উদ্দেশ্যে ঃ প্রথম দেখাতে, তিনি পান্টা পরিহাস করতে কেমন পটু ছিলেন; দুই, হাসির মোড়ক মুড়িয়ে বাঁশির উপমা দিয়ে কেমন সহজে প্রকাশ করলেন ভক্তমনের এক চিরন্তন অভীপ্সা যে চায় তাঁরই সুরে বেজে চলতে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "সাবিত্রী"তে বলেছেন মন্ত্রঝঙ্কারে

Earth is the chosen place of
the mightiest souls;
Earth is the heroic spirit's
battlefield,
The forge where the Arch-mason
shapes His works."

আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দে" আমি এর তর্জমা করেছি ঃ

বরিষ্ঠ মহাত্মা যাঁরা এ ধরণী করেন বরণ·
বীরোত্তমদের রণাঙ্গন এ-পৃথিবী—মঞ্চে যথা
বিশ্বকর্মা চিরন্তনী কারুকলা রচেন তাঁহার।

গুরুদয়ালজিও ধরণীবাদী ছিলেন মনে প্রাণে, তাই লিখেছিলেন তাঁর **Divine Dwellers in the Desert** এ (p. 21) :

"That is why the Sufis call God the Beloved and look upon this world as the pageant, panorama and playground of His Love."

এর অনুবাদ কাব্যছন্দেই সুষ্ঠু ঃ

ভগবান প্রিয়তম, এ-ধরিত্রী তাঁর অনিন্দিত
লীলাভূমি—যেথা ভাগবতী শোভাযাত্রা উদ্ভাসিত।

কিন্তু এ-পৃথ্বীবাদ—পার্থিব জীবনকে অপার্থিব চিরন্তনের বরণীয় দোসর বলে অঙ্গীকার করা—মহনীয় ও সত্য হয়ে ওঠে কেবল সেই দূরাশীর কাছে যে হয়ে উঠেছে—শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী"র ভাষায়—অনির্বচনীয়ের বাণীবাহ messenger of the Incommunicable।

দয়ালদাও তাই গানের পর গানে অঙ্গীকার করেছেন এই চিরন্তন সত্যকে যে, সব আগে বিশ্বনাথকে প্রেমে চির-আপন বলে বরণ করতে না পারলে বিশ্বমানবকে কাছে টেনে আপন করে নেওয়া অসম্ভব, জীবসেবার ব্যাপ্তি হতে পারে না জীবের মধ্যে আগে শিবের দেখা না পেলে। এই দেখা যখন সত্য হয় তখনই কেবল শিব সাধক সাচ্চাকার জনসেবক হয়ে বলতে পারেন সাবিত্রীর মন্ত্রসামে ঃ "I am a deputy of the aspiring world—আমি প্রতিনিধি এই নীলিমা-পিপাসী ধরিত্রীর।" দয়ালদা যে শ্রীঅরবিন্দের এ-মহাবাণীতে সর্বান্তঃকরণেই সায় দিতেন তার প্রমাণস্বরূপে তাঁর একটি চমৎকার কবিতা উদ্ধৃত করছি ঃ

তুমি বন্ধু প্রিয়তম—সবার উপরে তব স্থান।
তুমি করো পান দাও আমায় লভিতে স্বাদ তার
তব দান বলি। এ প্রার্থনা—যেন নিত্য গাই গান ঃ
"আমারে যখন ভালোবাসে কেহ—
সে প্রীতি তোমার
আদি প্রেম-উৎস হতে ঝরে।"
তুমি তাই, হে মহান্,
আমার প্রথম প্রেমাস্পদ, তার পরে প্রাণে বরি
আর সকলেরে। দেয় আমারে যখন তারা মান,
সঁপি আমি সে মানিকা পায়ে
তব অর্ঘ্য রূপান্তরি।
ব্যথার পিয়ালা যবে ধরে বিশ্ব অধরে আমার,
তুমি তারো স্বাদ লও সব আগে বারংবার।

মূল কবিতাটি (আমার ঢেলে-সাজানো আয়সিকে) ঃ

Thou comest first,
Beloved, in everything;
Thou tasteth what thou
givest then to me
To savour as thy gift.
Grant I may sing :
"When they love me never
will I forget thee,
Who art the source of all love.
So, thou, Lord,
Art my first Love. Thereafter
the others I greet;
When I am honoured by men
their every word
Of praise I offer gratefully
at thy feet.
And when the world
offers me a cup of pain
Thou drinkest the first draught
over and over again."

ধরার সঙ্গে অধরার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী—তাই ভগবানকে না মেনে শুধু মানুষকে মালাতিলক দেওয়া অন্তিমে পলকা উচ্ছ্বাসের ফেনায় পরিণত না হয়েই পারে না। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর ভাষায় ঃ

Since God has made earth,
earth must make in her God :
I claim thee for the world
that thou hast made.

ধাতা রচে বিশ্ব, তাই বিশ্ব চায় রচিতে ধাতারে
মর্মে তার। যে-বিশ্ব তোমার গড়া সেথায় তোমার
হোক অভ্যুদয়—এই চাই আমি জন্ম-অধিকারে।

দয়ালদার অন্তরে সাবিত্রীর এই দীপ্ত

প্রার্থনা ফুলেছিল ভক্তিকম্প্র অনুরণন, লিখেছিলেন তিনি তাঁর "দিলীক বাত"এ ('শ্রীঅরবিন্দ' শীর্ষক তর্পণে)ঃ

"তুম্‌হারে মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর সুনকর ধরাকে পুত্রোঁনে ফির একবার যাদ কিয়া কি উনকে জীবনকী সার্থকতা অমৃতকে পদ্রথ বননে মে হৈ, ঔর আপনে অন্তর-তমমে উন্‌হোনে একবার ফির অভীপ্সাকী দীপশিখাকো প্রজ্বলিত কিয়া।"

(ভাবার্থ : তোমার মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর শুনে মাটির শিশুদের মনে পড়ল আবার যে, অমৃতের পাত্র হলে তবেই জীবের জীবন সার্থক হতে পারে, তাই বুঝি তাদের অন্তরে জ্বলে উঠল আবার অভীপ্সার দীপ্তশিখা!)

এই প্রসঙ্গে মহাসন্ত শ্রীরামদাসের একটি কথা মনে আসছে। আমাকে তিনি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন যে, এক ইংরাজ মহিলা একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করে— সাধনার শিখর-উপলব্ধি কী? তাতে শ্রীরামদাস বলেন : "সবাইকে ভালোবাসা ঈশ্বরের সন্তান ব'লে।" মহিলাটি কিছুদিন পরে এসে সে কী কান্নাকাটি! "স্বামীজী, আপনি আমাকে কি না শেষটায় দ-য়ে

মজালেন! সবাইকে ভালোবাসতে গিয়ে আমি ক্রমশ আবিষ্কার করলাম যে, আমি কাউকেই ভালোবাসতে পারছি না আর।” শ্রীরামদাস তাঁর শিশু সরল হাসি হেসে আমাকে বললেন যে, মহিলাটিকে তিনি বলেছিলেন : “তুমি ঠিকই ধরেছ। কারণ, আগে ভগবানকে ভালোবাসলে তবেই তাঁকে সকলের মধ্যে দেখে সকলকে ভালোবাসা সম্ভব—নইলে নয়।”

এ কথা দয়ালদা শ্রীরামদাসের মুখে সানন্দেই শুনেছিলেন। এই দুই জীবন্মুক্ত সন্ত পরস্পরকে কী ভালোই যে বাসতেন! না ভালোবেসে পারেন? তাঁরা যে পরস্পরকে সত্যিই আত্মার আত্মীয় মনে করতেন। আজও মনে পড়ে বম্বেতে একদিন শ্রীনটবর পারেখের ওখানে শ্রীরামদাসের কথামৃত পান করছি এমন সময় দয়ালদার অভ্যুদয়—সঙ্গে সঙ্গে এ-দুই পরম ভাগবতের গাঢ় আলিঙ্গন! সে-দৃশ্য কি ভুলবার? এঁদের দুজনকে দেখে মন ভরে উঠেছিল ভাবতে তাঁরা কী অসাধ্য সাধনই না করেছেন—অহন্তা মমতার জয়—প্রতি কর্মে নিরভিমান হতে পারা আত্মজয়ী হয়ে! শঙ্করাচার্যের চিরস্মরণীয় মহাবাক্য : ‘জিতং জগৎ কেন? মনো হি যেন’—জগৎজয়ী কে? না, আত্মজয়ী যে।

কিন্তু আত্মজয়ী হতে পারে কে? না, যার সব আত্মাভিমান ভগবৎ প্রেমের আগুনে পুড়ে ছাই হ’য়ে গেছে। এ-আবিষ্কার দয়ালদা করেছিলেন সে কবে—যৌবনে, যে কথা তিনি তাঁর গুজরাতী ভাষায় লেখা জীবনস্মৃতি “প্রভুকৃপাকিরণ”-এ লিখেছেন বেশ ফলিয়েই। এ-সাধনার অন্য নাম প্রেমের আগুনে আত্মাহুতি দেওয়া। তাঁর একটি গানে আছে (ছন্দ অনুবাদ আমার)

“Why art thou, moth, so madly
In love with the burning flame?
Because,” the mad moth
answered,
“When I burn in the fire I claim
To be one with the flame
and then I
Rejoice as I pay the price.”
And so will a lover of God for
Men his all sacrifice.
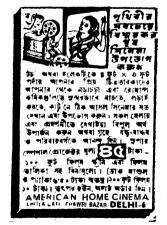
এমন পাগল হ’য়ে পতঙ্গ,
কেন ধাও জ্বালামুখীর টানে?
পতঙ্গ গায় : “আগুনে যখন
পুড়ে ছাই হই শিখার টানে,
আত্মাহুতির দাম দিতে ঝাঁপ
দেই আনন্দে বহ্নিকে।”
ভক্ত তেমনি শিববাঞ্ছিত
জীবতরে প্রাণও হারায় সুখে।

কিন্তু এ-আত্মাহুতি দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয় : আত্মাদরের লেশও থাকলে প্রেমাগ্নিতে আত্মাহুতি সম্পন্ন হতে পারে না। জীব শিবের বাঞ্ছিত—সত্য। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই শিব জীবকে ডাকেন নিজের সাথে এক হ’য়ে প্রেমকৈলাসে তাঁর সালোক্য তথা সাযুজ্য-বর পেতে। দয়ালদা এ কথা জানতেন—তিনি শিববহ্নিতে তাঁর জৈব অহংকার-মমকারকে আহুতি দিয়ে তাঁর পাশবদ্ধ জীবত্বকে পাশমুক্ত শিবত্বে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছিলেন ব’লে, জানতেন ব’লে যে, এ ছাড়া জীবন্মুক্তির আর পথ নেই—“নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।” একটা দৃষ্টান্ত দেই :

একদা কোনো টাইফয়েড জ্বরাক্রান্ত যুবকের কাছে গিয়ে বসতেই তাঁর আশীর্বাদে তার জ্বর কমে ফাঁড়া কেটে যায়। ডাক্তারে হাল ছেড়ে দিয়েছিল ব’লে আরো সবাই দয়ালদাকে স্তবস্তুতি শুরু করে। তিনি চমকে ওঠেন আবিষ্কার ক’রে যে, তাঁর মধ্যে একটি বিভূতির আবির্ভাব হয়েছে—রুগ্নকে নিরাময় করার। তিনি তক্ষুনি একান্তে এক শৈলচলে ব’সে সাশ্রুনেত্রে ঠাকুরকে ডাকেন—এ অযাচিত যোগবিভূতি ফিরিয়ে নিতে : রোগীকে রোগমুক্ত করার অভিমানের যেন তিনি আর ছায়াও না মাড়ান। বহুক্ষণ প্রার্থনার পরে স্বর শোনেন : “আচ্ছা যাও, মাভৈঃ।”

এর পরেও তাঁর সান্নিধ্যে অনেক রোগীর রোগ সেরেছে, কিন্তু তার ফলে তাঁর মনে কোনো অভিমানের ছায়াপাতও হয়নি। যথা—আর একটি দৃষ্টান্ত—সংক্ষেপে।

এক জেনেরাল বন্ধুর পুত্রের হৃদযন্ত্র বিকল হয়। মিলিটারি হাসপাতালে তার বহু পরিচর্যা ক’রেও কোনো ফল হয় না—ডাক্তারে জবাব দেয়। বন্ধু দয়ালদাকে তার করেন। দয়ালদা এসে কেবল ভগবৎ কৃপার কথা বলেন। ডাক্তারেরা উত্ত্যক্ত হ’য়ে ওঠে : ভগবৎ কৃপা! বলিহারি। যে-রোগীর এখন যায় তখন যায় অবস্থা......ইত্যাদি বিরক্ত গুঞ্জন। কিন্তু ও মা, যে-রোগী ঘুমের দাওয়াই ছাড়া বহুদিন চোখের দুটি পাতা এক করতে পারে নি তার জ্বর ছেড়ে গেল, সে ঘুমিয়ে পড়ল। দয়ালদা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন—পাছে রোগমুক্তির জন্যে পাঁচজনে তাঁর স্তবস্তুতি শুরু করে। এমনিই নির্ভেজাল ছিল তাঁর অকর্তার ভাব : “অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহম ইতি মন্যতে”—অহংকৃত মূঢ়রাই ভাবে তারা কর্ম-কর্তা—গীতার এই মহাবাক্যকে তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই যোগবিভূতি লাভ ক’রেও তিনি বেচাল হননি কোনোদিন।

(ক্রমশঃ)

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাতজন তরুণ শিল্পী সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁদের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বলতে বাধা নেই, প্রদর্শনীটি দেখে বিস্মিত হয়েছি। বিশেষ কোনও শিল্প-গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ বা কয়েকজন শিল্পীর একত্রে অনুষ্ঠিত বহু প্রদর্শনী ইতিপূর্বে দেখার সুযোগ হয়েছে। কয়েকটি যে মনে দাগ কাটেনি তা নয়। তবে এ প্রদর্শনীটি দেখে ভাল লেগেছে কয়েকটি কারণে।

রেড মাদার —সমীর দে

প্রথমত এই যৌথ প্রদর্শনীর সুনির্বাচন প্রথা। রচনাগুলি অসাধারণ না হলেও একটা নির্দিষ্ট মানের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, শিল্পীদের প্রগতিবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গী। তৃতীয়ত, প্রত্যেকেই আপন আপন চিন্তাধারাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। চতুর্থত, সব কয়টি নিদর্শনই পরিচ্ছন্ন। এই সব কয়টি গুণের জন্যই বোধ হয় প্রদর্শনীটির সামগ্রিক রূপ প্রথমেই সকলের চোখে পড়ে।

প্রদর্শনীতে শিল্পী জহর দাসগুপ্ত, পার্থপ্রতিম দেব, অমিত রায়, শান্তনু ভট্টাচার্য, চিন্ময় রায়, কে এস বিশ্বম্ভর ও সমীর দে-র মোট ৪১টি রচনা নিদর্শন দেখা যায়—তাদের মধ্যে ১২টি গ্রাফিক প্রিন্ট। সকলেই তেলরঙ ব্যবহার করেছেন। অঙ্কন-রীতির দিক থেকে বিচার করলে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়, কারণ প্রদর্শনীতে

দোকান —শান্তনু ভট্টাচার্য (লিথোগ্রাফ)

বিমূর্ত, সমবিমূর্ত, নিওরিয়ালিস্টিক ও আধুনিক রচনা চোখে পড়ে। বিভিন্ন শ্রেণীর কাজ দেখে বোঝা যায় যে প্রত্যেক শিল্পীই এখনও আত্মপ্রকাশ করার জন্য নানাভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলতালাভ করলেও কেউই যেন মনোমত যথার্থ পথের সন্ধান পাননি। শুধু তাই নয়, দু'-একটি নিদর্শন ছিল, যেগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি।

প্রথমেই অমিত রায়ের রচনা চোখে পড়ে। শিল্পী তেল ও ওয়াটারপ্রুফ রঙ ব্যবহার করেছেন। সমগ্র রচনা ক্ষেত্রটি তিনি আঁকা-বাঁকা আকার ও রেখায় বিভক্ত করে সাধারণত লঘু নীল, গ্রে, হলুদ ও বেগুনী রঙে ভরে ফেলেছেন। ফলে সুন্দর কারুকার্যের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটিতে আবার বাটিকের রূপ ফুটে উঠেছে, যেমন, হলুদ রঙ প্রধান রচনা, মার্কেট। আবার স্থানে স্থানে হালকা নীল রঙ ব্যবহার করার ফলে দু' একটিতে প্রাচীর-পত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। উদাহরণ হিসাবে মাই বেডরুম-এর নাম করা চলে। অসাধারণ না হলেও শিল্পীর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য ও সরলতা উপভোগ্য। জহর দাসগুপ্তের রচনা-রীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। তাঁর সাম্প্রতিক বিমূর্ত রচনাগুলিতে তিনি পোলকের প্রথায় স্থানে স্থানে বিভিন্ন রঙ জমিয়ে ফেলে রঙের ইমেজারি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙ ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে নীল, লাল ও সবুজ রঙ প্রধান পেন্টিং ২ ও লাল, হলুদ, নীল, সবুজ রঙ ভিত্তিক পেন্টিং ৪-এর নাম করা চলে। পার্থপ্রতিম দেব, নিওরিয়ালিস্টিক রীতির সঙ্গে স্থানে স্থানে অপ আর্টের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, সে জন্য তাঁর কয়েকটি নিদর্শন অনেকের ভাল লাগে, বিশেষ করে বিপরীত-ধর্মী গভীর রঙ ব্যবহার করার জন্য। যেমন, বয় উইথ হিজ ফেভারিট আমব্রেলা বা হোয়াইট সো। প্রথমটির ছাতার, বিভিন্ন রঙের রেখা ও দ্বিতীয়টির অপ আর্ট জাতীয় রেখা ব্যবহার তথা দ্বিআয়তনিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। চিন্ময় রায় রচনাক্ষেত্র নানা প্যানেলে বিভক্ত করে নানা চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার দ্বারা বিমূর্ত শিল্প সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, যেমন কমপোজিশন। রচনাক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটি ছোট চতুর্ভুজ আকার কেটে ফেলে চারিদিকে প্যানেলের মধ্যে প্রতীক স্থাপন করে 'স্কোয়ার'-এ শিল্পী আয়তনিক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। নতুনত্ব না থাকলেও পরিচ্ছন্নতা লক্ষণীয়। সমীর দে-র কাজ সমবিমূর্ত শ্রেণীর। অধিকাংশ স্থলেই তিনি মানুষের আকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে নিরাশা, ব্যথা ও যন্ত্রণার রূপ ফোটাতে চেয়েছেন। যেমন, রেড মাদার ও কমপোজি-শন ১। গ্রাফিক প্রিন্টগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে তারা আকার সর্বস্ব। অর্থাৎ অযথা খোদাই কাজের জটিলতা বা কারুকার্যের ওপর দৃষ্টি না রেখে শান্তনু ভট্টাচার্য এবং কে এস বিশ্বম্ভর উভয়েই আকারের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, যেটি আজকাল সচরাচর কম প্রিন্টে দেখা যায়। প্রথম জনের ন্যুডস (লিথোগ্রাফ), দি বেড (লিথোগ্রাফ) ও দ্বিতীয়জনের লিথোগ্রাফ ১ ও হলুদ ও কালো রঙ প্রধান লিথোগ্রাফ ৪ উল্লেখযোগ্য।

*

বহু লোক আছেন যাঁরা বিশেষ কোনও পেশা অবলম্বন করার জন্য ছাত্রজীবন থেকেই প্রস্তুত হন, অথচ দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী জীবনে তাঁরা সেই পেশার পরিবর্তে অন্য কোনও পেশা গ্রহণ করেন। পরিচিত শিল্পী সুনীলমাধব সেনের জীবনেও তাই হয়েছে। তাঁর আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা ছিল যে আইন শিক্ষালাভ করে তিনি ওকালতি করেন। আইন অবশ্য তিনি অধ্যয়ন করেন তবে ওকালতি করেননি। তার কারণ বাল্যকাল থেকেই চিত্রকলার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল, এবং তিনি নিয়মিতভাবে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, খ্যাতনামা শিল্পী অতুল বসু ও সতীশ সিংহের স্টুডিওতে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর মনোগত বাসনা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত তিনি শিল্পী হিসাবেই পরিচিত হলেন। ট্র্যানজিশন পাবলিকেশনস-এর তরফ থেকে প্রকাশিত একটি ছোট্ট ইংরাজী পত্রিকায় (Sunilmadhav, Trasition Publications· 162/100 Lake Gardens, Calcutta-45; Price .50 paise).

কলাসমালোচক অরূপ দত্ত শিল্পীর জীবন ও তাঁর শিল্প প্রচেষ্টার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বয়স ও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা লাভ করে কিভাবে শিল্পী তাঁর রচনারীতির বিবর্তন ঘটিয়ে নতুন দিগন্ত রেখার সন্ধান পান গ্রন্থকার সেটি সহজভাবে বিবৃত করেছেন। সেই সঙ্গে প্রয়োজনমত শিল্পীর বিভিন্ন সময়ে আঁকা কয়েকটি স্কেচও তিনি প্রকাশিত করেছেন। শিল্পী পরিচিতি হিসাবে এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

*

দক্ষিণ কলকাতায়, মুরে অ্যাভিনিউয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা (দেশ, ২৪ অক্টোবর) যে পত্রিকা প্রকাশ করে তার নাম "সকাল বেলা।"

—চিত্রপ্রিয়

ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম মহিলা দেবিকারানী

শ্রীমতী দেবিকারানী রোয়েরিক সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত দাদাসাহেব ফাল্কে পুরস্কার পেলেন। পুরস্কার পেলেন যিনি তিনি ভারতীয় চিত্র জগতে অনন্যা, আবার দাদাসাহেব ফাল্কের দান ছায়াছবিকে ভিত্ দিয়েছে এদেশে। সেখানে তিনি অনন্যসাধারণ।

গোবিন্দ ফাল্কে প্রথম ভারতীয় ছবির প্রযোজক, সম্পাদক, নির্দেশক। বলতে গেলে সবকিছু। একদিকে হিমাংশু রায় আর দেবিকারানীর বম্বে টকিজ আর অন্য দিকে বাংলা দেশে নিউ থিয়েটার্স চিত্রজগতে যে ইতিহাস রচনা করেছে তার তুলনা নেই। কিন্তু ফাল্কে সাহেব তারও অনেক আগের মানুষ। তাঁর প্রথম ছবি হরিশ্চন্দ্র ১৯১২ সালের। গোবিন্দ ফাল্কে প্রথম বিদেশে যান মুদ্রণ শিখতে। তার পরে সিনেমার রূপালী মায়ার মোহে উঠেছিলেন। একের পর এক ছবি রচনা করেও দাদা ফাল্কের জীবন ছিল এক রোমাঞ্চকর দুঃখের সাধনা। আজ তাঁর নামে স্বাধীন সরকার ১১ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজে নিঃস্ব অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেবিকারানীর জন্ম বাংলার গৌরবোজ্জ্বল বংশে। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে নাতনী, কর্নেল এম এন চৌধুরীর কন্যা তিনি। চৌধুরী মশাই আই এম এস ছিলেন ও মাদ্রাজে প্রথম সার্জন জেনারেল হয়েছিলেন। সম্পন্ন সংসারের আদরিণী কন্যা ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করার সময় লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টের পুরস্কার পান। পড়েছিলেন অবশ্য আর্কিটেকচার, কাপড়ের নমুনা আর গৃহসজ্জা।

১৯২৮ সালে দেবিকারানীর সঙ্গে হিমাংশু রায়ের পরিচয় হয়। হিমাংশু রায়ের The Light of Asia-র তখন বেশ নাম হয়েছে। দেবিকারানীকে তিনি নিজের প্রযোজনায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন। ১৯২৯ সালে হিমাংশু রায়ের সঙ্গে দেবিকারানীর বিবাহ হয়। হিমাংশু রায়ের সঙ্গে জর্মানীতে নানা বিখ্যাত স্টুডিওতে দেবিকারানী ফিল্ম সম্বন্ধে বহু কিছু শিখে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কারণ হিমাংশু রায়ের সঙ্গে তখন তিনি জার্মানী গিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে হিমাংশু রায় ও দেবিকারানী দেশে ফিরে "কর্ম" নামে ছবিটি ইংরাজী ও হিন্দীতে করেন। কর্ম বিদেশে সমাদর লাভ করে। কর্মের পর তাঁদের মিলিত কর্মজীবনের সৃষ্টি বম্বে টকিজ ১৯৩৪ সালে জন্ম লাভ করে।

বহু ছবিতে দেবিকারানী অভিনয় করেন। তার মধ্যে জীবন নাইয়া, অচ্ছুত কন্যা, দুর্গা, বচন ইত্যাদি আজও অমর হয়ে আছে। তাঁর অভিনয় কৌশল অতুলনীয়। এখনও তাঁকে ভারতের চিত্র জগতের প্রথম ও প্রধান তারকা বললে অন্যায় হয় না।

শ্রীমতী দেবিকারানী রোয়েরিক

১৯৪০ সালে হঠাৎ হিমাংশু রায়ের মৃত্যু হয়। তার পর দেবিকারানীর উপর সব দায়িত্ব আসে। সে দায়িত্বের মর্যাদা রাখতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি এই প্রতিভাময়ী নারী। পুনর্মিলন, বসন্ত, কিস্মত্ ইত্যাদি তাঁর অসামান্য প্রযোজনা শক্তির স্বাক্ষর। ১৯৪৫ সালের পর দেবিকারানী আর অভিনয় করেননি। বম্বে টকিজ থেকে অবসর নিয়ে বিখ্যাত রুশ চিত্রশিল্পী সেভোস্লাভ রোয়েরিককে বিবাহ করেছেন ও কুলু উপত্যকার অপরূপ পরিবেশে বাস করছেন। সরকারী, বেসরকারী বহু কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন কিন্তু শিল্পী স্বামীর সঙ্গে শান্ত পরিবেশেই সময়ের অনেকটা কাটান। সম্ভবত এজন্যই এখনও তিনি পরমা সুন্দরী। সময় যেন কেমন হার মেনেছে। রূপরসে ডুবে যার জীবন কেটেছে সে রূপসী আপন লাবণ্যে আজও অদ্বিতীয়া। তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না এখনও তিনি ঠিক সেই অচ্ছুত কন্যার মতই প্রায় রয়েছেন।

নূতন বিদ্রোহ

আমেরিকায় কেনাকাটায় যা পয়সা খরচ হয়, বলতে গেলে প্রায় সবটাই হয় মেয়েদের হাতে। মোটামুটি একটা হিসাব কষে দেখা গেছে বয়ের শতকরা অন্তত ৮৫ ভাগ মহিলারাই নিয়ন্ত্রণ করেন। কাজেই ব্যাপারীরা চট করে মেয়েদের চটাতে চান না। সম্প্রতি দেশে থাকবেন সংবাদপত্রের খবরে মেয়েদের নূতন বিদ্রোহের বিচিত্র কাহিনী। মহিলা মুক্তি সংগ্রামে ইউরোপে বিদ্রোহ করেছিলেন যাঁরা তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত blue stocking বা নীল মোজার দল। এবার মার্কিন মেয়েরা আরও একধাপ এগিয়েছেন। কাগজপত্রে এঁদের এক দলের নামও দিয়েছেন red stocking। এই লাল মোজার দল আমূল সংস্কারের জন্য লড়াই করছেন। মেয়েদের জন্য মেয়ে হিসাবে কোন ভেদজ্ঞান কোথাও থাকতে পারবে না। বিশেষ করে বিজ্ঞাপনে ফলাও করে বলা চলবে না যে মেয়েরা পুরুষের মন ভোলাবার মানুষ। কোন এক বিমান কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছিল "This nice little blonde from Barcelona will romance you all the way to Spain."

বারসেলোনার এই স্বর্ণকেশী স্পেন পর্যন্ত তোমার রোমাঞ্চ জাগিয়ে পাড়ি দেবে। উওম্যানস লিবরেশন মুভমেণ্ট বা নারী মুক্তিবাদীর দল ক্ষেপে আগুন। পুরুষের

প্রাণে রোমাঞ্চ প্রক্ষেপ কি নারীর সাম্যের বিরোধী কথা নয়?

মুক্তিসংগ্রামী মেয়ের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তাঁরা নতুন নতুন সংস্থা স্থাপনা করছেন। মজার মজার নাম আর তার চেয়েও মজার তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। একটি সংস্থার নাম উওমেনস ইনটার-ন্যাশনাল টেররিস্ট কনসপিরাসি ফ্রম হেল—ছোট করে বলা হয় W I T C H! ন্যাশনাল অরগাইনেজশন ফর উওমেন অপেক্ষাকৃত ভদ্রস্থ। তার সংক্ষিপ্ত নাম দাঁড়িয়েছে N O W। আরও বহু সংস্থা আরম্ভ হয়েছে। সব সংস্থার কার্যতালিকা এক নয়। তবে একটি ব্যাপারে সবাই মারমুখো। ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ছোট করা চলবে না। মেয়েদের অবলা বানিয়ে, তাদের কাপড় ধোওয়া বা বাসন মাজার সহায়ক বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলবে না। মেয়েরা বাইরের জগতেও প্রচুর কাজ করেন, বহু দায়িত্ব নিয়ে সংসার চালান, কিন্তু বেচাকেনার বাজারে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁদের কোন দায়িত্বকেই যেন যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাদের ছোটখাটো শখ আর খেয়াল, তাদের বিনোদিনীর ভূমিকা এইসব নিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের বাহারে ভুলিয়ে মন কাড়তে চায়। নারীর পক্ষে পরম অপমানকর নয় কি?

লুসি কোমিসার এক সাংবাদিক মহিলা। Now-এর তিনি সংগ্রামী সভ্য। ব্যাপারটি নিয়ে একেবারে ওয়াশিংটন পৌঁছোলেন। সেনেটের কাছে পেশ করতে হবে সব কথা। খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন সর্বত্রই নারীর ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। গৃহিণী, সচিব, সখী মাত্র আর মেয়েরা নেই। আমেরিকার মহিলা সংখ্যার অর্ধেক চাকরী করেন। মেয়েদের উপলক্ষ করে যে বিজ্ঞাপন তাতে তাদের ঘরোয়া কাজকর্মের কথা বেশী থাকবে কেন? পাশের বাড়ির বৌটির চেয়ে তোমার কাপড়কাচা ভাল হবে, অথবা তোমার ঘরের আসবাব কেমন ঝলমলিয়ে উঠবে—এইসব সাবান বা আসবাব পালিশ করার মাধ্যমের বিজ্ঞাপনে লুসি মেমসাহেবের ঘোর আপত্তি।

মেয়েরা আপত্তি করলে কিন্তু মার্কিন ব্যবসায়ীর মাথা ঘুরে যায়। কাজেই আপত্তির কারণ নিয়ে খুব গবেষণা চলেছে। তাঁরা অনুসন্ধান করলেন সাক্ষাৎকার মাধ্যমে। দুরকম সাক্ষাৎকার। একদল সংগ্রামী মহিলা সংস্থা সব ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন করলেন। আর একদল সাধারণ মেয়ে যাঁরা এসব আন্দোলনের সংস্রবে নেই তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। জবাবও কিন্তু খুব মজার। কেউ বা বললেন, "আজকাল কারও উপর ক্ষেপে ওঠা তো প্রায় ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেয়ালী বদমেজাজী বাচ্চার মত মহিলাদের দল সব হামলা করছেন। বিজ্ঞাপন দিয়ে যদি মেয়েদের ঘরোয়া জীবনের সুখ সুবিধার কথা কিছু বলা হয় তাতে ক্ষতি কি? সত্যিই তো ঘরের কাজ কত সহজ হয়েছে নানা কলা-কৌশলের সহায়তায়। গৃহিণীর নিত্য করণীয় এমন ছোট কাজই বা কি? ঘরের কাজ করে বেশ আনন্দ পান এমন মহিলারও অভাব নেই। হ্যাঁ, হামলা করতে চাও তো কর। মেয়েদের জন্য পুরুষের সংগে সমান করে উপার্জনের ব্যবস্থা, একই কাজের জন্য পুরুষের সমান পারিশ্রমিক—এইসব মহিলা প্রগতির পতাকা-বাহীদের ভাবনার ক্ষেত্র। তা বলে সব কিছু নিয়ে হৈ-চৈ করা চলে না। কেউ বা এমন বললেন হৈ-চৈ করা [illegible]ব যাদের তারা হৈ-চৈ করবেই। তার জন্য কারণ দরকার হয় না। যেসব মেয়ে অকারণে গোল বাধাচ্ছেন তাঁরা মেয়ে না হয়ে আর কিছু হলেও এরকম অনর্থ বাধাতেন, অনর্থের আর একটা কারণ খুঁজে পেতেন।

এ তো গেল সাধারণ মেয়েদের মন্তব্য। সংগ্রামী মহল কিন্তু সাক্ষাৎকারেও অটল। তাঁরা কেউ বললেন, এখন বিজ্ঞাপনের বাজার, বা পণ্যের পরোয়ানা কালো মানুষ-দের নিয়ে নেহাৎ সতর্ক। তাদের অভিমানে আঘাত লাগে এমন কথা ঘাঁটাতে কেউ সাহস করে না। কেন মেয়েদের বেলায়ও তাই হবে না। কেনই বা ঘরের কাজের সহায়ক সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিতে পুরুষকেও সমানে দেখানো হবে না। ঠাট্টা করার জন্য পুরুষকে appron বা সজ্জারক্ষণী দিয়ে সাজানো হয়। কেন তা হবে। appron পরা কি মেয়েদের এক উর্দি? এমন সব কাজ সবার। মেয়েপুরুষে ভেদ মানার দিন চলে গেছে।

শ্রীমতী

উন্নয়ন সমাচার — ৭

বিশ্বসংস্কার ও ভবিষ্যৎ

সুশীল দে

নন্দিতার হাবভাব, চেহারা নরম, মিষ্টি সুন্দরী কিশোরীর, কিন্তু তার মনের গড়নটা পুরুষের মত। চুলচেরা তর্ক করতে তার উৎসাহের অন্ত নেই। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সম্প্রতি যেসব আলোচনা হচ্ছিল, কথা-বার্তার শেষে তার সিদ্ধান্তগুলি তাই নিশ্চিন্ত হয়ে মনের মধ্যে পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখে সে স্বস্তি পায় না। তার নিয়ত সজাগ মন অনেক কথা নিয়ে বার বার নানাভাবে নাড়াচাড়া করে, নতুন নতুন প্রশ্নের উদয় হয়। কিছু কিছু জবাব সে আবার নিজের মনেই খুঁজে পায়, আবার কোনো কোনো বিষয়ে মনে হয় জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে আরও খুঁটিয়ে আলোচনা করা দরকার।

কয়েক দিন বাদে এমনি একটা প্রশ্ন নিয়ে সে জ্যাঠামশায়ের সামনে উপস্থিত হলো। বলল, তুমি বোধ হয় ভাবছিলে উন্নয়ন সম্পর্কে তোমার যা কিছু বক্তব্য ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। আরম্ভ করেছিলে কলকাতার চেহারা পালটাবার চেষ্টা নিয়ে। তারপর বোঝালে, কেন তা করতে হলে গোটা দেশটারই সমৃদ্ধির প্রয়োজন। তার জন্যে গতানুগতিক কাজের সূচীতে চলবে না, নতুন পথ খুলে দিতে হবে। তার পরের ধাপে বলেছ, এ পথে যদি লোককে প্রবুদ্ধ করতে হয় তো উন্নয়নের পরিকল্পনা-পরিচালনা করতে হবে দেশের সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে, তাদের সচেতন সহায়তা নিয়ে, তাদের কেন্দ্র করে। বর্তমানে তারা অক্ষম, দুর্বল, তাই তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হলে প্রথম অবস্থাতেই বড় বড় লাফ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তারপর এও বুঝলাম যে আর্থিক উন্নতির সঙ্গে জীবনের অন্য দিকগুলির উন্নতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, পূর্ণাঙ্গ উন্নতির জন্যে সবদিকে নজর রেখে সব দিকের ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। পরিশেষে বললে, যে মানুষকে ঘিরে এই প্রচেষ্টা, সে জ্যান্ত রক্তমাংসের আলাদা আলাদা ব্যক্তিবিশেষ, ভারতবাসীর বা মানুষ নামধারী জীবের abstract প্রতীক নয়। উন্নয়ন সাধনার চরম লক্ষ্য হলো তাই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার উত্তরোত্তর উন্মেষ। এ যুগের ছেলেমেয়েদের এই আদর্শে দীক্ষার অভাবেই তারা বর্তমানে দিশাহারা, তাদের আচরণে দেখা যায় ব্যর্থতার নিষ্ফল আক্ষেপ।

জ্যাঠামশায় এই জায়গায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি জানি এই আদর্শকে ধর্ম বলে আখ্যা দিয়ে তার পর্যায়ে তুলতে তোমার ও আরও অনেকের মনে বাধছে। তোমরা বলতে চাও, আমি যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা দেখতে চাই, সেটা আইডিওলজি, ধর্ম জিনিসটা তার থেকে ভিন্ন স্তরের, আইডিওলজিকে ধর্মের সামিল বলে গণ্য করাটা ভুল। আমি এই নিয়ে তর্ক বাড়াবো না। তোমরা হয়তো ধর্ম শব্দটার মূল অর্থের ওপর বেশী জোর দিচ্ছ। আমি বলব, তোমাদের সে অর্থে ধর্ম খুব কম লোকের জীবনেই আজ ক্রিয়াশীল। তাদের রোজকার জীবনে-আচরণে ধর্মের নামগন্ধও নেই, তোমাদের কাছে ধর্মের যে এই অভিধানগত গূঢ় বা esoteric রূপ, তার কোনো খোঁজ তারা রাখে না, তা নিয়ে তাদের কোনো কৌতূহলও নেই। যেহেতু আমার লোভ চিরকালের মোক্ষলাভের জন্যে নয়, ইহ-কালের জীবনটাকে ভাল করে গড়ার জন্যে, সেইহেতু আমি খুঁজছি এইসব অশিক্ষিত সাধারণ লোকের রোজকার চালচলন ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটা মূল আদর্শের কষ্টিপাথর। তার নাম কি হবে তা নিয়ে খুব একটা এসে যায় না। একে যদি তোমাদের ধর্ম বলতে আপত্তি থাকে তো একে আইডিওলজিই বোলো।

নন্দিতা : তোমার কথা, তোমার ও আর দশজনের কাছে এমন একটা কষ্টিপাথর ছাড়া জীবনে বাঁধুনি আনা সম্ভব না, এবং সে বাঁধুনির জন্যে এই কষ্টিপাথরই যথেষ্ট। এর চেয়েও সূক্ষ্ম অনুভূতি-উপলব্ধির খোঁজে কেউ যদি শাস্ত্র উপনিষদের শরণ নিয়ে বিশুদ্ধ ধর্ম চর্চায় মন দিতে চায়, তার সঙ্গে তোমার কোন ঝগড়া নেই।

জ্যাঠা : তা নেই। কিন্তু বলব, সে ধর্ম সাধারণের জন্যে নয়, একটা বিশিষ্ট অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন spiritual elite-এর জন্যে। সেই সূক্ষ্ম ধর্ম জগতের সঙ্গে আমাদের নিত্যকার ব্যবহারিক জগতের যদি কোনো যোগ রাখতে হয়, অর্থাৎ সেই ধর্মজগতের প্রভাব আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়া-কলাপের ওপর বিস্তার করতে হয়, তবে তার উপায় কেবল একটি। সে হচ্ছে সাধারণ মানুষের বিনা বাক্যব্যয়ে রোজকার আচার ব্যবহারের পরিচালনাতেও এই elite সম্প্রদায়ের বিধান মেনে নেওয়া।

নন্দিতা : তার মানে হোল, জাতে ব্রাহ্মণ না হোক, তত্ত্বজ্ঞানে ব্রাহ্মণ এক নতুন সম্প্রদায়ের হাতে জনসাধারণের ভালমন্দ বিচারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া। এঁরা কাশী-পুরীধামের বর্তমান মোহান্ত পান্ডাদের বিশুদ্ধ ও বিদগ্ধ সংস্করণ হতে পারেন, তবু যে ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ তার নিজের ভালমন্দের বিচার নিজে করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাতে তুমি সায় দিতে পার না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। পুরোনো ব্যবস্থার সঙ্গে এর একটা মস্ত তফাৎ আছে। তা হোল এই যে, যে-কোনো সাধারণ মানুষই সাধনার জোরে এই বিদগ্ধ গোষ্ঠীতে প্রবেশ করতে পারে, তার জন্যে জাতের টিকিট লাগে না। তত্ত্ব-জ্ঞান অর্জনের সুযোগ যদি প্রত্যেকের কাছেই অবারিত হয় তো গণতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে এর বিরোধ বাধছে কোথায়? গণতন্ত্রের অর্থ সব সুবিধায় সমান অধিকার নয়, সব রকম সুবিধা ভোগ করায় সমান সুযোগ।

জ্যাঠা : বিশুদ্ধ ধর্মতত্ত্বের পুরুত-ঠাকুরদের দলে ঢুকতে হলে যে কসরৎ-সাধনার দরকার তা অত্যন্ত দুরূহ, সাধারণ লোকের সাধ্যের বাইরে। বলতে পার, ব্যবহারিক জগতেও অনেক বিষয়ে আমরা পন্ডিতদের কথা মেনে নি। Electricity রহস্য জানি না বলে বৈদ্যুতিক আলো-

পাখা চালাতে দ্বিধা করি না, ডাক্তারী না জেনেও ওষুধ খাই। কিন্তু সবাই জানে, ফিজিকস বা সাইকলজির প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমাদের সহজবুদ্ধির প্রমাণসাপেক্ষ। পারমার্থিক তত্ত্বে পৌঁছতে হলে ভক্তি ও বিশ্বাস মার্গ ভিন্ন গতি নেই।

নন্দিতা : এ সব কথাতেই মোটামুটি তোমার সঙ্গে আমি একমত। সত্যি কথা বলতে কি, এ প্রশ্নগুলো তোলবার জন্যে আজ তোমার কাছে আসিনি। আমার মনে গতবারের আলোচনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গে। সে প্রশ্ন তোলবার আগেই তুমি নিজের ঝোঁকে এতক্ষণ এত কথা বলে গেলে। আমি অবশ্য বাধা দিই নি, কারণ তাতে ক্ষতি হয়নি কিছু। বরঞ্চ তোমার সেদিনকার অনেক কথা আরও খানিকটা স্পষ্ট হোল।

জ্যাঠা : তা হলে তোমার আজকের প্রশ্নটায় এবার আসা যাক।

নন্দিতা : তুমি সেদিন বলেছিলে, সারা পৃথিবী গ্রহটাকে একটা দেশ আর সমস্ত মানব জাতটাকে সেই দেশের অধিবাসী বলে গণ্য করবার সময় এসেছে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে রোজকার আচরণে তা কি সম্ভব? কিছুদিন আগে এক আদর্শবাদী মার্কিন ছোকরা নিজেকে One World এর নাগরিক বলে ঘোষণা করে প্রকাশ্যে তার পাসপোর্ট পুড়িয়ে ফেলেছিল। ফলে শুনেছি সে মাসের পর মাস এক এয়ারপোর্ট থেকে আর এক এয়ারপোর্ট, এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে হানা দিয়ে বেড়িয়েছে, কোনো দেশে ঢোকবার অনুমতি পায়নি। বিশ্বসংস্থা বা ইউনাইটেড নেশনস থেকে বিশেষ ছাড়-পত্র বা Laissez passer বিলি করার ব্যবস্থা আছে জানি, কিন্তু সে শুধু তাঁদের নিজেদের কর্মচারীদের জন্যে।

জ্যাঠা : তাও সে কর্মচারীরা যখন স্বদেশে পদার্পণ করেন তখন বলবৎ থাকে না। তাঁদের দেশীয় পাসপোর্ট দেখাতে হয়। তা ছাড়াও অনেক দেশ আছে যারা আজ অবধি U N-এর Laissez passer কে গ্রাহ্য করে না, U N-এর কাজ উপলক্ষে হলেও সে সব দেশে প্রবেশ করতে হলে জাতীয় পাসপোর্ট এর ওপর ভিসা নেবার দরকার হয়। আসলে U N-এর কাজের গোড়াতেই একটা বিরাট কনট্রাডিকশন বা অসঙ্গতি বিদ্যমান। সেটা হোল, একদিকে U N ও তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবী যে তারা সমস্ত মানবজাতির কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত। যাঁরা গত মহাযুদ্ধের পর এই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়েছিলেন তাঁরাও সব মানুষকে এই আশা ও ভরসা দিয়েছিলেন। অথচ অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানগুলো সংগঠনের সময় তাদের পরিচালনার চরম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের ওপর। এঁদেরই মুখপাত্রেরা ডেলিগেট হিসেবে এই সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিধানসভায় এসে এদের কর্মসূচী ও তার মূলনীতি বেঁধে দেন, তাদের খরচ বরাদ্দ করেন। U N-এর সেক্রেটারি জেনারেল ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ডিরেকটর-জেনারেল ও অধ্যক্ষদের থেকে আরম্ভ করে সব কর্মচারীদের কাজ হচ্ছে এই সব বাঁধা নীতি বা রেজোলিউশন ও কার্যসূচী বা প্রোগ্রাম বরাদ্দ টাকা বা বাজেট অনুযায়ী চালু করা। এর বাইরে যাবার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

নন্দিতা : তার মানে তুমি বলছ যে এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্বমানবতার নামে যে নীতি বেঁধে দেওয়া হয় তা আসলে বিভিন্ন সদস্য দেশগুলোর জাতীয়তাবাদদুষ্ট সিদ্ধান্তেরই প্রতিচ্ছবি।

জ্যাঠা : তা ছাড়া আর কিছু হওয়া কি সম্ভব? UN-এর মূল শাসন ব্যবস্থা বা সংবিধান অনুসারে এই সব প্রতিষ্ঠানের সভ্য হোল এক একটা সার্বভৌম স্বাধীন দেশ, সরাসরি মানবজাতটা নয়। সেইসব দেশের রাষ্ট্রকর্তাদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অনুশাসিত হবে এটা তো স্বাভাবিক।

নন্দিতা : কিন্তু সে তো ভয়ঙ্কর কথা! তাঁদের বিচারবুদ্ধির দৌড় তো আমরা জানি। যে সব দেশ নিজেদের ডেমোক্র্যাট বলে জাহির করে, যেখানে ক' বছর অন্তর সাধারণের ভোট নিয়ে তাদের শাসনকর্তাদের নির্বাচন হয়, তাদের দূরদৃষ্টি তো শুধু পরবর্তী নির্বাচন অবধি। ওই ক' বছর পরে শাসন ক্ষমতা ফিরে পাওয়া হচ্ছে তাঁদের চরম লক্ষ্য। তারপরে সমাজের চেহারা কি দাঁড়াবে না দাঁড়াবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর তাঁদের কতটুকু? আর যাঁরা একনায়কত্ব চালাচ্ছেন, তাঁরা তো দিনগত পাপক্ষয় করে যান, কে কেমনে সিংহাসন আঁকড়ে পড়ে থাকবেন, তার বেশী ভাবনা সম্ভব নয়।

জ্যাঠা : ভেবে দেখো, এই অদূরদর্শী রাষ্ট্রকর্তারাই আন্তর্জাতিক ডেলিগেটদের মন্ত্রণাদাতা। U N General Assembly থেকে আরম্ভ করে অন্য সব আন্তর্জাতিক সভায় এঁদের হুকুম-নামাই হচ্ছে চূড়ান্ত। অতএব বিশ্বসংস্থার নামে বিশ্বমানবতার মহান আদর্শের উদ্বোধন করে যেসব গালভরা বুলি ঘোষণা করা হয়, আসলে তার পেছনে আছে এইসব অপরিণামদর্শী, বুদ্ধিতে নাবালক, স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবাজ কূটনীতি।

নন্দিতা : তুমি একটু বাড়িয়ে বলছ না কি? বিভিন্ন রাষ্ট্র-প্রতিনিধিরা একত্র হলে, একজোট হয়ে এক একটা মানবসমস্যাকে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে দেখলে তাদের কি খানিকটা চোখ ফোটে না? অনেকগুলো পাতকুয়োর ব্যাঙকে অবধি বাইরে এনে একত্র বসিয়ে দিলে তাদের চোখে তাদের আগের পরিচিত জগতের চেহারাটা অনেকটা বদলে যায় না কি?

জ্যাঠা : তা যায়। আন্তর্জাতিক

প্রতিষ্ঠানগুলোর মানুষের প্রকৃত কল্যাণ-সাধনের পথে বর্তমানে যে সীমার কথা আমি উল্লেখ করলাম সেগুলো আমার নতুন আবিষ্কার নয়। যেসব আদর্শবাদী চিন্তাশীল নেতা এ প্রতিষ্ঠানগুলোর পত্তন করেছিলেন, তাঁদের কাছে নিশ্চয় অজানা ছিল না। তারপর যেসব বিস্তর ভাল লোক মহামানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপুল উদ্যমে এইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুভার নিতে এগিয়ে এসেছেন, তাঁরাও এদের সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

নন্দিতা : কিন্তু যেভাবে তাদের হাত-পা বাঁধা বলে তুমি বোঝালে তাতে সত্যিকারের দীর্ঘমেয়াদী ভাল কাজ করার কতটুকু অবকাশ তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে?

জ্যাঠা : তাঁদের মধ্যে অনেকেই মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে নৈরাশ্য, তিক্ততা আর মানসিক ও নৈতিক অবসাদের লক্ষণের তাই অন্ত নেই। সে লক্ষণ ফুটে ওঠে কাজের শৈথিল্যে, প্রচণ্ড, অকারণ স্নায়বিক দৌর্বল্যের আক্রমণে, এমন কি আত্মহত্যাতেও। তার সবগুলিই যে কাজের নিষ্ফলতার থেকে উদ্ভব, তা আমি বলছি না, কিন্তু এইসব ব্যাধির একটা বড় কারণ যে এই, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

নন্দিতা : একটু আগে তুমি বললে যে বিশ্বসংস্থার কাজে যে এইসব দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে তা জেনেশুনেও চিন্তানায়কেরা এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিশ্চয় তাঁদের মনে হয়েছিল যে এসব বাধা সত্ত্বেও মানবসমাজকে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ায় এতে সাহায্য হবে। কিসের ভরসায় এ আশা? আর তার কতটুকু সফল হয়েছে বলে তুমি মনে কর?

জ্যাঠা : একটা ভরসার কথা তুমি আগেই উল্লেখ করেছ। সেটা হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর কূপমণ্ডুকত্ব ঘোচান। সামনাসামনি বোঝা-পড়া করতে গেলেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো প্রশ্নের বিচার করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। বিশ্বসভায় আলোচনার সময় বার বার দেখা গেছে, প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজেদের গভর্নমেণ্টের কাছে আলোচনার ধারা রিপোর্ট করার ফলে তাদের প্রথম-দফার অভিমত নরম করতে বা বদলাতে রাজী হয়েছেন।

নন্দিতা : তা বটে। কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে মনে হয় যে, এ কথা বেশীর ভাগ খাটে এমন সব প্রস্তাবের বেলায় যাতে বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলোর স্বার্থে না লাগবে না। সচরাচর এই প্রসঙ্গগুলো অপেক্ষাকৃত নিরীহ সমাজসংস্কারমূলক, নিরস্ত্রীকরণ, গরিবদের বাণিজ্যে সুবিধাদান, কাশ্মীর বা আরব ইসরায়িলী ব্যাপারে নয়।

জ্যাঠা : তা নিশ্চয়। আসল স্বার্থের সংঘাত রাজনীতির ক্ষেত্রে, তাই ইউ এন-এর সিকিউরিটি কাউন্সিল-এর রেকর্ড সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক। তবু এটা অনেকেই মানবেন, যে কোনো বড় সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করতে না পারলেও, বছর বছর এসব প্রসঙ্গ নিয়ে বাকবিতণ্ডায় একঘেয়ে জের টেনে নিয়ে আসা হয়েছে বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত বড় রকম কোনো যুদ্ধের বিস্ফোরণ ঘটতে দেওয়া হয়নি। তবে তোমার এ কথা ঠিক, যে বিশ্বসংস্থার আসল কৃতিত্ব দেখা গেছে সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। তাই UNESCO, FAO, WHO ও ILO-র কাজ নিয়ে তাঁদের কর্তৃপক্ষদের বড়াই অনেক বেশী, খোদ ইউ এন তাদের তুলনায় অনেকটা ম্রিয়মাণ।

নন্দিতা : কিন্তু রাজনীতির কাঠামো অগ্রাহ্য করে সমাজের উন্নয়ন চলতে পারে কি?

জ্যাঠা : না, চলে না। তাই তো উন্নয়ন প্রসঙ্গে আজ আমরা বর্তমান প্রশ্নতে এসে ঠেকেছি। ব্যক্তি-প্রধান সমাজ-উন্নয়নকে সত্যিকারের সার্থক রূপ দিতে হলে সামাজিক ক্ষমতাবিন্যাসের ছকটাকে সম্পূর্ণ পালটে ফেলতে হবে। এই ক্ষমতা-বিন্যাসই হোল রাজনীতির মর্মকথা। এ ক্ষেত্রে আমাদের এখনও যে শিক্ষা ও সংস্কার চালু রয়েছে সে অনুসারে এ ব্যবস্থার চরম দায়িত্ব হোল বিভিন্ন ও বিভক্ত তথাকথিত স্বাধীন দেশগুলোর শাসনকর্তাদের। এরই জন্যে বিশ্বসংস্থার সংবিধান আজ obsolete দুর্বল ও মূলত অকেজো।

নন্দিতা : যখন টেকনলজির অপেক্ষাকৃত অপরিপক্ক অবস্থায় মানুষের সমাজ ছিল খণ্ডিত ও বিভক্ত, তখন এ অবস্থায় আপত্তি ছিল না। বরঞ্চ বিচ্ছিন্ন খণ্ড-সমাজের পাণ্ডাদের হাতে নিজের নিজের এলাকার উন্নতির দায়িত্ব ছেড়ে দেবারই দরকার ছিল বেশী। তুমি বলছ, আজ কিন্তু মানুষের ব্যবহারিক, বাইরের পরিবেশের নিয়ন্তা যে টেকনলজি, তা সে যুগটাকে অনেক দূরে পেছিয়ে ফেলে এসেছে। বর্তমানে মানব-জীবনের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য প্রসারের জন্যে পৃথিবীটাকে একটা অখণ্ডিত, অবিভক্ত সমাজ বলে গণ্য করা দরকার। তাই তার সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা-বিন্যাসের প্যাটার্নটাও আমূলে বদলে ফেলা চাই। অথচ আজকের দিনেই রোজ রোজ ঢাক ঢোল পিটিয়ে নিত্য নতুন দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে একরত্তি এক একটা দ্বীপও তাদের স্বতন্ত্র জাতীয় পতাকা, জাতীয় ডাক টিকিট, ট্যাঁকশাল ও বিধানসভা গড়তে মেতে গেছে, আর সেইসব উদ্বোধন করতে পৃথিবীর সব কোণ থেকে সব দেশের মহামান্য অতিথিদের সমাগম হচ্ছে।

জ্যাঠা : সঙ্গে সঙ্গে নিউ ইয়র্ক শহরে ইসট রীভার-এর পাড়ে ইউ এন দপ্তরের কাচের সৌধের প্রাঙ্গণে নতুন জাতীয় পতাকা আর অ্যাসেম্বলী ও মিটিং ঘরে নতুন প্রতিনিধিবর্গের আসনের জায়গা খুঁজে বার করতে সেখানকার ক্ষুদে কর্মচারীরা গলদঘর্ম হচ্ছে। সবাই মনে মনে জানে, আজকের দিনে বড় বড় বনিয়াদী দেশের পক্ষেও যখন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ অবাস্তব, অচল, প্রত্যেক দেশ যখন একান্তভাবে পরস্পরনির্ভর, তখন জাতীয় স্বাধীনতা নিয়ে মাতামাতি শুধু হাস্যকর নয়, ট্র্যাজিকও বটে। শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী সুপারসনিক রথে মহাকাশে বিচরণ করে মানুষ যখন মাটিতে পা দেয় তখন দেখে

নতুন পাসপোর্ট, কাসটমস আর স্বাস্থ্য-পরীক্ষার বেড়া উঠেছে, তাতে ভ্রমণের সময় সংক্ষেপ না হয়ে আরও দীর্ঘ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক মানুষের এই এক হাত দিয়ে অন্য হাতের কাজ বিকল করে দেবার ক্ষমতা অদ্ভুত, বিচিত্র।

নন্দিতা : তুমি যা বললে, আধুনিক মানুষ যে এসব কথা জানে না, বোঝে না, তা নয়। কিন্তু সাহস করে বলবে কে? যারা আগেকার কালে সাম্রাজ্যবিস্তার করে দূরের মানুষকে শোষণ করত, তাদের বলবার মুখ নেই। আর যারা সদ্য স্বাধীন হয়েছে তাদের ফন্দী বিশ্বসভায় দল ভারী করে পুরোনো পাপীদের সায়েস্তা করা। মাঝখান থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব-কল্যাণের লক্ষটা চাপা পড়ে গেছে, নয় তো যা হয়েছে নিতান্ত পরোক্ষ। এসবই বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে নিশ্চয় মাথা খুঁড়ে আক্ষেপ করাটা নিষ্ফল, আর তুমি বিশ্বসংস্থাগুলোকে বরবাদ করে দিতেও চাও না। এ অবস্থায় তবে করবার আছে কি?

জ্যাঠা : এগোবার পথ দুটো। এক নম্বর, বিশ্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রিয়াকলাপ ও আলোচনার মান উন্নত করে তোলা। এর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এইসব প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষ ও তাদের সহকর্মীদের। যে ডেলিগেটরা এদের বিধান দিতে আসেন তাদের বিবেচনার বিষয়গুলি অনেক সহজ-বোধ্য ও সুখপাঠ্য করে তাঁদের কাছে পেশ করা সম্ভব। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যখন বিভিন্ন দেশে তাঁদের কাজ দেখতে যান ও সেই উপলক্ষে সেখানকার সরকারী মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন, তখনও তাঁদের প্রভাবান্বিত করার সুযোগ পাওয়া যায়।

নন্দিতা : তার জন্যে যে ধরনের বুদ্ধি-মত্তা ও ব্যক্তিত্বের দরকার সেই যোগ্যতা এঁদের মধ্যে কতটা আছে বলে মনে কর?

জ্যাঠা : সম্প্রতি কর্মী মনোনয়নে জাতীয় সরকাররা যেভাবে হস্তক্ষেপ করার প্রবৃত্তি দেখাচ্ছেন তাতে এ দিক থেকে অনেকখানি ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তারা অনেক বেশী নিজেদের বিচারবুদ্ধিমত লোক নিয়োগ করতে পারতেন। তাঁরা বুঝতেন যে বিশ্বসংস্থার কাজ নিরপেক্ষভাবে মানব-কল্যাণের আদর্শ অনুযায়ী চালাতে হলে শুধু অগ্রণী দেশগুলো থেকে উচ্চশিক্ষিত লোক নিলেই হবে না। যেহেতু পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে টেনে তোলার দায় তাঁদের সবচেয়ে বেশী, সেইহেতু সেখানকার সমস্যা-গুলো সবচেয়ে ভাল বোঝে, সেখানকার মানুষের সঙ্গে যাদের মনের মিল আছে, যেসব লোকের ওপর সেসব দেশের মানুষের আস্থা আছে, এমন লোকেরও খুব প্রয়োজন। তাই প্রথম থেকেই বিশ্বসংস্থায় সব দেশের লোকেরই কাজ করার জায়গা ছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিধিরা ঠিক সেই সংখ্যা অনুপাতে লোক নিয়োগের দাবীর ওপর উত্তরোত্তর ঝোঁক দিয়ে চলেছেন। খুব সম্প্রতি অনেক দেশের সরকার বলেন, নতুন কর্মীদের প্রাথমিক নির্বাচন তাঁরাই করে দেবেন, তাঁদের মনোনীত ফর্দের বাইরে থেকে চূড়ান্ত নিয়োগ চলবে না। ক্রমে এই-ভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীদের মধ্যে জাতি-নির্বিশেষ মানবকল্যাণ সাধনের সংকল্পের জায়গায় নিজের নিজের দেশীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

নন্দিতা : কিন্তু কর্মীদের এর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার বিধি নেই?

জ্যাঠা : সে তো কত বিষয়ে আমরা কতরকম সুপথে চলবার প্রকাশ্য শপথ নিই, কিন্তু কার্যত তাতে গুরুত্ব আরোপ করি আর পালন করি কজন? কর্মীদের মধ্যে অনেকে জানেন, বিদেশের এই কাজ তাঁদের অল্পদিনের জন্য, দেশে ফিরে গিয়ে আবার নিজেদের সরকারের হুকুম তামিল করতে হবে। এ অবস্থায় যদি তাঁদের মধ্যে নির্ভীক না হয়ে জাতীয় প্রতিনিধিদের নির্দেশ উপদেশ মত চলবার প্রবৃত্তি দেখা যায় তো তা বিচিত্র কি?

নন্দিতা : বিশ্বপ্রতিষ্ঠানের বড় কর্তারা এসব বিষয়ে আরও দৃঢ়তা দেখান না কেন?

জ্যাঠা : কাজটা খুব সহজ নয়। এঁদের মেয়াদও ডেলিগেটদের নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি মহামানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে ঠিক পথে পরিচালনা করতে হয় তবে দৃঢ়তা প্রকাশে সবসময় কুণ্ঠা করলে চলবে না। কোন্ অবস্থায় ঠিক কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া যায় সে সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম অথচ সহজ বোধ থাকা চাই। হ্যামারশীল্ড ও থানট শক্তিশালী রাষ্ট্রদের হুমকী অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করে তাঁদের আদর্শ অনেক বিষয়ে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হ্যামারশীলড তা প্রমাণ করে গেছেন। উ থানট-এর অগ্নি-পরীক্ষা এখনও বাকী।

নন্দিতা : কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার মূল সংস্কারের প্রস্তাবটা তোমার মনে কি ছিল?

জ্যাঠা : খুব সোজা কথায় তা হোল বর্তমান ইউ এন জেনারেল অ্যাসেম্বলিকে সত্যিকারের ওয়ার্লড পার্লিয়ামেন্ট-এ পরিণত করা। অর্থাৎ সদস্যেরা সরাসরি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দর মুখ-পাত্র হবেন, কোনো জাতীয় সরকারের বা কোনো জাতিবিশেষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করবেন না।

নন্দিতা : ব্যবধানটা খুব বেশী নয় কি? তুমি কল্পনা করতে পার, মাঠ-ঘাট-ফ্যাক্টরীর লোক সরাসরি তাদের মধ্যে থেকে তাদের মনের কথা বলবার লোক নিউ ইয়র্কে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে পাঠাবে? তাদের হিতাহিত জ্ঞানের পরিধি কতখানি? তাদের মাথাব্যথা চাষের জমি আর তার ফলন নিয়ে, আশ-পাশের রাস্তাঘাটের সংস্কার নিয়ে, দিনমজুরীর ভাতা নিয়ে। বিশ্বসমস্যার কি তারা বুঝবে?

জ্যাঠা : তুমি ঠিকই ধরেছ, দুয়ের মধ্যে ব্যবধানটা অনেকখানি। তাই মাঝখানে অনেকগুলো ধাপ চাই। তার কথা এখন বলা হয়নি। কিন্তু এতদিন ধরে আমরা যে ঘাসের শেকড় আঁকড়ানো [illegible] প্ল্যানিং-এর কথা আলোচনা করে এ[illegible]হ, সে কথা মনে রাখলে প্রস্তাবটা [illegible] অবাস্তব, ইউটোপিয়া বলে ঠেকবে না। গ্রাম-পঞ্চায়েত বল, ফ্যাক্টরী সোভিয়েট বল, সব ছোট পড়শীগোষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক সংস্থার মধ্যে দিয়ে একটা পিরামিড-এর মত মানব সমাজ উন্নয়নের এই ধরনের সংবিধান তৈরী ও চালু করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। আজকালের মধ্যেই তা হবার নয় জানি। কিন্তু সেই লক্ষ্য থেকে দৃষ্টি নাবানো চলবে না। ইতিমধ্যে নানা বাধা-বেড়াসঙ্কুল বর্তমান বিশ্বসংস্থা-গুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা করে তার মধ্য থেকে যতখানি ভাল আদায় করা সম্ভব তা করে যেতে হবে।

এই সময়ে জেঠিমা ঘরে ঢুকে তাঁর হাত-ঘড়ির দিকে নজর করে বললেন, আজ এই পর্যন্ত থাক। তোমার বিশ্রামের সময় হয়ে গেছে।

জ্যাঠামশায় বললেন, সে কি? আমার যে কথা অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

জেঠিমা : সে তো থাকবেই। নটেগাছটি কখনও একেবারে মুড়িয়ে আনতে নেই। তারপর খাবে কি?

'উপল ব্যথিত গতি'

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের সাথে যাঁরা অল্প-বিস্তর পরিচিত ছিলেন, তাঁরা তো বটেই, বাংলার পাঠকশ্রেণীও 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীমতী যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক লেখাটি নিঃসন্দেহে অতি আগ্রহের সাথে পাঠ করছেন। আত্মভোলা সেই মহৎ শিল্পীর কথা এমন নিখুঁতভাবে (সব দিক দিয়ে) এর আগে আর কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

লেখিকা দু-একবার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরই 'নগেন্দ্র ভিলায়' ১৯৪০-৪১ সালে সাত-আট মাস আমি ছিলাম এবং বিভূতিবাবু ও নুটু-বাবুকে খুবই কাছে পেয়েছিলাম। লেখিকার কলমে সে সময়কার ঘাটশীলার ছবি বার বার ফুটে ওঠায়, তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। তবে, মনে হয়, অনিচ্ছাবশতই তিনি কয়েকটি সূত্র ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা যেমনভাবে বিভূতিবাবুকে বাইরের জগতে একেবারে নিকট করে পেয়েছিলাম, তার চেয়ে ঢের বেশি তিনি তাঁকে সংসারের মধ্যে বড়ঠাকুররূপে পেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের এই দুই পাওয়ার মধ্যে কিছু তারতম্য থাকতে বাধ্য।

সে সময় কবি কমলরাণী মিত্রের স্বামী অমর মিত্র ছিলেন ঘাটশীলায় আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা এবং তিনি Indian Copper Corporation-এ চাকরীও করতেন। তাঁদের বাড়িতে বিধায়ক ভট্টাচার্য মশায় কয়েকবার এসেছেন। (সেখানেই কি তাঁর 'মাটির ঘর' লেখা শুরু হয়েছিল?) এই অমরবাবুর সঙ্গে বিভূতিবাবু প্রতিদিন একবার আমার ঘরে এসে বসতেন এবং সাহিত্য নিয়ে কথা বলতেন। পাটনা থেকে তখন 'প্রভাতী' বেরোচ্ছে। নবেন্দুর লেখা নিয়ে আলোচনা হোত। মণিদা (Behar Herald ও প্রভাতীর সম্পাদক শ্রীমণি সমাদ্দার) আমাকে লিখলেন, বিভূতিদার কাছ থেকে কিছু লেখা আদায় কর। চিঠিখানা তাঁকে দেখাতে তিনি বললেন, সমাদ্দারকে লিখে দাও, "আদর্শ হিন্দু হোটেল" নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। পরে লেখা দেব।

বিভূতিবাবুর সাথে অবশ্য আমার পরিচয় ঘটিয়েছিল তাঁরই এক ভাগ্নে। (নামটা শান্ত কি?) ছোট্ট ছেলে, রোজ সকালে আসত আমার কাছে ডাকটিকিট নিতে। দ্বিজেন-বাবুর Dijon and son নার্শারীতে প্রতিদিন দেশি-বিদেশী প্রচুর চিঠিপত্র আসত। তাকে আমি ডাক টিকিট দিতাম। ডাক্তারবাবুর (নুটুবাবু) সাথেও পরিচয় ছিল, কিন্তু তখনো তিনি আমাকে বলেন নি অপরাজেয় কথাশিল্পী বিভূতিবাবু তাঁর দাদা। হয়ত তখনো আমি তাঁদের কাছে নতুন

লোক ছিলাম। সেদিন 'পথের পাঁচালী' আবার পড়ছি। ছেলেটি এসে ডাক টিকিটের জন্যে খুব ব্যস্ত করতে লাগল। বললাম, পরে এস। এখন পড়ছি। সে বললে, ওটা তো আমার মামার লেখা বই। বিশ্বাস হল না। আঙুল তুলে "গৌরীকুঞ্জ" বাড়িটা দেখিয়ে বলল, মামা এসেছেন, চলুন দেখবেন।

আর থাকতে পারি? ছেলেটিকে এক গাদা ডাকটিকিট দিয়ে তার সাথে "গৌরী-কুঞ্জে" গেলাম। নুটুবাবু বারান্দায় ছিলেন। দাদাকে ডেকে দিলেন। যখন শুনলেন ভাগলপুরে আমার বাড়ি তখন তাঁর সেখানকার চাকরী জীবনের কথা পেড়ে বসলেন। ঐ হোল শুরু। "সুবর্ণ সঙ্ঘের" অধিবেশন। বিভূতিবাবু বললেন, সুবোধ, পেট্রোম্যাকস জ্বালানো থেকে সিঙাড়া পরিবেশন, সব তোমার ডিউটি। উনি কেন আমাকে সুবোধ বলে ডাকতেন আজও জানি না। বার বার সংশোধন করে দিলেও বলতেন, ঐ হোল। তুমি সুবোধই তো। যা বলি তাই শোন যখন তখন তুমি নিশ্চয়ই সুবোধ। আমাদের 'সুবর্ণ সঙ্ঘের' অধিবেশন প্রতি পূর্ণিমায় হোত। শ্রীনীরদ-রঞ্জন দাশগুপ্তের 'সুশান্ত সা'র (যার ছবি হয়েছে শুনেছি) প্রথম পাণ্ডুলিপি এখানেই পড়া হয়। রামানন্দবাবু, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, সুধীরবাবু, এঁরাও এসেছেন সঙ্ঘের অধিবেশনে।

ডাহিগড়ায় সেবার পুজোর ধূম। বিভূতিবাবু কাঁধে ঢাক নিয়ে ঢাকিদের সাথে সমানে বাজাচ্ছেন। বললেন, সুবোধ, তুমি পার? বললাম, হ্যাঁ। বাজালাম। বললেন, কোথায় শিখলে? বললাম, ভাগলপুরে বাড়ি, কিন্তু উত্তরবঙ্গের মাটিতে জন্মেছি। কেটেছে সে মাটিতে অনেক কাল। বিভূতিবাবুর হুকুমে নুটুবাবুর উচ্চাঙ্গের আসরে তবলা বাজাতে হোত। তাই ওপাড়ার ওভারসিয়ার-বাবু (গৌরীকুঞ্জের পাশেই তাঁর বাড়ি ছিল) যখনই আমায় দেখতেন, বলতেন, কি আজও ডাক্তারবাবুর বাড়িতে 'তেরি ঘুঁই-ঘুঁই' বসবে নাকি? সে গানের আসরে বহু শ্রোতা হোত। নুটুবাবু চমৎকার গাইতেন।

তখন 'হলওয়েল মনুমেন্ট' আন্দোলন চালাচ্ছেন সুভাষবাবু। তাঁর Forward কাগজ আসত। বিভূতিবাবু 'নগেন্দ্রভিলায়' আমাদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কোন লেখায় রাজনীতির গন্ধ ছিল না।

তারপর বিভূতিবাবুকে দেখেছি ৭ বছর অন্য রূপে। আরণ্যক বিভূতিভূষণ।

যে সিন্‌হা সাহেবের কথা যমুনা দেবী 'বচ্‌কা' পর্যন্ত এনেছেন, তাঁরই সাথে মিঃ যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা পরে বিহার রাজ্যের chief Conservator of Forest হয়ে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে রাঁচীতেই বাড়ি করেন আছেন। সিন্‌হা সাহেব হিন্দীর একজন বিশিষ্ট লেখক। বিভূতিবাবুর মৃত্যুর পর সিন্‌হা সাহেব একটি অপূর্ব গ্রন্থ লিখেছেন, "পথের পাঁচালী কা বিভূতিভূষণ"। হিন্দীভাষীদের মধ্যে এই গ্রন্থের মাধ্যমে বিভূতিবাবু তাঁদেরও প্রিয়জন হয়ে আছেন। এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হলে বাঙালী পাঠক জানতে পারবেন বিহার অরণ্যে বিভূতিবাবু কেমনভাবে সময় কাটিয়েছেন।

একবারের ঘটনা বলি। কায়েদাজপঞ্জ ১৯৪৮ সালে গোয়েলকেরা গেছি। দুরন্ত শীত। সন্ধ্যায় কাষ্ঠ ব্যবসায়ী রামগোপাল আগরওয়ালার সাথে স্টেশনে পায়চারি করছি। শেষ ট্রেন চলে গেলে স্টেশন-মাস্টারকে বললাম, চলুন এবার। প্রতি রাত্রের রুটিন তাই ছিল। মধ্যে দু সন্ধ্যা অনুপস্থিত ছিলাম।

মাস্টারমশাই হাতে একটা খামের চিঠি নিয়ে বিরক্তির সুরে বললেন, আরে থামুন মশাই। কয়েক দিন থেকে যা ঝামেলায় পড়েছি। ঐ যে বন বিভাগের বড় সাহেব যোগীন সিংগি, তার সাথে ... এক লোক না কবি এসে জুটেছে। ঘা... নিয়ে ছাড়লে মশাই। প্রতিদিন কপি মটরশুঁটি আরো কি কি প্যাকেট আসছে চাইবাসা থেকে। তাড়া-তাড়ি সব পৌঁছন চাই।

চমকে উঠলাম। বুঝলাম কে এসেছেন।

বললাম, কোথায় আছেন ওঁরা?

—ঐ টুংরির বাংলোয়।

পরদিন সকালে বন্ধুবরের লরী নিয়ে জঙ্গলে বেরোলাম। ঠিক বাংলোর সামনে নেমে যেই গেট খুলেছি, বিভূতিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।—আচ্ছা লোক তো তুমি হে? এই গভীর জঙ্গলে পালিয়ে এসে বসে আছি, সেখানেও ধাওয়া করেছ?

সিন্‌হা সাহেব আর বিভূতিবাবু শাল-বনের মধ্যে বসে একরাশ পাঁপড় ভাজা আর ডিমসেদ্ধ নিয়ে 'মহুয়া' পড়ছেন।

১৯৫০ সালে রাঁচীতে তখন আমি সরকারী প্রচার বিভাগে। সিন্‌হা সাহেব বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়লেন।

বিভূতিবাবু আর নেই।

বালকের মত কাঁদতে লাগলেন তিনি।

স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

ডাহিগড়ায় দুর্গাপুজোয় ঢাকের বাদ্য

কানে বেজে ওঠে। মনে পড়ে সেই ছোট্ট ছেলেটিকে, যে আমায় প্রথম দিন নগেন্দ্র-ভিলা থেকে গৌরীকুঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল। আজ ত্রিশ বছরেও সে স্মৃতি একটুকু ম্লান হয়নি।

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী
হাজারিবাগ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তেসরা অক্টোবরের 'দেশ'-এ (সংখ্যা ৪৯) সত্যান্বেষী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শংকরের লেখাটি পড়ে দুঃখের সঙ্গে এই চিঠি লিখছি।

ওই লেখায় (আমার দাদু) পরশুরাম সম্বন্ধে যে অল্প আলোচনা আছে (পৃঃ ৯৬৫-৬৬) সেই নিয়ে আমার বক্তব্য। মোটামুটি ঘটনাটি ঠিকই আছে, কিন্তু তা লেখক যেভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে কিছু ভুল ধারণা উপস্থিত হতে পারে।

প্রথমতঃ, অংশটি পড়ে হয়ত মনে হতে পারে পরশুরাম কোষ্ঠী গণনায় বেশ বিশ্বাসী ছিলেন ও তাঁর কোষ্ঠীর ঐ ব্যাপারটিকে বেশ সিরিয়সভাবে নিয়ে সত্যিই তার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং শরদিন্দু না জেনে হঠাৎ সেটাতে আঘাত দিয়ে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। আসল ব্যাপার হল কোষ্ঠী গণনা বা হাত দেখায় কোনোদিন তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তাঁর কোষ্ঠীতে সত্যিই উল্লিখিত কথা ছিল, তিনি ও তাঁর স্ত্রী সারাজীবন তাই নিয়ে পরিহাস করেছেন ও অনেককে বলে বেড়িয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ, বহুবার দেখেছি কোনো একটা বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র বিশ্বাস না থাকলেও সে বিষয়ে আগ্রহী কারও বিশ্বাসে তিনি কখনো আঘাত দেননি বা নিরাশ করেন নি। একবার এক ভদ্রলোককে দেখেছি তাঁর হাতে ঘন কালো কালি মাখিয়ে ছাপ নিতে—হস্তরেখা বিচারের জন্য। তিনি বিরক্ত হন নি। যত দূর মনে পড়ছে শরদিন্দুবাবুকেও একবার তিনি তাঁর অনুরোধে নিজের কোষ্ঠী পাঠিয়েছিলেন।

শেষ কথা, পরশুরাম কখনো 'দাঁত মুখ খিঁচিয়ে...অশালীনভাবে' কাউকে কিছু বলতে পারেন একথা তাঁর সঙ্গে যাঁরা একবারও কথা বলেছেন তাঁরাও হয়ত বিশ্বাস করবেন না। ঠাট্টা করেও—যা হয়ত শংকর বোঝাতে চেয়েছেন—তিনি তা কখনো করেন নি।

আমার দৃঢ় ধারণা শংকর পরশুরামকে গভীর শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু আমার মনে হয় পরশুরাম ও শরদিন্দু (যাঁরা পরস্পরের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন) এই দুই অতি উচ্চ-স্তরাভিষিক্ত রসিকের রসিকতা শরদিন্দুর মুখে শুনে তার ঠিক তাৎপর্য বোধহয় তিনি ধরতে পারেন নি, অথবা ধরলেও, তার প্রয়োগ একটু অসাবধান হয়ে গেছে।

সদ্য পরলোকগত এক মহান্ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ সম্বন্ধে এই আলোচনা করতে হল বলে আবার দুঃখ প্রকাশ করছি।

দীপংকর বসু
কলকাতা-২৫

সচ্চরিত্র সমাজ

১০ অক্টোবর দেশ-এ শ্রীতরুণ দত্ত লিখিত প্রবন্ধ 'সচ্চরিত্র সমাজ' গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। শ্রীদত্ত নিঃসন্দেহে ক্ষমতাবান লেখক। ইতিপূর্বে দেশ-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। এই লেখাটিতে সেই ধারণা সমর্থিত হল। অধুনা বেশির ভাগ প্রবন্ধ যেখানে পড়া যায় না, সেখানে তাঁর প্রবন্ধ একবার তো বটেই, দ্বিতীয়বার পড়লেও সময়ের অপব্যয় হয় না। উত্তম রচনার যা লক্ষণ, অর্থাৎ পূর্বে মেঘ এবং উত্তরে মেঘ, তাঁর প্রবন্ধে দুই-ই আছে। তিনি পাঠককে একটি ধারণা থেকে সরিয়ে আনেন এবং নিপুণ হাতে তাকে অন্য ধারণার শিয়রে পৌঁছিয়ে দেন। লেখক হিসেবে এ কৃতিত্ব কম নয়। তাঁর লেখাটি ভাল লেগেছে, তাই একটি কথা এখানে সবিনয়ে উল্লেখ করছি। লেখাটিতে কম বেশি প্রায় সত্তরটি ইংরিজি শব্দ রয়েছে। এবং এগুলির বেশির ভাগের ব্যবহার অনিবার্য ছিল না। বাসমতী চালের সৌরভ তাঁর লেখায়। তিনি তাকে কাঁকরমুক্ত করুন, এই অনুরোধ।

আর একটা কথা। 'সাম্রাজ্যবাদিত্ব' (পৃঃ ১১১৫) শব্দটি কি ভাল শোনায়? যতদূর জানি 'সাম্রাজ্যবাদ' তো কোন অপরাধ করেনি।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়
ঝাড়গ্রাম

শেষ নমস্কার

দেশ পত্রিকাতে প্রকাশিত শ্রীসন্তোষ-কুমার ঘোষের লেখা "শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে" পড়লাম। এত অপূর্ব উপন্যাস জীবনে খুব কমই পড়েছি। "শেষ নমস্কার" একটু অন্য ধরনের উপন্যাস। লেখকের ছন্দময় তুলি উপন্যাসকে কবিতার মত মনোরম করে তুলেছে। আমাদের জীবনের আনন্দ আর ব্যথা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। "শেষ নমস্কার" পড়ে বহু-দিনের পিপাসা মিটল। এর প্রত্যেকটা চরিত্র যেন জীবন্ত। রজনী, সুধীরমামা, বুলা, বাঁশী আমাদের কাছের মানুষ। ওঁদের দুঃখে আমরা যেন কোন্ এক অন্য জগতে গিয়ে পৌঁছাই। মায়ের প্রতি ভক্তি আর ভালবাসার এই পবিত্র অর্ঘ্য যেন সর্বকালের সর্ব মানুষের মন ছুঁয়ে যায়—এই কামনা করি।

সবশেষে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষকে "শেষ নমস্কার—শ্রীচরণেষু মাকে" লেখার জন্য আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শৈবাল গুপ্ত
কলিকাতা-১৯

আজ থেকে দু-তিন দশক আগে পর্যন্ত এশিয়া এবং আফ্রিকার যে দেশগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ইতিহাসের অমোঘ বিধানে যে দেশগুলিতে সুদীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের নানান ভালমন্দ প্রভাব এখন পর্যন্ত বিদ্যমান, সে দেশগুলির ইংরেজী লেখকদের বিভিন্ন ধরনের রচনার আলোচনা ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। এই দেশগুলির অধিকাংশই কমনওয়েলথের অন্তর্গত, তাই এইসব দেশের লেখকদের রচনাগুলিকে সামূহিক-ভাবে 'কমনওয়েলথ লিটারেচার' নামে সাধারণত অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইদানীং ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় এই তথা-কথিত 'কমনওয়েলথ সাহিত্য' সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা প্রায়ই চোখে পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থটি এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বইটির সম্বন্ধে আলোচনার আগে এর ইতিহাস সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার। ছ' বছর আগে ১৯৬৪ সালে ইংলণ্ডের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যমে কমন-ওয়েলথের লেখকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনাচক্রে কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির লেখক এবং সমালোচকেরা আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। ভারত থেকে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আর কে নারায়ণ এবং শিক্ষক সমালোচক নগরাজন প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকও এই আলোচনায় যোগদান করেন। তাঁদের বিভিন্ন ধরনের আলোচনা একত্র করে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট প্রকাশক সংস্থা হ্যানিম্যান এডুকেশনাল পাবলিশার্স। সম্পাদনায় আছেন জন প্রেস।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা পাঠ করলে বুঝতে পারা যায় যে, গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রতিটি রচনাই যেন একটু 'ডিফেন্সিভ'—এ ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকলেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী নয়, তাঁদের ইংরেজীতে লেখা কেন? নীতির দিক থেকে এবং আর্টের দিক থেকেও তাঁদের কি নিজের নিজের মাতৃভাষাতেই লেখা উচিত নয়? এই ধরনের কয়েকটি প্রশ্ন যে লেখকদের মানসে সবসময়েই সচেতনভাবে রয়েছে, তাঁদের রচনাগুলি পড়লে তা বোঝা যায়। বস্তুত, আমরা জানি যে, স্বনামধন্য লেখকেরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত যে মাতৃভাষাতেই মহৎ সাহিত্য রচনা সম্ভব। ই এম ফর্স্টার তাঁর একাধিক রচনায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, বিখ্যাত কবি ইয়েটসও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, লেখকদের উচিত নিজের মাতৃভাষায় নিজস্ব দেশবাসীর জন্যে লেখা। এসব উদাহরণ ছাড়াও আমাদের বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পথিকৃৎদের উদাহরণ আছে, যাঁরা ইংরেজীতে লেখা শুরু করেও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মাতৃভাষাই সাহিত্য সাধনার প্রশস্ত এবং প্রকৃত মাধ্যম। বস্তুত, এরকম কয়েকটি উদাহরণের জন্যেই বাঙালী পাঠকমানসে এই ধরনের একটা ধারণা দৃঢ়-মূল হয়ে পড়েছে যে বাঙালী তথা

Commonwealth Literature. Unity and Diversity in a common culture. Edited by John Press. Heinemann Educational Books, 1966. London. 30 sh. (C) University of Leeds, 1965.

ভারতীয়দের পক্ষে ইংরেজীতে সাহিত্যচর্চা করা একটা অসম্ভব রকমের ব্যাপার, তাই যাঁরা এ কাজে ব্যাপৃত আছেন, তাঁদের রচনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি আছে। এই গ্রন্থটি পড়লে অবশ্য বোঝা যায় যে, পূর্বোক্ত 'ডিফেন্সিভ' ভাবটা থাকা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে গ্রন্থের বিদগ্ধ আলো-চকেরা সবাই একমত যে, কমনওয়েলথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচয়িতারা শিল্পী হিসাবে সার্থক। তাঁদের ইংরেজী সাহিত্য সাধনা যদিও আজ পর্যন্ত খুব বিস্তৃতরূপে স্বীকৃত নয়, তবুও নিকট-ভবিষ্যতে শক্তি-মান সাহিত্যিকেরা নিশ্চয়ই সার্বজনীন স্বীকৃতি এবং খ্যাতি পাবেন। বলা বাহুল্য, এটি আশার কথা।

আলোচ্য বইটির প্রস্তাবনা লিখেছেন লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, স্যার রোজার স্টিভেন্স। প্রত্যাশিত রূপেই তাঁর সংক্ষিপ্ত রচনায় 'ফর্ম্যাল' সুরটি বিশেষ স্পষ্ট। কমনওয়েলথ সাহিত্য প্রসঙ্গে কমনওয়েলথের যৌক্তিকতা এবং সার্থকতাই তাঁর কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে। তাই তিনি লিখেছেন:

One of the most welcome indications of the vitality of the Commonwealth is to be found in the growth and diversity of literary traditions in the English language throughout the many communities which compose it.

বইটির ভূমিকা লিখেছেন লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যক্ষ এ নরম্যান জেফারস। এই ভূমিকাতে আমরা কমনওয়েলথ সাহিত্যের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যপূর্ণ এবং সুলিখিত আলোচনা পাই। কবি ইয়েটসের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন যে, একজন লেখকের পক্ষে তাঁর দেশের এবং জাতির পাঠকবর্গের জন্যে রচনা করাই সর্বদা সন্তোষজনক। কিন্তু বৃহত্তর পাঠক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছাও প্রতিভাবান লেখকদের মনে সর্বদা বিদ্যমান থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, কমনওয়েলথের অনেক লেখকের পক্ষেই নিজের মাতৃভাষায় বই লিখে এই ইচ্ছে পূরণ করার সুযোগ ঘটে ওঠে না। এখানেই কমনওয়েলথ সাহিত্যের যৌক্তিকতা এবং সার্থকতা রয়েছে।

অবশ্য এই সঙ্গে তিনি এ কথাও পরিষ্কার করে বলেছেন যে, কেবলমাত্র এই একটি কারণেই যে আমরা কমনওয়েলথ সাহিত্যে আগ্রহী তা নয়, বস্তুত, প্রকৃত সাহিত্য পাঠের যে আনন্দ, আমরা কমন-ওয়েলথের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের রচনায় তা পাই। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

But this is not why one reads Narayan or Khuswant Singh of India, Soyinka or Achebe of Nigeria, Patrick White or A. D. Hope of Australia, Janet Frame or Dan Davin of New Zealand, Jimsit Hussain or Zulfikar Ghose of Pakistan, or any other of the excellent writers now writing throughout the Commonwealth. True, one reads them

because they tell us about the way their countries are evolving; true one reads them because they enrich our pleasure in the English language, but in the cold light of judgement one reads them for the [illegible] national qualities in their work. One reads them because they bring new ideas, new interpretations of life to us. One reads them in short, because they are good writers. The standards of judgement are not national standards. Standards of the critic must be cosmopolitan, only the best should be praised.

প্রসঙ্গক্রমে তার আলোচনায় লেখক এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, কমনওয়েলথের অন্তভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বেশ কয়েকজন লেখকই তাঁদের রচনায় দেশকালের সীমা অতিক্রম করে এক সার্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বলা বাহুল্য তাঁর এই বক্তব্যে মতান্তরের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

নাইজেরিয়ার লেখক জে ও একপেনিয়ং (J. O. Ekpenyoung) তাঁর রচনায় তাঁদের দেশে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

"The introduction of English as the official language is one of the greatest benefits of colonialism in Nigeria. How could communication of whatever nature among a people speaking about 250 languages and dialets have been possible without the tedious, expensive, time-consuming and sometimes unreliable process of interpretation?"

তার রচনার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং সরলতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর সঙ্গে সঙ্গেই এ আলোচনা আমাদের দেশের ভাষা সমস্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। বহুভাষাভাষী দেশ ভারতবর্ষে ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা কত ব্যাপক, এই আলোচনাটি পড়লে একবার নতুন করে সে কথা উপলব্ধি করা যায়।

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যক্ষ এস নগরাজন তাঁর রচনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে কয়েকজন ভারতীয় লেখক ইংরেজীতে লিখতে বাধ্য হয়েছেন শুধু এই কারণেই যে তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের মাতৃভাষা সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। এই প্রচণ্ড গতিশীল আধুনিক যুগে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন সময়সাপেক্ষ। তাই তাঁদের পক্ষে ইংরেজীতে লেখা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তাঁর মতে ভারতীয় লেখকেরা (যাঁরা ইংরেজীতে লেখেন) তাঁরা কেউই সাধারণত ইংরেজ লেখকদের অক্ষম অনুকরণ করেন না। বস্তুত, তাঁরা সকলেই এক ভারতীয় ইংরেজী রচনার জন্যে সচেষ্ট আছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজা রাওয়ের উপন্যাসগুলির বিশদ আলোচনা করেছেন। এই রচনাগুলি ভারতীয় ঔপন্যাসিক ছাড়া অন্য কারোর দ্বারাই রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর মতে ভারতীয় ইংরেজীর এক বিশেষ যৌক্তিকতা আছে :

To the native virtue of the English language it adds an element of extra beauty and colour, strangeness and wonder, and truth. Its test of success is that it recreates Indian life in all its shame and glory, its beauty and rottenness.

অনেকেই এ সন্দেহ পোষণ করেন যে, বিদেশী ভাষায় লেখক তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতা হয়তো প্রকাশ করতে পারেন না। আর কে নারায়ণ তাঁর রচনায় এই সন্দেহের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যরচনার তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারেন যে, এরকম রচনা সম্ভব। বস্তুত, সাহিত্যিক হিসাবে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, ইংরেজীতে লেখার জন্যে সে কথা তাঁর বলতে আদৌ কোন অসুবিধা হয়নি।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে আরো অনেক সুখপাঠ্য এবং তথ্যপূর্ণ রচনা আছে। আগ্রহী পাঠক বইটি পড়ে নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবেন। কমনওয়েলথ সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার কয়েকটি কথা বলার আছে। সন্দেহ নেই যে, ইদানীংকালে ইংলণ্ডে এই সাহিত্য নিয়ে প্রভূত আলোচনা হচ্ছে। Prof Macleod ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এখনকার ব্যাপার-স্যাপার দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কমনওয়েলথ সাহিত্য ইংলণ্ডের পাঠকমহলে অন্তত আগামী পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রধান আকর্ষণ হয়ে থাকবে। এটি অত্যুক্তি কিনা আমি জানি না। কিন্তু এই সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার ফলে ভারতীয় ভাষায় যে লেখকরা লিখে থাকেন, তাঁদের প্রতিভা ও শক্তিমত্তা সম্বন্ধে বিদেশী পাঠকদের মনে হয়তো ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাঁরা, ইংরেজীতে যে লেখকেরা লেখেন, কেবলমাত্র তাঁদেরকেই ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক বলে ধরে নিতে পারেন। বস্তুত, এই ধরনের একটি অবস্থা এখনই সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার সন্দেহ হয়। এটি দূর করার উপায় হচ্ছে ভারতের আঞ্চলিক ভাষার রচনাগুলিকে ইংরেজীতে সক্ষম অনুবাদ এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা। কমনওয়েলথ সাহিত্যের রচয়িতারা এ বিষয়ে অগ্রণী হতে পারেন।

পক্ষান্তরে, কমনওয়েলথ সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের কোন ভুল ধারণা রাখা উচিত নয়। এই সাহিত্যলেখকেরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁরা এখনো পরীক্ষানিরীক্ষার পর্যায়েই আছেন। তাঁদের রচনার প্রতি এক সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী রাখা প্রয়োজন। শুধু ভারতের কথাই যদি ধরি, তাহলে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনমানসকে জানবার জন্যে, তাঁদের সাহিত্য ও জীবনের পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা জানবার জন্যে ইং[illegible]ী ভাষার শরণ আমাদের নিতেই হবে। [illegible]রেকটু বৃহত্তরভাবে ভাবতে গেলে, [illegible]ওয়েলথের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক [illegible]যোগসূত্রগুলি যদি আমরা জানতে আগ্রহী হই, তাহলেও ইংরেজী রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আর এসব ছাড়াও আরেকটি কথা আছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে এতদিন আমরা ইংরেজী লেখকদের রচনাই পড়েছি এবং এই ব্যাপারটি অনেকটা 'ওয়ানওয়ে ট্রাফিকের' পর্যায়েই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। (অবশ্যই আমি সাধারণ ইংরেজ পাঠকের কথাই বলছি এবং সেই সব প্রাতঃস্মরণীয় ইংরেজ মনীষীদের, যাঁদের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁদের কথা বলছি না) আজ 'কমনওয়েলথ সাহিত্যের' নবজাগরণের কল্যাণে যদি সেদিনকার পরাধীন রাষ্ট্রগুলির রচনার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং এ সম্বন্ধে তাঁরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তা নিশ্চয়ই আনন্দের কথা হবে, কারণ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লিখে প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরা বৃহত্তর পাঠকবর্গের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ভাষাগত অসুবিধার জন্যে সহজে আকৃষ্ট করতে পারবেন না। আর এজন্যে যদি কমনওয়েলথের কিছু সংখ্যক লেখককে ইংরেজীর শরণ নিতে হয়, তাতে আপত্তির কোন কারণ নিশ্চয়ই থাকতে পারে না।

দিলীপ চক্রবর্তী

জীবনী

দেশবন্ধু। শ্রীমণি বাগচি প্রণীত। মোহন লাইব্রেরী, ৩৫/এ সূর্যসেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম পনের টাকা।

এই শতকের প্রথম পঁচিশ বছর কালের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে যদি কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হয়, তবে তিনি নিঃসন্দেহরূপে চিত্তরঞ্জন দাশ। যদিও তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে পাঁচ-ছয় বৎসরের অধিককাল ছিলেন না, তথাপি এই স্বল্প-কালের মধ্যেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তার চেয়ে বেশি কথা তিনি নিজেকে ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। সেই শতযুদ্ধের বিজয়ী বীরের স্মৃতি আজো ভারতবাসীর চিত্তে স্বমহিমায় বিরাজিত। যেদিন নাগপুর কংগ্রেসের পর চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেদিন থেকেই তিনি 'দেশবন্ধু' এই আখ্যায় সর্বভারতে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বহু ভঙ্গিম জীবনের কথা, তাঁর অসামান্য রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা আলোচনা করলে আমাদের মনে হবে যে, তাঁর ক্ষেত্রে এই 'দেশবন্ধু' উপাধিটি যেন সার্থকভাবেই প্রযুক্ত হয়েছিল।

শ্রীমণি বাগচি 'দেশবন্ধু' এই নাম দিয়ে এই সর্বজনবরেণ্য দেশ-নায়কের যে বিপুলায়তন জীবনচরিত রচনা করেছেন, সেটি আদ্যন্ত পাঠ করলে তাঁর জীবন ও চরিত্রের একটা সামগ্রিক পরিচয় আমরা পাই। লেখক তাঁর এই গ্রন্থটিকে রাজনৈতিক জীবনচরিত বলে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ তিনি দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত, যথা—(১) জাগরণ—১৮৭০—১৯১৬; (২) বিস্ফোরণ—১৯১৭—১৯২২ এবং (৩) উদ্ভাসন—১৯২৩—১৯২৫। প্রথম খণ্ডে আছে চিত্তরঞ্জনের কৈশোর ও যৌবনের কথা; তাঁর কবিকর্ম, সাহিত্য-সাধনা ও আইনজীবী হিসাবে তাঁর অসামান্য সাফল্য-

লাভের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের সঙ্গে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে জননেতারূপে চিত্ত-রঞ্জনের অভ্যুদয়। এই খণ্ডের আরম্ভে লেখক প্রসঙ্গত ১৯১৭ সালে ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতিরূপে প্রদত্ত চিত্তরঞ্জনের 'বাংলার কথা' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণটির কথাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় খণ্ডে অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে, গয়া কংগ্রেস, স্বরাজ্য দল গঠন, আইনসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে দেশবন্ধুর কর্মকৌশলের ফলে দ্বৈত শাসনের সমাধি রচনা ও ফরিদ-পুর কনফারেন্সের সভাপতি হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার সব-দিগন্ত—এইসব ঘটনাবলী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে।

মোটকথা, ইতিপূর্বে দেশবন্ধু সম্পর্কে কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থ লেখা হলেও, আমার বিবেচনায়, আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্যাখ্যানে ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এবং আন্তরিকতায় অভিষিঞ্চিত। দেশবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিরচিত এই গ্রন্থখানি একটি বিস্মৃত যুগের ও যুগ-নায়কের কথা আমাদের কাছে এনে দিয়েছে।

ব্যঙ্গাত্মক রচনা

ব্যাপার বহুতর। ওঙ্কার গুপ্ত। বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা

নতুন করে না বললেও চলে যে, ব্যঙ্গরচনা স্পষ্টত দু-ধরনের। এক ধরনের লেখায় নিছক রঙ্গ, অন্যটিতে কৌতুকের আবরণে সমাজজীবনের অসঙ্গতির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ। ওঙ্কার গুপ্ত শেষোক্ত ধারার লেখক। ইতিপূর্বে তিনি 'এই তো ব্যাপার' নামে একখানি মাত্র গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু সেই প্রথম গ্রন্থেই তিনি অনিবার্যভাবে সাহিত্যের আসরে নিজের একটি নিশ্চিত আসন অর্জন করে নিতে পেরেছেন। পাঠক এবং সমালোচক অকুণ্ঠ সংবর্ধনা জানিয়েছেন তাঁকে—ত্রৈলোক্যনাথ-পরশুরামের সুযোগ্য উত্তরসাধক হিসেবে।

'ব্যাপার বহুতর' তাঁর সাম্প্রতিক ন'টি ব্যঙ্গরচনার সংকলন। এতে তিনি পুরীর পুণ্যলোভী তীর্থযাত্রী থেকে শুরু করে অফিসের বড়-মেজ-ছোটবাবু, ঝানু ব্যবসাদার, অকৃতজ্ঞ করুণাপ্রার্থী বিচিত্র প্রতিবেশী আত্মসম্মানজ্ঞানলুপ্ত বঙ্গনন্দন—ইত্যাদি নানান চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ভুল বলা হল—এবং এক-দিক থেকে সকলেই আমাদের অতিমাত্রায় পরিচিত কিন্তু ঝানু ফোটোগ্রাফারের মতো এঁদের প্রত্যেকের আসল চরিত্রটা ওঙ্কার গুপ্ত আমাদের সামনে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। সেই ছবিটা অবশ্যই খুব সুখের নয়, অন্তহীন স্বার্থ আর নোংরামি, নীচতা আর নির্লজ্জতা বিভ্রান্তি ও বেলেল্লাপনা অসাধুতা ও প্রবঞ্চনার ছবি। কিন্তু সেইটাই জীবন্ত সত্য। ওঙ্কার গুপ্তের রচনা ধারালো, কটাক্ষ সুনিপুণ, বর্ণনা রসাত্মক। ফলে তাঁর এই গ্রন্থ 'এইতো ব্যাপার'-এর মতোই সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই। একটি শুধু কথা—সমকালীন দু একজন বিশেষ

লেখকের প্রতি তাঁর কটাক্ষ অনভিপ্রেত তো (যা হইয়াছেন' ও 'এই বাঞ্ছিত ভূমি' রচনায়)? না হলে ব্যাপারটা অশোভন ও কুরুচিপূর্ণ।

৬৪।৭০

পত্রিকা

কচি। সম্পাদিত : সোমা ভট্টাচার্য/সুস্মিতা গুপ্তা। এ৫ ও ৬ গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেট, ডাঃ সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৪।

নয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত এই পত্রিকার আরো বৈশিষ্ট্য, সম্পাদনায় যে দু'জন তাদেরও বয়স যথাক্রমে তেরো ও এগারো বছর। সুতরাং এটিকে যথার্থই ছোটদের দ্বারা সম্পাদিত ছোটদের পত্রিকা বলে অভিহিত করা যায়। ছোটদের ছোট ছোট লেখাগুলি ছোট্ট পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগবে এবং হয়তো তাদের লেখাতেও উৎসাহিত করবে।

ভ্রম সংশোধন

গত ৫২ সংখ্যা দেশ-এ শ্রীসুধেন্দু মল্লিকের কবিতা 'কি দেবে' আমাদের অনবধানবশত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

প্রাপ্তি স্বীকার

Delhi—Capital City—Asoke Mitra. Thompson Press (India) Limited: Connaught Place, New Delhi. Price Rs. 18.00.

The Liberator—Sri Aurobindo and the World. Sisir Kumar Mitra. Jaico Publishing House: 125 Mahatma Gandhi Road, Bombay-1. Rs. 6.00.

Makings in London—Deben Lahiri. Pathikrit Prakasani [illegible] Nayaratna Lane, Calcutta-[illegible] Rs. 5.00.

অমৃতের পথে। [illegible]সাধন ব্রহ্মচারী মুরলীধর। শ্রীশ্রী ভারত প্রকাশনী মহাসত্য সাধনাশ্রম বাকুড়া। মূল্য ১০·০০

আর্য ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ। নীল রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকুন্দরাণী দেবী অবসরক এন আর ব্যানার্জী, কোচিং ২য় ট্রাফিক অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, এস রেলওয়ে, জি আর সি, কলিকাতা-৪৩ মূল্য ১·৩০।

সিন্ধুতল। শ্রীবিমলচন্দ্র বেদজ্ঞ শ্রীমতী লীলা দেবী : ১১।৩১ মল রোড কলিকাতা-২৮। মূল্য ৪·০০।

তিনভুবন। অপূর্বকুমার সাহা/অমর শঙ্কর দত্ত/প্রদ্যোৎকুমার রায়। জাগরী প্রকাশনী : ৭৪/৫এ বাগবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-৩। মূল্য ২·০০।

জোয়ান শতাব্দী। সম্পাদনা : দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মনীষী গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : ৪/৩বি বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকারা-১২। মূল্য ২·০০।

বিদ্যাসাগর। সন্তোষকুমার অধিকারী রূপা অ্যান্ড কোম্পানী : ১৫ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

কিছু করি কণ্ঠ। সম্পাদনা : সুনীল দাশ ও সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রয়াসী : হাওড়া-২।

মৃণাল সেনের "ইন্টারভিউ" ছবিতে বুলবুল মুখার্জী ও রঞ্জিত মল্লিক।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

(মিত্র প্রোডাকশনস)

দেশবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" মুক্তি পেল। এই যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য। জীবনীচিত্র হিসাবে "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" কেমন হয়েছে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু ছবিটি দেখে দেশবাসী যে মহান নায়ককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন তার মূল্য অনেক।

এই জীবনীচিত্রের প্রথম ভাগ দেশবন্ধুর পারিবারিক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথম জীবনে, ব্যারিস্টার হয়ে হাইকোর্টে যোগ দেবার পর, দেশবন্ধু কীভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন তা দেখানো হয়েছে বিশদভাবে। এই অধ্যায়ে নাটারস সৃষ্টির একটা ঝোঁক দেখা গেছে চিত্রনাট্যে, পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এই পারিবারিক নাটক ছেড়ে যখন দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মজীবনে এলেন তখন ছবির অনেকখানি অংশ পার হয়ে গেছে। সুতরাং দেশবন্ধুর নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে আমরা এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা রাজনীতির এক বিশিষ্ট অধ্যায়ের যে প্রামাণ্য চিত্র এ ছবিতে আশা করেছিলাম তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। পরিচালক অবশ্য ছোট ছোট দৃশ্যে যুগ-পরিচয় দিতে চেয়েছেন—পিস্তল হাতে বিপ্লবীদের সংগ্রাম বা জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচার কিংবা দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে শোভাযাত্রা প্রভৃতি কয়েকটি দৃশ্যের ভিতর দিয়ে। টেকনিক্যাল কাজের দিক থেকে দৃশ্যগুলি খুব কাঁচা, ছবিতে এগুলি দেখানো হয়েছে অসংলগ্নভাবে। এসবের মধ্য দিয়ে একটি যুগের নির্ভীক প্রতিজ্ঞার স্পর্শ যেমন পেলাম না তেমনি একটি যুগ-সন্ধিক্ষণে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক নেতৃত্বের

তাৎপর্য, জাতীয় জীবনে তার প্রভাব, স্বরাজ্য পার্টির বিশেষ ভূমিকা ইত্যাদি কোন কিছুরই পরিচয় তেমন করে পরিস্ফুট হল না। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন, কবি চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন, দানবীর চিত্তরঞ্জন, নায়ক চিত্তরঞ্জন—দেশবন্ধুর জীবন ও চরিত্রের সব দিক সম্বন্ধেই পরিচালক সজাগ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে কী-ভাবে বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা এবং ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হল তার তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ ছবিতে নেই। দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে যে দিয়ে গেলেন সেটা ছবিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু গুরু-শিষ্য মিলনের দৃশ্যগুলিতে কেমন যেন ফাঁক রয়ে গেল। ভবিষ্যতের বিরাট নেতৃত্বের দীক্ষা যে সুভাষচন্দ্র নিলেন দেশবন্ধুর কাছ থেকে তা তেমনভাবে পরিস্ফুট হল কৈ। তার মধ্যে আবার একটি উদ্ভট ব্যাপার দেখানো হয়েছে—জেলখানায় সুভাষচন্দ্রের হঠাৎ 'দেশবন্ধু' বলে চিৎকার। দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধুর জীবনের তখন শেষ মুহূর্ত। এই "টেলিপ্যাথি"—ফিল্মের নাটকের সস্তা উপকরণ—এই জীবনীচিত্রে বেমানান। হাস্যকর ব্যাপার অনেক কিছুই আছে, সেগুলি উল্লেখ করে লাভ নেই।

তবে ভালর মধ্যে ছবির প্রথম অংশে শ্রীঅরবিন্দের কারাবরণ ও মুক্তি, দেশবন্ধুর ঐতিহাসিক সওয়াল ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। জেলে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-প্রেরণা লাভের মুহূর্তটি (এক্ষেত্রে নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ও অভিব্যক্তি চমৎকার) সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। দেশবন্ধুর ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় আদালতে অসামান্য অভিনয় করেছেন। এই মামলা লড়বার সময় দেশবন্ধুর প্রেরণা ও দেশপ্রেম তিনি অনেকখানি ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণত, বিখ্যাত ব্যক্তির চরিত্রে জনপ্রিয় ও অতি পরিচিত অভিনেতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের গুণে এই অস্বাভাবিকতা অনেকখানি কেটে গেছে। বাসন্তী দেবীর ভূমিকায় লিলি চক্রবর্তীকে মেনে নিতে রীতিমত অসুবিধা হয়েছে। পরিচালক এ ক্ষেত্রে কোন নতুন শিল্পীর খোঁজ করতে পারতেন, তাতে অন্তত আমরা বিশিষ্ট শিল্পীর অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে বাসন্তী দেবীর কথা বেশি করে ভাবতে পারতাম। অবশ্য লিলি চক্রবর্তীর অভিনয় মন্দ নয়।

দেশবন্ধুর জীবনে ও কাজে বাসন্তী

দেবীর প্রেরণা ও নেপথ্য ভূমিকা ছবিতে ভালভাবেই দেখানো হয়েছে। আগেই বলেছি, ছবিতে দেশবন্ধুর পরিবারের কথাই বেশি। যে-কারণে দেশবন্ধুর পিতা-মাতা ভুবনমোহন ও নিস্তারিণী দেবী (অভিনয়ে যথাক্রমে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্রিতা মণ্ডল) এবং ভগ্নী অমলা দেবীর (শমিতা বিশ্বাস) উপস্থিতি বিশেষভাবে রয়েছে। শিল্পীদের অভিনয় উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে শমিতা বিশ্বাসের। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চরিত্রে সুব্রত সেনের অভিনয় চমৎকার, তেজোদীপ্ত।

ছবিতে সংগীতের একটি বিশেষ স্থান থাকতে পারত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের গানও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু গানের ভিতর দিয়ে দেশাত্মবোধের বিদ্যুৎ-স্পর্শ এ ছবিতে যে অলভ্য তার কারণ চিত্র-পরিচালক গানগুলিকে সেভাবে কাজে লাগাননি। কোন কোন গানের একটি বা একাধিক কলি শোনা গেছে মাত্র। তবে আদালতে সমরেশ রায়ের কণ্ঠে "সার্থক জনম আমার" (গানের ব্যবহার কতখানি যুক্তিসিদ্ধ বা প্রামাণ্য জানি না), সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "আমি ভয় করব না" এবং বিশেষ করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গীত দেশবন্ধুর লেখা গান "নামিয়ে দাও জ্ঞানের বোঝা" শুনতে খুব ভাল লেগেছে।

এক মিনিটের ছবি

গত ৪ নভেম্বর লাইট হাউস প্রেক্ষাগৃহে "দ্য স্টোরি অব অ্যান আর্টিস্ট" নামে একটি ছবি দেখানো হয়—যার প্রদর্শনকাল মাত্র এক মিনিট। এই মাসে শিকাগোয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে সেখানে ছবিটি পাঠানো হবে। ছবিটির নির্মাতা : অজয় বসু, ক্যামেরাম্যান : শান্তি ব্যানার্জী, শিল্পী : নিতাই ঘোষ।

নিতাই ভট্টাচার্য পরলোকে

বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্য গত ২৫ অকটোবর ৭০ বছর বয়সে তাঁর নবদ্বীপের বাড়িতে পরলোক গমন করেছেন। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তাঁর রচিত কাহিনী অবলম্বনে অনেকগুলি ছবি খুবই জনপ্রিয় হয়। তাঁর রচিত সংলাপেরও জাদুকরী ক্ষমতা ছিল। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্য রচয়িতারূপে তিনি যেসব ছবির সঙ্গে জড়িত ছিলেন তার মধ্যে 'সংগ্রাম', 'স্বপ্ন ও সাধনা', 'সমাপিকা', 'সঞ্চারী', 'আবর্ত', 'শংকরনারায়ণ ব্যাংক', 'দেবী মালিনী', 'যদু-ভট্ট', 'শিল্পী', 'সাগরিকা', 'সবার উপরে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পরলোকে কালীপদ দত্তগুপ্ত

গত ৪ নভেম্বর রাত্রে নীলরতন সরকার হাসপাতালে চিত্র-প্রযোজক কালীপদ দত্ত

গদ্গন্ত পরলোকগমন করেছেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪১। কয়েক বছর আগে তিনি "বিন্যাস" ছবির প্রযোজনা করেন। তাঁর দ্বিতীয় ছবি "স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে" মুক্তির অপেক্ষায়। তাঁর বাবা, মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান বর্তমান।

সফল মহিলা চিত্র-প্রযোজক

এ দেশে সিনেমা-প্রযোজককে প্রধানত চিত্র-নির্মাণের আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে হয়। এ ছাড়া ছবির নির্মাণপর্বে বিবিধ আনুষঙ্গিক কাজের তত্ত্বাবধানও তাঁর দায়িত্বের অঙ্গীভূত। তবে ছবির গুণগত উৎকর্ষে সাধারণত প্রযোজকের নিজস্ব ভূমিকা এখানে সামান্য। ছবিতে তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন বিশেষ থাকে না। পরিচালকের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতাই এখানে বড় কথা।

আমেরিকা এবং ইউরোপের ছবির প্রযোজক কেবলমাত্র চিত্র ব্যবসায়ী নন, তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রকৃত অর্থেই তিনি চিত্রনির্মাতা। হলিউডের বিখ্যাত চিত্র প্রযোজক ডেভিড-ও-সেলজনিক এক সময়ে বলেছিলেন: "চলচ্চিত্রে প্রযোজকের ভূমিকা ঐকতান-সংগীতে কনডাকটারের যেমন, অনেকটা সেই রকম। আমি অন্তত ব্যাপারটা ওইভাবে দেখি।"

বিদেশের সফল চিত্র প্রযোজকের তালিকা রীতিমত দীর্ঘ। কিন্তু মহিলা চিত্র প্রযোজকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বেশী নয় বলেই বিদেশের, ধরা যাক ইউরোপের, সব-চেয়ে সফল মহিলা চিত্র প্রযোজক কে, এই প্রশ্নের উত্তরে বিতর্কের সম্ভাবনা কম। তিনি হলেন ফ্রান্সের শ্রীমতী এম বোদার। গত দশ বছরে তিনি দশটি কাহিনী-চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং এই ছবিগুলির অধিকাংশই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত। শ্রীমতী বোদার প্রযোজিত কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র: "লে পারাপ্লুই দ্য শেরবুরগ" (পরিচালনা: জ্যাক দেমি), "ল্য বনের" (আনে ভারদা), "ও আজার বালথাজার" এবং "মুশেতে" (রোবের ব্রেস), "দো উ ব্রোয়া শোজ কে জে সে দেল" এবং "ল্য শিনোয়া" (জাঁ-লুক গদার)। ব্রেস'র, গদারের অথবা অন্যান্য নুভেল ভাগ পরিচালকের ছবির ক্ষেত্রে শ্রীমতী বোদার তাঁর মৌলিক চিন্তা আরোপ করেছেন, এ-রকম কল্পনা অবশ্যই অসংগত। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই, উক্ত মহিলার প্রায় প্রত্যেকটি চিত্র-উপহারই বিশিষ্ট। সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সৃষ্টিকর্মে হস্তক্ষেপ না করেও তিনি নানাভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন, এই অনুমান অনায়াসেই করা চলে।

"খুঁজে বেড়াই" (পরিচালনা: সলিল দত্ত) ছবিতে অপর্ণা সেন

শ্রীমতী বোদার নিজে চিত্রকর, সুলেখিকা। ১৯৪৯ সনে তিনি ইন্দোচীনে ওয়ার-করেসপনডেন্ট ছিলেন, পরে ওই সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে একখানি বই লেখেন। চলচ্চিত্রের আসরে যোগ দেওয়ার আগে তিনি ফরাসী টেলিভিশনে কয়েকটি প্রদর্শনী প্রযোজনা করেন। এক কথায় বলা যায়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালকদের ছবির প্রযোজক হওয়ার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন। ওই চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নিতান্ত আকস্মিক নয়।

রুচিশীলা, বিদগ্ধ শ্রীমতী বোদার চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী। গদারের ছবি দুটি আর রোবের ব্রেস'র দুটি চিত্র বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এবং মননশীলতায় অনন্য। জাক দেমির সংগীত-চিত্র "লে পারাপ্লুই......" এবং জ্যাক দেমির স্ত্রী শ্রীমতী ভারদার "ল্য বনের" একেবারেই ভিন্ন রসের শিল্পকর্ম। অথবা ধরা যাক "বেনজামিন" ছবির কথা, যেটি পরিচালনা করেছেন দে ভিল। সম্প্রতি ছবিটি কলকাতায় দেখানো হয়েছে। যৌন বিষয় নিয়ে এমন মজার ছবি পরি-কল্পনা একমাত্র ফ্রান্সেই সম্ভব। এই চিত্র নির্মাণের চিন্তা শ্রীমতী বোদারের মনেই আসে। অবশ্য একটি মৌলিক চিত্রনাট্য পড়বার পর। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এল সাহস। তারপর তরুণ পরিচালক দেভিলকে কাজের ভার দেওয়া হল। ফল কী হয়েছে তার আলোচনা এখানে বাহুল্য। ছবিটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তা ভাল করেই জানেন। কিন্তু ছবিটি দেখতে দেখতে যাঁরা সমাজের

সরকার প্রোডাকসন্সের "অপর্ণা" (পরিচালনা : সলিল সেন) ছবিতে বীথি গাঙ্গুলি, তনুজা ও জয়া ঘোষ।

ফটো—দেশ

পেয়েছেন আবার সেই সঙ্গে হয়ত কিছু অস্বস্তিও বোধ করেছেন, তাঁরা কি খেয়াল করেছেন, এই সরস সেকস-কমেডির প্রযোজক এক মহিলা?

ধন্যি মেয়ে

শ্রী প্রোডাকসন্সের "ধন্যি মেয়ে" ছবির শুটিং চলছে। পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, হরিধন, নৃপতি, সুখেন এবং জয়া ভাদুড়ি ও উত্তমকুমার। সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ।

চণ্ডালিকা

গত ২৬ অক্টোবর পার্ক সার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পুজো কমিটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। কৃষ্ণা রায় (প্রকৃতি), চিত্রা চ্যাটার্জি (মা) ও বিজন বড়াল (দইওয়ালা) নৃত্যাংশে সকলের প্রশংসা পান। সখী ও গ্রামবাসীদের ভূমিকায় ছিলেন মিতা পাল, বনানী চৌধুরী, শান্তি চৌধুরী, রিংকু ভাদুড়ী, অরুণা দে, শিপ্রা সেন, শিপ্রা দাশগুপ্তা প্রভৃতি। নির্মলেন্দু বিশ্বাসের পরিচালনায় সংগীতাংশে ছিলেন স্বপ্না সেনগুপ্তা, মীরা চৌধুরী, কাজল বসু প্রভৃতি।

রূপসী

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত "রূপসী" ছবিটি অবিলম্বে মুক্তি পাবে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অজিত গাঙ্গুলির। অনিল বাগচী সংগীত পরিচালক। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পী : সন্ধ্যা রায়, সমিত ভঞ্জ, কালী ব্যানার্জী, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, তপেন চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, অনুভা ঘোষ, জহুই ব্যানার্জী, সুতপা, জহর রায় প্রভৃতি।

তিমির লগন

মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় পরবর্তী ছবি "তিমির লগন"। মহাশ্বেতা দেবীর ওই নামের উপন্যাস অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। সুরকার গোপেন মল্লিক। উত্তমকুমার ও তনুজা নায়ক-নায়িকা।

সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন

সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন পুজোর মুখে মুখে অনুষ্ঠিত হল মহাজাতি সদনে। মহাসমারোহে বলব না। এই কারণে নয় যে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আয়োজনে কোনো ত্রুটি ছিল, বরং তাঁরা শিল্পীদের তালিকা সম্পূর্ণাঙ্গ করতে গিয়ে যথেষ্ট দীর্ঘই করে ফেলেছিলেন। তাছাড়া সদারঙ্গের বৈচিত্র্য এবং উঁচু মান, দুইই বজায় ছিল। কিন্তু, পরিতাপের বিষয়, আয়োজন যে শ্রোতাদের জন্য তাঁরাই যথেষ্ট সংখ্যায় আসেননি। অবশ্যই শহরের বাতাস তখন খুবই চঞ্চল ছিল, একটু দূরে কলেজ স্ট্রীটে বারুদের গন্ধ। কিন্তু কলকাতায় এটাই তো ইদানীং যাকে বলে স্বাভাবিক পরিস্থিতি। গানের আসরে হাজিরা দিতে হলে সেই-মন নিয়ে যেতে হবে, যেমন নিয়ে ঠগী-পিনডারীদের আমলে গৃহস্থ তীর্থ পর্যটনে বের হতেন।

সম্মেলনের অনেক নামী শিল্পীদের ভিড়ের মাঝে দুটি কাঁচামুখ শ্রোতাদের সত্যিই চমক দিয়েছে। শিশুশিল্পী এই প্রশ্রয়ে নয়, শিল্পী বলেই জয়দীপ ঘোষ এবং রীণা চক্রবর্তী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাফ মাথা, সুর ও লয়ের জ্ঞানে উভয়েই ক্ষুদে-ওস্তাদ। জয়দীপ বাজাল সরোদ, রাগ ভীমপলশ্রী। রীণা সেতারী, বাজিয়েছে ইমন। যদি নিষ্ঠা অবিচল থাকে, সাধনায় ছেদ না পড়ে (মধ্যবিত্ত পরিবারে যা স্বাভাবিক), তবে বহুদিন ধরে এদের নাম সবার মনে থাকবে। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ, এদের উপস্থাপনার জন্য। এবং অমন সম্মানের সঙ্গে। নতুবা তবলা সহযোগিতায় রীণা কি আশা করতে পারত মহাপুরুষ মিশ্রকে?

ধ্রুপদ গানের প্রতি অবহেলার অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। সদারঙ্গ কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে তা উঠবে না। কারণ তিনটি ধ্রুপদ গানের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় একটিও তেমন উৎরোয়নি। দবীর খাঁ গেয়েছিলেন হেমকল্যাণ এবং শুদ্ধ বেহাগে ধামার। বি এস ঠাকুর, মেঘ। তরুণ শিল্পী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজাজ ভাল। কিন্তু তাঁর সামনে দীর্ঘ পরিশ্রমের কর্মসূচী পড়ে রয়েছে।

আমীর খাঁ সাহেবের রাগেশ্রী ও মালকোষ শ্রোতাদের ভাল লেগেছে। খুব জমেছিল কলাশ্রী। শরাফৎ খাঁ-র কণ্ঠ সুন্দর। ভৈরো ধরেছিলেন তিনি চমৎকার। কিন্তু জমজমাট ভাবটি অধিকক্ষণ থাকেনি। শ্রোতাদের অনুরোধে পরে গাইলেন বিখ্যাত ঠুমরী, 'বাবুল মোরা'। তা-ও কান থেকে অতিদ্রুত মিলিয়ে গেল। এম আর গৌতম গেয়েছেন গুর্জরী

কানাড়া, উল্লেখ্য অনুষ্ঠান নয়। বরং অল্পের মধ্যে সুন্দর লেগেছে জামিল হায়দারের বারোয়াঁ। আর উড়িষ্যার শিল্পী দামোদর হোতার আলাপ (মল্লার), খেয়াল (মেঘ)। কিচলু ভ্রাতৃদ্বয়, রবি ও বিজয়, একটি সার্থক অনুষ্ঠানে গেয়েছেন পূরবী এবং ওই বারোয়াঁ। এঁরাও সময় নিয়েছেন অল্প, আর তার সদ্ব্যবহার করেছেন। অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে মুক্তকণ্ঠে গেয়েছেন মুনাবর আলি খাঁ শুদ্ধ কল্যাণে খেয়াল। উত্তরোত্তর তাঁর গানে শ্রী ও সমৃদ্ধি আসছে। দেশ রাগে ছোট খেয়ালটি গীতগোবিন্দের শব্দ ঝংকৃত সুখ-শ্রাবী। কিন্তু গতবার ওই দেশ আরও ভাল লেগেছিল। শেষের ঠুমরীটিও চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

যথারীতি দুটি আসরে সংগীত পরিবেশণ করেন জনপ্রিয় শিল্পী সুনন্দা পট্টনায়ক। অনুরাগীদের প্রত্যাশা পূর্ণ করে অপরিচিত স্বরচিত লক্ষ্মীশ্বর এবং সমালোচকদের প্রার্থনার উত্তরে কোষী ভৈরব। লক্ষ্মীশ্বর খুব জমেছিল নমনীয় স্পর্শপ্রবণ কণ্ঠস্বরে। দ্বিতীয়টি সারারাত্রির আসর শেষে তত দাগ কাটেনি। 'যোগী মত যা' ভজনটি প্রতিবার তাঁকে গাইতে বাধ্য করা শ্রোতাদের উচিত নয়। মালবিকা কাননের মধুকোষ প্রারম্ভিক প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে শেষ হয়নি। তাঁর ঠুমরী গানটি মোটামুটি। নবীনাদের মধ্যে যে তিনজন, জয়ন্তী রায়চৌধুরী, নমিতা চট্টোপাধ্যায় ও কল্পনা চট্টোপাধ্যায়, সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা সবাই সে-সুযোগের মর্যাদা রেখেছেন। এটা উদ্যোক্তাদের পক্ষে তো বটেই, সবার পক্ষেই আনন্দের।

যন্ত্রসংগীতের সূচীতে বাদশা ছিল সেতার। সারারাত্রির আসর যখন রাত্রি জাগিয়ে, প্রত্যুষ পেরিয়ে, কোলাহলময় দুপুরের দিকে অগ্রসর, সেই ক্ষণে ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজালেন ভাটিয়ার। রজনী-জাগরক্লান্ত শ্রোতাদের ধন্য করে দেওয়া সেই অনুষ্ঠান। ইমরৎ খাঁ এসেছেন দুটি আসরে। প্রথমদিন ছন্দোবদ্ধ ইমন, দ্বিতীয় দিনে জমজমাট যোগ। অত্যন্ত রেয়াজী পরিশ্রমী শিল্পী, শ্রোতাদের আনন্দবর্ধনের চেষ্টায় কোনো ফাঁকি নেই। রইস খাঁ-র টোড়ি মিষ্টি হাতে পরিবেশন করা। পরে তাঁর ওই গান গাওয়া কিন্তু সেতারের আসরে অপ্রার্থিত। ভয় হয়, এটাই না মুদ্রাদোষে দাঁড়ায়। এতে গান বাড়ে না, বাজনা কমে। অপূর্ব অনুষ্ঠান করেছেন মণিলাল নাগ। বিশেষত কোষী কানাড়ার আলাপ ও ঝালা অংশে। গৎ প্রসঙ্গে শিল্পীর চিন্তা সমানুপাতে সাবলীল নয়। সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রী এবং মনোজশংকরের পুরিয়া কল্যাণ ভাল লেগেছে। কেকি জিজিনা ও অবন মিস্ত্রীর দ্বৈত সেতারবাদন সম্মেলনের মান ক্ষুণ্ণ করেছে। মহিলা তবলিয়া অবন সঙ্গতেও

'মঞ্জরী অপেরা' (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও উত্তমকুমার

উন। তাঁর তবলা লহরার অনুষ্ঠানটি অবশ্য মন্দ হয়নি। সরোদে বাহাদুর খাঁ (পূরবী কল্যাণ) এবং বাঁশির অনুষ্ঠানে গৌর গোস্বামী (আভোগী) চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন।

সঙ্গতিয়া হিসাবে প্রথমেই নাম করব কেরামৎ খাঁ সাহেবের। বিশেষত এ বছর তিনি তাঁর ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছেন। (আশু রোগমুক্তির পরও যদি তাঁর এই অতি উঁচু মানটি বজায় থাকে তবে শ্রোতাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে।) কিষেণ মহারাজ, কানাই দত্ত, মহাপুরুষ মিশ্র এঁরাও আশানুরূপ বাজিয়েছেন। তরুণদের মধ্যে গোবিন্দ বসু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়ে গেছেন। সারেঙ্গীতে লড্ডন খাঁ খেটেছেন বেশী, সাগীরুদ্দিন খাঁ আনন্দ দিয়েছেন যথাপূর্বম্।

সংগীত সমালোচক

সাংবাদিক সমাবেশে বীরেন্দ্রশঙ্কর

ইংলণ্ডে ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীতের আসরে যন্ত্রসংগীতের জনপ্রিয়তা বেশি। নৃত্যের আবেদনও কম নয়। সেই তুলনায় কণ্ঠসংগীতের কদর বেশ কম। তাছাড়া ওই-সব সংগীত এতাবৎ একক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়ে এসেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীতের সব বিভাগকেই জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে শ্রীবীরেন্দ্রশংকরের প্রচেষ্টায় ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীদের একত্র করে একই অনুষ্ঠানে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত এবং নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। বলা যায় পুরোপুরি একটা সংগীত সম্মেলন। "সাংস্কৃতিক" (সেণ্টার অব ইণ্ডিয়ান আর্টস) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে ওই সংগীত সম্মেলনের আয়োজন। শ্রীবীরেন্দ্রশংকর ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

লণ্ডনের কুইন এলিজাবেথ হলে ২০ সেপ্টেম্বর ওই অনুষ্ঠানের শুরু। তিনটে অধিবেশন বসে ওখানে। এর পর রয়াল ফেস্টিভ্যাল হল-এ। পরবর্তী পর্যায়ে বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার ও লীডসে কয়েকটি অনুষ্ঠান। প্যারিসেও একটি অনুষ্ঠান পরিবেষিত হয়।

ওইসব অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দেবার জন্য যে সব শিল্পীকে ভারত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীবীরেন্দ্রশংকর, তাঁরা হলেন : গিরিজা দেবী (খেয়াল ও ঠুংরী), রাজেশ্বরী দত্ত (রবীন্দ্র সংগীত), বিনয় ভরতরাম (রামপুর ঘরানার কণ্ঠসংগীত), ভি জি যোগ (বেহালা), শিবকুমার শরমা (সন্তুর), হাঁস

বীরেন্দ্রশঙ্কর ফটো : দেশ

"সংসার" (পরিচালনা : সলিল সেন) ছবিতে শ্রীমান অরিন্দম, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারাণী

প্রসাদ চৌরাশিয়া (বাঁশী), সত্যদেব পাওয়ার (বেহালা), রহমত আলি (সরোদ), কালিদাস গুপ্ত (লোকগীতি), উমা শর্মা (কত্থক নৃত্য), ইন্দর লাল (সারেঙ্গী), কাশীনাথ মিশ্র ও বিশ্বনাথ মিশ্র (তবলা)।

ওখানকার পত্র-পত্রিকায় "সাংস্কৃতিক"-এর এই অনুষ্ঠানগুলির প্রশংসা করা হয়। উদ্যোক্তা হিসাবে বীরেন্দ্রশংকরও অভিনন্দন পান। এই সব তথ্য গত ৩ নভেম্বর এক সাংবাদিক সমাবেশে বীরেন্দ্রশংকর নিজেই জানালেন। ওখানকার খবরের কাগজের কাটিংসও দেখালেন।

ওই উৎসবে যোগদানকারী অন্যতম শিল্পী শ্রীভি জি যোগ সাংবাদিক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানালেন, বিদেশের শ্রোতাদের কাছে ভারতীয় সংগীতের একটি পূর্ণ রূপ তুলে ধরার চেষ্টা ছিল এই উৎসবে। তা বেশ খানিকটা সফল হয়েছে। কোথাও কোথাও দর্শক-সংখ্যা হয়তো আশানুরূপ হয়নি, কিন্তু গভীর মনযোগের সঙ্গে তাঁরা অনুষ্ঠান শুনেছেন। তারিফও করেছেন। তবে, শ্রীযোগের মতে, প্রোগ্রামের সময় আরও বাড়ানো দরকার। ২০ থেকে ২৫ মিনিট বরাদ্দ ছিল এক-একটি প্রোগ্রামের। অত অল্প সময়ে রাগের রূপ দেওয়া খুবই শক্ত।

আগামী বছরও অনুরূপ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবার পরিকল্পনা শ্রীবীরেন্দ্রশংকরের আছে। এর জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। শ্রীশংকর আশা করছেন ভারত সরকার এবং ভারতীয় শিল্পপতিদের কাছ থেকে তিনি ওই টাকা যোগাড় করতে পারবেন। ভারতীয় সংগীত প্রচারের এই মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁদের সহযোগিতা তাঁর প্রয়োজন। এটা এখন তিনি প্রায় একটি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

—দিবাকর বর্মা

দু'টি ধ্রুপদী অনুষ্ঠান

ওস্তাদ মৈনুদ্দিন ডাগর স্মৃতি সমিতি সম্প্রতি সাদার্ন অ্যাভিনিউস্থিত বিড়লা আকাদমির প্রেক্ষাগৃহে দু'টি পরিচ্ছন্ন সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রথম দিন মৈনুদ্দিন-অনুজ আমিনুদ্দিন ডাগরের সম্বর্ধনা-সভায় সংগীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ধ্রুপদ-শিল্পী ফাল্গুনী মিত্র, সেতারশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায় এবং ডাগর সংগীতশিক্ষামন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। প্রথমোক্ত শিল্পী বেহাগের পরে 'শংকরা' রাগে যে ধামারটি শোনান, তা শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ পরিতৃপ্ত করে। তাঁর সংগে পাখোয়াজ সংগত করেন অমলেশ চট্টোপাধ্যায়। বিমল মুখোপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাবান শিল্পী। সেতারের সূক্ষ্ম কাজগুলি 'ধানেশ্রী' রাগকে আশ্রয় করে তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর সংগে তবলায় বুলবুল চৌধুরীর সহযোগিতাও চমৎকার।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রবীণ বীণকার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পুরিয়া বাজিয়ে শোনান। সংগতে ছিলেন প্রখ্যাত পাখোয়াজশিল্পী প্রতাপনারায়ণ মিত্র। এদিনের অনুষ্ঠানে আমিনুদ্দিন ডাগরের কণ্ঠে দরবারী কানাড়ায় আলাপ এবং ধামার নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান। শিল্পীর সুমিষ্ট কণ্ঠের নিখুঁত সুরগ্রন্থনা, রাগের প্রতিটি স্বরের বৈচিত্র্যধর্মী অলংকরণ, সমৃদ্ধ আলাপচারী, বিভিন্ন সপ্তকে কণ্ঠস্বরের সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ ওস্তাদ আমিনুদ্দিনের সার্থক শিল্পসাধনার দুর্লভ দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই। বিশেষ ধ্রুপদের স্ব[illegible] গাম্ভীর্য, তার ধ্যানগম্ভীর স্বরূপ যেমন ধরা পড়েছে তাঁর সেদিনকার অনুষ্ঠানের বলিষ্ঠ অথচ সংযত সুরবিস্তারে তা খাঁটি ধ্রুপদের নিরিখে নির্ভেজাল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও সাম্প্রতিককালে তা যে খুব সুলভ নয়, ধ্রুপদ-রসিক মাত্রই তা জানেন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও অনুষ্ঠানের শ্রুতিসুখকরতায় আবিষ্ট হয়েও মাঝে মাঝে যেন মনে হয় শিল্পী তাঁর সৃষ্টিকর্মে নিঃশেষে তন্ময় হতে পারেননি। অন্তত আমিনুদ্দিনের মতন উঁচুদরের শিল্পীর কাছে যতটা প্রত্যাশিত, ততটা নয়। তা যদি হোতো, অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে এত কথার অবতারণার কোনো অবকাশ হত কি?

—আনন্দবর্ধন

জপমালা ঘোষের একক গানের অনুষ্ঠান

সুগায়িকা জপমালা ঘোষ শিশুদের জন্য বিশেষ গান করে থাকেন। গত কয়েক বছরে তিনি যে কয়টি ছেলে-ভোলানো গান বা ছড়ার গান গেয়েছেন তার সব কয়টি জনপ্রিয় হয়েছে। শিশুদের প্রিয় শিল্পী জপমালার একক গানের একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন মণ্ডলেখা। ওই আসরে শিল্পী মোট চোদ্দটি গান গেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে সব কটি গানই খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। নজরুলের লেখা "বাবুদের তাল পুকুরে" গানটি দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। একক গানের এমন উপভোগ্য অনুষ্ঠানের জন্য জপমালা শ্রোতাদের অভিনন্দন অর্জন করেন।

বনপলাশীর পদাবলী ও শিল্পী সংসদ

মহাশয়,—গত ১৪ কার্তিক তারিখের ৫২ সংখ্যা দেশ পত্রিকার ১৩৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিবৃতি সম্পর্কে আমার নিবেদন দয়া করে প্রকাশ করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

শ্রীযুক্ত রমাপদ চৌধুরীর উক্ত উপন্যাসের প্রস্তাবিত চিত্ররূপের ভূমিকা-লিপিতে আমার নাম দেখা যায়। এ বিষয়ে আমার পূর্ব অনুমতি, সম্মতি, পরামর্শ, এমন কি কোনও সংবাদ নাই।

গত ত্রিশ বছরের অভিনয় পেশায় অনুরূপ অভিজ্ঞতা আমার বহুবার হয়েছে। নামগোত্রহীন, দায়িত্বহীন, স্বার্থলিপ্সু ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের এরূপ দুষ্কর্মের প্রতিবাদ প্রয়োজন বলে আমি মনে করিনি। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা না ধরলেও, শিল্পী সংসদকে আমি ঐ পর্যায়ে ফেলতে পারি না। বিশ্বাস করব দেশ পত্রিকার অগণিত পাঠক-পাঠিকাও তা করবেন না। ইতি—বিনীত—শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য।

[প্রকাশিত সংবাদটি শিল্পী সংসদ প্রেরিত নয়। স্টুডিওপাড়ায় গুঞ্জরিত সংবাদের ভিত্তিতে আমাদের প্রতিনিধি কর্তৃক ওই সংবাদ সংগৃহীত।]

অরণ্যদেব ✩ লী ফক

সোনালী মানুষদের দেশে---
আমাদের সেরা যোদ্ধাদের তুমি একাই পরাস্ত করেছ।
তার অর্থ, আজ থেকে তুমিই এখানকার রাজা।

আমার রাজা।
?

দেবদূত, এই আমাদের নিয়ম। আমাদের যোদ্ধারা যার কাছে পরাস্ত হয়, তাকেই আমাদের রাজা হিসেবে মেনে নিতে আমরা বাধ্য।
দাঁড়াও-
কিন্তু আমার পক্ষে তো এখানে থাকা সম্ভব নয়।

অনেক যুগ আগে তুমি আর একবার এখানে এসেছিলে। সে-কথা মনে পড়ে?
আমাকেই এরা আমার পূর্বপুরুষ বলে ভুল করছে।

!
তখনকার রানী তোমাকে ভালবেসেছিলেন। তোমাকে তিনি রাজা হতে বলেছিলেন। তুমি থাকোনি। তাঁকেই তুমি তোমার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। কিন্তু তিনি যেতে পারেননি। তুমি বিদায় নিলে। আর সেই দুঃখে তিনি মারা যান।
আমার পূর্ব-পুরুষ এখানকার রানীকে ভালবেসেছিলেন? কই, রোজনামচায় তো সে কথার উল্লেখ নেই?

আর তারপর থেকেই প্রতিটি রানীকে শপথ নিতে হয় যে, দেবদূত যদি আবার ফিরে আসেন, তাহলে এই শোকাবহ ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া হবে না।
আমার কথাগুলি তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ।

আমার শপথ অনুযায়ী তোমাকেই আমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করব।
!

কিন্তু সোনালী দেশের রানী, এখানে থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
অর্থাৎ আমাকে এখানে ফেলে রেখে তুমি বিদায় নিতে চাও?

তা আর হবে না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।
!

শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার কলকাতায় আগমন বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ২ নবেম্বর শ্রীমতী সেনগুপ্তা পাকিস্তানের বেনাপোল সীমান্ত হয়ে ভারতের হরিদাসপুর চেক পোসটে এসে পৌঁছান। প্রায় দু'মাস আগে চট্টগ্রামের বাড়িতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে তাঁর কোমরের নীচের হাড় ভেঙে গিয়েছে। সেজন্য চিকিৎসা করাতে তাঁর এখানে আসা। তাঁর সঙ্গে এসেছেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট দেশকর্মী শ্রীবিনোদ চৌধুরী। শ্রীমতী সেনগুপ্তাকে নো-ম্যানস ল্যানডে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন চব্বিশ পরগনা জেলার শাসক শ্রীরথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কলকাতা করপোরেশনের তিন প্রতিনিধি, কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা এবং তাঁর বড় ছেলে শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত ও ছোট ছেলের বিধবা পত্নী শ্রীমতী ইরা সেনগুপ্তা। স্ট্রেচারে শুয়েই তিনি সবচেয়ে প্রথমে পুত্রবধূ এবং তারপর বড় ছেলেকে আবেগভরে চুম্বন করেন। তারপর অ্যামবুলেনস করে তাঁকে বনগাঁর ইনসপেকশন বাংলোতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ডাঃ এ কে ভট্টাচার্য তাঁকে পরীক্ষা করেন। এখান থেকে তাঁকে গাড়ি করে কলকাতার ডায়মনহারবার রোডে ক্যালকাটা হসপিটাল ও মেডিক্যাল রিসারচ ইনসটিটিউটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সারজন শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর চিকিৎসা করবেন।

দেশী সংবাদ

২ **নবেম্বর**—পাকিস্তানের ইজরাইলী ধরনের 'চোরাগোপ্তা' আক্রমণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র সিং মাহিদা আজ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহীতেন্দ্র দেশাইকে অবহিত করেন। শ্রীমাহিদা সাংবাদিকদের কাছে বলেন—তাঁর দফতরে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত-সংবাদে জানা গিয়েছে যে, পাকিস্তান হয়ত এইরূপ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

৩ **নবেম্বর**—সোমবার শেষ রাত থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ঘটনায় বলি ৫ জন। এই ঘটনাগুলি ঘটে গ্যালিফ স্ট্রীট, আমহারসট স্ট্রীট এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড এলাকায়। পুলিসের গুলিতে ৩, বোমার আঘাতে ১, পাইপগানের গুলিতে ১ জন মারা যায়। এ ছাড়া এদিন আততায়ীর বোমার আঘাতে আড়িয়াদহের স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় ঘোষালের বড় ভাই শ্রীআদিত্য ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। অজয়বাবুও জখম হন।

৪ **নবেম্বর**—আজ মহাকরণে ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ, চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আড়াই লক্ষ সরকারী কর্মচারী সংশোধিত 'পে-স্কেল' অনুযায়ী নতুন হারে বেতন পাবেন। আরও প্রকাশ, সংশোধিত 'পে স্কেলে' সবচেয়ে লাভবান হবেন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা। তাঁদের ক্ষেত্রে মাসিক বেতন বাড়বে ১০ থেকে ১৫ টাকার মধ্যে।

আজ সি পি এম নেতা শ্রী কে জি বসুর স্ত্রী শ্রীমতী পারুল বসু বেলেঘাটায় দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ছুরিকাহত হন। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তাঁকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাঁর বুকে ছুরি মারা হয়। মহিলার প্রতি এ ধরনের আক্রমণ এই প্রথম।

৫ **নবেম্বর**—আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মশতবার্ষিকী দিবসে সারা দেশের সঙ্গে কলকাতা ও শহরতলির নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান নেতাকে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়। কলকাতার প্রধান অনুষ্ঠান ছিল ময়দানে দেশবন্ধুর ধাতু-মূর্তির আবরণ উন্মোচন। এ ছাড়া এদিনের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান—দেশবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যচিত্রের রিলিজ, নিমপীঠে ৫০ শয্যার দেশবন্ধু ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের উদ্বোধন, দক্ষিণ কলকাতায় দেশবন্ধুর নামে এক মহিলা কলেজ ভবনের শিলান্যাস।

জেল থেকে বন্দীদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করা ও ঘুষ নেওয়া ইত্যাদির অভিযোগে আসানসোল সাব-জেলের একজন হেড ওয়ারডার ও দুজন ওয়ারডারকে আজ গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে বলা হয়—গত ১ অকটোবর ওই জেল থেকে পলাতক ৬জন বন্দীর ২ জন সম্প্রতি ধরা পড়েছে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এই গ্রেফতার। জেল থেকে পলায়নের ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে নাকি ১৮ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়া হয়েছে।

৬ **নবেম্বর**—কিছুটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে ভারত সরকার আবার সারা দেশে পি ডি অ্যাকট প্রবর্তন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গে এই আইন জারির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত সংসদীয় পরামর্শ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য এই আইনটি পেশ হতে পারে।

৭ **নবেম্বর**—আজ রাত থেকে শনিবার সারা দিনে কলকাতায় ৪ জন খুন হন; পুলিসের গুলিতে ১ জনের মৃত্যু ঘটে। নিহতদের মধ্যে দুজন বড় ব্যবসায়ী, একজন ছোট, একজন নকশালপন্থী যুবক। পুলিস কাড়োয়ায় গুলি চালালে একজন যুবক মারা যান। শনিবার একজন পুলিস সারজেনট হেয়ার কাটিং সেলুনের মধ্যে ছুরিকাহত হন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সংবিধান পালটাবেনই এবং ১৯৭১ সনেই লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন করবেন—এই রকম খবর নিয়ে কয়েকজন নব কংগ্রেস নেতা দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরেছেন। তাঁরা বলেছেন, রাজন্য ভাতা ও অধিকার বিলোপের ব্যাপারে সুপ্রিম কোরটের রায় বের হবার পরেই এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা প্রকাশিত হবে।

৮ **নবেম্বর**—পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে ভারত সরকার কি করবেন তা ভেবে উঠতে পারছেন না। রাষ্ট্রপতির শাসনকালে যে সব নীতি অনুসরণ করা হয়েছে তাতে পরিকল্পিত সুফল পাওয়া যায় নি। শ্রী বি বি ঘোষ যতই আশ্বাস দিন, কেন্দ্র মনে করছেন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনও গুরুতর।

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজ কলকাতার শেঠ শুকলাল কারনানি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শুক্রবার রাত্রে তিনি সেরিব্রাল থ্রমবোসিস রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৩ বছর। সুলেখিকা অধ্যাপিকা ডঃ আশা দেবী তাঁর পত্নী।

বিদেশী সংবাদ

২ **নবেম্বর**—পোল্যানডের বাণিজ্য দূত শ্রী দুদা আজ করাচিতে বলেন : গতকাল করাচি বিমান বন্দরে পোল্যানডের প্রেসিডেনট ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। ওই ঘটনায় পোল্যানডের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী লরির নিচে পড়ে নিহত হন। শ্রী দুদা আরও বলেন যে, প্রেসিডেনট ও তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে লরিচালক একদম সোজাসুজি লরি চালিয়ে এসেছিল। মতলব এটেই এ কাজ করা হয়েছে।

৩ **নবেম্বর**—করাচিতে পোলিশ সহকারী প্রধানমন্ত্রীকে লরি চাপা দিয়ে হত্যা করার অপরাধে ধৃত লরিচালক ফিরোজ আবদুল্লা পুলিসের কাছে বলেছে যে, "আমি ইসলামের সমস্ত শত্রুদের সরিয়ে ফেলতে চাই। সফররত পোলিশ প্রতিনিধি দল সমাজতন্ত্রের সমর্থক। সমাজতন্ত্রীরা ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করতে চায়।"

৯ **নবেম্বর**—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে আজ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে একটি আফরো-এশীয় প্রস্তাব ৫৭—১৬ ভোটে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে ইজরায়েলকে জবর দখল আরব এলাকা থেকে সরে যেতে বলা হয়েছে। প্রস্তাবে ইজরায়েলকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদেও ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান দেওয়া হবে।

৫ **নবেম্বর**—কঙ্গোর সুপ্রিম কোরট আজ জেনারেল যোশেফ মোবুতুকে দেশের যথারীতি নির্বাচিত প্রেসিডেনট বলে ঘোষণা করেছেন। গত সপ্তাহের শেষে ভোট গ্রহণ করা হয়। জেনারেল মোবুতু কত ভোট পেয়েছেন তা প্রকাশ করা হয়নি। তবে তাঁর বিপক্ষে ১৫৮টি ভোট পড়েছে বলে জানা যায়।

৬ **নবেম্বর**—খুলনা জেলার খালিশপুর শহরে গতকাল রাত্রে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে মোট ছয়জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১২ জনেরও বেশি। সরকারীভাবে তিনজনের মৃত্যু-সংবাদ জানানো হয়েছে। বাকি তিনজনের মৃত্যু-সংবাদ বেসরকারী সূত্রে পাওয়া গিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, সংঘর্ষে ২০০টি বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। বাড়িগুলি পুড়ে গিয়েছে।

৭ **নবেম্বর**—নিউজ উইকের সংবাদদাতা জন ভরনবারগকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত করার বদলা হিসাবে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র একজন সোভিয়েত সাংবাদিককে বিতাড়িত করেছেন। মারকিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রেস অফিসার এই তথ্য প্রকাশ করে বলেন, এটি হল জন ভরনবারগকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করার পালটা ব্যবস্থা।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

ক্লান্ত ?
গ্ল্যাক্সোজ-ডি
আপনাকে কয়েক মিনিটেই শক্তি দেয়
ক্লান্তি বোধ করলেই রোজ
আমি গ্ল্যাক্সোজ-ডি খাই
আপনি রোজ ক্লান্ত বোধ করেন, কারণ, কাজের
খাটুনীতে আপনার শরীরের গ্লুকোজ অনবরত
ক্ষয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। গ্লুকোজের এই ক্ষয়
গ্ল্যাক্সোজ-ডি দিয়ে পূরণ করুন। এ থেকে
কয়েক মিনিটেই শক্তি পাবেন। গ্ল্যাক্সোজ-ডি
খান,—জলে গুলে, দুধের সঙ্গে, ফলের রসের সঙ্গে,
কিম্বা সোজাসুজি শুধু মুখে। কয়েক মিনিটেই
আপনি হ'য়ে উঠবেন সতেজ, ফিরে পাবেন শক্তি!
আজই, ক্লান্ত
বোধ করলেই
গ্ল্যাক্সোজ-ডি খান—
অল্প খরচে নিমেষে
শক্তিদায়ক
আহার!
GL/10 Ben.

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩
শনিবার ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 21 Nov. 1970

বিদ্যাচর্চায় বিঘ্ন

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান পাশাপাশি দেশ। তাদের রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক যদি মধুর হত, তাহলে দুই দেশেরই উপকার হত অনেকখানি। রাজনীতির আবহ তার ফলে অনেকাংশ নির্মল হত, সেইসঙ্গে বৈষয়িক জীবনও কম উপকৃত হত না। পাকিস্তানে এমন অনেক পণ্য উৎপন্ন হয়, এ-দেশে যার বাজার একেবারে তৈরী হয়েই আছে; আবার এ-দেশেও এমন পণ্য প্রচুর, পাকিস্তানে যার চাহিদা নেহাত কম নয়। স্বাভাবিক আমদানি-রফতানির ভিত্তিতে অতএব দুই দেশের মধ্যে একটা সুস্থ বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুব সহজেই বিকশিত হয়ে উঠতে পারত; এবং দুই দেশেরই বৈষয়িক সমৃদ্ধির গতি যে তাতে বাড়ত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাকিস্তানের যাঁরা কর্ণধার, প্রথম থেকেই এমন একটা নীতিকে তাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন, দুই দেশের সম্পর্ক যার ফলে কখনও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি। সেখানে একের-পর-এক শাসকচক্রের বদল ঘটেছে। এবং পাকিস্তানের আভ্যন্তর রাজনীতির চেহারা তাতে বারে-বারে পালটে গেছে, কিন্তু এই একটা ব্যাপারে দেখা গেল যে, সব চক্রেরই এক রা, ভারত সম্পর্কে সেই আজন্ম বিদ্বেষের নীতিকে তাঁরা কেউ কখনও পালটালেন না। বিদ্বেষ ডেকে এনেছে সঙ্ঘর্ষকে, এবং অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, দুই দেশের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার কোনও সম্পর্কই আর নেই। পাক-ভারত সংঘর্ষের আগে পর্যন্ত, যতই ক্ষীণ ধারায় হোক, বাণিজ্যের একটা স্রোতোধারা তবু বইছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে সেই ধারাটি একেবারে রুদ্ধ হয়ে আছে।

ফলে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে কি মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সৈয়দ মুর্তজা আলির উক্তি থেকেই তা বোঝা যাবে। অকটোবর মাসের শেষে ঢাকায় বাংলা আকাদামির যে পঞ্চম বার্ষিক সভা হয়ে গেল, তাতে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে বইপত্র আমদানির ব্যাপারে পাকিস্তানে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা প্রত্যাহার করা দরকার। তা নইলে গবেষণার কাজ কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। তাঁর বক্তব্যের খানিকটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ "প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ ও নানা যুগের মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার ঐশ্বর্যের পুণ্য সলিলের প্রয়োজন। এক কথায় পাণ্ডিত্য অর্জনে চাই মুক্ত বুদ্ধি ও চিন্তার প্রসার। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক তাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বইপত্র আমদানির উপর নিষেধজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন। কেননা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার উচ্চতর গবেষণার জন্য যে-সকল বই প্রয়োজন, তার বেশির ভাগই কলকাতায় প্রকাশিত।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক হাবিবুল্লাও কিছুদিন আগে এই একই মর্মে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরও এই একই দাবিঃ বইপত্র আমদানির ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা প্রত্যাহৃত হোক।

বলা বাহুল্য, দাবি শুধুই মনস্বী পণ্ডিত ও গবেষকদের নয়; দাবি আরও অনেকের। পশ্চিমবঙ্গে যে গল্প-উপন্যাস-কবিতার বই বার হয়, পূর্ববঙ্গে তার প্রচুর চাহিদা। পণ্ডিত ব্যক্তিরা যেক্ষেত্রে গবেষণার সুবিধের জন্য এখান থেকে প্রকাশিত বইপত্র দেখতে চান, সাহিত্যানুরাগী বৃহত্তর পাঠকসমাজ সেক্ষেত্রে জানতে চান যে, এখানকার সাহিত্য কোন পথে কেমনভাবে এগোচ্ছে। তাঁরা চান যে, এখানকার বই আর পত্রপত্রিকা সেখানে অবাধে যাক। ঠিক তেমনি, এখানকার গবেষকরাও জানতে চান যে, ডঃ শহীদুল্লা প্রমুখ মনস্বীরা তাঁদের গবেষণার ধারাটিকে কোন পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, এবং এখানকার সাহিত্যানুরাগীরাও পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক সাহিত্যকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে উৎসুক। সেই পারস্পরিক পরিচিতির পথ যে উন্মুক্ত হতে পারছে না, তার দায় অবশ্যই ভারত সরকারের নয়। দায় পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিদের, এই আদান-প্রদানের ব্যাপারটাকে যাঁরা মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। তাঁদের অনুদার বিদ্বেষী নীতির পরিণামে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সাহিত্যতৃষ্ণা তৃপ্ত হতে পারছে না, গবেষণা মার খাচ্ছে। পূর্ববঙ্গে সেজন্য অসন্তোষের অবধি নেই। কিন্তু পাকিস্তানে যতক্ষণ না স্বৈরশাসনের অবসান হচ্ছে, এবং সত্যিকারের উদারপন্থী মানুষেরা ক্ষমতা হাতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ যে এই সমস্যার কোনও প্রতিকার হবে, এমন আশা নেই। লেখকের প্রাপ্য ফাঁকি দিয়ে কিছু চোরাই প্রকাশক ততদিন সেখানে পশ্চিমবঙ্গীয় কিছু বইপত্র ছেপে যাবে ঠিকই, কিন্তু সমস্যার তাতে প্রতিকার হবে না।

[বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহে পশু-প্রেমিক সমিতি কর্তৃক প্রচারিত আবেদন]

মহাশয়গণ, দোহাই, নিছক আমোদের জন্য আর পশু পাখি শিকার করিবেন না। আপনারা বোধহয় অবগত নহেন যে, ভারতের জঙ্গলের যাহারা স্থায়ী বাসিন্দা, সেই সব হিংস্র ও অহিংস্র পশুপাখির বংশ আপনাদের আমোদের কারণে আত্মাহুতি দিয়া ফোত হইতে বসিয়াছে। অহিংস্র প্রাণীগুলি কাহারও ক্ষতি করে না। হিংস্র প্রাণীরাও গায়ে পড়িয়া কাহারও ক্ষতি করে না। অতএব উহাদিগকে বধ করা কেন? বরং উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন। এবং বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া উহাঁদের লীলা প্রত্যক্ষ করুন। সুবিমল আনন্দ পাইবেন।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না, আমরা আপনাদিগকে অহিংস হইবার উপদেশ দিতেছি। রামঃ! আমাদের বিন্দুমাত্র ওইরূপ কোনও অভিসন্ধি নাই। কারণ আমরা জানি, তাহা হইবার নহে। মানুষ আবার কবে অহিংস! হিংস্রতাই মানুষের স্বভাব। আমরা মানুষকে স্বভাব বদলাইতে উপদেশ দিব, আমাদের এত ধৃষ্টতা নাই। মনুষ্যজাতিকে আমরা শিকার হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহি না। শিকার মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি। মনুষ্য সভ্যতাই শিকারের ব্যাপক আয়োজন। শিকার যদি মানুষ আমাদের কথায় বন্ধ করিয়া দেয় তবে সভ্যতা কিরূপে টিঁকিবে? সভ্যতার স্ফুরণ ও বিকাশ শিকারের নব নব আয়োজনের উদ্ভাবনের ভিতর দিয়াই ঘটিয়াছে। যতদিন মানুষ শিকারের আয়ুধ-রূপে প্রকৃতি-সৃষ্ট বস্তু—অর্থাৎ গাছ, পাথর, কঙ্কালের হাড় ইত্যাদি ইত্যাদি—ব্যবহার করিয়াছে,—ততদিন তাহাকে আমরা সভ্য হিসাবে আমল দিই নাই। যেদিন হইতে মানুষ তাহার সৃজনী শক্তি ব্যবহার করিতে লাগিল, ব্রোন্‌জ্, তামা, লোহা ইত্যাদি গলাইয়া তীক্ষ্ণ মারণাস্ত্র প্রস্তুত করিবার কায়দা রপ্ত করিয়া ফেলিল, সেইদিন হইতেই কি আমরা মানুষকে সভ্য হিসাবে স্বীকার করিয়া লই নাই? সেইদিন হইতেই কি মানুষের ইতিহাস সৃষ্টি হয় নাই।? তবে? সেই জনাই মানুষকে শিকার খেলিতে নিষেধ করিতে আমাদের বাধে। আজ মানুষের সভ্যতা আরও কত অগ্রসর হইয়াছে! মানুষ পরমাণু বোমা তৈয়ারী করিয়াছে। দূর-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তাহার করায়ত্ত হইয়াছে। মানুষকে শিকার করিতে বারণ করার অর্থ [illegible] মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী প্র[illegible] আবিষ্কার করা। মানুষের সমাজে নূতন [illegible] সংকট সৃষ্টি করিতে আমরা চাহি [illegible] আমরা নির্বোধ নহি।

আমাদের আবেদনের স্পষ্ট অর্থ, আপনারা বন্য প্রাণী হত্যা করিবেন না। আমরা বন্য প্রাণী হত্যাই বন্ধ করিতে চাহি। শিকার বন্ধ করিতে চাহি না। বন্যপ্রাণীর বিকল্প হিসাবে আপনারা মানুষ শিকার করুন, আমাদের কোনও আপত্তি নাই।

আর মানুষ শিকারের পক্ষে কলিকাতার জনারণ্যই যে বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অরণ্য

তাহা আমরা গ্যারানটি দিতে পারি। আর পশ্চিমবঙ্গের মাঠ, প্রান্তর গ্রাম ও শহরও মানুষ শিকারের পক্ষে সমান সুবিধাজনক।

এ কথা আপনারা কে না জানেন যে, টুরিস্টদের মধ্যেই শিকারের প্রবণতা বেশি থাকে। এবং সংবাদপত্র মারফত নিশ্চয় এই খবরও পাইয়া গিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে টুরিস্ট আসা কি পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে! আমরা রাজ্য সরকারের টুরিস্ট দফতরকে জানাইয়া দিয়াছি যে তাঁহারা যদি নানা দেশের সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া বিজ্ঞাপন মারফৎ এই কথা ঘোষণা করিয়া দেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মানুষ শিকারের সর্ব রকম সুবিধা বিদ্যমান, তাহা হইলে আমাদের সমিতির সদস্যরা সরকারের এই সৎ প্রচেষ্টার সহিত সর্বতোভাবে সহায়তা করিবে।

আমরা সকলের জ্ঞাতার্থে এ কথাও জানাইতেছি যে, উপযুক্ত গাইড, হাতি ইত্যাদি এবং শিকারের সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বিনা লাভে সরবরাহ করিব। বিদেশী শিকারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে।

একবার কল্পনানেত্রে এই দৃশ্যটি দেখুন, বিদেশী শিকারীগণ (বাংলার বাহির হইতে আগত ভারতীয়গণও একই ট্রিটমেন্ট পাইবেন) হাতির পিঠে হাওদা জুতিয়া সপরিবারে কলিকাতার জনারণ্যে [illegible] হিংস্রতম মানুষ শিকারে বাহির হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে শিকারযোগ্য মানুষের তালিকা, অঞ্চল ও রেট নিম্নে বর্ণিত হইল।

এক॥ জোতদার-মানুষ। চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও সমগ্র উত্তরবঙ্গ ইহাদের বিচরণ ক্ষেত্র। অন্যান্য জেলাতেও ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি শিকার কুড়ি টাকা মাত্র।

দুই॥ মহাজন-মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গঞ্জগুলিতে ইহাদের আধিক্য বর্তমান। সন্ধ্যাবেলা এবং নির্জন দ্বিপ্রহরে পথিপার্শ্বে ইহাদের সহজেই শিকার করা যায়। কারণ সেই সময় দোকান বন্ধ করিয়া ইহারা আস্তানায় আহারের সন্ধানে ফিরিতে থাকে। প্রতি শিকার কুড়ি টাকা মাত্র।

তিন॥ প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষক-মানুষ। দশটা-পাঁচটা যে কোনও স্কুলেই এই ধরনের শিকার দেদার পাওয়া যায়। বালি হাঁস শিকারে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহাদের খুবই সুবিধা। শিকার প্রতি পাঁচ টাকা।

(ইঁহারা অহিংস-মানুষ। কমিউনিস্ট দেশের শিকারীদের পক্ষে এই ধরনের শিকার খুবই লোভনীয়। গাইড হিসাবে সি-পি-আই, এস-ইউ-সি, সি-পি-এম এবং নকশালপন্থীরাই নির্ভরযোগ্য।)

চার॥ নকশাল-মানুষ। অত্যন্ত হিংস্র। কলিকাতা শহর এবং মেদিনীপুরের ডেবরা-গোপীবল্লভপুর ইহাদের বিচরণ ক্ষেত্র। বিট্ শিকারে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে উপযোগী। বিটারদিগের দ্বারা সমস্ত অঞ্চল ঘিরিয়া ফেলিয়া ক্রমে ক্রমে তাড়া[illegible] হয় এবং একদিকের মুখ খো[illegible] রাখিয়া শিকারীকে হাতির পিঠে চড়িয়া আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া ওই মুখে বসিয়া শিকার করিতে হয়। প্রতি শিকার ২৫০ টাকা। সি পি এম এবং সরকারি গাইড, পুলিসই নির্ভরযোগ্য।

পাঁচ॥ সি পি এম-মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এবং কলিকাতার শহরে ইহাদের পাওয়া যায়। ইহারা খুব দ্রুতগামী এবং দলবদ্ধভাবে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ভাল গাইড সি পি আই, এস ইউ সি, ফরওয়ারড ব্লক ও নকশাল। প্রতি শিকার ৫৫ টাকা মাত্র।

ইহারা সব হিংস্র শিকার। এবং পুঁজি-বাদী দেশের পক্ষে লোভনীয়। এই তালিকায় সি পি আই, এস ইউ সি এবং ফরওয়ারড ব্লক মানুষও যথেষ্ট। তবে ইহাদের শিকারে তেমন কৌলীন্য নাই।

এইরূপে মহাশয়গণ, আপনারা মানুষ শিকারে মনোনিবেশ করিলে আপনাদের শিকারের শখ চরিতার্থ হইবে এবং বন্য প্রাণী বাঁচিবে এবং বাংলা দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া শিকার খেলিলেও আপনাদের শিকার ফুরাইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

অনিশ্চয়তা

সেদিন রাজ্যের একজন খুব উঁচু দরের অফিসারের সংগে আলোচনায় বসেছিলাম। কথা হচ্ছিল রাজ্যের কতকগুলি সমস্যা নিয়ে। সমস্যাগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভদ্রলোক বড় অফিসার হলেও তাঁর দৃষ্টি এখনও টাইয়ে আটক পড়েনি। কয়েকটা বেশ ভাল প্রস্তাবের কথা বললেন। যেমন, বেকার সমস্যা সমাধানের একটা প্রস্তাব। বললেন : আমরা সবাই শিল্প পুনরুজ্জীবনের কথা বলছি এবং তারই মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের আশায় বসে আছি। কলকারখানা না বাড়লে, কাজের সুযোগ না সৃষ্টি হলে যে বেকার সমস্যা কমতে পারে না সেটা সত্যি কথা। কিন্তু এইভাবে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। ততদিন এত বেকার কী করবে? তাদের জন্য একটা কিছু তো চাই। এদের জন্য অস্থায়ী কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। মাসিক ধরুন ১৫০, টাকা বেতন। যদি বছরে ১০ কোটি টাকা খরচা করা যায় তাহলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোককে চাকুরী দেওয়া যায়। এই পঞ্চাশ হাজার লোককে ২০০টা গ্রুপে ভাগ করে সমস্ত রাজ্যে নানা উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যায়—যে সব কাজে খুব কম মূলধন বিনিয়োগ প্রয়োজন, যে সব কাজে বেশী লোক দরকার। প্রতি গ্রুপে তিন-চারজন সুপারভাইজার নিযুক্ত হতে পারেন। ম্যাট্রিক পাস করে বা তার চেয়েও কম পড়ে যারা বসে আছে, চাকুরী পাচ্ছে না, তারা নিশ্চয়ই এইসব কাজ সাগ্রহে গ্রহণ করবে। সুপারভাইজার হিসাবে বেকার ইনজিনিয়ারদের নিয়োগ করা যায়। তাতে অন্তত সাত আট শ বেকার বাঙালী ইনজিনিয়ার কাজ পাবেন। আমরা তো পুলিসের জন্যই এ-বছর সাত আট কোটি টাকা বাড়তি খরচা করছি। পঞ্চাশ হাজার বেকারকে কাজ দেওয়ার জন্য বছরে বাড়তি ২০ কোটি টাকা খরচা করা কি সম্ভব নয়?

আমি বললাম : প্রস্তাবটা ভালই। তবে, অর্থনীতিবিদদের নিয়ে এটা ভাল করে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার।

উনিও বললেন : হ্যাঁ, আমিও বলছি না, বিনা বিচার বিবেচনায় এই কাজে হাত দেওয়া হোক। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

আমি বললাম : বলুন না কর্তাদের।

উনি বললেন : সেইটাই প্রবলেম, কাকে

বলব। মুশকিল হয়েছে কি জানেন সব মিলিয়ে দেখার কেউ এখন পশ্চিমবঙ্গে নেই। ধাওয়ান সাহেবকে বলতে গেলে মহা মুশকিল। তিনি গীতা ভাগবত থেকে আরম্ভ করে মার্কস লেনিন সব শোনাবেন। কিন্তু কাজের কথায় কিছুতেই আসবেন না। বি বি ঘোষকে বলব? এক নম্বর, তিনি সর্বদাই ভীষণ ব্যস্ত, তাঁর সময়ই খুব কম। দু নম্বর, তাঁকে বলতেই ভয় করে, কারণ তিনি হয়ত মনে করবেন আমি তাঁকে অ্যাডভাইস দিতে চাইছি। কারণ, এ ব্যাপারে তিনি নিজেই একসপার্ট।

তারও তিন-চারদিন পরে আর একজন আরও উঁচু অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। প্রায় চূড়ায় অধিষ্ঠিত। বললেন। খুনোখুনি নিয়ে একটা সর্বদলীয় বৈঠক বসাতে পারলে মন্দ হত না। সবাই যদি একসঙ্গে বসে এই ভয়াবহ তাণ্ডবের নিন্দা করতেন, সবাই যদি একত্রে বসে এই সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতেন, সবাই যদি এক-যোগে এটা থামাবার প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহলে হয়ত কিছুটা কাজ হত।

আমি বললাম : ভালই তো। লাট-সাহেবকে বলুন না এইরকম একটা বৈঠক ডাকতে। নকশালরা ছাড়া সবাই নিশ্চয়ই আসবেন।

ভদ্রলোক বললেন : ওইখানেই তো মুশকিল। ধাওয়ান সাহেব যে এক্সেকিউটিভ নন।

আমি বললাম : তাহলে এখন পশ্চিম-বঙ্গে এমন বৈঠক ডাকবেন কে? এ-দল ডাকলে সে-দল আসবে না। ইনি ডাকলে উনি আসবেন না। বি বি ঘোষ ডাকলেও দলের নেতারা আসবেন না। কারণ, তাঁদের মতে উনি শুধু আমলা।

উনি বললেন : হ্যাঁ, এইটাই মুশকিল, সর্বদলীয় বৈঠক ডাকবে কে?

*

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে আজ কেমন অবস্থা সেইটা বোঝাবার জনাই আমি এই দুটো উদাহরণ তুলে ধরলাম।

একটা অদ্ভুত অবস্থা রাষ্ট্রপতির শাসনের শুরু থেকেই। শুধুই অস্থিরতা। শুধুই অনিশ্চয়তা। কোনটা থাকবে, কী থাকবে, কে থাকবেন তা কেউই জানেন না। যাঁরা চূড়ায় অধিষ্ঠিত তাঁরাও না। সবাই এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

রাষ্ট্রপতির শাসন চলবে, না নির্বাচন হবে ১৯৭১ সনেই—সেইটাই ঠিক নেই। শুধু যে খবরের কাগজ দেখেই এখানের কর্তারা পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন না তা নয়। অথরিটেটিভ সোর্সেও খবর পাচ্ছেন দিল্লি থেকে যে ১৯৭১ সনে লোক-সভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন এবং সেই সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন হতে পারে। তাঁরা তাই বুঝতেই পারছেন না, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? যাঁরা উপদেষ্টা তাঁদের উপরও এই অনিশ্চয়তার প্রভাব পড়ছে। যাঁরা উঁচু পদের অফিসার তাঁরাও বুঝতে পারছেন না, কী হবে। তাঁদের সবচেয়ে বড় চিন্তা, কে আসবেন, কারা কারা সরকার গঠন করবেন। উপদেষ্টারা ভাবছেন, আমরা কদিন?

এবার আসা যাক রাজ্যপাল প্রসঙ্গে। মাস তিন চার ধরেই শোনা যাচ্ছে তিনি যাবেন যাবেন। কিন্তু যাচ্ছেন না। দিল্লি তাঁকে সরিয়ে নিচ্ছেন না। কিন্তু সরিয়ে না নিলেও বা নিতে পারলেও দিল্লি এটা বুঝিয়ে দিতে কসুর করছেন না যে তাঁরা ধাওয়ান সাহেবকে পছন্দ করেন না। ধাওয়ান সাহেবের রাইটার্স বিলডিংসে যাওয়া বারণ। বিবৃতি দেওয়া প্রায় নিষিদ্ধ। একা কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেও তাঁকে না বলে দেওয়া হয়েছে। তবু তিনিই রাজ্যপাল। কতকগুলি ফাইলে রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া সই ছাড়া চলে না। সে ফাইলগুলি জমে পাহাড় হয়ে যাচ্ছে। ধাওয়ান সাহেব এখন কলকাতায়ই কম থাকছেন। থাকলেও তিনি ফাইল কিছুতেই দেখতে চান না। রাষ্ট্রপতির শাসনে রাজ্যপালের এই অবস্থা অভূতপূর্ব!

উপদেষ্টাদের ব্যাপারটাও তথৈবচ। বি বি ঘোষ মুখ্য উপদেষ্টা। অবশ্য এটা গোড়া থেকেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন দিল্লি, মুখ্যউপদেষ্টা মানে প্রধান উপদেষ্টা নন। হাতের দফতরগুলি ছাড়া আর কারু দফতরের ব্যাপারে তাঁর তদারকীর ক্ষমতা নেই।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এম এম বসু। তিনি এখন ক্যাসুয়াল লিভে গিয়েছেন। আই সি এস থেকে অবসর নেবেন এ মাসেই। তিনি নাকি আর থাকবেন না। কারণ, দিল্লি তাঁর হাতে স্বরাষ্ট্র দফতর রাখতে ইচ্ছুক নন। তাঁর শূন্যস্থানে কেউ আসবেন কি? তাও কেউ সঠিক জানেন না।

আর এক উপদেষ্টা কিদোয়াই সাহেবের হার্টের অসুখ। তিনি গোড়া থেকেই পালাই পালাই করছিলেন। এখনও পা বাড়িয়ে।

চীফ সেকরেটারি, হোম সেকরেটারি, পুলিশ কমিশনার নিয়োগ নিয়েও প্রায় মাস খানেক টানাপোড়েন চলল। তারপর এক চীফ সেকরেটারি বসলেন। তাঁকেও আবার মাস পাঁচেকের মধ্যেই সরানো হল। দিল্লির নাকি তাঁর উপর তেমন ভরসা নেই। কিন্তু সেই তাঁকেই দিল্লি উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন। তাঁকে কয়েকটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ দফতর দিয়েছেন।

এখন একটা চরম অনিশ্চয়তা চলছে পুলিসের আই জি নিয়োগ নিয়ে। পুলিস, যেখানে আজ সবচেয়ে নিশ্চয়তা প্রয়োজন সেখানেই সবচেয়ে অনিশ্চয়তা। ডি আই জি, ডি সি, এস পিরা সবাই ভাবছেন, কে আই জি হবেন। অথচ, দিল্লির কর্তারা চুপচাপ।

রাজধানীর কর্তারা কী চান?

১৪।১১।৭০

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

দ্য গল
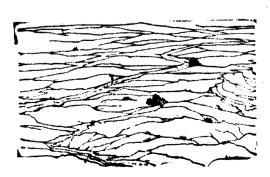
কে যেন বলেছেন ফরাসীদের তিন অবতার—জোয়ান অব আর্ক, নেপোলিয়ন আর দ্য গল। ঠাট্টা করেই কথাটা বলা হয়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু অস্বীকার করে উপায় নেই ফ্রান্সের ইতিহাসের মোড় ফিরিয়েছেন ও'রা তিনজন। ইংরেজদের কবল থেকে ফ্রান্সকে বাঁচিয়েছিলেন জোয়ান অব আর্ক পনেরো শতকে, ফ্রান্সকে নতুন রূপ দিয়ে তাকে একটা দুর্ধর্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন নেপোলিয়ন আঠারো-উনিশ শতকে, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তার মরা গাঙে বান ডাকিয়েছিলেন দ্য গল এই বিশ শতকে। এ'দের যদি ফরাসীরা অবতারের মত ভক্তি করে তা হলে সে কাজকে খুব বাড়াবাড়ি বলা বোধ হয় চলে না। দ্য গলের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ফরাসী রাষ্ট্রপতি পঁপিদু যে বলেছেন, ফ্রান্স আজ বিধবা হলো তাতে ভাবের আতিশয্য অনেকখানি আছে বটে, কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই। পঁপিদু অবশ্য দ্য গলের চেলা। দ্য গলের দৌলতেই তিনি আজ ফরাসী প্রেসিডেণ্টের গদি পেয়েছেন। তাঁর তো গুরুর মৃত্যুতে শোক হবার কথাই। কিন্তু তিনি একা নন, ফ্রান্সসুদ্ধ লোক চোখের জল ফেলেছে দ্য গলের মৃত্যুতে।

অথচ মরার সময় তিনি ছিলেন একজন সাধারণ নাগরিক, এককালের জেনারেল আর প্রেসিডেণ্ট, মারা তিনি অসময়েও যাননি। মরণকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল উন আশী, আর বারোদিন বাঁচলেই আশী পুরতো। লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করতো বয়েসে তিনি প্রবীণ ছিলেন বলে নয়, সত্যিই তিনি নবীন ফ্রান্সের জন্মদাতা বলে। পঞ্চাশ বছর বয়েস পর্যন্ত রাজনীতি তাঁর নেশাও ছিল না, পেশাও ছিল না। ১৯৪০ সন পর্যন্ত তাঁর পেশা ছিল যুদ্ধ করা, আর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, নেশা ছিল লড়ায়ের নতুন কায়দা বের করার চেষ্টা করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি নাম কেনেন একজন অফিসার হিসেবে। সে যুদ্ধের শেষ বছরটা তাঁকে কাটাতে হয়েছে জার্মানদের বন্দী শিবিরে। মুক্তি পাবার পর তিনি কখনও লড়াই করেছেন, কখনও বা দেশে দেশে ঘুরেছেন সেনাবাহিনীর ভার নিয়ে। মহাযুদ্ধের সময় যেমন তাঁর নাম হয়েছিল তাঁর সাহস আর-বীরত্বের জন্যে, তেমনই শান্তির সময় তাঁর সুখ্যাতি হয়েছিল লড়ায়ের কায়দা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা আর নতুন ধরনের ভাবনার জন্যে। ১৯৩৭ সনে তাঁকে করা হলো জেনারেল।

এর দু বছর বাদে বাধলো আবার লড়াই। সে লড়াইতেও অসাধারণ রণকৌশল আর বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন দ্য গল যতদিন ফ্রান্স নাৎসি-বাহিনীর সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিল। জার্মানদের অজেয় সাঁজোয়া বাহিনী একমাত্র দ্য গলের কাছেই হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল ১৯৪০ সনে। রেনো তখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী। দ্য গলকে ডেকে তিনি তাঁকে জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রীর পদে বসিয়ে দিলেন। রাজনীতিতে দ্য দলের সেই হাতে খড়ি। এরপর থেকে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু। শেষ হলো সামরিক পালা, এলো রাজনীতির পর্ব। নাৎসিদের আক্রমণে ফ্রান্স যখন ভেঙে পড়লো, রফা করলো তাদের সঙ্গে ফরাসী সরকার, দ্য গল তখন চলে এলেন বিলেতে। সেখানে পত্তন হলো তাঁর মুক্ত ফ্রান্স আন্দোলন। তিনি ফরাসী জাতকে ডাক দিলেন প্রতিরোধের আগুন দিকে দিকে জ্বালিয়ে তুলতে। যাই হোক না কেন, প্রতিরোধের শিখা নিভে যেন না যায়, সে শিখা নিভবে না, এই ছিল দ্য গলের আকুল ডাক। ফরাসী তাঁবেদার সরকার রেগে গিয়ে তাঁর ফাঁসির হুকুম দিলে কী হয় তাঁর স্বদেশবাসী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

ফ্রান্সের মুক্তি আন্দোলন সার্থক হয়েছিল ২৬ আগস্ট ১৯৪৪ যেদিন দ্য গল প্যারিসকে মুক্ত করেন। নতুন শাসনতন্ত্র চালু করার ব্যবস্থা হলো ফ্রান্সে তারপর। মুক্ত ফ্রান্সের স্বাধীন সরকারের কর্তা ছিলেন দা গল। কিন্তু নতুন শাসনতন্ত্র চালু হবার আগেই রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বনিবনা হলো না বলে হঠাৎ ইস্তফা দিয়ে বসলেন তিনি ২০ জানুয়ারি ১৯৪৬ সনে। বারো বছর তিনি ফরাসী সরকারের বাইরে ছিলেন—১৯৪৬ সন থেকে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত। ওই এক যুগ ধরে ফ্রান্সে যা চলেছিল তাকে বলা যেতে পারে শিবহীন যজ্ঞ। ওই বারো বছর ফ্রান্সে মন্ত্রিসভা গড়েছে আর ভেঙেছে। দা গল বাইরে থেকে সব দেখছিলেন। ফরাসী জনগণের নব জীবন বলে একটা সংগঠন তিনি গড়ে তুলেছেন, কিন্তু সেটা রাজনৈতিক দলও বটে, আর নয়ও বটে। ক্ষমতা দখলের যদিও কোনও চেষ্টা তিনি করেননি ওই বারো বছর, আবার কিন্তু তাঁকে ফিরে আসতে হলো ১৯৫৮ সনে। তখন আলজিরিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সের হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা—না পারে গিলতে না, পারে ওগরাতে। লড়াই চলছে সেখানে প্রচণ্ড, টাকা খরচ হচ্ছে জলের মত, লোকও মারা যাচ্ছে বিস্তর, কিন্তু নিষ্পত্তির কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

দ্য গল ফিরে আসার পর আবার বদলালো ফ্রান্সের সংবিধান। যুদ্ধের সময় ছিল তৃতীয় প্রজাতন্ত্র, যুদ্ধের পর এলো চতুর্থ প্রজাতন্ত্র, তাকেও বাতিল করে দ্য গল চালু করলেন পঞ্চম প্রজাতন্ত্র ১৯৫৯ সনে। তার আগে ১ জুন ১৯৫৮ থেকে তিনি ছিলেন প্রধান মন্ত্রী, নতুন সংবিধানের পর তিনি হলেন প্রেসিডেণ্ট। বারো বছর একটানা তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, মৃত্যুর সময়ও থাকতেন যদি না গত বছর একটা গণভোটের রায় তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়াতে তিনি স্বেচ্ছায় গদি ছেড়ে দিতেন। সে গণভোটের রায় তাঁর পক্ষে না গেলে তাঁকে গদি ছাড়তে হবে এমন কোনও কড়ার ছিল না। অন্য কেউ ওই কারণে ইস্তফা দিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু দ্য গল ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। গণভোটের রায় তাঁর আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছিল। তাই কোনও তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে গদি ছেড়ে চলে গেলেন গাঁয়ের বাড়িতে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১০ নভেম্বর, আর সেখানেই হয়েছে তাঁর সমাধি সাদাসিধেভাবে। দ্য গল তাঁর উইলে বলে গিয়েছিলেন তাঁকে কবর দেওয়া হবে তাঁরই গাঁয়ে, মানা করে গিয়েছিলেন সে সময় কোনও জাঁকজমক করতে।

ফ্রান্স যখন তার সম্বিৎ হারিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তখন সে সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন দ্য গলই। ফ্রান্সের মুক্তিদাতা হিসেবে তাঁর নাম লোকে চিরদিন মনে রাখবে। শুধু সম্বিৎ ফিরিয়েই আনেননি, পঞ্চম প্রজাতন্ত্র গড়ে তাকে বাঁচিয়েছেন গৃহযুদ্ধ থেকে। শক্ত করেছেন তার সংহতি, তার সাম্রাজ্যের বোঝা নামিয়ে তাকে করে তুলেছেন সত্যিকারের গণতন্ত্র, দুনিয়ায় বাড়িয়েছেন তার ইজ্জত, আর ঘরে এনেছেন সমৃদ্ধির প্রকাশ। আলজিরিয়াকে তিনি ফ্রান্সের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে আফ্রিকায় নব যুগের সৃষ্টি করেছেন—ফ্রান্সের উপনিবেশ-গুলো তিনিই পাটে তুলে দিয়েছেন। শুধু ভিয়েতনাম তার স্বাধীনতা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে, তবে তার জন্যে দা গল একটুও দুঃখিত হননি, সে উপনিবেশ আবার জয় করার কোনও চেষ্টাই করেননি। গেল বছরও তিনি ফ্রান্সকে বাঁচিয়েছেন গৃহযুদ্ধ থেকে। কী ব্রিটেন কী আমেরিকা কেউ তাঁকে দেখতে পারতো না কেননা তাদের কাউকেই তিনি খাতির করে চলতেন না। তাঁর চেষ্টায় একটা তৃতীয় শিবির গড়ে উঠেছিল দুনিয়ায় মার্কিন আর রুশ শিবিরের বাইরে। আজ ফ্রান্সকে সবাই যে সমীহ করে চলে তার একটা কারণ তার পারমাণবিক অস্ত্র। সেও দেশের হাতে তুলে দিয়েছেন দ্য গলই।

ক্ষুদ্র শিল্পের গণ্ডী সম্প্রসারণ সম্পর্কে...

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-scale Industries Board) তার অন্তর্বর্তী অধিবেশনে সুপারিশ করেছেন যে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়ন-কর্মসূচী ব্যাপকতর করা উচিত এবং এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়-ইউনিটগুলিকেও তার আওতায় আনা উচিত। গত বছর জাপানে যে ভারতীয় ডেলিগেশন গিয়েছিলেন তাঁরাও একই অভিমত দিয়েছিলেন। বর্তমানে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংজ্ঞা অনুযায়ী ৭·৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিমাণ হলেই যে-কোন শিল্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে পরিচিত হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের এই সর্বোচ্চ সীমা আরও বাড়াতে ইচ্ছুক নন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলির যাতে আরও সম্প্রসারণ হয় সেজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ-সরবরাহ সংস্থাগুলি কিভাবে তাদের দাদন দেওয়ার নীতি নির্ধারণ করবে সে সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংকের দিক থেকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতি ঘোষণা করা উচিত বলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড মনে করেন; বোর্ডের মতে দীর্ঘকালীন ঋণ-দানের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংকের নীতি আরও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণকল্পে কোন কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক উদার ঋণ-দান নীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নে ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে ঋণ-গ্রহণকারীর যোগ্যতা (অর্থাৎ, ঋণের সদ্ব্যবহার করার এবং ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা) উপেক্ষা করা কোন ব্যাংকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির উচিত গ্রামের লোকদের সঙ্গে নিবিড় যোগ-সূত্র স্থাপন করে গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির আর্থিক প্রয়োজন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া।

কাঁচা মালের প্রয়োজন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বোর্ড বলেছেন, শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের জন্য লাইসেন্স প্রদান করার সময় শতকরা ৫০ ভাগ লাইসেন্স ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আলাদা করে রাখা উচিত। এক্ষেত্রে মনে রাখা যেতে পারে, আমাদের শিল্পজাত সামগ্রীর শতকরা ৪০ ভাগ আসে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-গুলি থেকে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্পর্কে বোর্ডের অভিমত হচ্ছে, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্য-গুলির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি কি করে ত্বরান্বিত করা
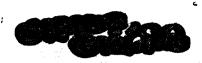
যায় সে সম্পর্কে বিবেচনাকে সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণকল্পে Small Industries Service Institute-এর কাজ আরও জোরদার করা উচিত বলে বোর্ড মনে করেন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উৎপাদিত জিনিস বাজারে যাতে ন্যায্য দরে বিক্রয় করা যায় এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিক্রয়-করণ ব্যবস্থা যাতে আরও উন্নত হয় সে সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। আমাদের দেশের "Industrial Estates"গুলির অনুরূপ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে "Commercial Estates" গঠন করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করার জন্য শিল্পোন্নয়ন এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যমন্ত্রী বোর্ডকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাছাড়া আমাদের দেশের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উৎপাদিত সামগ্রীর রপ্তানি কিভাবে আরও বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড সমীক্ষা চালাবেন বলে স্থির করেছেন।

কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা

সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী শ্রী চ্যবন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানে কর ব্যবস্থার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কর-ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি আলোচনা-চক্রে শ্রী চ্যবন ঘোষণা করেছেন যে, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার উপযুক্ত অর্থসংস্থানের জন্য করের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সম্পদ আহরণ করার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে। শ্রী চ্যবনের এ-ধরনের উক্তির ফলে অনেকের মনেই ধারণা হয়েছে যে, আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে কর-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে।

নয়াদিল্লিতে All-India Tax Executives Conference-এ কর-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। শিল্প-বিনিয়োগ এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উপর কর-ভার লাঘব করাই এই সুপারিশ-গুলির প্রধান উদ্দেশ্য। আন্তঃ-কোম্পানী মুনাফার উপর কর তুলে নেওয়া, যন্ত্রপাতি রপ্তানি করার জন্য যখন কোন কোম্পানীর সম্প্রসারণ করা হয় তখন বণ্টিত শেয়ারের উপর প্রদত্ত ডিভিডেন্ড কর-মুক্ত করা, এবং চার শত টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ কর-মুক্ত রাখা প্রভৃতি সুপারিশ এসেছে কর-দাতাদের দিক থেকে। হয়তো সবগুলি সুপারিশ সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-প্রচেষ্টার সম্প্রসারণকল্পে কোম্পানী-আয়ের ক্ষেত্রে কর-ব্যবস্থার কিছু রদবদল প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর-ব্যবস্থার ভূমিকা হচ্ছে বহুমুখী। শুধু যে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কর-ব্যবস্থার উপর সরকারকে নির্ভর করতে হয় তা নয়, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য, আয় ও ধনের বৈষম্য দূর করার জন্য এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় সঞ্চয় বাড়াবার জন্যও কর-ব্যবস্থার উপর সরকারকে নির্ভর করতে হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-মূলধন যেমন সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন, তেমনি বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার যাতে পুনর্বিনিয়োগ (re-investment) হয়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রাথমিক বিনিয়োগ থেকে মুনাফা প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ তখনই সফল হয় যখন কর-ব্যবস্থার খুঁটিনাটি জিনিস বিনিয়োগের পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়।

অনেকে আশা করছেন, আগামী বছরের বাজেটে সম্পদকরের হার বাড়বে এবং শহর অঞ্চলে সর্বোচ্চ পরিমাণে সম্পত্তির সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হবে। সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মূল্যের উপর কর-হার সু-উচ্চ করা উচিত এবং শেষ পর্যায়ে সম্পত্তির প্রান্তিক বৃদ্ধির উপর পুরোপুরি কর ধার্য করা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কর-ধার্য করার ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে? মূলধনী সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ এবং সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণে যে বিস্তর অসুবিধা আছে তা সুবিদিত; প্রধানত, এই কারণেই ব্রিটেনে 'রিয়েল এস্টেট ডিউটি' তুলে নেওয়া হয়েছিল। কর-ব্যবস্থার সংস্কার বাঞ্ছনীয়; কিন্তু কর-ব্যবস্থার সংস্কার শুধু নতুন কর ধার্য করা অথবা পূর্বতন করগুলির পুনর্বিন্যাস করা নয়। কর-নির্ধারণকারী অথবা কর-আদায়কারী কর্তৃ-পক্ষের প্রশাসনিক পরিবর্তনও একান্ত কাম্য। কর ফাঁকি বন্ধ করা আমাদের সব-চেয়ে বড় সমস্যাগুলির অন্যতম। কালো টাকার কালিমা জাতীয় অর্থনীতিকে ক্লেদাক্ত করেছে। আশা করবো, ওয়াংচু কমি-শনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে সম্ভাব্য সরকারী নীতি সম্পর্কে আঁচ পাওয়া যাবে।

সুব্রত গুপ্ত

দুর্দিনে সুদিনে

সমরেশ বসু

একটি অকাল মৃত্যু, আর একটি অকাল মৃত্যুর কথা আজ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ ভাবে আমাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কারণ আমার সাহিত্য জীবনের শুরুতে, দুজনেরই বিশেষ ভূমিকা ছিল। একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজন, যিনি সদ্য গত হলেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মানুষ নিজের কথা ভুলতে, পারে না। আমিও পারি না। আমার সাহিত্য জীবনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা, আজ তাই বিশেষ-ভাবে মনে পড়ছে।

ভাবিনি তো, তাঁর সম্পর্কে এসব কথা আমাকে এত তাড়াতাড়ি লিখতে বসতে হবে। ৭ নভেম্বর শনিবার 'দেশ' পত্রিকার অফিসে, সাগরদার কাছেই প্রথম শুনতে পেলাম, নারায়ণবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, হাসপাতালে রয়েছেন। সাগরদাকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত দেখলাম। ওঁর মুখেই শুনলাম, সুনন্দর জার্নাল লেখা শেষ করে, নারায়ণবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একটি ছোট ঘটনাও ব্যক্ত করলেন। জার্নাল লিখে আগেই নারায়ণবাবু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, পিওনের হাত দিয়ে। পিওন লেখাটি হারিয়ে ফেলেছিল। হারানোর বদলে বলা যায়, পিওন যখন সাইকেলের ব্যাগে লেখাটি রেখে, অন্যত্র কাজ মেটাচ্ছিল, তখনই লেখাটি কেউ তুলে নিয়ে যায়। এখন আমার ভাবতে ইচ্ছা করছে, সে লোকটি কে। সুনন্দর জার্নালের সেই পাণ্ডুলিপিটি এখন কোথায়, কার কাছে। কখনো কি সেই পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হবে। আমরা কি কখনো তা পড়তে পাব।

অতএব, নারায়ণবাবুর কাছে যখন খবর গিয়েছিল, লেখাটি খোয়া গিয়েছে, তিনি আবার লিখতে বসেছিলেন। এবং সেইটিই তাঁর শেষ লেখা। এসব কথা আলোচনা কালেই, একটা বিমর্ষ উৎকণ্ঠিত আবহাওয়ার মধ্যে, সাগরদা অফিস গুটিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। কিন্তু তখন কেউ বুঝতে পারে নি, আমরাও পারি নি, তিনি শেষ শয্যা নিয়েছেন।

এই মৃত্যু সংবাদের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

এ মৃত্যুকে স্বীকার করে নেবার জন্য একটি সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যেতে পারত, —যোদ্ধার মত, লিখতে লিখতেই তিনি শেষ শয্যা নিয়েছিলেন। কিন্তু আশা মেটে নি। অপূর্ণতার তৃষ্ণা যে এখনো তীব্র। এ মৃত্যু সান্ত্বনা দেবে কেমন করে।

এ মৃত্যু সাহিত্য ও সাহিত্যিককে কোন দিক থেকেই সান্ত্বনা দিতে পারে না।

শনিবার যখন তাঁর অসুস্থতার সংবাদ শুনলাম, তখন পটলডাঙার সেই অন্ধ বন্ধ গলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমার কাছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিন্তা মানেই, পটলডাঙার অন্ধ বন্ধ গলির সেই আধো অন্ধকার মত দোতলা বাড়ি। নিচের বসবার ঘর, সামনের চাতাল, দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, আশা বৌদি এবং দামাল শিশু-পুত্রটি। অনেকগুলো দিনের নানা স্মৃতি মনে জাগছে।

কলকাতা তখন আমার কাছে অনেক দূরে। রাস্তার দূরত্বে না, আমার অবস্থাই সেই দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। নিয়মিত কলকাতায় আসার মত সঙ্গতি ছিল না। তখন কেবল তাঁর বই পড়েছি। কলেজে পড়ুয়াদের মুখে তাঁর গৌরবর্ণ দীর্ঘকান্তি সুপুরুষ চেহারার বর্ণনা শুনেছি। চোখে দেখি নি। যখন চোখে দেখলাম, এগিয়ে গিয়ে পরিচয় করতে পারলাম না। কেবল 'উপনিবেশ'-এর বর্ণোজ্জ্বল ভাষাগুলো মনে পড়ছিল। একটা মফস্বলীয় সংকোচ এবং লজ্জা এগোতে দিল না।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তখন পরিচয় হয়েছে। মনের ইচ্ছাটা তাঁকেই জানালাম। তিনি বললেন, 'নারাণের সঙ্গে পরিচয় করবি, সে আর এমন কি কথা। ও তোকে লুফে নেবে। চ' আমার সঙ্গে।'

সেই প্রথম পটলডাঙায় যাওয়া। উনিশ শো বাহান্ন সালের শেষাশেষি সময়। সে সময়ে, আমার বুকে অনেক আশার ধিকি-ধিকি। কিন্তু চোখের সামনে সকলই অন্ধকার। আত্ম-পরিজনদের নিয়ে জীবনটাকে টিকিয়ে রাখা যাবে কী না, সেটাই সংশয়। স্বভাবতই একটা বিমর্ষ সংকোচের ভাব কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' তখন প্রকাশিত হয়েছে। ছোট গল্পের লেখক বলেই সে সময়ে যা একটু পরিচয়।

গলির শেষে বাড়ি ঢোকবার আগেই, জানালা দিয়ে নারায়ণবাবুকে দেখতে পেলাম, বসে আছেন। পবিত্রদা হাঁক দিলেন। নারায়ণদা তাড়াতাড়ি দরজায় এসে পড়লেন, 'আসুন পবিত্রদা।'

'দ্যাখ্, কাকে নিয়ে এসেছি। ওর নাম সমরেশ বসু।'

প্রথমেই শুনতে পেলাম, 'আরে বাহ্, চমৎকার।'

চশমার লেন্সের ওপার থেকে আমার দিকে একবার দেখলেন। হাত ধরে বসিয়ে বললেন, 'বসুন বসুন। প্রত্যেকটা গল্পই দারুণ। ওকে ডাকি।'

অর্থাৎ বৌদিকে। বৌদি এলেন। নানান আলোচনা শুরু হয়ে গেল। পবিত্রদাকে নারায়ণদা বললেন, 'আজ বিশেষ ভাবেই আপনার মিষ্টি পাওনা।'

আমার চোখের সামনের অন্ধকারটা যেন ফিকে হয়ে এল অনেকখানি। প্রথম দিনেই তাঁকে নারায়ণদা বলে ডাকতে পারি নি। ইচ্ছা করছিল। কারণ তাঁর সেই সুন্দর চেহারা, আচার আচরণ কথাবার্তা, সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়ে যেন সেই ডাকটাই জেগে উঠতে চাইছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমার অবস্থার কথা জেনে

গিয়েছিলেন। তারপরে যেন সহসাই মনে পড়ে গিয়েছিল, এমনি ভাবে বলেছিলেন, 'চলুন আপনাকে নিয়ে বেঙ্গল পাবলিশার্সে যাই। মনোজ বসু, শচীন মুখোপাধ্যায় দুজনেই খুশি হবেন।'

পবিত্রদা বললেন, 'আর আমি ফাঁকে পড়ে গেলাম। তোরা আমে-দুধে মিশে গেলি।'

পবিত্রদার কথাবার্তা এইরকমই। ফাঁকে পড়ার লোক তিনি মোটেই নন, ভালই জানতেন। আসলে নারায়ণবাবু একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আমাকে বেঙ্গল পাবলিশার্সে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিয়ে গিয়ে যে-ভাষায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা আজও স্পষ্ট মনে আছে, 'নিন, এবার থেকে যার বই ছাপতে হবে, তাকে ধরে নিয়ে এলাম। পারেন তো আজই কিছু অ্যাডভান্স করুন।'

এই পরিচয় করিয়ে দেবার সূত্রে বলা দরকার, মনোজদা এবং শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে যথেষ্ট স্নেহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

আজ বিশেষ করে, আমার সেই সব দুর্দিনের কথাই মনে পড়ছে। চরম দুর্দিন। বেঙ্গল পাবলিশার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে নারায়ণবাবু সেই দুর্দিনের অবসান করতে চেয়েছিলেন। করেও ছিলেন। কিন্তু সেখানেই ক্ষান্ত হন নি। তারপরেও তিনি সাহস করে আমাকে ডি এম লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'সাহস করে' শব্দটাই ব্যবহার করতে হয়। একজন নতুন লেখকের পক্ষে, ডি এম লাইব্রেরির সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদারের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যে কতো কঠিন ব্যাপার, অভিজ্ঞতা দিয়ে তা বিচার করা যাবে না।

নারায়ণদা পরিচয় করিয়ে দিলেন, ভাষার রকমফেরটা প্রায় একই। তিনি আমাকে একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে যেতে বলেছিলেন। শ্রীমতী কাফের বংশোধিত পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ আরক্তিম চোখে, গোপালদাস মজুমদার একবার আমার দিকে দেখলেন। পরমুহূর্তেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, নারায়ণদার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। নারায়ণদা আমার পাণ্ডুলিপিটি তুলে দিয়ে বললেন, 'আগে এটা নিন। পরে আরো অনেক চাইতে হবে। প্রথমটা আমার হাত দিয়েই আসুক।'
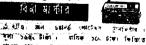
গোপালদাস মজুমদারের তাতে কিছুই এল গেল না। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্মানে আমাকে যে শুধু ফিরিয়ে দেওয়া গেল না, তা-ই না, সামান্য অর্থ প্রাপ্তিও ঘটল। কথাগুলো এখন এত সহজে লিখছি। সেই সময়ে সেই অর্থপ্রাপ্তি, একটা মুক্তির স্বাদের সঙ্গে যেন বুকের মাঝখানে ব্যথা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

নারায়ণদা-ই দিন স্থির করে দিয়েছিলেন, আবার কবে গিয়ে টাকার প্রার্থী হব। সেই স্থিরিকৃত দিনে যখন গোপালদাস মজুমদারের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, আমার বুক কাঁপছিল। তাঁর চোখে অপরিচয়ের দৃষ্টি। প্রথম জিজ্ঞাসা, 'কী চাই।'

ঢোক গিলে কোনরকমে নামটা বললাম। আমার সামনে এক ঘর ক্রেতা। পরবর্তী প্রশ্ন 'তা কী করতে হবে?'

পরিচয়টা আর একটু স্পষ্ট করার জন্য, নারায়ণদার কথা বললাম, এবং কোনরকমে টাকার কথাটাও বলে ফেললাম। ঠিক যেন বোমা ফাটলো, এত জোর ধমক। ক্রেতার দল চমকিত, আমি তৎক্ষণে দোকানের বাইরে। চোখে প্রায় জল এসে যাবার যোগাড়। সেখান থেকে সোজা নারায়ণদার পটলডাঙার বাড়িতে।

নারায়ণদা বাড়িতেই ছিলেন। সব শুনলেন। করুণ হেসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, 'এত ভেঙে পড়লে তো চলবে না ভাই।'

তারপরে বললেন, 'তবে গোপালবাবুকে আপনি যা ভেবেছেন, উনি তা নন। আপনি আশ্বস্ত হতে পারেন। আপনাকে আজ উনি যে-ভাষায় বলেছেন, তার চেয়েও খারাপ ভাষায় এক সময়ে স্বয়ং নজরুলকে বলেছেন।'

তারপরে অনামনস্ক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে আমি বলছি, একদিন এই গোপালবাবু আপনাকে খুঁজে বেড়াবেন।'

সেই সময়ে নারায়ণদার সেই ভবিষ্যৎবাণী আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী বিফলে যায় নি। আশ্চর্যরকম ভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল। ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকটা বছরও পার হয়ে গিয়েছিল। নৈহাটির বাড়িতে ফিরছি। পথেই একজন বলল, 'এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আপনার বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ভদ্রলোক বোধহয় ভাল চোখে দেখতে পান না। দু হাতে মিষ্টির ভাঁড়।'

অবাক হয়ে ভাবলাম, কে হতে পারেন। বাড়ি ঢুকে দেখি, গোপালদাস মজুমদার বসে আছেন। অনেক দিন আগের, নারায়ণদার কথা মনে পড়ে গেল। গোপালদাস মজুমদার তারপরেও অনেকবার নৈহাটি এসেছেন। সত্যি তাঁকে চিনতে পারি নি।

যে দুর্দিনের কথা বললাম, তা ছাড়াও সাহিত্যিকের জীবনে আরো দুর্দিন থাকে। সে দুর্দিন তার চিন্তার এবং ভাবনার। নারায়ণদা নানান ভাবে সেই চিন্তার জগতকেও আলোকিত করেছেন। সেই প্রসঙ্গ আর এই অল্প পরিসরে টেনে আনব না। কিন্তু একজন নতুন সাহিত্যিকের জন্য, যে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে, তার জন্য যে নারায়ণদা কত গভীরভাবে চিন্তিত হতেন, কিছুকাল আগেও তার আর একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম।

বৈঠকখানার বাড়িতে গিয়েছি। তিনি একজন নতুন লেখকের নাম করলেন। সেই লেখকের দু একটি লেখা আমিও পড়েছি। বাঙলা দেশের বর্তমান গ্রামীণ এবং কৃষক জীবন সম্পর্কে সেই লেখকের গভীর অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু সেই লেখক এমন একটি রাজনৈতিক দলের লোক, যার সঙ্গে নারায়ণদার কোন সম্পর্ক নেই, বরং বিরোধ ছিল।

সেই লেখকের বক্তব্য ছিল, পার্টির কাজের থেকে তিনি লেখক জীবনে বেশি মনোনিবেশ করতে চান। কিন্তু তাঁর পার্টির নেতা, সরাসরি সেটা নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, 'লেখা-টেখার কথা ছেড়ে দিন, আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হোন গিয়ে।'

সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে নারায়ণদা বললেন, 'এ রাজনীতি কোন্ কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করছে, বুঝতে পারছি না। এঁরা কি গর্কির কথা ভুলে গেছেন। তিঙ্ লিঙ্-এর কথা কি এঁদের মনে পড়ে না। এরকম একটা শক্তিমান কলমকে, পার্টি নেতা কেমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বললেন।'

বলতে বলতে নারায়ণদা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, সেই লেখক, নারায়ণদার মত একজন বিরোধী মানুষের কাছেই কেন তাঁর দুঃখের কথা জানিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি তাঁকে কী বললেন?'

নারায়ণদা বললেন, 'আমি বলেছি, আপনি আন্দোলন করুন, কিন্তু লেখা বন্ধ রাখবেন না। আপনার সংগ্রামী অভিজ্ঞতা থেকে, আমাদের বঞ্চিত করবেন না।'

নারায়ণদার মতই কথা। কিন্তু এসব কথা এভাবে, এত তাড়াতাড়ি আমাকে লিখতে হবে, তা জানতাম না।

সবচেয়ে নতুন, সবচেয়ে মোলায়েম, হাওয়ার চেয়ে হাল্কা লিপস্টিক
ল্যাক্মে
আলট্রা-গ্লো
আর
আলট্রা-ফ্রস্ট
লিপস্টিক
নানা রঙে রঙীন ঝলকানি—
এঁকে চলে রেশমী মসৃণ গতিতে
ঠোঁটের এই রঙের খেলা, দেখে হয় মন উতলা!

বনফুলের পত্র

শ্রীমান নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু,
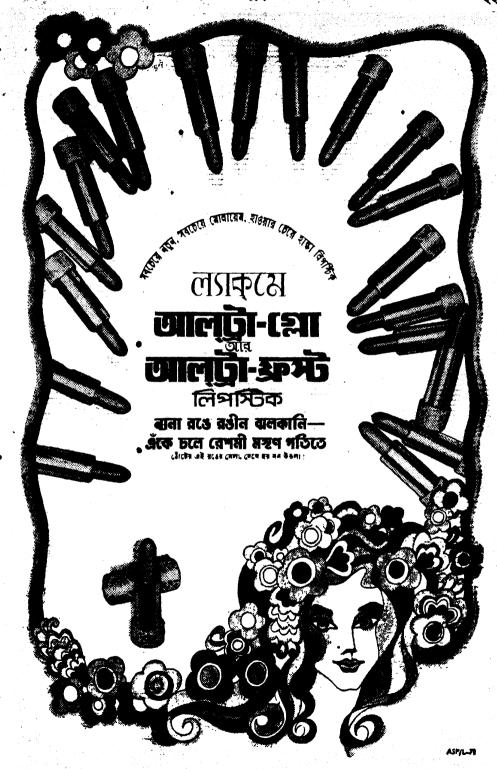
ভাই নারান,

আবার তুমি ঠিকানা বদলে ফেললে হঠাৎ। শেষ পর্যন্ত দেখাই হ'ল না তোমার সঙ্গে। তোমার শোক-মিছিলেও যেতে পারি নি। অসম্ভব ছিল বলেই পারি নি। মিছিলের ভিড়ে তোমার শবের উপর মাল্য-অর্পণ করছি এই মর্মান্তিক দৃশ্য রচনা করা সত্যিই অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে। কিন্তু খবরটা পাওয়ার পর থেকে আমরা (তোমার বউদিও) তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি মনে মনে। সর্বদাই আছি। কত কথাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে পনেরো টাকা খরচ করে আমার জন্যে একটা ইলিশ মাছ কিনে এনেছিলে বলে তোমাকে বকেছিলাম, মনে পড়ছে বড্ড বেশী লিখছ বলে তোমায় বকেছিলাম, মনে পড়ছে শরীরের সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছ না বলে বকেছিলাম। এখন সেই ভৎসনাগুলো মূর্তি ধারণ করে আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। তুমিও হাসছ।

আমার এ চিঠি তোমার কাছে পৌঁছবে না জানি, কিন্তু এও জানি এ চিঠির মর্ম তোমার কাছে পৌঁছবেই। সে মর্মটা কি তা স্পষ্ট করে লেখা যায় না, কিন্তু তোমার কাছে সেটা কোন-দিন অস্পষ্ট ছিল না, এখনও থাকবে না এ বিশ্বাস আমার আছে।

যেখানেই থাকো, সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো, আনন্দে থাকো এই কামনা করি। ইতি

শুভার্থী
বলাইদা

লেক টাউন
৯।১১।৭০

হে বন্ধু বিদায়

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বন্ধু নারায়ণ নেই।

ছোট্ট কথাটা কিন্তু কি অমোঘ কি মর্মান্তিক। জানি মানুষ অমর নয়—জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই একটি একটি দিন করে তার জীবনের কোষ মৃত্যুর দিনটির দিকে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যায় এবং যাবেও, তবু যখন সেই মৃত্যু অকস্মাৎ একপ্রকার বিনা নোটিসেই এসে দরজায় আঘাত হানে স্তম্ভিত ও বিহ্বল হয়ে যেতে হয় যেন। নারায়ণের মৃত্যুও ঠিক তেমনিই যেন অকস্মাৎ এসে আমাকে এবং সকলকে বিমূঢ় করে দিয়েছে। অনেকগুলো বছরের পরিচয় নারায়ণের সঙ্গে আমার। শীতের এক অপরাহ্ণে বোধ হয় সেটা ১৯৩৫ সাল। আনন্দবাজারের অফিস ছিল তখন বর্মণ স্ট্রীটে—তারই 'দেশ' পত্রিকার অফিসে বসে আছি এমন সময় এক পাতলা দীর্ঘ দেহী উজ্জ্বল গৌর, এক মাথা চুল, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ন নাসা, বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক হাস্যোজ্জ্বল দুটি চোখ এক যুবক এসে ঘরে ঢুকল।

পবিত্রদা আলাপ করিয়ে দিলেন, একে চিনিস—নারায়ণ গাঙ্গুলী।

সেই আলাপ আমার নারায়ণের সঙ্গে। নারায়ণ তখন দেশ পত্রিকায় গোটা দুই কবিতা লিখেছে—আর আমার গোটা তিনেক গল্প বের হয়েছে বোধ হয়। এম-এ ক্লাসের ছাত্র নারায়ণ তখন হেদোর কাছে একটা বাড়িতে বোধ হয় থাকত। দেশ পত্রিকার অফিস থেকে দুজনে এক সময় বের হলাম গল্প করতে করতে তার সঙ্গে তার বাসায় গেলাম। কিছুদিন পরে সেই বাসাতেই একদিন কথায় কথায় আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল তার 'উপনিবেশ' উপন্যাসের কয়েকটি পাতা। শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল অমন করে যদি লিখতে পারতাম। কি তীক্ষ্ন ভাষা—শব্দের অলংকারের কি ঝংকার।

কি আকর্ষণ ছিল জানি না তার চেহারায়, কথাবার্তায় ও স্বভাবে; কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে দেখতে তাকে যেন ভালবেসে ফেললাম। তারপর সেখানে ও পরবর্তী কালে বন্ধুত্ব আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তার পটলডাঙ্গার বাসায় কত দ্বিপ্রহর, কত সন্ধ্যা—কত রাত্রি কোথা দিয়ে যে কেমন করে কেটে গিয়েছে জানি না। জীবনে অনেক সাহিত্যিকের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু অমন করে বলতে আর কাউকে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। কথায় যেমন তীক্ষ্ন ধার, তেমনি কৌতুকের ঝিলিক। বুদ্ধির ক্রিস্টাল থেকে যেন আলো ঠিকরে বেরুত। ওর কথা শোনা যেন আমার একটা নেশার মতই ছিল। নারায়ণ যেন সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। ওর সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা শুনলেই মনে হতো ওর পড়াশুনা কি প্রচুর—কি অসাধারণ স্মরণশক্তি, কি তীক্ষ্ন বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তি। কিন্তু ওর সাহিত্যের বিচার আমার নয় সেজন্য বিদগ্ধজন আছেন আর তার বিচারও হয়েছে ভবিষ্যতে হয়ত আরও হবে। মানুষ হিসাবে ঘনিষ্ঠ ভাবে আমার তাকে জানবার যে সুযোগ হয়েছিল এক সময় দিনের পর দিন, সেই মানুষটার কথাই দু এক কথায় বলবো।

কৌতুক ও রহস্যালাপী নারায়ণ সর্বক্ষণই যেন একটা মৌজের মধ্যে থাকত। আমার ডিসপেনসারী তখন খান্না সিনেমার পাশে সার্কুলার রোডে—নারায়ণ থাকত পটলডাঙ্গার এক বাসা বাড়িতে, প্রায়ই সে আমার ডিসপেনসারীতে আসত আমিও যেতাম তার পটলডাঙ্গার বাসায়—যে পটলডাঙ্গাকে সে চিরস্মরণীয় করে রেখে গিয়েছে তার সাহিত্যের পাতায় ছোটদের জন্য লেখা গল্প পটলডাঙ্গার টেনীদার চরিত্রের মধ্যে। আমাদের একটা 'জয়যাত্রা' বলে কিশোরদের পত্রিকা ছিল, সেই জয়যাত্রায়ই বোধ হয় তার প্রথম টেনীদার গল্প বের হয়, শিবরাম হাসির গল্পের রাজা—আজও প্রৌঢ় বয়েসে তার একটি গল্পও আমি বাদ দিই না তেমনি নারায়ণের হাসির গল্পও বাদ দিতাম না। মনে সব ভাবনা চিন্তা যেন এক অনাবিল আনন্দে মুহূর্তের জন্য ভেসে যায়। টেনীদার প্যালার কাহিনী আর শোনা যাবে না হাসির গল্পের জগতে

যে এ কত বড় ক্ষতি যারা সামনের বছরে পূজো বার্ষিকীগুলো ছোটদের জন্য পড়বে তারাই বুঝবে।

ঐ টেনীদার গল্পগুলোর মধ্যেই যেন মানুষ নারায়ণের একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। অমনি রহস্যপ্রিয় অমনি কৌতুকপ্রিয় হাস্যময়।

দু একটি ঘটনা বলি। বোধ হয় রাত আটটা কি সাড়ে আটটা। বর্ষাকাল, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। কোথায় গিয়েছিলাম বা কোথায় যাচ্ছিলাম আজ আর মনে নেই, তবে আমার গাড়িতে ছিলেন তারাশংকরদা আর ছিলাম আমি ও নারায়ণ। আমিই গাড়ি ড্রাইভ করছিলাম। রাস্তাঘাট জলে কাদায় প্যাচ প্যাচ করছে, অন্ধকার কিছুই চোখে পড়ে না। নারান হঠাৎ বলে উঠলো, নিরুপায় একান্ত তোমার হাতে প্রাণ সমর্পণ করেছি রাখতে হয় রাখ, মারতে হয় মার।

তারাশঙ্করদা হাসলেন, বললেন, কেন ওতো ভালই ড্রাইভ করছে। নারান বললে, ভাল কি মন্দ জানি না দাদা তবে ও যেভাবে বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে তাতে যেন মনে হচ্ছে—

তারাশংকরদা বললেন কি!

দক্ষিণ দুয়ার খোলা—যমের, বসন্তের নয়। পেঁাছাব হয়ত ঠিকই তবে সেটা মর্ত্যলোকের কোন ঠিকানায় না সোজা প্রেতলোকে তাই ভাবছি।

সেদিন কিন্তু সত্যি সত্যিই ভয়াবহ একটা অ্যাকসিডেনটের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। আমার জন্য বলছি না, বলছি পরবর্তী যুগের সাহিত্য সম্রাট তারাশংকরদা ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সমালোচক-শিক্ষাবিদ সর্বজনপ্রিয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য। ভাবতে শিউরে উঠি এখনো, একটা অঘটন ঘটলে দেশের কি অপূরণীয় ক্ষতিই না হতো।

আমি কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে সহাস্যে জবাব দিয়েছিলাম, ভালই ত হয়, রাতারাতি দাদা ও তোর সঙ্গে বিখ্যাত হয়ে যেতে পারি পরের দিনের সংবাদপত্রের কলমে।

নারান আবার বলেছিল, বিখ্যাত হবার ওর চাইতেও সোজা পথ আছে তোমাকে বাত্লে দেবো।

যথা—

টাকে চুল গজানো। যদি পারো কোন একটা ঔষধ বের করতে টাকে চুল গজানোর তাহলে আর দেখতে হবে না দধীচির মত অমর।

ঠিক ঐ সময়ই একটা ঘোড়ার গাড়ি অন্ধকারে হঠাৎ বেমককা সামনে এসে পড়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে পাশ না কাটাতে পারলে চুরমার হয়ে যেত গাড়ি। গাড়ির বনেটে একটা লম্বা গভীর ক্ষত চিহ্ন ও ঘোড়ার গোটা চারেক দাঁতের উপর দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটেছিল সে রাত্রে সামান্যের জন্য ভয়াবহ এক দুর্ঘটনার।

নারান একটু পরেই বলে উঠল, দেখলেন ত দাদা—ওর গাড়িতে চাপার আগে লাইফ্ ইনসিওর করে আসা উচিত।

আরেক দিনের একটা ঘটনা।

নারানের পটলডাঙ্গার বাড়িতে গিয়েছি নারান একটা বই হাতে তুলে দিল।

কি বই।

টোপ—তোমাকে ডেডিকেট করেছি—

অদ্ভুত নাম ত বইটার।

হ্যাঁ—একটা জ্যান্ত ছেলে টোপ ফেলে বাঘ শিকার।

কি ভয়ংকর—

ডাক্তাররাও ঐ ভাবেই জল জ্যান্ত মিথ্যে কথা বলে রোগীর সামনে টোপ ফেলে বাঘ শিকার করে—

অর্থাৎ—

অর্থাৎ চিকিৎসার যাঁরা মৃত্যুর দিন যদি বা ও এসে থাকে তো তাকে বিলম্বিত করা।

তাই তোমার টোপ আমার হাতে।

হাঁ—বলা ত যায় না। হয়ত শেষ মুহূর্তে তোমাকেই ডাকতে হতে পারে—

তখন কি জানি তার সেদিনকার সেই কৌতুক কথা কত বড় সত্যি হয়ে বহু বছর পরে আমার জীবনে দেখা দেবে।

নারায়ণের শেষ রোগের শয্যার পাশে আমরাই ডাক পড়ল।

আশ্চর্য! এখনো যেন ব্যাপারটা ভাবতে পারছি না। শুক্রবার সকাল বোধ হয় সোয়া নটা হবে, হাসপাতালে যাবো বলে গাড়িতে উঠছি দেখি অল্প দূরে ও অন্য একটা গাড়িতে কয়েকজনের সঙ্গে উঠছে। আমাকে দেখে ডাকল, নীহার শোন—

এগিয়ে গেলাম, কি ব্যাপার কোথায় চলেছো! ঘোড়দৌড় পতি হচ্ছে নাকি? (ও সপ্তাহান্তিকে বলত ঘোড়ারপতি।)

ও হাসল। তারপর বললে, একটা জরুরী দরকার আছে তোমার সঙ্গে সন্ধ্যার পর দেখা হবে—

বললাম, এত দৌড়াদৌড়ি পরিশ্রম কর কেন।

বললে, অনেক বছর তো বাঁচলাম এবারে ক্লান্ত রাগিণীতে যাবার বাঁশী বাজে যদি বাজুক না। যাক চললাম—দেখা হবে—তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছি মনের মধ্যে ও শেষ যাত্রার নোটিশ পেয়ে গিয়েছে। যার ইংগিত সে আগেই দিয়ে রেখেছে ঐ সপ্তাহের সুন্দর জার্মানীর পাতায় শেষের কয়টি লাইনে এবং তার সকাল বেলার সেই কথাগুলো নিষ্ঠুর সত্যের মত ঐ দিনই রাত সাড়ে এগারোটায় আমার ঘরের দরজায় এসে ঘণ্টি বাজিয়ে তার শেষ যাত্রার সাক্ষী হতে ডাকলে আমাকে।

নারায়ণ একদিন বলেছিল মাত্র কিছু দিন আগে কথায় কথায়, দেখো ভাই সত্যি কথা বলা বড় কঠিন তাই হয়ত বেশীর ভাগই মিথ্যে আমরা বলি কিন্তু সত্য এমনই বস্তু—কখন কোন মুহূর্তে যে তোমারই মুখ দিয়ে বের হয়ে আসবে তুমিও তা জান না। তাই কি না। না ওটা নারানের প্রিয় নিশন।

রাত সোয়া এগারোটা নাগাদ হঠাৎ ডাকে ঘুমটা ছুটে গেল। নারান অসুস্থ এখুনি যেতে হবে। ছুটে গেলাম—যাকে চিরদিন হাসি মুখে কৌতুক কণ্ঠে অভ্যর্থনা করতে শুনেছি সে সেদিন অভ্যর্থনা জানাল না, তখন কি জানি দুরারোগ্য ছিমিপ্লিজিয়া (সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে) সে মূক হয়ে গিয়েছে আর সে কথা বলবে না। অনেক কথা বলে সে আজ ক্লান্ত স্তব্ধ মূক। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম শয্যার পাশে। বুঝতে দেরী হলো না—সেরিব্রাল থ্রম্বসিস্ হয়েছে। সেই রাত্রেই এক ঘণ্টার মধ্যে অনুজপ্রতিম ডাঃ দেবু মুখার্জিকে ডেকে ওকে হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স করে পাঠাবার সব ব্যবস্থা করা হলো। হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হলো। সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে কিন্তু তখনো।

পরের দিন সকালে হাসপাতালে দেখতে গেলাম। চিরদিনের রহস্যপ্রিয় নারান বেড়ে অসহায়ভাবে শুয়ে আছে, কথা বন্ধ—ডান

দিকটা শরীরের সম্পূর্ণ পঙ্গু। কিন্তু জ্ঞান পুরোপুরি রয়েছে। ডাকলাম সাড়া দিল মাথা নেড়ে।

বললাম চিনতে পারছো, মুখে হাসি দিয়ে জানাল হ্যাঁ।

কেমন আছো।

মাথা নেড়ে জানাল ভাল।

কষ্ট হচ্ছে না ত কিছু?

মাথা নেড়ে জানাল না।

রাত্রে আবার গেলাম। আবার কথা বললাম। সাড়া পেলাম ইংগিতে জ্ঞান টন টনে। সেই সময়েই ব্লাড রিপোর্ট এলো, ২৪৫ ব্লাড স্যুগার। কেঁপে উঠল বুকটা ভয়ে। ডাইবেটিস ছিল তার অনেক দিন ধরে। নিয়মিত ইনেজেকশান ও ঔষুধ খেতো। আক্রান্ত হবার দিনও বাদ যায়নি।

একটা কথা বলবো—রোগটা যতই আকস্মিক হোক না কেন—পূর্বেই জানান দিয়েছিল কিন্তু—দিন সাতেক আগেই।

ডান হাতে Cramps—ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা—তা সত্ত্বেও সে লিখে গিয়েছে, কোন বড় ডাক্তারের পরামর্শ নেয়নি, বিশ্রাম নেয়নি, কেন নিল না। তবে কি সে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল সত্যি সত্যি!

চিরদিনের রহস্যপ্রিয় নারায়ণ একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, অচিন্ত্যবাবুর দুইবার রাজা গল্পটা আমার খুব ভাল লাগে।

রাজার মতই যেন চলে গেল বন্ধু নারায়ণ।

আমার বাড়ির পাশে বাড়ি কিনে আসবার পর একদিন বলেছিল আমার ঘরে বসে, তোমার এখানে এতদিনে এলাম নীহার, একেবারে পাশাপাশি।

বললাম খুব ভাল হলো। ইদানীং তো দেখা সাক্ষাৎ হত না, এখন প্রত্যহ দেখা হবে।

হ্যাঁ সেটাই তো সব চাইতে বড় সুবিধা আমার, ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না—যেমন তেমন প্রয়োজন হঠাৎ হলে পাবো তোমাকে।

তারাশঙ্করদাকেও নাকি নারান একদিন কথাটা বলেছিল।

কিন্তু কি করতে পারলাম তার।

এতগুলো ডাক্তারকে অসহায় ব্যর্থ করে দিয়ে চলে গেল।

ডাক্তাররা সত্যিই—আমরা কত অসহায়।

তাঁর শেষ যাত্রার ছবিটা যেন এখনো চোখের উপর ভাসছে।

ফুলে ফুলে ঢেকে গিয়েছে মরদেহ।

নগরীর পথে শেষ পরিক্রমায় বের হয়েছে ১৯৭০ সনে—১৯৩৫য়ে যে যুবক এই নগরীর পথে এসে পা ফেলেছিল, দুর্বার গতিতে যে মাঝখানের বছরগুলো নগরীর মধ্যে পরিক্রমা করেছে সে আজ বের হয়েছে শেষ পরিক্রমায়।

দিনের সূর্য অস্তাচলমুখী।

আকাশ বিষণ্ণ।

ফুলের রথ কেওড়াতলায় প্রবেশ করল।

মনে হলো কে যেন পাশে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেল : হে বন্ধু। বিদায়। কেমন, বলেছি সেদিন সকালে অনেক বছর তো বাঁচলাম এবারে ক্লান্তরাগিণীতে যাবার বাঁশি বাজে যদি বাজুক না।

আমাদের মাস্টারমশায়

কণা বসু

রেডিওর অ্যানাউন্সমেণ্ট শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম—"প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর আজ আমাদের মধ্যে নেই।"

আমার চোখের সামনে পর পর ভিড় করে দাঁড়াল অনেকদিনের অনেক দৃশ্য, অনেক কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংয়ের ১৮বি-র বাংলা ক্লাশ...। কানের মধ্যে যেন বাজতে লাগল রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের ছোট গল্পের কথা, গর্কীর কথা, টলস্টয়, চেকভ্, মোপাসাঁর কথা, জাতকের গল্প, ব্রাহ্মণ বিষ্ণু শর্মার কথা, ভারতবর্ষে ছোটগল্পের জন্মের কথা।

আমি ছিলাম ব্যাক-বেঞ্চার, ফাঁকিবাজ। ইউনিভার্সিটির দীর্ঘ একটি ঘণ্টার ক্লাসগুলো যেন আর কিছুতেই কাটতে চাইত না। তাই প্রায়ই নানা ক্লাশ পালিয়ে কলেজ স্কোয়ার, কফি-হাউসে আড্ডা দিতাম। কিন্তু ওদিকে পারসেণ্টেজ রাখবার গরজও ছিল কম নয়। তাই একদিন যখন ক্লাশ শেষ করে ফিরছেন স্যার, আমি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ওঁকে একটা স্লিপ দিলাম। বললাম, "স্যার, পেছনের বেঞ্চিতে ছিলাম, আপনি আমার গলা শুনতে পাননি।"—স্লিপটা হাতে নিয়ে মুচকি একটু হাসলেন নারায়ণবাবু। বললেন, "তুমি তো আজ ক্লাসে ছিলে না।" বিনীতভাবে হেসে বললাম, "স্যার, আমার বাবার অসুখ, এই পিরিয়ডে তাই আসতে পারিনি।" উনি তাকালেন। চশমার মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল দুটি চোখ আমায় সহানুভূতি জানাল। বললেন, "তাই নাকি? কি হয়েছে তোমার বাবার?" পরে কিন্তু অনুশোচনা হয়েছিল তাঁকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম বলে। তারপরের সপ্তাহের ঘটনা। আবার আমি অনুপস্থিত তাঁর ক্লাসে। স্বভাবদোষ নাকি মানুষের কোনদিনই যায় না। মাস্টারমশাই ক্লাস থেকে বেরুচ্ছেন, পথ আটকে দাঁড়ালাম আমি। স্লিপ দিলাম। ট্রাম, বাসের জন্য দেরী হয়েছে বলতে গিয়েও মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "মায়ের অসুখ স্যার।"—স্যার তাকালেন। কিন্তু সেদিন তাঁর চাউনিতে সহানুভূতির বদলে যেন কৌতুক। এর পর দু' তিন সপ্তাহ যথারীতি চলল আমার ক্লাস। অন্য পিরিয়ডগুলো ইচ্ছে মতন ছুটি করে নিলাম শুধু তাঁর ক্লাসটি ছাড়া। আবার একদিন পালালাম নারায়ণবাবুর 'অনুপূর্বার' ক্লাসে। তারপর ক্লাসের শেষে তাঁকে ঘেরাও করলাম করিডোরে। স্যার হেসে বললেন, "কি ব্যাপার? আজ তোমার ঠাকুমার অসুখ বুঝি?"—আমি মাথা চুলকে বললাম, "না স্যার, ঠাকুমা আমার জন্মের অনেক আগেই...।" আমায় কথা শেষ করতে দিলেন না তিনি। বললেন, "যাক্, তিনি তাহলে রেহাই পেয়েছেন।" আজ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসছে ওঁর সেই ঠোঁটের হাসিটি। কালো চশমার ফাঁকের চোখ দুটোর দিকে তাকালে কখন ওঁকে চিন্তাশীল গম্ভীর অধ্যাপক মনে হত, কখন যেন তিনি বেমালুম ছেলেমানুষ টেনিদা হয়ে যেতেন।

মনে পড়ছে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটি। আমি তখন কলেজে পড়ি, ওঁর লেখা পড়ে পাগল। বিশেষ করে 'কালাবদর' পড়ে লেখককে একবার চোখে দেখবার জন্যে, তাঁকে একটিবার ধন্যবাদ জানানোর জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করছিল।

একদিন ইউনিভার্সিটির এক বন্ধুকে খোশামোদ করে ওর সঙ্গে উপস্থিত হলাম বাংলা ক্লাসে। কিছুক্ষণ পর বন্ধু খুব ডাঁট নিল। বলল, "অমন লোকের দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য কি সবার থাকে? উনি আজ ক্লাস নেবেন না বলে গেছেন।" কি আর করা? ভাঙা মন নিয়ে বেরিয়ে এলাম ইউনিভার্সিটি থেকে। থাকি সাউথে, পড়িও সাউথে, কলেজ স্ট্রীট পাড়া তখন সম্পূর্ণ অচেনা। এ পথ সে পথ দিয়ে ঘুরছি, হঠাৎ কলুটোলায় আবিষ্কার করলাম এক ভদ্রলোককে। দেখে মনে হ'ল যেন, স্বর্গের অ্যাঞ্জেল। দীর্ঘ দেহ, ফর্সা ধবধবে রঙ, খড়্গের মতন নাক, কালো ফ্রেমের চশমার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ভাবপ্রবণ চোখদুটি। আমি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। কেন যেন মনে হল, হয়ত ইনিই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, আপনি কি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়?" উনি একটু হাসলেন। আমি বিনা দ্বিধায় বলেও ফেললাম, "জানেন, আপনাকে দেখবার জন্যে আজ আমি ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলাম।"—কথা শুনে তিনি আরো জোরে হেসে বললেন, "কেন টেনিদার গল্প পড়ে?" বললাম, "না, কালাবদর পড়ে।"

শুনেছি লেখকরা নাকি খুব দুঃসাহসিক হন। জীবনকে দেখবার জন্য, বাস্তব জগৎ থেকে মালমশলা সংগ্রহের জন্য তাঁরা যে-কোন বিপদকে তুচ্ছ করতে পারেন। স্যারকে একদিন দেখেছিলাম টিয়ারগ্যাসের ধোঁওয়ায় চোখ ডলতে ডলতেও পুলিশের গুলির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। স্ট্রাইক হয়ে গেল ইউনিভার্সিটিতে। ছাত্র পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ চলছে। টিয়ারগ্যাসে চারদিক অন্ধকার। তার মধ্যে বন্দুকের গুলি। আমরা পালাচ্ছি কলেজ থেকে। নারায়ণবাবুকে দেখলাম ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন যেদিকে গোলমাল ঠিক সেদিকেই। আমরা ভীতভাবে বললাম, "স্যার, ওদিকে গোলমাল।" উনি একটু হাসলেন। বললেন, "জানি, তোমরা সাবধানে বাড়ি যাও।" আমরা তার পরের সপ্তাহেই

সুন্দর জার্নালে পড়েছিলাম সেদিনের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। রবীন্দ্রনাথ পড়াতে গেলেই উনি দুটি লাইন বার বার আওড়াতেন,

"আমি যে পথ দিয়া চলিয়া যাব,

সবারে যাব তুষি।"—

আজ মনে হচ্ছে, এ কথা ওঁর নিজের সম্বন্ধে কতখানি সত্যি। তাই তো আমাদের মতন তুচ্ছ ছাত্রছাত্রীদের দিকেও ওঁর ছিল দৃষ্টি। এম এ পরীক্ষার ফল বেরুনোর পর একদিন দেখা হল স্যারের সঙ্গে আনন্দবাজার অফিসে। আমি প্রণাম করলাম। উনি বললেন, "এবার বুঝি একটা চাকরী চাই?" হেসে বললাম, "না স্যার, এ আমার নাইনথ পেপার (অয়োলিং পেপার) নয়।" স্যার খুব হেসে উঠলেন। বললেন, "এসো একদিন।" কদিন পরই গিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে। মাস্টারমশায় বললেন, "তোমার সার্টিফিকেট আমি অনেক আগেই লিখে রেখেছি, কণা।" তাঁর নিজের হাতে লিখে দেওয়া লাইনগুলো কতবার করে যে পড়লাম! মনে হল, এসব যেন আমার কথা নয়। এতখানি প্রশংসা পাবার যোগ্যতা কি আমার আছে? উনি কত বড় লেখক ছিলেন, অথচ আমাদের লেখা দু এক কলম গল্প কোথাও পড়লে কি উৎসাহই না দিয়েছেন। সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ এসেছিলেন একবার ইউনিভার্সিটিতে। দ্বারভাঙ্গা হলে তাঁর বক্তৃতা চলছে। আমরা বাংলা বিভাগ সেখানে উপস্থিত। বক্তৃতার শেষে সুবোধবাবু যখন বিদায় নেবেন, স্যার হঠাৎ ডাকলেন আমায়। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। স্যার সুবোধবাবুকে বললেন, "আমাদের ছাত্রী কণা বসু। 'দেশ'-এর গোটা দুয়েক গল্প বেরিয়েছে।" —লজ্জায় আমার কান লাল। মনে হল, সমস্ত দ্বারভাঙা হল আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কোনরকমে সুবোধবাবুকে একটা প্রণাম করেই আমি ওখান থেকে পালালাম। সুবোধবাবুর লেখার আমি খুব ভক্ত হলেও সেদিন যেন আর কোন উৎসাহই রইল না ওঁর একটি অটোগ্রাফ নেবার। তখন লেখার পাতায় সবে আমার জন্ম। লেখক হিসেবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা ছিল অপরিসীম। অতএব ভয়ানক অভিমান হয়েছিল স্যারের ওপর, উনি মাত্র গোটা দুয়েক গল্পের কথা বলেছিলেন বলে। আমি তো অনেক কাগজেই লিখছি, সেকথা কি উনি জানেন না? পরে একদিন স্টাফরুমে তাঁকে একা পেয়ে মনের দুঃখ আর চেপে রাখতে পারিনি। মাস্টারমশায় বেশ একচোট হেসে বললেন, "সত্যি, এ ভারী অন্যায়। বেশ, কতগুলো গল্প তোমার বেরিয়েছে আমায় একটা লিস্ট করে দিও, এরপর যেদিন সুবোধবাবুর সঙ্গে দেখা হবে, সেদিন বলে দেব।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরিয়ে যখন কর্মক্ষেত্রে এলাম, তখন কিন্তু দেখা হলে আর অমন ছেলেমানুষী করতে পারতাম না। এই তো কিছুদিন আগে দেখা হ'ল গড়িয়াহাটায়। উনি বাজার করে গাড়িতে উঠছিলেন। আমি, "স্যার," বলে একটা প্রণাম করতেই উনি বললেন, "আরে তুমি? খুব রোগা হয়ে গেছ দেখছি। কি করছ এখন? একদিন এসো আমার বাড়ি। আমি তো এখন তোমাদের পাড়ারই বাসিন্দা।"

এক রোববার সকালে গিয়েছিলাম ওঁর গোলপার্কের বাড়িতে। দরজায় বেল টিপতেই উনি এসে দাঁড়ালেন। মনে হ'ল, মাস্টারমশায়ের শরীরটা যেন অনেক ভেঙে পড়েছে। খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল তাঁকে। সেদিন কি জানতাম এটাই আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা? আমায় দেখে খুব খুশী হ'য়ে বললেন, "এসো, এসো। তা টেলিফোন করে এলে না কেন? আজ ইন্দ্রানির আসবার কথা আছে, তাই আমায় বাড়িতে পেলে, নইলে তো বেরিয়ে যেতাম।" পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা আশাদেবীর সঙ্গে। সেদিন আর আমার কোন ছেলেমানুষী আবদার ছিল না। আমার ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে হিমসিম খেয়ে মরছিলাম। ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বার করে কিছু লিখে নিলাম মাস্টারমশায়ের কাছে থেকে। সেদিন এতদিন পর আমার ইচ্ছে করছিল, আবার ইউনিভার্সিটির ছাত্রী হতে। ফাঁকিবাজ নয়, সিরিয়াস। অনুশোচনায় দগ্ধ হলাম, এম এ ক্লাসের দিনগুলো অবহেলায় কাটিয়েছি ভেবে। ওঁর কথা যতই শুনেছিলাম ততই মনে হচ্ছিল, এত পাণ্ডিত্য, এত সুন্দর করে বলবার ভঙ্গি, এত উইট, এত স্যাটায়ার, এত হিউমার আমরা আর কোথায় পাব? সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কবিতা পড়াতে গিয়ে তিনি মূলে ফরাসী ভাষার উদ্ধৃতি দিয়ে যেতেন। বাংলা ছোট গল্প পড়াতে গিয়ে সারা পৃথিবীর ছোট গল্প চোখের সামনে এনে তুলে ধরতেন। বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক থেকে সাম্প্রতিকতম কথা-সাহিত্যদের রচনা বিশ্লেষণী আলোচনা শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এম এ পরীক্ষার আগে নারায়ণবাবুর পেপারের জন্যে আমাদের কোন রেফারেন্স বই দেখতে হয়নি। যারা কানে ওঁর অন্তত দু কথাও ঢুকেছে সেই লিখতে পেরেছে। ওঁর বক্তব্য ভঙ্গির মধ্যে ছিল আশ্চর্য একটা কল্পনা, কণ্ঠভরা দরদ, জটিল জিনিসকে সহজ করে তুলে ধরবার প্রণালী, রোমান্টিক মেজাজ, আর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য, যা খুব কম অধ্যাপকের মধ্যেই থাকে। তাই তো ওঁর ক্লাস ভিড়ে ভেঙে পড়ত। বেঞ্চিগুলোর ছজন করে বসেও যেন জায়গা হ'ত না। গোর্কির কথা বলতে গিয়ে উনি কতদিন বলেছেন, গল্প বলার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল গোর্কির। যে লেখক জীবনের কথা বলতে পারতেন এত সুন্দরভাবে তিনি লিখতে পারতেন আরও চমৎকার। আজ মনে হচ্ছে, আমাদের মাস্টারমশায়ও যখন যা কিছুই বলতেন, তাই যেন গল্প হয়ে যেত। তাঁর সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা করুন বাংলা সাহিত্যের রথী-মহারথীর দল। আমরা শুধু বলব আমাদের মাস্টারমশায়ের কথা। ক্লাশের শেষে কোনদিন আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখে যেতেন রোমান্টিক বিস্ময় এবং আলোড়ন। কোনদিন হাসির তুফান ছুটিয়ে দিতেন। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরু ধরের চরিত্র বলতে বলতে তিনি শিশুর মতন হেসে উঠতেন। একটা হাত দিয়ে মুখে রুমাল চাপা দিতেন, অন্য হাত পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে সারা শরীর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসতেন মাস্টারমশায়।

আজ কলকাতা থেকে একশো মাইল দূরে বসে তাঁর কথা লিখতে লিখতে শুনেছি, রাত সাড়ে দশটার শেষ খবর— "কথাশিল্পী এবং অধ্যাপক ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষকৃত্য আজ সম্পন্ন হয়েছে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে...।" আমার চোখ ভরে আসছে জলে। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না স্যার নেই। আর কোনদিনই তাঁর কণ্ঠস্বর বাজবে না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বাড়ির ঘরে ঘরে॥

মোহনার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

এ মাসের আট তারিখটি ছিল রবিবার। বিকেলে আমার ক'জন বন্ধু এসেছিলেন; একজন সস্ত্রীক। তাঁরা কেউ লেখক টেখক নন; একেবারে আলাদা গ্রহের মানুষ। সরকারী কর্মচারী, কেমিস্ট, মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী, অর্থনীতির অধ্যাপক ইত্যাদি ইত্যাদি। গায়ে জীবিকার যে ছাপই মারা থাক, এক জায়গায় তাঁদের দারুণ মিল। সবাই দুর্দান্ত পড়ুয়া; কাজকর্মের মধ্যেও সাহিত্য-টাহিত্যের জন্য উৎসুক তাজা একটি মনকে তাঁরা সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বিশেষ করে বন্ধুপত্নীটির মতন পাঠিকা আমি দেখিনি; মাত্র দু দিন আগে যে লেখাটি বেরিয়েছে তিনি তার খোঁজও রাখেন। ভাল ছাত্রী ছিলেন; মফঃস্বলের কলেজ থেকে ডিস্টিংসন নিয়ে বি-এ পাশ করেছেন। এম-এটা আর পড়া হয়নি; তার আগেই বিয়েটিয়ে হয়ে গেল। এই ভদ্রমহিলার চোখে ধুলো ছিটিয়ে বাঙলা সাহিত্যে কিছু হবার জো নেই।

যাই হোক, চা-কফি চিড়ে-ভাজা-টাজার সঙ্গে আড্ডা জমে উঠল। কংগ্রেস-সি পি এম-নকশাল-ফরোয়ার্ড ব্লক, ভিয়েৎনাম, আরব-ইজরেইল, নানা পথ ঘুরে আমরা শেষ পর্যন্ত যেখানে পৌঁছুলাম তার নাম সাহিত্য।

বন্ধুপত্নীটি জিজ্ঞেস করলেন, 'পুজো সংখ্যার কোন্ কোন্ লেখা ভাল লাগল?'

পুজোর একটা লেখাও আমার পড়া হয়নি; কেননা মহালয়ার পরেই আমরা কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলাম। ফিরেছি কালীপুজোর আগে আগে। পুজোসংখ্যাগুলো হাতের কাছেই আছে; ধীরেসুস্থে এবার পড়ব। সুতরাং ভাল-লাগা মন্দ-লাগার প্রশ্নই ওঠে না। বন্ধুপত্নীকে এই কথাগুলো জানালাম।

অন্য বন্ধুরা নানারকম মন্তব্য করতে লাগলেন। অমুক লেখাটা ভাল হয়েছে, অমুকটা মন্দ না, অমুকটা রাবিশ।

এক বন্ধু বললেন, 'সিনিয়র লেখকদের লেখা আর পড়া যায় না; ভদ্রলোকরা একেবারে ফুরিয়ে গেছেন। সেই তুলনায় জুনিয়ররা অনেক অ্যালাইভ।'

আমি চুপচাপ শুনে যেতে লাগলাম।

আলোচনাটা পুজোসংখ্যা থেকে ব্যাপকভাবে সাহিত্যের নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কেমিস্ট বন্ধুটি পাঠককুলে এক্সট্রিমিস্ট। কয়েকজন বর্ষীয়ান সাহিত্যিকের নাম করে বললেন, 'এ'রা যথেষ্ট লিখেছেন, এবার দয়া করে থামুন। আমরা মনুমেণ্টের তলায় এ'দের ফেয়ারওয়েলের ব্যবস্থা করব। লেখা না থামালে আইন করে এ'দের থামানো উচিত। তবে—'

সাহিত্য সম্পর্কে এই বন্ধুটির মতামতের দাম আমার কাছে কানাকড়িও না। বললাম, 'তবে কী?'

'সিনিয়রদের মধ্যে একজন অনারেবল একসেপসন আছেন; তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'তুমি যাঁদের যাঁদের নাম করলে নারায়ণবাবু কিন্তু বয়েসে তাঁদের চাইতে অনেক ছোট। এই তো সেদিন পঞ্চাশ পেরুলেন।'

বন্ধুটি আমার কথা হয়ত শুনতে পেলেন না। বলে যেতে লাগলেন, 'এমন জীবন্ত লেখক আর একজনও আছেন কিনা সন্দেহ। কখনও মনে হয় না তিনি ক্লান্ত; প্রতিটি লেখা ফ্রেশ। চারপাশে প্রতিদিন যা ঘটছে, যত ঘটনা, যত আন্দোলন, সব কিছুতে রি-এ্যাক্ট করতে পারেন। মাইণ্ড খুব সেনসিটিভ।'

আরেক বন্ধু বললেন, 'কলেজ লাইফ থেকে ওঁর লেখা পড়ছি—সেই 'উপনিবেশ' থেকে 'স্রোতের সঙ্গে' পর্যন্ত। আমার আগ্রহ আর শ্রদ্ধা কখনও মলিন হয়নি।'

বন্ধুপত্নী বললেন, 'ছ' সাত বছর ধরে 'সুনন্দর জার্নাল' (সুনন্দ ছদ্ম নামটির আড়ালে যিনি আছেন, তাঁর আসল নাম বাঙালী পাঠকের জানা হয়ে গেছে) পড়ে আসছি। প্রতি সপ্তাহেই মনে হয়, লেখক বুঝি টাটকা এনার্জি নিয়ে এই প্রথম লিখতে বসলেন।'

দেখতে দেখতে হেমন্তের বিকেল ফুরিয়ে এল। আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে বেয়ে সূর্যটা পশ্চিমে নেমে গেল। কেউ যেন লাটাইতে সুতো গুটনোর মতন দ্রুত শেষ বেলার আলোটুকু টেনে নিতে লাগল। তারও পর সন্ধ্যে হল। সন্ধ্যের পর রাত। অ্যাশ-ট্রেতে সিগারেটের টুকরোর পাহাড় জমে উঠল; টী পয়ে চায়ের শূন্য কাপগুলো সারি সারি সোজা পেতে লাগল। রাত আরেকটু বাড়লে বন্ধুরা একে একে বিদায় নিতে লাগলেন। সবাই চলে যাবার পরও বন্ধুপত্নী এবং তাঁর স্বামী, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের একজন অফিসার, থেকে গেলেন। আমার মনে হল, ওঁরা কিছু বলবেন।

খানিক দ্বিধার পর বন্ধু-পত্নী বললেন, 'আমার একটা উপকার করতে হবে।'

ঠাট্টার গলায় বললাম, 'আমার সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয়ই। আপনার জন্য অসাধ্য সাধনেরও চেষ্টা করব। ব্যাপারটা কী বলুন তো—'

চোখ নামিয়ে লাজুক স্বরে বন্ধুপত্নী বললেন, 'বাঙলা নিয়ে এম এ-টা পড়তে চাই। জানেনই তো মফঃস্বল থেকে বি এ পাশ করেছি; আমাদের কলেজে অনার্স ছিল না। শুনেছি অনার্স না থাকলে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যাবে না। নারায়ণবাবু আপনাকে স্নেহ করেন; যদি ওঁকে বলে আমার ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন—' একটু থেমে 'প্রাইভেটেও দিতে পারতাম কিন্তু নারায়ণবাবুর ক্লাশ করবার দারুণ ইচ্ছে। শুনেছি চমৎকার পড়ান। শুধু ওঁর কাছে পড়বার জন্যেই ভর্তি হতে চাই।'

চট করে আমার অন্য একটি বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। বন্ধুটি একটি কলেজে বাঙলার লেকচারার। পোস্টটা আপাতত টেম্পোরারি; তবে দু একমাসের ভেতর পার্মানেণ্ট করা হবে। যেহেতু ইউ-জি-সি'র ব্যাপার, তাই তার আগে কলেজ থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আরও অনেককে ডাকা হবে। অবশ্য আমার বন্ধুটিও থাকবেন। তাঁদের মধ্য থেকে যোগ্যতমকে পোস্টটা দেওয়া হবে। এ জাতীয় নিয়োগের ব্যাপারে ইউনিভার্সিটি থেকে একজন এক্সপার্ট আসেন। বন্ধুটি শুনেছেন, নারায়ণবাবুই নাকি এক্সপার্ট হয়ে আসবেন। তিনি আমাকে ধরেছেন; নারায়ণবাবুর বাড়ি নিয়ে যেতেই হবে। দেড় বছর পড়াচ্ছেন; এই কাজটা না হলে একেবারে ভেঙে পড়বেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, দু-একদিনের ভেতর নিয়ে যাব।

বন্ধুপত্নীকে বললাম, 'পরশু টরশু নারায়ণবাবুর বাড়ি যাব; তখন আপনার কথা বলব। কেউ পড়তে চায় এটুকু জানাতে পারলেই হল। নারায়ণদা তাঁর জন্য সব কিছু করেন।'

বন্ধুপত্নী আরও বারকয়েক অনুরোধ করে উঠে পড়লেন। ওঁরা নর্থ ক্যালকাটায় থাকেন। এগিয়ে দেবার জন্য ওঁদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। ট্রামে তুলে দিয়ে যখন ফিরছি, আমার চেনা একটি ছেলে,

ইকনমিক্সে এম এ-র ছাত্র, কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'দাদা, একটা খবর শুনেছেন?'

'কী?'

'নারায়ণবাবু মারা গেছেন—'

'নারায়ণবাবু? কোন্ নারায়ণবাবু?'

'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যিক—'

আমার হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন পলকের জন্য থেমে গেল। তিনদিন আগেও নারায়ণ-বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। একজন প্রখ্যাত কবির কাছে শুনেছি শুক্রবার এইচ-এম-ভিতে নারায়ণবাবু তাঁর একটি কবিতার আবৃত্তি রেকর্ড করেছেন। তাঁর শরীরটা কিছুদিন ধরেই অবশ্য ভাল যাচ্ছিল না। কিন্তু এমন কোন ভয়ানক অসুস্থতার কথা তো শুনিনি যা এত নিদারুণ এত মর্মান্তিক এক পরিণতিকে টেনে আনতে পারে।

বললাম, 'তুমি কার কাছে শুনলে?'

ছেলেটি বলল, 'একজন বলেছে।'

'কী শুনতে কী শুনেছ—' আমি আর দাঁড়ালাম না। আসলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ছেলেটার কথা বিশ্বাস করতে পারিনি, আবার সংশয়ও যাচ্ছিল না। দুয়ের মাঝখানে উদ্‌ভ্রান্তের মতন, শ্বাস-রুদ্ধের মতন বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, আবার অবিশ্বাসও করি না। সেই মুহূর্তে কিন্তু আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, হে ঈশ্বর ছেলেটি যা বলল তা যেন সত্যি না হয়।

বাড়ি ফিরেই রেডিও চালিয়ে দিলাম; যদি এ ব্যাপারে কিছু জানা যায়। একটু পর অশ্রুরুদ্ধ একটি স্বর শোনা গেল, 'গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজ পরলোকগমন করেছেন—'

নাঃ, দুঃসংবাদ কখনও মিথ্যে হয় না। আমার মনে হতে লাগল, ঘোষকের কণ্ঠস্বর ঘাতকের হাতের ধারাল অস্ত্রের মতন আমার বুকে-বাহুতে-ঘাড়ে-গলায় আঘাতের পর আঘাত দিয়ে যেতে লাগল।

এক সময় রেডিওর সেই কণ্ঠস্বর আর যেন শুনতে পাচ্ছিলাম না। ঝাপসা হতে হতে আমার কাছ থেকে অনেক, অনেক দূরে সেটা মিলিয়ে যেতে লাগল, আর পূর্বজন্মের স্মৃতির মতন পনের ষোল বছর আগের একটি দিনের ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠল।

উনিশ শ' তিপ্পান্ন চুয়ান্ন হবে। তার বছর দুই আগে পূর্ব বাঙলা থেকে কলকাতায় এসেছি। ঝোঁকের মাথায় একটা গল্প লিখে 'দেশ' পত্রিকায় দিয়ে এসেছিলাম। দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা সেটাই আমার প্রথম গল্প—'মাঝি'। দু সপ্তাহের ভেতর লেখাটা ছাপা হয়ে গেল এবং তার পরের সপ্তাহে গল্পটি সম্বন্ধে পোস্ট কার্ডের একটা চিঠি পেলাম। আট দশ লাইনের চিঠি; তার তলায় যাঁর স্বাক্ষর তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গল্পটা ছাপা হওয়া এবং নারায়ণবাবুর ঐ চিঠি পওয়া— আমার জীবনে মস্ত ঘটনা। এই দুটি যোগা-যোগ না ঘটলে সাহিত্যকে ওখানেই নমস্কার জানিয়ে অন্য কিছু করতে হত।

চিঠিটা হাতে পেয়েও সংশয় কাটছিল না। আমি একজন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কেই তখন জানি। যাঁর লেখা 'উপনিবেশ', 'স্বর্ণসীতা', 'মন্দ্রমুখর', 'শিলালিপি', 'সূর্যসারথি', 'লালমাটি' কিংবা 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর' প্রতিটি পাতা তখন আমার কণ্ঠস্থ। তাঁর ছোট গল্প 'বীতংস', 'হাড়', 'টোপ', 'নক্রচরিত', 'পুস্করা', 'ইতিহাস' কিংবা 'দুঃশাসন' আমার কাছে সেদিন মন্ত্রের মতন। বিশেষ করে তাঁর ভাষা; জাদুকরের মতন সেই ভাষা তখন আমাকে গ্রাস করে রেখেছে। শুধু আমাকেই কি, আমার প্রথম যৌবনে বাঙলাদেশের তরুণ মনকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতন আর কেউ এমন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেননি। সে সময় তাঁর লেখা যে কাগজেই বার হয়, খুঁজে খুঁজে পড়ি, তাঁর ভাষা মুখস্থ করি এবং সেই আদলে লিখতে চেষ্টা করি। সেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—আমার প্রিয়তম লেখকই কি এই চিঠি লিখেছেন? 'দেশ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক সাগরদাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'হ্যাঁ, তিনিই—'

নারায়ণবাবু যেতে বলেননি কিন্তু চিঠিটা আমাকে এত উৎসাহিত করেছিল যে, একদিন ঠিকানা টিকানা যোগাড় করে তাঁর পটলডাঙার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তখন দুপুরবেলা; মাসটা ভাদ্র-টাদ্র হবে, পুজোর খুব একটা দেরি নেই; আকাশে মেঘ আছে; অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। ভয়ে ভয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে যিনি আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন তাঁর বয়েস পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের মতন; তবে আরও কম দেখায়। টকটকে রঙ, একটু রোগা অবশ্য, গায়ে অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই, মুখ লম্বাটে এলোমেলো চুল, নাকটাক অত্যন্ত ধারালো, চশমা ছিল কিনা মনে পড়ছে না, তবে চোখ দুটি আশ্চর্য স্বপ্নময় এবং দূরগামী, ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসির রেখা। এ মানুষটি আমার চেনা; কেননা 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' বইটিতে ওঁর ছবি দেখেছি। আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়েই থাকলাম। এমন সুকান্ত সুদর্শন মানুষ আমি খুব বেশি দেখিনি।

আমি কিছু বলবার আগে নারায়ণবাবুই বললেন, 'এ হে, বৃষ্টিতে সব ভিজে গেল দেখছি। আসুন আসুন—'

উনি 'আপনি' করে বললেন। আমার খুবই সংকোচ হচ্ছিল। বললাম, 'আমি আপনার চাইতে অনেক ছোট। তুমি করে বলবেন—'

এক পলক ভাল করে আমাকে দেখে নিয়ে নারায়ণবাবু হাসলেন, 'হ্যাঁ, ছেলে-মানুষই। আচ্ছা 'তুমি'ই বলব।'

আমাকে নিয়ে নারায়ণবাবু বাইরের ঘরে গেলেন। সেখানে আরও তিন চার জন বসে ছিলেন। যতদূর মনে করতে পারি, ও'দের মধ্যে দুজন পত্রিকার সম্পাদক, একজন ছাত্র, আরেকজন প্রকাশক।

আমাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে নারায়ণবাবু উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, 'আমার কাছে কোন দরকার আছে ভাই?'

কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'দেশ' পত্রিকায় আমি একটা গল্প লিখেছি। আপনি গল্পটা সম্বন্ধে একটা চিঠি দিয়েছেন—' চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। পকেট থেকে বার করে দিলাম।

চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে আরেকবার আমাকে দেখে নিলেন নারায়ণবাবু। যেন খুব অবাক হয়েছেন, এমনভাবে বললেন, 'তুমি ঐ রকম একটা গল্প লিখেছ। কী আশ্চর্য, তুমি তো একেবারে বালক।'

আমার বলতে ইচ্ছা করছিল, মাত্র সতের বছর বয়েসে যাঁর কবিতা 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছে এবং বাইশে পা দিয়েই 'উপ-নিবেশ' নামের অবিস্মরণীয় উপন্যাসটি লিখে যিনি চমক লাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর অন্তত আমাকে নিয়ে উচ্ছ্বাস মানায় না। কিন্তু আমি কিছুই বলিনি।

এদিকে নারায়ণবাবু আরেক কাণ্ড করে বসলেন। পার্শ্ববর্তী সেই সম্পাদক আর প্রকাশকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'একে এখনই ধরুন, নইলে পরে আপসোস করতে হবে।' তারপর খুব আগ্রহের সঙ্গে আমার যাবতীয় খুঁটিনাটি, কোথায় থাকি, কী করি, দেশ কোথায়, ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে নিয়ে বললেন, 'আমার দেশও পূর্ব বাঙলায়। কত কাল যে যাইনি, বড় যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আর বোধহয় যাওয়া হবে না।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন; 'কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল; দেশটাকে পার্টিশান করা হল। কিন্তু এ তো আমরা চাইনি। ছাত্র জীবনে দেশোদ্ধারের জন্য কিছুদিন বিপ্লবীদের দলে জুটে গিয়েছিলাম। পুলিসের হাতে মার-টারও খেয়েছি। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কতটুকুই বা করেছি! কিন্তু যারা সারা জীবন জেলে জেলে কাটাল, ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিল তারা কি এই দেশভাগ চেয়েছিল? এত মানুষের এত আত্মত্যাগের এই পরিণাম? লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভিটেমাটি ছেড়ে এপারে চলে আসছে। তাদের অপরাধটা কী? এত বড় হিউম্যান ট্র্যাজেডি এ দেশে আর কখনও ঘটেনি। দেশটাকে টুকরো করে

কত বড় পাপ, কত বড় অন্যায় যে করা হল! এর জবাবদিহি একদিন করতে হবে।'

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, আর অনুভব করছিলাম, এই সুন্দর স্নিগ্ধ চারুদর্শন মানুষটির মধ্যে কোথায় যেন একটা আগ্নেয়গিরি লুকনো আছে। নারায়ণবাবু আবার বললেন, 'তুমি তো ইস্টবেঙ্গল থেকে সবে এসেছ; ওখানকার মানুষ নিয়ে লেখ। বাঙলাদেশের বারো আনা হচ্ছে পূর্ব বাঙলা। অথচ সাহিত্যে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। মানিকবাবু 'পদ্মানদীর মাঝি' লিখেছেন, অমরেন্দ্র ঘোষ একটা উপন্যাস, নরেন দু একটা গল্প লিখেছে, নবেন্দুও তাই। কেউ কেউ এক-আধটা কবিতা। কিন্তু পূর্ব বাঙলাকে ব্যাপকভাবে বাঙলা সাহিত্যে কেউ নিয়ে আসেননি। সাত কোটি বাঙালীর মধ্যে সোয়া চার কোটি ইস্টবেঙ্গলের। এত মানুষ সাহিত্যে অনাদৃত থাকবে, তা হতে পারে না। পূর্ব বাঙলাকে বাদ দিয়ে বাঙলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ।'

মানিকবাবু, নবেন্দু ঘোষ অমরেন্দ্র ঘোষ কি নরেন্দ্রনাথ মিত্রর কথা বলেছেন, অথচ নারায়ণবাবু নিজে যে পূর্ব বাঙলার জীবন নিয়ে 'উপনিবেশ', 'মন্দ্রমুখর', 'স্বর্ণসীতা'র মতন উপন্যাস, 'কালাবদরে'র মতন আশ্চর্য ছোট গল্প লিখেছেন তার উল্লেখ করলেন না। আমি সে কথা বলতে কুণ্ঠিতভাবে তিনি শুধু বললেন, 'ওগুলো কিছু না। পূর্ব বাঙলা নিয়ে আমার বড় কিছু লিখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু অনেকদিন দেশে যাইনি। কলকাতায় থেকে থেকে জীবনের এমন একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেছে যে সেখান থেকে পূর্ব বাঙলাকে বহু দূরের মনে হয়। অনেক সময় সেখানকার জল-মাটি-ঘাসের গন্ধ কেমন ছিল, মনে পড়ে না। এই অবস্থায় লিখলে কেমন হবে কে জানে। যদি দেশে একবার যেতে পারতাম—'

আমার সঙ্গে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে দু ফর্মা প্রুফ দেখে প্রকাশকটিকে দিলেন নারায়ণবাবু। অন্য ঘর থেকে একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি এনে (পুজো সংখ্যার জন্য) একজন সম্পাদককে দিলেন। দ্বিতীয় সম্পাদককে ক'দিন পর আসতে বললেন; কেননা তাঁর লেখা তখনও হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, ছাত্রটি ছিল খুব গরীব। কয়েকমাস মাইনে দিতে না পারায় কলেজ থেকে নাম কাটা গেছে কিংবা ঐ জাতীয় কিছু। নারায়ণবাবু প্রিন্সিপ্যালের কাছে তার বকেয়া মাইনেটা মকুব করে দেবার জন্য একটা চিঠি লিখে দিলেন।

সবাই চলে গেলে আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো ছাতা নেই। এখনও বৃষ্টি পড়ছে।'

বললাম, 'এতে কিছু হবে না।'

'হয়ত হবে না তবু এই বৃষ্টিতে তোমাকে আমি অন্তত ছেড়ে দিতে পারি না। একটু বোসো—' বলেই বাইরে বেরিয়ে গেলেন নারায়ণবাবু। কিছুক্ষণ পর একটা ছাতা এনে বললেন, 'চলো তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।'

খুব অস্বস্তি লাগছিল। বার বার বললাম, আমি এমনিই চলে যেতে পারব, কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না; সঙ্গে সঙ্গে বাস রাস্তা পর্যন্ত এলেন।

বাসে উঠবার পরও সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগল। এতক্ষণ সত্যি সত্যিই কি নারায়ণবাবুর সঙ্গে ছিলাম? যাই হোক এর মধ্যেই ভাবতে লাগলাম, প্রথম দিন মানুষটিকে কেমন দেখলাম? ছাত্রের প্রতি অসীম স্নেহ,

বাঙলা দেশ সম্বন্ধে অপার ভালবাসা এবং লেখক যেমনই হোক যত ক্ষুদ্রই হোক, তার প্রতি অন্তহীন মমতায় তিনি পরিপূর্ণ।

সেই শুরু। তারপর পটলডাঙার ঐ বাড়িটিতে কতবার গেছি। আশা বৌদির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। নারায়ণবাবু নারানদা হয়ে গেছেন। তাঁর ছেলে বাবলু তখন খুব ছোট।

নারায়ণদা সেই সময় সিটি কলেজে সকাল এবং দুপুরে, দুবেলাই পড়াতেন। আমি যখনই গেছি লক্ষ করেছি, সম্পাদক-প্রকাশক-ছাত্র-চিত্র পরিচালক, কেউ না কেউ বসে আছেন। দু বেলা ক্লাশ করার পর এত এত মানুষের হাজার রকম দাবী মেটাতে কি সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে হয়, ভাবতেও সাহস হয় না। নিদারুণ পরিণামের জন্য ভেতরে ভেতরে ক্ষয় তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল কিনা কে জানে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু তাঁকে কোনদিন ক্লান্ত দেখিনি। কোনদিন বিরক্ত হননি। কখনও বলেননি, 'আমি ব্যস্ত আছি; আরেকদিন এসো'। একটি মধুর বিনম্র কৌতুকময় হাসি তাঁর মুখে সব সময় মাখানো থাকত। মৃত্যুর ক'দিন আগেও যে দেখা হয়েছে তখনও সেই হাসিটি অম্লান।

তাঁর সমস্ত উপস্থিতিটাই রসে-হাস্যে উজ্জ্বল। মজার মজার গল্প করতে নারানদার জুড়ি আমি আর দেখিনি। একবার এক পুলিশ ইন্সপেক্টরের গল্প বলে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। নারানদা তখন থার্ড ইয়ার টিয়ারের ছাত্র। বৃটিশ আমল। গায়ে বিপ্লবী দলের গন্ধ থাকায় ধরা পড়ে গেলেন। তখনকার এস পি ছিলেন খাস ইংরেজ। তিনি নারানদাকে ইনভেস্টিগেশন আর ইন্টারোগেশনের জন্য পাঠালেন ইন্সপেক্টরের কাছে। ইন্সপেক্টরটির বয়েস হয়েছে, ঢাকা জেলায় বাড়ি; রিটায়ারমেন্টের আর দিন পনের বাকি। ভদ্রলোক ঝঞ্ঝাট টঞ্ঝাট পছন্দ করেন না; রাত্তিরবেলা দলবল জুটিয়ে খোল বাজিয়ে কীর্তন গান; দিনের বেলা ভয়ে ভয়ে কোনরকমে চাকরি রক্ষা করেন। তার ওপর কুঁড়ের বাদশা। পনেরটা দিন মানে মানে পার হয়ে গেলে এ জন্মের মতন বেঁচে যান।

পুলিশ নারায়ণদাকে হাজির করতেই ইন্সপেক্টর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'দ্যাখেন দেখি কী ল্যাঠায় ফালাইল। পনের দিন পর রিটায়ার করতে আছি; মালপত্র বান্ধাছান্দা হইয়া গেছে। পনেরটা দিন কাটাইতে পারলেই চাকরির পায়ে নমস্কার দিয়া নৌকায় গিয়া উঠুম। এইর মইধ্যে আপনেরে পাঠাইল। কী যে হালার ফ্যাচাং!'

নারানদা প্রথম দিকে ভয় পেয়েছিলেন; ইন্সপেক্টরের কথাবার্তার ধরনে পরে খুব মজা লাগল। বললেন, 'রিটায়ারমেন্টের' পর এক্সটেনসন চাইবেন না?'

ইন্সপেক্টর লাফিয়ে উঠলেন, 'পলাইতে পারলে বাঁচি, আপনে ক'ন এক্সটেনসন!' তারপর আরো কিছুক্ষণ বকবকানির পর নারানদাকে ভাল করে লক্ষ করে শুরু করলেন, 'এমন অ্যানজেলের মতো চেহারা; আপনি কি ঐ হগল বোমা-পিস্তল লইয়া ঘুরাঘুরি করতে পারেন! সুমুন্দির পুতেরা কারে ধরতে যে কারে ধরে। আরে মশয়, ক'ন না, আপনে ঐর মইধ্যে নাই; আমি লেইখ্যা লই। ইনভেস্টিগেশন টেশন আর করুম না; আপনে ব্রাহ্মণ-সন্তান। আপনে কি আর মিছা কথা কইবেন! আর পনেরটা দিন পার করতে পারলে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়।'

নারানদা স্বরের উত্থান-পতন ঘটিয়ে এমন চমৎকারভাবে ইন্সপেক্টর চরিত্রটি অভিনয় করে দেখালেন যে হেসে হেসে আমাদের দম বন্ধ হবার যোগাড়। তারপর সরস একটি মন্তব্য জুড়ে দিলেন, 'এই রকম আর ক'টি ইন্সপেক্টর জোটাতে পারলে আর দেখতে হত না; অনেক আগেই ইংরেজকে এ দেশ থেকে চাটিবাটি গোটাতে হত।'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কত বড় কথা-শিল্পী, বাংলা দেশের পাঠককে তা বলে দিতে হবে না। কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে কত বিশাল কত মহৎ একটি হৃদয় ছিল তা হয়তো অনেকেই জানেন না। কাছাকাছি আসার জন্য তাঁর চরিত্রের একেকটি দিক বহুবর্ণময় মণিখণ্ডের মতন আমার সামনে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

একদিন এক প্রকাশকের ঘরে বসে আছি। নারানদা একজন রুগ্ন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে নিয়ে সেখানে এলেন। প্রকাশককে বললেন, 'ইনি পূর্ব বাঙলা থেকে এসেছেন; খুব ভাল লেখেন। আপনাকে এঁর একখানা বই ছাপতে হবে।'

প্রকাশকের খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কারণ প্রৌঢ় লেখকটির তখনও নাম হয়নি, বাজার হয়নি। তাঁর বই ছাপা রিস্কের ব্যাপার। প্রকাশক সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' বললেন না। তখন নারানদা বললেন, 'আমার সাহিত্যবোধের ওপর যদি আপনার আস্থা থাকে তবে এঁর বই ছাপান। আমি বলছি এই লেখক খুব নাম করবেন। এঁকে কিছু টাকা দিয়ে দিন।'

শুধু সেই লেখকটিই নন, আরো তিন চারজনকে জানি, যাদের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন নারানদা।

লেখকদের মধ্যেই এমন অনেকে আছেন যাঁদের কাছে গেলে অস্বস্তি হয়। সব সময় ক্ষিপ্ত, অসহিষ্ণু এবং অন্যের উন্নতি কাতর হয়ে থাকেন। কিন্তু নারানদার সান্নিধ্যে এলে এমন একটি আলো আর প্রীতিপ্রদ উত্তাপ পাওয়া যেত যা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। জগতে আলো-বাতাস-জলের মতন এই অনাত্মীয় অথচ আত্মীয়ের অধিক মানুষটির কাছে আমি এমন অনেক কিছু পেয়েছি যার তুলনা নেই। জীবনে কখনও তাঁকে কারো নিন্দা করতে শুনি নি, কিছু ভাল লাগলে উচ্চকণ্ঠে বলে বেড়াতেন; যা তাঁর অপছন্দ সে সম্বন্ধে নীরব থাকতেন। নিজের নিন্দা-স্তুতিতে কখনও তাঁকে বিচলিত বা বিভ্রান্ত হতে দেখিনি।

মনে পড়ে, একজন মাঝারি মাপের লেখক তাঁর সম্বন্ধে একবার কিছু নিন্দা করেছিলেন। নারানদা তা জানতেন কিন্তু সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অন্য কেউ হলে এই নিন্দা-টিন্দা নিয়ে তুলকালাম করে ছাড়তেন অথবা নিঃশব্দে এমন একটি পাশুপত ছাড়তেন যা নিন্দুক হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যেতেন। কিন্তু নারানদা যা করেছিলেন তা অভাবনীয়। সেই লেখকটি হঠাৎ বিপদে পড়লে নিজে উপযাচক হয়ে এক প্রকাশককে তাঁর বাড়ি পাঠিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

নারানদার আরেকটা দিক ছিল; সেটা তাঁর স্মৃতিশক্তি। বাঙলা কবিতার তো কথাই নেই। ইংরেজি ও ফরাসী কত অসংখ্য কবিতা যে তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের গদ্য পাতার পর পাতা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন।

একবার বর্ধমানে একটি সাহিত্য-সভায় নারানদা সভাপতি হয়ে গেছেন। আমিও

গিয়েছিলাম।ফেরার সময় ধরলাম, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনব দাদা—'

'বেশ—' নারানদা শুরু করলেন।

বর্ধমান থেকে কলকাতা পর্যন্ত মোটরে আসতে আড়াই ঘণ্টার মতন লেগেছিল। এই সময়টা একের পর এক রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে গেছেন নারানদা।

মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের কবিতার মাঝখান থেকে একটা লাইন তুলে বলতাম, 'এর ওপরের চার লাইন বলুন কিংবা নিচের চার লাইন—' নারানদা তৎক্ষণাৎ সেই লাইন চারটে বলে দিতেন। এ ছিল একটা খেলার মতন: এই খেলায় নারানদাকে কখনও হারাতে পারিনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে অসাধারণ সুবক্তা, সে খবর অনেকেই জানেন। এ প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনা মনে পড়ছে।

কলকাতার কাছাকাছি একটা 'ফাংশানে'র ব্যবস্থা হয়েছে। ক'জন নামকরা ফিল্মস্টার আসবেন। তাঁরাই প্রধান আকর্ষণ। ব্যাপারটা একেবারে ফিল্মী-ফিল্মী হয়ে যায়; তাই ওতে একটা সাংস্কৃতিক গন্ধ ছড়াবার জন্য একজন সাহিত্যিককে সভাপতি করে আনা হয়েছে—তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নারানদা ঠিক সময়েই পৌঁছে গেছেন। কিন্তু চিত্রতারকাদের দেখা নেই। তাঁদের জন্য 'ফাংশন' আরম্ভ করা যাচ্ছে না। আধ ঘণ্টা যায়, এক ঘণ্টা যায়। এদিকে ফিল্মস্টার আসার খবর পেয়ে চারদিকের লোক ভেঙে পড়েছে। তারা ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল; তারপর শুরু হল চিৎকার, চেঁচামেচি। একটা বিশ্রী কাণ্ড যে কোন সময় ঘটে যাবে। সভার উদ্যোক্তারা ভয় পেয়ে নারানদার কাছে এলেন, 'কী করা যায় বলুন তো স্যার, স্টাররা আসছেন না; এরা যে আমাদের চামড়া খুলে নেবে!'

নারানদা উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জনতা গর্জে উঠল, 'কোন কথা শুনতে চাই না; অমুক অমুক কুমারকে চাই। স্টার দেখাবার নাম করে মাজাকি!'

নারানদা তার মধ্যেই বক্তৃতা শুরু করলেন। প্রথমটা কিছুক্ষণ উত্তেজনা চলল, তারপর সব শান্ত। বক্তৃতার ভেতরেই ফিল্মস্টাররা এসে মঞ্চে উঠলেন কিন্তু কোথাও টুঁ শব্দটি নেই; মুগ্ধ চমৎকৃত দর্শকের চোখ তখন নারানদার দিকেই।

নারানদা কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। তবে পোলিটিক্যাল পার্টির হয়ে ময়দানের জনসভায় গিয়ে দাঁড়ালে দিগ্বিজয় করতে পারতেন।

নারানদাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছি, 'আজকাল অনেকে বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতার কথা বলে থাকেন। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কী?'

নারানদা বলেছেন, 'কিসের নিঃসঙ্গতা? কিসের বিচ্ছিন্নতা?

'মানে এই সমাজ-টমাজ থেকে—'

'এই সমাজ থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বাঁচবার রসদ আদায় করে নিচ্ছি আর এখান থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব? এ কি রকম কথা?'

তাই দেখেছি এ শহরের যেখানে যা কিছু ঘটেছে তাতে চিরদিন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন নারানদা। রুশ-ভারত মৈত্রী সংঘ; ভিয়েৎনামের যুদ্ধ অবসানের জন্য আবেদন; মাইকেল জয়ন্তী, পূর্ব বাঙলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে জনসভা;—সেই উজ্জ্বল মনোহর মানুষটি কোথায় নেই?

শুধু কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ক্লাসরুম নয় কিংবা সম্পাদকীয় দপ্তর প্রকাশকপাড়াও না। এ সবের বাইরে যে বিশাল জগৎ সে সম্বন্ধেও ছিল নারানদার সজীব কৌতূহল। তিনি জানতেন গ্যারি সোবার্স শেষ সেঞ্চুরিটা ক'টা বাউন্ডারি মেরে করেছেন, ফ্রী-কিকে পরিমল দে ক'টি গোল দিয়েছেন; পি কে ব্যানার্জির ফর্ম কবে থেকে পড়ে গেছে কিংবা মহীশূরের মেয়ে সুদর্শনা কেমন বাস্কেট খেলেন। আমেচার থিয়েটারে যে নতুন অভিনেতাটি অশেষ সম্ভাবনা নিয়ে এসেছেন অথবা যে অখ্যাত শিল্পীটি মিউজিয়মের রেলিং-এ চিত্র-প্রদর্শনী করছেন; নারানদা

তাঁদের খবরও রাখতেন। আমার সেই বন্ধুটি বলেছেন, 'ভদ্রলোক সব ব্যাপারে রি-অ্যাক্ট করতে পারেন।' কথাটা ষোল আনা খাঁটি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন—দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ যুদ্ধ, কালোবাজারি, শঠতা, নীচতা। কিন্তু কখনও মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। মনে আছে সেবার পটলডাঙ্গার ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়ি কিনে উঠে গেলেন নারানদা। এই বাড়িটার চারদিকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের বাস। আমি বলেছিলাম, 'এখানে বাড়ি কিনলেন? যদি কখনও গোলমাল টোলমাল হয়—'

নারানদা আমার মনের কথাটা পড়ে নিয়ে বললেন, 'হয় হবে। মানুষকে যে এখনও বিশ্বাস করি, ভালবাসি, তার প্রমাণ দেব কি করে? শুধু মুখে মুখে বললে তো হয় না—আমি এখানেই থাকব।'

প্রতিবেশীদের অসীম সম্প্রীতি এবং শ্রদ্ধার মধ্যে অনেক দিন তিনি ঐ বাড়িতে কাটিয়ে গেছেন।

প্রথম যেদিন নারানদার কাছে গিয়েছিলাম তারপর থেকে তাঁর খ্যাতি দিনে দিনে আরো অনেক গুণ বেড়েছে, কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। সিটি কলেজ থেকে তিনি ইউনিভার্সিটিতে গেছেন। আমি নিজেও নানা কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলাম। এই সময়টা তাঁর কাছে খুব বেশি যাওয়া হত না। কিন্তু যখনই গেছি, প্রথম দিনের মতনই চোখে পড়েছে, নারানদার বাইরের ঘরটিতে ছাত্র-গবেষক-বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক-প্রকাশক-সম্পাদক চিত্র পরিচালকরা ভিড় করে আছেন। সেদিনের মতন এই মানুষটির কাছে এখনও তাঁদের বিপুল দাবি। কত লেখককে জানি, দু-চারখানা চমকে-দেওয়া লেখা লিখেই ফুরিয়ে গেছেন; তাঁদের কাছে পাবার আর কিছু নেই। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যাশাকে কখনও ম্লান হতে দেন নি।

তাঁর কাছে যে হাত পেতেছে সে-ই কিছু পেয়েছে; কারোকে হতাশ হয়ে কখনও ফিরতে হয়নি—শুধু একজন ছাড়া।

মনে পড়ছে তখন তিনি সবে বৈঠকখানার বাড়ি ছেড়ে গোল পার্কের কাছে নতুন বাড়িতে এসেছেন। আমি দেখা করতে গেছি। কিছুক্ষণ গল্পটল্পর পর একটি সেক্স ম্যাগাজিনের সম্পাদক এলেন। তাঁর কাগজের জন্য নারানদার একটা গল্প চাই এবং দক্ষিণা-স্বরূপ যা দেবেন বললেন তা একটা লোভনীয় অংক।

নারানদা বললেন, 'আমার শরীর খারাপ; পারব না।'

সম্পাদক বললেন, 'তবে কি পরে আসব?'

'না।'

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, কেননা নারানদা তো কখনও কারোকে 'না' বলেন না।

সম্পাদকটিও বিস্ময়ের মতন বললেন, 'আজ্ঞে—তা হলে—'

নারানদা বললেন, 'আমি সেক্স ম্যাগাজিনে লিখি না; আমাকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করবেন না।'

সম্পাদক মুখ কালো করে চলে গেলেন। একটু পর লিটল ম্যাগাজিনের এক তরুণ সম্পাদক এলেন। নারানদা তৎক্ষণাৎ দোতলায় গিয়ে একটি গল্প দিলেন। এই লেখাটার জন্য তিনি যে একটি পয়সাও পাবেন না তা তিনিও জানেন, আমিও জানি। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন কোত্থেকে টাকা দেবে? সাহিত্যের যে কোন সৎ প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এ রকম কত লেখা যে তিনি দিয়েছেন।

পুরনো মূল্যবোধের অনেকগুলিই ছিল তাঁর কাছে আদরণীয়। স্নেহ-প্রীতি-বন্ধুত্ব-শ্রদ্ধা; এ সবকে তিনি অসীম মূল্য দিতেন। স্নেহভাজন, প্রীতিভাজন বা শ্রদ্ধা-ভাজন কেউ কোন অনুরোধ নিয়ে গেলে যে ভাবেই হোক তিনি তা করে দিতেন। আমি কতবার যে তাঁকে উৎপাত করেছি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কৃতী অধ্যাপক, অসামান্য কথাশিল্পী। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্লাস কিংবা লেখার চাইতে তাঁর কাছে অনেক বড় ছিল জীবন আর এই বাঙলা দেশ। তাঁর মাস্টারমশাই কবি জীবনানন্দের মতন বাঙলা নামে একটি রূপের প্রতিমাকে সারা জীবন তিনি ধ্যান করে এসেছেন। কোথায় তরাইএর উদ্দাম হিংস্র অরণ্য, কোথায় সুন্দরবন, কোথায় বরেন্দ্রভূমির লাবণ্যময় প্রান্তর, কোথায় বঙ্গোপসাগরের বুকের তলা থেকে উঠে-আসা চর-ইসমাইল—সম্ভবত রাঢ় অঞ্চল বাদে সমস্ত বাঙলা দেশকে প্রগাঢ় ভালবাসায় [illegible] এঁকে [illegible]ছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ইদানীং দেখা হলে মাঝে মাঝে বলতেন, 'গোটা বাঙলা দেশ নিয়ে একটা বড় বই লিখব ভাবছি।'

সাগ্রহে বলেছি, 'নিশ্চয়ই। কবে আরম্ভ করছেন?'

'হাতে ছোটখাটো অনেকরকম কাজ জমে আছে; সেগুলো মিটিয়েই।'

কিন্তু সে বই আর লিখে যেতে পারেন নি নারানদা, তাঁর কাছে আমার বন্ধুপত্নীটির কথাও বলা হল না; সেই অধ্যাপক-বন্ধুটিকেও নিয়ে যাওয়া হল না।

ষোল বছরেরও বেশি নারাণদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ। কখনও মনে হয়নি থেমে গেছেন; সর্বক্ষণ প্রবাহিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলেছেন, চলেছেন, চলেছেন। জীবনকে মিছিলের সঙ্গে তুলনা করে কে যেন লিখেছিলেন, 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চলমান মিছিলের অংশ।' কিন্তু মিছিলের উপমাটা আমার পছন্দ না।

মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, বাঙলা দেশের নদী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে কি আশ্চর্যভাবেই না মুগ্ধ করেছে। পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়াল খাঁ-কালাবদর আত্রাই-মহানন্দা থেকে দামোদর-ময়ূরাক্ষী-রূপনারায়ণ, এগুলি তাঁর কাছে শুধু নদীই না, জীবনের আবেগময় কল্লোলিত রূপ। নারানদার লেখার পাতায় পাতায় এদের রমণীয় বর্ণনা আছে। নদীর প্রতি গভীর অনুরাগের জন্যই হয়ত তাঁর উপন্যাসের নাম হয় 'মহানন্দা', 'স্রোতের সঙ্গে' 'মোহানার নৌকো' গল্পের নাম 'কালাবদর', 'রূপ-নারায়ণ', 'স্রোত'।

তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেলায় মিছিলের বদলে স্রোতের উপমাটাই আমি বেছে নেব। ষোল বছর ধরে দেখছি একটি নৌকো স্রোতে ভেসে ভেসে মোহানার দিকে চলেছে—এ সেই মোহানা, যার নাম পরি-পূর্ণতা। কিন্তু হায়, সেখানে পৌঁছবার আগেই আরেক মোহানায় চলে গেলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; সেখান থেকে কেউ আর ফিরে আসে না।

সুনন্দ স্মরণে

॥ ১ ॥

সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আকস্মিক অকালমৃত্যুর সংবাদে আমার মত অনেকেই স্বজনবিয়োগের গভীর দুঃখ অনুভব করবেন।

নারায়ণবাবুর সুপ্রচুর সাহিত্যকীর্তি এবং তাঁর প্রাণসার রুচিস্নিগ্ধ ও সুচিন্তিত "সুনন্দর জার্নাল" তাঁকে বাংলার সুধী-সমাজের কাছে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর অকালবিয়োগে বাংলাদেশ ও 'দেশ' যে দরিদ্রতর হলো, এ কথা কে অস্বীকার করবে?

চলতি সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় তাঁর লেখা "অসুস্থ শরীরের ভাবনা" যাদের জন্য লেখা, তারা যদি অভিনিবেশ সহকারে সেটি পড়ে এবং তা থেকে উপকৃত হয় তবেই এই প্রগতিবাদী, দেশপ্রেমিকের আত্মা তৃপ্তি লাভ করবে, এই আমার বিশ্বাস।

তাঁর ঐ রচনাটি আরেকবার পড়লাম। মনে হলো তিনি যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তা নইলে, একবার নয় দুবার তিনি একই ভাবনা ব্যক্ত করেছেন কেন? রচনার শেষে তিনি লিখেছিলেন—"ভাবছি, পরের সংখ্যায় সুনন্দর জার্নালের পাতাটি যদি না থাকে, তা হলে জানবেন আরেকটি কমনম্যান বাঙ্গালীর অবলুপ্তি বা আত্ম-বিসর্জন ঘটল।"

না সুনন্দ—তোমার মতো আনকমন কমনম্যান বাঙ্গালীর অবলুপ্তি কখনও ঘটতে পারে না; তবে সুনন্দর জার্নালের এই শূন্য পাতাটি আর কেউ ভরাতে পারবে না, এই ভেবে তোমার অগণিত গুণমুগ্ধদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠবে, এই যা।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাসত, ২৪ পরগনা।

॥ ২ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নেই—ভাবতেও কেমন অবাক লাগছে। এই তো বছর দুয়েক আগে তাঁর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সরস বর্ণনা পড়লাম কোনো একটি শারদীয় পত্রিকায়, আর এরই মধ্যে তিনি নেই! তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর মনস্বিতা, উজ্জ্বল রসবোধ, আশ্চর্য বাকশৈলী ও মানবপ্রেমের গুণে আমার মতো বহু সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছেই ছিলেন—প্রিয়তম লেখক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা হারিয়েছি। 'দেশ' পত্রিকায় 'সুনন্দর জার্নাল'-এর পাতাটি চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। তবু তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মাঝেই দীপ্ত হয়ে রইবেন চিরকাল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মৃত —নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘজীবী হোন।

প্রদীপ্তা রায়, মেদিনীপুর।

> সুনন্দ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অকালপ্রয়াণে মর্মাহত হয়ে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা আমাদের কাছে শোকলিপি পাঠিয়েছেন। সমস্ত চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এখানে মাত্র কয়েকটি চিঠি প্রকাশ করা হল।

॥ ৩ ॥

'সুনন্দ নেই' রবিবার রাত্রে এই খবর শুনলাম। কী আশ্চর্য, শনিবার রাতে দেশ পড়ছিলাম, সুনন্দ তাঁর জার্নালের শেষের দিকে লিখেছেন, "...অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি পরের সংখ্যায় সুনন্দের পাতাটি যদি না থাকে তাহলে জানবেন আর একটি কমনম্যান বাঙ্গালীর অবলুপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল।"

পড়ে মনটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল, কিন্তু 'কমনম্যান সুনন্দ' যে এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে যাবেন তা তো সত্যিই ভাবতে পারছি না। গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন লেখকেরা কি সত্যিই ভবিষ্যত-দ্রষ্টা? এমন কী নিজের মৃত্যু সম্পর্কেও? কমনম্যান সুনন্দ আমাদেরই মত কমনম্যানদের চিন্তা-ভাবনাকে কত সার্থক, কত সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। পড়তে পড়তে কতবার মনে হয়েছে আরে এতো আমাদেরই কথা। লেখক ও পাঠকের মধ্যে এই একাত্মতা বিস্ময়কর! প্রতি সপ্তাহে 'দেশ' আসবার আগে জল্পনা কল্পনা করেছি, এবারে সুনন্দ কী নিয়ে লিখবেন এবং দেশ হাতে পাবামাত্র প্রথমেই জার্নাল পড়েছি। ভাবতেই পারছি না এবার থেকে 'দেশ'-এ জার্নাল থাকবে না—কমন-

ম্যানদের কথা শোনাবার কেউ থাকবে না।

প্রদীপ্ত বসু, রাঁচী, বিহার।

॥ ৪ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর নেই। সুনন্দর জার্নালে তিনি যে অশুভ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, অবশেষে তা-ই সত্যি হল। তবে কি তিনি পূর্ব হতেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বিদায় আসন্ন?

কৈশোরে পটলডাঙ্গার প্যালারামের মাধ্যমেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। আর সেই থেকেই আমি তাঁর অনুরাগী। কলেজে অনেক দূরে থেকে তাঁকে দেখেছি। সেই দেখা ছিল অপার কৌতূহল, ভক্তি এবং সম্ভ্রমের।

পরে তাঁর আরও লেখা পড়েছি। ভালো লেগেছে। আমি সাহিত্যের পাঠক নই, উপলব্ধির ক্ষমতাও সীমিত। তবু ভালো লাগতো—তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। এই বাংলা দেশের মাটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন। আর পূর্ব বাংলার সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ীর টান। প্রাদেশিকতার ছোঁয়া লাগিয়ে তাঁর সার্বজনীনতাকে সীমাবদ্ধ করা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নয়।

আজকের মূল্যবোধহীনতায় তিনি হয়েছিলেন মর্মাহত। হয়তো আশাহতও। তাই বোধ হয় এ আবহাওয়া থেকে তিনি মুক্তি নিয়ে গেলেন। এই চরম প্রতিবাদের ন্যায্য মূল্য কি আমরা দিতে পারবো না?

তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখার সাধ্য আমার মত সামান্য ব্যক্তির নেই। তবু শ্রদ্ধা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। বার বার চোখের কোণে জল এসে যাচ্ছে।

নৃপেন ভট্টাচার্য, কলকাতা-৫৬।

॥ ৫ ॥

"...পরের সংখ্যায় সুনন্দের পাতাটি যদি না থাকে তাহলে জানবেন...।" জানলাম। জানলাম অনেক কিছুই। না জানলেই ভাল হত।

শনিবার দিন হকার 'দেশ' দিয়ে যাবে। কিন্তু সাঁঝ বেলাতে কি 'দেশ' পড়বার সেই পুরানো আগ্রহ আর থাকবে না। 'দেশ'-এর অঙ্গসজ্জার মূল্যবান আভরণটি যে হারিয়ে গেল।

মিহির মজুমদার, কলকাতা-৮।

॥ ৬ ॥

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে বাজার করতে যেতুম। বছর দশেক আগেকার কথা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শীর্ণকায়, মাথায় লম্বা চুলের রাশি—উনি বাজারের থলে হাতে নিয়ে বাজার করতে আসতেন। দেখা হলে প্রণাম করতাম।

'থাক্, থাক্, কেমন আছিস?'—বলে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। বাজারে দরাদরি করতে জানতেন না। অনেক জায়গায় ঠকে যেতেন। ভাবতুম—সাবধান করে দিই। কিন্তু পারতুম না। মনে হত এই ঠিক। বস্তুজগত সম্পর্কে ওঁকে সাবধান করে দেওয়া ঠিক হবে না বোধহয়। কারণ উনি তো আর বাজার করছেন না। উনি সাহিত্যিকের দৃষ্টি আর দার্শনিকের মন নিয়ে অন্য এক জগতে বিচরণ করছেন। আমরা বাজার করি খুঁজে বেছে দরদস্তুর করে—উনি কিন্তু এর মধ্যে শিল্পীর মন নিয়ে মানুষকে দেখছেন, তাদের কলকোলাহলে মহানন্দে অবগাহন করছেন। বাজার করাটা ওঁর গৌণ।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে উনি একবার আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য আর এক প্রথিতযশা সাহিত্যিকের অকালমৃত্যুতে তাঁরই স্মৃতিসভার পৌরোহিত্য করা। স্টেশন থেকে সাড়ে তিন মাইল রাস্তা হয় গরুর গাড়িতে চড়ে, না হলে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। স্টেশনে নেমেই বললেন, "আরে, হেঁটেই যাওয়া যাক্, চলো......।"

ধানক্ষেতের আল ধরে হাসতে হাসতে আর গল্প করতে করতে চললেন উনি। সঙ্গে আর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ওঁদের দুজনের গল্প আর হাসিতে সাড়ে তিন মাইল পথ আমরা দেখতে দেখতে পার হয়ে এলুম। মাঠের মধ্যে এক জায়গায় জলে ওঁর পা ডুবে গেল। তাতে পা ডুবিয়ে ছেলেমানুষের মতো খেলা শুরু করে দিলেন। জুতো দুটো খুলে হাতে নিয়েই চললেন। কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো বিরক্তি নেই।

গ্রামে পৌঁছে স্নান সেরে খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন। তারপর সারা গ্রামটা ঘুরে বেড়ালেন, সকলের সঙ্গে আলাপ করলেন। গ্রামের লোক অবশ্য ওঁদের সেবা যত্নের ত্রুটি করেন নি। কিন্তু কে সেবাযত্নের ধার ধারে? শহর থেকে গ্রামে এসে উনি আনন্দে মাতোয়ারা। সন্ধ্যাবেলায় স্মৃতিসভায় পৌরোহিত্য করলেন। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত গ্রামের লোকেদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন। সকালে উঠে আবার ঐ ভাবেই হাঁটাপথে স্টেশনে ফিরে এলেন।

সুনন্দ আর দেশ-এ জার্নাল লিখবেন না। টেনিদার নতুন গল্প আর আমার ছেলেমেয়েরা পড়বে না। বাংলা সাহিত্যে আর এক ইন্দ্রপতন হলো।

অমিতাভ সেনগুপ্ত, কোদিলপুর, পাটনা-১।

॥ ৭ ॥

মফঃস্বলে থাকি। একদিন দেরীতে 'দেশ' হাতে এল। নববর্ষের প্রথম সংখ্যাটি নিয়ে আমার প্রিয় বিভাগ 'সুনন্দর জার্নাল'-এ চোখ রাখলাম। শেষ অনুচ্ছেদে এসে চোখ থেমে গেল। সুনন্দ অসুস্থ কিন্তু কমনম্যান সুনন্দর চিন্তাভাবনায় তো কোনদিন অসুস্থতার লেশমাত্র থাকে না! তবে শেষের কটা লাইন পড়ে মনটা ভারী হয়ে গেল কেন? এ তো নিছক হিউমার। কিন্তু হিউমার যে নিছক নয়, বুঝলাম সেইদিন রেডিওতে খবর শুনে।

ইদানীং লেখক-গড়ার কাছে কিছু কিছু গোষ্ঠীর কথা শোনা যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একাই একটি দল। এখনো ছোট গল্প নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। এককালের গল্প আন্দোলনের জরুণ গোষ্ঠীর অনেকেই পাশ কাটিয়ে গেলেও, বর্ষীয়ান নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন স্পষ্টতই অনন্য। আর কমনম্যান সুনন্দ! দুই বাংলার হৃদয়-স্পন্দন, ভাটিয়ালী গানের চিত্রকথা, বাংলার এম এ পাশ যুবকের বিড়ম্বনা, বঙ্কিম-নিধনের বেদনা, বঙ্গসংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহ—সুনন্দ ছাড়া কেই-বা তুলে ধরেছেন! নিজের মৃত্যু নিয়ে এমন রসিকতা ক'জন করেছেন! আসলে 'সুনন্দর জার্নাল' ছিল কমনম্যানদের কাছে একটি সুস্থ জীবন-ভাবনার প্রতীক: যার কোন বিকল্প নেই। **শান্তি সরকার**, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

॥ ৮ ॥

দেশ পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ "সুনন্দর জার্নাল"-এর লেখক প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর এ জগতে নেই—এ খবর শোনার পর বিশ্বাস করতে কিছুতেই মন চায় না। এ যে কল্পনাতীত মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। এই সপ্তাহের দেশের জার্নালে (২১ কার্তিক ৭ই নভেম্বর) তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ কটি লাইনে আসন্ন মৃত্যুর সম্পর্কে তাঁর দেওয়া পূর্বাভাষ যে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে এমন করে নির্মম সত্যে পরিণত হবে এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল! প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গো ক্ষুরধার সমালোচনায় আর বহু বৈচিত্র্যে ভরা "সুনন্দর জার্নাল" আর দেশের পাতায় দেখা যাবে না। একজন সত্যকারের দরদী, সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক তাঁর বহু সাহিত্য-অনুরাগীদের অনেক প্রত্যাশাকে অপূর্ণ রেখে দিয়ে চিরতরে বিদায় নিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্র হারাল এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিককে।

কিশোর সাহিত্যে অমন মজার করে আর কেউ "টেনিদার" গল্প শোনাবেন না। এ ক্ষতি বাংলাসাহিত্য জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি করল তা অপূরণীয় হয়েই থাকবে।

—**সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**, কলিকাতা-৬।

॥ ৯ ॥

জার্নালে তিনি যা বলেছিলেন, তা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে কে ভেবেছিল? তিনি কি তাঁর মৃত্যুকে এত কাছাকাছি দেখতে পেয়েছিলেন? ভাবতেও পারছি না এ কী দুঃসংবাদ শুনলাম। সত্যিই বাংলার দুর্দিন, নইলে এত কাছের মানুষ দূরে চলে গেলেন, যাঁর লেখা নতুন নতুন জার্নাল আর কোনদিন 'দেশ'-এ দেখতে পাব না।

তবে কি 'অ্যামপ্লিফায়ারের আর পটকা'র তান্ডব তাঁর মৃত্যুকে আরও দ্রুত ঘটিয়ে দিলো? আসলে হাজার প্রশ্ন মাথার ভেতর পাক খাচ্ছে। স্থানীয় সংবাদে মৃত্যুসংবাদ শুনে ভাবছি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে এত ভালবেসে ফেলেছিলাম ভেতরে ভেতরে? নাকি এই মৃত্যু সংবাদ শুনে অনেকেই একই সময়ে ঠিক আমার মত অনুভব করছেন?

আজ রবিবার (৮।১১।৭০) যে এই ভাবে শোকের মধ্য দিয়ে শেষ হবে ভাবিও নি। আমার সঙ্গে তাঁর কোনদিন কথা-বার্তা হয়নি, হয়েছে আমার বন্ধুদের সঙ্গে। অনেক কথাই এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। সব থেকে বেশী করে মনে পড়ছে, দু' বছর আগে তাঁর কতখানি দরদভরা হৃদয়ের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম! তিনি কোন বিষয়েই কোন সময়েই আমাদের বিমুখ করেন নি। উত্তর বঙ্গের বন্যা-ত্রাণের জন্য আমরা ক'জন বন্ধু তাঁকে ধরেছিলাম, তিনি সব কাজ ফেলে ঠিক রবিবার আমাদের সাথে বেরিয়েছিলেন, সমানে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

তিনি তরুণ কবি ও লেখককে কাছ থেকে, দূর থেকে এত উৎসাহ দিয়েছেন, যার তুলনা দেখেছি 'সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভেতর। দু' জনেই চলে গেলেন। **—রাণা চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-৬০।**

॥ ১০ ॥

কমন্ম্যান্ সুনন্দর অকাল জীবনা-বসানের কোনো সান্ত্বনা নেই। আমরা যা পারি তাই লিখি। যা পারি না, অথচ লিখতে চাই, সেই গভীর আনন্দ বেদনার রূপ তিনি আমাদের হয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর সহজ সাবলীল গদ্য-রীতিতে আশ্চর্য হয়েছি; আর কত অনায়াসে সেই সহজতার পথ ধরে একেবারে তাঁর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। তাঁর প্রতিটি লেখা পড়ে বারবার সোচ্চারে বলতে চেয়েছি, 'তিনি আমাদেরই লোক'। আমাদের এ গৌরবের তুলনা নেই। **—রীতা ঘোষ, কলকাতা।**

॥ ১১ ॥

আমি "দেশ"-এর একজন অতি সাধারণ কিন্তু অতি উৎসাহী পাঠিকা। প্রতি সপ্তাহে "দেশ" হাতে এলেই সর্ব-প্রথম যে লেখাটি আগ্রহভরে পড়তাম তা হচ্ছে "সুনন্দর জার্নাল"। লেখার ভেতর দিয়ে "সুনন্দ"র সঙ্গে আমার একটি অদৃশ্য আত্মীয়বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর আসল পরিচয় আমি জানতাম না, যদিও এক এক সময় তীব্র ইচ্ছা হত জানবার, কিন্তু কোন উপায় ছিল না জানবার, কারণ বলে দেবার কেউ ছিল না। ৭ই নভেম্বরের 'দেশ'-এ সুনন্দর জার্নালটি পড়ে মন বিষণ্ণ হয়ে গেল, যখন দেখলাম অসুস্থ "সুনন্দ" কোলাহলময় কলকাতা থেকে আত্মলুপ্তির জন্য ব্যগ্র। 'শব্দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যিনি নিজের চরম অমঙ্গল কামনা করতে পারেন তিনি কে,' এই প্রশ্নটিই তখন থেকে প্রবল হয়ে মনে দেখা দিল। অবশেষে রেডিওর স্থানীয় সংবাদদাতা আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সুনন্দ ছিলেন আমাদেরই প্রিয় লেখক শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সদ্য আবিষ্কৃত "সুনন্দ"র মধ্যে এক "কমনম্যান"কে এবং বহুপরিচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর মাঝে এক 'আনকমন' সাহিত্যিককে হারিয়ে বিস্ময়ে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেছি। **—নন্দিনী মিত্র, কলকাতা-৫।**

॥ ১২ ॥

ছেলেবেলায় গল্পের কতগুলো চরিত্রকে ভালোবেসেছিলাম, চরিত্রগুলোর নাম টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর প্যালারাম। মনে আছে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম পটলডাঙার টেনিশর্মার নিত্যনতুন কান্ডকারখানার। তখন, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, লেখকের নামটা নিছক দেখতে হয় বলেই দেখেছিলাম,—নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায়। তারপর আস্তে আস্তে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের পরিচয় যখন পেতে লাগলাম তখন দেখলাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি শুধু টেনিদা-হাবুল-ক্যাবলা-প্যালাতেই সীমাবদ্ধ নয়, চতুর্দিকে এর ব্যাপ্তি, বাংলা সাহিত্যের বিবিধ শাখায় নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায়-এর অবাধ বিচরণ। তখনই নামটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম, তারপর দেশ পত্রিকা। সুনন্দর জার্নাল পড়ার জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে অধীর প্রতীক্ষা, তখনও জানতাম না সুনন্দর অন্তরালে কে সেই নিপুণ কথার যাদুকর? তারপর যখন কলেজের অধ্যাপক সুনন্দর আসল পরিচয় আমার সামনে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এলেন তখন শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, তিনি যথার্থ সব্যসাচী।

কাল, হঠাৎ, রেডিওতে শুনলাম, তিনি চলে গেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তাঁর নশ্বর দেহ হয়তো পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু বেঁচে আছে তাঁর সৃষ্ট কত-শত চরিত্র। সর্বোপরি জার্নাল,—সুনন্দর জার্নাল, সেই জার্নালই তো বাঁচিয়ে রাখবে সুনন্দকে—নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায়কে। **—জয়ন্ত চক্রবর্তী, হুগলি।**

॥ ১৩ ॥

আমাদের একান্ত প্রিয় লেখক ও প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু আমাদের স্তব্ধ, বিমূঢ় ও নির্বাক করে দিয়েছে। কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছি না যে, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। ভাবতে পারছি না যে 'দেশ'-এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ যা আমাদের কাছে ছিল, সেই 'সুনন্দর জার্নাল'এর পাতাটি আর থাকবে না। 'দেশ' এলে কে কতক্ষণে 'সুনন্দর জার্নাল' পড়া শেষ করবে—এই নিয়ে বাড়িতে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। আজকের এই বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি ভোলবার নয়। গত ৫২নং সংখ্যায় তিনি কিছু বাঙালী তরুণের 'ঔদ্ধত্য', 'অতি-চাতুর্য' ও 'অতি প্রগলভতায় মর্মাহত হয়ে ভবিষ্যতে এর থেকে বিরত থাকবার জন্য তরুণ সম্প্রদায়কে সচেতন করে গেছেন।

এ যেন আপন অভিভাবক ও যথার্থ পথ-প্রদর্শক-এর মতোই কাজ। আজ তাই ছাত্র ও যুবসমাজ একজন প্রকৃত মঙ্গলকামী অভি-ভাবকের অভাব বোধ করছে। **—সুচরিতা সিংহ ও অন্যান্য কলিকাতা-২৫।**
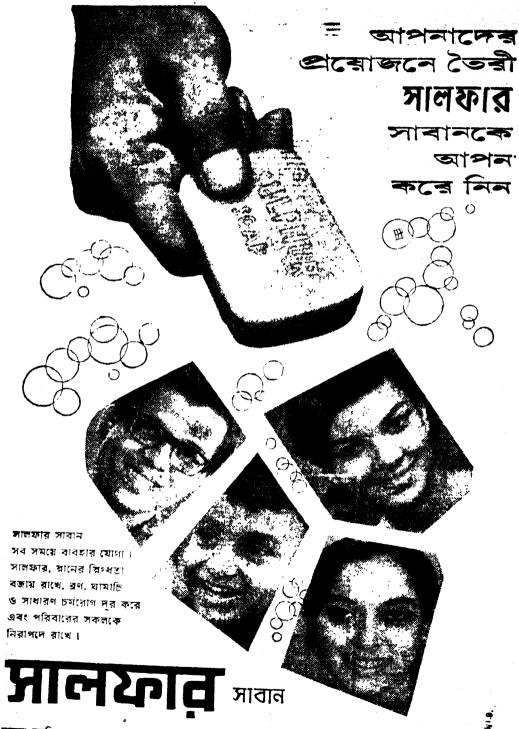
বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা - বোম্বাই - কানপুর - দিল্লী - মাদ্রাজ
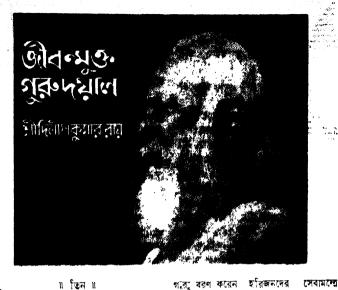
॥ তিন ॥

মহৎ-ই মহত্ত্ব দেখে আকৃষ্ট হয়। দয়ালদার জীবনে দুটি মহাজন সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে তিনি গুরুদেব বলতেন, আর মহাত্মাজি যাঁর ডাকে তিনি শেষ জীবনে আমেদাবাদে গান্ধীজীর হরিজন-আশ্রমে থেকে হরিজনদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন পুরোপুরি অকিঞ্চন হ'য়ে। তিনি বম্বে এলে থাকতেন সচরাচর হয় শ্রীশীতলবাবুদের জুহু-নিলয়ে, না হয় তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে মাউণ্ট প্লেজাণ্ট রোডে। কিন্তু টাকার তিনি ধার ধারতেন না—কেউ দিলেও নিতেন না। তাঁর অশনবসনের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি ঠাকুরের 'পরে যিনি তাঁর "যোগক্ষেম" বহন করতেন। শ্রীরামদাসের মতন দয়ালদাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন গীতার মহাবাক্য :

> যে-সাধক করে অনন্যমনে নিত্য আমার উপাসনা,
> তার ভার আমি বহি যুগে যুগে—সার্থক তার আরাধনা।*

তাঁর স্বভাবপ্রবণ স্নেহসুন্দর মন এ-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল সম্ভবত কোনো সাধুর কাছে। তিনি আমাদের কাছে শুধু বলেছিলেন যে, তিনি আকৈশোর চেয়েছিলেন—প্রথম, কৃষ্ণকান্ত হ'তে, দ্বিতীয় সর্বসেবক হ'তে—বিশেষ ক'রে সর্বহারাদের জন্যে তাঁর প্রাণ কাঁদত। গান্ধীজীকে তাই তিনি গুরু বরণ করেন হরিজনদের সেবামন্ত্রে দীক্ষা পেতে। আর রবীন্দ্রনাথকে গুরু করেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ঔদার্যের গাঙ্গধারায় আত্মশোধন করতে।

প্রথমে তিনি আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত প্রতিভায়। শান্তিনিকেতনে তাই তিনি যেতে চান কৈশোরেই। কবিগুরুকে একথা লিখতে তিনি উত্তর দেন—আগে পড়া শেষ করো। পাঠ শেষ ক'রে ডিগ্রি নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে বাস করেন ২২ বৎসর ছেলেমেয়েদের শিক্ষক হ'য়ে। তাঁর অন্তরের ঔদার্যের তথা স্বভাবের মাধুর্যে মুগ্ধ হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কাছে টেনেছিলেন—তাঁর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতাও করতেন তাঁর অপূর্ব সরস ভঙ্গিতে। দয়ালদাও ছিলেন স্বভাব-রসিক (ভাবুকের সঙ্গে রসিকের যোগ হ'লে মানুষ হয়ে ওঠে কমনীয় তথা বরণীয়—কে না জানে?) একটি উদাহরণ দেই যা তিনি আমাদের কাছে একাধিক বার বলেছিলেন একগাল হেসে।

একদা সকালে চা-পান-অন্তে রবীন্দ্রনাথ দয়ালদাকে সঙ্গে ক'রে শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীর সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ান। একটি বই নিতে এসেছিলেন তিনি, তাই ঈষৎ আতপ্ত সুরে বলেন : "লাইব্রেরি সকালেই খোলার কথা—" দয়ালজি তাঁকে সবিনয়ে বলেন : "কথা ঠিকই, কেবল আজ ছুটি যে।" কবি বিরক্ত হয়ে বলেন : "গাধা!"

দয়ালজি আমাদের কাছে কবির উষ্মার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন হেসে : "আমি পাঠান, দাদাজি। কিল খেয়ে কিল চুরি ক'রে বসে থাকার পাত্র নই। মনে মনে শুধু বললাম—আচ্ছা।

পরদিন সকাল সাতটায় ছেলেমেয়েরা এসে বসতেই আমি বললাম : 'লেখো একটি প্রবন্ধ গাধার সম্বন্ধে।' কিছুক্ষণ বাদে দেখি একটি ছেলে পেনসিল হাতে চুপ ক'রে ব'সে। কাছে গিয়ে দেখলাম সে লিখেছে : 'আমাদের আশ্রমে অনেক গাধা আছে।' এটুকু লিখেই তার প্রেরণা ফুরিয়ে গেছে দেখে তার হাত থেকে খাতা নিয়ে আমি সোজা রওনা হ'লাম গুরুদেবের রমানিলয়ের দিকে। পৌঁছে তাঁর প্রাতরাশের কক্ষে ঢুকে খাতাটি তাঁর টেবিলে কেদারার ডানদিকে খুলে রেখে চ'লে এলাম তাঁর কিঙ্করকে ব'লে : 'খাতাটি বন্ধ কোরো না।'

"যথাকালে কবি এসে টেবিলে স্কুলের ছাত্রের খোলা খাতা দেখে তো অবাক! কিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করতে সে ভয়ে ভয়ে বলল : 'গুরুদয়ালজি।' গুরুদেব প'ড়ে হেসে খাতার নিচে পেন্সিলে লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন : "Gurudayal! We are quits" (গুরুদয়াল! শোধবোধ!) ব'লে দয়ালদার সে কী হাসি। ঠিক যেন দশ বছরের দুষ্টু শিশু।

কিন্তু তা ব'লে যেন কেউ মনে না করেন দয়ালদা গুরু ভক্তিতে কারুর চেয়ে একচুলও কম ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি তাঁর হৃদয়বেদীতে চিরদিন আসীন ছিলেন প্রায় যুগল বিগ্রহ-রূপে। তাঁর "দিলকি বাত"-এ "গান্ধী-গুরুদেব" নিবন্ধে পাই :

"গান্ধীজি ছিলেন সোনালী-বাঁধাই গীতা, গুরুদেব ছিলেন উপনিষদের সচিত্র আবৃত্তি। ...গান্ধীজি বলতেন—ব্যক্তিগত সমস্যা থিতিয়ে জগতের সমস্যা। গুরুদেব বলতেন—জগতের সমস্যাই থিতিয়ে ব্যক্তিগত সমস্যা। কিন্তু উভয়েই এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, জীবনের ধারা সরল রেখায় চলে না, চলে আঁকাবাঁকা গতিতে। গান্ধীজির দৃষ্টিতে—এ-জগৎ ভগবানের কর্মালয়, গুরুদেবের দৃষ্টিতে—এ-জগৎ ভগবানের পুষ্পোদ্যান। গান্ধীজি চাইতেন—জীবনকে আনন্দময় করতে। গুরুদেব চাইতেন জীবনে আনন্দ সৃষ্টি করতে। গান্ধীজি নীতির অফুরন্ত পথের পথিক হ'য়ে পৌঁছতে চাইতেন ভাগবত পথে। গুরুদেব চাইতেন প্রেমের আবির্ভাবে আনন্দ নৃত্যের প্রসাদে অন্তরে অন্তর্যামীর পথদিশা পেতে।" (মূল হিন্দি থেকে অনূদিত)

গান্ধীজির শতবার্ষিকী এক সভায় ভারতীয় বিদ্যাভবনে দয়ালদা তাঁর ভাষণে একটি বড় চমৎকার কথা বলেন—যাকে ইংরাজীতে বলে aphorism :

"Man lives truly by love. Gandhiji embodied and expressed love of truth translated in action, while Rabindranath embodied and expressed truth of love revealed in beauty."

---

* অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥
(গীতা)

অর্থাৎ

গান্ধিজি :

সত্যের বরিয়া প্রেমে কর্মে হোক উচ্ছলিত তাহার উচ্ছ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ :

প্রেমের সত্যের বরি' রূপরাগে হোক তার অমল প্রকাশ॥

দয়ালজী এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই মূলত অঙ্গাঙ্গীই মনে করতেন, সত্য আর প্রেমকে আলাদা ক'রে দেখতে চাইতেন না। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিবাদী মনের ধারণা যাই হোক তাঁর অন্তর ছিল স্বভাবে উদাসী বৈরাগীই বলব। তাই তিনি যৌবনেই পণ নিয়েছিলেন ব্রহ্মচর্য বরণ ক'রে সত্য শিব ও সুন্দরের তিনে-এক-একে-তিন-এর উপাসনা করবার। এইখানেই ছিলেন তিনি সংসারী থেকে স্বতন্ত্র—সকলের মাঝে থেকেও অসঙ্গ। তাঁর Hound of the Heart-এর একটি কবিতা উদ্ধৃত করি আমার বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করতে। কবিতাটি লিখেছিলেন তিনি গদ্য ছন্দে ওরফে free verse-এ. কিন্তু গদ্য ছন্দে এ-শ্রেণীর কবিত্বময় ভাব ঠিক ফোটে না ব'লে আমি ইংরাজীতে এর তর্জমা করেছি ছন্দে মিলে :

All my life, Krishna, I have harked
To this world's phantom call;
Now, at long last, I pray: "Oh, light
My way when shadows fall."

All my life I have spent, O Lord,
In weaving Illusion's web
And strive, alas, assiduously,
With men to walk in step.

Now, when the day is done,
thou come,
Teach me to walk with thee :
Let only thy Name ring in my soul,
Thy feet my refuge be.

ভাবটি এত সুন্দর ও আন্তরিকতায় মর্মস্পর্শী যে আমি এর বাংলায়ও তর্জমা করেছি (আরো এইজন্যে যে, কৃষ্ণকে তিনিও বরণ করেছিলেন ইষ্ট ব'লে) :

জীবন প্রভাতে শুনেছি কৃষ্ণ, জগতের
মায়ামুরলী শুধু।
যাচি আজ—যবে আঁধার ঘনায়—
ধরো দীপ পথে আমার বঁধু!
এতদিন নাথ, বুনেছি কেবল কায়া-ভ্রমে
ছায়া-ঊর্ণা হায়!
চেয়েছি সবার সঙ্গে চলিতে
তাদেরই ছন্দে এ-বসুধায়।
দিনান্তে আজ এসো শ্রীকান্ত,
শিখাও চলিতে তালে তোমার,
মধু নামে প্রাণ ঝঙ্কারি' ঠাঁই দিয়ে পায়
করো অপারে পার।

*

কিন্তু তিনি সজ্জন এ কথা জানলেও উনি যে জীবন্মুক্ত মহাজন এ কথা জেনেছিলাম পুণায় আমাদের হরিকৃষ্ণ মন্দির গ'ড়ে ওঠার পরে। হ'ত কি, মাঝে মাঝে হঠাৎ তাঁর আবির্ভাব হ'ত।

"কী ব্যাপার দাদা? আছেন কোথায়?"

"এই এক সিন্ধি বন্ধুর ওখানে ভাই। বেচারি বড়ই শোক পেয়েছে—পুত্রশোক।"

কিছুদিন বাদে, ফের হঠাৎ তাঁর পুনরভ্যুদয়।

"কী ব্যাপার দাদা?" এবার আমাদের এখানে থাকবেন তো?"

"না ভাই—অমুক বন্ধু হাসপাতালে। এর পরের বার এসে তোমার ওখানে উঠব।"

ব্যাপারটার তখনও ঠিক আঁচ পাই নি। ভাবতাম দরদী মানুষ তাই ছুটে এসেছেন বন্ধুবান্ধবের প্রাণসংকটে। পরে ক্রমশ এর ওর তার মুখে শুনলাম—দয়ালদার এই-ই ব্রত—আর্তের শিয়রে এসে বসা। আর তিনি এসে বসলেই নাকি তাদের মনে ভরসা আসে, অনেক সময় ফাঁড়াও কেটে যায়। শুনলাম তাঁর মধ্যে healing power—আরোগ্যশক্তি—আছে, তাই আর্ত ক্লিষ্টের দল দুঃখে পড়ে তাঁর শরণ নেয়।

পরে যখন তিনি আমাদের মন্দিরে মাঝে মাঝে এসে দু চারদিন থেকে আমাদের আনন্দ বিতরণ করতে শুরু করলেন তখন চমকে উঠলাম—তাই তো, ইনি তো সাধারণ সাধুদের পর্যায়ে পড়েন না, মহাজনদের ভূমিকায়ই যে তাঁর সহজ অধিষ্ঠান! শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে মুখ ফসকে যখন নিজের সম্বন্ধে কিছু ব'লে ফেলতেন তখন আরও যেন তাঁকে নতুন ক'রে চিনতাম, উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম তাঁর স্নেহ-স্পর্শ পেয়ে। কী পবিত্র স্পর্শ! আহা! আকুমার ব্রহ্মচারীর পুণ্য স্নেহাশিস! মুখে ব্রহ্মচর্যের রাঙা আলো! ব্রহ্মচারী তো কম দেখি নি কিন্তু এমন আভা কজনের মুখে ফুটে ওঠে সাধনায়?

আমি এ-ইঙ্গিত করছি না যে, যাঁদের মুখে এ-আভা ফোটে না তাঁরা কেউ খাঁটি ব্রহ্মচারী নন। সাধনায় কারুর হৃদয়ে আলো নামে, তাঁরা হ'য়ে দাঁড়ান অপরের ব্যথার ব্যথী। কারুর মধ্যে আলো নামে মনে। তাঁরা হ'ন প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী—আরো উঁচুতে উঠলে—দ্রষ্টা, ঋষি। কিন্তু দেহে আলো নামে যাদের তাদের কী নাম দেব? শুধু মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম ধন্য হ'ল অন্তর।

শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, পল রিশার, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীরামদাস, শ্রীজয়কৃষ্ণ গিরি কৃষ্ণপ্রেমের সুভাষের মুখে আলো দেখেছিলাম। কিন্তু কত সত্যিকার সাধু সজ্জন কবি মনীষীর মুখেই তো দেখি নি আলো।

তবু এ কথা মানতেই হবে যে, মানুষের মুখে যখন আলো এসে হাজিরি দেয় তখন মন ও চোখ দুইই সাড়া দিয়ে বলে সানন্দে : ছুটি পেলাম। দয়ালদাকে দেখে এই ছুটি পেতাম আমরা—যখনই তিনি কাছে এসে দাঁড়াতেন। বলাবলি করতাম চুপি চুপি : There is a light on his face!" চুপি চুপি তাঁর গুণগান করতে হ'ত কারণ তাঁর কানে আমাদের গুণকীর্তনের একটু রেশ পৌঁছলেও তিনি এত সঙ্কুচিত হ'তেন যে আমাদের সত্যিই মায়া করত।

আর শুধু কি মুখের আলো? তাঁর চোখে ফুটে উঠত এক বিরল পবিত্রতার কোমল দ্যুতি। কোমল কিন্তু সবল। ফুল যেমন তার সৌরভ লুকিয়ে রাখতে পারে না, দয়ালদা তাঁর প্রস্ফুট কমনীয়তার মধ্যে তেমনি তাঁর অটুট পবিত্রতা গোপন রাখতে পারতেন না। সবার সঙ্গে তিনি মিশতেন সহজেই। বস্তুত তিনি ছিলেন শুধু মরমিয়া (mystic) নন, সহজিয়াও বটে। তাই তাঁকে অনেকেই চিনতে পারত না। একটি প্রবচন আছে : "সহজ না হ'লে সহজকে না যায় চেনা।" তাঁকে চেনা কঠিন হ'ত বিশেষ করে এই জন্যে যে, তিনি চেতনার যে-স্তরে বিচরণ করতেন সে-স্তর থেকে নেমে এসে সহজেই অপরের সাথী হ'তে পারতেন। তাই তাঁকে ভালোবাসত সবাই। কিন্তু ভক্তি করতে পারত কেবল তারা যারা তাঁকে চিনেছিল—যার ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে আরো মান দিত তাদের প্রাণের বেদীতে গুরুবরণ করে। তিনি না না করলে হবে কি? তারা যে ছিল একলব্য, পেয়েছিল যে তাঁর কাছে পথের পাথেয়। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা তাঁর শিষ্যদের কাছেও বেশি প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তবু অন্তরের আভা যখন মুখে বিছিয়ে যায় তখন গোপন কথাও ফাঁস হ'য়ে যায়—আমরা সিদ্ধান্ত না করে পারি না যে তাঁর ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়েছিল নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা রঙে। সেই পরমপুরুষকে তিনি নাম দিতেন কৃষ্ণ—এ কথার এজাহার পাই তাঁর দুটি কবিতায়—যদিও তিনি তা ব'লে গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করেই তাঁকে টেনেছিলেন উপনিষদের পানে। কবিগুরুর মুখে লেখায় কবিতায় দয়ালদা স্পর্শ পেতেন সেই পরাৎপরের যাঁকে দেখে বৈদিক ঋষির কণ্ঠ মন্ত্র ঝংকারে বেজে উঠেছিল :

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

সে-মহান পুরুষেরে জানি আমি—যাঁর বরাভয়
চিরোজ্জ্বল অজ্ঞানের তমসার পারে।
জানিলে তাঁহারে তবে হয় জীব শিব মৃত্যুঞ্জয়,
জীবন্মুক্তির নাই আর কোনো পথ এ-সংসারে॥

(ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী, হা হা

গৌরকিশোর ঘোষ

অ্যান, প্রাণাধিকাসু,

এই পর্যন্ত লিখে সে থামল। পড়ল। তারপর প্রাণাধিকাসু কথাটা কেটে দিল। তারপর দর্শকদের দিকে চেয়ে কৈফিয়ত দিল, কেন কাটলুম জানেন? আজ এখানে, এই কলকাতায়, এই পশ্চিমবঙ্গে আমার প্রাণের অধিক আমি ছাড়া আর কেউ নেই তাই। আমি আর আমার প্রাণ এক ঠাঁই রাখতে, সে যে কী প্রাণান্ত। হা হা!

প্রিয় অ্যান, তোমার চিঠিখানা পেয়ে অনেকদিন পরে আবার কাঁচা বয়সের রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। যখনই তোমার চিঠি পাই, আমার মনে হয় যেন দৈববাণী শুনি। মনে হয় অন্তরীক্ষে কোথাও দুটি চক্ষু আমার দিকে সতত চেয়ে আছে, মনে হয় অগণিত তারার মধ্যে মিশে আরও দুটো তারা নির্নিমেষ চেয়ে আছে শুধু আমারই দিকে। আর এই বোধটা এই মধ্যাহ্নের আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে যখন চলি, সেই নিঃসঙ্গ যাত্রায় বড় বল দেয়। তোমার কাছে স্বীকার করাই ভাল, আজ আমি একা। আর করার মত ভাল পারট আমার হাতে নেই। আমি আজ আর কারো বন্ধু নই, সন্তান নই, স্বামী নই, পিতা নই, ভাই নই। এইসব ভূমিকার সফল অভিনয় এত অজস্র রজনী করেছি, তাই ওগুলো আর লোক টানে না। আমি আজ শুধু আমি। অ্যান, তুমি আমার কে? এ প্রশ্নের আজও মীমাংসা হয়নি। আমি তোমার কে, তুমিও কখনও এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করনি। প্রথম সাক্ষাতে তুমি বলেছিলে, হু ইজ ফ্রম ইনডিয়া? তুমি, তাই না? আর আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ।

দৃশ্য এক : অ্যান হুইল চেয়ার ঠেলে এগিয়ে এল। তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সে হ্যানড শেক করল।

অ্যান হেসে বলল, কী করে চিনলাম? অবাক হচ্ছ? অবাক হবার কিছু নেই। তোমার গায়ে যে কলকাতার গন্ধ। ওয়েলকাম টু ওয়েলস্।

সে বলল, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেভিস, অ্যান যে খবরের কাগজের সাব্-এডিটার তিনি তার সম্পাদক, সমবেত বিদেশী অভ্যাগতদের উদ্দেশ করে বললেন, ওয়েল, ইটস এ ন্যাচারাল সিলেকশান। অ্যান তার দেশের লোক পেয়ে গিয়েছে। জেনটলমেন, লেট আস্ হ্যাভ্ এ টোস্ট্ ফর দি রি-ইউনিয়ন।

তারা সকলে মদের গ্লাস তুলে সমস্বরে বলে উঠল, গুড্ লাক্ টু মিঃ ক্যালকাটা।

সে গ্লাস তুলে বলল, ধন্যবাদ।

অ্যান বলল, থ্যাংক ইউ মিঃ ডেভিস। দিস্ ইজ্ এ সিলেকশন নো ডাউট অ্যানড এ ভেরি ন্যাচারাল ওয়ান ইনডিড্। অ্যানড আই হোপ্—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিঃ ডেভিস বললেন, দিস্ উইল বি এ রিওয়ার্ডিং ওয়ান টু। গুড্ লাক টু অ্যান।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

সে প্যাডের পাতা থেকে মুখ তুলে দর্শকদের বলল, অবিকল এইভাবে শুরু হয়েছিল, জানেন? সে আজ কত বছর হয়ে গেল! যেন অনেক জন্ম আগে। কী দারুণ বরফ পড়ছিল! এর আগে আমি সিনেমার, বিলাতী ফিলমে ছাড়া আর বরফ পড়তে দেখিনি কোথাও, সোনালী-চুল মেয়েও না। ডিনার টেবিলে অ্যান আমার পাশে বসে ছিল। সেই থেকে আমরা ঘনিষ্ঠ।

দৃশ্য দুই : ইউ বাস্টারড্! ইউ লায়ার! ইউ সোয়াইন! বলে চেঁচিয়ে উঠে খালাসী-টোলার নড়বড়ে বেঞ্চিতে ঠকাস করে মদের গেলাসটা নামিয়ে রেখে লোকটা সটান তার সামনে এসে দাঁড়াল। গাট্টাগোট্টা চেহারা। বুনো মোষের মত ফুঁসছে। ঘুঁষি পাকিয়ে বলে উঠল, সুশালা! মামদোবাজি পেয়েছ। অ্যান ইজ মাই লাভার। এক ঘুঁষিতে তোমার নাক ফাটিয়ে দেব। আই শ্যাল শুট্ ইউ।

জনা দুয়েক লোক এসে তৌরিয়া লোকটাকে জাপটে ধরল।

এই, কি মাতলামি হচ্ছে!

চল চল। আর হুজ্জোত বাধিওনি বাবা। সোময়টা ভাল না।

লোকটা চেঁচাতে লাগল, হি ইজ্ এ লায়ার। অ্যান আমার লাভার। অ্যানের বাবা আমার দাদুর কোলিয়ারির ম্যানেজার ছিল। আই লাভ হার। আই লুলাভ হার। অ্যান আমার লাভার। যে সুশালা তার দিকে পাপচক্ষে তাকাবে তাকে আমি—

সে দর্শকদের বলল, আপনারা বসুন। বিচলিত হবেন না। উনি বড় মজার লোক। এর আগে ওলিম্পিয়ায় উনি একদিন আমাকে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, অ্যান বড় ভাল মেয়ে। অ্যানকে আমি ভালবাসি। তুমি বড় ভাল ছেলে। তোমাকেও আমি, উঁক, ভালবাসি। অ্যান ছোটবেলায় এ দেশ থেকে চলে গেছে। ওকে কখনও, উঁক, চুমু খেতে পারিনি। আজ এস, তোমাকেই চুমু খাই। উম্ উম্ উম্।

তুমি যে-কলকাতার কথা জান আন, সে আবার দর্শকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লিখতে বসল, তুমি যে-কলকাতার ছবি দ্যাখ, ছবি আঁক আর আমি যে-কলকাতায় থাকি, এ দুটো কিন্তু এক পৃথিবীতে বাস করে না। তুমি তো এ-দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছ সেই কবে। তখন যুদ্ধ সবে বেধেছে। তখন তুমি খুবই ছোট। তখন কলকাতা ছিল বাংলা দেশের রাজধানী, আর সে বাংলা ছিল পূর্ব+পশ্চিম বাংলা, এ সেকেন্ড সিটি অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার। আর এই কলকাতা এখন পশ্চিমবঙ্গের নড়বড়ে শহর মাত্র। আর পশ্চিমবঙ্গ এক ঝাঁঝরা প্রমোদতরণী। এ লিকি বোট। হা হা। আর কলকাতা তার চুনকাম-করা উপরের ডেক। হা হা। আর আমরা এক ফ্যানসি ড্রেস বল নাচে রংমাখা সব কুশীলব। হা হা।

সে লিখতে লিখতে হঠাৎ একবার নেপথ্যের দিকে চেয়েই চেয়ার ছেড়ে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল, আসুন, আসুন। কি আশ্চর্য! তারপর দর্শকদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পৌরসভার নকীবের মত হেঁকে উঠল, লেডিজ অ্যানড জেনটেলমেন, মিঃ মেয়র!

দৃশ্য তিন : মেয়র মহোদয় যথেষ্ট আনুষ্ঠানিক মর্যাদা বজায় রেখে মেপে মেপে পা ফেলে প্রবেশ করছেন। তাঁর পরনে কালো রঙের স্যুট, টাই, কিন্তু প্যান্টের বোতাম একটাও না থাকায় ভিতর থেকে জাঙিয়ার সাদা দড়ি বাইরে বেরিয়ে পড়েছে এবং মেয়রের চলার গতির সঙ্গে তা পেন্ডুলামের মত এদিক-ওদিক দুলছে। মেয়র মহোদয় চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে দর্শকদের দিকে মুখ করে বসলেন। ফলে প্যান্টটা আরও হাঁ হয়ে গেল এবং ভিতরের

জাঙিয়াটি বেশ প্রকটভাবে দৃশ্যমান হল।

এক নং কাউনসিলারের নেপথ্য কণ্ঠঃ মিঃ মেয়র স্যার, এ ম্যাটার অব গ্রেট পাবলিক ইম্পরট্যান্স। আবর্জনার স্তূপে কলকাতা মহানগরী, যে মহানগরী রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজীর ঐতিহ্য বহন করছে, ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁর ধারা যেখানে ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত

মেয়র মহোদয় : মোদ্দা কথাটা কী বলুন।

এক নং কাউনসিলারের নেপথ্য কণ্ঠঃ মোদ্দা কথাটা হচ্ছে জঞ্জাল অপসারণে আপনার চরম ব্যর্থতা। নিদারুণ গাফিলতি। আমরা জানতে চাই জঞ্জাল সাফ হচ্ছে না কেন? রেট পেয়ার আর কতদিন এ অবহেলা সইবে।

মেয়র মহোদয় : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।

২নং কাউনসিলারের নেপথ্য কণ্ঠঃ মিঃ মেয়র স্যার, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভাতা বাড়াবেন বলে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই কথার উপর আস্থা রেখে আমরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছি। সেই বর্ধিত ভাতা কোথায়? কেন তা দেওয়া হচ্ছে না?

মেয়র মহোদয় : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।

৩নং কাউনসিলারের নেপথ্য কণ্ঠঃ মিঃ মেয়র স্যার, মেরামতির অভাবে কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা এমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নিত্য দুর্ঘটনা ঘটছে। লোক মরছে, জখম হচ্ছে, বাস গাড়ি উল্টে

মেয়র মহোদয় : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।

৪নং কাউনসিলারের নেপথ্য কণ্ঠঃ মিঃ মেয়র স্যার, কলকাতার জল সরবরাহের অবস্থা ভয়াবহ

মেয়র মহোদয় : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।

৫নং কাউনসিলারের নেপথ্য কণ্ঠঃ মিঃ মেয়র স্যার, আপনার প্যান্টের বোতাম নেই, জাঙিয়ার অংশবিশেষ দৃষ্টিকটুভাবে

মেয়র মহোদয় : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।

বিভিন্ন নেপথ্য কণ্ঠ : মিঃ মেয়র স্যার, মিঃ মেয়র স্যার, মিঃ মেয়র স্যর

মেয়র মহোদয় : অরডার অরডার। আপনারা ভুলে যাবেন না যে, আমরা নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করাকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছি। এও ভুলে যাবেন না যে, আমাদের একটু পরেই দেশবন্ধু ছবিটি বিশেষ প্রেস শো-তে দেখতে যেতে হবে এবং এই বছরই দেশবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং দেশবন্ধুই পৌরপ্রতিষ্ঠানের গৌরব ছিলেন। অতএব পৌরপিতা হিসাবে এই ছবিটি দেখে দেশবন্ধুর প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন যেন আমরা সর্বসম্মতিক্রমে করতে পারি, পৌরপিতা হিসাবে সেটা আমাদের বিশেষ দায়িত্ব। অতএব বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে, চলুন, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ি।

জনৈক কাউনসিলারের নেপথ্য কণ্ঠ : মিঃ মেয়র স্যার, এটা কি ক্যামিলি পাস?

মেয়র : আলবৎ। অনেক সংগ্রাম করে ওটা আদায় করেছি।

সকলে : (নেপথ্য থেকে চেঁচিয়ে) হিয়ার হিয়ার! থ্রি চিয়ার্স ফর মেয়র!

সে লিখল, কিছুদিন আগে ধাঙড় ধর্মঘট হয়েছিল। তাই আবর্জনার স্তূপ জমে আছে কলকাতার পথে পথে। মজা কি জান, যে পার্টির ইউনিয়ন সেই পার্টিরই মেয়র এবং সেই ধর্মঘট মিটেও গিয়েছে কবে! কিন্তু আজও জঞ্জালের স্তূপ রাস্তা থেকে সরল না।

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা যায় না অ্যান। ফুটপাথে জঞ্জাল, ফুটপাথে ব্যবসা বাণিজ্য, ফুটপাথে জন্ম মৃত্যু বিয়ে। কোথা দিয়ে হাঁটব তবে? রাস্তা?

দৃশ্য চার ॥ বিরাট চওড়া রাস্তা। নো পার্কিং সাইন। গাড়ি সারি সারি পারক করা। দুজন কনেস্টবল এক পানউলির সংগে হাস্য পরিহাসে মত্ত। রাস্তার মাঝখানে ট্রাম লাইন খোঁড়া। স্তূপাকার মাটি জমে আছে। রাস্তার এ ধারে গর্ত খুঁড়ে কেবল্ মেরামত হচ্ছে। ডাঁই-করা মাটি রাস্তাটিকে আরও সরু করে দিয়েছে। যে পথে পাশাপাশি দুটো গাড়ি অনায়াসে চলতে পারত সেখানে এখন একটা গাড়ি চলতে পারে কি না-পারে।

দৃশ্য পাঁচ : একটা লোক-বোঝাই প্রাইভেট বাস দ্রুত বেগে ওই সংকটে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দিলে। এক বৃদ্ধ ধাক্কা খেয়ে ছিটকে মুখ থুবড়ে রাস্তার পাশে পড়ল।

ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে : বাহানচোৎ তেরি বহেন কা—

প্যাসেনজাররা সমস্বরে : শালা অফিস টাইমে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে! এই ড্রাইভার ছোড় ছোড়, লেট হো যায়েগা।

বাসটার পিঠ থাবড়াতে লাগল যারা বাইরে ঝুলছিল। কনডাকটার বাস থেকে নেমে এগিয়ে গেল। তারপর বাঁয়া ডাহিনা করে মুমূর্ষু বৃদ্ধ আর মাটির ঢিপির ফাঁকটার ভিতর দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাসটাকে বের করে নিয়ে রণহুঙ্কার দিল, চলে—ই—বাস বেগে বেরিয়ে গেল।

দৃশ্য ছয় : একটা লরি তীর বেগে ছুটে ওই সংকটের মুখে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দিল। এক মহিলা লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন।

ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে : শালার মাগী—

টপ স্পিডে লরিটা বেরিয়ে গেল। মহিলার চোখ-মুখ রক্তে ভেসে যেতে লাগল। কেউ তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল না।

দৃশ্য সাত : একটা স্কুলের ছেলে গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ল। গাড়িটা তীর বেগে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই একটা প্রাইভেট গাড়ি ওখানে এল। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছেন। পাশে তাঁর মেয়ে বসে। স্কুল থেকে ফিরছে।

মেয়ে চীৎকার করল : বাবা! ওই দ্যাখ একটা ছেলেকে চাপা দিয়ে গেল! বাবা, ও কি মরে গেছে! বাবা ওকে তুলে নাও।

ভদ্রলোক ওর কথায় আমল দিতে চাইলেন না। বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

মেয়ে : বাবা, প্লিজ প্লিজ, ওকে ফেলে যেয়ো না। তুলে নাও বাবা। ও হয়ত বেঁচে যেতে পারে। ওই দ্যাখ নড়ছে।

মেয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। বাবা ইতস্তত করে গাড়ি ব্যাক করলেন। ওর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল।

বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, ব্যাপারটা খুবই রিস্কি।

গাড়ি ব্যাক করে আহত ছেলেটার কাছে ফিরে এল। ততক্ষণে সেখানে এক উত্তেজিত জটলা।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, ওই যে শালা ফিরে এসেছে। মার শালাকে।

সঙ্গে সঙ্গে একদল চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে টেনে হিঁচড়ে ভদ্রলোককে বের করে নিয়ে গেল। এবং লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে তাকে মেরে ফেলল। একজন ছুরি চালিয়ে তাঁর পেট ফাঁসিয়ে দিল। সেই কিংবা আর কেউ হয়ত গলার নলিটাও ফাঁক করে দিল।

মেয়ে ভয় পেয়ে গাড়ির মধ্যে বসে হিস্টিরিয়া রোগীর মত চোখ বুজে চেঁচাতে লাগল, বাবা বাবা বাবা!

দপ করে গাড়িতে আগুন জ্বলে উঠল। দাউদাউ আগুনের মধ্যে বসে মেয়েটা চোখ বুজে চেঁচাতে লাগল, বাবা বাবা বাবা!

দৃশ্য আট : কনেস্টবল দুজন পানউলির সঙ্গে খুব মস্করা করছে। হাসছে হো হো করে।

পানউলি : ও মিনসে, উধার যাও না। দেখ না কেয়া গোলমাল হোতা।

১ নং কনেস্টবল : আরে হোগা কেয়া? কোই নকসাল উকসাল আয়া গয়া হোগা, আউর কেয়া?

পানউলি : কেন, চোখের মাথা কি খেয়ে ফেলা হ্যায়। দেখতা নেই গাড়ি মে আগুন লাগাতা হ্যায়।

২ নং কনেস্টবল : আগুন দিচ্ছে তো আমরা গিয়ে কি করব? আমরা কি দমকল? আমরা ওদিকে যাই আর বোমা খাই। আমাদের শালা আর মাগ ছেলে নেই।

দৃশ্য নয় : দূরে, এক জটলার সামনে দাঁড়িয়ে দমকল ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

সে প্যাডের পাতা থেকে মুখ তুলে দর্শকদের বলল, ও দমকল আর আসবে না। কেন জানেন? ওরা ইঁট ছুঁড়ে, বোমা মেরে ওদের ভাগিয়ে দেবে। কলকাতার এখন এই দস্তুর।

অ্যান, সে ঘাড় গুঁজে আবার লিখতে লাগল, তোমার মনে আছে, ফ্রাংকফুরট থেকে তোমাকে যে চিঠিখানা লিখেছিলাম, তার কথা। তাতে তোমাকে প্রোফেসার হেলমুটের কথা লিখেছিলাম না! আজ কলকাতার অবস্থা দেখে, কেন জানিনে, বারবার তাঁর কথা মনে পড়ে। ওঁর মেয়ে ফ্রিডা, ফ্রাংকফুরটে আমার গাইড ছিল। ওকেই আমি বলেছিলাম, দ্যাখ, খালি ভাল ভাল জায়গা দেখে আর কি হবে? এত বড় একটা জাত, এত শক্তি, এত বুদ্ধি, এত উদ্যোগী, এরা কি করে একজন ডিকটেটরের পদতলে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিল, এটা আমার কাছে ধাঁধা। তোমাদের দেশে এলাম ফ্রিডা, এই ধাঁধার উত্তর না জেনেই ফিরতে হবে? ফ্রিডাই ব্যবস্থা করে ওর বাবার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিলে। ভারি সুন্দর দিনটা ছিল।

দৃশ্য দশ : প্রোফেসর হেলমুট তাঁর পড়ার ঘরে দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। ছোট ছোট টি-পয়ের উপর খাবার প্লেট চায়ের কাপ খালি পড়ে আছে। ফ্রিডা একটা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে। কুড়ি বছরের তরুণী। বেশ বিরাট চেহারা। চোখে মুখে লাবণ্য ঢলঢল করছে। ওর মা, প্রৌঢ়া, চেহারা দেখলেই মনে হয় অনেক দিন ধরে অনেক দুশ্চিন্তার ঝড় ওঁর উপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে গেছে. এসে খালি প্লেট গ্লাসগুলো তুলে নিতে লাগলেন। ফ্রিডা মাকে সাহায্য করতে গেল, উনি বারণ করলেন। স্বামীর দিকে একবার চেয়ে ভিতরে চলে গেলেন। প্রোফেসর হেলমুটের সব চুল সাদা রেশমের মত। অবিনাস্ত। সে প্রোফেসর হেলমুটের চুলের উপর দিয়ে তার দৃষ্টিটা পিছনের কাঁচের জানলার উপর ফেলল। বাইরে সুন্দর রোদ। একটা গাছের ডাল মৃদু হাওয়ায় দুলছে। নিচে, ওরা দোতলায় বসে ছিল, পারকে অজস্র রকমের ফুলের শোভা।

প্রোফেসর হেলমুট হঠাৎ ওর মুখের দিকে চাইলেন। তারপর মন্দ্রস্বরে বললেন, আমাদের ছেলে যতদিন ছোট ছিল, ততদিন ভালই ছিলাম। ও ক্রমে বাড়তে লাগল, বড় হতে লাগল, আর আমার মন অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। ওর বয়স যখন একুশ, আর দু' দিন পরেই ওর জন্মদিনের উৎসব, একদিন কলেজ থেকে ফিরে সটান আমার এই ঘরে ঢুকে পড়ল। ওর চোখ মুখ থমথম করছে। আমি প্রমাদ গণলাম। ও আমার চোখে চোখ রেখে বলল, হিটলার যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ ইহুদীকে, বিরোধী পক্ষের লোককে হত্যা
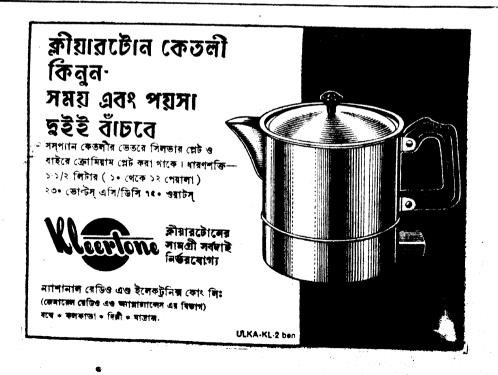
করেছে, এ খবর তুমি জানতে? বুঝলাম, আর পালাবার পথ নেই। আমার ছেলে একদিন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, এই আশংকায় আমি ওর মুখোমুখি হতাম না। সত্যি কথাই বললাম, আভাসে ইঙ্গিতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ও তার পরের প্রশ্ন করল, যখন বুঝতেই পেরেছিলে, তখন কী করলে? আমি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, আমি কী করব! অত বড় একটা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে, হিটলারের হাতে মিলিটারি, পুলিস, গোয়েন্দা, পোষা গুন্ডা, আর আমি এক নিরীহ প্রোফেসর, আমি কী করব! কী করতে পারতাম! ঘৃণায় ওর চোখ-মুখ বীভৎস হিংস্র হয়ে উঠল। সাপের মত হিস্ হিস্ করে বলল, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মরতে পারতে। কাপুরুষ! ভণ্ড! ইউনাক!

প্রোফেসর হেলমুট মাথা নিচু করে বললেন, সেই যে ও এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আর সে ফিরল না। আসলে আমি, আমরা ভয়ে জবুথবু হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। ভয়ে আমাদের বিচারবুদ্ধি গুলিয়ে গিয়েছিল। সেদিন কেন যে সব কিছু খুইয়েও শুধু বেঁচে থাকতেই চেয়েছিলাম, আজ তার ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব।

সে মুখ তুলে দর্শকদের বলল, আজ আমরাও কি এই প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়াইনি? এসে দাঁড়াইনি বিবেকের সামনে?

দৃশ্য এগার : ভঁক ভঁক করে হর্ন দিতে দিতে লোক বোঝাই এক দোতলা বাস এসে স্টপে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পাইপগান আর লোহার রড হাতে দুজন ড্রাইভারের কাছে ছুটে গেল।

ড্রাইভারের দিকে পাইপগান তাক করে একজন : এই শালা, বাঁচতে চাস তো শিগগির নেমে আয়।

ড্রাইভার কাঁপতে কাঁপতে নেমে গেল। ওরা ড্রাইভারের পেঁদে এক লাথি মারল।

অন্য দুজন দুজন কনডাকটারের পেটে ছোরা ধরে : এই শালা, যা আছে দিয়ে দে। দিয়ে ভাগ্।

কনডাকটার দুজন পকেট আর ব্যাগ হাতড়ে যা পেল, ওদের দিয়ে দিল। ওরা এক একজন কনডাকটারের পোঁদে এক একটা লাথি ঝেড়ে বলল, যা শালা ভাগ। হাসতে হাসতে যাবি শালা।

কনডাকটার দুজন হাসতে হাসতে চলে গেল।

চার-পাঁচজন ভিতরে ঢুকতেই দু-চারটা মেয়ে ভয়ে কেঁদে উঠল।

পাইপগান উঁচিয়ে একজন চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই চো-ও-প, সব চোপ।

সবাই চুপ করে গেল।

লোহার রড উঁচিয়ে একজন বলল,

সব প্যাসেঞ্জার দাঁত বার করে হাসতে লাগল

এখানে শালা কারো বাপের শ্রাদ্ধ হচ্ছে না যে, কাঁদতে হবে।

বোমা উঁচিয়ে একজন বললে, এটা হাসির নাটক হে, হাসির নাটক। প্রাণটি নিয়ে যে বাড়ি পৌঁছাতে পারবে সেই আনন্দে সবাই একবার বদন ভরে হাস।

সব প্যাসেঞ্জার দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

একজন ডান্ডা উঁচিয়ে হুকুম দিল, এবার সবাই ধীরে ধীরে নেমে যাও।

সবাই ধীরে ধীরে নেমে যেতে লাগল। গেটের কাছে ছোরা হাতে দুজন। এক একজন করে যাত্রী গেটের কাছে আসছে। ওরা পোঁদে লাথি মারছে। যাত্রীরা দাঁত বার করে, যেন কিছুই হয়নি, নেমে যাচ্ছে। বাস খালি হল। ওরা আগুন ধরাল। বাস দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

দৃশ্য বার : যাত্রীরা সবাই পোঁদে একটা করে লাথি খাচ্ছে আর হাসতে হাসতে ট্রাম থেকে নেমে যাচ্ছে। খালি ট্রাম দাউদাউ করে জ্বলতে থাকল।

দৃশ্য তের : বাস চলছে। ভিতরে ঝগড়া হচ্ছে।

একজন চেঁচিয়ে উঠল : এই শালা ড্রাইভার আগের মোড়ে বাস থামাও। বাস সামনের মোড়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভিতর থেকে একটি গুন্ডা ছেলে একজনকে টেনে হিঁচড়ে নামাচ্ছে। সে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, আমাকে বাঁচান। আমাকে ধরুন। আমাকে নামাতে দেবেন না। আমাকে খুন করে ফেলবে। সবাই চুপ। বাঁচান বাঁচান বাঁচান।

ছেলেটাকে নামিয়ে গুন্ডাটা সকলের সামনেই তার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিল। ছেলেটা বাবাগো বলে নিদারুণ এক চীৎকার দিয়ে গোঙাতে লাগল। সবাই চুপ।

গুন্ডাটা বলল, এই ড্রাইভার, আস্তে গাড়ি চালাও।

ড্রাইভার গাড়ি চালাল।

দৃশ্য চোদ্দ : স্কুলের দোতলার ক্লাস থেকে চারটি ছেলে পাইপগান, লোহার রড নিয়ে একটি ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে আনছে।

ছেলেটি চেঁচাচ্ছে : স্যর বাঁচান! বাঁচান। আমাকে খুন করবে। বাঁচাও। কে আছ বাঁচাও। পুলিসে খবর দাও।

পাইপগানধারী : চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক সব যদি বাঁচতে চাও।

একজন বারান্দায় একটা বোমা ছুঁড়ল। সবাই ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

ছেলেটাকে ওরা হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা যা পাচ্ছে, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছে। দরজা চেপে ধরল। ওরা টানছে ওকে। ও প্রাণপণে দরজা চেপে ধরে আছে। বাঁচান। স্যর অমাকে বাঁচান! একটা ছেলে লোহার রড পিটে ওর হাতের আঙ্গুল ছেঁচে দিল। ওর মুঠো আলগা হয়ে পড়ল। বাঁ-চা-ও, বাঁ-চা-ও! ওরা ওকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। ছেলেটা পেচ্ছাব করে ফেলল। বাঁচাও বাঁচাও।

লোহার রড চলল. আর কোথাও নিয়ে যাওয়ার দরকার কি? এই গেটের বাইরেই শালাকে খতম করে দে।

একটা ছেলে তার কানে পাইপগান ঠেকিয়ে গুলি করল। তারপর ওকে ফেলে রেখে নিরুত্তেজভাবে বেরিয়ে গেল। ছেলেটা পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ধড়ফড় করল। তারপর ঠান্ডা।

দৃশ্য পনের : ফাঁকা রাস্তা। দূরে কোথাও বোমা পড়ল। প্রথমে একজন এবং পরে আরও কয়েকজন ভয়ে ভয়ে এদিক

ওদিক তাকাতে তাকাতে পথ চলছে। আবার বোমার আওয়াজ। ওরা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

দৃশ্য ষোল : নেপথ্যে আওয়াজ শোনা গেল—হ্যানডস আপ। হাত ওঠাল সকলে। আগের দৃশ্যে যাদের দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল, তারা সব ঊর্ধ্ববাহু হয়ে একে একে উল্টো দিকে চলে গেল।

দৃশ্য সতের : একটা আর্মড পুলিসের ভ্যান ভোঁ করে এসে পড়ল। থামল। কয়েকজন পুলিস ও অফিসার উদ্যত রাইফেল ও রিভলবার নিয়ে ঝপঝপ করে নেমে পড়ল। তারপর কিছুক্ষণ এলোপাথাড়ি গুলি চালাল।

অফিসার দুটো রিভলবার তাক করে হুকুম দিলেন, হ্যানডস আপ!

একজন বাজারের থলি সমেত অতি কষ্টে হাত উঁচু করে চলে গেল।

সারজেন্ট একটা রিভলবার তাক করে : হ্যানডস আপ!

দুটি খুব আধুনিকা মেয়ে হাত উঁচু করে চলে গেল।

একজন কনেস্টবল রাইফেল তাক করে : হ্যানস আপ।

জনৈকা বেশ্যা চোখ মেরে : মিনসের ন্যাকরা দ্যাখ। যা না ঘরে গিয়ে মাগকে হ্যানসাপ কর। কোমর দুলিয়ে চলে গেল। কনেস্টবল রাইফেল নামিয়ে গোঁপে তা দিতে লাগল

আবার গাড়িতে সবাই উঠে পড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

সে দর্শকদের বলল, এই কলকাতার এখন শুধু বেশ্যারাই নির্ভয়।

দৃশ্য আঠার : একজন কনেস্টবল রাইফেল উঁচিয়ে ভয়ে ভয়ে লাট্টুর মত ঘুরপাক খেতে খেতে হ্যানসাপ হ্যানসাপ হ্যানসাপ বলতে বলতে ত্বরিত গতিতে বেরিয়ে গেল।

দৃশ্য উনিশ : দুজন কনেস্টবল পিঠে পিঠে জোড়া লাগিয়ে দুটো রাইফেল তাক করে কিছুটা সাহসের সঙ্গে উদো-বুধোর স্টাইলে জোড়া জোড়া পা ফেলে হ্যান্ডস্ হাপ্, হ্যান্ডস্ হাপ্ বলে হেঁকে হেঁকে কাঁকড়ার মত পাশে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

দৃশ্য কুড়ি॥ চারজন কনেস্টবল চার দিকে মুখ করে এবং চার দিকে রাইফেল তুলে এবং গায়ে গা ঠেকিয়ে সামনে পিছনে পাশে বিচিত্র গতিতে এগিয়ে হাঁকতে লাগল হ্যা-ন-স হা-প! তারপর ওইভাবে বেরিয়ে গেল।

দৃশ্য একুশ॥ এক মোটা মারোয়াড়ী মহিলা রিকশায় চেপে হাত উপরে তুলে বেরিয়ে গেলেন।

দৃশ্য বাইশ : একটা বাসের প্যাসেঞ্জাররা, যাঁরা সীটে বসেছিলেন, হাত উঁচু করে অফিসে চললেন।

সে দর্শকদের বলল, যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা যেহেতু ঊর্ধ্ববাহু হয়েই ছিলেন, সেই হেতু সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে গেল।

দৃশ্য তেইশ : বাবা আর ছেলে একসঙ্গে হাত তুলে পথ হাঁটছে। ছোট ছেলের খুব মজা লেগেছে। বলল বাবা, তুমি গৌরাঙ্গ হয়েছ। বাবা অপমানে ফুঁসছিল। ছেলের গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিল। এক কনেস্টবল বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটার পোঁদে এক বুটের লাথি কষিয়ে বলল, শালা, কার হুকুমে হাত নামিয়েছিস। হ্যানডস আপ।

দৃশ্য চব্বিশ : হাত তুলে একটা লোক এল। বিড়বিড় করে বলল, আমি মশাই গায়ক। কোনো সাতেপাঁচে নেই, বলুন দেখি কি বিড়ম্বনা।

আরেকজন ঢুকলেন। বৃদ্ধ। হাই পাওয়ারের চশমা। বললেন, আমি একজন অধ্যাপক। আমার মানসম্মান আছে। এসব কী হচ্ছে। অ্যাঁ। নেপথ্য থেকে গর্জন : হ্যানডস আপ। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি গৌরাঙ্গ হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিনসের ন্যাকরা দ্যাখ...

আরেকজন রাগতভাবে ঢুকলেন। বললেন, আমি রিটায়ারড জজ। আমি সব আইন জানি। পুলিসকে এমন যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা কে দিয়েছে, জানতে চাই।

নেপথ্যে গর্জন : হাত উঠাও, নইলে গুলি করব।

রিটায়ারড জজ তাড়াতাড়ি হাত তুলে এবং কিঞ্চিৎ নরম হয়ে বললেন, ব্যাটা বড্ড গোঁয়ার। আইনকানুন যে জানে না তা তো বোঝাই যাচ্ছে। হয়ত দুম করে গুলিই ছুঁড়ে বসবে। তার চাইতে বাড়ি চলে যাই, জ্যোতিষ নিয়ে বসিগে। কোন গ্রহনক্ষত্রের কুদৃষ্টির ফলে কপালে আজ যে এমন অপমান যোগ ঘটল, সেটা ভাল করে মিলিয়ে নেওয়াই তো ভাল, নয় কি?

দৃশ্য পঁচিশ : একজন পুলিস অফিসার ঢুকলেন। ডান হাতে রিভলবার, বাঁ হাতে পোরটেবল মাইক্রোফোন। দুমদুম করে দুটো ব্ল্যাংক ফায়ার করলেন। তারপর মাইক্রোফোন মুখে তুলে বললেন, যে যেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে আছেন, সেই অবস্থায় থাকুন সবাই। খবরদার, কেউ নড়বেন না।

রিভলবার তুলে শূন্যে আরও দুটো ফায়ার করলেন তিনি।

তারপর আবার মাইক্রোফোন মুখে তুলে বললেন, আপনারা কেউ নড়বেন না। এখনই পুলিস কমিশনার আসছেন। জনসংযোগ করবেন।

চারজন পুলিস চারদিকে রাইফেল উঁচিয়ে এক ব্যূহ রচনা করে ঢুকল। ব্যূহের ভিতরে পুলিস কমিশনার।

ব্যূহের ভিতর থেকেই পুলিস কমিশনার হাঁক ছাড়লেন, নবকেষ্ট!

পুলিস অফিসার দৌড়ে এসে খটাস করে এক স্যালুট দিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে বললেন, ইয়েস স্যার!

পুলিস কমিশনার : সব ঠিক আছে?

পুলিস অফিসার অ্যাটেনশন হয়ে : ইয়েস স্যার।

পুলিস কমিশনার : মাইক দাও।

পুলিস অফিসার বলল, অ্যাটেনশন। চারজন কনেস্টবল চারদিকে মুখ করে অ্যাটেনশন হল। পুলিস অফিসার যথেষ্ট শক্ত হয়ে এক দো তিন—তিন পা এগিয়ে গেলেন। প্যারেডের ছবি। নবকেষ্ট পা ঠুকে দাঁড়ালেন। একটা স্যালুট দিলেন। মাইক্রো-ফোনটা রাইফেলের মত একবার বুকের কাছে এনে ওটা কমিশনারের হাতে দিলেন। স্যালুট করলেন। তিন স্টেপ ব্যাকওয়ারড মারচ করলেন। অ্যাটেনশন, তারপর স্ট্যানড অ্যাট ইজ হয়ে দাঁড়ালেন।

পুলিস কমিশনার : নবকেষ্ট, তুমি একটু এগিয়ে ওই মোড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়াও।

নবকেষ্ট : ইয়েস স্যার!

পুঃ কঃ : কড়া নজর রাখবে। বুঝেছ!

নবকেষ্ট : ইয়েস স্যার!

পুঃ কঃ : একটু এদিক ওদিক দেখলেই ইউ শুট।

নবকেষ্ট ইয়েস স্যার বলে স্যালুট দিয়ে রিভলবার বাগিয়ে মারচ করে বেরিয়ে গেল।

পুলিস কমিশনার চারজন কনেস্টবলের ব্যূহের ভিতর দাঁড়িয়ে চোঙা মুখে দিয়ে বললেন, বন্ধুগণ, আজকের আমার এই জনসংযোগের উদ্দেশ্য, আপনাদের একটা কথা দৃঢ়ভাবে জানানো যে, পুলিসের মনোবল দারুণ হাই। আমি পুলিস কমিশনার, আমি এ কথা পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে জানাচ্ছি যে, পুলিস ফোরসের সাহস অটুট আছে। এবং পুলিসের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরা আগে যেখানে একটা পুলিস দিতাম, এখন সেখানে দুটো তিনটে পুলিস দিচ্ছি। আর তাদের হাতে ঢালাও রাইফেল রিভলবার দিয়েছি। দরকার লাগলে বোমাও দেব। এইভাবে আমরা শহরে আইন শৃংখলা ফিরিয়ে আনব। শৃংখলা যে বেশ খানিকটা ফিরেছে তা এখন শহরের রাস্তাঘাটে ঊর্ধ্ববাহু লোকের সংখ্যা দেখলেই বুঝতে পারবেন। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানও আপনাদের সাহায্য করবে। মাত্র তিন মাস আমরা গৌরাঙ্গ মুদ্রা চালু করেছি। প্রথম মাসে ৩৩%, দ্বিতীয় মাসে ৫৭% এবং এ মাসে, এ মাস শেষ হতে যদিও বার দিন বাকি আছে এবং সব থানার রিপোরট এখনও পাইনি, এরই মধ্যে ৭৮% লোক গৌরাঙ্গ মুদ্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এই অগ্রগতি, আমি তো মনে করি পুলিস ফোরসের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। নয় কি? এইবার অন্যের কথা। আগেই আপনাদের বলেছি, সব পুলিসের হাতেই আমরা অস্ত্র দিয়েছি। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে

এই যে, রাইফেল, রিভলবার তো সবাই চালাতে জানে না। আমরা যারা জানি, বহু দিনের অনভ্যাসের দরুন তাদের হাতেও আজ আর ভাল টিপ নেই। তাই আমরা সবাই পাইকারী হারে আগামী তিন মাস হাতের টিপ প্র্যাকটিস করে নেব সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সুখের কথা, আমাদের প্রশাসনের বিজ্ঞ অফিসারদের আমাদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা যখন ওয়াকিবহাল করেছি, তখন তাঁরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তা বিচার করে দেখেছেন এবং আগামী তিন মাস, অর্থাৎ পুলিসের টিপ প্র্যাকটিসের মরসুমে পুলিসের গুলিতে কেউ মারা গেলে তার কোনও তদন্তই হবে না, এই আশ্বাস পুলিসকে দিয়েছেন। আমরা আনন্দিত যে, পুলিসকে তাঁরা পুলিস হিসাবে না দেখে মানুষ হিসাবেই বিচার করেছেন। আপনাদের কাছেও আমার অনুরোধ যে, আপনারাও পুলিসকে মানুষ হিসাবেই গণ্য করবেন। এবং জানেন তো মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, তাই আগামী তিন মাসে এই বেচারী আনাড়ী পুলিস-মানুষেরা হাতের টিপ ঠিক করতে গিয়ে যদি রামকে মারতে শ্যামকে মেরে ফেলে, অবশ্যই ভুল করে, তবে তা নিয়ে হইচই করবেন না। কারণ আমরা তো আপনাদের নিরাপদেই রাখতে চাই।

মুখ থেকে চোঙ্গা নামিয়ে পুলিস কমিশনার হাঁক দিলেন, নবকেষ্ট।

নবকেষ্ট দৌড়ে এসে অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট দিল। তারপর প্যারেডের কায়দা-কানুন যথোচিতভাবে পালন করে চোঙ্গাটা পুলিস অফিসারের হাত থেকে নিয়ে নিল।

পুলিস কমিশনার হুকুম দিলেন, শুট। শুট টু কিল।

অ্যান, এখন আমরা দুই তরফের ফায়ারের মধ্যে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস, কারখানা, ইস্কুল, হাসপাতাল যাই, বাজার হাট করি, সিনেমা থিয়েটার দেখি, সঙ্গীতের জলসা, খেলার মাঠের ভিড় বাড়াই, আবার বাড়ি ফিরি। সব সময় কেমন ভয় ভয় করে। এই ভয় যা কিছুর সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ প্রাণের বন্ধন তা কুরে কুরে খেয়ে আলাদা করে দিচ্ছে। আমার নোঙরটা ছিঁড়ে গেছে। আমি শ্যাওলার মত ভেসে চলেছি। সব বন্ধন ছিঁড়ে ছিঁড়ে ক্রমশ আমি একা হয়ে পড়ছি। আবার যত একা হচ্ছি ততই ভয় বাড়ছে। যত ভয় বাড়ছে তত দ্রুত একা হয়ে যাচ্ছি!

মাঝে মাঝে অতি পরিচিত এই কলকাতা কেমন অচেনা হয়ে ওঠে। তখন আর পথঘাট দোকানপাট লোকজন কিছুই চিনতে পারিনে। অবাক, হতভম্ব হয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ি। এক সময় দেখি পথটা নড়ছে। লম্বা হচ্ছে। লম্বা হচ্ছে।

দৃশ্য ছাব্বিশ : রেড রোডটা ক্রমশ লম্বা হয়ে চলেছে। মেশিন থেকে [illegible] কাগজ বের হয়, অনেকটা সেই [illegible]। রেড রোড ক্রমশ লম্বা হতে হতে …রু হতে হতে সোজা দিগন্তে গিয়ে মিশল। পথের এক পাশে হিংস্র, ক্রুদ্ধ বিরাট একদল তরুণ ও যুবা, ভদ্র-অভদ্রের রকমারি ভিড়, হাতে লোহার রড সাইকেলের চেন, ছুরি বোমা, পাইপ-গান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পথের অন্যধারে উদ্যত রাইফেল ও রিভলবারধারী পুলিস ফোরস। আর পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলেছে কলকাতার অগণিত নাগরিকের, আবালবৃদ্ধবনিতার নিঃশব্দ মিছিল। এরা যেন রোমক বা মিশরীয় সাম্রাজ্যের পায়ে-বেড়ি দাসের দল, যারা শুধু অন্যের হুকুম নত মস্তকে মানতেই জানে। মাথা নিচু করে, নিজেকে ভাগ্যের হাতে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে ওদের মিছিল চলেছে দিগন্তের দিকে নিয়তির দিকে।

দৃশ্য সাতাশ : প্রোফেসার হেলমুট বললেন, আমরা বুঝতে পারছিলাম, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যত পিছিয়ে পড়ছি, ততই বিবেকের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আর বিবেকের কাছ থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছিলাম, ততই অন্যায়ে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস আমরা হারিয়ে ফেলছিলাম। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য আমরা কেউ রুখে দাঁড়াইনি। ভাইমার সংবিধানে ব্যক্তির অধিকার রক্ষার্থে

স্বীকৃত ছিল, নাৎসীদের, কমিউনিস্টদের ক্রমাগত প্রচারের ফলে সাধারণ লোক তার মর্ম বুঝতে পারেনি। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও তার মূল্য দেয় নি। গণতান্ত্রিক চেতনাকে, ব্যক্তির অধিকারবোধকে ওরা সবাই উপহাসের বস্তু করে তুলেছিল।

দৃশ্য আটাশ : ময়দানের মাইক তারস্বরে বলে চলেছে, এই কি গণতন্ত্র। এ তো ধাপ্পা। যে গণতন্ত্র বড়লোককে শুধু বড়লোক করে আর গরীবের গরীবী আরও বাড়িয়ে দেয়, সেই গণতন্ত্র তো ধাপ্পাবাজি। ঝুটা।

দৃশ্য ঊনত্রিশ : প্রোফেসার হেলমুটে বললেন, আমরা যারা বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, আমরা প্রথম দিকে এইসব কথা ফু ফু করে উড়িয়ে দিয়েছি। এই অপপ্রচারের জন্যেই উত্তর দেওয়া যে জরুরি, জনসাধারণকে সমান জোরের সঙ্গে এ কথাটা বোঝানো দরকার ছিল যে কল্পনার স্বর্গে পৌঁছুবার স্বপ্ন রচনা না করে বাস্তবের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করা অধিকতর কাম্য। আমরা, বুদ্ধিজীবীরা তা বোঝাতে পারিনি। অনেকে দেশের উপর রাগ করে, বিরক্ত হয়ে বা প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে দেশ ছাড়লেন, আর আমরা যারা রইলাম মুখ বুজে, তারা মূল-হীন মনুষ্যত্বহীন শুধু-বেঁচে-থাকার জীবন বেছে নিলাম। কেবলই নিজেকে ভাঁওতা দিচ্ছিলাম, অমঙ্গলের যে চেহারা দেখছি, এ সাময়িক। মানুষ মূলত কল্যাণ-কামী যখন, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

দৃশ্য ত্রিশ : গোটাকতক মাস্তান এসে বাসটা ঘিরে ফেলল। এক মাস্তান ড্রাইভারকে বলল, কি বে খুব যে নকশা দেখিয়ে ভেগে পড়া হচ্ছে। কালীপুজোর চাঁদাটা? ড্রাইভার দাঁত বের করে হেসে বলল, কেন দাদারা কাল যে দিয়ে গেলাম। মাস্তান বলল, রসিদ দেখি। ড্রাইভার রসিদ দেখাল। মাস্তান ঠাস করে ড্রাইভারের গালে এক চড় মেরে বললে, মাজাকি বার করছি। শালা, আমাকে ফল্‌স্‌ দিচ্ছ। ড্রাইভার চড় চাপড় খেতে খেতে বলল, এত চাঁদা রোজ রোজ কোত্থেকে দেব? কতজনকে দেব? ড্রাইভারের পেটে এক ঘুঁষি ঝেড়ে মাস্তান বললে, আবার রংবাজি হচ্ছে। যাত্রীরা চুপ।

দৃশ্য একত্রিশ : প্রোফেসার হেলমুটে বললেন, ছোটখাট উৎপাত—দোকান লুঠ, কি জবরদস্তি টাকা আদায়, কি সুদখোর ইহুদীর গলাকাটা, এ সব আমরা প্রথম দিকে তেমন আমল দিইনি। ভেবে-ছিলাম, এগুলো মূলত ল অ্যান্ড অরডারের সমস্যা। গণতন্ত্রের এখন জীর্ণ দশা, প্রশাসনের দক্ষতা নেই। একটা দক্ষতর শক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই এ সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে লিখল, অ্যান, আমরাও মোটামুটি এখনও সেই ধরনের চিন্তাই একটা করে যাচ্ছি। এই সর্বনাশের মূল খুঁজতে এখনও আমাদের আলস্যের অবধি নেই।

দৃশ্য বত্রিশ : প্রোফেসার হেলমুটে বললেন, ক্রমশ উৎপাত বেড়ে চলল। সেই সঙ্গে খুন, জখম, আর লুঠেরাদের আকাশ-ছোঁয়া দাবি।

অ্যান, দাবির বহর এখানেও বাড়ছে। কখনও পুজোর চাঁদার নামে, কখনও পারটির চাঁদার নামে জুলুম বেড়েই চলেছে। ফলে বাসওয়ালারা বিনা নোটিসে বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। খুন জখম বাড়ছে। স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে মারছে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে। বাড়ি চড়াও হয়ে খুন করছে। স্কুলের শিক্ষিকার বুকে বিঁধছে ছুরি। সবাই আমরা চুপ করে আছি। মুখ বুজে সব জুলুম হজম করে যাচ্ছি। আর মাথা তুলতে সাহস পাইনে কেউ। খাচ্ছি, দাচ্ছি, রমণ করছি, আর সিনেমা দেখছি, আর চায়ের দোকান, কফি হাউসে জাঁকিয়ে বসে রাজা উজীর মেরে চলেছি।

দৃশ্য তেত্রিশ : চৌরঙ্গী রোডের এক দিকের ফুটপাথ ঘন জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। মাঝে মাঝে কতকগুলো লোমশ হাত জঙ্গল ভেদ করে উপরে উঠছে। হাতে হাতে পাইপ গান, তলোয়ার, বর্শা, লোহার রড, সাই-কেলের চেন, বোমা। ওদিকের ফুটপাথে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিস ফোরস্‌। হাতে রাইফেল, রিভলবার, লাঠি। এপার থেকে পাইপ গানের আওয়াজ। মারো শালাকে। বোমার আওয়াজ। মারো শালাকে। ওপার থেকে হুকুম আসছে। শুট, শুট টু কিল। রাইফেলের ফট্‌ফট আওয়াজ। আর রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে ভীত ত্রস্ত অগণিত নরনারীর নতমুখী মিছিল।

এ পাশ থেকে পাইপগানের গুলি ছুটল। মিছিলের একটা মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। জঙ্গলে উল্লাস, "একটা শ্রেণী শত্রু খতম।"

ওপাশ থেকে হুকুম, "শুট।" রাইফেল আওয়াজ দিল ফট্‌ট্‌। মিছিলের একটি জোয়ান বুকে গুলি লেগে ছিটকে পড়ে গেল।

"হ্যালো, কনট্রোল রুম। চৌরঙ্গী এরিয়া স্যার। হ্যাঁ স্যার। এক রাউনড্‌। কাভার স্যার। একজন খতম স্যার। স্পট্‌ ডেড্‌ স্যার। সমাজবিরোধী স্যার।"

হঠাৎ চৌরঙ্গী রোডটা দ্রুত বেগে চলতে শুরু করল। যেন দ্রুতগতি একটা কনভেয়ার বেল্ট্‌।

সে দর্শকদের বলল, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন নিশ্চয় যে, ওরা, ওই মিছিলের লোকগুলো কেউ কারো দিকে চাইছে না। কাজেই ওদের সঙ্গীদের কে থাকল আর কে গেল, তা ওরা কেউ বুঝতেই পারছে না।

দৃশ্য চৌত্রিশ : চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। বাঁ দিক থেকে একটা বোমা এসে মিছিলে পড়ল। পাঁচ-ছজন পড়ে গেল। কেউ মৃত কেউ বা আহত। মিছিলের লোকগুলোর কেউ কেউ মৃত ও আহত সঙ্গীদের ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে গেল, কেউ কেউ বা মাড়িয়ে।

বাঁ দিকে উল্লাসধ্বনি : আরও শ্রেণী-শত্রু খতম।

ডান দিক থেকে কয়েক ঝাঁক গুলি এসে সেই বোবা মিছিলের আরও কয়েকটা লোককে মাটিতে শুইয়ে দিল। মিছিলের বাকি লোকেরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। কেউ কেউ ওদের ডিঙিয়ে গেল, কেউ কেউ বা মাড়িয়ে।

ডান দিক থেকে আওয়াজ উঠল : সিক্‌স্‌ রাউনড্‌স্‌ ফায়ার স্যার। থ্রি স্পট ডেড্‌, থ্রি ইনজিওরড্‌ স্যার। ইয়েস স্যার। অল অব দেম আর নোটেড ক্রিমিনালস্‌ স্যার। ওয়াগন ব্রেকারস্‌ স্যার। হ্যাঁ স্যার, কয়েকজন নকশালও আছে স্যার।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কনভেয়ার বেল্টের ফিতে হয়ে দ্রুত দিগন্তে ছুটে চলল।

সে লিখল, অ্যান আমরা এখন নিবিষ্ট চিত্তে নিজের দিকে চেয়ে আছি। শুধু নিজের দিকে।
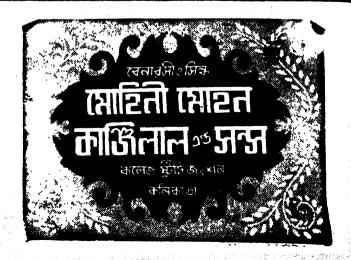
দৃশ্য পঁয়ত্রিশ : প্রোফেসার হেলমুট ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ আমরা সবাই নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিলাম। তাই পশুশক্তি আমাদের দাসে পরিণত করতে পেরেছিল।

দৃশ্য ছত্রিশ : কলেজের প্রিনসিপ্যাল উদ্‌ভ্রান্তের মত এগিয়ে এলেন। বললেন, ল্যাবরেটরি ভেঙে তচনচ করে ওরা চলে গেল। ওরা সংখ্যায় ছিল বারজন। আমার কলেজে? অধ্যাপক ত্রিশজন, ছাত্রসংখ্যা সাড়ে সাত শ' আর অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা সত্তর। আর দারোয়ান মালী দশজন।

প্রধান শিক্ষক উদ্‌ভ্রান্তের মত এগিয়ে এলেন। কাতরভাবে বললেন, পরীক্ষার হল ভেঙে তচনচ করে দিয়ে ওরা চলে গেল। ওরা সংখ্যায় ছিল দশজন। পাঁচ শ' ছাত্র পরীক্ষায় বসেছিল।

খবরের কাগজের এডিটার এগিয়ে এলেন, বললেন, জনসাধারণের বিবেক বলে কিছু আছে না কি যে, তা জাগ্রত করার জন্য কলম ধরব? আসলে কী জানেন, এখন এগেনস্ট্ কারেন্ট্। সকলেরই মোরেল ভেঙে গেছে। খবর রাখি তো। এখন কিছু কমিট না করাই ভাল। সময় আসুক, তখন দেখবেন, একেবারে আগুন ছুটিয়ে দেব। বলি, আমি যে লিখব, আমার লাইফের গ্যারান্টি কে দেবে? আরে মশাই, কাশী মিত্তিরও চিনি, আর নিমতলাও চিনি। নিতান্ত মরে আছি, তাই পথটা দেখাতে পারছিনে। হেঃ!

কলেজের প্রিনসিপ্যাল : ঠিক বলেছেন। আমি যে কিছু করব, আমায় প্রোটেকশান কে দেবে?

প্রধান শিক্ষক : তাই তো মশাই ওসব কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়িনে আমি। আমি শিক্ষাব্রতী। ছাত্রদের কিসে ভাল হয়, তাই দেখাই আমার কাজ। আমি তাই কষে এমন সব নোট বই লিখে যাচ্ছি, যা পড়লেই সিওর পাশ করবে।

দৃশ্য সাঁইত্রিশ : প্রোফেসার হেলমুট বললেন, আমরা অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম, অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। আমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ত ঝরেছে। তারা আমাদের চৈতন্য জাগ্রত করার জন্য দধীচির মত আত্মাহুতি দিয়েছে। তবু আমাদের চোখ খোলেনি। আমার অন্তরাত্মায় এই অশুভের ছায়াপাত ঘটেছিল। আমরা জানতাম, আমরা সর্বনাশের দিকে যাচ্ছি। কিন্তু হায়, জেনেও বুঝতে চাইনি। বুঝলেও প্রতিকার করার চেষ্টা করিনি। কোনও রকম নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি। আমরা গণতন্ত্রবাদীরা একেবারে নপুংসক হয়ে পড়েছিলাম।

প্রোফেসার হেলমুট তার দিকে মুখ তুলে চাইলেন। তারপর ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, আমার ছেলে ঠিকই বলেছিল। ইউনাক ইউনাক ইউনাক।

সে লিখল, আমার খুব ভয় করে অ্যান, আমার খুব ভয় করে। না, মৃত্যুভয় নয়। মৃত্যু তো অমোঘ পরিণতি। সে তো মায়ের কোলে ঠাঁই নেওয়া। আমি [illegible] ভয়ের কথা বলছি, তার কোনও শরী[illegible]ই। তাই তোমাকে আমি বোঝাতে [illegible]ছিনে। এই ভয় আমাকে নিঃসঙ্গ কর[illegible]ছে। আমার বন্ধুবান্ধব পিতামাতা স্ত্রী-সন্তান ভাই-বোন প্রতিবেশী সমাজ সবার কাছ থেকেই আমাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। আমি প্রাণপণে ওদের আঁকড়ে ধরতে চাইছি। ওরা ক্রমশ ফসকে যাচ্ছে। সবই যদি যায় তবে ত্রিশঙ্কু আমি, আমার বাঁচার সার্থকতা কী? আমার অস্তিত্বের অর্থই বা কী দাঁড়াবে? এই কথাটা আমি বোঝাতে চাইছি। কিন্তু যদি বোঝাতে পেরে না থাকি! সেই ভয়ে সতত অস্থির। আমার এই ভয়ের চেহারাটা আমি জানিনে। তবে উৎসটা জানি। আজ এই পাইকারী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির অক্ষমতাই আমার এই ভয়ের উৎস।

সে এই পর্যন্তই লিখেছিল। চিঠিটা শেষ করার আগেই তাকে আপিসে চলে যেতে হয়। অনেক রাতে, শেষ বাসে বাড়ি ফেরার সময় দূরের এক মোড়ে কনডাকটার তাকে বলে, বাস সোজা যাবে। ওদিকে যাবে না। ওদিকে হাঙ্গামা হচ্ছে। কনডাকটার তাকে ওখানেই নেমে যেতে বলে। সে নামে। খুব ক্লান্ত ছিল, তাই সে এক রিকশা নেয়। রিকশায় আসতে আসতে তার অ্যানের কথা মনে পড়ে। সে আর অ্যান, বিদায়ের শেষ মুহূর্তে একটা ফায়ার প্লেসের সামনে চুপ করে বসেছিল। অ্যান তার হুইল চেয়ারে আর সে কার-পেটের উপর। দৃশ্যটা তার মনে পড়ে। ওরা

একটা রেকরড চ্যাম্পিয়েন্‌ছিল ডিস্‌ক্‌ জকিতে। রেকরডটা অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়েছিল বোধ হয়। ওরা খেয়াল করেনি। রেকরডটা নিঃশব্দে ঘুরেই চলেছিল। আর ফায়ার প্লেসের কাঁপা কাঁপা আগুনে অ্যানের মুখ চোখ সোনালী চুল চকচক করছিল। অ্যান, তার মনে হল, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপে। তারপর অ্যান ওর দিকে চোখ তুলে, ওর মনে হল, ফায়ার প্লেসের আগুনেই অ্যানের চোখ দুটোকে এমন অস্বাভাবিক চকচকে করে তুলেছে, বলে সো! তুমি ফিরে চললে। সে ঠাট্টার স্বরে বলে, হ্যাঁ চললাম। তুমি নিশ্চয়ই আর আমাকে মনে রাখবে না। অ্যান সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারে, তবে তুমি কি ভেবেছ, তুমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিচ্ছেদে কাতর হয়ে বিছানায় গিয়ে গড়াগড়ি দেব। অ্যান্‌ড্‌ আই শ্যাল চিউ মাই হার্ট। নিজের সম্পর্কে তোমার বেশ উচ্চ ধারণা আছে দেখছি। অ্যানের বিদ্রূপে সে কাঁচুমাচু হয়ে ওঠে। এবং সে অ্যানকে তার অজ্ঞাতসারে যে ব্যথা দিয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং এও জানায়, ইংরাজি না জানার দোষেই এ রকমটা হয়েছে। অ্যান যেন কিছু মনে না করে। তার কথায় অ্যান হেসে ফেলে। বলে, সরি।

তাদের পাড়াটা যে অস্বাভাবিক থমথমে হঠাৎ সে টের পায়। এবং পরমুহূর্তেই অন্ধকার থেকে কেউ একজন হুকুম করে, হ্যান্‌ড্‌স্‌ আপ্‌। সে ব্যাপারটায় আমল দেয় না। রিকশাওয়ালা তাকে বলে, বাবু, হাত উঠাইয়ে। তার অভিমান আহত হয়। সে রাগতভাবে বলে, তুমি চল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে এক কনেস্টবল এগিয়ে এসে ঘাড় ধরে তাকে রিকশা থেকে টেনে নামায়। এবং বলে, শালা, কানে কথা ঢোকে না। সে কনেস্টবলকে জিজ্ঞাসা করে, কেন তাকে হাত ওঠাতে হবে। কনেস্টবল বলে, আমার হুকুম। সে জিজ্ঞাসা করে, এমন হুকুম দেবার অধিকার তাকে কে দিল? কনেস্টবল তখন রাইফেলের নল তার তলপেটে ঠেকিয়ে বলে, এই দিয়েছে। সে তখন আকাশের দিকে তাকায় এবং কোনও তারা দেখতে পায় না। নিদারুণ ভয়ে সে অসাড় হয়ে যায় এবং কনেস্টবলের হুকুমমত মাথার উপরে হাত তুলে বাড়িতে ঢোকে। তার স্ত্রী দরজা খুলে দেয় এবং সে ভিতরে ঢোকে। তারপর জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শোয়। তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে সে খাবে কিনা। সে তার স্ত্রীর কথার কোনও উত্তর দেয় না। তার স্ত্রীর সেইজন্য প্রচণ্ড অভিমান হয়। তারপর তার স্ত্রী বিছানায় উঠে আসে এবং অন্য দিকে পাশ ফিরে শোয়। কিছুক্ষণ কেউই কারোর শরীর স্পর্শ করে না। পরে তার স্ত্রী এগিয়ে আসে, তার গায়ে হাত রাখে এবং জিজ্ঞাসা করে সে আজ খুব ক্লান্ত কিনা। সে জানায় সে আজ বিশেষ ক্লান্ত নয়। তখন তার স্ত্রী আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয় এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে সে মানে তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়বে, না অন্যান্য দিন যা হয় আজও তাই হবে। এই প্রস্তাব তার মনে ধরে এবং সে সম্মতি জানায়। এর পর তার স্ত্রী বাহুপাশে তাকে বেঁধে ফেলে এবং তার মুখে চুমু খায়। সেও চুমু খাবে বলে ভাবে কিন্তু বোধ করে তার শরীরে তেমন সাড়া জাগছে না। তখন সে ভাবে পরিবেশটা আর একটু উন্নত করতে পারলে হয়ত তার শরীরেও সাড়া জাগবে। তাই সে হঠাৎ খাট থেকে নেমে পড়ে এবং তার স্ত্রী তাকে হঠাৎ নেমে যেতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়, এবং সে মানিকের কাছ থেকে কিনে আনা লাঠির মত একটা বৃহৎ ধূপকাঠি জ্বালায়। এবং সে পুনরায় খাটে এসে শোয়। ধূপকাঠির সুগন্ধে তার স্ত্রীর শরীরে কামের জোয়ার এসে যায় এবং তার স্ত্রী কাতরভাবে তার সহযোগিতার জন্য পুনঃপুনঃ আবেদন জানায়। তার স্ত্রীর আবেদনে সে কিঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করে এবং সাড়া দেবে বলে মনস্থ করে এবং তখনই তার খেয়াল হয় যে, নিরোধের প্যাকেটটা তার জামার পকেটে আছে। সে সে-কথা তার স্ত্রীকে জানায় এবং তার স্ত্রী ছটফট করতে থাকে। সে আবার খাট থেকে নামে এবং জামার পকেট থেকে নিরোধের প্যাকেটটা বার করে নেয় এবং বাথরুমে চলে যায়। এবং বাথরুমে গিয়ে সে সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয় এবং আয়নার সামনে দাঁড়ায় এবং অকস্মাৎ "এ কী!" বলে চিৎকার করে ওঠে। তার হাত থেকে নিরোধের প্যাকেট খসে পড়ে যায়, সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আপন মনে বলে ওঠে, "আমি হিজড়ে হলাম কখন!" সে তাড়াতাড়ি দরজার ছিটকিনি এবং খিল বন্ধ করে দেয়।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর, বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গেলে সে বোধ করে তাহার খারাপ লাগিতেছে না। সে বেশ হালকা বোধ করে। বরং জীবনে এই প্রথম সে তাহার চতুর্দিকে একটা সম্ভাবনাময় জগৎ দেখিতে পায়। সে এই ভাবিয়া পুলকিত হয় যে, এখন আর সে একা নহে। তাহার গলার স্বর ক্রমে পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং হাঁটাচলায় হিজড়ায় স্বাভাবিক ছন্দ ফুটিয়া উঠে।

সে পরম যত্নে নিরোধের প্যাকেটটি মেঝে হইতে কুড়াইয়া লয় এবং প্যাকেট হইতে এক একটি নিরোধ বাহির করিয়া ফুঁ দিয়া বেলুনের মত ফুলাইতে থাকে। এবং বেলুনগুলি সুতা দিয়া বাঁধিয়া বাথরুমের দড়িতে ঝুলাইয়া দেয়। এবং বেলুনের গায়ে টোকা মারিয়া উল্লাসের সহিত হাতে তালি দিতে দিতে বলিতে থাকে, "খোকার গালে চুমা খাব গ, খোকার মা।" রাঙা রাঙা খোকার গালে চুমা খাব গ, খোকার মা।" এবং ক্রমাগত হাতে তালি বাজাইয়া সে হিজড়া নাচ নাচিতে থাকে এবং "এখনই আর সন্তান নয়, তিনটির পরে কখনোই নয়।" এই রমণীয় সঙ্গীতটি যত্ন সহকারে গাহিতে থাকে।

তাহার গানের শব্দে পরিবারস্থ সকলের ঘুম ভাঙিয়া যায় এবং তাহারা সকলে আসিয়া বাথরুমের সামনে ভিড় করিয়া দরজায় দুম দুম করাঘাত করে এবং তারস্বরে কাহাকে যেন ডাকিতে থাকে।

ছেলেমেয়েরা ডাকে, "বাবা বাবা!"

মা ডাকে, "খোকা খোকা"

বউ বলে, "ওগো ওগো!"

এবং বাহিরে তাহাদেরও আওয়াজ ছাপাইয়া তালে তালে বোমা ফাটে বুম, বুম।

পাঁচ
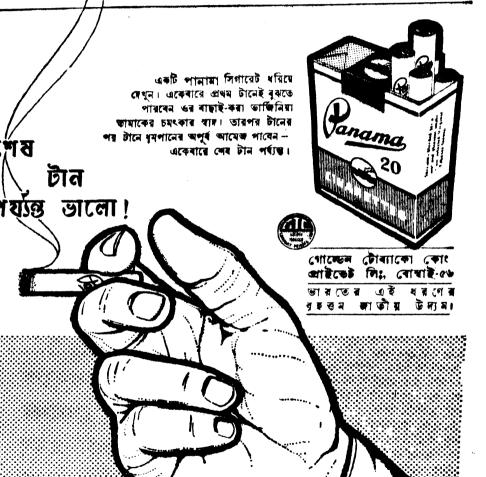
বাদুড়বাগানের সেই চারতলা বাড়ির গোলোকধাঁধায় বেগমপুরের শ্রীমতী দেবীকে কেই বা দয়া করে খবর দিত, যদি না তেতালার জানালা দিয়ে গোরী দেখতে পেত যে একটি লাজুক ছাত্র সদর দরজার বাইরে ঘুর ঘুর করছে, ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।

"আসুন, আসুন, আপনি কি রতনবাবু?" বলে সরকার গোছের একজন বেরিয়ে আসেন।

"আপনার জন্যে আমরা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি। রাস্তা চিনতে দেরি হলো বুঝি?"

হাঁ, সেটাও একটা কারণ। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কারণ সরকারবাবুর রত্নকে চিনতে দেরি হলো। কে বিশ্বাস করবে যে রতনবাবু বলতে বোঝায় অল্পবয়সী এক ছোকরা, যে পায়ে হেঁটে এসেছে। যার পরনে আটপৌরে খদ্দর।

সরকারকে অবাক হতে হলো যখন শ্রীমতী দেবীর খাস পরিচারিকা এসে রতনবাবুকে সোজা উপরে নিয়ে গেল। কোনো আত্মীয় হবেন বোধ হয়। স্বদেশী আন্দোলন করছেন।

শীতলপাটি দিয়ে মেজের সমস্তটা মোড়া। তার উপরে ফরাস পাতা। রত্নকে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসানো হলো। তার সামনে রাখা হলো ফল আর সরবৎ। পরে একটা মার্বেলের জলচৌকি পাতা হলো। তার উপর রাখা হলো দুপুরের আহার্য।

রত্ন আশা করেছিল আর কেউ তার সঙ্গে খাবে, কিন্তু বাড়ির ছেলেরা সবাই তখন কলেজে বা স্কুলে আর বাবুরা আপিসে বা আদালতে। মেয়েরা তো স্বতন্ত্র খান। গোরী ওদের সঙ্গে পরে একসময় বসবে।

রত্নর খাওয়া দেখবার জন্যে গোরী তো ছিলই। আর ছিল ললিতের বউ। সাবু। ওর মাথায় আধ-হাত ঘোমটা। ললিতের বন্ধু এই সুবাদেই রত্নর সেদিন ও বাড়িতে নিমন্ত্রণ। শ্রীমতীর দর্শনার্থী বলে নয়।

সাবু বেচারি সত্যিই ললিতের জন্যে ভাবছিল। জাহাজের জীবন ওর অজানা। তাই গোরী ওকে অভয় দিচ্ছিল এই বলে যে জাহাজে চড়া স্টীমারে চড়ার মতোই ব্যাপার। পদ্মার স্টীমারের সঙ্গে পরিচয় যার আছে সে নির্ভয়ে সমুদ্রযাত্রা করতে পারে।

ললিতের প্রসঙ্গেই অধিকাংশ সময় কাটে। তার পর ওঠে সাতভাই চম্পার প্রসঙ্গ। শেষে সাবু ওঘরে গেলে গোরী এদিক ওদিক তাকায় ও আস্তে আস্তে বলে, "জাহাজটা যাকে যাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল তাকে তাকে নিয়ে গেল না বলে একজনের মনে যে কী কষ্ট তা বলবার নয়। আরেকজনের মনে?"

"আরেকজন তো সারারাত ঘুমোতেই পারেনি সেই দুঃখে।" রত্ন বলে নিচু গলায়।

"কিন্তু গেলে পগলামি হতো না কি? জীবনের শুরুতেই পাগলামি?" গোরী বলে।

"তা ছাড়া আর কী?" রত্ন সাড়া দেয়।

"ধৈর্য ধরাই শ্রেয় মনে হয় নাকি?" গোরী জানতে চায়।

"অগত্যা।" রত্ন জবাব দেয়।

"আমাদের জীবনে অবিচ্ছিন্ন সুখ কোথায়?" গোরী দার্শনিকতা করে।

"বিচ্ছিন্ন সুখই বা কোথায়।" রত্ন আক্ষেপ করে।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর গোরী একটু সাহস পেয়ে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করে দেয়। বলে, "তুমি শুনে দুঃখিত হবে যে কলকাতার লেডী ডাক্তার মিসেস গাঙ্গুলিও একমত। কলকাতা এসে আমার নতুন কোনো অভিমত শোনা হলো না। শুধু আশঙ্কা বেড়ে গেল।"

"আশঙ্কা কিসের?" রত্ন উদ্বিগ্ন হয়।

"বিশ বছর বয়সে যারা প্রথম মা হয় তাদের খালাসের সময় বেশী কষ্ট হয়। কে জানে আমাকে কাটবে কি না! কাটলে কি আমি বাঁচব!" গোরী চোখ মোছে।

"কত মেয়ে বাঁচছে। সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো থাকলেই হলো। তোর—মানে তোমার—স্বাস্থ্য ভালো থাকা দরকার।" রত্ন ভরসা দেয়।

"সেইজন্যেই তো বাপের বাড়ি যাবার কথা হচ্ছে। যদি যাই তুমি কৃষ্ণনগরে আসবে তো?" গোরী সুধায়।

"কোন সুবাদে আসব?" রত্ন বিস্মিত হয়।

"সে ভার আমার উপর ছেড়ে দে—দাও।" গোরী হাসে।

ঠাকুর এসে আরেকবার পরিবেশন করে গেল। রত্নর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গোরীর হুকুম। আসলে ওরা চেয়েছিল আরো কিছুক্ষণ একসঙ্গে কাটাতে।

"এরা খুব ভালো। এই বাড়ির মেয়েরা। ললিতের মামার বাড়ি এটা। আমাকে যা খাতির করছে তা দেখবার মতো।" গোরী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে।

"তা বলে আমি তো ললিতের অনুপস্থিতিতে একটুও স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারিনে।" রত্নর মনে হয় তার স্বাগতের সময় অতীত হয়েছে।

"আচ্ছা, তা হলে সেই কথা রইল। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে। কে জানে হয়তো এই কলকাতাতেই। যদি আবার পরীক্ষার জন্যে আসতে হয়। শুনেছি আসতে হবে। মিসেস গাঙ্গুলি যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন।" গোরীর মুখে ভয় মেশানো হাসি।

"দেখা যাক। তোর ভয় কেটে গেলই খুশি হব।" রত্ন বিদায় নেয়।

বিদায় দেবার সময় গোরী আরো নিচু গলায় বলে, "এই কলকাতা শহরেই আমার আপনার লোক অন্তত আট দশ ঘর। কিন্তু কোথাও আমার ওঠবার জো নেই। যা কড়া পাহারা। নইলে তোর আদর আপ্যায়ন এমন যাচ্ছে তাই হতো না।"

প্রথম দর্শনের দিন গোরীকে যেমন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল এখন তার তুলনায় অনেক প্রাণবন্ত। এতদিনে সে ওই অপ্রত্যাশিত ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে। বিশেষ করে মিসেস্ গাঙ্গুলির অভিমত শোনার পর। যা হবার তা হবেই। মেনে না নিয়ে উপায় কী। তাই

ওর মুখে একটু হাসির আমেজ ফুটেছে। বেগমপুরের মতো মেঘলা নয়।

জ্যোতিদা বলেছিল পাঁচিশে মে কলকাতা আসতে পারবে না। কিন্তু পরে একদিন আসতে পারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় হাজিরা দিতে। রঞ্জু যদি ততদিন কলকাতায় থাকে তা হলে দেখা হবে। রঞ্জু উঠেছিল ওর এক কাকার সঙ্গে, তাঁর মেসে। সেইখানেই আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করল।

জ্যোতিদার সঙ্গে ওর একটা বিনি কথায় আত্মীয়তা ছিল, যেমন আর কারো সঙ্গে নয়। সেইজন্যে সাতভাই চম্পার বন্ধুদের চেয়ে নতুন হলেও ওদের বন্ধুতা গভীরতর স্তরের। কেউ কারো সঙ্গে একটি কথা না বলেও মনের ভাব আঁচ করে নিত।

রঞ্জু বেচারা অনিশ্চয়তার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। রেঙ্গুন তো মুখের গ্রাস মুখ থেকে ফস্কে গেল। এর পরে কবে কোথায় যাওয়া হচ্ছে কে জানে। হবে কি না তারই বা স্থিরতা কী। যা হওয়া আর না হওয়ার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক।

"গোরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে? কিছু বলল?" জ্যোতি জানতে চায়।

"হয়েছে। বলেছে আবার দেখা হবে। কৃষ্ণনগরে কিংবা কলকাতায়। কিন্তু কাজের কথা কিছু বলেনি। বোধ হয় নিজেই জানে না।" রঞ্জু উত্তর দেয়।

"মুক্তি বলতে এতদিন বোঝাত এমানসিপেশন। এখন বোঝায় ডেলিভারি। মেয়েদের জীবনে ওর মতো দুর্ভাবনা আর নেই।" জ্যোতি সমবেদনার সঙ্গে বলে।

"হাঁ, মনে হলো দুর্ভাবনায় পড়েছে। প্রাণের ভয় আছে।" রঞ্জু গম্ভীরভাবে বলে।

"না, না। ওটা ওর বাড়াবাড়ি। ও বাঁচবে ঠিকই। তুমি ভেবো না। নার্ভাস ভাবটা একটু একটু করে কেটে যাবে।" জ্যোতিদা অভয় দেয়।

"যাক, আমাদের তা হলে এখনকার মতো ছুটি। পরের কথা পরে।" রঞ্জু হাল্কা বোধ করে। দুর্ভাবনা তো বড়ো কম ছিল না ওদের।

"ছুটি হলেও ছুটির সময়টা হচ্ছে প্রস্তুতির সময়। আরো পাকা প্রস্তুতি চাই। ও হয়তো ওর বেবীকেও সঙ্গে নিতে চাইতে পারে। আগে তো এ সমস্যা ছিল না। আমাদের দায় দায়িত্ব কত বেশী বেড়ে যাচ্ছে!" জ্যোতিদা অভিভাবকের মতো বলে।

রঞ্জু মনে মনে শঙ্কিত হয়। বেবীকে কেমন করে সামলাতে হয় ও কি তা জানে! ভাগ্যিস জ্যোতিদাও সঙ্গে থাকবে।

"না, না, তোমাকে ওসব নিজের হাতে করতে হবে না। ওর জন্যে আয়া থাকবে। তবে আয়ার জন্যে বাড়তি খরচটা তোমাকেই জোটাতে হবে।" জ্যোতি হাসে।

রঞ্জু বিহ্বল হয়ে বলে, "আমার জীবনের গতি যেদিকে যাবার সেদিকে না গিয়ে এ কোনদিকে মোড় নিল, জ্যোতিদা! আমি তো কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে গোরী বলে একটি নারী আছে ও আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে নিরুদ্দেশযাত্রায়। কেন নিয়ে যাবে তাও কি আমি জানি! মুক্ত হবে, কিন্তু মুক্তির পর কাকে যে ওর জীবনের সাথী করবে তা তো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।"

"মুক্তির পরে ও কাকে বরণ করবে না করবে ওটাও মুক্তির অঙ্গ। স্বাধীন না হলে কেউ স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তোমারও তো আর কাউকে ভালো লেগে যেতে পারে। হৃদয় দেওয়া-নেওয়া করেছ, কিন্তু তার বেশী করতে যেও না। আগে মুক্তি, তার পরে সামাজিক বন্ধন, যদি দু পক্ষের ইচ্ছা থাকে। আপাতত তুমি ফ্রী, গোরী ফ্রী, সেই ভিত্তিতেই তোমাদের প্রেম বা বন্ধুতা।" জ্যোতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

"তুমি কি চাও যে আমিও তোমার সঙ্গে এখন থেকেই যোগ দিই? রেঙ্গুনের জন্যে নিষ্ক্রমণ করে এখন আর ঘরে ফিরতে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে মন চায় না। কে জানে আবার কখন গোরীর ডাক পড়বে। সব ছেড়েছুড়ে ছুটতে হবে।" রঞ্জু বলে।

"ডেলিভারির আগে তো নয়ই. পরেও কিছুদিন নয়। আমরা মোটের উপর এক বছর সময় পাচ্ছি। আমি ভাবছি বম্বে গিয়ে চাকরির তল্লাস করব ও গুছিয়ে বসব। তোমাকে রেখে যেতে চাই গোরীর কাছাকাছি। সময় হলে তোমরা আমার সঙ্গে যোগ দেবে। এই সময়টা কীভাবে কাজে লাগাবে সেইটেই প্রশ্ন। এম এ পড়লে তো ভালোই হত, কিন্তু কে জানে মাঝখানে ছেদ পড়ে কি না। যেমন পড়ল আমার বি এ পড়ার মাঝখানে। আমি হলে এম এ-টা আরম্ভ করে দিতুম। সেটা পরে কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, সেটাও প্রস্তুতির একটা ধাপ।" জ্যোতি আর কোনো পরামর্শ দিতে পারে না।

রঞ্জু বলে, "কিন্তু তুমি তো এক বছরের বেশী আমাদের দেবে না।"

"সাধ্য থাকলে দেব বইকি। গান্ধীজীর ত্বরা না থাকলে আমারও ত্বরা নেই।" জ্যোতি আশ্বাস দেয়।

(ক্রমশ)

বালগোপাল

কোয়াশিয়োরকর শব্দটি পশ্চিম আফ্রিকার। শব্দটির মানে ডাক্তারি শাস্ত্রে সাংঘাতিক অপুষ্টি বোঝালেও সরল আফ্রিকাবাসীর আটপৌরে অভিধানে মানে ছিল লম্বা। মোটামুটি অর্থ করলে বলা চলে, যে রোগে প্রথম শিশু কষ্ট পায় যখন দ্বিতীয় শিশু আসে মায়ের কোলে। সোজা কথায় শিশু যখন মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হয়ে নারীর গৃহস্থের সামান্য আহার্যের অংশীদার হয় তখনই সে দুর্বল হয়ে যায়, নানা অপুষ্টিজনিত লক্ষণে কষ্ট পায়।

আমাদের দেশে অপুষ্টির অংক যদি কষে দেখতে চান তবে সেখানেও ঐ বালগোপালদের সংখ্যাই পাবেন এক ভয়াবহ আকারে। প্রাইমারি স্কুল পর্যায়ে পৌঁছোয়নি, অর্থাৎ এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চার সংখ্যা ভারতবর্ষে ১২ কোটি। বর্তমান মাতৃ ও শিশু মঙ্গলের একটা ভাল রকম প্রচেষ্টায় আর কিছু না হক শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। আগে শিশু মৃত্যু সবচেয়ে বেশী হতো সূতিকাগৃহে। সন্তানের জন্ম ছিল এক সংকট ও পরবর্তী কয়েকদিন সতর্কতার অভাবে শিশুর নানা বিপদের মধ্যে কাটতো। এখন সারা দেশে ৫,000টি হেল্‌থ সেণ্টার মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন নেবার দায়িত্ব নিয়েছে। প্রত্যেক হেল্‌থ্ সেণ্টারের তিনটি করে সাবসেণ্টার আছে। তা ভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিও মা এবং শিশুর তত্ত্বাবাস করে। এ রকম কেন্দ্রও সবশুদ্ধ ১0,000 এর কম নয়। অবহেলিত হয়ে পড়ছে বালগোপালের দল। সরকারী বা বেসরকারী বিশেষ কোন ব্যবস্থাই বেচারাদের জন্য হয় না। মৃত্যু হারও তাই এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশী।

যদি ধরি যে বালগোপালের দল বেঁচে থাকে তাদের সংখ্যা ছয় কোটি, তাও তো চাট্টি খানি নয়। ১ থেকে পাঁচ বছর না ধরে যদি এই দলকে ১—১0 বছর ধরি তবে ভারতবর্ষের বিরাট জনসংখ্যার শতকরা ৪0টি তাদের মধ্যে পড়ে। যেখানে দুনিয়ার গড়পড়তা হিসাব শতকরা ১৫। আমেরিকাতে ১২। ইংলণ্ডে ১৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ লক্ষণ খুব সাংঘাতিক। বালক বয়সে মৃত্যু সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্ত গরীব দেশের সমস্যা। একমাত্র ভারতেরই যে তা নয়। অর্থের অভাব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার একান্ত অভাব সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে পঙ্গু করে রাখছে। অনুশীলনের পরিভাষায় বালগোপালগোষ্ঠী হচ্ছে সমাজের unproductive অংশ। জাতীয় economy বা আর্থিক অবস্থায় এদের কোন দান নেই। সমাজের কাছে সবটাই এদের প্রাপ্য, দেবার দায়িত্বের প্রশ্ন ওঠে না।

এদের পুষ্টির অভাব আমাদের সব পরিকল্পনার বড় বাধা। Greatest bottle-neck of our Planning এখানেও প্রথম এবং প্রধান সমাধান পরিবার পরিকল্পনা। গ্রামাঞ্চলের একেবারে অন্তঃকোণে এখনও কৃষক পরিবার বিশ্বাস করেন সন্তান সংখ্যা বেশী হলে তার নিঃসঙ্গ বার্ধক্যের ভয় থাকবে না। পুত্র সংখ্যা বেশী হলে অর্থনৈতিক সাহায্য হবে। বিদেশের এক বিশেষজ্ঞ দল অনুশীলন আর অনুসন্ধান করে এক কৌতূহলোদ্দীপক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। বাল মৃত্যুহার এত বেশী যে প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলের কৃষক দম্পত্তির ৬·২টি সন্তান হলে শতকরা ৯৫ ভাগ সম্ভাবনা থাকবে যে কৃষকের ৬0 বছর বয়সে পাশে দাঁড়াবার অন্তত একটি ছেলে জীবিত থাকবে। আপাতদৃষ্টিতে একটু অদ্ভুত ঠেকলেও কথাটা কিছু সত্য। দম্পতির সন্তান তো পুত্রই মাত্র নয়, অথচ গ্রামের অর্থনীতিতে আজও কন্যা কিছুই নয়। তার উপর ১ থেকে পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চার মৃত্যুহার শতকরা ৯৫। এবার বালক বালিকার অপুষ্টির আরও কাছে আসা যাক। দরিদ্র হলেই যে অপুষ্টি হবে তা বলছি না, কিন্তু বিত্তহীন সংসারে অপুষ্টির সম্ভাবনা শতগুণ বেশী। ছবিতে দেখুন পশ্চিমী মজুরের বালকটির পেট,

গ্রামের একটি হেলথ্ সেণ্টারে অপুষ্টিজনিত রুগ্ন শিশুর সঙ্গে মা

অর্থহীন ভাবহীন দৃষ্টি। উদরাময় যা পেটের অসুখের জন্য মা তাকে পরিয়েছেন লোহার বালা, দৈব গুণের ভরসাভরা মন্ত্রপূত কবচ। শুধিয়ে দেখুন কি তার কষ্ট, বিনা দ্বিধায় বলবে ছেলেটা পেট রোগা। দুধে হয়তো জল মিলিয়ে খাওয়ায়, অবশ্য যদি সেটুকু জোগাড় হয়। আসলে কিন্তু পেটটি তার অমন হয়েছে কারণ অপুষ্টিতে লিভারটি গেছে বড় হয়ে। লিভারের রং গেছে বদলে। লিভারের স্বাভাবিক কালচে রং হয়ে গেছে হলদে। এদের অন্ত্র বা intestines পর্যন্ত হয়ে যায় পাতলা আর স্বচ্ছ। তার উপর যকৃৎ বড় জবরদস্ত যন্ত্র। পুষ্টি পুরোপুরি না পেলে, তার প্রয়োজনীয় স্নেহের অভাব হলে শরীরের যেখানে যত স্নেহ পদার্থ আছে টেনে নেয়। কাজেই ঐ রোগা রোগা হাত পা টিং টিংগে বাচ্চার লিভারটি নাকি Fatty Liver। গলায় ঝুলছে ঠাকুরের দোরা ধরা মাদুলি কিন্তু গলাধঃকরণ যা করছে তাতে তার যকৃৎ, অন্ত্র ইত্যাদি সব যন্ত্র কাজ করছে না।

আমাদের দেশে ৯৫৬ হাজার প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। তাতে ১ কোটি ৯০ লক্ষ পড়ুয়াকে স্কুলে টিফিন দেওয়া হয়।
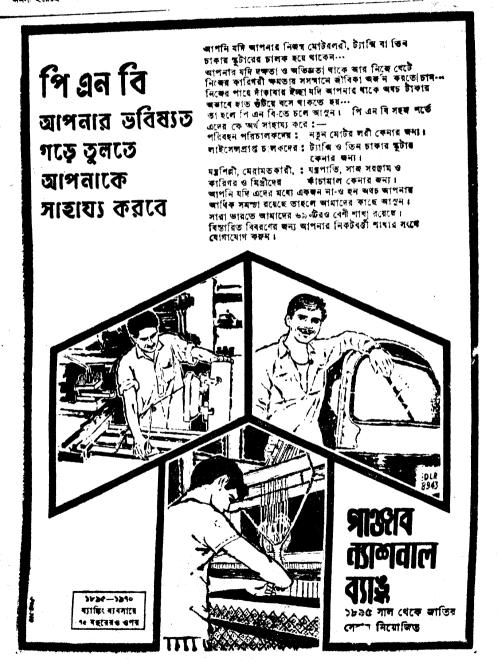
পৃথিবীতে এমন বিরাট আয়োজন নাকি আর নেই। বিরাট অবশ্য সংখ্যা। কিন্তু সে পর্যায়ে শিশু পৌঁছোবার আগেই যে সে হেঁদিয়ে যায়। এই যে আমরা সবুজ বিপ্লব বা green revolution নিয়ে মাতামাতি করছি সেটা কোথায়, কতটা কি যদি জানতে নাও পারি পুষ্টি মানের খাতায় খুঁজে পাই সেখানে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ১৯৬৬ সালে যে ক্যালরি গ্রহণের গড়পড়তা হিসাব ছিল ১৯৪০, '৬৭, '৬৮ এবং '৬৯-এ তার কতটুকু বা পরিবর্তন হয়েছে? তাও গড়গড়তার হিসাবে ধনী-সমাজ আছেন। তাঁদের ক্যালরি গ্রহণ এত বেশী যে গরীব বা স্বল্পবিত্ত মহলের সঙ্গে যোগ করলে গড়ের হিসাবে সঠিক ধারণা হওয়া কঠিন। কিছু দিন আগে হোম ইকনমিক্সে ডক্টরেট করবার জন্য একটি মেয়ে ৭৫টি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল সংসারের খাদ্য তালিকার খোঁজ সংগ্রহ করেছিল। দেখা গেল দশ বছর আগে তাঁরা যা খেতেন তার চেয়ে এখন অধিক গুণসম্পন্ন খাবার খান। Cereal অর্থাৎ ভাত-রুটি ইত্যাদি শর্করা প্রধান খাদ্য কম হয়েছে, শাকসবজী, তরি-তরকারি, মাছ মাংস বেড়েছে। স্বল্পবিত্ত, নিম্নবিত্তদের কি হয়েছে? মূল্যবৃদ্ধির চাপে তারা ডাল-রুটির ডালটুকু সংগ্রহ করতে পারে না, ভাতের মাথায় যে ছোট্ট একটু মাছের নাম থাকতো তা অদৃশ্য হয়েছে। গ্রামে তবু পুকুরের পারে নামলে শুসুনি, কলমি, থানকুনি, হেলেঞ্চা ইত্যাদি মিলবে, বনবাদাড়ে পাবে কাঁটানটে বা ঢেঁকিশাক। গেঁড়ি, গুগলি বা কুচো মাছ এক সন্ধ্যা খাওয়া অসম্ভব নয়। শহরের স্বল্পবিত্ত কি করবে বলুন?

অপুষ্টির আর এক ভয়াবহ ফল বছর দশেক আগে মেক্সিকোবাসী ডাঃ ক্রাভিয়োটো জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। তার আগে শিশুর বুদ্ধি পরীক্ষা বা I Q বিচার করার বিধি পেশ করে ছিলেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিনে। I. Q. বিচারে দেখা গেল অপুষ্ট শিশুর বুদ্ধি কম। দক্ষিণ আমেরিকা আমাদেরই মত গরীব। আমাদেরই মত তাদের বড় বড় শহরের দালান ইমারতের আবরণে দারিদ্র্যের অস্পষ্ট চাপা আর্তনাদ আছে। শহরের সামান্য বাইরে গেলে দরিদ্রের মাটির ঘরে অভাবের শতরূপ সবার সামনে প্রকট হয়ে ওঠে। তাই I. Q.-তে দরিদ্র বালক-বালিকার পরীক্ষা নিয়ে মাতলেন মেক্সিকোর কালো ডাক্তার Cravioto। সত্যি দেখা গেল অপুষ্ট শিশু অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিহীন। আবার ক্রাভিয়োটো সাহেবকে সমালোচনার সামনা-সামনি হতে হলো। বড় লোকের ছেলেমেয়ের যা অভিজ্ঞতা, গরীব ঘরে সে অভিজ্ঞতার সুযোগ কই? কি করে তাদের বুদ্ধির পরীক্ষা একই নিয়মে চলবে? ডাক্তার সাহেব দমবার মানুষ নন। এবার পরীক্ষার ব্যবস্থা হলো ভিন্ন। তাতেও দেখা গেল অপুষ্ট শিশুর চেয়ে সুস্থ সবল শিশুর I. Q. ভাল।

অপুষ্টি যে কেবলমাত্র শিশু জন্মের পরের কথা তাও নয়। জননীর জঠরে তার জন্ম সূচনা থেকে ৪ মাস পরে brain বা মস্তিষ্ক তৈরী হয়। চার মাস থেকে জন্মক্ষণ পর্যন্ত বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি। ভূমিষ্ঠ হবার পর দুই বা আড়াই বছর অবধি মস্তিষ্কের গঠন শেষ। তারপর শিশু যা শেখে তা অভিজ্ঞতা থেকে। সেই brain-এর উপর অভিজ্ঞতার স্পর্শ দিয়ে দিন দিন সে নূতন নূতন জ্ঞান ও চেতনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। কাজেই মায়ের পুষ্টি শিশুর স্বাস্থ্যের প্রথম প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই নূতন তথ্যের গবেষণায় একটি মহিলা আত্মনিয়োগ করেছেন। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ইঁদুর দিয়ে পরীক্ষা ও প্রমাণ করেছেন পুষ্টিহীন ইঁদুর খাদ্য সন্ধানে কম পটু। ইঁদুর খাদ্যের গন্ধে ছুটে আসে যথাস্থানে। তাকে রাস্তা বলে দিতে হয় না। রাজলক্ষ্মী ধাঁধার রাস্তা তৈরী করে এক কোণে খাবার রেখে দেখিয়েছেন পুষ্ট ইঁদুর বাধা যদি পায় তিন বার, অপুষ্ট ইঁদুর ছানা থমকে দাঁড়ায় ১৫০ বার। ভারী সুন্দর পরীক্ষা। যতবার ইঁদুরছানা বিভ্রান্ত হয় ততবার একটি বাতি জ্বলে বিজলীর। পুষ্ট মায়ের পুষ্ট ছানা ছুটে চললে বাতি জ্বললেও জ্বলে মাত্র দু'তিনবার, আর অপুষ্ট ছানাটি থতমত খায় যে কতবার তার সীমা নেই।

পুষ্টির জন্য অনেক কিছুর দরকার নেই। ছোলার ডাল মাত্র সম্বল করে বহু অপুষ্ট শিশুর চিকিৎসা হয়েছে। সামান্য শাকসবজী সংযোগ আর ডাল ভাত বা রুটি সময়মত পেলেই শৈশবের সমস্যার সমাধান হয়। গতবার আমরা গাজরের ক্যারটিন সম্পর্কে 'এ' ভিটামিনের কথা উল্লেখ করেছিলাম। সামান্য একটু শাকসবজীর অভাবে শৈশবের দৃষ্টি শক্তির ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখের কথা। ক্যারটিনের জন্য মহামূল্য কিছুই দরকার হয় না। অভাবের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতাই পুষ্টিহীনতার কারণ হয়। এমন কি সমৃদ্ধ সংসারে মেঠাই মণ্ডায় মানুষ হয়েও পুষ্টির অভাব হতে পারে।

শ্রীমতী

একটু জিরিয়ে নিন!
একটা চারমিনার খান
এতে পাবেন টোস্ট-করা
খাঁটি তামাকের স্বাদ।
চারমিনারের
CHARMINAR
THE VAZIR SULTAN
TOBACCO CO. LTD.
HYDERABAD DECCAN
৩৩ পয়সায় ১০টি
SPECIAL

(৩)
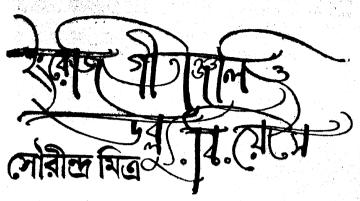
ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রকাশিত পাঠ নির্ণয়ে য়েট্‌সের হস্তক্ষেপের যে দাবী আমাদের বিচার্য বিষয় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের এবং অপর কয়েকজনের মূল্যবান সাক্ষ্য আমরা পাই মুখ্যত দুটি বিশেষ ঘটনার উপলক্ষে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই, ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে, অর্থাৎ ম্যাকমিলানকে লিখিত য়েটসের চিঠির তিন বৎসর পূর্বে। ভারতের ইংরেজ সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ভ্যালেণ্টাইন চিরোল নামক জনৈক ইংরেজ বাংলা দেশের মুসলমান নেতাদের কোনো এক আধা-প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেন যে, ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিয়ে আমাদের দেশে প্রচুর মাতামাতি হলেও, বইটি আসলে য়েটস কর্তৃক প্রায় পুরোটাই পুনর্লিখিত। কোনো সংবাদপত্রে চিরোলের এই উক্তি প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। জনৈক বন্ধুর নিকট এই সংবাদ শুনে কবি ১৭ই জানুয়ারী তারিখে স্টার্জ মুরকে এক পত্রে লেখেন :

'An incident will show you how the award of the Nobel prize has roused up antipathy and suspicion against me in certain quarters. A report has reached me from a barrister friend who was present on the occasion when in a meeting of the leading Mohamedan gentlemen of Bengal, Valentine Chirol told the audience that the English 'Gitanjali' was practically a product of Yeats. It is very likely he did not believe it himself, it being merely a political move on his part to minimize the significance of this Nobel prize affair which our people naturally consider to be a matter for national rejoicing. It is not possible for him to relish the idea of Mohamedans sharing this honour with Hindus'.

এই চিঠির উত্তরে ৪ঠা এপ্রিল স্টার্জ মুর কবিকে যে দীর্ঘ চিঠি লেখেন তার মধ্যে চিরোলের মতো নগণ্য ব্যক্তির মিথ্যা-প্রচার যে ধর্তব্যের মধ্যেই নয় এবং সেই মিথ্যার যে স্থায়ী হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই সে সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধাহীন স্পষ্ট সাক্ষ্য আছে। তিনি লিখেছেন :

'No lie about you has a chance of being so well published as the truth and one will sooner or later meet its complete contradiction. It is part of the price men pay for fame, to be lied about'.

স্টার্জ মুরকে লিখিত পত্রে কবির যে চাপা ক্ষোভের পরিচয় আছে তার লক্ষ্য হল ইংরেজ গভর্নমেণ্টের রাজনৈতিক শঠতা। প্রকাশ্যে এই গভর্নমেণ্ট কবিকে নানা উপলক্ষে কপট সম্মান দেখাতে ত্রুটি করে না (১৯১৫ সালের ৩রা জুন যথারীতি তাঁকে 'নাইট' উপাধিতেও ভূষিত করবে) কিন্তু অপ্রকাশ্যে চিরোলের মতো শিখণ্ডীকে দিয়ে কবির পক্ষে মর্যাদাহানিকর অপপ্রচার করাবার এবং গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ করে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করবার সুযোগ গ্রহণ করতেও দ্বিধা করে না। এই নীচতাই কবিকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে। কিন্তু ঐ চিঠি লেখার অব্যবহিত পরেই স্বদেশে তাঁর যেসব নিন্দুকদের কথা পূর্বে বলেছি, চিরোলের মুখনিঃসৃত 'দৈববাণী' শোনার পর তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মর্দনকুর্দন হয়তো কবি লক্ষ করে থাকবেন। কেননা প্রায় ঐ একই সময়ে রোটেনস্টাইনকেও তিনি একখানি চিঠি লেখেন, তাতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যেই যাদের ঐ মিথ্যাপ্রচারে বিশ্বাস করতে একান্ত আগ্রহী দেখেছেন তাদের ক্ষুদ্রতা এবং হীনতার বিরুদ্ধে। তিনি লিখলেন :

'It will amuse you to learn that at a semi-public conference of the Mohamedan leaders of Bengal, Valentine Chirol gave his audience to understand that the English 'Gitanjali' was practically written by Yeats. Naturally such rumours get easy credence among our people who can believe in all kinds of miracles except genuine worth with their own men. It is annoyingly insulting for me to be constantly suspected of being capable of enjoying a reputation by fraud and it makes me wish that

the chance had never been given to me to come out of the quiet corner of my obscurity.'

উত্তরে ২০শে মার্চ লিখিত পত্রে রোটেন-স্টাইন লিখলেন :

'Chirol can be answered by Yeats, by Fox Strangways, by Andrews or by myself at any time—unfortunately no report of any kind has reached any of us.'

এণ্ডরুজ তখন ইংলণ্ডেই ছিলেন, রোটেনস্টাইনের বাড়িতেই তাঁর অতিথি-রূপে। সেখানে এই সংবাদ পেয়ে ২৫শে মার্চ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন তার মধ্যে তাঁর বিস্ময় এবং ক্রোধ তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন :

"I cannot tell you how indignant I was to hear from him (Rothenstein) about Chirol's utterance concerning Yeats and your poems. It is hateful and miserable and contemptible ...... There is not a breath of a rumour of it over here and there never will be. I wonder where Chirol picked it up'.

যাই হোক, রোটেনস্টাইনের সমগ্র চিঠি-খানি পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কবির

ক্রোধ এবং ক্ষোভ তিনি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে যেহেতু তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে যে-কেউ যে-কোনো সময়ে উক্ত মিথ্যা-প্রচার খণ্ডন করতে সক্ষম ছিলেন। তবে তাঁকে একটু সাবধান হতে হয়েছে কেননা চিরোলের উক্তির কোনো প্রকাশিত রিপোর্ট তাঁরা কেউই পাননি। ঐ অপপ্রচার খণ্ডনে সক্ষম এবং প্রস্তুত বলে রোটেনস্টাইন যাদের নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে য়েট্সের উল্লেখ—প্রায় তিন বৎসর পরে ম্যাকমিলানকে লিখিত তাঁর আলোচ্য পত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে—আজ নিশ্চয়ই অচেতন irony-র একটা বিচিত্র এবং উপভোগ্য দৃষ্টান্ত বলে মনে হবে। কিন্তু এত জোরের সঙ্গে য়েট্সের নাম তিনি কেন করেছিলেন সেটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। সে সময়কার পুরাতন চিঠিপত্র পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠি গেলে, সেই চিঠি যাঁর নামেই উদ্দিষ্ট হোক না কেন, ঐ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সকলেরই হাতে হাতে তা ফিরতো এবং রীতিমত আলোচিত হতো। বিশেষ করে রোটেনস্টাইনের চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশটির মধ্যেই যে উক্তিটি আছে সেটি ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে: 'no report of the kind has reached any of us'.

স্পষ্টতই আলোচ্য বিষয়ে প্রতিবাদযোগ্য কোনো প্রকাশিত 'রিপোর্ট' উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ পেয়েছেন কিনা সে বিষয়ে রোটেনস্টাইন রীতিমত জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং সেই সূত্রে সকলের সঙ্গেই বিষয়টির যথোচিত আলোচনাও করেছিলেন। এই আলোচনার থেকে তিনি যা বুঝেছিলেন তারই ফলে এতটা জোরের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, প্রতিবাদ করতে সকলেই প্রস্তুত এবং সক্ষম এবং তাঁদের মধ্যে যদি য়েটসের নাম তিনি সবার আগে করে থাকেন তাহলে তার একটাই অর্থ হতে পারে এবং সে অর্থ খুবই স্পষ্ট : চিরোলের অপপ্রচার সম্বন্ধে তাঁর নিজের সঙ্গে য়েটসের মনোভঙ্গীগত কোনো পার্থক্যই তিনি তখন দেখেননি। এই সঙ্গে আরো একটি জিনিস লক্ষণীয় এবং স্মরণীয় : ভারতবর্ষে এই সময় ইংরেজি গীতাঞ্জলির সঙ্গে তাঁর নিজের নাম জড়িয়ে কোনো কোনো মহলে কী রটনার রটনা চলিত হয়েছিল সে বিষয়ে এই সূত্রে ১৯১৪ সালের গোড়াতেই য়েটস সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে গেলেন এবং খবরটা এমনই যে সেটা ফস করে তাঁর স্মৃতি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব ছিল, সেটা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

দেখা যাচ্ছে চিরোলের অপপ্রচার যে সম্পূর্ণ মিথ্যা সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন, তদুপরি স্টার্জ ম্যুর এবং রোটেনস্টাইনও (এবং তাঁর জবানিতে য়েটস প্রমুখ তাঁদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সকলেই) তার সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন। কবির চিঠিতে যে চাপা উত্তেজনা ও ক্ষোভের প্রকাশ আছে তা যে রোটেনস্টাইন এবং স্টার্জ ম্যুর উভয়কেই যথেষ্ট উদ্বেজিত করেছিল, তাঁদের চিঠিতেই তার নজির আছে। তবে ইংলণ্ডস্থ বন্ধুরা যে তৎক্ষণাৎ ঐ মিথ্যার প্রতিবাদ করবেন এই প্রত্যাশাতেই যে কবি চিঠি দুখানি লিখেছিলেন তা নয়। যাঁরা কবির মানসপ্রকৃতি সমনোযোগে লক্ষ্য করেছেন তাঁরা জানেন যে, যখনই তাঁর মনে কোনো কারণে ক্রোধ বা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তিনি তা জমতে না দিয়ে তখনই কাউকে না কাউকে, মৌখিকভাবেই হোক বা লিখিত পত্রেই হোক, সেসব কথা বলে মন পরিষ্কার করে ফেলতেন। একে তিনি বলতেন 'আচমন'। প্রতিবাদের কল্পনা-কল্পনা করেছেন রোটেনস্টাইন (এবং অন্যান্য বন্ধুরা)। কিন্তু প্রধান বাধা ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা এবং প্রতিপত্তির তুলনায় এই চিরোল নামক ব্যক্তিটি ছিলেন নিতান্তই নগণ্য, তদুপরি তাঁর উক্তিটিকে প্রকাশিত আকারে কোথাও তাঁরা পাননি। পার্লামেন্টের ব্যাপারে অবশ্য রোটেনস্টাইন বরাবরই খুব সাবধান কিন্তু রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির দিক থেকে বিচার করে এই মশা মারতে কামান দাগার ব্যাপারে তিনি যে যথেষ্ট সতর্ক হয়েছিলেন সেটা যুক্তিসঙ্গতই বলতে হবে। ইণ্ডিয়া অফিসের সঙ্গে

রোটেনস্টাইনের বরাবরই কিঞ্চিৎ দহরম-মহরম ছিল, সেই সূত্রে চিরোলের নামটি এবং ফরেন অফিসের কেরানী হিসেবে তাঁর প্রাক্তন কীর্তিকলাপও তাঁর জানা ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকারী মহলে চিরোলের প্রতিষ্ঠা যাই হোক, রোটেনস্টাইন, য়েটস প্রভৃতি কবি-আর্টিস্টদের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীটির সঙ্গে যে তাঁর বিন্দুমাত্র যোগ ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাহলে তাঁর প্রচারিত সংবাদটি তিনি কোথায় পেলেন? এণ্ডরুজও ঠিক এই প্রশ্নটিই করেছিলেন,

'I wonder where Chirop picked it up'

এটিকে আগাগোড়া বানানো বলা যেতো যদি না এর সঙ্গে আমাদের স্বদেশে প্রচারিত পূর্বোক্ত কিম্বদন্তীটির হুবহু মিল সুপ্রকট হতো। প্রশ্নটির উত্তর খুব সহজ: সংবাদটিকে বানাবার প্রয়োজনই হয়নি, চিরোল সেটিকে এই দেশের মাটিতেই কুড়িয়ে পেয়েছেন। পরম যত্নে এই রত্নটিকে সংগ্রহ করে তিনি এখানকারই কোনো বিশেষ সভায় বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিবেশন করেছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে প্রায় এক বৎসর পরে ১৯১৫ সালের গোড়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। ইংলণ্ডের রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস তখন আধ্যাত্মিক ভাবমূলক গদ্য ও পদ্যের একটি সংকলনগ্রন্থ (পরে ১৯১৬ সালে **The Spirit of Man** নামে প্রকাশিত হয়) প্রকাশের কাজ হাতে নিয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যে রচনানির্বাচনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির কয়েকটি অংশ এবং তাঁরই অনূদিত **One Hundred Poems of Kabir** থেকে কয়েকটি অংশ ব্যবহার করবার এবং সেই সঙ্গে গীতাঞ্জলির একটি কবিতার ভাষা কিছুটা পরিবর্তন করবার অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন। প্রকাশের অনুমতি অবশ্য কবি সানন্দেই দেন, কিন্তু গীতাঞ্জলির কোনো কবিতার প্রকাশিত পাঠের কোনোরকম পরিবর্তন তিনি অনুমোদন করেন না একথা জানিয়ে এবং কারণ ব্যাখ্যা করে ব্রিজেসকে একাধিক পত্র লেখেন। ব্রিজেস অদম্য, তিনি ম্যাকমিলানকে, রোটেন-স্টাইনকে এবং য়েটসকে এ বিষয়ে বারবার চিঠি লিখে প্রায় অতিষ্ঠ করে তোলেন এবং নানা কারণে রোটেনস্টাইন এবং য়েটস উভয়েই ব্রিজেসের এই ইচ্ছাটি পূরণ করবার জন্য কবিকে বারবার নানাভাবে অনুরোধ জানান. এইভাবে এঁদের মধ্যে পত্রবিনিময় চলে প্রায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং অবশেষে কবি ব্রিজেসকে সম্মতি দেন। এই সূত্রে ৪ঠা এপ্রিল রোটেনস্টাইনকে লিখিত রবীন্দ্র-নাথের একখানা চিঠি আমাদের বিচার্য বিষয়ের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। অন্যান্য পত্রে তাঁর কবিতার ভাষাগত পরি-বর্তন সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতার সাধারণ কারণগুলি তিনি বিশদভাবেই ব্যাখ্যা করে-ছেন, কিন্তু এই চিঠিখানিতে যে বিশেষ কারণের উল্লেখ তিনি করেছেন তার সঙ্গে পূর্বোক্ত কিম্বদন্তী এবং চিরোলের অপ-প্রচারের নিকট সম্পর্কে। পুরো চিঠিখানিই রোটেনস্টাইন তাঁর **Men and Memories** দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন। তার থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি:

'I got a letter from Dr. Bridges with his own version of a Gitanjali poem. I cannot judge it. But since I have got my fame as an English writer I feel extreme reluctance in accepting alterations in my English poems by any of your writers. I must not give men any reasonable ground for accusing me—which they do—of reaping advantage of other men's genius and skill. There are people
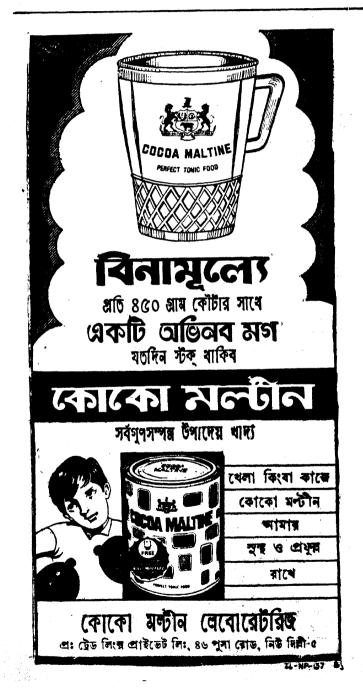
who suspect that I owe in a large measure to Andrews's help for my literary success, which is so false that I can afford to laugh at it. But it is different about yeats. I think Yeats was sparing in his suggestions—moreover, I was with him during the revision . . . . Though you have the first draft my translations with you **I have unfortunately allowed the revised typed pages to get lost in which Yeats pencilled his corrections.** Of course, at that time I never could imagine that anything I could write would find its place in your literature. But the situation is changed now. **And if it be true** that Yeats's touches have made it possible for **Gitanjali** to occupy the place it does then that must be confessed. At least by my subsequent unadulterated writings my true level should be found out and the faintest speck of lie should be wiped out from the fame I enjoy now. It does not matter what the people think of me but it does matter all the world to me to be true to myself. This is the reason why I cannot accept any help from Bridges excepting where the grammar is wrong or wrong words have been used . . . Andrews does not admire the alterations made by Bridges, but that does not affect me. In fact I am not so much anxious about mutilations as about added beauties which I cannot claim as mine.'

ব্রিজেসের প্রস্তাবিত ভাষা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কবির অন্যতম যুক্তি চিঠির শেষাংশে বিশদভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু সেই সংগে গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি সংশোধন সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা গভীর মনোযোগের সংগে বিচার্য। য়েটসের হস্তক্ষেপের জন্যই গীতাঞ্জলি কাব্যগুণে-মণ্ডিত হয়েছে একথা যে কবি আদৌ বিশ্বাস করেন না, তা সাধারণভাবে চিঠিটির tone-এর মধ্যেই প্রতিফলিত এবং বিশেষ করে একটি বাক্যাংশে :

'if it be true that Yeats's touches have made it possible for Gitanjali to occupy the place it does . . .'

তদুপরি এই সংশোধনের ব্যাপারে য়েটস কতটুকু করেছেন বা কতটুকুর করার তাঁর সুযোগ ছিল সে সম্বন্ধেও কবির উক্তি স্পষ্ট। তিনি বলছেন,

'I think Yeats was sparing in his suggestions,'

কিন্ত তার চেয়েও বড় কথা

'I was with him during the revisions'

প্রেস কপি প্রস্তুত করবার জন্য খুবই সীমিত ক্ষেত্রে এটা যে একটা collaboration ছিল সে বিষয়ে কবির এই ইঙ্গিত আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই সঙ্গে পাণ্ডুলিপি এবং [illegible] টাইপ কপিটির (যা র‍্যাডলী, রুক এবং য়েটস'কে পাঠানো হয়েছিল) উল্লেখ যে কবি করছেন তার তাৎপর্যটাও খুবই সহজবোধ্য। কেননা কবির সেই প্রাথমিক সংশোধনসহ এই টাইপ কপি হল যাকে বলা যায় বর্তমান বিচারে Crucial প্রমাণ এবং দুঃখের বিষয় এটিই গেছে হারিয়ে। কবি বলছেন :

'Though you have the first draft of my translations with you, I have unfortunately allowed the revised typed pages to get lost in which Yeats pencilled his corrections".

হারিয়ে যাওয়া টাইপ কপিটিতে পেনসিলে লেখা য়েটসের কিছু প্রস্তাবিত সংস্কারের উল্লেখ ('Correction' কথাটি ব্যবহৃত হলেও কবির বক্তব্য যে 'suggestions' তা চিঠির অন্য একটি বাক্যেই স্পষ্ট সূচিত :

'I think Yeats was sparing in his suggestions')

কবি কেন করেছেন সেটা ভেবে দেখা দরকার। য়েটসের suggestions যে সংখ্যার দিক থেকে সামান্য ছিল সেটাই তাঁর একমাত্র বক্তব্য নয়, তদতিরিক্ত আরো একটি কারণ ছিল যেটা তিনি সঙ্কোচবশত স্পষ্টতর ভাষায় ব্যাখ্যা না করলেও স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করেছেন : সেই স্বল্পসংখ্যক Sugnestionগুলির মধ্যেও অনেক তিনি গ্রহণ করেননি। কবির ইঙ্গিতটির পরোক্ষ প্রমাণ পরে প্রসঙ্গান্তরে যথাস্থানে উপস্থাপিত হবে। আপাতত দেখা যাচ্ছে আলোচ্য বিষয়ে কবির নিজের সাক্ষ্য হল : পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনের যে প্রস্তাবগুলি য়েটস নিজে করেছিলেন সেগুলি সংখ্যায় নিতান্তই অল্প; তাছাড়া কবি সব সময়েই নিজে উপস্থিত থেকে সেইসব প্রস্তাবের বিচার করে কিছু গ্রহণ করেছেন, কিছু বর্জন করেছেন এবং সব মিলিয়ে পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনে য়েটসের যেটুকু দান তার ফলে যে গীতাঞ্জলির কাব্যগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এ ইঙ্গিত ভিত্তিহীন। কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত সৌজন্যের ভাষায় শেষোক্ত ইঙ্গিতটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(ক্রমশঃ)
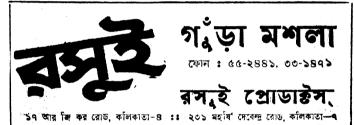
পুরো ভরসা রেখে
আপনার ট্র্যানজিস্টারে লাগিয়ে নিন
এভারেডী নং ১০৫০

ট্র্যানজিস্টারকে ক্ষয়ক্ষতি
থেকে বাঁচিয়ে
শক্তি যোগানোর জন্যে
বিশেষভাবে তৈরী
রাউণ্ড ব্যাটারী।

* বহুক্ষণ ধরে চালু থাকার একটানা
  শক্তি যোগায়।
* ট্র্যানজিস্টারের যন্ত্রপাতির
  ক্ষতি-নিরোধ করাই এর বিশেষত্ব।
* এই ব্যাটারী লাগিয়ে বরাবর
  পরিষ্কার ও নিখুঁত আওয়াজ পাবেন।
* যেমন এর কর্মকুশলতা তেমনি দীর্ঘ এর স্থায়িত্ব।

'এভারেডী' নং ১০৫০ লাগিয়ে
আপনার ট্র্যানজিস্টার থেকে
সবচেয়ে সুন্দর কাজ পাবেন।

১ টাকা ১০ পয়সা

সমস্ত রকম ট্র্যানজিস্টার রেডিওর জন্যই 'এভারেডী'
ব্যাটারী পাবেন।

বিশ্ববিজ্ঞান

ব্রাইটনে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংহতির চতুর্দশ মহাসম্মেলন বসেছিল মাস দুই আগে। ওদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল অণুতরঙ্গ জোতির্বিজ্ঞান বা মাইক্রোওয়েভ অ্যাসট্রোনমির উপর সাম্প্রতিক চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী। আন্তর্নক্ষত্র জগত সম্পর্কে অনাদিকাল ধরে এক পরম জিজ্ঞাসা কবি, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীর মনে সহস্র কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। একটি প্রশ্ন : বিশ্বসৃষ্টির আদি-অন্তের যোগসূত্রটি কী? মাত্র এক দশকের কাহিনী। সুদূর নক্ষত্র জগত থেকে ছুটে আসা বিচিত্র বেতার তরঙ্গের ঝাঁক ধরা পড়ল পৃথিবীর গবেষণাগারে। শুধু নক্ষত্র নয়, নক্ষত্রের চার পাশ ঘিরে যে সীমাহীন মহাশূন্য, একে একে স্পষ্ট হতে লাগল, যাদের নেহাৎ ফাঁকা, বস্তুহীন পরিমণ্ডলরূপে মানুষ দীর্ঘকাল কল্পনা করে এসেছে, সেখানেও বিরাজ করছে পদার্থের মৌল-

মহাজাগতিক বেতার-তরঙ্গ উৎস ডব্লু-৩-এর এই নিগেটিভ ফটোটি বছর দেড় আগে তোলা হয়। ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের যৌগিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। হাইড্রোক্সিল (OH) মূলকের এটি একটি অন্যতম আকার

কণিকা। কোথাও স্বাধীনভাবে তাদের বিচরণ, কোথাও বা রাসায়নিক যৌগরূপে। জলের অস্তিত্বও ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ। জীবন সৃষ্টির মূলে যাদের ভূমিকা অনিবার্য বলে আমাদের ধারণা, তাদের অনেকেই।...

ডেভিড লেভাইন-এর চোখে স্যার জুলিয়াস হাক্সলি

ফটো : দি টাইমস, অক্টোবর ৭, ১৯৬৯

সত্যিকারের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ চলেছে মাত্র দু বছর ধরে। তবু সীমিত এই সময় গণ্ডীর মধ্যেই আন্তর্নাক্ষত্র জগতে সন্ধান পাওয়া গেছে একাধিক রাসায়নিক অণুর। অক্টোবর ১৯৬৬, ১৮ সেন্টিমিটার বিকিরণ বর্ণালী পরীক্ষা করে সর্ব প্রথম ঘোষণা করা হয়, ভিন্ন নক্ষত্র-পরিমণ্ডলে হাইড্রোক্সিল মূলক (ওএইচ) বিরাজ করছে। রীতিমত চমকপ্রদ ঘটনা। ও এইচ বলতে কী বোঝায়, সে কথা আজকের দিনে স্কুলের একজন সাধারণ ছাত্রেরও জানা। এই বিশেষ মূলক শুধুমাত্র অপর কোন ধনাত্মক অণু বা পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিরাজ করে, এটাই সাধারণের ধারণা। কিন্তু বিস্মিত হয়ে গেলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। না কোন যৌগ সৃষ্টি করে নয়, শুধু ও এইচ-ই সম্পূর্ণ

ডেভিড লেভাইন-এর চোখে স্যার বার্নার্ড লোভেল

ফটো : দি টাইমস, অক্টোবর ১০, ১৯৬৯

স্বাধীন ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক। কী ভাবে এটা সম্ভব হল তার সঠিক ব্যাখ্যা অবশ্য এখনও পর্যন্ত যোগান সম্ভব হয় নি। বরং বিস্ময়ের মাত্রা গত সাত বছরে আরও বেড়ে গেছে। সুদূরে আন্তর্নাক্ষত্র পরিমণ্ডলে এই সময়ের মধ্যে একের পর এক সন্ধান পাওয়া গেল অ্যামোনিয়া, জল, ফরম্যালডিহাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, সাইনোজেন, হাইড্রোজেন এবং সায়ানোঅ্যাসেটাইলেন।

বস্তুত সোভিয়েত দেশের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আই এস স্কেলভস্কিই ব্রহ্মাণ্ড জগতে রাসায়নিক যোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানর ব্যাপারে সর্বপ্রথম আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করল অণু-তরঙ্গ-বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপির সাহায্যে।

মূল ব্যাপারটা এই রকম। মহাকাশে ভাসমান বস্তুকণা থেকে যে সমস্ত বেতার তরঙ্গ বিকীর্ণ হয়, তাদের কিছু কিছু অংশ পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। সেই বেতার তরঙ্গের মাত্রা এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ নির্ভর করে, কোন্ বস্তু থেকে তরঙ্গ প্রক্ষেপিত হচ্ছে তার

গুণাগুণের উপর। যেমন ধরুন, অ্যামোনিয়া ঠিক যে ধরনের তরঙ্গ নিক্ষেপ করবে তার গঠন সাইনোজেন থেকে নিক্ষিপ্ত তরঙ্গের অনুরূপ হবে না। আবার এমনও হতে পারে, মনে করুন, বিশেষ কোন একটি বিকিরণ মহাকাশের দূরবর্তী কোন অঞ্চল থেকে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। হঠাৎ তার গমনপথের সম্মুখে পড়ে গেল বিশেষ কোন বস্তুকণার স্তর। তখন এই ছুটন্ত বিকিরণ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ঐ স্তর কর্তৃক শোষিত হতে পারে। কী ভাবে শোষিত হবে এবং কতটা হবে সেটা আবার নির্ভর করছে ঐ স্তর ঠিক কী ধরনের বস্তুসামগ্রী দিয়ে তৈরি, তাদের গতি, প্রকৃতির উপর। ফলে হাইড্রোকসিল স্তরে যে ভাবে শোষিত হবে, অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে তা হবে ভিন্নতর। অতএব তরঙ্গের শোষিত অংশ অর্থাৎ শোষণ বর্ণালীর কাঠামো পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যেতে পারে, কোন পদার্থ তাকে শোষণ করেছে। আর ঠিক এই পদ্ধতিতেই সর্বপ্রথম হাইড্রোকসিল (ও এইচ) মূলকের অস্তিত্ব ধরা পড়ল ক্যাসিওপিয়া-এ তে। ঐতিহাসিক এই আবিষ্কারের পুরোধা ডঃ স্যানডার বাইনবের এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ।

শুধু শোষণ বর্ণালী নয়, বিকিরণ বর্ণালীর সাহায্যেও ও এইচ-এর সন্ধান পেলেন এর কিছুদিন পরই আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী, এক আধটি নয়, বেশ কয়েকটি জায়গায়।

মাত্র বছর দুই আগে আবার একটি চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশন করলেন বার্কলির কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এঁদের নেতৃত্ব করেন বিশ্বখ্যাত নোবেল বিজ্ঞানী এবং মেজার-এর আবিষ্কর্তা ডঃ চার্লস টাউনস। মহাকাশের মহাজগতিক বায়ুমণ্ডলে তাঁরা অ্যামোনিয়ার সন্ধান পেলেন যার তাপমাত্রা খুবই কম। ২৩ ডিগ্রি কেলভিন। এর ছয় সপ্তাহ পরে কালপুরুষ নীহারিকা অঞ্চলে এবং আমাদের ব্রহ্মাণ্ডেরই কেন্দ্রে আবিষ্কৃত হল জলীয় বাষ্প।

মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে জল এবং অ্যামোনিয়ার সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক বেশি কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। শুরু হল ব্যাপকতর অনুসন্ধানের কাজ। কারণ ইতিমধ্যে অনেকেরই মনে বিশ্বাস জন্মে গেছে, এক আধটি নয়, হয়ত আরও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যৌগের সন্ধান তাঁরা পেয়ে যাবেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার ন্যাশনাল রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি অবজারভেটরির দুজন বিজ্ঞানীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা হলেন ডঃ লুই স্নাইডার এবং ডঃ ডেভিড বুহল। তাঁরা পনেরটি মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে প্রথম আবিষ্কার করলেন ফরম্যালডিহাইড। আরও আশ্চর্যের

মার্কিন দেশ ভ্রাম্যমাণ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক এই মানমন্দিরটি (OAO-3) এ মাসেই মহাকাশে পাঠালেন। ওজন ২১০০ কিলোগ্রাম। জ্যোতির্মণ্ডলে পর্যবেক্ষণ চালানর জন্যে এতে বসান আছে ৯৬·৫ সেণ্টিমিটার ব্যাসের একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এত বড় দূরবীক্ষণযন্ত্র এর আগে আর কখনও মহাকাশে পাঠান হয় নি

ব্যাপার ডব্লিউ-৩ এবং ডব্লিউ-৪৯ দুটি উৎস, যেখানে এর আগে জল এবং অ্যামোনিয়ার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, ঠিক সেখানেই ধরা পড়ল ফরম্যালডিহাইড-এর সন্ধান। এ বছরের গোড়ার দিকে ডঃ এ পেনজিয়াস এবং ডঃ আর ডব্লু উইলসন কার্বন মনোক্সাইড আবিষ্কার করেছেন। এর অনতিকাল পর সন্ধান পাওয়া গেল হাইড্রোজেন সায়ানাইড এবং সাইনোজেন। গত জুলাই মাসে শেষ চমক সৃষ্টি করলেন ডঃ বি ই টারনার। এই প্রথম মহাকাশে তিনি আবিষ্কার করলেন পাঁচটি পরমাণু নিয়ে তৈরি সায়ানো-অ্যাসেটাইলেন।

অর্থাৎ যে মহাকাশকে মানুষ চিরদিন 'বস্তুহীন শূন্য' বলে চিহ্নিত করে এসেছিল, একে একে তার মধ্যে শুধু মৌলিক পদার্থের পরমাণুই নয়, বিভিন্ন ধরনের 'যৌগিক পদার্থের অণুও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০। ও এইচ-এর পর মাত্র এই তিন বছরের মধ্যে ব্যাপক মহাজাগতিক পরিবেশে যে আটটি দুই-এর অধিক পরমাণু দিয়ে গঠিত অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কারোর দ্বিমত নেই। বরং তাদের আবিষ্কার নাক্ষত্র জগতের সৃষ্টি এবং লয় সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের নতুন ভাবে এবং ভিন্নতর দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। ইতিমধ্যে অণু-তরঙ্গ জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাজগতের রাসায়নিক গঠন, ভৌতিক পরিবেশ এবং তার বিবর্তন সম্পর্কে বেশ কিছুটা তথ্য সরবরাহ করেছে।

আপাতত একটা প্রশ্ন সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মহাজাগতিক পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের রশ্মিতে স্নাত ঐ সমস্ত অণুগুলি অবিচ্ছিন্ন ভাবে কী কারণে বাস করে?

সর্দি-কাশিতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে — আর পাঁচরকম রোগে ধরে

মহাজাগতিক এবং অতি বেগুনী রশ্মির আঘাতে হাইড্রোকার্বন-অণুরাজ, সাইনোজেন প্রভৃতির তো ভেঙে মৌলিক পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে পড়বারই কথা! অন্তত মহাজাগতিক ভস্ম বা বরফের কণাও তো এই কাজ করতে পারত? এ কথা অবশ্য কেউ জোর দিয়ে বলছেন না, মৌলকণা থেকে সরাসরি ঐ সমস্ত মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। এমনও হতে পারে, আসলে ওরা কোন কোন মৃত নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ। আরও বড়, আরও জটিল অণুরাও একদিন হয়ত সেখানে বিরাজ করত। ক্রমে তারা ভেঙে গেছে এবং যাচ্ছে। ভেঙে গিয়ে তৈরি করছে মৌল-কণার ঝাঁক। বার্কলের গবেষকরা কিছু কিছু নতুন কথাও শোনাচ্ছেন। ও'রা বলছেন ঐ ভস্ম এবং বরফ-কণা নাকি মহাকাশে অ্যামোনিয়া অণু তৈরি করার ব্যাপারে অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে। ডঃ ডেভিড বুহল মনে করেন, কোন কোন রাসায়নিক যৌগ মহাজাগতিক মেঘপুঞ্জকে শীতল হতে সাহায্য করে। অতএব সত্যিই যদি ঐ সমস্ত অণুর কোন কোনটি আন্তর্নক্ষত্র জগতে 'হিমঘরের' ভূমিকা গ্রহণ করে সেই মেঘও ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়বে এবং অবশেষে মহাকর্ষের চাপে তৈরি করবে প্রোটোস্টার বা ভ্রূণ-নক্ষত্র। কালপুরুষ অঞ্চলে ঐ ধরনের নক্ষত্রের সন্ধানও পাওয়া গেছে। ফরমালডিহাইডের উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে কী ভাবে মৌলিক পদার্থ নিয়ত নক্ষত্র জগতে সৃষ্টি হয়ে চলেছে অথবা আন্তর্নাক্ষত্রজগতে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের বস্তুকণা, প্রভৃতি সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানা যাবে। বুহল এবং স্নাইডার সেখানে ফরমালডিহাইড অণুর মধ্যে কার্বন-১২ এবং কার্বন-১৩-র পারস্পরিক রূপান্তর লক্ষ করেছেন। এ ছাড়া এটাও লক্ষ করেছেন, এমন কিছু কিছু অঞ্চল সেখানে আছে যারা নিয়ত বিভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে আবর্তন করছে। আর এই আবর্তন করার সময় কেন্দ্রের কাছাকাছি বস্তুসমূহ দ্রুত ছুটে যাচ্ছে কেন্দ্রের দিকে। আর দূরবর্তী অঞ্চল সম্প্রসারিত হয়ে ক্রমেই বাইরের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এ তো গেল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা। বিগত তিন বছরের এই আবিষ্কার জীবরসায়নবিদদের মনে কিন্তু প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁদের প্রশ্ন, আন্তর্নক্ষত্রজগতে শেষ পর্যন্ত জল, কার্বন, কার্বনমনোক্সাইড, নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ— সবই তো একে একে আবিষ্কৃত হচ্ছে! তাহলে কী এটাই বলতে হয়, জীবন-সৃষ্টি একদিন মহাজাগতিক পরিবেশেই সম্পন্ন হয়েছিল? এবং পরে সেই প্রাথমিক জীবনকণা পৃথিবীর অনুকূল পরিবেশে প্রবেশ করে জৈবিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান জীবজগৎ তৈরি করে ...

ডঃ জুলিয়াস অ্যাক্সেলরড। ১৯৭০ সালে চিকিৎসা শাস্ত্রে যে তিনজন নোবেল পুরস্কার পেলেন, ইনি তাঁদের অন্যতম

প্রশ্ন: কার্বন, জল, ইত্যাদি যখন ঐ ঐ অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে, তখন সেখানে প্রাণের অস্তিত্বও কী খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়? যাঁরা আরও কিছুটা কট্টর আশাবাদী, তাঁরা বলছেন, কার্বন, জল, নাইট্রোজেন প্রভৃতি, অর্থাৎ পৃথিবীর অভিজ্ঞতা থেকে যাদের আমরা প্রাণ-সৃষ্টির মূল উপাদান বলে মনে করি, দৃষ্টিটা তাদের থেকে একটু সরিয়ে দেখলে কেমন হয়? ভিন্নতর রাসায়নিক মাধ্যমেও জীবনের অস্তিত্ব ধরা পড়তে পারে? তত্ত্বের দিক দিয়ে অবশ্য বলা চলে, ভিন্ন রাসায়নিক মাধ্যম এবং তাপমাত্রায় জীবনের বিকাশ ভিন্নতরই হবে। সেখানে কার্বনের ভূমিকা হয়ত নেবে সিলিকন। এ ছাড়াও অ্যামোনিয়াম, বোরন, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, বোরন এবং নাইট্রোজেনের যুগ্মযৌগ প্রভৃতিও কার্বনের বিকল্প রূপে কাজ করতে পারে। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে জৈবিক দ্রাবকও ভিন্নতর হবে। আমরা জানি, পৃথিবীর জীবজগতে জৈবিক দ্রাবক বা বায়োলজিক্যাল ...

সেখানে এই ভূমিকাটি থাকবে তরল অ্যামোনিয়ার উপর। কেউ কেউ অবশ্য এ ব্যাপারে আরও ভয়ঙ্কর রকমের কল্পনার প্রশ্রয়ও দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, শুধু অ্যামোনিয়াই বা কেন, এ দায়িত্ব তো হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড, সালফিউরাস অ্যানহাইড্রাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, ফ্লুওরিন অকসাইড এবং বিভিন্ন রকমের ফসফরাস সালফাইড প্রভৃতিও পালন করতে পারে? অর্থাৎ যস্মিন দেশে যদাচারেৎ! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। জল, কার্বন প্রভৃতি ছাড়াও প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব?

জানি না। আজও পর্যন্ত কেউ জোর করে বলতে পারেন নি, পারার মত জোরাল প্রমাণও কেউ দাখিল করতে পারেন নি। তবে এ কথা নিশ্চিত, আগামী দুই বছরের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার ঘটাতে সমর্থ হবেন। কারণ, পৃথিবীর সুদূরতম মেঘ আর ধুলোর ঝাপসা অঞ্চল ছাড়িয়ে পর পর যে কয়টি দূরবীক্ষণযন্ত্র আন্তর্নক্ষত্রজগতের উপর অনুসন্ধানের জন্যে যাত্রা করছে—এর আগে যা কখনও কেউ কল্পনা করেনি—তারা নতুন অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করবেই।

পরমাণু বোমার খরচ

সম্প্রতি এই ধরনের একটি হিসেব পাওয়া গেল।

বছরে আট কিলোগ্রামের মত শতকরা ৯৫ ভাগ খাঁটি প্লুটোনিয়াম-২৩৯ তৈরির খরচ: (এতে বছরে... একটি করে ২০ কিলোটন ক্ষমতার অস্ত্র তৈরি করা যেতে পারে)

		মূলধন	বাৎসরিক পরিচালনা ব্যয়
শোধনাগার এবং প্রাথমিক ধাতুপিণ্ড তৈরির কারখানা বাবদ	...	১·১ কোটি টাকা	১·০৫ কোটি টাকা
জ্বালানি তৈরির ব্যয়	... ...	১·০৫ কোটি „	৪৫ লক্ষ „
চুল্লির দরুন	... ...	৭·৫ কোটি „	৮০ লক্ষ „
প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশনের ব্যয়	... ...	১ কোটি „	১৫ লক্ষ „
বোমা তৈরির উপযুক্ত করে প্লুটোনিয়াম কাঠামো তৈরি	... ...	২২·৫ লক্ষ „	১৫ লক্ষ „
অন্যান্য খরচ	... ...	৫ কোটি „	৭ লক্ষ „

এ ছাড়া বোমা সংরক্ষণ, নিক্ষেপ প্রভৃতির দরুন প্রাথমিক এবং বাৎসরিক ব্যয় গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা।......এ কিন্তু খরচের একটি সামান্য অংশমাত্র। পরমাণু বোমার ব্যয়, পৃথিবীতে কোন কোন দেশ (ভারত নয়) এই বোমা তৈরির ব্যাপারে কতটা অগ্রণী ভাড়া করতে পারে, বারান্তরে তা বিশদভাবে আলোচনা করব।

দুর্দান্ত দুজনাই
অরবিন্দ ও
আপনি
আপনি। পরিধানে অরবিন্দের
কাপড়। দুর্দান্ত। চড়া রঙের ওপর
কড়া রঙচঙে প্রিন্টস। ঝপ-ঝরে-
পড়া হাল্কা প্রিন্টের ছড়াছড়ি।
'কোল্ড ড্রিঙ্ক', 'ব্লু বার্ড', 'সোনা',
'রূপা', পপলিন। সব, সব
উজাড় কোরে দিয়েছে অরবিন্দ—
আপনার জন্যেই।
অরবিন্দ
মিলস্ লিমিটেড
রেলওয়েপুরা পোস্ট
নারোদা রোড,
আমেদাবাদ-২
Arvind Mills Ltd.
LALBHAI GROUP

কয়েকখানি পত্র

(১)

গত ৫১ সংখ্যা দেশ-এর বিশ্ববিজ্ঞানে প্রকাশিত প্রথম চিত্রটির নীচে লেখা আছে "২৯·৫ মিটার ব্যাসের অধিবৃত্তাকার বেতার গ্রাহকটি..." ইত্যাদি। কিন্তু শব্দটি অধিবৃত্তাকার (Parabolic) না হয়ে উপবৃত্তাকার (Elliptical) হবে।

—অশোক সেন, সম্পাদক, বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, বহরমপুর।

(২)

'দেশ' পত্রিকার অনেক উৎসাহী পাঠকের মতো আমিও আগ্রহের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমরজিৎ কর মহাশয়ের লেখা 'বিশ্ববিজ্ঞান' বিভাগটি পড়ি। তথ্যপূর্ণ এই বিভাগটি একটি প্রধান আকর্ষণ 'দেশ'-এর।

২৪ অক্টোঃ '৭০ সংখ্যা ৫১ 'দেশ'-এর "কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ" প্রবন্ধটিতে কিছু ভুল আছে বলে মনে হচ্ছে। তা তথ্যাগত না মুদ্রণগত?

(১) অধিবৃত্তাকার বলতে ইংরিজীতে তো Parabolic বোঝায়, তার ব্যাস ২৯·৫ মিটার, বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(২) ভারত মহাসাগরের উর্ধ্বাকাশে ইনটেলস্যাট-৩ নামে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি রয়েছে, তা কি ভারতের পাঠানো, যদিও পড়ে তাই মনে হচ্ছে?

(৩) উপগ্রহের দূরত্ব প্রকৃতই কি ৩৬০০০ কিঃ মিঃ, না, শূন্যের গোলমাল হয়ে গেছে, মহাশূন্যের ব্যাপার তো!!

(৪) বাহাত্তরটি দেশে "আট কোটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান" (একেবারে গোড়ায়, বড় হরফে) আছে কি?

আশা করি, লেখক এই বিজ্ঞান-নির্ভর ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি লিখতে গিয়ে আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

—পবিত্র মুখোপাধ্যায়, ৪ ইচ্ছাপুর রোড, হাওড়া-১।

(৩)

২৫ অক্টোবর সংখ্যায় 'বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগের' লেখাটি চমৎকার। ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা কিভাবে গড়ে উঠছে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হোল পুণার আরভিতে সদ্য নির্মিত ২৯·৫ মিটার ব্যাসের অধিবৃত্তাকার বেতার গ্রাহক ও প্রেরকযন্ত্রটি।

কিছুকাল যাবৎ দেশ পত্রিকার 'বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগের' লেখাগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক হচ্ছে। তবে এই সংখ্যার 'বিশ্ববিজ্ঞান'-এর ১১৯৫ পাতার শেষ লাইনে লেখা আছে, "এই গ্রাহক থেকেই..."। মনে হয় ওই জায়গায় হবে "এই প্রেরক থেকেই"। কারণ সংকেতবার্তা ওর মধ্যে দিয়ে পাঠান হবে দূরদেশে।

এবারের 'সংবাদ' শিরোনামা দিয়ে লেখাটি বেশ অভিনব। আজকাল নানা জায়গায় এ ধরনের বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিজ্ঞানকে জনসাধারণের মধ্যে আকর্ষণীয় ও সহজ করে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। ছোটদের সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে তাদের বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে পারলে তবেই বিজ্ঞান শিক্ষার সার্থকতা। নতুবা স্কুলের বা কলেজের পাঠ্য বিজ্ঞান পড়ে মৌলিক কিছু করা আদৌ সম্ভব নয়। —দীপক দাঁ, খাটুরা, ২৪-পরগণা।

লেখকের নিবেদন : ১নং চিঠি প্রসঙ্গে জানাই, শব্দটি 'অধিবৃত্তাকার'ই হবে, 'উপবৃত্তাকার' নয়। Nuclear India, Vol. 8, No. 11-12 দ্রষ্টব্য।

২নং চিঠি : বেতার সংকেত-গ্রাহক-প্রেরক থালা অর্থাৎ 'অ্যান্টেনা'টির ভেতরের তল অধিবৃত্তাকার। প্রচলিত রীতি অনুসারে ব্যাস ২৯·৫ মিটার বলতে এখানে থালাটির সম্মুখের বৃত্তীয় প্রান্ত সীমাকেই বোঝান হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'অ্যাপারচার'-এর ব্যাস। ......কৃত্রিম উপগ্রহ তিনটি এবং তাদের কোনটিই ভারতের পাঠান নয়।... 'আরভি'র কেন্দ্রটি শুধু তাদের মাধ্যমে সংকেত আদান-প্রদান করবে।...না, শূন্যের কোন গোলমাল হয়নি। দূরত্ব ৩৬০০০ কিলোমিটারই হবে।...'আট কোটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান' না লিখে, 'বার্তা-সংযোগ' কেন্দ্র লেখাটাই সমীচীন হত। টেলিফোন একসচেঞ্জ, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান, বেতার এবং টেলিভিশন কেন্দ্র এবং সরকারী ও বেসরকারী যোগাযোগ ব্যবস্থা মিলিয়ে সংখ্যাটি দাঁড়ায়। ১নং চিঠিতে উল্লেখিত পত্রিকাটি দ্রষ্টব্য।

৩নং চিঠি : যেহেতু জিনিসটি আসলে 'রেডিও অ্যান্টেনা', অতএব শুধু গ্রাহক বা প্রেরক না বলে এক সঙ্গে মিলিয়ে বেতার সংকেতের 'গ্রাহক-প্রেরক আধার' বললে কেমন হয়?

চিঠির জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করে ফিরছি ৮ই নভেম্বর রাত্রে। হঠাৎ পথে শুনলুম বেতারে ঘোষিত হচ্ছে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ। বিশ্বাস করতে দেরী হল, ঠিক শুনলুম কি? কিন্তু না, সংবাদ মর্মান্তিক-ভাবেই সত্য। নারায়ণবাবু আর ইহজগতে নেই। সেই শান্ত, সৌম্য, সুরসিক সজ্জন পুরুষটি আমাদের মাঝখান থেকে অতি সহসাই তিরোহিত হয়ে গেলেন।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে আমার যে প্রায়ই দেখা হত এমন নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে গান-বাজনার আসরে তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখতাম এবং অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর সরস মন্তব্যে, বিদগ্ধ বাক্‌বিন্যাসে পুলকিত হতাম। তিনি যথার্থ সংগীতপ্রিয় ছিলেন। কতবার 'সুনন্দর জার্নাল'-এ সংগীত বিষয়ে কত আলোচনা করেছেন। একজন প্রকৃত সংগীতরসিক ছিলেন তিনি। তাঁর চিন্তার সুবিস্তৃত পটভূমিকায় সংগীতের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম না, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যেত, কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর প্রতি একটি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আমার মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের মাধুর্য ছিল এমনি।

'দেশ' পত্রিকায় তাঁর শেষ লেখাটি যে এমন আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠবে আমরা কেউই বোধ হয় ভাবতে পারিনি। রবিবার সকালেই এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল নারায়ণবাবুর এবারকার লেখাটি নিয়ে। শেষ লেখাতেও তিনি যে সত্য উক্তিটি করে গেছেন সেটি আবার উদ্ধৃত করিঃ

"এত অদ্ভুত ধরণের অশ্রাব্য গান লেখা যেতে পারে, সেইসব গানে এতরকম জান্তব আওয়াজ করা যায়, আর উৎকট সে সমস্ত রেকর্ডগুলোকে এতবার করে যে বাজানো যায়—আমার তা কল্পনারও বাইরে ছিল।"

নিন্দুক শার্ঙ্গদেবের পক্ষপাতদুষ্ট উক্তি এটা নয়, তাঁর চেয়ে অনেক খ্যাতিমান, চিন্তা-শীল ব্যক্তির ক্লিষ্টমুহূর্তের সকরুণ ধিক্কার।

পরলোকগত এই সুধী সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ ব্যক্তিটির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। তাঁর শোকাতুরা পত্নী ও পরিবার-বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

জন্ম-জয়ন্তীর আসরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

ভীষ্মদেব জন্মজয়ন্তী

ভীষ্মদেব ষাট পেরিয়েছেন, সম্প্রতি তাঁর একষট্টি বৎসর পূর্ণ হল। এই জন্ম-দিন উপলক্ষ্যে ৮ই নভেম্বর তাঁর ছাত্র-ছাত্রী এবং অনুরাগী বন্ধুবান্ধব তাঁকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন। প্রকাশ্য সঙ্গীতজগৎ থেকে ভীষ্মদেব অবসর গ্রহণ করেছেন অনেকদিন। পণ্ডিচেরি থেকে ফেরবার পর তিনি বোধ করি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোনও অনুষ্ঠানে গান করেননি। তবে বন্ধুদের অনুরোধ উপেক্ষাও করেননি। শরীর এবং সামর্থ্যে যখন কুলিয়েছে তখন রাত তিনটের সময় আসরে এসেও গান করে গেছেন। দেশের লোকেরা আজ আর তাঁর আগেকার গানের পরিপূর্ণ রূপ পর্যবেক্ষণ করবেন এমন আশা করেন না, কিন্তু তাঁর তানের ঝলক, স্বরক্ষেপের চমক, বিস্তার বা সরগমের অসাধারণত্ব প্রত্যক্ষ করতে চান। আজও অবহেলায় তিনি যে দ্রুত তানকর্তব করেন তা সারা ভারতের পয়লা নম্বরের ওস্তাদের কাছেও বিস্ময়ের বস্তু, ক্ষমতার বাইরে। এখনও তিনি স্বরপ্রয়োগের যে চাতুর্য প্রদর্শন করেন তা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের পরিকল্পনাতেও আসে না। ভীষ্মদেব আজ একটি আইডিয়া, সঙ্গীত-জগতের একটি মহাবিস্ময় তাঁকে ঘিরে লিজেন্ড রচনা করেছে।

আচার্যের শিষ্যেরা প্রথমে ভেবেছিলেন তাঁর বাসভবনেই তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আসবেন। কিন্তু পরে তাঁর পাড়াতেই ভুবন সরকার লেনের মোড়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হল। স্থানীয় অধিবাসীরা বহু সাহায্য করেছেন, প্ল্যাটফরমও তাঁরাই তৈরি করে দিয়েছিলেন। কাউন্সিলার শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু উপস্থিত থেকে সব দেখাশোনা করেছিলেন এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে একটি চমৎকার বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। উত্তর কলকাতার বর্তমান পরিস্থিতিতে খোলাখুলিভাবে কোনও অনুষ্ঠান করা যে মুশকিল তাই নয় বিপজ্জনকও বটে; কিন্তু অনুষ্ঠানটি সকলের সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়েছে। এইজন্য স্থানীয় অধিবাসিগণ বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। আরও বিশেষভাবে নানাদিক থেকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়, পরমবন্ধুবৎসল এবং শিল্পীজনসুহৃদ শ্রীবিমান ঘোষ, শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী, শ্রীমতী প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মণিকা মৈত্র, শ্রীনীলমণি চক্রবর্তী, শ্রীরবীন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি আরও অনেকে সুহৃদ সজ্জন। ভীষ্মদেবের সহযোগী, শিষ্য এবং পরিচিতদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে পড়েছে উদ্যোক্তারা তাঁদের সকলকেই উৎসবের কথা জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সুযোগ করে আসতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন। এই অনুষ্ঠানের যিনি প্রধান উদ্যোক্তা সেই কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় যে একটি পুজোর মনোভাব নিয়ে এই আয়োজন করেছিলেন তার প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারছি না।

সকালে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী নজরুলের "সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি"—এইটি গেয়ে এবং বেদগান সহযোগে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সঙ্গীতাচার্যকে তাঁর প্রচুর শিষ্যশিষ্যা এবং অনুরাগী বন্ধুবান্ধব

পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক প্রদান করেন। সুসজ্জিত শান্ত, সৌম্যমূর্তি ভীষ্মদেবকে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। সকালবেলার সঙ্গীতানুষ্ঠানে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রী ভি জি যোগ, শ্রীমতী তৃপ্তি চক্রবর্তী, শ্রীতুষারকান্তি মজুমদার, শ্রীকানাই ভট্টাচার্য এবং শ্রীদুলাল চক্রবর্তী। আচার্য নিজেও গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। সন্ধ্যার আসরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন সভাপতি প্রবীণ সাহিত্যিক বনফুল এবং প্রধান অথিতি সঙ্গীতাচার্য শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র। এই আসরেও বহু গুণীজন উপস্থিত ছিলেন এবং বহু পুষ্পমাল্যে আচার্য ভূষিত হন। এই অধিবেশনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে ছিলেন শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শ্রীমতী মালবিকা কানন, শ্রীমতী অনীতা মজুমদার, শ্রীমহেশপ্রসাদ মিশ্র এবং শ্রীকেদারনাথ মিশ্র। ভীষ্মদেব নিজে জয়জয়ন্তী রাগে খেয়াল শোনালেন। এই আসরে বহুজনসমাগম হয়েছিল এবং সকলে উচ্ছ্বসিত হর্ষে তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

উচ্চতর সরকারী সম্মানের উৎসব নয়, পৌর সম্বর্ধনাও নয়—কেবলমাত্র অনুগত শিষ্যদের সীমিত প্রচেষ্টায় আয়োজিত একটি ঘরোয়া উৎসব, কিন্তু শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার গৌরবে এর চেয়ে সম্ভ্রান্ত অনুষ্ঠানের কল্পনা করতে পারি না। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরেও গৌরবান্বিত মনে করছি।

পরিশেষে বনফুল যে কবিতাটি ভীষ্মদেবকে এই অনুষ্ঠানে উৎসর্গ করেছেন সেটি উদ্ধৃত করি :

আত্মপ্রকাশই আত্মবিশ্বাস
এরই সাধনায় নিখিল বিশ্ব সদা নিমগ্ন,
সে
অনির্বচনীয় অনন্তের সমীপে
নিজেকে সমর্পণ করল অহরহ
তাই চতুর্দিকে এত রূপের প্রকাশ
এত বিভিন্ন আবেদনের এক বিচিত্র
ঐশ্বর্য।

আমরা মানুষ
আমাদেরও সে চেষ্টার অন্ত নেই
কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে তার নিরন্তর
প্রকাশ।

কিন্তু আমি জানি
ভাষা সব প্রকাশ করতে পারে না।
শিল্পীর তুলির টানও কিছু দূর
গিয়ে থেমে যায়।

এরা যা পারে না
সুর তা পারে।
হে সুরশিল্পী
শব্দব্রহ্মের হে নিপুণ সাধক
রহস্য-সমুদ্রের হে মহা নাবিক
তোমাকে তাই শ্রদ্ধা জানাই
কামনা করি তোমার জন্মদিনে
তোমার সমুজ্বল শতায়ু
কামনা করি তোমার সাধনার সিদ্ধি।

বনফুল
৮।১১।৭০

একজন গুরুস্থানীয় প্রবীণতর সাহিত্যাচার্যের অপর গুরুস্থানীয় দেশবন্দিত সঙ্গীতাচার্যের প্রতি এই কাব্যোৎসর্গ ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে।

*

উত্তরা নামক অতুলপ্রসাদের গানের প্রচারকল্পে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা কবির শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের প্রাক্কালে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন :—

ছত্রিশ বছর হয়ে গেল অতুলপ্রসাদ সেন পরলোকগমন করেছেন। এই বিশিষ্ট

মানুষটির নানামুখী অবদানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর দীর্ঘজীবনের কর্মকেন্দ্র লক্ষ্ণৌ শহর তাঁর নামে একটি রাস্তা ও মর্মরমূর্তি স্থাপন করে হয়তো কিছুটা ঋণমুক্ত হয়েছে। কিন্তু "আ-মরি বাংলা ভাষা"র গীতিকার সম্পর্কে বাংলা দেশ আশ্চর্যভাবে উদাসীন। সম্প্রতি রেডিও ও গ্রামোফোনের মাধ্যমে তাঁর কিছু গান প্রচারিত হওয়ায় সঙ্গীতরসিক ও রুচিবান মহলের দৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অথচ সম্পূর্ণ রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত এই বিদগ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এটা আশার কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু গান রচনা ও সুরসৃষ্টি যে অতুলপ্রসাদের একমাত্র পরিচয় নয় এ কথা বিস্মৃত হলে বাঙালী জাতির পক্ষে সেটা ক্ষতি। কারণ দীর্ঘদিন প্রবাসী থেকেও অতুলপ্রসাদ তাঁর সমস্ত কাজ ও চিন্তাধারায় খাঁটি বাঙালী রয়ে গেছেন। সেই জন্যেই তাঁর গানের ভেতর, তা ভক্তিমূলকই হোক বা স্বদেশমূলকই হোক—বাঙালীর গানের প্রাণের সুরটা বড়ো বেজেছে। এই মানুষটিকে আমাদের মনে রাখা দরকার। আর ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২০শে অক্টোবর তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। বাংলা দেশ কিভাবে সেটি পালন করবে তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতির দরকার। দেশের চিন্তাশীল এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমরা ঐ বিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ করছি।

চিঠিপত্র

গত ২৬শে সেপ্টেম্বরের "দেশ" পত্রিকায় "গানের আসর"এ শার্ঙ্গদেব মহাশয়ের "বাংলা খেয়াল" সম্বন্ধে আলোচনা এবং ২৪শে অক্টোবর শ্রীহরিভূষণ বসু মহাশয়ের পত্র মনোযোগ সহকারে পড়িয়া আমার সামান্য কিছু মতামত জানালাম।

"বাংলা খেয়াল" সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব মহাশয় বলতে চেয়েছেন যে, শুধু হিন্দীর বদলে বাংলা বসিয়ে তাকে বাংলা খেয়াল বলে না চালিয়ে "বাংলা খেয়াল" বাংলার কিছু নিজস্ব ছাপ নিয়ে আসুক। প্রসঙ্গত তিনি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের গাওয়া কিছু গানের উল্লেখ করেছেন। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ঐ সমস্ত গানে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল। এ ছাড়া আরও অনেক গান পূর্বে শুনেছি যেগুলিকে খেয়াল অঙ্গীয়, খেয়াল ধর্মী যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন সে সমস্ত গানে খেয়ালের সব লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও ঠিক হিন্দী খেয়ালের অনুকরণ ছিল না।

টপ্পা সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। শ্রীযুক্ত কালীপদ পাঠক মহাশয়ের কাছে যে টপ্পা আমরা শুনেছি তা যে ঠিক হিন্দী বা পাঞ্জাবী টপ্পার হুবহু অনুকরণ নয় সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন। প্রসঙ্গত বলি, প্রথম যৌবনে একটি টপ্পা গান অনেককেই গাইতে শুনতাম যার রেশ আজও মনে লেগে আছে। গানটির প্রথম লাইন—"তোমায় রাধানাথ আর বলব না হে ও কুব্জার বঁধু।"

হিন্দী, মহারাষ্ট্রীয়, উর্দু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষায় প্রাচীন কাল থেকেই খেয়াল গান প্রচলিত ছিল, কিন্তু বাংলা ভাষায় ঐ ধরনের কোন খেয়াল গান প্রচলিত ছিল না। তাই আজ যদি ভাষা বদলিয়ে "বাংলা খেয়াল" করা হয় তাহলে তা হবে হিন্দী খেয়ালেরই নামান্তর মাত্র, এতে গৌরবের কিছু নেই। আর এই সামান্য কাজটুকু যে কেউ করতে পারেন।

ভারতবর্ষে রাগসঙ্গীত সব রকম গানেরই প্রাণস্বরূপ। এই রাগসঙ্গীত যে ভাষাতেই প্রচলিত থাকুক না কেন সেই সব সুপ্রাচীন "কালজয়ী বন্দিশ" রক্ষা না করার কথা ওঠে না। বরং বলা যায় সর্বাগ্রে রাগসঙ্গীতকে (খেয়াল) সম্পূর্ণভাবে অধিগত করে তারপর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিলে তবেই কিছু করা সম্ভব। সেই সব সুপ্রাচীন কালজয়ী বন্দিশগুলিকে স্রেফ অনুকরণ না করে শিল্পীরা "বাংলা খেয়ালে" বাংলার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য সহ নিয়ে আসুন আমরা এইটুকুই চাই। পূর্বে সুরীগণ পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। আমার মনে হয় শার্ঙ্গদেব মহাশয় এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

উপরোক্ত স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য কি তা বিশ্লেষণ করা বা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। এই পার্থক্য বোধ হয় ঠিকমত প্রকাশ করাও যায় না, অনুভব করা যায় মাত্র।

বাংলা খেয়ালকে যদি খেয়ালেরই একটি বিশেষ শ্রেণী বলা যায় তাতে আপত্তির কি আছে? "বাংলা খেয়াল" যদি হিন্দী খেয়ালের অবিকল নকল না হয়ে বাংলার কিছু নিজস্ব ছাপ নিয়ে আসে তাহলে "বাংলা খেয়াল" একদিন বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতকেও প্রথমে একটি বিশেষ শ্রেণী বলে অনেকে স্বীকার করতেন না, কিন্তু এখন করেন।

বাংলার প্রাচীন রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে ধারণা আছে এবং চর্চা করেন এমন শিল্পীর সংখ্যা খুবই কম। আমরা সচরাচর যে সমস্ত খেয়াল গায়কদের দেখি এবং গান শুনি তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই জ্ঞান এবং দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। নিছক ব্যবসায়িক কারণে যে ভাবে হিন্দী খেয়ালের প্রচার এবং প্রসার হচ্ছে এ বোধ হয় তারই ফল।

"বাংলার খেয়াল" প্রসঙ্গে আলোচনায় কারও প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অসংগত ভাষা ব্যবহার করা উচিত হবে না। এতে বরং অভিজ্ঞ শিল্পী, শ্রোতা এবং জ্ঞানীগুণী জনের মতামত জানতে পারলে বিষয়টি অনেক পরিষ্কার হবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে "বাংলা খেয়ালে" যেন বাংলার নিজস্ব কিছু ছাপ থাকে—শুধুই হিন্দী খেয়ালের অনুকরণ নয়।

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষাল
সৈদাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

একমাত্র মণ্টটনিক যাতে আছে ৬টি ভিটামিন—ভিটামিন বি-১২ সমেত
সুস্বাদু
অস্টোমল্ট
বিশুদ্ধ কমলার রসে ভরা
যোগায় বাড়তি উৎসাহ
যোগায় বেশী খিদে
যোগায় সুস্থ রক্ত
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-এ উজ্জ্বল চোখের জন্য (ওর উজ্জ্বল চোখ এখন দুষ্টুমিতে ভরা)
অস্টোমল্টে আছে আয়রণ,—যা সুস্থ রক্ত গ'ড়ে তোলে (ওর গাল এখন আর আগের মত পাংশুটে নয়)
অস্টোমল্টে আছে রিবোফ্ল্যাবাইন আর বি-১২—যা খিদে বাড়ায়. বি-১ হজমে সাহায্য করে (ইদানিং ও দু'বার ক'রে চেয়ে খাচ্ছে)
অস্টোমল্টে আছে মল্ট উৎসাহ আর শক্তি বাড়াতে (ও এখন কত বেশী প্রাণবন্ত, আগের চেয়ে ওর ঘুমও ভাল হয়)
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-ডি—সুস্থ সবল দাঁত আর মজবুত হাড় গ'ড়ে তুলতে (ওর এখন একটি সাইকেল চাই-ই! খুব তাড়াতাড়ি বড়সড় হয়ে উঠছে)
অস্টোমল্টে আছে নিকোটিনামাইড,—যা মুখে স্বাভাবিক এক সুস্থ দীপ্তি ফুটিয়ে তোলে (নাবিকের পোশাকে ওকে ছবির মত সুন্দর দেখায়)
Ostomalt
অস্টোমল্ট
পুষ্টি আর শক্তির জন্য সত্যি অতুলনীয়!
তৈরী
ASP/G/0-2

মিনি-বুক্

গ্রন্থটি ক্ষুদ্রাকার—দৈর্ঘ্যে পাঁচ ইঞ্চি; প্রস্থে তিন—বয়সে কিন্তু অভিজাত : রাজা দ্বাদশ লুইয়ের অনুমতিক্রমে তিন-শত বৎসর পূর্বে প্যারিসে মুদ্রিত। লেখকের নাম ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়ে [১৬২০-১৬৮৮]। তিনি যুগপৎ চিকিৎসক, দার্শনিক ও পর্যটক। চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করেন দক্ষিণ ফ্রান্সের মোঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে, দর্শন শেখেন স্বনামধন্য গাস্যাঁদি-র পদতলে; ভারতে অবস্থান করেন বারো বছর।

ভারতযাত্রী প্রথম ফরাসী নাগরিক তিনি নন [পিয়ের্ মালের্ব্ ও জাঁ-বাতিস্ত্ তাভের্নিয়ে-র পরে ভারতাগমন]; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজে তিনিই প্রথম ভারতের প্রতি কৌতূহল ও চিত্তাকর্ষণ সৃজনে সক্ষম হন। তাঁর সৌজন্যেই য়ুরোপীয় সাহিত্যে মোগল বাদশাহ [Grand Mogol] প্রবেশাধিকার করেছেন।

গ্রন্থটিকে দ্বাদশ লুইয়ের শ্রীচরণে উৎসর্গ করে বের্নিয়ে লেখেন : "নিবন্ধটি নিঃসন্দেহে অমার্জিত—অবিন্যস্তও বোধ হয়। আমার আশা, মহাধিরাজ বিষয়বস্তুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করবেন। এতদিনের বিশ্বভ্রমণ এবং বিদেশী-দরবারে কার্যনির্বাহের পরে আমার ভাষা অর্ধবর্বর হওয়া অস্বাভাবিক নয়।" এদিকে পাঠকের উদ্দেশে তিনি এই আবেদন জানান : "মোগল-ও ভারতীয়দের আচার-ব্যবহার, প্রথা ও প্রতিভা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা আমি করব না : তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই সেগুলির ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।"

গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোনাম 'মোগল বাদশাহের রাজ্যসমূহে শেষতম বিপ্লবের কাহিনী' এবং 'বিশেষ বিশেষ ঘটনা, অর্থাৎ মোগল বাদশাহের রাজ্যসমূহে যুদ্ধোত্তর বছর পাঁচেকের প্রণিধানযোগ্য ঘটনাবলী'। মূল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৬৭০ সালে; তার ইংরেজি ও ডাচ্ সংস্করণ যথাক্রমে ১৬৭১ ও ১৬৭২ সালে। বের্নিয়ে-র পুস্তকই ড্রাইডেনের [১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত] 'ঔরঙ্গজীব' ট্রাজেডির উৎস।

ভারতাগমন

বের্নিয়ে-র ভারত ভ্রমণ অপরিকল্পিত। তাঁর ইচ্ছা ছিল, লোহিত সাগর পরিদর্শন করবেন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। তাই কায়রো-তে এক বৎসরাধিক কাল কাটানোর পর ইথিওপিয়ায় যেতে মনঃস্থির করলেন। "আমাকে কিন্তু সনির্বন্ধে বলা হল, আজকালকার দিনে কাথলিকদের পক্ষে সে-দেশে যাওয়া নিরাপদ নয়; রানীমার চক্রান্তে পর্তুগীজরা হয় নিহত, নয়—তাদের গোয়া থেকে নিয়ে আসা জেসুইট মহাধর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে—বিতাড়িত হয়েছে। এক দুর্ভাগা কাপুচিন্ সন্ন্যাসী নাকি রাজ্যে প্রবেশ করে সুয়াকেন্-এ মাথাটা খুইয়েছেন। বাস্তবিক নিজেকে গ্রীক কিংবা আর্মেনীয় বলে পরিচয় দিলে এত বিপদের সম্মুখীন আমাকে হতে হবে না; এমন কি, রাজার যদি খেয়াল হয় আমি তাঁর কোনো কাজে লাগতে পারি, তবে তিনি আমাকে জমিও দেবেন। টাকা থাকলে ক্রীতদাস কিনতে পারব, তাদের দিয়েই সেই জমির চাষ করতে পারব। অসুবিধা এই যে, কর্তৃপক্ষেরা আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবেন—সেই গ্রীক-চিকিৎসক-সাজা সন্ন্যাসীর মতো—এবং দেশ থেকে আমাকে আর বেরুতে দেবেন না।"

তাই তিনি বরং মোগল বাদশাহের সাম্রাজ্যে পদার্পণ করলেন—সুরাটে, ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। বের্নিয়ে-র মতে 'মোগল' কথাটার অর্থ হল "ভারতীয়দের অর্থাৎ হিন্দুদের দেশের সাম্প্রতিক বিদেশী শাসনকর্তা; প্রকৃতপক্ষে তারা সকলে রক্তে মোগল নয়, অনেকে পারসিক, কেউ কেউ আবার আরবী কিংবা তুর্কী; ইসলামধর্মী শুভ্রবদন বিদেশী হলেই হল!" হিন্দুরা এদিকে শ্যামবর্ণ ও পৌত্তলিক [বের্নিয়ে-র ভাষায় Gentil বলতে শুধু পৌত্তলিক নয়, হিন্দু-ই বোঝায়; ভল্ত্যার্ ইংরেজি শব্দের অনুকরণে সাধারণত Gentou-ই লিখেছেন] আর য়ুরোপীয় খ্রীষ্টানেরা—ফ্রাঙ্গি [ফিরিঙ্গি]।

সাজাহানের বয়স তখন সত্তরাধিক; গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত তিনি। সেই ব্যাধিই বাদশাহের পুত্রদের মধ্যে পঞ্চবর্ষব্যাপী গৃহযুদ্ধের উৎস। বের্নিয়ে "দৈবক্রমে আর অর্থাভাবের দরুন দরবারে আট বছর কাটালেন মোগল বাদশাহের চিকিৎসক হিসেবে—এবং এশিয়ার বিজ্ঞতম সেই দানেশমন্দ খাঁ-র সেবায়।"

মোগল পরিবার

সম্রাটের পরিবারের এক প্রাণবন্ত বিবরণ তিনি রেখে গিয়েছেন। ইসলামীয় ধর্মক্রিয়া পালন করেও বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা, অর্থাৎ দারিয়ুস "হিন্দুদের সঙ্গে ছিলেন হিন্দু, খৃষ্টানদের সঙ্গে খৃষ্টান"। পণ্ডিতদের [Pendet] তিনি মোটা মোটা বৃত্তি দান করতেন, এবং জেসুইট সন্ন্যাসী বুজে-র কথাবার্তাতেও আনন্দ লাভ করতেন। কারও কারও মতে অবশ্য তিনি কোনো ধর্মই মানতেন না, ধর্মবিষয়ক তাঁর সেই কৌতূহল নিছক রাজনীতিপ্রসূত : খৃষ্টান গোলন্দাজ আর হিন্দু রাজাদের সৌহার্দ্য লাভই তাঁর একমাত্র কাম্য। তাতে ফল হল অল্প : কাফের আখ্যা দিয়েই ঔরংগজেব তাঁকে হত্যা করলেন। চাক্ষুস সাক্ষী বের্নিয়ে বর্ণনা করেছেন দিল্লীর রাস্তা দিয়ে দারা-র শেষ যাত্রা : "তাঁকে বসানো হল এক বুড়ো জিরজিরে হাতির উপর। নোংরা ও ইতর প্রাণীটার পিঠে পাতা ছিল এক ছেঁড়া কম্বল আর অনাবৃত দীন ধরনের এক আসন। তাঁর একমাত্র বস্ত্র ছিল মোটা কাপড়ের এক ময়লা সাদা জামা আর পাগড়ি—আর সস্তা এক শাল, চাকরেরা যেমন পরে। রাস্তার দু ধারের ছাদ আর দোকান থেকে আসছিল শুধু রোদন আর বিলাপ : স্ত্রীপুরুষ, ছোট বড় [ভারতীয়দের হৃদয় কোমল] সবাই হু হু করে কাঁদছিল, সর্বপ্রকার সহানুভূতি দেখাচ্ছিল, কিন্তু কেউই এক পা নড়তে সাহস পেল না।"

সাজাহান তাঁর কন্যা বেগম সাহেবাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। "গুজব রটেছিল, এতই তীব্র সেই ভালোবাসা যে তা কল্পনা করা দুরূহ; সম্রাট নাকি কৈফিয়ৎ হিসেবে বলতেন : বিধান-ব্যাখ্যাকার মৌলবীদের সিদ্ধান্তে, স্বহস্তরোপিত বৃক্ষের ফলই ভক্ষনীয়।" বেগম সাহেবা দারা-র অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ—বের্নিয়ে-র মতে—দারা তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, রাজসিংহাসনে আরূঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর বিয়ে দেবেন। "কথাটা অতি আশ্চর্য এবং হিন্দুস্থানে অশ্রুতপূর্ব-প্রায়, কারণ রাজকুমারীর স্বামী অতি প্রভাবশালী হবেনই; সর্বদাই সন্দেহ জাগবে, রাজমুকুটের তিনি আকাঙ্ক্ষী। এ-ছাড়া রাজারা এই আত্মভিমানী যে, তাঁদের কন্যাদের যোগ্য পাত্র মিলতে পারে, সে-কথা তাঁরা মানতে প্রস্তুত নন।"

বেগম সাহেবার জলের-টবে-লুকোনো প্রণয় প্রার্থীর অপমৃত্যুর সর্ববিদিত গল্প ছাড়া বের্নিয়ে আরেকটা বিচ্ছেদাত্মক কাহিনী বিবৃত করেছেন। দরবারে নজর খাঁ নামক এক সুশ্রী ও সুশিক্ষিত, সহৃদয় ও উচ্চাভিলাষী পারসিক ওমরাহ্ ছিলেন। বেগম সাহেবা তাঁকে খানসামা পদে নিযুক্ত করেছিলেন। বিবাহ প্রস্তাবিত হল, সাজাহান মত দিলেন না। "নজর খাঁ-কে সম্মানিত কর[illegible]চান, এই ভঙ্গিতে তিনি তাঁকে এক [illegible]lay খেতে দিলেন; যুবকটি—দেশের প্রথা অনুসারে—সেটাকে গ্রহণ করেই সঙ্গে সঙ্গে মুখে পুরে চিবোতে লাগলেন। Betlay হল ছোট এক মোড়ক; তার মধ্যে আছে সুস্বাদু পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন সামগ্রী—সমুদ্র-শাঁখের চুনের সঙ্গে মেশানো, যার জন্য মুখ ও ঠোঁট রক্তাভ হয়ে ওঠে, শ্বাস হয় মৃদু ও মনোরম। নজর খাঁ বিষের কথা মোটেই ভাবেন নি, সভা থেকে সানন্দেই বেরিয়ে এসে পাল্কিতে [Paleky] চড়ে বসলেন। বিষ এত সাংঘাতিক ছিল যে গৃহে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।"

শুধু ওমরাহদের নয়, এক খোজাকে পর্যন্ত প্রেমে পড়তে দেখেছেন বের্নিয়ে। খোজাটা যে-মেয়েটির প্রণয়ী ছিল, সে একজন হিন্দু 'লিপিকরের' ভগিনী। বন্ধু-মহলে অপমানিত ও উপহাসিত হওয়াতে ভদ্রলোকটি অপরাধী যুগলকে ছুরিকাঘাত করেন। হারেমের মহিলারা ও খোজাবৃন্দ তাঁর প্রাণনাশের জন্য সম্মিলিত হল, ঔরংগজীব কিন্তু তাঁকে মুসলমান করে ছাড়লেন। বের্নিয়ে-র মতে হিন্দু লোকটি খোজাদের নিষ্ঠুরতা বেশি দিন এড়াতে পারবেন না—এই কারণে যে "মুষ্কচ্ছেদিত জন্তুদের স্বভাব যদিও শান্ততর ও পোষ্যতর,

খোজারা কিন্তু হিংস্রতর ও দুর্বৃত্ততর, উদ্ধত ও অসহ্য।"

হাবশী রাজার দূত

ইথিওপিয়ার রাজা দিল্লীর দরবারে দুজন দূত পাঠান। "তাদের হাতে দিয়ে দেন — মোগল বাদশাহের উদ্দেশে উপহারস্বরূপ—পাঁচিশটি বাছা বাছা ক্রীতদাস; তাদের মধ্যে ছিল নটি কিংবা দশটি বালক—খোজা করার উপযুক্ত। পাঠক বুঝবেন, উপহারটা রাজার যোগ্য উপঢৌকন কি না, বিশেষভাবে মুসলমান নৃপতিকে দেয় খ্রীষ্টান রাজার উপহার! অবশ্য হাবশীদের আর আমাদের খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর।" রাজদূতদের ছিল, পথের খরচ হিসেবে, আরও বত্রিশটি বালকবালিকা; তাদের মোকা-য় বিক্রি করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, সে-বছরে দাসের বাজার বড় মন্দা।

এ-দুজন দূতের মধ্যে একজন ছিল আর্মেনীয় খ্রীষ্টান; নাম তার মুরাদ। তারই বাড়িতে বের্নিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন মক্কায়, তাই তিনি মোগল দরবারে মুরাদকে যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। শেষে কিন্তু তাঁর অনুশোচনা হয়। কারণ? কারণ ত্রিবিধ—বের্নিয়ে-র চোখে মুরাদের বিশ্বাসঘাতকতার তিনটি নিদর্শন: খ্রীষ্টীয় দূত হয়ে সে খ্রীষ্টীয় রাজার নামে মুসলমান সম্রাটের কাছে কোরান প্রভৃতি ইসলামীয় ধর্মগ্রন্থ উপহার চায়; সম্রাটের কাছে প্রতিশ্রুতিও দেয় ইথিওপিয়ায় পর্তুগীজদের হাতে বিধ্বস্ত এক পুরোনো মসজিদ সে পুনর্নির্মাণ করাবে; এবং—সবচেয়ে তীব্র ও ব্যক্তিগত আক্ষেপ—"সে কথা দিয়েছিল, আমার কাছে তার পুত্রকে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করবে, কথাটা কিন্তু রাখলে না, তিন শো টাকা দাবি করে বসল...ছেলেটিকে আমি কিনতে চেয়েছিলাম, ঘটনাটা বিরল বলেই; লোকমুখে ফিরবে, বাপ নিজেই আমার কাছে আপন সন্তানকে বিক্রি করেছে!"

বাংলা দেশের জলদস্যুর উপদ্রব বের্নিয়ে উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তারা গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি পর্তুগীজ-অধিকৃত এলাকা থেকে পলাতক—মঠত্যাগী সন্ন্যাসী, পুনর্বিবাহিত খ্রীষ্টান, খুনী...। "পরস্পর পরস্পরকে তারা হত্যা করত, বিষ খাওয়াত, নিজেদের যাজকদের পর্যন্ত বধ করত; ঐ যাজকদল অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ওদের থেকে বেশি সাধু ছিল না!" বাজার, বিয়ে বাড়ি, এমন কি গোটা এক গ্রাম পর্যন্ত তারা আক্রমণ করত, সবাইকে নিয়ে যেত বন্দী করে; যা লুঠ করতে পারত না, তা পুড়িয়ে ফেলত। বুড়োবুড়িদের করত বিক্রি, বাকিদের দাঁড়ীমাল্লা ও খ্রীষ্টান করে নিত; দম্ভ করে বলত, "সারা ভারতের পাদ্রি সম্প্রদায় দশ বছরের মধ্যে যত লোককে ধর্মান্তরিত করে, তারা তার থেকে বেশি করে এক বছরেই। খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের বিচিত্র কায়দা বটে!" সাজাহান অবশ্য প্রতিশোধ নিয়েছিলেন: আগ্রার জেসুইট ফাদারদের গির্জা ধ্বংস করা হয়; হুগলীর খ্রীষ্টান আবালবৃদ্ধবণিতাকে এবং যাজক ও সন্ন্যাসীদেরও ক্রীতদাস করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। সম্রাট সুন্দরীদের পাঠিয়ে দেন হারেমে, বৃদ্ধাদের বিতরণ করে দেন তাঁর ওমরাহদের মধ্যে; লোভ কিংবা হাতির পায়ে দলিত হওয়ার ভয় দেখিয়ে অনেককে তিনি মুসলমান করে নেন।

পরস্পর পরস্পরকে তারা হত্যা করত

বের্নিয়ে ঔরঙ্গজীবের চরিত্রকে নির্দোষ বলেন নি, ভাইদের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরতাও তিনি স্বীকার করেছেন, আর হয়ত—তাঁর মতে—রাজ্যের উত্তরাধিকার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর ন্যস্ত না থাকাতেই সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। বের্নিয়ের গ্রন্থে প্রকাশিত শেষ ইচ্ছা—পাঠকমাত্রই যেন বোঝেন, ঔরঙ্গজীব "বর্বর ছিলেন না; তিনি ছিলেন দুর্লভ প্রতিভাশালী, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, মহান এক সম্রাট।"

বের্নিয়ে-র পত্রাবলী

নৃবিদ্যার ক্ষেত্রে বের্নিয়ে ছিলেন পথিকৃৎ। মাদাম্ দ্য লা সাব্লিয়ের্-এর কাছে প্রেরিত এক পত্রে তিনি লেখেন: "ভৌগোলিকেরা পৃথিবীকে দেশে দেশে বিভক্ত করেছেন; বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন মানুষের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে আমি পৃথিবীকে অন্যভাবে বিভাগ করেছি।" ভারতীয়দের কৃষ্ণবর্ণ সত্ত্বেও তিনি তাদের আর য়ুরোপীয়দের একশ্রেণীভুক্ত করতে দ্বিধা করেন না: "ভারতীয়দের বর্ণ আপতিক—রৌদ্রজনিত; রোদ্দুরে যারা কাজ করে কম, স্প্যানিশদের চেয়ে তারা বেশি কালো হয় না।" এদিকে নিগ্রোদের কৃষ্ণত্ব অনিবার্য, রৌদ্রজনিত নয়; তাদের আছে মোটা ঠোঁট, চ্যাপ্টা নাসিকা আর তেল-চকচকে চামড়া; আর আছে অতি শুভ্র দাঁত আর লোহিত জিহ্বা; তাদের দাড়ি নেই বললে চলে, মাথাতেও প্রকৃত চুল নেই, আছে এক রকম পশম।

দ্য লামং-লাভায়ের্-এর উদ্দেশে রচিত এক ঘরোয়া চিঠিতে বের্নিয়ে জানান: দিল্লীতে ভালো পাউরুটি হয় না, ওদের আমও নাকি বাংলা দেশের আমের মতো সুস্বাদু নয়; মাছের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য rau ও sing-ola। "দেখবেন, ওরা যেন আপনার কাছে পাঁঠার নামে মেষের মাংস বিক্রি না করে: মেষের আর গরুর মাংস—বিশেষ করে মেষের মাংস—যদিও সুস্বাদু, উষ্ণ খুব, বায়ুজনক, গুরুপাক। সবচেয়ে ভালো খাদ্য হল ছাগশিশু, দোকানে কিন্তু তা প্রায়ই পাওয়া যায় না, গোটা আর জ্যান্ত জীবটাকে কিনতে হয়। কসাইখানায় সাধারণত যা মেলে—তা হল বড়

ষড়—আর বেশির ভাগ বগুনে ও শক্ত—ছাগলের টুকরো।" আসল অসুবিধা কিন্তু 'ভোজের প্রাণ' সেই সুরার অভাব; "এখানে এসে বিশুদ্ধ ও পবিত্র জলের অভ্যাস করতে হয়!"

কাশ্মীরের মেয়েরা অতি সুন্দরী: "দরবারে নবাগত অধিকাংশ বিদেশীরা ওদের জোগাড় করেন, তাঁদের সন্তানসন্ততি যাতে ভারতীয়দের চেয়ে অধিকতর শুভ্রবর্ণ হয়ে জন্মায়, প্রকৃত মোগল বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে।" বেনিয়ে স্বচোখে দেখেছেন কচি কচি মেয়েদের ঝড়ি করে কাঁধে তুলে, পাহাড় ভেঙে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদিকে তিনি একাধিকবার সহ-মরণেরও চাক্ষুষ সাক্ষী হয়েছেন: "বৃদ্ধা নয়, অসুন্দরীও বলা যায় না; মেয়েটির মুখে অংকিত ছিল পাশবিক দুঃসাহস আর এক হিংস্র উল্লাস...।"

সংস্কৃত [Hanscrit] বেনিয়ে শেখেন নি; তবে দানেশমন্দ খাঁ-কে শরীরতত্ত্ব এবং দেকার্ং ও গ্যাসাঁদি-র দর্শন ফার্সিতে বোঝাতে বোঝাতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, দারাশিকো-র সেই বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতেন; সেই পণ্ডিতের ফার্সিতে অনূদিত উপনিষদের এক প্রতিলিপি তিনি ফ্রান্সে নিয়েও যান। "ঈশ্বর, তারা যাঁকে অচর বলে, তাদের কাছে পাঠিয়েছেন চারটি বেদ: অথর্ব, যজুঃ, ঋক, সাম।" পণ্ডিতদের মতে হিন্দুধর্ম সার্বজনীন নয়, খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টানদেরই উপযুক্ত ধর্ম, যেহেতু "ঈশ্বর স্বর্গে যাওয়ার বিভিন্ন পথ নির্দিষ্ট করে থাকতে পারেন"... তারা কিন্তু বোঝে না যে, "আমাদেরই ধর্ম সার্বজনীন হওয়াতে, তাদের ধর্ম রূপকথা ও নিছক মিথ্যাকল্পনা ছাড়া আর-কিছু হতে পারে না।"

কচি কচি মেয়েদের ঝড়ি করে কাঁধে তুলে ...নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

বাংলাদেশ

একাধিক লেখার মধ্যে আর বিশেষভাবে শাপলাঁ-র কাছে প্রেরিত এক পত্রে বেনিয়ে বাংলা দেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন: "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বলা হয়েছে, মিশরই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও উর্বরতম দেশ, আমাদের লেখকদের মতে মিশরের সমতুল্য ভূমি আর কোথাও নেই—আমি কিন্তু বাংলা-রাজ্যে দু-দুবার যাত্রা করে বলতে পারি, বাংলা-রাজ্য মিশরের চেয়েও সেরা।" এই 'প্রাচুর্যের দেশে' শুধু রেশম ও তুলো কেন, সোরা, গালা, আফিম ও মোমের সমৃদ্ধ বাণিজ্য আছে। তাদের আম, লেবু ও আদা প্রভৃতি ফলের মোরব্বা প্রসিদ্ধ। টাকায় ন্যূনপক্ষে কুড়িটি মুর্গি কেনা যায়। ধান তারা রপ্তানি করে মালদ্বীপে, চিনি মেসোপোটামিয়ায়...।

মোট কথা, "প্রয়োজনীয় সব বস্তুর প্রচুরের জন্য—এবং ওদের নারীসমাজের সৌন্দর্য ও খোস মেজাজের দরুন—পর্তুগীজ ইংরেজ ও ডাচদের মধ্যে এক প্রচলিত প্রবাদ আছে: বাংলা-রাজ্যে প্রবেশপথায় আছে অসংখ্য, নেই কোনো নির্গমনের পথ।"
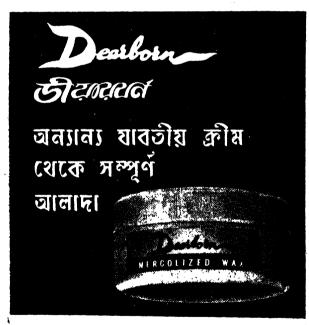
উজ্জ্বল উদ্ধার

প্রতিভা বসু

সুদর্শন এসে পৌঁছুবার দিন পনেরো আগে একদিন ভয়ানক উত্তেজিত মনে হলো তাঁকে। মাঝে কয়েকদিন আসতে পারে নি অঞ্জলি। সে-ও সুদর্শনের একটা চিঠি পেয়ে যথেষ্টই উত্তেজিত হয়েছিল। ফিরতি পথের জাহাজ ধরেছে সে, জানিয়ে দিয়েছে, কলকাতা পৌঁছুবার তিন সপ্তাহের মধ্যেই বিবাহের ব্যবস্থা পাকা ওরা দরকার। কেননা তাকে সেই সময়ের মধ্যেই কাজে যোগ দিতে হবে দিল্লি গিয়ে। সুতরাং তার চেয়ে বেশী সময় সে কাটাতে পারবে না কলকাতা। দিল্লিতে সেই মর্মে বাবাকেও লিখে দিয়েছি, যদি সম্ভব হয় অঞ্জলি যেন তার বাবা মাকেও খবরটা জানিয়ে রাখে। আর যদি এমন হয় যে, এর মধ্যে হিন্দুমতে পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে দিনক্ষণ পাওয়া গেল না, তা হলে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হবে। অঞ্জলি যেন তার জন্যও প্রস্তুত থাকে।

সেই প্রস্তুতি পর্বটাই চলছিল অঞ্জলির ভিতরে ভিতরে। যদিও বাবা মাকে বলি বলি করে বলতে পারেনি কিছু, তবুও প্রত্যেক মুহূর্তেই চেষ্টাটা করে যাচ্ছিল।.. তার কেবলি ভয় হচ্ছিল, বলামাত্রই না জানি কী একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

সুদর্শনের বাবার কাছে ঠিক সেই একই কারণে সে গিয়ে উঠতে পারছিল না। শুধু ভয় নয়, তাঁর কাছে লজ্জাও করছিল। মনে হচ্ছিল, এখন যাওয়া মানেই নিজের বিয়ের তদারক। ভাবছিল, তার চেয়ে যার আসবার সে আসুক, যার বলবার সে-ই বলুক।

এই রকম একটা বিশ্রী পরিস্থিতির জন্য তার মাস্টারমশায়ের কাছেও যাওয়া হচ্ছিল না।

কিন্তু যেতেই তিনি বললেন, 'তা হলো সুদিন সমাগত? অ্যাঁ?'

এই প্রশ্নে অঞ্জলি চমকে উঠেছিলো।

সে ভেবেছিলো, যে করে হোক তার আসন্ন বিবাহের প্রস্তাবটা বোধ হয় কানে গেছে মাস্টার মশায়ের।

লাল হয়ে উঠে সে তো তো করে বলেছিলো, 'কার কাছে শুনলেন?'

'কিছুই কি আর জানতে বাকী থাকে?'

অঞ্জলি অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত ভঙ্গিতে চুপ করে রইলো।

তিনি বললেন, থাক, তবু ভালো সীতেশ তার মনের ঢাকনাটা একটু খুলেছে।'

'সীতেশদা!'

'তাহলে আমি এতোদিন যা বলেছি এখন আর তুমি তা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবে না?'

'কী বলছেন আপনি? আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তাতো কোনোদিনই পার না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও পারবে না। কিন্তু তোমার এই ভান আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

ভান? কিসের ভান?'

'আমাকে লুকিয়ে তোমার দ্বিতীয় জীবনের ভান।'

'দ্বিতীয় জীবনের ভান?'

'আমাকে তুমি মান্য করো কিনা?'

'নিশ্চয়ই করি, কিন্তু—'

'যদি মান্য করে থাক তা-হলে একথাটাও মান্য করতে হবে, তোমার চলাফেরা মেলামেশা ইত্যাদি বিষয়ে আমি আমার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী যা বলবো, তাই তুমি করবে।'

অঞ্জলির মুখ শক্ত হলো, বললো, 'আপনি আমার গুরুজন, শ্রদ্ধেয়, আপনি প্রয়োজন বোধ করলে নিশ্চয়ই শাসন করবেন, সুবুদ্ধি দেবেন, কিন্তু তারপরেও প্রত্যেক মানুষের কিছু কিছু ব্যক্তিগত বিষয় থাকে যেখানে কোনো মানুষেরই হস্তক্ষেপ শোভন নয়।'

'তোমার বিষয়ে আমার সব ব্যবহারই শোভন, সমস্ত অধিকারই গ্রহণযোগ্য।'

'এটা আপনি ঠিক বলছেন না।'

মাস্টারমশায় ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ভেজানো দরজার ছিটকিনিটা নিঃশব্দে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে আসতে বললেন, 'আজ সাত দিন আমার কাজের লোক নেই, মরে গেলেও এক গ্লাস জল দেবার কেউ নেই, তুমি আসনি কেন?'

এবার মাস্টার মশায়ের রাগের কারণটা বুঝে নম্র হলো অঞ্জলি। ক্ষমাপ্রার্থীর গলায় বললো, 'বাড়িতে সকলেরই অসুখ বিসুখ, আমার কলেজ থেকে ফিরে গিয়ে আর বেরুনো হয়নি।'

'তোমার বাড়ির অসুখ বিসুখ নিয়ে তুমি এতো বিব্রত হতে পার, আর আমার অসুখ নিয়ে তোমার চিন্তা হয় না কেন?'

'আমি জানতাম না।' অঞ্জলি ব্যস্ত

হয়ে উঠলো, 'কী অসুখ করেছে আপনার? কলেজে যাননি?'

'ও, তাও তুমি লক্ষ করোনি?'

'বিষ্যুৎবার আমার অফ ডে ছিলো, শুক্রবার দিন আপনার ক্লাস ছিলো না—আর শনিবার—'

'থাক কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।' ঘন ঘন পা ফেলে ঘরের ঐটুকু পরিসরে ঢোলা ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ বিরক্ত হায়নার মতো হাঁটছিলেন।

অঞ্জলি বললো, 'নকুল এখনো দেশ থেকে আসেনি?'

নকুল মাস্টারমশায়ের ছোকরা ভৃত্য।

গম্ভীরভাবে মাস্টার মশায় বললেন, 'না।'

'আপনি কী খাবেন বলুন, আমি করে রেখে যাবো। চা করে দেব?'

'না।'

'এ কয়দিন—'

'সে সব কথা থাক। মাস্টারমশায় দূরে একটা চেয়ারে বসলেন, 'তুমি কি জান, এই মুহূর্তে সীতেশই আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী?'

'কী!'

'এবং আমার সমস্ত অভিপ্রায়ের অন্তরায়?'

'কী অভিপ্রায়?'

'এবং সীতেশের চিঠি পেয়ে আমি রীতিমতো বিচলিত?'

'কী লিখেছে সীতেশদা?'

'সে আমার জীবনের মূলসূত্র টেনে ধরেছে আজ।'

'সীতেশদা আপনাকে নিজের পিতার মতো ভালোবাসেন, আমি জানি, জানত সে আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।'

'এসব ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রেও বিরোধ ঘটে।'

অঞ্জলি থমকে রইলো।

মাস্টারমশায় বললেন, 'আর কিছুদিনের মধ্যেই সে ফিরে আসছে, আমি মনে করি, তার আগেই আমার যা জানাবার তা আমি তোমাকে জানাবো।'

এতোক্ষণ পরে চুরুটের কথা মনে পড়লো তাঁর, 'এখন দেহমনের এই উত্তেজিত অবস্থাতেই হয়তো বলা সহজ হবে।'

চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন, 'শোনো, বিছানায় শুয়ে তিন দিন ধরে আমি সব কথা সাজিয়েছি। নিজের মনের ছায়া আমি সম্পূর্ণ ধরতে পেরেছি, সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করেছি নিজেকে। এবং এ কথাও বুঝতে পেরেছি, অধিক অপেক্ষায় আর কোনো ফল-লাভের আশা নেই আমার। অথচ প্রহসনটা দ্যাখো, প্রথমে ভেবেছিলম, তোমাকে আমি সুখী করতে পারবো, সৌভাগ্যবতী করতে পারবো, তোমার সব আঘাত, সব দুঃখ আমি আমার ত্যাগের দ্বারা নিরসন করে তোমার কাছে মানুষ থেকে দেবতায় আসনে উত্তীর্ণ হবো।'

একটা বোঝা না বোঝার তরঙ্গের মধ্যে দোল খাচ্ছিলো অঞ্জলি, সে নির্বাক বিস্ময়ে কথা শুনেছিলো মাস্টারমশায়ের, সহসা ভীতস্বরে বললো, 'আমি বরং আপনার খাবার ব্যবস্থাটা করে দিয়ে যাই—' সে উঠেছিলো, ডক্টর সরকার বাতাসে হস্ত-সঞ্চালন করে তাকে বসতে বললেন। বললেন, 'কিছু দরকার নেই। ওটা তো সারাজীবনই আছে, কিন্তু উপযুক্ত মুহূর্ত সর্বদা আসে না।'

অঞ্জলি আবার বসলো।

চুরুটটা কামড়ালেন তিনি, 'বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোটো। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই জান, একটা বয়েস পেরিয়ে গেলে, অন্তত মেয়েরা তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে ওঠে, সব বয়সের পুরুষের সমকক্ষ হয়ে যায়? স্বীকার কর কিনা?'

অঞ্জলি মাথা হেলালো।

'আমি তোমাকে সেই বয়েসটাতে পৌঁছুতে দেবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'অপেক্ষা?'

'হ্যাঁ অপেক্ষা। আমি তোমাকে আমার সঙ্গ দিয়ে সান্নিধ্য দিয়ে, আর্থিক পরমার্থিক সমস্ত রকম সাহায্য দিয়ে আমার বন্ধু হবার,
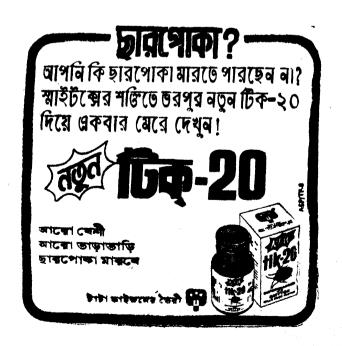
সুশ্রী হবার, যোগ্য করে তুলে নিতে চেয়েছিলাম, কেননা, তোমার মধ্যে আমি শুধু দেহের সৌন্দর্যই নয়, মানসিক সম্ভাবনাও দেখেছিলাম। তুমি যে পরিবেশ থেকে এসেছিলে সেই পরিবেশের কোনো চিহ্ন তোমার মধ্যে ছিলো না। তুমি ছিলে ঠিক হাঁসের মতো, তোমার সাদাশরীরে কোনো ময়লাই ধরবার নয়। প্রথম দর্শনেই আমি সোনাকে সোনা বলে চিনতে পেরেছিলাম।'

কাঁদো কাঁদো হয়ে অঞ্জলি বললো, 'সীতেশদা আপনাকে কী লিখেছে? কেন আপনি আমাকে এসব কথা বলছেন?'

'সেই সোনা ঘষে মেজে তুলতে তুলতেই আমি বুঝে ফেলেছিলাম, আমার আগেই তুমি আর এক জহুরির হাতে পড়ে গেছ। এবং সে সীতেশ।

'মাস্টারমশায়' চোখ মুখ লাল করলো অঞ্জলি, 'আজ আমারও তাহলে কয়েকটা কথা আপনাকে জানানো দরকার। আমি বোকা নই, হয়তো বা কিছুটা সাংসারিক জ্ঞানের অভাবে অনেক কথা বুঝতে আমার দেরি হয়। কিন্তু আপনি যে আমার আর সীতেশদার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, সেটা আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস না করবার দরুন, সেই বোঝাটাকে গুরুত্ব দিইনি কোনো, তাছাড়া একথা আমি যতোবার সীতেশদাকে বলতে গেছি—'

'ও, এ নিয়ে সীতেশের সঙ্গে তোমার কথাবার্তাও হয়েছে?'

'সীতেশদাকে না জানিয়ে আমি একটি পা ফেলিনি কোনোদিন।'

'উঃ' মাথা ঝোঁকে কপাল টিপলেন তিনি 'অঞ্জলি, আমি এমনিতেই অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি, আমার মধ্যে আর তুমি আগুন জ্বালিও না। আমার ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল, সেখানে আমার কোনো ক্ষমা নেই, বিচার নেই, বিবেচনা নেই একটি চুল পরিমাণ বাধাও সেখানে গণ্য করতে পারবো না।'

'মাস্টারমশায়!'

'তুমি সত্য করে বলো, তুমি কি সীতেশকে ভালোবাসো? তুমি কি তাকেই বিবাহ করতে উৎসুক নও?'

প্রায় বজ্রপতনের মতো চমকে উঠলো অঞ্জলি। মাস্টারমশায়ের কথাবার্তা অবোধ্য মনে হচ্ছিলো, সন্দেহটা স্পষ্ট ছিলো, কিন্তু তিনি তার চিন্তাটাকে অতদূরে নিয়ে গেছেন এটাই অঞ্জলি কল্পনা করতে পারেনি।

চুপ করে থেকে অনেক পরে বললো, 'আমি এবার যাই।'

'না।' মাস্টারমশায় বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিলেন, 'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি।'

'আমি পরে আসবো।'

'হয়তো তখন বলতে পারবো না। মানুষ তার ভদ্রতা সভ্যতার খোলসে অভ্যস্ত,

আজ যখন সেটা আমাকে মুক্তি দিয়েছে, আজই আমার দিন। কিন্তু তার আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও।'

'কী কথার?'

পকেট থেকে বিলিতি ডাক টিকিটের ছাপমারা একটা নীল খাম তিনি ছুঁড়ে দিলেন অঞ্জলির কোলের উপর।

অঞ্জলি প্রথমে ভাবলো, এ চিঠি সে পড়বে না, মাস্টারমশায়ের কোনো কথার জবাবও সে দেবে না এবং চলে যাবে এই মুহূর্তে।

কিন্তু চিঠি পড়ার কৌতূহল সে সামলাতে পারলো না। যে চিঠি পড়ে মাস্টার মশায় আজ এমন উন্মাদের মতো ব্যবহার করছেন সে কথাগুলো কী, সেটা জানার জন্য অদম্য ইচ্ছে হলো তার। সে চিঠিটা খুলে ধরলো চোখের তলায়।

অনেক কথার পরে শেষের দিকে লিখেছে, 'আমার একটা পরীক্ষা আছে সামনে, সেটা শেষ করে মাস কয়েকের মধ্যেই চলে আসছি। একটা কথা আপনাকে আমার জানানো হয়নি, আমি আসার আগেই আমার বিয়ে ঠিক করে এসেছিলাম, ফিরে গিয়ে সেটা সম্পন্ন হবে। আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। আপনার কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। অঞ্জলিকে আমি সব সময়ে লিখি, তোমার আমার জীবন মাস্টারমশায়ের দানেই উজ্জ্বল। আমরা যেন কখনো তা ভুলে না যাই।

চিঠি পড়ে অঞ্জলি হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারলো না। ঘরটা নিশ্চুপ ছিলো। কোনো দিক থেকে কোনো আওয়াজ আসছিলো না, সমস্ত ছাদজোড়া, কোণের দিকের এই এক ফোঁটা ফ্ল্যাটটাকে একটা নির্জন দ্বীপের মতো মনে হচ্ছিলো। মাস্টার মশায় উগ্র চোখে তাকিয়েছিলেন তার দিকে।

নিঃশ্বাস নিয়ে অঞ্জলি বললো, 'সীতেশদার [illegible]ে, সে তার সহকর্মিণী।'

'কী!'

'দিল্লির আপিসে কাজ করছে।'

'আর তুমি?'

'আমি কোথায় তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।' চিঠিটা ভাঁজ করলো সে। দৃঢ়-পায়ে উঠে দাঁড়ালো।

'ও!' গলা নরম হলো তৎক্ষণাৎ, 'তাহলে একটা ভীষণ ভুল হয়েছিলো আমার। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।'

অঞ্জলি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তিনি সেদিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, 'তাহলে বলে যাও, আর কোনো বাধা নেই?'

অঞ্জলি জানালা দিয়ে মস্ত ছাদের একা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'কিসের বাধা?'

মাস্টারমশায় বললেন, 'মিলনের।'

'মিলনের!'

'অবাক হচ্ছো কেন? এতোক্ষণ ধরে তাহলে কী শুনলে তুমি?'

'এসব কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'না পারবার কারণ নেই কোনো।'

এতোদিনের এতো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরেও শান্ত শক্ত বয়স্ক এই বিদ্বান প্রফেসারটিকে ভীষণ ভয় পেলো অঞ্জলি। আর্তস্বরে বললো, 'আমাকে যেতে দিন।'

'না।'

'আপনি সরুন, আমি যাবো।'

'না।'

'রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'যাক।'

'আপনি জানেন, বাড়িতে আমাকে বকুনি খেতে হবে।'

'কে বকবে? আমি ছাড়া অত স্পর্ধা আর কার আছে?'

'মাস্টারমশায়—'

'শোনো।'

'বলুন।' কেঁপে গেল গলা।

'কোথায় তুমি যেতে চাও?'

'আমি বাড়ি যাবো না?'

'এটাও কি তোমার বাড়ি নয়?'

অঞ্জলি ভীত দৃষ্টিতে ছিটকিনি আঁটা দরজাটার দিকে তাকালো. মাস্টার মশায়কে তার পাগল ব'লে মনে হচ্ছিল।

মাস্টার মশায় হাসলেন. দরজাটা সম্পূর্ণ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে ঘোষের মত বলে উঠলেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'খুখী!'

'আমি তোমাকে চচাই।'

'[illegible] সরকার—'

'[illegible] আমি তোমাকে বিয়ে করবো। তুমি হবে আমার সহধর্মিণী, আমার সখী, আমার সর্বস্ব। তুমি এখন সেই বয়সে

জিতুন!
–আর দুজনে
বিনা খরচায়
মহানন্দে
ইউরোপে
ছুটি কাটান!

প্রথম পুরস্কার: দুজনের দুসপ্তাহ ব্যাপি ইউরোপে ছুটি যাপন (অথবা নগদ ২০,০০০ টাকা)

দ্বিতীয় পুরস্কার: দুজনের ১০ দিন ব্যাপি কাশ্মীরে ছুটিযাপন (অথবা নগদ ৪,০০০ টাকা)

তৃতীয় পুরস্কার: লেনার্ড রেফ্রিজারেটর (২৮৩ লিটার)

চতুর্থ পুরস্কার: কসমিক্ কম্বো স্টিরিও এম্‌প্লিগ্রাম

পঞ্চম পুরস্কার: গোদরেজ স্টোরওয়েল

২০০টি সান্ত্বনা পুরস্কার: বাজাজ পপ-আপ টোস্টার

NIVEA
creme

স্মিথ অ্যাণ্ড নেফিউ'-এর
এক উৎপাদন

স্মিথ অ্যাণ্ড নেফিউ (ওভারসীজ) লিমিটেডের অতিথি হিসাবে দুই সপ্তাহের জন্ত ইউরোপে ছুটি যাপনের এই তো মস্ত সুযোগ! আপনাকে কেবলমাত্র, প্রবেশপত্রে প্রদত্ত ছয়টি ছবির সঙ্গে ছয়টি উক্তি যথাযথভাবে মেলাতে হবে এবং "আমি নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করি কারণ..." এই বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে হবে, কিন্তু দশটির বেশী শব্দ যোগ করতে পারবেন না।
আজই যোগ দিন!

তাড়াতাড়ি করুন! প্রবেশপত্র ১৯৭০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছানো চাই।

প্রতিযোগিতার পূর্ণ বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্ত আপনার নিভিয়া ডীলারের কাছথেকে প্রবেশপত্র চেয়ে নিন!

AIYARS-JLM 50 BN

পৌঁছেছে, যে বসন্তের জন্য এতদিন ধৈর্য ধ'রে এত অপেক্ষা আমার।'

'না, না, না।'

'আমি অনুপমও নই।'

'আপনি আমার বাবার মত। আমি আপনাকে—'

'স্বামীও মেয়েদের পক্ষে এক ধরনের বাবা, দু'জনই প্রোটেকশন দেয়—'

'না, না—'

'আমি দু' বছর ধরে প্রতীক্ষায় আছি।

'কিন্তু—'

'না অঞ্জলি, আর কোনো কিছুরই স্থান নেই এখানে।'

'হয় না, হয় না—' ভয়ে দুঃখে দুই চোখে সে ঝাপসা দেখছিল।

মাস্টারমশায়ের চোয়াল শক্ত হ'ল, বললেন, 'আমি আট শো টাকা মাইনে পাই, আমি সজ্জন, আমি—'

'আপনার অনেক গুণ, আপনি কৃতী, দাতা, আপনার করুণার সীমা নেই, আমাকে দয়া করুন, আমাকে যেতে দিন।'

'হ্যাঁ যাবে, কিন্তু বলে যাও কোথায় তোমার আপত্তি।'

দুর্ভাগ্যেরও যেমন সীমা ছিল না, এখন ভাগ্যেরও কোনো মূল্যজ্ঞান দেখতে পেল না অঞ্জলি। এই স্বল্পবাক ধৃতিমান ব্যক্তিটি তার পাণিপ্রার্থী— এ কি ভাগ্য নয়? ভালোবাসার এই প্রাবল্য এ কি ভাগ্য নয়? অথচ যে হতভাগিনী গ্রহণ করবে, সেই যে এ ক্ষেত্রে কত অসহায় তারও তো কোনো সীমা নেই?

অঞ্জলি ঢোঁক গিলল। ভেবে পেল না কী জবাব দেবে এই প্রশ্নের।

মাস্টারমশায় নিজেই বললেন, 'বয়েস?' স্থির চোখে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন, 'মানুষের বয়েস বছর গণনা ক'রে নির্ণয় ক'রো না, বয়েস মানুষের স্বাস্থ্যে স্বভাবে প্রাণপ্রাচুর্যে। আমার শক্তি একজন পঁচিশ থেকে ত্রিরিশ বছরের যুবকের মত। আমি উনিশ বছর বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় এক আত্মীয় মেয়েকে বিবাহ করেছিলাম, পাঁচ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, আমি যখন চব্বিশে পেঁছলাম, তিনি তখন অনন্তধামে পৌঁছলেন। একটি কন্যাসন্তান জন্মেছিল, বেঁচে থাকলে হয়তো তোমারই বয়সী হ'তো, কেননা আমার সন্তানের সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান মাত্রই কুড়ি বছরের ছিল। তারপর সেই চব্বিশ বছর বয়েস থেকে এই বেয়াল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত আমি একজন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছি। আমি কখনও দ্বিতীয় মেয়ে বিবাহ করবার কথা চিন্তা করিনি, কখনও কোনো স্ত্রীলোকের দ্বারা শরাহত হইনি। সুতরাং আমার বয়েস নিয়ে তুমি ভেবো না। আর তোমার কিসের দ্বিধা?'

অনেক নিপীড়ন সহ্য ক'রে অঞ্জলি বড় হয়েছে, অনেক নিঃশব্দ যুদ্ধে সে জয়ী হয়েছে, সে ভীতু নয়, স্তিমিত নয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার সব শক্তিই যেন দরজা খুলে পরিত্যাগ করল তাকে, সে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে ভাবল, পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ছিটকিনিটা খুলে [illegible] পালিয়ে যাবে কিনা। এবং পালাবার দ্রুততম উপায়টা কী?

শুধু তো ঘরের ছিটকিনিই নয়, ছাদ পেরিয়ে বেরুবার মুখের দরজাটাও তো বন্ধ। তারপরে খাড়া খাড়া অন্ধকার সিঁড়ি। তিনতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে একতলা, এতদূর পর্যন্ত একই রকম নীরব নির্জন। যার যার ফ্ল্যাট সে সে বন্ধ ক'রে রাখে, বেরুবার সময় শুধু ফাঁক হয়, তারপর আবার বন্ধ। যেহেতু সিঁড়িটা রাস্তা থেকে উঠেছে, সকলেই [illegible] বুঝি সর্বদাই সমাগত। সবাই নিরাপত্তার ভয়ে সাবধান।

'বলো', মাস্টার মশায় হাত ধ'রে তাকে সবেগে বসিয়ে দিলেন, 'বলো, তোমার আপত্তিটা তবে কোথায়?'

ঝাঁকানি খেয়ে নিজেকে ফিরে পেল অঞ্জলি, স্পষ্ট গলায় বলল, 'বিবাহের শুধু সেইটাই একমাত্র শর্ত নয়, অথবা সেইটাই সবচেয়ে গৌণ। আমি আপনাকে অন্যভাবে দেখেছি, অন্যভাবে ভেবেছি, আমার পক্ষে সেই সম্পর্কের তারতম্য ঘটানো অসম্ভব। আপনি আমার গুরুজন, পিতৃতুল্য—'

'না না!' গর্জন ক'রে উঠলেন তিনি, 'তোমার অবস্থার মেয়ের পক্ষে আমাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ শুধুমাত্র এটাই হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না। তুমি আমার কাছে সত্য কথা বলছ না কেন?'

'সত্য কথা?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার কাছে সেটাই আশা করি।'

'আমি—আমি—'

'মাস্টার মশায় সনিশ্বাসে বললেন, 'তুমি কী? তুমি কী?'

'আমি আর একজনের কাছে প্রতিশ্রুত।'

মাস্টার মশায়ের গলায় হাহাকার উঠল, 'প্রতিশ্রুত! সে কে?'

'আপনি তাকে চিনবেন না।'

'সতীশ?'

'না।'

'তবে?'

'সে অন্য একজন।'

'সে প্রতিশ্রুতি তুমি ভেঙে দাও।' গলা মুহূর্তে পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল।

অঞ্জলি দু' হাতে মুখ ঢেকে বলল, 'সে হয় না।'

'হয়। হয়। হতেই হবে।' মাস্টার মশায় ছটফট করলেন।

'আমি তাকে ভালোবাসি।' মুখ থেকে হাত সরালো অঞ্জলি, নত হ'য়ে বলল, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

'ক্ষমা!' অসহ্য ঘামতে লাগলেন তিনি 'আমি তো তোমাকে বলেছি, আমার ভালোবাসায় কোনো ক্ষমা নেই। যা আমি চাই তা আমি চাই।'

'আমাকে ছেড়ে দিন।'

'তাহলে আমি [illegible] ভেঙে গেলে ও আমি হাত তুলে [illegible]।'

'মাস্টার মশায়, আমি আপনার পায়ে পড়ি—'

'আমার ভালোবাসা ভীষণ, সর্বগ্রাসী। আমার [illegible] বুদ্ধিপ্রবৃত্তি আমি শুধু সেখানেই [illegible]। আমি তোমাকে প্রথম [illegible] থেকেই মনোনীত করেছিলাম, আমার স্ত্রী [illegible] পরে সেই প্রথম আমি ঠিক সেই দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। তোমার দিকে যে দৃষ্টি শুধু অনুরাধাই চিনেছিল। আমি অনুরাধাকে মনে রেখেছিলাম, তুমি তাকে ভুলিয়ে দিয়েছ। আমাকে তুমিই শূন্য করেছ, এখন তুমি আমাকে কোথায় ফেলে রেখে যাবে?'

অঞ্জলি ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, আমরা দুজনেই দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতি। আমাকে আপনি দয়া করুন।'

মাস্টারমশায় চোয়াল চেপে অনেকক্ষণ ধ'রে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন, তারপর দরজার সম্মুখ থেকে সরে গিয়ে জানালার দিকে হাত রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'তবে যাও।'

দরজা পর্যন্ত এসেছিল অঞ্জলি, হাত ও রেখেছিল ছিটকিনিতে।

'অসম্ভব। অসম্ভব।' বিদ্যুতের মত ছিটকে এসে তিনি ছিনিয়ে নিলেন তাকে।

অঞ্জলির গলা থেকে একটা ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল, হাতের পাতায় চাপা দিয়ে তিনি তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে এনে বিছানায় ফেললেন, গমগমে গলায় বললেন, 'আমি পুরুষ, আমি কেন পরাজিত হবো? যা আমার, অবধারিত-ভাবে আমার, তাকে গ্রহণ করতে আমার কিসের লজ্জা? কিসের ভয়? কিসের বিবেক? চেঁচিও না, হাত পা ছুঁড়ো না, শুধু দ্যাখো, কাকে ভালোবাসা বলে, কাকে যৌবন বলে, এবং সেই যৌবন আমি কীভাবে রক্ষা করেছি।'

তাঁর ঘামের স্রোত তার সারা গা ভাসিয়ে অঞ্জলিকেও সিক্ত করছিল। হয়তো বা শুধু ঘামের স্রোতই নয়, রক্তের স্রোতও ছিল, অঞ্জলি তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত ক'রে তুলছিল।

তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাসে বলছিলেন, 'আমাকে মারো, আরো মারো, আমকে তুমি মেরে ফ্যালো। কিন্তু তুমি দ্যাখো, আমার ভালোবাসা কী ভয়নক, যার প্রচন্ড ক্ষুধা থেকে আমিও মুক্তি পেলাম না। তুমি আমার সব বিকিয়ে দেয়া প্রেম দ্যাখো একবার, যা আমাকে পশুতে পরিণত করেছে। তা নইলে কে কবে আমাকে এমন উত্তাল হ'তে দেখেছে? আমিও তো আমাকে কখনও এই আয়নায় দেখিনি। আমার স্ত্রীও দেখেনি। এমন [illegible] হৃদয় নিয়ে আমি [illegible]। অঞ্জলি, অঞ্জলি, [illegible]

(ক্রমশ)

সন্ন্যাসীর কবিতা

সব কবিই ব্যাপক অর্থে সন্ন্যাসী। সৌন্দর্যজগতের [illegible] অন্বেষাই কবিতা রচনার প্রেরণা।

সব দেশে [illegible] অবলম্বন করেই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি [illegible]। আজ সাহিত্য ধর্মনিরপেক্ষ—[illegible] যাঁরা ধর্মচর্চাকেই অবলম্বন করেছেন তাঁরা অনেকেই সাহিত্য সম্পর্কে উদাসীন।

কবি [illegible] কবিতা আমরা মাঝে মাঝে পড়তে পাই, তিনি একজন আশ্রমবাসী সাধক। শ্রীপরমানন্দ সরস্বতীও একজন ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী এবং কবি। সম্প্রতি তাঁর তিনটি কবিতার বই একসঙ্গে পড়লাম, বেশ ভালো লাগলো।

তাঁর কবিতার বই তিনটির নাম বসন্ত-বহ্নি, কালমৃগয়া এবং আনন্দজাতক। অত্যন্ত সুমুদ্রিত, রুচিস্নিগ্ধ। সুন্দর প্রচ্ছদ-পটগুলিও তাঁর আঁকা। অর্থাৎ শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী একজন উঁচু জাতের শিল্পী ও কবি।

আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে শিল্পচর্যার সঙ্গে ধর্মচর্যার কোনো বিরোধ কখনো দেখানো হয়নি। প্রাচীন ঋষিরা এই ধরা সংসারে কবিদের প্রজাপতির আসন দিয়েছেন। শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী তাঁর একটি গ্রন্থের মুখবন্ধে বেদ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। শ্লোকটি বারবার পড়ার মতন :

চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে।

অর্থাৎ, কাব্য থেকেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি-দেরও অনায়াসেই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ হয়। এর দ্বারাই কাব্যের স্বরূপ নিরূপিত হচ্ছে।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে, একালের অতি তরুণ কবিরাও সেকালের ঋষিদের মতন কবিতার কাছে এতটাই মহিমা দাবি করেন।

শ্রীপরমানন্দ সরস্বতীর কবিতাগুলি নিছক সাধনভজনের সূত্র বা সরল ধর্ম-উপদেশ নয়। সাবলীল আবেগ, সুন্দরের প্রতি অনুরাগ ও সূক্ষ্ম দর্শনই কবিতা-গুলির ভিত্তি। শব্দের ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায় পাকা হাতের রচনা, নিশ্চিত অনেক দিন থেকেই তিনি কবিতা রচনা করছেন—কিন্তু সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রম সম্পর্কে কৌতূহল দেখাতে নেই বলেই সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুললাম না।

আমি ধর্ম সম্পর্কে নির্লিপ্ত। বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রচুর কাব্যরস পাই, সাধুসন্তদের জীবনী পড়তে বিশেষ ভালোবাসি—কিন্তু কোনো ধর্মকে বিশেষভাবে অবলম্বন করার বিন্দুমাত্র স্পৃহা আমার নেই। ঈশ্বর আছেন কিনা—এ সম্পর্কেও কিছুমাত্র কৌতূহল নেই

আমার। ছেলেবেলায় ভূতের ভয় ও ঈশ্বরের বিশ্বাস আমি কৈশোরেই ছেড়ে এসেছি। তবে, কাব্যরসের সন্ধানে যে-কোনো ধর্মসাহিত্য পাঠেই আমার আগ্রহ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা আমার চমৎকার লাগে, 'আমাকে রসে বশে রাখিস মা, শুকনো সন্ন্যাসী করিস না।' এটা শুধু ধর্মীয় সন্ন্যাসী সম্পর্কেই নয়, রাষ্ট্রনেতা বা দার্শনিকদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী শুকনো সন্ন্যাসী নন। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে ধর্মের ব্যাখ্যা কিভাবে আছে, তা বোঝার মতন বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই। আমি কাব্য হিসেবেই পড়েছি, এবং অনেক জায়গাতেই তাঁর কবিতাগুলি মর্মস্পর্শী। এবং সন্ন্যাসী হলেও এই কবি জগৎসংসার সম্পর্কে উদাসীন নন, মানুষের দুঃখ, দেশের অন্নাভাব, রাজপথের মিছিলও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। "কালমৃগয়া" গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক কালের হতাশা, অশান্তি ও যন্ত্রণারই বিশ্লেষণ করেছেন। 'বসন্তবহ্নি' বইতে যৌবন ও ভালোবাসার কবিতাই মুখ্য—বলাই বাহুল্য, এ ভালোবাসা নিছক রক্তমাংসের নয়—যে ভালোবাসার আবেদন সার্বজনীন। বস্তুত, তাঁর কবিতাগুলিতে ভালোবাসার প্রকাশ বড় মধুর। দু একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ভালোবাসা গঙ্গা যমুনা
আমি স্নান সেরে
বসি পূজোয়—
কালীর মত সে
আমার সকল বুকে
পা রেখে দাঁড়ায়।

(বসন্তবহ্নি)

কালমৃগয়া গ্রন্থেও ভালোবাসার নিদর্শন এই রকম :

'আমার এ ভালোবাসা কী যে তার নাম
—আগুন না জলের বিশ্রাম।
ভালোবাসা আলোর প্রতিমা
রক্তমেঘ যন্ত্রণার ঝড়ে
লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বালে অন্ধকার ঘরে।

'আনন্দজাতক' সাধারণভাবে মানবিক চেতনা ও কল্যাণবোধের কবিতা। তাঁর অনেক কবিতারই শব্দ ব্যবহারের আধু-নিকতা ও অভিনবত্ব বিস্ময় জাগায়। 'প্রচণ্ড ভৈরবী' কবিতার অংশ।

রক্তমাখা হৃদয় পেয়েও মন ভিজে না তার
আকাশ হয় তারি কাঁধের আগুনে সংস্কার।
ভাঁড়ারে তার ভোগরান্নার অনেক মসলাপাতি

কবিদের নতুন নতুন [illegible] [illegible]

শ্রীপরমানন্দ সরস্বতীর কবিতাগুলি পড়ে এক ধরনের [illegible] [illegible] আরও কবিতা পড়ার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম।

স্বনির্বাচিত

শান্তনু দাস ও রত্নেশ্বর সরকারের সম্পাদনায় বেরিয়েছে এই নামের একটি কবিতা সংকলন। এমন শোভন সংস্করণের কবিতা সংকলন এদেশে কেন, বিদেশেও তেমন দেখা যায় না, হাতে নিয়ে চমকে যেতে হয়। এতে আছে ৬৬ জন কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী, কবিতা বিষয়ক কিছু প্রশ্নোত্তর—কবিদেরই নির্বাচিত কয়া প্রিয় কবিতা এবং সব কবিদের ফটোগ্রাফ। যেমন দামী কাগজ, তেমনি ঝকঝকে ছাপা ও চোখ ধাঁধানো অঙ্গসজ্জা—সব মিলিয়ে এক এলাহি ব্যাপার। সম্পাদকদ্বয় যে একটা চমকপ্রদ কাজ করেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং বইখানিও নিশ্চিত কবিতা অনুরাগীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মতন। তবে, সব সংকলনের নির্বাচন তালিকা নিয়ে নানারকম তর্ক ওঠে। এই সংকলন সম্পর্কেও উঠবে, হয়তো একটু বেশী করেই উঠবে। এমন কয়েকজনকে বাদ দিয়ে এই ধরনের সংকলন করলে নিশ্চিত অঙ্গহানি হয়। আবার এমন কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাঁদের কবিখ্যাতি বা কবিতার মান সম্পর্কে সন্দেহ জাগে, অন্তত, তাঁদের গ্রহণ করে অন্যদের বাদ দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু, এই পর্যায়ে, কাকে বাদ দিয়ে কাকে কাকে গ্রহণ করা উচিত ছিল—নাম উল্লেখ করে সে রকম আলোচনা করা আমার কাছে অরুচিকর মনে হয়।

ভূমিকা লিখেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আধুনিক কবিতার বইতে সুনীতিকুমার ভূমিকা লিখেছেন—এ তো ভাবাই যায় না। সুনীতিকুমার বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই তিনি পরিতৃপ্ত, অন্য কবিতায় তাঁর প্রয়োজন নেই—তবে আধুনিক কবিতার সম্পর্কে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। মুখবন্ধ লিখেছেন শান্তিনিকেতনের অমিয়কুমার সেন। তবে, এই ধরনের একটি সংকলনের কবিতা সম্পর্কে একটা বিস্তৃত আলোচনা থাকলে মন্দ হতো না—এ কাজে আবু সয়ীদ আইয়ুব হতেন যোগ্যতম ব্যক্তি।

জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সুকান্ত ভট্টাচার্য দিয়ে শুরু। প্রশ্নোত্তরের পাতায় এঁদের প্রকাশিত রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে সম্পাদকদ্বয় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রশ্নগুলির

মধ্যে, সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা, কবির ক্ষেত্রে তার প্রভাব, আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ—এই ধরনের ব্যাপার আছে। প্রশ্নগুলি খানিকটা সাংবাদিক-সুলভ, কবিতা সংকলনে ঠিক মানায় না। অনেকে খুব অভিনিবেশ সহকারে বড় উত্তর দিয়েছেন। অনেকে এড়িয়ে গেছেন বা রসিকতা করেছেন। অনেক কবিই কবিতা সম্পর্কে নিজমুখে কিছু বলতে চান না, চান যে অন্যরা বলুক। কেউ কেউ অবশ্য জীবনটাই একটা দীর্ঘ কবিতা, কিংবা, কবিতার সংগ্রামী ভূমিকা—ইত্যাদি ক্লিশে ব্যবহারে ক্লান্তিহীন।

পূর্ব বাংলায় চারজন কবিও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আরও থাকা উচিত ছিল—কিন্তু যোগাযোগ ও সংগ্রহ করার অসুবিধের কথা সবারই জানা, উদ্যোক্তাদের এজন্য জোর দেওয়া যায় না।

সব মিলিয়ে সংকলনটি বেশ ঝলোমলো। তবু, একটা কথা মনে হবেই। এই বইখানি বড় বেশী চাকচিক্যময়, বড় বেশী অলংকার। এতটা অলংকার যেন কবিতাকে ঠিক মানায় না।

সনাতন পাঠক

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

তথ্য প্রকাশ করলেন গোল্ডেন টোব্যাকো কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ তারিখে নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোল্ডেন টোব্যাকো কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীপ্রতাপ নরসী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত সার।

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি আপনাদের সকলকে আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং গোল্ডেন টোব্যাকো কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি।

আপনারা নিশ্চয় জানেন, এই সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সিগারেট শিল্পের কয়েকটি দিকের প্রতি জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

দু' দিন আগে লুসাকাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে, ঔপনিবেশিকতাবাদ মোটেই কোন মৃত সমস্যা নয়। সব রকম ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। আমি যা করতে যাচ্ছি, তা হলো প্রধানমন্ত্রী যার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, তারই পরিপূরক। আমরা ঔপনিবেশিক যুগের একটি ধ্বংসাবশেষ, যে ধ্বংসাবশেষ চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি।

স্বাধীনতা লাভের তেইশ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতীয় সিগারেট শিল্প বিপুলভাবে ও সম্পূর্ণভাবে একটি বৈদেশিক একচেটিয়ার কর্তৃত্বাধীন, যে বৈদেশিক একচেটিয়া আমাদের পুরাণ-কথিত কালীয়নাগের মত বহুশির, কিন্তু একটি দেহ।

আমি যা করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে বাস্তব ঘটনাবলী — সমস্ত ঘটনা উপস্থাপিত করা এবং চূড়ান্ত বিচারের ভার সংবাদপত্র, জনসাধারণ ও সরকারের বিচার-বিবেচনার উপর অর্পণ করা।

নীতি প্রয়োগ

গত ৩রা আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসাবে আমি দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকদের দুর্যোগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং সরকারের নীচে উল্লিখিত ঘোষিত নীতিগুলো প্রয়োগের দাবী জানিয়েছিলাম :

(১) সিগারেটের জন্য চাহিদার প্রত্যাশিত বৃদ্ধি শতকরা ১০০ ভাগই পূরণ করা হবে ভারতীয় মালিকানাধীন কোম্পানীগুলোর দ্বারা। শিল্প উন্নয়ন, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও কোম্পানী বিষয়াবলীর মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দীন আলী আহমেদ ১০ই মে, ১৯৬৯ তারিখে লোকসভায় বলেছেন, "সরকারের নীতি হচ্ছে, বর্ধিত চাহিদার মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় মালিকানাধীন কার্মগুলোর সিগারেট উৎপাদনে উৎসাহ দান। শতকরা ১০০ ভাগই ভারতীয় মালিকানাধীন এমন কোম্পানী প্রতিষ্ঠায়ও সরকার উৎসাহ দিচ্ছেন। এই জন্য একটি কোম্পানীকে গুজরাট রাজ্যে ফ্যাক্টরী স্থাপনের জন্য লেটার অব্ ইন্টেন্ট দেওয়া হয়েছে।"

(২) মনোপলিজ অ্যাণ্ড রেস্ট্রিক্টিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেজ অ্যাক্টের বিধানাবলী অনুসারে যেসব গ্রুপের ইতোমধ্যেই কর্তৃত্বময়/একচেটিয়া ধরনের সংস্থা রয়েছে, তাদের কাউকেই আর সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হবে না।

(৩) সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির ২৫% পর্যন্ত বেশী উৎপাদন/বহুমুখীকরণের জন্য যে শিথিলতা মঞ্জুর করা হয়েছিল, তা ১৮ই জুলাই, ১৯৭০ তারিখের গেজেট অব্ ইণ্ডিয়ার অতিরিক্ত সংখ্যা, পার্ট-২, সেকশন-৩, সাব-সেকশন (২)-তে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(৪) বৈদেশিক মালিকানাধীন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানটি তাদের সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির অনেক বেশী উৎপাদন করে যাচ্ছে। এই কাজ করা হচ্ছে সরাসরি ইণ্ডাস্ট্রীজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট ভঙ্গ করে এবং তা দেশীয় ক্ষেত্রের (যার শতকরা ৭০ ভাগ ক্যাপাসিটিই অলস হয়ে পড়ে আছে) চরম ক্ষতি করছে (১নং সংযোজনী)।

উৎপাদন ঠেকানো — ত্রুটি সংশোধন

আপনারা জানেন, প্রত্যেক নীতিরই কথার মধ্যে এবং ভাবগত অর্থের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। বৈদেশিক একচেটিয়া যে তার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটির বাইরে উৎপাদন বাড়িয়ে যাচ্ছে তাতেই এটি প্রতীয়মান। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য আমি সিগারেট-শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়ার উৎপাদনে গোঁজ ঢুকিয়ে তা ঠেকাবার দাবী জানিয়েছিলাম, দেশলাই ও সাবানশিল্পে সাফল্যের সঙ্গে যেমন করা হয়েছিল সরকার কর্তৃক। এর ফলে ১৭ বছরে দেশলাই ও সাবানের বাজারে বৈদেশিক একচেটিয়ার অংশ যথাক্রমে ১০০% থেকে হ্রাস পেয়ে ৪৮% এবং ৯০% থেকে হ্রাস পেয়ে ৪০% হয়েছিল।

সিগারেট শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ২০ বছরের মধ্যে বৈদেশিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার ৮০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২৫% হবে। বর্তমানে সিগারেটের বার্ষিক ব্যবহার হচ্ছে ৬০০০০ কোটি। ভারতীয় ক্ষেত্রে এর অংশ হচ্ছে মাত্র ১২০০ কোটি। প্রতি বছর মোট উৎপাদন ৫/৭% বৃদ্ধি পেলে ১৯৯০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ১৯২০০ কোটি সিগারেট। বৈদেশিক একচেটিয়ার উৎপাদন যদি ঠেকানো যায়, তবে তাদের অংশ হবে ২৫% এবং অবশিষ্ট ৭৫% যাবে সম্পূর্ণ ভারতীয় মালিকানাধীন কোম্পানীগুলোর হাতে।

আমি একথাও বলেছিলাম যে, বৈদেশিক একচেটিয়ার উৎপাদনে এই ধরনের গোঁজ বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধমান অপচয় হ্রাস করবে — এই অপচয় প্রতি ১০ বছরে ৩০০% বেড়ে যাচ্ছে — ২নং সংযোজনীতে এর বিস্তারিত বিবরণী দেওয়া হল।

সরকারের প্রতিশ্রুত নীতি প্রয়োগ করার জন্য এগুলো নিতান্তই সরল ও পরিষ্কার দাবী। কিন্তু সরকার যদি তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনা মত বৈদেশিক একচেটিয়াকে ভারতীয় বাজারে তার অতিরিক্ত প্রভাব চালিয়ে যেতে দেবার জন্য এই সব নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন, তবে আমি এখনই আমার দাবী প্রত্যাহার করে নেব এবং সরকারের পরিবর্তিত নীতি মেনে নেব।

তাড়াহুড়ো করে আমার দাবী উত্থাপনের কারণ আমার [illegible] এসেছে বৈদেশিক একচেটিয়ার [illegible]। আপনারা জানেন, আমার বক্তব্যগুলো জানানো হয়েছে [illegible] দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকদের পক্ষ থেকে।

[শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন]

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

একচেটিয়ার হৃদয় পরিবর্তন?

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং লিঃ (পূর্বতন ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো)-এর চেয়ারম্যান হিসাবে মিঃ এ এন হাকসারের যত সব উত্তেজনা, তার কারণ আই সি এম এ গঠন—তাঁর কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন যে, নেটিভরা চঞ্চল হয়ে উঠছে এবং ভারতে তাঁর দুর্গ আক্রান্ত হয়েছে। ৬০ বছর নির্মম শোষণের পর আই টি সি নিজের ভিতর ছোট উদ্যোক্তার জন্য অপরিসীম কারুণ্য আবিষ্কার করতে লাগলেন এবং এই ছোট উদ্যোক্তাকে সকল রকমের সাহায্যের প্রস্তাব দিতে লাগলেন। এই পরিবর্তনকে আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু তা হলেও হৃদয়ের এই পরিবর্তন যাতে আবার না পরিবর্তিত হয়ে যায়, তার নিশ্চিতির জন্য আমি একচেটিয়ার উৎপাদন ঠেকাবার দাবী জানাচ্ছি।

তবু ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর চেয়ারম্যান মিঃ হাকসার গোল্ডেন টোব্যাকো-এর উপর বিষবাক্য প্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছেন। সুতরাং আমি গোল্ডেন টোব্যাকোর পক্ষ থেকে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে সমস্ত অভিযোগের উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের ওপর আক্রমণ-কালে মিঃ হাকসার যেসব বিষয় উত্থাপন করেছেন, তার কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উত্তরের ওপরই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। তাঁর অভিযোগ-গুলোর যথাযথ প্রত্যুত্তর খুব শীগ্‌গিরই সংবাদপত্রে দেওয়া হবে।

আই টি সি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান

দি মনোপলিজ অ্যান্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেজ অ্যাক্ট এক-চেটিয়াকে ব্যাখ্যা করেছে এই বলে যে, কোন প্রতিষ্ঠান একা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে মিলে বাজারের অন্যূন ৫০% নিয়ন্ত্রিত করলে তাই হবে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালের উদ্বর্ত পত্রে দেখা যায় যে, আই টি সি-এর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৪৫ কোটি টাকা, সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে মোট ২৫০ কোটি টাকা বিক্রয়ের এটি হচ্ছে ৬০%। তাছাড়া এর সংগে পারস্পরিকভাবে যুক্ত রয়েছে ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং।

ওয়াজির সুলতান আই টি সি-এর সংগে পারস্পরিকভাবে যুক্ত

এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, আই টি সি এবং ওয়াজির সুলতান পারস্পরিকভাবে যুক্ত কোম্পানি। পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য পরিচালকমণ্ডলী, সাধারণ বিক্রয় ও ক্রয় ব্যবস্থা এবং সহযোগী কোম্পানী-গুলি কর্তৃক বৈদেশিক শেয়ার মালিকানা ছাড়াও তাদের লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোং লিঃ-এর সংগে সাধারণভাবে যুক্ত। নীচে এসবের বিবরণ দেওয়া হল।

পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নের মীমাংসা বিচারপতিদের, যত প্রবীণই তাঁরা হন না কেন, মতামতের মধ্যে পাওয়া যাবে না, যদি তাঁদের চিত্রের কেবল অংশমাত্রই দেওয়া হয়—যেমন মিঃ হাকসার দেবার চেষ্টা করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানী এবং যুক্ত-রাজ্যের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী সিগারেট শিল্পের একটি বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রিত করে। এই দুইটি বৃহদাকার কোম্পানী ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোং লিঃ নামে আর একটি শক্তিশালী যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে—সিগারেটশিল্প যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সেখানে ছাড়া পৃথিবীর ৫৫টি দেশে স্থাপিত তাদের ১৫০টি ফ্যাক্টরীর মারফত সিগারেট শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

আই টি সি এবং ভি এস টি-তে বৈদেশিক শেয়ার মালিকানা এবং তার সংগঠনের বিবরণ শিল্প উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ১৩ই মে ১৯৬৯ তারিখে লোকসভায় দিয়েছেন, তা হ'ল নিম্নোক্ত মত :—

(১) ইম্পিরীয়াল টোব্যাকো কোং অফ ইণ্ডিয়া

লিঃ ইকুইটি মূলধনের পরিমাণ	...	১,৫১৬.০০ লক্ষ টাকা
অনাবাসিক শেয়ার মালিকানা :		
টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ, ইউ কে	...	১,০৩২.১১ " "
টোব্যাকো ইনভেস্টমেন্টস লিঃ, ইউ কে	...	৩৩০.১১ " "
ক্যারেরাস লিঃ, ইউ কে	...	৫০.৭০ " "
অন্যান্য অনাবাসিক শেয়ার মালিকানা	...	১.৭৫ " "
		১,৪১৭.৭৫ " "
বৈদেশিক মালিকানায় শতকরা হার	...	৯৪% (আনুঃ)

(২) ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং লিঃ :

৩০-৯-১৯৬৫ তারিখের হিসাব মত ইকুইটি মূলধনের পরিমাণ	...	১০০.০০ লক্ষ টাকা
অনাবাসিক শেয়ার মালিকানা :		
র‍্যালে ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ, ইউ কে	...	৪৪.১১ " "
টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ, ইউ কে	...	১৫.৬১ " "
টোব্যাকো ইনভেস্টমেন্টস লিঃ, ইউ কে	...	৪.৯৯ " "
ক্যারেরাস লিঃ, ইউ কে	...	০.৮৯ " "
অন্যান্য অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডার	...	২.১২ " "
		৬৭.৭২ " "
বৈদেশিক মালিকানায় শতকরা হার	...	৬৭.৭২%

এতাবৎকাল এই দুটো কোম্পানির কোন-না-কোন সময়ে একই চেয়ারম্যান/ডিরেক্টর ছিল; এ'দের মধ্যে আছেন মিঃ এফ এ কেলেট, মিঃ বি কে নেহরু, মিঃ সি এ বোন্, মিঃ এ এন হাকসার ও মিঃ এস ডি গুপ্ত। কর্মকর্তাদের চাকরিও এই দুটো কোম্পানির মধ্যে বিনিময় হয়।

পারস্পরিক সংযোগের অভিযোগ বিপুলভাবে সমর্থিত হয়, অন্যান্য বিচারকদের অভিমত ছাড়াও তামাক সম্পর্কে পৃথিবীর কয়েকজন অগ্রণী পণ্ডিতের অভিমতেও। লণ্ডনের ওয়ার্ল্ড টোব্যাকো (তামাক শিল্পের আন্তর্জাতিক পত্রিকা) এইরকম যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে :

'বি এ টি'-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ তারিখের সর্বশেষ নিজস্ব বার্ষিক রিপোর্টে বুঝা যায় যে, ওয়াজির সুলতান ও বি এ টি-র মধ্যে নিশ্চয়ই একটি যোগাযোগ আছে। এতে দেখানো হয়েছে, ওয়াজির সুলতানের ৪৭% শেয়ার সুনিশ্চিতভাবে বি এ টি এ-র মালিকানাধীন। "সুনিশ্চিতভাবে" বলছি এই কারণে যে, এই যোগাযোগ পরোক্ষ, ওয়াজির সুলতানের শেয়ারের যে অংশ ভারতের বাইরের মালিকানাধীন তার মালিক এমন একাধিক কোম্পানি যেগুলোতে বি এ টি-এর, আপ দৃষ্টিতে ১০০% নিয়ন্ত্রণাধিকার না থাকলেও, আর্থিক স্বার্থ রয়েছে।

অনুরূপভাবে—এবং পরোক্ষভাবেও, যেসব মালিক কোম্পানি বা কোম্পানিগুলোতে, আমি ধরে নিচ্ছি, বর্তমান সময়ে অ-বি এ টি শেয়ার-হোল্ডার নেই তাদের মারফত আই টি সি যুক্ত আছে বি এ টি এ-র সংগে। কিন্তু আমরা যতদূর সন্ধান পেয়েছি তাতে দেখা যায় ওয়াজির সুলতানে আই টি সি-এর বা আই টি সি-তে ওয়াজির সুলতানের কোন শেয়ার মালিকানা নেই। কাজেই যদিও আই টি সি এবং ওয়াজির সুলতান, বলতে গেলে, পরস্পর ভাই এবং বি এ টি-এর সংগে তাদের সম্পর্ক রয়েছে তবু তারা আর্থিক দিক দিয়ে পারস্পরিক সংযুক্ত বলে মনে হয় না এবং এরকম সম্পর্ক তাদের আছে বলেও আমি শুনিনি। অতীতে এই দুটো কোম্পানির মধ্যে কারিগরী ব্যাপারে সহযোগিতা ছিল; এই সহযোগিতা এখনও আছে কিনা আমি জানি না।"

বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়

বৈদেশিক মুদ্রার বহু প্রচারিত নীতি আর একটি রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা আয় বলে যে ১০ কোটি টাকার দাবি জানানো হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ টাকা হচ্ছে সিগারেট রপ্তানির জন্য আয়, অন্যদিকে ৯.৯৮ কোটি টাকা এসেছে ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপ-মেন্ট কোং লিঃ কর্তৃক পাতা তামাক রপ্তানির মাধ্যমে। এই কোম্পানিটি হচ্ছে একটি ১০০% ব্রিটিশ কোম্পানির একটি শাখা, তাতে রেজিস্টার্ড পর্যন্ত নয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, আই টি সি বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটাচ্ছে এবং এই অপচয় বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে।

আই টি সি যেসব ব্র্যান্ড বিক্রি করে তার মালিকানা বিদেশী

আই টি সি যেসব ব্র্যান্ড তৈরী করে তার কয়েকটি আন্তর্জাতিক। সেগুলো স্বর্ণপদক লাভ করেছে এবং যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত আদি কোম্পানিগুলো যদি রাজি থাকে ও সহযোগিতামূলক হয় তবে

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

এই ব্র্যান্ডগুলো রপ্তানি করাও চলবে। এতে এই কোম্পানিটি রপ্তানির জন্য বাড়তি উৎপাদন করে বছরে ২৫/৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

আই টি সি এমন সব ব্র্যান্ড বিক্রী করে যেগুলোর মালিকানা বিদেশী, যথা ক্যাপস্টান নেভি কাট, সিজার্স, উইলস ৯৯, উইলস নেভি কাট, উইলস ফিল্টার কিং, উইলস গোল্ড ফ্লেক, এমব্যাসি, পাসিং শো, গোল্ড লীফ, ব্রিস্টল, থ্রী ক্যাসলস, বার্কলে, বেয়ার্স স্পেশাল, উইন্ডসর, লেক্স, উডবাইন ইত্যাদি।

দেশীয় ফ্যাক্টরিগুলো লুপ্ত

হাস্যজনক যুক্তির উদাহরণ দিয়ে আই টি সি বলেছেন যে, ভারতীয় বাজারে প্রতি মাসে ৫ কোটি সিগারেটকে ক্ষুদ্রতম আর্থনীতিক কাজকর্ম হিসেবে ধরে নিলে গোটা দশের বেশী প্রস্তুতকারী ইউনিটের জায়গা হতে পারে না। এই নিতান্ত অদ্ভুত ধারণাটি দাঁড় করানো হয়েছে আই টি সি'এর এই যুক্তির সমর্থনে যে, ২০০টি ফ্যাক্টরি যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা সত্য নয়। **যেসব ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের একটি বিস্তৃত তালিকা ৩নং সংযোজনীতে দেওয়া হল। যেসব কোম্পানি বিদেশী একচেটিয়ার সঙ্গে মিশে গেছে, যুক্ত হয়েছে বা ক্রীত হয়েছে তারও একটি তালিকা পৃথকভাবে দেওয়া হল।**

ভারতের দুটি প্রাচীনতম সিগারেট কোম্পানী—আই টি সি থেকেও প্রাচীন—ডি ম্যাক্রোপোলো স্থাপিত হয় ১৮৬৩ সালে এবং ক্রাউন টোব্যাকো স্থাপিত হয় ১৯০০ সালে। প্রত্যেকটিই প্রতি মাসে ৬০ লক্ষ থেকে ১২০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন করে। তারা শুধু যে বেঁচেই আছে তা নয়, মিঃ হাকসারের মতে, তাদের একটি "অত্যন্ত ভাল কাজ করছে।" অবিচলতা যে একটি গুণ তা কিন্তু মিঃ হাকসারের কাছে সমাদর পায়নি।

দেশীয় ইউনিটগুলোর অলস ক্যাপাসিটি

মিঃ হাকসার ৭টি ভারতীয় কোম্পানির কোম্পানিওয়ারি বিশ্লেষণ দিয়েছেন। **মিঃ হাকসারের মতে,** তাদের কাজকর্মের মোট ফলশ্রুতিতে **এটিই প্রতীয়মান হয় যে, দেশীয় ক্ষেত্রে অলস ক্যাপাসিটি রয়েছে এবং তাদের পরিমাণ ১,০০,০০০ লক্ষ থেকে ১,২০,০০০ লক্ষ সিগারেট। বৈদেশিক একচেটিয়ার ৮০,০০০ লক্ষ সিগারেটের বাড়তি উৎপাদনের সঙ্গে এটি তুলনীয়।**

বৈদেশিক মূলধন ভারতীয় সিগারেট বাজারের ৮০% নিয়ন্ত্রিত করে

মিঃ হাকসার এই ঘটনাটি ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে অঙ্কের একটি ধাঁধা সৃষ্টি করেছেন যে, ভারতীয় সিগারেট বাজারের ৮০%-ই বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু **এই ঘটনা ১১ই অগস্ট, ১৯৭০ তারিখে লোকসভায় প্রদত্ত বিবরণীতেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিবরণীটি ৪নং সংযোজনীতে প্রকাশিত হল।**

বৈদেশিক একচেটিয়া ভারতীয় কোম্পানিগুলোর উন্নতি বিঘ্নিত করছে

শত শত কোম্পানি যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সে বিষয়ে মিঃ হাকসার নীরব রয়েছেন, অপরদিকে শতকরা একভাগ মাত্র যে টিকে আছে তারই কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি একথা উল্লেখ করেননি যে, বৈদেশিক একচেটিয়া সত্ত্বেও এবং এই কারণে নয়, এই কোম্পানিগুলো টিকে আছে ও উন্নতিলাভ করেছে।

দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আমি যে আবেদন জানিয়েছিলাম তা জানিয়েছিলাম প্রধানতঃ খুঁড়িয়ে-চলা দেশীয় ইউনিটগুলোর কথা মনে রেখেই এবং নতুন উদ্যোক্তা আকর্ষণের উদ্দেশ্যে। এই আবেদন নিশ্চয়ই গোল্ডেন টোব্যাকোর উপকারের জন্য ছিল না।

আই টি সি প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিয়েছে

মিঃ হাকসার দেশের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য আই টি সি-এর অবদানের কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এই যে দাবি এ শুধু সরকারকেই নস্যাৎ করে দেয়নি, সরাসরি একচেটিয়ার ফলে আই টি সি শিল্পকে যে নিজের কবজায় এনে ফেলেছে তারই স্বীকৃতিও বটে। আই টি সি-এর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বা সহযোগী কোম্পানিগুলো হচ্ছেঃ

(১) ইণ্ডিয়ান লীফ্ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ—তামাক ক্রয় ও বিক্রয়কারী।

(২) মোলিন্স ইণ্ডিয়া লিঃ—সিগারেটের মেসিনারী প্রস্তুতকারী।

(৩) ত্রিবেণী টিস্যুজ লিঃ—সিগারেটের কাগজ প্রস্তুতকারী।

এই কোম্পানীগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে এবং সিগারেট শিল্পে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। আই এল টি ডি-এর বহু কাজকর্ম দেশের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর। এর একটি উদাহরণ, ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো অ্যাসোসিয়েশনের কাছে গুন্টুরের সুবর্ণ টোব্যাকো কোং যে অভিযোগ করেছে তাতেই প্রকাশ। এই কোম্পানীটির অভিযোগ—তামাক ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর বৈদেশিক একচেটিয়ার শোষণ এবং তার ফলে মোট ৮০০টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭২০টিই গত ছয় বৎসরে বাধ্য হয়ে যে বন্ধ হয়ে যায় তারই সম্পর্কে।

রয়ালটির ছদ্মাবরণ

মিঃ হাকসার দাবি করেছেন যে, তাঁর কোম্পানি ট্রেড মার্ক বা ব্র্যান্ড কিংবা কারিগরী কলাকৌশলের জন্য টাকায় বা বৈদেশিক মুদ্রায় রয়ালটি হিসাবে কিছুই দেন না। **আই টি সি-এর উদ্বর্ত পত্রে যা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে এই কথাটি মিথ্যা বলেই প্রতীয়মান। গুডউইল ও ট্রেড মার্কের জন্য ৪,৯০,৩৪,৪৮৭ টাকার মত একটি অঙ্ক মূলধনে পরিণত করা হয়েছে, যা থেকে লাভাংশ হিসাবে ১৩% হারে ৬৫ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রতি বছর অপচয়িত হচ্ছে। অনুরূপ পরিমাণ যে অর্থ রিজার্ভে আছে, তার ওপরই এই মূলধনের টাকা এবং গুডউইলধারীর এই রিজার্ভের টাকা ন্যায়সংগতভাবেই দাবি করতে পারে।**

শেয়ার মালিকানা—আই টি সি বনাম জি টি সি

জি টি সি-এর ২·৪০ কোটি টাকা মূলধনের মাত্র ১৪ জন শেয়ার-হোল্ডার প্রত্যেকের ২০ লক্ষ টাকা রয়েছে—বলে অনেক কথাই বলা হয়েছে এটি হলো সেই প্রবাদের মত—চালুনি বলে ছুঁচকে তোর গায়ে ফুটো **আই টি সি-এর ১৪·১৬ কোটি টাকার শেয়ার ৩টি বড় বিদেশী শেয়ার-হোল্ডারের, সবচেয়ে বড় শেয়ারমালিকানা হচ্ছে ১০·৩২ কোটি টাকার।**

মুনাফা ও সামাজিক দায়িত্ব

জি টি সি গত ১০ বছরে আয়ের ওপর ৯·৫% মুনাফা দেখিয়েছে অপর পক্ষে আই টি সি দেখিয়েছে ৬·৪%। এই অঙ্কটি আই টি সি-এর চেয়ে ৫০% বেশী। কোম্পানিটির একচেটিয়া ধরনের অধিকার বিবেচনা করলে এই অঙ্কটি অবিশ্বাস্য মনে হয়। অবশ্য জি টি সি বিভিন্ন পদ্ধতি, যথা সস্তা দরে তামাক ক্রয় ইত্যাদি মারফত মুনাফার ওপর করের বোঝা হ্রাস করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য ইচ্ছুক ও সহযোগিতামূলক বিদেশী শেয়ারহোল্ডার/সহযোগী/ভ্রাতৃ কোম্পানির আশীর্বাদ পায় না।

ক্রেতাদের অর্থের উপযুক্ত মূল্য প্রদানের প্রশ্নে **এটি প্রমাণিত সত্য যে, ক্রেতারা আই টি সি ব্র্যান্ডের চেয়ে জি টি সি-এর ব্র্যান্ডে তাঁদের অর্থের জন্য ৫০% বেশী মূল্য পেয়ে থাকেন।** অধিকন্তু, **আই টি সি-এর উৎপাদন গত দুই বছরে—১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯—৭%'এরও কম বেড়েছে, অন্যদিকে তাদের মুনাফা বেড়েছে ৭০%। ক্রেতাদের কিছুটা সেবা এবং কিছুটা সামাজিক দায়িত্ব পালনই বটে!**

ঠিক একইভাবে ভি এস টি—**আই টি সি-এর সঙ্গে পারস্পরিকভাবে যুক্ত প্রতিষ্ঠান—এর উৎপাদন ১৯৬৯ সালে নেমে যায়, কিন্তু মুনাফা বেড়ে যায় ৫০%; অথচ মিঃ হাকসার সামাজিক দায়িত্বের কথা বলেন** নিজের ঢাক পিটানোর ব্যাপারে জি টি সি-এর অনীহা আছে। কিন্তু **অবস্থাগতিকে আমাকে এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত করতে হচ্ছে যে, ৫০ জন**

(পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটন

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

টাকা মূল্যের শেয়ার এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার নামে গঠিত একটি বেসরকারী দাতব্য ট্রাস্টের অধিকারে রয়েছে। **জি টি সি-তে এই ১৭% শেয়ার মালিকানা জনসাধারণের মধ্যে দান হিসাবে বণ্টিত হয়েছে। এর সঙ্গে তুলনীয়, আই টি সি'এর ২৫% শেয়ার ভারতীয় জনগণকে দেওয়া হয়েছে ৩০% প্রিমিয়ামে, তাও আবার বোর্ডে কোন প্রতিনিধিত্ব তাদের নেই।**

কুৎসা রটনার কূটকৌশল

এই বিষয়টি লক্ষ্য করে করুণা জাগে যে, সিগারেট শিল্পের গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মিঃ হাকসার বহু ক্ষেত্রেই "আমার যতদূর জানা আছে" বাক্যাংশ জুড়ে দিয়েছেন। এটি অজ্ঞতার একটি সাধারণ স্বীকৃতি, না কুৎসা রচনার কূটকৌশল, আমি তা জানি না।

মিঃ হাকসার যেসব প্রধান বিষয় ভিত্তি করে আমাদের ওপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছেন সেগুলি নিয়েই যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা আমি করবো। বিস্তারিত বিবরণ এবং তুলনা মূলধন, উৎপাদন, মুনাফা, কর, পরিচালনা সম্পর্কিত সংযোজনীতে (**৫নং সংযোজনী**) দেওয়া হয়েছে এবং দুটি কোম্পানির তুলনামূলক অবদান **সংক্ষেপে** প্রকাশ করা হয়। **এই সব বিবরণ ও তুলনা সরকারী দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।**

বৈদেশিক একচেটিয়া দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক-চাষী, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের পক্ষে যে বিরাট, বহুমুখী বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে, আশা করি, সে সম্বন্ধে একটি প্রকৃত ধারণা আমি দিতে পেরেছি।

আমি আপনাদের অনুরোধ করব, সিগারেটের ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নিয়ে আনীত অভিযোগগুলোর যাথার্থ্য সম্পর্কে আপনারা সন্তুষ্ট হয়ে নিন।

মিঃ হাকসার আরও বলেছেন যে, জাতীয় অর্থনীতিতে জি টি সি-এর অবদান অতি নগণ্য। এই বিষয়টি নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্কে রত হতে চাই না। কিন্তু জি টি সি-এর হাতে একটি সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে; সে সম্বন্ধে মিঃ হাকসার নিশ্চয়ই মতি স্থির করে তা অবহিত হবেন। সে সাফল্য আসবে তখনই যখন বৈদেশিক একচেটিয়া কর্তৃক ভারতীয় বাজারের অবিরাম ও অব্যাহত শোষণের যুগের অবসান আমি ঘটাতে পারবো—এবং তা পারবোই। আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের সহযোগিতায় এই সাফল্য লাভ করতে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না।

বিবৃতির শেষাংশে মিঃ হাকসার ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা নিয়ে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালনের সদিচ্ছার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই ঘোষণা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। তিনি সত্যিই যদি এরূপ মনে করে থাকেন তবে আই টি সি-এর বাড়তি উৎপন্ন সিগারেট রপ্তানি করে এবং দেশে বৈদেশিক মুদ্রা এনে দেশের বিরাট সেবাই করবেন।

আমি তাঁকে আই টি সি ও ভি এস টি-এর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের কথা অস্বীকার করা বন্ধ করতে এবং উভয় কোম্পানিরই কাজ-কর্ম মনোপলিজ অ্যাক্টের ভাবগত ও বাক্যগত অর্থের মধ্যে আনবার জন্যও অনুরোধ জানাব। মিঃ হাকসারকে আমি যতদূর জানি তাতে আমি অনুভব করি যে, আই টি সি যদি পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চায় তবে তা তাঁর চেয়ারম্যান থাকা কালেই করতে হবে। আমি তাঁর কাছে এই কামনাই করি।

উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি

সরকারের কাছে সানুনয় ও জরুরী আবেদন জানিয়ে আমার বিবৃতির সমাপ্তি টানছি। দেশীয় সিগারেট-ইউনিটগুলো বিরাটকায় বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে—যে বৈদেশিক মূলধনের ডালপালা সমগ্র শিল্প ও অনুষঙ্গীদের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে—নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম। একচেটিয়ার পদ্ধতি ও কলাকৌশল সব সময় খোলাখুলি নয়। সরকারের উচিত অবিলম্বে সিগারেট শিল্প, বিশেষ করে বৈদেশিক একচেটিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু করা। একমাত্র তা হলেই তাঁরা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক নীতি প্রয়োগে সমর্থ হবেন।

সংক্ষেপে

আই টি সি জাতীয় অর্থনীতির কয়েকটি বিভিন্ন খাতে আই টি সি ও জি টি সি-এর অবদানের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং আমি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আই টি সি-এর বিবরণীর সংশোধন করবো এবং প্রকৃত ঘটনাগুলি সম্পর্কে আমার অভিমত আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করবো। বস্তুতঃপক্ষে অবদানের এই ধরনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী কোন নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃকই রচিত হওয়া উচিত। আমি আশা করি বিচারকদের সংস্থা মনোপলিজ কমিশন কর্তৃক বিশদ তদন্তের দাবি এখন আমরা করবো যাতে জনসাধারণের কাছে সত্য প্রকাশিত হয় এবং সরকার তাঁদের নীতি প্রয়োগের জন্য নির্দ্বিধায় রত হতে পারেন।

কাজকর্ম ও অবদান	গোল্ডেন টোব্যাকো	ইণ্ডিয়া টোব্যাকো
১। ইকুইটিতে ভারতীয় শেয়ার মালিকানার হার ...	১০০	২৫·৩
২। ইকুইটিতে বিদেশী শেয়ার মালিকানার হার ...	নাই	৭৪·৭
৩। মোট বিদেশী শেয়ার মালিকানা ...	নাই	১৪,১৬,০০,০০০,
৪। মোট ভারতীয় শেয়ার মালিকানা ...	২,৮০,০০,০০০,	৪,৭৯,০০,০০০,
৫। ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা ...	১৩/১৪	২১৪৩০
৬। বিদেশী শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা ...	নাই	৩
৭। বিদেশী শেয়ারহোল্ডার পিছু মোট শেয়ার মালিকানা ...	নাই	৪,৭২,০০,০০০,
ভারতীয় শেয়ারহোল্ডার পিছু মোট শেয়ার মালিকানা ...	২০,০০,০০০,	[illegible]১৫,
৮। মুনাফার শতকরা হারে ঘোষিত লাভাংশ ...	৩০%	৭৫%
৯। বৈদেশিক শেয়ারহোল্ডার-গণকে লাভাংশ প্রেরণ ...	নাই	৭৫%
১০। ব্যবসায়ে রক্ষিত মুনাফা	৭০%	২৫%
১১। বোর্ড অব ডিরেক্টর্সে ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারের প্রতিনিধিত্ব ...	১০০%	—২৫%
১২। মনোনীত বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে (পেশাগত ম্যানেজার) বৈদেশিক শেয়ারহোল্ডারের প্রতিনিধিত্ব ...	নাই	১৩৩%
১৩। বাহিরাগত বিদেশী ম্যানেজার ...	নাই	১৭
১৪। ইউনিয়নভুক্ত ক্যাডারদের ভিতর থেকে ম্যানেজার	৯৯%	৩৩%
১৫। কর্মী পিছু মজুরী ...	৬,১০০,	৬,৩৫০,
১৬। ডিরেক্টরদের পারিশ্রমিক	১,৮০,০০০,	১৪,৭২,০০০,
১৭। ডিরেক্টর পিছু পারিশ্রমিক	৬০,০০০,	২,১০,০০০,
১৮। বৈদেশিক মুদ্রার হানি (তামাক বাদে কিন্তু প্রেরিত লাভাংশ সহ) ...	কয়েক লক্ষ	কয়েক কোটি
১৯। মূলধনে পরিণত গুড-উইল ও ট্রেড মার্ক ...	নাই	৪,৯০,৩৪,৪৮৭,
২০। প্রতি বছর লাভাংশ হিসাবে মূলধনে পরিণত গুডউইল বাবদ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ...	নাই	৬৫,০০,০০০,

(পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটন

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

কাজকর্ম ও অবদান	গোল্ডেন টোব্যাকো	ইণ্ডিয়া টোব্যাকো
২১। আমদানী (তামাক সহ)	কম	বেশী
২২। আমদানী প্রতিকল্পে অবদান ...	বেশী	বেশী
২৩। গবেষণা ও উন্নয়নে অবদান	—	—
২৪। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সহায়তা	৫৭টি শিল্প	৪৩টি শিল্প
২৫। ক্রেতার ব্যয়িত প্রতিটি টাকার মূল্য ...	৬৪ পয়সা	৬০ পয়সা
২৬। উৎপাদনে কর্মীদের শ্রেণী বিভাগ ...	দক্ষ	অদক্ষ
২৭। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক	চমৎকার	খারাপ
২৮। আয়ের ওপর সরকারী আয়কর বাবদ রাজস্ব শত-করা হিসাবে ...	৬·৩	৩ ৫
২৯। কৃষি অর্থনীতিতে সাহায্য ...	চাষীদের প্রতি উৎসাহ	চাষীদের শোষণ
৩০। পরিচালনা	ভারতীয়ভাবে অধিকৃত কোম্পানি	বিদেশীভাবে নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি
৩১। আয়ের মোটমাট মুনাফার হার ...	স্বাভাবিক	স্বাভাবিকের চাইতে কম
৩২। ডিরেক্টরগণকে প্রদত্ত দস্তুরি ...	সামান্য	অনেক
৩৩। অনুভূমিক একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ...	নাই	৪০%
৩৪। সিগারেট মেশিনারিতে শীর্ষস্থ একচেটিয়া ...	নাই	১০০%
৩৫। সিগারেটের কাগজ প্রস্তুতে শীর্ষস্থ একচেটিয়া ...	নাই	১০০%
৩৬। বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা	শোভন	অশোভন
৩৭। একচেটিয়া দামের উৎপাদন	এ প্রশ্ন ওঠেই না	অনেক বেশী
৩৮। নিয়ন্ত্রক ...	বম্বে	লণ্ডন
৩৯। শিল্পের প্রতি মনোভাব	সমাজতান্ত্রিকে	সাম্রাজ্যবাদী
৪০। লাইসেন্সপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ ছাড়াই উৎপাদনে বৃদ্ধি	নাই	বেশী
৪১। ব্যবসায়িগণকে কমিশন ইত্যাদি ...	উদার	অপ্রতুল
৪২। তামাক চাষিগণকে কমিশন ইত্যাদি ...	যথেষ্ট	দাম কাটা
৪৩। পরিবার পরিকল্পনায় অবদান ...	কম	সবচেয়ে বেশী
৪৪। দেশের সমৃদ্ধি এবং সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়া প্রভুত্ব থেকে মুক্তির জন্য পরিকল্পনা	বহুরকম	নাই

আমাদের দাবির সমর্থনে সংযোজনীসমূহ

১নং সংযোজনী

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং লিঃ (পূর্বতন ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো) এবং ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং লিঃ, উভয়েই পারস্পরিক সংযুক্ত সংস্থা; উভয়েই তাঁদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনুমোদিত সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির অনেক বেশী সিগারেট উৎপাদন করেন। পক্ষান্তরে অন্য ছয়টি ইউনিটের প্রচুর ক্যাপাসিটি অলস পড়ে আছে। নীচের হিসাবে তা প্রতীয়মান হবে:

		রেজিস্টার্ড সংস্থাপিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটি	১৯৬৭ সালে প্রকৃত উৎপাদন
		(লক্ষ সিগারেটে)	
বৈদেশিক একচেটিয়ার অতিরিক্ত উৎপাদন :			
ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কোং লিঃ, কলিকাতা ...	২,৪২,৪০০	৩৩১২০০	৩৮২১১০
ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং লিঃ, হায়দরাবাদ	৮৮,৮০০		
৭০% অলস ক্যাপাসিটি নিয়ে ছয়টি ভারতীয় সিগারেট কোম্পানি			
ন্যাশনাল টোব্যাকো কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ, কলিকাতা ...	১,৪৪,০০০		
দি ম্যাকেরোপোলো অ্যাণ্ড কোং লিঃ, বম্বে ...	১,০৮০		
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং ইণ্ডিয়া, বম্বে ...	৪,০০০		
ক্রাউন টোব্যাকো কোং, বম্বে ...	১,৮০০	১৬৭৬৮০	৪১৬০০
হায়দরাবাদ-দক্কান সিগারেট ফ্যাক্টরি, হায়দরাবাদ ...	১০,৮০০		
ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো কোং লিঃ, গাজিয়াবাদ ...	৬,০০০		

৩নং সংযোজনী

যে অনেক কয়টি দেশীয় সিগারেট ফ্যাক্টরী বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কয়েকটি

১। ইস্টার্ন টোব্যাকো কোং লিঃ, পোঃ অঃ নৈনি	এলাহাবাদ
২। টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ	অমৃতসর
৩। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সিগারেট কোং	বম্বে
৪। জেমস হিলটন অ্যাণ্ড কোং	বম্বে
৫। ভক্তিদাস অ্যাণ্ড কোং	বম্বে
৬। গোল্ড স্টার টোব্যাকো কোং, বরিভলি	বম্বে
৭। প্রিমিয়ম টোব্যাকো কোং, ভাবেকলা	বম্বে
৮। মগনলাল পরমানন্দ ভুটা	বম্বে
৯। দি প্রভাত টোব্যাকো কোং	বম্বে
১০। ন্যাশনাল সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং	বম্বে
১১। দি নবযুগ টোব্যাকো কোং, আন্ধেরি	বম্বে
১২। নবজীবন টোব্যাকো কোং, আন্ধেরি	বম্বে
১৩। জয়হিন্দ টোব্যাকো কোং	বম্বে
১৪। ভারত টোব্যাকো কোং, আন্ধেরি	বম্বে

(পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটন

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

আমাদের দাবির সমর্থনে সংযোজনীসমূহ

১৫। পাইওনিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল টোব্যাকো ওয়ার্কস	বম্বে
১৬। টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারার্স (ইন্ডিয়া) লিঃ	বম্বে
১৭। জেনিথ টোব্যাকো কোং লিঃ	বম্বে
১৮। অল গোল্ড টোব্যাকো কোং	বম্বে
১৯। সি জন প্রভেন্সিস, চাকলা	বম্বে
২০। ডি এন মাস্টার অ্যান্ড কোং	বম্বে
২১। এ জে গ্রীন (ই), প্যারেল	বম্বে
২২। ডায়মন্ড টোব্যাকো কোং	বম্বে
২৩। সান টোব্যাকো কোং	বম্বে
২৪। প্রধান টোব্যাকো কোং	বম্বে
২৫। আমেরিকান টোব্যাকো করপোরেশন	বম্বে
২৬। খোর্দাভিয়াল টোব্যাকো, বরিভলি	বম্বে
২৭। পি কেলারিনিস, সান্তাক্রুজ	বম্বে
২৮। হনুমান টোব্যাকো কোং, সান্তাক্রুজ	বম্বে
২৯। ভাইব্রাম টোব্যাকো, সান্তাক্রুজ	বম্বে
৩০। স্টার টোব্যাকো কোং	বম্বে
৩১। এস মার্স অ্যান্ড কোং, সান্তাক্রুজ	বম্বে
৩২। ফেডারাল টোব্যাকো কোং	বম্বে
৩৩। ফিনিক্স সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং	বম্বে
৩৪। ওসমানিয়া টোব্যাকো কোং	বম্বে
৩৫। আরাকিটা টোব্যাকো কোং, প্যারেল	বম্বে
৩৬। ফায়ার হ্যান্ড টোব্যাকো কোং	বম্বে
৩৭। গুজরাট টোব্যাকো কোং	বরোদা
৩৮। ভারত টোব্যাকো কোং	বরোদা
৩৯। এম জে টোব্যাকো কোং	বিজনোর
৪০। টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারার্স (ইন্ডিয়া) লিঃ	ব্যাঙ্গালোর
৪১। আমেরিকান টোব্যাকো সিন্ডিকেট	কলিকাতা
৪২। ইউনিয়ন টোব্যাকো কোং লিঃ	কলিকাতা
৪৩। ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো কোং (ইন্ডিয়া) লিঃ	কলিকাতা
৪৪। সকসেনা ব্রাদার্স	কলিকাতা
৪৫। মেপল টোব্যাকো কোং (ইন্ডিয়া) লিঃ	কলিকাতা
৪৬। হিন্দুস্থান টোব্যাকো কোং	কলিকাতা
৪৭। জেমস ক্যান্টারব্যারি লিঃ	কলিকাতা
৪৮। হাংজপোলো অ্যান্ড কোং	কলিকাতা
৪৯। টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারার্স (ইন্ডিয়া) লিঃ	কলিকাতা
৫০। ভার্জিনিয়া সিগারেট কোং	কলিকাতা
৫১। গ্রেট ইস্টার্ন টোব্যাকো কোং	কলিকাতা
৫২। দিল্লী টোব্যাকো কোং	দিল্লী
৫৩। হিন্দুস্তান সিগারেট কোং	দিল্লী
৫৪। মাহরি অ্যান্ড চৌধুরী সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স	দিল্লী
৫৫। আহমেদ টোব্যাকো কোং, দিল্লী এবং হায়দরাবাদ—সিন্ধু	দিল্লী
৫৬। গোয়ালিয়র টোব্যাকো কোং	গোয়ালিয়র
৫৭। প্রধান টোব্যাকো কোং	গোয়ালিয়র
৫৮। সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোং	গোয়ালিয়র
৫৯। ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো কোং অফ ইন্ডিয়া লিঃ	হাওড়া
৬০। ওয়েস্টার্ন টোব্যাকো কোং	হাওড়া
৬১। আপার সিন্ধু টোব্যাকো কোং	হায়দরাবাদ, সিন্ধু
৬২। স্টার টোব্যাকো অ্যান্ড সিগারেট কোং	হায়দরাবাদ
৬৩। জুবিলী সিগারেট ফ্যাক্টরি	হায়দরাবাদ
৬৪। এ এস কৃষ্ণা অ্যান্ড কোং লিঃ	হায়দরাবাদ
৬৫। টুনুগুন্টলা ভেঙ্কটরাও মার্কেন্টাইল টোব্যাকো কোং	হায়দরাবাদ
৬৬। নিজাম সাগর সিগারেট কোং	হায়দরাবাদ
৬৭। ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং	হায়দরাবাদ
৬৮। হক ব্রাদার্স	হায়দরাবাদ
৬৯। হিন্দ টোব্যাকো কোং	হায়দরাবাদ
৭০। স্ট্যান্ডার্ড সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং	জলন্ধর
৭১। শক্কর সিন্ধু টোব্যাকো কোং	করাচি
৭২। ইউনিয়ন টোব্যাকো কোং	লাহোর
৭৩। আজিজ টোব্যাকো কোং	লাহোর
৭৪। ডায়মন্ড জুবিলী টোব্যাকো কোং	লাহোর
৭৫। জি ডি গীয়ার্স	লাহোর
৭৬। সুরী টোব্যাকো কোং	লাহোর
৭৭। সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোং	লশকর (মঃ প্রঃ)
৭৮। ইন্দো ভার্জিনিয়া টোব্যাকো কোং	লখনউ
৭৯। ভাস্কর সিগারেট ফ্যাক্টরি	ম্যাঙ্গালোর
৮০। ইন্ডিয়ান সিগারেট টোব্যাকো ওয়ার্কস	নাদরা
৮১। ডেকান টোব্যাকো ওয়ার্কস	পুণা
৮২। পি আর চৌধরী	পারচুর
৮৩। রাজপুতনা টোব্যাকো ওয়ার্কস, পণ্ডিত প্যালেস, শ্রীপুরা	রাজপুতনা (কোটা রাজ্য)
৮৪। ইউ পি টোব্যাকো কোং	সাহারাণপুর
৮৫। সিলভার টোব্যাকো কোং	শিয়ালকোট
৮৬। সান্দুর টোব্যাকো কোং লিঃ	সান্দুর (মহীশূর)
৮৭। ইউনিভার্সাল টোব্যাকো কোং	শক্কর (সিন্ধু)
৮৮। এল ডেকান অ্যান্ড কোং	শক্কর (সিন্ধু)
৮৯। শঙ্করণপিল্লাই	ত্রিচি
৯০। প্রভাত বিড়ি অ্যান্ড সিগারেট ম্যানুঃ কোং	উমেতা
৯১। কলকনুমা সিগারেট ফ্যাক্টরি	বিজয়বাড়া
৯২। কোচবিহার সিগারেট ফ্যাক্টরি	বিজয়বাড়া
৯৩। আবদুল হক সিগারেট ফ্যাক্টরি	বিজয়বাড়া
৯৪। বেজওয়াড়া সিগারেট ফ্যাক্টরি	বিজয়বাড়া
৯৫। জে বি সন্স	ব্রোচ
৯৬। খিরুমল রাও অ্যান্ড কোং, বোরিং প্যালেস	মহীশূর রাজ্য

বৈদেশিক একচেটিয়া কর্তৃক ক্রীত/উহার সঙ্গে মিশ্রিত/সংযুক্ত সিগারেট ফ্যাক্টরিসমূহ

১। ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং	হায়দরাবাদ
২। এ জে গ্রীন	বম্বে
৩। টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারার্স (ইন্ডিয়া) লিঃ	বম্বে কলিকাতা ও ব্যাঙ্গালোর
৪। হিন্দ টোব্যাকো কোং লিঃ	হায়দরাবাদ
৫। পেনিনসুলার টোব্যাকো কোং লিঃ	বম্বে ও কলিকাতা

(পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

আমাদের দাবির সমর্থনে সংযোজনীসমূহ

৩নং সংযোজনী

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ (একণে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং লিঃ)

(লক্ষ টাকায়)

	বৎসর	বোনাস ইস্যু সহ আদায়ীকৃত মূলধন	গুডউইল	বিক্রয় ও আয়	করের পূর্বে মুনাফা	করের পর নীট মুনাফা	বৈদেশিক শেয়ার মালিকানার শতকরা হার	লাভাংশের আকারে অংশ পাঠানোর মারফত এবং অবশিষ্ট অংশ ভবিষ্যতে পাঠানর জন্য স্বীকৃত দায় হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়
	১৯৫৯	১৫১৬	৪৯০	৩৪৬০	২৮৭	১১৫	৯৩.৪	১০৭ লক্ষ টাকা
	১৯৬৯	১৫১৬	৬৯০	১২৬৪২	৭০৭	৩৫৯	৯৩.৪	৩৩৫ লক্ষ টাকা
বৃদ্ধির শতকরা হার				৩৪৩%	২৪৬%	৩১২%		
পরিকল্পনা সময়	১৯৮০			৪৮৪১৯	১৭৩৯	১১২০	৭৬.০	৮৫১ লক্ষ টাকা

১৯৬৯ ও ১৯৮০ সালের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ওপরে উল্লেখিত মত ৩৩৫ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৮৫১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে, এর গড় হিসাব হল বছরে ৫৯৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৮০ সাল, **এই ১১ বছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হবে আনুমানিক ৬৫২৩ লক্ষ টাকা।**

দি ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং লিঃ

	বৎসর	বোনাস ইস্যু সহ আদায়ীকৃত মূলধন	গুডউইল	বিক্রয় ও আয়	করের পূর্বে মুনাফা	করের পর নীট মুনাফা	বৈদেশিক শেয়ার মালিকানার শতকরা হার	বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়
	১৯৫৯	১২৯.৫৪	৫.৮১	৬০২	৬৯	২৯	৬৭.০	১৯ লক্ষ টাকা
	১৯৬৯	২২৯.৫৪	৫.৮১	৩৩০৯	২০৪	৮২	৬৭.০	৫৫ লক্ষ টাকা
বৃদ্ধির শতকরা হার				৫৫০%	২৯৬%	২৮৩%		
পরিকল্পনা সময়	১৯৮০			১৮২০০	১০৪	২৩২	৬৭.০	১৫৫ লক্ষ টাকা

১৯৬৯ ও ১৯৮০ সালের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ওপরে উল্লেখিত মত ৫৫ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৫৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে, এর গড় হিসাব হল বছরে ১০৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৮০ সাল, **এই ১১ বছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হবে আনুমানিক ১১৫৫ লক্ষ টাকা।**

৪নং সংযোজনী

১১ই আগস্ট, ১৯৭০ তারিখে লোকসভায় উত্তর দেবার জন্য উত্থাপিত তারকাচিহ্নবিহীন ২৩০১নং প্রশ্নের (ক) থেকে (ঘ) অংশের উত্তরে উল্লেখিত বিবরণী

বৎসর	ভারতস্থিত সিগারেট কোম্পানির নাম	মোট উৎপাদন (লক্ষটি)	বিদেশী মালিকানাধীন ও বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন সিগারেট কোম্পানির নাম	বিদেশী মালিকানাধীন ও বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন সিগারেট কোম্পানিগুলোর উৎপাদন (লক্ষটি)
১৯৬০	১। ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং, কলিকাতা		(১) ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং, কলিকাতা	
	২। ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো ম্যানুঃ কোং, হায়দরাবাদ			
	৩। গডফ্রে ফিলিপস, বম্বে			
	৪। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং, বম্বে			
	৫। ন্যাশনাল টোব্যাকো কোং, কলিকাতা		(২) ওয়াজির সুলতান টোব্যাকো কোং, হায়দরাবাদ	
	৬। ডি ম্যাক্রোপোলো, বম্বে			
	৭। মাস্টার্স টোব্যাকো কোং, বম্বে			
	৮। ক্রাউন টোব্যাকো কোং, বম্বে			
	৯। হায়দরাবাদ ডেকান সিগারেট ফ্যাক্টরি, হায়দরাবাদ	৩৬৯৭১০	(৩) গডফ্রে ফিলিপস, বম্বে	২৮১৫০০ ৭০%
	১০। হিন্দ টোব্যাকো কোং, হাদরাবাদ			
	১১। ইউনিয়ন টোব্যাকো কোং, কলিকাতা			
১৯৬৫	ওপরের ক্রঃ নং ১ থেকে ৯-তে উল্লেখিত কোম্পানি	৫৪১৩৩০	—ঐ—	৩৭৪৬৭০ ৬৮%
১৯৬৯	১৯৬০ সালে ক্রঃ নং ১ থেকে ৯-তে উল্লেখিত কোম্পানি এবং ইণ্টারন্যাশনাল টোব্যাকো কোং, গাজিয়াবাদ	৫৯৭১৪০	—ঐ—	৪৬১৩১০ ৮০%

(পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

আমাদের দাবির সমর্থনে সংযোজনীসমূহ

৫নং সংযোজনী

বৈদেশিক একচেটিয়া : কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

১। আই টি সি-এর মোট পরিসম্পদ নিম্নোক্ত মত বেড়ে গেছে **(লক্ষ টাকায়) :**

১৯৫৫	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৭০
২২৬৪	২৮৬৬	২৬৬৮	৪৪৬৩

এখানে উল্লেখ্য যে, **সম্প্রসারণের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সের নিমিত্ত আই টি সি দরখাস্ত না করলেও বা তাঁরা লাইসেন্স না পেলেও তাঁদের মোট পরিসম্পৎ ক্রমান্বয় বেড়ে গেছে।** স্বভাবতঃই আবশ্যক মঞ্জুরী ছাড়াই তাঁরা উৎপাদন বাড়িয়ে গেছেন। **এই কাজ ইন্ডাস্ট্রিজ (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্টের বিরোধী।**

আই টি সি-এর রেজিস্টার্ড সংস্থাপিত ক্যাপাসিটি হচ্ছে বছরে ১৪৩,৬০০ লক্ষ সিগারেট। তবু **তাঁদের প্রকৃত উৎপাদন এখন** ৩০০,০০০ **লক্ষ সিগারেট ছাড়িয়ে গেছে—এবং এই অঙ্ক তাঁদের রেজিস্টার্ড ক্যাপাসিটির অনেক বেশী।** বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করলে এবং লাইসেন্স-প্রাপ্ত ১৪৩,৬০০ লক্ষ ক্যাপাসিটির বাড়তি উৎপাদন রপ্তানির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করে রাখবার জন্য একচেটিয়াকে বাধ্য করলে সরকার সুবিবেচনাপ্রসূত কাজই করবেন।

আই টি সি-এর একচেটিয়া হ্রাস করার জন্য আই ডি আর অ্যাক্ট কেন প্রযুক্ত হবে না তা আমি বুঝতে পারি না। অন্যান্য ক্ষেত্রের অনুরূপ একচেটিয়া একেবারে সম্প্রতি প্রযুক্ত মনোপলিজ অ্যান্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেজ অ্যাক্টের অনেক আগেই সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়েছে। মেটাল বক্স, হিন্দুস্তান লিভার, ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানি, অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানিজ-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অতীতের এইসব একচেটিয়ার কবজা ৯০, ১০০% থেকে কমিয়ে ২০, ৫০% করা হয়েছে।

২। এখন আমরা প্রকৃত ঘটনা জানাচ্ছি :

ইকুইটি মূলধন	**কোটি টাকায়**	**%**	**শেয়ারহোল্ডারের** সংখ্যা
বিদেশী শেয়ারহোল্ডার ...	১৪·১৬	৭৪.৭	৩
ভারতীয় শেয়ারহোল্ডার ...	৪·৭৯	২৫·৩	২১৪৩০

১৪·১৬ কোটি টাকার বৈদেশিক শেয়ারমালিকানার মধ্যে মাত্র একজন বিদেশী শেয়ারহোল্ডারেরই ১০·৩২ **কোটি টাকার, অর্থাৎ** ৭০% **শেয়ার রয়েছে।**

প্রতি শেয়ারহোল্ডারের শেয়ারমালিকানার গড় হিসাব নিম্নরূপ :—
বিদেশী শেয়ারহোল্ডার ১৪,১৬,০০,০০০৲ + ৩ = ৪,৭২,০০,০০০৲ টাকা
ভারতীয় শেয়ারহোল্ডার ৪,৭৯,০০,০০০৲ + ২১৪৩০ = ২,২৩৫৲ টাকা

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানিতে ইকুইটি মালিকানার এই হল ধরন—এই ধরনকেই কোম্পানি প্রচার করেন "জনসাধারণের ব্যাপক অংশ গ্রহণ" বলে—এবং এই নিয়েই কোম্পানিটি নিজের পিঠ চাপড়ায়।

গত ১৩ই মে, ১৯৬৯ তারিখে লোকসভায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট, ইনটার্ন্যাল ট্রেড অ্যান্ড কোম্পানি ল-অ্যাফেয়ার্সের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্রিটিশ শেয়ারমালিকানার হিসাব দিয়েছেন :

	টাকা
টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ, ইউ কে ...	১০,৩২,১৯,০০০৲
টোব্যাকো ইনভেস্টমেন্টস লিঃ, ইউ কে ...	৩,৩০,১১,০০০৲
ক্যারেরাস লিঃ, ইউ কে ...	৫৩,৭০,০০০৲

বোর্ডে ২১৪৩০ জন ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারের কোন প্রতিনিধি নেই; তিনটি ব্রিটিশ শেয়ারহোল্ডার নিয়ে গঠিত গ্রুপের মনোনীতদের নিয়েই এই বোর্ড সম্পূর্ণরূপে গঠিত।

গোল্ডেন টোব্যাকো এইসব ঘটনা জনসাধারণের গোচরে আনতে সংকোচ বোধ করছেন......কারণ, মাত্র ১৪ জন শেয়ারহোল্ডার নিয়ে গঠিত একটি প্রাইভেট্ লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে তাঁর মর্যাদা সম্প্রতি ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি কর্তৃক উপহাসের সামগ্রী করে তোলা হয়েছে......অথচ প্রসঙ্গতঃ কতকগুলি প্রধান বিষয় উপেক্ষা করা হয়েছে।

গোল্ডেন টোব্যাকো যে কর দেয় তা ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর প্রদত্ত করের চেয়ে ৮০% বেশী; আয়ের শতকরা হিসাবে তা দাঁড়ায় সংক্ষেপে ৩·৫%এর তুলনায় ৬·৩%......এবং গোল্ডেন টোব্যাকোর ১৭% শেয়ারের মালিক এমন একটি জনহিতকর দাতব্য ট্রাস্ট যেটি গঠিত হয়েছে এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার নামে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক।

উৎপাদন ও মুনাফা

	বৎসর	সর্বভারতীয় উৎপাদন	বৈদেশিক ক্ষেত্রের উৎপাদন (লক্ষটি)	বৈদেশিক ক্ষেত্রের শতকরা হার	আই টি সি-এর মুনাফা (লক্ষ টাকায়)
(ক)	১৯৫৯	৩২১৬৬০	২৪৪৫০০	৭৬%	২৮৭
	১৯৬৬	৪৬১৯৬০	৩২৭৯০০	৭০%	২৮৯
	১৯৬৯	৫৯৭১০০	৪৬১৩১০	৮০%	৭০৭

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি

	বৎসর	উৎপাদন (লক্ষটি)	মুনাফা (লক্ষ টাকায়)
(খ)	১৯৬৪	২৩৬১০০	২৮৭
	১৯৬৯	২৯৯৯৩০	৭০৭

উৎপাদন বেড়েছে ২৮%, কিন্তু মুনাফা বেড়েছে ১৪৮%

	বৎসর	উৎপাদন (লক্ষটি)	মুনাফা (লক্ষ টাকায়)
(গ)	১৯৬৮	৩০০৮৪০	৫৯৩
	১৯৬৯	২৯৯৯৩০	৭০৭

উৎপাদন কমে গেছে, কিন্তু মুনাফা বেড়েছে ১১৪ লক্ষ টাকা।

	বৎসর	উৎপাদন (লক্ষটি)	মুনাফা (লক্ষ টাকায়)
(ঘ)	১৯৬৭	২৮১০৬০	৪০৯
	১৯৬৯	২৯৯৯৩০	৭০৭

উৎপাদনে বৃদ্ধি ৭%, কিন্তু মুনাফা বেড়েছে ৭৩%

	বৎসর	উৎপাদন (লক্ষটি)	মুনাফা (লক্ষ টাকায়)
(ঙ)	১৯৬৯	২৯৯৯৩০	৭০৭
	১৯৭০	৩২১৮৪০	৭৮৩

উৎপাদনে বৃদ্ধি অতি নগণ্য, কিন্তু মুনাফা বেড়েছে ৭৬ লক্ষ টাকা।

	বৎসর	**বৈদেশিক ক্ষেত্র**	**ভারতীয় ক্ষেত্র**
(চ)	১৯৬৫	৩৭৪৬৭০	১৬৬৬৬০
	১৯৬৯	৪৫৮০১০	১৩৯১৩০

(পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

ইনটারভিউ

(মৃণাল সেন প্রোডাকশনস)

"ভুবন সোম"-এর পরেই, "ইন্টারভিউ"—মৃণাল সেনের পরের ছবিটি নিয়ে দর্শকের আগ্রহ খুব বেশি হবারই কথা। দুয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচারের বাসনাও অনেকের মনে জাগতে পারে, তবে এ থেকে নিরস্ত হওয়াই ভাল। কারণ "ভুবন সোম" অন্য স্বাদের, অন্য জাতের ছবি। অবশ্য "ইনটারভিউ"-ও দর্শককে নতুন অভিজ্ঞতা দেবে, নিঃসন্দেহে ছবিটি আর সব সাধারণ বাংলা ছবির চাইতে উঁচু মানের এবং এ-ছবি নিয়েও বিতর্ক ও আলোচনা হবে।

ভুবন সোম-এর প্রথম ভাগ দেখেই বেশ বোঝা গিয়েছিল যে অতঃপর মৃণাল সেন ফিল্ম মিডিয়মটি নিয়ে আরও বেশ জোরের সঙ্গে একসপেরিমেন্ট চালিয়ে যাবেন। "ইনটারভিউ"-তে এই প্রবণতা আরও প্রবল। 'ইনটারভিউ' দেখে মনে হবে, বুঝি এখানে গল্প বা বক্তব্য আসল নয়—চাক্ষুষ চমকই বড় কথা। ছবি দেখে আবার এটাও মনে হতে পারে, সমাজ-সচেতন পরিচালক সব কিছুর উপরে তাঁর বক্তব্যকেই স্থান দিতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ইনটারভিউ-তে যে-দুটি বস্তু মুখ্য—ছবির যেটা মোটিভ ফোর্স—তা হল : ফর্ম ভাঙ্গার নেশা এবং রাজনীতিক -সমাজতান্ত্রিক দর্শন।

ফর্ম নিয়ে একসপেরিমেন্ট করার স্বাধীনতা পরিচালকের নিশ্চয়ই আছে। তবে কোন্‌টা একসপেরিমেন্ট আর কোন্‌টা শুধুই চমক বা গিমিক তার বিচার করবেন কে? নিশ্চয়ই দর্শক। এখানে কম্যুনিকেশন-এর প্রশ্ন আছে, ওই সব নতুন প্রয়োগবিধির মধ্য দিয়ে দর্শক অন্তরে কিছু গ্রহণ করবেন। যদি তা থেকে বঞ্চিত হন তবে প্রথাগত নিয়মের বাইরের ওই সব প্রয়োগকলা শুধুই গিমিক। ইনটারভিউ-তে ক্যামেরা, এডিটিং ও সাউণ্ড দিয়ে পরিচালক অনেক কিছু দেখিয়েছেন—নানা ফ্রেম, রাজপথের ধারের নানা পোস্টারের ক্লোজ-আপ, হঠাৎ বড় রুই মাছের গলা কাটা, স্কেচ, জুতোর অ্যানিমেশন, অকস্মাৎ একটি দৃশ্য ছেঁটে ফেলে অন্য দৃশ্যে জাম্প-কাট। সব সময় বোঝা যায় না, ক্যামেরা একটা ফ্রেম ছেড়ে আর একটাতে

"মঞ্জরী অপেরা" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে বেবী গুপ্তা ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

কেন গেল। এই সব ব্যাপারের সঙ্গে গল্পের যোগ সামান্য। চরিত্রবিশ্লেষণ, মানব সম্বন্ধ বিচার বা পরিবেশীয় প্রকৃতিই কি এ-সবের মধ্য দিয়ে বোধগম্য হয়েছে? অথচ ছবির মূল কাহিনী যে একটি আছে—আশিস বর্মণ রচিত—তাও ক্রেডিট টাইটেল-এ জানানো হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে মৃণালবাবুর এত সব প্রয়োগকর্মের সম্বন্ধ কতটুকু?

ছবির দ্বিতীয় মুখ্য বস্তু রাজনীতিক ও সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা। পরিচালকের বলবার বিষয় নিয়ে কোন আপত্তির কারণ নেই। পরিচালক যা বিশ্বাস করেন সেটা নিশ্চয়ই তিনি তারস্বরে বলবেন—বলেছেনও। এবং পোলিটিক্যাল ছবি—যে মতবাদেরই হোক—এদেশে তো হয়ই না। সেদিক থেকে ইনটারভিউ-র একটা বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতর মূল্য নিশ্চয়ই আছে। এবং রাজনীতিক আন্দোলনের কিছু প্রামাণিক দৃশ্য পরিচালক সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছেন। তবে পলিটিকস ছবিতে কতটুকু বিষয়ানুগত বা গল্পের ভিতর দিয়ে কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা-নিয়ে দর্শক ও সমালোচকের মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, মৃণালবাবু তাঁর বক্তব্যের জন্য যে-গল্পটি বেছে নিয়েছেন তা না কমেডি না রিয়্যাল। গল্পটিকে কমেডি ভেবে নিলে তবু একটা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু সাহেবি পোশাক পরে ইনটারভিউ দিতে পারেনি বলে মৃণালবাবুর নায়কের চাকুরি হল না। ইনটারভিউ-বোর্ডে বড় মুরুব্বি থাকা সত্ত্বেও না, অথচ আগেই জানানো হয়েছে ইনটারভিউটা কেবল একটা ফর্মালিটি, চাকুরি পাকা হয়েই আছে। নায়ক সাহেবি পোশাক পরতে পারল না কেন? কারণ ওইদিনই (নাকি আগের দিন থেকে?) লণ্ড্রী স্ট্রাইক। নায়ক ইন্টারভিউর কথা জানতে পেরেছে কবে? হঠাৎ করে মাত্র একদিন আগে কি? যাই হোক, লণ্ড্রীতে হয়ত নায়ক শেষ সময়ে যাবে বলেই ভেবে রেখেছে। কিন্তু এমন সুদর্শন নায়ককে ধুতি-পাঞ্জাবিতে তো 'আনস্মার্ট' দেখাবার কথা নয়। স্যুট জোগাড় বা স্যুটের অভাবে চাকুরি না পাওয়ার ব্যাপারটাকে কমেডি ভেবে নিলে মন্দ হয় না। এই অংশের ট্রিটমেন্টও—

অসকার-বিজয়ী "দি লায়ন ইন উইনটার" ছবিতে ক্যাথারিন হেপবার্ন ও জাঁ মরো

পুরো গল্পই তো তাই—কমেডির আঙ্গিকে। নায়কের পদে পদে বিভ্রাট দেখে দর্শক খুশি—দাড়ি কামানো, সেলুনে বসে থাকা ইত্যাদি সব টুকরো টুকরো ঘটনাই বেশ মজার। বাঙালী দর্শক ছবিতে মাছ দেখলেই উল্লসিত হন। এ-ছবিতে মাছের বাজারের অনেক রকম মাছ দেখানো হয়েছে। দর্শক হেসেছেন। তবে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচয়, ভাই-বোনের সম্পর্ক পরিচালক সুন্দর বাস্তববোধের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। সাধারণভাবে অবশ্য গল্পটি বা একদিনের ঘটনাটি কমেডির ঢঙে বিনাস্ত। শেষ পর্যন্ত বাসে পকেটমার ধরতে গিয়ে নায়ক অতি কষ্টে জোগাড় করা স্যুট বাসেই ফেলে আসে। নায়কের এই বিপত্তির ব্যাপারগুলো সত্যিই খুব উপভোগ্য। কমেডির রসও স্বতস্ফূর্ত। নায়কের ইনটারভিউ, স্যুটের অভাবে চাকুরি না পাওয়া ইত্যাদি একান্ত রিয়্যাল বলে ভাবতেই যত ব্যাঘাত। এই দুর্বল কাহিনীর ভিত্তিতেই পরিচালক তাঁর সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

চাকুরি না পেয়ে নায়ক আত্মতুষ্টই থাকতে চেয়েছিল। তার মনের চাপা রাগ বা অবচেতনের ক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছেন পরিচালক। সে আর এক পদ্ধতি, নেপথ্যে যার কণ্ঠস্বর শ্রোতব্য তিনি দর্শক, নায়ককে যিনি সকাল থেকে অনুসরণ করে আসছেন। দর্শকের একটির পর একটি প্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে 'আত্মপ্রবঞ্চক' নায়ক হঠাৎ ক্ষেপে উঠে প্রতিবাদ জানায় সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং পোশাকের দোকানের শো-কেসের কাচ ভাঙে এবং একটি ম্যানেকিনের কোট-প্যাণ্ট ছিঁড়ে সেটিকে প্রায়-উলঙ্গ করে দেয় ও ইঁট দিয়ে মূর্তিটিকে আঘাত করে। ছবির শেষে আবার দেখানো হয়েছে সেই দৃশ্য—একেবারে প্রথমে যা দ্রষ্টব্য—লরিতে গলায় দড়ি বেঁধে বিদেশীর মূর্তি সরানো হচ্ছে।

পরিচালকের বলবার বিষয়, তাঁর ক্রোধ এখানে অতি স্পষ্ট—স্পষ্ট আগাগোড়াই, কারণ অনেকবার অনেক দৃশ্যে তা তিনি দর্শককে জানিয়েছেন। বক্তব্যের এই অতি-স্পষ্টতা হয়ত পরিচালক ইচ্ছা করেই বেছে নিয়েছেন। তাতে শিল্পের অস্পষ্টতা নেই, আর্টের দিক থেকে সেটা হয়ত ক্ষতিকারক। কিন্তু পরিচালক যা কিছু বলতে চেয়েছেন তা কাকে উপলক্ষ করে? তাঁর নায়কের তো নিজের অস্তিত্বের সমস্যা নয়। নায়কের রোজগার আছে, সে সংসার চালায়, ব্যাণ্ড বক্সে কাপড় কাচতে দেয়। এই নায়কের উচ্চাশার সমস্যা, বেঁচে থাকার নয়। সেও উপরের তলায় উঠতে চেয়েছিল, সাহেবের পোশাক পরে। সেটা পারল না বলেই কি তার এত রাগ? এই পোশাক-পর্বের ভিত্তিতে কি সমাজ-বিপ্লবের

কথা স্বাভাবিক মনে হয়? প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, স্বদেশী পোশাকের প্রতিও যে খুব শ্রদ্ধা ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। নায়কের ধুতি-পাঞ্জাবি পরার সময়ও তো বাঙ্গালীবাবুর স্কেচ ও ধুতি কোঁচানো নিয়ে ব্যঙ্গ সৃষ্টি।

ছবির একটি বড় দিক হিসাবে পরিচালক যা দেখাতে চেয়েছেন সেটা সম্ভবত সমকালীনতা। রাজনীতিক আন্দোলন বা বিক্ষোভের যে দৃশ্যগুলি পরিচালক দেখিয়েছেন তাতে সমকালীন পরিচয় নিশ্চয়ই আছে। এবং সেটা প্রকাশ পেয়েছে ডকুমেণ্টারি চিত্রের মধ্য দিয়ে, আগেই বলেছি, গল্পের ভিতর দিয়ে নয়। অন্যদিকে, সে হাত তুলে ডাকা মাত্রই ট্যাক্সি পেয়ে যায়। এটা সমকালীন শহরের অভিজ্ঞতা নয়। পকেটমারকে জনতা থানায় ধরে নিয়ে যায়। এটাও আজকের লক্ষণ নয়। শুধু শহরের পথ-ঘাট, পোস্টার, বাজার, বস্তি, চলন্ত ট্রাম-বাস দেখালে সমসাময়িক নগর জীবনের বাইরের চেহারাটা হয়ত মেলে, শহরের হৃদস্পন্দন অনুভবের অবকাশ হয় না।

ইণ্টারভিউ-তে অন্যদিকে অবশ্যই এমন কয়েকটি মুহূর্ত আছে যা সত্যিই চমৎকার, যা শিল্পীর কাজ। নায়ক ও নায়িকার মুখে যে একই রকম সংলাপ দুবার শোনা গেছে তাতে পরিচালকের কল্পনার পরিচয় পাই। ভবিষ্যতের একটি মাত্র স্বপ্নেই তারা বন্ধ। আলা রেনের "জেতেম জেতেম" ছবিতে একই সংলাপের পুনরাবৃত্তির মত ঠিক এটা নয়। নায়িকার গাল-ভরা হাসির সঙ্গে মিলিয়ে পোস্টারে একটি বাংলা ছবির নায়িকার একই রকম হাসি দেখানোটাও চট করে অবাক করে। কিন্তু পরিচালক তো তাঁর চরিত্রদের রিয়্যাল বলে সমানে সওয়াল করে গেছেন। তবে সিনেমার নায়িকার সঙ্গে বুলবুলকে জড়িয়ে ফেলা কেন? পরিচালক তাঁর চরিত্রের রিয়্যালিটি বোঝানোর জন্য ফিল্ম ও বাস্তবের ভেদরেখা মুছে ফেলতে চেয়েছেন। শিল্পীদের প্রকৃত নাম ছবিতে ব্যবহৃত। তা ছাড়া ব্রেখট-রীতিতে ইলিউশন ভাঙ্গারও প্রচেষ্টা রয়েছে। ট্রামে হঠাৎ করে নায়কের মুখে তাঁর বাস্তব পরিচয় প্রদানের ব্যাপারটা, ফিল্মে ব্রেখট অনুসরণ খুব কার্যকর হয়েছে মনে হয় না, ইলিউশন রয়েই গেছে। যেখানে ক্যামেরার উপর পুরো দৃশ্য নির্ভরশীল এবং যেখানে পাত্র-পাত্রীরা রক্তমাংসের দেহ নিয়ে এসে দাঁড়ায় না (স্টেজে যেমন) সেই ফিল্ম মিডিয়ামে এই ব্রেখট-পদ্ধতি তাৎপর্যপূর্ণ হবে কি করে? যাই হোক, ইলিউশন গোড়া থেকেই যে রয়ে গেছে, তার একটি কারণ চরিত্রদের অভিনয়। অভিনয় তাঁদের এমন স্বাভাবিক কিছু হয়নি যাতে তাঁদের আমরা বাস্তবের লোক ভাবতে পারি। রঞ্জিত মল্লিক

"প্রতিবাদ" (পরিচালনা : তপেশ্বর প্রসাদ) ছবিতে বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

বা বুলবুল মুখার্জি দুজনকে দেখেই মনে হয়েছে তাঁরা অভিনয় করছেন। রঞ্জিতের অভিনয় স্মার্ট, তবে সেটা অভিনয়ই। কথা বলার ধরনও তাই। শ্রীমতী মুখার্জির অভিনয়ও বেশ আড়ষ্ট। বরঞ্চ এঁদের তুলনায় মমতা চট্টোপাধ্যায়কে কিছুটা স্বাভাবিক মনে হয়েছে, তবে অভিনয়ে নাটুকে ভাব থেকে গেছে। পাথের পাঁচালির একটা শট দেখিয়ে দিয়েছেন মৃণালবাবু। আমরা যেন এ-ছবিতেও সেই সর্বজয়াকে দেখলাম, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই অভিনয়।

অভিনয় বাস্তব ও ফিল্মের বিভেদ ঘোচাতে পারল না। তেমনি পারল না বিজয় রাঘব রাওয়ের সংগীত। যন্ত্রসংগীত শুনতে এমনিতে ভাল লেগেছে, কিন্তু ফিল্মের সঙ্গে তার যোগ কোথায়? পাঞ্জাবী ড্রাইভার ট্যাক্সি চালাবার সময় ভাঙরার সুর বাজনা হাস্যকর। তবে একটু জায়গায় মৃণালবাবু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যেখানে শহরের দৈনন্দিন জীবনের কর্কশ আওয়াজ ও বস্তির কলরব সুন্দর সংগীতকে ছাপিয়ে উঠছে। এখানে বাস্তববাদী পরিচালক তাঁর বলবার বস্তুটি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরিচালকের উদ্দেশ্যকে ফটোগ্রাফার কে কে মহাজন বিশেষভাবেই সফল করে তুলেছেন। তাঁর ফটোগ্রাফি ভাল, তবু এক জায়গায় নায়িকার বাড়িতে সময়টা দিন হলেও দেখিয়েছে যেন সন্ধ্যা সমাগম। গঙ্গাধর নস্করের এডিটিং নিশ্চয়ই ভাল, তা না-হলে পরিচালক তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী একটির পর একটি দৃশ্যের মিছিল এমন গতির ভিতর দিয়ে রচনা করতে পারতেন না। ওই মিছিলে মনে রাখবার মত বেশ কয়েকটি চমৎকার দৃশ্য আমরা পেয়েছি—যেমন, মির্জাজরে বুলবুলের ছবি আঁকা, নেপথ্যে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি উচ্চারণ। সুন্দর মুহূর্তগুলি চকিতে এসেই হারিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল মৃণাল সেনের সরব বক্তব্য—সমাজকে বদলাতে হবে। মৃণাল সেন এ-ছবিতে সমাজবাদী পরিচালক।

যাত্রা নাট্য-সমালোচনা

রমলা সার্কাস

(তরুণ অপেরা)

যাত্রা-নাটকের পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি যাঁদের অনুরাগ বেশি, তাঁদের কাছে তরুণ অপেরার 'রমলা সার্কাস' হয়তো ভাল নাও লাগতে পারে। যাত্রা নাটকের এই আধুনিক রূপটি ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে রঙ্গমঞ্চ তার যে রূপটিকে দু দশক পিছনে ফেলে এসেছে, বর্তমান যাত্রা বুঝি সেখানে পৌঁছেই আধুনিক সেজে গর্ববোধ করতে চাইছে। এই রূপে কতদিন মানুষের মন ভোলানো যাবে সেটি বোধ হয় ভেবে দেখার সময় এসেছে যাত্রা-প্রযোজকদের।

যাত্রার এই আধুনিক রূপ যাঁরা মেনে নেবেন তাঁদের কাছে তরুণ অপেরার আগের নাটকগুলির মত "রমলা সার্কাস"ও জনপ্রিয়তা পাবে। এঁদের "হিটলার", "লেনিন", "রামমোহন" প্রভৃতি নাটক যেমন যাত্রা-জগতে প্রগতির হাওয়া এনেছে, "রমলা সার্কাস" সম্পর্কেও সে কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সার্কাস-শিল্পটি এখন এমনই এক মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারী বেসরকারী নানা স্তরে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে

গেছে। যাত্রা-নাটকও সেই ভাবনার অংশীদার হতে পেরেছে—এটা সুখের কথা। কিছুকাল আগে যাত্রা-শিল্পটিও অনুরূপ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই যাত্রা-নাটকের মধ্য দিয়ে সার্কাস-জীবনের প্রতি এই আলোকপাত এক শিল্পের প্রতি আরেক শিল্পের সহানুভূতির পরিচয়।

মৃত্যুর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে পাঞ্জা লড়তে লড়তে যারা মানুষের মনে সুখ ও রোমাঞ্চের খোরাক যোগায় সার্কাসের সেই সব শিল্পীর জীবনের হাসি-কান্নার পাঁচালি "রমলা সার্কাস"। নাটকের প্রথমার্ধ তীব্র গতিসম্পন্ন এবং রুদ্ধশ্বাস। প্রথমার্ধের ঠাস বুনন দ্বিতীয়ার্ধে একেবারেই শিথিল। রিংমাস্টার রবিনসনের সঙ্গে হামিদাবানুর সম্পর্ক, জুবেদা ও সাকিনার প্রতি রবিনসনের পক্ষপাতিত্ব এবং গণি মিঞার চক্রান্তে সাকিনার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে সাসপেন্স তৈরী হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার অনুপ্রবেশে। প্রথমার্ধে নাটকের বিস্তার এত বেশি যে শেষ পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে জাল গুটোতে হয়েছে। ফলে শেষ দৃশ্যে নাটকে শুধুই সংলাপ। টানা সংলাপের মধ্যে দিয়ে সব ঘটনা বলে যবনিকা টানা হয়েছে। নাট্যকারের এ এক বড় ত্রুটি। ক্ল্যারিওনেটবাদক পরমেশের চরিত্রটি নাট্যকার (শ্রীঅমর ঘোষ) কি প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন তা বোঝা গেল না।

তবে এ নাটকের পরিচালনায় অমর ঘোষ সত্যিই দক্ষতা দেখিয়েছেন। দৃশ্যপটের সাহায্য ছাড়াই মঞ্চের উপর (মহাজাতি সদনে) তিনি সার্কাস তাঁবুর ইলিউশন তৈরী করে দিতে পেরেছেন শুধুমাত্র আলো-অন্ধকার ও শব্দের সুন্দর প্রয়োগে। শিল্পীদের অভিনয়ও চমৎকার। বিশেষ করে রিংমাস্টার রবিনসন চরিত্রে শান্তিগোপালের অভিনয়। ওই চরিত্রের রুক্ষতা ও কোমলতা, চাপা কান্নার হাহাকার শিল্পীর অভিনয়ে মূর্ত। নিঃসন্দেহে শান্তিগোপাল আধুনিক যাত্রা-জগতের এক কৃতী পুরুষ। এর পরেই নাম করতে হয় জুবেদা ও সাকিনার দ্বৈত চরিত্রে বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর সাবলীল অভিনয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অন্যান্য চরিত্রে নরেন দে (মকবুল), সুদেশকুমার (পান্নালাল), শিব ভট্টাচার্য (ফেলারাম), বিশ্বনাথ দত্ত (পেডনী), অমর ভট্টাচার্য (মুন্দারা সিং), পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (গণিমিঞা), শৈল দেবী (হামিদাবানু), গীতা দত্ত (ঊর্মিলা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। সুর-সংযোজনায় (অজিত বসু) নতুনত্ব কিছুই নেই, তবে কাওয়ালী গানের আসরটি বেশ জমে গিয়েছিল।

"এখানে পিঞ্জর" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবিতে অপর্ণা সেন ফটো—দেশ

দিবাকর বর্মা

কালো রাস্তা, সাদা বাড়ি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "কালো রাস্তা সাদা বাড়ি" উপন্যাসটির চিত্রস্বত্ব কিনেছেন চিত্রলিপি ফিল্মস। অজয় কর পরিচালিত চিত্রলিপির "মাল্যদান" ছবিটি মুক্তির প্রতীক্ষায়। এবার চিত্রলিপির দুই প্রযোজক বিমল দে ও অজয় কর "কালো রাস্তা সাদা বাড়ি"-র ভিত্তিতে নতুন ছবির প্রযোজনার কাজে হাত দেবেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

"মনের ভাবকে প্রকাশিত নয়
গোপন করিতে তারে
মানুষ আজকে লেগে গেছে
দেখ ভাষার সংস্কারে"

এই পংক্তি ক'টি কার লেখা মনে নেই, যদি নেহাৎ অন্য কারুর লেখা না হয়, তাহলে হয়ত স্ব-রচিত হতে পারে। যাই হোক পংক্তি কটিতে কাব্য থাক বা না থাক, ভাবে মৌলিকতা থাক বা না থাক, ভাষ্যে সত্যের সন্ধান আছে। কথাটা কেন উঠলো এবার সে কথায় আসা যাক। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ফিলিম জগতেও হাজার রকমের মানুষের সংস্পর্শে আমরা এসে থাকি অহরহ। সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল, ভদ্রলোক হিন্দী ফিলিমের গল্প লেখক। মানে ছবির টাইটেলে তাঁর নামটা সেই হিসেবেই থাকে, কিন্তু তিনি গল্প লেখেন না। পাঠক হয়ত ভাবছেন এ আবার কেমন কথা, গল্প লেখেন না অথচ 'গল্প লেখক'। একটু পরিষ্কার করে বলি, ভদ্রলোক গল্প লেখেন না, গল্প বলেন। লিখতে পারেন না বলে লেখেন না এমন কথা নয়, তিনি লেখেন না কারণ লিখে লাভ নেই। লেখা মানেই কমিট করে ফেলা, লেখা পরিবেশের পট পরিবর্তনে পাল্টানো যায় না। ফিলিমের গল্পের জন্য লেখা একটা হ্যান্ডিক্যাপ। নায়ককে শোনানোর সময় যে গল্প নায়ক-প্রধান, নায়িকাকে শোনানোর সময় সেই গল্পই নায়িকা-প্রধান, এ অঘটন গল্প লিখে ঘটানো যায় না। এটা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, লেখার সঙ্গে পড়া ব্যাপারটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লিখলেই পাঠক চাই। ফিলিম লাইনে পাঠক নেই। পড়ে সময় নষ্ট করে এমন সময় কারুর হাতে নেই। সুতরাং সিসটেমের চাহিদা স্টোরি টেলার, স্টোরি রাইটার না। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমাদের আলোচ্য 'গল্প লেখক' কেন কষ্ট করে গল্প লেখেন না। এবার মনের ভাবকে গোপন করতে কিভাবে মুখের ভাষার সংস্কার হচ্ছে, সে কথায় আসা যাক। কথায় কথায় ঐ গল্প লেখক ভদ্রলোক আমাকে কিছু জ্ঞান দিলেন। বললেন, "আপনার মশাই কিছু হওয়া মুশকিল।" বললুম, "কেন?" উত্তরে বললেন, "কারণ, আপনার বক্তব্য অতি সহজেই বোঝা যায়, তাই আপনাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।" আমি একটু অবাক হলাম। ভদ্রলোক বললেন, "বুঝলেন না তো, একটু পরিষ্কার করে বলি। আজকালকার মানুষ যদিও 'সব বুঝি', 'সব জানি' বলে চিৎকার করে আকাশ ফাটাচ্ছে, তবু তারা মনে মনে নিজেদের বোঝা এবং জানা সম্বন্ধে একেবারেই শ্রদ্ধাশীল নয়, তাই যখনই তারা কোন জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারে, তখনই সে জিনিসের প্রতি তাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না। বর্তমান পৃথিবীতে মাত্র দু ধরনের মানুষ আছে, এক ধরনের মানুষ বিক্রেতা, অন্য ধরনের মানুষ ক্রেতা। আর এই দুই ধরনের মানুষই মনে মনে ঠগ। দুজনেই দুজনকে ঠকাবার তাল করছে। মুখে বলছে 'হরি'র নাম, করছে আসলে হরণের কাম। বি আর চোপরার অফিসে বসে বললাম, রাজ কাপুরকে কথা দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু একদম ইচ্ছে ছিল না জানেন, ও যা সাবজেকট আপনার হাতে একেবারে ক্লাসিক বনে যেত, কিন্তু কি করি, রাজটা এমন নাছোড়বান্দা......আরে হ্যাঁ, শুনেছেন তো, মাদ্রাজে শুটিং করতে গিয়ে রাজেশের চোখে বাঘের লোম ঢুকে গেছে। দ্যাট রিমাইন্ডস মী, চাল্লি, কাল আবার সকালে মাদ্রাজ যেতে হবে, এ ভি এম-এর প্রোডাকসন নাম্বার সিকস্টিটুটা হয়ত শেষ অবধি আমাকেই লিখতে হবে। বুঝলেন কিছু।" ভদ্রলোক দুঁদে অভিনেতার ঢঙে আমার দিকে চাইলেন। আমি "বুঝেছি" হাসি হাসলাম। ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন, "বর্তমানে মানুষ, মানুষ চরিয়ে খায়, মানে সবাই সবাইকে চরিয়ে খেতে চায়—অথচ যেহেতু তারা মানুষ সেই জন্যে ভাবটা এমন যেন পাড়িয়ে খাচ্ছে। বুঝলেন। একটু ওৎ পেতে সবকিছু দেখবেন তা হলেই বুঝতে পারবেন 'অনেস্টি অব পারপাস' কথাটা কতখানি অবসলিট হয়ে গেছে। সামনাসামনি ভীষণ ভাব আর আড়াল হলেই খাওয়াখাওয়ি। এসব হচ্ছে ভয়ে। নিজের প্রতি আস্থা নেই বলেই মানুষের আজ অপরের প্রতিও বিশ্বাস নেই। তাই বেশির ভাগ লোকই যে জিনিসে বিশ্বাস করে না, সেই জিনিস করতে চায়।" একটু অবাক হয়ে বললাম "যেমন?" সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, "আজকাল বেশ কয়েকজন লোক ফিলিম বানাচ্ছে, যাদের আসল কাজ স্মাগলিং। আর এদের তিনজনের ছবির গল্প লেখক—আমি। এঁদের তিনজনের একজনের ছবিতেও আমি স্মাগলিং সিকোয়েন্স রাখতে পারিনি। এঁদের প্রত্যেকের ছবিরই আসল থীম সমাজ সংস্কার, হিরো ইনকারাপ্ট-এবল পুলিস অফিসার। বুঝলেন?" বললাম, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনার সব কথাই তো আমি বুঝতে পারলাম।" ভদ্রলোক হো হো করে হেসে বললেন, "বুঝলেন, কারণ আমি বোঝালাম। আপনাকে নয় কিন্তু, এ কথাগুলো আমার সরল শর্মার সঙ্গে হোল, মানে সরল শর্মার মাধ্যমে দেশের পাঠকদের সঙ্গে।"

সরল শর্মা

"রূপসী" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী) ছবিতে বঙ্কিম ঘোষ ও চিন্ময় রায়

কালীপদ পাঠক পরলোকে

টপ্পা গানের বিখ্যাত শিল্পী কালীপদ পাঠক গত ১৫ নভেম্বর বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন তাঁর হাওড়া কদমতলার বাসভবনে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮০ বছর ৮ মাস।

এত বয়সেও শ্রী পাঠক রীতিমত শক্ত-সমর্থ ছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবলীলায় সংগীত পরিবেষণ করতে পারতেন। মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি আমাদের অফিসে এসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে গেছেন। মৃত্যুর দিন সকালেও তিনি সুস্থ ছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় ডাক্তার ডাকা হয়। দুপুরে পথ্য গ্রহণের পর বিশ্রাম গ্রহণ

করেন। বিকালে চা পানের সময় দেখা যায় তিনি আর বেঁচে নেই।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলা পুরাতনী গানের আসরে একটি বেশ বড় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

নিউইয়র্কে গান্ধীজীর জীবনী নিয়ে নাটক অভিনয়

"গান্ধী" নামে একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন হয়েছে নিউ ইয়র্কের প্লেহাউস থিয়েটার মঞ্চে ২০শে অক্টোবর। এই নাটকে গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের তাৎপর্য উদ্ঘাটিত।

এই নাটকটি পারসী লেখিকা মিসেস গারজি ক্যাম্পবেলের দশ বৎসরব্যাপী সাধনার ফল। গান্ধীজীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন জ্যাক ম্যাকগোরান। স্যামুয়েল বেকেটের নাটকে তিনি প্রায়ই প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন।

জোস কুইনটারো নামে ব্রডওয়ের একজন বিশিষ্ট পরিচালক "গান্ধী" নাটকের পরিচালনভার গ্রহণ করেছেন। গান্ধীজীর পত্নী কস্তুরবার ভূমিকায় অবতরণ করছেন বেটী মিলার। মিঃ জিন্নার ভূমিকায় জ্যাক অ্যাক্লেরড এবং শিষ্যা সরোজিনীর ভূমিকায় গেনডোলিন অরনেস। এছাড়া বিশিষ্ট টেলিভিশন অভিনেতা ডেভিড শেলবী একটি কুট-ভূমিকায় দেখা দেবেন।

পোশাক পরিচ্ছদ, মঞ্চসজ্জা ও আলোক-সম্পাতের ভার নিয়েছেন যথাক্রমে জেন গ্রীণউড, মিং চো লী এবং রোজার মরগ্যান।

নতুন নাটক "খাঁচা"

আগামী ২৪শে নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুক্ত অঙ্গনে সুন্দরম্ নাট্য সংস্থা তাঁদের নবতম প্রযোজনা 'খাঁচা' মঞ্চস্থ করবেন। নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করবেন প্রতিদ্বন্দ্বীখ্যাত প্রতিভাবান শিল্পী ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। 'খাঁচা' প্রযোজনাটির নাটাকার, নির্দেশক এবং সংগীত পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। আগামী ২৪ নভেম্বরের পর নাটকটি মুক্ত অঙ্গনে ডিসেম্বরের প্রতি রবিবার সকালে নিয়মিতভাবে অভিনীত হবে।

"বিলেত ফেরৎ" (পরিচালনা : চিদানন্দ দাশগুপ্ত) ছবিতে নির্মলকুমার ও নবাগতা সোহাগ সেন

বিশ্বরূপায় দু'টি একাংক

নাট্য সংস্থা "শরিক" ২১ নভেম্বর, শনিবার বেলা ৩টায় বিশ্বরূপা থিয়েটারে তাঁদের দুটি একাংক নাটক "ব্যান্ড মাস্টার" ও "দ্বান্দ্বিক" মঞ্চস্থ করবেন।

সংসার

হেমন্ত ব্যানার্জী ও নলিন ব্যানার্জী প্রযোজিত "সংসার" ছবির শ্যটিং শেষ হয়েছে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সলিল সেনের। সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, নন্দিনী মালিয়া, বসন্ত চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অজয় গাঙ্গুলি, অমরনাথ, নির্মলকুমার, মৃণাল, হরিধন, শমিতা বিশ্বাস ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ্ণৌয়ে বাংলা নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতা

আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাব ও ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশন-এর ৮ম বার্ষিক বাংলা নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতা। বিশ্ব জাতিপুঞ্জ পরিষদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবারে এক বিশেষ আয়োজন করা হচ্ছে। ২০নং শিবাজী মার্গ, লক্ষ্ণৌ-১ অথবা বিনয় দাশগুপ্ত, ৯০।৩ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৫—এই দু জায়গার যে কোন এক জায়গায় প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য আবেদন করতে হবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে।

অরণ্যদেব
লি ফক্‌
দেবদূত, তুমি যদি এখানে থাকতে না চাও, তবে আমিই তোমার সঙ্গে যাব। যাওয়াটাই আমার কর্তব্য।
অল্যানডার, তুমি তো ওর বাগদত্ত স্বামী। তুমি কি চাও যে, ও আমার সঙ্গে যাক?
না, তা আমি চাই না। কিন্তু যাওয়াই ওর কর্তব্য।

সত্যি কি অল্যানডারকে ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক?
আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কিছু যায়-আসে না। দেবদূত, তোমার আদেশ মান্য করাই আমার কর্তব্য।
!!
!!
বেশ, তাহলে আমার আদেশ মান্য করো। আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি এখানে অল্যানডারের কাছেই থাকবে।
দু'শো বছর আগে আমার এক পূর্ব-পুরুষ এখানকার রাণীকে দারুণ দুঃখ দিয়েছিলেন। রাণীর মৃত্যুখবর তিনি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে।
ফিরে যাবার আগে জায়গাটাকে ভাল করে দেখতে চাই।

পুরনো সভ্যতা; চমৎকার ঘরবাড়ি, প্রশস্ত রাস্তাঘাট -----
এ-সভ্যতা কত দিনের প্রাচীন?
কী জানি! বলা শক্ত।
উঁচু, দুর্লঙ্ঘ্য মালভূমির উপরে সেই আশ্চর্য নগর।
'বাইরের কেউ এই বিচ্ছিন্ন স্বর্গভূমির খবর রাখে না।'
কিন্তু একদিন নিশ্চয় বাইরের মানুষ এখানে হানা দেবে। গড়ে উঠবে মস্ত হোটেল, নষ্ট হবে এই শান্ত সৌন্দর্য।
বিদায়, সোনালী বন্ধুরা। যতদিন পারো, এই সৌন্দর্য উপভোগ করো। শান্তিতে বসবাস করো।
আমার পূর্বপুরুষ এখানে এসে প্রেমে পড়েছিলেন। তাঁর আর ডায়নার মত কেউ ছিল না।
আগামী সপ্তাহে:

সেনাবাহিনীর হাতে ইমফল শহরের দায়িত্ব ভার অর্পণ এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচনার বিষয়। গোটা পৌর এলাকায় পাঁচ বা ততোধিক লোকের সমাবেশ এবং লাঠি ও আগ্নেয়াস্ত্র বহনও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত ১৩ নবেমবর বিকাল ৬টা থেকে ১২ ঘণ্টার জন্য আবার ইমফলের সমগ্র মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কারফু জারি করা হয়েছে। এখানে সকল রকম শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৩ থেকে ১৭ নবেমবর পর্যন্ত সমগ্র পৌর এলাকায় ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে। সিনেমা হলগুলিকেও এ কয়দিন প্রদর্শনী বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১২ নবেমবর ইমফলে ছাত্র ও পুলিসের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষের ফলে যে বিশৃংখল অবস্থা দেখা দিয়েছিল তারই ফলে এই শহরের দায়িত্বভার সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

দেশী সংবাদ

৯ নবেমবর—আজ রাজ্য সরকার বেতন কমিশনের সুপারিশ আংশিকভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত বেতনক্রম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা ঘোষণা করেন। সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার সরকারী, আধা-সরকারী এবং শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্মচারী উপকৃত হবেন। তবে আগামী জানুয়ারির আগে—সংশোধিত বেতনক্রম চালুর ফলে বাড়তি টাকা কর্মচারীরা হাতে পাবেন বলে আশা কম।

কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে রবিবার রাত থেকে সোমবার বিকাল পর্যন্ত নয়টি ঘটনায় নয়জন মারা গিয়েছে। পুলিস চারটি ক্ষেত্রে ২৬ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। পুলিসের গুলিতে মারা যায় ৫ জন। আটটি ঘটনার মধ্যে একজন সি পি এম ছাড়া সাতজন সমাজবিরোধী মারা গিয়েছে।

১০ নবেমবর—আজ কলকাতায় একজন ব্যবসায়ী খুন হন। কৃষ্ণনগরে খুন হন সশস্ত্র পুলিসের একজন সুবেদার। পুলিসের গুলিতে চারজন আহত হন। কলকাতায় শ্যামপুকুরে পুলিস পিকেট দুবার আক্রান্ত হয়। দুবারে পুলিস চার রাউন্ড গুলি চালায়। বেলেঘাটায় ও গোল পারকের কাছে স্টেট বাসে আগুন দেওয়া হয়। হেয়ার স্কুলে পটকা পড়ে।

রাজ্য নব কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে আদি কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরকম আঁতাত বা সমঝোতা করবেন না। সি পি আই-এর সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নটি দলের কর্মসমিতির বৈঠকে আজ এড়িয়ে যাওয়া হয়। নির্বাচনী নীতি নিয়ে আলোচনায় বেশ মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয় বলে জানা গেল।

১১ নবেমবর—দলের একজন সদস্যের উপর আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলে সি-পি-এম আজ লোকসভায় পশ্চিম বাংলায় হিংসাত্মক আবহাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব তুলতে চাইলে তাতে নিজেকেই প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রস্তাব ১৯১—৩৯ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ লোকসভায় আভাস দেন যে, উগ্রপন্থী এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যায় লিপ্ত ব্যক্তিদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রস্তাবিত আটক আইনটি সীমিত ধরনের হবে। স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, প্রস্তাবিত বিলটির খসড়া হয়েছে এবং আগামী ১৭ নবেমবর পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে খসড়া বিলটি বিবেচিত হবে।

১২ নবেমবর—আগামী ১৬ নবেমবর থেকে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় অকটরয় বা পণ্য প্রবেশ কর চালু হচ্ছে। রাস্তায় চেক-[illegible]

আদায় করা হবে। রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা বলেন, এমন কোন পণ্যের উপর কর নেওয়া হচ্ছে না যাতে সাধারণ মানুষের উপর চাপ পড়ে কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বাড়ে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ঠিক করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমির সর্বোচ্চ সীমা ১৫ একর করা হবে। রাজ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ২০ একর করার প্রস্তাব দেন। পরে তা হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেন। এরূপ সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তানকে নিয়ে গঠিত পরিবারকে একটি ইউনিট ধরা হবে।

১৩ নবেমবর—বুধবার শেষ রাত্রে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিসের গুলিতে যে দুজন নিহত হন তার মধ্যে একজন কলকাতা পোরট পুলিসের কনসটেবল। নাম—রঞ্জিত চক্রবর্তী। অপর ব্যক্তি রঞ্জিতেরই ভাই ট্রেনিংপ্রাপ্ত এন ডি এফ, নাম শ্রীসমীর চক্রবর্তী। পুলিসের গুলিতে পুলিস নিহত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম।

আদি কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের ঐক্য হবে না—বলেছেন আদি কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এস নিজলিঙ্গাপ্পা। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান মনোভাব যতদিন অপরিবর্তিত থাকছে—ততদিন নব কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য সাধনের জন্য আমরা এতটুকু আগ্রহী নই।

১৫ নবেমবর—আসন্ন পরীক্ষা মরসুমের মুখে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে হাঙ্গামা বন্ধের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আজ কলকাতার নাগরিক এবং শিক্ষাব্রতীদের দুটি পৃথক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজ্য সরকারও শান্ত পরিবেশে পরীক্ষা চালু রাখার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

আজ বেলা দশটা নাগাদ মহাত্মা গান্ধী রোড ও স্ট্রানড রোডের সংযোগস্থলের কাছে একজন ট্রাম চালকের সঙ্গে একজন ট্রাফিক কনসটেবলের বচসা ও ধস্তাধস্তি হয়। অভিযোগ এই সময় ট্রাফিক কনসটেবল তাঁর রিভলবার থেকে এক রাউনড গুলি চালায়।

১৫ নবেমবর—পশ্চিমবঙ্গের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সরকার পশ্চিম-বাংলা জননিরাপত্তা বিল নামে একটি বিলের খসড়া তৈরি করেছেন। কোন ব্যক্তিকে লুটপাট ও গুণ্ডামি করতে দেখামাত্র পুলিস যাতে গুলি করতে পারে, সেজন্য এই বিলে [illegible] হয়েছে।

রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা বলেন যে, স্কুলের আসন্ন বার্ষিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন হলে পুলিসের সাহায্য দেওয়া হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চান পুলিসের সাহায্য না নিয়ে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা সম্পন্ন হোক।

বিদেশী সংবাদ

৯ নবেমবর—গতকাল কায়রোতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইউ এ আর (সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র) লিবিয়া এবং সুদান এই তিনটি রাষ্ট্রকে একত্রিত করে একটি ফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই তিন রাষ্ট্রের তিন রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়ে একটি ত্রয়ী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১০ নবেমবর—ফ্রানসের প্রাক্তন প্রেসিডেনট জেনারেল দ্য গল গতকাল রাত্রি সাড়ে সাতটায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। ১৯৬৯ সালের নির্বাচনের পর তিনি প্রেসিডেনটের পদে ইস্তফা দেন।

১১ নবেমবর—সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাচ্ছেন, চাঁদ এবং চাঁদের পরিবেশ সম্পর্কে আরব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য মানব-আরোহী-হীন একখানা সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা-১৭ চাঁদের দিকে যাত্রা করেছে।

১২ নবেমবর—ব্রিনদিসির (ইতালী) এক মহিলা—শ্রীমতী মারিয়া এ কাসালিনি গতকাল ৩২তম সন্তানের জন্ম দেন। শ্রীমতী কাসালিনির বয়স ৪১ বছর। তাঁর ৩২টি সন্তানের মধ্যে ১৫টি জীবিত আছে। এই মহিলা দুবার ৪ করে, একবার তিনজন ও একবার জমজ সন্তান প্রসব করেন।

১৩ নবেমবর—নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের ফলে যে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয় তাতে বঙ্গোপসাগরে দুবলা দ্বীপ প্লাবিত হয়েছে এবং সেখানে কয়েক হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী ভেসে গিয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। খুলনা জেলা কর্তৃপক্ষ ঐ দ্বীপে ধর্মকর্মের জন্য সমবেত ১৩ হাজার তীর্থযাত্রীর ভাগ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই দুবলা দ্বীপটির প্রশাসনের দায়িত্ব রয়েছে খুলনা জেলা কর্তৃপক্ষের।

১৪ নবেমবর—ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ষোল ফুটেরও বেশী উঁচু হয়ে ঘনবসতিপূর্ণ হাতিয়া দ্বীপের ওপর দিয়ে সবেগে প্রবাহিত হওয়ায় প্রায় ষাট হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। তা ছাড়া পুণ্যার্থী যে পনের কুড়ি হাজার হিন্দু দুবলা [illegible] গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ক'জন [illegible] ছেন তা আজও সঠিক জানা যায়নি।

১৫ নবেমবর—আজ এক বেসরকারী খবরে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে তিন লাখ মত লোকের প্রা[illegible] ঘটেছে এবং দশ লক্ষাধিক লোক গৃ[illegible]। নোয়াখালি জেলায় দু' লাখ এ[illegible]প এলাকায় এক লাখ লোকের [illegible] বলে আশংকা করা হচ্ছে।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

বিভূতি-রচনাবলী

প্রতি খণ্ড—১৪৲
একত্রে তিন খণ্ডের ডাকখরচা ৪·১০

মূল ভূমিকা : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রথম খণ্ডের ভূমিকা : প্রমথনাথ বিশী
দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা : জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা : [illegible] [illegible]পাধ্যায়

চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ প্রতী[illegible]য়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সাম্প্রতিকতম রচনা

নতুন তোরণ ৪৷৷ কলধ্বনি ৪৷৷

[illegible] চিত্তরঞ্জন [illegible]সের
[illegible]কথা

সাহানা দেবীর

মৃত্যুহীন প্রাণ ৪৷৷

আবদুল জব্বারের
অপূর্ব রম্যরচনা

বাংলার চালচিত্র ১০৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মক্ষিরানী ৫৷৷

নজরুল ইসলামের

সন্ধ্যামালতী ৪৷৷

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
রবীন্দ্র-জীবন কথা

ভাগবতীতনু ১০৲

কমলা মিশ্রের

কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ৭৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

মণিমহেশ (হিমালয়ের একটি অজানা তীর্থ) ৬৷৷

ডঃ ভবতারণ দত্তের

বাংলা দেশের ছড়া ১০৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

"যমুনোত্তরী হ'তে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ" ৫৲

হিরন্ময় ভট্টাচার্যের
মন্দমধুর ৪৷৷০

হরীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের
লীলাভূমি ৫৲

স্বামী তত্ত্বানন্দের
তপস্বী ভারত ১০৲

স্বামী জগন্নাথানন্দ
শ্রীম কথা ১০৲

ডঃ সুকুমার সেনের
নট-নাট্য-নাটক ৪৷৷০

শচীন্দ্রনাথ রায়ের
জাহাঙ্গীর নামা ৮৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ব্যোমকেশ অমনিবাস

মগ্নমৈনাক ৪৷৷

সন্তোষকুমার ঘোষের
ত্রিনয়ন ৪৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রীমান শ্রীমতী ৭৲

লীলা মজুমদারের
আর কোনোখানে ৫৲
সুকুমার রায় ৪৷৷০

মহাশ্বেতা দেবীর
আঁধার মানিক ১২৷৷০

মানবেন্দ্র পালের
দূর থেকে কাছে ৫৷৷০

মৈনাকের
বাহুবলয় ৯৲

বাণী রায়ের
সকালসন্ধ্যারাত্রি ১০৲
বর্ষাবিজয় ৩৲

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
নূপুরের মতো ৮৲

মিত্র ও ঘোষ :: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ১২

বিড়ালের চোখের নতুন চমক

আনবে আপনার জুতোয়

বিল্লী শূ পালিশ এখন আপনার জুতোকে বিড়ালের চোখের চেয়ে বেশী চকচকে এবং বিড়ালের নরম শরীরের চেয়েও বেশী মোলায়েম ও পরিষ্কার করে তুলবে। সর্বদা বিল্লী শূ পালিশ ব্যবহার করুন। জুতোর নতুন চেহারা হবে এবং আপনাকেও খুব সৌখীন দেখাবে। ইহা কালো এবং গাঢ় বাদামী রংয়ে, ৪০ ও ১৫ গ্রামের, সহজেই খোলা যায় এমন কৌটোয় পাওয়া যায়। বিল্লী শূ ক্রীমও পাবেন।

বিল্লী
শূ পালিশ

বিল্লী শূ পালিশ থাকতে জুতোর আর কি চাই?

বিতরণ করেন: র‍্যালীজ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ULKA-BL-9 BEN

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মানে, অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা
Brooke
Bond
Tea
Red Label
Brooke
Bond
Tea
Red Label

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রাউন এণ্ড পলসন

কাস্টার্ড পাউডার দিয়ে তৈরী

মিসেস ইলীন ব্রাউন

ব্রাউন এণ্ড পলসন কাস্টার্ড নিখাদ পুষ্টিকর, সরের মত মোলায়েম। নানারকমের পুডিং ও ডেসার্ট যেমন ফিরনি, আইসক্রীম ও ট্রাইফল ইত্যাদি তৈরী করবার জন্য এই পাউডার ঘরে সবসময় মজুত রাখবেন। জেলী কিম্বা ফ্রুট স্যালাড···অথবা শুকনো ফল ও মধুর ওপর ছড়িয়ে খেতে সুস্বাদু। **ব্রাউন এণ্ড পলসন** সবচেয়ে সেরা কাস্টার্ড পাউডার, কেননা সেরা সেরা উপাদানে তৈরী এবং অতি সযত্নে প্রস্তুত।

এতে ডিম নেই

উপকরণঃ

- ৩ বড়চামচ ভর্তি ব্রাউন এণ্ড পলসন কাস্টার্ড পাউডার
- ½ লিটার দুধ
- ৪ বড় চামচ চিনি
- ৩ ছোট চামচ ইনস্টান্ট কফি পাউডার
- ২ বড় চামচ ঘনকরা (কনডেনসড্) দুধ বা ক্রীম
- ২৫ গ্রাম মাখন

১। প্রথমে অল্প দুধে **ব্রাউন এণ্ড পলসন কাস্টার্ড** পাউডার মিশিয়ে নিন। ২। এবারে এই মিশ্রণটি বাকি দুধে বেশ ভাল করে মেশান। ৩। সমানে নাড়তে নাড়তে এটিকে গরম করুন যতক্ষণ না কাস্টার্ডটি ফুটতে সুরু করে। তিনমিনিট ধরে ফোটান। চিনি মেশান ৪। ঘনকরা (কনডেনসড্) দুধে ইনস্টান্ট কফি পাউডার সমানভাবে মিশিয়ে নিন। এবারে এটি কাস্টার্ডের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। মাখন মেশান। ৫। আলাদা আলাদা পাত্রে ঢালুন। ঠাণ্ডা করে নিন।

বিনামূল্যে! নতুন পাকপ্রণালীর বই নং ৩

আজই এক কপির জন্য লিখুন

অনুগ্রহ করে আমাকে বিনামূল্যে একসেট পাকপ্রণালী পাঠাবেন— ইংরাজি/হিন্দী / বাংলা / তামিল / তেলেগু / মালয়ালম / গুজরাটি / মারাঠি / কন্নাড়া।

নাম································

ঠিকানা································

································

এই কুপনটি ভর্তি করে নীচের ঠিকানায় ডাকে পাঠিয়ে দিন: পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট, কর্ন প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই-১ বি আর

DE-3

আপনার পরিবারের সবার মনের মত এ রকম আরো নানা খাবারের জন্য এই পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি রাখুন

কর্ন প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই-১ বি. আর

Bensons/5721 BN

প্রকাশিত হল

দাম ৫·০০

ওরা ছ'জন। তিনটি তরুণ আর তিনটি তরুণী। সকালের ফুলের মতন তাজা, ঝকঝকে, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। দূর নিরালা এক সবুজ ভূমিখণ্ডে,—আকাশের নীলিম উদারতা যেখানে প্রান্তরের হরিৎ ব্যাপ্তিতে মেশামেশি, ঝিরিঝিরি বয়ে যাওয়া নদী টলটলে খুশিতে আত্মহারা,—ওরা গিয়েছিল পিকনিক করতে যেহেতু ওদের আর কোথাও যাবার ছিল না, যেখানে গিয়ে ওরা ওদের এই রুক্ষ পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তের কঠোর শাসনের হাত থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজেদের উচ্ছলিত জীবনপাত্রের উপচে-পড়া মাধুরী নিজেরাই প্রাণ ভরে পান করতে পারে। এই যাওয়া আসলে হয়তো প্রেমেই যেতে চাওয়া—সকল-দ্বার-রুদ্ধ

রমাপদ চৌধুরীর

দিনদুপুরের রাদ্দুপুরের উপন্যাস

পি ক নি ক

বন্দী বিহঙ্গের আপাত-মুক্তির একমাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথ রূপে যা প্রতীত। কিন্তু সেখানেও কি শেষ অবধি পৌঁছতে পারা যায় কি যায় না। ক্ষণিক ফূর্তির আদলে সারা জীবনের মূর্তিটিকে গড়ে তোলা যায় না বলেই হয়তো। তাই সেখান থেকেও অবশেষে ফিরতে হয়, ফিরে আসতে হয় সামান্য কিছু স্মৃতির মধ্যে—ছোট ছোট বুদ্বুদের মত রামধনু-রঙা কাঁচা ফাঁপা কিন্তু নিটোল স্মৃতি,—যেগুলিই মানুষের শেষ সম্বল, কিংবা কে জানে, হয়তো বা শেষ আশ্রয়।

● এই লেখকের আর দুখানি উপন্যাস ●

পরাজিত সম্রাট ৪·০০ **বনপলাশির পদাবলী** ৮·৫০

বোধোদয়

শংকর ॥ দাম ৫·০০

সন্ধ্যারাগ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ দাম ৫·০০

পিয়ামুখচন্দা

প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ দাম ৬·০০

দোলনা

আশাপূর্ণা দেবী ॥ দাম ৫·০০

প্রতিধ্বনি ফেরে

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ দাম ৪·০০

অষ্টাদশ শতকের বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবন অবলম্বনে রচিত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ঐতিহাসিক উপন্যাস

অমাবস্যার গান

তৃতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৩·০০

•

বিমল করের

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

ছটি অসাধারণ গল্পের সংকলন—যেগুলি পাঠের পর কিছু অপরিহার্য সম্ভাবনা এবং জিজ্ঞাসা সংপাঠককে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করে রাখে।

দাম ৪·৫০

কুশীলব

বিমল কর ॥ দাম [illegible] ৩০

প্রজাপতি

সমরেশ বসু ॥ দাম ৬·০০

রাতের পাখি

আশাপূর্ণা দেবী ॥ দাম ৪·০০

বসন্ততিলক

সুবোধ ঘোষ ॥ দাম ৫·০০

রূপবতী

মনোজ বসু ॥ দাম ৩·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭ বিক্রয় কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪
শনিবার ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৩৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষান্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩৩.০০
ষান্মাসিক ,,	... ১৬.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩৩.০০
ষান্মাসিক ,,	... ১৬.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষান্মাসিক ,,	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষান্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 28 Nov., 197

পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই প্রকৃতি এই বিশ্বজগতের সঙ্গে এক রহস্যময় সম্পর্ক স্থাপন করে বসে আছে। তাকে খানিকটা বোঝা যায়, খানিকটা বোঝা যায় না। কখনও সে সদয়, কখনও বা অতীব নির্দয়। পূর্ববঙ্গে অতি সম্প্রতি মাত্র একটি দিনে যে রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেছে বর্তমান শতাব্দীতে এ-ধরনের বিপর্যয় নাকি আর ঘটে নি : ঘূর্ণি-ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে চোদ্দ লক্ষ মানুষ মৃত, চারটি দ্বীপ প্রাণহীন; বহুকাল ধরে ধীরে ধীরে যেখানে জীবনের সাড়া জেগে উঠেছিল আজ আর সেখানে জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গে বহু বন্যা হয়ে গেছে, তার সমুদ্র উপকূলে অনেকবার প্রবল ঝড় হানা দিয়ে গেছে, লোকক্ষয় এবং ক্ষতি হয়েছে প্রচুর, কিন্তু এমন সর্বনাশা জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতি আর বুঝি হয় নি।

পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানকে বিশেষ করে তার দক্ষিণাংশকে বিশেষজ্ঞরা বিশেষ নিরাপদ বলে মনে করেন না। বঙ্গোপসাগর যেন এই ভাঙাচোরা স্থলভূমির দিকে সব সময়েই কেমন হিংস্র চোখে তাকিয়ে থাকে, সুযোগ বুঝলেই নির্দয় হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মাটির বুকে। তবু, গত শুক্রবার তেরোই নভেম্বর বঙ্গোপাগরের জলে যে মহাপ্লাবন ঘটে গেছে তার ভয়াবহতার তুলনা নেই : চারটি দ্বীপ—হাতিয়া, চরজব্বর, রামগতি, ভোলা প্রাণহীন। এই চারটি দ্বীপের লোকসংখ্যা ছিল চোদ্দ লক্ষ। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের খবর থেকে জানা যায়, বঙ্গোপসাগরে ছড়ানো দু হাজার মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে ও চর এলাকায় কোনো জীবিত প্রাণীও থাকার কথা নয়। বিশ ফুট জল আট ঘণ্টা যাবৎ এই সব এলাকায় জমে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের আরও কিছু এলাকা সেদিনের ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত। সরকারী খবরে বলা হয়েছে, বাইশ লক্ষ লোক এই বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা।

পূর্ব বংলার এমন বিপদের দিনে সবচেয়ে বেশী শিহরিত হয়েছি আমরা, যারা আপাতত পশ্চিমবঙ্গবাসী, অথচ ওই আর্ত এলাকার সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ ছিল একদা। বংশ পরম্পরায় যে সম্পর্ক একদা গ্রথিত হয়েছিল আজ তা রাজনৈতিকভাবে ছিন্ন হলেও মনের বা হৃদয়ের দিক থেকে নিশ্চয় হয় নি। বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গের এই বিপর্যয় আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত বিপর্যয় বলে মনে হয়েছে; লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির জন্যে আমাদের বেদনা এবং শোকও আন্তরিক। পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান সেবা ও ত্রাণকার্যের জন্যে ওপারের বাংলায় ছুটে যেতে চান, কিন্তু উভয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া তা হবার নয়। ইতিমধ্যে ভারত সরকার ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা এক কোটি টাকা মূল্যের সাহায্য পাক সরকারকে দিচ্ছেন।

বিশ্বের নানা দেশ থেকেই অতি দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে সাহায্য এসে পৌঁছচ্ছে। শত্রু মিত্র ভেদাভেদ এক্ষেত্রে হয় নি, হবার কথাও নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কোনো রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি নিশ্চয় সমগ্র মানব সমাজের বেদনার কারণ। যে হতভাগ্যরা আজ প্রকৃতির ক্ষণিক রোষে ইহলোকের ওপারে চলে গেছেন তাঁদের জন্যে শোক করা ছাড়া আমাদের আর করার কিছু নেই; কিন্তু যাঁরা জীবন্মৃত হয়ে আছেন, যাঁদের আশ্রয় বলে কিছু নেই, ক্ষুধায় অন্ন জুটছে না, রোগে-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন—তাঁদের জন্যে আমাদের কর্তব্য আছে। আর সেই কর্তব্য হল—সাহায্য ও সেবা। ভারত ছাড়াও বিশ্বের নানা দেশ পূর্ব পাকিস্তানকে নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন দেখে আশা করা যায়—বিরাট ক্ষয়ক্ষতির অনেকটাই হয়ত সামলানো সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে হয়ত একথাও মনে হবে, মানবিক শুভেচ্ছা, কল্যাণ ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে পারলে বহু বিপর্যয়কেই সহনীয় করে তোলা যায়।

জনাব লিসানুল মুল্‌ক্‌ মওলানা সঈদ আহমদুল্লা কাদ্‌রি কবি, ঐতিহাসিক এবং স্কলার বাহাদুর সমীপেষু,

জনাব! ধন্য হায়দরাবাদ, যিনি আপনার জন্মভূমি। কেননা এই হায়দরাবাদই আপনার অতুলনীয় বিদ্যাবত্তা, আপনার নিদারুণ ইতিহাস চেতনা এবং আপনার অপূর্ব কবি প্রতিভার কারণে আজ ভারতের অপরাপর নগরীর পরম ঈর্ষার স্থল হয়ে দাঁড়াল। আপনি এই বাঙ্গালী অ্যাপ্রেনটিস কবির হাজারো সালামৎ গ্রহণ করুন।

গুরো! আপনাকে সত্যিই আমি গুরু-পদে বরণ করেছি। কারণ হোয়াট হায়দরাবাদ থিংকস্‌ টো-ডে, ইনডিয়া উইল থিংক টু-মরো। আমাদের পরম প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর ৫৩ তম জন্মদিবসে তাঁর সন্তোষ উৎপাদনের জন্য ৫৩টি উর্দু বয়েৎ খরচ করে অপূর্ব কবিত্বশক্তিবলে আপনি "ইন্দিরানামা" নামে যে মহাকাব্যের গোড়াপত্তন করলেন, তা যে কালে কালে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের কবি-কুলের প্রতিভার যোগফলে পিরামিডতুল্য এক অক্ষয় অব্যয় সৃষ্টিতে পরিণত হবে (অবিশ্যি ভারতের জনজননী যদি ততদিন তাঁর অপূর্ব লীলামাহাত্ম্যে দিব্যস্থানে সমারূঢ়া থাকতে পারেন) সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই নেই।

এখন, ভাবছি, এই শীতের মরশুমে অভিশপ্ত কলকাতা নগরী পরিত্যাগ করে দিন কয়েকের জন্য ভাগিস রাজধানী ইন্দিরাপ্রস্থে এসেছিলাম এবং ভাগিস ইন্দিরাপসন্দ ইংরাজি দৈনিক ন্যাশন্যাল হেরাল্ডের (১৪ নভেম্বর, দিল্লি সংস্করণ) পাতাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে-ছিলাম! তাই তো পি টি আই পরিবেশিত এমন একটি খাসা খবর নজরে পড়ল। এবং জনাব, এ অধম, সেই সূত্রেই আপনার সন্ধান পেয়ে কৃতার্থ হল।

জনাব, দেখে আরও ভাল লাগল যে আপনি, শুধু কবি কি শুধু ঐতিহাসিক কি

শুধু স্কলার নন। আপনি এ আই সি সির (বলাই বাহুল্য নব কংগ্রেসের) সদস্যও বটেন। শাহ্‌নামা মহাকাব্য সুদূর অতীতে পারস্য দেশের যে কবিটি রচনা করেছিলেন তাঁর এবম্বিধ গুণরাজি ছিল কিনা জানা যায় না। সেই কারণেই মনে হয় তাঁর মহাকাব্যটিও অর্থাৎ শাহ্‌নামা আপনার ইন্দিরানামার ধারেকাছেও দাঁড়াতে পারবে না।

জনাব, এমন একটি খাসা খবর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার এই নতুন চেলাটি "ইন্দিরানামা" মহাকাব্যের চেহারাটা এক নজর দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। তাই সম্ভব অসম্ভব সর্বত্র গিয়ে ঢুঁ মারলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম আফরো-এসিয়ান লেখক সম্মেলনে গিয়ে ঢুঁ মারব। কারণ এমন প্রোগ্রেসিভ নুমায়েশ কালেভদ্রে নাগালের মধ্যে আসে। এবং ইন্দিরানামার খোঁজ এখানে অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু ও হরি! সেখানেও দেখি ওয়াক-আউট। ন্যাশন্যাল হেরালডের প্রতিবেদক ১৮ই নভেম্বর জানাচ্ছেন, লখনউ-এর আফ্রো-এসিয়ান কবি ও শিল্পী জনাব হাসান শাহীর এইদিন আফরো-এসিয়ান লেখক সম্মেলন থেকে ওয়াক-আউট করেছেন। শুধু তাই নয় এই সংস্থা অর্থাৎ কিনা আফ্রো-এসিয়ান লেখক সম্মেলন "আমেরিকান ইমপিরিয়ালিজম্‌-এর দালালি করছে," এই অভিযোগে পদত্যাগও করেছেন। এই খবরটি পড়ে, জনাব, মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমেরিকান ইমপিরিয়ালিজমের নামগন্ধও যেখানে থাকে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার ছায়াও মাড়ান না। নিশ্চয়ই আপনি আপনার ৫৩ বয়েতের কোনও একটাতে ইন্দিরাজীর এই নন-অ্যালাইনড্‌ স্বভাবের গুণকীর্তন করেছেন। তাই আমিও আর ওদিকে পা বাড়ালাম না।

জনাব, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, অনেক চেষ্টা করেও আপনার ইন্দিরানামা চাক্ষুস করতে পারিনি। তবে আন্দাজ হয়, আপনার এই চেলাটি ইন্দিরামঙ্গল কাব্যের যে খসড়াটি তৈয়ার করেছিল, আপনার ইন্দিরানামা তারই কাছাকাছি থাকবে। যথা:

সর্বশক্তির অধিকারিণী, হে দেবি,
তোমার চরণতলে আমি আশ্রয়প্রার্থী
আমাকে আশ্রয় দাও
হে দেবি, কোটি সূর্যের তেজ তোমার অন্তরে
বেগবান মরুৎ তোমার সারথি
তোমাকে ঠেকায় কে
তুমি কুপিতা হইলে আমার সর্বনাশ
তুমি প্রসন্না থাকিলে আমার পৌষ মাস
তুমি প্রসন্না হও
হে কীর্তিময়ী, তোমার কীর্তি [illegible]
তোমার তুলনা নাই
সর্বশক্তির মূলাধার হে দেবি
তব চরণতলে সদা রাখিও
তোমার শত্রুর কাছে হে দেবি
তুমি জারমলিন জহ্লাদের যম
তোমার মিত্রের কাছে তুমি কল্পতরু
আমি তোমার চির অনুগত
তোমার শাসনে ভারত আজ সুখী
জগৎসভায় আজ তাহার উচ্চাসন
দেবি, তোমার জয় হোক
তোমার রণনীতি ভারতকে
শত্রুশূন্য করিয়াছে
তোমার কূটনীতি ভারতের
মিত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে
দেবি, তোমার জয় হোক
তোমার কৃষিনীতি ভারতের
ভূমিহীনকে ভূমি দিয়াছে
তোমার অর্থনীতি সকলের দুঃখ
দূর করিয়াছে
জয় জয় দেবি চরাচর সারে—
ইত্যাদি ইত্যাদি

আদি কংগ্রেসের পরিণতি

বিভিন্ন উত্তেজক দ্রব্য সেবন করে দেহ ও মনকে চাঙ্গা করে রাখার চেষ্টা করা হলে একদিন যে বিরাট বিপদ আসতে বাধ্য এবার নিশ্চয়ই আদি কংগ্রেসের নেতারা তা বুঝেছেন। এখন তাঁদের দল বিরাট বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাঙ্গন প্রায় অনিবার্য। সে ভাঙ্গনটা বড় দরের না হলেও তার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে পার্টির দেহ ও মনের উপর।

আদি কংগ্রেসের নেতারা প্রায় গোড়া থেকেই এই ভুলটা করে এসেছেন। উত্তেজক দ্রব্য সেবনে তাঁরা পারটিকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বার বার দলের সমর্থকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, সরকারী ক্ষমতা হাতে এল বলে। তাঁরা খুব খোলাখুলিভাবেই জাহির করেছেন যে, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য যেনতেন প্রকারেণ ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটানো। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা বার বারই সংসদীয় জোট গঠনের চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এখন সবাই বুঝেছেন তেমন জোট হওয়া আপাতত অসম্ভব। তাঁরা এও বুঝেছেন, ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটানোও অন্তত তাঁদের পক্ষে প্রায় অসাধ্য কাজ। তাঁরা উত্তরপ্রদেশে নব কংগ্রেস-বিরোধী সরকারের পরিণতিও দেখছেন।

তাই, খুব সহজভাবেই পারটির মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে। এখন তার অনেকের পক্ষেই গদি-দখল-সম্ভাবনা-বটিকা সেবন করে দেহ ও মনকে চাঙ্গা রাখা সম্ভব হচ্ছে না! তাই, আজ, আদি কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গনের আশংকা দেখা দিয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী এই সুযোগটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। যে মুহূর্তে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আদি কংগ্রেসের একটা অংশে হতাশা নেমে আসছে অমনি তাঁদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি অবশ্য 'ভাঙ্গন' কথাটা মুখেও আনেন নি। তিনি প্রকাশ্যে এই ব্যাপারে তেমন কিছু বলতেও অরাজী। কিন্তু হতাশ আদি কংগ্রেসীদের এটা তিনি স্পষ্ট বুঝতে দিয়েছেন যে, তাঁরা নব কংগ্রেসে আসতে চাইলে তাঁদের সাদর অভিনন্দন জানানো হবে। এও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আদি কংগ্রেসী এম-পি এম-এল-এ ও নেতারা নব কংগ্রেসে এলে তাঁরাও তাবৎ সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

স্বভাবতই এই অফার বেশ কিছু আদি কংগ্রেসীকে প্রলুব্ধ করবে। বিশেষ করে যাঁরা এম-পি বা এম-এল-এ। কংগ্রেসীরা দীর্ঘ কুড়ি বছর সরকারী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে করতে এই জিনিসে এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, এখন আর এটা ছাড়া তাঁদের চলতে অসুবিধা হয়। তাই আদি কংগ্রেসীদের অনেকেও সরকারী সুযোগ-সুবিধা আবার ভোগ করতে একান্ত অভিলাষী। প্রধানমন্ত্রীর গোপন আহ্বান তাই স্বভাবতই তাঁদের প্রলুব্ধ করছে। "পুনর্মিলন" নামক ভদ্র শব্দটার আড়ালে তাই তাঁরা নব কংগ্রেসে ঢুকে পড়ার তাল খুঁজছেন।

❀

এই সরকারী ক্ষমতার লোভ দেখিয়েই প্রধানমন্ত্রী তাঁর দল রেখেছেন। ইন্দিরা গান্ধী আজ যদি কোনও কারণে হঠাৎ ক্ষমতাচ্যুত হন, তাহলে তাঁর দলে একেবারে ব্যাঙ্করাশ হবে। হাতে সরকারী ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও আদি কংগ্রেসে ষাটজন এম-পি আছেন। নব কংগ্রেস বা ইন্দিরা গান্ধীর দল ক্ষমতাচ্যুত হলে তার অর্ধেকও থাকবে কিনা সন্দেহ।

তাঁর দল যে প্রধানত সরকারী ক্ষমতা কেন্দ্রিক প্রধানমন্ত্রী নিজেই তা সবচেয়ে ভাল করে মানেন। সেই জন্যই তিনি আর যাই করুন সরকারী ক্ষমতা ছাড়তে রাজী নন। যে কোনও ভাবে ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবেনই।

এবং, এটাও তিনি জানেন যে যতদিন তাঁর হাতে কেন্দ্রীয় সরকার আছে ততদিন নানাভাবে তাঁকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও ভয়ে এবং লোভে নানা লোক তাঁর কর্তৃত্ব মেনে চলবে। তাঁরা গোপনে গোপনে যতই তাঁর পতন ঘটাবার চেষ্টা করুন, প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সাহস পাবেন না। কারণ, তাঁরা সরকারী ক্ষমতাকে ভয় করেন। কারণ,

শিবরাম চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা

তাঁর খ্যাতি যে মূলত ছোটদের একজন শ্রেষ্ঠ সা হি ত্য কা র হিসেবেই, সে-কথা স্বীকার্য : তবু সন্দেহ নেই, শিবরাম চক্রবর্তী সেই বিরল জাতের সাহিত্যিক, যাঁদের লেখা থেকে ছোটরা তো দুশো-মজা পায়ই, বড়রাও কিছু কম আনন্দ পান না। আজ যাঁদের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, ধরেই নেওয়া যায় যে, শিবরাম চক্রবর্তীর বই পড়তে-পড়তে, হাসতে-হাসতে তাঁরা বড় হয়েছেন, এবং বড় হয়েও সমান আগ্রহে পড়ে যাচ্ছেন তাঁর লেখা। তাঁর সৃষ্টি অবশ্যই বিচিত্র; কিন্তু জীবনও কিছু কম বিচিত্র নয়। বাংলা সাহিত্যের সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বাউন্ডুলে সেই মানুষটির স্মৃতি-কথা আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। নাম: **ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা।**

সরকারী দাক্ষিণ্য তাঁদের প্রয়োজন। কারণ, তাঁদের নিজেদের অনেক গলদ আছে।

প্রচণ্ড সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করেই প্রধানমন্ত্রী এখন তাঁর প্রত্যেকটি সমস্যা ও বর্তমান প্রতিপক্ষকে খানখান করে দিতে এগিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেকটি বামপন্থী দলের মধ্যে আজ ভাঙন। দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থী দলগুলির মধ্যেও নানা কারণেই উথালপাথাল চলছে। নিজের দলের মধ্যে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী তাঁদেরও পায়ের তলার মাটি কেটে দেওয়ার চেষ্টায় সদাসচেষ্ট। এমন কি, দিল্লির উচ্চপর্যায়ের অফিসারদেরও একের বিরুদ্ধে আর একজনকে লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক আজ এত মধুর, তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের পরিমাণ আজ এতই বেশী যে, এক সঙ্গে বসে দু দণ্ড আলাপ-আলোচনা করাও নাকি অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী এইভাবেই হাতে ক্ষমতা রাখতে চান।

তিনি এবার এগিয়েছেন তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ আদি কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে। এই চেষ্টায় যদি বড়রকমে সফল হন তাহলে সরকারী ক্ষমতা হাতে রাখায় তাঁর সুস্পষ্ট সুবিধা হবে। তাঁর শক্তি আরও বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে ম্যানুভারিং ক্ষমতা।

আদি কংগ্রেসের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় নামা সম্ভব নয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ, তাঁদের হাতে সরকারী ক্ষমতা নেই। তাই যত তাঁরা সরকারী ক্ষমতা লাভের বাসনাকে নির্ভর করে দল বাড়াবার চেষ্টা করেছেন ততই ডুবেছেন। আজ সরকারী ক্ষমতা যত দূরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে সরকারী ক্ষমতালোভাতুরদের হতাশা ততই বাড়ছে!

কিন্তু এপথে না গিয়ে যদি তাঁরা সংগঠন বাড়াবার এবং তাকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করতেন তাহলে অবশ্য এই বিপদে আজ পড়তে হত না। দলের কেন্দ্রীয় নেতারা লোকসভায় নানাপ্রকারের পার্লামেন্টারি-কমবিনেশনের জন্য যতটা সময় ব্যয় করেছেন তার অর্ধেকটাও যদি সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে ব্যয় করতেন তাহলে নিশ্চয়ই অনেক বেশী সুফল পেতেন।

যেমন মাদ্রাজে পেয়েছেন কামরাজ এবং পশ্চিমবঙ্গে পাচ্ছেন প্রফুল্ল সেন। কামরাজ অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে নিজ রাজ্যে দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তার সফলও পেয়েছেন। ওখানে ইন্দিরা গান্ধীর দল ডুবছে এবং কামরাজের দল বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গেও প্রফুল্ল সেনরা সেই পথে এগোচ্ছেন। তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নতুন সংগঠন গড়ার চেষ্টা করছেন।

মাদ্রাজের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অবশ্য নানা তফাৎ। মাদ্রাজে ডি-এম-কে'র প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে আদি কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করা ততটা কঠিন ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রধান সি পি এম-বিরোধী দল হিসাবে এখনই আদি কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, এখানে সি পি এমের বিরোধী বহু দল আছে এবং তাঁদের শক্তি, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং জনবল আদি কংগ্রেসের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। তার উপর এখানে আছেন অজয় মুখার্জী। তিনিই আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতম সি পি এম-বিরোধী নেতা বলে পরিচিত। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে শক্তিশালী নির্বাচনপন্থী দল সি পি এমের বিরোধী যে রাজনীতি তা অজয়বাবুকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে বাধ্য।

কিন্তু তবু আদি কংগ্রেসীরা এই রাজ্যে এগিয়েছেন। এগিয়েছেন গ্রামে, এগিয়েছেন ছাত্রদের মধ্যে। পার্টি ভাগের সময় ছাত্র পরিষদের প্রায় সবটাই চলে গিয়েছিল নব কংগ্রেসের সঙ্গে। সেই প্রায়-শূন্য থেকে শুরু করেও আজ আদি কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এগিয়েছে। নব কংগ্রেস যদি সি পি আই'র সঙ্গে প্রকাশ্যে আঁতাত করে তাহলে তার ও দলের জন্যেই আদি কংগ্রেসীদের সুযোগ আরও বাড়বে। সুযোগ বাড়বে গ্রামে এবং শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

কিন্তু দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব নিজেদেরই এদিকে এগোতে পারলেন না। এখন তো আর কোনও অফিসারদের অভিজ্ঞতার পরশ নেই। আজ এখানে কংগ্রেসীরা তাঁদের সামনে নিরন্তর আলো দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা অধিকাংশই এগিয়ে এসেছিলেন দলকে শক্তিশালী করতে। তাঁদের চোখে মুখে ছিল কঠোর পরিশ্রমের প্রতিশ্রুতি। কেন্দ্র তাঁদের ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারলেন না। তাঁরা শর্টকাটে সরকারী ক্ষমতা লাভের লোভে নিজেদের এবং দলকে এত বেশী জড়িয়ে ফেললেন যে গোটা দলটা দিশাহারা হয়ে গেল।

*

সরকারী ক্ষমতার মোহ কী বিচিত্র জিনিস দেখুন—এত বার ধাক্কা খেয়েও, নানাভাবে এত অপমানিত হয়েও তাঁরা শর্টকাটের মোহ ছাড়তে পারছেন না! এখনও তাঁরা এই সংসদেই পার্লামেন্টারি-কমবিনেশনের কথা ভাবছেন। এখনও কেউ কেউ প্রকাশ্যেই আজই ইন্দিরা-সরকারের পতন ঘটিয়ে গদিতে চড়ে বসার মোহে আবিষ্ট।

কিন্তু উত্তরপ্রদেশ দেখেও কি তাঁরা এটা বুঝছেন না, যে এই শর্টকাটের মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে দেওয়ার মত একটা কিছু করা প্রায় অসম্ভব?

উত্তরপ্রদেশে যেভাবে এস-ভি-ডি সরকার এগোচ্ছে সেইভাবে কোনও সরকারের অগ্রগতি কি সম্ভব? না, তার দ্বারা দেশের কোনও উপকার হতে পারে?

৫৩ জনকে মন্ত্রী করতে হয়েছে এক মাসেরও বেশী হয়ে গেল এখনও সব দপ্তর ভাগ সম্পন্ন হল না। সরকার এখনও কোনও বড় জরুরী প্রশ্নে স্পষ্ট করে তার নীতি ঘোষণা করতে পারলেন না। এই সরকার দেশের ভাল হতে পারে? এই রকম সরকার দেশের কোনও মঙ্গল করতে পারে না।

এই রকম একটা সরকার যদি কেন্দ্রে হয় তাহলে ভাবুন তো দেশের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? ভাবুন তো অস্থিরতা অনিশ্চয়তা আরও কত বাড়বে?

ইন্দিরা গান্ধী বহু অন্যায় করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী মোটেই গণতান্ত্রিক পথে চলছেন না। ইন্দিরা গান্ধী দেশে ব্যক্তিতন্ত্র বা ব্যক্তিপূজা প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। সবই সত্যি। কিন্তু তাহলে, দেশের পক্ষে, মধ্যপন্থা মানুষের পক্ষে সি এস পি-জনসংঘের জন্য একটা কেন্দ্রীয় সরকার কি কাম্য এবং মঙ্গলজনক? দেশ কি তাতে আরও ডুববে না?

২২-১১-৭০

রমন চলে গেলেন

সমরজিৎ কর

১৯৩০। সারা পৃথিবীতে এক প্রচণ্ড চমক। সে সংবাদ ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের মনে এক দারুণ বিস্ফোরণ। যেন অসম্ভব ঘটনা।

১৯৩০। বিশ্ববিখ্যাত নোবেল কমিটির ঘোষণা এসে পৌঁছলো:

'For his work on the scattering of light and for the discovery of the effect named after him.'

হ্যাঁ, আলোক বিজ্ঞানের উপর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ভারতীয় এক বিজ্ঞানী। চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। আলোকের বিচ্ছুরণের উপর তাঁর মৌলিক গবেষণা। তাঁর আবিষ্কারের নাম 'রমন এফেক্ট'।

সম্ভবত সেই শুরু। তারপর দীর্ঘ চার দশকেরও কিছু বেশি সময় যে বিরামবিহীন যাত্রা, শনিবার, নভেম্বর ২১, সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। রমন বিদায় নিলেন। সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হল এমন একটি দৃষ্টান্ত, যিনি দেখিয়ে গেলেন পৃথিবীর হট্টগোলের মধ্যেও কর্মসাধনা কীভাবে অবিচলিত রাখা যায়। দীর্ঘ চার দশকে ভারতে কত পরিবর্তন হয়ে গেল, রাজনৈতিক, সামাজিক, অনেক অনেক পরিবর্তন। কিন্তু রমন তাদেরই মাঝে এক সমাহিত পুরুষ। বিজ্ঞান তাঁর ধ্যান, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সাধনা। কাজ, শুধু কাজ। এই সেদিনও বার্ধক্যের প্রান্তদেশে এসেও তিনি গবেষণা করেছেন হীরে, চুনী, পান্না প্রভৃতি প্রকৃতিজাত, খনিজ কেলাসের গঠনতত্ত্ব আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে, কাজ করেছেন থিয়োরি অব ভিশনের উপর। অথবা থিয়োরি অভ্‌ সেন্স, যা শারীর বিজ্ঞানীদের যেমন কৌতূহলী করেছে সেই সঙ্গে বিস্মিতও। তরল জৈব-রাসায়নিক পদার্থের আণবিক গঠন নির্ণয়ের ব্যাপারেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

১৯২৫। এইচ এ ক্রেমার এবং হাইজেনবার্গ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আপতিত আলোক রশ্মির মধ্যে অবস্থান করে এক-রঙা বিকিরণের সমষ্টি বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির মধ্যে তারা তো থাকেই, সেই সঙ্গে থাকে অন্যান্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মিও। তবে তখনও পর্যন্ত এর সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ঐ সময়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমন এবং তাঁর সতীর্থরা আণবিক বিচ্ছুরণের উপর অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। ১৯২৮ সালে এঁরা বিশেষ একটি তরল পদার্থ দিয়ে মার্কারি-আর্ক ল্যাম্পের আলো বিচ্ছুরিত করেন। মূল আপতিত রশ্মির বর্ণালী নেওয়া হল। সেই সঙ্গে নেয়া হল তরলের উপর থেকে ঠিকরে আসা আলোক রশ্মির বর্ণালী।

রমন দেখলেন তরল পদার্থের মধ্যে থেকে ঠিকরে আসা আলোক রশ্মির বর্ণালীর মধ্যে সত্যিই কিছু কিছু নতুন ধরনের বর্ণালী-রেখা ফুটে উঠেছে। ক্ষীণ। অতি ক্ষীণ। তবু নিঃসন্দেহ সবলে। মূল আপতিত

রশ্মির বর্ণালীর মধ্যে ওদের খুঁজে পাওয়া যায় নি। ক্রেমার এবং হাইজেনবার্গের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হল। প্রমাণিত হল আপতিত রশ্মির মধ্যে এক-রঙা রশ্মির মিশ্রণ থাকলেও, সেই রশ্মিই যখন অপর কোন পদার্থের উপর ঠিকরে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে মূল রশ্মিগুলি ছাড়াও অন্য ধরনের বিকিরণেরও উদ্ভব হয়। এরই নাম রাখা হল 'রমন এফেক্ট'। এরই পুরস্কার নোবেল কমিটির ঘোষণা।

১৯২১ সালে ইউরোপ ভ্রমণের সময় রমন লিখেছিলেন, ...ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করার সময় সমুদ্রের শান্ত নীল রঙ দেখার সুযোগ হয়েছিল। কেন এই রঙ? আমার মনে হয়েছিল জলের অণুগুলিই সূর্যের আলোকে বিচ্ছুরিত করে এমন দৃশ্যের অবতারণা করেছে। ১৯২১-এর সেপ্টেম্বরে কলকাতায় ফিরে এসে কাজ শুরু করি।...দেখলাম আণবিক বিচ্ছুরণের ব্যাপারটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। শুধু বাষ্প বা বায়বীয় পদার্থেই নয়, তরল কেলাস অথবা অকেলাস পদার্থের মধ্যেও এটা ঘটে থাকে। সুতরাং এটা ঘটে ঐ সমস্ত মাধ্যমের অণুগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘোরাঘুরি করে বলে। ১৯২৩ সালে আণবিক বিচ্ছুরণের ওপর এই ব্যাপারটার উপর বেশ কিছু কাজ করেছিলেন রামনাথন। কলকাতায়। ১৯২৪এ বিভিন্ন তরল পদার্থের ক্ষেত্রেও এটা চোখে পড়ল কৃষ্ণাণের। অবশেষে শেষ সাফল্য এল ১৯২৮এ।...

রমনের এই আবিষ্কার পদার্থের আণবিক গঠন নির্ণয়ের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এরই উপর তিনি আরও ব্যাপক গবেষণায় হাত দেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে 'লেজার'-এর উপর আমরা অনেক কথা শুনেছি। সম্প্রতি একটি সংবাদে বলা হয়েছে, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রমন আবিষ্কার করেন, সাধারণ আলো কোন কোন অণুর উপর পড়লে তার কিছুটা শক্তি ক্ষরিত হয়ে যায়। পরে সেই আলো বিচ্ছুরিত অবস্থায় নিম্ন কম্পাঙ্ক নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।... ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে এই তত্ত্বের অনুরূপ ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নোবেল বিজ্ঞানী ডঃ টাউনস ক্ষুদ্র তরঙ্গকে জোরালো করে তোলার চেষ্টা করেন। এখান থেকেই সূত্রপাত 'মেজার'-এর। পরে এল 'লেজার'।

জন্ম নভেম্বর ৭, ১৮৮৮। দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপল্লীতে। পিতা সেখানকার এস পি জি কলেজের শিক্ষক। শিক্ষা: ১৯০২ সালে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে ১৯০৪-এ পদার্থ বিদ্যায় প্রথম স্থান পেয়ে বি এ উপাধি লাভ। ১৯০৭-এ সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে এম এ এবং ঐ সালেই কলকাতায় অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল পদ লাভ করে আগমন। ১৯১৭-১৯৩৩ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের পালিত অধ্যাপক। অতঃপর বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স-এর অধ্যক্ষ এবং অবশেষে ১৯৪৮ থেকে সেখানকার রমন রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রধান। আমৃত্যু তিনি তাঁর কর্মময় জীবনকে বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন। ১৯১৯-এ রমন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর অবৈতনিক সেক্রেটারি, ১৯২৬এ ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স-এর প্রবর্তন, ১৯২২এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এসসি উপাধি এবং ১৯২৯এ ফ্রাইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি লাভ। ১৯২৪এ লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো, ১৯২৮এ ইটালির অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স থেকে মাত্তুচি পদক প্রাপ্তি এবং ১৯২৯এ নাইট উপাধি।

হ্যাঁ, উপাধি এবং সম্মান অনেক এসেছে। তবু তাদের প্রাচুর্য বা ভীড় অক্লান্ত এই মানুষটিকে মূল লক্ষ্য থেকে কোনদিন বিচ্যুত করে নি। এ কারণেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে রমন এক দৃষ্টান্ত। রমন ভারত-রত্ন।

তিন সঙ্গী

দেবরাজ

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির গদিতে বসেই আনোয়ার সাদাত যে বলেছিলেন নাসেরের পথই তাঁর পথ তা যে নেহাত বাত কা বাত নয়, সেটা তিনি প্রমাণ করেছেন নভেম্বরের ৮ তারিখে। কায়রোতে পাঁচ দিন বৈঠকের পর লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি মুয়াম্মার কাদ্দাফি আর সুদানের রাষ্ট্রপতি জাফর নুমেরির সঙ্গে মিলে তিনি ঘোষণা করেছেন মিশর, সুদান আর লিবিয়া নিয়ে ফেডারেশন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র গড়বার সংকল্প তিন আরব নেতা করেছেন। তাঁদের আশা এই নতুন পরিকল্পনা যদি সফল হয় তা হলে আরব সংহতির বনিয়াদ পাকা হবে, সব আরব দেশ মিলে একটা বিরাট আরব রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। এমনতর আরব রাষ্ট্র গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন গামাল আবদেল নাসের। তাঁর স্বপ্ন অবশ্য সার্থক হয় নি। খালি তার চিহ্ন রয়ে গেছে মিশরের নামে আর তার জাতীয় পতাকায়। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র কারুর সঙ্গে এখন আর সংযুক্ত নয়। অপরের সঙ্গে তার পাকাপাকি সংযোগ শেষ হয়েছে অনেক কাল আগেই। আসলে সে দেশ এখন মিশর ছাড়া আর কিছু নয়। তার পতাকার দুটি তারার একটি অনেক আগেই খসে পড়েছে।

আরব সংহতি একটি মাত্র রাষ্ট্রের বাঁধনে ধরে ফেলতে চেয়েছিলেন নাসের। ১৯৫৮ সনে মিশর আর সিরিয়া মিলে গড়ে তুলেছিল সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র। তিন বছরের বেশী তা টেঁকেনি। টিঁকে আছে কোনও মতে শুধু নামটা মিশরের সংবিধানে। ইরাক তাদের সঙ্গে জুটে একটা ফেডারেশন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিল ১৯৬৩ সনের এপ্রিলে। চার মাসেই তার আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছিল। ইয়েমেনের সঙ্গেও আলগা গাটছড়া বাঁধার যে চেষ্টা নাসের করেছিলেন তাও ব্যর্থ হয়েছিল এক রকম শুরুতেই। এর পর নতুন কোনও উদ্যোগ আরবদের একই সুতোয় বাঁধবার নাসের করেন নি। তবে সে আশা তিনি ছাড়েনও নি। নইলে মিশরের নাম বদলে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র রাখার কোনও মানে হয় না। অবশ্য বার বার ঠকে তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। বাইরে আরব দেশগুলির সব কটিকে কিংবা কয়েকটিকে নিয়ে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গড়ে তোলবার জন্যে আগ্রহ না দেখালেও ভেতরে ভেতরে সে চেষ্টা তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। তারই সূচনা হিসেবে আরব সংহতি আরও শক্ত করবার জন্যে তিনি প্রাণপণ করেছেন।
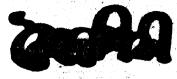
নাসেরের মতো লোক যা করতে পারেন নি তা কি সাদাত করতে পারবেন? এ প্রশ্নের জবাব কোনও মানুষ দিতে পারবে না—পারবেন একমাত্র বিধাতা পুরুষ। আর তিনি তো নিরুত্তর। তবে খবরটা রটতে না রটতেই ইউরোপ আমেরিকায় যে রকম হইচই পড়ে গেছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে তিন বন্ধুর যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঠোঁট বেঁকিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়—অন্তত পশ্চিমী ধুরন্ধররা তা মনে করছেন না, আর বোধ হয় ইস্রায়েলও ব্যাপারটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে চাইছে না। আগে যে সব পরিকল্পনা হয়েছিল সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গড়বার সেগুলোতে গলদ অনেক ছিল। এবারের পরিকল্পনাতেও যে নেই তা নয়। কিন্তু এবারের একটা মস্ত সুবিধে হচ্ছে মিশর, সুদান আর লিবিয়া লাগোয়া দেশ। তাদের নিয়ে একটা যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। তার ওপর সুদান আর লিবিয়ার যাঁরা আজ রাষ্ট্রপতি তাঁদের বয়েস কম তো বটেই—কাজেই নতুনত্বে তাঁদের আপত্তি নেই—তাঁরা নাসেরের গোঁড়া ভক্তও। নাসেরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা নিজের নিজের দেশে ক্ষমতা দখল করেছিলেন পুরোনো শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে।

তিন তরুণ রাষ্ট্রনায়কের চেষ্টা যদি সার্থক হয় তা হলে উত্তর আফ্রিকাতে দেখা দেবে এক জোরালো রাষ্ট্র। এই নতুন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা হবে পাঁচ কোটির ওপর। আয়তনে এটি হবে দুনিয়ার সাত নম্বর রাষ্ট্র, আর্থিক অবস্থাও এর ভালোই হবে। লিবিয়াতে আছে প্রচুর পেট্রোল। সুদান আর মিশরে জনমায় তুলো। তা ছাড়া সুদানের আছে কৃষিসম্পদের প্রাচুর্য। তিন দেশ এক হয়ে যদি আর্থিক উন্নয়নে লেগে যায় তা হলে লাভ প্রত্যেকেরই হবে। তেল বেচে প্রচুর টাকা করেছে লিবিয়া। সে টাকা যদি যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতির জন্যে লগ্নী করে তা হলে নানান শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে ওই এলাকায়। মিশরে দক্ষ কারিগরের অভাব নেই। শিল্প তিন রাষ্ট্রে গড়ে উঠলে তাদের বেকারি ঘুচবে, তাদের শিক্ষাদীক্ষাও কাজে লাগবে—যা এতকাল নষ্ট হচ্ছে সুযোগের অভাবে। তিন প্রতিবেশী যদি আর্থিক উদ্যোগের ব্যাপারে হাত মেলায় তা হলে উত্তর আফ্রিকার সমৃদ্ধি ঘন ঘন বেড়ে যেতে পারে এ কথাটা আঁচ করেছিলেন নাসের নিজেই। তার গোড়া পত্তনও তিনি করে গেছেন গত বছর ডিসেম্বরে ত্রিপোলিতে তিন দেশের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার এক চুক্তি সই করে।

তিন দেশেই ইহুদিবিদ্বেষ খুব প্রবল। পারলে তারা ইস্রায়েলের অস্তিত্ব মুছে ফেলে দুনিয়ার মানচিত্র থেকে। ইহুদি বান্ধবরা উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাই হিসেব করে দেখছে তিন দেশ এক হলে ইস্রায়েলের বিপদ কত বাড়বে। মিশরকে আর সুদানকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাচ্ছে রুশিয়া, লিবিয়াকে ফ্রান্স আর ব্রিটেন। ফ্রান্স দিচ্ছে ১১০টা মিরাজ জেট বিমান, ব্রিটেন ১৮৮টা সেন্টুরিয়ন ট্যাঙ্ক। যুক্তরাষ্ট্র গড়বার খবরে ফ্রান্স আর ব্রিটেন দু' দেশই ঘাবড়ে গিয়েছে। তারা লিবিয়াকে যুদ্ধের সরঞ্জাম যোগাচ্ছে এই শর্তে যে সেগুলো যেন না ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় কিংবা অন্য কোনও রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। তিন দেশ যদি এক হয় তাহলে তো আপনিই ও শর্ত নাকচ হয়ে যাবে, তাতে বিপদ বাড়বে ইস্রায়েলের। ফ্রান্স আর ব্রিটেন নাকি হুঁশিয়ার করেছে লিবিয়াকে, মিশরকে যদি তাদের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তাহলে সে সব জিনিস সরবরাহের চুক্তি তারা বাতিল করে দেবে। কিন্তু তা কী তারা পারবে? যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হতে হতে তো লিবিয়ার যা পাবার কথা তা সে পেয়ে যাবে।

তবে এ সব হচ্ছে গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। মিশর, লিবিয়া, সুদান মিলে মিশে একটা যুক্তরাষ্ট্র খাড়া করতে চেয়েছে এই মাত্র—সে রাষ্ট্র গড়ে এখনও ওঠে নি, তার অনেক দেরী। তিন নেতা ভাবের আবেগে অবশ্য অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু আবেগ মিলিয়ে গেলে তার কতটা টিঁকবে তা কে জানে। রাষ্ট্রপতি কাদ্দাফি জোর গলায় বলেছেন—আমাদের রাষ্ট্র এক, নেতৃত্ব এক, জাত এক, ভাষা এক। কিন্তু যতদিন না যুক্তরাষ্ট্র সত্যি সত্যি তৈরি হচ্ছে ততদিন ওই সব কথার মূল্য কিছুই নয়। সে যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া তৈরি করবে তিন দেশের প্রতিনিধিরা মিলে। কিন্তু সে প্রতিনিধি কারা হবে? মিশরের তবু একটা শক্তিশালী দল আছে, লিবিয়া কিংবা সুদানের তাও নেই। অথচ তিন দেশ মিলে একটা প্রজাতন্ত্রী সরকার গড়ে তুলতে চায়। তার আগে লিবিয়া আর সুদানকে শাসনতন্ত্র ঢেলে সাজাতে হবে। কাজেই রাতারাতি তিন দেশ এক হবে তার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ভাঙ্গা হাইস্কুল থেকে মাট্রিকুলেশন পাশ করে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে এসে ভর্তি হয়েছি। স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজে পড়বার গৌরব যেমন আছে, আছে এগিয়ে যাওয়ার উল্লাস তেমনি আছে পিছু টান। বাড়ির জন্যে মন কেমন করে। বাবা মা ভাই বোন কেউ কাছে নেই। স্কুলে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তারা হয় কলকাতায় না হয় অন্য কোথাও গিয়ে ভর্তি হয়েছে। চট করে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারিনে, কেমন যেন একা একা লাগে। জেলা শহর থেকে বাইশ মাইল দূরের সদরদি গ্রাম মনে হয় যেন দূর-দূরান্তরে পড়ে রয়েছে।

সেই নিঃসঙ্গতার দিনে প্রথম সঙ্গী হয়ে এল নারায়ণ। সন মনে আছে ১৯৩৩, কিন্তু দিন তারিখ মনে নেই। মনে নেই প্রথম আলাপের বিশেষ কোন ঘটনাকে। বানিয়ে লেখা যায়। বানাতাম, যদি দুজনে মিলে বানাতে পারতাম। আজ আর একা একা বানাতে আমার কলম সরে না। দুটি সহপাঠী তরুণ ছাত্রের মধ্যে যেমন স্বাভাবিক ভাবে আলাপ হয় তেমনি করেই আমাদের আলাপ হয়েছিল। প্রথম পরিচয়ের দিনে নিশ্চয়ই তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। সেই পরিচয় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে দিনে দিনে।

মনে পড়ে ক্লাসের মাঝামাঝি জায়গায় একটি বেঞ্চে একদিন আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম। আমার রোল নাম্বার ছিল ৯১, ওর ৪৮ কি। ৪৯ নম্বরটা ও ইচ্ছে করেই নেয়নি। অপয়া বলে? নাকি উনপঞ্চাশ পবনের ধাক্কা লাগবে বলে। সেদিন প্রফেসর দুবার করে আমার রোল নাম্বার ডাকলেন। বুঝতে পারলাম আমার প্রথম বারের সাড়া তাঁর কানে যায়নি। দ্বিতীয় বারও আমার স্বরগ্রাম বেশি উচ্চতর হল না। প্রফেসর কৌতুকের সুরে বললেন, 'এসেছ যে তা জোর করে বলতে পার না?'

সবাই কি পারে?

ক্লাস সুদ্ধ ছাত্র আমার দিকে তাকাল। কারো মুখে হাসি কারো মুখে মন্তব্য।

নারায়ণ আমার পাশ থেকে বলল, 'আপনি ভাববেন না। এর পর থেকে আমিই আপনার হয়ে রেসপণ্ড করব।'

তার বলার মধ্যেও কৌতুক ছিল। কিন্তু সেই কৌতুক মমতাহীন নয়।

হাঁ, ইণ্টারমিডিয়েটের সেই প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেও প্রথম প্রথম আমরা পরস্পরকে আপনি বলে সম্বোধন করতাম। এ কথা শুনলে এখনকার ছেলেদের অবাক লাগবে। পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসেও এখনকার ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা অন্তরঙ্গ হবার পরই একে অন্যকে তুই বলে ডাকে শুনতে পাই। শুনে আমাদেরও অবাক লাগে।

কিন্তু আপনি থেকে আমরা সহজেই তুমিতে নেমে এলাম। ক্লাসে আমি ভালো করে সাড়া দিতে না পারলেও নারায়ণের কাছে সাড়া দিলাম, সাড়া পেলাম। অনুভব করলাম পরস্পরের মনের মিল রুচির মিল, বুদ্ধি প্রবৃত্তির মিল। ও এসেছে কিশোরগঞ্জ-পুরের গ্রাম থেকে আমি এসেছি ফরিদপুরের গ্রাম থেকে। গ্রামের কি স্কুলের লাইব্রেরী থেকে ও যে সব বই পড়েছে আমারও প্রায় সেই সব বই পড়া। নারায়ণ স্কুলে থাকতে গল্প লিখেছে, কবিতা লিখেছে। হাতে লেখা কাগজের সম্পাদনা করেছে আমিও তাই। দুজনের অভিজ্ঞতা এক। বললাম, 'এসো—এখানেও আমরা একখানা কাগজ বার করি।'

নারায়ণ বলল, 'বেশতো।'

কাগজের নাম নারায়ণই দিল 'জয়যাত্রা।' সে কাগজের মাত্র দুজন লেখক। পাঠকও বোধ হয় দু চারজনের বেশি ছিল না। কিন্তু যুগল সম্পাদকের তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার হাতের লেখা ভালো নয়। নারায়ণের লেখা মুক্তার অক্ষর। তাই নারায়ণই মুদ্রাকর হল। জয়যাত্রায় আমরা গল্প লিখি কবিতা লিখি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখি আর লিখি ধারাবাহিক উপন্যাস। সেই ধারা এক মাসে আমি বহন করি আর এক মাসে নারায়ণ। আমাদের সব বিষয়েই পরামর্শ চলে। কিন্তু উপন্যাসের পরবর্তী অধ্যায় সম্বন্ধে আমরা নীরব। একজন আর একজনকে তাক লাগিয়ে দেব এই হল গোপন বাসনা।

সেই জয়যাত্রা বোধ হয় পাঁচ ছয় মাসের বেশি চলেনি। কিন্তু আমরা দিনের পর দিন পাশাপাশি চলেছি। হাতে হাত ধরে কোনদিন ধুলোভরা গোয়াল চামটের রাস্তায় কোনদিন বা কমলাপুরের ঘাসে ছাওয়া খালের ধার দিয়ে আমরা দুজনে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে হেঁটেছি। বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের কবিতা। ও এক লাইন বলে আমি পরের লাইন বলি। কখনো বা থেমে গিয়ে বলি, 'তুমিই বল। তোমার আবৃত্তি আরও ভালো।'

সেই প্রথম বছরেই পুজোর ছুটিতে নারায়ণ আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেল। কি কারণে যেন ওর সেবার দিনাজপুর যাওয়া হল না। ও বলল, 'চল তোমাদের বাড়িতে যাই।'

আমি বললাম, 'গিয়ে কিন্তু পালাই পালাই করতে পারবে না। পুরো ছুটিটাই কাটিয়ে আসতে হবে।'

ও বলল, 'বেশতো।'

রাত্রে দুজনে মিলে গয়নার নৌকোয় উঠলাম। অনেক যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে একটি বিছানা পাতা হল। পাশাপাশি শুয়ে রাত ভর কত গল্প করতে করতে আর বৈঠার শব্দ শুনতে শুনতে এলাম।

সকালে নৌকো এসে ভাঙ্গার বাজারের পারে ভিড়ল। বাজার তখন মিলতে শুরু করেছে। তখন আমার জেঠতুতো দাদা নিত্যানন্দ মিত্রের একটি মুদি দোকান ছিল। রাত্রে বাপি বন্ধ করে সেই দোকানেই তিনি ঘুমোতেন। ডিঙি নৌকোয় করে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার আগে আমি দোকানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার এই বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিলাম।

বললাম, 'বড়দা, ও আমাদের বাড়িতে যাচ্ছে।'

বড়দা বললেন, 'বেশ বেশ। এ যে দেখছি কার্তিক ঠাকুর।'

ছেলেবেলা থেকেই নারায়ণ ভারি সুন্দর দেখতে। ছিপছিপে চেহারা, গৌরবর্ণ। মাথার চুলে চিরুনির শাসন নেই তবু কি সুন্দর লাগে।

পরবর্তী গঙ্গোপাধ্যায় শুনে বড়দা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ব্রাহ্মণ? ব্রহ্মাকে জানেন নাকি?'

নারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে স্মিত মুখে জবাব দিল 'জানিনে। কিন্তু জানবার ইচ্ছে আছে।'

কথায় বার্তায় ওর এই সরস সপ্রতিভতা কোন দিন ম্লান হয়নি।

বাড়িতে মাত্র দু-একদিনের আলাপ-পরিচয়েই ও সকলের আপন হয়ে গেল। আমার দুই ভাই কানু বাচ্চু (ভালো নাম ধীরেন আর হেমেন) নারাণদার একান্ত অনুগত হয়ে উঠল। বাবা বললেন, 'ও একজন বড় লেখক হবে।'

কাকা বললেন, 'সব সময় কলম হাতে নিয়েই আছে। যখনই জিজ্ঞেস করি 'ঘরের কোণে বসে কী করছ গাঙ্গুলী?' ও বলে লিখছি একটু একটু। একটু একটু করতে

করতে ও যে মহাভারত লিখে ফেলল।'

কিন্তু শুধু ঘরের কোণে বসে থাকবার মত ছেলে নারায়ণ নয়। তার নানা দিকে কৌতূহল। জলে ডাঙায় বনে বাদাড়ে সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি।

বাবার মাছ ধরার শখ। নারায়ণ উঠল তাঁর সঙ্গে বঁড়শি হাতে ডিঙি নৌকোয়। আমি যাইনি। কানু আর নারায়ণকে নিয়ে বাবা গেলেন বিলে মাছ মারতে। ফিরে এলেন প্রায় খালি হাতে। হেসে বললেন, 'কবিকে নিয়ে কি আর মাছ ধরা যায়? জলে বড়শি ফেলে ও সারাক্ষণ কেবল গুন গুন করেছে। অত কবিতা শুনলে কি মাছ আসে?'

আমরা সেবার পাড়ার ছেলেরা মিলে সার্বজনীন কালীপুজো করেছিলাম। তখন সার্বজনীন কথাটা চালু হয়নি। আমরা বলতাম বারোয়ারী। সেই পুজোয় নারায়ণ ছিল পুরোহিত আর আমি তন্ত্রধারক। প্রসাদ বিতরণ হয়েছিল ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মিলিত পংক্তি ভোজনে। তখন অস্পৃশ্যতা বর্জনের দিন।

নারায়ণ তখন কবিতাই বেশ লিখত। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর প্রথম যে লেখাটি ছাপা হয় সেটিও কবিতা। প্রথম দুটি লাইন এখনো মনে আছে

'সনাতন চিন্ময়,
তব নূপুরের শিঞ্জিনী নিক্কণ বাজিল কি
প্রাণময়?'

এই সময় দেশেও নারায়ণ একটি কবিতা পাঠিয়েছিল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিতাটি মনোনীত করে ওকে উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। শুরু থেকেই ও আগে আগে চলেছে। বাইরের পাঠকজনের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছে উৎসাহ পেয়েছে। আর আমার উৎসাহের মূলে ছিল ও নিজে। ও বলত, 'লিখে যাও তোমারও হবে।'

ফরিদপুরে কলেজে বছর দেড়েক পড়বার পর ও চলে গেল বরিশালে। গিয়ে ভর্তি হল সেখানকার বি এম কলেজে। সেই প্রথম বিচ্ছেদ বেদনা। আমরা তখন চিঠি লিখতাম। ঘন ঘন চিঠি, বড় বড় চিঠি। চিঠির মধ্যে দুটি একটি করে কবিতাও থাকত।

তারপর নারায়ণের সঙ্গে ফের দেখা হল কলকাতায়। ও তখন বরিশাল থেকে বি-এ পাশ করে এম-এ পড়তে এসেছে। আর আমি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বেরিয়ে ৬৬ শোভাবাজার স্ট্রীটে একটি মেসের অধিবাসী হয়েছি। টিউশনি করি আর করি চাকরির সন্ধান। নারায়ণও এল সেই মেসে। দেখলাম সেই নারায়ণ। আরো লম্বা হয়েছে, গোঁফ দাড়ি কামাতে শুরু করেছে। চেহারা একটু বদলেছে কিন্তু এই ক' বছরের ব্যবধানে আমাদের বন্ধুত্বের কোন বদল হয়নি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর বন্ধুমণ্ডলী আরো প্রসারিত হয়েছে, এতদিনে আমারও দু'-চার-জন আলাদা বন্ধু হয়েছে। তাতে কি। প্রত্যেকটি বন্ধুর স্বাদও তো আলাদা।

কিছুদিন পরে ধীরেনও এসে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হল। বাসিন্দা হল একই মেসের। একই ঘরে মেঝেয় বিছানা পেতে পাশাপাশি থাকি। একদিকে ভাই আর একদিকে বন্ধু। আমি মধ্যবর্তী। আমি দুজনের রক্ষণাধীনে। শিয়রের কাছে প্রত্যেকেরই একটি করে স্যুটকেস। লেখার সময় সেইটিই ডেস্কে রূপান্তরিত হয়। তারই ওপর চলে সাহিত্য সাধনা।

মেসে শুধু থাকবার ব্যবস্থা ছিল। খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ভোজনং যত্রতত্র। আশেপাশের পাইস হোটেলে গিয়ে তিন-জনে খেতে বসতাম। যার কাছে যখন টাকা থাকত সেই বিল মেটাত। তখন নারায়ণও ছিল টিউশনি সম্বল। ও ছুটিছাটায় বাইরে গেলে ওর ছাত্রকে আমি পড়াতাম।

এই মেসে থাকতেই আমাদের প্রথম বই বেরোল। কবিতার বই জোনাকি। কবি একজন নয় তিনজন। নারায়ণ আমি আর বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য নামে আমাদের আর এক বন্ধু। প্রকাশক হলেন হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নারায়ণ আর বিষ্ণুপদর সহপাঠী। তিনিই খরচ দিলেন। জোনাকি নামটি আমারই দেওয়া। নারায়ণ হলে হয়তো রাখত বহ্নিকণা। কিন্তু সে দ্বিতীয় কোন নামের প্রস্তাব করেনি। আমার দেওয়া নামই মেনে নিয়েছিল।

কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করে ও প্রথম চাকরি নিয়ে গেল জল-পাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে। দ্বিতীয় বার আমরা দুই ভিন্ন জায়গার বাসিন্দা হলাম। কিন্তু চিঠিপত্রে যোগাযোগ বজায় রইল। আর একই পত্র পত্রিকায় লেখালেখি। আমি ওর লেখার সমালোচনা করে চিঠি লিখি ও আমার।

তারপর ফের ফিরে এল ও কলকাতায়। প্রথমে সিটি কলেজে সেখান থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। তারপর পঁচিশ ছাব্বিশ বছর ধরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মকীর্তি নানাদিকে ওর ক্রমবর্ধমান সাফল্য প্রসিদ্ধির কথা সবারই জানা। ও তখন রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলে। পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। অগণিত গুণ-মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীর ও প্রিয় অধ্যাপক, সহ-কর্মীদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, সাহিত্য সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রতিটি পত্র পত্রিকার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সাহিত্য সভায় বক্তা ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে নারায়ণ শ্রোতাদের মনোমুগ্ধকারী।

এত গুণবত্তা এত জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই হঠাৎ ওর আয়ত্তে আসেনি, এই সৌভাগ্য প্রতিদিনের নিরলস অনুশীলনে অর্জিত।

এমন নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী মানুষ আমি সমসাময়িক কালে আমার পরিচিত অর্ধ-পরিচিতদের মধ্যে আর দেখিনি।

আমি মাঝে মাঝে বলতাম, 'নারায়ণ এত দিকে এত কাজ করেও এত লেখ কী করে? তোমার পড়ানো আছে, খাতা দেখা আছে সভা-সমিতি আছে। তা সত্ত্বেও ধারাবাহিক লেখাগুলিতে তোমার একটি কিস্তিও খেলাপ হয় না, সম্পাদকরা নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের গল্পটি পেয়ে যান। তুমি নিশ্চয়ই চতুর্ভুজ নারায়ণ।'

চতুর্ভুজের একখানি হাত আমার কাঁধে এসে পড়ত। হেসে বলত, 'তুমিও কি কম লেখ নাকি?'

'আমি? আমি তোমার কাছে কুঁড়ের বাদশা।'

কুঁড়েমিতে যারা বাদশা, জীবনের আর সব ক্ষেত্রে তারা ফকির।

এত ওর কর্মব্যস্ততা তবু ওর মেজাজ বিগড়াতে খুব কমই দেখেছি। বিরস মুখ দেখিনি, নীরস বাক্য শুনিনি। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যাঁরাই ওর সংস্পর্শে গেছেন ওর সৌজন্য শিষ্টতা মধুর স্বভাব প্রীতি-প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পেয়ে এসেছেন।

ওর বহু ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তারা ওর প্রশংসায় মুখর। এমন বন্ধুর মত মাস্টারমশাই তারা আর পায়নি। ও ছিল যথার্থই ছাত্র-সুহৃদ।

নারায়ণ পড়াতে ভালোবাসত। লেখা-লেখির প্রসঙ্গে ও একদিন আমাকে বলেছিল, 'লেখক হিসাবে কতদিন থাকব কি না থাকব তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমার মাস্টারীটি থাকলেই হল। ছাত্রদের আমার পড়াতে ভাল লাগে। আমি ওদের পড়িয়ে খুশি।' ছাত্ররাও ওর কাছে পড়ে খুশী হত।

আমরা বেশির ভাগ লোকই লিখতে চাই কিন্তু কী করে লিখতে হয় তা জানিনে। বলতে চাই কিন্তু কী করে বলতে হয় তা জানিনে। নারায়ণ জানত। তাই ক্লাসে উন্মুখ ছাত্রছাত্রী, সাহিত্যসভায় উৎকর্ণ উৎসুক শ্রোতা শ্রেণীদের সকলের সম্বর্ধনা ওর ছিল নিত্যপাওনা।

নারায়ণ পড়াতে ভালোবাসত। ওর বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য ওর বহু প্রবন্ধ, বিশেষ করে ওর সাহিত্যে ছোটগল্প বইটিতে রয়ে গেছে। সমসাময়িক বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ও সমাসনে বসতে পারত।

ওর মধ্যে একই সঙ্গে জ্ঞানী আর গুণীর সমন্বয় ঘটেছিল। নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায়ের কিসে বেশী সাফল্য, ছোটগল্পে না উপন্যাসে. ওর প্রথম উপন্যাস উপনিবেশই ওর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কিন্তু সেই বিতর্কের মধ্যে আজ আর যাব না। আমি ওর মত সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা নই, বিশ্লেষক নই, গবেষকও নই। আমি এমন ময়রা যে সন্দেশ হয়তো কখনো কখনো খায়, কিন্তু তার স্বাদুতার বর্ণনা করতে জানে না। আমরা বন্ধু হিসাবে অভিন্ন

হৃদয় ছিলাম। কিন্তু লোক হিসাবে ভিন্ন-ধারার। তা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরের বেশির ভাগ লেখা উপভোগ করেছি। বিশেষ করে ওর অসাধারণ প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষমতা আমাদের সমসাময়িক সব লেখকেরই ঈর্ষার বস্তু হয়েছে। এমন প্রকৃতিপ্রেমিক বাংলা সাহিত্যে বেশি আসেননি। এ যেন দেখে দেখে লেখা নয়, ভালবেসে-বেসে লেখা। ও বাংলাদেশের নিসর্গ সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে যেত। প্রকৃতিকে আমরা কেই বা না ভালবাসি। কিন্তু সেই ভালবাসা যদি সবাইর মুখেই ভাষা যোগাত তা হলে আর কথা ছিল কি।

নারায়ণ ইদানীং কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু কাব্য ওকে ছাড়েনি। ওর কবিতা ছিল ওর সমস্ত গদ্যের মধ্যে মুখ লুকিয়ে। সেই লুকনো মুখের স্মিতহাসি যখন তখন ধরা পড়ত।

আমি বলতাম, 'তুমি রাজনীতিই কর আর চক্রপাণিই হও, তুমি আসলে রোমান্টিক কবি।'

ও বলত, 'তুমি রোমান্টিক নও?'

বলতাম, 'জীবনে নিশ্চয়ই।'

'আর সাহিত্যে?'

'যদি দলে টানো তা হলে খুশীই হব।'

বাস্তবকে সাহিত্যে ধরতে পারি এমন সাধ্য কি। যাকে ধরি সে বাস্তবের আর এক স্তর। অপর বাস্তব।

আমাদের বেশির ভাগ লোকেরই লেখা পড়া থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা এক বয়সে পড়ি আর এক বয়সে লিখি। কিন্তু নারায়ণ লেখাপড়া আর পড়ানোর মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এ সৃষ্টি সার্থক শিল্পসৃষ্টির মতই কঠিন আর নৈপুণ্যনির্ভর।

ইদানীং ওর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ কম হত। ও নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আমি তত কাজের মানুষ নই। কিন্তু নিজের অকাজ দিয়ে ওর সময় নষ্ট করতে চাইতাম না। মাঝে মাঝে ফোন করতাম। কোন কোন দিন অনুযোগ করে বলতাম, 'নারাণ, আমিই কেবল ফোন করি তুমি তো কর না।'

নারায়ণ হেসে বলত, 'তোমার টেলিফোন প্রীতি সবাই জানে। আমার তো অত অভ্যাস নেই। একদিন এসো গল্প করা যাবে।'

কিন্তু সেই গল্প করার সময় বড় একটা হয়ে উঠত না। একই শহরে থাকি কিন্তু পাড়া বিভিন্ন। তা ছাড়া প্রত্যেকেরই নানা দায় আছে, আছে দারা পুত্র পরিবার এবং আরো কত কৃত্য-কর্তব্য। সেই হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াবার দিন আর নেই।

তবু ওর ছাত্রদের কাছে নারায়ণ সেই দিনগুলির গল্পই বেশি বলত। সেই ফরিদপুরের দিনগুলি, শোভাবাজারের সেই যৌথ জীবন-সংগ্রামের দিনগুলি পরবর্তী জীবনে ওর বর্ণনায় নতুন সাজে শোভাযাত্রা করে বেরোত।

আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতাম 'তোমার এখন কত গুণগ্রাহী বন্ধু। অন্তরঙ্গতা আর কার কার সঙ্গে হল বল তো?'

ও বলত, 'এই বয়সে কি আর নতুন করে অন্তরঙ্গতা হয়?'

আমি ওর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু এ কথা শুনব বলে আশা করতাম না। জীবনের এ এক নিষ্ঠুর রঙ্গ একটা বয়সে এসে কেউ আর মানুষের অন্তরঙ্গ থাকে না। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নতা নিঃসঙ্গতার বোঝা সবাইকেই বহন করতে হয়। আমি হয়তো ওর অন্তরঙ্গ-মণ্ডলীর মধ্যে আর নেই মাঝে মাঝে আমার আশংকা হত। আমার চেয়েও নিবিড় করে গভীর করে পরবর্তী জীবনে ওকে অনেকে হয়তো পেয়েছেন। আমি তাঁদের পরিচয় জানিনে। জীবনে বিভিন্ন পর্বে কতজনের কাছে আমরা কতভাবে ধরা দিই। আবার পাইও। কিন্তু সবই যেন আংশিক। আমরা কি সেই সহস্র খণ্ডিত পরিচয়ের যোগ-সমষ্টি? নাকি তার চেয়েও কিছু বেশি?

জীবনের সবই বদলায়। ব্যক্তিগত সম্পর্কও কত বিচিত্র বিবর্তন আবর্তনের ভিতর দিয়ে চলে। কোন কোন সম্পর্ক নিয়ে মনে হয় এক একটি পুরো উপন্যাস লেখা যায়। তা একটি কি দুটি নিবন্ধে ধরে দেওয়া যায় না।

এই অনিত্য সংসারে নিত্যতার জন্যে আমাদের কী দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। আমাদের প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হোক, বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক, যশ সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী হোক। আমাদের মন কিছুতেই ক্ষণকালকে চায় না, চির-কালের জন্যে তার চিরকাঙালপনা। অথচ আমাদের শক্ত মুঠি শিথিল করে দিয়ে সেই চিরকাল মুহূর্তে মুহূর্তে ঝরে ঝরে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত কয়েকটি সম্পর্কের মধ্যেই আমরা সাধারণ সংসারী মানুষ বেঁচে থাকি। স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা প্রণয় আর বন্ধুত্ব। পারিবারিক গণ্ডি আর বন্ধুত্বের গণ্ডি। সেই গণ্ডি কখনো সংকুচিত কখনো প্রসারিত। কখনো গভীর কখনো অগভীর। তবু সেই ভালবাসার গণ্ডির মধ্যেই আসক্ত আবদ্ধ আমাদের নিত্য বসবাস।

নারায়ণ সেই গণ্ডি ভেঙে দিয়ে চির-কালের জন্যে চলে গেল। সে স্মৃতিতে থাকবে, থাকবে তার সাহিত্য-কীর্তিতে। কিন্তু কোনদিন তো আর পাশে থাকবে না, সামনে এসে দাঁড়াবে না। হেসে বলবে না 'কেমন আছ?' একটি ছোট্ট সংক্ষিপ্ত সাধারণ প্রশ্নের মধ্যে অনুচ্চারিত অনির্বচ-নীয় উত্তর আর শুনতে পাব না 'তুমি আছ আমি আছি।'

টেলিফোনে ডাকলে আর সেই প্রিয় পরি-চিত কণ্ঠের সাড়া পাব না 'বলো। ভাই।'

এবারও কলকাতা থেকে কদিনের জন্যে বাইরে যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলে গিয়েছিলাম [illegible] বিজয়ার কোলাকুলি আ[illegible]। এই মাত্র গাড়ি [illegible]

বললাম, [illegible] গাড়ি[illegible] উঠব কদি[illegible]

ও বলল [illegible]

বললাম, [illegible] যেখানে [illegible]। নৈনিতাল।'

ও বলল, 'খ[illegible] এই অক্টোবরের শেষে ওখানে যেয়ো না। দারুণ শীত, আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। তুমি মরে যাবে।'

আমি ভাবলাম নারায়ণ অনেক ব্যাপারেই আমার চেয়ে সাহসী, কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের মিল আছে আমরা দুজনেই শীতের ভয়ে ভীত।

আমার সঙ্গে অন্য দুজন বীর-পুরুষ ছিলেন আর একটি বীরাঙ্গনা। তাঁরা আমাকে টেনে নিয়ে চললেন। কদিন আগে নারায়ণ যে পথে ঘুরে গেছে আমিও সেই পথে চলেছি। রানীক্ষেতে যে হোটেলে ও উঠেছিল ঘটনা-ক্রমে আমিও সেই হোটেলে উঠলাম। গিয়ে দেখি হোটেলওয়ালাকে উদার হাতে নারায়ণ এক সার্টিফিকেট দিয়ে রেখেছে। দেয়ালের গায়ে টাঙানো সেই প্রশংসাপত্র ম্যানেজার আমাকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। হোটেল ছাড়বার সময় ভাবলাম নারায়ণকে গিয়ে বলতে হবে 'তুমি বড় বেশি উদারতা দেখিয়েছ। হোটেলের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত অত ভালো নয়।

কৌশানীতে গিয়েও ওর নিদর্শন পেলাম।

গান্ধী আশ্রমের অতিথিদের খাতায় আধ পাতা জুড়ে ও প্রশস্তি লিখে গেছে। কয়েক পাতা উল্টে আমিও লিখলাম মন্তব্য। ভাবলাম ফিরে গিয়ে এইসব গল্প করব। বলব, 'আমি সব সময় তোমার পিছনে পিছনে গেছি, পিছনে পিছনে আছি।'

কিন্তু ফিরে এসে আর দেখা হল না। এসে দেখি আমাকে বহু পিছনে রেখে ও অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

ওকে আর ধরবার জো নেই।

সাপ্তাহিক বসুমতীতে ওর একখানা ধারাবাহিক উপন্যাস বেরোচ্ছিল—স্রোতের সাথে। কোনদিন ওর কিস্তি খেলাপ হত না। এবার হল। সে উপন্যাস আর সম্পূর্ণ হবে না।

ভাবছি জীবনও কোন এক ধৈর্যহীন খেয়ালী লেখকের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। তাঁর রচনা সম্পূর্ণ করবার তাগিদ নেই। সম্পাদক আর পাঠকবর্গের কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ভয় নেই। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-কাতরতার দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। আকস্মিক ছেদেই তাঁর পরম বিলাস।

দেশ

বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৭

মেঘ বৃষ্টি আলো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস

আজকের অস্থির যুগ ও ততোধিক অস্থির যুবমানসের পটভূমিকায় একালের প্রেম ও একালের জটিল জীবনের শিল্পসুন্দর স্থিরচিত্র।

শান্তিদেব ঘোষ
সত্যজিৎ রায়
তিমিরবরণ ॥ রূপদর্শী,
অমিতাভ চৌধুরী
মৃণাল সেন
তরুণ মজুমদার
বসন্ত চৌধুরী ॥ তৃপ্তি মিত্র
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
নীহাররঞ্জন গুপ্ত

শার্লক হোমস্‌ কে ছিলেন?

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল সৃষ্ট শার্লক হোমস চরিত্রটি নিছক কল্পনা? নাকি এর পিছনে রয়েছে কোন রক্তমাংসের মানুষ? এই কৌতূহলোদ্দীপক রচনাটি সেই রহস্যান্তরালের মানুষটিকে কেন্দ্র করেই রচিত।

মনে পড়ে

শ্রীমতী অঙ্গুরবালা দেবীর স্মৃতিচারণ

বাংলা সাহিত্যে সেই বিনোদিনী দাসীর পর আর কোন অভিনেত্রীর উপভোগ্য স্মৃতিকথা আমরা পাইনি। এই রচনাটিতে মিলবে শুধু একটি ঘটনাবহুল জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনীই নয়, মিলবে রঙ্গজগতের একটা অবিস্মরণীয় যুগের অনবদ্য আলেখ্য।

দেবনারায়ণ গুপ্ত
ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য
সবিতাব্রত দত্ত
জ্যোতির্ময় বসুরায়
সূত্রধার ॥ রাজনবালা
অজয় বসু ॥ মতি নন্দী
চুনি গোস্বামী ॥ চিরঞ্জীব
প্রদীপ ব্যানার্জি
পুষ্পেন সরকার
শচীন ভৌমিক
সলিল চৌধুরী এবং
আরো অনেকের মূল্যবান
রচনায় সমৃদ্ধ,

আড়াই শতাধিক পৃষ্ঠার এই পরম আকর্ষণীয় সংখ্যাটির দাম হবে মাত্র তিন টাকা। রেজিস্ট্রী ডাকে টাঃ ৪·১০

শবাগার / মতি নন্দী

মুকুন্দ খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চারটি মৃত্যু-সংবাদ দেখল, বাসিমুখেই, দুজন বিদেশী মন্ত্রী, একজন বাঙালী ডাক্তার ও কেরলের এক এম পি। চারজনই করোনারি থ্রম্বসিসে। ওদের বয়স ৭২, ৫৫, ৫৮ ও ৫৬। মুকুন্দর বয়স ৫১, কিন্তু সে ব্যাঙ্কের প্রবীণ কেরানী। থাকে পৈতৃক বাড়িতে। ছোট সংসার, একতলা ভাড়া দেওয়া।

দোতলায় রান্নাঘর ও কলঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে সে চিন্তিত স্বরে লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "থ্রম্বসিসে আজকাল খুব মরছে।"

লীলাবতী চা তৈরিতে ব্যস্ত। বলল, "কে আবার মরল?"

হাঁ-করে ভিতরের পাটিতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে মুকুন্দ বলল, "খবরের কাগজে দিয়েছে, চারজন।"

"থ্রম্বসিস হয়েই তো ছোটঠাকুরঝির শ্বশুর আপিস যাওয়ার সময় বাসের মধ্যে মরে গেল। পাশের লোকটা পর্যন্ত টের পায়নি। কি পাজি রোগরে বাবা!"

এরপর লীলাবতী যা-যা বলবে মুকুন্দর জানা আছে। কি দশাসই চেহারা ছিল, কি দারুণ রগড় করত, কি ভীষণ খাইয়ে ছিল ইত্যাদি। একতলার কলঘরের ছিটকিনি খোলার শব্দ হতেই মুকুন্দ বারান্দার ধারে সরে এল। শুকনো শাড়িটা আলগা করে সদ্যস্নাত দেহে জড়িয়ে শিপ্রা বেরোচ্ছে। হাতে গোছা করে ভিজে কাপড়। শীতলপাটির মত গায়ের চামড়া, দেহটি নধর। লীলাবতী রান্না ঘর থেকে একটানা কথা বলে যাচ্ছে। মীরা স্কুলে যাবার জন্য আয়নার সামনে। মনু তার ঘরে এখনো ঘুমোচ্ছে।

শিপ্রা উঠোনের তারে কাপড় মেলে দিতে দিতে মুকুন্দকে দেখে ভ্রূকুটি করেই হাসল। গোড়ালি, মুখ ও দুটি হাত তোলা। চিবুক এবং বগলের কেশ থেকে জল গড়াচ্ছে। হাসতে গিয়েই ভারসাম্যটা টলে গেল সামান্য। তাইতে ওর বুক ও পাছার যৎসামান্য কম্পনটুকু উপভোগ করতে করতে মুকুন্দ মাজনের ফেনা গিলে, চেটো দিয়ে কষ মুছে নিয়ে হেসে লীলাবতীকে বলল, "এর থেকেও পাজি রোগ ক্যানসার।"

নিচের ভাড়াটে শিপ্রার স্বামী সৌরাঙ্গকে দিন কুড়ি আগে জবাব দিয়ে ক্যানসার হাসপাতাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিন গুণছে। লীলাবতী গলা নামিয়ে বলল, "যা অবস্থা দেখলুম, মনে হচ্ছে এ মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। বউ আর মেয়ের যে কি দশা হবে এরপর! মনুকে তুলে দাও তো, চা হয়ে গেছে।"

মনুকে ডাকতে গিয়ে মুকুন্দ দরজার কাছে থমকে গেল। কাত হয়ে খাটে ঘুমোচ্ছে, লুঙ্গিটা হাঁটুর উপরে উঠে

হয়েছে। বাইশ বছরের ছেলে, কলেজে পড়ে। ঈষৎ গম্ভীর প্রকৃতির। বাপের সঙ্গে কমই কথা বলে। মুকুন্দ সন্তর্পণে লুঙ্গিটা নামিয়ে মনুর কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ওঠ, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে কলঘরে মুখ ধুতে যাবার সময় মুকুন্দ দেখল, মেয়ের ফ্রকটা তারে মেলবার জন্য শিপ্রা ছুঁড়ে দিল এবং পড়ে গেল উঠোনের মেঝেয়। মুকুন্দর মনে পড়ল, তারটা এত উঁচু করে বেঁধেছিল গৌরাঙ্গই। ও খুব লম্বা। তখন ওর ক্যানসার ধরেনি।

দোতলা থেকে সিঁড়িটা এসে ঠেকেছে শিপ্রাদের দরজার পাশেই। ডানদিকে চলে গেছে হাত-পাঁচেকের একটা গলি, সদর দরজা পর্যন্ত, বাঁদিকে উঠোন ও শিপ্রার রান্নাঘর। মুকুন্দ বাজারের থলি হাতে নীচে নামতেই শিপ্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাপাস্বরে বলল, "আজ কিন্তু রেশন তোলার শেষ দিন, নইলে হপ্তাটা পচে যাবে।"

"অফিস যাবার সময় দেব।" বলেই মুকুন্দ ওর পাছায় হাত রাখল।

"ধ্যাৎ," শিপ্রা ফাজিল হেসে ছিটকে সরে গেল।

সদর দরজার গায়েই শিপ্রাদের ঘরের জানলা। মুকুন্দ একবার তাকাল, গৌরাঙ্গ বুকের উপর হাত রেখে স্থির চোখে কড়ি-কাঠের দিকে তাকিয়ে। বাজার থেকে ফেরার সময়ও সে তাকাল। গৌরাঙ্গ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে, চোখদুটো কঠিন বরফের মত ঝকঝকে। যেন শীতল-ক্রোধ জমাট বেঁধে রয়েছে। অফিসে যাবার সময় মুকুন্দ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নামল।

শিপ্রা দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে ঘরের দরজাটা ভেজানো। মুকুন্দর হাত থেকে দশ-টাকার নোটটা নেওয়া মাত্রই শিপ্রাকে সে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেতে যাবে, কিন্তু শিপ্রার চোখ দেখে পিছন ফিরে তাকিয়েই তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল। মনু সদর দরজার কাছে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। মুকুন্দর শরীরের মধ্যে তখন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথায় উঠছে, হাড় থেকে মাংস খুলে খুলে পড়ছে।

শিপ্রা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মনু মাথা নিচু করে মুকুন্দর পাশ দিয়েই উপরে উঠে গেল। সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মুকুন্দ অসহায় বোধ করে অবশেষে শিপ্রার ঘরের জানলায় তাকাল। গৌরাঙ্গর চুল ধরে বাচ্চা মেয়েটি টানাটানি করছে। গৌরাঙ্গর চোখ থেকে জল গড়িয়ে ঠোঁটের কোল ঘুরে চোয়ালে পৌঁছে টসটসে একটা বিন্দু হয়ে রয়েছে।

বাসে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মুকুন্দর মনে পড়ল, জয়ার শ্বশুর বাসের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছল। তারপর মনে হল, মনু কি আমায় ঘেন্না করবে?

"আজ সকালে আমাদের পাড়ার মধ্যে একটা খুন হয়েছে।" মুকুন্দর পিছনে কে একজন কাকে বলল, "পাইপগান দিয়ে মেরেছে! বছর আঠারো বয়স হবে।"

"কলকাতাতেই?"

"তবে নাতো কোথায়? সাঁড়ি থেকে বার করে এনে, রাস্তাভর্তি লোকের চোখের সামনে।"

"কেউ কিছু করল না?"

"পাগল! করতে গিয়ে কে প্রাণ খোয়াবে।"

"পুলিস?"

"এসে বডিটা নিয়ে গেল।"

"অ্যারেস্ট করেনিতো কাউকে? এটাই রক্ষে। যা পেটান পেটাচ্ছে।"

বাসের লোকেরা এরপর, পেটানোর নানান বীভৎস পদ্ধতির আলোচনা শুরু করল। মুকুন্দ তখন ভাবতে লাগল, আরো পনেরো-কুড়ি বছর যদি বাঁচি তাহলে মনুকে নিয়েই তো বাঁচতে হবে! কিন্তু কি করে বাঁচব যদি ও ঘেন্না করে?

অফিসের লিফটে পাঁচতলায় ওঠার সময় সে ভাবতে লাগল, মনু কি ওর মাকে ব্যাপারটা বলে দেবে? একেবারে ছেলেমানুষ নয়, সিরিয়াস ধরনের। হয়তো লজ্জায় নাও বলতে পারে! এই সময় মুকুন্দ শুনল, তার সামনের লোকটি পাশেরজনকে বলছে —"না ভাই, শরীর খারাপ নয়। ভাগ্নেটা পরশু মার্ডার হয়েছে, এখনো লাশ পাওয়া যাচ্ছে না। মনটা তাই—" লিফট চারতলায় থামতেই ওরা দুজন বেরিয়ে গেল।

চেয়ারে বসামাত্র পাশের টেবিলের অজিত ধর মাথা হেলিয়ে বলল, "মুকুন্দদা আজকের

কাগজে দেখেছেন? চার-চারটে ট্রামবাসিস-ডেথ ক্লটে পেজেই। সবাই অ্যাবাভ ফিফ্‌টি।"

"আমার ফিফটি-ওয়ান।" মুকুন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল টেবলের ফাটল থেকে উঠে আসা আরশোলাটার দিকে এবং সেটা একটা ফাইলের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার পর আবার বলল, "আমার একান্ন পূর্ণ হয়েছে।"

"এবার সাবধান হোন। স্নেহজাতীয় জিনিস খাওয়া কমান আর লাইট ধরনের কিছু ব্যায়াম করুন।"

অজিত ধরের স্বাস্থ্যটি চমৎকার। বছর পনেরো আগে ওয়েটলিফটিং-এ স্টেট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ফেদার ওয়েটে। বিয়ে করেনি। এখন তবলা শিখছে। মুকুন্দ ড্রয়ার থেকে দোয়াত বার করে কলমের ক্যাপ খুলতে খুলতে বলল, "তোমার এসব হবে না।"

"কি করে জানলেন?"

"যারা হ্যাপি, যাদের উদ্বেগ নেই তাদের হয় না। ট্রামবাসিসে কটা মেয়েমানুষ মরেছে?"

"কিন্তু আমি মেয়েমানুষ নই।" অজিত ধর গম্ভীর হয়ে নিজের টেবলে মুখ ফেরাল। মুকুন্দর মনে পড়ল, জয়ার শ্বশুরকে পাঁচদিন পর মর্গে পাওয়া যায়. পচে [illegible] দেখাচ্ছিল, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে [illegible] এসেই জয়ার ভাসুর [illegible] করে ফেলে। আইডেন্টিফাই করার মত কোনো কিছু সঙ্গে থাকলে ভদ্রলোক তার ফ্যামিলিকে [illegible] করাত না।

এখন মুকুন্দ, কৌতূহলবশতই ভাবল, সত্যি [illegible] যদি ট্রামবাসিসে মারা যেতাম, তাহলে আমার লাশটার কি হত। বাসটা থেমে যাবে। কেউ বলবে হাসপাতালে, কেউ বলবে থানায় বাসটাকে নিয়ে চল। [illegible] সেই লোকটা—যে বলেছিল, 'পাগল, কলকাতায় [illegible] কে প্রাণ খোয়াবে'—বলবে "একজনই যখন মরে গেছে তখন আমাদের অফিস লেট করিয়ে লাভ কি, বরং এখানেই নামিয়ে দিন, পাবলিক কিংবা পুলিস ব্যবস্থা করে দেবে।" শুনে মনে মনে সবাই হাঁফ ছাড়বে, তবে দু'-একজন আপত্তি জানিয়ে বলবে, রাস্তায় নামিয়ে দেওয়াটা খুবই নিষ্ঠুর দেখাবে, বরং বাসের একটা সীটে বসে থাকুক। সবাই অফিসে নেমে গেলে তারপর থানায় বা হাসপাতালে পৌঁছে দিলেই হবে। এই কথার পর তর্ক বেধে যাবে। তখন [illegible] বিরক্ত হয়ে বাসটা চালিয়ে দেবে। সবাই ড্রাইভারকে তখন উজবুক বলবে।

মুকুন্দর মজা লাগছিল এইরকম ভাবতে। কিন্তু সত্যিই যদি ট্রামবাসিসে মারা যেতুম? এই অজিত ধর কি লিফটে উঠতে উঠতে কাউকে বলবে—না মশাই, শরীর আমার ফিট আছে। বারো বছরের কলীগ মুকুন্দ সেন আজ পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ।

যা দিনকাল, মার্ডার-টার্ডার হল কিনা কে জানে। লোকটা অবশ্য একদিক থেকে ভালই ছিল, পলিটিক্স করত না, তবে মদ-টদ খেত শুনেছি।

আড়চোখে মুকুন্দ তাকাল অজিত ধরের দিকে। শরীর দুর্বল হয়ে যাবে বলে খিয়ে করেনি। শরীর গরম হতে পারে বলে ফুটবল খেলা পর্যন্ত দেখে না। আড়াইটে বাজলেই ড্রয়ার থেকে একটা আপেল বার করে খায়। ওর থ্রম্বসিস হবে না। ওর ছেলে থাকত যদি, সে বমি করার সুযোগ পাবে না। পকেট হাতড়ে মুকুন্দ কয়েকটা নোট, খুচরো পয়সা আর এলাচের মোড়ক বার করল। এর কোনটা দিয়েই তাকে আইডেন্টিফাই করা যাবে না। মোড়কটা জনৈক ভোলানাথ গাঁইয়ের লণ্ড্রী বিল। সেটা কুচিয়ে ফেলে মুকুন্দ নিজের নাম-ঠিকানা ইংরাজীতে একটা কাগজে লিখে, বুকপকেটে রেখে স্বস্তি বোধ করল।

অফিস থেকে বেরিয়ে মুকুন্দ শুনল উত্তর কলকাতায় ট্রাম পুড়েছে তাই ট্রাম বন্ধ। বাস স্টপে গিয়ে দেখল শিশির নামে লীভ সেকশ্যানের নতুন ছেলেটি দাঁড়িয়ে। বছর পঁচিশ বয়স, ফার্স্ট ডিভিশনে ফুটবল খেলে। অফিস টীমে খেলবে বলেই চাকরি পেয়েছে। আঁটসাট প্যান্ট, নাভির নীচে বেল্ট, উঁচু গোড়ালির ছুঁচলো জুতো আর ছিপছিপে শরীর। অফিসের মেয়েরা যে ওর দিকে তাকায় এটা ও জানে। কিন্তু শিশির এখন ধুতি-পাঞ্জাবি-চটি পরে দাঁড়িয়ে।

"ব্যাপার কি? এই বেশে তোমায় ঠিক মানাচ্ছে না ভাই, কেমন যেন বয়স্ক-বয়স্ক লাগছে।"

শিশিরকে মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভ দেখাল। একটি সুঠাম মেয়ে শ্যামবাজারের বাসে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে ধাক্কা দিতে দিতে এগোল এবং হ্যান্ডেল ধরে পা রাখামাত্র বাস ছেড়ে দিল। পা-দানির একটি যুবক তৎক্ষণাৎ মেয়েটির পিঠে বাহুর বেড় দিল। শিশির বাসটার থেকে চোখ সরিয়ে তিক্তস্বরে বলল, "এখন সবথেকে সেফ বুড়ো হয়ে যাওয়া। আমার পাশের বাড়ির ছেলেটাকে মাসখানেক আগে পুলিস রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এমন মেরেছে যে হাঁটু-দুটো এখনো ভাজ করে মুড়তে পারে না। আমি জানি ছেলেটা কোন গোলমালে নেই। ডাটো চেহারায় জন্যই ওর সর্বনাশ হল।"

মুকুন্দ চিন্তিত স্বরে বলল, "আমার ছেলেও গোলমালে থাকে না, কিন্তু কার সঙ্গে মিশছে তাতো জানি না।"

শিশির অলতোকরে চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "আমার ভাই কাল বাড়িতে বোমা এনে লুকিয়ে রেখেছিল। জানেন মুকুন্দদা, আমরা খুব গরীব। খেলার জন্যই এই চাকরি। পঙ্গু হয়ে যাই যদি আমায় রাখবে কেন, এখনো তো কনফার্মড হইনি। এই শরীরটাই আমার সব।"

মুকুন্দকে আর কিছু বলতে না দিয়ে শিশির প্রায় ছুটেই রাস্তা পার হয়ে ভিড়ে মিশে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুকুন্দও হাঁটতে শুরু করল। আধঘন্টা হাঁটার পর তার মনে হল রাস্তা ক্রমশ ফাঁকা দেখাচ্ছে, পথচারী কম, গাড়িগুলি জোরে যাচ্ছে, সি আর পি ভর্তি লরী তিন-চারবার চোখে পড়ল, ক্ষীণ বিস্ফোরণের শব্দও শুনতে পেল। মুকুন্দ স্থির করল, গলি ধরে যাওয়াই ভাল।

মিনিট কয়েক পরেই মুকুন্দর গা ছমছম করতে লাগল। যতই এগোয়, সব কিছু ভূতে পাওয়ার মত ঠেকছে। বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। চাপা ফিসফাস শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার ছাদে আবছা মুখের সারি। দূরে দূরে রাস্তার আলো, মাঝেরটা জ্বলছে না। দুধারের শ্যাওলাধরা, পলেস্তারা খসা, বিবর্ণ দেয়ালগুলোর মধ্যে, গর্ত, ঢিপি আর আস্তাকুড়ভরা রাস্তাটাকে প্রাচীন সুড়ঙ্গের মত দেখাচ্ছে। নিজের পায়ের শব্দে মুকুন্দ এবার ভয় পেল।

আর একটু এগিয়ে, ডানদিকের গলিটা দিয়ে তিন-চার মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছন যায়। তবু মুকুন্দ আর এগোতে সাহস পেল না। পাশের সরু গলির মধ্যে ঢুকে বড় রাস্তার দিকে কিছুটা এগিয়েই, আচমকা একটা রাইফেল ও দুটো পিস্তলের মুখোমুখি হয়ে দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কোথায় যাচ্ছেন?" সাদা প্যান্ট, হলুদ বুশশার্ট পরা লোকটি মুকুন্দর পেটে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল।

"বাড়ি যাচ্ছি স্যার, পাশের বস্তু সরকার লেনে থাকি।"

"তাহলে এখানে কেন?"

"অফিস থেকে ফিরছি। গোলমাল দেখে গলি দিয়ে যাচ্ছিলুম।"

"পাড়ায় কারা কারা বোমা ছোঁড়ে?"

"জানি না, স্যার।"

"নাকি বলবেন না?"

"সত্যি আমি জানি না।"

ইউনিফর্ম পরা ভারিক্কি ধরনের যে লোকটি এতক্ষণ শুধুই মুকুন্দর দিকে তাকিয়েছিল, বলল, "নিয়ে গিয়ে দেখাও তো, আইডেন্টিফাই করতে পারে কিনা।"

মুকুন্দর কোমরে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে হলুদ বুশশার্ট বলল, "বাঁয়ে, সে তখুনি বাঁদিকে ফিরে, দুহাত তুলে, চলতে শুরু করল। রাস্তার যেখানটায় আলো কম এবং দুটো বাড়ির দেয়াল 'দ'-এর মত হয়ে একটা কোণ তৈরি করেছে সেখানে টর্চের আলো ফেলে লোকটি বলল, "একে চেনেন?"

মুকুন্দ দেখল একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে, মুখটা পাশে ফেরান। দু হাত তোলা অবস্থায় এগিয়ে এসে ঝুঁকে "মনু" বলে অস্ফুটে কাতরে উঠেই বুঝল, দেখতে অনেকটা মনুর মতই। চোখের পাতা খোলা, নীল জামাটা ফালা হয়ে পিঠ উন্মুক্ত, কঠিনভাবে আঙুলগুলো মুঠো করা, ঠোঁট দুটো চেপে রয়েছে, গলার গভীর ক্ষত। ছিঁচড়ে টেনে আনার দাগ পড়েছে। গলা থেকে চোয়ান রক্ত থকথকে হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

"এর নাম মনু?"

"না, না, আমার ছেলের নাম মনু! একে অনেকটা তার মত দেখতে। একে আমি একদম চিনি না স্যার।"

"কখনো একে দেখেননি? ভাল করে দেখে বলুন।"

মুকুন্দ আবার ঝুঁকে পড়ল। গোড়ালি থেকে মাথার প্রান্ত জমাট বাঁধা অন্যেনর-গিরির লাভার একটা ঢেউ খেলানো খণ্ডের মত। এই খণ্ডটাই উত্তপ্তকালে ওর সর্বস্ব ছিল। ওর যন্ত্রণা, বিস্ময় অস্পষ্ট। খোলা চোখ থেকে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নির্গত হচ্ছে না।

মাথা নেড়ে মুকুন্দ বলল, "না, একে কখনো দেখিনি।"

"আচ্ছা চলে যান, এধার-ওধার করবেন না।"

কিছুদূর গিয়ে মুকুন্দ ফিরে তাকাল। বুশশার্ট তাকে লক্ষ্য করছে। রাস্তাটা এখন

অন্ধকারে। মুকুন্দ মনে মনে বলল, আর একটা আনআইডেণ্টিফায়েড ডেড বডি। তারপর বুকপকেটে হাত দিয়ে স্বস্তিবোধ করল। এবার গলিটা, আর একটা গলিকে কেটে সোজা মুকুন্দর পাড়ায় ঢুকে গেছে। মোড়টা আধো অন্ধকার। দুটি ছেলে হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়েই যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। একজনের হাতে ফুট দুয়েক লম্বা ঝকঝকে ইস্পাত।

"কি জিজ্ঞেস করছিল?"

মুকুন্দ চিনতে পারল ছেলেটিকে। মনুর বন্ধু ছিল ছোটবেলায়। তখন বাড়িতে আসত, নাম তাজু। না থেমে গঙ্গা পারাপার করে বলে সে শুনেছে। এখন পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানেই প্রায় সময় কাটায়। মনু এখন আর মেশে না।

"কিছুই না। শুধু জানতে চাইল লাশটাকে চিনি কিনা।"

"আমাদের কারুর কথা জিজ্ঞেস করল?"

"না।"

"খবরদার, বলবেন না কিছু।"

ওরা দুজন আবার দেয়ালে সেঁধিয়ে গেল। দুটি স্ত্রীলোককে নিয়ে একটি রিকশা আসছে। একজনকে বিরক্তস্বরে মুকুন্দ বলতে শুনল, "ওম্মা, এইতো যাবার সময় দেখে গেলুম সব ঠান্ডা।"

জানালায় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল। মুকুন্দকে দেখেই আলো জেলে দরজা খুলে বলল, "যা ভাবনা হচ্ছিল।"

"আমার জন্য?"

"তবে নাতো কি।"

শুনে মুকুন্দর ভাল লাগল প্রথমে। তারপর ভাবল, গৌরাঙ্গর জন্য একদম না-ভাবাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাই বলল, "গৌরাঙ্গ আছে কেমন?"

"একই রকম।" শিপ্রা সাধারণভাবে বলল এবং সহসা গলা নামিয়ে যোগ করল, "মনু কেমন-কেমন করে আজ তাকাচ্ছিল। কাউকে বলে দেবে না তো? আমার বড্ড ভয় করছে।"

"বড় হয়েছে। মনে হয় না বলবে।"

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এল। ঘরের জানলাগুলি বন্ধ। মীরা ও লীলাবতী সিঁটিয়ে বসে রয়েছে। তাকে দেখে ওরা হাঁফ ছাড়ল। মীরা বলল, "জানো কী কান্ড হয়েছে! একটা ছেলের গলা কেটে ফেলে রেখে গেছে খুদিরাম বসাক স্ট্রীটে।" মনু পাশের ঘর থেকে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "গোলমালের সময় অতুল বোস লেন দিয়ে না ঢুকে শেতলাতলার গলিটা দিয়ে আসাই সেফ্।"

ওর কথা শুনতে শুনতে মুকুন্দর মনে হল, মনু এতক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে ছিল। ছেলেটা আমার জন্য ভাবে, হয়তো বমি করবে না।

পরদিন অফিসে বেলা বারোটা নাগাদ মুকুন্দকে একজন টেলিফোনে উত্তেজিত স্বরে বলল, "আপনার ছেলে মানবেন্দ্র সেনকে পুলিস রাস্তা থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।"

"কি বলছেন! মনুকে?" মুকুন্দ চীৎকার করে উঠল। "আপনি কি করে জানলেন?"

আমার ভাইকেও ধরেছে। থানায় গেছলুম। আমাকে নাম আর ফোন নম্বর দিয়ে আপনার ছেলে বলল, জানিয়ে দিতে। এখুনি থানায় গিয়ে চেষ্টা করুন, ছাড়াতে পারেন কিনা।"

ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ পেল মুকুন্দ। তারপরই ওর চোখ-কান দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকতে লাগল। কিছুক্ষণ সে কিছুই দেখতে পেল না, শুনতে পেল

ব্যথা বেদনা দূরে তাড়ান
লিট্‌ল্‌স ওরিয়েন্টাল বাম লাগান
LITTLE'S
ORIENTAL BALM
SOLE MANUFACTURERS
MADRAS
TRADE MARK REGISTERED

না। তারপর কাতরস্বরে অজিত ধরকে বলল, "এইমাত্র একজন খবর দিল, ছেলেটাকে পুলিসে ধরেছে, রাস্তা থেকে। কিন্তু মনু তো ওসব করে না, অত্যন্ত ভাল ছেলে। এখন কি করি বলো তো?"

"দেরি করবেন না, এখুনি থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করুন। কেস লিখিয়ে ফেললে আর উপায় নেই, চালান করে দেবে। শুনেছি প্রচণ্ড মার দিচ্ছে থানায়।"

"তোমার কেউ চেনাশুনো থানায় আছে? অন্তত যাকে বললে, মারধোরটা করবে না। মনুর ভীষণ দুর্বল শরীর।"

অজিত ধর মাথা নাড়ল।

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে, থানায়?"

"সাড়ে তিনশো লোকের স্যালারি স্টেটমেণ্ট তৈরি করছি, মুকুন্দদা। চারদিন পরই মাইনে। এখনতো ফেলে রেখে—"

মুকুন্দ পাঁচতলা থেকে নামল সিঁড়ি দিয়ে। ট্যাক্সিতে বারদুয়েক বলল, "একটু জোরে চালান ভাই।" থানায় আট-দশটি ছেলের সঙ্গে মনুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও-সিকে বলল, "আমার ছেলে কোন-কিছুর মধ্যে থাকে না স্যার, ওকে ভুল করে এনেছেন।"

"কোন্‌টি আপনার ছেলে?" গম্ভীর এবং যেন ক্লান্ত, এমন স্বরে ও-সি বলল,

মুকুন্দ আঙ্গুলে তুলে দেখাবার সময় মনুর পাশে দাঁড়ান হাফ প্যাণ্ট পরা ছেলেটিকে কনুই তুলে খুব মন দিয়ে বাহুর থ্যাতলান জায়গাটা পরীক্ষা করতে দেখল। মনুর দিকে তাকিয়ে ও-সি বলল, "সব বাপ-মা এসেই বলে, তাদের ছেলে নিরপরাধ। যদি নিরপরাধ হয় তাহলে ছাড়া পাবে। আগে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি।"

"কখন ছাড়বেন তাহলে?"

ও-সি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মনু হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, "আমি কিছু করিনি স্যার আমি কিচ্ছু জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি শুধু কলেজে যাচ্ছিলুম। খাতা ছাড়া হাতে আর কিছু ছিল না।"

"চুপ করো।" কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল ও-সি'র পাশে দাঁড়ান ধুতিপরা লোকটি। থতমত হয়ে মনু তাকাল মুকুন্দের দিকে। দুটি ছেলে পাংশুমুখে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। লোকটি ধমকে আবার বলল, "তাজু তোমার পাড়ার ছেলে আর তাকে তুমি চেন না?"

মুকুন্দ ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমার ছেলে ওর সঙ্গে মেশে না স্যার।"

"বাজে কথা। আমাদের কাছে খবর আছে আপনার ছেলে ওর বন্ধু। তাজুকে কোথায় পাওয়া যাবে, দলে আর কে কে আছে, বলুক, আপনার ছেলেকে ছেড়ে দোব।"

মুকুন্দ দেখল মনু ঠক ঠক করে কাঁপছে। ওকে এত ভয় পেতে দেখে সেও কাতর হয়ে পড়ল। চোখের জল জমে ঠোঁটের কোল ঘেঁষে চোয়ালে পৌঁছে টলটল করছে। মুকুন্দের চোখ ঝাপসা হয়ে এল। আচমকা একটা স্মৃতি ফুটে উঠল তার মনে। কাল সকালে এই-রকম একটা বিন্দু টলটল করছিল ওর থুতনির কাছে। মেয়েটা তখন চুলধরে টানছিল। কিন্তু মনুর তো ক্যানসার হয়নি। মুকুন্দ বিস্ময়চোখে তাকিয়ে রইল মনুর দিকে। শুধু কি শরীরের জন্যই ওর এই কান্না। রাস্তায় কাল বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়েছিল যে ছেলেটি সেও কি শরীরটাকে ভালবাসতো না!

ও-সি ঘরের একধারে গিয়ে লোকটির সঙ্গে চাপাস্বরে মিনিট দুয়েক কথা বলে ফিরে এল। "আপনি এখন যান, সন্ধ্যার দিকে এসে খোঁজ নেবেন।"

"বিশ্বাস করুন স্যার, আমার ছেলে জীবনে কখনো পলিটিক্স করেনি। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন।" মুকুন্দ ঝুঁকে ও-সি'র হাঁটুতে হাত রাখল। হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে ও-সি বলল, "আচ্ছা ঘণ্টা দু-তিন পরেই আসুন, নিরপরাধ হলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।"

বেরিয়ে এসে মুকুন্দ ঠিক করতে পারল না এবার কি করবে। থানার সামনেই একটা বাড়ির রকে বসে পড়ল। এখন অফিসে ফেরা আর এখানে বসে থাকা একই ব্যাপার। লীলাবতীর কান্নাকাটির থেকেও ভাল, বসে

থাকতে থাকতে সে অবসন্ন বোধ করতে শুরু করল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে রইল থানার ফটকে। ক্লান্ত মস্তিষ্কে এলোপাথাড়ি নানান বীভৎস দৃশ্য এখন সে দেখতে পাচ্ছে, অদ্ভুত করুণ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। প্রত্যেকটাই স্নায়ুবিদারক।

ছটফট করে মুকুন্দ উঠে পড়ল। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বারবার সে শিপ্রার দেহে, নানাবিধ অশ্লীল শব্দে এবং প্রেমবিসসে নিজেকে আবদ্ধ করে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হল না। সবকিছু ছাপিয়ে মনুর হঠাৎ কান্নাটা তাকে পেয়ে বসছে। ঘণ্টাখানেক পর সে আবার থানার সামনে ফিরে এল এবং রকে বসতে গিয়ে দেখল মনু মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসছে।

"মনু।" ছোট্ট, তীক্ষ্ণস্বরে মুকুন্দ ডাকল। মনু মুখ তুলে তাকাল। মুকুন্দ ছুটে গিয়ে প্রথমেই তন্নতন্ন করে ওর আপাদ-মস্তক দেখল। তারপর হেসে বলল, "ছেড়ে দিল।"

মাথা নেড়ে মনু ফিকে হাসল।

"মারধোর করেনি?"

"হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল ধরার সময়।"

ওর কাঁধে আলতো করে হাত রেখে, হাঁটতে হাঁটতে মুকুন্দ বলল, "অনেকক্ষণ খাসনি, আয় এই দোকানটায়।"

"আমার খিদে নেই।"

"ধরল কেন তোকে?"

"যে ছেলেগুলোকে থানায় দেখলে, ওরা কোন্ একটা স্কুলে ভাঙচোর করে বোমা ফাটিয়ে এসে আমার পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ প্লেন ড্রেস পুলিস ঘিরে ধরে ওদের সঙ্গে আমাকেও ভ্যানে তুলল।

"তুই যদি বুড়োমানুষ হতিস তাহলে ধরত না।"

মনু জবাব দিল না। মিনিটখানেক পর মুকুন্দ বলল, "অফিসে ফোন পেয়েই সোজা থানায় এসেছি। বাড়ির কেউ জানে না, তুই বাড়িতে এ সম্পর্কে কিছু বলিস না, তাহলেই তোর মা কান্না জুড়ে দেবে।"

ঘাড় ফিরিয়ে মনু তাকাল ওর দিকে। চোখদুটো দেখে মুকুন্দের বুকের মধ্যে ক্ষীণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অবচ্ছভাবে সে গৌরাঙ্গর চোখদুটি দেখতে পেল। ঠিক এই চাহনিতেই সে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল। মুকুন্দের আবার মনে হল, মনুর কেন ক্যানসার হবে!

"তোকে আর কিছু কি জিজ্ঞাসা করেছে?"

চমকে উঠে মনু ভ্রূ কুঁচকে অস্বাভাবিক স্বরে বলল, "কি জিজ্ঞাসা করবে?"

"যা জানতে চাইছিল।"

"কিছু জিজ্ঞাসা করেনি।" মনু দাঁড়িয়ে পড়ল। "আমি এখন বাড়ি যাব না, তুমি কি বাড়ি যাবে?"

সব এমব্রয়ডারী করা কাপড়ই মনে হয় একইরকম
কিন্তু হাকোবা আপনাকে টাকার পরিবর্তে
আরও বেশি কিছু দেয়।
● উঁচুদরের কারুকার্যময় এমব্রয়ডারী
● হালফ্যাশানের নানারকম ডিজাইন
● পয়লা জাতের মজবুত কাপড়
● নিখুঁত ফিনিশ
এসব গুণের দরুণ হাকোবা
হয়ে উঠেছে অনন্য।
হাকোবা
এমব্রয়ডারী করা কাপড়
হাকোবা হচ্ছে এমব্রয়ডারী করা কাপড় ও এমব্রয়ডারী
করা লেসের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক যেসব তৈরী করে
ফ্যান্সী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬, অ্যাপোলো স্ট্রীট, বোম্বাই।
RATAN BATRA/FC/BEN/330

"আমি," মুকুন্দ দুখারে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "দেখি কোথাও গিয়ে সময় কাটাতে পারি কিনা।"

মনু ভিড়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মুকুন্দ তাকিয়ে রইল। তারপর স্থির করল, ও ক্লাস নাইনে ওঠার পর আর মাতাল হইনি, আজ হব।

রাত প্রায় বারোটায় মুকুন্দ বাড়ি ফিরল। কড়ানাড়ার আগেই সদরদরজা খুলে গেল। অন্ধকারে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়াতেই চাপাস্বরে মনু বলল, "এখন এত রাত করে বাড়ি ফিরো না।"

মুকুন্দ অন্ধকারের মধ্যে মনুর মুখটা দুই করতলে একবার চেপে ধরে, কথা না বলে, দোতলায় উঠে গেল।

দেরিতে ঘুম ভাঙ্গল তার, চা খেতে খেতে মনুর খোঁজ করল। দুটি ছেলে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে শুনেই চায়ের কাপ রেখে তাড়াতাড়ি মুকুন্দ রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনুকে দেখতে পেল না। ভয়ে বুক শুকিয়ে এল তার, শিপ্রাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কারা ডাকতে এসেছিল?

"একজনকে দেখেছি, রোগাপানা, ফর্সা, মনুরই বয়সী।"

"হাতে কিছু ছিল?"

"কেন?" ভীতস্বরে শিপ্রা বলল,

ধমকে উঠল মুকুন্দ, "যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।"

"অতশত দেখিনি।"

মুকুন্দ এবার ছুটে রাস্তায় বেরোল, ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত পরিচিতদের কাছে খোঁজ নিতে নিতে পৌঁছল। সেখান থেকে দু-তিনটে গলি ঘুরে, গলার [illegible] লাসটা যেখানে পড়েছিল সেখানে হাজি[illegible]ল। এইসময় তার বুকফাটা কান্না পেল। বাড়ি ফিরতেই, শিপ্রা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "মনু তো অনেকক্ষণ ফিরেছে।"

একটা করে সিঁড়ি টপকে মুকুন্দ দোতলায় এল। মনু তার ঘরে চেয়ারে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে। মুকুন্দ ঘরে ঢুকেই বলল, "কেন ওরা এসেছিল?"

"কারা!" মনু স্থির চোখে মুকুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চাহনিটা তুলে নিয়ে আবার জানলার বাইরে তাকাল।

"ওরা কি জেনেছে?" ব্যগ্র স্বরে মুকুন্দ বলল।

"কি জানবে?" মনু এবার তীব্রচোখে তাকালো।

মুকুন্দ ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি, আমি জানি।"

"কি জান তুমি?"

—"তোকে ভয় পেতে দেখেছিলুম।"

"কিসের ভয়?"

"শরীরটার জন্য ভয়।"

"তুমি পাও না?" প্রশ্নটি করার জন্যই

যেন নিজের ওপর অভিমানে মনুর মুখের ভঙ্গি কঠিন হয়ে গেল।

"হ্যাঁ পাই।" মুকুন্দ কোমল কণ্ঠে বলল।" আমি তোকে দোষ দিচ্ছিনারে। যদি বলতে না চাস তো বলিস না। কিন্তু তুই আমার ছেলে, তোর জন্য আমি ভয় পাচ্ছি। সব বাবাই পায়। এটা কাপুরুষতা নয়।"

"তোমার ভয়টা ছেলের প্রাণের জন্য, তাই সেটা কাপুরুষতা নয়।" মনু যান্ত্রিক-স্বরে যেন মুখস্ত বলল।

"এভাবে কথাটা নিচ্ছিস কেন।" মুকুন্দ বিব্রত হয়ে বলল। "আমাকে ঘেন্না করার নিশ্চয় অন্য কারণ আছে, কিন্তু এ জন্য করিসনি।"

"তুমি কি আমায় ঘেন্না করছ, আমি যা করেছি?"

"মোটেই না। আমি চিরকাল তোকে ভালবাসব।"

"কিন্তু আমি নিজেকে ঘেন্না করছি। থানায় তুমি এমনকরে আমার দিকে তাকালে, মনে হল আমি একটা মরা মানুষ। কিরকম যেন ভয় করল আমার। নয়তো একটা কথাও বলতুম না, কিছুতেই না।" মনু উঠে দাঁড়াল। টেবিলের বইগুলো অযথা ওলট-পালট করতে করতে মোচড়ান স্বরে বলল, "তোমার জন্য, তোমার জন্য। তুমি আমায় কাপুরুষ করেছ।"

মনু একবার শুধু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মুকুন্দ তখন, প্রত্যাশামত নিশ্চিত-রূপে দেখতে পেল, কঠিন বরফের মত ঝকঝকে ওর চোখদুটি। যেন শীতল ক্রোধে জমাট বেঁধে রয়েছে।

মুকুন্দর অফিসে যাবার সময় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল তার ঘরের দরজায়। সে হাসল। মুকুন্দ ভ্রূক্ষেপ করল না। গলির মোড়ে লাল ডোরাকাটা জামা গায়ে অজু দাঁড়িয়ে। মুকুন্দ তাকাল না। বাস মাঝপথে বিকল হয়ে থেমে গেল। মুকুন্দ কণ্ডাক্টরের কাছ থেকে ভাড়ার পয়সা ফেরৎ নিল না। অফিসে অজিত ধরের প্রশ্নের উত্তরে জানাল, খবরটা ভুল। মনুকে ধরেনি। ছুটির পর ট্রামে উঠল। ট্রাম থেকে নেমে মিনিট তিনেক হেঁটে বাড়ি। নামামাত্র দেখল জটলা করে লোকেরা ভীতচোখে তার পাড়ার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে। একজন তাকে বলল, "ওদিকে যাবেন না মশাই। এইমাত্র পরপর চারটে গুলির শব্দ হল।" মুকুন্দ সে কথায় কান দিল না। একটা পুলিসের ভ্যান দাঁড়িয়ে। সেটাকে ঘুরে পার হয়েই থমকে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর মাথা নামিয়ে গলিতে ঢুকল। তার পাশ দিয়ে দুটো লোক পিস্তল ও রাইফেল পরিবৃত একটা লাল ডোরাকাটা নিথরদেহ বহন করে নিয়ে গেল। টপটপ করে রক্ত ঝরছে। মুকুন্দ পিছন ফিরে তাকাল না। থমথমে গলির দুপাশের ভীত, বিস্মিত এবং অব্যক্ত চাহনি ও মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সে বাড়িতে ঢুকল।

মনু তার ঘরে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে। মুকুন্দ দরজার কাছ থেকে বলল, "অজুকে পুলিসে নিয়ে গেল। বোধ হয় বেঁচে নেই।"

লীলাবতী ও মীরা ছুটে এল বিবরণ শোনার জন্য। মুকুন্দ তখন কলঘরে ঢুকল। পিছনে পায়ের শব্দে সে ঘাড় ফেরাতেই দেখল মনু ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে কলঘরের দিকেই আসছে। "কি হল!" বলে মুকুন্দ দ্রুত গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। মনু তখন হড়হড় করে মুকুন্দর গায়ে বমি করল।

মধ্য রাত্রে মুকুন্দ নীচে নেমে এসে শিপ্রার ঘরের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে যেতেই ঘরে ঢুকে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরল।

"একি, একি! ঘরের মধ্যে নয়। ও রয়েছে যে!"

"থাকুকগে।" শিপ্রাকে মেঝেতে শোয়াতে শোয়াতে মুকুন্দ বলল। "ওতো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের।"

য়িহুদী মেনুহিন শয্যা ত্যাগ করেন সূর্য ওঠার সঙ্গে আর শীর্ষাসনে দাঁড়ান উঠবার পরমুহূর্তে। তাঁর স্ত্রী বলেন প্রাতরাশে কি পরিবেশন করা হবে সে প্রশ্নও তাঁর করতে হয় সেই সময়টুকুতেই। প্রাতরাশ সাদাসিধে, কাজেই ভাবনার কিছু নেই। দই, ফল আর সামান্য কিছু। সে আর এমন শক্ত কি, শীর্ষাসনেই শোনা চলে!

য়িহুদী মেনুহিন যে ভোরের আলোর প্রথম রেশ ফুটলেই জাগেন তা জানবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। গত বছর মাঘের শেষে মেনুহিন এসেছিলেন দিল্লিতে। রাজধানীর মাঘের বাতাস বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। সূর্যোদয় হয় দেরিতে। সকালে সকলেই সুখশয্যায় দু দণ্ড বেশী কাটাতে পারলে খুশী হন। তারিখটা মনে নেই। জানতামও না মেনুহিন দিল্লিতে আসছেন। আবছা অস্পষ্ট আলোয় টেলিফোন বেজে উঠলো। দুবার হোঁচট খেয়ে পরম বিরক্তির সঙ্গে রিসিভার তুলেছি আর অন্যদিক থেকে সুস্পষ্ট সুমধুর গলায় পরিচিতি জানালেন য়িহুদী মেনুহিন। তাঁর মত মানুষ যে এমন সাধারণ ভাবে স্নাত সকালে নিজে হাতে ফোন তুলে আপনজনের মত, বহুদিনের চেনা বন্ধুর মত আপ্যায়িত করতে পারেন আমার ধারণা ছিল না। সহজ সরলভাষী মানুষটি টেলিফোনেই সব সঙ্কোচ দূর করে দিলেন মুহূর্তে। একটি ফরাসী ছবির প্রযোজকের সঙ্গে এসেছেন। দিন দুয়ের মেয়াদ। ছবিতে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র আর যন্ত্রীর সহযোগ চাই। আমার স্বামীকে খুঁজছিলেন ব্যবস্থার জন্য। অল্প পরে মেনুহিন সাহেব সোজা পৌঁছোলেন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর দপ্তরে। একেবারে সরাসরি শিল্পীদের সঙ্গে কথা কইবেন। তাঁরা যে মেনুহিনের মনের মণিকোঠার মানুষ সবাই। সাবুরি খাঁ, নগেন দে, গোপাল দাস সারেঙ্গী, ফ্লুট আর তবলা নিয়ে তৈরি। মেনুহিন তাঁদের একান্ত নিজের বলেই মাত্র নয়, মেনুহিন যে শিল্পী এবং তাঁরাও শিল্পী। তার উপর সঙ্গীতের সাধক। সেখানে ছোট বড়র প্রশ্ন নেই, দেশ বিদেশে ভেদ নেই। এমন অনাবিল বন্ধুত্ব বুঝি আর কখনও দেখিনি। মেনুহিনের মত ভারতপ্রেমী মেলা ভার। তার উপর সঙ্গীতের অসীম সীমায় এক হয়ে মিলেছে পৃথিবীর এ-কোণ আর ও-কোণ, এ প্রান্ত আর ও প্রান্ত। সেখানে মানুষ মানুষই মাত্র।

দুঃখের বিষয় এত আয়োজনকে ফাঁকি দিয়ে প্রযোজকের যন্ত্রপাতি সময় মত এসে পৌঁছোল না। বিমানখানা সব সরঞ্জাম না নামিয়ে উড়ে গেল হংকং-এ। এদিকে দু দিনের বেশী দিল্লিতে থাকলে প্রযোজক মহাশয়ের কাজ পণ্ড হবে। সংবাদটি দিয়ে আবার সেই ভোরের পাখি ডাকার সঙ্গে সেই স্পষ্ট উচ্চারণ আর মিষ্ট কণ্ঠস্বর। সঙ্গে একটি অনুরোধ। নগেন দে, সাবুরি খাঁ আর তবলাবাদক গোপাল দাসকে বড় কষ্ট দিয়েছি। কাল সারাদিন ধরে চিত্রগ্রহণের আয়োজন চলেছে, বাজনার মহড়া হয়েছে। আজ কোন মুখে মেনুহিন জানাবেন চিত্রগ্রহণ সম্ভব নয়। এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে চান। পয়সা দিয়ে নয়। প্রাণ দিয়ে, মমতা দিয়ে। যে মেনুহিনের বাজনা শুনবার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী মানী যে কোন দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত, সে বাজনা বিশেষ করে ছোট্ট আসরে বাজবে তাঁর ভারতীয় গুণীবন্ধুদের জন্য।

সে আসরে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আশ্চর্য আসর। ছোট্ট একটি চৌকিতে চারজন। নগেন দের হাতে ফ্লুট, সাবুরি খাঁর হাতে সারেঙ্গী আর গোপাল দাসের কোলে বাঁয়া আর তবলা। বলাই বাহুল্য চতুর্থ কোণটিতে মেনুহিন আর তাঁর বেহালা। গল্প গুজব হাসিতামাশায় আসর সরগরম। বাইরের লোক বড় একটা কেউ নেই। তাই একান্ত ঘনিষ্ঠ আলাপনে মুখর চৌকিখানা আর তার চার ধার। সাবুরি খাঁর সারেঙ্গীর সুর আর মেনুহিনের বেহালা কেঁপে কেঁপে প্রীতি বিনিময়ের তান তুলেছে। সঙ্গে নগেন দের ফ্লুট আর গোপাল দাসের তবলা। প্রথমে অবশ্য

মেনুহিন

মেনুহিন বাজালেন বেটোভেন আর বাখ্-এর অপূর্ব রচনা। তার পর সুর তুললেন মিয়া কি তোড়িতে ভারতীয় শিল্পী-দ্বয় সব শেষে বিদায় ব্যথার ভৈরবী। এবার মেনুহিনের বেহালা যেন আপনা থেকে যোগ দিল সেই সজল সুরের আসন্ন বিদায়ের মোহজালে। সাবরি খাঁ মেতে উঠেছেন, গোপাল দাস ঠেকা দিতে দিতে বিভোর হয়ে যাচ্ছেন আর নগেন দে তো বাঙ্গালী, তার প্রাণের প্রত্যেকটি স্পন্দন সজল চোখে ধরা দিচ্ছে। বাঁশরীতে বাজছে পৃথিবীর সব বিদায়ের সেরা রাগিণী।

আসর ভাঙ্গাতে হলো। মেনুহিন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে প্লেন ধরবেন। সময় সামান্য বাকি। তবু যেন তিনি হারিয়ে গেছেন শিল্পীদের মাঝে। যেতে মন চায় না। বললেন কেন ভারতবাসী তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। মানুষের মুখে মুখে, ভারতের গ্রামে গ্রামে যে সংস্কার আর কৃষ্টির ইতিহাস যুগ যুগ ধরে নেমে এসেছে অবলীলাক্রমে; আধুনিকতার চাপে যদি তা মিলিয়ে যায় অতলে, তবে তার চেয়ে দুঃখের কিছু

নেই। যে সহজ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কণামাত্র পাবার জন্য পশ্চিমের মানুষ লালায়িত, তার এতটুকুও যদি হেলায় হারাতে হয় সে যে বড় দুঃখের কথা।

ভারতীয় ঐতিহ্যের জন্য এমন অসীম শ্রদ্ধা তাঁর কতবার দেখেছি ইয়ত্তা নেই। ভোজসভায় মেনুহিন তুলে নেন ভারতীয় খাবার। তাও আবার নিরামিষ। বলেন ভারতবর্ষে এলে কেমন যেন আমিষ খেতে মন আপত্তি করে। নিরামিষ খাদ্যের পবিত্রতা হিন্দুর আচার নিয়মে মিশে আছে আর সে পবিত্রতাকে পরম নিষ্ঠায় ভক্তি করেন তিনি। মধুরেণ সমাপয়েৎ-এর সময়ও তাঁর প্লেটে দেখবেন রসগোল্লা, সন্দেশ। এমনকি আইসক্রীম পর্যন্ত নয়।

এইতো এবার নেহেরু পুরস্কারের পরের দিনের প্রীতিভোজে য়িহুদী মেনুহিনের প্রস্তাবে প্রস্তাবিত শ্রীমতী ডায়ানা মেনুহিন পরে এসেছিলেন নামাবলীর একটি জামা। কে যেন ওঁকে বুঝিয়েছে নামাবলীর গায়ের লেখাটি বাংলায়। আসলে তা নয়। হিন্দিতে লেখা রামনাম। জিজ্ঞাসা করলেন বাংলায় কি লেখা। আশ্চর্য হলাম। আমি যে বাঙ্গালী বুঝলে কি করে? আরে ঐ যে কপালে সিঁদুরের টিপ, লাল পাড় তাঁতের শাড়ি তাই দেখে। জান বাঙ্গালী বন্ধু আমাদের অনেক। নারায়ণ মেননের স্ত্রী রেখা যে বাঙ্গালী। নারায়ণ আমার ভারতীয় সঙ্গীতের সাধনায় সহায়। কথার মাঝে এগিয়ে এলেন ডায়ানার স্বামী—আর জান বাঙ্গালীরা শিল্পী। তাদের যাদুর গল্প বললেন। বছর দশেক আগে কলকাতায় একবার তাঁর মহামূল্য বেহালায় চিড় খেয়েছিল। বেহালা বিশেষভাবে তৈরি কি করে কোথায় এমন জিনিস মেরামত হবে? চিৎপুর রোডের এক সামান্য কারিগর বেমালুম সেরে দিলেন যন্ত্রটি।

বেহালা আর য়িহুদী মেনুহিন অবিচ্ছেদ্য। এক বছর বয়সে নাকি তিনি প্রথম কনসার্ট শুনতে যান, কারণ তাঁর বাবামায়ের বেবিসীটার রাখার অর্থ ছিল না। তিন বছর বয়সে উপহার পান একটি খেলনা বেহালা। এর অল্প পরেই মেনুহিনের আসল বেহালা শিক্ষা শুরু হয়। সাত বছর বয়সে প্রথম বড় আসরে ও দশ বছর বয়সে বিখ্যাত কার্নেগী হলে বেহালা বাজান। গণিতজ্ঞ এলবার্ট আইনস্টাইন নিজে বেহালা বাজান। আইনস্টাইন ও সঙ্গীত পরিচালক টস্কানিনি দুজনেই কিশোর প্রতিভার পরিচয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। একবার বাজনার শেষে আইনস্টাইন এগারো বছরের মেনুহিনকে কোলে তুলে মুখ চুম্বন করে বলেছিলেন "তুমি প্রমাণ করে দিলে ঈশ্বর আছেন !"

প্রতিভায় ভাস্বর মেনুহিন সঙ্গীতের রাজ্যে সম্রাট হয়েছেন সত্য, কিন্তু তার

হেপজিবা, য়িহুদী ও ডায়ানা

চেয়েও বড় তাঁর অবদান মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ স্থাপনায়। সঙ্গীত সে যোগরচনার সেতু। পুরস্কার নির্ণায়ক গোষ্ঠী তাঁকে তাই বলেছেন, "not only the genius in the realm of music, but one believing in the common heritage of man." বাংলার কবিও একদিন এমন কথাই বলেছিলেন "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" সঙ্গীত সর্বজনীন, সর্বব্যাপী। সঙ্গীতের আবেদন কবিতার চেয়ে ব্যাপক। কবিতার বাহন ভাষা, সঙ্গীতের বাহন সুর। দেশে দেশে সঙ্গীতের ভিন্ন ধারা গড়ে উঠেছে, কিন্তু ধ্বনি আর সুর বিলীন হয়ে গেছে লৌকিক অভিজ্ঞতার ওপারে। সেখানে ভেদ নেই, দ্বন্দ্ব নেই, আছে অপার আনন্দ।

পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে মেনুহিন দুটি লংপ্লেয়িং রেকর্ড করেছেন। একটির বহিরাবরণে লেখা "I am indebted to Ravi Shankar for the most inspiring moments I have even enjoyed in music," সঙ্গীতের রচনায় রবিশঙ্কর, বাজিয়েছেন বেহালা মেনুহিন, সঙ্গে তবলায় সঙ্গত।

মেনুহিনের কথা সম্পূর্ণ বলতে হলে তাঁর বোন হেপজিবাকে বাদ দেওয়া যায় না। হেপজিবাও সঙ্গীত জগতে অনন্যা। মেনুহিনের সঙ্গে বহু সময়েই কনসার্টে থাকেন। সব চেয়ে বড় কথা ননদ-ভাজে ভাব খুব। এও বোধ হয় য়িহুদী মেনুহিনের মানুষের উপর পরম বিশ্বাসের আর এক বিচিত্র প্রকাশ। সামান্য হলেও ঠিক ফেলে দেবার মত কথা নয়।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনা…

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস করা হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনার অগ্রগতির যে হিসাব পাওয়া গেছে তা হতাশাব্যঞ্জক। যদিও ১৯৬৯-৭০ সালে জাতীয় আয় গত বছরের অনুপাতে ৫·২ শতাংশ বেড়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে এবং যদিও 'সবুজ বিপ্লবের' ধারা এ বছরেও অব্যাহত আছে, তবুও আর্থিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে চতুর্থ পরিকল্পনা পিছিয়ে আছে। প্রচলিত কর থেকে প্রাপ্য রাজস্ব, বৈদেশিক সাহায্য, সরকারী উদ্যোগ থেকে প্রাপ্য উদ্বৃত্ত, ক্ষুদ্র সঞ্চয় সব মিলিয়ে যতটা আর্থিক সম্পদ আহরিত হবে বলে মনে হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে তা অনেক কম হয়েছে। এভাবে যদি সম্পদ আহরণের কাজ চলতে থাকে, তবে অনেকে আশংকা করছেন, পরিকল্পনাটির ব্যয়-বরাদ্দ অন্ততঃ শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করার প্রয়োজন হতে পারে, আরও শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস করতে হতে পারে যদি জিনিসপত্রের দাম এভাবে বাড়তে থাকে। জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এমন কি অর্থমন্ত্রী শ্রীচাবন স্বীকার করেছেন যে জিনিসপত্রের দামের ক্রমবর্ধমান হার কমিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকার সফল হচ্ছেন না; শুধু খাদ্য-সামগ্রীর দামই গত বছরের তুলনায় শতকরা ছয় ভাগ বেড়ে গেছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে প্রকৃত আয় (Real Income) কমতে থাকে। তখন জাতীয় আয়ের যতই বৃদ্ধি হোক না কেন, তার তাৎপর্য প্রকৃত হারের পরিপ্রেক্ষিতে কমে যায়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এবং পরিকল্পনা কমিশন—উভয়ই বর্তমানে ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের (deficit Financing) পরিমাণ আর বাড়াতে ইচ্ছুক নন। পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য যদি আরও নতুন মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় তবে তা শুধু মুদ্রাস্ফীতির চাপকেই বাড়াতে সাহায্য করবে। অথচ সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ কমাবার ক্ষেত্রেও সরকারের অনীহা দেখা যাচ্ছে; কারণ, বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দিলে উন্নয়ন-হার (Growth rate) কমে যাবার সম্ভাবনা। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও এই নীতি পরিপন্থী হতে পারে। তাহলে কি চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের জন্য আরও কর চাপাতে হবে? সামাজিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন যাতে পাশাপাশি চলতে পারে তার জন্য কর-ব্যবস্থার যে আরও সার্থক ব্যবহার হতে পারে না তা নয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির উপর যদি আরও কর চাপানো হয় তবে তার ফলে শুধু জিনিসপত্রেরই দাম বাড়বে,—সাধারণ মানুষের কাছে পরিকল্পনার সুফল পেঁৗছে দেওয়া সম্ভব হবে না। সম্পদশালী লোকদের উপর কর ধার্য করার যে ব্যবস্থা বর্তমান আছে, তার হয়তো পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব। কিন্তু এখানে একটি কথা বিচার্য। সামাজিক ন্যায় কি শুধু ধনীদের উপর কর চাপিয়েই আনা যায়? গরীবদের আয়ের মাত্রা বাড়াবার এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রচেষ্টা চালিয়েও কি আয় ও ধনের বৈষম্য কমানো যায় না? সরকার সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন,—এ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে সমাজতান্ত্রিক। বিত্তশালীদের কর প্রদান করার ক্ষমতা বেশি; সুতরাং তাঁদের বেশি কর দিতে হবে—এ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু গরীবদের আয় বাড়াবার এবং তাঁদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করাও কি সরকারের দায়িত্ব নয়? সামাজিক ন্যায়ের অর্থ যদি এই হয় যে, আয় ও ধনের বৈষম্য কমাতে হবে, তবে সরকারের কি উচিত নয় বড়লোকদের উপর কর ধার্য করার সঙ্গে সঙ্গে গরীবদেরও অবস্থা উন্নত করা? পরিকল্পনা কমিশন অথবা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য যতটা সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো দরকার,—তা করতে পারেননি। জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ যে সঞ্চিত হচ্ছে না তার কারণ জাতীয় আয়ের হ্রাস নয়; তার কারণ হল সঞ্চয়ের প্রবণতার অভাব। সঞ্চয়ের হার কমে যাবার অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির দাম বেড়ে যাওয়ায় ভোগ-জনিত ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। আয়ের পরিমাণ অল্প অথচ করের বোঝা বেশি,—সঞ্চয় হ্রাসের এটাও অন্যতম কারণ।

সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সরকারী ব্যর্থতার আরেকটি নিদর্শন হল সরকারী সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপ। শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ঘোষণা করেছেন, এ বছর রেলওয়ে খাতে ঘাটতির পরিমাণ ৪৭ কোটি দাঁড়াবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হেতু রেল-লাইন নষ্ট হয়ে যাওয়া অথবা রেলপথে মাল চলাচল কমে যাওয়া প্রভৃতি কারণে হয়তো কিছু পরিমাণ আয় কমেছে; কিন্তু এই ঘাটতির প্রধান কারণ তা নয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ব্যয়-সংকোচ, আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন খুব সাফল্য দেখাতে পারেননি—অপরদিকে রেলকর্মচারীদের অন্তর্বর্তীকালীন বাড়তি বেতন দিতেও ৩৭ কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা এখন ক্ষতির পাল্লায় আছে; টাটানগর এবং ভিলাই ছাড়া অন্য ইস্পাত কারখানার অবস্থাও আশাপ্রদ নয়। ফুড কর্পোরেশনের ব্যবসায়ে লাভ হলেও খাদ্য-সামগ্রীর ক্ষতি ও অপচয়ের পরিমাণও কম নয়। অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, লাভ অপেক্ষা ক্ষতির দিকেই পাল্লা ভারী। লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের কাজ অবশ্য আশাব্যঞ্জক। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক-গুলি কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে বটে; কিন্তু দ্রুত উৎপাদন না বাড়ায় প্রদত্ত ঋণ মুদ্রাস্ফীতি প্রসারের সহায়ক হয়েছে।

এই অবস্থার পরিণতি কোথায়? যাঁরা আশাবাদী নন তাঁদের অভিমত হল, চতুর্থ পরিকল্পনার কিছু কাটছাঁট করা উচিত, এবং এই অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতেই অনেকে আশংকা করেছেন যে চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হ্রাস করা হতে পারে। কিন্তু তাতেই যে সমস্যার সমাধান হবে মনে হয় না। সীমিত সম্পদের মধ্যেই সরকারকে এখন অগ্রাধিকার দিতে হবে চারটি ক্ষেত্রে:—(১) বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য শ্রম-নিবিড় বিনিয়োগ কর্মসূচিতে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব আরোপ, (২) খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য 'সবুজ বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা, (৩) রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং (৪) কর ফাঁকির উপর ও কালো টাকা জমানোর উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ। আমাদের মনে হয়, শুধু এই চারটি কর্মসূচীকে সামনে রেখে চতুর্থ পরি-কল্পনাকে সফল করার জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যেতে পারেন। জিনিসপত্রের দাম কমাতেই হবে। তার জন্য সরকারকে কঠোর হস্তে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতির চাপে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত: এই দুইটি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা জোরদার না করে শুধু সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দেওয়া অর্থহীন। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই এই সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব।

সুব্রত গুপ্ত

সেই রাত্রে বাড়ি ফিরে অঞ্জলি অজ্ঞান অচৈতন্যের মতো পড়ে ছিল সারারাত। মনোরমা কুৎসিৎ কথা বলে বকাবকি করছিলেন, দেরি করে বাড়ি ফেরার দরুন বাবাও বকাবকি করছিলেন, সে সব কথা কোথাও তার বিঁধছিল না, এ সবের কোনো চেতনাই ছিল না। সকালে উঠতে গিয়ে দেখল, মাথা তুলতে পারছে না।

সে বুঝতে পারছিল, ভীষণ জ্বর হয়েছে, গায়ে অসম্ভব ব্যথা, চোখ দুটো পুড়ে যাচ্ছে, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, আগুনের মতো জ্বলছে হাত পা, জিব একেবারে শুকনো, মুখ নোনতা, বিস্বাদ।

'জল! টুকু, এক গ্লাস জল।'

ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে বাবা থমকে দাঁড়ালেন, ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেখে বললেন, 'কী হয়েছে? শুয়ে আছিস কেন? শরীর ভাল নেই?'

'জল।'

বাবা এগিয়ে এসে হাত রাখলেন কপালে, চমকে উঠে বললেন, 'ঈশ! এ যে পুড়ে যাচ্ছে। কী কাণ্ড!'

এর পরে ঘরে হয়তো আরও কেউ এসে থাকবে, হয়তো মনোরমাও এসেছিলেন, মাথার কাছে বসেছিলেন, হাওয়া করেছিলেন, বাবা সামনের ডাক্তারখানা থেকে দৌড়ে ওষুধ এনেছিলেন—সবই অঞ্জলির কাছে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশার মতো অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। তারপর পুরো সাতদিন একই ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থেকে আট দিনের দিন জ্বর ছাড়লো। এবং তার পরের দিন একটি চিঠি পেলো।

লেফাফার উপর হাতের লেখা দেখে বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। মাস্টার মশায়ের চিঠি।

অঞ্জলি,

সূর্য কুন্তীকে ভোগ করে তার কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, পরাশর সত্যবতীকে। এটা ধর্মের কথা, তখনকার সমাজের কথা, মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর কর্ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী দ্বৈপায়নের জন্মকথা। যদি সেটাই সত্য হয় তবে এটাও সত্য হোক, আমি ও আমার প্রিয়তমাকে তার কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিলাম। প্রার্থনা করি, সে সুখী হোক, মনে কোনো গ্লানি না রাখুক। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেভাবেই ঘটুক না কেন, এটা এমন মারাত্মক অপরাধ বলেও আমি গণ্য করি না। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মানুষের এই ধরনের পতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অনুত-ভাষী নীচমনা, কুটপ্রকৃতি ঔদরিক এবং স্বার্থপর মানুষ সর্বদাই ক্ষমার অযোগ্য।

তবুও শারীরিক প্রমাদবশত আমি আমাকে ছাড়িয়ে আমার স্বভাব এবং আদর্শ ছাড়িয়ে আমার সর্বাধিক প্রিয়াকে যে কষ্ট দিয়েছি, সেই কষ্ট বহু কোটি গুণ হয়ে এ কদিন আমাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে রেখেছে, মনে হচ্ছে একটা প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। তার আগে তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তলায় কোনো নাম সই নেই। অঞ্জলি চিঠিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে। বাইরে থেকে মনোরমা বললেন, 'কে চিঠি লিখেছে? সীতেশ বুঝি?'

দুর্বল গলায় অঞ্জলি বলল, 'হ্যাঁ।'

মনোরমা বললেন, 'আসবে কবে?'

অঞ্জলি বলল, 'ঠিক নেই।

পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলেই বাবা দরজার কাছে এসে বললেন, 'ডক্টর যোগেশ্বর সরকারই তো তোর স্টাইপেণ্ডের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, না?

কেঁপে গিয়ে অঞ্জলি বলল, 'হ্যাঁ।'

'তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

'কী!'

'এই দ্যাখ, কাগজে লিখেছে, 'ডক্টর যোগেশ্বর সরকার একজন বিখ্যাত ইতিহাস-বিদ। তিনি একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গুণীসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁহাকে ভালোবাসিত, তিনিও তাঁহাদের জন্য প্রাণ দিতেন। গতকাল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তাঁহার গৃহভৃত্য নকুলচন্দ্র জানা দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাকাডাকি এবং ধাক্কাধাক্কি করিয়া ভিতর হইতে বন্ধ দরজা খোলাইতে না পারিয়া ঘরের এ-পাশের জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখে যে তিনি তাঁর শয়ন-কক্ষের সিলিংয়ে পাখার আংটার সঙ্গে দাড়ি লাগাইয়া ফাঁসিতে ঝুলিয়া আছেন, এবং দুর্গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গিয়াছে। লোকটি ভয় পাইয়া ছুটিয়া নিচে যায় এবং চিৎকার চ্যাঁচামেচি করিয়া লোক জমাইয়া ফেলে। দোতলার ঠিকে ঝিটি নাকি দুইদিন আগে দুপুর বারোটা নাগাদ তাঁহাকে সামনের ডাক-বাক্সে একটি চিঠি ফেলিতে দেখিয়াছিল, চিঠি ফেলিয়াই তিনি চলিয়া আসেন এবং উপরে উঠিয়া যান। তাহাদের ধারণা, তাহার পর আর তিনি নামেন নাই। পর্দিলন

অসিরা তাঁহার ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢোকে এবং লাশ নামাইয়া মর্গে লইয়া যায়। মৃতের বিছানার উপর একটি খাতার পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো, 'আমার মৃত্যুর জন্য আমার পাপই দায়ী, আর কেউ নয়।'

মরা-মাছের মতো পলকহীন নিষ্প্রাণ চোখে অঞ্জলি বাবার দিকে তাকিয়ে খবর পড়া শুনেছিলো, পড়া শেষ হয়ে গেলেও তেমনিই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বুক ভারি হয়ে কান্না এলো তার।

তার মাস্টার মশায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছিলো, সে মনে মনে বলছিলো, 'আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম। মৃত্যুর পরেও যদি সত্যিই মানুষের আত্মা বলে কিছু থাকে তার যেন সদ্‌গতি হয়।

তারপর কয়েকটা দিন যে কী ভয়ংকর ভাবে কেটেছিলো, তা শুধু অঞ্জলিই জানে। একবার মনে হচ্ছিলো সতীশদা থাকলে হয়তো সে জুড়োতে পারতো একটু। তার-পরেই মনে হলো, একথা কি বলা যেতো তাকে? একজন পুরুষকে? অসম্ভব। অসম্ভব। আর সুদর্শন? সুদর্শনকে বলা যেতো কী?

নিশ্চয়ই। একমাত্র মানুষ তো সুদর্শনই যার কাছে সে তার সমস্ত দুঃখ সমস্ত বেদনা সমস্ত লজ্জা অকপটে উদ্ঘাটন করতে পারে। 'সুদর্শন, আমাকে তুমি বাঁচাও। এই গ্লানি থেকে আমাকে তুমি উদ্ধার করো।' এই আরম্ভ দিয়ে একটা চিঠিও লিখেছিলো সে। তারপরই ছিঁড়ে ফেললো কুটি কুটি করে। না, একথা সে চিঠিতে লিখতে পারে না। লেখা উচিত নয়। এটা সুদর্শনের পক্ষে কিছু সুখের খবর নয়। যদি কাছে থাকতো, বলা যেতো, সব বলে হালকা হওয়া যেতো। কিন্তু চিঠিতে অসম্ভব। কী লিখবে সে? কেমন করে লিখবে? এই লজ্জার ভাষা কী? আর তাছাড়া এখন সে জাহাজে।

অসুখ এবং এই ব্যাপার মিলে তাকে খুব দুর্বল করে দিয়েছিলো, মানসিক ভাবেও, শারীরিক ভাবেও। তার মধ্যেই একদিন জ্যোতির্ময় পুরুষের মতো সুদর্শন প্রত্যাবৃত্ত হলো কলকাতা শহরে। তার দিকে তাকিয়ে অঞ্জলির বিহ্বল হৃদয় তৎক্ষণাৎ ভুলে গেল সব দুঃখ, সব দৈন্য, ভাগ্যের সব নিষ্ঠুরতার কথা। কোনো বেদনা আর যেন অবশিষ্ট রইলো না। তারপরের কয়েকটা দিনের দ্রুততার তো কোনো তুলনাই নেই। বিবাহের প্রস্তাব, দিনক্ষণের হিসেব, ঠাকুর পুরুত, নিয়ম কানুন—

সুদর্শনের বাবার কোনো আপত্তি ছিলো না রেজিস্ট্রেশনে, কিন্তু আপত্তি করলেন অঞ্জলির বাবা। আর মনোরমাও ঈর্ষা রাগ সব ভুলে মেতে উঠলেন বিয়েতে। বোধ-হয় বড়োলোক দেখে হকচকিয়ে গিয়ে-ছিলেন। জামাইয়ের চাল-চলন চেহারা দেখে সাহস পাননি কথা বলতে। আর মিষ্টি-স্বভাবের সুদর্শনও বাচ্চাদের উপহার দিয়ে, গাড়ি চড়িয়ে বেড়িয়ে, মনোরমার মন ভুলিয়ে, বাবাকে সম্ভ্রম করে একেবারে মোহিত করে দিল।

বিয়ের চতুর্থ দিনেই চলে এলো দিল্লিতে। পেঁজা তুলোর মতো নির্ভার হয়ে উড়ে যেতে লাগলো দিন। আদরে সোহাগে প্রেমে ভালোবাসায় মূর্ছার মতো কাটতে লাগলো যুগল-জীবন।

বাড়িটি বড়ো সুন্দর ছিলো। শহর থেকে একটু দূরে, নিরিবিলিতে, বলা যায় একটি নিকুঞ্জ। সেই নিকুঞ্জের দুটি পাখি, সে আর সুদর্শন। সুদর্শনের বাবাও এসে ঘুরে গেলেন। মহা খুশি। সবই ভালো। সবই সুন্দর। সবই সম্পূর্ণ।

কিন্তু তবু কি কখনো মন খারাপ হতো না? হতো। কোনো কোনো ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে একটা সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ-মুখ কণ্টক বিদ্ধ হতো হৃদয়ে, গোপনতার কণ্টক। অথচ তখন আর বলতে পারতো না, অনুভব করতো, কোথায় একটা লজ্জা আর সংকোচ মুখ চেপে ধরেছে। সেই সঙ্গে ভয় এবং বেদনা। অথচ সেই সময়ে সেই সাংঘাতিক দুঃখের সময়ে সে আকুলিবিকুলি হয়ে সুদর্শনকেই চেয়েছিলো সব জানাবার জন্য। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেছে, উত্তাল তরঙ্গ এখন শান্ত। কাজেই গর্ত খুঁড়ে আর অশান্তির সাপকে টেনে বার করে কী লাভ?

তবু যে তার অভিন্ন হৃদয়, যার জন্য সে সব কিছু বিনিময় করতে পারে, তার কাছে এই ভীষণ সত্যটি উন্মোচন করতে না পেরে রক্তক্ষরণ হতো।

শুধু তো নিজের লজ্জাই নয়, মাস্টার-মশায়কে হেয় করতেও আঘাত লাগতো তার। একটা মুহূর্তের স্খলনে মানুষটা যে অন্যায় করে মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলে গেছেন আর তাঁকে ঘৃণা দিয়ে দ্বিতীয় বার হত্যা করতে?

'কার ছবি মা?'

পুরন্দর পিছনে এসে দাঁড়ালো। তার-পর খাটের উপর পড়ে থাকা পোস্টকার্ড সাইজ পোকায় কাটা সুদর্শনের প্রতিকৃতি-খানা হাতে নিয়ে ঘুরে মায়ের সামনে এসে বসলো, হাত থেকে পোর্টফোলিওটা ছুঁড়ে ফেললো ওপাশে।

ভীষণভাবে চমকে অঞ্জলি দেবী কেঁপে উঠেছিলেন, তারপরেই সচেষ্ট সংযমে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে এটা ওটা নাড়তে লাগলেন।

পুরন্দর চুপচাপ ছবির যুবকটিকে দেখতে দেখতে খাদের গলায় বললো, 'এই বুঝি?'

মুখ না ফিরিয়ে অঞ্জলিদেবী অস্ফুটে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কোনোদিন তো দেখাওনি।'

'মনে ছিলো না।'

'ছিলো।'

'দেখে কী হতো?'

'হাজার হোক, বাপকে তো আর মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। মূর্তিটা চিনে রাখতুম।

'তোর কাজকর্ম সব হলো? আর তো ছুটোছুটি করতে হবে না?'

'লোকটি দেখছি চেহারার দিক থেকে বেশ ভদ্রলোকেরই মতো, প্রথম বিভাগে পাশ করানো চলে।'

'তোর গরম কাপড়চোপড় বলতে গেলে তো নেই-ই দেখছি, তার মধ্যে পোকায়

ফেটেছে আবার। শুধু ওভার-কোটটাই নতুন।'

'প্রায় আমার বয়সেরই ছবি।'

'আমাদের স্কুলের বিভাদি বলছিলেন বম্বেতে শান্তিনিবাস বলে একটা অল্পদামের নতুন হোটেল হয়েছে—' .

'আচ্ছা মা, তুমি যখন চলে এলে—'

এবার মুখ ফেরালেন অঞ্জলি দেবী অস্থির গলায় বললেন, 'আঃ, ওসব কথা এখন থাক বুদু—'

পুরন্দরও অস্থির গলায় বললো, 'থাকবে কেন?' আমার সব জানা দরকার।'

'জেনে কী হবে?'

'কী আবার হবে? নিজের জীবন নিজে জানবো না, এ কেমন কথা?

সবই তো জানিস।'

'না জানি না। তুমি আমাকে যে অন্ধকারে রেখে বড়ো করে তুলেছ, কখনো কখনো আমার এমন সন্দেহও হয়েছে, পিতৃ-পরিচয়হীন এক অনাথ বালককে মানুষ করেই তুমি মা হয়েছ, আমি হয়তো তোমার গর্ভজাত সন্তান নই।'

অঞ্জলি ছেলের দিকে তাকালেন, বোঝা গেল বুকে তার তীর বিদ্ধ হয়েছে।

হোক। মায়ের এই চিরাচরিত চাপা স্বভাব পুরন্দরকেও এক সময়ে কম তীর বেঁধায়নি। যে ক'বছর একটা শিশু অচেতন থাকে, সে সময়টুকু বাদ দিলে পরবর্তী অনেক বছর, মানসিক ভাবে সত্যি সে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এই জন্যই ভোগ করেছে, তার মা তার বাবার বিষয়ে অস্বাভাবিক ভাবে নিঃশব্দ ছিলেন। ছেলে-মানুষী কৌতূহলবশত অনেক সময় সে জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, আমার বাবা কোথায়'? মা জবাব দেননি, অন্য কাজে ব্যাপৃত করেছেন নিজেকে। বাবার নাম পর্যন্ত কতোদিন জানতো কিনা তার ঠিক নেই।

অবশ্য বড়ো হয়ে সেই নৈঃশব্দের সমস্ত অর্থই খুঁজে পেয়েছে, বাবার বিষয়ে মায়ের অভিমানকে সে সঙ্গত বলেও মনে করেছে, তবু তার মন প্রবোধ মানেনি। তবু যেন কোথায় একটা সন্দেহের কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করেছে।

মায়ের অভিমান যে শুধু তাঁর নৈঃশব্দ্যেই সীমিত ছিলো তা নয়। মা নিজের বলতে কিছুই রাখেননি জীবনে। কখনো হাসেননি, বেড়াননি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বসনভূষণ কিছুই তাঁর ছিলো না। হঠাৎ দেখলে তাঁকে সন্ন্যাসিনী বলে মনে হতো। মায়ের এই বৈরাগ্যের বেদনা সে বুঝেছিলো, বুঝেছিলো বাবা নামের ব্যক্তিটি একজন অতিবড়ো পাষণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়, এবং আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে এর ওর তার কথা জোড়া দিয়ে এও বুঝেছিলো, বড়ো-লোকের পুত্রটি তার লাবণ্যময়ী মাকে দেখে একদা মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করলেও বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। তারপর শখ ফুরোতে ক'দিন লাগে? বিয়ের আগেই এক মেমসাহেবের সঙ্গে ভাব করে এসেছিলো বিলেতে, সেই মেম এসে একদিন হামলা করতেই তাড়িয়ে দিলেন স্ত্রীকে।

তবু—তবু যে কেন বাবাকে মন্দ ভাবতে তার কষ্ট হয় তা সে বুঝে উঠতে পারে না। বাবার বিষয়ে তার অদম্য কৌতূহল তাকে সেই অদেখা মানুষটির প্রতি আরো আকর্ষিত করে। তাঁর সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় সে অধীর হয়, চুপে চুপে অতি নিভৃত হৃদয়ে বাবাকে সে ভালোবাসতে থাকে। আর তারপরেই মায়ের সব কথা বুঝেও অবুঝের মতো রাগ করে। অথচ বাবা নামটা তার কাছে একটা সংজ্ঞা বা ধারণা ছাড়া আর কী?

তা হলে এই তার পিতৃদেব? ছবিটাকে পুরন্দর উলটে-পালটে দেখতে লাগলো। চমৎকার ফ্যাশনেবল যুবক। বাঁ হাতে সিগারেটটি ধরে; কোটের বাটনহোলে ফুলটি গাঁজে, কেমন সাহেব সাহেব চেহারা করে হাসছে তাকিয়ে তাকিয়ে। ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে আছে, যেন এখুনি কথা বলে উঠবে। দেখতে খুব ভালো লাগছিলো পুরন্দরের, বুকটা কেমন ভরা ভরা লাগছিলো।

ছেলের জন্য তাড়াতাড়ি চা তৈরি করে নিয়ে এলেন অঞ্জলি দেবী, জলখাবার নিয়ে এলেন। বললেন, 'সামান্য একটা ব্যাপারে কী হয়রানিই হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে এসব ঝমেলা ছিলো না। আমরা রওনা হচ্ছি কবে?'

পুরন্দর চায়ে চুমুক দিতে দিতে মাকে দেখলো, নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'শোনো মা, তুমি বম্বে পর্যন্ত যেও না। মিছিমিছি যাবে কেন? সেই তো একা একা ফিরতে হবে আবার?'

অঞ্জলি দেবী নিজেও এক কাপ চা ঢেলে নিলেন, বললেন, 'আমি ছুটি নিয়ে নিয়েছি ইসকুল থেকে। আমার জন্য ভাবিস না।'

'না, তা ভাববো কেন? আমার তো তোমার জন্য কোনোই ভাবনা নেই কিনা?' পুরন্দর অভিমান করলো।

'রাগ করছিস?' অঞ্জলি দেবী সস্নেহ হাস্যে হাত রাখলেন পিঠে।

পুরন্দর বললো, 'জানি, তোমার দুঃখ কষ্টের সঙ্গে তোমার একারই সম্পর্ক, দুঃখ কষ্টকে তুমি একাই আঁকড়ে রাখতে চাও, কিন্তু এখন যে তুমি একা নেই, সে কথাটা ভুলে যাও কেন বারে বারে?

'ভুলে যাই?' হঠাৎ চোখে জল এসে যায় অঞ্জলি দেবীর। আজ বড়ো বিচলিত হয়েছেন, ছাইচাপা আগুন একটু উস্কানিতেই কেমন গনগনে হয়ে উঠছে। বিদ্যুৎ চমকের মতো কতো কথা যে চমকে উঠছে বুকের মধ্যে! ভুলে যাওয়া কতো শত স্মৃতি ঘুমন্ত স্মরণশক্তিকে সতেজ করে তুলছে।

স্মৃতির চমক এই মুহূর্তে পুরন্দরকেও অভিভূত করলো। এবং এই ছবিটিই তার উপলক্ষ হয়ে মনে পড়িয়ে দিল তার শৈশব। পিতৃহীন শৈশব। যে সময় মা তাঁকে আদর করতেন, চুমু খেতেন, খাইয়ে-দাইয়ে পোশাক পরিয়ে আঙুল ধরে নিয়ে যেতেন তাঁর ইস্কুলে। নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখতেন নিচু ক্লাসের বাচ্চাদের সঙ্গে। বসে থেকে থেকে সে ঘুমে ঢুলে পড়তো, বুড়ো দারোয়ান মনবাহাদুর এসে কোলে করে নিয়ে যেতো নিজের ঘরে।

মার কাছে শুনেছে, যখন আরো ছোটো ছিলো, হাঁটতে পারতো না, ইস্কুলে নিয়ে যাবার মতো বড়ো হয়নি, মা তখন একা ঘরে একটা ঘেরাও করা কাঠের রেলিংয়ের মধ্যে, (সেটাকে প্লে-পেনের অপভ্রংশ বলা যেতে পারে) বিছানা পেতে রাজ্যের খেলনা আর খাবার দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বাইরে তালা ঝুলিয়ে চলে যেতেন। ইস্কুলের অল্প নিচেই ছিলো তাদের বাসস্থান, ছুটে ছুটে লাল হয়ে দেখে যেতেন এসে, টিফিনে এসে খাইয়ে যেতেন।

এ সময়গুলোর বিশেষ কোনো স্মৃতি নেই তার, বলা যায় তখনো সে অচেতন শিশুমাত্র। সে শুনেছে, প্রতিবেশীদের কাছে শুনেছে, শুনে শুনে গেঁথে গেছে মনের মধ্যে। ভুলে গেছে শোনা না জানা।

আর যতোদিনে তার জ্ঞান হলো, মনে রাখার শক্তি হলো, স্মৃতি হলো, ততোদিন থেকেই তো মায়ের কপালে রেখা দেখে অভ্যস্ত। দুঃখের রেখা, অপরিসীম দুঃখের রেখা। ধৈর্যের রেখা, সহ্যের রেখা। যে কষ্টে, যে যত্নে, যে নিষ্ঠায় তিনি তাঁর শিশুকে লালন করেছেন পালন করেছেন, তিলে তিলে বড়ো করে তুলেছেন, সত্যি তার কোনো বর্ণনা নেই, তুলনা নেই।

কোনো কিছু নিয়েই মার বিলাপ করা অভ্যাস ছিলো না, দুঃখের আগুনে একাই পুড়েছেন তিনি, তার তাপটুকু পর্যন্ত কোনোদিন টের পায়নি পুরন্দর। পুরন্দরও পায়নি, আশেপাশের কোনো লোকও পায়নি। তাঁর ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণ হাসিটি সব সময়েই লেগে থেকেছে, সব সময়েই মিষ্টি করে কথা বলেছেন, সহিষ্ণুতার সঙ্গে অন্যের কথা শুনেছেন। বালক বয়সে বোঝা না বোঝার দোলায় দুলতে দুলতে এই লোকটির উপর, ছবির এই সুন্দর যুবকটির উপর, বাবা নামের একজন অদেখা অজানা অস্তিত্বের উপর ভীষণ আক্রোশে জ্বলেছে সে। যতো জ্বলেছে ততোই মায়ের প্রতি করুণায় বিগলিত হয়েছে, ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছে। মনে মনে সে বাবার সঙ্গে তর্ক করেছে, যুদ্ধ ক'রে হারিয়ে দিয়েছে, তারপর কখন যেন ক্ষমা ক'রে বন্ধু হ'য়ে সেই জন্মদাতা পাষণ্ড পুরুষটিকে অসম্ভব দেখতে ইচ্ছে করেছে। যে বয়সে ছেলেরা দুরন্ত হ'য় ওঠে, অবাধ্য হয়ে ঘুড়ি ওড়ায়, লাট্টু খেলে, পাকা বন্ধুদের সঙ্গে নির্বিবন্ধ কথা বলে এবং শেখে, গুরুজনের সঙ্গে চালাকি ক'রে নানা দুষ্কর্মের সারথী হয়, সেই বয়সে সে কোনো নিভৃত কোণে ব'সে কল্পিত বাবার সঙ্গে একাত্ম হ'য়েছে। ফিস-ফিস ক'রে বলেছে বাবা, তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

অনেক বড়ো হ'য়েও এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। যুক্তি দিয়ে মনে হয়েছে, বিশুদ্ধ কৌতূহল ছাড়া আর কী!

এখন এই মুহূর্তে মায়ের জন্য বুকের ভিতরটা তার টনটনিয়ে উঠলো। মাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে কান্না উঠে আসতে চাইলো। তিন চার বছর তো কম সময় নয়, ফিরে এসে যদি দেখা না হয়!

ছিঃ এ সব কেন ভাবছে সে। এ ভাবনা মোটেই একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের মতো নয়। কিন্তু তার মা-ও তো অন্য পাঁচজনের মতো মা নয় যে সে-ও সকলের মতো মন নিয়ে মা বিষয়ে ভাববে? মার প্রতি তার শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ভালোবাসাই নয়, মার জন্য তার কর্তব্য কৃতজ্ঞতা করুণা স্নেহ সব একসঙ্গে জোট পাকিয়ে গেছে।

তাছাড়া মাকে সে পছন্দও করে। সাংঘাতিক কোনো মতবিরোধের প্রশ্ন এখনো ওঠেনি। সেটা কম কথা নয়, দুই জেনারেশনের পক্ষে। এবং সেই জন্যেই মা তার শুধুই মা নন, মা তার বন্ধু। মার সঙ্গে সময় কাটানো যায় গল্প ক'রে।

কিন্তু এই ছবিটা মা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন এতোদিন ধরে? কেন তাকে দেখতে দেননি কখনো? এও কি একটা আত্মনির্যাতনের উপায়? যেমন তিনি শক্ত শয্যায় ঘুমোন, স্বেচ্ছাকৃতভাবে গরমে ঘামেন, শীতে ফাটেন, রোদে পোড়েন? প্রতিশোধের কী অদ্ভুত পদ্ধতি, অস্বীকারের কী অভিনব উপায়। কিন্তু কী মনের জোর! অ্যাডমায়ার না করে পারে না পুরন্দর।

কিন্তু যার জন্য এভাবে প্রতিনিয়ত পিষ্ট করছেন নিজেকে, সে কি দেখছে তাঁকে? তবে কার জন্য এই ত্যাগ? কার জন্য?

(ক্রমশ)

শব্দ !!!
শিশু ?

বাইরের শব্দময় জগৎ সম্পর্কে আমাদের যে ভীতি, হয়ত সেটা অমূলক। সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শব্দ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মানুষের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি এড়ানোর জন্যে কোন কোন অঞ্চলে নিয়মিত গোলমাল বন্ধ করার আইনও প্রবর্তিত হয়েছে। এরই মধ্যে খানিকটা আশার কথা শুনিয়েছেন জাপানী গবেষকরা। ওঁরা বলছেন, এখনই অত ভয় করার কী হল ? শিশুদের জন্যে ভয় ? ওরা পৃথিবীতে আসে শব্দকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নিয়েই।

দেবতার প্রাণ : পেরুর ভূমিকম্প

ব্যাপারটা খুবই অভাবিত। জাপানের ওসাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সব সময়ই হট্টগোলে ভরপুর থাকে। এরই পাশে আইতামি শহর। জেট প্লেনের প্রচণ্ড শব্দে সেখানকার মানুষের কালা হবার মত অবস্থা। কিন্তু এর মধ্যে খুব আকস্মিক একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলেন কোবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী—ওয়াই আনদো এবং এইচ হাত্তোরি। ওঁরা দেখলেন কোন্ শিশু কতটা প্লেনের শব্দে আচ্ছন্ন হবে, সেটা নির্ভর করে তাদের মায়েরা কত-দিন ধরে আইতামি শহরে বাস করছেন তার উপর। এর আগে এমন ঘটনার কোন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় নি। ওঁরা ঠিক করলেন, এর উপর ওঁরা নিয়মিত সমীক্ষা চালাবেন।

আনদো এবং হাত্তোরিকে সৌভাগ্যবানই বলতে হবে। কারণ জাপানের আইন, যখনই কেউ নতুন কোন শহরে স্থায়ী বা অস্থায়ী-রূপে বাস করতে যাবেন, তাঁকে সেই শহরে নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে। এর ফলে ১৯৬৮ সালে আইতামি শহরে কতজন মা ঠিক কত সময় ধরে বাস করছেন তার হিসেব জোগাড় করা কঠিন হল না। ওঁরা ৩৪০০ জন মার নাম ঠিকানা টুকে নিলেন। পর্যবেক্ষণের জন্যে তিন শ' সাতজন শিশুকে চিহ্নিত করা হল এবং তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তুলে একটি করে তালিকা উত্তরের জন্যে ওদের মায়েদের কাছে পাঠান হল। যথা সময়ে উত্তরগুলি এলে জানা গেল, কোন্ মা কতদিন ধরে ঐ শহরে এসে বাস করছেন, তার আগে ঐ ধরনের কোলাহলপূর্ণ আর কোন শহরে তাঁরা বাস করেছেন কী, না, করলে কতদিন ধরে করেছেন এবং মাথার ওপরকার আকাশ পথে যখন কোন প্লেন উড়ে যায় তখন তাঁদের শিশুদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

পুরো হাদিসগুলি সমীক্ষার মত করে সাজিয়ে নিয়ে শুরু হল পর্যবেক্ষণ। রীতি-মত নাটকীয় কাণ্ড। কিছু কিছু মা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার আগেই আইতামি শহরে এসেছিলেন। সেখানে আসার পর তাঁরা সন্তান ধারণ করেন এবং ঐ সমস্ত শিশু ভ্রূণ অবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মায়েরা সেখানেই বসবাস করেন। দেখা গেল, ঐ সব শিশুর শতকরা ৫৮ জনই গোলমালের মধ্যেও বেশ বহাল তবিয়তে ঘুমোয়। এমন কি মাথার উপর দিয়ে প্লেন উড়ে গেলেও সে ঘুমে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তবে এ ক্ষেত্রে শতকরা ছয়জন জেগে ওঠে এবং কান্নাকাটি শুরু করে দেয়।

দ্বিতীয় দলে ছিলেন এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক মা, যাঁরা প্রথম পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঐ শহরে বাস করতে আসেন এবং সেখানেই তাঁদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এঁদের বেলায় দেখা গেল, গোলমালের মধ্যে শতকরা সাতচল্লিশজন শিশু কোন রকম ব্যাঘাত বোধ করে না, আরামেই ঘুমোয়। শতকরা তেরো জন গোলমাল হলেই কাঁদতে শুরু করে। শেষের দু' দল মা আইতামি শহরে এসে বাস করতে শুরু করেন অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার শেষের মাস চারেক অথবা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরে। এঁদের শিশুর শতকরা শুধু নয় থেকে ষোল জনের ঘুম গোলমালে বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু শতকরা পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশজনই জেগে ওঠে এবং ভীষণ-ভাবে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

গবেষকদের বক্তব্য, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর প্রায় প্রথম চার মাস শিশুর দেহের স্নায়ুতন্ত্র মোটেই পরিপুষ্ট অবস্থায় থাকে না। অতএব প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা 'শোনা' বলি, ঐ কাজটি করা তখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু কোন একটি জটিল পদ্ধতিতে বাইরের শব্দ তার শারীরিক গঠনের মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন আনে যার ফলে জন্মের পর

বাইরের শব্দের সঙ্গে সহজেই সে খাপ খেয়ে চলতে পারে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে ভ্রূণ অবস্থার কীভাবে এটা ঘটে থাকে সে কথা আনদো এবং হাতোরি অবশ্য পরিষ্কার করে বোঝাতে পারেননি। আমতা আমতা উত্তর একটা দিয়েছেন। বলছেন, বাইরের শব্দ সম্ভবত মায়েদের এনডোক্রিন এবং স্বনিয়ন্ত্রিত স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনই পরে ভ্রূণের এনডোক্রিন কিংবা স্নায়ুতন্ত্র অথবা উভয়কেই প্রভাবান্বিত করে। ও'দের বক্তব্য, তাঁদের এই আবিষ্কার এটাই প্রমাণ করে, আধুনিক পৃথিবীতে শব্দের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে মানুষের মধ্যেও দ্রুত বিবর্তন আসবে। ফলে, শব্দের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কোন অসুবিধেয় পড়তে হবে না। কথাটার মধ্যে খানিকটা যেন লেমার্কের তত্ত্বের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। লেমার্কের তত্ত্বে বলা হয়েছে, প্রাণীদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবর্তন নির্ভর করে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারের উপর। সে প্রত্যঙ্গ যে বেশি কাজে লাগায় সে অনেক বেশি সতেজ এবং সক্ষম হয়ে ওঠে। যাকে কম কাজে লাগান হয় বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে
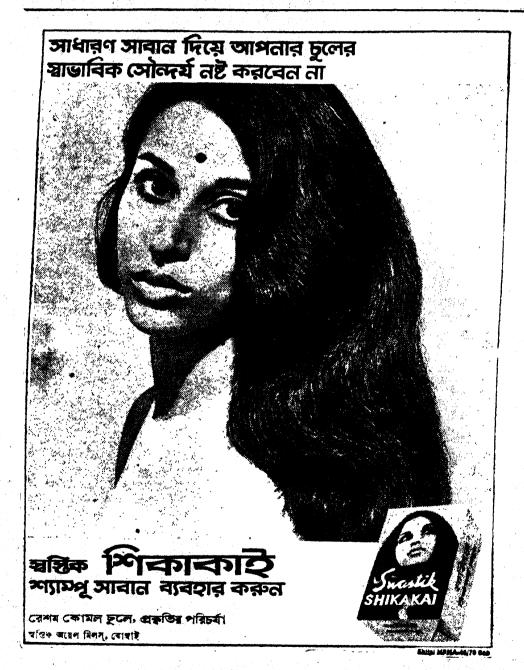
তারা দুর্বল এবং অবশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। বংশগতির মধ্যে দিয়ে এই সজীবতা বা দুর্বলতা ক্রমে ক্রমে সংবাহিত হয়, বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে যদি এই মতবাদ খেটে যায় তাহলে অবশ্য নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। বাইরের শব্দ শিশুদেহে যে পরিবর্তন ঘটাবে, সেই পরিবর্তন পরবর্তীকালে তার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও বর্তাবে। বরং সেই সঙ্গে সেই সন্তানরা ভ্রূণ অবস্থায় অতিরিক্ত সহ্যক্ষমতা অর্জন করে বাবা-মার চেয়ে নিজেদের আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলতে পারবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি এবং তার সঙ্গে স্বোপার্জিত পাওনা— একেবারে ডবল লাভ : অতএব মাভৈঃ!

ভূমিকম্প !!

পেরুর সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বিজ্ঞানীরা আবার নতুন করে ভূমিকম্পের দুর্যোগ সম্পর্কে খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। ওঁদের প্রশ্ন, সঠিক দুর্ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পূর্বে ভূমিকম্পের আভাস কী আগে থেকে যোগান সম্ভব নয়? অথবা খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করে কী ভূমিকম্পকে প্রতিহত করা যায় না?

সংবাদে আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন, এ বছর মে ৩১ পেরুতে যে ভূমিকম্প হয়ে গেল, শুধু সরকারী হিসেবেই তাতে নিহত হয়েছেন ৫০,০০০ মানুষ। পশুর কথা আপাতত বাদ রইল। এ ধরনের দুর্ঘটনার তুলনা লিসবনের ১৭৫৫-র ভূমিকম্প। সেবারও মৃত্যুর হার ঐ একই রকম ছিল। ১৯০৮ সালে সিসিলির ভূমিকম্পে নিহত হন ৭৫,০০০, ১৯২৩ জাপানে ১০০,০০০ জন।

পেরুর ভূমিকম্পের উৎকেন্দ্র বা এপিসেন্টার শিমবোটে বন্দর থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। অথচ সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় এক লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত ঐ শহরে মৃত্যুহার তেমন বেশি হয়নি। সম্ভবত শক্ত কংক্রিটের ঘরবাড়ির দরুন এটা হয়ে থাকতে পারে। অথচ সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হুয়ায়লাস গিরিখাত অঞ্চল। এখানকার ভূ-ত্বক যথেষ্ট শক্ত। তবু কম্পনের প্রাবল্য উপেক্ষা করে শতকরা দশটির বেশি ঘরবাড়ি সেখানে টিকে থাকতে পারেনি। অবশ্য বেশির ভাগ বাড়ি কাঁচা মাটির। তবে ভূ-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সবচাইতে ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নেভাদোস হুয়াসকারণ গিরি শিখর থেকে বিচূর্ণ হিমবাহ এবং বড় বড় পাথরের স্তূপের পতনে। ভূমিকম্পে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২১৮৬০ ফুট উঁচু পর্বত চূড়া থেকে ওরা প্রচণ্ড-ভাবে গড়িয়ে পড়ে আসপাশের অঞ্চলে। তখন ওদের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫০ মাইল। তিন শ' ফুট চওড়া এবং প্রায় এক মাইল

পেরুর সেই মর্মান্তিক ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়া। হিমবাহ এগিয়ে চলেছে উয়ানগে শহরের উপর দিয়ে। শহর তখন দশ ফুট কাদার নীচে সমাধিস্থ। বাঁ পাশে উপর দিকে বৃত্তাকার অংশে দাঁড়ান যীশুর মূর্তি

লম্বা বিরাট বরফের চাঁই পাথর এবং জঞ্জালের স্তূপদের ঠেলে গড়িয়ে পড়ে নয় মাইল দূরে ইউংগে এবং রানরাহিরকা শহরে। মুহূর্তে প্রায় দশ ফুট গভীর কাদার মধ্যে শহর দুটি সমাধিস্থ হয়ে যায়। আর তা এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে, শুধু ঐ দুটি শহরেই তার দরুন মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০,০০০।

তুষার স্তূপের অমন প্রচণ্ডগতির অন্যতম কারণ, যে অঞ্চল দিয়ে সেটি নেমে আসছিল তা খাড়ায় প্রায় সত্তর ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে অবস্থান করছিল। বলতে গেলে, সরাসরি মাথার উপর থেকে ঝুপ করে পতনের মত। এবং এই খাড়ায়-পতন ঘটেছিল প্রায় ১২০০০ ফুট উঁচু জায়গা থেকে। বরফ, ধুলোমাটি এবং পাথরের চাঁই মিলিয়ে উয়ানগে পর্যন্ত পৌঁছানর পর আয়তন দাঁড়ায় আট কোটি-ঘন ফুটের মত। আর তার সম্মুখগতি এত প্রচণ্ড ছিল যে ৬০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের বাধা সে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে যায়। অবশেষে রিও সান্তা উপত্যকায় পৌঁছে সেখানকার নদীটি পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ১৭৫ ফুট উঁচু একটি স্তূপের সৃষ্টি করে। এ থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ব্যাপক ধ্বংসলীলা সম্পর্কে নিশ্চয় কিছুটা অনুমান করতে পারছেন।

অধুনা সংঘটিত এই দুর্ঘটনার পর ভূ-বিজ্ঞানীরা আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন, ভূমিকম্পের পূর্বাভাস ঠিক মত জেনে নিয়ে শত শত মানুষ এবং তাদের মূল্যবান ধনসম্পদ কী রক্ষা যায় না?

গত এক দশক জাপান এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে আসছেন, সাফল্য তেমন কিছু মেলেনি। ভূমিকম্পের কিছু পূর্বে ভূত্বকের মধ্যে কিছুটা চাপের বৃদ্ধি এবং ভূ-চুম্বক বলরেখার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা যায় বলে কেউ কেউ দাবি করছেন। তবে এ সম্পর্কে সঠিক নির্ভর-যোগ্য কোন তথ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

কেউ কেউ বলছেন, ভূমিকম্প প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের ভাবা উচিত। খানিকটা অসম্ভবের মত মনে হলেও সম্প্রতি অনেকেই মনে করছেন কোন কোন ভূমিকম্পের মূলে মানুষও নাকি কাজ করছে। যেমন ধরুন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে অ্যারিজোনার হুভার বাঁধের পেছন দিকে লেক মিয়াড তৈরি করা হয়েছে। দেখা যায় হ্রদটি তৈরি করার পরবর্তী দশ বছর ঐ অঞ্চলে কম করেও প্রায় ৬০০ বার ভূ-কম্পন অনুভূত হয়। অতি সম্প্রতি রোডেশিয়ার কারিবা বাঁধ, গ্রিসের কৃত্রিম হ্রদ ক্রিমাস্তা এবং ফ্রান্সের মন্তেনার্দ বাঁধ তৈরির ফলেও এমনটি হতে দেখা গেছে। ভারতেও দাক্ষিণাত্যে কৃত্রিম বাঁধ তৈরির

ধরনে কোন কোন অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটে চলেছে। অথচ এক সময়ে সেখানে ভূমিকম্পের ব্যাপারটা কতকটা অজ্ঞাতই ছিল। কেনিয়াতেও ১৯৬৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের কারণও অনুরূপ।

শুধু বাঁধই নয়। কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার দরুন ইতস্তত যে সমস্ত খাল কাটা হচ্ছে বা জলাধার তৈরি হচ্ছে, তাদের ওপরেও আমাদের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। খাল কেটে সুবিধে মত জায়গা দিয়ে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করার সময় পরীক্ষা করে নেয়া দরকার যে সমস্ত জায়গা দিয়ে ঐ খাল নিয়ে যাওয়া হবে সেখানকার ভূ-স্তর যথেষ্ট সহনশীল কিনা, স্তরের মধ্যে দিয়ে ভূগর্ভের সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত জল প্রবাহিত হয়ে বা চুঁইয়ে ভূ-স্তর কমজোর করে দিচ্ছে কিনা, ইত্যাদি। কারণ জলসিক্ত ঐ স্তর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে এক সময়ে বসে যেতে পারে অথবা চূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এর ফলেও প্রচন্ড ভূ-কম্প হওয়ার আশংকা থাকে।

আরও একটি বড় রকমের আশংকা, ভূ-গর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা। দেখা গেছে, ১৯৬৮ সালে নেভাডার বেনহাম অঞ্চলে ভূগর্ভে যে এক মেগাটন বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছিল তার কম্পন চার হাজার কিলোমিটার দূরে পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়। অতএব মাঝে মাঝে যদি এ ধরনের পরীক্ষা চলান হয়, ভূ-স্তরের কঠিন আবরণের মধ্যেও ফাটল ধরতে পারে এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে ভূ-সম্প্রপাত প্রভৃতি ঘটে ভয়াবহ ভূমিকম্পনও সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা আপাতত

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

তিনটি বিষয়ের উপর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন। এক, পৃথিবীর ভূ-স্তর সম্পর্কে আরও যথাযথ তথ্য সংগ্রহ। যাতে করে ওঁরা অনুমান করতে পারবেন ঠিক কোথায় ভূমিকম্প হওয়ার আশংকা আছে এবং সেই মত জনসাধারণকে সতর্ক করা সম্ভব হবে। দুই, ঠিক কিভাবে এবং কোন কোন অঞ্চল দিয়ে কৃত্রিম বাঁধ সৃষ্টি করে হ্রদ বা খাল কাটা উচিত সে সম্পর্কে যথাযথ জরিপ। তিন, ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরণ সম্পর্কে সতর্কতা। এ ধরনের প্রচেষ্টা অন্তত মনুষ্যসৃষ্ট ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে।

মেঘনাদ সাহা : তাঁর গবেষণা

আমাদের দুর্ভাগ্য, জীবন নামক বস্তুটির সঠিক লক্ষ্য-পথে অনুবর্তিত করার মত যে মহৎ-জীবনের প্রয়োজন, তাকে সহজে আমরা খুঁজে পাই না। যাঁরা বয়স্ক, তাঁদের জীবন-বেদ শুধু স্মৃতিচারণেই সমাপ্ত। যাঁরা তরুণ, বিশেষ করে আজকের তরুণ, শতেক বাধা এবং বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাঁরা হৃদয়ের সহজিয়া বৃত্তিকে অনুভব করার, ফুটিয়ে তোলার নিজস্ব ক্ষমতাটিই উপলব্ধি করতে পারছেন না, দুর্ভাগ্য, স্মৃতির সঙ্গে তাঁদের মননের সংযোগ বড় কম। এদেশে যে সমস্ত জীবন-চরিত্র বাস্তব জগতে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, কী বিজ্ঞান চিন্তা, কী সাহিত্যে, রাজনীতি অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে, বেশি দিন আগে নয়, বিগত কয়েক দশকে, তাঁদের অনেককেই আমরা বিস্মৃত হয়েছি। বিস্মৃত হয়েছি দুটি কারণে : এক, দায়িত্বহীন ঔদাসিন্য; দুই, সম্ভবত সহজে বাজিমাৎ করার একটা ব্যাপক প্রবণতা; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকার ফলে ব্যারোমিটার-এর মত ঐ সমস্ত চরিত্রের সান্নিধ্যে এসে পাছে কেউ ধরা পড়ে যাই, তার প্রচ্ছন্ন ভীতি।

এগুলি কথা বললাম, খানিকটা দুঃখে, তবে বেশ কিছুটা আনন্দে, এই বিমূর্ত মুহূর্তে হঠাৎ একটি আলোর শিখা দেখতে পেয়ে। সম্প্রতি ভারতের বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণা সংস্থার (কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ) সহযোগিতায় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার গবেষণা বিষয়ক পত্রাবলী এবং কিছু মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের সংকলন প্রকাশের নজির খুবই কম। ১৯১৭ থেকে ১৯৫৪, এই দীর্ঘ সময় ভারত এবং বহির্ভারতের প্রখ্যাত গবেষণামূলক পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, তাদের বিষয়গত বিস্তৃতি এবং গভীরতা ঠিক এমন একত্রিত-ভাবে না দেখলে যেন বিশ্বাস করা যায় না যে মানুষটি বিজ্ঞান ছাড়াও স্বদেশের বিভিন্ন স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গীত করেছিলেন, তাঁর মানসিক বৈদগ্ধ কী প্রচন্ড রকমের সম্প্রসারিত ছিল। বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণায় যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন শুধু তাঁরা নন, যাঁরা ভবিষ্যতে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবেন, তাঁদের কাছেও এ ধরনের একটি গ্রন্থ নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

প্রখ্যাত নোবেল বিজ্ঞানী অ্যাস্টন সম্পর্কে মেঘনাদ লিখেছিলেন (দ্রঃ নবভারত ৩৪ খণ্ড, পৃঃ ৫২৭; ফাল্গুন, ১৩২৯ : ইং

84. NOTE ON DIRAC'S THEORY OF MAGNETIC POLES

In a note bearing the above heading, Professor H. A. Wilson[1] has described a simple method for finding out the value of Dirac's free magnetic poles. I may point out that this method was described by me nearly thirteen years ago in a paper, "On the origin of mass in neutrons and protons." I may just quote the result:

"It was Dirac who first showed that quantum mechanics demands the existence of free magnetic poles, having the

[1] H. A. Wilson, Phys. Rev. 73, 308 (1949).
[2] Ind. J. Phys. 10, 145 (1936).

... just the result obtained by Dirac."

ডিরাকের চৌম্বক মেরুর উপর অধ্যাপক সাহার মন্তব্য

১৯২২) : ...'অ্যাসটনের কথা বলিতেছি। ইঁহার ছাত্রাবস্থার সময় কেহ কোনদিন বোধ হয় কল্পনাও করিতে পারিতেন না যে ইঁনি একদিন নোবেল প্রাইজের অধিকারী হইবেন। ক্যামব্রিজের বি-এ পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় ইঁনি একদিন নোবেল প্রাইজের অধিকারী হইবেন। ক্যামব্রিজের বি-এ পরীক্ষায় পদার্থ-বিদ্যায় ইঁনি তিন-চারিবার অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। পরে সেফিল্ড বা বার্মিংহাম এইরূপ ছোটখাট কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কোন মতে পাশ করেন। পাশ করিয়া ১৯০৫ সন হইতে ক্যামব্রিজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জে জে টমসনের অধীনে পদার্থবিদ্যায় কাজ করিতে আরম্ভ করেন।...'আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, রাজপ্রাসাদতুল্য যন্ত্রশালা এবং য়ুরোপের খুব ভাল ভাল কোম্পানীর তৈয়ারী যন্ত্রপাতি, খুব মোটা মাহিনা, চার-পাঁচজন সহকারী এবং খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকিলে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা যায় না। অ্যাসটনের যন্ত্রশালা এবং কার্যপ্রণালী দেখিলে তাঁহাদের মাথা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অ্যাসটন প্রায় ষোল বৎসর কাল বেগার খাটিয়াছেন। যন্ত্রপাতি প্রায় সমস্তই তাঁর নিজের হাতে তৈয়ারী। সমস্ত অংশ তিনি সাধারণ মিস্ত্রীর মত খাটিয়া নিজে তৈয়ারী করিয়াছেন...আমাদের দেশের অধ্যাপকগণ যাঁহারা নিজেদের অকর্মণ্যতার জন্য হয় ব্যক্তিবিশেষকে নয় গভর্নমেণ্টকে দায়ী করেন, অ্যাসটনের দৃষ্টান্ত একবার অনুসরণ করিলে তাঁহাদের অজ্ঞান অন্ধকার অনেকটা ঘুচিয়া যাইবে।'

সঙ্কলনের ভূমিকায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং বসুবিজ্ঞান মন্দিরের পুরোধা অধ্যাপক ডি এম বসু মন্তব্য করেছেন,

'Meghnad Saha's approach was more direct; he wanted to learn from me the latest advances on the frontiers of research in Physics in relation to Quantum Physics and Thermodynamics. From time to time he discussed with me the theory of thermal ionization of gases and its application to the interpretation of stellar spectra.... 'The thermal ionization in gas and its application to the elucidation of the stellar spectra, which he published in 1920 when only twenty-seven years of age, is the most outstanding and original work on which Saha's fame as a Physicist will rest.'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপক বসুর কাছে মেঘনাদ শুধু ছাত্র হিসেবেই নন, অন্যতম সাহায্যকারী বন্ধু রূপেও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

একথা আগেই বলেছি, গ্রন্থটি মেঘনাদের গবেষণা পত্রের সঙ্কলন। কোনটি একক, কোনটি যুগ্মভাবে লিখিত। বিশদ বর্ণনার চেয়ে তাই গাণিতিক প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যাই এখানে বেশি। এদের কিছু কিছু বিভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীর ফলাফলের নতুনতর

ধূমপানের আনন্দের জন্যে পানামা...
একটি পানামা ধরিয়ে দেখুন। একেবারে প্রথম টানেই বুঝতে পারবেন ওর বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাকের চমৎকার টাটকা স্বাদগন্ধ। তারপর টানের পর টান আমেজের সঙ্গে টেনে চলুন। একেবারে শেষ টান পর্যন্ত পানামা আপনাকে দেবে ধূমপানের অপূর্ব আনন্দ।
Panama
20
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ,
বোম্বাই—৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম।

বিশ্লেষণ; কোনটিতে রয়েছে মেঘনাদের নিজস্ব মতামত বা গবেষণা লব্ধ ফল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য পত্রাবলী :

On the Pressure of Light, on the Influence of the Finite Volume of Molecules on the Equation of State, Ionization of the Solar Chromosphere. On the Physical Theory of Stellar Spectra, the Pressure in the Reversing Layer of Stars and Origin of Continuous Radiation from the Sun, Negatively Modified Scattering, Colours of Inorganic Salt, Inner Conversion in X-ray Spectra, Measurement of Geological Time in India. On the conditions of Escape of Microwaves of Radio-frequency Range from the Sun. প্রভৃতি। বর্তমান আলোচনায় ঐ সমস্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত করে কিছু বলার সুযোগ নেই। তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে মূল গ্রন্থটি যে শুধু মেঘনাদ প্রতিভারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরবে তা নয়, ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর ইতিমধ্যে যাঁরা কিছু কাজ করেছেন বা করার কথা ভাবছেন, তাঁদের কাছে খুবই সাহায্যের হবে।

তবু বিক্ষিপ্তভাবে সংকলনের ৮৪নং গবেষণা পত্রাণুটির কথা উল্লেখ না করে পারছি না। মেঘনাদের গবেষণার পরিধি যে কী ব্যাপকতর ছিল এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এ কথা সকলেই জানেন, বিদ্যুৎ আধান দু প্রকার, পজিটিভ বা ধনাত্মক এবং নিগেটিভ বা ঋণাত্মক। কৃত্রিম উপায়ে এই দুই আধানকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে চুম্বকেরও দুটি আধান আছে, যাদের বলা হয় পজিটিভ এবং নিগেটিভ ম্যাগনেটিক পোল। সাধারণ ভাষায় উত্তর এবং দক্ষিণ চৌম্বক মেরু। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে চুম্বক-মেরু দুটি একের থেকে আর একটিকে এখনও পর্যন্ত পৃথক করা সম্ভব হয়নি। মেঘনাদ লিখেছেন, ডিরাকই সর্বপ্রথম দেখিয়েছিলেন, কোয়ানটাম মেকানিকস বা অখণ্ড বলবিদ্যা অনুসারে স্বাধীন চৌম্বক-মেরুর অস্তিত্ব বর্তমান। তাকে বলা হয় চৌম্বক আধান। এটিকে বের করার একটি পদ্ধতি ১৯৪৭ সালে অধ্যাপক এইচ এ উইলসন বর্ণনা করেছিলেন।

কিন্তু এরও তেরো বছর আগে অধ্যাপক সাহা ঐ পদ্ধতিটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন এবং সহজতর পদ্ধতিতে চৌম্বক-মেরুর মান তাত্ত্বিকভাবে বের করেন। পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে মূল পত্রটির ছবি ছাপান হল।

নিঃসন্দেহে বলা চলে, বিদগ্ধজনের কাছে এ গ্রন্থ অন্যতম সম্পদরূপে বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই এই দুরূহ কাজটির যিনি প্রধান পুরোহিত, অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়কে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় নিজে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার ছাত্র এবং বর্তমানে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস্-এর শিক্ষণ বিভাগের প্রধান। সম্ভবত এ কারণেই মেঘনাদের গবেষণা জীবনের মূল ছন্দটি তাঁর অনুভূতির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। এ ধরনের সংকলন প্রকাশের পেছনে অসীম ধৈর্যের এবং খুঁটিনাটি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ থাকার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পাদনারও প্রয়োজন হয়েছে বলে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আমাকে জানান। প্রকাশনার ব্যাপারে মুদ্রণ পারিপাট্যের দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। সমস্ত মিলিয়ে গ্রন্থটি যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে, বলাই বাহুল্য। দাম ষাট টাকা। এমন সুবৃহৎ গ্রন্থের পক্ষে এ মূল্য অকিঞ্চিৎকর। প্রাপ্তিস্থান, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস্, কলকাতা-৯। এ ধরনের প্রকাশনায় ভারতের বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণা সংস্থার অর্থানুকূল্যকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

সমরজিৎ কর

ছয়

জ্যোতি যখনই যেখানে যায় ওর কাঁধে একটা ঝোলা থাকে আর সে ঝোলা থেকে যা বেরিয়ে পড়ে তা বেড়াল নয়, তা রকমারি কেতাব। আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, হেভলক এলিস, রাসেল, রলাঁ যেমন তার পাঠ্য তেমনিই মার্কস, লেনিন, রোজা লুকসেমবুর্গ।

"এঁরা কারা? এঁদের নামও তো আমি শুনিনি, এক লেনিন বাদ।" রত্ন বলে।

"এঁরা হলেন সমাজবিপ্লবী। কমিউনিস্ট।" জ্যোতিদা পরিচয় দেয়।

"তা হলে তুমি এঁদের বই পড় কেন?" রত্ন জিজ্ঞাসা করে।

"তুমিও তো ফরাসীবিপ্লবের অন্ধিসন্ধি জানো। সোসিয়ালিজমের উপর অনেক বই পড়েছ। আমার বেলা যত দোষ!" জ্যোতিদা হাসে।

"কিন্তু তুমি যে গান্ধীপন্থী। তোমার পঠনীয় রাস্কিন, থোরো, টলস্টয়। কই, ওসব তো তোমার ঝোলায় দেখিনে।" রত্ন মন্তব্য করে।

"ভারত যতদিন না স্বাধীন হয়েছে ততদিন আমি গান্ধীজীর সঙ্গেই আছি, কেননা আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে গান্ধীনেতৃত্ব না হলে গণসংগ্রাম হবে না, আর গণসংগ্রাম না হলে দেশের স্বাধীনতা হবে না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে আর গান্ধীপন্থায় কাজ দেবে না। কারণ তখন আমাদের লক্ষ্য হবে সমাজবিপ্লব। সেটা ফরাসীবিপ্লবের অনুরূপ হবে, না রুশবিপ্লবের, তা আমি বলতে পারব না। হয়তো সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব এক রূপ নেবে। মার্কস পড়ছি বলে মনে কোরো না যে আমি মার্কসপন্থী। বা লেনিন পড়ছি বলে লেনিনপন্থী।। রোজা লুকসেমবুর্গের জন্যে আমার দুঃখ হয়।" জ্যোতি তাঁর সম্বন্ধে আরো বলে।

"তা হলে স্বাধীনতার পরে তুমি গান্ধীকে ছাড়বে?" রত্ন জেরা করে।

"কী করি বল! গান্ধীজী কিছুতেই ধর্মের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করবেন না। ওঁর মতবাদও তেমনি ধর্মনির্ভর। সেই ধর্মও আবার ঈশ্বরনির্ভর। সেই ঈশ্বরও আবার পার্সনাল গড। সেই পার্সনাল গডও আবার কারো কাছে আল্লা কারো রাম কারো কাছে কালী। গোঁজামিলের একশেষ। গোঁজামিল দিয়ে সমাজবিপ্লবের ভূমি তৈরি হতে পারে না। আমি এখন বুঝতে পারি লেনিন কেন বলেছেন ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম। আমার অভিজ্ঞতাও আমাকে এই কথা বলছে। গান্ধীজীকে আমি জানিয়েও এসেছি যে এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার একদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। স্বাধীনতার পরে।" জ্যোতি বিস্তারিত করে।

"স্বাধীনতার আর কত দেরি!" রত্ন কৌতূহলী হয়।

"আমি কি গণৎকার! লোকে যদি গণসংগ্রামে ঝাঁপ দেয় তবে পাঁচ বছরই যথেষ্ট। যদি আশানুরূপ সাড়া না দেয় তা হলে কে জানে কতকাল! দেখছ না অধৈর্য হয়ে একদল তরুণ সন্ত্রাসবাদী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতা কোনোদিন এদের হাতে পড়বে না। পড়লে পড়বে ওই তোমার পার্লামেন্টারি বন্ধুদের হাতে। যাদের ব্যঙ্গ করে বলা হয় বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্ট।" জ্যোতি রঙ্গ করে।

"আমার পার্লামেন্টারি বন্ধু!" রত্ন প্রতিবাদ করে। "আমি বুর্জোয়াও নই, ন্যাশনালিস্টও নই, আমি অহিংস নৈরাজ্যবাদী।"।

জ্যোতি হো হো করে হেসে ওঠে। "ষাঁড়ের কাছে যেমন লাল ন্যাকড়া গোরার কাছে তেমনি অহিংসা। শুনলে ক্ষেপে গিয়ে গুঁতোবে। ওর মতে অহিংসা বীরের ধর্ম নয়, অহিংসা ভীরুর ধর্ম।"

"আর তোমার মতে?" রত্ন এর একটা বোঝাপড়া চায়।

"আমার আচরণ আমার মত। আমি যা করি তা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে করি। আমার কর্মীরাও যা করে তা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে করে। জনগণকে ইংরেজরা বুকে হাঁটতে শিখিয়েছিল। আমরা শেখাচ্ছি বুক ফুলিয়ে হাঁটতে। যদি একদিন বিদ্রোহ করতে হয় তো করবে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। এর মধ্যে ভীরুতা কোথায়? গান্ধীর লোক পিঠ দেখিয়ে পালিয়েছে এমন ঘটনা ঘটেছে কি? যদি ঘটে তবে গান্ধীই সকলের আগে ওদের নাম কেটে দিয়ে বলবেন, তোমরা হিংসার পথ নাও। তাতে যদি সাহসের পরিচয় দিতে পারো তো সেও ভালো।" জ্যোতি দু কথায় বোঝায়।

"না, ও পথ ভালো নয়।" রত্ন এক কথায় খারিজ করে।

"তা কেমন করে বলি? দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমেরিকানরা, আইরিশরা কি হিংসার আশ্রয় নেয়নি? সমাজবিপ্লবের জন্যে রাশিয়ানরা? রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্যে ফরাসীরা? হিংসারও বহু নজীর আছে, রত্ন। সেই-

জন্যে নৈতিক অর্থে ভালো মন্দের প্রশ্ন তুললে মুশকিলে পড়তে হয়। আমরা রাজনীতির লোক, ধর্মনীতির লোক নই। কিন্তু আমাদের যিনি নেতা তিনি ধর্মনীতিরও লোক। তিনি যখন ভালোমন্দের মীমাংসা করেন তখন তাঁর ধর্মনীতিরও তাতে সায় থাকা চাই। নইলে তিনি কাজ করতে পারবেন না। আর তিনি না পারলে আমরাও কি পারব? হিংসার পরিসর এদেশে এত সংকীর্ণ যে সংঘবদ্ধ হিংসায় জনগণ কোনো কালেই যোগ দেবে না। দিলে দেবে সৈন্যগণ, কিন্তু জনগণের কি তাতে আত্মশক্তির উপলব্ধি হবে? আমার তো তা মনে হয় না। অপর পক্ষে অহিংসার পরিসর অত সংকীর্ণ নয়। লক্ষ লক্ষ লোক খালি হাতে খোলাখুলি-ভাবে লড়তে পারে। এইজন্যেই আমি অহিংস।" জ্যোতি তার নিজের বক্তব্য বিশদ করে।

রঞ্জু তখন গোষ্ঠীর কথাই ভাবছিল। গোরা ওকে গুঁতিয়ে মারবে। 'গোর' করবে। যার সঙ্গে যার এমন অমিল তার সঙ্গে তার মিল হবে কী করে? জিজ্ঞাসা করে রঞ্জু।

"কথাটা ঠিকই।" জ্যোতি উত্তর দেয়, "ও যেমন সন্ত্রাসবাদের পক্ষপাতী তেমনি

বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্টদের দলে। কৌতুকের বিষয় যশোবাবুরা সবাই এখন কংগ্রেসের প্রোচেঞ্জার গ্রুপে ভিড়েছেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে। তোমার গৌরীও নির্বাচনী প্রচারে নামে। সেইজন্যেই তো বলছিলুম 'তোমার পার্লামেন্টারি বন্ধুরা'। কেন, প্রভাতও তো তাই।"

রত্নও শুনেছিল যে গৌরী নির্বাচনে জিতিয়ে দেয় ওর শ্বশুরকে। ক্ষতিটা কী? যদি নির্বাচন জিনিসটাই কাম্য হয়ে থাকে। ইংরেজরা তো নির্বাচন ভিন্ন আর কিছু বোঝে না। ওদের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের জন্যে ওরা প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে।

জ্যোতি এর উত্তরে বলে, "এ প্রসঙ্গে গান্ধী ও লেনিন একমত। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র জনগণের জন্যে নয়। ওতে বুর্জোয়াদেরই সুবিধে। আমাদের লক্ষ্য পঞ্চায়তী গণতন্ত্র।"

"গৌরী তা হলে বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্ট?" রত্ন সুধায়।

"হাড়ে হাড়ে। না, পুরোপুরি বুর্জোয়া নয়, অর্ধেকটা ফিউডাল। ওরা নবাবী আমলের রইস। ইংরেজ আমলে বিপাকে পড়েছে। ইংরেজরা ওদের এন্তার লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করেছে। তাই বাধ্য হয়ে ওরা এখন উকীল ডাক্তার ইনজিনীয়ার হাকিম মাস্টার কনট্রাক্টর হয়েছে। ওর এক মাসতুত দাদা আমদানী রপ্তানীর কারবার খুলেছেন। গৌরী সেইসূত্রে জাহাজের খবরও রাখে।" জ্যোতি বিবরণ দেয়।

গৌরী তা হলে বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্ট! শুনতে ভালো লাগছিল না রত্নর। কিন্তু ওর পক্ষে ও ছাড়া আর কী সম্ভব ছিল? চাষীদের সঙ্গে চাষাণী হওয়া?

"সেইরকমই তো স্বপ্ন দেখেছিলুম আমি।" জ্যোতি স্বীকারোক্তি করে। "তোমার আসার আগে আমিও ভালোবেসেছিলুম ওকে। কিন্তু ওর দিক থেকে সাড়া ছিল না। এটাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো যে ও কখনো নিজের হাতে ঘর নিকোবে না, হাঁড়ি ঠেলবে না, ধান ভানবে না, গোবর তুলবে না। ওর জন্যে ঝি রাখতে হবে, রাঁধুনি রাখতে হবে। হাতে দাগ লাগবে বলে কড়া পড়বে বলে ওদের বাড়ির মেয়েরা নিজের হাতে রাঁধে না। এই যাদের প্রথা ওদের একজন অসামান্য স্বাধীনা নারী বলে যে আমার কর্মসহচরী হবে এর কতটুকু আশা? শেষে আমিও কি ওর টানে বুর্জোয়া ন্যাশনালিস্ট হব?"

ভাববার কথা। গৌরীর জন্যে একটি ঝি, একটি রাঁধুনি তো রাখতে হবেই, ও যদি সন্তানে আসে তবে একটি আয়াও রাখতে হবে।

"আপনাকে বিকিয়ে না দিয়ে অত টাকা আমি পাই কোথায়! আমার তো পৈতৃক সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছুই নেই। থাকলেও আমার বাবা আমাকে ত্যজ্য করতেন, যখন শুনতেন যে আমি একটি বিবাহিতা নারীর সঙ্গে বাস করছি। তোমার বাবাও কি তোমাকে ত্যজ্য করতেন না, জ্যোতিদা?" রত্ন জিজ্ঞাসু হয়।

"সে আর বলতে!" জ্যোতি গুম হয়ে থাকে। "কিন্তু সেখানে আমি হার মানতুম না। আমার সম্পত্তির দরকার নেই। আমি সম্পত্তিতে বিশ্বাস করিনে। আমিও খেটে খেতুম, গৌরীও খেটে খেত। হিন্দু সমাজে এ রকমটি কখনো কোথাও ঘটে না তা নয়। নিচের দিকে গেলে এর দৃষ্টান্ত পাবে অনেক। খুব উপরের দিকে গেলেও এর নজীর পাবে। সে স্তরে অবশ্য খেটে খাওয়ার রীতি নেই।"

সমাজের দিক থেকে রত্ন চিন্তা করেনি। ও স্বয়ং যখন নৈরাজ্যবাদী তখন সমাজের আর দশজন কী করে না করে তাতে ওর কী আসে যায়? কিন্তু গৌরী তো বলেনি যে সেও নৈরাজ্যবাদী। তার হয়তো কিছু আসে যায়।

"না, গৌরীকে আমি খেটে খেতে দেব না।" রত্ন দৃঢ়তার সঙ্গে বলে। আমিই দু জনের হয়ে খাটব। তবে ওকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। যাতে ও আবার মনে না করে যে ও পরাধীন।"

"তার মানে ও চায় একটি বুর্জোয়া কেরিয়ার। স্কুলমিস্ট্রেস বা লেডী ডাক্তার, এইরকম কিছু। এদেশে এখনো মেয়েদের জন্যে সব কটা দুয়ার খোলেনি আমেরিকা বা রাশিয়ার মতো। খুলবে একদিন। তখন যোগ্যতার প্রশ্ন উঠবে। গৌরী কিসের যোগ্য তা কি ও ভেবেছে? বলে মুক্তির পরে ভাববে। তখন বুঝবে বুর্জোয়াদের মতো ম্যাট্রিক পাশ না করলে নয়। ওই হচ্ছে পাসপোর্ট। তুমি পারবে ওকে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেওয়াতে? আমি তো সে চেষ্টাও করেছিলুম। ওর বিশ্বাস ওর সুন্দর মুখই ওর সার্টিফিকেট। আর কোনো সার্টিফিকেটের আবশ্যক নেই।" জ্যোতি পরিহাস করে।

রত্ন প্রতিশ্রুতি দেয় যে চেষ্টা করবে। তবে সফল হবে কিনা সন্দেহ। ওকে মুক্ত করুক তো আগে। তার পরে ওকে স্বাবলম্বী করার প্রশ্ন উঠবে। আপাতত রত্নর নিজের উপার্জনক্ষম হওয়া চাই। উপার্জন যা করবে তা দু জনের—চাইকি তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া চাই। তবে ঝি ঠাকুর আয়া রাখার পক্ষে যদি যথেষ্ট না হয় তবে কী করবে জানে না। আরো পড়বে, আরো যোগ্য হবে, না এখনি ঝাঁপ দিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করবে? তা যদি করতে হয় তবে জ্যোতি যেন সাথী হয়। নয়তো ভারগ্রস্ত হয়ে ডুববে।

জ্যোতি অভয় দেয়। কিন্তু তার মেয়াদ এক বছর। আপাতত।

(ক্রমশঃ)

রবি রায়ের পড়াশোনা ছিল রাত্তিরে। খাবার টেবিলে কি বারান্দায় যেখানে খুশী।

কিন্তু একটা গলদ ছিল। সে হচ্ছে তার আলো। একটা ২৫ ওয়াটের বাল্‌ব জ্বলতো আর সেই টিমটিমে আলোয় পড়া—চোখের ক্ষতি তো এমন করেই হয়।

কয়েকমাস গড়িয়ে গেল। শেষকালে একদিন রাত্তিরে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। সারারাত ছটফট। এভাবেই সাধারণত শুরু হয়। দেখতে দেখতে চোখের জোর কমে আসে। অবসাদে, মাথার যন্ত্রণায় কাজের ক্ষমতাও কমে আর শেষ পর্যন্ত চশমা ছাড়া উপায় থাকে না। বেচারা রবি রায়!

আলো কমজোর হ'লে চোখের আর স্নায়ুর ওপর চাপ পড়বেই। ফলে মাথা ধরে, ক্লান্তি ও অবসাদ আসে, আর কাজের ক্ষমতাও বেজায় কমে যায়।
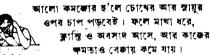
তিনটি দিকে নজর রেখে ঠিকমত জোরদার আলো ব্যবহার করা চাই: **বয়স:** যত বয়স বাড়বে তত বেশী আলো আপনার দরকার হবে। মনে করুন, ১০ বছর বয়সে লাগে ১ গুণ; ২০ বছরে লাগবে ১½ গুণ; ৩০ বছরে ২ গুণ; ৪০ বছরে ৩ গুণ; ৫০ বছরে ৬ গুণ; এভাবেই দরকার বাড়ে। **দূরত্ব:** আলোর ব্যবহারকারী আলো থেকে যত বেশী দূরে থাকবেন, তত বেশী ওয়াটের বাল্‌ব ব্যবহার করতে হবে। **কাজের ধরণ:** কাজ যদি এমন হয় যে তাতে খুব সূক্ষ্ম নজর বা রঙ চেনা দরকার হয়, যেমন রান্নাবান্না, পড়াশোনা কি সেলাই-ফোঁড়াই, তাহলে বেশী ওয়াটের বাতি লাগাবেন।

আরেকটা কথা বলছি, কমজোর আলোয় প্রথম-প্রথম চোখে কোনও অসুবিধা টের পাবেন না। সেটা পাবেন রাতের পর রাত সেই আলোয় কাজ করার পর। আর টের পাবার আগেই দেখবেন আপনার চোখের বারোটা বেজে বসে আছে।

তাই বলি, যেমনটি চাই তেমনি আলো পেতে হলে এখন থেকে ফিলিপ্‌সই নেবেন। ফিলিপ্‌স-এর হরেক রকমের আর্জেণ্টা ল্যাম্প—ভেতরে কোটিং থাকায় এর আলো চোখে লাগেনা, আর পাবেন ফ্লুরেসেণ্ট টিউব যাতে খরচ কম পড়ে। একথা ভুলবেন না, আজ ৪০ বছর ধ'রে ভারতে সঠিক আলো সরবরাহে ফিলিপ্‌সই অগ্রণী।

—যেমনটি চাই তেমনি আলো

কি রকম আলো হ'লে আপনার চোখ-দুটি ভালো থাকবে সেকথা ফিলিপ্‌স-এর কাছ থেকে শুনুন

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড
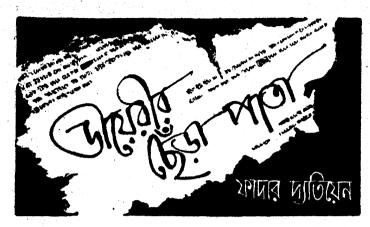
'আমার দেখা ভারত'

"বিশ্বাস-ই হয় না, ফিরে ফিরে দেখে চোখ রগড়ে বলে উঠতে হয়, এ কি সত্য?" উক্তিটি ইতালীর ঔপন্যাসিক আল্বের্তো মোরাভিয়া-র, 'আমার দেখা ভারত' নামক গ্রন্থে।

গো-যান দেখে তিনি বলেন, "কৃষি নির্ভর ভারতের আদি ও অকৃত্রিম এক চিত্র, খৃষ্টি-জন্মের দু হাজার বছর আগে ওর চেহারা যেমন ছিল, আজও বোধ হয় তা-ই আছে।" আর ভারতীয় কৃষক—"সারা ভারত জুড়ে এক ওরা, একই সহিষ্ণু গা-ছাড়া নির্লিপ্ত; একই ব্যাপ্ত ও অবিচল অজ্ঞতা, বংশবংশানুক্রমে প্রাপ্ত বিষাদমাখা মুখচ্ছবি; হুবহুভাবে আকারে-প্রকারে সৎ সহজ সম্ভ্রান্ত ঋষি-কল্প।" ওদিকে শহুরে ভারতীয়েরা "মোটা-সোটা, ভালো খেয়েদেয়ে হৃষ্টপুষ্ট, আত্মতৃপ্ত, সৌভাগ্যদর্পী—দরিদ্র দেশের সচ্ছল নাগরজন যেমনটি হয়ে থাকে।" ফুটপাতে শুয়ে-থাকা সারি সারি মানুষ দেখে সবিস্ময়ে মোরাভিয়া লেখেন: "ঠিক যেন ব্লিৎস্-আক্রমণকালে লণ্ডন শহরের দশা, কিংবা নাৎসিদের বন্দী শিবিরে নিহত বন্দীদের এক ছবি।"

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী "বৈচিত্র্যে অসাধারণ রকম ন্যূন"; রাস্তার দু ধারে পৃথিবীর সবচেয়ে গরীয়ান বৃক্ষ রাজির মেলা; রেলওয়ে-ক্রসিংয়ে সাপ ও ভালুকওয়ালারা; রেলওয়ে-স্টেশনে লোকজন, যাদের কাছে ট্রেনের আসাটা গৌণ, স্টেশনে থাকাটাই মুখ্য; খেয়াঘাটে নির্বিকার, প্রায়-উদাসীন, অন্তর অপেক্ষা: "নৌকো পৌঁছোল ঘাটে: একটি লরি, একটি কি দুটি গো-যান, কয়েকটি পরিবার, কয়েকজন ভবঘুরে নামল তা থেকে। আবার বোঝাই হল: একটি লরি, একটি কি দুটি গো-যান, কয়েকটি পরিবার, কয়েকজন ভবঘুরে উঠল নৌকোর উপর। যেন যা এল, তা-ই গেল ফিরে, পারাপারের প্রয়োজনটাই যেন ফালতু হয়ে যায়...।"

প্রধান সড়কের দুপাশে গঞ্জ গ্রামের—বাজারী গ্রামের—অবস্থান: দু পাশেই বিক্রির সামগ্রীগুলি ছড়ানো-ছিটানো এলোমেলোভাবে, যেন এইমাত্র একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে; একমাত্র ফল ছাড়া কোনো পণ্যই তাজা বা টাটকা ঠেকে না চোখে...। আর শহরগুলিও বৈচিত্র্যহীন, একটি দেখলেই সব-কটির ধারণা পাবেন! কলকাতা দেখে হতাশা: "ঘাবড়িয়ে দেয়, মুষড়িয়ে দেয়, মনে হয় যেন গ্লাসগো কিংবা লিভারপুলে এসে ঢুকলাম; অবিকল ব্রিটিশ-মার্কা শহর—ছাউনি, পিপে, গথিক্ রীতির প্রাধান্য...। এখানে ওখানে একটি তাল গাছ কিংবা হিন্দু মন্দির দেখে তবেই ঠাহর হয়—নয়, ভারতবর্ষেই আছি বটে।"

দু' পাশেই বিক্রীর সামগ্রী ছড়ানো-ছিটানো এলোমেলোভাবে

রেস্ট-হাউস। আমাদের দিক থেকে নৈরাশ্যকর, কিন্তু "খাবারটা ভালো। ট্যুরিস্ট শহরগুলিতে সাধারণত যে-ধরনের আধা-য়ুরোপীয় খানা পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক ভালো...। যাওয়ার আগে আপনাকে লিখতে হবে আপনার নাম, পদবী, পেশা, জাতি, বয়স, কোত্থেকে আসছেন, কোত্থেকে যাচ্ছেন, আগমন ও নির্গমনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ফর্দ-[illegible], পাসপোর্টের নম্বর, কামরার সংখ্যা, এমন কি জায়গাটি আপনার কেমন লাগল, আতিথেয়তার মানে আপনি পরিতুষ্ট কিনা। পরম পরিতোষের শেষে চার্জ-বিল্: অবিশ্বাস্যভাবে সস্তা।"

মোরাভিয়া লিখেছেন ভারতীয় শিল্পের কথা ["ফাঁকা স্থানকে ওদের বড় ভয়; ভরাট না করে তৃপ্তি নেই—[illegible] শুদ্ধ [illegible]"], দ্রাবিড়দের স্থাপত্যনৈপুণ্যের কথা ["সারা দুনিয়ার মহত্তম মন্দির-নির্মাণকারী জাত"], খাজুরাহোর [illegible] কথা ["এই,

নৌকো পৌঁছল ঘাটে...

খানেই দেখেছি বিপুলতার চাইতে যাথার্থ্যের প্রতি মনোযোগ...ভীতিসঞ্চার নয়, মনোহরণের প্রয়াস...”] এবং ভারতীয় চারুকলার কামকলা-সম্পর্কিত অলজ্জতার কথা : “পাশ্চাত্ত্য শিল্প এ-বিষয়টার বাস্তবানুগ উপস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় মনে করেনি, তাই যেখানে সেটা দেখা দিয়েছে, সেখানে ঘটেছে অশ্লীলতার সংক্রমণ; কিন্তু এরা—সারা জগতে একমাত্র এরা-ই—সেটাকে দরকারি বলে মেনেছে, আর তা মেনেছে বলেই বিষয়টাকে শোভন-সুন্দর করে তুলতেও সমর্থ হয়েছে।”

...হ্যাঁ, নেহরুর কথাও আছে বটে। স্বনামধন্য কোনো বিদেশী পর্যটক তাজমহল আর নেহরুকে না দেখে কি ছাড়েন?... “পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম [অথবা দ্বিতীয়, লেনিনকে ধরলে] বাগ্মিতা ও অযৌক্তিকতার সংক্রমণমুক্ত একজন চোস্ত্ বুদ্ধিজীবীর হাতে বিশাল এক দেশের কর্ণধারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। শুধু কতকগুলি ভালো বই লিখেছেন বলেই যে তাঁকে বুদ্ধিজীবী বলছি তা নয়—যদিও স্তালিন-মুসোলিনি-হিট্লারের কুলিখিত গ্রন্থগুলির আসল হেতু হল তাঁদের জীবনবীক্ষা, সে তুলনায় তাঁর লেখা ঢের ঢের উঁচু মানের; রচনাদির মধ্যে যা অম্লানভাবে বিধৃত হয়ে আছে।” বহু ভারতীয়ের চোখে তাঁর এই হ্যামলেটীয় ও অভিজাতসুলভ বাস্তব-মনোভাব একটি দুর্বলতামাত্র; বিশেষ করে মাও-সে-তুঙের প্রচণ্ড ও জনপ্রিয় একরোখা নীতির সঙ্গে তুলনাত্মক বিচারে নেহরুর নীতি তাঁদের কাছে ‘আপসমূলক’ বলে নিন্দনীয়—তিনি নাকি মানিয়ে চলেন, ‘না’ বলতে পারেন না কখনো, ভারতের মতো এক বহু দিনকার পরাধীন-পিষ্ট দেশের পক্ষে যে-প্রবল তেজঃশক্তির প্রয়োজন, তাঁর তা নেই...। “কিন্তু এ-ও তো ঠিক, বুদ্ধ ও গান্ধীর পন্থানুসারী তিনি, এবং ভারতীয় মানস সুভাষচন্দ্রের একমুখী তীব্রতার চেয়ে তাঁর সংশয়াকীর্ণ প্রাজ্ঞতার সঙ্গেই আপন সাধর্ম খুঁজে পেয়েছে...।” মুখচ্ছবি যুগপৎ দয়ার্দ্র ও কঠিন বিরক্তির চিহ্নে চিহ্নিত যেমন, তেমনই মণ্ডিত এক অবর্ণনীয় মাধুর্যে : “লোকে বলে উনি দাম্ভিক—নিজের রূপ-লাবণ্য ও সম্মোহনী শক্তি সম্পর্কে আত্ম-সচেতন, অধীর ও আত্মবিরক্ত...।”

ভারতীয় নিয়তি

সাধারণ দেখাশোনার এই বিবরণীর চেয়ে বিশ্লেষণমূলক অংশগুলিতেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন মোরাভিয়া, খুঁজতে চেষ্টা করেছেন ভারতীয় ইতিহাসের নিয়তিধারা, পরিব্যাপ্ত ভিক্ষাবৃত্তি ও দারিদ্র্যের মূল, জীবনদর্শনের প্রকৃতি এবং—সর্বোপরি—ব্রিটিশ উপনিবেশিকতার সঙ্গে ভারতের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, তাঁর মতে, য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদ থেকে মূলত আলাদা কিছু নয় জাতীয়তাবাদ সর্বত্রই এক—যুক্তিসম্মত ধারণা নয় কোনো, একটি ভাবাবেগ, জাতি-ভাষা-ধর্মের সঙ্গে ভৌগোলিক সীমানার সমাপতনের প্রয়াস, দরকার হলে কেটে-ছিঁড়ে খুবলে-খিমচে, মাথা কাটা গেল কি ধড় ছাটা গেল, তা বেমালুম কেয়ার না করে; যে-কোনো অযৌক্তিক বিশ্বাসের মতোই জাতীয়তাবাদ যেটা চায় তা হল সমাজের দুটো স্পষ্ট বিভাগ—এক, যারা নির্বাচিত; দুই, বাদবাকি সবাই, যাদের জন্য থাকল রসাতল। ভাগা-ভাগিটা ঘটেছে ভারতেও। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে? ভাষার? না, এই উপমহাদেশটিতে ভাষা যে অসংখ্য। তবে জাতির তা-ও অগণন। আর অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিচারে তো ভারত বিভাজ্য। থাকল শুধু—ধর্ম। “জগতে একমাত্র দেশ এই ভারত, যেখানে ধর্মের প্রশ্ন আসে অর্থনৈতিক কিংবা অন্য যে-কোনো প্রশ্নের আগে। ভারতীয় ইতিহাসের নিয়তির প্রথম ধারাটি এই।”

আরেক নিয়তি : ধর্ম সম্পর্কে এতখানি সংবেদনশীল এক দেশে সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের দুটি ধর্ম পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইসলাম—নীতিভিত্তিক, সমাজ ও রাজনীতি নির্ভর; আদর্শ ও প্রয়োজনের তাগিদে বিশ্বজনীনতার সন্ধানেও প্রসার-প্রবণতার দরুন অসহনশীল। আর হিন্দু ধর্ম—গ্রীস ও রোমের জাতীয় ও সুপ্রাচীন ধর্মগুলির মতোই দর্শন ও অধি-বিদ্যা নির্ভর এবং সহিষ্ণু। ইসলাম ধর্মও এ-দেশে পৌঁছে অনেকখানি ভারতীয়—এবং ফলত অনেকখানি উদার—হয়ে উঠেছিল, যেমন ঘটেছিল স্পেনে ও সিসিলিতে। জিন্না নিজেও গোঁড়া ছিলেন না প্রথম জীবনে, পরবর্তীকালে কিন্তু ব্যক্তিগত বিপর্যয় তাঁর প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছিল।

পরিচয় ঘটার আগেই তাঁর প্রথম পত্নীকে তিনি হারান; তারপর ভালোবেসে এক পার্সি মেয়েকে তিনি বিয়ে করেন, সে তাঁকে ছেড়ে চলে যায়—আর মারা যায়, পুনর্মিলনের জন্য বোঝাপড়ার সুযোগ না দিয়েই। শোকে ও অপমানবোধে জর্জরিত জিন্না ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠেন নিঃসঙ্গ, গোঁয়ার ও কঠিন হৃদয়।

দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তি

"ভারতীয়েরা প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকে, তাদের দেশের কোন্ দিকটা আমাদের মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছে। প্রশ্ন করার বিষণ্ণ ভঙ্গিতেই কিন্তু স্পষ্ট—উত্তরটা তারা জানে। উত্তরটা অবশ্য এক ও অনন্য : দারিদ্র্য।

শুনে তারা মাথা নাড়ে, যার অর্থ : 'হ্যাঁ, জানতাম বটে।' প্রতিবাদ করে না কেউ, বলে না মুখ ফুটে : 'কিন্তু এ-ছাড়াও তো এই এই দিকও ছিল দেখবার মতো!' আর দর্শনীয় অনেক ও অপূর্ব বিষয়ের ঘাটতি তো সত্যিই নেই এই ভূখণ্ডে।"

...য়ুরোপেও ভিখিরি আছে, কিন্তু সেখানে ভিক্ষেটা সাধারণ নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম; ভিখিরি মাত্রেরই ইতিহাসে আছে বিশেষ ও অস্বাভাবিক এক পটভূমি। "কিন্তু এ-দেশে ভিক্ষার্থে হাত প্রসারিত হয় অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে, বেওয়ারিশ গাছ থেকে বেওয়ারিশ ফল তুলে নেবার ভঙ্গিতে। ভিক্ষাদানটা এ-দেশে যেন একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা; আর ভিক্ষা প্রার্থনাটা এক অর্জিত অধিকার।" অসংখ্য এই ভিখিরিরা ... কিন্তু যেটা সবচেয়ে হতবুদ্ধিকর, তা ঐ সংখ্যা নয়, "সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে তাদের স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় স্থান—যেন তারা এমন এক সমাজে রয়েছে যেখানে তারা অবিচ্ছেদ্য ও অত্যাবশ্যক অঙ্গস্বরূপ।" যে-দারিদ্র্য এই বিস্তীর্ণ ভিক্ষুকতার মূলে, তা কোনো সহজে-প্রতিকারযোগ্য আকস্মিক পরিস্থিতি নয়—সহজাত এবং মজ্জাগত : সেটাকে বদলাতে কিংবা শোধরাতে গেলে জাতীয় চরিত্রেরই আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে।

"ট্যাক্সি দাঁড়াল মন্দির, দোকান বা হোটেলের সামনে, অমনি দেখা দিল ওরা... না মুখ দেখতে পাবেন না কারো, শুধু সনির্বন্ধ প্রসারিত ব্যাকুল হাত আপনার মুখের খুব কাছে এসে পৌঁছোবে—শিশুর হাত, যুবতীর হাত, শ্রমিকের, বৃদ্ধের। বাজারে যান টুকিটাকি এলোমেলো কাজ করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে জানাতে সার বেঁধে ওরা চলবে আপনার পিছু-পিছু দোকান থেকে দোকানে—শুধু একজন, ওদেরই একজন, দেখতে শুনতে আরো বেশি হতভাগ্য বলেই আপনার প্রসাদে ভাগ্যবান, চোখে-মুখে বিজয়ের দীপ্তি নিয়ে মুড়ি মাথায় চলবে আপনার আগে আগে। যেখানেই যান—ভিখিরি; প্রায়ই দেখবেন, আপনার উপস্থিতির দরুনই সদা সন্ত্র[illegible] তারা, হঠাৎ গজিয়ে উঠল যেন, [illegible] এক রঙের পরিপূরক আরেক [illegible]।" [illegible] অবস্থার উন্নতি ঘটাতে গেলে [illegible] করতে হবে নামমাত্র উপার্জন, অনবচ্ছি[illegible]রত্ব, সামাজিক সাহায্যের অভাব, গৃ[illegible]স্যা, অশিক্ষা...।

মোরাভিয়া প্রশ্ন রাখেন : ভারতী[illegible] চিন্তাধারার দুটি মৌলিক প্রস্তাবনা—'যা দেখছ তা মায়ামাত্র' এবং 'জীবন দুঃখময়'—সত্যিই কি তত্ত্বদর্শনের গভীর থেকে উৎসারিত সিদ্ধান্ত? তাঁর ধারণা, এগুলি বরং ভারতের অবস্থারই নিরীক্ষণ প্রসূত। ভারতীয় দারিদ্র্যের গূঢ়তম কারণগুলি খুঁজতে গেলে, আমাদের যেতে হবে ব্রিটিশ ও মুসলমান আমল পেরিয়ে আরও পিছনে সুদূর অতীতে—ইসলাম শুধু তার উপর ইসলামী পোঁচ বুলিয়েছে আর ব্রিটিশেরা পূর্বাবস্থাকেই আরও দুরবস্থায় পরিণত করেছে মাত্র। প্রথম কারণ হল বর্ণভেদ—অর্থাৎ নামান্তরে জাতিভেদ : 'বর্ণ' কথাটা গায়ের চামড়ার রঙেরই ইঙ্গিত দেয়। মূলে যে-চারটি প্রধান বর্ণ ছিল, তা ছিল বৃত্তি, গোষ্ঠী ও শ্রেণীগত পরস্পর-অভেদ্য বিভাগ; কালক্রমে চতুর্বর্ণ থেকে উদ্ভূত অসংখ্য বর্ণ সম্প্রদায়—ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও দম্ভের অগণ্য পরিমাণভেদের সঙ্গে তাল রেখে—সেই আদি জাতিভেদকে চূড়ান্ত ক'রে দিল। এই বর্ণভেদ প্রথার জগদ্দল স্থাণুতা ভারতকে পরম রক্ষণশীলতার গণ্ডিতে আটকে রেখেছে আজও।

দ্বিতীয় কারণ : এই রক্ষণশীলতারই এক ক্ষতিকর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রকরণ। কোনো [illegible] গৃহস্বামিনী যেমন আলমারিতে [illegible] অপ্রয়োজনীয় বস্তু-জঞ্জাল [illegible] ফেলে দিতে ভয় পায়, [illegible]তীয় [illegible] ও তেমনি অদ্যাবধি এমন [illegible] অহেতুক ও অযৌক্তিক বিশ্বাস ও [illegible] রয়েছে যাদের কোনো [illegible]তীয় জীবনে, এমন কি ধর্মীয় [illegible] নয়।

তৃতীয় কারণ : ব্রিটিশদের স্বার্থপরতা। স্থানীয় কারুশিল্পীদের তারা দাবিয়ে রেখেছে, এ-দেশের শিল্পায়নের প্রতি দেখিয়েছে অনীহা—নিজেদের শিল্পের বাজার গড়ে তোলা ও চালু রাখার জন্য। এর মূলেও কিন্তু ঐ বর্ণভেদ। বর্ণভেদে যার শক্তি, বর্ণভেদেই তার লুপ্তি : ব্রিটিশেরা এই নীতিই খাটাল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে, হয়ে উঠল নব্য ব্রাহ্মণ। সত্যি বলতে, ঔপনিবেশিক মনোভাব ও পরিস্থিতি আগে থেকেই আসীন ছিল এখানে, ব্রিটিশেরা তার সুযোগ নিয়েছে মাত্র। দুর্দশা আরও ঘোরতর হয়েছে এইজন্য যে এই নব্য ব্রাহ্মণকুল এ-দেশে বাসিন্দা হয়ে ওঠেনি, প্রবাসী ছিল মাত্র, তাদের প্রকৃত গাঁটছড়া ছিল দূর দেশের এক ক্ষুদ্র দ্বীপে বাঁধা।

অনেকের মতে আরেকটা কারণ আছে : এ-দেশের আবহাওয়া আর ভৌগোলিক সংস্থান। কারণটা দৃষ্টান্তগ্রাহ্য নয়; ইতিহাসে দেখি প্রতিকূল জলবায়ুতেও হয়েছে ঋদ্ধিমান সভ্যতার বিকাশ এবং

বহু দেশে অনুকূল আবহাওয়ায় সচ্ছল হয়েও সভ্যতায় পশ্চাৎপদ থেকেছে।

...বর্ণভেদ সম্পর্কে মোরাভিয়ার আরেক তীক্ষ্ণ মন্তব্য : "ভারতে যে শিল্পোৎকর্ষের ও ধর্মভাবনার পরম সমৃদ্ধি ঘটেছে, তা বর্ণভেদের জন্যই নয়, বর্ণভেদ সত্ত্বেও।। বর্ণভেদ-বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থান-কালে শিল্পের মানোন্নয়ন লক্ষ্য করুন, যার ঐ ধর্মের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও অধঃপাত।"

'মায়া'-দর্পণ

বেদে মায়াবাদ নেই, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগৎ সেখানে বাস্তব ও সত্য। অথচ উপনিষদে যে এই অতীব হতাশাব্যঞ্জক তত্ত্বটি দেখা দিল, তার পিছনে অবশ্যই আছে আবহাওয়ার পরিবর্তন। গ্রীক বা পারসিকদের কথা ভাবুন—আদি উৎসের বিচারে ওরাও তো ভারতীয়দেরই জ্ঞাতি-ভাই আর তবু মায়াবাদের ছায়ামাত্র তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মেলে না। য়ুরোপে মাঝে মাঝে মায়াবাদের কথা শোনা গেছে, কিন্তু তা নেহাৎ অন্যতম দার্শনিক চিন্তাধারারূপে, ধর্মের অভ্যন্তরে তার সংক্রমণ ঘটেনি। তবে কোথায় এর

শিকড়?...একটি তথ্য তর্কাতীত : এ-দেশের বাস্তবতা ঠিক ইন্দ্রিয়-সহনীয় নয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের অনায়াস একাত্মবোধ এখানে অতি দুরূহ, এক অস্বাভাবিকতার ছোঁয়াচ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

"প্রকৃতির দিকে তাকান—প্রচণ্ড গুমোট, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, শীতকালে চড়া রঙের সমারোহ, চোখে লাগে—সবটাই অস্বভাবী, দুঃস্বপ্নের মতো। এতখানি কড়াপাকের বাস্তবতা স্বস্তি দেয় না, সহ্য হয় না, মন চায় পরিবর্তন। মনে হয় সত্যি দুঃস্বপ্ন দেখছি, জেগে উঠতে ইচ্ছে হয়...। শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের ক্ষেত্রেও—মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সরল সম্পর্কের ক্ষেত্রেও—এই অস্বাভাবিকতা, অর্থহীনতা সূক্ষ্মভাবে অনুসৃত হয়। জাতিভেদ-প্রথা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কেউই যেন এই মনোভাব থেকে মুক্ত করতে পারে না নিজেকে।

তার উপর ভাবুন : একজন কুষ্ঠরোগী কিংবা পায়ে গোদ-হওয়া একটি হতভাগ্য—বিষণ্ণকর দৃশ্য বটে; কিন্তু যদি পালে পালে কুষ্ঠরোগী দেখতে হয় আপনাকে [যেমন বেনারসে] কিংবা ডজন ডজন গোদ-পেয়ে মানুষ [যেমন কোচিনে], তখন বিষাদ উবে গিয়ে থাকে অবিশ্বাস্যতা...।

এর সঙ্গে যোগ করুন ভোজবাজি বা সম্মোহনী শক্তিতে বিশ্বাস [বিখ্যাত দড়ির খেলা কিংবা মুহূর্তে আম-ফলানোর খেলা] : শুধু দর্শনের স্তরে নয়, এই বিশ্বাস ভারতীয়দের মানসিক অভ্যাসে পরিণত, মেলায়-মোচ্ছবে সাধারণ ভোজবাজি খেলুড়েরা পর্যন্ত জনমানসে প্রভাব সৃষ্টি করে।

অবশ্য মোরাভিয়া এ-ও বলেন, মায়াবাদ হতাশাব্যঞ্জক শুধু জাগতিক পটভূমিতেই। ধর্মের অওতায় এলে তা-ই আবার আশাবাদে ভাস্বর হয়ে ওঠে : ইন্দ্রিয়-বাস্তবতার সকল মূল্য অস্বীকার করে মায়াবাদ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে এক অতীন্দ্রিয় বাস্তবতার উপস্থিতি ও মহিমা।

পারস্পরিকতা

লেখকের সবচেয়ে মৌলিক সমীক্ষা অবশ্য ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কের ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের এক নতুন তাৎপর্যের উদ্ভাবন। ঔপনিবেশিক তো ছিল সকলেই—পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, কে নয়? কিন্তু ওদের ঔপনিবেশিকতা ছিল এক ধরনের বোম্বেটেপনা, দস্যুবৃত্তি, সুস্পষ্ট, সীমিত, সোজাসুজি, এবং মোটের উপর অনতিনিষ্ঠুর। পক্ষান্তরে ভিক্টোরীয় আভিজাত্যের মুখোশের আড়ালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা অনেক বেশি কূট, অবৌদ্ধিক, দূরস্পর্শী, আদিম ও নির্মম।

ফরাসি-পর্তুগীজ-ওলন্দাজেরা ব্যস্ত ছিল নিজেদের স্বার্থ নিয়ে, সরাসরি 'লুঠে নাও' ছিল তাদের মনোভাব, কোনো ঢাকঢাক-গুড়গুড় ছিল না, এবং লুণ্ঠনে তারা ছিল নির্লজ্জ। ইংরেজরা কিন্তু প্রথম থেকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যটাকে গোপন করতে শুরু করেছিল, সাফাই দিত; ভাবটা যেন এই—ইচ্ছে করে নয়, নিতান্ত ঘটনাচক্রে বেচারীরা দূর দেশে এসে জালে জড়িয়ে পড়েছে। এদিকে ঘটনাধারার ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, এ-দেশে রাজ্য গঠনের গোড়া থেকেই অনবচ্ছিন্নভাবে রাজ্য বিস্তার ক'রে গেছে তারা; ছেড়ে যেতে যেতেও পরোক্ষভাবে ছড়িয়ে-সেঁধিয়ে গেছে নিজেদের স্বার্থ ও প্রভাব। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাকে তাই ঔপনিবেশিকতা না বলে অন্যোন্যজীবিতা বলা ভালো—অন্যোন্যজীবিতার অর্থ এই যে, দুটি একেবারে আলাদা জাতের প্রাণী যেন চুক্তি ক'রে ঘর বেঁধেছে একত্রে, বেঁচে থেকেছে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, পারস্পরিক প্রয়োজনে এবং যদিও সর্বদা তা নয়—পারস্পরিক সুবিধার্থে।

"একে পারস্পরিকতা বলুন, সহজীবিতা বলুন, পরাশ্রয়িতা বলুন—ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিশেষ চরিত্রটিকে এই-জাতের অভিধার দ্বারাই স্পষ্ট ক'রে বোঝানো যাবে। ওদের ঔপনিবেশিকতা এক্ষেত্রে যতটা না রাজনৈতিক সংঘটন, তার চেয়ে অনেক বেশি যেন জৈব প্রক্রিয়ার সমতুল্য। কেন যে এটা ঘটল, তা নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা, অনেক ভাষ্য আছে আর তবু নিশ্চিতির সন্ধান মেলেনি : এটুকু কিন্তু বলা যায়, এই সম্পর্কটার মধ্যে কিছু একটা আছে যা অঘটন। নইলে উত্তর-য়ুরোপের কুয়াটিকাধূসর আবহাওয়ায় জাত, লালিত ও বর্ধিত এক শ্বেতচর্ম জাতি এত দূরে, ক্রান্তীয় অঞ্চলে পাটলবর্ণ এক জাতির মধ্যে যাদের তারা বোঝেনি কখনও, বাসেনি ভালো—বাস করতে এল, তাদের শোষণ ক'রে শাসন ক'রে, আবার নিজেদের উপস্থিতির কৈফিয়ৎ জোগাতে তাদের উপকারী-উপযোগীর ভূমিকা নিয়ে, কাটিয়ে গেল সার্ধশতাব্দী—এর ব্যাখ্যা কোথায়?"

ফরাসি, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের ঔপনিবেশিকতা তার প্রভাবের ক্ষণস্থায়িত্বর দ্বারাই প্রমাণ ক'রে দিয়েছে, কোনো বহিরাগত জাতির পক্ষে ভারতের বিজয় অর্থাৎ রূপান্তর ঘটাতে গেলে ভারতের দ্বারা রূপান্তরিত হতে হয়। ব্রিটিশেরাই তা করেছে : ভারতের ভালোমন্দ পরিবর্তন ঘটিয়েছে কম নয়, কিন্তু ভারতও তাদের উপর ঘটিয়েছে রাজনীতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন। "ভারতীয় সমস্যাগুলির সমস্ত রকম অলঙ্ঘ্য জটিলতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ মোকাবেলা করতে গিয়ে ইংলণ্ড অর্জন করেছে বৃহৎ আধুনিক দেশের আন্তর্জাতিক চরিত্রলক্ষণ; অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রাদেশিকতা ও বাগাড়ম্বরময় ভাবালুতা সে ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। আর এইজন্যই ভারত যখন ছাড়ল সে, ছাড়তে পারল অমন দর্শনীয়ভাবে, বিনা রক্তপাতে।"

এই পরস্পরজীবিতা, মোরাভিয়া বলেন, শুধু ব্রিটিশদের বেলাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তার মূল আরও অতীতে, এমন কি সুদূর অতীতে পরিব্যাপ্ত। বলতে গেলে ভারতের আবহমান ইতিহাসই এই প্রক্রিয়ার দ্বারা রচিত। "অষ্টশতকব্যাপী মুসলমান সাম্রাজ্যের কথা ভাবলে সেখানেও দেখা যাবে এই লক্ষণ, এবং অন্তত শিল্পক্ষেত্রে হিন্দু-ইসলাম সঙ্গম অনেক বেশি ফলপ্রসূ। কিন্তু সেখানেও আছে অবিশ্বাস্যতার উপাদান : ভারতের সঙ্গে ইসলামের সাজুয্যের সূত্র ছিল না কোনো, আর তবু তারা থেকেছে এখানে, লীন হয়েছে ভারতীয়ের মধ্যে, গড়ে তুলেছে ইন্দো-ইসলাম সভ্যতা।"

আর্যদের আবির্ভাবও এই একই অনন্য নিভৃত সংশ্লেষের সাক্ষ্য দেয়। "আর্যদেরই সৃষ্টি ঐ চতুর ও অন্যায়, স্থিতিশীল ও দীর্ঘায়ু বর্ণভেদ প্রথা...ওটা তারা গড়ে তুলেছিল ভারতের আদি অধিবাসীদের দাবিয়ে রাখতে; ব্যাপারটা কিন্তু এখানেও ততটা সামাজিক ও রাজনীতিক নয়, যতটা জৈব : তাতেও পারস্পরিকতা বীজগর্ভ হয়েছে—প্রাচীন আর্য-ভারতীয় সভ্যতা তার প্রমাণ।"

মোরাভিয়ার উপসংহার : ঔপনিবেশিকতা অন্তত আজকের দিন পর্যন্ত—ভারতের অমোঘ নিয়তি। এই ঔপনিবেশিকতা এক বিশেষ জাতের, যার নাম পারস্পরিকতা, অর্থাৎ বৃক্ষ-বৃক্ষলতার সম্পর্ক; কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে, প্রকৃতির মতো তা এমন সর্বাঙ্গ সফল হয়ে উঠতে পারে না। আজকের ভারতীয় জাতীয়তা সেই আদি ও শ্যামল দ্রাবিড় ভারতের জাতীয়তা, যা বারবার বহিরাগতের হাতে নির্জিত ও পর্যুদস্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, শত্রুকে রূপান্তরিত ক'রে নিয়ে। সব কিছু ঝেড়ে ফেলে আবার মাথা তোলে দ্রাবিড়-ভারত। আজ তার লড়াই চালু হয়েছে আর্য-ভারতের বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে।

এইবার ম্যাকমিলানকে লিখিত চিঠিতে য়েট্‌স নিজের দাবির সমর্থনে যে একমাত্র সাক্ষীর উল্লেখ করেছিলেন, সেই রোটেনস্টাইন এ-বিষয়ে ১৯৩২ সালে কী বলেছেন সেটা শোনা যাক ('মেন অ্যান্ড মেমোরিস'; দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) :

'I knew that it was said in India that the success of **Gitanjali** was largely due to Yeats's re-writing of Tagore's English. That this is false can easily be proved. The original MS. of **Gitanjali** in English and in Bengali is in my possession. Yeats did here and there suggest slight changes, but the main text, was printed as it came from Tagore's hands"....'

রোটেনস্টাইনের নিজের কাছেই গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি ছিল; প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা তাঁর পক্ষে কিছুই কঠিন হয়নি। তিনি বললেন, 'Yeats did here and there suggest slight changes', কিন্তু সে পরিবর্তন যে নগণ্য তাঁর উক্তিতেই তা স্পষ্ট :

'the main text was printed as it came from Tagore's hands.'

লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে, রোটেনস্টাইনের এই সাক্ষ্যের সঙ্গে য়েট্‌স-বর্ণিত সেই econtinual revision of vocabulary and even more of cadence —এর বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য দেখা যায় না। রোটেনস্টাইনের স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত অংশটি চিরোলের অপপ্রচারের আঠারো বৎসর পরে লিখিত হলেও সেটাই যে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল তা অংশটি পড়লেই বোঝা যায়। যাই হোক, ১৯১৪ সাল থেকেই তিনি প্রতিবাদের জল্পনাকল্পনা করছিলেন, তার সুযোগ হল আঠারো বৎসর পরে।। কিন্তু আরো একজন সাক্ষী ছিলেন, তিনি আঠারো বৎসর অপেক্ষা করেননি, ১৯১৫ সালেই তাঁর প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করেন রোটেনস্টাইনের চেয়েও স্পষ্টতর ভাষায়। ইনিও রবীন্দ্রনাথ, য়েট্‌স, রোটেনস্টাইন প্রভৃতি সকলেরই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন অথচ এঁর নামটি কেউ করেননি—রোটেনস্টাইনের সেই সম্ভাব্য প্রতিবাদীদের তালিকাতেও তিনি অনুপস্থিত। ইনি হলেন আর্নেস্ট রীজ, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনীকার।

এক হিসেবে রীজের সাক্ষ্য রোটেনস্টাইনের সাক্ষ্যের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান, তার কারণ তিনি নিজে কবি ছিলেন, সাহিত্যের এবং সমালোচনার নানা ক্ষেত্রে তাঁর দানও সামান্য ছিল না। সর্বোপরি সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটিতে পাণ্ডিত্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। 'এভরিম্যানস লাইব্রেরী' নামক বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের সুযোগ্য সম্পাদনায় এবং ঐ সিরিজের অন্তর্ভুক্ত বিচিত্র-বিষয়ক নানা গ্রন্থের তিনি যে সব ভূমিকা লিখেছেন, তাতে তাঁর মননশীলতার ব্যাপক পরিচয় আছে। চিরোলের কথা তিনিও অবশ্যই জানতেন এবং রোটেনস্টাইনের মতোই তিনিও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে গীতাঞ্জলির প্রকাশিত পাঠ মিলিয়ে দেখেছিলেন। সেইজন্যই ১৯১৫ সালেই প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর : এ বায়োগ্রাফিক্যাল স্টাডি' নামক গ্রন্থের এক অংশে আলোচ্য বিষয়ে তিনি যা বলেছেন, তাৎপর্যের দিক থেকে তা রোটেনস্টাইনের উক্তির চেয়েও অনেক বেশী সারগর্ভ। তিনি লিখেছেন :

'The wonder is that a poet born abroad with another mother-tongue than ours should have been able to use English with so sure and spontaneous a cadence .... So much so that it **has been rumoured by sceptical critics in India** that **Gitanjali** was in the process indebted to an English ghost; and the name of Mr. W. B. Yeats has been particularly associated with this mysterious office, thanks, it may be, to his known uncanny powers. It may be as well to say, then, that the **small manuscript book in which the author made these new English versions when he was on his way here in 1912, is still in the possession of Mr. Will Rothenstein; and any one who takes the trouble to compare the pocketbook with the printed text will find that the variations are of the slightest, while in certain instances the printed readings may be criticized as not an improvement on those in the MS'.**

পাণ্ডুলিপির পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের পার্থক্য যে নগণ্য সে বিষয়ে ১৯১৫ সালে রীজ যা বলেছেন ('দি ভেরিয়েশনস আর অফ দি স্লাইটেসট') তার সঙ্গে ১৯৩২ সালে রোটেনস্টাইনের সাক্ষ্য

('the main text was printed as it came from Tagore's hands')

অভিন্ন। কিন্তু রোটেনস্টাইন যা বলেননি, এমন একটি কথা রীজ বলেছেন। এই পরিমার্জনের ব্যাপারে বন্ধু য়েট্‌স জড়িত ছিলেন বলেই হয়তো তিনি কিঞ্চিৎ রেখে-ঢেকে বলে থাকবেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি যা বলেছেন, সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে, মুদ্রিত পাঠে পাণ্ডুলিপির ভাষায় যে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা লাভজনক হয়নি, এই মর্মে তার বিরূপ সমালোচনা অযৌক্তিক নয়। অর্থাৎ যথার্থ সংস্কার না হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকৃতিই ঘটেছে, এই হল আর্নেস্ট রীজের মত।

যাই হোক, ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত আরো একটি সাক্ষ্য আমাদের জানা আছে, যেটির মূল্যও কম নয়। এই সাক্ষ্যটি দিচ্ছেন এলান্ ওয়েড। ইনি অবশ্য রোটেনস্টাইনদের দলের কেউ নন, তবে য়েট্‌সের স্বতন্ত্র অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর একজন, প্রায় তাঁর অনুচর বললেই হয়। ইনি য়েট্‌সের যাবতীয় রচনাদির সংগ্রাহক, তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থপঞ্জীর সংকলক এবং ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত তাঁর পত্র সংগ্রহের সম্পাদক। য়েট্‌সের এই পত্রসংগ্রহেরই একটি পাদটীকায় তিনি লিখেছেন :

'The selection published in the book **(Gitanjali)** was made by Yeats out of an immense mass of material but **he made hardly any**
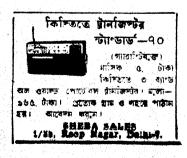
alterations in the English of the translations which were by Tagore himself'.

উক্তিটির প্রথম অংশে ওয়েড্ যা বলেছেন, তা অবশ্যই ভুল। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি যে য়েট্স রাশীকৃত রচনা থেকে নিজে নির্বাচন করেছিলেন তা মোটেই সত্য নয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি রোটেনস্টাইন পাণ্ডুলিপির ৮৭টি কবিতার মধ্যে ৮৩টি নিয়ে এবং পরবর্তী খাতা থেকে ২০টি কবিতা নিয়ে গীতাঞ্জলি সংকলিত হয়েছে এবং এই নির্বাচন ও সংকলনের ভার কোনো সময়েই একা য়েট্সের উপর ন্যস্ত ছিল না। যাই হোক, উক্তির শেষাংশটি সাক্ষ্য হিসেবে মূল্যবান:

'he made hardly any alterations in the English of the translations which were by Tagore himself.'

ওয়েড্ চল্লিশ বৎসরেরও বেশী য়েট্সের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি যা জেনেছেন এবং শুনেছেন তার থেকে য়েট্সের মৃত্যুর পনেরো বৎসর পরেও তাঁর সুস্পষ্ট মত হ'ল এই যে পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনের ব্যাপারে য়েট্স নিজে প্রায় কিছুই করেননি। দেখা যাচ্ছে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত স্টার্জমুর, রোটেনস্টাইন, আর্নেস্ট রীজ, এলান ওয়েড্ প্রভৃতি য়েট্সের অন্তরঙ্গরা—অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ে যাঁদের প্রত্যক্ষতম জ্ঞান থাকবার কথা—যা বলেছেন তার মধ্যে য়েট্সের দাবির ন্যূনতম সমর্থনও কোথাও নেই। সকলেই একবাক্যে য়েট্সের হস্তক্ষেপকে নিতান্তই গৌণ এবং নগণ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। রীজ একটু বেশী বলেছেন যে, ঐ সামান্য হস্তক্ষেপের ফল ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিকরই হয়েছে।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, য়েট্স যে ১৯১৭ সালে ঐ ধরনের একটা দাবি মনে-মনে পোষণ করেছেন, তার সম্বন্ধে এঁরা যে বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এঁদের কোনো উক্তির মধ্যে তার আভাসমাত্র নেই। প্রকাশক ম্যাকমিলানকে যে য়েট্স ঐ রকম একটা চিঠি লিখেছেন, সে খবরটা তাঁরা না জানতে পারেন, কিন্তু তিনি যে দাবি পেশ করছেন সেটা তাঁদের সম্পূর্ণ অগোচর কেন থাকবে? অথচ চিরোলের ব্যাপারের পর এণ্ডরুজ, আর্নেস্ট রীজ, রোটেনস্টাইন—এঁরা সকলেই স্পষ্ট করেই লিখেছেন যে, ঐ ধরনের গুজব একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। এণ্ডরুজ ইংলণ্ড থেকে লেখেন, there is not a breath of a rumour of it over here'; রীজ লেখেন 'it has been rumoured by sceptical critics in India' রোটেনস্টাইন লেখেন, it is said in India ইত্যাদি। রোটেনস্টাইন ১৯৩২ সালে 'মেন অ্যানড মেমোরিস', দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলে উদ্ধৃত অংশটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠিতে (৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩২) আরো স্পষ্ট করে লেখেন:

'I only wanted to rebutt the malicious suggestions made in India—never here'

ইংলণ্ডে রোটেনস্টাইন ঐ ধরনের কথা ১৯৩২ সালের মধ্যে কখনো শোনেননি। এলান ওয়েড্ ১৯৫৪ সালের মধ্যেও কখনো শোনেননি। এর থেকে কী বুঝবো? এর থেকে এই বুঝবো যে, ১৯১৭ সালে ম্যাকমিলানকে লিখিত চিঠিতে য়েট্স যে দাবি করেছেন, তার সম্বন্ধে কোনো কথাই তাঁর বন্ধুবান্ধব, অনুচর সহকর্মী কাউকেই ঘুণাক্ষরেও আভাসমাত্র তিনি দেননি। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে য়েট্স রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনা এবং তাঁর ইংরেজী জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কটূক্তি করেছেন, কিন্তু 'গীতাঞ্জলি' অথবা 'গার্ডেনার' তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন অথবা তাঁরই ব্যাপক সংশোধনের ফলে বই দুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন দাবি তাঁকে করতে শোনা যায়নি। তার মানে, ম্যাকমিলানকে লেখা উক্ত চিঠিখানি ছিল একটি গোপন চিঠি এবং তার বক্তব্যগুলিও ছিল এমন জাতের যা তিনি প্রকাশ্যে অপর কারো নিকট উচ্চারণমাত্র করেননি বা করবার উপায় তার ছিল না। স্বাভাবিক প্রশ্ন: কেন? দাবিটা যদি সত্যই হবে তাহলে তার সম্বন্ধে এই গোপনীয়তা কোন্ কারণে অনিবার্য হ'ল? এ কোন্ জাতের সত্য যা কেবল প্রকাশক ম্যাকমিলানের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলা যায় অথচ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছ থেকে গোপন করতে হয়? এ-প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ, কিন্তু আপাতত সেটি স্থগিত থাকুক। পরবর্তী অংশগুলির আলোচনায় সেটি স্বতই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। (ক্রমশ)

ম্যাক্সমুলের ভবন প্রাঙ্গণে সেদিন আহূত ও অনাহূত বহু ছেলেমেয়ের ভিড়। সকলের দৃষ্টি উপরে, দ্বিতলের বারান্দার দিকে। সেখানে বাঁধা শতাধিক রঙীন বেলুন। অধিকর্তা ডাঃ জে ওহলার্ড এসে সহাস্যবদনে বেলুনগুলির সুতো কেটে দিলেন। ভাজোরের পুতুলের মত হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ও বেগুনী রঙের বেলুনগুলি আকাশে উড়ে চলল। ছেলেমেয়েরা আনন্দে হাততালি দিল, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাবৃন্দও সহাস্যে ওপরের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাঃ ওহলার্ড সেদিন বেলুন উড়িয়ে ম্যাক্সমুলের ভবনে সপ্তাহ-ব্যাপী শিশু উৎসবের উদ্বোধন করলেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ম্যাক্সমুলের, ভবনের প্রতিটি কক্ষ যেন সাত দিনের জন্য শিশুদের স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ছোট ও বড় ছেলেমেয়ে-দের উপযোগী জার্মানীর কাপড় ও কাঠের নানা জাতীয় খেলনা ও পুতুল থেকে শুরু করে তাদের উপযোগী জার্মান ও অন্যান্য ভাষার গল্প ও রূপকথার বিভিন্ন বইয়ে কক্ষগুলি ও পাঠাগারটি ভরে উঠেছিল। তার ওপর ছিল দেওয়ালে দেওয়ালে রাখা জার্মানীর ছেলেমেয়েদের সকলের সম্মুখে বসে আঁকা (on the spot drawing) ৪২টি ছবি। মিউনিক-এর আন্তর্জাতিক যুব পাঠাগার স্টুডিও কর্তৃপক্ষ ছবিগুলি নির্বাচিত করে পাঠান। ছেলেমেয়েরা ১৯৭২ সালের অলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে—এই ছিল অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু। সেই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে জার্মানীর ছেলে-মেয়েরা যে ছবি এঁকেছে নানা কারণে তা উল্লেখযোগ্য। মনে হয় ও দেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে বিষয়বস্তু অপেক্ষা রঙই প্রধান আকর্ষণ। বাস্তবিকই, প্রায় সকলেই তীব্র উজ্জ্বল লাল ও নীল রঙ ব্যবহার করে মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছে, যদিও সেই সঙ্গে অন্যান্য রঙও দেখা যায়। কয়েকটি রচনা চোখে পড়ে রচনার অন্তর্নিহিত গতিশীলতার রূপের জন্য, যেমন সাইকেল রেস। কালো রঙের পরি-প্রেক্ষিতে সাদা রেখার বৃত্তাকার কয়েকটি মাত্র আকারের মধ্য দিয়ে কয়েকটি ধাবমান সাইকেলের গতিশীলরূপ ফুটে উঠেছে। অন্যান্য ছবির মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ, ভার-উত্তোলন, নৌকা-র নাম করা যায়। বলা বাহুল্য, ছবিগুলি সুনির্বাচিত ও তাদের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের সমকালীন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও আত্মপ্রকাশ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

কাঠের খেলনা কত সুন্দর, হালকা ও মার্জিত হতে পারে তা বিভিন্ন নিদর্শন দেখে বোঝা যায়। ছোট ঠেলা গাড়ি, ট্রাক, রেলগাড়ি, ইঞ্জিন, বিভিন্ন আসবাবপত্র, সবই সময়োপযোগী। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সব পুতুল ও খেলনাই ছেলেমেয়েদের বয়সের অনুপাতে তৈরি। যারা একটু বড় বা যাদের চিন্তা করার ক্ষমতা হয়েছে তাদের জন্য সৃজনশীল নানা খেলনা প্রদর্শনীতে দেখা যায়। যেকোনো জাতীয় সৃজনমূলক যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে নির্জনে আপনার মনে ছেলেমেয়েরা মাত্র কয়েকটি রঙীন কাপড়ের অংশের সাহায্যে কালো কাপড়ের ওপর নানা ডিজাইন তৈরি করতে পারে তারও সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি খেলনা সহজভাবে তৈরী ও স্থায়ী। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এই জাতীয় সহজ ও সুন্দর খেলনা দেখে উৎসাহিত হোক এবং এদেশে যাঁরা খেলনা তৈরি করেন তাঁরা এই শ্রেণীর খেলনা উৎপাদন করে শিশুদের কৌতূহল ও প্রয়োজন মেটান, এটিই হল এ জাতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। তবে আমাদের দেশের খেলনা বা পুতুলে যে বৈচিত্র্য, বিশেষ করে যে নানা রঙ, কারুকার্য ও সৃজনকুশলতা দেখা যায় তার বোধ হয় তুলনা নেই। রঙীন, সুদৃশ্য ও নানা আকারের শিশুপাঠ্য নানা সুন্দর বই রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে রেখে
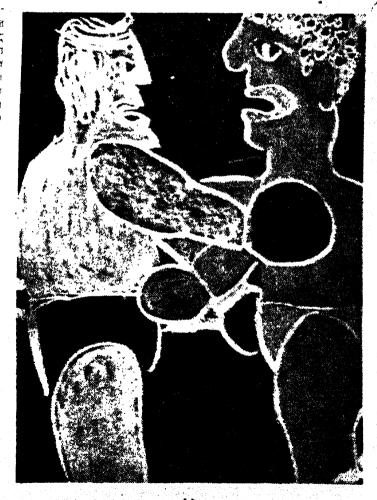
পাঠাগারটিকে পরিচালিকা শ্রীমতী ক্রিস্টেন দাস একেবারে রূপকথার রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। ছেলেমেয়েদের বয়স উপযোগী বিভিন্ন বই, তাদের রঙীন প্রচ্ছদপট, ছবি, ছাপা ও অক্ষর এবং সবার ওপর তাদের অঙ্গসজ্জা দেখে বোঝা যায় যে শিশুদের মনের খোরাক মেটাবার জন্য জার্মানিতে কি পরিমাণ যত্ন নেওয়া হয়। খ্যাতনামা জার্মান শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে এরিখ কাস্টনার, এচ এম ডেনেবোর্গ-এর লেখা গল্পের বই, উইলিয়ম বুশ-এর ম্যাক্স অ্যান্ড মরিজ ও বিশেষ করে হেনরিখ হফম্যান-এর স্ট্রুয়েল-ভাটার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তটি বিশ্ব শিশু সাহিত্যের একটি বিশেষ অবদান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা রূপকথা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত মোট ৪২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে—তাদের মধ্যে ভারতীয় রূপকথাও আছে। আর একটি উল্লেখ্য বই আছে যার বাংলা নাম করা যায়—কমলা রঙের বিড়ালের গোপন কথা। প্রদর্শনী উৎসবের জন্য কর্তৃপক্ষ ছেলেদের বিভিন্ন বয়সের পাঠোপযোগী ৭৪টি জার্মান বই আনেন। তাছাড়া থাকে ইংরাজী বাংলা ও হিন্দী

বইয়ের নিদর্শন—যেমন অ্যান্ডারসনস ফেয়ারী টেলস, গ্রিমস টেলস, স্নোহোয়াইট অ্যান্ড সেভেন ডোয়ার্ফস, চিলড্রেন বুক ট্রাস্টের রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প (ইংরেজী), টুনটুনির বই, ঠাকুরমার ঝুলি, পাপুর বই সঙ্গে ছড়া ইত্যাদি। প্রদর্শনী উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন জার্মান রূপকথা শোনানো হয় ও সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের উপযোগী জার্মান ও ইংরাজী কয়েকটি সুন্দর চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং চিলড্রেন্স থিয়েটার নাট্যানুষ্ঠান করে। প্রদর্শনী উৎসবের আয়োজন করে কর্তৃপক্ষ দেশের ছেলেমেয়েদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন। প্রদর্শনীটি দিল্লী, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর,

মুভমেন্ট-১০ —দীপক ব্যানার্জী

পুণা, হায়দ্রাবাদ বোম্বাই ও রাউরকেল্লাতেও অনুষ্ঠিত হবে।

*

শিল্পী দম্পতী দীপক ব্যানার্জি ও শ্রীমতী সুচিত্রা ব্যানার্জি সম্প্রতি সানি পার্কে তাঁদের একটি যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে শিল্পীর ৩৬টি গ্রাফিক প্রিন্ট ও শিল্পী-পত্নীর আটটি "হ্যাঙ্গিং" ও ছয়টি গ্রাফিক প্রিন্ট দেখা যায়।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে দীপক ব্যানার্জি সুপরিচিত। তিনি কলকাতা, দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন ও দুবার অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেছেন। ফরাসী সরকারের বৃত্তিলাভ করে তিনি ফ্রান্সে গ্রাফিক শিল্প শিক্ষা-লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাবিভাগে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

শিল্পীর প্রিন্টগুলি সুকল্পিত ও পরিচ্ছন্ন। এনগ্রেভিংগুলি প্রথমেই চোখে পড়ে। দেখে মনে হয় বিউরিন চালনায় তিনি দক্ষ। উদাহরণ হিসাবে ১৫, ১১ ও ১৬ নং-এর সূক্ষ্ম খোদাই কাজ প্রিন্টগুলির নাম করা চলে। গভীর খোদাই পদ্ধতিতে (deep biting) তিনি কয়েকটি প্লেটে দৃষ্টিবিভ্রম (optic illusion) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। একই প্লেটে বৃত্তাকারে তিনি ছোট ছোট বিন্দু গভীরভাবে খোদাই করেছেন। আবার কয়েক ক্ষেত্রে একই বিন্দু থেকে ক্রমবর্ধমান কয়েকটি বৃত্তের জ্যা খোদাই করেছেন ও পাশে, সেই একই প্লেটে, এই ডিজাইনেরই বিপরীত পথ অবলম্বন করেছেন, অর্থাৎ বৃহদাকার জ্যাগুলি ক্রমশ ছোট হয়ে একই বিন্দুতে মিশে গেছে। বৈশিষ্ট্য এই যে, বিভিন্ন বিন্দু বা জ্যাতে বিভিন্ন রঙ আরোপ করে তিনি প্রিন্ট গ্রহণ করেছেন—ফলে একটি প্লেট থেকে নেওয়া একটি প্রিন্টই নানা রঙে ঝলমল করে ও দৃষ্টি-বিভ্রমতার সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে মুভমেন্ট ১০, এচিং—৮, এচিং—২ ১৮ নং-এর নাম-করা যায়।

শ্রীমতী সুচিত্রা ব্যানার্জি দিল্লী° আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং গ্রাফিক শিল্পে স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ লাভ করেন। তাঁর প্রিন্টগুলি অধিকাংশ স্থলেই সাধারণ। তাহলেও দু একটি অবশ্য খোদাই কাজের সূক্ষতার জন্য চোখে পড়ে, যেমন, কম ফর্মস, এচিং—৩ ও এচিং—৩৩ নং। তবে তাঁর 'হ্যাঙ্গিং'গুলি সুন্দর। হ্যাঙ্গিং-গুলি অনেকটা স্ক্রল বা নেপালী তানখার মত। এগুলি দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়। পাহাড়ী রমণীরা যেমন দৈনন্দিন ব্যবহার উপযোগী ছোট তাঁত ব্যবহার করেন, সেই জাতীয় তাঁতে তিনি সুতা ও পশমের সাহায্যে নানা সুন্দর ছবি ও ডিজাইন বুনেছেন। টানা হিসাবে সুতো ব্যবহার করে পোড়েনে পশমের সুতো দেওয়ার ফলে হ্যাঙ্গিংগুলির বিশেষ রূপ ফুটে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে জগন্নাথ দেব (হ্যাঙ্গিং-৪) ও হ্যাঙ্গিং-১-এর নাম করা চলে। উপরে ও নীচে দীর্ঘ, লম্বমান সুতো ছেড়ে দিয়ে মধ্যে ডিজাইন সৃষ্টি করে শিল্পী হ্যাঙ্গিংগুলিতে একটি বিশিষ্ট রূপ আরোপ করেছেন। যেমন হ্যাঙ্গিং-২ ও হ্যাঙ্গিং-৬। বলা বাহুল্য এগুলি যে কোনও গৃহের শোভাবর্ধন করবে। রুচিশীল গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা হিসাবে এ জাতীয় হ্যাঙ্গিং যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

*

গত ছয় বৎসর যাবৎ ফিলিপ্স্ সংস্থা আয়োজিত ও 'পরিচয়' পরিচালিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চিত্র প্রদর্শনী জনপ্রিয়তা লাভ করে আসছে। সংস্থা পত্রিকা 'পরিচয়'-এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত সংস্থার কর্মচারীবৃন্দের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতি বৎসর একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি সপ্তম বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় যারা যোগদান করেছিল, অ্যাকাডেমির গ্যালারীতে তাদের শিল্প-নিদর্শনের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। সেই সঙ্গে কর্মচারীবৃন্দ গৃহীত ফটো শিল্প চিত্রও প্রদর্শনীতে দেখা যায়। এছাড়া মহাত্মা গান্ধী স্মারক পুস্তক একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। প্রধান প্রদর্শনীতে সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে শুরু করে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের ১৩৩টি রচনা দেখা যায় ও গান্ধী প্রদর্শনীতেও ঐ

হ্যাঙ্গিং —শ্রীমতী সুচিত্রা ব্যানার্জী

বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের ৬৪টি রচনা চোখে পড়ে। দুটি প্রদর্শনী দেখে বোঝা যায় যে কর্তৃপক্ষ নির্বাচন ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই জল রঙ ও প্যাস্টেল ব্যবহার করেছে— বিষয়বস্তু দেখে মনে হয় অনেকেই সমকালীন নানা বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীকে রঙ ও রেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছে। যাদের রচনা চোখে পড়ে তাদের মধ্যে প্রসেনজিৎ সরকার (বয়স ৪½), এন গিরিজা (বঃ ৮), মেরিনা ফার্নান্ডেজ (বঃ ৯), অরুণ কাপুর (বঃ ৭), জয়দীপ দত্ত রায় (বঃ ৬), মধুশ্রী চক্রবর্তী (বঃ ৯), শান্তা রায় (বঃ ১২), পার্থ সেন (বঃ ১০), দীপক মুখার্জি (বঃ ১৪), প্রদ্যুম্ন গুপ্ত (বঃ ১৪), আকেলা সীতাপতি (বঃ ১৫), চিত্রা সুব্রহ্মণ্যম (বঃ ১৩½) বীণা মজুমদার (বঃ ১৩) ও বিশেষ করে গণ্যা

রামস্বামী (বঃ ১৩) নাম করা যায়। শেষোক্ত শিল্পীটির নানা রচনায় প্রতিভার সন্ধান মেলে। গান্ধী প্রদর্শনীতে সুন্দর সুব্রহ্মণ্যম (বঃ ৯) ও কাল্যানী মেহতা (বঃ ১০) কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

স্থির চিত্রে শিক্ষার্থী ও সাধারণ বিভাগে ৩৭ জন ক্যামেরা শিল্পীর তোলা ১০৩টি স্থির চিত্র দেখা যায়. তাছাড়া, শিশু বিষয়ক ৩৫টি স্থির চিত্র পাঠান ১৯জন ক্যামেরা-শিল্পী। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এস বি বৈদ্য (পোরাস), সাধারণ বিভাগে এ সামি (পাহাল গাঁও তাজমহল), পি আর গুপ্ত (থ্রু দি উইণ্ডো অব হিস্ট্রি), এস নটরাজন (থ্রু দি ফরিস্তর), এ কে চক্রবর্তী (ফেস টু ফেস) জে সি সরকার (হার্ড টু কেপল) মন্দ লাগে নি। তবে ঠিক সমকালীন কোনও নিদর্শনের সংখ্যা অল্পই ছিল। শিশু বিষয়ক স্থির চিত্রের মধ্যে এম এ পার্নাসিকার (ফাইভ অব আল), পি আর গুপ্ত (টু সিস্টারস)-র নাম উল্লেখযোগ্য। রঙীন স্লাইডে জে এস ঠকরাল, অমল মুখার্জি ও টি কে সিংহের নাম করা যায়।

✻

'ক্যালকাটা পেণ্টারস' সংস্থার শিল্পী সভ্যগণ সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে সাতজন শিল্পীর ৩৫টি নিদর্শন দেখা যায়।

শিল্পী গোষ্ঠী হিসাবে ক্যালকাটা পেণ্টারস-এর নাম সুবিদিত এবং এই গোষ্ঠীর তরুণ ও মধ্যবয়স্ক সকল সভ্যই শিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। ইতিপূর্বে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, তাছাড়া গোষ্ঠী হিসাবেও ক্যালকাটা পেণ্টারস বহু শহরে যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন। সভ্যবৃন্দ সকলেই প্রগতিবাদী, কয়েকজন আধুনিক পন্থী। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, কয়েকজন শিল্পীর রচনায় সমকালীন জীবনের আভাস পাওয়া যায়। অধিকাংশই তেলরঙে কাজ করেছেন, তবে জলরঙের কাজও আছে।

চিত্রপ্রদর্শনীর সংখ্যা আজ বেড়ে গেছে, দর্শক সংখ্যাও যে সেই অনুপাতে শুধু বেড়েছে তাই নয়—তাঁদের মধ্যে ছবি চেনা, জানা ও বোঝার আগ্রহও বেড়ে গেছে। চিত্রকলার দিক থেকে এটা যে সুলক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে বর্তমান চিত্রকলা-ধারার সঙ্গে সমকালীন জীবন তথা সমাজের কোনও সম্পর্ক দেখা যায় না—অর্থাৎ আধুনিক চিত্রকলায় দেশের সমসাময়িক জীবনের কোনও সন্ধান মেলে না, যেটি সমকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এবং এই কারণেই সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে আমরা অধিক পরিচিত, শিল্প তথা শিল্পীর সঙ্গে নই। অভিযোগটিকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না—কারণ বিশেষ কোনও কালের প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে সেই কালের সাহিত্য তথা শিল্পক্ষেত্রে, যদিও সমকালীন সৃষ্টি অনেকাংশে নির্ভর করে শিল্প বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর।

প্রদর্শনীতে প্রথমেই প্রকাশ কর্মকার ও ইশা মহম্মদের রচনা চোখে পড়ে যায়। বর্তমান যুগ যন্ত্রণা, অর্থাৎ সমকালীন জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা অশান্তি ও বিক্ষোভেরই নানাদিক প্রকাশ কর্মকার ছবির মধ্যে দেখিয়েছেন। অনেকের কাছেই হয়ত এ শ্রেণীর রচনাগুলি রূঢ় স্পষ্ট ও আতঙ্কজনক মনে হবে, কিন্তু ভাল হোক মন্দ হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে যা ঘটছে তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন খণ্ডম, ক্যাল '৭০। দীর্ঘাকার রচনাটি মিশ্র রীতিতে আঁকা, আতঙ্কগ্রস্ত মুখ ও বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে হয়ত অনেকেই শিউরে উঠবেন। এক একটি মূর্তি যেন এক একটি কঙ্কাল, দুঃস্বপ্নের মত যেন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যাঁরা দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস সোসাইটি আয়োজিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনী দেখেছেন এই প্রসঙ্গে তাঁদের সুপরিচিত জাপানী শিল্পী নোবরু আবে রচিত 'এনটুমমেণ্ট' ছবিখানির কথা মনে পড়বে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তথা হিরোসিমার তাণ্ডব ও নিদারুণ ধ্বংসলীলাকে ভিত্তি করেই সেই বীভৎস ছবিটি আঁকা। প্রকাশ কর্মকারের আর একটি নিদর্শনও ঐ জাতীয়, লাইফ ফিউসন, ক্যাল '৭০। লাল ও নীল রঙ, নানা স্লোগান তার ওপর বিক্ষিপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তথা নিশ্চিহ্ন জীবনের বিভিন্ন বীভৎস রূপ। সমকালীন হলেও, সম্ভবত লোমাগ্রাহি লোম ক্যাল '৭০ দর্শক মনে স্থিরিক হিসাবে কাজ করে। ইশা মহম্মদ প্রকাশ কর্মকারের
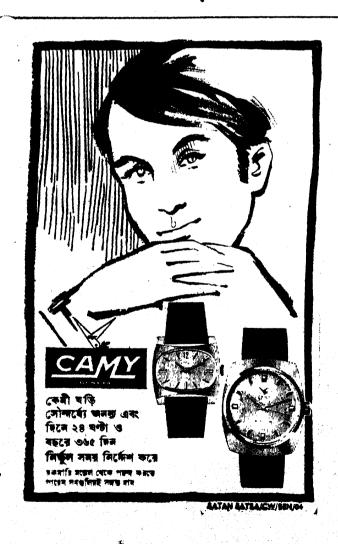
মত স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য পেশ করেননি। তাঁর রচনাও সমবিমূর্ত ও মিশ্র জাতীয়—তিনি ইঙ্গিত বা ইশারার মধ্য দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, যেমন ম্যান অ্যাণ্ড মোশন—মধ্যস্থলে লাল রঙ ব্যবহারের তাৎপর্য আছে। ইনোসেণ্ট বয় উল্লেখযোগ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিষ্পাপ একটি বালকের উদ্বেগ ও নিতান্ত অসহায় অবস্থা শিল্পী সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তবে 'গার্স্টাল' আবার অত্যন্ত স্পষ্ট।

অন্যান্য শিল্পীদের রচনা ভিন্ন শ্রেণীর, অর্থাৎ তাঁরা নানা রীতিতে কাজ করেছেন। দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে, তবে দু একজন ছাড়া কারুর কাজে ঠিক সমসাময়িক কালের আভাস মেলে না। দিলীপ কুণ্ডুর ক্যাপটিভ বার্ড চিত্রমালাকে হয়ত প্রতীক হিসাবে বিচার করা চলে। বর্তমান যুগের পেষণ ও অত্যাচারের খাঁচায় আবদ্ধ থেকে সমগ্র মানব সমাজ কিভাবে অসহায় বন্দীজীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে ও এই জীবন থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নীরবে বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করছে, শিল্পী সম্ভবত তাঁর চিত্রমালায় তা-ই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। বিশেষ করে ক্যাপটিভ বার্ড ১-এর নাম করা যায়—পাখির রক্তবর্ণ দুটি দৃঢ় ঠোঁটের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ক্যাপটিভ বার্ড ২-ও উল্লেখ্য। অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশানিস্ট রীতিতে চাপা রঙ ব্যবহার করে অনীতা রায় চৌধুরী তাঁর রচনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন (পেণ্টিং ১)। তবে দু একটি নিদর্শন ছাড়া পুনরুক্তি মনে হয়। রঙীন পৃষ্ঠভূমির উপজাতীয় নানা চিহ্ন ও প্রতীক বিভিন্ন প্যানেলে ব্যবহার করে রবীন মণ্ডল তাঁর রচনাবলীতে বিশিষ্ট কারুকার্যের অবতারণা করেছেন। যেমন চাপা হলুদ ও সবুজ রঙ প্রধান ট্রাইব্যাল ১ ও বিশেষ করে লাল এবং নীল রঙ ভিত্তিক উপজাতির প্রতীক হিসাবে আঁকা তিনটি মূর্তি ট্রাইব্যাল ৪। যোগেন চৌধুরীর রচনা অনেকটা সাররিয়ালিস্টিক জাতীয়, পরিকল্পনা ও সূক্ষ্ম রেখাচাতুর্যের জন্য চোখে পড়ে। অবচেতন মনের বিচিত্র চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে তিনি কয়েকটি ছবি এঁকেছেন। ড্রিম ৪-এর এই প্রসঙ্গে নাম করা চলে। মাছ ও আপেল যেন সহজ-লভ্য নয়, একটি হাতের মুঠো যেন সেগুলি নেবার জন্য বৃথা চেষ্টা করছে। ড্রিম ৫-ও প্রশংসাযোগ্য। অমিতাভ সেনগুপ্তের রচনা প্রতীক প্রধান, যদিও রেখার কাজ উপভোগ্য। মনটাজ ২-এর রেখাবিন্যাস ও বিশেষ করে লোকচিত্র ভিত্তিক প্যানেল কমপোজিশন মনটাজ ১ উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর কাজে রেখা ও রঙের সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়, যেমন হলুদ ও সবুজ রঙ প্রধান দি র‍্যাপসোডি বা পিপল অ্যান্ড দি ফিল্ড।

*

খতম —প্রকাশ কর্মকার

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস বোর্ড ও মণিপুর সরকারের উদ্যোগে কলকাতার ডিজাইন কেন্দ্রে মণিপুরে বস্ত্রশিল্প ও কারু নিদর্শনের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে মণিপুরবাসী উপ-জাতির ছোট তাঁতে (loin looms) বোনা নানা শাড়ি, স্কার্ফ, পরীচাদর, স্কার্টের কাপড়, কাপড়ের নানা খেলনা, রাসনৃত্য উপলক্ষে ব্যবহৃত রঙীন পোশাক পরিচ্ছদ ও অঙ্গভূষণ এবং বেত ও মাদুরের সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়।

মণিপুরবাসী উপজাতিদের শিশু তথা নরনারীর জীবনে নানা উজ্জ্বল রঙ যে কত অপরিহার্য তা তাদের বোনা বিভিন্ন বস্ত্র শিল্প দেখে বোঝা যায়। গাঢ় লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ রঙের সুতো নানাভাবে টানা ও পোড়েনে ব্যবহার করে তারা কাপড়ের ওপর সুন্দর ডিজাইন সৃষ্টি করেছে। এগুলির অধিকাংশই বোনা হয়েছে উপ-জাতীয় নানা চিহ্ন ও প্রতীক অবলম্বনে। প্রকৃতপক্ষে পাড় অপেক্ষা শাড়ির চওড়া অঞ্চলেই এ জাতীয় বিভিন্ন মোটিফ দেখা যায়। বিশেষ করে কয়েকটি শাড়ির আঁচলায় ঐ দেশের নিজস্ব শিল্প সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। প্রদর্শনীভুক্ত অধিকাংশ শাড়ি ও স্কার্ফ বিক্রি হয়ে গেল, এটা সুখের কথা সন্দেহ নেই। তবে যাঁরা কোনও শাড়ি বা স্কার্ফ, পছন্দ করা সত্ত্বেও কিনতে পারলেন না, তাঁরা যে অচিরে এ জাতীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারবেন তাও মনে হয় না। কারণ চাহিদা মত এ জাতীয় জিনিস নিয়মিত সরবরাহ করার মত কলকাতায় মণিপুর সরকারের কোনও বিক্রয় কেন্দ্র নেই। আসাম ভবনে অবশ্য কয়েকটি জিনিস হয়ত পাওয়া যায়, তবে সেগুলি ঠিক সুলভ নয়। বিক্রয়ের হার দেখে বোঝা গেল যে বাংলা-দেশে মণিপুরের শাড়ি ও স্কার্ফের চাহিদা আছে। মণিপুর সরকার যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়ে কলকাতা শহরে নিজস্ব কোনও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন তাহলে যে মণিপুরে শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন আরও জনপ্রিয়তা লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—চিত্রপ্রিয়

মুখের ওপর সবসময় ময়লা জমে, যে ময়লা গভীরে বসে গিয়ে চেহারার জৌলুষ নষ্ট করে, বুড়িয়ে দেয়, কুৎসিত দাগে ভরে তোলে,—এক কথায় আপনার রূপকে আড়াল করে রাখে। অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক দিয়ে এ আড়াল সরিয়ে দিন কারণ অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক যে কোনো ক্রীম বা ক্লেনজারের চেয়ে তরল।

ক্লেনজিং মিল্ক যত তরল হয় তত ভেতর পর্যন্ত পরিষ্কার করতে পারে। জলের মত টলটলে তরল অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক হল একমাত্র ক্লেনজার যা ত্বকের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে সমস্ত লুকোনো ময়লা বার করে আনতে পারে। কারণ, এই কাজের জন্যই এ বিশেষভাবে তৈরী। এ ময়লা ধুয়ে যায় না, ক্রীম জাতীয় ক্লেনজার দিয়েও সাফ করা যায় না কারণ ঘন ক্লেনজার ত্বকের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

যাচাই করে দেখুন: মুখ ধুয়ে আসুন। এবার একটু তুলো অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্কে ভিজিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে মুখে আর গলায় ঘষুন। তুলোতে কত লুকোনো ময়লা বেরিয়ে এলো দেখলেন তো? এই ময়লাই এতদিন আপনার রূপের আড়াল হয়ে ছিলো।

Anne French
DEEP CLEANSING MILK

অ্যান ফ্রেঞ্চ সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়, রূপচর্চায় অদ্বিতীয়

অন্য সুরে, তাই তাঁর হৃদয় সাড়া দিয়েছিলও অন্য ছন্দে—অকিঞ্চন হ'লেও তিনি ঠিক সন্ন্যাসী হননি। তিনি শুনেছিলেন তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বাঁশির ডাক :

"প্রেম সে কি কৃপণতা জানে?
আত্মরক্ষা করে আত্মদানে।" (বিচিত্রিতা)

তাঁর হৃদয়েও বেজে উঠেছিল বৌক। তিনি যে অন্তরে পেয়েছিলেন প্রেমনাথের দুটি সংকেত—বিশ্বপতিকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসতে হবে বিশ্ববাসীকে —নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলে আত্মরক্ষা ক'রে নয়—নিজেকে ছড়িয়ে বিলিয়ে আত্মদান ক'রে—কাল কী হবে এ-পরিণামচিন্তাকে বিদায় দিয়ে। আসলে তিনি ছিলেন স্বধর্মে—সেবাব্রতী, স্বভাবে বাউল। তাই একদিকে যেমন ছিলেন সকলের ব্যথার ব্যথী, দরদী, অন্যদিকে তেমনি নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত। তাই তিনি সমান ভালোবাসতেন সুফী ফকিরকে, হিন্দু বৈরাগীকে, গ্রাম্য বাউলকে। "জলমে কমল অলেপ"—যেমন পঙ্কের মধ্যে থেকেও পঙ্কজ নির্লিপ্ত, নির্মল—তেমনি দয়ালদার হৃদয়ও গাইত যেন বাউলের সুরে :

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল
ভিজাব না।
জলে নামব, জল ছড়াব জল তো ছোঁব না।
আঁপচ
আমরা পাখির জাত :
হেঁটে চলার ভাও জানি না,
(আমাদের) উড়ে চলার ধাত।

কিন্তু তাব'লে বলব না তিনি জ্ঞানী ছিলেন না, শুধুই গানের পাখী। তাঁর মধ্যে তিনটি অভীপ্সার সমন্বয় হয়েছিল : জ্ঞানের, সৌন্দর্যের, ভক্তির। কিন্তু সব আগে তিনি মিলনার্থী ছিলেন ঠাকুরের, কৃষ্ণের, একমেবাদ্বিতীয় বিভুর যাঁর পূর্ণিমাপ্রকাশ প্রেমে। তাই সুফী কবিদের "ভগবান ও প্রেম দুয়ে এক একে দুই" এ বাণীতে শুধু তাঁর হৃদয় নয়, প্রতি রক্ত-বিন্দু উজ্জ্বল হ'য়ে সায় দিত। তাঁর Dwellers in the Desert-এ তিনি সিন্ধি সুফীদের সোচ্ছ্বাসেই গুণগান করেছেন। লিখছেন (শা লতিফের স্তব-গানে) :

"তিনি ছিলেন রূপের প্রেমিক তাই বলতেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসনা হ'ল তাঁর অনিন্দ্য আননের সৌন্দর্য পান করবার সাধনা। শা লতিফ বলতেন :

উপবাস, প্রার্থনা? এ-সকলই সুন্দর।
শুধু আছে আর এক আলো
প্রভা যার আনে যুগান্তর,
মায়াগুণ্ঠ করে ছিন্ন, করুণায় যার
আমরা অনিন্দনীয় রূপশ্রী তাঁহার
সহজে বাসিতে শিখি ভালো।

জ্ঞানমার্গীদের মধ্যে অনেকে ভক্তিকে তেমন সুনজরে দেখেন না, বলেন ভক্তি নিম্নাধিকারী দুর্বলেরই পথের পাথেয়, তাই প্রেমের প্রভাকে নিশার্ধি বালে বরণ করুক ভীরু আর অবলারা। কিন্তু একথা যাঁরা বলেন তাঁরা শুদ্ধা ভক্তিকে হৃদয়ে অতিথি-রূপে পাননি। পেলে কখনই প্রেম ভক্তিকে খর্ব করতে চাইতেন না নিম্নাধিকারীর সাধনা ব'লে দেগে দিয়ে। উপনিষদের মহাবাক্য তাঁরা আওড়ান কথায় কথায় : "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—অর্থাৎ দুর্বলেরা আত্মারাম হতে পারে না বলেই তাদের জন্যে ভক্তির পাথেয় ব্যবস্থা। কিন্তু সত্যি কি শুদ্ধা ভক্তি পরা প্রীতি দুর্বলের অধিগম্য? চৈতন্যদেব গেয়েছিলেন প্রেমোচ্ছ্বাসে :

চাহি না ধন জন বণিতা সুন্দরী
কবিতা-নলিনীর অমল মধু,
জনমে জনমে শ্রীচরণে তব যেন রহে
অহৈতুকী ভক্তি শুধু।
(ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী
ত্বয়ি॥)

দুর্বল সাধক কৃষ্ণপ্রেমের জন্যে ঐহিক সব কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে পারে কি প্রেমিকাগ্রক হতে? শ্রীচৈতন্যপার্ষদ মহাভক্ত যবন হরিদাসকে যখন মুসলমান কাজী

হুহুঙ্কার করে বললেন—কাফেরদের হরিনাম ছেড়ে মুসলিম অল্লার নাম না নিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, তখন ভক্তরাজ হরিদাস বলেছিলেন :

খন্ড খন্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।

এ কি দুর্বলের অঙ্গীকার? হরিদাসকে কাজীর পুলিসেরা এমন বেত্রাঘাত করেছিল,

যে তিনি মৃতবৎ ভূমিশয্যা নিয়েছিলেন—তাঁকে মৃত ভেবে ওরা গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিতে তাঁর সাড় ফিরে আসে। কিন্তু জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নগরে ফিরে আবার হরি হরি বলে নৃত্য শুরু করলেন। দেখে নিষ্ঠুর কাজীও তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন :

যোগী-জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বোলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহাকুতূহলে।

শৌর্য দুর্জনকে সন্ত্রস্ত করতে পারে, কেবল ভক্তি প্রেমই পারে তাকে নম্রশীর্ষ অনুতপ্ত করতে।

সবশেষে, সর্বদমন করাল মৃত্যুকেও জীবন্মুক্ত ভক্ত ভয় করে না। প্রেমই তাকে করে মৃত্যুঞ্জয়। দয়ালদার শেষ অসুখে এ-সত্যের পুনঃপ্রমাণ পাইনি কি আমরা সবাই? দুরন্ত কর্কট রোগেও (cancer) তাঁর মুখের হাসি ম্লান হয়েছিল কি? না তো। তিনি গেয়েছিলেন অকুতোভয়েই :

মৃত্যুকে তুমি দৌত্যে পাঠালে, তোমার
এ যে নিমন্ত্রণ।
বিশ্বভ্রমণক্লান্ত তোমায় ছিল ভুলি'
ধূলিরঞ্জনে।
তাই তো তোমার চরণে আমায় আনিলে
টানিয়া প্রাণনাথ,
দয়াল বার্তাবহ সম দ্বারে করিলে
আমার করাঘাত।
কেমনে তবে হে বল্লভ, আমি ঝরাব
অশ্রু বেদনায়—
হেরিবে যখন তোমার আনন অন্তিমে
তব করুণায়?
পূরিবে আমার জন্মান্তর কামনা,
মিটিবে তৃষ্ণা।
মরণকে তাই গণি দেবদূত, নয় সে
দানবী কৃষ্ণা।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে (৭ অগস্ট ১৯৪১) দয়ালদা একটি তর্পণ লেখেন। তর্পণটি তাঁর "দিলকী বাত" গ্রন্থে পরে ছাপিয়েছিলেন। উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন যে, গুরুদেবের দেহান্তে তিনি যুগপৎ হেসে-কেঁদে উপলব্ধি করেছিলেন দুটি সত্য : ("মৈ রোয়া ঔর মৈ হঁসা" প্রবন্ধে—অনুবাদ আমার) :

"যখন আমার গুরুদেব এ-জগৎ ছেড়ে চলে গেলেন তখন বিশ্ববাসী সবাই কেঁদেছিল, আমিও কেঁদেছিলাম।...কান্না এসেছিল ভাবতে যে অমন অমলকান্তি আর এ-চোখে দেখব না, ছুঁতে পাব না তাঁর কমলচরণ।...কান্না পূজার একটি পরম নির্মাল্য।

"সঙ্গে সঙ্গে যেন শুনলাম মা বসুন্ধরা প্রিয় সন্তানকে কোলে নিয়ে বলছেন : "বৎস! দিগ্বিজয় করে ফিরে এসেছ? এসো, ক্লান্ত তুমি, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।"

"আর এই ভেবে আমি হেসেছিলাম যে, মৃত্যু তো স্নেহময়ী মা, মাকে কি কেউ ডরায়? তাই আমি যুগপৎ হেসে কেঁদে গুরুদেবকে স্মরণ করেছিলাম। মনে পড়েছিল কুড়ি বৎসর আগে শোনা এক প্রেমোচ্ছল ফকিরের বাউল গান। তার পদগুলি মনে নেই, কিন্তু ভাবটা এই :

"বন্ধু পুছি, বলো না গো, সারা জীবন
কাঁদিয়ে আমায়
আমার অশ্রুমুক্তা যত চুরি ক'রে
রাখলে কোথায়?
নয় তো শুধু এ মন চুরি—মনচোরার
ছলনা গো!
রাখলে কোথায় লুকিয়ে আমার অশ্রুমণি
- বলো না গো!"
গায় সখা : "আমার বাগানে আজ আর
অশান্ত ওরে!"
বলে আমায় সাদরে সে নিয়ে গেল
হাতটি ধরে
বলল : "এই যে রাশি রাশি কমল
হাসে বাগান জুড়ে,
প্রতিটি ফুল ফুটল তোরি অশ্রুবীজে—
দেখ না চেয়ে!"

দুঃখ ব্যথাকে জীবন্মুক্ত ভক্ত মনে করে না নিয়তির কশাঘাত, মনে করে সত্যিই বরদান। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের অন্ত্রে ক্যান্সারের অপারেশনের পরে বহু যন্ত্রণা ভুগে তিনি এসেছিলেন আমাদের অতিথি হয়ে—আমাদের বহু ভাগ্য। যন্ত্রণার কিছু উপশম হলেও তখনো সোজা হয়ে বসতে পর্যন্ত পারতেন না তিনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন মৃদু কিন্তু শান্ত সুরে : "করুণা? বটেই তো। আমার এ-রোগের যন্ত্রণাকেও আমি ঠাকুরের কৃপা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারি না। তাছাড়া অনহমানকাল যে-তীর্থপথ চলে এসেছে দুঃখ শোক রোগ বেদনার কাটাবনের মধ্যে দিয়ে—এ-ও তাঁর করুণারি বিধান।"

দয়ালদাও এই কথাই বলতেন, শুধু মুখে নয়—তাঁর জীবনের প্রতি কাজের সুরের মধ্যে দিয়ে। দুঃখ শোক বিপদ তিনি অজস্র সয়েছেন কিন্তু কখনো হার

---

*মুঝে য়াদ পড়তা হৈ, ইস বক্ত প্রভুকে প্রেমমে মস্ত বঙ্গালাকে এক ফকির কা গীত। মূলে গীত বাংলা মে থা, উস্‌কা ভাব য়হ হৈ :

"মেরে প্রিয়তম! আজ মৈ তুমসে এক প্রশ্ন পুছুঁ। মৈ সারা জীবন তেরী তলাশমে রোতা রহা। মৈনে হজারোঁ মোতিয়োঁ কৈসে বড়ে ঔর চমকতে আঁসু বহায়ে হৈ। য়ে সব মোতী কহাঁ গয়ে? তুনে হী চোরী কিয়ে হোগে—তুনে মেরা দিল ভি চুরায়া ঔর মেরে দিলকা ধন ভী। মৈ সির্ফ জাননা চাহতা হুঁ—মেরে আঁসু কঁহা গয়ে?"

প্রিয়তম নে জবাব দিয়া : "আ...... লেকিন তুঝে মেরে বাগীচে মে আনা হোগা। মেরে বাগীচে মে জো ইৎনে খিলে হু-এ কমল তু দেখতা হৈ, উন সবকা বীজ তেরে হী আঁসু তো হৈঁ।" (দিল কি বাত......মৈ রোয়া ঔর মৈ হঁসা—১৯৭-৯৮ পৃঃ)।

মানেন নি। জীবনের অন্তিম লগ্নেও তাঁর এ-বিশ্বাস টলেনি (তাঁরই একটি গানের অনুবাদ—মূল গানটি আমি আয়াম্বিকে তর্জমা করেছি) :

প্রেমই বিভু নিয়ন্তা বিশ্বের,
ইঙ্গিতে যার যুগল তারা কক্ষে তাদের ধায়।
প্রেমের স্তবেই রাগমালা গায়
দেবতা কিন্নর চিরদিন শিব সুন্দরের।
কৃপাণে তার খণ্ড খণ্ড হয় কালো বন্ধন,
আমি-আমার-মায়া যাদের রচে অনুক্ষণ।
সম্রাট সে-ই এ-মর্ত্যলোকের,
সে-ই করে ধারণ
লক্ষ জ্যোতির মধ্যে ত্রিভুবন,
বিরাট রাজ্য কোটি কোটি উধাও জ্যোতিষ্কের।

Love is divinity
And, everlastingly,
Makes the galaxies in their orbits run.
Love fashions fire and makes the angels sing in unison,
A mystic sword that cuts the chains,
Forged by the ignorant self, and on earth reigns.
Lastly, Love is a pillar on which rest the universe
And the kingdom of the stars.

নাস্তিক বুদ্ধিবাদীদের কাছে এ সবই মনে হবে কথা কথা কথা—উচ্ছ্বাসের ফেনা, রঙিন চশমা দিয়ে জীবনকে রঙিন দেখা। কিন্তু দয়ালদার কাছে এ-উচ্ছ্বাস কাব্য-কুয়াশা ছিল না। আমরা একথায় সাক্ষ্য দিতে পারি : আমরা যে শুনেছি আনন্দের মন্দিরে এ-পূণ্য পূজারীর কম্প্র স্তব, দেখেছি এ-সৌন্দর্যের মালাকরকে রূপের ফুলে প্রেমের মালা গাঁথতে তাঁর বরেণ্য বল্লভের জন্যে। সাধে কি তিনি ফুল এত ভালোবাসতেন?

"হাউন্ড অফ দি হার্ট"-এ তাঁর একটি কবিতায় তিনি ফুলকে দিয়েছিলেন তাঁর প্রাণের প্রণতি :

Flowers? They are the eyes of angels
Innocent in their purity,
Rapt in perpetual prayer—like
The saints in mystic ecstasy.
Flowers? They are lone dreamers born to dream
Of Beauty's deep inviolate Gleam,
Minstrels of Love who sing
Of the lovely King
Who talks through them to men,
In joy and pain:
A language understood by those alone
Who hark to their message—of Love's dominion.

ফুল? তারা যে মোহন দেবদূতের নয়নতারা,
নির্মলতার স্তবে আপনহারা,
ফোটে মহানন্দে অফুরন্ত প্রার্থনায়
ভক্ত যেমন প্রেমের বন্দনায়।
ফুল? তারা যে ফোটে কেবল দেখতে
অসীম স্বপন

করতে ছন্দে বরণ
রূপশ্রী আর অমলকিরণ,
রূপ আর আলো প্রেমের চারণ-বেশে,
গায় শুধু গান তাঁর—যিনি অনিন্দ্য
ফুলের ভাষায়,
হর্ষ-ব্যথায় মঞ্জুল আলোছায়ায়
করেন আলাপ। যারা ফুলের নীরব
ভাষা জানে
শোনে গহন প্রাণে
ফুলের মধুর চিরন্তনী বাণী :
'ধূলিধরায় আমরা, ওরে, প্রেমকে শুধু মানি।'

দয়ালদা এই কথাটিই আমাদের কাছে বলতে চেয়েছিলেন যখন তিনি তাঁর প্রাণের গুরু রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই ব'লে যে, তিনি "প্রেমের সত্যকে রূপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন "Truth of Love revealed in Beauty"), যোগীকবি এ-ই-ও এই সত্যের সত্যকেই ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন গেয়ে :

Within that quivering shell, the ear,
Farborne, a myriad voices throng.
Be still and listen: you shall hear
The universe revealed in song.

কাঁপিতে শ্রবণ-সিন্ধুকল্লোল-আহতশঙ্খ সম
ভেসে আসে দূর হ'তে কোটিকণ্ঠতরঙ্গ জনতা।
শান্ত হও, কান পাতো : শুনিবে সঙ্গীতে নিরুপম
ঝঙ্কৃত—বসুন্ধরায় গহনলীলার মর্মকথা।

[ক্রমশঃ]

"ওমা, আমার কাশি সারিয়ে দাও!"

নতুন ফর্মুলার সিরোলিনে ডি এম আর* রয়েছে যা বিশেষভাবে কাশির মূলস্থানে কাজে শুরু দেয়। তাই সিরোলিনে এত দ্রুত আরাম পাওয়া যায়।

যখনই আপনার মেয়ের কাশি শুরু হবে তখনি ওকে নতুন ফর্মুলার সিরোলিন খাইয়ে দেবেন। চেরীর মতো লাল সুস্বাদু ও সুগন্ধে ভরা মিষ্টি সিরোলিন খেতে ওর খুব ভাল লাগবে। দেখতে দেখতেই ও বিনা কষ্টে শ্বাস নেবে ও আবার খেলতে শুরু করবে।

কাশির সব ওষুধের মধ্যে নতুন ফর্মুলার সিরোলিন অদ্বিতীয়। এতে ব্যথা ও জ্বর সারাবার এমন ওষুধ রয়েছে যা জ্বরজ্বর ভাব বা অস্বস্তি বোধও দূর করে। তাছাড়া, সিরোলিনে নিদ্রাউদ্রেককারী ও কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করার মতো কোন ক্ষতিকর পদার্থ নেই।

কোন রকম ক্ষতি না করে সহজে দ্রুত কাশি সারাতে সিরোলিন এক মোক্ষম ওষুধ।

* ডেক্সট্রোমেথোরফান হাইড্রোব্রোমাইড

নতুন ফর্মুলার

সিরোলিন ®

'রোশ'

'রোশ' এর উৎপাদন একমাত্র পরিবেশক: ভোল্টাস লিঃ

যেমন গুরু তেমনি চেলা

লীলা মজুমদার

যাঁরাই রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরাই তাঁর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে-দেখা দুটি পরস্পরবিরোধী চরিত্রের পরিচয় পেয়ে অনেক সময়ই বিস্মিত হতেন। একটি মানুষ আপন-ভোলা, বে-হিসাবী, অধীর, অ-সংসারী, ভাবে-বিভোর আর অন্য মানুষটির তীক্ষ্ণ সাধারণ-বুদ্ধি, অদ্ভুত মেধা ও ভেদজ্ঞান, কার্যকরী সব বিষয়ে উন্মুখ, ধৈর্যশীল ও হিসাবী। কিন্তু দুটি মানুষই কবি, আদর্শবাদী ও নির্ভীক।

রবীন্দ্রনাথের হাতে যেসব ভাগ্যবান পুরুষরা তৈরি হয়েছিলেন, তাদের প্রায় সবাইকেই এই দুটি বিভাগের একটিতে বা অপরটিতে ফেলা যায়। কিন্তু সকলেই আদর্শবাদী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। আমাদের বীরেনদাও তাই ছিলেন, হয়তো এমনও বলা যায় যে, ঐ দ্বিতীয় দলের তিনি ছিলেন একটি অনন্য রত্ন।

এক বছর আগে বীরেন্দ্রমোহন সেন ইহলোক ছেড়ে গেছেন। পুকুর থেকে এক ঘটি জল তুলে নিলে, অন্য জল সেই জায়গাটুকু ভরে দেয়, এতটুকু ফাঁকা রাখে না। কিন্তু বীরেনদা যে জায়গাটুকু জুড়ে ছিলেন, সেটি অন্য জিনিস দিয়ে ভরবার নয়।

শান্তিনিকেতনের সব ছেলেবুড়োই তাঁকে বীরেনদা বলে ডাকত, বীরেনবাবু বললে কেউ তাকে চিনতে পারত না। দুঃখে বিপদে সবাই তাঁর কাছে ছুটে যেত, নিরাশ হয়ে কেউ কখনো ফিরত না। বেশির ভাগ সময়ই ছুটে যাবারও দরকার হত না। কাক-পক্ষীর মুখে খবরটুকু একবার বীরেনদার কানে উঠলেই হল। তিনি নিজে গিয়ে অনাহূত-ভাবে হাজির হতেন। এবং শুধু এখন নয়। ১৯৩১ সালে তাঁকে প্রথম যখন দেখেছিলাম, কবি তখন জীবিত, দেখতাম তিনিও অসুবিধায় পড়লেই বীরেনদাকে স্মরণ করতেন। যদিও বীরেনদার তখন মাত্র বছর ত্রিশেক বয়স এবং তাঁর পরবর্তীকালের খ্যাতি তখনো ভবিষ্যতের কোলে।

সেবার মীরাদির খুব শরীর খারাপ হল, মন-মেজাজও ভালো ছিল না, ছেলে বিদেশে, নন্দিতা নিতান্ত বালিকা, অন্য আত্মীয়-স্বজন কেউ কাছে নেই। খবর পেয়েই বীরেনদা দিনের পর দিন, অক্লান্তদেহে ও হাসি মুখে তাঁর সেবায় লেগে গেলেন। রাতে মীরাদির ভয় করত, তাই বীরেনদা নিজের বাড়িঘর ছেড়ে তাঁর বাড়ি আগলাতেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে নিজের বাড়িতে তিনি খুব জনপ্রিয় হননি। কিন্তু তাতে তিনি পেছপাও-ও হননি।

সেই সময় থেকেই তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমার গভীর স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। তখন সবে এম-এ পাশ করে, অধ্যাপনা করতে শান্তিনিকেতনে গেছি। সে আরেকটা শান্তিনিকেতন, যেখানে সকলের সঙ্গে সকলের আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল, সবাই সবাইকে চিনত জানত। অবিশ্যি কোনো বিরোধ হত না, এমন কথাও বলছি না।

অল্প দিনেই বুঝে নিলাম যে সেখানে বাড়ির জন্য মন কেমন করার খুব অবকাশ নেই, কারণ বিশেষ করে বীরেনদার বাড়িতেই সঙ্গীহীনদের বাড়ি পাতা রয়েছে। অন্যান্য কর্মী ও অধ্যাপকদের কাছ থেকেও গভীর প্রীতি ও আতিথ্য পেয়েছিলাম, কিন্তু বীরেনদার বাড়ির একটা বিশেষত্ব ছিল যে সেখানে অতিথি বলে কেউ থাকত না, সবাই বাড়ির লোক। তখনো তাঁকে হিসাব করে চলতে হত; কিন্তু তাঁর যা কিছু ছিল, যে আসত সে-ই তার ভাগ পেত।

পরে যখন তাঁর দিন ফিরল, তখনো তাঁর মধ্যে কোনো তফাত দেখলাম না। তখনো সেই অনাড়ম্বর, অনাবিল আদর যোগ্যা-যোগ্য নির্বিশেষে বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেবলি মনে হত এই হল সত্যিকার স্নেহ, এর কাছে যোগ্য বা অযোগ্য বলে কিছু নেই।

নিজে খুব স্বাচ্ছল্যে বা বিলাসে মানুষ হননি। বছর দশেক বয়সে বাপকে হারিয়েছিলেন। তখন তাঁর কাকা পণ্ডিত ক্ষিতি-মোহন সেন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতেন। ১৯১১ সাল থেকে সেইখানেই বীরেনদার পড়াশুনো চলতে লাগল। কবি তখন পুরোদস্তুর গুরুমশাই, নিজের হাতে ছেলেদের তৈরি করেন। তাঁর চিরকালের বিশ্বাস যে, সম্পূর্ণ মানুষ হতে হলে শুধু পাঠ্যপুস্তক গিললেই চলে না। বীরেনদার মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই উত্তম বস্তুই পেয়েছিলেন। বইপড়া, অঙ্ক কষা, নিজেদের কাজ নিজের করা, খেলাধুলো, গানবাজনা অভিনয়, প্রকৃতির শোভা দর্শন, অতিথি সেবা, আশ্রম তদারক, কোনো কিছুই বাদ যেত না। বীরেনদা এই শিক্ষা বোধ হয় তৃষ্ণার্ত মরুভূমির মতো শুষে নিয়েছিলেন। এসব তাঁর ব্যক্তিত্বের অঙ্গ ছিল, আলাদা শেখানো জিনিস ছিল না।

অঙ্কে ভালো ছিলেন, সুন্দর ছবি আঁকতেন, খেলাধুলো ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় কম ছেলে তাঁর সঙ্গে পেরে উঠত। স্বনামধন্য ফুটবল খেলোয়াড় গৌরগোপাল ঘোষ আর সূর্য চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গী ছিলেন। এঁরা সবাই পরে কলকাতায় ফার্স্ট ডিভিশনের খেলোয়াড় হয়েছিলেন।

তবে পড়াশুনো বেশি দিন চালানো সম্ভব হল না। মায়ের বড় ছেলে, অভিভাবকহীন পরিবারের অনেকখানি ভার তাঁকে অল্প বয়সেই নিতে হয়েছিল। পড়া ছেড়ে কাজে ঢুকলেন। কলকাতায় একটা সদাগরী আপিসে চাকরি পেলেন। হাতে-কলমে স্থাপত্যের কাজ শেখার সুযোগ পেয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে বাড়ি তৈরির বিদ্যা তাঁর রপ্ত হয়ে গেল। তখন শান্তিনিকেতনে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রটিকে ভালো করেই চিনতেন, তার-ই হাতে অনেক কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। পরে বাড়ি তৈরির ব্যাপারে কলকাতাতেও তাঁর যথেষ্ট সাফল্য ও খ্যাতি হল। সেখানে বাসা করে, বছরের পর বছর তাঁকে কাটাতে হল।

কিন্তু মন পড়ে থাকত শান্তিনিকেতনে। এতটুকু সুযোগ পেলেই সেখানে চলে যেতেন। সেখানেই তাঁর ছেলেমেয়ে মানুষ হতে লাগল। ১৯৩১ সালে বীরেনদার ছোট একতলা বাড়িতে, পিঁড়িতে বসে যখন-তখন খেয়ে আসতাম। পরে বড় দোতলা বাড়ি হল, সেখানে আধুনিক আসবাব এল, গাড়ি হল, জমিজমা সম্পত্তি হল। কিন্তু বীরেনদা আমাদের সেই বীরেনদাই রয়ে গেলেন।

বেঁটে বলিষ্ঠ মানুষটি, কোঁকড়া চুল, কটা চোখ, চঞ্চল চলাফেরা, মুখে হাসি আর অনর্গল গল্প। তার উপর কথায় কথায় গুরুদেবের কবিতা। মনে হয় বইকে বই মুখস্থ ছিল; ঠিক সময়টিতে টপ করে কয়েকটি উপযুক্ত পংক্তি বীরেনদার মুখে এসে যেত।

এ ধরনের মানুষ আজকাল দেখি না।

সাজ-সজ্জা কায়দা-কেতা লজ্জায় তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকত। কুসুমের মতো কোমল মন আর ইস্পাতের মতো বলিষ্ঠ শরীর; তাকেই বলে পৌরুষের প্রতিমূর্তি। বাইরের কোনো অলংকারের তাঁর দরকার। ছিল না।

এমন কাজের মানুষও কম দেখেছি। কোথায় যে এত সময় পেতেন বুঝতে পারি না। যাতে হাত দিতেন তাতেই সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ লাগাতেন। স্থাপত্যের কাজ ছাড়াও চাষবাস, ব্যবসা, সমাজসেবা, খেলা-ধুলো, কমিটি মিটিং, আমোদ-আহ্লাদ, কিছুই বাদ যেত না। একবার ট্রেনে একসঙ্গে কলকাতায় ফেরার পথে, বর্ধমানে বীরেনদা খাসা মাছ ফ্রাই ফরমায়েস দিয়ে খাওয়ালেন। রেলের বেয়ারারা মনে হল ওঁকে ঠাকুরপুজো করে; নাকি ভোজনালয়ের কমিটির তিনি সদস্য। এমন ধারা কত দায়িত্ব যে ঘাড়ে নিতেন তার ঠিক নেই। তিলে তিলে নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে বাকি রাখেননি।

আরেকবার ট্রেনে বেজায় ভিড়, কোথাও জায়গা পাচ্ছি না। বীরেনদা কোত্থেকে এসে একটা কামরায় আমাকে ঠেলে তুলে, এক-জন শায়িতা মেয়ের পাশে আদর করে বসালেন। বুঝলাম টাইফয়েড রোগিনী নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছেন। নিজেরও রোগের ভয় নেই, অন্য কারো যে থাকতে পারে সে ধারণাও নেই।

ঐ ছিল তাঁর কাজ। কোথায় কার কি অসুবিধা হচ্ছে, শুনেই সেখানে ছুটবেন। ভয় ভাবনা জানতেন না। একটি অনাত্মীয়া মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। [illegible] ব্যাপার থেকে লোকে দূরে থাকতে [illegible]। বীরেনদা ঠিক তার উল্টো। যেচে গিয়ে ভাগ্যহীনা মেয়েটিকে কোলে করে নামিয়ে আনলেন।

শাস্ত্রে বলে রোগশয্যায়, রাজদ্বারে, শ্মশানে যে পাশে দাঁড়ায়, সেই হল বন্ধু। বীরেনদা ছিলেন সেই রকম বন্ধু। কোথায় কাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে, সেইখানে বীরেনদা। অচেনা গ্রামবাসীর গোরুর গাড়ি ভেঙে সে সপরিবারে বিপদে পড়েছে, বীরেনদা আছেন, ভাবনা কিসের। অপরিচিত কে যেন দূরে জায়গায় টাকার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। বীরেনদা তাঁর শেষ-শয্যা থেকেও অমনি তিন শো টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

তার উপরে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়ে-দের কথা বলতে হয়। জীপগাড়ি বোঝাই করে যত রাজ্যের বালখিল্যদের নিয়ে বীরেনদা ঘুরে বেড়াতেন। আমরা ছোট ছেলেদের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে আমাদের ফলগাছ আগলাই, আর বীরেনদা তাদের ডেকে ডেকে এনে ফল বিলোতেন। যেন তাদের জন্যই তাঁর গাছ পোঁতা, যেমন মানুষমাত্রের-ই জন্য তাঁর জীবন ধারণ করা।

ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়া

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ আর কুৎসার উত্তর দিচ্ছেন গোল্ডেন টোব্যাকো

বিরোধের পটভূমি

ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসাবে গত ৩রা অগস্ট, ১৯৭০ তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনে যে ভাষণ দিয়েছিলাম তাতে আমার বক্তব্য প্রধানতঃ ভারতীয় মালিকানাধীন সিগারেট প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলোর বর্তমান দুর্যোগ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, সিগারেটের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য এইসব ইউনিটকে উৎসাহ-দানের জন্য সরকারী নীতির প্রয়োগ এবং বৈদেশিক একচেটিয়ার কবল থেকে সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের মুক্তি সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম।

তবে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং (পূর্বতন ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো)-এর চেয়ারম্যান মিঃ এ এন হাকসার কিন্তু আমার বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করার বদলে গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের পথ বেছে নিলেন, অথচ এই কুৎসা লক্ষণীয়ভাবে অগভীর ও কুতর্কমূলক। তাঁর বাক্‌সর্বস্ব অভিযানে যদি গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও মানহানিকর বিবরণী না থাকতো তবে তাকে আমি আহত নির্দোষিতার মুখোশ পরিহিত একটি বৈদেশিক একচেটিয়ার ধড়রকমের প্রচার অভিযানের চমকসৃষ্টিকারী কৌশল বলেই উপেক্ষা করতাম। কিন্তু মিঃ হাকসারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি আবার বলছি, এই গোল্ডেন টোব্যাকো ভারতে এই ধরনের জাতীয় সংস্থার মধ্যে বৃহত্তম।

সুতরাং গত ৩১শে অগস্ট, ১৯৭০ তারিখে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে আই টি সি-এর চেয়ারম্যান যে ভ্রমাত্মক ও মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন, গোল্ডেন টোব্যাকোর পক্ষ থেকে আমি তার প্রত্যেকটির উত্তর দেবো এবং তা বিচার করবার ভার আপনাদের ওপর, সংবাদপত্র, জনসাধারণ ও সরকারের ওপর ছেড়ে দেবো।

আমি প্রস্তাব জানিয়েছিলাম যে, (ক) সরকারের উচিত কেবলমাত্র ১০০% ভারতীয় কোম্পানিগুলোকেই সম্প্রসারণ করতে দেবার জন্য তাঁদের ঘোষিত নীতি প্রয়োগ করা, (খ) সিগারেট শিল্পে একচেটিয়াকে, বিশেষ করে বৈদেশিক একচেটিয়াকে উৎসাহ দেওয়া হবে না, (গ) আগে ২৫% পর্যন্ত বাড়তি উৎপাদনের যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এক-চেটিয়ার সেই বাড়তি উৎপাদন ১৪ই জুলাই তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রত্যাহার করে নিতে হবে, এবং (ঘ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটির বাইরে একচেটিয়ার যে বাড়তি উৎপাদন হয় তা রপ্তানি করতে হবে যাতে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয় এবং দেশীয় ইউনিটগুলোর যে ৭০% ক্যাপাসিটি অলস হয়ে পড়ে আছে তা কাজে লাগানো যায়—এর অর্থ বছরে ১০০০০০/১২০০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন।

আমি জানি, বৈদেশিক একচেটিয়ার এসব কথা ভালো লাগবে না, কিন্তু তাই বলে আমি এ আশাও করিনি যে, তাঁরা এতদূরে নীচে নেমে যাবেন এবং মিঃ হাকসারের বিবৃতিতে যে ভিত্তিহীন যুক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁরা তুলবেন—একে আমি স্বাধীন ভারতে ১০০% ভারতীয় কোম্পানিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির নগ্ন প্রচেষ্টা বলেই মনে করি।

উৎপাদনের গোঁজ—কার্যকরী পন্থা

আমরা সংবাদপত্রে রোজই পড়ি যে, বৈদেশিক যৌথ প্রতিষ্ঠানের সৌভাগ্যের দিন শেষ হতে চলেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখনও যা ঘটছে তা হচ্ছে, সরকারী নীতি ও আইন অন্যরকম নির্দেশ দিলেও তারা যা চাইছে তা পেয়ে যাচ্ছে। এই রকমের দুর্ঘটনা পরিহারের জন্য আমি তাদের উৎপাদন ঠেকাবার কথা বলেছিলাম, তা হলেই নির্ধারিত নীতির অপহ্নব ঘটানোর উদ্দেশ্যে যে খিড়কি-দরজার কৌশল তারা অবলম্বন করেছে তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হবে।

যেদিন একটি সংবাদে আমি জানতে পারলাম যে, ওয়াজির সুলতান তার উৎপাদন ৮৮৮০০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০৬২০০ লক্ষ সিগারেটে সম্প্রসারিত করার আবেদন করেছে সেদিন থেকেই এসব শুরু হয়েছে। আমি কয়েকবার দিল্লি এসেছি এবং সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ইউনিটকেই কেবল সম্প্রসারণের অনুমতি দেবার যে সরকারী নীতি রয়েছে তা, এবং ওয়াজির সুলতানের ব্যাপারটি, যে ওয়াজির সুলতান আই টি সি-এর সঙ্গে পারস্পরিকভাবে যুক্ত এবং যারা তাদের মধ্যে দেশের সিগারেট উৎপাদনের ৭০% নিয়ন্ত্রিত করে ও একটি একচেটিয়া গড়ে তুলেছে, সেই ওয়াজির সুলতানের ব্যাপারটি মনোপলিজ কমিশনের বিচারের জন্য পাঠানো উচিত বলে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ব্যাখ্যা করেছি।

একবার যদি ভি এস টি-এর সম্প্রসারণ মঞ্জুর করা হয় তবে দেশীয় ক্ষেত্রকে সুদিনের জন্য ১০ থেকে ২০ বছর অপেক্ষা করতে হবে, অথচ এই দেশীয় ক্ষেত্র তাকে উৎসাহ দানের জন্য সরকারের বর্তমান নীতির মুখ চেয়ে আছে।

একচেটিয়া যখনই চায় তখনই তার কাজটি যেভাবে সে চায় সেই-ভাবেই হয়ে যায়। কাজেই ভি এস টি/আই টি সি-এর মঞ্জুরী লাভের জন্য যুক্তপ্রচেষ্টা, সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় সত্ত্বেও যখন ভি এস টি-এর আবেদন পিছিয়ে গেল এবং অতীতের মত সাফল্যের বদলে ব্যর্থতা পেল তখন স্বভাবতঃই তারা আহত ও ক্রুদ্ধ হবে। ভ্রমাত্মক ধারণা সৃষ্টির জন্য তারা সবরকমের যুক্তির অবতারণা করে যাচ্ছে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বাস্তব ঘটনা ও পরিস্থিতির সত্যতার ওপর ভিত্তি করে এখনও অনেক প্রত্যয়সিদ্ধ পাল্টা যুক্তি আমার কাছে রয়েছে।

উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের উপযোগী একটি বিষয়

এই বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই আমাদের বক্তব্য পেশ করার পূর্ণ সুযোগ দানের জন্য বিষয়টি আমি মনোপলিজ কমিশনের কাছে পাঠানোর বা অনুরূপ কোন সংস্থা দ্বারা ব্যাপক তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছি। আই টি সি-এর চেয়ারম্যান বলেছেন যে, আই টি সি/ভি এস টি পারস্পরিক সংযুক্ত নয়। তা হলে, এই ধরনের তদন্ত যাতে না হয় তার জন্য কেন তাঁরা সবরকমের প্রভাব খাটাচ্ছেন ও চাপ দিচ্ছেন? তাঁরা অগ্রণী বিচারকদের মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি বলতে চাই যে, তাঁদের যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের মতামত প্রকাশ পেয়েছে; কাজেই সঠিক অভিমত পেতে হলে উভয় পক্ষ থেকেই পুরো তথ্য বিচারকদের এমন একটি সংস্থার কাছে পেশ করতে হবে যা, আমি আশা করি আপনারা স্বীকার করবেন, সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হয়। মনোপলিজ কমিশন ইতঃপূর্বেই গঠিত হয়েছে এবং তদন্তের পক্ষে এটিই সঠিক সংস্থা হবে।

আমি একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছি যে, ভি এস টি-এর বিরুদ্ধে আমি নিজে সম্প্রসারণের জন্য আবেদন পেশ না করে আমি বৈদেশিক একচেটিয়াকে মোটেই কৃতার্থ করতে যাচ্ছি না, এবং সরকার কাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন—৬৭% বৈদেশিক মালিকানাধীন কোম্পানিকে, না ১০০% সম্পূর্ণ ভারতীয় মালিকানাধীন কোম্পানিকে—তা নির্ধারিত করার ভার আমি সরকারের ওপরই ছেড়ে দেবো। গোল্ডেন টোব্যাকো একচেটিয়া হয়ে উঠবে, বৈদেশিক একচেটিয়ার এই যে আশঙ্কা তা সত্যিই কৌতুক-কর। আজকের বাজারে ৭০% একচেটিয়া রয়েছে যাঁদের তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন বাজারের মাত্র ১৪% অংশের অধিকারী একটি ক্ষুদ্র ভারতীয় কোম্পানির আগামীকাল একচেটিয়া হয়ে উঠবার ভয়ে! এই একচেটিয়াটি বাজারে তাঁদের ৭৫% ও তারও বেশী অংশ ভোগ করায় এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, অন্য কারুর প্রবেশকে স্বাগত জানাতে ও একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে তাঁরা যে শুধু রাজী নয় তা-ই নয়, তাঁরা একথা চিন্তা করতেও প্রস্তুত নয়।

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং আমি প্রস্তাব জানাচ্ছি যে, সবচেয়ে ভাল পথ হচ্ছে বৈদেশিক একচেটিয়া এবং অন্যান্য বড় বড় ভারতীয় প্রস্তুতকারক, যারা সরকারের আশঙ্কামত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তাদের উৎপাদন ঠেকানো। অবশ্য সরকারের এই আশঙ্কা অযৌক্তিক ও অকারণ। এই উৎপাদন যদি ঠেকানো যায় তা হলে বেসরকারী ক্ষেত্র এবং রাজ্য ক্ষেত্রেও নতুন নতুন অনেক উদ্যোক্তা ব্যর্থতার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে এই শিল্পে প্রবেশ করবে।

আই টি সি নিজের বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখছে

জি টি সি যা কিছু বলেছে তা-ই ভুল, একথা প্রতিপন্ন করার জন্য মিঃ হাকসার সবরকমের ও ধরনের যুক্তি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু যার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন বস্তুতঃপক্ষে তা প্রমাণ করতে পারেননি। নীচে আমি যে বিস্তৃত উত্তর দিয়েছি তাতেই তা পরিষ্কার হবে। তিনি যে টুকরো টুকরো তথ্য দিয়েছেন তার সম্পূর্ণার্থ ১০০% ভারতীয় সিগারেট শিল্পের জন্য আমার দাবির সমর্থনে যেসব বক্তব্য রেখেছিলাম তারই মত। এগুলো হচ্ছে:

(১) আই টি সি একটি একচেটিয়া, কারণ তাদের উদ্বর্তপত্র অনুযায়ী ১৪৫ কোটি টাকা বিক্রয় সর্বভারতীয় অঙ্ক ২৫০ কোটি টাকার ৬০%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক পত্র 'টোব্যাকো' তাদের ৫ই জুন, ১৯৭০ তারিখের সংখ্যায় বলেছেন: "ভারত—উৎপাদন বেড়ে গেলেও সিগারেটের রপ্তানি অত্যন্ত কমে যাচ্ছে:
"ভারতীয় সিগারেট-বাজারে প্রভুত্ব করে একটি বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং লিঃ। মোট বাজারের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশই এই কোম্পানিটির আয়ত্তে।"

(২) আই টি সি এবং ভি এ সটি যদি পারস্পরিক সংযুক্তই না হবে তবে কেন তারা মনোপলিজ কমিশনে যেতে দ্বিধা করছে? তাদের উচিত এর জন্য চাপ দেওয়া এবং নিষ্কলঙ্কে সার্টিফিকেট লাভ করা, তা হলেই একটি বাধা অপসৃত হবে।

পারস্পরিক সংযুক্ত আই টি সি এবং ভি এস টি

এখন আপনাদের গোচরে আনতে চাই যে, আই টি সি এবং ভি এস টি সন্দেহাতীতভাবে পরস্পর-সংযুক্ত, কারণ:

(ক) এদের সমগ্র ইতিহাসে চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর ও পরিচালনা বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা উভয় কোম্পানিতে একই এবং পারস্পরিক বদলীযোগ্য; এই ব্যাপারটি যে কেউ খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন;

(খ) ভি এস টি প্রস্তুত করে আই টি সি'এর উইলস ব্র্যাণ্ড এবং আই টি সি তৈরী করে ভি এস টি'এর চারমিনার—আই টি সি'এর শ্লোগান 'পরস্পরের জন্য নির্মাণ'-এর প্রতি সাঁচাই বিশ্বস্ত। ব্লেণ্ডিং'এর পর্যায় থেকে বাজারে পাঠানোর চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়েই তারা পরস্পরের জন্য এই কাজ করে যাচ্ছে; আবার এটিও স্মরণে রাখতে হবে যে, ব্লেণ্ডিং কাজটি হচ্ছে একটি মন্ত্রগুপ্তি, এক নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই এটি দেওয়া চলে না। অনুরূপ ধরনের কাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন প্রস্তুতকারক সিগারেট প্রস্তুতের জন্য এবং অন্যের ফ্যাক্টরিতে তা প্যাক করার জন্য অপরকে কেবল ব্লেণ্ড-করা রেডিমেড কাটা তামাকই দেয়, এইভাবে ব্লেণ্ডিং গোপন রাখা হয়।

(গ) আই টি সি হচ্ছে ভি এস টি'এর ব্র্যাণ্ডগুলোর সোল সেলিং এজেণ্ট; এই ব্র্যাণ্ডগুলো একই দামের তাদের নিজস্ব ব্র্যাণ্ড-গুলোর সংগে প্রতিযোগিতা করছে। উভয়ই যদি এক না হবে তবে আপনি কি একথা চিন্তা করতে পারেন যে, কোন প্রস্তুতকারক নিজের ব্র্যাণ্ডের বদলে অন্যের ব্র্যাণ্ডের প্রচার করবে?

(ঘ) আই টি সি / ভি এস টি, উভয়েরই জনক হচ্ছে লণ্ডনের ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোং লিঃ; এই কোম্পানি অসংখ্য সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিবারের কর্তা—এই সদস্যরা সকলেই পরস্পর-সম্পর্কিত এবং মাকড়সার জালের মত পরস্পরযুক্ত। একের সংগে অপরের সম্পর্ক জানতে হলে আপনাদের মূলে যেতে হবে; আপনাদের অবগতির জন্য আমি এখানে মাত্র দুটি দলিলের কথা উল্লেখ করছি—একটি, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত ইউ কে মনোপলিজ কমিশনের রিপোর্ট, অপরটি ওয়ার্লড টোব্যাকো ডিরেক্টরি।

(ঙ) এটি কাগজে-কলমে তর্কাতীত সত্য যে, অনুমোদিত সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির বাইরে একচেটিয়ার বাড়তি উৎপাদন রয়েছে, পক্ষান্তরে বহু দেশীয় কোম্পানির ক্যাপাসিটি অলস পড়ে আছে। অন্যের ক্ষতি করে আর্থনীতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করার এটি একটি নির্ভেজাল ঘটনা। তা হলে, অন্যরকম প্রমাণ করবার জন্য কেন এতসব যুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক কথা তোলা হচ্ছে? ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ টেকনিক্যাল ডেভেলপ-মেণ্টের দলিলপত্র থেকে আপনারা প্রকৃত [illegible] যাচাই করে নিতে পারবেন।

(চ) আই টি সি দেশের একটি বোঝা—লভ্যাংশ, তামাক ও অন্যান্য জিনিস আমদানী, ভবিষ্যতে প্রেরণের জন্য দায়ের পাহাড় গড়ে তোলা, মূলধনে পরিণত গুডউইল ও ট্রেডমার্ক ইত্যাদির ওপর লাভাংশ হিসাবে অর্থ প্রেরণ — এত সবের আকারে মূল্যোবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় সে ঘটাচ্ছে। এই অপচয়কে ঢাকা দেবার জন্য আই টি সি বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী এমন সব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে যেগুলোতে নিজেকে বৈদেশিক মুদ্রার নীট অর্জনকারী বলে দেখানো হচ্ছে—তাও করা হচ্ছে নিজস্ব সামান্য ২ লক্ষ টাকা মূল্যের সিগারেট রপ্তানির সংগে ১০০% একটি ব্রিটিশ কোম্পানির শাখা ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানির অর্জিত ৯৯৮ লক্ষ টাকা যোগ করে, যার মোট যোগফল হচ্ছে ১০ কোটি টাকা; এই কোম্পানিটিকে আবার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ভ্রাতৃ-কোম্পানি বলে। ছলনার কি চমৎকার দৃষ্টান্ত!

(ছ) ভি এস টি, আমার মনে হয়, ক্ষুব্ধ; আই টি সি এত বিচলিত হয়ে উঠছে কেন? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ভি এস টি নীরব কেন, আই টি সি'ই বা তার পক্ষ হয়ে সওয়াল করছে কেন এবং আই টি সি'এর চেয়ারম্যান তার মুখপাত্র হয়ে উঠলেন কেন? এটিই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, তারা পরস্পর সম্পর্কিত?

গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে কুৎসা

এখন আলোচনা করবো জি টি সি'এর বিরুদ্ধে আই টি সি'এর কুৎসা রটনা সম্পর্কে। বস্তুতঃপক্ষে, দুটি কোম্পানির মধ্যে তুলনা করার ব্যাপারে মিঃ হাকসারের বক্তব্যে শুধু আমাদের ক্ষতি করার ও আমাদের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কলেপন করার চেষ্টা ছাড়া কোন যুক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না। এ ব্যাপারেও তিনি সফল হয়েছেন বলে আমার সন্দেহ আছে। তবু আমার প্রতিক্রিয়া আপনাদের জানাচ্ছি এবং কে যে কি তার বিচারের ভার আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

(১) জি টি সি চমৎকার অগ্রগতি লাভ করেছে — আই টি সি'এর চেয়ে অনেক বেশী। আপনাদের অবগতির জন্য আরও জানাচ্ছি, আমি কখনও এ তথ্যের বিরোধিতা করিনি যে, আই টি সি/ভি এস টি শতকরা ভিত্তিতে সিগারেটের ক্রমসম্প্রসারণ-শীল বাজারের সবটুকু দখল করে নিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বর্ধিত চাহিদার ৮০%-ই চলে গিয়েছে এই একচেটিয়া গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ফ্যাক্টরিগুলোর কবজায়।

আপনার যদি ১০, টাকা মূলধন থাকে এবং কোন এক সময়কালে যদি আপনি ১০, টাকা আয় করেন তবে আপনার ১০০% বেড়ে গেল।

(পর পৃষ্ঠার দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু আপনার যদি ১০ কোটি টাকা মূলধন থাকে এবং আপনি যদি ১ কোটি টাকাও আয় করেন, তবে তা বাড়লো মাত্র ১০%। এই একই সময়কালে ১০ টাকা ও ১ কোটি টাকা আয়ের পার্থক্যটা উপলব্ধি করতে পারলেন তো? তা হলে আপনি—একই রকমভাবে যে-কোন ভারতীয়—কি চাইবেন যে, পণ্যশিল্পে ভারতীয় বাজারের কল্যাণ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মুখ চেয়ে থাকুক? এখনই কি এসব বন্ধ করা হবে না?

(২) আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি যে, একচেটিয়া অবস্থা সত্ত্বেও বৈদেশিক একচেটিয়া জি টি সি থেকে কম লাভ দেখায়, অথচ জি টি সি-কে একমেবাদ্বিতীয়ম্ প্রতিযোগীর সংগে লড়াই করতে হচ্ছে। জি টি সি-এর মুনাফার হার ৯.৫%, তার সংগে তুলনীয় আই টি সি-এর মুনাফা ৬.৪%, অর্থাৎ শতকরা ভিত্তিতে ৫০% বেশী। সঠিক মুনাফা দেখানো কি অপরাধ? আমরা স্বীকার করি যে, বিদেশে আমাদের ইচ্ছুক ও সহযোগিতামূলক শেয়ারহোল্ডার নেই, যারা সস্তা দরে তামাক কিনে আমাদের মুনাফার বোঝা হ্রাস করে আমাদের বাধিত করবে কিংবা এই শিল্পের সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখবার জন্য বৃহত্তর ও মোটা বেতনভোগী কর্মচারীমণ্ডলী আমরা পুষি না। যদি তদন্ত করা যায়, তবে সমগ্র বিষয়টি চমকপ্রদ তথ্য উদ্ঘাটিত করবে।

যথেষ্ট সম্প্রসারণ লাভের শর্তে ভারতীয়করণ একচেটিয়ার কব্জা আরও জোরদার করে তুলবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বাড়িয়ে দেবে। ভি এস টি ৮৮৮০০ লক্ষ থেকে ২০৬২০০ লক্ষ, অর্থাৎ ২৫০% সম্প্রসারণ লাভের জন্য বৈদেশিক শেয়ার ভারতীয় জনসাধারণের কাছে বিক্রী করে নয়, বরঞ্চ ৬৭% থেকে ৪৯% কিংবা তারও কম অর্থাৎ ১৮%-এর মত অতিরিক্ত ইকুইটি ইস্যু করে যদি বিদেশী শেয়ার মালিকানা হ্রাস করার প্রস্তাব দেয়, তবে দেশীয় সিগারেট শিল্পে তার অর্থ উপলব্ধি করা যে কারুর পক্ষে সহজ। সবটাই হচ্ছে বাজারের সামঞ্জস্যহীন বৃহত্তর লাভের উদ্দেশ্যে ভারতীয় শেয়ারমালিকানার নামমাত্র বৃদ্ধি কার্যকর করার খেলা। আই টি সি যেসব বিষয়ের উপর রহস্যের সৃষ্টি করেছে এখন আমি সেগুলো একটি-একটি করে ব্যাখ্যা করবো।

রহস্য-বনাম-ঘটনা

৩১শে আগস্ট, ১৯৭০ তারিখে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ হাকসার ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং গোল্ডেন টোব্যাকো'র বিরুদ্ধে একটি সুশৃংখল আক্রমণ চালিয়েছেন। কুৎসা রটনার অভিযানে তিনি যেসব প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলো সম্পর্কে আমি নীচে সত্য বিবরণ জানাচ্ছি।

ক ১। আই সি এম এ—দি সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের আছে ১০টি সদস্য, পক্ষান্তরে নবগঠিত ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হচ্ছে ছয়টি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্থার সব কয়টি। এই সংস্থাগুলোর নাম:

(১) ক্রাউন টোব্যাকো কোং,
(২) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ,
(৩) দি হায়দরাবাদ ডেকান সিগারেট ফ্যাক্টরি,
(৪) মাস্টার্স টোব্যাকো কোং (ইণ্ডিয়া),
(৫) এস জি আগরওয়াল,
(৬) ইউনিভার্সাল টোব্যাকো কোং।
অন্যান্যরাও পরে যোগ দিতে পারে।

২। আই সি এম এ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কারণ উৎপাদনের ২০%'এর প্রতিভূ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটির কণ্ঠ কোন সময়ই শোনা যায়নি। • ক্ষমতাশালী বৈদেশিক একচেটিয়া এবং সি এম এ সহ শিল্পের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার সর্বব্যাপক প্রভাবের বিরুদ্ধে এই সংগঠনের বলার কিছু নেই। সি এম এ'তে আবার ভোটের অধিকারের মধ্যে কোন সমতা নেই।

আই সি এম এ গঠনের ফলে তার সদস্যরা ইতোমধ্যেই সুফল পেয়েছে। গত মাসে সি এম এ'এর সভায় বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রতিনিধিরা বেশ ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করলেন, "ভারতীয় ক্ষেত্রকে উৎসাহদানে কোথায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি এবং আমাদের কি করতে হবে?"

মেশিনারি, কারিগরী কলাকৌশল সরবরাহ করে, সুযোগ-সুবিধা বিক্রী করে ও বিপণন করে, অর্থের যোগান দিয়ে ভারতীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকদের সাহায্য করার লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মিঃ হাকসার তাঁর ভাষণে বলেছেন, একটি কোম্পানি, যে নাকি খুঁড়িয়ে চলছিলো তাকে সাহায্যের অসম্ভব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফলে পরিস্থিতির চাপে সর্বাধিক সুবিধা লাভের আশায়, দীর্ঘকাল যারা সাহায্য করে এসেছে কোম্পানিটি তাদের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। আমি আশা করি, আই সি এম এ বা সি এম এ'র অন্যান্য সদস্যও বৈদেশিক একচেটিয়ার কাছ থেকে নিকট ভবিষ্যতে অনুরূপ সুবিধা আদায় করবে।

খ ১। জি টি সি-এর বিরুদ্ধে আই টি সি-এর কুৎসা

আই টি সি যাকে 'কুৎসার অভিযান' বলে আখ্যাত করেছেন তা দেশীয় সিগারেট শিল্পের দুর্দশা সম্পর্কে যে পূর্ণ বিবরণ আমি জনসাধারণ ও সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করেছি তাছাড়া আর কিছু নয়। শোষণই যাদের কাছে জীবনধারা হয়ে উঠেছে, তারা স্বভাবতঃই এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। আমি এখানে বলতে চাই যে, অতীতের মত এখনও আমি আপনাদের কাছে এবং জনসাধারণের কাছে শুধুমাত্র প্রকৃত ঘটনাই উপস্থাপিত করছি। আমি এগুলো এখনও বলছি এবং সব সময়ই বলবো।

২। আমাদের কাছে এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকদের পক্ষ থেকে আমরা যেসব সরল বাস্তব বিষয় উত্থাপন করেছি, তা আমাদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু আক্রমণ চালাতে আই টি সি'এর চেয়ারম্যানকে প্ররোচিত করলো। আমরা যা বিবৃত করেছি, তা যদি কুৎসা রচনা হয়, তবে তাঁর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত করবার মত ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। বহু ব্যাপারে তিনি গোল্ডেন টোব্যাকোর এবং তার ভাবমূর্তির যে ক্ষতি করেছেন তার জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।

৩। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং—তার কাজকর্ম

বিক্রয় ও উৎপাদন ব্যাপারে আমাদের সাফল্য সম্পর্কে তিনি যে সব ঘটনা ও অঙ্ক উপস্থাপিত করেছেন তার জন্য আমরা বস্তুতই কৃতার্থ। একথা খুবই সত্য যে, অতি সাধারণভাবে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম; সমগ্র বিশ্বে ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রের বহু ওজনদার সংস্থাই এইভাবে শুরু করেছিল।

গোল্ডেন টোব্যাকো যে অগ্রগতি লাভ করেছে, পরিষ্কার ভাষায় তা খুবই প্রশংসার্হ। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে আজও ক্রমসম্প্রসারণশীল সিগারেট বাজারে গোল্ডেন টোব্যাকোর মাত্র ১৪% অংশ রয়েছে। আই টি সি'এর পরিসংখ্যানে ১৯৪৮-৭০ সালের মধ্যে জি টি সি'এর বিক্রয়/মুনাফা ১১৫০০% বেড়েছে বলে যে 'দেখানো হয়েছে তা যেন কতকটা সেই কাহিনী—নাতির ওজন ৭ পাঃ থেকে ১৪০ পাঃ অর্থাৎ ২০০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিজের ওজন কমে গেছে বলে ঠাকুরদা'র আক্ষেপ।

পানামার বিজ্ঞাপনের সংগে আপনারা পরিচিত। এই সিগারেট এখন দেশের সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এটি হলো এই শ্রেণীর সবচেয়ে বেশী বিক্রীত ব্র্যাণ্ড। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারেন। বৈদেশিক একচেটিয়ার প্ররোচনায় ব্যবসায়ী মহলের অনুসৃত অশোভন রীতিনীতি ও অসহযোগিতামূলক মনোভাব তাদের কাছেই অকল্পনীয় যারা বস্তুতপক্ষে দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়নি। গলা-টেপা প্রতিযোগিতাও সমান হৃদয়ভংগকারী, যেমন দেখা গিয়েছে পনামা সিগারেটের বিক্রী ছিনিয়ে নেবার জন্য বাজারে প্রবর্তিত বিভিন্ন সিরিজের ব্র্যাণ্ডের—যথা আমেরিকান ক্লাব, অতিরিক্ত ফিল্টার আকর্ষণযুক্ত সিমলা, অতিরিক্ত লম্বা প্লাজা কিংস, লেক্স, উডবাইন, ২০টির প্যাকেটে বার্কলে, ক্যাপস্টান ম্যাগনাম, ফিল্টারসহ উইলস ব্রিস্টল ইত্যাদি—মারফত।

উপর্যুপরি উল্লেখিত ইস্যুকৃত মূলধন, রিজার্ভ ও অন্যান্য অঙ্কের বড় বড় হিসাব সম্পর্কে আমি কেবল এই কথাই বলতে চাই যে, গোল্ডেন টোব্যাকো উচ্চ হারে লাভাংশ ঘোষণা করে তাদের মুনাফা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়নি। যে লাভাংশ ঘোষণা করা হয়েছে তা ৩০%'এর কম এবং

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

৭০% নেওয়া হয়েছে রিজার্ভে। তার সংগে তুলনীয়, বৈদেশিক এক-চেটীয়া লাভাংশ ঘোষণা করে মুনাফার ৭৫% ছাড়িয়ে দিয়েছে, এবং গত বছর পর্যন্ত লাভাংশের ৯৩% চিরদিনের মত দেশ থেকে চলে গেছে। তারা যদি আমাদের মত অল্প পরিমাণ লাভাংশ ঘোষণার নীতি অনুসরণ করতো তবে আরও ভাল কাজকর্ম তারা করতে পারতো এবং বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বর্তমানের এক-তৃতীয়াংশ হতো।

ঠিক একইরকমভাবে, আমি অবাক হয়ে গেছি যে, সম্পত্তি এবং বৈদেশিক একচেটিয়ার সংগে প্রতিযোগিতার বাধা সত্ত্বেও জি টি সি'এর মুনাফা-যোগ্যতা আই টি সি অপেক্ষা বেশী। এটি কিভাবে ঘটলো আপনাদের তা অনুধাবনের জন্য আমি সেসব বিষয় আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। এর কারণ কি মোটমাট অধিক হারে ব্যয়, না এমন কোন চোরাগলি রয়েছে যার ভিতর দিয়ে অর্থ অদৃশ্য হয়ে যায়? এই টাকা কি এখনও আমাদের দেশে রয়েছে, না চিরদিনের মত দেশ থেকে চলে গেছে? এ কখনই হতে পারে না যে, বৈদেশিক একচেটিয়া অল্প লাভে সন্তুষ্ট হবে, কিংবা ক্রেতাকে তার অর্থের অধিকতর মূল্য দেবে। ভারতীয় কোম্পানিই একচেটিয়ার মুখে পড়ে অসুবিধা ভোগ করছে, তার আংশিক কারণ একচেটিয়া তার আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ব্র্যাণ্ডের জন্য — যেসব ব্র্যাণ্ড ভারতীয় সিগারেটের সংগে প্রতিযোগিতায় সরাসরি বাজারে ছাড়া হয়েছে — যে প্রিমিয়াম দাবি করতে পারে তা।

৪। গোল্ডেন টোব্যাকোর সমৃদ্ধি

আই টি সি যে আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন তা বেশ উত্তম।

১৯৫৫-৫৬ সালের ৫ লক্ষ টাকা মূলধন এবং পরবর্তীকালে এর বৃদ্ধি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আগেই বলা হয়েছে এর কারণ আমাদের মুনাফা রেখে দেওয়া ছিটিয়ে দেওয়া নয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের বদলে গোল্ডেন টোব্যাকো যে বছর স্থাপিত হয়েছে, যখন তার মূলধন ছিলো বিয়োগচিহ্নযুক্ত ৫০০০ টাকা—এও আবার ধার-করা মূলধন, সেই বছরকে যদি মিঃ হাকসার সূচক বছর হিসাবে ধরতেন তা হলে সাফল্যের শতকরা হার কিভাবে বার করা যেতো—এ যে অনন্তকে স্পর্শ করতো!

আমি জানতে চাই, আই টি সি বা তার জনক কোম্পানি বি এ টি প্রথম যখন ভারতে এলো তখন মূলতঃ কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তারা নিয়ে এসেছিলো, কত হাজার গুণ তারা ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে তার চিত্রই বা কি।

৫। আই টি সি সত্ত্বেও জি টি সি-র সমৃদ্ধি

গোল্ডেন টোব্যাকোর অগ্রগতি থেকে আই টি সি যে সিদ্ধান্ত টেনেছে তা হচ্ছে, দেশীয় প্রস্তুতকারকদের অগ্রগতি বৈদেশিক একচেটিয়া দ্বারা কোনভাবেই বিঘ্নিত বা ব্যাহত হচ্ছে না। আমি বলতে চাই যে, একচেটিয়া সত্ত্বেও জি টি সি-এর অগ্রগতি হয়েছে। এই ব্যাপারে অনেক কিছুই ঘটেছে। ক্রেতারা বিবেচনার মধ্যে আনালেন বিক্রেয় সামগ্রীর কোয়ালিটি ও মূল্য এং ব্যবসায়ীরাও একচেটিয়ার জবরদস্তিমূলক পদ্ধতি ও এক-চেটিয়া যে সামান্য কমিশন দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করতো তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসাবে জি টি সি-কে সমর্থন করতে লাগলেন।

৬। সিগারেট শিল্পে গোল্ডেন টোব্যাকোর ভূমিকা

গোল্ডেন টোব্যাকো সবসময়ই দেশীয় ক্ষেত্রের স্বার্থ তুলে ধরেছে, ফলে বৈদেশিক একচেটিয়ার সৃষ্টি হয়েছে মর্মবেদনা ও অসন্তোষ।

আপনাদের একটি উদাহরণ দিচ্ছি—জি টি সি কর্তৃক ১৯৬০ সালে প্রকাশিত ডায়েরির প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠায় দেশীয় সিগারেট শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ২০০টি ফ্যাক্টরি বন্ধ ইত্যাদির কথা বিবৃত হয়েছে। আই টি সি-এর কাছে এটি হলো চক্ষুশূল। মিঃ হাকসারের পূর্বসূরীরা এই ধরনের কাজে বিরত থাকবার জন্য বহুবার আমাদের বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্রেই তার প্রমাণ পাবেন।

(ক) ইয়ট্ ক্লাব ও রয়াল ইয়ট্ নামে ব্রাউন সিগারেট প্রস্তুতে রত দুটি ক্ষুদ্র প্রস্তুতকারকের সংগে গোল্ডেন টোব্যাকোর প্রতিযোগিতার উল্লেখ একটি সেরা সাজানো গল্প। স্বয়ং আই টি সি যে গোল্ডেন টোব্যাকোর তাজ ছাপ এবং অন্য দুটি ক্ষুদ্র কোম্পানির ইয়ট ক্লাব ও রয়াল ইয়ট বিলুপ্ত করে দেবার উদ্দেশ্যে ব্রাউন কাগজে ও একই দামের নেতা ও যমরাজ প্রভৃতি ব্র্যাণ্ড যে বাজারে ছেড়েছে তার কথা কিন্তু মিঃ হাকসার স্মরণে রাখবার প্রয়োজন মনে করেননি। এও বেশ কৌতুককর যে তাজ ছাপ প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে এবং মিঃ হাকসার এখন যে মর্যাদা তাকে দিচ্ছেন সে মর্যাদা কিন্তু সে কখনও পায়নি।

একথা জেনে আপনারা সুখী হবেন যে, কয়েক বছর আগে আমরা সাদা কাগজে তাজ ছাপ প্রবর্তিত করি এবং সেই সময় থেকেই আমাদের ব্রাউন তাজ ছাপ'এর বিক্রী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়, কিন্তু এর সুবিধা লাভ করে অন্যান্য সাদা কাগজের ব্র্যাণ্ড—দুটি ক্ষুদ্র প্রস্তুতকারক সে সুবিধা পায়নি, তারা এখনও ব্রাউন-কাগজের ব্র্যাণ্ড বিক্রী করছে।

(খ) একথা ঠিক যে, গোল্ডেন টোব্যাকো কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নয়, কিন্তু তাই বলে গোল্ডেন টোব্যাকোর সম্পদের ভাগীদার যে ভারতীয় জনসাধারণ নয় তা মোটেই সত্য নয়। গোল্ডেন টোব্যাকো ঘনিষ্ঠদের মধ্যে মালিকানাযুক্ত কোম্পানি হিসাবে সব চাইতে বেশী হারে আয়কর দেয়। আমাদের শেয়ার মূলধনের প্রায় ১৭% রয়েছে একটি পাবলিক চ্যারি-টেবল ট্রাস্টের হাতে এর জন্য কোন অর্থ তাকে বিনিয়োগ করতে হয়নি—এই ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে জনহিতের উদ্দেশ্যে। এর সংগে তুলনা করুন আই টি সি'এর শেয়ারের জন্য ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারকে শেয়ারের লিখিত মূল্য ছাড়াও ৩০% প্রিমিয়াম দিতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও মোট মূলধনের ২৫%'এর মত শেয়ার ভারতীয়দের হাতে আছে এবং আই টি সি'এর বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই।

(গ) গোল্ডেন টোব্যাকো তামাকের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে: তামাক উৎপাদনকারী এলাকার জন-সাধারণই সে কথা বলবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশের ফলে তারা উপকৃতই হয়েছে, এতদিন তা ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেণ্ট কোং'এর পূর্ণ প্রভুত্বাধীন ছিল — এই কোম্পানিটি আবার আই টি সি'এর সহযোগী এবং উভয়ের একই মূল বি এ টি।

কাজেই এখন চাষীরা একচেটিয়ার চাইতে বেশী দাম, অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও অধিকতর ভাল ব্যবহার পাচ্ছে — এসব তারা আগে পেতো না।

(ঘ) ভারতীয় সিগারেটের রপ্তানি উন্নয়নের প্রশ্নে গোল্ডেন টোব্যাকো তাদের ব্র্যাণ্ডগুলো রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আফগানিস্তান, গাজা, কঙ্গো, ইন্দোচীন, কোরিয়া, ইউ এস এ প্রভৃতির মত পৃথিবীর কয়েকটি দেশে ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করে এ ব্যাপারে অগ্রদূত হতে পেরেছে বলে ন্যায়সংগতভাবেই গর্ব অনুভব করে।

চেকোস্লোভাকিয়ার সংগে প্রায় তিন বৎসরকাল আমরা ভাল ব্যবসা করেছিলাম। কিন্তু বৈদেশিক একচেটিয়া আমাদের উৎখাত করার জন্য যখন দামের লড়াই শুরু করলো তখন আমরা আমাদের দাম কমিয়ে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতিসাধন অপেক্ষা ব্যবসারটি আমাদের হাত থেকে চলে যেতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করি।

তামাক রপ্তানির ক্ষেত্রেও গোল্ডেন টোব্যাকো প্রথম দুটি চীনা ও রুশ প্রতিনিধি দলের মনে এই বিশ্বাস স্থাপনের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে যে, ভারতীয় তামাক বেশ ভাল এবং তাঁদের দেশে সিগারেট প্রস্তুতের জন্য এই তামাক ব্যবহার করা চলবে। এই দুটি দেশ আগে

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

কখনও ভারতীয় তামাক ব্যবহার করেনি। কিন্তু এতে এই দেশগুলিতে অত্যন্ত অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক একচেটিয়া এবং তার আন্তর্জাতিক যোগসূত্রগুলি থেকে তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও আমরা যুক্তরাজ্য, ইউরোপের দেশগুলি ও জাপানে বছরের পর বছর আমাদের তামাক রপ্তানি বাড়াইয়া চলিয়াছি।

(ঙ) আমরা সবসময়ই বিশ্বাস করি যে, ভারত সরকার আমদানী প্রতিকল্পের নীতি সার্থকভাবে সূচিত ও প্রয়োগ করেছেন। এই নীতি এখনও অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু মিঃ হাকসারের ভাষণ পাঠ করলে দেখা যায়, সিগারেট শিল্পের উন্নতির জন্য আই টি সি যেন বহুলাংশে দায়ী। বাস্তবে ঘটনা হচ্ছে, গ্যারান্টি ও উচ্চ মূল্য দিয়ে, আমদানী প্রতিকল্পের বিকাশের নিজ নিজ সহযোগীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আই টি সি কেবল নিজের জন্য ও তার সহযোগীদের জন্য এই শিল্পের ওপর শীর্ষস্থ একচেটিয়ার কব্জাই সৃষ্টি করেছে। বিশদ তদন্তে এটি সপ্রমাণিত হবে।

এই ধরনের আমদানী প্রতিকল্প আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য আমরা সময় সময় সরকারের ওপর দোষারোপ করে থাকি। কারণ, এর ফলে আমাদের এমন সব মেশিনারি ও যন্ত্রাংশ নিতে বাধ্য হই, গুণের দিক দিয়ে যেগুলো নীচু মানের অথচ দাম বেশী। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃত অপরাধী হচ্ছে আই টি সি।

(চ) সিগারেট শিল্পের জন্য দেশীয় মেশিনারির উন্নয়ন বৈদেশিক একচেটিয়া ও তার আন্তর্জাতিক সংযোগ ও সহযোগিদের কর্তৃক একান্তভাবে একচেটিয়া কব্জার ভিতর এসে ফেলেছে। এই ক্ষেত্রে গোল্ডেন টোব্যাকো কোন উন্নতি সাধন করে নি বলে এখন দোষ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এটা কি গোল্ডেনের দোষ, না একচেটিয়ার দোষ, যারা সিগারেট শিল্পের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব বাড়াবার জন্য তাদের সহযোগীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর সঙ্গে এই শীর্ষস্থ একচেটিয়া সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত।

(ছ) মিঃ হাকসারের বক্তৃতা এই বলেই মনে হয় যে, পরিচালক-মণ্ডলীর এবং পেশাদারী ম্যানেজারদের ট্রেনিং ও [illegible] কেবল এই উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে স্থাপিত শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। প্রজেক্ট ভিতর এবং কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ট্রেনিং-এর মাধ্যমে ম্যানেজেরিয়াল ক্যাডারদের উন্নয়ন সমানভাবে সম্ভব। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের [illegible] বহন করতে পারে না, কারণ এগুলো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কেবলমাত্র বড় বড় কোম্পানীই এগুলোর ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম।

যাই হোক, স্বয়ং মিঃ হাকসারের উল্লেখিত মতে গোল্ডেন টোব্যাকোর অগ্রগতিতে এই যুক্তিই মেনে নিতে হয় যে, এই কোম্পানির পরিচালনা মোটেই খারাপ নয়। পেশাদারী ম্যানেজার বা শুধু ম্যানেজারই বলুন, অথবা অন্য যে-কোন আখ্যাই দিন না কেন, যে পর্যন্ত তারা তাঁদের কাজের প্রতি সমর্পিত মন থাকবেন ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সক্ষম হবেন সে পর্যন্ত নামের জন্য কিছু যায়-আসে না।

(জ) এই শিল্পে গবেষণা সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমরা জানতে চাই আই টি সি কর্তৃক ভারতে কোন গবেষণার কাজ করা হয়েছে। আমাদের ধারণা যে, আসল গবেষণা হয় লণ্ডনে এবং এখানে তাঁদের যে লেবরেটরি আছে তার উদ্দেশ্য শুধু কাঁচা মালের সরবরাহ বাড়াই করা।

বৈদেশিক কলাকৌশলের কোন সুবিধা আমাদের নেই। বস্তুতঃ এটি আমাদের দিতে অস্বীকার করা হয়েছে এবং সব সময় আমাদের নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি নিয়েই কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু যে গবেষণাই আমরা করে থাকি না কেন তা আমাদের নিজস্ব এবং আমাদের উৎপন্ন মালই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জনসাধারণই বিচার করবেন, সংকোচিত এই ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি কিনা।

(ঝ) তামাক-চাষীদের সাহায্যদানের ব্যাপারে গোল্ডেন টোব্যাকোর অংশের কথা হয়তো আই টি সি-এর চেয়ারম্যানের জানা নেই। এ ব্যাপারটি চাষীদের কাছ থেকেই জানা যাবে এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তারা সবসময়ই একথা বলবে যে, সাধারণতঃ এক্ষেত্রে গোল্ডেন টোব্যাকোর আসার আগে পর্যন্ত তারা নির্দয়ভাবে শোষিত হতো। গোল্ডেন টোব্যাকোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অংশগ্রহণ সত্ত্বেও এখনও তারা শোষিত হচ্ছে। তামাক চাষীরা এবং রপ্তানিকারকেরা এখনও আই টি সি এর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান আই এল টি ডি এর প্রভুত্বাধীন এবং তাদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। আরও অধিক সংখ্যায় ভারতীয় সিগারেট প্রস্তুতকারী যখন উদ্ভূত হবে তখনই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। যখন [illegible] প্রতিযোগী [illegible] আরও আগ্রহী ক্রেতা দেখা দেবে, তখনই ভারতীয় চাষীরা ও তামাক-ব্যবসায়ীদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবসার সম্ভাবনা সৃষ্ট হবে।

(ঞ) মনে হচ্ছে, গোল্ডেন টোব্যাকোতে শ্রমিক ইউনিয়ন না থাকাটা আই টি সি এর পক্ষে সন্তোষজনক হয়ে উঠেছে। কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন না থাকার অর্থ এই নয় যে, গোল্ডেন টোব্যাকোতে সমষ্টিগত দরকষাকষি নেই। আপনারা জেনে সুখী হবেন যে, জি টি সি এর শ্রমিকদের ওয়ার্কস কমিটির বৈঠক বেশ নিয়মিতভাবে বসে এবং তাতে সমষ্টিগত দর-কষাকষির মনোভাব নিয়ে সমস্যাবলীর সমাধান বের করা হয়।

কোন স্বাভাবিক মানুষই এমন কথা কি চিন্তা করতে পারে যে, আজকের দিনে যে কোন জায়গার কোন শিল্প-শ্রমিক মিঃ হাকসারের বর্ণিত [illegible] বোকা হয়ে আছে?

আগেই বলা হয়েছে গোল্ডেন টোব্যাকো যা চায় তা হচ্ছে, বৈদেশিক একচেটিয়াদের কার্যকলাপ না করে [illegible] বিদেশী অধিকৃত ৮০% অংশ ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে হাতে কমে আসে। তার জন্য আরও আরও ভারতীয় সিগারেট কোম্পানির সৃষ্টি হোক। অবশ্য তারা যদি দেশের আইনের বিরোধী কোন কাজ করে বা করে থাকে তার জন্য অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। আর তা না হলে এটাই আমরা আশা করবো ও কামনা করবো যে, তারা তাদের দীর্ঘ শ্রমের ফল ভোগ করুক। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, অবাধে তাদের বেড়ে উঠতে দেওয়া হবে, এতে দেশীয় কোম্পানিগুলোর বিকাশই ব্যাহত হবে।

৭। ইতঃপূর্বেই একচেটিয়া আই টি সি ভয় করছে জি টি সি-এর ভবিষ্যৎ বৃদ্ধিকে

মনে হবে যেন বৈদেশিক একচেটিয়া ভয় করছে যে, বাজারের মাত্র ১৪% অংশ নিয়ে একটি ভারতীয় কোম্পানি একচেটিয়া হয়ে উঠবে। স্বভাবতঃই নিজেদের একচেটিয়া যাতে চলতে না হয় [illegible] নিশ্চিত জন্য তারা যেরকম কল্পনা করতে পারে, সেরকম যুক্তি উত্থাপন করছে। গোল্ডেন টোব্যাকোর একচেটিয়া হয়ে ওঠার প্রশ্নটি মনোপলিজ আক্ট এবং সরকারী নীতি সাপেক্ষ। গোল্ডেন টোব্যাকো যদি কোন সময় একচেটিয়া হয়ে ওঠে তবে তার কাজকর্ম নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রিত করা হবে। কিন্তু সেরকম দিন যদি কখনও আসে তবে তা আসবে বর্তমান বৈদেশিক একচেটিয়া নিয়ন্ত্রিত করার দীর্ঘকাল পরে।

৮। আই সি এম এ-র প্রস্তাবিত প্রতিষেধ

(ক) বহু শিফটের কাজ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে বলে আমরা যে যুক্তি দিয়েছি তা পড়তে হবে একচেটিয়া গোষ্ঠীর অননুমোদিত বাড়তি উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে; এ বিষয়ে সরকারই বিচার-বিবেচনা করবেন।

(খ) বৈদেশিক মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিটের উৎপাদন ঠেকাবার যে যুক্তি রেজিস্টার্ড ক্যাপাসিটি সম্পর্কে তার কোন

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্য নেই। উৎপাদন ঠেকাতে হবে, যেমন করা হয়েছিল জাতীয় স্বার্থে সরকার যে পর্যায়েই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন সেই পর্যায়েই দেশলাই শিল্প, সাবান শিল্প ও তৈল শিল্পে।

বৈদেশিক একচেটিয়া ও পারস্পরিক সংযুক্ত সংস্থাগুলোকে আর সম্প্রসারণ করতে দেওয়া হবে না বলে আমি যে অভিমত জানিয়েছিলাম তা জানিয়েছিলাম জাতীয় স্বার্থেই। বৈদেশিক একচেটিয়াকে যদি সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তা শেষ পর্যন্ত একচেটিয়ার কবজা বাড়িয়ে দেবে এবং বর্ধিত মুনাফা হেতু বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ডেকে আনবে। একচেটিয়া সৃষ্টিকে জাতীয় বিকাশ বলে মুখোশ পরালে পার পাওয়া যাবে না।

(ঘ) কয়েকটি প্রস্তুতকারকের উৎপাদন হ্রাসের প্রস্তাব বস্তুতঃপক্ষে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটির বাইরে বাড়তি উৎপাদন না করতে তাদের বলা, কারণ তারা একাজ করে যাচ্ছে অন্যান্য এমন বহু প্রস্তুতকারকের ক্ষতি করে যারা তাদের মাত্র ৩০% ক্যাপাসিটির কাজ করছে, ৭০% পড়ে আছে অলস হয়ে।

এখানে আমি কলকাতার ন্যাশনাল টোব্যাকোর জ্বলন্ত উদাহরণ দিচ্ছি। শ্রমিক বিশৃংখলার জন্য ১৯৬৭ সালে এই কোম্পানিটির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়; ৪½ মাস পর আবার যখন তারা ব্যবসা শুরু করলো, তখন তারা দেখতে পেলো যে, চাহিদা অন্যান্য কোম্পানিতে ছড়িয়ে গেছে এবং তারা তাদের আগেকার উৎপাদনের এমনকি এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বিক্রী করা কষ্টকর বলে দেখতে পেলো। ৩/৪ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর এখনও তারা তাদের আগেকার বাজারের এক-তৃতীয়াংশের বেশী লাভ করতে পারলো না, অথচ দুই-তৃতীয়াংশ অলস পড়ে রইলো। শ্রমিক, পরিচালনা ও অন্যান্য খাতে ব্যয় হ্রাস করা যায় নি এবং এই বিশৃংখলার জন্য কোম্পানিটির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। এই কোম্পানিটি তাদের যা ছিল ও যা হারিয়েছিল তা যদি আবার ফিরে পায় তা কি যুক্তিযুক্ত ও শোভন হবে না।

শুধু তাই নয়, যে বাংলা ক্রমবর্ধমান বিশৃংখলার সম্মুখীন সেও বেশ ভালভাবেই উপকৃত হবে, কারণ ন্যাশনাল টোব্যাকো বাজারে তার মূল অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বাংলায় সিগারেটের উৎপাদন ৫০% কমে গেছে—ন্যাশনাল টোব্যাকোই বাংলায় সিগারেট প্রস্তুতকারী একমাত্র বৃহৎ কোম্পানি। আরও এমন অনেক প্রস্তুতকারক আছে যাদের ক্যাপাসিটি অলস পড়ে রয়েছে এবং বৈদেশিক একচেটিয়ার যে মোটামুটি ৪০০০০/১০০০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন তা যদি ছেঁটে দেওয়া হয় তা হলে তারাও উপকৃত হবে। বিদেশী বৃহৎ ফার্ম কর্তৃক ২৫% বাড়তি উৎপাদনের শিথিলতা ১৮ই জুলাই তারিখে প্রত্যাহৃত হয়েছে বলে এই সিদ্ধান্ত যে কার্যকর করা হবে, তা তো স্বাভাবিক।

১। এইসব প্রতিবেধের ফলশ্রুতি

(১) বৈদেশিক কোম্পানিগুলোকে সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর ভারতীয়করণের ফলে একচেটিয়ারও হ্রাস হবে না, বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়ও বন্ধ হবে না। ভারতীয়করণের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধির সবটাই ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের হাতে যেতে দেওয়া। চাহিদার বার্ষিক প্রত্যাশিত ৬% বৃদ্ধি যদি বৈদেশিক একচেটিয়া ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানির হাতে যায়, তা হলে দেশীয় ক্ষেত্রের অংশ ১০ বছরে ৫০% এবং ২০ বছরে ৭৫% বেড়ে যাবে। এটাই কি সিগারেট শিল্পকে ভারতীয়করণের শ্রেষ্ঠ পথ নয়? কারণ এতে শুধু ভারতীয়করণই হবে না, সকলের কল্যাণে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা এনে দেবে।

(২) উৎপাদনযোগ্যতা হারানোর কোন প্রশ্ন নেই। যদি কিছু হবই তা হবে, উৎপাদনযোগ্যতা বৈদেশিক একচেটিয়ার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে এমন অন্যান্য ফ্যাক্টরিতে ছড়িয়ে পড়বে যেগুলোতে লোক, যন্ত্রপাতি ও মেশিনারি ওপরে উল্লেখিত মত অলস পড়ে আছে।

(৩) সিগারেট শিল্পে দুষ্প্রাপ্য মূলধনী সম্পদের ভীতি একচেটিয়ার মূলধন বিনিয়োগ ও তার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অনবরত অপচয়ের কথা বিবেচনায় নিতান্তই স্বল্পমেয়াদী ও নগণ্য ধরনের।

(৪) মোলিনস্ ইণ্ডিয়া এখন যে প্ল্যাণ্ট ও মেশিনারি উৎপাদন করছে তা ভারতীয় ইউনিটগুলো সস্তা দরে পেতে পারে। আনুষঙ্গিক মেশিনারি সম্পর্কে বক্তব্য, আমরা আশা করি এগুলো যাতে পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, যুক্তিসঙ্গত দামে যাতে এগুলো পাওয়া যায় তার জন্য বৈদেশিক একচেটিয়া তাঁদের প্রভাব খাটাবেন।

(৫) বৈদেশিক একচেটিয়া ঠেকালে জনসাধারণেরই কল্যাণ হবে, কারণ এতে ক্রেতা-স্বার্থে বৃহত্তর স্বার্থেরই সৃষ্টি হবে।

(৬) বর্তমান শ্রম আইনে শ্রমিক ছাটাই বা লে-অফের প্রশ্ন ওঠে না; অন্যান্য ফ্যাক্টরির যদি জন্ম হয় তবে এইসব ফ্যাক্টরি চালাবার জন্য শ্রমিক ও পরিচালনা বিভাগের কর্মীদের চাকরি হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত বৈদেশিক একচেটিয়া তাদের চাকরিতে রেখে দিতে পারেন। এতে তাঁদের বড় জোর মুনাফা কমে যাবে, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে সেই পরিমাণ।

(৭) পাতা তামাকের উন্নয়নের ওপর এর প্রতিক্রিয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সিগারেট যদি দেশে প্রস্তুত হয় এবং তামাক যদি ব্যবহৃত হয়, তবে সিগারেট কে তৈরী করলো, ক, খ না গ, সে প্রশ্ন অবান্তর।

(৮) রপ্তানির ভীতি যে কমে যাচ্ছে তা কিন্তু উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কষ্টকর। তামাকের বিদেশী ক্রেতারা তাদের দৃষ্টি অন্যান্য দেশের দিকে কেন যে ফেরাবে তার কোন যুক্তি নেই। তামাক নিয়ে নাড়াচাড়া করে এমন একটি পৃথক কোম্পানি যার সহযোগীরা ও তার প্রধান কার্যালয় রয়েছে বহির্ভারতস্থ একটি দেশে।

(৯) তামাক চাষের ওপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না। বস্তুত চাষীরা একচেটিয়ার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার সুফল লাভ করতে পারবে।

(১০) সিগারেট ও তামাক শিল্পে উন্নয়ন ও গবেষণা ব্যাহত হওয়ার প্রশ্ন বৈদেশিক একচেটিয়া ঠেকানোর মূল প্রশ্নে অপ্রাসঙ্গিক। অন্যকে এই ক্ষেত্রে আসতে দেবার জন্য একচেটিয়ার কেবলমাত্র ভূমিকাই নির্দিষ্ট করা হচ্ছে।

(১১) আনুষঙ্গিক শিল্প সম্পর্কে আমার মনে হয়, একচেটিয়ার প্রভাব যদি হ্রাস করা যায় তবে তাদের অবস্থা ভালো হয়ে উঠবে।

(১২) নিজেদের প্রিয় ব্র্যাণ্ডের প্রতি ক্রেতাদের আনুগত্য হেতু সরকারী অর্থভাণ্ডারে রাজস্বের হানি চিন্তা করার মত বিষয়, কিন্তু ন্যাশনাল টোব্যাকোর অভিজ্ঞতা ও বাজারে তার অংশ সরে যাওয়ার প্রশ্নটি মনে রাখলে এটি অসম্ভব বলেই মনে হয়।

(১৩) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বিকাশের নিয়ন্ত্রণ যাদের একচেটিয়া রয়েছে তাদের মনঃপূত হবে না। কিন্তু তা যদি করা না হয় তবে দেশীয় ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটবে না এবং গত ২২ বছরের মতই তা ২০% মানেই স্থাণু হয়ে থাকবে এবং বর্ধিত চাহিদা—বর্তমানের মত এর অন্ততঃ ৮০%—বৈদেশিক ক্ষেত্রেই চলে যেতে থাকবে। বস্তুতঃ বৈদেশিক ক্ষেত্রের অংশ পার্লামেণ্টে প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের ৬৮% থেকে বেড়ে ১৯৬৯ সালের ৮০% হয়ে গেছে

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

(১৪) দেশের স্বার্থের প্রতি সচেতন থেকে সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগের ওপর নজর রাখছেন এবং উন্নয়ন যখন অন্যভাবে সম্ভব হবে না কেবল তখনই তাদের সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হবে।

(১৫) ক্রেতারা যা চান না তা-ই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন, এ বক্তব্য ঠিক নয়। বহু গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে সরকারী একচেটিয়া সিগারেট নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, যেমন জাপান, তাইল্যাণ্ড, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, বুলগেরিয়া, ইতালি, চেকোশ্লো-ভাকিয়া, ফ্রান্স ও অন্যান্য বহু দেশে বাছাই করার ব্যাপক সুযোগ ক্রেতাদের রয়েছে।

আজকের দিনেও ভারতের ক্রেতারা প্রাপ্তব্য ব্র্যাণ্ডগুলোর বাইরের জিনিস চান এবং তার ফলেই বাজারে চোরাপথে আগত ব্র্যাণ্ড দেখা যায়।

গ। আই টি সি-এর বক্তব্যে আমাদের উত্তর

দফা নং ১ : আই টি সি বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করছে।

বিদেশী শেয়ারহোল্ডার আছে বলেই বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। আমরা, ভারতীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকরা, একথা বারবার বলে যাবোই।

এ বিবরটি বেশ কৌতুককর যে, গত ৩ বছরে গড়ে যে ১০ কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছে বলে আই টি সি বিজ্ঞাপন দিয়েছে তার মধ্যে তামাকও রয়েছে, এদিকে গত বছরে সিগারেট রপ্তানি হয়েছে মাত্র ২ লক্ষ টাকার। এর অর্থ, ৯৯৮ লক্ষ টাকার রপ্তানি হয়েছে তামাক। তা হলে, সিগারেট প্রস্তুতকারী হিসাবে আই টি সি তামাক রপ্তানি থেকে অর্থ অর্জনের কৃতিত্ব দাবি কি করে করতে পারে এবং ৭৬% বিদেশী শেয়ারমালিকানার জন্য লাভাংশ দিতে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অপচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়ের কিভাবে সামঞ্জস্য ঘটাতে পারবে? ব্যাপারটি হচ্ছে যেন এস টি সি বা এম এম টি সি'এর লৌহপিণ্ড রপ্তানির কৃতিত্ব হিন্দুস্তান স্টীলের কিংবা কোটি কোটি টাকার কাঁচা তুলো রপ্তানির কৃতিত্ব দাবি যেমন করতে পারে কোন টেক্সটাইল মিল!

লাভাংশ পাঠানো সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, গত ১১ বছরের মত যদি আই টি সি'কে অবাধে বেড়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে তবে এই লাভাংশ পাঠানো বৃদ্ধি পাবেই। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আই টি সি'এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও মুনাফা ৩০০% বেড়ে গেছে। আজ সিগারেট শিল্পের বৈদেশিক ক্ষেত্র ৪ কোটি টাকার লাভাংশ পাঠিয়ে দিচ্ছে। যদি তা অবাধে চালিয়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে লাভাংশ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় চক্রবৃদ্ধি হারে ১২/১৪% বেড়ে যাবেই।

আই টি সি সম্পর্কে আরও একটি মজার ঘটনা আছে। আই এল টি ডি হচ্ছে একটি ১০০% ব্রিটিশ কোম্পানি; ভারতে তার শাখা আছে। আই টি সি হচ্ছে একটি ভারতীয় কোম্পানি যার অধিকাংশ শেয়ারমালিকানা বিদেশীর। মজার ব্যাপার হলো, এই আই এল টি ডি'কে আই টি সি'এর 'ভ্রাতৃ-কোম্পানি' বলে আখ্যাত করা হয়েছে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, আই টি সি'এর পেশাধারী ম্যানেজাররা, যাঁরা লণ্ডনস্থ একটি বিদেশী যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তাঁরা, আই এল টি ডি'কেও পরিচালনা করেন। এইসব পেশাধারী ম্যানেজারের কয়েকজন এখন বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে উন্নীত করা হয়েছে: তাঁরা আবার আই এল টি ডি'এর স্থানীয় পরামর্শদাতা কমিটিতেও আছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য—ভি এস টি'এর সংগে পারস্পরিক সংযোগের কথা আই টি সি অস্বীকার করছে; বস্তুতঃ এই ভি এস টি হচ্ছে আই টি সি'এর ভ্রাতৃ-প্রতিষ্ঠান—মূলে উভয়ের এক।

আই এল টি ডি—তদন্তের একটি বিষয়

আই এল টি ডি'এর কাজকর্ম সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে আমি অক্ষম, কিংবা আমি বুঝতে অক্ষম কিভাবে এর ওপর কর ধার্য করা হয়। বিক্রয়ের হিসাব যা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম—এর কারণ হয়তো বৈদেশিক একচেটিয়াকে স্থানীয়-ভাবে যে সরবরাহ তারা দেয় তা এবং তামাকের রপ্তানি বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া—এই বিক্রয়ের হিসাব কিন্তু কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রারের অফিসে প্রাপ্তব্য হিসাবের সংগে মেলে না। ইচ্ছামূলক কোন কারচুপি আছে বলে যে আমি সন্দেহ করি, তা নয়। আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, যেভাবে এটি উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে আই এল টি ডি'এর পুরা কাজকর্ম প্রতিফলিত হয় না। আই এল টি ডি'এর কাজ-কর্ম বোঝার জন্য সরকার কর্তৃক আরও বিশদ তদন্তের প্রয়োজন।

সরকার যেখানে বিদেশী কোম্পানিগুলোকে ভারতীয়করণে এত আগ্রহী সেখানে, বৈদেশিক একচেটিয়াকে তামাক সরবরাহের এত বড় ব্যবসা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান আই এল টি ডি যে কোন ভাবেই হোক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি আশা করি, এ ব্যাপারে নজর দেওয়া হবে, তা হলেই দেশ শুধু আয়করের দিক দিয়েই নয়, অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক দিয়েও উপকৃত হবে: কারণ খরচ-খরচাদির সংগে মুনাফা যুক্ত হবে এবং উচ্চ হারে বিক্রয়মূল্য অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা আনবে।

গুডউইল ট্রেডমার্ক

একথা জানাতে পেরে আমি আনন্দিত যে, আই টি সি রয়ালটি কারিগরী কলাকৌশল বা সহযোগিতা ফী হিসাবে কাউকে কিছু দেয় না। এখানেও যদি আপনারা আই টি সি'এর উদ্বর্তপত্রের ওপর চোখ বুলান তবে দেখতে পাবেন যে ৪৯০ লক্ষ টাকার মত একটি অংক "গুডউইল ট্রেডমার্ক" খাতে মূলধনজাত করা হয়েছে। এর ওপর যে লাভাংশ ঘোষিত হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা ৬% থেকে বেড়ে ১৩% হয়েছে—এর পরিমাণ বছরে ৩০ লক্ষ থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা। লাভাংশের নামে এটি কি রয়ালটি পাঠানো নয়?

দফা নং ২ : আই টি সি একচেটিয়া ছাড়া আর কিছু নয়

ভারতের সিগারেট শিল্পে একটি বৈদেশিক একচেটিয়া রয়েছে।

সিগারেট শিল্পের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ২৫০ কোটি টাকার মধ্যে আই টি সি'এর বিক্রীর পরিমাণ তাদের উদ্বর্তপত্র অনুযায়ী ১৪৫ কোটি টাকা। এটা কি ৫০%'এর বেশী নয়? একচেটিয়ার ব্যাখ্যা কি হালে পরিবর্তিত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে আই টি সি খাঁটি ও সঠিক একচেটিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "টোব্যাকো"-এর ৫ই জুন তারিখের সংখ্যা থেকেও আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এতে "ভারত" শিরোনামে "উৎপাদন যত বাড়ছে সিগারেট রপ্তানি তত কমছে" উপ-শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াও "ভারতীয় সিগারেটের বাজারে প্রভুত্ব করে একটি বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানি—ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং লিঃ। এই কোম্পানিটি গোটা বাজারের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশের উপর প্রভুত্ব করে।" এ দিয়ে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, সত্য কোথায় নিহিত।

আই টি সি এবং ভি এস টি পরস্পর সংযুক্ত

বিদেশী শেয়ারহোল্ডার সম্বলিত তিনটি কোম্পানির কোনটিই পরস্পরের সংগে যুক্ত নয়—একথা সত্য হলে হতেও পারে। কিন্তু এই বক্তব্যে এই তিনটি কোম্পানি ও অন্যান্য বহু সহযোগী কোম্পানিতে একই শেয়ারহোল্ডারের প্রশ্নটি উপেক্ষা করা হয়েছে। মূলে কোম্পানি—লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোং লিঃ-এর সংগে সাধারণ যোগাযোগের কথাও এতে গ্রাহ্য করা হয় নি। ওয়াজির সুলেতানের ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর কোন শেয়ারমালিকানা নেই, কিংবা নেই

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোতে ওয়াজির সুলতানের শেয়ারমালিকানা, কিন্তু শুধু বি এ টি-এর মাধ্যমে যে বন্ধন তা বহু যোগসূত্রের মধ্যে একটি—হয়তো সবচাইতে বেশী শক্ত—যা পরস্পরকে সংযুক্ত করেছে।

অত্যন্ত বিতর্কমূলক ও অসমর্থিত কোন বক্তব্যের সমর্থনে বিচারকদের নাম উল্লেখ করা নীতিসম্মত কিনা আমি জানি না।

প্রাজ্ঞ বিচারকদের মতামতের উপর স্থাপিত অবস্থার দিক বিচার করলে, মনোপলিজ কমিশনের কাছে ভি এস টি-এর সম্প্রসারণের দরখাস্ত যাতে না যায় তার জন্য আই টি সি কেন যে তার প্রভাব খাটাচ্ছে তা আমার বোধগম্য নয়। বিচারকদের অভিমত সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আই টি সি যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেছে তাঁদের সকলের ওপরই আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু সঠিক মতামত তাঁরা যাতে দিতে পারেন তার জন্য সমস্ত তথ্য ও প্রাসঙ্গিক মালমসলা তাঁদের দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আই টি সি যা বলেছে তা সেইভাবে ধরে নিলেও শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রকাশ্য শুনানীর পর মনোপলিজ কমিশনে বিচারকগণ কর্তৃক প্রশ্নটি মীমাংসা করা।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বিক্ষুব্ধ পক্ষ হচ্ছে ভি এস টি; সম্প্রসারণের জন্য তার দরখাস্তই ভি এস টি এবং আই টি সি-এর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ৩ মাসেরও বেশী কাল পিছিয়ে পড়েছে। আই টি সি-এর চেয়ারম্যান যা বলেছেন ভি এস টি-এর চেয়ারম্যানও যদি তা-ই বলতেন তা হলে তাও বোঝা যেতো। পারস্পরিক সংযুক্তির এটি কি আর একটি উদাহরণ নয়?

দফা নং ৩ : আই টি সি আন্তর্জাতিক ব্রাণ্ড বিক্রী করে

আই টি সি বলেছেন যে, চোরা পথে আসা ব্র্যাণ্ডগুলো ছাড়া দেশে কোন আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ড বিক্রী হয় না। আমি জানি, বিভিন্ন দেশের সিগারেট শিল্পের বিভিন্ন ব্যক্তি আন্তর্জাতিক ব্রাণ্ডের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন; এ নিয়ে আমি কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাই না। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, আই টি সি-এর প্রস্তুত বিদেশী মালিকানার দাবিসম্বলিত ব্রাণ্ডগুলো, যেমন **উইলস গোল্ড ফ্লেক, গোল্ড লীফ, এমব্যাসি, সিজার্স, ব্রিস্টল** প্রভৃতি কোন কোন দেশে আমদানী করা হয় লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর কাছ থেকে বা অন্যান্য দেশে তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে। এমন কি ভারতেও যে প্যাকেটে এগুলো বিক্রী হয় তাতে লেখা থাকে "এই প্যাকেটের জিনিসগুলো ব্রিস্টল ও লণ্ডনের ডব্লিউ ডি অ্যাণ্ড এইচ ও উইলস-এর উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি।" এতে কি বোঝায়? লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো বা ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কেন এই সিগারেটগুলো ভারত থেকে রপ্তানির চেষ্টা করেন না? দেশ যেখানে সবরকমের রপ্তানি বাড়াবার এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য গভীরভাবে চেষ্টা করছে সেখানে সে বৈদেশিক একচেটিয়াকে তার বাড়তি উৎপাদন চালিয়ে যাবার অনুমতি দিতে পারে যদি এই বাড়তি উৎপাদন রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। বৈদেশিক একচেটিয়া যদি দেশের বাজারের জন্য উৎপাদন তার সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে এবং বাড়তি উৎপাদন রপ্তানিতে ছেড়ে দেয় তা হলে কেউ তাতে আপত্তি করবে না।

কাঁচা মাল, শ্রমিক ব্যয় ইত্যাদি ব্যাপারে ভারত যেখানে সুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থিত এবং আই টি সি-এর সব রকমের কারিগরী কলাকৌশল অধিকারে রয়েছে সেখানে শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে সিগারেট রপ্তানি লাভজনকই হবে। তাতে শুধু দেশই নয়, কোম্পানির বিদেশী শেয়ার-হোল্ডাররাও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ফলে উপকৃতই হবে। এবং তামাক আমদানী, সিগারেট প্রস্তুত করা এবং তারপর তা রপ্তানি করার বদলে আমার মনে হয় বি এ টি অধিকতর লাভবান হবে যদি ভারত তার তামাক থেকে প্রস্তুত সিগারেট রপ্তানি করে।

একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো যেসব ট্রেড মার্ক ব্যবহার করে আইন ও চিরাচরিত ব্যবহারের ফলে সে এগুলির মালিক। একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত, কারণ, এই ব্রাণ্ডগুলো যেখানে ইচ্ছা রপ্তানি করার ব্যাপারে আই টি সি-এর ওপর এখন কোন বিধিনিষেধ আরোপিত নেই।

দফা নং ৪ : ২০০টি দেশীয় সিগারেট কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

গত চারটি দশকে ২০০টি দেশীয় সিগারেট কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

দুটি সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি — ডি ম্যাক্রোপোলো এবং ক্রাউন টোব্যাকো কোং ৭০/১০০ বছরেরও বেশীকাল ধরে সিগারেট প্রস্তুত করে আসছে। এরা হলো অগ্রদূত, আই টি সি-এর আবির্ভাবের বহু আগেই এরা এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। গত ৫ বছরে ডি ম্যাক্রোপোলো প্রতি বছর ৬০ থেকে ১১০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন করেছে, আর ক্রাউন টোব্যাকোর উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক ৭০ থেকে ১১০ লক্ষ সিগারেট। কাজেই, প্রতি বছর ৬০০০ লক্ষ (অর্থাৎ প্রতি মাসে ৫০০ লক্ষ) সিগারেট হচ্ছে ক্ষুদ্রতম গ্রহণযোগ্য আর্থনীতিক ইউনিট বলে মিঃ হাকসারের যে ধারণা, তা সঠিক নয়। আজ যদি তারা ৭০ লক্ষ উৎপাদন করে থাকে, তবে ৭০ বছর আগে তারা নিশ্চয়ই ৭০ লক্ষের অন্ততঃ কিছু কম উৎপাদন করেছে। আই টি সি-এর এটি আর একটি অতিকাহিনী।

তিনি বলেছেন যে, আই টি সি ৬০ বছরের মধ্যে কোন একটি দেশীয় সংস্থাকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়নি বা যুক্ত হয়নি বা কিনে নেয়নি। এটা সর্বসাধারণের জানা ব্যাপার যে, কলকাতার ইউনিয়ন টোব্যাকো এবং হায়দ্রাবাদের ভিজির টোব্যাকো চালু প্রতিষ্ঠান হিসাবে আই টি সি কিনে নিয়েছে। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, একটি আমেরিকান কোম্পানি এ জে গ্রীন কিনে নিয়েছে আই টি সি। আই টি সি-এর বর্তমান বম্বে ফ্যাক্টরি এখন চলছে সেই জায়গায় যেখানে এ জে গ্রীন ছিল। বহুসংখ্যক যে সব কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আরও যে বহুসংখ্যক কোম্পানিকে একচেটিয়ার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এগুলি তাদের ওপরে।

আই টি সি বলেছে যে, যে অল্প কয়েকটি সংস্থা এই শিল্পে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিল, তারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের অপ্রতুল বিনিয়োগ সম্পত্তি বা অপ্রতুল পরিচালনব্যবস্থা বা ক্রেতাদের দাবি মিটাতে অক্ষমতা হেতু। ভারতীয় সিগারেট শিল্পের উদ্যোক্তার পক্ষে বিনিয়োজ্য সম্পত্তি বা পরিচালনব্যবস্থার ব্যাপারে বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কষ্টকর এবং এটিই হলো তাদের উন্নতি ব্যাহত হওয়ার প্রধান কারণ। এই জন্যই আমরা বলি যে, একচেটিয়ার উৎপাদন যদি ঠেকানো না যায়, তবে অন্যান্যরা বেড়ে উঠতে পারবে না, কারণ তারা বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার উপযুক্ত নয়।

সাতটি দেশীয় কোম্পানি যে চালু আছে এবং তাদের কাজকর্মে সন্তুষ্ট হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে — আমার কাছে এটি একটি সংবাদ বটে। আমি যতদূর জানি, এদের মধ্যে ন্যাশনাল টোব্যাকোই হচ্ছে বৃহত্তম; এদের উদ্বর্ত্ত পত্রেই দেখা যায়, এদের কাজকর্মের কি দৈন্যদশা। অন্যান্য কোম্পানির উদ্বর্তপত্র এখনআমার হাতের কাছে না থাকলেও এটি জানা ঘটনা যে, তাদের বিকাশ ঘটছে না। এই সব কয়টি কোম্পানির উৎপাদন একত্র করলে মোট উৎপাদনের ১%-ও হয় না।

একটি মালিকী প্রতিষ্ঠান বিকাশলাভ করছে বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার বিক্রয়ের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে বলে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা কেবল তাদেরই বিভ্রান্ত করতে পারে, যারা এই শিল্পের সঙ্গে পরিচিত নয়। বৈদেশিক একচেটিয়ার নির্মম প্রতিযোগিতার জন্য সেই কোম্পানিটি অলাভজনক দামে সিগারেট তৈরী ও বিক্রী করছে।

একটি কোম্পানির ২০ লক্ষ টাকা মূলধন ও ১·১৮ কোটি টাকা আয় আছে বলে মিঃ হাকসার যে কথা বলেছেন, তা ঠিক হতে পারে। কিন্তু আমি এমন কোন নতুন সিগারেট কোম্পানির কথা জানি না, যার নিজস্ব ব্রাণ্ডে এত মোটা টাকা আয় হয়। হয়ত কোম্পানিটি অন্য কোম্পানির জন্য কোন কোন ব্র্যাণ্ড তৈরী করে দেয়।

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

আমি এ বিষয়ে আনন্দিত যে, তিনি ভারতের বৃহত্তম সিগারেট ফ্যাক্টরির কথা উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন, ১৯৬৭ সালে ৩/৪ মাস লক-আউটের ফলে তাদের অবস্থা ভাল নয়। একথা ঠিক যে, ক্রেতারা ৩/৪ মাসের মত সময় অপেক্ষা করে না; ফলে এই কোম্পানীটির বিক্রী অন্যান্য সিগারেট প্রস্তুতকারকের হাতে চলে গেছে। আমি খুবে সুখী হব যদি আমার বাড়তি উৎপাদন রোধের প্রস্তাব এই হতভাগ্য কোম্পানীটিকে তার আয়ত্তবহির্ভূত কারণে যা হারিয়েছেন, তা ফিরে পেতে সাহায্য করে। তাদের যা ছিল তা যদি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায় তবে তা-ই হবে ন্যায়সংগত ও শোভন।

একথা আই টি সি-এর পক্ষে বেশ মনোমত যে, সে কোম্পানীটির প্রধান ব্র্যাণ্ড হচ্ছে ইয়ট ক্লাব, সে গোল্ডেন টোব্যাকোর তাজ ছাপ-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়নি। সম্প্রতি বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রতিনিধিরা মেশিনারি, মালপত্র বিক্রয় ও বিপণনের সুযোগ-সুবিধা দানের যে প্রস্তাব কোম্পানীটিকে দিয়েছে তা কাজের দিক থেকে আমি উৎসুক নয়নে চেয়ে আছিই। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তা হলেই এই কোম্পানীটি গোল্ডেন টোব্যাকোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে। ৬০ বছর নির্মম ও অশোভন প্রতিযোগিতার পর,—যে প্রতিযোগিতা এতগুলো প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে—ক্ষুদ্র প্রস্তুতকারকদের সাহায্যদানের ব্যাপারে বৈদেশিক একচেটিয়ার চিন্তাধারার সাম্প্রতিক পরিবর্তন সাদরে গ্রহণীয়। ইয়ট ক্লাব প্রস্তুতকারী কোম্পানীটি এবং এই রকম আরও ছোট ছোট কোম্পানিকে যদি বৈদেশিক একচেটিয়া সাহায্য করে তবে আমার সমস্যার বেশ সুন্দর সমাধানই হয়ে যাবে। কিন্তু যাই হোক-না-কেন, হৃদয়ের পরিবর্তন আবার যাতে পরিবর্তিত হয়ে না যায় তার জন্য উৎপাদন ঠেকানো অত্যন্ত আবশ্যক।

জি টি সি মোট মুনাফা অর্জন করেছে বলে মিঃ হাকসার যে বিবৃতি দিয়েছেন সে সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে টাকার অঙ্ক পড়লে তাঁর যে [illegible] তা [illegible] কিভাবে করলেন আমি জানি না। [illegible] একটি ঠিক নয়, কারণ এই মুনাফা উৎপাদনের আয়তনের সাপেক্ষে এবং তা জাতীয় অর্থনীতির একটি [illegible]। [illegible] খাটানো হয়েছে যাতে ভারতীয় সিগারেট শিল্প বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়।

দফা নং ৫ : অলস দেশীয় ক্যাপাসিটি রয়েছে

এই শিল্পে সম্পূর্ণ দেশীয় ক্ষেত্রে প্রচুর অলস ক্যাপাসিটি রয়েছে। এটা কোন গোপন কথা নয়। পার্লামেন্টে শিল্পমন্ত্রীর প্রদত্ত বিবৃতিতে যা কিছু বলা হয়েছে তা ছাড়াও ছয়টি ভারতীয় সিগারেট ফ্যাক্টরির ১৬৭৬৮০ লক্ষ সিগারেটের ক্যাপাসিটি আছে এবং তারা ৫০০০০ লক্ষের কম সিগারেট উৎপাদন করছে আর ১১০০০০ লক্ষের মত সিগারেট উৎপাদনের ক্যাপাসিটি অলস রাখতে বাধ্য হচ্ছে। তার সঙ্গে তুলনীয় বিদেশী একচেটিয়ার ৮০০০০ থেকে ১০০০০০ লক্ষ সিগারেটের বাড়তি উৎপাদন। এটা কি বাঞ্ছনীয় নয় যে, বিদেশী একচেটিয়ার বাড়তি উৎপাদন রোধ করা হোক যাতে ছটি ভারতীয় কোম্পানি যথেষ্ট কাজ পেতে পারে?

১৮ই জুলাই তারিখের নীতি বিষয়ক বিবৃতি অনুসারে ২৫% বাড়তি উৎপাদনের শিথিলতা প্রত্যাহৃত হয়েছে বিদেশী বৃহৎ ফার্মের ব্যাপারেই। সিগারেট শিল্পের বিদেশী একচেটিয়াকে বিনা অন্তর্ভুক্তিতে বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘটনার বিকৃতি না ঘটিয়ে এটি মেনে চলতে হবে।

দফা নং ৬ : বৈদেশিক একচেটিয়া সিগারেটের বাজার নিয়ন্ত্রিত করে

"বৈদেশিক মূলধন সিগারেট-বাজারের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করে"—মিঃ হাকসার একথা অস্বীকার করেন। বস্তুতঃপক্ষে আমি যে বলেছিলাম তা হচ্ছে বড় বিদেশী শেয়ারমালিকানা নিয়ে বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো সিগারেট-বাজারের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্লামেন্টে মন্ত্রী মহোদয় প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারেই এটি এবং আমি সুনিশ্চিত যে, তিনি ঠিকই বলেছেন। নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ হাকসার যে কথা বলছেন তা এলোমেলো এবং নিজের যুক্তির উপযোগী করে অঙ্কের হিসাবও বিকৃত।

সম্প্রসারণের অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক শেয়ারমালিকানার শতকরা হার হ্রাসের যে অঙ্গীকার বৈদেশিক একচেটিয়া দিয়েছে তা জাতীয় স্বার্থে নয়, কারণ এতে একচেটিয়া যেমন হ্রাস পাবে না তেমনি হ্রাস পাবে না বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়। এখানে আমি বলতে চাই যে, এই বৈদেশিক একচেটিয়াটি ভারতীয়করণ না করেই তার কাজকর্ম ১০০০ গুণ বাড়িয়েছে; কাজেই, সম্প্রসারণ ছাড়াই যাতে তাদের ভারতীয়করণ হয়, না হলে তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং বাজারে তাদের অংশ ধীরে ধীরে যাতে কমে যায় ও তার ফলে সত্যিকারের ভারতীয়করণ ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা এখন সরকারের উচিত।

দফা নং ৭ : বৈদেশিক একচেটিয়া দেশীয় ক্ষেত্রের ক্ষতি করে

কয়েকটি কোম্পানির জন্য অন্যান্য কোম্পানি সমৃদ্ধ হতে পারে না তা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয়েছে দেশলাই, সাবান ও তৈলশিল্পের ক্ষেত্রে। এই শিল্পে যে মুহূর্তে বৈদেশিক একচেটিয়ার তৎপরতা ব্যাহত করা হলো সেই মুহূর্তেই দেশীয় ইউনিটগুলি দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠলো।

নাম—'ইণ্ডিয়া'

আমি একথা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর চেয়ারম্যান তাঁদের উৎপাদনে অন্তত ২৫% হ্রাসের জন্য আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন—এই উৎপাদন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটি ছাড়িয়ে গেছে এবং এর ফলে শ্রমিক ও পরিচালন বিভাগের কর্মী উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছে, বাজারের ক্ষতি, মুনাফার ক্ষতি, মর্যাদার হানি ইত্যাদি ঘটেছে। কোন সন্দেহ নেই যে, আমি ভারত সরকারের নির্ধারিত নীতির আশ্রয় নিয়েছি এবং এইসব নীতির গোলকধাঁধার মধ্যে যা ঘটা উচিত নয় তা দেখিয়ে দেবার চেষ্টাই কেবল করছি।

আই টি সি আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ড বিক্রী করে

আই টি সি-এর চেয়ারম্যান আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেট প্রস্তুতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেট যদি আন্তর্জাতিকভাবেই খ্যাত হয়ে থাকে তবে, কেন যে তিনি বলেন আই টি সি আন্তর্জাতিক সিগারেট তৈরী করে না তা আমি জানি না। কারণ, এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, অন্যান্য যেসব ব্র্যাণ্ডের কথা আমি উল্লেখ করেছি, যেমন গোল্ড লিফ, এমব্যাসি, সিজার্স, ক্লিপ্টন ইত্যাদি মিঃ হাকসারের উল্লেখিত আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেটের চাইতে বেশী বিক্রী হয়।

সিগারেটের ক্ষেত্রে "ইণ্ডিয়া" নাম ব্যবহারের ব্যাপারে, এর যৌক্তিকতার প্রশ্ন নিয়ে আমরা আমাদের নিজ নিজ মতামত গড়ে তুলবার অধিকারী। আমি জানি, অতীতে বীর চক্র নামের সিগারেট প্রস্তুতকারীরা এই নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়, কারণ তা দেশের আইনানুগ ছিল না কিংবা কোন কোন নামের পবিত্রতা হেতু এ ধরনের নামকরণ অন্যায় ছিল। পঞ্চবার্ষিকী বিড়ির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। যদি আমাদের দেশের আইনে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নেতাদের নাম, জাতীয় মনুমেণ্ট ও স্মারক চিহ্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ হয় তবে দেশের নামই বা কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

ঘ। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো ও গোল্ডেন টোব্যাকোর অবদানের মধ্যে তুলনা

অন্য দুটো কোম্পানি সম্পর্কে খোঁজখবর এখনও আমার নেওয়া হয়নি। তবে আমি জানি আই এল টি ডি ১০০% ব্রিটিশ কোম্পানি

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

এবং দিল্লী অ্যাণ্ড ওরিয়েণ্ট টোব্যাকো কোং আই টি সি'এর অর্থসাহায্য-পুষ্ট। এবিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে যে, এইসবগুলির সৃষ্টি দেশের অর্থনীতিতে সত্যিকারের কোন অবদান রাখিয়াছে কিনা, কারণ একই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে একক অখণ্ড ব্যবসায় সম্বলিত ৫টি কোম্পানির বদলে মাত্র একটি কোম্পানি এই কাজ করতে পারতো।

১। রপ্তানি-আমদানি-বৈদেশিক মুদ্রা

একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত যে, দেশের সংকটাপন্ন বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা সম্পর্কে আই টি সি অবহিত আছে। আমি ইতঃপূর্বেই দেখিয়েছি আই টি সি তামাক রপ্তানির কৃতিত্ব কত অন্যায়-ভাবে নিজের কোলে টেনে নিচ্ছে। বস্তুতঃপক্ষে আই টি সি'এর ক্ষেত্রে যতদূর বলা যায়, বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৯ ও১৯৭০ সালের মধ্যে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং ১৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ এই কয়টি বছরে ঘোষিত মোট লাভাংশের ৯৩% পাঠিয়ে দিয়েছে।

একথা জেনে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হবে যে, গোল্ডেন টোব্যাকো যদি এক্ষেত্রে না থাকতো, তবে বিক্রয়ে এর অংশ বৈদেশিক একচেটিয়ার হাতে চলে যেতো এবং তার ওপর লাভ বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের কাছে চলে যেতো। শুধু তা-ই নয়, যদি খুব কম প্রতিযোগিতা থাকতো তবে বৈদেশিক একচেটিয়ার মুনাফা বহুগুণ বেড়ে যেতো, কারণ কেবলমাত্র প্রতিযোগিতাই শোষণকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এমনকি আই টি সি/আই এল টি ডি কর্তৃক তামাক রপ্তানিও গত ৩ বছরের মধ্যে প্রত্যেক বছরেই কমে গেছে। সিগারেট রপ্তানির ক্ষেত্রেও তা-ই, এখন এর পরিমাণ বছরে মাত্র ২ লক্ষ।

রপ্তানিতে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি যে সাফল্য লাভ করেছে, নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই তা তার বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্যের ফল। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই শেয়ারহোল্ডাররা শুধু শেয়ারহোল্ডারই নন, বরঞ্চ তাঁরা এই লাইনেরই লোক। এই বিদেশী সহযোগীরা ভারত থেকে রপ্তানি ব্যাপারে সাহায্য করতে আগ্রহী ও ঐকান্তিক। তাঁরা আমাদের দেশের কিছুটা কল্যাণ করছেন। এই সহযোগীদের নাম আমি জানতে চাই, তাহলেই জানা যাবে এই সহ-যোগীরা কারা এবং কিভাবে তাঁরা শুধু আই টি সি, আই এল টি ডি'ই নয়, অনুরূপে অন্যান্য কোম্পানিও নিয়ন্ত্রিত করছেন।

গোল্ডেন টোব্যাকোর রপ্তানি সম্পর্কে, আমি ইতঃপূর্বেই বিবৃত করেছি যে, আগ্রহী ও ঐকান্তিক বিদেশী মালিকানা কিংবা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ড কিংবা সারা বিশ্বে বিদেশী সহযোগী না থাকা সত্ত্বেও সিগারেট রপ্তানি ব্যাপারে আমরা অনেক ভাল করেছি। আমাদের যথাসাধ্য আমরা এখনও করে যাচ্ছি।

২। ভারতীয় মূলধন—ভারতীয় ইকুইটি শেয়ারহোল্ডার

আই টি সি'এর ২১৪৩০ জন শেয়ারহোল্ডার আছেন—একথার প্রচারমূল্য বেশ জোরদার। কিন্তু তাঁদে যে শেয়ার আছে তার মোট শতকরা হার ২৫%-এরও কম। শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা নয়, তাঁদের শেয়ারমালিকানার পরিমাণই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মালিকানার প্রশ্নের আসল বিবেচ্য বিষয়। গোল্ডেন টোব্যাকো সম্পর্কে জ্ঞাতব্য এই যে, এটি হচ্ছে একটি মালিকী কোম্পানি। স্বভাবতঃই তার শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; কিন্তু বড় রকমের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এর ১০০% শেয়ারমালিকানাই ভারতীয়দের হাতে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়, শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা নয়।

ভোটদানের অধিকারবিহীন গরীব ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে আদায়-করা প্রিমিয়াম এবং ডিবেঞ্চারসহ ৯·১১ কোটি টাকার অঙ্ক কি করে যে কোম্পানির শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ বলে উল্লেখ করা হলো তা আমি বুঝতে পারি না। ডিবেঞ্চার ব্যবসা বৃদ্ধি/মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ঋণ ছাড়া আর কিছু নয়—এবং শেয়ার প্রিমিয়াম ইকুইটিও নয়।

আমি আরও বলতে চাই যে, ভারতীয় জনসাধারণ এবং এল আই সি ও ইউনিট ট্রাস্টের মত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ সত্ত্বেও বোর্ডে এই বিনিয়োগকারীদের কোন প্রতিনিধি নাই। আমি জানি না কেন এটি করা হলো না। ভারতীয় শেয়ারহোল্ডাররা বিনিয়োগকারী হতে পেরে সুখী এবং যেপর্যন্ত তাঁরা তাঁদের বিনিয়োগের প্রতিদান পেতে থাকেন সে পর্যন্ত কোম্পানির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন না বা প্রতিনিধিত্বের দাবি জানান না। দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করার সময় এসে গেছে এবং আমি নিশ্চিত যে, অতি শীঘ্র এই ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা—ব্যক্তিই হোক আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানই হোক—বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে তাঁদের ন্যায়সংগত স্থান লাভ করবেন।

৩। পরিচালনা

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং'এর বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁরা পেশাধারী ম্যানেজার ছাড়া আর কিছু নন, বিদেশীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য তাঁদের দ্বারাই নিযুক্ত ও নির্দেশিত। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, এটি বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স নয়, একদল ম্যানেজার মাত্র যাঁরা বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ও নিয়োগকর্তাদের কাছে ভালো ফল দেখাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং জাতির স্বার্থ রক্ষিত হোক আর না হোক, নিয়োগকর্তাদের কাছে এটিই প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালনার সবরকম পদ্ধতিই প্রয়োগ করছেন যে, বিদেশী পূর্বসূরীদের চাইতে তাঁরা বেশী দক্ষ বা সামর্থ্য-বান। বস্তুতঃপক্ষে পেশাধারী ম্যানেজারদের সঠিক স্থান হচ্ছে ম্যানে-জারের স্থান; বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের স্থান এঁদের ওপর হওয়া উচিত যাতে তাঁরা এঁদের সংযত করতে পারেন বা উৎসাহ দিতে পারেন এবং কোম্পানি যাতে কোন অশোভন বা জাতীয়স্বার্থবিরোধী কাজ না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য ও প্রেষণা ও প্রেরণা থাকলেও আর্থিক ঝুঁকি যাঁর রয়েছে সবকিছুর ওপর তাঁর দৃষ্টি থাকা দরকার।

গোল্ডেন টোব্যাকোর পরিচালনা

মিঃ হাকসার বলেছেন, পরিচালনা বিভাগের অধিকাংশ সদস্যই মালিকের আত্মীয়। আমাদের কোম্পানির ব্যাপারে তাঁর যে জ্ঞান আছে তার বেশী তাঁর কাছে আমি আশা করি না। আপনাদের অবগতির জন্য আমি বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স ছাড়া ম্যানেজারবৃন্দ ও কোম্পানির শীর্ষ-স্থানীয় অন্যান্য ব্যক্তিবৃন্দের পরিচয় নীচে দিচ্ছি :

শ্রী এস কে ওঝা ... সেক্রেটারি
শ্রী এস আর শৃংগারপুরী ... ম্যানেজার
শ্রী জে সি শাহ ... সেলস ম্যানেজার
শ্রী এস পি শাহ ... অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট
শ্রী পি ভি নাগদা ... বিজনেস ম্যানেজার
শ্রী এম এস রাম ... পাবলিসিটি ম্যানেজার
শ্রী আর এল জয়সোয়াল ... ম্যানেজার
শ্রী এ ডি মারফাতিয়া ... ম্যানেজার
শ্রী বি এইচ বাহাদিয়া ... ফ্যাক্টরি ম্যানেজার
শ্রী পি এস ভেংকটাচলম ... চীফ এঞ্জিনিয়ার
শ্রী জি বি সাবন্ত ... অ্যাসিঃ চীফ এঞ্জিনিয়ার
শ্রী জি আর চাবলানি ... অ্যাসিঃ চীফ এঞ্জিনিয়ার
ডাঃ পি ডি কুট্টান ... চীফ কেমিস্ট
শ্রী এস এ সাবন্ত ... পার্সোনাল অফিসার
শ্রী সি এন মাথুরিয়া ... ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এঞ্জিনিয়ার
শ্রী এ আর কাদাকিয়া ... কোয়ালিটি কণ্ট্রোল এঞ্জিনিয়ার
শ্রী এল ভি ধুতিয়া ... চীফ এঞ্জিনিয়ার
শ্রী ডি এন মূর্তি ... টোব্যাকো লীফ অ্যাডভাইজার
শ্রী আর ভি এস রাও ... টোব্যাকো লীফ অ্যাডভাইজার
শ্রী ডি এস এম গান্ধর্ব চৌধুরী ... ম্যানেজার
শ্রী এম রামস্বামী ... ম্যানেজার
শ্রী কে কে যেথানি ... ফ্যাক্টরি ম্যানেজার
শ্রী চ নারায়ণ ... ম্যানেজার
শ্রী চ ভি পি গোপাল রাও ... ম্যানেজার

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

এঁরা কোম্পানির ডিরেক্টরদের আত্মীয় নন। তবে, যদি পরিচালনা বিভাগের কোন বিশেষ শাখার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য তাঁর থাকে তবে তার এমন সব কারণ নিশ্চয়ই আছে যেগুলোর খুঁটিনাটি বিচার করতে তিনি ইচ্ছুক নন। কারণ এতে তিনি নিজেই বেকায়দায় পড়ে যাবেন। কাজেই এবিষয়ে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

৪। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৈদেশিক একচেটিয়ার মুনাফা জি টি সি'র চাইতে অনেক কম। আমি ধারণাই করতে পারি না যে, যে কোম্পানির এত একচেটিয়া অধিকার রয়েছে সে কি করে কম মুনাফার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে এবং পার্থক্য কোথায় রয়েছে বা টাকা কোথায় যাচ্ছে তা জানবার জন্য আমি খুব আগ্রহী। ছোট একটি ভারতীয় কোম্পানি টাকার অধিকতর কম মূল্য দিতে ও বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম—একথা বলা হাস্যকর। বস্তুতঃপক্ষে, আন্তর্জাতিকভাবে বিজ্ঞাপিত বা তিন পুরুষ ধরে বাজারে বিদ্যমান ব্র্যাণ্ডগুলোর ওপর থেকে বৈদেশিক একচেটিয়া যে প্রিমিয়াম আদায় করতে পারে সেগুলোর মত অন্যান্য বহু প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিতে জি টি সি সব সময়ই ক্রেতা যে দাম দেয় তার জন্য সুষ্ঠুতর প্রতিদান দিয়ে থাকে।

আই টি সি এবং জি টি সি'এর বিভিন্ন দামের পর্যায়গুলি সম্পর্কে আপনারা জানেন সবচাইতে লাভজনক লাইনকেই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। জেনে বেশ কৌতুক অনুভব করবেন যে, ১৯৬৭/৬৯ সময়কালে আই টি সি'এর উৎপাদন বেড়েছে ৭%'এরও কম, কিন্তু মুনাফা বেড়েছে ৭০%'এরও বেশী। এর অর্থ, মুনাফার হার উৎপাদনের ১০ গুণেরও বেশী। এর কারণ কি কম দামের সিগারেট, না এর কারণ ইণ্ডিয়া কিংস ভারতীয় বাজারে যার দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ের?

বস্তুতঃপক্ষে আমরা সবসময়ই এই ধারণা পোষণ করি যে, উচ্চতর পর্যায়ের সিগারেট আই টি সি'এর একক একচেটিয়া রয়েছে এবং তার জন্যই ব্যবসায়ীদের মুনাফার ওপর যে কমিশন দেওয়া হয় তা মাঝারি দামের সিগারেটের উপর কমিশনে এক-তৃতীয়াংশও নয়। প্রতিযোগিতা যদি না থাকে তবে আই টি সি শর্তাবলী আরোপ করে যাবেই যা মোটেই শোভন নয়। বৈদেশিক একচেটিয়ার কাছ থেকে ব্যবসায়ী মহল যেসব জবরদস্তিমূলক পদ্ধতি ও দুর্ব্যবহার সহ্য করে এসেছে তার কথা না বললেও চলে। পরিবর্তন যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তার কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছুটা বেশী প্রতিযোগিতা এবং মনোপলি আক্ট—বৈদেশিক একচেটিয়ার ব্যবসায়িক পদ্ধতি ও ব্যবসায়ীর প্রতি আচরণের ওপর এই আইন বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

অধিকতর সস্তা ব্র্যাণ্ড, যেগুলোর কথা আই টি সি উল্লেখ করে থাকেন সেগুলো সম্পর্কে লক্ষ্য করা দরকার যে, ভি এস টি কেবল অধিকতর সস্তা দামের সিগারেটই আরও [illegible] বলতে চারমিনার সিগারেট প্রস্তুত করে, এবং এই কোম্পানিটির মুনাফা ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত [illegible] বেড়ে গেছে। [illegible] উৎপাদন কিন্তু কমে গেছে। এর অর্থ কি সিগারেটের [illegible] কিংবা কোয়ালিটির হানি, সংক্ষেপে নিম্নআয়বিশিষ্ট [illegible] তাদের অবস্থা ভাল নয় তাদের শোষণ নয়?

৫। আমদানী প্রতিকল্প (আই টি সি এবং জি টি সি-এর **মধ্যে তুলনা**

এখানে আই টি সি সুস্পষ্ট কারণে বেশ সুবিধাজনকভাবেই তামাক রপ্তানির প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন। আমাদের তথ্যানুযায়ী এর পরিমাণ বছরে ২০ লক্ষ টাকা থেকে ১২০ লক্ষ টাকা। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্পূর্ণ ভারতীয় কোম্পানি বলে জি টি সি এমন সব মালপত্রের জন্য উচ্চতর হারে দাম দিতে বাধ্য হয় যা আমদানী করতে বাধ্য হয় যেগুলো আই টি সি তার সহযোগীদের মারফত আমদানী-করা মালপত্রের চাইতে বেশী ব্যয়বহুল—এমনও হতে পারে যে, এই সহযোগীরাই তামাক রপ্তানিতে সাহায্য করছে কিংবা তারাই আগ্রহী ও ঐকান্তিক অংশীদার/শেয়ারহোল্ডার। কিন্তু প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে যদি আমদানী-করা তামাকসহ বৈদেশিক মুদ্রার হার যোগ করা হয় তবে আই টি সি-এর হিসাবমত অঙ্ক প্রদত্ত অঙ্কের তুলনায় ৩০ গুণ বেশী হয়ে যাবে।

মেশিনারি

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং'এর অবদান আরও অনেক বেশী, কারণ মেশিনারি প্রস্তুতকারক মোলিন্স অফ ইণ্ডিয়া আই সি সি'এর মূল কোম্পানির সঙ্গে পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত, এই মূল কোম্পানিটি নিজেদের অন্যান্য হোল্ডিং কোম্পানির মারফত আই টি সি'এর শেয়ার রাখেন। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান হওয়া উচিত এবং ইউ কে মনোপলি কমিশনের রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে বি এ টি নামে ব্রিটিশ যৌথ কোম্পানি বা লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর কাজকর্মের আরও ভাল চিত্র দেবে।

এই যৌথ কোম্পানিটি যুক্তরাজ্যের একটি একচেটিয়া এবং যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বাজারে তার যথেষ্ট অংশ রয়েছে। ৫৫টি দেশে তাদের সিগারেট ফ্যাক্টরি আছে (সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার কোন কোনটি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই)। ওয়ার্ল্ড টোব্যাকো ডিরেক্টরিতে লণ্ডনের বি এ টি এবং আই টি সি'এর সহযোগীদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা থেকে তার সত্যতা নিরূপিত করা যাবে আর, শাখাগুলোর দিকে না তাকিয়ে আরও গভীরে মূলে আমাদের যেতে হবে এবং এই শাখাগুলো একই গাছের কিনা তা নিরূপণের চেষ্টা করতে হবে। পারস্পরিক সংযুক্তি, সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী কোম্পানি ইত্যাদির বলে একচেটিয়ার অনুভূমিক ও শীর্ষস্থ নিয়ন্ত্রণের যে মূল প্রোথিত রয়েছে তা যদি খুঁটিনাটিভাবে আমরা অনুসন্ধান না করি তবে মেশিনারি প্রস্তুতকারক, কাঁচামালের যোগানদার প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে তাদের ভূমিকার সত্য চিত্র বের করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠবে। বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি, কারিগরী কলাকৌশল, ড্রয়িং, ব্লু-প্রিণ্ট ইত্যাদি ব্যাপারে যে অবদানের কথাই তাঁরা বলুন না কেন, সবকিছুই অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

এটিও বেশ আগ্রহোদ্দীপক যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো ব্যাঙ্গালোরে মেশিন প্রস্তুতকারী একটি ইউনিট স্থাপন করেছে; আমি শুধু আশা করবো যে, তাঁরা তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে সরকারের অনুমতি নিয়েছেন, কিংবা সরকারকে অন্ততঃ তা জানিয়েছেন, কারণ ডি জি টি ডি কর্তৃক প্রকাশিত দেশীয় মেশিনারি প্রস্তুতকারকদের তালিকায় এর নাম প্রকাশিত হয়নি বলে এবিষয়ে আমরা কিছু জানি না।

সিগারেট প্রস্তুত, লীফ হ্যাণ্ডলিং, মেশিনারি প্রস্তুত ও কাঁচা মালপত্র প্রস্তুত যে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলীর কথা তাঁরা বর্ণনা করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা একচেটিয়ার কবজা বেশ ভালভাবেই অনুমান করতে পারেন এবং অনুমান করতে পারেন একে যদি কার্যকরভাবেই রোধ করা না হয় তবে কত সহজে সে এই কবজা আরও আঁট করে দিতে পারে।

আই টি সি স্বনির্ভরতার জন্য যে গর্ব করছেন তাতে অবাক লাগে। এটা হলো সরকারেরই অর্থনৈতিক নীতি। আই টি সি যদি তাঁদের সহযোগীদের এবং পারস্পরিক সংযুক্ত কোম্পানিগুলোকে ডেকে না আনতেন এবং শীর্ষস্থ একচেটিয়া নিজেদের আরূঢ় না করাতেন তা হলেই আমি তাঁদের কৃতিত্ব স্বীকার করতাম। এটি হলো সহজ ও সরল কথায় আত্মসমৃদ্ধির প্রচার মাত্র।

ভারতের বহু শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়া বা তাদের মূল কোম্পানির যে মোট সংযোগ রয়েছে বা তাদের ওপর যে প্রভুত্ব সে করে, সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। সরকার কর্তৃক এবিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানির আমদানী হ্রাস প্রশংসার্হ হত যদি যোগানদারদের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সংযোগের একান্ত ও গোপন স্বার্থ না থাকতো—এই যোগানদারদেরই তারা অর্থ, কারিগরী কলাকৌশল জ্ঞান ইত্যাদি দিয়েছে। এসব খুঁটিনাটি বিষয় আমার জানার কথা নয়, তবে সরকারের উচিত এবিষয়ে তদন্ত করা এবং লক্ষ্য রাখা যে, বিভিন্ন কোম্পানি যে আমদানী করে তা খাঁটি। বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের প্রয়োজনীয় আমদানীতে ইতর-বিশেষের কারণ ডি জি টি ডি কর্তৃক সাধারণত পরীক্ষিত হয় ও তা তাঁদের পরিজ্ঞাত, সুতরাং এব্যাপারে আই টি সি'এর উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।

আমাদের আপত্তি যেখানে তা হচ্ছে, এই কোম্পানিগুলো কর্তৃক শোষণ—এগুলো আবার উচ্চ মূল্য, পরিমাণের ডিসকাউণ্ট, কেবল আই টি সি'এর জন্য বিশেষ কোয়ালিটি রিজার্ভ রাখা, বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রয়োজনানুযায়ী প্রস্তুত-সূচীর পরিবর্তন ইত্যাদি নানা পন্থাতন্ত্রে

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন। এসব দেশীয় ক্ষেত্রের স্বার্থের বিরোধী। বহু ক্ষুদ্রায়তন শিল্প আই টি সি'এর সাহায্য পেয়েছে, এই তথ্য মর্মস্পর্শ করে। এব্যাপারে গোল্ডেন টোব্যাকোর অবদান কিছুই নেই, একথা বলার আগে আই টি সি'এর চেয়ারম্যান জি টি সি'এর কাছে খোঁজখবর নিলে বা পরামর্শ করলে ভাল করতেন, যেমন আমি মাঝে মাঝেই করেছি এবং তাঁর স্বীকৃতি চেয়েছি—এই স্বীকৃতি আমার কাছে জানালে জানাতেও পারেন আবার না-ও জানাতে পারেন।

গবেষণা ও উন্নয়ন

কোন লেবরেটারিতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের পরিমাপ করা যায় না। কোন নতুন উদ্ভাবনা ঘটেছে তা-ই আমাদের জানা দরকার, তা হলেই আমরা জানতে পারবো এটি সমগ্র শিল্পের ওপর বোঝা হয়ে রয়েছে, না কিছুটা প্রয়োজনীয়।

আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কে বলার এই যে, ক্রেতাদের কাছে আমরা পণ্য উপস্থাপিত করি তার কোয়ালিটি ও মূল্যের ভিত্তিতেই আমাদের বিচার করা হোক, এই দাবি আমরা জানাই। এটিই হলো ফলশ্রুতি য স্বতঃই প্রকাশিত এবং এনিয়ে কারো গর্ব করার কিছু নেই। অন্যেই বিচার করুক।

একচেটিয়া অধিকার যদি হ্রাস করা হয় তবে অন্যান্য কোম্পানিতেও গবেষণা ও উন্নয়ন দ্রুত ঘটতে থাকবে, কারণ তারা তখন বুঝতে পারবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাদের সামনে রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ বেশ ব্যয়বহুল; উৎপাদন, সঙ্গতি ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে।

কর্মসংস্থান — কর্মচারী

জি টি সি'তে আমাদের পক্ষে সব চাইতে সন্তুষ্টির বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রতি আমাদের কর্মীদের অবিচল আনুগত্য ও সহযোগিতা—এ আনুগত্য আর্থিক প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া আরও গভীরে প্রবেশ করিয়াছে। এই সমর্পিত মন যদি না থাকতো তবে জি টি সি বিশেষ করে জন্মকাল থেকেই বিরাট বৈদেশিক একচেটিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যে অগ্রগতি লাভ করেছে তা করতে সক্ষম হতো না।

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর নিয়োগাধীনে ১২০০০ জন শ্রমিক আছে। তারা ভালোভাবেই কাজ করছে। কর্মচারিগণকে চাকরির যেসব ভাল ভাল শর্ত দেওয়া হয়েছে তা সুপরিজ্ঞাত। জি টি সি'তে কাজের পারিশ্রমিক ও পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূলে এবং আই টি সি'এর সঙ্গে তুলনীয়। আই টি সি'তে তথাকথিত পেশাধারী ম্যানেজাররা যা পান তা অত্যন্ত বেশী, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হয়তো তাঁরা বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

একথা জেনে সুখানুভব করবেন যে, জি টি সি কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা আই টি সি'এর সঙ্গে তুলনায় উৎপাদনের প্রতি ইউনিটে কিছু কম। এর কারণ কি? এর অর্থ কি এই যে, বৈদেশিক একচেটিয়া এমন অনেক বেশী লোক নিয়োগ করে যারা উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু আর্থনীতিক ও আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখার জন্য তাদের প্রয়োজন? প্রদত্ত মজুরী সম্পর্কে একথা জেনে কৌতুক অনুভব করবেন যে, জি টি সি অত্যন্ত কম মজুরী দেয় বলে যে উক্তি করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ঠিক নয় জি টি সি'এর ক্ষেত্রে মাথাপিছু গড় পরিমাণ হচ্ছে ৬১০০, টাকা, আই টি সি'এর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৬৩৫০, টাকা। এই পরিমাণ কি খুব কম?

ইউনিয়ন নেই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকও নেই

জি টি সি'তে সংঘবদ্ধ দরকষাকষির জন্য নির্বাচিত ওয়ার্কস কমিটি রয়েছে এবং তা সক্রিয়ভাবে কাজও করছে। শ্রমিকরা এবং পরিচালনা বিভাগের কর্মীরা একই পরিবারের সদস্যের মত ঐক্যবদ্ধ। আমরা স্বীকার করি, এটি ঈর্ষণীয়।

একথা জেনেও কৌতুক অনুভব করবেন যে, আই টি সি'এর চেয়ারম্যান জানতে পেরেছেন, জি টি সি'এর নিযুক্ত সর্দারদের দ্বারা—যারা 'গ্রুপ লীডার' নামে আখ্যাত—কচ্ছ থেকে সমস্ত শ্রমিক সংগৃহীত হয়েছে। শ্রমিকদের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, এরা স্থানীয় এলাকা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই কচ্ছী নয়। তারা মারাঠী, মুসলিম, খৃষ্টান, পার্শী, শিখ—মহারাষ্ট্রের অধিবাসী সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক।

৯। বৈদেশিক মুদ্রা—সহযোগিতা—রয়ালটি

গুডউইল—ট্রেডমার্ক আই টি সি'এর উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত মত মূলধনে পরিণত করা হয়েছে এবং তার ওপর প্রদত্ত লাভাংশ—বছরে ৬৫ লক্ষ টাকা—রয়ালটি দানেরই সমতুল। বিদেশী মালিকানাধীন ব্র্যাণ্ড উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত রয়ালটি প্রদান কম ব্যয়বহুল হইবে, কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই রকমের ব্র্যাণ্ডের স্থান ভারতীয় ব্র্যাণ্ড ধীরে ধীরে দখল করতে পারিবে এবং তাতে মূলধনে পরিণত গুড-উইলের জন্য স্থায়ী দায়ের বদলে রয়ালটি প্রদান হ্রাস পাবে। একে যদি দেশের পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল পন্থায় মূলধন থেকে বের করে আনা যায় তবে বৈদেশিক মুদ্রার অনবরত অপচয় বন্ধ করবার জন্য এখনই তা করা উচিত।

১০। কৃষি—অর্থনীতি

দেখেশুনে মনে হয় বৈদেশিক একচেটিয়া যদি ভারতকে শোষণ করার জন্য এখানে আসার সিদ্ধান্ত না করতো তবে ভারতীয়রা দেশের তামাক দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতো না। যা কিছু কল্যাণ সাধিত হয়েছে তা সব সময়ই সত্য; কিন্তু দেশের অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়, একচেটিয়া কর্তৃক চাষী, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের শোষণ রোধ করতে হবে।

তামাকের ক্রেতা হিসাবে গোল্ডেনের অবদান এই অর্থে অনন্য যে, এই ভূমিকা একচেটিয়ার অধিকার ও তামাক-চাষীদের শোষণ হ্রাস করতে সাহায্য করেছে এবং এ জিনিসটি উপলব্ধি করতে হলে আপনাদের তামাক-চাষের এলাকায় যেতে হবে।

১১। রপ্তানি বাজারের জন্য ব্র্যাণ্ড

আই টি সি যখন বিশ্ব প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম এমন সিগারেট তৈরী করতে পারে তখন তাদের সিগারেট রপ্তানিতে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাধা কোথায় তা আমি জানি না। সিগারেট রপ্তানি করলে যে অর্থ অর্জিত হবে তা তামাক রপ্তানি থেকে অর্জিত অর্থের অন্ততঃ দ্বিগুণ। শুধু তাই নয়, শ্রমিক এবং অনুষঙ্গী প্রেরণাও পাবে। আমি সেইদিনের দিকে চেয়ে আছি যখন আই টি সি ১০ কোটি টাকার তামাক রপ্তানির ভুয়া দাবি করার বদলে ২৫ কোটি টাকা মূল্যের সিগারেট রপ্তানি করবে।

১২। মুনাফা—সামাজিক দায়িত্ব

সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে মিঃ হাকসারের বক্তব্য আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমি আগেও বলেছি, আই টি সি'এর উৎপাদন যেখানে ৭% বেড়েছে সেখানে মুনাফা বেড়েছে ৭০%। তবে, মনে হয়, সংস্থাপিত ক্যাপাসিটিতে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করার ভীতির সঙ্গে মুনাফা হ্রাসের ভীতি মিশে গেছে বলেই সামাজিক দায়িত্ব ও মুনাফা অর্জনের তত্ত্বকথা টেনে আনতে তাঁকে বাধ্য করেছে।

জি টি সি যে মুনাফা অর্জন করে তা তিনি যেরূপে অসামাজিক বলে মনে করেন সেরূপ নয়। অল্পসংখ্যক শেয়ারহোল্ডার নিয়ে গঠিত কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ কর প্রদানের পর মাত্র ৩০% লাভাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, বাকি ৭০% বৈদেশিক একচেটিয়া হ্রাসের উদ্দেশ্যে আরও সাহায্য দানের জন্য আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে নিয়োজিত করা হয়েছে। তার তুলনায় আই টি সি ১০ বছরে লাভাংশ হিসাবে ১৫ কোটি টাকা বিদেশে পাঠিয়েছে। আপনারা এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, দেশের আইনবিরুদ্ধ কিছু জি টি সি করেনি।

আমি ইতঃপূর্বেই আমদানী প্রতিকল্পের যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সিগারেট মেশিনারি, সিগারেটের কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত যদি আই টি সি'এর শীর্ষস্থ একচেটিয়ার বিরাট মতলবের অংশ না হয়ে থাকে, তবে আমি তার সম্বর্ধনাই জানাবো।

সবকিছু ব্যাপার আপনাদের কাছে, সংবাদপত্র, জনসাধারণ ও সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করলাম। এখন আপনারাই বিচার করুন, এই শিল্পের ভারতীয় ক্ষেত্রকে কিভাবে বৈদেশিক ক্ষেত্রের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

কাশীবাসিনী

আমার কথা নয়। বিদেশী এক বিশপ সাহেব সেই কোন্ কালে লিখেছিলেন, বারাণসীর পথে আর গঙ্গার ঘাটে ঘাটে মহিলাদের অপূর্ব এক মেলা মিলে থাকে। সকাল সন্ধ্যার সব রং, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের সব বর্ণচ্ছটায় বাঙালী শুচি-শুদ্ধ বিধবাদের শুভ্রবাস যেন সমন্বয়ের সূত্র। দশ বিশ বছর আগে নয়, প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে ঠিক এমনই ছিল শিবের রাজধানী কাশীর ছবি। পাদরী সাহেব কলকাতার আর্চবিশপ ছিলেন। সেজন্যই সম্ভবত বাংলার মানুষকে বেশী আপন লেগেছিল। তবে আজও দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণে বাঙালীটোলা ও তার আশপাশ জুড়ে যত মানুষের বাস তার অর্ধেক বাঙালী। পাকিস্তানের পত্তনের পর বাস্তুহারা বাঙালী, একালের অভিজাত ঐতিহ্যের উত্তরপুরুষ বড়লোক বাঙালী সন্তানহীনা নিঃসম্বল বিধবা সব একাকার হয়ে মিশেছে যেন মহাদেবের মহাক্ষেত্রে।

মহাদেবের মহাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রের মতই সর্বজনের সাধনার অবিরোধ মিলন ক্ষেত্র। পাগলা শিব সবার আশ্রয়। সেই জন্যই তো অমন দক্ষযজ্ঞের আচারানুষ্ঠান তিনি পণ্ড করে দিয়েছিলেন। বরুণা আর অসি বয়ে যাচ্ছে উত্তরে আর দক্ষিণে। পূবে বইছেন গঙ্গা, গম বা গতির প্রতীক। তাই তো জীবনের গতির সব ধারাকে ধরে তার বইতে দিতে পারেন। কি পতিহীনা অনাথা আর কি বড় ঐশ্বর্যের অধিকারী বিত্তবান আর পরাক্রান্ত পুরুষ। এখানে মকরবাহনা উত্তরবাহিনী হয়ে রচনা করেছেন যেন মহাদেবের ভালের অর্ধ চন্দ্রখানা। কাশীতে গঙ্গার রূপও অদ্ভুত। শঙ্খের মত গড়ন। শঙ্খের মুখখানা খুলেছে গঙ্গার সীমানায়। নারায়ণের পাঞ্চজন্য, অসুরের অস্থিতে গড়া মঙ্গলের জয়ধ্বনি। এটা তাই বৈষ্ণবেরও পরম তীর্থ। রামভক্ত রামানন্দের শিষ্য কবীর, রায়দাস, পদ্মাবতী সুরেশ্বরী কত ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারা থেকে এসে মিলেছিলেন গুরুর আহ্বানে। সারনাথ বা তদানীন্তন ঋষিপত্তনে ধর্মচক্রেরও জন্ম। জৈন তীর্থ-তীর্থঙ্কররাও বারাণসী বাদ দেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে কাশীর যোগেই বোধ হয় বাংলার এত মানুষ মেতেছিল কাশীধামের পথে পথে। সুদূর বৃন্দাবনে যেমন পাবেন অসংখ্য বাঙালী। মুক্তির আশায় প্রেমের নেশায় বৃন্দাবনের পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ছেন সাধক সাধিকা, সম্পন্ন আর সম্বল-হীনা। ললিতা সখির মন্দিরে খঞ্জনি আর মন্দিরাতে মেতেছেন সধবা আর বিধবা।

সমান ঠাঁই সেখানে। কৃষ্ণ যে সবার পতি। কাশীও ঠিক তেমনই। অনন্তদেবের চরণতলে এনেছেন সবাইকে। অনাথা কেউ নয়।

কাশী নাম মাহাত্ম্যও কেউ ব্যাখ্যা করেন আধ্যাত্মিক আলোকে বলে। মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে যে বৈরাগ্যের বাণী প্রতিমুহূর্তে জানাচ্ছে তাতে সংসার থেকে দূরে এসে আসক্তি ভোলা সহজ হয়। অন্তত নিজের কথা বলতে পারি, এমন অদ্ভুত অনুভূতি আমার কোনদিন কোথাও হয়নি। কাশীর গলিতে গণিকার উচ্ছল কলহাস্য শুনেছি, মন্দিরে পাণ্ডার আচরণে মন বিষিয়ে উঠেছে, বাজারে গজদন্ত আর রেশম জরির বাহার দেখেছি, সুগন্ধি তাম্বুলের রস গ্রহণের সুযোগ হয়েছে, আতর আর জর্দা, [illegible] চূড়াচূড়িতে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেছে, কিন্তু দশাশ্বমেধ ঘাটের জলে ভেজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে মাঝি মাল্লার নৌকোতে গঙ্গার অর্ধ চন্দ্র পরিক্রমাতে কাশীর যে রূপ দেখেছি তা অন্তরের গভীরের জিনিস, বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই।

এমন করেই তর্ক বন্ধ করে নামতে নামতে তখন শুনেছি পাশাপাশি [illegible] কথা বিহার...তখন মনে হয়েছে আমাদের এই হৃদয়হীন সমাজের অক্টোপাসের মত পাশ-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য সত্যই অভিমুক্তেশ্বরের আশ্রয় দরকার। মোক্ষদাও এই কথাই বলছিলেন। ঘাটের পথের মধ্যে পাশে যে তরিতরকারির পসরা বসে সেখানে উবু হয়ে বেগুন কিনছিলেন এক মনে। ধপধপে সাদা থান পরা, সোনার মত সুগৌর বর্ণ, বয়সের তুলনায় সুঠাম সুন্দর দেহ, হাতে বেশ বড় বোঝা। সব মিলে আত্ম-বিশ্বাসের ছবি বলে মনে হচ্ছিল। বিরাট একটি বাবার বাহন দেখে ভয় পেয়েছিলাম। তাই বর্ষীয়সী নির্ভীকভাবে এগিয়ে এসে অভয় দিলেন। কথায় কথায় পায় পায় চলেছি। কত যুগ যেন আমি তাঁকে জানি এমন সুন্দর মিষ্টি মুখের কথা। সম্পন্ন সংসারের মানুষ তিনি। কাশীতে কত কাল ধরে একা বাস করেন। মোক্ষ লাভের লোভ ততটা না থাকলেও আঁকড়ে রাখার মানুষ মেলেনি। সন্তানহীনা বিধবা এসে বসতি করলেন বাঙালীটোলার গলিতে। বাড়িখানা বড়। আগে থেকেই পারিবারিক সম্পত্তি। মোক্ষদা বাড়িটুকু ভরসা করেই রয়ে গেলেন। বাকি সম্পত্তি সব আপন জন আর আত্মীয় স্বজন ভাগ করে নিয়ে তাঁকে বঞ্চনা করবে ভেবেছিল। বঞ্চিত তিনি হননি। কারণ, কাশীতে এসে বিশ্বনাথের চরণে পৌঁছে প্রথম উপলব্ধি করেছেন তিনিও একটি

মানুষ, তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ পূজা নিবেদন করেছেন ঈশ্বরকে।

বাড়িখানা তাঁর ভাল। বিজলী বাতি আছে, কলের জল আছে। নিজের জন্য সামান্য অংশমাত্র রেখে বাকি সবটুকু ভাড়া দেন। নইলে আজকের বাজারে চলে কী করে? সেদিন কি আর কাশীরই আছে? এক সময় চার আনা পয়সা দিলেও শুনেছি মাথা গুঁজবার কোণটুকু পাওয়া যেত। আট আনা দিলে তো কথাই নেই। তখন বৃদ্ধা বিধবরা পাঁচ দশ টাকা মাসে খরচা করে কাশীবাস করতেন। কেউ বা সচ্ছলভাবে থাকতেন, কেউবা কায়ক্লেশে। মোক্ষদা দেবী বলছিলেন কত বিত্তবান পুত্রের মা অন্ধকার ঘরে কেরোসিনের ডিবে জেলে কোনরকমে আতপসৈন্ধব এক বেলা খেয়ে পারের পাটনির পথ চেয়ে দিনাতিপাত করেছেন। কখনও তাঁরা পুত্রের পাঠানো সামান্য দু চার টাকা হাতে পেয়েছেন, কখনও বা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তুলেছেন। মোক্ষদা দেবীর সেদিক থেকে ঝামেলা নেই। খোঁজ নেবার মানুষও নেই। তবে হ্যাঁ, কখনও দুটো মনের কথা বলবার জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। তেমন ভাব-ভালবাসার মানুষ পেলে বিনাপয়সায় ঘরে থাকতে দিতে রাজি আছেন। বিধবারা আগেও কাশীতে অল্প-বিস্তর কাজ করে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতেন। এখনও করেন। কারও বা কাশী-বাসের শুরুতে সামান্য সাহায্য আসে, পরে সবাই ভুলে যায়। তখন শক্তি থাকলে কাগজের ঠোঙা বানিয়ে ছোটখাটো কার-খানায় পর্যন্ত সামান্য সহজ কাজ করে উপার্জন করেন। সবচেয়ে বেশী করেন এঁরা রাঁধুনির কাজ। এই পাচিকাবৃত্তিও পুরোনো পেশা। কেউ-বা ভিক্ষাও করেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজ করেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছে বাস করলে ভিক্ষা বেশী মেলে। ভোরে গঙ্গাস্নান সেরে, দেবদর্শন করে ভিক্ষা করেন। ভিক্ষালব্ধ অর্থে চলে না বলে তারপর দুটি ভাতেভাত ফুটিয়ে খেয়ে অন্য কাজ করতে বের হন। কেউ কাঁথা সেলাই করেন, কেউ-বা বড়ি দেন অথবা পাঁপর তৈরি করেন।

মোক্ষদা বললেন, কারও বা ঘর নেবার অথবা কারও সঙ্গে ঘরের অংশমাত্র নেবারও সঙ্গতি থাকে না। তাঁরা কোন মন্দিরের কোণে আশ্রয় নেন। মালিকবিহীন বড়-লোকের বাড়িতে পাহারা হিসাবেও থাকে। একেবারেই অক্ষম বৃদ্ধারা কেউ কেউ সর-কারী পেনসন পান। পেনসনের অঙ্ক কুড়ি টাকা মাত্র। তাও কি আর সবটা মেলে? অল্প বিস্তর অপাত্রেও যায়, আবার কখনও পেনসনের পয়সার অংশ গচ্চা না দিলে কাজ হয় না। মোক্ষদা দেবীর কাছে এমন অনেক বিধবা আসেন তাঁদের দুঃখের কাহিনী শোনাতে। তবে এত সব সত্ত্বেও আত্মার মুক্তির আলো অনেককেই স্পর্শ করে। ভিক্ষালব্ধ সামান্য অর্থ থেকেও দু' চার পয়সা কাশীবাসিনীরা আতুর আর্ত ভিখারীকে দেন।

দেশ বিভাগের পর ভেসে আসা বাস্তু-হারা বরিশালের একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মোক্ষদা দেবী। ঝালকাঠি না সিদ্ধকাঠি বাড়ি তার। বাপের বাড়ি ছিল হাতিয়ায়। যে হাতিয়া ভেসে গেল এবার। হাতিয়ার হেরম্ব মোক্তারের মেয়ে।

আমি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ শোনামাত্র হাউমাউ করে উঠলেন হেরম্ব মোক্তারের মেয়ে হৈমবতী। হাতিয়া জানেন তো? নোয়াখালি থেকে যেতে হয়। মেঘনা নদীর মোহানায় হাতিয়া আর সন্দীপ। 'লোকে কয় কাশীর পেয়ারা। আমাগো হাতিয়ার বাসায় যে গৈয়া আছিল, কাশীর পেয়ারা লাগে কোথায়!' হাতিয়ার হৈমবতী সধবা না বিধবা, তা' সে নিজেই জানে না। স্বামীর সংবাদের সম্ভাবনা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শোক ভুলতে হয়েছে পেটের জ্বালায়। এসেছিল তন্বী তরুণী বধূটি। পাড়াপড়শীর সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। তাদেরই এক দলের সঙ্গে পৌঁছেছিল কাশীতে। এখন কে কোথায় ছিটকে গেছে। হৈমবতী গতর খাটিয়ে দিন চালাচ্ছে। তার সঙ্গে ছিল পটুয়াখালির নিবারণ পণ্ডিতের স্ত্রী। শক্ত সমর্থ মহিলা আপন-জন হারিয়ে যেন কেমন হাবাগোবা হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে চকচকে শ্যামবর্ণ কেমন যেন পোড়াকাঠ হয়ে গেল, দাঁত গেল, চোখেও ঝাপসা দেখেন। সরকারী একখানা বাড়িতে আরও পাঁচজন বাস্তুহারা অক্ষম বিধবাদের সঙ্গে তিনি থাকেন। মাসে ২৩ টাকা পেনসন পান। হৈমবতী মাঝে মাঝে দেখে আসেন।

পাঁচ বা ছয় টাকায় যে ঘর মেলে তা বলতে গেলে অন্ধকূপ। ঘুলঘুলির মত জানালা দিয়ে নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাস ঢুকলেও আলো ঢুকতে পারে না। কোথাও বা গলির রাস্তা এত সরু, যে পাশাপাশি দুটি মানুষ হেঁটে যেতে পারে না। চারদিকে উঁচু সব বাড়ি। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। তবু আত্মীয় আপনজনের অবজ্ঞার চেয়ে বুঝি ভাল। এমনভাবে বাস করেও এঁরা কেউ পয়সা জমান। যদি প্রয়োজন হয়। যদি একান্ত অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়। যাঁর পয়সা পোস্ট অফিসে জমা থাকে তা যায় সরকারের তহবিলে। যাঁর পয়সা থাকে বালিশের ওয়াড়ের মাঝে অথবা চালের টিনের তলায়, তা যায় পাড়ার বখাটে বাবুদের পকেটে।

কাশীর বাঙালী জীবনের বিশেষত্ব এই বিধবরা। তাই মোক্ষদা দেবীকে পেয়ে দু' চার কথা জানতে ইচ্ছা হয়েছিল। পাশ্চাত্য কৃষ্টিতে রোমকে বলা হয় শাশ্বত শহর। কিন্তু রোম যখন জন্মায়নি তখনও কাশীর নিত্য অবিনশ্বর অস্তিত্ব বেদে, পুরাণে, মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে। অনাদি অনন্ত, অপরিবর্তনীয় কাশীধাম সমাজের পরি-বর্তনকে বুকে পেতে নিয়ে আবার আর কোন ভূমিকায় বাঙালীর আত্মিক জীবনকে জড়িয়ে রাখবে কে জানে? হৈমবতী বা মোক্ষদা থাকবেন না। তা বলে কি বাঙালী মেয়ের কোন সমস্যা থাকবে না?

শ্রীমতী

সংবাদভাষ্য

গত ৫২ সংখ্যা দেশে রূপদর্শী বাংলা দেশের যে চিত্র এঁকেছেন তা যদিও মর্মান্তিক কিন্তু তবুও তা বাস্তব। রূপদর্শী যে তিনটি কারণকে (যথা উদ্বাস্তুর চাপ, খাদ্য সঙ্কট, শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয়) বাংলাদেশের বর্তমান সংকটময় অবস্থার জন্য দায়ী করেছেন, আমার মতে তার সঙ্গে আরো একটা প্রধান কারণ যোগ দেওয়া উচিত। সেটা হচ্ছে অধিকাংশ বাঙালীর কাজের প্রতি অনীহা। আবহাওয়া বা শারীরিক অপটুতার জন্য এটা চিরকালই বাঙালীর মধ্যে অল্প বিস্তর ছিল কিন্তু বর্তমানে তা প্রকট হয়ে উঠেছে। আজ অধিকাংশই সামান্যতম পড়াশুনা না করেই পরীক্ষায় পাস করতে চায়, আফিসে নির্দিষ্ট কাজ না করেও বেশী মাহিনার জন্য আন্দোলন করে এবং নাগরিক হিসাবে নিজেদের সামান্য দায়িত্বটুকুও পালনে অস্বীকার করে সরকারের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে চায়ের টেবিলে তুফান তোলে। বাংলা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলই এর জন্য কমবেশী দায়ী। কার্যতই বাংলাদেশের অনেক সমস্যা আছে কিন্তু সেগুলো সমাধানের জন্য কোন নেতাই বাঙালীদের আপ্রাণ পরিশ্রম করতে বলেন নি বরং তাঁরা পথ দেখিয়েছেন যে চালাকী দ্বারাই কার্য উদ্ধার করা যায়।

তার ফলে আজ এমন একটা অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে যে যখন প্রত্যেক বাঙালীকে কঠোর শ্রম, সততা ও নিষ্ঠা দ্বারা প্রতিকূল অবস্থা দূর করে নতুন প্রভাতের আলো আনতে হবে তখন তারা হাল ছেড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে অর্থহীন সমালোচনায় মত্ত হয়ে দেশকে চিরস্থায়ী অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যখন দেখি ভারতবর্ষের অন্যান্য অনুন্নত প্রদেশের লোকেরা কঠোর শ্রমের দ্বারা নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি করছে তখন বাঙালীরা তার উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিজেদের নিশ্চেষ্টতার জন্য দিনদিন খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা থেকে উন্নত হওয়া সবার জন্যই চাই নিরলস সংগ্রাম—কেবল ফাঁকা উত্তেজক বক্তৃতা দ্বারা মাঠে ময়দানে লোক সমাবেশের দ্বারাই দেশকে উন্নত করা যায় না। যাক দ্বারা যায় তার কথা কিন্তু কোন নেতাই এখানে বলেন না, হয়ত এই ভয়ে যে ফাঁসী দিতে উৎসাহিত করে যত জনপ্রিয়তা অর্জন করা এখানে সম্ভব, অধিক কাজের আহ্বানে তা সম্ভব নয়। সৎ নেতৃত্ব ছাড়া বর্তমান বাংলার অন্ধকারকে দূর করা আমার মতে সম্ভব নয়।

অমরেশ রায়
কলিকাতা—৩৫

'সত্যান্বেষী'

'সত্যান্বেষী' গল্পেই ব্যোমকেশ বক্সীর প্রথম আবির্ভাব—এই রকম একটি ধারণা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠক মহলে প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে রসিকজনের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করছি।

রচনাকাল অনুসারে ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্প হল 'পথের কাঁটা' (৭ই আষাঢ়, ১৩৩৯)। তারপর 'সীমন্তহীরা' (৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯)। 'এই দুটি গল্প লেখার পর', শরদিন্দুবাবুর নিজের কথায়—'ব্যোমকেশকে নিয়ে একটি সিরিজ লেখার কথা মনে হয়। তখন 'সত্যান্বেষী' গল্পে (২৪শে মাঘ, ১৩৩৯) ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে এস্‌ট্যাবলিস করি। পাঠকদের সুবিধের জন্য অবশ্য 'সত্যান্বেষী'কেই ব্যোমকেশের প্রথম গল্প বলে ধরা হয়। কালানুক্রমিক না হলেও অম্নিবাসের ব্যোমকেশ খণ্ডেও 'সত্যান্বেষী'কে প্রথমে রাখতে হবে।'

১৩৩৯ সন থেকে ১৩৪৩ সন পর্যন্ত ব্যোমকেশকে নিয়ে দশটি গল্প লেখার পর দীর্ঘকাল শরদিন্দুবাবু সত্যান্বেষীর কথা ভাবেননি। এই সময় উনি একবার বোম্বাই থেকে কলকাতায় আসেন; তখন পরিমলবাবুর (গোস্বামী) বাড়ির ছেলেমেয়েরা ওঁর কাছে অভিযোগ করেন—কেন আপনি ব্যোমকেশকে নিয়ে আর লিখছেন না? এ শুনে ওঁর মনে হয় এখনকার ছেলেমেয়েরা তাহলে ব্যোমকেশকে চায়। আবার উনি ডিটেকটিভ গল্পে হাত দেন। দীর্ঘ বিরতির পর ১৩৫৮ সনের ৮ই পৌষ 'চিত্রচোর' গল্পটি লেখেন। সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যোমকেশ ওঁর সঙ্গী। গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে ব্যোমকেশ সিরিজে মোট ৩২টি কাহিনী রচনা করেছেন।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে শরদিন্দুবাবু আর একটি ব্যোমকেশের গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন: সে লেখাটি অবশ্য শেষ করে যেতে পারেননি।

শোভন বসু
কলকাতা-৩০

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে

গত ১০ই অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় রূপদর্শীর সংবাদভাষ্যে ইন্দ্র মিত্র রচিত 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তারই একটা প্যারাগ্রাফে আছে:

"১৯২৫ সালের ২১ এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকা মন্তব্য করেছে: "সম্প্রতি আর এক লজ্জার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া কন্যা এখন যারপরনাই দুর্দশাগ্রস্তা, তাঁহাদের অন্ন জুটে না। পরের আশ্রয়ে কোনরূপে জীবন কাটাইতে হয়। দ্বিতীয়া কন্যা সন্তানাদি লইয়া কাশীতে অতি দীনভাবে কোনরূপে আছেন। তৃতীয়া কন্যা একটি মাতীয় বাড়ীর এক পার্শ্বে তাহারই দয়ায় স্থান পাইয়া বাস করিতেছেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার

রায় বিনোদিনী দেবী। তাঁর স্বামী ছিলেন সূর্যকুমার অধিকারী, যিনি প্রথমে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। পরে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের প্রথম অধ্যক্ষ, আরও পরে বালুচর এস্টেটের ম্যানেজার। সূর্যকুমার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর মুর্শিদাবাদ জেলায় বালুচরে চাকরি নিয়ে চলে আসেন এবং সেখানেই পাকাপাকিভাবে থেকে যান। তাঁর তৈরি বাড়ি তাঁর পৌত্রেরা এখন ভোগ করছেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কখনও ছাড়াছাড়ি হয়নি; এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবী ১৯১৮ সালে বালুচরেই স্বামী, পুত্র, কন্যা পরিবেষ্টিতা অবস্থায় মারা যান। সুতরাং আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৫ সালে তাঁর পক্ষে কাশীবাসী হয়ে নিতান্ত দুর্দশায় দিনাতিপাত করা সম্ভব ছিল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনী দেবীর স্বামীর নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৫ সালে তাঁর প্রথম পুত্র যোগেন্দ্রনাথ পুলিস বিভাগে, দ্বিতীয় পুত্র নগেন্দ্রনাথ কলকাতা কর্পোরেশনে এবং কনিষ্ঠপুত্র উপেন্দ্রনাথ বাংলা সরকারের চাকরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ অবস্থায় ঐ সময়ে "সন্তানাদি লইয়া কাশীতে অতি দীনভাবে কোনরূপে আছেন"—এ মন্তব্য নিতান্তই অবাস্তব বলে মনে হয় না কি?

আসলে সংবাদপত্রে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তাই প্রামাণ্য সত্য নয়। ঐতিহাসিককে যাচাই করে দেখতে হয়। উপরোক্ত তথ্য এখনও যাচাই করে দেখা সম্ভব। এঁদের উত্তরপুরুষেরা রয়েছেন; এঁদের ভালো করে চিনতেন এমন লোক এখনও জীবিত। যাচাই করে না রাখলে একটা অসত্য "লজ্জাকর ইতিহাস" বলে চালু হয়ে যাবার বিপদ রয়েছে।

আমার এই চিঠিটি 'সংবাদভাষ্যে' উদ্ধৃত একটি তথ্যের উপরই নিবদ্ধ। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙ্গে যে লজ্জাকর ঘটনা ঘটানো হয়েছে, সে সম্পর্কে রূপদর্শী যে তীব্র অনুভূতিকে রূপ দিয়েছেন, তা যথার্থ হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমি একমত।

শ্যামল চক্রবর্তী
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাখা,
বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন,
কলিকাতা

ছাত্র-বিদ্রোহ—একটি মূল্যায়ন

আমি আপনার জনপ্রিয় 'দেশ' পত্রিকার একজন অনুরাগী পাঠক। 'দেশ'-এ মাঝে মাঝে সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে যে সব আলোচনা প্রকাশিত হয় তা সত্যই প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের 'ছাত্র বিদ্রোহ— একটি মূল্যায়ন' (দেশ—২৩শে আশ্বিন ৫০ সংখ্যা) অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

শ্রী চক্রবর্তী ছাত্রদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উগ্রপন্থী এবং হিংসাত্মক রাজনীতির প্রভাবের কারণ অত্যন্ত সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, উন্নত দেশগুলিতে ছাত্র বিদ্রোহের কারণ যাই হোক না কেন, আমাদের দেশে প্রধানতম কারণ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। পড়াশোনা শেষ করে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তাই ছাত্রসমাজের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এই ক্ষোভ ও হতাশাই বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে আরো পরিষ্কারভাবে বোঝানো যেতে পারে। একযুগ আগেও সাধারণ আর্টস ও সায়েন্স কলেজগুলিতে যখন বামপন্থী রাজনীতি অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয় ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়ম শৃঙ্খলার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব ঐ সব প্রতিষ্ঠানে নগণ্য ছিল বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। অধিকাংশ ছাত্রই শিক্ষা সমাপনান্তে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত থাকায় রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হয়নি। ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে তীব্র বেকার সমস্যা দেখা দেওয়ায় আজ ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই উগ্রপন্থী রাজনীতির পুরোভাগে। জলপাইগুড়ি ও দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দুটি অনির্দিষ্টকাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যাদবপুরে এখনো সুস্থ অবস্থা ফিরে আসেনি। শিবপুরের অবস্থাও সংকটজনক।

ছাত্র বিদ্রোহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে বলে মনে করি। শ্রী চক্রবর্তী সম্ভবত এই কারণটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন নি। সেই কারণেই অনুল্লেখ রেখেছেন। এই কারণটি হল শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের বিশ্বাস ও আস্থার অভাব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ক্ষেত্রে এত বেশী দুর্নীতি ও অযোগ্যতা অনুপ্রবেশ করেছে যে ছাত্ররা এর প্রতি বিন্দুমাত্রও আস্থা পোষণ করতে পারছে না। ক্ষমতার অপব্যবহার, পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ, ছাত্রদের সামগ্রিক কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষানিয়ামকদের ছাত্র সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। পরীক্ষা পরিচালনাক্ষেত্রে নাক্কারজনক দুর্নীতির দৃষ্টান্ত গত বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের এম এ পরীক্ষার ব্যাপারেই প্রকাশ পেয়েছে।

কলেজ শিক্ষক হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এমন সব দৃষ্টান্ত দিতে পারি যাতে লজ্জায় অধোবদন হতে হবে। টুকে পাস করার সহজ রাস্তা ছাত্রদের আমরাই দেখিয়ে দিয়েছি। কেননা পয়সা রোজগারের উন্মত্ত লালসায় সস্তা নোটবই লিখে টোকার উপকরণ ছাত্রদের হাতে আমরাই তুলে দিচ্ছি। বাজারে Sure success, Sure pass জাতীয় বইপত্রের ছড়াছড়ি দেখে ব্যাপারটা যে কতদূর গড়িয়েছে সহজেই বোঝা যায়। এইসব বই যাঁরা লেখেন তাঁরা অনেকেই প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক। নিজেদের বই-এর কাটতি বাড়াবার জন্য বাছাই করে ওই সব বইগুলির সাথে সঙ্গতি রেখেই প্রশ্নও করা হয়। শিক্ষাজগতে দস্তুরমত racketeering চলেছে। আমাদের মত অর্থগৃধ্নু, চরিত্রহীন, লোভী ও স্বার্থপর শিক্ষকদের যদি ছাত্ররা শ্রদ্ধা না করে, এমন কি অপমান ও লাঞ্ছনাও করে খুব বেশী কিছু বলার আছে বলে আমি মনে করি না। ছাত্ররা আজ নেতৃত্বহীন ও উদভ্রান্ত। স্বাভাবিক নেতৃত্ব যাঁরা দিতে পারতেন তাঁরা আজ ভ্রষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত। শোষণহীন, ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন তরুণ সমাজের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাদের মধ্যে একটি অংশের এ বিষয়ে আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

সমস্যা হচ্ছে কোন্ পথে এই পরিবর্তন আসবে। এঁরা ক্রোধে দিশেহারা হয়ে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করছেন একথাও হয়ত ঠিক। কিন্তু এ বিষয়ে শুধু সদুপদেশ দিয়ে কোন কাজ হবে বলে আমি মনে করি না। আমরা শিক্ষকরা, এ বিষয়ে সামান্য কিছু নিশ্চয়ই করতে পারি। অন্ততঃ আমাদের আচার আচরণে সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এঁদের আস্থা ফিরে পাবার চেষ্টা করতে পারি। আমূল পরিবর্তন অবশ্যই রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত না হলে হবে না। ততদিন দার্শনিক সুলভ ঔদাসীন্য দিয়ে এই সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা কি ঠিক হবে?

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি আমাদের অস্তিত্বের সমস্যার সাথে জড়িত। আশা করি 'দেশ'-এ এ বিষয়ে আরো সুচিন্তিত আলোচনা প্রকাশিত হবে।

প্রভাস মজুমদার
প্রধান অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ,
রামপুরহাট

শিব্রাম

ছেলেবেলা থেকে অনেক প্রতিষ্ঠান দেখেছি। অনেক প্রতিষ্ঠান উঠে গেছে, অনেক নতুন গজিয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরক্ত রয়ে গেছি। সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম শিব্রাম। শিব্রাম চক্রবর্তী আমাদের বহুকালের সংগী, তাঁর লেখা পড়লে এখনো আমাদের সেই মোহময় শৈশব কৈশোরের কথা মনে পড়ে যায়, দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মনে হয়, বড় না-হওয়াই ভালো ছিল। বড়দের জগৎটা সুবিধের না।

শিবরাম চক্রবর্তীর জন্মদিন কবে জানি না, তাঁর পঞ্চাশ কি ষাট কি সত্তর বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করা যায় না, কারণ তাঁর নিজের জন্মসাল তিনি নিজেই জানেন না। রবীন্দ্রনাথের মতন তিনিও বলতে পারেন, 'সবার আমি এক বয়েসী জেনো'।

এক একটা ভাষায় ক্বচিৎ এমন এক একজন লেখক থাকেন, যাঁদের লেখা কখনো পুরোনো হয় না, যাঁদের লেখা ভালো-মন্দ বিচারের সীমায় থাকে না, দেখলে পড়তে হবেই—এমন নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। শিবরাম চক্রবর্তী সেই জাতের লোক।

ইদানীং তাঁর ছোটখাটো লেখাই চোখে পড়ে, সম্প্রতি তাঁর দুখানা নতুন বই পড়ার সুযোগ পেয়ে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করলাম। বই দুটির একটি ছোটদের, একটি বড়দের। শিব্রামের লেখা বড়দের বই-ও ছোটরা পড়লে কোনো ক্ষতি হয় কিনা, আমি ঠিক জানি না, কিন্তু তাঁর ছোটদের জন্য লেখা বইগুলি যে বড়দেরও সমান উপভোগ্য, তাতে কোনো দ্বিমতই নেই।

ছোটদের জন্য বইটির নাম 'কলকাতায় এলেন হর্ষবর্ধন'। এ সেই হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনের নানা বৃত্তান্ত। এই দুজন বাঙালী লরেল হার্ডিকে আমরা কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে চিনি, এদের যে-কোনো নতুন কান্ডকাহিনী জানার জন্য আমাদের কৌতূহল অপ্রতিরোধ্য। এই বইয়ের ভূমিকায় শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছেন যে মার্ক টোয়েনের 'ইনোসেন্টস্ অ্যাব্রড'-পড়ে তিনি প্রথম এই দুটি চরিত্র রচনার প্রেরণা পান, তারপর ফিলমের লরেল-হার্ডির ছায়া—সেই সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক বরেণ্য মনীষীর চরিত্রের আদলও তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। আমাদের তো মনে হয়, শেষের কথাটিই ঠিক, হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন এমনই চূড়ান্ত-ভাবে বাঙালী যে, বাইরে আর কোথাও তাদের তুলনা পাওয়া ভার।

আসাম থেকে কাঠের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা নিয়ে হর্ষবর্ধন আর তস্য ভ্রাতা গোবর্ধন কলকাতায় এসেছে। টাকা খরচ করার ঝঞ্ঝাট এবং ওদের নির্বুদ্ধিতা—ঠিক নির্বুদ্ধিতা নয়, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব—এই সব মিলিয়ে পদে পদে তুমুল কাণ্ড। কলকাতায় বাড়ি খোঁজা, ওদের বিয়ে, বড় হোটেলের পার্টি কিংবা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার বাসনা—এই সব ঘটনা বিছানায় এক পাশ ফিরে শুয়ে পড়া যায় না। মাঝে মাঝেই বই বন্ধ করে রেখে হো হো করে হেসে গড়াগড়ি দিতে হয়।

বলাই বাহুল্য, সব ব্যাপারগুলোই স্বাভাবিক ব্যাপারের উল্টোদিক। অর্থাৎ সাধারণ দৃশ্যকে উল্টোদিক থেকে দেখাবার দুর্লভ ক্ষমতা এই লেখকের আছে বলেই তিনি আমাদের এত আনন্দ দিতে পারছেন। কিন্তু, এইসব গল্পের ব্যাখ্যা খোঁজা এক বিড়ম্বনা মাত্র।

বড়দের বইটির নাম 'মেয়েরা হারাবেই।' আশা করি এই নামকরণ সম্পর্কে কারুর তর্ক করার বাসনা নেই। এমন কোন্ পুরুষ আছে, যাকে মেয়েরা কখনো হারায় নি। অবশ্য, এই হারানোর দুরকম মানে। মেয়েরা পুরুষদের হারায়, আবার তারা নিজেরাই মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়।

গল্পগুলির অধিকাংশই প্রণয়মূলক লঘু নির্মল রসের। 'সুন্দর মুখের 'Joy' কিংবা 'শিকার ঘাড়ভাগ' শিব-রামের হাতে কি রকম খুলবে, তা তো বোঝাই যায়। গল্পগুলির বর্ণনা দিতে গেলে সমালোচকের পক্ষে বেরসিকের পরিচয় দেওয়া হয়।

শিবরামের রচনার মধ্যে ফুটে ওঠে তিক্ততা বোধহীন, বিদ্বেষহীন একটি রসিক-মন। শিবরাম চক্রবর্তীর পুরো সাহিত্য জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয়, তাঁরা জানেন, ইনিই একসময় 'একদিন তারা কথা বলবে'র মতন সমাজ সচেতন নাটক ও 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী'র মতন প্রবন্ধ লিখেছেন। দেশের নানাবিধ সমস্যা, অনাচার, বৈষম্য বিষয়ে তিনি সচেতন, কিন্তু ও নিয়ে গরম গরম গালিগালাজ কিংবা রগরগে বাস্তবতা করার চেষ্টা করেননি, তিনি সূক্ষ্ম ঠাট্টা বিদ্রূপের মাধ্যমে সব ব্যাপারটাকে রসে জারিত করে দিয়েছেন।

এই ডামাডোলের বাজারে শিবরামের বই দুটি পড়ে কিছুটা সময় অন্তত মুক্তির আনন্দ পাওয়া যাবে। এই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বেঁচে থাকা জীবনে, খানিকটা প্রাণ খোলা হাসির সুযোগ পেলে ফুসফুস জোরালো হয়, বেঁচে থাকতে আর একটু ইচ্ছে করে। শিব্রাম আমাদের সেই সুযোগ দেন বলে দেশসুদ্ধু সকলের উচিত তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানো।

হোল্ডারলীন

এ বছর জার্মান কবি ফ্রিডরীশ হোল্ডারলীনের জন্মের দু শো বছর পূর্ণ হলো। ৭৩ বছর বেঁচেছিলেন এই কবি—তার মধ্যে অর্ধেক জীবনই কেটেছে অসুস্থ, জড়বুদ্ধি অবস্থায়। শুধু তাঁর অর্ধেক জীবনে রচিত দিব্যরসের কবিতাগুলির আবেদন এখনো অম্লান।

কিছুকাল আগে বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ ও প্রকাশ করেছেন হোল্ডারলীনের কবিতা। সেই সূত্রেই বাঙালী পাঠকদের কাছে ঐ কবির পরিচয়। জন্মদ্বিশত বৎসর উপলক্ষে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। 'ঈশ্বরদুহিতা' এই নামে। এই সব কাজে অলোকরঞ্জনের কৃতিত্ব বহুবিদিত। অনুবাদ কবিতাগুলি স্নিগ্ধ মধুর রসে সমুজ্জ্বল।

এ বছর কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থেরও জন্মের দু শো বছর পূর্ণ হলো। সে সম্পর্কে কারুর কোনো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না অবশ্য।

সনাতন পাঠক

রবীন্দ্রচর্চা

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ঃ সাহিত্য। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। নন্দরানী চৌধুরী। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ৪ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। আট টাকা।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক মূল্যবান আলোচনাসমূহের সংগ্রহের কাজে এক বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই সংগ্রহকার্যের প্রথম প্রয়াস হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থখানির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর নবীন প্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের দরবারে আবির্ভূত হন তখন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যাঁরা সুযোগ্যতার সঙ্গে লেখনী ধারণ করেছিলেন শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রভাবশালী সমালোচক হিসাবে শ্রীযুক্ত সমাজপতি সমসাময়িক বিদগ্ধজনের সোৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বর্তমান কালের পাঠকের কাছে শ্রীযুক্ত সমাজপতি রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচক হিসেবে যতখানি পরিচিত, নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবী হিসেবে ততখানি নন। অথচ, সুরেশচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির সম্যক পরিচয় ব্যতিরেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বর্তমান শতকের প্রথম দিককার বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির বিচার অপূর্ণ থেকে যায়, অসম্পূর্ণ থেকে যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার। বর্তমান বৎসরে শ্রীযুক্ত সমাজপতির জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে শ্রীনন্দরানী চৌধুরী অশেষ নিষ্ঠা ও শ্রমের সাহায্যে শ্রীযুক্ত সমাজপতির সাহিত্যকীর্তির পরিচয় গ্রন্থবদ্ধ করে বাঙালী পাঠককে ঋণবদ্ধ করলেন।

গ্রন্থখানি দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম পর্যায়ে সুরেশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যসেবা বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা একাধারে তথ্যবহুল এবং সুগ্রথিত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প কবিতা সমালোচনা লিখে শ্রীযুক্ত সমাজপতির সাহিত্যিক প্রতিভার উন্মেষ পরিচয়, সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁর কর্মদক্ষতা, তৎকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর নিকট-যোগাযোগ ও হৃদ্যতা, সমালোচক-ব্যক্তিত্ব, তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনার প্রকৃতি ও স্বরূপ, রবীন্দ্রবিরোধিতার কারণ, প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্রভক্তি, সাহিত্যের নব মূল্যায়ন, বিরূপ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া— সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত সমাজপতির বিচিত্র কর্ম ও কৃতিত্বের তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন শ্রীচৌধুরী।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়বস্তু রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক এবং সন্ধিৎসু পাঠকের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সমাজপতি যেসব মূল্যবান আলোচনা করেছেন তারই একটি সুনির্বাচিত সংকলন গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। এই সব আলোচনা যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধারার মূল্যায়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালিক 'সাধনা', 'পুরোহিত', 'ভারতী', 'প্রদীপ', 'উৎসাহ', 'নব্যভারত'(?), 'ভাণ্ডার', 'জাহ্নবী', 'প্রবাসী', 'দেবালয়', 'সুপ্রভাত', 'তত্ত্ববোধিনী', 'সবুজপত্র' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ গ্রন্থে উৎকলিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সমালোচনার ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্রের মতামত এবং ধারণা যে কতটা উদার, যুক্তিসহ এবং সশ্রদ্ধ ছিল তার পরিচয় এসব আলোচনায় ধরা পড়েছে। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশও যথেষ্ট মূল্যবান। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনা-প্রণালী সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সমাজপতির বক্তব্য অংশটি সাহিত্যরসিক পাঠকের কাছে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করবে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীযুক্ত সমাজপতির পত্রাদিবিনিময় অংশটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র সৃষ্টিধারার সম্যক অবধারণ বিষয়ে এবং সমালোচক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সমাজপতির সাহিত্য-কৃতির বিচারে গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম, এ কথা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করা যায়।

১৭৬।৭০

রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য। শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় কবি তাঁর কাব্যজীবনের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র কাজ করে গেছেন। সৃষ্টিপ্রাচুর্যের দিক থেকে শিশুসাহিত্য রচনায় কবির এই অবদান বৈচিত্র্যে এবং শ্রেষ্ঠত্বে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। পরন্তু, শুধু বিচ্ছিন্নভাবে শিশুসাহিত্য রচনা হিসেবেই নয়, কবি-রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিধারার পরিপ্রেক্ষিতেও এই প্রয়াস রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রসৃষ্টির এই স্বর্ণদিগন্তের মূল্যায়নে সমালোচক-সমাজে তেমন উল্লেখযোগ্য তৎপরতা এতাবৎ লক্ষ করা যায়নি। আনন্দের কথা, শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি 'রবীন্দ্রনাথ : শিশু-সাহিত্য' গ্রন্থখানি রচনা করে সেই অপূর্ব দিগন্তের রহস্য উন্মোচিত করলেন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের আলোচনায় সমগ্র বিচার-পদ্ধতিকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে সমসাময়িক শিশু সাহিত্য রচনার প্রয়াসের সঙ্গে অন্বিত করে আলোচনাকে সুস্পষ্ট করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। এবং শিশু-সাহিত্য রচনার পেছনে রবীন্দ্রনাথের মানসতা এবং মৌল প্রেরণার স্বরূপ সন্ধানে যত্নবান হয়েছেন। তথ্যসূত্র এবং কবি-প্রেরণার মূল সূত্রের সঙ্গে সংলগ্ন করে বিচাররীতিতে বিন্যস্ত করায় আলোচনা একটা সুপরিচ্ছন্ন, সতর্ক এবং সনিষ্ঠ সমালোচনার পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য রচনার উন্মেষকালের পূর্ববর্তী পর্যায়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের অবস্থা, 'বালক'-'মুকুল' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য রচনার উদ্যম, লোকসাহিত্যপ্রীতি এবং ছড়া সংগ্রহের পশ্চাতে শিশুসাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক, বিভিন্নজাতীয় রচনায় তাঁর স্রষ্টারূপের বিচিত্র বিকাশ, [illegible] প্রসঙ্গ এবং উক্তির সাহায্যে শিশু-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তির মূল্যায়ন বিষয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে তাৎপর্য দীপ্ত। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার রীতির মধ্যে যে সহিষ্ণুতা এবং বিশ্লেষণ-সামর্থ্য রয়েছে তা পাঠকমাত্রকে অভিভূত করবে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনারীতি এবং ভাষাব্যবহার তীক্ষ্ণ, তির্যক এবং গাঢ়বদ্ধ — যা প্রথম শ্রেণীর সমালোচনাপদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করে। গ্রন্থখানি বিদ্বজ্জনের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

১৬৩।৭০

প্রাপ্তি স্বীকার

সোনালী দিন। সুলতা সেনগুপ্ত বাণী মন্দির : এ ১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০।

ব্লাড ক্যানসার। উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সমেত প্রকাশন : ২৬ বাবুপাড়া রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। মূল্য ৩·০০।

রূপছন্দজগৎ

জাতীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

গত পনেরো বছরে দিল্লির বাইরে এই প্রথম চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (জাতীয় পুরস্কার) বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। মাদ্রাজে গত শনিবার (২১ নভেম্বর) এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম করুণানিধি। ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দফতরের মন্ত্রী ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ এবং ওই দফতরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী আই কে গুজরাল।

যে-কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের যোগ্য স্থান দিল্লি সন্দেহ নেই। কিন্তু অনুষ্ঠানটি যেহেতু ফিল্মজগৎ সংক্রান্ত তাই ভারতের প্রধান চলচ্চিত্র-প্রযোজনা কেন্দ্রে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা এক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। দিল্লির বাইরে পুরস্কার বিতরণ উৎসবে রাষ্ট্রের প্রধানদের উপস্থিত থাকা সব সময় সম্ভব না হতে পারে, তাতে হয়ত উৎসবের গ্ল্যামারও কিছুটা কমবে, কিন্তু অন্যদিকে আবার শোভাবর্ধনের সম্ভাবনাও রয়েছে। চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রধানরা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রাজধানী যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের শহরে থেকেই উৎসবের আকর্ষণ বাড়াতে পারেন। আসলে চলচ্চিত্র-শিল্পের 'পারটিসিপেশন' বা যোগদান দিল্লির বাইরেই আরও সহজ হয়ে ওঠে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র-প্রযোজক সমিতি (ইমপপা) এবারের এই রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানটি বয়কট করেছেন। বয়কটের কারণ 'ফালকে পুরস্কার' ভি শান্তারামকে না দিয়ে দেবিকারাণীকে দেওয়া হচ্ছে। এ-বছর থেকেই ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের পথিকৃৎ দাদাভাই ফালকের নামে কেন্দ্রীয় সরকার এই পুরস্কারের প্রবর্তন করেছেন। চলচ্চিত্রে যাঁদের অবদান বেশি এমন ব্যক্তিকেই সরকার এই পুরস্কার দেবেন। ব্যক্তি নির্বাচন করবেন সরকার। পুরস্কার পাবার উপযুক্ত ব্যক্তি যদি সরকারই নির্বাচন করেন তবে চলচ্চিত্রশিল্প-সংস্থার কাছে এ-ব্যাপারে সুপারিশ চেয়ে পাঠাবার দরকার কি? তাতে আরও মতান্তরের সৃষ্টি হয় না কি?

"প্রথম প্রতিশ্রুতি" (পরিচালনাঃ দীনেন গুপ্ত) ছবিতে নবাগতা সোনালী

বোম্বাই থেকে সুপারিশ এসেছিল প্রথম ফালকে পুরস্কার ভি শান্তারামকে দেবার জন্য। সরকার এই সুপারিশের মূল্য না দিয়ে দেবিকারাণীকে পুরস্কার দিচ্ছেন। চলচ্চিত্র-শিল্পে ভি শান্তারামের দান আছে, দেবিকারাণীর দানও কম নয়। এ-নিয়ে কোন কথাই উঠত না যদি সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের মতামত শুনতে না চাইতেন। আসলে ব্যাপারটা খুব 'ডেলিকেট', এ-নিয়ে মত-সংগ্রহ আরও অস্বস্তিকর। অনেকেই স্বীকার করবেন, যদি প্রথম ফালকে পুরস্কারের জন্য ভি শান্তারামের নাম উঠতে পারে তবে তারও আগে বি এন সরকারের নাম প্রস্তাব হওয়া উচিত। শ্রীশান্তারাম নিজেও হয়ত তা বলবেন। এ-নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বা মতান্তর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অতএব সরকার ভাল কাজ করবেন যদি কারো পরামর্শ না নিয়ে নিজেরাই এই নির্বাচন করেন। তাহলে চলচ্চিত্রশিল্পে অন্তত কোন অস্বস্তি দেখা দেবে না।

যাই হোক বয়কট সত্ত্বেও মাদ্রাজে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। কলকাতা থেকে পুরস্কার-বিজেতারা সকলেই গিয়েছিলেন। গত বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি 'ভুবন সোম'-এর নির্মাতা মৃণাল সেন, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি 'দিবারাত্রির কাব্য'-র নির্মাতা নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক, উর্বশী পুরস্কারে ভূষিতা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং ভরত পুরস্কার-প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা উৎপল দত্ত এবার বাংলাদেশ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। বোম্বাই-এর বাঙালী সংগীতকার শচীনদেব বর্মণও পুরস্কার প্রাপকদের অন্যতম। বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কার পেয়েছে নতুন পাতা ছবিটি।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

দক্ষযজ্ঞ
(সুজাতা মুভীজ)

বাংলায় ডাব করা দক্ষিণ ভারতের পৌরাণিক চিত্র এখানকার এক শ্রেণীর দর্শকের কাছে বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছে। এসব ছবিতে চাকচিক্য প্রচুর, আর থাকে অঢেল অলৌকিক ঘটনা তথা ক্যামেরার হরেক-রকম কৌশল। নাই বা রইল ভক্তির রস, দর্শক ফিল্মের ম্যাজিক দেখেই বোধ হয় খুশি হন বেশি। আলোচ্য দক্ষযজ্ঞ-র কথাই ধরা যাক। একাধিক মুহূর্তে শিব-সতীকে, যেভাবে ছবিটি তোলা, রোমান্টিক হিরো-হিরোইনের মতই লাগে। হয়তো অনেক দর্শকের কাছেই দৃশ্যগুলি পীড়াদায়ক। হয়ত অনেকের কাছেই নয়, কারণ জৌলুস এসব ছবির এত বেশি যে অনেকেই এই সব মারাত্মক দোষ উপেক্ষা করতে রাজি।

দক্ষযজ্ঞ ছবির প্রধান আকর্ষণ সম্ভবত দশমহাবিদ্যার রূপ ও শিবের প্রলয় নৃত্য দৃশ্যগুলি রঙিন। এ ছবির ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ছায়াছবির সাধারণ পাত্রদের মতই। তবে হিন্দী পৌরাণিক ছবির নারদের চাইতে এ ছবির নারদকে অনেক ভাল লাগে। এদের মাঝখানে দক্ষের দাপট ও বিনাশের কাহিনী যেভাবে বিন্যস্ত তা জায়গায় জায়গায় হাস্যকর। তবে বাংলা ভাষা আরোপের ফলে (সংলাপ : অরুণ রায়) ছবিতে কিছুটা আধ্যাত্মিক ও ধর্মভাব এসেছে। সংলাপ সত্যিই ভাল, অরুণ রায় রচিত দশমহাবিদ্যার বাংলা স্তোত্র রচনা ও অন্যান্য গানেও ভক্তিভাবের স্পর্শ মেলে। প্রধানত এই কারণে, বাংলা কথা ও গানের জন্য, বাঙালী দর্শকের কাছে ছবিটি আদরণীয় হবে হয়ত।

পিকনিক

"প্রথম কদম ফুল"-এর পর পরিচালক ইন্দর সেন রমাপদ চৌধুরীর সর্বাধুনিক উপন্যাস "পিকনিক"-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন। ইকানস ফিল্মস ছবিটির প্রযোজক।

নাট্য-সমালোচনা

পুনর্মিলন

(গান্ধার)

বুদ্ধদেব বসুর "পুনর্মিলন"-এর গঠনগত বা আঙ্গিকগত অভিনবত্বের কথা বলতে গেলে বেগস'-দর্শন বা ব্রেখট-রীতির কথা এসে যেতে পারে। কিন্তু নাটকটি আগাগোড়া দেখার পর ওই সব তত্ত্ব বা রীতির কথা মনেই থাকে না। নাটকটিতে একটা প্রচণ্ড ট্র্যাজেডির রস গড়ে তোলা হয়েছে ধাপে ধাপে, সংলাপে সংলাপে—সেখানে বিদেশের তত্ত্বগুলোও ক্রমশ কেমন যেন ফিকে হয়ে আসে, অথবা সেগুলির কোন মূল্যই আর শেষে অনুভব করা যায় না। নাটকটির গঠনভঙ্গি, সময়ের ভেদরেখা বিলুপ্তি কিংবা অ্যাবসার্ড ও অ্যান্টি-প্লে'র লক্ষণসমূহ হয়ত নাটকের রস ও বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে, কিন্তু সাহিত্যিক-নাট্যকার নাটকের এসব বাহ্য প্রকৃতি ও লক্ষণকে এমন এক রসের রাজ্যে উত্তীর্ণ করেছেন যে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনা ছাপিয়ে মানব সম্বন্ধের এক বিরাট "আয়রনি"র অভিজ্ঞতা এবং এক মর্মভেদী হতাশ্বাস আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে।

নাটকের নামের মধ্যেও আয়রনি। পুনর্মিলিত যখন নাটকের চরিত্ররা, তখন তারা ইহজগতে নেই। কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে এমন একটি জায়গা (সে কি পরলোক? নাকি নরক?) যেখানে তারা বন্ধ। বেরোতে পারছে না। নাটকটিতে এই রূপকস্থান একটি অখ্যাত স্টিমার-স্টেশন। জাহাজ আসবে, তারা পার হবে। কিন্তু পার হতে তারা পারেনি. একজনের অবশ্য জায়গা হল জাহাজে। নিষ্পাপ বলেই কি সে জায়গা পেল? নাট্যকার কি এখানে কর্মফলে বিশ্বাসী? ন্যায়-অন্যায় বোধে প্রভাবিত? অদ্ভুত ধরনের যে চা-ওলা তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছে সে কি বিধাতারই প্রতীক? এসব প্রশ্ন দর্শকমনে জাগতে পারে। কিন্তু নাট্যকারের বিশ্লেষণের প্রধান বস্তু মানুষের অস্তিত্বের যন্ত্রণা। জীবিতাবস্থায়ও বুঝি মানুষ তার নিজের তৈরি জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারে না। কল্পিত-লোকে তাদের বদ্ধতা কি এই অসহায়তারই রূপক?

নাটকটি ভাবায়, রসেও মন আপ্লুত করে। রস কখনও কঠিন। একটি দারুণ অপরাধ-বোধে পীড়িত নীলকণ্ঠ—সে ভুলতে পারছে না ওই মুহূর্তটি যখন তার বাবার অন্তিম অবস্থা তখন তার এ কী প্রবৃত্তি। জয়া তখন তার সঙ্গে। অন্তঃসত্ত্বা জয়া একদিন নিরুদ্দেশ। জয়ার ছেলে তার বাবার

"গীত" (পরিচালনা : রামানন্দ সাগর) হিন্দী ছবিতে রাজেন্দ্রকুমার ও মালা সিন্হা

পরিচয় পেল অনেক দেরিতে। তার আগেই সে তার বাবার অপঘাত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। অপঘাত মৃত্যু সকলেরই—নীলকণ্ঠর, জয়ার, তাদের ছেলে শিবেন্দুর এবং মদন পালের। মদন পালই দুষ্টগ্রহের মত এসে হাজির হয়েছিল জয়ার জীবনে।

অপঘাত-মৃত্যুও বুঝি কোন কিছুর প্রতীক, আজকের মানুষের আত্মিক অপঘাত-মৃত্যুর ব্যঞ্জনা কি? ওই যে কল্পিত এক স্টেশনে চারটি সত্তার বন্ধ হয়ে থাকা, সেও কি মরে বেঁচে থাকার প্রতীক? নাটকটি দেখার কালে দর্শকের মন এমনি সব চিন্তা বা প্রশ্নের সূত্রে জড়াতে থাকে। চমৎকার সংলাপ এবং ঘটনা বিন্যাসের নব্যরীতির মধ্য দিয়ে নাটকের রস ও চিন্তা আরও বেশি করে অনুভব করা যায়।

নাটকের নতুনত্ব নাট্যনির্দেশনায় (অসিত মুখোপাধ্যায়-কৃত) প্রতিফলিত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ছাদে নীলকণ্ঠ ও জয়ার মিলনের মুহূর্তে নেপথ্যের আর্তনাদ দিয়ে একটি প্রচণ্ড নাট্যক্রিয়া সৃষ্টি। পাত্র-পাত্রীদের মঞ্চের বিশেষ স্থানে ও কোণে দাঁড় করিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সময়ের ইলিউশন রচনার কৌশলটিও দেখবার মত। অভিনয় প্রায় প্রত্যেকেরই উন্নতমানের। সীতানাথ চৌধুরী (নীলকণ্ঠ), অচিন্ত্য চক্রবর্তী (মদন পাল), গীতা চক্রবর্তী (জয়া), গৌরী রায় (অরুণা), উদয় ভট্টাচার্য (শিবেন্দু) এবং ভবরূপ ভট্টাচার্য (চা-ওলা)—এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বিশেষ প্রশংসনীয় উদয় ভট্টাচার্যের অভিনয়। গান্ধারের এই টিম-ওয়ার্ক কৃতিত্বপূর্ণ।

পিন্টু বসুর আলোকসম্পাত বেশ ভাল। ভাস্কর মিত্রর আবহসংগীত নাটকের বিভিন্ন মুডের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে।

শঙ্করস্কোপ—শ্রীউদয়শঙ্করের নতুন উদ্ভাবন

মঞ্চে শ্রীউদয়শঙ্করের পর পর কয়েকটি এক্সপেরিমেণ্ট-এর কথা সম্ভবত দর্শকরা আজও ভুলতে পারেননি। একের পর এক শ্যাডো-প্লে—রামলীলা, ভগবান বুদ্ধ

"শঙ্করস্কোপ"-এর একটি দৃশ্যে পালি গুহ ও সাধন গুহ

সামান্য কাছে, প্রকৃতি-আনন্দ কি ভোলা যায়? শিল্পী এবার উপস্থিত করছেন "শঙ্করস্কোপ"। গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীউদয়শঙ্কর বলেছেন—গত কুড়ি বছর ধরে আমি একটি অভিনব প্রোডাকশনের কথা ভাবছি। সেটিই শঙ্করস্কোপ।

কী সব অসুবিধার জন্য তিনি আরও আগে শঙ্করস্কোপ দর্শকদের সামনে পেশ করতে পারেননি শিল্পী তাও বলেছেন। এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই ভ্যারাইটি শো'র আঙ্গিক ও প্রকরণের ব্যাপারে তাঁকে কত ভাবতে ও গবেষণা করতে হয়েছে তাও তিনি ব্যক্ত করেন।

শঙ্করস্কোপ, এক কথায়, রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমার সমন্বয়। শ্রীউদয়শঙ্কর বলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় এই ধরনের একটি কৌশল অবশ্য উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে আমি নতুন কিছু দিতে পারব।

শঙ্করস্কোপ প্রণালীতে নৃত্য, সংগীত, নাটক, ম্যাজিক ইত্যাদি দেখানো যাবে। শিল্পীকে দেখা যাবে ছবির পর্দায়, পরক্ষণেই মঞ্চে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই কৌশল আবিষ্কৃত।

আগামী ৮ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে শঙ্করস্কোপের উদ্বোধন হবে। দু' মাস চলবে। এই প্রদর্শনীর প্রযোজক শ্রীরণজিৎমল কাঁকরিয়া জানান, শঙ্করস্কোপের যদি তেমন জনপ্রিয়তা দেখা যায় তবে প্রদর্শনী দু' মাসের বেশীও চলতে পারে।

সাংবাদিক সমাবেশে সেতারী ইন্দ্রনীল

তরুণ সেতারী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য অতি সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরেছেন। গত বছর আগস্ট মাসে তিনি [illegible] কার "আলী আকবর কলেজ অব মিউজিক"এ শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে। বিদেশবাসের অভিজ্ঞতা জানাবার জন্য তিনি সাংবাদিকদের ডেকেছিলেন গত ২০ নভেম্বর বিকেলে রক্সি সিনেমার মিনি-প্রেক্ষাগৃহে।

মুখ খোলবার আগে হাত খুললেন ইন্দ্রনীল। ইমন-কল্যাণের আলাপে অচিরাৎ মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলেন ছোট আসরের স্বল্পসংখ্যক শ্রোতাকে। প্রায় সোয়া ঘণ্টার অনুষ্ঠান। সেতারের তারে শিল্পীর করাঘাত শ্রোতাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতেও ঘা দেয়। আগেও তাঁর বাজনা শুনেছি, কিন্তু এখন তাঁর হাতের কাজ আরও পরিণত। অমরকুমারের হাতে তবলা সম-তালে সহ অনুরাগে বেজেছে ইন্দ্রনীলের সেতারের সঙ্গে।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ফটো—দেশ

যন্ত্রের আলাপের পর মৌখিক আলাপ। ইন্দ্রনীল বললেন, আমেরিকায় সাধারণ মানুষের মনে ভারতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তা শেখার প্রেরণা এসেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে এই লক্ষণটি প্রবল। "আলী আকবর কলেজ অব মিউজিক"-এর যাঁরা শিক্ষার্থী তাঁদের অনেকেই ওখানকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মিউজিসিয়ান।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য মনে করেন, আমেরিকায় ভারতীয় সংগীতের কদর আরও বাড়বে। কয়েক মাসের মধ্যে ইন্দ্রনীল আবার আমেরিকা যাচ্ছেন শিক্ষকতার কাজে। এখানে জানুয়ারী মাসে তাঁর পিতা তিমিরবরণের সঙ্গে একটি অর্কেস্ট্রায় বাজাবেন। বিদেশেও কয়েকটি অর্কেস্ট্রা কম্পোজ করে ওঁদের কলেজের শিক্ষার্থীদের দিয়ে বাজিয়েছেন। ওই ব্যাপারটায় খুব আকর্ষণ বোধ করেছে ওখানকার শিক্ষার্থীরা।

শেষ পর্বে সকলের অনুরোধে আরও একবার যন্ত্র নিয়ে বসলেন শিল্পী। এবারে কাফিতে একটি গৎ বাজালেন। শিল্পীর হাতটি সত্যিই মনোরম।

—দিবাকর বর্মা

"স্ত্রীর পত্র" (পরিচালনা : পূর্ণেন্দু পত্রী) ছবিতে শ্যামল ঘোষ ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

বোম্বাই বিচিত্রা

'ভাবনা চিন্তা' সকলেরই আছে, কিন্তু সকলেই 'ভেবে চিন্তে' চলে না। যদি চলত তাহলে নাকি মানুষের জীবনধারণের ইতিবৃত্ত অনেক সহজ সরল হত। আর যদি সত্যি সত্যি মানুষের জীবনধারণের ইতিবৃত্ত বেশ সহজ সরল হত তাহলে আমার মত সরল শর্মারা বেহাতই অনাহারে, অনাদরে এবং অনিদ্রায় মারা যেত। ভাগ্যিস মানুষের জীবন জটিল, ভাগ্যিস মানুষের জীবনের ফ্যাক্টস ফিকশনের চেয়েও ফিকটিশাস, তাই আমাদের মত কিছু 'অনাথায় অকর্মন্য লোক' করে-কম্মে খাচ্ছে। আমাদের দেশে বায়োস্কোপ অর্থাৎ ফিলিম যখন জনজগতে আদৃত হতে শুরু করেছে এবং বায়োস্কোপ যখন একটি লাভজনক শিল্প ব্যবসায় হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডঙ্কা বাজল। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ না হলে আজ হয়তো পৃথিবীর চেহারাই হত অন্যরকম। অন্যরকম পৃথিবীতে ফিলিম জগৎও নিশ্চয়ই এরকম হত না। ফিলিমকে শিল্প ব্যবসায়ের পর্যায়ে উন্নীত করেছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। নিউ থিয়েটার্স, প্রভাত, এবং বম্বে টকিজ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ম্যাডান, ন্যাশনাল, রণজিৎ, ওরিয়েন্টাল মুভিটোনও নানা কারণে স্মরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই বেশ কয়েকজন অভিনেতা উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ছবির পপুলারিটির মাধ্যমে প্রায় তারকা পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন পরিচালক এবং সংগীত নির্দেশকের নামও সুপরিচিত হয়েছিল সব ভারতীয় চিত্রদর্শকের মনমানসে। তবু কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি ভালই চলছিলো। গোল বাঁধলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় পারমিট প্রথার প্রবর্তনে এবং কালোবাজারের মাৎস্যন্যায়ের ফলে। স্টার সিসটেম, কালোবাজার এবং পারমিট প্রথার জন্ম যুদ্ধের ঔরসে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার গর্ভে। নিউ থিয়েটার্স, প্রভাত, বম্বে টকিজের মত প্রতিষ্ঠান আজ ইতিহাসের পাতায় উঠে গেছে। প্রভাত স্টুডিওয় আজ ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া। বম্বে টকিজের ফ্লোরগুলো কারখানায় রূপান্তরিত। নিউথিয়েটার্সের ফ্লোরগুলো এখনো প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে টিঁকে আছে কোন রকমে, কিন্তু হাতির মুখ আর দেখা যায় না ছবির প্রারম্ভে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যে পারমিট, কালোবাজার এবং স্টারসিসটেমের চলন হয়েছিল তা এখনো চলছে পুরোদমে, চিত্রনির্মাণ চলছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না, ঐতিহ্য সৃষ্টি হচ্ছে না। 'নাম' বেচাকেনা হচ্ছে। নামের বাজার দরের ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। ফলে কর্মীদের অবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে দিনকে দিন।

বহু দিন বাদে আজ আবার রব উঠেছে "চলচ্চিত্র নির্মাণের নিয়ামকের লাগাম আবার চলচ্চিত্র নির্মাতা মানে কলাকুশলীদের হাতে ফিরে আসুক।" অনেক মিটিং করে, অনেক চেঁচামেচি করে স্টার সিসটেমকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য নিয়ম করা হয়েছে যে স্টাররা একসঙ্গে দু'টির বেশী ছবিতে কাজ করতে পারবে না। উত্তম প্রস্তাব। শোনা যাচ্ছে যে সংগীত নির্দেশকদের ব্যাপারেও ঐ একই রকম নিয়ম চালু করা হবে। খুব ভালো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যাঁরা স্টার তাঁরা যদি একসঙ্গে দু'টির বেশী ছবি না করেন তাহলে মোট ছবির সংখ্যা কমে যাবে কি-না? আমার তো মনে হয় কমবে। কারণ হাতেকলমে স্টার আমাদের এখানে মেরেকেটে চারজন, উঠৎ-উক স্টারদের সংখ্যাও ঐ রকম, বাকি সব বাসি মাল, যাদের থেকে নতুন মুখ অনেক শ্রেয়। স্টারদের জীবনে নিয়ম শৃঙ্খলা এসে পড়া মানেই তাদের সেক্রেটারীদের দুর্দিন উপস্থিত হওয়া। মাত্র দু'টি ছবিতে কাজ মানেই টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপারেও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রবর্তন হওয়া। এই সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলার শর্ত পালন করে নিয়ম মাফিক কাজ ক'জন চিত্রনির্মাতা করতে পারবেন তা আমার ঠিক জানা নেই। ক'জন চিত্রনির্মাতা তারকাবিহীন চিত্র নির্মাণে প্রবৃত্ত হবেন তাও বলা কঠিন। এবং যদি বা কেউ যুক্তিকে লোকসান মান হলেই যে তাঁর সে ছবি পরিবেশকরা কিনবেন এবং প্রদর্শকরা দেখাতে রাজী হবেন তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সমস্যাকে জটিলতর করা হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে। অনেকে বলছেন এর মানে শেষ অবধি এই দাঁড়াল যে হিন্দী ছবির ফিফটি পারসেন্ট প্রডাকসন কমে গেল। স্টারদের দাম আরো বাড়বে। টেকনিশিয়ানদের দাম আরো কমবে। আরো বেশী লোক বেকার হবে। স্টারদের হাতে যখন অগুন্তি ছবি, যখন তাঁদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই তখনই তাঁদের ইন্টারফেয়ারেন্সের ঠেলায় অন্ধকার। এর পর এদের হাতে যখন সময় থাকবে তখন এরা হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারবে তখন কী হবে, তাই ভেবে অনেকে

কাছে সরবেক্ষ্যনু দেখছিলেন। একজন [illegible] একটি চিত্রনির্মাতা বললেন, "নিয়ম করে যদি একজন চিত্রনির্মাতা বছরে একজনের বেশী স্টার নিয়ে ছবি করতে পারবে না।" আন্দোলনটা মন্দ নয়। আরেকজন বলছেন, "যে সব নির্মাতারা এ নিয়ম করেছেন তাঁরা আজ থেকে তিন বছর স্টারদের নিয়ে কোন ছবি করতে পারবেন না।" এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল! বহুদিন আগে স্বর্গীয় বিমল রায় 'ইউনাইটেড প্রডিউসার্স'-এর সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব এনেছিলেন যে, "কাউকে কালো টাকা দেওয়া হবে না"। এই শর্ত পালন করে তিনি একটি ছবিও শুরু করেছিলেন। ছবির নাম ছিল 'সাহারা', নায়ক নায়িকা ছিলেন ধর্মেন্দ্র এবং শর্মিলা ঠাকুর, সংগীত পরিচালক ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। সে ছবি শেষ হয়নি। বিমল রায় ইহজগতে নেই। ইউনাইটেড প্রডিউসার্স এখনো আছে। চলচ্চিত্র জগতে কালো টাকা এখনও চকচক করছে।

সরল শর্মা

আব্দুল হালিম জাফরের সেতার

গত ১৩ই নভেম্বর বসুশ্রী প্রেক্ষাগৃহের একটি প্রভাতী অনুষ্ঠানে শহরের সুপরিচিত সংগীত-সংস্থা "মিউজিক লাভার্স" প্রখ্যাত সেতারশিল্পী ওস্তাদ আবদুল হালিম জাফর খাঁর বাজনার আয়োজন করেন। বোম্বাই শহরের তবলা-বাদক সদাশিব পাওয়ার ওঁর সঙ্গে সংগত ছাড়াও একটি স্বতন্ত্র লহরার অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

আবদুল হালিম জাফর খাঁ

সেদিনকার সেতারের অনুষ্ঠানটি শুরু হয় জৌনপুরী রাগের একটি সুমিষ্ট শ্রুতিমধুর আলাপ দিয়ে। শিল্পীর হাতটি মিষ্টি, সুরের কাজে সূক্ষ্মতা আছে, কন্ঠ-ঘাতের ওজনও সুপরিমিত। 'জৌনপুরী' রাগের বিভিন্ন গম্ভীর ভাবরসটি উল্লিখিত কলাকৌশলের দক্ষতায় সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। ওস্তাদ আবদুল হালিম জাফর খাঁ সেদিন আলাপের সুরবিন্যাসে তাঁর পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশি সংযম এবং সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত 'জৌনপুরী'র কোমল পর্দাগুলির প্রয়োগে রাগের মাধুর্যটি যেন নিঙড়ে বার করেছেন। এই রাগের 'জোড়' এবং ঝালার বিভাগেও তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ নৈপুণ্যের স্পর্শ ছিল।

মধ্যমাদ সারঙের সুরগ্রন্থনায় অভিনবত্ব ছিল না। প্রথানুগত পথে, কিন্তু তা হলেও আশ্চর্য দরদের সঙ্গে এই রাগটির ব্যঞ্জনা শিল্পীর সেতারের তারে ফুটে উঠেছিল। তাঁর হাতের স্বচ্ছন্দ সঞ্চালনে ছোট ছোট ছন্দের বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করার মতন। তবলার সহযোগিতাও ভাল। 'ভীমপলশ্রী' রাগ অনেক দিন এই শহরের সম্মেলনে শুনতে পাইনি। শিল্পী এই রাগে মধ্যলয়ে একটি গৎ বাজিয়ে শোনান। এই অনুষ্ঠানটি রাগের অন্তর্নিহিত মাধুর্য এবং শিল্পীর মিষ্টি হাত সত্ত্বেও ঠিক মন ভরাতে পারল না যেন। শিল্পী যদি আর একটু অচঞ্চল এবং সংযত হতেন, তাহলে রাগটির প্রতি সুবিচার করতেন।

তাঁর সর্বশেষ অনুষ্ঠান ঠুংরীর চালে 'কলকাণ্ডী' নামে একটি কর্ণাটিক রাগ। ক্রমান্বিক দুটি রেখাব এবং দুটি ধৈবতসহ এই রাগ শিল্পী যে-ভাবে পরিবেশন করলেন তাতে তো তার মধ্যে দাক্ষিণী বৈশিষ্ট্য কিছু পাওয়া গেল না। লঘু ভঙ্গিতে নিছক একটি 'ধুন'এর আঙ্গিকে পরিবেশিত অনুষ্ঠানটি সমগ্রভাবে [illegible] রসের [illegible] বাঁধতে পারেনি। তবে শিল্পী মাঝে মাঝে একটু [illegible]-কাব্যিক আমেজ এই অনুষ্ঠানে বেশ সার্থক-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা শ্রোতাদের কাছেই বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

—আরণ্যবর্ষ

ব্যালে-সন্ধ্যায়

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ব্যালে নাচে হয়তো কিছু পরিবর্তন এসেছে, পৌরাণিক কাহিনী, পরীদের গল্প ছেড়ে আজকের ব্যালে নাচে সমকাল এবং সম-সমাজের কথা আসতে শুরু করেছে, কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে তেমন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয় না। এখনকার ব্যালের যা কিছু কারু-কৃতি তা সেই পুরনো কাঠামোকেই ভিত্তি করে। অন্তত ব্রিটিশ ব্যালে সম্পর্কে এ-কথা প্রযোজ্য। গত ১৬ ও ১৭ নভেম্বর ব্রিটিশ কাউন্সিল দুটি ব্যালে নাচের আসরের

আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্র সদন মঞ্চে। শিল্পী : বেলিনডা রাইট ও জেলকো ইউরেশা।

ব্রিটেনের এই শিল্পী দম্পতির নাচে ব্যালের ধ্রুপদী ভঙ্গী অপেক্ষা রোমান্টিক ভাবের প্রকাশ বেশী। ব্যালের মোলায়েম ভঙ্গীর অভাবও লক্ষণীয়। কিন্তু নাটকীয় অংশে দুই শিল্পীই সচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত। তুলনায় ইউরেশার কৃতিত্বই কিছু বেশি। "স্লিপিং বিউটি", "ডন কুইকসোট" ও "রোমিও জুলিয়েট"-এর মধ্যে শেষোক্ত অনুষ্ঠানেই শিল্পীরা আসর জমিয়েছেন।

বিশ্ববিখ্যাত চাইকোভস্কি ও মিঙ্কাসকার সংগীত এবং পেটিপা ও অ্যাশটনের কোরিওগ্রাফীর ভিত্তিতে অনুষ্ঠান পরিবেশিত। এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ বাহুল্য। মঞ্চ ও সজ্জা পরিকল্পনায় আলেক্স ল্যাডেলার কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত।

[illegible] বর্মা

অরণ্যদেব লী ফক

অরণ্যদেব মাঝে মাঝে যান তাঁর খুলি-গুহার রত্নাগারে, গিয়ে দেখেন পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত তাঁদের অমূল্য রত্নভাণ্ডার।
নতুন কাহিনীর সূচনা।

আবার কখনও যান বিলা-উম্বির সোনাবেলায় -----

সবচাইতে মনোরম জায়গা অবশ্য তাঁর স্বর্গ-দ্বীপ!

দ্বীপটিকে অর্ধেক বেষ্টন করে আছে হিংস্র পিরানহা মাছে ভর্তি নদী। তার ওদিকে নিবিড় অরণ্য -----

-- অন্যদিকে সমুদ্র। সমুদ্রের এপাশে খাঁড়ি। তার মধ্যে প্রচুর মাছ।

স্বর্গ-দ্বীপে বাঘ-সিংহ আর জেব্রা-হরিণ পাশাপাশি ঘুরে বেড়ায়। বাঘ-সিংহ সেখানে মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীকে খায় না!
4/5

তার মূলে রয়েছে অরণ্যদেবের কঠোর শিক্ষা-প্রণালী ..
খবরদার!
ক্র্যাক্!
!!

হিংস্র জন্তুকে পোষ মানাতে অরণ্যদেবের তুলনা নেই।
চল্!

স্থানীয় লোকেরা মাঝে-মাঝেই সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে খাঁড়ির মধ্যে ছেড়ে দেয় -----

একদিন এক তাজ্জব ব্যাপার!
আরে এ যে শুশুক! কী করে পেলি?
ঢেউয়ে ভেসে এসে ডাঙায় আটকা পড়েছিল।

বারাসত-আমডাঙ্গা অঞ্চলে রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড এই সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২০ নবেম্বর শুক্রবার সকালে চব্বিশ পরগনার বারাসত, আমডাঙ্গা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন রাস্তার পাশে এগারটি মৃত দেহ পাওয়া যায়। সকলের মাথায় ও বুকে গুলির চিহ্ন ছিল। তাঁদের হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। বয়স ষোল থেকে পঁচিশের মধ্যে। নিহত ব্যক্তিরা কেউই স্থানীয় বাসিন্দা নন বলে পুলিস ও রাজনৈতিক মহলের ধারণা। পুলিসের সন্দেহ এদের সকলকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ফরওয়ার্ড ব্লকের স্থানীয় শাখা থেকে অভিযোগ করা হয়, পুলিস সুপরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড করেছে। ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ মহাকরণে আই জি, ডি আই জি, আই বি প্রমুখের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে বসেন। ২২ নবেম্বর ঘটনার তৃতীয় দিনে মৃতদেহগুলি সব সনাক্ত হয়েছে কিন্তু আসল রহস্যের কোন কিনারা হয়নি। মৃতদেহগুলির তিনটি বারাসত-ব্যারাকপুর রোডের পাশে বড়বেড়িয়ায় পড়ে ছিল। তিনটি আমডাঙ্গা রঙমহলে, সন্তোষপুরে ও গঙ্গানগরে একটি করে। আর তিনটি নদীয়া জেলার রানাঘাট এলাকায় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য একাধিক বামপন্থী দল অভিযোগ তুলেছেন যে, এই হত্যাকাণ্ড পুলিসের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

দেশী সংবাদ

১৬ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আজ রাজ্যসভায় যে আলোচনা হয়ে গেল তা লক্ষ করে মনে হয় যে, রাজ্য সরকারের হাতে আটক আইনের ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে হয়ত বেশী বাধা আসবে না। নব কংগ্রেসের সদস্যরা ছাড়া আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসংঘ, বাংলা কংগ্রেস এবং কয়েকজন নির্দল আটক আইনের উপর জোর দেন। দুটি কম্যুনিস্ট পার্টি এই বিলের আইনের বিরোধিতা করেন।

সি পি এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু অভিযোগ করেছিলেন যে, পেট্রোলিয়াম ও কেমিক্যাল দফতরের মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন নব-কংগ্রেস দলের জন্য কলকাতার ঔষধ উৎপাদকের কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকা নিয়ে তাঁদের ঔষধের দর বাড়ানোর সম্মতি দিয়েছেন। ওই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে একটি সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব ডঃ সেন আজ লোকসভায় গ্রহণ করেন।

১৭ নবেম্বর—নেতাজী-অগ্রজ এবং শাহনওয়াজ কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু আজ কলকাতায় খোসলা তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে বলেন, নেতাজী মারা গিয়েছেন—এই কথা বলে শাহনওয়াজ খাঁ তাঁর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন। ১৯৫১ সালের ২৩ জানুয়ারী কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে তিনি বক্তৃতায় বলেছিলেন, নেতাজী জীবিত এবং আগামী জন্ম দিবসের মধ্যেই আবির্ভূত হবেন।

১৮ নবেম্বর—আজ কলকাতায় নেতাজী তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্রী জি ডি খোসলা দুইবার ঘেরাও হন। ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়েন কয়েকজন কৌঁসুলী। হুড়োহুড়ির মাঝে চেয়ার ভেঙে যায়। শ্রীখোসলা প্রথমবার সওয়া এক ঘণ্টা ঘেরাও হন নিজের কক্ষে। পরে তাঁকে দশ মিনিট আটক রাখা হয় লিফটে। দুই দফায় কমিশন হলে প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি চলে। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিসও আসে।

১৯ নবেম্বর—আজ রাত্রে কলকাতা বন্দরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্র এজন্য কলকাতা পোর্ট কমিশনারস এবং ডক লেবার বোরডের চেয়ারম্যানের উপর বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। ডক কর্মীদের একাংশের ধর্মঘটও বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। চেয়ারম্যান স্টিভেডোরদের জাহাজে কাজ সম্পন্ন

করতে বললেন। তা না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কলকাতা ও শহরতলিতে বিভিন্ন ঘটনায় নিহত হয়েছেন সাতজন। নিহতদের মধ্যে ৫ জন মারা গিয়েছেন পুলিসের গুলিতে। বেলেঘাটা ও শ্যামপুকুরে দুটি ঘটনায় আজ ভোরে ওই দুই জায়গায় পুলিস মোট ২৫ রাউণ্ড গুলি চালায়। নিহতদের মধ্যে চারজন নকশালপন্থী।

২০ নবেম্বর—জনসংঘ সদস্য শ্রীমান সিং বর্মার একটি প্রস্তাব নিয়ে আজ রাজ্যসভায় আলোচনা শুরু হয়। প্রস্তাবের বক্তব্যঃ মৌলিক অধিকারের তালিকায় কাজ পাওয়ার অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দেশের প্রত্যেকটি সমর্থদেহী বেকারকে বেকার ভাতা দিতে হবে।

২১ নবেম্বর—প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী 'ভারতের' ডঃ সি ভি রমন আজ সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে বাঙ্গালোরে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না।

নকশালী কাজকর্ম সম্পর্কে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য রাজস্থান থেকে শত শত লোককে পশ্চিমবাংলায় পাঠানো হয়েছে। নিবারক-নিরোধ অর্ডিন্যান্স-এর সমর্থনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ রাজ্য বিধানসভায় এইকথা জানান। এক গোপন সংবাদের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও জানান, নকশালী পোস্টার, প্রচার পুস্তিকা প্রভৃতি রাজস্থানে ছাপানো ও বিলি করা হচ্ছে। নিরাপত্তার কারণে তিনি এ সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলতে নারাজ হন।

২২ নবেম্বর—আজ সকালে পদস্থ সরকারী কর্মচারি অতিরিক্ত মিল্ক-কমিশনার শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদ পান্ডে (৪২) উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডায়ারির ভিতরে ভোজালির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁর অবস্থা সংকটজনক।

আজ রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গ হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধক বিলে সই দিয়েছেন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে আটক আইন আবার চালু হলো। কয়েকটি রাজনৈতিক দল সংসদের ভিতরে-বাইরে এর বিরোধিতা চালিয়ে যাবেন বলেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে কোন না কোন ভাবে আটক আইন ছিল। ব্যতিক্রম শুধু গত এগার মাসের কিছু কম।

বিদেশী সংবাদ

১৬ নবেম্বর—বিভিন্ন সরকারী মহলের খবরঃ গত শুক্রবারের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পর বঙ্গোপসাগরে পূর্ব পাকিস্তানের চারটি দ্বীপ বস্তুত প্রাণহীন। হাতিয়া, রামগতি চরজব্বর ও ভোলা এই চারটি দ্বীপের লোক সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষের কাছাকাছি। ত্রাণ কার্যের দেখাশুনো ও তদারকি করছেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান।

১৭ নবেম্বর—মহাকাশ প্রযুক্তি বিদ্যার এক অত্যাশ্চর্য বিস্ময় সৃষ্টি করে পৃথিবী থেকে পাঠানো একখানা গাড়ি চাঁদের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং পৃথিবীর নির্দেশ অনুসারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সে সকল তথ্য পৃথিবীকে জানিয়ে দিচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নই প্রথম চাঁদের দেশে স্বয়ংক্রিয় যান পাঠান।

১৮ নবেম্বর—চিয়াংকাইশেকের ফরমোজা রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। পিকিংকে এই অধিকার দিয়ে দেবার প্রশ্ন নিয়ে শুক্রবার বিতর্ক হবে। এই বিতর্কে পিকিংকেই একমাত্র আইনসিদ্ধ চীনা সরকার বলে সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৯ নবেম্বর—ঢাকার সংবাদপত্রগুলির হিসাব মতে, গত সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ১৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে। এদের এই হিসাব যদি ঠিক হয়, তা হলে বলতে হবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় বিপর্যয় আর হয়নি। অবশ্য পাকিস্তানের সর্বশেষ সরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৩৪ হাজার বলে জানানো হয়েছে।

২০ নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ আজ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাতে চীনের রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যভুক্তির ব্যাপারটি আরও এক বছর পিছিয়ে গেল। রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশের ব্যাপারে চীন সাধারণভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করলেও প্রয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হয়।

২১ নবেম্বর—আজ উত্তর ভিয়েতনামে আবার প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ শুরু হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে মার্কিন বোমারু বিমান উত্তর ভিয়েতনামের অনেকখানি ভিতরে উড়ে গিয়ে বোমা ফেলতে শুরু করে। এর আগে দু'বছরেরও বেশী সময় ধরে উত্তর ভিয়েতনামে বোমা ফেলা বন্ধ ছিল।

২২ নবেম্বর—ঢাকার সংবাদে বলা হয়েছে যে, ঘূর্ণিবাত্যায় ১০ লক্ষ লোকেরও বেশী মৃত্যু ঘটেছে। এই সংবাদ বেসরকারী হলেও সমর্থিত। এই সংবাদে বলা হয়—নোয়াখালি জেলায় ৩,০০০০০, পটুয়াখালিতে ৩,৩০০০০, ভোলা দ্বীপে ২ লক্ষ, হাতিয়া দ্বীপে ১,১০,০০০ এবং অন্যান্য ২০০ দ্বীপে ১ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীগোপাল দে

ক্রুকস
ল্যাক্টো-ক্যালামাইন
কি একটি ভ্যানিশিং ক্রীম ?
হ্যাঁ, তাই !
ভ্যানিশিং ক্রীমরূপে ক্রুকস ল্যাকটোক্যালামাইন ব্যবহার করুন।
প্রখর রৌদ্র, হাওয়া, ধুলো থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখবে।
কোমল লাবণ্য এনে দেবে — অতি মোলায়েম সুন্দর।
ক্যালামাইন ও উইচ হেজল সহ—ক্রুকস ল্যাকটো ক্যালামাইন
এছাড়াও ত্বককে পরিষ্কার করে, স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখে।
দাগ হতে দেয় না। ত্বকে এনে দেয় লাবণ্যময় আভা।
ল্যাক্টো ক্যালামাইন
সমগ্র
সৌন্দর্য
প্রসাধন সামগ্রী
Lacto Calamine
এখন
মিনি সাইজেও পাওয়া যায়
ক্রুকস্ ইন্টারফ্রান লিমিটেড, বোম্বে-২৫
lam. CIL. LC.

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫
শনিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 5 December 1970

বারাসতের হত্যা

পশ্চিমবঙ্গে আমরা যে কত স্বস্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছি তার আর একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত সেদিনের ঘটনা। সেদিন, বারাসত অঞ্চলে আট আটটি যুবকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। নিঃসন্দেহে এটি গণ-হত্যার মতন ঘটনা। যদিও দু একটি নরহত্যা এখন প্রতিদিনের ব্যাপার তবু বারাসতের ঘটনার মতন এমন বীভৎস ও নারকীয় হত্যার দৃষ্টান্ত আর খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য যুক্তফ্রণ্টের আমলে শ্রীপুরে কোলিয়ারী এলাকায় একাধিক শ্রমিক খুন এবং লাস গুম করার চেষ্টাও গণ-হত্যার সামিল। কিংবা বর্ধমানের সাঁই বাড়িতে হত্যাও এই ধরনের নারকীয় ও বীভৎস ব্যাপার। তবু বারাসত অঞ্চলে আটটি যুবকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ প্রাপ্তি কোথাও কোথাও এই দুই ঘটনার চেয়ে আলাদা। যেভাবে প্রকাশ্য স্থানে, একই পদ্ধতিতে নিহত আটটি যুবকের মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়েছিল—তাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, এ যেন একটা হত্যার প্রদর্শনী, মানুষকে আঙুল দিয়ে দেখানো যেন 'ওই মৃতদেহগুলি দেখ, এবং সাবধান হও।' আমরা তো জানি, হত্যা, সে যেমনই হোক—তাকে গোপন করার চেষ্টাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গোপনতার বদলে যেন এই বর্বরতাকে লোক-চক্ষুর গোচরে আনার একটি চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু কেন? মানুষকে সন্ত্রস্ত করা? নাকি বিপক্ষকে সন্ত্রস্ত করা?

এই হত্যার উদ্দেশ্য কী? কারাই বা এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাধা করল? নানান অসুবিধে সত্ত্বেও কীভাবে রাত্রের অন্ধকারে দেহগুলি এনে ফেলে রাখা সম্ভব হল—এ-সব প্রশ্ন সকলকেই উত্তেজিত ও বিচলিত করছে। এখন পর্যন্ত এর কোনো সদুত্তরও পাওয়া যায়নি। তবু মানুষের যা স্বভাব, নানা অনুমান ও গবেষণা চলছে। কারও কারও সন্দেহ, এই কর্ম পুলিসের; কারও বা সন্দেহ, বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের; কেউ কেউ আবার মনে করেন—রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসেবে এই নরবলি। অনুমান বা সন্দেহ ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন রকম হতেই পারে, কিন্তু তা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সত্য হিসেবে স্বীকৃত হয় না, অন্তত আইনের চোখে নয়। কে দোষী, কে নির্দোষ—এনিয়ে আপাতত আমরা গবেষণা করতে পারি বটে তবে শেষ কথা জানার এখনও দেরী আছে।

এমন বীভৎস একটি হত্যা ঘটনার তদন্ত নিশ্চয় হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তে রাজীও হয়েছেন। তদন্তের কাজও শুরু হয়েছে। উপস্থিত তদন্তের কোনো ফলাফল প্রকাশ করার সময় হয়নি, হয়ত সেটা অনুচিত হবে—। তবে আমাদের ধারণা, যদি না সরকার পক্ষ থেকে দ্রুত এর তদন্ত শেষ করা হয় তবে অনেক দিক থেকেই বিপদ দেখা দেবে। সরকারের খেয়াল রাখা উচিত, তাঁদের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে মস্ত রকম অভিযোগ উঠেছে। যত দিন যাবে ততই মানুষের মনে আরও বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে, কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব তদন্তের ফলাফল প্রকাশ পাওয়া দরকার।

বারাসত অঞ্চলের এই ঘটনাকে রাজনৈতিক পুঁজি করার একটা প্রকাণ্ড রকম চেষ্টাও চোখে পড়ছে। যদি এমনই হয়, নিহত তরুণেরা সকলেই নকশালপন্থী ছিলেন, তাহলে নকশালদের ওপর যাঁদের ক্রোধ এখন প্রায় সর্বজনবিদিত, যাঁরা বহুবার বলেছেন—পুলিস উঠিয়ে নিলে তাঁরা নকশালদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন, অহরহ যাঁদের নেতাদের মুখে হিংসার কথা শোনা যায়—তাঁরা রাতারাতি এত শোকবিহ্বল কেন? মানবিক কারণে? তাহলে অবশ্য খুবই ভাল। আর যাই হোক, শ্রীপুর এবং সাঁই-বাড়ির পর এঁদের মানবিক চৈতন্য উদয় হচ্ছে—এটা ভাবতেও ভাল লাগে।

আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি, হিংসাকে একবার সমাজে প্রশ্রয় দিতে শুরু করলে তাকে আর আয়ত্তে আনা যায় না। হিংসাকে হিংসা দিয়ে প্রতিরোধ করাও যায় না, ক্রমাগত সেটা বেড়ে চলে, গণ্ডা গণ্ডা খুনে সৃষ্টি হয়, জোর যার মুলুক তার হয়ে ওঠে। এটা কোনো সভ্য শাসন-ব্যবস্থা নয়, সাধারণের কল্যাণের পথ নয়। পুলিসই হোক, আর রাজনৈতিক দলই হোক—সন্ত্রাস সৃষ্টি কারও পক্ষে নৈতিক কর্ম নয়। বর্বরতা, নরহত্যা, পৈশাচিক মুণ্ড-শিকারের খেলা যে আমাদের পশুর চেয়েও অধম করে ফেলছে—এ সহজ বুদ্ধি কবে আমাদের হবে কে জানে!

হিংসাত্মক
কার্যকলাপ
নিরোধ বিল
আটক আইন
নকশালাইট

সি. পি. আই

শেষ পর্যন্ত সি পি আই প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা নব কংগ্রেসের বিরোধিতা করবেন। ২৭শে নভেম্বর আট পার্টির জোটের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে : পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনে আমরা নব ও আদি কংগ্রেস, সি পি এম ও সংযুক্ত গণ-আন্দোলন বিরোধী সব দলের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং তাঁদের পরাজিত করে এ রাজ্যে একটি স্থায়ী প্রগতিশীল সরকার গঠনের চেষ্টা করব।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে সি পি আইও শামিল হয়েছেন। সুতরাং, এই ঘোষণা মত সি পি আই নব কংগ্রেসকেও শত্রু দল বলে মনে করেন। তাঁরা নব কংগ্রেসকে পরাজিত করতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অবশ্য, এমন নয় যে সি পি আই বা আট পার্টি জোট শুধু নব কংগ্রেসকেই শত্রু বলে মনে করেন। তাঁরা নব কংগ্রেসের চেয়েও কড়া ভাষায় আদি কংগ্রেস এবং সি পি এমের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, সি পি এম এখনও সবচেয়ে বড় বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি। তাঁরা এই সঙ্গেই অভিযোগ করেছেন, সি পি এম পুলিস ও অফিসারদের একটা চক্রের সাহায্যে জনবিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সম্মিলিত গণ-আন্দোলনের ক্ষতি করছেন।

সি পি আই-র পক্ষ থেকেই জানান হয়েছে যে আট পার্টির জোটের কেউ সকলের সম্মতি না নিয়ে বাইরের কোনও দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা বা জোট বাঁধার আলোচনা করতে যাবেন না।

*

সি পি আই-র এই মতি পরিবর্তন রাজ্যের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কিছুটা বিস্মিত করেছে। সকলেরই প্রশ্ন, তাঁদের জাতীয় ও রাজ্য পরিষদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে সি পি আই হঠাৎ এভাবে সরাসরি গোটা নব কংগ্রেসের বিরোধিতায় রাজী হল কেন? তাঁদের জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদ এই সেদিনও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নব কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে তাঁরা নির্বাচনী সমঝোতা করতে চান। জাতীয় পর্যায়ে তাঁরা নব কংগ্রেসের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনেও যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। সেই সি পি আই হঠাৎ আজ তাঁদের মত পাল্টালেন কেন?

আর, সি পি আই যে শুধু পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসের কথা বলেছেন তা নয়। আট পার্টির প্রস্তাবে সাধারণভাবেই বলা হয়েছে : কংগ্রেসে ভাগাভাগির পরও নব কংগ্রেস প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। প্রতিশ্রুতি সত্বেও তাঁরা কায়েমী স্বার্থের হয়েই কাজ করে চলেছেন। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের জন্য কংগ্রেস সরকার সচেষ্ট।

আট পার্টির এই বক্তব্য সি পি আই-রও বক্তব্য। আট পার্টিতে যখন এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন সি পি আই-র জাতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর দুই বাঙালী সদস্য ভূপেশ গুপ্ত এবং ভবানী সেনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। সেইদিক দিয়ে এই প্রস্তাব আরও আশ্চর্যজনক। কারণ, এ থেকে এইটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সি পি আই নব কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁদের লাইন পাল্টাচ্ছেন। অর্থাৎ, ইন্দিরা গান্ধীর দল সম্পর্কে সি পি আই-র ধারণা বদলাচ্ছে।

এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, ভারতের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসছে। কারণ, কংগ্রেসের ভাগাভাগির পর থেকেই সি পি আই একেবারে খোলাখুলিভাবে নব কংগ্রেসের দিকে মৈত্রীতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লোকসভায় এবং বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতিতে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর দলের পূর্ণ সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কেরলে তাঁরা এক সঙ্গে নির্বাচন লড়েছেন এবং নব কংগ্রেসেরই সমর্থনে সরকার গড়েছেন। বিহারে আবার নব কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে তাঁরা সমর্থন জানিয়েছেন। সেই বন্ধুত্বে কি এখন চিড় ধরছে? যদি তাই হয় তাহলে তার কারণ কি? সি পি আই নেতৃত্ব সম্প্রতি রুশ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার জন্য মস্কো গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কি তাঁরা কোনও নতুন নির্দেশ নিয়ে এসেছেন?

না, আট পার্টির প্রস্তাবের ব্যাপারটাই সি পি আইর কোনও একটা রাজনৈতিক চাল? এবং, আসলে কি এইটাই সত্য যে সি পি আই-র নব কংগ্রেস-প্রেমী মনোভাব যা ছিল তাই আছে, আপাতত শুধু ফরওয়ারড ব্লক এবং এস ইউ সির চাপে পড়ে তাঁরা তাঁদের মূল লাইন থেকে কিছুটা সরে এলেন?

সি পি আই এত তাড়াতাড়ি তাঁদের জাতীয় রাজনৈতিক লাইন পাল্টাচ্ছেন কেন এইটা বুঝতে না পেরেই অনেকে সন্দেহ করছেন যে আট পার্টির নব কংগ্রেস বিরোধী প্রস্তাব মেনে নেওয়াটা ও'দের একটা সাময়িক কৌশল মাত্র।

*

পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসীদের সঙ্গে আঁতাত করায় সি পি আই-র অবশ্য বিশেষ কতকগুলি অসুবিধা ছিল।

প্রথম ও প্রধান অসুবিধা : রাজ্য পার্টির একটা শক্তিশালী অংশ নব কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও রকমের আঁতাতের বিরুদ্ধে। তাঁরা মানসিকভাবে এই রকম কোনও মৈত্রীর জন্য এখনও প্রস্তুত নন। তাছাড়া, তাঁদের বন্ধমূল ধারণা এতে দলের ক্ষতি হবে।

দ্বিতীয় অসুবিধা, আট পার্টির জোটের অধিকাংশই ঘোরতর নব কংগ্রেস বিরোধী। আদর্শগত এবং বাস্তব কতকগুলি কারণে তাঁরা কোনও মতেই নব কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত বা কোনও সমঝোতা করতে রাজী নন। আট পার্টির জোটের দুই বড় শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি তো গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে অনমনীয়। সি পি আই নেতারা এটা মোটামুটি বুঝে গিয়েছেন যে, তাঁরা নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে এগোলে এই দুই দল সি পি এম পরিচালিত ছয় পার্টির জোটের সঙ্গে একটা সমঝোতা করতে রাজী হয়ে যেতে পারেন। সেই সঙ্গে যোগ দেবেন আর এস পি এবং লোকসেবক সংঘও। তাহলে রাজ্যের বামপন্থী রাজনীতিতে সি পি আই পুরোপুরি আইসোলেটেড হয়ে পড়বেন।

কেরলে কিন্তু সি পি আই-র এই রকম কোনও অসুবিধা ছিল না। ফ্রন্টের মধ্যে একমাত্র কংগ্রেস বিরোধী দল ছিলেন আর এস পি। ও আর এস পির রাজ্য কমিটির নেতারা তত উগ্র নব কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন না। তাই, কেরলে নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে সি পি আই-র তেমন অসুবিধা হয়নি।

তৃতীয় বাধা এখানের নব কংগ্রেসীদের মনোভাব। এখানের নব কংগ্রেসীদের মধ্যে খুব কম লোকই সি পি আই-র সঙ্গে সমঝোতায় রাজী ছিলেন। সিদ্ধার্থ রায়, তরুণকান্তি ঘোষ প্রভৃতিরা অবশ্য দিল্লী থেকে নির্দেশ এলেই সি পি আই-র সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী হয়ে যেতেন। কিন্তু বিজয় নাহার, কৃষ্ণকুমার শুক্লা প্রভৃতিকে সেই প্রস্তাব গেলানো খুব কঠিন কাজই হত। তাছাড়া, মফঃস্বলের নব কংগ্রেসীরাও সি পি আই-র সঙ্গে সমঝোতার বিরুদ্ধে। তাঁরা এখনও মূলত সেই পুরনো কংগ্রেসী, যাঁরা কমিউনিস্টদের সহ্য করতে অরাজী। এখন যেটা রাজ্যের নব কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস সেই যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদও প্রকাশ্যেই সি পি আই বিরোধিতা ঘোষণা করেছেন।

সি পি আই যত নব কংগ্রেসীদের সংগে মৈত্রীর কথা বলেছেন রাজ্যের নব কংগ্রেসীরা তত বেশী করে সি পি আই বিরোধী কথা-বার্তা বলেছেন। এই অবস্থায় রাজ্য সি পি আই আর কত দিনই বা নব কংগ্রেসীদের সংগে সমঝোতার কথা বলে যেতে পারেন।

সি পি আই-র অপর একটা বড় অসুবিধা হয়ে গেল বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে। বাংলা কংগ্রেস ক্রমেই তাঁদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন। এবং সরতে সরতে বাংলা কংগ্রেস এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন যেখানে সি পি আইর বিশ্লেষণে বাংলা কংগ্রেস আদি কংগ্রেসের মতই প্রতিক্রিয়া-শীল। বাংলা কংগ্রেস আটক আইন দাবি করেছেন, বাংলা কংগ্রেস আরও জবরদস্ত পুলিসী ব্যবস্থার পক্ষে প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন, বাংলা কংগ্রেসের কেউ কেউ ঘোষণা করেছেন যে আদি কংগ্রেসের সংগেও তাঁরা নির্বাচনী সমঝোতায় রাজী। স্বাভাবিকভাবে সি পি আই-র পক্ষে এসব জিনিস মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

ফরওয়ারড ব্লক এবং এস ইউ সির নেতারা দীর্ঘদিন যাবত সি পি আই-কে বলছিলেন: আপনারা যত নব কংগ্রেস প্রেম দেখাতে যাবেন, দৃঢ় কংগ্রেস বিরোধী বক্তব্য রাখতে যত দেরী করবেন ততই বাংলা কংগ্রেস গণ্ডগোল করার সুযোগ পাবে। এই যুক্তি সি পি আই-র একটা অংশও বিশ্বাস করতেন।

সি পি আই-র নব কংগ্রেস-বিরোধী বক্তব্য যদি তাঁদের আসল সিদ্ধান্ত হয় তাহলে এবার বাংলা কংগ্রেসকেও আরও স্পষ্ট করে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে, তাঁরা কোন দিকে যাবেন—কংগ্রেসের দিকে, না আট পার্টির দিকে?

নিঃসন্দেহে আট পার্টির সর্বশেষ সিদ্ধান্তের ফলে তিন কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতার পথ কিছুটা সহজ হবে। যদিও এ ব্যাপারেও সব নির্ভর করবে প্রধানমন্ত্রীর উপর।

নবারুণ গুপ্ত

২৯-১১-৭০।

শিখণ্ডী-ফৌজ

দেবরাজ

গোশাক দেখে যেমন মানুষ চেনা যায় না, তেমনই সন-তারিখ দিয়ে কালের গতি বোঝা বুঝি সম্ভব নয়। নইলে পশ্চিম আফ্রিকার গিনীতে যা ঘটছে তা কি বিশ শতকের সত্তর সালে ঘটার কথা? দেড়শো-দুশো বছর আগে হামেশাই অমন ঘটেছে। ধলা হানাদারেরা কালাদের দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিস্তর লুটপাট করেছে, টাকাকড়ি, দামী জিনিস, সুন্দরী মেয়ে নজরে যা পড়েছে তাই গায়ের জোরে কেড়ে নিয়েছে, শেষ বেশ দেশের স্বাধীনতাও। আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় এমনি করেই পত্তন হয়েছে বিরাট বিরাট উপনিবেশের যেখানকার বাসিন্দারা কালা অথচ রাজা হচ্ছে ধলা। আজকের দিনে সে সব উপনিবেশ আর নেই বললেই চলে। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় তাদের বেশীর ভাগই আজ ছিটকে পড়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। ছিটেফোঁটা যেটুকু বাকী আছে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। পুরোনো দিনের কায়দায় নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলবার চেষ্টা দুনিয়ার কোনও জাতই করছে না।

বাদে পর্তুগাল। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্য এখন তার। বিলিতী, ফরাসী কিংবা ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের তুলনায় তা হয়তো কিছুই নয়। তবে তার জমিদারী যা এখনও আছে তাকেও হেলাফেলা করা চলে না। তার ওপর সে সাম্রাজ্যের এতটুকুও হাতছাড়া করার ইচ্ছে তার নেই। বরঞ্চ সে সাম্রাজ্য বাড়াবার সাধ তার এখনও যায়নি। ইউরোপ এশিয়াতে তো আর নতুন কোনও দেশ জয় করে সেখানে পর্তুগালের নিশান ওড়ানো সম্ভব নয়। তাই পর্তুগালের নজর পড়েছে আফ্রিকার ওপর। যে সব এলাকা আজও পর্তুগালের দখলে রয়েছে তার আয়তন হচ্ছে বিশ লাখ সত্তর হাজার আটশো আটষট্টি বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ষোলো বর্গ কিলোমিটার ছাড়া বাকী সবই আফ্রিকায়। পর্তুগালের নিজের হিসেবে অবশ্য তার সাম্রাজ্যের পরিধি আরও বেশী। কেন না পর্তুগীজ ভারত যে চিরকালের জন্যে তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তা সে মানতে গররাজী। তবে জোর করে গোয়া-দামন-দিউ দখল করার উদ্যোগ না করলেও আফ্রিকাতে জমিদারী রাখার শুধু নয় বাড়াবার চেষ্টাও তলে তলে পর্তুগাল করে যাচ্ছে।
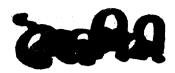
আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পর্তুগালের এককালে দাপট ছিল খুব। ওখান থেকে চালাও মানুষ বিক্রীর ব্যবসা চালাতো পর্তুগীজরা। বিশাল একটা উপনিবেশ সেখানে তারা অবশ্য গড়ে তুলতে পারেনি। সে কাজটা গুছিয়ে নিয়েছিল ফরাসীরা। তবে ওরই মধ্যে একটুখানি ঠাঁই ইংরেজরা আর পর্তুগীজরা করে নিতে পেরেছিল। ফরাসী উপনিবেশ সব হালে স্বাধীন হয়ে গিয়েছে, ইংরেজদের উপনিবেশগুলোও। শিবরাত্রির সলতের মতো জ্বলছে টিমটিম করে কিন্তু ও এলাকায় উপনিবেশের শেষ বাতি পর্তুগীজ গিনী আজও। একে একে তার প্রতিবেশীরা সবাই স্বাধীন হয়ে গিয়েছে —ফরাসী গিনী, সেনেগাল, মালি, বিলিতী সিয়েরা লিয়ন, গাম্বিয়া। কিন্তু পর্তুগীজ গিনী যে পরাধীন সেই পরাধীন। পর্তুগাল সেখানে মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসে আছে, নড়বার নামটি করছে না। শুধু তাই নয়, এমনই তার বুকের পাটা যে আশেপাশের দেশগুলোর ওপর নেকনজর দিতেও তার বাধছে না। এ বছরের শুরুতে পর্তুগাল ছোবল দিয়েছিল সেনেগালকে। তাতে লাভ অবশ্য কিছু হয়নি। এখন সে আছে গিনীকে কব্জা করার তালে।

গিনীর এক পাশে পর্তুগীজ গিনী আর একপাশে সিয়েরা লিয়ন। ১৯৫৮ সনের আগে পর্যন্ত দেশটা ছিল ফরাসী উপনিবেশ। ২ অক্টোবর ১৯৫৮ সনে গিনী স্বাধীন হয়ে ফরাসী গোষ্ঠির সঙ্গে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক ঘুচিয়ে নিয়ে হয়ে দাঁড়ালো প্রজাতন্ত্র। তার রাষ্ট্রপতি একজন সিকু তুরে। তিনি নির্বাচিত হন ১৯৬১ সনে প্রথম, তারপর ১৯৬৮ সনে। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ গিনীতে ৭ বছর। কাজেই অঘটন কিছু না ঘটলে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত তুরেরই রাষ্ট্রপতি থাকার কথা। তুরের উগ্র বামপন্থী বলে খ্যাতি আছে। তিনি দাবি করেন তিনি একজন নিষ্ঠাবান মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট। তবে তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও দেশটাকে লাল রঙে রাঙিয়ে দেননি। তা না দিন, তাঁর রকমসকম যাদের পছন্দ নয় তেমন লোক গিনীতে অনেক আছে। আবার তাঁর ভক্তেরও অভাব নেই। কাজেই তাঁকে গদি-ছাড়া করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তাঁকে উচ্ছেদ করার জন্যে একটা চক্রান্ত খোদ গিনীতে অনেককাল ধরেই চলে আসছে আর কুচক্রীদের মদত দিচ্ছে পর্তুগাল বাইরে থেকে।

অনেক হিসেব করে পর্তুগাল গিনীর রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রীদের উস্কানি দিচ্ছে। তুরেকে যদি হটানো যায় তা হলে হয়তো গিনীতে এমন বিশৃংখলা দেখা দেবে যে সেই ফাঁকে পাশের উপনিবেশ থেকে শান্তি রক্ষার নামে ফৌজ পাঠিয়ে দেশটাকে গ্রাস করে ফেলতে পারবে পর্তুগাল। আর অতটা যদি নাও হয় তুরে সরে গেলেই পর্তুগাল খুশী হবে। আফ্রিকাতে পর্তুগালের পথের কাঁটা হচ্ছেন তুরের মত উগ্র নেতারা যাঁরা কালো মহাদেশ থেকে ধলাদের ঝাড়ে-বংশে উচ্ছেদ করার পণ করেছেন। পর্তুগীজ গিনীর মুক্তিসেনাদের ঘাঁটি আশেপাশের স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ করে সেনেগালে আর গিনীতে। পর্তুগালের আশা তুরেকে যদি গদি-ছাড়া করা যায় তা হলে হয়তো গিনীকে এমন একটা সরকার তৈরি করা যাবে, যা হবে পর্তুগালের বন্ধু, অন্তত যার সঙ্গে বোঝাপড়া একটা করা সম্ভব হবে। আর সেখানে যদি সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, হানাহানি চলতে থাকে তা হলে তো সোনায় সোহাগা—এককালের ফরাসী গিনী হয়ে দাঁড়াবে পর্তুগীজদের খাস তালুক।

গিনীর রাজধানী কোনাক্রির ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে নভেম্বরের বিশ তারিখে। দশটা জাহাজে করে শত্রুরা সেদিন চড়াও হয়েছিল গিনীর ওপর। অতি-আধুনিক অস্ত্র, জঙ্গী বিমান কিছুরই তাদের অভাব ছিল না। তারা অবশ্য নির্বিঘ্নে কোনাক্রি দখল করতে পারেনি। প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে গিনীর রাজধানীর পথে পথে বার বার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল হানাদাররা। রাষ্ট্রপতি তুরে জাতিপুঞ্জের কাছে নালিশ করেছেন পর্তুগালের নামে আর চেয়েছেন সৈন্য সাহায্য। সে সাহায্য অবশ্য জাতিপুঞ্জ দিতে পারেন নি তাঁদের নিজেদের কোনও সেনা-সামন্ত নেই বলে। তবে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদ এক জরুরি বৈঠকের পর একটা প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন। পর্তুগাল অপরাধ কবুল করেনি। তার বৈদেশিক মন্ত্রী পাত্রিসিও বলেছেন ও ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গ তাঁরা জানেন না। গিনীতে অভিযান চালাচ্ছে তুরে-বিরোধী একদল গিনির বাসিন্দা। পর্তুগীজদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। কথাটা সম্ভবত আধা-সত্যি। তুরের শত্রুপক্ষ হয়তো কোনাক্রি আক্রমণে অংশ নিয়েছে। তাদের সঙ্গে ভাড়াটে সৈন্যও কিছু বেশ আছে (তাদের প্রত্যেককে নাকি আড়াই লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে)। কিন্তু তারা হচ্ছে পর্তুগালের শিখণ্ডী। তাদের সামনে রেখে পর্তুগালই লড়াই চালাচ্ছে বলে লোকের বিশ্বাস।

আজ বিকেলে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মাঝেমাঝেই বুকের মধ্যে ঝনকে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়।
জানলাতে মুখ রেখে দেখি, দূরে কাছে
আকাশ জুড়ে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে,
মন বসে না কোনো কাজে, কোনো খেলায়।
মাঝেমাঝেই বুকের মধ্যে ঝনকে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়।

বুঝি না ঠিক কিসের জন্যে এতটা পথ
এমন করে ছুটে এলাম।
বুঝি না ঠিক কার বিরুদ্ধে এত যুঝি,
এই ধুলো-জঞ্জালের মধ্যে কাকে খুঁজি,
উড়িয়ে দিয়ে সকল পুঁজি কাকে পেলাম।
প্রশ্ন জাগে, কিসের জন্যে এতটা পথ
এমন করে ছুটে এলাম

এই বিষণ্ণ বিকেলে হৃৎপিণ্ডে আমার
বিপন্নতা ঝনকে ওঠে।
সকল পথে ছড়িয়ে আছে কাচের গুঁড়ো,
ভেঙে পড়ছে সমস্ত মন্দিরের চুড়ো,
রক্ত ঝরছে সমস্ত মৌমাছির ঠোঁটে।
চিত্তে আমার অনিচ্ছা, হৃৎপিণ্ডে আমার
বিপন্নতা ঝনকে ওঠে।

অথচ সেই আগের মতই ফুটছে শিউলি,
আগের মতই বাতাস ছুটছে।
তবে কেন এই মাটি-জল আমার কিনা
স্পষ্ট করে বুঝে নিতে আর পারি না,
তবে কেন হাজার প্রশ্ন জেগে উঠছে?
আগের মতই ফুটছে যখন শান্ত শিউলি
আগের মতই বাতাস ছুটছে?

মাঝেমাঝেই বুকের মধ্যে ঝনকে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়
দিনের দীপ্তি মিলিয়ে যাবার খানিক আগে
বন্ধুদেরও মুখ দেখে আজ ধাঁধা লাগে,
মন বসে না কোনো কাজে, কোনো খেলায়।
বুকের মধ্যে বিষণ্ণতা ঝনকে ওঠে
এখন এই পড়ন্ত বেলায়।

উত্তরাধিকার

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার যখন একত্রিশ, তখন আসি ; এখন আমারই একত্রিশ,
দাঁড়িয়েছি আজ তোমার সামনে এসে স্পষ্ট মুখোমুখি,
তুমি বাধাটি, দেয়ালের তৈলচিত্রে পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত, সুখী,
ঈষৎ হাসির রেখা অধরে স্ফুরিত, নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছ
অহর্নিশ।

চোখে, চিবুকে, চুলে, ভ্রূভঙ্গিতে বহুচেনা মুখের আদল,
অনেক টুকরো মুহূর্ত যেমন অ্যালবামের হলুদ স্মৃতিতে,
একত্রিশ বছর আগে তোমার নিজস্ব পৃথিবীতে
যেন তুমি আরেকবার দাঁড়িয়ে রয়েছ অবিকল।

আজ আমি দাঁড়িয়েছি তোমার সামনে এসে স্পষ্ট, দেখ তুমি,
দু-আঙুল ব্যবধান তোমার আমার মধ্যে, তবু এক অচেনা গহ্বর
উত্তরাধিকার ভেঙে কেবলই সরিয়ে দিচ্ছে দূরে থেকে দূরে,
ধসে যাচ্ছে ঘর,
ম্লান থেকে ক্রমে ম্লানতর তোমার উজ্জ্বল পটভূমি।

দূরের প্রতিধ্বনি

শিশির ভট্টা

দুয়ার থেকে দূরে গেলেই
গহীন গাঙে উন্মোচিত ঢেউ
প্রেক্ষাপটে অনচ্ছ মুখগুলি
সিন্ধুজলে কঠিন বিষণ্ণতা।

দুয়ার থেকে দূরে গেলেই
মনের ভেতর আরো অনেক মন
মধ্যরাতে কঠিন জিজ্ঞাসাতে
পাত্রভরা হাজার প্রতিশ্রুতি।

দুয়ার থেকে দূরে গেলেই
আকাঙ্ক্ষিত গাঢ় সবুজ বন
পাহাড়চূড়োয় দূরের প্রতিধ্বনি
হাজার সূর্যে হিরণ্ময়ের দ্যুতি।

ভাঙা আয়নার পাশে

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভেঙে পড়ছে ভেঙে পড়ছে
সিঁড়িগুলি সব ধাপ উল্টেপাল্টে দিয়ে...
এখন কেবল স্তূপ চুন বালি সুরকি ধুলো...
সুন্দর মুখই হবে ফুলগুলি ওপরতলায়
আটকে আছে ঝুলে আছে
নামছে না নামছে না...
ঐ সিঁড়ি ধরে আমার উঠে যাওয়ার ছিল
দেখা থাকি এপাশ ওপাশ, চাঁদ, নক্ষত্র এবং
প্রথম সন্ধ্যায় ডাকা যে যে বক বাড়ি ফিরে যায়,
হয়ত বেড়ালই হবে কাঁদছে একটানা
হয়ত আরশোলাগুলো উড়ছে ফরফর্
কোথাও সুন্দর মুখ নেই বলে এই অন্ধকারে
ভাঙা আয়না খোঁজা নিরর্থক...
নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় শূন্যতার হাওয়া।

এপার ওপার

সমীর রক্ষিত

এপারে গঙ্গার জলধারা বর্তমানে ক্ষীণ।
শীতের উদাস হাওয়া ওপারের থেকে মাস্তুলে মাস্তুলে
বিলম্বিত আজানের মত কোন্ বার্তা আনে?
ক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাসে সন্দীপ হাতিয়া ভেসে গেছে?
কোন শিশু আর বেঁচে নেই,
নারী পুরুষের শব উচ্ছিষ্টের মত সমুদ্রের মোহানায় চরে?
কে যে কারে হাঁকে—'ও ভাই সুজন ভাই, কে কোথায় আছ?
আমি এইখানে।
কুয়াশার ভিতরে এখন দূরের নক্ষত্র শুধু অশ্রুপাত করে।
আমার পায়ের তলে নিহত শিশির,
ভগ্ন জীর্ণ শাখা কাণ্ড ছত্রখান পথের ওপরে,
কোন্‌দিকে যাব?
এপারের বহু মহীরুহ উৎপাটিত আ-শিকড় সাম্প্রতিক ঝড়ে।

॥ এক ॥

প্রায় লেখককেই নিজের কবর খুঁড়তে হয়—নিজের কলম দিয়ে। গায়কের মতন লেখকেরও ঠিক সময়ে থামতে জানা চাই। সমে এসে যথাসময়ে না থামলেই বিষম, সবটাই বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি কালজয়ী লেখকও যদি যথাকালে না থামেন তো জীবদ্দশাতেই জীবন্মৃতের অন্তর্দশা তাঁর বিধিলিপি।

অবশ্য মহাকাল কারো কারো প্রতি একটু সদয়। সময় থাকতে থাকতেই তাঁদের নিরস্ত করেন, নিজের পুনরাবৃত্তির পথে আত্মহননের ভোগান্তি তাঁদের আর পোহাতে হয় না। যেমন, মানিক বন্দ্যো, বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্র। বিস্ময় থাকতে থাকতেই তাঁরা অস্ত গেছেন।

আর, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। কালের স্থূল হস্তাবলেপ তাঁর গায়ে লাগেনি। প্রতিভার নবনবোন্মেষে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি প্রতিভাত উদ্ভাসিত। নিত্য নব ভাষাভঙ্গী, নব নব ভাবের উদ্ভাবনায় বিভিন্ন শৈলীর শৈলশিখরে স্বচ্ছন্দ বিচরণে বাঁকে বাঁকে অবাক করা, নিতুই নব তিনি। হিমালয়ের মতই চিরন্তনরূপে সর্বকালীন বলে যেন মনে হয় তাঁকে।

কিন্তু ওই মনে হওয়াটাই। যথার্থ বললে হিমালয়ও কিছু চিরকালের নয়। কালস্রোতে সেও ক্ষয় পায়।

তাহলেও এই মনে হওয়াটাই অনেক। ক্ষণস্থায়ীদের ঝরতি পড়তির ভিড়ে এই দীর্ঘক্ষণ স্থায়িত্বটুকুই বিস্তর। অমরত্বের ভ্রম জন্মায়। তাই কি কম?

তবে সত্যিকার সর্বকালীন লেখা কি নেই? আছে। সেটা বিধাতার নিজের রচনায়। যদিও তা মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে বদলে যায়, তবু এক চিরকালের আদল বজায় থাকে।

আর আছে তাঁর উচ্চারণায়—যা চারিধারে তিনি চারিয়ে দেন তাঁর প্রতিভূদের প্রতিধ্বনিতে। বেদ উপনিষদ গীতা চণ্ডী বাইবেল কোরআন কথামৃত—সেই জাতীয়। তাই কেবলমাত্র কালজয়ী। সর্বদাই আনকোরা, সর্বকালের মানুষ তার মধ্যে চিরদিনের জিনিস খুঁজে পায়—চিরকালের প্রেরণা।

তা বাদে আর সব লেখাই কালক্ষয়ী, কালক্ষয় করার জন্য লেখা এবং পড়া। কালের সাথে সাথে ক্ষয় পাবার।

সত্যিকারের হচ্ছে এই কালস্রোত। নদীর জলধারার মতই চিরন্তন, নিত্য নূতন।

বহতা নদীর ধারে আমার কালজয়ী মিউজমহল গড়ে তুললাম, অভ্রংলিহ সেই কীর্তিস্তম্ভ দাঁড়ালো বটে সগৌরবে, কিন্তু নদীর পথ পালটালো, নিজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেও অন্য ধারা ধরলো সে, সঙ্গে সঙ্গে সেই জলপথে যাতায়াতকারী যাত্রীদলেরও মতিগতি পালটে গেল, ভাব অবলা হয়ে গেল আরেক ধারায়। বহতা নদীর তীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুদূরপরাহত সেই কীর্তিমন্দির কারো কারো কাছে তখনো হয়ত পরিক্রমণীয় তীর্থ হলেও, নিজের দুর্বহতার বোঝা নিয়ে আর সবার কাছেই তখন তা প্রত্ন-তাত্ত্বিকের গবেষণার; একদার সেই মিউজমহল কৌতূহলী সকলের কাছে তখন মিউজিয়ম হল্ ছাড়া কিছু না।

আমার ধারণায়, আমাদের কারো কোনো লেখাই কখনই কালজয়ী হয় না। হতে পারে না। সব লেখকই ক্ষণকালজয়ী—যদি বা হয়। রূপের মতন সেই মুহূর্তের চোখ আর মন ভোলাতে পারলেই ঢের। তাহলেই সে সার্থক। পরমুহূর্তেই আবার নতুন রূপোদ্গমে নব বসন্তের নতুন মধুপদের আসর জমজমাট। পুরোনো রূপসীর দিকে তাকাবার কারো ফুরসৎ কোথায়?

আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি কখনই কালজয়ী হতে চাইনি, এমনকি বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাতেও নয়। সেই বৃথা চেষ্টার অক্লান্ত সাধনায় কালক্ষয় না করে সকলের জীবনের সকালটা, না, জয় করতে নয়, তার সঙ্গী হতেই চেয়েছিলাম আমি। ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় আমার লেখা পড়বে, একটু বেলা হলে বড় হলেই অক্লেশে ভুলে যাবে আমায়। সেই একটুক্ষণ তাদের একটুখানি খুশি করতে পারলেই আমার খুশি।

কিন্তু গোড়াতেই যেকথা বলেছি, ক্ষণজীবীই হোন আর দীর্ঘজীবীই হোন, খোদা কাউকে কখনো পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেন না, স্বেচ্ছায় না সরলে সরিয়ে নেন—শেষ খোদকারি তাঁরই।

পথচারীদের জন্যে সর্বদাই পথ সাফ রাখতে হয়, ট্রাফিক যেন জ্যাম্ জমায় না যায়।

এক জায়গায় এসে দাঁড়ি টানতেই হয়। আর সবার পক্ষে দেহরক্ষার পর হলেও লেখকের বেলায় তার ঢের আগেই। বলবার কথা ফুরিয়ে গেলেই তাঁর কথা বাড়ানোর কোনো মানে হয় না আর।

আমার নিজের কথা যদি বলি, আমার কী বলার কথা ছিল আমি নিজেই জানি না। এতদিন ধরে কত কথাই বলেছি, বেশির ভাগই তার আজে বাজে আর হাসির কথাই, নিতান্তই টাকার জন্য বাঁচার তাগাদায় লেখা—কিন্তু আর না। কিছু বলতে পেরে থাকি বা না থাকি, কিছু বলতে পারি আর নাই পারি—এই লেখাটার পরেই আমার দাঁড়ি। এইটাই আমার শেষ লেখা আমি আশা করি।

এর পরেও প্রাণের দায় যদি ফের আমার কলম ধরতে বাধ্য করে, এই দাঁড়ির পরেও কথা বাড়িয়ে আবার আমায় Comma-য় আসতে হয়, তবে সেই সব বাক্য অবশ্যই আমার মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করবে, আমি জানি, সে হবে আমার আপন স্বাদরে নিজের ডেথ সেনটেন্সে।

রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে জন্মাইনি ঠিকই; আর, যদি জন্মাতুমও, তাহলেও ঝিনুকের থেকে মুক্ত হতে আমার দেরি হত না। অল্প বয়সেই আমি বুঝেছিলুম মুখ মোটেই ঝিনুকের জন্যে নয়; আর রূপো না, মুখের সম্মুখে যদি কিছু রাখতেই হয় তো সে হচ্ছে রূপ। ঝিনুকের থেকে মুক্তি পাবার পরেই সেই মুক্ত।

সেই নব নব রূপে অপরূপ মুক্তি।

আর এই রূপেই হল আমার অভিশাপ। এই রূপের জন্যেই জীবনে আমার কিছু হল না এবং যা কিছু হল তা হয়ত ওর জন্যেই হল। এই অনির্বচনীয়ের স্বাদ বাল্যকালেই আমি পেয়েছিলাম আর তার টানে সেই কৈশোরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম বাড়ির থেকে স্বাধীনতার সাধে শুধু কেবল বহুবিচিত্র সেই রূপের আস্বাদে।

মুক্তির রূপ আর রূপের মুক্তি এক হয়ে মিশে গেছে আমার জীবনে।

এই কারণেই আয়াসসাধ্য কোনো সাধনা আমার দ্বারা হল না, সাধনালব্ধ কোনো সিদ্ধিও নয়। এমন কি, লিখে লিখে

মার কাছে আসত ত্রিশূল ধরা ভৈরবী

জীবনটা কাটালেও লেখকের মত লেখক আমি হতে পারলাম না কোনোদিনই।

লেখক হতে হলে যে উদয়াস্ত পরিশ্রম বা নিদারুণ পড়াশোনা বা যে দুর্নিবার দুঃখ ভোগ করতে হয় তা আমার কুষ্ঠিতে কই?

লেখক হতে চাইওনি বোধ হয় আমি। লিখতে ভালও লাগে না আমার। প্রেরণার বশে নয়, প্রাণের দায়েই, আর কিছু না হতে পেরেই অগত্যা আমার এই লেখক হওয়া—সাংবাদিক হতে গিয়েই লেখক। ঘরকুনো হয়ে ঘাড় গুঁজে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে লেখক হতে কোনদিনই আমি চাই না, পাঠক হতেই চেয়েছিলাম বরং। বিধাতা যে বর্ণপরিচয়ের কেতাব আমাদের চোখের সামনে চারি ধারে মেলে রেখেছেন সর্বদাই, যার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে মুক্তোর ছাঁদে সোনার আখরে আপন স্বাক্ষরে তাঁর অপরূপ কাহিনী লেখা, নতুন নতুন হরফে নব নব মুদ্রণে মুহূর্তে মুহূর্তেই সে-বইয়ের নিত্য সংস্করণ, সেই বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের পড়াই আমার শেষ হয়ে উঠল না জীবনে। লিখিয়ে হব কি, পড়ুয়া হয়েই থাকতে হল আমায় চিরটা কাল। কিন্তু সেই ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারলুম কি?

যে তিনটি কথা মাথায় নিয়ে আমার এই আত্মকাহিনীর শুরু, সে-তিনটির সঙ্গেই, যাকে বলে কনস্ক্রুপেশন, সেই বাল্যকালেই আমার হয়েছিল।

সত্যি বলতে, সে সময়টা ছিল কেমন ঈশ্বরপীড়িত। আমাদের বাড়িতে বাবা ছিলেন পরম বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত মা ছিলেন শাক্ত, শক্তির উপাসিকা ... আমার মামা ছিলেন নাম-সাধক, হরিগুণ গানে বিভোর।

বাবাকে আমার মনে হত মহাদেবের মতন। শিবের মতই ছিল তাঁর চেহারা আর ধরন-ধারণ। রক্তাভ গৌরবর্ণ চেহারা, সদাপ্রসন্ন, প্রশান্ত, আত্মনিমগ্ন। সংসার-উদাসীন আত্মভোলা।

ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম ভাঙত তাঁর। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি গোটা গীতাটা আওড়াতেন। তাঁর মুখে শুনে শুনেই গীতা আর উপনিষদের আদ্ধেক শ্লোক আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছল—মানে তার বুঝি আর নাই বুঝি। সেই পুঁজিই আমার সারা জীবন ভাঙিয়ে খাওয়া।

মার কাছে প্রায়ই আসত দেখেছি লাল চেলীপরা ত্রিশূলধরা ভৈরবীরা—হিমালয়ের কোন মঠ না কামিখ্যে থেকে কে জানে! মার সঙ্গে নিভৃত আলাপ হত তাঁদের। দিনকতক থেকে ফের কোথায় তাঁরা চলে যেতেন যে।

এক ভৈরবী আমায় ভালোবাসতেন ভারী। পেড়া-টেড়া খেতে দিতেন তাঁর ঝোলার থেকে। দেবী কামাখ্যার মহাপ্রসাদ। তিনি একবার আমায় বলেছিলেন—তোমার মাকে সামান্য মনে কোরো না বাবা। জগন্মাতার অংশ আছে তাঁর মধ্যে। কখনো মাকে অমান্য কোরো না।

মাকে আমি ভালোবাসি তো।

মা সাক্ষাৎ ভগবতী। মা-ও যা—মা দুর্গাও তাই। তিনি বলতেন।

জানি আমি। জবাবে আমি বলতাম—সবার মা-ই তো তাই। মা দুর্গাই। তাই না?

শুনে শুনেই এসব কথা জানা। আমিও শুনিয়ে দিতে ছাড়তাম না।

তাই বটে। তবে তোমার মা আরও বিশেষ।

কিন্তু কী যে সেই বিশেষ তা তিনিও কোনো দিন খুলে বলেননি, আমিও তা জানতে চাইনি কখনো।

মার সেই বিশেষত্ব সারা জীবন ধরে আমায় জানতে হয়েছে। জীবন ভরে জেনেছি। আর, পৃথিবীর সঙ্গে আমার মুখোমুখি হয়েছিল সেই বয়সেই। মাথার মধ্যে কী পোকা ছিল কে জানে, সুখে থাকতে আমায় ভূতে কিলোতো, আর মাঝে মাঝেই আমি বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়তাম বিবাগী হয়ে। পকেটে একটিও পয়সা না নিয়ে (পাব কোথায় পয়সা?) বিনাটিকিটে রেল গাড়ির লম্বা লম্বা পাড়ি জমাতাম—চলে যেতাম বৈদ্যনাথধাম। দেওঘরের দেবতা কি প্যাড়া কিসের টানে তা আমি বলতে পারি না।

চলে এসেছি কলকাতায়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি, খবরকাগজ ফিরি করেছি, জেল খেটেছি মাঝে মধ্যে, ফুটপাথে পার্কে শুয়ে রাত কেটেছে। কষ্টের মধ্যেও কতো সুখ। স্বাধীনতার স্বাদ।

আর, ভালোবাসা? তার পরিচয় কাউকে বোধ হয় চেষ্টা করে পেতে হয় না, সে নিজেই আগ বাড়িয়ে জানান দিয়ে থাকে। ওই একটি বস্তু, যা কারোর দ্বারা লভ্য নয়, (পাওয়াও যায় না বোধ হয়) নিজগুণে আপনার থেকে অযাচিত এসে ধরা দেয়।

চলার পথের মোড়ে মোড়েই তার দেখা মেলে। দেখতে না দেখতেই বেঁচে বেঁচে যাই। নতুন করে বাঁচি, নতুনতরো আঁচ পাই জীবনের। কি করে যে একজনকে আরেক-জনের এমন ভালো লেগে যায়, আর কী আশ্চর্য, তাকেও ভালো লাগানো যায় তেমনি আবার—কতো সহজেই না! আমার কাছে সে এক পরম বিস্ময়—পরমাশ্চর্য রহস্য!

ঈশ্বর, পৃথিবী আর ভালোবাসা—প্রত্যেকের জীবনেই ওতঃপ্রোতো। কেউ বঞ্চিত নয়। প্রত্যেককেই টের পেতে হয় কখনো না কখনো, না টের পেয়ে উপায় নেই, যিনি এই নাটের গুরু তিনিই টের পাওয়ান।

আর, বাল্যকালেই এসবের টের পেয়ে যাওয়া এক রকমের ভালোই বোধ করি। কেননা, ব্যাধি হিসেবে এই তিনটিই মারাত্মক—এই ঈশ্বর, পৃথিবী আর ভালোবাসা।

জানিস কে এসেছিল আজ?

তেমন করে ধরতে পারলে এ বস্তু কাউকে ছাড়ে না, রেহাই দেয় না সহজে, আজীবন ভোগায়, আপাদমস্তক গ্রাস করে বসে। সংসার, সারাৎসার আর...আর ভালো-বাসার কী আখ্যা দেব? অসার? নেহাৎ অসার ছাড়া কী আর ও? এর একটিই যদি কাউকে ধরে তো তার হয়ে গেল? জীবনের মতন ছাড়ান নেই। ঘোর সংসারী, ঘোরালো প্রেমিক কিম্বা ঘোরতর ঈশ্বরপ্রেমী হয়ে গেল সে। হতেই হবে। পরিত্রাণ নেই আর।

তাই কৈশোরেই কারো যদি এসবের টীকা নেয়া হয়ে যায়—খানিক খানিক স্বাদ পায় সে—তো এজন্মের মতই বেঁচে গেল বেচারা!

সটীক হয়ে থাকলে সঠিকভাবে বাঁচা যায় জীবনভোর। বাল্যে বসন্তের টীকা নিয়ে রাখলে তা যেমন কখনো প্রাণান্তকর হয়ে দেখা দিতে পারে না, দিলেও হামেশায় সামান্য ব্যাপার হয় মাত্র, তেমনি প্রাথমিক এই ত্রিবিধ টিকায়—এই ট্রিপ্‌ল অ্যান্টি-জেন্‌ নেয়া থাকলে সারা জীবন ধরে পৃথিবী ঈশ্বর আর ভালো-বাসার পার্থিব আর অপার্থিব সেই বসন্ত-কালকে অল্পে অল্পে একটু একটু করে হারিয়ে তারিয়ে চেখে চেখে খাওয়া যায়।

তাকেই খাই, তার খাদ্য হতে হয় না।

পরাৎপর হলেও সেই মহাকাল যেন পরাস্ত হয়ে থাকে।

বিবেকানন্দের ভাষায় অমৃত ভাণ্ডের কিনারে বসে তার কিনারা করা। তার ভেতরে ডুব দিয়ে মজে ভূত হয়ে যাওয়া নয়, তাকে কিনারায় রেখে বহালতবিয়তে থেকে দেখে শুনে চেখে যাওয়া।

ভবানীর ভাঁড়ে হারিয়ে না গিয়ে, মিলে-মিশে তার সাথে একাকারে নিজেও ভাঁড়ে ভবানী না হয়ে, নিজের ভাঁড়কেও ভবানী না বানিয়ে ভবানীর ভাঁড়ার লুঠ করা আর কি!

একদিন বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি মা আমার বিরাট দরদালানে কেমন যেন অভিভূতের মতন দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখে বললেন, জানিস কে এসেছিল আজ?

কে?

মা এসেছিলেন!

দিদিমা? তাই নাকি? কোথায় দিদিমা? আমি লাফিয়ে উঠেছি।

মা, তোর দিদিমা নয়। তোরও মা। তোর মা, আমার মা, সবার মা। তিনিই একটু আগে এসেছিলেন।

শুনে আমি হতবাক হই। বুঝতে পারি না কী।

মা কালী আমায় দর্শন দিয়ে গেলেন একটু আগে। এই সামনে, ওইখেনে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন—যেখানে তুই দাঁড়িয়েছিস। ওই জবাফুলটা দিয়ে গেলেন আমায়।...ভয়ে আমি হাত তুলে নিতে পারিনি। হতচ্ছাড়ী আমি!

সামনেই একটা জবাফুল পড়েছিল আমি দেখলাম। দেখে শুনে আমি শিউরে উঠেছি কেমন।

কাছেই একটা গোরু বসে জাবর কা কিন্তু জাবর কাটা সে ভুলে গেছে রোমাঞ্চিত হচ্ছে তখনো। মনে হয় বুঝি মা কালীকে দেখেছে।

আর, সত্যি বলতে, দিব্যদর্শনের ে তখনই আমার মালুম হয়েছিল। দণ্ডেই। (

জীবন / জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

চারদিক ফরসা হয়ে গেল। ভোর। রাত ভারি ছিল। একটা কালো পর্দার মতন ঝুলছিল। একটা ঢাকনা। বাপ্‌, কী ঘুটঘুটে অন্ধকারই না গেছে। মাথার ওপর বিস্তর তারা জ্বলছিল যদিও। কিন্তু সেসব অনেক দূরে, মাটি থেকে অনেক উঁচোয়। কাজেই তার কাজের কোনোরকম ব্যাঘাত ঘটেনি। নির্বিঘ্নে সব সারতে পেরেছে।

হুঁ, ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, একটা কালো আবরণ। আর চারদিক এমন চুপচাপ থমথম করছিল। এই নীরবতাও একটা পর্দার মতন আবরণের মতন তাকে ঘিরে রেখেছিল। যে জন্য নিশ্চিন্ত মনে সে তার নিজের কাজ সমাধা করেছে। গোলমালের মধ্যে এসব হয় না। খারাপ লাগে। মনে হয় চারদিকে জীবন, আর এ আমি কী করছি! জীবনের গোলমালের মধ্যে জীবন শেষ করা, চিরকালের মতন ফুঁ দিয়ে বাতি নিবিয়ে দেওয়া—বিচ্ছিরি লাগে।

না, কোনো শব্দ ছিল না চরাচরে। কেবল থেকে থেকে হাওয়া উঠে গাছের পাতা সোঁ সোঁ করছিল। কিন্তু সেটাকে শব্দ মনে হচ্ছিল না আওয়াজ মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কেউ বড় বড় শ্বাস ফেলছে। যেন কেউ কারো নাক চেপে ধরে রেখেছিল, তারপর নাকটা ছেড়ে দিতে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছে, বড় করে শ্বাস টানছে।

রাত্রে সব কিছু অদ্ভুত অন্য রকম মনে হয়।

কিন্তু এখন ভোর হয়ে গিয়ে অন্ধকার ঢাকনাটা সরে যেতে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে না কি। গাছে গাছে অসংখ্য পাখি কিচিরমিচির করছে। জীবনের কলরব।

কাজেই লাস দুটোর দিকে তাকাতে তার এত খারাপ লাগছিল।

ছেলেটার চোখ দুটো কিছুতেই বুজছে না। বউ চোখ বুজে আছে। বউ জানত এমন একটা কিছু করবে মনে মনে ঠিক করে সে দুজনকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালাবার নাম করে এই জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছে।

সন্ধ্যাসন্ধি তারা এখানে এসে পৌঁছেছিল। এই ডালপালা ছড়ান গাছটার নিচে, জায়গাটা একটু পরিষ্কার, কাঁটা ঝোপঝোপ তেমন ছিল না, তিনজন বসে পড়েছিল। তারপর সে ঠিক করল রাতটা এই গাছতলায় থেকে যাবে। অন্ধকারে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ওইটুকুন একটা ছেলে নিয়ে হাঁটার কোনো মানে হয় না। অবশ্য আগেও হাঁটা হয়েছিল প্রচুর। প্রায় সারা দিনই তাদের হাঁটতে হয়েছে, কাজেই রাতটা এখানে থেকে যেতে বউ রাজী হয়েছিল। বেচারাও কি আর হাঁটতে পারছিল। না খেয়ে খেয়ে শরীরে ছিলই বা কী। তা ছাড়া ক'দিন আগে আঁতুড়ে একটা সন্তান নষ্ট হয়েছে না?

পুঁটলিটার দিকে এখন তার চোখ পড়ল। কেমন এখন দিনের আলোয় সে বুঁ[illegible]
বিশ্রী লাগে। রাতে [illegible]

কিন্তু তা হলেও অন্ধকারে সব কিছু চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন ফরসা হতে সব আবার অচেনা অন্যরকম ঠেকছে। যেন এটা তার পুঁটলি না, অন্য কারো, এখানে ফেলে রেখে গেছে। বা যেন এই গাছতলায়ও সে ছিল না। অন্য গাছের নিচে দুজনকে নিয়ে বসেছিল।

একদৃষ্টে পুঁটলিটার দিকে সে চেয়ে রইল। কিছুই ছিল না সঙ্গে আনার। থালা-বাসন অনেক দিন আগেই গেছে। কেবল কিছু ছেঁড়া জামাকাপড় একটা অ্যালুমিনিয়ামের ফুটো বাটি আর বোধ করি ঘেণ্টুর একটা নতুন জামা আছে। নতুন মানে মাস চারেকের পুরোনো। তখনও তার কাজ ছিল। কারখানা খোলা ছিল। ঘেণ্টু একদিন কি নিয়ে খুব কান্নাকাটি করেছিল বলে জামাটা সে কিনে দিয়েছিল।

এই জামা ঘেণ্টু আর গায়ে দেবে না।

একটা পুরোনো কাঁথা দিয়ে পুঁটলিটা বাঁধা হয়েছে। কাঁথার কাজ কবেই শেষ হয়ে গিয়ে ছিঁড়েফেড়ে ন্যাতা হয়ে গেছে, তাই ওটা দিয়ে পুঁটলি জড়ান।

তা হলেও কাঁথাটার কথা তার মনে আছে। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। কাজ থেকে ফিরে নুন লঙ্কা দিয়ে সে চালভাজা খাচ্ছিল। ঘেণ্টু তখন পেটে। মাথা গুঁজে বউ কাঁথা সেলাই করছিল। হারিকেনের আলোয় লাল সুতো দিয়ে পদ্মফুল তুলছিল।

হলুদ ঘেণ্টুর ঐ ডোরাকাটা হলুদ জামাটা, কিছু ছেঁড়া কাপড়চোপড়, অ্যালুমিনিয়ামের একটা ফুটো বাটি আর আড়াই শ' গ্রামের মতন চিঁড়ে সঙ্গে এনেছিল তারা। রাস্তায় ক্ষুধা পেলে ঘেণ্টু খাবে। তা এখানে বসে ঘেণ্টু চিঁড়েটা খেয়েছে। সামনের ওই পুকুরটা থেকে সে নিজে গিয়ে জল এনেছিল। ঘাসের ওপর মগটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ফুটো বাটির সঙ্গে টিনের এই মগটাও এসেছে। এই তাদের বাসনকোসন। অনেক করে বলতে বউ এক মুঠ চিঁড়ে গালে ফেলে জল খেয়েছিল। চিঁড়ে জল খাবার পর পুঁটলি থেকে বউ একটা ছেঁড়া শাড়ি বের করে বিছানার মতন করে ঘেণ্টুকে শুইয়ে দিয়েছিল। খেতে বসেই ঘেণ্টু খুব ঢুলছিল। সারাদিন এত হাঁটা। মাঝে মাঝে কোলে নিতে হয়েছিল। বউ একবারও ছেলেকে কোলে নিতে পারেনি। নিতে হয়েছিল তাকেই। তার শরীরেও কি আর কিছু আছে। খানিকটা কোলে করে হেঁটে আবার ঘেণ্টুকে নামিয়ে দিয়েছে। এক একবার তার এমন হাঁপ ধরছিল।

নিজের সরু কব্জিটার দিকে চোখ রেখে এখন সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না খেয়ে, স্রেফ উপোস থেকে থেকে—অথবা যারা না খেয়ে আধপেটা খেয়ে পা পা করে মরণের দিকে এগোচ্ছিল, হলুদ ঘেণ্টু, তার স্ত্রী—তাদের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা দুশ্চিন্তা করে তার শরীরের এই হাল হয়েছে।

ঘেণ্টু শুয়ে পড়তে বউ একটু কাত হয়েছিল। বেচারার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। আশ্চর্য, সে নিজে শোয়নি, ঠায় বসে রইল। একটা পেঁচা, যেন এই শিরীষ গাছটার মাথায়, খুব করে দুবার ডেকে উঠেছিল। আওয়াজের মধ্যে ওই একটা আওয়াজই তার কানে এসেছিল। বিদঘুটে শব্দ। একবার তার মনে হয়েছিল শব্দটা বুঝি ঐ তারা-জ্বলা আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে গাছের মাথায় আটকে গিয়ে ঝুলছিল। হঠাৎ তার এমন মনে হয়েছিল কেন। তবে তার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তখনি গাছটার দিকে সে চোখ তুলেছিল।

বউ তাকে শুয়ে পড়তে পেড়াপীড়ি করেছিল। সে শোয়নি। বলেছিল তোর এক ঘুম হয়ে যাক তারপর আমি একটু শোবো—সাপখোপ বাঘ ভালুক কত কি থাকতে পারে জঙ্গলে, সকলের এক সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক না।

নিশ্চয় বউ তখন থেকে সন্দেহ করছিল। না, কেবল তখন থেকে হবে কেন। সন্দেহ করেছিল আগেই। নিশ্চয় পুঁটলি বাঁধার সময় ছোরাটা দেখে বেচারা কিছু আঁচ করেছিল। সব জিনিস যখন বেচে দিয়েছে টিনওয়ালার কাছে ঘেণ্টুর টিনের ভাঙাচুরা খেলনাগুলি পর্যন্ত হঠাৎ এমন একটা চকচকে ছোরা সে পেল কোথায়, আর ওটা
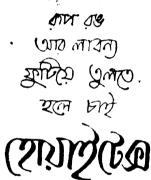
দিয়ে কী কাজ হবে বউ কি একবারও ভাবেনি। নিশ্চয় ভেবেছিল। মুখ ফুটে কিছু বলেনি। মুখ ফুটে কোনু দিনই বা ও কিছু বলতে পেরেছে। চিরকাল মুখচোরা লাজুক মানুষ। এমন নিরীহ মেয়েছেলে তার কম চোখে পড়ে।

হুঁ, চার মাস ঘর ভাড়া বাকি পড়াতে বাড়িওয়ালা রোজ কুকুরের মতন তাড়িয়ে দিতে চাইছিল। তখন বউকে সে একদিন বলেছিল, তাদের নিয়ে গোবিন্দপুরে তার মামার কাছে চলে যাবে। মামার চাষবাস আছে। সেখানে গিয়ে সে খেটে খাবে।

দু মাসের ওপর তার কারখানা লক-আউট হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়ে বেকার থেকে থেকে দুটো প্রাণীকে নিয়ে সে মরতে বসেছিল, হুট করে একদিন মামার কথা বলতে বউ কি বিশ্বাস করেছিল? কারণ এমন এক মামা আছে তার কোনু গোবিন্দপুর গাঁয়ে আগে তো তার মুখে শোনা যায়নি।

কাজেই বউ তখন থেকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল। নিশ্চয় এমন কোনো জায়গায় সে তাদের নিয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে তারা আর কোনো দিন ফিরবে না, বা সেখানে গিয়ে পৌঁছোবার পর তাদের আর বাঁচবার দরকার হবে না, রক্ত মুখে তুলে একটা কাজ একটা চাকরি জোটাবার জন্য তাকেও আর ছুটোছুটি করতে হবে না।

কিন্তু ঠিক এই গাছতলায় আজ রাতের মধ্যেই যে ব্যাপারটা সে সেরে ফেলবে এটা হয়তো বউ চিন্তা করতে পারেনি।

হুঁ, আগে সে বউয়ের বুকেই ছোরা বসিয়েছিল। কেননা, সে এটা জানত, বউয়ের যদি ঘুমটা ভেঙেও যায় তবু বেচারা চেঁচামেচি করবে না। ঘেন্টু জেগে গিয়ে ভয় পাবে এই ভেবে চুপ করে থাকবে, চুপ করে থেকে মরবে। অসম্ভব ধৈর্য রাখত মানুষটা।

অবশ্য ঘেন্টুটাও আর জাগেনি। ফুস-ফুসের কাছে ছোরাটা প.চ করে একটুখানি বসিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। আর শ্বাস ফেলেনি। ঘুমের মধ্যেই মরেছে।

তবু এখন দিনের আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘেন্টুটা খোলা চোখে চেয়ে আছে। বউয়ের চোখ দুটো একদম বোজা।

তার খুব ইচ্ছে করছিল ধারে কাছে তুলসীপাতা থাকলে ছিঁড়ে এনে ঘেন্টুর চোখ দুটো ঢেকে দেয়। বউয়ের বোজা চোখের পাতায়ও তুলসীপাতা দেওয়া যেত। আত্মাটা একটু শান্তি পেত।

কোথায় আর এখন তুলসীগাছ খোঁজা-খুঁজি করবে। চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল সে। পুব দিকটায় ডালিমদানা ফেটে পড়ার মতন অবস্থা। এখনি রোদ উঠবে। দিনের আলোটাই তার খারাপ লাগছিল। আর রাজ্যের পাখির কিচিরমিচির। সারা চোখ তুলে গাছটার দিকে তাকিয়ে সে ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল। তারপর একদলা থুথু ফেলল। রাত জাগার দরুন মুখের ভিতরটা লবণ লবণ লাগছে।

অবশ্য জিভের স্বাদফাদ নিয়ে এখন আর সে মাথা ঘামায় না। এখন একটা মূল ভাবনা তার মাথার ভিতরটা গোলমাল করে দিচ্ছে।

যে জন্য দিনের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘেন্টুর মার চোখের ভিতরটা দেখতে চেয়েছিল।

ঘেন্টু বুঝত না। পাঁচ বছরের অবোধ শিশু। ওর তাকিয়ে থাকা চোখ বুজে থাকা এক কথা। কাজেই ছোঁড়া যে মরে গিয়েও খোলাচোখে তার দিকে চেয়ে আছে এই জন্য মোটেই সে পরোয়া করে না।

ভাবছিল এই মেয়েটির কথা, যাকে এক-দিন নরসিংপুর গ্রাম থেকে বিয়ে করে এনে ঘরে তুলেছিল। যার নাম কাজল। যদি ঠিক এই সময়টায় ও চোখ মেলে দেখত যে তার ঘরের পুরুষ এখনও এই গাছটার নিচে চুপচাপ বসে আছে, একটার পর একটা বিড়ি টানছে, কেমন ভয়ানক চমক খেত, অবাক হত না?

তাই তো, পুঁটুলির ভিতর ছোরা দেখে এবং রাতারাতি তাদের দুজনকে নিয়ে কোনু এক মামার কাছে সে যাচ্ছে শুনে বেচারা ঠিকই সন্দেহ করেছিল। কিন্তু তার সন্দেহটা কি কেবল তাদের দুজনাকে নিয়ে হয়েছিল? যে মানুষটা হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে মাইলের পর মাইল তাদের নিয়ে যাচ্ছে সেই পুরুষকে নিয়েও কি তার সন্দেহ ছিল না।

নিশ্চয় ছিল। না হয়ে যায় না। কেননা এই পুরুষ চব্বিশ ঘণ্টা তাদের খাওয়া পরার চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে শরীর পাত করছিল, দরজায় দরজায় ঘুরছিল একটা কাজের জন্য চাকরির জন্য, কোথাও ভরসা পায়নি, রাত্রে ঘরে ফিরে দেওয়ালে মাথা ঠুকেছে, যদি বউ বোঝাতে গেছে, হাত ধরে প্রবোধ দিতে গেছে, তার হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে, বিকৃত গলার কান্না শুনে কতদিন ঘেন্টু ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চমকে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করত।

তা ছাড়া রাস্তায় আসতে আসতে অন্তত দশবার বউকে সে বুঝিয়েছিল, যদি আমি বাঁচি তোরাও বাঁচবি। আবার উল্টোটাও বলেছিল, যদি তোরা মরিস আমাকেও মরতে হবে। এক দণ্ড আমার তখন বেঁচে থাকা চলবে না, সম্ভব হবে না। হয় এক সঙ্গে বাঁচা, না হয় একসঙ্গে তিন জনের শেষ হয়ে যাওয়া। এই কথার অর্থ কি!

নিশ্চয় কাজলের বুকের মধ্যে শেষ সময়েও কথাটা গাঁথা হয়ে ছিল। অর্থাৎ আসলে তারা কেউ বাঁচবে না, তিন জনের

সম্ভব না। কাজেই সে শেষ হবে, ঘেন্টু শেষ হবে এবং তারপর তার সোয়ামী, ঘেন্টুর বাবা, ঘরের কর্তা।

সম্পার ছোরাটা এই জন্যই।

কর্তা আগে বউকে মারবে, ছেলেকে মারবে, তারপর নিজের বুকে সেটা বসিয়ে দিয়ে নিজে শেষ হবে।

কিন্তু এখন?

সে প্রায় বেকুব হয়ে গেছে তার নিজের বাম্বহারে।

তখন ভেবেছিল দু' দুটো খুন করার পর একটু দম নিয়ে একটা বিড়িটিড়ি খেয়ে তারপর ছোরাটা বুকের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে ওদের পাশে লুটিয়ে পড়বে।

আশ্চর্য, একটা বিড়ি খেল, তারপর আর একটা ধরাল, সেটা শেষ করে আবার একটা। আপন মনে বিড়ি টেনে চলল, ক্যারই হাওয়া উঠে গাছের পাতায় সরসর শব্দ হল, তারপর অন্ধকার ফিকে হতে লাগল জ্বলজ্বলে তারাগুলি ক্রমে মেদামার চেহারা ধরল, তারপর কখন ভোর হ… চারদিক ফরসা হয়ে গেল বুঝতেই পার… না। তাজ্জব বনে গেল সে। অথচ ছোরাট… কোলে নিয়ে বসে আছে। তার এ…

ব্যবহারটাকে কী বলা যায়। তাকেই বা এখন কী আখ্যা দেওয়া চলে। কাজেই সে চিন্তা করছে, কাজল চোখে দেখছে না, কিন্তু ওর আত্মাটা তো এখনও ধারেকাছে ঘুরঘুর করছে। সোয়ামীকে এভাবে চুপ-চাপ বসে থাকতে দেখে আত্মাটা কেমন দুঃখ পাবে? ভাববে, ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের দুজনকে বাড়ি থেকে এতটা পথ হাঁটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এনে খুন করল। অথচ নিজের বেলায় সে কিছুই করল না। ছোরাটা আর একবারও হাতে নিচ্ছে না। কেমন স্বার্থপর সে, কতখানি দরদ ছিল তার ছেলে আর বউয়ের জন্য এখন একবার মানুষ এসে দেখুক।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের ওপর এমন একটা ঘেন্না হল, তারপর চোখ ফেটে জল। মুখের নোনতা স্বাদটা মজে গিয়ে গলার কাছটা তেতো তেতো লাগছিল।

শালার পাখিদের চেঁচামেচি যেন আর থামছে না, খচ্চরের ঝাঁক চুপ চুপ! গাছের দিকে চোখ তুলে বড় করে একটা ভেংচি কাটল সে, একটা ঢিল ছুঁড়ল। কিন্তু পরের ঢিলটা কুড়োতে গিয়ে তার হাতটা স্থির হয়ে রইল, দূরে একটা শিমুল গাছের গুঁড়ির কাছে তার দৃষ্টিটা ছুটে ছুটে গিয়ে হঠাৎ যেন আছাড় খেয়ে পড়ল।

কি ব্যাপার। এই জঙ্গলে মেয়েছেলে? হুঁ, পরিষ্কার দেখছে সে একটি মেয়ে শিমুলতলার ওই ঝোপের পাশে একলা চুপ-চাপ বসে আছে।

তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াল। কোলের ছোরাটা ছিটকে ঘাসের ওপর পড়ল।

ছোরা পড়ে রইল। লাস দুটো পড়ে রইল। এক পা এক পা করে সে শিমুল গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যুবতী! কাজলের বয়সী। পায়ের কাছে একটা রক্ত-মাখা কাটারি পড়ে আছে। তিন হাত দূরে ঘাসের ওপর দুটো লাস। একটা বয়স্ক মানুষ, একটি শিশু। ঘাসের ওপর আঠা আঠা এত কালচে রক্ত। যেন এখনি দুটো একটা মাছি উড়ছে।

বেশ খানিকটা সময় চোখ গোল করে সে দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না। [illegible]টার কালো ডাগর চোখ বেয়ে [illegible]। [illegible] ডৌল অনেকটা [illegible] মুখ গোল টেপা। কাজলের চেয়েও [illegible] পোঁছ ফরসা। অথবা যেন লাল রোদের ছটা লেগে ফ্যাকাশে হয়েও মুখটা এত উজ্জ্বল লাগছে।

হুঁ, ডালিমদানা ফেটে গিয়ে সূর্য উঁকি দিয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ওদিকটা দেখে আবার সে এদিকে চোখ রাখল। হঠাৎ কি করবে বুঝতে পারছিল না।

অগত্যা একটু কেশে গলায় আওয়াজ দিল।

যুবতী চোখ তুলল, তাকে দেখল, কিছু বলল না।

আর এক পা এগিয়ে গেল সে। এখানেও পুরোনো ময়লা শাড়ি পেতে বিছানার মতন করা হয়েছিল, কাঁথার বদলে একটা ছেঁড়া লুঙি জড়ান বেশ বড় পুঁটলি, পাশেই একটা কলাই করা ফুটো থালা পড়ে আছে। সব কিছু দেখে ব্যাপারটা তখনই সে বুঝে গেল।

'সোয়ামী নাকি?' আস্তে প্রশ্ন করল সে।

'হুঁ', যুবতী মাথা নাড়ল, 'সোয়ামী আর পেটের ছেলে।'

শুনে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে কেমন যেন বিকৃত করে ফেলল সে। পাশের কাটানটের ঝোপের গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিল। একটু পরে আবার যুবতীর দিকে তাকাল।

'উপোসকাপাসে দিন কাটছিল বুঝি?'

যুবতী ঘাড় নাড়ল।

'ও মরদকে দিয়ে এমন শক্ত কাজটা না করিয়ে নিজে করলে কেন?'

'আমার মরদের সাহস ছিল না, ভেতরটা দুবলা, বলল, তুই আমাদের দুটোকে শেষ কর, তারপর তুই নিজেরটা নিজের হাতে পারবি।'

একটা তেতো ঢোক গিলে রক্তমাথা কাটারিটার ওপর একবার চোখ বুলোলো সে। দু' পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা মরা পুরুষটাকে দেখল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তালুর চুল নেই। দাঁত বেরিয়ে আছে। যেন দু' পাটির দাঁত এক সঙ্গে এঁটে গেছে। তাই হবে হয়তো, চিন্তা করল সে, কাটারির কোপ লেগে খুব যন্ত্রণা পেয়েছিল, পাছে চিৎকার করলে ছেলের ঘুম ভেঙে যায় তাই দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সহ্য করেছিল। মরা বাচ্চাটাকে দেখল সে। বাচ্চাটা চোখ বুজে আছে। পুরুষটা চেয়ে আছে। এখানেও হতচ্ছাড়া পাখিগুলির চেঁচামেচি।

হলুদ রঙের গোল গোল রোদ শিমুলে পাতার ফাঁক দিয়ে সোনার আংটি হয়ে যুবতীর মাথার চুলে পিঠে নাচানাচি করছিল।

'এখন তবে কি ঠিক করলে?' আস্তে বলল সে।

'নিজেরটা তো নিজে সাহস পেলাম না।' যুবতী আঁচলে চোখ ঢাকল। ফুঁপিয়ে একটু কাঁদল। তারপর আঁচল সরিয়ে মুখ তুলল। 'আপনি এই কাটারিটা দিয়ে আমায় শেষ করে চলে যান।'

শুকনো গলায় হাসল সে।

'আমারও যে একই অবস্থা, বউটাকে ছেলেটাকে শেষ করলাম, তারপর নিজের বেলায় অস্ত্র ধরতে সাহসে কুলোল না।'

চোখ মুছে ফ্যালফ্যাল করে যুবতী এই পুরুষটিকে দেখল। একটু ভাবল। তারপর মাটির দিকে চোখ নামাল।

'তবে এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?'

'ভাবছি মেয়েছেলে হয়েও তোমার যখন সাহস আছে, তোমার ঐ কাটারিটা দিয়ে আমাকে শেষ করে দাও। আমাদেরও ঐ একই অবস্থা চলছিল। উপোস করে করে দিন আর কাটছিল না।'

'লাস দুটো কোথায়?'

'ঐ যে', আঙুল দিয়ে সে শিরীষ গাছটা দেখাল। 'মেণ্টু ও কাজল ওখানে শুয়ে আছে।'

যুবতী কিন্তু সেদিকে চোখ ফেরাল না। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। যেন নিজের মনে বলল, 'চারদিকে কেবল উপোস-কাপাস চলছে, এক-একটা পরিবার এই করে করে সাফ হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার সোয়ামী কারখানার মানুষ ছিল বুঝি, ওখানেও লক-আউট চলছিল?'

যেন কথাটা বুঝল না, বড় বড় চোখ করে যুবতী তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর মাথা নাড়ল।

'লোকের খেতে জন খাটত, দু' দুবার বান হয়ে আমাদের উত্তর দেশটা এখন জলের নিচে, জন খাটাবে কে। লাগাড়ে চোদ্দ দিন কেবল শালুক খেয়েছি তিনটি প্রাণী। বাচ্চাটা এমনিও মরত, শেষ দিকে হাগা আরম্ভ হল, দেখুন হাড় পাঁজর কেমন বেরিয়ে আছে।'

বাচ্চার দিকে সে তাকাল না। ধপ করে যুবতীর পায়ের কাছে ঘাসের ওপর বসল।

'যে যাবার গেছে, যারা গেল তারা রক্ষে পেল, এখন তুমি নিজে কি ঠিক করলে, আমায়ই বা কি করতে পরামর্শ দেবে।'

ঘাড় গুঁজে পায়ের নখ দিয়ে যুবতী ঘাস খুঁটছিল। এক দৃষ্টে চেয়ে দেখল সে। বোঝা যায় একদিন রক্ত টুসটুস করত ঐ পলকা নরম নখের নিচে। ওপরে গোলাপী আভা ফুটত। উপোসে কাপাসে সব ক'টা নখ এখন মরা মাছের আঁশের চেহারা ধরেছে। ঘাস খোঁটা শেষ করে যুবতী করুণ চোখে তার মুখটা দেখল।

'আমি মেয়েছেলে, আমি আপনাকে কী পরামর্শ দেব। আমারটাই আমি বলছি, কাটারি দিয়ে কুপিয়ে আমায় শেষ করুন, না হলে সোয়ামীর কাছে আমার অধর্মের শেষ থাকবে না, চিরটাকাল তার চোখে পাপী হয়ে থাকব।' আবার ডাগর চোখের কোণে জল দাঁড়াল।

'পারব না।' ঘাসের দিকে চোখ রেখে সে জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'তোমার ঐ নরম গায়ে আমি কাটারি ছোঁয়াতে পারব না।'

চোখে জল নিয়ে যুবতী হঠাৎ কেমন করে জানি হাসল।

'আপনি পারবেন না, আমিও কি আপনার গায়ে অস্ত্র ঠেকাতে পারি।'

'তবে কি করা।' বিরক্ত হয়ে সে আর এক দলা ঘাস ছিঁড়ল। পাখির কিঁচির-মিচির অনেকটা কমেছে। রোদের কোলে সাদা সাদা মেঘ দেখা দিয়েছে। জোরে হাওয়া ছাড়ল।

সেদিকে চোখ রেখে যুবতী উদাস গলায় বলল, 'আপনি আমায় বিনাশ করতে পারছেন না, আমি আপনাকে বিনাশ করতে পারছি না। তবে তো দেখছি নতুন করে বাঁচার কথা ভাবতে হয়, নতুন করে জীবন শুরু।'

'তাই আমি চাইছি সোন্দরী, তাই আমায় করতে দাও।' খপ্ করে যুবতীর হাতটা সে মুঠোর মধ্যে টেনে নিল।

যুবতী ঈষৎ লাল হল। ঘাড় নিচু করে বলল, 'কিন্তু পেটের ভাতের জন্যে গায়ের কাপড়ের জন্যে আবার যে আপনাকে রক্ত মুখে তুলে ছুটোছুটি করে মরতে হবে গো মশাই।'

এবার সে থমকে গেল। গাছের আগায় একটা কাঠঠোকরা ঠকঠক করে কাঠ ঠোকরাচ্ছিল।

যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতের নানা রাগ-রাগিণী তাঁর মনে বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি যদি সেই সঙ্গে শিল্পচর্চাও করেন তা হলে তাঁর মনের ভাব তথা অনুভূতিটুকু প্রকাশ করতে পারেন রঙ ও রেখার মধ্য দিয়ে। ইউনিক গ্যালারীতে সম্প্রতি শিল্পী সুললিত সিংহ এই জাতীয় কয়েকটি সাইকোভিশন (psychovision) ছবি দেখবার সুযোগ দিলেন।

সুললিত সিংহ বাদ্যযন্ত্রশিল্পী—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে তিনি

ফিউরি —শঙ্কর গুহ

স্বরোদ বাদন শিখছেন। বিভিন্ন ভারতীয় রাগ-রাগিণী বিষয়ে তিনি গবেষণা করেছেন, এবং বিদেশে এগুলির প্রচারের জন্য তিনি রোমান অক্ষরে রাগ-রাগিণীর বহু স্বরলিপি রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান সেগুলি প্রকাশিত করেছে। উদ্দেশ্য, আমেরিকাবাসীদের মধ্যে যাঁরা ভারতীয় সঙ্গীতরস আস্বাদন করতে চান, তাঁদের মধ্যে সেগুলি প্রচার করা। সঙ্গীত বিষয়ে চিত্র রচনা আমাদের দেশে নতুন নয়। তার প্রমাণ পুরোনো রাগমালা চিত্র। তবে এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি সবই বিমূর্ত। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর ঝঙ্কার ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার নানা রূপেই তিনি বিমূর্ত আকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অন্ধকার কক্ষে প্রত্যেক ছবির ওপর মুহুর্মুহু আলোকপাত, বিভিন্ন রাগের কাল অনুযায়ী তীব্র লাল, নীল, সবুজ ও হালকা সবুজ রঙের সর্পিল, গতিশীল বিন্যাস ও নেপথ্যে রেকর্ড সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বিশেষ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল সন্দেহ নেই, তবে দর্শকদের মনে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। মনে হয়, একই সূতায় সঙ্গীত ও শিল্পকলার মালা গেঁথে দর্শকবর্গকে উপহার দেওয়ার আয়োজনে সম্ভবত কোনও ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। তবুও নতুন প্রচেষ্টা হিসাবে শিল্পীর উদ্যম প্রশংসনীয়।

✻

শিল্পী শঙ্কর গুহ অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ২৬টি রচনা দেখা যায়।

শিল্পী তরুণ। ১৯৬৮ সালে তিনি কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন। জাতীয় বৃত্তি লাভ করে তিনি এখন শিল্পী সত্যেন ঘোষালের কাছে কাজ করছেন। শিল্পীর এটি দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী। শিল্পী যে প্রগতিবাদী তা তাঁর রচনাবলী দেখে বোঝা যায়। তাঁর রঙের পাত্র নানা রঙে পূর্ণ। বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত রীতি অনুসরণ করে তিনি রঙের মাধ্যমে নানা পরীক্ষা করে চলেছেন। তবে কয়েক স্থলে অত্যধিক রেখাজাল ব্যবহারের ফলে ছবির মূল বক্তব্য অস্পষ্ট হয়ে গেছে, যেমন, ক্রাউ। শিল্পী নানাভাবে কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন। কোনও ক্ষেত্রে তুলির মৃদু স্পর্শে সমগ্র রচনাস্থলটি কারুকার্যে ভরিয়ে ফেলেছেন। গভীর নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি মূর্তির অবতারণা (ইনভোকেশন) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আবার, অপর ক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্যানেলে নীল, সবুজ, বেগুনী রঙের ওপর বলিষ্ঠ কালো রেখার সুন্দর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্য শ্রেণীর কারুকার্যের সৃষ্টি করেছেন। যেমন মার্কেট। কয়েকটিতে আদিম যুগের বিশিষ্টতা দেখা যায় (হাণ্টার)। রেন ডে—শিল্পীর প্রশংসনীয় রচনা। রচনাক্ষেত্রে গাঢ় নীল রঙের স্তরভেদ ও নীচে প্রতীকমূলক সাদা রঙের ব্যঞ্জনা করে শিল্পী ঝরঝর বর্ষার সুন্দর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে নীল-রঙ-প্রধান উইণ্টার-এরও নাম করা চলে। ছবির বক্তব্যটুকু শিল্পী বিন্দুভিত্তিক কারুকার্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অপরাপর ছবির মধ্যে রিফ্লেকশন, শিবরাত্রি ও ল্যাম্পলাইট উল্লেখ্য।

✻

কোনও কৃতী লেখক যখন পরলোক-

গমন করেন তখন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়েই সকলে তাঁকে স্মরণ করে থাকেন। কোনও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর মৃত্যুর পরে তাঁর কথা কদাচিৎ কারুর মনে পড়ে। মৃত্যুকালে কর্মরত শিল্পী সমাপ্ত ও অসমাপ্ত বহু ছবি রেখে যান। তাঁর স্ত্রী বা আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে সেগুলি সযত্নে পরিষ্কার করে সকলের অগোচরে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ও আবার ঘরেরই আর এক কোণে রেখে দেন! উত্তরকালে ছবিগুলির কি অবস্থা হয় সে কথার উল্লেখ নাই বা করলাম! পরলোকগত শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ও সেই সঙ্গে শিল্পী অশোক মুখার্জীর কথাও। দুজন শিল্পীর তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কারণ দুজনেই ভিন্নধর্মী। আমার বক্তব্য এই যে, শিল্পী-পত্নী ও গুণমুগ্ধ বন্ধুবর্গের উৎসাহ না থাকলে হয়ত এঁদের অবদান বিষয়ে কারুর কৌতূহল থাকত না। কথাগুলি মনে পড়ল আকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত অশোক মুখার্জীর প্রদর্শনী দেখে।

শিল্পী অশোক মুখার্জী গত বছর পরলোকগমন করেন। তাঁর পত্নী ও গুণমুগ্ধ বন্ধুবর্গের আগ্রহ ও অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীতে শিল্পীর আঁকা ১৯৫টি নিদর্শন দেখা যায়। অশোক মুখার্জী পরিচিত শিল্পী ছিলেন এবং অনেকেই তাঁর শিল্পকর্ম দেখে থাকবেন। তাঁর ছিল শিল্পী-সুলভ সজাগ চোখ ও অশান্ত চিত্ত। ইচ্ছাকৃত চাপা রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাঁর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। নানা মানুষের মুখের মধ্যে তিনি নানা রূপে ও মুড-এর সন্ধান পান ও তিনি অবলীলাক্রমে সেই সব মুখের মধ্য দিয়ে মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন রূপ

একটি মুখ —অশোক মুখার্জী

ফুটিয়ে তুলেছেন। জলরঙ ব্যবহারে তাঁর কতটা দখল ছিল তা এইজাতীয় প্রতিকৃতিগুলি দেখলেই বোঝা যায়। বিশেষ করে বার্নার্ড শ, যীশু খ্রীষ্টের প্রতিকৃতি অনেকের মনে থাকবে। আধুনিক ও সমবিমূর্ত রীতিতে আঁকা ছবিতেও তাঁর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। আকারকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে তিনি বহু নিদর্শন রেখে গেছেন যেগুলির মধ্যে পরিকল্পনা ও রচনারীতির স্বাভাবিক সমন্বয় লক্ষণীয় (মিউজিক ডিসটার্বড, নথিংনেস)। স্কেচগুলি বলিষ্ঠ শিল্পীর তুলিচালনা ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পরিচিত পরলোকগত শিল্পীদের অবদানের কথা মনে রাখতে হলে মাঝে মাঝে এ-জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।

*

হাসপাতালের দুটি ছবি। একটিতে হাসপাতালের শয্যায় একটি রোগী শুয়ে আছেন, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেবিকা। অপরটি অস্ত্রোপচার-কক্ষ, টেবিলে রোগী শায়িত, ওপর থেকে তীব্র আলোকপাত হচ্ছে, ডাক্তার ও সেবিকাগণ অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি হচ্ছেন। দুটি ছবিই জয় বিশ্বাসের আঁকা। না, কাল্পনিক রচনা নয়—দুটিই হাসপাতালের শয্যায় বসে আঁকা। জয় বিশ্বাস ছোট্ট ছেলে, অসুস্থ হয়ে সম্প্রতি হাসপাতালে যায়। আর্ট অ্যাকাডেমিতে সে ছবি আঁকা শেখে। আর্ট অ্যাকাডেমি আয়োজিত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক প্রদর্শনীর জন্য এই দুটি ছবি সে হাসপাতাল থেকে পাঠায়। যাঁরা এই প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরা অবশ্যই এই ছেলেটির আঁকা এই দুটি ও অন্যান্য ছবি দেখেছেন। ছেলেটি যেন তীব্র ও উজ্জ্বল রঙ নিয়ে খেলাচ্ছলে ছবি এঁকে যায়। প্রদর্শনীটি দেখে আনন্দ হল। ছয় থেকে ১৬ বৎসর বয়স্ক যে সব ছেলে-মেয়ে আর্ট অ্যাকাডেমিতে ছবি আঁকা শেখে তাদেরই সুনির্বাচিত কয়েকটি রচনা প্রদর্শনীতে দেখা গেল। সমকালীন বিষয় হিসাবে কয়েকটি বন্যার ছবি ভাল লাগল। এই প্রসঙ্গে সুবীর ঘোষ, অপরাজিতা সেন ও বিশেষ করে সুজাতা ঘোষের স্বল্প রেখাভিত্তিক বলিষ্ঠ রচনার নাম করা যায়। রীতিমুখের জলতরঙ্গ সৃষ্টির জন্য সুদক্ষিণ কুন্ডু প্রশংসা দাবি করতে পারেন (দেবদারু গাছ)। অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মধ্যে [illegible] বোস (সার্কাস), সোমনাথ মিত্র (দৈত্য), অমিতাভ দত্ত (ইন্টিরিয়র), সুজাতা ঘোষ ও মালা ঘোষ (প্রতিকৃতি) ও ইন্দ্রাণী ঘোষ (জলরঙ স্কেচ)-এর নাম করা যায়। প্রদর্শনীতে কয়েকটি সুন্দর বাটিক নিদর্শন দেখা যায়। মনে হয় মোম ব্যবহার পদ্ধতিটি সকলেই বিশেষ যত্ন সহকারে শিখেছেন। এই প্রসঙ্গে মাধবী দাস (মুরগির লড়াই), কৃষ্ণা চৌধুরী (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ও হার্প) ও তারা পান্ডে (মা ও ছেলে)-র নাম উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী বিমল দেব ত্রিপুরার মফস্বল শহর কৈলাসহরে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৯৬৮ সালে কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করার পরে এটিই কৈলাসহরে তাঁর প্রথম প্রদর্শনী, যদিও ইতিপূর্বে রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে তিনি আগরতলায় দুবার প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। প্রদর্শনীতে রসিক দর্শক সমাগম হয়।

—চিত্রপ্রিয়

॥ পাঁচ ॥
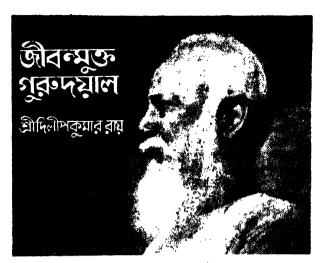
স্বপ্নচারণাকে যুগে যুগে সব দেশেই সাড়ে পনেরো আনা মানুষ অবাস্তব কল্পনাবিলাস বলে হাসাহাসি করে এসেছে। কারণ সাড়ে পনেরো আনা মানুষ সাধনা করতে চায়নি অন্তর্দৃষ্টির, অন্তঃশ্রুতির। তাই তারা ফুলের গোপন ভাষা বা ধরার মনের কথা শুনতে পায় না প্রাণের কানে। ওদের বহির্নয়নের ও বহিঃশ্রুতির পর্দায় ছাপ পড়ে কেবল বাইরের দুঃসহ কুরূপ ও বেসুরা ঘর্ঘর। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের একাহার তো সত্যনির্ণয়ের কষ্টিপাথর নয়। পরম সত্যকে পায় মাত্র কতিপয় মানুষ যারা সত্যসন্ধানী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সৌন্দর্যপিপাসু, সঙ্গীতসাধক। দয়ালদা ছিলেন এই মুষ্টিমেয় উচ্চাধিকারীর দলে, তাই তিনি চিরদিন গানের বাউল বলেই নিজের পরিচয় দিতেন—বিশেষ করে ভজনের। ইন্দিরার মীরা ভজনকে তিনি ভালোবেসেছিলেন মনে-প্রাণে এইজন্যেই যে, এ ভজনগুলির মধ্যে তাঁর মনপ্রাণ যুগপৎ মুক্তিমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবাঁশির সুর শুনতে পেত। মনে পড়ে এ ভজনগুলি শুনতে শুনতে কী অপরূপ সূক্ষ্ম ধারায় তাঁর চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ত! আমাকে লিখেছিলেন তিনি ইংরাজীতে লেখা একটি পত্রে আমেদাবাদ হরিজন আশ্রম থেকে (৮ই অগস্ট ১৯৬৫—অনুবাদ আমার) :

দাদাজি,

আহা, যদি তুমি ও ইন্দিরা মা কাল বিকেলে এখানে থাকতে! এখানকার বিনয়-মন্দিরের সুফী গুরু (ইনি একাধারে গায়ক ও কবি) গাইলেন ইন্দিরা মা-র দুটি ভজন। তাঁর বয়স এখন পঁচাত্তর। কিন্তু তাঁর গান শুনে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলাম। ইন্দিরা মা-র গান মন্দিরের স্কুলের ছাত্রেরা প্রায়ই গেয়ে থাকেন। কাজেই বলা চলে—বিনয় মন্দির হরিকৃষ্ণমন্দিরের একটি শাখা।

স্নেহধন্য গুরুদয়াল মল্লিক। আমরা যখনই বম্বে যেতাম দয়ালদাকে খবর দিতাম অমুক ভক্তের ওখানে ভজন হবে। তিনি পত্র পাবামাত্র বাতাসেরও আগে উড়ে আসতেন। গান শুনতে শুনতে তাঁর ভাবসমাধি হত প্রায়ই—মনে হত যেন আমাদের প্রার্থনার সুরে তাঁর প্রার্থনার সুরসঙ্গম হয়েছে।

বলেছি, তিনি তাঁর আত্মিক উপলব্ধি-অনুভূতির কথা বলতে চাইতেন না—কেবল তাঁর কবিতায় ছাড়া। একটি কবিতায় প্রকাশ হয়ে পড়েছিল পরা শান্তি কীভাবে তাঁর মধ্যে নামত। শান্তি বলতে সাধারণত আমরা বুঝি স্বস্তি—অর্থাৎ নানা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে কিছুকালের জন্যে রেহাই পাওয়া। কিন্তু দয়ালদা তাঁর গানটিতে যে শান্তির বাণী প্রকাশ করেছেন সে শান্তি এ ঘরোয়া স্বস্তির সগোত্র নয়, সে অন্তরাত্মার আনন্দের সোদর—যাকে ইংরাজীতে বলে : peace that passeth all understanding. এ গানটিকেও আমি ছন্দে মিলে আয়মিকে সাজিয়েছি তাঁর মূল গদ্যছন্দে লেখা গানের ভাবানুসারে :

What rapture—plumbless,
marvellous!
Delusion's now no more.
The senses' protean play has ceased,
The Shoreless meets the shore!
At the confluence of the
earth and skies
The finite merges in
The Infinite! What loveliness
Ineffable, serene!
Gone's bondage wed to little joys,
Soul wings the blue in bliss!
What miracle, what
wondrous change,
What peace—deep, fathomless!

আনন্দ অপরিমেয়, অপূর্ব, মধুর!
সব মায়াগুণ্ঠ গেছে ভেসে!
ইন্দ্রিয়ের বহুরূপী নৃত্য গেছে থেমে,
অকূল মিলেছে কূলে এসে!
ধরা-অধরার স্নিগ্ধ সঙ্গমে মিশেছে
অসীমা সীমার মোহানায়!
অনির্বচনীয় দীপ্ত লাবণ্য অগাধ
বিহায় অবর্ণ্য মহিমায়!
ছোটো সুখ হরষের বন্ধন বিলীন,
অন্তরাত্মা নীলাম্বরে ধায়!
কার ইন্দ্রজাল—কী আশ্চর্য রূপান্তর!
কী শান্তিসমুদ্র ব'য়ে যায়!

✻

পরা শান্তির এ-হেন গভীর অনুভূতি গড়পড়তা সাধকের নাগালের বাইরে। এ অপরিমেয় শান্তি ঝরে উপর থেকে স্নিগ্ধ নির্ঝরধারায় জীবনের সব কামনা-বাসনা যখন প্রেমে বিলীন হয় তখন। এ প্রসঙ্গে একটি জীবন্মুক্ত অন্ধ সাধুর কথা মনে পড়ছে যিনি একদা আমাদের মন্দিরে আমাদের আতিথ্য স্বীকার করে আমাদের ধন্য করেছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছিলাম—বাল্যকালেই তিনি অন্ধ হন। "কিন্তু দাদাজি", বলেছিলেন তিনি আমাকে হেসে, "লোকে ভাবে ঠাকুর কী নিষ্ঠুর! তারা তো জানে না তিনি আমার বাইরের দৃষ্টি রুদ্ধ করে অন্তর্দৃষ্টির পথ কীভাবে খুলে দিয়েছেন।"

আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে-

ছিলাম : ঠাকুরের দর্শন বলতে ঠিক কী বোঝায় বলবেন?"

তিনি উত্তরে বলেছিলেন : "দর্শন চাইবেন না তাঁর। চান তার চেয়েও বড় বর : যেন তাঁকে আপনি ভালোবাসতে পারেন—আপন মনে করতে পারেন প্রাণপ্রিয় বলে। শুনুন বলি, দাদাজি। যে জীবন্মুক্ত হয়েছে তার মধ্যে তিনটি ধন্য উপলব্ধি নেমেছে জানবেন।

(১) উদারতা—যার প্রসূতি অন্তর দীনতা।

(২) স্বাধীনতা—অর্থাৎ সব আসক্তির কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। কিন্তু এ স্বাধীনতা জীবন্মুক্তির একটি প্রধান বর হলেও আর একটি বর পাওয়াই চাই :

(৩) প্রিয়তা—অর্থাৎ তাঁকে প্রিয় বলে জানা, চেনা আপন হতে আপন বলে—তাঁর চেয়ে প্রিয় যে আর কেউ নেই এই সত্যটির আলো পাওয়া।

এই মানুষটিকে দেখতাম নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, সদানন্দ। পরমহংসদেব উপমা দিতেন 'অগাধ জলের মীন'-এর অবাধ আনন্দের। মনে হত এঁকে দেখে—জীবন্মুক্তির আনন্দ এমনিই হওয়া উচিত— অগাধ জলের মীন-এর মতনই বন্ধহীন, স্বচ্ছন্দ, নিশ্চিন্ত-নিষ্পরোয়া। আর একটি উপমা শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের—জীবন্মুক্ত আসীন মাধ্যাকর্ষণের ঊর্ধ্বে—কামনা-বাসনার পিছুটানকে যে কাটিয়ে উঠেছে নিত্য স্বাধীনতার অদিগন্ত চিদ কাশে।

দয়ালদাকে আমি প্রায়ই হেসে বলতাম : "আপনি শুধু যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম তাই নয়, আপনি নীড়কেও বিদায় দিতে পেরেছেন—অক্লান্ত প্রসন্ন পরিব্রাজক—কোহনাস্তি সদৃশম্ ত্বয়া—আপনার জুড়ি কে?"

দয়ালদার সম্পর্কে এই সাধুটির আর একটি কথাও সমান খাটে। সাধুজি বলতেন : "জ্ঞানী বলে : 'অহং ব্রহ্মাস্মি—অর্থাৎ আমি ঠাকুর বলে কৃতকৃত্য হলাম।' ভক্ত বলে। 'আমি কৃতাকৃত হয়েছি ঠাকুর আমার জন্যে মানুষী তনু ধারণ করেছেন বলে—অর্থাৎ আমার খেলার সাথী হলেন ঠাকুর আমার প্রেমের টানে। এর পরে আর কী চাই'?"

দয়ালদাও এই কথাই বলতেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—যে, সুফীরা যে সত্য চায় সে হল প্রেমের সত্য, লীলার সত্য, সুষমার সত্য, চায়—ভগবান এসে তাদের জীবনের কেন্দ্রে আসীন হোন। দয়ালদা উদ্ধৃত করেছেন তাঁর Dwellers of the Desert-এ একটি উক্তি দার্শনিক কবি এমার্সনের : "Love is a leveller and Allah becomes a groom and heaven a closet." (অর্থাৎ প্রেম সাম্যবাদী, তাই গায় : ভগবান আমার বল্লভ, স্বর্গ—আরামকক্ষ।)

এর চেয়ে বড় অঘটন আর কী হতে পারে? তবে এ মহত্তম অঘটনের আভাস দৈবী করুণা দিয়ে থাকেন একটু একটু করে—প্রথম দিকে ছোটখাট মিরাক্‌ল্ ঘটিয়ে, পরে আরো বড় আরো বড় মিরাক্‌ল্। তাই প্রতি সাধকের জীবনেই অঘটন না ঘটেই পারে না—কেননা দৈবী করুণার একটি প্রধান কাজই হল—বুদ্ধির অভিমানকে চুরমার করে দেওয়া যে সংসাধনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ হয় মিরাক্‌লে—অঘটনে। তাই বিখ্যাত মিসটিক-বৈজ্ঞানিক-ভাবুক পাস্কাল বলেছেন তাঁর PENSEE গ্রন্থে : 'খৃস্টের যদি কোনো অঘটনই না ঘটাতেন তবে তাঁকে নামঞ্জুর করলে কোনো পাপই হত না—সেণ্ট অগস্টীন অকারণ বলেন নি : 'অঘটন না ঘটলে আমি খৃস্টান হতাম না।' শুধু তাই নয় পাস্কাল স্পষ্টাস্পষ্টভাবেই লিখেছেন :

"Il n'est pas possible d. croire raisonnablement contre les miracles." (অঘটনে অবিশ্বাস করা সম্ভব নয় যুক্তিকে মান দিয়ে)।

অঘটন আজো সত্যিই ঘটে—তবে হয়ত সবচেয়ে বেশী ঘটে সাধুসন্তের জীবনে, কেননা তাঁদের তার্কিক সংশয় ও বুদ্ধির অভিমান নির্মূল হয়েছে বলে তাঁরা ভগবৎ-করুণাকে সহজেই সরল স্বরে বলতে পারেন "স্বাগতম্"। দয়ালদার জীবনেও নানা অঘটন ঘটেছে—যার ঘটক স্বয়ং ভাগবতী কৃপা— বলতেন তিনি প্রায়ই। এ কৃপা কী-ভাবে ঠাকুরের ইন্দ্রজালে নয়কে হয় করেছিল, তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিল কৃতান্তের কবল থেকে ছিনিয়ে—তার একটি দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের একাধিক বার বলেছিলেন—শেষবার বলেছিলেন আমাদের এক মনস্বী ফরাসী বন্ধু ও বান্ধবীর সামনে যাঁরা অঘটনের সত্যতায় অবিশ্বাসকে শুধু অন্যায় নয়, অযৌক্তিক বলে মনে করতেন।* যা হোক,

---

* বন্ধুটি বর্তমান যুগের বরিষ্ঠ ধ্যানী দার্শনিক Pierre Teillard de chardin-কে গুরুবরণ করেছিলেন যৌবনেই।

ভণিতা রেখে পালাগানে নামি। দয়ালদার নিজের ভাষায়ই বলব যথাসাধ্য :

"আমি সে সময়ে জুহুতে শ্রীশীতলবাদের অতিথি। রাত্রে যখন চাকরেরাও সবাই প্রস্থান করেছে তখন ঘরে আমি একেবারে একা। রাত প্রায় এগারোটায় আমি স্নানাগারে ঢুকতেই হঠাৎ পড়ে গেলাম—'স্ট্রোক'-এ। সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁ দিক অবশ।

"আমি উঠতেও পারি না, ডাকবই বা কাকে? তাই ভূমিশয্যায়ই প্রার্থনা করতে লাগলাম—শুধু তাঁর নামগান—এমন সময়ে হঠাৎ সামনের দেয়ালে দীপ্ত স্বর্ণাক্ষরে একটি আশ্চর্য নির্দেশ ফুটে উঠল : 'যদি বাঁচতে চাও তো শুয়ে শুয়েই চলমান হও ঘরের এদিক থেকে ওধারে—যতই কেননা ব্যথা লাগুক, থেমো না—হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলো তোমার অবশ দেহকে—ঘরের এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক।'

"আমি নির্দেশ মেনে অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও অর্ধশায়িত অবস্থায় ঘরের এদিক-ওদিক করতে থাকলাম—শুধু মুখে তাঁর নাম জপ করে।

"ভোর পাঁচটায় হঠাৎ আমার এক ডাক্তার বন্ধুর অভ্যুদয়। বললেন তিনি : 'আমি এ অসময়ে সুদূর কোলাবা থেকে জুহু ছুটে এসেছি শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখে—যে, তোমার সঙ্কট অবস্থা।' বলে তিনি আমাকে ধরে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমার পাশে ধ্যানে বসলেন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন : 'ভরে শুনেছি—কী দাওয়াই তোমাকে দিতে হবে। কিন্তু বলে রাখছি ওষুধ খেতে না-খেতে তোমার জ্বরের যন্ত্রণা অসহ্য হবে—সয়ে থাকতে হবে।'

"দাওয়াই সেবন করতে না-করতে আমার জ্বরের তাপ উঠল ১০৬ ডিগ্রি। সাত ঘণ্টা বেহুঁশের মতন কাটল। তার পরে সংবিৎ ফিরে আসতে দেখি আমার বাঁ হাত, বাঁ পায়ে সাড় ফিরে এসেছে! বন্ধু বললেন হেসে যে অংশা ধন্বন্তরীর এদিক-ওদিক করার নির্দেশই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—টেনে এনেছে যমের মুখ থেকে।"

প্রসঙ্গত মনে পড়ল আর এক অঘটনের কথা—যার ঘরোয়া নাম ভেলকি বা সিদ্ধাই। দয়ালদা বললেন : "একদা পথে চলতে চলতে হঠাৎ এক সাধু আমার বাহুমূলে খোঁচা দিয়ে হুকুম করল : 'এই! আয়, তোকে আজ মন্ত্র দিয়ে ধন্য করে আমার চেলা বানিয়ে নেব।' আমি করজোড়ে বললাম : 'প্রভু, আমি আদৌ আপনার চেলা হবার যোগ্য নই—অপরাধ নেবেন না।' তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন : 'হুম! তুই জানিস আমি কে? এই দেখ—হাত পাত, হাত পাত—নে—' বলে একটি হাত তুলে ধরলেন তাঁর মাথার কাছে—আমি নিচে হাত পাততেই অঝোরে ঝরে পড়ল চমৎকার সুস্বাদু দুধ! আমি চমকে উঠতেই তিনি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন : 'এবার বুঝেছিস—কে আমি?' আমি ফের হাত জোড় করে নমস্কারে বললাম : 'বুঝেছি বই কি প্রভু, না বুঝে উপায় আছে? কেবল ঐ সঙ্গে এ-ও বুঝেছি যে, আমি আপনার চেলা হবার আরো অযোগ্য।'

বলে দয়ালদা সে কী খিলখিল করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়া—যাকে সাহেব পুরাণে বলে rollicking laughter—মনে করিয়ে দেয় L' Allegro-তে মিল্টনের বিখ্যাত

Haste the, Nymph, and
bring with thee
Jest and youthful jollity...
Sport that wrinkled Care derides
And laughter holding both his sides

এসো রমা, সাথে নিয়ে হাসি পরিহাস,
যৌবন-উজ্জ্বল ফুল্ল বিলাস—
বরে যার জীর্ণ ভাবনা হয় দূর,
কুটি কুটি হই হেসে পুলক-মধুর!

[ক্রমশঃ]

ল্যাকমে ফেস্ পাউডার

রেশমের মধ্যে দিয়ে ছেঁকে মিহি ক'রে তৈরী। তাই এ এত নরম আর সূক্ষ্ম, আটকে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা··· সুন্দর ক'রে রাখে দীর্ঘকাল ধরে।

ল্যাকমে ফেস পাউডার রেশমী কাপড়ে ছেঁকে নেওয়া। তাই এর চেয়ে মিহি পাউডার আর হয় না। এর হালকা মধুর পরশে আপনার মুখ হ'য়ে ওঠে অপরূপ! রূপলাবণ্য ফুটিয়ে তোলবার আশ্চর্য এর ক্ষমতা—বুঝতেই দেয়না পাউডার মেখেছেন! এতে আছে স্নিগ্ধ কোমলতা,—নেই নিরস খসখসে ভাব। রেশমের মত অতিমিহি ল্যাকমে ফেস্ পাউডার—মেখে দেখুন!

ASP/L-53R

৩৩
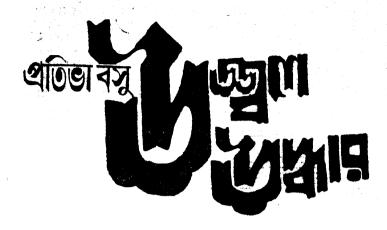
চায়ের বাসন কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন অঞ্জলি দেবী; তাকিয়ে সেইসব দিনগুলো সে দেখতে পেলো, ছবি হ'য়ে ভেসে উঠলো চোখে। পাহাড়ি দেশের সেই হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে মা শুধুই একটা হাতে বোনা স্কার্ফ গায়ে দিয়ে স্কুলে যাচ্ছেন, পরনে হালকা পাড়ের সস্তা দামের শাড়ি, গায়ে মোটা ব্লাউস, পায়ে কেডস। দিনের পর দিন সেই একই ছবি। হেঁটে হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত আসতো সে মায়ের সঙ্গে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামতো, বিদায় নিত 'বাই বাই' বলে। তার নিজের পরনে কিন্তু দামী সার্ট প্যান্ট কোট ওভার কোট মোজা জুতো সব থাকতো। তাও কতো সময় বলতো 'শীত করছে মা।' মা বলতেন 'আহা, ষাট ষাট, কাল তোমাকে আরও গরম উলের সোয়েটার এনে দেব একটা।'

ভোরে উঠে মা নিজেই তাকে পোশাক পরিয়ে দিতেন, রুটি মাখন দুধ কলা ডিম দিয়ে তার প্রাতঃকালীন আহার সমাপ্ত হতো, মা শুধু এক বাটি চা।

বড়ো হ'য়ে খেয়াল ক'রে সে বলতো, 'আর কিছু খেলে না মা?'

'না সোনা, আমার তো অনেক কাজ করতে হয়, খেলে বেশী কাজ করা যায় না।' মা এমন ক'রে বলতেন যে, তার শিশু হৃদয় কোনো সন্দেহের অবকাশ পেতো না।

স্কুল ছিল সকালে। রোদ ফুটতো না তখনো, দিক দিগন্ত আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতো কুয়াশায়, মা কানঝোরার রাস্তায় মিলিয়ে যেতেন এক সময়ে, সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর ফিরে এসে পড়তে বসতো। সে বুঝতে পারতো, যতোই দুধ ডিম রুটি মাখন খাক এ লোক, যতো ভালো পোশাকই পরুক না, এর মধ্যে মস্ত একটা ফাঁকি লুকিয়ে আছে, যেখান থেকে নিস্তার পেতে হ'লে তাকে ঠিকমতো পড়াশুনো করতে হবে, স্কুলে যেতে হবে, এ বাড়ি ছাড়তে হবে। মাও অবশ্য নানাভাবে নানা গল্পের মধ্যে দিয়ে নানা কথা বোঝাতেন তাকে। সেই গল্পের সারাংশও তাই ছিল এবং সেই সারাংশ তার মাথার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

যে স্কুলটায় মা কাজ করতেন, নেহাতই বাচ্চাদের স্কুল। মাইনে যৎসামান্য। কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে টিউশানি করতেন তিনি, তাছাড়া আরও যে কতো কাজ করতেন মনেও নেই সব। জীবিকার জন্য সেই চূড়ান্ত কষ্টের কথা চিন্তা করলে এখন বুঝতে পারে আত্মত্যাগ কাকে বলে। তাঁর নিজের তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। সবই তো পুরন্দরের জন্য। পুরন্দরের জামা জুতো ছাতা ওয়াটার প্রুফ, নামী স্কুলের মাইনে, দামী টিফিন ইত্যাদির জন্য। কোনো অভাবের কথা জানতোই না সে। বরং প্রাচুর্যের মধ্যেই তাকে মা ডুবিয়ে রেখেছিলেন।

শুধু কি প্রাতঃকালীন আহারেরই ডিম দুধ? মাছ মাংস ফল, কী না? তাকে বাঁচিয়ে রাখতে, সুখে রাখতে, ভালো রাখতে কী না করেছেন এই মহিলাটি। মা নামের যে এতো মহিমা সেটা অন্তত বোঝা গেছে এই মাকে দেখে।

শুধু বাসস্থানটাই যা খারাপ ছিল, সস্তা ছিল। সেটা আর কিছু করতে পারেননি। তারই দাম ছিল পনেরো টাকা।

আসলে ওটা একটা বাড়িই না। কোনো কাঠ গুদোমের অংশ মাত্র। পাথরের দেয়াল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল বেরুতো সারাদিন। সারাদিন হিম হ'য়ে থাকতো ঘরটা। শুধু বিকেলে রোদ পড়তো জানালা দিয়ে, বাকী সময় অন্ধকার। এতো স্যাঁতস্যাঁতে ছিল যে জামা কাপড় প্রত্যেকদিন ছাতা ধরতো। মা কেবল ঝাড়তেন আর রোদে দিতেন। উঠোনে খুব রোদ ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে একটা গলি পার হ'য়ে মস্ত আঙিনা, কাঠুরেরা কাজ করতো বসে বসে, ঘষর ঘষর আওয়াজ উঠতো কাঠ কাটবার, ঠুকঠাক পেরেক লাগাতো, ধুপধাপ জিনিসপত্র ফেলতো, রোদে ঝকঝক করতো সেই সমতল জায়গাটা।

ঘরটাও বেশ বড়ো ছিল। পিছনে তাকালে অতল সবুজ খাদ, পাশে আকাশ ঢেকে খাড়াই পাহাড়। মা মেঝেতে পুরু ক'রে খর বিছিয়ে তার উপর সতরঞ্চি পেতে

রাখতেন, নইলে মাটিতে পা পড়লে হাঁটু পর্যন্ত কনকন ক'রে উঠতো।

কাঠুরেদের কাছ থেকেই ফেলে ছড়িয়ে দেওয়া সব টুকরো কাঠ এনে ইঁটের পায়া দিয়ে তাকে টেবিল চেয়ার ক'রে দিয়েছিলেন, বইয়ের তাক ক'রে দিয়েছিলেন, বসবার লম্বা আসন করে দিয়েছিলেন। ছুটির দিনে অন্তত একবার রঙিন কাগজ আর ছবি ইত্যাদি সেঁটে দিতেন পাথরের দেয়ালে, ঠাণ্ডাও কিছুটা আটকাতো, অন্ধকার ঘরে কিছুটা উজ্জ্বলতাও পাওয়া যেতো। ভিজে গেলেই ফেলে দিয়ে আবার সাঁটতেন। যেদিন নতুন করে সাঁটা হত, খুব সুন্দর দেখাত। ফুলদানিতে বুনো ফুল সাজিয়ে, জানালায় পর্দা দিয়ে, রঙিন চাদরে বিছানা ঢেকে বেশ লাগতো তখন।

স্পষ্ট মনে আছে একটা চাকাওলা বাক্স ছিল, লম্বা হাতল ছিল, আগে বোধ হয় ওটা তার পিরাম্বুলেটার হিসেবেই ব্যবহৃত হ'তো, ওটার ক'রে ঠেলে মা তাকে উঠোনে এনে বসিয়ে রাখতেন স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে, রোদ লাগতো গায়ে। বড়ো হ'য়েও চার পাঁচ বছর বয়সেও ওটার মধ্যে বসে থেকেছে সে উঠোনে। কাঠ গুদোমের মিস্ত্রিরা কাজ
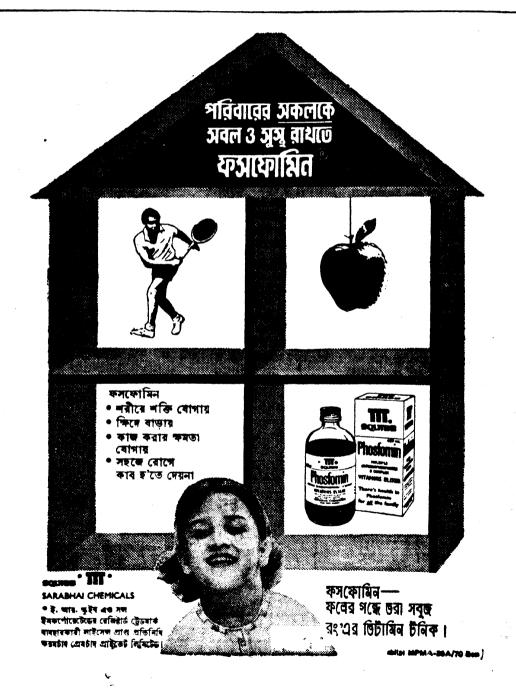
ধরতো, বাক্সটায় চাকা লাগিয়ে হাতল দিয়ে যাদের দিয়েই মা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন, যারাই দেখাশুনো করতো তাকে, বলতো, খোখা, তুম তো রাজাবাবু হ্য।' মিস্তির্র মাইয়াদের সেও খুব ভালোবাসতো।

তবে আসল দেখাশুনোর লোক ছিল, বুড়ো মনবাহাদুর আর তার বউ। তারা তাকে প্রাণতুল্য ভালোবাসতো। মনবাহাদুর ছিল তার নানা, আর তার বউ মায়লি ছিল তার নানিমা।

খুব গয়না পরতো নানিমা। কানে এতো বড়ো বড়ো ফুটোর মধ্যে এতো বড়ো সোনার দুল, গলায় পুঁতি আর সোনা দিয়ে গাঁথা মস্ত মোটা মুণ্ডমালার মতো একটা জিনিস। তুবড়োনো গালের রং একদম গোলাপী। একটা মখমলের ব্লাউস পরতো, সেকার পুরোনো জিরজিরে, বুকে চেপে চেপে আদর করতো তাকে। পুরো দশ দশটা বছর সেই একই বাড়িতে একই পরিবেশে দিন কেটে গেছে, পুরন্দর জানতো না ঐ সব নেপালী স্ত্রীপুরুষ ছাড়া আর কোনো পরিজন আছে তাদের। শুধু একজন বাঙালী বুড়ো নেপাল ডাক্তার ছাড়া। মা বলেছিলেন, এই ডাক্তার তাঁর অনেকদিনের পরিচিত। মাঝে মাঝে আসতেন তিনি, ভদ্রলোক বিপত্নীক ছিলেন, একা থাকতেন, ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চলে এসেছিলেন কলকাতা থেকে। এটা তাঁর শ্বশুর বাড়ির দেশ, এখানেই আবার নতুন ক'রে প্র্যাকটিস জমিয়ে নিয়েছিলেন।

পুরন্দর জানতো মা তাকে পেটে নিয়ে স্বামীর গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হ'য়েছিলেন। বড়ো হ'য়ে আস্তে আস্তে আরও অনেক খবরই সংগৃহীত হয়েছিল। মায়ের বিবাহ পূর্ব বৃত্তান্ত অনেক সময় দার্জিলিংয়ের নেপাল ডাক্তারই বলতেন কথা প্রসঙ্গে। পরে কলকাতা এসে বিবাহিত মায়ের বৃত্তান্ত কর্ণগোচর হ'য়েছে এর ওর তার মাধ্যমে। আত্মীয় পরিজন বলতে মার যে খুব অন্তরঙ্গ কেউ ছিল না সেটা বুঝে নিয়েছিল এবং এটাও বুঝে নিয়েছিল, দার্জিলিং পাহাড়ের এই কানঝোরা অঞ্চলের নিচু রাস্তায় কাঠগুদোমের স্বেচ্ছা নির্বাসন শুধুমাত্র সেই অভাবের জন্যই নয়, তার কারণ আরও গভীর। আসলে স্বামীর নিন্দা ঢাকতেই তিনি এরকম বিচ্ছিন্ন এবং গোপন জীবন যাপন করছিলেন। পাঁচজন জটলা ক'রে পাঁচ রকম প্রশ্ন করবে এটা সহনীয় নয়, তাঁর মত চরিত্রের মানুষের পক্ষে। পরিত্যক্তা স্ত্রী সকলেরই কৃপার পাত্র, কৌতূহলের বস্তু। সেটাই বা মা সহ্য করবেন কেমন ক'রে?

মনে শক্তি ছিল, সাহস ছিল, জেদ ছিল, জেলেকেও সসম্মানে বড়ো করে তুলেছিলেন।

ভালোই করেছিলেন। খুব ভালো করেছিলেন। নিজের দুঃখ নিজের মধ্যেই আবদ্ধ রেখে অনেক অহেতুক অসম্মান থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। আর লজ্জা। লজ্জাই কি কম? সেই লজ্জা তিনি রাখতেন কোথায়, যদি না এই নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ জীবনের অন্ধকার তাঁকে আবৃত ক'রে না রাখতো?

দশ বছর বয়সে প্রথম ঠাহ নড়ালো তারা, মা কলকাতায় এলেন।

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে দেখলো, তিনি ট্রাংক গুছোচ্ছেন। বইটই ফেলে বসে পড়লো পাশে। ট্রাংক দেখতে সে খুব ভালোবাসতো। ট্রাংক খুললেই কী সুন্দর ন্যাপথলিনের গন্ধ বেরুতো, কতো ছোটো খাটো জিনিস কতো না-দেখা শাড়ি ব্লাউজ, কতো স্মৃতির সমুদ্র।

মা পাশে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমরা কাল কলকাতা যাবো, জানিস?'

'কলকাতা!' চোখের তারা ছিটকে এলো তার।

'তোর কী ইচ্ছে?'

এর আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে নাকি? কলকাতা যাবে কি যাবে না, এর আবার কোনো জিজ্ঞাসা আছে নাকি? এইসব প্রশ্নের অতীত কথা বলার কোনো অর্থ হয় নাকি? মর্ত্যের স্বর্গ কলকাতার নাম শুনে সে তো অবশ হ'য়ে গেছে।

'সত্যি মা? সত্যি যাবো?' গলা ধ'রে ঝুলে পড়লো।

মা বললেন, 'কলকাতা না গেলে ভালো বাংলা শিখবি কী ক'রে? ভালো স্কুল কলেজ কোথায় পাবি? দেখবি কতো বড়ো একটা জগৎ।'

সে কথা জানে পুরন্দর। কলকাতা তো তখন তার কাছে একটা স্বপ্নরাজ্য মাত্র। কলকাত্তার গল্প কতো শুনেছে সে। শৈশবে মনবাহাদুর তার মন ভোলাবার জন্য কতো কেলকাত্তাই কসরৎ দেখিয়েছে ডিগবাজী খেয়ে, মনবাহাদুরের বউ কেলকাত্তার ছড়া গেয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, বাঁদর নাচ ভালুক নাচ সব খেলা কলকাত্তার গল্প বানিয়ে। গাঁইয়া বাঁদর কেমন করে কেলকাত্তার বুড়াহিকে বিহা করলো, কেলকেত্তার বুড়াহি কেমন ক'রে তাকে ছেড়ে চলে গেল, গোদা ভালুকটা কেলকাত্তা গিয়ে কী দেখলো, কেমন করে মিস্টার কেলকাত্তা হ'লো, এ সব শুনতে শুনতে কতোদিন সে উড়ে উড়ে কেলকাত্তা চলে গিয়েছে তার কি ঠিক আছে নাকি কিছু? সমানবয়সী নেপালী ছেলে-মেয়েদের জীবনেও ঐ একটাই উচ্চাদর্শ ছিল যে কোন-না-কোনদিন তারা কেলকাত্তা যাবে পালিয়ে গেলেও যাবে। কোনো ভালো জিনিস দেখলেই তারা বলতো, 'ই তো কেলকাত্তাকা চীজ।'

যখন বসন্ত শরতের সিজনে কলকাতার কেষ্ট বিষ্টুরা সব পাহাড়ে বেড়াতে এসে সেজেগুজে ম্যাল রাউন্ড দিত, বাচ্চারা মেয়েরা খচ্চরের পিঠে চড়ে দূরে চলে যেতো, পুরুষেরা যোধপুরী ব্রীচেস পরে কেঁপে কেঁপে ঘোড়ার পিঠে উঠতো, ওরা ছুটে ছুটে দেখতে আসতো। মা কিন্তু আটকে দিতেন তাকে, বলতেন 'ছি, ওরকম যেতে হয় না, লোকেরা হ্যাংলা বলে।'

সেই কলকাতায় মা যাচ্ছেন? সেও যাচ্ছে? এও কি সম্ভব?

কিন্তু সেই অসম্ভবকে মা কেমন করে সম্ভব করেছিলেন, কে জানে। একদিন তারা সত্যি কলকাতা এসে পৌঁছোলো। অবশ্য ঠিক কলকাতা নয়, হাওড়া। পুরোনো পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যে চিরদিনের জন্য চলে আসছে তা অবশ্য জানতো না পুরন্দর। সে ভেবেছিলো বেড়িয়ে ফিরে যাবে। বন্ধুদের অনেক গল্প করবে তখন। সাদর উপহারের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েও এসেছিলো। বিদায় দিতে সশ্রুনয়নে দাঁড়িয়েছিল তারা, মনবাহাদুর আর তার স্ত্রী স্টেশনে এসে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, মা-ও চোখ মুছছিলেন, তার কিন্তু কিচ্ছু দুঃখ হচ্ছিল না, চোখ কুচকে মনে মনে বলছিল, সব ছেলেমানুষ। একটু বেড়াতে যাচ্ছে তাই কান্নাকাটি।

এখন সেই সব মুখ কোথায় হারিয়ে গেছে! দেখলেই কি চেনা যাবে? আজও পর্যন্ত ভাবলে নস্টালজিয়া হয়।

যখন জেনেছিল আর ফেরা হবে না, কান্না পেয়েছিল। কিছুতেই মন বসাতে পারছিল না। সেটাই তো তার দেশ, তারাই তো তার আত্মীয়, এখানে এই শহরের ঘিঞ্জিতে নোংরায় ইঁটকাঠের শুষ্কতায় প্রতিবেশীদের ঔদাসীন্যে পাহাড়ী বালক পুরন্দরের দম আটকে আসতো। সেই ঘন সবুজের জন্য, আকাশ ছাপানো পাহাড়ের জন্য, কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার চূড়ার জন্য চোখ তৃষিত হ'য়ে উঠতো। সরল নেপালী বালক বালিকাদের বন্ধুত্বের অভাবে হাহাকার করতো প্রাণ। মনবাহাদুরকে সে কেঁদে কেটে একটা চিঠিও লিখেছিল বাংলা ভাষায়, তার বউকেও লিখেছিল, তোমরা চলে এসো, আমি আর থাকতে পারছি না তোমাদের ছেড়ে।
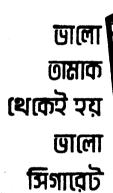
(ক্রমশ)

পানামা

সত্যিই ভালো সিগারেট

বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাক নিপুণভাবে মিশিয়ে তাদের টাটকা স্বাদগন্ধ বজায় রেখে তৈরী হয় আপনার পানামা। নিজে খেয়েও আরাম পাবেন, অন্যকে দিয়েও ভাল লাগবে!

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং, প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যোগ

GT (P)-671 Ben. Greens Advtg.

কৈফিয়ৎ চাই

মুর্শাকলে পাড়ভিক্ত বাপু, মুর্শাকলে পড়েছি খুব। ডায়েরিতে সেই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করতে যাই। আর তা-ই তো অস্বীকার করব না, মাঝে মাঝে করি বটে : পাঠক বুঝুন, ফাদার দ্যতিয়েন অশিক্ষিত মানুষ নন!]. লোকে বলে "বড্ড তাত্ত্বিক"। এদিকে—বাংলা দেশের মনু-মিনু-বুলু-জুমির কথা ভেবে—হালকা ধরনের কিছু লিখলেই চিঠি আসে : "ব্যাখ্যা চাই, পাদটীকা দরকার"।

আজকের পত্রদাত্রী জানাচ্ছেন, ভিনু-প্রদেশ-প্রবাসী মেয়েজামাইকে দেখতে গিয়ে ডায়েরি-পাঠে তিনি এতদিন বঞ্চিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে মেক আপ করেছেন গোগ্রাসে। তিনি আবার জিদের অনুরক্তা, জিদের যাবতীয় গ্রন্থ পড়েছেন, জিদের 'জুর্নাল'ও পর্যবেক্ষণ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে : "কই, কোথাও তো তিনি লেখেন নি 'সিমনো আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী ঔপন্যাসিক!' জিদের মতো সংযতভাষী সাহিত্য সমালোচক গোয়েন্দা-কাহিনীর সেই রচয়িতাকে—যাঁকে বোধ হয় ঔপন্যাসিকও বলা যায় না!—এত অভাবনীয় প্রশংসা যে কোথাও করেছেন, তা বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং আপনি যদি দয়া করে আপনার এই কিম্ভূতকিমাকার উক্তির সমর্থনে..."। অর্থাৎ কিনা কৈফিয়ত চাই কিংবা মুণ্ডু চাই! শেষোক্তের প্রতি আমার কিছুটা দুর্বলতা থাকাতে কৈফিয়ত-দানে প্রবৃত্ত হলাম। এই নতুন পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য মনু-মিনু-বুলু-জুমিরা আমাকে যেন মাফ করে!

পত্রাবলী

জিদের জুর্নাল-এ সিমনোর প্রথম উল্লেখ ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে : সিমনো ফরাসী 'ত্রিভাগে' ক্রিয়াপদটা যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা জিদের মতে বড় উপভোগ্য। এই দুই লেখকের মধ্যে কিন্তু দেড় বছর আগে থেকে পত্রালাপ চলছে। চলছে, চলবে—জিদের মৃত্যু পর্যন্ত।

প্রথম পত্রে [৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৮] জিদ্ লেখেন : "আশ্চর্য ...আপনার চিঠি যেন সেই চিঠিরই উত্তর, বেশ কিছুদিন থেকে আপনার কাছে আমি যা লিখতে চেয়েছি। ইতস্তত করছিলাম এই ভেবে যে : চিঠি কেন?... প্রবন্ধ লিখলে কেমন হয়?... কিন্তু বারো-দিনব্যাপী ফ্লু থেকে উঠেছি মাত্র, এখনো ভয়ংকর দুর্বলতা বোধ করছি। অতএব : প্রথমে চিঠি, পরে—সম্ভব হলে প্রবন্ধ।"

সিমনোর নব প্রকাশিত বারোটি বইয়ের মধ্যে পর পর নটি তিনি পড়ে ফেলেছেন। কি কি বই পড়েছেন সেটা না লিখে লেখেন, "কি কি পড়ি নি, সেটাই বরং চটপট আউড়ে যেতে পারি।"

জিদের বিচার : "লিখতে বসে আপনি অর্জিত নিশ্চিত ও শক্তিশালী দক্ষতার দ্বারা চালিত হন : খুঁটিনাটির যাথার্থ্য, সংলাপের ধাঁচ—আর রঙ চড়ানোর বাহুল্যটা একেবারেই নেই।" অনেকে তা লক্ষ্য করে না, তাই আমার নিবন্ধে ঠিক যে কথাটা আমি নির্দেশ করতে চাই, তা হল আপনার বিষয়ে এক বিচিত্র বিভ্রমের প্রতিষ্ঠা : 'জনতাকে' কোনোভাবেই উদ্দেশ না করেও জনপ্রিয় লেখক বলে আপনার নাম ছড়িয়েছে। এদিকে আপনার বইগুলোর উপজীব্য বা, যে-যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আপনি উপস্থাপনা করেন—সবই তাদের জন্য যারা সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন, অভ্রান্তভাবে তাদেরই জন্য যারা 'সিমনো আমাদের জন্য নয়' ভেবে আপনাকে এখনও পাঠ করে নি" আর পত্রান্তে লেখেন, "বিশ্বাস করুন, আঁদ্রে জিদের চেয়ে মনোযোগী আর আন্তরিক পাঠক আপনার আর নেই।"

এই 'মনোযোগী' কথাটা জিদ্ পত্রাবলীতে বারবার ব্যবহার করেন : শীঘ্রই কিন্তু যোগ দেবেন 'অনুরক্ত'; মাঝে মাঝে সিমনোর পরিবারের কথাও তিনি তোলেন ["পত্নীকে নমস্কার, সন্তানকে স্মিত-হাসি..."]। মৃত্যুর দেড় মাস আগে লিখিত তাঁর শেষ পত্রে একাশি বছরের জিদ্ লেখেন : "প্রিয় সিমনো, আপনাকে আমি ভালোবাসি খুব, আপনাকে আমার প্রগাঢ় আলিঙ্গন"।

জিদের দ্বিতীয় পত্রটি [৬।১।৩৯] যেন প্রথম পত্রেরই এক পুনশ্চ। নিজেই স্বীকার করছেন : এমনিতে আমি স্বল্পভাষী তবু জানি না কিসের টানে এত কথা আপনাকে লিখছি।" ইতিমধ্যে তেরিভ্-এর সিমনো বিষয়ক প্রবন্ধ বেরিয়েছে। জিদের মন্তব্য : "সত্যি সুখী হলাম এই দেখে যে উনি আপনার গুণগ্রাহিতায় সমর্থ হয়েছেন, এবং—শেষ পর্যন্ত!—সাহস করে বলে ফেলতে পেরেছেন 'মহান ঔপন্যাসিক—ঐ সিমনো!' বাহাদুর বলতে হবে! কিন্তু হাঁ মজাও পেলাম তেরিভ্ আর আমার মধ্যে উপভোগের ভিত্তিভেদ দেখে। সত্যি, প্রশংসাবাণী বহুমুখিনী! প্রকৃতই গরীয়ান

তাঁরা, যাঁদের নিয়ে অনুরাগীরা সর্বক্ষেত্রে একমত নন।"

জিদের দৃষ্টিতে সিমনোঁর কৃতিত্ব কোথায়? রচনার গঠনশৈলীতে : "অনেক বই আছে অবশ্য, পরম উৎকৃষ্ট বই, যেগুলির গঠনবিন্যাস বলে কিছু নেই। অথচ, সম্ভবত, এই বিন্যাসের জন্যই আপনার বই-গুলি আমার কাছে দুর্দান্ত!" ধরুন 'সাদা ঘোড়া' : বইটির "অদ্ভুত গঠনরীতি, সংগীতের মতো : উপসংহারে উপক্রমণিকার বিষয়টারই ফের খেই ধরা হল, কিন্তু ইতিমধ্যে সেটা আরো ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে, আরো পূর্ণ হয়ে উঠেছে যেন, চলমান কাহিনীধারায় ফুটিয়ে-তোলা বিষয়াদির সৌরভে।" কিংবা ধরুন 'লো কুর্' : তাতে "এমন কিছু নেই যা বাড়তি : না কোনো আপাত-আকস্মিক উপখ্যান, না কোনো সংলাপ, এমন কি ভূদৃশ্য-বর্ণনাংশ পর্যন্ত নয়। সব-কিছুই নিজস্ব ভূমিকায় স্থিত, অন্তিম স্বরসংগতি [কিংবা স্বরবিপর্যয়] প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।"

সিমনোঁর এই রচনাশৈলী জিদের কৌতূহল জাগিয়েছে : "জানতে আগ্রহী হয়ে আছি, এটা কি কোনো অবিচ্ছেদ অনুধ্যানের ফল, নাকি—আর তা-ই বিশ্বাস করতে আমি আরো বেশি প্রস্তুত—এক আকস্মিক অসামান্য প্রেরণার স্বাভাবিক স্ফুরণ। হয়তো কোনো দিন সুযোগ পাব এ-বিষয়ে আপনার সংগে আলাপের। সত্যি বলতে, আমি ভালো করে বুঝতেই পারি না, ঠিক কি করে আপনি আপনার বইগুলির ধারণা ও গঠনকর্ম সম্পাদন করেন। অলৌকিক ঘটনার চট্ করে বিশ্বাস করার পাত্র আমি নই, সেগুলিকে নিজের কাছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে ওঠা পর্যন্ত ক্ষান্তি নেই আমার—আর তবু আমার কাছে আপনি এমনই এক সংঘটন।"

সিমনোঁ নিজে সমস্যাটার উপর কিছুটা আলোকপাত করতে জিদ্ জানান [২০।১।৩৯] : "আপনার দীর্ঘ পত্রটি অকল্পনীয়ভাবে আমার ঔৎসুক্য জাগিয়েছে। পরম বিত্তের মতো সেটাকে আমি সংরক্ষণ করছি।" সিমনোঁর বিষয়ে যে-আলোচনাটা তিনি লিখবেন বলে স্থির করেছেন, তার জন্য সিমনোঁর সেই চিঠিটা কাজে লাগবে বটে। জিদের পক্ষে কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়, সিমনোঁর সংগে তিনি সাক্ষাৎ আলাপ করতে চান : "যদি সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করেন, তা সম্পন্ন করতে আমি অসাধ্যসাধন করব। আমার সমীক্ষাটি আপনাকে আগে দেখিয়ে না নিয়ে—এবং সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ত্রুটি ও প্রমাদমুক্ত করতে পেরেছি, এ-সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে—ছাপতে দিতে চাই না।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান-অধিকৃত ফ্রান্স ত্যাগ করে জিদ উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় নেন। তুনিস্ থেকে তিনি লেখেন [২১।৪।৪২] : "ইদানীং আপনার লেখাগুলি ফিরে ফিরে পড়েছি আমি, পড়িয়েছি চারপাশে অনেককেই। আপনাকে এত কম জানে লোকে, আর ভুল জানে...।" সিমনোঁর বই পড়তে পড়তে সিমনোঁর সংগে দেখা করার ইচ্ছাটা বেড়েই চলে : "হায়, কবে আমাদের দেখা হবে? কত কি বলার আছে আমার, আপনাকে পাঠ করতে করতে নোট নিয়েছি কত! আমার তো মনে হয়, আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি—শুধু আপনার অসামান্য গুণাবলীই নয়।" সিমনোঁর রচনার দোষ-নির্দেশনাতেও জিদ্ দ্বিধাহীন : অসমাপ্ত বাক্যের অতিব্যবহারে তিনি মুদ্রাদুষ্ট; তাঁর যাবতীয় নায়ক-নায়িকা ইচ্ছাশক্তি বিরহিত, জটিলপরম্পরায় ও পরিস্থিতির অবরোধে বন্দী...।

আলজে থেকে জিদ লেখেন [১১।১২।৪৪]ঃ "তিন-তিনবার সিমনোঁ-দাওয়াইয়ের উপর রইলাম; তুনিস্-এ ফেজ-এ আর আলজে-তে যত বই যোগাড় করে উঠতে পেরেছি, সবই পাঠ ও পুনঃপাঠ করলাম। দুঃখের কথা, গ্রন্থাগারগুলি দীন, সবচেয়ে দুঃখের আপনার সাম্প্রতিকতম গ্রন্থগুলির নাগাল পেলাম না।"

সিমনোঁ-বিষয়ক সেই প্রস্তাবিত ভাষণটা অনেকদিন থেকে প্রস্তুত, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা উচ্চারণ করতে জিদ নিস্-এ ও তুনিস্-এ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন : "আপনার হাতে এটিকে তুলে দেব এই সাধ ছিল অথচ দুঃখ পাচ্ছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে না পেরে—এই যখন, আমার মনে হয়, সাক্ষাৎটা উভয়ের পক্ষেই একান্ত ফলপ্রসূ হতে পারত। আপনাকে সুমন্ত্রণা দিতে পারতাম, এটা আমার বড়াই, আমি যে আপনাকে এত গভীরভাবে চিনে উঠেছি, এত গভীরভাবে চিনে উঠেছি, আর আপনাকে আরো ভালো করে চেনানোর জন্য এতখানি সপ্রেম উৎকণ্ঠা আমার। ভুল খ্যাতির উপর আপনি দাঁড়িয়ে ঠিক যেমন ছিলেন বোদ্‌লেয়ার কিংবা শপ্যাঁ। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হল পাঠক সাধারণকে তাদের হঠসাধিত প্রথম সিদ্ধান্তটাকে পাল্টাতে প্ররোচিত করা। আপনার আদি সাফল্যের ক্রীতদাস হয়ে আছেন আপনি, এবং পাঠকের জাড্য আপনার বিজয়াভিযানকে ঐখানেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। আমার সমগ্র ভাষণটির মধ্য দিয়ে আমি দেখাতে চাই, প্রমাণ করতে চাই, লোকে যা ভাবে তার চেয়ে আপনি অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

পরে দেখি, ভাষণটা তিনি ব্রাসাল্‌স্-এ ১৯৪৬ সালে দিতে প্রস্তুত ছিলেন : শেষ পর্যন্ত তারা [আইনজীবী সমিতি] অন্য এক বিষয় মনোনীত করে বসে।

এদিকে কিন্তু জিদের সিমনোঁ-পাঠে ভাটা পড়ে না : "তাঁর সিমনোঁ-য়ানায় আক্রান্ত হয়ে আছি এখানে আমরা সবাই—তিনি লেখেন ১৯৪৮ সালে—আমি নিজে তো বছরে একবার করে ওটাতে ভুগব-ই! কিন্তু যখনই আপনার বই পড়ি, নোট নিতে ভুলি না আর, আমার ইতিমধ্যেই মোটাসোটা-হয়ে-ওঠা ফাইলটাতে যোজনার জন্য।"

সিমনোঁ তখন আমেরিকায়। জিদেরও আমেরিকায় যাওয়ার কথা : সেখানে সিমনোঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা পুনঃপ্রকাশ করেন : "আমার পথ চেয়ে আছি : পরস্পরকে কত কি-ই না বলার আছে আমাদের। হৃষ্টপুষ্ট ফাইলটাকে তো সঙ্গে আমি আনছিই। দুজনে মিলে সেটা ফের পড়লে বোধ হয় লাভই হবে। ওর মধ্য দিয়ে গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে যেতে যেতে আমি আরিয়ানার সেই সূত্রটাকে খুঁজবার চেষ্টা করেছি যা আপনার রচনাকর্মের জটিল গোলক ধাঁধায় পাঠকের পক্ষে হবে পথনির্দেশক।"

শেষ চিঠিতে [২৯।১১।৫০] জিদ লেখেন : "আমার অসংখ্য চিঠি আপনি পেতেন, যদি না শুধু যা সেরা মানের, সেটুকুই আপনাকে পাঠাবার জন্য আমি সতর্ক থাকতাম।" অভিযোগ করেন : "কত কত লোক আছে, যারা এখনও আপনার বিষয়ে অজ্ঞ। কেউ কেউ আমাকে এসে শুধোয় : বলুন তো ও'র কোনটা পড়তেই হবে। আমি জবাব দিই : সব-কটিই।" তারা অনুভব করুক "সেই মাদকতা আপনার বই খোলামাত্র পাঠককে যা অবশ করে ছাড়ে এবং যা আমি আপনার বই নতুন করে পড়তে গিয়ে নতুন করে অনুভব করি : আবিষ্কারের প্রথম চমক তো আমার আর নেই, আর তবুও আমার সেই বিহ্বলতা প্রবল, এমনকি প্রবলতর, প্রথম পাঠে যা অনুভব করেছিলাম। স্থায়িত্বের এর চেয়ে বড় নিশ্চিতি আর কি?"

সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক

জিদের কন্যা কাথ্‌রিনের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত সিমনোঁ-সম্পর্কীয় সেই বৃহৎকায় ফাইল—উদ্ধৃতি, সংক্ষিপ্তসার আর মন্তব্যের মধ্যে—সেই অনুচ্চারিত ভাষণের ভূমিকার তিনটি খসড়া পাওয়া গিয়েছে। প্রথমটিতে জিদ লিখেছিলেন : "মহত্তম তিনি, প্রকৃততম অর্থে ঔপন্যাসিক" [le plus grand et le plus vraiment romancier] নীল পেনসিলে লেখা এক সংযোজন আছে : "বোধ হয়"। এই 'বোধ হয়' [Sans doute] কথাটার পরিবর্তে দ্বিতীয় খসড়ায় তিনি লিখেছেন "সম্ভবত" [Peut-etre]। তৃতীয় খসড়া দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে :

"সিমনোঁ-ই যে আজকের দিনে আমাদের মহত্তম ঔপন্যাসিক, আগামীকাল এই ঘোষণা আর আমার একলার থাকবে না। একলা?...না। এরই মধ্যে সিমনোঁ প্যারিসে, মফস্বলে, বিদেশে বেশ কিছু সংখ্যক উৎসাহী অনুরাগীর হৃদয়ে আসন করে নিয়েছেন। আশ্চর্য হব না যদি অল্পকালের মধ্যেই দেখি উন্মাসিকতা-মিশ্রিত এমন এক সিমনোঁ-মত্ততার যুগ শুরু হয়ে গেল সমালোচনা যেখানে নাগাল পায় না, এবং রুচি ডুবে যায় আসক্তিতে।

"কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি হয়ে রইলেন জনতার সেই মানসিক জাড্যের শিকার, যা চিরকালের মতো আদি ধারণাটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।

"প্রথম কয়েকটি বইয়ের সাফল্য সিমনোঁকে দিয়েছে গোয়েন্দা কাহিনী নামক সাহিত্যের এক সন্দেহভাজন ও অবজ্ঞাত ধারার লেখকের বিপজ্জনক খ্যাতি, তাঁকে আটকে রেখেছে সাহিত্যের উপকণ্ঠপ্রদেশে। এরপর পরম্পরায় দশটা-পনেরটা-বিশটা বিলকুল ভিন্‌জাতের যত বই-ই লিখুন না কেন তিনি, কোনো লাভ নেই : আমি জেনেছি, তুমি আছো গোয়েন্দা, সেই গোয়েন্দাই তুমি থাকবে।...।"

উপসংহার

সিমনোঁ নাকি দুশোটি উপন্যাসের লেখক [৬৭ বছরের বয়সে তিনি এখনো লিখে যাচ্ছেন]; তাঁর পঞ্চাশখানা বই চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সিমনোঁর রচনাবলী নাকি বত্রিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি নাকি দিনে আশি পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখতে পারেন তাঁর একটা উপন্যাস এগারো দিনের মধ্যেই রচিত হয়েছে...। এ ধরনের তথ্যসম্ভার পত্রদাত্রী মহিলাটি এবং আরো অনেকেই জানতে পারেন। জিদ কিন্তু আরো কিছু জানতেন; তিনি জানতেন, সিমনোঁর প্রকৃত পরিচয় পেতে গেলে আরো কিছু—অনেক কিছু—বলা দরকার।

অরবিন্দ শার্টিংয়ে
আপনাকে
কেতাদুরস্ত
দেখায়
অরবিন্দ
মিলস লিমিটেড
Arvind Mills Ltd.
LALBHAI GROUP
Interpub/A/4 Bom

শম্ভু মহারাজ ও তাঁর নৃত্যশৈলী

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান কালে কথক নৃত্য প্রসঙ্গে যে-দুটি নাম স্বভাবতই মনে পড়ে তা হচ্ছে শম্ভু মহারাজ ও বৃজমোহন (বিরজু)। বহুদিন পূর্বের নৃত্যপরম্পরা বহন করে এসে দুজনেই উত্তর ভারতীয় নৃত্যের প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন এবং নানাভাবে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে কথক নৃত্যের আধুনিক বনেদ গড়ে তুলেছেন।

শম্ভু মহারাজ বিগত ৪ঠা নভেম্বর নয়াদিল্লিতে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ব্যাপারটি আকস্মিক নয়, কারণ কিছুদিন যাবত হৃদরোগ ও গলায় ক্যান্সার রোগে তিনি ভুগছিলেন। এই "নৃত্য সম্রাটের" তিরোভাবে রাজধানীর রসিক মহলে নেমে আসে গভীর ক্ষোভ ও বিষাদের ছায়া। কলকাতার নৃত্যানুরাগী মহলও দুঃখিত হয়েছেন, কারণ জীবনের বহু অংশ শিল্পীর কেটেছে এই জনসমৃদ্ধ শহরে। শম্ভু মহারাজকে কেন্দ্র করে যে-কথক পরম্পরা কলকাতার গুণী মহলে সমাদর লাভ করে সে বিষয়ে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ হওয়া দরকার এই কারণে যে, এই ঐতিহ্যের আয়ু এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

শম্ভু মহারাজের কথক অবদান বুঝতে হলে ইতিহাসের পশ্চাদপট খুলে দেখতে হবে। মুঘল শাসনের আমলে এই নৃত্য-শৈলীর গঠন এবং প্রকৃতিগত আবেদনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হলেও সেই সময়কে উদ্ভবের আখ্যা দেওয়া যায় না। শিল্পসৃষ্টি আকস্মিক হওয়ার নজির খুব কম। বহু-কালের নিভৃত সাধনার সমষ্টিগত ফল নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটি শৈলীর বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিত্বের ছাপ বহন করে সেই শৈলীর ধারা বয়ে চলে পরবর্তীকালে। ক্রমে ছোট ছোট ধারা এসে মূল প্রবাহে মেশে, গড়ে ওঠে গঠন-শৈলীর সিন্ধুনদ। নৃত্যে ব্যক্তিত্বের ছাপ মেনে নিলে প্রবর্তনের ক্ষেত্রকেও মেনে নিতে হয়। কারণ প্রকৃত শিল্পী কখনও নিশ্চেষ্ট, নিস্পন্দ থাকতে পারেন না। আহৃত সম্পদকে সে সর্বদাই চেষ্টা করে নূতন আঙ্গিক বা ভাবধারার ছাঁচে ফেলে সমৃদ্ধতর করে তুলতে।

হিন্দু-মুসলমান চিন্তাধারার সংযুক্ত বেদীমূলে ভারতীয় সঙ্গীত যে সমৃদ্ধির সোপানে পা দিয়েছিলো তার পাশেই ছিলো নৃত্য। আকবর বাদশার প্রীতিধন্য ভারতীয় সঙ্গীত আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ। ঠিক সেইরূপ স্বীকৃতি পেয়েছে লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শার অনুরাগমণ্ডিত কথক নৃত্য। এই সঙ্গীতপ্রিয় নবাব নৃত্য বা সঙ্গীতের ব্যাপারে স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। সঙ্গীতকে সঞ্চারণমুখী করতে তাই তিনি ঠুংরি গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। একই মনোভাব নিয়ে তিনি কথক নৃত্যকেও রাজদরবারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অবশ্য এই নৃত্যের পশ্চাদপট আরও পুরাতন এবং সম্ভবত অন্ধকারে ঘেরা। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, ৫০০ বৎসরের অধিক কাল পূর্বে আগ্রা এবং তৎকালীন আউধ রাজ্যে কথকের সমপ্রাকৃতিক এক গ্রামীণ নৃত্য প্রচলিত ছিলো। কিন্তু কল নৃত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

প্রাচীনকালে রামায়ণ মহাভারতের সমাদর কথকতার সহায়তায় যথেষ্ট উর্দ্ধ-

শম্ভু মহারাজ

সীমায় পেশছেছিলো। কথার সঙ্গে মুদ্রার সংযোজন এই অভিব্যক্তির মূলকথা এবং জনসাধারণ অতি হৃষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করেছিলো। চিত্ত বিনোদনের এই ধারা যাঁরা পেশাগতভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বলা হতো—কথক। সম্ভবত এই পরম্পরা থেকেই মুঘলকালীন কথক নৃত্যের উৎপত্তি।

ওয়াজিদ আলী শার আমলে ঠাকুর প্রসাদ, কালকা প্রসাদ, বিন্দাদীন প্রমুখ এক বিশিষ্ট নৃত্যগোষ্ঠী কথক নাচকে জাঁকিয়ে তোলেন। এরপর রায়গড়, রামপুরে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কথক নৃত্যের গতি দুর্বার হয়ে ওঠে। ক্রমে উত্তর ভারতের একমাত্র নৃত্যশৈলী হিসাবে কথক পরিগণিত হতে থাকে। রেওয়া, জয়পুরে এবং পাঞ্জাবের কিছু স্থানে এই নাচকে আরথা নৃত্য বলা হয়।

কথক নৃত্যের মুখ্য নাম ঠাকুর প্রসাদ। তিনি ছিলেন ওয়াজিদ আলী শার দরবারের নৃত্যশিল্পী। ঠাকুর প্রসাদের পূর্বপুরুষদের নিবাস এলাহাবাদ জেলার হান্ডিয়া তহসিলে। পরবর্তীকালে এই পরিবারের কিছু সংখ্যক লোক চলে আসেন লক্ষ্মৌয়ে ভাগ্য অন্বেষণের তাগিদে। বংশগত নৃত্য-সম্পদকে রাজপৃষ্ঠপোষকতার সহায়তায় বহির্মুখী ও ব্যাপকতর করে তোলার অভিপ্রায় তাদের অপ্রাসঙ্গিক নয়। লক্ষ্মৌর দরবার তখন ওয়াজিদ আলীর সৌজন্যে ঝলমল করছে, একাধিক শিল্পীর সঙ্গীত-সম্ভার যেখানে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তারই পাশে এসে দাঁড়ালো কথক নাচ। সঙ্গীত ও নৃত্যের রাজ-অনুকম্পা-লাভ হয়তো আভিজাত্য বোধক, কিন্তু তার জন্য পরম্পরাগত সম্পদের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়নি। স্থানীয় সৌজন্যতার মর্মবাণী বহন করে নৃত্যের নামকরণ হলো কথক। পুরাতনের স্বীকৃতি ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না। রাজসভায় শোভাবর্ধন করে চললেন ঠাকুর প্রসাদ। কথক নাচের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত ভাবধারা তাঁরই কল্পনাপ্রসূত।

ঠাকুর প্রসাদের ভ্রাতা দুর্গা প্রসাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ-যোগ্য। দুজনে ভাই কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু উভয়েই ছিলেন রাজদরবারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নৃত্য-শিল্পী। নবাব একদিন প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলেন যে কত্থক নৃত্যে পাখোয়াজ বা লয়যন্ত্রের প্রাধান্য বেশি। কারণ সঙ্গতের নির্ধারিত পথের বাইরে যাওয়ার উপায় নৃত্যশিল্পীর নাই। কথাটি দুর্গা প্রসাদের মনে কাঁটার মতো বিঁধলো। নৃত্য প্রধান, না, সঙ্গত প্রধান এই বিতর্কের অবসান ঘটাতে তিনি নবাবের কাছে এক পরীক্ষামূলক আসরের প্রার্থনা জানালেন। সঙ্গীতপ্রিয় নবাব হৃষ্ট মনে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

পরীক্ষার দিন নৃত্যবিদ বেশ ধারণ করলেন পাজামা, শেরওয়ানী, দোপাট্টা এবং লক্ষ্মৌ টুপি। এই বেশভূষা তৎকালীন নবাবদের অনুরূপ বলা চলে। শুধু বেশভূষার ক্ষেত্র থেকে নেওয়া হলো চাদর যা কণ্ঠ প্রদক্ষিণ করে পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এই বেশ আজও অবিকৃত আকারে সকল কথক শিল্পী গ্রহণ করে থাকেন।

নাচ শুরু হলো সারেঙ্গী ও পাখোয়াজের যুক্ত সহযোগিতায়, বোল চৌতাল। চালের বিচিত্র গতি এগিয়ে নিয়ে চললো নাচকে। এক এক সময়ে লয় ও নাচের পার্থক্য এক সঙ্গে মিশে গিয়ে সৃষ্টি করলো এক অপরূপ অবস্থা। দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বোলের সঙ্গে নাচের পদকর্ম একটুও বিচ্যুত হলো না। অভিনয় আরম্ভ করবার পূর্ব অবস্থা এই ধরনের আঙ্গিক প্রধান। শুরু হলো অভিনয় বা ভাব প্রদর্শনের অধ্যায়—শ্যাম না আসায় বিদগ্ধ রাধার মনের অবস্থা বর্ণন। শতাধিক প্রকারে এই ভাব প্রদর্শিত হওয়ার পর দর্শক ও বাদক মন বিগলিত হয়ে একই সঙ্গে লীলাবিহারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে রাধার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলো। রাধা যেন তাদেরই একজন।

তারপর নৃত্যবিদ কৃষ্ণ আগমনের অধ্যায় শুরু করলেন। অভিনয়ের মধ্যে স্থান পেলো লীলাবিহারীর চতুর হাসি, যৌবন-দীপ্ত পদভঙ্গ—সবই যেন ইচ্ছাকৃত অপরাধের

পরিপূরণ। বিমোহিত শ্রোতা, ততোধিক বিমোহিত বাদকদ্বয়। সমস্বরে তারা বলে উঠলো—"নিষ্ঠুর, এতক্ষণে এলে!" ঠিক সেই মুহূর্তে নবাবের মুখ থেকে নিঃসৃত হলো—"নৃত্যই প্রধান"।

ভারতীয় নৃত্যের এই অলিখিত ইতিবৃত্ত থেকেই বোঝা যায় কতো উচ্চস্তরে কথক নৃত্য একদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

ঠাকুর প্রসাদের দুই পুত্র বিন্দাদীন ও কালকা প্রসাদ। পিতা ও পিতৃব্যের কীর্তি অম্লান রেখে কথক নৃত্যকে তাঁরা আরও সম্ভাবনায় ভরিয়ে তুললেন। লক্ষ্ণৌয়েই তাঁদের ভদ্রাসন স্থাপিত হলো। পরবর্তী-কালে এ নাচের প্রভাব গিয়ে পৌঁছলো জয়পুরে। ক্রমে সৃষ্টি হলো দুই ঘরানা—লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর। আজও এই বিভিন্নতা নাচের মাধ্যমে রক্ষিত হয়ে চলেছে। জয়পুর ঘরানার মুখ্য শিল্পী জানকী প্রসাদ, গোবর্ধন। চিরোঞ্জীলাল, বদরী, মোহনলাল, জয়লাল ইত্যাদি

বিন্দাদীনের বাল্যকাল কেটেছে রাজ-দরবারের পরিবেশে। পিতার সঙ্গে তিনি সেখানে গিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে বসে থাকতেন। নাচের প্রেরণা তাঁর এখান থেকেই। ভ্রাতা কালকা প্রসাদও থাকতেন সঙ্গে। কিম্বদন্তী অনুযায়ী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একদিন রাত্রে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বিন্দাদীনকে নৃত্যবিদ্যা দান করেন। ঐতিহাসিক সত্য এর পিছনে কিছু আছে কি না আমার জানা নাই। তবে একথা সত্য যে, কথক নৃত্য বিন্দাদীনের কৃতিত্ব অচিরেই প্রতিভাত হয়। মাত্র ৬ বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে থাকেন পিতার কাছ থেকে। বারো বৎসর বয়সে বালকের নৃত্য প্রতিভার কথা শুনে নবাব ওয়াজিদ আলী শা দরবারে নৃত্য প্রদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পিতা চিন্তিত। দরবারী পাখোয়াজী কুদউ সিং-এর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনে ১২ বৎসরের বালক সমর্থ হবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজ অভিপ্রায় পূরণ করার পথ অবলম্বন করে পুত্রকে আদেশ দিলেন দরবারে অবতীর্ণ হতে। বিষণ্ণ মনে পিতা বসে রইলেন দরবারের এক নিভৃত কোণে। পাখোয়াজীর হাতে পুত্রের অপূর্ণতা তিনি দেখতে নারাজ। কিন্তু দুনী বোলের সঙ্গে পুত্রের উপযুক্ত পদকর্ম দেখে তিনি আহ্লাদে ফেটে পড়লেন। দর্শক মহলের স্বীকৃতিও উচ্চস্বরে ধ্বনিত হলো। বিন্দাদীনের বেশভূষা মুসলমানী হলেও তিনি অন্তরে ছিলেন প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্ত। নিজ নাচকে তিনি নটবড়ী আখ্যা দিয়েছিলেন।

কালকা প্রসাদের তিন পুত্র—জগন্নাথ (আচ্ছন মহারাজ), বৈজনাথ (লচ্ছু মহারাজ) এবং শম্ভুনাথ (শম্ভু মহারাজ)। বিন্দাদীন ছিলেন নিঃসন্তান। আচ্ছন মহারাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন পিতৃব্য বিন্দাদীনের কাছে, কারণ অল্প বয়সেই তিনি পিতাকে হারান। তিন ভ্রাতাই কথক নৃত্যের অঙ্গনে নিজ নিজ অবদান ব্যক্ত করেছেন। আচ্ছন মহারাজের নাচে পৌরুষোচিত প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে নারীসুলভ কমনীয়তার সমাবেশ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। গুরু ও লঘুর সংমিশ্রণ কথক পরম্পরার মধ্যে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে। কথিত আছে যে এক হাতে ঝাঁপতাল (১৪ মাত্রা) অন্য হাতে ত্রিতাল (১৬ মাত্রা), পায়ে ঝুমরা (১৪ মাত্রা)। এবং মুখে আড়া চৌতালের বোল তিনি প্রদর্শন করতে পারতেন। ইদানীং কালের মধ্যে এই ধরনের প্রতিভাধর শিল্পীর সম্মুখীন হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু প্রকৃত প্রতিভার দীপ্তি তাঁর দেখা গেছে অভিনয়ের ক্ষেত্রে। মুদ্রাকে রূপায়িত করে নৃত্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারা তাঁর নাচকে মহীয়ান করে তুলতো। এই কারণেই অনেকের মতে, লক্ষ্ণৌ ঘরানার বৈশিষ্ট্য—ভাব এবং জয়পুর ঘরানার বৈশিষ্ট্য—লয়। আচ্ছন মহারাজের ক্ষেত্রে তা পৃথক আকারে প্রকাশ পায়নি। লয়কে বাদ দিয়ে ভাবের প্রাধান্য তিনি দেননি, আবার ভাবকে বাদ দিয়ে লয়ের প্রাধান্য তিনি স্বীকার করেননি।

এই সমন্বয়ের উত্তর-সাধক লচ্ছু ও শম্ভু শিক্ষাপ্রাপ্ত হন বড় ভাই আচ্ছনের কাছে। এ বিষয়ে তাঁরা দুজনেই যে সৌভাগ্যবান সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কথক নৃত্যের মৌলিক বিশেষত্ব তাঁরা সহজেই আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আচ্ছন মহারাজ জীবিত ছিলেন। বিন্দাদীন ছিলেন কথক নৃত্যের আঙ্গিক গড়ার মধ্যমণি, আচ্ছন ছিলেন সেই পরম্পরারই ব্যবহারিক রূপকার। বোল, পরণ, ভাব প্রয়োগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে তিনি এমন এক স্তরে এনেছিলেন যে কথককে উত্তর ভারতের নৃত্যশৈলীর অগ্রদূত বললে অত্যুক্তি হয় না।

আচ্ছন প্রবর্তিত কথক নৃত্যধারার সকল সম্পদ পেয়েছিলেন শম্ভু মহারাজ। তাঁর অর্জিত ধন ভাণ্ডারের খানিকটা সন্ধান পাওয়া যায় বৃজমোহনের শিক্ষার মধ্য দিয়ে। আচ্ছনের পুত্র বৃজমোহন পিতার কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে পারেননি। কাকা শম্ভুই তাঁকে নৃত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হওয়ার যোগ্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। শিক্ষাদান ছিলো শম্ভু মহারাজের অন্তরের বস্তু। নিজ সম্পদ অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করার উৎসাহ তাঁর কলকাতা থাকাকালীন বহুবার লক্ষ্য করেছি। বৃজমোহনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি ঠুংরী গানের বহু রচনা বংশাবলী সূত্রে তাঁর কাছে রক্ষিত আছে। লচ্ছু মহারাজের কাছেও সে কথা শুনেছি। এসব গান "বিন্দা কহে" ভনিতার আড়ালে রচিত। বিন্দাদীনের গান রচনার পরিচয় হয়তো অনেকেই পাননি, কাজেই তার সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি। শৃঙ্গার-রসাপ্লুত কথক নৃত্যে ঠুংরী[illegible]-এর প্রভাব কালকা-বিন্দা ঘরানার বৈশি[illegible] শম্ভু মহারাজ এ-ধারাকে বিক্ষিপ্ত করেননি। বরং হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাচে তাই ফুটে উঠতো ঠুংরির লাবণ্য। ভাব-বিকাশের ক্ষেত্রে এ-ধারা কতোটা রসমণ্ডিত অভিজ্ঞ মহলের সকলেই তা জানেন। লয়, আঙ্গিক, লম্বা ডোরার পদকর্ম ইত্যাদির ঊর্ধ্বে তিনি স্থান দিতেন ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রকে, অভিনয় যার আলংকারিক নাম। কথকের রূঢ়তা তাই তাঁর চেষ্টায় কমনীয় স্বভাব নিয়ে প্রতিফলিত হতো। আধুনিক কথকের ফলিত রূপায়ণ তাঁরই প্রচেষ্টায় ফল। অবশ্য তা পূর্ববর্তী সম্পদকে বিক্ষিপ্ত করে নয়।

শম্ভু মহারাজের মুখ্য শিষ্যবর্গের মধ্যে আছেন বৃজমোহন (বিরজু), সিতারা, লীলা দেশাই, অলখনন্দা, দময়ন্তী যোশী ইত্যাদি। আজ এই প্রতিভাধর শিল্পী ও শিক্ষকের প্রয়াণে কথক নৃত্যের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হলো। সকলের দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ রইলো বৃজমোহনের উপর। শম্ভু শিষ্য এই কৃতী সন্তান এখন কথক নৃত্যের সারথি। লক্ষ্ণৌ ঘরানার তিনিই এখন মুখপাত্র।

সাত

কেরিয়ার কথাটা রত্নর পছন্দ নয়। ও কেরিয়ার চায়নি। চেয়েছে স্বাধীন-জীবী হতে। স্বাধীনভাবে বাঁচতে। তার মধ্যে পড়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা ও কাজের পারিশ্রমিক পাওয়া। কোনো একটা বাঁধা কেরিয়ারের চেয়ে দিন আনা দিন খাওয়া ভালো। সেইজন্যে ও হতে চেয়েছিল ফ্রী লান্স। কিন্তু তার অসুবিধে হচ্ছে প্রেমে পড়লে প্রেমিকার দায় বহন করা দুষ্কর। যদি না তিনিও উপার্জনক্ষম হন। বেবীর কথা ও ভাবেনি।

কিন্তু প্রেমে পড়েছে বলে ও আত্মবিক্রয় করবে? মনটা তাই ওর গভীর বিষাদে মগ্ন। বন্ধুদের কাউকেই বুঝিয়ে বলতে পারে না কেন ওই বিষাদ। বি-এ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আর কেউ কি ওর মতো নিরানন্দ মনে দিন কাটাচ্ছে?

একমাত্র জ্যোতির কাছেই ও মন খোলে। বলে, "আমি যে পথে চলতে চাই সে পথে চলতে দিচ্ছে কে? গোরী যদি নির্দিষ্টভাবে দু' বছর সময় দিত তা হলে হয়তো এম-এ-টাও এমনি ভালোভাবে পাস করতুম। কিন্তু যদি এক বছরের বেশী সময় না দেয় তা হলে শুধু শুধু এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে কী এমন লাভ হবে? এ রকম অনিশ্চিত অবস্থায় আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পারি, জ্যোতিদা? তুমি নিজেও তো এক বছরের বেশী কবুল করছ না। বাকীটা মহাত্মার উপর ছেড়ে দিচ্ছ। তুমি চলে গেলে আমি কী উপায়ে দু'জনের জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থ উপার্জন করতে পারব? বেবী যদি আসে তো তিনজনের?"

জ্যোতি চিন্তান্বিত হয়ে বলে, "তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইনে, রতন। কিন্তু আরো একটা বিষয় আছে সেটাও হিসেবের মধ্যে আনতে হবে। গোরী তোমাকে দু' বছর সময় দিতে রাজী হলে কী হবে, প্রকৃতি যদি প্রবল হয় তখন? দু' মাস দেরি করে যে বিপত্তি ঘটল, দু' বছর দেরি করলে সেই বিপত্তি আবার ঘটতে পারে। কাজ কী আবার ঝুঁকি নিয়ে? ধরে নাও যে এক বছরই হচ্ছে প্রাকৃতিক সীমা। ওই কথাটাই আমার মনে ঘুরছে বলে আমি বলছি এক বছর। কিন্তু ও যদি বাপের বাড়িতে থেকে যায় বা অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে তবে দু' বছরেও কিছু ঘটবে না। কেন তা হলে তুমি এম-এ-তে ভালো করবে না? আমি কি চাই যে তুমি গোরীর জন্যে শহীদ হও?"

শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে গোরী কী করবে তার উপর। বাপের বাড়িতে থেকে যাবে, না অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে? নারীই নিয়ন্ত্রণ করবে পুরুষের ভাগ্য। হঠাৎ একদিন ডাক আসবে, বম্বে চল। রইল পড়ে এম-এ-র আধখানা।

"তোমাকে আমি যত দূর পারি সাহায্য করব, রতন। তবে আমারও তো জীবনের ব্রত আছে। গান্ধীজীকে আমি কথা দিয়েছি। যখনি তিনি ডাক দেবেন তখনি সাড়া দেব। গোরীর জন্যে কি আমার কথার খেলাপ হবে? তবে নিকট ভবিষ্যতে গণ-সত্যাগ্রহের লক্ষণ দেখছিনে। তা ছাড়া গোরীর ভার যখন তুমিই আপনা হতে নিয়েছ তখন আমার দায়টা মুখ্য নয়, গৌণ।"

"সেইজন্যেই তো আমি আরো ভালো করে তৈরি হতে চাই। তার জন্যে আরো কিছু সময় চাই।" রত্ন নিবেদন করে।

"আরো ভালো করে তৈরি হওয়া বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও?" জ্যোতি সুধায়।

"ঝি চাকর ঠাকুর আয়া—" রত্ন বোঝাতে যায়।

"হাতি ঘোড়া পালকি।" জ্যোতি ঠেস দিয়ে বলে "আমি নিজে এক বেলা খাই। মোটা চালের ভাত, অড়হরের ডাল, একটা সিদ্ধ। তুমিও তো মিতাহারী। ঠাকুর রাখতে হবে কেন? আমরাই পালা করে রাঁধব। ঝিয়েরই বা দরকারটা কী? পালা করে ঘর ঝাঁট দেওয়া যাবে, বাসন মাজা যাবে। আর চাকর ছাড়া কি কেউ বাজার হাট করে না? তবে আয়ার কথা আলাদা। যদি বেবী আসে সঙ্গে।" জ্যোতি সেইটুকু ছাড় দেয়।

"গোরীর কষ্ট হবে না?" রত্ন কষ্ট পায় ভেবে।

"স্বাধীনতা জিনিসটাই কষ্টার্জিত। কষ্ট করে রক্ষিত। যে যত স্বাধীনতাপ্রিয় সে তত কষ্টসহিষ্ণু। গোরীকেও তার জন্যে তৈরি হতে হবে। তৈরি কি কেবল তুমি আমিই হব? ভালোবাসা কি একতরফা?" জ্যোতি কঠোর স্বরে বলে।

"তবু ও যে স্টাইলে অভ্যস্ত—" রত্ন গোরীর পক্ষ নিয়ে বলতে যায়।

"সে স্টাইল হারেমের বেগমদের হারেমেই বন্দী করে রাখার ফন্দি। মুক্ত নারীর স্টাইল নয় ওটা। মুক্ত নারী খেটে খায়, বাঁদীকে দিয়ে খাটিয়ে নিয়ে খায় না। ও যদি আর কারো দাসী হতে না চায় তো আর কেউ ওর দাসী হবে কেন? এ কী রকম মুক্তি যার জন্যে তুমি শহীদ হতে তৈরি হবে? তোমাকে শক্ত হতে হবে, রতন। ডেকাডেণ্ট ফিউডাল শ্রেণীর বেগমদের মাটিতে নামিয়ে আনতে হবে। আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওর মাথাটি খাবে দেখছি।" জ্যোতি রূঢ় করে বলে।

রত্নও হাসে। কোথায় বম্বে, কোথায় গোরী, কোথায় আদর, কোথায় কী! সমস্তটাই একটা আলনস্করের স্বপ্ন। আরব্য উপন্যাসের শামিল।

গোরী কবে আসবে না-আসবে তারই উপর নির্ভর করবে রত্নর পড়া না-পড়া, চাকরি করা না-করা। একটি পুরুষের জীবনের ধারা নিয়ন্ত্রণ করবে একটি নারীর গতিবিধি। জ্যোতিষীদের মতে যেমন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি। এ কী জ্বালা! প্রেমেরও কি একপ্রকার জ্যোতিষ আছে? একজনের

ভাগ্যসূত্রে আর একজনের হাতে? প্রেমিকের স্বাধীন ইচ্ছা একটা মায়া?

বাড়ি ফিরে গিয়ে সে গৌরীর চিঠি পায়। লিখেছে ও মেয়ে—

"তোমাদের দিকে আমি চাতকের মতো চেয়ে আছি। কবে বর্ষণ করবে মুক্তিজল? কবে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ? তোমরা কি মনে করেছ আমার পায়ে বেড়ি পড়ল বলে আমি চুপচাপ স্থাণুর মতো বসে থাকব? তোমরা তৈরি হচ্ছ তো? আমি যে-কোনো সময় গিয়ে হাজির হতে পারি। আর সহ্য হচ্ছে না এ বিজয়োল্লাস। আমার উপর ও'র কী অনুকম্পা! যেন চিরকালের মতো হেরে গেছি। সত্যি, আমার আর দেখাবার মতো মুখ নেই। আমি আর গর্জন করতে পারিনে। কুঁইকুঁই করি। বুঝতে পারি সবাই টিপে টিপে হাসছে। দর্পহারী মধুসূদন আমার দর্প চূর্ণ করেছেন। কার বিরুদ্ধেই বা নালিশ করি! বাপের বাড়ির জন্যে দিন গুনছি। মা হতে নারাজ বলে আমার নিজের গর্ভধারিণীও আমার উপর বিমুখ ছিলেন। এখন তিনি আমাকে দেখতে ও আমার সৌজন্যে নাতির মুখ দেখতে উন্মুখ। কলকাতা যদিও কৃষ্ণনগরের পথে

পড়ে না শুধু আমার ইচ্ছে আছে আরো একবার কলকাতা আসতে ও ডাক্তার দেখাতে। সে সময় তোর সঙ্গে দেখা হবে তো?"

গৌরী যে-কোনো সময় এসে হাজির হতে পারে। ডাক্তার দেখানোর নাম করে। ওর মনের গতি এখন বাপের বাড়ির দিকে। বম্বের দিকে নয়। তার দেরি আছে। নবনীর মতো বন্ধুরা পরামর্শ দিচ্ছেন এম-এ-তে নাম লেখাতে। ওরা ভিতরের কথা জানে না। ওদের পরামর্শ শুনে এম-এ-তে ভর্তি হলে ক্ষতি কী? যে-কোনো দিন ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। রঞ্জুর মনের গতি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

ওদিকে জ্যোতিদারও বম্বে থাকার কথা নেই। থাকলে রঞ্জু টের পেতো। জ্যোতিদাকে লিখতেই সে বলে, "অনেক কথা আছে। আমি আবার কলকাতা আসছি। তুমিও এস।"

দেখা হলে জ্যোতি বলে, "গৌরী এখন বাপের বাড়ি চলল। সেইখানেই খালাস হবে। তার আগে আর কোনো ঘটনা ঘটছে না। কাজেই অত দীর্ঘদিন বম্বে গিয়ে কী করব আমরা? তার চেয়ে তুমি এম-এ-তেই লেগে যাও। ডিগ্রী পর্যন্ত সময় হয়তো পাবে না, কিন্তু ডিগ্রী ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার একটা মর্যাদা আছে। এতদিন বাদে আমিও সেটা অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। পরে তুমি বলতে পারবে যে অমুক অমুক অধ্যাপকের কাছে পাঠ নেবার সৌভাগ্য পেয়েছিলে। অমুক অমুক সহপাঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতেছিলে। ঘরে বসে বই পড়েও বিদ্যা হয় তা ঠিক। কিন্তু আর দশজন বিদ্বানের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক না করলে সত্যের বিভিন্ন মুখ নজরে পড়ে না। আশ্রমজীবনে আমাদের এ সুযোগটি মেলে না। সেইজন্যে আমিও ভাবছি মাস কয়েক কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাজুয়াল স্টুডেণ্ট হব। কোথায় যাই বলতে পারো?"

রঞ্জু নানান জায়গার নাম করে। কিন্তু জ্যোতি বলে, "ওরা আমাকে আমার প্রাইভেট স্টাডির জন্যে কোনোমতে ক্রেডিট দেবে না। সেই যে আমি থার্ড ইয়ার থেকে কলেজ ছেড়েছিলুম সেইখান থেকেই আমাকে কেঁচে-গণ্ডূষ করতে হবে। অথচ আমার সতীর্থরা ইতিমধ্যে এম-এ পাস করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।"

সমস্যা বটেক। একদিন এ সমস্যারও সমাধান জুটে গেল। কথাটা কেমন করে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কর্তাদের কানে পৌঁছয়। তাঁরা বলে পাঠান, "চলে এস।" তাঁদেরও ছাত্রের প্রয়োজন ছিল।

রঞ্জু জ্যোতিকে অভিনন্দন জানায়। জীবনের জন্যে প্রস্তুত হওয়াও তো দরকার। শুধু জীবিকার জন্যে নয়। বিশ্বভারতীতে জীবনচর্চা হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যার গুরু।

জ্যোতিকে একদিন ট্রেনে তুলে দিয়ে আসে রঞ্জু। বম্বের ট্রেন নয়, বোলপুরের ট্রেন। যেটা হবার সেটা হয় না। যেটা হবার নয় সেটা হয়।

একদিন রঞ্জুর নিজের বেলাও সেইরূপ এক ব্যাপার ঘটে। ওর বাবা ওকে নিয়ে যান কুষ্টিয়ার এস ডি ও সাহেবের কাছে। এমনি আলাপ করতে। বাঙালী সিভিলিয়ান। এই প্রথম মহকুমা পেয়েছেন। তিনিও তাঁর দিনে একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন।

রঞ্জুর কৃতিত্বের সমাচার শুনে ঘোষাল সাহেব বলেন, "আপনিও তো আমার চেয়ে কম কৃতী নন। তা হলে আমাদের সার্ভিসে যোগ দেন না কেন?"

রঞ্জুর চমক লাগে। ও বলে, "আমি কি পারব? যা কঠিন পরীক্ষা।"

"একবার দিয়ে দেখতে দোষ কী? আমিও তো ভয়ে ভয়েই দিয়েছিলুম। সব নির্ভর করছে কারা দিচ্ছে তার উপর।" ঘোষাল সাহেব আশ্বাস দেন।

রঞ্জুর মাথায় নতুন এক আইডিয়া ঢোকে। জানুয়ারি মাসে পরীক্ষা। মে মাসের মধ্যেই ফলাফল জানতে পারবে। গৌরী তো ডিসেম্বরে খালাস হবে। ওর প্রয়োজনের সঙ্গে রঞ্জুর প্রস্তুতি দিব্যি খাপ খাবে।

তবে আর বম্বে নয়। বম্বের পরপারে বিলেতে। জ্যোতিদাকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না। সমস্ত পরিকল্পনাটাই পালটাতে হবে। কিন্তু কৃতকার্য হলে তো? যা কঠোর প্রতিযোগিতা।

আট

সেটা কিন্তু একটি যুবকের কেরিয়ার মনোনয়ন নয়। সেটা শুধু

একটি যুবতীর বন্ধনমোচনের উপায় আবিষ্কার। গোরী যেদিন মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হবে রত্ন সেদিন ও পথ ছেড়ে দিয়ে স্বপথ অবলম্বন করবে।

তবু ওর মন থেকে অস্বস্তি দূর হয় না। পরার্থে আত্মবিক্রয় করছে না তো? করা কি শ্রেয়? ওটা যদি পরধর্ম হয়ে থাকে তবে ভয়াবহ নয় কি? পথটা যদি ওর পক্ষে অপথ হয়ে থাকে তা হলে কেন জেনে-শুনে অপথে চলা? কত শক্তি, কত সময়, কতখানি আয়ু, কতখানি যৌবন ক্ষয় হবে অপথ চলতে ও পরে আবার উজিয়ে আসতে! যেখান থেকে রওনা হচ্ছে সেখানে ফিরে এসে নতুন করে আরম্ভ করতে!

গোরী যেমন তার পরিণয়কে অঘটিত করতে চাইছে, পারছে না, রত্নও তেমনি ওর পরীক্ষার সফলতাকে অঘটিত করতে চাইবে, সহজে পারবে না। গোরী যেমন এক অর্থে বন্দী সেও তেমনি আরেক অর্থে বন্দী হবে। কোথায় থাকবে ওর অহিংস নৈরাজ্যবাদ! শুধু মুখের কথা। রত্নও দিনে দিনে রাষ্ট্র-যন্ত্রের অঙ্গ বনে যাবে। পুলিস আর আদালত আর জেল আর যুদ্ধ—প্রত্যেকটি নন্দকে মাথা পেতে মেনে নেবে। এসব যদি সাম্রাজ্যের স্বার্থে চালিত হয়ে থাকে তবে সেও হবে সাম্রাজ্যবাদী জগন্নাথের রথের অন্যতম চালক। আর যদি স্বরাজের পর বুর্জোয়া স্বার্থে চালিত হয় তবে সেও হবে বুর্জোয়া জগন্নাথের রথের অন্যতম সারথি। তখন তার নিজের বন্ধনমোচনের কী উপায়!

রত্ন ভেবেছিল গোরী ওর অভিপ্রায় শুনে সুখী হবে। আর জ্যোতিদা হবে অসুখী। কিন্তু ঘটল ঠিক তার বিপরীত।

জ্যোতিদা লিখল—"বাঃ! কী চমৎকার আইডিয়া! ইতস্তত না করে পত্রপাঠ পরীক্ষার পড়া শুরু করে দাও। যদি সফল হও তা হলে গোরীর ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। আর তোমার নিজেরও কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে। বাস্তবের কষ্টিপাথরে আদর্শের যাচাই হবে। একটার পর একটা এক্সপেরিমেণ্ট করে তুমি হাতে-কলমে শিখবে অহিংসা কী পরিমাণে ঘাতসহ আর নৈরাজ্যবাদ কত দূর কার্যকর। গান্ধীজীও একদা ব্যারিস্টার ছিলেন। যন্ত্রটাকে ভিতর থেকে দেখেছেন। তারপর বেরিয়ে এসেছেন। তোমার জীবনের অভিজ্ঞতাও যদি তাঁর অনুরূপ হয় তবে তোমার কথার দামও সেই অনুপাতে বাড়বে। তোমাকে তো আমি চিনি। তুমিও একদিন বেরিয়ে আসতে পারবে। সুতরাং ভয় কিসের? ক্ষতি যা হবে তা পরে পুষিয়ে নিতে পারবে।"

আর গোরী।—"হায় রে আমার পোড়া কপাল! তোর সঙ্গে খেতে হবে সাহেবদের সঙ্গে! আর মিশতে হবে মেমসাহেব হয়ে! [illegible] সঙ্গে আমার শত্রুতা তারাই হবে আমার মিত্র! আর যাদের সঙ্গে মিত্রতা তারাই হবে আমার শত্রু! একেই না বলে, তপ্ত কড়াই থেকে উনুনে ঝাঁপ! শুনেছি ওটা নাকি এমন একটা কঠিন পরীক্ষা যে তুই নির্ঘাত ফেল করবি। তাই যদি হয় তবে আর ভয়ের কী আছে! ভয় পাব যদি তুই সত্যি সত্যি পাস করিস। তখন দেখব যে বাংলা দেশের কুমারীরা তোর জন্যে মালা হাতে দাঁড়িয়ে। আমার দিকে ফিরে তাকাবে কে যে আমি তোকে আমার বলে দাবি করব! তখন আমার কী হবে, মানিক! আমি কি বাঁচব! তার আগেই অপারেশন টেবিলে আমার নির্বাণ। আমার জন্যে তোকে অত কষ্ট করতে হবে কেন? তুই আমার কথা ভেবে ও পথে যাসনে। যেটা তোর স্বপথ সেই পথেই চলিস।"

রত্ন যদি সফল হয় তা হলে আর গোরীর দিকে ফিরে তাকাবে না, বাংলা দেশের কুমারীদের একজনের মালা নেবে, গোরীর এই ঈর্ষাকাতর অবিশ্বাস ওকে নির্জীব করে রাখে। পরীক্ষার জন্যে যেসব ফর্ম পূরণ করতে হয় সেসব একেবারে শেষ দিনটি পর্যন্ত ফেলে রাখে। কী দরকার! গোরী যখন বিমুখ।

কিন্তু গোরী ঠিক বিমুখ নয়। পরে ওর চিঠির থেকে জানা গেল যে ওর মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে জ্যোতিকেও জড়িত থাকতে হবে। রত্নর সঙ্গে ও যাবে, যদি জ্যোতি সঙ্গে যায়। রেঙ্গুনের প্যাটার্ন যদি বম্বের প্যাটার্ন হয় তা হলে ও রাজী। যদি বিলেতের প্যাটার্ন না হয় তা হলে ও নারাজ। ওর অন্তরের গভীরে কোনো এক জায়গায় নিহিত আছে এ তত্ত্ব যে জ্যোতি ওকে দাদার মত আশ্রয় দেবে। তখন কেউ বলতে পারবে না যে ও রত্নর রক্ষিতা। হিন্দুর মেয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ তো কল্পনা করা যায় না। বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব নয়।

এখন জ্যোতিকে বিলেত যাত্রার সঙ্গী হতে বলবে কে? জ্যোতিই বা রাজী হবে কেন? সে চায় ছাড়া পেতে। ছাড়া পেয়ে গণসত্যাগ্রহে নামতে। বম্বের প্যাটার্ন যদি তিনজনের পছন্দ হয় তবেই সে তিনজনের একজন। তার বদলে বিলেতের প্যাটার্ন এলে সে সরে পড়তে চাইবে। তার পরের চিঠিতে তেমন আভাস পাওয়া গেল। বম্বের উপরে রত্নর টান নেই। টান বম্বের পরপারে। পশ্চিমের সঙ্গে ওর একটা নাড়ীর টান।

রত্ন শেষকালে অতিষ্ঠ হয়ে শুধায়, "দিন পেরিয়ে যাবার আগে আমি জানতে চাই, পরীক্ষাটা দেব কি দেব না। না দিলে দায়িত্বটা জ্যোতিদার।"

গোরী উত্তর দেয়, "জ্যোতি তো বম্বে যাবার নামও করছে না। দুজনেই হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই বা চলবে কেন। তোর যদি আত্মবিশ্বাস থাকে তবে তুই পরীক্ষাটা দিয়ে দে, মানিক। আর যদি কাউকে তো আমার পূজোই করবি। এটা যেন মনে থাকে। আমি যে মাধবের কণ্ঠে প্রতিদিন মালা পরাচ্ছি সে মালা কি তোর কণ্ঠে পরানো হচ্ছে না? তোকে আমি উৎসাহই দিতে চাই। নিরুৎসাহ করতে চাইনে। বীরাঙ্গনারা যেমন অসিযুদ্ধে প্রেরণ করে ও প্রেরণা যোগায় আমিও তেমনি মসীযুদ্ধে প্রেরণ করছি ও প্রেরণা যোগাচ্ছি। জয় হবে কি না জানিনে, লোকে বলছে হবে না, তবু আমি এই ভেবে খুশী যে তুই আমার জন্যে যুদ্ধে নামছিস।"

হাঁ। যুদ্ধই বটে। সেকালের টুর্নামেণ্টের যুগোপযোগী সংস্করণ। নাইটরা আসবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সকলের সঙ্গে সকলের বলপরীক্ষা। জিতবে জনকয়েক ভাগ্যবান। হারবে যারা তাদের ব্যর্থতাও মর্যাদাসূচক।

রত্ন আর কালবিলম্ব না করে পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে। এইবার যাত্রা হলো শুরু। এতদিন বাদে মনে হচ্ছে কোথাও এক দিকে যাওয়া হচ্ছে। বন্দরের কাল হলো শেষ। পালে লেগেছে দূর দেশের হাওয়া।
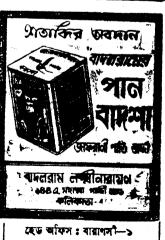
সম্ভবপর প্রতিযোগীদের খ‌ুঁজে বার করতে সময় লাগে না। তাদের সংখ্যা কম। যারা পরীক্ষা দিচ্ছে শ‌ুনে তাদের কেউ বা ধরাছোঁয়া দিতে ডরায়, কেউ বা হাত বাড়িয়ে দেয়। এমনি একজন খেলোয়াড় মনোবৃত্তির য‌ুবক উৎপল সরকার। উৎপলই অগ্রণী হয়ে ওকে ওয়াই-এম-সি-এ হসটেলে নিয়ে যায় ও নিজের র‌ুমমেট করে।

কিছ‌ু দিন একসঙ্গে থেকে দেখা গেল দ‌ু'জনেরই এক জায়গায় মিল আছে। দ‌ু'জনেই পড়ার সময় নোট লেখার ছলে চিঠি লেখে। উৎপলকে একট‌ু চাপ দিতেই সে স্বীকার যে সে প্রেমে পড়েছে। প্রেমিকাটি আর কেউ নন, তার এম-এ ক্লাসের সহপাঠিনী ইরাবতী মায়া। বর্মার মেয়ে। দার‌ুণ স্মার্ট। উৎপলের মতো ইরাবতীও খ‌ৃস্টান।

উৎপল যখন রঞ্জকে বিশ্বাস করে ওর বান্ধবীর পরিচয় দিয়েছে তখন রঞ্জকেও বাধ্য হয়ে আপনার বান্ধবীর পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু কিছ‌ুটা হাতে রেখে।

এর পরে ইরাবতীর সঙ্গেও আলাপ হয়ে যায়। কিন্তু গোরীর কথা ইরাকে বলা হয় না। ইরা একদিন উৎপলকে ও রঞ্জকে ওর জন্মদিনের পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে। সেদিন আরো কয়েকটি তর‌ুণীর সঙ্গে রঞ্জর পরিচয় হয়। তাঁরাও অবিবাহিতা। একটা নিমন্ত্রণের থেকে আরেকটা নিমন্ত্রণ আসে। আলাপ জমতে থাকে। কণ্টিনেন্টাল সাহিত্য নিয়ে আলাপ ধীরে ধীরে পত্রালাপে পরিণত হয়ে যায় সঙ্গে তার নাম সেবা। সেবা দাশগ‌ুপ্ত। রঞ্জর থেকে সিনিয়র।

অবিবাহিত তর‌ুণেরা অবিবাহিত তর‌ুণীদের সঙ্গে নানা উপলক্ষে মেলামেশা করবে, এর মতো স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? ওই তো উৎপল কেমন স্বাধীনভাবে মেলামেশা করছে। রঞ্জও এক বছর আগে যদি এ স‌ুযোগ পেত তা হলে তেমনি স্বাধীনভাবে মিশত। কিন্তু গোরী ওর জীবনে আসার পর থেকে ওর সে স্বাধীনতা বন্ধক রাখা হয়েছে। এখন কেবলি মনে হয় গোরী থাকতে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করলে প্রেমের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়।

আসলে গোরীকে আর তার বন্দীদশাকে ও এক ম‌ুহ‌ূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। স্টীম যেমন ইঞ্জিনকে ঠেলে নিয়ে চলে, ইঞ্জিনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ধার ধারে না, তেমনি গোরীর বন্ধনমোচনের দায় ওকে রাত বারোটার আগে বিছানায় যেতে দেয় না, শেষরাত্রে আবার ঘ‌ুমের মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে যায় পড়ার টেবিলে। উৎপল যখন স‌ুখনিদ্রায়, আর সকলে যখন স‌ুষ‌ুপ্তিশয্যায়, রঞ্জ তখন আকাশের তারার মতো অতন্দ্র। শরীরকে ও বিশ্রাম দেয় না, ক্লান্ত ঘোড়ার মতো চাবকিয়ে ছোটায়।

গোরী কি জানে এসব কথা? কেউ জানালে তো জানবে? কন্যাটি থেকে থেকে চিঠি লিখে মনে করিয়ে দেয়, "লালকমল, নীলকমল, তোমরা তৈরী তো?"

"আমরা তৈরী হচ্ছি। তুই নিশ্চিন্ত হ।" রঞ্জ জবাব দেয়। যদিও জানে না দ‌ু'জনের কোন্‌জন লালকমল আর কোন্‌জন নীলকমল।

ওদিকে গোরী ওর বাপের বাড়ি চলে গেছে ও সেখানে যাবার থেকে অপেক্ষাকৃত শান্ত আছে। ওর চিঠির স‌ুর তেমন জ্বালাময় নয়। শ্বশ‌ুরবাড়ির দৈনন্দিন সংঘাত বাপের বাড়িতে নেই। সংঘাত না থাকলে জ্বালাও থাকে না। তা হলেও বাপের বাড়ি তো ওর নিজের বাড়ি নয়। ছিল একদিন যখন ও কুমারী ছিল। এখন ও'রা কেউ ওকে কুমারী ভাবেন না, ও নিজেও কি সে রকম কোনো দাবি উত্থাপন করতে পারে?

ওর জন্যে লালকমল নীলকমল সাধনা করছে এই ভেবে ও নিশ্চিন্ত। রঞ্জ কিন্তু দ‌ুশ্চিন্তায় জর্জর। সাধনা বলতে ও বোঝে জীবনের জন্যে সাধনা। জীবিকার জন্যে নয়। জীবিকা তো ওর মতো ছেলের অনায়াসলভ্য। তার জন্যে মোমবাতি পোড়ানোই বা কেন, মোমবাতির মতো পোড়াই বা কেন? জীবিকার জন্যে সাধনা মান‌ুষকে সংকীর্ণচেতা করে, তার মনটা ছোট হয়ে যায়। বড়ো চাকরিও কম চাকরি নয়, বরঞ্চ বেশী চাকরি। অমন জিনিসের জন্যে জীবনের এই ম‌ূল্যবান দিনগ‌ুলি ব্যয় করা কি ক্ষতিকর নয়? যদি পরীক্ষায় বিফলতা ঘটে তা হলে তো তাহা অপচয়।

দ‌ু' ধারে জীবনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সবাই তাতে ডুব দিচ্ছে, স্নান করছে। উৎপলও তাদের একজন। কিন্তু রঞ্জর এক দণ্ডও ছ‌ুটি নেই। গোরীর বন্ধনমোচনের বোঝা ওর ঘাড়ে।

(ক্রমশ)

পরলোকগত সঙ্গীতাচার্য
শ্রীকালীপদ পাঠক

শেষবারের মত শ্রীকালীপদ পাঠক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসুর নৈহাটির বাড়িতে। সমরেশবাবু একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। এইটিই বোধ হয় কোনও বিশিষ্ট সভায় তাঁর শেষ যোগদান। তার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। সেবার তাঁর ঘরেই ছিলাম দুতিন দিন। তিনি ছিলেন তখন সঙ্গীত ভবনে ভিজিটিং প্রোফেসার। শান্তিদা (শ্রীশান্তিদেব ঘোষ) সঙ্গীত ভবনে একটি আসরের আয়োজন করেছিলেন। শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন সেই আসরে। তিনি পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলেন একটি মল্লার গাইতে। পাঠক মহাশয় একটি গান গেয়ে শোনালেন যাতে মল্লারের স্পর্শ আছে, গাইলেন দেশ, তারপর খাম্বাজ, বেহাগ ইত্যাদি। সেবারে তাঁর গলা বেশ ভাল ছিল যদিও আশীতে আসি আসি করছিলেন। শুধু তাই নয় অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে সোজা হাঁটাহাঁটি করছেন তখনও। সেটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত করেছিলেন। শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয়ের মদনমোহনতলার বাসভবনে পাঠক মহাশয় রবিবাসরের অনুষ্ঠানে অন্তত বার দুয়েক গেয়েছেন। শেষবারের অনুষ্ঠানটি পরম মনোজ্ঞ হয়েছিল। কতরকম বিচিত্র বাংলা গান শুনিয়েছিলেন সেই আসরে, বিশেষ করে গোপাল উড়ের যাত্রার গান আর নীলকণ্ঠের সেই গান—"তোমায় হেরে অঙ্গ জ্বলে।" প্রবীণ ব্যক্তিরা মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করেছিলেন তাঁকে। হঠাৎ চলে গেলেন তিনি। আশী বছরেরও ওপরে যাঁর বয়স তিনি চলে যাবেন—এতো জানা কথা; তবু এমন অকস্মাৎ! আর যে দেখা হল না। বিজয়ার পরে প্রণাম করতে যাওয়া হয়নি, চিঠিও লিখিনি যাব যাব করে। সেই শেষ পর্যন্ত গেলুম, কিন্তু প্রণাম রেখে এলুম তাঁর নিস্পন্দ পায়ের ওপর। অন্যবারের [illegible] আলিঙ্গনের কথা মনে পড় [illegible]

গ্রামোফোনের আর্টিস্ট ছিলেন না—সাধারণের মধ্যে অনেকে তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। অতএব জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে তাঁকে সচরাচর দেখা যেত না; কিন্তু বাংলায় ওস্তাদ মহলে তাঁর খ্যাতি

শ্রীকালীপদ পাঠক

ছিল—সেখানে তিনি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। হস্টেলে চিত্তদা (শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত—কেশব সেন স্ট্রীটের ওয়াই-এম-সি-এতে আমার দু বছরের সীনিয়র বন্ধু) প্রায়ই বলতেন পাঠক মশাই-এর [illegible]

গোস্বামী এবং পাঠক মহাশয় দুজনে একত্র গান গাইছিলেন। জ্ঞানবাবু তাঁকে বলতেন—কালোদা। অনেকক্ষণ ধরে গান হল বটে তবে তানের কাজই যেন বেশী। দুজনে দুরকম তান দিয়ে যাচ্ছেন। ওস্তাদী জোট। এককভাবে গাইলে দুজনেই বাংলা গানের অপরূপে চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করতেন, কিন্তু যুগলে গাইলে বোধহয় ওস্তাদীরই প্রকাশ হত বেশী। পাঠক মহাশয় জ্ঞানবাবুর কথা প্রায়ই বলতেন। তাঁকে ভালবাসতেন গভীরভাবে। আমাদের কাছে বলতেন—কেমনভাবে জ্ঞানবাবুর কণ্ঠ মাধুর্যে ফৈয়াজ খাঁর মত ওস্তাদও মুগ্ধ হয়ে যেতেন। একবার বিস্তার করতে করতে জ্ঞানবাবু যখন চড়ার সা-তে এসে পৌঁছেছেন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব তখন অধীর আনন্দে বলে উঠেছেন—"সাবাস, গিয়ানবাবু, ওয়োই রহ্ যাও।" কেষ্টবাবুর (অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে) কথাও পাঠক মহাশয় বলতেন। কোনও কোনও আসরে নাকি তাঁরা দুজনে এক সঙ্গে গেয়েছেন। ইনি চড়ার এক ধাপে পৌঁছে ছাড়ছেন তো উনি সেখান থেকে আর এক ধাপ চড়ায় পৌঁছে ছাড়ছেন। আসর মাৎ। কেষ্টবাবু নাকি একদিন বলেছিলেন—"পাঠক যদি সবরকম গান গাইত তা হলে কি হত!" তখনকার দিনে খোলা গলায় সুর চড়িয়ে যাওয়াটা একটি খুব কৃতিত্বের বিষয় ছিল। পাঠক মহাশয়ের এ অভ্যাস ছিল শেষ পর্যন্ত এবং এ নিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের চিন্তার অবধি ছিল না। কারণ বৃদ্ধ বয়সে একবার কাসি আরম্ভ হলে থামানো শক্ত এবং তা থেকে বিপদের সম্ভাবনাও কম নয়। কিন্তু তাঁকে থামানো যেত না। আর একজন প্রসিদ্ধ টপ্পাগায়ক পরলোকগত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং পাঠক মহাশয় যখন এক সঙ্গে গাইতেন তখনও উভয়ের কণ্ঠস্বর অবিশ্বাস্য পর্দায় চড়ে যেত।

যাক, সেই ছাত্রাবস্থার দিনগুলির পর বহু বৎসর কেটে গেছে, বহু বিপর্যয়ও গেল দেশের উপর দিয়ে। তথাপি পাঠক মশাই-এর কথা ভুলিনি। কলকাতার বাইরেই আমাদের বাস ছিল বলে স্থায়ীভাবে কলকাতায় কিছু করবার উপায় ছিল না। এবারে গুছিয়ে গাছিয়ে কলকাতায় বসা গেল। চিত্তদার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন দেখা। এবারে চিত্তদার মাধ্যমে পাঠক মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে গেল। এর আগে বোধ হয় বন্ধুবর কবি রমেন মল্লিকের বাড়িতে তাঁর একটি আসর হয়েছিল এবং সেইখানে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

প্রত্যেকের জীবনেই খ্যাতির কয়েকটি

পর্যায় আসে। পাঠক মহাশয়ের খ্যাতি শেষ পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাধ্যমে। প্রথমবারের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন খুব সার্থকতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন পরলোকগত মদন বন্দ্যোপাধ্যায় (এঁর লেখা "এন্টনি কবিয়াল" সমাদৃত হয়েছিল)। যতদূর স্মরণ হচ্ছে ইনিই পাঠক মহাশয়ের গানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু হায় রাত্রিব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে পাঠক মহাশয়ের সুযোগ হল না। ভোর বেলা যখন তাঁর ডাক পড়ল তখন একটি তবলিয়াও আসরে উপস্থিত নেই। শেষ পর্যন্ত একটি ছোট ছেলেকে পাওয়া গেল সে বাজাতে শিখছে। পাঠক মহাশয় তাকে নিয়েই গাইলেন তাঁর বিখ্যাত ভৈরবী টপ্পা "শ্যাম নাগর হে আমি আর প্রেম করব না—তুমি ফিরে যাও", যারা শুনল তারা বিস্ময়ে

বিমুগ্ধ। বাংলা গানে এমন জিনিস আছে তাদের ধারণায় ছিল না। এর পরে অনেকবারই তিনি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে গেয়েছেন। একাধিকবার বিদ্যাসুন্দরের পালার গানগুলি গেয়ে শ্রোতাদের পুলকিত করেছেন। কিন্তু শেষের দিকে বঙ্গ সংস্কৃতিতে যেসব শ্রোতার উপস্থিতি দেখেছি তাতে তারা যে এইসব গানের মর্যাদা রাখবেন এমন ভরসা হয়নি। এই কারণেই শেষ দুএক বৎসর তাঁর অনুষ্ঠান হয়নি। এর জন্য তিনি পরিমলবাবুর (শ্রীপরিমল চন্দ্র) উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন, কিন্তু আমি জানি পরিমলবাবু যাতে তাঁর অসম্মান না ঘটে সেইজন্যই তাঁর প্রোগ্রাম রাখতে ভরসা করেননি। আর কোনও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

বঙ্গ সংস্কৃতির যুগ থেকেই আরও কয়েকজন সুধী সজ্জন পাঠক মহাশয়ের নিবিড় সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ শেষ পর্যন্ত পাঠক মহাশয়ের জন্য যা কিছু সাধ্য ছিল করেছেন। তাঁরই উদ্যোগে দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমীতে পাঠক মহাশয়ের বহু গানের টেপ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর একটি রেকর্ডও গ্রামোফোন কোম্পানী বের করেছিলেন গৌরবাবুর অনুরোধে। এজন্য তাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন। এ ছাড়া যখনই প্রয়োজন হয়েছে গৌরবাবু তাঁকে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন। শুধু ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাই এর কারণ নয়, পাঠক মহাশয়কে তিনি বাংলার সঙ্গীতের একটি লুপ্তপ্রায় যুগের প্রতীক বলে মনে করতেন, এবং সেই যুগের কিছু যদি তাঁর মাধ্যমে রাখা যেতে পারে সেজন্য তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। ইদানীন্তন আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীসত্য দে মহাশয় পাঠক মহাশয়ের একজন প্রধান অবলম্বন ছিলেন। এঁদের পাঁচালী ভারতী অনুষ্ঠানে তিনি বহু দাশরথি রায়ের গান গেয়ে শুনিয়েছেন। সব শেষে শান্তিনিকেতন তাঁকে অধ্যাপক-রূপে সম্মানিত করেছিলেন। যথার্থ সম্মান পাবার অধিকারী তিনি ছিলেন কিন্তু আমাদের দেশের বহু সংস্থা সেটি তাঁকে দিতে কার্পণ্য করেছেন অথবা উপলব্ধি করতে পারেননি।

পাঠক মশাইকে বহুবার তাঁর নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু খুব বেশী জানতে পারিনি। গান বাজনার দিকে তাঁর আগ্রহ অল্পবয়স থেকেই ছিল। স্কুলের এক মাস্টারমশাই তাঁর গান গাওয়া একেবারে বরদাস্ত করতে পারতেন না—খুব মারধোর করতেন। ক্রমে ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো। একদিন প্রচণ্ড মার খাবার পর তিনিও বদলা নিলেন ইস্কুলের বাইরে। মাস্টারমশাই বেশ কদিন বিছানা থেকে উঠতে পারেননি তার পরে। অতঃপর তিনিও স্কুল ছাড়লেন। তাঁর প্রধান গুরু নিকুঞ্জবাবুও তাঁকে প্রথমটা গান শেখাতে চাননি। তাঁর পয়সা ছিল না, বিনা পারিশ্রমিকে গান শেখা ছিল অসম্ভব। কিন্তু তিনি আড়ালে নিকুঞ্জবাবু যখন শেখাতেন তখন শুনে শুনে সেসব গান আয়ত্ত করতেন। এতে নিকুঞ্জবাবু খুশী হতেন না। যাই হোক, বহু সাধ্যসাধনার পর তিনি গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পেরে-ছিলেন। পরে তিনি অর্থ সাহায্যও করে এসেছেন। কৃষ্ণভামিনী দাসীর কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। তাঁকে তিনি "দাদা" বলে ডাকতেন, এই গায়িকার বহু রেকর্ড ছিল। তিনি নাকি পুত্রস্নেহে তাঁকে নানারকম গান শেখাতেন। রমজান খাঁর কাছে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনও গান শেখেননি এটা তিনি আমাকে বলেছিলেন। তবে ফনী মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে রমজান মাঝে মাঝে আসতেন তখন তিনি তাঁর গান শুনতেন। একবার নাকি শীতকালে রাত বারটার সময় রমজান ফনীবাবুর বাড়িতে এসেছিলেন। তখন আবার নাকি হাওড়ার পুল খোলা ছিল। নৌকো করে নদী পেরুতে হয়েছিল তাঁকে। যে কারণেই হোক সে রাতে বহু গানও তিনি শুনিয়ে গিয়েছিলেন। চন্দননগর, তেলেনীপাড়ার একজন বাড়ুজ্যের নাম তিনি করতেন। তাঁর নামটি আমার মনে নেই। তিনি নাকি চমৎকার টপ্পা গাইতেন। এ ছাড়া বহু স্থান থেকে তিনি গান সংগ্রহ করেছেন। তিনি শ্রুতিধর ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি নাকি তালে খুব কাঁচা ছিলেন। একদিন মনের দুঃখে রেল লাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে হয় আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। তিনি সেখান থেকে সোজা গিয়ে তবলার সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে বসলেন। তারপর থেকে নাকি তিনি তালে উন্নতি করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যাঁরা তাঁর গান শুনেছেন তাঁরা সকলেই জানেন তাঁর সমে আসার রীতি ছিল ভারি চমৎকার। বিস্তারের পর বিস্তারে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে এমন সময় তিনি সমে এসে ছাড়তেন যে মন আপনা থেকেই বলে উঠত—বাঃ।

কোথা থেকে তিনি কোন গান সংগ্রহ করেছিলেন জানা সম্ভব হয়নি, তবে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গানের বহু বিচিত্র রীতি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। শেষ জীবনে এই সমস্ত গান তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না এবং তার জন্য তিনি এমন কিছু পারিশ্রমিকও দাবী করতেন না; কিন্তু এই চিন্তাটিই অনেকের মনে উদয় হয়নি। যার ফলে এই হল যে তাঁর সঙ্গে প্রাচীন বাংলা গানের অনেকখানি লুপ্ত হয়ে গেল। তাঁর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। শ্রীমান চণ্ডিদাস মাল তাঁর পুত্রের মত ছিলেন। গুরুর বিয়োগে এঁর শূন্যতা আমি অনুভব করতে পারি।

মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন খুব ফূর্তিবাজ, সদালাপী এবং সজ্জন। ভারি সরস কথাবার্তা বলতেন তিনি। কিছুকাল পূর্বে কলকাতা-আকাশবাণীর কর্মী সোমেশবাবুর বাড়িতে একটি ঘরোয়া আসরে তাঁর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তার একটি টেপ রেকর্ড করে রাখা হয়। তাঁর উজ্জ্বল বাক্‌পটুতার পরিচয় এই টেপ থেকে পাওয়া যায়।

কলকাতার প্রবীণতম সঙ্গীত সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন এক ব্যক্তি চলে গেলেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর তিনি ছিলেন প্রাচীনতম আর্টিস্টদের অন্যতম। তাঁর স্ত্রী বিয়োগের পর শ্মশান থেকে সোজা চলে গিয়েছিলেন রেডিওর স্টুডিওতে। নৃপেনবাবু তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেই অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রীর স্মরণে গেয়েছিলেন মূলতানে বাঁধা গান—"আর কে আদর করবে আমায় সব আদর তার সঙ্গে গেছে"। সঙ্গীত সমাজের আর এক সুপ্রবীণ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির কথা তিনি অনেকবার স্মরণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল। বোধ হয় শেষ জীবনে সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। যে যুগের কথা আমরা জানি না তার পরিচয় বোধ হয় আজকের দিনে একমাত্র তিনিই চিত্তাকর্ষক-ভাবে তুলে ধরতে পারেন।

শার্ঙ্গদেব

শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূলে আবহাওয়া ?

শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং সম্প্রতি এই আশার বাণী শুনিয়েছেন যে, দেশে শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবেশ ক্রমেই অনুকূল হচ্ছে। সমগ্র ভারতের দিকে তাকিয়েই হয়তো শ্রীসিং এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যে এ ক্ষেত্রে শোচনীয় তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কৃষি-উৎপাদনের ক্রম-বর্ধমান হার সামগ্রিকভাবে ভারতে অব্যাহত আছে। এ বছর খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদনও ১০৩·২ মিলিয়ন টন হয়েছে বলে অনুমিত হয়েছে। কৃষির উৎপাদন বাড়লে শিল্প-ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উৎপাদন বাড়ে। ভারতে শিল্পোন্নয়নের পথে যে বাধাগুলি বিশেষভাবে প্রতি পদে অনুভূত হয় তা হচ্ছে কাঁচা মালের অভাব এবং মূল-ধনের স্বল্পতা। শিল্পোন্নয়নমন্ত্রীর মতে কৃষির উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় কাঁচা মালের সরবরাহ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় সামগ্রীর জন্য বিদেশে নতুন চাহিদারও সৃষ্টি হচ্ছে। অপর দিকে, শিল্পোন্নয়নে মূলধন সরবরাহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে। দেশের শিল্পোন্নয়নের পথ আরও সুগম করার জন্য সরকার শিল্প লাইসেন্স নীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার কথাও ভেবেছেন। কিন্তু শিল্পোন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ যদি সমগ্র ভারতে গড়ে ওঠে তবে পশ্চিমবঙ্গ কি তার অংশীদার হতে পারে না ?

আমরা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার মূল কারণ যদি অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যাবে বেকার সমস্যার চাপে যুব-গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, এবং তারই পরিণতি হিসাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গে চরম বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি। হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক যখন কাজের সন্ধানে ঘুরে ব্যর্থ হচ্ছেন, তখন তাঁদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার কোন সক্রিয় প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। গঙ্গা নদীর উপর দ্বিতীয় সেতুর কাজ অথবা চক্ররেল (কিংবা পাতাল রেল) তৈরির করার কাজও শুরু হয়নি। এ ক্ষেত্রে শুধু আমাদের আশার বাণী শোনাবার পালা সাঙ্গ হয়েছে। অথচ এই কাজগুলি সময়মত শুরু করলে বহু লোকের কাজ হতে পারত। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যাই আজ পশ্চিমবঙ্গে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা কি সম্ভব হবে? পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু শিল্প অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। শিল্প-বিরোধের চূড়ান্ত রূপ পশ্চিমবঙ্গে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করছি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পোন্নয়নের অনুকূল আবহাওয়া পশ্চিম-বঙ্গে ফিরে আসছে এ কথা আমরা বলতে পারি না। অথচ পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে সমগ্র ভারতে শিল্পোৎপাদন বাড়বে এ কথা বলা অবাঞ্ছনীয় হলেও অনেকেই এই অভিমত পোষণ করছেন। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন প্রকল্প-গুলিকে যত দ্রুত সম্ভব (এবং সম্ভব হলে আগামী তিন মাসের মধ্যেই) রূপায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। "কলকাতার সমস্যা ভারতের জাতীয় সমস্যা" এবং "কলকাতার উন্নয়নের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ" এ ধরনের বুলি আর সাধারণ মানুষের মনে আশার আলো ফিরিয়ে আনবে না। সরকারের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার সঙ্গে সাধারণ মানুষ তখনই শামিল হবে যখন নতুন বিনিয়োগের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরায় ফিরে আসবে।

মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা কিভাবে হবে ?

এই মুহূর্তে যে সমস্যাগুলি সবচেয়ে বেশী তীব্র হয়েছে, তা হ'ল বেকার এবং মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা। বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা যতটা জোরদার করা উচিত, তা এখনও হচ্ছে না। যদি তা-ই হ'ত তবে বর্ধিত বেতন-হার প্রবর্তন করার পরিবর্তে সরকার নতুন শ্রম-নিবিড় প্রকল্প হাতে নিতেন ; তার ফলে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতাও আরও কম হ'ত এবং কিছু লোকের কর্মসংস্থানও হ'ত। অর্থমন্ত্রী চাবন জিনিসপত্রের আকাশ-ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য মজুরি বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু, এখনই মজুরি বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কারণ, শুধু যে শ্রমিক শ্রেণী মজুরি বৃদ্ধির জন্য অতি মাত্রায় সচেতন তা নয় ; জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সাধারণ শ্রমিকের পক্ষে আর মজুরি বৃদ্ধির দাবি না করা ছাড়া উপায় নেই। মজুরি আরও বাড়ানোর অর্থই হল আরও ঊর্ধমুখী মূল্যস্তরের সৃষ্টি। অথচ, এই চক্র থেকে উদ্ধার পেতে গেলে সরকার এবং শ্রমিক, দুই পক্ষেরই এখন যা করণীয় তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সরকারের দিক থেকে যেমন কঠোরভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করা দরকার, শ্রমিকদের দিক থেকেও তেমনি উৎপাদন বাড়ানোর সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া দরকার। উৎপাদন বাড়ছে না, অথচ মজুরি বাড়ছে—এ ধরনের অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা ক্রমেই বাড়বে। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলি তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ঘাটতি অর্থসংস্থান, পরোক্ষ করের চাপ, ভ্রান্ত মূল্যনীতি প্রভৃতির পরিণতি হিসাবেই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণগুলি দূর না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবার জন্য যে সকল কারণ দায়ী সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণাধীনে না আনা পর্যন্ত জিনিসপত্রের দামও যেমন বাড়বে, বর্ধিত মজুরির জন্য চাহিদাও তেমনি বাড়বে। শ্রমিকদের প্রকৃত আয় (real income) না বাড়াতে পারলে অথবা জিনিস-পত্রের দাম না কমাতে পারলে মজুরি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না।

জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং তার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে। যদিও অনেকে মনে করেন, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং মুনাফা বৃদ্ধির প্রবণতায় উৎপাদন বাড়াবার উৎসাহ বেড়ে যায়, ভারতের ক্ষেত্রে ঠিক তা হচ্ছে না। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির চাপে শুধু যে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে তা-ই নয়, উৎপাদন বাড়াবার প্রয়াসেও অনেকেরই মধ্যে ভাটার সৃষ্টি হয়েছে। রপ্তানি-বাণিজ্যও এজন্য প্রভাবিত হয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের অর্থ ব্যবস্থায় যে সকল নীতি সাধারণত গৃহীত হয় অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করে থাকে, সেগুলির সবই ভারতের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। অথচ মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা প্রশমিত হবার লক্ষণ দেখা যাওয়া দূরের কথা, বরং মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা ক্রমশই বেড়ে যাবে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে এক দিকে যেমন ব্যবসায়ী-আয় উপার্জনকারীদের ক্রয়শক্তি কমানো দরকার এবং চোরাকারবারী অথবা কৃত্রিম সামগ্রী সঞ্চয়কারীর তীব্র সাজা হওয়া দরকার, অপর দিকে তেমনি দ্রুত উৎপাদন বাড়াবার সর্বাত্মক প্রয়াস আরও জোরদার করা দরকার। যত দিন মূল্যস্তর স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে না আসে ততদিন পর্যন্ত যত দূর সম্ভব বাড়তি মজুরি বা বেতন দেওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

সুব্রত গুপ্ত

(৫)
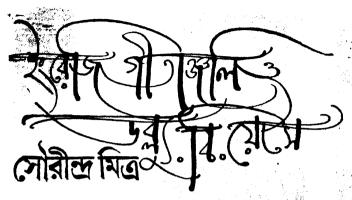
আমরা পূর্ববর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথের নিজের এবং স্টার্জ মুর, রোটেনস্টাইন, আর্নেস্ট রীজ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অধিকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে বিবৃতি, মতামত বা সাক্ষ্যের বিশ্লেষণ করেছি, প্রমাণ হিসেবে অবশ্যই তার যথেষ্ট মূল্য আছে কিন্তু সে প্রমাণ হল যাকে বলা যায় পরোক্ষ প্রমাণ। ইংরেজী গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও অভাব নেই। পূর্বেই বলেছি, রোটেনস্টাইন-পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ ফোটো-স্টাটিক কপি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। তার মধ্যে গীতাঞ্জলির তিরাশিটি কবিতার অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থের ৪/৫ অংশের প্রথম খসড়া অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান। অতএব ১০৩টি কবিতার মধ্যে ৮৩টি কবিতার কমা-সেমিকোলন সমেত প্রতিটি অক্ষর মিলিয়ে দেখার সুযোগ আছে। সেইভাবে তুলনামূলক বিচার করে দেখলে কী ফল পাওয়া যায় সেটা আগে দেখা যাক।

প্রথমেই একটা গাণিতিক হিসেব নেওয়া যাক। পাণ্ডুলিপির ৮৩টি কবিতার শব্দ-সংখ্যা হল প্রায় দশ হাজার। প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় পরিবর্তিত শব্দের সংখ্যা মোট পঁয়তাল্লিশটির বেশী নয়। উল্লেখ প্রয়োজন যে 'oh !' স্থলে যেখানে 'O' বসেছে অথবা 'thou Holy One'-এর জায়গায় 'thou holy one' (৩৯ নং) বসেছে, সেখানে পরিবর্তনটা স্পষ্টতই মুদ্রণ রূপের (typographical), শব্দের নয় এবং সেইজন্য শব্দ পরিবর্তনের হিসেবে থেকে এগুলি বাদ গেছে। সেই রকম, যেখানে 'you' স্থলে 'thou' অথবা 'thou' স্থলে 'you' বসেছে সেখানে ক্রিয়াপদের যে রূপগত পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই করতে হয়েছে, সেখানেও ঐ ক্রিয়া পদগুলিকে শব্দ পরিবর্তনের কোঠায় ফেলা হয়নি, তার কারণ তার পিছনে আছে ব্যাকরণের অনুশাসন, সচ্ছন্দ নির্বাচন নয়। ব্যাকরণে যাকে বলে sentence বা বাক্য (পেন্সের লাইন নয়) ঐ ৮৩টি কবিতার মধ্যে এই রকম বাক্য আছে প্রায় পাঁচশো। এই পাঁচশোটি বাক্যের মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে পরিবর্তনের স্পর্শমাত্র আছে এমন বাক্যের সংখ্যা মোট তেতাল্লিশটি মাত্র। তাছাড়া, পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত কোনো শব্দ যেখানে বর্জিত হয়েছে এবং শব্দের বা শব্দ-সমষ্টির পারম্পর্যে বা order-এ যেখানে কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা গেছে সেখানেই পরিবর্তনের এক একটি unit ধরে, যতিচিহ্নের অদলবদলসহ যাবতীয় পরি-বর্তনের মোট সংখ্যা দেখা যায় প্রায় দুশো পঞ্চাশটি, অর্থাৎ মোট শব্দ-সংখ্যার চল্লিশ ভাগের একভাগ।

প্রথম খসড়ার এই যে পরিবর্তন,

পরিমাণের দিক থেকে যে তা অত্যল্প সেটা এই সংক্ষিপ্ত হিসেব থেকেই লক্ষ্যগোচর হবে। কিন্তু আর্নেস্ট রীজ এবং রোটেন-স্টাইন এই স্বল্প পরিবর্তন কে যে কেন একেবারে সরাসরি নগণ্য বলেই বর্ণনা করে-ছিলেন সেটা এর থেকে পরিষ্কার নাও হতে পারে। সেই জন্য উদাহরণসহযোগে পরিবর্তনগুলির একটু বিশ্লেষণমূলক আলোচনা প্রয়োজন।

বর্জনের কথাটাই প্রথমে ধরা যাক। কিছু শব্দ বর্জিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষণের সংখ্যাই বেশী। যেমন 'great joy (১ নং), 'highest truth' (৪ নং), 'balmy sighs' (৫ নং), 'mad rebellion' (৩৮ নং), 'wild laughter' (৫৮ নং)—এইরকম ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশেষণটি বর্জিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিশেষণ-বর্জনের ফল ভালোই হয়েছে, অনাবশ্যক বিশেষণের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে মূল শব্দটি সর্বতোভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়, যেমন 'wild laughter' (৫৮ নং)-এর 'wild' বিশেষণটি নিতান্ত ফালতু ছিল না, এটি বর্জন করায় ধ্বনি বা ছন্দের দিক থেকে যে কোনো লাভ হয়েছে তা নয়, কিন্তু কথাটির মধ্যে যে একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা ছিল সেটি লুপ্ত হওয়ায় ক্ষতিই হয়েছে বলতে হবে। তেমনি দেখা যায় 'all' কথাটিকে প্রায় ক্ষেত্রেই বাহুল্যবোধে বর্জন করা হয়েছে, যথা 'All the delights of sight and hearing' ইত্যাদি (৭৩ নং), এই বাক্যাংশটি থেকে 'all' কথাটি বাদ গেছে কিন্তু এই বর্জনের ফলে যে খুব একটা লাভ হয়েছে এবং কথাটি অবর্জিত থাকলে যে খুব একটা ক্ষতি হতো এমন কথা বলা চলে না। অপর পক্ষে ৬৭ নং কবিতার প্রথম স্তবকে 'all the world'-এর বদলে 'the world, এবং ৩৭ নং কবিতার প্রথম স্তবকে 'provisions were all exhausted'-এর বদলে 'provisions were exhausted', এই পরিবর্তনের ফলে বাচ্যার্থ হয়তো ঠিকই আছে, এবং গদ্য হিসেবে লাইনটি পরিচ্ছন্নতর হয়েছে বলাও চলে কিন্তু কবিতাদুটির 'মুডে'র দিক থেকে ঐ 'all' কথাটির একটু বিশেষ ব্যঞ্জনা ছিল যা প্রকাশিত পাঠে বাদ পড়লো।

শব্দের পরিবর্তন হয়নি কিন্তু তার, order-টি পরিবর্তিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত কিছু আছে, যেমন 'am I' পরিবর্তিত হয়ে হল 'I am' (১৮ নং); 'I and thou'-এর জায়গায় বসলো 'thou and I' (৪২ নং কবিতায় এটিই একমাত্র পরিবর্তন); 'thou ever didst'-এর জায়গায় বসেছে 'ever didst thou' (১৪ নং); 'why ever I miss'-এর জায়গায় বসেছে 'why do I ever miss', ইত্যাদি। এগুলিকে কোনো অর্থেই 'improvement' বলা যায় না। মনে হয় কবিতাগুলি সরল গদ্যের ভঙ্গীতে লিখিত হলেও কখনো কখনো শব্দ বিন্যাসে একটু পদ্যের ঝোঁক এসে গিয়েছে এবং উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে এবং অন্যান্য অনুরূপ ক্ষেত্রে ভাবাবিন্যাসকে আবার গদ্যসম্মত করা হয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু কখনো কখনো শব্দ-বিন্যাসের এই পরিবর্তনের ফলে কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবের এবং 'মুডের' সুকুমার সংগীতটি ব্যাহত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই, যেমন ৭২নং কবিতায় 'It is he, the innermost one' ইত্যাদি-র স্থলে 'He it is, the innermost one' এই পরিবর্তনটি সমর্থনযোগ্য নয়, তার কারণ কবিতাটি একটি শান্তরসের কবিতা, শব্দের ও ভাবের যে musicটি কবিতায় নিহিত আছে তাও ধ্যানাবিষ্ট হৃদয়ের মৃদুগুঞ্জরণের সঙ্গে সংগত। 'It is he' এই কথাকটির মধ্যে যেটুকু emphasis আছে সেটুকুই যথেষ্ট অর্থাৎ কবিতাটির অন্তর্লীন প্রশান্তিকে তা ব্যাহত করেনি। কিন্তু 'It is he'-কে বদলে যখন 'He it is' করা হ'ল তখন ঐ emphasis-এর মাত্রাটা এমনভাবে চড়ে গেল যে গুঞ্জনটি হঠাৎ প্রায় চিৎকারে পর্যবসিত হ'ল বলা যায়। কবিতাটির মূল সুরের সঙ্গে ঐ চিৎকারটির কোনোই সংগতি নেই। যাই হোক দু'একটি ক্ষেত্রে সামান্য প্রাঞ্জলতা বেড়েছে বলা যায়, যেমন 'I know the happy moment will arrive of a sudden', বদলে হ'ল 'I know that of a sudden the happy moment will arrive' (৪৪ নং) তেমনি ৩৫ নং কবিতার শেষ ছত্রের পাঠ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়: 'there waken up my country into that heaven of freedom, my father!" বদলে হ'ল 'Into that heaven of freedom, my father, let my country awake' কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে

নিভিয়া ক্রীমের "কথা ও ছবি" প্রতিযোগিতায় যোগ দিন!

প্রথম পুরস্কার: দুজনের তিন সপ্তাহ ব্যাপি ইউরোপে ছুটিযাপন (অথবা নগদ ২০,০০০ টাকা)

দ্বিতীয় পুরস্কার: দুজনের ১০ দিন ব্যাপি কাশ্মীরে ছুটিযাপন (অথবা নগদ ৪,০০০ টাকা)

তৃতীয় পুরস্কার: লেনার্ড রেফ্রিজারেটর (২৮৩ লিটার)

চতুর্থ পুরস্কার: কসমিক কম্বো স্টিরিও এমপ্লিফায়ার

পঞ্চম পুরস্কার: গোদরেজ স্টোরওয়েল

২০০টি সান্ত্বনা পুরস্কার: বাজাজ পপ-আপ টোস্টার

NIVEA
creme

স্মিথ অ্যাণ্ড নেফিউ'এর এক উৎপাদন

স্মিথ অ্যাণ্ড নেফিউ (ওভারসীজ) লিমিটেডের অতিথি হিসাবে দুই সপ্তাহের জন্য ইউরোপে ছুটি যাপনের এই তো মস্ত সুযোগ! আপনাকে কেবলমাত্র, প্রবেশপত্রে প্রদত্ত ছয়টি ছবির সঙ্গে ছয়টি উক্তি যথাযথ-ভাবে মেলাতে হবে এবং "আমি নিভিয়া ক্রীম ব্যবহার করি কারণ..." এই বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে হবে, কিন্তু দশটির বেশী শব্দ যোগ করতে পারবেন না।

আজই যোগ দিন!

তাড়াতাড়ি করুন! প্রবেশপত্র ১৯৭০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছানো চাই!

প্রতিযোগিতার পূর্ণ বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য আপনার নিভিয়া ডীলারের কাছথেকে প্রবেশপত্র চেয়ে নিন!

AIYARS-LLM 10 BN

এই পরিবর্তন না করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, যেমন ৯৫নং কবিতাটির শেষ ছত্রে: 'to find its consolation in the left one in the very next moment' বদলে হ'ল in the next moment to find in the left one its consolation' আরো একটি পাঠ আছে। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা Poetry নামক পত্রিকায় গীতাঞ্জলির যে ছয়টি কবিতা মুদ্রিত হয় ৯৫নং কবিতাটি তাদেরই একটি। Poetry পত্রিকায় মুদ্রিত পাঠ হল: 'to find in the very next moment its consolation in the left one' পুস্তকে প্রকাশিত পাঠটিই যে শ্রেষ্ঠ এমন কথা হলফ্ করে বলা যায় না। ৮৫নং কবিতাটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য কেননা এই কবিতার চারটি স্তবক হ'ল চারটি সম্পূর্ণ বাক্য এবং তার মধ্যে তিনটি বাক্যেই মূল শব্দের বিন্যাসে অনুরূপ পরিবর্তন দেখা যায়। শেষ স্তবকে যে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে উদাহরণত তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আদি খসড়ার পাঠ, 'and they left behind them the fruits of all their life on the day they marched back to their masters' hall', প্রকাশিত পুস্তকে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো, and they had left the fruits of their life behind them on the day they marched back again to their master's hall." বাকি দুটি বাক্যে যে পরিবর্তন দেখা যায় তা এই একই জাতের।

যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করা হ'ল তার মধ্যে একটা জিনিস খুবই স্পষ্ট, তা হ'ল এই যে শব্দের বা শব্দগোষ্ঠীর বা clause-এর পারম্পর্য পরিবর্তনের ফলে বাক্যের আদিম এবং মূল কাঠামোর (structure) আমূল পরিবর্তন কোনো ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয় না। শব্দ বিন্যাসের বা বাক্যবিন্যাসের যে ছন্দ, এই জাতীয় পরিবর্তনের ফলে কোনো ক্ষেত্রে তার 'সংশোধন' হয়েছে এমন কথাও বলা যায় না। বাক্-বিন্যাসের যে ছন্দ গোড়া থেকেই কবিতাগুলির মধ্যে নিহিত ছিল, স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট কারণে শব্দের বা শব্দবিন্যাসের যেটুকু পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা তার সঙ্গে সর্বতোভাবে খাপ খাইয়েই করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপির ভাষাতে ছন্দযতির স্পষ্ট, এমনকি লক্ষ্যগোচর, ব্যত্যয় ছিল, পরিবর্তনের ফলে তা সংশোধিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত একটিও চোখে পড়ে না। য়েট্‌স যে দাবি করেছেন যে Cadence-এর আমূল পরিবর্তন তিনি করেছেন তার বিন্দুমাত্র সমর্থন কোথাও মেলে না।

শব্দ বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে কয়েকটি জায়গায় মূল পাণ্ডুলিপির ভাষা ঈষৎ সংক্ষিপ্ত হয়েছে। যেমন, 'I stand not where in thy simple great love thou camest down and didst own thyself as mine', বদলে দাঁড়ালো, 'I stand not where thou comest down and ownest thyself as mine' (৭৭নং)। আর একটি দৃষ্টান্ত পাণ্ডুলিপিতে আছে, 'I keep for my dowry this absolute poverty of mine for thy royal favour of acceptance' প্রকাশিত পুস্তকে 'I keep for my dowry this poverty' কিন্তু এই বাক্ সংক্ষেপ যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়েছে সেটা লক্ষ্য না করে উপায় নেই। যেমন ৭০নং কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে। এটিতে বাক্‌সংক্ষেপের হার সমগ্র বইটির মধ্যে উচ্চতম বলা যায়। মূল পাণ্ডুলিপিতে আছে একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা: 'Listen, canst thou hear from every direction of the sky, from all the sun, moon and stars, the harp-player of death smiles forth a firy round of music, pulsing in burning joy. The hurricane of maddening tunes is carrying all that ever is. Everything moves, they (Sic) stop not, they look not behind, they can never be bound in bonds—they are snatched and whirled and borne on by the liberating joy'। খসড়ার এই অংশটিতে ভাষার অবশ্য সামান্য কিছু খুঁত আছে এবং ঈষৎ সংস্কারের প্রয়োজনও স্পষ্ট। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিত্র ও ধ্বনির যোগে মৃত্যুর সুরে ও ছন্দে নর্তিত, আবর্তিত অস্তিত্বের যে উদ্দাম প্রবাহের একটি প্রত্যক্ষ, অনুভবগম্য বর্ণনা উদ্ধৃত অংশটিতে আমরা পাই সেটা কবিতাটির কেন্দ্রস্থ ভাবটির সঙ্গে শুধু যে সংগত তাই নয়, সেই ভাবটিকে একটা সম্পূর্ণতা দিচ্ছে বলা যায়। প্রকাশিত পাঠে দেখা যায় এই তীব্র, বেগবান, vivid বর্ণনাটি একটি সংক্ষিপ্ত, নিরুত্তাপ বর্ণসম্পদহীন মন্তব্যে পরিণত হয়েছে: 'All things rush on, they stop not, they look not behind, no power can hold them back, they rush on এই বাক্-সংক্ষেপকে এখানে improvement তো বলাই যাবে না, বরং কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব-রস-সংগীতের দিক থেকে এর ফলে কবিতাটির প্রাণস্পন্দন যে যথেষ্ট ক্ষীণ হয়ে গেছে তা বলতেই হবে। এই শেষোক্ত দৃষ্টান্তটিতে দেখা যায় তিনটি বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করা হয়েছে এবং সেই সূত্রে কিছু কথা বাদ গেছে যা বর্জনীয় ছিল না। কিন্তু এ-ছাড়া গোটা বাক্য বর্জিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত একটিও নেই। য়েট্‌স যে বলেছেন তিনি গীতাঞ্জলির কবিতার লাইনের পর লাইন বর্জন করেছেন, 'I left out sentence after sentence', সেটাকে অত্যুক্তি বললেও সত্যের অপলাপ হয়। উক্তিটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কিছু কিছু preposition-এর সামান্য বদল হয়েছে যেমন 'in' অথবা 'at'-এর পার্থক্যটি usage বা ব্যবহার-রীতি থেকে 'in'—শুধু ব্যাকরণের খাতিরেই নয়, অর্থকে সুস্পষ্ট করবার জন্যও বটে। দু এক জায়গায় preposition বর্জিত হয়েছে নানা কারণে। এর সব চেয়ে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হল একটি বিখ্যাত কবিতার একটি বিখ্যাত অংশ (১৮নং)। মূল পাণ্ডুলিপির পাঠ: 'I keep gaging on at the far away gloom. ইত্যাদি। প্রকাশিত পাঠে শুধু 'at' এই শব্দটি বর্জিত হয়েছে। কিন্তু এই সব পরিবর্তন বা বর্জন এমন জাতের যা অনেকে সচরাচর লোকে একটা চিঠির খসড়াতেও করে থাকে। অতএব এর চেয়ে হয়তো একটু বেশী চোখে পড়ে প্রথম পুরুষের সঙ্গে ব্যবহৃত 'will'-এর জায়গায় 'shall'-এর প্রয়োগ। যেমন 'And because I love this life, I know I will love death as well' (৯৫নং), মূল পাণ্ডুলিপির এই পাঠে 'will'-এর জায়গায় 'shall' বসানো হয়েছে, স্পষ্টতই ব্যাকরণের খাতিরে। কিন্তু ব্যাকরণের এই নির্দেশটি আজ পর্যন্ত বহাল থাকলেও shall এবং will-এর পার্থক্যটি usage বা ব্যবহার-রীতি থেকে ১৯১২ সালের বহুপূর্বেই লোপ পেয়েছে। অন্তত য়েট্‌স স্বয়ং যে ঐ ব্যাকরণবিধির বড় একটা পরোয়া করতেন না তার নজির তাঁর নিজের রচনার মধ্যেই আছে, যেমন বহুপূর্বে রচিত তাঁর অতিপরিচিত কবিতাটিতে: 'I will arise and go now, and go to Innisfree' বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অতিরিক্ত সচেতনতার কথা স্মরণ করে এটাকে তাঁর স্বকৃত পরিবর্তন বলে ধরে নেওয়াটা অযৌক্তিক হবে না।

(ক্রমশ)

চিত্রশিল্পী সোনিয়া দ্যলাওনে

বিমল ব্যানার্জি

এ কথা লিখতে ভালো লাগছে যে যখন একজন বিশ্বখ্যাতা, প'চাশী বছর বয়স্কা প্রজ্ঞানী শিল্পী তথা বিমূর্ত চিত্র-শিল্পী, সোনিয়া দ্যলাওনের (Sonia

সোনিয়া দ্যলাওনে

Delawnay) সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বাসনা নিয়ে বন্ধুবর গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ সহ পারীর প্রাক্-বসন্তের এক সন্ধ্যেবেলা, রু সাঁ সিষোঁয় গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন সত্যিই কিছুটা শিহরণ, আনন্দ ও নতুনের সন্ধান পিপাসায় উন্মুক্ত ছিল মন।

পারীর সন্ধ্যা মোহিনী রূপে নিয়ে আসে রোজ। সেদিন কিন্তু সে উপেক্ষিতা ছিল আমার কাছে। এক বৃদ্ধার দর্শন বাসনায় আমি অসহিষ্ণু তখন।

একটু ভূমিকা রাখি। গত বছর পারীতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রথম। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে দুটি "গোয়াস" চিত্র উপহার পাই। ঐ দুটি চিত্র এবং আমার জন্মদিনে প্রদত্ত আমার এক শিল্পী বন্ধু দত্ত আরও একটি "গোয়াস চিত্র" আমি দিল্লির "ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট"কে দান করি। গ্যালারী সে কথা তাঁকে পত্র মারফৎ জানান। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হন। এবার যখন পারীতে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তিনি অত্যন্ত সম্মান ও স্নেহের সঙ্গে আমায় গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে আমার শিল্পকর্ম দেখতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমার দুটি কাজের সঙ্গে তাঁর দুটি নতুন গ্রাফিক শিল্পকর্মের বিনিময় করেন—এইভাবে ক্রমশ আমরা দুজনে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হই। প্রখ্যাত বান্ধবীর জীবনী লিখতে চলেছি সুতরাং নিজেকে ধন্যও মনে করেছি কিছুটা।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন "পারীসিয়ান" আবাস-গুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তাঁর নিজস্ব সদন। ঝুল বারান্দায় রাখা বহু গাছ-গাছালীর কেয়ারী। সবৃহৎ কাচের "আকাশরশ্মি" যা দেখে সহজেই চেনা যায়—এক শিল্পীর স্টুডিও। "এলেভেটর" করে চার তালায় উঠে শ্রুতিমধুর ঘণ্টা বাজাতেই তাঁর নিজস্ব সচিব আমাকে দেখতে পেয়ে সাদরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বলতে গেলে বাড়ির সকলের সঙ্গে এমন কি ছবি ও আসবাবগুলোর সঙ্গেও আমার এক মিতালী হয়ে গিয়েছে বহুদিন আসা যাওয়ায়। সামনের দেওয়াল জুড়ে আছে স্বামী রবার্ট দ্যলাওনের এক বিশাল তৈলচিত্র আর তার চারপাশ ঘিরে আছে সোনিয়ার সারা জীবনের বড় ছোট নানান কাজ। এক কোণে রাখা সুন্দর টবে, প্রাচ্যের ঘন সবুজ লতা—যার পত্রগুচ্ছ বসবার ঘরকে করে তুলেছে স্নিগ্ধ ও শান্ত। অন্য দেওয়ালের তাকে তাকে সাজানো আছে ব্রাঁ কুইসি, মিরো, জাদ্‌কিন, এলবারস, ক্লীৎস ইত্যাদি বিশ্বখ্যাত শিল্পীবৃন্দের দেওয়া উপহার—শিল্পকর্ম। এইসব দেখতে দেখতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলে ভেসে গেলাম এক ফেলে আসা অতীতে—যেখান থেকে সোনিয়া শুরু করেছিলেন তাঁর শিল্পী জীবন।

১৮৮৫ সালের এক সূর্যালোকিত দিনের আলোয় "উক্রেন"-এ (Ukraine) সোনিয়ার জন্ম। "সাঁ-পিটারস বুর্গ" (Saint Piters Bourg)-এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি জার্মানিতে নকশা সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করতে যান। এর পর কিছুদিন ফিনল্যাণ্ডে কাটিয়ে ১৯০৬ সালে পারীতে বসবাস করতে আসেন। ১৯০৭ সালে "রু নতর-দাম দ্য শ্যাঁপ-এ মিঃ উঁদ্-এর গ্যালারীতে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী হয়। পরে এই উঁদ্‌কেই তিনি স্বামীত্বে বরণ করেন। এই গ্যালারীতেই রবার্ট দ্যলাওনের সঙ্গে সোনিয়ার প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রণয় ঘটে। ১৯১০ সালে উঁদ্‌কে "ডিভোর্স" করে তিনি রবার্টকে বিবাহ করেন। এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে, এই ১৯১০ সালেই ক্যানডিন্স্কি বিশ্বে "প্রথম বিমূর্ত চিত্র" রচনা করেন এবং

লেখককে উপহার দেওয়া ছবিটিতে নাম স্বাক্ষর করছেন সোনিয়া

"তৈলচিত্র" (১৯৫৮) শিল্পী : সোনিয়া দ্যলাওনে
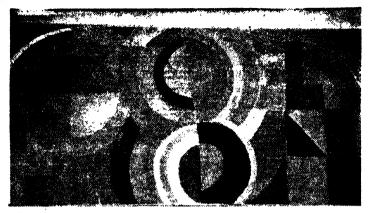
তিনি বিশ্বের বিমূর্ত চিত্রের জন্মদাতা। রবার্ট সেই সময় ফরাসী দেশের একজন নামকরা উঠতি যুবক শিল্পী। অতএব রবার্ট-সোনিয়া এই দুটি নাম, একটি পদবী পরবর্তী যুগে ফরাসী দেশ তথা ইউরোপে বিমূর্তধারা প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন। এঁরা হলেন দ্বিতীয় স্রষ্টা—ক্যানডিনস্কির ঠিক পরে। অতএব স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেল এঁদেরও নাম। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের অনুপ্রেরণার উৎস। বিবাহের প্রথম রাত্রি থেকেই উভয়ের জীবন শুধুমাত্র সমান্তরাল নয়, তাঁদের শিল্পকর্মও।

"মস্তে সিলভুপ্লে"—হঠাৎ স্নিগ্ধ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে স্বপ্নরাজ্য থেকে ফিরে এলাম, বুঝলাম সোনিয়া আমাদের তাঁর ওপরের স্টুডিওতে যাবার আহ্বান জানাচ্ছেন। ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বন্ধুবর সহ ওপরে উঠলাম। সোনিয়া ফুল ভালবাসে তাই যখনই তাঁর কাছে যাই হাতে ফুল থাকে। এবার কিছু সাদা চন্দ্রমল্লিকা নিয়ে গিয়েছিলাম। পুষ্পগুচ্ছ তাঁর হাতে দিতেই তিনি শিশুর মত সরল হাসি হেসে তা গ্রহণ করে আমায় ধন্যবাদ দিলেন আর তাঁর পরিচারিকাকে বললেন যেন ফুলদানীতে সাজানো হয় এখুনি। আমাদের বসতে বললেন। আমি আমার বন্ধুর পরিচয় দিয়ে বললাম যে আমার বন্ধু দুশমন দেশ পাকিস্তানের ছেলে। তিনি মজা বুঝতে পেরে বললেন, "তোমরা আমার সন্তান, আমার অতিথি—রাজনীতি মনুষ্যত্বের তুলনায় কিছু নয়। আমরা ভ্রান্ত, অন্ধ, তাই ভায়ে ভায়ে মারামারি করে জীবন ও বহুমূল্য সময় নষ্ট করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলে তা বুঝতে পারে না. তাই দেশে দেশে এত যুদ্ধ, লড়াই। গান্ধীজি একজন আদর্শবান দার্শনিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই আদর্শকে অনেকে মনে প্রাণে নিতে পারেনি আর মনে হয় সেই জন্যেই দুই দেশের আজ অগ্রগতি এত মন্থর ও ভেদাভেদ অনবলুপ্ত। তোমরা দুই ভাই আমার দুই পাশে বস।" আমরা চেয়ার টেনে নিলাম।

আমি আগেই তাঁকে "দেশ" পত্রিকার জন্যে কিছু লিখবো বলে রেখেছিলাম এবং কিছু প্রশ্নও করব তা জানিয়েছিলাম। তাই তিনি হাসিমুখে বললেন, "আমি প্রস্তুত।" আমি ঔৎসুক্য নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম—

প্রশ্ন—আপনি কবে থেকে বিমূর্তধারায় ছবি আঁকছেন? এবং কেন?

"১৯১১ সাল থেকে। তার আগে আমি প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি, প্রকৃতিগত চিত্র আঁকতাম। সেই প্রকৃতি থেকেই বিমূর্ত নক্শা আঁকার কল্পনা মাথায় আসে। তখন থেকেই ক্রমশ সব মূর্তিগত বস্তুকে শুধুমাত্র বিমূর্ত নক্শার আকারে দেখতে লাগলাম। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সামনে বস্তুগত মূর্তি দেখলেও কিছুতেই শুধু বিমূর্ত ছন্দ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতাম না।"

প্রশ্ন—রবার্ট আপনাকে কিভাবে সাহায্য করেছে?

"রবার্ট আমাকে দিয়েছে ফর্ম, আমি দিতে পেরেছি তাঁকে রঙ, আর এই রঙ ও ফর্ম মিলিয়েই আমাদের দুজনের শিল্পকর্মের প্রকাশ। এমন কি ১৯৪১ সালে রবার্ট-এর মৃত্যুর পরও আমি তা বহন করে চলেছি—আজও তার ছেদ ঘটেনি।"

প্রশ্ন—ভারতের আধুনিক শিল্পকলা ও ভারত সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

"সত্যি কথা বলতে কি ভারতের আধুনিক শিল্পকলা বা শিল্পী কেউ তেমন নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি বা নতুন কিছুর সন্ধানে গবেষণা করছেন না যা নিয়ে বিশ্বের আধুনিক শিল্পজগতে আলোচিত হতে পারে। অন্তত পাশ্চাত্ত্যে আমরা তার কোন প্রমাণ পাইনি বা দেখিনি। সুতরাং ভারতের আধুনিক শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার নেই। তবে প্রাচীন ভারতের শিল্প, কৃষ্টি, বিজ্ঞান বা স্থাপত্যের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমি নিজের উৎসাহে তা পাঠ করেছি অনেক।"

প্রশ্ন—পাশ্চাত্ত্যের কোন্ আধুনিক শিল্পীর কাজ আপনার ভাল লাগে?

"অঁরি মাতিস-এর কাজকে আমি বরাবরই শ্রদ্ধার চোখে দেখি। আমি মনে করি তিনি আধুনিক যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্পী ছিলেন। তাঁর মত এত শক্ত ও সরল চিত্র এর আগে আর কেউ আঁকতে পারেননি।"

প্রশ্ন—পাব্লো পিকাসোকে কি আপনি এ যুগের সবচেয়ে সৃজনশীল শক্তিশালী শিল্পী মনে করেন না?

"মোটেই আমি তা মনে করি না। তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমার তেমন উৎসাহ নেই। বলতে গেলে সে আমার সমসাময়িক। আমি তাকে প্রথম থেকে ভাল করে চিনি। সে ডিজাইনার ছাড়া আর কিছু নয়। টেকনিক তার দখলে আছে, আর আছে বুদ্ধি এবং সৌভাগ্যবশত বহু আর্ট ডিলারের সমাবেশ ঘটেছে তার জীবনে। এ সমস্ত কারণে আজ সে বিশ্বের নামকরা শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমি তার উৎসাহকে সমর্থন করি মাত্র। কিন্তু সৃষ্টির দিক থেকে সে বরাবরই একঘেয়ে। আমি পরীক্ষামূলক কাজ পছন্দ করি। যেমন ভ্যান গগ, জর্জ ব্রাক ইত্যাদির পরীক্ষামূলক কাজকে আমি সম্মান দিই—শ্রদ্ধা করি শিল্পসৃষ্টি হিসেবে। অঁরি মাতিস-এর কাজ খুব শুদ্ধ ছিল।"

প্রশ্ন—রবার্ট-এর কাজ কোন পর্যায়ে পড়ে?

"তিনি প্রথম যা সৃষ্টি করেছিলেন, যা চিন্তা করেছিলেন সমগ্র ইউরোপ পরে তা অনুসরণ করেছিল। প্রথম তিনি জার্মানীতে সম্মানিত হয়েছিলেন এবং জার্মানরা তাঁকে ও তাঁর কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পরে তিনি ফরাসী দেশ ও পারী মহানগরীর সম্মানে ভূষিত হন। তিনি বিশুদ্ধ শিল্প রচনায় বিশ্বাসী ছিলেন।"

প্রশ্ন—ভারতের সাহিত্য বা সাহিত্যিক সম্বন্ধে আপনি কি ধারণা পোষণ করেন?

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল সবচেয়ে বেশী। আমি জার্মানীতে থাকতে চাক্ষুস তাঁকে দেখেছি। পরে জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় তাঁর বহু লেখা পড়ার সুযোগ পাই ও উৎসাহিত হই। তিনি সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো সম্পর্কে আমি কিছু জানি না তেমন।"

প্রশ্ন—বর্তমান পাশ্চাত্ত্যের যুবশিল্পীদের শিল্পকলা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

"বেশ কিছু শিল্পী নতুন পরীক্ষামূলক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তবে বেশীর ভাগ শিল্পীই সস্তায় নাম কেনার মোহে ছুটছে। আর ছুটছে টাকার পেছনে। কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে অনেক অনেক ক্ষেত্রে

শিল্পী সাধারণ মানুষের থেকে বিস্তর আলাদা। শিল্পীর সবার আগে যেটা প্রয়োজন সেটা নন্দনতত্ত্বের আবিষ্কার-সন্ধানী মন ও আধ্যাত্মিকতা। বর্তমান যুগের বেশীর ভাগ শিল্পীই প্রকৃত শিল্প-সৃষ্টির আগেই টাকা গুণছে। আমার মনে হয় মহাত্মা গান্ধীরও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে মানুষের প্রতি ঐ একই মনোভাব ছিল। আমার মতে বর্তমানে মানুষকে এই আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাই দেওয়া উচিত আগে। এতেই শিল্পী সৃষ্টি করবে সার্থক শিল্প আর তা থেকেই মানুষ শান্তির সন্ধান পাবে। ভারতের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে কারণ এটা আধ্যাত্মিকতার একটা বহিঃ-প্রকাশ। আমার মতে বর্তমান যুগে সবাই পাগল, কারণ সকলে বস্তুতান্ত্রিকতায় ছুটছে। আজকাল কংগ্রেস (Congress) যে কথা বলছে যিশুখৃষ্ট তা দু হাজার বছর আগে বলে গেছেন। কিন্তু আজ যদি গোঁড়া সোস্যালিস্ট একথা আমার কাছে বলতে আসেন আমি তাঁদের "পেতি বুর্জঁয়া" (Petit Bourgeois) বলে থাকি।"

প্রশ্ন—শুনেছি আপনি ধনীর দুলালী। তবে আপনার এই আধ্যাত্মিকতার চেতনা কেমন করে এত প্রবলভাবে মনে চেপে বসল বুঝে উঠতে পারছি না।

"ঠিক কথাই যে আমার বিত্তশালী মা-বাবা আমার জন্যে ধনদৌলত অনেক কিছুই রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত জার্মানরা তা সমস্তই কেড়ে নিয়ে-ছিলেন। সমস্তই। একমাত্র ছবি ছাড়া। আর কেড়ে নিতে পারেনি যেটা, তা আমার শিক্ষা। এই শিক্ষাই আমাকে আধ্যাত্মিকতার পথ দেখিয়েছে বরাবর। এখন আমি রোজগার করছি যথেষ্ট তা সত্ত্বেও আমার ছবি আমি বিভিন্ন দেশে দান করছি নামের জন্যে নয়। কারণ আমি মনে করি শিল্প শুধুমাত্র একজনের একার সম্পত্তি নয়—এটা সার্বজনীন। সেখানে সবাই একাসনে শিল্পের অন্তঃরস পান করতে পারে।"

প্রশ্ন—ভবিষ্যতে আমি ভারতের হয়ে যদি আপনার কাছে কোন শিল্পসাহায্য বা নির্দেশ চাই আপনি কি আমায় সাহায্য করবেন?

"নিশ্চয়ই। আমি মনে করি যাঁরা বুদ্ধিমান বা যাঁদের কিছু দেবার ক্ষমতা আছে তাঁদের আমার সাহায্য করা ও তাঁদের অন্যদের সাহায্য করা উচিত। বর্তমান যুগের স্বার্থপরতায় ও পরশ্রীকাতরতায় আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।"

প্রশ্ন—ভারতের আধুনিক শিল্প গ্যালারীর জন্যে কি আপনি কিছু ভাল কাজ দান করবেন?

"নিশ্চয় করব। তবে এখন নয়। আমি উইল করে যাব যাতে আমার মৃত্যুর পর
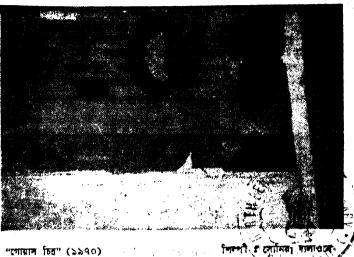
"গোয়াস চিত্র" (১৯৭০)

শিল্পী ঃ সোনিয়া দালাওনে

বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির অনুরোধ লিপিবদ্ধ থাকবে আর তাঁদের অনুরোধ মত সেই সমস্ত দেশে নির্দিষ্ট ছবি প্রদত্ত হবে। তোমার অনুরোধ আমি লিপিবদ্ধ করে রাখলাম আজ। উইল করে যাব যা আমার মৃত্যুর পর তোমার মারফৎ তোমার দেশের গ্যালারী পাবে। তুমি শুনে আশ্চর্যান্বিত হবে যে আমি আমার ও আমার স্বামীর কয়েক কোটি টাকা মূল্যের ছবি দান করেছি ফরাসী সরকারকে।"

প্রশ্ন—আমাদের দেশ আপনার বিশিষ্ট ছবি উপহার পাবে একথা ভাবতে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। আমি কি এখনই তা দেশের কাগজে প্রকাশ করতে পারি?

"কেন নয়?" কিছুক্ষণ আগেই আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।"

প্রশ্ন—গোটাকতক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে, মাদাম দালাওনে। রবার্ট আপনাকে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসতেন এবং আপনার কাজ দেখে নিজেও খুব উৎসাহিত বোধ করেছেন জীবনে?

"হ্যাঁ, তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সত্যি আমার উপদেষ্টা হিসেবে চাক্ষুস হারিয়েছি তাঁকে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে একদিন আমাদের নিজস্ব "মিউজিয়াম" হবে যাতে থাকবে আমাদের দুজনের কাজ আর যাঁদের কাজকে আমরা শ্রদ্ধা করি। আমরা গরীব ছিলাম তাই শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি। এখন আমার শেষ বয়স, তেমন আর উৎসাহ নেই।"

প্রশ্ন—যে-সব তরুণ শিল্পী অর্থাভাবে অন্য পথে চলে যাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে কি কিছু ভেবেছেন?

"আমার সঞ্চয় থেকে তাদের জন্যে মোটা ধরনের কিছু টাকার গ্রান্টের ব্যবস্থা করেছি যা দু-এক বছরের মধ্যে শুরু হবে চালু করা।"

প্রশ্ন—শুনেছি আপনি অতীতে খুব অর্থকষ্ট পেয়েছিলেন এবং তার জন্যে আপনাকে কিছু কমার্শিয়াল কাজ করতে হয়েছিল—সে বিষয়ে কি কিছু বলবেন?

"হ্যাঁ, আমার জীবনের প্রায় অনেক সময়ই খুব অসুবিধার মধ্যে কাটাতে হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের সুখ কখনও হারিয়ে যায়নি, উপরন্তু আমি প্রকৃত জীবনকে এই দুঃখের মধ্যে দেখতে পেয়ে শান্তি পেয়ে-ছিলাম। আর যখনই মন অসহ্য বা দুঃখে ভারাক্রান্ত হতো তখনই রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে আরম্ভ করতাম আর তাতে সঙ্গে সঙ্গে যাদুর মত মন এক আধ্যাত্মিকতায় প্রশান্ত হয়ে যেত।"

"সেই সময়কার কাজের মধ্যে ছিট কাপড়ের নক্শার জামার ডিজাইন, তাসের নক্শা, এমন কি এই সেদিন—১৯৫৯ সালেও এক তাসের নক্শা করেছি যা বাজারে এখনও চালু আছে। ১৯৬৯ সালে লিথোগ্রাফিতে করা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে প্রাথমিক ইংরাজী অক্ষর পরিচয় "ABCD" নামক পুস্তকের ১৫০ কপির এক এডিশন করেছি। ১৯১৩ সালে আমি ২ মিটার লম্বা ১ মিঃ চওড়া এবং বহু রঙের সমাবেশ সম্বলিত ছোটদের জন্যে একটি বিমূর্ত নক্শার এক বই প্রকাশ করি। তার সমস্ত কপি কিছুদিনের মধ্যে বিক্রী হয়ে যায় এবং খুব সমাদর লাভ করে বাজারে। এটাই আমার প্রাপ্য—সান্ত্বনা। আর কিছু চাইনি জীবনভর। শিল্পীর সফলতা কাজের মধ্যে, অর্থে নয়। আমি কোনদিন সুখী হতে চাইনি—যদিও এটা খুব কঠিন কথা, কিন্তু সত্য। আর যদি সকলে আমার মত ঐ আদর্শে বিশ্বাসী হয় তাহলে সকলের জীবন হবে স্নিগ্ধ ও সুন্দর। দুঃখ হতে সকলে পাবে মুক্তি।"

"এর বেশী আমি তোমাকে বোঝাতে

পারছি না, আর এটা খুবে দুঃখজনক যে আমি তোমার সঙ্গে তোমার ভাষায় কথা বলতে পারলাম না।"

কথায় কথায় ঘড়ির দিকে আর চাওয়া হয়নি। তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছিলাম ইতিহাসের পাতা থেকে ফেলে আসা জীবন-কাহিনী শিল্পীর নিজের মুখে। এক শিল্পী অন্য এক শিল্পীর সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা বলতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই তা মনকে স্পর্শ করে এবং যেন তা শেষ হতেও চায় না। তিন ঘণ্টার মত কেটে গেছে কখন। দেখলাম তিনিও একটু চঞ্চল ও অন্যমনস্ক। হয়তো অতীত স্মৃতি নিয়ে গভীরতম অন্তঃলোকে ডুব দিয়েছিলেন—সেখানে আমাদের উপস্থিতিতে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন এবং তিন ঘণ্টা আলোচনায় ক্লান্তও দেখাচ্ছিল তাঁকে।

শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে তাই আমরা বিদায় নিলাম। সমস্ত রাস্তা আমার বন্ধুর সঙ্গে কোন কথাই বলতে ইচ্ছে করেনি। কোন্ স্বপ্নরাজ্যে আমায় কে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছিল। যেখানে আমরা সকলেই ভীষণ একলা।

পারী/জুন, ১৯৭০

এরপর হঠাৎ একদিন মুকুলকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিতা জ্যাঠামশায়ের কাছে এসে বসল। জ্যাঠামশায় মুকুলের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, খবর কি ইঞ্জিনীয়ার সাহেব? মনে হচ্ছে অনেকদিন পর দেখা। সব কুশল তো?

মুকুল : তোমাদের আলোচনাটা যেরকম সূক্ষ্ম, দার্শনিক স্তরে উঠে এসেছিল তাতে আমার পক্ষে যোগ দেওয়াটা অনধিকার চর্চা হতো। তাই কাছে ঘেঁষতে সাহস হয়নি। আমি ইঞ্জিনীয়ার মানুষ, লোহা পিটেনো আমার ব্যবসা। ও সব তত্ত্বকথায় দাঁত ফোটাতে পারি না।

নন্দিতা : তুই উপমা গুলিয়ে ফেলছিস। কথা যত সূক্ষ্ম হবে, দাঁত তত সহজে ফুটবে। পাথর, লোহার মত স্থূল কথা হলেই দাঁত ফোটান শক্ত হয়। দেখছিস না, জ্যাঠামণির দাঁত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম কথায় অভিরুচি বাড়ছে?

মুকুল : আমাদের কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছিল কলকাতার নালা-নর্দমা সাফ করা নিয়ে। সে জিনিসটা আমি বুঝি। ক্রমে শুনলাম তোমরা পরলোক-তত্ত্বে মেতে গেছ। নর্দমার সঙ্গে পরলোকের সম্বন্ধটা যে কি, সেটা আমার বুদ্ধির বাইরে।

নন্দিতা : একটু ভেবে দেখলেই বুঝবি, নালা-নর্দমার অবস্থা যত বিগড়ে উঠবে তত শীগ্‌গির ইহধাম ছেড়ে পরলোকে পৌঁছন সহজ হবে।

জ্যাঠা : কিন্তু সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার কোন সাধ ওর নেই। সেটা মুকুলের মনের ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তবে জেনো মুকুল, আমিও পরলোক জায়গাটাকে যতদূর পারি এড়িয়ে চলতে চাই। আমারও ভাবনা ইহ-জগৎটাকেই ভাল করা নিয়ে।

মুকুল : শুনলাম গতবারের আলোচনাতে আবার মর্ত্তজগতে ফিরে এসেছ। ইউ এন প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে সংস্কার হতে পারে তা' নিয়ে তোমার মতামত দিয়েছ। এ-বিষয়ে আমার যথেষ্ট কৌতূহল আছে। আগে জানলে এবারের আলোচনাতেও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতাম। তবে নন্দিতার কাছে তোমার বক্তব্যটা মোটামুটি শুনে নিয়েছি।

জ্যাঠা : এ বিষয়ে আমার মতটা মেনে নিতে কি খুব বেশী বাধছে?

মুকুল : তা' নয়। কিন্তু অন্য ব্যাপারের মত এ বিষয়েও দেখছি তোমার মতে তাড়াতাড়ি কিছু ফল পাবার আশা বৃথা।

জ্যাঠা : তার কারণ, কোনো ব্যাপারেই কোনো সংস্কার সমাজের ঘাড়ে আমি ওপর থেকে চাপিয়ে দিতে চাই না। সে জিনিস টেঁকে না, মানুষের তা' ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবার প্রবৃত্তি হয়। আগে তাদের বুঝাতে হবে এ' সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কি আর কোথায়।

নন্দিতা : তার মানে, তোমার অস্ত্র হোল লোক-শিক্ষা। মুকুল আর তার বন্ধুরা বিপ্লবে বিশ্বাস করে।

মুকুল : আর তুই?

নন্দিতা : আমার মনটা টলছে, এখনও একেবারে স্থির করতে পারিনি। কিন্তু উন্নয়নকে কেবল যদি শিক্ষাপ্রসারের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়, তবে আমার নাতিপুতির বেলায়ও বিশেষ এগিয়ে যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ। এ কথা মনে করে মনটা দমে যায়। তখন ইচ্ছা করে, দূরে ছাই, লাল-ঝাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

মুকুল : তা ছাড়াও কথা আছে। মানুষ যে অত ধীরে এগোবার অবকাশ পাবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি? আমি দেখছি, তার অনেক আগেই ক্ষমতামত্ত লোভী স্বার্থ-কেন্দ্রিক হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করে এই গ্রহটাকে একটা বিষাক্ত বাষ্পপিণ্ডে পরিণত করার সম্ভাবনাটাই বেশী।

জ্যাঠা : মানুষের শেখবার ক্ষমতা যতটা ধীরে এগোয় বলে তোমরা ভাবছ তা ঠিক নয়। শিক্ষা বলতে তোমরা বোধ হয় ভাবছ বর্ণপরিচয়, ব্যাকরণ, ধারাপাত আর পুঁথিগত বিদ্যার কথা। কিন্তু আসলে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষার খোরাক সংগ্রহ হয়। সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া চাই মনটাকে সব-রকমে এর জন্যে তৈরি করা। তার জন্যে অক্ষরপরিচয় ও নামতা জানা যেমন দরকার, তেমনি মন-জাগানো, চোখ-ফোটান পরি-বেশেরও দরকার। এখনও বলব, প্রথম ধাপেই অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অগ্রগতির বেগ একই হারে বাঁধা থাকে না, শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে।

নন্দিতা : সনাতনী প্রেসক্রিপসন-এর সঙ্গে তোমার প্রেসক্রিপসন-এর তফাতটা হলো এই : তাদের সামাজিক পরিবেশ গুটিকয়েক নেতার বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলে। সাধারণ মানুষের মন তার সঙ্গে পাল্লা রেখে চলতে পারে না। অর্থ-নৈতিক বল, রাজনৈতিক বল, সারা সমাজ-ব্যবস্থাটাই তাদের কাছে ক্রমে দুর্বোধ্য ও অবোধ্য হয়ে ওঠে। তখন বিনা প্রশ্নে সেই ব্যবস্থার রীতি-পদ্ধতি বা টেকনোলজি না মেনে তাদের উপায় থাকে না। তখন টেকনোলজিই প্রভুত্ব করে, সাধারণ মানুষ হয় তার দাস।

মুকুল : বুঝতে না পারলে আর টেকনোলজির ফল বাস্তবক্ষেত্রে সুখ, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রসার না ঘটাতে পারলে শুধু কয়েকটি ওপরওয়ালার হুমকিতে সাধারণ মানুষ এভাবে টেকনোলজির অনুসরণ করত কি?

নন্দিতা : তা' ঠিক। তাদের সনাতনী ব্যবস্থায় আসক্তির আসল কারণ বস্তু-সম্পদ ও গ্যাজেট-এর প্রাচুর্যের একবার আস্বাদ পেয়ে তার লোভ তারা ছাড়তে পারে না। অথচ মনটাও টেকনোলজির অনুপাতে বাড়তে পারেনি বলে পরিণামে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী করে দেখা দিচ্ছে। সবচেয়ে প্রগতিশীল, বিত্তশালী দেশের তরুণ-তরুণীরা তাই আজ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে এই সমাজ-ব্যবস্থার গায়ে পদাঘাত করতে উদ্যত হয়েছে।

জ্যাঠা : সাবাস্ নন্দিতা, তোমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। এর চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা আমিও করতে পারতাম না। এখন শুনি এই সনাতন প্রথায় উন্নয়নের জায়গায় আমাদের মানব প্রধান উন্নয়নের কি ধারা ও চেহারা দাঁড়াবে বলে তুমি বুঝেছ।

নন্দিতা : সেখানেও বহু যুগের ঝিমিয়ে-থাকা সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে হলে প্রথম দফায় বাইরের নেতৃত্ব ও টেকনোলজি উন্নয়নের খোঁচার সাহায্য নেওয়া ছাড়া গতি নেই। শুধু প্রথম দফায় সে ধাক্কাটা দুর্বল মনের উপযোগী করে পরিমিত আর মৃদু হওয়া চাই। মনটা তখন জেগে উঠে বাইরের পরিবেশটাকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। আবার তারই ফলে এতোদিনের আটকানো মন আগের চেয়ে খানিকটা নড়াচড়া করার সুযোগ পেয়ে আর একটু পুষ্ট হয়ে দ্বিতীয় ধাপে ওঠবার জন্যে তৈরি হবে। এমনি করে বাইরের সঙ্গে ভেতরের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ বেড়ে চলবে। তাতে বাইরের পরিবেশটার বা টেকনোলজির রাশ-ছেঁড়া ঘোড়ার মত নিজের ঝোঁকে আয়ত্তের বাইরে ছুটে পালাবার ভয় থাকবে না।

মুকুল : এসবই বুঝলাম জ্যাঠামণি। আমার তবু এক জায়গায় খটকা লাগছে। যারা আধুনিক টেকনোলজিতে ইতিমধ্যেই অনেকদূর এগিয়ে গেছে আর সেই অগ্রগতির ফলে যাদের গতি বৃদ্ধির মাত্রা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট-এর হিসেবে ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, নতুন উন্নয়ন-কামী দেশেরা কোনোদিন তাদের সমতুল্য হবে কি করে? তোমার ব্যবস্থায় অগ্রণী দেশের তুলনায় গরীবেরা যে শুধু চিরকাল পিছিয়ে থাকবে তা নয়, দুই দলের মধ্যে ব্যবধান ক্রমে দীর্ঘতর হতে বাধ্য। এ অসাম্য বেড়ে চলা কি সম্ভব? পৃথিবীটা ফেটে পড়বে না?

জ্যাঠা : দুই উন্নয়ন-পদ্ধতির তুলনা করার হিসাবে তোমার ত্রুটি থেকে গেছে ইঞ্জিনীয়ার। আমি দেখাই ত্রুটিটা কোথায়। টেকনোলজি যত সাধারণ মানুষের বোধের আর আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, সেই টেকনোলজির আরও উৎকর্ষের ক্ষমতা সমাজের তত কমে আসবে ইনারশিয়ার ফলে বা নিজের ঝোঁকে টেকনোলজি খানিক দূরে এগিয়ে যেতে পারে বটে। কিন্তু আধুনিক কম্পিউটার বা হিসেব করার যন্ত্র অথবা অটোমেশন বা মানুষের সাহায্য না নিয়েই যন্ত্র চালানোর ব্যবস্থার যত দূরই প্রসার হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানতে হবে যে হাজার জটিল থেকেও কোন যন্ত্রেরই আত্ম-স্ফূর্ত মনন শক্তি নেই। শেষ পর্যন্ত মানুষের সৃজনশীলতার সহায়তা ভিন্ন গতি নেই। বেশীর ভাগ লোক যত নিষ্ক্রিয়ভাবে টেকনোলজির ফল ভোগ করতে অভ্যস্ত হচ্ছে, এই সৃজনশীলতা তত ম্রিয়মান হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই বলি মুকুল, তোমার যে ধারণা, সনাতন প্রথায় উন্নয়নের গতি নিরন্তর চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলবে তা ঠিক নয়।

নন্দিতা : তা ছাড়া অন্য কারণেও উন্নয়নের গতিরেখা নেমে আসবে বলে আমার মনে হয়। বর্তমানের দুর্বোধ্য অস্বাস্থ্যকর সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও আক্রোশ জমে ওঠার ফলে উত্তরোত্তর বেশী করে সামর্থ্য নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে ব্যয় হয়ে যাবে, টেকনোলজির আরোও উৎকর্ষের ভাবনা ভাববার অবকাশ থাকবে কম। বর্তমান টেকনোলজি কোনো রকমে চালু রাখাই তখন হবে দায়।

জ্যাঠা : অপরপক্ষে মানুষ-প্রধান উন্নয়নের পরিণামটার কথা ভেবে দেখ। সেখানে মানুষের মন যেমন চাইবে সেই অনুসারে জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর পুষ্টির প্রয়োজনে যতদূর ইচ্ছা উৎপাদন সম্ভোগের টেকনোলজিকে উন্নত করায় কোন বাধা নেই। কোনো অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির জন্যে উন্নয়নের স্বাভাবিক গতিবেগ বা acceleration-এর হ্রাস হওয়ার কারণ নেই। সুতরাং, তুমি যে ভাবছো মুকুল, মানুষ-প্রধান উন্নয়নের পথ অনুসরণ করলে সমাজকে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে হবে, সেটা আদৌ ঠিক নয়। আমি দেখছি, অন্য পথ ধরে আজ যারা এগিয়ে আছে, যথাসময়ে তাদের শুধু সমকক্ষ হওয়া চলবে তা নয়, ইচ্ছা করলে তাদের ছাড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে, সে ইচ্ছা হবে কিনা। কারণ, মনে রেখো, মানুষ প্রধান উন্নয়নের চরম লক্ষ্য শুধু জড়-সম্পদ ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া নয়। ধনোৎপাদনের একটা স্তরে পৌঁছে সাধারণ মানুষের মনে হতে পারে, এই মানটাকে বজায় রাখতে পারলেই চলবে, তার জন্যে যতটুকু সঞ্চয় ও পরিশ্রম করা দরকার তাই যথেষ্ট। তার বেশী সময় অবসর-বিনোদনের জন্যে ব্যয় করা সমীচীন। এই হলো আগেকার গ্রীক-সভ্যতা বা হেলেনিক গুড লিভিং বা পূর্ণাঙ্গ-সুন্দর জীবনের আদর্শ। এর বিপরীত আকর্ষণ হলো রোমান হাই লিভিং বা বিলাসের জীবনের। অধুনাসম্মত উন্নয়নের আদর্শ হলো রোমান, খাঁদু সর্দার আর আমার আদর্শ হলো গ্রীক-অ্যাথেনিয়ান।

মুকুল : আমার মনে হয়, যে-সমাজ ব্যবস্থায় জড়-সম্পদ প্রসারের পথে কোনো বাধা বা ব্রেক দেওয়া হয় না তারই জয়
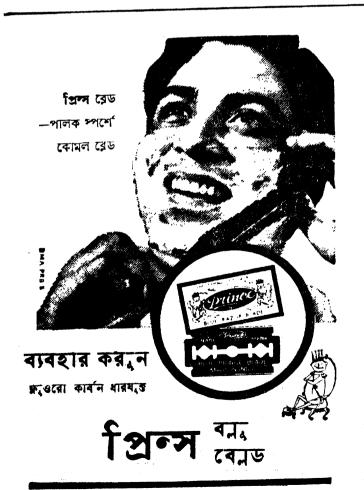
অবশ্যম্ভাবী। যে সমাজে অবসর-বিনোদনের খাতিরে সম্পদ প্রসারের কৌশলকে ইচ্ছা করে আটকে রাখা হয় তা ক্রমে হীনবল হয়ে যেতে বাধ্য। দুই সমাজে সংঘর্ষ বা যুদ্ধ বাধলেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে।

জ্যাঠা : সে কথা ঠিক। তাই জনোই তো আমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ও বজায় রাখতে হলে সমস্ত মানুষ জাতটাকে একটা বিশ্ব-রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে এনে জায়গা দিতে হবে। নইলে, শুধু যন্ত্রের বর্বর শক্তিতে যে সমাজ বড়, তার দ্বারা অন্যদের রোধ করার সম্ভাবনা থেকে যাবে তা শুধু নয়। জড়-সম্পদ প্রসারের নিজস্ব ভেতরকার একটা ঠেলা আছে, যার দরুন আমাদের বিপরীত ব্যবস্থার সঙ্গে তার সহবাস বা কো-এক্জিসটেনস সম্ভব নয়। এই মর্ত্য-জীবনে আসুরিক শক্তির হাত থেকে সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শকে রক্ষা করতে হলে আজ তাই বিশ্ব সংস্থার পরিবেশ অপরিহার্য। সেই জনোই তো উন্নয়নের খোঁজ করতে করতে নন্দিতা আর আমি এই প্রসঙ্গে এসে পৌঁছেছিলাম।

নন্দিতা : কিন্তু তোমার কি ভয় হয় না জ্যাঠামণি, যে আমাদের চরম লক্ষ যদি হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ, তো বিশ্ব-সংস্থার বিশাল, বিপুল ব্যবস্থাপনার আড়ালে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে? ছোট্ট পরিসর পড়শী-জীবনের আবেষ্টনীতেও যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখতে বেগ পেতে হয়, বিশ্বসমাজের অগাধ, অসীম জনসমুদ্রে তাকে অক্ষুণ্ন রাখার কি উপায় করবে?

জ্যাঠা : মনে পড়ে, সেই জনোই তো সেদিন বিশ্ব সংস্থার সংবিধানটা ধাপে ধাপে পিরামিডের নকশা অনুযায়ী গড়বার কথা বলেছিলাম? তারই ধাপে সাধারণ মানুষের চেতনা ও বুদ্ধিও বেড়ে উঠতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা আরো সিঁড়ি ভাঙ দিয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, জটিল থেকে জটিলতর ক্রমশ ব্যাপক সমস্যাগুলো ছেঁকে তোলা সম্ভব হবে, আর প্রত্যেক স্তরেই তা বিশ্ব কল্যাণের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা চলবে। আমার মনে হয় কেবল এই ব্যবস্থার সাহায্যেই বিশ্ব কল্যাণের আদর্শকে সাক্ষাৎকারের মানব কেন্দ্রিক করা সম্ভব। আমরা খুঁজেছি বিশ্ব সমাজ সংগঠনের এমন একটা পথ বা নকশা, যাতে তার পরিধি বিরাট হলেও সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও বিকাশের বাধা না হয়। অখণ্ড মানব জাতির ভিত্তিতে এই পিরামিডের সংগঠনই তার একমাত্র উপায়। রাষ্ট্র সংঘের সঠিক বর্তমান রূপ হলো রাষ্ট্রসংঘ। আমাদের দরকার স্বাধীন রাষ্ট্রের একত্রীকরণ নয়, এমন এক সংস্থা যার ভিত্তি হলো সারা বিশ্ব। সেখানকার বিধানসভার সদস্য হবে দেশ-নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র। সমস্ত মানুষের জাতটাই হবে তাদের ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস।

মুকুল : তুমি কি বলতে চাও, জ্যাঠামণি, দেশপ্রেম জিনিসটাকে মানুষ কোনো দিন মন থেকে আগাগোড়া উপড়ে ফেলবে? মাতৃভূমি, পিতৃভূমি বলতে যে টান সেটা একেবারে মুছে যাবে? রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড, জার্মানী বলে যে আলাদা আলাদা দেশগুলো রয়েছে, যা নিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের এতো গর্ব, তার অস্তিত্বই একেবারে লোপ পাবে? ভূগোল আর ইতিহাসের মানচিত্রে এই সব ও আরো অন্য ভূখণ্ডের যে নানা-রঙা ছবি আর তাদের সীমানার নির্দেশ, তা বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? আজ নয়, কাল নয়, কিন্তু এ কি কোনো দিনই সম্ভব? আর সম্ভব হলেও তা কি বাঞ্ছনীয় হতে পারে?

জ্যাঠা : না, আমি তা বলতে চাইনি। তুমি

আমার ভুল হয়েছে। আমি এদের অস্তিত্ব ঘোচাতে চাইনি, মানচিত্রের সব সীমান্তরেখা মুছে ফেলে সারা পৃথিবীটাকে এক-রঙা দেখতে চাইনি। জানি, তাতে মানুষের জীবনের অনেক বৈচিত্র্য হারিয়ে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেক সাহিত্য রচনা, অনেক আর্টের প্রেরণার উৎস শুকিয়ে যাবে। আমি চেয়েছি যে, এই সব আলাদা ভূখণ্ডের সীমানা ছাপিয়ে তাদেরও ওপরে সমস্ত মানুষ জাতটার ও সারা বিশ্বের যে একটা নিবিড়তর ঐক্যের বাঁধন আছে, সেইটে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিতে, আর সেই ঐক্যের ভিত্তিতে নতুন সংবিধানের পিরামিড-এর কাঠামোটা গড়তে। বিশ্বসভার শিখরের নীচে যে স্তরে স্তরে বিভিন্ন দেশ-প্রদেশ, গ্রাম, শহর, পাড়া পরিবার ও একক মানুষ রয়েছে, তারা তখনও থাকবে। তাদের যে স্বতন্ত্র গুণগুলো সভ্যতাকে সমৃদ্ধি দিয়েছে, তা শুধু বেঁচে থাকবে তা নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের আরো বেশী সুযোগ পেয়ে আরো সক্রিয় হতে পারবে। তাদের মধ্যে ভাল কাজের জন্যে রেষারেষি উঠে যাবে না, শুধু সে প্রতিযোগিতার থেকে ঝাল, বিদ্বেষ ঘুচে যাবে। এ পরিণামকে অবাঞ্ছনীয় মনে করবার কোন কারণ নেই।

নন্দিতা : মনে রাখিস, আমরা যখন বলি, সবার উপরে মানুষ সত্য, তখন কুকুর, বেড়াল, আরসোলা, টিকটিকির অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। শুধু বোঝাতে চাই, মানুষের আধিপত্য আর দাবি তাদের উর্ধে। স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাও মানুষের সৃষ্টি।

মুকুল : ধর্ম আর ভগবানকে বড় যে আজকাল তুচ্ছ করতে শিখেছিস! তাঁদের নাম নিয়ে ঠাট্টা করতে তোর দেখছি একটুও বাধে না। মনে পড়ছে, কিছু দিন আগে জ্যাঠামণি বলেছিলেন ছাত্র হয়ে যখন বিলেতে ছিলেন সেই সময়কার একটা ঘটনা। ব্রাহ্ম সমাজের একজন পান্ডা এক রবিবারে লণ্ডনের সমাজে গিয়ে উপাসনার সময় তাঁকে গান করতে বলেছিলেন। জ্যাঠামশায় নাকি তখন তাঁকে বলেছিলেন, সেই সময়টা টেনিস খেললে ও'র উপকার হবে বেশী। তাতে ভদ্রলোকের জাঁদরেল গিন্নীটি চটে গিয়ে শাসিয়েছিলেন, ভগবান ওপর থেকে সব শুনছেন। তোমার এই স্পর্ধার জন্যে পিঁপড়ের মত তোমায় পিষে ফেলবেন। জ্যাঠামণির সংস্পর্শে থেকে তোরও দেখছি পিষে মরবার ভয়টয় কেটে গেছে।

জ্যাঠা : আমার যদি কোন ভগবান থাকতেন তবে তিনি কেবল প্রেম ও ভক্তি-রসের ঠাকুর হতেন না, কৌতুক রসও উপভোগ করতে পারতেন। তা ছাড়া, তাঁর নজর অতো ছোট হতো না। আমি বা নন্দিতার মত নগণ্য মানুষ তাঁর নাম নিয়ে ঠাট্টা করলেই তাঁর কোপদৃষ্টি আকর্ষণ করতো না, অন্য বড় সমস্যা নিয়ে তাঁর সময় কাটতো।

মুকুল : এ নিয়ে আর তর্ক করবো না। তুমি একটু আগে বিশ্ব সংস্থার নতুন সংবিধানের যে প্রস্তাবটা করেছিলে, সে বিষয় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। এটা চালু করতে হলে তো স্বাধীন দেশগুলোকে বিশ্বসভার আধিপত্য মেনে নিতে হবে। তোমার কি মনে হয় যেসব লোক এখন বিভিন্ন দেশগুলোর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে বসে আছে—তারা স্বেচ্ছায় সে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হবে? আর তা যদি না হয় তো তোমার পরিকল্পনা কার্যকরী হবে কি করে?

জ্যাঠা : কেবল সুবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে হাতের ক্ষমতা ছেড়ে দেবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে যে, আজ এক দেশের স্বার্থ অন্য সব দেশের স্বার্থের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গেছে পৃথিবীর ইতিহাসে আগে তা কখনও ঘটেনি। যত দিন যাচ্ছে এই পরস্পরনির্ভরতা ততো বাড়ছে। তাই অতীতের নজির এ ক্ষেত্রে ঠিক খাটবে বলে মনে হয় না। আমি মানি যে, এই পরস্পরনির্ভরতা এখনও অনেকের কাছে খুব স্পষ্ট হয়নি। তাই সমাজ ব্যবস্থার এই নীতির প্রতিফলন দেখতে খানিকটা সময় লাগবে, কাল-পর্শুর মধ্যে তা হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা যত সুদূরপরাহত বলে তোমার ভয় হচ্ছে মুকুল, ততটা হয়তো নয়।

নন্দিতা : মুকুলের কথা ঠিক তা নয়। ও বলতে চায়, টেকনোলজির চাপে ধনোৎপাদন বন্টনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো যতই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনায়কেরা তার তাগাদা গ্রাহ্য করবে না। ক্ষমতার লোভ অর্থের লোভের চেয়েও বেশী। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তাই শাসনকর্তারা তাঁদের বর্তমান শাসন যন্ত্রগুলো আঁকড়ে পড়ে থাকবে। সাধারণের হিত তারা দেখবে না। যতক্ষণ পুলিস ও সৈন্য-বাহিনী তাদের হাতে, ততক্ষণ তাদের [illegible] কি করে?

জ্যাঠা : এসব কথাই সত্যি। তবু আমি দুটো আশার লক্ষণ দেখি। অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেসব দেশ আজকে সবচেয়ে অগ্রগামী, তাদের অনেক ক্রিয়াকলাপে আগের চেয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় ক্রমশ ফুটে উঠছে। অনেক আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে তাদের প্রতিনিধিদের কথাবার্তায় তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে। এর সপক্ষে রাষ্ট্রসংঘের সমাজ ও অর্থনৈতিক অনেক কাজের উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান সভ্যতার অগ্রদূত এই সব শক্তিশালী দেশের দৃষ্টান্ত অন্যদের প্রভাবান্বিত করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তর চেয়েও বড় কথা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। তাদের যেমন চোখ ফুটবে তেমনি তাদের কেবল রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে বিপথে চালিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। শুধু পুলিস আর সৈন্য বাহিনীর হুমকি দিয়ে সাধারণ মানুষকে তাদের নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালনা করার একটা সীমা আছে। আমরা তার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছি।

নন্দিতা : সোজা কথায় তুমি বলতে চাচ্ছ যে, নিজের হিত ও পরের হিত যে বিপরীত মুখী নয়, ক্রমশ কাছাকাছি এগিয়ে আস

মিশে এসেছে, এ চেতনা আজ যতখানি ছড়িয়ে পড়েছে অতীতের ইতিহাসে তা কোন দিন সম্ভব ছিল না। এই চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ শাসন কর্তাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে বাধ্য করবে।

জ্যাঠা ঃ তার জন্যে সময় লাগবে বলে অস্থির হলে চলবে না। অন্য সব জীব-ধর্মের বা অরগানিক ব্যবস্থার মত সমাজ ব্যবস্থার বিবর্ধনও তার নিজের তালে এগিয়ে চলে। সেই সময়টুকু দেওয়া চাই।

নন্দিতা ঃ তুমি কিন্তু আগে শিখিয়েছিলে যে মানুষের অগ্রগতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক বিবর্ধনের যুগ পেরিয়ে এসেছে। এটা প্ল্যানিং-এর যুগ। অর্থাৎ জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি খাটিয়ে উন্নয়নের গতি আরো দ্রুত করা সম্ভব। সহজ বিবর্ধনের জায়গায় এই প্ল্যান করা সমাজ উন্নয়নকে বিপ্লব আখ্যা দিতে তোমার আপত্তি কি?

জ্যাঠা ঃ কিছুমাত্র না। শুধু মনে রাখতে হবে যে জীব-ধর্ম অবলম্বী যে সমাজবিপ্লব তাকে সার্থক করতে হলে তার ভিত্তি গড়তে হবে সাধারণ মানুষের মনের ভেতর। ফিজিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর জড়পদার্থ-বিদ্যার নিয়ম এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন কি, সোশিয়াল ইনজিনিয়ারিং নাম করলেও আমার আপত্তি হবে। কারণ, ইনজিনিয়ারিং কথাটা বললেই মনে যে ছবির উদয় হয়, সেটা হলো বাইরের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি প্রয়োগ করে একটা ব্যবস্থার সংগঠন। আমরা যে উন্নয়ন চাই তার জন্যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির উৎস ও প্রেরণা আসা দরকার মানুষগুলোর ভেতর থেকে। তা নইলে বিপ্লবের সুফল পাওয়া যাবে না।

মুকুল ঃ একথা আমি মানি না। ইতিহাসে অনেক বিপ্লব ঘটেছে যার শুরুতে হিংসাত্মক রক্তপাত হলেও পরে ভাল ফল পাওয়া গেছে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার পথে বাধা দূর হয়েছে।

জ্যাঠা ঃ কিন্তু খতিয়ে দেখবে তার দাম দিতে হয়েছে অত্যধিক। শুধু যে সাময়িক রক্তপাত ঘটেছে তা নয়, বহু লোকের মনে বিরোধ থেকে গেছে। সেই বিরোধ নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টায় একের পর এক মানবতার আদর্শ বলি দিতে হয়েছে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা অগ্রাহ্য করে গণতন্ত্রের আদর্শকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। পরিণামে যে আদর্শ নিয়ে বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তা অনেকখানি তলিয়ে গেছে। আর যে আদর্শবাদীরা তার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন বিপ্লবের নামে এই সব অমানুষিক দাবির বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগে তাঁদেরই কারাবাস, নির্যাতন, এমন কী প্রাণদণ্ড দিতে হয়েছে।

নন্দিতা ঃ তবে কি পৃথিবীর ইতিহাসে তুমি বিপ্লবকে কোন দামই দিতে চাও না? তুমি কি স্বীকার কর না যে বিপ্লব ও রক্তপাতের সাহায্য নিয়ে মানুষকে অনেক সময় অনেকখানি এগিয়ে যেতে দেখা গেছে? উদাহরণ হিসেবে আমি উল্লেখ করব ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের মুণ্ডচ্ছেদ ও পিউরিটানদের বিদ্রোহ, আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব আর রুশ বিপ্লবের। তোমার কি বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত মাত্রেই আপত্তি?

জ্যাঠা ঃ না, তা বলব না। তুমি যেসব ঘটনার দৃষ্টান্ত দিলে তার প্রত্যেকটাই মানুষকে মুক্তির পথে এগিয়ে দিয়েছে সত্যি। তখনকার কালে এ পথ ভিন্ন গতি ছিল না। তার দামও দিতে হয়েছে বিস্তর, কিন্তু ক্ষতির হিসেব করেও মোটের ওপর লাভ হয়েছে বলেই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তখনকার হিসেব দিয়ে আজকের কাজের বিচার করলে চলবে না। ইতিহাসে যে গ্রীক সভ্যতার মৌলিক দান সর্বস্বীকৃত, তার বাহন ছিল তখনকার প্রচলিত দাসত্ব-প্রথা। তা না হলে সোক্রাটিস প্লাটো, আরিস্টটল, পেরিক্লিস-এর কাজ আমরা পেতাম না। তাই সেকালে দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে সে কথা আর খাটে না। তেমনি আজকের দিনে রক্তাক্ত বিপ্লব প্রায় সব ক্ষেত্রেই অচল। আজকের রাষ্ট্রশক্তির পেছনে আছে কামান, ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান। তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতে হলে দা, কুড়ুল হাতে জনতাকে দিয়ে রাজপথ আটক করে তা হবার নয়। ক্ষতির পরিমাণ হবে অপরিসীম! তা ছাড়াও অনেক কাজ থেকে যাবে অসমাপ্ত, অনেক সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই জন্যেই বলছি, সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের অস্ত্র হিসেবে আজ দাঙ্গা-হাঙ্গামী ঢং-এর বিপ্লব সেকেলে ও অকেজো হয়ে গেছে। একালে এগোবার রাস্তা হলো লোকশিক্ষা ও জনমত সংগঠন।

নন্দিতা ঃ ভুলে যেও না, হিংসাত্মক বিপ্লবের ঢং বদলে গেছে। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ছেলে ছোকরারা পেট্রোলের ড্রাম উলটে রাস্তা আটকে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে লড়াই করতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত বিপ্লবের আধুনিক সংস্করণ হলো গেরিলা-যুদ্ধ। তার হাতিয়ার ইঁট-পাটকেলের মত আর নিরীহ নয় বটে, কিন্তু কলকাতার কালো-বাজারেই তা কিনতে পাবে। নক্সালীরা সব সন্ধান রাখে।

জ্যাঠা ঃ স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে হয়তো গেরিলা বিদ্রোহেরও এ-কালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযোগিতা দেখা যেতে পারে। ভিয়েৎনামকে হয়তো এই পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু খুব অকাট্য যুক্তি নইলে আমি গেরিলা-যুদ্ধকে আমল দিতে রাজী নই। অপচয়ের সম্ভাবনা এতে খুব বেশী। তেমনি ভয়, হিংসা-প্রবৃত্তির অবাধ প্রশ্রয় পাবার। গীতার অনাসক্ত প্রাণহত্যা আমি কোনোমতে বরদাস্ত করতে পারি, কিন্তু ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যায় অবিশ্বাস আমার মজ্জাগত। এ হল যারা জনশিক্ষা এড়িয়ে শর্ট-কাট খোঁজে তাদের পথ। আর এই পথে গণমত উপেক্ষা করে একনায়কত্বের প্রবর্তন সবচেয়ে সোজা।

মুকুল ঃ তুমি দেখছি সব ব্যাপারেই শর্ট-কাট-এর বিপক্ষে। পাহাড়ে চড়তে কোনো দিন পাকদণ্ডী ব্যবহার করনি নিশ্চয়। এ মনোবৃত্তি তোমার জন্মগত, না বুড়ো বয়সে অভ্যাস করেছ?

জ্যাঠা ঃ তুমি আমায় ঠিক ধরে ফেলেছ মুকুল। পাকদণ্ডীতে কোন দিন আমার রুচি ছিল না। কিন্তু সেটা কোনো গভীর তত্ত্ব-জ্ঞানের ফলে নয়, সব সময়ে কায়িক পরিশ্রমে বিমুখতার জন্যে। ফাঁকি দিয়ে বাজিমাত করার প্রবৃত্তি সে বয়সে আমারও ছিল। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছি অনেক পরে।

মিনিট পাঁচ দেরি করে এলেন নেইল আর্মস্ট্রং। পেছনে চার্লস কনরাড। ছুটে গিয়ে ওঁদের দুজনের সঙ্গে করমর্দন করলাম। আর্মস্ট্রংকে বললাম, কেমন অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে না? যে হাত দুটি দিয়ে আপনি পৃথিবীর প্রথম মানুষ, চাঁদের মাটি সংগ্রহ করলেন, তারা এখন আমার মুঠোর মধ্যে? আর্মস্ট্রং-এর উত্তর : মহাকাশ গবেষণায় এটাই আমাদের পরম লাভ। চাঁদ পৃথিবীর মানুষকে অনেক কাছাকাছি টেনে এনেছে। কনরাড পাশে দাঁড়িয়ে ফোড়ন কাটলেন, গো অ্যাহেড কোয়েশ্চেন? আমার উত্তর : ইয়েস স্যাবর! মোনি মোনি! স্পেসিয়ালি অন ইয়োর জেমিনি ইলেভেন অ্যাডভেঞ্চার। 'উভস' হ্যাং এম আপ!' কনরাডের রসিকতা।

হ্যাঁ, ওঁদের জন্যে আয়োজিত এক ব্যক্তিগত মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রিত হয়ে গত নভেম্বর ২৩, সোমবার দিল্লি গিয়েছিলাম। সেখানে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে ওঁদের অভিজ্ঞতার কথা ওঁদের মুখে শোনার জন্যে অনেক প্রশ্ন করেছি। ওঁরা উত্তর দিয়েছেন।...

দেশের বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎরত চাঁদে পদার্পণকারী পৃথিবীর প্রথম মানুষ নেইল আর্মস্ট্রং

নভেম্বর ১৯, দুপুরের দিকে কলকাতার ইউ এস আই এস টেলিফোনে আমাকে খবর দেওয়া হয়, মার্কিন নভোচর নেইল আর্মস্ট্রং এবং চার্লস কনরাড নভেম্বর ২৩ এক ব্যক্তিগত মধ্যাহ্ন-ভোজে উপস্থিত থাকছেন। ঐ অনুষ্ঠানে ভারতের সাতজন বিজ্ঞান লেখক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। কলকাতা থেকে রয়েছেন ডঃ সনৎ বিশ্বাস এবং আমি।

অপ্রত্যাশিত। ওঁদের জানিয়ে দিলাম, আমি যাব।

রবিবার ২২ নভেম্বর দুপুরের প্লেনে ডঃ বিশ্বাস এবং আমি দিল্লি রওনা হলাম। উত্তেজনা আমাদের দুজনেরই। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মত নভোচরদের কাছে পাওয়া যাবে। কলকাতা থেকে চেষ্টা করেছিলাম, বিশেষ সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে নিতে। কিন্তু ওঁরা এত তাড়াতাড়ি ঐ ধরনের কোন ঝুঁকি নিতে সমর্থ হননি। তাছাড়া পুরো ব্যবস্থাদির দায়িত্ব দিল্লি কর্তৃপক্ষের উপর। এঁরা অনুরোধ করলেন, দিল্লি পৌঁছেই আমি যেন সেখানকার ইনফরমেশন বিভাগের মিঃ উইভারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি নিশ্চয় কোন ব্যবস্থা করে দেবেন।

প্লেনেই চাঁদ সম্পর্কে এ পর্যন্ত পাওয়া মোটামুটি তথ্য সম্পর্কিত কাগজপত্র দেখে নিলাম। বলা হয়েছে, একই সৌরমণ্ডলে যমজ ভাই-এর মত মনে হলেও গঠনের দিক দিয়ে পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে গরমিলও রয়েছে যথেষ্ট। পৃথিবীর ভূ-ভাগ এবং সমুদ্র বড় বড় ভূ-স্তরের উপর সদা সঞ্চরণশীল অবস্থায় বাস করছে। ফলে পারস্পরিক ধাক্কায় মহাসাগর কোথাও বা সম্প্রসারিত হচ্ছে, মহাদেশীয় ভূ-ভাগ স্থান পরিবর্তন করছে, সৃষ্টি হচ্ছে নতুন পর্বতমালা, ঘটছে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ।

সে তুলনায় চাঁদের ভূ-স্তর যেন চিরস্থানিক। কঠিন এবং অভঙ্গুর। তবু পৃথিবী তার নিজস্ব কক্ষপথে সঞ্চরণের সময় যখন চাঁদের কাছাকাছি এসে হাজির হয়, তার প্রবল মাধ্যাকর্ষণের টানে চাঁদের ভূগর্ভস্থ কিছু কিছু বায়বীয় পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসে।

গত নভেম্বর ১৮, নাসা চাঁদের পিঠে অ্যাপলো-১২র প্রথম পদার্পণ-বর্ষ পালন করলেন। নভেম্বর ১৯, ১৯৬৯ কনরাড এবং তাঁর সঙ্গী ঝঞ্ঝাসাগরে যে ভূ-পদার্থ বিষয়ক স্বয়ংক্রিয় গবেষণাগারটি স্থাপন করে এসেছিলেন যা এ যাবত চাঁদ সম্পর্কিত বহু তথ্যই সরবরাহ করে এসেছিল এবং এখনও করছে, ঐ অনুষ্ঠানে ম্যাসাচুসেট ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানী ডঃ ফ্রাঙ্ক সম্প্রতি তাদের উপর কিছু মন্তব্যও করেছেন। ওঁরও মনে জিজ্ঞাসা, পৃথিবী এবং চাঁদ একই পর্যায়ভুক্ত হয়েও এত ভিন্ন কেন?

স্বয়ংক্রিয় গবেষণাগার থেকে পাওয়া শুধু বিচিত্রই নয়, জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানীরাও সে সমস্ত থেকে রীতিমত বিভ্রান্ত এবং বিস্মিত। অ্যাপলো-১২-র ভূকম্পন পরিমাপক যন্ত্র পরিবেশিত তথ্য : চাঁদে গড়ে দৈনিক একবার করে ভূকম্পন হয়ে থাকে। কিছু হাল্কা ধরনের, কিছু প্রচণ্ড। বিশেষ করে ঐ যন্ত্রটি যেখানে বসান হয়েছে তার চারপাশে নয়টি বিভিন্ন স্থানে মাসে একবার বেশ শক্ত রকমের ভূকম্পন হতে দেখা গেছে। ঐ সময়ে পৃথিবী চাঁদের নিকটতম অঞ্চলে সঞ্চরণ করে। ভূকম্পনের কায়দা দেখে মনে হয় তাদের উৎপত্তির অন্যতম কারণ শুধু আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণজনিত ঘটনা হতে পারে না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে চাঁদের ভূ-স্তরে যে টানের সৃষ্টি হয়, সেটাও। চাঁদের বুকে নিয়ত উল্কাণুর বর্ষণ চলেছে। আয়তনে তারা খুবই ক্ষুদ্র। তবে মাসে একবার আঙুরের মত আয়তনের উল্কাণুরও পতন

নভেম্বর ২২, মহাত্মা গান্ধীর সমাধিবেদীতে মাল্য অর্পণ করছেন আর্মস্ট্রং এবং কনরাড। পাশে ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কিটিং

ঘটে। কেন, সে তথ্য এখনও অনাবিষ্কৃত। চান্দ্রস্তরের পনের থেকে কুড়ি কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত ভূ-স্তর প্রচণ্ড কঠিন এবং জমাট।

চলেছে সৌর ঝঞ্ঝার সূক্ষ্মকণার নিয়ত ঘর্ষণ, প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার স্থানে সেকেন্ডে পাঁচশটি। এরা মুখ্যত হিলিয়াম, আর্গন, জেনোন এবং ক্রিপটোন গ্যাস। পতনের পর কেউ লেগে থাকে চাঁদের বুকে, কোনটি বা ঠিকরে লাফাতে শুরু করে। এছাড়া, অ্যাপলো-১২-র নভোচররা যে কলকব্জা সেখানে বসিয়ে এসেছিলেন তাদের সাহায্যে এই প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল, পৃথিবীর মত চাঁদেও আয়নমণ্ডল আছে। দ্রুত সঞ্চরণশীল এই আয়নমণ্ডল মুখ্যত হিলিয়ামের স্তর। সম্ভবত অতীতের চান্দ্র-জগত থেকে মহাশূন্যে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পথে এর মধ্যে ধরা পড়ে গেছে। ঝঞ্ঝাসাগর থেকে সংগৃহীত পাথরের গড় বয়েস ৩২০ কোটি বছর। ৪৬০ কোটি বছর বয়স্ক পাথরের সন্ধানও সেখানে পাওয়া গেছে। সেখানে কাচের মত কিছু কণা পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে আছে প্রচুর পটাসিয়াম। গবেষকদের ধারণা, রেখে-আসা যন্ত্রপাতির ৩৭০ কিলোমিটার দূরে, উত্তর দিকে কোপার্নিকাস জ্বালামুখটি তৈরি হবার সময় যে বিস্ফোরণ ঘটে তারই ফলে ঐ কাচ-কণা উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ছাড়া আরও যে সমস্ত তথ্য জানা গেছে তারা : এক, চাঁদের পরিমণ্ডলে পৃথিবীর মত চৌম্বক ক্ষেত্র বিরাজ করছে। তবে খুবেই দুর্বল, পৃথিবীর প্রায় এক হাজার ভাগের এক ভাগ। দুই, চাঁদের ভূ-স্তরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ৮০০ থেকে ১০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তিন, চাঁদের ভূ-স্তরের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ বেসল্ট পাথরে তৈরি। কেন্দ্রের অংশে রয়েছে প্রাচীনতম পাথর পেরিডোটাইট ইত্যাদি। ওঁরা বলছেন, প্রচুর অকসাইডও আছে সেখানে, পৃথিবী থেকে হাইড্রোজেন নিয়ে গিয়ে সেই অকসাইডের অকসিজেন সংগ্রহ করে জল তৈরি করাটা শক্ত হবে না; তার একটি পদ্ধতিও বের করে ফেলেছেন।

*

দিল্লি পৌঁছেই প্রথমে যোগাযোগ করলাম মিঃ উইভারের সঙ্গে। উনি জানালেন, স্পষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় মধ্যাহ্ন ভোজের আসরেই ফুরসত করে নেয়া যাবে। একমাত্র এখানেই ভিড় থাকবে কম।

অতঃপর নভেম্বর ২৩। যথাসময়ে মিঃ গুলেকসিউ-এর বাড়িতে দুই নভোচরের সাক্ষাৎ মিলল। ধীর স্থির আর্মস্ট্রং। যথেষ্ট সংযত। সে তুলনায় কনরাড অনেক বেশি চঞ্চল। সীমিত সময়ের মধ্যে মোটামুটি অনেক কথাই হল ওঁদের দুজনের সঙ্গে। ওঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি প্রভৃতি। একান্ত সাক্ষাৎকারের সুযোগও মিলে গেল। মোটামুটিভাবে একমাত্র দেশ পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার হয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন আমি করেছিলাম এবং ওঁরা যে উত্তর দিয়েছিলেন এখানে উদ্ধৃত করছি :

প্রঃ : মিঃ আর্মস্ট্রং, চাঁদে ঈগল গিয়ে যখন অবতরণ করল, তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার মনের অবস্থা কেমন ছিল।

আর্মস্ট্রং : মনের দিক দিয়ে আমাদের কোন ক্লান্তি বা ভয় ছিল না। বিশেষ করে ঐ সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্মে আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম, একমাত্র কাজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবার মত কোন অবস্থা ছিল না।

প্রঃ : চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রাখার পর আপনি কি কোন রকম অস্বস্তি বোধ করছিলেন ?

আর্মস্ট্রং : না। কারণ, পৃথিবীতেই চাঁদের কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে সম্ভাব্য বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা ভেবে যে ধরনের অনুশীলন আমরা করেছিলাম, চাঁদে গিয়ে তার সবটাই মিলে যায়। আপনারা কাগজেই সে সবের অনেক কিছু পড়েছেন। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। পিঠটা পেছন থেকে দুমড়ে যাওয়ার মত অবস্থা। ডান হাত তুলে কাজ করার সময় লক্ষ রাখতে হচ্ছে বাঁ হাতটা না এলোপাথাড়ি অন্য দিকে সরে যায়। খুব সাবধানেই সমস্ত কাজ করতে হয়েছে।

প্রঃ : চাঁদের মাটিতে পা রাখার পর মুহূর্তে কী করলেন ?

আর্মস্ট্রং : পৃথিবীতেও যা আমরা করে থাকি তাই। অর্থাৎ নতুন জায়গাটা একবার দু' চোখে দেখে নেয়া। খটখটে পাথর। ধুলি, সম্পূর্ণ ন্যাড়া জগতের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে। সূর্য অনেক উজ্জ্বল।

প্রঃ : 'চাঁদ থেকে ফিরে আসার সময়, অর্থাৎ ঈগলের যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে, আপনি কি নিশ্চিত ছিলেন, ঠিক মুহূর্তে এবং সঠিক লক্ষ্য অর্থাৎ কলাম্বিয়ায় আপনারা উঠে আসতে পারবেন ? আমার বক্তব্য, এই পুনর্যাত্রায় কী সমস্ত দায়িত্ব আপনারা যন্ত্রের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন, মিঃ আর্মস্ট্রং ?

আর্মস্ট্রং : সেটা কী করে সম্ভব। যন্ত্রই যদি সব কাজ করবে, তাহলে আমাদের ভূমিকা কী? না, এ ক্ষেত্রেও আমরা নিশ্চিত ছিলাম। ঈগল পরিচালনার ব্যাপারে অনেক সিদ্ধান্তই আমাদের যাচাই করে দেখতে হয়েছে এবং সেই মত কাজ করতে হয়েছে।

প্রঃ : মিঃ আর্মস্ট্রং, ক্রমপরিবর্তন-অভিকর্ষবল, ক্রমপরিবতন কৌণিক গতি, মহাকাশযানের কৃত্রিম আবহাওয়া মণ্ডল প্রভৃতির মধ্যে আপনারা তো বেশ কয়েকদিন যাপন করেছেন। ঐ সময়ে আপনাদের অসুবিধে কিছু হয়নি ?

আর্মস্ট্রং : আপনি বুঝতেই পারছেন মিঃ কর, এগুলি এমন সব অভিজ্ঞতা যাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলে অসুবিধে হওয়ারই কথা। পৃথিবী থেকে দূরে মহাকাশে বিচরণ করার সময় ঐ সমস্ত পরিবেশকে আপনার করে নেয়া, বরং বলা চলে খাপ খাইয়ে চলার মত অনুশীলন আগে থেকেই আমরা করে এসেছিলাম। অসুবিধে আছে বইকি ? যেমন ধরুন, ঘুমের সময় শরীরটাকে ক্যাপসুলের মধ্যে ঠিক-মত রাখা একটা বড় সমস্যা। একটু কিছু নড়াচড়া করতে গেলেই দেহের এক একটি অংশ এক এক দিকে চলে যেতে চায়। তাদের ঠিকঠাক সংহত করা একটু গোলমেলে ব্যাপার বইকি ?

একমাত্র মল্টটনিক যাতে আছে ৬টি ভিটামিন—ভিটামিন বি-১২ সমেত
সুস্বাদু
অস্টোমল্ট
বিশুদ্ধ কমলার রসে ভরা
যোগায় বাড়তি উৎসাহ
যোগায় বেশী খিদে
যোগায় সুস্থ রক্ত
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-এ উজ্জ্বল চোখের জন্য (ওর উজ্জ্বল চোখ এখন খুশিতে ভরা)
অস্টোমল্টে আছে আয়রন,— যা সুস্থ রক্ত গ'ড়ে তোলে (ওর গাল এখন আর আগের মত পাংশুটে নয়)
অস্টোমল্টে আছে রিবোফ্লাবিন আর বি-১২—যা খিদে বাড়ায়. বি-১ হজমে সাহায্য করে (ইদানিং ও দু'বার ক'রে চেয়ে খাচ্ছে)
অস্টোমল্টে আছে মল্ট উৎসাহ আর শক্তি বাড়াতে (ও এখন কত বেশী প্রাণবন্ত, আগের চেয়ে ওর ঘুমও ভাল হয়)
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-ডি— সুস্থ সবল দাঁত আর মজবুত হাড় গ'ড়ে তুলতে (ওর এখন একটি সাইকেল চাই-ই! খুব তাড়াতাড়ি বড়সড় হয়ে উঠছে)
অস্টোমল্টে আছে নিকোটিনামাইড,—যা মুখে স্বাভাবিক এক সুস্থ দীপ্তি ফুটিয়ে তোলে (নাবিকের পোশাকে ওকে ছবির মত সুন্দর দেখায়)
Ostomalt
অস্টোমল্ট
পুষ্টি আর শক্তির জন্য সত্যি অতুলনীয়!

ডান দিক থেকে: দিল্লিতে আর্মস্ট্রং, কনরাড, অলডুন এবং খুনমন্ত্রের সাক্ষাৎকার।

প্রঃ : চাঁদে যতক্ষণ আপনারা ছিলেন, ততক্ষণ সেখানে বড় সড় উল্কাপিন্ড বা অনুরূপ কিছু কি পড়তে দেখেছেন অথবা পৃথিবী থেকে চাঁদে পৌঁছনোর মাঝপথে উল্কার ঝাঁক বা উল্কার ছুটোছুটি—?

আর্মস্ট্রং : না। চোখে পড়ার মত তেমন কিছুই ঘটেনি। মাঝপথেও আমরা তেমন কোন উল্কার সাক্ষাৎ পাইনি। আমাদের ক্যাপস্যুলের ডগায় যে ঘর্ষণ প্রতিরোধকারী তাপসহ ঢালের মত আস্তরণ ছিল তারও গায়ে কোন উল্কার আঘাতের চিহ্ন দেখিনি।

প্রঃ : আমি আমার আগের প্রশ্নে আবার ফিরে আসছি, মিঃ আর্মস্ট্রং। যে সমস্ত কৃত্রিম পরিবেশের কথা আমি একটু আগে বললাম, পৃথিবীতে ফিরে আসার পর আপনার দেহের বা মনের উপর তাদের কী কোন প্রভাব পড়েনি? মানে, এনি বাইওকেমিকেল এফেক্ট?

আর্মস্ট্রং : ওয়েল, দ্যাটস এ কোইশ্চেন, স্যার! নিশ্চয় কিছুটা শারীরিক ত্রুটি ঘটেছিল। প্রথমত, আমাদের শরীরের রক্তের শ্বেতকণিকাদের সংখ্যা অনেকটা কমে গিয়েছিল। ক্যালসিয়ামের মাত্রাও যথেষ্ট কম এবং আরও কিছু কিছু জৈবিক ত্রুটি ধরা পড়েছিল। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে এবং পৃথিবীর পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়ানর জন্যে আমাদের কিছুটা কসরৎ করতেই হয়েছে, মিঃ কর, তার জন্যে নাসার বিশেষজ্ঞরা বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করেছেন, দৈহিক দুর্বলতা আমাদের ছিল। মনের দিক দিয়েও খানিকটা ক্লান্ত—না কী বলব—এ কাইন্ড অব্ ইনডিফারেন্স টু অল থিংস—? পরিষ্কার করে বলা শক্ত।

প্রঃ : কতকটা হোমারের নায়ক ওডেসিউসের মত, কী বলেন? উড়ুক্কুভাব। ব্যাক এগেইন টু ম্যান?

আর্মস্ট্রং : ও—নো! ওয়েল, ইয়েস আই লাইক ইট!

প্রঃ : আপনি কি মনে করেন, এক বছরের কিছু বেশি সময় তো হয়ে গেল—এখন শরীরের দিক দিয়ে কোন গোলমাল কি কিছু বুঝছেন?

আর্মস্ট্রং : এখন? না, ঠিকই তো আছি। প্রথম দিকে কিছু অসুবিধে হয়েছিল।

প্রঃ : বিক্ষিপ্তভাবে আর একটি প্রশ্ন আপনাকে করব, মিঃ আর্মস্ট্রং। আচ্ছা, পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় আপনারা যখন, মানে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন আপনাদের কেমন লাগছিল?

আর্মস্ট্রং : ওয়েল। আমরা তো তখন খুবই ব্যস্ত। দৃষ্টিশক্তিটা কিছুটা গোলমাল শুরু করে। চোখের সামনে বিচিত্র রঙ ভেসে উঠছে। কখনও রামধনুর মত, কখনও লাল, কখনও হলদে।

প্রঃ : এই যে রঙবাহারী কাণ্ড, একি বাইরের পরিবেশের জন্যে হচ্ছিল, আই মিন, হোয়েদার অল দিজ হ্যাপেন্ড ডিউ টু ফিজিক্যাল ফোর্সেস আউটসাইড ইয়োর ক্যাবিন, মিঃ আর্মস্ট্রং?

আর্মস্ট্রং : ওয়েল দেয়ার ওয়াজ ফোর্সেস আউটসাইড। তবে চোখের স্নায়ুর উপর কোন প্রতিক্রিয়ার দরুনই এমনটি হয়ে থাকবে। যদি আপনার মাথায় একটি কিল মারি, তেমনটি দেখেন—!

আমি : ধন্যবাদ, মিঃ আর্মস্ট্রং

আর্মস্ট্রং : ধন্যবাদ। এই সঙ্গে তোমাদের পাঠক-পাঠিকাদেরও।

অতঃপর চার্লস কনরাড জুনিয়ার। ওঁকে কাছে পেতে একটু সময় লাগল। অত্যন্ত অমায়িক এবং গল্প করার সুযোগ পেলে তাকে পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করতে কসুর করেন না। চার বছর বয়েস থেকেই চশমা। নিজের হাতে পেলেন তৈরির নেশা তখনই। প্রিন্সটোনের সেরা ছাত্র। প্রিন্সটোনেরই ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট। ঝানু সুপারসোনিক জেটের পাইলট। পরে মহাকাশচারী। এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাও অনেক। জেমিনি-৫, জেমিনি-১১ এবং অবশেষে অ্যাপলো-১২-র অধিনায়ক। বিশেষ করে জেমিনি-১১-র ঐতিহাসিক মহাকাশে অ্যাজেনা রকেটের সঙ্গে মিলনের পরীক্ষা আগেই প্রমাণ করেছিল সাধারণভাবে একজন ছটফটে, একরোখা এবং গল্পবাজ মানুষ হলেও কাজের সময় কনরাড ইস্পাতের মত শক্ত। মহাকাশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও অনেক। বিশেষ করে অ্যাপলো-১২-র অধিনায়করূপে দীর্ঘ সময় চাঁদের বুকে বিচরণ এবং সার্ভেয়ার-৩-এর কিছু যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন তাঁর এবং তাঁর সহকারী নভোচরদের
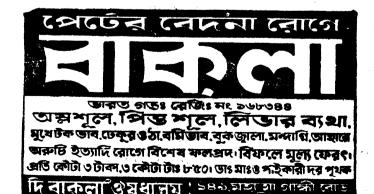
To the Staff and
Subscribers of DESH —
With very best Wishes

Neil [illegible]

Apollo 11
23.11.70

To
The Readers of the Desh Weekly,
Enjoy your work
like I enjoy mine
& you'll have as much
success.
Sincerely
Charles Conrad
11/23/70

'দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশে আর্মস্ট্রং এবং কনরাডের শুভেচ্ছা

বড় রকমের একটা কৃতিত্ব। অতএব গল্পের ঝাঁপি খুললে, ওঁকে রোখা শক্ত।

তবু সুযোগ মিলে গেল। ভিড় থেকে একান্তে সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম।

অতএব।

প্রঃ : মিঃ কনরাড, সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৬৬-র ঐতিহাসিক ঘটনা আমি কিন্তু এখনও ভুলিনি। ঐ দিন জেমিনি-১১-কে উৎক্ষেপ করা হয়। এর অধিনায়ক ছিলেন আপনি আপনার সহযোগী মিঃ রিচার্ড এফ গর্ডন। আপনারা ডিসেম্বর ১৫ পৃথিবীতে ফিরে আসেন। ঐ সময়ে আপনারা দুটি প্রচণ্ড কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এক, গর্ডনের দীর্ঘ সময় ধরে মহাশূন্যে জেমিনি ক্যাপসুলের বাইরে বিচরণ এবং দুই, অ্যাজেনার সঙ্গে জেমিনি-১১-র মিলন। আচ্ছা, গর্ডন বাইরে ভেসে চলার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কেন, সেই অভিজ্ঞতার কথাটা দয়া করে একটু বলুন।

কনরাড : টেরিবল। মনে আছে দেখছি তোমার। হ্যাঁ, প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে গর্ডনের ক্যাপস্যুলের বাইরে ভেসে বেড়ানর কথা ছিল। কিন্তু চুয়াল্লিশ মিনিট পর প্রথমবার দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মহাকাশ পোশাকের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত গ্যাস চলাচল ব্যবস্থায় কিছুটা গোলমাল দেখা দেওয়ায় অমনটি ঘটে। ওর চোখমুখ ভীষণভাবে ঘামতে থাকে। খানিকটা ক্লান্ত হয়েও পড়েছিল সে। শরীরে প্রচণ্ড ঘাম। আমাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গোলমালে ওর শরীরের রক্তচলাচলে কিছুটা অসুবিধে দেখা দেয়। অবশ্য পরে আমরা সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করে ফেলি।

প্রঃ : এর জন্যে কতটা আপনাদের 'রিমোট কন্ট্রোল' অর্থাৎ হিউস্টনের কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল এবং কতটা নিজেদের উপস্থিত বুদ্ধি এবং কর্মকুশলতা কাজে লাগিয়েছিলেন?

কনরাড : হিউসটনের উপর আমাদের খুবই নির্ভর করতে হয়েছে। বিশেষ করে ওঁদের নানা রকম উপদেশ প্রভৃতি। তবে প্রারম্ভিক সুবিধে অসুবিধে যাচাই করার দায়িত্ব

আমাদের উপর ছিল। যাকে বলে ফার্স্ট এইড। ঠিক ঐ মুহূর্তে যান্ত্রিক সাহায্যের থেকে আমাদের উপস্থিত বুদ্ধিরই প্রাধান্য ছিল বেশি। আর সেটাই তো আমাদের কাম্য। আমরা তো শুধু যন্ত্রের সাফল্যের জন্যে কাজ করছি না, মানুষই লক্ষ্য। মানুষের প্রয়োজন মেটানর জন্য যন্ত্রকে কতটা পারদর্শী করে তোলা যায় সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রঃ : আপনার যাত্রা করার পূর্বে দূর কক্ষ পথে একটি অ্যাজেনা রকেট পাঠান হয়েছিল। তাতে অতিরিক্ত জ্বালানি সংরক্ষিত ছিল। আর সেই জ্বালানি ব্যবহার করে আপনারা সুদূর কক্ষপথে পাড়ি দিয়েছিলেন। খুবই কঠিন কাজ, তাই নয় কি মিঃ কনরাড?

কনরাড : ওয়েল, মিঃ কর। কঠিন কিনা জানি না, ঝক্কি ছিল। আমার দায়িত্ব ছিল পৃথিবী থেকে দু'শ মাইল দূরে আগে পাঠান অ্যাজেনার সঙ্গে মিলিত হওয়া। গোড়ার দিকে সবই রিমোট কন্ট্রোল করে দিয়েছে। তবে মিলনের সময় রেট্রো-রকেট ব্যবহার করে ঠিকমত তার গা ঘেঁষে দাঁড়ানর দায়িত্ব আমাদের উপরেই ছিল। সেটা আমরা করেছি অনেকটা নিজেদের চেষ্টায়। তারপর ওই অ্যাজেনায় সংরক্ষিত জ্বালানির সাহায্যে আমরা প্রায় সাড়ে আটশ' মাইল দূরে সরে যাই। ঐ সময়ে আমাদেরও বেশ কিছু কাজ করতে হয়েছে।

প্রঃ : মিঃ কনরাড, অ্যাপলো-১২-র নায়করূপে আপনাকে তো চাঁদের পিঠে অনেক কাজই করতে হয়েছে। আপনারাও বেশ কিছু পরিমাণ চাঁদের পাথর কুড়িয়ে এনেছেন। কথা বলেছেন সেখান থেকে, ছবি তুলে পাঠিয়েছেন, সবই আমরা পৃথিবী থেকে রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করেছি। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, মানুষকে চাঁদে না পাঠিয়েও ঐ কাজ করা সম্ভব। তাতে জীবননাশের ঝক্কি কম, খরচও কম। অর্থাৎ আমার প্রশ্ন রবটকে দিয়েও তো ঐ কাজ করা যেত? নাকি আপনাদের গবেষণার গতিমুখ ভিন্নতর?

কনরাড : ভেরি কানিং কোয়েশ্চেন! আমি আগেই বলে রাখি, মিঃ কর, সোভিয়েত দেশের যন্ত্রযান লুনা-১৬ এবং ১৭-র সাফল্য মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে অনবদ্য। প্রযুক্তির দিক দিয়ে ওঁদের এই সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যৎ মহাকাশ গবেষণায় নিশ্চয় তা পরিপূরকরূপে কাজ করবে। তবে আগেই আমি বলেছি, গোড়া থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল চাঁদে মানুষ পাঠান। ফলে আমাদের ব্যবস্থাপনাও ভিন্নতর। যথেষ্ট জটিলও বটে। যেমন ধরুন, আমি যখন চাঁদে নামলাম, সেখানে নানারকম কাজ-কর্মের দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। পাথর সংগ্রহের কথাই ধরুন? আমাদের এবার চাঁদে গিয়ে ভূবিজ্ঞানীদের মত বিভিন্ন ধরনের পাথর চিনে বের করতে হয়েছে। কোনটা আমাদের গবেষণার জন্যে দরকার হতে পারে, কোন ধরনের পাথর বা ধূলিকণা না নিলেও চলবে, এসব আমাদের দেখতে হয়েছে। আমরা মনোমত নমুনা সংগ্রহ করেছি, অর্থাৎ মানুষের যে বুদ্ধি, পরিবেশের মধ্যে পড়েই শুধু যে বুদ্ধি কাজ করে—তাকে আমরা কাজে লাগিয়েছি। এই কাজে লাগানর ব্যাপারে যতটা যান্ত্রিক সাহায্য দরকার তা আমাদের নিতে হয়েছে। এবার বলুন ঐ পাথর বাছাই-এর কাজ কি রবট বা যন্ত্রমগজ করতে পারত? উদাহরণ আরও আছে। সত্যিই যদি কিছু করতে হয়—মানুষকেই দরকার। যন্ত্র কোনদিন মানুষের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে নিতে পারবে কী না, কবে পারবে, জানি না।

আমি : ধ[illegible]দ, মিঃ কনরাড।

কনরাড : সেম টু ইউ [illegible]!

সংবাদ

নভেম্বর ২১-২৮ ফেডারেশন এরোনটিক ইনটারন্যাশনেল-এর ৬৩তম সাধারণ সমাবেশ উপলক্ষে সোভিয়েত নভোচর ই ভি ভালিনভ, ই ভি খ্রুনভ এবং মার্কিন নভোচর নেইলা আর্মস্ট্রং ও চার্লস কনরাড নতুন দিল্লি এসেছিলেন। বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় আমাদের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আর্মস্ট্রংকে এফ এ আই স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। কনরাডকে ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশ স্বর্ণপদক অর্পণ করা হয়। এছাড়াও ও'রা দুজন এবং নভোচর রাসেল এল সইশকার্ট (অ্যাপলো-৯), ভালিনভ এবং খ্রুনভকে দ্য লা ভলাকস মেডেল অর্পণ করা হয়েছে। ফেডারেশনের উদ্দেশ্য মহাকাশ গবেষণাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত করা।

সমরজিৎ কর
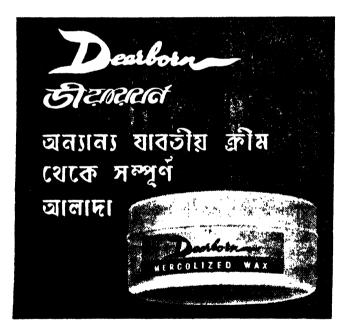
আমেরিকা ও ইউরোপের ছাত্র র‍্যাডিকালরা আজ পৃথিবীময় সংবাদ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, এই সব ছাত্র র‍্যাডিকালরা কেউ বা অ্যানার্কিস্ট, কেউ বা নিহিলিস্ট, কেউ বা ট্রট্স্কীপন্থী—অন্য অনেকে মাও-সে-তুং, চে গুয়েভারা ও রেজিস দেব্রের নাকি মন্ত্রশিষ্য। তবে দার্শনিক দিক থেকে হার্বার্ট মারকিউজ যে এদের অনেকেরই গুরু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মারকিউজের জন্ম জার্মানীতে—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। বার্লিন ও ফ্রীবুর্গে পাঠ সমাপন করে রোজা লাক্সেমবুর্গের বিপ্লবী আন্দোলনে তিনি কিছুকাল সক্রিয় ভূমিকা নেন। শোনা যায়, "ফ্রাংকফুর্ট স্কুল অব মার্কসিস্ট সোসিওলজি" স্থাপনেও তাঁর কিছুটা উদ্যোগ ছিল। ১৯৩৩ সালে জেনেভার "ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল রিসার্চ"-এ কিছুকাল কাজ করে মারকিউজ আমেরিকায় চলে যান। সে দেশে গিয়ে গবেষক অথবা অধ্যাপক হিসাবে কলম্বিয়া, হার্ভার্ড, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে থাকেন।

ভাবতে অবাক লাগে যে, ১৯৬৮ সালের পূর্বে মারকিউজ আমেরিকাতেও সামান্যই পরিচিত ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর Reason and Revolution (1940), 'Eros and civilisation' (1955) এবং Soviet Marxism—A critical analysis (1958) প্রকাশিত হয়েছে। তবুও কি বিদ্বজ্জনসমাজে কি ছাত্রমহলে মারকিউজ তখনও খুব প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নি। ১৯৬৪ সালে তাঁর 'One dimensional Man' প্রকাশিত হয়। এই বইটি এবং "A critique of pure tolerance" (1966) [প্রবন্ধ সংকলন কয়েকজন লেখকের]। প্রকাশিত হবার পর মারকিউজের বৃহস্পতি তুঙ্গে উঠল, অকস্মাৎ ইয়োরোপে ও আমেরিকার নয়া-বামপন্থী মহলে তিনি গুরুর আসন পেলেন। ১৯৬৮ সালের ছাত্রদের "ফরাসী বিপ্লব"-এর পর তো তাঁর খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে কোন কোন মহল থেকে তাঁকে 'C I A'-এর গুপ্তচর আখ্যাও দেওয়া হয়।

হেগেলপন্থী মারকিউজ :—

একদা মারকিউজ নিজেকে 'যুক্তিবাদী হেগেলপন্থী' বলতে ভালবাসতেন। আধুনিক অনেক পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে, হেগেলদর্শনে এমন উপাদান বর্তমান যার পরিণত ফল হিসাবে টোটালিট্যারিয়ান, বদ্ধ সমাজের উদয় সম্ভব। অনেকে তো এমন কথাও বলতে চান যে, "ফ্যাসিবাদী ধ্যান-ধারণার উৎস-সন্ধানে বেরুলে হেগেল-দর্শনেও পৌঁছতে হবে।" হেগেল-শিষ্য মারকিউজ 'Reason and Revolution' গ্রন্থে এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। বৃটিশ দার্শনিক এল. টি. হবহাউস্ হেগেলের মতামতকে বলেছিলেন 'wicked doctrine',—'ক্ষতিকর মতবাদ', 'যার প্রভাবে ১৮।১৯ শতকের সবিচার মানবিকতাবাদের প্রাণরস নিঃশেষ হয়েছে।' মারকিউজ এ ধরনের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। নাৎসীবাদ কিংবা ফ্যাসিবাদ যুক্তির মানদণ্ড বর্জন করেছে, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করেছে। আর হেগেলের দর্শন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের ধ্যানধারণাকে মর্যাদা দিয়ে তাদের ঐতিহাসিক পরিণতির দিগ্দর্শন নির্ণয় করতে চেয়েছে। ফলে মারকিউজ বলেছেন : "There can be no meeting ground between them and Hegel" (পৃ, ৩৯০)। হেগেলদর্শনের প্রগতিশীল দিক খুঁজে বার করায় আপত্তি হবার কথা নয় যদি উৎসাহের আতিশয্যে কোন লেখক উদ্ভটতত্ত্বের আশ্রয় না নেন। ১৯৩৪ সালে একটি প্রবন্ধে [The struggle against liberalism in the totalitarian State] মারকিউজ বলেছিলেন : লিবারেল মতবাদ ও ফ্যাসিবাদ টাকার এপিঠ-ওপিঠ। অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লিবারেল মতবাদের রূপান্তরের তাগিদ দেখা দেয়। ফলে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটে। এই ফ্যাসিবাদ "রূপান্তরিত লিবারেল মতবাদ" ছাড়া অন্য কিছু নয়। 'Reason and Revolution'-এও মারকিউজ মোটামুটি এই বক্তব্য রেখেছেন। হেগেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন যে, "লিবারেল মতবাদের (সমাজদর্শন হিসাবে) বিমূর্তের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা, কিন্তু বাস্তবের কাছে এর পরাভব অনিবার্য।" '[Liberalism sticks to the abstract and is always defeated by the concrete]" অর্থাৎ লিবারেল মতবাদের নীতিগুলি যথার্থ, বিমূর্ত স্তরে। 'স্বাধীনতা', 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য', 'প্রগতি', —এসব নীতিকে অস্বীকার করবে কে? কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে, সম্পত্তি ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার স্বার্থে লিবারেল মতবাদ এসব নীতিকে বর্জন করে এবং ফ্যাসিবাদের রূপ গ্রহণ ক'রে বিপরীতে রূপান্তরিত হয়। মারকিউজ তাই বলেছেন যে, লিবারেল মতবাদের সারবস্তু আজ মার্কসীয় সমাজ-তন্ত্রেই টিঁকে আছে। "লিবারেল মতবাদকে সার্থক রূপ দিতে হলে এ যুগের দাবি হবে 'সমাজ রূপান্তর কর'। আর ঠিক এই দাবি নিয়েই মার্কসীয় সমাজতন্ত্র হাজির।"

"The principles of liberalism are valid; the common interest cannot be other, in the last analysis than the product of the multitude of freely developing individual selves in society.. But the concrete forms of society that have developed since the 19th century have increasingly frustrated the freedom to which liberalism counsels allegiance. Under the laws that govern the social process, the free play of private initiative has wound up in competition among monopolies for the most part....
Social theory was faced with the alternative either of abandoning the principles of liberalism so that the existing social order might be maintained, or of fighting the system in order to preserve the principles. The latter choice was implied in the Marxian theory of society". [Pp 397-98]

মজার বিষয় এই যে, মারকুইজ জার্মানীর লোক। নাৎসী বর্বরতার কাহিনী ১৯৪০ সালে পৃথিবীর মানুষ জেনেছে। লিবারেল-ক্যাপিটালিস্ট দেশ ইংলণ্ড তখন ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। অন্যদিকে রাশিয়া ও জার্মানী তখন অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে আলিঙ্গনাবদ্ধ। অথচ ঐ সময় মারকিউজ আবিষ্কার করলেন যে, সমাজতন্ত্রই লিবারেল মূল্যবোধের ধারক ও বাহক, আর লিবারেল মতবাদই ফ্যাসিবাদের যমজ ভাই। বাস্তব

সম্পর্কে অনাগ্রহ, উদ্ভটতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ, নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্য থেকে তথ্য আহরণ ক'রে পাঁচমিশেলী, চটকদার মতবাদ খাড়া করবার প্রবণতা, এ সবই মারকিউজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

নব্য ফ্রয়েডীয় মার্কসবাদ :

"Eros and Civilisation"-কে মারকিউজ নাম দিয়েছিলেন 'ফ্রয়েড্ সম্পর্কে দার্শনিক বিচার'। মারকিউজ নিজেকে যতই যুক্তিবাদী বলে জাহির করুন না কেন, এ বইটি থেকে দেখা যায় যে, তিনি জাত-রোমান্টিক এবং ইউটোপিয়ান। জ্ঞানমার্গে তিনি বিচরণ করতে চেয়েছেন, তবুও কাব্য ও সৌন্দর্যতত্ত্ব বিচারে মারকিউজের প্রতিভা যে স্বাভাবিকভাবে পথ করে নেয় এই বইটি তার প্রমাণ। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের জগতের আত্মশোধনের (self-sublimation) মধ্য দিয়ে কেমন করে মুক্ত সংস্কৃতির প্রবাহ সৃষ্টি হয়, সাহিত্য ও পুরাণ ঘেঁটে সে কাহিনীর সুনিপুণ আলোচনায় মারকিউজ সিদ্ধহস্ত। সহৃদয়-হৃদয়বেদ্যতা তাঁর আছে। কাজেই কি শীলারের আলোচনায়, কি রিল্কের আলোচনায়, কি বোদলেয়ারের মূল্যায়নে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

অবশ্য 'Eros and Civilisation'-এর মূল উপজীব্য শোধিত ফ্রয়েডীয়ানার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মেলবন্ধন। মারকিউজের মতে ফ্রয়েড্ ছিলেন আমাদের সমকালীন সভ্যতার দীপ্তিমান সমালোচক। নানা বিস্ময়কর ক্রান্তিকারী সূত্রের তিনি উদ্ভাবক। আর এই সব মৌলিক সূত্র মানলে ফ্রয়েডবাদের অনেক অনেক সূত্র বর্জন করতে হয়। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য অবদমনের প্রয়োজন। সহজাত প্রবৃত্তিগুলি বে-আব্রু হয়ে যদি আত্মপ্রকাশ করে, জনারণ্যে মাতামাতি করে, তবে সভ্যতার টিঁকে থাকবার সম্ভাবনা নেই। মারকিউজ বলছেন : ফ্রয়েডের কথা একটু শোধন করে বলা যায় যে, আমাদের সমাজে অবদমন প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, সমাজ ও সংস্কৃতির স্থিতিশীলতার দাবিতে অবদমনের পরিসর হয়েছে বহুধাবিস্তৃত। প্রকৃত ফ্রয়েডবাদ এই মাত্রাতিরিক্ত অবদমনের সাফাই-এর মন্ত্র নয়। ফ্রয়েডের 'নয়া ভাষ্য' ক'রে মারকিউজ বলেছেন, অবদমন দু' ধরনের,—(ক) মৌলিক এবং (খ) বাড়তি (surplus)। মৌলিক অবদমন না থাকলে অজাচারন্যায় দেখা দেবে, সমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার। কিন্তু 'বাড়তি' অবদমনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সামাজিক ও শ্রেণী-প্রাধান্য বজায় রাখবার তাগিদে সমাজ এসব অবদমনের গুণগান করে, প্রয়োজন হলে রক্তচক্ষুর ভয় দেখিয়ে অবদমন অভ্যাস করতে শেখায় মানুষকে। মারকিউজ বলেছেন, মুক্ত সংস্কৃতির রাজ্যে বাড়তি অবদমনের রেশ থাকার কথা নয়। এবং যদি এই অবদমন থাকে তবে সংস্কৃতিকে মুক্ত ও নিপীড়নহীন আখ্যা দেওয়া চলে না।

আগেই বলেছি, মারকিউজ 'Eros and Civilisation'-এ মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ভেদাভেদ স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সমকালীন সমাজে মনোবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক-সামাজিক তত্ত্বের মধ্যে ঐতিহ্যগত সীমানা আজ সর্বাংশে বাতিল হয়ে গেছে,—"obsolete by the condition of man in the present era" মানুষের বিচ্ছেদ বা "অ্যালিয়েনেশন"ই এ যুগের অস্তিত্বের চরম সংকট।

'Reason and Revolution'-এ বামপন্থী শব্দসম্ভারে প্রথম এই পদটি ব্যবহার করেন মারকিউজ, জর্জ লুকাচ্-এর পরই অ্যালিয়েনেশনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথে গেছেন ফ্রয়েড। আর এর সামাজিক কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন মার্কস। সমাজে আজও যে 'বাড়তি' দমনপীড়ন চালু আছে, সেই দমনপীড়নের ফলে ব্যক্তির চিত্তভূমিতে দেখা দেয় যে মানসিক সংঘাত তার বেশীর ভাগই বাড়তি অবদমনের অপ্রত্যক্ষ ফল। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রাধান্য বিস্তারের তাগিদে এই অবদমন চালু রাখে স্থিতিশীল, অনড় সমাজ। তার ইতিহাস আলোচনা করেছেন মার্কস। অথচ মুক্ত বুদ্ধ মানুষ চায় এই বাড়তি নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পেতে। অ্যালিয়েনেশনকে বাতিল করতে না পারলে একদিকে যেমন 'সভ্যতার অসন্তোষ' দূরীভূত হবে না, তেমনি মানুষও প্রতিষ্ঠিত হবে না তার স্বকীয় মনুষ্যধর্মে।

মারকিউজের মার্কসবাদ :—

প্রায় তিরিশ বছর আগে 'Reason and Revolution'-এ মারকিউজ মার্কসের তৎকালে অল্পপরিচিত একটি দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আজকাল 'অ্যালিয়েনেশন' তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনার ছড়াছড়ি। কিন্তু তিরিশ বছর আগে এ আলোচনা দুর্লভই ছিল। "Reason and Revolution"এ মার্কসের (ক) বিযুক্ত শ্রম (alienated labour), (খ) শ্রমের বিলোপ (abolition of labour) (গ) শ্রমপ্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ (the analysis of the labour process) এবং (ঘ) মার্কসীয় ডায়ালেকটিক (The Marxian Dialectic) প্রসঙ্গে মূল্যবান আলোচনা আছে।

এখানে স্মরণ রাখা ভাল যে মারকিউজ কমিউনিস্ট পার্টি অনুমোদিত 'মার্কসবাদী' কোনকালেই ছিলেন না, আজও নন। ১৯৫৮ সালে লেখা 'Soviet Marxism' গ্রন্থেও মার্কসবাদের (সোভিয়েট দেশের) তত্ত্ব ও প্রয়োগকথার বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা আছে। তবে এই আলোচনার নাম তিনি দিয়েছেন — immanent criticism, অন্তর্লীন বিচার। আলোচনা প্রসঙ্গে মারকিউজ প্রায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কি বহিরঙ্গের বিচারে, কি অন্তরধর্ম-বিচারে, সোভিয়েট দেশ ও মার্কিন দেশের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। লেনিনবাদ তো মার্কসবাদেরই একটি বিশেষ ধারা। অথচ লেনিনবাদ আশ্রিত স্টালিন-প্রবর্তিত সোভিয়েট সমাজ কেমন হল? মারকিউজ বলেছেন, এ সমাজ টোটালিটারিয়ান রূপ পূর্ণাঙ্গ লাভ করেছে। ফলে এ সমাজের সংস্কৃতির অন্দরমহলে নিপীড়নের ছাপ। যে সব কারণে মারকিউজ শিল্পায়িত অসুন্দর মার্কিনী সমাজের যন্ত্রপুরীর বিপক্ষে, প্রায় সেই সব কারণেই তিনি সোভিয়েট সমাজেরও বিপক্ষে। শুধু তাই নয়। 'Soviet Marxism'-এ মারকিউজ বলেছেন যে, টোটালিটারিয়ান ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় হেয়, গণতন্ত্রের শত ত্রুটি সত্ত্বেও।

পূর্বেই বলেছি যে, মারকিউজ মনে করেছেন যে, লিবারেল মূল্যবোধ বেঁচে থাকবে সমাজতন্ত্রে। তিনি কল্পনার নিকষে যে সমাজতন্ত্রের অনুরাগী সেই সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের কিম্বা পার্টিতন্ত্রের কিম্বা সমাজপতিদের অহেতুক নিপীড়ন নেই। সেখানে ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশের জন্য প্রশস্ত 'স্বাধীনতা' সেখানে তত্ত্বকথার আড়ালে শূন্যে বিলীন হয় না। ফলে মারকিউজের মার্কসবাদের সঙ্গে অ্যানার্কিজমের আত্মীয়তা অনেকখানি। এবং 'অ্যানার্কো-মার্কসবাদী' মারকিউজই অধুনা নয়াবামপন্থীদের অনেকেরই গুরু।

একমাত্রিক মনুষ্যপ্রাণী :

'Eros and civilisatjon'-এর উচ্ছল আশাবাদ ও ইউটোপীয় মানসিকতার অবসান ঘটেছে মারকিউজের 'One-dimensional man' নামক পুস্তকে। কয়েক বছরের ব্যবধানে মারকিউজের অনেকখানি মোহভঙ্গ হয়েছে। নিপীড়নহীন সভ্যতায় তার অগাধ বিশ্বাস শিথিল হয়েছে এ ক' বছরে। ইতোমধ্যে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সমকালীন সব সভ্যতাই (সোভিয়েট, মার্কিনী প্রভৃতি) বিশেষত মার্কিনী সভ্যতা, নিপীড়নকে বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। এ সব সভ্যতার ছত্রছায়ায় মানুষের প্রকৃত মুক্তি নেই।

মারকিউজ সমকালীন সমাজের ছবি এঁকেছেন দক্ষতার সঙ্গে। আধুনিক সমাজে সমাজ বৃহদায়তন শিল্পের প্রাধান্য, এ সমাজ নগরকেন্দ্রিক, বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্ভর। এ সমাজের মানুষ-এর স্বাধিকার নেই। এ সমাজের মানুষের বিচার-বিবেচনা, রুচি-বুদ্ধি, সবই নিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে। এ সমাজে হয়তো 'গণতন্ত্র' আছে। কিন্তু আসলে এ ব্যবস্থায় জন-সাধারণের কোন ভূমিকা নেই। নেপথ্যচারী শক্তির হাতে তারা শুধু ক্রীড়নক। এই ব্যবস্থায় রেডিও, সংবাদপত্র, টেলিভিশনের দৌরাত্ম্যে মানুষ-এর চেতনা দুষ্ট হয়েছে, এন্টারটেনমেন্টের কর্তারা, কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা এবং বিত্তবানেরা সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে প্রাধান্য বজায় রেখেছে। গণতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে মারকিউজের বিশেষ সমালোচনা এই যে, এই সমাজে মানুষ দাসত্বকে 'স্বাধীনতা' বলে ভুল করেছে। 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে আমাদের', 'আমরা ভোট দিতে পারি', এই সব আপাত সত্যকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে, মানুষ বন্ধনকে পছন্দ করতে শিখেছে। অবস্থা আজ এমন হয়েছে যে, মানুষ পোশাক-আশাক, তৈজসপত্র ও বস্তু-সম্ভারের মধ্যে নিজেদের তৃপ্তি খুঁজে পায়। মোটরগাড়ি, বাড়ি, সুন্দর রান্নাঘর নিয়ে 'আত্মাকে যেন আবিষ্কার করে। "The means of mass transportation and communication, the commodities of lodging, food and clothing, the irresistible output of the entertainment and information industry carry with them prescribed attitudes and habits, certain intellectual and emotional reactions which bind the consumers more or less pleasantly to the producers and, through the latter, to the whole". শিল্পজাত দ্রব্য যত বেশী মানুষের হাতে পৌঁছচ্ছে ততই মানুষের প্রাণ মন চৈতন্য এক ছাঁচে বাঁধা পড়ছে, মানুষ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সাবিবদ্ধ জীবনপাতে অভ্যস্ত হচ্ছে এবং এ জীবনকে ভালও বাসছে। এখানেই মারকিউজের আপত্তি।

একথা সত্য যে পাশ্চাত্ত্যে ও আমেরিকায় শিল্পায়িত সম্পন্ন সমাজ—'অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি' গড়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়েছে। কিন্তু মারকিউজ বলেছেন যে, এই উন্নতি শুধুই প্রতিভাস। কারণ সম্পন্ন সমাজ হয়েছে আচারনিষ্ঠ—কনফর্মিস্ট সমাজ, যে সমাজে মৌলিক রূপান্তর অর্থাৎ 'বিপ্লব'-এর কামনা নেই। এই সমাজের বাসিন্দারা সম্পন্ন সমাজের ক্রীতদাসই বটে। মারকিউজ বলেছেন, **The slaves of developed industrial civilisation are sublimated slaves, but they are slaves, for slavery is determined neither by obedience nor by hardness of labour but by the status of being a mere instrument, and the reduction of a man to the status of a thing."**

সম্পন্ন সমাজের তার্কিক হয়তো বলবেন, "আমাদের সমাজে স্বাধীনতা আছে, অবাধ নির্বাচন আছে, সাম্যের দিকে আমাদের সমাজ অগ্রসরমান। এ সমাজে ক্রেতা ও ভোক্তাদের (Consumer's choice) পছন্দ-অপছন্দ করে জিনিসপত্র কেনবার স্বাধীনতা আছে; এমন কি এ সমাজে যৌন স্বাধীনতাও অনেকখানি স্বীকৃত। মারকিউজ বলেছেন, এ সব স্বাধীনতাই মায়া; আসলে অসৎ (unreal) কিন্তু সৎ (real) বলে এদের প্রতীতি হয়। আর এ সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য ও অন্যান্য বৈষম্যও আপাতসাম্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে। ফলে সব মিলিয়ে "সম্পন্ন সমাজ নরকই বটে" (hell of the Affluent Society)। মারকিউজ বলেছেন: "If the worker and his boss enjoy the same television programme and visit the same resort places, if the typist is as attractively made-up as the daughter of her employer, if the Negro owns a Cadillac, if they all read the same newspaper, then this assimilation indicates not the disappearance of classes, but the entent to which the needs and satisfactions that serve the preservation of the establishment are shared by the underlying population". উচ্চ-চাপা শিল্পায়িত সমাজ সম্পর্কে মারকিউজের মূল অভিযোগ এই যে, এ সমাজে বিদ্রোহের আবেগ স্তিমিত হয়ে যায়, শ্রমিকেরা নানাভাবে শ্রমিক সংগঠন ও মালিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে এবং নিজেদের চালু অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। শ্রমিক যদি ভাবে, "আমার অবস্থা তো ভালই হচ্ছে, আমি গাড়ি-বাড়ি, মোটর, ফ্রিজ কিনতে পারছি" তবে তার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সঞ্চালক শক্তি হবার যে যোগ্যতা নেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সম্পন্ন সমাজে শ্রমিক এবং বুর্জোয়া, প্রচলিত সমাজকাঠামোর সুযোগসুবিধা পেয়ে, এই কাঠামো বজায় রাখতে ব্যস্ত। তাদের রোগ একই। টি-বি রোগী যেমন ভাবে "আমি বেশ আছি, সেরে উঠছি", তেমনি এরাও সুখকর কিন্তু অলীক চৈতন্যের শিকার। শিল্পায়িত সমাজ সৃষ্টি করেছে একমাত্রিক মানুষ (one dimensional man) এবং আজ 'গণতান্ত্রিক' ও 'টোটালিটেরিয়ান' সমাজ একই লক্ষ্যে ধাবমান। "By virtue of the way it has organised its technological base, contemporary industrial society tends to be totalitarian. For 'totalitarianism' is not only a terroistic political coordination of society, but also a non-terroistic economic technical coordination which operates through the manipulation of needs by vested interests. It thus precludes the emergence of an effective opposition against the whole. Not only a specific form of government or party rule makes for totalitaria-

nism, but also a specific system of production and distribution which may well be compatible with a pluralism of parties, newspapers, "counterveiting powers", etc.

মুক্তির সন্ধানে :—শিল্পায়িত সমাজের ভোগসর্বস্ব শ্রমিক শ্রেণীকে দিয়ে আর কাজ হবে না। তাদের আজ অনেক কিছু হারাবার আছে। তাহলে বিপ্লবের বাহন হবে কারা? সমাজের যারা অন্ত্যজ, সমাজে যাদের স্থান নেই এমন সব সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মানুষ। এদের মধ্যে থাকবে ছাত্র, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বেকার, বস্তীবাসী মানুষ এবং আরো অনেকে যারা সমাজকে অস্বীকার করেছে এবং সমাজ যাদের আত্মস্থ করতে পারেনি আজও। "Underneath the conservative popular base is the substratum of the outcastes and outsiders, the exploited and the persecuted of other races and other colours, the unemployed and the unemployable. They exist outside the democratic process, their life is the most immediate and the most real need for ending intolerable conditions and institutions. Thus their opposition is revolutionary even if their con-

sciousness is not . . . .

It is an elementary force that violates the rules of the game. . . . The fact that they start refusing to play the game may be the fact which marks the beginning of the end of a period."

এই যে অবাঞ্ছিত অবজ্ঞাত, ব্রাত্যের দল যাদের হাতে বিপ্লব আনার দায়িত্ব, তাদের হাতে আয়ুধ কি? এই আয়ুধ হল 'অহিংস কর্মপদ্ধতি'। পরমতসহিষ্ণুতা, অহিংসা এ সবের হয়তো চরম মূল্য আছে। মানবধর্মী ভাবী সমাজে এ সবের স্থান হবেই। তবে সে সমাজ আজও আসেনি, এবং বর্তমানে পরমতসহিষ্ণুতা কিম্বা অহিংসার গুণগান করার অর্থ নির্যাতন ও নিপীড়নেরই সাহায্য পাওয়া। "A criteque of pure tolerance" প্রবন্ধে মারকিউজ এ কথাটাই রেখেছেন।

"The tolerance of the systematic moronisation of children and adults alike by publicity and propaganda, the release of destructiveness in driving, the recruitment for and training of special forces, the impotent and benevolent tolerance towards outright deception in merchandising, waste and planned obsolescence, are not distortions and aberrations, they are the essence of a system which fosters tolerance as a means for perpetuating the struggle for existence and suppressing the alternative."

মারকিউজ স্বীকার করেছেন যে, 'সহনশীলতা' ইত্যাদি ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল ধারণারই প্রকাশ। কিন্তু নিপীড়নমূলক সমাজে এই সব ধারণা বাস্তবে প্রযুক্ত হলে হয়তো প্রতিক্রিয়াশীল ফলই প্রসব করবে। তথাকথিত আধুনিক গণতন্ত্রে নাগরিকেরা গোড়াতেই যদি প্রতিশোধাত্মক হিংসা বর্জনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপর পার্লামেন্টারী কায়দায় নিবদ্ধ রাখে নিজেদের, তবে নিপীড়নাশ্রয়ী প্রশাসনই শক্তি সঞ্চয় করবে। কাজেই মারকিউজ পক্ষপাতমূলক সহনশীলতার পক্ষে রায় দেবেন কেননা 'সহনশীলতা' যদি চালু ব্যবস্থাকে রক্ষা করে, বাঁচিয়ে রাখে, তবে তা গ্রাহ্য নয়।

"Tolerance cannot be indiscriminate and equal with respect to the contents of expression, neither in word nor deed, it cannot protect false words and wrong deeds which demonstrate that they contradict and counteract the possibilities of liberation. Such indiscriminate tolerance is justified in harmless debates, in conversation, in academic discussion; it is indispensable in scientific enterprise, in private religion. But society cannot be indiscriminate where the pacification of existence, where freedom and happiness themselves are at stake; here certain policies cannot be proposed, certain behaviour cannot be permitted without making tolerance an instrument for the continuation of servitude." সহনশীলতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, এ সবের একদা নিশ্চয়ই গুরুত্ব ছিল। কিন্তু আজ বিপুল কলেবর শিল্পায়িত গণসমাজে এ সবই হয়েছে কথার কথা।

"Universal toleration becomes questionable when its rationale no longer prevails, when tolerance is administered to manipulated and indoctrinated individuals who parrot, as their own, the opinions of their masters, for whom heteronomy has become autonomy! তাহলে উপায়?

পক্ষপাতযুক্ত সহনশীলতা, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমতো সংহিস-পদ্ধতির প্রয়োগ, মতামত নিয়ন্ত্রণের বিকল্প ব্যবস্থা—এসবই চাই। সমালোচক বলবেন, "মারকিউজ 'টোটালিটারিয়ান গণতন্ত্রের অথবা স্বেচ্ছাতন্ত্রের পূজারী নিশ্চয়ই।" মারকিউজ বলেছেন, "না, আমার কাম্য মুক্ত সমাজ, কিন্তু সে সমাজ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কলকাঠি নেড়ে ভাঙ্গা চলবে না। এ সমাজে পৌঁছতে হলে আপাতদৃষ্টিতে 'অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি' না নিয়ে উপায় নেই।" অর্থাৎ, ঐ আদর্শ-সমাজে পৌঁছতে হলে

অনেক গোষ্ঠীর ও প্রতিষ্ঠানের বাক্-স্বাধীনতা খর্ব করতে হবে, অনেকের তথাকথিত স্বাধীন চিন্তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে হবে। অন্যান্য অনেক বিধিনিষেধও চাপাতে হবে প্রগতি-বিরোধী শক্তিগুলির উপর। এসব কাজ কারা করবে? এই প্রসঙ্গে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের কথা এসে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা আজ আর নেই। অন্যান্য সুবিধাভোগী শ্রেণীকে দিয়েও বিপ্লবের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করা যাবে না। এমতাবস্থায় অগ্রণী হতে পারে ছাত্র সম্প্রদায় এবং বুদ্ধিজীবীরা।

মার্কিউজ লিখেছেন:

"the author believes that it is the task and duty of the intellectual to recall and preserve historical possibilities which seem to have become utopian possibilities, ... that it is his task to break the concreteness of oppression in order to open the mental space in which this society can be recognised as what it is and does".

'হিংসা'র প্রশ্নে মারকিউজ বলেছেন যে, নিপীড়িত জনসাধারণের হিংসাকে নিন্দা করা চলে না। হিংসা যখন সমাজপতি, বিত্তবান, রক্ষণশীল শক্তি থেকে উৎসারিত হয় তখন সেই হিংসাকে আবার নিন্দা না করে উপায় নেই। অর্থাৎ নিপীড়িত ও বঞ্চিতের "হিংসা" ঐতিহাসিক দিক থেকে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।

"In terms of historical function, there is a difference between revolutionary and reactionary violence, between violence practised by the oppressed and by the oppressors. In terms of ethics, both forms of violence are inhuman, and evil—but since when is history made in accordance with ethical standards? To start applying them at the point where the oppressed rebel against the oppressors, the have-nots against the haves, is serving the cause of actual violence by weakening the protest against it."

দেখা যাবে মারকিউজ মুখে 'স্বাধীনতা'র শপথ নিয়ে অ্যানারকিজম ও মার্কসবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ করেছেন। ফলে এই দুই চিন্তাধারার গুণে তাঁর চিন্তায় দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু এদের সব দোষই মারকিউজের অ্যানার্কো-মার্কসবাদে উপস্থিত। অ্যানারকিস্টরা চেয়েছিল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সরকার নেই, শাসনযন্ত্র নেই, পুলিস ও আমলা নেই। এই ব্যবস্থা কায়েম করবার জন্য এবং পুরাতন ব্যবস্থা ভাঙবার জন্য তারা ঘরবাড়ি পোড়ানো, বোমাবাজি, অহেতুক হিংসার আশ্রয় নিত। মার্কসবাদীরা হিংসাকে ঘৃণা করেও 'প্রয়োজনীয় উপকরণ' হিসাবে স্থানকালপাত্র বিচার করে হিংসার স্তুতি করেছে। মারকিউজ বলেছেন, "এস্টাব্লিশমেন্ট"কে ভাঙতে হবে। ফলে তাঁর দাবি, রক্ষণশীলদের দমন করতে হবে। রক্ষণশীলদের বাক্‌স্বাধীনতা, চিন্তা, কর্ম ও মননের স্বাধীনতা খর্ব করতে হবে। ফলে তিনি সন্ত্রাসের রাজত্বের উদ্গাতা। তাঁর মত মেনে নিলে ছাত্র এবং অন্যান্য পিছুটান-হীন মানুষেরা চিরস্থায়ী বিদ্রোহের পতাকা বহন করে চলবে। যতদিন না রক্ষণশীল শক্তি নির্মূল হয় ততদিন নিপীড়নহীন সংস্কৃতির স্বার্থে দমনপীড়নের স্টীমরোলার চালাতে হবে। মার্কসের রাষ্ট্রবিলোপ তত্ত্ব মারকিউজের চিন্তায় স্থান পায়নি। শ্রমিক শ্রেণীর যে ঐতিহাসিক ভূমিকা মার্কসবাদে স্বীকৃত, মারকিউজ সে ভূমিকাও অস্বীকার করেছেন।

আসলে মারকিউজ ইউটোপীয়ান ভাববিলাসী। 'মানবতা' তার কাছে আকর্ষণীয় প্রত্যয় কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ শুধুই কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। তাঁর দর্শনে শুধুই "নেতি নেতি"র বাণী। সোভিয়েট সমাজ আদর্শ নয়, মার্কিনী সমাজও নয়। টোটালিটারিয়ান সমাজ ভাল নয়। গণতান্ত্রিক সমাজও নয়। "এস্টাব্লিশমেন্ট" ভাল নয়, পাণ্ডাপুরুত, পার্টিনায়ক, শাসকশোষক এমন কি "শ্রমিক শ্রেণী" ভাল নয়। তবু মারকিউজ সমাজের ও মানুষের আমূল রূপান্তর চান। ফলে বিপ্লবকে স্থানচ্যুত করে তিনি 'স্থায়ী বিদ্রোহ'-এর স্বপ্ন দেখেছেন। এ স্বপ্নের ধারক ও বাহক মুখ্যত ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী। সহকারী শক্তি বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষ।

সুনন্দর জার্নাল

সুনন্দর জার্নালের অগণিত পাঠকের কাছ থেকে আমি অসংখ্য চিঠি পেয়েছি। তাঁদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসায় ভরা চিঠিগুলোর জন্য আমি তাঁদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। আমার এই দুঃখের দিনে তাঁরা আমার সমব্যথী—এই আমার এক মাত্র সান্ত্বনা।

আশা দেবী

॥ পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী, হা হা ॥

॥ ১ ॥

"যদি ডাবলিন কখনো ধ্বংস হয়ে যায়", জেমস জয়স একদিন বলেছিলেন, "আমার ইউলিসেস থেকে আবারো অবিকল ডাবলিন তৈরি করা যাবে।" গৌরকিশোর ঘোষের "পশ্চিমবঙ্গ...হা হা" গল্পটিতে সমকালীন কলকাতা অনুরূপ অতিজীবন পেয়েছে বলে মনে করি।

বারাসতে প্রাপ্ত ৮টি শবদেহ ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কাকে না বোবা করেছে। গল্পটিও তাই, একটি খবরমাত্র, যা আপামর পাঠককে বাধ্যতামূলক ভাবাবে। এবং খবর বলেই, নিরক্ষরকে পাঠ করে শুনিয়ে দেখা যেতে পারে; সে বুঝবে। কেননা, আফটার অল, এই হচ্ছে কলকাতা, এ হয় তারই স্বদেশ। ও, গল্পটি এ-দেশবাসীকে যদি যথার্থই ডিস্টার্ব করতে সক্ষম হয় তবে মেনে নিতে হবে যে, শব্দ বা ভষা এখনো ক্ষমতার অন্যতম উৎস।

দৃষ্টান্তবিহীনভাবে মহত্তর বাকি লেখকদের ভিড়ে ঠেলে দিয়ে গৌরকিশোর ঘোষ কী তা হলে একা?

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৬

॥ ২ ॥

'দেশে' প্রকাশিত শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের "পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী, হা হা' বেশ আগ্রহভরে পাঠ করলাম। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে নগর-জীবন কলকাতার সমস্যাপূর্ণ ঘটনাবলী অতি তীক্ষ্নতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন তথা এই সর্বনাশের মূল কারণ রমাভাবে প্রকাশ করেছেন। মূল্যায়নের দিক থেকে এই বক্তব্যের মূল্য অনেকখানি। সত্যই, আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে নুয়ে পড়েছে। বিচার, বুদ্ধি সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আমরা নিজেদের নিয়ে বাঁচবার চেষ্টায় রত। কিন্তু এভাবে সমাজকে যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, সর্বোপরি নিজে বাঁচা যায় না—এটুকু দূরদৃষ্টি দিয়ে বোধ করি আমরা কেউ তা বিবেচনা করি না। বিপদক্ষেত্রে সব কিছু চুপ করে সহ্য করে যাই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভয় পাই।

বিবেকটাকে জোর করে চাপা দিয়ে কণ্ঠরুদ্ধ করি।

স্বাধীনতার পর বিশেষ করে গত দশকে আমরা সবাই রাতারাতি এক কল্পনার স্বপ্ন-রাজ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছি এবং অন্যদের সেই আশা দিয়ে এসেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের বাস্তব ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন করবার কোন চেষ্টা করিনি। দাবির বহর বাড়িয়ে, জুলুমবাজী করে সাময়িক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে কোন পথ অবলম্বন করেছি। এইভাবে দিনের পর দিন অন্যায়, জুলুম, খুন, জখম বেড়ে চলেছে। আমাদের এখন জীর্ণ দশা। গণতান্ত্রিক চেতনার এই বর্তমান পরিণতি। প্রশাসনকে দোষ দিয়ে বা তার কাঠামোকে দিয়ে জোর করে এ সমস্যা দূর করা যাবে না। এর জন্যে দায়ী আমরা প্রত্যেকেই। যেদিন থেকে আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সাহস পাই নি, জুলুমের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি নি, নিজেদের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গিয়েছি, সবকিছু মুখ বুজে চুপ করে সহ্য করেছি কেবল নিজেদের বাঁচবার চেষ্টা নিয়ে —সেদিন থেকে এ সমস্যা পুঞ্জীভূত হতে আরম্ভ করেছে। তাই আজ আমরা প্রত্যেকে অজানা আশঙ্কায় ত্রস্ত, ভীত। পথে, ঘাটে, অফিসে, বাজারে সর্বত্র সন্ত্রাস নিয়ে যন্ত্রের মতো চালিত হই। বেঁচে রয়েছি—এটাই একমাত্র সত্য। একমাত্র যারা সব খুইয়ে—আর কিছু হারাবার ভয় রাখে না—তারাই নির্ভয়।

তবে আমার কথা এই—মানুষ মূলত কল্যাণকামী। মানুষের ওপর বিশ্বাস রেখে পরস্পরের সাহায্য ও সৌহার্দ্যে মানুষ বেঁচে থাকে, এগিয়ে চলে। এ দুর্দশার প্রতিরোধ একদিন মানুষের মধ্যেই গঠিত হবে—নৈতিক বল ফিরে পেয়ে মানুষ আবার সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু কবে? এ সময়ের কি আরও দেরি রয়েছে? চিন্তাবিদ, সমাজবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, গবেষক, রাজনীতিবিদগণ কি এ নিয়ে একটুও চিন্তা করছেন না? একক প্রতিরোধ গড়ে তোলার কি কোন প্রচেষ্টা আয়োজিত হবে না?

লেখকের এই বক্তব্য খুবই সময়োপযোগী। অবশ্য ইতিপূর্বে এঁর লেখা "তলিয়ে যাবার আগে' সমাজের আর একটি চিত্র পরিস্ফুট করেছিল। এ ছাড়া "রূপদর্শীর সংবাদ-ভাষা" শিরোনামায় নিতিনিয়ত এ ধরনের সমস্যার কথা লেখক সুনিপুণভাবে তুলে ধরেন—সেই সঙ্গে মূল কারণ অনুসন্ধান করে আলোচনা করবার প্রয়াসী হন। ভবিষ্যতে এ ধরনের লেখা 'দেশে' আমরা আরও পাব—এ আশা রাখি।

পরিশেষে লেখককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

দীপা সেনগুপ্ত
দাঁতন, মেদিনীপুর

॥ ৩ ॥

গত ২১শে নভেম্বর দেশ পত্রিকায় গৌরকিশোর ঘোষের লেখা "পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী, হা হা" গল্পটির জন্য দেশ পত্রিকা ও গৌরবাবুকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। ইদানীংকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক পট-ভূমিকায় লেখা কোন গল্পই এমনভাবে মনকে নাড়া দিতে পারেনি। গৌরবাবুর লেখা গল্পটি আজকের যুগের বাংলাদেশের অস্থির চিত্ত যুবমানসের এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি। গল্পটি ছোটগল্প হিসাবে রসোত্তীর্ণ, ঘটনা বিন্যাসে সমুজ্জ্বল। এ কালের সমালোচনায় এক নির্ভীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আজকে আমরা যারা নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অন্যায়কে সহ্য করে চলেছি, প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি, তাদের এক অতি বাস্তব কাহিনী এই গল্পটি। অপরের দোহাই দিয়ে আমরা যে আমাদের ক্লীবত্বকে নির্বিবাদী জনসাধারণের মুখোশের অন্তরালে লুকোবার চেষ্টা করছি এই গল্পটি তার এক অনবদ্য কথাচিত্র। "তলিয়ে যাবার আগে" "আমরা যেখানে" আজ এসে পৌঁছেছি, এই গল্পের "লোকটা" (গল্পের নায়ক) যেন তার জ্বলন্ত প্রতিবিম্ব। গল্পের শেষাংশ সিম্বলিক্। লেখকের লেখা গল্পটি সাহিত্যক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি করবে। রূপদর্শীর (গৌরবাবুর) সত্যানুসন্ধান এখানেই পূর্ণ। রূপদর্শী আজ সত্যদর্শী।

বিদ্যুৎ সেন
মধুপুর

ধর্ম

শ্রীঅম্লান দত্তের কালোপযোগী রচনা ধর্ম ('দেশ'-৪৯ সংখ্যা) পড়লাম। লেখক মানুষের মনে ধর্মবোধ জাগানোর জন্য 'মৌলনীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা ও রক্ষা করা আবশ্যক' (পৃষ্ঠা নং ৯৮৯) বলেই আমাদের বুঝিয়েছেন। তার কারণ নির্দেশ করে আমাদের জানার আবশ্যকতা বোধ করেননি। ধর্মের সাথে মানুষের কোন যোগ—মানুষের সাথে মানুষের মনের কেমন যোগ। সুতরাং একদিকে ধর্ম ও অন্য দিকে মানুষের মন—এ-দুয়ের সমন্বয়ে মনোবিজ্ঞানের আলোকে শ্রীদত্তের ঐ নির্দেশের কারণ আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মানসিক বিপর্যয় ঘটে মনের বিরুদ্ধভাবাপন্ন গ্রন্থির (complex) সংঘর্ষে। গ্রন্থিগুলোর দ্বন্দ্বকে যুক্তির সাহায্যে বিচার না করে মানসিক তৃপ্তির আপাত ফললাভের আশায় মানুষ নিজের অসুবিধাজনক গ্রন্থিকে নিরুদ্ধকরণ করে। গ্রন্থির নিরুদ্ধকরণে যে প্রতিক্রিয়া [illegible] শক্তিকে অদ্ভুত হয়ে তাকে মানুষের মধ্যে মনোমত লাগে সন্দেহ, দুঃখ উত্তেজনা, অশান্তি, [illegible] জন্মে। এগুলোই মানসিক বিপর্যয় ঘটার প্রত্যক্ষ ও একমাত্র কারণ। মানসিক বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষের মনে শুভচিন্তা বা শুভবোধ আসতে পারে না। সুতরাং মানসিক বিপর্যয় ধর্মবোধ জাগানোর পরিপন্থী। তাহলে, দেখা যাচ্ছে যে, মানসিক বিপর্যয়ের কারণ মানসিক দ্বন্দ্ব। এই মানসিক দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার গ্রন্থির সাথে চিন্তার অসামঞ্জস্যতার ফলে— সুপরিকল্পিত চিন্তার সাথে অন্ধকারময় গতানুগতিকতাকে পাশে রেখে গ্রন্থির বিরোধ থামালে কোন নিরুদ্ধকরণের প্রশ্নই ওঠে না। এই অসামঞ্জস্যতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় মনের সাম্যাবস্থা। মনের সাম্যাবস্থা আসতে পারে মনের নমনীয় গুণের জন্য—আর এই গুণ হতে পারে মনে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধাবোধ জাগানোর মাধ্যমে। কতকগুলো ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রতি যুক্তিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের মনে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধাবোধ আসতে পারে। এখানেই ভাববাদী দর্শনের চরম সার্থকতা।

আর একটা কথা, কুসংস্কারকে আমরা মনুষ্যত্ববিকাশের পরিপন্থী বলে থাকি। অনেক সময় কুসংস্কারই আমাদের মনে অনেক শান্তির প্রতিশ্রুতি আনে। কৃত্রিম মনে অকৃত্রিমতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন কৃত্রিমতারই—অবশ্য সেটা প্রাথমিক পর্যায়ে। 'জড়বাদী অসংস্কৃতর' ক্ষোভ ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে কেটে যেতে পারে।

তমালকান্তি পাল
কলকাতা-৪৬

উনিশ শতকের সতীদাহ

১০ই অক্টোবরের "দেশ"-এ উল্লিখিত রচনাটি পড়লাম, কুসংস্কারদুষ্ট আমাদের বীভৎস অতীত যেন এখানে কথা কয়ে উঠেছে। সত্যিই, হাওড়া জেলার, বালী ঘোষপাড়া থেকে প্রাপ্ত সতীদাহস্মারক ফলকটি আমাদের বহিমান সমাজপ্রথার এক অদূর অধ্যায়কে নতুন করে মনে পড়িয়ে দিলো। চরম অমানুষিক ও নৃশংস এই কুপ্রথার মহান উচ্ছেদকারী রাজা রামমোহনের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীর দু' বছর (?) আগে এই আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এই শেষ নয়। ঘোষপাড়ার ফলকটি জানাল, সতী বিজলা ও ব্রজনাথের সহমরণ সংঘটিত হয় ১২০৬ সনে। শ্রদ্ধেয় লেখক এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকসুজনদের উদ্দেশে প্রায় সমকালীন দু' দুটি সতীদাহস্মারক মন্দিরের সন্ধান জানাই। বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সমৃদ্ধ সুপ্রাচীন গ্রাম মানকরে (বর্ধমান জেলা) ঐ স্মারক মন্দির দুটি অবস্থিত। অবশ্য দুটিই ঠিক আক্ষরিক অর্থে মন্দির নয়—একটি স্মারক স্তম্ভ, অপরটি মন্দির। শ্রদ্ধেয় বঙ্গ সংস্কৃতিবিদ বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি"-তে মানকরের অনেক প্রাচীনত্বের উল্লেখ করেছেন—কিন্তু আলোচ্য স্মারক দুটি সম্পর্কে নীরব দেখলাম।

প্রথমে স্তম্ভটির কথা বলি। এটি একটি বড়ো পুষ্করিণীর তীরে বর্তমানে আগাছার জঙ্গলে আকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ইঁটের তৈরি—উচ্চতা অনধিক সাড়ে তিন ফুট। মনে হয় অনেকটা অংশ মাটীর নীচে বসে গেছে। স্তম্ভগাত্রে পরিষ্কার বাংলা অক্ষরে কয়েকটি শব্দ উৎকীর্ণ আছে। কালের প্রহারে জীর্ণ লেখাটি অধুনা দুষ্পাঠ্য। মোটামুটি যা পড়া যাচ্ছে, তা হলো, কর্মকার বংশীয়া রাধা নাম্নী কোনো এক সতী ঐ স্থানে সহমৃতা হন। সন ১২১৪। মাঝের কয়েকটি অক্ষর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায় কেষ্ট ঠাকুরের নাম পড়া গেল না। দেখা যাচ্ছে, এটি ঘোষপাড়ার ঘটনার ঠিক সাত বৎসর পরবর্তী। স্তম্ভটির যথাযথ পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। ভগ্ন অক্ষরগুলির স্থান শূন্য রাখলাম।

মানকর নিবাসী — কর্মকারের বনিতা
রাধা — র সহমরণের স্থান
সন ১২১৪ সাল।

কয়েকটি কর্মকার পরিবার এ গ্রামে অদ্যাবধি আছেন। ঘটনাটির উপরে তাঁরা কেউ হয়ত অতিরিক্ত আলোকপাত করতে পারবেন—এই আশায় কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কিন্তু নিছক একটি জনশ্রুতি ছাড়া তাঁরা নতুন কিছু দিতে পারলেন না। সতী রাধা তাঁর স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রথমে নাকি অচঞ্চলভাবে কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে আগুন ধরান। তারপর ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গ আগুনে সমর্পণ করে।

অপর সতীদাহ স্মারক মন্দিরটি গ্রামপ্রান্তে অবস্থিত। মন্দিরটির জীর্ণ দশা দেখে আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীনতর কালের মনে হয়। গঠনকার্য ও গাঁথুনির উপাদান বিচার করে পণ্ডিতগণ মনে হয় সঠিক কালনির্ণয় করতে সক্ষম হবেন। মন্দির গাত্রে কোনো লেখা দেখতে পাইনি। এটি সম্পর্কে গ্রামবাসীর অজ্ঞতা বিস্ময়কর।

মন্দিরটি সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল এই যে একটি দেওয়ালের অংশ বিশেষ ভেঙে পড়ায় কিছু কিছু কাঠ কয়লা বেরিয়ে পড়েছে। সতীকে দাহ করার পর সম্ভবত চিতার উপরেই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।

এ সম্পর্কে যাঁরা তথ্য সংগ্রহ তথা গবেষণায় আগ্রহী, মানকরে তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আবদুস সামাদ
মানকর, বর্ধমান

THE SELLING OF THE PRESIDENT : by Joe McGinnis. Penguin Books. 6 Shillings.

টেলিভিশনকে কেউ কেউ Idiot Box বলেন। বোকা বাক্সই হোক কিংবা বোকাদের বাক্সই হোক এ বাক্স যেখানেই গেছে সেখানকার মানুষের জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে এ কথা সবচেয়ে বেশী খাটে। আমেরিকায় টেলিভিশন বা টি ভি সরকার আয়ত্ত নয়। অসংখ্য ছোট ছোট টি ভি স্টেশন আছে আর আছে তিনটি বড় বড় কোম্পানী। টি ভি খবর দেয়, ফিল্ম দেখায় কিন্তু ব্যবসায়িক টি ভি-ই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণটা আমেরিকান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আমেরিকায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন হয় পাইকারী হারে। বহু রকম মডেলের বহু কোম্পানীর গাড়ি, সাবান, টুথপেস্ট, তৈয়ারী জামাকাপড়, রেডিও টেলিভিশন যন্ত্র সেখানে রাশি রাশি তৈয়ারি হচ্ছে। জিনিস তৈয়ারি হলেই তো শুধু চলবে না তাকে বিক্রি করতে হবে। আমেরিকার তাই বিক্রি করার প্রতিযোগিতা বোধ হয় সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় টি ভি অপরিহার্য। আপনি ফেরিওয়ালাকে ঘরে ঢুকতে দেন না কিন্তু বিক্রয় কার্যক্রমের বিবিধ ভারতীকে আটকাতে পারেন না, আর যখন টি ভি আসবে তখন ফেরিওয়ালা সশরীরে আপনার বসবার কোঠার ঘরে প্রবেশ করবে।

আমেরিকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো তাই টি ভি বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা জানেন এবং বাজারে ভোগ্যপণ্য ছাড়বার আগে বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা নেন। বিজ্ঞাপনের কৌশল মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা এবং অভাববোধ জাগিয়ে তাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এক ধরনের শার্ট পরলে মেয়েরা আকৃষ্ট হয়, প্রত্যেক তিন বছর অন্তর নতুন গাড়ি কিনতে হয়, রঙীন টেলিভিশন না হলে আত্মার পরিতৃপ্তি হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিক্রির ব্যাপারে টি ভির যা দান রাজনীতিতেও তার চাইতে কিছু কম নয়। টি ভি আবিষ্কার হবার পর থেকে মার্কিন জনসাধারণের ঘরে পৌঁছবার জন্য প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থীই এর সাহায্য নিয়েছেন। আলোচ্য বই এ ম্যাকগিনিস নিক্সনের টি ভি নির্বাচনী অভিযানের এক অত্যন্ত মজাদার বিবরণ পেশ করেছেন। ম্যাকগিনিস নিজে বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং নিক্সন যেসব বিজ্ঞাপন-বিশারদের সাহায্য নিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। ম্যাকগিনিস বিশ্বাস করেন যে, একজন নির্বাচন প্রার্থীকে আর পাঁচটা ভোগ্য পণ্যের মতোই সুন্দর মোড়কে মুড়ে বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যে ভোটদাতাদের কাছে বিক্রি করা যায়। তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে, টি ভি বিজ্ঞাপনে যেসব প্রার্থী বেশ সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারেন কিন্তু যেসব প্রার্থীর কথা বলবার মতো বিশেষ কিছু নেই তাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। খবরের কাগজে একজনের বিচার হয় তিনি কি বলছেন তার ওপর। তিনি কোন বিষয়ে কী ভাবেন তার ওপরে। টি ভি-তে ও-সবের কোনো বালাই নেই, আসল কথা আপনাকে কিরকম দেখতে লাগছে, আপনার ব্যক্তিত্ব কতটা ফুটে উঠছে সেটার ওপর। আপনি কি বলছেন সেটা আর তখন প্রয়োজনীয় নয়; প্রয়োজনীয় কিভাবে বলছেন। ম্যাকগিনিস সাহেবের দাবি যে নিক্সনকে তাঁরা জিতিয়েছেন এই ভাবেই। যে নিক্সন ১৯৬২ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে হেরে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছিলেন সেই নিক্সনকে তাঁরা ১৯৬৮ সালে জিতিয়েছেন "নতুন নিক্সন" রূপে তাকে সারা আমেরিকার লক্ষ লক্ষ টেলিভিশন দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করে। নিক্সনের বলবার কিছু নেই তাঁকে লোকে বিশ্বাস করে না, অনেক লোক তাঁকে অপদার্থ বলে মনে করেন তবু তিনি জিতেছেন ম্যাকগিনিস এবং তাঁর ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন বিজ্ঞাপন বিশারদ কর্মচারীদের জন্য। ম্যাকগিনিস সাহেব তার ১৬৮ পাতার বিবরণীতে তাই বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে তাঁরা ক্যামেরা বসিয়েছেন, কি বলতে হবে সেটা নিক্সনকে বুঝিয়েছেন, কিভাবে তাঁরা নিক্সন যাতে না হেরে যান তার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর বিবরণীতে কি মজাদার উপায়ে প্যানেল আলোচনার তাঁরা বন্দোবস্ত করেছিলেন। প্যানেল আলোচনায় কোথায় নিগ্রোরা তাঁদের সাহায্য করেছিলো বা করেনি তার বিবরণ পাঠকদের খুব ভাল লাগবে। যাঁরা নিক্সনকে পছন্দ করেন না তাঁরাও খুশী হবেন।

দি সেলিং অব দি প্রেসিডেন্ট পড়তে ভাল লাগে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের একটা অনুদ্‌ঘাটিত দিক সম্বন্ধে এর আলোকপাতের ফলে বইটার একটা মূল্য আছে। কিন্তু বইটি পড়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। এক নম্বর প্রশ্ন ১৯৬০ সালে নিক্সন যে হেরেছিলেন তার দোষ দেওয়া হয়েছিল টি ভির ওপর। ১৯৬৮ সালে ঠিক উল্টো কথা বলা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত নিক্সন যে জিতেছিলেন তার কারণ টি ভি নয়। ১৯৬৮ সালে জনসন অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন এবং হামফ্রী তার শিকার হয়েছিলেন। ম্যাকগিনিস এবং তাঁর সমব্যবসায়ীরা এটা না হলে কিছুতেই নিক্সনকে জেতাতে পারতেন না। বইটার মধ্যে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হয়নি। তৃতীয়ত, নির্বাচন জিততে গেলে পার্টি যন্ত্র একটা বিরাট কাজ করে, ম্যাকগিনিস পার্টির সম্বন্ধে দু-চারটা অপ্রিয় মন্তব্য করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। চতুর্থতঃ, বিজ্ঞাপন বিশারদদের এত কেরামতি সত্ত্বেও নিক্সনের জনপ্রিয়তা নির্বাচনের আগের দিনগুলিতে প্রচণ্ডভাবে নেমে আসছিল। কেন?

আসল কথা মার্কিন জনসাধারণ, যত বোকাই হোক এতটা বোকা নয় যে শুধু মাত্র মোড়ক দেখে একজনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবে। প্রেসিডেন্ট জনসনের ব্যর্থতাই নিক্সনের সাফল্যের মূল কারণ। রবার্ট কেনেডি যদি বেঁচে থাকতেন তো নিক্সনকে ১৯৬২র মতো আরেকবার বলতে হতো "You won't have Nixon to kick around any more!" ম্যাকগিনিসদের ছলচাতুরি কোনো কাজেই আসতো না।

প্রিয় শর্মা

মিসিমা

প্রখ্যাত জাপানী লেখক য়ুকিয়ো মিসিমার আত্মহত্যা সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য জগতে সবচেয়ে রোমহর্ষক ঘটনা। লেখকের আত্মহত্যার ঘটনায় খুব বেশী নতুনত্ব নেই, বিদেশে অনেক লেখকেরই পরিণতি হয়েছে এই ভাবে। কিন্তু এ কি সাংঘাতিক ঘটনা, এবং এ কি কারণ!

মিসিমার আত্মহত্যার কারণটি আমার কাছে এখনো স্পষ্ট নয়। জাপানের প্রাচীন প্রথাগুলি সম্পর্কে আমাদের ঠিক ধারণা নেই, হারাকিরির কথা আগে শোনা আছে, কিন্তু কি কারণে হারাকিরি করলেন এমন একজন দেশবরেণ্য লেখক? মিসিমা তার অনুগামী দল নিয়ে এসে সেনাবাহিনীর সদর দফতর ঘেরাও করলেন, আটক করলেন সেনাধ্যক্ষকে। তারপর সেই বাড়ির বারান্দা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে দিলেন এক বক্তৃতা, যার মর্ম এই যে জাপানকে তার সংবিধান বদলাতে হবে, এবং মার্কিন তাঁবেদারি ছেড়ে জাপানের সামরিক ঐতিহ্য আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

এরপর মিসিমা আবার ফিরে এলেন সেনানায়কের সামনে, নতজানু হয়ে বসে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এক দীর্ঘ ছুরির ফলা। এবং তাঁর পূর্ব নির্দেশমতন এক সহচর এক কোপে কেটে ফেললো তাঁর মুণ্ড। পরক্ষণে সহচরটিরও মৃত্যু বরণ।

জাপানের সামুরাই ঐতিহ্য অনুযায়ী এ
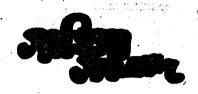
ভাবে মৃত্যুবরণ বীর যোদ্ধার সম্মানজনক মৃত্যুর মতন। কোন উগ্র দক্ষিণপন্থী নেতার এভাবে মৃত্যু বরণের মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু লেখকের এই ভূমিকার কথা আমরা ঠিক ভাবতে পারি না। মিসিমার রাজনৈতিক মতামত যাই হোক, সেটা

মিসিমা

সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে তিনি প্রকাশ করতে পারতেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। যার যা ভূমিকা। তবে কি, লেখনী তরবারির চেয়ে বেশী শক্তিশালী নয়?

মিসিমার এই রোমহর্ষক মৃত্যুবরণ নিয়ে যে কেউ কোনো উপন্যাস বা নাটক লিখবেন, তারও উপায় নেই। কারণ, মিসিমা নিজেই সেটা লিখে গেছেন। বস্তুত, তাঁরই এক কল্পিত কাহিনীতে তিনি বাস্তব ভূমিকায় অভিনয় করে গেলেন।

মিসিমা শুধু জাপানে নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতেও বেশ পরিচিত ছিলেন। কাওয়াবাতার নোবেল পুরস্কার পাবার আগে, অনেকে মিসিমাকেই জাপানের শ্রেষ্ঠ জীবিত লেখকের সম্মান দিতেন।

মিসিমার সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েছিল, এই কলকাতাতেই। ১৯৬৭ সালের ১০ই অক্টোবর সপ্তমী পূজোর দিন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে এক ঘরোয়া সভায় তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে তাঁর চেহারা ও কথা বলার ভঙ্গি। সাধারণ জাপানীদের তুলনায় বেশ দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। ইংরেজি খুব ভালো জানতেন না, আমাদেরই মতন কাজ চালিয়ে নিতে পারতেন। তবে, ইংরেজি ভাষা বা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর খুব একটা উৎসাহও দেখিনি। ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে বরং তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। ফরাসী সাহিত্য নিয়ে রীতিমতন পড়াশুনোও করেছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা আন্তরিক টান প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর কথাবার্তায়। বারাণসী ভ্রমণ করে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, বারবার বলেছিলেন সেই কথা। মায়াবাদ ও পূর্ব জন্ম বিষয়ে তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। যদিও তিনি এসেছিলেন ভারত সরকারের নিমন্ত্রণে, কিন্তু তিনি বলেছিলেন, তাঁর আসার মূল উদ্দেশ্য ভারতভিত্তিক একটি বৃহৎ উপন্যাসের জন্য অভিজ্ঞতা ও মাল মশলা সংগ্রহ করা। হায়, সেই বই আর তাঁর লেখা হলো না।

মিসিমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, একবারের জন্যেও তাঁকে সমরোন্মাদ জননেতা বলে মনে হয়নি। বিদেশে বেড়াতে গিয়ে অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিকই ভাবগম্ভীর ফাঁপা বাণী দিয়ে থাকেন। মিসিমা একবারও সেদিক দিয়ে যাননি, সূক্ষ্ম সাহিত্য ও শিল্পরুচি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কথায়। মানুষটির ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে, মনেই হয়, যা তিনি বিশ্বাস করেন না, সে রকম আজে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতে ভালোবাসেন না। তবে কথায় কথায় একবার লঘু হাস্যে বলেছিলেন অবসর সময়ে তাঁর শখ হচ্ছে তলোয়ার খেলা!

তখন আমরা মিসিমার রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, তিনিও বলেন নি। এখন জানা গেল, তিনি থাট নো কাই নামে একটি উগ্র স্বদেশপ্রেমিক দলের নেতা ছিলেন। এবং তাঁর এই মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে তিনি জাপানের উগ্রপন্থী যুবকদের জাগাবার আশা পোষণ করে গেছেন। যাতে জাপান পশ্চিমী শক্তির প্রভাব সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে এশিয়ার শক্তি হিসেবে প্রাধান্য লাভ করতে পারে।

যে-বইখানিতে মিসিমার এই রকম মৃত্যুবরণের ঘটনা আছে, সে লেখাটির নাম 'ইয়ুকোকু' (নিজের জীবনের কথা ভেবে বিরচিত)—এটি একটি জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হিসেবেও মুক্তি লাভ করেছিল। মিসিমার নাম নোবেল কমিটির কাছে সুপারিশ করা হয়েছিল কয়েকবার। মাত্র ৪৫ বছর বয়েস হয়েছিল তাঁর। খুবই অকালে, এবং আমাদের কাছে মনে হয় ব্যর্থ কারণে, একজন প্রতিভাবান লেখকের জীবন শেষ হয়ে গেল।

সনাতন পাঠক

প্রবন্ধ

কবি জীবনানন্দ দাশ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ভারবি. ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট. কলকাতা-১২। দামঃ সাত টাকা।

কবি, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শেষ পূর্ণাঙ্গ গদ্য রচনা 'কবি জীবনানন্দ দাশ।' সমকালীন কোনো কবির পক্ষে আরেকজন কবির নিরাসক্ত মূল্যায়ন খুব দুরূহ কাজ। তাছাড়া সমকালের কবি, বিশেষ করে কবি যদি সমালোচকের পরিচিত হন, তাহলে তো কথাই নেই। উপরন্তু এ ক্ষেত্রে সমালোচক আবার নিজেও একজন উল্লেখযোগ্য কবি। সমকালের দুই কবির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে অতি-আসক্তি বা অতি-ঔদাসীন্য দুই-ই থাকতে পারে। কিন্তু কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সমালোচক হিসাবে স্বকাল থেকে সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে একটা নিরাসক্ত মানদণ্ডের কেঠায় পৌঁছতে পেরেছেন। রবীন্দ্রযুগে জীবনানন্দ যে স্বাতন্ত্র্যের স্বাদ এনেছেন সেই স্বাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণই এই বইটির উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক একথাও স্মরণে রেখেছেন যে মহৎ লেখক আধুনিক হয়েও সর্বকালের। আধুনিকতার সীমানা ছাড়িয়ে কোথায় সেই মহত্ত্ব জীবনানন্দে চিহ্নিত, কীভাবে ঝরা পালকের 'সদ্য-প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা' ধীরে ধীরে ধূসর পাণ্ডুলিপির সবুজ ফসলে স্পষ্ট হয়ে আসছে—মৃত্যুবোধ বিচ্ছিন্ন 'আমি' কোথায় জীবনবোধে ব্যাপ্ত 'আমরা' হয়ে আসছে, বনলতা সেন পর্বে সময় গ্রন্থি চেতনা ও প্রকৃতি চেতনা কীভাবে মিশছে, মহাপৃথিবীর 'ভিশন' তৈরি হচ্ছে কোথায়, সাতটি তারার তিমিরে সময়ের তাৎপর্যের সঙ্গে গ্রন্থনার চেষ্টা চলেছে কীভাবে, জ্ঞান আর প্রকৃতি মিশে তাঁর কবিতা তৈরি হয়ে চলেছে কোন আশ্চর্য শব্দ-ছন্দ-স্মৃতি-অনুষঙ্গের সহাবস্থানে তার একটা বিস্ময়কর জগৎকে এই বইতে খুঁজে পাবেন পাঠক।

বাঙালী কবি আমাদের আগেকার প্রজন্ম পর্যন্ত অন্য কবিকে সাধারণত খুব ভাসা-ভাসা কমপ্লিমেণ্ট দিয়েই এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল কিংবা বুদ্ধদেব বসু সেই সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম। সেইদিক থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই জীবনানন্দ নিরীক্ষা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনানন্দের কবিতায় বিবর্তন, তাঁর ব্যবহৃত শব্দের তাৎপর্য, স্মৃতি-অনুষঙ্গ, তাঁর সমসাময়িক বাঙলা কাব্যপট ইত্যাদি সমস্তই এই আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাঠক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতামত সর্বত্র গ্রহণীয় মনে না করতে পারেন, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্লেষণ যে জিজ্ঞাসু পাঠককে অনেকখানি তৃপ্তি দেবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরিশিষ্টে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কিছু কথা আছে, দুটি চিঠিও আছে জীবনানন্দের লেখা। জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই তথ্যগুলি প্রয়োজনীয় হবে।

১২৮/৭০

মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতাঃ ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিতঃ ভারবিঃ ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

নিজের কবিতা সম্পর্কে কবি মোহিতলাল মোহগ্রস্ত ছিলেন না, সমালোচক মোহিতলাল সব সময়েই কবি মোহিতলালের কাব্য নির্বাচনে সজাগ থাকতেন। সেই জন্যই তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যা বেশি নয়। সত্তরের দশকে মোহিতলালের তেমন কদর নেই, কিন্তু তাঁর কাব্যশিল্পকে ধীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সমসময়ের কবিরা মোহিতলালের কাছে অন্তত দুটি দিক থেকে কিছু শিক্ষা নিতে পারেন। প্রথমত তাঁর কাব্যশিল্প সম্পর্কে প্রখর চেতনা। দ্বিতীয়ত দেহজীবন সত্যের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি। এই দুটি সূত্রেই মোহিতলাল বাঙলা কাব্য ধারার ভবিষ্যৎ প্রবণতা ও পরিণতির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের পর মোহিতলালই প্রখর শিল্প-সচেতন হয়ে দেশী-বিদেশী কাব্য-ঐতিহ্যকে নানাভাবে সম্মিলিত করে চিন্তা সমৃদ্ধ কাব্য রচনায় মন দিয়েছিলেন। অনুভব, চিন্তা এবং বলিষ্ঠ জীবন প্রশ্ন এই নিয়ে মোহিতলাল বাঙলা কাব্যে যে স্থান করে নিয়েছেন তা সহজে বিস্মৃত হবার নয়।

'স্বপন পসারী'তে মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথের মতোই নিশ্চিন্ত জীবনানন্দে প্রসন্ন ছিলেন। প্রেম ও সৌন্দর্যের মদে তখন আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি, 'কলম ভরা', 'গজল-গান'-এর মতো মদির কবিতা তখনই লেখা। তার সঙ্গে বীভৎসের মধ্যে থেকে জীবন-ভোগ করবার কঠোর সাধনারও ইঙ্গিত ছিল। 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরল' বই দুটিতে মোহিতলালের এক বলিষ্ঠ সাধনার সুর বেজে উঠলো, ভীষ্মের মতো এই দুঃখময় জীবনকে বহন করবার অকুণ্ঠ পৌরুষ দেখালেন তিনি। সেই প্রাণ চেতনায় কবি বললেনঃ 'প্রাণ যার ছিল উদাসীন জীবনে বাঞ্ছিত সেই—তার চেয়ে দুঃখী কেহ নয়।' এই সূত্রেই 'বুদ্ধ' এসেছেন, এসেছেন শোপেন হাউয়ের। কিন্তু বলিষ্ঠ জীবন প্রেমে মোহিতলাল এই দুই দার্শনিকের জীবন-ছলনাকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। মোহিতলালের এই বাস্তব প্রেম পরবর্তী যুগের কবিদের প্রেরণা দিয়েছে, ও দেবে, তাঁর চিন্তা ও অনুভবে সমৃদ্ধ কবিতাবলি তাই এ যুগের কবিদের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েনি, যদিও তাঁর কাব্যের মধ্যে আধুনিক কবিরা দুঃখের তীব্র দংশন জ্বালা কিংবা বিপন্ন বিচ্ছিন্নতা বোধ খুঁজে পাননি। ফর্মের প্রতি অতি সচেতন এই কবি সনেট রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং বাঙালী কবিদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেট রচয়িতাও বলা যায়। অনুবাদকর্মেও তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। বোধ হয় ফর্মের প্রতি তাঁর নিখুঁত মনোযোগ তাঁর কবিতাকে যতখানি শুদ্ধ করেছে, ততখানি স্বাধীনতা দানে বাধা দিয়েছে। যাই হোক মোহিতলালের বিভিন্ন পর্বের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি সম্পাদক এই কাব্য-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাঁর সনেটও কিছু আছে, আরও কিছু থাকলে বোধ হয় ভালোই হতো, এবং শেষে কিছু অনুবাদ আছে। অনুবাদ কবিতাগুলিতে মূল কবিতা যে কতখানি মোহিতলালের নিজস্ব রীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে তা লক্ষণীয়। কাব্য প্রেমিকের কাছে এই সংকলনের সমাদর হবে সন্দেহ নেই।

১৩১/৭০

উপন্যাস

গেরুয়া-কন্যা। বীরভদ্র। করুণা প্রকাশনী, ১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসটি কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বও লক্ষ করার মত। যদিও এটি একখানি প্রেমের উপন্যাস, তথাপি বাংলা দেশের একটি অঞ্চলের পুরো চেহারা বইটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বীরভূমের তাল তমাল হিন্তালের রূপ-ঐশ্বর্যের পাশাপাশি ওখানকার প্রত্নবস্তু ও কিংবদন্তী নিপুণ কৌশলে উপন্যাসের অঙ্গীভূত। ওরই মধ্যে নর-নারীর প্রেম, আবেগ, উত্তেজনা আর চোখের জল—একটি নিটোল গল্পের পক্ষে যা যা প্রয়োজন তার সবই আছে। লেখকের সবচেয়ে বড় মুন্সীয়ানা—বীরভূমকে তিনি একটি চরিত্র রূপে তাঁর উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ইতিহাসের ছাত্র শান্তনু এই কাহিনীর নায়ক। তাকে ভালবাসে যে দুই নারী তাদের একজন আধুনিকা সায়ন্তী, অপরজন বাউরী মেয়ে রূণকি। তিনটি চরিত্রই লেখক সুন্দরভাবে এঁকেছেন। শুধু

কেন্দ্রীয় চরিত্রই নয়, স্বল্প অবকাশে পার্শ্ব-চরিত্রগুলিও প্রত্যেকেই বৈশিষ্ট্য সহ উপস্থিত হয়েছে। লাভপুরের ঋষি, রামপুরহাটের সীতা, পাঁচড়াগ্রামের টাটু, কাবিল ইত্যাদি চরিত্রগুলি তো খুবই জীবন্ত। লেখকের ভাষা সাবলীল, কোথাও কোথাও কাব্যিক। সব মিলিয়ে উপন্যাসটি পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

আবগারী দারোগার ডায়েরী। সুভাষ সমাজদার। বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য ৫·০০।

বইটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন "১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি পশ্চিমবঙ্গের আবগারী বিভাগে এক্সাইজ সাব-ইন্সপেক্টারের পদে কাজ করেছিলাম", নিঃসন্দেহে বইটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। পুলিস, জেল, চোর-ডাকাত নিয়ে বই লেখা হয়েছে কিন্তু মদ-গাঁজার ভেন্ডার আর এসব নিষিদ্ধ বস্তুর স্মাগলারদের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা আর প্রেম-প্রণয়ের বিচিত্র ইতিবৃত্ত নিয়ে আর কেউ এ ধরনের বই লিখেছেন বলে জানা নেই।

এই গ্রন্থে ব্যারাকপুরে মদের ডিপোতে যেখানে দমদম থেকে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত সমস্ত মদ-গাঁজার ভেন্ডাররা মাল নেয়—তাদের অন্তরঙ্গ চিত্র এবং ডিপোর বুড়ো ক্লার্ক দারিদ্র্য-জীর্ণ যোগেশের পাপপুণ্য বোধ আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে লেখক বলেছেন।

দাক্ষিণাত্যের নৃত্যপটিয়সী মেয়ে কমলালক্ষ্মীর কাছে পাওয়া গেল চোলাই মদ। সেই আসামীর হয়ে গভীর রাত্রে যে তদ্বির করতে এল সে কমলালক্ষ্মীর গুরুভাই। একসঙ্গে এক গুরুর কাছে নাচ শিখেছিল তারা। শুধু তাই নয়—কমলালক্ষ্মী ছিল দেবদাসী। কিন্তু তেলেঙ্গনার দুর্ভিক্ষের সময় সে বাঙলা দেশে চলে এসেছিল—এই কমলালক্ষ্মীর মতই আরও একজন—জারা—ইরানী মেয়ে। বউবাজারের আন্ডার-গ্রাউন্ড তাড়ি-বারের ড্যান্সার। আন্ত-র্জাতিক স্মাগলার প্রণবের জন্য তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। চন্দননগরের বার-বধূ ফুলুর ভালবাসা—তাদের ঘর বাঁধার সেই চিরন্তন মোহ, নিবিড় আন্তরিকতা—সমস্ত মানবিক গুণগুলো হতাশার অন্ধকারে নিবে যায়। ফুলু আর ফাল্গুনী, জারা ও প্রণবের কাহিনী বলতে লেখক বউবাজারের আন্ডার গ্রাউন্ড নাইটবার এবং চন্দননগরের পতিতা পল্লীর চিত্র বেশ সুন্দরভাবেই পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। এমনি আরও অনেক কাহিনী আছে বইটিতে।

ঘটনা-বিন্যাস ও বিষয়বস্তুর অভি-নবত্বের জন্য বইটি পড়তে গেলে ক্লান্তি-বোধ হয় না। লেখকের সমাজ চেতনা ও সংবেদনশীল মনের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় প্রতিটি কাহিনীর বর্ণনায়। একদিন যেমন "প্রিয়নাথ দারোগার দপ্তর" পাঠকদের তৃপ্তি দিতে সমর্থ হয়েছিল তেমনি এ বইটিও পাঠক সাধারণকে ভাবিয়ে তুলতে সমর্থ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সংবাদ-সাহিত্য

লেনিন রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্য। অবিনাশ দাশগুপ্ত। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা-১২। চার টাকা।

বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম মহানায়ক এবং মার্কসবাদের প্রবক্তা ও প্রচারক মহামতি লেনিনের প্রভাব শুধু স্বদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বুদ্ধিজীবী তথা সাধারণ মানুষের কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং বর্তমানেও তার প্রভাব সুদূর-প্রসারী। লেনিনের এই মহতী কর্ম ও প্রেরণার ঢেউ বাংলা দেশের জাতীয় মানসেও দীর্ঘকাল আলোড়ন তুলছে। বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেনিনবাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কতখানি তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং এখনও তার কতটা জের চলছে তারই একটি তথ্যনিষ্ঠ দলিল হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থখানির এক অসাধারণ মূল্য রয়েছে। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচীন পত্রপত্রিকাদি থেকে নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য উদ্ধার করে গ্রন্থখানিকে সুসংবদ্ধ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লেনিনের সত্য মূর্তি উন্মোচনে আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলির নির্ভীক ভূমিকা, বুদ্ধিজীবী মহলে লেনিনবাদ গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ, সুদূর পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের চেতনার উদ্বোধনে লেনিনবাদের ভূমিকা, শিল্পী সাহিত্যিক মহলে লেনিনের আদর্শের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বহু আকর্ষণীয় তথ্যাদি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। তথ্য এবং প্রেরণার দিক থেকে এসব দৃষ্টান্তগুলির যেমন একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে, তেমনি বাংলা দেশের প্রগতিশীল গণ-আন্দোলন এবং গণচেতনার ইতিহাস পরিচয়ে এই সব তথ্য যথেষ্ট সাহায্য করবে। সংগ্রাহক হিসাবে শ্রীদাশগুপ্তের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের মত প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়া এবং প্রয়াসকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করেছেন, কোথাও নিজস্ব মতামতকে আলোচনার ভিতরে জোর করে চাপিয়ে দেননি। অথচ, ভাষা রচনার নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করে গেছেন। বাংলা দেশে লেনিনবাদের বিকাশ এবং বিস্তারের আলোচনায় গ্রন্থখানির যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য থেকে যাবে—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

১৮৩।৭০

প্রাপ্তি স্বীকার

For the Good of the Cause. Alexander Solzhenitsyn. National Academy : 9, Ansari Market, Delhi-6. Price Rs. 4.00.

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ঋষি দাস। অশোক প্রকাশন : এ৬২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৮·০০।

ধূর্জটিপ্রসাদ। অলোক রায়। বাণার্থ : ১/৩ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ৫·০০।

রৌদ্রের ভিতরে চিঠি। বাসুদেব দেব। কবিতা পরিষদ : ৬০/২/৮ লেক রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৩·০০।

Indian Euphemeris. Nirmal Chandra Lahiri. Astro Research Bureau : 57 6 Raja Dinendra Street, Calcutta-6. Rs. 4.00.

লেনিন সরণি। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পাভলভ ইন্স্টিটিউট : ১৩২/১ এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-৪। মূল্য ৩·০০।

রক্তাক্ত খাইবার। কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রকাশ : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৯·০০।

সংগীত নায়ক (প্রথম খণ্ড)। নিমাইচাঁদ বড়াল। প্রীতি প্রকাশনী : ৪১ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ১০·০০।

পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ রচনা। মীরা অধিকারী। শ্রীসাধনকুমার অধিকারী : ২২/২ সি রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ৯·০০।

বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান। কল্হন। সাহিত্য প্রকাশ : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ১২·০০।

বিধাতার অভূতপূর্ব সৃষ্টি। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীনয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য : ১, রমানাথ পাল রোড, কলিকাতা-২৩।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

মঞ্জরী অপেরা

(অ্যাপোলো পিকচার্স)

মঞ্জরী অপেরা" আরম্ভ হবার আগে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের সামনে এসে যাত্রাপালার প্রাণশক্তি ও ঐতিহ্যের কথা বলেছেন। এই ভূমিকাটির কোন প্রয়োজন ছিল কিনা জানি না, তবে তিনি যা বলেছেন, "মঞ্জরী অপেরা"-য় তা অনুভব করা গেল কি?

যদি দর্শকদের আমোদ দেবার চেষ্টাটাই বড় হয় তবে "মঞ্জরী অপেরা" চিত্র তৈরির পরিকল্পনা সফল। এন্টারটেনমেন্ট-এর দিক থেকে "মঞ্জরী অপেরা"-র একটা নিজের আকর্ষণ দর্শকের কাছে আছেই। একই সঙ্গে ছায়াছবির নাটক ও যাত্রা দেখার স্বাদ দর্শক এ-ছবিতে পাবেন। ও-ছাড়া যাত্রার আসরে ধুন্ধুমার জাতীয় নাচ-গানের বন্দোবস্তও আছে। জানি না সেটা যাত্রা-ঐতিহ্যের অন্তর্গত কিনা। তবে নর্তকী অভিনেত্রীর পরনে যে সামান্যতম বেশবাস (ইকনমি অব ক্লোদস) তাতে ছবিতে সেক্স-উপাদান যোগানের কাজ সম্পূর্ণ। ও-ছাড়া চাল-তলোয়ার সমেত পৌরাণিক যাত্রাও "বিবেক"-হীন; বিবেকের গান এতে নেই, আছে সিনেমা সুলভ লঘু সংগীত (সুধীন দাশগুপ্ত সুরারোপিত)। কোনটা কোনটা গানের আঙ্গিকে, কোনটা বসন্ত রাগের ঠাটে (রবীন্দ্র সংগীতও মনে করিয়ে দেয়)। গানগুলির সুর ভাল ("কেমন হল ও বঁধু চোখে কাজল টানা" গান শোনার সময় পলাতক-এর গান মনে পড়ে যদিও), মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান "হিট"-ও করবে হয়ত, কিন্তু সে কি যাত্রার গান? সংগীত পরিচালক অবশ্য আবহ-সুর রচনায় (যাত্রার আসরে এবং আসরের বাইরে) যাত্রার অ্যাটমসফিয়ার অনেকটা ফুটিয়ে তুলেছেন। তবু "বিবেক"-বর্জিত যাত্রা তো, তাই যাত্রার টাচ তেমন পাওয়া গেল না।

"মঞ্জরী অপেরা"-র উপযুক্ত ক্রেডিট-টাইটেল সুন্দরভাবে দেখাতে পেরেছেন পরিচালক অগ্রদূত, টাইটেলের সঙ্গে নেগেটিভ-এ যাত্রাভিনয়ের দৃশ্যে পরিচালকের চমৎকার কল্পনা প্রকাশ পেয়েছে, একটি ভিন্নতর পরিবেশ সম্পর্কে দর্শক ওই মুহূর্তে সজাগ। কিন্তু পরক্ষণেই কীর্তন দিয়ে যে নাট্যকাহিনী শুরু হল তা যাত্রা-দুনিয়ার জীবন-রহস্য ও বৈচিত্র্যকে পাশ কাটিয়ে অতি সরল প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত নাটকে পার্সোনাল ড্রামা-য় গিয়ে ঢুকেছে। এবং মঞ্জরী-কাহিনীও অনিবার্য ট্র্যাজেডি অতিক্রম করে অবাস্তব মিলনের পরিণতিতে পর্যবসিত। দর্শকের ইচ্ছা পূরণের জন্যই হয়ত গোরাবাবু, যিনি তখন নামকরা ফিল্ম স্টার। যা সম্ভব আর কী অসম্ভব তার তোয়াক্কা না রেখে একদা-পরিত্যক্তা মঞ্জরীকে এসে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। শেষে সেই একই কনভেনশন, নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গন।

আসলে যাত্রার প্রাণ ও ঐতিহ্য, যাত্রা-দলের অদ্ভুত জীবনযাত্রা ভিন্নতর পরিমণ্ডল ও চরিত্র পরিচয় ইত্যাদি সব মিথ্যা, "মঞ্জরী অপেরা"-য় ব্যক্তিগত নাটক তথা নায়ক ও নায়িকার প্রেম-বিচ্ছেদ-মিলনের গল্পই সত্য। মঞ্জরী অপেরা এ-ছবিতে শুধুই বাইরের খোলস, উপলক্ষ্য মাত্র। সেই সঙ্গে ছবির শুরুতে কাহিনীকার যা বলেছেন, সেই যাত্রা-শিল্পকে বিশেষভাবে জানা ও বোঝার সুযোগও এ-ছবিতে সামান্য।

তথাপি অগ্রদূতকে একটি বিষয়ে বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। যাত্রার আসরে যে নাটক চলছে তারই সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় তিনি ব্যক্তিগত নাটকটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। নাটকের কথা কখনও বা পাত্র-পাত্রীদের সত্যিকারের মনের কথা হয়ে উঠেছে। মঞ্চের অন্তরালের নাটক দেখাবার কাজে পরিচালকের এই বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষ

"স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে" (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায়

করার মত। তা-ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে লঘু পরিহাসের মুহূর্তে যাত্রাদলের লোকেদের মুখে যাত্রার সংলাপ রেখে দিয়ে পরিচালক একটি বিশেষ জগতের লোকেদের চিহ্নিত করে দিয়েছেন। ছবির সংলাপও ভাল, চিত্রনাট্যটিও (সুবীর হাজরা রচিত) কোন মুহূর্তে ঢিলে মনে হয়নি, যাত্রার আসর ছেড়ে গ্রীনরুমে, গ্রীনরুম থেকে নায়ক-নায়িকার ঘরে চিত্রনাট্যের গতি সদা স্বচ্ছন্দ। নাটকের প্রয়োজনে ফ্ল্যাশব্যাক এবং দৃশ্য-পারম্পর্য চিত্রনাট্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অথচ গতিসম্পন্ন। তাই এত বড় ছবিও ক্লান্তিকর হয়নি কোন মুহূর্তে। এবং পরিচালনার কাজের দিক থেকেও অগ্রদূতের এই ছবি তাঁর অন্যান্য ছবির সারিতে অতি বিশিষ্ট। ফ্রিজ শট থেকে মঞ্জরীর মায়ের অতীত কাহিনীর ফ্ল্যাশব্যাক আরম্ভ করার প্রয়োগটি দেখবার মত। টেকনিক্যাল কাজ (বিভূতি লাহার ফটোগ্রাফি এবং বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এডিটিং সমেত) সামগ্রিকভাবে ভাল হলেও কিছু কিছু দৃশ্য দৃষ্টিকটু কৃত্রিম সেট ব্যবহারের জন্য—যেমন, গোরাবাবু ও অলকার চলে যাওয়ার সময় যাত্রাদলের একটি ছেলের মুখে গানের সময়কার সেট। ওই কাঁচা সেট ওই নাট্যমুহূর্তের রস অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে। নতুবা হঠাৎ মঞ্জরীকে ছেড়ে অলকার সঙ্গে গোরাবাবুর চলে যাওয়ার এই দৃশ্যটি ছবির শ্রেষ্ঠ নাট্যমুহূর্ত। ওই একটি অংশের জন্য পরিচালক সাধুবাদ পাবেন।

মঞ্জরী অপেরা-য় ছায়াছবির নাটকাভিনয় এবং যাত্রাভিনয় দুই-ই আছে। উত্তমকুমার (গোরাবাবু) যাত্রা অভিনয় ছেড়ে যখন ফিল্ম স্টার হলেন, শহরের জীবনে চলে এলেন, তখন তিনি যেন নিজের ফর্মে। যাত্রাভিনয়ের শিল্পী রূপে তাঁকে কেমন যেন অস্বচ্ছন্দ লাগছিল। যাত্রাদলের খাঁটি শিল্পী হতে পেরেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় —মঞ্চে কী মঞ্চের বাইরে। চমৎকার অভিনয় করেছেন তিনি। গীতা দে-ও কম

"চৈতালী" (পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়) ছবিতে তনুজা ও বিশ্বজিৎ

হবে না। তাঁকেও ঈর্ষা ও পরিহাসের সময় মহানন্দের মেয়ে না ভেবে পারা যায় না।

নাম-ভূমিকায় শিল্পী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় যাত্রা ও সিনেমার অভিনয় নৈপুণ্যই দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। তবে মঞ্চের অভিনেত্রী হবার কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে যাত্রার আসরের বাইরের অভিনয়ে। তখন তা কেউ কৃত্রিম মনে হয়েছে। তবে বোনাবাবুর চলে যাওয়ার সময় তাঁর নীরব অভিব্যক্তি অসাধারণ। বাবুল বোস রূপে অনুপকুমার যখন কৌতুকপ্রিয়, তখন তাঁর অভিনয়ে রঙ্গ-সৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা ততটা ভাল না লাগলেও সীরিয়স মুহূর্তে তাঁর চরিত্রচিত্রণ বেশ ভাল।

বনানী চৌধুরীও প্রশংসা পাবেন—মঞ্জরীর মায়ের চরিত্রে সংযত ও মর্যাদাপূর্ণ অভিনয়ের জন্য। এই সঙ্গে আর দুজন শিল্পীর কৃতিত্বের কথাও বলতে হয়—এঁরা হলেন ভানু চট্টোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। ভৃত্য শিউশরণের চরিত্রে বঙ্কিম ঘোষ এবং ম্যানেজারের ভূমিকায় অজয় ব্যানার্জি টাইপ-চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

অলকা-বেশিনী জ্যোৎস্না বিশ্বাস তাঁর নাচ ও বেশভূষার জন্যই যে দর্শককে আকৃষ্ট করবেন তা নয়, অভিনয়ের জন্যও বটে। তাঁর এবং বেবী গুপ্তার যুগ্ম নাচ বেশ উপভোগ্য। তবে পোশাক-আশাকের দিক থেকে জ্যোৎস্না বিশ্বাসকে যাত্রা দলের শিল্পী ভাবতে কষ্ট হলেও মঞ্চের বাইরে তিনি অভিনয়ের নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। আর কিছু না হোক, উত্তমকুমারের সঙ্গে তিনি যেমন দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে (শহরে আসার পর একই বাড়িতে) গেছেন, তা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাপার।

এই অংশে উত্তরাই—উত্তমকুমার ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস একটি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরীক্ষা আর কিছু নয়, বিচ্ছেদের জন্য যে গতানুগতিক ঘটনায় তাঁদের বাধা হয়েছে, শিল্পীরা সেই নাটকের কৃত্রিমতা অনায়াসেই কাটিয়ে উঠেছেন। অস্বাভাবিকতা এই অংশে আরও আছে—সেটি "অভিনব সাক্ষী" সিনেমার পোস্টার ব্যবহারেও। যাত্রার পটভূমিতে ছবি—যাত্রার আসরের জন্যও যদি প্রকৃত যাত্রা প্যান্ডেল এবং বহির্দৃশ্য নেওয়া হত, তবে জায়গায় জায়গায় "মঞ্জরী অপেরা" আরও প্রাণবান হতে পারত। তবে এ-সব বৈসাদৃশ্য খুব বেশি নয়, এবং সব দিক মিলিয়ে অগ্রদূতের এ-ছবিতে নতুনভাবে দর্শকের চিত্ত বিনোদনের যে প্রতিশ্রুতি তা ব্যর্থ হবার নয়।

তুম হাসীন ম্যঁয় জোয়ান

(ভাপি সোনি প্রোডাকশনস)

নামে রোমান্টিক গল্পের আভাস থাকলেও 'তুম হাসীন ম্যঁয় জোয়ান' আসলে একটি ক্রাইম ছবি। অবশ্য হিন্দী ছবির নায়ক-নায়িকার (ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনী) প্রেম, গান, সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি, মিলন ইত্যাদি সবই ফরমুলা হিসাবে দেখানো হয়েছে। তবে হাসীন ও জোয়ানের সাক্ষাত এবং তাদের মধ্যে প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে এক অর্থলোভী ভিলেনের (প্রাণ) শয়তানির সৌজন্যে। দিদির সদ্যোজাত শিশুকে ভিলেনের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়েছে নায়িকা অনুরাধা। এদিকে নবকুমার ঘটনাচক্রে নায়ক সুনীলের হাতে এসে পড়ে। অনুরাধাও যথাসময়ে সুনীলের বাড়িতে শিশুটিকে দেখাশোনার জন্য গভর্নেসের চাকরি নিয়ে ফেলে।

একটার পর একটা সাজানো ও অবাস্তব ঘটনা এবং শিশুটিকে হত্যা করার জন্য ভিলেনের আপ্রাণ চেষ্টার মাঝখানে হিন্দী-চিত্রের যাবতীয় উপকরণ প্রযোজক পরিচালক ভাপি সোনি যথানিয়মে পরিবেশন করে গেছেন। তবে এ-ছবির কৌতুকাংশ বিরক্তিকর এবং পাপকাণ্ডে একটি শিশুকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া (শিশুর কপালের উপর রিভলবার ধরে তাকে হত্যার হুমকি, জিপে নিয়ে পলায়ন, চলন্ত করাতের সামনে শিশুকে ফেলে হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি) রীতিমত পীড়াদায়ক। রোমান্টিক প্রেমের দিক থেকে তো নয়ই, ক্রাইম ছবি হিসাবেও "তুম হাসীন..." দর্শককে খুব তুষ্ট করবে মনে হয় না। তবে শঙ্কর-জয়কিষণ সুরারোপিত গান হয়ত শুনতে ভাল লাগবে।

নাট্য-পাঠাগার

অহীন্দ্র চৌধুরীর দানে কলকাতায় একটি নাট্য-পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হল। প্রধানত নাটক সংক্রান্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার দেশী ও বিদেশী বই ছিল শ্রীচৌধুরীর ব্যক্তিগত পাঠাগারে। এই সব মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নিয়েই গঠিত হল নাট্য-পাঠাগার।

গত ২৫ নভেম্বর নাট্য-পাঠাগারের

অহীন্দ্র চৌধুরী নাট্য-পাঠাগারের উদ্বোধনে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি এস কেশবনকে একটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক দেখাচ্ছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

ফটো—দেশ

উদ্বোধন হল। পাঠাগার পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে অহীন্দ্র চৌধুরী ট্রাস্টের উপর। শ্রীচৌধুরী সহ এই ট্রাস্টে রয়েছেন পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আলিপুরে গোপালনগর রোডে এই পাঠাগারের উদ্বোধন করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবি এস কেশবন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর ভাষণে এই আশা প্রকাশ করেন যে, নাট্য-পাঠাগারটি একদিন বাংলা দেশের নাট্যানুরাগীদের কাছে পীঠস্থান রূপে পরিগণিত হবে। এদিনকার অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্যামোদী উপস্থিত ছিলেন।

"সোনা বৌদি" (পরিচালনা : পীযূষ গাঙ্গুলি) ছবিতে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশু শিল্পী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায় ও শিবানী বসু ফটো—দেশ

বোম্বাই বিচিত্রা

কলাম্‌নিস্টদের 'কলম' মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। কারণ একই শিরোনামার নীচে নিয়মিত লেখাকে 'সুলেখা' করে তোলা যে কী ধরনের ঝকমারী, তা যাঁরা "কলামের" পাঠক তাঁদের কিছুতেই বোঝানো যাবে না। সেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে সাদাসিধে ডিনার খেতে গেছি। ভদ্রলোক বিনয় করে বলেছিলেন 'বিশেষ কাউকেই ডাকছি না, এই আপনাদের মত কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, ব্যস'। সাধারণ ভিড়ের মানুষ তাই নামজাদাদের ভিড়কে একটু ভয়ই পাই। দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে, কাছে গেলেই পাছে এঁদের কাছে কাছেই থাকতে হয় সেই ভয়ে দূর থেকেই এঁদের প্রণাম করি মৃদু হেসে। কিন্তু সেদিনকার ডিনার পার্টিতে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, তখন দেখি একেবারে চক্রব্যূহের মধ্যিখানে পৌঁছে গেছি, নিষ্ক্রমণের আর পথ নেই। বন্ধুবর চিত্র প্রযোজকের বাইরের ঘরে এর আগেও বহুবার এসেছি এবং প্রত্যেকবারই আমার মনে হয়েছে ওঁর বাইরের ঘরে অনায়াসে একটা টেনিস কোর্ট হতে পারত। কিন্তু আজ মনে হল ঘরটা যেন ভীষণ ছোট। চিত্রাকাশের বেশ কয়েকজন উজ্জ্বল তারকা, আর তাঁদের এক একজনকে ঘিরে এক একদল উপগ্রহ। হোস্ট এবং হোস্টেস বিভিন্ন দলকে সামাল দিতে একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়ছেন। ওষ্ঠাধরের সদাহাস্য ভাবটিকে বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁদের ভয়ঙ্কর করুণ দেখাচ্ছে। সেটা লক্ষ করে একজন চরিত্র-অভিনেতা একটু হাসলেন। আমি ভাবছিলাম কোনমতে যদি একটু সুযোগ পাই তাহলেই কেটে পড়ব। সেই সুযোগের খোঁজে যখন সিগারেট ধরাবার ভান করে যে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সেই দ্বার-দিয়েই কেটে পড়ার তাল করছি তখন একেবারে জয়দ্রথের মত এক বীর চিত্র-নির্মাতা আমাকে কাঁক করে ধরে বললেন, "এই যে, আপনাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি।" হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে, কি বলব ভেবে না পেয়ে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম আমি, আর বীর জয়দ্রথ আমাকে বধ করবার একান্ত সংকল্পে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন সেই 'ন স্থানং তিল ধারণং' ড্রইংরুমের এক কোণে। তারপর আমাকে রীতিমত কোণঠাসা করে প্রায় কানে কানে বললেন "আচ্ছা মশাই আপনি নাকি 'দেশে' লেখেন?" করুণ হাসি হেসে একটা জ্যান্ত মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করলাম, "কৈ না তো!" ভদ্রলোক বললেন, "কেন খামোখা চেপে যাচ্ছেন মশাই, যিনি আমাকে এ খবরটা দিয়েছেন তিনি জীবনে কখনো মিথ্যে কথা বলেন না!" আমি আঁতকে উঠলাম! কিন্তু মুখে মৃদু হেসে বললাম, "কলির যুধিষ্ঠির সেই নমস্য ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন না, জীবনটা ধন্য হোক।" জয়দ্রথ বললেন, "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, এখুনি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—তিনি এখানেই আছেন।" বলেই একবার ধাঁ করে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। ওঁর চোখে চোখ রেখে বুঝলাম যে সেই যুধিষ্ঠিরটি এই জমায়েতেই কোন একটা পরিমণ্ডলে জমে আছেন। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে আত্ম-সমর্পণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে জয়দ্রথের মুখে বিজয়ের হাসি ফুটে উঠলো, এবং তিনি হঠাৎ বিগলিত হয়ে বললেন "দেখুন স্যার, পয়সা-কড়ি অনেক হয়েছে, এবার একটু নামযশ না হলে জীবনটা ঠিক মানানসই হচ্ছে না।" "তা তো বটেই, তা তো বটেই" হাসি হাসলাম আমি। জয়দ্রথ রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগলেন, "আর ভারতবর্ষে নাম যশ করতে হলে সব প্রথম স্বীকৃতিটা তো বাংলা দেশ থেকেই পাওয়া উচিত!" সে আর বলতে, সে আর বলতে ভাবে আবার মৃদু হাসলাম। তাতে আরো উৎসাহিত হয়ে জয়দ্রথ আমার কাঁধে হাত রাখলেন। গলার স্বরে ঘনিষ্ঠতার মধু বর্ষিত হতে লাগলো। কানের কাছে কান এনে ফিস ফিস করে উঠলেন "আমার আগামী ছবিতে একজন ফকির আছে তাকে আমি একেবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেকাপ দিচ্ছি, নায়কের বাবার মেকাপটা হবে একেবারে সি আর দাশের মত আর নায়ক যখন ছদ্মবেশে নায়িকাকে ভিলেনের খপ্পর থেকে উদ্ধার করছে তখন তার মেকাপটা হবে একেবারে বিবেকানন্দের ধাঁচে।" আমার বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন হাত মেলাতে। "বলুন, এমন নতুন, রেভুলিউশানারী আইডিয়া আর কোথাও পাবেন?" আমি তখনো হতভম্ব হইনি। আমার অবস্থাটা তখনো 'ন যযৌ, ন তস্থৌ'। ভদ্রলোক সেটা 'ভাব' লেগে যাওয়া ভেবে বললেন, "কথায় কথায় কিন্তু আইডিয়া কাউকে বলে ফেলবেন না, আপনি ঘরের লোক তাই বললাম, তাছাড়া এ ছবিতে আমি বাংলা দেশের [illegible] চাই, সেটা একটু খেয়াল রাখবেন!" আমি উত্তর দিতে যাবো এমন সময় একজন চরিত্র-অভিনেতা এসে খপ করে ধরলো জয়দ্রথকে, "এই যে মশাই আপনাকে আমার পুরো কাজটাই রিশ্যুট করতে হবে—রবীন্দ্রনাথের মেকাপে আমি কাজ করব না—এর আগেও একটা ছবিতে ঐ মেকাপ লাগিয়েছিলাম, সেটা বাংলাদেশের সমালোচকরা খুব ভালো নজরে দ্যাখেনি"। জয়দ্রথ মচকে যাওয়া প্রতিবাদের ঢঙে বললেন "কি বলছেন স্যার, এই তো এঁকে জিগ্যেস করুন!" চরিত্র-অভিনেতা ধমকে উঠলেন, "ওঁকে কি জিগ্যেস করব, এই তো সেদিন কলকাতা গিয়েছিলাম, পথে একদল ছেলে তাড়া করেছিল আমাকে, বলছিলো, ঐ যে রে শালা রবি ঠাকুর সেজেছিল, মার শালাকে"—জয়দ্রথ বললেন, "তারা তো রাস্তার ছেলে, তারা তো সমালোচক নয়!" চরিত্র-অভিনেতা বললেন, "ওরাই সবচেয়ে বড় সমালোচক মশাই!" আমি বললাম, "তা আর বলতে!"

সরল শর্মা

"অনিন্দিতা": (পরিচালনা: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) ছবিতে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও / অনুভা ঘোষ

আমজাদ আলীর সেতার

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সংগীতে এতখানি দক্ষতা—এ যেন সত্যিই অভাবনীয়। স্বীকার করি ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁর পুত্র ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁর রক্তের মধ্যে সংগীতের অনুপ্রেরণা, একটি বিরাট ঐতিহ্যের তিনি ধারক, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করে নিতে হয় যে শুধুমাত্র ঐতিহ্যের দৌলতেই এই বয়সে এতটা দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। সেতারের লক্ষ লক্ষ শ্রোতার মধ্যে অভিনন্দনের যেটি হেতু, তার অনেকটাই আমজাদের স্ব-অর্জিত।

গত ২৭ নভেম্বর কলামন্দিরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁর সরোদ বাজনার আয়োজন করেছিলেন। পণ্ডিত শামতাপ্রসাদ ছিলেন তবলায়। এই সন্ধ্যায় শিল্পী প্রথমে বাজালেন ঝিঁঝোটি রাগে।

ওস্তাদ আমজাদ আলী

জোড়ের অংশ, কিছুটা দেহাতী ছোঁয়া লাগানো। আমজাদের নিপুণ হাতের আলাপ, বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে গৎ এবং সবশেষে ঝালার ঝঙ্কারে আসরটি আগাগোড়াই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সংগীতের পরিবেশন অবশ্যই প্রচলিত পদ্ধতিতে, তবু কখনো কখনো শিল্পী অতিরিক্ত যেটুকু যোগ করেছেন তা আসরের শ্রোতাদের দিকে লক্ষ রেখেই। এ-জাতীয় আসরে তার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। আলাপের বিস্তারে কখনো শিল্পী আত্মমগ্ন, ধ্যানমগ্ন, যেন সুরলক্ষ্মীর চরণেই তাঁর সব কিছু নিবেদন; কখনো বা শামতাপ্রসাদের তবলার সঙ্গে তাঁর সুরের লুকোচুরি: আবার কখনো বা দর্শককে উদ্দেশ্য করেই তাঁর যন্ত্রের যত কিছু বাজনা।

বিরতির পর আমজাদ আলী কিরওয়ানী রাগে বাজালেন। এ-রাগের গভীরতায় আর সুরের কারুকার্যে শ্রোতাকে বিহ্বল করতে তাঁর বেশি দেরি লাগেনি। বিলম্বিত অংশ কিছু হ্রস্ব করে তিনি মুহূর্তেই দ্রুত লয়ে চলে এসেছেন। সময়ও বেশিক্ষণ নেননি। এর পর শ্রোতাদের অনুরোধে বাজালেন খাম্বাজ। এই মধুর রাগটি দিয়েই আসরের সমাপ্তি।

—দিবাকর বর্মা

রেকর্ড-সমালোচনা

কোহিনুর রেকর্ড

বিশেষ করে এ বছরেই দেখা গেল, রেকর্ডে নামকরা হিন্দী ফিল্মের হিট গানের সুর বাংলা কথায় পরিবেশন করার একটা ঝোঁক এসেছে। প্যারডি গানের অর্থ বুঝি, তাতে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের রস থাকে। কিন্তু ফিল্মী হিন্দী গানের সিরিয়াস বাংলা রূপান্তরের মানে কি?

কোহিনুর রেকর্ডে এমন আর দুটি গান শোনা গেল। এবার পুজোর অন্য রেকর্ডেও শোনা গেছে। এর নাম নাকি "ভার্সান"। নাম যাই হোক, এই গানের মৌলিকত্ব কোথায়? কোহিনুর রেকর্ডে হিন্দী "আরাধনা" ছবির দুটি জনপ্রিয় গানের বাংলা রূপ: "একি স্বপ্নের বাণী তুমি" এবং "বসন্ত বাহার" (দ্বৈত)। প্রথমটি গেয়েছেন বিনয় অধিকারী, পরেরটি দ্বৈত-সংগীত, সঙ্গের শিল্পী হলেন আইভিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, "আরাধনা"-র গানের সুরই আছে, গাওয়ার গুণ নেই। আইভিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি রেকর্ড (হীরামন ও পাখিটা/ঐ রামধনুকের) আছে। শ্যামল মিত্রর জন্য গেয়েছেন অনিল রায় (ও দুটি আঁখি/বাঁশিতে গুণ করেছে)। শ্যামলবরণ অর্কেস্ট্রা সহ গিটারে বাজিয়েছেন হিন্দী গানের সুর। শিল্পীদের চেষ্টা ও আন্তরিকতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। রেকর্ডগুলিও হয়ত কিছুটা জনপ্রিয় হবে, তবু শিল্পীদের আরও অনুশীলন দরকার।

মেগাফোন রেকর্ডে শ্যামশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একককার গান (চুপ চুপি কারে ডাকো/সজনী মোর) শ্রোতাদের তুষ্ট করবে। সুন্দর সুর (হিমাংশু বিশ্বাস-কৃত) এবং শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্যের জন্য গান দুটির কদর হবে।

গ্রুপ থিয়েটার 'নো' নাটক

সুশিক্ষণ বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গত ২২ নভেম্বর রবীন্দ্র সদন মঞ্চে দুটি "নো" নাটক পরিবেশন করলেন গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীরা। ইয়োকিয়ো মিসিমার "কানতান" ও "হানজো" এই দুখানি নো-নাটক অবলম্বনে সুরজিৎ বসু রূপান্তরিত "কামরূপে" ও "হৈমন্তী" নাটক দুটির নাম।

সাম্প্রতিক পশ্চিমী নো, আর্টস বা অ্যাবসার্ড নাটকের ধারাশ্রয়ী কিছু নাটক আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে, কিন্তু জাপানের ট্র্যাডিশনাল "নো" নাটকের বাংলায় অভিনয় এই প্রথম। সেদিক থেকে গ্রুপ থিয়েটার নাট্যরসিকদের অভিনন্দন পাবেন।

"নো" নাটকের মাধুর্য তার অনাড়ম্বর সংযমী সারল্যে, নিরলংকার কাব্যময়তায়। সেই গুণ আলোচ্য নাটক দুটিতেও বর্তমান। "নো" নাটকের সব গুণ বজায় রেখেও নাট্যকার আমাদের দেশের সমস্যার যে চিত্রটি এঁকেছেন তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তবে এই জাতীয় নাটক অভিনয়ে যে পরিমাণ

"আটাত্তর দিন পরে" (পরিচালনা : অজিত লাহিড়ী) ছবিতে সামন্ত ভঞ্জ ও চন্দ্রাবতী দেবী

দক্ষতার প্রয়োজন তার অভাব দেখা গেছে। অন্তত প্রথম নাটক "কামরূপো"র। মানুষ বাস্তবে যা পায় না, স্বপ্নে অথবা কল্পনায় তা সে পেতে পারে এবং সেই মুহূর্তটি তার মলিন জীবনের দুঃখ-বেদনার মধ্যেও এক টুকরো সান্ত্বনা হয়ে বেঁচে থাকে—এই রূপকটির রূপায়ণে শিল্পীরা পরিপূর্ণ সফল হয়েছেন এ-কথা বলা যায় না। অথচ আঙ্গিক, পারিপাট্য, নির্দেশনায় এবং সংগীতে পরিবেশ সুন্দর হয়েছে।

দ্বিতীয় নাটক "হৈমন্তী" অথবা "হানাকো"র কিন্তু শিল্পীরা বেশ খানিকটা দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিশেষ করে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (কামাচি) ও সুনন্দা মুখোপাধ্যায় (হানাকো)। প্রৌঢ়া কামাচির ব্যর্থ জীবন এবং তরুণী হানাকোর প্রেমিকের প্রতীক্ষার অভিবাহিত প্রায়োন্মাদ রূপটি এই দুই শিল্পী আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"কামরূপো"র প্রয়োগের দায়িত্বে ছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও "হৈমন্তী"-র নির্দেশনায় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি নাটকেরই মঞ্চ পরিকল্পনা পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের। মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অসিত মুখোপাধ্যায়, আলোকসম্পাতে পরেশ দত্ত ও রূপসজ্জায় সীতা মুখোপাধ্যায়।

এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকটি রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তি ও নজরুলের রচনা পাঠ করেন। এবং সব শেষে যোগেশ দত্ত তাঁর বিখ্যাত মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন।

—দিবাকর শর্মা

ইহুদি মেনুহিনের নেহরু পুরস্কার লাভ

বিশ্ববিখ্যাত এইচ এম ভি শিল্পী বেহালাবাদক ইহুদি মিনুহিন গত ৪ নভেম্বর নয়া দিল্লীতে এসেছিলেন ১৯৬৮ সালের নেহরু পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য। শিল্পীর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী ডায়না এবং ভগ্নী হেপজিবা। পালাম বিমান বন্দরে গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে শিল্পী পরিবারকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। দিল্লীতে নানারকম পোস্টারে ও বিপণি সজ্জায় তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। গ্রামোফোন কোম্পানীর জাতীয় রেকর্ডিং অধিকর্তা শ্রী ভি কে দুবে মেনুহিন-পরিবারকে দিল্লী থেকে বোম্বে নিয়ে যান। বোম্বেতেও তাঁদের বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। ৪ নভেম্বর তিন-মূর্তি ভবনে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী সভায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ ভি ভি গিরি এক লক্ষ টাকার নেহরু পুরস্কার এবং একটি অভিজ্ঞানপত্র মেনুহিনকে প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

রাম ও রহিম

সাইট অ্যান্ড সাউন্ডের নির্মীয়মাণ ছবি "রাম ও রহিম" শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র। কাহিনী রাজকুমার মৈত্রের। এ ছবির প্রযোজক শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত।

নন্দ ডাকাত

হিউ প্রডাকশনস নিবেদিত "নন্দ ডাকাত" ছবির শুভ মহরৎ সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। সংগীত পরিচালনা করেন অনিল দত্ত। সংগীতাংশে যেসব শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, সুলো সাহা ও একটি শিশু বাংলা গানে রূপ দিয়েছেন কুমার সেনগুপ্ত ও সুরকার অনিল দত্ত। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে অমরেন্দ্র সমর চৌধুরী। আগামী মাসে ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত শুটিং শুরু হবে।

পণ্ডিত কণ্ঠেমহারাজের জন্ম-জয়ন্তী

কলকাতার মিউজিক সার্কেল ৬ই ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৯-৩০টায় রবীন্দ্র সদনে প্রয়াত তবলিয়া পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের এক সর্বোত্তম জন্মজয়ন্তী পালন করছেন, সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং কণ্ঠে মহারাজ সম্বন্ধে বলবেন মাইচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী, হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। উক্ত অনুষ্ঠানে সেতার ও তবলা লহরা বাজাবেন যথাক্রমে মণিলাল নাগ ও পণ্ডিত কিষণ মহারাজ।

তরুণ সঙ্গীতশিল্পীর কৃতিত্ব

ভিলাইয়ের তরুণ সেতারবাদক শ্রীবুধাদিত্য মুখোপাধ্যায় এ বছর নিখিল ভারত বেতার সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। সে আকাশবাণীর নাগপুর কেন্দ্র থেকে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। বুধাদিত্যের পিতা শ্রী বি মুখার্জী ভিলাই ইস্পাত কারখানার উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ ঘরাণার একজন বিশিষ্ট সেতার-শিল্পী।

বুধাদিত্যের জন্ম কলকাতায় হলেও সে ভিলাইতেই মানুষ। এখন সে নবম শ্রেণীর ছাত্র। পাঁচ বছর বয়সে তার সংগীতশিক্ষা শুরু, এবং এগারো বছর বয়সে সে মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ সংগীতানুষ্ঠানে বাজনা বাজিয়েছে।

অরণ্যদেব

লী ফক্

ভাল করে পরীক্ষা দে। আমরা দুজনেই যদি সেরা নম্বর পাই, তাহলে কী হবে, মনে আছে তো?
তা আর নেই! দেখি, কী হয়।
কথা বোলো না।

আর নয়, এবারে খাতাগুলো দাও।
নম্বর কখন জানতে পারব?

তোমরা দুজনেই খুব ভালো নম্বর পেয়েছ।
কী মজা!

ব্যাপার কী? এত হাসি কেন?
ওয়াকার-কাকা*, আমরা দুজনেই 'এ' পেয়েছি। এবারে তোমার কথা রাখো।
দুজনেই খুব খেটেছিল।
* অরণ্যদেবকে ছাত্ররা বলে ওয়াকার কাকা

বেশ, আমার কথামতো তোমাদের দুজনকেই স্বর্ণ দ্বীপে নিয়ে যাব। সেখানে একটা ব্যাপার দেখে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।
কী?
কী?

অরণ্যদেবের সঙ্গে ওরা স্বর্ণ-দ্বীপের দিকে চলেছে।
কী দেখে অবাক হব ওয়াকার-কাকা?
আগে সেটা বলব না। দেখলেই বুঝবি!
4/12

নদী কি ভেলায় পার হব? নাকি তোমার মত দড়ি ধরে চলে যাব?
দেখ কী হয়।

খুব জোরে শিস দিলেন অরণ্যদেব... আর তখুনি—
এবারে নতুন কায়দায় নদী পার হব।
তাই নাকি?

খাঁড়ির ভিতর থেকে মস্ত দুই শুশুক নদীতে এসে লাফিয়ে পড়ল।

সলোমন আর নেফারতিতি।
?!
২

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কিছু পুলিস অফিসারের অন্যত্র সরানো প্রভৃতি ব্যাপার আলোচ্য সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বিষয়। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর পশ্চিমবঙ্গের ডি আই জি পর্যায়ের পাঁচজন অফিসারকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় কোন চাকরিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এঁদের বিরুদ্ধে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান বক্তব্য : বর্তমানে রাজ্যের যা অবস্থা তাতে এদের দিয়ে কাজ চলে না। এই সঙ্গেই রাজ্যের আর একজন সিনিয়র ডি আই জি পর্যায়ের পুলিস অফি-সারকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করতে কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছেন। এই অফিসারের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ছাড়াও নানা অভিযোগ আনা হয়েছে। কেন্দ্র থেকেও ডি আই জি এবং সিনিয়র এস পি পর্যায়ের কয়েকজন পুলিস অফিসারকে পশ্চিমবঙ্গে আনা হচ্ছে। এ সময়ে রাজ্য সরকারের পুলিসের কতকগুলি উঁচু পদে রদবদল হবে।

দেশী সংবাদ

২৩ নভেম্বর—বারাসতে কয়েকজন যুবকের মৃতদেহ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে। তদন্ত করবেন একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত হাই-কোর্টের বিচারপতি। এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অন্যান্য কাজে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর অধিকর্তাও কলকাতা আসছেন। কেন্দ্রীয় ফরেনসিক পরীক্ষাগারের বিশেষজ্ঞদেরও রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে বলা হয়েছে।

সোমবার দিন পশ্চিমবঙ্গে মোট নিহতের সংখ্যা আট। কলকাতায় তিন, চব্বিশ পরগণার দমদমে এক, হাওড়ার বালিতে এক এবং নদীয়ার চাকদহে দুই। এছাড়া চব্বিশ পরগণার জগদ্দলে রবিবার পুলিসের গুলিতে একজন মারা গিয়েছে বলে আজ খবর এসেছে।

২৪ নভেম্বর—আজ ভোরে হাওড়ার বাটরা থানা এলাকার শ্রীমদনমোহন খান নামে এক বড় ব্যবসায়ী ছুরিকাঘাতে খুন হন। সোমবার রাতে যাদবপুরে শ্রীসুরেশ ভট্টাচার্য নামে কেন্দ্রীয় কাচ ও সেরামিক গবেষণা কেন্দ্রের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিসটেন্টের ছুরির ঘায়ে মৃত্যু ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত জন-সাধারণের সেবার জন্য ভারত সরকার একসঙ্গে ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সহ ২৫০ শয্যাযুক্ত ভ্রাম্যমান হাসপাতাল পাঠাবার যে প্রস্তাব করে-ছিলেন, পাকিস্তান সরকার তা অগ্রাহ্য করেছেন। ত্রাণকার্যের জন্য ভারত সরকার নৌকা ও মাঝি-মাল্লা পাঠাতেও চেয়েছিলেন পাকিস্তান সরকার তাও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২৫ নভেম্বর—পরিচালনা ব্যবস্থায় নানাপ্রকার ধরনের দুর্নীতিবিচ্যুতির অভিযোগে এবং ক্রমাগত লোকসানের বহর দেখে রাজ্যপাল ডানলপের প্রোপার্টি লিমিটেডের বর্তমান বোর্ড অব ডিরেক-টরসকে বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে।

২৬ নভেম্বর—আজ প্রথম রাজ্য পুলিসের একজন ইনসপেকটর খুন হলেন। এই হত্যাকাণ্ড ঘটে বাঁকুড়ায়। এদিনের অন্যান্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে : হাওড়ার বাটরায় ছুরিকাঘাতে একজন তরুণের মৃত্যু, কসবায় এক যুবক খুন, কলকাতায় একজন হোমগার্ড, একজন কলেজ ছাত্র ও চামড়া ব্যবসায়ী একজন চীনাম্যানকে ছুরিকাঘাত।

খাদ্য ও কৃষি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ পি শিন্ডে আজ লোকসভায় বলেন, কলকাতার বিনিময়ে মাছ আমদানী করার ব্যাপার নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে এবং আসামে মাছের চরম অভাব আলোচনা করার প্রস্তাব তোলা হলে রাষ্ট্রমন্ত্রী তার জবাব দিচ্ছিলেন।

২৭ নভেম্বর—অবশেষে সি পি আই পশ্চিম-বাংলায় নব কংগ্রেসের বিরোধিতায় বাধ্য হয়েছেন এবং তার ফলে আজ আট পার্টি জোট ঘোষণা করতে পেরেছেন : আমরা পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনে নব ও আদি কংগ্রেস, সি পি এম এবং সংযুক্ত গণ-আন্দোলন বিরোধী সব দলের বিরোধিতা করব ও তাঁদের পরাজিত করে দীর্ঘস্থায়ী প্রগতিশীল সরকার গঠনের চেষ্টা করব।

ভারত পাকিস্তানকে ১ কোটি টাকার ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে এবং সাহায্যের পরিমাণের দিক থেকে বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের স্থান তৃতীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান যথাক্রমে আমেরিকা ও বৃটেনের। রাশিয়া ৩৫ লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চীন দিতে চেয়েছে নগদ ২০ লক্ষ টাকা এবং ৬০ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র।

২৮ নভেম্বর—'পুলিসী নির্যাতন ও আটক আইন ইত্যাদির প্রতিবাদে আট ডিসেম্বর মঙ্গলবার চব্বিশ ঘণ্টার জন্য হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওইদিন বাংলা বনধ। রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ও ১২ জুলাই কমিটি এবং আট পার্টি প্রভাবিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি একই দিনে হরতাল পালন করা হবে বলে স্থির করেছেন।

রেলে এবং অন্যান্য স্থানে সমাজবিরোধী কাজকর্মের মোকাবিলার জন্য সমাজসেবীদের নিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় লোকসেনাবাহিনী গঠন করা হবে। রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আজ এই ঘোষণা করেন।

২৯ নভেম্বর—উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় ভারতীয় ক্রান্তি দলের নয়জন সদস্য শ্রী টি এন সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাঁরা বিধানসভায় নির্দল সদস্য হিসাবে বিরোধী আসনে বসবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আজ মেদিনীপুরে ছয়জন ধৃত ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নিতে গেলে পুলিস গুলি চালায়। গুলিতে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। এদের মধ্যে একজন মহিলা। বোমা বিস্ফোরণের ফলে সোদপুরে শনিবার রাত্রেই দুজন যুবক মারা যান। আজ আরও একজনের মৃত্যু ঘটে।

বিদেশী সংবাদ

২৩ নভেম্বর—সোভিয়েট মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গতকাল পৃথিবী থেকে বেতার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ও তাঁদের লুনোখোদ বা চাঁদের গাড়িকে আঁকা বাঁকা পথে ১৯ গজ দূরে চালিয়ে নেন এবং দীর্ঘ চান্দ্ররাত্রির জন্য (পৃথিবীর সময়ের হিসাবে ১৪ দিন) তাকে একটি সমতল স্থানে রেখে দেন।

২৪ নভেম্বর—সোভিয়েট রাশিয়ার সরকারী মুখপত্রে আজ বলা হয়েছে, পশ্চিমী দুনিয়ায় সোভিয়েটের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভের 'স্মৃতিচারণ' নামে পুস্তক আকারে যা প্রকাশ করা হচ্ছে তা আসলে মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনী সি-আই-এর জালিয়াতি ছাড়া আর কিছু নয়।

২৫ নভেম্বর—প্রখ্যাত জাপানী লেখক মিশিমা ইউকিও আজ আনুষ্ঠানিকভাবে হারাকিরি করেন। তারপর তাঁর এক অনুগামী তাঁর মাথাটি কেটে ফেলেন। টোকিওতে সেনাবাহিনীর সদর দফতরে দক্ষিণপন্থী দেশ-প্রেমিকরা চড়াও হলে এই ঘটনা ঘটে।

২৬ নভেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরে গতকাল সকালে একদল পূর্ব পাকিস্তানী যে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তা দেখে পর্যবেক্ষকরা হতবাক হয়ে গিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানীরা ইয়াহিয়া খাঁ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সরকার ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানে তাড়াতাড়ি ও উপযুক্ত ত্রাণের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৭ নভেম্বর—এ-বছর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সোভিয়েট কথাসাহিত্যিক শ্রীআলেক-জান্ডার সোলঝেনিৎসিন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না। আগামী ১০ ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠান হবে। ১৯৫৮ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শ্রীবোরিস পাস্তেরনাককেও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে দেননি।

২৮ নভেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন : পূর্ব পাকিস্তানে দুর্যোগ সত্ত্বেও সাধারণ নির্বাচন পূর্ব নির্ধারিত ৭ ডিসেম্বরেই হবে। তবে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকার ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হবে কিনা মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারই তা ঠিক করবেন।

২৯ নভেম্বর—এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বয়স জনৈকা বলিভিয়ার মহিলার। বয়স তাঁর ২০৩। এই মহিলার ঠিক পরের স্থান হলো একটি রুশ ভদ্রলোকের—বয়স ১৯৫। তার পর একজন ইরানীয় ব্যক্তির : তাঁর বয়স ১৯০ বৎসর।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

নিরুপমা দেবীর
অন্নপূর্ণার মন্দির ৪॥

অনুরূপা দেবীর
মা ৭॥ মন্ত্রশক্তি ৭৲

মন্মথনাথ ঘোষের
বাঁকাস্রোত ৬॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
মহাপ্রস্থানের পথে ৬৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পথের পাঁচালী ৬॥ অপরাজিত ১০৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
স্বর্গাদপি গরীয়সী
১ম—৬৲ ২য়—৫॥০ ৩য়—৬৲

অবধূতের সেই-কালজয়ী দুটি উপন্যাস
মরুতীর্থ হিংলাজ ৬৲ উদ্ধারণপুরের ঘাট ৫॥

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর **বাঙালীজীবনে রমণী** ॥ ২য় মুদ্রণ ॥ ১০·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
কাল, তুমি আলেয়া ১২॥

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের পথেপথে ৭৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মগ্নমৈনাক ৪॥

কালীপদ ঘটকের
মৃদঙ্গার ৪॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপকণ্ঠে ১০৲ বহ্নিবন্যা ৮॥ স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম ৩॥

জরাসন্ধের
ছবি ৪৲ ছায়াতর ৫৲

সাহানা দেবীর
মৃত্যুহীন প্রাণ ৪॥

টলস্টয়ের
ওয়র য়্যাণ্ড পীস ১৭॥

চরণকুমার ভাদুড়ীর
সন্ধ্যাদীপের শিখা ৪॥

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অভিযান ৭৲ কবি ৬৲ কালিন্দী ১০

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
কঙ্কাবতী ৫॥০

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
ঠাকুমার ঝুলি ৪॥০ **ঠাকুরদার ঝুলি** ৪॥০
দাদামশায়ের থলে ৪॥০ **কিশোর গ্রন্থাবলী** ৪॥০

মহেশ ভট্টাচার্যের
ছায়ামিছিল ৬৲ **ভৃগুজাতক** ৫॥০

দেবেশ দাশের
সেই চিরকাল ৩॥০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
যাত্রাপথ ৪॥০ **দ্বৈতসঙ্গীত** ৩॥০

নলিনীকান্ত সরকারের
শ্রদ্ধাস্পদেষু ৫৲ **দাদাঠাকুর** ৫॥০

নির্মলকুমারী মহলানবীশের
বাইরে শ্রাবণ ৬৲

নিরুপমা দেবীর
প্রত্যর্পণ ৩৲ **শ্যামলী** ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কিরীটী রায় ১১৲ **ঝড়** ১০৲ **মুখোশ** ৬৲

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৫॥০ **রবীন্দ্র সরণী** ১০৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পা বাড়ালেই রাস্তা ৫॥০

বিমল ঘোষের
মায়ের বাঁশী ৪॥০

মৈনাকের
বাহুবলয় ৯৲

ভূপেন্দ্র সরকারের
জমি শিকড় আকাশ ২৲

নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ
সন্ধ্যামালতী ৪৲

শংকু মহারাজের ভ্রমণ কাহিনী
নীলদুর্গম ৬॥০ **পঞ্চপ্রয়াগ** ৫৲ **বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা** ৮৲

মানবেন্দ্র পালের
দূর থেকে কাছে ৫॥০

জয়ন্তকুমারের
অভিনেত্রী খুন ৪৲

প্রভাত দেবসরকারের
মথুরানগরে ৫॥০

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ [illegible]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা
দরবার নর্তকী কলাবন্ত—শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ...	৬১১
আলোচনা— ...	৬২১
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক ...	৬২৫
পুস্তক পরিচয়— ...	৬২৭
খেলার মাঠে—একলব্য ...	৬২৯
টেবল টেনিসের আইনকানুন—মুকুল ...	৬৩১
রঙ্গজগৎ— ...	৬৩৩
অরণ্যদেব— ...	৬৩৯
সাপ্তাহিক সংবাদ— ...	৬৪০

প্রচ্ছদ : শ্রীনৃপেন সেন

মিসেস্‌ পি. লক্ষ্মী শর্মা

সকলকে মুগ্ধ করতে···আর তার জন্যই রয়েছে টাটা টেক্সটাইলের সুতী কাপড়, যা আপনার চেহারায় এমন বৈশিষ্ট্যের ভাব ফুটিয়ে তোলে যে সকলে মুগ্ধ হয়ে আপনার দিকেই তাকিয়ে থাকতে চান। পুরুষোচিত রংয়ের ড্রিল ও পপলিন দিয়ে প্যাণ্ট ও সার্ট এত চমৎকার হয় যে আপনি আপিসে বা সাধারণ কোথাও বেড়াতে যাবার সময় বিনাদ্বিধায় পরতে পারেন। আমাদের পপলিন সার্টিংয়ের নাম—এমিনেন্স, হলমার্ক, স্ট্রংহোল্ড ও তাসকন্দ আপনার যা চাই, তাই নিন।
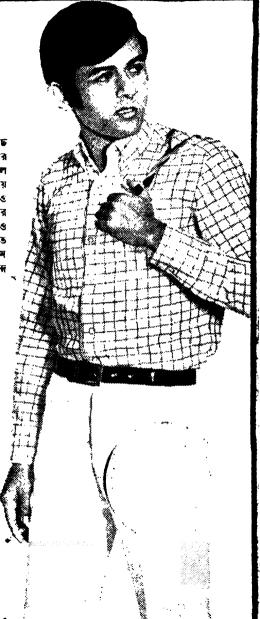
TATA Textiles

ULKA TT-

প্রকাশিত হল
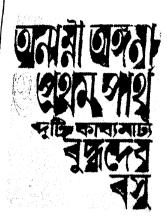
দাম ৫·০০

বিদুরের মাতা, যার নাম পর্যন্ত মহাভারতে উল্লিখিত হয়নি, সেই তরুণী দাসী 'অনাম্নী অঙ্গনা'র নায়িকা। রানীর আদেশে তাকে হতে হয়েছিল বিকল্প, এক রাত্রির জন্য ব্যাসদেবের শয্যাসঙ্গিনী। কত দ্বন্দ্বের পরে তার এই আত্মদান, এবং আত্মদানের পর তার জীবনে কী যুগান্তর এসেছিল, সেই কাহিনী আধুনিকতম মনোবিজ্ঞানের আলোয় উদ্‌ভাসিত হয়ে এই নাটকে বিবৃত হয়েছে।

'প্রথম পার্থ' নাটকে কর্ণের চরিত্রকে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। 'অনাম্নী অঙ্গনা'র বিষয় যেমন অনাবিল নারীত্ব, তেমনি এই নাটকের নির্ভর বিশুদ্ধ পৌরুষ। মহাযুদ্ধের আগের দিন কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে লুব্ধ করতে এলেন পর পর কুন্তী, দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ; কুন্তী তাঁকে তাঁর জন্মকথা শোনালেন, দ্রৌপদী চাইলেন বন্ধুতা, কৃষ্ণ অগ্রিম তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করলেন—কিন্তু কর্ণ রইলেন তাঁর সত্যে অবিচল, এক ভাস্বর, মহান, পরাজিত বীর; সত্যিকার একজন নিষ্কাম কর্মী। দুটি নাটকই ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রচিত, কোনোটিতেই দৃশ্যবিভাগ নেই।

বুদ্ধদেব বসুর

অনন্যসাধারণ দুটি কাব্যনাট্য

অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ

● এই লেখকের অন্যান্য বই ●

পুনর্মিলন ৪·০০ **বিপন্ন বিস্ময়** ৮·০০ **কালসন্ধ্যা** ৩·০০ **কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ** ৫·০০ **গোলাপ কেন কালো** ৫·০০ **তুমি কেমন আছো** ৬·০০ **পাতাল থেকে আলাপ** ৫·০০ **তপস্বী ও তরঙ্গিণী** ৩·০০

কয়েকটি চিরায়ত উপন্যাস

কোথায় পাবো তারে
কালকূট ॥ দাম ২০·০০

সূর্যসাক্ষী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ দাম ১৪·০০

নুনের পুতুল সাগরে
ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥ দাম ১০·০০

দ্বিতীয় দর্পণ
প্রতিভা বসু ॥ দাম ৮·০০

প্রেমের চেয়ে বড়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ দাম ১২·০০

পূর্ণ অপূর্ণ
বিমল কর ॥ দাম ১০·০০

কুবেরের বিষয় আশয়
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১০·০০

শতকিয়া
সুবোধ ঘোষ ॥ দাম ৮·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৯ ॥
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯ ॥

পরীক্ষা সমস্যা

বছর শেষের এই সময়টি স্কুলের পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের খুব সুখের নয়। অ্যানুআল পরীক্ষার জুজু অনেককেই বেশ কাবু করে দেয়। পড়ার দাপটে কারও মুখ শুকোয়, কারও বা গলা ভাঙে। পরীক্ষা-জুজুর ভয়ের সংগে একটা উত্তেজনাও মিশে থাকে ফলাফলের জন্যে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝির পর অবশ্য ভয়-ভাবনা কমে যায়, ততদিনে পরীক্ষার পাট চুকে গেছে। তারপর ক্লাসে ওঠাউঠি, নতুন বইয়ের লিস্টি, শুকনো মুখের বেশির ভাগের চোখেই আবার হাসিখুশী ঝলসে উঠে। এতকাল এইভাবেই স্কুলের অ্যানুআল পরীক্ষা, ছেলেমেয়েদের সারা বছরের পড়াশোনার মোটামুটি একটা বিচার চলে এসেছে। সাফল্য তাদের উৎসাহিত করেছে, বিফলতা দুঃখ দিয়েছে। এই পদ্ধতি ভাল কী মন্দ সেটা অন্য প্রসংগ হতে পারে—কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই পদ্ধতি এখন পর্যন্ত স্বীকৃত, অনুমোদিত। কেউ কোনো আপত্তি তোলেন নি : না ছাত্ররা, না শিক্ষক সম্প্রদায়, না বা সরকারী শিক্ষা-দপ্তর। একেবারে হালফিল, এই বিশেষ বছরটিতেই দেখা যাচ্ছে যে, স্কুল-কলেজের সমস্ত রকম পরীক্ষা পণ্ড করার একটা ব্যাপক ব্যবস্থা চলছে। কলেজের প্রসংগ আপাতত থাক, স্কুলের কথাই বলি। পশ্চিমবংগের বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষার মোটামুটি দু-রকম রেওয়াজ আছে: কোথাও কোথাও সম্বৎসরে তিনবার পরীক্ষা নেওয়া হয়, কোথাও কোথাও দু বার। এ-বছরে খুব কম স্কুলে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। ছেলেরা পরীক্ষা দিতে রাজী হয়নি, তেমন কোনো চেষ্টা হলেও স্কুলে হাংগামা করে পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে। তারা নিজেরাই যে পরীক্ষা দেয়নি এমন নয়, মেয়ে স্কুলেও পরীক্ষা হতে দেয়নি। অনেকে হয়ত আশা করেছিলেন, বছরের মধ্যে যত গণ্ডগোলই হোক, বছরের শেষে অ্যানুআল পরীক্ষাটা হয়ত কোনোরকমে হয়ে যাবে। সে আশা কতটা মিটেছে জানি না, তবে আমরা দেখছি—কলকাতার বেশির ভাগ স্কুলেই বার্ষিক পরীক্ষা হতে পারেনি। মফস্বলে হয়ত অনেক জায়গায় পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষা না হবার একটি মাত্রই কারণ : কিছু ছেলের দৌরাত্ম্য, শাসানি, হাংগামা ইত্যাদি। এই সব ছেলেরা শুনেছি নকশাল-পন্থী। এদের মতে, যে শিক্ষা ব্যবস্থা এখন চলছে—সেটা বুর্জোয়া ব্যবস্থা, আর সে ব্যবস্থা তারা মানতে রাজী নয়, অন্যদেরও মানতে দিতে সম্মত নয়। কথাটা বোধ হয় এই রকমই দাঁড়ায় যে, পরীক্ষা বুর্জোয়া ব্যবস্থা বলেই ছেলেরা তা দেবে না। অতি উত্তম কথা। কিন্তু পরীক্ষা যারা দেবে না তারাই আবার যখন দাবি করেছে পরীক্ষা ছাড়াই তাদের উঁচু ক্লাসে তুলে দিতে হবে তখন কী মনে হয় না যে এরা ক্লাসে ওঠার বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সব সময়েই রাজী, খালি পরীক্ষা দিতেই রাজী নয়।

তেমন করে দেখলে বেশ বোঝা যায়, শিক্ষা পদ্ধতি, তার পরিবর্তন, বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা—এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দায় কিংবা দায়িত্ব এদের নেই; থাকার কথাও নয়। (গুরুস্থানীয় নেতাদের কী আছে?) পরীক্ষার নামে—নিছক এই অজুহাতে স্কুলে স্কুলে হাংগামা করা, শিক্ষক শিক্ষিকাকে শাসানো, ছেলেমেয়েদের সন্ত্রস্ত করাই এক শ্রেণীর ছেলের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই কাজে তাদের সাফল্যও আশাতীত, অন্তত কলকাতার মতন শহরে। মফস্বলের অনেক জায়গায় এবং কলকাতার কোনো কোনো স্থানে সাধারণ মানুষ, অভিভাবক এবং অন্যান্যরা স্কুলে উপস্থিত থেকে পরীক্ষা যাতে নির্বিঘ্নে শেষ হয় তা লক্ষ করছেন। কলকাতায় এটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না। স্কুলের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীরা কিঞ্চিৎ নিরাপদ হয়ত, কিন্তু স্কুলের বাইরে পথে-ঘাটে, অলিতে গলিতে কে কার নিরাপত্তা রক্ষা করছে। কলকাতার মেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের কাছে এমন সব চিঠি গেছে বলে শুনি, বা ফোনে এঁদের যে-সব কথা বলা হয়েছে বলে গুজব তা যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে এর চেয়ে জঘন্য, নোংরা, উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ আর কিছুই নয়। পুলিস কী এ-সম্পর্কে অবহিত নন? স্কুলে-স্কুলে এই ত্রাস-সৃষ্টি যদি সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে কিছু মন্দ-বুদ্ধি, লেখা-পড়া না করা, হিংস্র ধরনের ছেলে এবং তাদের সমর্থকদের জন্যেই আজ পশ্চিমবংগের বিদ্যালয়গুলির লেখা-পড়ার এই হাল। যেখানে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে—বোঝাই যায় সেখানে শিক্ষক শিক্ষিকারা শত শত ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিতে ভরসা পাচ্ছেন না। প্রশ্ন হল, যারা এ-সব দুষ্কর্ম করে তাদের অভিভাবক কারা? তাঁরা নিজেরা কী করেন? কেন তাঁরা নিজেদের সন্তানকে শোধরাবার চেষ্টা করেন না? আমরা যদি সমস্ত দায়িত্ব পুলিস আর স্কুল-কলেজের মাস্টারমশাইদের হাতে দিয়ে বসে থাকি তবে যা চলছে সেই রকমই চলবে, মন্দ ছাড়া ভাল কিছু হবে না।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৬
শনিবার ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH
Saturday 12 December 1970

চিরন্তন ত্রিভুজ

রাষ্ট্রপতির শাসনে পশ্চিমবঙ্গ

দিল্লির হাতে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যে কোনও মতেই ভাল হচ্ছে না এখন তা প্রায় সবাই বুঝেছেন।

কর্তাদের কণ্ঠেও এখন আর সেই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আভাস পাওয়া যায় না। গোড়ায় তাঁরা বুক ফুলিয়ে বলতেন: আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি করবই, আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবই, বন্ধ কলকারখানাগুলি চালু করবই, নতুন নতুন শিল্প গড়বই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন কিন্তু আর ঠিক সে সুরে কথা বলেন না। এখন বলেন: চেষ্টা করছি, ব্যবস্থা হচ্ছে, কাজ এগোচ্ছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এখন কণ্ঠে আর সে দৃঢ়তার ছাপ নেই। এখন অনেক নরম সুর।

এই ব্যর্থতা যে কোনও একটা দিকে তা নয়, ব্যর্থতা সার্বিক। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে আইন ও শৃংখলার ব্যাপারটা আমরা সবচেয়ে বেশী করে দেখতে পাচ্ছি। কারণ, খুনোখুনি মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রত্যেক দিনই আমাদের দেখতে হচ্ছে। না দেখতে চাইলেও দেখতে হচ্ছে। রোজ সকালে খবরের কাগজ তা দেখিয়ে দিচ্ছে। চলতে ফিরতে প্রত্যেক দিন তা দেখতে এবং শুনতে হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবন তাতে ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং, আইন ও শৃংখলার ব্যর্থতার দিকটা সবচেয়ে বড় করে প্রত্যেকেরই চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

দিল্লির কর্তারা প্রথম প্রথম সবাইকে উল্টোটা দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃংখলার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এমনকি, রেডিওতে মারামারি খুনোখুনির খবর বলাও তাই বন্ধ করা হয়েছিল। এখন অবশ্য তাঁরা বুঝে গিয়েছেন, না, ওভাবে বাস্তব অবস্থাকে চাপা যাবে না, ও পথে সত্যকে লুকনো সম্ভব হবে না। কারণ, ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসনে খুনের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশতে গিয়ে পৌঁছেছে—রাষ্ট্রপতির শাসনে গড়ে দৈনিক হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা অন্তত ২। এবং সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হল, মারামারি খুনোখুনিটা এখন আর অঞ্চল বিশেষে বা কয়েকটি পকেটে সীমাবদ্ধ নেই। রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি জেলায়ই তা ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তফ্রন্ট রাজত্বের তের মাসে এর অর্ধেকও খুন হয়নি।

*

অথচ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরই দেখুন অবস্থাটা কেমন ভালর দিকে

এগিয়েছিল। অন্তত একমাস মারামারি খুনোখুনি প্রায় ছিল না বললেই চলে। গুণ্ডা, বদমাস, দাঙ্গাবাজ, রাজনৈতিক মস্তান, মুণ্ডুকাটা বিপ্লবী সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সবাই আশঙ্কা করেছিলেন, এখন বুঝে না চললে বিপদে পড়তে হবে, এখন কোনও বেয়াদবি বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু যেই সবাই বুঝলেন আশঙ্কাটা অমূলক, রাষ্ট্রপতির শাসনে যুক্তফ্রনট আমলের চেয়েও দৃঢ়তার অভাব—অমনি যে যার পথে যাত্রা শুরু করলেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনি ক্রমেই বেড়ে চলল।

এ জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী দিল্লি। রাষ্ট্রপতির শাসনে পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা কিছুতেই দৃঢ়তা আনতে পারলেন না। তাঁরা একের পর এক পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। তাঁরা যে যাঁর খেয়ালখুশি রাজনৈতিক মতলব হাঁসিল করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

দিল্লির কর্ত্রী এবং কর্তারা প্রথমে স্থির করলেন, তাঁরা ধাওয়ানের মত এক ব্যক্তিকে নিয়ে এ রাজ্যের প্রশাসন চালাবেন। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি জানার পরও, ধাওয়ান সাহেবকে এতভাবে চিনেও যে তাঁরা এই কথা ভাবলেন কি করে সেইটাই একটা পরম আশ্চর্যের বিষয়। সেই বিচিত্র এক্সপেরিমেনট শুধু ব্যর্থ হয়েছে বললে কম বলা হবে। বলা উচিত তা ল্যাজেগোবরে হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে প্রশাসনের ভিত যতটা নড়বড়ে হয়েছিল ধাওয়ান সাহেবের স্থূল হস্তাবলেপনে অবস্থা তার চেয়েও খারাপ হয়ে উঠল। সুযোগ সন্ধানীরা সবাই বুঝলেন, রাষ্ট্রপতির শাসনে পরিস্থিতিটা তাঁদের পক্ষে অনেক বেশী অনুকূল হয়েছে।

তারপর এল পরামর্শদাতা নিয়োগের প্রসঙ্গ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চিফ সেক্রেটারি বদলের প্রশ্ন। ত নিয়ে শুরু হল আর এক দক্ষযজ্ঞ। বি বি ঘোষ বললেন, মুখ্য উপদেষ্টা না হলে তিনি উপদেষ্টাই হতে রাজী নন এবং সুকুমার মল্লিক জানালেন, চিফ-সেক্রেটারির পোস্টটা তাঁর চাই-ই। বেশ কিছুটা তদবির তদারকির পর দুজনেরই দাবি মেনে নেওয়া হল। পাঁচজন উপদেষ্টা হলেন, আর সেই সঙ্গে চিফ-সেক্রেটারি হলেন মল্লিক সাহেব।

তাতেও দেখা দিল নতুন বহু সমস্যা। প্রথম সমস্যা হল মুখ্য-উপদেষ্টাকে নিয়ে। বি বি ঘোষ মুখ্য-উপদেষ্টা হওয়ায় এবং তাঁর হাতে কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপারটা যাওয়ায় রাজ্যপাল বেজায় চটলেন। তিনি খুব গোপনে বি বি ঘোষের কাজকর্মে কিছু কিছু বাধা সৃষ্টি করা শুরু করলেন। মুখ্য-উপদেষ্টাকে নিয়ে আবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এম এম বসুও সমস্যায় পড়লেন।

কারণ, বি বি ঘোষ মুখ্য-উপদেষ্টা রূপে আইন ও শৃঙ্খলার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দফতরের কাজেকর্মেও প্রত্যক্ষভাবে তদারকি শুরু করে দিলেন। তাঁর পরে চিফ-সেক্রেটারি হোম-সেক্রেটারি, আই জি, পুলিস
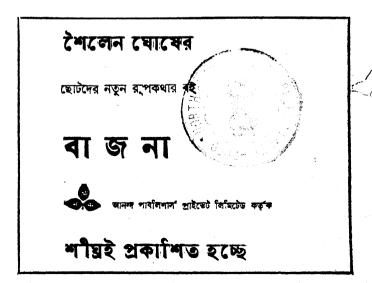
কমিশনার ইত্যাদির নিয়মিত বৈঠক ডেকে চললেন। তাতে বেজায় চটলেন এস এম বসু। এস এম বসু দীর্ঘদিন ধরে নানা পদে রাইটার্স বিল্ডিংসে। চট করে তিনি আর একজন অ্যাডভাইসারের খবরদারি মেনেই বা নেন কি করে! তাই দেখে ধাওয়ান সাহেবও এসে দাঁড়ালেন এস এম বসুর পাশে।

দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল অ্যাডভাই-সারদের সঙ্গে সেক্রেটারিদের সম্পর্ক নিয়ে। আগের বারের রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে রাজ্যপাল ধর্মবীর নিজেই প্রশাসন চালিয়েছিলেন। কোনও উপদেষ্টা তিনি নিয়োগ করেননি। তাতে সেক্রেটারিরাই দফতরগুলির সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছিলেন। এবার যখন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হল তখন সেক্রেটারিরা দেখলেন তাঁদের সে কর্তৃত্ব আর ফিরে এল না। ফলে তাঁরা চটলেন। আর শুধু যে চটলেন তাই নয়, হাত গুটিয়ে নিলেন, অসহযোগ শুরু করলেন। তাতে প্রশাসনই অচল হয়ে উঠল।

চিফ-সেক্রেটারিকে নিয়ে দেখা দিল আর এক সমস্যা। তিনি রাজ্যপাল এবং এস এম বসুর বিরোধিতা সত্ত্বেও চিফ-সেক্রেটারি হলেন। ফলে দুজনেই তাঁর উপর চটলেন। বি বি ঘোষও অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সুকুমার মল্লিককে দিয়ে কাজ চলবে না। ফলে, কার্যত চিফ সেক্রেটারি পদটি ফালতু হয়ে দাঁড়াল। অথচ, যে প্রশাসন ব্যবস্থা এদেশে চালু, তাতে চিফ সেক্রেটারিই হলেন প্রশাসনের প্রধান। সেই প্রধানই সাইফার হয়ে দাঁড়ালেন।

এই সব কিছু মিলিয়ে গোটা রাজ্যের প্রশাসন একেবারে অথর্ব হয়ে পড়ল। কংগ্রেস আমলেই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল—অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা, রেষারেষি সবই সংক্রামিত হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট আমলে সেই সঙ্গে এসে জুটেছিল অন্য আরও বহু ব্যাধি। ওঁরা গোটা প্রশাসনকে প্রচণ্ড ডামাডোলের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন। সবাই আশা করেছিলেন, রাষ্ট্রপতির শাসনে প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে, ফিরে আসবে দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল অবস্থা আরও খারাপ। অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা, পারস্পরিক ঝগড়াঝাটি এখন এত বেশী যা আগে কোনওদিন ছিল কিনা সন্দেহ।

তাই চলছে: রাজ্যপাল রাজভবনে বসে কলকাঠি নাড়ছেন। বি বি ঘোষ স্বরাষ্ট্র থেকে আরম্ভ করে সব গুরুত্বপূর্ণ দফতর নিয়ে বসে আছেন। কিদোয়াই সাহেব পালাই পালাই করছেন। এ কে ঘোষ রাইটার্স বিল্ডিংসটা শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর সুকুমার মল্লিক চুপচাপ একটা ঘরে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। সেক্রেটারি ডাই-রেক্টররাও আসেন আর যান।

*

প্রশাসনের এত শোচনীয় অবস্থা আর কোনওদিন দেখা যায়নি। এই অবস্থার ফলে শুধু যে আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যাহত হয়েছে তাই নয়। ব্যাহত হয়েছে উন্নয়নের কাজও। এটা সত্যি যে রাজ্য প্রশাসন বার বার দাবি জানানো সত্ত্বেও দিল্লি যেমন তাঁদের হাতে সময়মত

আইন দেননি, তেমনি অনুদানের টাকাটাও যথাসময়ে আসেনি। কিন্তু টাকাটা যখন এল অর্থাৎ অনুমোদিত হল তখনও কাজ তেমন কিছু হচ্ছেই না।

বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এ বছর বাড়তি প্রায় ২৭ কোটি টাকা অনুমোদন করেছেন। টাকাটা অনুমোদিত হয়েছে প্রায় তিন মাস হল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার ২৭ লক্ষ টাকাও ব্যয় করে উঠতে পারেন নি। চলতি আর্থিক বছর শেষ হতে আর মাত্র সাড়ে তিন মাস বাকি। যে টাকা খরচা হবে না তার সবটাই কেন্দ্রীয় রাজকোষের গর্ভে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে।

যুক্তফ্রন্ট আমলের বন্ধ কারখানাগুলির প্রায় ১০০টি এখনও বন্ধ হয়ে আছে। সেই বাবদ প্রায় ২০ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। এর উপর আবার রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলেও ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১৪০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। তার মধ্যে খুলেছে মাত্র ২৬ টি। এই সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার ফলেও প্রায় ৩০ হাজার কর্মী বেকার।

বন্ধ কল-কারখানাগুলি খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকার এখনও তেমন কিছু করে উঠতে পারেননি। হালে তাঁরা শুধু ঘোষণা করেছেন, কিছু বন্ধ কলকারখানা খোলার জন্য একটি আইন করা হবে। প্রশ্ন ওঠেনা কি, এই আট মাস কর্তারা বসে কী করছিলেন?

বেকারী তো হু হু করে বেড়েই চলেছে। গোটা রাজ্যে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা সঠিক করে কেউ জানেন না। তবে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, শিক্ষিত পূর্ণ বেকারের সংখ্যা অন্ততঃ ১০ লক্ষ হবেই। এর উপর আছেন অশিক্ষিত বেকাররা, আছেন আধা বেকাররা। কর্ম সংস্থান বাড়াবার ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে উল্লেখযোগ্য কিছুই হয়নি। হয়নি, অর্থাৎ এখনও নতুন কোনও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা ওরা করতে পারেননি। কলকারখানা যা আছে তাও কিছু কিছু বন্ধ হচ্ছে। এ রাজ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থলগ্নীও অত্যন্ত সামান্য। চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত এক কোটি টাকার নতুন মূলধনও বিনিয়োজিত হয়নি। ব্যাপক কর্মসংস্থানের কোনও পরিকল্পনা এখনও এরা করতে পারেনি।

সব মিলিয়ে সব দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রপতির শাসনে পশ্চিমবঙ্গের তেমন উন্নতি হয়নি। কেন হয়নি, কী কী করা দরকার, কী কী প্রয়োজন—দিল্লির কর্তারা একবার তা ভাল করে ভেবে দেখবেন কি?

৫-১২-৭০।

নবারুণ গুপ্ত

অজয় বসুর

এসিয়ান গেমসে পিছিয়ে পড়েছি না পিছিয়েই রয়েছি ?

গত এসিয়ান গেমসের সময় লেখক ব্যাংককে ছিলেন। অন্যান্য দেশের তরুণদের স্বচক্ষে দেখেছেন। লক্ষ করেছেন আমাদের তরুণ-তরুণীরা কত দুর্বল। ভারত কেন পিছিয়ে? সেই আলোচনাই করেছেন বিশিষ্ট ক্রীড়া-সাংবাদিক।

মতি নন্দীর

খেলা আর খেলোয়াড় নিয়ে গল্প-উপন্যাস

বিদেশের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকের গল্প-উপন্যাসে খেলা ও খেলোয়াড় স্থান পেয়েছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আজও নয়। এর কারণ কি বাঙালী লেখকদের অভিজ্ঞতার অভাব, অথবা বাংলার খেলাধুলোর অযোগ্যতা?

প্রদীপ ব্যানার্জির

জলন্ধরে যে ভারতকে দেখেছিলাম

ভারতীয় ফুটবল দলের একদা অধিনায়ক পি কে এখন ভারতীয় দলের কোচ। কোচের চোখ নিয়ে জলন্ধরে সন্তোষ ট্রফির একুশটি রাজ্য দলকে দেখেছেন। দেখেছেন প্রতিটি খেলোয়াড়কে। তাঁর এই প্রবন্ধ থেকেই জানা যাবে কেন বাংলা সেমি-ফাইনালে বিদায় নিল।

রাজন বালার

ওরা আমাদের ইতিহাস বদলাবে

অনেকের ধারণা ক্রিকেটে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পরাজয়ের পর পরাজয়ে এই ধারণাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের তরুণ ক্রিকেটারদের লেখক খুব নিকট থেকে দেখেছেন তাঁদের। তাঁর ধারণা : ভারতীয় ক্রিকেটের সোনালী দিন সমাগত।

সূত্রধারের

ছেঁড়া খাতায় কালের ইতিহাস

যাত্রা-পালা এবং যাত্রা-আঙ্গিকের বিবর্তনের তথ্যসমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অলংকৃত করেছেন

পূর্ণেন্দু পত্রী । সমীর সরকার । অলোক ধর ।

সত্যজিৎ রায়ের

চিত্রজগতের স্মৃতিকথা

এ-কথা সে-কথা

পথের পাঁচালীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক অখ্যাত ও বিখ্যাত অভিনয়-শিল্পীর সান্নিধ্যে এসেছেন সত্যজিৎ রায়। স্বর্গত ছবি বিশ্বাস, চুনীবালা দেবী এবং আরও কয়েকজন শিল্পীর কথা নিয়েই রচিত এই স্মৃতিকথা।

শান্তিদেব ঘোষের

গবেষণামূলক প্রবন্ধ

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের ক্রমবিকাশ

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণার কাজ ইতিপূর্বে বিশেষ হয়নি বলা যায়। রবীন্দ্র-নৃত্য ও সংগীত বিশেষজ্ঞ সর্বজনমান্য শান্তিদেববাবু সেই দুরূহ কাজের সূচনা করেছেন তাঁর এই প্রবন্ধ দিয়ে।

✻

দাম তিন টাকা

রেজিস্ট্রি ডাকে টাঃ ৪·২০

চুনী গোস্বামীর

তবুও কলকাতা ফুটবলের তীর্থ

'আমেদ খাঁ, ভেঙ্কটেশ অথবা মান্নাদা-র যুগে ফুটবলের যত উন্নতিই হোক, আমাদের কালে বাংলা তথা ভারত চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল। এখন মান নেমেছে।'—এজন্য কারা দায়ী? কোচ, কর্মকর্তা, না খেলোয়াড়রা?

পলি উমরিগড়ের

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতের দুটি দল চাই

ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক পলি উমরিগড়ের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীসলিল ঘোষের এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি উক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। কেন?

মুকুল দত্তের

ভারত ও আন্তর্জাতিক ফুটবল

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতীয় ফুটবল দল ও খেলোয়াড়দের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ আলোচনা।

রূপদর্শীর

তোমারই তুলনা তুমি

সম্প্রতি পরলোকগত টপ্পা গানের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী কালীপদ পাঠকের একটি অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্র এই রচনাটিতে বিধৃত। এঁকেছেন স্বনামে শিল্পীরই আর একজন অন্তরঙ্গ শিল্পী — রূপদর্শী।

আরও লিখছেন

শ্রীমতী । জ্যোতির্ময় বসু রায় । পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় । পুষ্পেন সরকার । দিলীপ দত্ত । দীনেন চক্রবর্তী । সমর মুখোপাধ্যায় । বিশ্বদেব বিশ্বাস । সুবীর ঘোষ । চিরঞ্জীব । রবীন্দ্রনাথ ঘোষ । প্রশান্ত ভট্টাচার্য । বিশ্বজিৎ রায় । অরুণ বাগচী । শ্রীধর কুণ্ডু ।

দুটি কবিতা

সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়

[এই কবিতা দুটি যাঁর লেখা, তিনি বেঁচে নেই। কলেজের পাঠ সাঙ্গ হবার আগেই তিনি বিদায় নিয়েছেন। তাঁর কবিতার খাতা থেকে দুটি লেখা এখানে প্রকাশ করা হল।]

কল্যাণ

যদি কোনো শান্ত সন্ধ্যায় ডাক দাও
কল্যাণীয়াসু,
তবে আমি ছড়িয়ে যাব আকাশে,
আমার সম্ভাষণে মদির হয়ে উঠবে
সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ।
ফুলের কাছে সৌরভ বিতরণ করে
পৃথিবীকে করে তুলব
সুগন্ধা।
সাগর থেকে বিশীর্ণ নদীকে আহ্বান জানাব
উৎসাহে।
ময়ূরের নাচকে করে তুলব ছন্দোময়
আমার প্রশংসায়।
তারপর শ্মশানের নিঃসীমতায় মিশে গিয়ে বলব,
আমি অনেক।

চারতলার ওপরে আমি

মাত্র চারতলার ওপরে বসেই আমি
নিজেকে সম্রাজ্ঞী মনে করি।
অনুকম্পায় কোমল চোখে আমি
চারতলা থেকে নীচের দিকে তাকাই।
উঁচু থেকে নীচটাকে সুস্পষ্ট দেখা যায়,
শুধু নীচতলার লোকগুলোর
ক্লান্ত অবসন্ন চোখের ভাষা বুঝতে
দারুণ অসুবিধে ঘটে।
অবশ্য আমি তাতে চিন্তিত নই।
কারণ আমি চোখ তুললেই দেখতে পাই
স্বচ্ছ আকাশ।
চোখ নামালে
দৃষ্টিটা আমার গুরুজনের আশীর্বাদের মতো
লোকের মাথাকে স্পর্শ করে।

ফলশ্রুতি

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি চলে গেলে ঘর অন্ধকার করে তুই
পড়ে থাকবি নিঝঝুম বিছানায়
একথা ভাবলে আমি কষ্ট বোধ করি

বন্ধ চোখের সামনে খেলবে নানা রঙের ফুল
শরীরে তেমনি রঙীন রক্তধারা সখী আমার
আর আমি তোর শরীরের থেকে
আমার দূরত্ব ক্রমাগত বাড়াতেই থাকবো
যতক্ষণ না থামি আমার আপন কাজে ঃ
এ কথা ভাবলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

খাটের শেষ প্রান্তে তোর ক্লান্ত পায়ের পাতা
মাথার দিকে কালো চুলের শব্দহীন ঢেউ
তোর নিশ্বাসের শব্দ নিয়ে চলে গেল ডবলডেকার
আর আমি এত দূর থেকে কেঁপে উঠলাম।

মদের নেশার মতো স্মৃতির ঘোরে আমার পা টলছে
আঙুলের শিখাগুলি গলে পড়ছে আবেগে উত্তাপে
সখী বিছানায় তোর উরুতায় আমার চিতা জ্বলছে
ী আনন্দে কী সংশয়ে কী বেদনায়
প্রেমিকা প্রেমিকা আমার।

এক ফুঁয়ে কি সরানো যায়?

গোপা গঙ্গোপাধ্যায়

একটি ফুঁয়ে অনেক-কিছু ওড়ানো যায়—
টাকাকড়ি, গাড়ি বাড়ি, অনেক শাসন,
সত্য-মিথ্যে অনেক ভাষণ;
তবু
ভোর-কুয়াশায় দল বেঁধে যে ফুল-কুড়নো
সেই স্মৃতি কি ওড়ানো যায়?

একটি ফুঁয়ে অনেক কিছু নেবানো যায়—
দুঃখে-সুখে বাঁচা-মরা, সম্বাদ আর বিসম্বাদের
বাঁকা পথের পথিক হয়ে চলাও যায়;
তবু
করুণ-মুখের ধিক্‌গুলিকে জীবন থেকে নেবানো যায়?

একটি ফুঁয়ে অনেক-কিছু সরানো যায়—
কাক-জ্যোৎস্নায় শপথ-বাক্য প্রাণের ভিতর যতই কাঁদাক,
বজ্র-বুকের বাঁধন পেয়ে স্বস্তি নিয়ে সরানো যায়;
তবু
জীবন-পাশে দুঃখ-স্মৃতি, সুখের ইচ্ছে
সমান তালে আঁকড়ে থাকে সেইগুলো কি
একটি ফুঁয়ে সরানো যায়?

এই দুর্মূল্যের বাজারেও এই বিলাসিতাটুকু রাজীব মল্লিক চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ছোট এক শিশি তেলে তার বেশ কয়েক মাস চলে যায়। যতটা আওয়াজ হয়, তেলের ফোঁটা ততটা পড়ে না।

তুষার নেমে এল। রাস্তার ওপর।

মনটা খিঁচড়ে গেল। বাড়ির মধ্যে ঢোকার একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বালিশের মধ্যে গোটা তিনেক টাকা ছিল, সেগুলো বের করে নিয়ে আসা দরকার। এখন থেকে লাইন দিলে, তবে টিকেট পাবার আশা আছে।

সিনেমার নেশা তুষারের বিশেষ নেই। বসে বসে আড়াই ঘণ্টা ধরে অতি রোমান্টিক কাহিনীর বিন্যাস দেখতে দেখতে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তার চেয়ে টিকেটগুলো চড়া দামে বিক্রি করতে পারলে হাতে কিছু বাড়তি পয়সা আসে।

তুষারের বিদ্যার পরিধি তার বাপের মতন ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত নয়। বি কম অবধি পড়েছে। পরীক্ষার ফি যোগাড় করতে পারলে হয়তো পাসও করে যেত। অবশ্য, তাতে বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হত না।

বিরাট গড্ডলিকাস্রোত, যেখানে বিদ্বান মূর্খ প্রায় সবাই সমান, সেই স্রোতে ভেসে বেড়াত। যার অভ্যন্তরে মধ্যে আঁকড়াবার মতন খুঁটি নেই, তার কাছে ঈশ্বরের সাকার আর নিরাকার রূপ একই।

মাঝে মাঝে তুষারের বিবেক যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যদি অবশ্য বেকারের বিবেক থাকে, তখন সে নিজেকে বোঝায়।

এতে আর অন্যায়টা কি। এও তো ভেজি-মন্দির খেলা। দম যখন কম তখন কেনো, বেশী দরের খদ্দের পেলে ছাড়ো। বিশ্বের অর্থনীতির একেবারে গোড়ার কথা।

তুষার ফিরে এল। চায়ের দোকানের সামনে যেখানে গোটা তিনেক ছেলের জটলা, সেখানে।

কি রে, কি হল রাধার? মুখটা আমসি যে?

পাশের কাঠের বেঞ্চে বসতে বসতে তুষার বলল।

সুবিধা হ'ল না। জন্মদাতা ঘাঁটি আগলে আছে।

তা হলে?

অফিসে বেরোক, তারপর ঢুকব।

দেরি হয়ে যাবে না?

যাবে একটু। তোরা লাইন দে গিয়ে।

বাকি তিনজন দাঁড়াল না। এমনিতেই বিলম্ব হয়ে গেছে।

আজকাল লাইনে ভিড় বাড়ছে। বেপাড়া থেকে ছেলের পাল এসে জুটছে।

ঘণ্টাখানেক পর, বেঞ্চে বসে বসে তুষার যখন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তখন রাজীব মল্লিককে দেখা গেল। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন ছুটছে পানের [illegible] কাটিয়ে কাটিয়ে।

বাবা গলির বাঁকে অদৃশ্য হতেই তুষার উঠে দাঁড়াল। এবার বাড়িমুখো। স্নান খাওয়া সেরে দৌড়তে হবে।

ঢোকবার মুখেই [illegible] সঙ্গে দেখা। বসে বসে চুল বাঁধছে।

রেশনের চাল। আনার কাজটা তুষারকেই করতে হয়। সপ্তাহে একবার। এখানে উপরি কিছু পাবার অসুবিধা আছে। একেবারে বাঁধা হিসেব। কাগজের স্লিপে দাম লেখা।

তাই তুষারকে অন্য পথ ধরতে হয়েছিল। কিছু চাল আর আটা বিক্রি করে দেওয়া। [illegible] ছিল না।

এও বেশী দিন চলল না। উর্মিলা মল্লিক [illegible] কোন [illegible] থেকে ওজন [illegible] এনে [illegible] শুরু করল। তার-পরই চেঁচামেচি।

রাজীব মল্লিকের একটিমাত্র [illegible], [illegible] এই সংসারের পটভূমিতে তুষার প্রতিজ্ঞা করেছে, আর নয়। রেশনে কারসাজি চলবে না।

[illegible] শুধু একবার চেয়ে দেখল। উপেক্ষা আর অবহেলা মেশানো দৃষ্টি। তুষারকে সে মানুষ বলেই গণ্য করে না।

[illegible] সব কথাও বলে।

পাশের বাড়ির এক হলুদ রঙের হুলো ঠিক খাবার সময় এসে জোটে। পাতের তলার এঁটোকাঁটা, মাঝে মাঝে অরক্ষিত অবস্থায় থাকলে পাতের ওপরও থাবা বাড়ায়। খাওয়ার পালা শেষ হলে আর কাছে-পিঠে দেখা যায় না। উধাও হয়ে যায়।

তোর সঙ্গে বেড়ালটার তফাত কোথায়? বাড়ির সঙ্গে শুধু খাবার সম্পর্ক। গৃহস্থ কোথা থেকে কি জোটাচ্ছে দেখবার দরকার কি।

তুষারের একটা দুর্বার ইচ্ছা হয় ভাতের থালা ঠেলে মেরে উঠানে ফেলে দিয়ে উঠে চলে যায়। এ ধরনের অপমান দুষ্পাচ্য।

কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করেছে। এই মেজাজের মূল্য দিতে হবে অনাহারে থেকে। কারও কোন অসুবিধা হবে না। বরং এই অপচয়ের কৈফিয়ত দিতে হবে রাজীব মল্লিকের কাছে।

তনিমার পাশ কাটিয়ে তুষার বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

স্নানের ঘর বন্ধ, তার মানে মা ঢুকেছে। বের হতে ঘণ্টা খানেকের কম নয়।

তুষার নিজের ঘরে ফিরে এল।

সিঁড়ির তলায় অপ্রশস্ত একটু জায়গা। এদিকে কাঠের পার্টিশন ঘিরে ঘরের চেহারা দেওয়া হয়েছে।

আড়াই হাত একটা তক্তপোশ আর একটা টিনের ট্রাংক। এই তুষারের সংসার। দেয়ালের পেরেকে ল্যুঙ্গি আর গামছা।

বালিশের খোলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তুষার একটা দু টাকার নোট বের করল, তারপর বালিশটা উল্টে পাল্টে তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাকি টাকাটার সন্ধান পেল না।

আশ্চর্য, তার এই ধনাগারের খবর তো বাড়ির আর কারো জানার কথা নয়। ভাবতে শুরু করল, টাকাটা আর কোথাও রেখেছে কিনা, কিংবা কিসে খরচ করেছে।

অনেক ভেবেও কুলকিনারা পেল না। উঠে বাইরে এল। চাল বাছা শেষ করে তনিমা চালগুলো একটা টিনের কৌটায় ঢালছে।

তুষার সেখানে এসে দাঁড়াল।

দিদি।

ডাক কানে গেছে তনিমার মুখ দেখে তা মনে হল না।

এই দিদি।

তুষারের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে।

তনিমা উত্তর দিল না। আড়চোখে শুধু দেখল।

আমার একটা টাকা পাচ্ছি না।

টাকা!

তনিমা এমন মুখের ভাব করল যেন টাকা কি পদার্থ সে জানে না, কিংবা তুষারের টাকা থাকতে পারে এটাই তার চরমতম বিস্ময়।

হাঁ, বালিশের খোলের মধ্যে রেখে-ছিলাম।

আমি নিয়েছি।

কথাটা তনিমা এমন নির্লিপ্ত, নিষ্পৃহ কণ্ঠে বলল যে তুষারের বুঝতে বেশ একটু অসুবিধাই হল।

সম্ভবত তনিমাই টাকাটা নিয়েছে, কারণ সে-ই মাঝে মাঝে তুষারের বিছানাপত্র রোদে দেয়, কিন্তু এত সহজে, একেবারে প্রথম অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করবে এটাই একটু আশ্চর্যজনক মনে হল।

তুই নিয়েছিস্?

হাঁ, মার মালিশের ওষুধটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, অথচ মার ব্যথাটা খুব বেড়েছিল, কোথাও একটি পয়সা নেই, খুঁজতে খুঁজতে তোর বালিশের মধ্যে থেকে টাকাটা পেয়ে গেলাম।

ঈশ্বর জানেন, কথাটা সত্যি কিনা।

তনিমা জানে মার শরীরের কথা বললে তুষার কিছু বলতে পারবে না। এ সংসারে ওই একটি মানুষের ওপর তুষারের সামান্য দুর্বলতা আছে, এটা তনিমার জানা।

সত্যিই মাঝে মাঝে মার মেরুদণ্ডে অসহ্য একটা বেদনা হয়। অনেকক্ষণ ধরে মালিশ করলে তবে ব্যথার একটু উপশম হয়।

কিন্তু এমনও হতে পারে, ওই টাকাটা দিয়ে মার ওষুধ নয়, তনিমা ঠোঁট রং করার কাগজ কিনেছে।

তুষার আর কথা বাড়াল না। সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবদাহের সৃষ্টি হবে। বের হতে দেরি, তারপর হয়তো মেজাজ দেখিয়ে তুষারকে অভুক্ত অবস্থাতেই বের হয়ে যেতে হবে।

তার চেয়ে একটা টাকার ব্যাপার এখন চাপা থাক। তনিমার সঞ্চয় কোথায় থাকে তা তুষারের অজানা নয়। একদিন সুদসমেত উশুল করে নিলেই হবে।

ছিটকিনির শব্দ শুনে তুষার বুঝতে পারল মা স্নানের ঘর থেকে বের হয়েছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে স্নান সেরে আসনটা পেতে নিয়ে তুষার রান্নাঘরে বসে পড়ল।

এবারে তনিমা নয়, মা ভাতের থালা সামনে বসাল। বেশ একটু শব্দ করে।

তুষার খেতে শুরু করতে নিভাননী এসে বসল।

লক্ষণটা খুবই খারাপ।

তুই কি ভেবেছিস মনে?

প্রথমে তুষার ভেবেছিল উত্তর দেবে না। নিরুত্তর থাকলে অনেক সময় সুবিধা হয়। বোবা অজাতশত্রু।

কিন্তু মা থামল না। প্রশ্নটা আবার করল। একই প্রশ্ন।

কি রে, তুই কি ভেবেছিস বলতে পারিস?

ভাতের গ্রাস মুখে নাড়াচাড়া করতে করতে তুষার বলল।

কি সম্বন্ধে? তোমাদের সংসারের ব্যাপারে?

অনেক ঘুষোঘুষির একটা কথা তুষার বইতে পড়েছিল, এবার চোখে দেখল।

প্রশ্ন, পারলে নাগরির মা উত্তেজনায় আরক্ত, উদ্দীপিত হয়ে উঠল।

তোর লজ্জা করে না, এত বড় ছেলে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছিস? একটা মানুষ দিনের পর দিন মুখে রক্ত উঠিয়ে তোর খোরাক জুটিয়ে যাচ্ছে?

তুষারের দুবার ইচ্ছা হল একবার বলে, শুধু আমার খোরাক নয় মা, তোমাদেরও। কিন্তু কিছু বলল না। ডালের বাটিটা পাতের ওপর উপুড় করে দিল।

দুটো একটা টিউশনিও তো করতে পারিস।

মহিলার অজ্ঞতায় তুষার বিস্মিত হল।

খাওয়া শেষ করে জলে চুমুক দিয়ে বলল।

কোথায় আছে মা? কে দেবে আমাদের টিউশনি?

মা যেন একটা সূত্র পেল।

সত্যিই তো, এমন লক্কা পায়রার মতন চেহারার কাছে কে ছেলেকে পড়তে দেবে। যেমন পোশাক, তেমনই জুলপির বাহার।

জুলপির উল্লেখে তুষারের মনে পড়ে গেল। বাঁ হাত দুটো গালে বোলাল। একটু ছাঁটতে পারলে হত। থুতনিটা কামানো উচিত ছিল তার মানেই তো ব্লেডের খেলা। বাপের ব্লেডে আগে কাজ সারত, কিন্তু রাজীব মল্লিক ইদানীং চালাক হয়ে গেছে। কামানোর বাক্স আজকাল আলমারির ভিতর।

একটা কিছু কর বাবা, এভাবে তো আর চলছে না।

উঠতে গিয়েও তুষার বসে পড়ল।

মার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর। এইতেই তুষার ঘায়েল হয়।

শক্ত কথার শক্ত জবাব দিতে তার কোন

অসুবিধা হয় না, কিন্তু মোলায়েম কণ্ঠেই মুশকিলে পড়ে যায়।

স্যারে বোঝ না কেন, আজকাল সবাই স্কুলের মাস্টারকে বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখতে চায়। শুধু কি আর পড়াবে, দরকার হলে কোয়েশ্চেনও বের করে নিয়ে আসবে। আজকাল সবাই চালাক হয়ে গেছে মা।

তুষার উঠে পড়ল।

বেশ দেরি হয়ে গেছে। হয়তো টিকেটই পাবে না। লাইনের ল্যাজের দিকে দাঁড়ালে যা হয়। তা হলে দিনটাই বরবাদ।

কোনরকমে জামাটা মাথায় গলিয়ে, প্যান্টের হিপ পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলের ওপর চালিয়ে তুষার বেরিয়ে পড়ল।

এখনও বাস ট্রাম বোঝাই। পাদানিতেও স্থান ভার। এত লোক নিত্য কোথায় যায় কে জানে।

চাকুরেরা চাকরি করতে যায়, বেকাররা যায় চাকরির সন্ধানে, আর একদল উটকো লোক এদিক থেকে ওদিকে চষে বেড়ায়। নোংরা বোম্বাবাবুদের কলকাতা দেখে।

অবশ্য বাসে ট্রামে ভিড় হলেই ভাল। গাটিখরচ দিতে হয় না।

তুষার চলন্ত একটা বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল।

সারা দিনে এত লোকের প্রাণান্ত হচ্ছে, তবু কিছু লোকের পরমায়ুর প্রতি মমতার অন্ত নেই। পরের পরমায়ুর প্রতি।

আহা হা, ঝুলবেন না, ঝুলবেন না, উঠে আসুন।

তুষার একবার আড়চোখে বাসের ভিতরের চেহারাটা দেখে নিল। উঠে এলে তো একেবারে বাসের চালায় উঠতে হয়।

একটা পা জুত করে মাডগার্ডের ওপর রাখতে রাখতে তুষার বলল।

ভাববেন না দাদা, মৃত্যুঞ্জয়ী পিল খেয়েছি। চট করে কিছু হবে না।

দূর থেকেই দেখা গেল।

মানুষের একটা দীর্ঘ লাইন সরীসৃপ আকারে ফুটপাথ হয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। ইটি নাম-করা লেখকের, সিনেমায় অবশ্য সত্যিই একটা বড় আকর্ষণ নয়। সেন্সারের কাঁচি এ ছবিতে খুব নির্মম হয় নি। কাজেই সব বয়সের লোকের ভিড় হবে। মবাঙালীরও।

কিন্তু লাইনে দাঁড়ানো অর্থহীন। যা ব্যাপার, লাইনের অর্ধেক লোক টিকেট পাবার আগেই টিকেটঘর বন্ধ হয়ে যাবে।

লাইনের পাশ দিয়ে তুষার হাঁটতে লাগল।

একটু এগোতেই দেখা মিলল।

অসীম বোলান আর সন্দীপ।

কি রে, এখন এলি কেন? ঘুমোগে যা। রাত্রির ঠিক হবে।

তুষার ... কোন উত্তর দিল না। পকেট থেকে দু টাকার নোটটা বের করে ... বলল ... রাখ এটা। দেড় টাকার একটা টিকেট কিনিস।

তুষার নোটটা সন্দীপের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, সে বলল।

পিছনে দে। আমি দুটো টিকেট কিনব।

বোলান হাত বাড়িয়ে নোটটা নিল। তার মুখে সিগারেট ছিল, সিগারেটটা হাতে নিয়ে বলল।

দেখ, আমরাই টিকেট পাই কিনা। লোকগুলো মনে হচ্ছে কাল রাত থেকে লাইন লাগিয়েছে।

তুষার লাইন থেকে সরে এল। এখন কিছু করার নেই। প্রতীক্ষা করা ছাড়া। টিকেট পেলে সেই টিকেট আবার খদ্দেরের

কাছে ঝাড়তে হবে। তাতে মুশকিল কিছু নেই। খদ্দেরদের কাছে যেতে হয় না, তারাই খুঁজে খুঁজে আসে।

যাদের টিকেট থাকে তারা প্রায় শো শুরু হবার একটু আগে আসে। দাঁড়ায় না, হনহন করে ভিতরে চলে যায়।

কিন্তু যাদের টিকেটের দরকার, তারা আগে এসে ফুটপাথে দাঁড়ায়। ছেলেদের দল দেখলে নীচু গলায় বলে, দাদা, হবে নাকি দুটো টিকেট? এক টাকা পঞ্চাশের?

তারপর দরাদরি শুরু হয়। বই অনুযায়ী ব্যবস্থা।

আগে পুলিসী হামলার ভয় ছিল। এখন পুলিস নিজের জান বাঁচাতেই অস্থির। এসব ছোটখাট ব্যাপারে নজর দেয় না।

খুব শ্লথগতিতে অজগর-লাইনটা নড়ছে। এক পা এক পা করে মানুষগুলো এগোচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুষারের ভাল লাগল না।

পাশের রেস্তরাঁয় এসে বসল। পকেট থেকে খুচরো বের করে হিসাব করল। যা আছে খুবই সামান্য। কটা দিন চলবে। যদি আজকের টিকেটটা ডবল দামে বিক্রি করতে

পারে তাহলে বাড়ীর দেড় টাকা পকেটে আসবে।

বয়কে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে তুষার আবার ভাবতে বসল। একটু দূরে ম্যানেজারের টেবিলে খবরের কাগজটা পড়ে রয়েছে। তুলে নিয়ে কর্মখালির বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ বোলালে হয়। যদি লাগসই কিছু নজরে পড়ে।

কিন্তু না ভাল লাগল না। সেইনকই সার। টাইপ করার খরচ আর খামের পয়সাই নষ্ট। এদেশে লোক ঠিক হয়ে গেলে তবে চাকরি খালির বিজ্ঞাপন বের হয়। নিছক নিয়মরক্ষা।

চা এল। আস্তে আস্তে তুষার চুমুক দিল। অনেকটা সময় কাটাতে হবে।

গোটা দশেক টিউশনি পেলে তো ভালই হয়। সংসারের সকলের মুখনাড়া খেতে হয় না।

তুষার চেষ্টা করে করে হয়রান হয়ে গেছে। তার চেহারাই দোষ হয় অন্তরায়। এমন একজনের হাতে কেউ ছেলের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

বিমলেন্দুর টিউশনি অবশ্য এমনই জুটে যায়। বশিরবাড়ীর দু একটা ছেলে পড়ালেই চাকরি। খেলে খেয়ে বসার মেজ তাড়ানো।

সমীরের কথা তুষারের মনে পড়ে গেল। বি-কম পাস ছেলে একসঙ্গে। তার সঙ্গে তুষারের অন্তরঙ্গতা ছিল সব চেয়ে বেশী। চাকরির চেষ্টায় মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে ফেলেছিল। ইদানীং অবশ্য এমন লোক ছিল না যাদের পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল। তারপর একদিন নিপাত্তা হয়ে গেল।

অনেকদিন পর যখন দেখা হল, তখন সমীরকে আর চেনবার উপায় নেই। পরনে টেরিলিনের শার্ট, টেরিকটের প্যান্ট, হাতে দামী ঘড়ি, চোখে সানগ্লাস। ডিপার্টমেন্টের চালকের পাশে বসে রয়েছে।

চিনতে পারার পর তুষার ছুটে গিয়েছিল।

কি রে, ভাল চাকরি করছিস মনে হচ্ছে?

উত্তরে সমীর শুধু হেসেছিল।

কোথায়, কোন ডিপার্টমেন্টে?

তুষারের এই উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে সমীর বলেছিল।

ডবল্যু বি।

ওয়েস্ট বেঙ্গল?

আমতা আমতা করে তুষার বলেছিল।

না, ওয়াগন ব্রেকার।

অতীতের গর্জনের সঙ্গে সমীরের শেষ দিকের কথাটা মিলিয়ে গিয়েছিল। বুঝতে তুষারের বেশ সময় নিয়েছিল।

চা শেষ করে কাপটা সরিয়ে রেখে তুষার পয়সা কটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল। আড়ামোড়া ভাঙল। রৌদ্রোজ্জ্বল

রাস্তার দিকে এক পলক দেখল তারপর বেরিয়ে এল রেস্তরাঁ থেকে।

লাইনে গন্ডগোল শুরু হয়েছে। চীৎকার, ঘুষোঘুষি চলেছে। ও কিছু নয়, থেমে যাবে। যে কোন ব্যবসাতেই এ রকম হয়। যারা পিছনে থাকে তারা গোলমাল করে।

একটু এগিয়ে বন্ধুরা কোথায় রয়েছে দেখতে গিয়েই তুষার ঘুরে দাঁড়াল।

রাস্তার দিকে থেকে একটা চীৎকার ভেসে আসছে।

ফুটপাথের ওপর একটা ভিখারিনী, সম্ভবত অন্ধ, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

কি আবার হল!

পায়ে পায়ে তুষার সেই দিকে এগিয়ে গেল। বছর ছয়েকের বেশী নয়। ছোট একটা বাচ্চা। পরনে নেংটি। রাস্তার ওপর থেকে কাগজ কুড়োচ্ছে।

বেশীক্ষণ দেখবার তুষার আর অবসর পেল না। দু এক মুহূর্ত দ্বিধা করেই ছুটে গেল।

লাল রঙের দোতলা দৈত্য একটা ছুটে আসছে। ছেলেটার সঙ্গে তার ব্যবধান ফিট কয়েক।

এটুকু তুষারের মনে আছে, ছেলেটার হাত ধরে সে নিরাপদ এলাকায় ছুঁড়ে দিয়েছিল। তারপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা। আশপাশে বাড়ি দোকান, লোকজনের মুখ ঘন কালো পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত। এখনও এত রক্ত ছিল তুষারের দেহে। যৌবনের রক্ত, কর্মহীন আলস্যে সে রক্তকণিকা জমাট বাঁধে নি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর বৃষ্টি শুরু হল চালকের ওপর। সিনেমার সামনের লাইনটা ভেঙে চুরে সবাই নেমে এল রাস্তায়। বাসের প্রতিটি কাচ চূর্ণবিচূর্ণ হল।

ক্ষিপ্রবেগে চালিয়ে বাসটাকে থানার মধ্যে ঢোকানো হল। কিন্তু গোলমাল থামল না। অন্য সব যানবাহন আক্রান্ত হল।

প্রথমে টিয়ার গ্যাস, তারপর কয়েকটা গুলি।

কোলাহল স্তিমিত হতে তুষারের দেহ মানুষের নজরে পড়ল। রাস্তার ওপর থেকে তাকে ফুটপাথের ধারে শোয়ানো হয়েছিল। সারা গায়ে কাচের টুকরো। চাপ চাপ রক্তে মুখ চোখ সব ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতাল, সেখান থেকে মর্গ। সন্দীপ, রেহান আর অসীম সঙ্গে রইল। লাশ ছাড়ল পরের দিন।

একদল ছোকরা অসীমদের সঙ্গে দেখা করল।

পুলিসের গুলিতে মারা গেছে?

কি জানি জানি না।

ক্লান্তকণ্ঠে একজন বন্ধু উত্তর দিল।

এ আর জানাজানি কি! পুলিস তো বেপরোয়া গুলি চালিয়েছে। দাঁড়ান, আমরা আসছি। আধঘণ্টার মধ্যে ওরা এল। খাটিয়া আর ফুলের স্তূপ নিয়ে।

তুষারের দেহ ফুলে ঢেকে গেল।

খাটিয়া ওঠবার সময় হাসপাতালের গেটে একজন স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারণ করল।

প্রথমে পার্টির অফিসে, তারপর তুষারের বাড়িতে।

বাড়ীর মল্লিকের কাছে খবর গিয়েছিল, সিনেমার টিকেটের কালোবাজারির [illegible] গিয়ে পুলিসের লাঠিতে তুষার খুন হয়েছে।

সর্বনাশ, এ খবর অফিসে পৌঁছলে চাকরি থাকবে না। অকর্মণ্য, অক্ষম ছেলের জন্য এ বয়সে বাড়ীর মল্লিক চাকরি খোয়াতে পারবে না।

দরজায় খিল দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। নিভাননী সেই দুঃসংবাদের অসহ্য যন্ত্রণায় শয্যাগত। তবু ইচ্ছা ছিল, শেষবারের জন্য একবার ছেলেকে দেখবে, কিন্তু স্বামীর ভয়ে পারল না।

খুব সাবধানে, মা-বাপের অগোচরে তনিমা খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। শবযাত্রা তখন বেশ একটু এগিয়েছে। ছুটতে ছুটতে তনিমা সামনে এসে দাঁড়াল। হাতের সস্তা দামের সাদা ফুলের মালাটা খাটিয়ার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আঁচলে মুখ ঢাকল।

বালিশের খোল থেকে নেওয়া এক টাকা থেকে আশী পয়সার মলম কিনেছিল মা'র জন্য। বাকি কুড়ি পয়সার গাঁদার মালা তুষারকে ফেরত দিল।

সংসারের কাছ থেকে আর তুষারের চাইবার কিছু থাকল না।

॥ দুই ॥

আত্মস্মৃতির পরিক্রমায় এগুবার আগে নিজের কুল পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন আছে বোধ করি। কিন্তু ছোট বেলাতেই যে নিরুদ্দেশের অকূলে ভেসেছিল অজস্র ঘাট পেরিয়ে অবশেষের বালবেলায় এসে জীবনের শেষ ঘাঁটি আত্মবিস্মৃতির উপকূলে পৌঁছে নিজের কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগানো সম্ভব নয় বোধ হয়।

মহাকালের মোহনায় দাঁড়িয়ে গত কালের মোহ না রাখাই তো ভালো। যখন সামনে চোখ রেখে কিছুই দেখা যায় না তখন পিছনে তাকিয়ে থেকে লাভ? মহাসাগরের অতলে ডুবে যাবার আগে নিজের মনে ডুব দেওয়াই তো বেশ। কিন্তু...

দিন কতক আগে এক ভদ্রলোক এসে এমন বেকায়দায় ফেললেন আমায়!

'অমুক পত্রের পক্ষ থেকে আমি আসছি।' তিনি জানালেন, 'আমাদের পত্রিকায় আমরা আপনার জীবনকথা ছাপতে চাই...।'

শুনেই না আমি চমকে গেছি। আমার প্রতি কোনো পত্রিকার এহেন পক্ষপাতের হেতু খুঁজে পাই না— 'আমার জীবনের কথা আসছে কোথা থেকে? আমি জন্মালাম কবে যে মরার...' কথা দিয়ে বলতে যাই।

'আমরা অমুক অমুক অমুক সাহিত্যিকের আত্মপরিচয় ছেপেছি, সেই পর্যায়ে আপনারটাও প্রকাশ করতে চাই আমরা।'

'তাঁদের পর্যায়ে আমি পড়ি না।' সবিনয়ে জানাই: 'তাঁরা যথারীতি জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন, বাড়ছেন আরো বাড়বেন—তাঁরা জীবন্ত। তাঁদের পূর্বসূরী উত্তরসূরী দুই-ই আছে। তাঁদের জীবনী অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু আমার কথা আলাদা।'

'আলাদা কেন?'

'কারণ এই যে আমি নিজেকে সাহিত্যিক বলেই মনে করি না। সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা আমি সৃষ্টি করতে পারিনি। গাইতে না পারলেও অনেকের গান বোঝার ক্ষমতা থাকে আমারও অনেকটা সেইরকম। স্বয়ং সাহিত্যিক না হয়েও আমি সাহিত্য বোঝার সামান্য একটু ক্ষমতা রাখি।'

'সাহিত্য বলতে আপনি কী বোঝেন? জানতে পারি কি?'

'যা সর্বকালে সর্বজনের সহিত যায়, যেতে পারে। সহযাত্রার শক্তি রাখে। সর্বজনের সর্বক্ষণের সম্পূর্ণ মনের মতনক্ষেত্র, আমার মতে, তাই সাহিত্য। সে রকম লিখতে পারে কজনা? আমি তা পারি না। তাই আমি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর থেকে আলাদা।'

'সাহিত্যিক নন কী আপনি?'

'সাহিত্যিকরা সবাই মহৎ স্রষ্টা, স্বভাবতই প্রেরণার বশে তাঁরা লেখেন। সামান্য লেখক-মাত্র আমি লিখি নিছকই টাকার জন্য। লিখে খাই আর নিজের খাই মেটাবার জন্যেই লেখা। প্রেরণার আদায়ে নয়, প্রাণের দায়ে আমার লেখা।'

লিখে খাই। নিজের খাই মেটাবার জন্যেই লিখি।

'প্রাণের দায়ে লেখা?'

'হ্যাঁ। লিখতে আমার একটুও ভালো লাগে না। যা কষ্ট হয় কী বলব! না লিখতে হলে বেঁচে যাই। লিখতে মেহনৎ, পরিশ্রমের ফল সেই লেখার গা থেকে ঘাম মুছাতে মেহনৎ আবার। আদৌ সাহিত্যিক নই। আমি মেহনতি জনতার একজন। মজদুরের সগোত্র।'

'সব লেখকই লিখে টাকা পান, তা বলে টাকার জন্য লেখেন এ কথা বলা যায় না।' তিনি বলেন।

'গায়ে জোর নেই বলে রিকশা টানতে পারি না। তার বদলে এই কলম টানি। কলমের ওপর টান আমার এই টুকুই।' আমি জানাই।—'সাহিত্যের সঙ্গে আমার সংযোগ ততখানিই।'

'তাহলেও আপনি লেখক তো নিশ্চয়ই। অনেক লিখেছেন খাবার খাতিরে না লিখলেও নেহাৎ মজুরির জন্যেই আপনার এত লেখা এ কথা ঠিক মানা যায় না।'

'লেখা আমার পেশা হলেও পিঠে হয়েই আমার লেখা। বেশ, মজদুর বলতে না চান মুটে বলতে পারেন আমায়। মুটে খেলেই আমার খাওয়া; মোটামুটি লিখে মোটের ওপর কিছু পেটে খাওয়া।'

'যাই বলুন, এদেশের মাপকাঠিতে আপনাকে সাহিত্যিকের মধ্যেই গণ্য করা যায়...'

'আমি গণ্য করি না। সাংবাদিক বলতে পারেন ইচ্ছে করলে। আসলে আমি হচ্ছি ছোটদের লেখক—ছোট লেখক।'

'বড়দের লেখা দিয়েই আপনি শুরু করেছেন বলে শোনা যায়...'

'সেসব লেখা দেখা যায় না আর। কোথায় তলিয়ে গেছে কে জানে! আমারও সেই দশাই হত, কোথায় চলে যেতাম আদ্দিন, ভাগ্যিস সেই ছোট বেলার ছড়াটা মনে পড়ে গেল 'বড়ো যদি হতে চাও ছোট হও তবে'—

ছোটদের লেখক হয়ে গেলুম—রয়ে গেলুম শেষ পর্যন্ত।'

'বড় হলেন ত শেষ পর্যন্ত।'

'আমি হইনি ঠিক। আমার পাঠকরা হয়েছে। বেড়ে উঠে তারা দিকপাল হয়েছে একেকটা। তারা আমায় টেনে তুলতে চেয়েছে বলে আজ আমার এই বাড়বাড়ন্ত।

'এরকম ত হয় না বড় একটা। বড় হয়ে ছোটবেলার লেখকদের ভুলেই যায় ছেলেরা।'

'কারণ আছে তার। আমার লেখায় ছোট-দের কখনই আমি ছোট বলে ধরিনি, অবোধ শিশু বলে গণ্য করিনি কখনো। আমার সমকক্ষ বলেই ধরেছি তাদের। বয়স্ক বন্ধুর মতন বিবেচনা করেছি। বড় হবার উপদেশ নয়, বড়ত্বের স্বাদ পেয়েছে তারা আমার লেখায়। সেই আস্বাদ তাদের মনে লেগে রয়েছে এখনো। সেই কারণেই হয়ত এটা হবে।'

'আপনি ছোটদের একজন প্রিয় লেখক আমি জানি। আপনার শিশুসাহিত্য ছোটরা খুব ভালোবাসে।'

'সে আমি শিশুসাহিত্য করি না বলেই। 'করি না' না বলে পারি না বলাটাই ঠিক। সত্যিকার শিশুসাহিত্য করেছেন দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর, কুলদাচরণ, সুখলতা রাও সুকুমার রায় প্রভৃতিরাই—শিশুদের জন্যই লিখেছেন—শিশুদের মত করেই লেখা। সে কলম আমি পাব কোথায়! এ যুগে সে লেখনী আর সেই লেখা হারিয়ে গেছে বলেই আমার মনে হয়। কারো কারো হাতে সে ধরনের লেখা এখনও খেলা করে বটে কিন্তু সে অতি বিরল।'

'একালের সেই বিরল দৃষ্টান্ত কারা?' তিনি জানতে চান।

একটা গিলটি বোধ সর্বদাই আমার মনে

'মোহনলাল, সুকুমার দে সরকার, সতী-কান্ত গুহর নাম করা যায়। এর পরের ধাপে মনে কিশোর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়েন, হেমেন্দ্র, প্রেমেন, নারাণ গাঙ্গুলী, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, ধীরেন ধরকেও ধরা যায়...'

'আর আপনি?'

'আমি এঁদের ধারে কাছেও নিজেকে ধরাতে পারি না। আমার ছোটদের লেখায় ভেজাল আছে, সেই অ্যাডালটারেটেড লেখা ছেলেমেয়েদের অ্যাডলট বানিয়ে ছাড়ে। আর সেই জন্যেই হয়ত তারা তা ভালোবাসে। কোনো হিতোপদেশ নেই আমার লেখায়, আদর্শ স্থাপনের বালাই নেই কোনো, কোনো বাণী দিইনে আমি—সেই জন্যেই হয়ত সোনার যোগ্য মনে করে তারা। বলুন, বাণী দেবার আমার কী আছে, সোনাই আসলে নেই যেখানে। খাঁটি সোনার নয়, পরিপাটি গিলটির—সেই কারণেই আমার রচনায় এত কারুকার্য, অলঙ্কার, এমন শব্দজাল, বুঝেছেন? শব্দমেরা বাদ দিলে আমার লেখায় কী থাকে, আর এই কারণেই একটা গিলটি বোধ সর্বদাই আমার মনে।'

ভদ্রলোক চুপ। আমার নিজের প্রতি নিজেরই দাক্ষিণ্যের অভাব দেখে বুঝি তিনি নিরুত্তর হয়ে গেছেন।

'আমার নিজের কী মনে হয় জানেন? শিশুসাহিত্যের সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। শিশুই নেই তো শিশুসাহিত্য। শিশু কোথায় এখন? শিশুরা আর জন্মায় না, জন্মালেও বেঁচে থাকে না বেশিদিন, মানে, ঐ শৈশব অবস্থাটা অতি ক্ষণস্থায়ী এখন। সময় গতিকে শিশুরা সব বয়স্ক হয়েই জন্ম নিচ্ছে, দেখতে না দেখতে বুড়িয়ে যাচ্ছে দেহের দিকে নয়, মনের দিক থেকে। এখন-কার ছেলেমেয়েদের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প দিয়ে ভোলানো যায় না, পক্ষিরাজ ঘোড়া আর তালপত্রের খাঁড়ায় তারা ভোলে না, চন্দ্রাভিযানের এই যুগে চাঁদের চরকা কাটার বুড়ির সুতোর মায়ায় জড়ানো যায় না তাদের। কল্পলোকের গল্পকথা এখন অচল। শিশুসাহিত্যের সেই সত্যযুগ গেছে, এখন তার এই ঘোর কলিতে তাই আমার এই গাঁজার কল্কে।'

'না না, কী বলছেন।' আমার তরফে তাঁর ওকালতি—গাঁজা নয়।

'গাঁজা কি না আমি জানি না? গাঁজানোই। তবে কী জানেন? লেখা মাত্রই নেশা ধরায়—গাঁজা হোক বা না হোক। নেশা না ধরালে পেশা চলে না। সব শিল্পেরই কলে কথা মূলে কাহিনী। তবে আসল কথাটা এই, ছেলেমেয়েদের আমি ভোলাতে চাইনি, ঠকাতে চাইনি, সজাগ করে দিতে চেয়েছি তাদের চোখ কান মন ফুটিয়ে দিয়ে... আজকের পৃথিবীর, এখনকার জীবনের একেবারে মুখোমুখি করে দিতে চেয়েছি।'

'সেই কথা বলুন!'

'এখনকার ছেলেমেয়েরা যেন খেলা করতে নিয়ে তৈরি হয়েই জন্মেছে, প্রদীপের মতই উন্মুখ। দেশলাই কাঠি ঘষে দিলেই প্রদীপ্ত। মুহূর্তের মধ্যে মানুষ। কৈশোর থেকে এক লাফে এক ধাপেই যৌবনে। সত্যি বলতে, সব শিশুর মধ্যেই সম্পূর্ণ মানুষটি রয়েছে পরিণত হবার প্রত্যাশায়—পুরোপুরি জেগে উঠতে চায় সে। সোনার কাঠি ছোঁয়ালেই হলো। তাহলেই চোখে কানে মনে সে সজাগ। বালক-বালিকারা ছদ্মবেশে বিশ্বজয়ীর দল। সাহিত্যের কাজ [illegible] তাদের এই জাগিয়ে দেওয়া। এবং শিশু-সাহিত্যই বলুন আর কিশোর সাহিত্যই বলুন, সর্বাগ্রে তাকে সাহিত্যই হতে হবে।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' তিনি মেনে নেন আমার কথাটা।

'দুধের বদলে পিটুলি গোলায় ভোলানো তাদের চলবে না। সেকালে যেমন করে কিশোরকে ব্রহ্মবোধের দীক্ষা দিয়ে ঈশ্বর সাক্ষাতে নিয়ে যাওয়া হত, একালে তেমনি জীবনবোধের শিক্ষা দিয়ে তাকে বিশ্বের সাক্ষাতে নিয়ে যাওয়া। সে যুগের উপনয়নের মতই এই উপনয়ন—দুনিয়ার দরবারে তাকে পৌঁছে দেওয়া। এই জন্মের মধ্যেই অনেক জন্ম লাভ, শুধু দ্বিজত্ব মাত্র নয়, আরো আরো অনেক জন্ম লাভের বোধ সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা লাভ করি। সাহিত্যই আমাদের তৃতীয় নয়ন—তার সাহায্যেই আমরা নিজেকে অপরকে জগতকে যথার্থরূপে দেখতে পাই। সাহিত্যই সেই দৃষ্টি প্রদীপ। সাহিত্যিকের দায়িত্বও তাই এই মনের চোখ খুলে দেওয়া। হৃদয়কে জাগানো।'

'সে কথা মানি।'

'আমিও সেই দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছি—আমার সাধ্যমত। কতটা পেরেছি জানিনে,

কিন্তু ছোটবেলাতেই যাতে তারা নিজেদের পরিবেশ—সমাজ সংসার মানুষের ধরণধারণ সম্বন্ধে সচেতন হয়, জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে, প্রয়াস পেয়েছি তার। জীবন আর জগতের সব কিছুই তাদের জানাতে চেয়েছি—যদিও একটু তির্যকভাবে। আড় চোখে দেখলে দেখা যায় আরো। সোজাসুজি না বলেও বোঝাবুঝির কোনো অসুবিধা হয় না—বুঝলেন? এমনিতেই ছোটরা আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে, বেশি বুঝদার।'

'এটা কী বললেন?'

'ঠিকই বলেছি। ছোটবেলায় বোধশক্তি স্বভাবতই তীব্র থাকে। অনুভবের দ্বারা তারা বোধ করে—কেমন করে যেন বুঝতে পারে সব। ছেলেবেলায় সকলেই খুব চালাক চতুর চৌকস থাকে, তারপরে যতই বড় হয়ে ওঠে চার ধারের ধাক্কা খেয়েই হয়ত বা, তাই আরো ভোঁতা হয়ে ভোঁদা মেরে যায় কেমন! নিতান্ত বোকা কিম্বা অতিবুদ্ধি হয়ে, বুদ্ধিজীবী বলে বুদ্ধু হয়ে যায় বোধ হয়।'

'হ্যাঁ, ছোটরা যে বড়দের চেয়ে চালাক চৌকস সেটা লক্ষ্য করেছি—'

'আর আমার গল্প পড়ে হয়ত তারা আরো একটু চোখা হয়। আমার লেখার পাওনাও সেইখানেই...থাক্ এ কথা, আপনি কী বলছিলেন?'

'আমি এসব কথা আলোচনার জন্য আসিনি। আপনার জীবনকথা জানার জন্যই এসেছিলাম, কিন্তু আপনি ধান ভানতে...'

কথাটা যেন তিনি উলটো বললেন মনে হলো। ধান ভানতে শিবের গীত নয়, শিবের গাজন গাইতে এসে ঢেঁকির বাদ্যি শুনতে হয়েছে ওঁকে। ঢেঁকির চক্কর নয়, শিবের গীত শুনতেই তিনি উদগ্রীব।

'আমার জীবনকথা আবার কি! সবার জীবনও যা আমারও তাই' আমি জানাই। —এমন কিছু ভিন্নতর নয়, সবার মতই। কোথাও হয়ত বা একটু ইতরবিশেষ, কোথাও একটু বিশেষভাবে ইতর। এই যা।'

'তা কি কখনো হয় নাকি?'

'যেখানে আর সবার থেকে আমি আলাদা তা আমার আর্ট। এই আর্টই লেখক শিল্পীর শিল্পসত্তা। তার বেঁচে থাকা, পেশায় এবং নেশায়। এ ছাড়া তার কোনো অস্তিত্ব নেই। শিল্পীর এবং তার শিল্পের কোনো অতীত কথা নেই, ভবিষ্যৎ বার্তাও নেই কোনো। সমস্তটাই তার বর্তমান।'

'বর্তমান?'

'সব সময়ই বর্তমান। সবার চোখের ওপর—সর্বদাই। মহাত্মা গান্ধীর জীবনই যেমন তাঁর বাণী, শিল্পাত্মা লেখকেরও তেমনি সে যা বানিয়েছে তাই তার জীবন। তার বাইরে কিছু নেই। সেই জীবনকাহিনীই তো জানালাম এতক্ষণ আপনাকে।'

(ক্রমশ.)

সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়াস—অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বহু শর্ত আছে; তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল সঞ্চয়-আয় অনুপাত বাড়ানো। বলা হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ যাতে সঞ্চয় করা যায় তার জন্য অনগ্রসর দেশগুলির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। জাতীয় আয়ের একটি অংশ সঞ্চিত হলে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান করার ক্ষেত্রেও তার একটি অবদান থাকে; তার চেয়েও বড় কথা হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টার অর্থসংস্থানে আমাদের জাতীয় সঞ্চয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পারে। সঞ্চয় বাড়াবার অন্যতম উপায় হল অনুৎপাদনমূলক ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস। ভারতের ক্ষেত্রে ভোগজনিত আয়ের পরিমাণ বেশী; কারণ ভারতবাসীর গড় ভোগপ্রবণতা (Propensity to Consume) বেশী। আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ খাদ্যশস্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির অন্য একটি উপায় হল কর-ভার বৃদ্ধি। সাধারণত মনে করা হয়, বেশী কর ধার্য করা হলে সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে যে বেশী রাজস্ব পাবেন তা পাওয়া সম্ভব হবে ভোগ-জনিত ব্যয়ের পরিমাণ কমে যাবার ফলে। কিন্তু কর-ভার বাড়াবার ক্ষেত্রে যদি পরোক্ষ করের উপর বেশী নির্ভর করা হয় তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। আমাদের দেশে যে জিনিসগুলির উপর সাধারণত কর ধার্য করা হয়ে থাকে সেগুলির অধিকাংশই নিত্যাবশ্যক; প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রীগুলিও কর থেকে রেহাই পায়নি। তাই পরোক্ষ করের বৃদ্ধি হলে বেশী দাম দিয়েই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনতে হয়; তার ফলে যে হারে সরকারের রাজস্ব বাড়ে, আপেক্ষিকভাবে তার চেয়ে ঢের বেশী হারে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ে। সঞ্চয় বৃদ্ধির আশা তখন সুদূর পরাহত হয়। প্রত্যক্ষ করের হারও আমাদের দেশে খুব বেশী। বিশেষ করে আয়করের প্রান্তিক হার এত বেশী যে, সঞ্চয়ের পরিমাণ তার ফলে ব্যাহত হয়।

সঞ্চয়ের পরিমাণ বহু ক্ষেত্রে কতকগুলি সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণগুলি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানোর দায় শুধু বেসরকারী ক্ষেত্রের নয়, সরকারী ক্ষেত্রেরও। সরকারী সংস্থাগুলি জাতীয় সঞ্চয় বাড়াবার কাজে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থাগুলির সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়াস

আদৌ সফল হয়নি। 'লাভও নয়, ক্ষতিও নয়,' এই নীতি ভারতের সরকারী সংস্থাগুলি অনুসরণ করে না। তবুও ভারতে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুবই কম। অধিকাংশ সরকারী সংস্থায় আমরা লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশী দেখতে পাচ্ছি। বেসরকারী ক্ষেত্রে সঞ্চয় হতে পারে গৃহস্থের ক্ষেত্রে (Household Sector) এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (Corporate Sector)। ভারতে বেসরকারী বিনিয়োগের অবস্থা খুব ভাল নয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি না হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভারতে সঞ্চয়ের অধিক অংশ আসে সাধারণ গৃহস্থদের কাছ থেকে। তাই সঞ্চয় বাড়াতে হলে প্রথমেই সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় (real income) বাড়ানো দরকার। প্রকৃত আয় বাড়তে পারে তখনই যখন একদিকে জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়বে, অপর দিকে জিনিসপত্রের দাম কমবে।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর করতে হলে, মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা প্রশমিত করতে হলে, মূলধন-সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত।

উন্নয়ন-ধারায় গতিশীলতা

ভারতের উন্নয়ন-ধারায় গতিশীলতার অভাব দেখা যাচ্ছে বলে অনেক অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। এই অভিযোগ মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় যেখানে শতকরা ৯·৭ ভাগ বেড়েছিল, ১৯৬৮-৬৯ সালে সেখানে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২·২ শতাংশ। অবশ্য এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতের ১·৮ শতাংশের বেশী জাতীয় আয় বাড়বে না; সে ক্ষেত্রে ২·২ শতাংশ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে মোটেই বেশী বলা যায় না। ১৯৬৯-৭০ সালে পুনরায় শতকরা ৫·৫ ভাগ জাতীয় আয় বেড়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন যদিও আশানুরূপে বেড়েছে, রপ্তানি উন্নয়নের হার বেড়েছে মাত্র শতকরা ৫·৩ ভাগ। অথচ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে শতকরা ৭ ভাগ হারে রপ্তানি-আয় বাড়বার কথা ছিল। কৃষি-উৎপাদন অবশ্য ভালোই হয়েছে। তবুও দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করে দেখলে এটা পরিষ্কার হয় যে, ভারতের উন্নয়ন-হার যতটা গতিশীল হওয়া উচিত ছিল, ততটা নয়। গত বছর কৃষি-উৎপাদন হয়তো শেষ পর্যন্ত শতকরা ১ ভাগ কম হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। অ-কৃষি উৎপাদন হার ৪·৫ শতাংশ বেড়েছে বলে অনুমিত হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে কিন্তু অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয়। চলতি বছরে রপ্তানি-আয় গত বছরের হারে বাড়বে বলে মনে হয় না।

দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে গতিশীল উন্নয়ন-ধারা বজায় রাখতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন কৃষিক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব'কে সার্থক করে তোলা। আমাদের দেশের প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগ অধিবাসী কৃষিজীবী। জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে খাদ্য আমদানি হেতু যে বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে বাইরে চলে যায় তা বাঁচবে। সেই বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে উৎপাদনের কাজে লাগতে পারে এ-জাতীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমরা আমদানি করতে পারি। শিল্পক্ষেত্রে এখনও আমরা প্রচুর পরিমাণ অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা (idle capacity) দেখতে পাচ্ছি। এই উৎপাদন-ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারলে শিল্প-উৎপাদনের হার বাড়বে। শুধু তাই নয়, নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন এখন খুবই বেশী, এবং এই বিনিয়োগে যতটা সম্ভব শ্রম-নিবিড় প্রকল্পে হওয়া দরকার। যদিও উন্নয়ন-হার দ্রুত বাড়াবার জন্য শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি থেকেও মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির গুরুত্ব বেশী; তবুও দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার লোকের স্বার্থেই আমাদের এখন শ্রম-নিবিড় উৎপাদন-সূচী গ্রহণ করা দরকার। বেকার সমস্যার মোকাবিলা দ্রুত না করতে পারলে দেশের উন্নয়ন-হার বর্ধিত করার প্রচেষ্টা নিরর্থক হবে। রপ্তানির পরিমাণ বাড়াবার জন্য আমাদের এক দিকে যেমন রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, অপর দিকে তেমনি চিরাচরিত জিনিসের পরিবর্তে নতুনতর জিনিসের রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টা করা দরকার। উন্নয়ন-হারে গতিশীলতা বাড়াবার জন্য প্রয়োজন হল অবিরত উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়াস ও উদ্দীপনা, এবং এ জিনিসটিরই অভাব এখন আমাদের দেশে খুব বেশী।

সুব্রত গুপ্ত

কমল
আননকে
কোমল ক'রে
তুলুন...
রূপচর্যার দুর্লভ
তেলের সমন্বয় —
ল্যাকমে
কোল্ড ক্রীম দিয়ে
Lakmé
COLD CREAM
ল্যাকমে
কোল্ড ক্রীম
ASP/L-74

নয়

এরই মাঝখানে একদিন গৌরীর কাছ থেকে বার্তাবহ আসে। ছেলেটি আর কেউ নয়, ওর ছোটভাই মোহন। অবিকল দিদির মতো দেখতে। কলকাতায় মাসীর বাড়ি থেকে ডাক্তারি পড়ে। মোহনকে দেখে রত্নর অন্তরে অহেতুক স্নেহের সঞ্চার হয়। আত্মার আত্মীয় যে!

গৌরী কলকাতা এসেছে। রত্নর কি চায়ের সময় অন্য কোনো কাজ আছে? না থাকলে একবার যেন দেখা করে যায়।

উৎপলের সঙ্গে সেদিন সেবাদির ওখানে যাবার কথা ছিল। রত্ন মাফ চেয়ে নেয়। সেবাদি অপেক্ষা করতে পারেন, গৌরী তো অপেক্ষা করবে না। ও ফিরে যাবে।

মোহন বাইরে দাঁড়িয়েছিল। রত্নকে ভিতরে নিয়ে গেল। গৌরী ওকে বাড়ির লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচয়টা হলো এই বলে যে ও জ্যোতির বন্ধু। এবার ওর আপ্যায়ন যেমন সাদর তেমনি সর্বাঙ্গীন। চা তো নয় ছোটখাটো একটা ভোজ।

গৌরীকে বেশ উৎফুল্ল দেখায়। সেই যে একটা 'মরে যাব, মরে যাব' ভাব ছিল সেটা আর নেই। লেডী ডাক্তার নাকি অভয় দিয়েছেন যে নর্মাল ডেলিভারি হবে। বাপের বাড়িতে থেকেও সেটা সম্ভব। কলকাতা থেকে ব্যবস্থা হবে, যদি দরকার হয়।

পত্নীত্বকে গৌরী কোনোদিন মেনে নিতে পারেনি, কিন্তু মাতৃত্বকে এই ক'মাসের মধ্যেই মেনে নিয়েছে। মা হতে যাচ্ছে বলে প্রথমটা ওর যেমন বিবমিষা ছিল এখন তেমন নয়। দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার মতো বাড়ছে ওর কলেবর। ওর তুলনায় রত্ন তো কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ। দিন দিন ক্ষীণ হচ্ছে।

"তোমাকে অমন সলতের মতো দেখাচ্ছে কেন? ওরা খেতে দেয় না?" গৌরী সুধায়।

"খেতে দিলে কি এমন রাক্ষসের মতো খেতুম?" রত্ন পাশ কাটায়।

"কিন্তু তোমার ঘরে যে ছেলেটি থাকে সে তো শুনেছি দিব্যি নাদুসনুদুস নন্দদুলাল।" গৌরীকে এ খবর দিয়েছে মোহন।

"কে? উৎপল?" রত্ন হেসে বলে, "ওর তো প্রায়ই ইরাদের ওখানে খাবারের নিমন্ত্রণ। আজ গেছে সেবাদের ওখানে। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমার পড়ার চাপ না থাকলে আমিও যে নন্দদুলাল হতুম না তা নয়।" রত্ন সরলভাবে বলে।

"পড়ার চাপ কি উৎপলের নেই বলতে চাও?" গৌরী জানতে চায়।

"উৎপলের সঙ্গে আমার তুলনা! ও পরীক্ষা দিচ্ছে প্রেস্টিজের জন্যে। সিভিল সার্ভিস, শুধু এই কথাটা শুনলেই মেয়েরা ঘিরে দাঁড়ায়। এর মধ্যেই ইরার সঙ্গে এনগেজড হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল যাই হোক না কেন বিবাহ ওর অবশ্যম্ভাবী। আমার বেলা কি ও কথা বলা চলে?" রত্ন কপট খেদের সঙ্গে বলে।

"তোমারও বিয়ে হবে, বাবা।" মাসী প্রক্ষেপ করেন।

"হ্যাঁ, আমি কেরানী হলেও আমার গুরুজন ধরে বেঁধে আমার একটা বিয়ে দেবেন তা জানি, মাসিমা। কিন্তু সেই উল্লাসে আমি পড়াশুনায় ঢিলে দিয়ে নন্দদুলাল হতে পারছিনে। আমার যারা প্রতিযোগী তারা সারা দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের আমি চাক্ষুষ না করলেও তাদের সঙ্গে আমাকে পাল্লা দিয়ে পড়তে হচ্ছে। উৎপলই যদি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হতো তা হলে আমিও সুখে নিদ্রা যেতুম।" রত্ন সকৌতুকে বলে।

"আর তুমিও হয়তো এনগেজড হতে।" মেসোমশায় হেসে ওঠেন।

গৌরীর মুখখানা লাল হয়ে যায়। রত্নও বিব্রত বোধ করে। ওরা যা হয়েছে তাও একপ্রকার এনগেজড ছাড়া আর কী! কিন্তু বিয়ের কথা তার মধ্যে কোথায়?

"ইরা মেয়েটি কে? দেখতে কেমন?" গৌরী প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয়।

"বর্মার মেয়ে। অসাধারণ স্মার্ট।" রত্ন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

"তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?" গৌরীর সলজ্জ প্রশ্ন।

"হবে না কেন? আমরা যে একসঙ্গে পড়ি। এম এর কথা বলছি।" রত্নর সহাস্য উত্তর।

"আর সেবাদি না কার কথা বলছিলে?" গৌরী কৌতূহলী হয়।

"না একসঙ্গে পড়িনে। উনি আমার থেকে সিনিয়র। তবে মাঝে মাঝে আলোচনা বৈঠকে

কণ্টিনেন্টাল সাহিত্য নিয়ে কথাবার্তা হয়।" রঞ্জু বিবরণ দেয়।

কিছুক্ষণ পরে মেসোমশায়, মাসিমা এ'রা একে একে উঠে যান। দুটি একটি কনিষ্ঠ বাকী থাকে। শেষে ওরাও প্রস্থান করে। তখন গোরী আর রঞ্জু নিরিবিলি পায়। বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ায় ও নিচের দিকে তাকিয়ে লোক চলাচল দেখে।

"এই জীবনই আমি চেয়েছিলুম। এই যে ছাত্রছাত্রীদের চেনাশোনা ও মেলামেশার জীবন। যাদের কথা বললি তারা তো খৃস্টান আর ব্রাহ্ম। হিন্দুর মেয়েরাও কি পড়ে?" গোরী জিজ্ঞাসা করে।

"দুটি একটি। তুই যদি ওদের একজন হতিস তা হলে কত ভালো হতো!" রঞ্জু বলে।

"ওরা কি কুমারী না সধবা না বিধবা?" গোরী জানতে চায়।

"কুমারী বা বিধবা। সধবা তো দেখিনে।" রঞ্জু যতদূর জানে।

"সেইখানেই তো বাধা। আমাকে কেউ পড়তেই দিত না।" গোরী আক্ষেপ করে।

"বিবাহিতা মেয়েরা ভর্তি হতে চায় না বলেই হয় না। চাইলে কি হতো না? তোকে আমরা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াব, গোরী। কিন্তু তার আগেকার ধাপগুলো একে একে পেরোতে হবে। বাড়িতে পড়ে ও প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে।" রঞ্জু বলে।

"ততদিনে আমি বুড়ী হয়ে যাব।" গোরী আপসোস করে। "চোদ্দ বছর বয়সে আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে না নিলে আমিও ইরার মতো তোর সহপাঠিনী হতুম, মণি। তেমনি স্মার্ট। আমিও সেবাদির মতো সেণ্টিমেণ্টাল সাহিত্য—"

"কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্য", রঞ্জু শুধরে দেয়।

"তার মানে কী?" গোরী মিষ্টি চোখে তাকায়।

'তার মানে ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, রাশিয়ান সাহিত্য। নরওয়েজিয়ান, সুইডিশও তার মধ্যে পড়ে। স্প্যানিশ, পর্তুগীজ—" রঞ্জু আরো নাম করতে যায়।

"অত বিদ্যা আছে তোর সেবাদির! আর তোর নিজের! তা হলে তুই সত্যি একদিন সাহেবদের দেশে যাবি!" গোরী অবাক হয়ে গালে হাত রাখে।

"সেটা নির্ভর করছে অনেকটা তোর উপরে। তুই যদি না যাস, আমার কিসের গরজ? আমি তো রেঙ্গুনেই যাচ্ছিলুম।" রঞ্জু হাসে।

"আমি এই ক'মাসে আরো ভীতু হয়েছি, মানিক। রেঙ্গুন এত কাছে, তবু রেঙ্গুন যেতেও ভয় করে। বম্বের কথা শুনেছি, ট্রেনে উঠলে দু'রাতের মামলা। তবু মনে হচ্ছে কোন সুদূর বিদেশ।" গোরী উন্মনা নয়, আনমনা।

"তা হলে আমরা বম্বের জন্যে তৈরি হব, না, বল?" রঞ্জু আশ্চর্য হয়।

"না, না, অমন কথা বলব না। তৈরি হতেই হবে। আমার অর্ধেক জীবন তো বৃথা গেল। না পারলুম ইরার মতো স্মার্ট হতে, না সেবাদির মতো শিক্ষিতা হতে। কেউ যে কেন আমাকে ভালোবাসবে এটাই আমার কাছে রহস্য। তোর ভালোবাসাও বেশীদিনের নয়। ওরা তোকে কেড়ে নেবে। আমি পারব না বেঁধে রাখতে।" গোরী করুণ স্বরে বলে।

"দেখছি তোর ইচ্ছা নয় যে আমি আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশি। আচ্ছা, বেশ, তাই হোক। আমিও আরো মন দিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়তে পারি। সত্যি, ওটা একটা বিক্ষেপ। পাঁচ পাঁচটা মিনিট যদি বাঁচাতে পারি তো এক একজন প্রতিযোগীকে টপকে যেতে পারি।" রঞ্জু ভরসা দেয়।
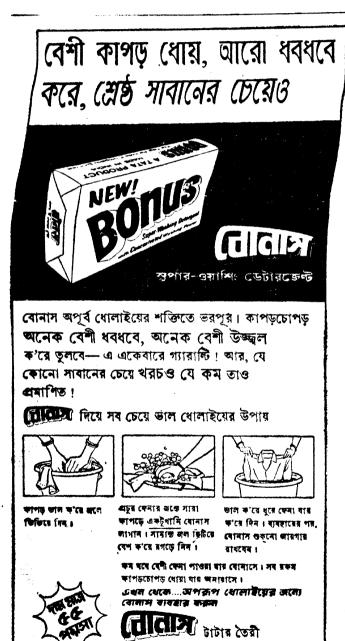
"ওরা জানতে পেলে আমাকে ক্ষমা করবে না।" গোরী কপট ভয়ে হাত যোড় করে।

"ওরা কেউ তোর মতো সুন্দরী নয়। প্রাণবন্ত নয়।" রন্তু ওর হাতে হাত রাখে।

"তবু ওরা অবিবাহিতা।" গোরী বলে লাখ কথার এক কথা।

"বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। রাধা বলে একটি বিবাহিতা মেয়েই তো তাঁকে পেয়েছিল। তখন অবিবাহিতারা ছিল কোথায়?" রন্তু দ্বাপরযুগের দৃষ্টান্ত দেয়।

"পেয়েছিল, কিন্তু হারিয়েও ছিল।" গোরী পরিণাম উল্লেখ করে।

"দৃষ্টান্তটা ঠিক জুতসই হলো না। আচ্ছা, আমরা একটা নতুন দৃষ্টান্ত দিয়ে যাব।" বলে রন্তু ওর চোখে চোখ মেলায়।

"এ জগতে নতুন বলে সত্যি কিছু থাকলে তো?" গোরীর চোখ ছল ছল করে।

"কালচক্রে সবই আবার ঘুরে ফিরে আসে আর যায়। যতক্ষণ বৃন্দাবন ততক্ষণ রাধা। সেই মথুরাযাত্রা অমনি রাধার কাছ থেকে বিদায়।"

"সেবার ও-রকম ঘটেছিল বটে, কিন্তু এবার আর ও-রকম ঘটবে না। মথুরায় যেতে হয় একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" রন্তু আবেগের সঙ্গে বলে।

"ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দে, মানিক। আমাদের জীবনের বর্তমানটুকুই আমাদের হাতে। এই সন্ধ্যা-গোধূলিটি। এই নিভৃতক্ষণটি।" গোরীর কণ্ঠে আকুলতা।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। কিন্তু তখনো সাঁঝ বাতি জ্বলে ওঠেনি। কেউ কোথাও ছিল না। থাকলেও অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রকাণ্ড বাড়ি।

রন্তু গোরীর একটি হাত ধরে কথা বলতে বলতে অচমকা ওটি তুলে নিয়ে মুখে ছোঁয়ায়। গোরীর দুটি গালে দুটি রাঙা গোলাপ ফুটে ওঠে। রন্তু তা দেখে বিহ্বল হয়ে একটি গোলাপের উপর সহসা দুটি ঠোঁট ছোঁয়ায়।

এক নিমেষের ব্যাপার। গোরী নিমেষের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। আর রন্তুর যা স্বভাব। না ভেবে চিন্তে দুম করে একটা কিছু করে বসে। তার পর সমস্তক্ষণ পস্তায়। গোরী না জানি কী মনে করেছে! কত ব্যথা পেয়েছে! একটি অবলা বালার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নেওয়া কী ভয়ানক অন্যায়!

রন্তু অন্যমনস্ক ছিল। পেছন ফিরে চেয়ে দেখে গোরী। ওর চোখে মুখে আনন্দের আভা। ও ফিক করে হেসে বলে, "একদিন আমি এর শোধ না নিই তো আমার নাম শ্রীমতী নয়। ওই যে ইংরেজীতে বলে, চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত।"

"সেই দিনটির আর কত দেরি?" রন্তু শঙ্কিত হয়ে বলে।

"আগে তো আমি স্বাধীন হই। আমি যে অনিচ্ছুক তা নয়। আমি অক্ষম।" কিছুক্ষণ এই মর্মে গৌরচন্দ্রিকা করে গোরীও অকস্মাৎ বদলা নেয়।

প্রিয়ার প্রথম দর্শন রন্তুকে অবিমিশ্র পুলক দেয়নি। প্রথম চুম্বন তা দিল।

দশ

রন্তু অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল যে গোরীর মুক্তির জন্যে ওর নিজের মুক্তি বিকিয়ে যাচ্ছে। অথচ গোরী যতদিন বন্দিনী ততদিন ওর পক্ষে স্বাধীন থাকাও লজ্জাকর। ওর শিভালরিতে বাধে। ও যে একজন নাইট।

শুধু কি শিভালরিতে? প্রেমেও নয়? ও কি কেবল একজন নাইট? একজন প্রেমিকও নয়? প্রেম চায় মিলনের মধ্যে বিকাশ ও পরিণতি। তার সম্ভাবনা কোথায় যদি গোরীর হাতের বাঁধন পায়ের বাঁধন খসে না যায়? খাঁচার পাখি যদি বনের পাখি না হয়?

বিদ্যুৎ চমকের মতো চকিত চুম্বন রন্তুকে যে মাধুর্যের স্বাদ দিয়েছিল তাকে সে দেবতার প্রসাদের মতো আঁচলে বেঁধে রেখেছিল। মাঝে মাঝে আঁচল খুলে মুখে ও মাথায় ঠেকালে খানিকটা আস্বাদন পেত। কিন্তু খাঁচার পাখি সেইভাবে কতটুকু তৃপ্তি দিতে পারে! হতো যদি বনের পাখি তা হলে দানের দ্বারা প্রাণ জুড়িয়ে দিত।

রন্তুর প্রেমানুভূতি ছিল মুক্তির অনুভূতির মতোই প্রখর। ওর মনে হচ্ছিল ওর ভিতরের দুয়ার এক এক করে খুলে যাচ্ছে। জগতের রহস্য একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছে। ওর দৃষ্টির অন্তরালে যা ছিল তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ও আরো বেশী দেখছে, আরো বেশী দূরে দেখছে। ওর সকল দেহ সহস্র নয়নের মতো উন্মীলিত হচ্ছে।

গোরীকে এ কথা জানাতেই সেও লেখে সেই কথা। প্রেম তাকেও দৃষ্টিমতী করেছে। জগৎ ওর রহস্য উন্মোচন করছে। সেও দেখছে বসে সেই দৃশ্য।

রন্তুর হৃদয়ে সর্বদা একটা ভরপুর ভাব। গোরীরও তাই। তবে দুজনের মধ্যে একটা তফাৎ। ইতিমধ্যেই গোরী ওর শিশুর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিল। একটি অস্তিত্বের গর্ভে অপর একটি অস্তিত্ব। এর চেয়ে বড়ো রহস্য কী আর আছে! গোরীর কাছে প্রেমই একমাত্র অনুভূতি নয়। বাৎসল্যও আর একটি অনুভূতি। সেও জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে।

রন্তুর উপলব্ধি যেমন একমুখী, গোরীর তেমনি দ্বিমুখী। ও যেমন একজনের প্রিয়া তেমনি একজনের সম্ভবপর মা। মা হতে যে ও ভালোবাসে না তা নয়। ওর কথা হলো ও নিজের ইচ্ছামতো সময়ে মা হবে।

হবে আপন মনোমতো পতির ঔরসে। তা তো নয়। তবে কেন এ দুর্ভোগ! যেখানে এত অনিচ্ছা সেখানে কি বেঁচে থাকাই দুর্ঘট নয়! যদি মরে তবে ওর মরার জন্যে দায়ী কে? সন্তানটি যার। রন্তু যদি ওর পতি হতো আর সন্তানটি হতো রন্তুর তা হলে ও সানন্দে মরণের ঝুঁকি নিত। কিন্তু এটা হলো তর্কের কথা। আসলে যা হয়েছিল তা এই যে, গোরী ইতিমধ্যে ওর অনাগত

বিন্দুকে ভালোবেসে ফেলেছিল। সে ভালো-বাসাও প্রেমের আর একটি মুখ।

গৌরী একদিন রঞ্জুকে অবাক করে দেয় এই কথা লিখে—

"ছেলে হবে না মেয়ে হবে কে বলতে পারে? আমার কিন্তু বিশ্বাস আমার কোলে যে আসবে সে হবে তোর মতো দেখতে। ও'র মতো নয়।"

রঞ্জু উত্তরে লেখে, "সেটা সম্ভব হতো যদি তুই আরো কয়েক বছর পরে মা হতিস। এখন তোর অদৃষ্টকে মেনে নিতে হবে। তবে আমার নিজের মনে হয় যে আসছে সে হবে মার মতো দেখতে। বাপের মতো নয়।"

এর পরে এই নিয়ে কিছুদিন জল্পনা কল্পনা চলে। গৌরী আশা করছে ছেলে। রঞ্জুর আশা মেয়ে। আশার সঙ্গে মিলিয়ে নামকরণও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কারো সঙ্গে কারো মেলে না। একটি জায়গায় দুজনের মিল হয়। যিনি আসছেন তাঁকে উল্লেখ করতে হবে ইংরেজীতে 'বেব' বলে। গৌরীর ধারণা ওটা নাকি পুংলিঙ্গ। রঞ্জু মনে মনে হাসে।

কিছুদিন বাদে দেখা গেল 'বেব' হয়েছে 'বেবি'। রঞ্জু লেখে, "তা হলে আর একটু
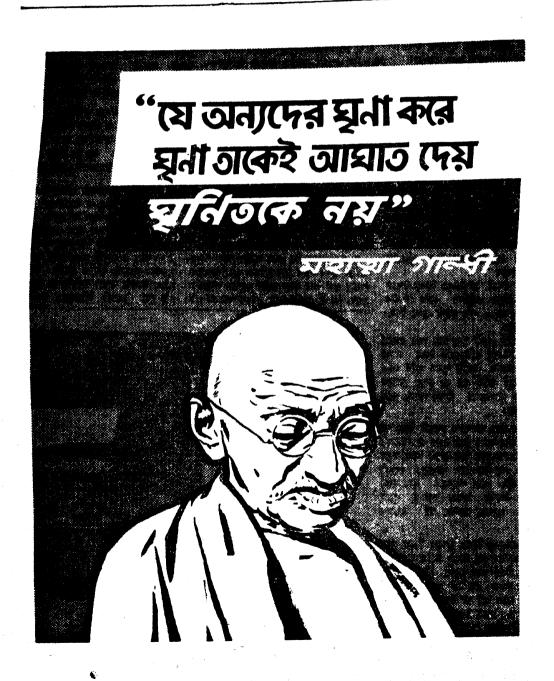
এগিয়ে গেলে কেমন হয়? মাদ্রাজীরা যেমন বলে 'রামন্', 'রাঘবন্' তেমনি আমরাও কি বলতে পারিনে 'বেবন্'?"

তা পড়ে গোরী বিষম চটে যায়। কিন্তু পরে ও আপনা থেকেই প্রস্তাব করে 'বুবুন'। যদি মেয়ে হয়। আর যদি ছেলে হয়? তবে সেই 'বেব'।

যাঁর ছেলে বা মেয়ে তাঁর সম্বন্ধে গোরী একটি কথাও লেখে না। যেন তাঁর মতামত একেবারেই অবান্তর। রঞ্জও তাই নিয়ে খোঁচায় না। ঘুমন্ত কুকুরকে জাগায় না। গোরী যদি ভুলে থেকেই সুখে থাকে তবে রঞ্জও সুখী।

গোরীর চিঠিতে আর নিত্য অভিযোগ থাকে না। বেগমপুর থেকে দূরে সরে থাকা যেন জ্বালামুখীর থেকে শতেক যোজন ব্যবধান রক্ষা।

"ওখানে ফিরে যাবার কথা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না, মানিক। ওটা আমার পূর্ব-জন্মের কারাগার।" গোরী একদিন আপনা হতেই লেখে। "তবে ওরা সবাই আমাকে চায়। একটু অনুশোচনার আভাসও যেন পাই। আমার সঙ্গে উচিত ব্যবহার করেনি বলে যেন একটু সচেতন। আমি কিন্তু অত সহজে ভুলছিনে। মাধব ভিন্ন ওখানে ভালো কেউ থাকলে তো? মাধব যদি ডাকতেন তা হলে হয়তো আমি দ্বিধা করতুম না। কিন্তু মানুষের ডাক আর আমি শুনতে চাইনে। আমি বধির। আমি পাষাণ। ওরা কেউ আমার নয়। আমিও ওদের কারো নই। কয়েদী আর প্রহরী।"

গোরী আপনাকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে বেগমপুরের অভ্যস্ত জীবন থেকে। কিন্তু ছাড়িয়ে নেওয়া যত সহজ মনে করেছিল তত সহজ নয়। মানুষের দেহ না হয় অনায়াসে স্থানান্তরিত হতে পারে, কিন্তু তার মন হচ্ছে মনোরথ। রথের একটা চাকা যদি মাটিতে বসে যায় আর সব কটা চাকা সেইখানেই ঘুর ঘুর করে। সেই চাকাটাকে টেনে না তোলা তক রথ অচল। তা তুমি যাই বল আর যাই কর। বেগমপুরে গোরীর মনের রথের একটা চাকা মাটিতে বসে গেছে। মাধবকেও ভুলতে পারছে না।

রঞ্জ নিজে প্রতিমাপূজক নয়। তাই এ দুর্বলতার মর্ম বোঝে না। যে মেয়ে মুক্তির জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে তার কেন এ পিছুটান? আর এ পিছুটান যদি থাকে তবে তার মুক্তির দৌড় কতটুকু? ও মেয়ে যদি রেঙ্গুনে যেত তা হলে কি মাধবের কাছে ফেরবার জন্যে ব্যাকুল হত না? তার মানে তো যশোমাধবের কাছে আত্মসমর্পণ?

রঞ্জ তাই প্রতিমাপূজারিণীকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। লেখে, "বাংলা দেশের নারী যদি আধুনিকতার অভিমুখে এগিয়ে যেতে চায় তা হলে তার মনের রথের প্রত্যেকটি চাকা সচল হওয়া চাই। একটি চাকা যদি মধ্যযুগেই আবদ্ধ রয় তবে একটির জন্যে সব ক'টিই স্থিতিশীল হবে। মাধবের জন্যেই দেখছি তোর মুক্তি আটকে থাকবে।"

গোরী অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানায়। লেখে, "তোর বোধ হয় ধারণা যে আমি মাধবকেই সব চেয়ে ভালোবাসি। তোকে তার চেয়ে কম। সেটা কিন্তু ভুল। নারী যাকে সব চেয়ে ভালোবাসে তার সঙ্গেই যায়। তোর সঙ্গে আমি পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তেও যেতে পারি, ধন। মাধবের জন্যে স্থিতিশীল হব? ওটা কি একটা কথা হলো? কে জানে হয়তো মাধবকে তুই মনে মনে হিংসে করিস। ও যেন তোর প্রতিদ্বন্দ্বী। দেবতা কি কখনো মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, মণি? আমার চোখে দুই এক। যার নাম মাধব তারই নাম রঞ্জ। যার নাম রঞ্জ তার নামই মাধব। কবি বলেছেন, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' এর চেয়ে সত্য আর কী আছে! আমি যদি মধ্যযুগে পড়ে থাকি তুই আমাকে ঠেলা দিয়ে চালিয়ে দিবি। যেদিকে খুশি টেনে নিয়ে যাবি। মাধবের সাধ্য কী যে তোর সঙ্গে গায়ের জোরে এঁটে উঠতে পারবে! তবে, হাঁ, ওকেও আমি এক-আধবার দেখতে চাইব। সে দুর্বলতা আমার আছে।"

রঞ্জ লেখে, "আচ্ছা, মুক্তির পর স্বাধীন-ভাবে তুই যদি মাধবের দর্শন পেতে চাস তো জ্যোতিদা বা আমি বাধা দেব না। কিন্তু বাধা অন্যদিক থেকে আসতে পারে, গোরী। তখন যেন আপস না করিস। আত্মসমর্পণ না করিস।"

গোরীর স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায় তা রঞ্জর কাছে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসছিল। আপনি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সে গোরীকেও প্রতিষ্ঠিত করবে। গোরী হবে সর্বতোভাবে স্বাধীনা নারী। সে যাকে ভালোবাসবে তাকে বিয়ে করবে, যদি বিয়ে করতে ইচ্ছা থাকে, বাধা না থাকে। নয়তো বিয়ে না করেও তার ঘর করবে ও তা করতে গিয়ে সমাজের সঙ্গে লড়বে। লড়তে যদি প্রস্তুত না থাকে তবে একসঙ্গে থাকা হবে না। তখন স্বাধীন জীবনের অর্থ হবে মিলনহীন জীবন। নিঃসঙ্গ জীবন। গোরী যদি তেমন স্বাধীনতা পছন্দ করে তবে তাই হবে।

স্বাধীনতা বলতে আরো বোঝায় গোরী যদি পরে ওর পুরুষোত্তমের দর্শন পায় তা হলে তাঁকেই মনপ্রাণ অর্পণ করবে। রঞ্জ তখন স্বেচ্ছায় সরে যাবে। সরে যাবার পর তার স্থান হবে জ্যোতির অনুরূপে। জ্যোতির মতো সেও নীরবে বন্ধুকৃত্য করবে। একেবারে বর্জন করবে না। ভালবাসা যতদিন না আপনা থেকে নিঃশেষ হয় ততদিন সে স্বতঃ অনুগত থাকবে, কিন্তু প্রেমিক হিসাবে তার আর কোনো দায় থাকবে না। সেও স্বাধীন। যদি অপর কোনো নারী তাকে ভালোবাসে তখন গোরী কেন কিছু মনে করবে?

"ওঃ! ওইসব কথা ভাবা হচ্ছে। ওরই নাম পরীক্ষার পড়া!" গোরী রাগ করে। "নিজের মনের কথাটিকে আমার উপর চাপিয়ে কার চোখে ধুলো দিবি, যাদু? মনে করেছিস আমি টের পাব না? তুই নিজেই যে তোর নায়িকা উত্তমার সন্ধানে আছিস। একবার তার দর্শন পেলে কি আর এ অধমাকে মনে ধরবে? তখন তুই স্বেচ্ছায় সরে পড়বি। আমি তো সেই ভয়েই সারা হচ্ছি। যে পুরুষের হাত আমি ধরব সে পুরুষ কি হাত ছাড়িয়ে নেবে না? তার জীবনে কি আর কোনো নারী আসবে না? আসবে কী, এসেছে। আমার কথা যদি জানতে চাস আমি বলব আর কোনো পুরুষকে চিনিওনে, জানিওনে, চাইওনে। যতদূর দৃষ্টি যায় একমাত্র তুই আমার জীবন জুড়ে রয়েছিস। ও থাকবি। তোর প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে যদি কেউ থাকে তো সে আমার অনাগত সন্তান। কিন্তু সে তো তোরও সন্তান। নয় কি?"

রঞ্জ আশ্বাস দেয়, "হাঁ, সে আমারও সন্তান।"

গোরী একদিন একখানা চটি বই পাঠিয়ে দেয়। অলিভ শ্রাইনারের 'ড্রিমস্' গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ। নারীর সন্তানসাধ অকপট-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বোঝা যায় গোরীও সন্তানস্বপ্নে বিভোর। অথচ তেমন স্বপ্ন রঞ্জর জীবনের দিক্‌চক্রবালে এখনো উদিত হয়নি। সে বয়সই তার নয়। নারী তার সন্তানের পিতা মনোনয়ন করবে, বেশ তো। কিন্তু তার জন্যে যদি রঞ্জকে মনোনয়ন না করে, অপরকে মনোনয়ন করে!

(ক্রমশ)

একমাত্র মল্টটনিক যাতে আছে ৬টি ভিটামিন—ভিটামিন বি-১২ সমেত
সুস্বাদু
অস্টোমল্ট
বিশুদ্ধ কমলার রসে ভরা
যোগায় বাড়তি উৎসাহ
যোগায় বেশী ক্ষিদে
যোগায় সুস্থ রক্ত
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-এ উজ্জ্বল চোখের জন্য (ওর উজ্জ্বল চোখ এখন দুষ্টুমিতে ভরা)
অস্টোমল্টে আছে আয়রণ,—যা সুস্থ রক্ত গ'ড়ে তোলে (ওর গাল এখন আর আগের মত প্যাংলাটে নয়)
অস্টোমল্টে আছে রিবোফ্লাবাইন আর বি-১২—যা ক্ষিদে বাড়ায়. বি-১ হজমে সাহায্য করে (ইদানিং ও দু'বার ক'রে চেয়ে খাচ্ছে)
অস্টোমল্টে আছে মল্ট উৎসাহ আর শক্তি বাড়াতে (ও এখন কত বেশী প্রাণবন্ত, আগের চেয়ে ওর ঘুমও ভাল হয়)
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-ডি—সুস্থ সবল দাঁত আর মজবুত হাড় গ'ড়ে তুলতে (ওর এখন একটি সাইকেল চাই-ই! খুব তাড়াতাড়ি বড়সড় হয়ে উঠছে)
অস্টোমল্টে আছে নিকোটিনামাইড,—যা মুখে স্বাভাবিক এক সুস্থ দীপ্তি ফুটিয়ে তোলে (নাবিকের পোশাকে ওকে ছবির মত সুন্দর দেখায়)
Ostomalt
গ্ল্যাক্সোর
অস্টোমল্ট
পুষ্টি আর শক্তির জন্য সত্যি অতুলনীয়!
গ্ল্যাক্সোর তৈরী
ASP/G/0-2

কহ্মান্

মানুষের মন কি বিচিত্র! কিসের সঙ্গে কিসের মিল যেন অজানা অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে দেয়। ভাষায় বোঝানো যায় না। এমনকি নিজের মনের কাছেও পুরো-পুরি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না। ঠিক এমনি এক উপলব্ধির অদ্ভুত অসমঞ্জস সাদৃশ্যে মন ভরে উঠেছিল মার্কিন দেশের প্রশান্ত সাগর উপকূলে স্যানফ্রান্সিসকোর থেকে হাজার দুই নো মাইলের উপর দিয়ে উড়ে যখন বিমানখানা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলুর উদ্দেশে আস্তে আস্তে অবতরণ করছিল। কবে রামেশ্বরম গিয়ে-ছিলাম! মাদুরাই থেকে সন্তর্পণে পৌঁছলাম মোটরে। মণ্ডপম থেকে ট্রেনে পামবান হয়ে যাবে রামেশ্বরম। অল্প একটু পথ। পামবানের ছোট ছোট বেঁটে নারকেল গাছ স্বর্ণাভ পাতার রাশির মাঝে মস্ত মস্ত সুপুষ্ট ফল সেদিনও আমায় অতীতের দৃশ্য স্মরণ করিয়েছিল। যা আর একটু আপন, আর একটু নিজস্ব। বরিশাল আর নোয়া-খালির নারকেল গাছ আর অপার অথৈ লবণাক্ত বারিধি। যাক সেদিনের স্মৃতি। আপাতত বলছি হনলুলুর কথা। পামবান-এর পরেই রেলের জানালায় মুখ রেখে বসে আছি, হঠাৎ দেখি নীল সমুদ্রের অপার বিস্তারে অশান্ত ঊর্মির খেলা। বোধ হলো সাগরবেলায় চলেছি এগিয়ে। ওমা! ওদিকের জানালায় তাকিয়ে দেখি সেই দিগন্তপ্রসারী চঞ্চলতা। তবে কি আমরা সাগরের বুকে? ঠিক তাই। ইস্টার্ন এয়ার লাইন্স আমেরিকার ঘরোয়া বিমান কোম্পানী। উঠেছি শিকাগোর লিঙ্কন বন্দরে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পাড়ি দিয়ে বিমানখানা এলিয়ে দিয়েছে গা, মেলে দিয়েছে ডানা সমুদ্রের জল ছুঁয়ে। কোথাও ফিরোজা নীল, কোথায় সবুজ। কি ভয়ানক সুন্দর। রামেশ্বরমের রাস্তায় রেল সরিসৃপের আরোহী ছিলাম, এবার পাখির ডানায় ভর করেছি। তফাত এইটুকুই।

হনলুলু এয়ারপোর্টে নেমে নিরাশ হলাম। সেবার যে South Pacific ছবিতে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের নগ্নবক্ষ, গলায় গাঁদা ফুলের মালা, মেয়েদের নাচতে দেখেছিলাম— তারা কই? মার্কিন মুলুকের আর দশটা এয়ারপোর্টের মতই ঐশ্বর্যে ঝলমল মানুষের মেলা। টেলিভিশনে দেখেছি পুরুষের পরম কাম্য হাওয়াই দ্বীপের উজ্জ্বল আবেগময় আকাশ বাতাস আর পলিনেশিয়ান সুন্দরীর ঘাস ছুঁয়ে ঘাসের ঘাগরায় যৌন আবেদন।

কামেহামেহা সুয়োরানী কহুমাণু

একটিও তো কোথাও নেই। আছে কেবল গাঁদা ফুলের গাদা গাদা মালা। পর্যটন ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে যা হয়েছে তার একটু নমুনা। আমাদের পর্যটন ব্যবসায়েও গাঁদা ফুলের মালাটুকু এসেছে! বিদেশী টুরিস্টকে অভ্যর্থনা করতে পর্যটন ব্যবসায়ের ফাঁসটুকুর ফুল নিশ্চয় আপনারাও লক্ষ করেছেন।

শিল্পরসিক পৃথ্বীশ নিয়োগী মশায়ের বাড়িতে যাব। শান্তিনিকেতনের মানুষ, বিদেশের অপরিচিত পরিবেশেন আপনজন। শ্রীমতী নিয়োগীও শান্তিনিকেতনে নৃত্য শিক্ষা করেছিলেন কিছুকাল। লসএঞ্জেলেস-বাসিনী লিলি নিয়োগীর নৃত্যে আগ্রহ আছে। হুলা নাচের হাল তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে নেব ভেবে ট্যাক্সিতে চড়লাম। বিরাট মার্কিন গাড়ি। ক্যাডিলাক বা প্যাকার্ড ট্যাক্সি। চালক অবশ্য ফিলিপিনো। নাম বললেন মোরেনো। দুই পুরুষে হাওয়াইবাসী। এয়ারপোর্ট থেকে লম্বা রাস্তা মানোয়া ভ্যালি পৌঁছবার। মোরেনো গল্প জমিয়ে বসলো। প্রাচ্যের বিনীত নম্রভাবে তার মার্কিন জেল্লাটুকু উপরিগত মাত্র। কথায় কথায় বললো, তার নাকি ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করার দারুণ শখ। দু'চারটে যা তাঁর নজরে এসেছে মনে হয়েছে সারা দুনিয়ায় কমনীয়তায় তারাই একনিষ্ঠ প্রেমের কাম্যকামিনী। কি করে তার এমন ধারণা হল জিজ্ঞাসা করায় সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললো, তার বাবার কাছে শুনেছে ভারতীয় মেয়েরা স্বামী ও সংসারের অনুরক্তিতে আপনাদের উৎসর্গ করে দেয়। পাশ্চাত্ত্য প্রগলভতায় তার রুচি নেই। অবাক হলাম শকটচালকের প্রশংসাবাণী শুনে। জানি না সভ্যতার সন্ধিক্ষণে আমাদের কিশোরী যুবতী একটি সাধারণ মানুষের

সাধুবাদ আর সুখ্যাতিকে কতটা মূল্য দেবেন।

মানোয়া ভ্যালি হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টারের কাছে। নিয়োগী মহাশয় হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মনোরম মানোয়ার বাড়িটুকু নিজস্ব। মানোয়া নদীকে অবশ্য ঝরনা বললেই চলে কিন্তু অপরূপ তার চারি ধার। পাহাড়ি পথের বাঁকে ট্যাক্সি থামল দোতলার দরজায়। নীচের তলা পাহাড়ের গায়ে নেমে যেতে হয়। নিয়োগীমশায়ের ছোট্ট সাত বছরের মেয়ে এষা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এল, হাতে এক গুচ্ছ Strawberry Guava। এমন মজার ফল আগে কখনও দেখিনি। ঠিক মার্বেলের গুলির মাপের পেয়ারা, ভিতরটা টুকটুক করছে লাল। স্ট্রবেরির মত দানা দানা বীচ। স্বাদে সুগন্ধে সেখানকার মানুষের মতই মেশানো।

হাওয়াইবাসী এখন চার লক্ষের মত। তার মধ্যে হাজার কুড়ি বাইশকে আধিকারিক ভাষায় সেকালের পলিনেশিয়ান বলে ফেলা হয়। তার মধ্যেও অতি অল্পই খাঁটি পলিনেশিয়ান। একচতুর্থাংশ পলিনেশিয়ান রক্ত থাকলেই তারা আজকাল কিছু কিছু বিশেষ সুযোগ পান এবং তাদের পলিনেশিয়ান আখ্যা দেওয়া হয়। পলিনেশিয়ানদের ইতিহাস রোমাঞ্চকর। আজ তাদের দেখা পাওয়া ভার কিন্তু এক সময় তারাও এসেছিলেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দুস্তর সাগরে ভেলা ভাসিয়ে। কেউ বলেন মালয়, যবদ্বীপ থেকে এশিয়ার মানুষ এসেছিল বহু যুগ আগে। তারা অবিমিশ্র না হলেও আর্য জাতিরই বংশধর।

মুখোশপরা মানুষ

আমার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল শুনে তা হচ্ছে, হাওয়াই-এর সেই মানুষগুলির মধ্যে মেয়েদের মর্যাদা ছিল খুব বেশী। রাজা অথবা সর্দার সংসারে উত্তরাধিকার আসত মেয়েদের দিক থেকে। পুরুষের মত মেয়েরাও হতেন দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবতী ও শক্তিশালী। শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় সাহায্য তো দূরের কথা, রানীগিরি করেছেন পূর্ণ রাজদণ্ড হাতে এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে।

সেদিনের ইতিহাসে রাজা কামেহামেহা নামকরা শাসক। ১৭৮২ সালে সিংহাসনে বসেই এমন ব্যবস্থা করলেন যে "the old men and women and little children could sleep safety in the highways. "বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও শিশু সদর রাস্তায় নির্ভয়ে নিদ্রা যেতেন।" কামেহামেহা কথাটির মানে নাকি the lonenly one. বলেছিলেন এক হাওয়াই গাইড। তবে কামেহামেহা অথবা নিঃসঙ্গ রাজার ছিল সাতাশটি বউ। তার মধ্যে সুয়ো ছিলেন কহুমাণু। পাটরানী কিন্তু ছিলেন কেওপুওলানি। কেওপুওলানি কামেহামেহার মৃত্যুর পর ১৮২৩ সালে প্রথম খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন ও দ্বীপপুঞ্জে নূতন ধর্মের পথ সুগম করেন। কামেহামেহার জীবদ্দশায় তা সম্ভব হয়নি। কামেহামেহা পশ্চিমের সাদা মানুষগুলিকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন। সাদা মানুষের পাল্লায় সামান্য মদিরাপান প্রথমে শিখেও তা পরে সম্পূর্ণ বর্জন করেন, পুরোনো হাওয়াই-এর ধর্মকে নূতন রূপ দিয়ে সেই বিশ্বাসকেই প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৮২৫ সালে কামেহামেহার আদরিণী রানী কহুমাণু খ্রীষ্টান হয়ে নাম নিলেন "নূতন কহুমাণু" new Kaahumanu. কহুমাণু অর্থাৎ বলিষ্ঠ; নূতন রূপ ও নূতন নাম নিয়ে বদলেন তাঁর মন কাননের হাল। আগে ছিলেন গর্বিত ও নিষ্ঠুর, আর এখন হলেন মঙ্গলময়ী। দলে দলে যাঁরা খ্রীষ্টান হলেন তাঁরা বেশির ভাগই মেয়ে। রানী-মহারানী, দল-নায়িকা ইত্যাদি আগে ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন। কহুমাণুর মত ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও নামজাদা রানী ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন। কালানিমকু … একজন। কালানিমকু মানে লোহার … । লোহার শিকলের মত কঠিনপ্রাণ রানী নাকি নিমেষে মঙ্গলময়ী হয়ে গেলেন।

এতো ধর্মরাজ্যের কথা, শাসনের দণ্ড কামেহামেহার রাজত্বকালেই কহুমাণুর হাতে এসেছিল। কামেহামেহার রানী কহুমাণু হয়েছিলেন তাঁর "কুহিনা নুই" বা প্রধান মন্ত্রী। রাজকুমার লিলোহিহোর উপর ভরসা তেমন ছিল না কামেহামেহার। রাজা রানী ইংলণ্ড গেলে কহুমাণু রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন কারণ তিনি প্রায় রাজার সমান ক্ষমতা আগেই লাভ করেছিলেন। কামেহামেহার শাসনকালেই কালানিমকু রাজকোষের ভার নিয়েছিলেন এবং কহুমাণুর সময়েও সে ভার তাঁরই ছিল। কহুমাণুর মৃত্যুর পরও শাসনকর্তা বা কুহিনানুই হলেন তার একটি মেয়ে। লিলোলিহো পরে হয়েছিলেন দ্বিতীয় কামেহামেহা। তাঁর মেয়ে কিন হলেন কুহিনা নুই। হাওয়াই দ্বীপের রানীদের কথা টেনিসন থেকে নিয়ে রবার্ট লুই স্টীভেনসন কাব্যে গেঁথে অমর করে গেছেন।

শ্রীমতী

প্রতিভা বসু

উজ্জ্বল উদ্ধার

॥ ৩৪ ॥

মা হাওড়ার কোনো একটি স্কুলেই কাজ যোগাড় করে চলে এসেছিলেন। আসল কথা চেষ্টা চরিত্র করে কোনো রকমে বি এ পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলতে চাইছিলেন তিনি। বি এ পাশ করলে অন্তত একটু উঁচুতে উঠতে পারেন। বি টি-টা দিতে পারেন। পুরন্দর বড়ো হয়ে উঠলে, তার শিক্ষার খাতে আরো বেশী অর্থের প্রয়োজন হবে, সে কথা ভেবে নিজেকে তখন থেকেই যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন। তারপর আসবার বেশ কিছুদিন বাদে, সে তখন আবার ভর্তি হয়ে গেছে স্কুলে, হঠাৎ মার সঙ্গে বাসে যেতে যেতে এক বুড়ো ভদ্রলোকের দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোকটি মাকে অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ করছিলেন, মা খেয়াল করেননি। হঠাৎ নিজের আসন থেকে উঠে এসে বললেন, 'অঞ্জু, না?'

চমকে ফিরে তাকালেন মা, তারপর শান্তভাবে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'তুই? তুই কোত্থেকে?'

'আমি হাওড়ায় থাকি।'

'হাওড়া? আমিও তো হাওড়ায় থাকি।'

'ও।' মা তেমনি নিস্তাপ।

'ছোটো একটা বাড়ি কিনেছি সস্তায়, কিন্তু তোকে তো কখনো দেখিনি। আমি শুনেছিলাম—'

'আমি দার্জিলিংয়ে ছিলাম। অল্পদিন এসেছি।'

'এটি কে? ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ সুন্দর ছেলে তো।' দুঃখিত স্বরে বললেন, 'আমি সব শুনেছি। এমন চাঁদের মতো ছেলে—যাকগে, ঠিকানা বলো দেখি তাড়াতাড়ি—'

'তুমি কি এখানেই নেমে যাবে?' একটু যেন নড়ে চড়ে উঠলেন মা।'

'এই তো আমার স্টপ। আসবি? আয় না। বাড়িটা চিনে যাবি।'

চুপ করে থেকে মা বললেন, 'তুমি বরং চলো না।' গলায় আগ্রহ ফুটলো। 'চলো, আমার বাড়িতে নিয়ে যাই তোমাকে।'

'যাবো?' ভদ্রলোক একটু দ্বিধা করলেন, তারপরেই বললেন, 'আচ্ছা চল। কতোদিন পরে দেখছি। কী কান্ড! কোথায় যে চলে গেলি।'

সেই বুড়ো ভদ্রলোক মায়ের বাবা।

'বাবা? তোমার বাবা?' শুনে পুরন্দর একেবারে বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। 'সত্যিকারের বাবা?'

অঞ্জলি করুণ রেখায় হাসলেন, 'বাবা কি কারো মিথ্যে হয় নাকি বোকা ছেলে?'

'তবে এতোদিন বাবা কেন আসেননি তোমার কাছে?'

'আমি তো অনেক দূরে ছিলাম।'

'তুমি কেন আসনি বাবার কাছে?'

'দূরে থেকে আসা কষ্ট বলে।'

'এসেও কেন বাবাকে ডাকনি?'

'ঠিকানা জানতাম না।'

'তবে তোমার বাবাও বুঝি আমার বাবার মতো? নিজের মেয়ের ঠিকানা জানে না, এ আবার হয় নাকি?'

মা চুপ করলেন। পুরন্দর ভাবতে লাগলো। মায়ের বাবার কথা নয়। তার নিজের বাবার কথা। মনে হলো এমনি করে একদিন সেও দেখতে পেয়ে যাবে তার বাবাকে। কী করে চিনবে সে কথাটা তখন তার মনে হয়নি। কিন্তু আজ, এই এখন হলো। এই বড়ো বয়সের পুরন্দরের। অবাক হয়ে ভাবলো, এই ছবিটা না দেখলে আমি কেমন করে চিনতাম তাকে? ছেলেবেলায় মানুষ কী বোকাই না থাকে।

দাদুর সঙ্গে সেদিন লজ্জার বেড়া ডিঙিয়ে খুব বেশী আলাপ জমলো না। তার উপরে দাদু ভয়ানক দুঃখের কথা বললেন। এতো দুঃখের কথা যে মা এবং দাদু তারপর দুজনেই বসে থাকলেন চুপ করে।

একটা দুঃখের কথা বললেন, 'তোমার মা আজ দু'বছর হলো আমাদের মায়া কাটিয়েছেন।'

মায়ের মা-ও ছিলেন তবে? কী আশ্চর্য।

মা অবিচলিতভাবে বললেন, 'ও। কী হয়েছিলো?'

নিজের মা মরে গেছেন তবু মা কাঁদছেন না? কী আশ্চর্য!

দাদু বললেন, 'ক্যানসার। প্রায় বছর খানেক ভুগলেন। খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন।'

মা মাথা নিচু করলেন। নিঃশ্বাস ফেলে দাদু বললেন, 'ছোট মেয়েটাও গেছে।'

'অ্যাঁ? খুকু নেই?'

'তবু ভালো তোমার মায়ের মৃত্যুর আগে যায়নি। ছিলো টুকুর কাছে ভাগলপুরে। নিউমোনিয়া হয়েছিলো।'

মা বললেন, 'টুকুর কবে বিয়ে হলো?'

'সে তো অনেক দিন। বাচ্চাও হয়েছে দুটি। বকুরও বিয়ে হয়েছে গেল বছর।'

'আর নন্টু?'

'নন্টু ম্যাট্রিক পাশ করে ইছাপুর গান ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছে। পড়াশুনোয় তো কারোরই মন ছিলো না? সীতেশের সংবাদ জান তো?'

চমকে উঠে মা বললেন, 'কী?'

'খবরের কাগজে দ্যাখোনি? সেই যে রেল কলিশন হলো, তাতে তো সীতেশ আর তার বউ দুজনেই ছিলো।'

মা গলায় একটা আর্তনাদের মতো শব্দ বার করে মুখ ঢাকলেন দু'হাতে।

পুরন্দর ভেবে পেলো না, 'যার মা মরে গেলেও তেমন কষ্ট হয় না, তার এক-জন সীতেশ মারা গেলে এতো কষ্ট কেন?

পরে অবশ্য সবই জেনেছে, সবই শুনেছে, সীতেশদার কথা মা শোকের মুখে নিজেই বলেছেন সবিস্তারে, বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন। মাকে কাঁদতে দেখাও একটা দেখাই। সেই সঙ্গে বালক পুরন্দরও সিক্ত হয়ে উঠেছে তার আবাল্য দুঃখিনী মার কথা ভেবে।

আরো পরে যুবক হয়ে উঠতে উঠতে মায়ের বঞ্চিত জীবনের সব তথ্যই জেনেছে সে, একদিন গিয়ে দেখেও এসেছে এলগিন রোডে নিজেদের বাড়ি। শুনেছে বৃদ্ধ ডাক্তার সব ছেড়ে কাশী চলে গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে বেদ বেদান্তে মনোনিবেশ করেছিলেন, সেখানেই তাঁর পরম গতি লাভ হয়েছে। আর ডাক্তারের ছেলে চিরপ্রবাসী। বাড়িটা একটা ভূতের বাড়ির মত পড়ে আছে তালাবন্ধ অবস্থায়।

এসব অভিমান মা জানেন না। জানিয়ে কী বা হবে।

লুকিয়ে লুকিয়ে সে তার বাবার ঠিকানা সংগ্রহেরও চেষ্টা করেছিলো, পারেনি। পেলে কী করতো তা অবশ্য জানে না। কিন্তু না পেয়ে সে হতাশ হয়েছে, রাগ নয়, দ্বেষ নয়, প্রতিশোধ স্পৃহা নয়, শুধু অভিমান আরো গাঢ় হয়েছে। কী অদ্ভুত।

বাবা শব্দটার মধ্যেই যেন একটা যাদু ছিলো। বাবা তার গোপন জগতের নাম।

হাওড়া এসে প্রথম দিকে ভীষণ কষ্টে পড়েছিলো তারা। এখানে বাড়ির দাম বেশী, জিনিসের দাম বেশী, চলতে ফিরতে পয়সা খরচ লাগে। দার্জিলিংয়ে সবই ছিল হাঁটা হাঁটির মধ্যে, যানবাহনের ব্যাপারই নেই কোনো। তাছাড়া সেখানে কোনো অসম্মান ছিল না, কাঠ গুদোমের স্বতন্ত্র আবাসে, আশেপাশে নেপালী বস্তির মানুষদের সঙ্গে ছোট বড়র প্রভেদ ছিল না, সর্বোপরি ভালোবাসা ছিল। তারা সরল, প্রকৃতির কাছাকাছি মানুষ, রেগে গেলে কেটে ফেলে বটে, তলায় তলায় বিষ ঢালে না। গান করে, প্রেম করে, বাগান ঝুলিয়ে দেয় জানালায়, বাঁশি বাজায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে। খোলামেলা উদাত্ত জীবন।

কিন্তু হাওড়া এসেই বোঝা গেল এখানে সে ভাবে থাকা অসম্ভব। এখানকার ঐ জাতীয় লোকেরা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানকার বস্তির জীবন বড় দুঃসহ, বড় নোংরা, তারই মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলিতে বিধ্বস্ত। দার্জিলিংয়ে বসে বোঝাই যায়নি বাংলা ভাগ হয়ে কী কান্ড ঘটেছে, হাওড়া এসে প্রথম অনুভূতি হলো, গান্ধীজী আর এখন নেই।

দার্জিলিংয়ে কাঠ গুদোমের ঘরটা মনবাহাদুরই গুদোমের বড়ো কর্তাকে বলে ঠিক করে দিয়েছিল, আশেপাশের নেপালী বাসিন্দারা তাদের সহায় ছিল, মিস্তীরিরা বলেছিল 'তুমি থাকো মাইজি, আমরা পাহারা দেব। যে কথা সেই কাজ। কারখানার মধ্যেই আসত তারা, পাহারাও পালাই দিত।

হাওড়াতে পাহারার উল্টো কিছু ঘটে ছিল কিনা বালক পুরন্দরের জানা নেই, এখন মনে হয়, মা যে সারারাত বসে থাকতেন, টুক করে শব্দ হলেই থরথরিয়ে কেঁপে উঠতেন, তার একটা নিগূঢ় অর্থ ছিল। এক মাসের মধ্যেই শেষে বস্তির ঘর ছেড়ে একটু ভদ্রপাড়ায়, ভদ্রসংস্রবে বেশী ভাড়ায় মরিয়া হয়ে একটা ঘর নিয়ে ফেললেন। আবার খুঁজে পেতে টিউশানি যোগাড় করলেন, স্কুলের বাচ্চাদের জন্য টিফিনের বন্দোবস্ত নিলেন কর্তৃপক্ষকে বলে কয়ে। আবার সেই রিচারিত বিরতিহীন পরিশ্রম। এই ইস্কুলে যাচ্ছেন, এই টিউশানিতে যাচ্ছেন, এদিকে রান্না করছেন ছেলের জন্য, তাকে পৌঁছে দিয়ে আসছেন স্কুলে, কোন ফাঁকে মোটা মোটা বারকোষ ভর্তি নারকোল জবাল দিয়ে রেখেছেন, নাড়ুর জন্য, গজা তৈরি করেছেন, নিমকি তৈরি করেছেন রুটি লুচি ঘুঘনি, আরও কত কী। আবার সেই সব হাতে করে নিয়ে গিয়ে জমা দিচ্ছেন ইস্কুল ক্যানটিনে। সব শেষে রাত্তিরের ঘুম কেড়ে নিজের পরীক্ষার পড়ার জন্য তৈরি হওয়া। কী জীবন। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। মনের জোরে যে মানুষ সব কিছু পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তার মা। পরিকল্পনা মত সত্যি একদিন বি এ পাশ করলেন তিনি, বি টি পাশও করলেন। আর পুরন্দর উঁচু ক্লাসের ছাত্র হতে হতে অবস্থাটা সত্যি আয়ত্তে এনে ফেললেন।

সেই সময়েই খবর এলো মনবাহাদুর মারা গেছে। চিঠিপত্রের আদান প্রদান রেখেছিলেন মা। তক্ষুনি তার স্ত্রীকে টাকা পাঠিয়ে দিলেন কিছু, লিখলেন, যখন যা দরকার সব যেন মাকে সে নিঃসংকোচে জানায়। সে কিছুই জানাল না, টাকা পেয়ে সেই টাকায় একখানা টিকিট কেটে চলে এলো কলকাতা। ঠিকানা দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক এসে পৌঁছল বাড়িতে। কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বলল, তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই মা, তুমিই আমার লেড়কি। 'আমাকে ফিরিয়ে দিও না।'

মা সেই নিঃসন্তান মানুষটিকে আদর করে হাতে ধরে ঘরে তুললেন, সসম্মানে থাকতে দিলেন, বললেন, 'তোমরা ছাড়াই বা কে ছিল আমার সেই দুর্দিনে? এখনও তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

নানিমা আসায় খুব সুবিধেও হয়ে গেল। মা অনেক নিশ্চিন্ত হলেন ছেলেকে নিয়ে, বিশ্রামও পেলেন একটু। সেই বিশ্রামকে তিনি ধীরে ধীরে অন্য উপায়ে

কাজে লাগালেন। ভেবে 'চন্তে এক ঘরের বাড়ি ছেড়ে হঠাৎ দু'ঘরের ফ্ল্যাটে উঠে এলেন অবস্থার অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে, তার মধ্যে একটি ঘরে কোচিং ক্লাস খুললেন। সন্ধে থেকে রাত দশটা অবধি পড়াতেন। প্রথম দিকে জনা তিনেক নিয়ে খুলেছিলেন, তারপরে আস্তে আস্তে ভরে উঠল। উপার্জন দ্বিগুণ হলো, পুরন্দর স্কুল ফাইনাল পাশ করল।

একবার ইস্কুলের দরজা পেরুতে পারলে অন্য দরজা পার হতে আর কতক্ষণ লাগে? তাছাড়া মনের মধ্যে সতত‌ই মায়ের জন্য একটা বেদনাবোধ থাকার দরুণ কোথাও কোনো শৈথিল্য ছিল না। আশৈশব সে মনে মনে মাকে সুখ দিত, স্বাচ্ছন্দ্য দিত, বিশ্রাম দিত। হয়তো সেই মনই তাকে ক্লাসের পর ক্লাস অমন মসৃণভাবে পার হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, ইস্কুল পেরিয়ে নিয়ে গেছে কলেজের দরজায়, সেই দরজাও পার হয়ে এসেছে সসম্মানে। চাকরি পেয়েছে কলেজে, দিন আর তখন খুঁড়িয়ে চলেনি, দু ঘরের ফ্ল্যাট ছেড়ে তিন ঘরের ফ্ল্যাটে এসেও খুঁত খুঁত করেছে যথেষ্ট আলো হাওয়া নেই বলে।

এমন কি ইদানিং মা একটি পুত্রবধূর আগমনও কামনা করছিলেন। বলতে গেলে প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই জুটে গেল বৃত্তিটা।

'মা।' তাকিয়ে থেকে ডাকলো সে।

'কিরে?' যেতে যেতে ফিরে তাকালেন অঞ্জলি দেবী।

'আমি চলে গেলে তোমার কি খুব কষ্ট হবে?'

'কষ্ট কিসের? পড়াশুনো করতে যাচ্ছিস, কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসবি, আমার কত আনন্দ, কত গর্ব।'

কিন্তু আমি আবার বলছি, তোমার বম্বে পর্যন্ত গিয়ে কোনো দরকার নেই।'

'যাই না, তুলে দিয়ে আসি তোকে।'

'থার্ড ক্লাসে যাবো, কী ভীষণ ভিড়, তোমার খুব কষ্ট হবে।'

'কষ্ট কী! কিচ্ছু কষ্ট না।' দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন তিনি। তারপরই হাসলেন। বিদ্যুতের মত চমকে উঠলো কোনো এক শিশির ভেজা ভোর রাত্তিরের ছবি। একটু একটু শীত করছিল, একটা পাতলা চাদর ছিল গায়ে, হাতে একটি ছোট এটাচিকেস আর বড়ো একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। সুদর্শন বিলেত থেকে এনে দিয়েছিল। অনেকগুলো খোপ ছিল তাতে, চেইন দিয়ে আটকানো। অ্যাটাচির মধ্যে ঠিক দুখানা শাড়ি দু'টি ব্লাউস আর অন্তর্বাস। ব্যাগের মধ্যে নিত্য-প্রয়োজনীয় টুকিটাকির সঙ্গে এই পোস্টকার্ড সাইজের ছবিখানা সহ কিছু টাকা, এই নিয়ে সব পিছনে ফেলে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। কী করবেন, কোথায় যাবেন, কিছুই জানতেন না। ছায়ার মতো কুয়াসায় ঝাপসা হয়ে ধা ধা করে হাঁটছিলেন যে কোনো একদিকে। জন-বিরল পথ, কিন্তু এক ফোঁটা ভয় ছিল না মনে, শুধু একটা ভীষণ তুফান বয়ে যাচ্ছিলো বুকের মধ্যে, এবং সেই অনুভূতি ছাড়া অন্য সব অনুভূতিই ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

খানিকটা হেঁটে একটা টাঙা পেয়ে উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি, বললেন স্টেশনে চলো। আর স্টেশনে এসে নেমেই উদভ্রান্ত হয়ে ভাবলেন 'আমি কোথায় যাচ্ছি? তারপরেই মনে হলো 'একমাত্র জায়গা আমার পরপারে।' ঠিক! উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। মাথার মধ্যে পরপার শব্দটা ক্রমাগত কানা-মাছির মতো ভনভন করতে লাগলো, ট্রেনে-তলায় গলা দেবার অপেক্ষায় তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব অস্থির আক্ষেপে ছটফট করতে লাগলো। কিন্তু কোথায় ট্রেন? ফাঁকা স্টেশন, লাইনগুলো পড়ে আছে অজগরের মতো, এ-মাথা ও-মাথা হাঁটতে লাগলেন জোরে জোরে। হঠাৎ মনে হলো যদি কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজেকে লুকোতে। হয়তো লুকোবার প্রয়োজনেই একখানা খবরের কাগজ কিনে, বেঞ্চিতে বসে, মেলে ধরলেন মুখের উপর। পৃষ্ঠা উল্টোতেই একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো। দার্জিলিংয়ে একটি বাচ্চাদের স্কুলের জন্য শিক্ষিকার প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতার সীমা আই-এ পাশ হলেই চলবে। কিন্তু বয়েস যেন পঁচিশের উর্ধ্বে না হয়। বুকটা ছলাৎ করে উঠলো। এ তার কিসের ইঙ্গিত? নিজের প্রাণ নেয়াও যেখানে মহাপাপ বলে বর্ণিত সেখানে সে অভ্যন্তরস্থ আর একটা প্রাণকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে বলেই কি এই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে গেল? তাই কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ঈশ্বর?

এই পুরন্দরই তখন তার জঠরে সাতমাস ধরে লালিত-হচ্ছিল। স্নেহে ভালোবাসায়

জন্ম উদ্বেল হয়ে উঠলো। একটা প্রাণের ম কম কথা নয়। একে ভগবানের দান ছাড়া ার কী বলা যায়? বন্ধ্যারমণীর গর্ভে কোন্ ীজ অঙ্কুর গজাতে পারে? সুদর্শন একদিন লেছিল, মেয়েরা মাটি, খুব সত্য কথা। ায়েরা মানেই তো মা, সর্বংসহা বসুন্ধরা। ীজকে যত্নের দ্বারা মহীরুহে পরিণত করাই া তাঁদের ধর্ম। তবে তিনিই বা সেই ধর্ম থেকে চ্যুত হবেন কেন? কিসের বিনিময়ে? বিচার সুবিচার যে যাই করে থাকুক না কেন, াঁর নিজের কর্তব্য হচ্ছে আশু আগত ন্তানটিকে রক্ষা করা।

মনের মধ্যে আবার তিনি জোর খুঁজে পেলেন। উঠে দাঁড়ালেন সোজা হয়ে. মনস্থির রতে আর এক বিন্দু সময় অপচয় করলেন া। টিকিটঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন, রপার নয়, এপারেই/আমার অসমাপ্ত কাজ াঙ্গ করতে আরো কিছুদিন বাকি আছে।

কিন্তু না, যে চাকরির আশায় তিনি ট্রেনের তলায় গলা না দিয়ে উঠে বসেছিলেন ইলো কামরার তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চতে, ায় চব্বিশ ঘণ্টার শারীরিক এবং মানসিক কল সহ্য করে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁচেছিলেন, সেই স্টেশনেই অনাহারে নিদ্রায় আরো একটা বেলা কাটিয়ে াজিলিং মেইল ধরেছিলেন, সেই চাকরি তাঁর য়নি। তিনি গিয়ে পৌঁছবার আগেই র্তৃপক্ষ তাঁদের স্থানীয় লোক নিয়োগ করে ফেলেছিলেন।

বিহ্বলভাবে বেরিয়ে এসে তিনি কাক-ঝারার নিচু রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন রপর তাঁর ভবিষ্যৎ কী? তাঁর দেহ ভেঙে আসছিল, পা আর চলছিল না, মনে হচ্ছিল তিনি এখুনি পড়ে যাবেন। এই বুড়ো মন-াহাদুর এসে থমকে দাঁড়ালো। দরদভরা লায় বলল, মাইজি তুমহার কি তবিয়ৎ ঠিক নেই?'

চোখ গালে উপছে চোখের জল ফিরিয়ে দয়ে অঞ্জলি দেবী বললেন, 'না, বাবা আমি ার পারছি না।'

'তুমি কি বাঙালী ছ?'

অঞ্জলি বললো, 'হাঁ।'

'হামারভি ওই মুলুক । হামি তো দশ রষ বাঙলা মুলুকে ঘুরিয়েছি। হামি বাংলা ভ ভালো জানে।'

'এখানে কোনো সস্তা হোটেল আছে?'

'সোব আছে, সোব হামি ঠিক করিয়ে দব। কিন্তু নকরি তোমার হলো না কেন?'

'না বাবা খালি নেই।' তিনি ধুঁকছিলেন।

'নকরি তোমার চাই?'

'আছে?' আগ্রহে অধীর হয়ে তাকালেন তিনি।

মনবাহাদুর বলল, 'আছে।'

'কোথায়?'

'এই তো আর একটু নামিয়ে কার্ট রোডে কঠো নার্সারি করেছে এক সাহেববাবু, নতুন ভি হয়েছে স্কুলটা, ঐখেনে লোক মাঙছে, হামি জানি।'

'আমি সেখানেই যাবো, আমাকে তুমি নিয়ে যাও—'

'তুমি কি একা এসেছ মাইজি?'

'আমার কেউ নেই।'

'কিন্তু তোমার পেটে তো বাচ্চা আছে, তুমি হামার ঘরে চলো, খাবে, থোড়া বিশ্রাম ভি হোবে, হামার বউ তোমাকে লিয়ে যাবে সেখানে।'

অঞ্জলির শ্রান্ত-ক্লান্ত সর্বহারা চেহারা দেখে মায়ায় পড়ে গিয়েছিলো বুড়ো মন বাহাদুর, পরে সে বলেছে যৌবনে কলকাতায় এক বাঙালী সাহেবের মেয়েকে সে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলো, তেরো বছর বয়সে সে মেয়ে মারা গেল। মনের দুঃখে চাকরি ছেড়ে দিয়ে একেবারে দেশে চলে এলো। সেই মেয়েকেই কেন জানি হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিলো অঞ্জলিকে দেখে।

আসলে ওই রকম সব জুটেই যায় বিপদের সময়। নইলে ভগবানের নাম আর বিপদতারণ হবে কেন?

প্রথম জীবনে যেমন সীতেশদা এসে দাঁড়িয়েছিলো সব নিরাপত্তা নিয়ে, ওই অসহায় অবস্থায়, তেমনি মনবাহাদুর এসে দাঁড়ালো ঈশ্বর প্রেরিত হ'য়ে। মানুষ দুঃখ পায় তার কর্মদোষে, তারি মধ্যে যতোটুকু সান্ত্বনা তার ভাগ্যে জোটে, তার নামই ঈশ্বর।

মনবাহাদুরের সাহায্যেই শেষে চাকরিটা হলো, গুদোম ঘরে বাসস্থান জুটলো, তারপর নির্দিষ্ট সময়ে নেপালী ডাক্তারের সাহায্যে মনবাহাদুরের স্ত্রীর হাতেই জন্মালো এই শিশু এই পুরন্দর। কী আশ্চর্য! আজ সেই পুরন্দর তার মায়ের কষ্টের কথা ভেবে আকুল হচ্ছে।

একটা সুখ-দুঃখ মেশানো ঘন নিঃশ্বাস আবার উদ্গত হলো বুক থেকে। বললেন, 'কষ্ট বলতে গেলে তোরই হবে থার্ড ক্লাসে। ভিড়ের মধ্যে বসে বসে ঘুম হবে না, আবার বম্বেতে নেমেই কতো কাজ তারপর জাহাজের কষ্ট তো আছেই। কতো লোকের কতো শরীর খারাপ হয়, বমি হয়—আমি বলি কি তুই সেকেণ্ড ক্লাসে যা,—'

'আর তুমি থার্ডক্লাশে, না?'

'আমার ঘুম কম, বসে থাকতে আমি খুব ভালোবাসি। লোকজন দেখবো সময় কেটে যাবে।'

'আর তুমি কী কী ভালোবাসো মা?' হাসতে হাসতে পুরন্দর মার হাত ধরলো. 'কম খাওয়া, কম ঘুম, আর কী? ও, ভালোকথা. তোমার জন্য দুটো শাড়ি এনেছি আমি।'

পোর্ট ফোলিওটা টেনে এনে. একটা প্যাকেট বার করলো, 'দেখ, পছন্দ হয় নাকি?'

'শাড়ি! আবার শাড়ি আনলি কেন?' অঞ্জলি দেবী বিব্রত বোধ করলেন। তারপর প্যাকেট খুলে একেবারে হতবাক। একখানা টকটকে লাল পাড়ের নিচে জরি দেয়া টাঙাইল শাড়ি, আর একখানা গাঢ় সবুজ পাড়ের সিল্ক।

পুরন্দর মায়ের বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মজা পেলো, খুশির গলায় বললো, 'রঙিন আনিনি সেই জন্যেই আমাকে ধন্যবাদ দাও, বুঝলে? যদি বম্বেতে যেতে হয় এই শাড়ি পরে যেতে হবে। ব্যস্! আর যদি কথা না শোনো, দুই ধমক দিয়ে রেখে যাবো।'

উঠে সে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়ালো, দুই কাঁধে হাত রেখে বললো, 'মানুষটাকে যদি অস্বীকারই করতে পারতে তো আর এই আত্মনির্যাতনের দরকার হতো না বুঝলে? আর এই ছবিটাও—' ছবিটা সে পকেটে ভরলো, 'এমন করে লুকিয়ে রাখতে না।'

ছেলের কথা শুনে অঞ্জলি দেবী আরক্ত মুখে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

প্রথম খণ্ড শেষ

(ক্রমশ)

॥ ছয় ॥

বলাই বাহুল্য যে, দয়ালদার অগোচর ছিল না—ভাগবতী করুণা কীভাবে অঘটন ঘটায়, আর তান্ত্রিকদের সিদ্ধাই কীভাবে। তিনি মনেপ্রাণে ভক্ত হ'লেও অধ্যাত্ম পদযাত্রায় শুধু তো ভক্তির পারানিই সঞ্চয় করেননি, জ্ঞানের বহু রত্নমণিরও দিশা পেয়েছিলেন। তাই দুরভিসারে তাঁর পদস্খলন হয়নি। হবে কেমন ক'রে? ঠাকুর নিজে যে ছিলেন তাঁর হাত ধ'রে। কবি নিশিকান্তের একটি অপরূপ গানে আছে:

কান্ডারী যার সাথের সাথী,
কী হবে তার পার অপারে?
কী হবে তার দিনের আলোয়,
রাতের কালো অন্ধকারে?

কিন্তু তা বলে এ ইঙ্গিত করার আমার উদ্দেশ্য নয় যে, দয়ালদার পথে বারবার বাধারা এসে হামলা করেনি। ইতিপূর্বে লিখেছি বড় আধারের সামনে বাধাও বড় হ'য়ে ওঠে। কেবল বড়রা বড় ব'লেই ক্রমাগত বিষম ঘা খেলেও হার মানে না, যা ধরে তা ছাড়ে না। বাল্যকালে কোথায় পড়েছিলাম:

প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ।
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ॥
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি॥

অর্থাৎ

হীনমতি বাধা ভয়ে অভিসার করে না বরণ,
মধ্যপন্থী যাত্রাপথে নিরুৎসাহ হয়
বিঘ্ন ভায়,
বারবার বিঘ্ন বাধা গর্জি
যদি আসে রুক্ষ ঢেউয়ে—
বরেণ্য প্রবীর যাঁরা মানেন না হার সাধনায়।

দয়ালদা ছিলেন বরেণ্য প্রবীর, উচ্চ কোটির সাধক। তাই তাঁর জীবনে দুঃখ শোক রোগ জরা স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য—কিছুই অলংঘ্য বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে পারেনি, তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সুরে তিনি সুর মিলিয়ে বলতেন সংকটের মুখোমুখি হয়ে:

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে
মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে তাপিত চিত্তে নাই-বা
দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

দয়ালদা জীবনে বাধাজয়ী হয়েছিলেন অগুন্তিবার। কিন্তু সংকটে পড়ে ক্লিষ্ট হ'লেও কান্নাকাটি করেননি কোনোদিনই। নানা দুর্যোগেই তাঁর চোখের আলো কালো হ'য়ে এসেছে বারবার, কিন্তু তিনি কখনো ভুলেও নালিশ করেননি নিয়তির দরবারে, ঠাকুরকে বলেননি নিষ্ঠুর। অতুলপ্রসাদের একটি বাউল গান তাঁর বড় প্রিয় ছিল (বাউলরা ছিল যে তাঁর আত্মার আত্মীয়):

তোমার ঠাকুর বলব নিঠুর কোন মুখে?
শাসন তোমার যতই গুরু
ততই টেনে লও বুকে।

নিঃসঙ্গ উদাসী ছিলেন তিনি স্বভাবে—বলেছি। তাই ফকির দরবেশ সাধু সন্ত আউল বাউল তাঁর মন টানত বরাবরই। তাঁর "দিব্যাকি বাত"-এ একটি ফকিরের কথা লিখেছেন বলবার মত, তারই অনুবাদ দেই। বলছেন দয়ালদা স্মৃতিচারণী সুরে:

"একদা আমি নিশুত রাতে সমুদ্রতীরে ধ্যানে বসতে না বসতে এক ফকিরের আবির্ভাব। আমি সেলাম ক'রে বললাম: 'আপনার নাম কী জানতে পারি?'

"তিনি বললেন: 'আমার নাম? জানি না তো!'

"'জানেন না? সে কি? ঠিক বুঝতে পারছি না।'

"তিনি বললেন হেসে: 'আমি নিজেও বুঝিনি ভাই—কী জবাব দেব তোমাকে? কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, বহুদিন আগে এক সাধু আমাকে একটু আভাস দিয়েছিলেন। সেই থেকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার নাম।'

"আমি বললাম: 'শুনে ধাঁধা লাগছে—নামের রহস্যভেদ করবার চাবি কী? সেই সাধুজি ঠিক কী বলেছিলেন বলবেন আমাকে?'

"তিনি বললেন: 'নিশ্চয়। বলব না কেন? সাধুরা নির্দেশ দেন তো সকলেরই জন্যে। শোনো তবে।

'তিনি আমাকে বলেছিলেন—প্রতি মানুষেরই দুটি নাম থাকে: একটি—যে নামে তাকে সবাই ডাকে, চেনে। আর একটি হ'ল—যে নামে তাকে খোদা ডাকেন, চেনেন। সেইটেই তার আসল নাম।'

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে বিশ্ব ঘরে
পেতাম না ঠাঁই,
দুজন যদি হ'ত আপন হ'ত
না মোর আপন সবাই।)

এ-গানটি দয়ালদা শান্তিনিকেতনে তাঁর ঘরে ফ্রেম ক'রে ছবির মতন দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। গুরুর এ-অঙ্গীকার-মন্ত্র তাঁর জীবনকে চলতে ফিরতে অনুপ্রাণিত করেছিল বলেই ভারতের সব প্রদেশের লোকই তাঁকে বরণ ক'রে নিয়েছিল পরমাত্মীয় ব'লে।

দ্বিতীয় বাণীটি—রবীন্দ্রনাথের "মুক্তি"র আদর্শ (নৈবেদ্য):

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

এ-যুগের মানুষ আমরা রবীন্দ্রনাথের এ-অপরূপ মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলাম চাক্ষুষ করেছিলাম ব'লে—রবীন্দ্রনাথ প্রতি পদক্ষেপে কীভাবে এ-জীবন দর্শনকে রূপ দিয়েছিলেন তাঁর অশ্রান্ত কর্মের সঙ্গে বিশ্বমানববাদী প্রতিভার মণিকাঞ্চন-যোগে।

বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ (এবং তাঁর পরে শ্রীঅরবিন্দও) এ-আদর্শের জয়ধ্বনি করেছিলেন বৈদিক ঋষিদের আনন্দবাদী তপস্যার উত্তর সাধক হ'য়েই। শ্রীঅরবিন্দ মায়াবাদ খণ্ডন করেছিলেন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" নৈতিবাদের প্রত্যুত্তরে বেদের "সর্বং-খল্বিদং-ব্রহ্ম" ঝাণ্ডা উড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথও প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন উপনিষদের বিখ্যাত শ্লোক—"এস দেব বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ—বিশ্বকর্মা মহাশিব প্রতি জীবের হৃদয়-বাসী।"

লীলাবাদী তান্ত্রিকেরাও পরে তাঁদের জীবনসৌধের চূড়ায় উড়িয়েছিলেন এ-আদর্শের পতাকা। মহানির্বাণ তন্ত্রে পাই:

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নাৎ সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥

উষা হ'তে সন্ধ্যা, পরে সন্ধ্যা হ'তে
উদয় লগন—
যা কিছু করি মা তারা—
সকলই তোমার আরাধন।

উপমাসম্রাট যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন উঠতে বসতে: "আমি নিত্য লীলা দুইই লই। বেলটার পুরো খবর পেতে হ'লে তার শাঁস খোসা বীচি সবকিছুরই হিসেব নিতে হবে—নৈলে যে ওজনে কম পড়বে।"

কুলার্ণব তন্ত্রে শিব পার্বতীর কাছে করেছেন এ-আদর্শের ঘোষণা:

ভোগো যোগায়তে দেবি!
দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ
কুলধর্মে কুলেশ্বরি!

অর্থাৎ, লীলাবাদী তান্ত্রিকের প্রাণ সাধনায়—
ভোগ হয় যোগ, হয় স্খলনও সোপান,
এ-সংসার হয় মুক্তিপীঠ মহীয়ান।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পরে শ্রীঅরবিন্দও গেয়েছিলেন সাবিত্রীতে:

A high and black negation
is not all
The meaning of this great
mysterious world:
Here to fulfil himself was
god's desire.

উত্তুঙ্গ বৈরাগ্যমুখী মসীকৃষ্ণ নাস্তিবাদ নয়
বিচিত্র রহস্যময় এ-মহাবিশ্বের শেষ বাণী:
জীবনের কৃতার্থতা অভিপ্রেত—
আনন্দময়ের।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এ-জীবন ভাষ্যের পাঠ দিয়েছেন তাঁর নানা গ্রন্থেই—যার অন্ত্য পরিণতি পাই তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীর ছত্রে ছত্রে। এখানে শুধু আর একটি উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—ঘোষণাটি ফুটেছে—রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্যের" মতই—ওঙ্কারের ঝঙ্কারে ব'লে:

Only the everlasting
No has neared,
But where is the Lover's
everlasting Yes,
The symboled Om, the great
assenting Word,
The chamber where the glorious
enemies kiss,
The smile that saves, the
golden peak of things?

চিরন্তন নাস্তিবাদ জনায় এ-জীবনলীলায়,
কেবল, কোথায় বিশ্বপ্রেমিকের
মৃত্যুহীন বাণী—
ঝংকারিত 'ওম্'—করে যে
প্রাণসুন্দরে অঙ্গীকার,
সে-বাসর—যেথা করে দীপ্ত যুযুৎসুরা
আলিঙ্গন—
তারিণী-করুণা-হাসি স্বর্ণপ্রভা
শিখর সাধনা?

কিন্তু লীলাবাদীর এ-মহা-অঙ্গীকার আমাদের ভারতীয় সাধনায় আনন্দবাদী উপনিষদে, কর্মমন্ত্রী গীতায় ও সর্বাস্তিবাদী তন্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ হ'লেও রবীন্দ্রনাথের এই ঝঙ্কৃত জীবন দর্শনের ডাকে লক্ষ লক্ষ ভাবুক সাধকও সাড়া দিয়েছিলেন কেবল তাঁর প্রাণোন্মাদী কাব্য-বাণীর দীপ্তপ্রেরণায় নয়—দিয়েছিলেন কবি তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন তাঁর সৌন্দর্যপূজারী জীবনের রক্তস্বাক্ষরে ব'লে, তিনি হাতে কলমে ক'রে দেখিয়েছিলেন ব'লে—কীভাবে অন্তর মন্দিরে এ-আদর্শের দীপালিকা জ্বালাতে হয়:

প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে॥

শুধু তাই নয়, কবি সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বললেন যে তাঁর পণ এই:

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

যাতে পরম পরিণতি হবে ("দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে" তন্ত্রবাণী স্মরণীয়)

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

কিন্তু এ-অসাধ্য সাধনার কাব্যরূপ সিদ্ধার্থ হ'তে পারে না যদি জীবনসিদ্ধি না তার পিছনে থাকে দৃশ্য তরুর সার্থক বিকাশের মূলে মাটির প্রচ্ছন্ন রসধারার মতো। দয়ালদা রবীন্দ্রনাথের শুধু প্রতিভায় নয়, মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর জীবন শিল্পের সার্থক সঞ্চরণে, সৌরভে, লক্ষ কর্মের মধুচ্ছন্দ লতা-ফুল ফলের বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে। তাই তিনি গুরুনিষ্ঠ অভীপ্সায় চেয়েছিলেন সর্বান্তকরণেই এই প্রাণলীলার প্রেমবিকাশকে জীবনে আরাধনা ক'রে উপলব্ধি করতে, সবার মাঝে থেকেও সর্বাবিচ্ছিন্ন উদাসী হয়ে ফুটে উঠতে। সাধে কি তাঁর প্রেমিক জীবন তাঁর এমন বহু অনুরাগী ও ভক্তের কাছে আদর্শ হ'য়ে উঠেছিল যারা তাঁর সেবা করতে পেলে নিজেদের ধন্য বোধ করত—যাদের মধ্যে আমরাও ছিলাম তাঁর মহত্ত্বমুগ্ধ গুণগ্রাহী তথা পুণ্যসঙ্গপ্রার্থী।

[ক্রমশঃ]

॥ ৬ ॥

প্রায় দশ হাজার শব্দের মধ্যে মাত্র পাঁয়তাল্লিশটি শব্দ পরিবর্তিত হয়েছে সে কথা পূর্বেই বলেছি। এই পরিবর্তনের মূল্যায়ন করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, উল্লেখযোগ্য এবং সার্থক পরিবর্তনের সংখ্যা মাত্র দুটি। প্রথমটি গীতাঞ্জলির ১৫ নং কবিতায়।

আদিম খসড়ার পাঠ:

'When in the morning air the golden harp **is** tuned, honour me, my lord, by asking for my presence'

প্রকাশিত পাঠ 'When in the morning air the golden harp is tuned, honour me, **commanding** my presence.'

দ্বিতীয়টি হ'ল ৪৩ নং কবিতায়। খসড়ার পাঠ:

'My king, thou didst stamp thy seal of eternity upon many a fleeting moment.'

প্রকাশিত পাঠ:

'My king, thou didst **press the signet of eternity** upon many a fleeting moment.'

এ-দুটি বাদ দিলে পরিবর্তিত শব্দের মধ্যে যা বাকি থাকে তার অধিকাংশই বৈশিষ্ট্য-বর্জিত, একটি শব্দের পরিবর্তে তার অপর একটি প্রতিশব্দ গ্রহণ। যেমন 'বিয়ার'-এর স্থানে 'এনডিওর' (১৯), রোম-এর স্থানে ওয়ানডার (১২), মাই কিঙ-এর বদলে মাই মাসটার (১৫), মাই লর্ড-এর জায়গায় মাই গড (১০৩), ব্রাও-এর জায়গায় ফোরহেড (৫৯), গ্রামবল-এর জায়গায় মার্মার (৫১) ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত জমকালো শব্দের বদলে ঘরোয়া শব্দের ব্যবহার যথা 'পিনিয়ন'-এর বদলে 'উইঙ' (১২), 'ভারজার'-এর বদলে 'গ্রাস' (৫৮), মেইডেন-এর বদলে গার্ল (৬১), রিকুইটেসট-এর বদলে রিওয়ারডেসট (৮৩), 'ডুয়েলিং'-এর জায়গায় 'হাউস' (৯৩), 'অ্যারাইভ্যাল'-এর বদলে কামিং (৪১) ইত্যাদি। ঠিক এর উল্টোটাও দুর্লভ নয়, যেমন পভারটি-র স্থলে 'পেনিউরি' (৩৬)। আবার কখনো কখনো মৌখিক ঘরোয়া শব্দ বিন্যাসের বদলে শব্দের অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত রূপের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন বাই হুইচ-এর বদলে 'হোয়ারবাই' (৩৪)। এই রকম পরিবর্তনের মধ্যে যে খুব একটা সুচিন্তিত নীতির পরিচয় আছে তা নয়। যেমন 'মেইডেন' কথাটি ৬১ নং কবিতায় পরিবর্তিত হয়ে গার্ল হয়েছে যদিও ঐ কবিতার কনটেকসট-এ মেইডেন কথাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। কিন্তু ৬৪ নং কবিতায় দেখা যায় 'মেইডেন' কথাটি তার স্বস্থানে অক্ষুণ্ণই রয়েছে। তেমনি ৭২ নং কবিতায় 'ব্লিস' বদলে 'জয়' করা হয়েছে কিন্তু ৬৩ নং কবিতায় একই অর্থে ব্লিস কথাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। যাই হোক, এই রকম পরিবর্তনের উপর কবিতার কল্যাণ—তাও ইংরেজি গীতাঞ্জলির মতো কবিতার—কোনোভাবেই নির্ভর করতে পারে এমন প্রস্তাব বিবেচনারই অযোগ্য।

শব্দের অথবা শব্দ গুচ্ছের পূর্বোক্ত পরিবর্তনের ফলে কিছুমাত্র ইমপ্রুভমেণ্ট হয়েছে এমন কথা বলা চলে না কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যেমন ৪৩ নং কবিতায় 'মোটলে ক্রাউড'-এর পরিবর্তে বসানো হয়েছে 'কমন ক্রাউড', ফলে জনতার বর্ণনাত্মক বিশেষণ হিসেবে 'মোটলে' কথাটিতে যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার একটু বিশেষ রং ছিল সেটা 'কমন' এই নির্বিশেষ কথাটির তলায় চাপা পড়ে গেল। তেমনি প্রশ্ন করা যায় ২০ নং কবিতায় যে একটিমাত্র শব্দের পরিবর্তন দেখা যায় অর্থাৎ 'ভেগ ফ্রাগ্রানস'-এর পরিবর্তে 'ভেগ সুইটনেস' বসানো হয়েছে, সেটা কি ইমপ্রুভমেণ্ট? অর্থের দিক থেকেই হোক অথবা কবিতার মুড-এর দিক থেকেই হোক ভেগ সুইটনেস কি অচেনা, অনির্দেশ্য সৌরভ, ভেগ ফ্রাগ্রানস-এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে? কথাটা কি অনেকখানি ঝাপসা, অনেকখানি ভোঁতা, এমন কি য়েটস নিজেই যাকে 'ফ্ল্যাট' বলতে অভ্যস্ত ছিলেন তা-ই হয়ে গেল না? উল্লেখ প্রয়োজন যে পোয়েট্রি পত্রিকার পাঠে ফ্রাগ্রানস কথাটিই আছে। তেমনি ৫৮নং কবিতার দ্বিতীয় স্তবক-এর আদি পাঠ হ'ল।

'The joy that makes the earth flow over in riotous excess of **ver-dure**, the joy that sets the twin brothers--life and death--into **mad Capers** over the wide world.'

প্রকাশিত পাঠ হ'ল:

'The joy that makes the earth flow over in the riotous excess of grass, the joy that sets the twin brothers, life and death, dancing
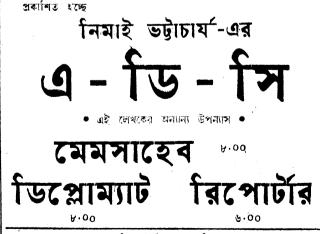
over the wide world.' ' প্রকাশিত পাঠটি যে ইমপ্রুভমেনট তা কোনো মতেই মানা চলে না। প্রথমত, 'ভারজিওর'-কে 'গ্লাস'-এ পরিণত করলে যে আনন্দের কথা কবিতায় বলা হচ্ছে তার তাৎপর্যকে সংকীর্ণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী আনন্দ শুধুমাত্র ঘাসের মধ্যেই হিল্লোলিত হচ্ছে এমন কথা অবশ্যই কবির বক্তব্য নয়। এই আনন্দের স্পন্দন বিশ্ব প্রকৃতিতে যা কিছু 'সবুজ', যা কিছু প্রাণবান তার মধ্যেই কবি দেখছেন। 'ভারজিওর' কথাটিকে যদি সেকেলে অথবা অ্যাবস্ট্রাকট মনে হয়, এটির সার্থক পরিবর্তন অসম্ভব নয়, কিন্তু 'গ্রাস' বলায় কবির বক্তব্যটিই খণ্ডিত হল। তেমনি 'ইন টু ম্যাড ক্যাপারস'-এর স্থলে 'ডানসিং', এই পরিবর্তনের ফলে জীবন ও মৃত্যুর উন্মত্ত নৃত্যলীলার মধ্যে যে কৌতুক কবি লক্ষ্য করেছেন সেটা বাদ পড়ে গেল। 'লাফটার'-এর বিশেষণ 'ওয়াইল্ড' কথাটিও বর্জিত হয়েছে, কিন্তু সেটা যে বর্জনীয় নয়, তা আগেই উল্লেখ করেছি। ৭৬নং কবিতার পাণ্ডুলিপির পাঠ হ'ল :

'In this work-a-day world of thine, surging with toil and struggle, among bustling crowds shall stand before thee face to face.'

এটির প্রকাশিত পাঠ হল :

'In this laborious world of thine, tumultuous with toil and with struggle, among hurrying crowds ইত্যাদি।

অর্থের দিক থেকে 'টয়েল' এবং 'স্ট্রাগল'-এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, সেই জন্য মূলের 'with toil and struggle" কে ভাগ করে 'with toil and with struggle' করা হয়েছে সেটা ভালোই হয়েছে বলতে হবে কিন্তু তাই বলে 'bustling'-এর স্থলে 'hurrying'-এর বিশেষ তাৎপর্য আছে তা বলা যায় না। অপরপক্ষে, মূল পাঠের 'work-a-day world' -কে যে 'laborious world' করা হলো, তার ফলে প্রতিদিনের অভ্যস্ত এই বৃহৎ বিশ্বকে শুধু মাত্র 'লেবোরিয়স' বা শ্রমাক্রান্ত জগৎ বলায় তাকে অনেকটা ছোটো অনেকটা সংকীর্ণ করে ফেলা হ'ল না? তারপরে, জগৎকে লেবোরিয়স বলার পরে আবার তাকে 'tumultuous with toil' বলায় যে পুনরুক্তি ঘটলো সেটা-কি খুব বাঞ্ছনীয়? উপরন্তু 'সারজিং' কথাটির মধ্যে তরঙ্গের বা স্রোতের যে প্রচ্ছন্ন উপমাটি ছিল 'টিউমালটাস' এই বিশেষণটির মধ্যে তা বজায় রইল এমন দাবী কি করা যায়? যাই হোক, আরো একটি দৃষ্টান্ত আছে যা এর চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ। ৩৯নং কবিতার চতুর্থ স্তবকের আদি পাঠ হ'ল :
'break open the door, my king, and come in with thy regal splendour.'

প্রকাশিত পাঠ :

break open the door, my king, and come with the ceremony of a king.'
প্রথমত, প্রকাশিত পাঠে 'কিং' কথাটির খুব কাছাকাছি দুইবার ব্যবহার কানে একটু কটুই লাগবার কথা। তারপর মূল কবিতার 'রাজসমারোহ' বলতে 'regal splendour'ই বোঝায় কিন্তু 'the ceremony of a King' বলতে কি ঠিক একই জিনিস বোঝাচ্ছে? সেরিমনি-র অর্থ অনুষ্ঠান, সমারোহ নয়। অর্থের দিক থেকেও 'সেরিমনি অফ এ কিং' অস্পষ্ট, কেননা রাজার আগমনে তাঁর অভ্যর্থনায় সেই অনুষ্ঠান অপরের কৃত্য, রাজার নয়। তা ছাড়া জীবন যখন শুকায়ে যায়, তখন হৃদয় দুয়ার ভেঙে যে রাজার আবির্ভাবের কথা কবি বলছেন এবং যে ভঙ্গীতে বলছেন, তার সঙ্গে সমারোহের ভাবগত যোগ আছে, অনুষ্ঠানের বা সেরি-মনি-র নয়। এই পরিবর্তনটিতে য়েট্‌সের হাত আছে এমন মনে করা স্বাভাবিক, তার কারণ, তাঁর নিজের রচনায় ঐ সেরিমনি কথাটি ঠিক এমনি অস্পষ্ট অর্থেই তিনি ব্যবহার করেছেন যেমন **The second coming** নামক কবিতাটির একটি পরিচিত লাইন :
'the ceremony of innocence is drowned.'
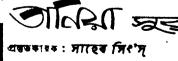
এই সঙ্গে আরো দুটি দৃষ্টান্ত বিচার করে দেখা যেতে পারে। ৬১নং কবিতায় 'two timid buds of parul' বদলে হয়েছে 'two timid buds of enchantment' এবং ৬০নং কবিতায় 'and smiles the sea beach বদলে হল 'and pale gleams the smile of the sea beach.'

• পরিবর্তিত বাক্যাংশ দুটিতে 'এনচান্ট্‌মেন্ট' এবং পেল কথা দুটি আছে বলে য়েট্‌সের হস্তক্ষেপের কথা স্বতই মনে হতে পারে, কেননা তাঁর প্রথম দিককার রচনায় 'pale', 'enchantment', 'dim', 'dream' প্রভৃতি শব্দগুলির পৌনঃপুনিক ব্যবহার পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। নিশ্চিত প্রমাণ অবশ্য একে বলা যায় না, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজে কথাগুলিকে অজস্রবার ব্যবহার করেছেন। যাই হোক, 'buds of parul' এর বদলে 'buds of enchantment' বসিয়ে কিছু লাভ হয়েছে এমন বলা যায় না। এই পরিবর্তনকে কোনোক্রমে অনিবার্যও বলা যায় না, যেহেতু ৫৪নং কবিতার গৃহীত পাঠে 'babla flowers' এবং 'neem leaves'-এর অকুণ্ঠব্যবহার দেখা যায়। ৬০ নং কবিতার 'pale gleams the smile of the sea beach-এর আদি খসড়ায় দেখা যায় কবি একটু দ্বিধান্বিত অবস্থাতেই অংশটি তখনকার মতো ছেড়ে দেন। তিনি প্রথমে লেখেন (কাটাকাটি সত্ত্বেও স্পষ্টই পড়া যায়) 'and the sea beach smiles'. তাতে বাক্যটির স্বকীয় ছন্দ বজায় থাকে। পরে দেখা যায় তিনি এটি কেটে করলেন, 'and smiles the sea beach' এবং পাণ্ডুলিপিতে এইভাবেই রেখে দেন। এতে বাক্যটির শেষাংশটি ধ্বনির দিক থেকে ঈষৎ দুর্বল হ'ল মনে করা যেতে পারে। প্রকাশিত পাঠে বাক্যাংশটির গোড়ায় 'পেল গ্লিমস' এই দুটি নতুন শব্দের ভার চাপিয়ে ধ্বনির ওজন রক্ষিত হ'ল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ অংশটির মধ্যে এমন একটি ভাবের প্রক্ষেপ ঘটলো যা কবিতাটির পক্ষে অনিবার্য অথবা সুসংগত নয়। মনে রাখতে হবে, যে সমুদ্রতীরের কথা বলা হচ্ছে সেটা হ'ল 'the sea shore of endless worlds'। এক দিকে তার অসীমতা এবং দুর্জ্ঞেয় রহস্য, অন্যদিকে বালু নিয়ে, নুড়ি নিয়ে খেলায় মত্ত শিশু ভোলানাথের দল। তাদের মধ্যেই যেন সখ্য এবং সেই জন্যই সাগর খেলে শিশুর সাথে/হাসে সাগর বেলা'। ক্ষয়-ক্ষতি, আশঙ্কা, মৃত্যু জগতে ভরে আছে কিন্তু তা আছে ঐ সাগরের সঙ্গে শিশুর খেলার যে-জগৎ তার বাইরে 'মরণদূত উড়িয়া চলে' কিন্তু সাগরবেলা শুধু হাসে। 'Pale gleams the smile'-এর মধ্যে যে চিত্রলতার স্পর্শ আছে তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটা দস্তুর নিষ্ঠুরতার আভাস দেয় যেটা কবিতাটির মূলভাবের পক্ষে ঈষৎ উৎকেন্দ্রিক এবং অপ্রাসঙ্গিক। ফলে সমগ্র কবিতাটির ভাব ও রসের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুরস্খলন ঘটে। অতএব কবি প্রথমে যা লিখেছিলেন অর্থাৎ

'The sea plays with children and the sea beach smiles'

এই লাইনটির মধ্যে চটকদার শব্দের সমাবেশ না থাকলেও সহজ সরল বাগ্‌বিন্যাসে সমগ্র কবিতাটির সঙ্গে এটাই সুসমঞ্জস ছিল এ কথা বলতেই হবে।

দেখা গেল, দশ হাজার শব্দের মধ্যে মোট পঁয়তাল্লিশটি শব্দ পরিবর্তনের অধিকাংশই হ'ল নিতান্ত মামুলি, বিশেষত্ববর্জিত, যেগুলির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় পাল্লাই সমান ভারি। কিছু আছে যার ফলে কবিতার ক্ষতি হয়েছে, মূল বাংলার আক্ষরিক অর্থ থেকে দূরে সরে গেছে বলে নয় (আক্ষরিক অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ কোনো কালেই করেন নি), ইংরেজি কবিতাতেই সে ভাব এবং রস ফুটেছে, কোনো না কোনো দিক থেকে তার ঈষৎ সংকীর্ণতা অথবা বিকৃতি ঘটেছে ব'লে। তাছাড়া সর্বতোভাবে লাভজনক হয়েছে এমন পরিবর্তন দেখা যায় মাত্র দুটি এবং এই দুটিও যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ করেননি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। য়েট্‌সেরও হতে পারে, তবে পরিবর্তন দুটি পরীক্ষা করলে এমন কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে না যার ফলে সে দুটিকে অনিবার্যভাবে য়েট্‌সের নামের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, যে টাইপ কপির কথা কবি রোটেনস্টাইনকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেছিলেন সেটি আমরা পাই নি। তার মধ্যে কবি-কৃত প্রাথমিক সংশোধন যে ছিল ১৯১২ সালের ১২ই জুলাই তারিখে 'টাইম্‌স' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা দুটির মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। তা ছাড়া য়েট্‌সের সঙ্গে 'কোলাবোরেশান' শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও (সেপ্টেম্বর, ১৯১২) কবি একাই যে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছিলেন তারও নজির আছে। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে ইণ্ডিয়া সোসাইটির বিশেষ সংস্করণ গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে ১৯১৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী লিখিত এক পত্রে লিখছেন :

'Mr. Yeats is not satisfied with some of the corrections that have been made without his knowledge.'

কবিকৃত অন্তত একটি পরিবর্তন সম্বন্ধে য়েট্‌স লিখিত প্রতিবাদ করেন এবং পুরাতন পাঠটি পরবর্তী সংস্করণে বহাল রাখবার জন্য সকরুণ আবেদন জানান। য়েট্‌স লিখছেন (৯ জানুয়ারী, ১৯১৩) :

'I was most sorrowful to find the magnificent "no more coiness (sic) and sweetness of demenour (sic)" was changed and the whole poem badly ruined . . . . . Do please put back the old sentence which suggested the very women, in the new edition'।

দেখা যায় আদি খসড়ার পাঠ 'no more coyness and sweetness of demeanour' বদলে ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণে কবি নিজেই সেটাকে করেছিলেন, 'no more shy and soft demeanour' এবং স্বভাবতই য়েট্‌সকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। য়েট্‌স যে বলেছেন তার ফলে কবিতাটি একেবারে 'badly ruined' হয়ে গেছে সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত অনেকেই হবেন না এবং হবার প্রয়োজনও নেই। শুধু লক্ষ্য করতে হবে যে তিনি ওকালতি করছেন রবীন্দ্রনাথেরই স্বরচিত একটি আদিম পাঠের স্বপক্ষে, নিজের প্রস্তাবিত কোনো পরিবর্তনের জন্য নয়। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ য়েট্‌সের অনুরোধ উপেক্ষা করেন নি এবং মার্চ মাসে যখন প্রথম ম্যাকমিলান সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল তখন দেখা যায় সেই পুরাতন খসড়ার পাঠটিই আবার ফিরে এসেছে। তার ফলে মনে হয় এইটিই গীতাঞ্জলির ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণ এবং ম্যাকমিলানের সাধারণ-সংস্করণের মধ্যে একমাত্র পাঠগত প্রভেদ। যাই হোক, য়েট্‌সের সহযোগিতায় সংস্কারের কাজ শুরু হবার পূর্বে এবং শেষ হবার পরে কবির স্বকৃত সংস্কার বাদ দিলে এবং একযোগে কাজ করবার সময়েও কবি নিজে যেটুকু জুগিয়ে থাকবেন সেটার জন্যও আনুমানিক margin ধরলে, ঐ পঁয়তাল্লিশটি শব্দ পরিবর্তনের কয়টা য়েট্‌সের ভাগে পড়তে পারে আর তার মূল্যই বা কতটুকু হওয়া সম্ভব? অপর পক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির আদিম পাঠে কলমের আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ে নি এমন কবিতার সংখ্যা ২১টি এবং এক-আধটি নগণ্য শব্দ পরিবর্তন উপেক্ষা করলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৩৫। এগুলির মধ্যেই আছে গীতাঞ্জলির বিখ্যাততম কতকগুলি কবিতা যথা :

'Light, my light'; 'Thou art the sky and thou art the nest as well' 'No more noisy, loud words for me'; 'On the day when death will knock at the door'; 'O thou the last fulfilment of life, Death, my death'; 'In one solution to thee' ইত্যাদি।

(ক্রমশ)

গবেষকদের উদ্দেশে

স্নাতকোত্তর কত ছেলে নিযুক্তি-পত্রের আশায়, স্নাতকোত্তর কত মেয়ে নিযুক্ত পাত্রের আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যক্ষেত্রে গবেষণা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। কার্যের নির্বাচনে স্বাধীনতা অল্প, কর্তার নির্বাচনে আরো কম, কিন্তু বলুন, গবেষকদের আলোচ্য বিষয়টা কি অনেকটা স্বেচ্ছাপেক্ষী নয়?... তা-ই বটে। তাহলে জিগ্যেস করি, এত অল্পসংখ্যক গবেষক সত্যকার প্রয়োজনীয় সাবজেক্ট মনোনয়ন করেন কেন? কবুল করতে লজ্জা করে না, উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে নবীনের কি হেমচন্দ্রের প্রকৃতিবোধ কিংবা সমাজচেতনা সম্পর্কে আমার কৌতূহল সীমিত।

প্রয়োজনীয় সাবজেক্ট বলতে কি বোঝায়? ধরুন : প্রাচীন বাংলা গদ্যের এক আধুনিকীকৃত গ্রন্থতালিকা- কি কি বই, কোথায়, কোন্ অবস্থায় অবশিষ্ট আছে, তার এক নির্দেশ। গবেষকেরা পাঠককে জানতে দিন, কেরীসাহেবের বাঙলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণ বোধ হয়—এদেশে অন্তত—বিলুপ্ত, কেরী সাহেবের কথোপ-কথনের প্রথম সংস্করণ, মনে হয় বাংলাদেশে কোথাও মেলে না, পণ্ডিচেরীতে আছে।

আরেকটা থীসিস প্রচলিত কথা মতো 'দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ করবে', সেটা হল অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে। ধরুন, আমি ফরাসি কাব্যের এক বাংলা সঙ্কলন প্রকাশ করতে চাই, সর্বাগ্রে আমাকে জানতে হবে, কি কি ফরাসী কবিতা, কোন্ খ্রীষ্টাব্দে, কোন্ পত্রিকায়, কোন্ ভাষা থেকে কোন্ পূর্বসূরীর হাতে অনূদিত হয়েছে!

আমার বইয়ের শেলফে আছে পিয়ের লতির "ভারত—ইংরেজের কথা বাদ দিয়ে" ভ্রমণ কাহিনী। আমাকে কি জানতে হবে না [কিন্তু খবরটা পাব কোথায়?] পুস্তকটি অনেকদিন আগেই বাংলায় অনূদিত হয়েছে, বাঙ্গালী অনুবাদকের—প্রাতঃস্মরণীয়—নাম : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা অনুবাদের—বিভ্রান্তিকর "ইংরাজবর্জিত ভারতবর্ষ"...?

জুলিয়্যাঁ ভিয়ো [১৮৫০-১৯২৩] ছিলেন এক জাহাজী কাপ্তেন; ঘুরেছেন দুনিয়াময় : সেনেগাল, আমেরিকা, তুরস্ক...। 'পিয়ের লতি' তাঁর ছদ্মনাম, লেখনী-নাম, তাহিতি থেকে কুড়িয়ে নেওয়া। দেখেছেন তিনি অনেক, লিখেছেনও তেমনি কম নয়; বইয়ের সংখ্যা চল্লিশ পার, 'আইসল্যান্ডের জেলে' তাঁর সর্বখ্যাত উপন্যাস। তাঁর রচনার সিকি ভাগই ভ্রমণ-কাহিনী : 'মরক্কো-তে' [১৮৯০], 'ভারত—ইংরেজের কথা বাদ দিয়ে' [১৯০৩], 'ইস্পাহান অভিমুখে' [১৯০৪]...

মানুষটা অতীতের প্রেমিক, আধুনিকে বিতৃষ্ণ, অনাড়ম্বর জীবনের পক্ষপাতী, ইসলাম ও তুরস্কের অনুরাগী, মৃত্যুভয়-ভীত...। ফরাসী সাহিত্যে তাঁর কোনো তাৎপর্যময় স্থান নেই : লাঁসো-রচিত সার্ধ-সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী 'ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস' প্রামাণিক গ্রন্থে তিনি পেয়েছেন এক পাতা [মোপাসাঁ দুই, রলাঁ তিন]।

দক্ষিণ ভারতে

খুব বেশিদিন ভারতে থাকেননি লতি; এসেছিলেন শতাব্দী সন্ধিক্ষণে, এ দেশেই দেখেছিলেন গত শতকের সূর্যাস্ত, বিংশ শতকের সূর্যোদয়। জাহাজে আসতে আসতে প্রত্যাশা ও উদ্বেগে দুলেছিলেন : "কিছুই পাব না—কি তাঁর এই দুশ্চিন্তা নিয়ে; শেষপর্যন্ত হতাশ হব—কি প্রচণ্ড এই আশঙ্কা নিয়ে চলেছি ওখানে, ঐ ভারতে, মানুষের মনীষা ও প্রার্থনার সেই আদিলালয়িত্রী ভূমিতে, আগেকার মতো লঘু বিহারের উদ্দেশ্যে নয়, আর্য প্রজ্ঞার ঐ সংরক্ষণ-ভাণ্ডার থেকে চয়ন করব বলে... যে অবর্ণনীয় খ্রীষ্টীয় আশা আমার অন্তরে আজ লুপ্ত, তার অবর্তমানে আত্মার অনির্দেশ্য স্থায়িত্বায় ওদের সেই কঠোরতর বিশ্বাস, অন্তত ওদের কাছে, যাচনা করে নেব ব'লে...।"

সিংহলে এক হপ্তা, তারপর পালামকোটা ও তিনেভেল্লি হয়ে ত্রিবাঙ্কুরে। পথে হিন্দু মন্দির দর্শনের প্রথম বিষণ্ণ অভিজ্ঞতা : "এক নিরানন্দকর পৌত্তলিকতার এবং আবদ্ধতার অভিঘাত পেলাম, যা প্রতিহত করে, আতঙ্ক জাগায়। এমনটি তো আশা করিনি; মন্দির দর্শনে অহিন্দুদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাও আমার আশাতীত ছিল। মহীয়ান পূর্বপুরুষদের এই ধর্মের অন্তস্তলে আলোক প্রাপ্তির যে প্রত্যাশাটুকু ছিল আমার, তা এখন মনে হচ্ছে কি অসার, কি শিশুসুলভ! আহা, খ্রীষ্টীয় গির্জার অন্তর্লীন মধুর প্রশান্তি! সবার জন্য খোলা তার দুয়ার, বিশ্বাসচ্যুতের জন্যও প্রসারিত তার কল্যাণহস্ত। শুনেছি ভারতের অন্যান্য অংশে এমন উপাসনালয় মিলবে, যা কম ভীতিপ্রদ এবং আমার জন্যও মুক্তদ্বার। এখান থেকে কিন্তু, অভদ্রতা এড়াতে হলে, আমাকে বিদায় নিতেই হবে; আমাদের গাড়িটা শুধু—যদি আমি চাই—এই মস্ত মন্দিরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে আসতে পারে।"

রাতে বড় বড় পাখা দুলিয়ে ভৃত্যদের বীজন। প্রাতে চোখ মেলে তাকাতেই

শৈশবস্মৃতি-জাগানো আবহ : "আশ্চর্য হয়ে দেখছি আমার নিজের ছেলেবেলার পরিচিত দৃশ্যাবলীর অনুরূপ এক পরিবেশ। চড়ুই পর্যন্ত রয়েছে, ভারি জংলি চড়ুই আমাদের ছাদের নিচে বাসা বাঁধে যারা, তাদের মতোই দেখতে; কিন্তু মানুষের উপর ওদের কি গভীর আস্থা : আমি কাছে এগিয়ে এলেও ওরা উড়ে যায় না! এদেশের সব পশুপ্রাণীর বেলাতেই অবশ্য এটা সত্য, আমার অনভ্যস্ত চোখে অদ্ভুত ঠেকে...। সত্যি, কোথাও কোথাও এই দেশ আমার জন্য সঞ্চিত করে রেখেছে আমার স্বদেশের সঙ্গে সাদৃশ্যের বিস্ময়, এখানকার শীতঋতুর পরিপূর্ণতায় আমাদের গ্রীষ্মান্ত-মাধুর্যের আস্বাদ পেলাম...। না, ভুলছি না যে আমি ভারতে আছি—সুদূর এক দেশে: তবু 'নিজেকে মধুর বিষাদের সঙ্গে সঁপে দিলাম আমার মাতৃভূমির-স্মৃতি-জাগানো এই সম্মোহনের হাতে।"

দক্ষিণের মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা তাঁর চোখে সুন্দর : "এত মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পথে ঘাটে, কিন্তু [illegible] দৃষ্টিকে তারা হতাশ করে। বরং পুরুষেরা অধিকাংশই সুদর্শন : তামাটে রংটা

স্বামীদের চেয়ে পুরুষের সুরমাগুলোই বেশি মানায়; আর ঐ পুরু ওষ্ঠাধর পুরুষের বেলায় তেজী গোঁফের আড়ালে তবু প্রচ্ছন্ন থাকে, মেয়েদের বেলায় উন্মাত্রিক মনে হয়। আর বক্ষোদেশ প্রায় নারী মাত্রেরই বক্ষোদেশের বাঁধুনি অপবারসেই ইতস্ত্রী. বস্ত্রাবরণে সেটাকে ঢাকবার গরজ পর্যন্ত নেই।"

রাজপ্রাসাদে

ভারতের এই দক্ষিণতম অঞ্চলে রেলপথ নেই। ত্রিবান্দ্রুমের মহারাজা, যাঁর প্রাসাদে লতি কিছুকালের জন্য অতিথি হবেন, নবাগত বিদেশীর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন দু-ঘোড়ায় টানা গাড়ি। গো-যান থেকে লতি অশ্বযানে আরূঢ় হলেন। ত্রিবান্দ্রামে পৌঁছে বড় ফটক দেখে মনে হল, গাড়ি নিশ্চয়ই তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করবে, কিন্তু "জানতাম না, একমাত্র ভারতীয়েরাই এই সংরক্ষিত স্থানে থাকতে পায়। বড় ফটকটার সামনে পৌঁছে আমাদের গাড়িটা হঠাৎ বাঁক নিল ডাইনে..."; পাশ্চাত্য ঢঙের একটি বাড়ি মহারাজা লতির জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।

শহরে ঘুরতে বেরিয়ে তাঁর চোখে পড়ে, আধুনিক রাজধানীর সমস্ত উপকরণই সেখানে বিদ্যমান; মন্ত্রী ভবন, বক্তৃতাগৃহ, ব্যাংক, স্কুল...। কিন্তু ভারতীয় স্থাইলের নয় কোনোটাই : "পৃথিবী জুড়ে এই একই ধরনের রুচিপ্রমাদের সম্মুখীন হতে আজকাল অভ্যস্ত হতে হবে আমাদের।" তাঁর ক্ষোভ, এসব দেখাতে তো এদেশে আসেননি তিনি, "কিন্তু বুঝতে পারছি ক্রমশ, কি কঠিন ঐ হিন্দু ভারতের সঙ্গে ভারতের নাড়ির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন; এই যে এত কাছ থেকে তাকে অনুভব করছি আমি, টের পাচ্ছি তার প্রাণ ও নিবিড়তার অভিঘাত, অনেকটাই রয়ে গেছে তার রহস্য-ঘনতায়—জবড়ে।"

কাক, কাকের ডাক..."সর্বত্র কাক, ভারত গুলজার করে রয়েছে ওরা, সেই সাত-সকালে উড়ে আসে, বেঁচে থাকার, জেগে ওঠার আনন্দটাকে হিম করে দেয়। যেন বলে : আছি, আমরা আছি সর্বভূতের বিনাশ ও পচনের প্রতীক্ষায়...।" ওদের কান-ঝালাপালা-করা এক একটানা সব ধ্বনি ও আওয়াজের ভিত্তিস্বরূপ এটাই তা, যে শেষ পর্যন্ত তাদের চিৎকার অভ্যাসের সাবলীলতায় ডুবে যায়।"

মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ। ফরাসী রাজ-পদকে মহারাজাকে ভূষিত করার ভার তিনি নির্বাহ করেন। য়ুরোপ নিয়ে কথাবার্তাও হল কিছু, "সেই য়ুরোপ, বর্ণাশ্রমের কঠোর অনুশাসনে ভারতের বাইরে পদার্পণ করতে অক্ষম মহারাজা যেখানে কোনোদিনই যাবেন না।" [illegible]

এটা আমি প্রথম দরবারেই বুঝে নিয়েছি যে ওঁর হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ প্রদেশ সেই বিশাল মন্দিরটির মতোই—আমার কাছে অভেদ্য থাকবে। গূঢ় ব্যবধান রয়ে গেছে আমাদের মধ্যে—জাতিগত, বংশগত, ধর্মগত, এমন কি ভাষাগত এবং তৃতীয় এক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় হৃদয়-বিনিময়ের বাধাবাধকতার আড়াল-বাড়ানো প্রতিবন্ধক, দোভাষীর সহৃদয়তা সত্ত্বেও যা মর্মঘাতী।"

মহারানীর সঙ্গে মোলাকাত। মহারানী মানে মহারাজার মাসি। নারীরাই এতদঞ্চলে প্রধান, তাদের মধ্য দিয়েই পদবি, উপাধি ও বিত্তের উত্তরাধিকার বর্তায়, যে কোনোদিন স্বামী ত্যাগের অধিকার তাদের আছে। 'মহারানী' উপাধি পান রাজার বড় মেয়ে, 'মহারাজা' বলতে বোঝায় যুবরানীর বড় ছেলেকে মহারাজার ছেলেদের 'রাজকুমার' উপাধি পর্যন্ত গ্রহণের এক্তিয়ার নেই।

রাজবাড়িতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রতি ছ বছরে একবার করে হয় এই অনুষ্ঠান, চলে পঞ্চাশ দিন ধরে। এ বছর তিরিশ হাজার ব্রাহ্মণের পাত পড়ল প্রাসাদের প্রাঙ্গণে। রাজনির্দেশে রাজবাদকের দল একদিন সংগীত পরিবেশন করতে এল লতির বাড়িতে। লেখেন : "হায়, মহারাজার স্বপ্নজগৎ, প্রেমের বেদনা, মৃত্যুর বিষাদ আমাদের থেকে কত আলাদা! কিন্তু বোধ হয় আমাদের বিভাষী-ও-আনুষ্ঠানিক-শব্দ-কণ্টকিত দুরূহ কথোপকথনের চেয়ে তাঁর এই দুর্লভ ও উৎকৃষ্ট মানের সংগীতই তাঁর আত্মার কিয়দংশ আমার কাছে উন্মোচিত করল।"

অদ্যপ্রত্যুষের এক ক্ষুদ্র মন্দিরের সামনে অনুভব করেন : "চক্রানিনাদ আর বন্য গীতবাদ্য সহকারে তালপত্রতলে পূজিত এবং আমাদের পক্ষে সুদূর এই দেবতা রহস্যময় ব্রাহ্মণদের দেবতারই আরেক প্রকরণ, আমাদের ঈশ্বরেরও অন্য প্রকরণ বটে।

কারণ 'অলীক দেবতা' বলে কিছুই নেই; যাঁরা বলেন যে শুধু তাঁরা-ই জানেন সত্য দেবতা কে, কি তাঁর নাম, সেই-সব পণ্ডিতম্মন্যের দম্ভ শিশুসুলভ দম্ভমাত্র। ব্রহ্মা, যিহোবা কিংবা আল্লা যা-ই বলুন— তিনি একই হোন, আর, চান যদি, অনেকই হোন—তুলনাতীতের ও ধারণাতীতের প্রত্যন্তে যাঁর স্থিতি, এতটাই তিনি আমাদের পক্ষে বিশাল ও নিগূঢ় যে তাঁর সম্পর্কে আমাদের ভাবনায় একটু কম কি একটু বেশি ভুলও যদি থাকে তাতে কিছু এসে যায় না। আর হয়তো এই দীনজনের, নিতান্তই প্রাকৃতজনের দল জঙ্গলে এক সবুজ-মুখো কর্ণ শিলাপুত্তলির পায়ের কাছে তাদের জীবন-মরণের যে-বেদনার চিৎকার শোনাতে যায়, তা তাঁর কানে গিয়ে ঠিকই পৌঁছোয়।"

ভারতীয়দের সমুদ্র-বিমুখতায় বিস্ময়: "পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সমুদ্র স্বভাবতই মানুষকে টানে, লোকে বসত গড়তে চায় তার কাছাকাছি...। এ-দেশে উলটো, সমুদ্রতীরকে এরা শতহস্ত দূরে রাখে, যেন সমুদ্র মানেই নাস্তি ও মৃত্যু, অনতিক্রম্য রসাতল, উপযোগহীন, ভয়ংকর।"

দক্ষিণের অন্যত্র

৩১শে ডিসেম্বর পৌঁছোলেন কোচিনের রাজধানী এর্ণাকুলামে, উঠলেন ভূতপূর্ব ওলন্দাজ-গভর্নরের বাড়িতে। খবর এল, রাজদর্শন ঘটবে না এ-যাত্রা, রাজার অশৌচ। দুর্ভের একাকিত্ব—সরকারী আদরের দ্বারা রচিত—তাঁর বিষাদ বাড়ায়ঃ "ত্রিবাঙ্কুরে আর এখানে... ভারতেই রইলাম বটে, কিন্তু তা যেন না-থাকার মতোই।" আরেক জায়গায় লেখেন, "কিছুই আঁচ করতে পারলাম না ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই অন্যতম কেন্দ্রভূমিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গূঢ়তত্ত্ব। আ মা দে র — য়ুরোপীয়দের—কাছে ওসবের দ্বার এখনও বন্ধ, এদের অভ্যর্থনার ভঙ্গিটি যতই সৌহার্দ্যপূর্ণ হোক না কেন।"

ত্রিবাঙ্কুরে শুনেছিলাম পাঁচ লক্ষ খৃস্টানদের কথা: "এঁদের পূর্বপুরুষেরা এদেশে এসে তখনই গির্জে গড়েছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন পর্যন্ত ছিলেন পৌত্তলিক।" কোচিনে ইহুদীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নীল চীনেমাটিতে গড়া তাদের ভজনালয়ের মেঝেটি; ছয় শতাব্দী আগে খোদ চীন থেকে সেই মাটি নিয়ে আসা হয়েছিল। দুটি বিভাগে বিভক্ত তারাঃ শ্বেতাঙ্গ ইহুদীরা এসেছিল ৮ খৃস্টাব্দে; কৃষ্ণাঙ্গেরা দাবি করে তারা এসেছিল আরো আগে, শ্বেতাঙ্গেরা কিন্তু মানতে রাজি নয়, বলে ওরা আসলে নিম্ন ইহুদী, অর্থাৎ কিনা ধর্মান্তরিত প্যারিয়া। এমনিতে গায়ের রঙের বিচারে তাদের ইন্দো-ইহুদী মিশ্রণ বলেই মনে হয়। নাক উঁচু সাদা-রা কালোদের সঙ্গে আন্তর্বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বিরূপ, অভিযোগ করেন স্থানীয় রব্বি। জেরুজালেমের প্রধান রব্বিকে হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছিল; তিনি অস্পষ্ট—এবং কিছুটা অনিপুণ উত্তর পাঠিয়েছিলেনঃ 'পালক এক হলে তবেই চড়ুইরা এক বাসায় নীড় বাঁধে।'

শ্রীরঙ্গমের মন্দির তাঁকে নিরাতিশয় প্রাচুর্যে হারিয়ে যাবার অনুভূতি দেয়, 'তুমুল বিদেশীয়তার' দ্বারা প্রহত করে; 'খুঁটিনাটি ও বিশালতার বাড়াবাড়ি' তাঁকে প্রতিহত করে। 'যা-কিছু পড়ে থাকুন ভারত সম্পর্কে, যা-কিছুই ভেবে থাকুন যে আপনি জানেন, সব-কিছুকে প্রবলভাবে ছাড়িয়ে যাবে স্বচক্ষুদৃষ্ট অভিজ্ঞতা।'

মাদুরায় শুষ্কপ্রায় কূপ থেকে জল সংগ্রহের আপ্রাণ প্রয়াসের নমুনা দেখে আসন্ন মর্মন্তুদ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পান : 'দুর্ভিক্ষ...ভারতে আসার আগে পর্যন্ত সেটা প্রাগৈতিহাসিক এক বিপর্যয় বলেই জানতাম। বাষ্পপোত আর রেলওয়ের যুগে, আজকের দিনে এ তো মার্জনাতীত।'

পণ্ডিচেরি। ছোট্ট মুমূর্ষু ফরাসী **কলোনি, চারদিকে বৈরীভাবাপন্ন প্রতিবেশী,** শিল্প নেই, বিজলি নেই, বন্দর নেই, নেই বিদেশী কিংবা কৌতূহলী পর্যটক। তবু এখানেই মন-কেমনিয়া হাওয়া বয়ে গেল মনের মধ্যে, লতি-র মনে স্বদেশের স্মৃতি হানা দিয়ে গেল।

হায়দারাবাদ, গোলকোণ্ডা, ইলোরা ঘুরে উদয়পুর। আলাপ হল দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতার সঙ্গে। বড় প্রাচীন তাঁদের বংশের বনেদিয়ানা, মিশ্র-বিবাহ ব্যতিরেকে, অভঙ্গ কৌলীন্য আঁটি রেখে দুই থেকে তিন হাজার বছর পর্যন্ত বয়ে এসেছে অক্ষুণ্ণ বংশধারা। সাত্ত্বিক স্বভাব—ক্রোধ, যুদ্ধ বা বাণিজ্যে কখনো লিপ্ত হন নি তাঁরা, কখনো হত্যা বা ভোজন করেন নি কোনো সপ্রাণ বস্তু। "ব্যবহার মধুর ও সর্বতোভদ্র, আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু ঐ শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেশানো রয়েছে জাতিভেদের ঘৃণা, আমার সামনে ওরা পানাহার করবে না, এক গ্লাস জলও নেবে না কখনো আমার হাত থেকে—তা হবে অমার্জনীয় অপরাধ।"

মাদ্রাজে থিওজফিস্টদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন : "তাদের পরম উদ্দিষ্ট এমন এক স্বর্গ যাতে নেই কোনো 'ব্যক্তিময়' ভগবানের উপস্থিতি, এমন এক অমরতা যাতে নেই কোনো সুস্পষ্ট আত্মার সাযুজ্য, এমন এক শোধন যাতে নেই কোনো প্রার্থনার দৌত্য...। যুক্তির বালাই নেই, নিজেদের সিদ্ধান্তে তারা আত্মতৃপ্ত।' লতি কিন্তু তৃপ্তি পান না, বার বার তাঁর সেই অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে : "কি লাভ হল তাহলে ভারতে—মানুষের ধর্মাবলীর এই আদি উৎসভূমিতে—এসে, যদি সব মিলিয়ে শুধু এই-ই পেলাম: মন্দিরগুলিতে পৌত্তলিকতার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন এক ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর এখানে [থিওজফিস্টদের সান্নিধ্যে] এমন এক প্রত্যক্ষবাদ যার উৎস বৌদ্ধধর্ম এবং দুনিয়া জুড়ে যত্রতত্র লভ্য প্রেতচর্চার পুঁথি।" তাঁর বিক্ষোভ লক্ষ করে মাদ্রাজী থিওজফিস্টরা বললেন বেনারসে যেতে। থিওজফি-র বৌদ্ধ সংস্করণ নাকি তাঁর উপযোগী নয়; যে-গূঢ় ব্রাহ্মণ্যধর্মের সন্ধানে তিনি ফিরছেন, তার দিশা তিনি পাবেন ওঁদের বেনারস-স্থিত বন্ধুদের কাছে। অর্থাৎ, তাহলে বেনারসই একমাত্র ভরসা; সেখানে ব্যর্থ হলে—হতাশা।

উত্তর ভারতে

এই হতাশ হবার আশঙ্কায় পীড়িত হতে হতে বেনারস-যাত্রা যথাসম্ভব পিছিয়ে দিতে চান লতি। প্রথমে যান পুরীতেঃ "একটু পশ্চাৎপদ জায়গাটি। বিদেশী-দর্শনে বিস্ময়... পথচারী মানুষ ফিরে ফিরে দেখে, বাচ্চারা রাস্তা পেরিয়ে পিছু নেয়। এখানেও মন্দিরের ঐ প্রচণ্ড দেওয়ালটাকে প্রদক্ষিণ করতে পারব আমি, কিন্তু গণ্ডি পেরোতে মানা...।"

আগ্রায় তাজমহল—"পৃথিবীর সবচেয়ে অতিকায় আর সবচেয়ে অকলঙ্ক মর্মর-স্তূপ", আর কুতব—"দুনিয়ার সম্ভবত উচ্চতম মিনার"। কিন্তু আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না, এরপরেই বেনারস, "যেখানে বোধ হয় চূড়ান্ত আশাভঙ্গ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।"

বেনারসে দেখা করলেন অ্যানি বেসান্টের সঙ্গে : 'তাঁর কাছেই, তাঁর সহৃদয়তার অবকাশে আমি আমার অজ্ঞতার সামনে জ্ঞানের ভীতিপ্রদ দুয়ারখানি কিছুটা উন্মুক্ত করবার আশা নিয়ে এসেছি। আগে তো তিনি ছিলেন আমারই সগোত্র একজন, আমার মাতৃভাষা তাঁর কাছে সুপ্রবেশ্য।" প্রথমেই লতি এক পরীক্ষার ফাঁদ পাতেন বেসান্টের সামনে, জিগেস করেন মাদাম ব্লাভাট্স্কির কথা, যিনি বেসান্টের আগে এখানে এসেছিলেন এবং ঋষিদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন বহু বছর, কিন্তু পরে প্রতারণা ও কপটতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বেসান্টের উত্তর : যে-কোনো প্রতারণা যে-কেউ তা করুন না কেন—নিন্দনীয়।

লতি কিছুদিন কাটান বেনারসে—পাঠগ্রহণে। স্বীকার করেনঃ "বৈদিক শাস্ত্রে আশার বাণী রয়েছে—প্রথমে যা মনে হয়, তার থেকে বেশিই। এবং তার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিসহ, প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগুলির মতো যুক্তির আওতার বাইরে নয়।" বেসান্ট কিন্তু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন না: "ব্যক্তি-মানুষ ক্ষণস্থায়ী এবং মায়াপ্রতিভূ... আর আপনার মতো হাড়ে হাড়ে ব্যক্তিবাদী মানুষের পক্ষে সেটা দুর্বোধ্য ব্যাপার বটে!"

অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন তিনি এ-দেশে। সফল হল কি তাঁর ভারতাগমন?...

তাঁর অন্তরঙ্গ জবানিতে আমরা পড়িঃ "কাউকে কোনো কিছুকেই আমি ভালোবাসি না। আমার আস্থা নেই কোনো, আশ্বাসও নেই। আমি শুধু আমার 'কালিমার' গান গাইতে এসেছি—সহানুভূতি চাই। চাই যা-কিছু হয়েছি, যা-কিছু চেয়েছি, যা-কিছু বেসেছি ভালো, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে...।"

বেশ গর্বের
সঙ্গেই
সিগারেটটি
ধরিয়েছেন!
Panama
20
■ সিগারেটটি হচ্ছে পানামা। বেশ মোলায়েম এবং ঠাণ্ডা
আমেজের। আর তাজা স্বাদে—গন্ধে ভরপুর।
■ সারা ভারতময় লক্ষ লক্ষ ধূমপায়ীর প্রিয় সিগারেট।
■ এই শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাটতির সিগারেট এটি।
■ কী সুন্দর এর প্যাক! ভারতের সর্বপ্রথম পাউচ প্যাক।
পানামা সিগারেট
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম
GT (P)-673 Ben. Greens' Advtg

প্লাজমা!

প্লাজমা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের বেশির ভাগ, বলা চলে শতকরা নিরানব্বই ভাগই প্লাজমা। পৃথিবীতে বিরল হলেও, কৃত্রিম উপায়ে বিজ্ঞানীরা একে তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। যেদিন ইচ্ছে অনুযায়ী একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, সেদিন তাঁরা মানব সভ্যতাকে উপহার দেবেন অপরিমিত শক্তির এক অফুরন্ত উৎস।..... সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু আলোচনার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম প্লাজমা বিশেষজ্ঞ ডঃ জয়ন্ত বসুকে। ডঃ বসুর মূল রচনা পরিবেশিত হল।

কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। পদার্থের এই তিনটি অবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের বেশির ভাগ, বলা যেতে পারে শতকরা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি, যে বিশেষ অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করে তাকে আমরা কঠিন, তরল বা বায়বীয় এদের কোনটিই বলতে পারি না। বরং বলা চলে, সেটা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। নাম প্লাজমা। ১৮৭৯ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুকস সর্বপ্রথম এই অবস্থাটির প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কঠিন পদার্থকে ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত করলে প্রথমে তা তরল এবং পরে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যেমন বরফ থেকে জল, জল থেকে বাষ্প। কিন্তু ঐ বাষ্পেরই তাপমাত্রা যদি আমরা প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দিই, তা পরিণত হবে প্লাজমায়।

প্লাজমা বলতে কী বোঝায়?

এ কথা অনেকেই জানেন, পরমাণুর ধনাত্মক আধান এবং মোট ঋণাত্মক আধান পরিমাণগতভাবে সমান হওয়ায় পরমাণু সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। উত্তাপের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে যদি পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বহিষ্কার করা যায়, তাহলে পরমাণুটিতে ধনাত্মক আধানের পরিমাণ ঋণাত্মক আধানের পরিমাণের চেয়ে বেশি হবে। এই অবস্থায় পরমাণুটিকে ধনাত্মক আয়ন বলা হয়। ঐ রকম অনেকগুলি আয়ন ও সমান সংখ্যক বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনের একত্র সমাবেশের নামই হল প্লাজমা। প্লাজমার মধ্যে নিরপেক্ষ অণু-পরমাণু থাকতে পারে, কিন্তু সবসময়ই বন্ধনমুক্ত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণার সংখ্যা সমান। প্লাজমার তাপমাত্রা সাধারণত ২০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপরে উঠলে তখন আর তাতে নিরপেক্ষ কণা থাকে না, সবগুলিই ভেঙে গিয়ে ধনাত্মক আয়ন ও বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হয়। এই অবস্থায় প্লাজমাকে 'বিশুদ্ধ' প্লাজমা বলা যেতে পারে।

প্লাজমার মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণার সংখ্যা সমান হওয়ায় প্লাজমা বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ। **কিন্তু কোন আহিত কণা যদি সেখান থেকে নির্গত** হয়, তখন প্লাজমা বিপরীতভাবে আহিত হয়ে যায় এবং তার আকর্ষণে নির্গত কণাটি সাধারণত আবার প্লাজমার মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এইভাবে পলায়নপর আহিত কণাগুলিকে একত্র ধরে রেখে প্লাজমা তার অস্তিত্ব বেশ ভালভাবে বজায় রাখতে পারে।

পদার্থের তৃতীয় অবস্থার সঙ্গে চতুর্থ অবস্থার অর্থাৎ গ্যাসের সঙ্গে প্লাজমার একটা বিশেষ পার্থক্য হল এই যে, গ্যাস বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে না, কিন্তু প্লাজমা পারে। এর মূলে রয়েছে প্লাজমার মধ্যে অনেকগুলি বন্ধনমুক্ত আহিত কণার উপস্থিতি। আহিত কণাই হল বিদ্যুতের বাহক। প্লাজমার মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে এই সব কণা সহজেই গতিশীল হয় এবং এদের সেই গতি বিদ্যুৎ-প্রবাহ হিসাবে প্রকাশ পায়।

ডঃ জয়ন্ত বসু, কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অভ্ নিউ ক্লিয়ার ফিজিকস-এর রীডার। গত বারো বছর প্লাজমা-পদার্থবিদ্যার উপর কাজ করছেন। এই বিষয়ের উপর গবেষণা করে ১৯৬০-এ ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধী লাভ করেন। জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত।

প্লাজমার ভিতর ইলেকট্রনের গতিবিধির ব্যাপারে কঠিন ও তরল অবস্থার মাঝামাঝি জেলির মত একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জেলির একটা অংশকে সামান্য স্থানচ্যুত করে ছেড়ে দিলে তা যেমন নিজ থেকেই স্বস্থানে ফিরে যায়, সেইরকম প্লাজমার ভিতরে কয়েকটি ইলেকট্রনকে একই দিকে সরিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে তারা আবার আগের জায়গায় ফিরে যেত চায়। জেলির যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল, জীবকোষের প্রোটোপ্লাজম্ বা প্লাজমার মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই সমান সংখ্যক ধনাত্মক আয়ন ও ইলেকট্রনের একত্র সমাবেশকে আমেরিকার বিজ্ঞানী আর্ভিং ল্যাংমুয়্যার ১৯২৮ সালে প্লাজমা নামে অভিহিত করেন।

*

বস্তুত প্রায় সব নক্ষত্রই প্লাজমা অবস্থায় রয়েছে। আমাদের সুপরিচিত নক্ষত্র সূর্যও প্লাজমার একটি জ্বলন্ত গোলক। নক্ষত্রের সুউচ্চ তাপমাত্রায় অণু-পরমাণু অত্যন্ত গতিশীল হয় এবং তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সেগুলি ভেঙে গিয়ে ধনাত্মক আয়ন ও ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে; ফলে প্লাজমার উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন তাপমাত্রা ও চাপে কোন পদার্থে আয়ননের মাত্রা কত হয় অর্থাৎ ঐ পদার্থের অণু-পরমাণুর শতকরা কত ভাগ ভেঙে গিয়ে আয়ন ও ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে, ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি সূত্র থেকে তা সহজেই হিসাব করতে পারা যায়। ঐ সূত্রটি 'সাহার সূত্র' নামে বিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত।

নক্ষত্রের ভিতরেই কেবল নয়, আন্তর্নক্ষত্র অঞ্চলেও পদার্থ প্লাজমা অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবীতে প্লাজমা বিরল হলেও ভূপৃষ্ঠের উপর যে প্রায় হাজার কিলোমিটার উচ্চ বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তার একটি অংশের বায়ু আয়নিত হয়ে প্লাজমা সৃষ্টি করে রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের ঐ অংশটিকে আয়নমণ্ডল বলা হয়। দূর পাল্লার বেতা
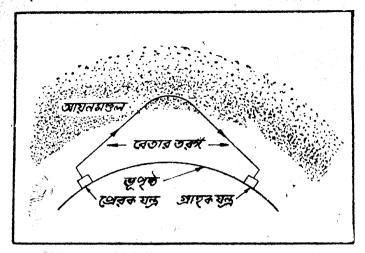
সংযোগে আয়নমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম; কারণ দূরে থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ ঐখানে প্রতিফলিত হয়ে তবেই গ্রাহক যন্ত্রের কাছে পৌঁছায়। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যথাক্রমে অরোরা বোরিয়ালিস ও অরোরা অস্ট্রালিজ নামে যে মেরুজ্যোতি দেখা যায়, তাও এক ধরনের প্লাজমারই অভিব্যক্তি। যে ফ্লুওরেসেন্ট ল্যাম্প বা প্রতিপ্রভ বাতির ব্যবহার এখন আমরা হামেশাই দেখে থাকি, সেই বাতি যখন জ্বলে তখন তার ভিতরের বেশির ভাগ অংশই প্লাজমা অবস্থায় থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে এই প্লাজমার সৃষ্টি। বিজ্ঞাপনের জন্যে বহু ক্ষেত্রে যে নিওন বাতি ব্যবহৃত হয়, তাতেও নিওন গ্যাস বৈদ্যুতিক উপায়ে প্লাজমায় পর্যবসিত হয়। গত দশ পনের বছর প্লাজমা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ যে অনেক বেড়ে গেছে, তার কারণ হল—প্লাজমা-মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরমাণু-কেন্দ্রকের সংযোজন প্রক্রিয়ায় অফুরন্ত শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা।

নিয়ন্ত্রিত সংযোজন প্রক্রিয়া

দুটি হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্রকের সংযোজন ঘটলে অর্থাৎ ঐ দুটি কেন্দ্রক মিলিত হয়ে একটি নতুন কেন্দ্রক গঠিত হলে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে এতে অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রগুলির মোট ভর সামান্য কমে যায় এবং ঐ হারানো ভরই বিপুল শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। সূর্য যে প্রচণ্ড শক্তির আধার, তার মূলে রয়েছে সূর্যের প্লাজমা মাধ্যমে হাইড্রোজেনের সংযোজন প্রক্রিয়া। পৃথিবীর মানুষও কেন্দ্রকের সংযোজনজনিত শক্তি সৃষ্টি করতে পেরেছে, যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে। সংযোজন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার মঙ্গলজনক ব্যবহারের জন্যে বিজ্ঞানীরা এখন বিশেষভাবে সচেষ্ট আছেন। এজন্যে তাঁরা যে যন্ত্রের উদ্ভাবনে উৎসুক, তাকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লী।

মনুষ্য-সভ্যতার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানী এক শ' বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। জলের স্রোত, সৌর কিরণ প্রভৃতি উৎসব থেকে যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, চাহিদার পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট হবে না। তখন উপায় কেবল কেন্দ্রকে বিভাজন বা সংযোজনজনিত শক্তি। ভারী কেন্দ্রকের বিভাজনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয়, তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি পারমাণবিক বোমায়। বিভাজন চুল্লী থেকে ঐ শক্তিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে পাওয়াও সম্ভব হয়েছে। যাই হোক, বিভাজনের উপযোগী জ্বালানী অনেকটা সীমিত হওয়ায় এর ব্যবহার শক্তি-সমস্যাকে এক শতাব্দী পরে মাত্র কয়েক দশক হয়তো পিছিয়ে দিতে পারবে। ভরসা কেবল কেন্দ্রকের সংযোজন। সংযোজনের একটি উপযোগী জ্বালানী হল হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম। সুখের বিষয়, সমুদ্রের জলে বিপুল পরিমাণ ডয়টেরিয়াম আছে। সংযোজনের জ্বালানী হিসাবে তা সভ্যতার দ্রুত বর্ধমান চাহিদাকে অনায়াসে ১০০ কোটি বছর মেটাতে পারবে। ভাবতে অবাক লাগে যে, এক লিটার জলের ডয়টেরিয়াম থেকে সংযোজন প্রক্রিয়ায় যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তা ৩৫০ লিটার পেট্রোলের শক্তির সমান। আরও উল্লেখ্য যে কয়লা থেকে শক্তি পেতে যা ব্যয় হয়, ডয়টেরিয়াম থেকে শক্তি পেতে সে তুলনায় ব্যয় হবে শতকরা এক ভাগ মাত্র।

বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে যে সংযোজন চুল্লী নির্মাণের চেষ্টা করছেন, তাকে একটি ক্ষুদে সূর্য বলা যেতে পারে। সূর্যের প্লাজমা-মাধ্যমে যেমন সংযোজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, সেইরকম কৃত্রিম উপায়ে প্লাজমা তৈরি করে বিজ্ঞানীরা তার মধ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে সংযোজন ঘটাতে চাইছেন। এই প্লাজমা থেকে পর্যাপ্ত শক্তি পেতে গেলে প্লাজমার তাপমাত্রা বেশ কয়েক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হওয়া দরকার।

সংযোজন চুল্লীর সার্থকতার জন্যে প্লাজমার মধ্যে আয়ন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা যথেষ্ট হতে হবে এবং প্লাজমার স্থায়িত্বও। সমস্যা হল উত্তপ্ত প্লাজমাকে সামান্য সময়ও একত্র ধরে রাখা অত্যন্ত শক্ত কাজ। সাধারণ কোন পাত্রে ঐ প্লাজমাকে রাখলে পাত্রটির দেওয়াল থেকে বিকিরণের ফলে অনেকখানি শক্তির অপচয় হয় এবং প্লাজমার তাপমাত্রা অচিরেই বহুলাংশে কমে যায়। প্লাজমাকে তাই ধরে রাখবার জন্যে ব্যবহৃত হয় ম্যাগনেটিক কেজ চৌম্বক পিঞ্জর। সেসব আয়ন বা ইলেকট্রন
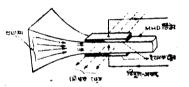
প্লাজমা থেকে পলায়নপর হয়, চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে তাদের গতির পরিবর্তন করে এই অদৃশ্য পিঞ্জরের মধ্যে তাদের আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করা হয়। তবে অনেক চেষ্টা করেও প্লাজমাকে আধ সেকেণ্ডের বেশি সময় পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

তাপ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি

সংযোজন চুল্লীর পরিকল্পনা এখনো সফল না হলেও তা থেকে যে শক্তি প্লাজমার তাপরূপে পাওয়া যাবে, তাকে কীভাবে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হবে, বিজ্ঞানীরা তাই নিয়ে গবেষণা করেছেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই বানিয়ে ফেলেছেন। এই যন্ত্রটিকে বলা হয় ম্যাগনেটো-হাইড্রো-ডাইন্যামিক জেনারেটর। ম্যাগনেটো, হাইড্রো ও ডাইন্যামিক, এই তিনটি ইংরেজী শব্দের আদ্যাক্ষরগুলি নিয়ে যন্ত্রটির সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়েছে MHD জেনারেটর।

এই জেনারেটরের বিষয় আলোচনা করবার আগে তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি সাধারণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। উক্ত ব্যবস্থাটিকে বলা হয় থার্মাল ডি সি জেনারেটর বা তাপ-পরিচালিত সমপ্রবাহ বিদ্যুৎ উৎপাদক। এই ব্যবস্থায় কয়লা, সাধারণ তাপ বিদ্যুৎ
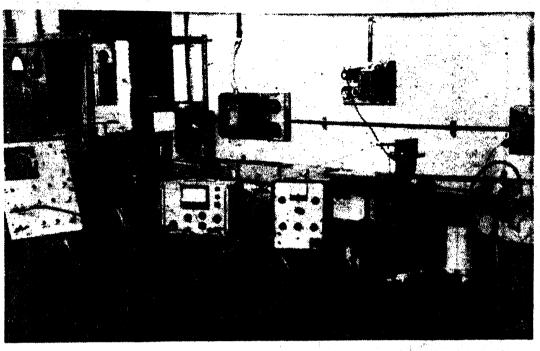
কলকাতার সাহা ইনসটিটিউট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ প্লাজমা সম্পর্কে গবেষণার জন্যে ক্ষুদ্র-বেতার-তরঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে। এর জন্যে একটি বৈদ্যুতিক জনন নলের মধ্যে যে প্লাজমার সৃষ্টি করা হয়েছে ছবিতে ক্রস-চিহ্নিত স্তম্ভ রূপে তা দেখান হল।

উপাদন কেন্দ্রে কয়লা বা অনুরূপ কোন জ্বালানি পুড়িয়ে জলীয় বাষ্প তৈরি করে জেনারেটার চালান হয়ে থাকে। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে তারের কুণ্ডলীকে গতিসম্পন্ন করা হয়, MHD জেনারেটরে সেখানে ঐ কুণ্ডলীর পরিবর্তে প্লাজমাকে গতিশীল করবার ব্যবস্থা থাকে। তারের কুণ্ডলীর মত প্লাজমাও বিদ্যুৎ-পরিবাহী হওয়ায় চৌম্বিক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে তার গতির ফলে বিদ্যুচ্চাপের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে বিদ্যুৎ শক্তি আহরণ করা যায়। MHD যন্ত্রে টার্বাইনের দরকার হয় না; উত্তপ্ত গ্যাসকেই সোজা জেনারেটরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং সেই গ্যাসর তাপশক্তি সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। টার্বাইন ও জেনারেটর সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থার নানাবিধ উন্নতি করে তার এফি-সিয়েন্সি বা কার্যকারিতা যেখানে শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত করা গেছে, MHD যন্ত্রের কার্যকারিতা সেখানে বর্তমানে শতকরা ৬০ ভাগ; অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তা ৮০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে।

MHD যন্ত্রে বর্তমানে যে প্লাজমা ব্যবহৃত হয়, তার তাপমাত্রা সাধারণত ২.০০০ থেকে ৩,০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড হওয়ায় তার মধ্যে আয়ন ও বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা খুব বেশি হয় না; সেজন্যে তার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা যথেষ্ট নয়। এই পরিবাহিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ঐ প্লাজমার সঙ্গে শতকরা প্রায় ১ ভাগ পটাসিয়াম বা ঐ ধরনের এমন কোন পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয়, যা সহজেই আয়নিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় seeding বা বীজবপন।

মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে মহাকাশযানকে চালিত করবার জন্যে প্লাজমা-চালিত রকেটের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রকেট কীভাবে গতিসম্পন্ন হয়, তার মূল নীতিটি আমরা প্রায় সকলেই জানি—রকেটের পিছন দিকের একটি ছিদ্র দিয়ে গ্যাস সজোরে নির্গত হতে থাকলে সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় রকেটটি সামনের দিকে চলতে থাকে। রকেটে রাসায়নিক জ্বালানী ব্যবহৃত হলে সেই জ্বালানীর দহনে যে তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়, সেই তাপমাত্রার একটি ঊর্ধসীমা থাকায় নির্গত গ্যাসের গতিবেগও একটি নির্দিষ্ট মানের বেশি হতে পারে না। রকেট চালনায় গ্যাসের পরিবর্তে প্লাজমা ব্যবহার করার সুবিধা এই যে, বিদ্যুচ্চুম্বকীয় উপায়ে প্লাজমাকে ত্বরান্বিত করে মহাকাশযান থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি গতিসম্পন্ন অবস্থায় নির্গত করা যায়। দীর্ঘকাল-ব্যাপী মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে বা মহাকাশ অভিযানে কক্ষ পরিবর্তনের পক্ষে প্লাজমা-চালিত রকেট বিশেষ উপযোগী।

মহাকাশ অভিযানে প্লাজমা অবশ্য বিপত্তিরও সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীতে ফিরে আসবার পথে কৃত্রিম উপগ্রহ যখন বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশ করে, তার চতুর্দিকে তখন একটি প্লাজমার উৎপত্তি হয়। উপগ্রহ থেকে ভূপৃষ্ঠে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যে যে বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তা ঐ প্লাজমাকে ভেদ করতে পারে না। ফলে উপগ্রহের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ কিছুক্ষণের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়। বেতার তরঙ্গের প্রেরক বা গ্রাহক যন্ত্রে যে অ্যাণ্টেনা থাকে, প্লাজমার মধ্যে তা নিমজ্জিত থাকলে তার বিদ্যুচ্চৌম্বিক ধর্ম কিরূপে পরিবর্তিত হয়, সেই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। কলকাতার সাহা ইনস্টিটুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সেও এই বিসয়ে গবেষণা শুরু করা হয়েছে।

প্লাজমা টর্চ, প্লাজমা বুলেট,...

প্লাজমার ব্যবহারের ক্ষেত্র ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে প্লাজমা টর্চের কথা বলা চলে। এই টর্চ থেকে আলোর পরিবর্তে প্লাজমা নির্গত হয়। রাসায়নিক দহন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত অগ্নিশিখার ঊর্ধতম তাপমাত্রা যেখানে ৫.৫০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড, প্লাজমা টর্চ থেকে নিঃসারিত প্লাজমার তাপমাত্রা সেখানে প্রায় ৩০,০০০ ডিগ্রী

সেণ্টিগ্রেড। সেজন্যে ধাতব পদার্থের সঙ্গে সেরামিক যুক্ত করা, অত্যন্ত অল্প সময়ে ইস্পাত কেটে ফেলা প্রভৃতি নানারকম কাজে এই টর্চের ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশের ট্রম্বেতে অবস্থিত পারমাণবিক শক্তি সংস্থার কারিগরী পদার্থবিদ্যা বিভাগ প্লাজ্‌মা টর্চ নির্মাণে সাফল্য অর্জন করেছেন। পরে তাঁরা একটি শক্তিশালী প্লাজ্‌মা জেটও তৈরি করেছেন। দূর্গাপুরের সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিট্যুটেও এই বিষয়ে কাজ হয়েছে।

তথাকথিত প্লাজ্‌মা বন্দুক থেকে যে প্লাজ্‌মা বুলেট নিক্ষিপ্ত হয়, তার গতিবেগ সেকেণ্ডে ১২০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে! চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে ঐ বুলেটের আকৃতির পরিবর্তন হয়; তখন একে বলা হয় প্লাসময়েড। কয়েকটি প্লাসময়েডের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সেগুলির এমন আকৃতি হয়েছে, যার সঙ্গে মহাকাশের অনেক গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগতের আকৃতির আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, প্লাসময়েড সম্পর্কিত গবেষণা থেকে নক্ষত্র জগতের সৃষ্টি রহস্যের হয়তো একটা হদিস পাওয়া যাবে।

প্লাজমার অন্তর-রহস্য উদ্ঘাটন

কোন মানুষের দেহ সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে গেলে যেমন তার দেহের ভিতর কোথায় কী হচ্ছে তা জানা দরকার, যে কোন প্লাজ্‌মা সম্পর্কেও তেমনি একই কথা প্রযোজ্য। সংযোজন চুল্লী নির্মাণের ব্যাপারে বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও বিফল হয়ে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, প্লাজমাকে ঠিক মত নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে হবে। প্লাজ্‌মার মধ্যে বিদ্যুচ্চাপের মাত্রা, বিভিন্ন ধরনের কণার সংখ্যা ও গতিবিধি, সেখানে কোন তরঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে কি না প্রভৃতি বিষয় নির্ধারণ করবার জন্যে তাঁরা নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। আমাদের দেশের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, শিলিগুড়ির নিকট অবস্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই শহরের ইনডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজি ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, রাজস্থানের যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের কিছু কিছু গবেষণার কাজ হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্লাজ্‌মা সম্বন্ধে তত্ত্বগত গবেষণাতেও আমাদের দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী নিযুক্ত আছেন। তবে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে প্লাজমার যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে অগ্রসর দেশগুলিতে যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের প্লাজ্‌মা সম্পর্কিত গবেষণার ধারাগুলিকে আরও সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী করবার দিকে মনোযোগ দেওয়া একান্তই আবশ্যক বলে মনে হয়।

ওষ্ঠ!

তুমি এত রূঢ়?

না, ওষ্ঠ না বলে সাদা বাংলায় ঠোঁট বলাই ভাল। কারণ এক্ষেত্রে ব্যাপারটা

হৃদয়গ্রাহী না হয়ে, হৃদয় বিদারকও হতে পারে। মাফ করবেন, কথাটা ভবাতের মত না শোনালেও বলব, যদি আপনি নারী হন এবং নিয়মিত লিপস্টিক ব্যবহার করে থাকেন, আর সেই সঙ্গে বুঝে থাকেন আপনার ভেতর প্রায়ই অপরাধ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে ভুল করেও সিগারেট খাওয়ার চেষ্টা করবেন না। খেলেও তাকে সরাসরি ঠোঁটে না ধরে, নল ব্যবহার করুন। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লিপস্টিক না ব্যবহার করলেও ক্ষতি নেই। এবং শুধু নারী নন, পুরুষ হলেও সঠিক যা প্রয়োজন, একটি পোড়া সিগারেট যোগাড় করতে পারলেই কাজ হাসিল করা শক্ত হবে না। যদি আপনি অপরাধী হন, ধরা আপনি পড়বেন।

সম্প্রতি 'জার্নাল অভ ফরেনসিক মেডিসিন' (খণ্ড ১৭, পৃঃ ৫২)-এ কাজুও সুজুকি এবং ইয়াসুয়ো সুচিহাসি মন্তব্য করেছেন, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ঠোঁটের চামড়ার খাঁজ ভিন্ন। ফলে কারুর লালাসিক্ত ঠোঁট সিগারেটের ওপর অজ্ঞাতসারে যে ছাপ এঁকে দেয়, ব্যক্তি বিশেষে তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকবেই। অতএব আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করে যেমন অপরাধীর সন্ধান করা হয়, ঠোঁটের ছাপের সাহায্যেও অনুরূপ কাজ করা যেতে পারে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা আরও ভালভাবেই সম্ভব।

অভিনব এই মতলবটির কথা প্রথম শোনা গিয়েছিল ১৯৬৬-তে, কোপেনহেগেনে। ঐ বছর সেখানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফরেনসিক মেডিসিন-এর সাধারণ অধিবেশনে ব্রাজিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেণ্টাল স্কুলের বিজ্ঞানী ক্লাউকো সান্তোস ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ঠোঁটের ভাঁজ যে ভিন্ন সে কথা প্রকাশ করেন। এখান থেকেই ব্যাপারটায় অনুসন্ধিৎসু করে তোলে সুজুকি এবং ইয়াসুয়োকে। পরে ওঁরা মিলিতভাবে দু শ আশি জন লোকের ঠোঁটের ছাপ সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেন। দেখা গেল কোন ক্ষেত্রেই দুজন মানুষের ঠোঁটের ছাপ এক রকম হয়নি। এরপর একই পর্যায়ের আঠারোজন যমজের উপর পরীক্ষণ চালান হয়। কিন্তু দেখা গেল, ক্ষেত্রে প্রতি জোড়া যমজের ঠোঁটের ছাপ হুবহু একরকম। এ থেকে ঐ জাপানী বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন, প্রাণী তার ঠোঁটের ছাঁচটি লাভ করে হয় তার বাবা, না হয় তার মা'র কাছ থেকে ইতিমধ্যে একটি অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে গেল। ১৯৬৮তে টোকিও মেট্রোপলিটান পুলিস বিভাগের জেনারেল ডাইরেক্টার একটি উড়ো চিঠি পেলেন কোন একটি সন্ত্রাসবাদী দলের কাছ থেকে। চিঠিতে বলা হয়েছিল, পুলিসের সদর দপ্তর উড়িয়ে দেবার তারা পরিকল্পনা নিয়েছে। যোগাযোগ বলছি এই কারণে, চিঠির খামটির যে দিকটায় ঠিকানা লেখা ছিল সেখানে দুটি ঠোঁটের ছাপ পাওয়া গেল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐ ছাপ সংগ্রহ করে তার সাহায্যেই অপরাধীকে খুঁজে বের করা হয় এবং তার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করা হয়। এ থেকে ঐ দুজন বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেছেন অনেকেই খাম জোড়ার সময় ঠোঁটের লালা ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে খামের উপর তাদের ঠোঁটের স্পষ্ট ছাপ আঁকা হয়ে যায়। অতএব সহজেই ঠোঁটের ছাপ সংগৃহীত হতে পারে। সিগারেটের বেলায় ঐ ধরনের ছাপ সংগ্রহ করা আরও সহজ।

অবহাওয়ার রাশিচক্র

বৃটিশ বিজ্ঞানী ডঃ আর এফ হে গত তিন বছর ধরে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের আশপাশের বাতাসের চাপ পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর ধারণা, ঐ গবেষণা ভবিষ্যতে অতিভবিষ্যৎ-আবহাওয়াজনিত পূর্বাভাস যোগাতে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যে ১৮৭৪ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের কোথায় এবং কোন দিনে কী ধরনের জল-হাওয়া ছিল সে সম্পর্কে তিনি একটি সমীক্ষা তৈরি করেছেন। তাতে দেখা গেছে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক বেশ নিকটের। বিশেষ বিশেষ বৎসর অন্তর অতি বৃষ্টি, ঝড়, খরা প্রভৃতি হয়ে থাকে। বাতাসের চাপের হ্রাস বৃদ্ধিও ঘটে থাকে একটি নিয়মমাফিক সময়কাল ধরে। আর সেই চাপের কায়দা কানুন দেখে বলে দেয়া যেতে পারে, এ বছর যদি ঘূর্ণিঝড় হয়, ওই ধরনের ঘূর্ণিঝড় আর কত বছর পর ঘটতে পারে? সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, বৃটেনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যদি কোন সাল জোড়া বছরের হয়, তা হলে ঐ বছর আবহাওয়াটি তেমন ভাল থাকে না। বিজোড়ের ক্ষেত্রে উল্টো।

সমরাজিৎ কর
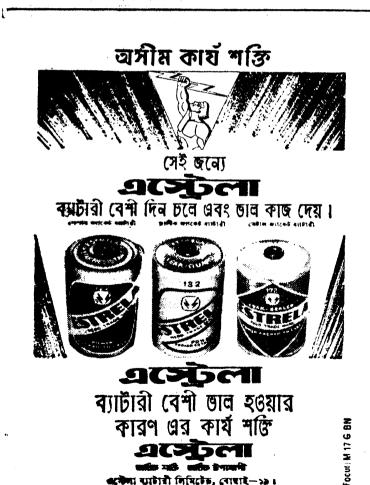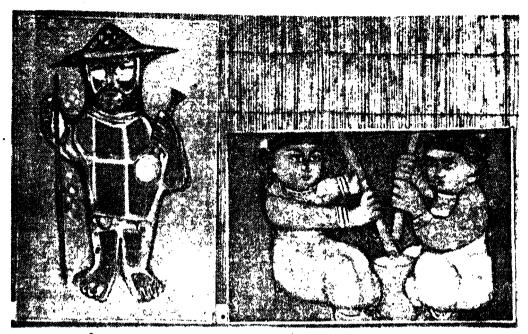
বামে, ম্যান অব দি সয়েল ও নীচে, হাউসহোল্ড ওয়ার্কস্ —রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পকর্ম্ম নিদর্শন দেখার জন্য যাঁরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গ্যালারীতে যাতায়াত করেন তাঁরা তিনজন শিল্পীর সাম্প্রতিক কাজ দেখে আনন্দলাভ করে থাকবেন ঃ শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অঞ্জলি এলা মেনন ও নরিত নন্দী। তিনজনই কৃতী শিল্পী, তবে পৃথকপন্থী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনীতে টেম্পারা ও দেশী রঙে আঁকা ২৬টি নিদর্শন ও সেই সঙ্গে শতাধিক স্কেচও দেখা যায়। 'দেশ'-এর প্রচ্ছদপটে শিল্পীর আঁকা বহু ছবি প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং 'দেশ'-এর নিয়মিত পাঠক-পাঠিকার কাছে তিনি অপরিচিত নন। শিল্পী শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষালাভ করেন ও গত কয়েক বছর যাবৎ পুরুলিয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে কলাশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। শিল্পী কলকাতার বাইরে থাকেন, সুতরাং শহরের শিল্পীমহলেও তিনি হয়ত ঠিক পরিচিত নন। তা সত্ত্বেও গুণীজনের দৃষ্টি তিনি এড়াতে পারেন নি। 'দেশ'-এর প্রচ্ছদপটের বিশেষত্ব লক্ষ্য করে একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের প্রচার-সচিব শিল্পীর সঙ্গে গত বছর যোগাযোগ করেন। মস্কো শহরে তখন এক্সপো-৬৯ প্রদর্শনী চলছে। স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন সেখানে তাঁদের প্রচারকক্ষে ভারতীয় চর্মশিল্প বিষয়ে একটি উপযুক্ত প্রাচীরচিত্র করাতে চান। উক্ত প্রচার সচিবের অযাচিত প্রশংসা ও শিল্পীর অঙ্কননিদর্শন দেখে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন কর্তৃপক্ষ শিল্পী রামানন্দকে প্রাচীরচিত্র আঁকার ভার দেন। প্রাচীরচিত্রটি এক্সপো-৬৯ প্রদর্শনীতে প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। এ ছাড়া বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন, কলকাতার বেদান্ত মঠ ও রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানেও তিনি প্রাচীরচিত্র এঁকেছেন। শিল্পী স্বভাবে লাজুক, আজকালকার প্রচার ও স্বীয় ঢক্কানিনাদের যুগেও তিনি তাঁর প্রদর্শনীর পরিচয়পত্রে (Catalogue) এগুলির কথা উল্লেখ করেননি। আলাপ প্রসঙ্গে, অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিল্পী কথাগুলি বললেন এবং আমিও কর্তব্যবোধে এগুলি প্রকাশ করলাম। বলা বাহুল্য, গুণী শিল্পী যথাকালেই স্বীকৃতিলাভ করেন—প্রচারকার্যের প্রয়োজন হয় না।

এটি তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। যাঁরা প্রদর্শনীটি দেখেছেন তাঁরাই বুঝেছেন পেরেছেন যে, এই শিল্পী ভিন্ন গোত্রের। নন্দলাল বসুর যোগ্য ছাত্র হিসাবে তিনি সযত্নে ভারতীয় রীতি আয়ত্ত করেছেন ও ভারতীয় ছবিই এঁকেছেন, অথচ লক্ষ করার বিষয় যে, শিল্পী হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ আধুনিকপন্থী। দেশের ঐতিহ্য ও প্রাচীন লোকশিল্প ধারার ওপর তাঁর আস্থা আছে। দেওয়ালে আঁকা প্রাচীন লোকচিত্র থেকে তিনি প্রেরণা লাভ করেছেন। শিল্পী ভারতীয়, তার ওপর গ্রামপ্রেমিক। গ্রামবাসী ও গ্রামের ধুলোমাটির প্রতি তাঁর অসীম মমতা। গ্রামের বিভিন্ন ও নিজস্ব নানা চরিত্র তিনি প্রাচীন লোকচিত্রধারার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর আকার তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট করে ভারতীয় ও আধুনিক রীতির সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাই তাঁর ছবিগুলি এক একটি বিশিষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিল্পীর বৈশিষ্ট্য তাঁর রঙ ব্যবহার প্রণালী। তিনি লাল, হলুদ ও বেগুনী রঙের পক্ষপাতী। টেম্পারা ছাড়া অনেক স্থলে তিনি দেশী রঙ (earth colour) ব্যবহার করেছেন ও তার ওপর তুলির কয়েকটি টানে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তুলি চালনায় তিনি দক্ষ—প্রত্যেকটি টান পরিমিত, বলিষ্ঠ অথচ স্বতঃস্ফূর্ত। কয়েকটি রচনায় হয়ত প্রশ্নের

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব দেখা যায়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। সোহাগী, ম্যান অব দ্য সয়েল ও বিশেষ করে কালিং দ্য চিলড্রেন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিল্পী যে আধুনিকধর্মী তার একটি প্রমাণ যে, প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েক স্থলে তিনি রঙীন কাগজের টুকরো ব্যবহার করে কোলাজ জাতীয় রচনা সৃষ্টির পরীক্ষা করেছেন—যেমন নিয়ন ফিশ। সবুজ ও নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে, তুলির সাবলীল বিভিন্ন টানের ওপর প্রতীকজাতীয় নীল ও লাল কাগজের টুকরো ব্যবহার প্রয়াস হিসাবে উল্লেখ্য। আরও দুটি ছবি অনেকের চোখে পড়েঃ স্প্রিং এক্সপেকটেশন ও দ্য মাস্টার। প্রথমটিতে লাল রঙের ছোট ছোট প্রতীকমূলক আকারের পরিপ্রেক্ষিতে উপবিষ্টা এক যুবতী নারীর মনের রঙীন স্বপ্নটিকে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন; এটি কাব্যধর্মী। দ্বিতীয়টি চারকোলে আঁকা একজন বানরওয়ালার ছবি, কাঁধে তার একটি বানরশিশু। ছবির ওপর জল ছিটিয়ে শিল্পী ড্রাই ব্রাশের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে হাউসহোল্ড ওয়ার্কস, গণেশ জননী, ভিজা কাপড়ের ওপর আঁকা হোয়াইট বোর এবং বিশেষ করে উজ্জ্বল লাল রঙে রচিত বোথ-এর নাম করা যায়। পৃষ্ঠভূমিতে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হালকা নীল রঙের স্থলে উজ্জ্বলতর নীল রঙ ব্যবহার করলে হয়ত এটির আবেদন আরও বর্ধিত হত। বলা বাহুল্য, স্কেচগুলিও সুন্দর। দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখেও কিভাবে সমকালীন রীতিতে শিল্প সৃষ্টি করা যায় শিল্পী তা প্রমাণ করলেন। অর্থাৎ, লঘু-সঙ্গীত আসরে রাগপ্রধান গানই নতুন সঙ্গীতে পরিবেশন করে তিনি যেন চমক সৃষ্টি করে গেলেন।

*

শিল্পী অঞ্জলি এলা মেননের প্রদর্শনীর আয়োজন হয় আকাডেমি গ্যালারীতে। বাল্যকাল থেকেই চিত্রকলার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, যদিও পরে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। কয়েক বছর পূর্বে বোম্বাই ও দিল্লীতে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করার পরে তিনি ১৯৬১ সালে ফরাসী সরকারের বৃত্তি লাভ করে প্যারিস যান ও প্রাচীরচিত্র অঙ্কন শিক্ষা করেন। তারপর ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ৩১টি ছবি দেখা যায়। শিল্পীর রচনা রোমান্টিক শ্রেণীর; দৃষ্টিভঙ্গী ও রঙ ব্যবহার প্রণালীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব দেখা যায়। শিল্পীর রঙের পাত্র নানারঙে পূর্ণ; বিষয়বস্তুও বিভিন্ন, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই নারী-সুলভ চিন্তাধারা প্রাধান্যলাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বুরুশের অগ্রভাগ ব্যবহার করে কারুকার্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। রঙের মধ্যে তিনি হলুদ ও বেগুনী রঙের পক্ষপাতী, তাই কয়েক ক্ষেত্রে তাঁর কাজ দেখে গগ্যার কথা মনে পড়ে। কিন্তু সেটি কেবল বিশেষ রঙটির জন্য—গগ্যার অঙ্কন বলিষ্ঠতা বা ছবির পরিবেশ এখানে দেখা যায় না। তবে শিল্পীর রচনা-রীতি সরল—বিশেষ করে নারীমূর্তিগুলির চোখ কালো রঙে ভরে ফেলে আলুলায়িত কেশদামের ওপর বুরুশের অগ্রভাগ ব্যবহারের জন্য ছবিগুলির একটি সামগ্রিক, বিচিত্ররূপ সকলকে আকৃষ্ট করে। অঙ্কন ও

বুল অ্যান্ড দ্য বার্ড —সরিত নন্দী
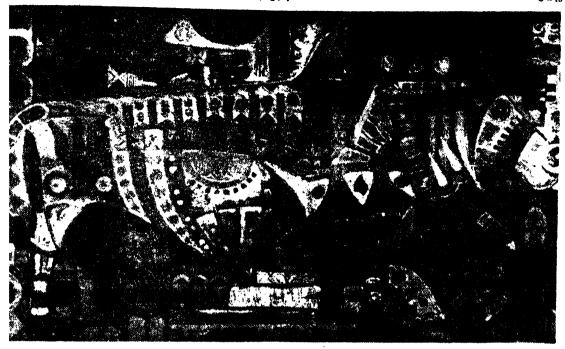
বাবহার—দুটি বিদ্যাতেই শিল্পী
শী। তাই বিদেশী প্রভাব থাকা
রচনাগুলি নজরে পড়ে। যেমন ন্যুডে
য়েসা। কয়েকটিতে শিল্পী আদিম ও
ম সরলতা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই
গ ব্ল্যাক ম্যাডোনার নাম করা যায়।
একটি উল্লেখ্য রচনা। শায়িতা
য় পৃথিবীর প্রথমা নারী হাতে তার
ল। এটির কমপোজিশন ও
চিত রঙ ব্যবহার অনেকের ভাল
কয়েকটি ছবি সাংকেতমূলক, যেমন
জ। কেবলমাত্র কয়েকটি লাল রঙের
ও প্রয়োজনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে
অল্প কথায় গ্রামের রূপ ব্যক্ত করে-
এই সঙ্গে হাউস অন দা হিল এরও
করা চলে। প্রতীকমূলক হিসাবে
র পরিপ্রেক্ষিতে রচিত লক্ষ্মী এই
য অর একটি নিদর্শন। অন্যান্য
মধ্যে স্পেকটর, জেরিকো ও মেরিয়ম
যোগ্য। রচনারীতি ও রঙ ব্যবহারে
ী প্রভাব থাকলেও শিল্পীর
টক দৃষ্টিভঙ্গী অনেককে মুগ্ধ

*

শিল্পী সরিত নন্দী অ্যাকাডেমি
তে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।
নীতে তেলরঙে আঁকা ও নানা
উপাদানে তৈরী ১৮টি রচনা দেখা যায়, সেই
সঙ্গে থাকে ১৯টি স্কেচ।

শিল্পী খড়্গপুর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির কলা বিভাগের অধ্যাপক। গত কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এই শিল্পীর রচনানিদর্শন দেখে আসছি। সুতরাং শিল্পী যে শিক্ষাদান করার সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে নিয়মিতভাবে শিল্প-চর্চা করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিল্পীর বৈশিষ্ট্য, অধুনা ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান, যথা কাঁটা, পেরেক, বোতাম, পয়সা, লৌহখণ্ড সহকারে তিনি প্রতীক-মূলক কমপোজিশন সৃষ্টি করেন। এ-জাতীয় উপাদান আজকাল অনেকে ব্যবহার করছেন কিন্তু এগুলি রচনা ক্ষেত্রে স্থাপন করলেই শিল্পপর্যায়ে পড়ে না—যতক্ষণ না এই শ্রেণীর রচনার মধ্য দিয়ে বিশেষ কোনও রূপ ফুটে ওঠে। টেকনলজির শিক্ষায়তনে শিল্পী কারখানা ও গবেষণাগারের বিভিন্ন কার্যধারা দেখে নানা উপাদানের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করে শিল্পী-পরিচিতি লাভ করেছেন। এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এই যে, এখানে তাঁর তেলরঙের কয়েকটি রচনাও দেখা গেল। সুসম্বদ্ধ কমপোজিশন বিষয়ে তাঁর সম্যক জ্ঞান আছে মনে হয়। প্রয়োজনমত তিনি রচনাক্ষেত্র ভাগ করতে পারেন ও বিষয়বস্তু হিসাবে শূন্য স্থানেরও সদ্ব্যবহার করতে পারেন। অনেক সময়ে বলিষ্ঠ রেখার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুর মুখ্য আকারটুকু প্রকাশ করে রচনাক্ষেত্রটি প্রতীকমূলক নানা আকারে ভাগ করে বিভিন্ন রঙ ও রেখার কারুকার্যে রচনাক্ষেত্রটি ভরে ফেলেছেন, যেমন বুল অ্যান্ড দ্য বার্ড। এটির রীতি-মুখরতা লক্ষণীয়। কয়েকটিতে আবার প্রাচীন সভ্যতা নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে দ্য ডিয়ার-এর নাম করা যায়—দেখে মহেঞ্জোদারোর শীলের কথা মনে পড়ে। সুন্দর কারুকার্যের দিক থেকে বিচার করলে আর একটি ছবিরও নাম করতে হয়—দ্য ব্লু বার্ড উইথ এগস। শিল্পী তুলি চালনায় দক্ষ—প্রমাণ দ্য বার্ড। বলিষ্ঠ ও গতিশীল রেখার মধ্য দিয়ে শিল্পী মুরগীর একটি বিশিষ্ট ছবি এঁকেছেন। বিভিন্ন উপাদানে তৈরী কমপোজিশনের মধ্যে দা অ্যাক্রোব্যাট প্রথমেই চোখে পড়ে যায়। প্রতীক হিসাবে বিভিন্ন উপাদান স্থাপন করে শিল্পী অ্যাক্রোব্যাটের বিশিষ্ট রূপটুকু প্রকাশ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ল্যাবরেটরি ও কমপোজিশন ২-এরও নাম করা চলে। তবে ওয়ারিড ছবিখানি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। শিল্পীর স্কেচগুলি দ্রষ্টব্য—রেখার বলিষ্ঠতা ও গতিশীলতা এগুলির প্রধান আকর্ষণ—বিশেষত জ্যামিতিক রেখাজালের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত মুরগীর বিভিন্ন স্কেচ অনেকেরই চোখে পড়ে।

—চিত্রপ্রিয়

দরবার নটী কলাবন্ত

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

তানসেন মেহেরউন্নিসা সমাচার

মহাগুণী গায়ক-সুরকার তানসেন। রূপসী কলাবতী মেহেরউন্নিসা। রহস্যে ঘেরা তানসেন জীবনের আর এক রহস্য। তাঁর জীবননাট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক। নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে আছেন রাজা রামচাঁদ বাঘেলা ও মোগল বাদশা আকবর।

স্থান মধ্য ভারতের ভাথা রাজ্য ও আকবরের দরবার। প্রেক্ষাপট গোয়ালিয়র ও বৃন্দাবনের সঙ্গীতক্ষেত্র।

কাল ১৫৬২ খৃঃ।

সেই অপ্রকাশিত সংবাদ বিবৃত করবার আগে, আলোচ্য ব্যক্তিদের মনসলোক ও পট-ভূমি জানবার জন্যে ঐতিহাসিক পূর্ব-বৃত্তান্ত কিছু আছে। ......

আকবরের সেই মাত্র ২০ বছরের তরুণ জীবনেই ফুটে উঠেছে আদিম মোগল চরিত্র। তৈমুর বংশের রক্তে তিনটি প্রধান উপাদান ছিল—বিবেকহীন উচ্চাশা, অদম্য ভোগ-লিপ্সা আর কুটিল নৃশংসতা : সব্যসাচী লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি গল্পে এই ইতিহাস-সিদ্ধ মন্তব্য করেছেন। এর ব্যতিক্রম ছিলেন না আকবরও। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে আকবর ১৩ বছর ৩ মাস বয়সে রাজা রূপে ঘোষিত হয়েছেন (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬)। এই সময়েই তাঁর অভিভাবক বেহরম খাঁ পাঠান-প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্মূল করেছেন দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে। সেই ১৪ বছর বয়সেই আকবরের প্রথম বিবাহ। ১৫৫৭ সালের প্রথমদিকে অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। তখন থেকেই অভিভাবক বেহরম খাঁর সঙ্গে বৈরিতার সূত্রপাত।

১৮ বছর বয়সে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে আগ্রা থেকে আকবর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছেন ফতেপুর সিক্রিতে (১৫৬০)। অতি অল্প সময়েই সমগ্র দরবার সরকারী জিনিস-পত্র, লোকলস্কর, এক হাজার বন্য জন্তুর পশুশালা, ততোধিক সংখ্যার রমণী সমেত হারেম ইত্যাদি ফতেপুর সিক্রিতে নতুন রাজধানী স্থাপন করার দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে নগরটি ও তার সৌধমালার অস্তিত্ব আগে থেকেই ছিল।

হুমায়ুনের ভাগিনেয়ী সালিমা বেগমকে বিবাহ করার জন্যে বেহরম খাঁ বিষনজরে পড়েন ঈর্ষাজর্জর আকবরের। ফলে প্রথম সুযোগেই তাঁকে পদচ্যুত, ক্রমে তাঁর সব ক্ষমতা ধ্বংস, বারকয়েক প্রকাশ্য যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করে নির্বাসন ও শেষে ঘাতকের সাহায্যে (জানুয়ারি ১৫৬১) আকবর বেহরম খাঁর হত্যাসাধন করেন। হত্যাকাণ্ডের পরেই বেহরম খাঁর পত্নী সালিমাকে শিশুপুত্র (পরবর্তী জীবনে আবদুর রহিম খান খানান) সমেত অন্তর্ভুক্ত করেন নিজের হারেমে।

তার দু-মাস পরে (২৯ মার্চ, ১৫৬১) আকবরের বাহিনী আধম খাঁর সেনাপতিত্বে মাণ্ডুরাজ, সঙ্গীতগুণী বাজ বাহাদুরের রাজ্য অধিকার করে নেয়। বাজ বাহাদুর প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন এবং তাঁর প্রধানা বেগম রূপমতী আত্মহত্যা করেন আধম খাঁর লালসা থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায়। মাণ্ডু রাজ্যে আধম খাঁর দারুণ অত্যাচার চলে। বাজ বাহাদুরের ধনরত্ন ও হারেমের বাছাইকরা সুন্দরীদের আধম খাঁর হস্তগত হওয়ার সংবাদ পেয়ে অচিরাৎ আগ্রা থেকে নিষ্ক্রান্ত হন আকবর (২৭, এপ্রিল, ১৫৬১)। তারপর সেনাপতিকে শাস্তিদানের ছলে

তানসেন

লুণ্ঠিত সমস্ত সামগ্রী সমেত আগ্রায় ফিরে আসেন (৪, জুন, ১৫৬১) ও রাজ বাহাদুরের রমণীদের নিজের হারেম-জাত করেন।

ওই মাসেই আকবর এটা জেলায় আট-খানি গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় এক হাজার হিন্দুকে জীবন্ত দগ্ধ করেন (১৫৬১, জুন)।

১৫৬৪ খৃঃ রানী দুর্গাবতীর আদর্শ সুশাসিত রাজ্য গোণ্ডওয়ানাকে আকবরের আদেশে মোগল সেনাপতি আসফ খাঁ পর্যুদস্ত করে বিনা প্ররোচনায়।

এমনিভাবে আকবরের নিরন্তর পররাজ্য লুণ্ঠন ও আক্রমণকালের মধ্যে বর্তমান আখ্যায়িকার সূত্রপাত। রানী দুর্গাবতীর জনপ্রিয় রাজত্বকে উৎসন্ন করে দেবার দু বছর আগেকার কথা। মধ্যপ্রদেশের আর একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ রাজ্য ভাথার ওপর আকবরের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল। এ রাজ্যের কোষাগার যেমন বহুমূল্য মণিমুক্তায় পূর্ণ, তেমনি এর দরবার সুরঞ্জিত করে বিরাজ করছেন সঙ্গীতরত্ন তানসেন। এ সবই আকবরের হস্তগত হওয়া চাই।

সদানীরা নর্মদা নদীর তীরে সেকালের ভাথা রাজ্য। তার পঞ্চাশ বছরাধিক পরে ১৬২০ খৃঃ এখানে রেবা নগরীর পত্তন হবার পর থেকে সমগ্র রাজ্য রেবা নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আকবরের সময়ে নাম ছিল ভাথা। সমসাময়িক নথিপত্রেও সেকথা উল্লেখিত। রাজধানীর নাম বান্ধবগড়। তখনকার নৃপতি ছিলেন মহারাজা রামচাঁদ বাঘেলা।

বাঘেলা কুল পদবীতে প্রসিদ্ধ এই রাজ-বংশ শোলাঙ্কি রাজপুত জাতির এক শাখা। দশ থেকে তের শতকের গুর্জর রাষ্ট্র গুজরাট। ছিল সেই শোলাঙ্কি বংশীয়দের আদি রাজত্ব। রাজা রামচাঁদের তিনশ বছর পূর্ববর্তী ব্যাঘ্রদেব নামে এক ব্যক্তি মধ্যভারতের এই অঞ্চলে সমাগত হন। তাঁদের আদি নিবাস গুজরাটের যে স্থানে ছিল, ব্যাঘ্রের প্রাদুর্ভাবের জন্যে তা পরিচিত থাকে বাঘপল্লী নামে। সেখান থেকে রামচাঁদের উক্ত শোলাঙ্কি রাজপুত পূর্বপুরুষ ভাগ্যান্বেষণে এসে ১২৩৪ খৃঃ কালিঞ্জরের নিকটস্থ মাদাসায় বসবাস আরম্ভ করেন, ব্যাঘ্রদেবের নামানুসারী সেই বাঘেলা বংশে কয়েক পুরুষ পরবর্তী বীরসিং স্থানীয় ভীল রাজাদের কাছ থেকে বান্ধবগড় দুর্গ জয় করে নেন। বীরসিং বাঘেলার হাতে পরাস্ত হবার আগে ভীল রাজারা বান্ধবগড় অধিকার করেছিলেন মুসলমান আক্রমণে হতবল কল-চুরি রাজাদের নিকট থেকে। দুর্গটি বহু প্রাচীন; খৃঃ তৃতীয় শতক থেকে এখনকার এক পাহাড়ে স্থাপিত। ব্যাঘ্রদেবের বংশীয় উত্তরকালের রাজারা বাঘেলা এবং তাঁদের অধ্যুষিত অঞ্চল বাঘেলখণ্ড নামে ইতিহাসে সুপরিচিত হয়েছে। সেই প্রাচীন বান্ধবগড় আজো লুপ্ত হয়নি এবং বাঘেলা রাজবংশও কখনো দত্তক গ্রহণ না করে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এখনো বর্তমান। ১৬২০ খৃঃ থেকে রাজ্যটি রেবা নামে পরিচিত হবার কারণে অনেক

অব্যাহত ছিল এবং লছমনদাস যে কি আচার্য স্থানীয় মর্যাদায় নেপাল দরবারে অবস্থান করতেন তা বিবৃত হয়েছে নেপালের রাণা দরবারের অধ্যায়ে। তানসেন যে ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন তার একটি অকাট্য প্রমাণ তাঁর মাতুলের ব্রাহ্মণসূচক মিশ্র উপাধি।

গদাধর মিশ্র তানসেনের বয়োজ্যেষ্ঠ মাতুল এবং গোয়ালিয়রের ১৯ ক্রোশ মাত্র দূরে বিহট গ্রামে বাস ও সঙ্গীতচর্চা করতেন। তানসেনের সেই বিহটের মাতুলালয়েই জন্ম ও বাল্যজীবন যাপনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং তানসেনের সঙ্গীত শিক্ষা তাঁর মাতুলের নিকটে প্রথমে সম্পন্ন হয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত করা কি অযৌক্তিক? সাক্ষাৎ প্রমাণ বা সমসাময়িক বিবরণে সমর্থন না পেলেও এ সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা যায় না বিরুদ্ধ প্রমাণ নিশ্চিত না পেলে।

গোয়ালিয়রে প্রথম জীবন যাপনের পর তানসেন জীবিকার্জন ও আরো সঙ্গীত-বিদ্যা লাভের আশায় অন্যত্র অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাথারাজের দরবারে যোগদানের পূর্ববর্তী জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিবরণের অভাব। মহম্মদ ঘাউস কিংবা অদলী বা শের শার ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শার নিকটে তানসেনের সঙ্গীতশিক্ষার কথা সাম্প্রদায়িক প্রচার মাত্র। বাঘেলা রাজের আশ্রয় লাভ করবার আগে ইসলাম শার পার্ষদ দৌলং খাঁর কাছে তাঁর কিছুকাল থাকবার কথা কোন কোন মতে শোনা যায়, কিন্তু সে বিবৃতি ঐতিহাসিক নয়।

বৃন্দাবনের সন্ত-সঙ্গীতজ্ঞ হরিদাস স্বামী যে তানসেনের আর একজন সঙ্গীতগুরু ছিলেন এই কিংবদন্তী অতি প্রচলিত। এই জনশ্রুতিকে অস্বীকার করবার মত উপযুক্ত বিরুদ্ধ প্রমাণ নেই। তানসেনের নামে [illegible] কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ এবং কোন কোন গানে বৃন্দাবনের উল্লেখ হরিদাস স্বামীর প্রভাবের দ্যোতক ভাবা যায় না কি? তাঁর রচিত 'কানহী ধুনসো বাজায়ে বাজত শ্রীবৃন্দাবন রঙ্গ ঘুমড় রহো সঘন [illegible] বাদর বিমানয়া' ইত্যাদি ধ্রুপদে [illegible] তানসেনের অন্তরের অন্তর্লোকে সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়......

এখন তানসেনের দরবারী প্রসঙ্গ। ভাথরাজ রামচাঁদ বাঘেলা ১৫৫৫ খৃঃ সিংহাসন লাভ করেন এবং পরের বছরেই তানসেনকে বহুমানে নিযুক্ত করেন বান্ধবগড় দরবারে। বাঘেলা রাজ সংগীত গুণীকে সাদরে বরণ করে রেখেছিলেন, প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকনও দিতেন। এই উদার আশ্রয়ে ছ বছর অবস্থানের সময় বহু বিস্তৃত হয় তানসেনের সঙ্গীত-খ্যাতি। তাঁর প্রতিভার সান্নিধ্যে সঙ্গীত-প্রেমী রাজা রামচাঁদের দিনগুলি তখন পরমানন্দে অতিবাহিত হচ্ছিল। এমন সময় তাঁর [illegible] বিপর্যয় ঘটল এসে ১৫৬২ সালে। মোগল ফৌজ বান্ধবগড় অবরুদ্ধ করলে, [illegible] তানসেন ও অন্যান্য উপঢৌকন দানে আকবরকে তুষ্ট করা হয়।

প্রমাদ গণলেন ভাথ-রাজ এবং তাঁর পাত্র মিত্র সভাসদরা। কারণ মোগল বাহিনীর আক্রমণের রূপ মন্দু প্রভৃতির দৃষ্টান্তে তখন কারুরই অজানা নয়। রাজা রামচাঁদ তানসেনকে হারাবার দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলেন। প্রথমে তিনি সম্মত হলেন না সঙ্গীতগুরুকে আকবরের দরবারে প্রেরণ করতে। এমন সহৃদয় গুণগ্রাহী [illegible] ত্যাগ করে যেতে তানসেনও [illegible] ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু [illegible] হল তাঁর। [illegible] আকবরের দরবারী ঐতিহাসিক [illegible] বদায়ুনীর [illegible] বিবৃতি পাওয়া যায়:

'Tan Singh did not wish to leave the royal Hindu patron. Finally a fierce Muslim general Jalal Khan Kurchi came & brought him to a sense of duty'. Badayuni's Chronicle, page 345).

বাঘেলারাজকে তানসেনের সঙ্গে প্রচুর স্বর্ণ, মণিমাণিক্য, অশ্বারোহী ও পদাতিক দল ইত্যাদি ভেট দিয়ে আকবরের কাছ থেকে উচ্চমূল্যে শান্তি ক্রয় করতে হল।

এইভাবে তানসেন যখন আকবরের দরবারে যোগ দিতে বাধ্য হলেন তখন আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত অন্যান্য গুণী-দের সমাগম ঘটেনি সেখানে। 'আইন-ই-আকবরী'র লেখক আবুল ফজলের (জন্মঃ ১৫৫১ খৃঃ) সঙ্গে আকবরের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৫৭৪ খৃঃ এবং উক্ত গ্রন্থের রচনা

পরিবর্তিত হল কূটনীতি।

সেদিন বাগিচায় বসে অন্যমনে মেহের উন্নিসা গাইছেন। রাগ বাগেশ্বরী।

পাশের পুষ্পকুঞ্জে আকবর আত্মগোপন করে আছেন।

মেহের উন্নিসার গান কিন্তু অনিন্দনীয় হচ্ছে না অন্যান্য দিনের মতন। বেসুর নয়, তবে বাগেশ্বরীর রাগ রূপায়ণে বার বার ত্রুটি ঘটে যাচ্ছে। অলক্ষ্যে উৎসুক হয়ে অপেক্ষমান আকবর।

অকস্মাৎ নিজের আবাস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসে মেহের উন্নিসার সামনে দাঁড়ালেন তানসেন। এ যাবৎ সুর ও রূপের আবেদন তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আজ তিনি বিচলিত বোধ করেছেন রাগের বিকৃতিতে। তাঁর অবশ্য জানবার কথা নয় যে, মেহেরের এই বাগেশ্বরীর ত্রুটি ইচ্ছাকৃত। কারণ তাঁর প্রতি আকবরের নির্দেশ ছিল : গলত্ গাও!

তানসেন অসহিষ্ণু হয়ে গায়িকাকে বলে উঠলেন—এ কি বাগেশ্বরী? সব ভুল, সব ভুল।

নির্দেশ মতন মেহের উন্নিসা নতমুখে বললেন, যদি মেহেরবানি করে দেখিয়ে দেন কেমন করে গাইব...

বলবার প্রয়োজন হত না হয়ত। কারণ বাগেশ্বরীর সুর-ধ্যান তানসেনের প্রাণে আগেই জেগেছে। আর তাঁর পক্ষে কণ্ঠকে রুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি বাগেশ্বরীর রূপ যথাযথ প্রদর্শনের জন্যে গান আরম্ভ করলেন। এতদিন পরে এমনি ঘটনাচক্রে এবং অন্তরের প্রেরণায় আবার আত্মপ্রকাশ করল তাঁর নিজস্ব সঙ্গীত সত্তা। তিনি শুধু গাইলেন না, মেহের উন্নিসার গানের ত্রুটি শোধন করে তাঁর কণ্ঠে অবিকৃত বাগেশ্বরী সযত্নে তুলিয়ে দিলেন।

তখন অন্তরাল থেকে গায়ক-গায়িকার সামনে উপস্থিত হলেন সিদ্ধকাম আকবর। তানসেনকে বললেন মেহের উন্নিসাকে আপনি এমনি করে তালিম দিন, যখন আপনার খুশি। এই মেহেরের মহল—আপনার জন্যে সর্বদা খোলা থাকবে।

সেই দিন সূত্রপাত হল। তারপর থেকে তানসেনের মেহের উন্নিসার মহলে যাতায়াত ও সঙ্গীতচর্চাদির কার্যক্রম।

তাঁদের সংবাদ আকবর নিয়মিত রাখেন। লক্ষ্য করেন, বিলম্বিত হয়ে চলেছে তানসেনের বিষণ্ণ উদাসীন ভাব। তাঁর স্বাভাবিক সঙ্গীতজীবন ফিরে আসছে।

আরো কিছুকাল যায় এইভাবে। তানসেনের গানে এখন পূর্ণ প্রাণের স্পন্দন। তিনি পুনরায় স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন সঙ্গীতবিশ্বে। অতীতের জন্যে বাহ্যত আর তাঁকে তেমন কাতর দেখা যায় না। নিঃসঙ্গ আর তিনি নন।

তখন আকবর প্রস্তাব করলেন, তানসেন যেন বিবাহ করেন মেহের উন্নিসাকে।

এবং সে প্রস্তাব কার্যকর হল। তবে জানা যায় না নিকা বা কোন্ বিধি মতে।

এই বিবরণ অনুসারে, বিলাস খাঁ হলেন তানসেন মেহের উন্নিসার সন্তান। আরো কথিত আছে যে, মেহের উন্নিসার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হবার আগে পর্যন্ত তানসেনের কাছে তাঁর প্রথমা পত্নী আসেন নি কিংবা তাঁকে আসতে দেওয়া হয়নি। তানসেনের সেই পূর্ব পরিণীতা তখনো ছিলেন বান্ধবগড়ে বাঘেলারাজের আশ্রয়ে, তাঁর কন্যা পুত্রদের সঙ্গে। তানসেন ভাটা রাজ্য থেকে মোগল দরবারে একাকী আসার এ কারণও সম্ভব যে, তিনি পুনরায় বান্ধবগড়ে ফিরে যাবার আশা প্রথমে মনে পোষণ করতেন। যাই হোক, মেহের উন্নিসার সঙ্গে নতুন জীবন আরম্ভ করবার পর তানসেনের প্রথমা পত্নী এসেছিলেন স্বামী সন্নিধানে। পুত্র সন্তানদেরও সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু তানসেনের এই অভিনব পরিবেশে সেই প্রথমা নাকি বাস করতে পারেননি। পরে [illegible] সন্তানদের নিয়ে অনেক সময় তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে হত।

তানসেনের জীবনীর এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে হল চমকপ্রদ কাহিনীর অবতারণা। অথচ এটি প্রামাণিক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নয়, কারণ সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই সেই জন্যেই কি বিবেচনা পরিত্যাজ্য? ইতিহাসের সব সত্যই কি সমকালীন লিপিতে সমর্থিত হয়েছে? অপর পক্ষে, সমসাময়িক কোন উক্তি কি

তানসেন' পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থাদি থেকে তানসেনের গানের সংখ্যা পাওয়া যায় ২৮৮। তা ভিন্ন তাঁর আরো কিছু সংখ্যক গান সঙ্গীতজগতে প্রচলিত আছে, যা কোন পুস্তকে মুদ্রিত হয়নি। সর্বসাকুল্যে ৩০০-র কিছু বেশি সংখ্যক ধ্রুপদ গান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তানসেনের রচনা বলে। এখানে অবশ্য তাঁর 'সঙ্গীতসার' ও 'রাগমালা'র রচনা ধরা হচ্ছে না। তার মধ্যে দেখা যায় তিনি রচনা করেছেন পীর পয়গম্বর বিষয়ে ৭টি, আল্লা বিষয়ে ১টি, হজরৎ মহম্মদ বিষয়ে ১টি ও হজরৎ আলী সম্পর্কে ১টি। অর্থাৎ তিন শতাধিক গানের মধ্যে মাত্র ১০টি ইসলামী বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। এই [illegible] নিদর্শন কতটুকু কি তানসেনের [illegible] স্বাক্ষরস্বরূপ গ্রহণ করা যায় [illegible] ইসলামের প্রতি আনুগত্য [illegible] দরবারের পৃষ্ঠপোষক [illegible] কোন কোন উপলক্ষে লিখে দরবারী পরিবেশের অনুসারে গান রচনা করতে পারেন। অন্যদিকে আকবরের দরবার থেকে [illegible] যায় যে, আকবরের নিযুক্ত ৩৬ জন দরবারী গায়কের মধ্যে ৩০ জনই মুসলমান। সেই সময় সঙ্গীতজ্ঞদের সাধারণ পরিবেশও দরবারী। সুতরাং এই গান কটি দরবারী শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্যেও রচনা করে শোনাতে পারেন তানসেন।

(৫) পরিণত বয়সেও এত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবী বন্দনা এবং কৃষ্ণলীলার নানা প্রসঙ্গ বিষয়ে তানসেন সংগীত রচনা করেছিলেন যে, এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। শুধু তাঁর অন্তিমকালের রচনারূপে প্রসিদ্ধ দুখানি গান দেওয়া হল তাঁর ধর্মমনসের শেষ নিদর্শন স্বরূপ :

(ক) মুলতানী ধনাশ্রী, চৌতাল—

এরা ঈশ্বর মো হিয় কি জানত,
গাত যো বীতত, বিনা দেখয়ে
তুম দরশ॥
এক নিমিষ যুগ পৈ নাহি ন
নিখত মার,
সাঁঝ অকুলাত, কছু না সহাত ইহাতে,
মনৈন সো জাত হরস॥
ভবভঞ্জন মনোরঞ্জন [illegible] সুখ সম্পদ,
[illegible]
তুহি [illegible], তুহি মহেশ, তারণ তরণ,
তানসেন তুহি অরণ শরণ॥

(খ)

তেরি গতি অগাত সো পৈ বর্ণ
না জাত নারায়ণ নিরঞ্জন,
নিরাকার পরমেশ্বর সন্ত স্বদীপ
বিশ্বম্ভর॥
বিশ্বম্ভর অবতার কৌ লেবত
হরত ভরত দিত,
দেখত তেরি বিস্ময় সবহি,
সকল স্ত্রী পুরুষ নারী নর॥

তুহি জল থল তুহি পশুপক্ষী,
তুহি পবন পাণি, তুহি ধরতি অম্বর,
তুহি চন্দ্র তুহি সূর্য, বসো যো জল থর।
তানসেনকো প্রাণ উড়ত হায়,
জানত হায় সব ঘর ঘর॥

ইত্যাদি প্রসঙ্গ তানসেনের স্বধর্মে অধিষ্ঠানের প্রমাণ স্বরূপ গণনীয় নয় কি? শুধু অন্তিম পর্বের এই রচনাতেই নয়, রচিত গীতাবলীর শতকরা ৯৫ ভাগেই তাঁর দ্বিধাহীন হিন্দু-মানস প্রতিফলিত দেখা যায়। তানসেন আবাল্য মুসলমান থাকলে কিংবা আকবরের দরবারে যোগ দেবার পর ইসলাম অবলম্বন করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করত তাঁর কবি প্রাণের সঙ্গীত রচনা। বিশেষ মোগল প্রভাবে অবস্থানকালে।

এমন সব আন্তর সাক্ষ্য প্রমাণাদি সত্ত্বেও তানসেনের হিন্দুত্বের বিপক্ষে স্থূল 'প্রমাণ' দেখানো যায়—গোয়ালিয়রে তাঁর কবর স্থানটি, যেখানে তাঁর স্মৃতিতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সঙ্গীত সম্মেলন। এর কি কৈফিয়ৎ?

উত্তরে, তানসেনের অন্তিমকালে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডির দিকে ইঙ্গিত করতে হয়। মুসলমানী পত্নী সহবাসের কারণে, জীবনযাত্রা ও আচার আচরণের বিচারে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও শেষে বিচ্যুত হয়ে পড়েন তিনি। সনাতন ধর্মাশ্রিত তাঁর পূর্বসমাজে আর লৌকিক-

ভাবে তাঁর স্থান ছিল না। ইসলাম অবলম্বন না করলেও সংস্পর্শের কারণে তাঁর কাছে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল হিন্দু সমাজের দ্বার। মধ্যযুগে এমনি কূর্মবৃত্তির সাহায্যেই হিন্দু-সমাজ আগ্রাসী বিধর্মী অনুপ্রবেশের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। সেকালের নানা দৃষ্টান্তের মতন তানসেনের জীবনও তার অন্যতম উদাহরণস্থল।

মৃত্যুকালে তানসেনের সামাজিক পরিস্থিতি কি ছিল? কারা ছিলেন তাঁর ব্যক্তিজীবনের পরিমণ্ডল জুড়ে? পত্নী মেহের উন্নিসা, পুত্র বিলাস খাঁ, সবংশে ধর্মান্তরিত হয়ে নৌবাৎ খাঁ নামপ্রাপ্ত জামাতা। প্রথমা পত্নীর পুত্ররা কি তখনো স্বধর্মে ছিলেন? সন্দেহের কথা। কারণ, সেই তানতরঙ্গ, সুরৎ সেনের বংশধরেরা পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মান্তরিত আত্মজনরাই ত তাঁর শেষকৃত্যের অধিকারী ছিলেন। উপরন্তু, তানসেনের অন্তিমকালে উক্ত আত্মজনদের সঙ্গে যদি যোগ করা যায় মোগল সভাসদদের সমাজ, যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি—তাহলেও বোঝা যাবে কেন তাঁর জন্যে অন্যপ্রকারের অন্ত্যেষ্টি সম্ভব ছিল না।...

তানসেনের জীবনকালের মধ্যে একমাত্র তাঁর মৃত্যুর বছরটি সঠিকভাবে জানা যায়—১৫৮৯ খৃঃ ২৬ এপ্রিল। (আবুল ফজলের 'আকবর-নামা'য় উল্লেখিত আছে যে আকবরের রাজ্যকালের ৩৪ বছরে তানসেনের মৃত্যু ঘটে, সেই অনুসারে মৃত্যু তারিখটি পাওয়া যায়।) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ কিংবা ৬৯ বছর (তাঁর জন্ম সন ১৫২০ অথবা ১৫৩০ অনুসারে)।

তানসেন কয়েকটি রাগ-রীতির প্রবর্তক-রূপে কীর্তিত আছেন। যেমন কানাড়া গোষ্ঠীর অন্তর্গত 'দরবারী কানাড়া'। তেমনি মল্লার, তোড়ি ও সারঙ্গের শ্রেণীর মধ্যে তাঁর সৃষ্ট রাগ-রীতির নাম বিখ্যাত হয়েছে যথাক্রমে 'মিঁয়া-কি-মল্লার', 'মিঁয়া-কি-তোড়ি', 'মিঁয়া-কি-সারঙ্গ' রূপে। রাগগুলি মুখে মুখে ওই নামে চলিত হয়ে যায় এই কারণে যে, মোগল দরবারে তিনি মিঁয়া বলে সম্বোধিত হতেন। তাঁর মুসলমানী সংস্পর্শ, মোগলাই আহার বিহার, ইত্যাদি কারণে সম্ভবত মিঁয়া নামে কথিত হতেন তিনি। এই অভিনব নামের সঙ্গে তানসেনের ধর্ম-জীবন তথা উপাসনা পদ্ধতির কোন সম্পর্ক ছিল না। এ বিষয়ে অনুরূপ দৃষ্টান্তস্থল হলেন বাংলার অন্যতম আদি টপ্পাচার্য কালী মীর্জা। ১৮।১৯ শতকের স্বনামধন্য টপ্পাগায়ক, সঙ্গীতরচয়িতা এবং রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতগুরু, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম অনুসারী জীবনযাপন করেও কালী মীর্জা নামে অভিহিত হতেন তাঁর উর্দু ফার্সী পোশাক, মুসলমান দরবারী পোশাক-আশাক [illegible] ধারণ ইত্যাদি কারণে। তাঁর পদবী ও হিন্দু ছিলেন, [illegible] থেকে [illegible] পর্যন্ত [illegible]। সেকালের কলকাতার কালী মীর্জার উদাহরণ থেকে ধারণা করা যায়, মুসলমানী-ভাবী তানসেন বৈদিক ধর্মে অধিষ্ঠিত থেকেও কেন মিঁয়া রূপে অভ্যস্ত হতেন মোগল দরবারে। বোঝা যায়, মেহের উন্নিসার সঙ্গে [illegible] অতিবাহিত করেও তানসেনের ব্যক্তিজীবনে দুই ধারা বিভক্ত হয়ে যায়নি। হিন্দু তানসেন মুসলমান তানসেন—এই দুই বিভক্তি [illegible] তাঁর মানসলোক চিহ্নিত বা অবস্থ থাকেনি [illegible] ও [illegible]। মেহের উন্নিসার সাহায্যে এবং [illegible] দরবারের পরিমণ্ডলে তানসেনের [illegible] পরিচয় [illegible] তাঁর বহিরঙ্গ জীবনের রূপরেখা।

তাঁর ব্যক্তিজীবন ও অন্তর্লোকের সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলিতে। [illegible] সঙ্গীতগুলিতেই তানসেনের [illegible] রয়েছে। নিদর্শনস্বরূপ তাঁর সেই সব সঙ্গীত [illegible]:—

(১) শ্রী। চৌতাল

[illegible]

[illegible]

হর হর॥...

(২)। নট। চৌতাল

[illegible] অব মন রো।...

(৩) মল্লার। চৌতাল

শ্যাম ঘন ঘনশ্যাম উমড় ঘুমড় আয়ো।

মন্দ মন্দ মুরলি তান

গগন ঘোর ঘহরাই॥...

(৪)

পারে তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিষ্ণু

তুঁহি শেষ তুঁহি মহেশ।

তুঁহি আর তুঁহি অপার

তুঁহি নাদ তুঁহি গণেশ॥...

ইত্যাদি

এদিকে সুবিশাল সিলেবাস। কাজে কাজেই, বাজারের সিওর সাকসেস বা মেড-ইজির সাহায্য না নিলেই নয়। অধ্যাপক মজুমদার এসব সস্তা ধরনের নোট বইয়ের বিরোধিতা করলেও সুবিশাল সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। অথচ এটাও একটা গ্রেট ফ্যাক্টর। কলেজে যে কটা দিন পড়ানো হয়, তাতেও কি সিলেবাসের একের তৃতীয়াংশও কভার করে—?

পরিশেষে আমার বক্তব্য, এইভাবে টানা হেঁচড়ার মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রীখানি লাভ করার পর ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিকভাবেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছা হয়। মনে হয় এবার নিজে উপার্জন করে সংসারের দারিদ্র্য মোচন করবো। অভিভাবকরাও বোধ হয় তাই চান। কিন্তু কাজ চাইলেই কি কাজ পাওয়া যাবে? হাজার হাজার বেকার ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যেই চাকরির দরখাস্ত হাতে নিয়ে অফিসে অফিসে লাইন লাগিয়েছে। তাহলে বুঝুন এবার অবস্থা! আর যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর আর্থিকসঙ্গতি একটু ভালো তারা নিজেদের ডিগ্রীটাকে আর এক ধাপ বাড়িয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসে। কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎও কি খুব উজ্জ্বল? গতবার ইডেন টেস্ট ম্যাচের সময় যে সমস্ত এম এ পাশ যুবক চায়ের দোকান দিয়েছিলেন, তাঁরা কি কোনও দিন এ ধরনের কাজ করতে হবে স্বপ্নেও ভেবেছিলেন? কিন্তু এদের কথা আজ কে ভাবে?

অন্যের কথা জানি না, নিজের তো মনে হয় এম এ পাশ করার পরও যদি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো ছোটখাটো কোন সুযোগই না-মেলে তাহলে চাই না এ সমাজ। আসুক বিপ্লব। আসুক একটা বিরাট পরিবর্তন। [illegible] সত্যিই ভারতবর্ষ যেখানে [illegible] মন-প্রাণে বলতে পারবো—আমি [illegible] হবো, আমি ডাক্তার, [illegible] একজন নির্ভীক, নিরপেক্ষ সাংবাদিক।

বলতে পারেন, সত্যিই কি এ রকম দিন কখনও আসবে?

অশোককুমার চক্রবর্তী
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পাখির চোখ

গত ১৪ই নভেম্বর শ্রীযুক্ত নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের 'পাখির চোখ' গল্পটি পরিবেশন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বর্তমান সমাজে যুব শক্তির যে অপচয় ঘটে চলেছে এবং সেই অপচয় ঘটার কারণটিও যে কোথায় তার ইঙ্গিত গল্পটিতে সুস্পষ্ট। কুন্তল-এর মত শিক্ষিত বেকার তরুণদের তাজা বুকের রক্ত কিভাবে দেশের মাটিকে সিক্ত করছে তাতো আমরা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠছি। শিক্ষিত বেকার তরুণেরা ধিক্কৃত জীবন নিয়ে বিপর্যস্ত। দেশের অধিকাংশ নেতারা ভোট ক্যানভাসের জন্যে দেশের তরুণ শক্তির একটা বড় অংশকেই নিজেদের স্বার্থে লাগায় টাকা আর চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে। ভোট ফুরিয়ে গেলে সেই তরুণেরা হয়ে পড়ে অপাংক্তেয়। কিন্তু তরুণদের মধ্যে যে বিষ তারা (নেতারা) দিয়ে যায় তার ফলেই ঘটতে থাকে পারিবারিক সংঘর্ষ। এক তরুণ আর এক তরুণকে হয়তো কোন রেষারেষির কারণে হনন করতে দ্বিধা করে না। কুন্তলদের মত সরল-স্বভাব শিল্পীরাও বোমা তৈরি করতে গিয়ে অপমৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়।

'পাখির চোখ' গল্পটিতে আজকের সমাজের তরুণ শক্তির অবক্ষয়ের একটা দিক তুলে ধরা হয়েছে। দেশের তরুণদের কাছে এই অখ্যাত সাহিত্যসেবীর বিনীত অনুরোধ—তারা পরস্পর হনন-ক্রিয়া থেকে বিরত হয়ে, সমস্ত তরুণ শক্তির সম্মিলন ঘটিয়ে, একত্রে সকল অনাচার, অত্যাচার আর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাঁদের রক্ষার জন্যে দেশের সকল মানুষকেও সহায়তা করার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। না হলে, কুন্তলের বোমার আর এক কুন্তলের মৃত্যু পশ্চিম বাংলার বিপর্যয়কেই ত্বরান্বিত করে তুলবে।

সলিল মিত্র
পলাশী।

এ বছর তাঁর বয়েস ষাট বছর পূর্ণ হলো। এই উপলক্ষে তাঁকে একটি সম্বর্ধনা জানাবার প্রস্তাব করা হয়েছে, এবং সেই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী থেকে শুরু করে বাংলা দেশের অতি তরুণ কবি পর্যন্ত অনেক সুধীজন। তাঁর কাব্যগ্রন্থাদি প্রকাশ ও এষা পত্রিকায় মানোন্নয়নের জন্য বাংলা কবিতায় অনুরাগীদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্যও চাওয়া হয়েছে। আবেদনপত্রে আছে, "সহৃদয় দেশবাসীর কাছে আমাদের নিবেদন, তাঁরা যেন এই উদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে এবং সাধ্যমত সাহায্য দান করে এই জনপ্রিয় কবির কাব্য সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।" সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা : রেণুকা ঘোষ, ২ মদ ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা-২৬।

প্রভাত সাইকেল স্টোর্স

বিমল মুখোপাধ্যায় জন্মেছিল ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে, দু' বছর আগে ডিসেম্বরের একটি দিনে সে মারা গেছে। বাড়ির সামনের দিঘিতে একটা সাঁতার প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। উৎসাহী দর্শকদের মধ্য থেকে সে-ও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে সাঁতারে কৃতী ছিল, কিন্তু ডিসেম্বরের শীতে পুকুরের জলে তার হাত পা জমে যায়, সে আর পুকুর পার হতে পারে নি, সে ডুবে যায় গহন জলে।

বিমল দরিদ্র পরিবারের ছেলে ছিল। পূর্ব বাংলা থেকে বাড়ি ঘর ছেড়ে তারা আশ্রয় নিয়েছিল হুগলীর ডানকুনি গ্রামে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। অদম্য উৎসাহ ছিল, কষ্টের মধ্যে দিয়েও লেখাপড়া চালিয়ে বি এ পাস করে। সে ছবি আঁকতো, গান গাইতো, সে ছিল প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

কলকাতার মেট্রোপলিটন স্কুলের শাখায় সে অস্থায়ী শিক্ষকের একটি পেয়েছিল। অস্থায়ী চাকরিকে করার জন্য সে আন্দোলন করে, করে রাজ্যপালের সঙ্গে। জানুয়ারী থেকে তার চাকরি পাকাও হয়ে যায়, কিন্তু সেই পাকা চাকরি ভোগ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। সে জলে ডুবে মরে গেল অকস্মাৎ।

এটা শিরোনামের উপন্যাসটির কাহিনী নয়, এটা ঐ উপন্যাস লেখকেরই জীবনী। বিমল মুখোপাধ্যায় খুব অল্প বয়েস থেকেই লিখতো, অনেক জায়গাতে ছাপাও হয়েছিল। প্রভাত সাইকেল স্টোর্স, বিমল মুখোপাধ্যায়ের ১৬ বছর বয়েসে লেখা উপন্যাস। এই উপন্যাস সে প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করছিল, কিন্তু মুদ্রিত রূপ দেখে যেতে পারেনি।

উপন্যাসটি পড়লে নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, একজন প্রতিভাবান লেখককে বাংলা দেশ হারিয়েছে, এটা একটা নিশ্চিত ক্ষতি। মফঃস্বলে একটি ছোট্ট সাইকেল সারানোর দোকানকে ঘিরে এর কাহিনী, দোকানের মালিক, তার রুগ্ন বউ, বারো বছরের মেয়ে, পাশের দোকানদার এই সব গরীব দুঃখী মানুষ—অসহায় অবস্থার মধ্য থেকেও তাদের উজ্জ্বল জীবনের স্বাদ পাবার বাসনা—এই সব খুব নিপুণ ভাবে ফুটে উঠেছে। চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা দেখলেই বোঝা যায়, এই লেখক এক সময়ে আমাদের নিশ্চয়ই অনেক মহৎ কিছু উপহার দিতে পারতেন। বাংলা সাহিত্য একজন সত্যিকারের ক্ষমতাবান লেখকের রচনা থেকে বঞ্চিত হলো।

সনাতন পাঠক

পরিচালক : সমীর লাহিড়ী, আবহ-সংগীত পরিচালনা : নিতাই ঘটক, দৃশ্য পরিকল্পনা : অনিল দাস ও আলোক পরিকল্পনা শচীন ভৌমিকের। নাটক শুরুর আগে সংস্কৃতে ডঃ রমা চৌধুরী রচিত 'বিদ্যাসাগর বন্দনা' খুবই হৃদয়গ্রাহী হয় সুর ও ছন্দবৈচিত্র্যে।

—দিবাকর বর্মা

বোম্বাই বিচিত্রা

গত সপ্তাহে এক মধ্যবয়স্ক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে করে আমার কাছে উপস্থিত। সাত সকালে এমন অতিথি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। তবুও ভদ্রতার খাতিরে ভদ্রলোকদের আদর করে বসালাম। ভদ্রলোক আমার স্বর্গীয় পিতার পরিচিত। তারপর যখন আরো একটু খুলে বললেন তখন মনে হল ওঁকে আমিও চিনি। উনি একজন লোহার ব্যবসায়ী ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, তারপর পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় আমাদের এলাকার রেশনের দোকানও ছিল ওঁর। সম্ভবত সেই সূত্রেই আমার বাবার সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় হয়ে থাকবে। কারণ কোন লোহার ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার বাবার পরিচয় থাকবার কথা নয়। যাই হোক সে সব পুরনো কথা। গত এক যুগ যাবত ভদ্রলোক বোম্বাইবাসী। বাংলা দেশ কালক্রমে যে অবস্থায় পৌঁছেছে সেই অবস্থাতে যে পৌঁছোবে সেটা এই দূরদর্শী অবাঙালী ব্যবসায়ী-ভদ্রলোক নাকি অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন এবং সেইজন্যেই তাঁর ব্যবসার বস্তা সুদূর বম্বেতে বয়ে এনে এখানেই তার মুখ খুলে দিয়েছেন। হু হু করে বিস্তার হচ্ছে। বম্বের বিভিন্ন এলাকার এখন ওঁর পাঁচটি হোটেল। বাইশটা ফ্ল্যাট। পঁয়ত্রিশটা লরী। সাতটা ট্যাক্সী। এ ছাড়া আর একটা ব্যবসা আছে যেটার কথা উনি আর সবাইকে বলেন না, আমি নেহাত ঘরের লোক বলে বললেন। এত কথার পরও আমি বুঝতে পারলাম না ভদ্রলোক আমার কাছে কেন এসেছেন। ওপর ওপর কথা হচ্ছে আর ভেতর ভেতর আমার মাথায় ঐ প্রশ্নটা ঘুর ঘুর করছে। ভদ্রলোক ঠিক বুঝে ফেললেন এবং একটু হেসে বললেন "আপনি হয়তো ভাবছেন এই সাত সকালে আপনার কাছে আমরা কেন এসেছি?" আমি উত্তর দিতে পারার আগেই ভদ্রলোক আবার বললেন, "দেখুন পয়সা কড়ি তো অনেক করা গেল, এবার একটু পরিচিত হতে চাই।" মনে মনে ভয় পেয়ে গেলাম, লেখক কে জীবনী-টিবনী লিখতে বলবেন না তো। তবু মুখে কিছু না বলে শুধু একটু হাসলাম। উনি বললেন, "আপনার হয়তো মনে আছে উনিশশ পঞ্চান্ন সালে একবার ইলেকশন লড়েছিলাম কিন্তু রাজনীতি আমার ঠিক সইলো না, ওখানে সব নেমকহারাম, আমার কাছ থেকে পয়সা নিলো আর অন্যকে ভোট দিয়ে আমাকে হারিয়ে দিল!" আমি বললাম, "হ্যাঁ রাজনীতিটা সকলের ধাতে সয় না!" ভদ্রলোক বললেন, "দেখুন, রাজনীতির পরেই নাম করার সবচেয়ে ভাল লাইন হল ফিল্মের লাইন, এই যে আমার ছেলে দেখছেন, একে আমি ফিল্মের হিরো বানাতে চাই, যদিও একটু মোটা আছে, কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেলেই স্লিম হয়ে যাবে। দেব আনন্দকে যে লোকটা মালিশ করে তাকে গত মাস থেকে লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মালিশওয়ালা দেব আনন্দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে বলে আজ তিন সপ্তাহ ঘোরাচ্ছে। হঠাৎ কাল রাত্রে আমার আপনার কথা মনে হল, তাই চলে এলাম। আপনি একটা উপায় বাতলে দিন। টাকার আমার অভাব নেই, সির্ফ আমার ছেলেটাকে হিরো বানিয়ে দিতে হবে, আর আমার নাম করিয়ে দিতে হবে, টাকা যত লাগবে আমি ঢালব।" আমি বললাম "তার মানে আপনি ছবি প্রডিউস করতে চান!" ভদ্রলোক বললেন, "ওসব আমি জানি না, টাকা ফেলে যা যা করা যায় সব করতে চাই, আপনি শুধু আমাকে কিছু লোক জোগাড় করে দিন যারা আমাকে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে সাহায্য করবে।" আমি বললাম, "আপনি এক কাজ করুন, প্রথমে কয়েকটা সিনেমা হাউস বানিয়ে নিন, তারপর একটা ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী খুলুন, তারপর..." ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে উঠলেন, ওসবে অনেক সময় লেগে যাবে, আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে আমি আর তিন বছর মাত্র বাঁচবো—যা কিছু করতে হবে তারই মধ্যে করতে হবে।" বললাম "তাহলে এক কাজ করুন, ভারতবর্ষের যে কজন নাম করা পরিচালক আছেন তাদের সকলকে দিয়ে একটা একটা করে ছবি করান, একটা না একটা স্টেট আওয়ার্ড পাবেই, একটা না একটা ভেনিসে যাবেই..." এতক্ষণে ভদ্রলোকের পুত্র, ভাবী নায়ক মুখ খুললেন, "না বাবা, ওসব কাজে হাত দিও না, তাহলে আমার হিরো হওয়া হবে না। ঐ নামকরা ডিরেক্টররা কারুর কথা শোনে না।" ভদ্রলোক বললেন, "তাছাড়া ও পলিসিটাও ঠিক নয়। সেই তো এক ভদ্রলোক বাংলা দেশে এক সঙ্গে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং তপন সিংহকে নিয়ে একসঙ্গে তিনটে ছবি বানিয়েছিলেন, সুতরাং ওসব ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই, আপনি একটা প্রাকটিক্যাল সাজেসসন দিন।' বললাম, 'তাহলে বরং আপনি ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের মত একটা ফিনান্স করপোরেশন খুলে ফেলুন, দেখবেন সবকিছু অমনি হয়ে যাবে।" ভদ্রলোক বললেন, "আপনি বুঝতে পারছেন না, আমার টাকার বেশীর ভাগই কালো টাকা, ওসব করা যাবে না।" বললাম, "তবে আর কি, আপনি কোনো ফিনান্স ব্রোকারকে ধরুন, সেই সব ঠিক করে দেবে।" ভদ্রলোক চটে গেলেন, ব্রোকারই যদি সব ঠিক করে দিতে পারত তাহলে আপনার কাছে আসা কেন, দু-একজন নাম করা লোক আমার সঙ্গে কুটিয়ে দিন তারপর দেখুন আমি সব নিজেই করে নেব!' ভদ্রলোককে কয়েকজন নামকরা লোকের ঠিকানা দিয়ে দিলাম। যাবার আগে ভদ্রলোক বলে গেলেন "ভেবেছিলাম আপনার একটু উপকার করব, সেটা আর করতে দিলেন না!' নমস্কার!"

সরল শর্মা

'নিমন্ত্রণ' ছবির শ্যুটিং-এ অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার

লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান। শ্রীশংকর চ্যাটার্জি পরিচালিত এই অনুষ্ঠানটি এদিন এক মনোরম পরিবেশ

মাদ্রাজে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ, ফালকে পুরস্কার বিজয়িনী শ্রীমতী দেবিকারাণী, তাঁর স্বামী শ্রীরোয়েরিখ ও 'দিবারাত্রির কাব্য' চিত্রের অন্যতম পরিচালক শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

সৃষ্টি করেছিল। শিল্পী সংঘের শিল্পীদের কণ্ঠে গীত সংগীত সুধারসকে অনুভব করে তুলেছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সাধনা গুহ, পাল গুহ, স্বাতী সেন, শম্ভু ভট্টাচার্য প্রমুখ তাঁদের নৃত্যাভিনয়ে।

একটি পেশাদার নৃত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে সমতা রক্ষা করে সংগীত পরিবেশনে এই অপেশাদার সংগীত গোষ্ঠী (শিল্পী সংঘ) যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একক সংগীতশিল্পী হিসাবে কৃষ্ণা দত্ত, দিলীপ বিশ্বাস, শ্যামগোপাল মুখার্জি সার্থক।

শপথ নিলাম

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও কর্মসাধনা নিয়ে তৈরি 'শপথ নিলাম'। শচীন অধিকারী ছবিটির পরিচালক। সমিত ভঞ্জ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, মঞ্জিলা দেবী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, ভাস্কর চৌধুরী, নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্তা প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী। সুকুমার মিত্র ছবির সংগীত পরিচালক।

"লবণাক্ত" অভিনয়

বিশ্বরূপা থিয়েটারে মেটকো রিক্রিয়েশন "লবণাক্ত" নাটকটি অভিনীত হয়। পরিচালনা করেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়। সুষ্ঠু পরিচালনায় ও শিল্পীদের সুন্দর সমষ্টিগত অভিনয়ে নাটকটি দর্শকদের বিশেষ ভাবে ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক পৃথ্বীশ সরকারের মুগ্ধ করে। অভিনয়াংশে পীযূষ দাশগুপ্ত, কার্তিক ব্যানার্জি, পান্নালাল অধিকারী ও

উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন সুভাষ ঘোষ, প্রবাল দাস, অমরেন্দ্র রায়, দেবকুমার মুখার্জি, অজন্তা চৌধুরী ও বিশাখা গোস্বামী।

"জননী" সমাপ্তির পথে

জাতীয় সংস্কৃতির পরিবেশনায় "জননী"র চিত্রগ্রহণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। "জননী"র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী নিজে। জননীর চরিত্রে আছেন সুলোচনা চ্যাটার্জী। আর যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা হলেন সুলতা চৌধুরী, দিলীপ চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, কালী ব্যানার্জী, সত্য ব্যানার্জী, অজিত চ্যাটার্জী, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, সমিত ভঞ্জ ও রত্না ভাদুড়ী। শ্যামল মিত্র এই ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

জীবন জিজ্ঞাসা

বি এম ডি মুভীজ-এর পরবর্তী ছবি ("জীবন-মৃত্যু"র পর) "জীবন জিজ্ঞাসা"। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী ছবির নায়ক-নায়িকা। পীযূষ বসু ছবিটি পরিচালনা করছেন। চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। সুলতা চৌধুরী ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছবির দুটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্যামল মিত্র।

থিয়েটার ওয়ার্কশপের নতুন নাটক

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার ওয়ার্কশপ তাঁদের নতুন প্রযোজনার জন্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নির্বাচন করেছেন। 'গিনিপিগ' নামে প্রকাশিত এই নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন বিভাস চক্রবর্তী। প্রথম অভিনয় আগামী ২৫শে

অরণ্যদেব
লী ফক

আরে, এরা আবার কারা?
সলোমন আর নেফারতিতি। শুশুক। খুব বুদ্ধিমান প্রাণী।
ওরেব্বাস, এত বড় মাছ?

!!

বলো কী! আজব ব্যাপার!
ওই দ্যাখো, সলোমন কেমন লাফ মারছে। অন্যটার নাম নেফারতিতি।
এ নাম রেখেছ কেন?

সলোমন নাম রেখেছি বুদ্ধি দেখে, আর নেফারতিতি নাম রেখেছি সৌন্দর্য দেখে।
চলো, ওদের পিঠে চড়ে বসা যাক।
এ যে দারুণ মজা!

চেপে বসো।
কী মজা!
আরেব্বাস!

নদী পার হয়ে শুশুকরা গিয়ে খাঁড়িতে ঢুকছে!
!
!
4/19

স্বর্গ-দ্বীপের বাসিন্দারা অরণ্যদেবকে দেখে দারুণ খুশী!
গরর্, গরর্, গরর্-

২

Brooke Bond Tea
Red Label
Brooke Bond Tea

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এর কারণ, কাপড়চোপড় পরিষ্কার করতে স্পা অনেক বেশী শক্তিশালী। এর গাঢ় ফেনায় ময়লা কেটে যায়! যেসব ময়লা দাগ কিছুতেই উঠতে চায় না, তা'ও পরিষ্কার হয়ে যায়—এমন কি খরজলে কাচলেও।

সত্যি তাই। ঘরে ঘরে গিন্নিরা দিন-দিনই দেখছেন যে স্পা-ই একমাত্র শক্তিশালী পরিষ্কারক, যা দিয়ে খরজলে কাচলেও কাপড়চোপড় অনেক বেশী পরিষ্কার ধবধবে হয়। এর কারণ, স্পা বিশেষ উপাদানে তৈরী। তাই তো, স্পা-র ওপর সবার এত ঝোঁক! আপনিই বা বাকী থাকবেন কেন?

স্পা

—এই শক্তিশালী ওয়াশিং পাউডারে
জামাকাপড় সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়

KPS 8033A

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৭
শনিবার ৩ পৌষ ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২০

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 19 Dec. 1970.

পাকিস্তানের নির্বাচন

অনেক অনিশ্চয়তার পর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছে। মাত্র নয়টি কেন্দ্র এবং মহিলাদের কয়েকটি আসনের কথা বাদ দিলে নির্বাচনের সব কটি আসনের ফলও প্রকাশ পেয়েছে। যে নয়টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি সেই এলাকাগুলি পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘূর্ণি-ঝড় এবং সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে আপাতত নির্বাচন কোনো মতেই সম্ভব নয়। পাকিস্তান গণ-পরিষদে মহিলাদের জন্যে তেরোটি আসন সংরক্ষিত রাখা আছে, যদিও এই আসনের নির্বাচন প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ; অর্থাৎ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মনোনয়নেই এই আসনগুলি পূর্ণ হবে। সে হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সাতটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ছয়টি আসন এখন পর্যন্ত ফাঁকা আছে। পাকিস্তান গণ-পরিষদের মোট তিনশো তেরোটি আসনের মধ্যে উল্লিখিত বাইশটি আসনের কথা বাদ দিলে মোট দুশো একানব্বইটি আসনের যে ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যায়, পাকিস্তানের দু প্রান্তে দুই নেতা ও তাঁদের দল অসামান্য সাফল্য লাভ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর জাতীয় আওয়ামী লীগের জয়-জয়াকার, তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের একশো তিপ্পান্নটির মধ্যে একশো একান্নটি আসনে জয়লাভ করেছেন। অন্য দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিরাট সাফল্য লাভ করেছেন জনাব জেড এ ভুট্টো ও তাঁর পিপলস পার্টি। এঁরা পেয়েছেন বিরাশীটি আসন। এই দুটি রাজনৈতিক দলের সাফল্যের কথা বাদ দিলে আরও যে কুড়ি বাইশটি দল নির্বাচনী আসরে নেমেছিল তাদের মধ্যে অনেকের ভাগ্যেই একটি আসনও জোটে নি, কেউ কেউ দু পাঁচটি পেয়ে গেছেন। মুসলিম লীগের ব্যর্থতা অবিশ্বাস্য।

এই নির্বাচনের ফলাফল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও ভারতীয়রা কীভাবে গ্রহণ করছে সেটা অবশ্য উল্লেখ করতে হয়। শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগের সাফল্য আমাদের নিশ্চয় আনন্দের কারণ, বিশেষত বাঙালীদের। যদিও পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা আজ দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত তবু এই দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বহুকালের যে সম্বন্ধ, আত্মীয়তা, বাঙালিত্ব বোধ তার অনুভূতি এখনও মরে যায় নি। শেখ মুজিবর পূর্ব পাকিস্তানকে বাঙালীর অহংকার হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা ও সুযোগ সন্ধানীদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষার জন্য তিনি এবং তাঁর দল দীর্ঘকাল কঠিন সংগ্রাম করে আজ জয়লাভ করেছেন। আমাদের আনন্দিত না হবার কোনো কারণ তো নেই। অন্যদিকে জনাব ভুট্টোর দলের জয়লাভে আমরা নিশ্চয় স্বস্তি অনুভব করতে পারছি না। পাক-ভারত যুদ্ধের সেই স্মৃতি আজও আমাদের মনে আছে; মনে আছে ভুট্টো-সাহেবের ভারত-বিরোধিতার কথা। এখনও মাঝে মাঝে তাঁর মুখে ভারত-বিদ্বেষের কথা শোনা যায়। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, তিনি এবং তাঁর দল পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ প্রধান শক্তি। এই শক্তিকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। অন্য দিকে পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবর-সাহেব এবং তাঁর আওয়ামী লীগকেই বা বাতিল করবে কে, কোন সাহসে? মুজিবর-সাহেব ভারতবিদ্বেষী নন, দুই বাংলার সম্প্রীতি এবং বন্ধুত্বে তিনি বিশ্বাসী। স্বভাবতই, আমরা, যারা পাকিস্তানের—বিশেষত পূব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী—তারা আজ আশান্বিত হয়ে উঠবো। পাক-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক ও সরল হোক—এ প্রার্থনা কে না করে! কিন্তু সে আশা কি সফল হবে? পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফল থেকে আপাতত স্পষ্ট কিছু অনুমান করা যায় না। একদিকে শ্রীমুজিবর, অন্যদিকে শ্রীভুট্টো; দুই নেতার এবং তাঁদের দলের মনোভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। এক্ষেত্রে কী অবস্থা হবে? কী করে সরকার গঠিত হবে বা প্রশাসন চলবে! অবশ্য, দুই নেতা ও দলের মধ্যে সমঝোতা না হলে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান তো আছেনই। তাঁরই হাতে এখন পর্যন্ত সব কিছু নির্ভর করছে। জানি না, তাঁর মনে কী আছে। তবে, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসক গোষ্ঠি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন—পূর্ব পাকিস্তানকে আর নিছক শাসন দিয়ে সামলানো যাবে না; তার দাবির অনেকটাই পূরণ করতে হবে। মুজিবরসাহেব কিংবা আওয়ামী লীগকে ছলে বলে ভুলিয়ে রাখা আর কী সম্ভব হবে! মনে হয় না।

চোখ খুলবে কি?
নির্বাচনী
ইশ্‌তাহার

[সিন্ধবাদ নাবিকের নবতম ভ্রমণ বৃত্তান্ত]

বাগদাদ নগরীর কফিখানায় শীতের কবোষ্ণ মধ্যাহ্নে বসিয়া কফি খাইতে খাইতে নাবিক সিন্ধবাদ অন্য একজন নাবিকের মুখ হইতে এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন।

উক্ত নাবিক সিন্ধবাদকে কহিলেন, হে নাবিকশ্রেষ্ঠ সিন্ধবাদ আমি এইবার ইংলনড ভ্রমণে গিয়া এমন এক আজব চীজ দেখিয়া আসিয়াছি, যাহা আপনার অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতাকেও হার মানায়। যদি অনুমতি করেন তবে ওই কাহিনী বলিতে পারি।

নাবিক সিন্ধবাদ কফির পেয়ালায় চুমুক মারিয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! ভ্রাতঃ, আপনি স্বচ্ছন্দে উহা বিবৃত করুন। বৃথা বিলম্বে কাজ কী?

নাবিক সিন্ধবাদের এতাদৃশ উদারতায় মুগ্ধ হইয়া উক্ত নাবিক কহিতে লাগিলেন মহাত্মন, এইবার আমাদের জাহাজ নানাবিধ পসরা লইয়া ইংলনড নামক এক মহাদ্বীপের উপকূলে গিয়াছিল। ঐ দ্বীপটি খুবই সমৃদ্ধ এবং কাফেরদিগের বাসভূমি। উহাদিগের রাজা নাই। গদীর মালিক এখন এক রানী। কিন্তু রাজ্য শাসনে রানীর কোনও এখতিয়ার নাই। প্রজাগণ কাজকর্ম করে মদ খায়, হারাম খায়, উহাদের বিবিগুলি খুবই খাপসুরৎ কিন্তু উহারা বিবিদিগকে বে-আব্রু করিয়া রাখে আর কয়েক বৎসর পর পর হাত তুলিয়া রাজ্য শাসন কারবার উপযুক্ত আমীর ওমরাহ উজীর নাজির নির্বাচন করে। যাহা হউক, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ে উহারা বড়ই লায়েক। ওই দেশের নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে ম্যানস্টন শহরে একদিন উপস্থিত হইলাম। ওই শহরে ঘুরিতে ঘুরিতে এক পশু বিক্রেতার দোকানে দেখি খুব ভিড়! দলে দলে লোক আসিয়া তথায় জড় হইতেছে। শহরের তামাম লোক হাজির। আমার খুব কৌতূহল হইল। ভিড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে সামনে গিয়া দেখি, পশু বিক্রেতা এক আজব জানোয়ার পয়দা করিয়াছে। ওই জানোয়ারের মাথাটা কুকুরের মত, কিন্তু উহার মুখে বিড়ালের মত গোঁফ আছে। গায়ের রোঁয়াও বিল্লীর মত এবং পায়ের থাবাও তাহাই। উহার নাম শুনিলাম "কুড়াল" বা "কুল্লি" অর্থাৎ কুত্তার "কু" আর বিল্লির "ল্লি"।

এই পর্যন্ত বলিয়া উক্ত নাবিক একটু থামিলেন তারপর সিন্ধবাদকে কহিলেন, তারপর যখন শুনিলাম, ওই পশু বিক্রেতাই আপন কুদরতে কুত্তার সহিত বিল্লির পাল খাওয়াইয়া এই কুল্লি হাসিল করিয়াছে তখন আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কেয়া তাজ্জব!

এই পর্যন্ত বলিয়া উক্ত নাবিক আবার

থামিলেন এবং বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে কাটিয়া গেলে সিন্ধবাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন! খোদার জাহানে মানুষের এইরূপ খোদকারি আপনি কি কখনও দেখিয়াছেন?

নাবিকের এই অত্যাশ্চর্য বিবরণ শুনিয়া নাবিক সিন্ধবাদ স্মিত হাস্য করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আল্লা রসুলের কেরামতির অন্ত কে দেখিতে পায়? আসমানের উপর আসমান আছে তাহার

উপরেও আসমান কে তাহার অন্ত দেখিতে পায়? সেইরূপ খোদার সৃষ্ট মানুষের খোদকারির শেষও কেহ দেখিতে পায় না। তোমার কাহিনী সত্যই আশ্চর্য। কিন্তু এই দুনিয়ায় আমি উহা অপেক্ষা আরও এক আজব চীজ দেখিয়াছি। তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নাবিক সিন্ধবাদ অতঃপর তাঁহার সাম্প্রতিক দেশভ্রমণের অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা কহিতে লাগিলেন। তোমরা সকলেই জান, আমি এবার হিন্দুস্তান ভ্রমণে গিয়াছিলাম। কলিকাতা বন্দরে আমাদের জাহাজ নোঙর করিবার পর দিন হইতে ওই বন্দরে ধর্মঘট শুরু হইল এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ জানাইলেন, ধর্মঘট না মিটিলে আমাদের জাহাজ বাহির হইতে পারিবে না। তাই সেই সন্ধ্যায় শহর দেখিতে বাহির হইলাম। এ পথে সে-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় হাজির হইয়াছি এমন সময় চার-পাঁচটি কিশোর একেবারে জিনের মত যেন মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইল এবং ছুরি বাহির করিয়া আমার পেটে পিঠে ঠেকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, এই ব্যাটা কোতোয়ালের চর, ইহাকে ফাঁসাইয়া দে। আমি যত বলি, আমি নাবিক সিন্ধবাদ, বিদেশী পর্যটক, কোতোয়ালের চর নহি। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? উহারা আমার পেট ফাঁসাইতে বদ্ধপরিকর। একজন কহিল, বিদেশী যখন, তখন তুমি আলবৎ সি-আই-এ'র চর। তোমাকে মরিতেই হইবে। তখন অগত্যা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আল্লা রসুলের স্মরণ লইলাম। অমনি সেইস্থলে কোতোয়ালের বাহিনী আসিয়া গেল। এবং আততায়ীরা তৎক্ষণাৎ শূন্যে মিলাইয়া গেল। অতঃপর কোতোয়ালের বাহিনীর সর্দার এই ব্যাটা আলবৎ নকশাল। ব্যাটাকে গেরেফতার কর' বলিয়া হুকুম দিল। এবং আমাকে তাহারা কয়েদ করিল। আমার পরিচয় তাহারা গ্রাহ্যই করিল না। কয়েদখানা নকশাল বন্দীতে ভর্তি ছিল বলিয়া আমাকে সেই রাতে তাহারা কয়েদখানার উঠানে ছাড়িয়া দিল। আমি তখন এই আজব দেশ হইতে মুক্তির পথ কী, তাহা ভাবিতে বসিলাম। হঠাৎ দেখি অন্ধকার কোণে একটা রকপাখির বাচ্চা ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া উড়িবার চেষ্টা করিতেছে। কোতোয়ালের লোকের উহাকে বোমা ভাবিয়া তুলিয়া আনিয়াছিল। আমি বাচ্চাটিকে উড়িতে দেখিয়াই এক লাফে উহার এক ঠ্যাং চাপিয়া ধরিয়া সেই মসীকৃষ্ণ রাত্রির আঁধারে শূন্যে ভাসিলাম। কতক্ষণ উড়িয়াছিলাম জানি না। এক সময় হাত ফসকাইয়া গেলে পড়িয়া গেলাম। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আমি এক ভারি জমায়েতের ভিতর বসিয়া আছি। পাশের একজন বলিল, ভ্রাতঃ! ভাষণ শেষ হইয়াছে। এবার ভোট। হাত তুলিতে হইবে। আর ঘুমাইয়ো না। দেখিলাম, তৎক্ষণাৎ সকলেই জাগ্রত হইল এবং হাত উঠাইল। মঞ্চ হইতে একজন ঘোষণা করিলেন, আমাদের রাজনৈতিক প্রস্তাবের বিপক্ষে মাত্র সাত ভোট পড়িয়াছে এবং স্বপক্ষে অধিকাংশের ভোট। অতএব প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। তাহার পর খানাপিনার অবসর খাইতে খাইতে শুনিলাম, আমি লখনউ নামক এক শহরে আসিয়া পড়িয়াছি এবং এই জমায়েত আদি কংগ্রেস নামক একটা দলের জমায়েত। উহারা হিন্দুস্তানের সমাজবাদী রানীকে হটাইয়া দিতে চায়। এই আদি দলের নীতি নাকি সমাজবাদ এবং গণতন্ত্র। এবং ইহারা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। কিন্তু রানীকে হটাইবার জন্য ইহারা এমন দুই দলের সঙ্গে মিতালী করিতে চায় যাহাদের একজন অর্থাৎ স্বতন্ত্র দল সমাজতন্ত্র মানে না এবং অন্যের অর্থাৎ জনসংঘের সেকুলারিজমে আস্থা নাই। তাই ইহারা একটা "কুল্লি" রাজনৈতিক প্রস্তাব পাস করাইয়া লইল। প্রস্তাবের মাথা এবং লেজটা সেকুলার-সমাজবাদী-গণতন্ত্রের মত। কিন্তু মুখে জনসংঘের গোঁফ এবং গায়ের রোঁয়া এবং পায়ের থাবা স্বতন্ত্র দলের। ভ্রাতঃ! তাই বলিতেছিলাম আল্লার দুনিয়ায় মানুষের খোদকারি তাজ্জবের হদিশ কে কহিতে পারে?

অবশেষে সিদ্ধান্ত

নবাট অধিবেশনে আদি কংগ্রেস নিজেদের অনিশ্চয়তা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

ভাল হোক, মন্দ হোক, আদি কংগ্রেস এতদিন পরে একটা লাইন নিয়েছে। তাঁরা যে জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি প্রভৃতির সঙ্গে আঁতাত করবেন এতদিন পরে তা মোটামুটি নিশ্চিত করে বলেছেন। দলের ভেতরে এখনও অবশ্য এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দল মোটামুটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নব কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি প্রভৃতির সঙ্গে ঐক্য করা হবে।

আদি কংগ্রেস অবশ্য এই সঙ্গে এস এস পি প্রভৃতি ইন্দিরা-বিরোধী দলের সঙ্গেও আঁতাত করতে উৎসাহী। কিন্তু যেহেতু এস এস পি সঙ্গে সি পি এমকে নেওয়ার ব্যাপারেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সুতরাং শেষ পর্যন্ত আদি কংগ্রেসকে এস এস পির আশা ছাড়তেই হবে। আদি কংগ্রেস নেতারা আর যাই করুন সি পি এমকে সঙ্গে নিতে পারবেন না। সি পি এমও তাঁদের সঙ্গে যাবে না। অবশ্য একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরল ছাড়া আর কোথাও সি পি এমের তেমন কোনও প্রভাবও নেই।

আদি কংগ্রেস, জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির জোটে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রান্তি দল যাবে কিনা সেটা প্রধানত নির্ভর করবে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভার ভবিষ্যতের উপর। যদি চরণ সিং উত্তরপ্রদেশে আদি কংগ্রেস এবং জনসংঘের ক্রিয়াকলাপকে সন্তোষজনক বলে মনে করেন তাহলে তিনি ক্রান্তি দলকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে এঁদের সঙ্গে হাত মেলাবার অনুমতি দিতে পারেন। ক্রান্তি দল, জনসংঘ এবং আদি কংগ্রেসে জোট হলে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের জোট দুটিতে তার যথেষ্ট প্রভাব পড়বে।

অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি যে কোন দিকে যাবে এখনও বলা মুশকিল। যেমন, উড়িষ্যায় হরেকৃষ্ণ মহতাবের দল অথবা বিজু পট্টনায়েকের পার্টি। অথবা মহারাষ্ট্রের শিব সেনা, বা [illegible] নানা আঞ্চলিক দল। আকালি পার্টি, ডি এম কে, বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি যে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রীর দিকেই থাকবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কামরাজ যতক্ষণ আদি কংগ্রেসে থাকছেন এবং যতক্ষণ আদি কংগ্রেসই মাদ্রাজে তাঁদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ততক্ষণ ডি এম কে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নব কংগ্রেস অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীকেই সমর্থন করবে।

সর্বভারতীয় দলগুলির মধ্যে সি পি আই আনুষ্ঠানিকভাবে নব কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেলেছে। সি পি আই এখনও প্রধানমন্ত্রীরই সমর্থক। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের দূরে ঠেলে না দিলে বা জাতীয় পর্যায়ে তাঁদের হাতে বেশী লোকসভার [illegible] মত কিছু না করলে সি পি আই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে থাকবেও। তবে, প্রধানমন্ত্রী হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের জোটের খাতিরে সি পি আইকে ঠিক কতটা দূরে রাখেন সেইটেই দেখার।

সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে দুটি দলের দুই মহাজোটের বাইরে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা তাঁরা হলেন এস এস পি এবং সি পি এম। এস এস পির ভেতরে নানা মত। দলে অনেকে খুবই ইন্দিরা বিরোধী। তবে, যোশী প্রভৃতিরা আবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাত মেলাবার পক্ষে। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই দলে নানা উপদল এবং তাঁরা সবাই যে যার নিজ নিজ পথে চলেন। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক কতটুকু তা বলা মুশকিল। আর, সি পি এম যেমন নব কংগ্রেসকে শত্রু মনে করে, তেমনি আদি কংগ্রেস, জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টিও তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই দুই দলের দুই মহাজোটের বাইরে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন যদি ১৯৭১ সালেই হয় তাহলে মোটামুটিভাবে দেখা যাবে সারা দেশে দুই মহাজোটে লড়াই হচ্ছে। একদিকে আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ প্রভৃতি। আর একদিকে নব কংগ্রেস, পি এস পি, সি পি আই প্রভৃতি। জাতীয় ভিত্তিতে অবশ্য এর কোনও পক্ষই জোট না বেঁধে লড়তে পারেন। হয়ত দুপক্ষই শুধু রাজ্য স্তরে আসন রফা করবেন এবং সেইভাবে প্রকাশ্যে জোট বাঁধার আনুষ্ঠানিকতা এড়াবার চেষ্টা করবেন। তবুও কার্যক্ষেত্রে গিয়ে লড়াইটা দাঁড়াবে প্রধানত দুই অলিখিত মহাজোটেই।

*

জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে জোট বাঁধার প্রশ্ন নিয়ে আদি কংগ্রেসের মধ্যে বহুদিন থেকেই বিরাট মতভেদ চলছিল। দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা অনেকেই এর পক্ষে ছিলেন। তাঁরা একা নানাভাবে চেষ্টাও করছিলেন। কিন্তু আর একদল, অপেক্ষাকৃত তরুণ যাঁরা তাঁরা অনেকেই এর বিরোধিতা করছিলেন। বিশেষত, গুজরাট এবং মহীশূরের অনেকেই এর বিরোধী ছিলেন। এই দুই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত একচ্ছত্র আদি কংগ্রেস রাজত্ব করে। তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীরাও গোড়ায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বর্ষীয়ান নেতারা তাই বার বার এগিয়েও বার বারই পিছিয়ে যাচ্ছিলেন।

এবার কিন্তু তাঁরা আর পিছিয়ে যেতে রাজি হন নি। দলের ভিতরে নানা বাধা সত্ত্বেও এবং দলের অনেকেরই আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আদি কংগ্রেস জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি প্রভৃতির সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করতে

রাজী হয়েছেন—সে সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ পথে এগোলে দলের ক্ষতি হবে না ভাল হবে—আমি আপাতত সে আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে, এটা নিশ্চয়ই লক্ষণীয় যে এতদিনে আদি কংগ্রেস একটা মোটামুটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। এই জিনিসটাই আদি কংগ্রেসীরা কিছুতেই পারছিলেন না। দল ভাগের সময়ও তাঁরা তা পারেন নি। কোনও বিষয়ে কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই আদি কংগ্রেস নেতারা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী যখন পত্রপাঠ মোরারজী দেশাইকে বরখাস্ত করলেন তখনও আদি কংগ্রেস নেতারা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। যখন তিনি দলের প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে ভি ভি গিরির হয়ে ক্যাম্পেন করতে আসরে নামলেন তখনও আদি কংগ্রেস নেতারা কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। বার বার তাঁরা যত ইনডিসিশনে ভুগেছেন ততই প্রধানমন্ত্রী লাভবান হয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে কিন্তু কোনও সংকটময় মুহূর্তেই ইনডিসিশনের ভাব দেখা যায় নি।

আমি এখনও মনে করি, আদি কংগ্রেস নেতারা যদি যেনতেনপ্রকারেণ ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটানো এবং ক্ষমতা দখলের কথা না চিন্তা করে আপাতত বিরোধী দলেই থেকে সংগঠন গড়ার কথা ভাবতেন তাহলে শেষ পর্যন্ত দলের ও দেশের অনেক বেশী মঙ্গল হত। কিন্তু তা ওঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওই দুটো লক্ষ ত্যাগ করা দলের অধিকাংশ নেতার পক্ষেই অসম্ভব। এই অবস্থায় দল এতদিন যা করছিল তা সবচেয়ে ক্ষতিকর—আদি কংগ্রেস ইনডিসিশনে ভুগছিল, কোনও দিকেই ভাল করে এগোতে পারছিল না। না পারছিল জোট বাঁধার রাজনীতিতে এগোতে, না সবাই মন দিচ্ছিলেন সংগঠন গড়ার কাজে।

এই ইনডিসিশনটা এবার মোটামুটি কেটে গিয়েছে। লখনউয়ে তাঁরা বলতে গেলে একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সম্ভবত, ১৯৭১ সনে লোকসভায় অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা তাঁদের এখন একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। সম্ভবত, নেতারা বুঝেছেন, আর বেশী দিন অস্পষ্টভাবে চলতে গেলে, দো টানায় দলটাই ডুবে যাবে। তাই, এই ডিসিশন। সেই হিসাবে এটা দলের পক্ষে ভাল। রাজনীতিতে ইনডিসিশনের চেয়ে খারাপ জিনিস আর কিছুই নেই।

*

এর ধাক্কা অবশ্য দলের উপর কম পড়বে না।

প্রথমত, যে দলের কর্মীরা এতদিন শুনে এসেছেন যে, জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টি দেশের প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর, অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা তাঁদের সব সদস্য ও সমর্থকের পক্ষে সেই জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে আঁতাত করার সিদ্ধান্ত চট করে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেনই। কিছু কর্মী ও নেতা দল ত্যাগ করবেনই।

দ্বিতীয়ত, এই সিদ্ধান্তের ফলে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং মহীশূরে মন্ত্রিসভার উপর কিছুটা আঘাত আসবেই। কতটা আঘাত আসে সেইটাই দেখার। এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে কোন্ রাজ্যে ক'জন আদি কংগ্রেসী এম এল এ দলত্যাগ করতে পারেন, তা এখনও অজানা। প্রধানমন্ত্রীর লোকজনরা অবশ্য আশা করছেন যে এর ফলে গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশের সরকারের পতন ঘটবেই। তা যদি হয়, অর্থাৎ নির্বাচনের আগে যদি প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে এবং উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন (যা আসলে প্রধানমন্ত্রীরই রাজত্ব) কায়েম করতে পারেন তাহলে ভোট-যুদ্ধে তিনি নিশ্চয়ই যথেষ্ট লাভবান হবেন।

তৃতীয়ত, এর ফলে মুসলমান ভোট আদি কংগ্রেসের কাছ থেকে একেবারে সরে যাবে। কংগ্রেস সমর্থক অধিকাংশ মুসলমান ভোট ইতিমধ্যেই অবশ্য নব কংগ্রেসের দিকে চলে গিয়েছে। তার পরও যে সামান্য অংশ আদি কংগ্রেস পেতে পারত এবার তাও চলে গেল। কারণ, জনসংঘের সঙ্গে যাঁরা আঁতাত করবে মুসলমানেরা তাঁদের কিছুতেই ভোট দেবে না। সারা ভারতের প্রায় ২৫ কোটি ভোটের অন্তত সাড়ে তিন কোটি মুসলিম ভোট।

অসুবিধা যেমন আছে তেমনি সুবিধাও আছে।

সবচেয়ে বড় জিনিস হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে জনসংঘ আদি কংগ্রেস এবং বি কে ডি যদি একযোগে নব কংগ্রেস, পি এস পি এবং সি পি আই জোটের বিরোধিতা করতে নামতে পারে তাহলে তাঁরা বেশ জোরদার একটা লড়াইয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন। একা আদি কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, অর্থবল এবং সরকারী ক্ষমতার সামনে একবার দাঁড়াতেই পারত না। আদি কংগ্রেস, জনসংঘ ও বি কে ডির জোট হলে হয়ত একটি জোরদার নির্বাচনী সংগঠন দাঁড় করানো যাবে এবং পশ্চিম রোধ সম্ভব হবে, যেমনি 'গণতন্ত্র বিপন্ন', 'কমিউনিস্টরা এসে গেল', 'মুসলিম লীগ আবার আসছে' ইত্যাদি শ্লোগানও ভালভাবেই তোলা সম্ভব হবে। হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে ভোটযুদ্ধে এখনও এসব শ্লোগানের বিরাট প্রভাব।

১৩-১২-৭০।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

পোহায় রজনী

পাকিস্তানের জঙ্গী রাষ্ট্রপতি শেষ পর্যন্ত তাঁর কথার খেলাপ করেননি। দিন পেছিয়ে দিলেও ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানে নির্বাচন করেছেন ডিসেম্বরের সাত তারিখে। ঘূর্ণী ঝড়ের চোট-খাওয়া পূবে পাকিস্তানেও সে নির্বাচন হয়েছে বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে-পড়া ন'টি কেন্দ্র বাদে। সে সব কেন্দ্রে নির্বাচন হবে পরে। সাতুইয়ের নির্বাচন হয়েছে জাতীয় পরিষদের জন্যে. প্রদেশে প্রদেশে নির্বাচন হয়েছে সতেরোই ডিসেম্বর। তবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর বৈঠক আপাতত বসছে না—বসবে নতুন সংবিধান তৈরি হবার পর। সে কাজের ভার জাতীয় পরিষদের। জাতীয় পরিষদ পাকিস্তানের শুধু পার্লামেণ্ট নয়, কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লিও বটে। এ ব্যাপারে তার ক্ষমতা কিন্তু অবাধ নয়। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁ আগে থেকেই গেয়ে রেখেছেন জাতীয় পরিষদ যেমন খুশী সংবিধান তৈরি করবে আর তিনি তা মেনে নেবেন সেটি হচ্ছে না। নতুন সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে পাকিস্তানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সে প্রজাতন্ত্র ফেডারেশন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র হবে আর তার অঙ্গরাজ্যগুলোর যতটা বেশী সম্ভব স্বাতন্ত্র্য থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রও হবে শক্তিশালী। না হলে সে সংবিধান তিনি বাতিল করে দেবেন।

যে সোনার পাথরবাটি ইয়াহিয়া খাঁ চেয়েছিলেন তা কিন্তু পাকিস্তানী ভোটারদের না-পসন্দ বলেই মনে হচ্ছে। এবারে পাকিস্তানে স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। অমন গণতান্ত্রিক নির্বাচন এর আগে সে দেশে কখনও হয়নি, নির্বাচনে এত ঘটাও এর আগে দেখা যায় নি। জাতীয় পরিষদে মোট আসন হচ্ছে ৩১৩। তার মধ্যে ১৩টি আলাদা করে রাখা হয়েছে শুধু মেয়েদের জন্যে—সাতটা পূবের, ছটা পশ্চিমের। তবে সে সব আসনের জন্যে সরাসরি নির্বাচন হবে না. জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরাই ভোট দিয়ে বাছাই করবেন ওই তেরোটি আসনের সদস্য। নির্বাচন হয়েছে বাদ বাকী তিন শো আসনের জন্যে। তার মধ্যে একটা কেন্দ্রে একজন মাত্র প্রার্থী থাকাতে সেখানে নির্বাচন দরকার হয়নি। লড়াই হয়েছে ২৯০টি কেন্দ্রে। তার জন্যে আসরে নেমেছিলেন তেইশটা দলের ১২৬০ জন আর শ' তিনেক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অর্থাৎ দলছুট প্রার্থী। পাকিস্তানে মোট ভোটারদের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি আশী লক্ষ। তাঁদের মধ্যে ভোট দিয়েছেন প্রায় তেকরা ষাট জন অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটির কাছাকাছি। পূবে আর পশ্চিমে ভোটারদের ছিল সমান উৎসাহ।

আসরে দল যতই নামুক না কেন লোকের ধারণা ছিল বাজীমাত করবে পূবে আওয়ামি লীগ আর পশ্চিমে পিপ্‌লস্‌ পার্টি। হয়েছেও তাই। পূবে তো আওয়ামি লীগের জয়জয়কার, পশ্চিমে অতটা না হলেও পিপ্‌লস্‌ পার্টির। আওয়ামি লীগ পেয়েছে ১৫১টা আসন আর পশ্চিমে পিপ্‌লস্‌ পার্টি ৮১টা। অন্য সব দল এক রকম নির্মূল হয়ে গেছে বললেই হয়। ঝড়তি-পড়তি কুড়িয়ে বাড়িয়ে কেউ পেয়েছে এক কী দুই, কেউ বা আরও কিছু বেশী। নয়ের বেশী তাদের কারুর ভাগ্যেই জোটে নি। এতে প্রমাদ গুণেছেন ইয়াহিয়া খাঁ আর আয়ুব খাঁ আর তাঁদের চেলাচামুণ্ডারা। গদী নতুন করে দখল করার কোনও আশাই অবশ্য আয়ুব খাঁর নেই। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আয়ুবপন্থীরা নির্বাচনে বেশ কিছু আসন পেলে তিনি আর একবার মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন। সে সাধ তাঁর ঘুচিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানী ভোটাররা। ইয়াহিয়া খাঁ মুখে অবশ্য গণতন্ত্রের জয়গান গেয়েছেন কিন্তু মনে মনে তিনি বেজায় চটেছেন। যে দুই দলকে ভোটাররা মাথায় তুলেছে তাদের দুই নেতার ওপর তিনি হাড়ে চটা। তার ওপর তাঁরা কেউই তাঁর পছন্দসই সংবিধান তৈরি করতে রাজী নন।

আওয়ামি লীগের নেতা মুজিবর রহমান এখন পূব পাকিস্তানের মাথার মণি। পদ্মা-মেঘনা-করতোয়া-কর্ণফুলিতে হঠাৎ যেন বান ডেকেছে আর সেই বান তাঁকে নিয়ে তুলেছে ক্ষমতার বেহেস্তে আর ভাসিয়ে দিয়েছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাঁচা বাড়ি আর পাকা দালান। মুজিবরের দল পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে পেয়েছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অন্য সব দল একজোট হলেও সেখানে তাঁকে হারাতে পারবে না। গণপরিষদেও তিনি যা চাইবেন তাই হবে যদি না ইয়াহিয়া খাঁ নতুন কোনও প্যাঁচ কষেন। আইনের ফাঁকিতে প্রেসিডেণ্ট শেখ মুজিবর রহমানকে কাবু করতেও পারেন। সে ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে রেখেছেন। তিনি হয়তো হুকুম জারি করতে পারেন যে, গণপরিষদে কোনও প্রস্তাব পাস করাতে গেলে নিছক অর্ধেকের বেশী ভোট তার পক্ষে পড়লে চলবে না, অন্তত তিন ভাগের দু' ভাগ সদস্য তার দিকে থাকা চাই। তেমন নিয়ম হলে মুশকিলে পড়বেন মুজিবর রহমান। জাতীয় পরিষদে তাঁর দলের লোক অর্ধেকের কিছু বেশী হলেও তিন ভাগের দু' ভাগ তো নয়। কাজেই তাঁকে জব্দ করার পথ ইয়াহিয়া খাঁ খোলা রেখেছেন।

আওয়ামি লীগ আর শেখ মুজিবর রহমানের মতিগতি কোনও দিনই ইয়াহিয়া খাঁ কেবল নয় পশ্চিম পাকিস্তানের খানদানী ঘরের কারুরই ভালো লাগেনি। কী শিল্প-বাণিজ্য, কী উঁচু সরকারী চাকুরি, কী সেনা-বাহিনী সর্বত্র পশ্চিম পাকিস্তানী—বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের প্রভুত্ব। তারা পূবে পাকিস্তানকে আমল দিতেই চায় না, তাদের খাঁটি মুসলমান বলেই মানতে চায় না। সেখানকার নেতা বলেই তারা লোকের চোখে হেয় করতে চেয়েছিল মুজিবরকে তাঁকে ভারতবর্ষের চর বলে. দেশদ্রোহিতার মিথ্যে মামলাও এনেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই দেশদ্রোহীরই তো আইন-মাফিক প্রধানমন্ত্রী হবার কথা পাকিস্তানের। আর তা হলে তিনি নির্বাচনের আগে যে ছ' দফা দাবি জানিয়েছিলেন তা তো আর অগ্রাহ্য করা যাবে না। মুজিবর যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান পাকিস্তানে চান বটে কিন্তু সে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকবে সীমিত ক্ষমতা—প্রতিরক্ষা আর বৈদেশিক নীতি, বড় জোর যোগাযোগ আর মুদ্রা প্রচলনও। কিন্তু তার ট্যাক্স বসাবার অধিকার থাকবে না। পূবে পাকিস্তানের জন্যে আলাদা ফৌজ তৈরি করতে হবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার হিসেব থাকবে আলাদা। তার ভাষা হবে রাষ্ট্রভাষা (উর্দুও থাকবে), নাম হবে বাংলা দেশ।

এতটা হজম করা ইয়াহিয়া খাঁর পক্ষে শক্ত। কিন্তু তিনি করবেনই বা কি? নির্বাচনের রায়কে তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—থাক না ফৌজ তাঁর সহায়। আর পশ্চিমে যা ঘটেছে তাতেই বা তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন কই? সেখানকার পয়লা নম্বর দল (অস্থিরচিত্ত বললেও বুঝি ভুল হয় না) তো জুলফিকার ভুট্টোর। তিনিও তো ইয়াহিয়া খাঁর দু' চোখের বিষ। বিস্তর ঠাট্টা বিদ্রূপ তাঁকে ইয়াহিয়া খাঁর দল করেছেন, ইসলামের শত্রু বলতেও ছাড়েননি। কিন্তু ভোটার শীর সিন্নি খেলেন ভুট্টোর, ইয়াহিয়া খাঁ কিংবা কাঠমোল্লাদের নয়। ভুট্টো লড়েছেন ইসলামী সমাজতন্ত্রের দাবিতে। তার মানে যাই হোক না কেন বোঝা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের ওপর টান আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত আর গরীব ভোটারদের। পুরোনোদের পাকিস্তান আর চায় না, চায় না পুরোনো নেতাদের, পুরোনো দলগুলোকে। তাই পুরোনো দিকপালদের পতন হয়েছে পাইকারি হারে। পাকিস্তানীরা চায় পরিবর্তন, চায় নতুন কিছু। আজ তারা নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিয়েছে আনকোরা দুই নতুন নেতার হাতে যদি রাতের অন্ধকার কেটে তাদের দেশে নতুন ভোরের আলো ফোটে।

নকশা ৩৮

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সব তরলতার মতো স্নেহও নিম্নাভিমুখী।
আকাশ থেকে ঝরে বর্ষা
পাহাড়ের বিগলিত মাথা থেকে নামে ঝর্নাস্রোত
সে তো স্নেহেই।
তবে, আমার সামনে, ছাতিমগাছের ধূসর কর্কশ
কান্ডটার মধ্যে
লুকোনো কাচের স্বচ্ছ নল বেয়ে উঠে চলেছে সারি সারি
যে রসবিন্দু

সবুজ ফুলের গুচ্ছে গন্ধ দিতে
তা কি স্নেহ নয়, প্রত্যাখ্যান?
নাকি কাজ
কুয়ো থেকে জল তোলার মতো?
নাকি, বর্ষা ঝর্নাস্রোত
ভূপাতিত সূর্যকিরণ, বসন্তে ফুলের উৎসব
সবই কাজ? স্নেহ মনে হয় ভ্রমে।

যত হেলা-ফেলা করো

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

যত হেলা-ফেলা করো, আমি তত দৃঢ় হয়ে উঠি
সম্পন্ন সংসার গাঁথো, নিজ হাতে
দুই বেলা জল দাও টবে
আমি ভেঙে করি কুটি-কুটি।

মাঝে মাঝে আবরণ সহজ নিয়মে খসে যায়
পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির রহস্যের থেকে
জ্যোৎস্না আসে, তুমি বন্ধ করে রাখো চোখ
তুমি জানো, কেউ-কেউ জন্ম-অন্ধ হয়েই জন্মাই।

যত তুমি ধুলো দাও, ততবারই সোনা হবে মুঠি
এতো ভালবাসাহীন তুমি জন্মালো
কোটরের থেকে চোখ বাড়িয়ে সাহসে
আমি তাকে ভ্রমবশে কখনো তো বলিনি ভ্রূকুটি।

আমাকে নির্বাসন দিও না

সতী চক্রবর্তী

সম্রাট,
আমাকে নির্বাসন দিলে
অথচ তোমার রাজ্যে বসন্তের সমারোহ
সম্রাট, তোমার দন্ড আজ অত্যন্ত অসহ
তুমিই দেখেছো আমার উদ্দীপ্ত যৌবন
আজও তোমারই থাকতে চাই।

সম্রাট,
আমাকে তোমার ভালোবাসার বৈভবে অহংকারী
থাকতে দাও।

সম্রাট, আমাকে নিঃসঙ্গ ক'রো না
যাবৎজীবন আছে তোমাকেই ভালোবাসতে চাই
আমি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবো
তোমাকে খুশী রাখবো।

কিন্তু সম্রাট,
তোমার পাত্র মিত্র পারিষদ ওদের কাছে আমাকে
যেতে বলো না।

সম্রাট,
আমি তোমার একার
আমাকে সেই সুযোগ আবার না
নির্বাসন দিও না।

কৃষ্ণচূড়া গাছের তিমিরে

কালীকৃষ্ণ গুহ

যে পথ দিয়ে রোজ বাড়ি ফিরি সেই পথে আজ
কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে।
আমি তোমাকে একদিন
কৃষ্ণচূড়া গাছের গহন তিমিরে নিয়ে যাবো।

সেই পথে সারা দিন লোক আসে, যুগান্ত থেকে
লোক আসে।
আমি সারা দিন তাদের মূর্ছা এবং পায়ের শব্দ
অনুভব করি।
সেই পথে সমস্ত শতাব্দী কাঁপে, নারী-মূর্তি কাঁপে—
মানবিক কোলাহল চূর্ণ হয়, নারী-মূর্তি
কথা বলতে চায়, দারুণ পিপাসায় কথা বলতে চায়,
প্রকৃতির ভিতর জীবন নুইয়ে দিতে চায়।

আমি আজ আর কিছুই দিতে পারবো না
তোমাকে, শুধু
একটি দীর্ঘ যাত্রাকাহিনী বোঝাবো সমস্ত দিন। আজ
তোমাকে কৃষ্ণচূড়া গাছের গহন তিমিরে নিয়ে যাবো,
বলবো:

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে, এখানেই একদিন আমাদের
চরম দীর্ণ—পরিচয় মেলে দেওয়া হবে।'

> ইতিহাসসাধকশ্রেষ্ঠ আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁর জীবনের প্রান্তভাগে এসে একটি ভাষণে, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দীর্ঘজীবন সাধনায় নিরত থেকেছেন, যুবক-কর্মীদের উদ্দেশে সংক্ষেপে তার ব্যাখ্যান করেছেন। আচার্য যদুনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হল।
>
> —সম্পাদক, দেশ

আজ যে কথা বলতে হবে তার বিষয় হচ্ছে আমার জীবনের দর্শন, অর্থাৎ কোন আদর্শ সামনে ধরে, কোন্ মন্ত্র ধ্যান করে আমি এত বছর কাজ করে এসেছি। আত্মজীবনী ব্যাখ্যান করতে গেলে নিজেকেই সব কাজের কেন্দ্র বলে ধরে নিয়ে চলতে হয়। রামায়ণ লিখতে গেলে রামকে বাদ দেওয়া যায় না। আমার জীবনে মেনে নেওয়া আদর্শটি দেখাতে গেলে আমি কোন্ পথে চলেছি, এবং কেন সে পথে চলেছি, তা না বললে উপায় নেই। যদি কেউ একে আত্মম্ভরিতা বলেন তবে অবিচার করা হবে।

আমরা সকলেই নিজ জীবনের আদর্শ বেছে নিই চোখের সামনে যাঁদের দেখেছি তাঁদের কাজগুলির ভিতরকার মূলমন্ত্র বুঝে, অথবা বই পড়ে অতীতের মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী ভেবে ভেবে। কারণ তরুণ মানুষ যে বড় মানুষের মত হতে চাইবে এটা স্বভাবের নিয়ম।

যাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা, স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার; আজ ৩৪ বৎসর হল তিনি পরলোকগমন করেছেন; মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বৎসর। ধনী জমিদার সন্তান এবং ইংরেজী শিক্ষিত হলেও তিনি কখনও ভোগসুখ বা আড়ম্বর চান নাই; চিরদিন সরল সংযত জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, আমাদের রাজশাহী জেলার সব রকম লোকহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। বাংলার প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষার সমস্ত সুফলই তিনি পেয়েছিলেন। অথচ তাঁর চিত্ত শান্তি পেত, বল পেত, বৈষ্ণব ধর্মের এক সরল উদার রূপ হৃদয়ে মেনে নিয়ে—এতে কোন বাইরের ভণ্ডামী বা অন্ধ কুসংস্কার ছিল না, এজন্য তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন, কলকাতায় এলেই তাঁকে দর্শন করতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার মির্জাবিহাড়ে তাঁর এক কাঠা ভূসম্পত্তিও ছিল না, অথচ সেখানকার মুসলমান প্রজাদের নীলকুঠিওয়ালা সাহেবদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি অনেক বৎসর ধরে নিজের খরচে লড়াই করেন, জেলা আদালত ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা করে গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে আন্দোলন করে এমন কি ঐ বিষয় সংক্রান্ত দলিলপত্র ও সরকারী রিপোর্ট ছাপিয়ে তা পার্লামেণ্টের উদারনৈতিক সদস্যদের জন্য বিলাতে পাঠিয়ে।

ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনি

আচার্য যদুনাথ সরকার

পথ বেছে নিয়েছ, তোমরা সফল হবেই হবে. "জীবনে না হয়, মরণে।"

আমাদের শিক্ষিত লোকদের দুর্বল চরিত্র ও নীচ মন দেখে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেষ বয়সে misanthrope হয়ে পড়েন, অর্থাৎ মানবজাতিকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করতেন। কিন্তু দেখ, দেশ সেবায় তাঁর যে জীবন উৎসর্গ হয়েছিল, তা নিষ্ফল হয়নি; যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন তবে এদেশে নানারকম সমাজ-সংস্কার কার্যে এবং নানা ক্ষেত্রে বাঙালীর যা কখনও ভাবা যায়নি, এমন সব প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখে তিনি আনন্দিত হতেন। সেইমত আমি নিজে দেখেছি। বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেশবাসীর স্বার্থপরতায় চটে গিয়ে চেঁচাচ্ছেন—"এই (গো-খেকো) জাতের কিছু হবে না।" হায়! আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ত দেখতে পেতেন যে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর সায়েন্স-এর সেই বৌবাজারের পুরানো বাড়িতে গবেষণা করে একজন ভারতবাসী জগদ্বরেণ্য হলেন, মৌলিক আবিষ্কারের জন্য রমন বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেলেন। মহেন্দ্রলালের জীবন ব্যর্থ হয়নি।

যে যুবক-সাধক এই মহা আদর্শ বরণ করবে, তাকে প্রথমে চারদিক থেকে দৈন্য হিংসা দুর্নাম এবং বহু বাধা বিপত্তি নীরবে সহ্য করতে হবে। এজন্য তার পক্ষে চাই একটি অন্তর্জগৎ, অর্থাৎ মনের মধ্যে একটা দুর্গ সৃষ্টি করা, যেখানে বসে তার চিত্ত স্নিগ্ধতা ও শান্তি পেতে পারে। সেই জগৎটা হচ্ছে পূর্বগামী মনীষিগণের রচিত সাহিত্য। আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ হয়েছে এই গ্রন্থের সাহচর্য। উপনিষদ ও সংস্কৃত, কাব্য, ইউরোপীয় কাব্য, ইতিহাস ও জীবনী, বাংলার ত কথাই নাই, এগুলি আমাকে এক নূতন রাজ্য দিয়েছে যেখানে কোনো শত্রু প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে গিয়ে আমি নূতন প্রাণশক্তি পাই। এটিও আমার পিতার কাছ থেকে শিখেছি।

সাহিত্য বা কলার সাধনা ঠিক যোগ-সাধনার মত। এতে কঠিন জিনিস দেখে ভয় পেলে চলবে না। যে লোক ভাবে যে সস্তায় কাজ হাসিল করবে, সে কখনও কখনও যশ বা ধন পেতে পারে বটে কিন্তু তার জীবনের ফল একটি অসার প্রাণহীন শুষ্ক শস্যের খোসা মাত্র। মেকী জিনিস বেশী দিন চলে না।

যোগসাধনে রত তপস্বীর মতই আমাদের গবেষককে সরল শ্রমসহিষ্ণু জীবন যাপন করতে হবে, দীর্ঘকাল কঠোর দারিদ্র্য সহ্য করে তারপর সিদ্ধি আসবে। এইজন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে আমরা বিজ্ঞান-এবং দেশী লোকের যৌথ ব্যবসা—এই দুটিই ধ্যান করেছিলেন, সুখ নহে।

বর্তমান যুগে এইরূপ সাধনা আগের চেয়ে বড় কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা বলে থাকি এটা জনতন্ত্রের যুগ, age of democracy, কিন্তু যেখানে জনগণ, অশিক্ষিত, অ-সংবদ্ধ, সেখানে রাজনৈতিক জুয়াচোরের প্রাধান্য হবেই হবে। যে ফন্দিবাজ লোক ব্যবসা বা বিদ্যাবলে লাভবান হবার সম্ভাবনা নাই দেখলে, সে দল পাকিয়ে নেতা হয়ে নিজের আত্মীয় ও অনুচরদের দেশের টাকায় ধনী করলে। চারদিকে এইরূপ অবিচার ও অসাধুতার প্রাধান্য দেখে চিন্তাশীল স্বদেশভক্ত যুবক হতাশ্বাস হতে পারে, সে ভাবতে পারে, "দূর ছাই! ভাল খাঁটি কাজ করা এদেশে অসম্ভব। চারদিকে চোরের রাজত্ব, ঘুষের জয়। আমি একক, দুর্বল, এই বন্যার স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভেসে যাব।"

আমি তাকে বলব—"হতাশ হয়ো না। সত্যের জয় হবেই হবে, হয়ত তোমার মৃত্যুর পর। কিন্তু দেশের সকল সুসন্তানই যদি হতাশ হয়ে দেশের জন্য খাঁটি কাজ করার ব্রত মাথায় তুলে নিতে পিছু পা হয়, তবে দেশের কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না, অসাধুতার বিরোধী সৈন্যদল গঠন করা কারও পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না। সমস্ত জাতিটা লোপ পাবে। অযোগ্য প্রাণী, জুয়াচোর জাতি ধ্বংস হবে, প্রকৃতির এই কঠোর নিয়ম অনিবার্য।"

খাঁটি কাজের, জ্ঞানসাধনার, দেশসেবার কঠোর ব্রত কখনও কখনও সাধককে জীবিত কালেই পুরস্কার দেয়; আমি নিজে তা পেয়েছি। তাই যে যুবক কর্মী এই পথে চলে আমার চেয়ে কম ভাগ্যবান হবে, তাকে বলি—কোন বাধা, বাইরের কোন চক্রান্ত, সত্যসন্ধানী দেশসেবককে একটি সান্ত্বনা হতে বঞ্চিত করতে পারবে না—সে সান্ত্বনা এই, তোমাকে মৃত্যুশয্যায় বলতে হবে না—

> হন্তেদং বন্ধ্যাত্রাম্ নীতং
> ভব-ভোগোপলিপ্সয়া,
> কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত
> চিন্তামণির্ময়া।

অর্থাৎ হায়! আমি কি একাই ঠকেছি। সারা জীবনটা মাটি করলাম, টাকা সুখ যশ এইসব ভোগের সামগ্রী খুঁজে খুঁজে। আমি একটা দৈব শক্তিসম্পন্ন মণি পেয়েছিলাম, যেটা আমাকে যা চাই তাই এনে দিতে পারত। অথচ আমি সেই চিন্তামণি ফেলে দিয়ে এক টুকরো চকচকে অসার কাচ নিলাম।"

---

১২ অক্টোবর ১৯৪৮ কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে পঠিত। পৌষ ১৩৫৫ প্রবাসী হইতে

সতীশ হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। মরেই যখন গেছে ও, ন্যাংটো থাকতে আর ক্ষতি কি। কিন্তু মরগের বাইরে কারা যেন এ সময় গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে শুনতে পাচ্ছে সতীশ। কমরেড সতীশ জিন্দাবাদ। খুনকা বদলা খুন হ্যায়, জানকা বদলা জান। একজন বিলম্বিত লয়ে সুর করে চেঁচাচ্ছে, কমরেড সতী-ঈ-ঈ-শ— আর সকলে ধুয়ো তুলছে, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

সতীশের খুব কৌতূহল হল। টেবিল থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর দরজা ফাঁক করে একটু বাইরের দিকে তাকাল। তাকিয়েই থাকল। অনেককেই ও চিনতে পারছে এখন। ওদের পাড়ার মিহিরবাবু এক হাতে কোঁচা সামলিয়ে তারস্বরে বক্তৃতা ঝাড়ছে, দেখতে পেল সতীশ। মিহিরবাবুর সংগে ভোটের সময় আলাপ হয়েছিল ওর। ভোটার লিস্টে সতীশের নাম ছিল না। মিহিরবাবু বুঝি তাইতেই আগ্রহ দেখিয়ে সতীশকে দিয়ে একটা ফলস ভোট দিইয়েছিলেন। সে একটা মজার অভিজ্ঞতা ওর।

মিহিরবাবু এখন বলছেন, সতীশ ছিল আমাদেরই লোক। আমাদের পার্টির একজন কর্মী। তাকে যারা নৃশংসভাবে হত্যা করল, দাদুগণ, আমরা তাদের ক্ষমা করতে পারি না।

সতীশ এখন ন্যাংটো হয়ে আছে বলেই বাইরে বেরিয়ে ঠাস করে লোকটার গালে একটা চড় কষাতে পারছে না। বেড়ালের মত পা ফেলে ফেলে দরজাটা ভেজিয়ে রেখে আবার ও টেবিলে এসে শুয়ে পড়ল।

ফুলের মালা নিয়ে এসেছে লোকগুলো। হয়ত সতীশকে নিয়ে ওরা মিছিল করবে। ওরা বলাবলি করছে, সতীশ মরেনি! শহীদ হয়েছে সতীশ। ভালই হল, মরে গিয়ে তো আর কিছুই হওয়া যাচ্ছিল না, শহীদ হওয়া গেল। সতীশ আবার মনের সুখে দাদের মলমের বিপিনের ছড়াটাকে আওড়াতে শুরু করল, চুলকাইতে বড় সুখ, সুখ রে—

কিন্তু সতীশের মনে হচ্ছে, বাইরে যেন হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। সবাই কেমন চুপ মেরে গেছে। হঠাৎ এরকমভাবে উত্তেজনা থেমে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারল না ও। অপেক্ষা করল। চারপাশে তাকাল, উদোম ন্যাংটো ছেলে মেয়ে বুড়ো, মধ্যবয়স্ক জোয়ান আর যুবতী ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে। সব লাশই চিত নয়, কেউ চিত, কেউ কাৎ কি মেরে এক পাশে হেলে, কেউ বা উপুড় হয়ে। সব লাশই গটমট করে তাকিয়ে নেই, কেউ হাফ-চোখে, কেউ ফুল, কেউ বা আবার পুরোটাই বুজে রেখেছে চোখ। কারো মাইয়ের ছায়া পড়েছে পেটের দিকে, কারো হাঁটু চকচক করছে আলোয় কলাগাছের মত। বেশ সুখেই আছে মনে হচ্ছে সবাইকে।

সর্দি, শ্লেষ্মা, মচকানি, যন্ত্রণার জন্যে জোরালো ওষুধ—৮৫ বছর ধরে নির্ভরযোগ্য !

একমাত্র বিতরক: কে. এল. মরিসন সন এ্যাণ্ড জোন্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, বোম্বাই . কলিকাতা . মাদ্রাজ . দিল্লী . ব্যাঙ্গালোর .

নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। নমুনাগুলি দেখে বোঝা যায় যে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা ও পরীক্ষা দুই-ই করে থাকেন। বিশেষ করে চশমা ও চিরুনির খাপের ওপর তিনি যে সুন্দর ও সহজ ডিজাইন এঁকেছেন সেগুলি সকলেরই চোখে পড়ে। প্রত্যেকটির রঙ পাকা। নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ জিনিসগুলিই সামান্য রঙ বা রেখার যাদুস্পর্শে যে অপরূপ হতে পারে এগুলি তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রদর্শনীর অন্যান্য জিনিসের মধ্যে জার্মান মহিলা শ্রীমতী পাণ্ডে রচিত বাতিস্তম্ভের নতুন ধরনের রঙীন আবরণ, ছোট্ট মুরগী-ছানার মত, পশমের তৈরী ডিম্বাধার আবরণ, রঙীন মোমবাতি ও কুশনের নাম করা যায়।

*

শহর ও শহরতলীর নানা স্থানে বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সবগুলি বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের, সব প্রদর্শনীর আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। সম্প্রতি যে কয়টি প্রদর্শনীর আয়োজন হয় তাদের মধ্যে কলাভারতী, ত্রিপুরা ফাইন আর্ট সোসাইটি ও চন্দননগর রবিবাসর পরিচালিত প্রদর্শনীগুলি উল্লেখযোগ্য।

—চিত্রপ্রিয়

রত্ন ও শ্রীমতী

অন্নদাশঙ্কর রায়

তৃতীয় ভাগ

এগারো

গোরী ওর অনাগত সন্তানের স্বপ্নে বিভোর। ওর সেই সাত রাজার ধন মানিককে নিয়ে কী করবে, কোথায় রাখবে ভেবে পায় না। শুধু স্বপ্ন দেখে আর স্বপ্নটাকে উপভোগ করে। রত্ন যে কঠোর তপস্যায় মগ্ন তা কি ও জানে না? জানে, তবু উপভোগের ভাগ দেয়। যেন রত্নই ওর সন্তানের জনক।

রত্ন অবশ্য আনন্দ বোধ করে ও প্রকাশ করে। সেটা কিন্তু গোরীর আনন্দেই আনন্দ। পিতা হতে যাওয়ার আনন্দে আনন্দ নয়। সে উপলব্ধিই তার নেই। গোরীর আনন্দ যদি হয় সূর্যালোক তবে রত্নর আনন্দ চন্দ্রালোকের মতো তার প্রতিফলন।

আনন্দের মাঝখানে অস্পষ্ট একটা অনুভূতি জাগে। কই, রত্নকে তো কেউ মনোনয়ন করেনি? না পুরুষরূপে না সন্তানের জনকরূপে। ওকে ভাগ দিলে ও নেবে কোন মুখে? ও সহানুভবী। সমানানুভবী নয়।

কিন্তু গোরীকে জানায় না অত কথা। কী দরকার বেচারিকে বিব্রত করে! যখন একসঙ্গে যাত্রা করাই দু' জনের সিদ্ধান্ত। এক যাত্রায় পৃথক ফল চায় কে? গোরীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পা মিলিয়ে নেওয়াই রত্নর কর্তব্য। যেটা করণীয় সেটাকে আনন্দের করে নিতে হয়। আনন্দের করে নেওয়াটাই সুবোধ।

গোরীর চিঠিপত্রে বেগমপুরের কথা একেবারেই থাকে না। ওটা যেন ওর পূর্ব-জন্মের মতো বিস্মৃত। থাকে কৃষ্ণনগরের গল্প। এক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে ও সই পাতিয়েছে। সইটি ওর চেয়েও দুঃখিনী। ওর স্বামী ওকে নেয় না। ওকেও এখন লেখাপড়া শিখে লায়েক হতে হচ্ছে। সম্ভব হলে ডাক্তারি শিখবে। চাহিদা তো রয়েছে। বাধছে সংস্কারে। গোরী তাই ওর সইকে বলছে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে।

"মানা আমার সই ওর স্বামীকে এক মুহূর্তের জন্যেও মনের আড়াল করতে পারছে না। কে জানে ওর স্বামী হয়তো ওকে ফিরিয়ে নিতে আসবে। ফিরে যাবার পথ বন্ধ করা কি উচিত? ডাক্তারি করতে গেলে পথ খোলা থাকবে না। ওদের যা সংস্কার ওরা কিছুতেই ডাক্তার বউকে ঘরে নেবে না। তা হলে দেখছিস তো, মণি, সংস্কার এক তরফের কাটলেও আরেক তরফের কাটে না। তা হলে বরাবরের মতো স্থির করতে হয় যে আর স্বামীর ঘর করবে না। মানা কি প্রাণ ধরে পারে ওকথা ভাবতে? কোনো মেয়ে পারে? আমি সেই জন্যে ওকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। পথ নির্দেশ করা সহজ, কিন্তু যাকে নির্দেশ করা হলো সে যদি ও পথে চলতে দ্বিধা করে তা হলে কী করা যায়? দুর্ভোগে ভুগছে, ভুগবে। মানার জন্যে আমার দুঃখ হয়। ওর তো তোর মতো কেউ নেই যাকে ধরে ও দাঁড়াবে।" গোরী লেখে।

সমস্যা বইকি। স্বামী পরিত্যক্তাও আশা ত্যাগ করতে পারছে না একদিন স্বামীর কৃপা হবে। তারপর ষষ্ঠীর কৃপা। সেই জন্যে ডাক্তারের কন্যা হয়েও ডাক্তারি শিক্ষার সুযোগ থাকলেও ডাক্তারির পথে যাবে না। পাছে গতানুগতিক পথভ্রষ্ট হয়। গোরীও যেমন, ওর ধারণা মানারও যদি কেউ একজন থাকত যাকে ধরে ও দাঁড়াত। না, তেমন কোনো অবলম্বন রত্নর সন্ধানে নেই। সাত ভাই চম্পা ভেঙে গেছে। নইলে বন্ধুদের বাজিয়ে দেখত।

এক নবনীর সঙ্গেই কদাচিৎ দেখা হয়। সে এখন চাকরি নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। সময় পায় না, পেলে মাসিকপত্রে লেখে। কানন চলে গেছে ট্রেনিং কলেজে। ললিত তো জাপানে। প্রভাত সরকারী চাকরির ধাঁধায় ঘুরছে, এখনো পায়নি। হৈম আইন পড়ছে। রত্নর যখন ছুটি ওর তখন কাজ। একদিন এসেছিল খোঁজ নিতে। রত্নর ব্যাঘাত হচ্ছে বুঝতে পেরে উঠল।

এখন এক-একজনের জীবনে এক-একরকম অভিজ্ঞতা। তাই কারো সঙ্গে কারো সুর মেলে না। সাত ভাই চম্পা এখন সাতজনের একটি সপ্তক নয়। রত্ন তার চম্পাভাইদের কাছে সব কথা খুলে বলতে সাহস পায় না। পাছে জানাজানি হয়ে যায়। তখন গোরীর উপর কড়া পাহারা বসবে। তার বন্ধনমোচনে বাধা পড়বে।

প্রাণের বন্ধুদের কাছে কোনো কথা গোপন করলে তারা আর প্রাণের বন্ধু থাকে না। রত্ন এর জন্যে দুঃখিত। কিন্তু নিরুপায়। তার তো ইচ্ছা গোরীকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে। আইনে না বাধলে বধূরূপে। সমাজটা যদি তার ইচ্ছায় চলত তা হলে তো কোনো ঝামেলাই ছিল না। তা যখন সম্ভব হচ্ছে না তখন দায়ে ঠেকে লুকোচুরি করতে হচ্ছে। এর জন্যে সে লজ্জিত।

"মানাকে আমি আমাদের কথা বলেছি।" গৌরী লেখে। "ও সমর্থন করে। কিন্তু বুঝতে পারে না কেমন করে আমাদের কাহিনীর সুখকর সমাপ্তি হবে। সমাজ কি ক্ষমা করবে? গুরুজন কি আপনার হবেন না? তা হলে কি সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়ে দিয়ে আমরাই হব আমাদের একমাত্র আত্মীয়? সংসারটা যদি একটা নির্জন দ্বীপ হতো তা হলে আমরাই আমাদের নিয়ে থাকতুম, আর কারো মুখাপেক্ষী না হলেও চলত। যেমন রবিনসন ক্রুসো আর তার অনুচর ফ্রাইডে। কিন্তু তোমরা তো আমাকে তেমন কোনো দ্বীপে নিয়ে যাচ্ছ না। বম্বে বা বিলেত কোনোটাই নির্জন দ্বীপ নয়। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক কাটলেও প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে হবে। তাদের সমর্থন পাব তো? না তাদের কাছে মিথ্যে পরিচয় দিতে হবে? মানিক রে, আমি যে এর উত্তর খুঁজে পাইনে। আমি চাই সত্য পরিচয় দিতে, যাই থাক কপালে। কিন্তু চারদিকের অবস্থা দেখে আমার মনের জোর কমে যায়। আমিও তখন আর একটি মানা। তেমনি দুর্বল।"

রত্নকে ভাবিয়ে তোলে এ রকম চিঠি। এ সমস্যার সমাধান করবে কে? তারই মতো আর একজন নাইট? তারই মতো প্রেমে পড়বে? প্রেমাস্পদ হবে?

যতই ভাবে ততই বোঝে যে, এ সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে সমাজ। সমাজকেই করতে হবে এর সমাধান। বিয়ের সময় সব কিছু হিসাবের মধ্যে আনা হয়, হয় না শুধু কুমার কুমারীর হৃদয়। মানারও বিয়ে নিশ্চয়ই দেখে শুনে দেওয়া হয়েছিল সুপাত্রেই নিশ্চয়। কিন্তু ওর আর ওর বরের হৃদয় কী বলে তা কোনো ডাক্তার স্টেথোস্কোপ দিয়ে শোনেননি। হৃদয়কে যদি তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করা হয় হৃদয়ও নির্দয় হয়ে প্রতিশোধ নেয়।

যে কোনো দুজন ছাত্রকে ছাত্রাবাসের একখানা ঘরে রাখা যায়, কিন্তু তা বলে তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যায় না। এই যেমন উৎপল ও রত্ন। এরা সহাধ্যায়ী, এরা ভদ্র, এরা বনিয়ে চলে। কিন্তু কার মনে কী আছে তা জানে না, জানতে চায় না। পরিচয় দেবার সময় বলে, "আমার বন্ধু উৎপল" বা "আমার বন্ধু রত্ন"। কিন্তু সেটা হলো সাধারণ অর্থে বন্ধু। তেমন বন্ধু তো অনেকেই। গভীরতর অর্থে বন্ধু যদি কেউ থাকে তবে রত্নর বেলা জ্যোতিদা ও সাত্ত্ব ভাই চম্পার কাঞ্চন। আর তার বাল্যবন্ধু হীরু।

না, বন্ধুতাও ধরে বেঁধে হয় না! মানুষের হৃদয় নিজেই নিজের বন্ধু বেছে নেয়। তেমনি নিজের প্রিয়া বা প্রিয়। এটা তার জন্মস্বত্ব। কিন্তু সমাজ কি তার এই স্বরাজের দাবি স্বীকার করবে? না, এর জন্যে সংগ্রাম করতে হয়। গৌরী যেমন সংগ্রাম করছে। মানাকেও হয়তো একদিন তেমনি সংগ্রাম করতে হবে। বিনা সংগ্রামে এ দেশের নারী তার প্রেমের অধিকার অর্জন করতে পারবে না। এ দেশের পুরুষও কি পারবে? পিতৃভক্ত মাতৃভক্তের দল অম্লান-বদনে পণযৌতুকের বিনিময়ে পাণিগ্রহণ করে। প্রেমের মূল্য বোঝে কজন! সেবাযত্ন পেলেই ওরা ধন্য হয়ে যায়। সেই সঙ্গে শয্যাসুখ।

হয়তো সেবাযত্ন বা শয্যাসুখে কোনো একটা বিষয়ে ফেল করেছে মানা। গৃহকর্মেও হতে পারে। হয়তো স্বামীকে সন্তানসুখে সুখী করতে পারেনি। কিন্তু কী হবে এ নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে? এ রকম তো একটি-দুটি নয়। কথা হচ্ছে এরা কি এদের স্বামীদের সুমতির অপেক্ষায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে, না নিজেরাই করেকর্মে খাবে? চাকরিবাকরি বা ডাক্তারি নার্সগিরি করবে? মানা যদি ডাক্তারি শেখে ওর স্বামী ওকে কোনো দিনই নেবেন না। তাই বলে ও দিন দিন অকর্মণ্য হবে?

রত্ন পরামর্শ দেয় মানাকে, গড়িমসি না করে মনঃস্থির করতে। আর কিছু দিন পরে ওর ডাক্তারি পড়ার বয়স গড়িয়ে যাবে। তখন ওকে স্বামীর পায়েই দাসখৎ লিখে দিতে হবে। কে জানে হয়তো সতীনের ঘর করতে হবে। আর নয়তো বাপের বাড়িতেই থেকে যেতে হবে।

এই সূত্রে মানা মেয়েটির সঙ্গে পত্রালাপ। রঞ্জুকে দাদা বলে ডাকে আর নিজের করুণ কাহিনী শোনায়। বড়লোকের মেয়ে! ওর বাবা ওর জন্যে যা রেখে যাবেন তা ওর সারাজীবনের উপার্জনের চেয়েও বেশী। তা হলে চাড় কিসের? কেন পরিশ্রম করবে? গোরীর মতো আত্মাভিমান নেই, যেটুকু আছে সেটুকু স্বামীর কাছ থেকে লাঞ্ছনার ফল। ওর বিশ্বাস ও যদি কৃচ্ছ্রসাধনা করে তবে ওর স্বামীর মন একদিন ভিজবে। সুতরাং ডাক্তারি শিখতে যাওয়া কেন? আইডিয়াটা ওর নিজের নয়, গোরীই ওর মাথায় ঢুকিয়েছে। দেশের মেয়েদের স্বাবলম্বনের দীক্ষা দিতে চায় গোরী। যাতে তারা স্বামীদের মুখাপেক্ষী না হয়। স্বামীরা হাজার ভালো হলেও স্বামী তো! স্বামী মানে মালিক। আমেরিকার ক্রীতদাসদের মালিকরাও কি বহুক্ষেত্রে সজ্জন ছিলেন না?

কথা হলো নরনারী সম্পর্কটা স্বামী-দাসী সম্পর্ক নয়। যদি কোনো এক দেশে ও কোনো এক কালে স্বামী-দাসী সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তবে আমেরিকার মতো গৃহযুদ্ধ করাই শ্রেয়। কত মেয়ের সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে, জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তবু সংগ্রামের শেষে সমাজ সুস্থ হবে। নবনারী প্রকৃতিস্থ হবে। গোরী মানাকে ভজায়, কিন্তু মানার দোটানা যায় না। ওর মালিকের কাছে ফিরে যেতে ও পা বাড়িয়ে রয়েছে। ডাক আসছে না এই যা দুঃখ। বাপের বাড়িতে কিসের অভাব! কিন্তু স্বামী থাকতে স্বামীর অভাব কি কেউ ভুলতে পারে!

গোরীর সঙ্গে চিঠিপত্রে এটাও পরিষ্কার হয় যে, প্রথার পরিবর্তন গোরীর অভীষ্ট নয়। ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইলেও তার সুযোগ কোথায় এদেশে যে, সেটাকে ও সর্বত্র প্রবর্তন করবে? সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়া যেমন চলে এসেছে তেমনি চলতে থাকবে। শুধু দেখতে হবে যে বর কনে দুজনেই দুজনের মনোনীত। পছন্দের অধিকার দুই পক্ষেরই থাকবে। ক্রীতদাসীর মতো যদি কোনো মেয়েকে তার মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার বিদ্রোহের অধিকার মেনে নিতে হবে। সে বিদ্রোহ করে প্রথমে হবে স্বাধীন তথা স্বাবলম্বী, পরে যদি মনোমতো বর পায় তবে আবার বিবাহ করতে পারবে।

তা বলে ডিভোর্স গোরীর সংস্কারসম্মত নয়। মুসলমানদের মতো তালাক! মা গো! একজনের সঙ্গে বিবাহগ্রন্থি ছিন্ন না হলে আর একজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে যুক্ত হওয়া যায় কি? কেন হবে না? পুরুষের বেলা তো অবাধে হচ্ছে। আগে ওটা বন্ধ কর দেখি। বহুবিবাহ যেদিন বন্ধ হবে বিবাহ বিচ্ছেদ সেদিন চলতি হবে।

গোরীর মন ওইভাবে কাজ করে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বা পুনর্বিবাহ কোনোটার বেলা ও সীরিয়াস নয়। যাদের বেলা সীরিয়াস তারা হলো মুক্তি আর প্রেম। জ্যোতি ও রঞ্জু ওকে মুক্তি এনে দেবে। রঞ্জু এনে দেবে প্রেম।

বারো

চিঠি পেলে মন্ত্র প্রথমে দেখে নেয় কার চিঠি! লিখেছে কে! ওঃ মানা! মানার চিঠি পরে পড়লেও চলবে। এখন সময়াভাব।

পরে পড়তে গিয়ে চমকে ওঠে। এ কী! এ কে। এ তো মানা নয়। এ যে মালা। মালাদি। পরিষ্কার লেখা নয়, তাই ল পড়তে পড়েছে ন।

তারপর মালাদি কোনখান থেকে? এই কলকাতা থেকেই। হায়, হায় কী দুঃখের কথা! ওর বাবার স্বর্গলাভ হয়েছে। কাশীর পাট তুলে দিয়ে মাকে নিয়ে ও কলকাতা চলে এসেছে। এখানকার বাড়ির একাংশ ভাড়াটেরা ছাড়ছে না। কোনোরকমে ঠাসা-ঠাসি করে চালাতে হচ্ছে। কারো জন্যে কিছুই আটকায় না। শোক পেয়ে মনে হয়েছিল আর কেন বেঁচে থাকা। কার জন্যেই বা। নিজে তো চিররুগ্ন। মায়ের সেবা করবে না মাকে বুড়ো বয়সে খাটিয়ে নেবে। পড়াশুনো একটুও এগোয়নি। প্রাইভেট বি এ দিতে ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ভাবছে কলকাতায় দেবে। যদি শরীরে কুলোয়। যদি কেউ দেখিয়ে দেয়। বন্ধুর কি চেনাশুনো কোনো মহিলা আছেন, যিনি দয়া করে দেখিয়ে দিতে রাজী হবেন? হ্যাঁ, মহিলা হলেই ভালো হয়। কেন তা খুলে বলতে হবে না বোধ হয়।

না, বন্ধুকে বলতে হবে না। ওর মনে আছে। মালাদির মা যেমন সন্দিগ্ধ প্রকৃতির, কোনো ভদ্রলোক কখনো টিউটর হয়ে তিষ্ঠতে পারবে না। যদি না হয় কানা কি খোঁড়া, কালা কি বোবা, বুড়ো কি মড়া। বেচারি মালাদি! ও যে রূপে একটি বিদ্যাধরী তা নয়, ও হচ্ছে বিধবা। বিধবাকে যদি কেউ ফুসলিয়ে নিয়ে যায় তা হলে কী হবে গো! যদি বিয়ে করে তা হলে তো আরো ঘেন্নার কথা। ও মেয়েকে আবার ঘরে ঠাঁই দিতে হবে। ওর ছেলেমেয়েকে নাতিনাতনি বলে স্বীকার করতে হবে। সনাতন হিন্দু-সমাজে এমন স্বেচ্ছাচার! কত বড়ো বংশের কত উঁচু মাথা যে ধুলোয় মিশিয়ে যাবে! তখন কি ছোট মেয়ের সুপাত্র জুটবে, না বিয়ে হবে!

সুপাত্র দেখেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল মালাদির। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উজ্জ্বল রত্ন। উনিই ওকে পড়াশুনোয় এগিয়ে দেন। নইলে ছাত্রী হিসাবে ওর তেমন যোগ্যতা ছিল না। ওর ছিল গানের দিকে টান। কিন্তু অনুশীলনের অবসর ছিল না। না বাপের বাড়ি, না শ্বশুরবাড়ী কোনোখানেই গানের চর্চা ছিল না। ছিল অর্থচর্চা। অর্থকরী বিদ্যাচর্চা। ওর স্বামী অবশ্য অর্থের কথা ভেবে ওকে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে বলেননি। বলেছিলেন ওরই মানসিক উৎকর্ষের জন্যে। ছেলেমেয়েরা জানতে আরো

ভালোভাবে মানুষ হতে পারে। ছেলেমেয়ে হয়নি। তার আগেই স্বামী হঠাৎ বসন্ত হয়ে মারা যান।

পড়াশোনায় সত্যি যে ওর মন ছিল তা নয়। পতির ইচ্ছাই সতীর ইচ্ছা। কিন্তু বৈধব্যের পর যাঁরা ওকে পড়াতে আসেন তাঁদের একজন ওর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন। ততদিনে পতির স্মৃতি ম্লান হয়ে গেছে। শোকের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তি নেই। বছরখানেকের বিবাহিত জীবনকে ক'বছর জড়িয়ে ধরে থাকা যায়! ওটা যেন স্বামীর শবকে কোলে নিয়ে বেহুলার মতো ভেলায় ভেসে চলা। শেষ পর্যন্ত কোলে থাকে কঙ্কাল। মালাদির বেলাও তাই হয়েছিল। ও মনে মনে প্রীত হলেও সমাজভয়ে ভীত। আরো ভয় মাকে আর বাবাকে। মা ওকে নিয়ে কাশীবাস করছিলেন। যাতে ধর্মকর্মের মধ্যে ও বেচারি শান্তি পায়। বাবা কলকাতায় চাকরি করতেন, মাঝে মাঝে কাশী যেতেন। শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।

কাশীধামেও মানুষে শান্তিতে বাস করতে পারে না। শিব যেখানে মদনও সেখানে। এবার কিন্তু শিবকে ভোলাতে নয়. শিবের কাছে আশ্রয়প্রার্থিনী অষ্টাদশী তপস্বিনীকে ভোলাতে। মালাদি ওর দ্বিগুণ বয়সী শিক্ষাব্রতীকে শিবের মতোই ভক্তি করত। তিনি ত্যাগী পুরুষ। বেতন নিতেন না। ওটা তাঁর সমাজসেবার অঙ্গ। তাঁর অভিলাষ মালাও তাঁর সমাজসেবার সাথী হয়। দীর্ঘজীবন সামনে পড়ে রয়েছে। কী নিয়ে দিন কাটবে ওর? চাকরি তো করবে না. করতে হবে না। বাপ মা কি চিরকাল থাকবেন?

মালা ভাবতেই পারে না যে ওর আবার বিয়ে হবে। বিদ্যাসাগর মশায়কে ও দেবতার মতো ভক্তি করলেও বিধবার পুনর্বিবাহ ওর চক্ষে পাপ। মাস্টার-দা কি ওকে পাপ করতে প্রবর্তনা দিচ্ছেন? উনিও অপ্রস্তুত হন। কথাটা কেমন করে মা বাবার কানে যায়। বাবা নির্বোধ নন। বোঝেন যে ওই একমাত্র সমাধান। কিন্তু ওঁর নৈতিক সাহস ওঁর সুবুদ্ধির তুলনায় কম। উনি বলেন, "মালা এখনো নাবালিকা বললেও চলে। আরো কিছুদিন যাক। আগে তো ও গ্রাজুয়েট হোক। তারপর নিজে ভেবেচিন্তে উত্তর দেবে।" মা কিন্তু সোজা জবাব দিলেন মাস্টারকে। শুনিয়েও দিলেন দশ কথা। বিনা বেতনে পড়ানোর ছলে কী করতে আসা হয়েছিল বাবুর? 'পেম'? 'পেম' করেও যথেষ্ট হয়নি? বলে কিনা বিয়ে করতে চায়! অত বড়ো পাপ কি আর আছে!

মালাদি বিধবা হয়ে অবধি একটা না একটা অসুখে ভুগে আসছে। মাস্টার-দা লোকের চিকিৎসাও করেন। হোমিওপ্যাথি। ওঁর কাছে থাকলে মালাদিকে উনি সারিয়ে তুলতেন। ওঁর মতে সব অসুখের মূলে একটাই অসুখ। অ-সুখ। বৈধব্য থেকেই তার উৎপত্তি। বৈধব্যের প্রতিকার করলে তারও প্রতিকার হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মালাদি চায় ওর শোককে পুষে রাখতে। একবার দাগা পেয়ে ওর আশঙ্কা ছিল যে একজনের মতো আরেকজনকেও হারাবে।

কিন্তু যেটা ওর সব চেয়ে গোপন কথা, যেটা ও কাউকেই খুলে বলত না সেটা হচ্ছে এই যে মাস্টার-দাকে ও সত্যি কামনা করত। কিন্তু কামনাপূরণ যে পাপ। উনিও সেটা অনুমান করেছিলেন বলেই বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। উনিও যে নিষ্কাম পুরুষ ছিলেন তা নয়। নারীর কামনা যে কী বস্তু তাও তাঁর জানতে বাকী ছিল না। কাশীতে এত যুবতী বিধবার ভিড় কেন তার রহস্য তিনি জানতেন। তিনি মুখ দেখেই বলতে পারতেন কে তাঁর কাছে ওষুধ চাইতে এসেছে, কে ধরা দিতে এসেছে।

মাস্টার-দাকে হাঁকিয়ে দেবার পর থেকে মালাদির আর পড়ে সুখ নেই। কত লোক এল গেল। ও আর কাউকেই পছন্দ করে না। তাই পরীক্ষা দেয় না। বি এ পড়তেই চার বছর কাটল। পড়েছে যত ভুলেছে তার চেয়ে বেশী। ওর ছোট ভাই বিধু কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থেকে এম এ পড়ছে। তা পড়ুক। পড়াশুনা পুরুষ-মানুষেরই কাজ। মেয়েদের কাজ তা নয়। মালাদির মা শুনেছেন ইংরেজীতে লেখা আছে, মেন মাস্ট ওয়ার্ক অ্যাণ্ড উইমেন মাস্ট উইপ। পুরুষমানুষ কাজ করবে, মেয়ে-মানুষ কাঁদবে, ইহাই নিয়ম।

ইতিমধ্যে ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর তিনি একটু যেন উদার হয়েছেন।

আগের মতো বজ্র আঁটুনি আর নেই। মালাদিকে অত বেশী চোখে চোখে রাখেন না। তা বলে কলেজে ভর্তি হতে দেবেন তা নয়। পড়তে হলে বাড়িতেই মাস্টার রেখে পড়তে হবে। ওটাই ও বাড়ির রেওয়াজ। বিশেষ করে সধবা কিংবা বিধবা মেয়ের বেলা। কলকাতায় বহুকাল পরে ফিরে এসে মালাদির মা দেখেও দেখতে চান না যে হাওয়া বদলে গেছে। আগেকার মতো কড়াকড়ি আর নেই। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষাও চলছে।

মালাদির চিঠি পেয়ে রত্নর মনে পড়ে যায় একদিন এই মেয়েটিকেই সে দেবী বলে উপাসনা করত। তার জীবনের প্রথম প্রেম। দেবী থেকে ক্রমে ক্রমে ও হলো বিয়াট্রিস। যাকে ভালোবাসা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না। তার বিয়াট্রিসের প্রতি তার আনুগত্য এই সেদিন অবধি সত্য ছিল। গোরী এসে মালাদিকে সরিয়ে দিয়েছে এককোণে। যেখানে সে বিরাজ করছে যাদুঘরে রক্ষিত মর্মরমূর্তির মতো। নিখুঁত নিটোল অথচ অনুষ্ণ। হাজার চেষ্টা করলেও সে উত্তাপ জাগিয়ে তোলা যাবে না। মালাদিকে আর অসাধারণ মনে হয় না। অসাধারণ হচ্ছে গোরী। এ বিশ্বের একমাত্র নারী। না, দেবী নয়, নয় বলেই এত মধুর। মাধুর্য আস্বাদনের জন্যে শ্রীকৃষ্ণ কি দেবীদের কাছে যেতেন, না গোপীদের কাছে? রত্নর জীবনেও তেমনি মাধুর্যের পিপাসা এসেছে। পিপাসা মেটানোর জন্যে এসেছে পানীয় জলের গাগরী। মালাদি এখন নিতান্তই দিদি বিশেষ। বয়সেও কিছু বড়ো।

মালাদির চিঠির উত্তরে রত্ন ওকে স্বাগত জানিয়ে বলে, "মহিলাদের মধ্যে আমার যাঁদের সঙ্গে আলাপ তাঁদের একজন হয়তো রাজী হবেন। তিনি আরো একটি মেয়েকেও পড়ান। সপ্তাহে দু'দিনের বেশী সময় দিতে পারবেন না কিন্তু।"

একদিন রত্ন মালাদির সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দিয়ে আসে যে সেবাদি আপাতত একটির জায়গায় দুটি ছাত্রী নেবেন না। কাজেই অন্য চেষ্টা করতে হবে। দেখা গেল মালাদিরও মহিলা টিউটরের জন্যে মাথাব্যথা নেই। তার চেয়ে টিউটর না থাকাই ভালো। পাশ যে করতেই হবে এমন কী কথা আছে!

সেইদিনই নিভৃতে মালাদি বলে, "তোমাকে আমি আমার বন্ধুর মতো মনে করি। চাণক্য উপদেশ দিয়ে গেছেন, ষোল বছর বয়স হলে পুত্রের সঙ্গেও মিত্রের মতো ব্যবহার করতে হয়। তা হলে ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুর মতো নয় কেন?"

"হাঁ, বয়সটা যখন ষোল নয়, একুশ।" রত্ন স্মরণ করিয়ে দেয়।

"তা হলে শোন, লক্ষ্মীটি। এই চিঠিগুলো নিয়ে যাও। এ বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। কে কখন চুরি করবে। পরে যদি আমার দরকার হয় ফেরত দিয়ো, ভাই। আশা করি হারিয়ে ফেলবে না। মনে রেখো এ আমার প্রাণ।" মালাদি প্রাণ সঁপে দেয়।

"তোমার স্বামীর চিঠি বুঝি!" রত্ন দুষ্টুমি করে।

"হায়!" মালাদি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। "সে ভাগ্য কি আমি করেছি যে তাঁর মতো মহাদেবকে স্বামীরূপে পাব! তুমি কি জান না রতন, আমার সেই দুঃখের কাহিনী।"

রত্ন মুচকি হাসে। "তুমি না বললে আমি জানব কী করে? তবে সেবার কাশী গিয়ে আমি চোখ কান খোলা রেখেছি। কথাটা কানে এসেছে। কোন সূত্রে তা ফাঁস করব না।"

মালাদি করুণভাবে তাকাতেই রত্ন গলে যায়। বলে, "তোমার কাছে যিনি মাস্টারদা আমার কাছে তিনি ঝণ্টুদা। তিনিও আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যেমন তুমি। মাঝে মাঝে কুষ্ঠিয়ায় আসেন। তখন আমাদের বাড়ি দেখা করে যান। আমার যিনি হেড মাস্টার মশায় ওঁকে তিনি পড়িয়েছেন। হেড মাস্টার মশায়ের সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধটা প্রকৃত গুরুশিষ্যের। তাই জীবনের সুখ দুঃখের কথা বলেন। পরামর্শ নেন। হেড মাস্টার মশায়ের মতে এ বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। হয়নি বলে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। অন্য মেয়েকে বিয়ে করা অনুচিত।"

তা শুনে মালাদির মুখে স্বর্গীয় আভা। "সত্যি? না, বানিয়ে বলছ?"

"সত্যি। এখন পর্যন্ত উনি কোনো মেয়েকে কথা দেননি। কিন্তু ওঁকে আর তুমি ঘুরিয়ো না, মালাদি। পরে হয়তো পসতাবে।"—রত্ন ওয়ার্নিং দেয়।

"চিঠিগুলো পড়তে দিয়েছি। পরে কথা হবে।" মালাদির চোখে কৌতুক।

(ক্রমশ)

সুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে, প্রাচীন ভারতের শল্য-চিকিৎসকরা প্লাস্টিক-সার্জারি সম্পর্কে অবহিত ছিল। ঐ সময়ে শল্য-চিকিৎসায় একশ একুশ রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত যাদের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসকদের যন্ত্রপাতির যথেষ্ট মিল আছে। ......কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, তামা নিষ্কাশন করা হত সিংভূম এবং হাজারিবাগ জেলায়, মধ্য প্রদেশ, কুমায়ুন অঞ্চল, গাড়োয়াল উত্তর প্রদেশ এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোন কোন অঞ্চলে। সে প্রায় দু হাজার বছর আগের কথা।...উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্যে চাই আলো, খাবার, বাতাস এবং জল। বৈশেষিক সূত্রের রচয়িতার কাছেও এ সমস্ত তথ্য জানা ছিল।

এক কথায়, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা শুধু চমকপ্রদই ছিল না, রীতিমত বিস্ময়েরও।

ওঁকে আমরা প্রাচীন ভারতের ঋষি এবং মনীষীদের প্রতিনিধিস্বরূপ মনে করতাম।...অতীতের ঋষিদের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, শুধু প্রাণীজগৎ নয়, যাবতীয় বস্তু, জড় এবং জীব, সকলের মধ্যেই একটা অন্তর্ভুক্ত ঐক্য—সমধর্মিতা এবং সমধর্মিতা বিরাজ করে।...তাই বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন, খণ্ড খণ্ড বিষয়রূপে বিবেচনা না করে সামগ্রিকভাবে তার মধ্যে একটি অখণ্ড অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যেই তিনি গবেষণা করে গেছেন।...নভেম্বর ৩০, কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি-বক্তৃতামালার বাত্রিশতম অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে জগদীশ বসু সম্পর্কে এ কথা বলেন, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম শিষ্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের প্রাক্তন পালিত-অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। তিনি মূখ্যত প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এখানে তার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি। উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-প্রচেষ্টার বহুমুখী বিকাশের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ছিল খুবই নিকটের। আত্মিক উন্নতির জন্যে চাই সুসমন্বিত জীবন-ধারা। অতীতের মনীষীরা বিজ্ঞানকে তারই সহায়করূপে গ্রহণ করেছিলেন।

গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা : ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম পূর্ব খৃষ্টাব্দে রচিত বোধায়নের শুল্বসূত্রে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের বর্গ, জ্যামিতিক পদ্ধতিতে দুই-এর বর্গমূল নির্ণয়, কোণ এবং বাহুর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতির নামকরণ এবং সমতালিক জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার পদ্ধতি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। সপ্তম খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের উপপাদ্য প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের কর্ণ নির্ণয় এবং চতুর্ভুজ অঙ্কনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবম খৃষ্টাব্দে বাচস্পতি আধুনিক কো-অর্ডিনেট জ্যামিতির প্রবর্তন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাম : আর্যভট্ট (৪৯৯ খৃঃ)। জ্যামিতিক-বীজগণিতের উপর ইনি নানারকম তথ্য এবং তত্ত্বের উপর কাজ করেছেন। মহাবীরের গণিত সার সংগ্রহ (৭৫০ খৃঃ) শ্রীধরের সিদ্ধান্তশেখর (১০ খৃঃ), দ্বিতীয় ভাস্কর-এর বীজ গণিত (১১৫০ খৃঃ) প্রভৃতি।

এই সময়ের মধ্যে গণিত শাস্ত্রের বিভিন্ন ধরনের প্রতীক, দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি, অস্থিরীকৃত সমীকরণের, পর্যায়-সরণীর যোগ ফল নির্ণয়, পারমুটেশন এবং কম্বিনেশনের ধারণা, বাইনোমিয়েল থিওরেম প্রভৃতির উপর কাজ করা হয়। দ্বিতীয়-ভাস্কর গ্রহের মুহূর্ত-গতি বা 'ইনস্টেনটেনিয়াস মোসন'-এর গণনার জন্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতি নিয়ে হিসেব বের করার ব্যবস্থা করেন বস্তুত আধুনিক ইনটিগ্রেল এবং ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসেরই যেন তাঁরা সমপর্যায়িক মতবাদ। ঐ সময়ে পৃথিবীর চারপাশে সূর্যের সরণকে ৩৬০ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যার এক একটিকে বলা হয় সৌর দিন। এই সঙ্গে চান্দ্র-মাসেরও প্রচলন ছিল। সাতাশ অথবা আটাশ দিনে এক চান্দ্রমাস।

পদার্থ এবং রসায়নবিদ্যা : প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে সময় অনিত্য। দেশ এবং দিক, এই নিয়ে জগৎ। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু কণায় সৃষ্টি আকাশে। একথা প্রাচীন বেদান্ত দর্শনেই বলা হয়েছে। আশ্চর্য! বর্তমান দশকের পরমবস্তুবাদী জ্যোতিষ্কপদার্থবিজ্ঞানীদের মতেও এই যেন বিশ্বসৃষ্টির বাস্তব ঘটনা। কনাদের মতে আলো এবং উত্তাপ হল 'তেজ' বা বিকিরণ-শক্তি। ওরা মূখ্যত এক। প্রকাশে ভিন্নতর। শব্দ বাতাসের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে সঞ্চারিত হয়। সেই প্রাচীন যুগে এমন মতবাদ রীতিমত

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। জন্ম জানুয়ারী ১৬, ১৮৮৮, চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে। আজীবন বিজ্ঞানতপস্বী, সফল গবেষক এবং সুলেখক। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাঁর মৌলিক গবেষণা : **Co-ordination Chemistry, Chemistry of Biguanides, Magneto Chemistry.**

বিস্ময়কর। আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের সূত্র, বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চারণের সময় বাতাসের স্তরে পর্যায়-ক্রমিক সংকোচন এবং সম্প্রসারণ ঘটে থাকে, এমন ধারণা ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে ভর্তৃহরি রচিত 'মীমাংসা'-তেই দেখা গেছে। বক্র এবং সরলগতি, ভরবেগ, মাধ্যাকর্ষণ, চৌম্বক-আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, চাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায় ন্যায়-বৈশেষিক ভাষ্য (৩-৪ খৃঃ)। এমন কি ন্যায় বৈশেষিকের পণ্ডিতদের চোখে অ্যাম্বার বা পীত-স্ফটিককে ঘর্ষণ করে খড়-কুটোর সামনে ধরলে খড়কুটো যে তার দ্বারা আকর্ষিত হয় সেটাও এড়িয়ে যায়নি। এ ছাড়া রথ এবং বিভিন্ন ধরনের চাকা তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সতপথ ব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে, নগর পরিকল্পনার উল্লেখ আছে অর্থশাস্ত্রে

(৩ খঃ পঃ) ঘরবাড়ি এবং আসবাবপত্রের কথা জানা যায় যুক্তিকল্পতরু (১১ খঃ), যান্ত্রিক পুতুল এবং খেলনাপাতি সম্পর্কিত বর্ণনা সমরাঙ্গন সূত্রধরে (১২ খঃ), জাহাজ নির্মান-এর ব্যাপারে বিবরণ যুক্তিকল্পতরু এবং সমরাঙ্গনসূত্রধর প্রভৃতি গ্রন্থে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান : আয়ুর্বেদ বা প্রাণ বিষয়ক বিজ্ঞান। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন। প্রথম দিকে চিকিৎসার ব্যাপারটা কতকটা যেন আদিভৌতিক কান্ডকারখানার মতই ছিল। মন্ত্রোচ্চারণ, তুকতাক, মন্ত্রপূত কবচ বা দেবতার পূজা প্রভৃতির সাহায্যে রোগ-নিরাময়ের চেষ্টা চললেও পরবর্তীকালে মানুষের দৈহিক গঠনতন্ত্র শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত হয় উদ্ভিদ এবং ধাতু ওষুধরূপে। দেহের ভেতর নানারকম রস নিঃসরণের সংগে রোগসৃষ্টির যে সম্পর্ক রয়েছে সে

বিশ্বাসও তাঁদের জন্মায়। উত্তর-বৈদিক যুগে রচিত চরমসংহিতা এবং শুশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ভ্রূণ কীভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে যে ধরনের বর্ণনা এই সমস্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় যার সঙ্গে আধুনিক বর্ণনার পার্থক্য নেই বললেই চলে। ও'দের মতে দৈহিক রোগের মূল কারণ (ত্রিধাতু) তিনটি। এক, বায়ু। স্নায়ুমণ্ডলের কার্যকারণ সপর্কিত; দুই, পিত্ত। বিপাকীয় ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণকারী রসসমূহ; তিন, কফ। লসিকা সংক্রান্ত কোষ কলার কার্যাবলীর ত্রুটি। এদের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা রোগকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ'দের মতেও মুখ্যত রোগ তিন প্রকারের। এক, নিউরোসিস বা স্নায়ু-সংক্রান্ত রোগ, দুই বাইওসিস বা জৈবঘটিত রোগ এবং তিন, স্ক্লেরোসিস বা ধমনী প্রভৃতির কাঠিন্যজনিত রোগ। নিরাময়ের ব্যাপারে খাবার ওষুধের ব্যবস্থা ছিল, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করে দেওয়ার জন্যে তরল ওষুধ, গলা ধোয়ার বা গার্গল করার ওষুধ, ভেষজ-বড়ি, নাকের মধ্যে দেবার ওষুধ, তরল মলম, ডুসের জল প্রভৃতি। উত্তরকালে রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে আরও উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ঐ সময়ে শল্যচিকিৎসারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। শুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে, তখনকার দিনে ত্বকের অস্ত্রোপচার, প্লাস্টিক সার্জারি, চোখের এবং মাথার খুলির অস্ত্রোপচার প্রভৃতি করা হত। এবং অস্ত্রোপচারের জন্যে প্রায় একশ একুশ রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত। এই সমস্ত যন্ত্রপাতির সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রপাতির যথেষ্ট মিল আছে। অ্যালকেমি বা অপরসায়নবিদ্যার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নতুন ধরনের ওষুধও আবিষ্কৃত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিঁদুর। আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞদের মতে মকরধ্বজ নাকি প্রায় সমস্ত রোগ নিরাময়ের ব্যাপারেও যথেষ্ট সক্রিয়।

রসায়ন : পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত প্রাচীন ভারতেও এই বিশেষ শাস্ত্রটি জন্মলাভ করে মানুষেরই প্রয়োজনে। তাপের প্রভাবে মাটি বা কিছু কিছু খনিজ পদার্থে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, ৩০০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দের ভারতবাসীর কাছেও তা অজ্ঞাত ছিল না। তার পরিচয় বেলুচিস্থানের কুল্লি, নাল এবং কোলবা। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদরো থেকে পাওয়া ২৫০০—২০০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দের পোড়ামাটির তৈজসপত্র তার নিদর্শন। ওরা মাটির পাত্রের পালিশ করার কাজ জানত। জিপসাম এবং বালি মিশিয়ে ইঁট জোড়া

জগদীশচন্দ্র : ১৯২৮

বাঁ দিক থেকে বসে : মেঘনাদ সাহা, আচার্য জগদীশ এবং জে সি ঘোষ। বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে : এস দত্ত, সত্যেন বসু, ডি এম বসু, এন আর সেন, জে এন মুখার্জি, এন সি নাগ।

দেওয়ার মশলা, ঘরে পলস্তারা দেবার জন্যে জিপসামের সিমেণ্ট, তামা এবং ব্রোঞ্জের অস্ত্র এবং তৈজসপত্র, সোনা, রুপো এবং সোনা ও রুপো মিশিয়ে সংকর ধাতু (ইলেকট্রাম) তৈরি করে তাদের গহনাপত্র তৈরির ব্যাপারে অভিজ্ঞতাও ছিল যথেষ্ট। সুতী-কাপড় রং করার উপায়ও ওদের জানা ছিল।

তবে বৈদিক যুগে (১৫০০ পূঃ খৃঃ—৬০০ পূঃ খৃঃ) এবং উত্তর বৈদিক যুগে (৬০০ পূঃ খৃঃ—৮০০ খৃষ্টাব্দ) রসায়ন শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। ঐ সময়ে সোনা, রুপো, তামা, ব্রোঞ্জ, সীসে এবং টিনের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। চামড়া ট্যান করে পোশাক, চাবুক, বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী তৈরি করা হত। কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের ধাতুর নিষ্কাশন পদ্ধতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সীসের সঙ্গে মিশিয়ে রুপোকে পরিশুদ্ধ করার একটি পদ্ধতির কথা জানা গেছে যা আধুনিক 'কিউপেলেসন' পদ্ধতিরই অনুরূপ। তামা সংগ্রহ করা হত সিংভূম, হাজারিবাগ জেলায়—আজ থেকে দু হাজার বছর আগে। ঐ সময়ে মধ্য প্রদেশ, কুমায়ুন জেলা, গাড়োয়াল, উত্তর প্রদেশ এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোন কোন অঞ্চলেও তামা নিষ্কাশিত করা হত।

নৃতত্ত্ববিদরা উত্তরপ্রদেশের কোপিয়ার একটি সুপ্রাচীন (৫ পূঃ খৃঃ) কাচের কারখানা আবিষ্কার করেছেন, যা প্রাচীন

কাচ শিল্পে ভারত যে প্রচণ্ড রকম এগিয়ে ছিল, তার প্রমাণ দেয়। এই কুরুক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষের মধ্যে বিচিত্র ধরনের রঙিন কাচ, কাচের গোলক, চাঁই প্রভৃতি পাওয়া গেছে। তক্ষশিলাতেও কাচের চুড়ি পাওয়া যায় যা আজকের রসায়নবিদের কাছে এক বড় রকমের বিস্ময়। এ ছাড়াও বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতি, যেমন ভস্মীকরণ, তাপজারন, পাতন, ঊর্ধ্বপাতন বাষ্পীকরণ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়।

প্রাণীবিজ্ঞান : অথর্ববেদ-এ বিভিন্ন প্রাণী, তাদের বর্ণনা, আচরণ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। বর্ষায় ব্যাঙের ডাক, বিষাক্ত পতঙ্গের দংশন, ইত্যাদি। ছান্দোগ্য উপনিষেদ (৮০০ পূঃ খৃঃ) প্রাণীজগতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক, জীবজ বা জরায়ুজ। দুই, অণ্ডজ। তিন, উদ্ভিজ্জ। চরক প্রাণীদের এগার ভাগে ভাগ করেছেন : ক্রিমি, কীট, পতঙ্গ, এক-সাপ, বিষসাপ, মৃগ, ক্রব্যাদ, শ্বাপদ, জঙ্গল, গোময় এবং সর্প। শুশ্রুত, উমাস্বাতি প্রভৃতি অবশ্য ভিন্নতর এবং আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই ধরনের পৃথকীকরণের কাজ করেছেন। পাখী, বিভিন্ন ধরনের পশুর মধ্যেও যে স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রাচীন বিজ্ঞানীরা তা লক্ষ করেছেন। এমন কি, উদ্ভিদ জগতকেও তাঁরা ভাগ করেছেন গুণানুসারে এবং প্রয়োজনের দিকে চেয়ে : ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ, মানুষের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ, বিশেষ ধরনের গাছপালা, বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং পরিবেশ-সংযুক্ত উদ্ভিদ।

ভাষ্য : বস্তুত শুধু ঐতিহাসিক মূল্যেই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপূরকরূপে ব্যবহার করা যায় কি না এদিকে লক্ষ রেখে প্রাচীন ভারতের বিস্মৃত বিজ্ঞান-গবেষণা সম্পর্কে উদ্যোগী হতে পারলে হয়ত অনেকভাবেই আমরা লাভবান হতে পারব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে সোভিয়েত দেশ ইতিমধ্যেই তাঁদের হারানো বিজ্ঞানের পুনোরুদ্ধারের কাজে অনেক বেশি এগিয়ে গেছেন। তাতে লাভবানও হয়েছেন।

*

বসু বিজ্ঞান মন্দির-এর অধ্যক্ষ ডঃ এস এম সরকার তাঁর বাৎসরিক প্রতিবেদনে ঐ গবেষণা কেন্দ্রের বর্তমান কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করেন।

উল্লেখযোগ্য গবেষণার মধ্যে আছে : পারমাণবিক বিক্রিয়া, পরমাণু কেন্দ্রের গঠন এবং পরমাণু-কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়া রত বল; গামা রশ্মির সঙ্গে পরমাণুর প্রতিক্রিয়া, তেজষ্ক্রিয় অনুসন্ধানী বা ট্রেসার পদ্ধতির সহায্যে বিভিন্ন তাপমাত্রায় পারদের স্বপরিব্যাপ্তি (সেলফ ডিফিউসন) নির্ণয়, মাইক্রো ওয়েভ এবং আলট্রাসোনিক-এর যুগ্ম প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সমধর্মী এবং বিপরীত-ধর্মী তরলের গুণাগুণ নির্ণয়। রসায়ন বিভাগ কাজ করছেন ছাগল এবং গবাদির প্রোটিওলাইটিক এনজাইম এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুবর্তিতার ওপর; কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য সংশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তারা বংশ শাসনের ব্যাপারে কাজ করতে পারে কী না, তা নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। অনু-জীববিদ্যা বিভাগ বোসমাইসিন নামে এক ধরনের অ্যান্টিবাইওটিক পৃথক করতে পেরেছেন যা প্রাণীদেহে মাথাটার ধরনের বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। কাজ চলছে উদ্ভিদ-রোগ নিরাময়ের উপর। এখানে দেশী এবং বিদেশী ধানের সংকর তৈরি করা হয়েছে যা গুণাগুণ এবং উৎপাদনের দিক দিয়ে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। এ ছাড়াও গবেষণাগারের প্রাণী এবং প্রজনন বিভিন্ন বিভিন্ন সমস্যার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানের শেষে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় এবং উপস্থিত বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-প্রেমিকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পুরোধা ডঃ ডি এম বসু।

সংবাদ

দিল্লির ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার-এর বিজ্ঞানী শ্রীমহেন্দ্র-কুমার বর্মন একটি বিশেষ ধরনের 'মাইক্রোফিল্ম এবং জেরোগ্রাফিক মুদ্রন যন্ত্র' তৈরি করেছেন। জটিল এই যন্ত্রের সাহায্যে মাইক্রোফিল্ম-এর উপর তোলা বই-পত্র বা কোন লেখার ছবি সরাসরি একটি কাচের পর্দার ওপর প্রক্ষেপ করা যাবে এবং তা সহজেই পড়ে নিতে কারুর অসুবিধে

হবে না। যন্ত্রটির সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হল পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার ফিল্ম-এর নেগেটিভ বা পজিটিভ থেকে এর সাহায্যে সাধারণ কাগজের উপরই বিবর্ধিত পাঠ্যাংশ তুলে নেয়া সম্ভব। এর জন্যে এক ধরনের দেশজ তড়িৎ-ধর্মী পাওয়ার ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটির মূল্য পনের হাজার টাকার মত পড়বে। অথচ ঐ একই কাজের জন্যে যে ধরনের যন্ত্র বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে তার দাম এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর সবচাইতে সুবিধে হল, ঐ মেসিনে এক কপি লেখার ছাপ তুলতে যেখানে খরচ পড়ে আড়াই টাকা, নতুন যন্ত্রটি সেই এক কাজই করবে মাত্র পঁচিশ পয়সায়। নতুন এই উদ্ভাবনার জন্যে ১৯৭০ সালের জাতীয় পুরস্কার স্বরূপে শ্রীবর্মন এক হাজার টাকা সম্মানী পেয়েছেন।

সুমেরুর বরফ এবং আবহাওয়া

সুমেরু অঞ্চলে সঞ্চিত বরফের আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ যদি আমরা গলিয়ে ফেলি, কেমন হয়? কেউ কেউ মনে করেন, এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া মন্ডলে একটা প্রচন্ড রকমের পরিবর্তন আসবে। কিন্তু প্রচলিত এই ভাবনার বিপক্ষে মতামত জানিয়েছেন ডঃ খোরেন পেট্রোভিচ পোগোসিয়ান। ডঃ খোরেন সোভিয়েত দেশের জল-আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের বিভাগীয় প্রধান (দ্রঃ প্রিরোদা, ১৯৭০/নং ৬, পৃঃ ৭৪)।

ওঁরা অত্যন্ত জরুরী একটি সমস্যা নিয়ে কাজ করছিলেন। উত্তর মেরু অঞ্চলের আবহাওয়াকে কীভাবে উন্নত করা যায়, যাতে করে মানুষ সেখানে বাস করতে পারে, প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে পারে—সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তার উপর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, ঐ সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ খনিজ পদার্থ খনিজ তেল এবং গ্যাস পাওয়া যায়। ওঁরা চান মূল ভূখন্ড থেকে জাহাজ পথে সেখানে গিয়ে তাদের সংগ্রহ করতে। কিন্তু তার জন্যে চাই সরাসরি জল পথ। আর সে পথকে প্রশস্ত করতে হলে ভূখণ্ডের উপর জমে থাকা সাগর অঞ্চলে ভেসে বেড়ান বড় বড় হিমশৈলদের গলিয়ে ফেলা দরকার।

ডঃ পোগোসিয়ান এই ধরনের কোন ঝুঁকি নিতে গিয়ে উত্তর গোলার্ধের বায়ু-মণ্ডলে সত্যিই কোন পরিবর্তন আসে কিনা, এলে কী ধরনের পরিবর্তন দেখা যেতে পারে তার উপর পরীক্ষা চালান। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, ঐ ধরনের কাজ করতে গিয়ে সুমেরু এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলে
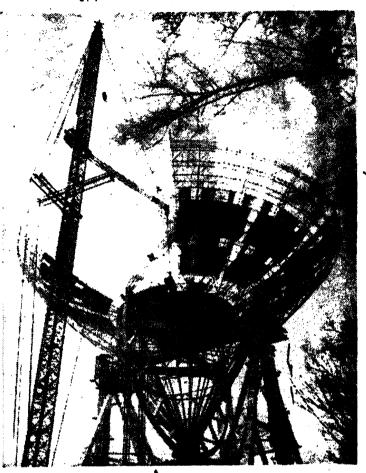
পৃথিবীর বৃহত্তম বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ওজন ৩০০০ টন। এর বেতার প্রেরক-গ্রাহক থালাটির সম্মুখভাগের ব্যাস একশ মিটার। এর সাহায্যে বন-এর ম্যাকস-প্লাংক ইনসটিটিউটের বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূর নক্ষত্র মন্ডলের বেতার নক্ষত্রের উপর পর্যবেক্ষণ চালাবেন। এ বছরেই এর কাজ চালু হয়ে গেছে। ছবিতে আংশিক-নির্মিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

বিশেষ করে শীতকালে বায়ুমন্ডলে কিছুটা চাপ এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন হতে পারে। তবে ঐ পরিবর্তন ইউরোপের উত্তরাংশে তেমন কোন লক্ষণীয় কিছু ঘটাবে না। এশিয়া এবং আমেরিকার পরিস্থিতি একই থাকবে। ঘূর্ণীঝড়ের প্রাবল্য, গতিপথ এবং ঘটনা সামান্য কিছু বাড়তে পারে। তবে তার বেশির ভাগই ঘটবে পশ্চিম সাইবেরিয়ায় এবং কিছুটা উত্তর সাগর অঞ্চলে। সেই সঙ্গে আবহাওয়ার দিক দিয়ে সুমেরু-অঞ্চল এবং অবশিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে আর কোন ব্যবধান থাকবে না।

ডঃ পোগোসিয়ানের গণনায় ধরা পড়েছে: উত্তর অঞ্চলের শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর তাপমাত্রার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না। বরফবিহীন সুমেরু অঞ্চলে সম্ভবত মে এবং সেপ্টেম্বর, এই দুই মাসে আবহাওয়ায় একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। অক্ষরেখা বরাবর বায়ু-প্রবাহে কিছুটা শ্লথ গতি দেখা দেবে। উক্ত অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় ছয় থেকে সাত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত বাড়তে পারে।

তবে ইতিমধ্যে পোগোসিয়ানকে সমালোচকদেরও সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। ওঁদের বক্তব্য, তাঁর ঐ তথ্যাবলী হয়ত ঠিক, গ্রহ-প্রযুক্তিবিদদের কাছে ব্যাপারটা হয়ত কৌতূহল উদ্দীপক, কিন্তু বরফ গলার ফলে অতিরিক্ত যে জল পাওয়া যাবে, তা পৃথিবীর নিম্নাঞ্চলের শহরগুলিকে কী নিমজ্জিত করবে না?

সমরজিৎ কর

পানামা
সিগারেট
একটি পানামা সিগারেট ধরিয়ে দেখুন। একেবারে প্রথম টানেই বুঝতে পারবেন ওর বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাকের চমৎকার স্বাদ। তারপর টানের পর টানে ধূমপানের অপূর্ব আমেজ পাবেন — একেবারে শেষ টান পর্য্যন্ত।
শেষ টান পর্য্যন্ত ভালো!
Panama
20
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম।

॥ তিন ॥

'বিলক্ষণ!' নিশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক: 'আপনার আর্ট তো খালি কথার খেলায়।'

'বাহিলক্ষণ তাই বটে। কিন্তু এহ বাহ্য। বাহ্যদশার মতন অন্তর্দশাও থাকে, এমনকি শব্দদেরও।' আমি বললাম: 'কথার খেলাকে নিতান্ত খেলার কথা ভাববেন না। শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ব্রহ্মের রহস্য কী, আমি জানিনে, কিন্তু শব্দদের চিরদিনই আমার রহস্যময় মনে হয়। একেকটি word একেকটি world। তার মন নিয়ে, মনন নিয়ে স্বতন্ত্র এক একটি শব্দ, প্রায় মন্ত্রের মতই, কেবল যে তার অর্থের সহিতই জড়িত তাই নয়, তার মধ্যে একাধিক অর্থ, বিচিত্র রস, আশ্চর্য দ্যোতনা।'

'এ আবার কোন শব্দতত্ত্ব আনছেন?'

'নিজেই জানি না। এক স্বরে একাধিক ব্যঞ্জনা, এক ব্যঞ্জনায় একাধিক স্বর, ভাবলে অবাক হতে হয়। অবাক হয়ে ভাববার। শব্দরূপ, শব্দরস, আর শব্দতত্ত্ব—সব মিলোলে পরম রহস্য—আমি হয়ত চেয়েছিলাম তাই দিয়ে জগন্নাথের ভোগ বানাতে, জগন্নাথ মানেই জগজ্জন। কিন্তু আমার অক্ষমতায় তা হয়ত হয়ে দাঁড়িয়েছে নেহাৎ এক জগাখিচুড়ি।'

'আপনার ক্ষোভের কারণ নেই। জগজ্জন না হোক জগতের বালকজন আপনার সেই খিচুড়ি খেয়ে খুশি। জগত বলতে অবশ্য আমাদের এই বাংলা দেশ।'

'সুবোধ বালক তারা—যা পায় তাই খায়, তাতেই খুশি। তাদের কথা ছেড়ে দিন!...'

'আপনিও ও কথা ছাড়ুন। কথার কথা থাক্, কাজের কথায় আসা যাক। যে জন্যে এসেছিলাম—ভুলে গেলেন নাকি? আপনার জীবনকাহিনী...'

'আমার জীবন আমার যত কাহিনীর মধ্যেই বিধৃত, বিবৃত। তার মধ্যেই তার ধরা পড়েছে, ধরা রয়েছে। খুঁজে পেতে সমঝে নিতে হবে। আমার কাহিনীই আমার জীবন, আর জীবনই আমার যত কাহিনী।'

'তার মানে?'

'নিজের জীবন নিয়েই আমার যত গল্প লেখা, বুঝলেন কিনা, আমার জীবনটা অনেকটা গল্পের মতই। জীবন দেখে, জীবন থেকেই তো সাহিত্য ছেঁকে নিতে হয়। আমার জীবনে আমার নিজের জীবনটাই ঘুরে ফিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি কেবল, সীমিত ক্ষমতা নিয়ে তার বাইরে আর যেতে পারিনি, তাই ঘুরে ফিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই জীবনটাকেই দেখিয়েছি আমার রচনায়।'

'আপনি লিখেছেনও তো নেহাৎ কম না মশাই!'

'জীবনও তো বিপুল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, দিগ্বিদিকে বিস্তৃত। ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট। বেশির ভাগই ট্রাজেডি। তবে কিনা, একজনের দুঃখের কারণ অপরের উপভোগের বস্তু হতে পারে। আমার জীবনের বিয়োগ-যোগগুলি আমি তাই অপরের উপভোগ্য করে তুলেছি। নিজের দুঃখেই কাঁদছি, কতক্ষণেরই বা সে কান্না! তাই দিয়ে আবার অন্যকে কাঁদিয়ে কী হবে?'

'তা বটে।'

'তবে কিনা, সর্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি করতে সবার জীবন দেখে সকলের জীবন থেকেই নিতে হবে। কিন্তু বলেছি তো আমার ক্ষমতা অতি সীমিত, উৎসাহও পরিমিত। কুলী কামিনের কাহিনী লিখতে হলে কয়লা কুঠিতে কাটাও, বস্তির চরিত্র বানাতে পাঁকের মধ্যে মজো, গঙ্গার গল্প লিখতে গিয়ে জেলে হও, জেলেদের সঙ্গে মেশো গিয়ে, আর কয়েদখানার কাণ্ড জানতে হলে কষ্ট করে জেলে যাও। এবং জেলে গিয়ে কষ্ট করো। পাহাড়ে পরিবেশের পরিচয় দিতে বিস্তর চড়াই উতরাই পেরোও। কিন্তু পায়ের হাড় শক্ত নয় যে পাহাড় পার হই, তাই কোনো মহা-প্রস্থানের পথে না গিয়ে ঘরে বসে নিজেকে দেখে নিজের থেকেই আমার এই প্রবোধলাভ।'

'নিজেকে জানলে সবাইকে জানা যায় বলে যে।' তিনি বলেন—'তাই বা মন্দ কি?'

'হ্যাঁ, মন্দ কি! পহেলা, আত্মানং বিদ্ধি। প্রথমে নিজেকে বিদ্ধ করে তারপর আর সবাইকে বিদ্ধ করা। লক্ষ্যভেদ করা নিয়ে কথা। আমিও সেই কথাই বলি। সেই সঙ্গে একথাও বলি, আমার সাহিত্য সর্বজনীন সৎকালীন এমনকি সর্বাঙ্গীনও হয়নি। সত্যি বলতে, তা সাহিত্যই নয়।'

'সাহিত্যই নয়। তাহলে কী তবে?' বলেছি তো জগাখিচুড়ি। তবে কিনা খিচুড়িও একেক সময়ে ভালো লাগে। বাদলার দিনে তাতেই মজে যায় সবাই। তাই যদি বা কখনো মানুষের পাতে পড়ে, ভোগে লাগে। তার জীবন যন্ত্রণায় একটুখানি ভোলানোর জন্যেই আমার এই হাসির পরোয়ানা। দুঃখের পরোয়া না করার। তবে তাতেও কতটা সিদ্ধকাম হয়েছি তা জানিনে।'

'আপনার গল্পকথা থাক, সে তো আপনার বই পড়লেই জানা যায়। আমি এসেছি আপনার কথা জানতে, আপনার নিজের মুখ থেকে। আপনার ঠিকুজি কুলজী নিতে।'

'আমার কোনো কুলের খবর আমি রাখিনে। ছোটবেলায় বাড়ির মায়া কাটিয়ে পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন, পিতৃকুলে বাবার নামটুকু জানি খালি, ঠাকুর্দার নাম জানিনে। মাতৃকুলে দাদামশায়ের নাম জানতাম, ভুলে গেছি এখন। কোন্ না কোথাকার জমিদার ছিলেন, তাঁদের বংশের কে বেঁচে বর্তে আছেন জানা নেই। তিনকুলের পিতৃকুল মাতৃকুল মাতৃকুল গেল, তারপর জামাতৃকুল। তাও আমার নাস্তি।'

'জামাতৃকুল?'

'হ্যাঁ। তাও নেই। মেয়ে থাকলে তো জামাই। মেয়েই নেই, বিয়ে হয়নি বলে।'

'বিয়ে হয়নি কেন?'

'পৈতে হয়নি বলে বোধহয়। সেকালে অসবর্ণ বিবাহ ছিল না। পৈতে নেই, অচেনা বামুনকে কে মেয়ে দেবে? আর, বিয়ে যখন হয়নি আমার শ্রাদ্ধও হবে না আশা করি। ছেলে নেই, পিণ্ডি চটকাবে ছেরাদ্দ করবে কে?'

'আপনি খালি কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন! কোথায় গেলে আপনার কুলের খবর পেতে পারি তাই বাতলান।'

'কোথায় পাবেন! নিজের কুলকিনারা পাই এমন আমার ক্ষমতা নাই। কোথায় যাবেন?'

'আপনার বন্ধুকুলের কারো কাছে?'

'বন্ধুকুল! পৃথিবীতে বন্ধু বলে কেউ আছে আমি জানিনে। শুধু আমার নয়, কারো আছে কি না সন্দেহ! বন্ধু পাওয়া যায় ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজেই। প্রাণের বন্ধু। তারপর আর না।'

'আর না? সারা জীবনে আর না?'

'জীবন জুড়ে যারা থাকে তারা কেউ কারো বন্ধু নয়। তারা দুরকমের। এনিমি আর নন্-এনিমি। নন্-এনিমি-দেরই বন্ধু বলে ধরতে হয়।'

'আপনার বেলায়?'

'আমার কেউ এনিমি নয়। এ পর্যন্ত পাইনি একটাও। কিন্তু তারা কেউ আমার কোনো খবর রাখে না।'

'কেন, ভবানীবাবু তো অনেক খবর রাখেন আপনার। তাঁর লেখা অমৃতের 'কাছে বসে শোনা' সিরিজে আপনার কথা বেরিয়েছিল...'

'তাঁর মহিমা। আগাগোড়া মনগড়া। আমি তাঁকে কাছে বসে কিছু শোনাইনি। তাঁকে শোনাবার আমার কিছু নেই এই কথা তাঁকে জানাতে যেদিন তাঁর বাড়ি গেলাম, শুনলাম তিনি আগের দিনই তাঁর লেখাটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন কাগজে। যথাসময়ে আমি যেতে পারিনি তাই।'

'পড়েননি লেখাটা?'

'পড়েছি। পড়ে আমি তাজ্জব। বাল্মীকির যেমন রাম না হতেই রামায়ণ রচনা, তাঁরও তেমনি এই শিব্রামায়ণ কাণ্ড! আপন মনের মাধুরি মিশায়ে সেই আশ্চর্য সৃষ্টি! তিনি যে অসাধারণ কথাশিল্পী তার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর ছাড়া কিছু নয়।'

'বলেন কি!'

'আমার ভাঁড়ে ভবানী তা জানি কিন্তু—ভবানীর ভাঁড়ে যে এতও আছে তা আমার জানা ছিল না। গল্প লেখায়, মহৎ জীবনী রচনায়, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমীক্ষা, সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর ভাঁড়ার অফুরন্ত জানতাম, কিন্তু একটা নগণ্য ভাঁড়কে এমন প্রকাণ্ড করা—সত্যিই অদ্ভুত! অবাক করা কাণ্ডই! সামান্য ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড দেখানোর মতন বাহাদুরি আর হয় না!'

'প্রেমেনবাবুও তো 'আমার বন্ধু শিব্রাম' বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন কোন কাগজে, পড়েননি? সেটাও কি বানানো?'

'পড়েছি। কে একজন এনে পড়িয়েছিল লেখাটা। না, সেটা বানানো নয়। সত্যি ঘটনাই। প্রেমেনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনাই। এক সিনেমা হাউসেই সেটা হয়েছিল। অবশ্যি, তার আগে কল্লোল কার্যালয়ে তাকে দেখেছিলুম, কিন্তু সেখানে কোনো কথা হয়নি—আলাপ হয়নি—আলাপ জমেছিল সেই সিনেমাতেই।'

'কোন সিনেমাতে?'

'আমার ঠিক মনে নেই। এখনকার এলিট-এই হবে বোধকরি। স্মরণীয় হলেও কোনো কিছু আমার মনে থাকে না, ধরে রাখতে পারে না আমার মন। এমনিই আমার বিস্মরণশক্তি। কিন্তু আশ্চর্য স্মরণশক্তি ওর, সিনেমা হলের সামান্য খুঁটিনাটিটা পর্যন্ত সে মনে করে রেখেছে। তার সেই লেখাটাতেই দেখা

তার চেয়ে দামটাই না-হয় দিয়ে দিই
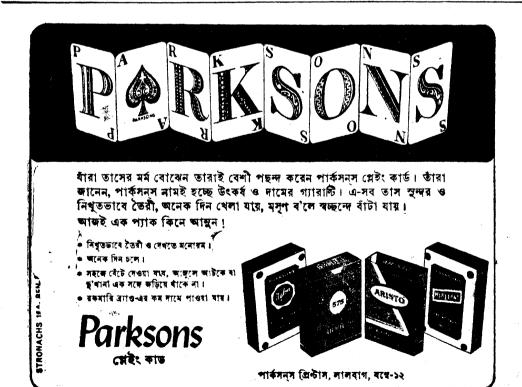
গেল। না মশাই, তাতে আমার বিষয়ে কোনো অত্যুক্তি নেই। প্রায় সব ঠিক কথাই।'

'প্রায় ?'

'একেবারে, ঠিক ঠিক এ দুনিয়ায় কিছুই হয় না, হতে পারে না। সবই যেন প্রায় প্রায় হয়ে যায়।'

'আবার অচিন্ত্যবাবুও আপনার কথা লিখেছেন তাঁর কল্লোলযুগে।'

'শুনেছি, কিন্তু পড়া হয়নি। সেটাও নিশ্চয় অচিন্তনীয় কিছু হবে। ওর কলম তো কারো কোনো খুঁৎ দ্যাখে না, সবার ভালো দিকটাই দ্যাখে কেবল, নিতান্ত সাধারণকে অসাধারণ করে দেখায়।'

'পড়ে দেখেননি? আপনার কথা আপনি পড়ে দেখেননি!' তিনি একটু অবাক হন।—'আশ্চর্য তো!'

'কী করে পড়ব! পাইনি তো। কেনাও হয়নিকো, বেজায় দাম বইটার, কিনতে পারিনি তাই। পয়সা কই আমার।'

'অচিন্ত্যবাবু দেননি আপনাকে?'

'দিয়েছিল, মানে, দিতে চেয়েছিল। বলেছিল ডি এম লাইব্রেরি থেকে নিয়ে নিয়ো। চাইতে গেলে গোপালবাবু বললেন, কী করবেন বই নিয়ে? ফুটপাথে বেচে দেবেন ত! নাম খারাপ হবে আমাদের। তার চেয়ে তার দামটাই না হয় দিয়ে দিই। এই নিন পাঁচ টাকা। ধরুন।"

'কী করলেন?'

'ধরলাম। তৎক্ষণাৎ। সমঝদার লোক তো। এ বিষয়ে আমিও বুঝদার বেশ। ওই পাঁচ টাকায় ও'রই দোকানের সামনে ফুটপাথ পেরিয়ে চাচার হোটেলে গিয়ে নিজেকে বাঁচালাম। কল্লোলযুগে শুনেছি, আমার সম্বন্ধে বিস্তর ভালোমন্দ কথা ছিল, পড়া হল না। কিন্তু ভালোমন্দ খাওয়া গেল খুব। ডি এম অচিন্ত্যর দৌলতে কাটলেট খাওয়া গেল মজা করে।...নিজের প্রশস্তি পাঠের চেয়ে সেটা আরও প্রশস্ত ব্যাপার নিশ্চয়।'

'কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়তে পারতেন তো বইটা?'

'কৌতূহল হয়নি আমার। সত্যি বললে, কৌতূহল বস্তুটা আমার কম। কোনো বিষয়েই তেমনটা নেই, নিজের বিষয়ে তো আরো কম। কেননা, আমার কাছে আমার কিছুই বোধহয় অজানা নেই। নিজের বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি অপরের চেয়ে একটু বেশি জানি।'

'তাহলেও এটা আমার কাছে কেমন যেন ঠেকছে।' তিনি বললেন: 'বইটা হাতে পেলে কি আর আপনি পড়ে দেখতেন না?'

'ভদ্রলোক ধরেছিলেন ঠিকই। দামী বইটা নিয়ে বেচেই দিতাম আমি, ফুটপাথে ঠিক না হলেও। তবে বইটা আগাগোড়া পড়ার পরেই বেচতাম যদিও। কী করব বই নিয়ে? আমার বাসায় বই রাখবার জায়গা কই? একটাও আলমারি কি বুক-শেলফ আছে? কোনো বই-ই আমার কাছে নেই কো, এমনকি, নিজেরও একখানা নয়। চেয়ে দেখুন চারধারে।'

'তাই ত দেখছি। লেখকের ঘরে এক-খানা কারো বই নেই? আশ্চর্য!'

'যেমন লেখক, তেমনি আমি পাঠক। যেমন লেখায় তেমনি পড়ায় আমার অনীহা। লেখাপড়ায় আমি সমান চৌখস।'

'কিন্তু আপনি যে বইটা নিয়ে বেচে দেবেন, গোপালবাবুর এটা ধারণা করা অন্যায়। উনি সেটা টের পেলেন কি করে?'

'বারে! উনি টের পাবেন না? ও'র কাছেই তো বেচেছি কত বই! আমার কোনো বই বেরুলে তার কমপ্লিমেণ্টারির পঁচিশ কপি তো ও'র দোকানে গিয়েই বেচে আসতুম, একটু বেশি কমিশন দিয়ে নগদ মূল্যে। উনি কিনতেন আর উনি জানবেন না!'

'তাই নাকি! নিজের নতুন বইও বাড়ি এনে দেখবার সাধ হত না আপনার?'

'সাধ্য হত না। পাড়ার ছেলেমেয়েরা কেড়েকুড়ে নিত রাস্তাতেই। ভাব ছিল তাদের সঙ্গে। তাছাড়া, বাসার লোকরাও পাবার আশা করত। দিলে আর তা ফিরে পাবার প্রত্যাশা ছিল না। বৃথা বাজে বরবাদ না করে তার চেয়ে নিজের আশ মেটানোটা কি ভালো না মশাই?'

'নিজের আশ মেটানো?'

'ভালো একটা প্রাতরাশ। টোস্ট মাখন ডিমের পোচ দিয়ে কোনো রেস্তরাঁয় গিয়ে। তারপর ধরুন, তেমনি

ভাল একটা প্রাতরাশ

পরিপাটি একখানা মধ্যাহ্ন আশ—কোনো পাইস হোটেলে নানারকমের মাছ মাংসে, সন্ধ্যায় আবার তেমন ধারার একটা সান্ধ্য আশ। তারপর? না, তারপর আর কোনো আশ নেই। তারপর একটানা সারা রাত্তির লাশের মতন লম্বা ঘুম একখানা।'

'এরকম করতেন কেন? না, আপনার ঐ খাওয়া কি ঘুমের কথা বলছি না। এই বই বেচাটা...'

'ঠিক লেখকসুলভ নয়, এই ত? কিন্তু আমিও তো সুলভ লেখক নই। খবর কাগজ বেচেই জীবিকার্জনের শুরু হয়েছিল বলেই হয়ত অভ্যেসটা এসে থাকবে। তারপর সেই সব কাগজে লেখা শুরু করেই আমার লেখক জীবনের সূত্রপাত হল। আর সব লেখকের কেমন আয় হত জানি না, আমার প্রায় যায়

যায় দশাই ছিল। ভারী টানাটানির সময় গেছে সেটা। যেমন ছিল লেখার দর, তেমনি তার আদর। তিনশ লাইন লিখে তিন টাকা পেতাম তখন।'

'বলেন কি!'

'এমনিই ছিল সেকালটা। এখন অবশ্যি তিন লাইন লিখে তিনশ টাকা পাই। তবে তার কতটা আমার আর কতখানি খোদার কুদরৎ তা জানি না। একটা কথা বলব আপনাকে? কাউকে বলবেন না। প্রেমেন জানলে মনে ব্যথা পাবে, অবশ্যি, এখনও যদি তার ব্যথা পাবার মতন মন থেকে থাকে।'

'বলুন।'

'প্রেমেনের প্রথম বই 'পুতুল ও প্রতিমা', বেরিয়েছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় থেকে। গল্পের বই। অতুলনীয় গল্প সব। অনেকদিনের পর তার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুলে সিগনেটের থেকে। তার একখানা কপি হাতে পেতে পাতা উল্টে দেখি, বইটা আমার নামেই উৎসর্গ করা। এ কী! আমি অবাক হয়ে গেলাম দেখে। তোমার প্রথম বইটা আমাকেই দিয়েছ দেখছি। গদ্‌গদ কণ্ঠে তাকে বললাম।'

'সে কি! তুমি জানতে না?' সে শুধালো।

'না। এই দ্বিতীয় সংস্করণ বের হবার পর টের পেলাম।' আমি বলি—'দ্বিতীয় সংস্করণটাই দিয়েছ বুঝি আমায়? প্রথম সংস্করণটা কাকে দিয়েছিলে?'

'কেন, তোমাকেই ত! তুমি জানতে না?' সে তো হতবাক। 'বইয়ের প্রথম সংস্করণ একজনকে, দ্বিতীয় সংস্করণ আরেকজনকে—এরকম দেওয়া যায় নাকি!'...আশ্চর্য! বইটা বেরুবার দিনই তো দিয়েছিলাম তোমায়, তোমার বাসায় গিয়ে, মনে নেই?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে এখন। আমি বাসার থেকে বেরুচ্ছি আর তুমি এলি—পথেই তো দেখা হল, মনে আছে বেশ।'

'বইয়ের মলাটও উলটে দ্যাখনি নাকি!'

'উলটে দেখার কী ছিল? তোমার সব লেখাই ত মাসিকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই পড়া। একবার নয় বারবার। সেই সব জানা গল্প আবার নতুন করে জানতে যাবার কী আছে—তাই কোন কৌতূহল হয়নি আমার।'

মনে পড়ল তখন। হাতে পেয়ে বইটার মলাট দেখেই খুশি হয়েছিলাম। মলাটের পাতা উলটে আরো বেশি খুশি হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি যে, সেটা আমার ললাট! প্রেমেনের বই তখন লোকের হাতে হাতে চলত, তাই মনে হয়েছিল এই দুর্যোগের দিনে এটাকেও হাতে হাতেই চালিয়ে দিই এই সুযোগে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এম সি সরকারে গিয়ে বেচে দিয়ে এসেছিলাম বইটা। (ক্রমশ)

লোকসঙ্গীতের আলোচনাচক্র

বছরখানেক আগে একবার এনথ্রপলজি ডিপার্টমেণ্ট থেকে আয়োজিত একটি সেমিনারে কলকাতায় প্রচলিত নানারকম সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। এর সঙ্গে বর্তমান কলকাতার আরও অনেক বিষয়ের চিত্তাকর্ষক আলোচনাও হয়েছিল। এ সম্বন্ধে লিখেওছিলাম। সম্প্রতি জানা গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাংলার যাবতীয় লোকব্যাপারের একটি আলোচনাচক্র বসবে। অর্থাৎ, কলকাতা তথা 'আর্বান' ব্যাপারটি এবারে বাদ। সমগ্রভাবে এটিকে এঁরা 'বাংলায় লোকসংস্কৃতির আলোচনাচক্র' নাম দিয়েছেন। লোকসঙ্গীত স্বভাবতই এই বৃহত্তর বিষয়ের একটি আলোচনার বস্তু।

লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছে। বিশেষ করে বাউল সম্বন্ধে গভীর গবেষণাও হয়েছে। নানারকম লোকসঙ্গীতের স্বরলিপির বইও কম দেখা যায় না। তথাপি লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনায় লোকসঙ্গীতের মূল্যায়নের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কেননা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সাংগীতিক অবস্থাটি কিরকম সেটি নির্ধারণ করা আবশ্যক। লোকসাহিত্যের আলোচনায় সাধারণভাবে লোকসঙ্গীতও বেশ খানিকটা এসে পড়ে—কিন্তু সবটা নয়। অনেক বিষয় আছে যা সাংগীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে সম্পূর্ণ বিচার করা যায় না। ঠিক সেভাবে লোকসঙ্গীতকে বিচার করা হয়েছে বললে হয়ত যথার্থ বলা হবে না।

এই আলোচনার সূত্রপাত করতে গেলে স্বতই অতীতের কথা এসে পড়ে। কেননা অতীত এবং বর্তমান নিয়েই মূল্যায়ন ও ভবিষ্যতের নির্দেশ সম্ভব হয়ে থাকে।

"লোক" শব্দটির ব্যবহার আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এর একটি বিশেষ সংজ্ঞা আছে। লোকযাত্রা শব্দটির ব্যবহারও উক্ত গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এই শব্দের অর্থ সাধারণ জনজীবনের গতি প্রকৃতি। নাট্যাদিতে লোকপর্যায়ের বিবিধ বস্তুর প্রয়োগ যেমন হত তেমনি কৃত্রিম আর্টের নানা উপকরণ থাকত। এই দুটি অভিনয়ের নাম ছিল লোকধর্মী এবং নাট্যধর্মী। তৎকালে শক, যবন, পুলিন্দ, শবর, খস প্রভৃতি নানা জাতির ব্যবহারের নানা প্রতীক পর্যন্ত নাট্যে স্থান পেত। অতএব লোকসংগীত যে নানাভাবে নাট্যাদিতে প্রযুক্ত হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত নাটকের গানগুলি প্রধানত রচিত হত প্রাকৃতে। সাধারণের উপভোগের জন্যই যে এটি করা হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকের ধারণা আছে হিন্দু যুগের নাটক

ছিল রাজা মহারাজদের চিত্তবিনোদনের জন্য। এই ধারণা ভ্রমাত্মক। নাটকের মূল উদ্দেশ্যই ছিল লোকচিত্তের বিনোদন। নাটকের মাধ্যমে লোকে অনেক কিছু দেখবার, জানবার সুযোগ পেত। শাস্ত্রীয় নির্দেশ এ বিষয়ে খুবই স্পষ্ট।

সেকালে এইসব সঙ্গীতকে বলা হত দেশী সঙ্গীত। দেশে দেশে যে সব সংগীত প্রচলিত ছিল তাদের দেশী পর্যায়ে ফেলা হত। এই সব নানা সংগীতের বিবরণ প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এইগুলিকে দেশী সংগীতের প্রবন্ধ শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। বহুতর প্রবন্ধই ছিল সেকালের লোকগীতি।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে আমরা "নাগরক" শব্দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। দেশের বিশিষ্ট স্থানাদিতে যাঁরা পরিশীলিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদের বলা হত "নাগরক"। এঁরা উনবিংশ শতাব্দীর বাবু শ্রেণীর না হলেও পরিচ্ছন্ন বিলাসিতায় জীবন যাপন করতেন। এঁরা যে গীতবাদ্য অভ্যাস করতেন তাও যথেষ্ট পরিশীলিত। এ থেকে বোঝা যায় নগর সভ্যতা এবং গ্রামীণ জীবনধারা বহু পূর্ব থেকেই যথেষ্ট পৃথক হয়ে গেছে। কিন্তু দুটি ধারার সংস্কৃতিকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরবর্তী হিন্দু যুগে বা মুসলমান শাসনের প্রাক্‌কালে দেখা যায় দেশে প্রচলিত বিবিধ সংগীতের বর্গীকরণ হয়েছে এবং রাগসংগীত ও প্রবন্ধসংগীত এই দুই ভাগে সংগীতকে ভাগ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধ পর্যায়ের আবার কয়েকটি উপবিভাগ ছিল। এগুলির মধ্যে "প্রকীর্ণ" পর্যায়ে লোকসংগীতসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। মোটামুটি হিন্দু যুগ থেকে মুসলমান শাসনের প্রথম যুগ পর্যন্ত বর্গীকরণের একটা চেষ্টা ছিল কিন্তু মধ্য যুগ থেকে এই প্রথা আর তেমনভাবে অনুসরণ করা হয়নি। এই কারণে লোকসংগীতের বিবর্তনের সম্পূর্ণরূপ আমাদের পক্ষে পাওয়া আর সম্ভব হয়নি। অবশ্য এই বর্গীকরণের প্রথাটা খুব শিথিল ছিল, তথাপি শ্রেণীবিভাগের ফলে কোনটার ধরণ কি রকম সেটা আন্দাজ করা যেত; কিন্তু পরে তার সূত্র ধরে আর কোনও কাজ না হওয়ায় সেই সব প্রচলিত গানগুলি কাদের সঙ্গে মিশে গেল বা কোথায় রয়ে গেল সেটা আর জানা যায় না। এ বিষয়ে কোনও বিশেষ কাজ হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। সঙ্গীতরত্নাকর গুজরাট অঞ্চলে লেখা হয়েছিল। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বহুপ্রকার গান হয়ত এখনও উক্ত অঞ্চলে অনেক স্থলে থাকা সম্ভব। আমার মনে হয় "ধবল" জাতীয় কোনও গান যেন বছর কয়েক পূর্বে রেডিওতে আঞ্চলিক পর্যায়ের সঙ্গীত হিসাবে শুনেছিলাম। এই রকম চেষ্টা করলে এই সব গানের অস্তিত্ব উত্তর ভারতের অন্যত্র পাওয়াও যেতে পারে। এটা করা দরকার।

বিবর্তনের কথা বলছিলাম। লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অপরাপর ব্যাপারের মত বিবর্তন ঘটে চলেছে। স্থান, কাল, পাত্র অনুসারেই এই বিবর্তন ঘটে। পরিশীলিত সমাজের সঙ্গীতেও এই ভাবেই বিবর্তন ঘটে। কিন্তু দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। লোকসংগীতে পরিবর্তন আসে অনুভূতি থেকে আর পরিশীলিত সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয় ইনটেলেক্‌ট্‌ থেকে, অর্থাৎ ধীশক্তির প্রয়োগে। জনজীবনে যে সংগীত প্রচলিত সেটা পূর্বের ধারা অনুসরণ করে মোটামুটিভাবে একই নিয়মে চলে আসে বটে কিন্তু নানা কারণে অঞ্চলসমূহের পারিপার্শ্বিক বদলায়। তখন তার প্রভাবে কখন যে তাদের সঙ্গীতে পরিবর্তন এসে যায় তা হয়ত তারাও বোধ করতে পারে না। অনেক সময় বাইরের রীতিগুলি তাদের মনকে আকর্ষণ করে এবং সেগুলি আপনা থেকেই তাদের সংগীতে এসে পড়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে। এই ভাল লাগাটা প্রধানত অনুভূতির ব্যাপার, যাচাই করবার প্রশ্ন তাদের মনে উদিত হয় না। কিন্তু পরিশীলিত সমাজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কাজ করে, তাদের প্রয়োগ সব সময়েই অর্থপূর্ণ। তা সত্ত্বেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুটি সমাজের মিশ্রণেও সংগীত সৃষ্ট হয়ে থাকে। এখানে একটা সাধারণ ক্রিয়া উভয় মনকে শাসন করে বলে মনে হয়। পাঁচালী, কথকতা, কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতি রীতিতে এর নানাবিধ উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। যেখানে নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোক সংস্কৃতির মিল আছে সেখানে উভয়ের যুক্ত হবার কোনও বাধা থাকে না।

তথাপি একটা সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেটি হচ্ছে, লোকসংগীত যতই অনুভূতি প্রধান হোক না কেন একেবারে নির্বিচারেই সে পারিপার্শ্বিক থেকে আহরণ করে না। এক্ষেত্রেও লোকনিয়মে একটি নির্বাচন প্রণালী অনুসৃত হতে দেখা যায়। যে অনুভূতি এক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে সেটা নির্বাচনের নিয়মকেই মেনে চলে। যেটা লোকচিত্তে সাড়া দেয় অর্থাৎ যার মধ্যে লোকচিত্তে আবেদন করবার উপাদান আছে কেবলমাত্র সেটাই লোকসংগীতে গৃহীত হয়, নতুবা নয়।

শহরের লোকেরা অনেক সময় লোক-সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়। এর কারণ কি উক্ত সঙ্গীতের সারল্য, কম্পোজিশন বা মেলডির বিশেষ আবেদন? আমার মনে হয় এগুলি কারণ হলেও মুখ্য হেতু নয়। আসল ব্যাপারটা বোধ করি এই যে লোকসঙ্গীতে শহরের লোকেরা তাদের কৃত্রিম জীবনধারার বিবিধ নিয়ম নিষেধের বাঁধন থেকে মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। পরিশীলিত সঙ্গীত শত চেষ্টা করেও লোকসঙ্গীতের মত মানবমনের একান্ত কাছে আসতে পারে না। যেটা যার নেই সেটার প্রতিই তার আকর্ষণ তত বেশী। বোধ করি এই কারণেই পরিশীলিত সমাজ লোকসঙ্গীতে এক প্রকার অসামান্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করে আকৃষ্ট হয়।

এই আকর্ষণেই নাগরিক সঙ্গীতশিল্পী-দের মধ্যে কেউ কেউ লোকগীতি গেয়ে থাকেন। কিন্তু নাগরিক জীবনে নাগরিক সঙ্গীতের শৈলীতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের কণ্ঠে লোকসঙ্গীত লোকজীবনের ধারায় অভ্যস্ত শিল্পীর মত বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। কিছুটা সংস্কার তাঁদের করে নিতেই হবে। এখানেও প্রায় মনের অগোচরেই এই নির্বাচনের ক্রিয়া ঘটে চলেছে। বিদগ্ধ শ্রোতাদের কাছে বা যেখানেই হোক নাগরিক শিল্পীকে কিছুটা পরিশোধিত করে লোকসঙ্গীত পেশ করতে হবে। এটা স্বভাবেরই বিধান। তবে এই শোধনের একটা সীমা থাকা দরকার। যেটুকু সংস্কারবশে ঘটে সেটা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু তার অতিরিক্ত যে পরিবর্তন ঘটানো হয় সেটা কৃত্রিম। তাতে লোকসঙ্গীতের মূল রূপটি বা আবেদনটি বিকৃত হবার সম্ভাবনা। সেটির প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল।

লোকসংগীত বা উপজাতীয়দের সংগীত সম্পর্কে কতকগুলি ধারণা আলোচকদের মধ্যে গড়ে উঠেছে; যথা এ সব গানে তিনটি বা চারটি স্বরের প্রয়োগ হয় কারণ যে সব সম্প্রদায়ে এগুলি প্রচলিত তারা কয়েকটি স্বরে ছাড়া অপর স্বরের প্রয়োগ সম্বন্ধে অবগত নয়, যেহেতু তারা আদিম স্তরে রয়ে গেছে। এত সহজে বোধ করি এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। অনেক কারণেই অল্প স্বরের প্রয়োগ হতে পারে। তার কারণ এ নয় যে অধিক স্বর প্রয়োগের রীতিটা তারা জানে না। প্রয়োজন হলেই স্বরের প্রয়োগ বাড়বে এবং অলংকরণেও বাড়বে। সামগানের যোনী-মন্ত্রগুলি তিন স্বরে আবৃত্ত করা হত কিন্তু এরই গানময় রূপ ছয় স্বরে গাওয়া হত। এমনকি পবমান স্তোত্রগুলি গানের আকারেই গাওয়া হত। কেবলমাত্র যোনী মন্ত্রগুলি থেকেই এ ধারণা যদি করা যায় যে তিনটি স্বরের অধিক স্বর আর্যদের জানা ছিল না তাহলে সে ধারণা সংগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণগুলি বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্তে গ্রহণ করা দরকার।

লোকসঙ্গীতে গাইবার যেমন বিশিষ্ট রীতি-পদ্ধতি আছে তেমনি আসরে বিধি-সম্মত পর্যায়েও এই গানগুলির প্রয়োগ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কোনও কোনও অঞ্চলের আসরের উল্লেখ করতে পারি যেখানে চার পাঁচটি পর্যায়ে গান গেয়ে আসর সম্পূর্ণ হয়। সারা রাত ধরে এই সব অনুষ্ঠান চলে। প্রথমে গুরুভজন দিয়ে আসরের সূচনা হয়। তারপরে হয় মন-শিক্ষার গান। এই সব গানে মনকে সম্বোধন করে নানা কর্তব্য পালনে এবং সাধন ভজনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তার পরে আসে দেহতত্ত্ব যেখানে দেহকে উপলক্ষ করে অতি গূঢ় তত্ত্ব প্রচার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব গানের ভাষা একমাত্র সম্প্রদায় বিশেষ ছাড়া অপরের কাছে সুবোধ্য নয়। দেহতত্ত্বের গান বহু সম্প্রদায়ে বহুভাবে প্রচলিত আছে। এর পর রাত যখন গভীরতর হয় তখন অনুষ্ঠিত হয় রাধাকৃষ্ণের মিলনসঙ্গীত এবং রাত্রিশেষে ভোরের দিকে বিরহের সঙ্গীত গেয়ে আসর শেষ হয়। এই মিলন ও বিরহের গানগুলির সরল মাধুর্যের তুলনা নেই। এইভাবে নানা সম্প্রদায়ে নানা পর্যায়ে গান গেয়ে আসর সম্পূর্ণ হয়। উপজাতীয়দের মধ্যেও এ রকম বৈচিত্র্য পর্যায়ে গান করে অনেক অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানের ধারা স্বতন্ত্র হতে পারে কিন্তু তা একান্তভাবেই মানবিক, অকৃত্রিম এবং লোকগ্রাহ্য। এই কারণেই এর একটি সর্বাঙ্গীন আবেদন বর্তমান।

পরলোকে শ্রীসুবোধচন্দ্র নন্দী

সম্প্রতি প্রখ্যাত তবলিয়া শ্রীসুবোধ-চন্দ্র নন্দীর পরলোকগমন অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা। মৃত্যুকালে তিনি চল্লিশের কোঠায় ছিলেন। একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বিশিষ্ট মার্দঙ্গিককে আমরা হারালুম। সুবোধবাবু বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন। কলকাতায় তরুণ বয়সে এসে ইনি গীতবিতানে যোগদান করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে এঁর পাখোয়াজে সঙ্গত অত্যন্ত মনোগ্রাহী হত। বস্তুত তবলার সঙ্গে পাখোয়াজ এবং খোলবাদ্যেও তিনি অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তবলার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর অভাব ছাত্রছাত্রীরা তীব্রভাবেই অনুভব করবেন। তবলা সম্বন্ধে তাঁর একটি সুন্দর বইও আছে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে পাখোয়াজ, খোল বা তবলা সঙ্গত করতে পারেন এমন ব্যক্তি বেশী নেই। সুবোধবাবুর মৃত্যুতে এই দিক দিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি হল।

শার্ঙ্গদেব

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ ১ ॥
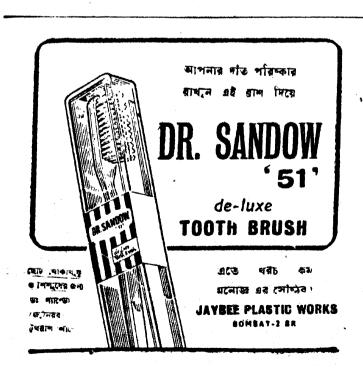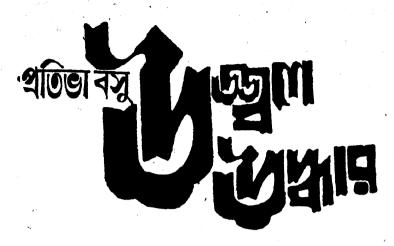
বৃষ্টি। বৃষ্টি। বৃষ্টি। ক'দিন কী কাণ্ড গেল এই শহরে। মনে হচ্ছিলো, এর বুঝি আর নিবৃত্তি হবে না। এমনিতে এখানে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু নামে যদি তা হলে আর রক্ষে নেই। আট দিনও থাকতে পারে, আঠেরো দিনও চলতে পারে। তবু মন্দের ভালো, সাত দিন বাদে আজ রোদ উঠেছে. কিন্তু কী কড়া রোদ, যেন ঝলসে যায় চোখ। সেই সঙ্গে বিশ্রি একটা ভাপা ভাপা গরম।

ডক্টর রায় কাজের ফাইল দেরাজে ঢুকিয়ে পাশের টেবিলে ঢেকে রাখা গ্লাস থেকে জল খেলেন দুই চুমুকে, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখলেন ভুরু কুঁচকে, অস্ফুটে বললেন, 'চারটে বাজতে চার? তা হলে?'

তা হলে সময় আছে খানিকটা। অন্তত তিরিশ মিনিট তিনি তাঁর নিজের জন্য খরচ করতে পারেন। একবার গেস্টহাউসে যাওয়া দরকার, যৎসামান্য ভোজ্যবস্তুর প্রয়োজন এখন। এক মগ কফি নইলে তো চলছেই না। মাথাটা যেন জাম হয়ে আছে। এই বর্ষার কৃপায় বেশ ভারি হয়েছে শরীর, সর্দিভাব, জ্বরভাব, গায়ে ব্যথা—সারিডন সব সময়েই পকেটে আছে। কফির সঙ্গে সেটাও গিলবেন দু' একটা, স্যাণ্ডুইচ বা কেক বা হ্যামবার্গার যা হয় কিছু, খেতেও হবে।

ভেবেছিলেন উপোস দিয়ে শরীর সারাবেন, তাই লাঞ্চ খাননি, এখন দেখছেন, শরীরও যেমন তেমনি আছে, মাঝখান থেকে না খেয়ে আরো বিশ্রি লাগছে।

দাঁড়ির কোমরের প্যাণ্টটা একটু টাইট করলেন, সাদা ধবধবে বকের পালকের মতো দামী বিলিতি শার্টের স্টিফ কলারের ফাঁকে টাইয়ের নটটা ডাইনে বাঁয়ে হেলালেন, পকেট থেকে চিরুনি বার করে ফসফস করে মাথা আঁচড়ে দু' পা এগিয়ে এসেছিলেন বাইরে যাবার দরজার কাছে, ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠলো।

'পরা' বিরক্তিসূচক এই শব্দটি মুখ থেকে বেরিয়ে এলো তৎক্ষণাৎ।

এয়ার-কণ্ডিশন করা কাচ-ঢাকা নিঃশব্দ ঘরে ফোনের আওয়াজটা বড়ো বেশী কড়া শোনাচ্ছিলো। ডক্টর রায় এক সেকেণ্ড ভাবলেন ফোনটা ধরবেন কি ধরবেন না। কেননা, এখন বেরুবার মুখে ফোন ধরা মানেই আরো কয়েক মিনিট অপচয়, যার মূল্য এই মুহূর্তে তাঁর কাছে যথেষ্ট ম্যাটার করছে। তাছাড়া ভালোও লাগছে না কারো সঙ্গে কথা বলতে।

তিনি তাঁর কোটের জন্য ক্লসেটে হাত দিলেন, ফোনটা বেজেই চললো।

বাজুক, বললেন মনে মনে, আমি বাধ্য নই ধরতে। আমার এখানে থাকবার মেয়াদ ছাব্বিশ মিনিট আগে শেষ হয়েছে। আমার বেরুবার কথা ছিলো সাড়ে তিনটেতে, কেরানী কানেকশান দিল কেন? দেখছি কঠিন না হলে এখানে কেউ কারো কথা শোনে না।

এমনিতে ডক্টর রায় মানুষটি সহিষ্ণু, শান্ত, মিষ্টভাষী, অমায়িক এবং অধৈর্যহীন। কিন্তু আজ তাঁর শরীর ভালো নেই, তাই মেজাজও ভালো নেই। এক কাপ চা বা কফির জন্যে সমস্ত অন্তরাত্মা এখন তৃষিত।

তিনি কোট গায়ে দিলেন। তাঁর লম্বা বলিষ্ঠ চেহারায় কোটটা খাপে খাপে ফিট করলো। হঠাৎ দেখলে বিদেশী বলে ভ্রম হতে পারে। প্রায় চব্বিশ বছর একাদিক্রমে বিদেশে থেকে হাবভাব চাল-চলনও অনেকটা তাদেরই মতো হয়ে গেছে। গায়ের রং টকটকে, মুখের দিকে তাকালে আর্যবংশোদ্ভূত বলে মনে হয়। আসলে ভদ্রলোক সুপুরুষ। বয়েস ঠিক কতো অনুমান করা শক্ত, কেননা চুল এখনো ব্রাউন, চামড়া এখনো টান, চশমা-বিহীন চোখ। চোখের তারা কুচকুচে কালো এবং চঞ্চল। চুল নয়, চামড়া নয়, বোধ হয় চোখের সেই চাঞ্চল্যই তাঁর যৌবনকে স্থির করে রেখেছে। বম্বের এই বিখ্যাত নিকসন অ্যাণ্ড নিকসন কোম্পানীর তিনি ডিরেক্টার। এই বিলাসবহুল আপিসটি একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান। লণ্ডন থেকে সোজা তাঁকে এখানে পাঠানো হয়েছে, অথবা দেশে ফেরার বাসনায় তিনি স্বেচ্ছায়ই চেষ্টাকৃতভাবে প্রত্যাগত হয়েছেন। এসেছেন মাত্রই ছ' মাস আগে। শীতের দেশের পালিশ এখনো সারা শরীরে বিদ্যমান। স্বভাবেও তিনি তাদেরই মতো নিষ্ঠাবান। কাজে অনীহা নেই, সময় জ্ঞান
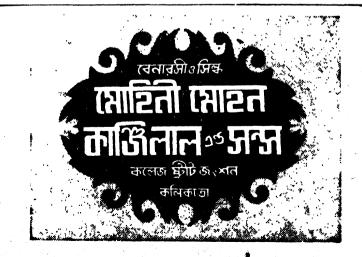
প্রবল, কর্তব্যে অবিচল। কিন্তু এখানে এসে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছেন। এখানকার মানুষেরা সময়ের মূল্য দেয় না, কাজের মূল্যও বোঝে কম। কর্তব্যজ্ঞান বোধ হয় একেবারেই শূন্যের অঙ্কে।

সাড়ে চারটেয় একটা জরুরী মিটিং আছে অন্য বিল্ডিংয়ে। যদি গেস্টহাউসে গিয়ে চা বা কফি খেতে হয়, তা হলে এখুনি বেরুনো দরকার, নইলে মিটিংয়ে তিনি কাঁটায় কাঁটায় উপস্থিত হতে পারবেন না।

কোট গায়ে দিয়ে ফোনের ডাক অগ্রাহ্য করে বাইরের দরজার কাছে এসেছিলেন, ভাবতে চেষ্টা করছিলেন, সাড়ে তিনটেতেই তিনি বেরিয়ে গেছেন ঘর থেকে, এই ফোনের ডাক তাঁর কর্ণগোচর হয়নি, সুতরাং সাড়া দেবারও কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু স্বভাবদোষে ফিরলেন। এভাবে শুনতে পেয়ে ও ফোনটাকে বাজতে দিয়ে চলে যাওয়া তাঁর সমীচিন মনে হলো না। কোন কিছুই উপেক্ষা করার অভ্যাস নেই তাঁর। সব সময়ে সকলের কাছেই তিনি অধিগম্য, সকলের কথাই মন দিয়ে শোনা তাঁর স্বভাব. ফোনও তিনি বাজলেই ধরেন, নিজে হাতে ধরেন। এটাও তাঁর বিবেচনায় উচিত কাজ।

সুতরাং ফিরে টেবিলের কাছে এসে রিসিভারটা কানে তুলে বললেন, 'হ্যালো।'

'আমি—মানে আমি—' একটি ইতস্তত তরুণ গলা থতোমতো খেলো।

'বলুন।'

'আমি পুরন্দর।' ঝপ করে ডুব দিল গলা।

'পুরন্দর।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পুরন্দর রায় চৌধুরী।'

'পুরন্দর রায় চৌধুরী?'

'এটা নিকসন অ্যান্ড নিকসন কোম্পানী তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে ডক্টর সুদর্শন রায় চৌধুরী বলে কাউকে কি পাওয়া যেতে পারে?'

'আমিই বলছি।'

'ওহ, আপনি? আপনিই—' গলাটা কাঁপলো।

'হ্যাঁ, আমার নামই সুদর্শন রায়।'

'তা হলে আমি ঠিক মানুষটিকেই ধরতে পেরেছি?'

'আশা করি।'

'জানেন, আজ সকাল থেকে এই বিকেল চারটা পর্যন্ত আপনার জন্য, শুধু আপনার ঠিকানার জন্য আমি কী গলদঘর্ম হয়েছি?'

'কী প্রয়োজন, বলুন?'

'আর তারপর এই ফোন নম্বর। কতো কষ্ট করে যে ফোনটা করলাম—'

'কিন্তু কেন এতো কষ্ট করলেন সেটা না জানলে—'

'কেন কষ্ট করলাম?' এক ফোঁটা হাসি ভেসে এলো, 'এক ধরনের মানসিক বিকৃতও বলতে পারেন।'

'কী!'

'মানুষের অনেক পাগলামি থাকে। তাদের মন যে কতো অপ্রয়োজনেও কতো কিছুর জন্য ব্যাকুল হয় এই মুহূর্তে আমি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।'

'আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আপনার পক্ষে অবশ্য বুঝতে না পারাই সুবিধের।'

'তা হলে আর সময় নষ্ট করা কেন?' গলা গরম হলো ডক্টর রায়ের।

'একটু ধৈর্য ধরুন।' উল্টো পিঠের গলা বেশ বক্র।

ডক্টর রায় বললেন, 'দেখুন, আমি খুব ব্যস্ত, বৃথা আলাপের সময় নেই এখন।'

'অত সময় সময় করছেন কেন? সময় কি শুধু আপনারই কম, আর আমার হাতে অঢেল!'

'তা হলে আসল বক্তব্যটা আপনার কি সেটা তো বলে ফেললেই পারেন।'

উত্তরে একটি গাঢ়স্বর ভেসে এলো, 'আমি আপনাকে একবার দেখতে চাই।'

'আমাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কেন তা আমি জানিনা।'

'কী বলছেন কী আপনি?'

'আপনাকে অন্তত একবার জীবনে চোখে দেখবো, এ আমার আবাল্যের আকাঙ্ক্ষা।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।'

'আমিই কি আপনাকে চিনি?'

'তবে?'

'তবে যে কী তাও আমার জানা নেই।'

'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্যের কী আছে? একজনের কি আর একজনকে দেখতে ইচ্ছে করতে পারে না?'

'পারে যদি চেনা জানা থাকে, অথবা বিখ্যাত ব্যক্তি হয়। এ ক্ষেত্রে তো দেখছি কোনোটাই নয়।'

'আপনি আমার কাছে চেনা জানা বা খ্যাত অখ্যাতর অনেক ঊর্ধ্বে।'

'আমি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি। আপনার মতো একজন বিচার-বিবেকহীন নিষ্ঠুরতম ব্যক্তি।'

'কী বললেন?'

'বললাম, আপনার মতো একজন—' ওপিঠ থেকে কাটা কাটা স্পষ্ট অক্ষরে উচ্চারিত হলো, 'বিচার-বিবেকহীন নিষ্ঠুরতম ব্যক্তিকে দেখে চোখ সার্থক করবার আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল থেকে আমাকে তাড়না করেছে।'

ডক্টর রায় গম্ভীর হলেন, গলা মৃদু এবং দৃঢ় হলো, বললেন, 'বিবেকের সঙ্গে কোনো দিনই আমার কোনো বিরোধের কারণ ঘটেনি, হৃদয়হীন বলেও দুর্নাম নেই।'

ওপিঠ হাসলো, 'আর পাঁচজনের কাছে না থাকতে পারে, আমার এবং আমার মার কাছে নিশ্চয়ই আপনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন অপদার্থ মানুষ ছাড়া আর কিছু নন।'

'কেন? কখনো কি কোনো উপকার করেছিলাম?' ফোনটা রাখতে গিয়েও ঝগড়ার সুরে জবাব দিলেন।

'উপকার নয়', ওপিঠের গলা বিদ্রূপে ভরা, 'উপকারের চেহারায় সর্বনাশ করেছিলেন।'

'সর্বনাশ!'

'মনের অগোচরে পাপ নেই, চিন্তা করে দেখুন তো, এতো উঁচুতে উঠেও, এতো মানুষের উপর প্রভুত্ব করেও কাদের কাছে আপনি ছোট হয়ে আছেন?'

'না, আমি কারো কাছেই ছোট হয়ে নেই।'

'অন্তত আমার কাছে নিশ্চয়ই।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন?'

'না। গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি করা আমার অভ্যাস নয়।'

'গুরুজন? আমি আপনার গুরুজন হতে যাবো কেন?'

'উত্তেজিত হবেন না। আপনার মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে তা শোভন নয়। শুনেছি পিতা হিসেবে নিকৃষ্ট হলেও মানুষ হিসেবে অন্তত লোকচক্ষে উৎকৃষ্টের পর্যায়ে আছেন।'

'পিতা!'

'নন?'

'ননসেন্স।' এবার ডক্টর রায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো, বুঝতে পারলেন, একটি অজ্ঞাত ফক্কড়ের পাল্লায় পড়ে এতোখানি সময় তাঁর মিথ্যেমিথ্যি নষ্ট হলো। আসলে লোকের সঙ্গে কর্কশ ব্যবহারে অনভ্যস্ত বলেই মাঝে মাঝে ভারি বিপদে পড়ে যান। টেলিফোনটা তাঁর অনেক আগেই কেটে দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এখনকার লোকেদের কি খেয়ে দেয়ে কোনো কাজ নেই? রাগতভাবে ঠাস করে ফোনটা রেখে দিতে যাচ্ছিলেন, কানটা আটকে গেল। চকিত হয়ে বললেন, 'কী! কী বললেন?'

'বললাম, অঞ্জলি নামে কখনো কাউকে আপনি চিনতেন কি?'

'অঞ্জলি!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা—তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক'?'

'এই আপনার সঙ্গে যা।'

'মানে?'

'মানে আমি আপনারও পুত্র, তাঁরও পুত্র।'

'তুমি অঞ্জলির ছেলে?' হঠাৎ পিঠ বেয়ে একটা শিরশিরানি অনুভব করলেন ডক্টর রায়।

'এবং আপনারও ছেলে।'

'আমার ছেলে!'

'আশা করি আপনার কৃতকর্ম বিষয়ে আপনাকে এবার কিঞ্চিৎ অবহিত করতে পেরেছি।'

'আমার ছেলে!' ডক্টর রায় পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। ঐ এয়ার-কন্ডিশন করা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েও তাঁর কপাল বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে যাচ্ছিলো।

'নিজের বাবাকে দেখতে কোন ছেলের না কৌতূহল হয়, বলুন?'

ডক্টর রায় চুপ।

'শুনলাম আপনি বম্বেতে আছেন, প্রলোভন সামলাতে পারলুম না।'

'ও।'

'গলার আওয়াজ শুনে তৃপ্তি হচ্ছে না, একবার চোখেও দেখতে ইচ্ছে করছে। আপত্তি আছে আপনার?'

'আপত্তি। না—' থেমে, ভেবে, 'আপত্তি কেন।'

'অনুমতি করলে আপনি যেখানে বলবেন সেখানে গিয়েই—'

'তুমি, মানে তোমার নাম পুরন্দর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পুরন্দর রায় চৌধুরী?'

'কী আর করা, সমাজের আইন অনুসারে পিতৃপদবী নিতেই হয়। নইলে মার পদবীই গ্রহণ করা উচিত ছিল আমার। আপনি আপন অভিলাষে জন্মদাতা হওয়া ছাড়া তো আর কোনো কর্তব্যই করেননি।'

ডক্টর রায়ের ফর্সা মুখে রক্তোচ্ছাস দেখা গেল! তাঁর কান দুটো পুড়ে যাচ্ছিলো।

ওপার থেকে আবার বিদ্রূপবাণ ভেসে এলো, 'ভয় পাবেন না, পুত্র হলেও কোনো পার্থিব দাবি নিয়ে উপস্থিত হবার সংকল্প আমার নেই। শুধুমাত্র একবার চোখের দেখা, এইটুকু।'

ডক্টর রায় ঢোঁক গিললেন।

'নিতান্ত ভাগ্য দোষেই আপনার মতো পিতার সন্তান হয়ে জন্মায় মানুষ। তবু কী কান্ড দেখুন, আপনার উপর আমার যথোচিত রাগ নেই।'

ডক্টর রায় তেমনই নিঃশব্দ।

'কিছু বলছেন না কেন?'

'না—মানে—' জল খেলেন গ্লাস থেকে।

'তা হলে আপনি দেখা করতে নারাজ?'

'কী আশ্চর্য! নারাজ কেন? সে তো বেশ কথা, মানে যদি আসতে চাও—'

'যদি না, আমি আসতেই চাই, একবার আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখতে চাই আপনাকে।'

'ও।'

'বলুন, কোথায়।'

'তা হলে, তা হলে—' ডক্টর রায় তাঁর সমস্ত শক্তি সংহত করে বলে উঠলেন, 'আমার বাড়িতে আসবে?'

'বাড়িতে?'

'ঠিকানা তুমি গাইডেই পাবে। হিলটন হাউস ও-পাড়ায় সবাই চেনে, সাত নম্বর বাংলো।'

'বেশ। কখন?'

'কখন? তা রাত্তিরেই এসো না, আটটা নাগাদ, গলা পরিষ্কার করলেন, 'বলছিলাম, রাত্তিরে আমার ওখানেই খেয়ে যাবে।'

'খাওয়াটা গৌণ, কিন্তু যাবো।'

কেটে দিল ফোনটা। ডক্টর রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তবু অনেকক্ষণ যন্ত্রটা কানের মধ্যে চেপে রেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অনুভব করলেন হাতটা কাঁপছে। কোটের তলায় পিঠের শার্টটা ভিজে শপশপ করছিলো।

॥ ২ ॥

ঘর থেকে বেরুলেই, লাল কার্পেট মোড়া মস্ত লম্বা করিডোর। করিডোরটাও ঠান্ডা। কিন্তু বাইরে এসেই ধাঁধিয়ে গেল চোখ। সাত দিন টানা বৃষ্টির পরে মেঘ-ছেঁড়া

রোদের তাপ সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। ডক্টর রায় গাড়ির জন্য এদিক ওদিক তাকালেন।

এটা সেপ্টেম্বর মাস না? হঠাৎই মনে হলো কথাটা। তারপরেই মনে হলো, বাংলা মাসটা যেন কী? খুব আশ্চর্য, বাংলা মাসগুলো কিছুতেই মনে থাকে না। কাজ কারবার তো সবই ইংরিজী মাসের সঙ্গে, তাই ভুলে যেতে হয়। কিন্তু কেন ভুলবো? ভারি রাগ হলো কথাটা ভেবে। যা আমাদের তা আমরা হাজার চাপেও মনে রাখবো না কেন? বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন—সুন্দর সব নাম। হ্যাঁ সুন্দর। খুব সুন্দর!

যেন ঝগড়া করতে লাগলেন কোনো অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে। আর ঋতুর নামগুলো? তাই কি কম সুন্দর? এতো সুন্দর যে মা বাবারা নাম রাখে ছেলেদের। শরৎ হেমন্ত বসন্ত। আর মেয়ে হলে বর্ষা। বর্ষা! কী সুন্দর নাম! তা হলে? তা হলে এটা যদি ইংরিজির সেপ্টেম্বর হয়, বাংলা মাসের কোন নামটা এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়? আর কোন ঋতু! ঋতুটা সহজ। সেপ্টেম্বর মানেই অক্টোবর, অক্টোবর মানেই শরৎকাল। ঠিক। শরৎকাল হতে হলে ভাদ্র আশ্বিন ছাড়া আর কী মাস হতে পারে?

এই আবিষ্কারটি করে তিনি ঘড়ির দিকে চোখ ফেললেন। ঘড়ির মধ্যেই তাঁর ক্যালেণ্ডার। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে তারিখটা দেখলেন তিনি। তেরোই সেপ্টেম্বর। তেরো তারিখ? এর মধ্যে তেরো তারিখ হয়ে গেল! এই তো সেদিন আগস্ট শেষ হলো, পাতা ছিঁড়লেন ক্যালেণ্ডারের, আর এর মধ্যেই তেরো তারিখ? কী ভাবে বয়ে যাচ্ছে সময়।

কিন্তু সেটা ছিলো অক্টোবরের দুই তারিখ। গান্ধীজির জন্মদিন ছিলো। অদ্ভুত। অদ্ভুত। সকাল বেলায় যখন ফিরে আসছিলেন তিনি, পথে পথে ছেলেমেয়েরা প্রভাতফেরী গাইছিলো। তারপর বাড়ি এসে শূন্য ঘরে তাকিয়ে—নাঃ। তারিখটা আর ভোলা গেল না।

আর তারপর কিনা আজ এই? এই টেলিফোন? ছেলেটি কতো তিরস্কারই না করলো! কী নাম? পুরন্দর। বেশ নাম। এই পুরন্দর নামটির জন্যে কাকে বাহবা দেয়া যায়? নিশ্চয়ই ওর মা।

ওর মা? ডক্টর রায় অন্যমনস্ক হলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সৈনিকের মতো স্মৃতির পিঁপড়েরা দাঁড়িয়ে গেল সারিবন্ধ হয়ে, তরতর করে উঠে এলো মনের উপর তলায়, তিনি অস্বস্তি অনুভব করলেন। চিন্তাটাকে সবলে উপড়ে দিতে চেয়ে আবার তিনি ফিরে এলেন তাঁর বাংলা মাস আর বাংলা ঋতুর আনুগত্যে। হাতের কর গুণে তর্জমা করলেন, আজ যদি সেপ্টেম্বর মাসের তেরো তারিখ হয় তবে ভাদ্রের কতো হতে পারে? সাতাশ? আটাশ? তাই তো হওয়া উচিত। আর তাই যদি হয় তবে দোসরা অক্টোবর আশ্বিন মাসের কতো তারিখ হবে? কতো? সেদিন তো পনেরো ছিলো।

আচ্ছা, তা হলে দাঁড়ালোটা কী? যদি দোসরা অক্টোবর পনেরোই আশ্বিন হয়, তা হলে আজ, এই সেপ্টেম্বর মাসের তেরো তারিখে ভাদ্র মাসের কতো তারিখ হতে পারে?

ভুরুতে ত্রিশূল এঁকে ডক্টর রায় গভীর মনোযোগ নিক্ষেপ করলেন এই হিসেবটার উপরে।

কতো? কতো হবে? সাতাশ? আটাশ? উঁহু, পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নিশ্চয়ই নয়।

তা হলে পঁচিশ ছাব্বিশ? না, সাতাশ-আটাশ? না কি তেইশ-চব্বিশ! তেইশ-চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ—এই চারটার মধ্যে কোনটা? কোনটা? সহসা ভয়ংকরভাবে এই অংকটা নিয়ে তিনি গলদঘর্ম হতে লাগলেন। এর চেয়ে কঠিন অংক জীবনে আর কখনো করেছেন বলে মনে পড়লো না তাঁর।

•

সূর্যের প্রখর তাপ বিদ্ধ করতে পারছিলো না তাঁকে, তিনি কালো চশমা পরতে ভুলে গিয়েছিলেন। এক ঝাপটা ধুলো উড়লো, অভ্যাস মতো নাকে রুমাল চাপা দিতেও মনে থাকলো না। মনে থাকলো না ধুলোতে তাঁর ভীষণ অ্যালার্জি, বিশেষত এই সর্দির মধ্যে তাঁকে আরো নাজেহাল হতে হবে। অসম্ভব গাণিতিক গবেষণায় এতো নিমগ্ন রইলেন যে অদূরে গাছের ছায়া থেকে এগিয়ে এসে ঝকঝকে ঢাকা ক্যাডিলাক গাড়িখানা কখন তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়ালো, কখন তিনি তাঁর নরম কালো গহবরে উঠে বসলেন, আর কখন সেই গাড়ি নিঃশব্দ মসৃণ গতিতে তাঁকে এক বিল্ডিং থেকে আর এক বিল্ডিংয়ের দরজায় পৌঁছে দিল কিছুই খেয়াল করতে পারলেন না। কেবল ভিতর থেকে একই শব্দ উত্থিত হতে লাগলো—কতো? কতো? কতো?

মিটিং বসবে পাঁচতলার বড়ো হলে, সেখান থেকে জানালায় দাঁড়ালেই অবারিত সমুদ্র তৃপ্ত করে চোখ, হাওয়া উঠে আসে জোরে। এ ঘরে ডক্টর রায় যতোবার মিটিং করতে এসেছেন, এমন কখনো হয়নি যে ঘরে ঢুকেই তিনি সোজা চলে যাননি সেই দৃশ্য দেখতে। সেই দৃশ্য কখনোই তাঁর কাছে পুরোনো লাগে না, প্রতিবার নতুন করে উপভোগ করেন। আজ তারও ব্যতিক্রম ঘটলো। তাড়াতাড়ি এসে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লেন। বসে বসে গ্রামোফোনের ফাটা রেকর্ডের মতো কেবল ভাবতে লাগলেন, কতো? কতো? কতো? কানের কাছে নীল মাছির মতো ভন ভন করে উড়তে লাগলো শব্দ, দোসরা অক্টোবর যদি পনেরোই আশ্বিন হয় তবে তেরোই সেপ্টেম্বর ভাদ্রের কতো তারিখ হতে পারে।

যেন একটা মস্ত বড়ো ধাঁধা। ধাঁধাটা এই রকম,

'দুই দিনে হয় যদি পনেরোই তবে,
তেরো দিনে ভাদ্রের কতোদিন হবে?'

যতোক্ষণ সভা চলছিলো, কেবলি এই লাইন দুটো আওড়াচ্ছিলেন তিনি। এবং ঠিক বুঝতেও পারছিলেন না, লাইন দুটো কখন এমন মিলের আকৃতি নিয়ে ছেলেমানুষী ছড়া হয়ে জিভের মধ্যে খেলা করছে। বারে বারে তিনি মিটিংয়ের কথা ভুলে যাচ্ছিলেন, অনেক প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছিলো কান, অন্যরা তাঁকে লক্ষ করে অবাক হচ্ছিলো, তবু তিনি সচেতন হচ্ছিলেন না। কারণ, কিছুই খেয়াল করবার মতো মনের গতি ছিলো না তাঁর। (ক্রমশ)
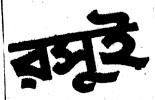
॥ ৭ ॥
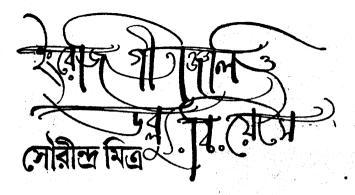
অতএব দেখা যাচ্ছে, ইংরেজি গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে য়েট্‌সের যে তিনটি সাড়ম্বর দাবী আমাদের বিবেচ্য অর্থাৎ সেই 'Continual revision of vocabulary and even more of cadence', এবং তৃতীয়ত, 'I have left out sentence after sentence,' তার একটিও ধোপে টেঁকে না। তিরাশিটি কবিতা মূলে খসড়ার সঙ্গে মিলিয়ে এবং বাকি যে কুড়িটি কবিতার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি তার জন্য সম্ভাব্যতার margin রেখেও অনায়াসেই বলা চলে যে য়েট্‌সের দাবি যে শুধু অত্যুক্তি-মূলক তাই নয়, একেবারে অবিমিশ্র মিথ্যা। তা ছাড়া, মূল্যের কথা যদি ওঠে, তাহলে সবগুলি পরিবর্তন য়েটস একাই করেছেন সেটা তর্কের খাতিরে ধরে নিলেও শেষ পর্যন্ত সেই দুটি সার্থক শব্দ পরিবর্তন বাদে জমার খাতে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই দেখা যায় না। তা ছাড়া, এই নগণ্য পরিবর্তনের ফলেই গীতাঞ্জলির কাব্যগুণ স্বীকৃত হয়েছে এমন কথা সেই সময়ে য়েটস নিজেও যে কোনোক্রমে মনে স্থান দেন নি গীতাঞ্জলির ভূমিকাতেই তার প্রমাণ আছে। সেই উচ্ছ্বাসময় ভূমিকাটিতে গীতাঞ্জলির ভাব, রস এবং style-এর বিস্ময়কর 'simplicity', 'spontaneity' এবং 'abundance'-এর দৃষ্টান্ত হিসেবে যে ছ'টি কাব্যাংশ তিনি উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে একমাত্র ৪৩নং কবিতাটির উদ্ধৃতাংশে 'thou didst press the signet of eternity', এইটি ছাড়া বাকি সবগুলিই পাণ্ডুলিপির পাঠের থেকে অভিন্ন। এর থেকেই বোঝা যায়, স্টার্জ মূর, রোটেন-স্টাইন, আর্নেস্ট রীজ, এলান্ ওয়েড্ এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং য়েট্‌সের হস্তক্ষেপকে যে নগণ্য বলেই মনে করেছেন, ভূমিকায় য়েট্‌সের নিজের পরোক্ষ সাক্ষ্য সেটাকেই সমর্থন করছে। বস্তুত ম্যাক-মিলনকে লিখিত চিঠিতে যদি সত্য ভাষণের কিছুমাত্র উৎসাহ য়েট্‌সের থাকতো তাহলে তিনি এ-কথাই বলতেন যে ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তন করবার মতো বিশেষ কিছুই ছিল না, দেবরাজ জিয়ুসের মানসকন্যা প্যালাস আথেনার মতো এই কাব্যগ্রন্থখানি যেন তার নিখুঁত পূর্ণতার রূপ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল। অন্তত সাড়ে চার বৎসর পূর্বে সেই ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁর সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা সাত্রে এই সত্য কথাটাই তিনি বলেছিলেন: 'Even as I read them (these lyrics) in these literal prose translations, they are as exquisite in style as in thought'.

অপরপক্ষে, গীতাঞ্জলির অন্তত একটি কবিতার প্রকাশিত পাঠে যে মুদ্রণবিকৃতি গত প্রায় ষাট বৎসর ধরে চলে আসছে তার কৃতিত্ব যে য়েট্‌সের সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। ৭৬নং কবিতার 'Day after day, O Lord of my life, shall I stand before thee face to face?' এই বাক্যের প্রশ্নবোধক অংশটি কবিতাটির ধুয়া, সেই জন্য এটি বারবার কবিতায় ফিরে ফিরে আসছে। সকলেই চিনবেন এটি 'প্রতিদিন আমি, হে জীবন স্বামী, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে', এই বিখ্যাত গানটির ইংরেজি রূপান্তর। মূল কবিতাটি একটি প্রার্থনা, তার মধ্যে কোনো প্রশ্ন নেই। তবে অনুবাদে ঐ প্রশ্ন চিহ্নটি এলো কোথা থেকে? রোটেনস্টাইন পাণ্ডু-লিপিতে প্রশ্ন চিহ্ন নেই, পূর্ণ ছেদ সুস্পষ্ট। অতএব প্রশ্নচিহ্নটি রবীন্দ্রনাথ বসান নি, বসাবার কোনো কারণই ছিল না। তবে এটি কোথা থেকে এলো? গীতাঞ্জলিতে প্রশ্নচিহ্নসমেত কবিতাটি পাঠ করে জন্ র‍্যাট্রে নামক জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের মনে এই প্রশ্ন দীর্ঘদিন আলোড়িত হয়েছিল যদিও তিনি বাংলা জানতেন না এবং ইংলণ্ডে কবির সেই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীটির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন না, তবে অপরাপর সত্ত্বেও কবিতাটির যথার্থ মর্মগ্রহণ করবার মতো রসগ্রাহিতা তাঁর ছিল। ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ-কালে এই প্রশ্নচিহ্নটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বই বের করে দেখান। কবি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হন, বলেন, Yes, of course, that mark of interrogation ought not to be there', এবং স্বহস্তে প্রশ্নচিহ্নগুলিকে কেটে নাম সই করে দেন। এই সাক্ষাৎকারের কৌতূহলজনক বর্ণনা র‍্যাট্রে তাঁর 'I shall Stand' নামক প্রবন্ধে দিয়েছেন (Visva-Bharati Quarterly, Vol. XIV, No. 1, দ্রষ্টব্য; শতবার্ষিক সংখ্যাতেও প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে)। ভুলটি তো কবির স্বকৃত নয়, পাণ্ডুলিপিতেও নির্ভুল পাঠ আছে। ভুলটি তবে কার এবং কেমন করেই বা প্রকাশিত বইতে এটি ঢুকলো? গীতাঞ্জলির ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণ এবং ম্যাকমিলান সংস্করণ এই দুটিরই 'প্রুফ' যে য়েটস স্বয়ং দেখে সংশোধন করে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণ প্রকাশিত হলে কবির স্বকৃত কয়েকটি পরিবর্তনের মধ্যে একটি সম্বন্ধে আপত্তি তুলে য়েটস যে চিঠিটি লেখেন (পূর্বে যার একটি অংশ উদ্ধৃত হয়েছে), তারই শেষে তিনি লেখেন 'I had not notice the change in the proof'। তারপর ম্যাকমিলান সংস্করণ প্রকাশের পূর্বেও রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'Gitanjali' is to appear, I gather, at once and hope Yeats had the proofs' অতএব প্রথমবারের প্রুফ সংশোধন করবার সময়েই য়েটস ঐ প্রশ্ন চিহ্নটি বসিয়েছিলেন এমন অনুমান করাটা অযৌক্তিক হবে না। কেননা যাঁরা য়েটসের পাণ্ডুলিপি অথবা পাণ্ডু-লিপির facsimile পরীক্ষা করে দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে অতি সাধারণ ইংরেজি শব্দের বানান (অন্তত দুটি দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত একটি পত্রাংশেই পাওয়া যাবে) এবং বিশেষ করে punctuation সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা ছিল

বিস্ময়কর। এ বিষয়ে তিনি নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ১৯১৫ সালে ব্রিজেসকে লিখিত এক পত্রে তিনি লেখেন: "You asked me about my stops and commas. Do what you will. I do not understand stops. I write my work so completely for the ear that I feel helpless when I have to measure pauses by stops and commas". তের বৎসর পরেও যে এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ উন্নতি হয়নি, ১৯২৮ সালে লেডী গ্রেগরীকে লিখিত এক পত্রে তাঁর একটি উক্তিতে তা জানা যায়: 'Ezra pound has been helping me to punctuate my new poems'. 'পাংকচুয়েশন' সম্বন্ধে যাঁর এ-হেন জ্ঞান তিনি যে 'প্রুফ' সংশোধনের সময় 'I shall stand'-এর বদলে 'Shall I stand' লেখা মাত্র একটি প্রশ্ন চিহ্ন বসিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারবেন না সেটা একরকম অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে হয়। যেটস প্রুফ দেখেছেন বলে অপর কেউ আর এ বিষয়ে কখনো চিন্তা করেন নি এবং ভুলটাও সেই থেকে চলে আসছে। অথচ কবিতাটি যে য়েটসের খুবই পরিচিত, এমন কি প্রিয় কবিতা ছিল তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা ১৯৩৬ সালে যখন তিনি Oxford Book of Modern Verse সংকলন করেন তখন রবীন্দ্রনাথের যে সাতটি কবিতা উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন আলোচ্য কবিতাটি তার মধ্যে প্রথম। বলা বাহুল্য সেখানেও এটি বিকৃত অবস্থাতেই মুদ্রিত হয়েছে। এই বিকৃতির ফলে কবিতাটি যে একেবারেই অর্থ শূন্য হয়ে গেছে তা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু বিকৃতি সত্ত্বেও জন ম্যাট্রের মতো সাধারণ শিক্ষিত এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি যেখানে কবিতাটির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করে কবিকে দিয়ে ভুলটি সংশোধন করিয়ে নেন, সেখানে বহুবার পাঠ করেও য়েটসের মতো বিশিষ্ট কবি যে কবিতাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি, সেটা নিশ্চয়ই খুব বিস্ময়কর। এবং এই সূত্রে গীতাঞ্জলির প্রকাশিত পাঠে মূল পাণ্ডুলিপির যে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যেও যেখানে যেখানে অর্থ-বিকৃতির আভাস পাওয়া যায় সেখানেও য়েটসের প্রত্যক্ষ যোগ এবং দায়িত্ব কতখানি থাকা সম্ভব ছিল সে প্রশ্নটাও স্বভাবতই মনে না জেগে পারে না। সেই সংগে নজির হিসেবে য়েটসের পাঠকদের মনে পড়বে পরিণত বয়সে য়েটস তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের কতকগুলি কবিতার 'সংশোধন' করতে গিয়ে কীরকম শোচনীয়-ভাবে সেগুলি নষ্ট করে ফেলেন।

যাই হোক, ইংরেজি গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে য়েটসের স্বকৃত দাবির সত্যতার যে পরিচয় পাওয়া গেল, তার নিরিখে অন্যান্য প্রশ্নের মীমাংসা এখন সহজ হবে।

(ক্রমশ)

॥ সাত ॥

কিন্তু দয়ালদা জীবনশিল্পে সিদ্ধিলাভ ক'রে অপরূপ বিকাশে দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন—নিরভিমান হবার অভীপ্সা তীর্থপথে আজীবন তাঁর সহযাত্রী ছিল বলে—তিনি হাড়ে হাড়ে জানতেন বলে যে, মানুষ জীবন্মুক্তির ওরফে ভগবৎ-প্রেমের সাধনায় সিদ্ধ হ'তে পারে না অহন্তা (egoism) ও মমতার (attachment) মায়া কাটিয়ে উঠতে না পারলে। এ পারা সহজ নয়। কারণ এর জন্যে চাই যুগপৎ নিরহঙ্কার তপস্যা ও ভগবানের কৃপা। সাধনার প্রথম স্তরে তপস্বীর 'আমি কর্তা' এ ভাব বল দিলেও পরের স্তরে আমি অকর্তা ভাবকে পরম দীনতায় বরণ করাই চাই—নইলে ভগবৎকৃপার অবতরণ হয় না। দয়ালদা এ কথা জানতেন ও মানতেন বলেই নিরন্তরই চাইতেন "সবার মাঝারে নিজেকে গোপন" রাখতে—ওরফে আত্মাভিমানকে দাবিয়ে ঠাকুরের কৃপার কাছে হাত পাততে। গীতায় পাই 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' অর্থাৎ যার যেমন শ্রদ্ধা ও অভীপ্সা তার তেমনি পরিণতি। দয়ালদা চেয়েছিলেন—ঠাকুরের করুণাই তাঁর জীবনের নিয়ন্ত্রী হোক। ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছিলেন: তথাস্তু।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একদা তিনি আমাদের কাছে বলেছিলেন আমেরিকায় ডাক্তারদের ফাঁপরে পড়ার কথা। দয়ালদার ভাষায়ই বলি :

"আমাকে দুবার য়ুরোপে ও একবার আমেরিকায় যেতে হয়েছিল। এখানে ওখানে যা পারি বলতাম ঠাকুরের কথা।

"একবার অসুখ করে—নিউয়র্কে। ডাক্তার সেখানে গিশগিশ করছে। এসে ছেঁকে ধরল আমাকে। এ-ও-তা হাজারো পরীক্ষা (চেক্-আপ্) করে তারা মেঘলা মুখে কোরাসে রায় দিল : 'আমার ব্যাধি দারুণ, ভয়াবহ, জটিল তথা সংকট। অন্তত সাত আট মাস হাসপাতালে চিৎপাত হয়ে থাকতে হবে—অনেকগুলি অপারেশনের পরে। কতগুলি অপারেশন করাতে হবে তাঁরা পরে বলবেন......ইত্যাদি। আমি মৃদু হেসে বললাম : 'আমি হাসপাতালে গেলে তবে তো অপারেশন। আমি ও-মুখোই হব না।' তারা অপ্রসন্ন হ'য়ে বলল : 'কিন্তু এর নাম তো আত্মহত্যা।' আমি বললাম : 'এতদিন তো বেঁচে আছি আত্মহত্যা না ক'রে।' ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলল : 'স্যর, একটি প্রশ্ন করতে পারি কি?' আমি হেসে বললাম : 'একটি কেন, দশটি করলেও আমি দমব না।' সে বলল : 'আপনার মধ্যে এতরকম দুরন্ত ব্যাধির জটলা সত্ত্বেও আপনি সত্তর বৎসর ধরে বেঁচে আছেন কেমন করে? আপনাদের দেশে কি এমন দাওয়াই আছে যার খবর আমরা রাখি না—মানে, এমন কোনো ওষুধ যা এতদিন মৃত্যুকে হার মানিয়েছে?' আমি হেসে বললাম : 'আছে স্যর।' সে কৌতূহলী হয়ে আমাকে শুধালো : 'সে ওষুধের নাম জানতে পারি কি স্যর?' আমি বললাম : 'পারেন স্যর, যদিও আপনি না জেনেও জানেন।' সে বিষম ধাঁধায় পড়ে বলল : 'মানে?' আমি বললাম নাটুকে ভঙ্গিতে : 'তার নাম ভগবৎকৃপা—Divine Grace—হা হা হা'।" বলে দয়ালদার সে কী হাসি দুষ্টু ছেলের মতন! এমনি দিলখোলা বিচিত্র মানুষ ছিলেন তিনি—একাধারে বহুপাঠী, বহুভাষী, ভাবুক রসিক, গানপাগল, কবি, লেখক—কী নয়? ঐ যে বললাম—তাঁর মধ্যে রকমারি উচ্চাশী মানুষ একসঙ্গে ঘরকন্না করত। তাই তো তাঁর জীবন হ'য়ে উঠেছিল এমন সমৃদ্ধ, মুখ—আভাময়, ব্যক্তিরূপ—চিত্তাকর্ষী। তিনি চলতে ফিরতে বলতেন : "গীতায় পাই—তাঁকে যারা সব ছেড়ে ডাকে তাঁর কৃপা তাদের ভার নেয়ই নেয়। আমি এই সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই—'তাঁর কৃপা বিনা আমরা কেউ এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না।' এ আমার কথার কথা নয় ভাই। আমি যে চাক্ষুষ করেছি কৃপা কীভাবে (দরকার হলে অঘটন ঘটিয়ে) শরণার্থীকে লালন করে মা-র মতন, পালন করে পিতার মতন।"

বলেছি, তিনি ছিলেন শুধু সাধক ও প্রেমিক নয়, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণধী ভাবুক। একটা দৃষ্টান্ত দিই তাঁর Dwellers in the Desert থেকে। এ-ই-র একটি বিখ্যাত কবিতা তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কবিতাটির নাম OUTCAST :

Sometimes when alone,
  At the dark close of day,
Men meet an outlawed majesty
  And hurry away.
They come to the lighted house;
  They talk to their dear;
They crucify the mystery
  With words of good cheer.
When love and life are over
  And flight's at an end,
On the outcast majesty
  They lean as a friend. (A.E.)

দিনান্তে জীবনপান্থ নিরালা আঁধারে
  ওঠে চমকিয়া দেখি' সে-মহিমময়ে
যাঁরে ঠাঁই দেয় নাই আঙনে কখনো,
  অমনি সরিয়া দূরে যায় সে সভয়ে।
আলোক-উচ্ছল গৃহে ফিরিয়া সে সাধে
  প্রিয় পরিজনে—কাছে ডাকে কলভাষে;
পেয়েছিল যে-অলোক-অতিথির দেখা
  শরশয্যা রচে তাঁর মুখর বিলাসে।
সাঙ্গ যবে প্রাণরঙ্গ প্রণয়বিহার,
  নির্লক্ষ্য উধাও গতি থামে শ্রান্তি ভরে,
অনাদৃত সে-মহিমময়েরি কোলে সে
  বন্ধু বলি' চায় ঠাঁই একান্ত নির্ভরে।

দয়ালদা লিখছেন Sufism in Sindh অধ্যায়ে :

"The seeker, when he is under the sway of his self, says: 'God is nowhere.' But when he has become one with Truth, he says: 'God is now here.' The phenomenal world remains as before, it is his eye which has become winged with the vision of the One. In the first stage, to use A. E.'s phrase, 'the Majesty' has been 'outlawed and outcast,' the individual depending on himself as the very centre of the world, but, in the final stage, he 'leans as a friend' on this very Majesty."

(ভাবার্থ : ধর্মার্থী যতদিন তার অহন্তার এলাকায় বসবাস করে ততদিন সে দেখে—'ভগবান্ কোথাও নেই।' কিন্তু যেই সে সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয় সে-ই দেখতে

পায়—'ভগবান তো এখানেই আছেন'। বাহ্য জগৎ আগে যা ছিল পরেও তেমনিই থাকে, কেবল দেবপ্রসাদে দৃষ্টিবর লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়ে—তিনি এ-জগতেই অনুস্যূত হ'য়ে বিরাজ করছেন। প্রথম স্তরে ভগবানকে সে নামঞ্জুর ক'রে অর্ধচন্দ্র দেয়—কেননা তখন সে অহংমুগ্ধ হয়ে নিজেকে জগতের কেন্দ্রে বসিয়ে ভাবে আত্মকেন্দ্রিকতা মানেই স্বাবলম্বী হওয়া। কিন্তু জীবনের অন্তিম চোখ-ফোটার পর্বে সে অনাদৃত ও বহিষ্কৃত ভগবানের 'পরেই ভর করে—তাঁকে পরম বন্ধু ব'লে বরণ ক'রে হয় ভগবৎকেন্দ্রিক।)

দয়ালদা স্বভাবে ভক্ত ও স্বধর্মে বিবেকী ছিলেন ব'লে যৌবনেই টের পেয়েছিলেন অহন্তা মানুষকে কীভাবে ঘুরিয়ে মারে (রামপ্রসাদের ভাষায়) "চোখ বাঁধা বলদের মত"। তাই তিনি পণ নিয়েছিলেন ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে আত্মবোধের আলোয় কৃতকৃত্য হবেন—উপনিষদের ভাষায় (ছান্দোগ্য) "ব্রহ্মচর্যেন হ্যেবেষ্ট্বা আত্মানম্ অনুবিন্দতে"—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য বরণ ক'রে তবে আত্মারাম হবার পথ খুঁজতে হবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

চিবুক চর্চা

আগে মেয়েরা কথায় বলতেন 'কুড়িতে বুড়ি।' এমনকি পশ্চিমের সৌন্দর্য সচেতন, প্রসাধন পটিয়সীরাও সপ্তদশীর রূপকেই নারী জীবনে সৌন্দর্যের সেরা সময় মনে করতেন। মধুর রূপের মাধুরী বছরে বছরে কমে এসে কুড়িতে হতেন রূপসী Old mother twenty। এখন কিন্তু রূপসী যতদিন চান রূপ ধরে রাখেন। বৃদ্ধার লোলচর্মও যত্নে প্রয়াসে পায় নবজীবন।

সৌন্দর্য সাধনায় আগ্রহশীলদের মুখে শুনি চিবুকেই বয়সের রেখা পড়ে সবার আগে Double chain বা মেদবহুল চিবুকে যে ভাঁজ পড়ে তা' তো বেশী বয়সের আগেই হতে পারে। কালিদাস থেকে বর্তমান সাহিত্য কবিতায় মেয়েদের সুগঠন সুন্দর গ্রীবাদেশ মরালগ্রীবার সঙ্গে তুলনা করেছেন। মরালগামিনী কিন্তু 'শ্রোণি-ভারাদলস গমনা' ছিলেন কিন্তু গ্রীবা-ভঙ্গী তার মৃণালবাহুর মতই মেদহীন ছিল।

মেদবাহুল্যের জন্য double chin থেকে রক্ষা পেতে হলে মেদভার কমানো প্রথম কাজ। কিন্তু বেশী দিনের double chin তাড়াতাড়ি কমাতে গিয়ে বলিরেখাপাত হতে পারে। ত্বকের স্থিতিস্থাপকতার সীমা নেই। একই ত্বকের আবরণে কত দূরে মেদ বৃদ্ধি ধারণ করে আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু প্রসারণের যে ক্ষমতায় ত্বক তা করে, সংকোচনের পালায় ঠিক সে ভাবে ফিরে যাওয়া কঠিন হয়। অনেক সময় কুঁচকে যায় বা রেখা পড়ে। কাজেই মেদবাহুল্যের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে মালিশ ইত্যাদির দ্বারা অতি সতর্কতার সঙ্গে বলি রেখাপাত সম্বন্ধে সাবধান হতে হয়।

ত্রিশের কোঠায় বয়স পৌঁছোলে যৌবনের অতি স্বাভাবিক লাবণ্য আর অত সহজ থাকে না। এই বয়সে বিশেষ করে ত্বক ও পেশীর চর্চা না হলে বলি রেখা বা কুঁচকে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন কাজ।

Exereise বা ব্যায়াম যেমন আর সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবশ্য প্রয়োজনীয়, চিবুকের জন্যও ঠিক তাই। চিবুক এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবাদেশ সুস্থ সবল সুগঠন রাখতে সবার আগে দরকার নিয়মিত ব্যায়াম। অনেক সময় লাগবে না, লাগবে সামান্য মাত্র নিয়ম ও নিষ্ঠা। চিবুক বা গ্রীবাদেশ বলিরেখা বর্জিত মাত্র থাকবে তাই নয়, অপরূপ লাবণ্যময় হবে গঠনেও। প্রথম গ্রীবাদেশ যতদূরে পিছনে যায় ততদূরে পিছনে নিন। ঠোঁট চেপে ঘন ঘন জোরে নিঃশ্বাস নিন। তাতে ঠিক চিবুকে টান পড়বে গলার ও ঘাড়ের

পেশীতে ব্যায়ামের ফলও হবে। রাতে শুতে যাবার সময় যখন মুখে কোল্ড ক্রীম মাখেন তখনই ব্যায়াম ও গলায় মালিশ করবার প্রশস্ত সময়। যদি কাগজি বাদামের তেল একটু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তবে কোনও ক্রীম তার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। ভাল করে প্রসাধনী তুলে গরম জলে মুখ ধুয়ে বাদাম তেল মালিশ করবেন। কণ্ঠদেশের তলা থেকে ক্রমাগত উপরের দিকে মালিশ করবেন। অক্ষকাস্থি বা Collar bone থেকে আরম্ভ করতে পারলে আরও ভাল হবে।

সকালে মুখ ধুয়ে সামান্য টোনিং লোশানে তুলো ডুবিয়ে মুখে স্থানে স্থানে লাগাবেন ও গলায় লাগাবেন। টোনিং লোশন না থাকলে গোলাপ জল বা ওডিকোলোনে জল মিশিয়ে লাগাবেন। দিন কয়েক কাটলেই দেখবেন কত উপকার হয়েছে। মালিশের জন্য বাদাম তেলের বদলে দুধের সর, লবণবিহীন মাখন বিকল্পে সরষের তেল হলেও কাজ চলবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে ত্বকের আর্দ্রতা কমে আসে। তাই আর্দ্রতা আনবার মত জিনিস দরকার। ত্বক সিক্ত ও নরম থাকবে ঐ আর্দ্রতার গুণে।

টুকিটাকি

ভাদ্র, আশ্বিন আর কার্তিক কাটিয়ে অঘ্রানে নেমেছে বিয়ের মরসুম। আর বাজারে এসেছে মাগ্যি মাছ মাংস আনাজ। শুনছি ভারতের সব সেরা শহরের মাল ব্যাপারীরা ঠেলছে কলকাতার বাজারে। বিয়ের এমন মহোৎসব, যে যা দাম হাঁকবেন তাঁরা, কন্যাকর্তারা কোনটাতেই কসুর করবেন না। সামাজিকতা এমনই সর্বগ্রাসী।

সামাজিকতার অন্য দিকটাও কম সাংঘাতিক নয় কিন্তু। অনটনের সংসার থেকে সামান্য কিছু বাঁচিয়ে উপহার দেওয়া কষ্টকর ব্যাপার। তার উপর মৌসুমী পার্টি-কারী পর্বের গাটিকতক যদি আপনজন আর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হয়।

সমাজের কায়দাকানুনে আমূল বদল হয়ে চলেছে। উপহার দেওয়া ব্যাপারটার কিছু করা যায় না। অনায়াসে যা সংগ্রহ করতে পারবেন তাতে প্রীতির সংযোগ থাকবে ঢের বেশী। লোক দেখানো অকেজো উপঢৌকনের জ্বালা থেকে নব দম্পতি বাঁচবেন। কনের উপর প্রীতি উপহার বর্ষণ বা bridal shower পাশ্চাত্ত্য দেশের আইবুড়ো ভাত বলতে পারেন। আইবুড়ো ভাতের মতই তাতে উপহার আসে অল্প বিস্তর। কিন্তু বহুমূল্য চমক লাগানো জিনিসপত্র নয়। কনের যা কাজে লাগবে তা যত সামান্যই হক সাদরে গ্রহণ করেন তিনি। হাতা, চামচ, সাধারণ রান্নার বাসন থেকে নিয়ে হাত মোছার তোয়ালে, সুগন্ধ সাবানের বাক্স সুন্দর মোড়কে সোজা পৌঁছে যায় কত মানিনীর মনোরঞ্জনে।

আমাদের মেয়েরাও এখন গৌরীদানের দায় থেকে অভিভাবকদের মুক্তি দিয়েছেন। অনেকেই বিয়ের টোপর নামিয়েই নূতন সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দিন না তাদের ঐ রকম সব কাজের জিনিস। হাতাবেড়ি খুন্তি কড়াই ডেকচির কত নূতন রূপে নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে। যার যেমন সাধ্য সাজিয়ে দিন। তাতে কনের উপকার হবে, অভিভাবক কিছুটা যৌতুক আঁচ পাবে আর আপনি পাবেন অনায়াসে দেওয়ার মত উপহার। আনন্দে বাধা পড়বে না।

হাতাবেড়ি বাদেও কত কাজের জিনিস আছে তার সীমা নেই। ছোট বড় তোয়ালে, বিছানার চাদর, টেবিল ঢাকা, সামান্য প্রসাধনীর কৌটো শিশি। অথবা ওষ্ঠরঞ্জনি ইত্যাদি সবই আধুনিকার নিত্য প্রয়োজনীয়। কয়েক প্যাকেট চুলের কাঁটা, সেফটিপিন ইত্যাদিও সুন্দর মোড়কে উপহার দেওয়া যায়। ছোট বড় চিরুনি, কপালে লাগাবার টিপ কত কিছু আছে, একটু ভাবনা করলেই মিলবে উপযুক্ত উপহারের হদিস।

খবরের টুকরো

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটা খবর দেখে হতবাক হয়েছিলাম। খবরটি সাংঘাতিক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি হয় আজকাল তারও একটু আন্দাজ ইংলণ্ডের এই সংবাদটিতে বোঝা যায়।

লণ্ডনের হাসপাতাল। তার যৌনব্যাধি বিভাগ থেকে পাওয়া পরিসংখ্যানের হিসাবে এক নূতন উপসর্গ সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। কোমলা কিশোরী যৌনব্যাধির চিকিৎসার জন্য আসছেন অনেক অধিক সংখ্যায়। তারা সবাই তথাকথিত ভদ্রঘরের মেয়ে। বারবিলাসিনীদের আনাগোনা কমেছে। কিশোরীদের সংখ্যা অন্যান্য মহলদের মধ্যে ১৯৫৩ সালে ছিল শতকরা পাঁচ, এখন হয়েছে শতকরা পঁচিশ। কিশোরদের বেলায় কিন্তু সংখ্যা একই আছে। তখনও শতকরা পাঁচ থেকে দশ, এখনও তাই।

হাসপাতালের বিবরণী এর কারণও দিয়েছেন। মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতায় অবাঞ্ছিত পরিণাম এমন এক দুঃখময় পরি-স্থিতি সৃষ্টি করেছে। অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ

সরলা বালিকা পুরুষের কাম-লালসার বলি হচ্ছে অবলীলাক্রমে। সেজন্য পেশাদার গণিকার আর তেমন জোর ব্যবসা চলে না। ইউরোপীয় পুরুষ ক্রমশ বেশ্যার বদলে সহজে পাওয়া তরুণী কিশোরীর সহবাসে আসক্ত হচ্ছেন।

এ রকম খবরে আমরা চমকে উঠি। আলোচনা করতেও যেন প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু সমাজের সত্যরূপ স্বীকার না করলে, প্রতিকারের প্রয়াস অসম্ভব। অবাধ স্বাধীনতা আমাদের মেয়েদেরও আসছে। বাধা দেবার প্রচেষ্টায় ফল হবে না। মুক্তির স্বাদ পাওয়া কিশোরীকে কি করে আর আবদ্ধ জীবনে ফিরিয়ে নেবেন? সেজন্য জীবনের সত্যরূপ সম্বন্ধে তাকে জানিয়ে দিতে হবে। পদে পদে বিপদ আছে বুঝিয়ে দিতে হবে। সুখী পারিবারিক পরিবেশ যেন তাকে সংযম ও আত্মমর্যাদায় দীক্ষা দেয়। স্বাধীনতা যে অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃংখলতা নয় এ কথা সে আপনা থেকেই বুঝবে। যথেচ্ছাচারিতা যে বিষময় ফল আনে তা জানবার জন্য কোন তিক্ত অভিজ্ঞতার দরকার হবে না।

শ্রীমতী

রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অসাফল্য

আমাদের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় শতকরা সাত ভাগ হারে রপ্তানি সম্প্রসারণের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯-৭০ সালে রপ্তানি বেড়েছে মাত্র শতকরা ৩·৮ ভাগ; অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকের অল্প বেশি। রপ্তানির পরিমাণ আশানুরূপ না বাড়ার প্রধান কারণ, ভারত নতুন রপ্তানি-বাজার আশানুরূপ গড়ে তুলতে পারছে না। যে দেশগুলিতে আমরা বরাবর রপ্তানি করে থাকি, সেসব দেশ তাদের আমদানীর বিকল্প জিনিস উৎপাদনে যেমন যত্নবান হয়েছে, অনুরূপভাবে রপ্তানি বাজার বজায় রাখা অথবা সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে আমাদের নতুন প্রতিযোগীও দেখা যাচ্ছে। রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীগুলির উৎপাদন-খরচ কমানো এবং মান উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে ভারতীয় উৎপাদকগণ আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারছেন না। ১৯৭০-৭১ সালেও যে আমরা শতকরা সাত ভাগ রপ্তানি বাড়াতে পারব তা মনে হয় না। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা জোরদার করার যতটা উদ্যম দেখা যাওয়া উচিত ছিল তা আমরা দেখাতে পারছি না। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বৈপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ব্যাপারেও আমরা বাধা-বিপত্তি দেখতে পাচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ, নেপালের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

তবে আশার কথা হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) এ বছর বিদেশ থেকে বহু সামগ্রী রপ্তানি করার অর্ডার পেয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া থেকে ৩৬০০ ওয়াগনের (যার মূল্য ৩৮ কোটি টাকা) অর্ডার এসেছে। তাছাড়া পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের অর্ডার আসছে এবং এই মুহূর্তে রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে ৬০ কোটি টাকার অর্ডার আছে। পশ্চিম ইউরোপে চামড়া রপ্তানির সুযোগ সম্প্রসারিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

যদিও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন অনুমান করছে যে, রপ্তানির পরিমাণ ১৯৭০-৭১ সালে গত বছরের তুলনায় সামান্য বাড়তে পারে, তবুও একথা বলা যায় না যে, ৭ শতাংশ হারে রপ্তানি বাড়াবার কর্মসূচী সফল হবে, নতুন ধরনের জিনিসের রপ্তানি কিভাবে বাড়ানো যায়, তার চেষ্টা আরও জোরদার করা দরকার। ভারতীয় চা যাতে সিংহলের চা-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে না যায় অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে চটজাত জিনিস রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিযোগিতা যাতে তীব্র না

হয়, সে জন্য আমাদের প্রচারকাজ আরও জোরদার করা দরকার।

রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য বিদেশী আমদানিকারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কতটা বেশি দেওয়া যায়, সে সম্পর্কে সরকারের একটি সমীক্ষা চালানো দরকার। তাছাড়া রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন যাতে কোন কারণেই ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার; এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন রপ্তানি শিল্পে শিল্পবিরোধের উল্লেখ করা যেতে পারে। গত আর্থিক বছরে চা ও পাটশিল্পে ধর্মঘট আমাদের রপ্তানি-আয় কমাবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে দ্বিমত

ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ-প্রদান নীতি একটু কঠোর করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক সম্প্রতি যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হল মুদ্রাস্ফীতির উপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। এ ধরনের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার প্রধান কারণ হল ১৯৬৯-৭০ সালে মুদ্রা সম্প্রসারণের পরিমাণ অতিরিক্ত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির দিক থেকেও কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করার উৎসাহ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় রিজার্ভ ব্যাংক, আরও মুদ্রা সম্প্রসারণের উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতির যৌক্তিকতা স্বীকার করেও বলা যায়, গত এক বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি কর্তৃক আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ আশানুরূপ হয়নি বলে সঞ্চয় সংগ্রহীকরণের কাজ খুব বেশি এগোয়নি। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর থেকে এই ব্যাংকগুলি এক বছরের মধ্যে ২৯০০ নতুন শাখা খুলেছে; এই এক বছরে ব্যাংকগুলির আমানত বেড়েছিল ৬৮০ কোটি টাকা; অথচ এর আগের বছর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত না হওয়া সত্ত্বেও এবং এত শাখা খোলা না হলেও আমানতের পরিমাণ বেড়েছিল ৬৭০ কোটি টাকা। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, আমানত বৃদ্ধির হার নতুন শাখা খোলার হারের তুলনায় পিছিয়ে আছে। ঋণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করার অনুপ্রেরণা থাকলে অথবা আকাঙ্ক্ষা থাকলে ঋণের অভাব হবে বলে মনে হয় না।

রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির উদ্দেশ্য হল অনুৎপাদনমূলক ব্যয় প্রতিরোধ করা এবং অবাঞ্ছিত বিনিয়োগ বন্ধ করা, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকৃত প্রয়াস কোন প্রকারেই বাধাপ্রাপ্ত হবে না বলে রিজার্ভ ব্যাংক এবং ভারত সরকার জানিয়েছেন।

আমাদের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য উৎপাদন বাড়াবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতা অন্যতম বড় সমস্যা, কিন্তু এই মূলধন সহজলভ্য করার জন্য ব্যাংকগুলির ঋণ-প্রদান নীতিকে বর্তমানে সব ক্ষেত্রেই উদার করে রাখা চলে না। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ হয়তো অনেক। কিন্তু অতিরিক্ত মুদ্রা সম্প্রসারণ দাম বেড়ে যাওয়াকে আরও উৎসাহ দিতে পারে; সেজন্যই নিয়ন্ত্রণমূলক মুদ্রানীতি সাময়িকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে সব ক্ষেত্রেই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। আমাদের মনে হয় ঋণের জন্য ব্যাংকের কাছে যখনই কোন আবেদনপত্র আসে, তার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখার সময় উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে ঋণের টাকা কতটা কার্যকরী হতে পারে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই নীতি সব ক্ষেত্রেই যদি অনুসৃত হয়, তবে রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

সুব্রত গুপ্ত

ইনি সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী—দুই ছেলের মা
ঘুমপাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত—সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব ঝক্কিই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্সের পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উদ্যম আর উৎসাহ যোগায়।

হরলিক্স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এত গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

কেন এই অস্থিরতা?

না, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অস্থিরতা আজ ভারতের সর্বত্র। অস্থিরতা আজ আন্তর্জাতিক সমস্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিকতা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞান প্রগতি অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অসমতার সৃষ্টি করছে। ফলে আজকের জীবন ধারার মূল্যায়ন যতটা না জ্ঞান-কেন্দ্রিক, তার চাইতে বেশি দাঁড়িয়েছে জীবিকা-কেন্দ্রিকে। এই দুই-এর সংঘাতে জীবন নামক বস্তুটি আজ বিভ্রান্ত। আজকের জীবনের চাহিদা কী, তার পরিপূর্ণতা বলতে কী বোঝায়, সামাজিক অর্থে ন্যায়-অন্যায়ের সঠিক সংজ্ঞা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিসত্তার যথাযথ মূল্যায়ন কাকে বলা যেতে পারে — এ ধরনের শতেক প্রশ্নের সম্মুখে পড়ে বর্তমানের সমাজ-বিজ্ঞানীরা আজ রীতিমত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ সমাজ জীবনে নানারকম প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই সমস্ত আদর্শ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অথচ এ কথা অনস্বীকার্য, রাজনীতিকে যদি আমরা বৃহৎ কারখানার সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে সমাজকে বলা যেতে পারে সেই কারখানারই উৎপন্ন ফল। রাজনীতির মূল লক্ষ, এমন একটি সমাজ-অবস্থাকে রূপায়িত করা যে সমাজের প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব জৈবিক এবং আত্মিক সামর্থ্যকে সঠিক উপলব্ধি করতে পারে, এই উভয়ের সমন্বয়ে যে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, তাকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করতে পারে। দুর্ভাগ্য, আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা বহুধা। ফলে সমাজের আঙ্গিকও আজ ছিন্ন, অস্পষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী। আর তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি আজকের এই অস্থিরতা। অস্থিরতা আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ছাত্র এবং যুব সমাজে, শিল্পে, অফিস-কাছারিতে, তরুণদের কাজকর্মে অস্থিরতা, বৃদ্ধের ভাবনাচিন্তায় অস্থিরতা, অস্থিরতা আজ সাধারণ জীবনে, অস্থিরতা অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার-মানদণ্ডে যাঁরা উর্ধ্ব-মার্গের বলে বিবেচিত, তাঁদের মধ্যেও।

অথচ অস্থিরতাই জীবনের অন্যতম ধর্ম। অস্থিরতা প্রকৃতিদত্ত জৈবিক নিয়ম, যার

সমরজিৎ কর

মধ্য দিয়ে জীবজগত ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে। সেই যে অগ্রগতি, তাকে বুঝতে হলে অস্থিরতারও স্বরূপ উপলব্ধি করা দরকার।

প্রশ্ন উঠেছে, আজকের পশ্চিমবঙ্গে এত অশান্তি কেন? এর কারণ কী শুধু রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক অসাম্য? এই যে অস্থিরতা, এর হোতা কী শুধু অশান্ত ছাত্রসমাজ? অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত? ভূমিহীন কৃষক? শোষিত শ্রমিক? নাকি, যাকে কেউ কেউ অস্থিরতা বলছেন, সেটা আসলে জীবনের নবরূপে বিকাশ, যার তাৎপর্য কারোর কারোর কাছে অস্পষ্ট? একি কোন বিপ্লবের চিহ্ন? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সত্যি কি আজ এক প্রচণ্ড অবক্ষয়ের সম্মুখীন? তবু একথা বলতেই হবে, এখানকার সমাজ আজ বড় বেশি যেন বিখণ্ডিত—বরং ব্যক্তিকেন্দ্রিক এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিক্ষোভে মাঝে মাঝে ফেটে পড়ছি। কেন পড়ছি, তার যথাযথ উত্তর অনেকে হয়ত বুঝে উঠতে পারেন না।

সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে এই প্রশ্নের সম্যক উত্তরের অন্বেষণে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী এক আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নৃতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিজ্ঞ, শ্রমিক নেতা এবং সাংবাদিক। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক অস্থিরতার কারণ নির্ণয়ে নিজস্ব মতামত জ্ঞাপন করেন। মূল সমস্যার উৎস সন্ধানে এঁদের সেই আলোচনা হয়ত কিছুটা বিক্ষিপ্ত। তবু তারই মধ্যে দিয়ে এমন কিছু কিছু প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যাদের কোনক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না।

আলোচনার পুরোভাগে **ভারতের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল শ্রীবিক্রমকুমার রায়বর্মণ** মন্তব্য করেন, ভারতে সমাজ-বিজ্ঞানের উপর মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া দরকার। কীভাবে সেই গবেষণা চালাতে হবে তার যথাযথ লক্ষ্যগুলি সর্বাগ্রে নির্ণয় করে নিতে হবে। এবং তা করতে হবে সমাজের সার্বিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। এর জন্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আই আর … এবং ভারতীয় সংবিধান প্রভৃতি অনুসারে হওয়া দরকার। দেশের বুদ্ধিজীবীদের উচিত সম্মিলিতভাবে বর্তমান সমাজের বিভিন্ন আঙ্গিকের উপর নিজ নিজ মতামত

ব্যক্ত করা। জনমানসের সঙ্গে তাঁরা কে কোনভাবে সংযুক্ত রয়েছেন, তারই উপর নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু পর্যালোচনা স্থাপন করা। ইতিমধ্যে আমেদাবাদে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, সমাজবিজ্ঞানী এবং গান্ধী পিস ফাউন্ডেসন অনুরূপ আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওঁর প্রশ্ন ঃ পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতা সম্পর্কে কি ঐ ধরনের ব্যবস্থা করা যায় না? বর্তমানে ঐ অস্থিরতা শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও আছে। হয়ত ভিন্নতর ভাবে। ভারতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ব্যবহারিক জীবনের উপর ভিত্তি করে সেনসাসের কাজও করা হয়েছে। আমাদের উচিত ঐ ধরনের সভায় তাদের উপস্থাপিত করা।

শ্রীরায়বর্মণ বললেন, আজ সকলের মুখেই এক কথাঃ অস্থিরতা। আনরেস্ট! আমাদের বুঝে নিতে হবে, আসলে 'অস্থিরতা' বলতে আমরা কী বোঝাতে চাইছি? আসলে এটা কি কোন সচেতন প্রটেস্টের অভিব্যক্তি? হয়ত এটা প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সে প্রতিবাদ 'আনকনসাসলি' অর্থাৎ মূলে অভিব্যক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা বশতও হওয়া সম্ভব। হয়ত এমনও হতে পারে আজকের সমস্ত প্রতিবাদই সঠিক সচেতনতারই প্রয়াস। শুধু মাঝপথে কিছু সুযোগসন্ধানীর দল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই মাথা গলিয়ে মূল প্রতিপাদ্যটিকেই এমনভাবে বিশৃঙ্খল করে তুলছে—যাকে আমরা আখ্যা দিচ্ছি 'অস্থিরতা'। যদি সত্যিই এমন ঘটে তাহলে দেখতে হবে একটি অপরটিকে কীভাবে এবং কতটা প্রভাবিত করছে? 'প্রতিবাদ' এবং 'আন্দোলন' দুটি পৃথক জিনিস। শিল্পক্ষেত্রে আজকের যে অস্থিরতা তার মূলে কতটা প্রতিবাদ এবং কতটাই বা সত্যিকারের আন্দোলন সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ প্রতিবাদ এমন কোন কিছুর উপর নিজের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। কিন্তু আন্দোলনের উদ্দেশ্য কোন প্রচলিত ব্যবস্থাকে সঠিক একটি লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।

বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বদেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিকের মধ্যে [illegible] কিছু ছড়িয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বদেশের সমাজ বা অর্থনৈতিক উন্নতি কী ভাবে ঘটেছে, প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে জাগতে পারে। অনেক প্রতিবেশী দেশ, যেমন তিব্বত নেপাল প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এ প্রসঙ্গ উপেক্ষণীয় নয়। তিব্বতে খুব কম সময়ের মধ্যে একটি দারুণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। এর একটি ইমপ্যাক্ট যদি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উপর পড়ে থাকে অস্বাভাবিক কিছু বলা চলে কী? ইতিমধ্যে বাংলায় কিছু কিছু আঞ্চলিক বিক্ষোভ দেখা গেছে। যেমন ডেবরা, নকশালবাড়ি ইত্যাদি। এদের সত্যিকারের তাৎপর্য কী তার অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে বর্তমান ভারতের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক বলতে সত্যিকারের কী বোঝায়? পশ্চিমবাংলার সমাজধারায় তাদের প্রতিফলন কতটা?

পশ্চিমবাংলার প্রাচীন শিল্প সম্পদ এখন প্রায় অবলুপ্ত। অথচ কামার, ছুতার প্রভৃতি সম্প্রদায় একদিন গড়ে উঠেছিল ঐ সমস্ত শিল্পসম্পদকেই কেন্দ্র করে। এই প্রসঙ্গে একটা বড় রকমের ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দেখা যায়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গ্রামীণ পরিবেশে যে সমস্ত আবাসিক শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, অর্থ-

নৈতিক ক্ষেত্রে তাদের বিস্তার ছিল নগর জীবনেও। তাদের ক্রেতা শুধু ছিল নগরেরই মানুষ। কিন্তু বাংলা দেশের গ্রামীণ শিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গ্রামেরই জমিদার বা জোতদার প্রভৃতি। এই পৃষ্ঠপোষক সম্প্রদায়ের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত শিল্পের বাজারেও মন্দা দেখা দেয়। অতএব প্রশ্নঃ এদের যারা ধারক, তাদের সম্পর্কে এখন কী করা হচ্ছে? শিল্পক্ষেত্রে বাঙালী শ্রমিক যখন যোগ দেয়, তখন তাদের অতীত মানসিক গঠন অন্তরায় রূপে কাজ করছে কিনা তারও অনুসন্ধান করা দরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রী রায় বর্মণ বাংলার বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রভৃতি। স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের অবদান অনস্বীকার্য। একদা বঙ্গবাসীদের সেই যে ত্যাগ, তার তুলনায় পাওয়াটা যেন ঠিক মত হচ্ছে না, এও হয়ত অবচেতন অবস্থায় বিক্ষোভ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথাও বিশ্লেষিত হওয়া দরকার। সেই

সঙ্গে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে যা রোজগার করেন প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। এ সমস্যার উপরও দৃষ্টি দিতে হবে। একটি সমীক্ষা উত্থাপন করে শ্রী রায় বর্মণ বলেন, সর্বভারতীয় গণনায় অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা হাজার প্রতি যেখানে ৫৩৭ জন, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে হাজার প্রতি ৪৭৭। ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বেকার যথাক্রমে হাজার প্রতি ৩ এবং ২২। ১৯৫৩-র গণনায় কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন শিল্প বেষ্টনীতে মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রশ্রেণী এবং [illegible] শ্রমিক এবং অন্যান্যদের মধ্যে বেকারের অনুপাত ছিল ২:১। অথচ ঐ সময়েই পশ্চিম বাংলার বাইরে মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকের অনুপাত ছিল ১:১০। শুধু শিল্প-বেষ্টনীর হিসেব মত মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক শ্রেণীর অনুপাত ৯:৭। ১৯৫৩ সালে কলকাতার শিল্প বেষ্টনীতে শতকরা ২০ জন উদ্বাস্তু কাজ করছিলেন, কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রের সূত্রে তিনটি বিভাগী-করণের কথা ভাবা দরকার। এক, কর্মদাতা; দুই কর্মী; তিন, স্বনিযুক্ত কর্মী। পশ্চিম-বঙ্গে চাকুরের সংখ্যা সবচাইতে বেশি কলকাতা, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা এবং বর্ধমান জেলায়। মালদায় স্বনিযুক্ত কর্মীই বেশী। এই স্বনিযুক্ত কর্মী বলতে তাদের বোঝায় যারা নিজেদের আর্থনৈতিক প্রচেষ্টার দরুন কায়িক বা কোন রকম শ্রম নিজেরাই করে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা সুচারুরূপে বিশ্লেষিত হওয়া দরকার। ১৯৬০ সালের হিসেবে দেখা যায়, পশ্চিম-বঙ্গে শিল্প ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ জন বাঙালী শ্রমিকের পেশায় যোগ দিয়েছিল।

কিন্তু সম্প্রতি যে কোন কারণেই হোক, এই সংখ্যা বেশ কিছু পরিমাণে কমে গেছে। অবশ্য এটা 'ডাবল ডিসপ্লেসমেণ্ট' বা পেশার পরিবর্তনের জন্যেও ঘটতে পারে। এক সময়ে তারা যে যে পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করেছিল, পরে তাদের থেকে ভিন্নতর বৃত্তি গ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও যারা দক্ষ-শ্রমিকের বৃত্তিতে নিযুক্ত রয়েছে, তারাও দেখছে রোজগার বেশি করলেও সামাজিক মর্যাদা তারা যথাযথ পাচ্ছে না। এর ফলেও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পায়।

সম্প্রতি যে কারণেই হোক, শ্রী রায় বর্মণ নিজের অভিজ্ঞতা ধরে অভিযোগ করেন : দুর্গাপুরে, বেনারস, ফরিদাবাদ, আমেদাবাদ, এমন কি বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে গিয়ে দেখেছি কলকাতা থেকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান উঠিয়ে নিয়ে সেই সমস্ত জায়গায় বসান হবে। এটাও একটি মস্ত বড় সামাজিক অস্থিরতার কারণ। আমাদের দেখতে হবে শিল্পক্ষেত্রে বাঙালীর সংখ্যা বাড়ছে কিনা। আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করার মত। বেশির ভাগ শিল্প সংস্থায় যে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ করে, বংশপরম্পরায় তাদেরই পুত্র কন্যা তাদের বাবা মা বা আত্মীয় স্বজনের শ্রম সম্পর্কে দক্ষ হয়ে ওঠে। ফলে কাজ পাওয়ার সুযোগও তারা বেশি পায়। এর দরুণ অনুরূপ কোন বৃত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপ্রবেশ বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়। সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি বহু সমস্যার কথাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচিত হওয়া দরকার। সেনসাসে এদের উপর বহু তথ্যই সংগ্রহ করা হয়। আগেও হয়েছে। এখনও হচ্ছে। শ্রী রায় বর্মণের অভিযোগ, কিন্তু সেই সমস্ত তথ্যের অনেক কিছুই আমরা কাজে লাগাই নি। শুধু আজ নয়, অতীতেও। ফলে সমাজের সঠিক দর্পণটি আজও আমাদের কাছে অনির্দিষ্টই রয়ে গেছে। সামাজিক অস্থিরতার কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিকারের জন্যে এগুলির পর্যালোচনা এখনই দরকার।

ভারতীয় নৃতত্ত্ব সংস্থার সভাপতি ডঃ সুরজিৎ সিংহ শ্রী রায় বর্মণের শেষোক্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, কথাটা ঠিক। সমাজ-বিজ্ঞানের বহু গবেষণালব্ধ ফল বাস্তবে রূপায়িত করা হয় নি। সমাজ-বিজ্ঞানীরাও কাজে লাগাতে চান না। সম্ভবত জটিলতার মধ্যে গিয়ে পরিশ্রম করতে তাঁরা অপরাগ। একটি প্রবহমান বা প্রচলিত রীতিকে ধরে বাঙালীরা আজও জীবনচিন্তা করে চলেছেন, মনে হয় এ ধরনের ভাবনা এখন খুবই দূরের ব্যাপার। বরং সবস্তরে এই মুহূর্তে যা ঘটে চলেছে তার উপর আমাদের অনুসন্ধান চালান দরকার। অস্থিরতা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের শ্রেণী-অবস্থা বা ক্লাস পোজিশনের কথা ভাবতে হবে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রাধান্য এখনও প্রকট। বিচার্য বিষয় 'লোয়ার ক্লাস' বা নিম্নবিত্ত শ্রেণী। যাদের

উপর মূখ্যত নির্ভর করছে ব্যাপক উৎপাদন ব্যবস্থা। তাঁদের মন বা মেজাজ দিয়ে বর্তমান অস্থিরতার মূলে উৎসের সন্ধান করলে কেমন হয়? উচ্চ-বিত্তের প্রতি তাদের মনোভাবটা কী? যেমন ধরুন, বস্তীতে যারা বাস করে তাদের অনুভূতির কথা বিবেচনা করা যাক। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করতে পারছেন না। বাংলা দেশের খুব কম মানুষই নিম্ন শ্রেণীর সত্যিকারের অবক্ষয় বা অবস্থা সম্পর্কে সচেতন বা সে সম্পর্কে জানার, বিশেষ কোন চেষ্টা তাঁরা দেখিয়েছেন। সুদূর গ্রামাঞ্চলে কোন কোন গোষ্ঠী সঠিক কার্যসূচী নিয়ে ব্যস্ত। এরা সব স্ব ব্যাপার নিয়েই মাথা ঘামায় বেশি। সেখানে আরও কিছু কিছু গোষ্ঠী আছে যাদের জীবিকা-ব্যবস্থা অনিয়মিত। এই পরোক্ষ শ্রেণী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং জীবনের বাস্তব বোধের ব্যাপারেও তারা সম্পূর্ণ সচেতন নয়। তাদের ব্যক্তিত্ব কতকটা ভাসা ভাসা। তাদের কোন নিজস্ব মতামত নেই। এই হারিয়ে যাওয়া মানবতাই অস্থিরতার আরও একটি কারণ কি না, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। যদিও আরও একটি প্রশ্ন এই সঙ্গে এসে পড়ে। অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য চাই উন্মত্ত আনুগত্য। যাতে 'বাবুরা' লড়াই করতে বললেই, তারা লড়াই করবে। এটাও পরীক্ষা করতে হবে। একমাত্র আদিবাসীদের সমাজেই দলীয়ভাবে কোন কিছুকে অমান্য করার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র সেখানেই মোড়লের নির্দেশই সমস্ত কিছুর মূল কথা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব সেখানে পরাজিত। ডঃ সিংহ উপসংহারে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেন। এক, পশ্চিমবঙ্গে সত্যিকারের বা জেনুইন কোন অস্থিরতা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। দুই, যদি থাকে, সেটা কতখানি আছে। তিন, এই অস্থিরতার কারণ কতটা আর্থিক এবং কতটা পারিপার্শ্বিক।

শ্রীতরুণ দত্ত বলেন, অশান্তিটা মুখ্যত 'এক্সপেকটেশন' অর্থাৎ প্রত্যাশার প্রশ্ন। ভগ্ন আশাই অস্থিরতার ভূমিকে উর্বর করে তোলে। আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গে মূলে অশান্তির বীজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই ছড়ান হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরায় বর্মণের মন্তব্য : এ কথাটা সর্বৈব সত্য কিনা সেটা দেখা দরকার। কারণ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, সাঁওতাল বা মুন্ডাদের বিদ্রোহের মধ্যে কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপ্রবেশ দেখা যায় নি। অনেক ক্ষেত্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিনা প্ররোচনাতেই বিদ্রোহ ঘটতে দেখা গেছে।

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীইন্দ্র সেন বলেন, নিত্য-নৈমিত্তিক অভাব অভিযোগ মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, অস্থিরতা তারই প্রতিফলন। জন সমাজের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সংবাদপত্রের ভূমিকাও কোন কোন ক্ষেত্রে দায়ী। বিকৃত সংবাদ অথবা বিশেষভাবে পরিবেশিত সংবাদ অনেক সময় জনসাধারণের মনে যে বিভ্রান্তির উদ্রেক করে, কতটা করে, সেটাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীমাখন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক অস্থিরতা সম্পর্কে কতকগুলি স্পষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেল। তাঁর মতে, শিল্পক্ষেত্রে বর্তমানে যে অস্থিরতা চলেছে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে যদি এইটেই আমরা মনে করে বসি, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক এবং ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে অস্থিরতার কারণ ভিন্ন, অথবা এই উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে, সেটা ভুল হবে।

শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতে কলকাতা বন্দর এলাকায় যে অস্থিরতা দেখা যায় তা মোটেই সাংঘাতিক কিছু নয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, যেমন ধরুন গত পুজোর সময় কলকাতা বন্দরের একটি বিভাগে অশান্তি দেখা দিয়েছিল। এই বিভাগে মোট শ্রমিক ছিল ৪০০০। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ৫০জন লোক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। তারাই নিয়োগকর্তাদের প্রতি কটূক্তি করেছিল, অসংযত আচরণ প্রকাশ করেছিল। তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আবদ্ধ ছিল সেই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে, বৃহত্তর অংশের মধ্যে তাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি।

প্রঃ এটা কি স্বতঃস্ফূর্ত না প্ররোচিত বিক্ষোভ?

প্রঃ এটা কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই?

শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের উত্তর : প্ররোচনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয়েই কাজ করেছে।

তবে এই সঙ্গে এ কথাও তিনি স্বীকার করেন, বোম্বাই বা ভারতের অন্যান্য বন্দর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে কলকাতার বন্দর শ্রমিকদের অবস্থার পার্থক্য কিছুটা আছে। বোম্বাই-এ বন্দর কর্মী এবং অপরাপর স্থানীয় কর্মীদের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে ব্যবধান কম। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। কলকাতার বিশেষ বিশেষ সওদাগরি অফিসের কর্মীরা বোম্বাই-এর সওদাগরি কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি অর্থনৈতিক এবং চাকরীর সুযোগ-সুবিধে পান। কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে চিত্রটি বিপরীত। সেখানকার সাধারণ শ্রমিক কলকাতার শ্রমিক থেকে অনেক বেশি টাকা রোজগার করে। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতে নিয়োগকর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করলে কিছুটা সুফল অন্তত মেলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতার শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে সংঘবদ্ধতা অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের চেয়ে বাইরের লোকের ভীড় বেশি দেখা যায়। নেতারাও যা বলেন তা বিশ্বাস করেন কম। শিল্পজগত সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও কোন কোন ক্ষেত্রে সীমিত। প্রসঙ্গত তিনি এ কথাও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়োগকর্তাদের মনোভাবের পরিবর্তন দরকার। শিল্প জগতে অস্থিরতার মূলে এরাই আজ কাজ করছে।

শ্রীজ্যোৎস্নাকান্ত বসু বলেন, অফিস কর্মীদের মধ্যে অশান্তির কারণ ছাঁটাই-এর আতঙ্ক। ইতিমধ্যে কোন কোন কোম্পানি কর্মীদের আগাম কয়েক বছরের মাইনে চুকিয়ে দিয়ে আগাম অবসর নিতে বাধ্য করেছে। ওঁর মতে, কায়িক শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি কম। অনেক সময় রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং অপরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রতিযোগিতায় শ্রমিকদের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে অস্থিরতা সৃষ্টি করে থাকে।

অধ্যাপক অসিত ভট্টাচার্য-এর কণ্ঠে ছিল প্রত্যক্ষ অভিযোগ। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক অস্থিরতা আজ আর অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষ ভাবে এর শুরু ১৯৬৬তে, যখন খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬০ সালে ভারতের খাদ্য-এলাকা ভেঙ্গে যায়। খাদ্য চলাচলের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় চাপ বাড়াতে থাকে। কৃষি-উৎপাদনে সেই সঙ্গে মন্দা। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী এস কে পাতিলের রেল বাজেটে বৈমাত্রেয়সুলভ মনোভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প বিরাট চোট খেল। শুরু হয় ছাঁটাই। তারপরই দেখা দিল ছাত্র বিক্ষোভ। এক সময়ে ধারণা ছিল, অন্ততঃ যারা কারিগরি শিক্ষা পেয়ে থাকে, চাকরীর ব্যাপারে তাদের কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু সাধারণ শিক্ষিত ছাত্রই নয়, বিশেষভাবে উচ্চতর কারিগরি ছাত্রের কাছেও কর্মসংস্থান এখন সুদূরপরাহত। অথচ ছাত্রদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসছে। বর্তমান ছাত্র সম্প্রদায়ের এই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎও অশান্তির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। কেউ কেউ বলছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ বিপথগামী। এটা ঠিক নয়। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বিভিন্ন শ্রেণী সমাজ বিশ্লেষিত হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত নিদারুণ। বোম্বাই অথবা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এখানকার অবস্থা অনেক বেশি শোচনীয়। এখানে একজন চাকুরের উপর নির্ভর করতে হয় পরিবারের বহুসংখ্যক প্রাণীর। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা আরও একটি বড় প্রশ্ন। দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে শুধু পশ্চিমবঙ্গে যতজন মানুষ পাড়ি দিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এবং

কোথাও, সে ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই হোক—এত জন মানুষ দেশান্তরিত হন নি। অথচ এর জন্যে তারা নিজেরা দায়ী নয়। আজও তারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। এ ধরনের অবস্থা আর কতদিন চলতে পারে? তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দল এ যাবৎ প্রদেশের অর্থনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা স্থাপনে কোন নজিরই দেখাতে পারেন নি। কিন্তু আসামের দিকে তাকান? তেমন দৃষ্টান্ত সেখানে পাবেন।

কলকাতার ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্ট-এর প্রধান **ডঃ বরুণ দে** কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত করলেন। তাঁর মতে অস্থিরতা আজ বড় মাইনের চাকুরেদের মনেও এসেছে। শিল্পপতিরা বলছেন শ্রমিকদের বুঝিয়ে দাও, একটা লিমিট পর্যন্ত ওদের পয়সা-কড়ি দেওয়া সম্ভব। অথবা শিল্প সংস্থাগুলি সরিয়ে নাও। এক ধরনের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, কলকাতার অবস্থা নাকি খুবই খারাপ। এখানে রাতের দিকে নাকি পথঘাটে বেরুনো যায় না, ইত্যাদি। দেখতে হবে, আজকের অস্থিরতার পেছনে কতখানি বাস্তব সত্য আছে, কতখানি শুধু মনের কল্পনা। ধনিক শ্রেণীর ধারণা, এই বুঝি তাদের আয় কমে গেল। দেখতে হবে, কেন এই ভয়? ধরে নিলেই চলবে না, উৎপাদন কমলেই দেশ রসাতলে গেল। অথবা আয় বাড়লেই দেশে আর কোন অশান্তি থাকবে না। ও'র দ্বিতীয় প্রশ্ন। কৃষকদের মধ্যে ধনী, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নসম্প্রদায় বলে যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, কার উপর ভিত্তি করে তা করা হল? ইতিহাস থেকে দেখা যায়, যারা ধনী কৃষক তাদের জীবনধারার মধ্যে আধুনিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। যারা জোতদার এক সময়ে তাদের অবস্থা ভাল ছিল না, এখন ভাল করার চেষ্টা হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ক্রমান্বয় বৃদ্ধিও অস্থিরতার অন্যতম কারণ। আজকের মধ্যবিত্ত চাষী শ্রেণী অর্থ সঞ্চয় করতে পারছে না। তার মূলে এও নয়, তারা সকলেই আধুনিক জীবন যাপনের জন্যে অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে পড়ে হিমসিম খাচ্ছে। যদি অফিসগুলির দিকে চাওয়া যায়, দেখা যাবে, সেখানকার নিয়মানুবর্তিতা দিন দিন ভেঙে পড়ছে। অবশ্য অংশত এর মূলে রয়েছে উর্ধ্বতন কর্মীর নিয়মানুবর্তিতার অভাবও। এই সিদ্ধান্ত, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সামাজিক অস্থিরতা [illegible] দেখা দরকার। সেই সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে রাজধানী কেন্দ্রিক জীবন-প্রণালী। অর্থাৎ রাজধানী কেন্দ্রিক জীবনের সুযোগ সুবিধের বিকেন্দ্রীকরণ দরকার।

অধ্যাপক অশোক সেন-এর [illegible], পশ্চিম বাংলার সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে যে ধ্যানধারণা চলছে তার সঙ্গে জনজীবনের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়নি। অতীতেও দেখা যায় যাঁরা এ বিষয়ে চিন্তা করে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ খুব কম। এ ক্ষেত্রে আদর্শের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই ধরা পড়েনি। সে ব্যাপারে তেমন কোন চেষ্টাও চলে নি। মধ্যবিত্তদের চিন্তাধারার এটাই আজ সবচাইতে বড় গলদ। যেমন ধরুন, কৃষি উৎপাদনের ব্যাপার। অনেকের ধারণা এর উৎপাদন এবং বণ্টনই বুঝি সব সমস্যার সমাধান। এ ধরনের চিন্তাকে একটা মস্তবড় 'মধ্যবিত্ত-ভ্রান্তি' বা ইল্যুশন ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। যেমন ধরুন, জমি দখলের আন্দোলন। জমি না হয় দখল করা গেল এবং জমিহীনদের মধ্যে বণ্টনও করা গেল। কিন্তু সেই জমিতে যদি চাষ না হয়—চাষ করার কোন দায়িত্ব না নেওয়া হয়, তাহলে এ আন্দোলনের সার্থকতা কোথায়? স্বয়ং মাও সে তুংও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার আগে একটা সমাজ গঠন করেছিলেন। কিন্তু নকশালরা জোতদার হত্যা ছাড়া আর কী করছে? আসল কথা, শুধু রোগ নির্ধারণের দায়িত্ব নিলেই চলবে না। তাকে সারিয়ে তোলারও চেষ্টা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে **শ্রীমনকুমার সেন** মন্তব্য করেন, পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক অবিচার সম্বন্ধে চেতনার যে অভাব রয়েছে

অঞ্জনা ও আরতির অনুরোধে

অঞ্জনা ও আরতি হরিহরাত্মা। হরি আর হরের মধ্যে যে কতকখানি ভাব, তা অবশ্য আমি জানি না; জানি শুধু অঞ্জনা ও আরতির বন্ধুত্ব—ওদের নিজেদেরই ভাষায় বলি—সাংঘাতিক।

আরতির সঙ্গে প্রথম দেখা হয়—আকস্মিক সাক্ষাৎ—পি জি হাসপাতালে। সেদিন স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরোবার দশটায়, মেয়েটি খবর পায় একটায়, বাড়ি ফেরে দেড়টায়, অ্যাসিড খায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বাথরুমের তাকে ফেলে-রাখা দেশীয় অ্যাসিড। না, জমাদার বলল, দেশীয়-ও নয়, একেবারে যাকে বলে 'লোকাল'—হরিহরকে ধন্যবাদ! বিকেল চারটেয় ডাক্তার রায় দিলেন : মেয়েটি বাঁচবে।

দুজন এবার পাশ করেছে। ভালো পাশ নয়, তবে পাশ তো বটে। ছাত্রী-জীবনে ইতি টেনে—বাবা-মা বরের মেলায় ঘুরতে ঘুরতে নাকাল—মেয়েরা সুন্দর রুটিন স্থির করেছে : রোজকার সকালটা কাটায় অঞ্জনা আরতিদের একতালার ঘরে; আর আরতির বিকেল কাটে অঞ্জনাদের ছাদে। বিরস আলোচনায়। অঞ্জনার সমস্যা : দেহশীর্ণতা, আরতির ভাবনা : চর্মশ্যামত্ব। অঞ্জনাকে দেখতে এসে "বড্ড রোগা" বলে পাত্ররা ফিরে যায়। আর আরতি? অনেকে আসেই না দেখতে।

টুলু অঞ্জনার ছোট বোন, দুষ্টু বোন; পড়ে কনভেন্ট স্কুলে। সিস্টারেরা ওকে পরিত্রাণাতীত বলে ঘোষণা করে—ছুটিতে আটকে রাখাটা পর্যন্ত বন্ধ করেছেন। ওই টুলুরই মুখে শুনেছি, ওর কৃশাঙ্গী দিদি যেদিন কাপড় পরতে শুরু করে, কাল বৈশাখীতে মেয়ে-সুদ্ধ উড়ে যায় শাড়ি, নেমে আসে পুকুরের মাঝখানে। আরেকদিন ফটোর অ্যালবামে এক কুচকুচে কালো কাগজ দেখিয়ে টুলু জিগ্যেস করেছিল :

"চিনতে পারছেন না?...কালো শাড়ি-ব্লাউজ-পরা আরতিদির ছবি!" কথাটা ডাহা মিথ্যে! আরতি নিজেই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছে, কোনোদিনই সে—হায়—কালো [কিংবা গাঢ় লাল] শাড়ি-ব্লাউজ পরেনি; কৃষ্ণাঙ্গনাদের, জানবেন, মানায় না।

বন্ধুদ্বয়ের শুভাকাঙ্ক্ষীদের তালিকায় আমার স্থান নগণ্য নয় : ওদের সঙ্গে যখনই দেখা হয়, ওদের স্মরণ করিয়ে দিই, বিদেশী ছেলেরা রোগা মেয়েদেরই পছন্দ করে বেশি; আর বিদেশী মেয়েরা সারা গায়ে মলম মেখে রৌদ্রস্নান করে কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

মানিকজোড় 'দেশ' পড়ে। আর তাতেই অসুবিধা খুব। একটি গল্প যেই বলতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে : "পড়েছি ডায়েরিতে, তেইশে মের সংখ্যায়...। অন্য গল্প বলুন, আপনার দেশের গল্প বলুন!"

আমরা কি আপনার কাছে কোহিনুর দাবি করব?

একদিন তারা জানতে চাইল আমার নিজের ছেলেবেলার কথা : খেলা করতাম কি কি, ঝগড়া করতাম কি না? ভাষা শিখতাম কি কি, বৃত্তি পেতাম কি না?... পরের আলোচনার বিষয় হল বেলজিয়ামের রান্না : আরে বাবা, সে আবার কি রকম দেশ? ভাত খায় না, দুধ খায় না, চা খায় না...খায় কি, জানেন? আলু সেদ্ধ—দু বেলা! আলুর সঙ্গে মাংসের ঝোল ...আর অবশ্যই জাতীয় সোমরস—বীয়র।

আর আজকে নাকি বলতে হবে আমার দেশের বিয়ের কথা। এ ব্যাপারে বলা বাহুল্য—আমি বিশেষ বিশেষজ্ঞ নই : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার নেই।

"নেব না পণ, করেছি পণ..."

না, আমাদের দেশে যৌতুকের বালাই নেই। প্রথাটা—সবাই জানে—এদেশেও উঠে গিয়েছে; পাকা-দেখার দিনে বাঙালী ভাবী শ্বশুর শুধু বলবেন, "যৌতুক?... আমাদের কি এত ছোট লোক ভেবেছেন? স্বয়ং লক্ষ্মী আমাদের বাড়িতে আসছেন, তার উপর আমরা আবার পণ নেব?... কনে-কে সাজাবেন, গোছাবেন, এই আর কি!...আমরা কি মেয়ের ব্যবসা করি? কিংবা বউমা শ্যামবর্ণ বলে আমরা কি আপনাদের কাছে কোহিনুর দাবি করব?... ভরি বাইশেক সোনা দিলেই যথেষ্ট। আবার ধরুন, বউমা অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস মিস করেছে বলে আমরা কি আপনাদের কাছে বিদেশী গাড়ি চাইব?...অ্যাম্বাসাডার দিলেই তো চলবে, খুবই চলবে। আমাদের দুই ঘর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে, আর আমরা কি না লোভ দেখাব? ভেবেছেন কি, মশায়? দেখুন বরং : আপনার মেয়ে তো ক্লাসিকাল গান শেখেনি, তাই বলে আপনাদের জামাই কি রাজকুমার না রায় বাহাদুর যে আলিপুরে বাড়ি চেয়ে বসবে? ...না, ওকে বরঞ্চ বিলেত পাঠানোর বন্দোবস্ত করুন; পড়াশোনা শেষ করে ফিরবে যখন, দেখবেন ঐ অ্যাম্বাসাডারে কত জায়গায় কত মজা করে বউমাকে ঘোরাবে। ইতিমধ্যে গাড়িটা আমাদের গ্যারাজেই থাক!..."

বউমার ছটি বোন আছে—ছোট বোন। কারো রঙ আবার অতি-গৌর নয়, ক্লাসিকাল গাওয়ার মতো গলা নেই, আর বি এ-তে ওরা যে ফার্স্ট ক্লাস পাবে, তারও সম্ভাবনা অল্প। হরিহরের কাছে প্রার্থনা : ওদেরও কপালে যেন ঘটে এমনই উদার এক শ্বশুরের সাক্ষাৎ।

বিদেশী বিয়ের কথা বলছিলাম না?...

সুধী পাঠক ক্ষমা করবেন; Excursus আমার লেখনীর এক বিশেষ দুর্বলতা : মা-কে পর্যন্ত চিঠি দিতে গিয়ে দেখবেন, আমাকে পদে পদে গোল আর চৌকো বন্ধনীর শরণাপন্ন হতে হয়। ধরুন, একটি টেরা ছেলের উল্লেখ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে [চৌকো বন্ধনীর মধ্যে] বোঝাব ওর ঠিক কোন্ চোখ কোন্ চোখের সঙ্গে আড়ি করেছে; তারপর (গোল বন্ধনীর মধ্যে) বলব ছেলেটির মুখমণ্ডলের অবশিষ্ট গুণাগুণ।

পূর্বরাগ

তাহলে শুনুন : আপনি এম এ পড়ছেন, আপনার বাবা একদিন আপনাকে ডাকবেন, বলবেন, "দেখ, ছোকরা, তোমার বোন বড় হয়ে যাচ্ছে; তোমার জন্মদিনে তোমার সব বন্ধুকে আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে আনবে, খুকিকে ভালো ভালো ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ ক'রে দেবে।" এদিকে আপনার বোন বি এ পড়ছে, আপনার মা একদিন ওকে ডাকবেন, বলবেন, "দেখ রে ছুঁড়ি, তোর দাদা বড় হয়ে যাচ্ছে; তোর জন্মদিনে তোর সব

বান্ধবীকে আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে আনলি, তোর দাদাকে ভালো ভালো মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ ক'রে দিবি।"

এ ধরনের পারিবারিক পার্টিতে বিবাহোপযোগী ছেলেমেয়েদের হবে ধাপে ধাপে সাক্ষাৎ [করিডোরে], আলাপ [বৈঠকখানায়], পরিচয় [স্যান্ডুইচের রোমন্থনে] আর পূর্বরাগ [নৃত্য-বাজনার তালে তালে]। প্রতিটি স্তরে অনুভূত হবে পিতামাতার অনাড়ম্বর উপস্থিতি—লজ্জালু ছেলেদের তাঁরা দেবেন উৎসাহ, উপেক্ষিত মেয়েদের দেবেন আশ্বাস।

পালায় পালায় চলবে আতিথ্য গ্রহণ ও নিমন্ত্রণ দান: পালায় পালায় পড়বে সবাই একে একে—মদনদেবের পুষ্পশর নিক্ষেপে। নৃত্যের মধ্যে বাজনা যেই থামে, সঙ্গে সঙ্গেই জোড়াগুলো ভেঙে যায়, নর্তকেরা আপন আপন সহচরকে ছেড়ে অন্য একজনকে বেছে নেয়। গ'ড়ে ওঠে নতুন জোড়া—অ্যাটমে অ্যাটমে ছাড়াছাড়ি হলে গ'ড়ে ওঠে যেমন নতুন অণু, রসায়নের ক্লাশের ব্ল্যাক-বোর্ডে।

এমনিভাবে ঘটবে কি? অমুকা শ্রীমতী বুঝবে, নাচতে নাচতে বারবার সে পড়ে এসে তমুক শ্রীমানের বাহু বন্ধনে। একদিন [বরং একরাত; রাতেই জানবেন, ঐ ধরনের আলোচনা জমে বেশ...] মেয়েটি মায়ের কাছে কথাটা পাড়বে। চেম্বার-ফেরৎ বাবাকে জুতো খোলার সময় না দিয়েই মা ও'র কাছে বাৎলাবেন "ও গো শুনছ, তোমার মেয়ে কি বলছিল"-র বিদেশী সংস্করণ।

ছেলেটি এদিকে এক বন্ধু ফাদারের কাছে গিয়েছে। ওসব ব্যাপারে বোধ হয়, ফাদারকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করা নিরাপদ নয়। না, মাকেও না। মা তো শুধু বাবার কাছে কেন, পাড়ার যাবতীয় মাসীর কাছে এবং ট্রাঙ্ক-কল ক'রে প্রবাসিনী যত খুড়ী-পিসী পিসু-খুড়ীদের কাছে—সিক্রেটটাকে বিট্রে করবেন!...ছেলেটি ফাদারকে শুধু বলেছে : "ঐ ডাক্তারের মেজো মেয়েটা, জানেন...মানে...হ্যাঁ, আমার কিছু ইন্টারেস্ট আছে...আপনি যদি দয়া করে ওকে একটু হিন্ট দিয়ে খোঁজ নিতে পারেন...কিন্তু খুব সাবধানে...।" ফাদার স্মিত হাসি হেসে ছেলেটির পিঠ চাপড়ে জানালেন যে, ঠিক আছে, সাবধানে তিনি খোঁজ নেবেন। আর বিদায়কালে বলতে ভোলেন নি যে, ডাক্তারবাবু লোকটি ভালো খুব, গিন্নীও মহিলাটি বেশ, আর ও'দের ঐ কচি মেজো মেয়েটো বাইশ ক্যারাটের সোনা। ছেলেটি ফাদারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে অনেক অনেক হালকা বোধ করে বাড়ি ফিরল মনে মনে গান করতে করতে। হ্যাঁ, সেই গ্রামোফোনের

বরং চুষতে ভুলে গিয়ে......

গানই বটে, ঐ ডাক্তারের গ্রামোফোনের ঐ দিনের গান...।

ফাদার সেদিন তাঁর সায়ংসন্ধ্যার প্রার্থনায় এক পুনশ্চ যোগ দিলেন : "হে প্রভু, সবই তো আপনার মঙ্গলবিধান; সর্বত্র সর্বদা সর্বতোভাবে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।...আর তবু, কিছু যদি মনে না করেন, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলবঃ জোড়াটা কিন্তু মন্দ নয়। আমেন।" পরের দিন ছেলেটিকে জানালেন—অল ক্লিয়ার।

গৃহপ্রবেশ

বসে থাকল সে, সুযোগের অপেক্ষায়: ভাবতে লাগল, কোন্ সূত্রে, কোন্ উপলক্ষ্যে, কোন্ সযত্নে-পূর্বকল্পিত দৈব-ঘটনায় মেয়েটির সাক্ষাৎ মিলতে পারে—নির্জনে, নিরালায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অজান্তে। একদিন দুহাতে সাহস কুড়িয়ে [আর তিন তিনবার রং নম্বর ডায়াল করে—মুদিখানা, দমকল আর সৎকার-সমিতিতে] ডাক্তারের বাড়িতে সে ফোন করল: ওপারের গলা শুনেই বুঝল, ও নিজেই ফোন ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে বোঝাতে লাগল, নিজের পরিচয় দিতে বেমালুম ভুলে গিয়ে, ওর সঙ্গে তার এক বিশেষ দরকার...হ্যাঁ, গানের ব্যাপারে...জলসার মহড়া...। মেয়েটি প্রথমে ঐ আবোল-তাবোল কিছুই বুঝল না, তবে, ধৈর্য ও ভদ্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে 'ভদ্রলোকটির' নামটা জিগ্যেস করল। ও তো অজ্ঞান...ডাক্তারের বাড়িতে এত অদ্ভুত অদ্ভুত ফোন আসেঃ ধরুন, আপনি মধ্যাহ্নের সুপটা খেতে বসেছেন: হঠাৎ লক্ষ্য করেছেন, আপনার সদ্য-স্থাপবিষ্টা সহধর্মিণী প্রসব-বেদনায় আক্রান্ত, কিংবা আপনার ঔরসজাত বংশধর একটা আধুলি গিলে ফেলেছে...ডাক্তারের কাছে ফোন করতে গিয়ে দেখবেন সহজ কথাটা জিভে সহজে ফোটে না।

সাক্ষাৎ হল রুদ্যলাগার-স্থ কফি-হাউসে। রুদ্যলাগার-এর অর্থ হল 'স্টেশন-অভিমুখী রাস্তা'। ঐ ধরনের নামকরণ ভালো লাগে বেশঃ গির্জার স্কোয়ার, হাট-খোলার লেন, চৌষট্টি বাড়ির স্ট্রীট...। কিন্তু হায়! এত যুদ্ধে এত সেনাপতি মরে, এত দুর্ঘটনায় এত বীর এত লোক বাঁচায় যে, শীঘ্রই দেখবেন, যাবতীয় পুরোনো রাস্তাকে নামান্তরিত করলেও ভক্তদের আশা মিটবে না; ঐ-সব প্রাতঃ-সন্ধ্যা-স্মরণীয় ব্যক্তির সম্মানার্থে নতুন নতুন রাস্তাঘাটের উদ্ভাবন প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে।

কফি-হাউসের এক দূর-কোণে—আট-আনা বধির, দশ-আনা নিরেট মালিকের কর্ণেন্দ্রিয়ের অগোচরে—কোকো-কোলা চুষতে চুষতে [বরং চুষতে ভুলে গিয়ে] চলছিল মধুর সম্ভাষণঃ কত শুভদিনের কত শুভ পরিকল্পনা! বাড়ি হবে কত বড়, মাইনে হবে কত মোটা...ছেলেপিলেদের পড়াবে কোন্ স্কুলে, ঘোরাবে কোন্ দেশে...।

একদিন ছেলেটি যাবে ডাক্তারদের ওখানে—চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে। নিয়ে যাবে গিন্নীর জন্য এক তোড়া গোলাপ [নিজের পয়সা দিয়ে কেনা বেস্ট গোলাপ—সুন্দর দেখতে, সুন্দর শুকতে...] আর বাচ্চাদের জন্য এক বাক্স চকোলেট [নিজের পয়সা দিয়ে কেনা বেস্ট চকোলেট—ভিতরে ভিতরে ক্রীম]। গিন্নী অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে বলবেন, "মিছিমিছি এত খরচ করতে গেলে কেন, বাবা?..." আর বাচ্চারা, সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট খুলে, মিষ্টিগুলির সদ্ব্যবহার করবে, আঙ্গুল আর ঠোঁট চাটতে চাটতে।

চা-টা কেক-টেক যথাস্থানে পৌঁছোনোর পরে, মুহূর্তের গাম্ভীর্য বুঝে, নিয়ে একটু ইতস্তত করে, ছেলেটি—মৃদু স্বরেই—মেয়েটির জন্মদাতাকে বলবে, "আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।" কথাটা যে কি, তিনি অবশ্য ভালোভাবেই জানেন, আর তা শোনার জন্যই আজকের এই নিমন্ত্রণ।

ডাক্তারের বৈঠকখানায় এসে ছেলেটি দেখল—তার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে ঝালর-দেওয়া এক আরাম-চেয়ার। ডাক্তারের স্মিতমুখ আর পরম অমায়িকতা দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে সে আওড়াতে শুরু করল মুখস্থ করা ডায়লগ : 'আপনার ফ্যামিলি আমার খুব পছন্দ আপনার রোগীদের মুখে আপনার কত প্রশংসা শুনেছি...মাদামও কত ভালো, কত দয়া-শীলা: কত সামাজিক কাজ তিনি করে যান...আপনার বড় ছেলের আমাদের স্কুলে কত নাম ছিল, খেলাধুলায় কত ভালো,

পড়াশোনায় ফার্স্ট'...। ও হ্যাঁ...আপনার বড় মেয়ে যাকে বিয়ে করেছেন না, তিনি আবার আমার সেজো মামার বাড়ির ডাক্তার...। আর আপনার ছোট ছেলেমেয়েকে না...আমি না ...আপনি জানেন বোধ হয়...খেলা ও কুচকাওয়াজ দেখাই প্রতি রোববার, সন্ধ্যা-বেলায়, 'শিশু সংঘে'...। [তারপর মাথাটা নিচু করে] আর আপনার মেজো মেয়ে... দেখুন, আপনি কিন্তু যদি 'না' বলেন, আপনি আর মাদাম যদি মনে করেন, আমি ওর যোগ্য নই, কিংবা ওকে সুখী করতে আমি পারব না, আপনাকে কথা দিচ্ছি, ওর সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলব না, ওর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করব না... আমার পড়াশোনার যে-কয়েক মাস বাকি আছে, আমি সেই সময়টুকু হস্টেলে থেকেই কাটাব। কিন্তু জানেন, আমার বাবা-মাও ...আপনার মেজো মেয়েকে খুব ভালো-বাসেন।..."

আর-কিছু বলতে হল না; ডাক্তার নিজেই এবার, যেন মাছি তাড়াচ্ছেন, এমন ভঙ্গিতে চোখের কোণে অশ্রুর ফোঁটা মুছতে মুছতে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন : "তোমার বাবা আমার বাল্যবন্ধু, তোমার মা আমার স্ত্রীর সঙ্গে কত কমিটিতে কাজ করেছেন, 'মাতৃসদনে' আমার হাতেই তোমার ডেলিভারি হয়েছে...তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলেই তোমার খোঁজ নিয়েছি, পড়া-শোনায় তোমার সাফল্যের কথা শুনে আনন্দ পেয়েছি—তুমি যে আমার এক প্রিয় বন্ধুর বড় ছেলে! না...জীবনেও আমি ভাবিনি, তুমি একদিন আমারও ছেলে হবে। কিন্তু যেদিন বুঝেছি তোমাদের ভালো-বাসার কথা [আর, সত্যি, বেশ কিছুদিন লাগল বুঝতে; আমরা—ডাক্তাররা—এত ব্যস্ত, অন্যদের এত ভাবনা নিয়ে আমাদের এত ভাবতে হয় যে, নিজের নাকের সামনে যা ঘটছে, তা আমাদের চোখে সহজে পড়ে না], সেদিন থেকেই আমি তোমাকে, তোমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করেছি।"

এই 'অনুষ্ঠানটির' নাম : গৃহপ্রবেশ—অর্থাৎ মেয়েটির বাড়িতে নিমন্ত্রণ-ছাড়া বেসু-টেপার অনুমতি লাভ।

বাগদান

পরে বাগদান। ছেলেটি এবার শেষ পরীক্ষা দিয়েছে, চাকরি নিয়েছে। নিকটতম আত্মীয়দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দুজনে পরস্পর পরস্পরের হাতে—ছেলেটির বাড়িতে—বাগদানের অঙ্গুরীয় পরিয়ে দেয়। যাজক এই প্রার্থনা উচ্চারণ করেন : "করুণাময় পরমেশ্বর, আমাদের স্নেহাস্পদ এই পরস্পর-বাগদত্ত অমুক ও তমুকার প্রতি সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। বিবাহ-সংস্কারের পবিত্র বন্ধনে ইহারা অবিলম্বে আবদ্ধ হইবে, ইহাদিগকে আশীর্বাদ কর। ইহাদের নবীন ও নির্মল প্রেমকে সুদৃঢ় ও অবিচলিত করিয়া তোল। আমেন।" সেদিন থেকে দুজনে এবার একসঙ্গেই চার্চে যাবে, সিনেমায় যাবে, বেড়াতে যাবে—ছেলেটি মেয়েটিকে ওর ডান পাশটিতে রেখে।

এক ভাড়াটে ঘর দেখতে যাবে, কিছু কিছু আসবাবপত্র কিনবে—খুব বেশি না অবশ্য...ওরা বরং টাকা বাঁচিয়ে বাড়ির গুদামে পড়ে-থাকা শেলফ-টেলফ সারিয়ে নিয়ে কাজে লাগাবে। মায়েদের পরামর্শ-মতো প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যের এক ফর্দ তৈরি করবে : কাকা-জেঠাদের যেদিন ওরা বিবাহের নিমন্ত্রণ জানাতে যাবে, নিজে থেকেই তাঁরা জিগ্যেস করবেন, ওদের কেনা-কাটা কি কি বাকি আছে ; কেউ কিনে দেবেন ক্রিস্টালের গ্লাস কেউ চীনামাটির প্লেট, কেউ বা রুপোর ডিশ। বুড়ো-

সুড়ীরা টাকাই দেবেন, বলবেন ঃ "তোমরা বরং মনের মতো কিছু কিনে নিও।"

তারপর কার্ড পাঠানোর পালা; একই কার্ডের বাঁদিকে মেয়েটির, ডানদিকে ছেলেটির বাবা-মা [হ্যাঁ, মায়েদেরও উল্লেখ থাকবেই বটে...না, স্বর্গীয় কি অস্বর্গীয় ঠাকুরদা-জেঠাদের বালাই নেই।] জানাবেন শুভ সংবাদ। কার্ড পেয়ে বুঝবেন, আপনি গির্জায়-অনুষ্ঠিত বিবাহ-ক্রিয়াকর্মে যোগ দিয়ে নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করলে বরকন্যার পিতামাতারা সুখী হবেন—এই পর্যন্ত। বরকন্যার [এবং ওদের বাবা-মার—না ভাইবোনদের না] যাঁরা বিশেষ বন্ধু, তাঁদের কাছে পাঠানো খামে আরেকটা চিরকুট থাকবে, বিয়ের পরে প্যারিস হল-এ রিসেপশন, অর্থাৎ বরকন্যাকে ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা জানাবার সুযোগ-দান। সঙ্গে সঙ্গে কিছু জলপান। ঠিক জলের পান অবশ্য নয়, অন্য এক পানীয়ের পানপর্ব।

বিবাহ

তারপর বিয়ের দিন। না, লগ্ন-ফগ্নর ঝামেলা নেই; তবে দেখবেন, অনেকেই শনিবারের সকালটা পছন্দ করে—আর হ্যাঁ, ইস্টার-পূর্ববর্তী চল্লিশদিনব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত-কালে বিবাহ হলে সাড়ম্বরে হয় না।

সেই শুভ শনিবার [শুভ শনি কেমন শোনায়?] বরকন্যা প্রথমে যাবে টাউন হল-এ রেজিস্ট্রি করতে। মেয়র মহাশয় কালো-হলদে-লালে [জাতীয় এই তিনটি রঙ।] রঞ্জিত এক মোটা কোমরবন্ধ পরিহিত হয়ে [শুনতে হাস্যকর লাগে?...আরও লাগে দেখতে...তবে বাংলা দেশের বরের টোপরের মতো বোধহয় নয়] সরকারীভাবে-বিবাহিত দম্পতিকে অভিনন্দন জানাবেন, আদর্শ নাগরিক হতে আর আদর্শ নাগরিকের বাবা-মা হতে উৎসাহদান করবেন—লাল ফিতেকাজের ভয় না ক'রে। বুদ্ধিমান হলে [কিন্তু হায়, আমাদের এই সমাজতন্ত্রে, বুদ্ধিমান না হলেও জনগণের ভোটাধিক্যে মেয়র হওয়া যেতে পারে] তিনি আর বেশি কথা বলবেন না; তিনি জানেন, ক্যাথলিকদের মতে প্রকৃত বিবাহ এখনও বাকি—নিমন্ত্রিত সবাই গির্জার প্রাঙ্গণে ঠাসা ঠাসা হয়ে বরকন্যার অপেক্ষায় আছে। যাজক গির্জার ফটকে দাঁড়িয়ে বরকন্যাকে অভ্যর্থনা জানাবেন; অর্গান-বাদক যেন ফিউজ-এর তার কেটে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে পুরো দমে বাজাতে বাজাতে কাঁপাবে জানালার কাচ।

কেনা কিংবা নিজের-হাতে-সেলাই-করা সাদা গাউন পরিহিতা কন্যার বাম বাহুকে আপন ডান কনুইয়ে গ্রহণ ক'রে ভাড়া-ক'রে-নেওয়া কালো স্যুট পরা বর, যাজকের অনুসরণ ক'রে বেদীর অভিমুখে অগ্রসর হবে। বরকন্যার পিছনে জোড়া জোড়া ক'রে ছেলের মা আর মেয়ের বাপ, মেয়ের বাপ আর ছেলের মা, ছেলের ভাই আর মেয়ের বউদি, ছেলের জেঠা আর মেয়ের মাসী, মেয়ের কাকা আর ছেলের মামী... আর ওঁদের সবার অবিবাহিত বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা। একমাত্র ওঁরাই বিবাহের ভোজে নিমন্ত্রিত। নিজের খুড়তুতো ভাই মাসতুতো বোন হলে কি হবে! আপনি বিবাহিত—রিসেপশন পর্যন্ত আপনার অধিকার।

সবাই বসেছে যখন [দরকার হলে অর্গান-বাদককে যেন সুইচ অফ করার ভয় দেখিয়ে থামিয়ে], যাজক আরম্ভ করেন: "স্নেহাস্পদ অমুক ও তমুকা, তোমরা এক পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ জীবনে প্রবেশ করতে চলেছ। তোমাদের দাম্পত্য-জীবন পবিত্র প্রেম, সুদৃঢ় বিশ্বাস অবিচলিত নিষ্ঠায় সত্য হয়ে উঠুক ইত্যাদি..."

পরে তিনি—পর পর বর ও কন্যাকে—তিনটি প্রশ্ন করবেন: "তুমি কি স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে বিয়ে করতে এসেছ? তোমার এই ভাবী পত্নী/পতিকে বিশ্বস্ত চিত্তে ভালোবাসতে ও সম্মান করতে তুমি কি স্থির করেছ? ঈশ্বর তোমাকে যে সন্তান দান করবেন, খ্রীস্টীয় পিতা/মাতার কর্তব্য অনুসারে তাদের মানুষ ক'রে তুলতে তুমি কি প্রস্তুত আছ?" বরকন্যা সুপক্কবয়ঃপ্রাপ্ত হলে শেষ প্রশ্নটা—সহজবোধ্য কারণে বর্জনীয়।

প্রশ্নমালার উত্তরগুলি অস্তিবাচক হলে [সুন্দরবনের এক গির্জায় এক মেয়েকে 'না' বলতে শুনেছি......শ্বশুর মশায় নাকি জুতো পেটা করেছিলেন, পেটাননি] বরকন্যা পরস্পরের হাতে পেলব সোনার এক আংটি পরিয়ে বলে: "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে এই অঙ্গুরীয় তোমার বিশ্বস্ততার চিহ্নরূপে পরিধান কর।" এখানে অবশ্য ব্যাখ্যান্তরের অবকাশ আছে: কারও কারও মতে আংটিটা হল [শকুন্তলার আংটির মতো] অঙ্গুরীয়-গ্রাহক গ্রাহিকার নয়, অঙ্গুরীয়দাতাদাত্রীরই বিশ্বস্ততার প্রতীক।

বাংলা দেশের হিন্দু বিয়ে দেখেছি বহুবার। একটা সমস্যা কিন্তু রইল অমীমাংসিত; অনুষ্ঠানের পদে পদে জিগ্যেস করতে ইচ্ছা করে, "এবার ধরুন, ভূমিকম্প হয়েছে... কিংবা পুজারীর হার্টফেল...ওরা কি বিবাহিত?" অর্থাৎ জানতে চাই, ঠিক কোন্ পুণ্য মুহূর্তে, কোন্ মন্ত্রের উচ্চারণে হিন্দু বিবাহ সম্পাদিত হয়? প্রশ্নটা বোধ হয় নিরর্থক। খ্রীস্টীয় বিবাহে কিন্তু সুনির্দিষ্ট এক মন্ত্র আছে: "ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে পতি/পত্নীরূপে গ্রহণ করি। আজ থেকে সুখে-দুঃখে ধনে-দারিদ্র্যে-স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে আজীবন নিষ্ঠচিত্তে আমি তোমাকে রক্ষা করব।" এ ক'টি শব্দ দুজনে উচ্চারণ করলে, বাস......মেয়েটি ভালো রান্না জানে না, রাতে ছেলেটির নাক ডাকে?......উপায় নেই! খ্রীস্টমণ্ডলী ওসব বুঝবে না: তোমরা বিবাহিত, আজীবন বিবাহিত। যাজক তাই দুজনকে আশীর্বাদ করার পর সাড়ম্বরে ঘোষণা করেন: "সমবেত খ্রীস্ট ভক্ত-মণ্ডলী, এই পবিত্র বিবাহ-বন্ধনের সাক্ষী হইতে আপনাদের আহ্বান করিতেছি। ঈশ্বর যাহা একত্র মিলিত করিয়া দিয়াছেন, মানুষ যেন তাহা বিচ্ছিন্ন না করে।"

অনুষ্ঠানান্তে দেখবেন, গির্জা থেকে প্রসেশনটা বেরুবে যখন মেয়েটি এবার ছেলেটির বাম পার্শটিতে।

বিয়ের ভোজ?...হ্যাঁ, বিয়ের ভোজ হবে বটে। ভোজটা শেষ হওয়ার আগেই উঠে পড়বে দুজনে, যাবে হানি-মুন করতে। পয়সা থাকলে—বিদেশে। ফিরে এসে সেটল করবে ঐ ভাড়া বাড়িটিতে—প্রথম থেকেই আলাদা হয়ে। জমাতে শুরু করবে। কয়েক বছরের মধ্যে সমবায়িকা থেকে লোন নিয়ে বাড়িও কিনবে—নিজেদের বাড়ি।

অঞ্জনা আরতিকে বলল, "ওদের দেশের নিয়মটা না—চমৎকার!"

ক্যারিবিয়নে তিনটি দ্বীপ

আরতি দত্ত

ক্যারিবিয়ন সাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ হল জামাইকা। দূর থেকে দেখে মনে হয়, নীল সমুদ্রের বুকে যেন মস্ত একটা কচ্ছপ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। যে নীল পাহাড়ের সারি (Blue mountains) জামাইকা দ্বীপকে প্রায় দুভাগে ভাগ করে রেখেছে, সেখানেই নাকি জন্মায় পৃথিবীর সেরা কফি।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে ক্যারিবিয়ন সাগরের বুকে জামাইকা দ্বীপের রাজধানী কিংসটন—আমার গন্তব্যস্থল। লণ্ডন থেকে যাত্রা শুরু করে নিউ ইয়র্ক ও বাহামা দ্বীপে খানিক থামবার পর রাত বারোটার কাছাকাছি আমরা কিংসটনে পৌঁছলাম।

১৪৯২ সালে কলম্বাস যখন ভারত অন্বেষণে প্রশান্ত সাগরের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় তিনি একে একে দ্বীপগুলি আবিষ্কার করেন। ১৪৯৪ সালে কলম্বাস জামাইকা আবিষ্কার করেন, তখন এর নাম ছিল Xamayca। জলপথে ঘুরে ঘুরে খাবার ও জলের অভাবে যখন কলম্বাস ও তাঁর সঙ্গীরা পরিশ্রান্ত এমন সময় জামাইকার স্থলভূমি তাঁদের চোখে পড়ে। তাই জামাইকাকে বলা হয়, "the land of wood and water." পরবর্তী একশো বছর স্পেনীস রাজাদের অধীন থাকার পর জামাইকা বৃটিশ শাসনের অধীনে আসে এবং আরো ৩০০ বছর বৃটিশ শাসনে থাকার পর, ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। কলম্বাস জামাইকা আবিষ্কার করবার সময় এখানকার আদি অধিবাসী আরাওয়াক ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ ছিল। ক্রমে বিদেশীদের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্পেন, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, ফ্রান্স ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে সোনা ও ঐশ্বর্যের সন্ধানে বিভিন্ন বণিকের দল এদেশে এসেছে; তাছাড়া এসেছে দস্যুর দল এবং রাজ্য ও ক্ষমতা লিপ্সুর দল। এদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে আদি জাতি আরাওয়াকরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। পরে যখন শাসকরা বসবাস করতে শুরু করলেন তখন এই অবণ্যভূমিতে বসবাসের সুবিধার জন্য আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানি শুরু হল। তারও অনেক পরে, যখন সভ্যতা আরও বিস্তার লাভ করল তখন আখের চাষের জন্যে কুলি মজুরের প্রয়োজন হল। তখন ভারতবর্ষ থেকে আমদানি হল বহু দরিদ্র চাষী ও মজুর শ্রেণীর লোক। তাদের অধিকাংশেরই দেশ ছিল বিহার ও উত্তর প্রদেশে। দেশটি দুই বর্ণসংকরে ভরা। বহুকাল পাশাপাশি থেকে ইউরোপীয়, নিগ্রো ও ভারতীয়েরা মিশে গেছে অনেকখানি। বর্ণ বৈষম্যের কথা এদেশে কেউ ভাবে না। সেদিক দিয়ে এরা সুখী, প্রাণখুলে হাসে, ক্যালিপসো তৈরি করে গান করে; সামাজিক নিয়মকানুনের তেমন বাঁধন নেই এদের জীবনে।

জামাইকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। সমুদ্র সৈকতের ধারে ধারে প্রবালের পাহাড় (coral reef); মাইলের পর মাইল নারকেল গাছের ভিড়; সমুদ্র সৈকতে বালির রঙ গেরুয়া লাল সাদা কোথাও বা ফিকে নীল। শুনেছি এদেশে দু'হাজার রকমের ফুল আছে আর আছে নানা রঙের চিত্রবিচিত্রিত প্রজাপতি, নানারকমের পাখি, মধুর তাদের ডাক আর নানারকমের ব্যাঙ, যারা গাছে চড়ে, উড়ে বেড়ায়, সুরেলা কণ্ঠে গান গায়। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে তাঁর দান ঢেলে দিয়েছেন। আখ, লেবু, নারকেল আম, কলা আরও কতরকমের চেনা অচেনা ফল। তাছাড়া এদেশের কফি তো বিখ্যাত।

কিংসটনে 'কিংস হাউস' বহু পুরাতন প্রাসাদ, বড় বড় গাছ ঘেরা সুন্দর বাগান, দূরে দেখা যায় 'নীল পাহাড়'। প্রথমদিনে ছাপান্নটি মহিলা প্রতিষ্ঠানের সমবেত আলোচনা সভায় যোগ দেবার সুযোগ এল। সারাদিন ধরে সমাজসেবিকা বিভিন্ন জামাইকান ও ইউরোপীয় মহিলাদের বক্তব্য শুনে মনে হলো এদেশের মেয়েদের পুরুষজাতির উপর একটা বিশেষ আক্রোশ আছে। তাদের এরা না করে বিশ্বাস, না আছে তাদের উপর কোন নির্ভরতা। শুনে আমার আশ্চর্য লেগেছিল কিন্তু তখনও আমার এদেশের সামাজিক ইতিহাস ও স্বরূপ জানা ছিল না।

এদেশের সমাজকে একদিক দিয়ে 'নারী-প্রধান' সমাজ বলা যেতে পারে, কিন্তু সে সমাজে মেয়েদের যে পরিমাণ দায়িত্ব আছে, সে পরিমাণে সম্মান বা প্রাধান্য নেই। একথার মর্ম বুঝতে হলে এদের ইতিহাস জানা দরকার।

আফ্রিকা থেকে অতীতকালে যখন

সেন্ট ফারনানডো-মাইলাপুর

ত্রিনিদাদ মহিলা সমিতির সদস্যারা

রাজভবন—পোর্ট অব স্পেন

গ্রামে জ্যামাইকান বাড়ি
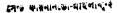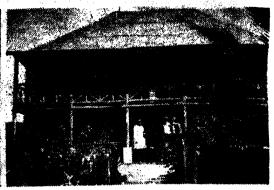
নিগ্রোদের আমদানি করা হতো, ক্রীতদাস করে রাখবার জন্যে। তখন তাদের গরু ভেড়ার মত দেখা হতো। নির্মমভাবে পরিবারকে ভেঙে বিভিন্ন মালিকের কাছে তারা বিক্রি হতো। বাবা, মা, সন্তান, ভাই, বোন কে কোথায় চলে যেতো কেউ জানতেও পারতো না। দরিদ্র নিগ্রো পরিবারদের ঘর বাঁধবার বৃথা আশা দিয়ে, মিথ্যা ছলনায় ভুলিয়ে বিদেশে আনা হতো আর তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে দাস ব্যবসা চলত। ক্রীতদাসদের যত সন্তান হতো, তত হতো মালিকের সম্পদ-বৃদ্ধি। ক্রীতদাসদের বিবাহ করবার অনুমতি ছিল না, কিন্তু তাদের বহু সন্তান হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজরা স্পেনীয়ার্ডদের হারিয়ে, ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে দিল। ক্রীতদাসরা স্বাধীনতা পেয়ে হারাবার ভয়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। যখন তারা আবার সভ্যসমাজে ফিরে এল তখন তাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা লোপ পেয়েছে, সামাজিক নিয়মেরও কোন বাঁধন নেই। তখন 'মা'কে অবলম্বন করেই জ্যামাইকান পরিবার গড়ে উঠল। সন্তানরা বাপের খবর জানত না, জানলেও তাদের কাছে বাপের অস্তিত্বের বিশেষ মূল্য ছিল না। মা অর্থোপার্জন করতেন ও দিদিমা সন্তান পালন করতেন, এই ছিল পারিবারিক জীবনধারা। এইসব মাতৃপ্রধান পরিবারের ছেলেদের কাছে 'Father image' বা পিতার আদর্শ বলে কিছু না থাকায় তারা দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নয়। তাই পরবর্তী জীবনে স্ত্রী ও সন্তানের কোন ভার নেবার প্রয়োজন তারা বোধ করে না। তাদের মনোভাব হল সংসারের সব দায়িত্ব মেয়েরাই বইবে। আজকের দিনে জ্যামাইকান পরিবারে এই হল সবচেয়ে বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান আবার সমাজে প্রবর্তন হয়েছে কিন্তু অনুষ্ঠান দিয়ে তো মানুষকে কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধা যায় না। তাই আজও বেশির ভাগ পরিবারে মেয়েদেরই সন্তানের সব ভার নিতে হচ্ছে। বিবাহ বহির্গত বহু অবৈধ সন্তানেরও জন্ম হচ্ছে, তাদের মানুষ করবার ভারও মায়েদের।

জ্যামাইকাতে এসে প্রথম দিনেই এদেশের মেয়েদের জীবনের নিত্য দ্বন্দ্ব ও একটি বিশেষ ট্র্যাজেডির রূপ, আমার কাছে ধরা দিয়েছিল। নারী সমাজের এই বেদনাবোধ থাকা সত্ত্বেও ওদের জীবন দর্শন এত সহজ, সরল ও বন্ধনহীন যে কোন সমস্যাই তেমন জটিল রূপ নেয় না। জ্যামাইকাতে থাকা-কালীন পথে, প্রান্তরে যুবক যুবতীর চাল-চলনে কোন অশোভনীয় দৃশ্য চোখে পড়ে নি, যা লণ্ডন ও নিউইয়র্কে হামেশাই দেখা যায়।

এদেশের জাতীয় আদর্শটি ভালো লাগলো "Out of many, one people". জ্যামাইকাতে ভারতীয়দের বংশধরদের পূর্ব ভারতীয় বলা হয়। পূর্ব ভারতীয় মেয়েরা দিনের বেলায় পাশ্চাত্য ধরনের পোশাক পরে মাথায় ওড়না দেন (বিশেষ করে বয়স্কা মহিলারা)। সন্ধ্যেবেলা অনেকেই পোশাকী হিসাবে শাড়ি পরেন। তাঁরা শাড়ি পরেন উঁচু করে, অনেকগুলি ব্রোচ লাগিয়ে, অনেকটা ঠাকুরমার আমলে যেমন কাপড় পরবার ধরন ছিল, তারই অনুসরণ করে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের আধুনিক হালচাল, পোশাকের ও সাজবার ধারা এখনও এদেশে পৌঁছয়নি। পূর্ব ভারতীয়রা অনেকে কেবল-মাত্র হিন্দী বা গুজরাটি বলেন, নিরামিষ খান। এদেশে অনেক মন্দির ও মসজিদ আছে, সেখানে পুজো ও প্রার্থনা নিয়মিত হয়। মন্দিরে পুজোর্থীর ভিড় অনেক। ব্যবসাও অনেকখানি পূর্ব ভারতীয়দের হাতে, বাজারে অধিকাংশ দোকানের মালিক তাঁরা। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ জনেরই পূর্ব পুরুষ বহু বছর আগে ভারতবর্ষ ছেড়ে এসেছিলেন। তাঁরা কোনদিন ভারত-বর্ষে যাননি কিন্তু সেই সুদূরের দেশকে তাঁরা গভীরভাবে ভালবাসেন। সেই কল্পনার বহু চিত্রভরা দেশে কোনদিন তাঁরা ফিরে যাবেন, তার স্বপ্ন দেখেন। দোকানে কোন জিনিস কিনলে, ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছি জানতে পারলে, আর দাম দেওয়া যেত না। এক কথা, 'আপনি আমাদের দেশের মেয়ে, আপনার কাছে দাম নিতে পারবে না। ভারত-বর্ষের মানুষকে দেখলে, পূর্ব ভারতীয়রা অতি আপনজন বলে মনে করেন। জ্যামাইকার East Indian Progressive Society ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে প্রবাসে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁদের বিরাট শ্রদ্ধা, তাঁর লেখা ও জীবনী পাঠ ও আলোচনা পূর্ব ভারতীয়রা বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকেন।

পূর্ব ভারতীয় হিন্দু মা ও মেয়ে ত্রিনিদাদ

এদেশে প্রকৃত দারিদ্র্য নেই, কিন্তু আছে জ্ঞানের অভাব। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যবহার নেই, মাটি ও পাতায় তৈরী কুটিরগুলি। এলুমিনিয়ম খনির কাছে যারা থাকে, তাদের অবস্থা ভালো। প্রকৃতির অকৃপণ দানে মোটের উপর কারো কষ্ট নেই, অনাহারে কাউকে থাকতে হয় না।

জ্যামাইকার পুরাতন রাজধানী পোর্ট রয়েল

টবেগোর সমুদ্র তীর

পোর্ট রয়েলে নেলসন দুর্গ —জ্যামাইকা

"the wickedest city in the world", পৃথিবীর সেরা পাপের শহর বলে পরিচিত ছিল। এখানে জলদস্যুরা সব অপকর্মই করত, এটি ছিল তাদের আমোদ প্রমোদে অবসর সময় কাটাবার জায়গা। ১৬৯২ সালে বিরাট ভূমিকম্পে পোর্ট রয়েল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। গিয়ে দেখলাম চার পাশে ভাঙাচোরা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও একটা শান্ত গ্রাম্য পরিবেশ। এখানকার পুরনো দুর্গে ১৭৭৯ সালে নেলসন্ কিছুদিন ছিলেন।

একদিন পথে একটি লোক দেখলাম, তার মাথায় খাড়া দাঁড়ানো বিনুনি, (শুনলাম গোবর দিয়ে শক্ত করা) কালো চাপ দাড়ি, লাল লাল চোখ, খুব নোংরা পোশাক ও মুখে এমন একটা রুক্ষ ভাব যা দেখলে ভয় হয়। শুনলাম এদের বলা হয় রাস্তাফেরিয়ন। এরা বিশ্বাস করে ইথিওপিয়ার সম্রাট হেইল সেলেসি সাক্ষাৎ ভগবান। বাইবেলে নাকি লেখা আছে কিন্তু কোথায় লেখা আছে তা কেউ জানে না। এরা আফ্রিকায় ফিরে যেতে চায়, কিন্তু কবে, কেমন করে তারা তা জানে না। এরা বর্ণ বিভেদে বিশ্বাসী, মনে করে আফ্রিকা নিগ্রোদের দেশ, সেখানেই তাদের বাস করা উচিত। এরা গাঁজা খায়, কদাচিৎ মারপিট করে গোলমাল করে কিন্তু মোটের উপর এরা শান্ত; নোংরা থাকা ও গঞ্জিকা সেবনই এই আন্দোলনের বিশেষ অংগ বলে মনে হলো।

জ্যামাইকা ছেড়ে এবারে এসে পৌঁছলাম ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অফ স্পেন।

ত্রিনিদাদ ও টবেগো

ত্রিনিদাদের নাম হলো "the land of the humming birds" বহু বিচিত্র পাখি দেখা যায় এই দ্বীপে, বিভিন্ন তাদের ডাক কিন্তু আমি ভুলিনি এদেশের ব্যাঙ-এর ডাক। এমন মধুর ব্যাঙের ডাক একমাত্র কারিবিয়ন সাগরের দ্বীপগুলিতেই শোনা যায়।

ত্রিনিদাদে জ্যামাইবার Blue Mountain-র মত কোন বড় পাহাড় নেই, তাছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্য সব এক ধরনের। এদেশে শতকরা ৩৬জন অধিবাসী ভারতীয়। তাই নির্মিত বেতারে হিন্দীতে সংবাদ ও সংগীত শোনা যায়। হিন্দু মহাসভা চল্লিশটি বিদ্যালয় ও দুটি কলেজ পরিচালিত করে, এগুলিতে বিশেষ করে হিন্দী শেখাবার ব্যবস্থা আছে। আঞ্জুমান সুন্নত কুড়িটি বিদ্যালয় ও একটি কলেজে পরিচালিত করে ও উর্দু শেখায়। মন্ত্রিসভায় কুড়িজন মন্ত্রীর মধ্যে দুজন ভারতীয়। এদেশে শিক্ষা অবৈতনিক কিন্তু শিক্ষকের বিশেষ অভাব তাই বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষক আমদানি করতে হয়। ত্রিনিদাদের ঐশ্বর্য হলো তেল। Pointe-a-Pierre এর Texaco Refinery কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়, সেখানে প্রতিদিন ৮,৫০০ কোটি গালন Crude oil উৎপাদন হয়।

ত্রিনিদাদের তার চেয়েও বড় ঐশ্বর্য হলো

জ্যামাইকাতে বেতের কাজ

সংগীত। ও দেশের ক্যালিপসো গান, দৈনন্দিন জীবনের সুখ, দুঃখ ব্যথা বেদনার উপর ভিত্তি করে, মুখে মুখে রচিত হয়। গানগুলি অনেকটা আমাদের দেশের কবিগানের মত। কিছুকাল আগে যখন ত্রিনিদাদের সবচেয়ে বড় রপ্তানি ছিল কলা, তখন সমুদ্র পার হয়ে বড় বড় নৌকোতে কলা নিয়ে দূরে দেশে যেতো ত্রিনিদাদের গরিব চাষীরা। সেই অজানা ভয়সংকুল পথ পার হয়ে আবার তারা কোনদিন দেশে ফিরে আসতে পারবে কি না জানতো না। এই সব গানে সেই বেদনার কথা আছে। ক্যালিপসোর মধ্যে সেরা হলো Banana Songs। হ্যারি বেলাফনটেন এই গানগুলিকে পৃথিবী প্রসিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলিতে ঠিক ক্যালিপসোর স্বরূপ ধরা পড়েনি।

ত্রিনিদাদে থাকাকালীন একদিন সন্ধ্যেবেলা ও-দেশের প্রসিদ্ধ Steel Band শুনতে গেলাম। ময়লা ফেলবার 'ডাস্টবিন' থেকে আরম্ভ করে নানা রকমের 'টিন' দিয়ে বাজনাগুলি তৈরি হয়েছে, আর তাই বাজিয়ে যে অপূর্ব মাদকতাপূর্ণ সংগীত সৃষ্টি করল তা নিজে না দেখলে ও শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। আধুনিক জ্যাজ থেকে আরম্ভ করে শোঁপ্যা ও স্ট্রস-এর ওয়াল্‌জ ও মোজার্ট-এর শ্রেষ্ঠ সংগীত বাজিয়ে শোনালো। শুনলাম কয়েক বছর আগে, পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা মারামারি, খুনোখুনি করত, নয়তো রকে বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাত। এরই মধ্যে ময়লা ফেলার টিন বাজাতে বাজাতে কোন অজ্ঞাত সংগীতরসিক স্টীল ব্যান্ড-এর পরিকল্পনা করেছিল। এখন পাড়ায় পাড়ায় স্টীল ব্যান্ড হয়েছে। এ দেশের মানুষের রক্তে সংগীতের নেশা, তাই ক্যালিপসো গান ও স্টীল ব্যান্ড অনেক নেশাকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। সান ফারনানদো-তে গান্ধীজীর সুন্দর একটি মর্মর মূর্তি আছে। সান ফারনানদোর পথে, এ দেশের প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক আলকাতরার (Pitch) হ্রদ দেখি। হ্রদটি ১০৫ একর বিস্তৃত। এই রকম আর একটি মাত্র হ্রদ

জ্যামাইকান মহিলা সমিতির সদস্যরা

ত্রিনিদাদে পূর্ব ভারতীয় মুসলমান মেয়েরা
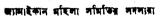
আছে ভেনজুয়েলাতে। অলসকাতরা ঠিক চোরা বালির মত, দেখে মনে হয় উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া যায়, অথচ পা পড়লে ডুবে যাওয়া নিশ্চিত। একটা বড় মালভর্তি লরি দু' দিন আগে লেকে পড়েছিল, ডুবতে ছ' ঘণ্টা সময় নিয়েছিল কিন্তু টেনে তোলবার কোন উপায় ছিল না। মানুষও নাকি ডুবে মরেছে এই লেকে কয়েকবার। আমরা যখন সেখানে পেঁছলাম, তখন সূর্যাস্তের সময়। অস্ত যাওয়া সূর্যের রাঙা আলো হ্রদের উপর পড়ে এক অপূর্ব ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। দূরে কোথায় একটা পাখি ডাকছিল, জনহীন নিস্তব্ধতা আরো গভীর হয়ে উঠছিল। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি।

টবেগো ত্রিনিদাদের নিকটতম প্রতিবেশী দ্বীপ, দূরত্ব মাত্র আশি মাইল ও রাজনৈতিক ভাবে যুক্ত। টবেগোর মত এমন সুন্দর দ্বীপ ক্যারিবিয়নে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। টবেগো দ্বীপ কেন্দ্র করেই নাকি রবিনসন ক্রুসোর গল্প লেখা হয়েছিল। রবিনসন ক্রুসোর গল্পে বর্ণিত দ্বীপের সঙ্গে টবেগোর যথেষ্ট মিল আছে। চারিপাশে পাহাড়, নারকেল বন আর জবা ফুলের জঙ্গলে ভরা দ্বীপটি নীল সমুদ্রের মাঝে ছবির মত। সমুদ্র তীর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে, জলের মধ্যে প্রবাল পাহাড় (Coral reef) দেখতে আমরা গেলাম। তখন জোয়ার আসতে বেশি দেরি নেই, তাই মোটর বোটের মাঝিরা আমাদের নিয়ে যেতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না কিন্তু আমার বান্ধবীরা এত দূর দেশে এসে প্রবালের পাহাড় না দেখে আমাকে ফিরে যেতে দিতে ততোধিক অনিচ্ছুক। তাই কোন আপত্তি না শুনে আমরা দশজন মোটর বোটে উঠলাম। সমুদ্রের জলে নীল ও সবুজ রঙের নানা সমাবেশ, উজান ঠেলে আমরা Nylon pool-এ গিয়ে পেঁছলাম। সেখানে জল বেশি নয়, নিচে নানা বিচিত্র আকারের প্রবাল পাথর দেখতে পেলাম; দেখলাম তারি মাঝে মাঝে লাল, নীল, হলদে মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধারে ধারে নানা রকমের ফুল, উদ্ভিদ শেওলা। ফুলগুলি নাকি এত স্পর্শকাতর যে কাছে গিয়ে আঙুল দেখালে পাপড়ি বুজে যায়। বান্ধবীরা সাঁতারের পোশাক নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছিলেন, তাঁরা তাই পরে জলে নামলেন জাল দেখতে। আমার জল সম্বন্ধে বরাবর আতঙ্ক, সাঁতার জানি না, তাই সব অনুরোধ কাটিয়ে মোটর বোটে বসে রইলাম; তখন তো জানতাম না পরে কি হবে। ক্রমেই জোয়ারের জল বাড়তে লাগল, নাইলন পুলের কোমর জল গলা জল হল নিমেষে। বিরাট ঢেউ এসে দূরে নারকেলের জঙ্গল, পাহাড় নিয়ে তীর-ভূমি বারে বারে ঢেকে দিতে লাগল। সংগীরা বেগতিক দেখে নৌকোতে উঠলেন, এবারে ফেরার পালা কিন্তু একী মোটর বোটের হৃদয় বিকল, মোটর চলছে না। মাঝি দুজনে বললে, দু' ঘণ্টার আগে মোটর বোটের কেউ সন্ধান নেবে না আর এই ঢেউ ঠেলে, সাঁতার কেটে তীরে পেঁছে খবর দেওয়া অসম্ভব। বিরাট ঢেউগুলি আমাদের নৌকোকে নিয়ে খেলা শুরু করে দিল। মনে হলো এই বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমার সংগীরা যাঁরা একটু আগে 'বিকিনি' পরে জলকেলি করছিলেন তাঁরা সবাই চোখ বুজে প্রার্থনা শুরু করলেন। আমি তো গোড়া থেকেই তা করছি। তাঁরা সবাই (মুলে) আফ্রিকান পরনে সাঁতারের পোশাক সমুদ্রের নোন জল গায়ে চিকচিক করছে আর সবাই চো বুজে প্রার্থনা করছেন। এখন বলতে বা নেই আমি ওরই মধ্যে একটু চোখ খু দৃশ্যটা দেখে নেবার লোভ সম্বরণ কর পারিনি। আজ লিখতে মজা লাগছে, তখ কিন্তু ভয়ে চোখ বুজে মনে মনে প্রার্থ করলাম, ওদের দেখে হাসার অপরাধ ক্ষ করে আপাতত ডাঙায় নামাও। এতজনে ব্যাকুল প্রার্থনা ব্যর্থ হল না, মোটর বে অবশেষে বিরাট দীর্ঘশ্বাস ও কয়েকব খুকখুক কেশে চলা শুরু করল। মাটি পা দিয়ে এমন খুশী বোধহয় জীব কখনও হইনি। টবেগোর সমুদ্রের জ নিচে প্রবাল পাহাড়কে কখনও ভুলব না

ত্রিনিদাদ ও টবেগোর মেয়েদের স ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ হয়েছি তাঁদের গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের কাজ ও নানা হস্তশিল্প খুবই প্রশংসার যোগ্য। তাঁ প্রাণখোলা হাসি, গল্প, নানা রকমের জা নাচ, গান, টবেগোর প্রবাল পাহাড়, ভয়, মুক্তি—কিছুই ভুলিনি।

ক্যারিবিয়নে স্বপ্নের মত দিনগুলি হয়ে গেল। আবার উড়ে যাওয়া, অ আকাশ, আবার নীল সাগরের উপর ভেসে যাওয়া। এবারে চলেছি দ আমেরিকায়, লঙ্কা গায়ানা ও ব্রেজিল।

পরশ্যুরাম

॥ ১ ॥

'দেশে' গত ১৪ই কার্তিক 'সাহিত্য সংবাদ'-এ রাজশেখর বসু প্রমুখ লোকান্তরিত লেখকদের সম্বন্ধে সনাতন পাঠক যা লিখেছেন তা অনেকেরই প্রাণের কথা। তবে তিনি যে লিখেছেন, প্রতি বছর শরৎকালে রাজশেখর বসুর দুটি বা তিনটি গল্প বেরুতো, তা ঠিক নয়। পর পর বেশ কয় বছর আমি নিজে কমপক্ষে ছটি করে পরশুরামের গল্প ঐ সময় বেরুতে দেখেছি। যে যে পুজো সংখ্যায় গল্প বেরুতো তাদের নাম : (১) আনন্দবাজার পত্রিকা, (২) দেশ, (৩) যুগান্তর, (৪) গল্পভারতী, (৫) তরুণের স্বপ্ন ও (৬) সচিত্র ভারত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজশেখর বসুর স্বহস্তলিখিত কাটাকুটি-হীন, সুন্দর নির্ভুল পাণ্ডুলিপি সত্যি দর্শনীয় ছিল। মনে আছে, একবারের শারদীয়া তরুণের স্বপ্নে তাঁর গল্পের পুরো পাণ্ডুলিপিটাই ব্লক করে ছাপিয়ে দেওয়া হয়।

অমলকুমার রায়
কলিকাতা-৩২।

॥ ২ ॥

'দেশ'-এর ১৪ই নভেম্বরের সংখ্যায় পরশুরামের পৌত্র (দৌহিত্র কিনা জানা নেই) শ্রীদীপংকর বসুর পত্র পড়ে বিস্মিত হলাম। শরদিন্দু প্রয়াণের পর খ্যাতিমান সাহিত্যিক শংকর তাঁর প্রতি এ পত্রিকার মাধ্যমে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন তাতে নাকি শ্রীবসু বেদনাবোধ করেছেন, কারণ তাঁর অভিযোগ পরশুরামকে সেখানে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি, পরন্তু তাঁর অবমাননা করা হয়েছে।

শংকরের উক্ত রচনাটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অপূর্ব আলেখ্য। পড়তে পড়তে যেমনি কণ্ঠরুদ্ধ ও অশ্রুসজল হয়ে উঠতে হয় তেমনি অনাবিল হাস্যরসের আনন্দ বন্যাও বয়ে যায়। বিশেষ করে পরশুরাম সম্পর্কিত সমাচারটি পাঠ করে আমরা উচ্ছ্বসিত হাসি সংবরণ করতে পারিনি। পরশুরাম কোষ্ঠী গণনায় বিশ্বাস করতেন কি করতেন না, অপরের বিশ্বাসে তিনি আঘাত করতে চাইতেন কি চাইতেন না সে প্রশ্ন সেখানে একেবারেই অবান্তর। হিউমারই সেখানে প্রধান, আর সব কিছু গৌণ। শংকর লিখেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কোষ্ঠীর ছক চাইলেন তখন রাজশেখরবাবু প্রথমটায় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিলেন এবং অত্যন্ত [illegible]

হবে না। কিন্তু পরে যখন হিউমারটি তিনি ছাড়লেন তখন অগ্রজপ্রতিমের প্রতি শরদিন্দুর কোনো বিরূপ ভাব থাকার তো কথাই নয়, আর আমাদের কাছেও বক্তব্যটি আরো সরস হয়ে উঠেছে; প্রথম অনুরোধেই যদি পরশুরাম ওটি ছাড়তেন তবে নিশ্চয় রহস্যের এতটা ঔজ্জ্বল্য থাকত না। হিউমারের খাতিরে তিনি কথাটা গুরু-গম্ভীরভাবে নিশ্চয় বলেছিলেন, সেই ব্যাপারটিকে উপরোক্ত ভাষায় (হিউমারের খাতিরে হয়তো শরদিন্দুবাবু বাড়িয়ে বলেছেন) প্রকাশ করার ফলে পরশুরামের চরিত্রের উপর কোনোমতে কালি লেপন করা হয়নি।

সুশীল দাশগুপ্ত ও
সীমা দাশগুপ্ত
সোদপুর

পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী

॥ ১ ॥

২১শে নবেম্বর তারিখে "দেশ" পত্রিকায় শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের "পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী, হা হা" পড়লাম। পড়ে শুধু এই কথাটুকু ভাবছি যে সাহিত্যের নামে কি প্রহসন। মানুষ যে তার লেখনী এত নীচে নামাতে পারে তার ধারণা ছিল না। লেখক সময়-বিশেষে যে কথাগুলি গল্পটিতে প্রয়োগ করেছেন যেমন "পোঁদে লাথিমার" তা ছোট ছোট ছেলেদের মুখে অনেক সময় শুনতে পাওয়া যায় এবং শুনলে আমরা লজ্জায় মরে যাই, আর উনি অবলীলাক্রমে স্পষ্টভাবে লিখে গেছেন। তারপর "মেয়র" সম্বন্ধে যা ওনার উক্তি তাতে কোন ভদ্র সমাজের লেখক বলে ওনাকে মনে হয় না। লেখকের ভাষা অতি নিম্ন স্তরের। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে যে এ ধরনের লেখা স্থান পায় "দেশ"-এর মত উচ্চমানের একটি পত্রিকায়। এটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে "দেশ" পত্রিকা এরকম লেখকের দ্বারা গভর্মেণ্টের প্রচারকার্যের সাহায্য করছেন কিনা! আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে যা বুঝি সরকার সব কিছু নিয়ে বিশেষ করে বেকার সমস্যায় একরকম জড়িয়ে পড়েছেন। কি করে যে সামাল দেবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। সে কথাটির উল্লেখ একবারও করা হয় নাই কেন? উপরন্তু বিরূপ এবং নোংরা সমালোচনা দিয়ে সব কিছু ঢেকে দেবার চেষ্টা হয়েছে। যারা আজ লেখাপড়া শিখছে তাদের ভবিষ্যৎ কোথায় বলতে পারেন? তাদের কি আশা করেন শ্রীঘোষের মত সমালোচক হোক? যাই হোক এরূপ সমালোচনায় দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নতি অসম্ভব। এবং এই রকম লেখা ছাপা হতে থাকলে "দেশ" পত্রিকার পরমায়ু বোধ হয় খুব বেশী দিন।

নয়। আমার এই চিঠিটি "দেশ" পত্রিকায় আশা করি ছাপা হবে।

শ্রীমতী রেবা ঘোষ
বেলঘরিয়া

॥ ২ ॥

২১শে নভেম্বরের দেশ-এ একালের এক দুর্ধর্ষ লেখকের সেই দুঃসাহসিক রচনাটি পড়লুম। আমরা 'সাগিনা মাহাতো', 'লোকটা' 'আমরা যেখানে' খ্যাত শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী হা হা'-র কথা বলছি। লেখাটি যেন শঙ্কর মাছের চাবুক। সেই চাবুক পড়েছে আমাদের মতো ভীরু, কাপুরুষ, আত্মবিক্রীত বাঙালীর নগ্ন পৃষ্ঠে। ক্ষতবিক্ষত করেছে আমাদের সর্বাঙ্গকে। তথাকথিত ভালোমানুষিতার আড়ালে আমরা যারা দায়িত্ব এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছি, পদে পদে মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত ক'রে চলেছি, তুচ্ছ 'বেঁচে থাকা'র কাছে দাসখত লিখে দিয়ে বিবেককে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত-নির্বীর্য জীবন যাপন করছি গৌর-কিশোরবাবু সেই আমাদের সমস্ত পোশাক, মায় জাঙিয়া পর্যন্ত খুলে দিয়ে প্রকাশ্যে উলঙ্গ ক'রে দিয়েছেন। বেশ করেছেন। সুন্দর করেছেন। হা হা! অত্যন্ত সময়োচিত এই লেখাটির জন্য গৌর-কিশোরবাবুকে অজস্র ধন্যবাদ। তাঁর দুঃসাহসিক সত্য কথনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। সর্বত্রই গোপন ভয়ের এই ক্লীব জীবনযাত্রার আসরে তিনি এখন বিবেকের মতোই নির্ভয়, নিঃশঙ্ক।

গৌরকিশোরবাবু সমসাময়িক জীবনের এক কুশলী কথাকার। অবশ্য সময়ের দাবী এত তীব্র যে তাকে উপেক্ষা ক'রে চলা এখনকার সাহিত্যিকদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সেইজন্য একালের খ্যাত-অখ্যাত সমস্ত লেখকের রচনায় সমকাল তার গভীর ছাপ রেখে যায়। কিন্তু গৌরকিশোরবাবুর সময়চেতনার স্বাদ আলাদা। আলোচ্য গল্পে তাঁর তীব্র সমাজসচেতনতা ও প্রখর মানবিকবোধ বিস্ময়ের বস্তু। গল্পটি [illegible] জীবন-যাত্রার সার্থক ফটোগ্রাফ। বাস্তবের ফটোগ্রাফিক-ই সাহিত্য কিনা, কলা-কৈবল্যবাদী সেই অধ্যাপক তা নিয়ে তর্ক তুলুন গে, চোখে যার অক্ষম পিচুটি। তাতে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই। সম্ভবত লেখকেরও নেই। তাঁর দৃষ্টি এখানে বিশ্বস্ত সাংবাদিকের দৃষ্টি। চোখ তুলে যেমনটি দেখেছেন, হুবহু তেমনটি লিখেছেন। গল্পকে রসালো করার জন্য কল্পনার ভেজাল মিশিয়েছেন, এমন দুর্নীতির দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করতে তাঁর এক নম্বর শত্রুও পারবেন না। জীবন যে রকম, সাহিত্য যদি সেই রকম হয়, ভালো কথায় সাহিত্যকে যদি জীবননিষ্ঠ হ'তে হয়, তবে তা' এখন কী রকম হওয়া উচিত, গৌরকিশোরবাবু আলোচ্য গল্পে তারই একটা সুন্দর আদর্শ রেখে দিলেন। এই আদর্শ অনুসরণযোগ্য।

তাঁর লেখায় একটি উগ্র ঝাঁঝ আছে। এই ঝাঁঝ সত্যের। অকপটতার। তাঁর রচনার মধ্যে প্রচণ্ড একটা জ্বালা আছে। এই জ্বালা তার নিজের হৃদয়ের। পেছনে ক্রমাগত লাথি খেয়েও দুহু প্রাণ ধারণের নির্লজ্জ লালসায় যারা আজ [illegible], সমস্ত অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পিত, সেই অধঃপতিত স্বজাতির চারিত্রহীনতা তাঁর হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে তীব্র [illegible]। আলোচ্য রচনাটি সেই অন্তরনিরুদ্ধ জ্বালারই সশব্দ বহিঃপ্রকাশ। একটি ভীষণ আগ্নেয়গিরির যেন সরোষ অগ্ন্যুদ্গার ক'রে চলেছে। [illegible] লাভাস্রোত সব কিছু আবরণ বিদীর্ণ ক'রে তীব্রগতিতে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। দেশে দেশে ঘটেছে বিস্ফোরণ। তাঁর কথা প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কথা। চারিদিকে নিরন্তর হত্যাকাণ্ড ও বিস্ফোরণের মধ্যে উত্তেজিত অসহনীয় এই পুলিসতন্ত্রে কী অবলীলাক্রমে আমরা বেঁচে আছি ও থাকার চেষ্টা করছি, কতো দ্রুত আমরা আরও আরও [illegible]। যাঁরা বর্তমান রচনাটি তারই এক জ্বলন্ত স্থিরচিত্র।

১৯৭০ সালের পশ্চিম বাঙলা ও বাঙালী জীবনচর্যা কেমন ছিল, রচনাটি তার প্রামাণ্য এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে। অষ্টম-নবম শতাব্দীর বঙ্গ দেশের কথা জানতে হলে ফাহিয়েনের বিবরণ যেমন অবশ্য পাঠ্য, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গকে জানতে হলে [illegible] [illegible]

দিনের অনুসন্ধিৎসু দেশবাসীকে এই রচনাটির উপর নির্ভর করতে হবে। এই রচনা ঐতিহাসিক রচনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার অমানুষিক ক্রীতদাস প্রথায় জ্বলন্ত আলেখ্য এঁকেছিলেন মিস হ্যারিয়েট বীচার স্টো। নীলকর সাহেবদের নৃশংস পাশবিক অত্যাচারকে ভাষা দিয়েছিলেন দীনবন্ধু। বিকৃত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দূষিত সংস্পর্শে যুবসমাজের অধঃপতনের ছবি এঁকেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন, শিবনাথ শাস্ত্রী। আর গৌরকিশোরবাবু এঁকেছেন বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের পশ্চিমবঙ্গকে। 'আঙ্কল টমস কেবিন' বা 'নীল দর্পণ' বা 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা' যেমন সাধু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও চক্ষু উন্মীলনকারী রচনা, বর্তমান রচনাটিও ঠিক তাই—তেমনিই মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তেমনই দৃষ্টি উন্মোচনকারী। উপর্যুক্ত রচনাগুলি যেমন যুগান্তকারী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সেই একই মর্যাদা আলোচ্য রচনাটিরও প্রাপ্য।

কতকগুলি দৃশ্যে বিভক্ত গল্পধর্মী এই সমাজচিত্রের আদ্যন্ত ঝলসে উঠেছে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। নায়কবৃন্দের হা হা হাস্যধ্বনির মধ্যেই তা ঝলসিত। এই ধরনের হাসিতে রক্ত ঝরে। তীব্র ব্যঙ্গাত্মক এই রচনায় যে বস্তুটি অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তা' হলো অধঃপতিত, নষ্টচরিত্র স্বজাতির প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধ। 'মেবারপতন' নাটকে স্বদেশপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সেকাতর্য আবেদন জানিয়েছিলেন, 'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ।' গৌরকিশোরবাবুর আবেদন অনেক সূক্ষ্ম। কিন্তু বক্তব্য প্রায় একই। 'আবার তোমরা পুরুষ হও। হিজড়ে হ'য়ে যেও না।'

আলোচ্য রচনায় জর্মন অধ্যাপক হেলমুটের ছেলের জবানীতে লেখক আমাদের একই কথা শুনিয়েছেন। আমরা ক্রমশ ইউনাক হয়ে যাচ্ছি। অথবা হ'য়ে গেছি বলেই প্রতিবাদের ভাষা নেই, প্রতিরোধের শক্তি নেই এবং প্রাণ ভয়ে, পুলিশ-ভয়ের দরুণ গোঁফখেজুরে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছি।

কবে আমাদের চোখ ফুটবে? বোধ হয় সেই দিন যেদিন অধ্যাপক হেলমুটের ছেলের মতো আমাদের আগামীদিনের বীর্যবান বংশধরেরা আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কৈফিয়ৎ চাইবে, বলো তোমার সামনে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছোকরা স্কুলের একটা মাস্টারকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল! চোখের সামনে রাস্তায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে জানেলার ঝাঁপ বন্ধ ক'রে ঘরে বসে রইলে? পরিবারের সকলে মিলে তৈরি থাকতে যাতে ধরা পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি তুমি বাড়ি পালিয়ে এসেছিলে? তোমার সময়েই একজন হেডমাস্টারকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল? এগারোজন তাজা তরুণকে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে গুলি করে মেরে বারাসতের রাস্তায় রাস্তায় ছড়ান হয়েছিল? তুমি কোনো প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারনি?

আমি, আমরা আমতা আমতা ক'রে বলব, 'কী করব? একা কী করতে পারি? কোনো উপায় ছিল না।'

আর তখনই ক্রোধে-ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে আগামীদিনের ছেলে চীৎকার করে তার পূজনীয় পিতৃদেবকে বলবে, 'শা—' (যেহেতু স্কুল-কলেজ ততদিনে সমস্তই ভস্মীভূত হওয়ায় তার ভাষা খুবই গ্রাম্য হবে) মরতে পারনি? তুমি বেঁচে থেকে দুনিয়ার কী উবগারটা ক'রেছ?' তারপর 'হ্যাক থু' ক'রে মুখে থুতু দিয়ে বলে যাবে, 'তোমার নামে আমি একটা মাদী কুকুর পুষব।'

যাতে সেই চরম পরিস্থিতিটা ফেস করতে না হয় রচনাটি সেইজন্যেই লেখা। গল্পটির দৃশ্যে দৃশ্যে বেজে চলেছে সেই বিপদেরই সাবধানকারী অব্যর্থ সাইরেন।

আবদুস সামাদ
আনকর—বর্ধমান

সত্যান্বেষী প্রসঙ্গে

গত ২৮শে নবেম্বর ১৯৭০ তারিখে প্রকাশিত 'আলোচনা'য় শ্রীশোভন বসু লিখিত 'সত্যান্বেষী' নামক চিঠিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যোমকেশ' বিষয়ক আলোচনায় আমার নাম উল্লেখ করে তিনি যা বলেছেন, তার সমর্থনে আমি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমাকে লেখা একখানা চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

মালাড
১।৬।৫২

পরিমল

নরেন্দ্রর [নরেন্দ্র ঘোষ] মুখে তোমার কথা শুনলাম।...গতবারে যখন কলকাতা গিয়েছিলুম তোমার ছেলেমেয়েরা ব্যোমকেশের গল্প লেখার জন্য আমাকে ধরেছিল। তাদের অনুরোধ আমার মনে বিঁধে ছিল। তারা শুনে হয়তো খুশী হবে সম্প্রতি দুটি ব্যোমকেশের গল্প লিখেছি। তার মধ্যে একটি বেশ বড়—১০ ফর্মার উপন্যাস। গল্প দুটিকে এখনও পরিস্থ করিনি।...

এ সম্পর্কে অবশ্য অন্যান্য চিঠিতে আরো সংবাদ আছে।

পরিমল গোস্বামী
কলকাতা-৬০

The Penguin Book of SOCIALIST VERSE. Ed. by Alan Bold. 12s. 1970.

সোস্যালিস্ট ভার্স কী 'সমাজতান্ত্রিক' কবিতা? না কি সমাজতান্ত্রিক অনুষঙ্গের কবিতা? এই বইয়ের সংকলক কবি অ্যালান বোল্ড্-এর প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পড়ে মনে হয় দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই তাঁর উদ্দেশ্যের কাছাকাছি যায়, কারণ, ইংরিজী সোস্যালিস্ট শব্দটির বিভিন্ন অর্থ থেকে যে-কোনো একটিকে বেছে নিলেও তার গা থেকে রাজনীতির গন্ধ মুছে যায় না। সে-রকম উদ্দেশ্য থাকলে, মনে হয়, সোস্যালিস্ট-এর পরিবর্তে পলিটিক্যাল শব্দটিই বোল্ড্ পছন্দ করতেন বেশি এবং ব্যবহারও করতেন। আর একটি বিষয়ও আমাদের ধারণার স্বপক্ষে দাঁড় করানো যায়। মূল্যবান এই সংকলনটিতে একদিকে যেমন আছেন মাও সে-তুং, হো চি-মিন্, চে গুয়েভারা বা বের্টল্ট্ ব্রেখ্ট্, পল এলুয়ার, মায়াকভস্কি, লুই আরাগঁ, নাজিম হিকমেত, পাবলো নেরুদার মতো অখণ্ড রাজনীতিবিদ বা রাজনীতিমনস্ক কবি, তেমনি অনেকেই আছেন—এবং এঁদের সংখ্যাই বেশি—প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যাঁরা কখনো অংশ নিয়েছেন বলে জানি না। এঁরা হাইনরিখ হাইনে, অডেন, রেনে শার, ডিলান টমাস, ছাস্কো পোপা, শেলী স্যাক্স্ প্রভৃতি। বিভিন্ন দেশের কবি—এখানে ইংরিজী অনুবাদে পেলেও এঁদের মধ্যে ভাষা ও সময়গত ব্যবধান দুস্তর। কিন্তু, একটি সহজ আত্মীয়তার সম্পর্কে এঁরা সকলেই একই উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পেরেছেন ঃ সময়, ইতিহাস, প্রসঙ্গ ও মানুষের প্রতি এঁরা সকলেই অঙ্গীকারবদ্ধ, যে-কোনো সামাজিক বৈষম্য, অসাম্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদে অন্বার্থ, স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী; এবং এ-সব সত্ত্বেও কবি।

যে-কোনো সংকলনেই একটি সময়-সূচনার দরকার হয়। সোস্যালিস্ট ভার্স-এর প্রথম কবি হাইনরিখ হাইনে, যিনি মার্ক্স-এর সমকালীন ও বন্ধু। সমাজ-তন্ত্রের পথে মানুষের নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন মার্ক্স। মার্ক্সের সমকালে এবং তার পরেও বহু লেখক, কবি, শিল্পী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, এখনো হচ্ছেন। এজ্‌রা পাউন্ড, গট্‌ফ্রীড বেন প্রভৃতি প্রতিবাদী দৃষ্টান্ত মনে রেখেও উক্ত তথ্য এড়ানো যায় না। বৈষম্য, ক্ষমতার দাপট বা স্বৈরাচার, সমাজতান্ত্রিক সংজ্ঞা ছাড়াও, মানবতা বিষয়টির মধ্যে আসে না—পরোক্ষভাবে এটা অস্তিত্ব ও সভ্যতার প্রতিই আঘাত। শিল্পীরা যে-হেতু দ্রষ্টাও, সাধারণের চেয়ে অনেক তাড়া-তাড়ি ও সূক্ষ্মভাবে তাঁরা পারেন এগুলির তাৎপর্য ও অভিঘাত হৃদয়ঙ্গম করতে। তাঁদের কাতরতা এবং আরো বেশি যে-হেতু জীবন, অহমিকাবোধ, সম্মান ইত্যাদি ছাড়াও এ-সবের ফলে নষ্ট হ'য়ে যায় তাঁদের অমূল্য দান—শিল্পী ও সাহিত্যকর্ম, হিতবোধ, আদর্শ ও স্বপ্ন।

এইসব অভিঘাত অস্বীকার ক'রে, উদাসীন ও নিঃসম্পর্কিত হ'য়ে, কেউ কেউ অবশ্য স্বরচিত নিসর্গে আত্মগোপন করতে পারেন; কিন্তু, প্রশ্ন থেকে যায়, সেভাবে কি শিল্প ও জীবনে সমীকরণ ঘটানো সম্ভব! শিল্প কি শুধুই ব্যক্তিগত? বা, ব্যক্তির অনুভব ও প্রতিবেশ কি ইতিহাস ও সমকালীন অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আরো রক্তরূপময় হ'য়ে ওঠে না! কথাটা পরিষ্কার ক'রে বলা ভালো ঃ রাজনীতি, সমাজ ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতার সংশ্লেষ শিল্পকে তাৎক্ষণিকতায় রূপান্তরিত তো করেই না, বরং দেয় অতিরিক্ত এক তাৎপর্য—রসস্বাদনের প্রসঙ্গে যে-তাৎপর্য ব্যক্তিগত ও সর্বজনীনের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয়; সমকালীনতা যেখানে পায় চিরকালীনতার মর্যাদা। কিন্তু, অভিজ্ঞতা, সংশ্লেষ ইত্যাদি সবই অকেজো হ'য়ে পড়ে যদি না তাদের প্রয়োগে রচিত বস্তুটি শেষ পর্যন্ত প্রকৃত শিল্প হ'য়ে ওঠে কবিতা, সাহিত্য। নিছক স্লোগান, বিবৃতি বা প্রচারধর্মিতার সঙ্গে শিল্পকর্মের প্রভেদটি এখানে বুঝে ফেলা দরকার। ভিয়েতনামে মার্কিন অত্যাচারের প্রতিবাদে কেউ যদি দু' চার লাইন রাগী পদ্য লিখে দাবি করেন এটাই কবিতা, তাহলেই মাটি। মনে রাখতে হবে, শিল্পী ও সংবাদিকের সংজ্ঞা ভিন্ন এবং শুধুমাত্র 'রেফারেন্স' দিলেই শিল্প-গরিমা লাভ করা যায় না। বস্তুত শিল্পের সঙ্গে রাজনীতি, ইতিহাস তথা সমাজ-বাদের কোনো বিরোধ নেই, বিপত্তি এদের সার্থক সমীকরণ ঘটানোয়। ব্রেখ্ট্ তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ব্যাখ্যা করতে 'গায় ইন্ প্রেজ অফ কম্যুনিজম' কবিতায় সম্ভবত এটাকেই বলেছিলেন, 'দি সিম্পল থিং/সো ডিফিকাল্ট টু অ্যাচিভ'। এমন কি এলিয়টও—যিনি কোনোদিনই ব্রেখ্টের মতো রাজনীতিমনস্ক ছিলেন না—কবিতায় রাজনৈতিক বিষয় পরিহার্য বলে মনে করেন নি। কিপলিংয়ের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য এখানে স্মর্তব্য ঃ 'রাজনীতির সম্পর্ক কবিতার অব্যবহিত আকর্ষণের কারণ হতে পারে; কিন্তু এই সম্পর্ক ব্যতিরেকেই কবিতা পড়া হবে, পড়া হয়, আজ না হোক, কাল।' রাজনৈতিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ভালো, কিন্তু তা যদি যথেষ্ট হৃদ্য, মানবিক ও কবিত্বে উদ্ভাসিত না হ'য়ে ওঠে, সে-কবিতা ভুলে যাওয়া আরো ভালো।

প্রায় বিশেষজ্ঞের মতো অ্যালান বোল্ড্ কবিতা নির্বাচন সম্পর্কে উপরোক্ত শর্ত ও গুণাবলির অনুসন্ধান করেছেন এবং সফলও যে হয়েছেন এই সংকলনের কবিতাগুলিই তার প্রমাণ। দেশ বিদেশের একধর্মী কবিতা সংগ্রহ করা এমনিতেই কঠিন কাজ, বিশেষত অনুবাদে। বোল্ড্-এর কৃতিত্ব আরো বেশি এইজন্যে যে শুধু সংগ্রহই নয়, সক্ষম অনুবাদের প্রতিও তাঁর লক্ষ্য ছিল সতর্ক। মূল না পড়েও তার ফলে ভিন্ন ভাষার কবিতার তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধে হয় না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেত অনেক; স্থান সংক্ষেপের জন্য এখানে শুধু অস্ট্রিয়ার কবি এরিখ ফ্রিয়েড্-এর 'টয় অন টারগেট' কবিতাটি তুলে দেওয়া হল ঃ

TOY ON TARGET

Dropping
toys
instead of bombs
for the Festival of the children
that,
the market researchers said,
will doubtlessly make
an impression.
It has made
a great
impression
on the whole world

2

If the aeroplane
had dropped the toy
a fortnight ago
and only now the bombs
my two children
thanks to your kindness
would have had something
to play with
for those two weeks

এই কবিতাটির একটি উপলক্ষ আছে' ভিয়েতনামের শিশুদিবসের উৎসবে মার্কিন বোমারু বিমান থেকে নানা জায়গায় খেলনা নিক্ষেপ করা হয়, এমনকি সেইসব গ্রামেও যেখানে এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে বোমা নিক্ষেপের ফলে মৃত্যু হয়েছিল অসংখ্য শিশুর। কিন্তু, উপলক্ষ ছাড়াই এটিকে তীব্র কবিতা ব'লে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এটিই একমাত্র নয় এমনি আরো অনেক কবিতা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত, নির্বিশেষে যা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। বিষয়বহির্ভূত বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত, অমূর্ত ইত্যাদি কবিতার দুরূহতার মধ্যে না গিয়েও এই কবিতাগুলি ব্যাপক মানুষের হৃদয়গ্রাহ্য হ'য়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে।

দিব্যেন্দু পালিত

সংকটকাল ও সাহিত্য

দেশ বা সমাজের কোনো বড় রকমের সংকটের সময় অনেকে সাহিত্যের মধ্যে তার প্রতিফলন আশা করেন। অনেক পাঠক চান তাঁর প্রিয় লেখকরা এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখাবেন। সাহিত্য কখনো কোনো পথ দেখাতে পারে কিনা আমি জানি না। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে সেরকম কোনো নিদর্শন আমার চোখে পড়েনি। সাধারণভাবে মনে হয় পথ দেখানোর কাজ নয় সাহিত্যের, সাহিত্য মানুষকে মানুষের প্রতি সমব্যথী হতে শেখায়।

যদি ধরাও যায়, সাহিত্যিকরা পথ দেখাবে, তাহলেও অবশ্য কোনো কাজ হবে না। কেউ সে কথা শুনবে না, অন্তত রাজনীতিবিদ বা সমাজরক্ষক—যাঁরা এখন সাধারণ মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁরা গ্রাহ্যই করবেন না। প্লেটো তাঁর রিপাবলিকে কবিদের স্থান দিতে চাননি, এখনকার দলনেতারাও তাঁদের চিন্তা-জগত থেকে লেখক-কবি-শিল্পীদের বাদ দিয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য তাঁদের যজ্ঞে কিছু লেখককে ঢাক ঢোল করতাল বাজাবার আহ্বান জানান।

পথ দেখাবার চেষ্টা না থাকলেও সমকালের ছবি সাহিত্যে ফুটে ওঠেই। সাধারণ মানুষের বাসনা, উদ্বেগ, দুঃখ ও আনন্দ সাহিত্যে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। আমাদের বাংলাদেশে এখন যে নিদারুণ দুর্যোগ ও সংকটকাল চলছে, তার ছবি আমাদের সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তেমনভাবে ফুটে উঠেছে বলে মনে হয় না। এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। আমার মতে অন্যতম কারণ এই যে, এখনকার এই গোলযোগের আসল কারণটাই কেউ বুঝতে পারছেন না। এই সমাজ পরিবর্তনের প্রকৃত কোনো কাজ এখনো শুরু হয়নি, যা চলছে তাকে যদি বলা যায় পরমত অসহিষ্ণুতার লড়াই, তবে সাহিত্য তার থেকে আপাতত দূরেই থাকবে। কেননা, কোনো প্রকৃত লেখকই পরমত সম্পর্কে অসহিষ্ণু হতে পারেন না। সাহিত্যের মূল নির্ভরই হচ্ছে, মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, দুজন আলাদা মানুষের আলাদা রকমের চিন্তা করার অধিকার। পাঁচজন মানুষ বা পাঁচটা দলের আলাদা আলাদা চিন্তাধারা থাকতে পারে, এর মধ্যে একটি লোক বা একটি দল যদি প্রাধান্য পেতে চায়, তবে তার উচিত নিজের আদর্শ সুষ্ঠুভাবে প্রচার করা এবং সেইমত কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন—তাহলেই তো দেশের বেশীর ভাগ মানুষ তার সমর্থক হবে। এর বদলে যদি হানাহানি করে কে ঠিক কে ভুল তাই নির্ধারণ শুরু হয়, তাহলে তা মানবতার বিচারে কখনো সমর্থন পাবে না। কাজ শুরু হয়নি, নিধন চলছে, তাই সাহিত্যিকরা এখন অনেকেই বিমর্ষভাবে নির্বাক।

না

দেশজোড়া ভাঙাচোরায় বহু মানুষের ক্ষতি, সাহিত্যের মধ্যে রীতির ভাঙাচোরায় কারুর কোনো ক্ষতি হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যের খানিকটা নতুন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। নিজের জীবন নিয়ে যেমন সব মানুষই যে কোনো রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারে, সাহিত্য সম্পর্কেও সেই স্বাধীনতা। কারণ ঐ একই, এতে অন্য কারুর ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

পূর্ব বাংলার তরতাজা সাহিত্যের প্রাণশক্তি এখন অনেক বেশী, নতুন নতুন পরীক্ষার প্রয়াস দেখতে পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। পূর্ব বাংলার একটি গোষ্ঠীর 'না' নামের আন্দোলনের মুখপত্রের কয়েকটি সংখ্যা আমার চোখে পড়লো।

কিছুকাল আগে পশ্চিম বাংলার বার্নপুরেও একটি লেখক দল 'না' নামে আন্দোলন এবং পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের সেই উদ্যোগ এখনো অব্যাহত আছে কিনা আমি জানি না। তবে পূর্ব বাংলার এই গোষ্ঠীটি অনেক বেশী উৎসাহী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং রিসোর্সফুল মনে হয়। এদের পত্রিকাতেই তার প্রমাণ।

তিনটি সংখ্যা আমি পেয়েছি। তিনটিরই আকার বিচিত্র। কবিতা বা গল্প উপন্যাসের বাহ্যিক আকার বদলানোকে অনেকে হুজুগ মনে করেন। সত্যি নয়। সাহিত্যের একটা চাক্ষুষ প্রতিক্রিয়াও আছে। একই রকমের ছাপা বই, একই আকারের কবিতা দেখতে দেখতে অনেক সময় চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যে কোনো একটি ক্লান্ত ইন্দ্রিয় নিয়ে পুরো রস আস্বাদন করা যায় না। তা যদি না হতো, তাহলে গীয়ম অ্যাপোলিনেয়ার, এজরা পাউণ্ড, কামিংস প্রভৃতি কবিরাও এরকম করেছিলেন কেন?

এঁদের একটি সংখ্যা নীল-সবুজ-হলুদ রঙের ছ' কোনা, পাতা ওল্টাবার চেষ্টা করলে প্রজাপতির ডানার মতন দেখায়। আর একটি সাদা কালো মোটিফ সহ প্যাকেটবন্দী উপহারের মতন। অপরটিতে চটের মলাট, লম্বাটে, জমি, অংক, জ্যামিতি প্রভৃতির মাধ্যমে সাহিত্য।

বেশ টাটকা রচনাগুলি। চোখকে আরাম দেয়, ঠোঁটে হাসির প্রক্রিয়া ঘটায়। এদের দলে আছেন তাজুল চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, রবিউল কাজী, সাহিদ হাসান প্রমুখ। কাজী সাহিদ হাসান-এর চিন্তা: ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে কবিতাকে এই মর্মান্তিক অবস্থা থেকে রেহাই দিতে হলে আমাদের উচিত (১) চিঠি (২) খবর (৩) ডিটেকটিভ বই (৪) উপন্যাস (৫) বিজ্ঞাপন (৬) দ্বান্দ্বিক চিন্তা (৭) প্রকল্পনা ইত্যাদির কংকাল দিয়ে কবিতা লেখা।

কবিতা-পরিচয়

দীর্ঘকাল বাদে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কবিতা-পরিচয়' নামে পত্রিকাটির একটি নতুন সংখ্যা বেরিয়েছে। কবিতার নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনার এমন পত্রিকা আর নেই। এই সংখ্যাটিতে অবশ্য কোন কবিতার আলোচনা, স্থান পায়নি, সম্পাদক কয়েকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন কিছু কবির কাছে, তাঁরা উত্তর লিখে দিয়েছেন। প্রশ্নগুলি এই রকম: আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করেছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কি ভাবে? এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার কাছে—ইত্যাদি। উত্তর দিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মনীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, সিদ্ধেশ্বর সেন, শঙ্খ ঘোষ প্রভৃতি।

এই সংখ্যাটি বিশেষ আকর্ষণীয় মনে হবে তাঁদের কাছে, যাঁরা কবিদের কথা থেকে এইসব উত্তর শোনার জন্য উৎসাহী বোধ করেন। আমি করি না।

কবি-সমীক্ষা

কবিতা সিংহ সম্পাদিত "দৈনিক কবিতা" একটি সমীক্ষার আয়োজন করেছেন। পঞ্চাশজন পাঠকের কাছে পঁচাত্তরজন কবির একটা ছাপানো নামের তালিকা পাঠানো হবে। ঐ লিস্টের মধ্যে প্রত্যেক পাঠক মোট কুড়িজন কবিকে নিজ রুচি অনুযায়ী নির্বাচন করবেন। তারপর সমীক্ষা নিয়ে জানা যাবে, পাঠকদের বিচারে কোন কুড়িজন কবির প্রভাব এখন পাঠকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

অবশ্য কোন পঞ্চাশজন, পাঠককে এই তালিকা পাঠানো হবে এবং তাঁদের যোগ্যতা কি, তা জানানো হয়নি।

সনাতন পাঠক

গ্রামজীবনের কথা

বাংলার চালচিত্র। আবদুল জব্বার। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দশ টাকা।

পশ্চিমবাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের গ্রাম, প্রকৃতি এবং শ্রমজীবী মানুষদের জীবন্ত চিত্রের সমাবেশে 'বাংলার চালচিত্র' সাম্প্রতিক কালের একখানি উল্লেখযোগ্য বই। চাষী, মজুর, জেলে, কুমোর, তাঁতী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে এমন সরস ও অকৃত্রিম ডকুমেণ্টারী রচনা ইতিপূর্বে কোথায়ও প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। শুধু মানুষই বা কেন, গাছগাছালি, ফুলফসল, পশুপাখি সম্পর্কেও যে সব অজস্র খুঁটি-নাটি তথ্য ও পরিচয় এতে আছে তাও কম বিস্ময়কর নয়। বিশিষ্ট আঞ্চলিক পেশা বা শিল্প সম্পর্কেও আছে অনেক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা। সাগরদ্বীপের মহাজন; জয়নগরের মোয়া; মেটিয়াবুরুজের দর্জি, মৎস এবং কসাই—এর যে কোন একটি রচনা পড়লেই বোঝা যায় যে এই অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সঙ্গে লেখকের পরিচয় কী নিবিড়!

বাংলার চালচিত্র ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশের সময়েই একটা দারুণ চমক সৃষ্টি করেছিল পাঠকমহলে। যেমন অভিনব বিষয়বস্তু তেমনি তাজা তার বর্ণনার ভাষা—সব মিলিয়ে যেন জীবন্ত, দরিদ্র এবং নিতান্ত গ্রাম্য এক খণ্ড বাংলা দেশ। পাঠকদের মধ্যে তখনই অনেকে লেখাটি সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল ও উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। প্রশংসা বা সমালোচনামূলক অনেক চিঠিও ছাপা হয়েছিল দেশের পাতায়। সুতরাং বাংলার চালচিত্র যে এখন বই আকারে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যরসিক ও বিদগ্ধ পাঠকমহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলবে তাতে আর সন্দেহ কি।

আবদুল জব্বার গ্রামের মানুষ। বিশেষত গ্রামদেশের নিম্নবিত্ত, দরিদ্র মুসলমান সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় রক্তনাড়ীর। ফলে সাধারণ পাঠকদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত এই সমাজের আচার-বিচার, ঘরোয়া উৎসব-অনুষ্ঠানের যে খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি দিতে পেরেছেন তার জন্যে এই বইয়ের আকর্ষণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি যেমন সরস তেমনি আঞ্চলিক কথ্যভাষা, ছড়া, প্রবাদ, খিস্তি খেউড়ের ঢালাও ব্যবহারে মানুষগুলোও যেন জীবন্ত। কোথাও কোথাও তাঁর ভাষার তেজ লক্ষ করবার মত। লেখার আকর্ষণ বৃদ্ধি করবার জন্যে কয়েকটি স্কেচ, গল্পের আকারে পরিবেশন করেছেন লেখক। এর মধ্যে হিজড়েদের নিয়ে লেখা বৃহন্নলা সংবাদ হৃদয় স্পর্শ করে। সেয়ানে সেয়ানে রচনাটিও বেশ উপভোগ্য।

কিন্তু আবার এই গল্প বানিয়ে তুলবার আগ্রহের জন্যেই কোন কোন রচনা কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। একঘেয়েমি কাটাবার জন্যেই হয়ত লেখক এটা করতে চেয়েছেন। গাছ-গাছালি, ফল-ফসলের তালিকা বর্ণনার বেলায়ও এটা ঘটেছে। শহুরে মানুষদের তাক লাগিয়ে দেবার মোহও যেন কোথাও কোথাও লেখককে পেয়ে বসেছে। ফলে দীর্ঘতর পরিসংখ্যানের চাপে কয়েকটি লেখা নীরস ও বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়েছে। লেখকের ঘরোয়া গ্রাম্যশব্দের ভাঁড়ার নিঃসন্দেহে অসম্ভব রকমের জোরালো। কিন্তু গভীর কোন উপলব্ধির বেলায় বা দার্শনিক কোন মন্তব্যের ক্ষেত্রে কেমন কৃত্রিম হয়ে পড়ে তাঁর ভাষা।

এই সামান্য দু একটি ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বাংলার চালচিত্র নিঃসন্দেহে বাংলা দেশের মাটি, মানুষ ও ফসলের জীবন্ত ও তাজা প্রাণের স্পর্শে ভরা। গ্রামের অজ্ঞাত অসহায় মানুষ, তাঁদের ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি সব মিলিয়ে এই অভিনব রচনাটি পাঠকদের কাছে এক নতুন জগতের সংবাদ এনে দেবে।

সমাজ ও সংস্কৃতি

সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথ (২য় পর্ব)—ধীরেন্দ্রনাথ বসু। গ্রন্থকার, ৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দশ টাকা।

বিশ্বখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ নিজেও স্বক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র ছিলেন। ভক্ত, সাধক, দেশপ্রেমিক ও বহুবিদ্ব মহেন্দ্রনাথের জীবনে যেমন অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর অনুপ্রবেশও ছিল তেমনই গভীর। তা ছাড়া তাঁকে প্রায় শতাব্দী কালের সমাজ ও মানুষের ইতিহাসের ধারক বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। লেখক এহেন মনীষী পুরুষের সংলাপ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক কর্তব্য পালন করেছেন। প্রথম পর্বের মত প্রায় ছ'শ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ গ্রন্থের বিশেষত্ব হল, গ্রন্থকার কোন পরিকল্পনা করে, ছকবাঁধা প্রশ্ন তৈরি

করে মহেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তার উত্তর সংগ্রহ করেন নি। দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা যেমন হয়েছে, তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তা লিখে নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। কথাবার্তা প্রসঙ্গে শাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সামাজিক আচার-ব্যবহার, দেশের সাধারণ ও বিশিষ্ট মানুষ, ইত্যাদি নানা বিষয় এসেছে। মহেন্দ্রনাথ নিজে সে সব সম্বন্ধে প্রসঙ্গত বহু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। সেই সারগর্ভ মন্তব্যগুলি গ্রন্থের প্রায় পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তথ্যান্বেষী সব শ্রেণীর পাঠকই তা পাঠ করে শুধু যে উপকৃত হবেন তাই নয়, মহেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের রূপটিও তাঁদের মনের পটে ফুটে উঠবে। এ পর্বে ১৯৪২—১৯৪৫, ১৯৪৭, ১৯৪৯, ১৯৫৩—৫৫ এই সময়ের সংলাপ সংগৃহীত হয়েছে।

গ্রন্থখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ও বাহ্য সৌষ্ঠব সুরুচির পরিচায়ক। গ্রন্থ মধ্যে মহেন্দ্রনাথের দুখানা সুমুদ্রিত চিত্র আছে।

২৬৮।৭০

সঙ্গীত

সঙ্গীত নায়ক (প্রথম খণ্ড)—নিমাইচাঁদ বড়াল। প্রীতি প্রকাশনী, ৪১নং, হরিতকী-বাগান লেন, কলিকাতা-৬। দশ টাকা।

গ্রন্থকার একটি প্রখ্যাত সঙ্গীত[illegible] পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং [illegible]ও সংগীতজ্ঞ। গ্রন্থটিতে পাঁচটি অধ্যায়ে ভারতীয় রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ঔপপত্তিক অধ্যায়টি সবচেয়ে বড়। এতে হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটকী স্বরের তুলনামূলক আলোচনা, ঠাট-মেলের দিক দিয়ে এই দুই দেশীয়-রীতির প্রভেদ শ্রুতি, স্বরসপ্তক, বর্ণ, অলংকার, তান, রাগলক্ষণ, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি প্রভৃতি বিভিন্ন গীতিরীতির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এবং এর সঙ্গে আরও বহু বিষয়ের আলোচনা আছে। প্রাচীন শাস্ত্রাদি থেকে উদ্ধৃত করে তিনি বহু সাঙ্গীতিক পরিভাষারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অলংকারগুলি আমাদের দেশে কত বিভিন্নভাবে পাওয়া যেত তার পরিচয়ও এই অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। এছাড়া কাদের নায়ক বা গুণী হিসাবে স্বীকার করা হত সেগুলিও তিনি উল্লেখ করেছেন। রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে প্রায় সব জ্ঞাতব্য তথ্যই এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অপর অধ্যায়গুলিতে সঙ্গীতের শিক্ষা-তত্ত্ব, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি, আধুনিক কালে সঙ্গীতের সমস্যা ও শিক্ষাপদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুর-সাধনা—এই সব বিষয় সম্বন্ধে যত্নসহকারে এবং সমীচীনভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সর্বাংগীন ধারণা করতে গেলে এবং সঙ্গীত তত্ত্বকে বিচার করে বুঝতে গেলে যেসব আলোচনার প্রয়োজন গ্রন্থকার তার কোনটিকেই বাদ দেননি। গ্রন্থটি কেবলমাত্র অনুসন্ধিৎসু পাঠকদেরই নয়, ছাত্রছাত্রীদেরও বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে। গ্রন্থে কিন্তু বহু ছাপার ভুল ও বানান ভুল দেখা গেল। পরবর্তী সংস্করণে এগুলি শোধিত হওয়া আবশ্যক।

প্রাপ্তি স্বীকার

অহংকার হে আমার। শান্তি লাহিড়ী। কবয় : ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

Soviet Close-ups. Ranabir Singh. Progressive Publishers : 6B/6 N.E.A., New Delhi. Price Rs. 2.

Red tape and White cap : P. V. R. Rao. Orient Longman Ltd. : 3/5 Asaf Ali Road, New Delhi-1. Price Rs. 25.

ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের অভিমত

বাঙ্গালোরে কিছুদিন আগে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের কয়েকটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র নিয়ে একটি উৎসব হয়। পরিচালক শ্রীরায় সেখানে গিয়েছিলেন।

সেখানে একটি সংবর্ধনা-সভায় এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি এদেশে ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন যেভাবে চলছে সে-বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। শ্রীরায়ের বক্তব্য : ফিল্ম ক্লাবগুলির কাছে আশা করা গিয়েছিল, তারা দর্শকদের রুচি বদলে সাহায্য করবে, শিল্পগুণের ছবি সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ বাড়াবে, ইত্যাদি। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, ফিল্ম ক্লাবের সদস্যরা শুধু নিজেরাই কিছু ভাল ছবি দেখতে চান তার বেশী কিছু তাঁরা করছেন না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের মানউন্নয়নে তাঁদের একটি সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার।

কলকাতার ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন কি শিল্প-চিত্র নির্মাণের পথ প্রশস্ত করবে? শ্রীরায়ের এ-বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। ফিল্ম সোসায়েটির ছবির প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে সেনসরশিপবিধি তুলে দিয়ে কোনও লাভ হয়েছে বলেও তিনি মনে করেন না। তিনি বরং সরকারকে আরও দুই বছর সেনসরশিপের নিয়ম-কানুন ফিল্ম সোসায়েটির ছবির ক্ষেত্রেও চালু রাখতে বলতে চান। অন্য কোনও কারণে না, শুধু পরখ করে দেখবার জন্য যে, তার পরেও কতজন সদস্য এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এ-রকম একটা পরীক্ষার দরকার আছে বলে তিনি মনে করেন।

বোম্বাইয়ের একটি পত্রিকায় শ্রীরায়ের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি প্রকাশ পাবার পর এ-নিয়ে ফিল্ম ক্লাব মহলে তুমুল আলোচনা চলছে।

তপন সিংহ পরিচালিত "এখনই"/স্বরূপ দত্ত, অপর্ণা সেন ফটো—দেশ

শংকরস্কোপ

কলকাতার কীর্তি যে-দিকে যত বড়ই হোক না কেন, আর্ট বা শিল্পের জগতে কলকাতা মোটেই পিছিয়ে নয়। বরং সম্পদ যে বেড়েই চলেছে তার একটি প্রমাণ "শংকরস্কোপ"—উদয়শংকরের এক বিস্ময়কর উদ্ভাবন। শংকরস্কোপ কী—কী এর 'স্কোপ' বা ডাইমেনশন—তা চোখে না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না। চোখে দেখবারই জিনিস—দুই বিস্মিত চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে হয় এক নতুন টেকনিক যাতে স্টেজ, স্ক্রীন ও ম্যাজিকের সমন্বয়।

এই ত্রিবেণী সঙ্গম যে পদ্ধতিতে সম্ভব তার ডাইমেনশন অকল্পনীয়। ফিল্মের একটা ইলিউসান থাকেই, স্ক্রীনে যাদের দেখি তারা রক্ত-মাংসের অস্তিত্ব নিয়ে যে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নেই তা আমরা বুঝতে পারি। যতই ব্রেখট-রীতি প্রযুক্ত হোক না কেন সে ইলিউশন ভাঙবার নয়। তবু ভাঙে, ভাঙাতে পারে যখন ফিল্মের ধাক্কা—অন্তত যখন আমরা চোখে দেখি—

স্ক্রীন থেকে সরাসরি স্টেজে নেমে আসছে। এর জন্য টাইমিং-এ একটা গাণিতিক নির্দিষ্টতা দরকার। এক মুহূর্ত এদিক-সেদিক হলে চলবে না। প্রজেক্টরের কাজ, ফিল্মের গতি, মঞ্চে পর্দার আড়ালে শিল্পীদের একই পোশাকের কনটিনিউটি বজায় রেখে একটি মুহূর্তের জন্য সতর্ক উপস্থিতি—এই সব যেন একটা মেশিনে চলেছে। এই পুরো ব্যাপারের পরিকল্পনা উদয়শংকরের—এর নাম তিনি দিয়েছেন "শংকরস্কোপ"।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে গত সপ্তাহ থেকে শংকরস্কোপ আরম্ভ হয়েছে। উদয়শংকরের এই এক্সপেরিমেন্ট দর্শকদের নতুন অভিজ্ঞতায় রোমাঞ্চিত করবে সন্দেহ নেই। দর্শকরা দেখবেন, স্ক্রীনের চরিত্র কেমন করে মঞ্চে নেমে এসে বাকি কাজটুকু সেরে নিচ্ছে—দুয়ে মিলে যেন একই দেহ। ... স্টেজ ও স্ক্রীনের আলাদা অস্তিত্ব দর্শক ভাববার সময় পান না। তা-ছাড়া রয়েছে ম্যাজিক, মঞ্চ থেকে চরিত্রদের অদৃশ্য হওয়া, বাঁধা খোলার ভিতরে চোখের সামনে রূপবদল ইত্যাদি।

আগেই বলেছি, শংকরস্কোপ ... সেটা সর্বাংশেই চাক্ষুষ চমক। এই টেকনিক অবাক হয়ে দেখবারই। শংকরস্কোপ-কে এমন কোন কাজে লাগানো হয়নি যা থেকে দর্শক তাঁর অনুভূতিতে মূল্যবান কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারেন। অর্থাৎ শংকরস্কোপের বিষয়বস্তু তেমন কিছু নেই, কোন সুগ্রথিত গল্প বা কাহিনী তো নয়ই। দুটি-একটি চিন্তা আছে। সেও হল আমাদের মামুলী "কমার্শিয়াল" সিনেমার ঘটনা। কৌতুক (ঘোষকের কার্যকলাপ ও ঘোষণার নমুনা) ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত—হিন্দী ছবির ভাঁড়ামি মনে করিয়ে দেয়। তাঁর ইংরেজি বলাও সুন্দর নয়। বিভিন্ন ধরনের "আইটেম" রাখা হয়েছে বলেই হয়ত "অ্যানাউনসার" বা ঘোষক রাখা হয়েছে। তবে তাঁর কাজ আরও সংযত ও মার্জিত হতে পারত। অন্যদিকে ছোট ঘটনা হিসাবে যা দেখানো হয়েছে, যেগুলিকে আগে বলেছি সাধারণ সিনেমার পরিস্থিতি, তাতে কর্তা অভিনয়, ও নিম্নমানের আধুনিক গান (অবশ্য কমলেশ মৈত্রর দেওয়া সুর খুবই সুন্দর) মোটেই মনে রেখাপাত করে না। এক্ষেত্রে আরও ভাল জিনিস দেওয়া যেতে পারত।

অর্থাৎ শংকরস্কোপ একটি টেকনিক সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা যাদের জন্যে এক চমৎকার এক্সপেরিমেন্ট ছাড়া এখনো

"এখানে পিঞ্জর" (যাত্রিক পরিচালিত/অপর্ণা দেবী

পর্যন্ত কিছু নয়। আশা করা যায় এর মধ্য দিয়ে মহৎ বিষয়বস্তু হয়ত একদিন তুলে ধরা হবে। তবু এর মধ্যে একটি বস্তু রাখা হয়েছে যা সত্যিই মহৎ—কী উপস্থাপনে কী রূপবিন্যাসে। সেটি রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" অংশ। ওই অংশে ফ্যান্টাসি (একালের পরিপ্রেক্ষিতে) সৃষ্টির পরিকল্পনাও চমৎকার। "বিউটি কম্পিটিশন" আখ্যানভাগ বক্তব্যধর্মী, এই অংশটিও ভাল লেগেছে। সব চাইতে বেশি মুগ্ধ করে শেষ দৃশ্যটি—প্রাণের উদ্দামতায় সমবেত নাচে দ্রুত কম্পমান আলো ফেলে ওই দৃশ্যে উদয়শঙ্কর এক নতুন ডাইমেনশন সৃষ্টি করেছেন। কখনো মনে হয় শিল্পীরা চিত্রার্পিত, ফিল্মের ফ্রিজ।

শঙ্করস্কোপের প্রধান আকর্ষণ উদয়শঙ্করের "কল্পনা" ছবির কিছু দৃশ্য, তাতে উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্করের নাচ আছে। উদয়শঙ্করের নাচের ধারা যে আজও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বর্তমান তা দেখানো হয়েছে একটি চমৎকার পরিকল্পনায়—একটি পাতলা স্ক্রীনের উপর "কল্পনা" ছবির দৃশ্য, স্ক্রীনের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে শিল্পীরা একই সঙ্গে মঞ্চে নেচে যাচ্ছেন। উদয়শঙ্করের ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ—কী সমবেত কী একক—দর্শককে মুগ্ধ করবেই। ওঁদের নাচের শিক্ষা আলাদা, ঐতিহ্য আলাদা। চণ্ডালিকা-র অংশে শক্তি গুহের (প্রকৃতির মা) নাচ অসাধারণ। সাধন গুহও একাধিক দৃশ্যে নাচে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। প্রশান্ত সেনগুপ্ত, অনুপমা দাস, অরুণ নাথ প্রভৃতি শিল্পীরাও [illegible] কৃতকার্য। উদয়শঙ্কর-অমলাশঙ্করের [illegible]

[illegible] কাজ করেছেন।

[illegible]
(সম্পাদনা), অমিতাভ বসুর (শিল্প-নির্দেশনা), দোলাক পাল (আলো), মহেন্দ্রকুমার (স্থিরচিত্র ফটোগ্রাফি) প্রভৃতির কাজ প্রশংসনীয়। গান ভাল গেয়েছেন তপন চট্টোপাধ্যায় ও পাপিয়া বাগচি।

চিত্র-সমালোচনা

রূপসী

(এ আর সি প্রোডাকশনস)

গ্রাম বাংলার কোলে কৃষকের ঘরে মেলোড্রামাই সব নয়, "রূপসী"-র আবার একটা বিশেষ বক্তব্যও আছে। "রূপসী"-র যিনি অন্যতম নায়ক—ওই পরিবারের বুড়ো দাদু, তিনি কৃষিকর্মকে ধর্ম বলে জ্ঞান করেন। তাঁর ছোট নাতি বলরাম দাস চাষবাস ছেড়ে কবি-গানে আসক্ত হয়ে পড়ায় তাকে দাদুর কাছে ঝিধর্মী আখ্যা পেতেও হয়েছে। এই বলরামকে—যার উপাধি হয়েছে গায়েন—উপলক্ষ করে পরিচালক-কাহিনীকার অজিত গাঙ্গুলি ছবিতে কবি-গানের আসর বসিয়েছেন। নিঃসন্দেহে কবির লড়াই—বিশেষত অনিল বাগচি যেখানে সুরকার—ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। দর্শকরা কিছুটা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি-র স্বাদ পেয়েছেন। অবশ্য পরিচালক পরে বলরামকে কৃষিকর্মে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। ছবির শেষে কৃষকের মর্মকথা (দাদুর মুখে) ধ্বনিত।

এই বক্তব্যে পৌঁছবার আগে যা আছে সেটা রোমান্টিক প্লট। নায়িকা রূপসী—যার নামে ছবি। এই রূপসী ছবির মধ্যভাগ পর্যন্ত দর্শককে বার বার রবীন্দ্রনাথের সমাপ্তি-র মৃন্ময়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তবে রূপসীর দুষ্টুমি আরও মারাত্মক, অনেক অবাস্তব। এবং সে প্রণয়ের পাবে কবি-গানের আসরে জাঁদরেল গায়েন বলরামকে হারিয়ে দিয়েছে। বলরাম ওই মুহূর্তেই বাঁধা রূপসীর চোখে দেখেছিল তার সর্বনাশ। তাই সে

গাইতেই ... [illegible] ... তার পর ... [illegible] ... যেভাবে ভাবী ... [illegible] ... ভাবী জামাইয়ের মাধ্যমে মাঠে নেমে ধান বুনেছে সে তো ভাবাই যায় না। যাই হোক রূপসীর চেষ্টাতেই মানুষ মন পালটেছে, এবং পরিচালকের বক্তব্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

খুব বেশি বিচারবুদ্ধি না খাটিয়ে ছবি দেখে যাঁরা আনন্দ পেতে চান, সংগীত-বহুল "রূপসী" তাঁদের নিরাশ করবে না। যদিও এই ছবিতে দর্শকের ইচ্ছাপূরণের ফরমুলায় একটির পর একটি ঘটনা সাজানো। গ্রাম্য কৃষকের মুখে সফিসটিকেটেড গান না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, একটি কমিক চরিত্রকে (রূপসীর পাণিপ্রার্থী) ভিলেন করার চেষ্টাও এতে আছে। তবে দোষে-গুণে মিলিয়ে "রূপসী" আমোদপিপাসু দর্শককে হয়তো খুশিই করবে। রোমান্টিক দৃশ্যগুলি মোটামুটি উপভোগ্য। ছবির একটি গুণ আউটডোর দৃশ্য, যা রোমান্টিক পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে। এই ব্যাপারে পরিচালকের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই আছে। তবে অনুভা ঘোষের মুখে কালো রঙ মাখিয়ে বাস্তবতা আনার চেষ্টা হাস্যকর। বিশেষ, সারা ছবিতে যখন তা কোথাও নেই।

ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ সন্ধ্যা রায়ের স্বচ্ছন্দ অভিনয়। চরিত্রটি অনেকাংশে অবাস্তব হলেও তাঁর প্রাণোচ্ছলতার গুণে রূপসীকে ভাল লাগে। কবি-গানের আসরে গানের সঙ্গে ঠোঁট মেলানো এবং স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর কাজে সামন্ত ভঞ্জও গায়েন হিসাবে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে রোমান্টিক দৃশ্যে তাঁর অভিনয় বেশি সফিসটিকেটেড, তাঁকে চাষার ঘরের ছেলে ভাবতে কষ্ট হয়। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় দাদু হিসাবে যা করেছেন সে অভিনয় তাঁর কাছ থেকে আগেও পেয়েছি। সেই একই প্যাটার্ন। বরং অনুভা ঘোষ ও সুলতা চৌধুরীকে মন্দ লাগে না। অন্যান্য চরিত্রে জোছনারাণীর প্রয়োজন নিখুঁতভাবে মিটিয়েছেন রবি ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ এবং তপেন চট্টোপাধ্যায়। ছোট্ট একটি ভূমিকায় চিন্ময় রায় খুবই সুন্দর।

ছবিটি গানে সমৃদ্ধ। অমল বাগচির সুর দেওয়া প্রায় সব কটি গানই জনপ্রিয় হবে হয়তো। কলাকৌশলের কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন আলোকচিত্রশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত। মেঘের ছায়া এবং বৃষ্টির দৃশ্যগুলি সত্যিই সুন্দর।

'সংসার' (মৃণাল সেন পরিচালিত) : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, [illegible]

নাট্য-সমালোচনা

মা

(এম জি এণ্টারপ্রাইজ)

ম্যাক্সিম গর্কীর "মাদার" উপন্যাস অবলম্বনে নাটক বাংলা মঞ্চে নতুন নয়। নাটকটির রাজনৈতিক বক্তব্য আমাদের দেশীয় পটভূমিতে কতখানি প্রয়োজনীয় অথবা ফলপ্রসূ সেটা অন্য কথা, কিন্তু ওই ব্যাপারটি ছাড়াও এ নাটকের একটি সর্বজনীন এবং সর্বকালীন আবেদন আছে। দারিদ্র্যের হাত থেকে, কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম সব দেশের মানুষই করে এসেছে এবং আজও করে চলেছে। গর্কীর উপন্যাসে পাভেলের নিরক্ষর সমাজ-ভীরু মায়ের চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়া এবং সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারটি এক মহান উত্তরণের ঘটনা। সেদিক থেকে এ নাটকের মূল্য কম নয়।

এম জি এণ্টারপ্রাইজের খ্যাতি ধর্মমূলক নাটকের অভিনয়ে। "ঠাকুর রামকৃষ্ণ", "নিমাইমঙ্গল", "রানী রাসমণি" প্রভৃতি নাটকে তাঁদের যে অভিনয়ধারা এবং যে প্রয়োগভঙ্গী লক্ষ করা গেছে, তাঁদের সম্প্রতিক প্রযোজনা "মা" নাটকে (৬ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সদনে অভিনীত) তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এখানে তাঁরা অনেকটা আ[illegible] ধারা ও [illegible] আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন এ ব্যাপারেও তাঁদের দক্ষতা কম নয়।

তবে নাটকের গঠনে (নাট্যরূপ ঃ সময় চট্টোপাধ্যায়) কিছু ত্রুটি থেকে গেছে যা সংশোধন দুঃসাধ্য নয়। সংলাপের ভার আর একটু কমালে, কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় অংশ বিযুক্ত করলে এ নাটক দর্শকের মনে ছাপ ফেলতে পারবে। নতুবা ঘটনাগুলি যে ভাবে সাজানো হয়েছে, দুটি ভিন্ন জোনে একই সময়ে যেভাবে অভিনয় করানো হয়েছে এবং মূল বক্তব্যের প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

"মা"-এর প্রয়োগের চমৎকৃতি অবশ্যই মুগ্ধ করবে। ফ্লাশ-ব্যাকের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ সত্যিই সুন্দর। প্রথম ক্ষেত্রে শ্রোতা হিসেবে মারিয়ার উপস্থিতি অপ্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণ সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোকপাত সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। একেবারে শেষ মুহূর্তের 'ফ্রিজ'-এর পরিকল্পনা ও প্রকাশ অপূর্ব। যেন সমস্ত ব্যাপারটাই মুহূর্তে একটি ছবি হয়ে গেল।

নাট্যভাবনায় ও প্রয়োগকর্মে যে পরিবর্তন এম জি এনটারপ্রাইজের এই নাটকে পরিলক্ষিত, অভিনয় ধারায় কিন্তু ততটা পরিবর্তন তাঁরা আনতে পারেননি। এমন কি স্বয়ং মলিনা দেবীও নয়। রাশিয়ার কোন প্রত্যন্ত প্রদেশের মা এবং বাংলা দেশের কোন গ্রামাঞ্চলের মা অন্তর-অনুভবে হয়তো এক, কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশ তাঁদের ভিন্ন। সেই ভাবটি মলিনা দেবীর অভিনয়ে পুরোপুরি প্রকাশিত নয়। নতুবা আবেগের আকুলতা এবং মৈত্রী রূপে তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা অসাধারণ। মারিয়া চরিত্রের শিল্পী মুক্তি মিত্র একটি টাইপ উপহার দিতে পেরেছেন। বরং সর্বাঙ্গ মিলিয়ে সময় চট্টোপাধ্যায় (পেভেল), মুকুল সরকার (পাভেল) এবং [illegible] বিশ্বাস (নিকোলে) [illegible]

"[illegible]" ছবির মহরৎ : গান রেকর্ডিংয়ে বনশ্রী সেনগুপ্ত, শমিতা বিশ্বাস, সংগীত পরিচালক অনিল দত্ত ও বন্দনা সাহা

পুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। পুলিস ইনস্পেক্টর রূপে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বেশ আনন্দ দিয়েছেন দর্শকদের।

—দিবাকর শর্মা

বোম্বাই বিচিত্রা

বোম্বাইয়ের বায়োস্কোপের জগতে উৎসব-অনুষ্ঠানের স্কোপ কথায় কথায়। আজ কারুর জন্মদিন তো কাল কারোর ছবির মহরৎ, পরশু হয়তো অন্য কারুর ছবির সিলভার জুবিলী, তার মানে পার্টি লেগেই আছে। এখানে জাত, পাত, ধর্মাধর্মের বাছবিচার নেই। এ একেবারে আসল ফিলিম-তীর্থ। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থের' ছাঁদে গড়া। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে—এই ফিলিমের দরিয়া দিলের হৃদয় থিরে।

ফিলিম জগতের দিল সত্যিই দরিয়ার মত, এখানে জাত-পাতের বালাই নেই, প্রাদেশিকতার হাঙ্গামা নেই, ধর্মের জেহাদ তুলে হাতাহাতি নেই। ফিলিম জগতের মানুষেরা সাধারণ ভারতীয়দের মত সংকীর্ণমনা নয়। এখানে দেওয়ালীর দিন সবাই রঙীন কার্ড ছাপায়, (সবাই মানে জাতিধর্মনির্বিশেষে) নানা রকম মিষ্টির লেনদেন করে। হোলির দিনে আবার সবাই রঙীন জলে স্নান করে রঙীন পানীয় পান করে। রাখীপূর্ণিমার দিনেও ঐ একই ব্যাপার। তারপর যখন ঈদ আসে তখনও মুসলমান অভিনেতা, অভিনেত্রী, বা প্রযোজক পরিচালকের বাড়িতে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে জমায়েৎ হয় উৎসবমুখর জলসায়। হিন্দু, মুসলমান, জৈন এসব ভেদ ফিলিম সমাজে নেই বটে, তাই বলে যে একেবারে জাতিভেদ নেই এমন কথা বলা মুশকিল। আমাদের ফিলিম জগতে খালি চোখে দেখলে অন্তত দুটো জাত স্পষ্ট চোখে পড়বে। প্রথম নম্বরের জাতে তাঁরা পড়েন যাঁরা বাজারে হটকেক। দ্বিতীয় নম্বরের জাত হল মাইনাস হট—অর্থাৎ শুধু কেক। খালি চোখ মানেই ওপর ওপর দেখার চোখ, ভিতর থেকে দেখতে হলে চোখে একটা নেকড্ডরের চশমা আঁটতে হবে। আর সেই চশমা আঁটলেই দেখা যাবে যে আর সব ভারতবাসীর মতই ফিলিম জগতের অধিবাসীরাও অসংখ্য জাতে বিভক্ত। এ জগতেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ আছে যারা দারিদ্র্য সত্ত্বেও দাম্ভিক, সোচ্চার, একরোখা এবং কুচক্রী। তারই পাশে আছে হরিজন সম্প্রদায়, শত শত ফিলিম সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে যারা কাজ করে চলেছে কিন্তু তবু তারা অপাঙক্তেয়। বৈশ্যও আছেন অনেক আবার শূদ্র বা ক্ষত্রিয়ের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সাধারণ জীবনে জাতি ধর্ম নির্ণয় হয় জন্মের ভিত্তিতে। ফিলিমের অসাধারণ জগতে এ প্রথাকে মানা হয় না। এখানে আজ যে হরিজন কাল সে অনায়াসে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য হতে পারে এবং এখানে আজ যে ব্রাহ্মণ কাল তার অজ্ঞাত কুলশীল হতেও বেশী সময় লাগে না। এখানে যা চলে তারই নাম গাড়ি। ফিলিম জগতও ভারতের মত বৈশ্য শাসিত। এ জগতের ব্রাহ্মণরাও বৈশ্যপালিত। এ জগতের ক্ষত্রিয়রা বৈশ্য আশ্রিত এবং এ জগতের শূদ্ররাও বৈশ্য, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের দ্বারা যথেষ্ট শোষিত। ফিলিম জগতেও অনাহার, অনিদ্রা এবং অত্যাচার আছে তবু এখানে বাইরের জগতের মত বিক্ষোভ নেই, বিদ্রোহ নেই, [illegible] জগতের সংকীর্ণ-তম গলি ঘুঁজিতেও [illegible] যাতায়াত আছে। [illegible] লাঞ্ছিত হয়েও ফিলিম জগতের নাগরিকেরা, যা পূজারী বা ভক্তেরা 'আশা' দেবীর সম্বন্ধে কখনো হতাশ হন না। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এ জগতের বীজমন্ত্র। আমাদের ফিলিম জগৎ বর্তমান ভারতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় তীর্থ, কারণ ফিলিম জগতে এখনো স্বপ্ন আছে। ফিলিম জগতে আলস্য নেই, কুঁড়েমি নেই, ইনডিফারেন্স নেই, কারণ এখানে কারুর চাকরি পারমানেন্ট নয়, এখানে প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, এখানে সিকিউরিটি নেই, বাঁধা ধরা গ্রেড নেই, নিয়মমাফিক প্রমোশন নেই, ফিলিম জগতে উন্নতি বা অবনতির সিঁড়ি নেই। এটা হাই জাম্প, লঙ জাম্প বা পোলভল্ট-এর জগৎ। এখানে খ্যাপারা পরশমণি খুঁজছে, এখানকার আলাদীনরা আশ্চর্য প্রদীপের খোঁজে হন্যে। সবাই পরিশ্রমী। সবাই উচ্চাকাঙ্খী। সবাই সৎ। এমন কি অসৎ-তম লোকটিও।

সরল শর্মা

"অরো ফিল্মস"

বিখ্যাত চলচ্চিত্র-শিল্পপতি শ্রীতারাচাঁদ বারজাতিয়া সম্প্রতি কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে "অরো ফিল্মস"-এর কথা ঘোষণা করেন। শ্রীঅরবিন্দের নামে এই অরো ফিল্মস। আন্তর্জাতিক টাউনশিপ "অরোভিল"-এর (অরবিন্দ-নগর) ফিল্ম ও টেলিভিশন কর্মসূচী সুসম্পন্ন করার জন্য অরো ফিল্মস-এর সৃষ্টি। শ্রীবারজাতিয়া এর পরিচালক। তিনি সাংবাদিকদের জানান, প্রথমে কিছু অল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র তোলা হবে। এ-সব ছবির উদ্দেশ্য হবে—ভারতের প্রকৃত ইমেজ দেশবাসী ও বিদেশীদের কাছে তুলে ধরা। এবং একই উদ্দেশ্যে, তিনি জানান, তৈরি হবে "ভারত-দর্শন" পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এই ছবির মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম প্রভৃতির সত্য পরিচয় জানা যাবে। তা-ছাড়া ১৯৭২ সনে শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অরো ফিল্মস উপহার দেবেন এই মহাসাধকের পূর্ণাঙ্গ জীবনী-চিত্র।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীবারজাতিয়া পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা বলেন। তিনি আজকাল প্রায়ই আশ্রমে গিয়ে বাস করেন। এক সঙ্গে কয়েক মাস, সম্প্রতি ছিলেন একটানা ছয় মাস। ফিল্ম ব্যবসায় তিনি ছাড়েননি, তবে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নিজের সম্পত্তি ও পরিশ্রম

তিনি এখন বৃহত্তর উদ্দেশ্যে নিয়োগ করার সংকল্প করেছেন। অরো ফিল্মস এবং শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান এখন তাঁর প্রথম কাজ। আশ্রমের জীবনের কথা, শ্রীমায়ের আশীর্বাদের কথা এবং শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের কথাও তিনি সাংবাদিক-দের বলেন। তিনি জানান, শ্রীমা তাঁর আশ্রমিক নাম দিয়েছেন "দ্বিজ"।

ভুবনেশ্বরে শ্রীঅরবিন্দের পূতাস্থি নিয়ে আসা হয়েছিল। তারই ছায়াচিত্র তোলার কাজে তিনি ভুবনেশ্বরে যান। যাবার পথে কলকাতায় গত ৫ ডিসেম্বর তিনি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন।

মুক্তির প্রতীক্ষায়

"প্রথম বসন্ত" (ছায়ারূপা) ছবিটি পরিচালনা করেছেন নির্মল মিত্র। প্রতিভা বসুর কাহিনীর এই চিত্ররূপে আছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলি, অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরকার।

সোনা বৌদি (দীনেশ চিত্রম) ছবিতে রয়েছে নাটক ও অ্যাকশন। অভিনেতা সুখেন দাস এ-ছবির কাহিনীকার। অন্যতম শিল্পীও তিনি। অন্য শিল্পীরা হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, কণিকা মজুমদার, শিবানী বসু, বিজন ভট্টাচার্য, সমিত ভঞ্জ প্রভৃতি। "পান্না-হীরে-চুনী"-খ্যাত সঙ্গীত পরিচালক অজয় দাস ছবির সুর রচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়।

গ্রাম বাংলার জীবনের সঙ্গে শহরের যান্ত্রিক জীবনের সংঘাত নিয়ে তৈরি **মাটি অন্য রং** (রামকৃষ্ণ পিকচার্স)। রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী পরিচালিত এ-ছবিতে অনুপকুমার, সুমিতা সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতা দে, শিবানী বসু, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। হৃদয় কুশারী সংগীত পরিচালনা করেছেন।

চলন্তিকার "ঘণ্টাফটক"

মহিলা সাংস্কৃতিক সংস্থা 'চলন্তিকা' তাঁদের দ্বিতীয় নিবেদন প্রশান্ত চৌধুরীর 'ঘণ্টাফটক' নাটকটি সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অভিনেত্রী শ্রীমতী মলিনা দেবী।

সমবেত অভিনয় গুণে নাটকটি বিশেষ উপভোগ্য হয়। তমালিকা গুহ (দর্প-নারায়ণ), অঞ্জলি ব্যানার্জি (রক্তবাঈ), তপতী গুপ্তা (পঞ্চানন), প্রণতা ভট্টাচার্য (পিয়ারীলাই), অদিতি ঘোষ (মুর্শিকুলি আসগর), মালবিকা ঘোষ (বাঁকিত মহাজন) বেশ ভাল অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেন গীতা মুখার্জি, দেবী গুপ্তা, শকুন্তলা, স্বপ্না, মঞ্জু, পরী মৈত্র প্রভৃতি।

"ফাঁক" (পরিচালনা : রূপু চক্রবর্তী) ছবিতে জয়শ্রী রায়

শকুন্তলা

বলাকা পিকচার্সের প্রযোজনায় "শকুন্তলা" ছবির শুটিং চলছে, পরিচালনা করছেন শ্রীধর ভট্টাচার্য। কালিপদ সেনের পরিচালনায় সম্প্রতি ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্যের ভিত্তিতে চিত্রকাহিনী রচিত।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে প্রামাণিক চিত্র

তথ্যচিত্র নির্মাণে অ[illegible] মুখোপাধ্যায়ের সুনাম আছে। সুসংবাদ এই, তিনি এবার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একটি প্রামাণিক জীবনীচিত্র তৈরি [illegible]। ছবিটির দৈর্ঘ্য হবে দু'হাজার ফুট। সাদা-কালোয় ছবিটি তোলা হবে এবং এতে নেতাজীর রাজনীতিক ও দার্শনিক ভাবনা এবং কর্মজীবনের পরিচয় থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীমুখোপাধ্যায় ছবিটি তৈরি করছেন। জানুয়ারিতেই কাজ শুরু হবে, শেষ হতে সময় লাগবে চার-পাঁচ মাস।

একক রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠান

, পিয়াসী ভবনে কুলটির জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রীসমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর একক রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পিয়াসী সঙ্ঘের উদ্যোগে। প্রকৃতি, প্রেম ও পূজা পর্যায়ের একুশটি গান শ্রীলাহিড়ী পরিবেশন করেন। বিশেষ করে "আমার যে গান তোমার পরশ পাবে", "আমায় থাকতে দে-না আপন মনে", "আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই", "অনেক কথা বলেছিলেম", "তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে" প্রভৃতি গানগুলি উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব পাকিস্তানের গণ-পরিষদের নির্বাচন এই সপ্তাহের বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়। স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের দাবিদার শেখ মুজিবর রহমানের জাতীয় আওয়ামি দল শতকরা ৯১টি আসনে জয়লাভ করেছে। এর ফলে পাকিস্তান গণ-পরিষদে জাতীয় আওয়ামি লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের দরুন নয়টি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত আছে। গণ-পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের আসন সংখ্যা ৩০০ শতটি। পাকিস্তানের নির্বাচনী রণাঙ্গনে আরও ২২ দলের আবির্ভাব হয়েছিল : তাদের কেউ কেউ একটি আসনও পাননি। মৌলনা ভাসানির নেতৃত্বাধীন চীনপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি নির্বাচন বয়কট করেন। নির্বাচনে জয়-জয়কারের পর আওয়ামি লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঢাকায় তাঁর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন : তাঁর দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের ওপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানের নতুন জাতীয় পরিষদকে সংবিধান তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রের হাতে শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতরের ভার ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়েছে ওই ইস্তাহারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানে ঐসলামিক সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজেড এ ভুট্টোর পিপলস পারটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে শ্রীভুট্টো এবং শ্রীরহমানের মতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রীরহমান ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের পক্ষপাতী এবং শ্রীভুট্টো চীনের সঙ্গে।

দেশী সংবাদ

৭ ডিসেম্বর—আজ বিকালে সিঁথিতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর একজন নায়ক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বিডন স্ট্রীট এবং কারবালা ট্যাংক লেনের মোড়ের কাছে একজন ব্যবসায়ী খুন হন। অন্য দু'জন খুন হয়েছে হাওড়ায়।

কলকাতার প্রায় তিন হাজার বস্তির পরিবেশ উন্নয়নে দু'বছরের এক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কেন্দ্র যোজনা বহির্ভূতভাবে ৮ কোটি টাকার সাহায্য মঞ্জুরির কথা ঘোষণা করেছেন। ওই টাকাটা পুরোপুরি সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে।

৮ ডিসেম্বর—আজ কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গায় চব্বিশ ঘণ্টার হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে রাত্রের দিকে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হাংগামা ঘটে। হরতাল বিরোধিতার দরুন কোথাও কোন ঘটনা ঘটেনি।

৯ ডিসেম্বর—বিভিন্ন বেসরকারী শিল্পসংস্থা এবং অফিসগুলিতে ওভারটাইম বন্ধ করে বেকার যুবকদের চাকুরি দেবার দাবিতে স্লোগান উঠেছে। কলকাতা এবং শহরতলির অনেক অফিসের দেওয়ালে পোস্টার দেখা যাচ্ছে। ব্যাংক এবং কয়েকটি সওদাগরি অফিসের কর্তৃপক্ষও এইরকম দাবি পত্র পেয়েছেন বলে প্রকাশ।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর চেয়ারম্যান শ্রী এস মোহন কুমারমংগলম আজ বলেন, বোমবাই থেকে অ্যভ্রো বিমান চালনা করতে যে-সব পাইলট এখনও রাজি হচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

১০ ডিসেম্বর—আজ সকালে রাণাঘাটের কাছে চলন্ত ট্রেনের তলায় পড়ে কর্মরত ছয়জন রেল শ্রমিকের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটে। দু'জন গুরুতরভাবে জখম হন। ঘটনাস্থল রাণাঘাট ও কালীনারায়ণপুর স্টেশনের মাঝখানে একটি বাঁকের মুখে। শিয়ালদহ থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে।

সহকর্মীদের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের হুকুম তুলে না নেওয়া পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বোমবাই মাদরাজ ও কলকাতাস্থ পাইলটরা বিমান চালাতে অস্বীকৃত হওয়ায় কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী ডঃ কর্ণ সিং আজ তার উপদেষ্টাদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন ডাকেন।

১১ ডিসেম্বর—পাইলটদের অঘোষিত ধর্মঘট আজ দিল্লি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ইনডিয়ান এয়ার লাইনস-এর কর্মচারিদের দুটি ইউনিয়নও পাইলটদের পক্ষ নিয়েছেন। মাদরাজে সাসপেনড হয়েছেন আরও সাতজন পাইলট। এদিকে বিপর্যস্ত বিমান চলাচল চালু রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় বিমানবাহিনী ও এয়ার ইনডিয়ার পাইলটদের সাহায্য চেয়েছেন।

গত ২১ নবেমবর সারভে অব ইনডিয়া অফিসে মেজর কোহলী ও দুজন মহিলা গুপ্তচরের রাত্রি যাপনের ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ সীমানা সংক্রান্ত মানচিত্র চুরি যাওয়ার অভিযোগে মেজর কোহলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই দুজন মহিলাকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

১২ ডিসেম্বর—আইন ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মাদক বর্জন কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারিদের মদ্যপান পুরোপুরি নিষিদ্ধের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটি চান, সরকারী কর্মচারিদের চাকুরির শর্তাবলী যথোপযুক্ত সংশোধন করা হোক। সম্প্রতি এই কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে।

আজ কলকাতা ও হাওড়া শহরে বিভিন্ন ঘটনায় পাঁচজন খুন হয়েছেন। তার মধ্যে কলকাতায় শ্যামপুকুরে একজন, ফুলবাগানের সুভাষ সরোবরে একজন, জোড়াবাগানে একজন এবং হাওড়ার শিবপুরে একজন ও বৈষ্ণবপাড়ায় একজন। একাধিক জায়গায় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও গুলি ছোঁড়ে।

১৩ ডিসেম্বর—জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য সরকারের আইন প্রণয়নের প্রস্তাবগুলি আজ সংসদের পশ্চিমবঙ্গ পরামর্শ কমিটিতে গৃহীত হয়েছে। সদস্যরা কিছুটা রদবদল করে প্রস্তাবগুলি মেনে নেন। কলকাতার বস্তি উন্নয়নের জন্য আইন প্রণয়নের প্রস্তাবগুলিও সদস্যরা মেনে নেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির গাড়ি চালককে রিভলবার দেখিয়ে একদল যুবক চালকসহ গাড়িটি নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এই ঘটনাটি ঘটে জনবহুল চৌরঙ্গী এলাকায় গত-রাত ১টার সময়। আজ সকালে যন্ত্রপাতি লোপাট অবস্থায় শহরতলির বি টি রোডের উপর গাড়িটির হদিস পাওয়া যায়।

বিদেশী সংবাদ

৭ ডিসেম্বর—গত একুশ বছর ইউরোপের যে সীমান্তটি নিয়ে সর্বাধিক দুর্ভাবনা বিরাজ করছিল এবং যে সীমান্তটি নিয়ে পশ্চিম জারমানী ও পোল্যানডের মধ্যে তিক্ততার শেষ ছিল না, শেষ পর্যন্ত তার অবসান ঘটতে চলেছে। পশ্চিম জারমানীর চ্যানসেলার আজ পোল্যানডের বর্তমান পশ্চিম সীমানাটি সরকারীভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

৮ ডিসেম্বর—১৯৭১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা বাজেটে ১৭৯০ কোটি রুবল (প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সোভিয়েট অর্থমন্ত্রী আজ ঘোষণা করেন।

৯ ডিসেম্বর—পশ্চিম জারমানির মানমন্দির থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পৃথিবীর হিসাবে ১৪ দিন শীত যাপনের পর সোভিয়েটের চাঁদ গাড়ি লুনোখোদ আবার কাজ শুরু করে দিয়েছে। তার কাছ থেকে নিখুঁত বেতার-সংকেত পাওয়া যাচ্ছে।

১০ ডিসেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী নেতা ৮৯ বৎসর বয়স্ক মৌলানা ভাসানী ঢাকাতে এক বৈঠকে বলেন, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি আরও বলেন : পশ্চিমবংগ যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের সংগে যোগ দিতে চায় তবে স্বাগত জানান হবে।

১১ ডিসেম্বর—গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, আরজেনটিনা এবং সুইডেনের ৭ জন অধ্যাপক একটি অনুষ্ঠানে রাজা গুস্তাভ এডলফের কাছ থেকে এ বছরের নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে যেতে না পারার আশংকায় সাহিত্যের পুরস্কার প্রাপক শ্রীসলঝেনিতসিন এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

১২ ডিসেম্বর—বৃটেনের বিদ্যুৎ-কর্মীরা নিয়মমাফিক কাজ এবং ওভারটাইম বন্ধ করার ফলে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তার মোকাবিলার জন্য ব্রিটিশ সরকার আজ জরুরি ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। বিদ্যুৎ কর্মীদের ধীরে কাজ কর আন্দোলনের দরুন জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

১৩ ডিসেম্বর...চেকোস্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ একজন বিশিষ্ট কমিউনিসট বলে বিদিত এবং ১৯৬০ সাল থেকে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিটি সরকারের সদস্য অলড্রিচ সারনিক কমিউনিসট পারটি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। বহিষ্কারের কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

আপনার সন্তানের হোক

ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতি হলে চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টির ক্ষতি হতে পারে। প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স—আপনার বাচ্চাকে তার প্রয়োজনীয় "চোখের ভিটামিন" যোগায়—পুরোমাত্রায়।

সুস্থ রক্ত

৫ জনের মধ্যে ৪ জন ভারতবাসীর আহারে লোহার অভাব থাকে অথচ সুস্থ রক্তের জন্যে লোহা একান্ত প্রয়োজন। আপনার বাচ্চাকে ১ চামচ করে সিরাপ মিনাডেক্স দিয়ে তার দৈনিক লোহার চাহিদা মেটান। এতে রক্ত সুস্থ থাকবে।

মজবুত হাড়

বাড়ন্ত বাচ্চাদের হাড় ঠিকমত গড়ে তোলার জন্যে দরকার ভিটামিন 'ডি'। কারণ, খাবারে যে ক্যাল্‌সিয়াম আর ফসফরাস থাকে, ভিটামিন 'ডি'তা বেশী করে কাজে লাগাতে পারে। ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ পর্যাপ্ত পরিমাণে "হাড়ের ভিটামিন" আছে।

MINADEX

MINADEX

GLAXO

অল্প দাম!
স্বাস্থ্য
ভরপুর!

সিরাপ

মিনাডেক্স ®

তিনগুণের এক টনিক—গ্ল্যাক্সোর তৈরী

প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স দিয়ে আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করুন। কমলালেবুর স্বাদগন্ধে ভরা সিরাপ মিনাডেক্স। ওর ভালো লাগবেই।
সিরাপ মিনাডেক্স এর দাম খুব অল্প। অথচ আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্যে কত উপকারী।

১৭০মি.লি. মাত্র ৩টাঃ ৬৩পঃ } ট্যাক্স
৩৪০মি.লি. মাত্র ৬টাঃ ২৭পঃ } অতিরিক্ত

গ্ল্যাক্সো ল্যাবোরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

CMGM-1-234 B

সূচীপত্র

খোট খাই - ষোল-আনা তৃপ্তি চাই!
SCISSORS
Diamond Jubilee
MADE IN INDIA
10 SCISSORS
সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা
সর্বাধিক দাম
৫৮ পয়সায় ১০টি
স্থানীয় কর সাপেক্ষ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীঅজিত দত্ত

সব এমব্রয়ডারী করা
কাপড়ই মনে হয়
একইরকম কিন্তু
হাকোবা
এমব্রয়ডারী করা কাপড়
আপনাকে
টাকার পরিবর্তে আরও
বেশি কিছু দেয়।

দেহ নয় মন

প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ ৪·০০

এ উপন্যাসের নায়িকা মিস ঊর্মিলা গুপ্তের পাশের বাড়ির সে মেয়ে—চিরকালের মেয়ে। এ মেয়েকে আমরা একই সঙ্গে একই কালে দুই পরিবেশে। একজন থাকবে প্রতিদিনের প্রয়োজনে, অন্যজন রসের পরিকল্পনায়। 'দেহ নয় মন' এক মেয়ের চিরন্তন এবং সাধনার অধুনাতম এক উপাখ্যান ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

সরল সত্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·০০

নির্মম অথচ অপ্রতিরোধ্য গুপ্ত-আঘাতজনিত অবিরত রক্তক্ষরণের মত সকল আত্মিক মূলধনের ধীর ও অনিবার্য অপহরণের নামই জীবন, অথবা অদৃশ্য ঘাতকের সকল আঘাত প্রাণপণ প্রতিরোধের দ্বারা আপন আপন সম্পদ অক্ষয় রাখার অসম্ভব ও হাস্যকর প্রচেষ্টার নাম?—এ উপন্যাসে এমন একটি জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে পাঠকদের ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

নিশিপালন

বিমল মিত্র ॥ দাম ৬·০০

তারা তিনজন—জয়ন্তী, সবিতা আর বনলতা। সংসারে সব মেয়ে যা চায়, তারাও তা-ই চেয়েছিল। কিন্তু এমনই তাদের অদৃষ্ট, এই সামান্য আকাঙ্ক্ষাটুকুও তাদের পূর্ণ হয়নি। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের তৃষ্ণা তাদের অতৃপ্তই রয়ে গেল চিরদিন। সেই তিনটি হতভাগিনীর বিষাদময় জীবনচর্যার কাহিনী ॥

সামান্য-অসামান্য

সুশীল রায় ॥ দাম ৫·০০

সামান্য দুটি রমণী—জন্ম এবং জীবন যাদের মর্যাদাময় ছিল না, বরঞ্চ পাতিত্য এবং বহুবল্লভতার গ্লানিতে ছিল ঘৃণ্য—অসামান্যত্ব অর্জন করেছিল তারা নিজ কৃতিত্বে। সেই অতি সামান্য অথচ অতিশয় অসামান্য দুটি নারীর নিরন্তর তীব্র সুরে বাঁধা মর্মদাহী জীবনসংগীত ॥

সাগিনা মাহাতো

গৌরকিশোর ঘোষ ॥ দাম ৪·০০

রাজনীতি-শাসিত বর্তমান যুগের এমন নির্মম উদ্ঘাটন, এমন বলিষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন। এই বইয়ের প্রত্যেকটি চরিত্রকে পাঠকদের মনে হবে তাঁদের প্রত্যেকেরই চেনা মুখ। তপন সিংহ পরিচালিত এবং দিলীপকুমার ও সায়রা বানু অভিনীত এই কাহিনীটির চিত্ররূপ দর্শকসমাজে আলোড়ন এনেছে ॥ পঞ্চম মুদ্রণ ॥

প্রকাশিত হল

শৈলেন ঘোষের

ছোটদের নতুন রূপকথার বই

বাজনা

ছোট্ট একটি ছেলে। আদর করে মা নাম রেখেছে বাজনা। নাক-চ্যাপটা ছেলেটার চোখ দুটো কেমন গোল গোল! দুষ্টুমি মাথা! দাঁত-ফোকলা ছেলেটার গাল দুটো কেমন হাবলা! যেন অনেক পিঠে! উঃ! কী দুষ্টু। ছেলে নয় তো দস্যি। ছেলের জন্যে মা তো জ্বালাতন-পোড়াতন! মায়ের হাড়-মাস একেবারে কালি! মা কত আদর করত, কত বোঝাত, কত গান শোনাত। বয়ে গেছে বাজনার গান শুনতে, আদরে বশ হতে।

এমন যে দুষ্টু বাজনা, সবাই বলল, নামটা তার বিচ্ছিরি! বাঁশি-ফোটো থেকে আরম্ভ করে দমকা হাওয়া, সোনা ব্যাঙ, রাজহাঁস, মাছেরা সব্বাই। এমন কি, হাট থেকে সদ্য কিনে আনা পুঁচকে কাঠের ঘোড়াটাও বললে, বাজনার দেহের মধ্যে একটা বিচ্ছিরি নামের অসুখ ঢুকে গেছে, আর সে-জন্যেই সে অত দুষ্টু! সুতরাং কি আর করা! অগত্যা বাজনা বেরোল নামের অসুখ সারাতে। সঙ্গী তার কাঠের ঘোড়া! বন্ধু এবং উপদেষ্টাও। সেই দুঃসাহসিক অভিযাত্রার মনোরম রূপকথা 'বাজনা'।

দাম ৪·০০

● এই লেখকের অন্যান্য বই ●

ছোট্ট সোনার গল্প শোনা	৪·০০
মিতুল নামে পুতুল	৩·০০
অরুণ বরুণ কিরণমালা	২·০০

গাছের পাতা নীল

আশাপূর্ণা দেবী ॥ দাম ৬·০০

তন্ময় তপস্যার দুর্গে নিজেকে সুরক্ষিত করে জীবনের মানে খুঁজেছিলেন সরোজাক্ষ সৌন্দর্য ও শুভের মধ্যে। তবু তিনি সচকিত হয়ে একদিন দেখলেন—বিষে নীল হয়ে গেছে সারা পৃথিবীর সকল সবুজ সকল স্নিগ্ধতা। এ যুগের আত্মিক সঙ্কট এবং তার বিমূঢ় অসহায়তার এক অনন্য চিত্র লেখকের এই অনুপম উপন্যাসে বিধৃত ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

লোকরহস্য

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫·০০

বর্ণময় পরিপ্রেক্ষিতের ভূমিকাহীন স্বল্প কিছু রেখার টানে সুপরিস্ফুট এবং দীপ্ত কয়েকটি অনুপম রেখাচিত্রের আকরগ্রন্থ যেন এই গল্প-সংকলনটি। সামান্য কিন্তু সবল কটি রেখা—আড়ম্বরহীন এবং বর্ণচাতুর্যহীন—অথচ তারই মধ্য দিয়ে বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যময় কটি ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্র্যের উজ্জ্বল উদ্ভাস ॥

ঝড়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ দাম ৮·০০

আকস্মিক ঘটনা-সংঘাতের প্রবল ঝড় চারটি নরনারীর জীবনকে কেমন অপ্রত্যাশিত জটিলতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন্ অকল্পনীয় পরিণতিতে নিয়ে গিয়ে ফেলল, তারই এক পরম উপভোগ্য কাহিনী ॥

একদা কুয়াশায়

বিমল কর ॥ দাম ৬·০০

সচরাচর বাজার-চলতি যে-সমস্ত রহস্য-কাহিনী আমাদের কালহরণের খোরাক, এ উপন্যাসটি তার থেকে পুরোপুরি ভিন্ন স্বাদের, অন্য ধাঁচের। অপরাধ-কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও তা যে নিখুঁত সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে, লেখক 'একদা কুয়াশায়' তা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণ করেছেন ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

আগ্রা যখন টলমল

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ দাম ৪·০০

স্বনামধন্য ঘনাদার এসো এসো পূর্বপুরুষদের নবপুরাণ-কথায় বিজ্ঞানের বিস্ময়ের বদলে ইতিহাসের রহস্যের ভেলকিবাজি। ইতিহাসের রঙ, রস, রোমাঞ্চ, উত্তেজনার সঙ্গে শ্রীঘনশ্যাম দাসের তুলনাহীন কৌতুক-কল্পনার কালোয়াতি মেশানো উপন্যাসের আজব নতুন পাক 'আগ্রা যখন টলমল' ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৯ ॥
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯ ॥

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৮
শনিবার ১০ পৌষ ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮০৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 26 Dec., 1970

শীতের আগমন : বড়দিন

ঋতুর আসরে শীত আবির্ভূত হয়েছে। প্রকৃতির যে রকম নিয়মকানুন তাতে এই আসরে একজন এলে অন্যজনকে বিনয় সহকারে বিদায় নিতে হয়, অবস্থান বড় একটা চ'লে না। হেমন্ত খানিকটা নরম মেজাজের ঋতু, তার এক-দিকে শরৎ-শেষের বিষণ্ণ স্নিগ্ধতা অন্যদিকে প্রথম শীতের চাঞ্চল্য থাকে। সেই হেমন্ত এখন পুরোপুরি আসর ছেড়ে চলে গেছে, তার জায়গায় সকালের কুয়াশা আর শিশির, সারা দিনের রুক্ষ উত্তুরে হাওয়া, রাত্রের হিম এবং কনকনে ঠাণ্ডা নিয়ে শীত এসে জাঁকিয়ে বসেছে। ইংরেজী বছর শেষ—তার শেষ পাতাটা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে মনে হচ্ছে এই সময়টাকে আমরা বাঙলা করে 'বড়দিন' বলি। [illegible]

[illegible] শু-ভজনার উৎসব অনুষ্ঠানের [illegible] বাঙালী-[illegible] দিন [illegible]র্ব সচল হয়ে গেছে। আমাদের কাছে প্রধানত এটা শহুরে শীতের উৎসব; আমোদ প্রামোদ এবং কিঞ্চিৎ ভোজন ব্যবস্থা বই বিশেষ কিছু না। তবু, একটা কথা এখানে মনে এলে ভাল বই মন্দ হবে না। কথাটা এই ঃ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন যে শুভ উৎসব,-যীশু-ভজনা, তার একটা মানবিক তাৎপর্য রয়েছে। যীশু বেদনার সন্তান ঃ তিনি সেই দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য থেকে এসেছেন যাকে আমরা বলি তিমির কাল। মানুষের মৃত চেতনা, আত্মিক শূন্যতা থেকেই সেই আঁধার যুগ। মানুষের চরম দুর্গতির দিনে নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে আলোর জ্যোতির মতন তাঁর আবির্ভাব। তিনি চিরকালের বঞ্চিত, পীড়িত, ক্ষুব্ধ, দুঃখী মানুষের প্রতিভূ। প্রভু খ্রীষ্ট আমাদের কাছে এইমাত্র আশ্বাস রেখে গেছেন, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব, শুভবোধ ও সহানুভূতিই মানুষকে গৌরবান্বিত করে। আজকের এই বিশৃঙ্খলার দিনে, হিংসা এবং হানাহানির মত্ততার মধ্যে যদি কারও এই কথাটুকু মনে আসে তাও বুঝি যথেষ্ট।

আমাদের কাছে যে-অর্থে বড়দিন একটা ঝলমলে চেহারা নিয়ে দেখা দেয় তারও এবার বেশ অভাব। মনে হয় না, মানুষের আর অল্পস্বল্প আনন্দ-ফূর্তি করার মেজাজ আছে। কলকাতা শহরে এক সময় ছিল দিনে মাছি রাতে মশা, এখন মাছি মশার সঙ্গে যোগ হয়েছে দিনে ছুরি রাতে বোমা। সূর্যের আলোটুকু যতক্ষণ ততক্ষণ যে মানুষ নির্ভয় তা নয়—তবু অফিস কাছারির দৌলতে জনসমুদ্রে জোয়ার থাকে, কিন্তু সন্ধ্যের পর এমন কলকল্লোলিনী কলকাতার বিরাট এলাকা কেমন নিস্তব্ধ, মৃত, ছমছমে হয়ে যায়। যেখানে মানুষের জীবন-প্রবাহ ভয়ে আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় ক্রমশই নির্জীব হয়ে আসছে সেখানে উৎসবের যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ দেখা দেবে এমন তো মনে হয় না। অবশ্য ওরই মধ্যে নিশ্চয় কিছু শিশু যাবে চিড়িয়াখানায়, কিছু যুবক যাবে চড়ুই-ভাতি করতে, পশমী জামাকাপড়ে শোভিত হয়ে কোনো কোনো দল হয়ত 'কাছা-কাছি' কোথাও ভ্রমণ সেরে আসবে। তাহলেও ঠিক তেমন বড়দিন নয় যেমনটি আমরা আগে দেখেছি।

আগের সঙ্গে তুলনা অবশ্য করা অনুচিত। আগে এই সময়—শীতের মরসুমে নিতান্ত ছা-পোষা মানুষের সংসারেও খাওয়া-দাওয়ার কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য ছিল। শীতের শাকসবজির প্রবেশ ছিল অল্পবিস্তর। এ বছরে তাও নয়, বাজারে সবেরই চড়া দর, শাকপাতায় চুম্বি লাগে না, তবুও। তার একটা কারণ নাকি মালপত্র আনার অসুবিধে। প্রায়ই রেল চলে না, মাঝে মাঝেই গাঁ-গ্রামেও বন্ধ্ চলছে; তাছাড়া জীবন ধারণের সব রকম উপকরণের দামই যখন ঊর্ধ্বগতি তখন ব্যাপারীরাও পেটের দায়ে কিছুটা তো দাম বাড়াবেই।

গ্রামে গ্রামে এখন ফসল কাটার দিন। পৌষ মাস—সে তো বাঙলার ঘরে লক্ষ্মী মাস। শীতের রুক্ষ বাতাস যত ধুলো, যত তীক্ষ্নতাই আনুক—গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে এই ক'টি দিন যদি সুখ এবং স্বস্তির স্বাদ আনে তাতেও আমরা খুশী। কিন্তু ফসল কাটার কাজও কী শান্তিতে চলছে? যতদূর শোনা যায়, ফসলের মাঠে রক্তপাত ঘটার প্রবল সম্ভাবনা। জানি না, অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—তবে আশা করব ফসল কাটার মরশুম যেন নির্বিঘ্ন হয়।

বিড়ালের বিড়ম্বনা

সম্প্রতি জোড়াবাগান ২০ নং ওয়ারড থেকে প্রায় চার-পাঁচশত মহিলা লালবাজারে পুলিস নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন। তাঁদের পক্ষ থেকে পুলিস কমিশনারের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয় : (ক) পাড়ায় পাড়ায় পুলিস জুলুম চলবে না, (খ) কোনও কারণ না দেখিয়ে কোনও ছেলেকে ধরা চলবে না, (গ) ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে পারে না কেন, তার বিচার চাই, (ঘ) পুরুষেরা বাজার-দোকান, অফিস-আদালতে যেতে পারে না, (ঙ) সারা রাত পাড়ায় বোমার জুলুমে রাতের শান্তি ভঙ্গ হয়, (চ) শান্তিকামী নাগরিক শান্তি চায়, (ছ) মায়ের কাছ থেকে জোর করে ছেলে ধরে নেওয়া চলবে না, (জ) ধৃতদের বিনা বিচারে মুক্তি দিতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জোড়াবাগানের মহিলারা যে-সব অভিযোগ এবং দাবী তুলেছেন, বিভিন্ন ধরনের লোকের সঙ্গে বেশ কিছুকাল যাবৎ কথা বলে আমার ধারণা জন্মেছে যে, এই ধরনের আলগা অভিযোগ এবং ঘটুকো দাবী তোলার লোকের সংখ্যা এখন এখানে নিতান্ত কম নয়। অতএব এই অভিযোগ এবং দাবীকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলেই আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সেই কারণেই, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই আমি উক্ত অভিযোগ এবং দাবীগুলি বিচারে প্রয়াসী হয়েছি।

প্রথমেই বলে রাখি এই অভিযোগ এবং দাবী যাঁরা পেশ করেছেন, সেই সব মাতৃ ও ভগিনীগণ আমার নমস্য, কেন না তাঁরা ঘরের আড়ালে বসে বসে নিষ্ক্রিয় অভিসম্পাতে বা নীরবে অশ্রুপাত করে কপাল চাপড়িয়ে কালহরণ না করে তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার চাইতে নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। যে মায়ের কোলের ছেলে বা যে ভগিনীর আদরের ভাইকে পুলিস "বিনা কারণে" গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, তাদের মর্মব্যথা অনুভব করবেন না, বঙ্গদেশে এমন লোক বিরল।

তা সত্ত্বেও এই অভিযোগের উৎস, পটভূমি, পরিস্থিতি ও পরিণাম নিয়ে আমাদের বিচারে বসতেই হয় এবং বিচারকালে আবেগকে ঠেলে অন্দরমহলে ঢুকিয়ে রাখতেই হয়, নচেৎ বিচারে ঠিকে ভুল হবার আশঙ্কা থাকে।

মাতা ও ভগিনীগণ! আপনাদের অভিযোগ এবং দাবীগুলি পড়ে মনে হবে, আজকের শান্তিকামী নাগরিকরা যে অশান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন বা তাঁদেরকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, পুলিসই বুঝি তার প্রধান নায়ক।

আমার মনে হয়, এইখানে আপনাদের ঠিকে ভুল হয়েছে। আমার মতে পুলিস এই নাটকের মুখ্য নায়ক নয়, উপনায়ক মাত্র। প্রকৃত চিত্র এই, হিংসাত্মক রাজনীতি আজ সমস্ত রকম মানবিক বোধ বিসর্জন দিয়ে খুনের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এদেরই ভাড়াটে গুণ্ডারা অথবা এদেরই প্ররোচনায় উন্মত্ত আপনার আমার পথভ্রান্ত ছেলেরা নিরীহ শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারী কেরানী, অফিসার, পুলিস কনেস্টবল, ছাত্র, দোকানদার, শিক্ষিকা, ব্যবসায়ী, গৃহবধূর

বুকে ছুরি বসাচ্ছে, ক্ষুর বা মাংস কাটা দা বা ভোজালী বা তলোয়ার দিয়ে গলা কাটছে, লোহার রড দিয়ে মাথা ফাটাচ্ছে, স্ত্রেন গান, স্টেন গান, পাইপ গান, রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে মানুষ মারছে, সারা রাত পাড়ায় বোমা ফাটিয়ে রাতের শান্তি ভঙ্গ করছে। সমাজদেহে এইভাবে নগ্ন হিংসা ছড়িয়ে দিয়ে এরা ব্যাপকভাবে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে, তারই সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধী শক্তিগুলো, চোর ডাকাত বদমাসগুলো একক বা সংঘবদ্ধভাবে এক ব্যাপক এলাকায় অবাধে লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিজলীর তার কেটে নগরিকের ঘর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে, রেলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ চুরি করে রেল অচল করে দিচ্ছে। এরাই হচ্ছে অশান্তি সৃষ্টির প্রধান নায়ক। এদেরই দৌরাত্ম্যে আপনার আমার ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যেতে পারে না, পুরুষেরা বাজার-দোকান অফিস-আদালতে যেতে পারছেন না।

এখন প্রশ্ন, এইসব খল নায়কদের দমন কীভাবে করা যাবে এবং কে করবে? স্বাভাবিকভাবে যে উত্তর মনে আসে, তা এই : কেন, পুলিস?

পুলিসের কাজ শান্তিরক্ষা, কিন্তু এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, যে পুলিসের উপর নাগরিকরা আস্থা রাখতে পারেন না, সে পুলিস দিয়ে আর যাই হোক, এমন ব্যাপক বিশৃঙ্খল অবস্থায় শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হয় না। বরং তারাই হয়ে দাঁড়ায় ত্রাস সঞ্চারের দ্বিতীয় অঙ্গ।

বর্তমানে তাই হয়েছে। পুলিসের উপর আস্থা রাখার মত মনোবল জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের চোখে ভুলই হোক আর ঠিকই হোক পুলিসের যে চিত্র ভাসে তা এই : (১) ঘুষের সুতোয় পুলিস আর যাবতীয় সমাজবিরোধীর গাঁটছড়া বাঁধা, কাজেই পুলিস সমাজবিরোধীদের কখনোই দমন করতে চাইবে না, অতএব প্রতিকারের জন্য থানায় যাওয়া বৃথা, (২) থানায় গেলে পুলিসের কাছ থেকে সাধারণ নাগরিক সর্বদাই খারাপ ব্যবহার পায়, জনসাধারণের ধারণা এটা পুলিসের স্বেচ্ছাকৃত, (৩) পাড়ার কোনও গুণ্ডা বা রাজনৈতিক মস্তানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করলে, সেই গুণ্ডা বা মস্তানকে থানা থেকে অভিযোগকারীর নাম বলে দেওয়া হয় এবং সব থেকে জঘন্য, পুলিস সন্দেহবশে ধৃত ব্যক্তিদের উপর পশুর অধম উৎপীড়ন করে। দৃষ্টিটা হয়ত একপেশে, পুলিসের অনেক লোক এবং অফিসার এ দোষে দোষীও নয়। তবু সাধারণের চোখে পুলিস এই রূপেই প্রতিভাত।

এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে, পুলিসের উপর জনসাধারণের আস্থা নেই, বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। অথচ বর্তমানের পাইকারি খুন জখমের দিনে নিজের ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্যই পুলিসের সাহায্য প্রত্যেকের দরকার। (মাতা ও ভগিনীগণ! আপনি আমি কোন্ ছার। হিংসাত্মক রাজনীতির দুই নাটের গুরু কমরেড জ্যোতি বসু এবং কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজেরাই শাদা পুলিসের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘোর রবে হিংসাত্মক বিপ্লবের বাণী প্রচার এবং পুলিসের মুণ্ডপাত করে চলেছেন!)

পাড়ায় যখন উৎপীড়কদের জুলুম চলে, নরহত্যা ঘটে, পুলিসকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না বলেই তাকে আমরা মদত দিতে সাহস পাই না। কাজেই অপরাধীর সন্ধানে পুলিসকে এলোপাথাড়ি ব্যবস্থা নিতে হয়। ফলে আমার আপনার নিরপরাধ ছেলে বা ভাই বা প্রিয়ভাজন অন্য কেউ পুলিসের হাতে গ্রেফতার হয়, উৎপীড়িত হয়। পুলিসের উপর আমাদের রাগ বাড়ে। আমরা এবং পুলিস পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াই। আর দূরে দাঁড়িয়ে প্রকৃত খলনায়ক খলখল করে হাসে এবং অবাধে হিংসাত্মক কাজ চালিয়ে সমাজের ভিত নাড়িয়ে দেয়।

কীভাবে পুলিস-নগরিকের অনাস্থার দুষ্ট চক্র ভাঙ্গা যায়, শ্রী বি বি ঘোষ ভেবে দেখবেন কী?

অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে কি?

রাজন্যভাতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের রায় বের হওয়ার পর সেই প্রশ্নটি এবার একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সেই প্রশ্নটা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালেই লোকসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করতে চাইবেন, না ১৯৭২ সন পর্যন্ত অপেক্ষা করে সাধারণ নির্বাচনে নামবেন?

সুপ্রীম কোর্টের রায়টা অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। এমন কি নব কংগ্রেসেরও প্রায় সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে রাজন্যভাতা বিলোপের মামলায় সরকার হারবেন, রাজারা জিতবেন। সরকার পক্ষের ব্যারিস্টাররাও মামলা চলার কিছুদিনের মধ্যেই ধরে নিয়েছিলেন, হার তাঁদের অবধারিত। তাই এ মামলায় হার ধরে নিয়েই প্রধানমন্ত্রী এতদিন প্রস্তুত হয়েছেন।

এই মামলায় একটা জিনিস অবশ্য অপ্রত্যাশিত। সেটা হল বিদায়ী প্রধান বিচারপতির রায়। হেদায়েতুল্লা তাঁর রায়ে বলেছেন, রাজারা যে ভাতা পেতেন সেটা তাঁদের নিজস্ব 'সম্পত্তি'। সুতরাং এই 'সম্পত্তি' যদি সরকার নিয়ে নিতে চান তাহলে রাজাদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এই রায়ের পর সংসদে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে রাজন্য ভাতা বিলোপের নীতিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; "যথাযোগ্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা" নিয়ে এই রাজন্যভাতা এবং রাজাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা বিলোপ করা হবেই।

"যথাযোগ্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা" বলতে প্রধানমন্ত্রী কী বোঝেন তা অবশ্য ব্যাখ্যা করা হয়নি। একটা পন্থা ভূপেশ গুপ্ত প্রভৃতি সুপারিশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সংবিধান সংশোধনের জন্য লোকসভায় আবার একটা বিল আনা হোক এবং সংবিধানে রাজাদের জন্য যে বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে তা তুলে দেওয়া হোক।

এই পথেই সরকার প্রথম এগিয়েছিলেন। লোকসভায় সেই বিল প্রয়োজনীয় সমর্থনও পেয়েছিল। কিন্তু রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় ভোট পেল না। তাই সে বিল বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তারপরই এসেছিল রাজন্যভাতা বিলোপ করে রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক হুকুম। সেই হুকুমই সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দিলেন।

ক'মাস পরে অবশ্য সরকার সংসদে আবার এই সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব আনতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেজন্য প্রয়োজনীয় ভোট পাবেন কিনা? দিল্লির পর্যবেক্ষকরা বলছেন, না, তা আর সম্ভব নয়। লোকসভায়ও আর এই রকমের কোনও সংবিধান সংশোধন বিলের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁদের মতে, বর্তমান লোকসভার সদস্যদের শক্তি দিয়ে সংবিধান সংশোধন করে রাজন্যভাতা বিলোপ সম্ভব নয়। তা করতে হলে নতুন লোকসভা প্রয়োজন—যেখানে রাজন্যভাতা বিলোপের প্রস্তাবের সমর্থকদের বেশী করে জিতে আসা প্রয়োজন।

রাজাদের ভাতা এবং সুযোগ সুবিধা লোপ করার জন্যই প্রধানমন্ত্রী লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন করবেন, এটা অনুমান করলে অবশ্য ভুল করা হবে। প্রধানমন্ত্রী যদি '৭১-এই লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন করেন তাহলে সেটা করবেন তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রয়োজনে—লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার অধিকার অর্জনের জন্যই। প্রধানমন্ত্রী দেখবেন, '৭২-এর জন্য অপেক্ষা করা ভাল, না ১৯৭১-এ অন্তর্বর্তী নির্বাচন করলে তাঁর জয়ের সম্ভাবনা বেশী। লোকসভা ভেঙে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী অন্তর্বর্তী নির্বাচন সুপারিশ করলে এই বিচারেই করবেন।

সুতরাং নির্বাচন '৭১-এ হবে, না '৭২-এ হবে এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে বিচার করে দেখতে হবে কোনটা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সুবিধাজনক কবে নির্বাচন করা তাঁর স্বার্থের অনুকূল। সেই বিচারেই তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

'৭১-এ নির্বাচন অনুষ্ঠান অর্থাৎ লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পক্ষে যে

যুক্তিটা সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরা হচ্ছে তা হল এই যে, রাজ্যগুলির নির্বাচনের সঙ্গে লোকসভার নির্বাচন করলে তখন ভোটদাতার সামনে নানা প্রশ্ন এসে যাবে। সরাসরি শুধু লোকসভার প্রশ্ন, ইন্দিরা গান্ধীর প্রশ্ন আসবে না। তাতে লোকসভার জন্য নব কংগ্রেসের ভোট কমে যাবে।

এ যুক্তিতে নিশ্চয়ই কিছুটা সার আছে। রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভার ভোট এক সঙ্গে হলে ভোটদাতাদের সামনে রাজ্য বিধানসভার প্রশ্নই মুখ্য হয়ে ওঠে। কারণ সরাসরিভাবে যে কোনও ভোটদাতা রাজ্যের সরকার নিয়েই বেশী মাথা ঘামান। আবার বিধানসভা এবং লোকসভার প্রশ্ন আলাদা আলাদা করে বিচার করেও ভোট দেন খুব কম লোক। এক সঙ্গে ভোট হলে সাধারণ ভোটদাতা বিধানসভায় যে দলকে ভোট দেন লোকসভায়ও সেই দলকেই সমর্থন করেন।

'৭২ সনে সব রাজ্যে অবশ্য ভোট হওয়ার কথা নয়। তবে নব কংগ্রেসের কতকগুলি শক্ত ঘাঁটিতে '৭২ সনে ভোট হবেই। যেমন, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, রাজস্থান প্রভৃতি। ওই সময় লোকসভার নির্বাচন হলে এইসব রাজ্যে বিধানসভার প্রশ্নই প্রধান হয়ে উঠবে। ১৯৬৭ সনে যেমন মাদ্রাজ, ওড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধিতার একটা বন্যা বয়ে গিয়েছিল অনেকে আশঙ্কা করছেন তেমনি নব কংগ্রেস বিরোধিতার বন্যা এবার ভাসিয়ে নেবে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যকে। তাই তাঁরা মনে করেন যদি বিধানসভা এবং লোকসভার নির্বাচন এক সঙ্গে হয় তাহলে তার ধাক্কা লোকসভার ওপরও পড়বে।

আর যদি এখনই লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয় তাহলে বিধানসভার নির্বাচন হবে শুধু পশ্চিমবঙ্গ এবং মণিপুরে। বিহারেও হতে পারে যদি ইতিমধ্যে সেখানে কোনও বিকল্প সরকার না হয়। অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলে তাই শুধু লোকসভার প্রশ্ন উঠবে, শুধু ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রশ্ন আসবে।

প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকরা অনেকেই মনে করেন, তিনি যদি বড় বড় কতকগুলি ইস্যু সামনে এনে এখনই নির্বাচনে নামেন তাহলে ভোটদাতাদের সামনে শুধু সেইসব প্রশ্নই আসবে। এর মধ্যে একটা ইস্যু হতে পারে রাজন্যভাতা বিলোপ। আরও কতকগুলি ইস্যু প্রধানমন্ত্রী আনতে পারেন। ভোটদাতাদের সামনে শুধু সেইসব প্রশ্ন আসবে এবং প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকরা স্থির নিশ্চিত, অধিকাংশ ভোটদাতা ইন্দিরা গান্ধীকেই সমর্থন করবেন।

*

প্রধানমন্ত্রীর কোন কোন সমর্থক অবশ্য উত্তর প্রদেশ ও বিহার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তাঁরা বলছেন, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের সরকার যদি প্রতিপক্ষের হাতে থাকে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে '৭১ সনে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। কারণ ওই দুটি রাজ্যেই মোট ১৪০টি লোকসভা আসন। আগামী লোকসভায় এই আসনগুলির মূল্য বিরাট।

কথাটা সত্য। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে প্রতিপক্ষের সরকার থাকলে প্রধানমন্ত্রী অন্তর্বর্তী নির্বাচন করতে সাহস পাবেন না। কারণ তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে সব পারটি কীভাবে দলগত স্বার্থে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করেন।

কিন্তু বিহারে প্রতিপক্ষের সরকার এখনও হয়নি। সেখানে একটি নব কংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটেছে। নব কংগ্রেস নতুন নেতার মুখমন্ত্রিত্বে আবার সেখানে সরকার গঠনের চেষ্টা করবেনই। যদি সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের উদ্যোগ আয়োজন চলবে। নিত্যানন্দ কাননগো, নেহাত বাধ্য না হলে বিহারে কিছুতেই সংযুক্ত বিধায়ক দলকে সরকার করতে দেবেন না। যদি বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসনই চলে তাহলে কার্যত প্রধানমন্ত্রীরই রাজত্ব চলবে।

আর উত্তর প্রদেশ। উত্তর প্রদেশের টি এন সিং সরকারের পতনের জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁর সমর্থকদের আশা, অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি সফল হবেনও।

যদি বিহার ও উত্তর প্রদেশে ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়ে যায় তাহলে ১৯৭১ সনে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর তেমন অসুবিধা থাকবে না।

*

এ সবই অবশ্য অন্য লোকের বিশ্লেষণ। আসল প্রশ্ন হল, প্রধানমন্ত্রীর বিশ্লেষণ কী? তিনি যেভাবে ভাবছেন বা ভাববেন নিশ্চয়ই সেইভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন।

দিল্লির খবরাখবর যাঁরা রাখেন তাঁরাও বলছেন, প্রধানমন্ত্রী লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনই চাইবেন। হয় মারচের শেষে, না হয় এপরিলের গোড়ায়। মাত্র ৪৫ দিন আগে নাকি তিনি লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন সুপারিশ করবেন। তারপর খুব দ্রুতগতিতে কতকগুলি ইস্যু দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রবল বেগে নির্বাচনী যুদ্ধে নামবেন —একেবারে জার্মান ব্লিৎসক্রিগের কায়দায়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিপক্ষের দলগুলিও সেইভাবেই প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের আশংকা প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ নির্বাচন ঘোষণা করে অন্য সবাইকে বিপর্যস্ত করতে চাইবেন। যাতে কেউ প্রস্তুত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ না পায়। তাই, তাঁরা সবাই প্রস্তুত হচ্ছেন। জোট বাঁধার কাজ, অর্থ সংগ্রহের অভিযান সবাই পুরোদমে শুরু করে দিয়েছেন। কেউ বোকা বনতে রাজী নন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রধান প্রতিপক্ষ আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র জোটও ধরে নিয়েছে '৭১-এই নির্বাচন হবে। তাঁরা সেইজন্যই এই জোট বাঁধার কাজটা খুব দ্রুত শেষ করে ফেলছেন।

তাঁদের প্রধান নির্বাচনী স্লোগান হবে কমিউনিস্ট বিরোধী। তাঁরা বলবেন, প্রধানমন্ত্রী কমিউনিস্টদের প্রতি দুর্বল বলেই পশ্চিমবঙ্গ গোল্লায় গিয়েছে। তাঁরা আরও বলতে চান, এই প্রধানমন্ত্রীর হাতে যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে গোটা ভারতেরও পশ্চিমবঙ্গের দশা হবে। তাই, তাঁরা সারা ভারতের ভোটদাতাদের কাছে আবেদন রাখতে চান : ইন্দিরা গান্ধীকে হটাও, না হলে আজ পশ্চিমবঙ্গে যা হচ্ছে কাল অন্যান্য রাজ্যে তাই হবে।

১৯৭১ সনে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলে বিরোধীরা অনেকেই গোটা দেশে পশ্চিমবঙ্গকে প্রধান ইস্যু করতে চাইবেন।

২০-১২-৭০

নবারুণ গুপ্ত

পেটের দায়ে

দেবরাজ

পূব ইওরোপের দেশগুলোর মধ্যে শিল্প-প্রধান হচ্ছে পূবে জার্মানি আর চেকোস্লোভাকিয়া। বাকী সবাই কৃষিপ্রধান, শিল্পে তারা অনেক পেছিয়ে। তাদের মধ্যে পোল্যাণ্ডের অবস্থা কোনও দিক দিয়েই ভালো নয়, না শিল্পে, না চাষবাসে। ফসলের প্রাচুর্য কোনও দিনই সে দেশে ছিল না। কাজেই খাবার দাবারের অভাব পোল্যাণ্ডে অনেক দিনের। তা নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জুতও হয়েছে মাঝে মাঝে। বছর চোদ্দ আগে রীতিমত দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল পোল্যাণ্ডের [illegible] দাঙ্গায় গোটা দেশটা কেঁপে উ[illegible]সে যাবার উপক্রম হয়েছিল সম[illegible] রাষ্ট্রের শক্ত ভিত। অনেক কষ্ট করে সে ধাক্কা সামলেছিল পোল্যাণ্ডের কম্যুনিস্ট পার্টি। তবে তার দামও দিতে হয়েছিল দলকে। পুরোনো নেতাদের সরিয়ে দিয়ে দলের নতুন নেতারা হাল ধরেছিলেন পার্টিতে, সরকারেরও। তখন পোল্যাণ্ডের কম্যুনিস্ট দলের প্রধান হন ভ্লাদিস্লাভ গোমুলকা। ১৯৫৬ সন থেকে তিনি সে দেশের ভাগ্যবিধাতা। কম্যুনিস্ট দুনিয়ার প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে ছিল তাঁর আসন। মোটের ওপর দেশটাকে তিনি চালাচ্ছিলেন ভালোই। তাঁকেও শনিতে ধরেছে। তিনি পার্টির নেতার পদ ত্যাগ করেছেন। তাঁর সঙ্গে অপসারিত হয়েছেন আরও ৪জন পলিট-ব্যুরোর সদস্য। এদের ভেতর আছেন বোলেস্লভ জাসজুক। যিনি জিনিসপত্রের দাম বাড়াবার জন্য দায়ী।

বালটিক সাগরের উপকূলে গদান্‌স্‌কা, জিডিনিয়া আর সোপোট শহরে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যেন প্রলয় কাণ্ড হয়ে গেছে। সংঘাতিক দাঙ্গা বেধেছিল ওই তিনটি শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্রে। সে দাঙ্গা থামাতে কালঘাম ছুটে গেছে সরকারের। মিলিশিয়া ডেকেও তা সহজে থামানো যায়নি, জীবন আর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। লোক মারা গেছে, বাড়ি ঘর পুড়েছে, কলকারখানা হদ্দর তছনছ হয়েছে। সোজা কথায়, দাঙ্গা বাধলে যা অন্য দেশে হয়ে থাকে পোল্যাণ্ডেও তাই হয়েছে। দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে কম্যুনিস্ট আর অকম্যুনিস্ট দেশের মধ্যে বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। লোকে ক্ষেপে গিয়ে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই ভেঙে চুরমার করেছে। পুলিস, লাঠি কেন, গুলি চালিয়েও তাদের শায়েস্তা করতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছে। অবস্থা আয়ত্তে অবশ্য এসেছে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু থমথমে ভাব শহর অঞ্চলে যায়নি। অশান্তি যদি আবার দেখা দেয় অল্প দিনের মধ্যে তা হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ঢালাও হুকুম দিয়েছেন মিলিশিয়ার লোকদের যেমন করে হোক দাঙ্গা থামাতে, যারা হাঙ্গামা বাধাচ্ছে, আর গোলমাল করতে লোককে উস্কানি দিচ্ছে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে। যে সব শহরে অশান্তি ঘটেছিল সে সব শহরে কার্ফু জারি হয়েছে, লোককে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে রাস্তায় বেরিয়ে সরকারী হুকুম অগ্রাহ্য করে কেউ যদি বিক্ষোভ দেখায় তা হলে মিলিশিয়ার লোকেরা তাদের নির্বিচারে গুলি করে মারবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কিছু বিরুদ্ধবাদী লোক দেশের কোনও কোনও এলাকাতে অরাজকতা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করছে তারা সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করেছে, দোকানপাট নষ্ট করেছে, শহরে শহরে নিরীহ নাগরিকদের শান্ত জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করেছে। তাদের ক্ষমা করার কথা উঠতেই পারে না, এমন একটা আভাসও তিনি দিয়েছেন। ভয়ে শহর ছেড়ে অনেকে পালিয়েছে গাঁয়ে কিংবা অন্য কোনও এলাকায় যেখানে অবস্থা এখনও স্বাভাবিক না হলেও শান্ত। লোক যে কত মারা গিয়েছে তার কোনও সরকারী হিসেব দাখিল করা হয়নি। কাজেই মুখে মুখে অনেক কিছুই রটছে।

পোল্যাণ্ডের দাঙ্গা কিন্তু রাজনৈতিক নয়। বাইরে থেকে এর উস্কানি কেউ দিয়েছে এমন অভিযোগ শোনা যায়নি। আর দেবেই বা কে? পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যে পশ্চিম জার্মানির সীমান্ত নিয়ে এত-দিনের ঝগড়া তা তো মিটে গিয়েছে। এই সেদিন পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের যে সব এলাকা জার্মানরা মানচিত্রে দেখাতো পোলদের দখলে জার্মানির অঞ্চল বলে সেগুলোকে পোল্যাণ্ডের এলাকা বলেই দেখানো হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানির প্রধানমন্ত্রী ব্রাণ্ডট পোল্যাণ্ডের সঙ্গে হালে চুক্তি করেছেন দু দেশের সীমানা হচ্ছে ওডের আর নাইসে নদী বরাবর। ও দু নদীর ওপারে যে সব এলাকা বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানির অংশ ছিল তাদের ওপর দাবি চিরকালের জন্যে পশ্চিম জার্মানি ছেড়ে দিয়েছে। কাজেই সে দেশের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের ঝগড়াও মিটে গিয়েছে। দু দেশ এখন বন্ধু। পোল্যাণ্ডকে আর্থিক সাহায্য দিতে পশ্চিম জার্মানি এখন তৈরি। সে সাহায্য নিয়ে নিজের দেশের শিল্পের বনিয়াদ পাকা করবে এই হলো পোল্যাণ্ডের ইচ্ছে। পশ্চিম জার্মানি পোল্যাণ্ডে অশান্তি বাধাবার জন্যে চেষ্টা করবে আজকের নতুন পরিবেশে তা অসম্ভব।

পোল্যাণ্ডের দাঙ্গা কম্যুনিজমের উচ্ছেদের জন্যেও নয়, সোভিয়েট দেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবার জন্যেও নয়। দু বছর আগে অবশ্য রুশীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল পোল্যাণ্ডের ছাত্রছাত্রীরা। চেকোস্লোভাকিয়াতে যে কাণ্ড কারখানা রুশীরা করেছে, তার বিরুদ্ধে পোল ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এবারের দাঙ্গা কিন্তু তার জের নয়। এ আন্দোলন হচ্ছে নিছক অর্থনৈতিক। নিতান্তই পেটের দায়ে লোকে ক্ষেপে গিয়ে ওই কাণ্ড করেছে। ধরতে গেলে ১৯৫৬ই আবার ঘুরে এসেছে ১৯৭০-এ। সেবারেও হয়েছিল খাবার নিয়ে দাঙ্গা, এবারও তাই। চাষ বাসের অবস্থা ইদানীং পোল্যাণ্ডে আদৌ ভালো নয়। অজন্মা হয়েছে উপর্যুপরি দু বছর। খাবার জিনিসের দেশে দারুণ অভাব। কেবল গমের নয়, মাংসেরও। লম্বা লম্বা কিউ দিয়ে লোক খাবার জিনিস কিনছে। যোগানে টান বলে অনেক করেও সকলের বরাতে রুটি-মাংস জুটছে না, সবজিও মিলছে না। গেল বছর ১৫ লাখ টন গম আমদানি করেও কুলোতে পারা যায়নি। এবার দরকার ৫৫ লাখ টন। অত গম কোথা থেকে আসবে? কম্যুনিস্ট দুনিয়াতে এমন কোনও দেশ নেই যার এত বাড়তি গম আছে যে পোল্যাণ্ডের খাঁই মিটোতে পারে। পশ্চিমী দুনিয়া থেকে আনতে গেলে চাই টাকা। সে টাকা পোল্যাণ্ডের কোথায়?

পোল্যাণ্ড সরকার নেহাত নিরুপায় হয়েই খাবার-দাবারের দাম বাড়িয়েছেন গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে। দুটো পথ তাঁদের সামনে খোলা ছিল। এক রেশনিং করা, আর দাম বাড়ানো। শেষের পথটাই তাঁরা বেছে নিয়েছেন। তাঁরা চান টাকা বাঁচিয়ে সে টাকা কলকারখানা তৈরি করার কাজে লাগাতে। কাজেই পোল্যাণ্ড তাই করছে—যা টাকা জোগাড় করতে পারছে তাই দিয়ে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কিনছে, শিল্পের মালমশলা সরঞ্জাম কিনছে, দেশেও তাই বানাচ্ছে। ওতে খাবার আমদানি করার জন্যে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। রুটি-মাংসের দাম বাড়িয়ে পোল সরকার চেয়ে-ছিলেন অবস্থা আয়ত্তে আনতে। তার ফল হয়েছে উলটো। লোকে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়েছে সারা দেশে। যারা সে দক্ষযজ্ঞে মাতেনি তাদেরও সহানুভূতি সরকারের দিকে নয়, যারা দাঙ্গা বাধাচ্ছে তাদের দিকেই। খিদের কষ্ট সইতে তারা রাজী নয়—আখেরে তাদের আর তাদের নাতিনাতনিদের ভালো হবে এ প্রতিশ্রুতিতে তারা আর তুষ্ট নয়।

ভীষণ খারাপ

হেনা হালদার

বুকের কপাটে কান পেতে কপটতা খোঁজা
ভীষণ খারাপ!
চোখের গরলে চোখ ডুবিয়ে তরল সুখ
তুলে আনা পাপ।

কে [illegible] নগাছে জড়ানো সাপের মত
নিশ্চিন্ত আরামে
শরীরের ঝাঁপি খুলে পরশপাথরটাকে
বেচতে চড়া দামে?

খুচরো স্মৃতির শব্দ দু' হাতে বাজিয়ে কেউ
হৃদয় কি কেনে?
কতটুকু ওঠে হাতে সংলাপের ছাঁকনিতে
ভালবাসা ছেনে?

বিন [illegible] আড়লে পরলে
তুলবে [illegible] পাপ!
ঠোঁটের ধবল শ্বেতী লুকোনো রঙীন হাসি
ভীষণ খারাপ!

কোনও দিন স্বপ্নে, মধ্যরাতে

জয়োৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

অদূরে সীমান্তরেখা কাঁটা-তার তুলেছে আড়াল
ধাতব জুতোর শব্দ রাত্রিদিন শুধু জেগে থাকে
শাণিত ছুরির মুখে ঝলসে ওঠে ক্রোধ খর রোদে
উদাস দুপুরে একা নীলকণ্ঠ ফেরে ডেকে ডেকে।

পুরনো স্মৃতির ঝাঁপি তুলে রেখে মনের সিন্দুকে
আজও কেউ অন্যমনা হয়ে চলে আসে ইস্টিশানে
কে এল গঞ্জের থেকে, দুই চক্ষু খোঁজে চেনা মুখ
প্রশ্ন নিরুত্তর ফেরে, কে এসেছ ওপারের ট্রেনে!

গাঢ় অভিমান জমে, সহসা তোমার মুখ ভেসে ওঠে যেন
কেউ তো আসে না কিংবা চোরা-গোপ্তা দিয়ে কেউ আসে
মনের দুর্বার টানে। ভীষণ সন্ত্রাসে কাঁপে সীমান্তের মাটি
ঝলসে ওঠে অস্ত্র, হাওয়া বারুদের গন্ধ মেখে হাসে।

তুমি দূরদূরে, বক্ষে খোলা জানলায় চেয়ে থাক
তাই তো সীমান্তরেখা ভুলে ছুটে চলে যাই স্বপ্নে, মধ্যরাতে।

এক সন্ধ্যার পবিত্র পৃথিবী

অরুণ বসু

আমি যে-কোনো রমণীর মৃতদেহের কাছে
। গোলাপ-ফুল হাতে ছুটে যেতে চাই
স্তূপের মধ্যে ক্রমশ পুঁতে দিতে চাই
রজনীগন্ধার প্রতিটি পাপড়ি
ঘুমের মতো খুব ক্লান্ত-স্নায়ুতে
নারী ও ভালোবাসা এলে
আমি হাত তুলে জানাতে চাই
আমি ভালো আছি
শীতল-সাপকে আমি আগুনের পাশে
নিয়ে গিয়ে
চুম্বন ও সঙ্গমের মতো সুখ ও
উত্তাপ দিতে চাই
আমি চাই না ধানক্ষেতের মধ্যে অলৌকিক ও সুন্দর দিগন্ত
মানুষ ও পৃথিবীর গোপন-দুঃখের ভিতরে
খুব হাসাহাসি করুক
আমি চাই না তিনটে লাল-পিঁপড়ের বুকে
ত্রিগুণ ও ধৃতি-রূপ চোখ মেলে
ঈর্ষা করুক মানুষকে

আমি চাই না মায়া-স্বপ্নের মধ্যে নারী তার
চুল ও শরীর খুলে দিক
প্রিয়-পুরুষের প্রতি
আমি নিবিড়-অবসরে তরল-শিশুদের গীতিনাচ
দেখতে-দেখতে
ঝর্নার ভিতরে একসময় সুদূর ঘুমিয়ে পড়তে চাই
আমি চাই সুন্দরী ও মৃত-রমণীদের জন্য
এবার সঙ্ঘবদ্ধ হোক
পৃথিবীর
অনাবিল
ভ্রূণ ও মাংসের ভিতরে
বিশাল মমির মতো কোন ঝুলন্ত-গোলাপবাগান
যেখানে প্রতিটি ধ্বংস ও মৃত্যুর জন্য
শুধু প্রতিদিন অপেক্ষা করবে
মন্দার পুষ্পের মতো দুটি নির্লিপ্ত-চোখ ও প্রার্থনা
এক সন্ধ্যার
পবিত্র
পৃথিবী

নতুন ফর্মুলার সিরোলিনে ডি এম আর* রয়েছে যা বিশেষভাবে কাশির মূলস্থানে কাজে শুরু দেয়। তাই সিরোলিনে এত দ্রুত আরাম পাওয়া যায়।

যখনই আপনার মেয়ের কাশি শুরু হবে তখনি ওকে নতুন ফর্মুলার সিরোলিন খাইয়ে দেবেন। চেরীর মতো লাল সুস্বাদু ও সুগন্ধে ভরা মিষ্টি সিরোলিন খেতে ওর খুব ভাল লাগবে। দেখতে দেখতেই ও বিনা কষ্টে শ্বাস নেবে ও আবার খেলতে শুরু করবে।

কাশির সব ওষুধের মধ্যে নতুন ফর্মুলার সিরোলিন অদ্বিতীয়। এতে ব্যথা ও জ্বর সারাবার এমন ওষুধ রয়েছে যা জ্বরজ্বর-ভাব বা অসুস্থতা বোধও দূর করে। তাছাড়া, সিরোলিনে নিদ্রাউদ্রেককারী ও কোষ্ঠকাঠিণ্য সৃষ্টি করার মতো কোন ক্ষতিকর পদার্থ নেই।

কোন রকম ক্ষতি না করে সহজে দ্রুত কাশি সারাতে সিরোলিন এক মোক্ষম ওষুধ।

* ডেক্সট্রোমেথোরফান হাইড্রোব্রোমাইড

নতুন ফর্মুলার

সিরোলিন®

'রোশ'

'রোশ' এর উৎপাদন একমাত্র পরিবেশক: ভোল্টাস লিঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,
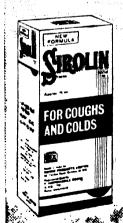
......পিতামহ ওঁর কবিতার বই-এর একটি পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়ে গেছেন প্রকাশের জন্য। ওঁর জীবৎকালে প্রকাশ করতে পারলাম না, এই দুঃখ আমাকে চিরদিন দহন করবে। তার থেকে একটি কবিতা আপনাকে পাঠালাম। আমার যত দূর ধারণা ও জ্ঞান—এটি অপ্রকাশিত। যদি সম্ভব হয় 'দেশ'-এ প্রকাশ করলে আনন্দিত হবো।

ভবদীয়

সুধেন্দু মল্লিক

ফুলের আশা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

শিথিল হতেছে বৃন্ত রে ফুল, লাগিতেছে ঝড় গাছে
আর দেরি নাই ঝরে পড়িবার সময় আসিছে কাছে।
কোথা সে বাহার কোথা পরিমল?
কোথা সরে গেছে মৌমাছিদল?
খসিয়া পড়েছে সঙ্গীরা তোর দিবসের খর আঁচে

ফোটা আর ঝরা—এই যাতায়াত চলেছে চিরন্তন
একটু আলোক একটু গন্ধ একটু আন্দোলন।
ফুল-জনমের পরিণতি এই
ইহার বেশী কি আর কিছু নেই?
বুকের ভিতর কে তবে বলিছে—আছে নিশ্চয় আছে!

আছে গন্ধের মণিমন্দির রূপের মহল ভাই
ভাগ্য যাহার সুপ্রসন্ন সেই লভে সেথা ঠাঁই।
সেই গন্ধেই সুরভিত সব
ভুবন ভরিয়া তারি উৎসব
সুন্দর যাহা গঠিত হতেছে—সেই সে রূপের ছাঁচে।

বিফল নহে কো এ এক সাধনা এই ফোটা এই ঝরা,
সেই হরি-পরিমণ্ডল লাগি নিজেকে যোগ্য করা।
আসিবে তোমার সে সুপ্রভাত
সে প্রেমময়ের হবে আঁখিপাত
যুগে যুগে যাহা সাধু ও সাধক ব্যাকুল কণ্ঠে যাচে।

একটি পুরাতন বকুলবৃক্ষ

সুশীল রায়

একদা একটি গান নিয়ে দেশের লোক বেশ বিভ্রমে পড়েছিল। গানটির কলির মধ্যে যে আবেদন কবি নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন, তার সুর সেই আবেদন অধিকতর নিপুণভাবে বহন করে এনে একেবারে পৌঁছে দেয় হৃদয়ের দরোজায়। সকলে তন্ময় হয়ে শুনতেন সেই গান। অনেকদিন আগের কথা আজ মনে পড়ে। তখন আমরা কলেজের ছাত্র। সন্ধ্যার পরে পড়ার বই নিয়ে বসেছি, হয়তো মনোযোগ দিয়ে পড়ব বলেই মনস্থ করেছিলাম, হঠাৎ পাশের বাড়িতে বেজে উঠল রেডিও, এবং বেজে উঠল একটি গান—

ওরে মাঝি, তরি হেথা বাঁধব না কো
আজকে সাঁঝে
ভিড়িয়ো না কো চলকে তরি
নদীর মাঝে

গানটি বেজে ওঠা মাত্র বই বন্ধ করে ছাদে গিয়ে কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ।

গান বন্ধ হল, তার অনেকক্ষণ পর বই খুললাম। গানের রেশ কানে লেগে ছিল অনেকক্ষণ ধরেই।

এই গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা ব'লেই অনেকের ধারণা ছিল। এই গানটি সেই সময়ে এতটা জনপ্রিয় ছিল যে, অনেকেই গুনগুন করে এই গান গাইতেন, ও ভাবতেন রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা করছেন। এমন চর্চা অবশ্য আমরাও যে করিনি, এমন নয়।

এই গানেরই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নাকি কুমুদরঞ্জনকে বলেছিলেন যে, লোকে বলছে ঐ গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা, অর্থাৎ কুমুদরঞ্জন তাঁর গান রবীন্দ্রনাথের উপর নাকি চাপিয়েছেন।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কানেও ঐ গানের কথাটি গিয়ে পৌঁছেছিল। তাই তাঁর পরিহাস করে বলা যে, কুমুদরঞ্জন তাঁর গান রবীন্দ্রনাথের উপর চাপিয়েছেন।

একথা শুনে কুমুদরঞ্জন অবশ্যই গর্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু সংকুচিত হয়েছিলেন নিশ্চয় ততোধিক। যিনি প্রকৃতিতে সহজ

কবি কুমুদরঞ্জন

সরল ও নম্র, তাঁর পক্ষে গর্বিত হয়ে ওঠা সম্ভব নয়, সংকুচিত হওয়াই অবশ্য স্বাভাবিক।

পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতিই ছিল তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু। পল্লীজীবনের পালাবদল আছে, পল্লীপ্রকৃতির রূপপরিবর্তন আছে, ঋতুতে-ঋতুতে তার রীতির ইতরবিশেষ ঘটে। কিন্তু যে জিনিস কখনো ঘটে না তাকে বলা যেতে পারে sophistication; কুমুদরঞ্জন ছিলেন সেই রকম অকৃত্রিম কবি, প্রাকৃতিক কবি ও প্রকৃতির কবি। নিসর্গই ছিল তাঁর কাছে স্বর্গতুল্য। সেইজন্যে গ্রামজীবনকে তিনি আপনজন ও আপনজীবন বলে গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই জীবনকেই তিনি বেষ্টন করে ছিলেন, অথবা সেই জীবনই তাঁকে বেষ্টন করে ছিল। চন্দন গাছের সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অজগর যেমন সেই গাছ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে, মধুপ যেমন ফুলের মধুহ্রদে ডুব দেয়—এও বুঝি অনেকটা সেইভাবে জড়িয়ে থাকা, সেইভাবে ডুবে থাকা।

পল্লীজীবনই তাঁর জীবন ছিল বটে, কিন্তু পল্লীকবি বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি কুমুদরঞ্জন সে রকম কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন কবি, তিনি ছিলেন পল্লীপ্রাণ কবি।

তাঁর নিজের কথাতেই বলি, "প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাই প্রথম আমার চক্ষে কবিতার রূপে প্রকাশ করিয়া দেয়।"

জহুরিই নাকি জহর চেনে। কিশোরবয়সেই তিনি কবিতার রূপের প্রকাশ পেলেন ঐ বিদেশী কবির রচনায়। তাঁর মনের তন্ত্রী যে সুরে বাঁধা ছিল কুমুদরঞ্জন সেই সুরের ঝংকার পেলেন ঐ রচনায়। তাঁর মনের তন্ত্রীও বেজে উঠল। ওয়ার্ডসওয়ার্থও পল্লীকবি নিশ্চয় ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি—প্রকৃতি তাঁর কাছে প্রাণহীন কোনো কল্পনা ছিল না, প্রাণবান চেতনার মত কবির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরে বেড়াত।

কুমুদরঞ্জনও ছিলেন অনুরূপ স্বভাবের ও অনুরূপ প্রকৃতির কবি। যাঁরা তাঁকে প্রাচীন বলেন তাঁরা ঠিক কথাই বলেন, কুমুদরঞ্জন প্রাচীন হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁকে অপাঙক্তেয় বলেন, তাঁরাও হয়তো ঠিক কথাই বলেন, কেননা তাঁদের সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের পঙক্তিভোজন সম্ভব নয়। কুমুদরঞ্জন ছিলেন কবি, কেবলমাত্র কবি, শুধুমাত্র কবি, এবং কবি ছাড়া কিছু না। অনেকটা সেই "আমি কেহ নই, আমি শুধু এক কবি"-গোছের।

পরিণত বয়সেই তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। ৮৮ বৎসর বয়সে। জন্ম ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১৮ ফাল্গুন (১৮৮২ খৃীষ্টাব্দের ৩ মার্চ) মৃত্যু ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ২৮ অগ্রহায়ণ (১৯৭০ খৃীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর)।

কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় একটি সাহিত্যসভায়। কুমুদরঞ্জন ছিলেন ঐ সভার সভাপতি, প্রধান-অতিথি ছিলেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আমি উপস্থিত ছিলাম অন্যতম বক্তা রূপে। আমি তাঁর পাশে বসে তাঁর সঙ্গে দু-একটি কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু যখন একজন বক্তা কিছু বলছেন তখন

সভায় একটু গোলমাল হচ্ছিল। বক্তা-মহাশয়ের কথা কেউ বুঝি শুনতে পাচ্ছেন না ভেবে কুমুদরঞ্জন যেভাবে বিচলিত বিব্রত ব্যথিত হয়ে উঠলেন, সকলকে চুপ করাবার জন্যে যেভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাতেই যেন ফুটে উঠেছে তাঁর চরিত্রটি, তাঁর সেই মুখের ভাবটি দেখেই স্পষ্ট চিনতে পারা গেল সেই অকৃত্রিম মানুষটিকে। এই আন্তরিকতা ও এই দায়িত্ববোধ তিনি সভাপতিরূপে অবশ্যই দেখাননি, তিনি দেখিয়েছেন একজন ব্যক্তিরূপেই। এবং এইটেই তাঁর ব্যক্তিত্ব।

সভা হল নিস্তব্ধ বটেই, এই সহজ ব্যক্তিত্বটি সভাকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল বলেই এটা সম্ভব হল।

রচনার মধ্যে যেটা স্টাইল, সেটি নাকি রচয়িতার ব্যক্তিত্ব। কুমুদরঞ্জনের এই যে ব্যক্তিত্ব এইটেই তাঁর রচনার মূলধন, এবং এইটেই তাঁর স্টাইল। এই কারণেই তাঁর রচনার প্রভাব পাঠকমনে কাজ করেই। কথার ফুলঝুরি দিয়ে তাঁর কবিতা নয়, তাঁর কবিতা কথার ঝরনা দিয়ে। তিনি মন মাতোয়ারা করতে জানতেন না, তিনি মন মাত্‌ করতে জানতেন।

তরুবরে হয় না স্মরণ,
কুসুমটি তার ভুলতে নারি:
ভুলতে পারি হোলির দিবস,
ফাগের দাগ যে ভুলতে নারি।

ক্ষুদ্র যে কখনো তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্রের মধ্যেও যে মন-কাড়বার ষড়যন্ত্র আছে কুমুদরঞ্জন এই কথাই প্রকাশ করেছেন ঐ কবিতায়। এ তো অতি সংগত কথাই। আয়তনে বৃহৎ হলেই প্রয়োজনেও যে তার দাবি বেশি—সব সময় এমন নাও হতে পারে। একথা অন্যভাবেও বলা যেতে পারে, যেমন—

স্থান-বিশেষে সবার বড়
ছোটর দাবিখানি
ছোট্ট-চোখের-তারার 'পরে
পড়লে ছোটছানি

কিন্তু কবি কুমুদরঞ্জন এই কথাই বলেছেন অন্যভাবে, সম্ভবত আরও সহজ ও সুন্দর-ভাবে।

অজয় আর কুনুর নদী যেখানে সংগত হয়েছে সেই কোগ্রামে সাধকের মতন বসে বাংলাদেশের এই বাঙালী কবি দীর্ঘজীবন ধরে কাব্যের সাধনা করে গিয়েছেন। এই অঞ্চলটিই সাধনার যেন পীঠস্থান। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, কাশীরাম, জ্ঞান দাস, দাশরথি রায় প্রভৃতি কবির আবির্ভাব এখানেই। তাই মনে হয় এ মাটির প্রত্যেক একটু গুণ বুঝি আছে। কুমুদরঞ্জন সেই মাটির রস আহরণ করে নিজেকে রসসিক্ত করেছেন, এবং এইজন্যেই তাঁর কাব্যে আমরা অন্যান্য রসের সঙ্গে ভক্তি-রসেরও স্বাদ লাভ করি। দেশের সঙ্গে এবং দেশের মাটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল বলেই ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাও তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে।—

বাঙালী জাতিই বাঁচাইবে এ ভুবন
রণমুখী নয়, হরিমুখী করি মন।

এ বিশ্বাস তাঁর ছিল বলেই তিনি দৃপ্তকণ্ঠ-ভাবে বাঙালী জাতির প্রতি পূর্ণ আস্থার কথা বলতে পেরেছেন।

সংক্ষেপে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, গ্রামের পাঠশালায় তাঁর হাতে-খড়ি হয়। তারপর ভর্তি হন কলকাতার স্কুলে এবং রিপন কলেজ (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে ১৯০৫ সালে বি-এ পাশ করেন এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক' পান। এরপর আত্মনিয়োগ করেন শিক্ষকতায়।

অল্পবয়সেই কুমুদরঞ্জনের কাব্যচর্চার আরম্ভ। গ্রামের যাত্রা, ফকিরের গান, রাখালদের গান তাঁকে আকর্ষণ করত। বাড়িতে রামায়ণ-মহাভারত-হরিকথা পাঠ হত—তাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। বৈষ্ণব কবিদের কবিতা তাঁর বেশ প্রিয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় ১৯০১ সালে। তিনি তখন ছাত্র। এর পরেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। শান্তিনিকেতনেও তিনি গিয়েছেন সেই রবীন্দ্রপ্রতিভার দীপ্তি যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল সেই সময়ে বঙ্গসাহিত্যে কুমুদরঞ্জনের আবির্ভাব। সেই দীপ্তিতে সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বে পাঠকবর্গ কুমুদরঞ্জনের কাব্যের প্রতি প্রীতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পেরেছেন, কুমুদরঞ্জনের স্বকীয়তা এর দ্বারাই স্বীকৃত বা যায়। রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ, রবীন্দ্রকাব্যে অনুরক্ত-ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রক

প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। কুমুদরঞ্জনের কাব্যের ধ্বনিই আলাদা, সুরই পৃথক। কিন্তু এক জায়গায় উভয়ে এক ছিলেন, শুধু ভঙ্গি দিয়ে লোককে ভুলাবার পথ এঁদের ছিল না। এই জন্যেই এঁদের কবিতা ছিল আসল কবিতা। 'কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় কবি কালিদাস রায় যে কথা বলেছেন, সে কথাই বুঝি ঠিক, তিনি বলেছেন—

"কুমুদরঞ্জন বিশ্বকবি নহেন, বাংলারই আসল কবি।"

কুমুদরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতদল' ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। পরে 'উজানী' 'নূপুর' 'বনতুলসী' 'একতারা' 'বীথি' 'বনমল্লিকা' 'তূণীর' 'রজনীগন্ধা' 'অজয়' 'স্বর্ণসন্ধ্যা' প্রভৃতির গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার পরিচয় ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে।

তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কুমুদরঞ্জনকে জগত্তারিণী পদক দান করেন, ১৯৬১ সালে অর্থাৎ রবীন্দ্র জন্মশতপূর্তির বছরে কুমুদরঞ্জন আনন্দ পুরস্কার পান।

কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ যে পুরস্কার তাও লাভ করেছেন কুমুদরঞ্জন। তিনি দেশের মানুষের ভক্তিপ্রীতির পুষ্পমালিকা পেয়েছেন। এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা প্রকৃত কোনো কবির থাকে না। তাঁর কাছে কবিতাই ছিল জীবন, গ্রামই ছিল প্রাণ। তা তিনি স্বীকার করেছেন, এই ছত্র-কয়টির মধ্যেই আছে সেই স্বীকৃতি

তোমারে যে আমি ভালোবাসিয়াছি
কাব্য পড়িয়া নহে
নয়কো শ্যামল স্নেহের লাগিয়া
অন্যে যে কথা কহে,
হয়েছি তোমার সুখদুখভাগী
নয় তো নেহাত অভাবের লাগি'
আমার ভক্তি এ অনুরক্তি
বুকের রক্তে বহে।

তাঁর এ পল্লীপিপাসা তাঁর কোনো বিলাস নয়, এইজন্যেই একজীবনে তাঁর আশা শেষ হয়নি, তিনি পুনরায় এই পল্লীতে ফিরে আসারই প্রার্থনা জানিয়েছেন—

ফিরে যদি জন্মাতে হয় এই করুণা চাই
এই গ্রামেতেই দিয়ো দয়াল ফিরে
আবার ঠাঁই।

আধুনিকতা নিয়ে একটু আস্ফালন ও আন্দোলন একালে আছে। কিন্তু কে আধুনিক? কেই-বা নয় আধুনিক? নিজ নিজ কালে—সেটা জীবৎকাল সব সময় না হতে পারে—সর্বকালেই সকলে আধুনিক। সর্বকালের সব কবিতাও তৎকালীন আধুনিক। অদ্য যা আধুনিক, আগামীকাল তা আধুনিক নয়। সুতরাং এই সামান্য বিষয় নিয়ে অসামান্য উত্তেজনা সংগত মনে হয় না। কুমুদরঞ্জন বর্তমান কালে আধুনিক নন, কিন্তু তাতে কী এসে গেল? কবিতা কবিতাই। কবিতার এই একমাত্র পরিচয়। অন্যকে সুতরাং বেশি গুরুত্ব না দিয়ে পদ্যকে গুরুত্ব দেওয়াই ভালো।—

Who can say
Why Today
Tomorrow will be Yesterday

এ জিজ্ঞাসার জবাব নেই। অতএব আমরা অযথাই এর উত্তর খোঁজবার জন্যে কালক্ষেপ না করলাম।

আমরা বলেছি প্রকৃতিই ছিল কুমুদরঞ্জনের প্রাণ, প্রকৃতিকে তিনি প্রাণবান চেতনা বলে মনে করতেন, যেন জীবন্ত কোনো প্রাণী। একটি পুরাতন বকুল-বৃক্ষের মৃত্যুতে তাঁর শোক তাই একটি জীবের মৃত্যুশোকরূপে প্রকাশিত দেখি—

পাঁচ শো বছর হেথায় ছিলে
প্রাচীন তরুরাজ
অজয় নদের স্রোতের ঘায়ে
পড়লে ভেঙে আজ।...
শিশু তুমি না হও, মোদের
বৃদ্ধ বকুল গাছ
বক্ষ ওঠে টনটনিয়ে
বিদায় নিলে আজ।

কুমুদরঞ্জনও বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তিনিও ঐ বকুল বৃক্ষের মতই বিদায় নিয়েছেন। বকুল বৃক্ষটির মতই তিনি তারকা-সদৃশ অনেক কাব্যকুসুম আমাদের দিয়ে গিয়েছেন—এইটুকুই আমাদের লাভ। সেই সৌরভই আমাদের সম্বল।

এই প্রবন্ধরচনায় শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'পূর্বপত্র' ও সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬ সংখ্যা থেকে কিছু কিছু তথ্য গৃহীত হয়েছে।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নেই আর আছে

'Here in death's dream kingdom
The Golden vision reappears
I see the eyes but not the tears—"

ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল শরদিন্দুর। শীত ঋতুর মত বিকেল বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে এসেছে। বাতাসও ভিজে ভিজে। যদিও শীতের এখনো কিছু দেরি। সবে কার্তিকের শেষ। দক্ষিণ কলকাতার শহরতলির বড় বড় গাছে শেষ বেলায় পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা লেগে আছে।

ট্রাম থেকে নেমে কেমন হকচকিয়ে গেল শরদিন্দু। তার বাড়ি ফেরার যে শান্ত রাস্তাটা কবরখানার গা ঘেঁষে এদিক-ওদিক বেঁকে গেছে, আজ তা বড় সরগরম।

সকালে কিছু ছিল না, এখন শরদিন্দুর মনে হল, এই রাস্তায় যেন মেলা বসে গেছে। দু' ধারে ছোট বড় চায়ের স্টল। ফুলের ঝাড়ি নিয়ে বসেছে অনেক লোক। কেউ কেউ বিক্রি করছে মোমবাতি, ফুলঝুরি আর অনেক রকম মালা।

খদ্দের আকর্ষণ করবার জন্যে এক সঙ্গে এই সব মানুষের ভাঙা গলার চিৎকার শরদিন্দুকে কোন মেলা কিম্বা প্রদর্শনীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ভিড় তো ছিলই। অজস্র এই রাস্তায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছিল গাড়ি ট্যাক্সি সাইকেল রিকশা এবং দেশী-বিদেশী নানা বয়েসের নারী ও পুরুষ।

রাস্তার মুখে থিমড়ে হয়ে দু'-এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল শরদিন্দু। পরে ভাবল, কোন 'গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল' জাতীয় কেউ বোধ হয় আসবে এ পাড়ায়—লাট-বেলাট কিম্বা কোন পার্টির মাতব্বর বক্তৃতা-টক্তৃতা দেবে হয়তো—কে জানে! এসব জানবার কোন কৌতূহল ছিল না তার।

হঠাৎ শরদিন্দু বিব্রত বোধ করল। সে ভুল জায়গায় এসে পড়েনি তো। মনের যেমন অবস্থা—এত অন্যমনস্ক সে থাকে আজকাল সব সময় যে দিগম্বরী তলার দিকে না এসে হেঁটে হেঁটে সোজা ক্যাওড়াতলার শ্মশান ঘাটে চলে যাওয়া তার পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়।

তবে আজ সে ঠিক জায়গায় ট্রাম থেকে নেমেছে। কাঁধ ঈষৎ ঝাঁকিয়ে হাবা একটা মানুষের মত আর একবার শরদিন্দু চার পাশে তাকিয়ে দেখল। আর সব এক রকমই আছে। সবাই তার খুব চেনা। পিছনে টার্ফ ক্লাবের উঁচু লম্বা পাঁচিল। বাঁ দিকে সরকারী

হাসপাতাল, পরিত্যক্ত রাজবাড়ির মত একটা ফিল্ম স্টুডিও। ডান দিকে ডাক্তার পোদ্দারের 'হসপিটাল কর্নার' আর তেওয়ারিজীর পেট্রল পাম্প। এসব ছাড়া খোলা ড্রেনের উৎকট গন্ধ তো আছেই।

"দুত্তোর!" রুক্ষ একটা শব্দ উচ্চারণ করে মনে মনে শরদিন্দু নিজেকেই বকাবকি করল। একটা ইডিয়ট—একটা রাস্কেল হয়ে যাচ্ছে সে। একটা গবেট, একটা শুয়োর, একটা —নিজের সম্পর্কে হঠাৎ এই রকম আর কোন বিশেষণ খুঁজে না পেয়ে শরদিন্দু তার চেনা রাস্তা ধরে চলতে গিয়ে সতর্ক হল। তাড়াহুড়ো করা যাবে না। ভিড় গাড়ি-ঘোড়া দোকানপাট রাস্তা জুড়ে আছে। এসব বাঁচিয়ে তাকে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে এগোতে হবে।

একটু এগিয়েই এই রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় কবরখানার খুব উঁচু আর বাঁকানো গেটটা চোখে পড়ল শরদিন্দুর। এবং এতক্ষণে আজকের এই হুড়োহুড়ির কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। সে একটা গবেটই হয়ে যাচ্ছে বটে।

একটু আস্তে হাঁটিতে হাঁটিতে শরদিন্দু ভাবল, ব্যাপারটা তার আগেই বোঝা উচিত ছিল। অগ্রহায়ণের ঠিক আগে আগে এই বিশেষ দিনে এই রকম ঘটা করে প্রত্যেক বছর ক্রীশ্চানরা কবরখানায় ঢোকে। মৃত আত্মীয়-আত্মীয়ার কবরে ফুল রাখে, মোমবাতি জ্বেলে দেয় এবং তাদের মনে করে প্রার্থনা-টার্থনাও করে হয়তো।

আলো আর নেই। হালকা অন্ধকার অল্প অল্প করে ঘন হয়ে উঠছে। মিষ্টি একটা গন্ধ খেলে বেড়াচ্ছে। রাস্তার এক পাশ থেকে কিছু দূরে কবরখানার ভিতরটা দেখতে পেল শরদিন্দু। এবং দেখতে দেখতে বিস্ময় মুগ্ধ এক দর্শকের মত তার মনে হল সে যেন সত্যজিৎ রায়ের ছবির অপূর্ব কোন দৃশ্য দেখছে।

শরদিন্দু দেখল, সারি সারি মোমবাতি জ্বলে উঠেছে। আলোর শিখা হাওয়ায় হেলছে, দুলছে। কুয়াশার ওপর পড়েছে সোনালী একটা আভা। বড় বড় গাছ এবং উঁচু উঁচু ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে এতদূরে থেকে প্রার্থনারত জীবন্ত মানুষগুলোকেও মনে হচ্ছে গ্রহান্তরের পুতুলের মত।

রাস্তার ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শরদিন্দু। পাশেই বাচ্চাদের ছোট পার্কের মত খানিকটা ঘেরা জায়গা। কয়েকটা বেঞ্চ, একটা ভাঙা স্লিপ—শরদিন্দু মুখ ফিরিয়ে দেখল। এবং নিজেকে তার বড় পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল বলে সে তার বাড়ির দিকে গেল না, নিচু রেলিঙ টপকে পার্কের ভিতরে এসে ভিজে ভিজে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল।

আজকাল হঠাৎ এক-এক সময় যেখানে-সেখানে এই রকম বসে পড়বার একটা জায়গার অভাব অনুভব করে শরদিন্দু। খুব অল্প সময় দাঁড়িয়ে থাকার পরই তার মনে হয়, হাত-পা—সব অবশ হয়ে আসছে। ক্লান্ত চোখে সে তাকায় এদিকে-ওদিকে বসবার একটু জায়গার আশায়। এমন কি, দু-একজন মানুষের ভাবভঙ্গী লক্ষ করে সে বোঝবার চেষ্টা করে তারা কাছাকাছি নামবে কি না।

আবার কোথাও অনেকক্ষণ বসে থাকার পরেও শরদিন্দু ভিতরে ভিতরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাথার মধ্যে প্রবল একটা চাপ—বুকে যন্ত্রণাকর এক অনুভূতি তাকে একটু বেশী সময়ের জন্যে কোথাও শান্তে বসে থাকতে দেয় না। হাত-পা গুটিয়ে স্থির হয়ে থাকবার চেষ্টা করলেও ভয়ঙ্কর একটা বেদনা, ব্যর্থতা ও হতাশা এবং উদ্ধত এক আক্রোশ আহত অশ্বের মত চার পায়ে লাথি মেরে মেরে তাকে বুঝিয়ে দেয় যে এ জীবন বড় দুর্বহ—এ জীবন শূন্য, অসার।

শরদিন্দু এখন বড় স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে যে এ জীবন তাকে আর কিছুই দেবে না। এবং আশ্চর্য, পার্থিব কোন কিছুর ওপর তার আকর্ষণও আর নেই। যদিও মৃত্যুর কথা সে ভাবতে পারে না, তবুও এই মরজগতে চলাফেরা করতে তার বেশ কষ্ট হয়। এক-এক সময় শরদিন্দুর মনে হয় সে এখন আর, সম্ভবত মানুষ নয়, সে হয়তো একটা প্রেত কিম্বা একটা শব। গুরুভার বহন করে করে সে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট। শরদিন্দু বেঁচে থাকার যন্ত্রণা বড় বেশী অনুভব করে।

বাচ্চাদের পার্কের অপরিচ্ছন্ন এক বেঞ্চে বসে সে পায়ের ওপর পা তুলল। তার পিছনেই অপ্রশস্ত একটা নালা, নোংরা জলের শব্দ হচ্ছিল। বস্তীর কয়েকটা ছেলেমেয়ে ভাঙা স্লিপে গড়াগড়ি খেতে খেতে বড় চেঁচামেচি করছিল। শরদিন্দুর ঠিক সামনে, রাস্তার ওপারে কচুরিপানা

ঠাসা একটা পুকুর। তার পাশেই বাস্তি আর ইঁটের স্তূপ। কাছাকাছি নতুন বাড়ি-টাড়ি উঠছে হয়তো—অন্ধকারে সে কিছু বুঝতে পারল না।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলেও তার ভিতরে-ভিতরে শেষ কার্তিকের ভিজে জ্যোৎস্না মিশে গিয়েছিল। শরদিন্দু মাথা তুলে দেখল চাঁদ-টাঁদ কিছু নেই। আকাশ একেবারে সাদা, কবরখানার মতই নির্জন। কিন্তু মোমবাতির মত কাঁপা-কাঁপা তারা একটাও নেই।

কবরখানার দিকে আর একবার তাকিয়ে শরদিন্দুর মনে হল একটা আলোর ক্ষেত্র তার খুব কাছেই হঠাৎ যেন ভেসে উঠেছে। এখনও কিছু কিছু মানুষ ওদিকে যাচ্ছিল, অনেকে বেরিয়েও আসছিল। মৃত আত্মীয়-আত্মীয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে বলে তারা বেশ প্রফুল্ল, যেন বড় চরিতার্থ হয়ে একটা উত্তেজনার ঘোরে খুব জোরে জোরে হাঁটছে।

কিছু বাইরের ধোঁয়ায়, কিছু ভিতরের ঈর্ষায় চোখ ছোট হল শরদিন্দুর। মুখও কঠিন হল। তার গোটা দেহটাই যেন বড় খসখসে, বড় রুক্ষ হয়ে উঠল। তৃপ্ত, প্রফুল্ল মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে সে ভাববার চেষ্টা করল, যারা মৃত, যারা আর নেই এখন এই রকম ঘটা করে তাদের ডাকাডাকি করলে আসলে কী লাভ হবে আমার? আমার মুখেও কি তৃপ্তির এমন একটা আভা খেলবে, হাসি ফুটবে? আমিও কি আবার এইসব জ্যান্ত মানুষের মত বেঁচে থাকার নেশায় মশগুল হতে পারব?

শরদিন্দুর মুখ থেকে অতর্কিতে বিরক্তির একটা শব্দ বেরিয়ে এল। সে বড় স্পষ্ট করে অনুভব করল তার মনে বিদ্বেষ ছাড়া যেন আর কোন অনুভূতিই নেই। তার পরিবারের কাউকে স্মরণ করা তার পক্ষে বড় কঠিন।

কাঠের অপরিষ্কার বেঞ্চের ওপর কাঠ হয়ে বসে থাকল শরদিন্দু। তার চোখ কচুরিপানায় ঠাসা ঝাপসা পুকুরের দিকে স্থির হয়ে ছিল। তার গায়ে হাতে পায়ে—সব জায়গায় ক্লান্তি সেঁটেছিল। খিদে ছিল শরদিন্দুর, খাবার ইচ্ছে ছিল না। তার গলায় তৃষ্ণা ঠেলে উঠছিল। একটু দূরেই চায়ের ছোট ছোট স্টল। শরদিন্দু সেদিকে তাকিয়ে থাকল করুণ চোখে একটা ভিখিরির মত। সে বুঝল তার এখন অতটা হেঁটে যাবার ক্ষমতা নেই।

এদিকটা একেবারে ফাঁকা বলে শীতের ছোঁয়ায় বাতাস অবাধে ধারালো হয়ে উঠছিল। আলোর বালব্ ঘিরে সবুজ পোকারা জড়ো হচ্ছিল। বাতাসে ওষুধের গন্ধ—শরদিন্দুর কাছাকাছি হাসপাতালটার কথা মনে পড়ে গেল। এবং একটা কঠিন যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে সে অনুভব করল তারও মনে আলোর একটা ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

শরদিন্দুর মুখ প্রফুল্ল হল না, মন প্রফুল্ল হল না—বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছেও জাগল না। তবুও তার মনের ভিতরে যে আলোর ক্ষেত্র ছিল তা দপদপ করতে থাকল। শরদিন্দু বিকৃত স্বরে আতিঙ্ক একটা মানুষের মত বলে উঠতে চাইল, কোথায়—কোথায় তারা।

রাস্তাটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মেলা ভেঙে যাচ্ছে। এদিকের সব আলো

হঠাৎ এক সঙ্গে নিভে গেল। পোকা পড়তে লাগল শরদিন্দুর চোখে, মুখে, মাথায়। সে হাত-পা নাড়ল, ছটফট করল। পরে এইসব উপদ্রব আর গ্রাহ্য করল না।

তন্দ্রার মত একটা ঘোরে লম্বা-লম্বা নিশ্বাস পড়ছিল শরদিন্দুর। সে বেশ অবাক হয়ে ভাবছিল তার মন যেন এই মুহূর্তে অন্যরকম হয়ে গেছে। যে মন রাস্তার কুকুরের মত কোথাও স্থির হয়ে আর বসে না—এদিক-ওদিক শুধু ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়—এখন আলোর ক্ষেত্রের সামনে তা একেবারে স্থির—শরদিন্দুর বড় বাধ্য।

এত পরে একটা সিগ্রেট ধরাল শরদিন্দু। অন্ধকার। জ্যোৎস্নাও বড় ফিকে। দূরে অসংখ্য মোমবাতি এখনও মিটমিট করছে। সেদিকে আর তাকাল না শরদিন্দু। তার দেশলাই মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সে তাও তুলল না। সিগ্রেটের আগুনের দিকটা মুখের কাছে তুলে খুব মনযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শরদিন্দু দেখল। দেখল, ছাই আর আগুন বড় অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে আছে। এবং তা দেখতে দেখতে মধুর এক ভাবনার ভিতরে সে তলিয়ে যাচ্ছিল।

শরদিন্দুর মনে হচ্ছিল ট্যাক্সিটা বড় আস্তে চলছে। বিরক্ত হয়ে এক-একবার সে সামনে ঝুঁকে পড়ছিল—ভাবছিল, ড্রাইভারকে বলবে, সর্দারজি জলদি—বহুৎ জলদি। সদ্য কেনা একটা হারমোনিয়ম ছিল তার পাশেই, নতুন পালিশের গন্ধ উঠছিল। হারমোনিয়মের ওপর যেন বড় স্নেহভরে একটা হাত রেখেছিল শরদিন্দু।

অফিস থেকে রোজ সোজা বাড়ি পৌঁছয়, আজ কিছু কেনাকাটা ছিল বলে সে পৌঁছল অনেক পরে।

গ্রীষ্মের প্রথম অন্ধকার ঝিরঝির করছে। শরদিন্দু দেখল একটা আইসক্রীমওলা একদিকে হলদে গাড়ি রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

ঘামে গলা ভিজে উঠেছে শরদিন্দুর। ছেলেমানুষের মত একটা উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছিল। কাঁপা-কাঁপা হাতে কোনরকমে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে মাটিতে পা দেওয়ার আগেই শরদিন্দু চিৎকার করে ডাকল, "রাধারানী, স্বপন—" এবং শুনল তার ছেলে ও মেয়ের উল্লাসের স্বর, "বাবা! ওমা, বাবা এসেছে।"

দোতলা থেকে হুড়মুড় করে নিচে নেমে এল রাধারানী আর স্বপন। শরদিন্দুকে দেখে প্রথমে ওরা থমকে গেল। সে তখন ভারী হারমোনিয়ম সাবধানে ধরে আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে আসছিল।

"ও বাবা, এটা কী?"

রাধারানী খুশী-খুশী মুখে স্বপনকে মৃদু তিরস্কারের মত বলল, "জানিস না বোকা, ওটা আমার হারমোনিয়ম।"

"আমিও বাজাব। দিদি, আমায় বাজাতে দিবি না?"

"তুই জানিস বাজাতে? ভাগ, ছুঁতেও দেব না তোকে।"

দোতলায় শরদিন্দুর ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল। মমতাও এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। রাধারানীর কথা শুনে সে ঈষৎ ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "ছোট ভাই-এর সঙ্গে ওরকম খিটখিট করতে কতবার তোকে বারণ করেছি রাধা!"

মমতার দিকে তাকিয়ে হাসল শরদিন্দু, "রাধারানীর জন্যে কিনেই ফেললাম আজ—"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি—" শরদিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে বসবার ঘরে এল মমতা, আলোর সুইচ টিপে বলল, "একসঙ্গে দাম দিলে?"

"না, আস্তে আস্তে দেব—" হারমোনিয়মটা গোল একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে পকেট থেকে রুমাল টেনে নিয়ে শরদিন্দু গলা ও কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "মুখ কালো হয়ে গেল যে? দেখ দেখ মমতা, ছেলেমেয়েরা কী খুশী হয়েছে!"

"তা-ও দেখছি। কিন্তু এটা আর কয়েক মাস পরে কিনলে হত না? এত অবুঝ হলে চলে!"

"কিনব-কিনব করে তো এক বছর কেটে গেল—" শরদিন্দু মমতার রাগ-রাগ মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে খুশী করবার চেষ্টায় হালকা স্বরে বলল, "রাধার তো আর তোমার মত ধৈর্য নেই, আর দেরি করলে বাপের ওপর ও ভীষণ ক্ষেপে যেত।"

"সেই ভয়ে মরলে তুমি!" মমতা বোধ হয় এবার হাসল, "নিজের যা সবচেয়ে বেশী দরকার—এক জোড়া জুতো কিনতে তোমার আর টাকা থাকে না—"
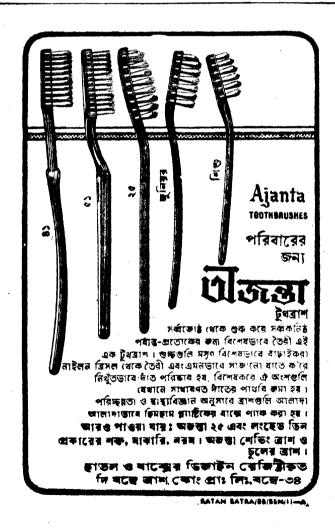
"ও, জুতো! হবে খন। এ মাসেই কিনে ফেলব ঠিক।"

মমতা আর দাঁড়িয়ে থাকল না, শরদিন্দুর চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল। মা-বাবার কথায় মন ছিল না রাধারানীর, সে রীড টিপে-টিপে প্রথমে হারমোনিয়ম পরীক্ষা করে দেখল, পরে আপনমনেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা সুর বাজাল। স্বপন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, হারমোনিয়মটা দিদির সামনে ছুঁতে সাহস পেল না। ভাবল, দিদি উঠে গেলে সে-ও বাজাবে।

শরদিন্দু তাকে লক্ষ করল। মুখ বড় করুণ হয়ে এসেছে স্বপনের। শরদিন্দু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, "তোর কী চাই বল? কাল ঠিক এনে দেব।"

"দিদির মত হারমোনিয়ম আমাকে এনে দেবে?"

"তোর মত ছোট ছেলে হারমোনিয়ম বাজায় নাকি? তোর জন্যে একটা সুন্দর ছবির বই নিয়ে আসব।"

"আমাকে একটা বই-এর আলমারি কিনে দেবে বাবা?"

"হ্যাঁ, দেব।"

শরদিন্দুর গালে একটা হাত রেখে বড় খুশী হয়ে স্বপন বলল, "তবে আমি হারমোনিয়ম চাই না। আমি বই লিখব বাবা। বই লিখে-লিখে আলমারিতে রাখব। আমাকে অনেক আলমারি কিনে দেবে তো?"

শরদিন্দু স্বগতোক্তি করার মত বলল, "মাই ব্রিলিয়ান্ট বয়! তোকে আমি অনেক বই-এর আলমারি কিনে দেব স্বপন—যত চাস।"

শরদিন্দুর জন্যে খাবার সাজিয়ে তাকে ডাকছিল মমতা। সে তখন কোল থেকে স্বপনকে নামিয়ে দিল, আদরও করল—রাধারানীকে বলল একটা গান করতে। বাইরে থেকে এত পরে এলেও কোন ক্লান্তি ছিল না শরদিন্দুর। সে চোখে-মুখে অনেক জল দিল। পায়জামা পাঞ্জাবি পরল। পরে পরিচ্ছন্ন হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে খাবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মমতাকে দেখল।

তাকে দেখতে দেখতে এই ভরা সন্ধ্যায়ও সংগমের একটা ইচ্ছা জাগল শরদিন্দুর। ঘন ঘন সিগারেট টেনে সে তার সে-ইচ্ছা দমন করবার খুব চেষ্টা করছিল। নিটোল স্বাস্থ্য মমতার। তার দেহে যৌবন উথলে উঠেছে। গায়ের রঙ যদিও শ্যামলা, চোখ দুটো টানা-টানা, অদ্ভুত। সাদা শাড়ি পরেছে মমতা, নীল পাড়। তার কানে সোনার দুটো রিঙ ঝিকমিক করছে। তাকে দেখলে বাইরের লোক হঠাৎ রাধারানীর দিদি বলে ভুল করতে পারে।

সম্ভবত সিগারেটের গন্ধ পেয়ে মমতা শরদিন্দুর উপস্থিতি জানতে পারল এবং পিছন ফিরে বিরক্তিব অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলল, "দেখছ চা ভিজিয়েছি, এখন আবার সিগারেট ধরালে কোন বুদ্ধিতে?"

শরদিন্দু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল বাচ্চা চাকরটা কাছাকাছি আছে কিনা, পরে সে কয়েক পা এগিয়ে এসে মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বলল, "এটা ধরাবার দরকার ছিল, না ধরালে হয়তো স্থান কাল জ্ঞান থাকত না। যতই দিন যাচ্ছে তোমাকে ততই—"

মমতার চোখে কৃত্রিম শাসন ঠেলে উঠল, "সারাদিন ওই এক ভাবনা! মেয়ের কত বয়েস হল খেয়াল আছে?"

"মেয়ের বয়েস হয়েছে তো কী?"

"দু' দিন পরে বিয়ে দেবে, তারপর যদি—"

শরদিন্দু বাধা দিয়ে বলল, "মানে, বলতে চাও মা আর মেয়ের যদি একসঙ্গে বাচ্চা-টাচ্চা হয়—" সে হাসল, "হয় হবে। বাচ্চার শখ তো এখনো আছে তোমার, আর আমিও রীতিমত সবল—"

"থাম। রাধার বিয়ে দাও আগে, স্বপনটা মানুষ হোক। দুটোকে মানুষ করতেই হিমসিম খাচ্ছ—"

চেয়ারে বসে পড়ল শরদিন্দু। তার বেশ খিদেও পেয়েছিল। রোজকার মত আজও নতুন কিছু করেছে মমতা। শরদিন্দুর প্লেটে চিংড়ি মাছের গরম কাটলেট ছিল। শেষ হওয়ার আগেই সে সিগ্রেট নিবিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলল।

একটা কাটলেট ভাঙতে গিয়ে ইতস্তত করল শরদিন্দু, মুখ তুলে মমতাকে বলল, "রাধা আর স্বপনকে একটু ডাক তো—"

"না, কিছুতেই ডাকবে না। ওরা অনেক খেয়েছে।"

"তবে তুমি একটু খাও—"

"আমিও খেয়েছি—" মমতা উষ্মস্বরে বলল, "নিজে খাও না।"

ততক্ষণে একটা কাটলেটের কিছু অংশ জোর করে মমতার মুখে দিয়ে দিয়েছে শরদিন্দু, "বাঃ, চমৎকার। আর একটু খাবে?"

"এখান থেকে আমি চলে যাব বলছি কিন্তু—"বলে মমতা সুইচ বোর্ডের কাছে এসে রেগুলেটারের খটখট শব্দ করে পাখার স্পীড বেশ কমিয়ে দিল। না হলে শরদিন্দুর চা জুড়িয়ে যাবে। দক্ষিণের জানলার পর্দা পতপত করছে। হাওয়া উঠেছিল। কাটলেট খেতে খেতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল শরদিন্দু। রাধারানী

নতুন হারমোনিয়ম বাজিয়ে খুব মন দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে।

তা শুনতে শুনতে কিছু পরে শরদিন্দু বলল, "র ধার গলা সত্যি আশ্চর্য রকম মিষ্টি হয়েছে, শুনেছ কী দরদ!"

মমতা হেসে বলল, "কিন্তু পড়াশুনোয় যে একেবারেই মাথা নেই।"

"না থাক, এমন যার গলা—" শরদিন্দুও হাসল, "তার আর ভাবনা কী—" সে একটু চুপ করে থেকে বলল, "তবে স্বপনটা সত্যি ব্রিলিয়ান্ট। ওর মাথা সোনা দিয়ে বাঁধান। এইটুকু বয়েসে এত বুদ্ধি—"

"পরে কী হয় দেখ।"

শরদিন্দু জোর দিয়ে বলল, "ও সাংঘাতিক ভাল ছাত্র হবে। পরে খুব নাম করবে। সেই যে একটা পুরোন কথা আছে না, যে-গাছ বাড়ে তার দু পাতায় বোঝা যায়?"

শরদিন্দু সামনে থেকে খালি প্লেটটা সরিয়ে নিয়ে মমতা বলল, "ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি একটু বেশী আদিখ্যেতা কর। নিজের কথা ভাব না, নিজের দিকে তাকিয়েও দেখ না।"

"আমাকে তো তুমি দেখবে—" হা-হে চুমুক দিল শরদিন্দু, চামচ নেড়ে ভাল করে চিনি মিশিয়ে নিল। পরে একটু ভিজে স্বরে বলল, "আরো কত কিছু করা উচিত ওদের জন্যে—মাঝে মাঝে বাইরে ঘুরিয়ে আনা—পাহাড় সমুদ্র দেখানো। টাকার জন্যে কিছুই করা হয় না।"

একটা ম্লান আভা শরদিন্দুর মুখে ফুটে উঠেছিল দেখে সম্ভবত তা মুছে ফেলার ইচ্ছায় মমতা বলল, "যা করছ তাই ঢের। এর চেয়ে বেশী আজকালকার দিনে আর ক'জন করতে পারে।"

"অন্য লোকের কথা জানি না মম, তবে রাধারানী আর স্বপনের মত ক'জনই বা হয়—" কয়েক মুহূর্তের জন্যে উদাসীনের মত হয়ে থাকল শরদিন্দু, কী ভাবতে ভাবতে বলল, "ছেলেবেলায় আমরা কত খাঁ পেয়েছিলাম! প্রচুর অর্থ, খোলামেলা জায়গা, নদী মাঠ পুকুর—বাবার বদলীর চাকরি তো। তা ছাড়া ছুটিতে ছুটিতে দিল্লী জয়পুর দার্জিলিং বেড়ানো—এই রকম ঘোরাঘুরি তো ছিলই।"

"সময়টাও তখন যেন ভাল ছিল। আমরা ছিলাম ঢাকায়, তারপর দিনাজপুরে—আমার বাবারও বদলীর চাকরি ছিল। জলপাইগুড়িতে বাবা মারা গেলেন। তারপর থেকেই আমরা এখানে, কলকাতায়।"

"কত সালে তোমরা প্রথম কলকাতায় আস মনে আছে?"

"না, সাল-টাল মনে নেই। আমি তখন খুব ছোট, ইস্কুলে নিচু ক্লাসে পড়ি।"

চা খেতে খেতে পুরোন দিনে ফিরে যেতে বেশ ভাল লাগছিল শরদিন্দুর। তার আবার সিগ্রেট খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। প্যাকেটটা পকেটে নেই, সে তা শোবার ঘরে ফেলে এসেছে।

শরদিন্দু চায়ের কাপে আঙুল দিয়ে টুং-টাং শব্দ করতে করতে বলল, "আমিও ঠিক তাই। ক্লাস এইটে পড়ি। বাবা মারা যাওয়ার পর আমরাও এখানে এলাম—" সে মমতার দিকে তাকিয়ে হাসল, "সেটা উনিশ শ তেত্রিশ সাল। আমরা যেদিন প্রথম কলকাতায় এলাম সেদিন বিরাট একটা শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল—দেশপ্রিয় জে এম সেনগুপ্তের দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই প্রথম ওই রকম ভিড় দেখেছিলাম। জান মম, রাস্তায় বড় বড় গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে উঠে বসেছিল মানুষ দেশপ্রিয়কে শেষ নমস্কার জানাবার জন্যে।"

শরদিন্দুর কাপে আর একটু চা ঢেলে দিয়ে মমতা গালে একটা হাত রেখে প্রথমে খুব অবাক হওয়ার ভান করল এবং পরে কৌতুক ছলে বলল, "এত মনে থাকে তোমার! তুমি দেখছি আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো!"

মমতার পরিহাস উপভোগ করে তাকে দেখতে দেখতে চোখের একটা ভঙ্গী করল শরদিন্দু, "আমার মধ্যে বার্ধক্যের কী লক্ষণ তুমি দেখতে পেলে বলতো—" সে স্বর অনেকটা নামিয়ে নিয়ে বলল, "রাত্তির-টাত্তিরে সময়-বিশেষে তোমাকেই তো আমার বুড়ি বলে মনে হয়—একটুতেই একেবারে কাহিল হয়ে পড়—"

মমতা বড় বিরক্ত হয়ে এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দেখল শরদিন্দুর কথা আর কেউ শুনতে পেয়েছে কি না। তার চোখে শাসন কাঁপছিল, "একটু সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলতে শেখ, বুঝলে?"

ওসব মিডলক্লাস ভীতি আমার নেই। প্রাণে শখ ষোল আনা, বাইরে সব রেখে-ঢেকে চেপে-চেপে চলা—" শরদিন্দু একটা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করল, "হিপক্রিটিক! আমাদের

বয়েসের আগে বুড়িয়ে যাবার কারণই হল এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দমন।"

"দমন আর কোথায় করছ। নির্লজ্জের মত শুধু থাই থাই।"

"এতে তোমার তো খুশী হয়ে ওঠার কথা। এখনো আমার প্রেম অটুট, এখনো যৌবনের আবেগে—"

"আঃ, থাম না—" কাপ গেলাস ছোট ছোট প্লেট একদিকে সরিয়ে খাবার টেবিল একটু পরিষ্কার করে রাখছিল মমতা, "এসব ইয়ার্কি ফাজলামী না করে স্বপনটাকে একটু পড়াও না।"

শরদিন্দু হালকা স্বরে বলল, "সেক্স আর্জকে তুমি ইয়ার্কি ফাজলামী বল?"

"তা ছাড়া আর কী—" মমতার চাপা স্বরেও ধমকের রেশ ছিল, "অসভ্য।"

মনে মনে বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল শরদিন্দু। অখিল ক্ষুধা খেলছিল তার চোখে। একপাল তাজা হরিণীর মত গ্রীষ্মের হাওয়া হুড়মুড় করে এখন ঘরে ঢুকে পড়ছিল। শরদিন্দুর চোখের সামনেই মীটসেফের ওপর পাকা পাকা অনেক আম ছিল। শরদিন্দু সেগুলো দেখল এবং আপন মনেই হাসল।

মমতার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। শরদিন্দু বুঝল সে এঘরে আর থাকবে না। শরদিন্দুও উঠে পড়ল। সিগ্রেট থাকলে সে আরো কিছু সময় এখানেই বসত। হিটারে বোধ হয় মাংস বসিয়েছে মমতা, একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। এত কাটলেট খাবার পরেও সে-গন্ধ ভাল লাগল শরদিন্দুর।

মমতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই শরদিন্দু অল্প অল্প হাসতে হাসতে খুব আস্তে বলল, "মনে হচ্ছে তুমিও খুব ইচ্ছুক। কাটলেট, মাংসের গন্ধ, সামনে পাকা আম—"

শরদিন্দুর কথা শুনে মমতা ফিক করে হাসল, "আমের মধ্যে তুমি কী সেক্স অ্যাপীল দেখতে পেলে?"

"যার মন তাজা সেসব জিনিসের মধ্যেই প্রাণ খুঁজে পায়—" শরদিন্দু বলল, "আর প্রাণ যার আছে সে স্বভাবতই অস্থির—আমি প্রাণচঞ্চল লোকদের কথাই বলছি। এই মম প্লীজ, একটা কথা শুনে যাও—" সে মমতার বেশ কাছে এগিয়ে এল, "শোন, আমার তাজা মন আজকাল এক নতুন খেলা খেলতে শুরু করেছে—"

"দয়া করে তোমার খেলাধুলো একটু তাড়াতাড়ি শেষ করবে? মাংসটা পুড়ে না যায়—"

"পোড়েই যাক। শোন না—" শরদিন্দু পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে আর একবার সিগ্রেট খুঁজল, "ট্রামে বাসে কিম্বা কোথাও যখন দেখি স্বামী স্ত্রী বেশ ভালমানুষের মত মুখ করে বসে আছে তখন আমার কল্পনা আজকাল হঠাৎ খুব প্রখর হয়ে ওঠে—"

"তা তো হবেই—" কিছু একটা আঁচ করতে পেরে মমতা বলে ফেলল, "তোমার মনের পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।"

মমতার কথা অগ্রাহ্য করে শরদিন্দু বলে চলল, "আমি কল্পনা করি ওদের রাতের রঙ্গ। আবরণহীন আদিম নরনারী। পূর্ণ, চরিতার্থ। অথচ আশ্চর্য, সামাজিক শাসনের চাপে এখন ওরা কত নম্র, কী ভদ্র!"

"তা সকলেই দিন রাত রঙ্গ করে বেড়াবে নাকি? সকলেই তোমার মত?" কথা শেষ করে মমতা চলে গেল।

সিগ্রেটের কথা আবার মনে পড়ল শরদিন্দুর। সে এল শোবার ঘরে, ছোট একটা টেবিলের ওপর থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট, দেশলাই তুলে নিল। মাংসের গন্ধ আরো বেশী করে তার নাকে লাগল। হয়তো ডেকচির ঢাকনা খুলে মমতা দেখছে মাংস সেদ্ধ হয়েছে কিনা।

সিগ্রেট ধরিয়ে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি পেল শরদিন্দু। তরুণ কবির দু-একটা লাইন উচ্চারণ করবার ইচ্ছে হল তার। একটা অ্যাসট্রে হাতে নিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল সে। পরেই গুনগুন করে উঠল, "তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণের—" শরদিন্দু চুপ করল। পরের কথাটা, "বর্ষা ঋতু" উচ্চারণ করতে দ্বিধা হলেও সে সবটা না বলে পারল না—

"তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণের বর্ষাঋতু
এখন আমার বুক জুড়ে শুধু রৌদ্রদহন
কখনো কি আর সাগরে মরুতে বাঁধবে সেতু
মেঘ-যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে তুমি ছুঁয়ে যাবে
মন?"

শরদিন্দুর মুখ নরম হয়ে এল, করুণ হয়ে উঠল। এই লাইনগুলো থেকে থেকে তার মনে আসে কেন। সুখে সম্ভোগে হঠাৎ অতর্কিতে ঐ রকম এক বেদনাকে প্রশ্রয় দিতে কেন তার ভাল লাগে, সে তা জানে না।

পুড়ে পুড়ে সিগ্রেট খুব ছোট হয়ে এসেছিল। শরদিন্দুর ঠোঁটে ছেঁকা লাগতেই সে চমকে তাড়াতাড়ি সিগ্রেট ফেলে দিল। ঠোঁটে অল্প অল্প জ্বালা করছে। তার ডান পা অসাড়ের মত হয়ে গেছে, পায়ে খিল ধরেছে—নাড়তে গেলেই চিনচিন করে উঠছে। হতভম্বের মত বসে থাকল শরদিন্দু। ভূমিকম্পে কি বন্যায় ঘর বাড়ি চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অদৃশ্য হয়ে গেলে মনের যেমন অবস্থা হয়, তার অবস্থা এখন কতকটা যেন সেই রকম।

এখনো আলো জ্বলে ওঠেনি। অন্ধকার দেখে মনে হয় বেশ রাত হয়েছে। একটু দূরে বড় রাস্তায় বাস-ট্রাম চলাচলও অনেক
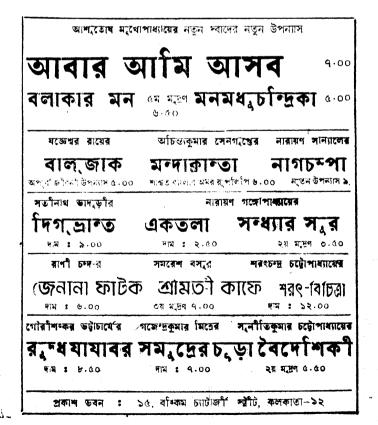
ক্রমে এসে... ...থেকে দূরে থেকে ঢেউ-এর মত শব্দ আসছে এবং পরেই রাস্তা ফাঁকা পেয়ে হুস করে ট্রাম বেরিয়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে বড় আরামে গড়াগড়ি যাচ্ছিল শরদিন্দু। তার চোখ মুখ শরীর মন—সবই খুব হালকা, খুব নরম হয়ে উঠেছিল। সিগ্রেটের আচমকা ছেঁকা তার সাধের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। আস্তে আস্তে সেই তাপটাই আবার তাকে পেয়ে বসল। তার চোখ কটকট করে উঠল। মাথার যন্ত্রণা সে আবার অনুভব করল। শরদিন্দু দাঁতে দাঁত চাপল। কিন্তু তা করবার আগেই তার মুখ রুক্ষ হয়ে উঠেছিল।

শরদিন্দু দেখল তার সামনে কচুরিপানায় ঠাসা সেই পুকুর, পিছনে ছোট নালা, এ-পাশে ভাঙা ক্লিপ, ওপাশে একপাটি ছেঁড়া চটি—কোন চাকর-বাকর ছেড়ে গেছে হয়তো। তাকে অনেকক্ষণ থেকে মশা কামড়াচ্ছিল, এখন এত পরে খুব বিরক্ত হয়ে মশা মারতে গিয়ে সে নিজের দেহের এখানে-ওখানে জোরে জোরে চড় মারল।

এবং তা করতে করতে শরদিন্দু আর একবার অনুভব করল তার পায়ে খিল ধরে আছে। জোর করে ওঠবার চেষ্টা করল সে, পরেই বসে পড়ল। দুত্তোর! সে এখানে বসে বসে এত সময় কাটাল কেন। মনটা আরো তেঁতো তেঁতো হয়ে উঠেছে—রক্তের চাপ বাড়ছে। এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলে মুশকিল, লোকে মাতাল-টাতাল ভাববে।

একটা প্রক্রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল শরদিন্দুর। পায়ে খিল ধরলে কানে কলম কিম্বা হালকা কিছু গুঁজে দিলে তা ছেড়ে যায়। পকেট থেকে ডট পেন টেনে নিল সে। কট করে ক্লিপের শব্দ হল। কানে কলম গুঁজেই জোর করে উঠে দাঁড়াল শরদিন্দু। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটল। রাতে সে ভাল দেখতে পায় না, তাই মাথা নিচু করে ঠাহর করে করে হাঁটছিল। তার দু হাত গুটিয়ে সে বুকের কাছে ঠেকিয়ে রেখেছিল।

এত সাবধানে হাঁটলেও ছোট একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ল শরদিন্দুর এবং সে হোঁচট খেতে খেতে টাল সামলে নিল। তার মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। সে বলে উঠল, "ওরে শালা পৌর প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডারা, তোদের মা-বোনকে চিৎ করে আর কতদিন কলকাতার রাস্তায় শুইয়ে রাখবি? খালি গর্ত আর গর্ত।"

এই রকম উক্তি করেই শরদিন্দু বড় গম্ভীর হয়ে গেল। যার যা খুশি করুক, তার কী। শহরের সুখ-সুবিধার কথা ভেবে কবে সে মাথা ঘামিয়েছে। সুতরাং, এখন ফোঁস করে উঠে লাভ কী। রাস্তায় মাথা গরম করলে আবার তাকেই হোঁচট খেতে হবে।

এখনো শরদিন্দুর ঠোঁট জ্বলছিল। পা-টাও টন টন করছে। তবু একটু জোরেই পা চালাল সে। একটা কদম গাছ হিমে জড়োসড়ো হয়ে আছে। পর পর কয়েকটা একতলা ছোট বাড়ি। ছিমছাম। কোথাও কোথাও শাকসবজি ফলফুলের বাগান। বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। এসব দেখে-শুনে শরদিন্দু বড় মন-মরা হয়ে যাচ্ছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে কিছু পরেই আবার চমকে উঠল সে। প্রচণ্ড শব্দ করে কাছাকাছি কোথাও একটা বোমা ফাটল। আবার ফাটবে। তারপর ফটফট গুলির শব্দ হবে। এবং ফায়ার ব্রিগেডের একটানা ঘণ্টাও শোনা যাবে। এইরকম দুমদাম গুরুমগাড়াম ঢংঢং চলবে সারা রাত ধরে।

—এসব শরদিন্দুর গা-সওয়া হয়ে গেলেও এরকম শব্দ-টব্দ হলে এখনো সে চমকে ওঠে—উৎকর্ণ হয়ে ওঠে—অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু এখন শরদিন্দু দেখল, কোন বাড়ির দরজা-জানলা একটুও ফাঁক হল না। গাছের একটা পাতাও কাঁপল না। এমন কি, রাস্তায় একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়েছিল, সে-ও নড়ল না।

শুধু শরদিন্দুই খোঁড়াতে-খোঁড়াতে হাঁপাতে-হাঁপাতে এবং একটা যন্ত্রণায় ভিতরে-ভিতরে জ্বলতে-জ্বলতে হাঁটল, হাঁটল, হাঁটল।

এক-একটা সিঁড়ি অন্ধকারে ভেঙে যেন বড় পরিশ্রান্ত হয়ে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠে এল শরদিন্দু। তার ফ্ল্যাটের দরজায় হাত দিয়ে শব্দ করল। কোন সাড়া এল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছিল শরদিন্দুর, সে আর একটু জোরে দরজায় ধাক্কা দিল।

"কে?"

একটু রুক্ষ স্বরে শরদিন্দু বলল, "খোল না শিগগির!"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলল মমতা, অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "সেই কখন আলো নিবে গেছে! বড় ভয় করছিল। তুমি এত দেরি করে ফিরলে কেন?"

শরদিন্দু কিছু বলল না। দেখল, আলো বন্ধ হয়ে আছে বলে এখানেও মোমবাতি জেলে দিয়েছে মমতা। প্রথমে বাইরের জামা-কাপড় ছেড়ে নিল শরদিন্দু। শার্ট প্যান্ট ভাঁজ করে আলনায় রাখতে রাখতে একবার পিছন ফিরে দেখল তার সুবিধার জন্যে একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে মমতাও শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

চোখ দুটো বসে গেছে মমতার, চুলে পাক ধরেছে। তার মুখে ঘাম, গায়ে তেলের গন্ধ। হাড় জিরজিরে শরীর, যেন মোমবাতিটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শরদিন্দু বুঝল, মমতা কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছে না কিন্তু তার মনের মধ্যে একটিই প্রশ্ন তাকে আরো কাহিল করে তুলেছে।

এসব ভাবতে-ভাবতে খুব রাগ হয়ে গেল শরদিন্দুর। সে মুখ-টুখ ধুতে গেল না, ঝুপ করে খাটের ওপর বসে পড়ে কর্কশ গলায় বলল, "কেন ফিরতে দেরি হল জান না?"

মোম গলে-গলে অশ্রুর মত গরম ফোঁটা মমতার হাতের ওপর টপটপ করে ঝরে পড়ছিল, সে মোমবাতিটা কাচের উঁচু তাকের ওপর তেল চিরুনি সাবানের একপাশে বসিয়ে দিতে দিতে খুব নরম করে জিজ্ঞেস করল, "উকিলবাবু কী বললেন? স্বপনকে জামিনে ছাড়বে না?"

"কে জানে! অনেক পাপ করেছি তো, যত ঝক্কি আমার!"

"উকিলবাবু যে বলেছিলেন—"

খাটের ওপর ভেঙে পড়ে উত্তেজনায় হাত-পা ছুঁড়ল শরদিন্দু, "আরে দুত্তোর! শালাদের খালি টাকা খাওয়ার মতলব। মার্ডারারকে বের করে আনা সোজা? তোমার গুণধর ছেলের নামে কী-কী চার্জ এনেছে পুলিস, জান?"

মমতা মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "জানি।"

"না, জান না—" বিকৃত স্বরে চিৎকার করে উঠল শরদিন্দু, "তিনটে ছুরিকে সামনা-সামনি স্টাব করেছে, কলেজের ছাদ থেকে বোমা ছুঁড়ে রাস্তার একটা নিরীহ লোককে মেরে ফেলেছে—"

খাটের ওপর বসে পড়ল মমতা, শরদিন্দুকে শান্ত করবার জন্যে তার গায়ে একটা হাত রাখল এবং ভারী নিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত স্বরে বলল, "আমি সবই জানি।"

"জান ত দিনরাত কেন তোমার গুণধর দেশনেতাটির জন্যে ফ্যাচ-ফ্যাচ কর? কেন—কেন আমার কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর কর—এক ঝটকায় গা থেকে মমতার হাত সরিয়ে দিয়ে শরদিন্দু বলল, "বাবু রাজনীতি করবেন, পলিটিক্স করবেন—আর আমি বাড়ি-ভাড়া বাকি রেখে, প্রত্যেকটি পাওনাদারকে ফিরিয়ে দিয়ে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা ঢেলে ওর জন্যে ফতুর হয়ে যাব! হারামজাদা, অনগ্রেট-ফুল, স্কোয়াইন!"

মমতার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। মোমের অল্প-অল্প আলোয় সে তাকাল ঠাকুরের পটের দিকে। শুধু দেখলই। কী চাইবে, কী প্রার্থনা করবে ভেবে পেল না। আলোর শিখা কেঁপে-কেঁপে ম্লান হয়ে আসছিল। তার ঠাকুরের পটও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

মন শক্ত করবার চেষ্টা করে মমতা কিছু পরে বলল, "অত ভাবনা-চিন্তা করবার দরকার কী স্বপন তো চায় না যে আমরা ওর জন্যে কিছু করি। সে তো পরিষ্কার বলেছে, আমাদের মানবে না—আমাদের কোন কথা শুনবে না—"

"তা বললে পুলিস শুনবে? পুলিস এ ফ্ল্যাটে হানা দিচ্ছে না? জিনিসপত্র তছনছ করছে না? হারামজাদা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তো এই রকম শুরু হয়েছে—"

অধিক উত্তেজনায় শরদিন্দু হাঁপাচ্ছিল, বালিশের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে একটু থেমে সে বলল, "আহা, কী সুখের সংসার। যেমন হয়েছে ছেলে, তেমন হয়েছে মেয়ে। হীরের টুকরো একেবারে। বাপ-মাকে রাজা-রানী করে রেখেছে।"

রাধারানীকে স্বপনের মত পুলিস গ্রেপ্তার-টেপ্তার করেনি। গত বছরে সে লুকিয়ে এক গীটার বাজিয়েকে বিয়ে করেছিল। পরে তার সঙ্গে বনিবনা হল না। স্বপন একদিন মমতাকে বলেছিল, মনাদাকে ডিভোর্স করে দিদি বম্বে চলে গেছে প্লে-ব্যাক করতে। রাধারানী কোথায় আছে, কী করছে মমতা কিছুই জানে না। কেননা বিয়ের পর বাপ-মার সঙ্গে যোগাযোগ করবার কোন চেষ্টাই সে করেনি।

রাধারানীর নাম কখনো উচ্চারণ করে না শরদিন্দু, আজ ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে ফেলল। মেয়ের নাম শুনে এবং শরদিন্দুর কথা ভেবে ঝিম মেরে গেল মমতা। একটা অসহ্য ব্যথা তার বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠছিল।

কিছু পরে মমতার মনে হল তার এই রকম ঝিমিয়ে পড়া এখন শরদিন্দুর পক্ষে আরো ক্ষতিকর। তবুও সে স্থির করতে পারল না এই অবস্থায় কী বলবে—কী করবে। একটু আগে ঠাকুরের পট লক্ষ করে মমতার আকুল প্রার্থনার ইচ্ছা জেগেছিল, তখন সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি কী সে চায়। এখন চোখ বন্ধ করে মমতা মনে মনে বলল, আমাকে পাথর করে দাও ঠাকুর—পাষাণ করে দাও! আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

এবং চোখ বন্ধ করেই মমতা বুঝতে পারল তার ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। তার মাথা আর কাজ করছে না। হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডার একটা ভারী ঝাপটা তার শরীরের রক্ত চলাচলও সম্ভবত বন্ধ করে দিতে চলেছে।

এই রকম পাষাণে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার ভাবনায় ভয় পেয়ে চোখ খুলল মমতা। দেখল, তার পাশেই অসাড় একটা শবের মত উপুড় হয়ে পড়ে আছে শরদিন্দু। মমতা ইতস্তত করল না, তার গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে ডাকল, "ওগো?"

বালিশে মুখ গুঁজেই শরদিন্দু বলল, "উঁ?"

"একটু চা-টা খাবে? করে দেব?"

"থাক, রাত হয়ে গেছে।"

মমতা বড় মিষ্টি করে বলল, "অমন উপুড় হয়ে শুতে নেই। ঠিক হয়ে শোও।"

শরদিন্দু যেন বড় কষ্টে তার দেহটাকে নাড়াল, চিৎ হয়ে শুয়ে দেখল মমতাকে। কথা বলল না। পরিশ্রান্ত মানুষের মত চুপ-চাপ থাকল।

"ভাত খাবে এখন?"

"খিদে-তেষ্টা আর নেই।"

শরদিন্দুকে সান্ত্বনার কোন কথা বলল না মমতা, অনুনয় করার মত শুধু বলল, "ওঠ, চল।"

শরদিন্দু উঠল না। মমতার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সে হঠাৎ বড় শান্ত হয়ে গেল। তার চোখে অশ্রু ছিল না, জ্বালাও না—শরদিন্দুর মনে হল, মমতার দৃষ্টি সব বেদনা আর যন্ত্রণার জগৎ থেকে তাকেও যেন অনেক ওপরে তুলে নিতে চাইছে।

মোমবাতিটা ততক্ষণে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে প্রায় নিভে এসেছে।

[illegible]

তেরো

গোরীর যখন উদয় হয়নি তখন এই মালাদিই রত্নর অন্তরাকাশ আলো করে থাকত। এখন সেসব দিনের কথা ভাবতে হাসি পায়। ওটা কি প্রেম, না দেবীপূজো? গোরীর যেমন বীরপূজো। রত্ন ও পর্যায় ছাড়িয়ে এসেছে।

মালাদিকে বিয়াত্রিস মনে করে দান্তের মতো কামগন্ধহীন প্রেম অনুভব করা, এটা ছিল ওর পরের পর্যায়। এটাও সে অতিক্রম করেছে। গোরীর প্রেমই এখন তার সাধ্য শিরোমণি। আর পেছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছা নেই। পিছু হটা নয় না। মালা এখন বাসিফুলের মালা।

রত্নর কাছে। কিন্তু ঝন্টুদার কাছে নয়। তাঁর কাছে ও তাজা ফুলের মালা। তিনি ওকে আদর করে গলায় পরাতে চান তার জন্যে চার বছর ধরে অপেক্ষা করছেন, আর কতকাল করবেন? তিনিও যে যৌবনের শেষ প্রান্তে।

মালাদি যদিও ঝন্টুদার চিঠি রত্নকে পড়তে দিয়েছে তবু, পরের চিঠির প্রাইভেসী ভঙ্গ করা কি উচিত? ঝন্টুদা শুনলে কী ভাববেন? প্রেমপত্রের জগতে তৃতীয়জনের প্রবেশ মানা। তেমন কেউ এসে জুটলে প্রেমপত্রই বন্ধ হয়ে যায়।

সেইজন্যে রত্ন এই চিঠির তাড়াটা শিকেয় তুলে রেখেছিল। কিন্তু মালাদিই ওকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে রাখতে পারবে না, ফেরত দিতে হবে। তার আগে যেন একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। যদি না পরীক্ষার পড়ার ক্ষতি হয়।

রত্ন চিঠির তাড়া খুলে বসে। না, প্রেমপত্র যাকে বলে তা নয়। শুরুতে "স্নেহের মালা," শেষের দিকে "স্নেহ জেনো"। তারপর "ইতি। শুভাকাঙ্ক্ষী ঝন্টুদা।" কী চিঠিতেই এই। চিঠির সংখ্যাও রাশি রাশি নয়। মাসে দুমাসে একখানা। আকারও সাধারণত বড়ো নয়। [illegible]

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ক্রমেই তাঁর প্রত্যয় হচ্ছে যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হলে মুসলমানদের সঙ্গে বংশবৃদ্ধির দৌড়ে হার হবে। তখন আবার মুসলিম আধিপত্য।

ঝন্টুদা এমনভাবে আটঘাট বেঁধেছেন যে চিঠিগুলো যদি মালার গুরুজনের হাতে পড়ে তবে তাঁরা কোথাও প্রেমগন্ধ পাবেন না। কামগন্ধ তো দূরের কথা। তবে "প্রেম" না থাকলেও তার চেয়ে আপত্তিকর জিনিস আছে। বিবাহের জন্যে ব্যাকুলতা। চিঠিগুলো পড়ে রত্নর ধারণা দাঁড়ায় মালাদি সোজাসুজি "না" বলে দেয়নি। দিলে দুয়ার রুদ্ধ হয়ে যেত। আর চিঠি আসত না। তা হলে কি "হাঁ" বলেছে বা বলবে? না, তাও নয়। ও মা ভীতু। লোকটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। হাতছাড়া করবে না। ঝন্টুদাও যেমন। ঘুরে ফিরে ওর কাছেই আসবেন।

শেষের চিঠিখানা চরমপত্রের মতো শোনায়। তাঁর মা নেই, বাবা নাকি বলাবলি করছেন যে ছেলে যদি সংসারী না হয় তবে পিতৃদেবই দ্বিতীয় সংসার করবেন। নইলে বংশরক্ষা হবে কী করে? মুসলমানরা যদিও আর সব বিষয়েই পেছিয়ে রয়েছে তবু এই একটা বিষয়ে তো এগিয়ে যাচ্ছে। আরো এগিয়ে যাবে না?

আবার যখন মালাদির সঙ্গে দেখা হয় তখন রত্ন চিঠিগুলো ফেরত দিয়ে বলে, "চরমপত্রটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়, মালাদি। আমি চিনি ঝন্টুদার পিতৃদেবকে। আমাকেই একদিন পাকড়াও করে বলেন, তোর তো মা নেই। তুই বিয়ে করিসনে কেন? শোন যুক্তি। মা নেই বলেই কি আমি যোগ্য হবার আগেই বিয়ে করব? তাও যদি জানতুম কে আমাকে ভালোবাসে ও আমি কাকে ভালোবাসি।"

তখনো গোরীর আবির্ভাব ঘটেনি। মালাদিই ওর হৃদয় জুড়েছিল। কিন্তু বিয়াত্রিসের মতো নারীকে তো বিবাহ করা যায় না। কামগন্ধ আছে তায়।

"তুমি তা হলে ভালোবাসা না হলে বিয়ে করবে না, রতন?" ভালোবাসার উল্লেখে মালাদির মুখখানি রাঙা হয়ে ওঠে।

"না, মালাদি। যার সঙ্গে ভালোবাসা হয়নি তার সঙ্গে বিয়ে আমার নীতিবিরুদ্ধ ও রুচিবিরুদ্ধ। আমার আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি ওর প্রতিরোধ করব।

এর ফলে হয়তো চিরকুমার হয়ে জীবন কাটাবে। সেও ভালো।" রত্ন সীরিয়াস হয়ে বলে।

"বিবাহের মতো একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অতটা সীরিয়াস হচ্ছ কেন? এদেশে সব মেয়ের ও সব ছেলের বিয়ে হয়। কেউই তো বলে না যে, ভালোবাসা না হলে বিয়ে করব না। বিয়েটা একবার হয়ে গেলে তারপরে ভালোবাসার পালা আসে। এই তো নিয়ম।" মালাদি সরল মনে বলে।

"ভালোবাসা আগে, বিয়ে তারপরে, এইটেই নিয়ম হওয়া উচিত। আমরা একালের তরুণ-তরুণীরা নতুন নিয়ম প্রবর্তন করব। তুমিও আমাদেরই একজন।" রত্ন সাহস করে বলে।

"আমি!" ভয়ে পেছিয়ে যায় মালাদি। "আমার তো ওপাট চুকে গেছে, ভাই।"

"বাইশ বছর বয়সে কত মেয়ের ও পাট আরম্ভই হয়নি। যেমন সেবাদির। কেন তুমি তোমার বয়সের ধর্মকে অস্বীকার করছ? যে সুযোগ আপনা হতে এসেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে নেই। করলে পসতাবে। অমলদা বোধ হয় আর সবুর করবেন না। অন্যত্র দেখবেন। চিঠিতেই তার ইঙ্গিত আছে। পিতৃদেবকে এ বয়সে অমন অপকর্ম করতে দেবেন না। তোমার যদি সত্যি বিয়ে করার বাসনা না থাকে তবে সরাসরি 'না' বললেই পারো। 'নাও' না, 'হাঁও' না, এ দোটানায় পড়ে আর কতকাল কাটবে?"

উত্তর না দিয়ে মালাদি এমন একখানি হাসি হাসে যাকে বলে মোনালিসার হাসি। রত্ন মনে মনে ভাবে, এ মেয়ে তো বিয়াত্রিস নয়। এর জাতই আলাদা। এরই প্রেমে পড়েছিল একদিন!

আরো দু'চার কথার পর মালাদি বলে, "আচ্ছা, তোমরা পুরুষ মানুষেরা কেন অমন নাছোড়বান্দা? কেন বিয়ে না করে ছাড়বে না? ভালোবাসা যদি পাও তবে তাই নিয়ে তুষ্ট হও না কেন?"

"মেয়েরাও কি তাই নিয়ে তুষ্ট হয়, মালাদি?" রত্ন পালটা দেয়।

"তুষ্ট!" মালাদি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "ধন্য হয়। বেঁচে যায়।"

সেদিন আর ও নিয়ে কথাবার্তা হয় না। রত্নর মাসিমা এসে পড়েন। সন্দেহ-ভাবে এদিক-ওদিক তাকান। ততক্ষণে চিঠির তাড়া মালাদির ব্লাউসের ভিতরে চালান। ভিজে বেড়ালটি সেজে ও প্রশ্ন করে, "তা হলে টু প্লাস টু ইকুয়াল টু ফোর?"

ভাগ্যিস মাসিমার বিদ্যা ততদূর নয়। তিনি ধরে নেন এটা বি-এ কোর্সের সামিল একটা কঠিন প্রশ্ন। যদিও মালাদির বি-এ তে গণিতশাস্ত্রই ছিল না।

"তুমি ফুল মার্কস পাবে।" রত্ন অম্লানবদনে বলে।

"তুই মাঝে মাঝে আসিস, রতন। একটু দেখিয়ে দিস ওকে।" মাসিমা বলেন। মাস্টার বা মাস্টারনী খুঁজলে না পাই। চেষ্টা তো করছি এত। ঠিক মনের মতো হয় কই? যার তার কাছে তো আর মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কে জানে কার মনে কী ফন্দি আছে! এই সেদিন তো একটা ছোকরা একজনের বিধবা মেয়েকে পড়াতে এসে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে করল কী শুনবি? আমি তো ঘেন্নায় মারা যাই!"

"কী করল, মাসিমা? বলিদান দিল না তো?" রত্ন কপট ভয়ে শিউরে ওঠে।

"ও একরকম বলিদান বইকি। বলিদানও ওর চেয়ে ভালো। স্বর্গে যেত। ও যে হল চোদ্দ পুরুষের নরকবাস। বাছা রে, তোর কপালে এই ছিল!"

"কেন, মাসিমা, বিদ্যাসাগর মশায় তো বিধান দিয়ে গেছেন। আইনও করে দিয়ে গেছেন পঁচাত্তর বছর আগে।" রত্ন অনুযোগ করে।

"বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণ পরিচয় আর কথামালা আমি পড়েছি, বাবা। অত বড়ো বিদ্বান আর হয় না। কী চমৎকার এই বাঘের গলায় হাড় ফোটার গল্প। কিন্তু অত বড়ো বিদ্বান হলে কী হবে, একমাত্র ছেলের বিয়ে দিলেন কিনা এক বিধবা মেয়ের সঙ্গে! ছি ছি! বিদ্যাসাগর না বিদ্যার নাগর!" এই বলে মাসিমা ঝট করে পালিয়ে যান।

মালা আর রত্ন লজ্জায় কেউ কারো দিকে চাইতে পারে না।

মাসিমার প্রস্থানের পর রত্ন বলে, "মালাদি, তুমি যে কেবল প্রত্যুৎপন্নমতি তাই নয়, তুমি প্রকৃতভাষিণী। দুই আর দুই মিলে চার। এর মতো সত্য আর কী আছে? তুমি আর তোমারটি মিলে দুই। আমি আর আমারটি মিলে দুই। দুই আর

দুই মিলে চার। সেইজন্যেই তো তোমাকে ফুল মার্কস দিয়েছি।"

মালাদি ফিসফিস করে সুধোয়, "তোমারটি কে? সেবা?"

"দূর। সেবার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক।" হেসে উড়িয়ে দেয় রন্তু।

"আর কেউ আছে নাকি?" কৌতূহলী হয় মালা।

"আছে। কিন্তু তোমাকে বললে তুমি ধিক ধিক করবে।" রন্তু মিটমিট করে হাসে।

"না, না, ধিক ধিক করব কেন? ভালোবাসা কি পাপ? আমি কি তেমন কোনো আভাস দিয়েছি? আমি কি তোমার মাসিমা?" মালা অভয় দেয়।

"কী জানি! মায়ের সংস্কার হয়তো মেয়েতেও বর্তায়। নইলে ঝনটুদাকে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলিয়ে রাখা হতো না।" রন্তু বলে খেলিয়ে খেলিয়ে।

"বল না, ভাই লক্ষ্মীটি, কাকে তুমি ভালোবাস?" মালার কৌতূহল তীব্র হয়।

"তুমি আগে কথা দাও যে শুনে ধিক ধিক করবে না।" রন্তুর শর্ত এই।

"তা কি পারি? আমার ভাই যাকে ভালোবাসবে আমিও তাকে ভালোবাসব। এখন বল, মেয়েটি কে? কী নাম? কেমন দেখতে?" মালার প্রশ্ন এই সব।

ডাক নাম গৌরী। অপূর্ব সুন্দরী। এর বেশী জানতে চেয়ো না। তার আগে আমাকে বল, আমার গুরুজন যদি আমার চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে দিতেন, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারতেন না, বউ যদি আমার অপছন্দ হতো তাহলে কি ও বিয়ে আমি মাথা পেতে মেনে নিতুম, না সাবালক হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে স্বাধীনতার দাবিতে খারিজ করতুম? তারপর প্রেমে পড়লে আরেকজনকে বিয়ে করতে চাইতুম?" রন্তুর ধাঁধা।

মালা এবার বোঝে আর বেলুনের মতো চুপসে যায়।

"বিকার বোধ করলে তো!" রন্তু মুচকি হাসে।

"না, না, বিকার নয়। তবে ঠিক পুলকও নয়। আমার ভাই যাকে ভালোবাসে আমি কি তাকে ভালো না বেসে পারি? কিন্তু কেন তুমি জেনে শুনে জড়িয়ে পড়লে?" মালার চোখে জল আসতে চায়। সে রুমাল দিয়ে মোছে।

"সাধ করে কি কেউ জড়াতে যায়? প্রেমে যারা পড়ে তারা পতঙ্গের মতোই পড়ে। আগুনের দুর্বার আকর্ষণে। দেবী বলে একদা একজনকে পুজো করতুম। সেও একটি দীপশিখা।" রন্তু আভাস দেয়।

মালার জিজ্ঞাসার উত্তরে রন্তু এই প্রথম জানায়, "সে আমার সম্মুখেই।"

চোদ্দ

কথা ছিল গৌরী মাসে একবার করে কলকাতা এসে পরীক্ষা করাবে। সেই সূত্রে রন্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু মাসের পর মাস যায়। দেখা আর হয় না।

"আমার রূপ যা হয়েছে দেখলে তুই মূর্চ্ছা যাবি। অমন করে তোকে ভয় পাইয়ে দেওয়া কি ভালো? তুই আমার যে রূপ দেখেছিস তারই ধ্যান কর। এ মূর্তি দেখলে তোর ভালোবাসা উবে যাবে।" গৌরী লেখে।

জ্যোতিদা শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা আসে সর্বভারতীয় নেতাদের শুভাগমন হলে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অবসরে রন্তুর সঙ্গেও এক আধ ঘণ্টা কাটিয়ে যায়। দুজনে মিলে বিলিতী বইয়ের দোকানে যায় ও বেছে বেছে কেনে।

গৌরীর কথা উঠতেই জ্যোতিদা বলে, "তন্বী ও মেয়ে কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু এখন যা হয়েছে তা বর্তুলাকার। আমাকে ডেকেছিল একদিন। গিয়ে দেখে এলুম। আছে মনের সুখে। খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে। এখন ওর একমাত্র চিন্তা সেফ ডেলিভারি। বেঁচে থাকলে তো মুক্তির প্রশ্ন উঠবে?"

রন্তু তা শুনে উদ্বিগ্ন হয়। বলে, "সেইজন্যেই তো কলকাতা এসে ডাক্তার দেখানো উচিত। জ্যোতিদা তোমার কি মনে হয়? বাঁচবে তো?"

"বাঁচবে না কেন? চাষীর মেয়েরা কি বাঁচছে না? প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলে প্রকৃতিই বাঁচায়। কিন্তু প্রকৃতি বলে কাজকর্ম করতে, গতর খাটাতে। ফিউডাল সুন্দরীরা কি প্রকৃতির পরামর্শ শুনবেন? ডাক্তার। ডাক্তারই যেন সর্বশক্তিমান। তুমি ওকে লিখবে সংসারের কাজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে।" জ্যোতিদা যুক্তি দেয়।

রন্তু বলে, "যার যা স্বভাব। তোমার দৃষ্টান্ত ও পাঁচ বছর ধরে দেখে আসছে। যদি দেখে না শেখে তো ঠেকে শিখবে। বম্বে গেলে ওকেই সংসারের কাজ করতে হবে।"

জ্যোতিদাও একমত হয়। সেই সঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে। বলে, "জানো তো গৌরী যতদিন আমার কাছাকাছি থাকত ততদিন আমার মতো করে ভাবত। আমি যদি বলতুম, রেঙ্গুন চল, তো রেঙ্গুনে চলত। এখন পড়েছে মায়ের হাতে। উনি ওকে এক বিষয়ে নির্ভয় করে দিয়েছেন। ওঁর হেফাজতে কখনো কখনো মেয়ের খালাসের সময় বিভ্রাট ঘটেনি। সেইজন্যে উনি যাই বলেন ও তাই শোনে। উনি যদি বলেন, কারো সঙ্গে যাসনে তবে ও যাবে না কারো সঙ্গে। অতি চতুর মহিলা। এর মধ্যেই জেনে নিয়েছেন রন্তুটিকে। কেন ওকে রোজ রোজ চিঠি লেখা হয়। ওই বা কেন চিঠি লেখে রোজ রোজ! জানেন, কিন্তু আপত্তি করেন না। তোমার সম্বন্ধে বলেন, ও বোধ হয় আর জন্মে আমার পেটের ছেলে ছিল। সেইজন্যে আমার পেটের মেয়েকে এত ভালবাসে। আহা, ভাই-বোনের কী স্বর্গীয় ভালোবাসা। ওকে একদিন আসতে বল।"

রন্তু মনে মনে উৎফুল্ল হলেও সেও আশঙ্কা প্রকাশ করে। "অমনি করে উনি ওকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছেন। সম্পর্কটা যদি ভাই-বোনেরই হয় তবে তো আর ইলোপমেন্টের প্রশ্নই ওঠে না। ও যাবে না বম্বে।"

"শুধু কি তাই? গৌরীর মনের পরতে-পরতে অদৃশ্য কালিতে লেখা হয়ে যাচ্ছে পুরাতন সামাজিক শৃঙ্খলার ভিত্তিগত যতসব মূল্য। স্বামী আর পুত্র আর সম্পত্তি আর সতীত্ব। শৃঙ্খলার সঙ্গে শৃঙ্খলের প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আছে তা মানো তো? গৌরী যদি শৃঙ্খল ভাঙতে চায় তো পুরাতন শৃঙ্খলার বাঁধাধরা মূল্যগুলিকেও আঘাত করতে হবে। নইলে শৃঙ্খল মোচন হবে না। আমার পাঁচ বছরের কাজ এক বছরেই মাটি করবেন ওর মা। আমার দূর সম্পর্কের দিদি। যদি এক বছর কাছে রাখতে পান।" জ্যোতিদা শঙ্কিত স্বরে বলে।

সেইরকমই তো কথা হচ্ছে।" রন্তু গৌরীর কাছে শুনেছে।

"তার আগেই ওকে সরানো দরকার।" জ্যোতিদা সীরিয়াসভাবে বলে।

রন্তু অবাক হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়। তার আগে সরানো কি সম্ভব!

"গৌরী খালাস হবে ডিসেম্বরে। তোমার পরীক্ষা সারা হবে জানুয়ারিতে। তোমাদের ইলোপমেণ্ট ফেব্রুয়ারির আগে যদি হয় তবে সেটা বড্ড সকালে। অথচ ফেব্রুয়ারির পরে যদি হয় তবে ওটা বড্ড দেরিতে। ফেব্রুয়ারিই তোমাদের ইলোপমেণ্টের মাস। সোভিয়েট বিপ্লবের দিন যেমন ৬ই নয়, ৮ই নয়, ৭ই নভেম্বর।" জ্যোতিদা বলে লেনিনের অনুকরণে।

রন্তুর জানা ছিল জ্যোতিদার বিচিত্র মতবাদ। প্রথমে আসবে স্বরাজ সেটা গান্ধী নির্দিষ্ট মার্গে। তারপরে আসবে বিপ্লব, সেটা লেনিন নির্দিষ্ট পন্থায়। জ্যোতিদারা আপাতত গান্ধীজিকে তাঁর ঐতিহাসিক মিশন পূর্ণ করতে দিচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীদের মতো বাদ সাধছে না। কিন্তু আখেরে বিপ্লবের জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছে। স্বরাজ তো বলতে গেলে আসন্ন। আর বছর পাঁচেকের মধ্যেই পাকা ফলটির মতো মাটিতে পড়বে।

ভারতের কেরেনস্কিরা জোর পাঁচ বছর রাজত্ব করবেন। তারপরে ভারতের লেনিনদের পালা।

"তা না হয় হলো, কিন্তু বাচ্চাটির কী হবে?" রত্ন জিজ্ঞাসু হয়।

"বাচ্চার দায়িত্ব তোমরাই নেবে। খরচের জন্যে ভেবো না। আমি আছি। তবে এমনও হতে পারে যে বাচ্চাকে ওরা সহজে ছাড়বে না। অনর্থ বাধাবে। কাজ কী ওই নিয়ে লড়াই করে? গোরীর কাছে না থেকে বাচ্চা থাকবে ওর দিদিমার কাছে। পরে ওর ঠাকুমার কাছে।" জ্যোতিদা রায় দেয়।

"বেচারি গোরী! ওর কষ্ট হবে না?" রত্ন ব্যথিত হয়।

"কষ্ট হবে বইকি। কিন্তু বাচ্চার দিক থেকে সেইটেই ভালো। ভারী তো জানে গোরী বাচ্চা মানুষ করতে! ওদের বাড়িতে মায়েরা কেউ মাই দেয় না, জানো? দুধ-মা যোগাড় করে এনে রাখে।" জ্যোতিদা এক আজব খবর শোনায়।

"কেন, দুধ-মা কেন? নিজের দুধ থাকতে?" রত্ন বিস্মিত হয়।

"নিজের দুধ থাকলেও নিজের বাচ্চাকে দিতে নেই। স্তনের শেপ যদি নষ্ট হয় তবে যে সর্বনাশ! এটা বহুকালের ফিউডাল সংস্কার। আমাদের জমিদার ঘরানার কেউ মাতৃস্তনা পান করে মানুষ হননি। সবাই দুধ-মার সন্তানকে বঞ্চিত করে অমানুষ হয়েছেন। জানিনে কার কাছে এ শিক্ষা পেলেন। রাজপুতের কাছে না মোঘলের কাছে।" বলে জ্যোতিদা রত্নকে তাক লাগিয়ে দেয়।

"গোরী যদি বাচ্চাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসে আমরা কিন্তু দুধ-মা রাখব না। গোরীকেই মাই দিতে হবে।" রত্ন আলনস্করের মতো হুকুম জারী করে।

"দুধ-মা রাখা হবে না, এই পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমি একমত। গোরীকেই মাই দিতে হবে, ওটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। আজকাল ইউরোপীয় মায়েরাও তো ফীডিং বটলে করে দুধ খাওয়ান। মনে রেখো, ফিউডালিজমের সঙ্গেই আমাদের সংগ্রাম। মডার্নিজমের সঙ্গে নয়। একালের মেয়েরা অনেকেই মা হতে চায় না। তুমি কি তা বলে সেকেলে মেয়ে বিয়ে করবে? না একেলে মেয়েকে সেকেলে করে তুলবে?" জ্যোতিদা রত্নকে দোটানার মধ্যে ফেলে।

"বিয়ের কথা ওঠে কেন, জ্যোতিদা? গোরী তো আমাকে কথা দেয়নি যে বিয়ে করবে। আমিও তো বিয়ের প্রস্তাব করিনি। আগে তো ও মুক্ত হোক। তারপর যাকে খুশি বিয়ে করবে। আমার সঙ্গে ইলোপ করা মানে আমাকেই বিয়ে করা নয়। আমরা দুজনেই ফ্রী থাকতে চাই। তবে সাধারণত দেখা যায় ইলোপ যারা করে তারা বিয়ের জন্যেই করে। বিয়ে করেও। আমরাও খুব সম্ভব বিয়ে করব। যদি ও ছাড়পত্র পায়। কিন্তু ও ছাড়পত্র চাইলে তো পাবে? চায় কি না তাই আমার অজানা।" রত্ন বলে।

"ছাড়পত্র চাইলেও পাবে না। হিন্দু আইনে 'ডিভোর্স' চলে না। ওই পরকীয়াই সারা জীবন চালিয়ে যেতে হবে। আর নয়তো মুসলমান হতে হবে।" জ্যোতিদা রত্নকে তাজ্জব বানায়।

"গোরী যেমন ঠাকুরদেবতা মানে ও কি কখনো মুসলমান হতে রাজী হবে? না, জ্যোতিদা। আমিও নারাজ। যদিও আমি ঠাকুরদেবতা মানিনে তবু আমি হিন্দু। উপনিষদে আমি যা পাই তা কি আমি ছাড়তে পারি?" রত্ন দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"তাহলে বিয়ের আশা ছেড়ে দাও তোমরা। বিয়ের মন্ত্র না পড়েও কি স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা যায় না? দেশে বিদেশে অজস্র উদাহরণ। গোটে কি ক্রিশ্চিয়ানেকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিলেন? অবশ্য পরে বৃদ্ধ বয়সে আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়।

ততদিনে সামাজিক বাধা অপগত হয়েছে। তোমরাও স্বরাজের পরে আনুষ্ঠানিক বিবাহ করতে পারো। তার আগে আমরা হিন্দু আইনে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করব। আরো ভালো হয় যদি বিপ্লব পর্যন্ত সবুর করতে পারো। আনুষ্ঠানিক বিবাহের প্রয়োজনই থাকবে না। স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকলেই সেটাকে বিয়ে বলে ধরে নেওয়া হবে। আনুষ্ঠানিক বিবাহের সঙ্গে লেশমাত্র তফাৎ থাকবে না।" জ্যোতিদা আশ্বাসের বাণী শোনায়।

"কিন্তু ইতিমধ্যে ছেলেমেয়ে যদি হয়?" রত্ন নাস্তিকের মতো বলে।

"তোমাদের খুশি। গোটে ও ক্রিশ্চিয়ানেরও তো হয়েছিল। পরে ডিউকের আদেশে বৈধ বলে মেনে নেওয়া হয়। বিপ্লবের পরে প্রত্যেকটি সন্তানকেই বৈ… বলে ঘোষণা করা হবে। সম্পত্তির বা… তো থাকবে না। বুর্জোয়াদের সমাজ সম্পত্তি ভিত্তিক বলেই বৈধ অবৈধ নিয়ে ওদের এত মাথাব্যথা।" জ্যোতিদা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত।

রত্ন এরপর স্বীকার করে যে দুটি জায়গায় ওর সংস্কারে বাধে। বিয়ে যতদিন না হয়েছে ততদিন এক সঙ্গে শোয়া উচিত নয়। বিয়ে না হয়ে থাকলে ছেলে-মেয়ের জন্ম দেওয়া উচিত নয়।

"ওঃ তুমিও দেখছি একজন নীতিধ্বজ! যাদের মতে মন্ত্র পড়ালেই মন্দটা হয়ে যায় ভালো, না পড়লেই ভালোটা হয়ে যায় মন্দ।" জ্যোতিদার মুখে বাঁকা হাসি।

"না জ্যোতিদা, মন্ত্রের তেমন কোনো পাবনী শক্তিতে আমার বিশ্বাস নেই। মন্ত্র পড়েই হোক আর না পড়েই হোক, বিয়ে আমাকে করতে হবেই, যদি কখনো কারো সঙ্গে শুই। তখন যদি না করি তো পরে, যদি সন্তানসম্ভবা দেখি। এটা আমার অন্তরের বিধি, সমাজের বিধি যাই হোক না কেন।" রত্ন অকপটে বলে।

(ক্রমশ)

সত্তরের শেষে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

বিগত এক বছরে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব আশাপ্রদ বা উজ্জ্বল হয়েছে তা নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে যে অবস্থার উন্নতি হয়নি তা নয়, তবে হিসাবের খাতায় লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশী : ১৯৭০ সালের গোড়াতেই আমরা দেখেছি ১৪টি ব্যাংক জাতীয়করণের জন্য যে আইন ১৯৬৯ সালে প্রণীত হয়েছিল, সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দিয়েছে; তাই আবার নতুন আইন তৈরী করতে হয়েছে। যদিও ব্যাংক জাতীয়করণ সংক্রান্ত প্রথম আইনটি সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল হয়ে গিয়েছিল, তবুও সরকার মোটেই তাঁর নীতি পরিত্যাগ করেননি, সঙ্গে সঙ্গেই নতুন একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে ব্যাংক জাতীয়করণের পূর্বতন ব্যবস্থা পুনর্বহাল রেখেছিলেন। শুধু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু হেরফের হয়েছে। ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির বহু নতুন শাখা খোলা হয়েছে; কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প আগের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাংক-প্রদত্ত ঋণের সুবিধা পাচ্ছে। রপ্তানি-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি কর্তৃক নতুন ঋণ দেওয়া হচ্ছে। মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বমুখী গতি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের নীতি ব্যর্থ হয়েছে। এক বছরে জিনিসপত্রের দাম প্রচুর বেড়েছে। সরকার এক দিকে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করতে চান এবং এজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কর্তৃক নগদ সম্পদ রিজার্ভের নীট অনুপাত (Net Liquidity Ratio) তিন কিস্তিতে বাড়িয়ে শতকরা ৩০ ভাগ থেকে ৩৩ ভাগ করা হয়েছে। অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এবং সেই ঋণের পরিণতি হিসাবে আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বেড়েছে বই কমেনি। আবার ব্যাংকগুলি যে পরিমাণে নতুন শাখা খুলেছে সে পরিমাণে আমানত সুসংহত করতে পারেনি বা বাড়াতে পারেনি। এই অবস্থার পরিণতি হিসাবে আমরা মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতাই দেখতে পাচ্ছি।

কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে স্থিতাবস্থা বজায় আছে। কিন্তু খাদ্য-আমদানি বন্ধ করা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন না করতে পারলেও অবস্থা বিবেচনায় বলা যায়, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সরকার অবনতির দিকে দেশের অর্থনীতিকে আর ঠেলে নিয়ে যাননি। কৃষি-উৎপাদনের যে হার এখন আমরা দেখতে পাই, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, "সবুজ বিপ্লবের" যে স্লোগান আমরা সরকারের মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছি, তার পরিপ্রেক্ষিতেই কৃষি-ক্ষেত্রে ভারতকে উন্নত বলা ঠিক হবে না। পর পর তিন বছর যদি ভারত বন্যা অথবা অনাবৃষ্টির মোকাবিলা করেও কৃষি-উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে পারে তবেই সবুজ 'বিপ্লবের' সূচনা হয়েছে বলা সার্থক হবে। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এ বছরে হয়েছে শতকরা প্রায় সাড়ে পাঁচ ভাগ; গত বছরের অনুপাতে এটা বেশী হলেও ১৯৬৮-৬৯ সালের পর্যায়ে আমরা এ বছর যেতে পারিনি। রপ্তানি-আয়ের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও শোচনীয়। যেখানে শতকরা ৭ ভাগ হারে রপ্তানি বেড়ে যাওয়ার কথা, সেখানে ১৯৭০ সালে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১৯৬৯ সালের অনুরূপ সময়ের অনুপাতে রপ্তানি-আয়ের পরিমাণ ৩·১ শতাংশ কমেছে।

সত্তরের শেষে যে সমস্যাটি সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে তা হল বেকার সমস্যা। বেকার সমস্যার কারণগুলি আলোচনা করে লাভ নেই। বছরের পর বছর ধরে যে সমস্যায় ভারতের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত, তার কারণগুলি সবারই জানা আছে। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ১৯৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭০ সালে বেকার সমস্যার তীব্রতা অনেক বেড়েছে এবং তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি যুব-গোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে। নৈরাশ্য ও হতাশা বেকার যুবকদের অন্ধকারের পথেই নিয়ে যাচ্ছে; তার সঙ্গে যোগসাজস হচ্ছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার। অথচ আজ যাঁরা বেকার তাঁদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজ থেকে সদ্য পাস করা যুবক; দেশ স্বাধীন হবার পরেই তাঁদের জন্ম হয়েছে। তিন মাস আগেই বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি "Crash Plan" গঠন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন; সম্প্রতি একটি কমিশন গঠন করার কথাও ঘোষিত হয়েছে। শুধু কমিশন ঘোষণা করে সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করার মত অথবা সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করার মত সময় আর হাতে নেই। রোগী মৃত হয়ে গেলে ডাক্তার ডাকা যেমন অর্থহীন, এ ক্ষেত্রে বেকার সমস্যা নিয়ে নতুন ক্ষেত্রে কমিশন আরও অর্থহীন। তার চেয়ে কিভাবে শিল্প ও কৃষির দ্রুত উন্নতি করে এবং শুধু শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি রেখে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায় তারই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। স্বাধীনতার পর থেকে যে সমস্যাটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল সরকার সেটা করেননি। খাদ্য ও কর্মসংস্থান—৫৫ কোটি লোকের কাছে এই দুইটি মূল প্রয়োজন। সরকারের উচিত এই দুইটি মূল সমস্যার সমাধানকে সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রাধিকার দিয়ে অন্য সমস্যার মোকাবিলা করা।

১৯৭০ সালে সরকার শিল্প লাইসেন্স নীতির সংস্কার করেছেন। তার ফলে শিল্পোৎপাদন কিছুটা বাড়বে বলে আশা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই সামান্য। আগেই বলা হয়েছে, আমাদের জাতীয় আয় বিগত বছরে শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগ বেড়েছে বলে অনুমিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ধিত আয়ও সমানভাবে বণ্টিত হয়নি। যাঁদের আয় বাড়ছে তাঁদের ক্রয়শক্তিও বাড়ছে এবং বিভিন্ন ভোগ-সামগ্রীর জন্য চাহিদাও বাড়ছে। তার ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়েই যাচ্ছে। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হবে বলে মনে হয় না। যদিও চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে, চূড়ান্ত চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০ সালের মে মাসে। বহু চেষ্টা করেও সরকার ঘাটতি অর্থসংস্থান (Deficit financing) এড়াতে পারেননি। করের বোঝাও ক্রমশই বাড়ছে। এভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়াকে আরও মদত দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকারের সামনে বিকল্প পথ কই বা আছে। এখন মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণকল্পে শ্রম-নিবিড় শিল্প-প্রকল্প বিনিয়োগ প্রভৃতি কর্মসূচীকে সামনে রেখেই

সরকারের এগিয়ে চলা উচিত। কৃষিক্ষেত্রে যে উদ্বৃত্ত আয় সৃষ্টি হচ্ছে তার খানিকটা সরকার আদায় করতে পারেন বড় বড় জোতদারদের উপর কর ধার্য করে। এই নীতি এখনও ঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে না। শহর অঞ্চলের সম্পত্তির ঊর্ধ্বতম সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাবও এখন পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

যাঁরা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ নিশ্চয়ই চিন্তা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে যে কিরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে যে কিরূপ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং নাগরিক জীবনের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়, সেগুলির কারণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা আরও গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। আশা করব সত্তরের ভুলের মাসুল ১৯৭১ সালে দিতে হবে না; সত্তর সাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আগামী বছরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা চলবে।

সুব্রত গুপ্ত

উড়ো উদ্ধার

প্রতিভা বসু

৩

সন্ধ্যা শেষ হল ঠিক সাতটায়।

সাঁঝ ঝাঁ রোদ্দুরে ঢুকেছিলেন, গাঢ় সন্ধ্যায় বেরিয়ে এলেন। আপিসের মস্ত চৌহদ্দি তখন আলোয় আলোময়। তৈরি-করা সবুজ ঘাসের আস্তরণ ঢাকা মাঠের পাশ দিয়ে লম্বা লম্বা পাঁচচালা পাথর দু' পাশে নিয়ন আলোর নীলচে দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছিল। বাগানে জলের ফোয়ারা শতধারে উপচে পড়ছিল, মৌসুমী ফুলের রংয়ের বাহার বাতাসে দুলে দুলে অন্য কোনো অলৌকিক জগতের ছবি আঁকছিল।

কিন্তু কোনো দিকে তাকাবার সময় ছিল না তাঁর রায়ের। পাঁচতলা থেকে আলাদা লিফটে হুস করে একতলায় নেমে, বারান্দা পেরিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন। মাঠ বাগানের জোড়া সৌন্দর্য পিছনে ফেলে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই চালাচ্ছিলেন ইচ্ছাসুখ স্পীড বাড়িয়ে দিলেন। মনে হচ্ছিল, কোনো রকমে উড়ে গিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হতে পারলে বাঁচেন।

সেই সময়ে ছড়াটা যেন কখন ভুলে গেলেন তিনি। মাথার মধ্যে তখন অন্য একটি চিন্তা ঘুণপোকা হয়ে ঘুরছিল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো', 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো।' কিন্তু কেন?

না, সেই কেনর কোনো সদুত্তরও ছিল না তাঁর কাছে।

শরীরটা থেকে থেকে জানান দিচ্ছিল সে ভালো নেই। গা ব্যথা বেড়ে উঠছিল, মাথার টিপ টিপ জোর হচ্ছিল, চোখ মুখও জ্বালা জ্বালা করছিল। বোঝা যাচ্ছিল সাতদিনের বৃষ্টি তাকে বেশ একখানা ভালো উপহার দিয়ে বিদায় নিয়েছে।

অবশ্য বৃষ্টির দোষ নেই কোনো। দোষ তাঁর নিজেরই। কাল রাত্রে ছিলেন জানালাটা সারারাত খোলা ছিল, ঘুমের মধ্যে গভীর রাত্রে ছাট এসে যখন তাঁকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল তিনি গাঢ় নিদ্রায় অচেতন ছিলেন। তারপর সকালে উঠে দেখেছেন, বালিশ বিছানার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাত পোশাকটিও ভেজা। স্যারিডন, কোসাভিল, ওরিসুল, অ্যাভিল, সব অসুধ মজুত আছে ঘরে, চিন্তা করে স্যারিডনই খেয়েছিলেন প্রথমে, গা ম্যাজ ম্যাজ করা আর মাথাধরা দুই-ই কমে গিয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে, শত্রু অজেয়। এত সহজে পরাস্ত হবার নয়। আরো কড়া ডোজে কিছু খেতে হবে বাড়ি গিয়ে। জ্বরটর হয়ে পড়ে থাকলে তো বিপদ।

কী বিস্বাদ লাগছে সব। বিস্বাদ। বিস্বাদ। শরীর মন সব বিস্বাদে ভরা। অবশ্য এই বিস্বাদ তাঁর নতুন নয়। শরীরের বিস্বাদ হয়তো সাময়িক কিন্তু মানসিক বিস্বাদ চিরন্তন। বলতে গেলে বহু বছর যাবত এই বিস্বাদের সঙ্গে বাস করতেই তিনি অভ্যস্ত। শুধু ডিগ্রির তফাত ঘটে মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে বাড়ে আর মাঝে মাঝে কমে।

যেমন আজ। আজ সকাল থেকেই শরীর প্রতারণা করছিল তাঁর সঙ্গে, কিন্তু ফোনটা পেয়ে থেকে মনটাও যেন বিষের টুকরো হয়ে আছে। যেখানে ছুঁয়েছেন সেখানেই ব্যথা, সেখানেই বিস্বাদ।

অসুখবিসুখ বড় একটা হয় না, জ্বর যে শেষ কবে হয়েছিল মনেই পড়ে না, আজকের স্বাদটা জ্বরের মত। গাড়ি চালাতে চালাতে হাত ছেড়ে নিজের তাপ নিজেই পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন, প্রায় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল একটা পোস্টের সঙ্গে, ক্ষিপ্র হাতে সামলে নিয়ে স্পীড কমালেন। কুয়াশার মত ছেয়ে থাকা ঝাপসা মনখারাপ করা ভাবটা আরো প্রবল হয়ে উঠলো।

সেবার ক্যালিফোর্নিয়ায় কোনো একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে একটা ইটালিয়ান ছবি দেখে খুব অভিভূত হয়েছিলেন। এই বিস্বাদেরই ছবি। ইংরিজীতে যাকে বলে বোরডম। নায়ক ছিল মার্চেল্লো আর নায়িকা সোফিয়া লোরেন। ছবির টুকরো টুকরো কতগুলো দৃশ্য এখনও জাজ্বল্যমান। বোরডমে ভুগতে ভুগতে

লোকটা শেষে কী যে করল আর করল না ঠিক নেই কোনো। ছবির নায়কটিকে নিজের সংগে আইডেনটিফাই করে বেশ উত্তেজিত বোধ করেছিলেন তিনি। সেই রাত্রে ঘরে ফিরে আর ঘুমুতে পারেননি। আর সেই রাত্রেই হঠাৎ ভীষণ জবর এসেছিল। সকালে উঠেই হাসপাতাল। সপ্তাহখানেক পড়ে থাকতে হল বিছানায়।

বলতে গেলে দেশ ছাড়ার পরে সেই জবরই বোধ হয় প্রথম ও শেষ।

কিন্তু জবরে যত না ভুগেছিলেন, বোরডমে ভুগেছিলেন তার চেয়ে বেশী। বিরস মুখ দেখে নার্স জিজ্ঞেস করেছিল, গার্ল ফ্রেণ্ড চাই কি না। এত হাসি পেয়েছিল!

আচ্ছা, ইংরিজীতে ওরা যাকে বোরডম বলে, আমরা কি তাকেই বিস্বাদ বলি? ডক্টর রায়ের চিন্তা আবার বিস্বাদ আর বোরডমের গবেষণায় সক্রিয় হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন, বিস্বাদ আর বোরডম একই কিনা অথবা আলাদা। যদি আলাদাই হয় তবে বোরডমের প্রতিশব্দ কী?

বিস্বাদ, বিষাদ, বিশ্রী-লাগা, মন খারাপ, ক্লান্তি—কোনটা এর সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ? কোন্‌টা? খানিক আগের ঐ ইংরিজী বাংলা তারিখের মতই এই গবেষণা তাঁর মাথাকে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়াতে লাগল। আস্তে আস্তে তিনি অস্থির বোধ করতে লাগলেন, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন।

•

নির্বেদ।

ইয়েস্‌। নির্বেদ। দ্যাট্‌স দা ওয়ার্ড, নির্বেদ। হঠাৎ শব্দটা পেয়ে গিয়ে গাড়ি চালানো ভুলে উৎসাহে তিনি দু হাত উপরে তুলে দিয়েছিলেন।

নির্বেদ। চমৎকার প্রতিশব্দ। শব্দটা কি আমি বানালাম নাকি? কী কাণ্ড। তা হলে বাংলা জ্ঞান এখনও একটু একটু টিকিয়ে আছে মাথার মধ্যে? এত খুশি লাগল সে কথা ভেবে যে, একটা গানের লাইন পর্যন্ত মনে পড়ে গেল। 'যে ছায়ারে ধরবো বলে করেছিলেম পণ, আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন।' বেসুরো গলায় একটু সুরও ভাঁজলেন।

•

কিন্তু আমার কলম? কলমটা কই? সংগে সংগে বাঁ হাতটা বুক পকেটে চেপে আঁতকে উঠলেন। নিশ্চয়ই ফেলে এসেছেন। কোথায় ফেললেন? এই কলম ছাড়া তাঁর চলবে কী করে? অত্যন্ত প্রিয় কলম, এটাকে তিনি চোখে হারান। প্রিয় বলতে এই ধরনেরই দু' একটা জিনিস এখনও অবশিষ্ট আছে জীবনে, এরা গেলে আর থাকল কী? নির্বেদ এবং গানের সুর ভুলে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। বাড়ির অর্ধেক রাস্তায় এসে আবার গাড়ি ঘোরালেন, আর ঘুরিয়েই পায়ের তলায় চোখে পড়ল কলমটি। কখন পড়ে গেছে নীচে।

আঃ। একটি আরামের নিশ্বাস বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ। কলমটি তিনি বছর সাতেক আগে জর্মানিতে গিয়ে কিনেছিলেন। চমৎকার কলম। নামটিও সুন্দর, মবলো। দেখতেও সুন্দর। ঘন সবুজ গা আর মাথায় লাল টুপি। এটা দিয়ে না লিখলে তো তাঁর লেখাই হয় না।

৪

গাড়ি বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছুল। দারোয়ান দৌড়ে এসে গেট খুলে দিয়ে সেলাম জানিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল। গাড়ি

গোল হয়ে ঘুরে বাংলোর বারান্দায় থামল। পোর্টিকোতে আলো জ্বলছিল, গৃহ-সেবকেরা ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল মনিবের জন্য। এবার তারা ছুটোছুটি শুরু করল। বেয়ারা অকারণে এ কাঁধের ঝাড়ন ও কাঁধে নিল, গোয়ান পাচকটি অ্যাপ্রোনের লাগান বোতাম খুলে আবার লাগাল, ছোট ছোকরাটা গাড়ি থেকে পোর্টফোলিও নামিয়ে ছুটে গেল দোতলায়।

অন্য দিন মিটিং থাকলে বা ডিনার থাকলে বা অন্য যে কোনো কারণে হোক দেরি হবে জানলে তিনি ওদের বলে যান। আজ ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা বলে গেলে লোকজনেরা অনেক শান্তিতে থাকতে পারে। কেননা, কখন আসবেন কখন আসবেন এই উদ্বেগ থাকলে তাদের পক্ষে ইচ্ছেমত কিছু করাই সম্ভব নয়। গতিবিধি জানলে দরকার মত কোথাও যেতে পারে, তাস খেলতে পারে, আড্ডা দিতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেকে পরিপূর্ণ স্বাধীন ভাবতে পারে।

দেখা গেল সেই কারণেই মনিবের জন্য আজ সবাই বেশ উদ্বিগ্ন। আসলে মনিবকে ওরা ভালোবাসে, মনিবের সুখসুবিধের জন্য ওরা স্বেচ্ছায় উৎসুক। ডক্টর রায়ও অবশ্য ওদের ভালোবাসেন, যত্ন করেন, খোঁজখবর নেন, নিজের লম্বা মাইনের বেশ বড় একটা অংশ ভাগ করে দেন সকলের মধ্যে। ভৃত্যরা তাঁর কাছে ভৃত্য নয়, আত্মীয়, বন্ধু, সন্তান।

ঘরে ঢুকে সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি সামান্য হাসলেন, তারপর সোজা চলে এলেন নিজের ঘরে। দু' মিনিটে চা নিয়ে এলো আমজাদ আলি, খাবার নিয়ে এল, তিনি জলের মত এক কাপ পাতলা চায়ের সঙ্গে দুটো ওরিসুল খেয়ে মাথা টিপে বসে রইলেন।

ফোন ধরে, মিটিং করে, দ্রুততম বেগে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁর ব্যর্থতাবোধ তাঁকে আক্রমণ করেছে। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না, কে না কে এক উদ্ধত যুবক তাঁর সন্তানের দাবি নিয়ে দু'চারটে চিৎকার চাঁচামেচি করা মাত্রই তিনি আচমকা তাকে খেতে বললেন কেন? দেখা করতে চাইলেই কি দেখা করা যায়? কেন দেখা করবেন? কী প্রয়োজন? কী বলবেন তিনি? এই এক রাগী অপাপবিদ্ধ ছোকরাকে তাঁর মত বয়স্ক একজন পুরুষের কী বলবার থাকতে পারে? থাকলেই কি তা বলা যায়? বলা উচিত?

তাঁর ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। তবু উঠলেন, ঘর সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। ঠাণ্ডা জল গরম জলের কল খুলে, সল্ট ছিটিয়ে টবে অবগাহন করলেন। সেই সময়ে তাঁর মন শূন্য ছিল, তিনি কিছুই ভাবতে পারছিলেন না।

একটু পরেই সচকিত হলেন। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে চুল মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ঘড়িতে দেখলেন আটটা বাজতে পাঁচ। আবার তাঁর শূন্য মনের যন্ত্রণাটা চঞ্চল হয়ে উঠল, ইঞ্জিনগুলো গর্জাতে লাগল, একটা যন্ত্রণাময় প্রতীক্ষায় ছটফট করতে লাগলেন।

৮

বাড়িটি খুব সুন্দর। দেড় বিঘা জমির উপর বাগান আর লনে ঘেরা এরকম চারটি বাংলো আছে এই কম্পাউণ্ডে। চারটি বাংলোই তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কেণ্টবিষ্টুরা আলোকিত করে রেখেছে। অন্য তিনজন খাস ইংরেজ, একমাত্র তিনিই ভারতীয়। যার যার বাংলোর সামনে পিছনে তার তার লন বাগান এবং সবজি-খেত। প্রতিষ্ঠানের মাইনে করা মালিরাই সে সব রক্ষণাবেক্ষণ করে, বসবাসকারীরাও কিছু দক্ষিণা দিয়ে যার যার অংশে পছন্দমত ফুলে সাজায়।

বাড়িটিতে একতলা দোতলা মিলিয়ে ঘরের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কিন্তু প্রশস্ত। এক তলায় খাবার ঘর, বসবার ঘর, রান্না ঘর, অতিথির ঘর ইত্যাদি মিলিয়ে হাত-পা ছড়ানো, দোতলায়ও তেমনি শোবার ঘরগুলো মস্ত বড়। বলতে গেলে নিচতলাটা ব্যবহারই করেন না ডক্টর রায়, তাঁর সবই দোতলায়। যেদিন কোনো পার্টি থাকে শুধু সেদিনই নীচের ঘরগুলো মুখর হয়ে ওঠে। হলের মত বিরাট ড্রইংরুমটি ভরে যায় অতিথিতে, খাবার ঘরের প্রকাণ্ড টেবিল কাটা-চামচ-প্লেট এবং শৌখিন লেসের ঢাকনায় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। নইলে ডক্টর রায় দোতলাতেই বসেন, খান এবং শোন।

দোতলার বসবার জায়গাটি তাঁর ভারি প্রিয়। ঝোলানো অর্ধচন্দ্রাকার তিন দিক ঢাকা বারান্দাটিতে বসলে মুহূর্তে মনের গ্লানি ফিকে হয়ে আসে, দূরে তাকালে সমুদ্র দেখা যায়, তার অস্পষ্ট কল্লোলও শ্রুতিগোচর হয়। আর বাতাস একেবারে ছুটে এসে ঘা দেয় বাড়িটার দেওয়ালে দেওয়ালে। তাঁর পর্দা ওড়ে, ড্রেসিংগাউন ওড়ে, তিনি চুপচাপ দাঁড়ান আলোর তলায়, বসে বসে বই পড়েন, সামনের টেবিলে বেয়ারা হুইস্কি সোডা রেখে যায়।

স্নান সেরে প্রস্তুত হয়ে তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন, রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রাঁধুনিটিকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমার সঙ্গে আজ একজন খাবেন, মুর্গী করো। ফ্রিজে আছে তো? আইসক্রীমও করো। আর ভাজা-টাজা—যা তুমি ভালো মনে কর। হ্যাঁ শোনো, ভাত দরকার হবে, ভাত। যে আসবে সে ভাত খায়। ডিম মাংস সবজি সব মিলিয়ে ভালো করে চীনে ভাত করে দাও। তাড়াতাড়ি কর, চারটে প্যাসট্রি জেনে দাও।'

রান্নাঘরের দরজা থেকে ড্রইংরুমে এলেন, এর ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আলোগুলো জেলে দাও সব। বারান্দা বাগান লন, বসবার ঘর, যতগুলো আলো আছে, সব জেলে রাখ। আর হ্যাঁ, একজন গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক গেটের ধারে। একটি অল্পবয়সী ছেলেকে দেখলেই জিজ্ঞেস করবে সে আমার বাড়ি খুঁজছে কিনা। এলে একেবারে উপরে, আমার বসবার বারান্দায় নিয়ে যাবে।'

বলতে বলতে টুকটুক নিজেই আলো-গুলো জেলে দিলেন। বারান্দায় এলেন; বারান্দা থেকে বাগানের গেট দিয়ে লনে ঢুকলেন। ঘুরে ফিরে, ধীরে ধীরে গেটের কাছেও এসে দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ, তারপর কী ভেবে ফিরে গেলেন তাড়াতাড়ি। দোতলায় গিয়ে বারান্দায় বসলেন প্রতিদিনের মতো। হাতে বই, মাথার কাছে আলো।

সেখান থেকেও তিনি রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন, বাগান দেখতে পাচ্ছেন, অনন্ত আকাশ দেখতে পাচ্ছেন, আর দূরে দেখছেন বিশাল কালো জলরাশির অতল অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে উল্কার মতো ফসফরাসের চিড়িক।

আবার মেঘ করল। চমকে গেলেন তিনি, আটটা বেজে আট। এলানো চেয়ারের আরামে রোজের মতোই একখানা বই নিয়ে আধশোয়া হয়েছিলেন, দাঁড়ানো আলোর একাগ্র জ্যোতি তার বইয়ের অক্ষরকে দীপ্তিময় ক'রে তুলেছিল, কিন্তু তিনি মন দিতে পারছিলেন না।

যদি বৃষ্টি হয়? যদি ঝড় ওঠে? এই চিন্তায় বিদ্ধ হতে লাগলেন। অবশ্য বৃষ্টি হলে তাঁর কী? তিনি তো বাড়িতে পৌঁছে গেছেন, বাইরেও এমন কেউ নেই, যার জন্য এতো ভাবনা। এই প্রশ্ন তিনি নিজেকেই নিজে করেছিলেন, তেমন যুক্তিযুক্ত জবাব দিতে পারেননি। শেষে ভাবলেন, 'না, এরকম সময় অসময়ের বৃষ্টি আমি ভালোবাসি না বোধ হয়।'

ভালোবাসেন না? বাসেন। নিশ্চয়ই বাসেন। বৃষ্টির ঋতু চিরদিন তাঁর প্রিয়। মেঘের আওয়াজ ছেলেবেলা থেকে তাঁকে পাগল ক'রে তোলে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে বৃষ্টির গান তাঁর সব চেয়ে বেশী ভালো লাগে। 'একি গভীর বাণী এলো ঘন মেঘের আড়াল ধরে সকল আকাশ আকুল ক'রে' অথবা 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে, সেই আগুনের কালো রূপ যে আমার চোখের পরে নাচে।' অথবা 'হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে, বেড়া ভাঙার মতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।' এই সব গান তেঁ

এখনও তাঁর কণ্ঠস্থ। কণ্ঠস্থ না ব'লে অবশ্য শ্রুত বলা ভালো। কেননা কণ্ঠে তাঁর গান নেই। সুর নামক পদার্থটি বড়ো বেশী দূরে তাঁর কাছ থেকে। তবু আকাশে মেঘ ডাকলেই তো তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গেয়ে ওঠেন এসব গান।

অর্থাৎ কোনোদিন গেয়ে উঠতেন, এখন নয়। এখন সবই অতীত। সবই ইতিহাস।

চোখ আবার ঘড়ির দিকে গেলো। আটটা পনেরো।

পা নাচাচ্ছিলেন তিনি, বইয়ে মনোযোগ-ভ্রষ্ট হ'য়ে অশান্তভাবে নড়াচড়া করছিলেন। বেয়ারা এসে দরজায় ছায়া ফেললো। ধড়মড়িয়ে সোজা হ'য়ে বসলেন, গম্ভীর-ভাবে নিবন্ত সিগারেট টান দিলেন।

'সাব।'

'বলো।'

'সোডা হুইস্কি—'

'ও, সোডা হুইস্কি? না, এখন থাক।'

আবার ঢিলে হ'য়ে হেলান দিলেন চেয়ারে, পা নাচানোটা বেড়ে গেলো।

আটটা কুড়ি। পা নাচানো বন্ধ করে

এবার তিনি চুল টানতে লাগলেন। খানিক বাদে বইটাও বন্ধ ক'রে ঠাস ক'রে রেখে দিলেন টেবিলে। কী ভেবে আলোটাও নিবিয়ে দিলেন।

কিন্তু কেন যে স্থির থাকতে পারছেন না কে জানে। আবার তাঁর ঘড়ি দেখার দরকার হ'লো, অন্ধকারেও জ্বলছিল কাঁটা-গুলো, তাতে হ'ল না টিপ ক'রে আলো জেলে নিলেন। আটটা তিরিশ। অর্থাৎ সাড়ে আটটা।

'ইরেসপনসেবল।' অস্ফুটে উচ্চারণ ক'রে অত্যন্ত রাগতভাবে অ্যাসট্রেতে সিগারেট ঘষটে দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন সামনের দিকে।

কিন্তু সেভাবেও বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। উঠে দাঁড়ালেন, আড়মোড়া ভাঙলেন, চলে এলেন রেলিংয়ের কাছে। দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা। মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটি পথিককে যাচাই করতে লাগলেন তীক্ষ্ন চোখে।

নাঃ। ছোকরা আর এলো না। সত্যি সময়জ্ঞান ব'লে কোনো পদার্থ এদের নেই। আসবে এসো, না আস তো এসো না। তা বলে অন্যকে এমন উদ্বিগ্ন করে রাখার কোনো অধিকার নেই তোমার।

রেলিংয়ের ধার থেকে তিনি ফিরে এলেন। এর নামই সামাজিক অপরাধ। অন্যের কাজের ক্ষতি করা।

যাকগে, না এলো তো নাই এলো। বরং বাঁচা গেল একদিক থেকে। এলে তিনি কী বলতেন তাকে?

'বেয়ারা।' পানীয়ের জন্য হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে মুখ বার করল সে, বিনীত স্বরে বলল, 'যে বাবুর আসবার কথা ছিল, তিনি এসেছেন।'

প্রায় কেঁপে উঠেছিলেন ডক্টর রায়। হাতের সিগারেটটা পড়ে গেল, পায়ের চাপে নিবিয়ে দিতে দিতে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'কোথায়? কোথায়?'

'নিচে ড্রইংরুমে বসেছেন।'

'ড্রইংরুমে কেন? এখানে, এখানে নিয়েসো।'

বেয়ারা চলে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি বসলেন। কিন্তু উঠলেন তক্ষুনি। হাঁটতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন। আবার সিগারেট ধরালেন। কী যে করবেন ঠিক ভেবে পেলেন না। তার মধ্যেই হুড়-মুড়িয়ে একটি উদ্ধত যৌবন এসে বারান্দায় আবির্ভূত হ'ল।

যে ছেলের মায়ের মুখটা তিনি অতি সন্তর্পণে অতি সংগোপনে অনেক চিন্তার মধ্যেও বারে বারেই মনে আনতে চেষ্টা ক'রে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ যেন প্রত্যক্ষ হ'য়ে তাঁর দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিল।

ছেলেটি এগিয়ে এসে ঘোষণা করল, 'আমি পুরন্দর।'

ডক্টর রায় চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। আমি সুদর্শন রায়।'

'আমিও বুঝতে পেরেছি।' পুরন্দর হাসল। কালো রংয়ের একটা চাপা প্যাণ্ট আর ছাপকা ছাপকা একটা বুশসার্ট পরেছে, জ্বলজ্বল করছে দু'টো চোখ, গালভরা দাড়ি আর মাথাভরা চুল ঈষৎ এলোমেলো। কোথাও এতোটুকু দ্বিধা আছে বলে মনে হ'লো না।

ডক্টর রায় বললেন, 'বোসো।'

'কিন্তু তার আগে কি আপনাকে আমার প্রণাম করা উচিত?'

স্মিতহাস্যে ডক্টর রায় বললেন, 'একেবারেই না।'

'যাক, এই একটা সামাজিকতা থেকে তা হ'লে বাঁচা গেল।'

'আমি সামাজিকতার কথা ভেবে বলিনি।'

'কী ভেবে বলেছেন?'

'ভেবেছি তোমার বিবেচনায় আমি নিশ্চয়ই প্রণম্য নই?'

'ঠিক। ঠিক ধরেছেন। আমি কখনোই আপনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি না।'

'অতএব চুকে গেল।' সহাস্যে দেশলাইয়ের বাকসের উপর তিনি সিগারেট ঠুকলেন, 'যিনি শ্রদ্ধেয় নন, তাঁকে প্রণাম করবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তার চেয়ে এসো—' হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'বিলিতী প্রথামত হ্যাণ্ডশেক করা যাক।'

'তাই ভালো।' হাতের সঙ্গে হাত মিলোলো পুরন্দর, আর যৌবনের তাপেই গলে গিয়ে ডক্টর রায় তাকে আলিঙ্গন করলেন।

'আমার দেরি দেখে নিশ্চয়ই ভাবছিলেন আসবো, না?' পুরন্দর বললো।
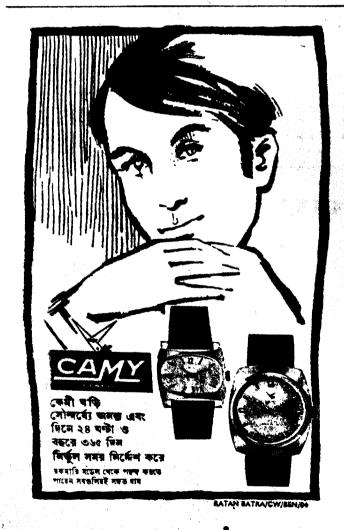
তিনিও বললেন, হাসিমুখে বললেন, 'তা ভাবছিলাম।'

'আর মনে মনে বলছিলেন বাঁচা গেল।'

'না।'

'তবে?'

'মনের সব কথা কি সকলকে বলা যায়?'

'না বললেও বুঝতে পারছি, তেমন ব্যস্তও আপনি ছিলেন না।'

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে ডক্টর রায় বললেন, 'ছিলাম।'

'ছিলেন? কেন?'

'এই একটা কৌতূহল।'

'কৌতূহল? কী রকম?'

'যেমন তোমার, ঠিক তেমনি।'

'বাপ বিষয়ে ছেলের কৌতূহল আর ছেলে বিষয়ে তার বাবার কৌতূহল কি এক বস্তু?'

'কী জানি।' ডক্টর রায় অন্যদিকে তাকালেন।

'লোকেরা বলে স্নেহ নিম্নগামী, আপনি কি সেই প্রবাদটা বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কিছু নেই, শুধু জানবার আছে যে স্নেহাস্পদ মানুষটি কে?'

'এক্ষেত্রে তো সেটা জানাই ছিল।'

'ছিল নাকি?'

'ছিলো না?'

'বলো, কী খাবে? চা? কফি? না কি অন্য কোনো পানীয়?' ডক্টর রায় প্রসঙ্গটা সেখানেই শেষ ক'রে দিতে চাইলেন।

পুরন্দর বলল, 'আপনার যা খুশি। খাওয়া নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, গোটা কয়েক কথা বলতেই এসেছি আমি।'

'রাত্তিরে কটার সময় খাওয়া তোমার অভ্যেস?'

'আটটা ন'টা দশটা এগারোটা বারোটা—ওসব কিছুই ঠিক নেই, কিন্তু কথাটা হচ্ছে—'

'তুমি কি বরাবর এই বম্বেতেই আছ?'

'না, এসেছি। এবং এসেই—'

'কোথায় থাক?'

'কলকাতা। আমি আপনাকে যা বলতে চাইছি—'

'কী করো সেখানে?'

'পড়াই। তা হ'ল এই যে—'

'কলেজে না স্কুলে?'

'কলেজে। আমাদের পিতাপুত্রের জীবনে সত্যি বলতে—'

'বম্বেতে কোথায় আছ?'

'পান্থনিবাস বলে একটা সস্তা হোটেলে। যা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে স্নেহবশে আমার কথাই আপনার মনে পড়া। তা কিন্তু হয়নি। উল্টোদিক থেকে আমিই আপনাকে অহরহ ভেবেছি, ভেবে ভেবে—'

'ও পান্থনিবাস? জানি। নতুন হ'য়েছে, তাই না?'

'হতে পারে। অথচ আমি আপনাকে দেখিনি, শুনিনি, চিনিনি, এবং সবচেয়ে যেটা বড়ো কথা, আমি আপনাকে জগতে আনিনি, আপনিই আমাকে এনেছেন—'

ছেলেটিকে প্রতিহত করতে না পেরে ডক্টর রায় এবার চুপ করলেন।

'ব্যাপারটা তবু অন্যরকম কেন হ'লো? আপনি আমার জন্য ব্যাকুল না হ'য়ে আমি কেন আপনার জন্য ব্যাকুল হলাম?' ভয়ানক উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত পা নেড়ে কথা বলছিল পুরন্দর 'শুধু তাই নয় টেলিফোনে আমার নিজের পরিচয় জানাবার পরেও আপনার স্বরূপ এক আমাকে শুধু আহতই করেনি, আমি তাজ্জব হ'য়ে ভেবেছি লোকটার কি সত্যি মনপ্রাণ ব'লে কোন পদার্থ নেই? অবশ্য তা যে নেই সে তো আমার মায়ের অবস্থা দেখেই আমি জেনেছিলাম। তবু ভেবেছিলাম, মানুষে তার স্ত্রীর সম্পর্কে যতো নিষ্ঠুরই হোক, প্রকৃতির পরিহাসে আপন সন্তান বিষয়ে নিশ্চয়ই অন্যরকম হ'তে বাধ্য। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার প্রতীতি জন্মালো যে ব্যতিক্রম সর্বত্রই সম্ভব। তবু আমি এসেছি। যদিও মনকে চোখ ঠার দিয়ে বলেছি, এ আসা আমার আসা নয়, এ আমার যুদ্ধ ঘোষণা কিন্তু মনের অগোচরে পাপও তো নেই, সুতরাং জানি সে কথা যদি পঁচিশ পরিমাণ সত্য হয়, বাকি পঁচাত্তর ভাগ আমার কাঙালপনা, যা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

একতোড়ে এতো কথা ব'লে একটু থামলো পুরন্দর। সে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

দুই হাতের পাতায় মুখের ভার রেখে ডক্টর রায় বললেন, 'তুমি শান্ত হও, বিশ্বাস করো তোমাকে দেখে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই।'

'গ্লানি? গ্লানি কিসের?'

'সোজা ভাষায় আমার খুব ভালো লাগছে।'

'শুধু এই?'

'ফোনে তুমি যখন আমাকে তোমার পিতৃত্বের আসনে বসিয়ে সমস্ত অধিকারের দাবি নিয়ে তিরস্কার করছিলে, প্রাপ্য নয় জেনেও আমি তা লোভীর মতো গ্রহণ করছিলাম।'

'প্রাপ্য নয় মানে?'

'সব কথার মানে জানতে চেয়ো না, এসো আমরা অন্য বিষয়ে কথা বলি। তোমার মা কেমন আছেন?'

'আমার মা? আমার মাকে কি আপনার মনে আছে?'

'জগতে এমন অনেক কিছু আছে যা ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।'

হঠাৎ চুপ করে থেকে পুরন্দর ভালো করে তাকালো ভদ্রলোকটির মুখের দিকে। পিতা নামক সুবেশ সুন্দর মানুষটিকে সে দেখতে লাগলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

(ক্রমশ)

॥ চার ॥

জীবন জিজ্ঞাসু সেই চমকপ্রদ ভদ্রলোকটি কিছুদিন বাদ আবার একদিন এসে হাজির আচমকাই।

যতই সচকিত হই না, যথোচিত স্বাগত জানাতেই হয়—'আইয়ে জনাব। আসুন।'

'আপনার কূল কিনারা করে ফিরেছি এবার। ঠিকুজি কুলজী সব নিয়ে।' তিনি জানালেন—'এর জন্যে মশাই, খোঁজ-খবর করে করে আপনার দেশে পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম শেষটায়।'

'আমার দেশ। কোথায় আমার দেশ?'

চমকাতে হ'ল আমায়।

'কেন, কোথায় আপনার দেশ আপনি জানেন না?'

'একটা মহাদেশ তো জানি, এই ভূভারত। তাছাড়া একটা খণ্ড দেশেরও বাসিন্দা আমি বটে—এই চোরবাগানের।' আমি জানাই, 'তবে এটাকে কলাবাগানও বলা যায় আবার। সত্যি বলতে, উভয় দেশের মধ্যপ্রদেশে—চোর আর কলা—এই চাতুর্যকলার মাঝামাঝিই আমি রয়েছি। কলাচাতুর্যের নোম্যানস-ল্যাণ্ডের সীমান্তে আমার আস্তানা।

'আপনি উত্তরবঙ্গের নন? জন্মেছিলেন কোথায় শুনি?'

'উত্তরবঙ্গে নয়, কলকাতারই কোনো অলিগলিতে হবে বোধ হয়।' আমি বলি—'মার মুখে শুনেছিলাম দর্জিপাড়ায় জন্ম আমার—দাদামশায়ের বাড়িতেই। নয়ান-চাঁদের লেন না কোথায় যেন ছিল সেটা।'

'কত নম্বর বাড়িতে?'

'ভুলে গেছি অ্যাদ্দিনে। কানে শোনা মাত্র, কোনোদিন নয়নে দেখিনি সেই গলিটাকে। দেখতে যাইনি, কৌতূহল হয়নি।' আমি নিশ্বাস ফেলি—'তা ছাড়া সে গলি কি আর রাস্তায় পড়ে আছে অ্যাদ্দিন! কলকাতা এর ভেতর কতবার ভোল পালটালো।'

'হতে পারে জন্ম আপনার দর্জিপাড়ায়, কিন্তু আসলে আপনি উত্তরবঙ্গের কোনো রাজবংশের সঙ্গে জড়িত—সম্ভ্রান্ত পরিবারের থেকে এসেছেন জেনে এসেছি আমি।'

'কী সর্বনাশ!' শুনে এবার চমকে গেছি সত্যিই!—'রক্ষে করুন, প্রলিতারিয়েত, পাতিবুর্জোয়া যা খুশি বলুন, কিন্তু এভাবে আমাকে বংশ দেবেন না, এমন কি, কোনো রাজবংশও নয়। দোহাই আপনার! আমি রাজবংশীদের কেউ না।'

'বললে কী হয়! আপনার মাতামহ-কুলও প্রায় রাজবংশই; ঠিক রাজগোত্রের না হলেও জমিদারগোষ্ঠীর ত বটে। তখনকার কালে ওই জমিদারদেরই রাজা বলত সবাই। কোনার না কোথাকার জমিদার ছিলেন নাকি তাঁরা।'

'পৃথিবীর কোন কোনায় কে জানে!' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। 'বিশ্বাস করুন, আমার পিতৃকুলে মাতৃকুলে কোনো কুলেই রাজা গজা কেউ নেই কো। তবে হ্যাঁ, মাসতুতো কুলে, তাও আমার আপন মাসির নয়, দূর সম্পর্কের মাসতুতই, আমার বাবার মাসির মানে বাবার এক মাসতুত ভাই একটা রাজাই ছিলেন বটে। খেতাবী রাজা। তবে তাঁর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। এক রোদে ধান শুকোবার সম্বন্ধেও না।'

'তাহলেও আপনাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারেরই একজন বলতে হবে।'

কি করে ভদ্রলোকের এই সভ্রান্তি দূর করি, ভারি মুশকিলে পড়ি আমি। বংশের খোঁজে জীবনে জীবনে ঘুরে ঘুরে বাঁশবনে ডোমকানা হওয়ার মতই তাঁর এই দশা বুঝতে পারি। কার স্বকপোল-কল্পিত কে জানে, একটা কানা বাঁশ নিয়ে এসে ধরে বেঁধে কষে লাগাতে শুরু করেছেন আমায়।

'দেখুন, আমার নিজের ধারণা ছিল আমি কলকাতার কোনো বস্তির থেকে আমদানি কিম্বা ফুটপাথের কোনো কুড়িয়ে পাওয়া। কেন যে আমায় এভাবে অযাচিত এই বংশ ধারণ করতে বলছেন তা জানিনে। আমি তো জানি, কলকাতার ফুটপাথে ঘুরে ঘুরেই আমি মানুষ। কেয়ার অব ফুটপাথই আমার ঠিকানা ছিল অনেক

কাল। সেখান থেকেই, উঠে এসেছি এই মেসে। কিন্তু ফুটপাথ আমায় ছাড়েনি, চেয়ে দেখুন, আমার ঘরে যত রাজ্যের জঞ্জাল। কলকাতার রাস্তার মতনই পুঞ্জীভূত। ফুটপাথের প্রতি আমার এই স্বাভাবিক আসক্তি, এটা কি আমার রক্তের টান নয়?'

'হতে পারে। সে খবরও একেবারে মিথ্যে নয় হয়ত। সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু তাহলেও সামাজিক সম্পর্কটাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না মশাই। অপনার বংশধারার বিবরণ শুনুন আমার কাছে...উত্তরবঙ্গে চাঁচোর নামে একটি সমধিক প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, এখন উদ্বাস্তুদের সমাগমে সে গ্রাম প্রায় শহরের মতই, যাই হোক, সেই গ্রামে একদা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র নামে এক নৃপতি বাস করতেন। তিনি সিদ্ধেশ্বরী এবং ভূতেশ্বরী এই দুই পত্নী রাখিয়া অপুত্রক অবস্থায় দেহরক্ষা করেন...'

'বটে বটে? আপনি দেখছি বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প এনে ফাঁদলেন—বত্রিশ সিংহাসনের এক খানা নিয়ে এসেছেন আমার কাছে।' বেতালার মত বললাম।

'উক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর দুই পত্নীকেই পরের পর দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার দিয়ে যান। রাণী সিদ্ধেশ্বরী প্রথমে সেই অধিকার খাটাবেন, তিনি ব্যর্থকাম হলে তারপর দ্বিতীয় রাণী। তাঁর সেই ইচ্ছে মতন রাণী সিদ্ধেশ্বরী দেশের থেকে নিজের বোনের ছেলেকে নিয়ে এসে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন বা করতে চান...বোনের নামটা কী ছিল কেউ বলতে পারল না।'

এই জানতে আপনি অদ্দুর কষ্ট করে এত নাস্তানাবুদ হতে গেছলেন

'ধরুন না, প্রেতেশ্বরী। সিদ্ধেশ্বরী ভূতেশ্বরী প্রেতেশ্বরী—এক সুরে না হলেও এক স্বরে মিলে যায় বেশ।'

'বিন্ধেশ্বরী হবে যেন শুনেছিলাম। যাই হোক, এই বিন্ধেশ্বরীর সন্তান স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী হলেন...'

'আমার বাবা। এতো আমি জানতাম। বাবার নাম আমি জানতাম না? এই জানতে আপনি অদ্দুর কষ্ট করে এত নাস্তানাবুদ হতে গেছলেন!'

'উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রেরও মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে...তাঁর স্বর্গত হবার পর...'

'স্বর্গে তো গেছেন। এখন ঈশ্বর ঈশ্বরচন্দ্র বলুন তাহলে। কিম্বা চন্দ্র-বিন্দু ঈশ্বরচন্দ্রও বলতে পারেন।' আমি বাধা দিলাম।

'হ্যাঁ। ঈশ্বরচন্দ্রের মনের ইচ্ছা ছিল প্রথমা পত্নীর বোনের ছেলেকেই উত্তরাধিকারী করার...রাণী সিদ্ধেশ্বরী হয়ত তাঁকে দত্তক নিয়েও থাকতে পারেন..'

'না মশাই, না। নেননি।' আমি জোর গলায় বলি—'আমার বাবা কারো পোষ্যপুত্র হবার পাত্র ছিলেন না, তাঁর স্বভাব চরিত্রের মর্ম আমি জানি। মাসীর প্রতি টান থাকা স্বাভাবিক, আমি মানি। এমন কি অপত্যস্নেহবশে তাঁর ছেলেকে রাজতক্তে বসিয়ে যাওয়ার বাসনা থাকাও শক্ত নয়, কিন্তু সেই ছেলেটির ধনশালী হওয়ার বাসনা ছিল না কোনোদিনই। যতটা জানি তিনি রাজাগজা কিছু হননি, হতেও চাননি কখনো। কখনো না।'

'কেন হননি বা কেন হতে চাননি তার মূলে একটা রহস্য আছে। সে কথা পরে। এখন বলুন ত, আপনার বাবা যে সন্ন্যাসী হয়ে গেছলেন এ খবর কি আপনার জানা?'

'জানি বই কি। এমন কি তাঁর সন্ন্যাসী বেশে ধ্যানমগ্ন চেহারার একখানা ফটোও ছিল আমার কাছে। অনেকদিন অযত্ন করে রেখেওছিলাম—কি করে হারিয়ে গেছে কে জানে! নইলে দেখাতে পারতাম আপনাকে।'

'হারিয়ে গেছে, কি করে হারালো?'

'কবে কেন জানি না, সব কিছুই আমার হারিয়ে যায়। কিছুই কখনো ধরে রাখতে পারি না আমি।'

'তাঁর সন্ন্যাসী হয়ে হঠাৎ এভাবে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে বেরিয়ে যাবার কারণটা আপনি বলতে পারেন?'

'জায়গাটার দোষ বোধ হয়।'

'জায়গার দোষ?'

'হ্যাঁ, ঐ যে চাঁচোর বললেন না? ওটার ইংরেজি নাম হল গে চঞ্চল—সেখানকার ডাকঘরের ছাপেও তাই পাবেন। 'CHANCHAL', তাই মনে হয়, সেই চাঞ্চল্যের ডাকে আমাকে যেমন এক সময় বাড়ি ছাড়া করেছিল সেইরকম বাবাকেও বোধ হয়...'

'না মশাই না। কোনো চঞ্চলতার নয়। চাঁচোরের খবর প্রাচীন এক [illegible] কাছে জেনে এলাম, অন্য কারণ। তাঁরও কথাটা আবার আরও প্রাচীন ব্যক্তির মুখ থেকেই শোনা। আপনি শোনেননি হয়ত। যাই হোক, আপনার বাবার হঠাৎ এই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়ার কারণটা কী হতে পারে আপনার ধারণা?'

'চাঞ্চল্য ত হঠাৎই হয়ে থাকে—তার আবার কারণ কী! আমার কী মনে হয় জানেন? জায়গার যদি না হয় তবে এটা সেই সময়টারই দোষ। সন্ন্যাসব্যাধি তখন কেবল ব্যক্তিগত বা বংশগতই ছিল না। সামাজিক মহামারির মতনই ছিল অনেকটা। তখন তো খাওয়া পরার ধান্দা ছিল না কোনো, জীবন সংগ্রামই ছিল না বলতে গেলে। এখনকার মতন নয়, কারো কোনো ভাবনা চিন্তাই ছিল না সেকালে। আর নেই কাজ তো খই ভাজ। কোনো ভাবনা না থাকলেই যত ভাব এসে মাথায় চাপে। বৈরাগ্যভাবটাও সেইরকম। ঈশ্বর চিন্তায় মানুষ পাগল হয়। ভগবানের খোঁজ খবর নিতে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে অকস্মাৎ। আমার বাবাও সেইরকম...'

'না মশাই না। এর মধ্যে অন্য রহস্য আছে...'

'হ্যাঁ, রহস্য তো আছেই। জীবনটাই এক রহস্য। আমি তো আজীবনই সেই রহস্য দেখছি—বিন্দুমাত্রও তার ভেদ করতে পারিনি যদিও। চাঁচোর থেকে এই চোর-বাগান অব্দি সেই রহস্য ওতোপ্রোতো। আপনি দেখছেন না?'

'কী রহস্যের কথা বলছেন?'

'সেই রহস্য। দেখছেন না আপনি, চাঁচোর আর চোরবাগান দুয়ের মধ্যেই একটা রহস্য রয়ে গেছে? লক্ষ করেননি?'

'না তো। কী রহস্য?'

'দুটি জায়গাতেই একই বিশেষণে একই বিশেষ্য—অভিন্ন রূপে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্তমান? দেখছেন না?'

'উঁহু।'

'এত বড়ো চোর আপনার নজরে পড়ছে না? আশ্চর্য!'

'চোর?' সারা মুখটাই একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে ওঠে ওঁর—'কোথায় চোর?'

'চোরই বলুন আর গোলামই বলুন—আপনার সামনেই। এই নরাধম।' হাতের তাস ফেলি।

'কী বলছেন মশাই?' তাঁর মুখের রেখায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ওপরে বিস্ময় চিহ্ন দেখা যায়।

'হ্যাঁ। চাঁচোরেও যে চোর এই চোর-বাগানেও সেই চোরই—সেই আমিই এই আমি। আমার চোরামি ঠাওর হচ্ছে না আপনার?'

'আপনার অকারণ এহেন কবুলতির কারণ?'

'কারণ আবার কি! সত্যি কথা স্বীকার করাই কি ভালো নয়? আর সত্যি বলতে, আমাদের এই দেশ, এই আর্যাবর্ত ব্রহ্মচর্যের পীঠস্থান। এটা তো মানেন? ব্রহ্মসূত্র আর কর্মসূত্র এক চৌর্যবৃত্তির দ্বারা এখানে বিধৃত। এর তুঙ্গ স্থানে সেই ব্রহ্ম, আর কর্মস্থলে কেবল চৌর্য—দুয়েতে এই উভয়কে আঁকড়ে ধরে আমাদের জীবন। ব্রহ্মচৌর্য ছাড়া বাঁচা যায় না। বাঁচতে পারি না আমরা।'

'ব্রহ্মচৌর্য কী বলছেন? ব্রহ্মচর্য বলুন।'

'একই কথা। বাগর্থ এক হলেও তার বাচ্যার্থ ভাবার্থ গূঢ়ার্থ অনেক থাকে—নানা অর্থ তার, নানান অনর্থ। ব্রহ্মকে চর্যাপদে আনলে পদে পদে ঐ চৌর্যকর্মই। তাছাড়া পথ কই? বাঁচতে হলে, বাঁচার মত বাঁচতে হলে ব্রহ্মবৃত্তি আর চৌর্যবৃত্তি দুই-ই আমাদের চাই যে। পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজের জীবনে সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। বাঁচার তাগিদে ননী চুরি থেকে গোপিনীর বস্ত্রহরণ কিছুই বাদ দেননি তিনি।'

'টাকা পয়সা চুরি করাটাকেই আমরা চুরি বলে ধরি। শ্রীকৃষ্ণ তা করেননি।'

'খাবার অভাবেই লোকে টাকা পয়সা

তিনি ননী চুরি করে No-need হতে গিয়েছিলেন

চুরি করে—অভাব মেটাবার স্বাভাবিক তাগাদায়। ছেলেবেলায় চুরি করে থাকে সবাই—অভাববশে নয়, স্বভাবতই। তারা ওটা চুরি বলে মনে করে না। শ্রীকৃষ্ণেরও বাল্যকালে সেই need ছিল, ননী খাওয়ার লোভ, তার অভাব মেটাতেই ননী চুরি করে তাঁর ওই no-need হতে যাওয়া। কিন্তু খাবার কি তার বিকল্প টাকা পয়সা চুরি করাটাকে চুরি বলেই আমি মনে করি না। শুধু অর্থই নয়, পরমার্থও আমাদের চুরি করে পেতে হয়। সহজে মেলে না।'

'কিছুই সহজে মেলবার নয় তা জানি। সে কথা ঠিক।' তিনি মেনে নেন।

পরকে এক্সপ্লয়েট না করে বাঁচা যায় না। পরকে আত্মসাৎ করে পরের আত্মসাৎ করেই আমরা বাঁচি, আমরা বাড়ি, আমরা হই। এই চুরি বিদ্যাই হচ্ছে বড় বিদ্যা—সুন্দর বিদ্যা। তার সমন্বয়ে এই জীবন বিদ্যা-সুন্দর। সেই চৌর পঞ্চাশৎ যেমন কালী-পক্ষে তেমনি বিদ্যা পক্ষেও।...আমার কথা যদি বলেন আমি এতাবৎ বেঁচে রয়েছি পরের খেয়ে পরেই। পরের এবং পরির।'

'পরির?'

হ্যাঁ, পরির তো অবশ্যই। পরের থেকে অর্থ, আর পরির থেকে পরমার্থ—উপরন্তু না অর্থার্থ-সিদ্ধি? এক্সপ্লয়েট এবং সেক্‌স্‌প্লয়েট? দুয়ে দুয়ে যেমন তেমনি দু হাতে দুধারের দুদোই না আমাদের বাঁচায়?'

'কী বলছেন মশাই?'

'সেই কথাই বলছি...কামিনী আর কাঞ্চন এই দুটিই আমাদের জীবনের সার বস্তু। জীবনের আর পৃথিবীর। এই দুই নিয়েই ত বাঁচা। বাঁচার মত বাঁচার জন্য দুইটাই চাই আমাদের—যে করেই হোক। আর ভগবান? হ্যাঁ, ভগবানও বটে। তিনি এই উভয়ের মধ্যে উহ্য। দুই মেরুর মধ্যে দণ্ডের মতই গুহ্য তিনি, তাঁর ওপর ভর করে তাঁর ভরসাতেই পৃথিবীর মতন আমাদের সূর্য প্রদক্ষিণ। শিরদাঁড়া না থাকলে কি বাঁচা যায় মশাই? খাড়াই হওয়া যায় না ঠিক মতন। তাই ভগবানও আমাদের চাই বই কি। দুই মেরুর মধ্যে একই প্রাণদণ্ডে আমাদের সঙ্গে তিনি সমান সজীব। সেই অক্ষর বস্তু আপন স্বরে আর ব্যঞ্জনায়—সম্মিলিত হয়ে যুক্তাক্ষর—কামিনী আর কাঞ্চন নিয়ে সশরীরে আমাদের মধ্যেই। আপন মহিমায় নব নব ভূমিকায়। অবতার রূপে না ধরেও আমরা প্রত্যেকেই তাঁর অবতারণা।'

'কিসের থেকে কিসের অবতারণা!'

'আজ্ঞে, সেই কথাই।...এই কামিনী আরও কাঞ্চন...পরের থেকেই পেতে হয় আমাদের, পরস্বাপহরণ না করে মেলে না কখনোই। এক আধটু চুরি চামারি না করলে কেউ বাঁচতেই পারে না। এই দুনিয়ায় সোধ হয় বাঁচাই যায় না একদম। অন্তত আমি তো পারিনি মশাই। আমার কথা যদি কই, মার্কটোয়েনের থেকে চুরি করেই আমার হাসির লেখার হাতেখড়ি—আমি লেখক হই। শুধু তিনিই নন, আরো অনেকের কাছে আমি ধারি। মুক্ত হস্তের এই ধার মুক্তকণ্ঠে আমার স্বীকার। চার ধারের কতো আখের রস পেষণ করে আমার এই আখের। এই লেখক পেশা। চোরামির কৌশল মজ্জাগত ছিল বলেই ছ্যাচরাতে ছ্যাচরাতে আসতে পেরেছি আজিদন—জীবনদশায় টিকে থেকে কোনো গতিকে। সত্যি বললে, আমি যেমন চোর তেমনি এক ছ্যাচোর। সে কথা প্রকাশ করতে আমার কুণ্ঠা নেই।'

'অসম্ভব না। খুনের ছেলের পক্ষে চোর হওয়া বিচিত্র নয় কিছু।'

'কী বললেন?'

'আপনার বাবা যে রাজ্যলোভ সম্বরণ করে বিবাগী হয়ে সন্ন্যাসী হতে গেছলেন সে কোনো ঈশ্বরের খোঁজে নয় মশাই। আপনার মাকে খুন করে তিনি ফেরার হয়েছিলেন।...'
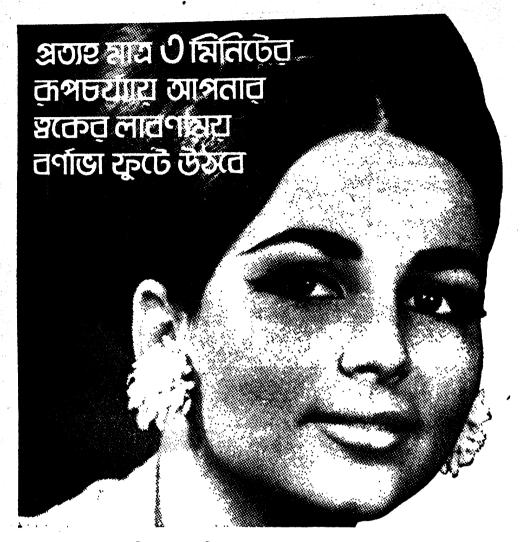
[ক্রমশ]

সি. ভি. রামন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন 'রামন এফেক্ট'-এর উপর। কী সেই আবিষ্কার সেই আবিষ্কারের পটভূমি এবং উত্তরকালে তার ভূমিকা কী, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিই এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

রামন এফেক্ট নামে যে বিখ্যাত আবিষ্কারের জন্য চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন বিজ্ঞানজগতে অমর হয়ে রইলেন, তার প্রয়োগের পরিধি যেমন বিপুল, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার আঙ্গিনাকে সেই প্রয়োগ তেমনি

আলো যে তরঙ্গাকারে চলে তার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ

বিস্ময়কর। নোবেল পুরস্কার অর্জনের কৃতিত্বেই নয়, আলোকবিজ্ঞানে এই আবিষ্কার যুগান্তর এনেছে। বর্তমান প্রবন্ধে রামন এফেক্ট, তার প্রয়োগ ও ক্রমবিকাশ এবং এই আবিষ্কারের পটভূমিকার আলোচনায় এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

বিকিরণের তরঙ্গতত্ত্ব

আগের শতকেই জানা ছিল যে, সূর্যের আলো বর্ণহীন মনে হলেও তা কয়েকটি রঙের আলোর মিশ্রণ। এই সব বিভিন্ন আলো-গমন করে তরঙ্গাকারে। তাদের রঙের মত তরঙ্গদৈর্ঘ্যও পৃথক। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ছোট, যেমন লাল আলোর মাঝামাঝি ·০০০০৭১ সেন্টিমিটার বা ৭১০০ A (1A= $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার=০০০০০০০১ সেঃ মিঃ ... এক সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের প্রায় কয়েক কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। লাল আলোর চেয়ে দীর্ঘতর তরঙ্গের লাল উজানী, বেতার তরঙ্গ যেমন দৃশ্য নয়, বেগুনি আলোর চেয়ে হ্রস্বতর দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি এক্সরশ্মি বা গামারশ্মির বিকিরণও চোখে দেখা যায় না। দৃশ্য ও অদৃশ্য সব বিকিরণের গতিবেগই (C) অভিন্ন অর্থাৎ আলোর গতির অনুরূপ। তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও তার কম্পনসংখ্যার সম্পর্ক হল C=তরঙ্গদৈর্ঘ্য×কম্পনসংখ্যা। এই সূত্র থেকে ৭১০০A দৈর্ঘ্যের কম্পনসংখ্যা পাওয়া যাবে ৪·২৩× $১০^{১৪}$ সাইক্লস/সেকেন্ড।

বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন নূতন ধারণার আমদানি হয়েছে। সেই-সব ধারণার অন্যতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। পরীক্ষালব্ধ ফল থেকেই বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক এই তত্ত্বের অবতারণা করেন—এর জন্য দৃশ্য ও অদৃশ্য বিকিরণের একককে একটি অখণ্ড কণিকা বা কোয়াণ্টা রূপে ধরে নিতে হয়। দৃশ্য আলো দিয়ে আইনস্টাইন আর একটি বিখ্যাত পরীক্ষার মাধ্যমে এই তত্ত্বটিকে আরও মজবুত বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তবু বিকিরণের তরঙ্গবাদ যে এই নূতন কোয়াণ্টা-বাদের ভিত্তিতে বাতিল হয়ে গেল, তা নয়। কেবল বিভিন্ন বিকিরণের এক একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা বা কোয়াণ্টা ধরে নিতে হ'ল যাদের শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট। দৃশ্য আলোর কোয়াণ্টাকে বলা হয় ফোটন। এই কোয়াণ্টা বা ফোটনের শক্তির পরিমাণ ও তার কম্পনসংখ্যার সম্পর্ক হল, E=h×কম্পনসংখ্যা। কম্পনসংখ্যার (f) কথা তো আগেই বলা হয়েছে, E হল একটি কোয়াণ্টার শক্তির পরিমাণ। এ দুয়ের মধ্যবর্তী h একটি নিত্যসংখ্যা যা প্ল্যাঙ্কের নামানুযায়ী পরিচিত। তরঙ্গবাদের ভিত্তিতে জানা ছিল যে, আলো বিকিরণের উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়লে দূরত্বের বর্গ অনুযায়ী তার দীপ্তি হারিয়ে ফেলে। এই নিয়ম অনুযায়ী উৎস থেকে এক মিটার দূরে এক বর্গ সেণ্টি-মিটার আয়তনে প্রতি সেকেণ্ডে আমরা যদি সেই আলোর এক একক Q শক্তি পাই, তবে ১০ মিটার দূরে ৳·০১ একক শক্তি পাব, ১০০ মিটারে ·০০০১ একক এবং আরো দূরে দীপ্তি কমতেই থাকবে।

দৃশ্য আলোর নানা রঙের মোটামুটি সীমারেখার অবস্থান ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিমাণ
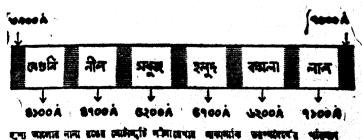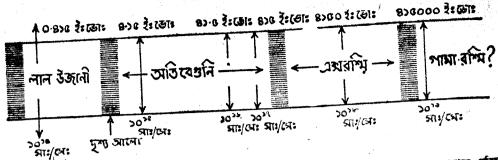
লাল উজানী বা অবলোহিত বিকিরণ ও উচ্চতর কম্পনসংখ্যার অন্যান্য বিকিরণের কয়েকটি ক্ষেত্রে শক্তি ও কম্পনসংখ্যার পরিমাণ। এই শ্রেণীবিভাগে সীমারেখাগুলিতে কার্যত কোনো বিরতি নেই

বাদের ভিত্তিতে কিন্তু এই দীপ্তি একটি ফোটনের শক্তির নীচে নামতে পারবে না। কোয়াণ্টাম বা ফোটন হল শক্তির অবিভাজ্য পরমাণুর মত। নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী এর শক্তিমাত্রাও নির্দিষ্ট। দীপ্তি যতই ক্ষীণ হোক না কেন, আমরা সেই আলোর এক, দুই, ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যক ফোটন পাব, ভগ্নাংশ কখনোই নয়। দৃশ্য ও অদৃশ্য এই সব বিকিরণের উৎস হ'ল বস্তু। বস্তুর অণু-পরমাণুর ভেতরকার শক্তিই বিকিরণের আকারে ছড়িয়ে পড়ে, আবার সেই সব বস্তুই বিকিরণের শক্তি কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎও করতে পারে। পরমাণুর কাঠামো সম্পর্কে এ কথা কারুরও অজানা নেই যে, একটি নিউক্লিয়াস্‌কে ঘিরে সেখানে বিচরণ করছে নির্দিষ্টসংখ্যক ইলেকট্রন; এই ইলেকট্রনগুলি চলে বিভিন্ন কক্ষপথে। প্রত্যেকটি কক্ষপথের ইলেকট্রনের বন্ধনশক্তি এক রকম নয়। ভারী পরমাণুর নিউ-ক্লিয়াসের নিকটতম কক্ষের ইলেকট্রনের বন্ধনশক্তি সবচেয়ে বেশী—দূরতর কক্ষ-গুলির ইলেকট্রনগুলির শক্তি ক্রমশ কমে আসতে থাকে। সাধারণ অবস্থায় এই সব পরমাণু থেকে কোনো বিকিরণ হয় না। তবে বাইরের উদ্দীপনায় পরমাণুটি তা থেকে ফোটন শোষণ করে নিয়ে উত্তেজিত হতে পারে। এই উত্তেজনার ফলে অবশ্য পরমাণুর কাঠামোটি ইচ্ছেমত ওলটপালট হবে না। ফোটনের শক্তি অনুযায়ী পরমাণুর ইলেকট্রন আরও একটি উপরের শক্তিস্তরে লাফিয়ে উঠবে। পরমাণুটি আয়নিত হবার আগে পর্যন্ত এরকম কয়েকটি শক্তি স্তর থাকতে পারে। কিন্তু দুটি শক্তিস্তরের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় ইলেকট্রনের অবস্থান সম্ভব নয়, যেমন দুটি বা একটি ফোটনের মাঝামাঝি ভগ্নাংশ সম্ভব নয়। এই উত্তেজিত অবস্থায় পরমাণুটি বেশীক্ষণ থাকতে পারে

পরমাণু থেকে ফোটনের স্বতঃবিকিরণ

—না। আপনা থেকেই ইলেকট্রনটি নিম্নস্তরে নেমে আসে—ফলে আমরা পাই বিকিরণ।

বিক্ষিপ্ত আলোর স্বরূপ

এতক্ষণ আমরা রামনের আবিষ্কারের পটভূমিকা হিসেবে আলোচনা করেছি কীভাবে আলোর তরঙ্গবাদ থেকে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের ক্রমবিকাশ হল। রামন এফেক্ট আলোকবিজ্ঞানে যুগান্তর নিয়ে এসেছে—তার কারণ হল, এই আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর নবতম ধারণা কোয়াণ্টাম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আলোকবিজ্ঞানে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের এই বিস্ময়কর প্রয়োগের বৃত্তান্ত জানাতে হলে আলোর সাথে বস্তুর সংঘাতজনিত ক্রিয়ায় কী ঘটে তার আলোচনা প্রয়োজন।
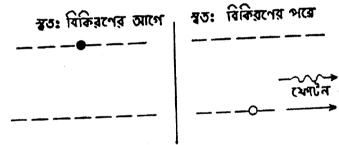
অস্বচ্ছ বস্তুর ওপর আলো পড়লে সে পাসপোর্ট পায় না, যেটুকু বা জোর করে ঢুকে পড়ে তা আর ফিরে আসে না। স্বচ্ছ বস্তুতে আলো পড়লে তা কিছুটা প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়। সেখানে আলোর প্রবেশে কোনো বাধা নাই। ছোট ছোট কণিকায় আলো পড়লে উদ্ভাসিত কণাদল থেকে যে আলো বিক্ষিপ্ত হয়, তা ঠিক উদ্ভাবনী আলোর মত নয়। ১৮৬৯ খ্রীঃ টিন্ডাল কণাদল বিকিরণ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। ১৮৭২ খ্রীঃ র‍্যালে দেখালেন যে, শুধু কণাদল নয়, উদ্ভাসিত বস্তুর অণু থেকেও আলো বিক্ষিপ্ত হয়, তার ধরণধারণও উদ্ভাসী আলো থেকে পৃথক। এই পার্থক্য হল আলোর দীপ্তিতে। আমরা আগেই বলেছি—এমনিতেই উৎস থেকে দূরত্বের বর্গ অনুযায়ী আলো তার দীপ্তি হারায়
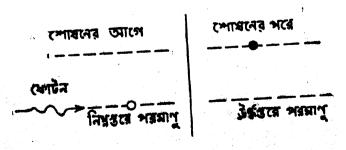
পরমাণুতে ফোটনের শোষণ

ফেলে। কিন্তু অণু বা কণিকার বেলায় উদ্ভাসী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে যদি তা ছোট হয় তবে তা থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর দীপ্তি নিম্নোক্ত নিয়ম মেনে চলবে—

$$\frac{i}{I} = \left(\frac{2\pi}{\text{তরঙ্গ দৈর্ঘ্য}}\right)^4 \cdot \frac{1}{R^2} \cdot a^2$$

এখানে Z ও I যথাক্রমে বিক্ষিপ্ত ও উদ্ভাসী আলোর দীপ্তি, উদ্ভাসী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, R অণুর ব্যাসার্ধ নিত্যসংখ্যা a বিক্ষেপক অণুর আয়তন সম্পর্কীয় সংখ্যা।

এই সূত্রটি থেকে বোঝা যাবে যে, বেগুনী লাল আলোর চেয়ে প্রায় ষোল গুণ বেশী দীপ্তিতে বিক্ষিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। অবশ্য বিশেষ অণুর ক্ষেত্রে R, a এই সংখ্যাগুলিও এই দীপ্তির নিয়ন্ত্রণ করে। আকাশ কেন নীল দেখায় এই সূত্রটি থেকে আমরা তার ব্যাখ্যা পেতে পারি। মেঘের বর্তুলাকার জলকণা সাদা দেখায় তার কারণ এই কণাগুলির আয়তন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মতই—তাই র‍্যালের নিয়ম সেখানে খাটে না। বড় জলকণার ক্ষেত্রে তাই আমরা আলোকবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মে দেখতে পাই রামধনু। এসব গবেষণাই তরঙ্গবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। আলোর কোয়াণ্টা বা ফোটন নিয়ে তখন মাথা ঘামানোর কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

০, ১ সংখ্যা অণুর স্থিরকম্পন বা শক্তির স্তর। উদ্ভাসী আলোর শক্তি অনুযায়ী অণু অস্থায়ী ক স্তরে উত্তেজিত হয়ে ০তে ফিরে এলে হয় র‍্যালে বিকিরণ। ১-এ ফিরে এলে উদ্ভাসী আলো থেকে হ্রাসপ্রাপ্ত কম্পন সংখ্যার রামন রেখা পাওয়া যায়। প্রতিপ্রভ আলোর কম্পনসংখ্যা উদ্ভাসী আলো থেকে সব সময়েই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে—এই নিয়ম প্রচলিত করেছিলেন স্টোক্স্। তাই হ্রাসপ্রাপ্ত কম্পনসংখ্যার রামন বর্ণালী ঐ নামে পরিচিত। তেমনি ১ থেকে অস্থায়ী কোনো স্তরে উত্তেজিত হয়ে অণুটি ০তে ফিরে এলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কম্পনসংখ্যার যে রামনরেখা পাওয়া যায়, তা অ্যান্টি স্টোক্স্ বলে অভিহিত হয়। অবশ্য ২, ৩, ৪ ইত্যাদি উচ্চতর শক্তি স্তর অণুতে থাকলে এরকম একাধিক রামন বর্ণালী পাওয়া যেতে পারে

কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ও রামন এফেক্ট

এ শতকের গোড়ার দিকে যখন কোয়াণ্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তখন তার প্রয়োগ সম্পর্কে একটি চমৎকার পরীক্ষা করলেন কম্পটন। দেখালেন যে, এক্সরশ্মির সাথে ইলেকট্রনের সংঘাতে আপতিত ঐ রশ্মির কম্পনসংখ্যা থেকে ইলেকট্রন কিছুটা কেড়ে নেয়, ফলে এক্সরশ্মির শক্তি তথা কম্পনসংখ্যা পালটে যায়। আপাতত এক্সরশ্মির দীপ্তি নয়, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যই পালটে গেল, তরঙ্গবাদ দিয়ে এর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অদৃশ্য এক্সরশ্মি নিয়ে যে পরীক্ষাটি কম্পটন করলেন তার অনুরূপ কোনো পরীক্ষা কি আলো দিয়ে সম্ভব? হ্যাঁ, স্মেকাল গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে, অণুর সাথে সংঘাতে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বদলে যেতে পারে। ১৯২৫ খ্রীঃ ক্রামার্স ও হাইসেনবার্গ যে বিশদ তত্ত্ব খাড়া করলেন তাতে অণু ও আলোর সংঘাতে কম্পটন এফেক্টের অনুরূপ ফল পাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। এসব হল তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত। এই সব সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষাই রামনের আবিষ্কারের ভিত্তিভূমি। ১৯২৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে রামনের গবেষণাগারেই তাঁর সহযোগী রামনাথন জল ও সুরাসার দ্বারা বিক্ষিপ্ত আলোকে উদ্ভাসী আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে অভিন্ন, ক্ষীণ র‍্যালে বিকিরণ ও অস্পষ্ট অদৃষ্টপূর্ব এক ক্ষীণতর দীপ্তির ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর সন্ধান পান। পরে কৃষ্ণান ও রামন একাধিক তরল পদার্থ, বরফ, স্বচ্ছ কাচখণ্ড প্রভৃতি থেকে অনুরূপ এই বিশিষ্ট বিক্ষিপ্ত আলো আরো স্পষ্টতরভাবে লক্ষ করেন। ১৯২৮ খ্রীঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী রামন নিশ্চিতভাবে অণু থেকে বিক্ষিপ্ত এই আলোর সন্ধান পান, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য উদ্ভাসী আলো থেকে ভিন্ন। অবিলম্বে তিনি এই পরীক্ষালব্ধ ফলের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিজ্ঞানীসমাজে প্রদর্শন করেন। ঐ সনের ১৬ই মার্চ দক্ষিণ ভারতের বিজ্ঞানসভার উদ্বোধনী ভাষণে সাধারণ সমক্ষে রামন তাঁর এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন। ৩১শে মার্চ বিলাতের নেচার পত্রিকায় তাঁর প্রেরিত আবিষ্কারের সংবাদ পত্রাকারে প্রকাশিত হয়। আলোর রাজ্যে কম্পটন এফেক্টের অনুরূপ এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি বিজ্ঞানমণ্ডলী কর্তৃক রামন এফেক্ট নামে অভিহিত হয়। একই সময়ে রাশিয়া থেকে ল্যান্ডসবার্গ ও ম্যাণ্ডেলস্ট্যাম রামনের আবিষ্কারের কথা না জেনে কোয়ার্টজ্ খণ্ডে অনুরূপ বিক্ষিপ্ত রশ্মির সন্ধান পান। জার্মানের একটি পত্রিকায় ঐ সনের ৫ই মে সেই সংবাদটি প্রচারিত হয়। তবু যথার্থ পূর্বসূরী হিসেবে রামন এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। আলোর রাজ্যে কোয়াণ্টাম এই সকল প্রয়োগই রামন এফেক্টের একমাত্র কথা নয়। রামনের আবিষ্কারের প্রয়োগ, বিজ্ঞানে এক নূতন রাজ্যে অজানা রাজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছে।

রামন এফেক্ট ও অণুজগৎ

এই অজানা রাজ্য হল অণুজগৎ। এক বা একাধিক পরমাণু মিলে সৃষ্টি হয় অণুর। পরমাণুর যোজনাশক্তির উপর নির্ভর করে কতগুলি পরমাণু কীভাবে অণুতে মিলিত হবে। অণুর ভেতরকার এই পরমাণুব্যূহ সহজে ভেঙে পড়ে না—সাম্য অবস্থাতেই থাকে। তবে এই মিলনের ফলে কিন্তু অণুতে সৃষ্টি হবে

স্থির কম্পনের। সেই স্থির কম্পনগুলির নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যা রয়েছে। কোনও অণুতে পরমাণুগুলি রয়েছে সরল রেখায়, আবার অন্য অণুতে ইংরাজী V বা L অক্ষরের মত সাজানো। একটি বিশেষ অণুতে ক'টি স্থির কম্পন আছে বা তাদের মাত্রা কত সেটা বোঝা যায় অণুর গঠন বৈচিত্র্য ও পরমাণুগুলির যোজনা শক্তির তীব্রতা থেকে। এই কম্পন বিকিরণধর্মী হয়েও বিকিরণের আকারে অণুর বাইরে ধরা পড়ে না।

এখন রামনের পরীক্ষায় এই অণু রাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি কী করে পাওয়া গেল তা কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, নির্দিষ্ট শক্তির কয়েকটি ফোটন অণুতে আঘাত করল। অণু আর ফোটন অণুতে আঘাত করল। অণু আর ফোটনের মধ্যে তখন চলল শক্তিপরীক্ষা। কিছু ফোটন এই শক্তিপরীক্ষা এড়িয়ে তার নিজস্ব শক্তি নিয়েই অণু থেকে বিক্ষিপ্ত হ'ল—যদিও তাদের দীপ্তির হ্রাস হ'ল অনেকাংশে। উদ্ভাসী আলো থেকে অভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই ক্ষীণ বিক্ষিপ্ত আলোই হল র‍্যালে-বিকিরণ, যার কথা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। এখন অবশিষ্ট ফোটনগুলি শক্তিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে অণুর অভ্যন্তরে তার স্থির কম্পনগুলির নির্দিষ্ট সমপরিমাণ শক্তি খুইয়ে বিক্ষিপ্ত হল, আবার কখনো অণু থেকে ঐ পরিমাণ শক্তি চুরি করে নিয়ে আরো একটু শক্তিশালী ফোটন হয়ে বেরিয়ে এল। দুটি ক্ষেত্রেই উদ্ভাসী ফোটনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কম্পনসংখ্যা পালটে গেল। একটি অণুতে অনেকগুলি স্থির কম্পন থাকতে পারে তাদের শক্তি যদি E(1), E(2) ইত্যাদি হয়, তবে E(n) প্রতীক দিয়ে n সংখ্যক কম্পনের শক্তি প্রকাশ করা যেতে পারে। প্ল্যাঙ্কের সূত্র অনুযায়ী আমরা উদ্ভাসী আলোর শক্তিকে যদি h×f ধরি তবে বিক্ষিপ্ত আলোতে কিছুটা থাকবে h×f শক্তির র‍্যালে-বিকিরণ আর কিছুটা হ'বে n×f+E(n)1 রামন এফেক্টের এই হল মূল সূত্র। এই সূত্র থেকে বলা যায় যে, E(n)-এর সংখ্যা অনুযায়ী পরিবর্তিত শক্তির ফোটনের সংখ্যা ক'টি হবে। সব পরীক্ষাতেই এই সূত্র অনুযায়ী সমস্ত ফোটনগুলিকে পাওয়া যাবে তা নয়। তারও সংগত কারণ আছে। সে যা হোক, বিভিন্ন অণুর মধ্যে E(n)-এর পরিমাণ সাধারণত ০·১ থেকে ০·০১ ইলেকট্রন ভোল্টের মধ্যে পড়ে—আর উদ্ভাসী আলোর শক্তি সাধারণত ২ই ভো হলে বর্ণালী লেখযন্ত্রে বিক্ষিপ্ত কম্পনসংখ্যার পার্থক্য ধরা কঠিন নয়। তবু ...বিক্ষিপ্ত র‍্যালে বিকিরণ ছাড়া
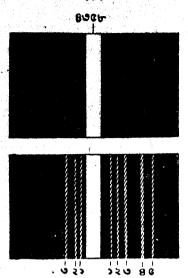
ফটোগ্রাফিক প্লেটে (উপরে) পারদ বাষ্পদীপের আলোর বর্ণালী যেরকম দেখায়, (নীচে) ঐ আলোতে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড অণুর বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালী রামন পরীক্ষায় বর্ণালীলেখ যন্ত্রে যেমনটি দেখায়। মাঝের অভিন্ন কম্পনসংখ্যার বর্ণালীরেখার ডানদিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কম্পনসংখ্যার তিনটি অ্যান্টি স্টোকস্ ও বাঁদিকে তিনটি স্টোকস্। রামনরেখা অণুর তিনটি স্থিরকম্পনের জন্য দায়ী—এদের কম্পনসংখ্যা (১) ২১৮°, (২) ৩১৪°, (৩) ৪৫৯°, (৪) ৭৬২°, (৫) ৭৯১° এই কম্পনসংখ্যার দুটি স্থির কম্পন দীপ্তির ক্ষীণতার জন্য অ্যান্টি স্টোকস্-এ ধরা পড়েনি

কেন ধরা পড়েনি, তার কারণ হ'ল এই বিকিরণের দীপ্তি র‍্যালে বিকিরণের চেয়েও সহস্রাংশে ক্ষীণতর। বাস্তবে একটি অণু সংগ্রহ করে তার সাহায্যে কোনো পরীক্ষা করা যায় না, বস্তুর নমুনাতে থাকে অনেকগুলি অণুর সমাহার। এই সমাহার যখন উদ্ভাসী আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন টিন্ড্যাল কথিত কণাদল বিকিরণ, বস্তুর প্রতিপ্রভতার দীপ্তি প্রভৃতি অবাঞ্ছিত উজ্জ্বল আলো রামন বিকিরণের ক্ষীণ দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রামনের কৃতিত্ব হ'ল, অণু থেকে বিক্ষিপ্ত এই সব ক্ষীণ দীপ্তির আলো বিশেষ সাবধানতার সাথে তিনি ধরতে পেরেছিলেন। এজন্য তাঁকে বর্ণালী লেখযন্ত্রের সাথে উপযুক্ত সূক্ষ্ম ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হয়েছিল।

রামন এফেক্টের পরীক্ষা

রামন পরীক্ষায় থাকে একটি তীব্র ... কয়েকটি ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৪০৪৭ A বা ৪৩৫৮ A তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। যে নমুনা থেকে আলো বিক্ষিপ্ত হবে, তা যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকা চাই। তাতে অবাঞ্ছিত আলোর ভিড় অনেক কমে যাবে। বিক্ষিপ্ত আলো আলোক-সমাহারী লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাতে বর্ণালী লেখযন্ত্রে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা পড়ে সেজন্য আরো কিছু সূক্ষ্ম ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সে যা হোক, প্লেটে ধরা পড়লে একটি জানা বর্ণালী রেখার কম্পনসংখ্যার সাথে তুলনা করে এই সব ক্ষীণ আলোর রেখার কম্পনসংখ্যা নিরূপণ করা যায়। সাধারণত তরল পদার্থের ওপর এই পরীক্ষা করা সহজ—তবে পরবর্তী কালে কঠিন ও বায়বীয় পদার্থেও রামন বর্ণালী পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া রামনের পরবর্তী কালে রামন পরীক্ষার অনেক উন্নতি হয়েছে। ফটোগ্রাফিক প্লেটের পরিবর্তে ফটো মালটিপ্লায়ার (যাতে আলো বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বিবর্ধিত আকারে পাওয়া যায়)-এর ব্যবহার ও র‍্যালে বিকিরণ থেকে রামন বিকিরণ পৃথক করে নিয়ে আসার উন্নততর ব্যবস্থা রামন এফেক্টের ব্যবহারিক প্রয়োগকে আরও সুদূরপ্রসারী করেছে।

রামন বর্ণালীর বিশ্লেষণ

রামন এফেক্টের প্রয়োগের গুরুত্ব হল—অণু থেকে বিক্ষিপ্ত রামন বর্ণালীর কম্পনসংখ্যা নিরূপণ নয়, রামন এফেক্টের সূত্র থেকে অণুর স্থির কম্পনগুলির কম্পনসংখ্যা অর্থাৎ E(n) এবং ক'টি স্থির কম্পন আছে তা নির্ধারণ করা। অবশ্য বিক্ষিপ্ত আলোর বর্ণালী রেখার সংখ্যা থেকে অণুর স্থির কম্পনের সংখ্যা ও ঐ রেখাগুলির এবং উদ্ভাসী আলোর কম্পনসংখ্যার পার্থক্য থেকে এদের কম্পনসংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন নয়।

এছাড়া রামন পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণে আর একটি প্রয়োজনীয় মাপকাঠি রয়েছে—তা হ'ল রামন বর্ণালী রেখার দীপ্তির মাত্রা। কোনো বস্তুর রামন-বর্ণালী নিয়ে দেখা যায় যে, তাতে যে একাধিক রেখা রয়েছে তাদের দীপ্তি সমান নয়। এর কারণ হ'ল অণুর মধ্যে স্থির কম্পনগুলি সব এক রকমের নয়। এক ধরনের স্থির কম্পন হ'ল সাম্যধর্মী। এই কম্পনে দুটি পরমাণু একবার যেন মুখোমুখি আসছে—আবার পরমুহূর্তে বাইরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংকোচন আর প্রসারণের ফলে অণুর আয়তনটা যেন খুব বাড়ছে কমছে। সাম্যধর্মী এই স্থির কম্পনের শক্তিপরীক্ষায় যে রামন বর্ণালী রেখা পাওয়া যায় তার দীপ্তি খুবই,

উজ্জ্বল। আবার সম্পূর্ণ সাম্যবিরোধী স্থির কম্পন আছে, যাতে একটি পরমাণু এক দিকে এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসছে, অন্যটি শুধু বাইরের দিকেই ফুলে ফুলে উঠছে। ফলে অণুটির আয়তনে যেন একটুও হ্রাসবৃদ্ধি নেই। এরকম কম্পন রামন পরীক্ষায় ধরা যায় না। তবে সাম্যবিরোধী স্থির কম্পনের বেলায় অণুর আয়তন বাড়ে কমে না বটে কিন্তু তার বৈদ্যুত কেন্দ্রটি কিছুটা নড়াচড়া করে। সে ক্ষেত্রে লাল উজানী বা অবলোহিত বিকিরণের শোষণে এই সব কম্পনের পরিমাপ করা যায়। তাই এই পদ্ধতিটি রামন পরীক্ষার পরিপূরক বলা যেতে পারে। রামন পরীক্ষা থেকে এই পদ্ধতিটি আরো কঠিনতর। রামন পরীক্ষার একটা সুবিধা এই যে, অগণিত অণুর অধিকাংশেই স্থির কম্পনগুলি সাম্যধর্মী অথবা কিছুটা সাম্যবিরোধী। আমরা সরল-রেখাকার দুটি অণুর উদাহরণ দিয়েছি. বাস্তবে বহু জটিলতর গড়নের অণু রয়েছে। কেউ বা এড়ো জাতের, কেউ বা V অক্ষরের মত, কারো গড়ন অষ্টতলীয় ইত্যাদি। এই বিচিত্র অণুর সমাবেশে যাদের স্থির কম্পন সম্পূর্ণে সাম্যবিরোধী রামন পরীক্ষায় তারা ধরা পড়ে না; কিন্তু যারা কিছুটা সাম্যবিরোধী তারা অনুজ্জ্বল দীপ্তির রামন বর্ণালী রেখা সৃষ্টি করে। তাই বলছি কেন রামন বর্ণালী রেখার দীপ্তি কত সেই পরিমাণ থেকে স্থির কম্পন কোন জাতের তা বুঝতে পারা যায়।

র‍্যালে বিকিরণের সময় আমরা অণুর আয়তন জাতীয় সংখ্যা হিসেবে α ব্যবহার করেছি। স্থির কম্পনের ফলে অণুর আয়তনে কতটুকু হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ তারা কতটুকু সাম্যধর্মী α দিয়ে তার পরিমাপ করা যায়। কোনো অণুর ক্ষেত্রে α-র মাত্রা ঠিক করা একটু দুরূহ ব্যাপার। আলোর সমবর্তন পরীক্ষা থেকে α নির্ণয় করা যায়। আলোর বিকিরণ যে বস্তুর ইলেকট্রনের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে নড়া-চড়ার ফলে সম্ভব হয়, একথা আমরা আগেই বলেছি। বিদ্যুৎকণা ইলেকট্রনের এই নড়চড়ায় সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎক্ষেত্র ও চুম্বক-ক্ষেত্রের। তাই বিকিরণতরঙ্গ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। আলোর গতিপথের সাথে লম্বভাবে এই দু'রকমের ক্ষেত্রই আড়াআড়ি এগিয়ে চলতে থাকে। একই আলোর অজস্র তরঙ্গ যখন এগিয়ে চলে তাদের বিদ্যুৎক্ষেত্র তখন কিন্তু একই সমতলে থাকে না। যখন একই সমতলে থাকে তখন বলা হয় আলোর সম্পূর্ণ সমবর্তন হয়েছে। স্বাভাবিক আলোতে সমবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু র‍্যালে বিকিরণের আলোতে কিছুটা সমবর্তন লক্ষ করা যায়।
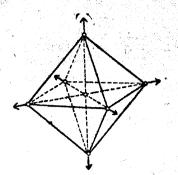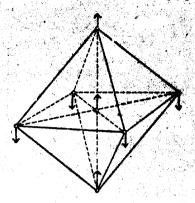
অষ্টতলক অণুতে রামন এফেক্ট ছাড়া (ক) সাম্যধর্মী ও লাল উজানী ছাড়া (খ) সাম্যবিরোধী স্থিরকম্পন ধরা যায় না। (তীরচিহ্ন স্থিরকম্পনে পরমাণুর গতিবিধির দিগ্‌দর্শী)। সরলরেখাকার বা যে কোনো গড়নের অণুতে এই দু রকম ছাড়া অংশত সাম্যধর্মী কম্পনও থাকে

তার কারণ হল, বিক্ষেপক অণুতে স্থির কম্পন যতটা সাম্যধর্মী হয় র‍্যালে বিকিরণ সেই অনুপাতে সমবর্তিত হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য না হারিয়েও র‍্যালে বিকিরণ অণুর ভেতরকার এই প্রভাব এড়াতে পারে না। তাহলে, রামন বিকিরণ, যা অণুর স্থির কম্পনের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িত, তারও তো সমবর্তন সম্ভব। ঠিকই, রামন বর্ণালী রেখার দীপ্তি না মেপেও তারা কে কতটুকু সমবর্তিত হয়েছে, তা থেকে বলা যায়, কোন স্থির কম্পনের কতটা সাম্যধর্ম বর্তমান।

এই সব আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে রামন পরীক্ষার ফল অনুসরণ করে অণুরাজ্যের রহস্যমন্দিরের অন্তরালে আমরা প্রবেশ করতে পেরেছি। রামন বর্ণালী যেন অণুর বুড়ো আঙুলের টিপ, যা থেকে আমরা জটিল একটি মিশ্রণের মধ্যেও তাকে খুঁজে নিতে পারি, কিছুটা গণিতের সাহায্য নিয়ে তার গঠন, তার স্থির কম্পনের সাম্যধর্ম সম্পর্কে হদিস পাই, আবার এসব জানা থাকলে পরমাণু পরমাণুতে যে আকর্ষ শক্তি পদার্থের অণুগুলির পারস্পরিক সংবদ্ধ অবস্থায় থাকবার ক্ষমতা এ সবই আমরা বলে দিতে পারি।

তাই রামন গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা প্রচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, "এই পরীক্ষালব্ধ ফল দিয়ে তরঙ্গবাদ, অণু-পরমাণুজগৎ, বিকিরণতত্ত্ব, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতির বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব, যার সমাধান এখনো পাওয়া যায়নি। প্রচুর কাজ শুধু বিজ্ঞানকর্মীর অপেক্ষায় আছে।" এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে মিলে-ছিল। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য কর্মী রামন পরীক্ষার প্রয়োগ করলেন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে। ফলে বর্ণালী বিজ্ঞানের একটি নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হল—যার নাম রামন বর্ণালী বিজ্ঞান (Raman Spectro-scopy)। এই আবিষ্কারের উপর আজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশী মৌলিক প্রবন্ধ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সব প্রবন্ধের সংখ্যা ১৯২৮ খৃঃ থেকে ক্রমশ বেড়ে ১৯৩৬ খৃঃ বার্ষিক হিসাবে সর্বাধিক দাঁড়িয়েছিল। ক্রমশ এই সংখ্যা প্রতি বছর অল্প অল্প কমতে থাকে। তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, রামন পরীক্ষার আঙ্গিকে যে অণুগুলি পরীক্ষার বিশেষ অনুকূল, তাদের নিয়ে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় রামন বর্ণালী বিজ্ঞানে কাজ ক্রমশ ঢিমেতালে চলতে থাকে। আর একটা কারণ বোধ হয় রামন বর্ণালীর দীপ্তির ক্ষীণতা। অবশিষ্ট বহু অণুর ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা বিশেষ কষ্টসাধ্য করে তোলে। আমরা আগেই বলেছি রামন পরীক্ষার পরবর্তী কালে এর আঙ্গিকের বহু উন্নতি সাধন হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু

উত্তেজিত বিকিরণ

অসুবিধা রয়ে গেছে। প্রধান অসুবিধা হ'ল পারদ বাষ্প দীপের উদ্ভাসী আলো। এর প্রখর নীল ঘেঁষা ৪৩৫৮ A তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো সাধারণত রামন পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। এই দীপের আলোর ছড়িয়ে পড়া দীপ্তি কেন্দ্রীভূত করা এক সমস্যা। ফলে বিক্ষেপক নমুনা একটু বড় আয়তনে নিতে হয়। তাতে পরীক্ষার যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, তাও কষ্টসাধ্য। কখনো কখনো এই উদ্ভাসী আলোর অবিরাম আভাস রামন বর্ণালীকে ঢেকে ফেলতে পারে। তা ছাড়া এই নীলঘেঁষা আলো প্রায়ই নমুনা থেকে অবাঞ্ছিত উজ্জ্বল প্রতিপ্রভ আলোর সৃষ্টি করে। কখনো বা এই আলোতে বিশেষ নমুনার বস্তু বিকৃত হয়ে যায়। রঙীন বস্তুর বেলায় দেখা যায় যে, উদ্ভাসী এই আলো নমুনাতেই শোষিত হয়ে যায়—ফলে সেক্ষেত্রে রামন বর্ণালী পাওয়া অসম্ভব। কঠিন পদার্থের রামন বর্ণালী নেওয়াও কষ্টসাধ্য, কারণ তার বহু পৃষ্ঠদেশ থেকে অবাঞ্ছিত আলোর অজস্রমুখী প্রতিফলন হয়।

লেসার ও রামন বর্ণালী

১৯৬১ খ্রীঃ লেসার রশ্মির আবিষ্কার আলোকবিজ্ঞানে আর এক নবযুগের ইঙ্গিত নিয়ে এল। সাধারণ আলো, তা সে যতই এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হোক না কেন, তার দীপ্তি লেসার রশ্মি থেকে অনেকাংশে ক্ষীণ। তার স্বাভাবিক বর্ণালী রেখাও ঈষৎ চওড়া। আলোর বিকিরণ পদ্ধতিতেই এই গলদ অবশ্যম্ভাবী। পরমাণু থেকে কীভাবে বিকিরণ হয় তা আগেই বলেছি। পরমাণু বাইরের উত্তেজনা থেকে, তা সে উত্তাপই হোক বা অন্য কোনো কণিকার সংঘাত হোক, যখন উত্তেজিত হয়, তখন তার ইলেকট্রন নিম্ন শক্তিস্তর থেকে ঊর্ধ্ব শক্তিস্তরে লাফিয়ে পড়ে। সেই ইলেকট্রন যখন আপনা-আপনি নিম্ন স্তরে নেমে আসে তখন আমরা পাই বিকিরণ। এই বিকিরণে ফোটনের শক্তি দুটি তেজস্তরের বিয়োগফলের সমান। কিন্তু একই বস্তুর লাফিয়ে নামার ব্যাপারটা যুগপৎ ঘটে না। ফলে পরমাণুদের বিকিরিত তরঙ্গসমষ্টির শীর্ষ বা পাদগুলি কিছুটা এগিয়ে পিছিয়ে খেয়ালখুশিমত চলতে থাকে। এই খেয়াল-খুশিপনা যতই কম হোক না, এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল, সব তরঙ্গের শীর্ষ বা পাদ সমান তালে চললে আলোর যে দীপ্তি হ'ত তা হ্রাস পায়, তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও একটু হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। পরমাণুর এই স্বতঃ-বিকিরণের (Spontaneous emission) গলদ পরমাণুর স্বভাবজ তাকে এড়ানো যায় না। স্বতঃবিকিরণ ছাড়া আইনস্টাইন আর এক রকম বিকিরণের কথা বলেছিলেন, তা হল—উত্তেজিত বিকিরণ (Stimulated emission)। এই বিকিরণের পদ্ধতি হল পরমাণুগুলির স্বতঃবিকিরণের আগে যখন উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, তখনই ঐ বিকিরণের সমশক্তির ফোটন দিয়ে পরমাণু-গুলিকে আঘাত করলে, উত্তেজিত বিকিরণ পাওয়া যায়। এতে উদ্ভাসী বিকিরণ পর-মাণুর নিজস্ব বিকিরণকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসে। লেসার আবিষ্কারের অনেক আগেই ডির্যাক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে উত্তেজিত বিকিরণ হবে সুসংগত (Coherent) অর্থাৎ এদের তরঙ্গসমষ্টি চলবে সমান তালে, এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিন্দুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি হবে না। আবার এই বিকিরণের সবটাই হবে সমবর্তিত অর্থাৎ বৈদ্যুৎক্ষেত্র থাকবে এক সমতলে। এই সূত্র ধরেই ১৯৬১ খ্রীঃ আবিষ্কৃত হ'ল লেসার (LASER = Light Amplification by stimulated Emission of Radiation)। লেসার রশ্মি যে-কোনও আলোর চাইতে অনেক গুণ প্রখর। রামন পরীক্ষার উদ্ভাসী আলো হিসেবে লেসারের ব্যবহারে রামন এফেক্টের প্রয়োগ আরও সহজ এবং দূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে। পারদ বাষ্প দীপের অসুবিধাগুলি লেসার ব্যবহারে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। .২ বা ১ মিলিমিটার ব্যাসের নমুনাতে ও অতি তীব্র লেসার রশ্মি কেন্দ্রিত করা সম্ভব; ফলে তরল, কঠিন, এমন কি বায়ব পদার্থের নমুনা থেকেও অনেক সহজে উজ্জ্বলতর রামন বর্ণালী পাওয়ার

বেলায় রামন বর্ণালী নেওয়ার অসুবিধা দূর হল। তার কারণ অনেক মাপের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেসার রশ্মি পাওয়া যায়, তা থেকে এমন একটি বেছে নেওয়া যায় যা রঙীন পদার্থে শোষিত হবে না। হিলিয়াম-নিওন লেসারের ৬৩২৮ A, আর্গন আয়ন লেসারের ৪৫৪৫-৫২৮৭ A ক্রিপটন লেসারের ৬৪৭১ A এই সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অবিরাম রশ্মিগুলি রামন পরীক্ষার বিশেষ উপযোগী। লেসার রশ্মি পুরোপুরি সমবর্তিত বলে বিক্ষিপ্ত রামন বর্ণালীর আলোতে সমবর্তনের পার্থক্য থেকে অণুর স্থির কম্পন কতটা সাম্যবিরোধী, তা জানা আগের থেকেও সহজ হয়।

লাল উজানী বিকিরণের শোষণ বর্ণালী নেওয়ার পদ্ধতির তুলনায় লেসার ব্যবহারে রামন পরীক্ষার অসুবিধা এখন আর কিছু নেই বললেই চলে। অণুর ২×১০/১২ থেকে ১০/১৪ কম্পনসংখ্যার পাল্লায় যে-কোনো স্থিরকম্পন ধরার পক্ষে এখন একরকম একটি লেসার বর্ণালীযন্ত্রই যথেষ্ট—অথচ লাল উজানী পদ্ধতিতে কোনো একটি যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজ হয় না।

তা ছাড়া লেসার রামন যন্ত্রে এখন রঙীন পদার্থ বা যেসব নমুনা পারদ বাষ্প দীপের আলোতে বিকৃত হয়ে পড়ত; অথচ এ [illegible] জানা ছিল যে, এদের রামন বর্ণালী [illegible] অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া [illegible], তাদের বর্ণালী পাওয়া সহজ হয়েছে। বায়ব বা কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রেও রামন এফেক্ট-এর ফল অনায়াসে পাওয়া যাচ্ছে। এমন কি প্লাস্টিকের [illegible] ছোটখাট জিনিসের রামন বর্ণালী নেওয়া এখন আর কোনো সমস্যাই নয়। ১৯৪০ খ্রী-এর পর রামন বর্ণালীবিজ্ঞানে যে কিছুটা মন্দা ভাব এসেছিল, লেসারের প্রয়োগে সে অবস্থা কেটে গিয়ে রামন এফেক্টের গবেষণায় আবার নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় জোয়ার এসেছে। মনে হয় এই শতাব্দীর শেষ দিনটি পর্যন্ত রামন এফেক্ট তার নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

একবার এক কৌতূহলী সাংবাদিক রামনকে প্রশ্ন করেছিলেন, "স্যার, আপনার নাম যে দেশে-বিদেশে পত্র-পত্রিকায় লোকে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে সেজন্য কি আপনার অনুমতি নেওয়া হয়?" রামন একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "রামন শব্দটির এই ব্যবহার তো নামপদবাচ্য নয়, বরং বিশেষণ হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে; তাই আর অনুমতির প্রশ্ন ওঠে না।" চন্দ্রশেখর বেংকট রামন একজন প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক রূপে বহু দিন ধরে মানবসমাজের শ্রদ্ধা পাবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই শতাব্দীর এক বিপুল বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের বিশেষণ হয়ে শুধু 'রামন' শব্দটি চিরদিন অম্লান থাকবে।

লুনোখোদ—১।

নভেম্বর ১৭, ১৯৭০। ঐ দিনে ভারতীয় সময় সকাল ন'টা বেজে সতের মিনিটে সোভিয়েত দেশের চান্দ্রযান লুনা-১৭ চাঁদের দেশে 'বর্ষা সাগর'-এ গিয়ে অবতরণ করেছিল। আর তার পরমুহূর্তেই পরিবেশিত হয় চমকপ্রদ সংবাদ : স্বনিয়ন্ত্রিত চক্রযান 'লুনোখোদ-১' চাঁদের পিঠে বিচরণ করছে। সম্প্রতি এই বিস্ময়কর যানটি সম্পর্কে এ পি এন-এর সংবাদদাতা বি কনোভালোভ প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী এবং ইণ্টারকসমস প্রোগ্রাম-এর চেয়ারম্যান অ্যাকাডেমিসিয়ান বি পেত্রোভকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। জানা গেছে, তথাকথিত গাড়ীর মত দেখতে হলেও, প্রযুক্তির দিক দিয়ে লুনোখোদ-১ অনেক বেশি স্বতন্ত্র। অভিনব। প্রযুক্তিগত এই নতুন অভিজ্ঞতা মহাসাগরের রহস্য উদ্ঘাটনেও হয়ত সাহায্য করতে পারে।......

নভেম্বর ২০, মস্কো সময় রাত তিনটে বেজে তিরিশ মিনিটে চাঁদের দেশ থেকে এই ছবিটি পাঠিয়েছিল লুনোখোদ-১। ছবিতে চান্দ্র-ভূমির গহ্বর এবং পাথরের টুকরোগুলি লক্ষ করুন। ছবির মাঝখানের বিশেষ যন্ত্রটি চাঁদের পৃষ্ঠতলের উল্লম্ব দিক নির্ণয়ে সাহায্য করে। নীচের দিকে দু' পাশে লুনোখোদের চাকার অংশ দেখা যাচ্ছে। ছবিটি একমাত্র বিশ্ববিজ্ঞান-এর জন্যে পাঠিয়েছেন সোভিয়েত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

প্রশ্ন : চন্দ্র-অভিযানের ক্ষেত্রে এই ধরনের স্বচালিত যান কী কী ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে?

পেত্রোভ : এ ধরনের যান চাঁদের ভূতলের বিশেষ বিশেষ অংশে পর্যবেক্ষণ চালানোর ব্যাপারে প্রায় অপরিহার্যই বলা চলে। লুনোখোদ-১-এ এমন কিছু কিছু যন্ত্র বসান হয়েছে, যারা সহজেই চান্দ্র-মৃত্তিকার কাঠিন্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা আমাদের যোগাতে পারবে। জানা যাবে তাদের রাসায়নিক গুণাগুণ। এ ছাড়া আশপাশে ঘুরেফিরে লুনোখোদ অনেকগুলি ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠায়। ঐ ছবি চাঁদের পরিবেশ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ধারণা আমাদের যোগাবে, যা দেখে ভবিষ্যতে ঠিক কোন জায়গাটি মানুষের বাস করা অথবা চান্দ্র-গবেষণাগার স্থাপন করার ব্যাপারে উপযুক্ত তা আমরা সহজেই নির্বাচিত করতে পারব। চন্দ্রযাত্রীদের চাঁদের দেশে স্থানান্তরে যাওয়ার ব্যাপারেও সাহায্য করবে।

প্রশ্ন : চাঁদে বিচরণ করার মত স্বচালিত যে যানটি তৈরি করা হয়েছে তার অভিজ্ঞতা পুরোপুরি মানুষের কল্যাণে কি কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

পেত্রোভ : স্বচালিত মহাকাশযান, একটা সাংঘাতিক রকমের বিশেষ কোন ঘটনা নয়। মানুষ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় পৃথিবীতেই স্বনিয়ন্ত্রিতকরণের ব্যাপারে আধুনিকতম প্রচেষ্টার যে পরিচয় দিয়েছে, লুনোখোদ তারই উত্তর ফল। মহাকাশ প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে নানা রকম যন্ত্রপাতি অনেক হাল্কা করে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, সেই সঙ্গে নির্ভর-যোগ্যও। দূরে থেকে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অনেক বেশি উন্নত করা গেছে। এদের উপর নির্ভর করে তৈরি করা ঐ সমস্ত যান বিপরীত পরিবেশ, যেমন অনিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার ব্যবধান, অনেক উঁচু এবং অনেক নীচু চাপ, প্রতিকূল পরিবেশ-এ নিয়ম মাফিক কাজ করতে পারবে। এ তো গেল মহাকাশের চার পাশের কথা। ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা মহাসাগরের গভীরতম অঞ্চলে অনুসন্ধানের কাজে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে পারবে। সাহায্য করবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে অগ্নিময় অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ চালাতে অথবা উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর রহস্য সন্ধানে।

প্রঃ ইণ্টারকসমস প্রোগ্রাম-এর চেয়ারম্যান হিসেবে অনুগ্রহ করে আপনি কি বলবেন, লুনোখোদ-১-এ সোভিয়েত এবং ফরাসী দেশের যুগ্ম প্রচেষ্টাস্বরূপ যে কোণ প্রতি-ফলক যন্ত্রটি বসান হয়েছে, তার সঠিক তাৎপর্যটি কী?
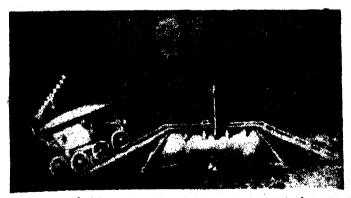
লুনা-১৭ চাঁদের পিঠে অবতরণ করার পর তার ভেতর থেকে লুনোখোদ-১ গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে : এ পি এন রেডিও ফটো
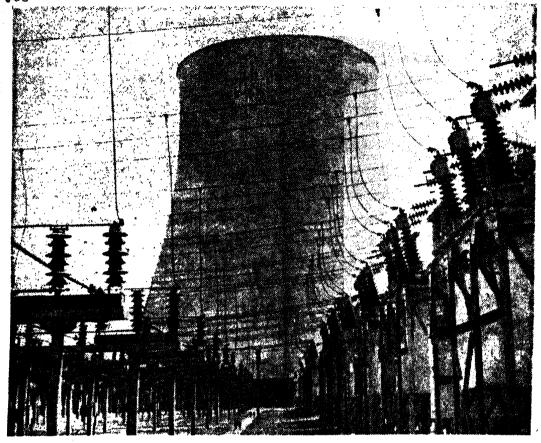
আমেদাবাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অতিকায় শীতক স্তম্ভ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এক রীতিমত বিস্ময়

পেত্রোভ : বিশেষ এই পরীক্ষাটির ব্যাপারে ইতিপূর্বেই সোভিয়েত দেশ এবং ফ্রান্সের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী লুনা-১৭-র সাহায্যে ফরাসী বিজ্ঞানীদের তৈরি একটি কোণ প্রতিফলক যন্ত্র চাঁদে পাঠান হয়। উদ্দেশ্য, লেজার-এর সাহায্যে চাঁদের পিঠের কোন জায়গার সঠিক দূরত্ব নির্ণয়।...এর সাহায্যে পৃথিবী এবং চাঁদের দূরত্ব অনেক বেশি নির্ভুলভাবে জানা যাবে : ভুল হলেও কয়েক মিটারের বেশি হবে না।...এ ছাড়া চাঁদের গতি-তত্ত্বকে সংশোধন করা যাবে, সূক্ষ্মতার সঙ্গে চাঁদের সঠিক পরিক্রমণ পথ এবং পরিক্রমণ করার সময় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সঞ্চারণ।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক পেত্রোভ ভবিষ্যতে চাঁদে গবেষণাগার স্থাপনের নানা রকমের সুবিধের কথা আলোচনা করেন। বিশেষ করে, তাঁর মতে, সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত পালসারস—নিউট্রন নক্ষত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান এর ফলে অনেকটা সুগম হয়ে যাবে সেই সঙ্গে সৃষ্টি রহস্যও। ঐ সমস্ত নক্ষত্রের ব্যাস এত ছোট, কয়েক কিলোমিটার মাত্র, যাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে খুঁজে

লুনাখোদ-১-এ যে প্রতিফলকটি বসান হয়, তার মধ্যমণিরূপে কাজ করে বিশেষভাবে তৈরি চোদ্দটি চতুস্তলক প্রিজম। প্রত্যেকটি প্রিজম এমনভাবে তৈরি যেন তারা এক-একটি ঘনকের অংশ এবং পুরো প্রিজমের তিনটি কোণই সমকোণ। অর্পিত রশ্মি প্রিজিমে প্রবেশ করার পর তার ভেতরে পর পর তিন বার প্রতিফলিত হয় এবং অবশেষে
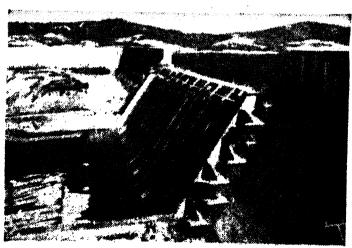
একদার সেই ভয়ঙ্করী পার্বত্য নদী সাবরমতী এখন মানুষের শাসনে। দুই কিলো-মিটার লম্বা এই বাঁধ চল্লিশ হাজার কর্মীর এক অভিনব কলাকৃতি

মূল রশ্মিটি যে দিক বরাবর প্রিজিমের উপর এসে পড়ে ঠিক সেই দিক বরাবর ফিরে আসে। এ কাজের জন্যে অত্যন্ত নিখুঁত পরিমাপের প্রয়োজন এবং এমন ভাবে তা করা হয় যাতে করে চাঁদের অনিয়ত তাপমাত্রা প্রভেদের মধ্যেও প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে চাঁদে কখনও কখনও এই তাপমাত্রার প্রভেদ তিনশ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড-এর মত হয়ে থাকে।

সোভিয়েত এবং ফরাসী বিজ্ঞানীরা যুগ্মভাবে এই বিশেষ প্রতিফলক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। তবে ফরাসিদের তৈরি যন্ত্রটি লুনোখোদের মাধ্যমে চাঁদে পাঠান হয়। পৃথিবী থেকে চাঁদ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা লেজার রশ্মি যুগপৎ ক্রিমিয়ার জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গবেষণাগারে এবং পিরেনিজ পর্বতের ওপর অবস্থিত 'পিক-দ্যু-মিদি' মানমন্দিরে ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জটিল লেজার রশ্মি-প্রক্ষেপ যন্ত্রটি তৈরি করেন সোভিয়েত অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর লেবেডেভ ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট। রুবি-লেজার থেকে লেজার রশ্মি পাঠান হয় চাঁদে। এই রশ্মির কম্পাঙ্ক ছিল সেকেণ্ডে দশ কোটি। অর্থাৎ লেজার রশ্মির তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে দশ কোটি বার কম্পিত হচ্ছিল। এর সাহায্যে চাঁদের দূরত্ব বের করার হিসেবটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। ধরুন, পৃথিবী থেকে লেজার রশ্মি চাঁদে গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল এবং এতে সময় লাগল 'ক' সেকেণ্ড। অতএব পৃথিবী এবং চাঁদের দূরত্ব অতিক্রম করতে ঐ রশ্মির সময় লাগে 'ক'-এর অর্ধেক সময়। এখন আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। অতএব 'ক'-এর অর্ধেক সময়ে আলো যতটা পথ অতিক্রম করে সেটাই হবে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব। আপাত দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও, এই সময়টিকে সঠিক ভাবে মেপে বের করা কিন্তু খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। আলোর গতিবেগ যেখানে এত প্রচণ্ড সেখানে একটি সেকেণ্ডের বহু ক্ষুদ্রাংশ সময়ও উপেক্ষা করা চলে না। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এক সেকেণ্ডের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ও মাপতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে, নিখুঁত দূরত্বটি হিসেব করা সম্ভব হয়েছে। দুটি পৃথক অঞ্চল থেকে পর্যবেক্ষণ চালান হয় এবং উভয় স্থান থেকে যে হিসেবটি বের করা হয়, তারা একই। বলে রাখা ভাল, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কোন সময়ই সমান নয়। এরা উভয়েই নিজ নিজ কক্ষপথে সঞ্চরণের সময় কখনও কাছে সরে আসে, কখনও দূরে সরে যায়। এই সঞ্চরণের ব্যাখ্যা নিউটনের 'মহাকর্ষণের' সূত্র দিয়েও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহাকর্ষণের সূত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে হিল-ব্রাউন-এর নিয়ম। [illegible]

সারবতী জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সামনের সারিতে অতিকায় জেনারেটারগুলি লক্ষ করুন।

অবস্থানিক সম্পর্ক বের করার ব্যাপারে অনেকটা সাহায্য পাওয়া যাবে যার উপর নির্ভর করে 'হিল-ব্রাউন'-এর নিয়মটিকে সম্যক যাচাই করা সম্ভব হবে। এবং এর ফলে দূরবর্তী গ্রহে মহাকাশযান পাঠান এবং সেখানে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবতরণ করান সহজতর হবে।

কিন্তু এদের চেয়েও বড় বিস্ময় লুনোখোদ। বলা হয়েছে, তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে লুনোখোদ-এর আটটি চাকার কার্যপ্রণালী পৃথিবীর চক্রযানেরই অনুরূপ। কিন্তু প্রযুক্তি গত জটিলতা সেখানে অনেক এবং সেদিক দিয়ে ভাবতে গেলে পৃথিবীর গাড়ির চাকার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তার চাকার মিল খুবই কম। লুনোখোদ-এর চাকা তৈরি করার সময় বিশেষজ্ঞদের অনেক কিছু ভেবে নিতে হয়েছে। এক, চাঁদ প্রায় পুরোপুরি বায়ুশূন্য পরিবেশ; দুই, সেখানে দিন এবং রাতের তাপমাত্রার ব্যবধান অস্বাভাবিক বেশি। অর্থাৎ গাড়ির চাকা এমনভাবে করতে হয়েছে যাতে করে তার গতি অমন প্রতিকূল তাপীয় অবস্থার মধ্যে কার্যকর থাকে। যে বস্তু দিয়ে তারা তৈরি অমন তাপ-প্রভেদের মধ্যেও যেন তার ক্ষমতা অটুট থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে, পৃথিবীতে অনেক ধাতুই, এমন কি লোহাও অত বেশি তাপমাত্রা বা অত বেশি ঠাণ্ডায় অমন ঋজুতা রক্ষা করতে পারে না। টিন প্রভৃতি ধাতু নিম্ন তাপমাত্রায় ভঙ্গুর হয়ে যায়। তিন, চাঁদের পাথর বা মাটি পৃথিবীর থেকে স্বতন্ত্র। অতএব চাকার সঙ্গে তাদের ঘর্ষণের কায়দাটাও হবে ভিন্নতর এবং ঐ পরিবেশে ঐ চাকাগুলি যাতে সচল থাকে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হয়েছে।

লুনোখোদ-এর পরীক্ষায় চাঁদে চক্রযান চালনার ব্যাপারে সোভিয়েত দেশ প্রথম হয়ে রইলেন। এই পরীক্ষার আরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল, ভবিষ্যতে ঐ ধরনের চক্রযানে চড়ে মানুষ চাঁদের বুকে সহজেই শত শত মাইল দূরত্ব হয়ত অতিক্রম করতে পারবে। শুধু সীমিত অঞ্চলে যাওয়ার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বড় বড় রকেটের সাহায্যে মানুষ পাঠানর প্রয়োজন হবে না। দুই একটি

তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

ঘাটি থাকলেই হল। মানুষ সেখানে গিয়ে অবতরণ করবে। তারপর গাড়ি চড়ে অবাধ বিচরণ। আর সেটা করা সম্ভব হলে, তবেই চাঁদের নাড়ি-নক্ষত্র জানার কাজ সহজ হয়ে যাবে।

ভারতের শক্তি

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এখন ভারতে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র এখন তারাপুরে। সেও ভারতে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০। দুই দশকের এই ব্যবধান যে কত বেশি, আজকের ভারতীয় শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির দিকে চাইলে সেটা নজরে পড়বে। ছোট বড় অনেক নদী, যারা একদিন প্রকৃতির অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে প্রাণচঞ্চল ছিল, স্বাধীন সত্তার নিজেদের খেয়াল-খুশী মত বিচরণ করত, তাদের অনেকেই এখন মানুষের অধীন। বাঁধ দিয়ে শত শত নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। তাদের জল এখন উর্বর জমিকে সিক্ত করে ভারতের কৃষি প্রকল্পগুলি সার্থক করে তুলেছে। ১৯৭০-এর সবচাইতে বড় খবর, ভারত এখন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ম্ভর। ১৯৭১-এর পর ভারতকে আর হয়ত বিদেশীদের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। বিগত কুড়ি বছর ছোট বড় শত শত শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। রেলের ইঞ্জিন থেকে শুরু করে ঘড়ি তৈরির কারখানা, বড় বড় সেতু, ঘর বাড়ি তৈরির ভারী ইস্পাতের যন্ত্রপাতি, অনেক অনেক প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে পথে। আধুনিকতম চিকিৎসা ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার আধুনিকীকরণ—গবেষণাগারের সম্প্রসারণ আজ সর্বত্র। ভূপালের হিন্দুস্থান ভারী যন্ত্রপাতির কারখানা আজ পৃথিবীর অন্যতম উৎপাদন কেন্দ্র।—আর এ সমস্ত করতে গিয়ে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা দিন দিন ভীষণভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপর চাপ পড়ছে অনেক বেশি। কিন্তু এ দেশে যতটা কয়লা-সম্পদ রয়েছে তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে বর্তমান দশকের শেষের দিকেই হয়ত টান পড়তে পারে। তাই জলবিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ওপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হয়েছে সবচাইতে বেশি। আর সবচাইতে আনন্দের কথা, এগুলি তৈরি করার ব্যাপারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখন কাজ করছেন ভারতীয় কুশলী, বিজ্ঞানী এবং উদ্ভাবকরা। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি রূপায়িত করতে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সামগ্রীই সংগ্রহ করা হচ্ছে এ দেশেরই বিভিন্ন শিল্প সংস্থা থেকে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, অনিবার্য কারণ না ঘটলে বর্তমান এই দশকের মধ্যেই ভারতের শক্তি উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণের মত বেড়ে যাবে। আর এই বিদ্যুৎ ব্যয় করা হবে গ্রামাঞ্চলের ঘরবাড়ি আলোকিত করতে, গভীর নলকূপ চালিয়ে কৃষকদের চাষের জল সরবরাহ করতে, গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলতে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য পূরণই তার মূল উদ্দেশ্য হবে।

সংবাদ

গালিভার এক সময়ে লিলিপুট বামন মানুষের দেশে গিয়ে বেড়িয়ে এসেছিল। সেটা কল্প-কাহিনী। কিন্তু এটা কি ঠিক, বর্তমানের মানব শিশু অতীতের মানব শিশু থেকে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়? আমাদের নাতি-নাতনীরা আমাদের থেকে দৈহিক দিক দিয়ে অনেক বেশি বেড়ে উঠবে? এটা কি সত্য, আমাদের সমসাময়িক মানব শিশু লম্বায় বড় হয়ে যাচ্ছে আগের চেয়ে অনেক বেশি? ভবিষ্যতের নারী-পুরুষ কি শেষ পর্যন্ত গালিভারের অভিজ্ঞতার মানুষের মত আকৃতির রূপ নেবে? সোভিয়েত দেশের পার্ম মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এভিজাফেব ওলেনেভা এই অভিনব বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক এবং চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করেছেন। আগামী সংখ্যায় [illegible]-এ তাঁর সেই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করব।

সমরজিৎ কর

বেদ-উপনিষদের দেশে

ঝড়ের অন্তরীপ উত্তমাশা অন্তরীপে পরিণত হল যখন, য়ুরোপ ভিড়ল এসে ভারতের তটে। কেউ এল লুঠ করতে—লুঠ নিয়ে ফিরে গেল; কেউ এল বাণিজ্য করতে—বাণিজ্য করতে এসে রয়ে গেল। কেউ কেউ কিন্তু এলেন আরেক স্বপ্ন নিয়ে। রাজ-প্রাসাদে গেলেন না তাঁরা বাদশাহের দরবারে সনদ চাইতে; গেলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে—পাঠ নিতে। ধনবর্ধনের ফন্দি ফিকির এঁটে কুঠি গড়লেন না, সাধুসন্তের কুটিরে দিন কাটালেন জ্ঞানার্জনে। সম্পদ-দোহনের জন্য এখানে গেড়ে বসলেন না, ফিরে গেলেন প্রাচীর শাস্ত্রজলধি মন্থন করে, বই নিয়ে। "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে..." প্রাচী-প্রতীচীর মধ্যে এই বিনিময়ের সূত্রপাতের পুরোধা এঁরা।

এঁদের একজনের কথা বলতে চাই: আঁকেতিল দ্যু পেরোঁ [১৭৩১-১৮০৫] ইনি, ১৭৫৪ সালে [তখনও মাত্র সদ্য কুড়ি-পেরোনো বয়স তাঁর], উইলিয়ম জোন্সেরও আটাশ বছর আগে সৈনিকের বৃত্তি নিয়ে ভারতযাত্রা করলেন "পারসিক ও ভারতীয়দের জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধানে"।

হল্যাণ্ডে তিনি পড়েছিলেন হিব্রু আর আরবী, প্যারিসে ফিরে তিনি হলেন রাজ-গ্রন্থাগারের কর্মচারী, আর সেখানেই ঘটে Vendidad Sade [অর্থাৎ 'জেন্দ্ আবেস্তা'] কেতাবের অক্সফোর্ডে রক্ষিত খানকয় পাতার এক প্রতিলিপির সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ—যার বর্ণমালা তখনও পর্যন্ত য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা রপ্ত করে উঠতে পারেননি। জেন্দ আবেস্তার পাঠোদ্ধারের ইচ্ছেটাই তাঁর মাথায় সেঁধিয়ে দিল ভারত-যাত্রার পরিকল্পনা। তাঁর আশা ছিল, উপরিপাওনা হিসেবে বেদের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। বিশ্বাস করতেন, পুরাণশাস্ত্রের তুলনাত্মক আলোচনার দ্বারাই তিনি অকাট্যভাবে প্রমাণসিদ্ধ করবেন জাতি-সমাজে 'মনোনীত জাতি' ইস্রায়েলের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সেই জাতির ধর্ম-পুস্তক বাইবেলে নির্দিষ্ট কালক্রমের যাথার্থ্য।

প্যারিসে ফিরলেন ১৭৬২-তে ছ-ছটি বছরের অনুপস্থিতি, ক্লেশভোগ আর বিরাম-হীন সংগ্রামের পর। সঙ্গে ছিল জেন্দ, পেহ্লেবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার একশ আশিটি পাণ্ডুলিপি। এ-ছাড়া চারটি ভারতীয় ভাষার অভিধান-রচনার উপকরণ [হিন্দুস্থানি, 'মালাবার', তেলেগু, সংস্কৃত] আর এক সংস্কৃত ব্যাকরণেরও উপাদান; কালে-কালে সবগুলিই প্রকাশের অভিপ্রায় ছিল তাঁর।

১৭৭১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর জেন্দ আবেস্তার তর্জমা; সুরাটে তিনি দু বছর ছিলেন, সেখানেই বইটি আবিষ্কার ও অনুবাদ করেন। যুগান্তকারী এই কর্ম: এই প্রথম এশিয়ার—দুজ্ঞের, রহস্যময় সেই এশিয়ার—'চন্দ্রচূড়-জটাজালে'-বন্দী ভাষা-সমূহের মধ্যেকার অন্যতম ভাষাজাহ্নবীর যাত্রাপথ খনিত হল পাশ্চাত্ত্যের উদ্দেশে; এই প্রথম এক এশিয় গ্রন্থ য়ুরোপীয়দের সামনে উপস্থাপিত হল এমন এক দৃষ্টি-কোণ থেকে যা যুগপৎ বাইবেলীয় এবং ক্লাসিকাল ঐতিহ্য থেকে মুক্ত। এই মুক্ত-ধারার ভগীরথ হলেন আঁকেতিল। তাঁরই উদ্বোধনে [এবং পরবর্তী উইলিয়ম জোন্সের পরিশ্রমী উদ্যাপনে] ভাষা-ইতিহাসের তথা ভাষাগত ইতিহাসের সূচনা—এবং একান্তভাবে প্রাচী-গবেষণার শুভারম্ভ। সরাসরি মূল গ্রন্থের মোকাবেলায় এই শুরু।

আঁকেতিলের মতে "বেশির ভাগ ভারত-পর্যটকই বড় জোর ব্রাহ্মণদের ধরে ধরে তাদের বিশ্বাসের মূলনীতি কি, অমুক-তমুক বিষয়ে কি তাদের প্রত্যয়, এটুকু জিজ্ঞেস করেই তৃপ্ত থাকেন; তাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি জোগাড়ের ক্লেশস্বীকার পর্যন্তও করে থাকেন কেউ কেউ—সংখ্যায়

তাঁরা অল্প। ব্রাহ্মণদের উত্তর এবং শাস্ত্র-গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি যথাযথ হতে পারে; আবার প্রশ্নকর্তার মত, রুচি ও পরিস্থিতির সঙ্গে মিলেও যেতে পারে। আসলে সত্য জানার একমাত্র উপায় : ভাষাগুলোই ভালো করে শিখে নিয়ে মৌলিক গ্রন্থগুলি অনুবাদ করে ফেলা এবং পুঁথিপত্তর বগলদাবা করেই ও-দেশের প্রাজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা।"

বেদের টেক্সট আঁকেতিল সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। [১৭৭১ সালে তাঁর উদ্দেশে লিখিত এক চিঠিতে দেখি, ফাদার ক্যর্দু বৈদিক সংস্কৃতকে "এক অনতিক্রম্য প্রহেলিকা" বলে উল্লেখ করছেন]; তবে উপনিষদের সঙ্গে তিনি যে য়ুরোপের পরিচয় স্থাপন করেছেন, সেটাই বোধ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। Oupnek'hat নামক গ্রন্থে তিনি যে পঞ্চাশটি উপনিষদের অনুবাদ মুদ্রিত করেছেন সেগুলির মূলে সংস্কৃত পাঠও তিনি করায়ত্ত করতে পারেন নি, পেয়েছিলেন এক ফারসি তর্জমা, শাজাহানের পুত্র দারা শিকোর জন্য বেনারসের পণ্ডিতেরা যেটা প্রস্তুত করেছিলেন। ইতিপূর্বে বেনিয়েও এই তর্জমারই এক কপি হাতে প্যারিসে ফিরেছিলেন; এই একই তর্জমার আরেক কপি উত্তরকালে রামমোহন রায়ের সঙ্গে উপনিষদের যোগাযোগ ঘটাবে।

প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব

আঁকেতিলের ধারণা : "জেন্দ্‌ আবেস্তা আর উপনিষদ যে-সত্যের পাঠ দেয়, প্লেটো-পন্থীদেরও শিক্ষার সঙ্গে তার ভেদ নেই। ঐ দার্শনিকেরা সম্ভবত প্রাচীর কাছ থেকেই সে-সব গ্রহণ করেছিলেন।" তখনকার দিনের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব ও বিস্ময়কর তাঁর উদার মনোভাব ও পক্ষপাতহীন বিচার : "সকল জাতি, সকল ধর্মতত্ত্ব ও সকল দর্শনেরই আছে নিজ নিজ ভাবাদর্শ চিন্তার তথা রূপায়ণের নিজস্ব রীতি...। ভারতীয়দের গ্রন্থরাজিও আমাদের পড়ে উঠতে হবে —ঠিক যেমনভাবে আমরা গ্রীক-লাতিন পড়ি। তাদের ভালো করে বোঝা-টাই আদিকৃত্য; তারপর, আমাদের মত তাদের মতের চেয়ে শ্রেয়, এই সিদ্ধান্তে যদি উপনীত হই, তাদের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের থাকবে, কিন্তু বিনয় সহকারে, তিক্ততা ও বিদ্রূপের নামগন্ধ ব্যতিরেকে।" তিনিই সর্বপ্রথম আঁচ করতে পেরেছিলেন, গ্রীক-লাতিন শিক্ষাটাই একমাত্র শিক্ষা নয়; বুঝেছিলেন, সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধ বলে কিছু নেই, ভারতজ্ঞান য়ুরোপীয় শিক্ষার যথার্থ পরিপূরক।

ভারি সৎ ও ঋজু প্রকৃতির মানুষ এই আঁকেতিল। বিপ্লবোত্তর কালে ফ্রান্সে যখন 'সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হল, আপন পদ থেকে ইস্তফা দিলেন—নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে শপথ নিতে হবে বলে। এদিকে উত্তম ও আন্তরিক খ্রীষ্টান, কিন্তু ভারতীয় ঋষিদের শিষ্যরূপে নিজেকে আখ্যাত করতে দ্বিধা করেন নি। 'ভারত সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গবেষণাবলী' নামক গ্রন্থের শেষ বাক্যটিতে তাঁর এই আশাবাদী কণ্ঠস্বর আমরা শুনি : "শীঘ্রই জরার শীত আমার ধমনীর রক্ত হিম করে দেবে। তবে আমি কবরে যেতে পারব অন্তত এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, ভারতের সঙ্গে ইউরোপের রাখীবন্ধন স্থাপিত হতে চলেছে : সোনা-রূপো-মণিরত্ন-বস্ত্র-মশলা বাণিজ্যপণ্যের সেই বিনিময়সূত্রে নয়, [যা এতাবৎকাল একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র ছিল এই দুই মহাদেশের] কিন্তু যোগ্যতর এক যোগসূত্রে—মনের সঙ্গে মনের, ভাবনার সঙ্গে ভাবনার...। সানন্দে মরতে পারব এই বলে : ভারতীয়েরা আমাদের ভালোবাসতে পারে।"

ভারত : ইংরেজ বনাম ফরাসি

এমন নয় যে, বাণিজ্য ব্যাপারেও আঁকেতিলের উৎসাহ ছিল না। 'বাণিজ্যের মর্যাদা' নামে একটি বই পর্যন্ত তিনি ছাপিয়েছিলেন ১৭৮৯ সালে। তাছাড়া তাঁর **ভারত : ইউরোপের সঙ্গে তার সম্পর্ক**

গ্রন্থের একান্ত আলোচ্য : বাণিজ্যপ্রসঙ্গ এবং বাণিজ্যঘটিত রাজনীতি।

বইটিতে ইংরেজ-চটানো কথাবার্তা রয়েছে ঝুড়ি ঝুড়ি। সেন্সরের কাঁচি এড়ানোর জন্য আঁকেতিল এটাকে তাই ১৭৮২ খৃীষ্টাব্দে চালান করে দেন ন্যশাতেল-এ [সুইজারল্যান্ড], সেখানকার ছাপাখানায় মুদ্রণের জন্য। এর আগেও তাঁর আরেকটি গ্রন্থ প্রথম আলোর মুখ দেখেছিল বৈদেশিক প্রকাশে : 'ভারতীয় বিধিবিধান' ১৭৭৮-এ ছাপা হয় আমস্টার্ডামে; আর এর পরেও, ১৭৮৬-৮৯ সালে, তাঁর সেই পূর্বোক্ত 'গবেষণাবলী' বার্লিন থেকে মুদ্রিত হয়ে বেরোয়। 'ভারত'-গ্রন্থটি অবশ্য সুইজারল্যান্ড থেকে চোরা-গোপ্তাভাবে প্রকাশিত হতে পারল না। ফরাসি মন্ত্রীদপ্তর, ইংরেজের অসন্তোষের আশঙ্কায়, খবর পাঠিয়ে ছাপার কাজ আটকে দিলেন। বইটি, অবশেষে, প্যারিসেই ছাপা হল পাক্কা ১৬ বছর পরে, ১৭৯৮ সালে, হালফিল তথ্যাদিতে সমৃদ্ধ হয়ে।

খোদ নামপত্রেই ইংরেজ-বিরোধিতা প্রকটভাবে উপস্থিত। লেখক একটুও ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে তীক্ষ্ণভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, বইটিতে আছে "ভারতে ইংরেজের কূট স্বার্থসর্বস্ব মেকিয়াভেলিয়ানার এক নিখুঁত ভয়াবহ চিত্র এবং ফরাসি সরকারের উদ্দেশে ভারতে এক-চেটিয়া অধিকারসম্পন্ন এক 'কোম্পানির' সুচিন্তিত এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজদের পক্ষে বিভীষিকাজনক পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।"

উৎসর্গপত্রে আবাহন করা হয়েছে দ্যুপ্লেক্স এবং লা বুর্দন্যা-র প্রেতাত্মাদের : "নিষ্ঠুর, বিশ্বসঘাতক, উদ্ধত ইংলন্ড তোমাদের রাজনৈতিক নৈপুণ্য এবং সামরিক কৌশলের দ্বারা নির্জিত হয়ে সেদিন যে লাঞ্ছনা ও অবমাননায় মজ্জিত হয়েছিল, আজ তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সকে তা-ই সে সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিয়ে চলেছে...। ত্বরান্বিত কর প্রতিশোধের মুহূর্ত...। আর তোমাদের মহীয়ান কীর্তিপুঞ্জে ধন্য সেই ভারতবর্ষে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে মর্ম যন্ত্রণায় পীড়িত হতে হতে পর্যটন করেছে যে পথিক, হে সহৃদয় ছায়ামূর্তিদ্বয়, তার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর...। ভারত তোমাদের আহ্বান করছে। য়ুরোপীয় জাতিসমূহের অন্যায় ও হিংস্র কাণ্ডকারখানা চেপে বসে আছে তার ঋদ্ধিশালী প্রদেশগুলির বুকের উপর, তিক্ততায় ভরিয়ে তুলছে সেই ভারতবাসীর প্রকৃতি-প্রসাদে-লভ্য শেষ কটি দিন, ভারতের অবরুদ্ধ কণ্ঠে যিনি আজ বাণী-যোজনায় সমুদ্যত।"

মুখবন্ধ

পাছে লোকে বলে তাঁর বইটি এক নিরুপায় ইংরেজ-বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ, এক মর্মাহত স্বাজাত্যাভিমানের অক্ষম ক্রন্দন ও দিবাস্বপ্ন, পাছে কেউ আপত্তি তোলে, ভারত নিয়ে লেখাজোখা এখন অর্থহীন ও বিপজ্জনক—"ইংরেজরা ওখানে জমিদারি পেতেছে পাতুক, আমরা থাকি আমাদের নিজেদের মতো"—তাই আঁকেতিল তাঁর ফরাসি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর গ্রন্থ ও বক্তব্যের বাস্তব ও সমকালীন উপযোগ : "সমাজসৌধের ভিত্তিস্বরূপ, যে বৃত্তিগুলি আর সব-কটিই কানায় কানায় পূর্ণ; প'ড়ে রয়েছে ফ্রান্সে অসংখ্য মানুষ, কর্মহীন, বৃত্তিহীন, যাদের অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্ব শুধু ভার বাড়াবে পৃথিবীর, বিপজ্জনক বোঝা হয়ে উঠবে দেশের পক্ষে। অথচ ওরাই স্বদেশের মহিমার আকর হয়ে উঠতে পারে, যদি ওদের চরিত্রের উপযুক্ত এমন কর্মকাণ্ডে ওদের নিযুক্ত করা হয়, যা স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।"

এরা কারা? তাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন আঁকেতিল, "ঐ তারা, বিপ্লবের যারা বলি হল, বিপ্লবের দ্বারা যারা আর্ত। তারা সর্বশ্রেণীতে ছড়িয়ে আছে, সকল প্রকার চিন্তাধারার মনুষ্য-গোষ্ঠীর মধ্যে তারা রয়েছে : হর্ম্য ধসাতে গিয়ে মিস্ত্রি নিজে প্রায়শই আহত হয়, পড়ন্ত দেওয়ালের সঙ্গে সেও ধসে পড়ে, ধ্বংসাবশেষের স্তূপের চাপে বিনাশ পায়।"

তাক্যরা-র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "ঐ তারা, খুনেদের ডান্ডার কোপে যারা হারিয়েছে সব-কিছু মাতৃভূমিকে যা অলংকৃত করে রেখেছিল...। স্বদেশের দিকে তাকিয়ে যারা শুধু অনুভব করে বেদনা কিংবা অনুতাপ...যারা আর ভরসা রাখতে সাহস পায় না সেই দেশের উপর, যার কাছে পেয়েছে এমন মর্মাঘাত...।"

বিবৃত করেন তাঁর পরিকল্পিত লক্ষ্য ও সতর্কবাণী : "স্পাঞ্জের মতো হিন্দুস্থানকে নিংড়ে নিচ্ছে ইংরেজরা...ঐ রক্তমাখা সৌভাগ্যসম্পদ আমাদের বিলুব্ধ না করুক, মানবধর্ম ও বিবেচনার সীমার মধ্যেই আমরা থাকব না-হয়, কিন্তু একেবারে ছেড়ে আসব কেন সেই সব খনি, যা ভারতীয়দের সহায়তায় আমরা ফলপ্রসূ ক'রে তুলতে পারি এবং যার একচ্ছত্র আত্মসাতের অধিকার আমাদের য়ুরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের নেই...। আমাদের লক্ষ্য হবে ঐ মোগল-মারাঠা-মালাবার-বাঙ্গালী জাতিগুলির সঙ্গে, সাম্য ও মানবিকতার ভিত্তিতে, এমন এক গাঁট-ছড়া বাঁধা—ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় অর্থেই—যা হবে দুপক্ষেরই শুভঙ্কর..."। চল্লিশ বছরের মননকর্মের ফসল এই বই; তার সঙ্গে মিশেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা, ভাষা-মানুষ-ও-মনোভাব-সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদ্বিষয়ক যাবতীয় রচনার পঠনপ্রসূত তথ্যাবলী।"

আর এই বলে তিনি মুখবন্ধের উপসংহার টানেন : "ভারতে কোনোদিন যে বাস করেছে, ফ্রান্সে ফিরে এসে দীর্ঘকাল ধরে বিষাদ থাকবেই তার মনে। শুধু ইংরেজরাই আমার এই অক্লান্ত আমন্ত্রণে আশঙ্কিত বোধ করবে—কেন, তা সহজেই বোঝা যায়।...কিন্তু তা করবে বলেই আরও বেশি বলব, সোৎসাহে ও অবিলম্বে এই আমন্ত্রণ অবশ্যগ্রহণীয়।"

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি-কিছু আর বাকি থাকবে না-অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না—বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়-যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,-যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে। খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,
— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে —

১)
বাইরে থেকে গায়ে

২)
ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে।

এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।
সবচেয়ে সুফল যদি তাড়াতাড়ি পেতে চান তো ভিক্স ভেপোরাব যথেষ্ট পরিমাণে লাগান—১৯ গ্রামের পুরো এক শিশি, -বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৭ থেকে ৮ বার আর বড়দের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪ বার লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব—নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

নতুন ১২ গ্রামের বড় টিন।

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

শ্রীমতী বাসন্তী সেন ও শ্রীমতী পেগি স্যাটো অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে গ্যালারীর আর এক অংশে ডাঃ মরিস সেলিমের কয়েকটি রচনাও দেখা যায়। একই গ্যালারীতে প্রদর্শিত হলেও তিনজন শিল্পীর কাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও অঙ্কনরীতির মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়ে।

শ্রীমতী বাসন্তী সেন ঠিক অপরিচিতা নন। ইতিপূর্বে এখানে তিনি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। লণ্ডন রিজেণ্ট পলিটেকনিক স্কুলে তিনি কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন, পরে শিল্পী জগদীশ রায়ের সঙ্গে কাজ করেন ও সেই সঙ্গে তালিম নেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা নয়টি রচনা দেখা যায়। বিষয়বস্তু নানা-জাতীয়। শিল্পীর অধিকাংশ ছবিই ইমপ্রেশানিস্টিক। শিল্পী সোচ্চার, বিশেষ করে লাল ও নীল রঙের পক্ষপাতী, তার ওপর হলুদ রঙের প্রাধান্যও চোখে পড়ে। যেমন, দি ওয়াটার্স এজ। হলুদ রঙের পরিপ্রেক্ষিতে গাঢ় নীল ও সবুজ রঙের বিন্যাস ও স্তরভেদ, মধ্যস্থলে কয়েকটি মূর্তির সঙ্কেতমূলক অবতারণা ও তার সঙ্গে স্থানে স্থানে লাল রঙের মৃদু প্রলেপের মধ্য দিয়ে শিল্পী বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পাদভূমির অঙ্কন কাজ নিখুঁত হলে বেগুনী রঙে আঁকা পুষ্পস্তবক হস্তে নারীর (থার্ড প্রবলেম) ছবিখানি আরও সুন্দর হয়ে উঠত। শিল্পীর কাচের উপর আঁকা পুষ্পগুচ্ছ (বুকে) স্টিল লাইফ রচনার সুন্দর নিদর্শন। মার্কেট অ্যাট কালিমপংও মন্দ লাগে না। প্রধানত কালো রঙের সুকৌশল বিন্যাস ও স্তরভেদ সৃষ্টির জন্য রেড স্কাই অ্যাট নাইট-এর নাম করা চলে।

*

শ্রীমতী পেগি স্যাটো ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অব আর্টস-এ শিক্ষালাভ করেন। কলকাতায় এটি তাঁর প্রথম প্রদর্শনী। একটি অংশে তাঁর আঁকা কয়েকটি ন্যুড স্টাডি দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রাথমিক অঙ্কনবিদ্যায় তাঁর দখল আছে। তাঁর রেখার টান বলিষ্ঠ ও সাবলীল। তাছাড়া শারীরবিদ্যা বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন, এই জাতীয় স্টাডিতে যেটি বিশেষ প্রয়োজন। শিল্পীর বিশেষত্ব এই যে, মডেলের নানা নতুন ও বিভিন্ন ভঙ্গী থেকে তিনি ন্যুড স্টাডি করেছেন, যে জাতীয় পোজ বা ভঙ্গীর স্কেচ কম চোখে পড়ে। তা সত্ত্বেও দু'একটি স্কেচে সামান্য অঙ্কন ত্রুটি অনেকেই দেখতে পান। পোজ বা ভঙ্গীর দিক থেকে কঠিন হলেও রিক্লাইনিং ন্যুড-১-এর স্টাডিতে বাম হাত ও দক্ষিণ উরুর অস্বাভাবিকতা সহজেই ধরা পড়ে। স্টাডি হিসাবে বলিষ্ঠ হলেও রোজ ন্যুড (৯নং)-এরও অঙ্কন দোষ চোখে পড়ে। তবে শিল্পীর দুটি স্টাডি সত্যিই প্রশংসনীয়: রিক্লাইনিং ন্যুড-২ (১১নং) এবং ব্রাউন ন্যুড (৮নং)। শেষেরটিতে শিল্পীর শারীরবিদ্যার সম্যক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বুক, মুখ ও সারা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সোফার ওপর ছড়িয়ে রেখে উপুড় হয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে একটি নারী শুয়ে আছে—নিষ্ঠুর কঠিন রেখার সংঘাতে তার কোমল দেহলতার বিকশিত যৌবনভার যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলিষ্ঠ রেখার কয়েকটি টানের মধ্য দিয়ে শিল্পী সুনিপুণ ও স্বাভাবিকভাবে যুবতী নারীর একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী রূপায়িত করেছেন। বলা বাহুল্য কয়েকটি নিদর্শন প্রশংসা দাবি করে।

হাশ্ —ডাঃ মরিস সেলিম

*

ডাঃ মরিস সেলিমের ১০টি রচনা দেখা যায়। সবগুলিই তেলরঙে আঁকা, বিষয়-বস্তু নিসর্গ, অন্ত তথা বহির্দৃশ্য। এ শিল্পীও ঠিক নবাগত নন, ইতিপূর্বে এখানেই তাঁর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যানভাসটি কয়েক ভাগে বিভক্ত করে শিল্পী তার বিভিন্ন স্থানে সোজাসুজিভাবে রঙ করে ফেলেছেন। রিয়ালিস্টিক জাতীয় রচনারীতি ও রঙ ব্যবহার প্রণালীর সরলতাটুকু প্রথমেই চোখে পড়ে। সম্ভবত রচনাক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য শিল্পী কয়েক ক্ষেত্রে ছোট ছোট চতুর্ভুজ এঁকে একটি বাদ দিয়ে আর একটি কালো রঙে ভরে ফেলেছেন, ফলে সমগ্র আবেষ্টনীতে যেন একটি শান্ত, সমাহিত ভাব ফুটে উঠেছে, যেমন হাশ। শিল্পীর রচনার আর একটি গুণ—পরিচ্ছন্নতা। বিশেষ করে টরকা-২ অনেকের ভাল লাগে। গাঢ় নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সাদা বাড়ি, দরজাগুলি নীল রঙের, জানালাগুলির রঙ সবুজ, পাদভূমিতে স্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ ও শীর্ণ, শাখা-সর্বস্ব কয়েকটি বৃক্ষ; যেন একটি স্নিগ্ধ, সচল ও মায়াময় পরিবেশ। দি সাণ্ডলারও মন্দ লাগে না। সম্মুখে নীল সমুদ্র বক্ষে ভাসমান ছোট ছোট নৌকা, পিছনে পাহাড়ের ওপর কয়েকটি বাড়ির ইঙ্গিত ও ওপরে নীল ও ছাই রঙের আকাশ। অঙ্কন ও রঙ ব্যবহার রীতির স্বাভাবিক সরলতার মধ্য দিয়ে একটি স্নিগ্ধ ও সুন্দর পরিবেশ তৈরী করার ক্ষমতা শিল্পীর আছে এবং সেজন্যই কয়েকটি ছবি দেখতে ভাল লাগে।

*

হস্ত ও কারুশিল্পের জন্য এককালে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থান পরিচিত ছিল। শিল্পগুলির চাহিদা থাকায় জন-সমাজে তাদের প্রচলনও হয়। বলা বাহুল্য, বৃটিশ রাজত্বকালে তদানীন্তন সরকার

দেশের শিল্প তথা শিল্পসংস্থাগুলিকে সুনজরে দেখেননি, তাঁদের স্বার্থ ছিল এদেশে বিলাতী মালের প্রচলন করা। সুনজর, সাহায্য ও যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দেশের বিশিষ্ট শিল্প উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সেগুলি লোপ পাবার উপক্রম হয়। সুখের বিষয়, স্বাধীনতা লাভ করার পরে আমাদের জাতীয় সরকার দেশের ম্রিয়মাণ শিল্পগুলির বিষয়ে সচেতন হন। নিখিল ভারত হস্ত শিল্প সংস্থা স্থাপিত হয়, দেশের বিভিন্ন শহরে গুণী শিল্পীদের পরিচালনায় ডিজাইন কেন্দ্রও খোলা হয়। বিভিন্ন শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে সরকার কারিগর-শিল্পীদের উৎসাহ, অর্থ সাহায্য ও সেই সঙ্গে যুগের চাহিদা মত পরিকল্পনা দান শুরু করলেন। প্রত্যেক প্রদেশেও প্রাদেশিক পর্যায়ে শিল্প সংস্থা ও শিল্পী, তাঁদের কারিগর-শিল্পীদের নানাভাবে উৎসাহিত করতে আরম্ভ করলেন। মৃতকল্প শিল্পগুলি পুনর্জীবন লাভ করল—শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের নানা শিল্পসামগ্রী আজ বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে, ফলে বিদেশী মুদ্রাও আসছে।

নিখিল ভারত হস্তশিল্প সপ্তাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ডিজাইন কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের পুনরুজ্জীবিত নানা অপরূপ শিল্পসামগ্রী দেখে উপরোক্ত কথাগুলি মনে এল। প্রদর্শনীতে ঢোকরা, ঝিনুক, শাঁখ, মোষের শিং, হাতীর দাঁত, শোলা, কাঠ ও পাথর খোদাই এবং পোড়ামাটির বহু নিদর্শন দেখা যায়—সেই সঙ্গে চোখে পড়ে সেকালের সূক্ষ্ম সূচিশিল্পের নমুনা হিসাবে রাখা ১০০ বছরের পুরানো একটি কাঁথা। ঝিনুকের তৈরী নেকলেস, ইয়ারিং, ক্ল্যাস্কেট ও বিশেষ করে সামুদ্রিক গেঁড়ির (turbo shell) খোল থেকে তৈরী চায়ের কাপ ডিস ও চামচ দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। মোষের শিংয়ের কাজের জন্য ওড়িশা সুপরিচিত। কিন্তু মেদিনীপুর ও কলকাতায় তৈরী মোষের শিংয়ের সাপ, ময়ূর, সারস, নানা মূর্তি এবং বিশেষ করে বারুইপুরের পিয়ালি গ্রামের শ্রীসবল বাগের তৈরী অশ্বারূঢ় শিবাজীর অপূর্ব কাজ দেখে পশ্চিমবঙ্গের কারুশিল্পীদের সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন বস্তুর স্বাভাবিক আকার বজায় রেখেও কিভাবে নানা সুন্দর ও ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী তৈরি করা যায়, শাঁখের ল্যাম্পশেড, সিংহাসন ও মন্দির দেখে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শোলা ও ঢোকরার নিদর্শন ছিল শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। সরকার চালিত বারুইপুর পরীক্ষা কেন্দ্রে কালিপদ মালাকার রচিত শোলার শ্রীদুর্গা মূর্তি (দিল্লীর ক্র্যাফটস মিউজিয়মে রাখা

ঢোকরা, ময়ূর, উচ্চতা ৭½"

ওড়িশায় তৈরি শোলার বিরাট শ্রীদুর্গা মূর্তির কথাও এই প্রসঙ্গে বলা চলে) ও আদিত্য মালাকার (বর্ধমান) রচিত কালী-মূর্তির সূক্ষ্ম ও অপূর্ব কারুকার্য দেখে সকলেই বিস্মিত হন। পরিমল দাস (বাঁকুড়ার)-এর ঢোকরা ও পোড়ামাটির নিদর্শন ছিল প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। ঢোকরার ছোট বড় নানা দেবদেবী, পাখী ও জন্তুর মূর্তি ও পোড়ামাটির মনসাদেবীর ঝাঁড়ি ও হাতী দেখে তাঁর চিন্তাধারা ও সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে ছিল অপূর্ব কারুকার্য শোভিত বালুচরের শাড়ি ও হাতীর দাঁতের কাজ, সহদেব কর্মকারের পাথর খোদাই মূর্তি, শম্ভুনাথ ভাস্কর (নতুন গ্রাম, বর্ধমান)এর কাঠ খোদাই নমুনা, বিশেষত দেবদেবীর বিভিন্ন মূর্তি। সবগুলিই গামার জাতীয় একটিমাত্র কাষ্ঠখণ্ডের ওপর খোদিত।

বিভিন্ন নিদর্শনগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশই আধুনিক যুগের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি। যুগের রুচি, নিত্য ব্যবহার ও প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে প্রাদেশিক সরকারের কুটির শিল্প সংস্থার শিল্পী গোপেন রায় নতুন নতুন পরিকল্পনা করেন ও বিভিন্ন শিল্পের কারিগর-শিল্পীর যোগ্য ও কুশলী হাত থেকে সেইগুলিই নানা অপরূপ আকারে রূপায়িত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে হস্তশিল্পক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বলা বাহুল্য, দেশবাসীর মধ্যে দেশীয় শিল্প সামগ্রীর প্রচলন করা এই প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য। তবে এর জন্য চাই যথাযথ প্রচার ও বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন। দুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার প্রচেষ্টা নগণ্য। রাজধানীতে বহুকাল যাবৎ বিভিন্ন প্রদেশের তথ্য, শিল্প সংস্থা তথা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র সেদিন এ বিষয়ে সচেতন হলেন! সরকার যদি এই ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহশীল হয়ে অন্যান্য প্রদেশে কয়েকটি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মৌলিক ও অপরূপ হস্তশিল্পসম্ভারের কথা সমগ্র দেশবাসী জানতে পারবেন, ফলে পরোক্ষে পশ্চিমবঙ্গের কারিগর-শিল্পীদেরও অবস্থার উন্নতি হবে। মূল্যবান শিল্পসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হোক, সে ত আনন্দের কথা! কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য অথচ সুন্দর শিল্প নিদর্শন স্বল্প মূল্যে দেশবাসীই বা ব্যবহার করার সুযোগ না পাবেন কেন?

চিত্রপ্রিয়

ধূমপানের আনন্দের জন্যে পানামা...
একটি পানামা ধরিয়ে দেখুন। একেবারে
প্রথম টানেই বুঝতে পারবেন ওর বাছাই-করা
ভার্জিনিয়া তামাকের চমৎকার টাটকা
স্বাদগন্ধ। তারপর টানের পর টান
আমেজের সঙ্গে টেনে চলুন। একেবারে
শেষ টান পর্যন্ত পানামা আপনাকে
দেবে ধূমপানের অপূর্ব আনন্দ।
Panama
20
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ,
বোম্বাই—৫৩
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম।

॥ আট ॥
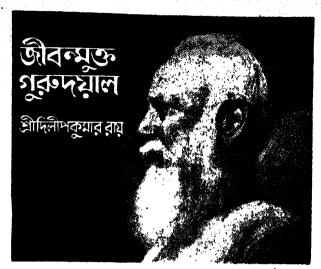
আগেই বলেছি, দয়ালদা ছিলেন স্বধর্মে উচ্চকোটির সাধক যে একবার পথ নিলে ছাড়ে না—"মন্ত্রের সাধন-কিম্বা-শরীর-পাতন"-সুরে কণ্ঠ সেধে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলে আরাধ্যের করুণাকে শিরোধার্য ক'রে। কিন্তু দেহ তাঁর কোনোদিনই বলিষ্ঠ ছিল না। কাঁটাবনে পথ কেটে চলাতেন তিনি কেবল সাধননিষ্ঠা ও ভগবৎ কৃপাকে বরণ ক'রে আত্মজিৎ হ'তে চেয়ে। আমরা তাঁকে মাঝে মাঝেই বলতাম বিশ্রাম নিতে--কিন্তু আর্তের আবেদনে তিনি যে পারতেন না স্থির থাকতে--তাই প্রতি বৎসরই সারা ভারত চক্র দিতেন আজ এখানে কাল সেখানে—যেখানেই বিপন্ন আপন্ন সেখানেই হাজির দিতে।

কিন্তু সেই পক্ষাঘাতের পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরেছিল। শেষে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি রাজী হয়েছিলেন যে বছরে অন্তত ছয়মাস আমাদের মন্দিরে বিশ্রাম নিতে ঠাকুরের কৃপার শান্তির আবহে। কিন্তু সেই একই বাধা : বিশ্রাম নেবেন কেমন ক'রে? অসমুদ্রহিমাচল নানা আর্তই যে তাঁকে চাইত সান্ত্বনা পেতে, শান্তি পেতে—সর্বোপরি, তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অভয় পেতে। প্রীতি স্নেহ সমবেদনা তাঁর ছিল নিঃস্বার্থ, তার উপর পবিত্র চরিত্র, মঞ্জুল কথালাপ, আনন্দময় ব্যক্তিরূপ, রসিক ভাবুক দরদী। ফলে তাঁর বিশ্রাম নেবার জো ছিল না। গত বৎসর (১৯৬৯) সেপ্টেম্বরে তিনি বিশ্রান্ত হ'তে আমেদাবাদ হরিজন আশ্রম থেকে এসে ছিলেন কিছুদিন বম্বেতে একটু নিরালায় থাকতে। কিন্তু হরিজনরা ধরল : আসুন এখানে ঘনঘটা ফেঁপে উঠছে। শুনে শরীর দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন হরিজন আশ্রমে, আমেদাবাদে।

তারপরেই বাধল বিষম কম্যুনাল দাঙ্গা। দয়ালদা আমাকে লিখলেন একটি পত্রে যে, আশপাশের মানুষের দুঃখ আর্তি দেখে তিনি রাত্রে ঘুমতে পারেন না। তবু সেখানে টিঁকে রইলেন আর্তদের মিনতিতে। ফল হ'ল—যা হবার। শয্যা নিতে হ'ল তাঁকে। গলায় ক্যান্সার—শিবের অসাধ্য ব্যাধি। সকলে বলল টাটা ইনস্টিটিউটে যেতে। কিন্তু তিনি বললেন : "না। ঠাকুর যা করেন। আমি অপারেশন করাব না।"

মনে পড়ছে, কলকাতার এক পরম ভাগবতের কথা। অষ্টাশী বৎসর বয়সে পদ্মাসনে সমাধিস্থ হ'য়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁরও ছিল দয়ালদার মতন দুর্বল শরীর। আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন কি না। তিনি বলেছিলেন : "ঠাকুর কি জানেন না আমি অসুস্থ? তাছাড়া আমি স্বাস্থ্যের জন্যে প্রার্থনা করব কেন? তাঁর যা ইচ্ছা তাই হোক। আমি শুধু প্রার্থনা করি : ঠাকুর, তোমার পায়ে শুদ্ধা ভক্তি দাও। বাস।' শয্যাশায়ী অবস্থায়ও তিনি এক ফোঁটাও ওষুধ খাননি। মৃত্যুর পূর্বে এক ভক্তসেবককে শুধু বলেছিলেন তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে কৃষ্ণের ছবির সামনে। তারপর সমাধিস্থ হ'য়ে দেহত্যাগ'।

অত্র দয়ালদার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মিল ছিল। তাই দয়ালদাও এক ফোঁটা ওষুধ খাননি। (হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতেন শুধু ডাক্তারের মান রাখতে, কারণ কে না জানে হোমিওপ্যাথি বটিকায় ক্যান্সার সারে না?) বম্বেতে ওঁকে সাদরে স্বভবনে নিয়ে এলেন তাঁর এক সিন্ধি সেবার্থী—ডাক্তার কে জি ফুলরায়। সবাই জানত তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে, দয়ালদাও জানতেন। কিন্তু তাঁর মুখের প্রসন্নতা একদিনের জন্যেও ম্লান হয়নি। কথা বলতেন অতি কষ্টে। তবু প্রত্যহই প্রার্থনা লিখতেন কয়েক ছত্র ক'রে। একদিনও তাঁর বাদ যায়নি ঠাকুরকে "প্রেমপত্র" লেখা।

আমরা ব্যস্ত হ'য়ে তাঁকে লিখলাম—আমাদের মন্দিরে আসতে। কিন্তু খবর পেলাম তখন তিনি চলৎশক্তিহীন—বম্বে ছেড়ে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। তবু লিখলাম তাঁকে—আমাদের মোটরে বা এক গুজরাতী বন্ধুর মস্ত মোটরে শুইয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে পারি। উত্তরে তিনি লিখলেন :

বম্বে, চেম্বুর
২৩ সিন্ধি সোসাইটি

১১-৩-৭০

পূজ্য মা ইন্দিরাজী

আপকো ঔর পূজ্য দাদাজীকো সপ্রেম প্রণাম, ঔর সব ভক্তোকো সপ্রেম নমস্কার।

আজ মৈ আপকো পেশগীমে আপকে শুভ জন্মদিন (দোলপূর্ণিমা) কা খাস প্রণাম করনে আয়া হুঁ। ক্যা আপনে মোর বিনীত হৈ বহ নীচেবালে ভজন যে আপকো মালুম হো জায়েগা :—

রংগবালে, কর কৃপা তু রংগ দে।
য়হ চদারিয়া মৈনে রংগী বারবার,
রংগ তো উতর গয়া, তব তু হী রংগ দে।
তু হৈ এক কারিগর রংগরেজ,
ঔর রংগ তেরে হৈ সভী পক্কে।
সবসে জ্যাদা পসন্দ হৈ মুঝে গেরুবা।
গেরুবা হী তু রংগরেজ রংগ দে।

জ্যাদা ক্যা লিখুঁ, মা? মৈ অভীতক বিস্তরে হী পর হুঁ।

স্নেহধন্য গুরুদয়াল॥

অনুবাদঃ পূজ্য মা ইন্দিরাজী, আপনাকে আর পূজ্য দাদাজীকে সপ্রেম প্রণাম, আর সব ভক্তদের সপ্রেম নমস্কার।
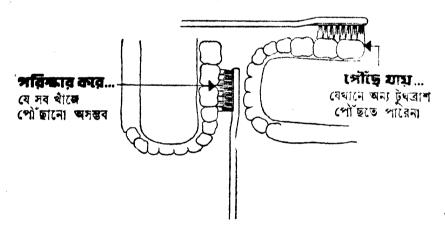
আজ আমি (চার দিন আগেই) দোল-পূর্ণিমায় আপনার শুভ জন্মদিনের প্রণাম জানাচ্ছি। আপনার কাছে কেবল একটি প্রার্থনা—শুনুন:

রঙিন করুণাময়ী! আমি চাই করুণা তোমার:
রঙাও আমার উত্তরীয়।
বারবার রঙায়েছি, হয়েছে সে-রং বারবার
ম্লায়মান। তুমি জানি বর্ণময়ী শিল্পী মহনীয়
কলায়, যাহার রং নয়।
আমার গৈরিক রং সব চেয়ে প্রিয়:
সে-রঙে রঙিন করো আমায় মা! জয় তব জয়

ভাবতেও চোখে জল আসে। না, দয়ালদার রোগার্তির জন্যে অশ্রুপাত নয়, তাঁর মহত্ত্বের কথা মনে ক'রে অশ্রুচ্ছ্বাস। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন একটি অপরূপ শ্লোকে ("প্রবাসে" কবিতায়)।

পরের দুঃখে কাঁদিতে শেখা—
তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদিতে জানা—
তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

মৃত্যু যখন শিয়রে, আশা যখন লুপ্ত—তখনও এ কী অপরূপ প্রার্থনা? আমাকে ভাগবত রঙে রাঙিয়ে দাও—আর কিছুই চাই না। "দিল কী বাত"-এ "মৃত্যু পর বিজয়" নিবন্ধে দয়ালদা উদ্ধৃত করেছেন খৃষ্ট সাধকের অভীতোক্তির কথা:

O Death, where is thy sting?
O Grave, where is thy victory?
[হে মরণ! কোথা তব করাল-দংশন?
হে সমাধি! কোথা তব জয়-আস্ফালন?]

এর ভাষ্য করেছেন তিনি এই বলে: "তভী মৃত্যু আতী হৈ—মৃত্যু জো দেশ ঔর কাল কী ভাষা মেঁ বিয়োগ কী বাত সুনায়া করতী হৈ- হমে যদি দিলাসেকে লিয়ে কি যহ তো ভূল জানে কা আবরণ হৈ, যহ তো অপনী সচ্চী সত্তাকো ভুলা দেনে কি বিড়ম্বনা হৈ—যহী মিথ্যা হৈ, ইসে হী ভুক্ত জানা হোগা, ঔর যে জো দুঃখকে আঁসু হৈঁ বে সুখকে ... সমান উপরকে কঠিন আবরণকো বিগলিত করনে কে লিয়ে হী বহ রহে হৈঁ, জিসসে ভীতর ছিপা হুআ সত্য মুক্ত হো জায়, অপনী বন্ধনহীন পূর্ণতাকো প্রাপ্ত হো।"

(ভাবার্থ: মৃত্যু আমাদের আত্ম-বিস্মৃতির মায়াগ্রন্থিকে ছেদ করে, যেমন অশ্রু আমাদের উপরকার কঠিন আবরণকে গলিয়ে দেয় যাতে ক'রে আমার গহন অন্তর সত্য মুক্ত হ'য়ে নির্বন্ধ পূর্ণতায় আসীন হতে পারে।)

*

আমরা বম্বে গিয়েই দয়ালদার ওখানে গেলাম চেম্বুরে ডাক্তার কে জি ফুলবার-এর রমা নিলয়ে। গিয়ে দেখলাম, তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর বহু অনুরাগী—নরনারী বালক-বালিকা ও প্রেম প্রীতি ভক্তির এক স্নিগ্ধ সেবার্থী পরিমণ্ডল। ইন্দিরা ও আমি গিয়ে দয়ালদাকে প্রণাম করলুম। প্রসন্ন হেসে তিনি মাথা হেলিয়ে প্রতি-প্রণাম করলেন। আমরা জোর করে আমাদের মাথায় তাঁর হাত রাখলাম, তিনিও প্রত্যুত্তরে তাঁর মাথায় আমাদের হাত দু হাতে চেপে ধরলেন।

চোখের জল ফেলবে কে? জীবন্মুক্ত সাধুকে দেহতাপ হার মানাবে কেমন করে? কথা বলতে তাঁর অসহ্য কষ্ট হয়—বললেন ডাক্তার ফুলবার। আমরা বললাম: "তিনি চুপ করে শুনুন আমরা গাই।" গাইলাম ইন্দিরার একটি ভজন, যেটি তাঁকে হরি-কৃষ্ণ মন্দিরে একাধিকবার শুনিয়েছি, গানটি ছিল তাঁর অতি প্রিয়:

হে গোবিন্দ, হে গোপাল, কৃষ্ণ হে মুরারি!
হে দয়াল, নন্দলাল, পাপতাপহারী!
... ...
কমল নয়ন মধুর বৈন মাল গল মুহারে।
চপল চরণ মনমোহন যমুনাতট আরে।
মধুর মধুর মুরলি অধর অঙ্গ পীতধারী।
হে দয়াল, নন্দলাল, পাপতাপহারী।
... ...

[কমল নয়ন অমিয় বচন শ্রীকণ্ঠে দোলে মালা।
চপলচরণ মনমোহন যমুনাতট উজালা
অধরে মুরলী চরণে নূপুর পীতাম্বরধারী
হে দয়াল নন্দলাল পাপতাপহারী]

অনেকেই চোখ মুছলেন। এক ভক্ত তাঁর চোখ মুছিয়ে দিল। আমার বুকের মধ্যেও গাইতে গাইতে অশ্রুসাগর দুলে উঠল..

গুরুদয়াল নাম তাঁর সার্থক...কত নাম-না-জানা জনই যে তাঁকে দয়াল গুরুপদে বরণ করেছে কেউ কি জানে? সারা জীবন কত আর্তকেই না তিনি ভরসা দিয়েছেন, অশান্তকে সান্ত্বনা, ক্লিষ্টকে শান্তি, মুমুর্ষুকে অভয়—সর্বোপরি নিঃস্ব হরি-জনদের সেবা।

ফিরে এলাম বন্ধু রামকৃষ্ণের ওখানে। ইন্দিরা বলল: "তুমি যখন গাইছিলে তখন আমি শুনেছি একটি গান।" বিদায়ের গান অথচ বিদায়ের মধ্যে নব আগমনী—সাধে কি ইন্দিরার ভজন দয়ালদা এত ভালো-বাসতেন? গানটি সে আবৃত্তি করল আমি টুকে নিলাম—২৯ই এপ্রিলে তাঁর দেহান্তের পরে আমাদের মন্দিরে গেয়েছিলাম:

ইস রূপ নহী, উস রূপ সহী,
হম আতে হৈঁ, ফির আয়েংগে।
ইস রাগ নহী, বহ রাগ সহী,
হম গাতে হৈঁ, ফির গায়েংগে।
কভি বাদল বন কর ঘুমেংগে,
কভি ডালী বন কর ঝুমেংগে।
গোবিন্দ নহী, গোপাল সহী,
হম ফির হরিনাম সুনায়েংগে।
তটিনীকে তালমে দেখোগে,
হমে পবনকে চালমে দেখোগে,
ইস রীত নহী, উস রীত সহী,
হম নাচতে গাতে জায়েংগে।
কোয়েলকে গীতমে ছুপ ছুপ কর,
প্রেমীকী প্রীতমে ছুপ ছুপ কর,
ইস ঢঙ্গ নহী, উস ঢঙ্গ সহী,
হম ফিরভী প্রীত গায়েংগে।
কভি পথকে দীন ভিখারি বনে,
কভি মীরা রাজকুমারি বনে,
ইস ভেষ নহী, উস ভেষ সহী,
হরিপ্রেমকা রঙ্গ লুটায়েংগে।

আমি এ গানটি ইংরেজী তথা বাংলায় তর্জমা করেছিলাম দয়ালদার মহাপ্রয়াণের পরে। বাংলা অনুবাদটি এই:

এ-রূপে নয় গো, আর এক রূপে
আসিব আবার আমি ফিরে।
এ-রাগে নয় গো, আর এক রাগে
গাহিব আবার আমি ফিরে।
ভেসে যাব মেঘ বুকে কভু,
দুলিব শাখার মুখে কভু
কখনো গোপাল কখনো দয়াল
নামগানে উঠি' শিহরি'রে!
নাচিব তটিনীতলে আবার,
পবনে পরশ পাবি আমার,
এ ছন্দে নয়, আরেক ছন্দে
নাচিব গাহিব উচ্ছলি'রে!
কোকিলের গানে সংগোপনে
প্রেমিকের তানে প্রাণবনে
এ-ঢঙে নয়রে, আরেক ঢঙে
উঠিব প্রণয়ে ঝলকি'রে।
কভু হ'য়ে পথে ভিখারিনী,
কভু মীরা রাজনন্দিনী,
এ-বেশে নয়, আর কোনো বেশে
হরিপ্রেমের বর্ণে রাঙি'রে।

দয়ালদার মতন পরম ভাগবতের তর্পণ হতে পারে শোকের গানে নয়, এই আনন্দ-সুরে বাঁধা কীর্তনে—এমন জীবন্মুক্ত—যিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার আগে শুধু বলেছিলেন: "মেরী কিশতী কিনারে লগ গই—অব ক্যা জীনা?—আমার খেয়া তীরে পৌঁছেছে—আর কী চাই?"

সমাপ্ত

॥ ৮ ॥

গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে তাঁর দাবিটি পেশ করার সুরে, যেন অনেকটা কথার পৃষ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ভরে এবং অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে, য়েটস গার্ডনার সম্বন্ধেও সেই একই দাবি উপস্থিত করেছেন : 'William Rothenstein will tell you how much I did for Gitanjali and even his Ms. of The Gardener'. অর্থাৎ আবার সেই continued revision of vocabulary and even more of cadence'. এক কথায় 'পুনর্লিখন'। এক্ষেত্রেও আমাদের সেই একই প্রশ্ন : সত্যিই য়েট্স কতটুকু করেছিলেন বা কতটুকু করবার তাঁর সুযোগ ছিল এবং তার ফলটাই বা কী?

সমসাময়িক চিঠিপত্র থেকে কিছু তথ্য উদ্ধার করা যায়। আমেরিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে ফিরলেন ১৯১৩ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি। 'গার্ডনার'-এর টাইপ কপি পেয়ে য়েট্স প্রাপ্তি স্বীকার করছেন তাঁর লণ্ডনের ঠিকানা থেকে ২৫শে এপ্রিল। তিনি লিখছেন : 'The Poems (also 'Post Office') have reached me. I have only had time to read a few so far but in them find **some are of great beauty. I find some words to be changed**, it is again the old difficulty, "the words that have not got their souls yet and the words that have lost their souls".' অতঃপর ২০শে মে লিখিত একটি পত্রে য়েট্স জানাচ্ছেন যে পরদিন তিনি আয়র্লণ্ড রওনা হচ্ছেন, কবিতাগুলি সঙ্গে নিচ্ছেন এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানাতে পারবেন। পরের দিনই অর্থাৎ ২১শে মে তারিখে লেডী গ্রেগরীর বাসস্থান কল্‌পার্ক থেকে আবার লিখছেন : **'I shall return to London on Saturday of next week and then we will have gone through all the new poems. I read a number yesterday and thought them most beautiful. I am making a few suggestions in pencil on the margin'.** তারপর ২৫শে মে তারিখের এক পত্রে য়েট্স জানাচ্ছেন যে শনিবার হয়তো লণ্ডনে ফেরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। সেই সূত্রে কবিতাগুলি সম্বন্ধে আবার মন্তব্য করলেন : **'I am reading the new poems everyday with deep delight.** I feel that the love poems probably lose more as translations than the others and they seem to need rhyme and the lightness of some lyrical measure, **but great beauty remains'.**

দেখা যাচ্ছে কবিতাগুলি সম্বন্ধে য়েট্সের প্রশংসাবাদ অকুণ্ঠ : 'Of great beauty', 'most beautiful', 'reading with deep delight', 'great beauty remains' ইত্যাদি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দুটি উক্তি বিচার্য। প্রথম চিঠিতে বলছেন, '**I find some words to be changed**' দ্বিতীয় চিঠিতে বলছেন '**I am making a few suggestions in pencil on the margin**'. এই উক্তি দুটি যোগ করলে যা দাঁড়ায় বা দাঁড়াতে পারে এবং suggestion হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যদি একেবারে আক্ষরিকভাবে তার পুরোটাই গ্রহণ করে থাকেন তাহলেও তা কি **'continual revision of vocabulary and even more of cadence'** বলতে যা বোঝায় বা বোঝানো উচিত তার সীমানার কাছাকাছিও যেতে পারে? পেন্সিলে লিখিত য়েট্সের a few **suggestion**-এর কিছু কবি নিয়েছেন সেটা ধরে নিলেও সেই সংস্কারের পরিমাণটা কি এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেগুলি কি ধরনের সংস্কার এটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মেলাতে পারলেই এই প্রশ্নের সহজ উত্তর মিলে যেতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গীতাঞ্জলির যেমন পাণ্ডুলিপি বর্তমান, 'গার্ডেনার'-এর তেমন একটি বিশেষ আদিপাঠ সম্বলিত সম্পূর্ণ অথবা প্রায়-সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। কিন্তু 'গার্ডেনার'-এর অন্তর্গত কোনো কবিতারই যে আদিপাঠ পাওয়া যায়নি তা অবশ্যই নয়, প্রথমত, ১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসেই চিকাগোর শ্রীমতী হ্যারিয়েট্ মনরো সম্পাদিত **Poetry** পত্রিকার জন্য এজরা পাউণ্ডের হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নয়টি কবিতা পাঠান এবং ৬ই জানুয়ারী এবং ১৩ই জানুয়ারী এই দুই তারিখে রোটেনস্টাইনকে লিখিত তাঁর দুটি পত্রে এর স্পষ্ট এবং বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এই নয়টি কবিতা **Poetry** পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের জুন সংখ্যায়। উক্ত পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কবিতার এটা হল দ্বিতীয় কিস্তি, প্রথম কিস্তিতে গীতাঞ্জলির ছয়টি কবিতা যে তার পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, ইতিপূর্বে তার উল্লেখ করেছি। ১৯১৭ সালে হ্যারিয়েট্ মনরো এবং এলিস করবিন্ হেণ্ডারসনের যুগ্ম-সম্পাদনায় The new Poetry নামক যে কাব্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে From the Gardener এই শিরোনামে

পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ-সমেত নয়টি কবিতাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্পাদকদ্বয় প্রকাশিত 'গার্ডেনার'-এর সঙ্গে ভালো করে মিলিয়ে দেখেননি বলেই বুঝতে পারেননি যে নয়টি কবিতার মধ্যে দুটি (২য় এবং ৩য়) 'গার্ডেনার'-এর কবিতা নয়। যাই হোক, বাকি সাতটি কবিতা 'গার্ডেনার'-এর এবং সেগুলির পাঠ য়েট্‌সের হস্তক্ষেপের পূর্ববর্তী আদি পাঠ।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার আমেরিকায় যান (১৯১২ গাল) তখনই চিকাগোতে এবং আর্বানা-ইলিনয়ে কবির একটি ভক্তমণ্ডলী গড়ে ওঠে এবং চিকাগোতে শ্রীমতী হ্যারিয়েট্‌ ভন্‌ মুডির বাড়িতে এবং আর্বানায় অধ্যাপক আর্থার সেমুরের বাড়িতে প্রায়ই সেই ভক্তগোষ্ঠীর নিকট কবি তাঁর স্বরচিত কবিতাগুলি পাঠ ক'রে শোনাতেন। এ বিষয়ে শ্রীমতী অলিভিয়া হাওয়ার্ড্‌ ডান্‌বার রচিত **A House in Chicago** (১৯৪৭) নাম পুস্তকে এবং **Indian Literature, Vol. IV (Tagore Number, 1961)** সংখ্যায় প্রকাশিত হ্যারল্ড্‌ হারউইজ রচিত **'Tagore in Urbana, Illinois'**

নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। যাই হোক, সেই সদ্য রচিত কবিতাগুলি শ্রীমতী ডনমুড়ির সেক্রেটারি শ্রীমতী ইডিথ কেলগ সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করে একটি 'ফাইল' প্রস্তুত করেন এবং প্রথমে 'টেগোর ক্লাব' এবং পরে 'টেগোর সার্কল' এই নামে সংঘবদ্ধ কবির ভক্তমণ্ডলীর নিকট এটি রক্ষিত থাকে। কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক সেমুরের স্ত্রী শ্রীমতী মেস সেমুর নিজের attestationসহ এই ফাইলটি রবীন্দ্রসদনে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর এটিকে 'সেমুর ফাইল' নামে উল্লেখ করতে হবে। এটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় এর মধ্যে 'গার্ডনার', 'ক্রেসেণ্ট মুন', 'ফ্রুট গ্যাদারিং' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতার আদিপাঠ বর্তমান। এই সেমুর ফাইলে 'গার্ডনার'-এর চারটি কবিতা আছে যদিও তাদের মধ্যে ঈষৎ পাঠভেদসহ Poetry পত্রিকায় প্রকাশিত সাতটির অন্তর্গত। মিসেস সেমুর সমগ্র ফাইলটির attestation-এর সূত্রে যে ক্ষুদ্র ভূমিকাটি লিখেছেন তার মধ্যে তিনি স্পষ্টই বলছেন যে তাঁর এবং 'টেগোর সার্কলের' অন্যান্য সদস্যদের মতে ফাইলভুক্ত কবিতাগুলির আদিপাঠ গ্রন্থভুক্ত পাঠ অপেক্ষা কাব্যগুণে নিঃসন্দেহে অধিকতর সমৃদ্ধ। 'গার্ডনার' প্রকাশিত হবার চার বৎসর পরে হ্যারিয়েট মনরো এবং এলিস কর্বিন হেণ্ডারসন যে তাঁদের সম্পাদিত The New Poetry সংগ্রহগ্রন্থে 'গার্ডনার'-এর প্রকাশিত পাঠ মুদ্রিত না করে Poetry পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ-সম্বলিত কবিতাগুলি মুদ্রিত করেছেন, এবং ভূমিকায় যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁর 'mastery of English makes him a poet in two languages', সেটাকে মিসেস সেমুর ও তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর মতের প্রকাশ্য ঘোষণা বলা যায়। যাই হোক, আদিপাঠ সম্বলিত 'গার্ডনার'-এর পূর্বোক্ত এগারোটি কবিতা আমাদের হাতে আছে। পরবর্তী পাঠান্তরের বিশ্লেষণ বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং, বিশেষ করে, য়েটসের চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশ কটিতে তাঁর তৎকালীন বক্তব্যের আলোকে এই এগারোটি কবিতার পরীক্ষাই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

তুলনামূলক পরীক্ষার ফলে গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি 'গার্ডনার'-সম্বন্ধেও সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। পরিবর্তন সংখ্যায় নাই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাৎপর্যের দিক থেকে নগণ্য। ধরা যাক 'গার্ডনার'-এর ১০ নং কবিতার প্রথম লাইনটি: 'Let your work be, bride. Listen ইত্যাদি। Poetry পত্রিকার এবং সেমুর ফাইলের পাঠ: 'Leave off your works, bride. Listen ইত্যাদি। তেমনি Poetry-র পাঠ: 'Come as you are, tarry not over your toilet'. 'গার্ডনার'-এর ১১ নং কবিতায় তার ঈষৎ পরিবর্তিত পাঠ: 'Come as you are; do not loiter over your toilet'. অথবা 'গার্ডনার'-এর ৬০ নং ক্ষুদ্র কবিতাটির শেষাংশটি ধরা যেতে পারে। Poetry-র পাঠ ছিল:

Great time sits enamoured at
your feet and repeats to you;
"Speak, speak to me, my love;
speak, my mute bride."
But your speech is shut up in
stone, O you immovably fair!

পুস্তকে প্রকাশিত পাঠে দেখা যায় 'repeats'-এর বদলে 'murmurs' বসেছে, 'mute bride'-এর 'mute' বিশেষণটি পরিত্যক্ত হয়েছে এবং 'immovably fair'-এর জায়গায় 'Immovable Beauty' বসানো হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি কি কবিতাটির পক্ষে অপরিহার্য ছিল? এবং এগুলিকে কি improvement বলা যায়?

অপরপক্ষে, পরিবর্তন লাভজনক না হয়ে উলটে ক্ষতিকর হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও কিছু চোখে পড়ে এবং সেদিক থেকে মিসেস সেমুর এবং তাঁর বন্ধুদের অভিমত সমর্থনযোগ্য বলেই স্বীকার করতে হয়। 'গার্ডনার'-এর ৮৪নং কবিতাটি একটি দৃষ্টান্তস্থল। poetry পত্রিকায় এবং সেমুর-ফাইলে এই কবিতা দুটির আদিপাঠ বর্তমান এবং দুটি পাঠের মধ্যে সামান্য প্রভেদ থাকলেও দুটি পাঠ মূলত একই বলা যায়। প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ থেকে তাদের মূল পার্থক্যও এক। এজরা পাউণ্ড free women নামক পত্রিকায় ১৯১৩ সালের ১লা নভেম্বর "His Second Book in English." এই শিরোনামে 'গার্ডনার'-এর যে সমালোচনা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাতে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন এবং জোরের সঙ্গে মন্তব্য করেন: 'He gives us pure Imagisme'. ইমেজিস্ট আন্দোলনের তখন প্রথম অঙ্কুরোদ্গম সবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঐ মন্তব্যের চেয়েও বিশেষভাবে পাউণ্ডের উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয়: যে পাঠটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন সেটি হ'ল Poetry পত্রিকার পাঠ, যে-বইটির সমালোচনা করছেন তার অন্তর্গত পরিবর্তিত পাঠটি নয়। এ বিষয়ে তিনি সংক্ষেপে মন্তব্য করেন: 'I give the poem as it originally appeared in English, the later version is available in the Gardener". উদ্ধৃতি দেবার প্রচলিত এবং প্রত্যাশিত রীতি অবশ্যই এটা নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটাকে একেবারে দুর্বোধ্য বলা যায় না। কেননা পাউণ্ড এখানে স্পষ্টই ইঙ্গিত করেছেন যে Poetry-পত্রিকায় প্রকাশিত আদি পাঠটি গ্রন্থভুক্ত পাঠটির চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট এবং পাঠকদেরও দুটি পাঠ মিলিয়ে দেখতে বলছেন। পাউণ্ডের ইঙ্গিত অনুসরণ করে দুটি পাঠ মিলিয়ে দেখলে স্বীকার করতেই হয় যে, অন্তত এই ব্যাপারে তিনি ভুল করেন নি।

আলোচ্য কবিতাটি হ'ল 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই', এই বিখ্যাত গানটির ইংরেজি রূপান্তর। Poetry-পত্রিকার পাঠ এবং সেমুর-ফাইলের পাঠের সঙ্গে 'গার্ডনার'-এ প্রকাশিত পাঠান্তরের মধ্যে দুটি গৌণ পার্থক্য আছে, সে দুটি প্রথমে ধরা যেতে পারে। আদি পাঠ: 'drunken with the light they (the bees) foolishly hum and hover'. গ্রন্থভুক্ত পাঠ: 'drunken with light they foolishly hover and hum'। এই সামান্য পরিবর্তনে কবিতাটির বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে এমন বলা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা চলে না। আদি পাঠ: 'Laughters fly floating in the air like foams in the flood'. 'গার্ডনার'-এর পাঠ: Laughter floats in the air like foam in the flood'। পরিবর্তনের মধ্যে 'fly' কথাটি বর্জিত হয়েছে, মনে হয়, অনুপ্রাসের একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে এই ভয়ে। কিন্তু ভয়টাকে ঠিক সমর্থন করা যায় না, যেহেতু ইংরেজি কাব্যের ক্ষেত্রে অন্তত বছর চার-পাঁচ পর থেকে হপকিন্সের কবিতার প্রচারের ফলে এই রকম অনুপ্রাস নিয়ে

নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃষ্টান্তের সঙ্গে পাঠকসমাজ যথেষ্ট পরিচিত হয়েছে এবং এই জাতীয় অনুপ্রাসের মধ্যে কখনো কখনো প্রত্যাশিত রস খুঁজে পেয়েছে। যাই হোক, তার চেয়ে বড় কথা, 'fly' কথাটি থাকাতে মূল পাঠে যে গতিবেগের উদ্দামতার আভাস ছিল, সেটি বর্জনের পরে শুধুমাত্র 'float' কথাটি যেন কিছুটা নির্জীব হয়ে পড়েছে বলা যায়। তা ছাড়া laughters এবং 'foams'-এর বহুবচনসূচক রূপটিও বৈচিত্র্যব্যঞ্জক ছিল, গ্রন্থভুক্ত পাঠে কথাদুটিকে একবচনে রূপান্তর করার ফলে সমগ্র লাইনটিই যেন য়েট্‌স নিজেই যাকে 'flat' বলেছেন তাই হয়ে গেল। কিন্তু সমগ্র কবিতাটিতে যে পরিবর্তনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে সেটিকে আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর মনে হয় না বটে, কিন্তু তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে সেটি কবিতাটিকে যথেষ্ট দুর্বল করেছে। Poetry-পত্রিকার এবং সেমুর-ফাইজের পাঠ: "None shall go home, brothers . . . we shall take the blue sky by storm . . . Brothers, we shall squander our morning in futile songs". গার্ডেনার-এর পাঠান্তর: 'Let none go back home, brother . . Let us take the blue sky by storm . . . Brothers, let us squander our morning in futile songs." এ-ক্ষেত্রে 'we shall'-এর জায়গায় 'let us' বসানোর ফলে ব্যাকরণের দিক থেকে যতোটা না হোক, কবিতাটির ভাব এবং mood-এর দিক থেকে ক্ষতি হয়েছে। যে বোহিমেনী, বেপরোয়া আনন্দ বিশ্ব লুটে করতে বেরিয়েছে, 'we shall' এই কথা-দুটির পুনরুক্তির দ্বারা তার ব্যঞ্জনা ঠিকই ফুটেছিল। তার পরিবর্তে ব্যবহৃত 'let us' -এর মধ্যে সেই উদ্দাম ইচ্ছার সেই অদম্য উল্লাসের বিন্দুমাত্র আভাস নেই। আর তা নেই বলেই 'Let us take the blue sky by storm-এর মতো লাইন নিতান্তই যেন একটি মেকী অত্যুক্তির মতো শোনাচ্ছে। আর একটি দৃষ্টান্ত হ'ল 'গার্ডেনার'-এর ১১ সংখ্যক কবিতার একটি লাইন। Poetry-পত্রিকার আদি পাঠ: **'If your feet are pale with the tew, if your anklets slacken, if pearls drop out of your chain, do not mind"** 'গার্ডেনারের' পাঠান্তর:— **'If the raddle come from your feet because of the dew, if the rings of bells upon your feet slacken, if** pearls ইত্যাদি। 'anklets'-এর পরিবর্তে 'rings of bells', 'if your feet are Pale with dew' -এর মতো একটি চমৎকার বাক্যাংশের স্থলে "if the raddle come from your feet because of the dew" —এই জাতীয় পরিবর্তনকে কি improvement বলা যায়? শেষোক্ত পাঠান্তরের মধ্যে যে 'raddle' কথাটির আমদানী করে হয়েছে (অলক্তরাগের তর্জমা হিসেবে), অন্তত একজন ইংরেজ সমালোচকের কানে সেটি শ্রুতিকটু ঠেকেছে এবং তিনি মন্তব্য করেছেন **(Pall Mall Gazette, 14 Oct, 1913):**

'Raddle almost requires a foot-note, for though, like most provincialisms, it is sound English, few people in this part of the kingdom know that it means the red ochre that smartens a flagged cottage floor after cleaning'. । এই সমালোচক 'গার্ডেনার'-এর প্রশস্তিবাদই করেছেন কিন্তু তাঁর সমালোচনার অন্য এক জায়গায় ভাষাগত ত্রুটির প্রসঙ্গে তিনি সেই সব 'Crudity'-র একটু তির্যক উল্লেখ করেছেন যা কিনা **'a self-translator into English is bound to incur unless he submits to advice and correction'.** । মন্তব্যটির মধ্যে যে unconscious irony আছে সেটি উপভোগ্য বটে। কিন্তু কটাক্ষটি য়েট্‌সের নিজের দাবী অনুযায়ী তাঁরই প্রাপ্য, রবীন্দ্রনাথের নয়।

দৃষ্টান্ত আর বাড়িয়ে লাভ নেই। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গীতাঞ্জলির মতোই 'গার্ডেনার'-এর বেলাতেও য়েট্‌স যা করেছেন তা নগণ্য। অনেক ক্ষেত্রে যা করেছেন, না-করলেই ভালো ছিল। (ক্রমশ)

স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়
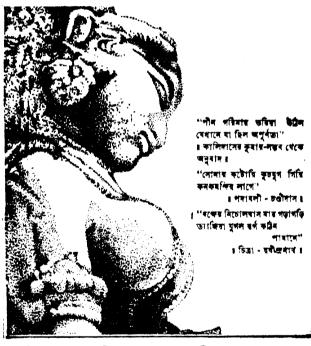
আমি এসেছি শুনেই তিনি বেরিয়ে এলেন। বললেন, আয় বোস। বিপরীত দিকের কাঠের চেয়ারটায় বসে তিনি তাকালেন আমার দিকে। তারপর তাগিদ দিলেন ঃ বল এবার, কি সংবাদ?

আমি ওঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম, মোটা কাপড়ের সাদা পাঞ্জাবি, ঢোলা পাজামার ওপরে কালো জহরকোট পরে তিনি বসে আছেন। ওটাই তাঁর প্রিয় পোশাক। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমার ওধারে দুটি দীপ্ত চোখের অস্তিত্ব; নাকের নীচে চওড়া গোঁফ।

আমার ইতস্তত ভাবে তিনি বিস্মিত হলেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে তাই আবার জানতে চাইলেন ঃ কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোর? কি বলতে এসেছিস?

আমি কিন্তু বলতেই গিয়েছিলাম যে, আমাদের বাড়িঘর তো সবই দাঙ্গাতে বিধ্বস্ত। তার ওপর বাবা-মাও পশ্চিম বাংলায় এই সেদিন চলে গেছেন। আমি এখন আত্মীয়স্বজনবিহীন, নিঃসঙ্গ, একক। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের শহরের আই-বি ইন্সপেক্টর আজহারউদ্দিন খান মার্শাল ল' আইনের ২৪/ক ধারায় এক মামলা ঠুকে আমায় গ্রেফতার করিয়েছিলেন। অনেক দিন সে মামলা চলার পরও সরকার পক্ষ আমার বিরুদ্ধে কোন চার্জশীট দিতে পারেন নি। ফলে মামলা ডিসমিস হয়ে যায়।

এতে ক্ষিপ্ত হয় সামরিক কর্তৃপক্ষ ও আয়ুবী-স্থানীয় পাণ্ডারা। ফলে গুণ্ডা নিয়োজিত হলো আমার পেছনে। তখন দাঙ্গা উপদ্রুত পরিবেশ ও কিছুটা উত্তপ্ত আবহাওয়া। কাজেই আমার পরিণতি রাজনৈতিক হবার চেয়ে সাম্প্রদায়িক হবার সম্ভাবনাই বেশী। এতে করে খুব সোরগোলও হবে না। এ খবরটা স্থানীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি সামসুজ্জোহা জানতে পারেন। এবং আমাকে ডেকে সাবধান হতে বলেন।

আমি তাই অনেক চিন্তার পরেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ওই পরিবেশে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁকে জানাতে গেলাম ঃ

শেখ মুজিবর রহমান

আমি চলে যাচ্ছি পশ্চিম বাংলায়।...অনেক দিন সভাতে আমরা একসঙ্গে বক্তৃতা দিয়েছি। উনি আমার বক্তব্যকে পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। কিভাবে বক্তব্যকে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতে হয়, কিভাবে যুক্তিজাল বিস্তার করতে হয়, তা ধরে ধরে শিখিয়েছেন। তাঁর মনের মতো বলতে পারলে বলতেন ঃ সাব্বাস। আবার বিপরীত মুহূর্তে মুখ খিঁচিয়ে বলতেন ঃ ছাওয়াল, তুমি একটা গাড্ডল। এমনি কতদিন কত ঘরোয়া মুহূর্তেও মনের কথা প্রকাশ করেছি। অথচ সেদিন প্রকাশ করতে পারলাম না মনের সব কথা। নেহাতই অস্পষ্ট কিছু কথা আউড়েই কেন জানি চুপ করে গেলাম।

তিনি আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর খানিকটা পায়চারী করে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। একেবারে মুখোমুখি। পূব বাংলার একচ্ছত্র নেতা 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমানের মুখোমুখি। '৬৪ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের এক ম্লান সন্ধ্যায় আমি তাঁর ঢাকার বাসভবনে মুজিব-ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে।

তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন। আমার মনে হলো, ভীষণ শীতল আর অসাড় সে হাত। তারপর ধরা গলায় বললেন ঃ যেতে চাইছিস যা। আমরা এখনও যোগ্য হইনি তোদের নিরাপত্তার জন্যে। এটা আমাদের সব চাইতে বড় লজ্জা, বড় পরাজয়।

তবে কি জানিস, যে বিষের জ্বালায় চলে যাচ্ছিস, ওখানেও তা আছে। যদি পারিস, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করিস! আর ওদের বলবি, ওদের আমরা ভুলিনি। ভূগোল যতই চড়া রঙ চড়িয়ে থাকুক না কেন, আমাদের পরিচয় ইতিহাসের। এ ছিন্ন হবার নয়।

আমি প্রণাম করলাম। মুজিব-ভাই বাধা দিলেন না। এগিয়ে দিতে দিতে আর একটা কথাই বললেন। বললেন ঃ আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি, ইস্পাতের ধারায় আমরা কণ্টকিত ঠিকই, তবু আমাদেরই ছেলে সালাম-বরকত-জব্বার বাংলা ভাষার জন্যে প্রাণ দিয়েছে। ধর্মান্ধতার জন্যে আমীর হোসেন চৌধুরী জান কোরবান করেছে। এটা কথনও ভুলিস না ভাই।

*

গঙ্গাপারের বাংলা 'বন্ধ' পালন করেছে সেদিন। বাজার-দোকান-অফিস—সব বন্ধ। অথচ আমি, আমার চোখ-কান আর হৃদয়ের গবাক্ষ উন্মুক্ত রেখে ট্রানজিস্টরটাকে খুলে রেখেছিলাম। ঢাকা বেতার একটু পরে-পরেই এক-একটা কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করেছে। একটা বিজয়ীর জয়টীকা শেখ মুজিব,

আওয়ামী লীগ ও 'জয় বাংলা' স্লোগানকে দিয়ে যেতে লাগল। পৃথিবীর সংসদীয় গণতন্ত্র অথবা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কোন নির্বাচনে কি এমন দৃষ্টান্ত আছে যে, ১৫৩টি আসনের মধ্যে ১৫১টাই একটি দলের। এই ঐতিহাসিক সমর্থন পেতে বুলেট-বেয়নেট চালাতে হয়নি, বোমা-পেট্রোল-আগুন জ্বালাতে হয়নি, মায়ের চোখের সামনে সন্তানকে খুন করতে হয়নি। স্রেফ জনতা যা চায়, তারই ভিত্তিতে, প্রকৃত মানুষ হিসেবে বাঁচবার স্বাধিকার লাভের ছয় দফাতেই এই আশ্চর্য গরিষ্ঠতা এসেছে।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী সমগ্র জনতা আজ শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়। আর এই জনতার মাঝে দীর্ঘ ছায়া নিয়ে আছেন শেখ মুজিবর রহমান। শেখ মুজিব দেবতা নন, ডিক্টেটর নন, ধর্মান্ধ নন। নিন্দুকেরা গোপন প্রকোষ্ঠে বলেছে, মুজিবর হলো মীরজাফর—কুইসলিং। রাজনৈতিক অনুসারীরা বলছেন, তিনি কামাল আতাতুর্ক বা নাসেরের মতো নেতা। অথচ পদ্মাপারের তরুণ যুবারা জানে শেখ মুজিব হলো তিতুমীর, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরী। এটা তাঁর নিজের কথাও। প্রকাশ্য জনসভা না জানলেও তাঁর কাছের কর্মীরা বলেন, মুজিবরের কাছে সুভাষচন্দ্রের স্থান কত উঁচু, কতখানি নিষ্ঠা দিয়ে অনুসরণের।

'৪৮ সালে পাকিস্তানের সর্বময় কর্তা জিন্নাহ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় বলছিলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখনই কয়েকটি যৌবন-দীপ্ত কণ্ঠ প্রতিবাদ করে উঠেছিল। শেখ মুজিব তাদের সংগে মিলিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে তাদের বা প্রেসিডেন্সি কলেজে অনেক বছর আগে উদ্ধত ওটেনকে মেরে যে বীর দুরন্ত সাহস দেখিয়েছিলেন, ঢাকার ছেলেরা তারই ঝণ্ডা উঁচু করল আরও। যাকে ভালোবাসার উদাহরণকে আরও উজ্জ্বল করল।

*

'৪৮ থেকে '৫২। পদ্মা-মেঘনায় তখন প্লাবন এসেছে। পূর্ব বাংলার বাঙালীরা তখন ক্ষিপ্ত-রুষ্ট। প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। এক দিকে করাচীওয়ালার প্রতিভূ নাজিমুদ্দিন, অন্যদিকে তাঁরই তাঁবেদার পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন। একদিকে রাইফেল কাঁদানে গ্যাস অকথ্য অত্যাচার, অন্যদিকে চূড়ান্ত ত্যাগ, সংগ্রামী একতা ও উৎসর্গীকৃত বুকের তাজা রক্ত। এই আশ্চর্য সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুসলিম লীগ ও উর্দু ভাষার উন্মাদ ক্ষমতাসীন সরকারের পুলিস গুলি চালালো ২১শে ফেব্রুয়ারী। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে এম-এ ক্লাসের ছাত্র আবুল বরকত রফিক, জব্বার, সফিউদ্দিনেরা বুকের রক্তে সংগ্রামের পথকে রক্তাক্ত করে গেল।

ওই অগ্নিগর্ভ পরিবেশে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছে। মুসলিম লীগের সদস্য আবদুর রসিদ তর্কবাগীশ সরকারের অপদার্থতায় পদত্যাগ করলেন দল থেকে। 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম সামসুদ্দিন পরিষদের সদস্যপদই ত্যাগ করলেন। বিরোধী দলনেতা বসন্তকুমার দাস জোর দাবি জানালেন যে, এই অবস্থায় পরিষদের কাজ চলতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রীকে সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করতে হবে।

অথচ সমস্ত বিক্ষোভ ও দাবী-দাওয়ার প্রত্যুত্তরে ক্রুরবুদ্ধি নুরুল আমিন তার পরের দিন ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এক বেতার-বক্তৃতায় বলেন : '...সরকারের নিকট যে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, এই জঘন্য পরিকল্পনার গভীরতম তাৎপর্য বর্তমান; আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। এই ষড়যন্ত্রের নায়কদের মধ্যে কয়েকজন পাকিস্তানের বাইরে থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন। সুতরাং এই হীন প্রয়াস ও ষড়যন্ত্রের চেষ্টাকে খতম করার জন্যে দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।'

শুধু তাই নয়, বড় বড় সব নেতাকে জেলে পোরা হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক মৈত্রী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, মোজফফর আহম্মদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ অজিতকুমার গুহকে গ্রেপ্তার করা হলো। এক ক[illegible] পূর্ব বাংলা কারাগারে পরিণত হলো।

তখন মুজিব-ভাইয়ের বয়স কত [illegible] জোর তিরিশ। অথচ ওই বয়সেই তিনি ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায়, চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দানে, বরিশালের অশ্বিনী দত্ত হলে, ময়মনসিংহের স্বদেশী বাজারের কর্মীসভায়, বগুড়ার এডোয়ার্ড হলে, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়ার মাঠে আগুন জ্বালালেন। সব প্রবীণ আর প্রতিষ্ঠিত নেতাদের পেছনে ফেলে তিনি আহ্বান জানালেন জনতাকে অনলবর্ষী ভাষায়। প্রকাশ্য সভায় তিনি বললেন : রোম যখন পুড়ছে তখন নিরোর মতো বাঁশীর বাজনা নয়, আজ আমাদের বাঁশী ছেড়ে অসি ধরতে হবে। সমগ্র অস্তিত্ব আজ বিপন্ন; এ লড়াইয়ে আমরা যদি হারি, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য; আর যদি জিতি তবে তা হবে আগামী দিনের সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপিত। কাজেই এ লড়াই শুধু আজকের নয়, আগামী দিনের। বাংলা ভাষা, বাঙালী জাতি ও বাংলা দেশের। তিরিশ বছরের যুবাপুরুষ শেখ মুজিব সেদিন তাঁর ডাকে তিরিশ লক্ষ ছাত্র-যুবককে মাঠে নামালেন। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির ব্যানারে আতাউর রহমান থাকলেও তিনি ছিলেন 'শো-ম্যান', আসল ম্যাগনেট ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি নিজে ধারালো ছিলেন বলেই রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে অত ধার দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! আন্দোলনের শেষার্ধে যখন উর্দু ভাষার উমেদাররা ল্যাজ-গোটানো জীবের মতো পশ্চাদপসরণ করলো তখন 'ইত্তেফাকে'র সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনের ঢাকার বাসায় ছাত্র-কর্মীদের এক সভায় তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। সেখানে তিনি ধরা গলায় থেমে থেমে বললেন :

'ভাইয়েরা আমার। তোমরা আমার নেতা। তোমাদের পতাকাতলে যে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, এতেই আমি ধন্য। আমাকে তোমরা পথ দেখাও, আমি শহীদ হয়েও বেঁচে রাজী।' ছাত্র আর তরুণদের এমনি করে ভালোবেসে আর শ্রদ্ধা করেছেন বলেই আজ তিনি তরুণ রক্তের কাছে এত প্রিয়, এত প্রাণের কাছাকাছি।

*

'৫২ সালের পরাজয়ের পর মুসলিম লীগ সর্বশক্তি নিয়ে '৫৪ সালের নির্বাচনে অবতীর্ণ হলো। জেল-জুলুম, টাকা বিলিয়েও তারা হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্টের কাছে গো-হারা হেরে গেল! নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল মোট ২৯৩টা আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট—২১৬, মুসলিম লীগ—৮, স্বতন্ত্র—১১, রব্বানি দল—১, জাতীয় কংগ্রেস—২২, সংখ্যালঘু যুক্তদল—৯, গণতান্ত্রিক দল—২, কমিউনিস্ট সমর্থিত নির্দল—৫, তফসিলী—১৭, খৃস্টান—১ ও বৌদ্ধ—১। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শেরে বাংলা সরকার গঠন করলেও করাচীর চক্রান্তে সে মন্ত্রিসভা সামান্য কদিন বাঁচলো। করাচীর অভিযোগ শেরে বাংলা অযোগ্য, অপদার্থ, ভারতের দালাল, আরও অনেক কিছু।

করাচীর ওই হীন চক্রান্তে অনেক নেতাই মুষড়ে পড়লেন। আওয়ামী লীগের এক ঘরোয়া কর্মী-সম্মেলন ডাকা হলো। তখন আওয়ামী লীগ এক। মওলানা ভাসানী তখনও সস্তা শ্লোগানে দল দু' টুকরো করতে পারেন নি। সে সভায় আতাউর রহমানরা যখন বুঝে চলার পক্ষে মতামত প্রকাশ করলেন, শেখ মুজিব তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নেওয়াকে যদি আমরা সহনশীলতার মাধ্যমে গ্রহণ করি, তবে আগামী দিনে আরও দুর্দিন আসবে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সফল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের আপোসহীনভাবে এগুতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনকে ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে শুরু করতে হবে। কারণ, ওই আন্দোলনের পশ্চাতে যে মানসিকতা, তা-ই আমাদের অনুপ্রেরণা, আমাদের রক্ষাকবচ।

সেদিন আতাউর রহমান খানেরা মুজিবভাইয়ের প্রস্তাব মেনে নেন নি। তার পরিণতিও সুস্পষ্ট। একের পর এক মন্ত্রিসভা বাতিল হলো। খেয়োখেয়ির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের মধ্যে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটলো। সব শেষে '৫৮ সালের অক্টোবরের ৭ ও ২৭ তারিখে কুখ্যাত আইউব খানের আবির্ভাব। অথচ সে সময়ে মুজিব-ভাইয়ের সাজেশ্যান মতো যদি আন্দোলনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত, তবে একটা তীব্র গণ-আন্দোলনের ফলেই '৫৮ সালেই '৭০ সালের পূর্ব বাংলা বেরিয়ে আসত।

*

ডিক্টেটর আইউব ফৌজি ক্ষমতার মালিক হলেও মুজিবকে ভয় পেতেন। তাই '৫৮ সালেই মুজিব-ভাইকে জেলে পাঠানো হলো। '৫৯ সালের মাঝামাঝি কয়েকজন নেতা ও কর্মী সাক্ষাৎ করতে গেলেন জেলে। চাঁদপুরের মিজানুর রহমান চৌধুরী, আনোয়ারা খাতুন, ছাত্র-নেতা শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোঃ সোলায়মান, আরও কয়েকজন সে দলে ছিলেন।

ঠিক সময়ে মুজিব-ভাই বেরিয়ে এলেন। অত্যাচারে-অনিদ্রায় তিনি ক্লান্ত, কিন্তু তবু তাঁর শির উন্নত। দৃপ্ত। এগিয়ে আসতেই কর্মীদের একজন উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো : একি মুজিব-ভাই, একি স্বাস্থ্য হয়েছে আপনার?

ভ্রূ-কুঞ্চিত মুজিব-ভাই তার দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমরা কি আমার স্বাস্থ্যের খবর নিতে এসেছ? তা হলে জেনে যাও, আমি ভালো আছি, এবং জেনে বাড়ি চলে যাও।

কর্মীরা বুঝলেন মুজিব-ভাই ক্ষুব্ধ। তাই তারা দলের কিছু কথা, দেশের পরিস্থিতির উল্লেখ করে পথনির্দেশ চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজিব-ভাই মুড ফিরে পেলেন। আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে বললেন তাদের। বললেন, আমি কারাগারে থাকি, বাঁচি কিংবা মরি তাতে কি যায়-আসে। তোমরা এগিয়ে যাও। আইউব প্রকাশ্য সভা নিষিদ্ধ করেছে তো তোমরা ঘরোয়া কর্মী-সভা চালিয়ে যাও। কাডার তৈরি কর। কর্মীদের বোঝাও এই অবস্থায় কর্তব্য কি! এরপর কর্মীদল ফিরে এসে কাজে লেগেছিল। সংগঠিত হয়েছিল।

*

শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইউব খানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন ঢাকাতে এসে পল্টনে সভা করলেন, তাতে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দলের নজন নেতাকে এক প্ল্যাটফর্মে এনে ঘোষণা করলেন, এঁরা সব মিলিয়ে 'নবরত্ন'। ভবিষ্যৎ আন্দোলন এঁরাই সমবেতভাবে পরিচালনা করবেন।

সেই বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে জানালেন তাঁর মনের কথা। তিনি স্পষ্ট বললেন, জনসাধারণের ইচ্ছার জোয়ারে বিভিন্ন দলের নেতারা আজ দলীয় বিভেদ ও কোন্দল ভুলে এক হয়ে গেছেন, যদি কোন কারণে এঁরা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেন তা হলে তার যোগ্য জবাব যেন জাগ্রত দেশবাসীই দেন।

সে সভায় নুরুল আমিন, আতাউর রহমান প্রভৃতিরা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে দায়সারা ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁরা শেখ মুজিবের ভাষণের গূঢ়ার্থ না বুঝেই মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, ওঁরা যখন নেতা, তখন জাতিকে পরিচালনার দায়িত্ব ওদেরই। শেখ মুজিবের মতো জনতাকে অতিরিক্ত ইম্পর্টেন্স দেওয়া উচিত নয়। এর ফল নাকি ভালো হয় না।

অথচ '৭০ সালের পূর্ব বাংলা দেখিয়ে

মিল জনতার ওপরে বিশ্বাসস্থাপনকারী শেখ মুজিবই জনতার একচ্ছত্র নেতা, আর যাঁরা সেদিন বাঁকা হাসি হেসেছিলেন, তাঁরা বন্যার তোড়ে কোথায় ভেসে গেছেন। শুধু দুজন বিরাট সেনাপতি সব হারিয়ে ভাঙা গাছের মরা ডাল ধরে কোনক্রমে বেঁচে আছেন। নিয়তি আর কাকে বলে।

✻

এই সেদিন পূর্ব বাংলার নির্বাচনের ফলাফল দেখে পদ্মাপারের আমার সহপাঠী মাহবুব তালুকদার, খান জয়নুল সৈয়দ সওগাত আলী হেদায়েত মোরশেদ মনিরুজ্জামান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বকর আহ্‌মদ, আলতাফ বা আল-ইমামকে ইচ্ছে করছিল এক দীর্ঘ অভিনন্দনপত্র লিখি। লিখতে চাইছিলাম : দোস্ত্, এবার তোরা বড় জেতা জিতেছিস। সাবাস ভাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, না, এমনি লেখার চাইতেও বেশী প্রয়োজন অন্য কথার। সে কথা হলো : ভাইয়েরা; তোরা জানিস না, এটা তোদের বিজয় বটে, তবে তার চাইতেও গুরুতর হলো, তোরা আজ ঝড়ের সংকেত পেয়েছিস। পিনাকপানির ডমরু ত্রিশূলে আজ সবে গর্জে উঠলো। হুঁশিয়ার ভাই। তোরা আজ এই নির্বাচনের পথ দিয়ে চক্রব্যূহতে প্রবেশ করলি। চারপাশে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কৃপাচার্য, শকুনীরা সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান। সবচেয়ে আসল আঘাত হানতে জয়দ্রথেরা ছুটে আসবে পশ্চিম থেকে আকাশপথে, জলপথে। তোদের পূর্ব বাংলায় ঢাকার কুর্মিটোলায়, চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে, কুমিল্লার ময়নামতিতে ও যশোহরের মনোহরপুর সামরিক ঘাঁটিতে অক্ষৌহিনীরা প্রস্তুত হয়ে আছে। তাই শেষের সে দিন ভয়ংকর হয়েই দেখা দেবে। কাজেই এ জয়ের ফলাফল শুধু তোদের মনোবল বাড়িয়েছে। সংগ্রামের ময়দানে ঠেলে দিয়েছে। আসল লড়াই সামনে। পশ্চিমের ক্রূরতা তোদের এই একতার ওপরে খড়্গহস্ত হবেই। সে দিন সামনে। '৭১ সালের মাঝামাঝিতেই।

✻

খড়্গহস্ত হয়েছিল ওরা '৬৪ সালেও। খুলনার সবুর খান, চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী তখন আইউবি পুতুল মন্ত্রিসভার মাতব্বর। সঙ্গে দোসর গবর্নর মোনেম খান। সবশেষে মদত দিল আদমজী-ইস্পাহানি-কাওয়াসী গোষ্ঠীর দেদার টাকা। ফলে প্রথমে খুলনা তার পরে ঢাকাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলো। কারফিউ জারী, মিলিটারি ঘুরছে সঙ্গীন নিয়ে, তারই মাঝে হিন্দুদের নিধন চলতে লাগলো। ১৬ই জানুয়ারি ঢাকা শহরের নবাবপুর রোডের এক বাড়ির তিনতলায় আমি তখন। নীচে প্রহরারত এক পাঠান সৈনিককে জিজ্ঞেস করলাম যে, চার দিকে আগুন জ্বলছে, লুঠ হচ্ছে, মানুষ খুন চলছে যখন, তখন তারা কিছু করছে না কেন?

তার পরিষ্কার জবাব, কর্তৃপক্ষ আদেশ দিয়েছে শুধু রাস্তায় পেট্রোল দিতে, কাউকে গ্রেপ্তার করতে না, গুলী চালাতে না। এমনি ষড়যন্ত্রের পরিবেশে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হলো। দাঙ্গার খবর প্রকাশিত হতে দেওয়া হবে না। প্রতিটি সংবাদপত্রে সামরিক বাহিনীর লোক বসে গেল।

এরই মাঝে 'ইত্তেফাক'-সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, 'পাকিস্তান অবজারভার'-সম্পাদক আবদুস সালাম খান, 'সংবাদ'এর রণেশ দাশগুপ্ত ও মুজিব ভাইয়েরা এক হ্যান্ডবিল প্রকাশ করলেন : দুর্গত মানবতার স্বপক্ষে রুখে দাঁড়াও। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়া হলো। সেই অবস্থায়ও চেষ্টা চললো ঢাকা শহরের টিকাটুলি, কমলাপুর, শাঁখারী বাজার, নারিন্দা, গেণ্ডারিয়াতে শান্তি কমিটি গঠন করার। প্রবীণরা ইতস্তত করলেন। বললেন : এ অবস্থায় কিছু করা স্পট গিয়ে খুব রিস্ক।

গর্জে উঠলেন মুজিব ভাই। বললেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে যে, ভাইয়ের রক্তে ভাই হাত রাঙাবে প্ররোচিত হয়ে, বিভ্রান্ত হয়ে—তা চুপ করে বসে দেখতে হবে! না, জীবন গেলেও তা রুখতে হবে এবং তা এক্ষুনি। '৪৬ সালে একটা মানুষ শান্তির জন্য কলকাতার সবচাইতে উপদ্রুত অঞ্চলে বসবাস করে যেতে যখন পেরেছেন তখন '৬৪ সালের বাঙলা তার থেকে পিছিয়ে যাবে? অসম্ভব!

ফলে গঠিত হলো শান্তি কমিটি। ষড়যন্ত্রকারীদের কালো হাত পিছিয়ে গেল। অসাম্প্রদায়িক শেখ মুজিব কোরাণ পুরাণের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে 'জয় বাঙলার' দিকে এগুতে পারলেন।

✻

'৬৫ সালে কাশ্মীর আক্রমণ করে যখন পূর্ব বাংলার জাগ্রত জনতাকে বিভ্রান্ত করা গেল না, তখনই আইউব মরিয়া হয়ে '৬৬ সালের ৮ই জুন গ্রেপ্তার করলেন শেখ মুজিবকে। অভিযোগ : স্বাধীন পূর্ব বাঙলা গড়তে শেখ মুজিব ষড়যন্ত্র করেছেন। ঢাকার সিগন্যাল মেসের বিশেষ আদালতে দাঁড়িয়ে মুখ্য আসামী শেখ মুজিব বললেন : 'আগেও বলেছি, এখনো বলছি, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আমি চাই। পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার বিরুদ্ধে আমৃত্যু আমার আন্দোলন চলবে। কোনো বুলেট বেঅনেটের সাধ্য নেই সেই আন্দোলন রোখে।'

সত্যিই তাঁকে কেউ, রুখতে পারেনি। এবং পারেনি বলেই সেই স্লোগানের উপর রচিত ৬ দফা দাবীতে অন্যান্য সুযোগ-সন্ধানী দলের দফা রফা করে দিয়ে তিনি আজ সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

✻

শেখ মুজিব জাতীয়তাবাদী। দেশপ্রেমিক। আন্তর্জাতিক মতবাদের কচকচিতে হয়তো তিনি তাঁরই ভাষায় 'গাড়ল' কিন্তু জাতীয় স্তরে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আশ্চর্য জনপ্রিয়। তাই আজকে তাঁর জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগের ও 'জয় বাঙলা' ধ্বনির ঐতিহাসিক সাফল্যে গঙ্গাপারের বাঙলায় বসে মনে পড়ছে মুজিব ভাইয়ের সেই কথাগুলি, যা আমি বিদায়ের আগে তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন এ রাজ্যের মানুষদের উদ্দেশে : 'ওদের বালিস, ওদের আমরা ভুলিনি। ভূগোল যতো চড়া রঙ চড়িয়ে থাকুক না কেন, আমাদের পরিচয় ইতিহাসের। এ ছিন্ন হবার নয়।'

মুজিব ভাই সেদিন ছিলেন সংগ্রামে লিপ্ত এক সাহসী সৈনিক। আজ তিনি সাফল্যে দীপ্ত এক নেতা। তিনি তো আজ জানেন না পুরোপুরি যে, গঙ্গাপারের এরাও পদ্মাপারের ওদের ভোলেনি। ভুলতে পারবে না। মানচিত্রের কাটাকুটিতে যে রক্তস্রোত সীমান্ত পেরিয়ে '৪৭ সাল থেকে আসছে যতদিন: যতদিন আমরা ইতিহাসের পটভূমিতে দাঁড়াতে না পারবো, ততদিন আমাদের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার পথে নিয়ে যেতে হবে। এবং এ মুহূর্তেও ইতিহাসের অনিবার্য, নিরবচ্ছিন্ন ও অবধারিত, গতিধারার কাছে শান্তিকামীরা ঐক্যবদ্ধ, জোটবদ্ধ ও একশ একাত্ম আসনের মতো আশ্চর্য সংখ্যাগরিষ্ঠ, নয় কি?

সয়াবীন থেকে ছানা তোলা

সেদিন শুনে একটু অবাকই হলাম। আসাম অঞ্চলে নাকি চমৎকার সয়াবীন জন্মায় এবং পাহাড়ী এলাকায় তার প্রচুর ব্যবহার হয়। সয়াবীন-এর চাটনি সেখানে পরম প্রিয় পরিবেশন। সয়া সিদ্ধ করে দিন কতক রেখে তাই দিয়ে সে চাটনি প্রস্তুত হয়। যদি প্রণালীটি সংগ্রহ করতে পারি, পেশ করার ইচ্ছা রইল।

সয়া এখন অল্পবিস্তর আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হচ্ছে। বাজারেও কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। ঘরণীদের হাতে আছে পরিবেশনের ভার। তাঁরা নানাভাবে সয়াকে নিত্য ব্যবহারে নূতন রূপ দিয়ে এই দারুণ খাদ্যাভাবের দিনে পুষ্টির পথ প্রশস্ত করতে পারেন। মূল্যো-মান বৃদ্ধির সংকটে সয়া পরম সহায় হিসাবে ঘরে ঘরে প্রচলিত হোক। এককালে টোম্যাটো, এমনকি আলু পর্যন্ত আমরা জানতাম না। ঋগ্বেদে লবণ বা Sodium Chloride-এর উল্লেখ নেই। সয়া তো বরং পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের আট-পৌরে ব্যাপার।

হংকং থেকে হনলুলু পর্যন্ত সয়া-বীনের সরবৎ খুব চলছে। মার্কিন দেশের মানুষ তো আর খাদ্যাভাবে সয়া শুরু করেনি। করেছে সয়ার খাদ্যগুণে। কেকের ময়দা থেকে নিয়ে নানা জিনিসে সয়া সংযোগ করে প্রোটিন বাড়ানো হয়। বর্তমান স্বাস্থ্য সচেতনতায় স্টার্চ বা শর্করা কম খেয়ে আমিষ বা প্রোটিন খাদ্য অধিক খাওয়ার বিধি বিশেষ করে বিত্তবান সমাজে চলছে। সেখানে সয়া সংযোগ সখের। কিন্তু সাধারণ সংসারে মাছ মাংস বা দুধের বিকল্প হিসাবেই হোক বা গ্রীষ্মের পানীয় হিসাবে হোক পরিবেশন করলে খাদ্যমান-এর উন্নতি হবে, পুষ্টির সমস্যা কমবে।

সরবৎ যদি বানাতে চান তবে রাত্রে সয়াবীন গরম জলে ভিজিয়ে দেবেন। সকালে মিহি করে পিষে আবার জল মিশিয়ে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নেবেন। নারকেলের দুধ যেমন একাধিকবার চিপে নেওয়া চলে সয়ার বেলায়ও ঐ কাপড়ের ছাঁকায় গরম জল মিশিয়ে একাধিক বার ছেঁকে নেওয়া যায়। এবার ইচ্ছামত ঐ দুধকে সরবৎ করে পরিবেশন করতে পারেন। অনেকে দু-চারটে এলাচ ও চিনি বা মিছরি সহযোগে ফুটিয়ে বেশ ঠান্ডা করে বরফ সহযোগে পানীয় প্রস্তুত করেন। দু'চার ফোঁটা গোলাপজল, ভ্যানিলা বা অন্য সুগন্ধ সংযোগ করাও চলে। খরচাও বাজারে কেনা পানীয়ের চেয়ে কম হবে।

সয়ার দুধ সাধারণ গরুর দুধের মত করে ফুটিয়ে নেওয়া যায়। পাত্র যেন

খুব পরিষ্কার থাকে। ঠিক যেমন করে আমরা দুধের ছানা কাটি, তেমন করেই সয়া দুধের ছানা কাটবেন। লেবুর রস আন্দাজ করে ব্যবহার করবেন। ছানা কাটাবার পরে বাড়তি জল ফেলে বাকীটুকু কাপড়ে বেঁধে টাঙিয়ে দেবেন। যদি ডালনা ইত্যাদির জন্য শক্ত ছানা চান তবে নোড়া চাপা দিয়ে কিছু সময় রাখলেই চাপে যেমন দুধের ছানা হয় ঠিক তাই হবে। তখন যেভাবে ইচ্ছা রান্না করুন অতি মুখরোচক হবে। সয়ার ছানা রান্নায় যদি প্রথম আপনার কোনও খটকা থাকে, তবে আস্তে আস্তে অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না আরম্ভ করুন। মাছ বা মাংসের পুরে যেখানেই দেবেন সয়া মিলিয়ে দেখুন কেউ টেরও পাবে না। সয়ার নিজস্ব স্বাদ বা গন্ধ বিশেষ নেই বলে এই ছলনাটুকু অনায়াসে করতে পারবেন। আদা, পেঁয়াজ, ধনেপাতা, হিং, গরমমশলা সবই সয়া সুন্দরভাবে টেনে নেবে। কোথাও ছন্দ পতন বা বেমানান হবে না। পরে তো পরীক্ষা করে দেখবেনই তা ভিন্ন কাটলেট, কোফতা বা কাবাবে চালান, চমৎকার হবে। সয়ার চাপা ছানা টুকরো করে কেটে নিরামিষ পোলাও করে দেখুন কি দারুণ স্বাদ হয়। সাজাতেও এই সয়ার টুকরো পোলাও-এর উপর ব্যবহার করতে পারেন।

সয়াবীন সিদ্ধ করে বেটে আলুভাতের সঙ্গে মেখে কাঁচালঙ্কা তেল নুন-সহযোগে দিতে পারেন। শর্করাপ্রধান আলু তাতে আমিষ সহযোগে অধিক পুষ্টি দেবে।

সয়ার আরও একটি সুবিধা যে আমিষ যেমনই বেশী স্নেহপদার্থ তেমনই নয়। জান্তব আমিষ যাঁরা খান না অর্থাৎ তথাকথিত নিরামিষাশী, তাঁরাও খুব উঁচু-দরের প্রোটিন সয়া থেকে পাবেন। স্নেহ-পদার্থ কম বলে যাঁরা তৈলাক্ত খাদ্য খেতে চান না, তাঁদেরও উপযুক্ত খাদ্য সয়া। সিদ্ধ মটর ইত্যাদি দিয়ে যে ঘুগনি রান্না হয়, ঠিক ঐরকম করে সয়া মুখরোচক এক চায়ের সঙ্গে পরিবেশন হতে পারে। আলাদা আলাদা ভিজিয়ে দাক্ষিণী রান্না "দোসে"তে সয়া মেশানো যায়। কাঁচা কলাই ও সয়াবীন মিহি করে পিষে, মোটা করে পিষে নেওয়া চালের সঙ্গে একত্র মিলিয়ে আগের দিন রেখে দেবেন। তাতে সয়াও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা গাজিয়ে যাবে।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে সয়াবীন সম্বন্ধে প্রচুর আগ্রহ নিয়ে, বিশেষ অর্থ-নিয়োগ করে সয়ার প্রচলনের প্রচেষ্টা করে-ছিলেন। তাঁর নির্দেশে প্রস্তুত নানা সয়া-বীন থেকে তৈরী মেঠাই উৎসবে আসরে রসনারঞ্জন করেছে। দুঃখের বিষয় এরকম নিঃস্বার্থ এক প্রয়াস উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি। এখন শুনছি ভারত সরকারের খাদ্য এবং কৃষি দফতর উঠেপড়ে লেগেছেন সয়ার প্রচার ও প্রসারের জন্য। সয়া থেকে নানা ত্বরিত পরিবেশনযোগ্য অর্থাৎ instant খাদ্যসম্ভারের জন্য মূল্যবান গবেষণা চলেছে। হয়তো বা অচিরে কিছু ফলও দেখা যেতে পারে। আমাদের দুঃখ এই যে, একটি মানুষের একক প্রচেষ্টা যে এই নূতন পথের প্রথম পথপ্রদর্শক তা হয়তো সর্বভারতীয় আসরে সেদিন কেউ স্মরণ করবে না। আজও যদি বাংলার ঘরে ঘরে সয়ার সমাদর গৃহিণীরা করতে আরম্ভ করেন তা হলেও জানবো গোষ্ঠবাবুর চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। আমাদের রান্নাঘরে নূতনের প্রবেশ কষ্টসাধ্য সত্য, কিন্তু এখন তো সয়াবীন আর নূতনের খেয়ালী অভিনবত্ব মাত্র নয়, সে যে এখন পুষ্টির প্রয়োজক।

টুকিটাকি

ভ্রূরেখা নিয়ে বিপদ যাদের কোনদিনও হয়নি তাদেরও হঠাৎ দু-একটি ভ্রূর চুল বেসামাল হয়ে উঠতে পারে। সামান্য তেলের হাত বা একটু ক্রীম হলেই আবার নমনীয় সুন্দর হয়ে যাবে ঐ বেপরোয়া একটি কি দুটি চুল।

শীতকালে বিশেষ করে হাতের মধ্য গ্রন্থি বা কনুই কর্কশ ও রুক্ষ হয়। কখনও বা কালো হয়ে যায়। খুব ভাল করে ঘষে ধুয়ে তৈলাক্ত কিছু ব্যবহার করলে কোমলতা ফিরে আসবে।

বড় শহরে বা কলকারখানাবহুল অঞ্চলে যাঁরা বাস করেন তাঁরা দিনে অন্তত তিন-বার মুখ পরিষ্কার করবেন। সকালে, রাত্রে ও দিনের মধ্যভাগে একবার। সকালে যখন মুখে প্রসাধনী থাকে না তখন সাবান ও জল হলে চলবে কিন্তু দিনে বা রাত্রে ক্রীম

যা প্রসাধনী তুলে নেবার অন্য বিধি পালন করার পর প্রয়োজন হলে সাবান জল ব্যবহার করবেন। বয়স একটু বেশী হলে ত্বককে নিত্য যত্ন না করলে সহজে মলিন ও বিবর্ণ দেখাবে।

শীতকালে রক্ত চলাচল ভাল রাখতে সামান্য ব্যায়াম অথবা ঘরের কাজকর্ম করা দরকার। রক্ত সঞ্চালন ভাল থাকলে, ত্বক মোলায়েম এবং উজ্জ্বল থাকবে।

যাঁরা জলসাবানের কাজ, রান্না বা বাসন ধোওয়া বেশী করেন তাঁদের হাতের কাছে তৈলাক্ত ক্রীম থাকলে ভাল হয়। কাজকর্মের পর হাত ধুয়ে মুছে ক্রীম মালিশ করে নিলে হাত খসখসে রুক্ষ হবে না। অতি সামান্য দুধের সর বা দু-ফোঁটা তেল হলেও হবে। তবে তেলের গন্ধ উগ্র। কাজেই তেল মেখে গরমজলে তোয়ালে ভিজিয়ে মুছে ফেলা দরকার।

যাঁদের পা খুব ফাটে, মোজা পরলে উপকার বোধ করবেন। সামান্য তৈলাক্ত কিছু মালিশ করে মুছে ফেলে মোজা পরলে পা নূতন জীবন লাভ করবে, নরম থাকবে।

শ্রীমতী

'সমাজতন্ত্র না সমাজকল্যাণ'

"সমাজতন্ত্র না সমাজ কল্যাণ" প্রবন্ধে (দেশ : ৩১-১০-৭০) শ্রীসমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন—সমাজতন্ত্র ও সমাজকল্যাণ অভিন্ন কিনা। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিকতা মাত্রেই সমাজ-কল্যাণ না হ'লেও একথা সত্য যে সমাজ-কল্যাণ ব্যতীত সমাজতন্ত্র তাৎপর্যহীন। মার্কসবাদের যথার্থ অনুসারীদের পক্ষেও মৌল-প্রাপনীয় হিসাবে রাষ্ট্রহীন সমাজের প্রতিষ্ঠার আদর্শকে কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ভিতরে রূপায়িত করার ভাবনাকে গ্রহণ করতে শেষ পর্যন্ত হয়ত আপত্তি থাকবে না।

মার্কসবাদী চিন্তাধারায় পরমতম প্রাপনীয় হ'ল শ্রেণীহীন, শোষণহীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং পথ হ'ল বৈপ্লবিকতা, বিবর্তন নয়। কার্যত মার্কসবাদে বিপ্লব অর্থে শ্রেণী সংগ্রামের একটা নিয়মতন্ত্র-বিরোধী ও বল প্রয়োগ-ভিত্তিক প্রণালীবদ্ধ ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানকে বুঝান হয়। এর মূলে লক্ষ্য সর্বহারা-শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। শ্রেণী-সংগ্রামকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত করতে সম্মত থাকলেও মার্কসবাদীরা এ বিষয়ে স্থির-নিশ্চিত যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ক্রান্তিকালীন চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়লাভ করা শেষ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অসম্ভব। ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের পুলিস, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সেই চূড়ান্ত সংগ্রাম হবে বলপ্রয়োগ ভিত্তিক।

কিন্তু ক্রম-ব্যাপকতর পুলিস, আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনী হ'ল ধনতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট নির্বিশেষে আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র মাত্রেরই তিনটি অপরিহার্য স্থায়ী ধারক-স্তম্ভ। তথাকথিত সর্বহারার একনায়কত্বের ভিতরেও রাষ্ট্রের স্থায়ী কাঠামো হিসাবে ঐ তিনটি উপাদান শুধু যে থেকেই যায় তা নয়, এর সর্বাত্মকতার সুযোগ গ্রহণ করে এ তিনের প্রাতিষ্ঠানিক পরিধি উদার-নৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার তুলনায় বরঞ্চ অনেকটা বেড়েই যায়। অনেকে মনে করেন যে, জগতে ধনতন্ত্রী ও তথাকথিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির সহাবস্থান যতকাল থাকবে, ততকাল শেষোক্ত দেশগুলিতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিঁকে থাকতে হবে পূর্বোক্ত দেশগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রমণ থেকে আত্ম-রক্ষার জনাই। কিন্তু আন্তঃরাষ্ট্রবিবাদের সমস্যাটিকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রাদর্শগত বিরোধিতা বিবেচনা করলে একে অতি-সরলীকৃত করা হবে। আন্তঃরাষ্ট্রবিবাদের অন্যতম মৌলিক কারণ বিবদমান রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থের সংঘাত। তা যদি না হত, তবে একটি ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর একটি ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের এবং একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের বিবাদ কিছুতেই ঘটতে পারত না। কমিউনিস্ট জগতে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ইতিহাসের বয়স অদ্যাবধি আড়াই দশক মাত্র। কিন্তু এর মধ্যেই এদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক স্বার্থগত বিবাদ বহুবার তিক্ত আকার ধারণ করেছে।

কমিউনিস্ট দেশগুলিতে রাষ্ট্রিক ক্ষমতার পূর্ণ কেন্দ্রীয়তার সুযোগ গ্রহণ ক'রে পার্টি তার নিজস্ব স্বৈরতন্ত্র চালাবার শক্তি অর্জন করে। তাই শাসকগোষ্ঠী ও শাসিত জনসাধারণের ভেদরেখা যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন এই ব্যবস্থার ভিতরেও শ্রেণীভেদ ও শোষণের (আর্থিক না হলেও আত্মিক) অবসান অঘটিতই থেকে যাবে।

এই অবস্থাকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' আখ্যা দেওয়া সংগত নয়। এই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ যদি নিজেই বিবর্তন-বিরোধী সর্বাত্মক রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তবে এর প্রতিরোধের জন্য বৈপ্লবিক-তাকেই আবার গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? ফলত বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের অন্তহীন প্রবহমানতার তত্ত্বকেই সেক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য সত্যরূপে স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের ঐ চিরন্তন আবর্তচক্র যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্রকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকবে, তাই প্রশ্ন থেকেই যায়, এই পদ্ধতির ভিতর রাষ্ট্রহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে কি উপায়ে?

কিন্তু শ্রেণীহীন, শোষণহীন ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগত বন্ধনহীন-সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার যদি মানুষের সামনে না থাকে, তাহলে তার দৈনন্দিন জীবন-চর্যায় নিয়ত-সঞ্চিত গ্লানির দায়ভাগ ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠবে। "কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া" গতির যদি অন্যকোন সার্থকতা না থাকে তাহলে 'কিছু হওয়ার সাধনা' থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ প্রতিনিয়তই 'নতুন কিছু' করার ক্ষমাহীন কর্মস্তূপে চাপা পড়ে যাবে, তার সত্তার অস্তিত্বশীলতাকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে, ক্রমেই তার স্থান হতে থাকবে যন্ত্র আর প্রতিষ্ঠানের ভগ্নাংশ থেকে ভগ্নতর অংশে।

তাই শ্রেণী, শোষণ ও রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার এই মহান মার্কসীয় অঙ্গীকারকে খুঁজে নিতে হবে এই মাটির পৃথিবীর বাস্তব পরিসীমাতেই। বেদনার সঙ্গেই এই কঠিন সত্যকে আজ স্বীকার করতে হবে যে রাষ্ট্র-আখ্যাত প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে সম্পূর্ণ বর্জন করা মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষ তার ক্রমবর্ধ লোক-সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মৌল প্রয়োজন মেটাবার জনাই যন্ত্রশক্তির সাহায্যে জড়-প্রকৃতির উপরে কর্তৃত্ব ক্রম বাড়িয়ে চলতেই বাধ্য। তার ফলে তার সমাজ-ব্যবস্থা ও উৎপাদনব্যবস্থা উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকবে। ফলে ঐ অতি-জটিল ও ক্রম-জটিলতর সমাজের সমন্বয়-বিধায়ক কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে একটা অতিকায় প্রতিষ্ঠানকে টিঁকে থাকতেই হবে: তাকে রাষ্ট্র অথবা অন্য যে-কোন নামই দেওয়া হোক না কেন। সেই অতিকায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রী-করণের মাধ্যমে অসংখ্য স্বায়ত্তশাসিত ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর পরেও তার অস্তিত্বের যে অংশ অবশিষ্ট থাকবে, তাকে নিয়োজিত করতে হবে জনকল্যাণ-ধর্মী বহুমুখী কর্মধারা-সমূহে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে বাস্তবায়িত করতে হবে।

প্রাপনীয় যদি হয় কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, তার পথ হিসাবে বিপ্লব অপেক্ষা বিবর্তনই শ্রেয়। আর বিবর্তনের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি। যে সকল ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রে বিবর্তনের সুযোগ আছে সেখানে বিপ্লবের পরিবর্তে একেই সমাজ-বিকাশের পথ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অপরপক্ষে, সর্বাত্মক কমিউনিস্ট-রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তনের সুযোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলতে হবে। পরিণামে উভয়ক্ষেত্রেই উদারনৈতিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে। ধনতন্ত্রী জগতে গত একশত বৎসরে নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তনের সুযোগ ও প্রয়োগ বহুদূর ব্যাপকতা লাভ করেছে। এই নব সম্ভাবনার প্রতি উদাসীন থাকার ভিতরে মার্কসবাদী-সুলভ অতিবুদ্ধির প্রমাণ থাকতে পারে, কিন্তু, মার্কসীয়-বস্তু-নিষ্ঠার স্বাক্ষর নেই।

কান্তি গুপ্ত
কলকাতা-৪৮

[বিঃ দ্রঃ—মূল প্রবন্ধটির মত এখানেও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র অর্থে সেই সকল রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়েছে, যারা মার্কসবাদী পরি-চিতির ভিত্তিতে নিজেদেরকে বর্তমানে সর্বহারার [illegible]নায়কত্বের অধীনস্থরূপে প্রচারিত ক[illegible]]

ছাত্রসমাজে বিক্ষোভ

গত ১২ই অগ্রহায়ণের 'দেশ'-এ প্রকাশিত শ্রীপ্রভাস মজুমদারের লেখা 'ছাত্র-বিদ্রোহ—একটি মূল্যায়ন' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লাম। তিনি 'দেশ'-এ এ বিষয়ে আরো সুচিন্তিত আলোচনা প্রকাশিত হবে—এই আশা নিয়ে তাঁর নিবন্ধটি শেষ করেছেন। সেই কারণে কিছু লিখতে প্রবৃত্ত হলাম।

আজ বাঙালী ছাত্র সমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে দেখে প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, যে-ছাত্রসমাজ কিছুদিন আগেও ধীর স্থির ছিল তার এমন কি হলো যে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। ছাত্ররা যে আজ ছাত্রধর্ম ভুলে গিয়ে দেশে নিদারুণ বিপর্যয় ডেকে এনেছে তার প্রধান কারণ হোল, আমার মনে হয়, বাংলা দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা।

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, নিদারুণ অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা দিনের পর দিন সেখানে বাসা বাঁধছে। ইস্কুলের পরিচালনা ভার যাঁদের উপর, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট দায়িত্ববোধসম্পন্ন নন। শিক্ষার আদর্শ ও নীতির দিকে তাঁদের দৃষ্টি তেমন জোরালো নয়। শিক্ষার্থীর প্রকৃত উন্নতি কোন্ পথে সে-সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট সজাগ নন। তাঁদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি করে দেখা যায়, তাহলো দলীয় স্বার্থ এবং সেই স্বার্থ-সঞ্জাত ঝগড়া-বিবাদ—যেটা যে-কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উন্নতির অন্তরায়। ইস্কুলের প্রধানশিক্ষক মহাশয় আদর্শবান পুরুষ হলেও নানাদিক থেকে তাঁর হাতপা বাঁধা। তাঁকে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। স্বাধীনভাবে কাজ করা তাঁর বড় একটা হয়ে ওঠে না। এ অবস্থায় শিক্ষার উচ্চ আদর্শকে রূপায়িত করা তাঁর দ্বারা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। আর যাঁরা নিম্নতন শিক্ষক তাঁদের তো কথাই নেই। শিক্ষকতা হোল তাঁদের কাছে নিদারুণ অভিশাপ। তাঁরা যা বেতন পান তাতে তাঁদের সংসারই চলে না। অথচ এই সংসারের চাহিদা তাঁদের মেটাতেই হবে, না মিটিয়ে কোন উপায় নেই। তাই তাঁদের দেখি 'টিউশনি' বা 'পার্ট-টাইম' কোথাও কাজ করে এই ঘাটতি পূরণ করতে। এভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁরা ছাত্রদের ঠিকমত শিক্ষাদান করতে পারেন না। ফলে ছাত্রদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। শিক্ষকরা অভাবগ্রস্ত হওয়ায় তাঁদের চরিত্রে দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই চারিত্রিক দুর্বলতার জন্যেই শিক্ষকরা আজ ছাত্রদের চোখে অশ্রদ্ধার পাত্র। শিক্ষক-কুলের আত্মবিস্মৃতি আজ ছাত্রসমাজকে আদর্শহারা করে তুলেছে।

এর উপর নির্দিষ্ট [illegible] পাঠ্যক্রম শেষ না করা, প্রশ্নপত্র রচনা বিষয়ে অসতর্কতা, পাঠ্য পুস্তকের বিরাট বোঝা, পরীক্ষা গ্রহণের ত্রুটিযুক্ত নীতি—ছাত্রদের পড়াশুনায় অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটায়। এতে ছাত্ররা বিদ্যাচর্চায় অনুরাগ বা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তাদের মনের কোণে ক্রমশ বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। অথচ এমনই মজা, পরীক্ষায় পাস করতে না পারলে ভবিষ্যৎ অর্থাৎ চাকুরির দ্বার রুদ্ধ। তাই তারা অনন্যোপায় হয়ে উচ্ছৃংখলতার আশ্রয় নেয়, অবাঞ্ছিত ঘটনার সংগে নিজেদের জড়িত করে।

দেশের শিক্ষা সংকটই ছাত্রসমাজকে দিশেহারা করে তুলেছে, তাদের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। ছাত্রেরা ইস্কুল ছেড়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখনও ঐ একই অবস্থা। তারা অনেক আশা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, কিন্তু খুব শীঘ্রই তাদের সকল আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। নৈরাশ্যের মধ্যেই তাদের আনাগোনা চলে এবং পরিণামে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ ছাত্রকেই দেখা যায় অভিশপ্ত বেকার-জীবন যাপন করতে। এই বেকারিত্ব থেকেই আসে 'ফ্রাসট্রেশন' এবং পরিণামে সমাজে নেমে আসে নিদারুণ বিপর্যয়।

বারিদবরণ ঘোষ
হুগলী।

ছাত্র-অসন্তোষ

"জনৈক অধ্যাপক"-এর (দেশ, ১২-১২-৭০) প্রতিবাদী আলোচনা বিষয়ে দুটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী বক্তব্য উপস্থিত করতে চাই।

(১) "নিন্দা পাপ..." ইত্যাদি স্মরণীয় হলেও শরৎচন্দ্রের উক্তি নয়। এ কথা কটি রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট চরিত্র গোরা বলেছে হারাণবাবুকে। শরৎচন্দ্র তাঁর শিক্ষার বিরোধ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথেরই অস্ত্রে ঘায়েল করতে চেয়ে এ অংশটি উদ্ধৃত করেছিলেন মাত্র। আসল বই না পড়ে নোট বই পড়ে ছাত্ররা প্রায়ই এইরকম ভুল উদ্ধৃতি লেখে। তার পরে তারা আবার যখন শিক্ষক ও অধ্যাপক হয় তখন শিক্ষকতা ও অধ্যাপনার বড় দুর্দিন।

(২) "সংঘবদ্ধ শক্তির...মারাত্মক অপব্যবহার" যখন "একটি দুশ্চরিত্র ছাত্রকে বিদ্যালয় থেকে অপসারিত করার চেষ্টা" হলে ছাত্রদের নির্বিচার উন্মত্ত প্রতিবাদে প্রকাশ পায় (দুশ্চরিত্র মানে কী? রাজনীতিতে লিপ্ত? মদ্যপানে লিপ্ত? পুস্তকাগারের বই চুরি করেছে?) তাকে অধ্যাপক মজুমদার সমর্থন করবেন কিনা, করলে কোন যুক্তিতে করবেন তা আমি জানি না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় "জনৈক অধ্যাপক"-এরও অজানা নেই যে, 'শিক্ষক-গোষ্ঠির মধ্যেও "ধূর্ত" অথবা অবাঞ্ছনীয় শিক্ষককে শিক্ষণবৃত্তি থেকে অপসারিত করতে চাইলে তা রোধ করবার জন্য ছাত্রদেরই নির্বিচার উন্মত্ত প্রতিবাদ এবং "সংঘবদ্ধ শক্তির...মারাত্মক অপব্যবহার" কাজে লাগাতে শিক্ষকেরা আদৌ দ্বিধা করেন—এমন প্রমাণ আমাদের ছাত্রকাল থেকে আজ পর্যন্ত বেশি মেলেনি।

মানসী দাশগুপ্ত
কলকাতা-১৯।

জীবন

'দেশ' পত্রিকার (৫ই ডিসেম্বর '৭০) শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর "জীবন" পড়ে মুগ্ধ হলাম। আজকের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযন্ত্রণার যে কঠিন নিষ্ঠুর অথচ বাস্তব প্রতিচ্ছবি তিনি এই ছোট গল্পটির মধ্যে তুলে ধরেছেন তা সকলকেই নাড়া দেবে।

জীবনে দুঃখ আছে, কিন্তু তারই মধ্যে বাঁচার সাধও আছে। তাই জীবন এত মধুর, এত রমণীয়। জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েও সে আবার জীবনের কোলেই ফিরে যেতে চায়, এই নিষ্ঠুর অথচ সার্বজনীন সত্যটিকে তিনি অপরূপ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু লেখেন কম, কিন্তু তাঁর লেখায় গভীরতা আছে। খিস্তির ভাষা না আউড়েও যে যুগযন্ত্রণাকে ছবির মত ফুটিয়ে তো[illegible] যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নতুন ক[illegible] প্রমাণ করলেন।

লেখক এবং এমন একটি নিটোল সুন্দর গল্প প্রকাশের জন্য 'দেশ' পত্রিকাকে সাধুবাদ জানাই।

বাদল চট্টোপাধ্যায়
শিবপুর।

চিত্রশিল্পী দালাওনে

চিত্রশিল্পী সোনিয়া দালাওনে সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বিমল ব্যানার্জির মনোজ্ঞ রচনাটি (৫ই ডিসেম্বর) পড়লাম। এই বিশ্বখ্যাতা চিত্রশিল্পী ফরাসী দেশে বা সারা ইউরোপে বিমূর্ত ধারা প্রচার শিল্পী হিসাবে অগ্রণী। ইনি ও এঁর স্বামী রবার্ট, প্রথম বিমূর্ত চিত্রশিল্পী কানডিনস্কির পরেই বিমূর্ত চিত্রজগতে সাড়া তোলেন। বিমলবাবু নিজ গুণে এই প্রতিভাশালী মনীষী মহিলার ছবি চমৎকারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

এই রচনায় একটি বিশেষ কথা জানা গেল। শিল্পী সোনিয়া দালাওনে নিজের চিত্ররাজি সব উইল করে যাবেন জগতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য। তিনি বিমলবাবুকে কথা দিয়েছেন যে, 'ভারতের আধুনিক শিল্প গ্যালারী' তাঁর মৃত্যুর পর

কয়েকটি চিত্র পাবেন। আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়। যে কোন আর্ট গ্যালারীই এঁর আঁকা ছবি পেয়ে গৌরব অনুভব করবে।

কিন্তু এই 'উইল' কথাটায় ভয়ের কারণ আছে। মনে হয় পুরো জিনিসটা যেন সরকারের 'রেড টেপ' আর ফাইলের আওতায় পড়ল। তার মানে মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে সেটা উদ্ধার করে দিল্লির গ্যালারীতে পৌঁছতে। এর মধ্যে অবশ্য দামি কথা যদিই বা পৌঁছায়। কারণ হয়ত এক যুগ বাদে যখন পার্শেলটি হস্তগত হল, নয়াদিল্লির দপ্তরের বড় সাহেব ভুরু কুঁচকে বিজ্ঞভাবে বলবেন তিনি নিজে দেখতে চান কি জিনিস এল। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট দেখেই তিনি ক্ষেপে উঠবেন—চিৎকার করে বলবেন "ছবির জায়গায় ভুল করে ফরাসী সরকার কালিঝুলি মাখান সব আধময়লা পরদা পাঠিয়েছে। প্রিপস্টারাস। অবিলম্বে এগুলোকে গুদামে নিক্ষেপ কর অথবা আন্ডার উইডিং রুলস, উইড কর।"

আশার কথা এটা বিমলবাবুর মারফত হবে। কিন্তু দেশবরেণ্য ভিটলভাই প্যাটেলের উইলও ত সুভাষবাবুর ইচ্ছানুযায়ী হবার কথা ছিল। হল কই?

মাণিক ঘোষ
লখনৌ।

ভারতের আনবিক আয়োজন

গত ৭ই নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকাতে প্রকাশিত শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের বৈজ্ঞানিক তথ্যমূলক প্রবন্ধ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা 'ভারতের আনবিক আয়োজন' সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পেলাম। বর্তমান আনবিক যুগে ছোট বড় বহু শক্তিশালী দেশ আনবিক শক্তিতে বিশেষভাবে বলীয়ান। সমৃদ্ধিহীন ভারতই এ ব্যাপারে সনাতন যুগে পড়ে আছে। আনবিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত দেশগুলি বিত্তহীন শক্তিহীন দেশগুলির প্রতি কৃপার দৃষ্টিতে সব সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। কোন দেশ কোনদিন পরধনে এবং পরের শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে না। ভারতের নেতারা এ ব্যাপারে উদাসীন। বিশ্বের দরবারে ভারত শান্তি-প্রেম ও অহিংসার ধ্বজাধারীরূপে যথেষ্ট হাস্যাস্পদ কেননা বিবেকানন্দের কথায় দুর্বলের মুখে শান্তির বাণী শোভা পায় না। এখন ও সময় আছে, দিল্লীর গদিতে যারা আসীন তাঁদের সরাভাই পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য কার্যকরী তৎপরতা নিয়ে আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীদের স্বাধীন প্রয়াসে উপযুক্ত অর্থসহ সাহায্যে এগিয়ে আসা একান্ত দরকার। এদেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার আশা সুদূরে প্রসারী অথচ স্বাধীনরাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রথম প্রয়োজনীয়তা সুরক্ষা। আশা করি দেশের কর্ণধারগণ এর গভীর গুরুত্ব বুঝে এগিয়ে যাবেন নতুবা ১৯৬২ আবার বহুশত গুণ ভয়ংকর হয়ে ফিরে আসবেই।

কমল ঘোষ
[illegible]

দরবার নটী কলাবন্ত

গত ২৬-৮-১৩৭৭ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের "দরবার নটী কলাবন্ত" পড়লাম। কয়েকটি ক্ষেত্রে মাননীয় লেখকের প্রকাশভঙ্গি ও অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম বিচারশক্তি বিকশিত হয়েছে সে বিষয় অনস্বীকার্য। কিন্তু একটি বিষয়ে লেখকের সাথে একমত হতে পারলাম না। উক্ত প্রবন্ধে দিলীপবাবু উল্লেখ করেছেন, "তৈমুর বংশের রক্তে তিনটি প্রধান উপাদান ছিল—বিবেকহীন উচ্চাশা, অদম্য ভোগলিপ্সা আর কুটিল নৃশংসতা : সব্যসাচী লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি গল্পে এই ইতিহাসসিদ্ধ মন্তব্য করেছেন। এর ব্যতিক্রম ছিলেন না আকবরও।" কিন্তু সত্যই কি তাই? উপরোক্ত তিনটি বিশেষণে কি কলঙ্কিত করা যেতে পারে মহান সম্রাট আকবরকে? তৈমুরের বংশধর হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন কেবলমাত্র অদম্য সাহস ও অটুট দৈহিক শক্তি। An Advanced History of India থেকে বলছি "Like other princes of the house of Timur, Akbar was endowed with remarkable courage and uncommon physical strength." (Page 460).

একাধিক পত্নীই যদি "অদম্য ভোগলিপ্সার" মাপকাঠি হয় তাহলে ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর বহু নৃপতি যাঁরা ইতিহাসে সুশাসক ও প্রজারঞ্জক হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছেন তাঁদেরকে ঐ একই দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে হয়। আর আমার মনে হয় বিবেকহীন উচ্চাশা আর কুটিল নৃশংসতা আকবরের মধ্যে মোটেই দেখা যায় নি। মহামতি আকবর কেমন ছিলেন তা অতি সহজেই বোঝা যায় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক Dr. V. A. Smith-এর একটি উক্তি থেকে, He was a born king of man, with a rightful claim to rank as one of the greatest sovereigns known to history. That claim rests securely on the basis of his extraordinary natural gifts, his original ideas, and his magnificent achievement." (Akbar the great Mogul, Page—256).

তাই মাননীয় লেখককে প্রশ্ন করি কোন দৃষ্টিতে তিনি এইরূপ [illegible] [illegible] করতে চেয়েছেন তা যদি [illegible] ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে উপকৃত হব।

অসিতকুমার দোলুই
মেদিনীপুর

ইংরেজী গীতাঞ্জলি

গত ৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত দেশে "ইংরেজী গীতাঞ্জলি এবং ডব্লু বি য়েটস্‌" নামে ধারাবাহিক সমালোচনামূলক আলোচনায় লেখক শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র একজায়গায় লিখেছেন "৬৭নং কবিতার প্রথম স্তবকে all the world এর বদলে The world...... ; আসলে ৬৭নং কবিতায় world বলে কোন শব্দই নেই। বর্জন করা হয়েছে ৬৬নং কবিতার শেষ স্তবকে There was none in (all) the world ..

নাসিরুদ্দিন আহম্মদ
বহরমপুর

পরীক্ষা সমস্যা

পরীক্ষা সম্পর্কিত আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এই প্রবন্ধে সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্বন্ধে যথার্থ বক্তব্য রাখা হইয়াছে। অভিভাবকগণ সচেতন না হইলে শিক্ষকগণ কি করিতে পারেন? ইহা সকলেরই অনুধাবন করা দরকার। নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদের সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি না দিলে অভিভাবকগণের কর্তব্যচ্যুতিই হইবে। অনেক বিলম্ব হইয়াছে বটে, তবে এখনও সময় আছে।

শ্রীঅপরাজিতা দাশগুপ্ত
কলিকাতা—১৪

ফরাসী শিল্পী পাবলো পিকাসোর সৃষ্টি-সম্পদের মূল্যায়নে বিদগ্ধ সমালোচকরাও বার বার বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাঁর দেখবার চোখ স্বতন্ত্র, অনুভব স্বতন্ত্র, প্রকাশের ভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। সেই অনুভবকে ছবিতে রূপ দেবার জন্য যে-রীতি তিনি উদ্ভাবন করেন, তা নন্দনতত্ত্বের প্রচলিত সূত্রগুলিকে গুলাতে এক রকম অস্বীকার করেছিল। সেই সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের নতুন সূত্র গঠনেরও ইঙ্গিত যে সেখানে ছিল, সেটা অনুমান করতে সমালোচক ও শিল্পরসিকদের কিছু সময় লেগেছে। বিভ্রান্তির অন্যতম মূল কারণ সেইখানে। এখন তা বহুলাংশে অপসৃত; তবুও ব্যাখ্যাতেরা তাঁর ছবির শিল্পবিচারে সর্বদা এবং সর্বত্র একমত নন। সে যাই হোক, পিকাসোর শিল্পজগতের বিষয় বা পাত্র-পাত্রী যতই অদ্ভুত বা আপাত-দুর্বোধ্য হোক, প্রকাশের দিক থেকে নানা মতের যতই অবকাশ থাকুক, একটি ব্যাপারে শিল্পরসিকরা একমত। তা হল এই যে, পিকাসো মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন; তার জটিল মনের কথা, প্রবৃত্তির কথা, স্ববিরোধিতার কথা। মানুষকে নিয়েই তাঁর শিল্পজগৎ।

চিত্রকর পিকাসো তুলি ছেড়ে কিছুদিনের জন্য যখন কলম ধরেছেন (১৯৩৫), কবিতা রচনা করেছেন, তখনও স্বভাবতই শিল্পীর জগৎ বদলায়নি। আবার তাঁর কবিতাও সেই "দুর্বোধ্য" চিত্রকর পিকাসোরই কবিতা—ছবি এখানে বাণীবদ্ধ। প্রচলিত রীতি আর অভিধার তাঁর জন্য নয়। নাটকের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষণীয়। এ-পর্যন্ত তিনি দুটি নাটক লিখেছেন। পিকাসোর প্রথম নাটক "ডিজায়ার কট বাই দা টেল" (১৯৪৩-৪৪) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে লেখা। যুদ্ধকালের আবর্তে পতিত অগণিত মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, ক্ষুধা আর প্রবৃত্তির বাণী-চিত্র এখানে রচিত; ওদের আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তা পূর্ণ হবার পথ বন্ধ। ঠিক চার বছর পরে পিকাসো লেখেন তাঁর দ্বিতীয় নাটক **ফোর লিটল গার্লস** এই নিবন্ধে যা আলোচ্য।

"ফোর লিটল গার্লস" যখন তিনি রচনা করেন (১৯৪৭-৪৮), পিকাসোর বয়স তখন ৬৬-৬৭, মহাযুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর পৃথিবীতে তখন শান্তি। শিল্পীর মন কিন্তু তখনও প্রায় একই রকম অশান্ত। অনেক আগে তাঁর মিউরাল চিত্র "গুয়ের্নিকা"য় শিশু আর মৃত্যুকে কাছা-কাছি দেখানো হয়েছিল। জীবন, মৃত্যু আর প্রেম পিকাসোর শিল্পকার্যে বার বার একাকার হয়ে গিয়েছে। চার বালিকার এই রূপক-নাট্যেও সেই জীবন, মৃত্যু আর প্রেম যেন অবিচ্ছেদ্য। ওই তিনটি শব্দের ব্যঞ্জনা নানাভাবে এখানে ছড়িয়ে আছে। ওই তিনের সঙ্গে যুক্ত হাসি—বালিকাদের হাসি। ছয় অঙ্কের এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের শেষে তিন বালিকা (প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ) গান গাইছে:

"...মৃত্যু, প্রেম, জীবন, প্রেম
তোমরা সবাই হাসবে কি?
মৃত্যু তুমি হাসবে কি?
জীবন তুমি হাসবে কি?
তোমরা সবাই হাসলে কি,
আমিও যেতে হাসতে পারি..."।

পিকাসোর শিল্পজগতে তথা চিন্তায় রাজা দেবতা আর শয়তানের সহাবস্থান। তাঁর এই নাটকের কুশীলব চার বালিকা। খেলাঘরের বাগানের সামনে ওরা খেলতে এসেছে মজার খেলা। যে খেলায় ওদের কল্পনার ক্রিয়া অবাধ। আলিসের মত ওরাও রূপকথার আজব দেশে চলে গিয়েছে। কিন্তু চার বালিকার আজব দেশ আলিসের আজব দেশের মত মধুর নয়, নিছক সুখস্বপ্ন দিয়ে ঘেরা নয়। স্বপ্ন ওরাও দেখছে কিন্তু সে-স্বপ্ন বড় জটিল। কারণ, পিকাসোর এই শিশু চরিত্র দেবদূতের মত নিষ্কলঙ্ক পূত চরিত্র নয়; ওদের জ্ঞান যদি-বা কিছু জন্মেছে, সেখানে অশান্তির বীজ ঠিকই বর্তমান। পিকাসো জানেন, শিশুরা একদিকে যেমন সুকুমার চিত্ত, অন্যদিকে তেমনই নিষ্ঠুর। ওদের বাসনা আর আকাঙ্ক্ষার যে-ছবি নাটকে ফুটেছে, প্রায়শ হিংসা আর ভয়ংকরতার কালো রঙে তা রাঙানো। তবে ওদের ইচ্ছা অনেক রকম। সে সবের প্রকাশ অসংলগ্ন। ওই অসংলগ্নতার ক্ষেত্রে শিশুমনকে চেনা যায়। আর চেনা যায় উচ্ছ্বাসে। নাটকের শুরুতে প্রথম বালিকা বলছে: "...এসো আমরা নিজেদের আঘাত করবার খেলা খেলি, তারপর সজোরে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তারস্বরে হয়তো বা চিৎকার করি...!" এই সংলাপের কিছুক্ষণ পরে ওই বালিকা আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ দিয়ে বলে..."এরই মধ্যে যতটুকু পারো, জীবনকে সার্থক করে নও...!" ওদের এক-একটি সংলাপ যেন গ্রীক কোরাসের মত, নিয়তির বচনের মত নির্মম, জ্ঞানগর্ভ। যেমন: "দ্বিতীয় বালিকা—সংঘর্ষের ক্ষেত্রে যে-ষাঁড় নিহত হয়, তারই চোখ শুধু দেখতে পায়। প্রথম বালিকা—সে দেখে নিজেকে। চতুর্থ বালিকা—বিকৃত আয়নাও দেখে। দ্বিতীয় বালিকা—মৃত্যু, যা নিয়ে [illegible]। প্রথম বালিকা—সে-জন্য বড় ভয়।"

The Four Little Girls: Pablo picasso: Translated by Roland Penrose.

চার বালিকার কাউকেই সাধারণ বা শিশু-চরিত্র হিসেবে ভাবা যায় না। এই চারজনের একজন তো প্রায় সারাক্ষণই নেপথ্যে রয়েছে, সামনে সে বলে চলেছে, "আসছি, আসছি, আসছি...!" নাটকের যবনিকা পড়বার আগে কিছু আগে সে যেন দেহে কূপ থেকে উঠে এসেছে। এরা চারজনেই প্রতীক-চরিত্র। আর সব মিলিয়ে নাটকটি যেন শৈশবের একটি [illegible] রূপকথা। যে-রূপকথায় শুভ আর অশুভ ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে।

নাটকটিতে প্রকৃতির সজীব ভূমিকা। ফুল ফল, গাছ, হ্রদ—সবই আছে। আছে নানা জন্তু-জানোয়ার। তার মধ্যে রূপকথার জীবও কম নয়। যেমন: সাদা পক্ষীরাজ ঘোড়া, শীর্ষাসনে বসা পেঁচা ইত্যাদি। মঞ্চের নির্দেশ যদিও খুব যত্ন করে দেওয়া হয়েছে, তবু মনে হয় না, পিকাসো এ-নাটকের অভিনয় কামনা করেছেন। যার শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের নির্দেশ এই রকম: "...বালিকারা মাটিতে শুয়ে পড়ে ঘুমোতে থাকে। ওদের সামনে কিছু গাছ, কিছু ফুল, কিছু ফল—সর্বত্র রক্ত ঝরছে, রক্তের পুকুর তৈরি হচ্ছে, রক্তে মঞ্চ ভরে উঠছে!" না, তিনি নিশ্চয় বিশ্বাস করেননি, কোনও রঙ্গমঞ্চে এ-নাটক অভিনীত হবে। কোনও দল কখনও "ফোর লিটল গার্লস" অভিনয় করবার কথা ভেবেছেন কিনা তা-ও জানি না। বস্তুত, "ফোর লিটল গার্লস" পাঠ্য নাটক, যা গভীর মনঃসংযোগ দাবি করে। এই রচনা পাঠককে আনন্দ দেবে না, দেবে পিকাসোর জটিল জগতে প্রবেশের অধিকার।

জ্যোতির্ময় বসু রায়

গড়ুন শক্তি বোঝাই পেশী

দিনে মাত্র ৫ মিনিটে !
কেমন করে তা দেখিয়ে দিচ্ছেন বিশ্ব জুডো চ্যাম্পিয়ন

গড়ুন ঢেউ-খেলানো ইস্পাতকঠিন বাইসেপস। গড়ুন পেশীপুষ্ট বুক। গড়ুন চওড়া পুরুষোচিত কাঁধ, লৌহ-দৃঢ় মুষ্টি ও বলিষ্ঠ পুরোবাহু । গড়ুন বলশালী উরু ও পায়ের গুলি

আমস্টারডাম: বিশ্ব হেভীওয়েট জুডো চ্যাম্পিয়ন তাঁর ব্যায়াম 'রহস্য' প্রকাশ করছেন,—বুলওয়ার্কার ২ নামে এক অভূতপূর্ব ব্যায়ামযন্ত্র। এই হল আমাদের কাছে তাঁর চিঠি

প্রিয় মহাশয়গণ;
জুডোতে থাকলে পেশীগুলো যেমন জোরালো তেমনি নমনীয় হওয়া দরকার। সেইজন্যেই আমি প্রত্যেক দিন বুলওয়ার্কার করি। এটা অকল্পনীয় পেশী তৈরী করে। আর বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ব্যাপার হল এই যে দিনে মাত্র ৫ মিনিটে, বুলওয়ার্কার সুবঠিন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য আমার যে শক্তি ও সহ্যক্ষমতা দরকার সেটা আমায় যোগায়। এই অবিশ্বাস্য ফলপ্রদ ব্যায়ামপদ্ধতির কাছে আমার উপাধির জন্যে আমি অনেকাংশে ঋণী, আর খেলোয়াড় হোন বা না হোন, জীবনের লড়াইয়ে যিনি চ্যাম্পিয়ন হতে চান, তাঁকেই প্রাণ খুলে এই যন্ত্রের অনুরাগী হতে বলব

আপনার বিশ্বস্ত
উইম রাস্কা
বিশ্ব ব্ল্যাক বেল্ট জুডো চ্যাম্পিয়ন

সত্যি, যে দেহকে অন্য পুরুষে ঈর্ষা করে ও মেয়েরা সমাদর করে তাকে দিনে মাত্র পাঁচ মিনিটে তৈরী করার অবশেষে এই একটা গতিসমৃদ্ধ পন্থা। ওজন নয়। বারবেল নয়। শুধু সহজ আর দ্রুত। আমাদের নতুন পুস্তিকায় ব্যায়ামরত ব্যক্তির ফটো দিয়ে বর্ণিত ব্যায়ামপ্রণালীর সম্পূর্ণ ধাপগুলো দেখুন। কুপন ডাকে দিলে সেটি বিনামূল্যে আপনার। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষিত আইসোমেট্রিক — আইসোটোনিক নিয়ম। এ পর্যন্ত যত ব্যায়ামযন্ত্র দেখেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বুলওয়ার্কার ২ আইসোমেট্রিক ও আইসোটোনিক নিয়মের উভয়কে একটা হালকা, বহনযোগ্য, কমদামী ব্যায়ামযন্ত্রে সমন্বিত করেছে। সহজ পদ্ধতিটাকে ধাপে ধাপে শুধু অনুসরণ করুন, ফল পাচ্ছেন একটা ব্যায়ামাগারের পুরো ব্যায়ামধারার সমান, দাড়ি কামাতে যে সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে আপনার পেশীগুলো সর্বোচ্চ শক্তির শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে! পরিশ্রম নেই। দীর্ঘ ব্যায়ামের ধকল নেই। পোষাক খোলার দরকার নেই। অথচ আপনার সমস্ত পেশীচক্র, হাত, কাঁধ, বুক, পেট, পা এবং পিঠ একটা যেন চঞ্চল নতুন [illegible] করছে

এই নয়টি উপকারের সাথে অন্য যে কোন পদ্ধতির তুলনা করুন
দিনে মাত্র ৫ মিনিট সময় নেয়। বাড়ীতে, অফিসে, যেখানে খুশী ব্যবহার করুন। দ্রুত সুফল, ব্যবহার করা সোজা। শক্তিমান পেশী গড়ে। হাত, পা, পিঠ, বুককে বলশালী করে। দামী, ভারী যন্ত্রপাতির দরকার নেই। ওজন চাইনা। বারবেল চাইনা। কপিকলের চাকা নয়। ব্যায়ামের দীর্ঘ পুনরাবৃত্তি চাইনা। আপনি সন্তুষ্ট না হলে এক পয়সাও দিচ্ছেন না।

—কঠিন, দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে। অভাবনীয় সুফলকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন ব্যবহারকারীরা। তিরিশটির বেশী দেশে পুলকিত ব্যবহারকারীদের দ্বারা প্রশংসিত। এই চমক লাগানো ফলগুলো পড়ুন।
অন্য যে কোনও পদ্ধতির সঙ্গে এই নয়টি সুফলের তুলনা করুন।

- হের জে. ইউ., ২৮ বছর বয়স হ্যানোভার, জার্মানী থেকে মাত্র ৩৫ দিন ব্যায়াম করার পর এই বিস্ময়কর উন্নতির খবর দিয়েছেন: বুকের ১২ সিএম বৃদ্ধি, বাইসেপস-এর ৫ সি·ম, গলার ২ সিএম উরুর ৮ সিএম পায়ের গুলির ২ সিএম।
- বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হেভীওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে বলেন: প্রত্যেক লড়াইয়ের আগে বুলওয়ার্কার দিয়ে নিজেকে তৈরী করি। বিশ্বাস করুন, এই বিস্ময়কর জিনিষটি চ্যাম্পিয়ন তৈরী করে।"
- 'আমার ভুঁড়িটা এখন সমতল পেশীর আবরণ।" জি জি, (ইউ, এস, এ)
- "আমার বিবাহের প্রথম দিকের সেই সুস্থতাবোধ ও সবল পেশী ফিরে পেয়েছি।" ও. কে. (ডেনমার্ক)
- 'আমার বুক প্রশস্ত, আমার বাইসেপস দৃঢ়, আমার পেট সমতল হয়েছে।" ই. পি, (প্যারিস)

অন্যেরা লিখছেন, "আপনাদের ব্যায়ামপরীক্ষা আমার সব সন্দেহ দূর করেছে—সত্যিই কাজ হয়। আপনারা যা বলেন সব হয়, তার চেয়েও বেশী"... হ্যাঁ এটা হল সেই নতুন সহজ পন্থা—দিনে মাত্র পাঁচ মিনিটে যাঁরা তাঁদের পেশীচক্রকে প্রচণ্ড নবলব্ধ ক্ষমতায় পূর্ণ করতে চান সেইরকম পুরুষের কাছে সর্বত্র এর সমাদর।

বিনামূল্যে পুস্তিকা দেখায় কেমন করে তা হয়—কোনো বাধ্যবাধকতা নেই

আপনি কি দুর্বল, শিথিল পেশীর বদলে ইস্পাত কঠিন ঢেউ খেলানো গর্বকরার মত "ডাইনামো" চান? আপনি কি আপনার শরীরের একটা পেশীচক্র নির্বাচন করে আপনার চির কালের স্বপ্নের বিপুল ক্ষমতা

ও উত্তাল প্রাণশক্তির জন্যে এখুনি কাজ সুরু করতে চান? তাহলে আজই বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্যে কুপন ডাকে দিন, কোনো দাম বা বাধ্যবাধকতা নেই।

বিশ্বব্যাপী প্রশংসা

বুলওয়ার্কার ২-এর পিছনে বৈপ্লবিক আইসোমেট্রিক আইসোটোনিক বিধিকে সমর্থন করেছেন ক্যাসিয়াস ক্লে ও এডি মার্কসের মত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়রা, ও সারা বিশ্বের শিক্ষক, ক্রীড়া জগতের চিকিৎসকবৃন্দ ও স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদগণ। রীডারস ডাইজেষ্ট, ডার স্টার্ন, লুক ম্যাগাজিন ও অগণিত চিকিৎসা ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রপত্রিকায় বিবৃত এই ব্যায়ামপদ্ধতি, পেশীপুষ্টির জন্য উদ্ভাবিত উপায়ের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত—চিরাচরিত পদ্ধতির চেয়ে চতুর্গুণ দ্রুত।

বিনামূল্যে পুস্তিকা

ধাপে ধাপে বর্ণিত ব্যায়ামরত ব্যক্তির ফটো দেখিয়ে দেয় কেমন করে আপনার পেশীচক্রকে নতুন ক্ষমতায় পূর্ণ করতে হয় দাড়ি কামানোর চেয়েও কম সময়ে। বাড়ীতে, অফিসে, যেখানে খুশী ব্যায়াম করুন। এমন কি বসে থাকার সময়েও আজকেই কুপন ডাকে দিন। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আজকেই কুপন কেটে ডাকে দিন।

Mail Order Sales Pvt. Ltd.
15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

বিনামূল্যে

121-B

নাম ------------------------
ঠিকানা ------------------------

------------------ বয়স ------

BULLWORKER SERVICE DS 9
15 Mathew Road, Bombay 4
অনুগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা ইংরাজীতে লিখুন

উপন্যাস

হৃদয়ে প্রবাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পরিবেশক, কথা ও কাহিনী। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-১২। দাম : ৫·৫০।

এই ছোট উপন্যাসটিতে একটি বিচ্ছিন্নমনস্ক বাঙালী-ছেলের জীবনের কতকগুলি ঘটনার মাধ্যমে তার প্রবাসী হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ফুলব্রাইট স্কলার তপন বিদেশে গিয়ে যে মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে তার বাবা মার্ক উডল্যান্ডকে ঢাকায় তপনের বাবা স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে হত্যা করেছিলেন। তপনের জ্যাঠামশাই এক সাহেব লেফটেনান্ট কর্নেলের অত্যাচারে মারা যান এবং তারই প্রতিশোধে তাঁর ভাই অর্থাৎ তপনের বাবা অনেক বছর বাদে ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মার্ক উডল্যান্ডকে সংস্কৃত শেখাতে গিয়ে হত্যা করেন। এই উডল্যান্ডেরই মেয়ে অ্যালিসের সঙ্গে লণ্ডনে ঘটনাচক্রে তপনের আলাপ হয় এবং তার বাড়িতে গিয়ে মার্ক উডল্যান্ড এবং তাঁর হত্যাকারী তপনের বাবার ছবি দেখতে পায় তপন। তখন তার মনে পুরোনো ক্ষতের মতো ব্যথা জেগে ওঠে এবং বোধ হয় সেই জন্যই অ্যালিসের মতো আগ্রহী মেয়েকেও সে বিয়ে করতে রাজি হয় না। 'বোধ হয়' বলছে এই জন্য যে অ্যালিসের অত্যধিক আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তপন যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই নিষ্ঠুরতার কারণ হিসেবে তপনের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বটুকুর প্রকাশ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু উপন্যাসে তা নেই। নেই বলেই অ্যালিসের প্রেমিক-নিষ্ঠা যেন বাঙালী মেয়ের সতীত্বকেই মনে করায়। তপনের নিষ্ঠুরতাও বর্বরোচিত মনে হয়। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে লণ্ডনের সমাজের কিছু টুকরো ছবি উপভোগ্য হয়েছে। যেমন ভারতীয় বা আফরিকান ছেলের সঙ্গে যে সব ব্রিটিশ মেয়েরা মেলামেশা করে তাদের প্রতি অন্য ব্রিটিশ মেয়েদের ঘৃণা বা ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণাবশত টেডি বয়দের অত্যাচার যার শিকার হয়েছে তপন নিজেই। এছাড়াও আর একটি জীবন্ত চরিত্র আছে সে হলো টেড। ফ্রান্সিসকোতে তপনের সঙ্গে একই বিভাগে এই বীট ছেলেটি পড়তো। তার বন্ধন-বশ্যতা না মানা ভাব ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব তপনকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তারই সঙ্গে সে লণ্ডনে এসেছে। যাই হোক তপন অ্যালিসকে নিষ্ঠুরভাবে ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসেছে। এসে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করেছে। এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে। সেখানেও এমন এক সংকট যে তপন সেই বন্ধুর সাহচর্যকে

খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেল না। শুধু এক বাঙালী মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং আলাপও হয়েছে যিনি তপনকে চাকরি প্রার্থী ভেবে বয়সের অধিকারে অনর্থক উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ করে ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর সিউড়ি গিয়েছে তপন। সেখানে এক খুড়তুতো বোনের বিয়ে সেরে সেই গভীর নিঃসঙ্গতাবোধে আবার লণ্ডনে এসেছে অ্যালিসের কাছে। কিন্তু অ্যালিস তপনের কাছে ঘা খেয়ে শেষ পর্যন্ত তার এক সহকর্মীর বাগ্‌দত্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলোর গুরুত্ব এতো দেওয়া হয়েছে যে, তপনের নিঃসঙ্গ মনের ভেতরকার ছবিটা আমরা তেমন পাইনি। সুবীরের বাড়িতে দময়ন্তীর সন্তান প্রসবের ঘটনা কিংবা কাকার বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাই-বোন এবং ঠাকুমার সঙ্গ—এই ঘটনাগুলির ডিটেলস্ অবান্তর হয়ে উঠেছে. এই জন্যে যে এগুলি তপনের নিঃসঙ্গতাকে, তার প্রবাসী হৃদয়কে স্পষ্ট করেনি। স্পষ্ট করলে এই ডিটেলস্ একটা উদ্দেশ্যে অন্বিত হয়ে সার্থক হত।

এই ছোট উপন্যাসটিতে সামগ্রিকতার অভাব থাকলেও কতকগুলি টুকরো দেশী-বিদেশী সমাজের ছবি খুব জীবন্ত হয়েছে এবং বর্ণনার আন্তরিকতায় বইটির পাঠ্যগুণ যে ফুটেছে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

১৩২/৭০

গীতিকা সংগ্রহ

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা। (প্রথম খণ্ড)। সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। ৬/১এ, ধীরেন্দ্র ধর সরণী, কলকাতা-১২। দাম : ১০·০০।

পূর্ববঙ্গ যে ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রাচীন পল্লীগাথার ভাণ্ডার তা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ষাট-সত্তর বছর আগে বিশেষ জানতেন না। দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই ঐশ্বর্যকে শিক্ষিত মানুষের সামনে তুলে ধরেন এবং গাথাগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে বিদেশী সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের কাছে এগুলির পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯২৩ সালে দীনেশচন্দ্রের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হলে আলোচ্য বইখানির সম্পাদক শ্রীমৌলিকের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হয়। এই বই প্রকাশের আগেই শ্রীমৌলিক প্রকাশিত গাথার অনেকগুলি পূর্ববঙ্গের গায়েন ও বয়াতীর মুখে শুনেছিলেন। প্রকাশিত পালাগুলির মধ্যে যেগুলির বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন সেগুলিই তাঁকে পালাসংগ্রহে ও প্রকাশে উৎসাহ দিয়েছিল।

দীর্ঘকাল শ্রীমৌলিক পূর্ববঙ্গে ঘুরে পল্লীগাথা সংগ্রহ করেছেন এবং গাথাগুলির গায়ক বয়াতী ও গায়েনদের সঙ্গে আলোচনা করে গানের সুর, তাল ও ছন্দ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া কাহিনী বর্ণনার অস্পষ্ট স্থানগুলিতে তিনি কথ্যভাষায় ব্যাখ্যা করে সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। পাঠান্তর,

সুবোধ্য শব্দের তাৎপর্য এবং প্রতিটি পালার পরিচয় ভূমিকা লিখে শ্রীমৌলিক তাঁর সম্পাদনার কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন।

প্রথম খণ্ডে বাইদ্যা কন্যা মহুয়া, সুন্দরী মলুয়া, চন্দ্রাবতী, দস্যু কেনারাম, আয়না বিবি, শ্যাম রায়ের পালা এই কটি পালা আছে। পাঠান্তর সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত টীকা ও ভূমিকা সমন্বিত এই পালাগুলি লোক-সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের বিশেষ কাজে লাগবে। তাছাড়া আছে একটি ছড়া [illegible] শ্রীমৌলিক এমন [illegible]

দীনেশচন্দ্রের গীতিকা সংগ্রহের পরিপূরক হিসেবে শ্রীমৌলিকের এই গীতিকা সংগ্রহ বিশেষ মূল্যবান বলে আমরা মনে করি। ১৩৭/৭০

চিত্রাঙ্কণ

ছবির কথা। অহিভূষণ মালিক। কলা-মন্দির, ২৮।১বি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। ছয় টাকা।

ছবি আঁকেন শিল্পী, লক্ষ লক্ষ রসিক দর্শক ছবির সমাদর করেন। অথচ ছবিটির সম্যক উপলব্ধি না ঘটলে সমাদর করা সম্ভব নয়। কবিতা বুঝতে যেমন ভাষা, কবিতার ব্যাকরণ ও কাব্যরীতির এগিয়ে চলার ইতিহাস কিছুটা জানার দরকার, চিত্রকলা বুঝতে গেলেও তেমনি। একটি শিল্পীর ছবি আঁকার পেছনে আছে তাঁর মেজাজ, পরিবেশ এবং ছবি আঁকার নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা ঐতিহ্য। তাই কোন উঁচুদরের ছবি ঠিকমত বুঝতে গেলে শুধু-মাত্র চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের নির্ভরই যথেষ্ট নয়, ছবি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানও অপরিহার্য। বাংলা ভাষায় ছবি আঁকা শেখান নিয়ে মূলত ড্রইং তত্ত্বের কিছু কিছু বই আছে, কিন্তু ছবি বোঝার উপযোগী বই চোখেই পড়েনি। ছবি আঁকার সঙ্গে ছবি বোঝার বিষয়টি ছোট বয়স থেকেই আরম্ভ করা দরকার। প্রখ্যাত চিত্রকলা সমালোচক ও শিল্পী অহিভূষণ মালিক ছোটদের জন্য 'ছবির কথা' বইটি লিখে এই অভাবটি পূরণ করার কিছুটা চেষ্টা করেছেন। ছোটদের উদ্দেশ করে লেখা হলেও, বহু বড়, যাঁরা ছবির শিল্পরীতি ও বিকাশ সম্পর্কে জানার সুযোগ পাননি, তাঁদের পক্ষেও বইটি সমান উপযোগী।

চিত্রকলার অঙ্গ ও আঙ্গিক অগ্রগতির নানা বিষয় সহজ করে বলা হয়েছে বইটিতে। রঙের কাজ কি, চিত্রকলার কম্পোজিশন, রবীন্দ্রনাথের ছবি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছবির পার্থক্য, চীনা ও জাপানী চিত্রকলা, ভারতীয় চিত্রকলা, প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রকলা, বাইজানটাইন আর্ট, রেনেসাঁস, ইমপ্রেশনিজম, স্যানডে পেন্টার, সেজান ও কিউবিজম, ফভিজম, সুররিয়ালিজম, এক্সপ্রেশনিজম, অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ও অ্যাকশন পেন্টিং, বারোক, সিয়েনীজ ঘরোয়ানা, ফ্লেমিশ স্কুল, স্পেনের চিত্রধারা, রিয়ালিসটিক আর্ট, মিশরের শিল্প, রোমান আর্ট, গ্রীক আর্ট ও হাইনরিক শ্লেইমানের কীর্তি, ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন, কালিঘাটের পট-শিল্প, ভারতীয় শিল্পের ষড়ঙ্গ, ক্যালকাটা গ্রুপ ইত্যাদি নিয়ে অল্প কথায় সরসভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গগ্যাঁ ভ্যান ঘঘ [illegible] স্মরণীয় [illegible] বর প্রতিলিপি ছবি বুঝতে সাহায্য করবে। বিখ্যাত শিল্পী নীরদ মজুমদারের আঁকা বহুবর্ণ প্রচ্ছদ-ছবিটি শুধু সুন্দরই নয়, একটি অনুপম চিত্রকলার নিদর্শন হিসেবে বইটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বইটির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

ছবি দেখতে শেখার এ বইটি ছোটদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য, অনেক বড়দের পক্ষেও দরকারী। সবার পক্ষেই বইটি ছবি দেখার চোখকে আরো তীক্ষ্ণ, আরো সরস করে তুলবে, সন্দেহ নেই।

কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-১২। ছ টাকা।

'ভারবি' পরিকল্পিত শ্রেষ্ঠ কবিতামালার অন্তর্গত শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রকাশ আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক সমাজের কাছে এক সুসংবাদ সন্দেহ নেই। চল্লিশের অন্যতম শক্তিমান কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এখনো অক্লান্ত এবং তার কাছে বাঙালী কাব্যপাঠকের প্রত্যাশা এখনো যথেষ্ট পরিমাণে অপেক্ষিত। তবু তার সুদীর্ঘকালের কাব্য সাধনার নিরলস প্রচেষ্টার একখানি সামগ্রিক দৃষ্টান্ত হিসাবে আলোচ্য শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন-খানির প্রকাশ রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটিতে কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহচ্যুত' থেকে একালের 'হাওয়া দেয়' পর্যন্ত সুদীর্ঘ ত্রিশবৎসর ধরে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থধৃত অজস্র কবিতা স্থান পেয়েছে। ভূমিকা থেকে জানা যায়, কবি স্বয়ং নিজের কবিধর্মের বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে কাব্যগ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলীকে কালের দিক থেকে ঈষৎ এদিক সেদিক করেছেন। এর ফলে, কাব্যক্রমে একটা চমৎকার ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাব্য সাধনার ভেতর দিয়ে দেশ-কাল-মানুষ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ জগতের সন্ধান দিয়েছেন। কবিকে বলা যেতে পারে, অনেকটা পরিমাণে 'কমিটেড'। কবিতাকে এতটা পরিমাণে চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা আধুনিক বাংলা কবিতায় দুর্লক্ষ্য না হলেও এ বিষয়ে তাঁর আপসহীন প্রয়াস তাঁর কবিতাবলীকে এক বিরল অনন্যতা দান করেছে। 'সমস্ত পৃথিবী করো মানুষের একটি জন্মভূমি/মানুষের প্রেমে দীপ্ত, শ্রমে মুখরিত, তপস্যায় পরিশুদ্ধ, অমল স্বদেশ'। প্রকৃতি এবং প্রেমবিষয়ক কবিতাতেও এই উক্তা বিকিরিত।

১১/৭০

বিধাতার অদ্ভুতপূর্ব সৃষ্টি : অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীনয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১ রমানাথ পাল রোড, কলিকাতা-২৩।

এই গ্রন্থখানাতে লেখক কবি নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কবির প্রতি লেখকের বিনম্র শ্রদ্ধা বইটিতে সুপরিস্ফুট।

প্রাপ্তি স্বীকার

From Savagary to Civilisation : M. N. Roy. Renaissance Publishers Pvt. Ltd. : 15 Bankim Chatterjee St., Calcutta-12. Price Rs. 8.

সময়ের কাছে কেন/আমি বা [illegible] মানুষ। শংকু রক্ষিত। শতরূপা : [illegible] মাকড়দহ রোড, হাওড়া—১। মূল্য ৩·০০।

গান্ধীবাদ। সত্যব্রত ঘোষ। ২ করুণাময়ী ঘাট রোড, কলিকাতা-৪১। মূল্য ২·০০।

তুমি এলে। নির্মলকুমার বসাক। তপেন্দ্র স্মৃতি আসর ১১/২ বৈঠকখানা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

মঞ্চের বাইরে মাটিতে। অরুণ মিত্র। সারস্বত লাইব্রেরী : ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·৫০।

জামায় রক্তের দাগ। মণীন্দ্র রায়। সারস্বত লাইব্রেরী : ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·০০।

প্রবন্ধ সংকলন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। সারস্বত লাইব্রেরী : ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৮·০০।

আবর্ত—ইতিহাস উনকোটি। জয়ন্তনাথ চৌধুরী। সারস্বত লাইব্রেরী : ২০৬ বিধান সরণী, : কলিকাতা-৬। মূল্য ৫·০০।

বল্লভপুরের মাঠ। দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী। ডি এম লাইব্রেরী : ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ৬·০০।

ক্ষুধা। সত্যকাম। শ্রীশোভা দত্ত : ৩৭/এল, চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০। মূল্য : ৩·০০।

গোলটিই এবারকার এশিয়ান গেমস-এর, পাঁচটি খেলায় ভারতের বিরুদ্ধে একমাত্র গোল। এই গোলের ফলেই পাকিস্তান পায় এবারকার এশিয়ান গেমসের একমাত্র স্বর্ণপদক।

ভারত ও পাকিস্তান, বিশ্ব হকির দুই দিকপাল দল। খেলায় উত্তাপ স্বাভাবিক পরিণতি। তাছাড়া দুই দেশের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে হকির লড়াই আরও গরম হবার কথা। কিন্তু সুখের বিষয় এবারকার ফাইনালে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অধিকন্তু গত ১০ বছরের মধ্যে এই খেলাটিকে সবচেয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ, সবচেয়ে গতিময় এবং সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন হকি খেলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। খেলার শেষে পরাজিত ভারতীয় খেলোয়াড়রা আলিঙ্গন করেছে পাকিস্তানের বিজয়ী খেলোয়াড়দের। প্রাণপণ সংগ্রামের পর এই প্রাণের স্পর্শই খেলাধূলার অন্যতম লক্ষ্য। কে সোনা পেল, কে পেল রুপো সেটা বড় কথা নয়। খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবই ক্রীড়া আসরের পরম সৌন্দর্য। তাই পাকিস্তান ও ভারত দুই দেশের খেলোয়াড়দেরই অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আশা করছি আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে দশ দেশকে নিয়ে বিশ্ব হকির যে আসর বসবে সেখানেও এই মনোভাব বজায় থাকবে।

ব্যাংককে সোনা হারালেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই। তারা সাধ্যমত সংগ্রাম করেছে। বিশেষ করে তরুণ খেলোয়াড়রা। রাইট ব্যাক বিনোদ-কুমার, রাইট ইন বলবীর এবং সেন্টার ফরোয়ার্ড হরবিন্দার সিং—মেক্সিকো অলিম্পিকের এই তিনজনই ছিলেন ভারতীয় দলের বয়ীয়ান খেলোয়াড়। বাকি সবাই উঠতি খেলোয়াড়। ব্যাংককের অভিজ্ঞতা তাদের ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির পথ সহজ করে তুলবে বলে আশা রাখি।

নীচে ভারত ও পাকিস্তানের খেলার ফলাফল দেওয়া হল।

ভারত—৭ : সিঙ্গাপুর—০
ভারত—৬ : সিংহল—০
ভারত—২ : মালয়েশিয়া—০
ভারত—১ : জাপান—০
ভারত—২ : মালয়েশিয়া—০
পাকিস্তান—৩ : জাপান—০
পাকিস্তান—১০ : হংকং—০
পাকিস্তান—০ : থাইল্যাণ্ড—০
পাকিস্তান—৫ : মালয়েশিয়া—০

ফাইনাল

পাকিস্তান—১ : ভারত—০

তৃতীয় স্থানের খেলা

জাপান—১ : মালয়েশিয়া—০

ফুটবল

ফুটবলে ভারতের ব্রোঞ্জ পদক লাভ অবশ্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক। যদিও এশিয়ান গেমস-এর মোট ৬টি খেলার মধ্যে ভারতকে জাপানের কাছে এবং সেমি-ফাইন্যালে বরমার কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে তবুও তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় আবার জাপানকে হারিয়েই ভারত ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। জাপান শুধু গতবারের এশিয়ান গেমস-এর ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারীই নয়, মেক্সিকো অলিম্পিকের ফুটবলেও জাপান ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন বরমার কাছে ভারত সেমিফাইনালে হার স্বীকার করলেও কোন অংশে খারাপ খেলেনি। তাছাড়া শক্তিশালী ইন্দোনেশিয়াকে ৩—০ গোলে পরাজিত করেছে ফুটবলের উন্নত কলা-চাতুর্যের পরিচয়ে। এই খেলায় ভারতের প্রতিটি খেলোয়াড় খুবই ভাল খেলেছেন। বিশেষ করে সুধীর কর্মকার, নাইম, সি প্রসাদ, শ্যাম থাপা ও মগন সিং।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এবার মারডেকা ফুটবলেও ভারত তৃতীয় স্থান পেয়েছে, এশিয়ান ফুটবলেও নষ্ট সম্মান কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছে। নীচে ভারতের খেলার ফলাফল দেওয়া হল।

ভারত—২ : থাইল্যাণ্ড—২
(সুভাষ ভৌমিক)
ভারত—২ : দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—০
(হাবিব ও মগন সিং)
ভারত—৩ : ইন্দোনেশিয়া—০
(নটরাজ, মগন সিং, শ্যাম থাপা)
ভারত—০ : জাপান—১
ভারত—০ : বরমা—২
ভারত—১ : জাপান—০

ফাইনাল

বরমা—০ : দঃ কোরিয়া—০
(যুগ্ম বিজয়ী)

ওয়াটারপোলো

ব্যাংককের এশিয়ান গেমস থেকে ওয়াটারপোলো খেলার রৌপ্য পদক নিয়ে আসায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের এই কারণেই সাধুবাদ জানাচ্ছি যে, ১৯৫১ সালে ভারতের মাটিতে আয়োজিত প্রথম এশিয়ান

ব্যাংককে ভারতের পদক জয়

প্রতিযোগী	বিষয়	পদক
যোগীন্দার সিং	লোহার বল ছোঁড়া (রেকর্ড)	স্বর্ণ
পারভিন কুমার	ডিসকাস ছোঁড়া (রেকর্ড)	স্বর্ণ
মহীন্দার সিং গিল	হপ স্টেপ ও জাম্প (রেকর্ড)	স্বর্ণ
কমলজিৎ সাধু	৪০০ মিঃ দৌড় (মহিলা)	স্বর্ণ
চাঁদগী রাম	১০০ কেঃ জিঃ ওয়েট মল্লযুদ্ধ	স্বর্ণ
জাওয়া সিং	হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ	স্বর্ণ
ই সিকুইরা	৫০০০ মিঃ দৌড়	রৌপ্য
শ্রীরাম সিং	৮০০ মিঃ দৌড়	রৌপ্য
এস জি শেঠি	ডেকাথলন—অ্যাথলেটিকস	রৌপ্য
লাভ সিং	হপ স্টেপ ও জাম্প	রৌপ্য
৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ের প্রতিযোগীরা		রৌপ্য
অজিত সিং	১০ কিঃ গ্রাঃ ওয়েট মল্লযুদ্ধ	রৌপ্য
এস ভেনু	ফেদার ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ	রৌপ্য
হকি খেলা		রৌপ্য
ওয়াটারপোলো খেলা		[illegible]
ভীম সিং	হাই জাম্প	ব্রোঞ্জ
৪×১০০ মিটার দৌড়ের প্রতিযোগীরা		ব্রোঞ্জ
হরমেজ সিং	৩০০০ মিঃ স্টিপল চেজ	ব্রোঞ্জ
লাভ সিং	লং জাম্প	ব্রোঞ্জ
সুচা সিং	৪০০ মিটার দৌড়	ব্রোঞ্জ
নেত্রপাল	৮২ কে জি ওয়েট মল্লযুদ্ধ	ব্রোঞ্জ
মুক্তিয়ার সিং	৭৪ কে জি ওয়েট মল্লযুদ্ধ	ব্রোঞ্জ
ওমপ্রকাশ	৬৮ কে জি ওয়েট মল্লযুদ্ধ	ব্রোঞ্জ
সোলি কন্ট্রাক্টর ও এ হোসেন	ইয়াটিং এন্টারপ্রাইজ	ব্রোঞ্জ
ফুটবল দল		ব্রোঞ্জ

গেমস-এর পর কোনো এশিয়ান গেমসেই ওয়াটারপোলো দল পাঠানো হয়নি। বলতে গেলে দীর্ঘ উনিশ বছর আন্তর্জাতিক ওয়াটারপোলো খেলার সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়দের কোন পরিচয় নেই। তার উপর এবারও ওয়াটারপোলো দল পাঠানো নিয়ে টালবাহানা হয়েছে। দল গড়ার ব্যাপারেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আছে। অনুশীলন শিবিরও ঠিকমত পরিচালিত হয়নি। তবু ভারতের ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়রা যে ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানের কাছে ৪—২ গোলে পরাজিত হয়েছেন সেটা তাদের কৃতিত্বেরই পরিচয়। খেলার বিবরণেও দেখেছি জাপানের সঙ্গে ভারত প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং দুটি গোল খেয়েছে অভিজ্ঞতার অভাবে। ভারতের খেলাগুলির ফলাফল নীচে দেওয়া হল।

ভারত—৭ : সিঙ্গাপুর—৭
ভারত—৪ : তাইল্যান্ড—৩
ভারত—৯ : ইন্দোনেশিয়া—৬
ভারত—৬ : ইরাণ—৩ (সেঃ ফাঃ)
ভারত—২ : জাপান—৪ (ফাইনাল)

একলব্য

বাংলা ছবির এক বছর

বাংলা ছবির একটি বছর—১৯৭০ সাল—নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। '৭০ সালের বাংলা ছবি "দিবারাত্রির কাব্য" (নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক পরিচালিত) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য মাধবী মুখোপাধ্যায় উর্বশী পুরস্কার লাভ করেছেন। উর্বশী পুরস্কার বাংলা দেশে এই প্রথম এল। '৭০ সালে যে জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হল তাতে কলকাতার চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন এবং অভিনেতা উৎপল দত্তের জয়লাভও উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁদের ছবি (ভুবন সোম) হিন্দী। সেদিক থেকে এবার জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছেন আরও কয়েকজন বাঙালী শিল্পী ও কলাকুশলী। তাঁদের মধ্যে সকলের আগে শচীন দেববর্মণের নাম করতে হয়।

বাংলা ছবিতে '৭০ সালে সর্বাধিক নবাগত শিল্পীর আগমন ঘটেছে। সত্যজিৎ রায়ের "প্রতিদ্বন্দ্বী"-তে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, জয়শ্রী রায়, দেবরাজ রায় মমতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নতুন শিল্পীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। মৃণাল সেনের ইন্টারভিউ-র দুই উল্লেখযোগ্য নতুন শিল্পী হলেন রঞ্জিত মল্লিক ও বুলবুল মুখার্জি। "মেঘ ও রৌদ্র" ছবিতে হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং "বিলম্বিত লয়" ছবিতে দীপা চট্টোপাধ্যায় দুই বিশিষ্ট নবাগত অভিনেত্রী।

সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে দর্শকরা এ-বছর দুটি ছবি পেয়েছেন। "অরণ্যের দিনরাত্রি"-তে অনেককাল পর কাবেরী বসু অভিনয় করেছেন। "নায়ক"-এর পর শর্মিলা ঠাকুরের বাংলা ছবিতে আবার অভিনয় "অরণ্যের দিনরাত্রি"-তেই। বোম্বাইয়ের সিমিকেও দেখা গেল এই ছবিতে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীও এই প্রথম চিত্ররূপ পেল। "প্রতিদ্বন্দ্বী"—সত্যজিৎ রায়ের চিত্রতালিকায় একদিক থেকে অতুলনীয় সৃষ্টি এবং বাংলা ফিল্মে এক নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট। এই সব বিচারে '৭০ সালে দর্শকরা শ্রীরায়ের কাছ থেকে পেলেন অনেক কিছু।

এই বছরের বাংলা ছবিতেই দিলীপকুমার ও সায়রা বানু (সাগিনা মাহাতো) পার্শ্বাংশ ভূমিকায় অভিনয় করলেন। বাংলা ফিল্মের জগতে তাই তপন সিংহের "সাগিনা মাহাতো" একটি বিশেষ ঘটনা।

মোট ছাব্বিশটি বাংলা ছবি ১৯৭০ সালে মুক্তি পেয়েছে। তাতে সর্বাধিক ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার (মোট ৬টি)। সব চাইতে বেশি সংখ্যক ছবির নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (মোট ৮টি)। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায় তিনটি বাংলা ছবির নায়ক। মাধবী মুখোপাধ্যায় তিনটি ছবির নায়িকা। নানা বিষয়বস্তুর ছবি '৭০ সনের তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পৌরাণিক ও জীবনীমূলক ছবির সংখ্যা তিন (নল দময়ন্তী, মহাকবি কৃত্তিবাস এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন)। ক্রাইম উপকরণ সম্বলিত বাংলা ছবিও চারটির বেশি নয় (কলঙ্কিত নায়ক, মুক্তিস্নান, দুটি মন ও পদ্মগোলাপ)। যদিও এগুলিকে ক্রাইম ছবি বলা চলে না। বেশির ভাগ ছবি সামাজিক, সমসাময়িক জীবনের পটভূমিতে তোলা ছবিও আছে (অরণ্যের দিনরাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী, ইন্টারভিউ)।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছে দুটি ছবি (অরুন্ধতী দেবীর "মেঘ ও রৌদ্র" এবং স্বদেশ সরকার পরিচালিত "শাস্তি")। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে এই দ্বিতীয়বার ছবি হল—"দিবরাত্রির কাব্য"। রূপদর্শীর কাহিনী নিয়ে প্রথম ছবি "সাগিনা মাহাতো"। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিশিপদ্ম), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (প্রথম কদম ফুল), সমরেশ বসু (স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মঞ্জরী অপেরা), শক্তিপদ রাজগুরু (মুক্তিস্নান), বিশ্বনাথ রায় (কলঙ্কিত নায়ক), নীহাররঞ্জন গুপ্ত (মেঘ কালো) প্রমুখ কাহিনী-

"আজকের নায়ক" (পরিচালক : দীনেন গুপ্ত) ছবিতে সমিত ভঞ্জ ও সুমিত্রা মুখার্জি

ফটো—দেশ

বোম্বাই বিচিত্রা

স্টার সিসটেমের সঙ্গে 'অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে' আছেন যারা সিলিং সিসটেম যে তাঁদের প্যাঁচে ফেলবে এ তো জানাই কথা। মাছের তেলে মাছ ভেজে এতদিন যাঁরা ছবি বানাচ্ছিলেন, মানে যাঁদের ছবি হয়ে যাচ্ছিল তাঁরা সিলিং সিসেটেমের প্রথম স্ট্রোকটা কোনমতে সামলে নিয়েই 'সিলিং'টাকে যাতে 'ফলস সিলিং'-এ পরিণত করা যায় সেদিকে মন দিয়েছেন। আমাদের দেশ ঠেকে শেখার দেশ, তাই নিত্য নতুন আইন প্রণয়ন এখানকার দৈনিক সংবাদপত্রের প্রাত্যহিক খবর। নতুন আইন জারী করা হয় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাই সে খবর সকলেই পায়। কিন্তু আইনকে লঙ্ঘন করবার পন্থা যাঁরা আবিষ্কার করেন তাঁরা হলেন মৌন কর্মী, তাঁদের কাজ চলে তলায় তলায়। মৌন কর্মীরা কাজে লেগে গেছেন। মুখর আইন প্রবর্তকরা সচেতন হোন।

পৃথিবীর সমস্ত ব্যবসায়ই চাহিদা এবং সরবরাহ নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে একমাত্র মানুষ আর ফিলিম ছাড়া বাকি সব কিছুরই চাহিদা বেশী আর সরবরাহ কম। আসলে ফিলিমেরও চাহিদা তেমন কম নয়। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহটা যথেষ্ট পরিমাণ বেশী। তাই ফিলিমওয়ালাদের নাকালের অন্ত থাকে না। সারা ভারতবর্ষে মোট সিনেমা হাউসের সংখ্যা হাজার ছয়েক, আর গড়ে ভারতীয় ছবির উৎপাদন সংখ্যা বছরে প্রায় তিনশো। সুতরাং বর্তমান অবস্থার জাঁতাকলে ফিলিমওয়ালারা যৎপরোনাস্তি নাস্তানাবুদ এবং প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের কৃপাপ্রার্থী। অনেক আইন কানুন করেও প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের পথে আনা যাচ্ছে না। তাঁদের আবদার দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। দেশের প্রত্যেকটি বড় শহরের সিনেমা হাউসের মালিকরাই আসলে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের ভাগ্য বিধাতা। তারকাদের নিয়ে মাঝারি ধরনের ছবি বানাতে যা খরচ হয় তার অর্ধেক খরচাতেই দেশের যে কোন বড় শহরে একটি সিনেমা হাউস বানানো চলে এবং যদি বানানো যায় তাহলে সাদা-কালোর মিলিয়ে কমপক্ষে মাসিক তিরিশ হাজার নেট প্রফিট ঠেকানোর কোন উপায় নেই। অর্থাৎ যে প্রেক্ষাগৃহের মালিক শুধু ছবি দেখিয়ে বছরে তিন লক্ষের বেশী রোজগার করেন তাঁর কিন্তু সিনেমা ব্যবসায়ে কোনো রিস্ক নেই। সিনেমা ব্যবসায়ে স্টার, প্রেক্ষাগৃহের মালিক এবং সরকার সবসময়েই ব্যবসায়ের কোন ঝক্কি কাঁধে না নিয়েই সিনেমা ব্যবসায় থেকে কেবল রোজগার করে চলেছেন। এবং প্রায়শই এঁদের কারুর রোজগারই সিনেমা শিল্পের উন্নতির জন্য রোজগারের ফিলিম ব্যবসায়ের পুঁজি হয়ে ফিরে আসে না। ছবি সফল হোক আর না হোক, স্টার তার আকাশচুম্বী পয়সা পায়, সরকার আমোদকর পান এবং প্রেক্ষাগৃহ পায় হয় ফিক্সড হায়ার নয় প্রটেকশন মানি। কোন রকমের প্রটেকশন নেই শুধু চিত্রনির্মাতার আর আপাতচক্ষে পরিবেশকের। মাঝে মাঝে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের ধাতস্থ করতে নানা রকম আইন কানুন করা হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। আর হবেও না। কারণ আইনের যত আস্ফালন তার নিজস্ব সীমার মধ্যে। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন আইনমত একটি বিশেষ ছবি একটি বিশেষ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এবং নিজ গুণে যতদিন চলতে পারে—চলবে। অথচ প্রেক্ষাগৃহের মালিক সেই ছবিটি চালাতে চাইছেন না কারণ ঠিক সেই সময়ে বিশেষ কোন কারণে অন্য একটি ছবি তিনি চালাতে চান তাঁর হাউসে। কিন্তু আইনত তা করতে পারছেন না। তখন তিনি আলোচ্য ছবির প্রযোজক বা পরিবেশককে আড়ালে ডেকে তাঁর মনোভাব জানালেন। বলাই বাহুল্য আইন যাদের সহায় তারা সহজেই আড়ালের অনুরোধ শোনেন না। আমাদের প্রযোজক বা পরিবেশকও শুনলেন না। তখন প্রেক্ষাগৃহের মালিক জানালেন, 'ঠিক আছে তাহলে নির্ধারিত দিনেই আপনাদের ছবি আমার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে—কিন্তু ছবি যদি না চলে তাহলে দোষ দেবেন না।' ছবির প্রযোজক এবং পরিবেশক নিজেদের প্রডাক্ট সম্বন্ধে অত্যন্ত কনফিডেন্ট। তাঁরা বললেন, 'ঠিক আছে।' প্রেক্ষাগৃহের মালিক হেসে বললে, 'ঠিক নেই। কেননা আপনাদের ছবি চলতে চলতে অনেকবার ছিঁড়ে যাবে, মাঝে মাঝেই হলের এয়ার কণ্ডিশন ফেল করবে—এবং এসব ব্যাপারে তো কারুরই কিছু করার নেই, দৈবপাতি তো কোন আইনের কবলে পড়ে না।' এবার বুঝুন ছবির প্রযোজক এবং পরিবেশকের অবস্থা। প্রেক্ষাগৃহের মালিকের কথা শুনে প্রযোজক তো চটে আগুন, কিন্তু পরিবেশক বিজ্ঞ লোক, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যে চলে না এ

রাজ কাপুরের "মেরা নাম জোকার" : রাজকাপুর এ-ছবির প্রধান অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক

নীতিবাক্য তাঁর জানা, সুতরাং তিনি বললেন, 'আপনি যাঁদের ছবি চালাতে চাইছেন তাঁরা এক্ষেত্রে কী করছেন? প্রেক্ষাগৃহের মালিক বিস্তৃত জানালেন পরিবেশক রাজি। আইনের অংক মিলে গেল নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত প্রেক্ষাগৃহে আইন সম্মত উপায়ে আইন নির্বাচিত ছবিটি মুক্তি পেল।

এই হল আমাদের দেশে আইনের অবস্থা। আমাদের দেশে চিত্রনির্মাতারা এক-একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আর প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা হলেন কুলীন বরপক্ষ। যতদিন ফিলিমকন্যার সংখ্যা বেশী ততদিন তাঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। ফিলিমে স্লিপিং প্রথার প্রবর্তনের ফলে ফিলিমের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া খুব স্বাভাবিক, এবং ফিলিমের সরবরাহ কম হওয়া মানেই প্রেক্ষাগৃহের প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়া। সুতরাং বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি স্লিপিং প্রথাকে বানচাল করতে প্রায় বদ্ধ পরিকর। তলে তলে তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন। স্লিপিং প্রথার প্রথম ধাক্কায় যে সব চিত্রনির্মাতারা আপাতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁরাই সম্ভবত এই দলের প্রথম শিকার হবেন।

সরল শর্মা

ছায়াছবির অশালীন বিজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে অশ্লীল সিনেমা পোস্টার ও বিজ্ঞাপনের ওপরে কড়া নজর রাখবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন হিসেবে যে সব পোস্টার লাগানো হয়, তার মধ্যে কিছু কিছু সুরুচির পরিচায়ক নয়। এমন কি এগুলি অনেক ক্ষেত্রে অশালীন ও অশ্লীল। জনসাধারণ ও আইনসভা সদস্যদের কাছ থেকে এই মর্মে অভিযোগ পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। এমন অভিযোগও করা হয়েছে যে, এই সব পোস্টার এমন সব দৃশ্য থাকে যেগুলি ছায়াছবি থেকে সেন্সর করে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছেন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই সব আপত্তিকর সিনেমা পোস্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা রাজ্য সরকার ও পৌর কর্তৃপক্ষের আছে। সমস্ত ছায়াছবির পোস্টার প্রদর্শনের আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করে রাজ্য সরকারগুলি যাতে আইন প্রণয়ন করে এবং দরকার হলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ নম্বর ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেন তার জন্যেও রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বোম্বাইয়ে বিবেকানন্দ ক্লাবের অনুষ্ঠান

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বাঙালীর দুর্গাপূজা, বাঙালীর গান, বাঙালীর নাটক এবং এক কথায় বাঙালীর সংস্কৃতি যে মহারাষ্ট্রের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক জীবনে বিকশিত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া গেল বান্দ্রা-খার অঞ্চলের বিবেকানন্দ ক্লাবের অনুষ্ঠানে। বিবেকানন্দ ক্লাব ১৯৫৮ সনে

বিবেকানন্দ ক্লাবের শিশু-অনুষ্ঠান

প্রতিষ্ঠিত। এবারে দুর্গাপূজায়ও এই ক্লাব শিবাজী পার্কের নাটক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তাঁরা মঞ্চস্থ করেন ধনঞ্জয় বৈরাগী 'রূপালী চাঁদ'।

গত ১৬ অক্টোবর এই ক্লাবের সভ্যরা বান্দ্রায় মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে মিলনোৎসব উদযাপন করেন। এই অনুষ্ঠানের দুই মুখ্য শিল্পী ছিলেন মান্না দে ও স্বপন গুপ্ত। দিব্যেন্দু গুহর পরিচালনায় অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের একাঙ্ক 'সমাজসেবী বিজয় হরি' নাটক দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৫ ডিসেম্বর বান্দ্রার সেন্ট থেরেসা স্কুল হলে শিশুদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শিশুদের সংগীত, আবৃত্তি, নাচ ও নাটক দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেয়। বিবেকানন্দ ক্লাবের নিজস্ব একটি দল আছে। এঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকেন। এঁদের বিশেষ প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান হল 'ভারতের লোকসংগীত'।

"মেরা নাম জোকার" আগামী সপ্তাহে

বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত রাজ কাপুরের "মেরা নাম জোকার" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। তিনটি অধ্যায়ে ছবিটি তৈরি, চার ঘণ্টা পনেরো মিনিটের ছবি। সার্কাসের এক ক্লাউনের জীবনের সাতটি উপাখ্যান নিয়ে ছবির তিনটি পর্ব। পৃথিবীর মানুষকে সুখী করাই এই ক্লাউনের জীবনের ব্রত। রাজ কাপুর ছবির পরিচালক, প্রযোজক এবং প্রধান শিল্পী।

"স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে" (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে দিলীপ রায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

নির্বাক চলচ্চিত্র উৎসব

ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইন্ডিয়া এবং ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের যুগ্ম ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় আমেরিকার নির্বাক চলচ্চিত্রের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। দুই জায়গায় উৎসব চলছে—সরলা রায় মেমোরিয়াল হল এবং আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টার। উৎসবে দেখানো হচ্ছে নির্বাক যুগের কিছু বিখ্যাত ছবি।

গত বুধবার সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। ওইদিন দাদাভাই ফালকে পরিচালিত ভারতীয় নির্বাক চিত্রের অংশ এবং আমেরিকার 'দি ডেজার্টার' দেখানো হয়। দাদাভাই ফালকের 'শ্রীকৃষ্ণ জন্ম', 'ভক্ত প্রহ্লাদ' এবং 'সেতুবন্ধন' ছবিগুলির কিছু দৃশ্য প্রদর্শনীর অন্তর্গত।

শতাব্দীর হাসির নাটক

শতাব্দী সংস্থার 'বঙ্গভঙ্গপারের রূপকথা' নাটকটি পুনরভিনীত হচ্ছে আগামী ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫-৩০টায় প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে। রচনা ও নির্দেশনা বাদল সরকার।

'সব হিসেবের বাইরে'

আগামী ৩০শে ডিসেম্বর রঙ্গনায় কবিতা সিংহের পরীক্ষামূলক নাটক 'সব হিসেবের বাইরে' মঞ্চস্থ করছেন তরুণ নাট্যগোষ্ঠী শিল্পী যাযাবর। এ'রা এই সংগে এ'দের বহু প্রশংসিত নাটক অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রমত্ত প্রহসনও মঞ্চস্থ করছেন। নাটকের মঞ্চ ও আলোকসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীহীরক মুখোপাধ্যায় এবং নাটকটি পরিচালনা করছেন শ্রীজগন্নাথ বসু।

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

রবীন্দ্র সদন কর্মনির্ধারক সমিতির উদ্যোগে ২৫ থেকে ২৯ ডিসেম্বর, পাঁচদিন-ব্যাপী একটি প্রথম আঞ্চলিক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবাংলার ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট সংস্থাগুলি যোগদান করেছেন।

"রূপসী" ছবির প্রেস শো-তে সত্যজিৎ রায়, "রূপসী"র প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরী ও উত্তমকুমার

প্রমথেশ স্মৃতিসভা

প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে সম্প্রতি (২৯ নভেম্বর) উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে চিত্রাচার্য প্রমথেশ বড়ুয়ার ১৯তম মৃত্যুদিবস পালিত হয়। সভানেত্রী ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী ও শ্রীমতী যমুনা দেবী। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীরবীন মজুমদার। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নেন শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় ও শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

সভা শেষে বড়ুয়ার 'শেষ উত্তর' চিত্রটি দেখানো হয়।

সুকৃতি সংঘের বার্ষিক অনুষ্ঠান

সুকৃতি সংঘের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দুদিনব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। প্রথম সিলুয়েট সংস্থার 'আবার দর্শনিক' ও দ্বিতীয় দিনে তরুণ সংঘের 'সামান্য-অসামান্য' নাটকাভিনয় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

রাজন্যভাতা বিলোপের আদেশ খারিজ বর্তমান সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। রাজন্যবর্গের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিয়ে ১৯৭০ সালের সেপটেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি যে আদেশ জারি করেন, সুপ্রিম কোর্ট ১৫ ডিসেম্বর তা সংবিধান বিরোধী ও অপ্রযোজ্য বলে রায় দিয়েছেন। অধিকাংশ বিচারপতির রায়ে রাজন্য বর্গের স্বীকৃতি প্রত্যাহার সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশটি বাতিল হয়ে যায়। দেশীয় রাজ্য গুলি ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় ভারত সরকার প্রাক্তন নৃপতিদের জন্য রাজন্যভাতা ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে স্বীকৃত হন। স্থির হয়—বছরে মোট ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা রাজন্য ভাতা দেওয়া হয়। তা ছাড়াও অন্যান্য অনেক সুযোগ-সুবিধাও তাঁরা পেয়ে থাকেন। স্বাধীনতার আগে স্বয়া ভারতের ৩/৫ ভাগ বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল বাকি ২/৫ অংশ শাসন করতেন ৫৬২ জন দেশীয় রাজা। তন্মধ্যে একজন নৃপতির রাজ্যের আয়তন ছিল মাত্র আধ বর্গমাইল আর রাজস্ব বছরে ১৮০ টাকা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির আদেশ বহাল রাখার জন্য চেষ্টা হবে বলে আশা করা যায়।

দেশী সংবাদ

১৪ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষের একমাত্র পুত্র শ্রীদীপ্তিমান ঘোষ (২২) আজ সকালে কলকাতায় তাঁদের কাশীপুরের বাড়িতে একদল যুবকের অতর্কিত আক্রমণে গুরুতর জখম হন। আততায়ীরা ছোরা, রড ও পাইপগান নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয়। আক্রান্ত পুত্রকে বাঁচাতে গিয়ে মা শ্রীমতী মাধুরী ঘোষ (৪৪) ছুরিকাহত হন। পরিমলবাবুর পুত্র ও স্ত্রীকে সুকলাল কারনানি হাসপাতালে পাঠানো হয়। দীপ্তিমানের অবস্থা সংকটজনক।

প্রখ্যাত কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক আজ কলকাতার বালিগঞ্জ প্লেসের বাসভবনে সকাল দশটা কুড়ি মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর এক মিনিট আগেও তিনি তাঁর বড় ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর।

১৫ ডিসেম্বর—ইনজিন ড্রাইভার ধর্মঘটের ফলে আজ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিসনের উত্তর, মেইন ও দক্ষিণ শাখায় সারা দিন লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। রেল-কর্তৃপক্ষের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এদিন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কোন লোকাল ট্রেন ছাড়া যায়নি। কোন ট্রেন শিয়ালদহ আসেও নি।

আজ সকালে কলকাতা পোর্ট পুলিস চা বোঝাই একখানি জাহাজ থেকে কয়েকটি চায়ের বাকস আটক করে। অভিযোগ : ওই সব বাকসের ভিতরে চায়ের বদলে কাঠের গুঁড়ো ভর্তি ছিল। জাহাজখানি লনডন যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি বাকস ভেঙে যাওয়ায় নাকি ওই কাঠের গুঁড়ো দেখতে পাওয়া যায়।

১৬ ডিসেম্বর—আজ মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে ধৃত নকশালপন্থী ও কারারক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষে সাতজন নিহত ও আটজন আহত হন। তখন বেপরোয়া ইট ও পাথর ছোঁড়া হয় [illegible] লোহার রড [illegible] হয় এবং কম্বলের স্টোর ও [illegible] ইত্যাদিতে আগুন লাগিয়ে দেওয় হয় নক [illegible] পন্থীদের হাতে বন্দী কয়েকজন সহকর্মীকে উদ্ধার করার জন্য কারারক্ষীরা গুলি চালায়।

নেভিল ম্যাকসওয়েলের চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ বইয়ে পরিবেশিত তথ্যাদি গোপন নথিপত্র থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা তা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরকে তদন্ত করে দেখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ লোকসভায় এ কথা ঘোষণা করেন।

১৭ ডিসেম্বর—বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে পাঁচজন খুন হন। এ ছাড়া আসানসোলের কাছে হীরাপুরে পুলিস দল আক্রান্ত হয়ে গুলি

চালালে ২ জন নিহত হন। পুলিসসূত্রের খবর অনুসারে ওই পাঁচটি খুনের মধ্যে তিনটির ক্ষেত্রে উগ্রপন্থীরা জড়িত। একটি রাজনৈতিক শত্রুতা এবং বাকি একটি ব্যক্তিগত শত্রুতার পরিণতি।

সংবাদপত্রের রেজিসট্রার আজ লোকসভায় ভারতের পত্রপত্রিকা ১৯৭০ নাম দিয়ে একটি রিপোরট পেশ করেন। তাতে আগের বছর— ১৯৬৯ সালের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আনন্দবাজার পত্রিকার দৈনিক প্রচার ২৩১,০৫০ কপি। ১৯৬৮ সালের প্রচারের চেয়ে ১৯,৭৮৭ কপি বেশী। এই সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সবগুলি সংবাদপত্র মিলিয়ে প্রচার-সংখ্যা কমেছে মোট ৭৩,০০০ কপি।

১৮ ডিসেম্বর — বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগাপ্রসাদ রাই আজ রাতে তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়ে যাওয়ায় নব কংগ্রেস পরিচালিত সংকটাকীর্ণ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আয়ু ফুরালো। এই মন্ত্রিসভা ৩০৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল শ্রীরাইকে মুখ্যমন্ত্রিত্বের কাজ চালাতে বলেন।

আজ বেলা প্রায় তিনটায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান কলেজে তাঁর নিজের ঘরেই ছুরিকাহত হন। আক্রমণকারীদের বাধা দিতে গিয়ে ওই বিভাগের ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেনট শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য [illegible] হন।

১৯ ডিসেম্বর—একখানি রুশ রিলিফ বিমান আজ পানাগড় বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের অদূরে আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয়। বিমানটিতে সতেরজন আরোহী ছিলেন, সকলেই মারা গিয়েছেন। ঢাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়ে বিমানটি দিল্লীর বিমান বন্দরের পথে পানাগড়ের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে।

হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিরোধ আইন সংক্রান্ত উপদেষ্টা বোরডের চেয়ারম্যান এবং বারাসত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এক সদস্য তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীতারাপদ মুখার্জি (৬৪) আজ সকালে বালিগঞ্জ রবীন্দ্র সরোবরের অজ্ঞাত তিনজন আততায়ীর ছোরার আঘাতে গুরুতর আহত হন। তাঁকে শুকলাল কারনানি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

২০ ডিসেম্বর—রিজারভ ব্যাঙ্ক-এর ১৯৬৯-৭০ সালের রিপোরটে বলা হয়েছে যে, গত বছরের তুলনায় বর্তমান আর্থিক বছরে বাজারে অতিরিক্ত ৩৬৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ছাড়া হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এই বছর নোট ছাড়া হয়েছে অনেক বেশী, মুদ্রা ছাড়া হয়েছে কম।

পানাগড়ে রুশীয় বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত করতে মসকো থেকে একটি রুশ বিশেষজ্ঞ দল আগামীকাল পানাগড়ে এসে পৌঁছবেন। এদিকে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষও একটি তদন্ত আদালত বসিয়েছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৪ ডিসেম্বর—ফিলড মারশাল লরড স্লিম আজ ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ চতুর্দশ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। তিনি কিছুকাল অসট্রেলিয়ার গবরনর জেনারেলও ছিলেন।

১৫ ডিসেম্বর—আজ মুখোশ ও বন্দুকধারী ৬ জন দুর্বৃত্ত উত্তর লনডনের একটি ব্যাংকে হানা দিয়ে ৫০ হাজার পাউনড (৯ লক্ষ টাকা) নিয়ে চম্পট দেয়। ব্যাংকের একজন কর্মণিক এবং একজন (ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছিলেন) এই ঘটনায় নিহত হন।

১৬ ডিসেম্বর — পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমান গতকাল ঢাকায় বলেন যে, গত শনিবার চট্টগ্রাম বন্দরে তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। তিনি ওই ঘটনার সঙ্গে সম্প্রতি করাচি বিমানবন্দরে পোলিশ রাষ্ট্রনায়কদের উপর আক্রমণের তুলনা করেন। ওই ঘটনায় পোলিশ রাষ্ট্রমন্ত্রী নিহত হন।

১৭ ডিসেম্বর—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন পোল্যানডের কোন কোন অঞ্চলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তার ফলে ডানসক এবং পোল্যানডের উত্তর বালটিক উপকূলের বিভিন্ন অংশে যে সংঘর্ষ হয় তাতে ১২ জন মারা গিয়েছেন এবং কয়েক শত লোক আহত হয়েছেন।

১৮ ডিসেম্বর — এক পক্ষকালের মধ্যে দ্বিতীয়বার শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর অপরিসীম জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিলেন। আর ভুট্টো পরিচয় দিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের দুটি প্রদেশ পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে তাঁর প্রভাব প্রশ্নাতীত। পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার ৩০০ আসনের মধ্যে ২৬৫টি দখল করে মুজিবরের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে নিরংকুশ গরিষ্ঠ হয়েছে ভুট্টোর পিপলস পারটি।

১৯ ডিসেম্বর—আজ নেভাদার মারকারিতে মৃত্তিকাগর্ভে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময় মৃত্তিকার ছিদ্রপথে অকস্মাৎ তেজস্ক্রিয় মেঘপুঞ্জ আকাশের দিকে উঠে যায়। ফলে এখানকার প্রায় ছয়শত কর্মীকে ছুটে পালিয়ে যেতে হয়।

২০ ডিসেম্বর—পোলিশ কমুনিসট পারটির প্রধান শ্রীগ্রোমুলকা গোমুলকা স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন পোলিটব্যুরোর সদস্য এডওয়ারড গিয়েরেক।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরাজানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রু'র স্বাদ ! নতুন স্বাদ !

একমাত্র মল্টটনিক যাতে আছে ৬টি ভিটামিন—ভিটামিন বি-১২ সমেত
সুস্বাদু
অস্টোমল্ট
বিশুদ্ধ কমলার রসে ভরা
যোগায় বাড়তি উৎসাহ
যোগায় বেশী ক্ষিদে
যোগায় সুস্থ রক্ত
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-এ উজ্জ্বল চোখের জন্য (ওর উজ্জ্বল চোখ এখন দ্যুতিতে ভরা)
অস্টোমল্টে আছে আয়রণ,— যা সুস্থ রক্ত গ'ড়ে তোলে (ওর গাল এখন আর আগের মত পাংশুটে নয়)
অস্টোমল্টে আছে রিবোফ্লাবাইন আর বি-১২—যা ক্ষিদে বাড়ায়. বি-১ হজমে সাহায্য করে (ইদানিং ও দু'বার ক'রে চেয়ে খাচ্ছে)
অস্টোমল্টে আছে মল্ট উৎসাহ আর শক্তি বাড়াতে (ও এখন কত বেশী প্রাণবন্ত, আগের চেয়ে ওর ঘুমও ভাল হয়)
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-ডি— সুস্থ সবল দাঁত আর মজবুত হাড় গ'ড়ে তুলতে (ওর এখন একটি সাইকেল চাই-ই' খুব তাড়াতাড়ি বড়সড় হয়ে উঠছে)
অস্টোমল্টে আছে নিকোটিনামাইড,—যা মুখে স্বাভাবিক এক সুস্থ দীপ্তি ফুটিয়ে তোলে (নাবিকের পোশাকে ওকে ছবির মত সুন্দর দেখায়)
Ostomalt
গ্ল্যাক্সোর
অস্টোমল্ট
পুষ্টি আর শক্তির জন্য সত্যি অতুলনীয়!
গ্ল্যাক্সোর তৈরী
ASP/G/0-2

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

অধ্যাপক অরবিন্দ চক্রবর্তী একটি সম্মানিত নাম। এ নামটি যাঁর, সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণ তাঁর প্রচুর : বিদ্যাবত্তা, শিক্ষক হিসাবে সুনাম, সততা, চারিত্র্য প্রভৃতি নানাবিধ। মানুষ হিসেবেও তাঁর লোকপ্রিয়তা অসামান্য। তবু, অবিবাহিত প্রৌঢ় একক এই মানুষটির জীবনের আর একটি দিকও ছিল; অন্ধকার অপ্রকাশ্য গোপন আর একটি দিক—যেখানে তিনি মদ্যপ, নৈশ অভিসারী লম্পট, বারবনিতা-সক্ত। সম্পূর্ণ বিরোধী এই দুটি সত্তার দ্বন্দ্বজাত দাহ থেকে জন্ম যে আত্মানুসন্ধানের তা-ই এক অকপট স্বীকৃতির রূপ নিয়েছে সমরেশ বসুর এই নতুন উপন্যাস 'অবচেতন'-এ।

মানুষের সংস্কারাবদ্ধ কোনও বিশ্বাস অবচেতনের গভীরে দৃঢ়মূলে হয়ে বাসা

সমরেশ বসুর

নতুন উপন্যাস

অ ব চে ত ন

বাঁধলে তা-ই কি শেষ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য হিসেবে দেখা দেয়? এবং শেষ পর্যন্ত ছোট্ট একটি কাঁচপোকা যেমন বড় এক তেলাপোকাকে সম্মোহিত করে ও মোঘ আকর্ষণে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে, অবচেতনের অতলে সুপ্ত ছোট্ট একটি গূঢ়ৈষাও কি সমগ্র জীবনকে তেমনি করে তার ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করে? —এরকম একটি সংশয়ও এ উপন্যাসে উপস্থিত।

● এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস ●

মানুষ ৪·০০ যার যা ভূমিকা ৭·০০ সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা ৪·০০ এপার ওপার ৫·০০ প্রজাপতি ৬·০০ স্বীকারোক্তি ৫·০০ বিবর ৫·০০ ফেরাই ৩·০০ দুই অরণ্য ৬·০০

নিশীথ ফেরী

নরেন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ৫·০০

একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকদের সামনে উদ্যত হয়ে উঠবে : কেন এই হত্যাকাণ্ড?

আঁধার পেরিয়ে

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ দাম ৫·০০

এক বারবনিতা এবং এক শিখ লরি-ড্রাইভার—সমাজের একেবারে নিচুতলার এই দুটি অবহেলিত ও ঘৃণিত মানুষের জীবনতৃষ্ণার এক অনবদ্য কাহিনী ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

ঘুণপোকা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ দাম ৪·০০

নৈরাশ্য এবং নির্বেদের অন্ধকার অতলে ডুবতে ডুবতে কেমন করে একটি মানুষ ধীরে ধীরে লক্ষ্যান্তরিত হল জীবনচর্যা এবং ভালোবাসায়, তারই এক অসাধারণ কাহিনী ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

সাক্ষী বালুচর

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দাম ৪·০০

লোকালয় থেকে দূরে এক পুরনো ভাঙা বাংলো বাড়িতে এক রাতে পালিয়ে-আসা দুটি যুবক-যুবতীকে নিয়ে সংঘটিত এক শ্বাসরুদ্ধকর মর্মান্তিক কাহিনী ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান

মতি নন্দী ॥ দাম ৪·০০

তরুণ লেখকের এই অনন্যসাধারণ উপন্যাসটি বর্তমানের নিম্ন-মধ্যবিত্ত নাগরিক-জীবনের চরম ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে হারতে হারতেও হার না-মানার এক অনবদ্য আলেখ্য ॥

হলুদ বসন্ত

বুদ্ধদেব গুহ ॥ দাম ৪·০০

একটি তরুণ যুবমনের তীব্র আবেগ-কামনাময় প্রচণ্ড ভালোবাসার এক অনন্য বাণীরূপ এই মিষ্টি প্রেমের উপন্যাসটিতে বিধৃত হয়েছে ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

অসংলগ্না

বনফুল ॥ দাম ৩·০০

বস্তুতে কতকগুলি ভাব ও কল্পনাকে ব্যক্তির আরোপ করে উপন্যাসে সম্পূর্ণ 'অসংলগ্না' নতুন রীতিতে লেখা এক অদ্ভুত-পূর্ব উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

কুবেরের বিষয় আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ১০·০০

কুবের সাধুখাঁ নামে একটি মানুষ, যে বিষয়ের মধ্যে শিকড় প্রবিষ্ট করিয়েও বৈভবের মধ্যে আশ্রয় পায়নি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির মধ্যেই আশ্রয় খুঁজেছিল, তার জীবনের এক করুণ ট্র্যাজেডি ॥

জল দাও

সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ দাম ৩·৫০

তিমিরকুমারের মৃত্যুর কারণ পিপাসা। অথচ পৃথিবীতে ঝরনা ছিল, নদীতে জল ছিল—ছিল আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতেরও সম্ভাবনা। তবুও কেন ওর তৃষ্ণা নিবারিত হল না? দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৯ ॥
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯ ॥

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৯
শনিবার ১৭ পৌষ ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
*
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
*
টেলিফোন
২৩-২২৪৩ ২৩-৮০৫১
*
চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক ... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক ... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ... ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,, ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,, ... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,, ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,, ... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক ... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,, ... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,, ... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... ৩৯.০০
ষাণ্মাসিক ... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক ... ১০.০০
*
দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা
*
DESH

Saturday 2, Jan. 1971

অন্তর্বর্তী নির্বাচন : লোকসভা বাতিল

ইংরেজী নব বৎসর তার গোপন ভাণ্ডারে আমাদের জন্যে কী কী মজুত রেখেছে—কতখানি সুখ শান্তি বা কী পরিমাণ দুঃখ অশান্তি—তা অবশ্য এখন থেকে অনুমান করা যায় না। তবে বৎসরের প্রথম অনুগ্রহ, লোকসভা বাতিল হয়ে গেছে, আবার একটি নির্বাচন আসন্ন। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হচ্ছে। অনেকদিন ধরেই এরকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সময় সুযোগ বুঝে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন চেয়ে বসবেন, এবং সেটা '৭১ সালের গোড়ার দিকেই। পেশাদারী জ্যোতিষীদের মতন পেশাদারী রাজনৈতিক নেতারা নানা ধরনের অঙ্ক কষে থাকেন, সেটা সব সময় না মিললেও মাঝে মাঝে মিলে যায়। শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে এই ধরনের অঙ্ক কষা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল, তিনি কখন কী করবেন, কোন্ সময় কোন্ চমক লাগাবেন তা আগেভাগে ঠাওর করা ঝানু রাজনীতিকদেরও অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুদিন আগেও শ্রীমতী গান্ধীর মুখ থেকে প্রকাশ্যভাবে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কথা আদায় করা যায়নি। বরং তাঁর হাবভাব থেকে মনে হচ্ছিল, নির্বাচনের কথাটা পুরোপুরি গুজব। হালে অবশ্য জানা গিয়েছিল, লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন গুজব-কথা নয়, প্রধানমন্ত্রীর দল তাঁকে এগিয়ে যেতে বলেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তারপর, রবিবার সাতাশে ডিসেম্বর রাত্রে শ্রীমতী গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি লোকসভা বাতিল করে দিয়ে আচমকা এক ঘোষণা দিলেন। ব্যাপারটা একেবারেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন যদি মাস দুই পরে, মার্চ মাসের গোড়ায় হয়—তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কী হবে? পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনও কী এই সঙ্গে হয়ে যাবে? সেটাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা। আর কিছু না হোক, নির্বাচন, অন্তর্বর্তী নির্বাচন, তারপর আবার অন্তর্বর্তী—এই ব্যাপারটা আমাদের যেন ধাতস্থ হয়ে গেছে। যাঁরা ভোট দেন এবং যাঁরা ভোট নেন—উভয় পক্ষই বোধ হয় মনে করেন মাঝে মাঝে এ-রকম হওয়া মন্দ কী, রাজনৈতিক বাজার বেশ গরম থাকে। উনিশ শো সাতষট্টি থেকে এ-যাবৎ সত্তর পর্যন্ত—তিন বছরে দু দফা নির্বাচন হয়ে গেছে এখানে, দু দফা জনপ্রিয় বামপন্থী বা কংগ্রেস-বিরোধী সম্মিলিত দল শাসন ক্ষমতায় এসেছেন, দু বারই সে মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। শুধু পতনই হয়নি—পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্থ চেহারা আরও দীন আরও বীভৎস হয়ে উঠেছে। আবার একটি নির্বাচনের পর কী হবে আমরা জানি না। এইমাত্র বলতে পারি, রাষ্ট্রপতির শাসন নিশ্চয় কারও কাম্য নয়, কিন্তু তেমন সরকার গঠনের মূল্য কী—যদি দেখা যায় ফিরে ফিরে সেই রাষ্ট্রপতির শাসনই এই রাজ্যে কায়েম হচ্ছে? বরং যে রাজনৈতিক কোন্দল পরে মন্ত্রিসভায় গিয়ে লড়তে হবে সেটা যদি আগে-ভাগে লড়ে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া করে মন্ত্রিসভায় যাওয়া যায়—তাতে কিঞ্চিৎ সুবিধে হতে পারে, অন্তত আমাদের। কিন্তু তা কী বাস্তবে সম্ভব?

এখন কথা হল, লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিধান-সভারও নির্বাচন হচ্ছে—এ-কথা কে বলল? সরকারীভাবে কেউ এমন কথা বলেননি। আমরা বরং শুনে আসছি, পশ্চিমবঙ্গের এমন বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থার মধ্যে নির্বাচন হতেই পারে না। সম্প্রতি একটি খবরে দেখা গেল, জনৈক ডান কম্যুনিস্ট নেতা নাকি কলকাতায় তাঁর দলবলকে খবর দিয়েছেন—খুনোখুনি না থামলে গোটা দেশে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলেও পশ্চিমবঙ্গে আপাতত লোক-সভা এবং বিধানসভার নির্বাচন বন্ধ থাকবে। সে জায়গায় এই রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবে। ওদিকে জগজীবনবাবু দিল্লিতে সেদিন বলেছেন, অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গেও তা হবে, তবে একই সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন হবে কিনা তা তিনি সঠিক জানেন না। একেবারে শেষের যা খবর তাতে বলা হয়েছে, শ্রীমতী গান্ধীর দল পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে নাকি সম্মত হয়েছেন।

অবস্থা দেখে আমাদেরও সঠিক করে কিছু অনুমান করার উপায় নেই। তবে সব ক'টি রাজনৈতিক দলই ধরে নিচ্ছেন, এখানে নির্বাচন হবে, আর সেই মতন তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন। বিশেষ করে লোকসভা বাতিল হবার পর রাজনীতিতে দ্রুত তৎপরতা দেখা দিয়েছে, নির্বাচনী আবহাওয়া গড়ে ওঠার উপক্রমও লক্ষ করা যাচ্ছে। ঝিমিয়ে পড়া রাজনীতি আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, যেন নতুন বছরের উদ্বোধন হচ্ছে এই নির্বাচনের প্রস্তুতি দিয়ে।

১৯৭১
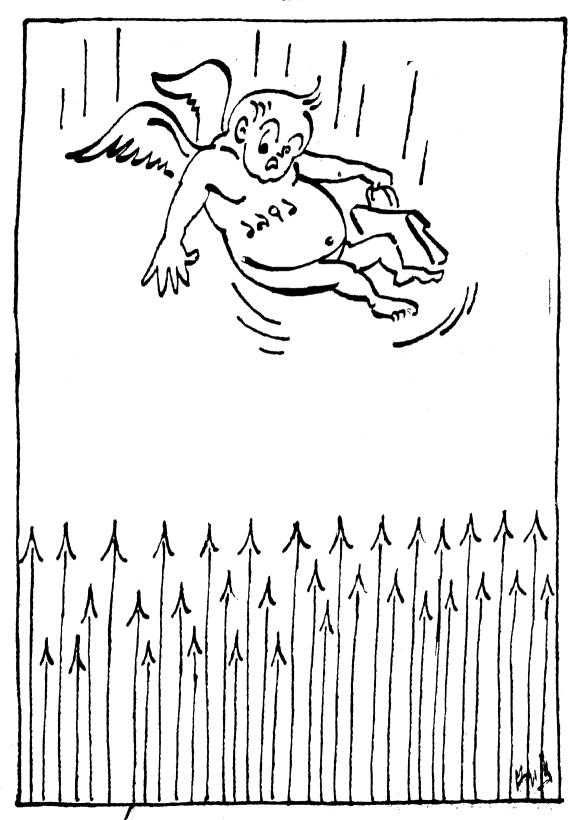
পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসকমণ্ডলী, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, অভিভাবক এবং প্রত্যেকটি হিতকামী ব্যক্তির সামনে আজ এক "হেলপলেস" অধ্যাপকের নিদারুণ মর্মপীড়ার কাহিনী পেশ করছি। আমাদের শিক্ষাজগৎ আজ কোন রসাতলে এসে পৌঁছেছে, তা এই আদর্শবান এক মফস্বল কলেজের অসহায় অধ্যাপকের মর্মভেদী কাহিনীই উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে।

কর্মস্থল থেকে উক্ত অধ্যাপক তাঁর পিতাকে (১২ ডিসেম্বর) যে ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলেন, এখানে হুবহু তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলাম : "কোলকাতার আবহাওয়া ক্রমশই মফস্বলে ছড়িয়ে পড়ছে। সম্প্রতি আমাদের কলেজে এর চরম প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাই এখন কলেজের বৈশিষ্ট্য। বড়ই মানসিক অশান্তিতে আছি। আমাদের কলেজের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় টোকাটুকি করতে না দেওয়ায় অন্যান্য কলেজের তুলনায় পাসের হার স্বভাবতই কম হয়েছে। ছাত্রদের এক প্রতিনিধিদল কনট্রোলার অব একজামিনেশন এবং উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করলে তাঁরা নাকি 'তোমরা কেন টুকতে পারনি?' 'কে তোমাদের টুকতে বারণ করেছে?' ইত্যাদি বলে ছাত্রদের বর্ধমান থেকে বিতাড়িত করেন। তখন এরা আমাদের কলেজে এসে প্রিন্সিপ্যালকে দিয়ে ট্রাংক কল করিয়ে (রেজাল্ট অফিসিয়ালি পাবলিশড্ হলেও এমন কি মার্কশীট কলেজে আসার পরও) পরীক্ষা পাস সংক্রান্ত ব্যাপারে স্পেশ্যাল কনসিডারেশন-এর ব্যবস্থা করে—যার ফলে সবচেয়ে মজার কথা, একেবারে অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার, ফেল করা ছাত্রদের পাঠান মার্কশীট আবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্পর্কিত অফিসে ফেরত পাঠান হয়। সেকেনড টাইমে যে নতুন মার্কশীট আসে, তাতে কতকগুলো বিষয়ে (যেমন ইংরেজি ৬০-এ পাস, তাতে ১২ নম্বর) গ্রেস দিয়ে অনেক ফেল করা ছাত্রকে 'পাসড্' বলে ঘোষণা করা হয়। আবার এর দু-চার দিন পরে থারড লিস্ট আসে। তাতে ইংরাজিতে ১৬ নম্বর দিয়ে আরও অনেককেই স্নাতক ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই ফোরথ লিস্ট আসবে (জানি না, এতে ৬০ নম্বরই গ্রেস দেওয়া হবে কি না)। এই পরিস্থিতিতেও ছাত্রদের মুখ্য দাবী—'আমাদের টুকতে দিতে হবে। প্রত্যেক কলেজে টোকার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—আমাদের কেন দেওয়া হবে না?' স্বভাবতই ক্লাস-লেকচারে ছাত্রছাত্রীদের কোনও আকর্ষণ নেই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদরদী শিক্ষাবিস্তার বিরোধী এই কার্যকলাপের নিন্দাসূচক

প্রতিবাদ দরকার। আমাদের কিছু করার নেই—আমরা হেল্‌পলেস।"

"মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মহাশয়, তিনি নিজেও একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতী, চিঠিখানা আমাকে পাঠিয়ে সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার জগন্নাথ কিশোর কলেজে।

তিনি লিখেছেন, "শুধু একটা প্রশ্নই মনে জাগে, শিক্ষাজগতের কর্তৃপক্ষ কি বুঝতে পারছেন না যে, এভাবে পরীক্ষা নিয়ে কোনও লাভ নেই। শুধু তাই নয়, তাঁরা বর্তমানে যে বিষবৃক্ষ রোপন করছেন, তার ফলে শুধু বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতে বহু বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাজগৎ সম্পূর্ণ বিষিয়ে থাকবে। এর মর্মান্তিক কুফলে বাঙ্গালী সমাজ, তথা বাংলা দেশ দীর্ঘকালের জন্য পিছিয়ে পড়বে।"

আমি ভাবছি, ছাত্র ও শিক্ষাজগতের প্রধান শত্রু কে? বুর্জোয়া-শিক্ষাবিরোধী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসকারী বালখিল্য নকশালী কালাপাহাড়েরা, না শিক্ষা জগতের এই সব অপরিণামদর্শী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অবিবেকী কাণ্ডারীগণ—যাঁদের হাতে আমরা, সাধারণ লোকেরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ পরম বিশ্বাসে সঁপে দিই। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভবিষ্যৎটিকে এইভাবে চিরতরে পঙ্গু করে দিতে যাঁদের বিবেকে আদৌ বাধছে না, নকশালী কালাপাহাড়দের চাইতেও সেইসব কাপুরুষ উপাচার্য, কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকগণ বা রাইটার্স বিলডিংসে আলো করে বসে আছেন যেসব অপদার্থ প্রশাসক, এরাই আমাদের বড় শত্রু। কারণ নকশালরা মূর্তি ভেঙে, স্কুল কলেজ ভেঙে বা ল্যাবরেটরি লাইব্রেরি পুড়িয়ে যে ক্ষতিটা করছে, সে ক্ষতি যত বিরাটই হোক তা একদিন পূরণ করা যাবে, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে যাঁরা সে দায়িত্ব পালন না করে চাকরিটা টিঁকিয়ে রাখার ফিকিরে কেবল হাজরে সই করে যাচ্ছেন বা মানে মানে শুধু ঠাটটুকু বজায় রেখে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাইছেন, শিক্ষার যুগোপযোগী সংস্কার সাধনে যাঁদের পরিকল্পনা এবং উদ্যম নেই, ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার যোগ্যতা, যাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন এবং ক্রমাগত নানাবিধ ঘুষ দিয়ে কখনও পরীক্ষা না নিয়ে প্রোমোশন, কখনও টুকবার অবাধ অধিকার প্রদান, কখনও বা ঢালাও গ্রেস মার্ক দিয়ে পাইকারি হারে পাস করানো) যাঁরা ছাত্রদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষাকেই পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ছাত্রদের মনে পশুত্ব, অশ্রদ্ধা, উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাধি ঢুকিয়ে দিয়ে যে সর্বনাশা ক্ষতি করছেন, তা কিছুতেই পূরণ হবার নয়। আমরা চাই সরকার একটি শিক্ষা কমিশন অবিলম্বে গঠন করে আমাদের শিক্ষা জগৎ সম্পর্কে একটা ব্যাপক তদন্ত করুন।

পশ্চিমবঙ্গে স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে লক্ষ্যবিহীন যে শিক্ষা সরবরাহ করা হচ্ছে তাই আজ এই রাজ্যের অরাজকতা এগিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রায় একলক্ষ দশ হাজার ছাত্র এখন শুধুমাত্র কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতার কলেজগুলোতেই পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশে ১৬ জন ছাত্র পিছু একজন অধ্যাপক থাকবেন। কিন্তু কলকাতার কলেজগুলোতে প্রতিটি অধ্যাপকের খোঁয়াড়ে ৭৫ থেকে ১০০ জন ছাত্র নামধারী জীব ভরে দেওয়া হয়। টিউটোরিয়ালের কোনও ব্যবস্থা এখানে নেই। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবস্থা চলে আসছে, কেউ পরিবর্তন চাননি। বিশেষ করে বামপন্থী মহল, ছাত্ররা যাদের কাছে আন্দোলনের হাতিয়ার মাত্র। (আপনারা একটু খোঁজ নিলে এই কথা জেনে পরম পুলকিত হবেন যে ঘোর বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের কুলতিলকদের অধিকাংশেরই পড়াশুনা এত ডামাডোলেও বেশ নিরুপদ্রবেই সমাধা হয়।) কমরেড জ্যোতি ভট্টাচার্যের পুত্র টুকে ফারস্ট ক্লাস পাবে, স্নেহশীল পিতা এটা বরদাস্ত করবেন বলে মনে হয় না, কমরেড সত্যপ্রিয়ের একে ক্ষতি কেমনা পোয়া বার হোক।

পড়াশুনার মান যত নেমে যাবে, ছাত্র অসন্তোষ তত বাড়বে, এ তো জানা কথা।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্ভব ?

নব কংগ্রেস সভাপতি জগজীবন রাম যদিও বলেছেন যে, ১৯৭১ সনে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবেই বলে ধরে নেওয়া ভুল, তবু প্রায় সবাই ধরে নিয়েছেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারি-মারচ মাসেই লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হচ্ছে। এই লেখা যখন ছেপে বের হবে ততদিনে হয়ত নির্বাচন সম্পর্কে সরকারী ঘোষণাও বেরিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কী করবেন কেউই জানে না। তবে, বহু রাজনৈতিক নেতা এবং রাজধানীর অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বলছেন যে, ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যেই তিনি সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবেন। আর তার পর নির্বাচন কমিশনার লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন।

এই সপ্তাহই শোনা যাচ্ছে, একই সময় পশ্চিমবঙ্গ ও মণিপুর বিধানসভারও নির্বাচন হবে। এই দুই রাজ্যে বিধানসভা এখন নেই। পশ্চিমবঙ্গ ও মণিপুরে লোকসভার আসনগুলির নির্বাচন করতে হলে এই দুই রাজ্যের বিধানসভারও নির্বাচন করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং মণিপুরে লোকসভার নির্বাচন করব, আর বিধানসভার নির্বাচন করা সম্ভব নয় বলব—তা তো আর হতে পারে না!

ইতিমধ্যেই অবশ্য গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য থেকেও খবর আসছে যে, প্রধানমন্ত্রী যদি ফেব্রুয়ারি-মারচে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন তাহলে একই সময় হিতেন্দ্র দেশাই এবং মোহনলাল সুখাড়িয়াও গুজরাট এবং রাজস্থানে বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন দাবি করতে পারেন।

মজা ব্যাপারটা লোকসভার অন্তর্বর্তী

নির্বাচন। যদি ফেব্রুয়ারি-মারচে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয় তাহলেই ওই সময় বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের প্রশ্ন আসবে। আর যদি '৭২-এ লোকসভার নির্বাচন না হয় তাহলে আপাতত রাজ্যগুলিতে নির্বাচনের প্রশ্নও উঠবেই না—যে দুটি রাজ্যে এখন বিধানসভা নেই সে রাজ্যগুলিতেও না।

*

লোকসভা এবং অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচন আর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কিন্তু একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। লোকসভার নির্বাচনের ব্যাপারে আসল প্রশ্ন, শাসক দল অর্থাৎ নব কংগ্রেস অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী এখনই নির্বাচনে যাবেন কি না? অন্যান্য রাজ্য বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আবার মূল প্রশ্নটা হল, লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে কি না?

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্নটা একেবারে ভিন্ন। এখানে মূল প্রশ্নটা হল, নির্বাচন হওয়ার মত অবস্থা আছে কি না, এ রাজ্যে মোটামুটি সুষ্ঠু ও স্বাধীন কোনও ভোটাভুটি এখন হতে পারবে কি না?

মোটামুটি সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারবে কি না, মোটামুটি স্বাধীনভাবে ভোটদাতারা মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন কি না, জনগণের ইচ্ছা নির্বাচনে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে কি না এসব প্রশ্ন ভারতের অন্য কোথাও তেমনভাবে নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চয়ই আছে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ অত্যন্ত অস্বাভাবিক। যেটা শহর কলকাতাকে ওপর ওপর দেখলে বোঝা যাবে না। এতই অস্বাভাবিক যেটা ট্রামে-বাসে, চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েও মালুম হবে না। এতই অস্বাভাবিক যেটা খবরের কাগজের ডে-টু-ডে রিপোর্টিং-এও ঠিক ধরা পড়ে না।

যখন রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গে প্রবর্তিত হল, যখন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে, "আইন ও শৃঙ্খলা না ফিরে আসা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবে না", সেই সময়ের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আজ অনেক অনেক গুণে খারাপ। শুধু যে খুন বেড়েছে তা-ই নয়, শুধু যে মারামারি বেড়েছে তাও নয়—পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলের একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এই এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ মনুষ্যের বহু গুণ বা দোষ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁদের সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই মৌলিক পরিবর্তন আজ চট করে বাইরে থেকে চোখে পড়ে না। চৌরঙ্গীতে যান, বিরাট ভীড়। পার্ক স্ট্রীটে যান, আলো ঝলমল করছে। অফিস খোলা বা ছুটির সময় ডালহৌসী পাড়ায় দেখবেন, লোক গিজ গিজ করছে। শিল্প এলাকায় যান, দিব্যি কলকারখানা চলছে। কিন্তু এটাই শহর পশ্চিমবঙ্গের সব নয়। আর একটা শোচনীয় ভয়ঙ্কর দিকও আছে।

ওই পার্ক স্ট্রীট বা চৌরঙ্গী বা ডালহৌসী বা শিল্পাঞ্চলে যদি হঠাৎ দেখেন একজন মানুষকে পাঁচটি রোগা লিকলিকে ছোকরা আক্রমণ করেছে তাহলেই চোখে ধরা পড়বে পশ্চিমবঙ্গের আসল রূপটা। দেখবেন হাজার হাজার মানুষ ছুটে পালাচ্ছে। দোকানপাটের ঝাঁপগুলি ঝটপট পড়ে যাচ্ছে। রাস্তাগুলি নিমেষে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আর তার পর ফাঁকা রাস্তায় শুধু একটি রক্তাপ্লুত দেহ পড়ে আছে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আধঘণ্টা পরে কেউ কেউ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসবেন। কেউ কেউ হয়ত টেলিফোনে পুলিসকেও খবর দেবেন। কিন্তু বাস, ওই পর্যন্তই। কেউ এই ছেলেগুলিকে বাধা দিতে এগোবে না, পুলিস এসে জিজ্ঞেস করলে কেউ বলবে না সে কিছু দেখেছে—এমনকি ওইসব ছেলেকে চিনলেও না।

একটা অদ্ভুত ভীতি পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছে। এইজন্যই দেখবেন, কলকাতায় ট্রামে বাসে চায়ের দোকানে এখন কেউ রাজনীতি

আলোচনা করেন না। প্রকাশ্যে একাধিক রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কেউ কোনও মন্তব্য করতেও সাহস পান না। পাড়াটা ভেঙে একজনকে খুন করছে দেখলেও হাজার হাজার মানুষ ভয়ে শুধু পালায়—কেউ বাধা দিতে, প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসে না।

*

এতো গেল একটা দিক। আরও একটা দিক আছে এবং সেই দিকটা আরও ভয়াবহ।

গোটা বৃহত্তর কলকাতা আজ মোটামুটি কতকগুলি জোনে বিভক্ত। এখনও অবশ্য কিছু কিছু ফ্রি জোন আছে—বিশেষ করে বড়লোকদের বসতি এলাকাগুলি। কিন্তু তা ছাড়া বৃহত্তর কলকাতার সব বসতি এলাকা পার্টিগত জোনে বিভক্ত। কোনওটা নকশাল জোন, কোনওটা সি পি এম জোন কোনওটা ফরওয়ার্ড ব্লক জোন, কোনওটা সি পি আই জোন। এমনি সব ভাগ। আপনি যদি জোনের বাসিন্দা সেই পার্টির আধিপত্য আপনাকে মানতেই হবে। এমন অবস্থা এখনও হয়নি যে, বাবু জোনে বাস করতে হলেই আপনাকে সেই পার্টিতে যোগ দিতেই হবে। তবে, আপনি অবস্থাপন্ন লোক হলে সেই জোনের কর্তাদের হয়তো আপনাকে চাঁদা দিতে হবে। কোনও মতে আপনি তাঁদের বিরোধিতা করতে পারবেন না। আপনি তাঁদের বিরুদ্ধে—এটা বুঝলে দিলেই আর রক্ষা নেই।

ধরুন, কমারটুলি-আহিরীটোলা এলাকার কথা। এটা নকশাল জোন বলে পরিচিত। এমন নয় যে, ও পাড়ার সাধারণ লোকের উপর নকশালরা সব সময় খবরদারি করছেন। তবে এটা সত্যি যে ওপাড়ায় কোনও সক্রিয় সি পি এম কর্মীর বসবাস সম্ভব নয়। কথাবার্তা চালচলনে নকশালদের বিরোধিতা করে কেউ আজ কমারটুলি-আহিরীটোলা এলাকায় বাস করতে পারেন না। বহু সি পি এম কর্মী তাই ওই এলাকায় বসবাস করা ছেড়ে দিয়েছেন। এমনকি কাজকর্মেও [illegible] ও এলাকায় যাচ্ছেন না।

ঠিক একই অবস্থা [illegible] [illegible] [illegible] এলাকায়। নকশালপন্থী বা সি পি এম-বিরোধী কোনও পার্টির সক্রিয় কর্মীর পক্ষে ও এলাকায় বসবাস করা সম্ভব নয়। [illegible] [illegible] নয়। নকশাল সমর্থক, এমনকি কংগ্রেসী বহু ছেলেকেও ওই এলাকা ছাড়তে হয়েছে।

গোটা বৃহত্তর কলকাতায় আজ এই অবস্থা। এইভাবে গোটা বৃহত্তর কলকাতা নানা পার্টি জোনে বিভক্ত। এলাকাগুলি পার্টিগত খাসতালুকে হয়ে গিয়েছে।

এই ভাগাভাগিটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। বোঝাও যায় না। কিন্তু সব রাজনৈতিক কর্মীরাই এই অবস্থাটা মানেন। তাঁরা ক্রমে ক্রমে সেইভাবে চলতে অভ্যস্তও হয়ে উঠছেন। কেউ ভুলেও শত্রুর জোনে ঢোকেন না। জোনে জোনে অবশ্য প্রায়ই যুদ্ধ চলে।

আর শুধু রাজনৈতিক দলের কর্মী কেন। সরকারী কর্মীরা, বিশেষ করে পুলিসও এখন এইসব এলাকা ভাগাভাগি মেনে চলেন। নকশাল জোনে কোনও পুলিস কর্মী বসবাস করেন না। স্ত্রী পুত্র পরিবার ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার পুলিস কর্মী এখন থানায় বা পুলিস মেসে বসবাস করেন।

সবচেয়ে বড় জিনিস, পশ্চিমবঙ্গের কোনও সাধারণ মানুষের আজ এই বিশ্বাস নেই যে, কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও হামলাবাজ তাঁকে মারতে চাইলে সরকার রক্ষা করতে পারবেন বা মারলে, যে মেরেছে তাকে পুলিস ধরতে পারবে।

এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অর্থাৎ স্বাধীন মতামতের অভিব্যক্তি সম্ভব হবে কি?

নির্বাচনের মুখে যদি নকশালরা ঘোষণা করেন যে, "যে ভোট দেবে তাকে দেখে নেব", তাহলে এই অবস্থায় কজন ভোট দিতে যাবেন?

নকশাল এলাকায় কজন সি পি এম কর্মীই বা নির্বাচনী প্রচার চালাতে সাহস পাবেন? আবার সি পি এম এলাকায়ও বা কজন কংগ্রেসী বা ফরওয়ার্ড ব্লকী নির্বাচনের প্রয়োজনে ঢুকতে ভরসা পাবেন?

পুলিস দিয়ে ব্যালট বাক্স পাহারা দেওয়া গেলেও যেতে পারে; কিন্তু ভোটদাতার মনের ভয় দূর করা যাবে কি?

নবারুণ গুপ্ত

২৬-১২-৭০

বিচারের প্রহসন

চল্লিশ দিন পরে দেশে ফিরেছেন জার্মান কূটনীতিক ইউজেন বেল-শেফার ডিসেম্বরের পঁচিশে। লড়াইয়ের পর এই প্রথম তিনি তাঁর আপনজনের সঙ্গে বড়দিন কাটাতে পারলেন না। সেদিন যদিও তিনি ছিলেন স্বদেশে, তাঁর পরিবারের আর সবাই ছিলেন অনেক দূরে, স্পেনের সান সিবাস্টিয়ান শহরে। তাঁদের ফেলে রেখে দেশে পালিয়ে আসেননি বেল-শেফার। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁকে আনা হয়েছিল পশ্চিম জার্মানিতে যেখানে তাঁর বাস। এনেছিলেন তাঁর দেশের সরকার নন তাঁরই একজন শুভাকাঙ্ক্ষী স্পেনের বাস্ক এলাকার একটি গুপ্ত সমিতির নির্দেশে। বেল-শেফার জাতে জার্মান, পেশায় বণিক, ব্যবসাসূত্রে তিনি থাকতেন স্পেনের সান সিবাস্টিয়ান বন্দরে। সেখানে তিনি ছিলেন পশ্চিম জার্মানির অনারারি কনসাল অর্থাৎ অবৈতনিক কূটনীতিক। ডিসেম্বরের পয়লা কাজকর্ম সেরে যখন তিনি বাড়ি ফিরছিলেন তখন তাঁর ওপর চড়াও হল একদল শহুরে গেরিলা। ইউরোপে তাদের আবির্ভাব এই প্রথম। দিন দুই পরে পিরেনিজ পাহাড়ের পথে তাঁর মার্সেডিজ গাড়িখানা পাওয়া গেল। আর ফ্রান্সের সাঁ দা লুজ শহরের বাস্ক উদ্বাস্তুদের খবর দেওয়া হলো যে, বেল-শেফার বাস্ক জাতীয়তাবাদীদের হাতে বন্দী।

বাস্করা হচ্ছে ইউরোপের একটা খুব পুরোনো জাত—কত পুরোনো তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতের মিল নেই। এখন তাদের দেখা মেলে পিরেনিজ পাহাড়ের দু-ধারে। দক্ষিণে স্পেনের নাভারা, আলাভা, গুইপুজকোয়া আর ভিজকায়াতে; উত্তরে ফ্রান্সের বাস-পিরেনিসে। নিজেদের একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলবার চেষ্টা তারা করে চলেছে অনেকদিন ধরেই, বিশেষ করে স্পেন থেকে বাস্করা যে সব অঞ্চলে বাস করে সেগুলোকে আলাদা করে নেবার আন্দোলন বহুকাল ধরেই চলছে। শুধু তাই নয়, একটা প্রবাসী বিদ্রোহী বাস্ক সরকার আস্তানা বেঁধেছে প্যারিসে বেশ কিছু দিন। তবে ফ্রাঙ্কো বেঁচে থাকতে তাদের মতলব হাসিল হবার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সে কথা বাস্ক স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও জানে। তা ছাড়া এতকাল পরে তাদের স্বাধীন হবার ইচ্ছেটাও আর তেমন জোরদার নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারা দু পয়সা করেছেও। সঙ্গে সঙ্গে বাড়াবাড়ির বাসনাও তাদের কমে গিয়েছে। তারা অবশ্য নিজেদের পুরোপুরি স্পেনের লোকদের শামিল করে নিতে চায় না। স্পেনীয় বলে পরিচয় দিতেও তাদের ঘোরতর অনিচ্ছে। তাদের অধিকাংশ

দেবরাজ

লোকই এখন অটোনমি অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পেলেই খুশী হবে।

কিন্তু জাত কিংবা গোষ্ঠীর সকলেই যে একমত হবে এতটা তো আর আশা করা যায় না। নরম-গরম দু রকম দল সব গোষ্ঠীর মধ্যেই থাকে, বাস্কদের মধ্যেও ও রকম মতের অমিল আছে। বিশ বছর আগে নরমপন্থী বাস্ক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। যারা চরমপন্থী তারা নতুন একটা দল গড়ে তোলে। তার নাম ইটা। ইউসকাডি টা আসকাটাসুনার সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মানে বাস্ক মাতৃভূমির স্বাধীনতা। ইটাও পরে ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একটার নাম সেলিপ। এরা নৈরাজ্যবাদী আর মাওবাদীদের সংগঠন। সন্ত্রাসবাদে এরা বিশ্বাসী। তারা শুধু বাস্কদের ভালো চায় না, তারা চায় স্পেনে পুরোনো সমাজ আর শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সেখানে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন করতে। দু নম্বর দল হচ্ছে ইটাবেরি অর্থাৎ নতুন ইটা। লড়াই করতে এরা নারাজ। সরকারের ওপর চাপ দিয়ে বাস্কদের দাবি আদায় করাই এদের লক্ষ্য। সে দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। তিন নম্বর দল হলো পুরোনো ইটার ঝড়তি-পড়তি নিয়ে গড়া ইটা। এদের মধ্যে আছে মার্ক্সিস্ট, স্বাতন্ত্র্যবাদী, কিছু সন্ত্রাসবাদীও।

বেল-শেফারকে গায়েব করেছিল ইটার লোকেরা। তাদের উগ্রপন্থী উপদলই এ কাণ্ডটা ঘটিয়েছে বলে লোকের বিশ্বাস। এর উপলক্ষ হচ্ছে স্পেনের বার্গোসে ১৬ জন উগ্রপন্থী নেতার কোর্ট মার্শাল। ওই যোলো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৯৬৮ সনে সান সিবাস্টিয়ানের গুপ্ত পুলিসের কর্তাকে খুন করার অপরাধে। এঁরা সবাই বাস্ক মুক্তি আন্দোলনের নেতা তো বটেই, ঘোরতর বামপন্থীও। লোকের সন্দেহ, ওঁদের ধরা হয়েছে সত্যিই পুলিস খুনের জন্যে তাঁরা দায়ী—এই সন্দেহে নয়, তাঁরা বামপন্থী এই অপরাধে। নইলে তাঁদের সাধারণ আদালতে বিচারের জন্যে হাজির না করে তাঁদের ফৌজী কোর্টে জেরা করার ব্যবস্থা হতো না। বাস্করা স্বাতন্ত্র্য কিংবা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাইছে বলে স্পেন সরকার ততটা বিচলিত নন যতটা সাম্যবাদী আন্দোলন সে দেশে মাথা চাড়া দেওয়াতে। কম্যুনিস্ট দল প্রকাশ্যে স্পেনে নেই, কেননা তেমন দল গড়া বেআইনী সে দেশে। আর রাতারাতি দেশটা লাল হয়ে যাবে এমন কোনও লক্ষণ দেখা দেয়নি। কিন্তু ফ্রাঙ্কো সরকার কোনও বিরুদ্ধবাদীদের সহ্য করতে প্রস্তুত নন। গণতন্ত্রে তো তাঁদের বিশ্বাস আদৌ নেই।

একত্রিশ বছর ধরে স্পেনের একচ্ছত্র প্রভু জেনারেল ফ্রাঙ্কো। এতদিন যা খুশি তাই তিনি করেছেন। ইউরোপে তিনি এক-দিন ছিলেন একঘরে বললেই হয়। সবে মাত্র তাঁর সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক বদলাতে শুরু করেছে। একটুখানি গণতন্ত্রের হাওয়া যেন ইদানীং বইতে আরম্ভ করেছিল সে দেশে। ইউরোপে তার জাতে ওঠবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। এমন কী দু-চারটে কম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গেও তার কথা-বার্তা শুরু হয়েছিল। কিন্তু বার্গোসে বিচারের প্রহসনে সারা ইউরোপ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহীদের বিচার করবার, তাদের সাজা দেওয়ার অধিকার সব দেশের সরকারেরই আছে। কিন্তু বিচারের নামে ভণ্ডামি কোনও গণতান্ত্রিক দেশই সহ্য করতে পারে না। স্পেনে বিদ্রোহ কেউ ঘোষণা করেনি, গৃহযুদ্ধের চেষ্টাও কাকে দেখা যায়নি অথচ স্পেন সরকার এমন সব কাণ্ডকারখানা করছেন যেন দেশে আইনও নেই শৃঙ্খলাও নেই, শান্তিও নেই নীতি-বোধও নেই। তাঁরা ঘোষণা করেছেন, বিচারে যদি কেউ বেকসুর খালাসও হয় তা হলেও তাকে আটক করে রাখার অধিকার সরকারের থাকবে, ছ মাস পর্যন্ত বিনা বিচারে কোনও লোককে ধরে রাখা চলবে।

স্পেন সরকারের এই দুর্নীতির খেসারত দিতে হয়েছে জার্মান কূটনীতিক বেল-শেফারকে। তাঁকে গুম করে বাস্ক মুক্তি আন্দোলনের নেতারা দাবি তুলেছিলেন যদি বার্গোসে যে বিচার চলছে তার যোলো জন আসামীকে খালাস করে দেওয়া হয় তা হলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। *সে দাবি যে ন্যায়সঙ্গত এ কথা অবশ্য বলা যায় না—সে দাবি স্পেন সরকার মানেনও নি।* বিচার প্রহসন ঠিকই চলেছে। তবে এক হিসেবে ইটার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ও বিচারের সঙ্গে ন্যায়নীতির যে কোন সম্পর্ক নেই তা টের পেয়েছে তামাম দুনিয়া। সর্বত্র ছি ছি পড়ে গেছে স্পেন সরকারের। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে খোদ স্পেনেই লোকে সরকারের কাজের ঘোর নিন্দা করছে। ফ্রাঙ্কো ভেবে-ছিলেন বাস্ক বিদ্রোহীদের বিচারের ব্যবস্থা করলে আপত্তি উঠবে বাস্ক অঞ্চলে, তাও সে এলাকায় যারা সরকারবিরোধী তাদের মধ্যে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিক্ষোভ দেখা দেবে সারা দেশে আর সমাজের সর্বস্তরে—এমন কী ফৌজী নেতারাও বাদ যাবেন না এতটা তিনি আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ভাবতে পারেননি।

মৃত্যুর নিয়ম

অনন্দ বাগচী

দরজায় আওয়াজ দিয়ে ঘরে ঢুকলে এমন দেখতে না
এতটুকু শিষ্টাচার অন্তত তোমার কাছে প্রত্যাশা করেছি,
দরজায় তিনটে টোকা, তিন বিন্দু শব্দ, মানে তিনটে বুদ্বুদ
অনন্ত কালের শর্তে কতটুকু? তোমার যৌবন থেকে কত
খরচা হত? দু এক লহমা মাত্র, আমাকে সময় দিতে যদি!
ব্যর্থ হৃদয়েরও চেয়ে ভারী, ক্লান্ত জুতো জোড়া খুলে
গলার সুভদ্র ফাঁস, সান্ধ্য নিমন্ত্রণের পোশাক
খুলে, বদলে, আলো জেলে, সপ্রতিভ সহজ হতাম,
তুমি তা দিলে না সখি, প্রায় গায়ে গায়ে ঘরে এলে।
নারী ও জুয়ার কাছে সময়ের ভিক্ষা কিছু নেই,
এই অগোছালো ঘরে ছন্নছাড়া উত্তরতিরিশে
এখন কোথায় খুঁজবো বিছানার চাদর কিংবা
সোফার ফুলদানি?
উদোম স্নানের ঘর, সিগারেটের টুকরো আর নচ্ছার দেশলাই
টেবিলে ছড়িয়ে আছে অন্ধকার বইয়ের পাতার মধ্যে ছাই।

অবৈধ সঙ্গমে, যুদ্ধে, নুনপক্ষে কয়েক বিঘত
জায়গা চাই, রুমালে মুখ মোছার মত সামান্য সময়,
চকিতে চুম্বনযোগ্য ওষ্ঠাধরে সামান্য আড়াল,
কিছু আনোনি সঙ্গে স্বয়ংবরা নায়িকা আমার
খসা আঁচলের শব্দ, বিপজ্জনক দুই উরুতটে এসে
ছলকায় অদৃশ্য কোনো জলরেখা, বসো এইখানে
বাইরে অশরীরী জ্যোৎস্না পা ঝুলিয়ে ছাদের কার্নিসে
বসে আছে। তুমি এসে আমার মুখের সামনে বসো,
বাতাসে গুলির শব্দ, রক্তের ভিতরে ভয়ঙ্কর চাঁদমারি।

সংলাপ আয়নার সামনে

ফণিভূষণ আচার্য

নবেন্দু আমার ছবি আয়নায় আজকাল মোটেই ফোটে না
এমন চরিত্রহীন সময়ের কাছে
আমাদের আর কিছু প্রত্যাশার নেই
আমার নিঃশব্দ ঘরে আগুনের মতো স্বচ্ছ আয়নার ভিতরে
আমার চরিত্র খুঁজে পেয়েছি অনেক দিন রিক্ত করতলে
যেখানে আকাশে তারা এবং মুখের ব্রণ
একসাথে গুনে গুনে শেষ করা যায়
নবেন্দু বিশ্বাস কর কিছুকাল থেকে আমি
ক্রমশ কেমন যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছি
মানুষ এবং এই সময়ের কাছে।

উদ্ধৃত অনেক ধুলো মাকড়শার ঝুলে
ঘাতকের নিশ্বাসের মতো এই কলকাতার ঘর্মাক্ত ধোঁয়ায়
আমরা কেমন দ্যাখ পরস্পর থেকে দিন দিন
ভীষণ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছি ক্রমশই
মৃত আকাশের নিচে ক্ষয়িষ্ণু পাহাড়দের মতো দীর্ঘশ্বাস
পদশব্দ ভেঙে ভেঙে প্রতি মুহূর্তেই আমরা
নেমে যাচ্ছি জারুলের চিতার ভিতরে।

নবেন্দু আমার ছবি আয়নায় আজকাল মোটেই ফোটে না
অথচ শৈশবে দ্যাখ আমাদের কত দূরে প্রতিশ্রুতি ছিল
গ্রাফিক আকাশ ছিল ভালোবাসবার মতো বাতাস এবং
আয়নায় সনির্বন্ধ প্রেম
চিড়িয়াখানায় সেই সদ্য-আনা জলহস্তিনীর
বিশাল হাঁ দেখে আমরা প্রথম রোমাঞ্চ পেয়েছিলুম শরীরে
আটতিরিশ বছর আমরা ধোঁয়ায় ঘৃণায় আর ব্যর্থ অন্ধকারে
নির্বাসিত
মুক্তাকাশ রেস্তোরাঁয় হার্দ্য এক মহিলার হাই-তোলা
মুখের ভিতরে
বহু দূরে অন্ধকার দেখে আমি ভয়ে কেঁপে উঠি

দু হাতে দুঃখের জট অভিজ্ঞতা তিক্তমূল ক্ষয়িষ্ণু শিকড়ে
চরিত্রের প্রতিশ্রুত সব স্থির মেরুরেখা মুছে
নবেন্দু কেমন দ্যাখ
জ্বলন্ত ছায়ার মতো আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি অদৃশ্য সংলাপে

ঘূরন্ত মঞ্চে

প্রতিমা ঘোষ

ঘূরন্ত মঞ্চে একে একে ঘুরে যাচ্ছে
নরম মোমবাতির আলোয় কাঁপা মুখ—
ধানক্ষেত—ঘাসের সবুজ গালচে
জ্বলন্ত ট্রেন—চলন্ত মিছিল।

ঘুরতে ঘুরতে মঞ্চের আলোয়
আবার দেখা গেল
মিনারের পাশে তন্বী চাঁদ
ঝকঝকে সাদা পায়রা
শ্বেত পাথরের সমাধিস্তম্ভের ওপরে—
নরম নীলের গায়ে উড়ন্ত হাঁসের সারি
ট্রেনের জানলায় মিলিয়ে-যাওয়া পুরনো কেল্লা।

আবার,— বিমূঢ় সহস্র মুখ—
মশালের আলোয় নররক্ত দিয়ে
প্রেতপুজার সমারোহ—
মঞ্চের পরদায়...কাঁপছে...পাশাপাশি
সাদা মিনার—জ্বলন্ত কঙ্কালের সারি।

ছবি

আবু কায়সার

জানালাতে এসব হয় না আমি হলুদ ঘরে যাবো
আমার ইচ্ছে অন্যরকম ছোঁবো তোমার মূল দরজা।

ছিন্ন-ভিন্ন শরীরটা তো ছিলো করাতকলের নীচে
তুমি তোমার বিশদ ব্যাগে টুকরো-টাকরা কুড়িয়ে নিলে

নিপুণ নখে সেলাই করলে খণ্ড খণ্ড বাঘের স্বাস্থ্য
তাদের দুঃখ ঘষে তুললে অভিজ্ঞতার ইরেজারে

আমার ইচ্ছে অন্যরকম ভেবেছিলাম আস্তে আস্তে
চাকার দাঁতে রক্ত হয়ে গড়িয়ে যাবো নিবিড় নলে

মাটির ঢেলা তেলের গাঁদে তুমি আমার শরীর দিলে
পেলাম মহান চিলেকোঠা প্রেমের মতো দিব্য অসুখ।

আমার ঘরে জানলাগুলো মধ্যরাতে খোলা থাকে
জানলা-টানলা খোলার পরে দরজা কেউ বন্ধ রাখে ;

জানালাতে এসব হয় না আমি হলুদ ঘরে যাবো
আমার ইচ্ছে অন্যরকম ছোঁবো তোমার মূল দরজা।

বুড়ো বাবাকে

অরুণেশ ঘোষ

তুমি বসে থাকলে বারান্দায়, পুরনো, তোমার বয়সী
আধা ইজিচেয়ারে
যেরকম পৃথিবীর সমস্ত বুড়োরা বসে থাকে
সন্ধ্যাবেলা আর
চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে ধুতির কোঁচায় মুখ মোছে
তারা তখন কিছুই পড়ে না, না খবরের কাগজ অথবা
১০০ বছর আগের কোন বই
চেয়ে থাকে শুধু চেয়ে থাকে, দেখে কি করে কালচে
হয়ে উঠছে হাওয়া আস্তে আস্তে
তোমার দিকে পিছন ফিরে আমরা চলে এসেছি, আমরা,
তোমার সন্ততিরা
সামান্য ঝোপ বা একটা থামের আড়ালে সরে গিয়ে
ধরিয়েছি সিগারেট
তোমার সাদা চুল ও কোটরে বসা চোখের দিকে তাকিয়ে
ভাবতে পারি না
তোমার শীর্ণ দু হাঁটু ও উরুর দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারি না
কোন একদিন রমণী শরীরের মুখোমুখি বসেছিলে

নগ্ন ও ছড়ানো শরীর
নগ্ন ও বিশাল শরীর
প্রবল মুঠোর মধ্যে জ্বলে উঠেছিল স্তনের রক্তিম
ভাবতে পারি না
বুড়ো, আজ কোন দুঃখ নেই আর আমি হাত তুলে
হাওয়ায় নাড়তে পারি বিদায় বিদায়
তুমি শার্টের উপর থেকে তামাকের ছাই ঝেড়ে উঠে
চলে যাও
তুমি বারান্দার অন্ধকার থেকে অন্য অন্ধকারে যাও,
আজ কোন শোক নেই আর
আজ কোন দুঃখ নেই আর, বিদায় বিদায়, সাড়হীন
মুণ্ডু ঝুলে পড়ে
দু দিকে এলিয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ দু'হাত
আমি পতিতা পল্লীর পাশে দীর্ঘ পানশালা
হো হো হাসি ভেসে যাই ঘূর্ণমান টেবিলের স্রোতে
কিশোরী বেশ্যার ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেলে
চরাচর জুড়ে জেগে ওঠে দাঁত।

এখানে বসতে পারি স্যার? ধন্যবাদ। আজ এ চায়ের দোকানে বড্ড ভিড়, একটি টেবিল খালি নেই। প্রত্যেকদিন এখানে এসে এক কাপ চা খাওয়ার অভ্যেস। চলে যেতে ইচ্ছে করলো না। দেখলাম কোণের এই টেবিলে আপনি একা বসে আছেন। তাই এখানে এলাম। আমি দেখেছি প্রত্যেকদিন আপনি এ সময় এখানে এসে বসেন। একাই আসেন। একাই বসে চা খান। তাই মনে হলো আমিও বসলে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। এই বেয়ারা। এক কাপ চা। আজকের খবরের কাগজটা? ও, আচ্ছা, আমি পরে অন্য কোথাও দেখে নেবো।

স্যার, আপনার দেশলাইটা একটু নিতে পারি? ধন্যবাদ স্যার, থ্যাংকিউ। উঃ, আজ কি হট্টগোল এই চায়ের দোকানে। আপনি এর মধ্যে কি করে বই পড়ছেন স্যার? অবশ্য ওটা ইংরেজী ডিটেকটিভ নভেল। এককালে ও নেশা আমারও ছিলো, এখন আর ভালো লাগে না। কার বই স্যার? ও হ্যাঁ, ওঁর বই তো খুব চলে আজকাল।

আমি আপনার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলছি, কিছু মনে করছেন না তো? আপনার হাতে গোয়েন্দা কাহিনী দেখেই কৌতূহল হলো, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। আমি প্রত্যেকদিনই লক্ষ করি আপনি সকালে এ সময় আসেন, পরপর দু'কাপ চা খান, চায়ে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট ধরিয়ে ইংরেজী গোয়েন্দা কাহিনী পড়েন, ঘণ্টাখানেক পরে উঠে চলে যান। গোয়েন্দা কাহিনী বেশ ভালো লাগে,—না স্যার? আমারও এক সময় খুব ভালো লাগতো। সাংঘাতিক নেশা! একবার আরম্ভ করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। শেষের পাতা পর্যন্ত বোঝাই যায় না কে অপরাধী। যারা এসব গল্প লেখেন তাঁরা সত্যিই জিনিয়াস, কি বলেন? কতো মাথা খাটিয়ে তবে একটা গোয়েন্দা কাহিনী লেখা যায়। প্রেমের গল্প লেখা তো সহজ মশাই। আপনার জীবনের গল্প আমার জীবনের গল্প সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে দিলেই হলো। ভালো একটা ডিটেকটিভ গল্প কেউ লিখুক, বুঝবো কেমন মুরোদ।

কিন্তু স্যার, আমার ভালো লাগে না। এককালে খুব পড়তাম। রাত্ত জেগে জেগে পড়তাম। তারপরে ছেড়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে যদি পড়ি তো প্রেমের গল্প পড়ি। মন্দ লাগে না। পড়তে পড়তে আমি মনে মনে নিজেই গল্পের নায়ক হয়ে যাই। মনে হয় লেখক যা বর্ণনা করছে তাতেও আমি আছি, যা বর্ণনা করছে না বা করতে সাহস করছে না তাতেও আমি আছি। আবার তাও এক এক সময় একঘেয়ে লাগে। তবে সেটা কোনো কথা নয়। আজকাল কিই বা একঘেয়ে লাগে না। এই যে চায়ের দোকানে এসে বসি প্রত্যেক দিন সকালে, এক কাপ চা খাই, তিন চারটে সিগারেট খাই, খবরের কাগজটা উল্টে দেখি তাও কি একঘেয়ে লাগে না? ওই যে দেখুন বড়ো রাস্তায় এত গাড়ি বাস ট্যাক্সি ছুটে যাচ্ছে, ফুটপাথ দিয়ে অল্পবয়েসী একটি ছেলে ও মেয়ে হাসতে হাসতে চলেছে যেন দুনিয়াটা

গোয়েন্দা কাহিনী বারীন্দ্রনাথ দাশ

তাদের, হকারগুলো চিৎকার করছে, তাও কি একঘেয়ে লাগে না?

না না সার, আপনি পড়ুন। আমি অনর্থক বাজে কথা বলে আপনার সময় নষ্ট করছি। আমি বরং বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। এ জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে। খুব নিরিবিলি ওই পাড়ার ভিতর দিয়ে ছোটো রাস্তাটা এখানে বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছে। মোড়ের এই চায়ের দোকানে বসলে দুদিকে দুটো আলাদা কলকাতা দেখা যায় একই সঙ্গে। ওই যে ফুটপাথে বসে লোকটা হেঁকে হেঁকে লটারির টিকিট বেচবার চেষ্টা করছে ওর দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎটাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

একি স্যর, বই নামিয়ে রাখলেন কেন? আমি নিজের মনে বড্ড বকবক করছি,—না? না সার, আপনি পড়ুন। আমায় সিগারেট অফার করছেন? থ্যাংকিউ সার। কি বললেন? হ্যাঁ, আমি প্রায় প্রত্যেকদিন এ সময় এখানে এসে বসি। কি করি? হাঃ হাঃ শুনলে হাসবেন। হয়তো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে না। না সার, এত কথা আমি বলি না। সাধারণত বলি না।

তবে আপনাকে দেখে অনেকদিন ধরেই আমার কথা বলার ইচ্ছে। পারলে এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলার ইচ্ছে। এর কারণটা হলো, আপনার হাতে সব সময় দেখি ইংরেজী গোয়েন্দা কাহিনী।

কথাটা হেঁয়ালি ঠেকছে, তাই না? আচ্ছা স্যার, গোয়েন্দা কোনোদিন দেখেছেন? প্রাইভেট ডিটেকটিভ? যাদের নিয়ে ওসব গল্প? দেখলে আর গোয়েন্দা কাহিনী পড়ার শখ থাকবে না একটুও। আমি জানি। সে জন্যেই আমার নিজেরই শখ চলে গেছে।

বেগ ইওর পার্ডন? আজ্ঞে? আমি দেখেছি কিনা? গোয়েন্দা? দাঁড়ান, সিগারেটটা ধরিয়ে নিই। আপনার জন্যে আরেক কাপ চা আনতে বলি? কি জিজ্ঞেস করছিলেন? আমি গোয়েন্দা দেখেছি কিনা? আপনার কি মনে হয়? প্রাইভেট ডিটেকটিভ দেখতে কি রকম? যদি বলি আমার মতো? ছদ্মবেশ নিয়ে নয়। সত্যি সত্যি। হাসছেন? আপনাকে বললে কোনো ক্ষতি নেই, আমি নিজেই একজন ছোটোখাটো প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

না না স্যার, শার্লক হোমস কি পোয়ারো যেমন কি ব্যোমকেশের মতো নয়। অতো ক্ষুরধার বুদ্ধি আমার নেই। আমি চাকরি করি। আমাদের ফার্মের নাম শুনে অবশ্য আপনি ঠিক ধরতে পারবেন না, কিন্তু ওটা ডিটেকটিভ এজেন্সি। ওখানে বেশ কিছু লোক চাকরি করে। আমিও করি। কিরকম পাই? সে কথা আর কেন জিজ্ঞেস করছেন। চলে যায়। অন্য কোনো কাজ পেলে এটা আমি এক্ষুনি ছেড়ে দিই।

হ্যাঁ স্যার, ডিটেকটিভ এজেন্সি গল্পের বইয়ের বাইরেও আছে। হ্যাঁ, এই শহরেই আছে। ওদের হাতে কাজও অনেক। তবে কি ধরনের কাজ আমি জানি না। আমার মতো লোকের জানার কথা নয়। আমাদের সাধারণ চাকরি। যখন যা করতে বলা হয়, তাই করি। কখনো কাউকে কিছু দিয়ে আসতে হয়, কখনো কারো সঙ্গে কোথাও যেতে হয়, কখনো কারো গতিবিধির খবর নিতে হয়, কে কোথায় গেছে, কি করছে, কোথায় কিরকম লোকের সঙ্গে দেখা করছে—এইসব, অফিসে ফিরে কর্তার কাছে রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। ওরা কে, এসব খবরের কি বিশেষত্ব, ভেতরের ব্যাপারটা কি, এসব জানতে পারি না, জানার কথাও নয়, জানার আগ্রহও নেই। মাসের শেষে মাইনেটা নিয়মিত পেলেই খুশী। তাও অনেক সময় ঠিক মতো পাই না।

আপনি অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, অনেক লোক আছে যারা পুলিসের কাছে যায় না, ওরা এসব এজেন্সির কাছে আসে। তবে সেসব যে গোয়েন্দা কাহিনীর রোমহর্ষক ব্যাপার তা মোটেই নয়। আমি তো এত বছর কাজ করছি, কোনো রকম রোমাঞ্চের গন্ধ কোনোদিন পাইনি। রীতিমতো একঘেয়েই লাগে এক এক সময়। কোন বড়ো সায়েবের বউ দুপুরবেলা কোথায় বেরোয়, কোন ধনবতীর স্বামী কোথায় সন্ধ্যা কাটায়, কোন কোম্পানির ছোটো তরফের প্রতিনিধি ডিরেক্টার গোপনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোথায় কতবার দেখা করছে, এ ধরনের সব ব্যাপার। মাঝে মাঝে হয়তো বা কারো ছেলে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, কি কারো মেয়ে বাড়িতে চিঠি লিখে উধাও হয়েছে, এ ধরনের কোনো কেস। না স্যার, খুনের কেস আমি শুধু খবরের কাগজেই পড়েছি। হাতে কোনোদিন পাইনি।

তাই ভাবছিলাম, আপনি যদি কোনোদিন প্রাইভেট ডিটেকটিভ চোখে দেখতেন, আপনার কি ভালো লাগতো এ সব গোয়েন্দা কাহিনী? যেদিন থেকে আমি এ চাকরি নিয়েছি, আমারও আর ভালো লাগে না। মাইনের জন্যে চাকরি করি, যেসব খবর আনতে বলা হয়, সেসব যোগাড় করি। অনেক সময় তাও পারি না, বানিয়ে বানিয়ে রিপোর্ট তৈরি করি। তারপর কি হয় আমি জানি না। জেনে কি লাভ? অনেক সময় খবর জানতে পেরেও জানাই না; যেমন ধরুন, ওই কেসটা—খুব পয়সাওয়ালা এক ভদ্রলোকের একটি মাত্র মেয়ে। ওর ধারণা হলো মেয়ে এমন একজনের সঙ্গে মেলামেশা করছে যার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আজকালকার মেয়ে, বাড়িতে তো আটকে রাখা যায় না। কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না। বলাও যায় না। তিনি এজেন্সির কাছে এলেন মেয়ের গতিবিধির খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে। আমাকে চার্জ দেওয়া হলো। আমি দেখলাম মেয়েটির সঙ্গে খুব ভাব একটি ছেলের, যে খুব সাধারণ একটা চাকরি করে। তারাই সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে, সিনেমায় যায়, লেকে যায়, রেস্তরাঁয় যায়। আমি কি তখন আর সত্যি সত্যি রিপোর্ট দিলাম কর্তার কাছে? বানিয়ে বানিয়ে অন্যরকম কথা বললাম। তারপর কি হলো জানি না। হয়তো সেই ছেলেটির সঙ্গেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। কিংবা হয়তো হয়নি। হলেও যা, না হলেও তা।

কিন্তু স্যার, মনে মনে মাঝে মাঝে নানারকম প্রশ্ন জাগে। কোনো উত্তর পাই না। গল্পের বইয়ের গোয়েন্দার মতো বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু একেবারে বোকা নই। কতো রকম লোক দেখি, কতো বিচিত্র চরিত্র। কিছু অভিজ্ঞতা আছে, বিচার বিশ্লেষণ করবার কিছু ক্ষমতাও আছে।

তাই অনেক কথা মাঝে মাঝে ভাবি। অথচ কোনো উত্তর পাই না। এই ধরুন যেমন, আমার আত্মা মরে গেছে। তাকে কেউ খুন করেছে। কিন্তু কে? কেন? কি ভাবে? এ রহস্যের সমাধান তো স্যার আমি করতে পারছি না। এর জন্যে সত্যি সত্যি গোয়েন্দাকাহিনীর ডিটেকটিভ দরকার। আপনাকে তো দেখি সব সময় গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ছেন, তাই ভাবি আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করবো। আপনি লেখা-পড়া জানা লোক, বিলেত ঘুরে এসেছেন।

অবাক হচ্ছেন? আমি কি করে জানলাম? আমিও তো ছোটোখাটো একটি গোয়েন্দা। অল্পস্বল্প ক্ষমতা আমার মতো লোকেরও আছে। শুনতে চান আপনার সম্বন্ধে আমি কতোটা জানি? আপনার নাম হিমাদ্রি গুপ্ত। আপনি কিছুদিন বিলেতে ম্যানেজমেন্ট পড়েছেন। দিল্লীতে চাকরি করতেন। এখন বেকার। নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করছেন। আপনি এখনো

বিয়ে করেননি। কয়েক বছর আগে আপনি একটি মেয়েকে ভালোবাসতেন।

খুব অবাক হয়ে গেছেন—না? এ তো গোয়েন্দাকাহিনীর টেকনিক, প্রাইভেট ডিটেকটিভ তার নবাগত ক্লায়েন্টকে এমন কতকগুলো কথা বললো যে ক্লায়েন্টের চক্ষুস্থির। না স্যার, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ সব ট্রেড সিক্রেট। খদ্দেরকে এভাবে ইমপ্রেস করতে হয়। কোনোদিন কোনো পেশাদার জ্যোতিষীকে হাত বা ছক দেখিয়েছেন? কি আশ্চর্য মিলিয়ে দেয়। আপনার এখন সময়টা খারাপ যাচ্ছে। কি রাশি আপনার? কন্যা? শনিটা অষ্টমে। ওটা সরে যাক, বেশ কিছু টাকা পেয়ে যাবেন হঠাৎ। হ্যাঁ, আপনার পাওনা টাকা, যেটা এতদিন ঘোরাঘুরি করেও ঠিকমতো আদায় করতে পারছেন না। তবে কথাটা কি জানেন, আপনি বাড়ির সবার জন্যে এত করেন, অথচ কেউ আপনার স্যাক্রিফাইসের কোনো দাম দেয় না—। আপনি ভাবছেন কি অদ্ভুত বলে যাচ্ছে লোকটা। কিন্তু আপনি জানেন না, ও অন্য ক্লায়েন্টদেরও ওই একই কথা বলছে, সে মিথুন রাশিই হোক আর কুম্ভ রাশিই হোক। আমাদের ওই একই ব্যাপার। শুনবেন কি করে এক নজরেই আপনার সম্বন্ধে এত কথা জানলাম? আচ্ছা, শুনুন।

কয়েক বছর আগে আপনি একটি মেয়েকে ভালোবাসতেন। এটা নিছক অনুমান হতে পারে। এই চায়ের দোকানে এত লোক বসে চা খাচ্ছে, আপনি আমায় একটি লোক দেখিয়ে দিন যে কয়েক বছর আগে একটি মেয়েকে ভালোবাসতো না। আপনি নানা জায়গায় চাকরির চেষ্টা করছেন? দু'তিনবার আপনাকে পোস্ট অফিসে দেখেছি। লম্বা খাম আপনি রেজিস্ট্রি করছেন। আমি হয়তো পাশেই ছিলাম, আপনি খেয়াল করেননি। কিন্তু আমি তাকিয়ে দেখেছি। খামের উপর এক এক সময় এক একটি বড়ো ফার্মের নাম লেখা। ও সব চাকরির দরখাস্ত। হ্যাঁ, আমার অনুমান। তবে আজকাল এতলোক চারদিকে দরখাস্ত করছে, তাদের মুখের চেহারার সঙ্গে আপনার মুখের চেহারার আশ্চর্য মিল। আপনাকে বাজারের ওধারে রাস্তার টাইপিস্টদের পাশে বসে ফুলস্ক্যাপ চিঠি টাইপ করতে দেখেছি। আপনি বিলেতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়েছেন, দিল্লিতে চাকরি করতেন—আমি কিভাবে জানি? মশাই, রাস্তার ওপারে সেদিন সিগারেট কিনছি, আপনি হয়তো হেঁটে আসছেন, মনে করুন হঠাৎ দুজন লোকের সামনে আপনি থেমে গেলেন। একজন আপনার পুরোনো বন্ধু, অন্যজন আপনার অচেনা। আপনার বন্ধু হয়তো অন্য লোকটির সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিলো, আপনার নাম বললো, আপনি কোথায় কবে কি করতেন, সবই হয়তো বললো। আমি কান পেতে শুনলাম। আপনারা হেঁটে চলে গেলেন। আমাকে লক্ষ করেননি। অথচ আমি শুনলাম, জানলাম। আপনি বিয়ে করেননি তাও হয়তো জেনে গেলাম।

অথচ দেখুন, প্রত্যেকদিন সকালে আপনিও এখানে আসছেন, আমিও আসছি, কিন্তু আপনি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তবু আশ্চর্য ব্যাপার, আপনাকে দেখে আমার কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে আপনার কাছে এসে বসবো, আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো। আপনি বিদ্বান লোক, আপনি বিদেশ ঘুরে এসেছেন, আপনি বলতে পারবেন চারদিকে যে এত ক্রিমিনাল ব্যাপার-স্যাপার দেখছি এর শেষ কোথায়? আগে তো কোনোদিন মনে হতো না, কিন্তু আজকাল চারদিকে যার মুখের দিকেই তাকাই, তাকেই ক্রিমিনাল মনে হয়। প্রত্যেকেই আবার অন্য কোনো অপরাধীর খোঁজ করে বেড়াচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজেই আবার কোনো না কোনো অপরাধীর শিকার। হ্যাঁ মশাই, আপনি আমি, ওধারের টেবিলের ওই লোক দুটি, সবাই।

ঠিকই বলেছেন, আমার কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার আমাকে একটু ভাবাচ্ছে। সেটাই আপনাকে বলবো ভাবছিলাম। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর রহস্য। আমাকে অনেকদিন ধরেই ভাবাচ্ছে। শুনবেন? আপনার এক ঘেয়ে লাগছে না তো?

তাহলে পুরোনো কথায় চলে যেতে হয়। এজেন্সিতে চাকরি নেওয়ার আগে আমি একটি স্কুলে চাকরি করতাম। ড্রিল মাস্টারের চাকরি। খেলাধুলোয় বরাবরই ভালো ছিলাম। বক্সিং, জুডো, যোগাসন এ সবেও ট্রেনিং আছে।

হঠাৎ একদিন চাকরি চলে গেল। টেম্পোরারি চাকরি, আরেকজনের লীভ ভেকেন্সিতে কাজ করছিলাম। সুতরাং তা নিয়ে আমার কোনো নালিশ ছিল না। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল।

কয়েক বছর আগেকার কথা, তাই এখন আর আপনাকে বলতে কোনো বাধা নেই। ব্যাপারটা কি জানেন, আমি এক ভদ্রলোককে যোগাসন শেখাতাম। তাঁর একটি বোন ছিল।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। যা হয় আর কি। এখন সমস্যা দাঁড়ালো, চাকরি তো গেল, তাকে বিয়ে করি কি করে। আশ্চর্য ব্যাপার, সে নিজেই এর সমাধান করে দিল। মানে হঠাৎ আমাকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল। তার মুখ দেখে মনে হলো তাকে যেন কেউ খুন করেছে। তারপর একদিন দেখি সে আবার হঠাৎ বেঁচে উঠেছে। সে আগের চাইতে অনেক বেশী জীবন্ত।

আমি কিন্তু তখন বেশ দূরে সরে গেছি। চাকরিরও চেষ্টা করছি। বিদ্যেবুদ্ধি তেমন নেই, তাই পাচ্ছিও না। আমার এক বন্ধুর দাদা এটর্নি। একদিন হঠাৎ বললেন, ওহে, একটা ডিটেকটিভ এজেন্সিতে কাজ খালি আছে। করবে?

কাজটা হয়ে গেল। সে সময় একদিন মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা হলো। ওকে দেখে মনে হলো, ও আবার মরে গেছে। রং চটে যাওয়া মাটির পুতুলের মতো মুখ।

কি করছো এখন? চাকরি করছি। কোথায়? একটা আধা সরকারী অফিসে।

সেই একদিন দেখা। তারপর একদিন। তারপর আবার একদিন।

একটা কথা বলবো ভাবছিলাম। বলো। কথাটা কিন্তু খুব পুরোনো। নতুন বলে কি কিছু আছে আমাদের জীবনে? বলো তুমি বিয়ে করবে না? বিয়ে? কে করবে আমায়? মনে করো যদি আমি করতে চাই। তুমি? হাঃ হাঃ।

সেদিন তুমি কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে, আমি কিন্তু খুব সিরিয়াসলি বলেছিলাম। আমিও খুব সিরিয়াসলি উত্তর দিয়েছিলাম। দিয়েছিলে? কই না তো, শুধু হেসেছিলে। না, উত্তরও দিয়েছিলাম, তুমি শুনতে পাওনি, আমি কি করবো। কি উত্তর দিয়েছিলে? কি জানি, ভুলে গেছি। আবার জিজ্ঞেস করবো? করো। আমায় বিয়ে করবে? আমি কি বলেছি করবো না?

শানাই, গোধূলি লগ্ন, মাংস কোথায়, দই সে, আরো দুটো মিষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হিমাদ্রিবাবু, আগের সেই লোকটিকে আর পেলাম না। যে মেয়েটিকে জানতাম সে যেন মরে গেছে। এ শুধু একটা শরীর। আমার চোখের সামনে সংসার করছে, আমার চোখের আড়ালে আনমনা হয়ে থাকছে। তারপর তার টি-বি হলো। কেন বলুন তো?

হ্যাঁ, টি-বি আজকার দিনে তেমন কিছু অসুখই নয়। সারিয়ে তোলা যায়। তবে ওকে সারিয়ে তুলতে পারিনি। যা রোজগার, তাতে সংসারই ঠিক মতো চলে না। তার ওপর অসুখ। সেরে ওঠে আবার হয়। তারপর একদিন মরেই গেল। কেন বলুন তো?

আগে আমাকেই ভালোবাসতো। পরে আমাকেই বিয়ে করলো। তারপর আমাকে ভালোবাসতে পারলো না। কেন বলুন তো?

মাঝে মাঝে মনে হতো ওর মৃত্যু একটা রহস্য। ওর তো মরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। স্বচ্ছন্দে আর দশজনের মতো বেঁচে থাকতে পারতো, সংসার করতে পারতো। কিন্তু সে মরলো। একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার। দুবার বেঁচে উঠেছিল, তিনবারের বার আর পারল না। কেন বলুন তো?

এই বেয়ারা, আর দু কাপ চা। খুব গরম। হ্যাঁ বলুন। স্বচ্ছন্দ। হ্যাঁ, হতে পারে। ঠিক যে সময় আমার চাকরি গেছে, সে সময় হয়তো আরেকটি ছেলে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করেছিল। আমারও তাই মনে হয়েছিল, কারণ বিয়ের পরে সে আমায় একদিন বলেছিল, আমার চাকরি ছিল না, তাই সে আমার উপর কোনো বোঝা হতে চায়নি, একজনাই দূরে সরে গিয়েছিল; আমি জানি মেয়েরা এরকম ওজর দেয় একসময় অন্য কারো প্রেমে পড়লে; আমার ধারণা সেই ছেলেটি হঠাৎ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাই সে বিয়ে করেছিল আমাকেই। আপনারও তাই ধারণা? ও হলে আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম।

কিন্তু তার টি-বি হলো কেন? ছোঁয়াচে রোগ। হয়তো হয়ে গিয়েছিল কোনো-রকমে। যেখানে থাকি, আলো নেই হাওয়া নেই। সেরে উঠেছিল। কিন্তু আবার হলো। সেই ছেলেটির কথা ভাবতো বলছেন? ভাবতো নিশ্চয়ই। কারণ ওর কথা আমিই বলেছিলাম।

শুনুন তাহলে, ও জানতো না যে আমি জানি। আমি একটু খোঁজখবর করেছিলাম। বিশেষ কিছু শুনিনি, তবে আমার অনুমান যে ভুল নাও হতে পারে সেটা মনে করার মতো দুচারটে খবর আমি পেয়েছিলাম। যে সময় আমার স্কুলের চাকরিটা চলে যায়, সে সময় একজন ওদের বাড়ি প্রায়ই আসতো। যে সময় আমি এজেন্সিতে চাকরি নিয়েছি, তার কিছু আগে থেকে সে ছেলে ওদের বাড়ি আর আসে না। ওর নামও আমি জানতে পেরেছিলাম।

হ্যাঁ, ও যখন আবার অসুস্থ হয়েছে, ওকে একদিন তার নাম করে কয়েকটা খবর দিয়েছিলাম। ও জানতো না যে ওই ছেলেটির নাম আমি জানি। আমি চাকরির ব্যাপারে নানারকম কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তাম। তার উপর রং ফলিয়ে ওর কাছে গল্প করতাম অনেক সময়। এক একদিন সেই ছেলেটির নাম করেই বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলতাম। সে বিদেশ থেকে ঘুরে এসে একটা বিরাট চাকরি করছে। তার মেমসাহেব বউ, লম্বা মাইনে, পেল্লায় বাড়ি, জাহাজের মতো গাড়ি। কিন্তু লম্পট। দারুন মদ খায়। আজ অমুকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে, কাল অন্য এক নামজাদা লোকের বউয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে এজেন্সি থেকে নিয়োগ করেছে আমাকেই। ঠিক যেন আর দশটা রসালো কেসের মতো এও একটা রসালো কেস, যার গল্প করছি বউয়ের কাছে বসে।

হ্যাঁ মশাই, এসব শুনতে শুনতেই বউ একদিন চোখ বুজলো।

কি ভাবছেন আমাকে। মশাই? কিছুই ভাবছেন না? আশ্চর্য ব্যাপার। আমিও কিন্তু আপনার সম্বন্ধে ভাবছি না কিছুই। কেন আপনার সম্বন্ধে ভাববো? তা হলে খুলেই বলি আপনাকে। আপনি বেশ ভালো লোক। আপনার কাছে কিছুই আর গোপন করতে চাই না। আপনি আমাকে চেনেন না। আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। তাই অনেকদিন ধরেই ভাবছি আপনাকে বলবো। আপনার নাম হিমাদ্রি গুপ্ত। আমার বউ যাকে ভালোবাসতো তারও নাম হিমাদ্রি গুপ্ত। ওকি, অবাক হলেন কেন? অলকা নামে কোনো মেয়েকে চিনতেন? বিয়ের আগে ওর পদবি ছিল—ম, কি যেন? কি আশ্চর্য, এরই মধ্যে ভুলে গেছি? যাক ওসব পুরোনো কথা। অলকার মৃত্যু তাহলে আর কোনো রহস্য নয়। খুন বলতে চাই না, তবে হ্যাঁ, আমিই ওকে সেরে উঠতে দিইনি। এই বেয়ারা, বিল নিয়ে এসো। ওকি, আপনি দিচ্ছেন কেন? আজ আমাকেই দিতে দিন। আমরা যখন প্রত্যেকদিনই আসছি, আপনি না হয় কাল দেবেন।

বাঙালী পল্টনের স্বপ্ন ও জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী

অমল মুখোপাধ্যায়

মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন-দেখা হয়তো তেমন কঠিন নয়। তার জন্য আমৃত্যুলালিত চেষ্টাচরিত্র করাও হয়তো তেমন দুঃসাধ্য নয়; এমন কি মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও তত সুকঠিন নয়, যত কঠিন তাকে যথার্থ সম্মান, মর্যাদা ও আদর্শানুযায়ী বাঁচিয়ে রাখা। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরেই আমরা প্রায়শই এ-সত্য অনুভব করি। আমাদের স্কুল কলেজ পাঠাগার ক্লাব যে আবেগ ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়, প্রায়ই সেই আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার মধ্যে বাঁচে না। বাঁচলেও অনাদর অবহেলার মধ্যে এমন অসম্মান নিয়ে টিঁকে থাকে যে মাঝে মাঝে মনে হয় এর চেয়ে না-বাঁচাই বুঝি ভাল।

এই কথাগুলি আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে যে সর্বভারতীয় সংগঠনের কথা আমার মনে আছে সেটি সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম অ-সামরিক যুব-সংস্থা, যার ইংরেজী নাম ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, বাংলা ও হিন্দী নাম জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী এবং যে সংস্থাটি আজ সাধারণ মানুষের কাছে ইংরেজি সংক্ষেপ নাম এন সি সি বলেই পরিচিত।

কমিশন বসিয়ে, অনেক বিচার অনেক বিবেচনা করে সুপরিমাণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই ১৯৪৮ সালে ইউ টি সি-র সঙ্কীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে দেশ, জাতি ও ছাত্রসমাজের সর্বকালীন বৃহত্তর স্বার্থে এন সি সির গোড়াপত্তন হয়েছিল। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে এই সর্বভারতীয় ছাত্রসংস্থা গড়ে উঠেছিল তার অভিনবত্ব ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রথম উদ্দেশ্যটিতে আছে ছাত্রদের মধ্যে 'Character', 'Leadership' এবং Comradeship' গড়ে তোলা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল: 'to stimulate interest in the defence of the country'. তৃতীয় উদ্দেশ্য হল: 'to build up a reserve of potential force so that the Armed Forces can expand rapidly at the time of a National emergency'.

বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যই ছিল মহৎ উদ্দেশ্য। তবু জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর জন্মমুহূর্তে ঘটা করে কোন মঙ্গল শঙ্খ বাজেনি, বাজলেও তার নিনাদ এতই মৃদু ও অদূরগামী ছিল যে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ এর সম্পর্কে সচেতন হন নি। তা অত্যন্ত দুঃখের। সর্বস্তরের অবহেলা ও অনাদর পেতে পেতেই এর বাইশ বছর বয়স হয়ে গেল। দুটি ইমারজেন্সির কাল আমরা পেরিয়ে এলাম। ১৯৬২-তে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ ও ১৯৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই। এই দুটি থেকে কতটুকু শিক্ষা আমরা নিতে পেরেছি সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা জানি না, সমরোপকরণ বাড়িয়ে প্রতিরক্ষার সমস্ত বিভাগকে কতখানি অতি আধুনিক করে, আমাদের প্রতিরক্ষা কতখানি বল অর্জন করেছে। কিন্তু একটি বড় আপৎকালীন অবস্থার পর তিন বছর যেতে-না-যেতেই জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীকে কেটে ছেঁটে অনেক ছোট করা হয়েছে। এটা জানি। হয়তো এই কেটে ছোট করবার পেছনে অনেকই কারণ আছে। তবু ভেবে দেখবার অবকাশ আছে যে, একটা দেশের সমরোপকরণ যতই আধুনিক হোক, সৈন্য বিভাগ হোক না অনেক বড়, ছাত্র তথা যুব সমাজকে প্রস্তুত না-রেখে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তা আদপেই দুর্বল হতে বাধ্য। অতএব জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর বর্তমান দীন ও দৈন্যাবস্থা যে কোন দেশ-সচেতন মানুষকেই আতঙ্কিত করে তুলবে। এত বড় একটি যুব সংগঠনকে যদি কোন সরকার দায় ও বালাই বলে মনে করেন তার চেয়ে দুর্ভাগের আর কিছুই হতে পারে না।

বিশেষ করে বাংলা দেশে, জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর বাপ-মা বলে কেউ নেই। সরকার, শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক সকলেই একে অনেকটা গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া বলে মনে করেন। তাই অন্য সকল রাজ্যের তুলনায় বাংলা দেশে এন সি সি ট্রেনিং ব্যবস্থার জাত-মান সামান্যই আছে। যুদ্ধবিদ্যা বিমুখ বলেই কিনা জানি না, পশ্চিম বাংলায় যথেষ্ট উদাসীনতা দিয়েই এর গোড়াপত্তন হয়েছিল। কলকাতায় স্বল্প সংখ্যক ও মফঃস্বলে হাত-গুণে গুটিকতক স্কুল ও কলেজে এই জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী অনুপ্রবেশ লাভ করেছিল। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে এই সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে কোনই সচেতনতা ছিল না এবং বাংলা দেশে যারা উৎসাহ দেখালে যে-কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে, তারা কোনো স্তরেই স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য সামরিক শিক্ষার এই আয়োজনকে স্বাগত জানান নি। সেই জন্য ১৯৬২ সালে বিপদ এসে যখন ঘাড়ে চাপলো, তখন পড়ি কি মরি করে অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে কলেজের ছাত্রদের জন্য সামরিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করে দেওয়া হল। যা স্বভাবত হয়নি, তাকে স্বভাবগত করে তোলার কোনো প্রয়াস বিপদ আসার আগে করা হয়নি, তাকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে এক ধরনের আত্মতুষ্টি লাভ করা যায়, কিন্তু ফল কিছু মেলে না। আমাদের হয়েছিলও তাই। ১৯৬৫র দ্বিতীয় আঘাতের কুয়াশা কেটে যেতে-না-যেতেই, জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর অত্যুৎসাহীদের দেহ থেকে চর্মবর্ম খসে পড়েছিল। এর চেয়ে দুঃখ ও গ্লানির বিষয় খুব কমই হতে পারে।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণে, বাংলা দেশে, জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর উপর বিশেষ জোর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রথমত বাঙালী ছেলেরা স্বভাবতই অথবা দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে যুদ্ধবিদ্যা বিমুখ। উপরন্তু ব্রিটিশ সরকার সামরিক বিভাগ থেকে বাঙালীকে সরিয়ে রাখায় সযত্ন প্রয়াসী ছিলেন। ফলত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসাহে কিছু কিছু যুবক সামরিক বিভাগে যোগ দিলেও, দল বেঁধে বাঙালী সৈনিক বৃত্তিতে বহু কাল যোগ দেয়নি। বাঙালী রেজিমেন্টের শেষ কৃতিত্বের সংবাদ মেসোপটেমিয়ার প্রান্তর অতিক্রম করে কোনো ক্রমেই যাতে বাংলা দেশের হাওয়ায় না-মিশতে পারে তার ত্রুটিহীন ব্যবস্থা ব্রিটিশ করেছিলেন।

ফলে যে অ-সামরিকতার অপবাদ নিজেদের অযত্নে ও ব্রিটিশের অপচেষ্টায় পরাধীন ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল, দেশ স্বাধীন হোতে হোতেই সে নিন্দা ও অপবাদ অপনোদনের চেষ্টা সম্ভব ছিল দুটি পথে। এক, পুনরায় বাঙালী রেজিমেন্ট সৃষ্টি করে; দুই, জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর পোষকতার মধ্য দিয়ে। প্রথমটি বঙালীর ও বাংলা দেশের নেতাদের অদূরদর্শিতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য পুনর্গঠিত হল না। নবগঠিত রাজ্য নাগাল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকার বৈরী নাগাদের কথা স্মরণ রেখেও স্বেচ্ছায় নাগা-রেজিমেণ্ট খুলে দিলেন কিন্তু এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী, ভাইস অ্যাডমিরাল চক্রবর্তী ও অ্যাডমিরাল চাটার্জি ও সর্বোপরি সেনাধ্যক্ষ জয়ন্ত চৌধুরীর কথা মনে রেখেও বাঙালী রেজিমেন্টের পুনর্বাসন অসম্ভব বিবেচনা করলেন। বাঙালীর এমনই দুর্ভাগ্য! দ্বিতীয়টি সম্পর্কেও প্রায় একই অবস্থা। না-আমাদের রাজ্য সরকার, না-হেডমাস্টার-প্রিন্সিপাল বা ভাইস চ্যান্সেলাররা জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীকে স্কুল-কলেজগুলিতে কতখানি আন্তরিকতার গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে কেউই ভাবলেন না। যে সময় বাংলা দেশে এন সি সি ট্রেনিংকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে তখন পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও মহীশূরের ছেলেরা এই ট্রেনিং নিয়ে প্রচুর সংখ্যায় সামরিক (আর্মি, নেভী, এয়ার ফোর্স), আধা-সামরিক (সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) এবং বে-সামরিক সর্বভারতীয় সংস্থাগুলিতে স্থান করে নিয়েছে। এমনিতেই এই সকল রাজ্যগুলিতে এক বা একাধিক সামরিক ছাউনি (Regimental unit) আছে। এই সব রেজিমেণ্টে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যের যুবকদেরই নিয়োগ করা হয়। কাজেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশ ছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্য—যাদের ধর্ম কি রাজ্য কি জাতি কি উপজাতির নামে রেজিমেণ্ট আছে, তারও এন সি সি-র দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে গাছেরও খাচ্ছে তলারও কুড়োচ্ছে।

যদিও এন সি সি কোন সামরিক সংস্থা নয়, এতে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে শিক্ষা-সূচী ও ব্যবস্থা আছে তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারলে প্রচুর সংখ্যক ছেলে-মেয়েকে সমরবিদ্যায় শিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও সামরিক মনোভাবাপন্ন করে তোলা যায়। আর তাতে আখেরে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কারণ আমরা দেখছি ও জানি যে ভারতের পরিকল্পনার সিংহভাগটি ব্যয় হচ্ছে ও হবে প্রতিরক্ষার কাজেই। এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে প্রতিরক্ষার কাজে। এই বিরাট অঙ্কের বড় ভাগ হয়তো নানারকম আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি কিনতে ব্যয় হবে বটে, তবু বিপুল সংখ্যক সৈন্যসামন্ত নিয়োগেও অভাবনীয় টাকা ব্যয় হবে। ব্যয় হবে সামরিক বিভাগের জোয়ান ও অফিসারদের পেনসন গ্রাচুইটি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা মেটাতে। সেই টাকার কতটুকু আসবে বাংলা দেশের ঘরে? আর কতটুকুই বা যাবে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের ঘরে? এই দুর্দিনে বেকারীর দিনে কোন প্রদেশের ছেলেরা কোন রাজ্য সরকারের ভার লাঘব করে উল্টো সরকারকেই নতুন নতুন বিনিয়োগের টাকার সহজ সংস্থান করে দেবে তা সহজেই অনুমেয়।

অন্য রাজ্যকে ঈর্ষা করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিন্দা করে কোন লাভ নেই। আমি তা করছিও না। কারণ আমি জানি, শুধুমাত্র নিন্দা দুর্বলের অক্ষম অস্ত্র। বরং বলছিলাম এই তো চমৎকার সুযোগ ছিল। যদি উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে আমাদের সাহসী ডানপিটে ভয়ভাবনাহীন ছেলেগুলিকে
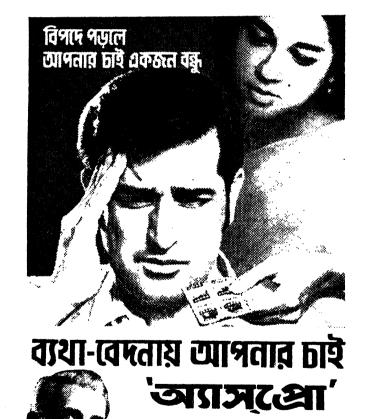
উপযুক্ত পরামর্শ নিয়ে আর্মি, নেভী, এয়ার-ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস, সিকিউরিটি গার্ড ইত্যাদি নানান শাখায় ঢুকিয়ে দেওয়া যেত তাহলে প্রথমত জাতি হিসেবে বাঙালীর সুনাম অনেক বেড়ে যেত। কারণ, আমাদের ছেলেরা যে বুদ্ধি, সাহস ও তৎপরতায় অন্য রাজ্যের ছেলেদের চেয়ে গুণশালী তা ভিন্‌দেশীরাও স্বীকার করেন। দ্বিতীয়ত, যতবেশী ছেলে সামরিক বিভাগে যোগ দিত ততই রাজ্যের দুর্বিষহ বেকারীর বোঝা কমতো। তৃতীয়ত, এরাই আবার আগামী দিনে যখন অবসরের সঙ্গে সাহস উদ্যম অভিজ্ঞতা, উৎসাহ ও অবসরকালীন অর্থ নিয়ে ঘরে ফিরে আসতো, তখন নিশ্চয় করে বলতে পারি, মাঝারি ছোটখাট নানান ধরনের বিনিয়োগে দেশ ভরে যেত। যা পাঞ্জাব প্রদেশে অতীতে ঘটেছে, আজ আরও বেশী সংখ্যায় ঘটছে, আগামী-দিনে দেশ ছেয়ে যাবে। কাজেই গৃহশিল্প ক্ষুদ্রশিল্প ও গমের বিপ্লব সেখানে রুখবে কে! পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনের মূলে তার ঘরে ঘরের জোয়ান ছেলেরা সব নয় বটে, কিন্তু অনেক। মনে রাখতে হবে, বিন্দুজল একা কিছুই করতে পারে না, কিন্তু অনবরত ক্ষরন্ত জল বন্যা বইয়ে দিতে পারে।

তাছাড়া এটা বোঝা গেছে, মৃদুতম আন্দোলন ব্যতিরেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অকৃপণ হাতে অর্থ ব্যয় যে বিভাগে হতে পারে তা একমাত্র সামরিক বিভাগ। কাজেই বলছিলাম, বাঙালী ছেলেকে আজকের দিনে সামরিক বৃত্তি উপেক্ষা করলে চলবে না। বরং স্কুল কলেজ থেকেই সামরিক বৃত্তির দিকে ধ্রুব দৃষ্টি রেখে আমাদের ছেলেরা যদি পড়াশুনো করে যায়, তা হলে রাজ্যব্যাপী বর্তমান চরম বন্ধ্যদশা থেকে দেশ মুক্তি পেতে পারে। মাসমাহিনার অঙ্কের অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দিক থেকে প্রতি-রক্ষা বিভাগের চাকরী একমাত্র সরকারী চাকরী যা সওদাগরী অফিসের চাকরীর চেয়ে সম্ভবত কম লোভনীয় নয়।

এসব কোন নতুন খবর নয়। অনেকেই এ সত্য জানেন বোঝেন ও স্বীকার করেন। তবু যে বাঙালী ছেলেরা জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগ দিতে এবং যোগ দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত উৎসাহ দেখায় নি তার কারণ পরিবারে, সমাজে ও রাজ্য সরকারী পর্যায়ে উদাসীনতা। মাদ্রাজ সরকার ভাষাগত কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিরোধ করে এন সি সি তুলে দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য পর্যায়ে অনেক শক্তিশালী এন সি সি সংগঠন গড়ে তুলেছে। তার কারণ ওখানকার সরকার সচেতন যে, এন সি সি তুলে দিলে সর্ব-ভারতীয় অনেক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই তাদের পিছিয়ে পড়তে হবে। আমরা পশ্চিম-বঙ্গে এন সি সি ট্রেনিং তুলে দিইনি বা তুলে দেওয়ার কথা বলিনি বটে, কিন্তু না-তুলেও যে প্রায়-উঠিয়ে দেওয়া যায় তার দৃষ্টান্ত রেখেছি।

আমাদের অনেকদিনের ক্ষোভ ও অভিমান যে বাংলা দেশে কোনো সামরিক রেজিমেন্ট নেই। বাংলা দেশে বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে তোলার জন্য মাঝে মধ্যে আমাদের পত্রপত্রিকায় তোপ দাগা হয় বটে কিন্তু এইসব দেখে শুনে বেঙ্গল রেজিমেন্টের আকাঙ্ক্ষা যে কতখানি আন্তরিক তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। কোন কিছুই একদিনে হঠাৎ হয় না। সব কিছুর জন্যই সাধনা তথা অনুশীলন ও চর্চা আবশ্যক। হঠাৎ একদিন 'জরুরী অবস্থার' কালো মেঘ দেখে 'সরকি লাও বন্দুক লাও' বলে চীৎকার করলেও কাউকে পাওয়া যায় না অথবা 'বাঙালী ওঠো জাগো' বলে উত্তেজক ধ্বনি দিলেও সামরিক মনোভাব সৃষ্টি হয় না। এরজন্য চাই স্কুলে কলেজে সমাজ-সংগঠনে উৎসাহ। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তানের লড়াই-এ পাকিস্তান পাঞ্জাবকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করেছিল। গোটা

পাঞ্জাবে সামরিক বিভাগ যে তৎপরতার সঙ্গে তার সমুচিত জবাব দিয়েছিল তাতে জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর ছাত্ররা যথেষ্ট উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঘটনাটি এতই প্রশংসার্হ ছিল যে, লড়াইয়ের তিন বছর বাদে ১৯৬৮র স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা বাণীতে এয়ার চিফ-মার্শাল অর্জুন সিং স্বীকার করতে ভোলেন নি :

The National Cadet Corps continues to play a useful roll in preparing own youth to serve the country in various spheres. Cadets of N.C.C. were able to take over many duties during the Indo-Pakistan conflict in 1965. (The Cadet, I.D. No. 1968).

কাজেই সামরিক শিক্ষা ও বৃত্তির প্রতি আমাদের উৎসাহ যদি ধাতুগত নাও হয়, তাকে স্বভাবের মধ্যে গ্রহণ করানোর জন্য সর্বপর্যায়ে সর্বপ্রকারের প্রয়াস প্রয়োজন। বিশেষ করে দেশ ও কালের পরিবর্তিত অবস্থার দিকে লক্ষ রেখে উৎসাহ গড়ে তোলা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। এই প্রচেষ্টা আরম্ভের সবচাইতে বড় হাতিয়ার দুটি আছে। একটি জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী ও অন্যটি টেরিটোরিয়েল আর্মি। এই দুটিরই সযত্ন পোষকতা প্রয়োজন। তবে দুয়ের তুলনায় শিক্ষার্থী বাহিনীর প্রভাব অনেক-বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সামরিক শিক্ষার জন্য ছাত্ররা আসবে দেশের প্রতিটি পরিবার থেকে এবং এই শিক্ষিত ছেলেরাই পরবর্তী পর্যায়ে তাদের ঘর-পর-প্রতিবেশীকে প্রভাবিত করতে পারবে।

এইসব স্বার্থের কথা ছেড়ে দিলেও যে লক্ষ ও আদর্শের উপর জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী দাঁড়িয়ে আছে তা এতই উন্নত যে শুধুমাত্র সেজন্যই এই বাহিনীকে সকল দিক থেকে সুগঠিত করে তোলা এবং ছাত্রদের স্বেচ্ছায় এতে যোগ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করা শিক্ষক এবং অভিভাবকের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ, যে শৃঙ্খলার জন্য আমরা ছাত্র-সমাজের কাছে আবেদন নিবেদন করি তা যদি তার স্বভাবের মধ্যে ঘরেই উপ্ত না হয়ে থাকে তাহলে বাইরে থেকে যে শিক্ষার মাধ্যমে তা যুবে চরিত্রে সঞ্চারিত করা যেতে পারে তা নিঃসন্দেহে এই এন সি সি-ট্রেনিং। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভারতীয় সামরিক বিভাগ। নানান প্ররোচনা সত্ত্বেও আমাদের সেনাবিভাগ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তামাম দুনিয়ার আর্মি যখন নানা স্বরূপে উদ্ঘাটিত তখন ভারতীয় সেনা বিভাগ নীরবে নিজেদের কাজ করে চলেছে। এটা যথার্থই শিক্ষণীয় বিষয়। আমাদের অসামরিক জীবন পর্যায়ে যে সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তাতে শৃঙ্খলার শিক্ষাই বর্তমান কালের শিক্ষার প্রাথমিক অঙ্গ হওয়া উচিত।

তাছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বহুকাল আমাদের দৃষ্টির অগোচরে আছে। সেটি হল, আমাদের সাধারণ ছাত্রের দৈহিক স্বাস্থ্যের নিম্নমান। এর জন্য আমাদের দারিদ্র্যই প্রথমত দায়ী সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দৈহিক পটুতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষার অভাবও সেজন্য কম দায়ী নয়। আমাদের স্কুল কলেজের হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে যে সংখ্যক ছাত্র কোনো-না-কোনো রকম খেলাধুলো বা দেহচর্চার সঙ্গে জড়িত তাদের সংখ্যা শতকরা হিসেবের মধ্যে আসে না। আমাদের অভিভাবক-শাসিত ছেলেরা পড়া-শুনা করে এবং ঘরে থাকে আর আমাদের বন্ধনমুক্ত ছেলেরা উপযুক্ত স্থানে আসীন বা দণ্ডায়মান থেকে রাজনীতি-সমাজনীতি, নাটক-চলচ্চিত্র, নেতা-অভিনেতা সম্পর্কে তীব্র উত্তেজক আলোচনার মত খেলধুলো নিয়েও আলোচনা করে, কিন্তু খেলে না। অবশ্য সেইজন্য একমাত্র ছাত্রদের দায়ী করা যায় না। ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ সুবিধার অভাব আমাদের দেশে এত প্রকট যে তা নিয়ে আলোচনা চলে না। বাংলা দেশের কটি স্কুল কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠ আছে তা সবাই জানেন।

কাজেই মানসিক তৎপরতার সঙ্গে যে দৈহিক পটুতা আজকের দিনের প্রয়োজন, যদি আমাদের বিপুল সংখ্যক ছেলেদের সে পটুতা অর্জনের পথ করে দিতে হয় তা একমাত্র এমন কোনো প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মধ্য দিয়েই সম্ভব যেখানে হাজার হাজার ছেলেকে এক যোগে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য এখনও পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীই একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান যা সবদিক থেকে সাহায্য পেলে এই বিরাট জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু কই সেই আকাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত সাড়া? কি অভিভাবক, কি শিক্ষক, কি দেশনেতা, কি শিক্ষা-প্রশাসক—এতবড় গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে কারো মধ্যেই না। অথচ এদিকে, এতদিনের চেষ্টায় ও যত্নে এন সি সি-র যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার অবয়ব ক্রমশ শুষ্ক ও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে। কোনো স্তরে কোনো উৎসাহ ও উদ্দীপনা বলে কিছু তো নেই-ই তদুপরি এন সি সি-কে যথার্থ দুর্বল করে দেওয়ার জন্য ন্যাশানাল সার্ভিস কোর ও ন্যাশানাল স্পোর্টস কোর নামে দুটি নতুন সংস্থা এন সি সি-র বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ১৯৬৮ সাল থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে। দু'বছর কেটে গেছে এখনও এই পরিকল্পিত সংস্থা দুটির কোনো চেহারা দেখা যায়নি। কতদিনে কিভাবে দেখা যাবে সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

এন সি সি-র বিকল্প কিছু গড়ে উঠলো না। গড়ে উঠে অনায়াস সার্থকতা অবলম্বন করবে এই অনুমানে এন সি সি-কে অনেক খাটো করা হল অথচ ন্যাশানাল সার্ভিস কোর বা স্পোর্টস কোর কোনটাই গড়ে উঠলো না। অর্থাৎ বাইশ বছরের পরিশ্রম যত্ন ও অভিজ্ঞতা নিয়ে যে সংস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে হারাতে বসেছি এবং যাকে পাব বলে বড়াই করেছিলাম তারও কোনো হদিস নেই। এমন সদুঃখ কৌতুককর অবস্থা আর কি হতে পারে।

আসল সত্য অনারূপ। আসলে গত বাইশ বছরে এন সি সি তার প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে এন সি সি-র কোনো বিকল্প হতে পারে না। এন সি সি-র কার্যক্রমের বাইরে কোনো যুব প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। দেশের যুবকদের নিয়ে যে কোন পরিকল্পনা এন সি সি-র আওতার মধ্যে আসতে বাধ্য। একটি ব্যায়ামাগারের যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য এন সি সি ট্রেনিং তা দিতে পারে। একটি রাইফেল সুটিং ক্লাব মুলত যা করতে চায়, এন সি সি-তে তার সুযোগ আছে। সমাজ-সেবী সংঘগুলি যা করে বা করতে পারে, যথা, পুকুর সংস্কার, রাস্তা তৈরী, গ্রামে গ্রামে সংক্রামক রোগের টীকা বা ইঞ্জেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা, গ্রামের মানুষদের মনোরঞ্জনের সাময়িক ব্যবস্থা করা—এ সবই এন সি সি তার বাৎসরিক ট্রেনিং ক্যাম্প বা অতীতের সোস্যাল সার্ভিস ক্যাম্প করেছে বা করতে সক্ষম।

ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা সৃষ্টি করে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনেক অর্থের ও সময়ের অপব্যয় করার মত অবস্থা আমাদের দেশের নেই। অতএব সোস্যাল সার্ভিস কোরই হোক আর স্পোর্টস কোরই হোক সবই এন সি সি-র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বর্তমান অবস্থায় সেটা করাই অতি সুবিবেচনার কাজ হবে। একটি স্ট্যানডার্ড ব্যাটালিয়নে যেমন রাই-ফেল কোম্পানী থেকে আরম্ভ করে সাপোর্ট

কোম্পানী পর্যন্ত অনেক কিছুই থাকতে পারে, তেমনি এন সি সি ব্যাটালিয়নগুলিকে নতুন করে সংগঠিত করে রাইফেল, সার্ভিস ও স্পোর্টস কোম্পানীতে ভাগ করে সহজেই সব দিক বজায় রাখা যেতে পারে। এমনি করে মূলে সংগঠনটিকে সুদৃঢ় করে অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলায় উদ্যোগী হলে সব সমস্যার সহজ সমাধান হবে।

প্রকৃতপক্ষে এন সি সি-র মূলে সমস্যা একটিই। সেটি হল ছাত্ররা এতে অনুৎসাহিত। এই অনুৎসাহ বরাবরের নয়। ক্রমশ যেন প্রকট হয়ে উঠছে। আগে এই সাধারণ অনুৎসাহের এতই ব্যতিক্রম ছিল যে, অনুৎসাহের ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যে আসত না। কিন্তু এখন যে-নিম্নতম সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হলে একটা কোম্পানী বা ব্যাটালিয়নকে টিকিয়ে রাখা যায়, তাও হচ্ছে না। ছাত্রদের এই অনুৎসাহ কতটা স্বভাবগত, কতটাই বা ব্যক্তিগত অসুবিধা-জনিত আর কতটাই বা প্রশাসনিক দিক থেকে ছাত্রদের উৎসাহিত করবার অদক্ষতা হেতু তা আজো পর্যন্ত যাচাই করা হয়নি। হয়তো কোনদিন হবেও না। অবশ্য বর্তমান অবস্থায় তার প্রয়োজনীয়তাও নেই। কারণ, যে-কোন কাজই হোক না কেন, যতক্ষণ তা আমাদের পক্ষে আইনগত আবশ্যিক করা হয়, ততক্ষণ যে-কোন অজুহাতে তার থেকে দূরে থাকা আমাদের স্বভাব। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা সবই করবো এই আশায় বসে থাকলে সময়ও যাবে, কাজও হবে না। তার চেয়ে ক্রমাগত তাড়া খেয়ে আমরা বিরক্ত হতে হতেও অনেক ভাল ভাল কাজ করতে পারি। তার বড় প্রমাণ জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় এখনও বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সংখ্যক পুরস্কারের অধিকারী।

বাঙালী সমর-বিদ্যা বিমুখ জাতি, একথা কখনোই সত্য নয়। যথার্থ মনঃসংযোগ করলে বাঙালী কি যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষায়, কি রণক্ষেত্রে অন্য অনেক তথাকথিত রণনিপুণ জাতির চেয়ে শক্তি, বুদ্ধি ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, তার নজির অদূর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং বাংলা দেশের ছেলেদের সচেতন প্রয়াসে আরও অধিক সংখ্যায় আর্মি, নেভী, এয়ার ফোর্সে স্থান করে নিতেই হবে। এবং সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি দায়িত্ব আছে অভিভাবকের, হেড-মাস্টার-প্রিন্সিপালের ও রাজ্য সরকারের। শুধুই ছেলেদের দোষ দেখিয়ে, বক্তৃতার বাগাড়ম্বর করে কোনই ফল হবে না। যারা উৎসাহী বা যারা উৎসাহী হতে পারে তাদের জন্য এবং অনুৎসাহীদের উৎসাহিত করে তোলার জন্য কয়েকটি অতি-বাস্তব সম্মত তোলার জন্য কয়েকটি অতি-বাস্তবসম্মত প্রয়োজন। যেমন—

(১) প্রতি রবিবার বাসে ও ট্রামে এন সি সি ইউনিফর্ম পরিহিত ছাত্রদের ভাড়া মকুব করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) একাদিক্রমে ছ' পিরিয়ড প্যারেডের ব্যবস্থা থাকলে, স্বাস্থ্যপ্রদ টিফিন দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৩) প্রথম শ্রেণীর টার্নআউট অক্ষুন্ন রাখবার জন্য প্রতি প্যারেড-ডেতে ধোবী খরচ অন্তত একটাকা দিতে হবে।

(৪) যারাই শতকরা ৮০% ভাগ প্যারেডে উপস্থিত থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ট্রেনিং শেষ করবে, তাদেরই সরকারী চাকরীতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৫) 'বি' ও 'সি' সার্টিফিকেট পাস-করা ক্যাডেটরা যাতে সার্ভিস সিলেকশান বোর্ডের পরীক্ষায় সুফল করে অধিক সংখ্যায় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে পারে সেজন্য সরকারী আনুকূল্যে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করতে হবে যে, অন্যান্য যোগ্যতা সমান হলে এন সি সি-র 'বি' ও 'সি' সার্টিফিকেট পাশ করা ক্যাডেটদের চাকরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৭) যে সকল ক্যাডেট শতকরা ৮০% ভাগ প্যারেডে উপস্থিত থাকবে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাদের শতকরা ২½% ভাগ নম্বর পারিশ্রমিক হিসেবে দিতে হবে। তাহলে এদের প্রতি যথার্থ বিচার করা হবে। কারণ, যে ছেলেরা খেলাধূলো, এন সি সি, কি সোস্যাল সার্ভিস ট্রেনিং উপেক্ষা করে

পড়াশ্যনোয় মনঃসংযোগ করে পরীক্ষায় ভাল ফল করে তারা সাধ্য। তাদের কৃতিত্ব আছে বটে। কিন্তু যারা খেলাধ্যলো করলো, এন সি সি-র ট্রেনিংও উপেক্ষা করলো না, সোস্যাল সার্ভিস ক্যাম্পে যোগ দিয়ে পুকুর কেটে কি রাস্তা বানিয়ে এসেও পরীক্ষা বৈতরণী পার হয়ে গেল, তাদের কৃতিত্ব ঐসব সাধ্য ছেলেদের চেয়ে বেশী, এতে আশা করি একজনও দ্বিমত হবে না।

উপরের প্রস্তাব মত সুশৃঙ্খলভাবে কাজ হলে, ব্যক্তি-ছাত্র ও ছাত্র-সংঘের চেহারা পালটে যাবে। লেখাপড়ার বাইরে ছাত্রদের অব্যবহৃত আবেগ, উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে যদি এন সি সি ট্রেনিং-এর অত্যন্ত উৎসাহ-ব্যঞ্জক দিকগুলির সঙ্গে—যেমন—রুট্ মার্চ, স্পর্ট ও লং রেঞ্জ ফায়ারিং, নাইট মার্চ, ক্যাম্পিং, বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ, অ্যানুয়েল ট্রেনিং ক্যাম্প, সোস্যাল সার্ভিস ক্যাম্প, রেগুলার আর্মি এটাচ্মেণ্ট—যুক্ত করে দেওয়া যায়, তাহলে ছাত্রসমাজের মহৎ উপকার করা হবে। কিছ্যু দিয়ে কিছ্যু প্রত্যাশা করার মধ্যে যে সততা আছে তা আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক। অন্যথায়, অরণ্যে রোদন করে কী লাভ হবে।

বাংলার লোক-সংস্কৃতি

রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা চক্র

সম্প্রতি ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে বাংলার লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক ও গভীর মননশীলতায় সমৃদ্ধ এই আলোচনা চক্রটি বাংলার সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে নতুন সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করল। বাংলার লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে বাংলা দেশে এই প্রকার সমষ্টিগত প্রয়াস ও সামগ্রিক পর্যালোচনা সম্ভবত এই প্রথম।

আলোচনাচক্রে ৬টি অধিবেশনে ১৯টি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। এই ১৯টি প্রবন্ধ বাংলার লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ পরিক্রমা ও তত্ত্ব বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। বাংলার লোক-সংস্কৃতি আলোচনার মধ্যে লোক-সাহিত্য, ভাষা, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য, শিল্প, ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কার, উৎসব প্রভৃতি বিশেষভাবে স্থান পায়। বিশেষ বিভাগে অতিরিক্ত বাংলার দুটি আঞ্চলিক লোক-সংস্কৃতির আলোচনা হয়—উত্তরবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি এবং পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোক-সংস্কৃতি। লোক-সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রবন্ধ আলোচিত হয়। অপর একটি প্রবন্ধে বাংলার সমৃদ্ধতম লোক-সংস্কৃতি বিকাশের পটভূমির তত্ত্বগত ও তথ্যগত পরিচয় দেওয়া হয় এবং বাংলার লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির যোগসূত্র সন্ধানের সহায়ক হিসাবে বাংলার আদিবাসী সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে আর একটি প্রবন্ধ পড়া হয়।

১৬ই ডিসেম্বর লোক-সংস্কৃতি আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। লোক-সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বিষয়ক উদ্যোগকে তাঁরা বিশেষভাবে স্বাগত জানান।

এই অনুষ্ঠানে অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য অভিনন্দন পত্র পাঠান জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন বসু। এই অনুষ্ঠানে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার লোক-সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব বিষয়ে ভাষণ দেন। সমবেত সুধিবৃন্দকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে মানিক সরকার স্বাগত জানান।

আলোচনা চক্রের প্রথম অধিবেশনে (১৭ই ডিসেম্বর) সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুরজিৎ সিংহ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলার লোক-সাহিত্য, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়—বাংলার লোক-সংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট এবং ডঃ অমলকুমার দাসের পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সংস্কৃতির ধারা বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ এই অধিবেশনে পঠিত হয়। ডঃ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের উপর আলোচনায় ডঃ ভবতোষ দত্ত এবং ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের আলোচনায় অধ্যাপক বিনয় ভট্টাচার্য প্রধান অংশ নেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ সুরজিত সিংহ পঠিত প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনা করেন।

আলোচনা চক্রের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮ই ডিসেম্বর) সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। এই অধিবেশনে বাংলার লোকসাহিত্যের ভাষায়—ডঃ সুকুমার সেন, বাংলার লৌকিক ভাষা—ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, ও বাংলার লোক-সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য—শ্রীগোপাল হালদার এবং বাংলার লৌকিক দেবদেবী—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। এই অধিবেশনের আলোচনায় উল্লেখযোগ্যরূপে অংশ গ্রহণ করেন ডঃ অনিমেষ পাল, শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্তা গৌরী আইয়ুব, ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়

বাংলার লোক-সংস্কৃতি সম্মেলনে উদ্বোধন ভাষণরত ডঃ রমা চৌধুরী

প্রমুখ সুধীবৃন্দ। সভাপতির ভাষণে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় লোক-সংস্কৃতি চর্চার এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন। ভাষা সংস্কৃতি ঐক্যের সূত্রে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সামগ্রিক সংস্কৃতি চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯শে ডিসেম্বর সকাল ৯টায়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অধিবেশনে পশ্চিম-সীমান্ত বঙ্গের লোক-সংস্কৃতি—ডঃ সুধীরকুমার করণ, উত্তরবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি—শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যম—শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রবন্ধ পেশ করা হয়। এই অধিবেশনের আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, অধ্যাপক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক স্মরজিৎ চক্রবর্তী, ডঃ অনিমেষ পাল, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ অধিবেশন ১৯শে ডিসেম্বর বিকাল অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। বাংলার লোক-নাট্য—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলার লোক-নৃত্য—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, বাংলার লোক-সঙ্গীত—শ্রীরাজেশ্বর মিত্রের প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই অধিবেশনের বিভিন্ন প্রবন্ধের উপর আলোচনায় বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেন—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীমণি বর্ধন, ডঃ অনিমেষ পাল, শ্রীবিশাখা গুপ্ত রায়, শ্রীপূর্ণিমা সিংহ, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সভাপতির ভাষণে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বাংলার লোক-সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তৃতরূপে আলোচনার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে ২০শে ডিসেম্বর সকালে পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলার লোক শিল্প—ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার মৃৎ শিল্পের সমাজতত্ত্ব—শ্রীবিনয় ঘোষ, বাংলার নব পর্যায়ের মন্দির চর্চা—শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যালের প্রবন্ধ পেশ হয়। প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনায় বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেন—অধ্যাপক কাঞ্চন চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী, শ্রীপ্রণব রায়, শ্রীপূর্ণিমা সিংহ, শ্রীবরেন্দ্রনাথ মাকড়, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুরজিৎ সিংহ প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক ঘোষ প্রবন্ধ ও আলোচনাগুলি পর্যালোচনা করে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেন।

আলোচনা চক্রের শেষ ও ষষ্ঠ অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় ২০শে ডিসেম্বর বিকালে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ মীনেন্দ্রনাথ বসু। তিনি মূল্যবান ভাষণ দেন। এই অধিবেশনে বাংলার লোক-ধর্ম—ডঃ সুধীররঞ্জন দাস, বাংলার লোক উৎসব—ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক, বাংলার লোক-বিশ্বাস ও সংস্কার—ডঃ সমীরকুমার ঘোষ প্রবন্ধ পড়েন। ডঃ সুধীরকুমার করণ, শ্রীতারাশিষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ মিনতি চক্রবর্তী, শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

এই অধিবেশনে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ডঃ এল পি বিদ্যার্থী উপস্থিত থাকেন। তিনি তাঁর ভাষণে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে রাজ্যান্তরে লোক-সংস্কৃতি চর্চার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে এই ধরনের প্রয়াসকে প্রথম বলে অভিহিত করেন এবং উদ্যোক্তাদের অভিনন্দিত করেন। আলোচনাচক্রের সামগ্রিক পর্যালোচনায় শ্রীগোপাল হালদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে আরও ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান।

তথ্য জনসংযোগ অধিকর্তা শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর প্রবন্ধ রচয়িতা, আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী এবং বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতি মহাশয়গণকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এঁদের প্রচেষ্টায় আলোচনা চক্রটি সজীব ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তিনি দীর্ঘ আলোচনা চক্রের অধিবেশনগুলিতে সমবেত সুধীবৃন্দকে এবং বিশেষ করে অংশ গ্রহণকারী তরুণ ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের অভিনন্দিত করেন। সমাপ্তি ভাষণে শ্রীমাথুর বর্তমান আলোচনা চক্রকে ভবিষ্যতের এই সংক্রান্ত আরও ব্যাপক কর্ম প্রচেষ্টার সূত্রপাত বলে উল্লেখ করেন।

প্রতিদিনের বিকালের অধিবেশনের শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোক-সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

সামগ্রিকভাবে অধিবেশনগুলির পর্যালোচনায় বলা যায় লোক-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এই আলোচনা চক্র ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই অধিবেশনগুলি বিশেষজ্ঞগণের উপস্থিতি, প্রবন্ধ পাঠ, বিতর্কমূলক আলোচনায় সজীব হয়ে ওঠে। বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে সাধারণভাবে লোক-সংস্কৃতি ও তার স্বরূপ সম্পর্কে বহুবিধ মৌলিক জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয় এবং বিশেষভাবে বাংলার লোক-সংস্কৃতির রূপ নির্ণয়ের সামগ্রিক প্রচেষ্টা সুসংহত হয়ে ওঠে।

এই আলোচনা চক্র লোক-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অতীতের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে সামগ্রিক সংহতি দানের একটি উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় পদক্ষেপ।

মা ফলেষু —

পর পর দুটি মেয়ে হওয়ার পর পারুলের অনেকদিন অখণ্ড অবসর গেছে। মেয়েরাও বড় হয়ে এল। যেমন তারা দেখতে সুন্দর, তেমন কাজে কর্মে আর পড়াশুনোয়। ঘর আলো করা যেন। লক্ষ্ণৌ শহরে লোকে এক ডাকে তাদের চেনে। পরীক্ষায় প্রথম হওয়া, নাচে গানে টেক্কা দেওয়া তখন ঠিক এতটা একচেটিয়া ছিল না শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত সংসারের মেয়েদের। পারুল নিজেও নানা গুণের অধিকারিণী ছিলেন। সাজানো সংসার, তবু মাঝে মাঝে পুত্রার্থে মনটা ছটফট করতো। আহা যদি একটি ছেলে থাকতো। ভেবে দেখুন সমাজ আর সংস্কারের শিকড় কত গভীর। ক্লাবে, পার্টিতে, কেতাবী বিদায় আধুনিকতার পাঁচপুরু প্রলেপের নীচে ঐ পুরোনো কালের ঠাকুমা দিদিমার সংস্কার বাস করে। সংস্কার ভাল কি মন্দ তা' নিয়ে বিচার করছি না, মাত্র তার প্রবল শক্তির কথাই বলছি।

পারুলের পুত্রলাভ হলো। বহুদিন পরে নূতন শিশুর আগমন সংসারকে যেন নূতন আনন্দে ছেয়ে দিল। বেশী বয়সের সন্তান, তার উপর অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার পুঞ্জীভূত সার্থকতা। সোহাগে আদরে শিশু বেড়ে উঠলো। আমি যখন তাকে প্রথম দেখি তখন শিশু শিশির কৈশোরে পা দিয়েছে। এমন সুন্দর ছেলে আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পারুল প্রবীণা, কোন কালে সুন্দরী ছিলেন বলে মনে হয় না। শিশিরের বাবা সাহেবীর শত পোঁচ সত্ত্বেও সাধারণ বাঙ্গালীর মত চেহারা পাল্টাতে পারেন নি। অথচ ছেলে যেন শাপভ্রষ্ট কোন দেবকুমার।

যে-জিনিসটা আমার খুব ভাল ঠেকতো না তা প্রথমত, বাপমায়ের অতিরিক্ত আদর আর দ্বিতীয়ত শিশিরকে নিয়ে অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কোমলমতি কিশোরকে ঘিরে দশজন গৃহশিক্ষক হাবুডুবু খেতেন। সঙ্গীতে তাকে তানসেন তৈরী করতে হবে, বিদ্যায় বিদ্যাসাগর, ওয়াজেদ আলি শাহের মত কবিতা লিখতে হবে, শম্ভু মহারাজের মত কথক নাচতে হবে, ভ্যান গগের মত ছবি আঁকতে হবে আরও কত কি। মিষ্টি ছেলেটা বাপ এবং মায়ের অ্যাম্বিশনের চাপে হোঁদিয়ে উঠতো। পারুল বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। সুগৃহিণী, নিপুণ সংসারী বলে সবাই জানে তাঁকে। প্রথম ঘর-কন্নার হাতেখড়ি আমার তাঁর কাছে। ক'মণ কয়লায় মাস যাওয়া উচিত, কতটুকু কিমা দিলে ক'খানা আলুর চপ অবলীলাক্রমে গড়া যায়, সব যেন পারুলের ফরমুলায় ফেলা। চকচকে বাঁধানো লাল মলাটের হিসাবের খাতাটি প্রায় রিসার্চ প্রকাশনের পাণ্ডুলিপির মত পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে। এমন মিতব্যয়িতার সঙ্গে প্রাচুর্যের সংসার চালাতেন যে দেখে তাক লেগে যেতো। এক-মাত্র শিশিরের বেলায় যেন তাঁর মাপজ্ঞান থাকতো না। আদরের বেলায় না, তাকে ঘিরে উচ্চাশার বেলায়ও না।

শিশির বাংলা আর হিন্দির এক খিচুড়ি বানিয়ে যখন কথা বলতো ভারি মিষ্টি লাগতো। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হতো নিজের ভাষা, নিজের ঐতিহ্য খাঁটিভাবে শেখাবার যোগ্যতা পারুলের আছে, তাঁর স্বামী পালমশাই-এরও আছে। কিন্তু ঐখানে উচ্চাশার কোন যোগ ছিল না। কিছু কখনো বলতে সাহস করতাম না। আমি কতটুকু বুঝি। এ'রা গুণী, জ্ঞানী, বিদ্বান। হঠাৎ স্কুলের ছুটি হ'লে শিশির ছুটে এসে যখন বলতো 'ছুট্টি দিলিয়ে দিল', তখন পারুলদি আর পালমশাইকে সংশোধন করতে শুনিনি। সেবার দল বেঁধে আমরা কলকাতার দুর্গাপুজো দেখতে গেলাম। মহাষ্টমীর ভোগের ভোজ খেতে বসে শিশির বললো 'খাটাই'টা আর একটু চাই। চাপা হাসির ধুম পড়ে গেল। আস্তে কানের কাছে মুখ এনে তার দিদি বললো, 'খাটাই নয়, বল টকের তরকারি'! তবু পারুল বা

পালমশাই এতোটা বিচলিত হলেন না। যে ছেলে দিগ্বিজয়ী হবে, তার বেলায় সামান্য নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি?

যাক গে সব অবান্তর কথা। আসল ব্যাপারে আসা যাক। পারুলের অভ্রভেদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিন দিন শিশিরকে মাধ্যম করে উচ্চতর হয়েই চলেছিল। দিদিরা দারুণ মেধাবী। কাজেই শিশিরের সেই পাল্লায় পরীক্ষার ফল তুলতে প্রাণ যায়। গৃহ-শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ে, খেলাধুলো আমোদের সময় কেটে দেওয়া হয়। তবু বাপমা অন্ধকার মুখে বসে থাকেন। তাঁরা যে ভেবেছিলেন শিশির হবে সবার সেরা।

পারুল পালের সাজানো সংসারে কেমন যেন ছন্দপতন হয়। শিশিরকে অসামান্য করবার প্রয়াসে মেয়েরা এদিক ওদিক ছুটে গেছে, খেয়াল হয়নি কারও। কোন মুল্লুকের যেমন তেমন মানুষকে তারা বিয়ে করেছে। কারও বা ঘরে আছে আগের এক বিরাট সংসার, কারও বা আর কিছু। দুঃখের প্রথম ধাক্কা সামলে এবার পালদম্পতি উঠে পড়ে লাগলেন। ঐ এক ধ্যান, এক তপস্যা। পড়াশুনোয় শিশিরের মাথা কম, আগ্রহ নেই। বোধহয় যে কোন বিষয় নিয়ে জোরজবরদস্তি বেশী করা যায় তাতে অজ্ঞাতে অদ্ভুত এক অরুচি জন্মায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার বাবা মা'র মনে কিছু যেন খট্‌কা আসে। সোহাগের ভরা জোয়ারে ভাটার টান ধরে। পাল মশাই চুপ করে থাকেন, কি যেন ভাবেন, কি যেন হিসেব করেন। অকারণে আকাশের গায়ে আঙুল দিয়ে অঙ্ক কষেন। কিন্তু পারুল পাল ঠিক শূন্যে হাত বুলোবার মানুষটি নন। মুখ ফুটে দু চার কথা শিশিরকে শোনাতে আরম্ভ করেন। এর চেয়ে মেয়েরা তাঁর মুখ উজ্জ্বল করেছে কত বেশী। ছি ছি, তুলনায় তো শিশির একটি নিরেট!

অত দীর্ঘদিনের আদর সোহাগের শেষে সামান্য একটু শ্লেষ শিশিরের অসহ্য ঠেকে। বিদ্রোহী মনের অশান্ত পরিণাম শুরু হয় অসংযত আচরণে। অল্প অল্প করে দু একটি কুঅভ্যাস আরম্ভ হয়। মা বাবার উপর অভিমানে বেপরোয়া জীবন দিয়ে তাঁদের অগ্রাহ্য করাই যেন তার লক্ষ। তাঁদের দুঃখ দেওয়াই যেন একমাত্র কামনা।

কলেজ পর্যায়ে পৌঁছোতে শিশিরের বেগ পেতে হলো। মায়ের বিদ্রূপ আরও জোরালো হলো, সঙ্গে সঙ্গে শিশির বদ্ধপরিকর। মায়ের উচ্চাভিলাষ ভেঙ্গে চুরমার করে গোঁপ চুমরে ইয়ারদোস্তের সঙ্গে নানা আড্ডায় সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পালমশাই প্রতাপশালী মানুষ। ছেলেকে কাজে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন ভেবে সে ব্যবস্থাই করে দেন। নাই বা হলো আইনস্টাইন ব নীল বোর। সওদাগরী অফিসে মোটারকম বেতনে আরামের জীবন তো কাটাবে। পারুল ছেলের উপর বিরূপ বেশী। ছেলের মাধ্যমে তাঁর দশজনের একজন হবার আশার জলাঞ্জলি তাঁকে আঘাত দিয়েছে বেশী।

তা হ'ক। তবু তো বুড়োবয়সের ছেলে। শিবরাত্রের সলতে। সওদাগরী দপ্তরের ঠাটই কম কি? শিশির কিন্তু সেখানেও তাঁকে আঘাত হানতে ছাড়লো না। সওদাগরী মহলের আসবাসক্তি তাকে পেয়ে বসলো। মত্ত মাতাল শিশিরকে কখনও বা পথে ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। কখনও বা তার খোঁজ মেলে এমন এক এলাকায় যে পালমশাই স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন; মায়ের মুখে কথা সরে না। কি সাংঘাতিক পরিণতি! তাঁদের আদরের দুলাল দুপুর রাতে কত্থক নাচের ভঙ্গীতে প্রমত্ত অবস্থায় দরজায় এসে দাঁড়ায়। সেই যে শৈশবে নাচ গান শিখিয়েছিলেন তার অবস্থান্তরের শেষ ফল!

পালদম্পতি এতদিনে ছেলের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে বালগোপালের শরণ নিয়েছেন। সকাল সন্ধ্যা ঠাকুরঘরে কাটান। রাত কাটে মাতাল ছেলের সন্ধানে। শিশিরের অমন সুন্দর কান্তি কোথায় মিলিয়ে গেছে। সওদাগরী অফিসের কর্তারাও অতটা সহ্য করতে নারাজ। পাল সাহেবের প্রতিপত্তি আর কিছু করতে পারলো না। মত্ত অবস্থায় শিশিরকে কুখ্যাত পল্লীতে পাওয়া গে... এতে তাঁদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বদনাম... শিশির এ দরজা ও দরজা ঘুরে চাকরীর বাজার সম্বন্ধে বিরূপ হ'য়ে সম্পূর্ণ মদ ও অন্যান্য আসক্তিতে সংলিপ্ত হয়ে নিজের সর্বনাশ দিয়ে মা বাপের সমুচিত শিক্ষা দিল। রোগজর্জর শিশির জরাকীর্ণ মাতাপিতার ভারস্বরূপ। শুনেছি অত্যধিক পানে তার যকৃৎ-এ ভয়াবহ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। পারুল পাল ঠাকুরকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, যেন এ দুঃখ তাঁর একমাত্র সন্তানকে অধিক দিন ভোগ করতে না হয়।

এ কাহিনীতে নূতনত্ব কিছুই নেই। দলে দলে পারুল আছে আর শিশিরের মত ছেলে আছে। কিন্তু আজ আমার ওদের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে কারণ শুনলাম নূতন তথ্য। মা বাপের উচ্চাভিলাষ নাকি সন্তানকে অনেক অশান্তির পথে ঠেলে দেয়। গবেষণার ফলে দেখা গেছে সন্তানের মধ্য দিয়ে জীবনের বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাতাপিতা সার্থকতায় পরিণত করতে চান। সন্তানের মধ্যে সাবধানে অ্যামবিশনের বীজ বপন করা ভাল কিন্তু নিজের ইচ্ছার প্রতিবিম্ব দেখতে গিয়ে তার জীবনকে ছিন্ন ভিন্ন করে লাভ নেই। প্রত্যেক মানুষের জীবনের গতির সাবলীলতা রক্ষা করা সবার আগে দরকার। আপন ইচ্ছায় অন্যের জীবন চালনা করার অধিকার মাতা পিতারও নেই।

শ্রীমতী

॥ চার ॥

'ওমা, সে কী কথা গো।' শুনেই না আমি আৎকে উঠেছি : 'তা কি কখনো হয় নাকি!'

'না হবার কী আছে!' তিনি বললেন : 'সেকালের পতিদেবতার পক্ষে এতো অতি সহজ কাজ। সেযুগে বৌ ঠেঙানো লোকে বিলাসিতা বলেই মনে করত, আর, বৌকে মেরে খুন করে ফেলা তো চরম বাহাদুরি! আপনার বাবা কিছু আর তখনকার সমাজ-বহির্ভূত লোক নন? তবে হ্যাঁ, এই ফেরার হওয়াটা একটু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বটে। স্বভাবতই সে সময়ে এসব আপনার থেকেই চাপা পড়ে যেত, থানার দারোগাকে কিছু ধরে দিলেই মিটে যেত হাঙ্গামা। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সদরের পুলিস সাহেবের কানে গিয়ে গড়িয়েছিল কিনা। তিনি স্বয়ং সরজমিনে তদন্তের জন্যে মহানন্দপথে তাঁর বজরায় এসে পড়লেন একদিন...গেরেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে......'

'আর, বাবাও অমনি রাজ্যপাটের পরোয়া না করে বজরাঘাতের আগেই কেটে পড়লেন সেখেন থেকে?' আমি অনুযোগ করি : 'এই তো বলতে চাইছেন আপনি?'

'অবিকল।'

'কিন্তু তা কি করে হয় মশাই? আমার মাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি যে...জলজ্যান্ত দেখেছি...বাবা মারা যাবার পরেও অনেকদিন তিনি বেঁচে বর্তে বহাল তবিয়তে ছিলেন।'

'তাই নাকি? কিন্তু আপনার মা হেমাঙ্গিনী দেবীর নিহত হবার খবর সেখানকার সুপ্রাচীন অনেকের কাছেই জেনে এলাম যে!'

'হেমাঙ্গিনী—কী বলছেন? আমার মার নাম যে শিবরাণী।'...আমি প্রকাশ করি : 'বাবার নাম শিবপ্রসাদ। আমার ভাইয়ের নাম শিবসত্য, ঘাটশিলার স্কুল কাম কলেজের হেডমাস্টার বনাম প্রিন্সিপাল। শিব দিয়ে মিলিয়ে নাম সব আমাদের।'

শুনে তিনি অবাক হন—এরকম নামের যোগাযোগের মানে?'

কে জানে, কেন! আমাদের দুভায়ের নাম বাবার রাখা—তিনিই মিলিয়ে রেখেছেন আর, মার নামটা নাকি হরেই ছিল আগের থেকে। আর, ঐ নামের মিলের কারণেই বিয়েটা হল নাকি শুনেছি।'

'মনের মিল হয়ে বিয়ে হয় তা জানি কিন্তু এই নামের মিল দেখে—আশ্চর্য।'

'আশ্চর্য ত বটেই। বাবা যখন সাধুবেশে মুক্তিলাভের আশায় হিমালয়ের পথে বিপথে ঘুরছিলেন তখন এক ঋষিকল্প সন্ন্যাসী নাকি তাঁকে সংসারে ফিরে গিয়ে বংশরক্ষণ করে নিজের প্রাক্তনখণ্ডনের উপদেশ দেন আর তিনিই বলেছিলেন যে, তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী অপেক্ষা করছে—যার নাম শুনলেই তিনি টের পাবেন। আর একটা রাজপ্রাসাদও নাকি তৈরী হয়ে রয়েছে তাঁর জন্যে। ভদ্রলোকের এই দুটো ভবিষ্যবাণীই কিছু কিছু ফলেছিল বলতে হয়।'

'সেই রাজপ্রাসাদটা আমি দেখে এসেছি এবার ওই চাঁচোরে গিয়ে, যেখানে আপনারা এককালে বাস করতেন। ওল্ড রাজ প্যালেস বলে থাকে লোকে এখনো। তবে তার রাজোচিত চেহারার কিছু আর অবশিষ্ট নেই...তিন ধার পড়ে গেছে তার। অনেককাল হলতো।'

'আমার বাবা যখন সন্ন্যাস ছেড়ে সংসারে ফিরে এলেন তখন স্বভাবতই তাঁর বিয়ের কথা উঠল—নানা জায়গার থেকে সম্বন্ধ নিয়ে আসতে লাগল ঘটক। তাদের মধ্যে একজনের নাম শিবরাণী দেখেই না বাবা ঠিক করে ফেললেন, বললেন যে, ওই মেয়েই আমার সহধর্মিণী।'

'অবাক কাণ্ড ত?'

'সেই পরমহংসদেবের মতই না? তিনি ছোটবেলাতেই এক দঙ্গল বালিকার মধ্যে একটিকে দেখিয়ে বলেছিলেন—ওই আমার বৌ। পরে তার সঙ্গেই তাঁর বিয়ের ঠিক হয়। তিনিই মা সারদামণি। তাই না?'

'তা না হয় হোলো কিন্তু বিলকুল গড়বড় হয়ে যাচ্ছে যে! বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া খবর সব...জেনে এলাম আপনার মাকে খুন করে বাবা ফেরার হয়েছিলেন এদিকে আপনি বলছেন বাবা মারা যাবার পরেও আপনি মাকে দেখেছেন। মনে হচ্ছে, যাকে দেখেছেন তিনি আপনার মা নন, সৎ মা। উক্ত হেমাঙ্গিনী দেবীই মা

আপনার...আপনার বাবা দুই বিবাহ করেছিলেন আপনি. তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে।'

'আবার আমার প্রতি আপনার এই অযথা পক্ষপাত...'

'অসম্ভব কিছু নয়ত। সেকালে একাধিক বিয়ের রেওয়াজ ছিল। প্রায় লোকেই তা করতেন।'

জানি। তবে সেটা কুলীনদের বেলাতেই হত মশাই! এক কুড়ি দু' কুড়ি বিয়ে করা তাঁদের পক্ষে কিছুই ছিল না—এমনকি কুড়িয়ে বাড়িয়ে একশও ছাড়িয়ে যেত কারো কারো শুনেছি। কিন্তু চকরবরতিরা কুলীন নয়, যদ্দুর আমি জানি।'

'চকরবরতিরা কঞ্জুস হয় একথাটা যেমন আপনার জানা তেমনি ত?' তিনি হাসতে থাকেন।

'চকরবরতিরা যে কঞ্জুস হয় সেটা কেবল জানা কেন আমার দেখাও যে।' আমি জানাই: 'এই চর্মচক্ষেই দেখা—আয়নার মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান!'

'তাহলেও, কুলীন না হলেও দু'তিনটে বিয়ে এমন কিছু কঠিন ছিল না কারো পক্ষেই তখন। এমন অন্নসংকট তো দেখা দেয়নি সে সময়। আমার ধারণা আপনার

বাবা ফেরার দশায় পর ফিরে এসে দ্বিতীয়-বার বিয়ে করেছিলেন এই শিবরাণী দেবীকে।'

'তাহলে তো সেই দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ হত আমার যা খুব কম ছেলের বরাতেই ঘটে থাকে...' আমি বলি : 'বাবার বিয়ে দেখতে পেতাম আমি। মানে এই দ্বিতীয় বিয়েটাই। আমার চোখের ওপরই ঘটত তো! আর কিছু না হোক, বৌভাতের দিন অন্তত পানের খিলি বিলি করার পার্টটাও আমি পেতাম।'

'তার জন্যে আপসোস করবেন না। আপনার লেখায় ত তাই বিলিয়েছেন সারা-জীবন।' বলে তিনি খিলখিলিয়ে হাসেন।

সে কথা সত্যি, মানতে হয় আমায়। পাঠক পাঠিকার পাতে আর সব লেখকের নানান উপাদেয় ভূরিভোজ্য পরিবেশনের পর জীবনভোর আমার ঐ পানের খিলি বিলোনোই ত। পুষ্টিকর কিছু নয়, মুখ-বদলাবার জন্য তুষ্টিকর যৎকিঞ্চিৎ। আমার ফসলে ধান গমের কিছু নেই, তার আবাদেও পারঙ্গম নই আমি, আমার বরোজে খালি ওই পানই ফলে। চুটকি লেখার চটক! কারো মনের আকাশে খানিকক্ষণ উড়লেও খানিক-বাদেই ফুরুৎ করে মিলিয়ে যায় হাওয়ায়।

'যাক। ওসব কথা থাক, আপনার কুলপঞ্জীতে আসি। আপনার কাছে খবর-গুলো যাচিয়ে নেওয়া যাক। আপনার ঠাকুর্দার নামটি কী বলুন ত?'

'কি করে বলব! আমার বাবাই জানেন।'

'আপনি জানেন না? শোনেননি কখনো বাবার কাছে?'

'শুনব না কেন, কত বারই তো শুনেছি। কিন্তু বছরে একবার করে শুনলে কি মনে থাকে কারো, না, মুখস্থ হয়?'

'বছরে একবার করে?'

'হ্যাঁ সেই মহালয়ার দিন পার্বণশ্রাদ্ধর সময়। তখনই বাবা ঊর্ধ্বতন চোদ্দ পুরুষের নাম আউড়ে তর্পণ করতেন...সেই দেবশর্মণঃদের নাম তখন তখন হলে না-হয় বলতে পারতাম; কিন্তু এখন অ্যাদ্দিন বাদ—।

'কিন্তু অন্তত তিন চার পুরুষের নাম তো মনে থাকে। মনে রাখে সবাই।'

'রেখে লাভ মশাই? যখন সেই অতীত কুলকোটিনাম্ সপ্ত দ্বীপনিবাসিনাম কারো নামই আমাদের স্মরণে নেই, তখন হারানো মহাসমুদ্রের এক গণ্ডুষ মাত্র—গণ্ডাকয়েকের নাম মনে রেখে কী হবে? তবে...' আমার আরো অনুযোগ—'এটুকু আপনাকে বলতে পারি ঠাকুর্দার সম্পর্কে যে শিব দিয়ে তাঁর নাম নয়। কেননা, আমার বাবা তো তাঁর নামকরণের সুযোগ পাননি আদৌ।'

'তবে শুনুন সেটা আমার কাছে। আপনার ঠাকুর্দার নাম হচ্ছে নবকুমার।'

'অ্যাঁ? তাই নাকি?' আমি যেন চোট সামলাই, 'তাহলে ইনিই কি সেই নবকুমার যিনি নৌকোর থেকে কাঠ কুড়োতে নেমে বালিয়াড়িতে গিয়ে পথ হারিয়েছিলেন?'

'পথ হারিয়েছিলেন? তার মানে?'

'মানে, পথিক! তুমি কি পথ হারাইয়াছ-র নবকুমার? আপনি কি বলতে চান যে কপালকুণ্ডলা আমার ঠাকুমা?' আমার বঙ্কিমকটাক্ষ।— 'বঙ্কিমবাবুর সেই মানস-কন্যা যাকে দামোদরের বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে, কপালকুণ্ডলা ডুবিয়া গেল আর উঠিল না বলে এক কথায় তিনি খতম করে দিয়েছিলেন, যে নাকি আবার সাঁতরে দামোদর পেরিয়ে মৃন্ময়ীরূপে লোকসমাজে ফিরে দেখা দিয়েছিল আবার?'

'আপনার ঠাকুমার নাম আমি পাইনি। চেষ্টাও করিনি জানবার। তবে আপনার জন্মবৃত্তান্ত জেনে এসেছি, তাও কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়।'

'হাতী ঘোড়া কিছু নয় নিশ্চয়? আর সবাই, সাধারণ মানুষরা যেমন করে জন্মায়...'

'হাতী ঘোড়ার কথা আসছে কেন এখানে?'

'মানে, আমার জন্ম ব্যাপারে হাতীমার্কা কিছু ঘটেনি সেই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম। গোপা দেবী গৌতম বুদ্ধের জন্মের আগে হাতীর স্বপ্ন দেখেছিলেন না?'

'না, তেমন অলৌকিক কিছু না হলেও একেবারে লৌকিকও বলা যায় না ঠিক। মার মুখে আপনি শোনেননি কিছু?'

'শুনেছিলাম একটুখানি এক সময়। কিছুতেই নাকি আমি হচ্ছিলাম না, তাই বাবা মা বিন্ধ্যাচলে গিয়ে মানত করেছিলেন ছেলের জন্যে—আর তারপরেই নাকি আমি হলাম। মা বিন্ধ্যবাসিনীর দয়াতেই হওয়া, জগন্মাতার দোয়াতেই আমায় পাওয়া। তাই মা আমার নাম রেখেছিলেন পার্বতীচরণ। পরে বাবা আমার সেই প্রথম নামটা পালটে শিবরাম বানিয়ে দেন।'

'কেমন করে পাওয়া আপনি, জানেন তা? তাঁরা দেবীর পুজো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পান এক নবজাতক শুয়ে রয়েছে মন্দিরচত্বরে, অনেক খোঁজখবর করেও তার বাপ-মার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন সেই বেওয়ারিশ শিশুটিকেই মার দেওয়া মনে করে তুলে নিয়ে এসে তাঁরা মানুষ করেন। সেই শিশুই হলেন আপনি।'

'আশ্চর্য নয়। আমারও সেইরকমই মনে হয়। বলেছিলাম না আপনাকে যে আমি কোনো বস্তির আমদানি নয় রাস্তারই কোণ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া—মিলে গেল ত?'

'মেলালেই মেলে।' তিনি নিশ্বাস ফেলেন।

'তিনিই মেলান।' মেলাবার মালিক তিনিই। মেলাবেন তিনি মেলাবেন—অমিয় চক্রবর্তীর সেই কবিতাটা স্মরণ করুন। বস্তির সঙ্গে প্রাবস্তির, কুঁড়ে ঘরের সঙ্গে কুঁড়ের বাদশাকে তিনিই মিলিয়ে দেন—মিলিয়ে থাকেন। সবই তাঁর অবদান।'

'এবার আপনার বাবার চরিত্র কথা শুনুন তবে—যা জেনে এসেছি। আপনার মনঃপূত হবে কিনা জানি না। আপনি তো বললেন আমার বাবা পূত চরিত্রের দেবতুল্য আত্মভোলা মানুষ ছিলেন—কিন্তু সুন্দরী ললনাদের প্রতি দারুণ তাঁর ঝোঁক ছিল জানেন সেটা?'

'নিজের থেকেই জানা যায়—আমার মধ্যেও সেই ঝোঁক যে। আমার দেহে বাবার রক্ত প্রবাহিত কি না জানি না, যদি আমি বিন্ধ্যাচলের সেই বেওয়ারিশ হয়ে থাকি, তবে আমার স্নেহে সেটা প্রকট। বাবার দৃষ্টান্তেই মানুষ তো! নামান্তরে সেই বাবাই। সুন্দর মেয়েদের সামনে আমিও আপনাকে সামলাতে পারি না। কেউ পারে কি না কে জানে!'

'সুন্দরী বধূদের তিনি হীরে চুণী পান্নার আংটি উপহার দিতেন জানেন তা?' সে তল্লাটের অনেক গিন্নীই হাতের সেই আংটি দেখালেন আমায়—প্রৌঢ় হলেও প্রথম যৌবনে যে তাঁরা বেশ রূপসী ছিলেন দেখলেই সেটা টের পাওয়া যায়। এটা আপনি জানতেন?'

'জানব না কেন। স্বচক্ষে দেখেছি। যখনই তিনি কলকাতায় যেতেন একগাদা সোনার আংটি গড়িয়ে আনতেন পাথর বসানো, আর যাঁকে তাঁর ভালো লাগত স্বহস্তে তার আঙুলে পরিয়ে দিতেন দেখেছি।'

'আর আপনি এদিকে বলছেন আপনার বাবা ছিলেন নিরাসক্ত দেবতুল্য মানুষ—'।

'তাতে কী হয়েছে। মহাদেবের কি মোহিনীর প্রতি ঝোঁক ছিল না?' বাবার হয়ে সাফাই গাই : 'আর সত্যি বলতে, বাবার ওই আদর্শ থেকেই আমি প্রেরণা পাই। এটাকে মনের দুর্বলতা বলতে পারেন, কিন্তু আমার মনের জোর ওই থেকেই। নিজের মনের দুর্বলতা অনায়াসে কাটিয়ে ওঠার অতি সহজ এই উপায় বাবার দৃষ্টান্ত থেকেই আমি শিখেছি। বাবার ওই আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়—তাঁর ওই আচরণের ছেলেবেলাকার সেই-শিক্ষায় এই অধম জীব বহুৎ বাধা অবলীলায় উৎরে এসেছে।'

'পরস্ত্রীর প্রতি ওই আসক্তি কি ভালো?'

'তা আমি জানি নে। তবে বলতে পারি আমার মধ্যে একটুও পরস্ত্রীকাতরতা নেই। পরস্ত্রী ছাড়া কি আর মেয়ে নেই দুনিয়ায়?

পদ্মীর মত মেয়ে? তারা থাকতে—পরধনে হস্তক্ষেপ করবার দরকার। তবে হ্যাঁ, ওই আংটি দেওয়াটা একটু বায়সাপেক্ষ বটে। কিন্তু ও ছাড়াও বিয়ে না করেও পরকন্যার পাণিগ্রহণের অন্য পথ আছে আরো, একেবারে নিখর্চায়। কাজী আমায় শিখিয়েছিল পামিস্ট্রি। মিষ্টি হাতকে হস্তগত করার সহজ উপায় হচ্ছে ঐ হাত দেখা। ঐ করে প্রথম হাতিয়ে না, তারপর শনৈঃ শনৈঃ! শনৈ পর্বত লঙ্ঘনম ইত্যাদি! কাজী নাকি ঐভাবেই বাগাতো মেয়েদের। আর সেই কারণেই আমি বলতাম, আমাদের মধ্যে Kazi Knows RULE?'

'কাজীর কথা থাক, আপনার বাবার কথা কই তিনিও কিছু কম কাজের কাজী ছিলেন না।'

'বাবার কুলকুণ্ঠী আর আপনার কাছে কী শুনবেঁ? তাঁর কুলকাহিনীর আমিও কিছু কিছু জানি। তাঁর মুখেই শোনা। বলব আপনাকে?'

'বলুন বলুন।'

'আমাদের আদিনিবাস ছিল নাকি চৌয়ায়...মুর্শিদাবাদের কোনখানে যেন সেই জায়গাটা। সেখান থেকে চুঁইয়েই আমরা ওই চাঁচোরে গিয়ে পড়েছিলাম—তারপর সেখান থেকে বিদূরিত হয়ে কোথায় না! যাক, ওই চৌয়া যে কেমন জায়গা চোখে দেখিনি, যাইনি কখনো সেখানে, তবে বাবা একটা ছড়া কাটতেন—ছড়াটা তাঁরই কিনা কে জানে—শীত নেই প্রীতি নেই সব সময়েই ধোঁয়া। সকাল নেই

মিষ্টি হাতকে হস্তগত করার সহজ উপায়...

সন্ধ্যে নেই শেয়াল ডাকে হোয়া। গ্রামের নামটি চৌয়া॥ এই চৌয়ায় একবার এক যাত্রা পালার আসর বসেছিল। চাঁচোরেও আমি যাত্রাদল আসতে দেখেছি। মুকুন্দ দাসও এসেছিলেন একবার মনে আছে। এখন চৌয়ার কথাটাই বলি। যেদিন রাত্রে যাত্রা হবার সেদিন সকালে বাবা সামনের বাগানে প্রাতঃকৃত্য করতে গেছেন, দেশগাঁয় গায় হাওয়া লাগিয়ে প্রকৃতি রসিকের ন্যায় নিঃসর্গ দৃশ্য দেখতে দেখতে মুক্ত বাতাসে নিজেকে বিমুক্ত করাই যে রেওয়াজ তা আপনি অবহিত আছেন আশা করি। এখন, সেই যাত্রাদলের একটি ছেলেও বসেছিল প্রাতঃকৃত্য করতে কাছাকাছি—তিনি লক্ষ্য করেন নি। এহেন কালে একটা কুল এসে পড়ল তাঁর সম্মুখে। টোপাকুল। দেখে তিনি লোভ সামলাতে না পেরে মুখে পুরে দিয়েছেন, ছেলেটা সেটা দেখেছিল।...'

'তারপর?'

'তারপর, সন্ধ্যায় যাত্রার আসর বসতে রাধাকৃষ্ণের পালা শুরু হোলো। সেই প্রাতঃকৃত্যের ছোঁড়াটা জটিলা-কুটিলা একজনা সেজেছিল। নাচতে নাচতে আসরে এসে গাইতে লাগল 'তোমার কুলের কথা কয়ে দেব' রাধার কাছেই হাত মুখ নেড়ে গাইছিল সে, তারপর গোটা আসরেই ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল তাই। বাবার কাছে এসে যখন সে হাত নাড়তে লেগেছে—তোমার কুলের কথা কয়ে দেব। বাবা তাকে একটা টাকা প্যালা দিয়েছেন। চলে গেছে। এক চক্কর ঘুরে ফিরে আবার সে এসে শুরু করেছে তোমার কুলের কথা কয়ে দেব। অমনি বাবা হাটে হাঁড়ি ভাঙবার ভয়ে পাঁচ টাকা প্যালা দিয়েছেন। ফের আবার। বকশিস পেয়ে পেয়ে ছোঁড়াটার উৎসাহ বেড়েছে, ঘুরে ঘুরেই আসছিল সে আর গাইছিল ওই কুলের কথার কলিটা—বাবার মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে। আর বাবাও অমনি তেড়ে তেড়ে প্যালা দিচ্ছেলেন ছেলেটাকে—তার মুখ চাপা দেবার জন্য। তিনি যত চাপতে চাচ্ছিলেন ততই তার চাপল্য বাড়ছিল যেন। সে ভেবেছিল তার গানটা বুঝি বেজায় মনে ধরেছে বাবুর—তাই সে গানও ছাড়ছিল না, বাবাকেও না। আর পাগলের মত বাবা প্যালা দিয়ে যাচ্ছিলেন—ঐ করে বাবার আংটি গেল, সোনার ঘড়ি চেন গেল, গায়ের শাল দোশালা আংরাখা, লক্ষ্ণৌ টুপির কিছুই থাকল না, সব চলে গেল বাবার ওই গানের ঠ্যালা সামলাতে, কিন্তু প্যালারামকে থামানো গেল না। শেষটায় কুলের কাঁটার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বাবা উঠে পড়লেন আসর থেকে—সর্বশেষ প্যালা নিজের পরিধেয় বস্ত্রটি খুলে দিয়ে বললেন, যা ব্যাটা, কগে যা আমার কুলের কথা। হাগতে বসে একটা কুল খেয়েছি, এই না? কয়ে দিগে, বয়েই গেল আমার। বলে বিলকুল দিগম্বর হয়ে বেরিয়ে এলেন আসর থেকে।'

'তাই নাকি?'

'বাবার এই কুলকাহিনীটা তো আপনি শুনতে পাননি? সত্যি বলতে, সবার কুলকথা কুলকেচ্ছাই প্রায় এইরকম। আমিও নিজের কুলের কথা কাউকে কইতে চাইনি তা এইজন্যই। পাছে দিগম্বর সাজে লোকসমাজে বেরিয়ে পড়তে হয় সেই ভয়।

[illegible]

তোমার কুলের কথা কয়ে দেব...

আপনি কি জানেন, যে সমস্ত মানব-শিশু আগামী দশ বছর পরে ভূমিষ্ঠ হবে, দৈহিক ওজন এবং আয়তনে তারা আজকের নবজাতকদের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকবে? শৈশবে যে হারে আমরা নিজেরা বেড়ে উঠেছিলাম, সে তুলনায় আজকের ছেলেমেয়েদের বাড় অনেক বেশী এবং এখনকার চার মাসের শিশুকে তিরিশ বছর আগে কেউ দেখলে ছয় মাসের বলে ভুল করত?...সম্প্রতি এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি পরিবেশন করেছেন সোভিয়েত দেশ-এর পারম মেডিকেল ইনস্টিটিউটের, অধ্যাপক এলিজাবেথ ওলেনেভা। ও'র বক্তব্য, শুধু দৈহিক বৃদ্ধির হারই বাড়ে নি, সেই সঙ্গে শিশুদের মানসিক গঠনেরও উন্নতি ঘটছে, বয়েসের তুলনায় বুদ্ধিরও।...

প্রাণীবিজ্ঞানীদের প্রশ্ন : এইভাবে চললে সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের চেহারা কী শেষ পর্যন্ত গালিভারের গল্পের দৈত্যের মত গিয়ে দাঁড়াবে না?

সবচাইতে বিপন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা। ওঁদের মন্তব্য, শিশুদের বৃদ্ধির হার যদি সত্যিই বাড়তে থাকে তাহলে সামাজিক প্রয়োজনে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারটা নিয়ে এখনই নতুনভাবে চিন্তা করা দরকার, আরও সতর্কতার প্রয়োজন।

এখনকার ছেলে-মেয়েরা দ্রুত বেড়ে ওঠে। যাঁরা বয়স্ক তাঁদের তারুণ্য দীর্ঘ সময় ধরে বজায় থাকছে। বিগত কয়েক বছর এ ব্যাপারটার ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিশেষজ্ঞরা এখন একমত, এ যুগের স্ত্রী-পুরুষদের যৌবন অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে নয়, ভ্রূণ অবস্থা থেকেই খুব কম সময়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি বড়সড় হতে শুরু করে। যে সমস্ত চিকিৎসক বা ধাত্রী মাতৃসদনের সঙ্গে জড়িত, তাঁরাও লক্ষ করছেন, গত দশ বছর আগে যে সমস্ত শিশুদের ভূমিষ্ঠ হতে দেখা গেছে তাদের তুলনায় আজকের নবজাতকরা যথেষ্ট বড় এবং ওজনেও ভারী। গত তিরিশ বছরের নথিপত্র থেকে জানা গেছে, এই বৃদ্ধির হার প্রতি দশকেই চোখে পড়ার মত। তখনকার ছয় মাসের শিশুটি যেন আজকের চারমাসের শিশুর মত দেখতে।

একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিন বছরের শিশু গড়ে যতটা লম্বা হতো, তার তুলনায় বর্তমান দশকের তিন বছরের শিশুর গড় উচ্চতা দশ থেকে পনের সেন্টিমিটার বেশি, ওজনের পার্থক্য দেড় থেকে দুই কিলোগ্রামের মত। তেরো বছরের ছেলেমেয়েরা উচ্চতায় তখনকার ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের তুলনায় বেশ কিছুটা লম্বা। আর এই পার্থক্য সবচাইতে বেশি ধরা পড়ে সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা শিল্প অথবা কারিগরি বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। গড়ে তারা কুড়ি সেন্টিমিটার বেশি লম্বা, ওজনে প্রায় ষোল কিলোগ্রামের মত বেশি ভারী। বিংশ

শতাব্দীর প্রথম ভাগে সতের বছরের ছেলেমেয়েরা লম্বায় এবং ওজনে যতটা হত, বর্তমান দশকে তেরো থেকে পনের বছরের ছেলেমেয়েরাই সেই আকার বা ওজন পেয়ে যাচ্ছে।

না, একে গালগল্প আর বলা চলে না। পৃথিবীর বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানীদের অভিমতও এই সমীক্ষার সপক্ষে। ওঁরাও একমত, আধুনিক বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের গড়-উচ্চতা গত কয়েক বছরের তুলনায় কম করেও সাত থেকে দশ সেন্টিমিটার বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে ওজন বেড়েছে দশ কিলোগ্রামের মত। স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ওরা আগের তুলনায় কিছু কম বয়সেই পূর্ণতা লাভ করছে, ওদের যৌবন-অবস্থা
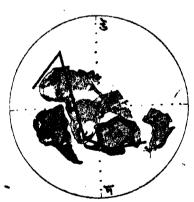
ষাট কোটি বছর পুরনো রক্ত-বেগুনি পাথরের স্তর পরীক্ষা করে ডঃ ম্যাক এলহিনি বলতে চেয়েছেন, ঐ সময়ে পৃথিবীর চৌম্বক-মেরুর অবস্থানের চিহ্ন উপরের দুটি ক্রস-চিহ্নিত স্থানে দেখা যায়। তিরিশ কোটি বছর পূর্বে নীচের (ডান পাশে) ক্রস-চিহ্নিত স্থানে মেরু প্রান্ত ধরা পড়েছে। ঐ সময়ে পৃথিবীর চুম্বক-মেরু যে পথে স্থান পরিবর্তন করেছিল মোটা-কালো রেখা টেনে তা দেখান হল

(সংবাদ ৮৯১ পৃষ্ঠায়)

সংরক্ষিত থাকছে আগের তুলনায় অনেক বেশি এবং সন্তান ধারনের ক্ষমতা তিন থেকে চার বছর বেশি বয়েস পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ আগে যে বয়েসের পর মেয়েদের সন্তান ধারণ ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যেত, এখন সেটা তিন চার বছর বেড়ে গেছে। এ যেন এক জৈবিক-ত্বরণ। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সমানে সে কাজ করে চলেছে।

কিন্তু কেন এই ব্যতিক্রম? একি কোন প্রাকৃতিক বিবর্তনেরই সঞ্চারণ? সামাজিক কারণ? না কেন প্রজননগত সম্পর্ক এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে? বিচিত্র এই ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে বিজ্ঞানীরা আজ নানা রকম প্রশ্নের জাল সৃষ্টি করে চলেছেন। কেউ কেউ বলছেন, মানুষের ওজন এবং শারীরিক এই ক্রমবৃদ্ধির মূলে কাজ করছে সৌর-বিকিরণের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি এবং ঋতুর ক্রম পরিবর্তন। ও'দের বক্তব্য অতীতের ঋতু বৈচিত্র্যের সঙ্গে বর্তমান ঋতু বৈচিত্র্যের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তবে সব চাইতে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে ভিটামিন এবং খাদ্যের ওপর। সম্ভবত অতিরিক্ত ভিটামিন এবং পুষ্টিকর খাদ্যই মানুষের জৈবিক ক্ষমতাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এটাই জৈবিক-ত্বরণের অন্যতম কারণ। কারণ দেখা গেছে, গত বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সমস্ত শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের ওজন এবং উচ্চতার হার কিন্তু অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। বলাই বাহুল্য, এর অন্যতম কারণ, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির দরুণ ঐ সমস্ত শিশুদের যথাযথ খাদ্য যোগান সম্ভব ছিল না। কেউ কেউ এমনও বলছেন, মানুষের জৈবিক ত্বরণের মূলে অংশত নগর-জীবনও কাজ করছে। শহরের বহুল জীবন-বৈচিত্র্য, অস্থিরতা এবং প্রাণচাঞ্চল্য হয়ত দৃশ্যভাবে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যার ফলে মানুষের দৈহিক এবং মানসিক অবস্থা নিয়ত সংঘাতের সম্মুখীন হয়। মানসিক চাঞ্চল্যের দরুন শরীরে অন্তঃক্ষরণীক গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ডগুলি প্রায়শই ব্যস্ত থাকে। ফলে ঐ সমস্ত গ্রন্থির রস বা হরমোন শারীরিক প্রতিক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করায় জৈবিক-ত্বরণ সৃষ্টি করে। এ অভিমত অবশ্য সমাজ-মনোবিজ্ঞানীদের। এখানে

এরোডাইন। অদূর ভবিষ্যতে নতুন ধরনের এই বিমান যাত্রী বহনের কাজে লাগান হবে। সাধারণ বিমানের মত এর কোন ডানা থাকবে না, হেলিকপটরের মত বড় বড় পাখাও থাকবে না। ওজনে অনেক হাল্কা, গতি দ্রুততর এবং মাটি থেকে সরাসরি উলম্বভাবে আকাশে উঠতে পারবে। প্রযুক্তিবিদদের মতে, এই বিমান শব্দের চেয়েও দ্রুততর গতিতে উড়ে যেতে পারবে এবং ওড়ার সময় কানে তালা লাগানর মত শব্দও করবে না। ছবিতে ফ্লাইয়েডারিখান শ্যাফেনের প্রখ্যাত জেট-বিমান পরিকল্পক আলেকজান্ডার এম লিপিশ-এর তৈরি পরীক্ষামূলক একটি 'এরোডাইন' দেখান হল। মানব-চালকহীন এই যানটি পাঁচ মিটার লম্বা, ওজন ৪০০ কিলোগ্রাম

উল্লেখ করা যেতে পারে, নগরবাসীদের গড় উচ্চতা কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের চেয়ে কিছুটা বেশি।

অনেকে একথাও বলছেন, বাবা-মায়েরা এক ভৌগলিক পরিবেশ থেকে যখন ভিন্নতর ভৌগলিক পরিবেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন, তখন তাঁদের সন্তানদের মধ্যে অতিরিক্ত জৈবিক-ত্বরণ দেখা যায়। উদাহরণ, পোল্যান্ড এবং ইউক্রেইন থেকে যাঁরা কানাডায় গিয়ে বাস করছেন, দেখা গেছে, বয়েস অনুপাতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের উচ্চতা সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে গড়ে দশ সেণ্টিমিটার বেশি। কারুর অভিমত, সমষ্টি গত ভাবে জনগোষ্ঠির স্বদেশ ত্যাগ এবং ভিন্ন দেশে গিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ফলে নতুন যে মানব-শিশুর দল জন্মগ্রহণ করে, তাদের মধ্যেও জৈবিক-ত্বরণকে যথেষ্টভাবে প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রয়োগের কথাও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেননি।

দীর্ঘতর তালিকা আপাতত নিষ্প্রয়োজন। এ কথা অনস্বীকার্য, জৈবিক-ত্বরণের কারণ স্বরূপ অনেক উদাহরণই দাঁড় করান যেতে পারে। বাস্তবতার দিক দিয়ে কোন কোনটি গ্রাহ্য হতে পারে, আবার অনেকেই যথাযথ প্রমাণ অভাবে গ্রহণযোগ্য নাও মনে হতে পারে। তবে জৈবিক-ত্বরণের মূলে প্রাণী-বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের অনেক সূত্রই যে কাজ করছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে মানুষের দৈহিক যন্ত্রপাতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবর্তন আসছে চেহারায়, হাবভাবে এমন কি মনন-শীলতায় এবং অবশেষে বাইরের প্রভাবের ফলে অর্জিত এই গুণবলী বংশগতির মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে উত্তর পুরুষের মধ্যে।

কিন্তু মূল সমস্যা এখানে নয়। আমাদের পূর্বসূরীদের তুলনায় উত্তর পুরুষ হয়ত দৈহিক কাঠামোয় আরও খানিকটা পুষ্টকায় হয়ে উঠতে পারে, তবে ঠিক এই মুহূর্তে এ কথা কেউই বিশ্বাস করতে চান না যে, শেষ পর্যন্ত তারা গ্যালিভারের দেখা দানবে পরিণত হয়ে যাবে। আপাতত সমস্যা, নতুন ঐ আগন্তুকদের মানসিক ক্ষমতা দারুণভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বার্নার্ড শ সম্পর্কে বলা হয়, শিশুর স্কন্ধে বৃদ্ধের মস্তক। আগামী দিনের তরুণদের ক্ষেত্রে হয়ত কথাটা ব্যাপকভাবে খেটে যাবে। কারণ বয়সে তারা নাবালক হলেও তাদের মস্তিষ্কের ধরন-ধারণ হবে সাবালকেরই অনুরূপ। ইতিমধ্যে তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এ যুগের শিশু অথবা ছেলেমেয়েরা বয়েসের তুলনায় মনের দিক দিয়ে অনেক দ্রুত প্রবীণ

হয়ে পড়ছে। তাদের এই উন্নত মননশীলতাকে যদি উপযুক্তভাবে কাজে লাগান না যায়, বিপদ অনিবার্য। এর জন্যে দরকার উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা। ওঁরা মনে করেন, পঞ্চাশ বছর আগে ঠিক যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দশ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্যে উপযুক্ত ছিল, আজ তা অচল। পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা এবং শারীরিক ক্ষমতার বৃদ্ধির দরুন, আজকের তরুণদের মানসিক কাঠামো অনেক বেশি পরিব্যাপ্ত। তাদের বিচার ক্ষমতা বাড়ছে, অন্তর্দৃষ্টি সূক্ষ্মতর হচ্ছে, চিন্তা ভাবনার কায়দা কানুন ভিন্নতর হচ্ছে। সুসম্বদ্ধ সামাজিক কল্যাণে যদি তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাজে লাগাতে হয়, সমাজবিজ্ঞানীদের বেশ কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে নতুন নতুন পরিকল্পনা চয়ন করতে হবে।

ইতিমধ্যে একথা ভেবে, সোভিয়েত দেশের কোন কোন বিদ্যালয়ে অনেক নীচু শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় বীজগণিত চালু করা হয়েছে। মার্কিন দেশেও স্কুলের পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছে উচ্চতর জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, জ্যোতির্বিদ্যা, এমন কি পরমাণু বিজ্ঞানের কিছু কিছু অংশ। এছাড়াও এমন কিছু কিছু বিষয়, যা গত দশ বছর আগের পাঠ্যসূচীর তুলনায় অনেক জটিল এবং উন্নত ধরনের। এই সঙ্গে আছে উপযুক্ত ব্যায়াম, খেলাধূলো এবং কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার নানা রকম পদ্ধতি। আর এসব করতে গিয়ে শিক্ষক এবং অভিভাবকরা রীতিমত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন।

চাই জীবনের নতুনতর মূল্যায়ণ। স্থূল জৈবিক প্রয়োজন মেটানর চেয়ে এখন সবচাইতে বড় প্রয়োজন ঐ তরুণ-প্রবীণদের মানসিকতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের কোন সুষ্ঠু উপায় অনুসন্ধান। অন্যথায় আগামী এক দশকের মধ্যে যদি কোন সামাজিক বিস্ফোরণ ঘটে তাকে অনিবার্য ফল স্বরূপ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

হামবুর্গের জনবহুল রাজপথ ২০০০ নম্বর স্ট্রিটের পুরনো গাছগুলির গোড়ার মাটির নীচে এখন নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম এবং কিছু কিছু অনুঘটক পদার্থ দ্রবণের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুরনো গাছপালার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কারণ বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত খাদ্য তারা আর সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে। নতুন এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে হামবুর্গ-এ প্রায় এক লক্ষ গাছকে আবার প্রাণবন্ত করে তোলা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, যে কোন বড় সহরেই প্রচুর গাছ পালা থাকা দরকার। আর সেটা শুধু মনোহারী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যেই নয়, বেশি প্রয়োজন জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্যে। গাছের পাতা যেন 'সবুজ হৃদপিণ্ড'। সহরের লক্ষ মানুষের নিশ্বাসে মিশ্রিত কার্বনডাই অক্সাইডকে তারা শোধন করে দেয়

গণ্ডোয়ানা আজও এক রহস্য

পৃথিবীর সুপ্রাচীন শিলাস্তরে চুম্বককণার বিন্যাস এবং সমুদ্রতলের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা এখন একমত : পৃথিবীর বুকে শত শত দ্বীপ, উপদ্বীপ এবং মহাদেশগুলিকে ঠিক যে যে জায়গায় আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা চিরদিন সেখানে ছিল না। পৃথিবীর বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জলভাগ কোথাও প্রসারিত হয়েছে, কোথাও বা সংকীর্ণ। অতীতের নমনীয় ভূ-স্তর ক্রমে কঠিনতর হয়েছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নতুন গিরিখাদ, পাহাড় পর্বত, দ্বীপমালা। পৃথিবীর ওপরকার ভূভাগে ফাটল ধরেছে, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে গেছে, অতঃপর উভয়ের মাঝখানে বিস্তৃত মহাসাগর এক একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি উত্তরমেরু অঞ্চল, উত্তর সাগর এবং উত্তর আতলান্তিক অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে একদল বিজ্ঞানী দাবী করছেন, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের বিরাট ভূখণ্ড একদা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ছিল। আতলান্তিকের উত্তর অংশে কোন জলভাগ ছিল না। ওঁরা বলছেন, পৃথিবীর ভূখণ্ডগুলি কেউ স্থির এক জায়গায় বসে নেই। এখনও তারা সমানে স্থান থেকে স্থানান্তরের অভিমুখে ভেসে চলেছে। হিমালয় পর্বতমালা ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছে। ফলে মঙ্গোলিয়া, আরব প্রভৃতি অঞ্চলের কিছু কিছু অংশ হয়ত ভারতের কাছাকাছি সরে আসতে পারে। ভূ-বিজ্ঞানীরা এখন এই ধরনের ভূতাত্ত্বিক কার্যকারণের উপর নজর রাখছেন। পৃথিবীর বুকে ঠিক কিভাবে একদা কঠিন ভূ-ভাগের সঞ্চারণ ঘটেছিল, আজও তা কতটা অব্যাহত রয়েছে অথবা ভবিষ্যতেই বা কতটা থাকবে এর উপর তাঁরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন, নতুনতর ব্যাখার সন্ধান করছেন।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও, প্রাচীনতম ভূখণ্ড গণ্ডোয়ানা সম্পর্কে আজও অনেকে বিভ্রান্ত। ভারতসহ এশিয়ার দক্ষিণাংশ, আফ্রিকা মহাদেশ, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া—আজকের এই বিচ্ছিন্ন ভূভাগ-গুলি সত্যিই কী একদিন একই সঙ্গে জুড়ে বসবাস করত? ওদের মধ্যে আজকের যে দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান, কীভাবে সেটা রচিত হল? বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের নীচের দিকটা এমনভাবে খাঁজকাটা, যা দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং উত্তরাঞ্চলের বেশ কিছু অংশকে খাপে খাপে ভিড়িয়ে নিতে পারে। ওদের পাশাপাশি আনলে মনে হয় এক সময়ে ওরা যেন একই সঙ্গে জুড়ে ছিল। ভারতের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। ভারতের পশ্চিম উপকূল এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মাঝামাঝি অংশ, যার অগ্রভাগ অন্তরীপের মত লোহিত সাগরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে—ওদের পাশাপাশি অগ্রভাগ অন্তরীপের মত লোহিত সাগরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে—ওদের পাশাপাশি আনুন—উভয় উপকূলই অদ্ভুতভাবে মিলে যাবে। দক্ষিণ-মেরুর ভূভাগ এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। ভারতে আপাতত প্রাচীনতম জীবাশ্মের মধ্যে ব্যাপকভাবে চুম্বক-কণার অনুসন্ধান করা হচ্ছে। যদি ঐ সমস্ত চুম্বক-কণার সঙ্গে আফ্রিকায় পাওয়া চুম্বক কণার সাদৃশ্য থাকে তাহলে ভারত এবং আফ্রিকার মধ্যে একদিন যে সরাসরি ভূ-সংযোগ ছিল সেটা প্রমাণ করা শক্ত হবে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, একই সময়ের নয়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জীবাশ্ম-চুম্বকের উপর পর্যবেক্ষণ না চালিয়ে কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত জানা যাবে না।

সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের লবণ-পর্বতমালায় কিছু কিছু সুপ্রাচীন জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ঐ জীবাশ্মগুলি পরীক্ষা করে প্রাচীন পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর অবস্থান সম্পর্কে খানিকটা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয়, ভারত-ভূখণ্ড এক-দিন সত্যি সত্যিই আফ্রিকার পশ্চিম উপ-কূলের সঙ্গে খাঁজে খাঁজে ভেড়ান ছিল। তবে অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে দ্বিমত দেখা দিয়েছে। হয়ত অস্ট্রেলিয়ার কিছু অংশ আংশিকভাবে আফ্রিকার সঙ্গে জুড়ে ছিল। এবং তা যদি হয় তাহলে দক্ষিণ মেরু ভূখণ্ডের পক্ষে আফ্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভূ-সংযোগ স্থাপনের মত জায়গা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

ভারত-ভূখণ্ড সম্পর্কে নতুন এই অনু-সন্ধান চালিয়েছেন ক্যানবেরার অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গবেষক ডঃ ডব্লু ম্যাকএলহিনি। অনুসন্ধান চালিয়ে প্রায় ষাট কোটি বছর পুরনো এক ধরনের রক্ত-বেগুনী রঙের বেলে পাথরের উপর। ডঃ ম্যাকএলহিনি দেখিয়েছেন একসময়ে মেরুর স্থানিক অবস্থান উপরের দিকে ছিল। পরে নীচের দিকে ভারতীয় মেরুর সাম্প্রতিক অবস্থান সরে এসেছে প্রায় তিরিশ কোটি বছর আগে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দীর্ঘ এই সময়ের ব্যবধানে চুম্বক-মেরু ঠিক কোন পথ ধরে সরে এসেছিল, তিনি তা আবিষ্কার করেন। উভয় দেশের চুম্বক-মেরুর সঞ্চারণপথ প্রায় একই। এ থেকে ম্যাকএলহিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা এক সময় একই ভূখণ্ডরূপে বিরাজ করত। এইভাবে তিনি আফ্রিকার সঙ্গে ভারতকেও জুড়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গণ্ডোয়ানা-ভূখণ্ডের যে চিত্রটি তিনি তৈরি করেছেন, তার সঙ্গে এ এল দ্য তইত-এর কল্পনার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। তইত মহাদেশ-সঞ্চারণ বা 'কনটিনেনটাল ড্রিফট'-তত্ত্বের অন্যতম পুরোধা।

ডঃ ম্যাকএলহিনির এই সিদ্ধান্তের মূল তাৎপর্য হল, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সঙ্গেই ভারত ভূখণ্ডের জুড়ে থাকা সম্ভব। কেউ কেউ যে মনে করেন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এই উপমহাদেশটি একদিন সংযুক্ত

ছিল, সেটা কখনই সম্ভব হতে পারে না।

মঙ্গলে বৃষ্টিপাত?

১৮৭৭ খৃস্টাব্দে ইটালির বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী সিয়াপারেলি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন, ঊষর মঙ্গল গ্রহের বুকে তিনি আঁকাবাঁকা কতকগুলি রেখা দেখতে পেয়েছেন। ওঁর মতে, ঐ রেখাগুলি ঐ গ্রহের বিচিত্র কোন প্রাণীর নিজেদের হাতে কাটা খাল ছাড়া আর কিছু নয়। উত্তরকালে বহু বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সিয়াপারেলিকে। তাঁর সমালোচকের বক্তব্য, মঙ্গলে জলের অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু বছর তিনেক আগে মহাকাশযান পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে, তরল অবস্থায় জল না পাওয়া গেলেও মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে তার পরিমাণ খুবই নগণ্য।

অতি সম্প্রতি মার্কিন দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, এর আগে মঙ্গলের পরিমণ্ডলে যতটুকু জলীয় বাষ্প আছে বলে মনে হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে তার পরিমাণ অনেকটা বেশিই হবে। খুঁজলে রক্তাভ ঐ গ্রহটির বুকে জলের ধারাও আবিষ্কৃত হতে পারে।

১৯৬৮-৬৯-এ প্যাসাডেনা জেট প্রোপালসন ল্যাবোরেটারির ডঃ আর এ সোরেন, ডঃ সি বি ফারমার এবং টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এস কে লিটল যুগপৎ বেতার দূরেক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলের বর্ণালীচিত্র তোলেন। ঐ সময় গ্রহটি পৃথিবীর নিকটতম অঞ্চলের দিকে সরে আসছিল। প্রথম দিকে তোলা কয়েকটি বর্ণালী চিত্র পরীক্ষা করে তাঁরা হতবাক।

আপাতত যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, তাতে দেখা যায়, পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অবশ্য কম। কিন্তু সেখানকার বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত পাতলা হওয়ায় তার আর্দ্রতা অনেক বেশি। এমন কি ভূ-সংলগ্ন অঞ্চলে পরিমাণটা শতকরা পঞ্চাশ ভাগও গিয়ে দাঁড়াতে পারে। সেখানকার মাটির কাছাকাছি অঞ্চল বাতাসের চাপের পরিমাণ দেখে ঐ গবেষকরা সিদ্ধান্ত করেছেন, অনুকূল অবস্থায় সেখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামাও অসম্ভব নয় এবং সেই বৃষ্টির জলের কিছু অংশ মাটির স্তরে সঞ্চিত অবস্থায় থেকে যেতে পারে।

ওঁদের জিজ্ঞেস করা হয়, ১৯৬৩ থেকে নিয়মিত মঙ্গলের আবহাওয়ার উপর বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানী যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন, তাতে দেখা যায় সেখানকার জলীয় বাষ্পের ব্যাপারে কারুরই হিসেব সমান নয়, এর কারণ কী? ওঁদের উত্তর : পৃথিবীর মত মঙ্গলেও ঋতুর পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। সম্ভবত ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে সেখানকার আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্পের মাত্রাও ভিন্নতর হয়, এর জন্যেই হিসেবে হেরফের হয়ে থাকে। তবে এর চেয়েও চমকপ্রদ তথ্য হল, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মঙ্গলের আবহাওয়ায় একটি বড় রকমের পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। আগ্নেয়গিরির সাময়িক বিস্ফোরণের ফলে এটা হওয়া সম্ভব। কারণ গ্রহ-পদার্থবিদ্‌দের অভিমত, মঙ্গলগ্রহের ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরে এখনও আগ্নেয় কর্মকাণ্ড শেষ হয়ে যায় নি।

সংবাদ

যৎসামান্য ফ্লুওরাইড যে দাঁতকে ক্ষয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা একথা অনেকদিন ধরেই জানতেন। অতি প্রয়োজনীয় এই ফ্লুওরাইড আমরা মুখ্যত খাবার থেকেই সংগ্রহ করি। আজকাল টুথপেস্টের সঙ্গে ফ্লুওরাইড মিশিয়েও দাঁতকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। কোন কোন দেশে পানীয় জলের মধ্যেও এই বস্তুটি মিশিয়ে কাজ সারার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, ফ্লুওরাইড ছাড়াও কিছু কিছু বস্তু দাঁতের ক্ষয় প্রতিরোধের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। বারমিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেন্টাল হস্‌পিটালের বিশেষজ্ঞ ডঃ আর জে অ্যান্ডারসন পর পর কতকগুলি ছেলের দাঁত পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ করেন, কিছু ছেলের দাঁতে ক্ষয়ের কোন চিহ্নই নেই, অবশিষ্টের দাঁত অকালে অনেকটা ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গেছে। পরে খবর নিয়ে দেখা গেল প্রথম দলে যারা ছিল তারা এমন এক অঞ্চলে বাস করে যেখানকার মাটিতে মলিবডেনাম-এর পরিমাণ বেশি। কিন্তু দ্বিতীয় দলের ছেলেরা যে অঞ্চল থেকে এসেছিল, সেখানকার মাটিতে এই বস্তুটি নেই বললেই চলে। ডঃ অ্যান্ডারসন পরে ঐ উভয় অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের দাঁতের উপর সমীক্ষা চালান। স্বভাবতই যে মাটিতে মলিবডেনামের আধিক্য দেখা যায়, সেখানকার গাছপালার মধ্যেও মলিবডেনামের মাত্রা বেশি থাকে। ফলে ঐ অঞ্চলের শাকসব্জি বা গম, যব প্রভৃতি খেলে শরীরে মলিবডেনামের মাত্রাও বেড়ে যায়। সম্ভবত এর জন্যেই প্রথম দলের ছেলে-মেয়েদের দাঁতে তেমন কোন ক্ষয় চোখে পড়ে নি। পরে নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে ডঃ অ্যান্ডারসন লক্ষ করেছেন, দাঁতের ক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে মলিবডেনামও ফ্লুওরাইডের মত সমান কার্যকর। তবে এ সম্পর্কে আরও নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে জাপানের মিতসুরু এবং তাকেয়ির কাছ থেকে। ও'রা দুজনেই আইচি-গাকুইন ডেন্টাল স্কুলে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দাঁতের ক্ষয়রোধের ব্যাপারে মলিবডেনামের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। অবশ্য নিউইয়র্কের ইস্টম্যান ডেন্টাল সেন্টারের বিজ্ঞানী লোস এবং বিডডি দেখিয়েছেন, ঐ একই উদ্দেশ্যে বোরিয়াম, বোরোন, লিথিয়াম, স্ট্রনসিয়াম এবং ভ্যানাডিয়ামও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে জাপানের দুজন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, খাদ্যে মলিবডেনাম এবং ফ্লুওরাইড যদি একই সঙ্গে গ্রহণ করা যায়, দাঁতের ক্ষয় পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব।

সমরজিৎ কর
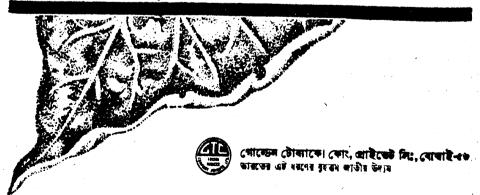
উপক্রমণিকা

আঁকেতিলের কথা হচ্ছিল না?...বলেছি এঁর সেই 'ভারত' গ্রন্থের নামপত্রের কথা, উৎসর্গপত্রের কথা, মুখবন্ধের কথা। এবার বলব—না, মূল গ্রন্থভাগের নয়, তার উপক্রমণিকার কথা।

গোটা বইয়ে বিশদ করে আঁকেতিল যেটা বলতে চলেছেন, তা-ই উপক্রমণিকায় সংক্ষিপ্ত সংহত করে বিবৃত করেছেন অষ্ট প্রস্তাবে। ফরাসী জাতি ও ফরাসী সরকার অবধান করুন।

পয়লা প্রস্তাব : জবরদখলের পলিসিটা মুছে ফেলুন মন থেকে। ভারত মুলুক তো আর বেওয়ারিশ পতিত জমি হয়ে পড়ে নেই; অধ্যুষিত তার এলাকা। তুমি বহিরাগত জাত—কোন্ হরিদাস পাল, ভুঁইফোড় লাট, যে ভুঁয়ে পা দিয়েই বলবে, 'এ বাপু আমার জমানা'? সে হক আর নেই! ভাড়া দাও, ভালো কথা; নচেৎ কিনে নাও, চুক্তিপত্র সই করে, ভারতীয় মালিকদের কাছ থেকে। জোর যার, মুলুক তার—এ-ফিকির বেআইনি, মানবিকতার পরিপন্থী।

দুই : লাঠি ঘোরালেই কি কাজ হাসিল হবে? ডান্ডা মেরে ঠান্ডা রাখার নীতি অবাস্তবও কি নয়? সেই কোন্ সাত-সমুদ্দুর পারের দেশ, পিলপিল করছে মানুষজন, লড়ুয়ে জাতও আছে বেশ কয়েকটা! বিশুদ্ধ অস্ত্রঝঞ্ঝনা তুলে কোন লাভটা হবে? কোন য়ুরোপীয় জাতিই নির্ভেজাল গায়ের জোরে ওখানে বড় মাপের মালিকানা কায়েম করতে পারবে না।

তিন : যেতে হবে বন্ধুর মনোভাব নিয়ে, যাকে মিত্ররূপে চাই, তার দিকে সাহায্য ও উপকারের হাত বাড়িয়ে। কান্ডজ্ঞান, মানবধর্ম, জনগণের অধিকারের প্রতি সম্ভ্রমবোধ সেই শিক্ষাই একদিন দিয়েছিল য়ুরোপীয় জাতিগুলিকে: দেখিয়েছিল—মৈত্রীর পথটাই সুবর্ণপন্থা নয়, একমাত্র মার্গ।

চার : বন্ধু হতে গেলে জানতে হবে ভারতের প্রকৃত অবস্থাটা। দেশীয় রাজাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং য়ুরোপীয় জাতিগুলির প্রতি তাদের মনোভাব বুঝলে তবেই তো সম্ভব হবে—স্বার্থসিদ্ধির জন্যও—নিজেকে প্রয়োজনীয় করে তোলার ব্যবস্থা।

পাঁচ : বাহ্য আড়ম্বর বাদ দিতে হবে; থাকবে শুধু ব্যবসাভিত্তিক অপরিহার্য সম্পত্তিটুকু—সাদাসিধে প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যকুঠি, সম্ভব হলে একটি পোতাশ্রয়; আর কলোনির প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত কায়েম রাখার জন্য যা যা দরকার। ভারতীয় রাজা-রাজড়ার সঙ্গে অধিকার, ক্ষমতা আর জাঁকজমকে পাল্লা দেওয়ার চিন্তা মনের কোণেও যেন ঠাঁই না পায়। ধনজনের আস্ফালন বেশি করতে গেলে তাতে শুধু বিদ্বেষই বাড়বে, স্থানীয় মানুষের চোখ টাটাবে, ঘনিয়ে তুলবে অহেতুক ও অনাবশ্যক ঝড়, যার বলি হবে—বাণিজ্য। দূরদেশের উটকো লোকজন এসে দেশের বুকের উপর হাত-পা ছড়িয়ে গেড়ে বসবে—এটা মুখ বুজে মেনে নিতে যাবে কোন্ জাতি?

ছয় : বাণিজ্যই হবে প্রথম কথা, বাণিজ্যই হবে শেষ কথা। দেশের সর্বত্র তার জাল দিতে হবে ছড়িয়ে; অবশ্যই সেটা করতে হবে সাম্যের ভিত্তিতে, দেশীয় বিধিবিধানের প্রতি সমীহ দেখিয়ে। বাণিজ্যের স্বার্থে স্থল ও জলসৈন্য থাকবে, কিন্তু স্থানীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা হবে, আক্রমণাত্মক নয়, প্রতিরোধের ও প্রতিরক্ষার।

সাত : ন্যায়নীতির খাতিরে ভারতীয় ধর্মকর্ম, আচার ও প্রথাদি বিষয়ে অনধিকার-হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। তবে যদি একটা প্রথা দেখা যায় প্রকৃতি ও মানবধর্মের বিরোধিতা করছে, সেখানেও গ্রহণীয় হবে জবরদস্তি নয়, মৃদু পরামর্শ ও সুপ্ররোচনা।

আট : সব মিলিয়ে, সমস্ত নীতির সফল অনুসরণের জন্য আবশ্যিক প্রস্তুতি হিসেবে চাই ভারতের সব-কটা ভাষার সঙ্গে পরিচিতি।

মূল গ্রন্থভাগ

কিন্তু সর্বাগ্রে চাই জাতিগত সব কুসংস্কারের অব্যবহিত নিরসন। মূল কেতাবে এসে এ-কথাটার উপরেই আগাগোড়া জোর দেন আঁকেতিল, মন্ত্রণা দেন : সাদা-কালোর ভেদজ্ঞান ভোল; "কৃষ্ণাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গ—অঙ্গ-বিচারে এরা দুটো আলাদা জাত নয়; ও-অর্থে স্বতন্ত্র কাউকে খুঁজতে গেলে খুঁজতে হবে একপেয়ে মানুষ, একচক্ষু মানুষ...। সমস্ত মানুষ মিলিয়ে এক গোটা মানব-পরিবার, যদিও ছাড়াছাড়ি আর ঠাঁই-ঠাঁই হবার ফলে অনেকে আজ ভুলে গেছে এই ভ্রাতৃত্বের কথা। ভালো কি হয় না, যদি আবার তাদের মেলাতে পারি আমরা, বুঝতে চেষ্টা করি পরস্পরকে, যদি বলি : আমরা সকলেই ভাই-ভাই, আমাদের স্বার্থটাও ভিন্ন ভিন্ন নয়, পারস্পরিক? গায়ের রঙটা গৌণ খোলসমাত্র; মুখ্য হল মানবপ্রকৃতি। ভারত হোক, চীন হোক, কিংবা হোক আফ্রিকার গূঢ় অভ্যন্তরপ্রদেশ, যেখানেই দুজন মানুষ পরস্পরকে বুঝতে শিখেছে, সেখানেই তারা আত্মীয়। দেশভ্রমণের উপযোগিতা বলে যদি কিছু থাকে, তা এই কৃত্রিম বিভেদের নিরাকরণ [শিক্ষার কুসংস্কার যা দিয়ে মানুষের থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে রেখেছে] এবং এই অনুভূতির জাগরণ যে, কত মঙ্গলময় মানুষের সেই হৃদয়-বিনিময়, গোটা বিশ্বটাই যার একমাত্র সীমারেখা।"

আর তবু, হায়, অধিকাংশ য়ুরোপীয়ের ধারণাতেই বুদ্ধিসুদ্ধি বলুন, কান্ডজ্ঞান বলুন, সব-কিছুর পরিসীমা সীমিত হয়ে আছে ক্ষুদ্র এক ভৌগোলিক ভূখণ্ডে : ডেনমার্কের উত্তর থেকে স্পেনের দক্ষিণ প্রান্ত একদিকে, আরেক দিকে ইংলন্ড থেকে তুরস্কের পশ্চিম কিনারা অবধি। আসুক আমেরিকা থেকে সোনা-রুপো ও মণিমুক্তা, আসুক ভারত ও চীন থেকে বস্ত্র ও মশলাপাতি, সাগ্রহে সানন্দে আমরা, য়ুরোপীয়েরা, গ্রহণ করব সেসব; দরকার হলে দাম পর্যন্ত দেব না, হাতিয়ে নেব। কিন্তু সততা, বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিশৃঙ্খলা—য়ুরোপের বাইরে ও-সবের চাষ হয় না। ঐ কালো-কালো আধা-নঙ্গা মানুষগুলো, মোটা মোটা ঠোঁট, ভেড়ার লোমের মতো চুল, কানে মেয়েলি দুল, মুহুর্মুহু পান চিবোয়, আর এক-বর্ণও ফরাসি জানে না—ওদের সঙ্গে কথা বলব বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি নিয়ে?...আরে ছিঃ। ঐ জীবগুলো বড়

জোর দেখতে-শুনতে আমাদের মতো; যদি বলেন, ওদের আত্মাও আছে, তা-ও না হয় মানলাম। কিন্তু ভুললে চলবে না—ভুললে বিপদও হতে পারে—যেভাবে জন্তু-জানোয়ারদের পোষ মানাতে হয়, সেভাবেই ওদের বশীভূত করতে হবে : গায়ের জোরে।

বহু স্বদেশবাসীর ঈদৃশ মনোভাব আঁকেতিলকে ব্যথিত করেছে, কিন্তু এখানেও তাঁর মতে ভিলেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ সেই ইংরেজ – "প্রাচুর্যজনিত উদর-স্ফীতি বন্ধনীর মতো যার চোখে ঠুসি পরিয়ে রেখেছে..." [ক্রোধের প্রকোপে উপমা জোগাতে গিয়ে পেট আর চোখ একাকার করে দিয়েছেন লেখক!] আর ঐ পাজির পা-ঝাড়াদের হাতে করুণতম শিকার হল বাংলা-দেশ—যেখানে "এক বন্ধ্যমেনোভাবাপন্ন জাতির মধ্যে দানা বেঁধে উঠছে ভয়ংকর এক ঘৃণা। অমানুষিক নিপীড়নের প্রকট দাগ পরিস্ফুট তার কম্পমান দেহে। তার আতিথেয়তার দরুণ এই সে পেয়েছে পুরস্কার!"

তাহলে—উন্নাসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে নিয়ে—বাস্তব নীতির ক্ষেত্রে কোন্ ধারায় এগোবে ফরাসীরা? আঁকেতিল এবার চার দফা প্রস্তাব রাখেন ফরাসী পাঠকের সামনে।

ফরাসি কর্মনীতি

প্রথমত ফরাসীদের ভারতে ভিড়তে হবে সক্ষমতার পরিচয়ে, স্ব-ক্ষমতায় সজ্জিত হয়ে : "যা আইনগত আমাদের, তা রাখতে হবে স্বাধিকারে; যা কেড়ে নিয়েছে ইংরেজ, তা ছিনিয়ে নিতে হবে নিজ বলে—দেশীয় রাজাদের সাহায্য না নিয়ে। অন্যের দ্বারা আত্মরক্ষা মানেই আত্মশক্তিলোপ।"

দ্বিতীয়ত, ভারতে দস্তুরমতো প্রতিষ্ঠিত হবার পর যুদ্ধে-লড়াইয়ে নিতে হবে মধ্যস্থের ভূমিকা। "আমাদের জাতীয় মহিমার সঙ্গে তা হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ—দুই-জগতের কাছেই আমাদের স্থান যে য়ুরোপীয় জাতিসমূহের শীর্ষদেশে।"

তৃতীয়ত, অসুবিধে আসবে বাংলা দেশ থেকে। ইংরেজরা ওখানে মস্তান, শাসনের নামে যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে, আর তবু স্থানীয় নৃপতিরা কেউই তাদের সঙ্গে সামনা-সামনি লড়ে যেতে—কিংবা বিপ্লব ঘটলে মদত জোগাতেও—প্রস্তুত নয়।

চতুর্থত, ভারতীয় জাতিগুলির মধ্য থেকে "নিজ বন্ধু নির্বাচন আমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে করব—এবং সেই বন্ধু হবে মারাঠারা।" কেন? কারণ তাদের আছে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা। আর তার চেয়েও যা বড় কথা, পূর্বপুরুষের মসনদের তারাই আইন-সিদ্ধ অধিকারী, স্বভূমে সুপ্রতিষ্ঠিত। মোগল-পাঠানেরা তো বহিরাগত বিদেশী মাত্র; আর টিপু সুলতান—বা তাঁর পিতা—বিজেতা ছাড়া আর কিছু নন, নয়োবুদ্ধি বা স্বেচ্ছাচারিতায় যথাকালে তাঁর আধিপত্যে ইতি টেনে দেবে।

কিন্তু রাজনীতির কথা উঠবে কর্মকাণ্ডের বেলাতেই; এদিকে কর্মে নামার আগে চাই প্রস্তুতির কর্মসূচী। আঁকেতিল এই আদিকৃত্য হিসেবে বাতলান : ফ্রান্সে ভাষা-শিক্ষার একটি ইসকুল-প্রতিষ্ঠা।

আইডিয়াটা অবশ্য মৌলিক নয়, ইংরেজ-মহাজনের পদানুসরণ। ইংরেজকে হাজার গালমন্দ করেও ভারতের বুকে তাদের আচরণকে "সকল ন্যায়নীতির বিনাশী এবং ঐহিক-পারত্রিক সর্বপ্রকার অনুশাসনের পরিপন্থী" হিসেবে অভিহিত করেও, আঁকেতিল মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না, যদ্যপি দুশমন ওই ইংরেজ তনয়, তথাপি তস্য পন্থা বিবেচ্য নিশ্চয়।

কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা চলবে ফ্রান্সেই; পর্তুগীজ, ভূগোল আর আধুনিক ইতিহাস হবে সাধারণ পাঠ্যসূচী। আর এদিকে থাকবে তিনটি শাখা : রাজনীতি, পুলিস ও বাণিজ্য। রাজনীতির ছাত্রেরা পড়বে ইংরেজি, প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচ্য ইতিহাস; পুলিস-শাখার ছাত্রদের পড়তে হবে হিব্রু ও আরবী, ইহুদী ও ইসলামী ধর্মগ্রন্থ তথা হিন্দু সংবিধান। ভারতীয় ভাষা তারা রপ্ত করবে খোদ ভারতে এসে, কেননা উচ্চারণযাথার্থ্য ভাষাশিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ। ভারতে আরেকটি ভাষা তাদের শিক্ষণীয় হবে : ফারসি—যা শিখলে স্থানীয় দোভাষীর মুখাপেক্ষিতার প্রয়োজন আর থাকবে না। দুপ্লেক্সের কথা-ই ধরুন : পরম প্রতিভাধর তিনি নিজেই ব্যক্তিত্বে মহান—আর তবু তাঁর সাফল্যের জন্য অনেকাংশেই তিনি ঋণী তাঁর তেজস্বিনী ও দৃঢ়চেতা পত্নীর কাছে, যিনি, কৃষ্ণাঙ্গ দোভাষীদের অজ্ঞাতসারে, স্থানীয় ভাষা জানার দরুণ, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলা-মেশা করতে পারতেন। আর সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৭ সালে যে-মুহূর্তে জেনেছিলেন কাশিমবাজারে এক ফরাসি-জামা জ্বাসীর—অর্থাৎ স্বয়ং আঁকেতিলের—উদয় হয়েছে, বারবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কি আগ্রহ প্রকাশ করেন নি নবাব?...কিংবা যদি ফরাসীদের ভেদ করতে হয় Scaye নামক লোহিত বস্ত্ররঞ্জকের প্রস্তুত-প্রণালী কিংবা ক্ষারদ্রব্যের শোধন-পদ্ধতির স্থানীয় ফর্মুলার রহস্য, সে-ক্ষেত্রেও ভাষাজ্ঞান কি বিশেষ সহায়ক হবে না?

উপরন্তু, এত কষ্ট করে আট থেকে দশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে যারা ঐসব প্রাচ্য ভাষা আনল দখলে, প্রাচীভূমিতে কাটিয়ে এল দীর্ঘকাল, ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের পরেও তারা নিঃশেষিত হয়ে যাবেন না; ফরাসী সরকার তাদের নিয়োগ করতে পারবেন ফ্রান্স-ভারত সম্পর্কের ক্রমোন্নতির স্বার্থে—দেশে বসেই তাঁরা ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয় ভাষায় পত্রযোগে ভাবের আদান-প্রদান চালিয়ে যেতে পারবেন।

উপসংহার

"সেই ১৭৬২ থেকে ভারত নিয়ে পড়ে আছি আমি," ঈষৎ সখেদে আঁকেতিল জানান তাঁর পাঠকদের। "ক্রমাগত বলে চলেছি ভারতের অধিবাসী, ভাষা, উৎপাদন, বাণিজ্য, রাজনীতি ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির কথা। অবশেষে, এই আটাশ বছর পরে, আমার আহ্বান যে কানে তুলেছে কেউ কেউ—মুখে যদিও তা স্বীকার না করে—ফ্রান্সের মতো দেশে এই বা কম কি?" ভারত-সম্পর্কিত এক গ্রন্থ লিখে এক ভদ্রলোক পেয়েছেন দু হাজার পাউন্ড। সুসংবাদ! কিন্তু সঙ্গীতকারেরা পান এর তিনগুণ, আর এক অপেরা-গায়কের কথা উল্লেখ করেন আঁকেতিল, যিনি সরকারের কাছ থেকে ভাতা পান এর চারগুণেরও বেশি।

উপসংহারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশবাসীর প্রতি তিনি পুনরুচ্চারণ করেন তাঁর প্রগতি-শীল, আন্তরিক ওকালতি : "আমরা যেন সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে শিখি যে, ভারতীয়েরাও মানুষ, তাদেরও আছে আমাদেরই সমান স্বাভাবিক অধিকার, আর তা আমরা বিশ্বাস করতে পারব তখনই, যখন তাদের ভাষার অভ্যন্তরে সহজ হবে আমাদের গতায়াত। আমরা যেন এ-ও বিশ্বাস করি, কোনো কোনো বিষয়ে তারা আমাদের সমকক্ষ, কোনো কোনো বিষয়ে—এমন কি—তারা আমাদের গুরুজন। এই প্রতীতি আমাদের চিত্তে স্পষ্টভাবে মুদ্রিত হলেই, আমাদের সাহসিকতার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেও, আমরা হৃদয়ের গভীরে অনুভব করব মহত্তর মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উৎসারণ।"

পনেরো

ওদের কথাবার্তা আরো একটু অন্তরঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছয়। জ্যোতিদা বলে "অন্তরের বিধি যাকে মনে করেছ ওটা হচ্ছে শিভালরির অন্য নাম। নবযুগের নারী চায় সমানাধিকার। শিভালরি নয়। আমার বৌদি ইঙ্গেবর্গকে তো চেনো। চিত্রা যাঁর ভারতীয় নাম।"

"হাঁ, আলাপ হয়েছে একবার।" রত্নর বেশ মনে আছে।

"তিনিই ওদেশের নবযুগের নারীত্বের প্রতিভূ। নিউ উওম্যান দেখতে চাও তো তাঁকেই দেখ। তিনি আমাকে যা শিখিয়েছেন গৌরীকে আমি তাই শিখিয়েছি। যাতে গৌরীই হয় এদেশের নবযুগের নারীত্বের প্রতিভূ। এদেশের নিউ উওম্যান। এ বিষয়ে আমি দুই দেশের তফাৎ মানিনে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাও যা, চিত্রা বৌদিও তাই সেজন্যেই তো ওঁর নাম চিত্রা।" জ্যোতিদা বলে অন্তরঙ্গ স্বরে।

"তাই নাকি?" রত্ন কৌতূহলী হয়।

"ওদেশে ফেমিনিজমের হাওয়া যখন ওঠে তখন ওঁর বয়স আঠারো কি উনিশ। ওঁর সমবয়সিনী আরও অনেকের মতো উনিও পণ করেন যে, পুরুষের দাসত্ব কদাচ নয়, সুতরাং যে যার কেরিয়ার বেছে নেবে। সমানাধিকারের ভিত্তিতে বিবাহ তখন সম্ভব ছিল না, তাই ওঁরা ছিলেন বিবাহবিমুখ। তা বলে প্রেমবিমুখ নন, মাতৃত্ববিমুখ নন।" জ্যোতিদা রত্নর মুখভাব দেখে থেমে যায়।

"তা হলে বিয়ে করলেন কী করে? তোমার বৌদি হলেন কী করে!" রত্নর মনে ধাঁধা লাগে।

"বিয়ে করেন মহাযুদ্ধের পরে। ততদিনে সমানাধিকার অনেকটা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু যখনকার কথা আমি বলছিলুম তখনকার দিনে তার জন্যে ঘরে বাইরে আরেক রকম যুদ্ধ করতে হয়। সাফ্রাজেটদের কাহিনী জানো নিশ্চয়।" জ্যোতিদা বলে।

"জানি বইকি। চিত্রাঙ্গদার মতোই দুর্ধর্ষ অ্যামাজন।" রত্ন মনে মনে সেলাম করে।

"সবাই অ্যামাজন নয়। নারীত্বের সংজ্ঞা যদি উদারতর কর তা হলে দেখবে সাফ্রাজেটরাও নারী। কিন্তু সমকক্ষ নারী। পদানত নারী নয়। আমাদের দেশে এখনো আমরা সমকক্ষের কথা ভাবতে পারছিনে। তাই পদানত নারীকেই ভক্তি ভরে বলি, তুমি দেবী, তুমি শুচি, তুমি অপাপবিদ্ধ।" জ্যোতিদা বলে শ্লেষভরে।

"আচ্ছা তুমি যা বলছিলে তা বল।" রত্ন শুনতে চায়।

"বলছিলুম যে, বিবাহ করবেন না বলে ওঁর অর্জুনকে উনি ফিরিয়ে দেন, কিন্তু তাঁরের সন্তানকে সাদরে বহন করেন। যথাকালে মা হতেন, তার জন্যে প্রস্তুতিরও অভাব ছিল না, এমন সময় জাহাজের দোলায় মিসক্যারেজ ঘটে যায়। বারো তেরো বছর পরে এখনো তার জন্যে শোক করেন। নারী নয় তো কী?" জ্যোতিদা সুধায়।

রত্নর সংস্কারে বাধলেও সে সায় দেয়। "নয় তো কী!"

"এর সাত আট বছর পরে দাদার সঙ্গে ওদেশে বিয়ে। উনিও কিছু গোপন করেন না। দাদাও সব জেনেশুনেই ওঁর জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করেন। সাথীত্বের ভিত্তিতেই বিয়ে। সাথীত্ব যদি ভেঙ্গে যায় তবে বিয়েও ভেঙে যাবে। এইরকম পরীক্ষামূলক অবস্থায় উনি আর মা হতে চান না। দাদাও চাপ দেন না।" জ্যোতিদা বিশ্বাস করে বলে।

"কেন, পুরুষেরও কি পিতৃত্বের অধিকার নেই।" রত্ন ভাবে এ কেমন সমানাধিকার।

"আছে বইকি। কিন্তু ওটা খাটাতে গেলে ওই কারণেই বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। দাদা ধৈর্য ধরছেন।" জ্যোতিদা একটু অপ্রস্তুত হয়।

"আমার কথা যদি বল আমি আমার শিভালরির বিধি মেনে চলব, জ্যোতিদা। কখনো কারো সঙ্গে কিছু ঘটলে তাকে বিয়ে করব। আর ওই যে সম্ভাবনা ও রকম কিছু দেখলে কালবিলম্ব করব না। বেচারি মেয়ে আমার জন্যে পথে বসবে, এ কি কখনো হতে পারে?" রত্ন বলে আবেগের সঙ্গে।

"বেচারি মেয়ে যাকে বলছ সে যদি আর-একটি ইসাডোরা ডানকান হয়ে থাকে তো সে-ই হয়তো তোমাকে পথে বসাবে। ছেলে তোমার বলে যে তুমি পাত্তা পাবে তা নয়। ছেলে ইসাডোরার। রেবেকা ওয়েস্টের

লেখা পড়েছ নিশ্চয়। কিন্তু জানো না যে ওটা যাঁর ছদ্মনাম তাঁর বিয়ে হয়নি, অথচ সন্তান হয়েছে। সন্তানের পিতা তোমার গুরুকল্প এইচ জি ওয়েলস।" জ্যোতিদা মুচকি হাসে।

"ওয়েলস!" রয় হতভম্ব হয়। "না, না, ওয়েলস নন।"

"ওয়েলসের তোমার মতো অমন সংস্কারের বাধা নেই। উনি অনেকটা পুরাণের ইন্দ্র বা চন্দ্রের মতো। তোমার অপর গুরুকল্প বার্নার্ড শ কিন্তু পয়লা নম্বর পিউরিটান। যদিও লেখা পড়ে মনে হয় ঠিক বিপরীত। জানো ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক বিশুদ্ধ নিরামিষ।" জ্যোতিদার চোখে হাসি।

রয় জানত না যে তার দুই চিন্তাগুরুর স্বভাব উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুর মতো। চুপ করে ভাবে। আধুনিক নারীর সঙ্গে আধুনিক পুরুষের সম্পর্কটা তা হলে কার মতো হবে?

"আমি কিন্তু ওয়েলসকে খাটো করবার জন্যে ও কথা বলিনি, বলেছি রেবেকা ওয়েস্টের সমর্থন করতে। নারীর ইচ্ছা বলে তো একটা জিনিস আছে। সে ইচ্ছা করলে
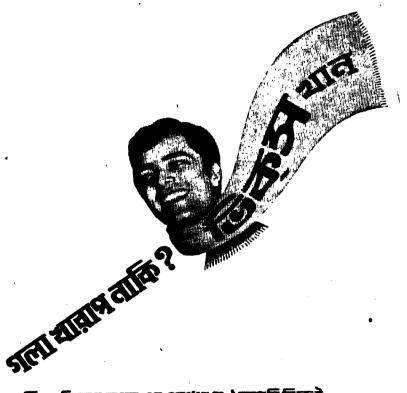
বিয়ে করতেও পারে, না করতেও পারে। মা হতেও পারে, না-হতেও পারে। বিয়ে না-করেও মা হতে পারে, বিয়ে করেও মা না-হতে পারে। তোমার সংস্কারে বাধলেও তার সংস্কারে না-বাধতে পারে। এখন এসব কথা তোলার অর্থ গোরীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে দেওয়া। তার যেটা ইচ্ছা সেটাই সে অনুসরণ করবে। তোমার ইচ্ছাধীন হবে না। তুমি যদি ওর ইচ্ছাধীন না-হতে চাও তবে তুমিও স্বাধীন। কেই বা তোমাকে বলছে শিভালরির খাতিরে নারীর ইচ্ছাধীন হতে!" জ্যোতিদা কোমল স্বরে বলে।

রত্ন ভাবনায় পড়ে। গোরী যদি ইসাডোরা ডানকান হতে চায় তবে ওকেও কি গর্ডন ক্রেগ হতে হবে? না ও বলবে, "আগে তো বিয়ে হোক। তারপরে ওসব।" কিম্বা গোরী যদি চিত্রা বৌদির মতো আর মা হতে না চায় তবে ওকেও কি মোতি মুস্তফীর মতো ধৈর্য ধরতে হবে? সাত বছর হলো বিয়ে হয়েছে ওদের।

কে জানে এমনও হতে পারে যে গোরী পালন করতে চাইবে অসিধার ব্রত, বার্নার্ড শ গৃহিণীর মতো। তখন রত্নকেও কি বার্নার্ড শ মার্গ অবলম্বন করতে হবে? জীবনের কোনো কামনা পূর্ণ হবে না?

প্রশ্নগুলো জ্যোতিদার কানে তুলতে সে হেসে ওঠে হো হো করে। "তোমাকে এখন থেকেই ব্ল্যাংক চেক লিখে দিতে কেউ পরামর্শ দেবে না। পুরুষের ইচ্ছা বলেও তো একটা জিনিস আছে। গোরীকে খোলাখুলি জানতে দিয়ো কী তোমার ইচ্ছা। তারপর তোমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হবে। যেখানে সমঝোতা হয় না সেখানে কিছুই হয় না। সম্পর্কটা তো একতরফা নয়।"

রত্ন তা শুনে লজ্জিত হয়। বলে, "নারীর ইচ্ছায় কর্ম। এই আমার মতবাদ। পুরুষের ইচ্ছা বলে আলাদা কিছু থাকলেও আমি কি জানাতে যাচ্ছি ভেবেছ? তবে আমার কাম্য পরিপূর্ণ জীবন। তার অঙ্গ পরিপূর্ণ প্রেম।"

জ্যোতিদা প্রীত হয়। "আমারও কাম্য তাই। তোমার সঙ্গে আমি ষোল আনা একমত। তা হলেও তোমাকে বলে রাখি যে, তুমি তোমার জীবনে যত বড়ো হবে বলে আশা করেছ গোরী তার জীবনে ওর চেয়েও বড়ো হতে পারে। জর্জ সাঁর মতো তার স্বামীকে, তার প্রথম প্রেমিকাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। শোপাঁর মতো সঙ্গীতকারকে দ্য মুসের মতো কবিকে সিঁড়ির মতো মাড়িয়ে যেতে পারে। শেষে হয়তো সাহিত্যে অমর হতে পারে।"

"ও যদি সাহিত্যে অমর হয় আমিই সব চেয়ে সুখী হব, জ্যোতিদা।" রত্নর অভিমানে লাগলেও সে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে মুখর হয়। "আমার হাতেও তো লেখনী থাকবে। তা দিয়ে আমিও তো ওকে সাহিত্যে অমর করে দিতে পারি।"

"তোমাকে লঘু করা আমার অভিপ্রায় নয়, রতন।" জ্যোতিদা অপ্রতিভ হয়ে বলে।

"জর্জ সাঁর উপমাটা জুতসই হয়নি মানছি। তোমরা বরং অ্যানি বেসান্ট ও বার্নার্ড শ'র সঙ্গে তুলনীয়? জানো তো ওঁরাও এককালে প্রেমিক প্রেমিকা ছিলেন।"

"তাই নাকি?" রত্ন কল্পনাও করতে পারে না।

"হাঁ, ওঁদেরও একদা যৌবন ছিল! আর ছিল মহত্ত্বের প্রতিশ্রুতি। মিলিত হলে ওঁরা আরো মহান হতে পারতেন।" জ্যোতিদা বলে যায়। "মিসেস বেসান্ট ইতিপূর্বেই তাঁর স্বামীর কাছ থেকে আইন অনুসারে ফারাক হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তো ডিভোর্স নয়। সেটার জোরে তো আরেকবার বিয়ে করা যায় না। শ তখনো অবিবাহিত। বিবাহ সম্ভব নয় দেখে তাঁরা স্থির করেন যে বিনা বিবাহেই একত্রবাস করবেন। এবং সেটা সবাইকে জানিয়ে শুনিয়ে।"

"আমাদেরও সেই রকম অভিলাষ।" রত্ন মনে মনে মিলিয়ে নেয়।

"কিন্তু বাধল কোথায় জানো? আইনে নয়, লোকাচারে নয়, লেখাপড়া করতে গিয়ে। হাঁ, দুজনেই চাইলেন যে একটা লেখাপড়া হয়ে যাক। কার কী অধিকার, কার কী দায়িত্ব। অ্যানি যেসব শর্ত তুললেন জর্জ তাতে সম্মতি দিলেন না। খুঁটিনাটি আমার জানা নেই। চিত্রা বৌদির কাছেই গল্প শোনা। তাঁরও অজানা। শর্তে বনল না বলে লেখাপড়া হলো না। লেখাপড়া হলো না বলে একত্রবাস হলো না। সম্বন্ধটাই গেল কেঁচে। মিসেস বেসান্ট সোশিয়ালিজম ছেড়ে দিলেন। আর-কারো সঙ্গে মিলিত হলেন না। থিওসফিস্ট হলেন, ভারতে এলেন, কত উচ্চে উঠলেন। সেসব তো জানো। ওদিকে বার্নার্ড শ আবিষ্কার করলেন তিনি নাট্যকার। তাঁর হাত খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বরাতও খুলে গেল। বিবাহ হলো একজন কুমারীর সঙ্গে পরিপূর্ণ বনিবনার ভিত্তিতে। কিন্তু কায়িক সম্পর্ক বাদ দিয়ে।" জ্যোতিদা গল্পটা শেষ করে।

"তুমি কি বলতে চাও জ্যোতিদা, যে আমাদের বেলাও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে?" রত্নর মনে খটকা বাধে জ্যোতিদার মুখভাব দেখে।

"তা একটা লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে গেলে মন্দ কী? যদি শর্তে বনে।" জ্যোতিদা বলে।

"আমি সব শর্ত মেনে নেব। গোরী যদি তাই চায়।" রত্ন চোখ বুজে রাজী হয়।

ষোল

রত্নর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় জ্যোতিদার অর্ধেক মুখ ছিল দাড়িতে ঢাকা। এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে ও রাহুমুক্ত হয়েছে, তাই ওর চেহারা খুলেছে।

দাড়ি মুড়োনোর রহস্য কী জিজ্ঞাসা করলে জ্যোতিদা বলে, "অসহযোগের আমলে স্বদেশী ক্ষুর ব্যবহার করতে গিয়ে নিত্য রক্তপাত ঘটে। নিজের রক্ত হলেও সেটা প্রাণীরক্ত তো বটে। অহিংসাবাদী আমি বাধ্য হয়ে দাড়ি কামানো বন্ধ করি। ছেড়ে দেওয়া দাড়ি হু হু করে বেড়ে যায়। ফলে রাজনীতিক মহলে আমার সম্মানও বাড়ে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখি সম্মান তো নয়, অসম্মানই আমার পাওনা। মেয়েরা এমন ভঙ্গীতে তাকায় আমি যেন একটা জংলী জানোয়ার। ছেলেরাও পাশ কাটায়। তবে কি আমি শুধু বুড়োদের দলেই মিশব? সতীর্থরা বলবে, ছোট গুরুদেব?"

"ওঃ সেইজন্যে তুমি দাড়ি কামিয়ে ফেললে?" রত্ন শুধায়।

"ছিল আরো গভীর কারণ। সেটা পরে জানতে পাবে। রোমান্সটা এখনো জমেনি। আমার যেমন ভাগ্য জমবার আগেই বাষ্প হয়ে না যায়!" জ্যোতিদা হাসে।

রোমান্সের আমেজ পেয়ে রত্ন পুলকিত হয়। শান্তিনিকেতন রোমান্সের জায়গা বটে। জ্যোতিদা কি তারই সন্ধানে ওখানে যায়?

"আরে না, না। আমি চেয়েছিলুম বিশ্বের সঙ্গে ভারতকে মিলিয়ে নিতে। আর প্রতীচীর সঙ্গে প্রাচীকে। আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীকে। সাবরমতী আশ্রমে ছিলুম কিছুকাল, তা তো তুমি জানোই। সাবরমতীর পরিপূরক হলো শান্তিনিকেতন আশ্রম। সেখানের মতো এখানেও আমি বছর খানেক থাকতে পারলে জোড় মেলাতে পারতুম। কিন্তু থাকতে চাইলে থাকতে দিচ্ছে কে?" জ্যোতিদার কণ্ঠে খেদ।

"কেন, ওঁদের দিক থেকে কি আপত্তি আছে?" রত্ন দরদের সঙ্গে বলে।

"না, ওঁদের আপত্তি কিসের? আমরা তো একমুঠো ছাত্র। সব কটিকেই ওঁরা ধরে রাখতে চান। কিন্তু আমার নিজেরই প্রোগ্রাম সাতুই পৌষ অবধি। মেলা দেখে আমি আমার জীবনের এ পর্ব চুকিয়ে দেব। তারপর বম্বে। তোমাদের একটা বিহিত করতে হবে। একদিন ও পাটও চুকে যাবে। তখন আবার আমার নিজের আশ্রমে ফিরে এসে গণসত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হব। তখন তোমাদের পথে তোমরা। আমার পথে আমি। আশা করি, তখন আর আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না।" জ্যোতিদা বলে।

"কী করে বলব? যদি প্রতিযোগিতায় সফল হই তা হলে তো বম্বে থেকে বিলেত যেতে হয়। গোরীকে কোথায় রেখে যাব? ও কি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হবে? ওর বাচ্চাকে ও কার কাছে দিয়ে যাবে। না সঙ্গে নিয়ে যাবে? এমনি একরাশ প্রশ্ন আমাকে

আজহাল করবে, যদি তুমি আমার ধারে কাছে না থাক। তোমার ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন সেইদিনই ফুরোবে যেদিন আমার ওগসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে।" রত্ন বলে।

জ্যোতিদা চুপ করে থাকে। "আচ্ছা, আমি তোমার ধারেকাছেই থাকব, যদি তুমি চাও, যতদিন তুমি চাও।"

"গণসত্যাগ্রহ আরম্ভ হলেও?" রত্ন বাজিয়ে দেখে।

"না, ওইটি পারব না। আমি হলুম যুদ্ধের ঘোড়া। যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধক্ষেত্রই আমার স্থান।. তোমরা যদি আমাকে আটকাও তা হলে আমার জীবন ব্যর্থ হবে, রতন। তবে আমার বিশ্বাস গণসত্যাগ্রহের আগেই তোমরা স্থিতি পাবে। শান্তিনিকেতনের গুজরাতী বন্ধুরা আমাকে সাবরমতীর খবর আনিয়ে দেয়। সেখানে গণসত্যাগ্রহের লেশমাত্র সাড়াশব্দ নেই। গান্ধীজী গঠনের কাজে আপনাকে ঢেলে দিয়েছেন। গঠন মানেই তো সংগঠন। সংগঠন দৃঢ় না হলে কেউ সংগ্রামে নামে না।" জ্যোতিদা বলে।

রত্ন তা শুনে আশ্বস্ত হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্যে সে তেমন অধীর নয়, যেমন গোরীর স্বাধীনতার জন্যে। দেশ যদি দশ বিশ বছর অপেক্ষা করে তা হলে ক্ষতি যা হবে তা অপূরণীয় নয়। কিন্তু গোরীকে যদি দশ বিশ বছর অপেক্ষা করতে হয় তবে তার অপূরণীয় ক্ষতি। তার আয়ু, তার যৌবন, তার জীবিকা, তার প্রেম কিছুই ততদিন বসে থাকবে না। গোরীর স্বাধীনতাটাই জরুরি।

"শান্তিনিকেতনে তোমাকে অত কম সময় থাকতে হচ্ছে এর জন্যে আমি দুঃখিত। পরে আবার যেয়ো।" রত্নও আশ্বাস দেয়।

"না ভাই, জীবনে পুনরাবৃত্তি ঘটে না। ছাত্র হিসাবে থাকতে হয় তো এই আমার শেষ সুযোগ। পরে হয়তো পর্যটক হিসাবে যাব, হয়তো কর্মী হিসাবে। তখন তো কেউ আমাকে ছাত্রদের সঙ্গে থাকতে বা ছাত্রীদের সঙ্গে মিশতে দেবে না।" জ্যোতিদা আপসোস জানায়।

"খুব মিশছ নাকি?" রত্ন চুপি চুপি বলে।

"না, খুব নয়। দাড়ি কামালেই যে মেলামেশা হামেশা হয় তা নয়। আমি লাজুক মানুষ। এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে জানিনে। তা ছাড়া সমবয়সিনী মেয়েদের কী বলে সম্বোধন করব সেটাও একটা সমস্যা।" জ্যোতিদা রহস্য করে বলে।

"সে কী! কলকাতায় তো আমরা বলি, মিস দাশগুপ্ত, মিস দত্ত।" রত্ন আশ্চর্য হয়।

"ওটা বিজাতীয় আদব! আমাদের পক্ষে বেআদবি। শান্তিনিকেতনে আমরা বিশুদ্ধ ভারতীয় শিষ্টাচার পুনঃপ্রবর্তন করতে চাই।" জ্যোতিদা গম্ভীরভাবে হাস্য গোপন করে।

"বেশ তো। কুমারী দাশগুপ্ত, কুমারী দত্ত বললেই তো সমস্যা মেটে। ও নিয়ে অত ভাববার কী আছে?" রত্ন সহজ সমাধান বলে দেয়।

"ওটা বিলেতের নকল। গুরুদেবের ভাষায় বৈলাতিকতা। ভদ্রদের বেলা আমরা বলি রামবাবু, শ্যামবাবু। কিংবা রামজী, শ্যামজী। ভদ্রাদের বেলা এক দিদি ছাড়া আর কিছু মুখে আসে না। সেটা কি আমাদের সমবয়সিনীদের বেলা চলে? ও'রা রাগ করবেন যে!" জ্যোতিদা হাস্য গোপন করে আবার।

"তা হলে সমাধানটা কি?" রত্নও গম্ভীর হয়ে ওঠে।

"ব্যাপারটা চরমে ওঠে যখন গোবিন্দন বলে একটি দক্ষিণী ছাত্র গোপী বলে একটি সিন্ধী ছাত্রীকে দিদি বলে ডাকে। কন্যাটি সোজা গুরুদেবের কাছে গিয়ে নালিশ করে। তাই নিয়ে একটা বৈঠক বসে। আমিও তাতে যোগ দিই। মেয়েরা বলে, আমরাও তা হলে দাদা বলে ডাকব। আমি যতদূর জানি গোপীই গোবিন্দনের চেয়ে বয়সে বড়ো। দিদি বলে ডাকলে ওর আপত্তি করা সাজে না। কিন্তু পারিবারিক মহলের বাইরে কোন মেয়ের কত বয়স সেটা তো আর-কারো জানার অধিকার নেই। মেয়েরা ও বিষয়ে স্পর্শকাতর। গোবিন্দনের মতো তালগাছের দিদি হলে লোকে সত্যি সত্যি গোপীর বয়স যত নয় তত ঠাওরাবে।" জ্যোতিদা রঙ্গ করে।

"তা হলে শুধু গোপী বলে ডাকলেই চুকে যায়!" রত্ন সরলভাবে বলে।

"তা কি হয়? এটা কি ইংলণ্ড না আমেরিকা যে সমবয়সিনীর সঙ্গে দুদিন আলাপেই তুমি ওকে মেরী বা জেন বলে ডাকবে?" জ্যোতিদার চাপা হাসি ফুটে বেরয়।

"তা বৈঠকে কী মীমাংসা হলো?" জানতে চায় রত্ন।

"সেখানেই তো মজা। ছেলেরা বলে মেয়েরাই বলুন ও'দের কী বলে ডাকতে হবে। মেয়েরা বলেন, দেবী। যেমন সেবা দেবী। কিন্তু গুরুদেবই মাথা নাড়লেন। তিনি অনেক ভেবেচিন্তে দাড়িতে অনেকবার হাত বুলিয়ে এই রায় দিলেন যে, প্রাচীন ভারতে নারীদের সম্বোধন করা হতো যা বলে সেই সব চেয়ে ভালো। আর্যা। এখনকার ছেলেরাও বলবে, 'আর্যা'। আর মেয়েরা বলবে, 'আর্য'।" জ্যোতিদা হেসে ওঠে।

এতে হাসার কী আছে বুঝতে পারে না রত্ন।

পরের দিন কিন্তু রটে গেল যে ছেলেরা মেয়েদের সম্বোধন করবার সময় বলবে 'আর্যা' আর মেয়েরা ছেলেদের সম্বোধন করতে গেলে বলবে 'আর্যপুত্র'। তা শুনে চারদিকে হাসাহাসি আর কান্নাকাটি পড়ে যায়।" জ্যোতিদাও হাসমুখর হয়।

"সমস্যাটা যদি আধুনিক হয় তবে সমাধানটা প্রাচীন হয় কী করে?" রত্ন বলে সীরিয়াসভাবে। "কবে কোন দেশে তরুণ-তরুণীদের সহশিক্ষা ছিল?"

"ওটা হলো গুরুদেবের রসিকতা।" এই বলে উড়িয়ে দিতে চায় জ্যোতিদা।

"না, না, আমি লক্ষ করেছি গান্ধীজীর মতো গুরুদেবেরও মনের আধখানা পড়ে রয়েছে প্রাচীন ভারতে। আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে ও'রা সমন্বয় করবেন কার, না প্রাচীন ভারতের। 'আর্য' আর 'আর্যা'দের যুগ চলে গেছে। ইতিহাসের মঞ্চ থেকে তারা চিরবিদায় নিয়েছে। তথাপি তাদের ফিরিয়ে আনা চাই। যে কোনো ছলে। এটাও তেমনি একটা ছল।" রত্ন বিরূপ হয়।

"রবীন্দ্রনাথকে তুমি ভুল বুঝলে, রতন। বিশ বছর আগে উনি রিভাইভ্যালিস্ট ছিলেন সে কথা সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে উনি মডার্নিস্ট হয়েছেন। এমন কি তোমার আমার চেয়েও বেশী। অত্যাধুনিক সাহিত্যিকরাও ও'র চেয়ে অত্যাধুনিক নন। কিন্তু এটাও তো মানতে হবে যে আর সকলের মতো তাঁরও একটা দেশ আছে। সে দেশের ঐতিহ্যকে তিনি এককথায় খারিজ করতে পারেন না। পশ্চাৎপদ দেশবাসীকেও সঙ্গে করে চলতে হয় অগ্রগামীকে। তার ফলে তাঁর অগ্রগমন কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়। এটা কি একদিন তোমার আমার বেলাও সত্য হবে না, মনে করেছ?" জ্যোতিদা বোঝায়।

রত্ন তার অগ্রগমনে ব্যাঘাত সহ্য করবে না। জ্যোতিদা করবে। সে ধৈর্যশীল। দুই বন্ধুর মধ্যে এই যে তফাৎ এটা ক্রমে স্পষ্ট হয়।

"রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু তোমার শান্তিনিকেতনের মেয়েরা যদি বলে ওদের 'দেবী' বলে সম্বোধন করতে হবে তবে ওটা ক্ষমাযোগ্য নয়। গীতা চট্টোপাধ্যায় গীতা দেবী লিখতে আরম্ভ করেছেন। সে অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু তাই বলে মালা মিত্র তো মালা দেবী লিখতে পারেন না। শাস্ত্র সে অধিকার তাঁকে দেয়নি। শাস্ত্র মতে তিনি মালা দাসী। গীতার পক্ষে প্রাচীন ভারত যেমন সৌভাগ্যের আকর মালার পক্ষে তেমনি দুর্ভাগ্যের। মালাকে বাঁচাতে পারে প্রাচীন ভারত নয়, আধুনিক ইউরোপ। তাই তিনি লেখেন মালা মিত্র, মিস মালা মিত্র। যদিও তিনি বিধবা।" রত্ন গর্বের সঙ্গে বলে।

"মালা মিত্রটি কে? তোমার কেউ হন না তো?" জ্যোতি কৌতূহলী হয়।

(ক্রমশ)

বছর কয়েক ধরে "সংস্কৃত দিবস" নামক একটি উৎসব পালন করা হচ্ছে। সম্ভবত সংস্কৃত পাঠ বা সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ বিষয়ে যে শাস্ত্রাদি রচনা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করাই এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যে মহৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কয় বৎসরে কিছু বক্তৃতা বা মামুলি অনুষ্ঠান ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে কিছু সার্থক কাজ হওয়া দরকার এবং এ বিষয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যাপকতা অনেকখানি। বিভিন্ন বিষয়ে বহুতর সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। এইসব বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে বলে আমাদের মনে হয় না। সংস্কৃত দিবসকে উপলক্ষ করে যদি কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় তাহলে বোধ করি কিছু যথার্থ কাজ হতে পারে।

অপরাপর বহু বিষয়ের মত সঙ্গীত সম্বন্ধেও সংস্কৃত ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ আছে। এর অনেকগুলিই বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি। যেগুলির অনুবাদ পাওয়া যায় তাতে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আশানুরূপভাবে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের সঙ্গে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, পুরাণ, নাট্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের যোগ আছে। সেগুলির সম্পূর্ণ উল্লেখ ও বিশদীকরণ দরকার। অতএব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাদির সম্পাদন না হলে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা সম্ভব হয় না। অতএব এ বিষয়ে আমাদের মুখ্য কাজ হল সংস্কৃত গ্রন্থাদির সরল, সুবোধ্য অথচ যথাযথভাবে সম্পাদন।

সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থাদির আলোচনাকালে এমন কিছু পরিভাষার সম্মুখীন হতে হয় যেগুলির অর্থ প্রচলিত অভিধানে নেই। সেইসব শব্দের সম্যক ব্যুৎপত্তি এবং টীকা প্রয়োজন। এইসব গ্রন্থের সহজ অনুবাদেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনও অ্যাকাডেমিক সংস্থা যদি এইসব গ্রন্থের যথোপযুক্ত সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন তাহলে ভাল হয়।

কিন্তু শুধু সঙ্গীত গ্রন্থাদির কথাই বলছি না—আরও বহুবিধ বিষয়ের পুনরালোচনা প্রয়োজন। একেবারে বেদ-গ্রন্থাদি থেকেই এই পরিকল্পনার প্রয়োজন। বর্তমানে সরল হিন্দী অনুবাদ এবং টীকা টিপ্পনী সহ বেদগুলি সুলভে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলায় এইরকম কোনও পরিকল্পনা হতে দেখা যায় না। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন—সামগান থেকে প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতে অনেক কিছু সংগ্রহ করা হয়েছিল। অনেকে এইসব উক্তির কোনও তাৎপর্য দেখতে পান না। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, সামবেদ সংহিতায় যেহেতু সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও আলোচনা নেই সেইহেতু এইসব উক্তি শোনা কথা ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধারণা ঠিক নয়। নাট্যশাস্ত্রের মত গ্রন্থে নিতান্ত বাজে কথা বলা হয়নি। সামগুলি কিভাবে গাওয়া হত তার বহু পরিচয় পুষ্পসূত্র, অক্ষরতন্ত্র, সামতন্ত্র শিক্ষাগ্রন্থ প্রভৃতি শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। ভাল করে অধ্যয়ন করলে সামগানের মোটামুটি স্বরলিপিও প্রস্তুত করা যায়। বর্তমান রাগসঙ্গীতের মত সামগানেরও নানারকম রূপ ছিল। এইসব ধরন নানাভাবে লৌকিক গানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন পদ্ধতির সৃষ্টি করেছিল। অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন হলেও নারদী শিক্ষা সামগানের স্বরূপ নির্ণয় করতে আমাদের অসামান্য সহায়তা করে। কিন্তু এইসব গ্রন্থই দুষ্প্রবেশ্য। সংস্কৃতে যথেষ্ট অধিকার ব্যতীত এইসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। এমন কি যে নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ আজকাল অনেকে কথায় কথায় করে থাকেন তারও একটি উত্তম অনুবাদ নেই। এর ফলে আমাদের পরমতের উপর নির্ভর করতে হয় এবং আমাদের সিদ্ধান্তে গোলযোগ থেকে যায়।

এক সময় প্রচুর পুরাণ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল কিন্তু আজকাল আর সেগুলি পাওয়া যায় না। আবার আমাদের নতুন করে এসব কাজে হাত দেবার সময় এসেছে। পুরাণগুলিতে ইতিহাসের বহু তথ্য পাওয়া যেতে পারে এবং আরও বহু বিষয়েরই সন্ধান এই বিস্তৃত পুরাণ সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। আজ এদিকে একটি বিরাট শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে জাতকগ্রন্থগুলির উত্তম অনুবাদ হওয়া দরকার, কারণ, পুরাণাদির মত প্রাচীন সমাজ, ইতিহাস, আচার ব্যবহার, লোকযাত্রা প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার এই গ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া যায়। এক সময় কিছু অনুবাদ হয়েছিল কিন্তু আজ আরও অনেক ব্যাপকভাবে এই সমস্ত কাজ হওয়া দরকার।

শুনতে পাই আমাদের দেশে অনেক কিছু কাজ হচ্ছে। আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে গবেষণার প্রস্তুতি চলেছে। কিন্তু এও শুনতে পাই যে, আজকালকার কাজ মানেই পরমতের সংগ্রহ এবং সেগুলিরই পুনর্বিন্যাস। দেশে যদি বস্তুর অভাব হয় তাহলে এ ছাড়া আর আমরা বিশেষ কিছুই আশা করতে পারি না। যে ভাষায় গবেষকদের অধিকার নেই সেই ভাষাকে এড়িয়ে পরের মাধ্যমে যদি তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয় তাহলে ফল হবে ভাসা ভাসা ধারণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এতে ডক্টরেট অর্জন করা যেতে পারে বটে, কিন্তু চিন্তার দিক থেকে দেশকে এগিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।

অতএব এই সংস্কৃত দিবসকে উপলক্ষ করে কেবলমাত্র উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার চেয়ে সংস্কৃত ভাষায় যে বিপুল শাস্ত্রাদি রচিত হয়েছে তার সরল, নির্ভরযোগ্য অনুবাদ, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি প্রণয়ন করাই হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারেননি, তাঁরাও যেন অসহায় বোধ না করেন, আর যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তাঁরাও যেন আরও অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ লাভ করেন। এই বিরাট পরিকল্পনা ধীরে ধীরে সার্থক হয়ে উঠলে আমাদের ধীমান মণ্ডলী বহু সার্থক কার্যে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

দেশের প্রভাবশালী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যদি এই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহলে উপযুক্ত অর্থের অভাব হবে না। দেশে ইউনিভার্সিটির পর ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হচ্ছে, সরকার থেকে নানারকম গ্র্যান্ট মঞ্জুর করা হচ্ছে। এইসব সংস্থা উদ্যোগী হলে এমন একটি গুরুতর কাজ অসম্পন্ন থাকবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ভ্রম সংশোধন

গতবারে পরলোকগত কালীপদ পাঠক সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখিত "শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত" নামটি হবে "শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।" অনবধানতাবশত এই ভ্রমটির জন্য লেখক দুঃখিত।

চিঠিপত্র

শার্ঙ্গদেব সমীপেষু—

'কালীপদ পাঠক সম্পর্কে' আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি যে চন্দননগর, তেলিনীপাড়ার একজন বাড়ুজ্যের উল্লেখ করেছেন—যিনি চমৎকার টপ্পা গাইতেন, তাঁর নাম হল জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যদিও "কালোবাবু" নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। আমি চন্দননগর তেলিনীপাড়ার

বাঁড়ুজ্যে বাড়িরই মেয়ে, তাই আপনার লেখা পড়ে ও'র নামটি জানালাম।

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়
সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
কলিকাতা-৯।

সবিনয় নিবেদন,

এ সপ্তাহের দেশে (৫ই ডিসেম্বর. ১৯৭০) আপনি স্বর্গত কালীপদ পাঠক মহাশয়ের সংগীত প্রতিভার আলোচনাসূত্রে লিখেছেন... চন্দননগর তেলিনীপাড়ার এক বাঁড়ুয্যের নাম তিনি করতেন, যিনি খুব সুন্দর টপ্পা গাইতেন।" আপনি লিখেছেন এ'র নামটা আপনি ভুলে গেছেন। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই তিনি হচ্ছেন ৺জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালোবাবু নামেই তিনি সমধিক পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ'দের এক পূর্ব পুরুষ ছিলেন ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর নামের উল্লেখ শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর "কেরী সাহেবের মুন্সী" বই-এ পাওয়া যায়।

কালোবাবুর মুখেই শুনেছি—যে তাঁর শোরী মিঞার ঘরোয়ানার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ রমজান খাঁর কাছে টপ্পা শিখেছিলেন খাঁ সাহেবের কাছে টপ্পা শিখেছিলেন বললে সামান্যই একটু বলা হয়। তখনকার দিনে এই পশ্চিমী ওস্তাদজীকে এ'রা বাড়িতে রেখেছিলেন এবং তাঁরই সুযোগ সুবিধা মাফিক কালোবাবুকে রমজান খাঁ সংগীত শিখিয়েছিলেন।

আমরা ছেলেবেলাতে এ'দের বাড়িতে অনেক গেছি। এ'র বৈঠকখানায় বেশ কিছু গান শুনেছি। কালীপদবাবু প্রায়ই বালী থেকে এ'র বাড়িতে আসতেন। তখন খুবই গানের মজলিস হত।

কালোবাবু অতি সুন্দর গাইতেন; সুন্দর স্বরবিন্যাস, গিটকিরি এবং তান লাগাতেন। বেশীর ভাগ গাইতেন শোরী মিঞার এবং রমজান খাঁর টপ্পা। ঠুংরিও গাইতেন প্রচুর। তিনি অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের জজও হতেন। একবার তিনি এলাহাবাদের অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের জজ হয়েছিলেন। গহর জান, মালকা জানের গানও এ'র খুব প্রিয় ছিল। নিধুবাবুর টপ্পা কালোবাবু গাইতেন কিনা কোনদিন শুনিনি—পশ্চিমী গানই (ক্লাসিক্যাল) বেশী গাইতেন।

তাঁর বয়স যখন ৭০-এর কাছাকাছি তখনও তাঁর গান আমরা শুনেছি। সেই সুরেলা গলা তখনও তাঁর ছিল। তাঁদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি পাশাপাশি হওয়ার জন্য আমরা তাঁর এবং অনেক গুণীর গান শোনবার সুযোগ পেয়েছি।

জগদীশ দাশ (ডাঃ)
২০ হাউজ খাস এনক্লেভ
নিউদিল্লী-১৬

৭-১২

... ইন্ডিয়া রেডিওর একটি ছাপানো ...সট্রাকশন থেকে একটি লাইন কোট করছি:—

"Reproduction of film songs or songs of gramophone records should be avoided."

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ নিয়ম কতটা প্রতিপালিত হচ্ছে তার প্রমাণ সাম্প্রতিক কলকাতা "খ"-এর একটি প্রোগ্রাম। গায়ক দিব্যি রেকর্ডের গান রিপ্রডিউস করে দিয়েই বেরিয়ে গেলো—"সুন্দরী গো মান কোরো না" এবং একাধিক। পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলে মাইকের জ্বালায়, ছোটবড় ফাংশানে হেঁজিপেঁজি আর্টিস্টের গলায় এসব শুনতে শুনতে তো কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এর ওপরেও আছে রেডিয়োর অনুরোধের আসর। তার ওপর আবার পয়সা দিয়ে আর্টিস্ট নিয়ে এসে সেই একই গান রিপ্রডিউস? রেডিও স্টেশনের কর্তারা দয়া করে হুঁশিয়ার হৌন।

জনৈক শ্রোতা
খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

শাঙ্গর্দেব

৫
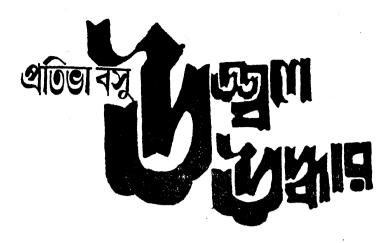
বেশ লাগছিলো দেখতে। চলন বলন চেহারা ভঙ্গি—সব, সব তো মনে এক মুগ্ধতার আমেজ এনে দিচ্ছিলো। তার বোধ হচ্ছিলো, কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে যার জন্য এই ভদ্রলোকটি ঠিক দায়ী নন। এবং এই মুহূর্তের মুখশ্রীতে যে বেদনা প্রতিফলিত তাও অসত্য নয়।

ডক্টর রায়ও দুই চোখ দূরে ভাসিয়ে দিয়ে অনেক কথাই চিন্তা করছিলেন। ভেবে পাচ্ছিলেন না একদিন যেজন্য সমস্ত জগৎ-সংসার ওলোটপালট হয়ে গেল, সমস্ত জীবন একটা যন্ত্রণার কুন্ডে পরিণত হলো, আপন হাতে যার জন্য তিনি বুক থেকে তাঁর কলজে উপড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, আজ কেন সেই কারণগুলো এমন অর্থহীন, এমন পলায়মান। তিনি হৃদয়ের মধ্যে ভারি মধুর একটি স্নেহ অনুভব করছিলেন ছেলেটির জন্য। ছেলেটির রাগ অভিমান তিরস্কার, বিশ্বাসের সরলতা, সব কিছু তাকে মায়াবী করে তুলছিলো, তাঁর ভালো লাগছিলো এই একটি তপ্ত জীবন্ত অস্তিত্বের মুখোমুখি বসে থাকতে। পিতৃত্বের আস্বাদে তিনি বস্তুতই সিক্ত হচ্ছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়ত্ব—

'আপনার বাড়িটি ভারি সুন্দর।' পুরন্দরের জেহাদ ঘোষিত গলা ঈষৎ কোমল শোনালো।

'উঁ?' তিনি চমকে তাঁর চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এলেন। মৃদুহাস্যে বললেন, 'তোমার ভালো লাগছে?'

'লাগবে না!'

'বম্বেতে ক'দিন থাকবে তুমি? এখানে চলে এসো না।'

'এখানে?'

'দোষ কী?'

'পিতা হয়ে পুত্রের প্রতি এই ভদ্রতার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে এই আমন্ত্রণের কথা আমি মনে রাখবো। আপাতত আমার মেয়াদ অত্যন্ত সংকীর্ণ।'

'কলকাতাতেই ফিরে যাচ্ছ?' কবে?

'আমার জাহাজ পরশু বেলা দশটায় ছেড়ে যাবে।'

'জাহাজ?'

'আমি একটা বৃত্তি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছি।'

'বিদেশে!' হঠাৎ কেমন একটা বিচ্ছেদের কষ্ট উপলব্ধি করলেন ডক্টর রায়। চুপ করে থেকে বললেন, 'কোথায়?

'আমেরিকা। হিউস্টনে।'

'ও।' একটু থেমে, 'কি করবে?'

'কী আর। যা সবাই করে।'

'পি এইচ ডি?'

'তাইতো ভাবছি।'

'কী বিষয় ছিলো তোমার?'

'অর্থনীতি।'

'অর্থনীতি? ইকনমিক্স?'

'শুনেছি সে বিষয়ে আপনি পয়লা নম্বর ছিলেন।'

'কার কাছে শুনেছ?' ডক্টর রায় উৎসুক হলেন।

'লোকপরম্পরায়।'

'ও।' জবাব শুনে যেন একটু স্তিমিত হলেন। আবার উৎসুক ভাবে বললেন, 'বিষয়টা তোমাকে কে নির্বাচন করালো?'

'আমি নিজে।'

'তুমি নিজে?'

'সম্পূর্ণভাবে।'

'ও।'

'পাশটাশ ক'রে বেরুবার পরে শুনলাম আপনার মাথার ছিটেফোঁটা আমার মাথার মধ্যেও ঢুকেছে।'

'কে বললো?' আবার দুই চোখে আগ্রহের আলো জ্বাললেন তিনি।

পুরন্দর মৃদু হেসে বললো, 'এক্ষেত্রেও লোকপরম্পরা শব্দটি প্রযোজ্য।'

'ও।' ডক্টর রায় বেগে পা নাচাতে লাগলেন।

'আমি শুনেছিলাম আপনি বহুকাল যাবৎ লণ্ডন প্রবাসী।'

'এও কি লোকপরম্পরার খবর?'

'আজ্ঞে হাঁ, কলকাতা এসে বড়ো হতে হতে দেখলাম, চারদিকে অনেক লোক, এবং লোকেরা সকলের সব খবরের জন্যই সমান উৎসাহী। অবশ্য আমিও আপনার খবর জানবার জন্য সেই উৎসাহে সমানে পাল্লা দিয়েছিলাম।

'কী জানলে?'

'জানলাম, স্ত্রীকে ত্যাগ করে আপনি বিদেশে চলে গেছেন।

'ও।'

'সেখানেই বাড়িটাড়ি কিনে—' পুরন্দর এতোক্ষণে কী যেন খেয়াল করে রঙিন পর্দা ঢাকা ঘরগুলোর দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠলো, রূঢ় গলায় বললো, 'আর সব কোথায়?'

হাসলেন ডক্টর রায়, 'লোকেরা বলে দেয়নি সেকথা?'

'না।'

'তাহলে ব্যক্তিগত বলে সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে আমার জন্য?'

'নিশ্চয়ই। ক্ষমা করবেন, আপনার সেই ব্যক্তিগত জীবনটার কথা এতোক্ষণ আমার একেবারেই মনে পড়েনি।'

'মনে পড়লে কী করতে?'

'আসতাম না। আমি শুধু আমার বাবা ভেবেই এমন ছিটকে চলে এসেছি, যদি মনে পড়তো—'

'কী আশ্চর্য! অন্য কারো বাবা হলেই বা তোমার আপত্তিটা কোথায়? লোকেদের তো ভাইবোন থাকে, না কি থাকে না?'

পুরন্দরের ক্রোধ দেখে তিনি কৌতুক বোধ করছিলেন।

'না, এক্ষেত্রে আমার পক্ষে সেটা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। আমি চলি।'

'আরে বোসো বোসো। আমার সঙ্গে খাবার কথা আছে না তোমার?'

'আমি খাবো না।'

'এ তো ভারি মেজাজী ছেলে দেখছি। শোন—'

'বলুন।'

'এরকম রাগ করে চলে যাচ্ছ কেন?'

'রাগ করার কোনো প্রশ্নই নেই। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতোটুকু? আপনার যারা স্বজন, তারাই বরং এই

আপ্যায়নের জন্য রাগ করবেন আপনার উপর।'

'আমার স্বজন? কে বলো তো?'

'নিশ্চয়ই আপনার বিদেশিনী স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানেরা।'

'দুঃখিত। সেই শুভ সংবাদটি তোমাকে আমি দিতে পারলাম না।'

'মানে?'

'অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আমার স্বজন আমি ছাড়া কেউ নেই।'

'এখানে নেই, সেখানে আছে। কারো সঙ্গেই আপনার প্রতারণা করা উচিত নয়।'

চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলেন ডক্টর রায়, গভীর গলায় বললেন, 'যৌবনে আমি একটি বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করেছিলুম, তাছাড়া আর কোথাও নোঙর গাড়িনি। লোকেরা সব সময় সব কথা সত্য বলে না। অন্তত অঞ্জলির সেকথা বিশ্বাস করা উচিত হয়নি।'

বেয়ারা ট্রে ভর্তি পানীয় এনে নামালো টেবিলের উপরে। সঙ্গে কিছু খুচরো খাবার। পুরন্দর কফি নিল, ডক্টর রায় তাঁর অভ্যাস মতো হুইস্কিতে সোডা মেশালেন। তারপর অনেকগুলো নিঃশব্দ মুহূর্ত গড়িয়ে গেল দুজনের মাঝখান দিয়ে।

৬

অনেক পরে পুরন্দর বললো, 'আপনি যা ভাবছেন তা নাও হতে পারে।'

'আমি কী ভাবছি?' বহুদিনের প্রলেপিত ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছিলো ডক্টর রায়ের হৃদয়ে, তিনি চেষ্টা করেও অভ্যাস মতো আজ আর তাঁর অতীতকে দূরে ঠেলে রাখতে পারছিলেন না।

'আমি আমার মা'র বিষয়ে বলছিলাম—'

'কী?'

'বললেন না একথা আমার মা'র অন্তত বিশ্বাস করা উচিত হয়নি?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি আপনার বিষয়ে কী বিশ্বাস করেন বা করেন না, তা কেউ জানে না। আমিও না। আপনাকে নিয়ে কখনো কোনোদিন একটি বাক্যও তিনি বিনিময় করেন না কারো সঙ্গে।'

'ও।'

'আমি ভেবে পাই না, আমার মায়ের মতো অমন একজন মানুষ সারাজীবন কেন এতো কষ্ট পেলেন। কী তাঁর অপরাধ ছিলো।'

ডক্টর রায় চুপ করে থাকলেন।

'আপনার সাবালক পুত্র হিসেবে আজ সেই কৈফিয়তের দাবীটা কি আমার পক্ষে খুব অসঙ্গত?'

'আমার সাবালক পুত্র?' মন্ত্রমুগ্ধের মতো মুখে মুখে উচ্চারণ করলেন তিনি।

'শুনেছি আমার মাকে আপনি পছন্দ করে নিজেই বিয়ে করেছিলেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডক্টর রায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কী ভেবে পছন্দ করেছিলেন?'

'পছন্দ কি কেউ ভেবে চিন্তে করে?'

'ঘরে তিনি নির্যাতিত অবহেলিত। অবস্থায় আপনার সমাজের তুলনায় অনেক নিচের মানুষ, সম্ভবত সেটাকেই আপনি করুণা করেছিলেন।'

'করুণা?' টকটকে চোখে তাকালেন, গম্ভীর গলায় বললেন, 'এ প্রসঙ্গ থাক।'

'কেন থাকবে?' প্রতিহিংসার সুর বেরুলো পুরন্দরের গলায়, 'নিজের অন্ধকার দিকটা দেখতে বিবেকে বাধে ব'লে?'

'বিবেক? কী জানি।' ডক্টর রায় অন্তঃস্তলে তাকিয়ে খুঁজলেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন তারপর তিনি কী করেছিলেন।

'সব চেয়ে আশ্চর্য কী জানেন?' পুরন্দরের কালোপক্ষ বড়ো বড়ো চোখের দৃষ্টিতে ছায়া ঘনালো। একটা অক্ষম রোষে ছটফট করে উঠে বললো, 'যিনি আমার সমস্ত দুঃখের মূলে তাঁর উপর আমার যথোচিত রাগ নেই।'

রাগ! যথোচিত রাগের অভাবে কি ডক্টর রায়ও এই মুহূর্তে অসহায় বোধ করছেন না? কিন্তু একদিন তো সেই রাগে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে ফেলেছিলেন, গলা কাটতে গিয়েছিলেন ব্লেড দিয়ে, শেষে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। যাবার আগে তার ভাঙা মোটা পুরুষ গলা চিৎকার করছিলো 'ন্‌না, ন্‌না, ন্‌না। এ আমি সহ্য করতে পারবো না, আমি কোনো কথা শুনবো না, আমি চাই না এ অবস্থায় কেউ আমার বাড়িতে থাকুক।'

'রাগ তো নেই-ই, বরং ছেলেবেলা থেকে একটা অভাববোধ সর্বদা আমাকে আকুল করে রেখেছে।'

'অভাববোধ? কিসের অভাববোধ?'

'আপনার।'

'আমার।'

'আপনার। শুধু আপনার অভাবে আমি কাঙাল হয়ে থেকেছি।'

'কিন্তু আমাকে তো তুমি চিনতে না।'

'কিন্তু জানতাম।'

'কী জানতে?'

'জানতাম আপনি আমার বাবা। প্রতি পদক্ষেপে যার নাম আমাকে ব্যবহার করতে হয়।'

'আমার নাম?'

'উপায় কী বলুন?'

'কেন?'

'পুরুষ শাসিত সমাজে মায়ের কি কোনো মূল্য আছে? মায়ের মর্ম কে বোঝে?'

'তুমি প্রতিবাদ করতে পারতে।'

'কী বলতাম?'

'বলতে আমার বাবাকে আমি চিনি না, তিনি আমার কেউ না, আমার মা-ই আমার সব।'

'হ্যাঁ, সেটাই আমার উচিত ছিলো। কিন্তু একটা শিশু যখন ইসকুলে ভর্তি হতে যায়, তখন কি সে এই তর্ক তুলতে পারে?'

'তার মা পারে।'

'মা?' নিঃশ্বাস নিল পুরন্দর, 'স্বামীকে অস্বীকার করবেন এমন শক্তি তিনি আজো সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি। আপনার বিষয়ে তাঁর দুর্বলতা তর্কের অতীত। আপনি জানেন না, কীভাবে আমার শৈশব কেটেছে। কী ভীষণ অন্ধকারে সাঁতার কেটে কেটে আমি বড়ো হয়েছি। আপনার উপর জেদ, রাগ, অভিমান, ভালোবাসার প্রাবল্য, প্রেম, সবটা মিলিয়ে মার মনে এমন অদ্ভুত এক নিঃশব্দ জগৎ তৈরী হয়েছে যে সেখানে তাঁর সন্তানেরও প্রবেশপথ বন্ধ।

'তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা অনমনীয়, সহ্য করবার ক্ষমতা তুলনাহীন, নিজের ব্যর্থতাকে কী সাংঘাতিক আত্মনির্যাতনের চাবুক মেরে মেরে তিনি সজীব রেখেছেন যে তাঁর প্রতিশোধের এই আশ্চর্য কৌশল দেখলে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া কখনোই সুখের হয়নি। নিজের দুঃখ নিয়ে তাঁর সেই নিথর নিশ্চল দম আটকানো চুপ করে থাকার অসম্ভব ক্ষমতা আমাকে সব সময়েই এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় দগ্ধ করেছে।' অনেকদিন পর্যন্ত আমি জানতাম না, তিনি সধবা না বিধবা না কুমারী। এ-ও জানতাম না আমি তাঁর গর্ভজাত সন্তান অথবা পালিত পুত্র।'

ডক্টর রায় বুকের ভিতর থেকে আওয়াজ বার করলেন। 'তাহলে আমার নাম তুমি জানলে কী করে?'

অপ্রয়োজন বোধে পুরন্দর সে কথার জবাব দিল না, সনিশ্বাসে বললো, 'আপনি তো শুধু তাঁকেই ভাসিয়ে দেননি, আপনার নিজের সন্তানকেও কষ্টের চরমসীমায় পৌঁছে দিয়েছেন। একথা তো আপনার অজানা ছিলো না যে, স্বামী পরিত্যক্তা অবস্থায় বিমাতার সংসারে মরে গেলেও তিনি আশ্রয়ের জন্য যাবেন না, আর একথাও অবিসংবাদিত সত্য যে স্বামী বর্তমানে কোনো হিন্দু মেয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বিশেষত আমি তখন তাঁর পেটে। তাছাড়া আপনার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা প্রচণ্ডভাবে অন্ধ। তাঁকে গৃহহীন করতে আপনার অন্তরে কি এতোটুকুও কম্পন উঠলো না? একটা মনুষ্যত্ব বলেও তো কথা আছে? আমি শুনেছি আপনি তখন কোনো শ্বেতাঙ্গিনীর প্রণয়ে—'

অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর রায়, দাঁতে দাঁত চেপে কী বলতে গিয়েও কঠিন সংযমে শান্ত করলেন নিজেকে। স্থির গলায় বললেন, 'না, তোমার মাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের প্রতি আমার কখনো কোনো দুর্বলতা ছিলো না, এখনো নেই। সবই ভাগ্য।'

'ভাগ্য!' বিদ্রোহীর ভঙ্গি করলো পুরন্দর, 'আমি বিশ্বাস করি না, ভাগ্য বলে কোনো কথা আছে। সবই আমাদের কৃতকর্ম। মনকে চোখ ঠার দেবার জন্যই আমরা সব সময়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে থাকি। আমার মা-ও তাই করেন। আমি রেগে যাই। আমি তাঁর হাতের লোহা কতোদিন টান মেরে খুলে দিয়েছি, কতোবার বলেছি, কী জন্য তুমি একজন অবিবেচক নিষ্ঠুর মানুষকে মনের মধ্যে জিইয়ে রাখতে একটা লোহার বালা পরে কয়েদী হয়ে আছ? মা শোনেন না, আপনার বিষয়ে কোনো বিপরীত কথা বললে তাঁর মুখে রক্ত উঠে আসে, অত শান্ত সংযত মানুষও যে কী পরিমান উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তারপরই বলেন, 'কারো কোনো দোষ নেই, সবই আমার ভাগ্য।' আমি আপনাকে কী বলবো, এই যে আপনার প্রতি আমার এই এক অহেতুক আকর্ষণ, মনে হয় তা-ও আমার মায়েরই নিঃশব্দ প্রভাব। এ আমার মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া সংক্রামিত রোগ। কিন্তু আপনি একটা কী! আপনি একটা কী!'

বলতে বলতে বহুকালের সঞ্চিত অভিমান থেকে এক বিক্ষুব্ধ বিকৃত আওয়াজ বেরিয়ে এলো পুরন্দরের গলায়। উৎসারিত ঘৃণার সঙ্গে বললো, 'বাংলা দেশের সুযোগ্য সন্তান আপনি, জন্মেছিলেন রূপোর চামচে মুখে নিয়ে, পৈতৃক প্রাসাদে বসে বিবাহের দ্বারা স্ত্রীর উপর শুধু বাসনাই চরিতার্থ করেছেন, আর কিছু নয়। তারপরেই মানুষটা ফুরিয়ে গেছে, পুরোনো হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন আপনার তথাকথিত উচ্চসমাজে এবং আপনার বিলাসী জীবনে, সেই দুঃখীনি মেয়েটি কোনোদিক থেকেই সমকক্ষ নয়, তাই—'

'শাট আপ্।' এতোক্ষণ সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে সহসা চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর রায়। তাঁর মাথা ফেটে যাচ্ছিলো। তিনি দুহাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে থরথরিয়ে উঠলেন। তারপরেই হাত বাড়িয়ে হাত ধরলেন পুরন্দরের, রুদ্ধস্বরে বললেন, 'এসব কথা থাক পুরন্দর, এসব কথা থাক। যা অতীত তা অতীতের গর্ভেই লুকিয়ে থাকতে দাও। তুমি আমার বন্ধু হয়ে কথা বলো, সমকক্ষ হয়ে কথা বলো, তোমার পিতৃ সম্বোধন আজ আমার হৃদয়কে বড়ো বিচলিত করেছে, আমি তোমাকে হারাতে চাই না।'

পুরন্দর দীর্ঘশ্বাস ফেললো, হাসলো ঠোঁটের কোণে, বললো, 'হ্যাঁ, আপনার পক্ষে যা অতীত, তা নিশ্চয়ই অতীত, নিশ্চয়ই গত কিন্তু আমি কী করবো? আমি কেমন করে চুপ করে থাকবো? আমার পক্ষে তো তা নয়। আমার উত্তেজনা আপনি মার্জনা করুন, হয়তো আপনার সঙ্গে আজ আমার যেমন প্রথম দেখা, তেমনি শেষ দেখাও। আমি কিছুতেই না বলে পারছি না, নিজের পিতার মুখোমুখি বসে বন্ধুর ভঙ্গিতে একটু আধটু গল্পগুজব করে, ভালো বাসনে ভালো খেয়ে, ভালো বাড়ির আরাম শুষে নিয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে ফিরে যাবো এর তুল্য অপমান আর আমি কিছুই ভাবতে পারি না। বরং যে অতীত অনেকদিন আমি ভুলেছিলাম, সে অতীত আজ এই মুহূর্তে আমাকে নতুন করে বেদনার স্রোতে ভাসিয়ে নিচ্ছে। আপনার বাড়ি ঘর মান সম্মান সম্পদ—সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে আমার মার জন্য আমার বুকে নতুন করে শেলবিদ্ধ হচ্ছে। আপনি কি জানেন, আপনার স্ত্রীকে কীভাবে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছে? কীভাবে মানুষ করতে হয়েছে একটা শিশুকে? কী না করেছেন? ঘরে

ঘরে বাচ্চা পাড়িয়ে তাদের অভিভাবকদের হাজারো বায়না মিটিয়ে, ফরমাস খেটে, টিফিনের ছুটিতে ইস্কুলের বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের কাছে ঘরে তৈরী খাবার বিক্রী ক'রে কতো অসম্মান অপমানের কাঁটায় রক্তাক্ত হ'তে হ'তে কী ভীষণ হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁর দিন আর রাত। একটা গুদোম ঘরের ঠাণ্ডায় আমাকে তপ্ত রাখতে লেপ কম্বল কাঁথা সব কিছু দিয়ে ঢেকে নিজে মরে গেছেন শীতে। সেখানে আলো ছিল না, জল ছিল না, একটা বাথরুম পর্যন্ত না। ভোর হ'তেই আলোর জন্য আমাকে একটা কাঠের বাক্সে বসিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসতেন বাইরে, আমি রোদ খেতাম, আর তিনি চোখের মাথা খেয়ে অন্ধকারে বসে বসে আমার রান্না রাঁধতেন, টিফিনে বিক্রীর খাবার তৈরী করতেন, বাসন মাজতেন, বিছানা ঝাড়তেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, শিশুর পরিচর্যার সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। এই ক'রে ক'রেই আমাকে সুখ দিয়েছেন, স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন, শিখিয়েছেন পড়িয়েছেন, নিজেও বি এ পাশ ক'রে তিনে তাঁর উঁচুতে বেঁধেছেন!'

(ক্রমশ)

একটি কবিতা ও সিংহরাজ

সোমনাথ রায়

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) বিখ্যাত 'ভারতসঙ্গীত' কবিতাটি আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে, ৭ই শ্রাবণ, ১২৭৭ সালের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' (ইংরেজী ২২শে জুলাই, ১৮৭০) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বছর দশেকের বালক গান্ধীজী কয়েক মাসের শিশু। স্বনামখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই সময় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন হেমচন্দ্র তাঁর খন্ড কবিতাগুলি একত্রে পুস্তকাকারে 'কবিতাবলী' নামে প্রকাশ করেন তখন 'ভারত সঙ্গীত-এর কয়েকটি পংক্তির পরিবর্তন করে দেন। কিভাবে কবিতাটি পরিবর্তিত হয় তার সামান্য উদাহরণ দেওয়া চলতে পারে:—

এডুকেশন 'গেজেট'

* * * *

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত কেবলি ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি,
শিখরে দাঁড়ায়ে বীর মহাবলী
শিবজী, নয়নে হানিয়ে বিজলী
গাহিতে লাগিল গভীর নাদে।

গাহিতে লাগিল শিখর উপরে
নয়ন জ্যোতিতে স্থির আভা ধরে,
বাজিল শঙ্গ বিবিধ ছাঁদে

* * * *

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ ভারতমণ্ডলে,
যবনরুধিরে করিতে স্নান।

জপ তপ আর যোগ আরাধনা
পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চ্চনা
দূরে পরিহরি যবন বাসন
সমরে নিবার খুলে কৃপাণ।

* * * *

'কবিতাবলী'

* * * *

(ঐ আছে)

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায় নামাবলী
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গাইতে লাগিল জনেক যুবা।

আকর্ণ-লোচন উন্নত-ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায় নামাবলী
নয়ন জ্যোতিতে হানিল বিজলী
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

* * * *

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ তপ আর যোগ আরাধনা
পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না
তূনীর কৃপাণে কর রে পূজা।

* * * *

'কবিতাবলী'তে প্রকাশকালে একটি ক্ষুদ্র মুখবন্ধ সংযোজিত হয়। মুখবন্ধটি হল:—"ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশাহদিগের অত্যান্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র-অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারত-সঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।" কেন এই মুখবন্ধটি যোগ করা হয়, আর কেনই বা কবিতাটির পরিমার্জনের প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে হেমচন্দ্রের জীবনীকার লিখেছেন, "এই পদ্য প্রকাশিত হওয়ার পর মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।......অনুবাদক রবিনসন যবন শব্দের অনুবাদে লিখিলেন foreigner, আর শিবজীর স্থানে লিখিলেন Sewji। ছোটলাট বাহাদুর স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ভূদেববাবুর কৈফিয়ৎ তলব করিলেন,—কেন এমন পদ্য এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়? ভূদেববাবু বলিলেন, প্রকাশিত না করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিতাতে ঐতিহাসিক ভারতবাসীর এক-সময়ের মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার উপর কবিতাটি বড় সুন্দর, এমন কবিতা প্রেরিত স্তম্ভে স্থান দেওয়া যে মন্দ, তাহা— কিরূপে বুঝিব? Shivaji-র নাম কবিতাতে স্পষ্ট আছে, অনুবাদক Sewji করিয়া গোল করিয়াছেন। বিশেষ, যবন শব্দে মুসলমান; অনুবাদক foreigner করিয়া আরও গোল বাড়াইয়াছেন। এই কৈফিয়তে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইলেন,—তবে অনুবাদক বেচারাকে ত্রুটি-স্বীকার করিতে হইল।"(১) ভূদেব চরিত-কারও ঘটনাটি সম্পর্কে প্রায় একই বিবরণ দিয়েছেন।(২)

এঁদের বিবরণীতে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়নি। রবিনসন সাহেব যবনের অনুবাদ foreigner করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু শিবজীর ইংরেজী Sewji লেখেননি, লিখেছিলেন Sheoji। আর শুধু ছোটলাটেই ব্যাপারটি সীমিত ছিল না, বড়লাট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কবিতাটি প্রকাশের পর সরকারী মহলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল উল্লিখিত পুস্তক দুটির রচয়িতারা তা সঠিকভাবে অবগত ছিলেন না। প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল সেই কৌতুককর কাহিনী এই প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেওয়া গেল।

প্রথমে 'ভারত-সঙ্গীত' 'এডুকেশন গেজেট' প্রকাশকালে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়া স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মাত্র বছর বার তের আগে ১৮৫৭-৫৮-র বিদ্রোহে ভারতবর্ষে বৃটিশরাজের ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল। সেই রক্তঝরা দিনগুলির স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মত বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজ রাজপুরুষদের মনে জাগরিত ছিল। ওই জাতীয় ঘটনার পনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল সজাগ। রাজদ্রোহমূলক চক্রান্ত কোথাও সংঘটিত হচ্ছে কি না বিশেষভাবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হত। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেননি,

---

(১) অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'কবি হেমচন্দ্র' (২য় মুদ্রণ) পৃঃ ৯-১০

(২) মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, 'ভূদেব চরিত', ১ম ভাগ, পৃঃ ৩১৭-১৮

অনন্তযৌবনা যুনানী মণ্ডলী,
মহিমা ছটাতে জগত উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া মরু গিরি দলি,
কৌতুকে হাসিয়া চলিয়া যায়।

আরবা, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত কেবলি ঘুমায়ে রয়"।

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি,
শিখরে দাঁড়ায়ে বীর মহাবলী
শিবজী, নয়নে হানিয়ে বিজলি,
গাহিতে লাগিল গভীর নাদে।

গাহিতে লাগিল শিখর উপরে,
চন্দ্র জ্যোতিতে স্থির আভা ধরে,
বাজিল শৃঙ্গ বিবিধ ছাঁদে।

বাজিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারত ভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়ে শৃঙ্খল বাঁধা!

আর্য্যাবর্ত্ত জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত এসে প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ!

ধিক্ হিন্দুকুলে, বীর ধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু করতলে,
এ সোনার পুরী করিতে ছার!

হীন বীর্য্য সব হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে রিপু পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহা কুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার।

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ রঙ্গ মত্ত পূর্ব্ব পিতৃগণ,
যখন তাহারা করেছিল রণ,
করেছিল জয় পঞ্চনদ গণ,
তখন তাহারা কজন ছিল?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিল তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্ম্মদা পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজিত রণে,
তখন তাহারা কজন ছিল?

এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।

তবে ভিন্ন জাতি শত্রু পদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন?

ঐ দেখ্ সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপে ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম
হিন্দু বীরদর্প বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধিসীমা?

সকলি ত আছে সে সাহস কই,
সে গভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই,
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই,
ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা!

হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি,
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি
আর কি ভারত সজীব আছে!

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে"!

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র বীর শৃঙ্গনাদ ভুলি,
আবার শৃঙ্গ মুখে দিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গভীর স্বরে।

এখনো জাগিয়া উঠ রে সবে,
"এখনো সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকর সম দ্বিগুণ প্রভাবে
ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ ভারতমণ্ডলে,
যবনজাতির করিতে নাশ।

জপ তপ আর যোগ আরাধনা
পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চ্চনা
দূরে পরিহরি, যবন বাসনা
সমরে নিনাদ তুলে কৃপাণ।

ছিল বটে আগে, তপস্যার বলে
কার্য্য সিদ্ধ হতো এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না, হবে না, খোল তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

স্বজাতি স্বজাতি কলহ বিবাদ
ত্যজে, রণ মদে হওরে উন্মাদ,
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিষাদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হলি দিশে হারা,
সেই হিন্দু জাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও?

ঐ দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
যেরূপে ঘুরিত দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল;

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহিমা হবে না উজ্জ্বল?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

সবিনয় নিবেদন মিদং

কৈবর্ত্ত জাতি শুনি কন্যার গর্ভে স্বর্ণকার বীর্য্যে উৎপন্ন বিধায় অন্ত্যজ জাতি, ইহাদের জলব্যবহার শাস্ত্রসঙ্গত কি না।

এই প্রশ্নের উত্তর।

মহাশয়! শুনি কন্যার গর্ভে স্বর্ণকার হতে কৈবর্ত্ত জাতি উৎপন্ন এইটী মতান্তর প্রমাণ। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত জাতি-মালাতে ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ কলৌ তীবরসংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভুবি। বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় বীর্য্যে কৈবর্ত্তের উৎপত্তি, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং এই প্রমাণ আমা দেশের, ও এতদ্দেশের কৈবর্ত্ত জাতির জীবিকা বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ হয় সাধারণে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ বলিয়া জল ব্যবহার করেন, এবং ইহাও দৃষ্ট হয় যে, কতক অংশ কৈবর্ত্ত বৈশ্য-উদ্ভব বলিয়া পনর দিবস অশৌচ ধারণ করেন।

শ্রীরাজনারায়ণ ভৌমিক।

'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত 'ভারত সঙ্গীত'

কিন্তু তাঁদের মনে যে এর গভীর প্রভাব পড়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্রোহের ঠিক পরবর্তীকালেই আমরা দেখছি যে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীতে 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'নীলদর্পণ' ও 'ভারত-সঙ্গীত' রচিত হচ্ছে। 'নীলদর্পণে'র লেখক তাঁর নাটকে ভারতীয়ের দ্বারা ইংরাজকে প্রহার দেওয়ার দৃশ্য দেখিয়েছেন। অন্যান্য লেখকেরা হয়তো সে সাহস দেখাতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের অবচেতন মনে বিদেশী শাসনের বাঁধন মুক্ত করার যে তীব্র বাসনা সুপ্ত ছিল, তা মূর্ত হয়েছিল তাঁদের রচিত ঐতিহাসিক নাটক, কাব্য ও উপন্যাসগুলিতে।

বিদ্রোহের ফলে 'কোম্পানী বাহাদুরে'র শাসন শেষ হয়, শুরু হয় মহারাণীর রাজত্ব। কিছু শিক্ষিত ভারতীয় ও ইংরাজের মনে প্রশ্ন জাগল, কেন হল এই বিদ্রোহ? সৈয়দ আহমেদ খাঁ একটি পুস্তিকায় লিখলেন যে কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে (Imperial Legislative Council) কোন ভারতীয় সদস্য নেই। বিদেশী শাসকেরা আইন প্রণয়ন করে থাকেন, কিন্তু সেই আইনের কি প্রতিক্রিয়া ভারতীয় জনসাধারণের মনে হয়ে থাকে, তাঁরা অবহিত হওয়ার চেষ্টা করেন না। ভারতীয়দের মনোভাব জানতে হলে আইন প্রণয়নের সময় তাঁদের উপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। বিদ্রোহের বছর পাঁচেক আগেই কলকাতার 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন' মাদ্রাজের 'মাদ্রাস নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন' ও মহারাষ্ট্রের 'বম্বে অ্যাসোসিয়েশন' বৃটিশ পার্লামেন্টে আবেদন করেছিলেন, বিধান পরিষদে ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন করা হোক। পার্লামেন্ট সে আবেদনে কর্ণপাত করেনি। বিদ্রোহের ধাক্কায় বৃটিশসিংহের টনক নড়ল। কেন্দ্রে এবং মাদ্রাজ, বম্বে, বাংলার ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা হল।

একদিকে বিধানসভায় কিছু সংখ্যক ভারতীয় আসন লাভ করলেন, অন্যদিকে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়মিতভাবে ইংরেজীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। সংবাদপত্রেই সমসাময়িক সমাজের ছবি প্রতিফলিত হয়। জনমতের ধারা কোন খাতে বইছে সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। 'ভারত সঙ্গীত' 'এডুকেশন গেজেট-এ প্রকাশিত হলে, অনুবাদক রবিনসন সাহেব (J. Robinson) তার একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সাপ্তাহিক রিপোর্টে প্রকাশ করলেন। (৩) এর মাসখানেক পূর্বে ওই পত্রিকাতেই (২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭, ইং ১৬ই জুন, ১৮৭০) হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'এডুকেশন গেজেট' সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ছিল। নির্বিরোধী ভূদেব বাংলা সরকারের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রতিটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টরকে নির্দেশ দেওয়া ছিল তাঁরা যেন ডাকমাশুল সমেত পত্রিকাটি ক্রয় করেন। সেই 'এডুকেশন গেজেট-এ যখন 'ভারতবিলাপ' প্রকাশিত হল তখন ভারত সরকার সচকিত হলেন। গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য জন স্ট্র্যাচি (যিনি বছর দুয়েক পরে লর্ড মেয়ো আন্দামানে নিহত হলে অস্থায়ীভাবে ভাইসরয় হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন) বড়লাট লর্ড মেয়োকে জানালেন যে, এই জাতীয় রচনা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেই পত্রিকাকে অর্থ সাহায্য করা, অথবা তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখা বাঞ্ছনীয় নয় 'It is not desirable that the Govern-
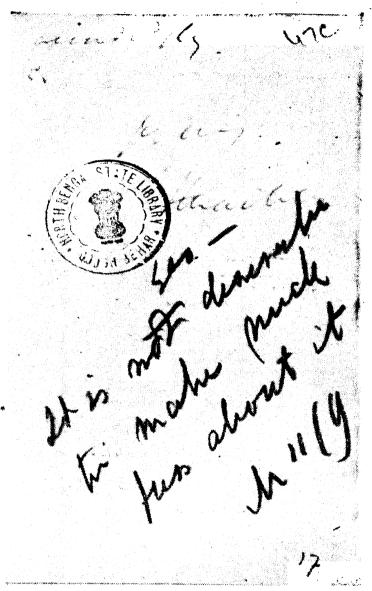
“ভারত সঙ্গীত” প্রসঙ্গে লর্ড মেয়োর স্বহস্ত লিখিত নোট

(৩) Report on Native Papers for the week ending the 23rd July, 1870. পৃঃ ৬।

ment should continue to have any connection or to afford its patronage, to a paper conducted in this manner) (৪) মেয়ো নির্দেশ দিলেন সরকারীভাবে বাংলা সরকারের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করার আগে স্ট্র্যাচি যেন ছোটলাট (Lieutenant Governor) উইলিয়ম গ্রেকে এক আধা-সরকারী (demi-official) চিঠি লেখেন। বড়লাট নিজেও গ্রেকে এক গোপন পত্র লিখলেন। চিঠিটি এই :—

ব্যক্তিগত ও গোপনীয়

সিমলা,
৯ই জুলাই, ১৮৭০

প্রিয় স্যার উইলিয়ম,

১৬ই জুনের এডুকেশন গেজেটের প্রেরিত স্তম্ভে (correspondence column) প্রকাশিত ভাবালুতায় পূর্ণ একটি রাজনৈতিক রচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আমার ধারণা, সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ রাজদ্রোহমূলক না হলেও, এদেশের সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা, এবং তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা ব্যতীত এর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। **(To my mind this song, if not purely seditious, is calculated to have no other effect than to bring the Government of this country in contempt and breed discontent and disaffection).**

জানতে পারলাম, বঙ্গ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আপনার প্রেসিডেন্সির বেশ কিছু সংখ্যক রাজকর্মচারী পত্রিকাটির গ্রাহক হয়েছেন।

আমি লক্ষ্য করছি বাংলা পত্রিকাগুলিতে ইদানীং ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও রাজদ্রোহমূলক রচনার সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। (৫) এই সঙ্গীতটির মত বিরক্তিকর কুরুচিপূর্ণ রচনা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেটি কোন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভের যোগ্য নয়। অবশ্য হঠাৎ এই সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া যে কিঞ্চিৎ অসুবিধাজনক, সে আমি উপলব্ধি করি।

এ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত না জানা অবধি, সরকারীভাবে কোন পত্র আমি বাংলা সরকারকে লিখতে চাইনি। তবু জানিয়ে রাখি, স্বরাষ্ট্র বিভাগ নিয়মমাফিক বিষয়টি আমার নজরে এনেছেন।

—মেয়ো

---

(৪) Note by Strachey, 3 July, 1870.

(৫) মেয়ো এখানে স্ট্র্যাচির মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। পূর্বোল্লিখিত ৩রা জুলাইয়ের নোটে স্ট্র্যাচি লেখেন,
"For some time past I have observed that the tone of the Bengalee newspapers—always bad—has become more insolent—not to say seditious—than ever."

সরকারী মহলে 'ভারতবিলাপ' কবিতাটি নিয়ে যে এই আলোচনা চলছিল, 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক মশায়ের তা জানা ছিল না। জানলে ৭ই শ্রাবণের 'এডুকেশন গেজেট-এ 'ভারতসংগীত' নিশ্চয় প্রকাশিত হত না। সুতরাং ক'দিন পরে 'নেটিভ পেপার রিপোর্ট'-এ রবিনসন কৃত 'ভারত সংগীত'-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদটি পড়ে স্ট্যাচি সাহেব তো ক্ষেপেই লাল। হুকুম দিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব এডুকেশন গেজেটের ওই সংখ্যাটি জোগাড় করা হোক। এর সারাংশের অনুবাদ যদি নির্ভুল হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে কবিতাটি সম্মানহানিকর **(Get a copy at once of the Education Gazette. If this turns out a correct summary it is quite scandalous)** (৬) পরদিনই* সিমলা থেকে ওই সংখ্যাটি চেয়ে পাঠিয়ে তার গেল কলকাতায়। ইংরেজীতে কবিতাটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদেরও ব্যবস্থা হল।

'ভারত সংগীত' প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। "এমন চক্ষু ছিল না, যাহা এই কবিতা পড়িয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করে নাই, এমন হৃদয় ছিল না, যাহা ইহার আবেগে আলোড়িত, কম্পিত ও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে নাই।" (৭) 'ভারত সংগীত'-এর জবাবে, সেকালের অতি জনপ্রিয় পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'-এ কয়েকদিনের মধ্যেই আর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এর রচয়িতা হাতীবাগানের গোবিচন্দ্র বসু (গোবিন্দ চন্দ্র?)। এই জবাবী কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :—

"শিমলা শিঙ্গানাদে, দাণ্ডায়ে শিখরে,
কারে, ক্ষেপা ছেলে! ডাক উচ্চৈঃস্বরে?
কে ঘুমায়ে? দেখ, জাগ্রত সকল
পড়ে আছে, নাহি উঠিবার বল।
* * * *
সত্য বটে, এই ভারত ভিতরে,
কোটি কোটি লোকে বসবাস করে,
কিন্তু কয়জন লোকের মতন
আছে বল দেখি করিয়ে গণন?
লক্ষ লক্ষ তারা কি করিতে পারে?
এক চন্দ্রে দেখ আঁধার সংহারে!
একা সিংহ-সুত কোটি মৃগ ধ্বংসে।
একা খগপতি নাশে নাগ বংশে।
এক বিনা দেখি আঁধার চক্ষে।
ভারত কি সহে পারত পক্ষে!"(৮)

---

(৬) **Note by oJhn Strachey, 8 August, 1870.**

(৭) মন্মথনাথ ঘোষ, "হেমচন্দ্র", ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১।

(৮) সোমপ্রকাশ, ১৭ই শ্রাবণ, ১২৭০ (১লা আগস্ট, ১৮৭০)। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন।

সিমলা থেকে আবার তার গেল কলকাতায়। চেয়ে পাঠান হল 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা ও সেই সঙ্গে গোবিচন্দ্রের কবিতার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।

ভারত সরকার অবশ্য গোবিচন্দ্রের কবিতা নিয়ে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হলেন না। এর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, 'সোমপ্রকাশ' সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ছিল না। দ্বিতীয়ত, 'ভারত সংগীত'-এর তুলনায় রচনাটিও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। হেমচন্দ্রের কবিতায় যে আবেদনশীলতা বর্ত্তমান, গোবিচন্দ্রে তার একান্ত অভাব। 'ভারত সংগীত' সেই কারণে অনেক বেশী বিপদজনক।

'ভারত সংগীত'-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ স্বরাষ্ট্র দপ্তরে এলে গভর্ণর-জেনারেল-এর কাউন্সিলের সামনে রাখা হল। কিন্তু ইতোমধ্যে মেয়োর এবং স্ট্র্যাচির চিঠি পেয়ে ছোটলাট গ্রে এ সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করেছেন। বাংলা সরকারের বিবেচনাধীন থাকায় ভারত সরকার আপাতত এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে অগ্রসর হলেন না; তবু স্বরাষ্ট্র সচিব, বেলী সাহেবকে (E. C Bayley) নির্দেশ দেওয়া হল বাংলা সরকারকে জানাতে, যেন একটা জোড়াতালি গোছের তদন্ত করেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি না হয়। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব যে সে লোক হতে পারেন না। বাঘা বাঘা আই সি-এস'দের মধ্যেও যিনি রীতিমতো ঝানু ও জাঁদরেল তিনিই এই পদের অধিকারী হয়ে থাকেন। স্বরাষ্ট্র সচিব যে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকেও ঘোল খাওয়াতে পারেন সে তো গুলজারিলাল নন্দর ক্ষেত্রে আমরা স্বচক্ষেই দেখলাম। অভিজ্ঞ ও ধুরন্ধর সিভিলিয়ন হিসেবে বেলীর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি বাংলা সরকারের সচিব অ্যাশ্‌লে ইডেনকে (কিছুকাল পরে ইডেন বাংলার ছোটলাট নিযুক্ত হন) এক ব্যক্তিগত চিঠিতে জানালেন যে ভারতীয় পিনাল কোডের ১২৪-এ ধারায় কবিতাটির রচয়িতা ও প্রকাশকের অন্ততঃ তিন বছর কারাবাস, এমনকি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও হওয়া অসম্ভব নয়।(৯)

বেলীর চিঠি কলকাতায় পৌঁছানোর আগেই গ্রের নির্দেশে বাংলা সরকারের অন্য এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রিভার্স টমসন (পরে লর্ড রিপনের শাসনকালে ইনি বাংলার ছোটলাট হন; কিন্তু ইলবার্ট বিল নিয়ে টমসন ও অন্যান্য ইংরাজেরা রিপনের প্রতি এতই খাপ্পা হন যে গোপনে স্থির করেন যে বড়লাটকে ধরে বেঁধে চাঁদপাল ঘাটে জাহাজে চড়িয়ে সোজা বিলেতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন) ভূদেববাবুকে তলব করেন। গ্রের নিজের মতে প্রথম কবিতাটি অর্থাৎ

---

(৯) Bayley to Eden, 17 August, 1870.

'ভারত বিলাপ' তেমন আপত্তিজনক নয়; কিন্তু 'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশিত হওয়ার পর তিনিও কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। গ্রের বিশেষ অনুরোধেই মাত্র বছর দুয়েক পূর্বে ভূদেব 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন, এবং বাংলা সরকারও পত্রিকাটির সম্পূর্ণ স্বত্ব ভূদেবকেই অর্পণ করেন। গ্রে ভূদেবের নামে টমসনের হাতে একটি চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে তিনি যদি সম্পাদক হিসেবে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন তবে তাঁকে যেন স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হয় যে বাংলা সরকারের সঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট'এর সব সম্পর্ক ছিন্ন হবে। টমসন ছোটলাটকে ভূদেববাবুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের রিপোর্টে জানালেন যে তিনি এই ধরনের মনোভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ করেননি। ভূদেব টমসনকে বলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে সহযোগী সম্পাদক কবিতাগুলি ছাপিয়ে দিয়েছেন। ভূদেব চরিতকার অবশ্য লিখেছেন যে, কবিতা দুটি পাঠ করে তিনি নিজেই ছাপাবার অনুমতি দেন।(১০) ভূদেববাবু যদিও নিজে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে সহযোগী সম্পাদকের স্কন্ধে দোষ চাপালেন, তবু সেই সঙ্গে কবিতাটির নির্দোষিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে বলেন যে, মধ্যযুগের একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করেই ওটি রচিত হয়েছে। বর্তমানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যাই হোক, ভূদেববাবু টমসনের কাছে গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ভবিষ্যতে এই জাতীয় রচনা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত হবে না (He, however, expressed the fullest regret that the poems had been allowed to appear in the Education Gazette and volunteered the assurance that there should be no repetition of a similar cause of offence). (১১)

বিশেষ গোল বাধল 'যবন' কথাটি নিয়ে। বিদ্রোহ দমনের পর বছর পনের পার হয়নি, এরই মধ্যে আবার যবন রক্তে স্নান করার আহ্বান জানান হচ্ছে। রাজপুরুষেরা স্বভাবতই শঙ্কিত হতে পারেন। কয়েকটি সুবিখ্যাত বাংলা বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ভূদেববাবু দেখাতে চাইলেন 'যবন'-এর অর্থ 'বিদেশী' নয়, 'মুসলমান'। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' রয়েছে

"শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁএ দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইলে নিজ রূপ দর্শন।"

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'এও 'যবন' অর্থে কি মুসলমানকেই বলা হয়নি?

"উত্তম তিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥
যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
নাহি করে কর্ণবেধ, না দেয় সুন্নত॥"

ওই পুস্তকেরই আর এক পৃষ্ঠায় রয়েছে:

"দেব পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
যবনেরা যবে করে পেটের লাগিয়া॥"

বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থ থেকে এইভাবে সর্বসমেত দশটি উদাহরণ দাখিল করে ভূদেববাবু প্রমাণ করতে চাইলেন 'যবন' শব্দের অর্থ 'বিদেশী' নয়।

এই উদাহরণগুলি দেখে ইডেন সন্তুষ্ট হলেন। ভূদেববাবুর সঙ্গে বহুদিন ধরেই তাঁর গভীর মৈত্রী ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রবিনসনও ভূদেবের প্রেরিত উদাহরণগুলি দেখে স্বীকার করলেন যে, কবিতাটিতে 'যবন' অর্থে মুসলমানকেই বলা হয়েছে। ইডেন অতএব বেইলীকে জানালেন যে, রবিনসন স্বীকার করেছেন তাঁর অনুবাদ সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ। ভূদেব সম্পর্কে তিনি লিখলেন: "আমি নিশ্চিত জানতাম কোন রাজদ্রোহমূলক চিন্তা করতে ভূদেব মুখোপাধ্যায় অক্ষম।...আমি তাঁকে বেশ কয়েক-বছর ধরেই জানি।"

(I was quite certain that Bhoodeb Mookerjee was incapable of a seditious thought. I have known him for many years). (১২)

মনে হয় ইডেনের চাপে পড়েই রবিনসন ভূদেবকে এক চিঠি দেন। তিনি স্বীকার করলেন 'ভারত সঙ্গীত' যে মহারাষ্ট্র নায়ক শিবাজীকে নিয়ে রচিত হয়েছে অনুবাদ করার সময় সেটি তাঁর বোধগম্য হয়নি। বোধগম্য হয়নি তার কারণ কবিতাটির প্রথম দিকেই আমেরিকা ও অন্যান্য কতকগুলি দেশের

(১০) 'ভূদেব চরিত', ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৯৫।
(১১) Thompson to Grey, 17 August, 1870.
(১২) Eden to Bayley, 25 August, 1870.

উল্লেখ রয়েছে। সে যুগের ভারতবাসী এই নামগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলেই তিনি মনে করেন। 'যবন' শব্দ সম্পর্কে রবিনসন জানালেন যে Wilson-এর ইংরাজী-সংস্কৃত ও Haughton-এর বাংলা-সংস্কৃত অভিধানে যে অর্থ করা হয়েছে তিনি সেই অর্থই গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, ভূদেব প্রেরিত উদাহরণগুলি দেখে তিনি বুঝতে পারছেন যে কবিতাটিতে 'যবন' অর্থে 'মুসলমান'কেই বলা হয়েছে। রবিনসনের অনুবাদের ভুলে ভূদেবকে যে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে সেজন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। (১৩)

বেলীর ১৭ই আগস্টের চিঠিখানি পেয়ে কিন্তু ইডেন ফাঁপরে পড়লেন। ভূদেবের মত সজ্জন ব্যক্তিকে কিনা, স্বরাষ্ট্রসচিব দ্বীপান্তরে পাঠাবার মতলব করছেন। ভূদেবকে বাঁচাতে অতএব ইডেন রবিনসনের ঘাড়েই দোষ চাপালেন। তিনি লিখলেন, কোন ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাবাস দেবার আগে দেখা প্রয়োজন যে তালগোল পাকিয়ে অনুবাদ করে রবিনসন কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছেন কিনা? তিনি জানালেন, রবিনসন যে মিশনারি সম্প্রদায়ের অনুগামী এক সময় তাদের হাতেই 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকাটি ছিল। ভারতীয়দের হাতে পত্রিকাটি চলে যাওয়ায় তাদের গাত্রদাহের শেষ নেই। কবিতাটি একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিয়ে রচিত। বর্তমান ইংরাজ সরকারের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। ভূদেব সম্পর্কে বিশেষ করে ইডেন আবার লিখলেন : "আপনি নিশ্চিত থাকুন, কোনরূপ রাজদ্রোহমূলক রচনা ওই পত্রিকার সম্পাদকের দ্বারা রচিত হতে পারে না। ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর মত ব্যক্তি দুর্লভ।"(১৪)

স্বরাষ্ট্র বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে অবশ্য অত সহজে ভোলানো গেল না। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বেলীর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। এই বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভূদেব আর ইডেন যাই বলুন না কেন, 'যবন' শব্দের অর্থ যে শুধু মুসলমান তিনি মানতে স্বীকৃত হলেন না। ইডেনকে তিনি জানালেন যে মহম্মদের জন্মের বহু পূর্ব হতেই 'যবন' কথাটির প্রচলন ছিল। একাধিক প্রাচীন গ্রন্থে 'যবন' অর্থে গ্রীক-জাতিকেই সম্ভবত বলা হয়েছে। অধিকাংশ ব্যক্তির মতে এটি Ionian শব্দের অপভ্রংশ। অশোক তাঁর একটি শিলালিপিতে অ্যান্টিওকাসকে যোন অর্থাৎ যবনরাজ বলে অভিহিত করেছেন। একটি প্রাচীন পুঁথিতে যবনদের সাথে অন্তরঙ্গতার জন্যে কাবুল অঞ্চলের ক্ষত্রিয়দের অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। বেলীর মতে এক্ষেত্রে ব্যাকট্রিয়াবাসী গ্রীকদেরই উল্লেখ করা হয়েছে। আরও পরে সাগর পেরিয়ে আসা বিদেশীদের প্রতি এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। সেক্ষেত্রে তিনি মনে করেন রোমক জাতিকেই বর্ণনা করা হয়ে থাকবে। মুসলমানদের প্রতিও যে 'যবন' কথাটি ব্যবহৃত হয় তিনি অস্বীকার করেন না, তবু বেলীর মতে, "যবনের যথার্থ ইংরেজী প্রতিশব্দ 'বিদেশী' ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না, এবং আমার মতে প্রকৃত অর্থ 'শ্বেতকায়' বিদেশী।"(১৫) ভূদেব সম্পর্কে বেলী লিখলেন যে তাঁর সঙ্গে তিনি সম্যক পরিচিত নন, সুতরাং ভূদেবের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি তিনি কেমন করে জানবেন? একথা কি অস্বীকার করা চলে যে তাঁর পত্রিকায় দুটি রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছে? উদ্দেশ্যহীনভাবে কেউ নিয়মিতরূপে রাজদ্রোহমূলক রচনা লিখতে বা প্রকাশ করে যেতে পারে তিনি বিশ্বাস করতে অপারগ। বেলী অবশ্য ইডেনকে জানালেন যে গভর্নর জেনারেল এবারের মত অপরাধ মার্জনা করেছেন, সুতরাং পত্রিকাটির সরকারী সাহায্য আপাতত বন্ধ হবে না। তবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে সম্পাদককে যেন বিশেষরূপে সতর্ক করে দেওয়া হয়, এবং প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া হয় যে 'যবন'-এর অর্থ যাই হোক না কেন, ভবিষ্যতে এ জাতীয় রচনা তাঁর পত্রিকায় স্থান পাবে না।

যেদিন বেলী এই চিঠিখানি ইডেনকে লিখছিলেন সেদিন ছোটলাটও স্ট্র্যাচিকে দীর্ঘ দশ পৃষ্ঠার এক পত্র দেন। গ্রে তখন সফরে বেরিয়েছিলেন। কুষ্ঠিয়া থেকে স্বহস্তে লেখা তাঁর এই চিঠিতে 'ভারত সঙ্গীত' সম্পর্কে গ্রে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। গ্রে স্পষ্টই স্বীকার করলেন যে আপাতদৃষ্টিতে কবিতাটি যদিও মুসলমানদের বিরুদ্ধেই রচিত, সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে এটি বর্তমান যুগের প্রতিও প্রযোজ্য হতে পারে। এসত্ত্বেও গ্রে পত্রিকাটির অর্থসাহায্য বন্ধ করার বিপক্ষেই মত দিলেন, কারণ তিনি জানালেন, "বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সৎ উদ্দেশ্যে আমার বিশেষ আস্থা আছে। আমি নিশ্চিত জানি, অধিকাংশ বাঙ্গালীর মত তিনি ইংরেজ সরকারের অনুগত, যদিও বা কোন কোন সরকারী নীতির তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনা করে থাকতে পারেন। আমি এক মুহূর্তের জন্যেও মনে করি না যে কবিতা দুটি লেখার সময় রচয়িতার মস্তিষ্কে কোন রাজদ্রোহমূলক চিন্তা জেগেছিল, যিনি প্রকাশক তাঁর দ্বারা তো একেবারেই অসম্ভব।"(১৬) দূরদর্শী গ্রে অবশ্য আশংকা প্রকাশ করলেন যে ভবিষ্যতে তরুণ ও উৎসাহী ছাত্রদের মনে এই কবিতা দুটি অলঙ্ঘ্য বাধা পেরোবার স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে পারে। এ সত্ত্বেও ভূদেববাবুর চরিত্রের কথা স্মরণ রেখে, এবং তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটি বিবেচনা করে 'এডুকেশন গেজেট'-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন না। গ্রে তাঁর পত্রের উপসংহারে জানালেন যে, কলকাতায় ফিরে তিনি ভূদেবকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললেন; এবং দ্বিতীয়বার তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেবেন যে, এই জাতীয় রচনা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত হবে না। এই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘিত হলে তাঁর পত্রিকার সঙ্গে সরকারী সম্পর্ক বজায় রাখার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

চিঠিখানি পড়ে স্ট্র্যাচি ও বেলী দুজনেই গ্রের অভিমত সমর্থন করলেন। তাঁরা মত প্রকাশ করলেন, আপাতত ভারত সরকারের আর এ নিয়ে কিছু করার প্রয়োজন নেই। বড়লাটের সামনে ছোটলাটের চিঠিখানি রাখা হলে এই প্রসঙ্গে যবনিকা টেনে মেয়ো লিখলেন, "এ নিয়ে আর অধিক বাড়াবাড়ি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" (Yes. It is no desirable to make much fuss about it). (১৭)

দেখা যাচ্ছে গ্রে আর ইডেন 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদকের স্বপক্ষে না দাঁড়ালে স্ট্র্যাচি আর বেলী হয়তো ভূদেব ও হেমচন্দ্রকে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর না হোক, অন্তত কিছুকালের জন্য শ্রীঘরে পুরে দিতেন। ভূদেবের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলীও তাঁকে রেহাই পেতে সাহায্য করেছে। সরকার মহল যে 'ভারত সঙ্গীত' পাঠে রুষ্ট হয়েছেন এ খবর জেনে 'কবিতাবলী' প্রকাশকালে হেমচন্দ্র কবিতাটির পরিমার্জন করেন। মূল কবিতাটি থেকে 'শিবজী'র নাম বাদ গেল, কিন্তু একেবারে বাদ গেল না। বর্তমানে যে মুখবন্ধটি আমরা কবিতাটির শুরুতে পাই 'শিবজী' সেখানে

(১৩) Robinson to Mookerjee, 26 August, 1870.

(১৪) **Eden to Bayley, 28 August, 1870.**

(১৫) Bayley to Eden, 29 August, 1870. দেখা যাচ্ছে বেলীসাহেব রবিনসনের অনুবাদকেই সমর্থন করলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসও তাঁর অভিধানে যবনের অর্থ দিয়েছেন গ্রীক জাতি, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ম্লেচ্ছজাতি ও বিধর্মী। তাঁরও মতে এর **উৎস Ionia দেশের অধিবাসী বা যোনবাসী গ্রীক।**

(১৬) Grey to Strachey, 29 August, 1870.

(১৭) **Note by Mayo, 11 September, 1870.**

স্থানান্তরিত হলেন। মূল কবিতায় 'যবন' শব্দটি অন্তত তিনবার ব্যবহার করা হয়, পরে সেটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে 'যবন' কথাটি একাধিকবার ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 'যবন'কে সরিয়ে দিয়ে 'পাঠান' শব্দ প্রয়োগ করেন। সম্ভবত ভূদেব অথবা হেমচন্দ্রের কাছে 'ভারত সঙ্গীত'-এ ব্যবহৃত 'যবন' শব্দের যে প্রতিক্রিয়া সরকারী মহলে হয়, সে কাহিনী জেনেই তিনি এই পরিবর্তন করেন।

'ভারত সঙ্গীত' পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবির শুধু প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতেই দখল ছিল না, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও তিনি রীতিমত ওয়াকিবহাল ছিলেন। মাত্র কয়েক বছর আগে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। লিংকন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বজাতির ঐক্য বজায় রেখে গেলেন। ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা যে বিশ্ব রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে হেমচন্দ্র যেন তা উপলব্ধি করেছিলেন। জাপানের বিশেষণ হিসাবে তিনি 'অসভ্য' কথাটি প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কখনই সম্ভব হত না। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই 'ভারত সঙ্গীত' রচিত হয়। তবে হেমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ। সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, নওরোজী ও গোখেল, গান্ধী ও সুভাষের জাতীয়তাবাদের তুলনায় হেমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের পরিধি অনেক সঙ্কুচিত। তাঁকে বরং দয়ানন্দ বা তিলকের সমধর্মী বলা চলে। ভারতীয় লেখকেরা অনেকেই সরাসরি ইংরাজকে আক্রমণ করার সৎ সাহস না দেখিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের লেখনী চালনা করে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার যে নীতি গ্রহণ করেন, জাতির জীবনে তার পরিণাম সুখকর হয়নি।

পরবর্তীকালে হেমচন্দ্রের প্রতি ইংরাজ সরকার প্রসন্নই ছিলেন। বছর দশেক পরে 'কবিতাবলী' পাঠ্যপুস্তকরূপে সরকারী স্বীকৃতি পায়।(১৮) পরিমার্জিত 'ভারত সঙ্গীত'কে নিশ্চয় তখন আর বিপজ্জনক মনে করা হয়নি। শেষ জীবনে আর্থিক কষ্টে পড়লে প্রতি মাসে ২৫ টাকা সরকারী সাহায্যও তাঁর নামে বরাদ্দ হয়।(১৯) বাংলাদেশে কবিদের 'চিরকালই দুর্দশা'। রবীন্দ্রনাথ একটি ব্যতিক্রম।

'ভারত সঙ্গীত'-এর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল মনে হয় না। কিছুকাল পরে প্রখ্যাত হিন্দী কবি হরিশচন্দ্র 'ভারত দুর্দশা' রচনা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হরিশচন্দ্রের যথেষ্ট দখল ছিল। অনুমান করা অসঙ্গত নয় হেমচন্দ্রের রচনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। 'ভারত সঙ্গীত'-এর জনপ্রিয়তা আজও হ্রাস পায়নি। বাংলা সাহিত্যে সে স্থায়ী আসন লাভ করেছে, অথচ 'সোম প্রকাশ'-এর মত একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। কোন লেখকের রচনা সার্থক কি অসার্থক, শ্লীল কি অশ্লীল, মহাকালই তার প্রকৃত বিচারক। সে নিয়ে আদালতে দৌড়ে যাওয়া নিরর্থক। মহাকালের বিচারে হেমচন্দ্র বেঁচে আছেন, হারিয়ে গেছেন গোবিন্দচন্দ্র।(২০)

---

(১৮) 'কবিতাবলী', সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ (১৩৬০), পৃঃ ৷৵০।

(১৯) মন্মথনাথ ঘোষ, 'বঙ্গ সাহিত্যে হেমচন্দ্র' (১৩১১), পৃঃ ৩২

(২০) নতুন দিল্লীর ন্যাশন্যাল আর্কাইভস্ অফ ইন্ডিয়া'র কর্তৃপক্ষ পুরানো সরকারী দলিলপত্র দেখার সুযোগ দিয়েছেন। পাটনা শহরের বহুদিনের বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান 'সুহৃৎ পরিষৎ ও হেমচন্দ্র গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক শ্রীপরমেশ ঘোষ ও গ্রন্থাগারিক শ্রীহরিলাল সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থ সরবরাহ করেছেন। এঁদের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

রসিকেষু —

চণ্ডী লাহিড়ী

দুনিয়ার হাস্যরসিক এক হও বলে আওয়াজ ওঠেনি এখনও। কারণ রসস্রষ্টা মাত্রই কাজ করেন এককভাবে। যাঁরাই মৌলিক কিছু সৃষ্টি করেন তাঁরা সৃজন-কালে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি। সেজন্য দাবি আদায়ের প্রয়োজনে হাস্যরসিকদের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন বোধ হয় কোনদিনই ঘটবে না। বিশ্বের অনেক দেশ এখন বিলক্ষণ টের পাচ্ছেন, হাসিকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তার নাম হাসপাতাল। সেকালের রাজারা ঘরের পয়সা খরচ করে ভাঁড় পুষতেন। শুধু স্তুতি শুনে মন ভরত না, ব্যাজস্তুতিও শুনতে চাইতেন। কারণ রাজারা বুঝেছিলেন, ফলস্টাফরা ভাঁড় নয়, তাঁরা প্রচ্ছন্ন দার্শনিক। প্রচুর রাজ-

প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত কার্টুন সুইডেনের কার্লসন

Harold Wilson

ক্যারিকেচার বিভাগে প্রথম ডেনমার্কের ওয়ার্নার

কার্যের চাপে যখন শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন, তখন এই ভাঁড়েরা তাঁদের মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করত। বিজ্ঞানের কল্যাণে সভ্য মানুষ ক্রমাগত ছুটে চলেছে। এই গতিপাগল ছুটেচলা মানুষের কাছে ছুটি বলে কিছু নেই। আর ছুটি নেই বলে রঙ্গব্যঙ্গেরও তেমন বিকাশ নেই যন্ত্রমুগ্ধ দেশগুলিতে।

রঙ্গব্যঙ্গকে উৎসাহিত করার ও হাস্যরসিকদের সম্মান জানানোর জন্য স্থায়ীভাবে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করছিলেন অনেকেই। মন্ট্রিল শহরের সর অগ্রণী হওয়াতেই সারা বিশ্ব থেকে অভাবিত সাড়া পেয়েছেন। সাত বছর আগে তিনি মন্ট্রিল স্টার সংবাদপত্রের সহযোগিতায় শুরু করেছিলেন কার্টুন উৎসব। বিভিন্ন দূতাবাসের মারফত এবং ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পেশাদার কার্টুনিস্টদের অনুরোধ করেন, তাঁদের প্রকাশিত বাছাই করা কার্টুনের মূল ছবি ও মুদ্রিত ছবির ক্লিপিং পাঠাতে। অনতি বিলম্বে প্রমাণিত হল এই কার্টুন প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা। শুধু কানাডা নয়, দেশবিদেশের রসিকজন দলে দলে আসতে লাগলেন এই প্রদর্শনী দেখতে। এরপর কানাডাতে অনুষ্ঠিত হল এক্সপো-৬৭। এখানে আন্তর্জাতিক কার্টুন প্রদর্শনীকে সম্প্রসারিত করে আন্তর্জাতিক রঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রদর্শনীতে রূপান্তরিত করা হল। নূতন মণ্ডপের নাম হল প্যাভিলিয়ন দা হিউমার। এক্সপো-৬৭ শেষ হওয়ার পর ম্যান-অ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্ল্ড নামক প্যাভিলিয়নটি সুইস সরকার বিশ্বের হাস্য-রসস্রষ্টাদের উদ্দেশ্যে দান করে গেছেন। এরই স্থায়ী নাম রাখা হয়েছে প্যাভিলিয়ন দা হিউমার।

এই মণ্ডপের পরিকল্পনাটি অভিনব। বিশ্বের ৫৬টি দেশের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে এই মণ্ডপের ভিতরে পাঁচশো কার্টুন সাজানো হয়েছে। শুধু কার্টুন প্রদর্শনী এর উদ্দেশ্য নয়, সাহিত্যে, শিল্পে, চলচ্চিত্রে, সঙ্গীতে বা অভিনয়ে—এক কথায় জীবনের সর্বত্র যে রঙ্গব্যঙ্গের সুধা উৎসারিত হচ্ছে তাকেই স্বাগত জানানো এর লক্ষ্য। কাজেই কাগজে আঁকা কার্টুন ছাড়াও মাটি, পাথর, ব্রোঞ্জে উৎকীর্ণ কার্টুন বা সেই ভঙ্গীতে তৈরি অন্যান্য শিল্প সামগ্রী, হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসের বই, পাণ্ডুলিপি, হাসির গানের রেকর্ড, কোন কিছুই প্রদর্শনীতে বাদ পড়েনি।

প্রদর্শনীর প্রবেশ দ্বারে বসানো হয়েছে হাস্যরসের দেবতা বেসের প্রতিমূর্তি। তারপর পাশাপাশি রাখা দুই বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা দুটি বিখ্যাত ছবির

প্যারডি। গেরিকল্টের মেডুসের প্যারডি করেছেন বার্থি ও, আর মাইকেল এন্‌জেলোর প্যারডি করেছেন হুডো। বড় পর্দায় প্রতিফলিত করে দেখানো হয়েছে ত্রিশ দশকের তিন সেরা শিল্পীর বাছাই করা কার্টুন। লো, কোভারুবিয়াস ও গ্যারেটো। বাইরে মণ্ডপের সামনে রাখা হয়েছে 'ডন-কুইকসোটের' মূর্তি হাস্যরসের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও চেকোস্লোভাকিয়া বিশেষ ডাক টিকিট প্রকাশ করেছেন। প্রদর্শনীতে সেই সব ডাকটিকিট দর্শকরা আগ্রহের সঙ্গে কিনছেন। সাহিত্যে হাস্যরসের জন্য স্টিফেন লীককের নাম অবিস্মরণীয়। কানাডার এই সুসন্তানের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁরা এই প্রদর্শনীতে আয়োজনের ত্রুটি রাখেননি। লীককের পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থাদি, নানারকম ফটো তো আছেই। বি-বি-সি একটি ভিডিও টেপ পাঠিয়েছেন যাতে দর্শকরা ইচ্ছা করলেই টেলিভিসনে লীককে তাঁর রচনা পাঠ করতে দেখবেন।

শুধু হাস্যপরিহাসের উপর নির্ভর করে বৃটেনে পাঞ্চ, রাশিয়ায় ক্রোকোডিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাড, পোলাণ্ডে স্পিলকি, বুলগারিয়ায় স্টারসেল, যুগোশ্লাভিয়ায় জেজ, ইরানে ক্যারিকেচার প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। আজকের দিনে সংবাদ-

হিউমারাস কার্টুন বিভাগে প্রথম পুরস্কার
ফ্রান্সের সোলাস
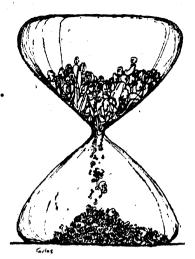
পত্রগুলি যখন খুন রাহাজানি যুদ্ধ ও রাজনীতি নিয়ে কোলাহল মুখর, তখন তাদেরই পাশাপাশি সেই সব বিষয়বস্তুকেই অবলম্বন করে 'হেসে উড়িয়ে দাও, দুদিন বইতো নয়' গোছের ভঙ্গী নিয়ে গোমরা মুখে হাসি ফোটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। জীবনকে একটু বাঁকা চোখে দেখতে যাঁরা সাহায্য করছেন তাঁদের চোখের দোষ নেই। চতুঃষষ্টি কলার বাইরে আর একটি কলার নাম হল পরকলা, যা চোখে লাগিয়ে দেখলে জীবনের নূতন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কার্টুনিস্টের বঙ্কিম দৃষ্টিই হল সেই পরকলা। বিষয়টিকে তরল করে বোঝাবার জন্য প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ দেওয়ালে কিছু বিশেষ ধরণের আয়না রেখেছেন যাতে দর্শকেরা নিজেদের বিকৃত রূপ দেখে হেসে ফেটে পড়েন। কার্টুনিস্টের প্রতীক হল এই বিশেষ ধরনের আয়না।

এই প্যাভিলিয়ান দ্য হিউমার থেকে প্রকাশিত অ্যালবামে প্রদর্শিত কার্টুনগুলি ছাপা হয়। তার থেকে বিশ্বের হাস্যরসের গতি কোন দিকে, দুনিয়ার কার্টুনিস্টদের দৃষ্টি কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছেন তার হদিস পাওয়া যায়। ১৯৭০ সালে ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দ্য-গল মারা গেছেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁকে অবলম্বন করে সর্বাধিক কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নূতন ফরাসী প্রেসিডেন্ট পম্পিদু প্রায় অনুল্লেখিত। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ স্তিমিত হয়ে আসার ফলে নিক্সনকে নিয়েও কার্টুনিস্ট মহলে তেমন হইচই নেই। পরলোকগতদের মধ্যে ১৯৬৮ সালে মার্টিন লুথারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন বিশ্বের কার্টুনিস্টরা সর্বাধিক সংখ্যায়, ১৯৬৯ সালে দেখা যাচ্ছে বার্টাণ্ড রাসেল সেই আসন লাভ করেছেন। ১৯৬৯ সালে দ্য-গলের পর সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তি হলেন ইস্রায়েলের জেনারেল মসে ডায়ান। অসংখ্য কার্টুন তাঁকে নিয়ে।

কমিউনিস্ট দেশগুলিতে নিজ দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সমালোচনা করে কার্টুন আঁকলে সরকার বরদাস্ত করেন না। ফলে সে সব দেশে পলিটিক্যাল কার্টুনের তেমন উন্নতি লাভ ঘটেনি। সেটা আমার মতো শাপে বর হয়েছে। রাজনীতির জটিলতা পরিহার করে সেই সব দেশের শিল্পীরা বিশুদ্ধ হাস্যরসের উপর নির্ভর করে কার্টুন আঁকছেন। রাজনৈতিক কার্টুন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যাপার। একটি বিশেষ কালের বিশেষ কিছু মানুষকে হাসিয়ে ভাবিয়ে সে নিজেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু হিউমারাস কার্টুন বিশুদ্ধ হাস্যরসকে পাথেয়রূপে গ্রহণ করায় সেগুলি হয় কালোত্তীর্ণ। পরবর্তী যুগের পাঠকও তার রস-আস্বাদন করতে পারে। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে 'বাহির দুয়ার বন্ধ আজিকে ভিতর দুয়ার খোলা' থাকায় সে দেশে যুগোত্তীর্ণ কার্টুন প্রচুর তৈরি হচ্ছে। রাজনীতিকদের কথাটি অপ্রিয় হতে পারে, রসিক সুজনের কাছে এটা আনন্দের কথা। এ পর্যন্ত সর্বাধিক পুরস্কার প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেছে যুগোশ্লাভিয়া।
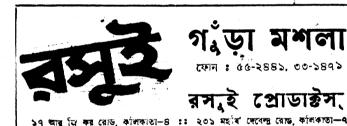
বিদেশের চোখে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ডিসেম্বর মাস থেকে ইটালীর Institute For Economic Development-এ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে যে আলোচনা-চক্র শুরু হয়েছে, তাতে পৃথিবীর ৪০টি দেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছেন। এই আলোচনা-চক্রে অনগ্রসর অথবা উন্নয়নশীল দেশগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা চলছে। ভারত সম্পর্কে সবারই আগ্রহ দেখা গেল। ইরাকের একজন প্রতিনিধি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কলকাতার অবস্থা এখন কেমন? শ্রমিক অশান্তির মাত্রা কি আরও বেড়েছে? ভারত উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ কলকাতার এই হাল হল কেন?" আরেকজন প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলেন, "ভারতে পরিবার পরিকল্পনা নীতি কি সার্থকভাবে রূপায়িত হচ্ছে না? ৫৫০ মিলিয়ন লোকসংখ্যা হল কেন?" ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কেও অনেকের আগ্রহ দেখা গেল। অধ্যাপক মহলানবীশের পরিকল্পনাতত্ত্ব (Planning Model) সম্পর্কেও গভীর আগ্রহ দেখা গেল, যদিও মহলানবীশের তত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে ভারতে গৃহীত হয়নি। অবশ্য অর্থশাস্ত্রে এই তত্ত্বের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

বিদেশীদের কাছে ভারতের যে সমস্যাটি এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল বেকার সমস্যা ও জনসংখ্যার চাপ। পরিবার পরিকল্পনার নীতি সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারত সরকার ৩১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। শহর অঞ্চলে এই পরিকল্পনা যতটা কার্যকরী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে ততটা হচ্ছে না। জনসংখ্যার চাপ কমাবার জন্য প্রধান প্রয়োজন নাগরিকদের শিক্ষার। বিদেশী অর্থনীতিবিদ্‌গণ ভারতের জনসংখ্যার চাপ দেখছেন; কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, জনসংখ্যা যে এখন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে তার একমাত্র কারণ সুউচ্চ জন্মহার নয়, মৃত্যুহারও অনেক কমে গেছে; এটা অবশ্যই চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির পরিণতি। পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনও অব্যাহত আছে। জন্মহার এখনও গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে অশিক্ষিত অথবা অর্ধ-শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বেশী। সব মিলিয়েই জনসংখ্যর চাপ বাড়ছে।

ভারতের বেকার সমস্যা সম্পর্কে বিদেশীদের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, তা খুবই স্বাভাবিক। স্বাধীনতার তেইশ বছর পরে বেকার সমস্যার চাপ শুধু বেড়েছে; কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে যতটা নিষ্ঠা ও আগ্রহ পরিকল্পনা-

কর্তৃপক্ষের থাকা উচিত ছিল, তা আমরা দেখতে পাইনি। পরিকল্পনা-পদ্ধতির ত্রুটিও এক্ষেত্রে বিচার্য। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্য ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল; পরিকল্পনাটিও সীমিত গণ্ডীর ভিতর সফল হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গুরুভার শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হল; পরিকল্পনা কমিশন যুক্তি দেখালেন, খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রীর যা ঘাটতি হবে তা বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে। কিন্তু তার পরিণতি আমরা কী দেখেছি? বৈদেশিক মুদ্রাসংকট চূড়ান্ত রূপে ধারণ করল দ্বিতীয় পরিকল্পনায়; ঘাটতি অর্থসংস্থানের আশ্রয় নেওয়া হল মাত্রাতিরিক্ত এবং তার ফলস্বরূপ মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হল। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বেকার সমস্যা। অথচ, দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকেও পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। বেকার সমস্যা সম্পর্কে তৃতীয় পরিকল্পনায়ও যে ভ্রান্ত নীতি অনুসৃত হয়েছিল, তার ফলস্বরূপ আজকের বেকার সমস্যার এই ভয়াবহ রূপ। তৃতীয় পরিকল্পনার পর থেকে আজ পর্যন্ত সাড়ে চার বছর ধরে অবস্থার তো উন্নতি হয়-ই নি; বরং দিনের পর দিন বেকার সমস্যা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। "কলকাতার এই হাল হল কেন?" বিদেশীদের এই প্রশ্নের উত্তরে কি এ কথা বলা যায় না যে, বেকার সমস্যাজনিত হতাশা ও নৈরাশ্য যুবগোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করেছে এবং কলকাতার বর্তমান অবস্থার জন্য এটা অন্যতম কারণ! কিন্তু যদি আরও গভীরে যাওয়া যায়, তবে দেখা যাবে, শুধু বেকার সমস্যাজনিত নৈরাশ্য ও হতাশা-ই নয়, কলকাতার বর্তমান অবস্থার জন্য আরও অনেক কারণ আছে। গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু কতটা উঁচু হবে, অথবা মাটির নীচ দিয়ে যাবে কিনা, এ বিষয়ে বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি; এজন্য এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও কাজ এগোয় নি। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হত। কলকাতায় পাতাল রেল হবে কিনা অথবা চক্ররেল হবে কিনা, এ নিয়ে

এখন সমীক্ষা ও বিতর্ক চলছে। অথচ আরও দশ বছর আগেই এটা সম্পূর্ণ করা যেত। ব্রিটেনের গ্লাসগো অথবা ইটালীর নেপলস শহরেও পাতাল রেল আছে; অথচ গ্লাসগোর লোকসংখ্যা হবে কলকাতার এক-চতুর্থাংশ এবং নেপলসের লোকসংখ্যা হবে কলকাতার এক-পঞ্চমাংশ। এই প্রকল্প শুরু হলে সরকারের লোকসান তো কিছুই হত না; বরং কিছু লোকের কর্মসংস্থান হত। বিদেশীদের কাছে সব কথা হয়ত বলা সম্ভব নয়; কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, কলকাতার বর্তমান অবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গাফিলতি কম দায়ী নয়।

শ্রমিক-অশান্তি কলকাতায় এত বেশী কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, শ্রমিক-অশান্তির দায়িত্ব এককভাবে মালিক পক্ষের অথবা শ্রমিক পক্ষের নয়। দায়িত্ব এখানে উভয় পক্ষেরই আছে। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় শিল্প-প্রকল্প দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় অশান্তি লেগেই আছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারিগণ সম্প্রতি যে বর্ধিত বেতন পেয়েছেন, তাতে তৃপ্ত নন। অথচ যতটা বেতন বেড়েছে, তাতে যে জিনিসপত্রের দাম কত বেড়েছে, অথবা বেতন আরও বাড়লে জিনিসপত্রের দাম যে আরও কত বাড়বে এবং তার পরিণতি হিসাবে আর্থিক আয় বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত আয় যে কত কমবে, সে হিসাব তাঁরা অনেকেই রাখেন না। শ্রমিক-অশান্তি এবং সরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভের কারণ নিশ্চয়ই বিদেশীদের কাছে সম্পূর্ণ বলা যায় না। কারণ নিজের দেশের সরকারকে অথবা দেশবাসীকে এমনভাবে তুলে ধরা যায় না যাতে বিদেশীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু যদি আমরা আত্ম-সমীক্ষা করি, তবে এটা কি মনে হয় না যে, শ্রমিক-অশান্তির অধিকাংশ কারণই অনতিক্রম্য নয়? সরকার, মালিক পক্ষ, শ্রমিক সংঘ, সরকারী কর্মচারী — যার যেখানে অতৃপ্তি অথবা বিক্ষোভের কারণ আছে, তাদের সব সমস্যারই মোকাবিলা করা কি এতই অসম্ভব! কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অনুসৃত নীতি সর্বভারতীয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অশান্তি আমরা দেখতে পাই, সবই স্থানীয় ব্যাপার। ভারতের অন্যান্য রাজ্য যদি শান্তিপূর্ণভাবে এগোতে পারে তবে পশ্চিমবঙ্গই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা 'সবুজ বিপ্লবের' সূচনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গও কি শিল্পোক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারত না?

ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি এবং গণতন্ত্রসম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রতি বিদেশীদের সপ্রশংস আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি হলেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রধান। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কোন বিদেশী অর্থনীতিবিদ প্রশ্ন তুলেছেন। রাজনৈতিক স্পর্শের বাইরে পরিকল্পনা কমিশনকে রাখলে নীতিনির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক সম্পদের বণ্টন কি আরও নিরপেক্ষ হতে পারত না? ভারত সরকারের অবলম্বিত কয়েকটি ব্যবস্থা — বিশেষ করে ভূমিসংস্কারের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির জাতীয়করণ, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপন প্রভৃতি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক মতবাদ, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নীতিতে ভারতের অবদান প্রভৃতিও বিদেশীদের মনে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

উনিশ শো একাত্তর সালে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা কিভাবে প্রবাহিত হয় তা বিচার করে দেখা দরকার। এ বছরের সূচনা কিন্তু ভাল হয়নি। রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস, জিনিসপত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যার তীব্রতম রূপ — সব নিয়েই নতুন বছর শুরু হয়েছে। শ্রম-নিবিড় ক্ষুদ্র প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ করে এবং কৃষির উপর আরও বেশী গুরুত্ব আরোপ করে সামরিকভাবে যাতে গ্রামাঞ্চলে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, বছরের গোড়া থেকেই সরকারের এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। বেকার সমস্যার মোকাবিলা না করতে পারলে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আরও বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

সুব্রত গুপ্ত

॥ ৯ ॥

ক্রেসেণ্ট মুন-ও স্টার্জ ম্যুরের দ্বারা 'exhaustively revised' হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, য়েট্সের এই দাবীটিকেও একই কারণে টেঁকানো কঠিন। স্টার্জ ম্যুর নিজ মুখে কখনো এই রকম কোনো দাবী করেননি এবং অপর কারো মুখেই এমন কথা কদাচ শোনা যায় নি। য়েট্স নিজেও ঐ চিঠিটিতে ছাড়া আর কখনো এমন কথা প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে বলেন নি।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত স্টার্জ ম্যুরের খান চল্লিশ চিঠি রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত আছে। সেই সব চিঠি পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির অনামনস্ক ঢিলেঢালা স্বভাবের মানুষ. তাঁর চিঠিগুলিও অত্যন্ত আলুথালু এবং প্রায়শই তাঁর নিজের 'general thoughtlessness and dreamyness (sic)' এর জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একজন যথার্থ ভক্ত এবং ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে একান্ত আগ্রহী। এই গ্রন্থ প্রকাশ-ব্যাপারে যে-কোনোভাবে সাহায্য করবার জন্য তিনি রীতিমত উমেদার ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে :কানো কাজের ভার দিলে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কবির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন স্থিরীকৃত হলে স্টার্জ ম্যুর রবীন্দ্রনাথকে লেখেন (২২শে আগস্ট, ১৯১৩) :

'You will I hope trust me after you are gone as before to help you in any way I can either in preparing ms. or correcting proofs etc., etc'

বাচনভঙ্গীতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি বা তাঁর কাজের প্রতি স্টার্জ ম্যুরের মনোভঙ্গীর পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশিতব্য পাঠ নির্ণয় করবার জন্য অনেকের কাছ থেকেই suggestion আহ্বান করতেন সে-কথা পূর্বেই বলেছি। স্টার্জ ম্যুর ছিলেন তাঁদের অন্যতম। শুধু 'ক্রেসেণ্ট মুন' নয়, 'চিত্রা' (ইংরেজি), 'পোস্ট অফিস', 'ফ্রুট গ্যাদারিং' প্রভৃতির ভাষা সতর্কভাবে পরীক্ষা করে যদি কিছু suggestion মাথায় আসে, তাকে জানাবার জন্য কবি সব সময়েই স্টার্জ ম্যুরকে উৎসাহ দিতেন। যেমন 'পোস্ট অফিস' সম্বন্ধে তিনি স্টার্জ ম্যুরকে লিখছেন (১২ জুলাই, ১৯১৩) :

'If anything strikes you as offensive in the language or manner of expression kindly make a note of it'.

স্টার্জ ম্যুর খুব উৎসাহের সঙ্গেই তাঁর নিজের suggestion-গুলি note করতেন এবং কবিকে জানাতেন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, সেইসব প্রস্তাবের গ্রহণ অথবা বর্জন বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে কবির নিজস্ব বিচার বা প্রত্যয়ের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতো। সেই জন্যই স্টার্জ ম্যুরের কয়েকটি চিঠিতে দেখা যায় তিনি কবিকে লিখছেন :

'I should be very glad if you could come earlier to go through "Chitra" with me... (১২।৮।১৩)'। 'I think we could then go through the children's poems together or at any rate a good part of them' (২।৮।১৩)। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অনেক পাণ্ডুলিপি অথবা সম্পূর্ণ গ্রন্থের টাইপ কপি তাঁর জিম্মায় থাকতো এবং সেগুলি নিয়ে তিনি যেটুকু পরিশ্রম করতেন, তাকে য়েট্সের মতো তিনি কখনো সময়েই 'correction' বা 'revision' বলে মনে করতেন না, তিনি বলতেন (রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিতে যেমন বলেছেন) 'preparing the ms.' শুধু তাই নয়, য়েট্স যে কথায় কথায় তাঁর suggestion সম্বলিত টাইপ কপিকে 'my version' বলে উল্লেখ করতেন তার প্রতি স্টার্জ ম্যুরের সোৎপ্রাস কটাক্ষের নমুনা তাঁর চিঠি থেকে পরে যথাস্থানে উদ্ধৃত হবে।

প্রত্যক্ষভাবে 'ক্রেসেণ্ট মুন' সম্বন্ধেই কবিকে লেখা স্টার্জ ম্যুরের ছয় সাতখানি চিঠি পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটির বিষয় হ'ল ম্যাকমিলানের আদি সংস্করণে 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর মলাটের জন্য স্টার্জ ম্যুরের স্বকৃত ডিজাইন। বাকিগুলি মিসেস স্টার্জ ম্যুরকে ফরাসী তর্জমার আইনসঙ্গত অধিকার দেবার জন্য কবির নিকট দরখাস্ত এবং এ বিষয়ে তাঁকে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রায় করুণ মিনতি। তার কারণ গীতাঞ্জলি এবং ডাকঘরের ফরাসী অনুবাদক আঁদ্রে জীদ এই সময়ে 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এরও একটি ফরাসী অনুবাদ করতে উৎসাহী হয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ব্যবসায়িক প্রতিনিধি, বিখ্যাত ভারত-সংগীতবিদ ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ তাঁকে একরকম কথাই দিয়েছিলেন এবং স্বাভাবিক কারণেই মিসেস স্টার্জ ম্যুর কর্তৃক অনুবাদের প্রস্তাবকে একেবারে আমলই দেননি। শেষ পর্যন্ত জীদের অবশ্য

মিসেস স্টার্জ মুরকেই যে অনুবাদের right দেওয়া হয় (যদিও শর্ত-অনুযায়ী সেই অনুবাদ তাঁর কর্তৃক সংশোধন-সাপেক্ষ ছিল) তার একমাত্র কারণ রবীন্দ্রনাথের সদয় হস্তক্ষেপ এবং তাঁর নিজের রচনা এবং তার প্রচার সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ অ-পেশাদারী মনোভাব। যাই হোক, এইসব চিঠিপত্র বিনিময়ের মধ্যে কোনো জায়গায় এমন আভাস নেই যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অন্যান্য বইয়ের বা পাণ্ডুলিপির তুলনায় 'ক্রেসেন্ট মুন'-এর ব্যাপারে স্টার্জ মুরের উপর কোনো অতিরিক্ত অথবা বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন অথবা স্টার্জ মুর স্বয়ং অনুরূপ অথবা তুলনীয় কোনো দাবী নিজের মনেও কোনো সময়ে পোষণ করেছেন। তবে Chitra এবং Fruit Gathering-এর পাণ্ডুলিপির মতোই Crescent Moon-এর পাণ্ডুলিপি নিয়েও যে সাধারণভাবেই তিনি চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে কবি যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন য়েটসের সঙ্গেও সে বিষয়ে মতবিনিময় করেছিলেন তার কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন আছে। শ্রীমতী উরসুলা ব্রিজের সম্পাদনায় য়েট্‌স

এবং স্টার্জ ম্যুরের যে পত্রসংকলন (**W. B. Yeats and T. Sturge Moore: Their Correspondence**, ed. Ursula Bridge, 1953) প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'ক্রেসেণ্ট মুন' সম্বন্ধে তাঁদের চিঠি আছে। 'গীতাঞ্জলি'-র অন্তর্গত যে তিনটি কবিতা (৬০ থেকে ৬২নং) পরে 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এ স্থান পেয়েছে তার মধ্যে দুটি হল মুখ্যত আলোচ্য বিষয়। সম্পাদিকা তাঁর টীকায় একটু ভুল করেছেন, তিনি সরাসরি 'গীতাঞ্জলি'র উল্লেখ করেছেন, যেন 'গীতাঞ্জলি'র কপি নিয়েই আলোচনা হয়েছে দুই কবির মধ্যে। তিনি লক্ষ্য করেননি যে আলোচনায় কবিতা দুটির শিরোনাম উল্লিখিত হয়েছে যথাক্রমে 'On the sea shore' এবং 'The Source' বলে। 'গীতাঞ্জলি'র সবগুলি কবিতাই শিরোনামহীন কিন্তু তার মধ্যে পূর্বোক্ত তিনটি কবিতা নূতন শিরোনাম সহ 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মানে, তাঁরা তখন যে টাইপ কপির আলোচনা করছিলেন, সেটি 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর, 'গীতাঞ্জলির' নয়। তা ছাড়া য়েট্‌সের 'On the **sea shore**'-এর প্রকাশিত পাঠেরও উল্লেখ আছে, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঐ পত্রালাপ হয়েছিল ১৯১২ সালের নভেম্বরে ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্করণ 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই, কেননা চিঠিতে শুধু সালটা ১৯১২ বলে উল্লিখিত আছে। য়েট্‌সের এই চিঠি এবং স্টার্জ ম্যুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করতে হবে, কেননা প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ছাড়াও চিঠি দুটির মধ্যে একটি ছোটোখাটো প্রহসনের উপাদান আছে। য়েট্‌স লিখছেন : Sunday (1912)

No. I am sorry but I prefer my **own versions.** I have made one change.... I brought both versions to Lady Gregory and told her I did not know which was yours and which mine. She said both (the poem was **The Source**) were bad, though 'bud of **enchantment**' less good than 'poppy buds', but 'coyly open' impossible, and finally said **the version in print was the best. She was emphatic against changes in On the Sea Shore** but in that case she knew they were not my **changes.** I took a great deal of trouble with these poems and used the 'buds of enchantment' which I dislike because the flowers in the Bengali are connected with an Indian fairy tale which is the association Tagore wanted. I do not want to alter anything now when I have forgotten the reasons I had when working over these poems. I have left one change, that on page 19.

P.S. On going over **The Source,** I have made a slight change and put in 'poppy'.

য়েট্‌সের চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর জন্য গীতাঞ্জলির অন্তর্গত পূর্বোক্ত কবিতা দুটির (৬০ এবং ৬১নং) কিছু ভাষাগত অদলবদল করে তিনি ও স্টার্জ্‌ ম্যুর দুটি 'version' প্রস্তুত করে পরস্পরের মধ্যে সোৎসাহে মতবিনিময় করবার চেষ্টা করেছিলেন। চিঠিটির মধ্যে য়েট্‌সের স্বভাবসিদ্ধ **aggressiveness**-এর পরিচয় আছে। প্রথম লাইনেই দেখা যায় তিনি অতি সংক্ষেপে স্টার্জ্‌ ম্যুরের 'version'টি ('Version' কথাটির ব্যবহার লক্ষণীয়) একরকম হাঁকিয়ে দিয়ে নিজের 'version'টিই সাড়ম্বরে সমর্থন করলেন। তারপর দেখা যায় তিনি লেডী গ্রেগরীকে তাঁদের দুজনের মতপার্থক্যের বিচারে মধ্যস্থ মেনেছেন। লেডী গ্রেগরী ছিলেন একাধিক অর্থে য়েট্‌সের 'আশ্রয়দাত্রী', অতএব তাঁর মতামতের প্রতি য়েট্‌স যে বিশেষ পক্ষপাতী হবেন সেটা সহজবোধ্য কিন্তু তাঁকে মধ্যস্থ মানাটা স্টার্জ ম্যুরের পক্ষে রুচিকর হবে কিনা সে সম্বন্ধে য়েট্‌স যথারীতি উদাসীন। লেডী গ্রেগরী যে স্টার্জ ম্যুরের প্রস্তাবগুলিকে আদৌ পাত্তা দেন নি এবং য়েট্‌সের নিজের মতামতের প্রতি যে তিনি কী রকম পক্ষপাতী সে বিষয়ে য়েট্‌স চিঠিতে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করছেন দেখা যায়। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, লেডী গ্রেগরী যে শুধু স্টার্জ্‌ ম্যুরের প্রস্তাবগুলিই বাতিল করেছিলেন তাই নয়, য়েট্‌সের প্রস্তাবগুলিও তিনি সমভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'The Source' নামক কবিতাটির প্রসঙ্গে লেডী গ্রেগরীর মত য়েট্‌স উদ্ধৃত করেছেন :

'She **said** both (**versions**) were bad....**and finally said** the version in print was the best'. 'On the Seashore' শীর্ষক কবিতাটির প্রসঙ্গে লেডী গ্রেগরীর মত :

'**She is** emphatic **against changes** in "On **the Sea shore**", অর্থাৎ দুটি কবিতারই 'গীতাঞ্জলি'-তে প্রকাশিত পাঠই যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে লেডী গ্রেগরীর অভিমত সুস্পষ্ট। তৎসত্ত্বেও য়েট্‌স তাঁর নিজের 'versions'কে যে কোন যুক্তিতে স্টার্জ্‌ ম্যুরের 'version'-এর তুলনায় 'preferable' বলে সাব্যস্ত করেন তা বলা কঠিন। যাই হোক, আরো দু-একটি তথ্য উদ্ধার করা যায়। দেখা যায় 'buds of enchantment' এই কথা কয়টি য়েট্‌সের মনঃপূত ছিল না কিন্তু তিনি সেগুলি বজায় রাখলেন যেহেতু রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ রূপকথার অনুষঙ্গ কথাগুলিতে আনতে চেয়েছেন। পূর্বেই যথাস্থানে উল্লেখ করেছি যে, রোটেনস্টাইন পাণ্ডুলিপিতে আদিপাঠ ছিল, 'buds of **Parul**', গীতাঞ্জলিতে প্রকাশিত পাঠান্তর 'buds of enchantment'। শেষোক্ত পাঠের প্রতি য়েট্‌সের সুস্পষ্ট অনীহা লক্ষ্য করলে মনে হয় উক্ত পরিবর্তনটি রবীন্দ্রনাথেরই স্বকৃত। য়েট্‌সের নিজের প্রস্তাব যে 'poppy buds' ছিল সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না, সেই সঙ্গে 'coyly open' কথাটি যে প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক, য়েট্‌সের স্পষ্ট ধিক্কার লক্ষ্য করলে বুঝতে বাকি থাকে না যে, সেটা ছিল স্টার্জ্‌ ম্যুরেরই প্রস্তাব। যাই হোক কপির ১৯ পৃষ্ঠায় য়েট্‌স একটি পরিবর্তন বজায় রাখলেন বলে লিখেছেন কিন্তু সেটি কোন্‌ কবিতার অন্তর্গত এবং পরিবর্তনটি কে প্রস্তাব করেছিলেন চিঠিখানি পড়ে সেটা বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে যা লিখেছেন সেটা খুবই স্পষ্ট :

'On going over **The Source** I have made a slight change and put **in** "poppy". শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের প্রস্তাবিত 'poppy buds'-এর 'poppy' কথাটি অন্তত কবিতায় ঢুকিয়ে দিয়ে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন দেখা যাচ্ছে।

যাই হোক, চিঠিখানি যে স্টার্জ ম্যুরের খুব রুচিকর হয়নি তা তাঁর লিখিত উত্তর পড়লেই বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন :

'**My** dear Yeats: you strain **at gnats** and **swallow** camels. **What Tagore** and I so object to **in the version you call "yours"** is the use **of** "flits" which means nothing, **being** quite wrong, and the arrangement of the phrases which **is absurdly** un-English and clumsy. **I** thought you would notice these things at once and jump at them but you only worry over a phrase **which** can have no harmony while it is set in a dislocated sentence. However, it is too late to convert your blindness'.

(ক্রমশ)

শুনেই তো আমি
লাফিয়ে উঠলাম
RILAXON
কুশনে
খরচা এত কম!
এত অল্পতে এমন দুর্লভ আরাম, সত্যি, ভাবা যায় না!
বিলেতে এখন রেওয়াজ হচ্ছে রবারকৃত গদির কুশন। যেমন কিনা রিল্যাক্সন। কেন জানেন? রিল্যাক্সন বরাবর তোফা আরাম দেয়। অন্যগুলোর মতন মাঝখানটা বসে যায় না। রিল্যাক্সন ইচ্ছে মতন উল্টে নেওয়া যায়। আজকের দিনে টেঁকার দিক থেকে এ কুশনের জুড়ি নেই। রিল্যাক্সন তুলতুলে নরম এবং সব ঋতুতেই সুখকর। তার কারণ? এর অসংখ্য ছিদ্রপথ দিয়ে বারোমাস হাওয়া খেলে। রিল্যাক্সন আপনি পাবেন আপনার দরকারমত যে কোনো গড়নের, যে কোন মাপের। রিল্যাক্সন পোকামাকড় আর ছারপোকার অভেদ্য। স্বাস্থ্যবিধিসম্মত এবং ধোয়ামোছার যোগ্য। সবচেয়ে বড় কথা, রিল্যাক্সন আপনি পাচ্ছেন কত কমে। ভাবলেও আরাম। নয় কি!
রিল্যাক্সন বলতে:
গদি, বালিশ, কুশন, তাকিয়া, মোটর গাড়ি-বাস-রেলের সীট আর ব্যাকরেস্ট, কার্পেটের তলায় পাতবার জিনিস, এয়ার ফিল্টার, প্যাকিং-এর উপাদান এবং আরও অনেক কিছু।
হেস্টিংস মিল লিমিটেড
কয়ার এণ্ড ফেল্ট ডিভিশন
১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১
সেক্রেটারী:
বাজুর ব্রাদার্স লিমিটেড।
RILAXON কুশন

কলকাতার অধিকাংশ গ্যালারীতেই এখন প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হচ্ছে। সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী শ্রীমতী শ্যামশ্রী বসু প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পী সুনীল দাসের প্রদর্শনী হয় কেমুল্ড গ্যালারীতে এবং শিল্পী শ্রীমতী শুক্তিশুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে। তা ছাড়া পার্ক স্ট্রীটে রাজস্থান ও গুজরাটের হস্তশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীমতী শ্যামশ্রী বসুর প্রদর্শনীতে তেল-রঙে আঁকা নয়টি নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পী

এক্সপ্লোডেড মিথ —শ্যামশ্রী বসু

হিসাবে শ্রীমতী বসু (অবিবাহিতাকালীন পদবী, ঘোষ) অপরিচিতা নন। সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করার পরে তিনি কলকাতা ও দিল্লীতে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এ প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য— নিদর্শনসংখ্যা অল্প ও সেগুলি সুনির্বাচিত। শিল্পীর রচনারীতি বিমূর্ত ও সংক্ষিপ্ত। সেই সঙ্গে প্রাচীরচিত্র জাতীয় কাজও দেখা যায়। শিল্পী কেবলমাত্র আকার বা রঙের ওপর নির্ভর করে বিমূর্ত রচনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নি। বিশেষ কোনও বিষয়বস্তু বিষয়ে তিনি চিন্তা করেছেন ও সেই চিন্তা-ধারাটিই বিমূর্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। রচনাক্ষেত্রটি তিনি নানাভাবে ভাগ করে বিভিন্ন রঙে ভরিয়ে ফেলেছেন, যদিও সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মনে হয় তিনি চাপা রঙের পক্ষপাতী। দুই-এক ক্ষেত্রে হঠাৎ রচনাক্ষেত্রটি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ও ছোট ছোট আকারে বিভক্ত করার ফলে বিষয়বস্তুটি আকারের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হতে পারে নি। তবে যেখানে স্থূল রেখার সাহায্যে মূর্তিগুলি চিহ্নিত করেছেন সেখানে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন, যেমন ভেনডেটা। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পী প্রতীকের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে দি ফার্স্ট টুথ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীরচিত্র জাতীয় কমপোজিশনটিতে ন্যায় ও সত্যের জয় তিনি প্রতীক বা চিহ্নের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমকালীন ছবির নিদর্শন হিসাবে ডেলিউজ অনেকের চোখে পড়ে। প্রকৃতির দুর্দমনীয় শক্তি তথা তাণ্ডব ধ্বংসলীলার কাছে মানুষ যে কত নগণ্য তা সর্বগ্রাসী বন্যার উত্তাল বেগ ও মানুষের অসহায় মূর্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। প্রাচীর-চিত্র হিসাবে আগনি অ্যান্ড একসট্যাসি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংগীতের মূর্ছনা কিভাবে সারা চিত্তকে অভিভূত করে এক অনির্বাচনীয় আনন্দলোকের সন্ধান দেয়, দুটি প্যানেলে বিভক্ত সমান্তরাল প্রাচীর-চিত্রে সংগীতের সংকেত মাধ্যমে শিল্পী তা প্রকাশ করেছেন। গভীর নীল ও বেগুনী-রঙপ্রধান প্রাচীরচিত্রটি কমপোজিশন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর সব রচনানিদর্শন রসোত্তীর্ণ হয়নি, তবে সুসম্বদ্ধ কমপোজি-শনের মধ্য দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে।

*

সুনীল দাস সুপরিচিত শিল্পী। যে সব তরুণ শিল্পী অবসর সময়ে নিয়মিত-ভাবে শিল্পচর্চা করেন, এঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। নানা আঙ্গিকে নানা ভাবে পরীক্ষা করাই শিল্পী হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত এজন্যই পরীক্ষালব্ধ আনন্দ ও অভিজ্ঞতা রসিক জনসাধারণকে পরিবেশন করার প্রলোভনটুকু তিনি দমন করতে পারেন না। শিল্পীর সাম্প্রতিকতম রচনাবলী তাঁর নতুনতম পরীক্ষালব্ধ ফলের পরিচায়ক। কালি ও নানা রঙ-সাহায্যে তিনি রচনাক্ষেত্রের ওপর বিশেষ একটি কারুকার্যের সৃষ্টি করেছেন। কয়েক মাস পূর্বে যাঁরা U.S.I.S. প্রদর্শনী কক্ষে তাঁর খবরের কাগজের ফলকের ওপর আঁকা ছবি দেখেছেন তাঁদের কাছে মনে হয় সাম্প্রতিকতম রচনায় বিশেষ নতুনত্ব ধরা পড়ে নি। ফলকের পরিবর্তে এবারে তিনি অক্ষরযুক্ত ছাপা বইয়ের পাতা বা ছবি রচনা-ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং তার ওপর কালি ও রঙ সহযোগে নানা অদ্ভুত আকার ও ইমেজারীর সৃষ্টি করেছেন। দু-এক স্থানে তাই পপ আর্টের বিশেষত্ব দেখা

রচনা নিদর্শন—৩ —সুনীল দাস

কালী। —শুক্তিশুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

গেছে। যেমন ১১নং চিত্র—পুরোভাগে রাশিকৃত ইউরিয়া থলির ছাপা একটি ছবির ওপর তিনি কালি-মাধ্যমে আকার ও কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন। তবে বিভিন্ন আকার বা মূর্তিগুলি ঠিক স্বাভাবিক নয়, অনেক ক্ষেত্রেই অদ্ভুত। এখানেই শিল্পী হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব। রঙের সুকৌশল ব্যবহারের জন্য রঙিন ছবিগুলিতে গ্রাফিক প্রিণ্টের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে—বিশেষ করে সূক্ষ্ম কারুকার্যে। এই প্রসঙ্গে চাপা নীল, কমলা রঙপ্রধান ৬নং ছবি উল্লেখযোগ্য। সূক্ষ্ম লাইন রচনায় শিল্পী সিদ্ধহস্ত, সেজন্য অতি সূক্ষ্ম রেখাজাল সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটিতে স্ক্র্যাপার বোর্ডের কারুকার্য ফুটে উঠেছে। কয়েকটিতে আবার রচনাপদ্ধতির সৌকর্যের জন্য কোলাজের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, যেমন ৪নং চিত্র। শিল্পীর সাম্প্রতিকতম রচনা ছাপা কাগজ ও কালি এবং রঙ-মাধ্যমে আর এক ধরনের পরীক্ষা, সঠিক শিল্পকর্ম বা চেতনা অপেক্ষা এগুলির মধ্যে শিল্পীর অস্থির চিত্ত ও নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা ও প্রয়াসটুকুই বিশেষভাবে ধরা পড়ে। যাঁরা শিল্পীর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, নতুন রীতি, মাধ্যম এবং অঙ্কন-প্রণালীর মধ্য দিয়ে নতুনতরভাবে শিল্প-সৃষ্টি করার জন্য শিল্পী যেন সমগ্র শিল্প-ক্ষেত্র চষে ফেলেছেন। বর্তমান প্রদর্শনীর নিদর্শনগুলিও তাঁর শিল্পীমনের এই অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করি। এই অস্থিরতাই শিল্পীর প্রেরণার প্রধান উৎস। মনে হয়, এইভাবে নিরন্তর পরীক্ষা করতে করতে তিনি হয়ত নতুন বিচিত্রতর দিগন্তের সন্ধান পাবেন।

*

শিল্পী শ্রীমতী শুক্তিশুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদর্শনীতে ১৬টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশই জলরঙ ও টেম্পারায় রেশম ও কাগজের ওপরে আঁকা, দুটি গ্রাফিক প্রিণ্ট।

শিল্পী তরুণী, মাত্র গত বছর সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন। এটি তাঁর প্রথম প্রদর্শনী। ছবিগুলি দেখে শিল্পক্ষেত্রে জনসাধারণ সমক্ষে প্রথম প্রবেশসুলভ সংকোচ দ্বিধার আভাস পাওয়া যায়—মনে হয়, নির্বাচন ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হয়ত তিনি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবি বাতিল করেছেন। ছবিগুলি একজাতীয় নয়। ভারতীয় রীতির প্রাধান্য থাকলেও দু'-একটিতে সমবিমূর্ত ও আধুনিক অঙ্কনরীতির পরিচয় মেলে। তবে শিল্পী যে মুখ্যত রাজস্থানী ও ভারতীয় অঙ্কনপদ্ধতির পক্ষপাতী তা তাঁর রচনাবলী দেখে বোঝা যায়। কারণ, বিমূর্ত রীতির নিদর্শন থাকলেও সেগুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ হয়নি (ফার্স্ট বর্ন)। তবে যেখানে তিনি রচনার সরলতা বজায় রেখে, বিশেষ করে জ্যামিতিক ক্ষেত্রভিত্তিতে রচনা সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তিনি সাফল্যলাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ম্যাজিক প্যাভি-লিয়নের নাম করা যায়। গেরুয়া রঙের পরিপ্রেক্ষিতে পুরোভাগে গ্রে, সবুজ ও লাল রঙের সংমিশ্রণের ফলে ছবিখানি একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। শিল্পীর কমপোজিশন রচনার ক্ষমতা আছে ও তিনি প্রয়োজনমত রচনাক্ষেত্রটি বিভিন্নভাবে ভাগ করে সুনির্বাচিত রঙ ব্যবহারপ্রণালীর মধ্য দিয়ে একটি কাব্যরূপ সৃষ্টি করতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে এনচ্যাণ্টেড ক্যাস্‌ল-এর নাম করা চলে। তবে কমপোজিশনের দিক থেকে বিচার করলে অ্যাওয়েটিং অনেককে মুগ্ধ করে। সুসমঞ্জসভাবে রচনাক্ষেত্রটি বিভক্ত করে চাপা হলুদ, সবুজ, কালো ও বাদামী রঙ ব্যবহার করে শিল্পী যেন একটি মায়াময় স্বপ্নরাজ্য রচনা করেছেন। শিল্পীর কালী (লিনো কাট) বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পর পর বিভিন্ন রঙের তিনটি প্লেটের প্রিণ্ট নিয়ে তিনি শেষে একটি প্রিণ্টেই বাটিকশিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এটির পরিকল্পনা ও অঙ্কন-চাতুর্যও লক্ষণীয়।

*

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের উদ্যোগে পার্ক স্ট্রীটের একটি দোকানে রাজস্থান ও গুজরাটের চিত্র, হস্ত ও কাঠখোদাই শিল্পের একটি ছোট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে দুটি বৃহদাকার রাজস্থানী চিত্র চোখে পড়ে। লম্বাকৃতি ছবিখানির অঙ্কনকুশলতা, বিশেষ করে ছয়জন নারীমূর্তির মুখ, চোখ ও পোশাকের রচনারীতি ও রঙ ব্যবহার

সারেঙ্গী বাদক (কাঠ) —গুজরাট

দেখে মনে হয়, এটি অধিকতর পুরোনো। প্রদর্শনীতে গুজরাটে তৈরি কয়েকটি সূচীশিল্প-নিদর্শন দেখা যায়। সূক্ষ্ম ও রঙিন সূচীকার্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত নানা বিচিত্র প্যাটার্ন দেখে গুজরাটি মহিলাদের সূচী-শিল্পকৌশলের পরিচয় পাওয়া গেল। বিশেষ করে উৎসব উপলক্ষে তোরণদ্বার সাজাবার জন্য তৈরি সূচীশিল্পনিদর্শনগুলি সুন্দর ও রুচিসম্মত। প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ ছিল গুজরাটের কাঠখোদাই কয়েকটি মূর্তি। একটি মাত্র কাষ্ঠখণ্ডকে নানাভাবে খোদাই করে বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে আছে নানা সূক্ষ্ম ও অপূর্ব কারুকার্য। কয়েকটি মূর্তির আকার ও খোদাই-কাজে অন্য দেশের প্রভাব চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কারুকার্যশোভিত কাঠের একটি ব্র্যাকেট বিশেষভাবে উল্লেখ্য। একই কাষ্ঠখণ্ডের দু' দিকেই দুটি মূর্তি খোদিত হয়েছে, এবং সেইসঙ্গে আছে বিচিত্র খোদাই কারুকার্য।

চিত্রপ্রিয়

এই বিস্ফোরণ : আমার চোখে

অশোককুমার চক্রবর্তী

জানি ঠিক এই মুহূর্তে এ প্রসঙ্গে নতুন করে কিছু লিখতে যাওয়া হবে ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার শামিল, সেই সঙ্গে এ-ও জানি সুযোগ পেলে সেই আহত ভীমরুলের দল আমাকেও দংশাতে ছাড়বে না। কিন্তু তবু আজকের ছাত্র সমাজকে উপলক্ষ করে কিছু লেখার যখন আহ্বান পেয়েছি তখন সে সুযোগটা ছেড়ে দেওয়াও বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তবে ভারী ভারী কিছু তত্ত্ব কথা আর কিছু উদাহরণ দিয়ে পাতা ভরানোর পক্ষপাতী আমি নই। ছাত্র হিসেবে নিজের বহুদিন অভিজ্ঞতা ও আরো পাঁচজন সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবের চিন্তা ভাবনায় ভর দিয়ে আজকের তরুণ সমাজের সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে ওঠার পথের অন্তরায়গুলোর কথাই বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাই। হতাশা, ব্যর্থতা ও আত্ম-গ্লানি ঠিক কখন কোন্ মুহূর্তে তরুণ সমাজকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেই আমার এই রচনা। কার্যকারণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সেই সরল সত্যটুকু উদ্ধার করতে পারলে বয়োজ্যেষ্ঠদের মনে আজকের ছাত্র সমাজ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণার পাহাড়টা অবস্থান করছে সেটা যদি সামান্য অংশেও ধ্বসে পড়ে তার মূল্যই বা কম কী?

শুরুতেই জানিয়ে রাখি, এই লেখক নিজে কোনও ছাত্রনেতা বা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক নয়। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোনও দিনই সে ছাত্র ইউনিয়নের ধারে কাছে ঘেঁষেনি। সকল রকম রাজনৈতিক মতবাদ থেকে নিজেকে সর্বদা দূরে রেখে দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ও যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে সকলের সুবিধা অসুবিধা জানবার চেষ্টা তার বরাবরের। ফলে, ছাত্র জীবনের প্রতিটি স্তরেই সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবদের মনের খুব কাছাকাছি পৌঁছতে পেরে নিজেকে সে ধন্য মনে করছে।

আজকের ছাত্র সমাজের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনায় নামার আগে আমি নিজে কি ধরনের ছাত্র সে প্রসঙ্গে সামান্য কটি কথা বলে নেওয়া যাক।

শহর কলকাতার ছেলে হয়েও আমার শৈশব কৈশোর ও প্রাক-যৌবনকাল কিন্তু কেটেছে গ্রাম বাঙলার নিভৃত আঙিনায়। আমি তাই শহরের ছেলেদের সঙ্গে একেবারে গোড়া থেকে মেলামেশা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। গ্রামের ছেলেরা পড়াশোনায় নিরলস এবং গ্রামের দিকে সত্যিকারের কিছু শিক্ষা-দীক্ষা এখনও আছে এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে আমার বাবা মা আমাকে আমার মামা-বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। একটানা আট নটি বছর আমি গ্রামে থেকেছি এবং সেখানকার সহজ সরল গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে মিশে গেছি। তবে হ্যাঁ, লেখাপড়া সেখানে যেটুকু শিখেছি তার মধ্যে কোনওরকম ফাঁক বা ফাঁকি ছিলো না। গ্রামের মাস্টারমশাইদের স্নেহমমতারও বুঝি শেষ ছিলো না। তাঁদের আজও আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যে ছিলো গভীর একাত্মতা। সব ব্যাপারেই সংঘবদ্ধতা বা ঐক্য ছিলো অটুট। প্রত্যেকেই ছিলো প্রত্যেকের সমব্যথী। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ছিলো face to face relationship. ফলে, কোনও দিন কেউ মিথ্যা কথা বলতে বা অন্যায় কাজ করতে সাহস পেতাম না।

সুদূর পল্লীগ্রামের ঐ অখ্যাত অজ্ঞাত স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ দিয়ে শহরের ছেলে শহরে ফিরে এলাম। বাড়ির কাছাকাছি হয় ভেবে বাবা ভালো রেজাল্ট করা সত্ত্বেও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ভর্তি করে দিলেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আমার নিজের মধ্যে অনেক বিষয়েই কেমন অসুবিধা ঠেকতো। প্রথমত, কলেজের ছাত্ররা খেলবে এমন কোনও মাঠ ঐ কলেজের নেই। খেলার ব্যবস্থাও খুবই সঙ্গীন। দেখতাম অবসর সময়ে ছাত্ররা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়—ফুকফুক করে সিগারেট ফোঁকে। এটা আমার কাছে খুবই দৃষ্টিকটু ঠেকতো। কিন্তু ছেলেদেরই বা দোষ দিই কি করে? তারা অবসর পিরিয়ডে করবেই বা কি, কমনরুম সবাইকে জায়গা দিতে পারে না। একই সংকট লাইব্রেরীরও। কাজে কাজেই, ফুটপাথের আড্ডা চলছে—চলবে। নিজের খেলাধুলো করার চর্চা উঠে গেলো। বাড়িতেও সে সুযোগ খুব একটা ছিলো না বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, আমি দেখতাম ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে চাইতো না। সবাই কেমন আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব নিয়ে ক্লাসে ঢোকে, আবার ক্লাস শেষে বাড়ি যায়। হাজার চেষ্টা করেও আমি কলেজ জীবনে মনের মতো বন্ধু পাইনি। তৃতীয়ত কলেজে মাস্টারমশাইদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ খুবই

দুর্লভ ছিলো। কিছু অধ্যাপক চাইলেও, অনেকেই ক্লাসের বাইরে পড়াশোনা বিষয়ে আলোচনায় আপত্তি জানাতেন। ফলে, অনেক বিষয়েই দুর্বোধ্যতা চাপা রয়ে যেতো। স্কুল জীবনের সেই সব অভ্যেস কাটিয়ে নতুন করে কলেজ জীবন শুরু করতে আমার বেশ কিছু কাল কেটে গেছলো।

সেদিন মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্র হিসাবে আমার নিজের মনের ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ থাকলেও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কোনও দিনই কিন্তু নিজের কলেজের নামটা সহজে ব্যক্ত করতে পারতাম না। কারণ দু' একজনকে ইতিপূর্বে জানিয়ে বেশ লজ্জা পেয়েছিলাম।—"মণীন্দ্র কলেজ আবার একটা কলেজ নাকি! ওটাতো স্রেফ পলিটিক্সের ঘাঁটি।" এই ধরনের মন্তব্য আমি বহুবার বহু জনের কাছে শুনেছি। নিজের কলেজ সম্বন্ধে এহেন অপবাদ আমার খুব খারাপ লাগতো। অবশ্য এটাকে 'অপবাদ' বলে উড়িয়ে দিই বা কী করে? নিজের চোখেই তো পরে দেখেছি ছাত্র ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে কি অশান্তি! নির্বাচন নিয়ে সে কী খুনোখুনি, হানাহানি! অন্যের মুখে নিজের কলেজ সম্বন্ধে নিন্দা শুনলে আমার
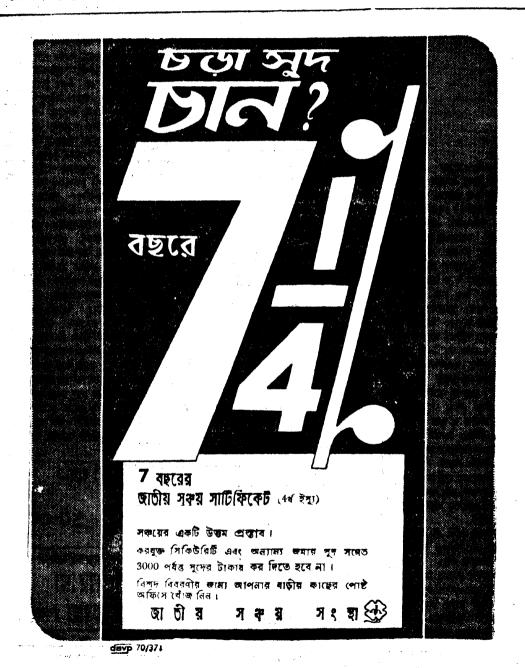
সমস্ত রাগ তখন গিয়ে পড়তো কলেজ ইউনিয়নের ওপর। একমাত্র কলেজ ইউ-নিয়নকে কেন্দ্র করেই তো যত বিষের ধোঁয়া! ছাত্র ইউনিয়নগুলোই প্রত্যেকটি কলেজের সুচিত, মাধুর্য নষ্ট করে, রাজনৈতিক কালিমায় কলেজকে কলঙ্কিত করে।

'ছাত্র ইউনিয়ন' কোনও দিনই আমার মতের সমর্থন পায়নি। আজও পাবে না। কলেজের ছাত্র হিসাবে সেদিন আমারও সদস্য নির্বাচনে ভোটের অধিকার ছিলো! কিন্তু সে অধিকার প্রয়োগে আমি উৎসাহী ছিলাম না। কারণ, নির্বাচনে কোনও দিনই সুস্থ পরিবেশ থাকে না। ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনভাবে ভোট দিতে কখনই দেওয়া হয় না। সবটাই চলে জোর জবরদস্তি। শাসানিও বাদ যায় না। আমি বুঝেছিলাম, ক্ষমতা দখলের জন্য যখন এমন প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তখন নিশ্চয়ই ছাত্র-কল্যাণ বিষয়টা গৌণ, দলবাজীর কাজটাই মুখ্য। না হলে সামান্য রাজনৈতিক মত বিরোধে একজন সহপাঠী অন্য জনের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে কি করে!

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও ছাত্র ইউনিয়নের অস্তিত্ব লক্ষ করছি। তবে এখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্বটা কলেজের চেয়ে বহুলাংশে বেশী। এখানে রাজনৈতিক দলও একাধিক। ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রের স্বার্থে বলেই শুনেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, ছাত্র ইউনিয়ন অনেক সময় ছাত্রদের স্বার্থের পরিপন্থী হিসাবেও কাজ করে থাকে। একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপারকে তাঁরা আন্দোলনের পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটাকে এমনি ঘোরালো করে তোলেন, তখন মনে হয়, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! স্রেফ রাজনৈতিক মতবাদের প্রচারটাই এখানে আসল। ছাত্রকল্যাণ নিছক উপলক্ষ মাত্র। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে রাজ-নীতি করার এমন একটা চমৎকার সুযোগ পেয়ে গিয়ে ছাত্ররা যত না খুশী তার চেয়ে ঢের গুণ বেশী খুশী রাজনৈতিক নেতারা—যাঁরা চূড়ায় বসে সমস্ত কিছুর কলকাঠি নেড়ে চলেছেন। ছাত্রছাত্রীরা আজ তাঁদের সহজ শিকার। ছাত্রছাত্রীদের 'শিখণ্ডী' করে তাঁরা দিনের পর দিন আন্দোলন চালিয়ে বাহবা পাচ্ছেন। এ কথা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের মহামান্য রাজনৈতিক নেতারা কিভাবে ছাত্র-দের ভ্রান্ত ধারণায় বিভ্রান্ত করে যুব শক্তিকে একটু একটু করে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন। যে দেশে ছাত্র সমাজে এতো দলাদলি সেখানে সঙ্ঘবদ্ধতা বা ঐক্য খুঁজতে যাওয়াই বৃথা। একজন ছাত্রের সঙ্গে আরেকজন ছাত্রের রাজ-নৈতিক পরিচয় ছাড়াও যে অন্য একটি সুমধুর সম্পর্ক বিদ্যমান সে বিষয়ে আজ আর কারোরই হুঁশ নেই। শুনেছি আগে ইংরেজ পুলিসের গুলিতে একজন ছাত্র প্রাণ হারালে সমগ্র ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে এগিয়ে আসতো। আর আজ সহপাঠী বন্ধুকে অন্য একজন সতীর্থ নির্দ্বিধায় খুন করতে পারছে! সত্যিই ছাত্র সমাজের আজ ঘোর দুর্দিন। আত্মকলহই সেই দুর্দিন ডেকে নিয়ে এসেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে প্রথম প্রবেশ করে আমার অনেক ভালো লাগার ভেতরেও যে জিনিসটা সবচেয়ে খারাপ লাগছিলো তা হলো, 'পোস্টার কলঙ্ক।' বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাচীর থেকে শুরু করে বারান্দা, দালান এমন কি ক্লাসরুম পর্যন্ত কোথাও বাদ নেই। বিভিন্ন দলের নানান ধরনের বক্তব্য ঘোষণায় এই সব রঙ-বে-রঙের পোস্টার। আমি আজ বাজি রেখে বলতে পারি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন ক্লাস ঘরের পোস্টারে পোস্টারে এমন অবস্থা যেখানে এক ইঞ্চি সাদা দেওয়াল খুঁজে মেলা দুষ্কর। ইদানীং আবার দেখছি পোস্টারের পরিবর্তে যেখানে একটু সাদা অংশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সেখানেই কালো রঙ বা আলকাতরা জাতীয় কিছু দিয়ে বক্তব্য লিখে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো পোস্টারের চেয়ে আরো বেশী দৃষ্টিকটু!

কথা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দলের ছাত্র নেতাদের আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলে-ছিলাম—আর কোথাও না হোক, অন্তত ক্লাস ঘরের পোস্টারগুলো মুছে দিন। বোর্ডে পর্যন্ত পোস্টার মারার লেখার অসুবিধা হচ্ছে। পোস্টার দেখতে দেখতে ছেলেদের পড়ায় মন বসানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই মুহূর্তে ও'রা আমার বক্তব্যকে সমর্থন জানালেও আজও যেখানকার পোস্টার সেখানেই আছে। কি জানি, এগুলোই হয়তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান ভূষণ!

বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর ক্লাস করে আমি বহু রকম ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছি। যারা আজ দুমদাম্ করে ভাঙচুর করছে, যারা হতাশা আর আত্মগ্লানি নিয়ে ধুঁকছে এবং হাজার হতাশার মধ্যেও ক্ষীণ আশা বুকে চেপে নিয়ে যারা বইখাতা নিয়ে আজও কলেজে আসছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই কথা বলে তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা জানতে চেয়েছি। তাদের কেউ স্পষ্ট করে সমস্যাটা বলতে পেরেছে। আবার কেউ বা বোঝাতে চেয়েছে: "কেন আর

জিজ্ঞেস করছিস? জানিস-ই তো এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ নেই!" ফের প্রশ্ন রেখেছি—"তা বলে এভাবে নিজেকে আত্ম-হননের পথে ঠেলে দিবি?" জবাব পেয়েছি রূঢ় ভাষায়: "তোদের ওসব কেতাবী ভাষা রেখে দে। আত্মহনন-ফনন্ বুঝি না। করার কিছু নেই—তাই অকর্ম করে বেড়াচ্ছি!"

ছাত্রদের নিয়ে আজকের সমাজে ভাবনার বুঝি অন্ত নেই। আমার মনে হয়, ভাবনার চেয়ে ভর্ৎসনাই বেশী। সেই যে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—ডুবন্ত বালক সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে—পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন গুরু-মশাই—তাকে দেখে ছাত্রের ফের চিৎকার—গুরুমশাই জল থেকে তোলার পরিবর্তে অবাধ্য ছাত্রকে শুধু ভর্ৎসনাই করে চলেছেন। আজকের সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনায়াসেই ঐ গল্প-পড়া গুরুমশায়ের ভূমিকায় বসানো যায়। তাঁরা ডুবন্ত ছাত্র সমাজকে রক্ষা করার পরিবর্তে তাদের অতীতের অবাধ্য আচরণের ভর্ৎসনাতেই মুখর। আমার মতে, ছাত্র সমাজ বা তরুণ সমাজ নিয়ে আমাদের সমাজের একটি মানুষও যদি ভাবার মতো ভাবতেন তাহলে, আর কিছু না হোক একটা সঠিক পথের নির্দেশও অন্তত পাওয়া যেতো। কিন্তু হায়! কোথায় সেই গণদেবতা?

ছাত্রদের আজ অনেক অপবাদ—তারা পরীক্ষা হলে নকল করে, প্রশ্নপত্র কঠিন হলে চেয়ার টেবিল ভাঙ্গে, নকলে বাধা দিলে গার্ডদের শাসানি দেয়, তারা ক্লাস পালিয়ে সিনেমায় যায় বা পার্টির কাজ করে—এমনি আরো কত শত! এমন দিনের কথা শুনেছি—যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ ছাত্রদের স্নেহের চোখে দেখতো প্রাণ দিয়ে ভালো-বাসতো। এমন কি বিপদে পড়লে উৎসাহ যোগাতেও সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসতো। তখন 'ছাত্র' কথাটার সঙ্গে একটা আদর্শের ভাব জড়িত ছিলো। কিন্তু সেই সাধারণ মানুষের চোখের দৃষ্টি আজ বদলেছে। আজ আর ছাত্রদের জন্যে তাদের মনে কোনও সহানুভূতি নেই, কোনও মমত্ববোধ নেই। ধ্বংসোন্মুখ ছাত্র সমাজ এখন কারো কারো চোখে নিতান্তই বিভীষিকা। প্রকাশ্য রাজ-পথে ছেলেয়-ছেলেয় ছুরি মারামারি চললে আজ আর কেউ ছাড়িয়ে দিতে আসে না। পরন্তু দূরে সরে দাঁড়িয়ে মুরগীর লড়াই দেখে। এই তো আমাদের বর্তমান সমাজের হাল!

অস্বীকার করি না যে, ছাত্র সমাজও আজ আর আগের মতো আদর্শনিষ্ঠ নেই। ছাত্র সমাজেও আজ ভীষণ রকমের উচ্ছৃংখলতা অবাধ্যতা। তারা আজ দুর্বিনীত—ক্ষেত্র-বিশেষে নির্মম, নির্দয়ও। গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি তাদের আজ আর সেই আগের মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি বা বিনয়ের ভাব নেই। পরীক্ষা হলে প্রশ্নপত্র কঠিন হলে তার চেয়ার-টেবিলও ভাঙ্গে। গার্ডসদেরও নকলে বাধা দিলে শাসানি দেয়। সব মিলিয়ে তাদের আচরণ আজ আর আদৌ ছাত্রসুলভ নয়। তারা আজ কথায় কথায় উত্তেজিত—ধৈর্য-হারা। তারা ক্ষুব্ধ—হতাশা জর্জরিত। তাদের দু' চোখে আজ ধ্বংসের নেশা। স্বীকার করি—সবই স্বীকার করি।

কিন্তু প্রশ্ন: কেন এই বিস্ফোরণ?

প্রশ্নটা যত ছোট—উত্তরটা কিন্তু ততো ছোট নয়। ছাত্র সমাজের ধ্বংসোন্মুখ রূপ দেখে সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের আসরে অনেক সময় অনেক বাক্-বিতন্ডা চলে। পরিবারের অভিভাবকদের বুকেও আজ জমা রয়েছে অনেক পুরনো নালিশ। চিন্তাশীল মনীষীরা কাগজে, সাময়িক পত্রে ছাত্রদের নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে যান। কাগজের সম্পাদকেরাও সেগুলো হৃষ্টচিত্তে প্রকাশ করে বাহবা নেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ছাত্র প্রসঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠদের রচনা নিতান্তই অসম্পূর্ণ এক-পেশে। কারণ তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রসঙ্গটা প্রায়সই এড়িয়ে গিয়ে ছাত্রদের প্রচুর সদুপদেশ উপহার দেবার চেষ্টায় থাকেন। তরুণদের উপযুক্তভাবে মানুষ করে তোলার ব্যাপারে অভিভাবক তথা বয়োজ্যেষ্ঠদের যে গুরুদায়িত্ব থাকে তা প্রতিটি মুহূর্তেই আজ লঙ্ঘিত। তরুণ সমাজকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিতে তাঁরা আদৌ চেষ্টা করেন না বলেই আজ আমাদের পদে পদে এমনি পদস্খলন।

প্রতিটি বাপ-মায়েরই ইচ্ছে তাঁদের সন্তান 'মানুষ' হোক। পাঁচ জনের একজন হয়ে বাপ-মা তথা বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। কিন্তু সন্তান 'মানুষ' হোক মুখে বললেই তো আর 'মানুষ' করা যায় না। সে জন্য পিতামাতা, অভিভাবকদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। অনেক অনেক ত্যাগ স্বীকার না করলে একটা সন্তানকে 'সুসন্তান' করে তোলা যায় না। যাঁরা আজ মনীষীর আখ্যা পেয়েছেন তাঁদের পারিবারিক দিকে বারেক চোখ মেলে তাকান—দেখুন তাঁদের অভিভাবককুল কত বেশী সন্তান সম্বন্ধে যত্নবান। পিতামাতার দায়িত্ব-বোধ সম্বন্ধে তারা কত বেশী সচেতন!

আজকের সমাজে একটা সন্তান পৃথিবীতে আসার পর থেকে দেখুন অভিভাবকদের পদে পদে কি রকম অবহেলা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। সন্তানের জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে সমাজের যা কিছু অশোভন, অসুন্দর তাই চাক্ষুষ করে চলেছে। শিশুর দু' চোখে গভীর কৌতূহল থাকায় সেও দেখামাত্র সব কিছু আয়ত্ত করে ফেলছে। বলা যায়, এক রকম তাকে জোর করেই যা দেখবার নয় তা দেখতে বাধ্য করা হচ্ছে যা শুনবার নয় তা শোনানো হচ্ছে। অথচ সরল শিশু সে তো একটা সুন্দর মন ও পবিত্র হৃদয় নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলো। তাকে সুন্দর ও পবিত্র করে না রাখতে পারাটা শিশুর দোষ নয়—দোষ অভিভাবকদের।

বর্তমান সমাজে একটা সন্তানের শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বড় হয়ে ওঠার আজ একাধিক প্রতিবন্ধকতা। সেসব 'মুক্ত পুরুষের' মতো কাটিয়ে ওঠা নিতান্তই অসম্ভব। ফলে, আজকের তরুণ সমাজ অকালেই বৃদ্ধ—অসময়েই ঘোরতর সংসারী। আমার মতে প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় মূলত চারটি: (এক) উপযুক্ত পরিবেশের অভাব; (দুই) অভিভাবকদের অর্থনৈতিক সংকট; (তিন) আস্থাশীল চরিত্রের দুর্লভতা ও (চার) শিক্ষান্তে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ব্যর্থতা।

(এক) দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের সংকোচনও অনিবার্য। বিশেষত শহর কলকাতায় বাসস্থানের সংকোচন খুবই প্রকট। এক কামরা কি দু' কামরা ঘরের লোক সংখ্যা দশ থেকে বারোটি। সবাই এক সঙ্গে গাদাগাদি করে খায়-দায় ঘুমোয়। কিন্তু শিশু চায় খোলামেলা পরিবেশ। তার দেহ-মনের সুস্থ বিকাশের জন্য খোলা মেলা পরিবেশের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বাড়িতে সে সুযোগ অভিভাবকরা তাকে দিচ্ছেন কোথায়? তাদের পক্ষে তা দেওয়াও বোধকরি সম্ভব নয়। কাজে কাজেই, শিশু কৈশোর লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। শহরে খেলাধুলোর মতো যথেষ্ট পার্ক বা ময়দান নেই বললেই চলে। তাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পাড়ার রক বা দালানে বসে আড্ডা জমায়। বন্ধুবান্ধব জোটে নানান শ্রেণীর। ভালো খারাপ পাঁচ রকম পাঁচটা কথাও কানে শোনা যায়। সেই ছেলের তখন আর ঘরে মন বসানো দায়। ঘরের চার-দেওয়ালের চেয়ে বাইরের আকর্ষণই তখন তার কাছে খুব বেশী। দিনে দিনে সন্তানের অবাধ্যতা বাড়ে। অভিভাবকদের শাসনের অভাবে সেই সন্তান তখন হয়ে দাঁড়ায় একটি 'ক্ষুদে মাস্তান'। তার তখন দাপট দেখে কে!

(দুই) বাংলা দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য আজ খুবই প্রকট। এখানে যার আছে সবই আছে—আর যার নেই তো কিছুই নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচটি সন্তানকে তাদের অভিভাবকেরা ইচ্ছে থাকলেও ঠিক মতো মানুষ করতে পারেন না। ভালো স্কুলে পড়াতে কিংবা ভালো মন্দ পাঁচরকম পাঁচটা খাওয়াতে না পারায় সন্তানসন্ততি পিতার ব্যর্থতা লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হয়। অথচ তারই সমবয়সী বন্ধু গাড়ি করে স্কুলে যায়-ফেরে, ভালো ভালো জামা কাপড় গায়ে দেয়, বেড়াতে যায় ছুটিতে ছুটিতে। এই সব দেখার পর স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য তার মন ভারাক্রান্ত হয়। তার মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। তার তখন ইচ্ছা জন্মে যেন তেন প্রকারেণ কিছু অর্থ উপার্জন করার। অতঃপর সাফল্যকণ্ঠ অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের শিক্ষার বোঝাভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে উচ্চাশী বা ঐ

ধরনের কোনও পার্টটাইম কাজের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ে। তাও আবার বরাত ভালো হলে জোটে—না হলে একটা টিউশানীর জন্যও দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। সেই অল্প বয়েস থেকেই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করতে করতে সেই তরুণ তখন নিজের সাধ আহ্লাদ সব কিছু হারিয়ে ফেলে। নিজের পড়ার সময়টুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলার তার তখন নিজের পরীক্ষায় পাশের জন্য নোটবই, সিওর সাকসেস ও মেড-ইজির সাহায্য নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। নোট-বই সম্বল করে পরীক্ষা দিতে বসে যারা লিখতে পারে—পারে। আর যারা আদৌ লিখতে পারে না তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে পরীক্ষা পণ্ড করার তালে থাকে। অথচ তারা কেউই খারাপ ছেলে নয়।

(তিন) আমাদের সমাজে আস্থাশীল চরিত্র আজ নেই বললেই চলে। তরুণ সম্প্রদায় বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুকরণেই বড় হয়ে ওঠে। পুঁথিপত্রে মনীষীদের ছেলেবেলার সততা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যের নানান ধরনের কাহিনী পড়লেও তারা বাস্তব সমাজে ঠিক তারই প্রতিফলন দেখতে চায়। কিন্তু বাস্তবে সেই সব মহৎ গুণাবলীর ছিটেফোঁটাও কোথাও চোখে পড়ে না আজ। যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ এতো দুর্নীতি, অসাধুতা, ছলনা ও বঞ্চনা সেখানকার তরুণেরা ভালো হওয়ার আদর্শ শিখবে কোথা থেকে? কি দেখেই বা অনুপ্রাণিত হবে?

বর্তমান সমাজের অভিভাবক, শিক্ষক-অধ্যাপক, ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী-অফিসার, সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রত্যেকেই আজ নানান দোষদুষ্ট। আজ আর মহত্ত্ব কারোরই মধ্যে চোখে পড়ে না। সবাই কেমন আত্মকেন্দ্রিক—নিজের স্বার্থ চরিতার্থে ব্যস্ত। তরুণ সমাজের প্রতি এঁদের দায়িত্ব কর্তব্য সব কিছুই আজ এঁরা খুইয়ে বসে আছেন। নিজেরা কর্তব্য পালনে বিমুখ হবেন, অথচ তরুণ সমাজের গুরুজনদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা দেখলেই সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠবেন। এ কি করে সম্ভব? আপনারাই তো শুনিয়েছিলেন প্রথমে—'ভালো না বাসলে ভালোবাসা পাওয়া যায় না!' তাহলে দেখুন—কেন আজ তরুণ সমাজ মনে মনে বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করছে। অথচ বড়দের কাছ থেকে সামান্য একটু সহানুভূতি ও ভালোবাসা পেলে সেই অবাধ্য তরুণ সমাজই তাদের মাথায় করে রাখতে পারে। কিন্তু আজ কোথায় তাঁদের সেই প্রাণ-উজাড় করা স্নেহ ভালোবাসা?

(চার) আজকের তরুণ সমাজ সম্বন্ধে মস্ত বড় একটা অভিযোগ—তারা নাকি পাঠ-বিমুখ! সারা বছর পড়াশোনা করে না, ঘুরে ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়ায় আর পরীক্ষার সময় বই দেখে টুকতে না পারলে পরীক্ষা পণ্ড করে। চেয়ার টেবিল ভাঙে।

স্বীকার করি কথাটা ষোল আনাই সত্যি। সত্যিই আজকের তরুণ সমাজ পড়াশোনার প্রতি অনুরাগী নয়। শুধু 'ধর কাছি তো—ধরে আছি' এমনি মনোভাব। কিন্তু প্রশ্ন: অনুরাগ আসবে কোত্থেকে?

আজ ঘরে ঘরে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় বেকার বসে রয়েছে [illegible]। [illegible] এখনও স্কুলের কিংবা [illegible] ছাত্র, সে দেখছে দাদারা কেউ এঞ্জিনীয়ার, কেউ এম-এ পাশ দিয়ে চাকরির জন্য [illegible] ঘুরছে। বাড়িতে তারা এখন [illegible] শামিল। চাকুরিহীন [illegible] বন্ধুবান্ধব, [illegible]—
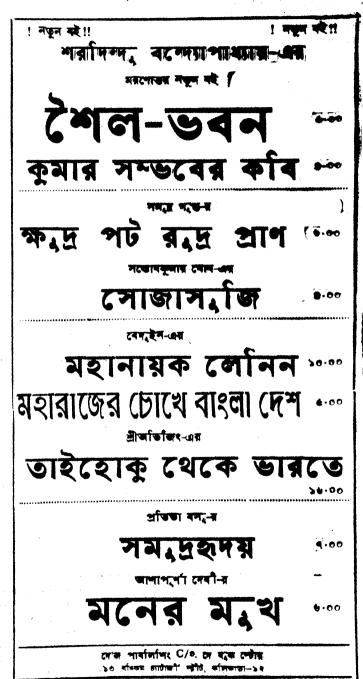
দীক্ষা বেশী দূরে গড়ায় নি, তারা এখন তাদের শিক্ষাকে ধিক্কার দিচ্ছে। দাদারা নিজেরাই জানে না এখন তাদের উপায় কি? কাজে কাজেই, ছোট ভাই অনুভব করছে—এই শিক্ষা ব্যবস্থা মেকী। একখণ্ড কাগজের ডিগ্রীপত্রের আজ আর কোনই মূল্য নেই। এমন কি পেটের অন্ন জোটাতে সাহায্য করে না। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তারা আজ আস্থাহীন। ভাঙচুরের নেশায় মত্ত। শিক্ষান্তে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ব্যর্থ যুব সমাজও আজ ভাবছে—চাই না এ সমাজ। আসুক পরিবর্তন। ঘরে ঘরে শত সহস্র কর্মহীন তরুণের আজ ঐ একই দাবি। এই সমাজব্যবস্থার আশু পরিবর্তন চাই।

বাঙালী তরুণদের সম্বন্ধে আরো একটা অভিযোগ প্রায়ই কানে আসে—তারা নাকি বাইরে যেতে চায় না। সবাই এই কলকাতা শহরে, না হয় বড়জোর বাংলা দেশের মধ্যেই কাজ পেতে চায়। ফলে, চাকরির এই হাহাকার।

কথাটা বেশ কিছুকাল আগে হয়তো খাটতো, কিন্তু এখনকার সময়ে একেবারেই অচল। এখন কাজ পেলে বাঙালী তরুণ বিদেশেও পাড়ি দিতে পারে। তারা কেউই ঘরকুনো হয়ে থাকতে চায় না—তারা চায় স্বনির্ভরশীলতা। সারা ভারতের যেখানে হোক তারা চায় আজ একটা কাজ। কিন্তু বাংলার বাইরে বাংলা দেশের তরুণদের জন্য আজ আর কোন কাজ নেই। একমাত্র বাঙালী হওয়ার অপরাধেই তাদের এই শাস্তি।

অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী তরুণদের হাজার যোগ্যতা থাকলেও চাকরি হয় না। সামান্য ছুতোয় তাদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এর চেয়ে পরিতাপের আর কি থাকতে পারে। আমার নিজের কয়েকজন বন্ধু এইভাবে চাকরি লাভে বঞ্চিত হয়ে ফিরে এসেছে। তাদের কথা যদি সত্যি না-ও হয় তাহলে এ প্রসঙ্গে গত ৪।১২।৭০ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙালী বাইরে যায় না?' শীর্ষক একজন ভুক্তভোগী বেকার তরুণের চিঠি দ্রষ্টব্য। বাংলার বাইরে যদি বাঙালী তরুণদের এভাবে বঞ্চনা করা হয় তাহলে যুব সমাজে ক্ষোভ আসাটা কি কোনও অন্যায়?

এ দেশে ছাত্রবিদ্রোহ—একদিনে একটিমাত্র কারণে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তরুণ সমাজের মনে এসে জমেছে একটির পর একটি অসন্তোষ। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা এসে তার মনের বল চূর্ণ করে দিয়েছে। ছেলেবেলাকার সেই দু' চোখ ভরা স্বপ্ন আজ মুছে দিয়েছে। দিনে দিনে এসেছে যন্ত্রণা ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ এনেছে আত্মগ্লানি, ঘৃণা। ঘৃণা থেকে এসেছে প্রতিহিংসাপরায়ণতা। তাই আজকের তরুণ সমাজ এমন অশান্ত, উদ্দাম। এই জীর্ণ, নিষ্ফলা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে তাদের দু'চোখে আজ বিপ্লবের রঙিন স্বপ্ন। "শ্রেণী শত্রু" খতম করে শ্রেণীহীন এক সুন্দর সমাজ গঠনই তাদের এখনকার সংকল্প। বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য দিকে দিকে আজ কর্মহীন যুবকের উদাত্ত আহ্বান। সর্বত্রই সাজ সাজ রব। তবে কি বিপ্লব এসে গেল?

এখনকার দৈনিক প্রভাতী সংবাদপত্রের নিত্যকার হেড-লাইন—"পুলিসের গুলিতে পাঁচজন তরুণ নিহত—বহুজন গ্রেপ্তার।" গুরুত্বহীন ছোট্ট খবর—"নকশালপন্থী যুবক খুন।" রিপোর্টের শেষে একেবারে কম গুরুত্বে ছোট্ট খবর—"সি- পি-এম সমর্থক ছাত্র ছুরিকাহত।"

দিনের পর দিন এইভাবে গণ্ডায় গণ্ডায় ছাত্র তরুণের নাম পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে। তবু আত্মাহুতির বিরাম নেই। বিপ্লব আনতে গেলে নাকি কিছু রক্ত ঝরবে। তা বলে থেমে গেলে চলবে না। সংগ্রামকে জীইয়ে রাখতেই হবে। পরিবর্তন একটা চাই-ই। কারণ, এ সমাজব্যবস্থায় কারো কোনও উন্নতি নেই। বিপ্লবের স্বপ্ন-দেখা ছাত্র তরুণদের এই মতবাদকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় কি? তাদের আচরণ-পদ্ধতি ভালো কি মন্দ সে বিচার পরে, তবে তাদের এই যুক্তিটাকে কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না কখনোই।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকটি তরুণই আজ লক্ষ্যহীন। ছোট বড় কারোরই নিজের কোনও ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। নিজের পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্তিমাত্রেরই। কেউই পরনির্ভরশীলতাকে ভাল মনে করে না। পরনির্ভরশীলতা আত্মগ্লানি আহ্বান করে। কিন্তু আজ প্রত্যেকেই পরনির্ভরশীল হতে বাধ্য। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিজে কাজ করে বাঁচার সুযোগ এ সমাজে নেই বললেই চলে। তরুণ মাত্রেরই মাথায় অল্প বিস্তর বুদ্ধি আছে, গায়ে বল শক্তি আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ ঘটাবার যদি কোনও সুযোগ কোনওদিনই না আসে তাহলে কতদিনই বা সে-বলশক্তি পেশীতে ধরে রাখা যায়? তরুণ সম্প্রদায়ের অসামান্য বলশক্তিকে দেশ মানুষের সৃষ্টির কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে তা তো ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত হবেই। তাকে রুখবার সে-সাধ্য কারোরই নেই। হতাশা, ক্ষোভ আর আত্মগ্লানি আজকের তরুণ সমাজকে যেভাবে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে তার থেকে মুক্তির পথ পাওয়া সহজসাধ্য বলে মনে হয় না। প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ঘৃণা আজ তাদের আত্মহননের পথে প্রতিনিয়তই ঠেলে নিয়ে চলেছে। তরুণ মাত্রেই আজ মরিয়া। তাদের কাছে কোনও ভয়ই আজ ভয় নয়, কোনও দমনই দমন নয়।

এই সমাজব্যবস্থার যেখানে স্তরে স্তরে এমনি পঙ্কিলতা, ক্লেদ সেখানকার নবনায়কেরা সব পূতঃচরিত্রের অধিকারী হবে এমন আশা করাটাই আজ অন্যায়। ঘুণধরা এই সমাজ ব্যবস্থায় আজ কোথাও এতটুকু ভালো জিনিস চোখে পড়ে না। ঘর থেকে পথে নামলেই দেখতে হবে শঠ ব্যবসায়ীর অপচেষ্টায় নির্মিত নগ্ন চিত্রতারকার ছবিতে দৃষ্টি আকর্ষক পোস্টার। প্রকাশ্য রাজপথে চলেছে জুয়ার আড্ডা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সরকারী পরিবার পরিকল্পনার সচিত্র মাহাত্ম্য ব্যাখ্যান। এমনি আরো কত হরেক রকমের মনোলোভা দৃশ্য! সুকুমারমতি কিশোর-তরুণদের এসব দেখানোর পরও কি আর ভালো ছেলে করে ঘরে ধরে রাখা যায়? সমাজের যারা আগামী দিনের কুশীলব তাদের ভালোভাবে মানুষ হয়ে ওঠার কতটুকু সুযোগ-সুবিধা এই সমাজ দিতে পেরেছে? যে দেশে সরকার বা শাসনযন্ত্র বহাল তবিয়তে থাকা সত্ত্বেও জুলিয়াচুরি, রাহাজানি চক্রান্ত অকপটে দিবালোকে চলতে পারে, সে-দেশের তরুণরা কি সব এক-একটা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হবে?

তাই বলছিলাম—ঘুণধরা, পঙ্কিল এই সমাজব্যবস্থায় আর একদিনও নয়। পরিবর্তন আনতেই হবে। আর সে কাজ তরুণ সমাজেরই। অসুস্থ এই সমাজের সব কিছুই এখন অসুস্থ। বিষাক্ত এক ধোঁয়ায় সারা দেশ ছেয়ে যেতে বসেছে। তার থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এখন দরকার বিপ্লব। আমরা বাংলাদেশের তরুণ সমাজ আজ বিপ্লব চাই—সেই বিপ্লব—যে বিপ্লব দেশের ছোটবড় প্রতিটি মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসবে—যার মধ্যে থাকবে না কোনও হিংসা, দ্বেষ। এ তো সবার জন্যে সবার কাজ। এর মধ্যে হিংসার ঠাঁই কোথায়? বিনা রক্তপাতে, দেশের প্রতিটি মানুষের স্পর্শে, প্রতিটি মানুষের স্বার্থে আসুক সেই বিপ্লব। নিয়ে আসুক এক বিরাট পরিবর্তন। গঠিত হোক এক সুন্দর, সজীব ভারতবর্ষ। যেখানে প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষকে ভাই বলে কাছে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। প্রিয় ভাবতে পারবে।

আজকের এই প্রলয়ের মধ্যে দিয়েই আগামী দিনে দেশমাতৃকার সেই কল্যাণী মূর্তির আবির্ভাব ঘটবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ধ্বংস নয়, এক সুন্দর সজীব ভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্নই আজও প্রতিটি তরুণের চোখে-মুখে। বিশ্বাস না হলেও, মানতে হবে।
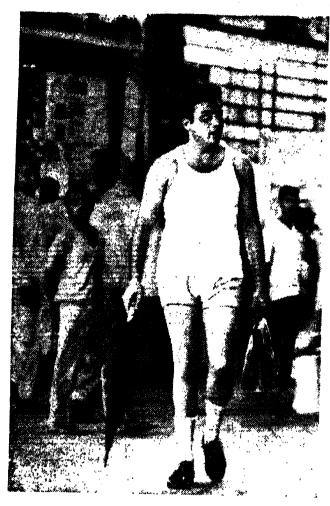
পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী হা হা

দেশ (২১ নভেম্বর '৭০) পত্রিকাতে শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গ এক তরণী হা হা' পড়েছি। সেই সঙ্গে পড়েছি এই গল্পটির প্রসঙ্গে নানা ধরনের চিঠি যাতে বিভিন্ন মতামত ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। লেখকের রচনাটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দেখে আনন্দ হল। অর্থাৎ অনেকেই তাহলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি-কলঙ্কিত দুর্নীতি-ভরা বাস্তব জীবনকে দেখছেন। শ্রীঘোষের লেখাটি পড়ে ভাবছিলাম এলোমেলো ভাবে। আমার মনে হয় রচনাটি আমাদের আজকের রাষ্ট্রিক রোগের একস্-রে রিপোর্ট। নির্মম সত্য নির্মমভাবে দেখানোর সাহসের জন্য শ্রীগৌরকিশোর ঘোষকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই দেশ পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে এই বলিষ্ঠ রচনাটি প্রকাশের জন্য।

১৯ ডিসেম্বর আলোচনা বিভাগে বেলঘরিয়ার শ্রীমতী রেবা ঘোষের গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্যটি পড়লাম। তাঁর প্রথম অভিযোগ গল্পটি সাহিত্যের নামে প্রহসন। আমার মনে হয় আজকের এই ছন্নছাড়া বাংলা দেশে প্রহসন কোথায় নেই? শিক্ষা-ক্ষেত্রের দিকে, কর্মক্ষেত্রের দিকে, রাজনৈতিক নেতাদের গরম গরম লেকচারের দিকে আর এই অনিশ্চিত আতঙ্কময় দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার নাভিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না কি বেঁচে থাকাটাই একটা প্রহসন? সেই নির্মম প্রহসনকে যদি কেউ নিপুণভাবে সাহিত্যের রূপ দেন—তাহলে সেই প্রহসনই তো অমূল্য সাহিত্য।

তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগ একটি বাক্য গল্পটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই বাক্যটির থেকে অনেক নোংরা শব্দ আমাদের কানে আসে—অতএব সেটা যদি লেখক লজ্জা না করে লিখে থাকেন তাহলেই কি গল্পটি দোষে দুষ্ট হয়ে গেল? তা ছাড়া বাক্যটি স্থান-কাল-পাত্রের বিচারে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

তাঁর তৃতীয় অভিযোগ মেয়ের চরিত্রকে ছোট করা হয়েছে। আমার তো মনে হয় প্রতিদিন খবরের কাগজে যে রিপোর্টিং পড়ে থাকি তারই সংক্ষিপ্ত বাঙ্গচিত্র পেয়েছি লেখকের লেখনিতে। এতে অপমানের কি আছে? তাহলে তো কার্টুন আঁকাও অপরাধ!

তারপর লেখিকার মনে হয়েছে রচনাটি গভর্মেন্টের প্রচার। রচনাটি পড়ে যদি প্রচারমূলক মনে হয় তাহলে অসংখ্য অসহায় শান্তিপ্রিয় মানুষের মর্মান্তিক অবস্থার সরব প্রচার। যা আমরা প্রতিদিন দেখছি, জানছি, শুনছি, যে বীভৎস অবস্থার মধ্যে 'সবাই চুপ করে আছি। মুখ বুজে সব জুলুম হজম করে যাচ্ছি'—'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী হা হা' হ'ল তারই প্রচার। আর প্রচার মাত্রই আপত্তিকর নয়। আপত্তিকর যা তা হ'ল অপপ্রচার।

অরূপ মুখোপাধ্যায়
হুগলি

॥২॥

গত ২১শে নভেম্বর তারিখে দেশ পত্রিকায় শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের "পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী হা হা" পড়েছি। লেখক কতগুলো পরিস্থিতি অত্যন্ত নগ্নভাবে পরিবেশন করায় খট্‌কা লেগেছে খুবই। চুপচাপ ছিলাম। ১৯শে ডিসেম্বর শ্রীমতী রেবা ঘোষ ও আবদুস সামাদ আলোচিত দুটি বিপরীত ধর্মী লেখায় অস্থির হয়ে উঠলাম। শ্রীমতী ঘোষ শুধু নগ্নতাই লক্ষ করলেন—বাস্তবতাকে বিলকুল অস্বীকার করে। এটা ঠিক নয়। সমকালীন ঘটনা প্রবাহকে নগ্নভাবে এঁকে শ্রীঘোষ দোষী হতে পারেন—কিন্তু বস্তুমূল্য দিতে হবে বই কি! আর এ ধরনের লেখা 'দেশ'-এ স্থান পাওয়া উচিত নয়—এটা শ্রীমতী ঘোষের নিছক মতামত ছাড়া কিছুই নয়।

সামাদ সাহেব শ্রীগৌরকিশোর বাবুকে যে ভাবে প্রশংসা করে তুঙ্গে তুলেছেন আলোচ্য লেখার জন্য তাঁর ততখানি প্রাপ্য নয়। বহু পত্র-পত্রিকায় বহু লেখক পঃ বঙ্গ তথা ভারতের বর্তমান সংকটঘন পরিস্থিতি সুনিপুণ হস্তে এঁকে যাচ্ছেন সুতরাং, সামাদসাহেবের বিচারে যে লেখা ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি হবার কথা—ঘটনা ঠিক তা নয়। একটি সাধারণ লেখা নিয়ে সামাদসাহেব যত সারগর্ভ আলোচনার অবতরণা করেছেন এবং লেখককে অকৃপণ হস্তে অদ্বিতীয়ের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন তাকে বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু বলা যায় না। আমার ধারণা শ্রীঘোষের লেখার উপর আলোচনা না করে সামাদসাহেব যদি এ ব্যাপারে নিজে কিছু দিতে পারতেন পাঠক পাঠিকাদের তার মূল্য হ'ত অনেক বেশী—কেন না তার আলোচনার মূল্য শ্রীঘোষের মূল লেখার মূল্যকে ছাড়িয়ে গেছে।

সুরেশচন্দ্র রাহা
সোনামুখী, বাঁকুড়া।

বঙ্গ আমার, জননী আমার

॥ ১ ॥

গত ৩ পৌষ ১৩৭৭ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ছোটগল্প, "বঙ্গ আমার, জননী আমার" পড়লাম। পুরো গল্পটিই একটি ইল্যুশনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটি আঙ্গিকের দিক দিয়ে আমায় মুগ্ধ করেছে। কিন্তু গল্পটির একটি অংশ, সাহিত্যের দিক থেকে নয়, তথ্যগত দিক দিয়ে আমার কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে।

"বিদ্যাসাগর! সতীশ উৎসাহে বিদ্যাসাগরের দিকে এগোতে গিয়ে আগেই একটা টেবিলের ওপর নেতাজীকে পড়ে থাকতে দেখল। নেতাজী খানিকটা ফৌজী কায়দায় ধমকে উঠলেন সতীশকে: দেখতে পাচ্ছ না কিভাবে শুয়ে আছি। ফাজলামো করার আর সময় পাও না, না? এই দেশটার জন্যই কিনা আমি জীবন শপথ নিয়ে ছিলাম।"

নেতাজী মৃত কি না আহত তা সম্পূর্ণভাবে রহস্যাবৃত। বিশেষত আজ যখন বহু লোকই তাঁদের প্রিয় নেতা নেতাজী জীবিত আছেন বলে মনে করেন, তখন গল্পের মধ্যে দিয়ে এ ধরনের উল্লেখ না থাকাই ভাল ছিল।

শ্রীজয়দেব দাশগুপ্ত
হাওড়া-৩

॥ ২ ॥

৩৮ বর্ষ। ৭ম সংখ্যা দেশে প্রকাশিত হয়েছে একটি অনবদ্য গল্প; গল্পটি হলো 'বঙ্গ আমার জননী আমার'—গল্পকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক এবং 'দেশ' কর্তৃপক্ষকে গল্পটি প্রকাশের জন্য। আর লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই।

এক কথায় গল্পটি অনবদ্য। সাম্প্রতিক শ্রেষ্ঠ গল্পের সারিতে স্থান পাবে। গল্পের উপস্থাপনা ভারি সুন্দর—যদিও অসুন্দরই এ গল্পের বিষয়বস্তু। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অদ্ভুতভাবে টেনে নিয়ে যায় পাঠক-পাঠিকাকে। গল্পের নায়ক ফেরিওয়ালা সতীশের জবানবন্দী আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মসমীক্ষা। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা সতীশ—কিছু জানার আগেই উত্তাপে ভস্মীভূত। লেখক যখন 'লাশ ঘরে' মৃত মানুষের মুখ-সন্দর্শনে নিয়ে গিয়ে একে একে উল্টে-পাল্টে দেখাচ্ছেন, তখন শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে হয় একি! কেন এই বীভৎস তাণ্ডব? আমরা যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি! লাশ ঘরের বাইরে মিছিল। রাজনীতির আবরণ উন্মোচিত করলে অন্য এক রূপ—সে রূপ বিংশ শতাব্দীর পিশাচী রূপ। সবমিলে এ গল্প শুধু গল্প নয়, যেন আরও কিছু।

অশোককুমার সাহা
মল্লারপুর। বীরভূম।

ছাত্র বিদ্রোহ

বিগত কয়েক সংখ্যায় দেশ পত্রিকায় "ছাত্র বিদ্রোহ" সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। জনৈক ছাত্র হিসাবে আমি আমার কিছু বক্তব্য রাখলাম। আজকের এই ছাত্র বিক্ষোভের জন্য অনেকেই ছাত্রদের উপর দোষারোপ করেন। আমাদের উপর সহানুভূতি নিয়ে তাঁরা কেন কিছুই বুঝতে চান না। জনৈক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীপ্রভাস মজুমদার আমাদের পক্ষে কিছু বক্তব্য রাখায় কলকাতার জনৈক অধ্যাপক তার বিরোধিতা করেছেন। বাস্তব-ধর্মী ছাত্র হিসাবে আমি এইটুকু জানি যে, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক আজ প্রায় স্বপ্নের মত মলিন। সৌভাগ্যক্রমে আমি কলকাতার এক কলেজের ছাত্র। আমাদের কলেজে বহু নামকরা অধ্যাপক আছেন এবং তাঁদের লিখিত অনেক বই বাজারে বিক্রি হয়। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা ক্লাসে এমন সব অদ্ভুত কথা বলেন যা শুনলে তাঁদের উপর শ্রদ্ধা সেই মুহূর্তে চলে যায়। ক্লাসে বেশী গণ্ডগোল হলে তাঁরা প্রায়ই বলেন, "তোমরা পাশ করলেও আমার মাইনে বাড়বে না। ফেল করলেও কমবে না, আমার যা মাইনে আমি তাই পাব।" বছরের মধ্যে বেশির ভাগ দিনই ক্লাসে তাঁরা আসেন না।... অবশ্য সব অধ্যাপক খারাপ একথা কখনই বলব না। অনেক অধ্যাপককে আমরা এখনও ভয় করি, শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধাটা অর্জন করতে হয়, এটা কেউ কাউকে যেচে দেয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'তিনটে ছাপ থাকলেই অধ্যাপক হওয়া যায় না। বিভিন্ন ছাত্রের সমাবেশে অর্থাৎ ক্লাসে তাদের চুপ করিয়ে পড়ানো এক বিরাট শক্ত ব্যাপার। একই ক্লাস, একই ছাত্র অথচ একজনের ক্লাসে কেন এত চেঁচামেচি আবার আর একজনের ক্লাসে কেন এত চুপচাপ? আমরা যে খুব ভাল একথা আমি একবারও বলব না। আমরা খারাপ, আমরা রকবাজ, আমরা রাস্তায় মেয়েদের টিটকিরি করি। একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সব হওয়ার পেছনে কে বা কারা দায়ী এ কথা কেউ চিন্তা করে না। আজ আমরা যে ভয়ঙ্কর সমাজে বাস করছি সেই সমাজ পরিবর্তনের কথা কেউ ভাবেন না। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ছাত্রদের পুলিসের সামনে এগিয়ে দিয়ে দেশের নেতারা (সব দলেরই) নিজেদের বাঁচান। নেতাদের ছেলেরা ভাল ভাল স্কুল, কলেজ বা কনভেন্টে থেকে পড়াশুনা করে। আজ আমরা এক বিরাট বিস্ফোরণের মুখে—যে কোন মুহূর্তে এটা ফেটে যেতে পারে।

কী বিচিত্র আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা। আকবর, বাবর সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কি খেতেন, কি পরতেন সে সব মুখস্থ করি। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কত টন গম উৎপন্ন করে ইত্যাদি মুখস্থ করি। কি লাভ এতে আমাদের? কাজ করব হয়ত কেরানির যেখানে আকবর, বাবরের কোন মূল্যই নেই।

তিন বছর ক্লাসের মধ্যে কটা দিন আমরা ক্লাস করি? অথচ সেই তুলনায় কী বিপুল আমাদের সিলেবাস। কলেজে অর্ধেক দিন ছুটি, ধর্মঘট তো লেগেই আছে। তার উপরে প্রশ্নপত্রের উপর প্রশ্নকর্তার বিদ্যা জাহির তো আছেই। আগে যেখানে তিন মাসে পরীক্ষার খবর বার করত সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ ফল বার করছে পাঁচ থেকে ছয় মাস পর। এই বিশ্ব-বিদ্যালয় এমন সব পরীক্ষকদের হাতে খাতা দেয় যাঁরা ট্রেনের কামরায় পরীক্ষার খাতা রেখে স্টেশনে চা খেতে যান। খাতা হারিয়ে যাওয়ার পর যাহোক করে হারিয়ে যাওয়া খাতার ছাত্রদের নম্বর দেওয়া হয়। এই সমস্ত শিক্ষকদের কেন শাস্তি দেওয়া হয় না? আজ আমরা সব দিক দিয়ে মার খাচ্ছি। রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুল হয়ে আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারছি। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের ছাত্র হয়ে আমরা গণ্ডগোলের সময় পুলিসের সামনে ছাত্র বলে পরিচয় দিতে ভয় পাই। আমরা আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গছি, আমরা

শিক্ষকদের অপমান করছি। পুলিসের গাড়িতে বোমা মারছি। ঠিক কথা। কিন্তু এই ধরনের বিশৃঙ্খলা চার বা পাঁচ বছর যাবৎ চলছে। এর আগে তো আইন ছিল শৃঙ্খলা ছিল, সবই ছিল। তখন দেশের কী উন্নতি হয়েছে? ধনী আরও ধনী হয়েছে। গরীব আরও গরীব হয়েছে। নেতারা গণতন্ত্রের বুলি আওড়ে নিজেদের খুঁটি শক্ত করেছেন। ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কথা চিন্তা না করে রাজধানীতে হাজার হাজার গোলাপ ফুলের চারা পুঁতেছেন যেন আমরা গোলাপ ফুল খেয়েই বাঁচব। এঁরা জানেন না নিজেদের কবর এঁরা নিজেরাই খুঁড়ছেন।

আমাদের উপর দোষারোপ করে লাভ কি? আমি কোন রাজনৈতিক দলেরই সভ্য নই। আমি বাংলার এক মধ্যবিত্ত ঘরের এক সাধারণ ছাত্র। সামান্য আমার বক্তব্য। আজ বাংলার প্রতিটি কলেজের দিকে কান পাতলে শোনা যাবে এই একই কথা। আজ আমরা (ছাত্ররা) ধ্বংসের মুখে। আজ আমাদের উদ্ধারের জন্য কেউ নেই। এমন কি আমাদের অভিভাবকেরাও নন। যেন এটা আমাদের নিজেদের দায়িত্ব। সত্যিই কি তাই? কে উত্তর দেবে?

জনৈক ছাত্র

পরীক্ষা সমস্যা

'পরীক্ষা সমস্যা'র উপর সম্পাদকীয় আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানবেন। আমি নিজে একজন শিক্ষক। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু কিছু চিন্তা আমিও করি। গত কয়েক বছর, বিশেষ করে এ বছর, পরীক্ষা নিতে গিয়ে আমরা মফস্বলের শিক্ষকরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তাতে আমাদের অভিজ্ঞতা কিছু ভিন্নতর হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে, বর্তমান বৎসরে 'পরীক্ষা সমস্যা' যতটা না নকশালপন্থীদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি সৃষ্ট হয়েছে এক শ্রেণীর না-পড়ুয়া ছাত্রদের দ্বারা। এই শ্রেণীর ছাত্ররা এর আগেও আগের বছর পরীক্ষার আগে দু' দশদিন নোট বই মুখস্থ করে আর পরীক্ষার হলে শিক্ষকের চোখের আড়ালে টুকলি করে পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ করেছে কেউ; কেউ বা ফেল।

এ বছর এরাই সুযোগ বুঝে মওকা নিয়েছে। নকশালদের পরীক্ষা বয়কট আন্দোলন এবং সরকারের নকশাল আন্দোলন ঠাণ্ডা করার অদ্ভুত ব্যবস্থাপনা এদের সেই সুযোগকে প্রসারিত করেছে। পরীক্ষা ভণ্ডুল করে স্কুল কলেজ ছেড়ে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে এই শ্রেণীর ছাত্ররা আদৌ চায় না; এরা আর কিছু বোঝে না, কেবল নিজেদের সুযোগ আর স্বার্থটাই বোঝে। স্কুলে কলেজে হাঙ্গামা-হুজ্জুত বাধিয়ে এরা শুধুই পাশ করতে চায়। পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর সেই কারণেই এদের জেহাদ। আসলে পরীক্ষার নামে যদি সত্যিকারের পরীক্ষা হয় তাহলে এরা অনেকেই উতরাতে পারবে না। তাই পরীক্ষার নামে প্রহসন হলে এদের পরীক্ষা দিতে আপত্তি থাকে না। সুতরাং আমাদের মতে 'পরীক্ষা সমস্যা'র জন্য কেবল মাত্র নকশালদের দায়ী করলে হবে না। আপনি আপনার সম্পাদকীয়তে এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে মোটামুটি একমত হয়েছেন দেখলাম। তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে যে কথা আপনি বলেছেন, আমরাও সেই কথা মনে করি। আমরাও মনে করি, এই সমস্ত ছাত্রদের সংশোধনের দায়িত্ব পুলিস আর মাস্টারমশায়দের উপর দিয়ে বাবা-মা আর অভিভাবকরা যদি নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকেন, তবে যা চলছে তা আদৌ বন্ধ হবে না। প্রত্যেক বাবা-মা ও অভিভাবককে এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। এখনও যদি না তাঁরা সচেতন হন; তবে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের প্রথম ভাগের সেই ছেলেটির কথা তাঁদের স্মরণ করতে অনুরোধ করছি; যে ছেলেটি তার মাসীর কান কেটে নিয়েছিল দাঁত দিয়ে।

পরিমল ঘোষ
মেদিনীপুর।

বন্ধুবিয়োগ

"দেশ" পত্রিকার গত ১২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত "বন্ধু-বিয়োগ" প্রবন্ধে তিন বন্ধুর প্রথম কবিতার বই "জোনাকি"-র প্রকাশক হিসাবে হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে ওই নামটি হবে হরলাল মুখোপাধ্যায়। লেখকের এই ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য। শ্রীমিত্র জানিয়েছেন অনবধানবশত এই ভ্রমটি ঘটেছিল।

একটি আফরিকান উপন্যাস

অনেক আশা নিয়ে লেনার্ড পিটার্স-এর লেখা 'দা সেকেন্ড রাউন্ড' উপন্যাসটি পড়তে শুরু করেছিলাম। প্রথম দিকটায় তো পড়তে বেশ ভালোই লাগছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, এই বিভাগে আমি বিদেশী সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা অনেক কমিয়ে দিয়েছি। তার প্রথম কারণ অবশ্যই এই, বিদেশী সাহিত্য বিষয়ে আমার নেহাৎ অল্প-জ্ঞানের পরিচয় এই বহুলে প্রচারিত সাপ্তাহিকে ফলাও করে না প্রকাশ করাই ভালো। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বিদেশের সাহিত্য বিষয়ে ছুটছাট খবর বা কোনো বই সম্পর্কে মেঠো আলোচনার বদলে কুচবিহার বা আসামের নবীন বাঙালী লেখকদের প্রচেষ্টার সংবাদ আমাদের পক্ষে বেশী জরুরী। কিন্তু এই বইটির আলোচনা করছি অন্য কারণে।

লেনার্ড পিটার্স সাহেব নন, একজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকান। এই লেখকের বয়েস আটত্রিশ, জন্ম গাম্বিয়ায়, পরে সিয়েরা লিয়ন-এ বসতি। ইনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়েছিলেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ছাত্র নেতা হয়েছিলেন, পরে লন্ডনে ডাক্তারির ডিগ্রি নেন। মূলত কবিতাই লেখেন, এখানি তাঁর একমাত্র উপন্যাস। এখন দেশে ফিরে এসে ডাক্তারি করছেন।

বইটি আমাকে আকর্ষণ করেছিল এই কারণে যে, এর আখ্যানভাগের প্রথম দিকটির সঙ্গে আমাদের দেশের পটভূমিকারও খুবই মিল আছে। উপন্যাসের নায়ক ডঃ কাওয়া বিলেতে ডাক্তারি পাস করে অনেকদিন বাদে দেশে ফিরছে। অনেকেই তার বাড়ি ফেরার আশা ত্যাগ করেছিল। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বাপ মায়ের অনেক আশা নিয়ে বিলেতে পড়তে গিয়েছিল, তারপর সেখানেই আটকে যায়। বছরের পর বছর কেটে যায়, সবাই ভেবেছিল ইওরোপের মোহিনী মায়ায় মজে গিয়ে সে দেশকে ভুলে গেছে। এরকমই আজকাল স্বাভাবিক। আমাদের দেশের অনেক ছেলেও আজকাল ডাক্তারি পাস করে কিংবা পড়তে পড়তে ইওরোপ আমেরিকায় চলে যায়। প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকে বিদেশ থেকে উন্নততর ডিগ্রী আনবার, কিন্তু আর দেশে ফেরা হয় না। ইওরোপ আমেরিকায় মোটামুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে অর্থ উপার্জন করে। প্রথম কয়েক বছর বাড়িতে কিছু টাকা পাঠায়, তারপর সে সম্পর্কও ঘুচে যায়। কেউ কেউ মেম বিয়ে করে, কেউ বা এক মাসের জন্য দেশে ফিরে টুপ করে একটি দেশী মেয়ে বিয়ে করে আবার ফিরে যায়। কেউ কেউ অবশ্য ফেরে। আমাদের দেশে বিলেত-ফেরৎ ডাক্তারেরও অভাব নেই। আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষ এখনো বিনা চিকিৎসায় মরে—এবং বহু ডাক্তার শহরের ডিস্পেনসারিতে বসে থেকে রুগী পায় না, মাছি তাড়ায়।

বিলেত-ফেরৎ ডাক্তাররা উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন—তাঁরা কেউ সে বিষয়ে লেখেন নি। অর্থ উপার্জন ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে তাঁদের কারুর কোনো মর্মবেদনা জাগে কিনা তা জানতে পারিনি।

লেনার্ড পিটার্স নিজে ডাক্তার এবং তাঁর উপন্যাসের ডাক্তার নায়ককে তিনি কতকগুলো বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। ডাক্তার কাওয়া ফিরে এসে দেখলেন, এতদিন দূরে থেকে যে স্বদেশের কথা তিনি ভেবেছেন, সে দেশ আর নেই। ইওরোপের মতন মাতৃভূমির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। দেশীয় আচার ব্যবহারের সঙ্গে সাহেবিয়ানা মিশে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা। যে লোক অন্তরের টানে সাহেবদের দেশ ছেড়ে এলো, নিজের দেশে নকল সাহেবীয়ানা তার অপছন্দ।

সবচেয়ে মজার কথা এই, ডঃ কাওয়ার কাছে তাঁর আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাই আশা করে যে তিনি এবার একটি বাছাই সুন্দরীকে বিয়ে করবেন, চোখ ঝলসানো বাড়ি তৈরী করবেন একটা, রেফ্রিজারেটর, গাড়ি, রেকর্ড-প্লেয়ার এসবও ইনস্টলমেণ্টে কেনা চলতে থাকবে। নাইট ক্লাব ও হুইস্কি-ব্রাণ্ডির সমাজে তিনি হবেন শিরোমণি। অর্থাৎ, দেশের লোকই চায়, বিদেশ প্রত্যাগত এই মানুষটি দেশের মানুষকে এক্সপ্লয়েট করে ধনী হোক। কিন্তু লাস্যময়ী সুন্দরী, গাড়ি, ফ্রিজ ও হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি তো বিদেশে থাকলে আরও সহজেই পাওয়া যেত—তা হলে আর দেশে ফেরা কেন?

আলাদা প্র্যাকটিস না জমিয়ে ডঃ কাওয়া সরকারী হাসপাতালে কাজ নিলেন। সেখানে দারুণ অব্যবস্থা ও শৈথিল্য তাঁর মনকে পীড়া দেয়। খৃষ্টধর্ম ও বিলেতি পোশাক সত্ত্বেও কুসংস্কার ছাড়েনি মানুষকে। সার্জন হিসেবে তাঁর সুনাম রটে যাওয়ার ফলে গর্ভিনী মায়েরা তাঁর হাতে ছাড়া অন্য কারুর কাছে সন্তান প্রসব করাতে চায় না—শত শত রোগিণীর ভিড় জমে যায়, সাতদিন ধরে গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত সন্তান প্রসব করালেও ভাবী মায়েরা অন্য সার্জেনের কাছে যাবে না।

বাড়িতে ফিরেও ডঃ কাওয়ার বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। দলে দলে মায়েরা এসে তাকে পীড়াপীড়ি করে তাদের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য। সেই সঙ্গে নিজের মায়ের অনুরোধ তো আছেই।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী স্কুলের ছাত্রদের বছরে একবার ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হয়। ডঃ কাওয়া এসে দেখলেন, প্রায় তিনশো ছাত্রকে একবেলার মধ্যে পরীক্ষা করতে হবে। কি পরীক্ষা তিনি করবেন? তিনি বুঝলেন, বেশীর ভাগ ছাত্রেরই অসুখ কোনো বীজাণুঘটিত নয়, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে। এ সম্পর্কে কি করবেন তিনি?

উপন্যাসটির এই পর্যন্ত একজন বিমর্ষ আদর্শবাদী ডাক্তারের চরিত্র বেশ ভালো ফুটেছে। অর্ধেকের পর থেকে তিনি উপন্যাসটি একেবারে নষ্ট করে ফেলেছেন। লেনার্ড পিটার্সের উদ্দেশ্য শুভ, কিন্তু তিনি উপন্যাস লিখতে জানেন না।

অর্ধেক লেখার পর হঠাৎ তাঁর ম... হলো, শুধু দেশজ সমস্যার কথা ... যথেষ্ট নয়, একটা বেশ অ... মনস্তাত্ত্বিক ধরনের প্রেম-ট্রেমের কথা ... উচিত। তারপর যা শুরু হলো তার কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই। অন্ধকার রাস্তায় একটি মেয়েকে কয়েকজন লোক বলাৎকার করছিল, ডঃ কাওয়া তাকে উদ্ধার করলেন এবং মানসিক অসংবদ্ধতা থেকে বাঁচালেন। মেয়েটির প্রতি বেশ দুর্বল হয়ে পড়লেন ডঃ কাওয়া, তাকে বিয়ে করবেন ঠিক করলেন, তবু কয়েক পাতার মধ্যেই সেই মেয়েটি কেন যে অন্য পুরুষের অনুরক্তা হয়ে চলে গেল, তা কিছুতেই বোঝা গেল না। এরপর শুরু হলো, আর একটি দীর্ঘ উপকাহিনী। তাঁর প্রতিবেশীর স্ত্রী ভাগিনেয়ের প্রেমে আসক্ত, সেই প্রেমিকটির আবার নাকে ক্যানসার—এদের সঙ্গে ডঃ কাওয়ার জড়িয়ে পড়ার কোনো যুক্তি উপন্যাসের দিক থেকে নেই। প্রতিবেশীর স্ত্রীর আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় উপন্যাস শেষ।

শুধু শেষ দিকের গল্পাংশের দুর্বলতার জন্যই নয়, চরিত্রগুলো কোনো রক্ত মাংসের চেহারা পায়নি। ফ্রি টাউনের আফ্রিকান অধিবাসীদের মধ্যে অনেক সম্পত্তিসম্পন্ন পরিবার আছে, এবং তারা সবাই ক্রিশ্চান বলে, তাদের নাম মার্সান, ক্লেয়ার, ফ্রেডি, লরা প্রভৃতি। এমন কি দাসীর নাম অ্যান। টেনিস কোর্ট, মটরগাড়ির ছুটোছুটির মধ্যে এইসব নামের চরিত্রগুলোর কোনো রূপই ফুটে ওঠেনি।

তবু বইটি নিয়ে আলোচনা করলুম এইজন্য যে, লেনার্ড পিটার্স যে সমস্যা নিয়ে শুরু করেছিলেন, সেটা আমাদের দেশেরও সমস্যা। কিন্তু আমাদের দেশে এই সম্পর্কে কেউ এখনো লেখেননি। লেনার্ড পিটার্স অন্তত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

সনাতন পাঠক

রাজনৈতিক রচনা : উপন্যাস ও জীবনী

অদ্বিতীয়া চেকোশ্লোভাকিয়া। শৌনক গুপ্ত। পরিবেশক: কথা ও কাহিনী, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: বারো টাকা।

হো চি মিন। শৌনক গুপ্ত। পরিবেশক: কথা ও কাহিনী, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: দশ টাকা।

আমাদের এখন কেন্দ্রশাসিত জীবন। আর সেই কেন্দ্র হল রাজনীতি। সুতরাং বইয়ের বাজারে রাজনীতি ঢুকেছে বলে বিলাপ করে লাভ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক সাহিত্য কতটা সাহিত্য হয়ে উঠছে। কলকাতার অন্ধ গলি ছেড়ে বেরোননি অথচ জার্মানী কি লাতিন আমেরিকা নিয়ে রাজনৈতিক 'রমন্যাস' লেখার সময় প্রত্যক্ষদর্শীর মতো কৌশলে বর্ণনা ফাঁদছেন, এমন লেখকেরও অভাব এদেশে নেই। সেগুলো সাহিত্য নয়, আত্মপ্রবঞ্চনা। চ্যাটারটন ছিলেন এক শক্তিশালী ইংরেজ কবি, তবু পাঠকদের প্রবঞ্চনা করেছেন এই অভিযোগে ইংরেজী সাহিত্য তাঁকে নির্বাসনে দেয়। তাঁর পাণ্ডুলিপি বড় করুণ।

শৌনক গুপ্ত 'অদ্বিতীয়া চেকোশ্লোভাকিয়া'র মুখবন্ধে জানিয়েছেন, লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে এক চেক অধ্যাপকের আলাপ হয়েছিল, সেই সূত্রেই তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে এক উপন্যাস লেখায় অনুপ্রাণিত হন। অবশ্যই তাঁর কাহিনীর এক প্রামাণ্য সূত্র থাকা দরকার; নইলে কলকাতায় এমন কি লণ্ডনে বসেও শুধু কল্পনায় এবং কাগজপত্র ঘেঁটে চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর উপন্যাস লেখার কোন উপযোগিতা থাকে না। সেদিক থেকে বইটির গুরুত্ব এই যে, এক দায়িত্ববান চেক নাগরিকের কাছ থেকে লেখক সেখানকার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করেছেন। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটুকু বইতে ভালো ফুটেছে। দেশের সংকটের সময় বহু প্রাচীন, দৃঢ়মূল বিশ্বাস টলে ওঠে, নতুন বিশ্বাস জন্মায়। রাজনীতির দুর্ধর্ষ চক্রীরা আড়ালে তাদের গোপন দাঁত বসিয়ে চলে। সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। এতদিনের মিত্র সোভিয়েত রাশিয়া সত্যিই আগ্রাসী না রক্ষক? দুবচেক লোকটা আসলে প্রতিক্রিয়াশীল, শোধনবাদী, না কি দুর্দান্ত স্বদেশপ্রেমিক? কয়েক দিনের ঝড় এবং তাণ্ডব যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে, তখন তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই বইয়ের চার চরিত্র—কারাশেক, ফ্রানস, লেনকা আর রোজ মেরী সেইসব জ্বলন্ত প্রশ্নে দগ্ধ হচ্ছে। অবশ্য সেই সঙ্গে আছে প্রেম। কিন্তু প্রেম জ্বালা বাড়ায় না কমায় তা হলপ করে বলা কঠিন। যদিও বইটিতে এক কাহিনীকে খেলিয়ে তোলা হয়েছে তবু বইটির প্রধান উদ্দেশ্য সাম্প্রতিক চেক ঘটনাবলীর আলোচনা এবং সেই সূত্রে ইতিহাস-অন্বেষণ।

হো চি মিন বা গান্ধীর মতো প্রকৃত গণনায়ক খুব কমই আসেন পৃথিবীতে। তাঁরা প্রথমত অসাধারণ স্বদেশপ্রেমিক; প্রধানত মানবদরদী। তাঁদের প্রকৃতির মধ্যেই তাঁদের স্বদেশের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। তবু গান্ধীকে আততায়ীর গুলিতে নিহত হতে হয়, সংকীর্ণ এবং অন্ধ রাজনীতি, অসুস্থ রাজনৈতিক চিন্তা, অশুভ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেশকে গ্রাস করে। অথচ হো চি মিন শেষ দিন পর্যন্ত স্বদেশে সূর্যের মতো উজ্জ্বল, প্রতিটি মানুষের কাছে ফুলের মতো আদরনীয়। তাঁর দেশ এখনো তাঁরই শেখানো স্বদেশী-মন্ত্রে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আমাদের বিপ্লব-বিলাসীরা কমরেড হো চি মিনের জীবন থেকে বিপ্লবের আগুন জেলে নিয়ে আসেন, সভায় মিছিলে তাঁর নামে আকাশ কাঁপান কিন্তু তাঁর গুরুতর সিদ্ধান্ত এবং পরামর্শগুলি গ্রহণ করেন না। হো আজীবন দেশাত্মবোধক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন।

সেইজন্যে এক সময় তিনি পপুলার ফ্রন্টকে এত চওড়া করতে চেয়েছিলেন যে, শুধু শ্রমিক-কৃষক নয়, বুর্জোয়া এবং দেশপ্রেমিক জমিদার মালিকরাও তাতে স্থান পেতে পারে। বুর্জোয়া বা মালিকদের চামড়া দিয়ে জুতো বানাবার উপদেশ তিনি দেন নি। তিনি জানতেন রাশিয়ার লেনিনবাদ বা চীনের উগ্রতাবাদ নিয়ে বিতর্কে মাতবার বা বিচ্ছেদের রাজনীতিতে প্রশ্রয় দেবার সময় এটা নয়। রাশিয়া বা চীনের সঙ্গে তাঁর দেশের যত মিল তত অমিল; সুতরাং সেখানকার মাটি নিয়ে এখানে গাছ পোঁতার তিনি ভক্ত ছিলেন না। ১৯৪৬ সালে গান্ধীর মতো তিনিও চুক্তির বিনিময়ে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। বারবার তিনি বলেছেন শান্তির বিকল্প হল দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। এই নিয়ে ভিয়েতমিনদের মধ্যে প্রচুর মতবিরোধ হয়েছিল। তবু ভিয়েতনামীরা তাঁকেই ধ্রুবজ্ঞান করে সংকট এড়িয়েছে। অথচ ভারতে স্বাধীনতার সময় থেকে ভাগাভাগি, ভাঙাভাঙি এবং বিপক্ষ রাজনীতির খেলা শুরু হয়ে যায়। শৌনক গুপ্ত অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে হো চি মিনের জীবনী লিখেছেন। তাঁর জীবন যেমন বিরাট তেমনি বিস্ময়কর। তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা এবং ভিয়েতনামের ইতিহাস বুঝতে বইটি সাহায্য করবে।

১২১।৭০, ১২২।৭০

মন্দির স্থাপত্য

চব্বিশ পরগণার মন্দির। অসীম মুখোপাধ্যায়। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছ' টাকা ॥

জাতীয় জীবনের সম্যক অবধারণে জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা একান্তই প্রয়োজন। বিশেষ করে ভারতীয় তথা বঙ্গ সংস্কৃতির যখন একটা প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রয়েছে। একদা, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে নবজাগৃতির কালে দেশের মনীষীবৃন্দ প্রাচীন শিল্পসংস্কৃতির উদ্ধার ও পুনর্মূল্যায়নে তৎপর ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে দেশপ্রেমের একান্ত অসদ্ভাব যখন জাতীয় চৈতন্যকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে—তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা ক্রমশ আমাদের সুপ্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ছি। এহেন দৈন্যদশায় কতিপয় দেশপ্রেমিক গবেষক মাঝে মাঝে এ বিষয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছেন,—এটা আশার কথা। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়ের 'চব্বিশ পরগনার মন্দির' গ্রন্থখানিকে দেশপ্রেমের একখানি দলিল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

মন্দিরময় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাদেশেও একদা মন্দির-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এই সমস্ত মন্দির শুধু আমাদের দেশের প্রাচীনকালের স্থাপত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবেই মূল্যবান নয়, এর প্রত্যেকটি মন্দিরের সঙ্গে আমাদের ধর্মচেতনা এবং শিল্পচেতনার বিবর্তনের উল্লেখযোগ্য স্বরূপও বিধৃত রয়েছে। পরিতাপের বিষয়, কালের শাসনে বাংলাদেশের বহু প্রাচীন মন্দিরই লুপ্ত, বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র চব্বিশ পরগনা জেলার ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলোর খুঁটিনাটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের শ্রম ও নিষ্ঠার যথেষ্ট প্রশংসা করতে হয়। লেখক প্রচলিতরীতিতে কেতাবী ঢঙে মন্দিরগুলোর স্থাপত্যরীতির আলোচনায় রচনাকে সংকীর্ণ রাখেননি, ব্যক্তিগতভাবে চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে সরেজমিনে মন্দিরগুলো পর্যবেক্ষণ করে আলোচনাকে সজীব করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। এবং এ বিষয়ে তার আলোচনা নিছক প্রত্নতত্ত্বদর্শীর বিবরণে পর্যবসিত না হয়ে তার গবেষক-সুলভ বিচার পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি আলোচনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফলে, সাধারণভাবে সন্দিৎসু পাঠকের কাছেও গ্রন্থের বিষয়-মালা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

গ্রন্থের আলোচনাক্রম সুপরিকল্পিত। প্রথমাংশের আলোচনায় লেখক সাধারণভাবে মন্দির-নির্মাণ শিল্পের বিভিন্ন রীতি এবং ঢঙ বিষয়ে চিন্তামূলক আলোচনা করেছেন। অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মন্দিরগুলির সঙ্গে চব্বিশ পরগনার মন্দিরসমূহের নির্মাণ পদ্ধতিতে মৌলিক মিল-বিষয়ে লেখকের আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বিচারসহ। মন্দির-নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলা দেশে প্রচলিত প্রাচীন চারটি রীতির সবিশেষ আলোচনা পাঠককে কৌতূহলী করে তুলবে। 'জটার দেউল', 'ইছাপুরের মন্দির', 'পাটেশ্বরীর আটচালা' 'কেশবেশ্বরের মন্দির', গোবিন্দপুরের শিব-মন্দির' ইত্যাদি অসংখ্য মন্দিরের আলোচনা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই আলোচনা ইতিহাস-ধর্ম-স্থাপত্য পদ্ধতির বিচিত্র ও তথ্যাশ্রয়ী প্রসঙ্গে সুসম্পূর্ণ। লেখকের বর্ণনাপদ্ধতি এবং বিশ্লেষণরীতি সর্বত্র বৈজ্ঞানিক মনন ও যুক্তিনিষ্ঠায় স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছন্দ। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কাম্য।

১৩৪/৭০

প্রাপ্তি স্বীকার

ইতিহাস চক্র। রামমনোহর লোহিয়া। রামমনোহর লোহিয়া সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্ট : ৮. ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ৪.০০।

চিত্র-সমালোচনা

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

(সারদা চিত্রমন্দির)

সন্তানকে উপলক্ষ করে দাম্পত্য সংকটের উপশম সিনেমায় অনেকবারই দেখা গেছে। অবশ্য উপকরণ এক হলেও নাটক একই রকম হয় না। একই উপাদানে কেউ ভাল নাটক গড়তে পারেন, কেউ পারেন না। স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে অর্থাৎ দার্জিলিংয়ে পরিচালক-চিত্রনাট্যকার পীযূষ বসু তাঁর নায়ক-নায়িকাকে—অমর ও সুমিতাকে—যে পথে মিলিয়ে দিয়েছেন তাতে চড়াই-উৎরাই নেই, পথটি সহজ, সেই অপত্যস্নেহের সরল পন্থা। সন্তান যেখানে উপলক্ষ সেখানে স্বামী-স্ত্রী শুধুই পিতা-মাতা, একটি বন্ধনে আবদ্ধ। অতএব জটিলতাও সহজে সরলীকৃত, কুয়াশা মুহূর্তে তিরোহিত।

এই অ-জটিল পথে আবার নাটকীয় চমক আছে, রয়েছে 'টেনশন'। কাকলি বাবাকে দেখে ছুটে যেতে চায়। এতেও যেন সুমিতার অপমান। রাগের মাথায় সুমিতা মেয়েকে চড় মারে। মেয়ের গায়ে এই প্রথম হাত তোলে সুমিতা। অভিমানে কাকলি কুয়াশার মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে বিপজ্জনক জায়গায় চলে আসে। ওকে অমর-সুমিতা প্রথম দেখতে পায় না। খুঁজে পেয়েছে শেষ পর্যন্ত। এক সেকেণ্ড দেরী হলেই কাকলি উঁচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে নিচে অতলে তলিয়ে যেত। জায়গাটা দার্জিলিং হলেও অমর-সুমিতার জীবন থেকে কুয়াশা কেটে গেল ওই মুহূর্তে।

কাঞ্চকুটের 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' কাহিনীর ভিত্তিতে যে চিত্রনাট্য রচিত তাতে ফ্ল্যাশব্যাক রয়েছে সঙ্গত কারণেই। পরিচালক প্রথমে দেখিয়েছেন সুমিতাকে দার্জিলিংয়ের পথে ট্রেনে—আর সব যাত্রী থেকে যেন সে আলাদা, কী যেন এক চাপা কষ্ট তার, কেমন যেন এক স্তব্ধতা। তার পাশে যারা রয়েছে—বিশেষত প্রাণের শক্তিতে উচ্ছল তরুণ-তরুণীরা, সুমিতা যেন তাদের থেকে অনেক দূরে। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে দার্জিলিং। পরিচালক সম্ভবত দুটি জীবন-ধারার বিপরীত চিত্র পাশাপাশি দেখাতে চেয়েছেন। এই 'কনট্রাস্ট' দার্জিলিংয়েও—পিকনিকে সকলেই আমোদ-স্ফূর্তিতে ব্যস্ত, সুমিতা দূরে দাঁড়িয়ে গাছের নিচে, কিছুতেই যেন তাদের সঙ্গে মিশতে পারছে না। ওই সময়েই সুমিতার মনেও তার জীবনের রঙিন দিনগুলির কথা মনে পড়ে। তার ও অমরের প্রেম, বিয়ে ইত্যাদি। ফ্ল্যাশ-ব্যাক শুরু। পরেও আছে ফ্ল্যাশব্যাক, যখন সে তার অতীত কাহিনী বলে সমরবাবুকে। সমরবাবুর লেখকের চরিত্র, স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে-র গল্পে তার ভূমিকা দর্শকের। অতিরিক্ত কাজও তার আছে। দার্জিলিংয়ে একত্রে যারা গেল তাদের সকলেরই কোন না কোন সমস্যার সমাধানের জন্য তার প্রয়োজন—যেমন ছেলে-মেয়েদের প্রেমে সফল হওয়ার ব্যাপারে। সকলকেই লেখক সান্ত্বনা ও সংবুদ্ধি দিয়ে যাচ্ছে, কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কেও সকলকে সজাগ করে দেওয়াই যেন তার দায়িত্ব। এমনও মনে হয় কখনো, সে যেন যাত্রার দলের বিবেক-এর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সকলের মাঝখানে। অথবা দেব-দূতের মত নেমে এসেছে। অর্থাৎ নীরব বা নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা সে নয়, তবে খুব দরদী, হিউম্যান। চরিত্রটিকে যে ভাল লাগে তার কারণ দিলীপ রায়ের সংযত, মার্জিত অভিনয়। শিল্পীর কথা বলার ধরনটিও সুন্দর। এই লেখক-চরিত্রের সান্নিধ্যে এসেছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর মেয়ে প্রেম করে বিয়ে করেছে। বাবা এসেছেন মেয়ের সংসার দেখতে। মেয়ে সুখে আছে দেখে তাঁর মনের ধারণা পাল্টে গেল। নতুন যুগের দাবিকে তিনি মেনে নিয়েছেন। তাঁর মনের তিক্ততা ও দুঃখ চলে গিয়েছে। ওদিকে ট্রেনে যে তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে ছিল নেহাতই সহযাত্রী তারাও প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়। যেন সব পেয়েছির দেশ ওই স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণ। এটা শুধুই ইচ্ছা-পূরণের নাটক।

তবে অসম্পূর্ণ গল্পে, অমর-সুমিতার বিবাহিত জীবনে পরিচালক বিরোধের বীজটি সুন্দরভাবে রোপণ করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংঘাত ছোট-খাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে অনিবার্য ও অনতিক্রমণীয় করে তুলেছেন। এবং ভুল বোঝাবুঝির ওইসব

"খুঁজে বেড়াই" (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবিতে অপর্ণা সেন

ফটো—দেশ

রাজ কাপুরের "মেরা নাম জোকার" ছবিতে সিমি ও মনোজকুমার

ঘটনা অনেকাংশেই রিয়্যাল মনে হয়েছে। রাত্রে শোবার ঘরের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। সুমিতা কাছে টানতে চেয়েছে স্বামীকে, অমরের দিক থেকে কোন সাড়া নেই, 'টায়ার্ড' বলে সে সুমিতাকে সরিয়ে দিয়েছে। ওই মুহূর্তে সুমিতার প্রতিক্রিয়া খুবই বাস্তবসম্মত। সংসার, স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি কাজ-পাগল স্বামীর উপেক্ষা দম্পতি-জীবনের বিরোধের একটি সহজগ্রাহ্য উপাদান। গল্পে, সিনেমার কাহিনীতেও এটি বহুব্যবহৃত। তা সত্ত্বেও সুমিতার অপমানবোধ ও আহত অভিমানের কথা পরিচালক আমাদের বিশ্বাসযোগ্যরূপেই জানিয়েছেন। ছবিটিতে প্রশংসনীয় পরিচালনার কাজ আরও আছে। দার্জিলিংয়ের পটভূমিতে মূল চরিত্র ও গল্পের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনা ও চরিত্রদের জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেমন ভাবে তাতে একটা সুপরিকল্পনা বা প্ল্যানিং-এর পরিচয় আছে। তবে ট্রেনের দৃশ্য আরও ছোট হতে পারত, সামগ্রিকভাবে চিত্রনাট্যও। অমর দার্জিলিং চলে যাবার পর আবার তার আগের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাকের কোন প্রয়োজনই ছিল না। ছবিটি এমনিতেই মন্থর, ওই ফ্ল্যাশব্যাকের ফলে মন্থরতা আরও বেড়েছে। এই গল্পে নাটকীয়তা কম, একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার উপরই গল্প। তাই একই প্রসঙ্গ ও বক্তব্যের ভিত্তিতে পরিচালককে একাধিক দৃশ্য সাজাতে হয়েছে। তাতে একঘেয়েমিও এসেছে। তা-ছাড়া এমন সিরিয়স বিষয়বস্তু সম্বলিত ছবিতে এত গান কেন? আধুনিক গানের সুর (শৈলেশ রায়-কৃত) ভাল হয়েছে, গান চলবে, সে ভিন্ন কথা। কিন্তু গানের ব্যবহার একাধিক জায়গায় ছবির মর্যাদা নষ্ট করেছে। ফ্ল্যাশব্যাকে সুমিতার মুখে গান না দিলেই ছিল ভাল। সিনেমার নিয়মে প্রেমিক অথবা প্রেমিকার মুখে নির্জনে গান থাকতেই হবে এমন কী কথা। তা-ছাড়া, যেহেতু রোমান্টিক নায়ক হিসাবে স্বরূপ দত্তকে বিশেষ ভাল লাগেনি তাই সম্ভবত ওই মামুলি রোমান্টিক দৃশ্য আরও খারাপ লেগেছে। কর্মব্যস্ত ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে স্বরূপ দত্ত অবশ্য ভালই অভিনয় করেছেন, মাধবী মুখোপাধ্যায়ের (চক্রবর্তী) মুখে যে গান ভাল লাগেনি তার একটি কারণ, ছবির গোড়া থেকেই তাঁকে দর্শকরা অন্য রূপে দেখে এসেছেন। দুটো রূপ যেন কেমন খাপ খায়নি। বিবাহিত জীবনে সুমিতার প্রচণ্ড অভিমান, যন্ত্রণা এবং পরে বিচ্ছেদের সময় তার কষ্ট মাধবী মুখোপাধ্যায় সুন্দর প্রকাশ করেছেন। তাঁর মেয়ের ভূমিকায় বেবি রিঙ্কুকে বেশ লাগে। আর যে-সব চরিত্র রয়েছে তার মধ্যে তরুণকুমারের বৃদ্ধ চমৎকার। শিল্পী এই চরিত্রটিকে কমিক ঢঙে আগাগোড়া চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। প্রেম করতে ব্যস্ত তরুণ-তরুণীরা—অরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শিখা ভট্টাচার্য ও জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাণশক্তির প্রকাশ একটু বেশি দেখিয়েছেন, হৈ-হুল্লা করেছেন বেশ। হয়ত এটা পরিচালকেরই নির্দেশ। তবে এঁদের মধ্যে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায় বেশ স্বচ্ছন্দ।

ছবিটি যে একটু ভিন্ন ধরনের মনে হয়েছে তার মূলে বিষয়বস্তু বা অনেক ক্ষেত্রে পরিচালকের সুন্দর ট্রিটমেন্ট তো আছেই, আরও একটি বড় কারণ দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উঁচু মানের ফটোগ্রাফি। দার্জিলিংয়ের পটভূমিতে তিনি ক্যামেরার কৃতিত্বপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। শট কম্পোজিশনও বেশ শিল্পসম্মত।

বোম্বাই বিচিত্রা

বোম্বাই-এ সংস্কৃতির বাজার দিন দিন সরগরম হচ্ছে। সিনে ক্লাবগুলির সংখ্যা বাড়ছে হু-হু করে। নতুন কায়দায় ড্রইংরুম সাজানোর হিড়িক পড়ে গেছে। সরকারী হ্যাণ্ডিক্রাফটস-এর দোকানগুলো চাহিদার যোগান দিতে পারছে না। আর্ট এক্জিবিশন হলেই ছবি বিক্রি হচ্ছে। শিল্পীদের সঙ্গে উঠতি আর্টিস্টদের আঁতাত হতে শুরু করেছে। তাদের ড্রইংরুমে আড্ডা বসছে প্রায় নিয়মিত। আড্ডা বসা মানেই আলাপ-আলোচনা, আর আলাপ-আলোচনা করতে হলেই নিত্য নতুন 'বিষয়' দরকার। এই 'বিষয়' সংগ্রহের তৎপরতায় এঁরা ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার হচ্ছেন, সন্ধ্যাবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভিড় জমাচ্ছেন। ড্রইংরুম সরগরম হচ্ছে।

অন্যান্য বড় শহরের মত বোম্বাই-এও সকল প্রদেশ-প্রবাসীদের নিজ নিজ সংস্থা আছে, আছে তাদের আপন আপন অনুষ্ঠান। অন্যান্য শহরে প্রবাসীদের অস্তিত্ব অনেকটা পরগাছার মত, কিন্তু বোম্বাই-এ সকল প্রবাসীরা একত্র হয়ে আসল

ম্বাইবাসীরাই পরগাছা সদৃশ হয়ে রবে। প্রবাস বোম্বাই-এ অনেক বাঙালী কে গুজরাতি বা কেরলীয় শিল্পী বা দ্ধিজীবীর আনাগোনা, আবার অনেক রাঠী মহলে বা গুজরাতি মহলে বাঙালী স্কৃতির আধিপত্য। এমনিভাবে, খানিকটা পেশাগত কারণে, খানিকটা ব্যবসাগত কারণে, আর খানিকটা প্রবাস-বাস হেতু ঔদার্যের ন্য এই বিভিন্ন প্রদেশ-প্রবাসীরা একে অন্যের পৃষ্ঠপোষক। ফলস্বরূপ প্রবাস বোম্বাই-এ প্রবাসী সংস্কৃতির আদান-প্রদান দিন দিন বাড়ছে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীরও একটা সুরাহা হচ্ছে। সারা দিন কাটছে বাণিজ্যে, বসতে লক্ষ্মীর পাসনায় আর সন্ধ্যার সান্নিধ্যে সরস্বতী।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বোম্বাই প্রদেশ, ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক কিছু রপ্তানি করে। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্র পরিবর্ধিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় উৎপাদনে পুরোপুরি চাহিদা মিটছে না। সুতরাং সংস্কৃতি আমদানি হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বছরে পাঁচ-সাতটি দল আসছে বাংলা দেশ থেকে, কেউ আসছে নাটক নিয়ে, কেউ বা নৃত্যনাট্য। কেউ বা তার ঝুলি থেকে বার করছে "পুতুল নাচের ইতিকথা" আবার কারুর কাঁধে ভানুমতী-র খেলা। সবই চলছে, কারণ নতুন সাজে সাজা দর্শকের সংখ্যা বোম্বাই-এ ক্রমবর্ধমান।

*

সদ্য প্রতীক্ষিত রাজ কাপুরের 'মেরা নাম জোকার' মুক্তি পেয়েছে। রাজ কাপুরের এই দেশী ছবির প্রিন্ট তৈরি হয়েছে বিদেশে। প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মেরা নাম জোকারই, (রাজের প্রথম ছবি 'আগ'-এর পর) একমাত্র ছবি, যে ছবিতে গীতিকার শৈলেন্দ্রর অনুপস্থিতি সম্ভবত রাজের দর্শক মহলে লক্ষিত হবে। যদিও মেরা নাম জোকার-এর গীতিমালায় শৈলেন্দ্রর লেখা গান আছে, তবু সে গানগুলি শৈলেন্দ্রর জীবদ্দশায় রেকর্ডেড করা গান নয়। রাজ কাপুরের সমস্ত ছবির নাটকই সংগীত-সংগতে গড়ে ওঠে এবং আর কে-র সমস্ত ছবির সাফল্যের পেছনেই ওই সংগীতের দান অসামান্য। রাজ কাপুরের প্রায় সমস্ত ছবিরই নাটকীয় এবং শ্রুতিমধুর গানগুলি কথা-প্রধান সহজ সুরের গান। এই কথাপ্রধান-শ্রুতিমধুর গানগুলির দুই নেপথ্যশিল্পী শৈলেন্দ্র এবং মুকেশ আর কে প্রতিষ্ঠানের দুটি স্ফটিকস্তম্ভ। এর মধ্যে একটি স্তম্ভ আজ নেই। রাজের দ্বিতীয় ছবি বরসাতে "বরসাত মে হামসে মিলে তুম সজন, তুমসে মিলে হাম" শৈলেন্দ্রর লেখা। তারপর আওয়ারার "আওয়ারা হুঁ", শ্রী ৪২০-এর

"চিঠি" (পরিচালনা : নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে অসীম চক্রবর্তী, সন্ধ্যা রায় ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

"মেরা জুতা হায় জাপানী", "দিলকা হাল শুনে দিলবালা", জিস দেশ মে গঙ্গা বহতী হ্যায়-এর "হোঁটোপে সাচাই রহ্‌তি হ্যায়, দিলমে সাফাই রহ্‌তি হ্যায়", "মেরা নাম রাজু ঘরানা আনাম", "ও বাসন্তি পবন পাগল", "প্যার করলে ওরনা ফাঁসি চড় জায়েগা", সংগম-এর "বোল রাধা বোল সংগম হোগা কি নহী", "দোস্ত দোস্ত না রহা", "ও দিল জো প্যার করেগা গানা গায়েগা" এ সমস্ত গানই শৈলেন্দ্রর লেখা, এবং এক-আধটি ছাড়া সমস্তই মুকেশের গাওয়া। "মেরা নাম জোকার"-এ রাজ কাপুর, শংকর-জয়কিষণ, মুকেশ, আব্বাস, হসরত্ জয়পুরী ছাড়াও, ধর্মেন্দ্র, মনোজ, দারা সিং, রাশিয়ান সার্কাস, রাশিয়ান সুন্দরী এবং রাধু কর্মকার আছে—নেই শুধু শৈলেন্দ্র। রাজ কাপুরের চিত্র-জীবন থেকে নার্গিসের প্রস্থানের পরও কিন্তু রাজ তাঁর দর্শকদের তেমনভাবে আশাহত করেন নি নার্গিস-হারা হয়েও! শৈলেন্দ্র-হারা হয়েও রাজ তাঁর দর্শকদের আশাহত করেন নি। দুঃখ শুধু এই যে, রাজ কাপুরের চিত্রজীবনের চরমলগ্নের ফসল কাটার সময় সহজ কবি শৈলেন্দ্র উপস্থিত থাকতে পারল না। এ দুঃখ শুধু রাজের নয়, শুধু শংকর-জয়কিষণের নয়, এ দুঃখ সমগ্র চিত্রসংগীত-জগতের।

সরল শর্মা

লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ভগবদ্‌গীতা

শুধু ফিল্মের গানেই লতা মঙ্গেশকরের সংগীত প্রতিভার সবটুকু পরিচয় নয়। শিল্পীর ক্ষমতা যে আরও কত বেশি তার প্রমাণ আমরা সময় সময় অ-ফিল্মী গানেও পেয়েছি। এবার তিনি যে গুণের পরিচয় দিলেন তার তুলনা নেই। সম্প্রতি দি গ্রামোফোন কোম্পানির এইচ-এম-ভি লং-প্লেয়িং রেকর্ডে শ্রীমতী মঙ্গেশকর ভগবদগীতার দুটি অধ্যায় আবৃত্তি করেছেন—একটি রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ (নবম অধ্যায়), অপরটি ভক্তিযোগ (দ্বাদশ অধ্যায়)। রেকর্ডের দুই দিকে দুটি অধ্যায়ের আবৃত্তি। কেবল আবৃত্তি বললে ভুল হবে, রাগাভিত্তিক সুরে অনুপম কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ। শিল্পীর সংস্কৃত উচ্চারণ অতি সুন্দর। তার চেয়েও বড় কথা, গীতার দুটি অধ্যায় তিনি ভক্তির সঙ্গে আবৃত্তি করেছেন। অর্থাৎ আবৃত্তি কোন মুহূর্তেই শুষ্ক মনে হয়নি। গীতাপাঠ শুনলে শ্রোতার মনে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। শ্রীমতী মঙ্গেশকরের আবৃত্তি শ্রোতাকে সম্ভবত আরও বেশি ভগবদভাবে উদ্দীপ্ত করবে। কারণ শ্রীমতী মঙ্গেশকার শুধু আবৃত্তি ও সুরের সুষ্ঠুতার প্রতিই নজর দেননি, ভক্তির সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ করেছেন।

আবৃত্তি আরও চিত্তাকর্ষক হয়েছে হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সংগীতের গুণে। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে ভগবানের এক একটি উক্তির পর ঘণ্টাধ্বনি এবং দুটি আবৃত্তিরই শেষে আরতিধ্বনি চমৎকার আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই লং-প্লেয়িং রেকর্ড একটি অমূল্য সম্পদ সন্দেহ নেই।

এ-ভি-এম'এর নতুন হিন্দী ছবি

এ-ভি-এম'এর নতুন হিন্দী ছবি "ম্যায় সুন্দর হুঁ" প্রায় শেষ। বিশ্বজিৎ ও লীনা চন্দ্রভারকর ছবির নায়ক-নায়িকা। কৃষ্ণান-পাঞ্জু ছবির পরিচালক। সংগীত পরিচালনা করেছেন শংকর-জয়কিষণ।

তানসেন সংগীত সম্মেলন

নানা গোলমাল ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও শহরের বড় বড় সম্মেলনগুলি একে একে হয়ে যাচ্ছে এটা আনন্দের কথা। মরীয়া কনফারেনস-কর্তারা চৌকি পেতে যাচ্ছেন। সাহসী শিল্পীরা যথাসাধ্য আনন্দ দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যাঁদের জন্য এত পরিশ্রম, এত আয়োজন—সেই শ্রোতারা কোথায়? তাঁদের হাজিরা সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে কেন? ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে ভয় ধরে যায় যে!

তানসেন সংগীত সংস্থার ত্রয়োবিংশ অধিবেশন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ কলকাতার ইন্দিরা সিনেমা হলে। চারদিনের আসর, চারটিই সারা রাত্রির আসর।

"স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে" ছবির ট্রেড-শোতে প্রযোজক আর ডি বনশল, পরিচালক পীযূষ বসু, শিল্পী মাধবী মুখোপাধ্যায়, বেবী রিতু, দিলীপ রায় ও তরুণকুমার

সম্মেলনের স্বর্ণিল অতীতের কথা মনে পড়ে যায়, যখন আসর অত দীর্ঘই হত। শিল্পীও ছিলেন সব বাঘ সিংহ। এখন অফিস কামাই করে গান শোনার ধৈর্যও যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সরস্বতীর বরপুত্ররাই বা সব কোথায়?

অনুষ্ঠান সূচীর প্রথমেই ছিলেন প্রবীণ গায়ক সুবোধ দে। অতি বলিষ্ঠ গলায় তিনি ধ্রুপদ (জয়জয়ন্তী ও পটমঞ্জরী) এবং ধামার (দরবারী) গেয়ে শ্রোতাদের খুশী করে দেন। দিল্লিবাসী আইরিন রায় চৌধুরী ও অনিতা রায়-চৌধুরীর দ্বৈতসংগীত আরও জমা উচিত ছিল। আইরিনের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্টি, একা ঠুমরী গাইলেন যখন চমৎকার লাগল। আবার তানের অংশে অনিতা বেশী তৈরী। কিন্তু দ্বৈতগায়নের পদ্ধতিতে কিছু ত্রুটি থাকায় একের গান অপরের গানকে না বাড়িয়ে কিছু গোলযোগ সৃষ্টি করছিল। এদিনের আসরে অতি উচ্চাঙ্গের অনুষ্ঠান করে গেলেন শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য, সরসতা তাঁর খেয়াল (ঝিনঝোটি) এবং টপ্পা গানে ভালই পাওয়া গেল। আলি আমেদ হোসেন ও সম্প্রদায়ের সানাই (হিন্দোল) বেশ কানে লাগবার মত। বেহালায় বিভা দাস (রাগেশ্রী, রাগমালা) ভাল বাজিয়েছেন। কিন্তু সুনীল দাস ও দীপক ঘোষের দ্বৈত সেতার বাদন ভাল লাগেনি।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হল লতা কুমারী ও অর্জুনকুমারীর কথক নাচ দিয়ে। হৃষীকেশ মুখারজির ছায়ানট রাগে খেয়াল ভালই হয়েছে। রবি কিচলু ও বিজয় কিচলু বড় সহকারে পরিবেশন করলেন ভৈরব। সুনন্দা পট্টনায়ক গাইলেন চন্দ্রকোষ রাগে খেয়াল এবং অতি অপূর্ব দুটি ভজন। শ্যাম গাঙ্গুলী সরোদে হেমন্ত রাগ বাজিয়ে খুবই আনন্দ দিয়েছেন। নিখিল ব্যানারজি তাঁর বিপুল খ্যাতির সম্মান পুরোপুরি রক্ষা করে উপহার দিয়েছেন আহীর ভৈরো ও ভৈরবীর উপর একটি কমপোজিশন। তবলা লহরার অনুষ্ঠানে নবীন শিল্পী স্বপন চৌধুরী ঝাঁপতাল ও ত্রিতালে চমৎকার ছাপ রেখে যান।

তৃতীয় আসরের প্রথম শিল্পী ছিলেন আলো মুখারজি। পূরিয়া ধানেশ্রী রাগে খেয়াল গান করেন তিনি। কৃষ্ণা দাশ-গুপ্তার মারুবেহাগ শ্রোতাদের উচ্চাশা পূর্ণ করেনি। অপূর্ব অনুষ্ঠান করেছেন সেতারী বলরাম পাঠক (আহিরী)। উদীয়-মান বেহালাবাদক মৃণ্ময় ধর (ছায়ানট) খুব তৈরী বাজিয়েছেন। রস সমৃদ্ধির দিকেও তাঁকে এবার নজর দিতে হবে। এ-রাতের শিল্পীদের তালিকায় ছিলেন অধ্যাপক শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু অসুস্থতা-বশত তিনি গাইতে পারেননি। কানাই দত্তর ত্রিতালে নিবদ্ধ তবলা লহরা যথারীতি চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

এই আসরের সর্বপ্রধান আকর্ষণ পদ্ম-ভূষণ বিসমিল্লা খাঁ। সদলবলে আসর জাঁকিয়ে বসে তিনি ফুঁয়ে ফুঁয়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে সুরের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন। তাঁর বৈরাগী ভৈরো গম্ভীর সুন্দর। ধুনটি অত্যন্ত মিঠে। সংগে মুন্সীয়ানার সঙ্গে তবলা বাজান তাঁর বালক-পুত্র।

প্রথম ও তৃতীয়, এই দুটি আসরে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির (বর্তমানে বোমবাইবাসী) শিখভ্রাতৃদ্বয় তেজপাল ও সুরিন্দর সিং। এঁরা যথাক্রমে পরিবেশন করেন কলাবতী, আড়ানা, ললিত ও গুণকেলি। প্রথম দুটি আলো জমেনি। কিন্তু অন্য দুটি রাগ ভাল হয়েছে।

রাস্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এঁরা গান করেছেন। তবলার কাছ থেকে আর একটু সহযোগিতা পেলে গান আরও জমত।

চতুর্থ অধিবেশনের সূচনায় এলেন রোমিলা মিত্র, কথক নাচে। মোটামুটি অনুষ্ঠান। চোখে পড়বার মত; মনে রাখবার মত নয়। সুচিত্রা সেনগুপ্ত ও তপতী সরকারের দ্বৈত খেয়াল (কেদারা) তেমন উৎরায়নি। বেহালায় রবীন ঘোষ হেমবেহাগের রাগরূপটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছিলেন। খেয়াল ও ঠুমরীর আসরে সন্ধ্যা মুখারজি খুব ভাল গেয়েছেন। তাঁর ঠুমরী তো লোকের মন কাড়বেই। খেয়াল (বাগেশ্রী) গানটি গেয়েছেনও বেশ ভরাট গলায়। সেতারে মণিলাল নাগ ইদানীং সব অনুষ্ঠানই সফলভাবে করছেন। এবারকার সুহা কানাড়াও ব্যতিক্রম নয়।

কণ্ঠসংগীতের আসরে অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন মুনাবর আলি খাঁ। জোরালো খোলা গলায় গাওয়া তাঁর গুণকেলি শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেয়। আসর কাঁপিয়ে দেওয়া অমন গান অনেকদিন যেন শুনিনি। ভৈরোতে নিবদ্ধ দাদরাটিও খুব জমেছিল। সবশেষে শ্রোতাদের অনুরোধে পেশ করেন 'আয়ে না বালম'। সতর্ক হয়ে, এবং সুন্দরভাবে।

সরোদিয়া আমজাদ আলির নামের পিছনে বিশেষণ লিখবার আর প্রয়োজন হয় না। কলকাতার আসরে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা এবং পৌনঃপুনিক উপস্থিতি। গুর্জরী টোড়ি রাগরূপের বিশ্লেষণ তিনি করেন অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে। সম্মেলনের সর্বশেষ শিল্পীর উপর যে গুরুদায়িত্ব থাকে, তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

শহরের ছোটবড় সংগীতিয়ারা প্রায় সবাই নানা আসরে অবতীর্ণ হন। এবারের তানসেনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কেরামৎ খাঁ সাহেবের প্রত্যাবর্তন। রেডিও সংগীত সম্মেলনের পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং দীর্ঘ দু-মাস তাঁর তবলা নীরব ছিল। সেই তবলায় আবার সুরেলা চাঁটি পড়ামাত্র সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে যে আনন্দহিল্লোল বয়ে গিয়েছিল তার তুলনা নেই। বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে বাজিয়েছেনও তিনি প্রাণভরে, স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি পেয়েছেন সবার কাছ থেকে। রেওয়াজী শিল্পী মহাপুরুষ মিশ্রের বাজনা দিন দিন কেন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে তা চিন্তার বিষয়। কানাই দত্তর কাছেও আমাদের প্রত্যাশা উচ্চতর। অনিল ভট্টাচার্য, চন্দ্রভান, শংখ চ্যাটারজি, স্বপন চৌধুরী কৃতিত্বের সঙ্গে বাজিয়েছেন। এছাড়া ছিলেন অমর দে, অনিল রায় চৌধুরী ও পংকজ চক্রবর্তী। সারেঙ্গীতে ছিলেন নামী সবাই—সাগীরুদ্দিন, লছমন, রামনাথ, বাচ্চালাল ও কেদার মিশ্র।

হারমোনিয়ামে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ভবানীশংকর মুখারজি ও কৃষ্ণলাল মুখারজি। এছাড়া সর্বপরিচিত আমীর আলি বাজিয়েছিলেন মুনাবর আলি এবং সন্ধ্যা মুখারজির সঙ্গে।

তানসেন কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন ভবিষ্যতে সুভেনিরে শিল্পীদের, অন্তত নবীন শিল্পীদের, সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্র ছাপেন। শ্রোতাসাধারণের কৌতূহল শুধু শিল্পীদের এবং কর্মকর্তাদের ছবি দেখে তৃপ্ত হয় না।

সংগীত সমালোচক

সুরের মেজাজে আমজাদ

ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ সত্যিই সেই সন্ধ্যায় এক আশ্চর্য মেজাজে ছিলেন। সুরের আবেশে তাঁর সমস্ত অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। শুরু থেকেই অনুষ্ঠানটি তাই প্রাণবন্ত, সমবেত শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ। ওস্তাদ আমজাদের সরোদের এই আসরটির আয়োজন করেছিলেন "কনোইশায়ার" গোষ্ঠী, ২৬ ডিসেম্বর, কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে।

বয়স যখন যৌবনকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত হয়, সুরের রাজ্যে যৌবন নাকি ঠিক তখনই আসে। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে সে ব্যতিক্রমের সংখ্যা কররেখা গণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবং সেই ব্যতিক্রমের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম উদাহরণ সম্ভবত ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ—যিনি সবে পঁচিশে পা দিয়েছেন।

ওস্তাদ আমজাদ তাঁর ঘরাণার সঠিক ও সার্বিক অনুসারী কিনা তা সংগীত-পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়, কিন্তু আমজাদ আলী যে ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁর সার্থক এবং গর্বিত উত্তরাধিকারী—সে বিষয়ে সম্ভবত কোন দ্বিমতের অবকাশ কোথাও নেই। আমজাদ আলীর জনপ্রিয়তা এ কথার সাক্ষ্য দেয়।

এই সন্ধ্যায় আমজাদ আলী প্রথমে বাজালেন আভোগী কানাড়া রাগে (আলাপ, জোড় ও ঝালা)। সদ্য-সন্ধ্যায় এই রাগ পরিবেশন হয়তো কোন কোন শ্রোতার মনে প্রশ্ন তুলে থাকতে পারে, কিন্তু আমজাদের স্বভাবসিদ্ধ নিপুণ করসঞ্চালনে যে সুরের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হল তারপর আর ওই জাতীয় ভাবনার অবকাশ কোথায়? শিল্পী কখনো ধ্যানমগ্ন তাপস, কখনো বা উদাসী বাউল; কখনো লাস্যময়ী রঙ্গিনী আবার কখনো বা বিরহিনী ক্রন্দসী। কখনো তিনি শ্রোতার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন তাঁর অধর-প্রান্তের সরস স্নিগ্ধ হাসিটি, কখনো বা আত্মসমাহিত অবস্থায় ফিরে যাচ্ছেন কোন নির্জন প্রান্তরে, যেখানে তিনি একা—শুধুই

ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ ফটো—দেশ

একা। লয়দার হিসাবে তিনি যে কত দক্ষ তা তবলায় উপবিষ্ট কানাই দত্তর সঙ্গে তাঁর সরোদের সওয়াল-জবাবে টের পাওয়া যায়। দু-দুবার কানাই দত্তকে তিনি বুদ্ধির খেলায় পরাজিত করলেন, দর্শকের সহাস্য উপভোগের সঙ্গে কানাই দত্তও মিশিয়ে দিলেন তাঁর পরিতৃপ্ত পরাজিত হাসি। একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে আমজাদের বাহু ছুঁয়ে কেয়াবাৎও জানালেন। একেই তো বলে সত্যিকারের সাংগীতিক পরিমণ্ডল।

আভোগী কানাড়ার বিলম্বিত গতটি ঝাঁপতালে পরিবেশন করলেন আমজাদ আলী। দ্রুত গতে তিনি ত্রিতাল-আশ্রয়ী। ঝালার অংশে বিদ্যুৎগতি অঙ্গুলি সঞ্চালনের সঙ্গে যে প্রচণ্ড গমক তা বার বার শ্রোতাদের করতালির সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। বিরতির ঘোষণাতেও তার বিরাম নেই।

বিরতির পর তিলক কামোদ রাগের অনুষ্ঠানটি আমজাদ সম্ভবত সংক্ষিপ্ত করেছেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, দর্শকদের কথা ভেবে। তিনতালে মসিতখানি গৎ কিংবা ওই তিনতালেই রজাকখানি গৎ-এ তাঁর আরও অনেক কিছুই যে দেবার ছিল তা তাঁর অতৃপ্ত চোখে-মুখে স্পষ্টই প্রতীয়মান। রাত দশটাতেই এমন এক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে এ দুঃখ দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল—যা থেকে শ্রোতারা কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্ত হয়ে এক রসস্নিগ্ধ সুরলোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

—দিবাকর বর্মা

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন প্রসঙ্গ বর্তমান সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ২৪ ডিসেম্বর নব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনুমোদন পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতিকে জানান যে, মন্ত্রিসভা লোকসভা ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছুক। বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতি ওই সুপারিশ গ্রহণ করেছেন এবং ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এদিনই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মত রাষ্ট্রপতি লোকসভা বাতিল করে দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন এখন মধ্যবর্তী নির্বাচনের কর্মসূচী স্থির করবেন। কমিশন এমনভাবে নির্বাচন কর্মসূচী প্রণয়ন করবেন যাতে নতুন সরকার নতুন লোকসভায় ভোট অন অ্যাকাউনটস পাশ করানোর জন্য যথেষ্ট সময় পান। আগামী ৮ মারচের মধ্যে নতুন লোকসভা গঠনের জন্য চেষ্টা করা হবে। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন, তার অন্যতম প্রধান কারণ—সরকার ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ চালাতে পারছেন না এবং দেশবাসীর কাছে তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী আশা করেন, নতুন নির্বাচনপর্ব সময়মতই সম্পূর্ণ হবে এবং চলতি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগেই মারচে নতুন লোকসভার অধিবেশন বসবে। ভারতে লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন এই প্রথম।

দেশী সংবাদ

২১ **ডিসেম্বর**—রাজ্যের আদি কংগ্রেস লখনৌউ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত বজায় রেখেই রাজ্যের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক করবেন, আঁতাত করা হবে কি হবে না। সম্মেলনে এ আই সি সি-র মহাজোট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে কেউ বিদ্রোহ করবেন বলে নেতারা মনে করেন না।

সোমবারের ঘটনায় বিভিন্ন-স্থানে ছয়জন নিহত হয়েছেন। বাশদ্রোণীতে পুলিসের গুলিতে একজন, ছুরিকাঘাতে একজন, বসিরহাটে একজন, দুর্গাপুরে একজন, বালিতে ছুরিকাহত হয়ে একজন নিহত হয়েছেন এ ছাড়া বাগিনা নিশ্চিন্দার একটি রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

২২ **ডিসেম্বর**—আজ বিহার সংযুক্ত দলের নেতা শ্রীকপুরী ঠাকুর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। শ্রীঠাকুর ছাড়া ক্যাবিনেট পর্যায়ে ৯ জন মন্ত্রী ও একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী শপথ নেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এটি হলো বিহারের অষ্টম মন্ত্রিসভা।

আজ রামমোহন সরণীতে (আমহার্স্ট স্ট্রীট) সিটি কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দমকল কর্মীরা বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেও আগুন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনতে পারেননি। জলের অভাবে আগুন নেভাতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। ল্যাবরেটরীটি চারতলায় অবস্থিত ছিল।

২৩ **ডিসেম্বর**—ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর পাইলটদের ধর্মঘট নিয়ে অচলাবস্থার উন্নতির কোন লক্ষণ আজ দেখা যায়নি। এদিকে বিমান কারিগর সমিতির সাধারণ সম্পাদক হুমকি দিয়েছেন—তাঁরা যেকোন মুহূর্তে ধর্মঘট শুরু করতে পারেন।

দুর্নীতির অভিযোগে আজ কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ কলেজ স্ট্রীট মারকেটের সুপারিনটেনডেনট, এক সাব-ইনসপেকটর, একজন সারজেনট ও চারজন কলেকটিং সরকারকে সাসপেনড করেছেন। অভিযোগে প্রকাশ : পণ্য বিক্রেতাদের মধ্যে দশজন। দুর্নীতিপরায়ণরা ধার্য আর কারুর কাছ থেকেই এ দিনের বাজার কর আদায় করা হয়নি।

২৪ **ডিসেম্বর**—নেতাজী তদন্ত কমিশনের বিচারপতি শ্রী জি ডি খোসলা আজ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করলে তাঁকে বিচার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। নেতাজীর নাম যুদ্ধ-অপরাধীদের কোন তালিকাতেই নেই। শ্রীখোশলা বলেন যে, তিনি পূর্ণ অধিকার সহকারেই একথা বলছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ১৮ দিনব্যাপী পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট অবসানের জন্য ট্রেড-ইউনিয়নসমূহ ও ভারতীয় পাটকল সমিতির প্রতিনিধিদের মধ্যে এক মীমাংসা হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য দফতরের উদ্যোগে উভয় পক্ষের চারদিনব্যাপী বৈঠকের পর এই সংবাদ ঘোষণা করা হয়। আগামী সোমবারের মধ্যেই কাজ আরম্ভ হবে।

২৫ **ডিসেম্বর**—আজ প্রত্যুষে পাঁচটার মধ্যে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের চরম নির্দেশ অমান্য করার পর ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর পাইলটরা আজ অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী ডঃ করণ সিংয়ের সঙ্গে স্বেচ্ছায় দুদফা আলোচনার পর রাত্রে নিজেরা আলোচনায় বসেন।

পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-বিরোধী ব্যাপকতম জোট গঠনের উদ্দেশ্যে আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। কিভাবে আট-পার্টির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের একটা নির্বাচনী সমঝোতা করে এরাজ্যে একটা মহাজোট গঠন করা যায় তা নিয়ে কয়েকজন নেতা আজ গোপনে আলাপ আলোচনা করেছেন।

২৬ **ডিসেম্বর**—সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল চায় তাদের যে-সব রাজ্য শাখা সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারগুলিতে যোগ দিচ্ছে, তারা যেন আর্থিক দিক থেকে লাভজনক নয় গ্রামাঞ্চলে এমন জমির ওপর ভূমি-রাজস্ব রহিত করে এবং জমির সর্বোচ্চ সীমা কমানোর জন্য ওই সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

বিহার নবজাত সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রিসভার সামনে উভয়বিধ সংকট দেখা দিয়েছে। এক ঝাড়খণ্ড পার্টির পক্ষে ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার জন্য অবিলম্বে একটি স্বশাসিত উন্নয়ন সংস্থা গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। দুই—কয়েকজন দলত্যাগী এম এল এ জানিয়েছেন, মন্ত্রিত্ব না পেলে তাঁরাও ওয়াক-আউট করবেন।

২৭ **ডিসেম্বর**—লোকসভার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা এবং মণিপুরে বিধানসভার নির্বাচন হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লোকসভার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা বিধানসভা নির্বাচনের পক্ষপাতী। শ্রীমতী গান্ধী এই ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

কলকাতার কূটনৈতিক মহলের খবর ভারত মাসখানেকের মধ্যেই ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে। ভারত সরকার অনুমতি দিলে এখনই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সরকার আরও মাসখানেক দেরি করতে চাইছেন।

বিদেশী সংবাদ

২১ **ডিসেম্বর**—বেলজিয়াম আজ ভারতের সঙ্গে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ফ্রাঁর একটি ঋণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। মেয়াদ ৩০ বছরেরও বেশী। শতকরা দুটাকা হারে সুদ দিতে হবে। এই ঋণের পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে। এর সঙ্গে ঋণ সরবরাহের কোন সম্পর্ক নেই।

২২ **ডিসেম্বর**—পাকিস্তান পিপলস পার্টির শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো গতকাল লাহোরে বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামি লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে ইচ্ছুক। শ্রীভুট্টো বলেন : পশ্চিম জারমানীতে শীল ও ব্রানডন যদি কোয়ালিশন করতে পারেন তাহলে ভুট্টো ও মুজিবর রহমানের মধ্যেই বা তা হবেনা কেন?

২৩ **ডিসেম্বর**—ভুটান রাষ্ট্রপুঞ্জে সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। ভুটানের রাজা ওয়াংচুক রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি-জেনারেলের কাছে এক পত্রে জানিয়েছেন, তাঁর সরকার ও জনগণ এই সদস্যপদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন।

২৪ **ডিসেম্বর**—আজ ঢাকায় এমন কি লীগ সূত্রেও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান শ্রীভুট্টোর মধ্যে একটা সমঝোতা হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়।

২৫ **ডিসেম্বর**—পিকিং পন্থী পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীজেড এ ভুট্টো আজ পুনরায় বলেন পাকিস্তানের সংবিধান রচনার ব্যাপারে তিনি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলেন পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য অবশ্য সংবিধানে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২৬ **ডিসেম্বর**—পশ্চিম জারমানীর কনসাল ইউজিন ভিল-এর অপহরণের জন্য দায়ক জাতীয়তাবাদীরা পঃ জারমান টেলিভিশনের ২ জন কর্মীকে আটক করে রেখেছিলেন। শ্রীভিল নিরাপদে ফিরে আসার পর ওঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওঁদের কোথায় আটক রাখা হয়েছিল তা ওঁরা বলতে পারেননি।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

বিমল মিত্রের কড়ি দিয়ে কিনলাম

সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

প্রথম খণ্ডের একাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল।

॥ দাম কুড়ি টাকা ॥

দ্বিতীয় খণ্ড এখনও চৌদ্দ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

॥ মিত্র ঘোষের নূতন অভিযান ॥

বাংলা পকেট বই

প্রথম কিস্তিতে সাতখানি নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে

এই বইগুলি পুস্তকাকারে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি

লেখকবৃন্দঃ আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অবধূত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নীহার-রঞ্জন গুপ্ত, সুমথনাথ ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

আনুমানিক সওয়াশ' পৃষ্ঠার বই ঃ বহুবর্ণ প্রচ্ছদপট

= মূল্য প্রতিটি মাত্র দু টাকা =

যাঁরা অগ্রিম দুই টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন—তাঁরা এই সাতখানি বই শতকরা কুড়ি টাকা কমিশনে পাবেন—ঐ দুই টাকা সাতটি বইয়ের মোট দাম থেকে বাদ দেওয়া হবে। তবে বইগুলি একসঙ্গে নিতে হবে।

মফঃস্বল এজেন্ট মহাশয়দেরও অপ্রত্যাশিত সুবিধা দেওয়া হবে।

তাঁরা দয়া করে চিঠি লিখে যোগাযোগ করুন।

আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে প্রকাশিত হবে

অবধূতের
মরুতীর্থ হিংলাজ ৬৲

আশাপূর্ণা দেবীর
সুবর্ণলতা ১৩৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
পঞ্চতপা ৬৲

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ১০৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
পূর্বাচল ১১৲

সুমথনাথ ঘোষের
বনরাজীনীলা ৭৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
আমি কান পেতে রই ১৪৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কিরীটি রায় ১১৲

শঙ্কু মহারাজের
নবতম ভ্রমণকাহিনী
গঙ্গাসাগর ৮৲
তীর্থের ইতিহাস সহ পূর্ণ বিবরণ ঃ
বহু চিত্র সহ

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন ৩৪৩৪৯২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সবচেয়ে নতুন, সবচেয়ে মোলায়েম, হাওয়ার চেয়ে হাল্কা লিপস্টিক
ল্যাক্‌মে
আলট্রা-গ্লো
আর
আলট্রা-ফ্রস্ট
লিপস্টিক
নানা রঙে রঙীন ঝলকানি—
এঁকে চলে রেশমী মসৃণ গতিতে
ঠোঁটের এই রঙের মেলা, দেখে হয় মন উতলা
ASP/L-79

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

নির্মল বার সাবানই পাচ্ছেন তা বুঝবেন কি করে?

যা-ই কিনুন তা পুরোপুরি খাঁটি কি না
না-দেখেই সরল বিশ্বাসে হয় তো
নিয়ে নেন। কিন্তু সাবধান!
নির্মল বার সাবানের হুবহু নকল
বাজারে বেরিয়েছে।
বাইরে থেকে দেখলে মনে
হবে যেন একই।

Nirmal
BAR SOAP

এবার থেকে যখুনি
নির্মল বার সাবান কিনবেন,
জিনিসটা কুসুম প্রোডাক্টস
লিমিটেড-এর তৈরী কি না
দেখে নিলে আর
ঠকতে হবে না। নকল
মালের হদিশ পেলেই
আমাদের জানান, যাতে
খাঁটি নির্মল পেতে আমরা
আপনাকে সাহায্য
করতে পারি।

নির্মল
বার সাবান

পূর্ব-ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে।

KPN 6103A

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১
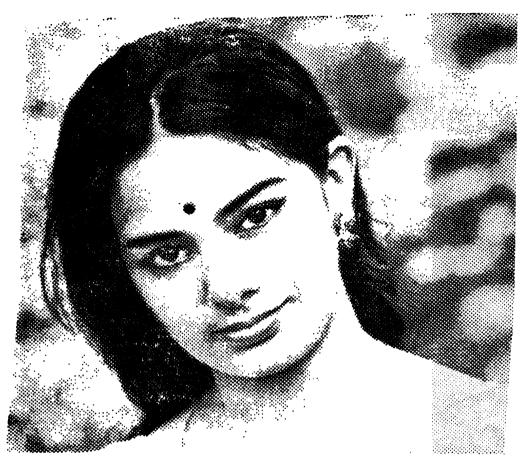
অপরূপ কোমল জয়
আপনার রূপরঙে আনে
চিরতারুণ্যের আভা

আপনার সাবানটি এমন হওয়া উচিৎ
সেটি আপনার প্রতিটি রোমকূপকেও
পরিষ্কার করে তুলবে এবং চামড়া নরম
করার তেলের অভাব পূরণ করবে। জয়
সাবানের মোলায়েম ফেনার ঠিক এটাই
হ'ল বিশেষত্ব। এটি আপনার চামড়াতে
আনে সতেজ নির্মল কমনীয়তা।
জয় সাবানের অপূর্ব চামেলীর গন্ধ শেষ
অংশটুকু ক্ষয়ে না যাওয়া পর্যন্ত
অটুট থাকে।

টাটার
তৈরী

চিরতারুণ্যের আভা আনে জয় সৌন্দর্য্য সাবান

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ ১০ সংখ্যা
শনিবার, ২৪ পৌষ ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষান্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষান্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষান্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষান্মাসিক ,,	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষান্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 9 Jan. 1971

একটি পাপ ও আমরা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গোপালচন্দ্র সেন গত বুধবার, তিরিশে ডিসেম্বর, সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের মধ্যে আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়েছেন। সর্বজনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয়, পণ্ডিত ও বিশিষ্ট একজন শিক্ষাব্রতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার বিশেষ মুহূর্তে কেন নিহত হলেন, কোন্ অপরাধে—এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আমরা জানি না। শুধু এইমাত্র জানি : কবে কোন অতীতে তিনি এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন, তারপর সুদীর্ঘ-কাল এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষক এবং পরে উপাচার্য হিসেবে যুক্ত থেকে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার সময় এই আজীবনের কর্মসাধনার স্থানটিতে দাঁড়িয়েই বিদায় নিয়েছেন। এই বিদায় অবশ্যই গৌরবের, কিন্তু স্বাভাবিক নয় ; কয়েকজন গুপ্ত ঘাতক বর্বরের মতন, কাপুরুষের মতন, হিংস্র ইতর জীবের মতন এক প্রায়-বৃদ্ধ, অসহায়, শিক্ষককে নির্বিচারে হত্যা করে পলায়ন করেছে। যিনি জীবনের সহজ কাম্য—অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি সবই উপেক্ষা করে আদর্শ শিক্ষকের মতন তাঁর সাধের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন—তাঁর এই পরিণতি—নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক। সারা জীবনের সাধনার এই বুঝি প্রতিদান? আমাদের এই বিচিত্র সংসারে এমন প্রতিদান ভাগ্যে না জোটে এমন নয়; গান্ধীজীর জীবনেও জুটেছিল। যখন আর কোনো সান্ত্বনা থাকে না, কথা জোটে না, বিচার-বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়—তখন আমরা মনে মনে এমন কথাই বলি।

ডঃ সেনের আততায়ী কারা, একজন প্রবীণ শিক্ষাব্রতীর অবশিষ্ট আয়ু এবং রক্ত কোন বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন হল আমরা জানি না; বুঝতে পারি না, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এই পৈশাচিক কীর্তি! যে পিশাচ-বৃত্তি আজকাল বাংলা দেশের যত্রতত্র নিত্যদিন আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে অকুণ্ঠচিত্তেই বলা যায়, এই বাংলার নরম মাটিতে রক্ত-বারি বর্ষণের এক গোপন যজ্ঞ চলেছে। নির্বিচার হত্যা—নারী পুরুষ, শিশু যুবা, বৃদ্ধ, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, বেকার যুবক—কোনো বাদ বিচার নেই, একমাত্র উদ্দেশ্য নরহত্যা, সন্ত্রাসকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। এই হত্যা এবং সন্ত্রাস আমাদের কী দেবে? সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা? অর্থনৈতিক স্বাধীনতা? নতুন মূল্যবোধ? জীবনের প্রতি নিষ্ঠা? প্রেম ভালবাসা? অথবা আমরা সন্ত্রস্ত, ভীত, নির্বাক, ব্যাধিগ্রস্ত, রুগ্ন মেষশাবকে পরিণত হয়ে যাব? সে লক্ষণ কী আজও ফুটে ওঠেনি? আমরা কী দেখতে পাচ্ছি না, বাংলা দেশের মহা মহা বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলি ভোট জেতার কলা-কৌশল ও আসন দখলের কর্তব্য ছাড়া অন্য কোনো কর্তব্য পালনে নীরব থাকছে কেন? আমরা কী দেখি না, মিছিলে যারা সি আর পি-কে 'কুত্তা' বলে চেল্লায় সেই বীরের দলের অনেকেই নিজের নিজের এলাকা ছেড়ে পলাতক? কেন? কোন ভয়ে? কী এমন ঘটে গেল যে, বিচক্ষণ নেতারা দলবল এবং পুলিসের গাড়ি পিছনে রেখে ঘোরাফেরা করেন? স্কুল কলেজের দরজা প্রায়শই বন্ধ রাখতে হচ্ছে কেন? আর সাধারণ মানুষ কেনই বা স্থান-কাল-পাত্রভেদে কোনো রকমে গা বাঁচিয়ে বেঁচে আছে! এ কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের এখানে সেই বীভৎস নরঘাতী রাজনীতির বীজ বপন হয়ে গেছে—যে-রাজনীতি মানুষের বিচার বিবেচনাকে বিন্দুমাত্র মূল্য দেয় না, মূল্য দেয় সন্ত্রাসকে। জীবনের ভয়ে, প্রাণের ভয়ে, স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করার দুশ্চিন্তায় এবং দুর্বলতায় মানুষ যত সহজে মাথা নীচু করে নেয়, তত আর অন্য কিছুতে নয়। বলা বাহুল্য, আমরা সেই রাজনীতির অসহায় শিকার হয়ে পড়েছি। যত দিন যাবে, ততই তার অনুগত হয়ে যাবে।

ঠিক এমন সময়, ডঃ গোপালচন্দ্র সেনের এই মর্মান্তিক মৃত্যু একটি শিক্ষা হতে পারে। বাংলার মানুষের কাছে, ছাত্র সমাজের কাছে—আজও যাঁদের মনে শ্রদ্ধা রয়েছে, তাঁদের কাছে এই ঘটনাটি আমাদের আরও একটি মহা পাপ বলে মনে হোক। এই পাপ—আমার ও তোমার! সেই সন্ধ্যাটিকে যে বর্বররা কলঙ্কিত করল—তারা আকাশ থেকে পড়ে নি, এই সমাজেরই জীব। অমন জীব দুই চার বা দশ নয়, এই সমাজেরই কোথাও গোপনে মারাত্মক বীজাণুর মতন বংশবৃদ্ধি করছে। আর তার চেহারা এক নয়, নানা রকম, তবে তার চরিত্র এক—সেটা হিংসা এবং হত্যার। আমরা যদি আজও তা বুঝতে না চাই, সে পাপের মূল্য ভবিষ্যতে আমাদের দিতে হবে। তার মূল্য, ইতিহাস বলে, খুব একটা সামান্য নয়।

আরেক চমক!
মধ্যবর্তী
নির্বাচন

অথ U. L. F বা উলফের পুনরুত্থান কথা

মোহন লিখিত "যীশু মৃত লাসারকে জীবন দেন"—এই সুসমাচারই অদ্যকার চাষের প্রেরণা৷

পশ্চিমবঙ্গে একদা নির্বাচন-বৈতরণী পার হইবার নিমিত্ত সর্বহারার বান্ধবদিগের দুইটি জোট হইয়াছিল। উলফে নামে একটি জোটকে এবং পুলফ (P. U. L. F) নামে আরেকটি জোটকে যথাকালে বাপ্তাইজ করা হইয়াছিল। যদিও উলফ এবং পুলফ এই উভয়ের বর্ণই লাল এবং উভয়ের নয়ন হইতে সর্বহারার নাম শ্রবণমাত্র প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়িত তথাপি একবার নির্বাচনী কুরুক্ষেত্রে উলফে ও পুলফ একে অন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। কারণ স্বরূপ উলফ বলিয়াছিল, উলফই একমাত্র আগমার্কা সর্বহারাপ্রেমী, পুলফের আগাগোড়া ভেজাল। এবং পুলফ বলিয়াছিল, পুলফই একমাত্র আগমার্কা সর্বহারাপ্রেমী, উলফের ভিতরের মাল ভেজাল এবং উপরের ট্রেডমার্কটা জাল। পুলফ অতঃপর বিজ্ঞাপনে আন্তর্জাতিক ট্রেডমার্ক ছাপিয়া দিয়াছিল। নির্বাচনের পর হঠাৎ উলফ ও পুলফ উপলব্ধি করিল কে আসল আর কে জাল, এই বিষয়টি প্রমাণ করিবার জন্য শক্তিক্ষয় মূর্খতা মাত্র। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সর্বহারাগণের খাঁটি জিনিস ভোগ করিবার কোনও ঐতিহ্যই গড়িয়া উঠে নাই, যেহেতু তাহারা পুরুষানুক্রমে জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি ভেজালেই অভ্যস্ত।

অতএব উলফ ও পুলফ পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, এই রাজ্যের সর্বহারাদিগকে খাঁটি প্রোলেতারিয়েত সরকার দিলে উহাদের হজমের গোলমাল হইতে পারে. অতএব লঘুপাক একটা ভেজাল সরকার গঠন করিয়া উহাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখাই কর্তব্য। এইরূপে মহান কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উলফ ও পুলফ একে অপরের সহিত মিশিয়া গেল। মিশিবার সপক্ষে উলফ ও পুলফের হিসাবটা ছিল এইরূপ : উলফ খাঁটি+পুলফ ভেজাল=ভেজাল অথবা পুলফ খাঁটি+উলফ ভেজাল=ভেজাল, অথবা উলফ ভেজাল+পুলফ ভেজাল=ভেজাল। অর্থাৎ যেভাবেই মেশানো হউক না কেন, দেখা গেল, উলফ পুলফ মিশ্রিত সরকার একটি খাঁটি ভেজাল সরকার হইতে বাধ্য। ফলাফল এইরূপ ধ্রুব দেখিয়া উলফ ও পুলফ নিশ্চিন্ত মনে একে অপরের সহিত রাজনৈতিক প্রেম করিল এবং পরস্পর মিশিয়া গেল। অতঃপর উলফ ও পুলফের কবরের উপর এই রাজ্যে পর পর দুইবার স্বল্পায়ু বিশিষ্ট যুক্তফ্রন্ট বা ভেজাল সরকার ভূমিষ্ঠ হইলেন এবং অকালে শোক সাগরে ভাসাইয়া পর পর দুইবার ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এবং উলফ ও পুলফ কবরস্থই রহিলেন। ইহাই হইল পূর্ব কথা।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন নির্বাচনী সদাপ্রভুর নিকটে আসিয়া এক প্রিয়পাত্র কহিলেন, প্রভু, দেখুন, আপনি যাহাকে (অর্থাৎ উলফকে) ভালবাসেন, কবরের অন্ধকারে থাকিতে
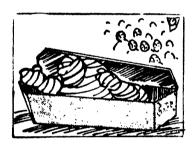
থাকিতে সে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। প্রভু কহিলেন, এ পীড়া মৃত্যুর জন্য হয় নাই, কিন্তু সি পি এম-এর গৌরবের নিমিত্ত, যেন সি পি এম কমরেডগণ ইহার দ্বারা গৌরবান্বিত হন। কেননা সি পি এমই উলফের হস্ত পদ প্লীহা যকৃৎ পিত্তাশয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অন্ত্র ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড সম্বলিত দেহ এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মুণ্ড এবং সি পি এমই উলফের অস্থি উপাস্থি সহ পায়ু। সি পি এমই উলফের অপান বায়ু ও প্রাণ। অন্যান্য যে দল সকল উলফের উপাদান হিসাবে আছে তাহারা ব্রহ্মতালু হইতে পদনখ পর্যন্ত সন্নিবিষ্ট উলফের শরীর-দেশের কুঞ্চিত কেশ ও রোমরাজিমাত্র, তাহার বেশি কিছু নহে। অতএব উলফের অভ্যুত্থানে সি পি এমই গৌরব পাইবে। তোমরা বিচলিত হইও না।

নির্বাচনী সদাপ্রভু উলফ এবং তাঁহার উপাদানসমূহকে প্রেম করিতেন। যখন তিনি শুনিলেন উলফ কবরে শায়িত হইয়া পীড়া বোধ করিতেছে, তখন যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে আর কিছু দিবস রহিলেন। ইহার পরে তিনি কহিলেন, আইস, এবার আমরা উলফের নিকট যাই। তখন কয়েকজন প্রিয়পাত্র কহিলেন, সি পি এম আপনাকে পাথর মারিবার চেষ্টা করিতেছিল, তবু আপনি সেখানে যাইতেছেন। নির্বাচনে উহাদের বিশ্বাস নাই, উহারা বিপ্লব চাহে। প্রভু উত্তর করিলেন, সি পি এম বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। 'হয় নির্বাচন, নতুবা বিপ্লবে' বিশ্বাস করে। কেন না, আমাতে আশ্রয় না করিয়া উহাদের উপায় নাই। কারণ উহাদের নেতারা সকলেই বুড়া হইয়াছে। গাড়ি ছাড়া কেহই আর এখন গতর নাড়াইতে পারে না। তিন বেলা যথাসময়ে খোরাক না পাইলে উহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্তই কাতর হইয়া পড়ে।

নির্বাচনী সদাপ্রভু কহিলেন, যদি কেহ দিনে চলে, সে উছোট খায় না, কেননা সে এই জগতের দীপ্তি দেখে। যদি কেহ রাত্রিতে চলে, সে উছোট খায়, কেননা দীপ্তি তাহার মধ্যে নাই। উহাদের নেতারা জানে বিপ্লবের দীপ্তি উহাদের মধ্যে নাই, উহাদের মধ্যে শুধু বিপ্লবের ধোঁয়া আছে। অতএব জানিও উহারা কদাপি বিপ্লব করিতে পারিবে না। 'হয় নির্বাচন, নয় বিপ্লব' করিবে অর্থাৎ নির্বাচন করিবে অর্থাৎ আমাতেই আশ্রয় লইবে।

তিনি এই কথা কহিলেন; আর ইহার পরে প্রিয়জনদিগকে বলিলেন, অতএব চল, আমাদের বন্ধু উলফ কবরে নিদ্রা গিয়াছে, তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইতে যাই। তখন প্রিয়জনেরা কহিলেন, প্রভু, সে যদি নিদ্রা গিয়া থাকে, তবে রক্ষা পাইবে। প্রভু উলফের মৃত্যুর কথাই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয়জনেরা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা মনে করিলেন যে তিনি নিদ্রাঘটিত বিশ্রামের কথা বলিতেছেন। অতএব প্রভু তখন স্পষ্টরূপে তাঁহাদিগকে কহিলেন, উলফ মরিয়াছে, তথাপি চল, আমরা তাহার কাছে যাই।

অতঃপর উলফ যেখানে কবরস্থ আছে নির্বাচনী সদাপ্রভু তথায় গমন করিলে চারি-দিকে তাঁহার আগমন বার্তা ছড়াইয়া পড়িল। অনেক লোক সেখানে আসিয়া জড় হইল। প্রভু তাঁহাদিগকে কহিলেন, উলফ আবার উঠিবে। একজন তাঁহাকে বিশ্বাসভরে কহিল, আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানে সে উঠিবে। নির্বাচনী সদাপ্রভু কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে। আর যে কেহ জীবিত আছে এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না। এই কথা বলিয়া প্রভু কহিলেন, কবরের পাথর সরাইয়া ফেল। তারপর তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া বলিলেন, উলফ, বাহিরে আইস। তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন; তাঁহার চরণ ও হস্ত কবর-বস্ত্রে বাঁধা ছিল এবং মুখ গামছায় বাঁধা ছিল। প্রভু কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া দাও ও যাইতে দাও। আমেন।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গেই বিধানসভার নির্বাচন হবে কিনা তা নিয়ে এখন জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। এই লেখা যখন ছেপে বের হবে ততদিনে নিশ্চয়ই এ প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর রায়ও বেরিয়ে গিয়েছে। ততদিনে সকলেই জানতে পেরেছেন, পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন এক সঙ্গে হচ্ছে কিনা।

আইনত বিধানসভার নির্বাচন এখন না করেও পারা যেতে পারে। কিন্তু লোকসভার নির্বাচন এখন করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি লোকসভা আসনে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা যোগ না দেওয়া অবধি লোকসভা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হতে পারবে না। তাই নতুন লোকসভা চালু করতে হলে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন করতেই হবে। দাঙ্গাহাঙ্গামায় দিন

৫০ বা ১০০ বা ১০০০ লোক মারা গেলেও লোকসভার নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে করতেই হবে।

অন্যান্য রাজ্যে লোকসভার নির্বাচন করে পশ্চিমবঙ্গে আপাতত লোকসভার নির্বাচন বন্ধ রাখলে লোকসভা বসানো যাবে না। আবার, লোকসভা না বসানো গেলে বাজেট ইত্যাদি পাস করানো যাবে না। ৩১ মার্চের মধ্যে বাজেট পাস করতেই হবে। তাই মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে নতুন লোকসভা বসাতেই হবে। আবার, মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে নতুন লোকসভা বসাতে গেলে ওই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সব আসনে নির্বাচন শেষ করতেই হবে।

প্রত্যেকবার সাধারণ নির্বাচন যখন হয় তখনও লোকসভা থাকে। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও পুরনো লোকসভার একটা স্বল্পকালীন অধিবেশন হয়। সংসদীয় পরিভাষায় তাকে বলা হয় লেম ডাক সেশন। এবার কিন্তু নির্বাচনের সময় লোকসভা নেই। এখন তাই সংবিধানকে চালু রাখতে হলে লোকসভার নির্বাচন সম্পূর্ণ করতেই হবে। যখন সাধারণ নির্বাচনের সময় লোকসভা চালু থাকত তখন কোনও কারণে লোকসভার নির্বাচন আটকে গেলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে কিছুদিন পুরনো লোকসভা দিয়েও কাজ চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু এবার তা সম্ভব নয়। এবার সংবিধান চালু রাখতে হলে যেন তেন প্রকারেণ লোকসভার নির্বাচন করতেই হবে। সংসদ ছাড়া ছ' মাসের বেশী রাজত্ব চলতে পারে না। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিও কিছু করতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সংবিধানের কতকগুলি ধারা বাতিল রেখে রাজত্ব চালাতে চাইলেও সংসদের অনুমোদন চাই। সংসদের অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছামত বেশী দিন জরুরী অবস্থাও চালাতে পারেন না।

সুতরাং, সংবিধান চালু রাখতে হলে লোকসভা চালু করতেই হবে। জরুরী অবস্থায়ও লোকসভা চাই। লোকসভা চালু করতে হলে আবার পশ্চিমবঙ্গের ৪০টি লোকসভা আসনেও নির্বাচন করতেই হবে।

যদি এখন কোনও কারণে কোনও রাজ্যে নির্বাচন আটকে যায় তাহলে সংবিধান বাতিল হতে বাধ্য। তখন কোনও ধরনের একনায়কত্ব চালু হতে পারে, কেউ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতায় থাকতে পারেন বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পারেন—কিন্তু সংবিধানের নিয়ম-কানুন মত আর রাষ্ট্র চলতে পারবে না।

তাই, সংবিধান চালু রাখতে হলে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন করতেই হবে।

✻

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ক্ষেত্রে অবস্থাটা তা নয়। ছয় মাস অন্তর সংসদের অনুমোদন নিয়ে আরও বছর দুয়েক পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু রাখা যায়। তাই, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন এখনো না করলেও চলে। প্রধানমন্ত্রী যদি আজ সিদ্ধান্ত নেন যে লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন হবে না তাহলে কেউ তাঁকে আইনত কিছুই করতে পারেন না। কারণ, আইনতই তেমন ব্যবস্থা করার অধিকার তাঁর আছে।

কিন্তু নির্বাচনে আইনের চেয়েও রাজনীতির প্রশ্ন বড়। রাজনৈতিকভাবে যদি বিচার করা হয় তাহলে বলতেই হবে, পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন হতে পারলে বিধানসভার নির্বাচন না হতে পারার কোনও কারণ নেই।

আইন ও শৃংখলার প্রশ্নটা উঠছে এই প্রসঙ্গে বারে বারে। এর আগের সপ্তাহে আমি আলোচনা করেছি এই প্রশ্নটা। আমার নিজের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গে এখন স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের মত আবহাওয়া নেই। যে রাজ্যে সব মানুষ সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না, যে রাজ্যে অধিকাংশ মানুষ প্রকাশ্যে কোনও রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করতে সাহস পায় না, যে রাজ্যে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এবং পুলিস সদাসর্বদা গুপ্তঘাতকের ভয়ে ভীত, সেখানে স্বাধীন নির্বাচন, স্বাধীন ভোটাভুটি অসম্ভব।

তবু এই পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন করতেই হবে। যদি প্রতিদিন ১০০০ লোকও খুন হয় তাহলেও করতে হবে। আর না হয়, সংবিধানকে বাতিল করে দিতে হবে। যদি পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার নির্বাচন সম্ভব হয় তাহলে বিধানসভার নির্বাচন সম্ভব হবে না কেন? অসুস্থ, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে লোকসভার নির্বাচন হতে পারলে বিধানসভার নির্বাচন হতে পারবে না? কেউই এটা নিশ্চয়ই বলবেন না যে লোকসভার ভোটাভুটির স্বাধীন পরিবেশ না হলেও চলবে, কিন্তু বিধানসভার নির্বাচনের জন্য সুস্থ পরিবেশ চাই-ই।

তাই, যদি লোকসভায় নির্বাচন হতে পারে তাহলে বিধানসভার নির্বাচনও হতে পারা উচিত। একই পরিবেশ, একই রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক পরিস্থিতি, একই নির্বাচন কেন্দ্র—ফারাক শুধু বাক্সে। লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন এক সঙ্গে হলে দুটো বাক্স থাকবে। ভোটদাতা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ঢুকে দুটো বাক্সে ভোটপত্র ফেলবেন। আর শুধু লোকসভার নির্বাচন হলে একটা বাক্সে ভোটপত্র ফেলতে হবে। একটা নির্বাচন হলেও প্রচার যুদ্ধ চলবে, রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি হবে, ভোটদাতাকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যেতে হবে। আবার দুটো নির্বাচন একসঙ্গে হলেও ওর সবই হবে।

✻

তবে হ্যাঁ, লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে হলে উত্তেজনাটা নিশ্চয়ই কিছুটা বেশী সৃষ্টি হবে। কারণ, রাজ্যের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই রাজ্য বিধানসভা এবং রাজ্য সরকার নিয়ে বেশী চিন্তিত। সি পি এম, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ারড ব্লক, এস ইউ সি, আর এস পি প্রভৃতি দল আঞ্চলিক পারটি। তাঁদের সামনে কেন্দ্রে সরকার গঠনের প্রশ্ন নেই। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী সরকার নিয়ে বেশী চিন্তিত। তার উপর তাঁদের অধিকাংশেরই মরণ বাঁচন নির্ভর করছে। সুতরাং, বিধানসভার নির্বাচনে তাঁরা যেভাবে নামবেন ঠিক ততটা প্রাণপণ লড়াই লোকসভা নিয়ে করবেন না বলেই অনেকে অনুমান করছেন।

এই অনুমানে অবশ্য কিছুটা ভুল আছে। যদি লোকসভার নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচনের আগে হয় তাহলে অন্য এক কারণে সবাই সেই নির্বাচনেও প্রাণপণ লড়াইয়ে নামতে বাধ্য। লোকসভার নির্বাচনের ফলাফলে নিশ্চয়ই জনমতের ট্রেনড বোঝা যাবে। অন্তত সাধারণ মানুষ ধরে নেবে যে, লোকসভার নির্বাচনে যে ফলাফল হবে সেইটাই জনমতের ট্রেনড। বিধানসভার ফলাফলও সেই ধাঁচেই হবে। তাই, সব দল লোকসভার ফলাফলকে প্রাণপণে নিজের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। যাতে বিধানসভার নির্বাচনের সময় লোকসভার ফলাফল দেখিয়ে তাঁরা বলতে পারেন আমরাই জিতব। তাই, শুধু লোকসভার নির্বাচন হলেও এবার পশ্চিমবঙ্গে তাতে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। কারণ, এই নির্বাচনের ফলাফল মোটামুটিভাবে বলে দেবে বিধানসভার নির্বাচনে কোন দল বা গোষ্ঠী জিতবেন।

আর যদি শুধু নকশালপন্থীদের কথা ধরা যায়, তাঁদের দৃষ্টিতে সব নির্বাচনই সমান। তাঁরা যদি নির্বাচনের বিরোধিতা করেন, যদি নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা দিতে চান, তাহলে শুধু লোকসভার নির্বাচন হলেও বাধা দেবেন, আবার একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন হলেও তাতে বাধা দেবেন।

নকশালপন্থীরা কী করবেন, এটা অবশ্য এখনও কেউই জানেন না। চারুবাবু নির্বাচন লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন, আবার নির্বাচনকে পুরোপুরি উপেক্ষা করার জন্যও কর্মীদের হুকুম দিতে পারেন।

তবে, নির্বাচন হতে দিতে তিনি চাইবেন না চাইবেন না, সেটা অজানা থাকলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে চারুবাবু পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম সরকার গঠনে প্রাণপণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেনই। সি পি এম যদি কোনও মতে পশ্চিমবঙ্গে সরকার দখল করতে পারেন তাহলে তাঁরা সকলের আগে নকশালপন্থীদের খতম করবেন। এটা সবাই জানেন যে তখন কেউই চিৎকার করে সেই খতম অভিযানকে ঠেকাতে পারবেন না। ক্ষমতা হাতে পেলে কমিউনিস্টরা কীভাবে তা ব্যবহার করেন, এটা যুক্ত ফ্রন্টের রাজত্বে সবাই কিছুটা কিছুটা দেখেছেন।

৩-১-৭১

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

দোটানা

গেল বছরের পনেরোই জুন রুশী পুলিস লেনিনগ্রাডের স্মোলনি বিমান বন্দরে জন বারো লোককে গ্রেপ্তার করে। তারা নাকি একটা প্লেন জবরদখল করে সুইডেনে পাড়ি দেবার মতলব ভেঁজেছিল। এরা সবাই রুশ নাগরিক, দুজন ছাড়া সবাই আবার জাতে ইহুদি। তাদের বাড়ি সোভিয়েট লাটভিয়ার রিগা শহরে। শোনা গেল যদিও বিমানে চড়ে বসতে পারলে তারা প্লেটাকে জোর করে সুইডেনের বোডেন শহরে নামাতো সে দেশে থাকার ইচ্ছে তাদের ছিল না—বিশেষ করে যারা ছিল তাদের মধ্যে ইহুদি। ওরা চেয়েছিল ইহুদিদের মাতৃভূমি ইস্রায়েলে গিয়ে বসবাস করতে। তাদের কেউ কেউ নাকি রুশ সরকারের কাছে ইস্রায়েলে চলে যাবার জন্যে ছাড়পত্র চেয়েছিল। সে ছাড়পত্র মেলেনি বলে তারা বিমান জবরদখল করে নিজেদের মতলব হাসিল করার ফন্দি এঁটেছিল। অন্তত নিজেদের কাজের সেই কৈফিয়তই দিয়েছেন ধরা-পড়া ইহুদিদের একজন—আনাটোলি আলট্মান।

স্মোলনি বিমানবন্দরে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে এগারো জনের বিচার হয়ে গিয়েছে ডিসেম্বর মাসে লেনিনগ্রাড শহরে। তাদের খানাতল্লাসি করে পাওয়া গিয়েছে রিভলভার, গুলি, বারুদ, কুড়ুল ফাঁস, ঠুলি, আরও কত কী। সঙ্গে সঙ্গে উড়োজাহাজে সুইডেনে পৌঁছুবার পথের নিশানাও। চালককে কাবু করে বিমান কেড়ে নেওয়ার জন্যে যা কিছু সরঞ্জাম দরকার সে সবই তাদের কাছে ছিল বলেই জানানো হয়েছে রুশ সরকারের তরফ থেকে। জেরায় তারা নাকি কবুলও করেছে তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল। তারা সবাই স্বীকার করেছে সোভিয়েট দেশে তাদের আর মন টিঁকছে না—তারা চলে যেতে চায় দুনিয়াতে ইহুদিদের স্বর্গরাজ্য ইস্রায়েলে যেখানে আরও অনেক ইহুদি ঘর বেঁধেছে রুশিয়া থেকে। এমন কথাও তাদের কেউ কেউ বলেছে সোজা পথে ইস্রায়েলে যেতে না পেরে তারা ওই বাঁকা পথ ধরতে গিয়েছিল—তাদের যদি দেশ ছেড়ে ইস্রায়েলে যাবার অনুমতি দেওয়া হতো তা হলে তারা যে কাণ্ড করেছে তা কখনই করতো না।

লেনিনগ্রাড কোর্ট অবশ্য আসামীদের কৈফিয়ত যথেষ্ট বলে মনে করেননি। তাদের রায়ে আসামীদের সকলেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। ফাঁসির হুকুম হয়েছে দু' জনের—মার্ক ডাইমশিট্সের আর এডুয়ার্ড কুজনেৎসফের। বাকী সকলের জেল হয়েছে ৪ বছর থেকে ১৫ বছর, সব মিলিয়ে ১০ বছর। সকলেই ধরে নিয়েছিল ডাইমশিট্স্ আর কুজনেৎসেফের এ যাত্রা আর রক্ষে নেই, তাঁদের সাক্ষাৎ যমে ধরেছে। কিন্তু সকলকে তাজ্জব বানিয়ে ৩১ ডিসেম্বর সোভিয়েট সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের প্রাণদণ্ড মকুব করেছেন। তাঁদের অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়নি—তাঁরা কেন, আসামী এগারো জনের কেউই খালাস হননি। তবে যাঁদের চরম দণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁদের পনেরো বছরের জেল হয়েছে। ওর বেশী ধরে রাখার নিয়ম নাকি রুশীদের আইনে নেই। অন্যদের বরাতেও ছিটেফোঁটা করুণা কিছু মিলেছে। প্রায় প্রত্যেকেরই জেলের মেয়াদ কিছু কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও সব মিলিয়ে তাঁদের জেল খাটতে হবে ১২৩ বছর। কুজনেৎসফের বউ শ্রীমতী সিলভা জালমানসনের বেলায় সুপ্রিম কোর্ট দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাননি—তাঁর সাবেক শাস্তি—দশ বছরের জেল—বহাল আছে।

লেনিনগ্রাডের মামলা নিয়ে তো দারুণ শোরগোল হয়েছে সারা দুনিয়ায়। সবচেয়ে বেশী হইচই করেছে ইস্রায়েল আর আমেরিকা—ইহুদিদের স্বদেশ আর তাদের বান্ধব। অন্য দেশেও কিন্তু এ নিয়ে বিরূপ সমালোচনাই হয়েছে। লেনিনগ্রাডের রায় সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করতে ইউরোপের কম্যুনিস্টরাও ছাড়েনি। ফরাসী কম্যুনিস্টদের মুখপত্রে বলা হয়েছে—অপরাধের সঙ্গে রায়ের কোনও সামঞ্জস্য নেই। তারই সুরের সঙ্গে যেন সুর মিলিয়ে ইটালিয়ান কম্যুনিস্ট দলের কাগজে বলা হয়েছে লেনিনগ্রাডে বিচার চালানোর আর তার রায়ে এমন অনেক জিনিস আছে যা বোঝা শক্ত। দুটো পত্রিকাতেই বিচার গোপনে করার নিন্দে করা হয়েছে। ইস্রায়েলের পার্লামেণ্ট তো তাদের বৈঠকে খোলাখুলি প্রস্তাব পাস করেছে লেনিনগ্রাড আসামীদের মুক্তি দেওয়ার জন্যে। অতটা না বললেও প্রাণদণ্ড যাঁদের দেওয়া হয়েছিল তাঁদের সম্পর্কে সে হুকুম রদ করার অনুরোধ অনেক দেশের তরফ থেকেই জানানো হয়েছিল—ভাটিকানও বাদ যায়নি যদিও ক্যাথলিকদের সঙ্গে ইহুদিদের ঝগড়া চিরকালের।

রুশ সুপ্রিম কোর্ট কেন যে আগের কোর্টের রায়ের হেরফের করলেন তা অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটা ঠিক রুশিয়া আগের মতো আর বেপরোয়া নয়—বুর্জোয়া জনমতকেও সে আর তেমন তাচ্ছিল্য করে না। নইলে জন দুই ইহুদিকে গুলি করে মারার হুকুম সে রদ করবে কেন? সাফাই হিসেবে বলা হয়েছে বিমান চুরির মতো জঘন্য অপরাধ আসামীরা করতে যাচ্ছিল বটে কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়াতে তা তো আর করে উঠতে পারেনি কাজেই চরম শাস্তি তাদের না দিলেও চলে। এটা নিতান্তই কৈফিয়ত ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে সোভিয়েট সরকার টলেছেন ও ব্যাপারটা নিয়ে সারা দুনিয়াতে হই চই বাধাতে। রুশ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের চব্বিশ ঘণ্টা আগে স্পেনের ফ্রাঙ্কো বার্গোস বিচারের রায়ে যে ছ' জন বাস্ক বিপ্লবীকে ফাঁসিতে লটকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল তা বাতিল করে দিয়ে সে ছ' জনকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ফ্যাসিস্ট স্পেন যে করুণা দেখিয়েছে তাও যদি সমাজতন্ত্রী রুশিয়া না দেখাতে পারতো তা হলে নিঃসন্দেহে দুনিয়া সুদ্ধ লোক তাকে ছি ছি করতো। রুশ সুপ্রিম কোর্ট যে সরকারের মুখ রক্ষে করেছেন তাতে ভুল নেই।

লেনিনগ্রাড মামলার জের কিন্তু সহজে মিটবে বলে মনে হয় না। ব্যাপারটা ঠিক সাধারণ অপরাধঘটিত নয়। প্লেন চুরি করা কিংবা পাইলটকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে তাকে যেখানে খুশী যেতে বাধ্য করা নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ। তার কড়া শাস্তিও বিশেষ দরকার। কিন্তু যে এগারো জনের বিচার হয়ে গেল লেনিনগ্রাডে তাঁদের অপরাধ কি বিমান চুরি না আর কিছু? কথা উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে অমন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাঁরা ইহুদি বলে, তাঁরা অপরাধী বলে নয়। আজও রুশিয়াতে যত ইহুদি আছে তত ইস্রায়েলেও নেই। ইহুদিদের নাগরিক অধিকার সবই রুশিয়াতে আছে। তবুও তারা নাকি সে দেশে টিঁকতে পারছে না, তারা পা বাড়িয়ে আছে জেরুজালেমের দিকে যে জেরুজালেমকে তারা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন দু' হাজার বছরেও ভুলতে পারেনি। বিস্তর ইহুদি নাকি ইতিমধ্যেই রুশিয়া ছেড়ে পালিয়ে এসেছে ইস্রায়েলে, আরও অনেকে নাকি যাবার জন্যে তৈরি। দ্বন্দ্ব বেধেছে ইহুদিদের ধর্মের টানের সঙ্গে দেশপ্রেমের। তাই দোটানায় পড়েছে রুশিয়ার অনেক ইহুদিই। তারা ভেবে পাচ্ছে না ধর্মের শ্যাম রাখবে না রাষ্ট্রের কুল রাখবে।

আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য

পীযূষ রাউত

আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য
চিরকাল বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকবো। যেমন, দেশের বাড়িতে
নৌকার জন্য প্রতীক্ষমাণ মা ও আমি, আমি ও ছোটভাই;
নদীতীরে
উদ্দাম হাওয়ার মধ্যে
আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য
চিরকাল ঘনিষ্ঠ প্রেমের জন্য উন্মুখ ইচ্ছাগুলি
মিছিলের দাবীর মতো সোচ্চার। এগুলো সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত
ভ্রমণ নয়; মাঠে নেমে
বল না ছুঁয়ে পুর্ণাঙ্গ খেলা। কারণ সবল বাহুদ্বয়
উঠে পড়ে
আন্দামান দূরে নয়, গোসবার অনতিদূরে। বহুদূরে
শ্রেণীবদ্ধ মেঘ যদি গলে গলে
পাগল বৃষ্টির স্রোতে গর্জন করে জাটিংগার মতো
কোমল নদী;
আমি ও সান্ত্বনা, সান্ত্বনা ও সৈকত আমরা কয়েকজন
কয়েকজনের জন্য চিরকাল,
চিরকাল প্রতীক্ষার পথ ॥

ঝাউগাছটা কর্তা ব্যাক্তি

সুধেন্দু মল্লিক

সকাল থেকে তুলছি ছবি একটা ছবি আতা ফুলের।
ঝাউগাছটা কর্তা ব্যক্তি নজর রাখছে তখন থেকে
ঠায় দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝেই
দুহাত দিয়ে বাতাস ঠেলে বিদায় করছে
টিয়ার ঝাঁককে ধমকে বলছে—এই কি আসার সময় এখন?
দেখছো কতো ব্যস্ত আছি!
সকাল থেকে তুলছি ছবি একটা ছবি আতাফুলের।
লাজুক লাজুক তাকিয়ে আছে মিষ্টি হেসে।
তক্ষুণি প্রেম একগলা প্রেম ফটোগ্রাফার ডুবলো এবার।
ও মাধুরী শুনতে পাচ্ছো—ও মাধুরী হাতখানি দাও।
ঝাউগাছটা কর্তা ব্যক্তি নজর রাখছে কড়া নজর—
নাও হে একটু জলদি করো।

সকাল থেকে তুলছি ছবি একটা ছবিই।
কাঠবেড়ালি ফচকে ছোঁড়া দৌড়ে এসে রগড় দেখে
চোখ দুটোকে করলো বিশাল।
এর ভেতরেই এমন কান্ড! মানুষগুলো পারেও বাপু।
যা হোক আমার এম্নি পোজে একটা ছবি তুলতে হবে,
নইলে হাটে ভাঙবো হাঁড়ি। বলেই আবার
লোভীর মতো ছুটে দিলো বাদাম তলায়।
ঝর্ণা ঝরে। আলোর শব্দ। মাটির ওপর আঁকড় কোকড়।
সকাল থেকে তুলছি ছবি একটা ছবিই সকাল থেকে।

মুখপুড়ী ও গিয়াসউদ্দীন

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

'তু' করে দেখেছি ডেকে, আসেনি সে
এত অহংকার
পা ধরে সেধেছি তার, ফল নাস্তি
এমন গোঁয়ার।

একদিন ভুলিয়ে-ভালিয়ে
মুদ্দাফরাসের সঙ্গে দেবো তার বিয়ে
মুখপুড়ী মজা পাবে টের
এবং গাঁটের
পাঁচপণ খসায়েও, রোজা ডেকে কিছু তুকতাক্
তারপর একদিন বাণপ্রস্থে চলে যাবো বমডিলা
অথবা লাডাক।

হৃদয়ে রেখেছি আট অক্ষৌহিণী সেনা
সকাল সহজে আসে, শুধু সে আসেনা
দিন আসে, চলে যায় দিন,

কে নাড়ে দরজার কড়া
আমি সা'ব, গিয়াসউদ্দীন।

আদিম ঘোড়া

শামশের আনোয়ার

শৈশবের বন্দুক, শৈশবের কামান এগিয়ে আসছে আমার দিকে
ওস্তাদ পেড্রো আমায় বাল্যকালে কিছু ঘোড়া উপহার
দিয়েছিলো, সে-গুলো ছিলো প্রস্তরাত্মক—
আমি তুলোর হরিণ ফেলে এসেছিলাম পাহাড়ের নিচে
জন্মদিনে আমি পেয়েছিলাম মাদ্রাজী পুতুল
সে হৃৎপিন্ডে চাবি লাগিয়ে আমার সাথে খেলা করতো
আমার ছিলো ট্রেন-গাড়ি, যা আমি কোনদিন চালাই নি
এই কারণে যে আমার ঘোড়াগুলো একটুও না নড়েই
বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটতে পারত
যেরকম ওস্তাদকে পিঠে নিয়ে ছুটে যেত বারান্দার রেলিং
এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে আসার মধ্যে পার্থক্য নেই
বুঝতে পেরে, আমি একদিন নিজের হৃৎপিন্ডের
চাবিও হারিয়ে ফেলি
এইভাবে সমস্ত খেলা নষ্ট হওয়ায় পিতৃদত্ত বন্দুক, মাতৃদত্ত
কামান এগিয়ে আসছে আমার দিকে—
আমার ঘোড়াগুলো কি প্রস্তুত! আমি আজ ভয় পাই
আমি আজ অন্ধকারে নির্ভরযোগ্য লাগাম খুঁজি।

বেঁচে থাকা

সমরেশ মজুমদার

ট্যাঙ্গলার পার্কের সামনে অবনীভূষণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আশেপাশের দোকানগুলো বন্ধ হচ্ছে। যে দোকানটায় ও তড়কা রুটি খায় সেটাও ঝাঁপ টেনে দিচ্ছে, চেয়ারগুলো টেবিলের উপর পা তুলে শোয়ানো। অতএব আজ রাত্রে খাওয়া হল না। অবনীভূষণ অবশ্য খাওয়ার জন্যে তেমন কোন কিছু বোধ করছিল না। একটু আগেই শেষ বাসটা গড়িয়াহাটের দিকে গেছে। সেটা থেকেই নামল অবনী।

বসন্ত রায় এখন চুপচাপ। ফুটপাত ধরে হাঁটছিল অবনী। আর একটা দিন কাটলো। কলেজ স্ট্রীট থেকে রাত দশটার বেরিয়ে হেঁটে নন্দন রোড। তারপর এই শেষ বাস-এর ভিড়ে মিলে মিশে আসায় একটাও পয়সা খরচ হল না। অবশ্য দশ পয়সার রিস্ক ছিল। ওটা নিতেই হয়। কাঁহাতক আর হাঁটা যায়। রাসবিহারীর মোড় থেকে এই তিনস্ট স্টপেজ অবশ্যই ফাউ।

আর একটা দিন কাটলো, অথচ কিছুই হল না। পরমেশদার কথা বুলি হয়ে যাচ্ছে ইদানীং। ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু না করেও উপায় নেই। লাইনে নাম ডাক আছে। মোটর সাইকেলটা কভার করেছে সম্প্রতি। আজকের অপারেশনে পরমেশ ওকে এড়িয়ে গেল। ঠিক হ্যায়! অবনী চারমিনারটা ছুঁড়ে ফেলল। এই সময় ও কুকুরগুলোর ডাক শুনতে পেল। কাশো কুকুর আছে এ পাড়ায়? শালারা রোজ রাত্রে ওকে দ্যাখে, অথচ। অবনীর চারপাশে কোন লোকজন নেই অথচ সম্মিলিত সারমেয় চীৎকার ওকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ করল। এ পাড়ায় কোন নেড়ি কুত্তা নেই। দামী কুকুরগুলো যারা চীৎকার করছে তারা কেউ রাস্তায় বেরুবে না। কিন্তু অরুণদার কাছে রিপোর্ট হয়ে যেতে পারে। তাহলে এখানকার আস্তানা থাউজেন্ড ভোল্ট হয়ে যাবে। প্রথমদিন অরুণদা বলেছিল, 'এখানে আসতে চাও; আমার আপত্তি নেই। আমার অফিস দশটা টু আটটা। এই টাইমটা অ্যাভয়েড করবে। আর ওপারের ফ্ল্যাটের বাড়িওয়ালা যেন কোন কমপ্লেন না করে।' বাংলায় এম এ দেবার পর অরুণদার সঙ্গে আলাপ। তখন দু'একটা গল্প লিখতো অবনী। আর অরুণদা একটা কাগজ করত। ব্যস।

অর্ণদার এই অফিসটা শালা মিঃ আই এর টাকায় চলে। কালচারাল ব্যাপার সব। মারো গাড়ু। অর্ণদা অবশ্য ওকে স্নেহ টেহ করে। এমের পর তিনটে বছর ফিউজ হয়ে গেল। অর্ণদা কি চেষ্টা করলে একটা চাকরি দিতে পারত না? আজ দেড়মাস এখানে আছে অর্ণদার সঙ্গে দেখাই হয় না। অবশ্য এখন আর চাকরির জন্যে ওর কোন নোলা নেই। কারণ বয়সটা থাউজেণ্ড হর্স পাওয়ার নিয়ে ছুটছে। এজ লিমিট বার।

অর্ণদার অফিসের সামনে ছোট্ট বাগান। লম্বা লোহার গেট। ওপরে বাড়িওয়ালার ফ্লাট। অবনী দেখল গেট বন্ধ। দশটায় তালা পড়ে। একবার চারপাশে চোখ বোলাল ও, কোন মানুষ বা রাউণ্ডের পুলিসের মুখ দেখতে পেল না। খাঁজে খাঁজে পা রেখে ও লোহার গেটটার উপর উঠতেই বাড়িওয়ালার কুকুরটা হাউমাউ করে উঠল। অবনী ধীরে সন্থে নেমে বাগানটা পেরিয়ে অর্ণদার দেওয়া ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে অফিসের দরজা খুললো। আশেপাশের সমস্ত বাড়ির আলো নেবানো। এ পাড়ার লোকগুলো তাড়াতাড়ি বিছানায় যায়, আর

...প্রহর রাত্রে বাড়ি ফেরে তাদের গাড়ি আছে।
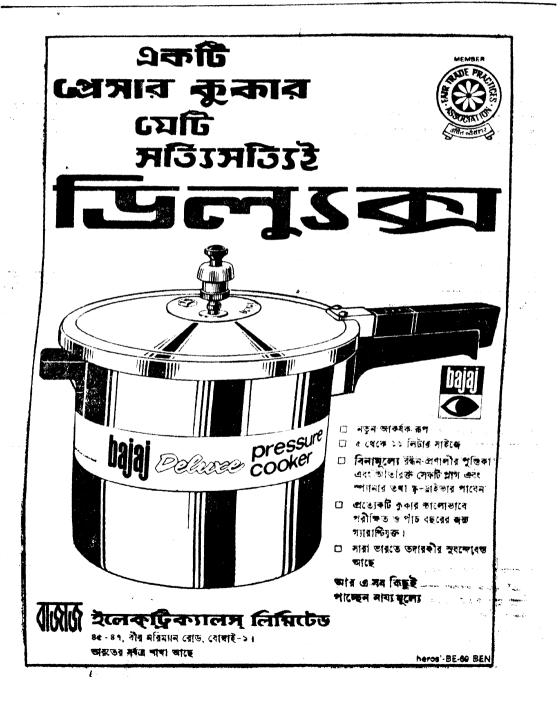
বিরাট হল ঘর। দেয়ালে দামী দামী ছবি। এ সব ছবির মানে বুঝতে পারে কি ...রে লোকে অবনীর বোধগম্য হয় না। ...ম লাইটটা জ্বালালো ও। অনেকগুলো ...র। সব ঘরেই ছবি, ম্যাগাজিন। অবনী ...মোপ্যান্ট ছেড়ে বাথরুমে গেল। সারাদিন ...রে হাঁটাহাঁটি। গেঞ্জি আণ্ডারওয়্যারে ...টকা গন্ধ ছাড়ছে। দারুণ বাথরুম ...জায়েক করা. শাওয়ার বাথটব সব আছে। অবনী বিবস্ত্র হয়ে শাওয়ার খুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর অরুণদার মার্গো সাপ দিয়ে গেঞ্জি আণ্ডারওয়্যার কাচতে শুরু করল।

এখন রাত একটা। মেঝেতে শব্দ হচ্ছে গেঞ্জি কাচার। সাবানটায় ভাল ফেনা হয় না। শব্দটা একটু আস্তে করার চেষ্টা করল সে। দারুণ ফোর্সে শাওয়ার থেকে জল পড়ে। আগে যে মেসটায় ছিল সে সেখানে কল দিয়ে বাচ্চা ছেলের পেচ্ছাপের থেকেও সরু জল পড়ত। বড়লোকদের কেতাই আলাদা।

স্নানটান সেরে অফিস ঘরে এসে দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে স্টোর রুমের কোণায় গোঁজা বিছানাটা নিয়ে এসে ভাল করে পাতল। এখন একটু খিদে খিদে পাচ্ছে। অবনী আর একটা চারমিনার ধরালো। ধরিয়ে অরুণদার বসার ঘরটায় ঢুকলো। দারুণ সাজানো। এই ঘরটা রাস্তার দিকে। কাচের জানলা দিয়ে বাইরের আলো ঢোকে। অবনী অরুণদার রিভলভিং চেয়ারে বসে দুটো পা ছড়িয়ে দিল টেবিলের উপরে। টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া একটা চিরকুট। অবনী পড়ল, 'টেলিফোনটা অফিসের জন্য।' তার মানে? এটা কি অবনীকে উদ্দেশ্য করে! কি বলতে চায় অরুণদা! শালা ফরেন মানি নিয়ে অফিস, তার ফুটুনি! খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠল অবনী। একবার ভাবল অরুণদার বাড়িতে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে এভাবে ইনসাল্ট করার কারণটা কি। ও রিসিভার তুলে ডায়াল করল। রিং হচ্ছে ওপাশে। কেউ ধরছে না। এখন রাত কটা? দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল অবনী, একটা কুড়ি। নিশ্চয়ই অরুণদা ঘুমোচ্ছে। ওর বউটা যা মুটকী। রিং হচ্ছে। অবনী চারমিনার টানতে টানতে শুনলো ওপাশে কেউ এসে রিসিভার তুললো। মেয়েলি গলা। ঘুম জড়ানো। 'হ্যালো, হ্যালো।'

অবনী দুবার হ্যালো শুনে বলল, 'কাল সকালেই বেস মালটা আসে, বুঝলেন!'

'মাল! কিসের মাল!' ভদ্রমহিলার অবাক গলা।

'কলগোলা। এটা কি কে সি দাসের দোকান নয়?'

'রং নাম্বার।' বলে ঘটাং করে লাইন কেটে দিলেন ভদ্রমহিলা। অবনী প্রাণ খুলে কিছুক্ষণ হাসলো তারপর আবার রিসিভার তুললো। কাকে ডায়াল করা যায়! কোন ...ম না পেয়ে এমনি কয়েকটা নাম্বার ঘোরালো ও। এবার বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটি হেঁড়ে গলা ধরল, 'হ্যালো।'

অবনী বলল, 'ইয়েস, আপনার স্ত্রী কোথায়?'

ওপারের গলায় বিস্ময়, 'স্ত্রী, কেন বলুন তো?'

'দরকার, জরুরী দরকার। লালবাজার থেকে বলছি।'

'লালবাজার? ও-ও তো বাপের বাড়িতে।'

'না সেখানে নেই।'

'নেই মানে?'

'আপনি ইমিডিয়েটলি ডাফরিন হসপিটালে চলে যান। সিরিয়াস অবস্থা। হারি প্লিজ।' অবনী ফোনটা কেটে দিল। অবনী আন্দাজ করল লোকটা এখনই ডাফরিনে ছুটবে। এবং গিয়ে দেখবে ওটা একটা বাচ্চা হবার হাসপাতাল। লোকটার মুখের চেহারাটা তখন কেমন হবে? হো হো করে হাসতে হাসতে অবনী উঠতেই টেলি-ফোনটা বেজে উঠল। একি হলো। অবনীর দুচোখে বিস্ময়। এত রাত্রে কোনদিন ফোন আসে না তো। নাকি ওর মত কোন পার্টি মজাকি করছে। রিসিভার তুলল ও, 'হ্যালো।'

'হ্যালো, আপনি কি করছেন কি?' কড়া গলার স্বর।

'মানে?'

'মানে এত রাত্রে মেঝেতে কি আওয়াজ করছেন। আপনার মনে রাখা উচিত এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, আমি কমপ্লেন করবো।' ওধারে গলা উত্তেজিত।

শালা বাড়িওয়ালা। অবনী একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর কাটা কাটা গলায় বলল, 'আপনি কি ড্রাঙ্ক?'

'মানে?'

'রং নাম্বার।' ফোনটা নামিয়ে রেখে পা টিপে টিপে এসে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল অবনী। আঃ। আরাম। আর একটা দিন কাটলো অবনীভূষণের। আগামী-কাল কিছু বিজনেস আছে। নাটে নাটে লাগলে বাড়িওয়ালার থোড়াই কেয়ার। মনে মনে গুনগুন করতে লাগল, 'শালার চামড়ায় বানাবো ঢাক, তেরে কেটে তাক।' অবনী-ভূষণ ঘুমিয়ে পড়ল।

উল্টোডাঙ্গার তিন নম্বর লাল বাড়িটায় পরমেশকে পেয়ে গেল অবনী। কাল রাত্রে খাওয়া হয়নি কিছু। আজ ঘুম থেকে উঠেই স্নানটান সেরে বেরিয়ে পড়েছে। বেরোবার সময় গেটে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা। লেক থেকে চেনবাঁধা কুকুরকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরছে। অবনী মুখোমুখি হতেই হেসে বলল, 'ভাল আছেন মেসোমশাই।' ভদ্রলোক দুটো ভ্রূ কুঁচকে ভেতরে ঢুকে গেলেন। অবনী মনে মনে একটা সুন্দর খিস্তি করে নিল। তারপর পাঞ্জাবী দোকানটা থেকে পেট পুরে খেয়ে উল্টো-ডাঙ্গায় চলে এল পরমেশকে ধরতে। এখন ওর পকেট খালি। পরমেশকে এখানেই পেয়ে গেল।

পরমেশ টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে লিখছিল, অবনীকে দেখে সরিয়ে নিল কাগজপত্র। এই বাড়িটার মালিক মাড়োয়ারী। বহুত ব্যবসা আছে। নীচে কাঠের আড়ৎ। পরমেশ ওকে দেখে বাঁ চোখ কুঁচকে কি ভাবল, তারপর বলল, 'যাক ভালই হয়েছে তুই এসে পড়েছিস।'

অবনী একটা চেয়ার টেনে নিল, 'কালকে তুই শালা আমাকে কাতলা দিলি কেন?'

'বাতেলা? তোকে! ধ্যাৎ, ধ্যাৎ, ওসব ফালতু কাজ তুই করবি কেন? আমি তো তোকে জানি।' পরমেশ হাসল।

'কাজটা কি ছিল?'

'ঐ আর কি। থ্রি-বি রুটের একটা স্টেট হাইজ্যাক করতে হল।

'কত মাল ছেড়েছে?'

'দুই। পাঁচটা সাকরেদ ছিল। হাতে কিছু থাকে না দিয়ে-থুয়ে।' পরমেশ নির্বিকার।

মনে মনে অবনী পরমেশকে তারিফ করল। হাতে কিছু না রাখার মাল পরমেশ নয়। শালা। কোন রিস্ক ছিল না কাজটায়। আলিপুরের মোড়ে বাস থামিয়ে বুটো আওয়াজ দিলেই প্যাসেঞ্জাররা পালাবে। তারপর টিনটা উপড়ে করে ট্যাঙ্কের মুখটা খুলে দিয়ে দেশলাই ছুঁড়ে দেওয়া। বাস। সিংজি নগদ পেমেন্ট করে। পার স্টেট বাস দুহাজার। পুলিস আসার আগেই পরমেশ নিশ্চয়ই পার্ক স্ট্রীটে বসে বিয়ার টানছিল। একটা স্টেট বাস পুড়লে দুহাজার খরচ, আসবে হাজার গুণ। আরও একটা প্রাইভেটের পারমিট পাবে সিংজি। শালা। অবনী দেখল, টেবিলের ওপর খবরের কাগজের ফ্রন্ট পেজে পোড়া বাসের ছবি।

অবনী বলল, 'আছিস ভাল। কিছু ছাড়ো এবার।'

'কত?'

'পাঁচ।'

'অসম্ভব। দুশো দিতে পারি। অ্যাডভান্স।' পকেট থেকে টাকা বের করল পরমেশ।

'অ্যাডভান্স কেন?'

'আজকের অপারেশনটার জন্যে। ভাল দাঁও আছে। আমি ভেবে দেখলাম তোকে নিয়েই করব। তেওয়ারীকে ও মাল আমি নিতে দেব না।' অবনীর সামনে দুটো একশ টাকার নোট রাখল পরমেশ।

'কাজটা কি?' অবনী টাকাটা পকেটে রাখল।

'তেওয়ারী তিন নম্বরের লাইনে আজ রাতে যাবে। কেন যাবে খবর পাইনি। এমনি যাবার মাল ও নয়। এ সব ব্যাপার লিক হলে অবনী—।' পরমেশ থামল হঠাৎ।

'বলতে হবে না।' হাসল অবনী, ওয়াগনের ব্যাপার নাকি গুরু।'

'না ওসব ব্যাপার না। তুই এক কাজ কর। একটা মাল ভোলভারী আছে। আমিই জেতাম, তুই এসেছিস, ভাল হয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে ঠিক দশটায় স্পোবের সামনে যাবি। তেওয়ারীর লোক থাকবে ওখানে। বাঁ হাতে রুমাল জড়ানো। তোকে দেখে রুমালটা খুলবে, আর বাঁধবে। মালটা নিয়ে চলে আসবি।'

'তেওয়ারীর লোক?'

'হ্যাঁ বস্। তেওয়ারী আমার বহুদিনের দোস্ত।' বলে পরমেশ টেবিলের নিচ থেকে ছোট এয়ার ব্যাগটা বের করে অবনীর সামনে রাখল। 'বিকেল সাড়ে পাঁচটা পাঁচমাথার মোড়ে কফি হাউসের সামনে চলে আসিস।'

এয়ার ব্যাগটা নিয়ে অবনী ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায় স্পোবের সামনে পৌঁছালো।

এখন এ দিকটায় বেশী লোকজন নেই। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে ও স্পোবের কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বেশ ভারী ব্যাগটা। ট্যাক্সীতে আসতে আসতে ও খুলে দেখেছে অন্তত গোটা কুড়ি গ্রেনেড আছে। কোথা থেকে যে পায় পরমেশ। আর এই সব অস্ত্র ও তেওয়ারীর হাতে তুলে দিচ্ছে যে তেওয়ারীকে আজ রাত্রে প্রয়োজন হলেই হাপিস করে দেবে পরমেশ। তাজ্জব ব্যাপার সব। এইজন্যই পরমেশকে গুরু বলতে ইচ্ছে করে।

অবনী চোখ রাখছিল রুমাল বাঁধা হাতে কেউ আসছে কি না। মিনিট তিনেক কাটলো। শালা এ অবস্থায় যদি পুলিসে ধরে দিল তো তিন বছর জেল। মারাত্মক অস্ত্রসহ সমাজবিরোধী গ্রেপ্তার। খবরের কাগজের হেডিং হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে তো পরমেশই ওকে এখন ধরিয়ে দিতে পারে। একটু ঘাম জমলো ওর শরীরে। ঠিক এই সময় ওর চোখে পড়ল একটি ডাঁসা মেয়ে স্পোবের ভিতরে ঢুকলো। বাঁ হাতের কব্জিতে রুমাল বাঁধা। ও একটু অবাক হল। এই মেয়েটা কি তেওয়ারীর লোক? ইমপসিবল, হতেই পারে না। মেয়েটা রুমাল খুলছে আর বাঁধছে। এক একবার এদিক ওদিক দেখছে। তেওয়ারীর রিক্রুট তো দারুণ জিনিস। অবনী এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'চলুন'।

কপালে ভাঁজ ফেলল মেয়েটি, 'মানে?'

'তেওয়ারী?' অবনী আস্তে করে কথাটা ছেড়ে দিল।

মেয়েটি হাসল, 'হ্যাঁ, দিন।'

'এখানেই নেবেন? চলুন না কোথাও বসা যাক।' অবনী উদার হল।

মেয়েটি হাসল, 'আমার শুধু নিয়ে যাবার কথাই ছিল কিন্তু।'

'আমার শুধু দেবার। একটু অবাধ্য হই না, আপত্তি আছে?'

'বেশ চলুন। কোথায় বসবেন?'

অবনী মেয়েটিকে নিয়ে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকল। সলিড স্বাস্থ্য মেয়েটির। কথাবার্তা চটপটে। অবনীর পাশে বসল ও। অবনী একটা হাত মেয়েটির পিছনে চেয়ারের হাতলে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কদ্দিন লাইনে?'

'লাইনে?' মেয়েটি চোখ তুলে দেখল অবনীকে, 'ও, তিন মাস।'

সব শালাই তাই বলে। মনে মনে ভাবল অবনী।

'ভাল লাগে?' অবনী গাঢ় করতে চাইল গলার স্বর।

'এই আরম্ভ করলেন তো। সেদিন এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ পেছনে ঘুরে আলাপ করলেন। শুরুতেই আমি বললাম, দেখুন আমি কিন্তু প্রফেসনাল। শুনেই ভদ্রলোক চম্পট।'

'বাঃ তিনমাসেই বেশ কথা শিখে গেছেন তো। এরপর কত মাস কত হাজার মাস চলে যাবে দেখতে দেখতে।'

'মোটেই না। আমি বেশীদিন এ কাজ করব না।'

'কি নাম?'

'বীথি।'

'আসল নামটা।'

'বীথি।'

অবনী একটা হাত এবার বীথির কাঁধে রাখল। বীথি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম?'

অবনী হেসে পর্দা সরিয়ে বেয়ারাকে ডাকল, খাবার বলল, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'পরমেশ।'

'ও আপনি?' মেয়েটির চোখ উজ্জ্বল হল। 'আপনার কথা তেওয়ারীর কাছে শুনেছি।'

অবনীর হাত মেয়েটির গলায় নেমে এল। উপচানো স্বাস্থ্য মেয়েটির। অবনীর খুব ইচ্ছে হল মেয়েটার বুক ছুঁয়ে দেখে।

'তুমি প্রফেসনাল না!'

'কেন?' মেয়েটি হাসল।

'কত নাও?'

'কেন, যাবেন?'

'যদি যাই?'

'বেশ তো মালটা ডেলিভারী দিয়েই আমি ফ্রি।'

একটু আদর করল অবনী, 'কত নাও?'

'পঁচিশ, আর ঘর ভাড়া পনের। পুলিসের ঝামেলা নেই। যাবেন?'

'উম্‌ম্‌ আগে একটু গরম হই।'

'বাব্বা!'

'থাকো কোথায়?'

'টালীগঞ্জে। বাড়ি ছিল পাকিস্তানে।'

'আবার পাকিস্তান কেন? উম্‌ম্‌। বাবা আছে?'

'হুঁ।' মেয়েটি অবনীর কোলের কাছে সিঁটিয়ে এল। গদগদে ভাব। অবনীর মনে হচ্ছিল ও মরে যাবে।

'তোমার মা দারুণ দেখতে না?'

'আঁ, আবার মেয়েকে ছেড়ে মাকে কেন?'

'উম্‌ম্‌ তোমাকে দেখে। দারুণ দেখতে তুমি। দারুণ জিনিস। উম্‌। তোমার বাবা আছে তাহলে। কি করে। উম্‌।'

'বাবা।' মেয়েটি হাসল, 'বাবা রাস্তায় রাস্তায় হাঁকে চা-ই-ই সি-টু কা-পড় চা-ই-ই-ই।' প্রায় অবিকল বৃদ্ধের গলা নকল করে মেয়েটি চীৎকার করে উঠল। থতমত খেয়ে গেল অবনী। বেয়ারাটা ছুটে এসে পর্দা ফাঁক করে দেখে সরে গেল। আর অবনীর পা থেকে মাথা অবধি চীৎকারটা পাক খেতে লাগল। ওর মনে হল একজন বৃদ্ধ কাঁধে সস্তা ছিট কাপড় ফেলে হাতে একটা লোহার সিক নিয়ে রোদজ্বলা দুপুরে গলিতে গলিতে ঘুরছে আর কুঁজো শরীর বেঁকিয়ে চীৎকার করছে, ছিট কাপড় চাই। আর তার মেয়ে ওর পাশে বসে গদগদে শরীরে বলছে 'চাই-মাংস-চাই।'

মেয়েটির চোখে বিস্ময়, 'কি হল?'

'কিছু না।' অবনী বললো, কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ওর সমস্ত শরীর গুটিয়ে আসছিল, হঠাৎ ও বললো; 'চলুন উঠে পড়ি।'

'কেন খাবেন না?'

'না। ভাল লাগছে না।'

'আমার সংগে যাবেন তো?'

'আজ থাক।'

অবনী হাসল, 'আজ বোধহয় আর গরম হবো না।'

মেয়েটি অবাক চোখে কিছুক্ষণ দেখল তারপর ব্যাগটা তুলে নিল। অবনী বলল, 'সাবধানে যাবেন। ওতে কি আছে জানেন না বোধহয়।' মেয়েটি কোন কথা না বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল। অবনী বেয়ারাকে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল মেয়েটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে এমনভাবে যাচ্ছে যাতে যে কোন মুহূর্তেই কারোর সংগে ওর ধাক্কা লেগে যেতে পারে। তার তারপরেই। অবনী কিছুক্ষণ বিস্ফোরক বয়ে নিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে দেখল। হঠাৎ তার মনে হল ব্যাপারটা খুব ছেলেমানুষী হয়ে গেল। তার ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। শালা সব মানুষই তো ফেরিওয়ালা। তা নিয়ে ন্যাকামো করার কি আছে। অবনী দুচোখ দিয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু মেয়েটাকে আর দেখা গেল না। অবনীর খুব আফসোস হল, নিজেকে জুতোতে ইচ্ছে করল ওর।

সোদপুরের একটু আগে যেখানে রেল-লাইনটা বাঁক নিয়েছে সেখানটায় মোটর-সাইকেল থামাল পরমেশ। সারাটা রাস্তা পরমেশ সমানে খিস্তি করেছে অবনীকে। বহুৎ দেরী করে এসেছে ও কফি হাউসে। অবনী বোঝাতে চেয়েছে ওর কোন দোষ নেই। দুপুর থেকে সারা কলকাতা জুড়ে বোমা বাজী। বাস-ট্রাম বন্ধ। ট্যাক্সি আসতে চায় না। কিন্তু পরমেশ অবনীর মুখে হুইস্কির গন্ধ পেয়েই খিস্তি করতে শুরু করল। বলেছে, শালা তোকে টাকা দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবনী স্বীকার করেছে, হ্যাঁ আজ দুপুরে ও চার পেগ মাত্র খেয়েছে ব্লু ফক্সে বসে। সেটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু পরমেশ এখনও গরম। বি টি রোড ধরে আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। খুব জোরে চালাচ্ছিল পরমেশ। পেছনের সিটে বসে ঘাম ছুটে গিয়েছিল অবনীর। পরমেশ টাইট প্যান্ট আর গেঞ্জী শার্ট পরেছে। দুটোই কালো। ভাল মানিয়েছে। সেন্ট মেখেছে নাকি। দারুণ গন্ধ ছাড়ছে। গলায় সোনার চেনটা চিকচিক করছে। শালা।

এখান থেকে স্টেশনে হেঁটে যেতে হবে। ঠিক স্টেশনে নয়। তার আগেই ইয়ার্ড। লম্বা কয়েকটা মালগাড়ি সব সময়েই সেখানে পড়ে থাকে। এ সব জায়গা ওদের জানা। মোটর সাইকেল একটা দোকানের সামনে রেখে পরমেশ দোকানদারকে কি যেন বলল ফিসফিস করে। তারপর ওরা হাঁটতে লাগল। একটু এগিয়ে পরমেশ পকেট থেকে একটা গ্রেনেড বের করে অবনীকে দিল, 'এটা রেখে দে। দরকার না হলে ইউজ করিস না।' অবনী গ্রেনেডটা পকেটে রেখে দিল। ওরা নিঃশব্দে হাঁটছিল। ছোট একটা কালভার্ট পেরিয়ে এল এরা। এদিকে জনবসতি নেই বললেই হয়। ওরা রেললাইন থেকে দূরত্ব বাঁচিয়ে হাঁটছিল। পরমেশ কথা বলছে না এখন। মাঝে মাঝে নজর বুলিয়ে নিচ্ছে চারধারে। এদিকটায় ছোট জঙ্গল মতন। এরপরেই ইয়ার্ড। ওরা একটা বড় নর্দমা পেরিয়ে এল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ওরা রেললাইন ধরে হাঁটতে লাগল এবার। দারুণ জোনাকি জ্বলছে চারধারে। অন্ধকারটা তাই একটু পাতলা। হাওয়া দিচ্ছে মৃদু মৃদু। পরমেশ দাঁড়াল একটা ঢালু জায়গা দেখে। তারপর বলল, 'অবনী, তুই এখানে শুয়ে পড়। শিস দিলে গুঁড়ি মেরে উঠে আসবি।' বলে ও রেললাইনের পাশ ঘেঁষে অন্ধকারে চলে গেল। আসবার সময় পাখি পড়া করে ও অবনীকে বুঝিয়েছে কি কি করতে হবে। মোটা টাকার ব্যাপার। অবনী শুয়ে পড়ল খোয়া বিছানো মাটিতে।

পকেটে হাত দিয়ে অবনী গ্রেনেডটার অস্তিত্ব অনুভব করল। একটা মাত্র গ্রেনেড ওর সঙ্গে। পরমেশ ইচ্ছে করেই ওকে বোধহয় বেশী কিছু দিতে চায়নি। পরমেশের কাছে রিভলভারটা নিশ্চয়ই আছে। সব জায়গায় শালা বেইমান। একটা আলাদা দল করবে যে পরমেশকে ছেড়ে তারও উপায় নেই। পার্টির ব্যানারে না গেলে আজকাল লাইন বন্ধ। এম-এ পাশ করার পর বেকারির দিনগুলোতে পরমেশ তাকে হাত ধরে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছে। তবু শালা ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তেওয়ারীর সঙ্গে পরমেশের দোস্তি আছে এ কথা সবাই জানে। তেওয়ারী পেটো গ্রেনেড সাপ্লাই করে। ওর স্টক শর্ট পড়ে গিয়েছিল বলে পরমেশের কাছ থেকে কিছু মাল আজ কিনলো ও। তেওয়ারীটা শালা এক নম্বরের হারামী।

অবনী চিৎ হয়ে শুল। আকাশ ভরা তারা। উঃ কত যে তারা আকাশে। দারুণ লাগে দেখতে। অবনীর মনে পড়ল ছেলেবেলায় তমলুকে ওদের বাড়ির উঠোনে বসে ও তারা গুনবার চেষ্টা করত। বাবার কথা মনে পড়ল। তিনমাস আগে চিঠি পেয়েছিল, 'এম-এ পাশ করিয়া এখন অবধি একটি চাকুরী জোটাইতে পারিলা না।'

অবনী হাসল।

পর পর দুটো লোকাল ট্রেন চলে গেল। মাটিতে কাঁপন অনুভব করল সে। হঠাৎ সময় শিষ শুনতে পেল অবনী। মাথা তুলে দেখল। সমস্ত জায়গাটা অন্ধকার। গুঁড়ি মেরে জঙ্গলটার পাশে গিয়ে বসল ও। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। একটা মাত্র গ্রেনেড। ছোট ছোট কয়েকটা ঝোপ এখানে। পরমেশের গলা শুনতে পেল ও। ফিসফিস করে ডাকছে, 'এদিকে আয় বাঁ দিকে।'

অবনী বাঁ দিকে সরে এল। পরমেশ হাঁটু গেড়ে বসে কি যেন দেখছে। অবনী দেখবার চেষ্টা করল। সামনে ফাঁকা রেল-লাইন। ইয়ার্ডে মালগাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ অন্ধকারে কিছু নড়তে দেখলো সে। মূর্তি দুটো স্পষ্ট হল। আর একটু পরে ও বুঝতে পারল ওদের মধ্যে একজন তেওয়ারী। ওরা উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। পরমেশ চাপা স্বরে কি একটা বলল। তারপর এগিয়ে গেল গুঁড়ি মেরে। এখন অবনীকে একটু বাঁ দিক দিয়ে পরমেশকে ফলো করতে হবে। পরমেশ আচমকা ফায়ার করবে। করে মাল হাতাবে। থলিটা নিয়েই অবনীকে দেবে। অবনী সেই মাল নিয়ে বাঁ দিক দিয়ে ছুটবে। পরমেশ ডান দিক দিয়ে ঘুরে মোটর সাইকেলের কাছে ফিরে যাবে। অবনী যেমন করেই হোক মালটা নিয়ে ডানলপ ব্রীজের তলায় পরমেশের জন্যে ঘণ্টাখানেক বাদে অপেক্ষা করবে। এই নির্দেশ। কিন্তু মালটা কি হতে পারে? পরমেশ খবর পাইনি বললেও অবনীর দৃঢ় বিশ্বাস পরমেশ সব নাড়ীনক্ষত্র জানে। অবনী আরও কয়েক পা এগোল। তেওয়ারীরা মালগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। একটা টর্চ জ্বললো দূর অন্ধকারে। সম্ভবত রেল-পুলিস।

পরমেশ এগিয়ে যাচ্ছিল গুঁড়ি মেরে। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা খান খান করে পর পর তিনটে ফায়ারিং হল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গ্রেনেড অবনীর ডান দিকে ফাটলো। জায়গাটা মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল। অন্ধকারটা যেন ঝলসে গেল।
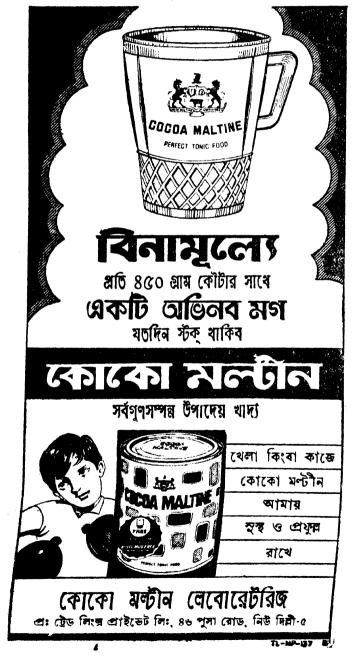
আর সেই স্বল্প আলোয় অবনী দেখল পরমেশ মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। দূরে স্টেশনের দিকে হইচই শুরু হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। কারা যেন দুপদাপ করে ছুটে বেরিয়ে গেল অবনীর পাশ ঘেঁষে। অবনী হতভম্ব হয়ে পড়েছিল প্রথমটায়। তারপর দৌড়ে পরমেশের দিকে এগিয়ে গেল। রেললাইনের ওপর পরমেশ পড়ে আছে। বাঁ হাতটা উড়ে গেছে। প্যান্টটা পুড়ে গেছে। ফিকে জোনাকির আলোয় অবনী দেখল পরমেশের সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। আচমকা গুলি এবং গ্রেনেড খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অবনী হাঁটু গেড়ে বসে পরমেশকে চিৎ করে শুইয়ে দিল। পরমেশের ঠোঁট কাঁপছে। বুকে হাত দিল অবনী। ভিজে গরম রক্ত হাতে লাগল। অবনী কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওকে এখান থেকে কি করে সরানো যায়। পরমেশকে বাঁচানো দরকার। অবনীর কান্না পাচ্ছিল।

স্টেশনের দিকে চীৎকারটা বাড়ছে। মুহুর্মুহু টর্চ জ্বলছে। পরমেশ গোঙাচ্ছে। কানটা মুখের কাছে নিয়ে গেল অবনী। 'শা-লা-সা-জা-নো—বেইমানী—'। অবনী শুনলো। অবনীর বলতে ইচ্ছে করল, 'গুরু আমি আছি। তেওয়ারীকে আমি জবাব দেব।' অবনী পরমেশকে তুলতে চেষ্টা করল। অসম্ভব। এত ভারী শরীর নিয়ে অবনী এক পা হাঁটতে পারবে না। কারা যেন, সম্ভবত রেল পুলিসের দল টর্চ জ্বালিয়ে ছুটে আসছে দেখতে পেল অবনী। দু-তিনবার রাইফেলের আওয়াজ করল পুলিসগুলো। ওরা এগিয়ে আসছে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ—? অবনী উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে পরমেশকে শেষবার দেখল। আর সেই সময় ওর নজরে পড়ল পরমেশের গলার সোনার চেনটা চিকচিক করছে অন্ধকারে। অবনী পরমেশের মাথার কাছে এগিয়ে এসে এক ঝটকায় ছিঁড়ে নিল হারটা। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। চটচট করছে। ছেঁড়ার সময় পরমেশের মাথাটা ঝাঁকুনি খেল। অবনী পরমেশের খোলা চোখের সাদা মণি অন্ধকারেও দেখতে পেল।

পুলিসগুলো প্রায় এগিয়ে এসেছে। অবনী ছুটতে আরম্ভ করল এবার। তিন চারটে রাইফেলের গুলি ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ ওর মনে হল পরমেশটা যদি না মরে যায়, যদি হাসপাতালে চাঙ্গা হয়ে ও সব ফাঁস করে দেয়—অবনীর নামটা-ও। বেইমান কাকে বলল? অবনীকে? হার ছেঁড়ার সময় পরমেশের চোখ খোলা ছিল। অবনী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে পরমেশের দেওয়া গ্রেনেডটা বের করে পরমেশের রক্তাক্ত শরীরটা যে দিকে শুয়ে আছে সেইদিকে ছুঁড়ে দিল। প্রচণ্ড শব্দে গ্রেনেডটা ফাটল। অবনীর শব্দটা ভাল লাগল।

অবনী আবার দৌড়াতে লাগল। পুলিস গুলো এগিয়ে আসছে। ফায়ারিং হচ্ছে। ও সেই বিরাট নর্দমার কাছে এসে পড়ল। রক্তাক্ত হারটা কোথায় রাখবে ভেবে না পেয়ে মুখে পুরে নিয়ে অবনী নর্দমার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। নর্দমার নোংরা পচা স্রোতে অবনী ভেসে যাচ্ছিল। এই পাঁক এবং পূতিগন্ধে অবনী এক সেকেণ্ডও থাকতে পারত না, কিন্তু পরমেশের রক্ত মাখা হারের নোনতা স্বাদ ওর জিভ মুখ শরীরকে একটা আলাদা জগতে নিয়ে যাচ্ছিল। বেঁচে থাকার জন্যে দারুণ লোভে অবনী বুঝতে পারছিল যে এই নর্দমার স্রোতেই ও সবচেয়ে নিরাপদ।

ছবিতে একটি হাল্কা ধরনের পলিগ্রাফ দেখান হল। উপরে হোসপাইপের মত টিউবটি বুকের চারপাশে জড়িয়ে দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা জেনে নেওয়া হয়। উপরের ডান দিকে রক্তচাপ এবং নাড়ির স্পন্দন মাপার যন্ত্র। ডান পাশে ঝুলে রয়েছে ত্বকের তড়িৎ-রোধ নির্ধারণের দুটি তড়িৎ-দ্বার. বাঁ পাশে উপরে তিনটি কলম লিবিবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় লেখচিত্র
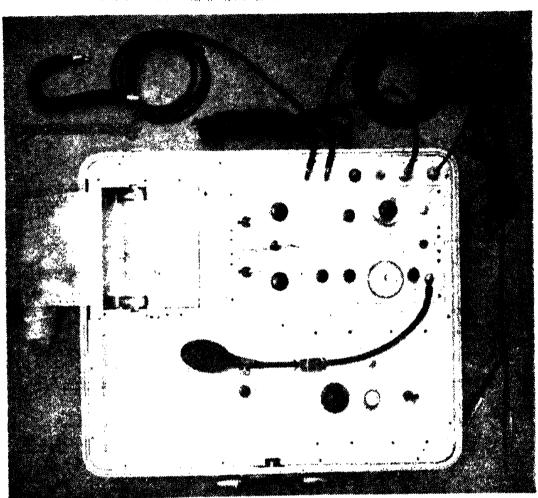
পলিগ্রাফ!

মানুষ কেন মিথ্যের আশ্রয় নেয়, এ প্রশ্নের মীমাংসার দায়িত্ব দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানীর। তবু সামাজিক প্রয়োজনে মিথ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের ব্যাপারটা কোন কালে, কোন অবস্থাতে কেউই এড়িয়ে যেতে চায়নি। এর জন্যে বিভিন্ন সময়ে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছে। তার কিছুটা যুক্তিহীন উদ্যোগ, কিছুটা আধুনিক বিজ্ঞানপুষ্ট অভিজ্ঞতা। ইদানিং যন্ত্রেরও চল হয়েছে। নাম পলিওগ্রাফ। যার মুখ্য ভূমিকা, 'মিথ্যুক'কে আবিষ্কার করা, অপরাধীর জবানবন্দী আদায়ে সাহায্য করা।

তবু প্রশ্ন উঠেছেঃ সত্যিই কি এটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি? তাছাড়া নৈতিকতার দিক দিয়েও কি একে সমর্থন করা চলে?

শুধু আজ নয়, মানব সমাজে মিথ্যেবাদীর অস্তিত্ব চিরকাল ধরা পড়েছে। পরিস্থিতি অথবা পরিবেশের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক অক্ষুণ্ণতাকে রক্ষা করতে গিয়ে সে মিথ্যের আশ্রয় নেয়। কখনও তার পেছনে থাকে মানসিক প্রেরণা কখনও ভ্রান্তি, আত্মশ্লানি, অথবা আত্ম-চরিতার্থতা। মিথ্যা কখনও কুটিলতা বা মানবিক প্রবৃত্তির বিরূপ অভিব্যক্তি। সমাজের সার্বিক কল্যাণে সে মিথ্যুককে চিনে নিতে হয়। মিথ্যা কখনও বা আবার সার্বিক প্রয়োজনে মঙ্গলের ভূমিকা গ্রহণ করে। সংকীর্ণ অর্থে মিথ্যুককে অনেকে তখন অভিনন্দন জানায়। মানসিক বিকৃতিও অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে 'মিথ্যুক' করে তোলে। তখন সে মিথ্যুকের ভূমিকায় অভিনয় করে, অবচেতন মানসিকতার তাগিদে। কেন করে কীভাবে করে, কোন পরিস্থিতিতে করে, সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না।

কারণ যাই হোক, মিথ্যা কোনদিন প্রশ্রয়

পারেনি। মা [illegible] কাল থেকে মিথ্যুককে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে। সে অনুসন্ধানের পেছনে কখনও কাজ করেছে প্রচলিত সংস্কার, কখনও বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত নানারকম উপায় বা পদ্ধতি।

আরবের বেদুইনরা এক সময়ে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে, এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিব দিয়ে গরম লোহা চাটতে দিত এবং জিবে ফোসকা পড়লে ধরে নিত লোকটি মিথ্যুক। প্রাচীন চীনদেশে মিথ্যুক বলে কাউকে সন্দেহ করা হলে তাকে শুকনো চালের গুঁড়ো চিবুতে বলা হত। চিবুনোর পর যদি দেখা যেত সেই গুঁড়ো মুখের লালায় সিক্ত হয়নি, তাহলে ধরে নেয়া হত লোকটি মিথ্যে কথা বলেছে। এক সময় বৃটেনে ঐ একই কারণে শুখনো রুটির টুকরো গিলে খাওয়ানর ব্যবস্থা ছিল। সন্দেহজনক ব্যক্তি গিলতে না পারলে তাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করা হত। এ থেকে মনে হয় অতীতের বিশেষজ্ঞরাও জানতেন, যদি কেউ ইচ্ছাকৃত মিথ্যে কথা বলে, কথা বলার সময় তার মধ্যে কিছু কিছু শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। তার মুখে যথাযথভাবে লালা নিঃসৃত হতে পারে না। ফলে কোন কিছু খেতে গেলে খাদ্যবস্তু গলায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং এর জন্যেই তাঁরা কাউকে কিছু খাইয়ে পরীক্ষা করতে চাইতেন, সত্যিই সে কোন অপরাধ করেছে কি না? আধুনিক বিশেষজ্ঞরাও লক্ষ করেছেন মিথ্যে কথা বলার সময় বক্তার শরীরে একাধিক প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে। সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে কিছু কিছু যন্ত্রপাতিও তৈরি করা হয়েছে যার নাম পলিগ্রাফ বা অত্যন্ত সাধারণ অর্থে 'মিথ্যুক আবিষ্কারের' যন্ত্র। সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অপরাধী চিহ্নিত করণের কাজে, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সততা নির্ধারণের জন্যও এই যন্ত্র ব্যবহার করছেন। ইদানিং চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও এর সাহায্যে মানুষের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ জানার চেষ্টা করেন।

ক্ষেত্র বিশেষে মনোবিজ্ঞানীরা যন্ত্রটি কাজে লাগান মানসিক প্রবণতা এবং তার গতি-প্রকৃতির কায়দাকানুন জেনে নিতে। অতএব সংকীর্ণ অর্থে 'মিথ্যুক আবিষ্কারক যন্ত্র' আখ্যা দিলেও, ব্যাপক অর্থে বলা চলে, পলিগ্রাফ এমন ধরনের যন্ত্র যা একই সময়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন তথ্য নির্ধারণে সাহায্য করে। মিথ্যেবাদিতা নির্ণয় এর একটি দিক মাত্র।

অদ্ভুত ব্যাপার, কেউ যখন মিথ্যের আশ্রয় নেয়, তখন সে নিজেও জানে সে মিথ্যে কথা বলছে। এ তার স্বতঃপ্রণোদিত এবং ইচ্ছেকৃত প্রয়াস। কাউকে প্রতারণা করার সময় সে নিজেও বোঝে, সে অপরাধী। মুহূর্তে ভীতি এবং অসহায়তা তাকে গ্রাস করে। সেই সঙ্গে শারীরিক বৈলক্ষণ্য। তখন তার মুখের লালা নিঃসরণ ব্যাহত হয়, হৃদস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং দৈহিক তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে স্নায়ুতন্ত্রের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়। চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব, তোতলামি এবং অস্থিরতা, শরীর ঘর্মাক্ত, চোখ রক্তাভ। অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এ সমস্ত উদাহরণ খুবই পরিচিত। এগুলি দেখে ওঁরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন, বক্তা যা কিছু বলে চলেছে, হয়ত তা সত্যি নয়। যন্ত্র ওঁদের ঐ অভিজ্ঞতাগুলি বিশেষভাবে বুঝে নিতে সাহায্য করে।

এবং সম্ভবত এ ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রচেষ্টার প্রথম গৌরব ইটালির প্রখ্যাত অপরাধ বিজ্ঞানী—সিজার লমব্রোসর। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাড়ির স্পন্দন এবং রক্তচাপের পরিবর্তন মেপে বহুক্ষেত্রে তিনি সঠিক অপরাধীদের চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে ভিত্তোরিও বেনুসসি নামে আরও একজন ইটালীয় গবেষক ঘোষণা করেন, শ্বাসপ্রশ্বাসের মাত্রার সঙ্গে তিনি নাকি প্রতারণার একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পেরেছেন। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯১৫-তে উইলিয়ম মউলটন কারস্টোন এবং হিউগো মানস্টারবার্গ নামে জনৈক মনোবিজ্ঞানী মিলিতভাবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চমকপ্রদ গবেষণায় ব্রতী হন। উদ্দেশ্য, মিথ্যেবাদিতার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং সম্প্রসারণজনিত রক্তচাপের তারতম্য নির্ণয় করা। ১৯১৭ সালে তাঁদের সাফল্যের কথা ঘোষণা করা হয়। ওঁরা প্রস্তাব করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যারা শত্রুপক্ষের গুপ্তচররূপে কাজ করছিল, তাদের স্বীকারোক্তি আদায় করার কাজে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হোক। প্রস্তাব অনুযায়ী কিছু কাজও হয়েছিল।

এই সময়ে জন এ লারসন নামে জনৈক পুলিস অফিসার বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হন। ইনি ইতিপূর্বে মনোবিজ্ঞানের উপর কিছুটা চর্চাও করেছিলেন। প্রায় চার বছরের

মত ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ১৯২১ সালে ইনিই প্রথম তৈরি করলেন আধুনিক 'মিথ্যাক আবিষ্কার যন্ত্র' পলিগ্রাফ-এর প্রথম সংস্করণ। এর আগে লমব্রোসো, বেনুসসি এবং মারস্টোন যে যে পদ্ধতির উপর কাজ করেছিলেন লারসন তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রে মিলিতভাবে তাঁদের উদ্যোগকে কাজে লাগান। অর্থাৎ তাঁর যন্ত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তির রক্তচাপ, নাড়ির স্পন্দন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের মাত্রার তারতম্য যুগপৎ নির্ণয় করার ব্যবস্থা করা হয়। পরে লারসনের জনৈক সতীর্থ লিওনার্দ কীলার ঐ যন্ত্রটির আরও কিছুটা সংস্কার সাধন করেন এবং অপরাধী চিহ্নিতকরণের কাজে যথাযথভাবে যাতে যন্ত্রটিকে ব্যবহার করা যায় তার জন্যে নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ-অনুসন্ধান বিষয়ক গবেষণা বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। বর্তমানে যে সমস্ত পলিগ্রাফ প্রচলিত রয়েছে মূলত সেগুলি কীলারের উদ্ভাবিত যন্ত্রেরই অনুরূপ।

অধুনা যে সমস্ত পলিগ্রাফ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাদের ওজন খুবই কম। আয়তনেও খাটো। অতএব সহজেই বহন করা সম্ভব। এর সাহায্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাড়ির স্পন্দন, রক্তচাপের ব্যতিক্রম, শ্বাসপ্রশ্বাসের কায়দা এবং দেহত্বকের বৈদ্যুতিক রোধ বা রেজিস্টান্স নির্ণয় করা যায়। রক্তচাপ নির্ণয়ের পদ্ধতিটি খুবই সহজ। চিকিৎসকেরা সাধারণ রোগীর ব্যাপারে যে ভাবে কাজ করেন কতকটা তাই। ব্যতিক্রম যেটুকু তা হল, এ ক্ষেত্রে রক্তচাপ যন্ত্রের সঙ্গে একটি স্বয়ংক্রিয় লেখযন্ত্র লাগান থাকে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়—একের পর এক, একনাগাড়ে বেশ কিছুটা সময় ধরে। যতক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলে, ততক্ষণ রক্ত-চাপ মাপার যন্ত্রটি সক্রিয় থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে উত্তরদাতার রক্তের চাপে যে যে ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তার সমস্তটাই লেখচিত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ঐ সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীরতার তারতম্য মাপার জন্যে বুকের চারপাশে জড়িয়ে দেওয়া হয় কাপড়ের তৈরি স্বল্প প্রশস্ত এবং লম্বা নল বিশেষ। নলের ভেতরটায় রবার বা প্লাস্টিকের আস্তরণ থাকে এবং বাইরে থেকে তার মধ্যে প্রয়োজন মত বাতাস পুরে কিছুটা ফুলিয়ে নেয়া হয়। একটি সরু রবারের নলের সাহায্যে এটিকে জুড়ে দেয়া হয় আর একটি লেখ-যন্ত্রের সঙ্গে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি প্রশ্নোত্তরের সময় যদি উত্তেজিত হয়ে ওঠে অথবা তার স্নায়ুতন্ত্রে যদি কোন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, ঐ প্রতিক্রিয়া তার শ্বাস-প্রশ্বাসেও পরিবর্তন ঘটায়। ফলে কখনও সে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকে। কখনও বা শ্বাসকার্য মন্থর হয়ে আসে। এবং এর সমস্তই লিপিবদ্ধ হয়ে যায় লেখযন্ত্রের উপর। ত্বকের তড়িৎ-রোধের পরিবর্তন মাপার জন্যে হাতের আঙুলে অথবা বাহুর কোন জায়গায় দুটি ধাতব তড়িৎ-দ্বার ছুঁইয়ে রাখা হয়। তারপর উপযুক্ত একটি তড়িৎ-রোধ এবং গ্যালভেনোমিটারের সঙ্গে ঐ দুটি তড়িৎদ্বার মিলিয়ে একটি সম্বন্ধ বর্তনী বা সারকিট তৈরি করে তার মধ্যে দিয়ে মৃদু তড়িৎ-প্রবাহ পাঠান হয়ে থাকে। কথা বলার সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তির মধ্যে কিছুটা মানসিক উত্তেজনা দেখা দেয়, যার ফলে তার হাতের তালু অতিরিক্ত ঘর্মাক্ত হয়। ফলে হাতের চামড়ার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতায় তারতম্য দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন, উত্তেজনার দরুন ঠিক যে ভাবে অতিরিক্ত ঘাম নির্গত হয় তার সঙ্গে সাধারণ বিপাকীয় পদ্ধতির তেমন কোন মিল নেই। অর্থাৎ ওঁরা বলতে চান, অতিরিক্ত দৈহিক শ্রম অথবা জোরে চলাফেরার দরুন শরীর যে কারণে ঘর্মাক্ত হয়, এ ক্ষেত্রে কারণটা কিন্তু ভিন্ন। সম্ভবত দেহত্বকে বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার দরুন এটা ঘটতে পারে। ঘর্মস্রাবী গ্রন্থিতে বৈদ্যুতিক সমবর্তিতা বা পোলারাইজেশনের দরুনও এমনটি হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলে রাখি, এ ধরনের পলিগ্রাফকে 'মিথ্যাক আবিষ্কারক 'যন্ত্র' আখ্যা দিলেও, এর সাহায্যে সত্যিকারের 'মিথ্যাকে' কিন্তু ধরা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যের সাহায্যে প্রতারণা করার চেষ্টা করে, তখন তার মধ্যে যে শারীরিক বৈলক্ষণ্যগুলি প্রকাশ পায় তাদের জেনে নেওয়াই এর লক্ষ্য। পরে সংগৃহীত সেই সমস্ত তথ্যের সাহায্যে বুঝে নিতে হয়, যার উপর পর্যবেক্ষণ চালান হল, সত্যিই সে অপরাধী কী না। এবং মূলে সমস্যা সেখানেই।

এক, যিনি এই যন্ত্রটি ব্যবহার করবেন

তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। পর্যবেক্ষণ চালানর সময় তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে, যার উপর পর্যবেক্ষণ চালান হচ্ছে সে যেন অহেতুক উত্তেজিত হয়ে না পড়ে। দুই, এর জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে নেওয়া দরকার। পর্যবেক্ষণের সময় যে সমস্ত প্রশ্ন তিনি করবেন, সে-গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই। তিন, প্রয়োজন হলে, যন্ত্রটি ব্যবহার করার আগে সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঙ্গে পরীক্ষক খোলা-খুলি কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন। তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে, ব্যাপারটা মারাত্মক কিছু নয়, তবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াও খুব সহজ হবে না। চার, পরীক্ষক কী ভাবে কাজ করতে চান, সেটা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিশদ বুঝিয়ে দিতে হবে।

অবশেষে সক্রিয় অনুসন্ধানের কাজ। পরীক্ষক এবার সন্দেহভাজন ব্যক্তিটিকে সামনের আসনে বসতে বলবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে, তার এতটুকু যেন অসুবিধে না হয়। তারপর তার দেহের বিভিন্ন অংশে পরিমাপক বস্তুগুলি লাগিয়ে দিতে হবে। অতঃপর পলিগ্রাফের কাজ শুরু করা।

ড্রামের উপর বসান গ্রাফ কাগজের ফিতে ধীরে ধীরে সরতে শুরু করল। আর তার উপর অত্যন্ত হালকাভাবে বসান সূক্ষ্ম কলমের ডগা এঁকেবেঁকে দাগ টেনে চলল। পরীক্ষক একে একে প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নই সরাসরি এবং ছোট। উত্তর-দাতা উত্তরে শুধু 'হাঁ' অথবা 'না' বলে যাবে। আর এই উত্তর দেবার সময় তার মধ্যে যে ধরনের মানসিক উদ্দীপনা সঞ্চারিত হবে তার প্রভাবে তার রক্তচাপ, নিশ্বাস প্রভৃতির অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকবে। ফলে লেখ-চিত্রের টান কখনও হবে বিক্ষিপ্ত, অত্যন্ত চঞ্চল, কখনও বা সরল। পরীক্ষক এই সঙ্গে লক্ষ রাখবেন প্রশ্নোত্তরের সময় কোন্ কোন্ টান কোথায় অতিরিক্ত স্পন্দিত হয়েছে অথবা সরলপথে চলেছে। পরে যথাযথ প্রশ্নের সঙ্গে টানের কায়দার তুলনা করে তিনি বুঝতে পারবেন কোন প্রশ্নে ঐ ব্যক্তির মনে সঠিক কী ধরনের চাঞ্চল্যের উদ্রেক করেছিল এবং তার উপর নির্ভর করে লোকটি সম্পর্কে উপযুক্ত সিদ্ধান্তে তৈরি করবেন।

লেখ-চিত্র তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সাধারণত সেটিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেখান হয়ে থাকে। তাকে বোঝান হয়, কখন কী প্রশ্ন তিনি করেছিলেন এবং তার যে উত্তর সে দিয়েছে তার ফলে কী ধরনের রেখা ফুটে উঠেছে এবং সেই রেখা থেকে কী ধরনের সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। এই ভাবে তার মনে পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করে যদি তার কোন স্বীকৃতি দেবার থাকে সেটা আদায় করে নেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিবেশে পড়ে অনেকেই নিজেদের দোষ স্বীকার করে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, লেখ-চিত্রের পঠনের ব্যাপারে পরীক্ষককে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, এক : অনেক সময় তার টানগুলির মধ্যে বড় রকমের পরিবর্তন এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে; দুই : আবার এমনও হতে পারে, রক্তচাপের লেখচিত্র দেখে হয়ত মনে হল, লোকটি প্রশ্ন শুনে যেন খুবই উত্তেজিত হয়েছে, হয়ত তার অর্থ করলে দাঁড়াবে সে ভয় পেয়েছে। কিন্তু, বৈদ্যুতিক রোধের লেখ-চিত্র পরীক্ষা করে পাওয়া গেল, তার মানসিক অবস্থায় তেমন কোন চাঞ্চল্যই দেখা যায়নি। এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষককে বেশ কিছুটা নিজের অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়। প্রয়োজনে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ভিন্ন ধরনের প্রশ্নবাণ বর্ষণ করে আবার নতুন লেখচিত্র সংগ্রহ করে নিতে হয়। আর গোলমালটা এখানেই। শুধু এই কারণেই পলিগ্রাফের সাহায্যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। বিচারকের কাছে পলিগ্রাফের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয়ও নয়। তবে মোটামুটিভাবে

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকৃতি সংগ্রহের ব্যাপারে যন্ত্রটি যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তিই নয়, ইদানিং কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাঁদের কর্মচারীদের সততা পরীক্ষার জন্যেও পলিগ্রাফের সাহায্য নিতে শুরু করেছেন। কাজে কেউ নিয়মিত ফাঁকি দিচ্ছে কী না, আর্থিক বা অন্যান্য জিনিসপত্রের ব্যাপারে কেউ অসাধুতার পরিচয় দিচ্ছে কী না, এমন কি, কোন নতুন কর্মী নিয়োগ করার সময়, সেই কর্মী অতীতে কোন অপরাধ করেছে কিনা, এমন অনেক পরীক্ষার কাজেই আজকাল এই যন্ত্রটির সাহায্য নেয়া হচ্ছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও, পলিগ্রাফের বিরুদ্ধে আজ বিরাট দুটি অভিযোগ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এর একটি বিজ্ঞানগত, অপরটি নৈতিক প্রশ্ন। প্রথম প্রসংগটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, মনোস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নকর্তার ব্যাপারটা উপেক্ষা করলে চলবে না। তিনি যতই সাবধান হোন, অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে যতই নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব হয়ত তার উপর এমনিতেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। হয়ত তাঁর গলার আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি অহেতুক মন্থর অথবা অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ এবং চঞ্চল হয়ে যেতে পারে। এমনও হতে পারে, যে প্রশ্নগুলি তিনি করছেন সেগুলি যথাযথ নয় এবং যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল। আবার এও সম্ভব, কোন একটি প্রশ্নের উত্তরে সে যা বলল, তা নেহাতই তার সুপ্ত চেতনার অভিব্যক্তি, যা একদা শৈশবে তার মধ্যে দানা বেঁধেছিল—হয়ত অকারণে। তার সঙ্গে তার বর্তমান কার্যকারণের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন ধরুন একজনকে প্রশ্ন করা হয়, সে চা পান করে কিনা। প্রশ্ন শুনেই সে উত্তর দিল 'না'। সঙ্গে সঙ্গে পলিগ্রাফে টান পড়ল—আর অর্থ গিয়ে দাঁড়াল সে ভয় পেয়ে গেছে। পরে অনুসন্ধান নিয়ে জানা গেছে, লোকটি ঐ প্রশ্ন শুনে সাময়িকভাবে কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সত্যিই চা পান করার অভ্যাস তার ছিল। কিন্তু ছোট বয়সে তার চা পানের অভ্যাসটিকে তার বাবা বরদাস্ত করতেন না এবং তার জন্যে রীতিমত মারও খেতে হয়েছে তাকে। অনেক সময় আড়ালে চা পান করে, সামনে বাবাকে বলতে হত 'না'। এ সব তার শৈশবের কাহিনী। তবু সেদিনের সেই শাসন আজও তার অবচেতন মনে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাই পরীক্ষকের সামনে পড়ে তার প্রতিক্রিয়াও হয়েছে আগেরই মত।

আর একটা উদাহরণ দিই। এ পরীক্ষাটি করেছিলেন ভারজিনিয়া স্কুল অব্ মেডিসিনের মনোবিজ্ঞানী ডঃ এইচ বি ডিয়ারম্যান। জনৈক ব্যাংক ম্যানেজারের উপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালানর জন্যে পলিগ্রাফের সাহায্য নেওয়া হয়। কয়েকবার রেকর্ড নেওয়ার পর, নেহাৎ সাধারণভাবেই ডঃ ডিয়ারম্যান ঐ ম্যানেজারটিকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'এবার বলুন তো মশায়, কোন ব্যাংক অথবা ব্যাংকে টাকা রাখেন এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কখনও কি আপনি টাকা চুরি করেছেন?' ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। সংগে সংগে পলিগ্রাফের উপর ফুটে উঠল প্রচণ্ড রকমের চাঞ্চল্য। সূক্ষ্ম কলমের নিবগুলি লেখচিত্রের উপর দীর্ঘ রেখা টেনে জানিয়ে দিল, বক্তা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছে। এর অর্থ, সম্ভবত ভদ্রলোকটি কোন সময়ে চুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন। লেখচিত্র পরীক্ষা করে মনে হল চুরির পরিমাণ ছয় হাজার থেকে আট হাজার টাকার মত হতে পারে। কিন্তু কী ভাবে এই টাকা তিনি চুরি করেছেন এ কথা বুঝে উঠতে পারলেন না। তবে হাতের সমস্যাকে উপেক্ষা করার মত সাহসও তাঁর নেই। তাই বলে ফেললেন, হাজার সাতেকের মত তিনি চুরি করেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য, ব্যাংকের হিসেব এবং অন্যান্য সম্ভাব্য জায়গায় তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেও বোঝা গেল না, সত্যিই তিনি ঐ টাকাটা চুরি করেছেন কী না। অবশেষে মনোসমীক্ষকের সাহায্য নেওয়া হল এবং শেষ পর্যন্ত জানা গেল ব্যক্তিগত লেন-দেনের

সময় তাঁর মা এবং স্ত্রীর কিছু অর্থ তিনি একবার সরিয়ে ফেলেছিলেন এবং তার পরিমাণ আট হাজার টাকা। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, নৈতিক অর্থে একে হয়ত চুরিও বলা চলে না। কিন্তু প্রশ্ন কর্তা যে মুহূর্তে ব্যাংকের 'লেনদেনকারীর' কথা বললেন, সংগে সংগে তাঁর মা এবং স্ত্রীর কথাই মনে পড়ল, কারণ ও'রা তার ব্যাংকের 'লেনদেনকারী' ছিলেন।

উদাহরণ আরও আছে। পরীক্ষকের পরিবর্তনের সংগে পলিগ্রাফের লেখচিত্র পাল্টায়। একই প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্নতর হয়। অনেক সময় কোন কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ পরিবেশের অভাবে সে আবেগ সে প্রকাশ করতে পারে না। ফলে উত্তর দেওয়ার সময় তার মধ্যে তেমন কোন শারীরিক পরিবর্তন ঘটে না। কারুর হয়ত নিজের নামটি সম্পর্কে দুর্বলতা আছে। ধরুন, তার নাম 'হনুমান প্রসাদ।' এবং এই নামটির তাৎপর্য লোকচক্ষুর কাছে কেমন, সে সম্বন্ধে সে দারুণ সচেতন। অতএব পলিগ্রাফিক পরীক্ষার সময়, যে মুহূর্তে তার নাম জিজ্ঞেস করা হল, প্রচণ্ড লজ্জা বা সংকোচ তাকে ঘিরে ধরল। আর লেখচিত্রের উপর ধরা পড়ল তার প্রতিক্রিয়া। কখনও বা বক্তা তার সততা সম্পর্কে নিশ্চিত থেকেও, উত্তর দেবার সময় এমন ভাবে কথা বলল, যার মধ্যে তার দৃঢ়তার কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না। আবেগজনিত এই নিষ্ক্রিয়তা তার শারীরিক বিষয়গুলির উপর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করায়, পলিগ্রাফে কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল না। এ ছাড়া ঠিক যেখানে বসে পরীক্ষক প্রশ্নোত্তর চালান সেখানকার তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আসবাবপত্র, দেওয়ালের রঙ প্রভৃতির কথাও বিবেচনা করা দরকার। সেই সংগে ঐ সময়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তির দৈহিক অবস্থা কেমন ছিল সেটাও। কারণ মনের উপর এদের প্রভাব খুবই প্রত্যক্ষ। অথচ বেশির ভাগ সময়ে এগুলি উপেক্ষা করা হয়।

প্রশ্ন উঠেছে : মানুষের স্বীকারোক্তি আদায় করার ব্যাপারে পলিগ্রাফকে কতখানি নির্ভরযোগ্য বলা চলে?

এ ব্যাপারেও অনেকে দ্বিমত। কেউ কেউ বলেন শতকরা প'চানব্বুই ভাগ ক্ষেত্রেই নাকি নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞ শতকরা একশ ভাগ বলে দাবী করছেন। ১৯৬২ সালে ফোর্ডহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ জোসেফ এফ কুবিস ১১০ জন ভবঘুরের উপর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ওদের চোখ মুখ দেখে মনে হয়েছিল ওরা সকলেই চোর এবং অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি। পলিগ্রাফের সাহায্যে প্রশ্নোত্তর চালিয়ে দেখা গেল, মাত্র দুজন বাদে অবশিষ্টরা সত্যিই কোন না কোন সময়ে চুরির আশ্রয় নিয়েছিল। ডঃ কুবিস-এর মতে, সাধারণভাবে শতকরা বাহাত্তর থেকে বিরানব্বুই ভাগ ব্যক্তির স্বীকারোক্তি আদায় করার ব্যাপারে তিনি নাকি যথেষ্ট সুফল পেয়েছেন। দেখা গেছে, ত্বকের বৈদ্যুতিক রোধ এর উপর নির্ভর করলে সবচাইতে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়—শতকরা নব্বুই ভাগ। হৃদস্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে যন্ত্রটি শতকরা ষাট সত্তর ভাগ নির্ভরযোগ্য। অতএব পলিগ্রাফ-স্বীকারোক্তি কতখানি নির্ভরযোগ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত সে সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ আছে।

এবার এর নৈতিক দিকটার কথাই ভাবুন। এ সম্পর্কে সবচাইতে বড় অভিযোগ : এক, সাধারণভাবে যন্ত্রটির নাম রাখা হয়েছে 'মিথ্যে আবিষ্কারের যন্ত্র।' কিন্তু সত্যিই কী তাই? অথচ এই বিশেষ নামকরণ, যাদের উপর পরীক্ষা চালান হয়, প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে প্রতিকূল মানসিকতা সৃষ্টি করে। সে ব্যক্তি সন্দেহভাজন না হলেও, ঘাবড়ে যেতে পারে এবং তার ফলে লেখচিত্রের লিপির মধ্যে গরমিল দেখা দেয়। দুই, যিনি পলিগ্রাফটি চালান, তিনি নিজে কোন ধর্মযাজক, সাধু বা আদালতের বিচারক নন। অতএব নৈতিক দিক দিয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি আদায় করার যোগ্যতা সামাজিক স্বীকৃতি পেতে পারে না। তিন, স্বীকারোক্তির সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়ত কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে এমন সমস্ত কথা বলতে পারে যা নেহাৎই ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং যার সংগে কল্পিত অভিযোগের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষিত নাও হতে পারে। ফলে তার সংজীবিকা, সামাজিক স্বীকৃতি প্রভৃতি আজীবন ব্যর্থতায় পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। সে হয়ত বোকামি অথবা ব্যক্তিগত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলল। ফলে সারাজীবন তাকে অকারণ নিরাপত্তায় মধ্যে অতিবাহিত করতে হবে। চার, বলা হয়, পলিগ্রাফ-পরীক্ষা নেওয়াটা নির্ভর করে নাকি অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছের উপর। কিন্তু বাস্তবে সত্যিই কি সেটা মেনে চলা হয়? পাঁচ, অনিবার্য কারণে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হয়ত কেউ অপরের স্বার্থ রক্ষার জন্যে মিথ্যে কথা বলল, পরের অন্যায়ের বোঝা নিজের উপর চাপাল অথবা সত্যিকারের কোন সৎব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে কোন স্বীকারোক্তি করে বসল। তখন সাধারণভাবে তাকে প্রতারক বলে মনে হলেও নৈতিকতার দিক দিয়ে বৃহত্তর ব্যক্তিমানসের কষ্টিপাথরে তার অন্যায়কে স্বীকার করা ছাড়া হয়ত আর কোন উপায় থাকে না। শুধু পলিগ্রাফের উপর নির্ভর করে সত্যি কি এ ধরনের ঘটনার উপর যথাযথ কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব?

স্বীকরোক্তি - সংগ্রাহক-পলিগ্রাফ বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানী এবং অনুসন্ধানীদের মনে তাই আজ বড় রকমের একটি প্রশ্ন।

অমরজিৎ বসু

দেশের ভাগ্যজয়ের যাত্রায় মেয়েরা

যখন এ লেখা লিখছি তখনও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন সম্বন্ধে নিশ্চিত বিচার হয়নি। হয়তো যখন আপনারা পড়বেন পরিষদের ভবিষ্যৎ সাধারণের সিদ্ধান্ত প্রার্থনায় চঞ্চল হ'য়ে উঠতেও পারে। লোকসভার নির্বাচনের ঘোষণার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পর গত সাতাশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভারতের প্রত্যেক নাগরিক জেনেছে তাদের দায়িত্বের নূতন পরীক্ষা আসন্ন। গণতন্ত্রে অংশ নেবার এ আহ্বান এবার এসেছে একটু আগে মধ্যবর্তী নির্বাচন হিসাবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রগতিশীল সংসদের নিদর্শন হিসাবে এ নির্ধারণকে আমরা স্বাগত জানাই। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কি চায়, কোথায় তাদের বাধা, কোথায় বা তাদের সমস্যা তার নিষ্পত্তির নিতান্ত এতটুকুও যদি হয় তাকে জাতীয় জীবনের পরম সার্থকতা মনে করি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী অথবা ১লা মার্চ নির্বাচন হবে বলে ভারতের মুখ্য ইলেকশন কমিশনার শ্রীযুক্ত সেনবর্মা জানিয়েছেন। যে সময় নির্বাচন হবার কথা তার ১৪ মাস আগে দেশের পঞ্চম ইলেকশন শুরু হবে। এবার হয়তো কোথাও কোথাও একাধিক দিনের ব্যবস্থা হবে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ শেষ হয়। রাজনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় এবারকার ইলেকশন। ভোটদাতা হিসাবেও ভারতীয় নাগরিক অনেক এগিয়ে এসেছে। যাদের আমরা ... বনবাসী, মূর্খ অজ্ঞ ... বলে ... মাথা দিয়ে এসেছি, তারাও রাজনৈতিক সচেতনতায় কোন দেশের কোন মানুষের চেয়ে কম নয়। দূর পল্লীর সাধারণ অধিবাসীও আজ জানে তার মঙ্গল কোথায়। রাজনীতির পাশা খেলায় যখন উচ্চ মহল নানা চালের চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্র নিরন্ন মানুষ তখন সরল সিদ্ধান্তে সফলতার পথে এগিয়ে যেতে চায়। ইলেকশন-এর প্রচার বা বিজ্ঞাপনের চমকপ্রদ কৌশল কতটুকুই বা তাকে ভোলাতে পারে। ম্যানিফেস্টো বা কর্মসূচীর সব প্রকাশ্য ঘোষণাতে সে আর তত কাবু হয় না। ভোটার হিসাবে অগ্রগতির অলপরিসরে আমাদের মেয়েদের স্পর্শ করেছে। শ্রীযুক্ত সেনবর্মা সেদিন বলছিলেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর ছোটখাটো নির্বাচনী আসরে গিয়ে দেখেছেন মেয়েদের ব্যবহারিক বা প্রয়োজনীয় বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। অবশ্য চীফ ইলেকশন কমিশনার সাহেবের আদি বাড়ি অশ্বিনীকুমার দত্তের গ্রাম বাটাজোরের পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মণকাঠিতে। বরিশাল জেলার ঝালকাঠি, সিদ্ধকাঠি ইত্যাদির খবর যাঁরা জানেন আর কর্মযোগী অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা মহিলাদের আত্ম-প্রত্যয়ের উপর শ্রীযুক্ত সেনবর্মার অগাধ বিশ্বাসে আশ্চর্য হবেন না। বরিশাল জেলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত ব্রজমোহন পুরস্কার মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ। তাই বোধহয় শ্রীযুক্ত সেনবর্মা ভারতের মহিলা সমাজের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রতিভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি তামিলনাদের ধীবর পল্লীতে গিয়ে দেখেছেন মেয়েরা ভোটদানের দায়িত্ব সম্বন্ধে কত সতর্ক। তিনি তামিলনাদের ভাষা জানেন না, অল্পস্বল্প ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজীতে তামিলনাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করে জেনেছেন কি তীক্ষ্ম তাদের বুদ্ধি, কত জীবন্ত তাদের জাতীয় জীবনের মঙ্গলের আগ্রহ। কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে গিয়েছেন। বলছিলেন, এমন পাশাপাশি, কাছাকাছি পল্লীবাসিনীর দেখা মিলেছে যে রাজনীতির মঞ্চ থেকেও তা মেলে না। সেখানেও ভাষা জানতেন না। তবে এটুকু জেনেছিলেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক, কি মেয়ে কি পুরুষ, গণতন্ত্রের দায়িত্ব বোঝেন, তাঁরা শক্তির অপব্যয় করতে সহজে চান না।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কম কথা নয়। বিশেষ, ভারতের মত বিরাট মহাদেশে। সমস্ত পৃথিবীর এক সপ্তমাংশ

মানুষের বাস এখানে। ১৯৬৬ সালের তালিকার পরও ২১,০০,০০০ ভোটার এবার বেশী। প্রাদেশিক নির্বাচন বাদ দিলেও কর্তব্যের ভার কম কি? ৫২০টি লোক-সভা আসনের নির্বাচন করবে ২৭১৪৪৬২৯১টি ভোটার।

ভারতবর্ষে প্রতি হাজার পুরুষে, নারীর সংখ্যা ৯৪১। প্রায় সমান সমান বললেই হয়। এমন রাজ্য আছে যেখানে নারী পুরুষের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। কেরালায় ১০০০ পুরুষের ক্ষেত্রে ১০২২ মেয়ে। বাংলায় অবশ্য অনেকটা তফাৎ। প্রতি হাজার পুরুষে ৮৭৮টি মেয়ে। ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বলেন, কলকাতা এবং কলকারখানা এলাকার পুরুষ প্রাধান্য এর জন্য দায়ী। দলে দলে পুরুষ বাংলাদেশের বাইরে থেকে কর্ম-সন্ধানে কলকাতায় আসে। সবাই পরিবার আনে না। অবশ্য হিসেব প্রায় দশ বছর আগের, ১৯৬১. সালের আদমসুমারের। বর্তমান সংখ্যা জানা যাবে আগামী লোক গণনায়।

ভোটার তালিকা প্রস্তুতের সময় এককালে খুব ঝামেলা হ'তো মেয়েদের নিয়ে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে। মেয়েরা অনেকক্ষেত্রে স্বামীর নাম নিতে নারাজ হ'তেন। একবার এক ঘটনার গল্প শুনেছিলাম। বিহার অঞ্চলের পল্লী। গ্রাম্য মহিলা, স্বামীর নাম তারাচাঁদ। মহিলা কিছুতেই নাম মুখে আনবেন না। যতই জিজ্ঞাসা করা হয় ততই বলেন "রাতমে যো উঠতে হৈ।" অবশেষে বোঝা গেল রাতে ওঠা তারা এবং চাঁদ!! কখনও বা গ্রামের মেয়ের নাম অমুকের মা হিসাবে চলতো। তার আসল নাম হয়তো সে ভুলেও যেতো। স্বাধীনতার পর পঞ্চম নির্বাচনে সংস্কারের শাসন অনেকটা কমেছে। মেয়েরা জেনেছে তাদের শক্তি কোথায়। বিশেষ করে শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিত্ব প্রত্যেক ভারতবাসিনীকে প্রেরণা দিয়েছে। বুদ্ধিগত স্বাধীনতার অভাব তার কোনদিনই ছিল না। এখন স্বল্প উপলব্ধির প্রকাশে সে সম্পূর্ণ হতে চলেছে। মুক্তির সেই তো পরম বিকাশ।

সম্প্রতি জাতি সঙ্ঘের জয়ন্তী উৎসবে যখন শ্রীমতী গান্ধী আমেরিকা গিয়েছিলেন, মুক্তির উদ্দাম প্রয়াসে বিভ্রান্ত মার্কিন মহিলাদের লিবারেশন ফ্রন্টের কেউ নাকি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতীয় মহিলা স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি কি মনে করেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন ভারতীয় মহিলা স্বাধীন। তাদের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসের প্রয়োজন কোথায়?

প্রয়োজন এখন স্বাধীনতার সম্যক ব্যবহারের। শিক্ষার আলোকে সংস্কার দূর করে স্বচ্ছন্দ চিন্তার পথ ধরে যেতে হবে। মঙ্গল অমঙ্গল, সত্য অসত্য চিনে নেবার ভার তার নিজের হাতে। ভোট দেওয়া যে কোন গণতন্ত্রের জাতীয় জীবনের মস্ত বড় ঘটনা। সে অধিকার লাভ করার জন্য বহু দেশে মেয়েরা যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করে। আত্মত্যাগ করেছে। আমরা পেয়েছি অবলীলাক্রমে। স্বাধীন ভারতে নাগরিক হিসাবে সমান অধিকার সবার। মেয়ে পুরুষে ভেদ নেই, ধনী দরিদ্রে তফাৎ নেই। প্রত্যেক অধিকার দায়িত্বের সঙ্গে জড়িত। এ অধিকারও তাই। ভারতীয় জনসাধারণের অনুশাসন ও অনুমতির দ্বারে প্রার্থী তার জাতীয় ভবিষ্যৎ। জনসাধারণের বিরাট অংশ তার মহিলা সমাজ। জাতীয় জীবনের আগামী দিনে সার্থকতার সন্ধান করতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা এগিয়ে আসবেন এতটুকু আশা করা অন্যায় নয়। ভোটের ভালমন্দ বিচার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে সমষ্টিগতভাবে মেয়েরা যেন ভোটের বাক্সকে এড়িয়ে না যান। গণতন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য তবে বিফল হবে।

শ্রীমতী

সতেরো

খুলে বলতে হলো রত্নকে তার প্রথম কাহিনী। যে প্রেম সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণরাগের মতো। এতদিনে মিলিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। মালা এখন তার কেউ নয়। এখন আরেকজনের।

“অমন কত হয়। গৌরীর জীবনেও কি অমন ঘটেনি?” জ্যোতিদা অভয় দেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেয় যে গৌরী ভুল বুঝতে পারে। মালাদের ওখানে কি না গেলেই নয়?

রত্ন বলে, “আচ্ছা। আপাতত যাওয়া কমিয়ে দেব। নিজেরও তো পড়াশুনোর চাপ। আমার সময় কোথায় যে মালাদিকে সিনেমায় নিয়ে যাব? বটানিকসে নিয়ে যাব। কোথাও যেতে পারে না বেচারি।”

মালাদির আকর্ষণ সত্যি অপনীত হয়েছিল। অবশিষ্ট যা ছিল তার নাম প্রেম নয়। বেশ ভালো করেই বাজিয়ে দেখেছিল রত্ন। আপনাকে তথা মালাদিকে। না, ওদের ওটা প্রেম নয়। মালাদিও সাবধান ছিল রত্ন যেন তেমন কিছু দাবী করে না বসে। তা হলেও দুজনের মধ্যে একটি প্রীতির সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝে দেখা না হলে মন কেমন করত।

মালাদির বিয়ে দেওয়া চাই। রত্নকেই এর জন্যে উদ্যোগী হতে হবে। কিন্তু এখন নয়। পরে এক সময়। মালাদির মুখ দেখে মনে হয় তারও অন্তরের ইচ্ছা তাই। কিন্তু হিন্দু বিধবার সংস্কার তার ইচ্ছার চেয়ে শক্তিমান। মা বাপের অমতে বিধবা মেয়ের বিয়ে কি সম্ভব? তার আগে পাশ করে স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। তার ঢের দেরি।

মালাদির গল্প গৌরীকে জানিয়ে রেখেছিল রত্ন। সেইজন্যে তার মনে অপরাধবোধ ছিল না। আর গৌরীর মনেও তার উপর অবিশ্বাসের ভাব ছিল না। তবু বলা তো যায় না। মালাদির সঙ্গে মেলামেশা হাজার নির্দোষ হলেও ঘটনার চেয়ে রটনা ভারী হতে কতক্ষণ।

“ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের খালি একটি-মাত্র সম্পর্ক থাকবে। এটা কখনো ঠিক হতে পারে না, রত্ন। প্রেম যেমন সত্য, সখ্যও তেমনি সত্য। একটির সঙ্গে আরেকটির বিরোধ কোথায়? তা সত্ত্বেও আমাদের সতর্ক হতে হবে, যাতে অকারণে বিরোধ না বাধে। তোমার চেয়ে আমার সাংসারিক অভিজ্ঞতা বেশী। চিত্রাদির কাছে ওদেশের কথা অনেক শুনেছি। একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আরেকজনের সঙ্গে প্রেম এই দুই নৌকায় পা রেখে টাল সামলানো যায়নি। বিবাদ বেধে গেছে। তোমাদের প্রেম আর একটু পাকা হলে বন্ধুতার ভর সইবে। ততদিন তুমি না হয় একনিষ্ঠ দেবতার উপাসনা করলে।” জ্যোতিদা রঙ্গ করে।

“সানন্দে। আমি এক ঈশ্বরী বাদী।” রত্ন আরো বলে, “ঈশ্বরকেই আমি নারী রূপে আরাধনা করি। আমি সুফী।”

“তুমি দেখছি গুরুদেবকেও ছাড়িয়ে যাবে। কোনদিন লিখে বসবে দেবতারে প্রিয়া করি, প্রিয়ারে দেবতা।” জ্যোতিদা মুচকি হাসে।

রত্ন সলজ্জভাবে বলে, “আগে ওটা জীবনে উপলব্ধি করি, তারপরে সাহিত্যে প্রকাশ করব। যা উপলব্ধি নয়, নিছক উক্তি তাতে আমার অনুরক্তি নেই, ভাই জ্যোতিদা।”

যার করুণায় জীবনে উপলব্ধি করবে সে যে গৌরী বলে একটি নারী এ বিষয়ে ওর লেশমাত্র সংশয় ছিল না। ও মেয়ে ওর জীবনে উদয় হয়েছে ওই সত্যটিকে সাকার করতে রত্ন সেইজন্যে সকারবাদী। ব্রাহ্মদের মতো নিরাকারবাদীও নয়, জ্যোতিদার মতো নিরীশ্বরবাদীও নয়। বাবার মতো বৈষ্ণবও নয়।

“আমি কিন্তু ঠিক নিরীশ্বরবাদী নই।” জ্যোতিদা সংশোধন করে। “পার্সনাল গড মানিনে বলে প্রার্থনা উপাসনা করিনে। ভগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করিনে। কিন্তু তৎ সৎ মানি।”

জ্যোতিদা ওর বেশী ধরাছোঁয়া দেয় না। রত্ন চেপে ধরলে বলে, “অন্ধের হস্তিদর্শন জানো তো। মানুষ কোনো দেশেই কোনো কালেই সমগ্র হস্তীটাকে মুক্তচক্ষে দর্শন করেনি। ঋষিরাও না। প্রোফেটরাও না। যিনি যেটুকু ছুঁয়েছেন সেইটুকুকেই সমগ্র ভেবেছেন। তাই ধর্ম নিয়ে এত বিবাদ বিসম্বাদ। কারো সঙ্গে কারো মত মেলে না। মেলাবার আশায় বলতে হয় যত মত তত পথ। কিন্তু সেটাও তো সমগ্রের স্বরূপদর্শন নয়।”

সমগ্র সত্য কেই বা কবে জেনেছে যে জানাবে? জ্ঞানমার্গে এর কি কোনো সমাধান আছে না হবে? রত্ন সেইজন্যে প্রেমমার্গ বরণ করেছে। ভালোবেসেই ভালোবাসা পেয়েই সে সমগ্রতার স্বাদ পাবে। একটুখানি স্বাদই এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট।

জ্যোতিদা হেসে বলে, “এ যেন হস্তিদর্শন নয়, ক্ষণেকের জন্যে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ।”

এরপরে আবার গৌরীর কথা ওঠে। গৌরী যখন কলকাতা আসতে পারছে না তখন রত্নকেই কৃষ্ণনগরে যেতে হয়। বিশেষত গৌরী যখন বার বার যেতে বলছে।

“কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে পরীক্ষার পড়া ফেলে কোথাও যাওয়া উচিত কি না। তা ছাড়া অন্য কারণও আছে।” রত্ন সঙ্কোচে বিবর্ণ হয়।

“শুনি।” জ্যোতিদা উৎকর্ণ হয়।

“সেবার আমাকে যেতে হলো বেগমপুরে।

সেখানে ওর স্বামীর সম্মুখীন হতে হলো। এবার কৃষ্ণনগর গেলে হতে হবে ওর মা বাবার সম্মুখীন। এ যেন একপ্রকার পরীক্ষক-মণ্ডলীর সম্মুখীন হওয়া। কী আছে আমার? কী করে ওঁদের দৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হব?"

জ্যোতিদাকে নীরব দেখে রঞ্জুই আবার বলে, "আমি যদি ওঁদের ভালোবাসা না পাই, ওঁদের ভালোবাসতে না পারি তা হলে গোরীর দৃষ্টিতেও তো অনুত্তীর্ণ হব। অথচ আমি সত্যিই চাই যে গোরীর স্বজনদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা হয়। ওঁরাও আমাকে আপন জন মনে করেন, আমিও ওঁদের।"

জ্যোতিদা সকৌতুকে বলে, "তাই নাকি? ওর স্বামী?"

রঞ্জু অতটা ভাবেনি। লজ্জিত হয়ে বলে, "কেন নয়? উনি যদি ওকে গ্রেসফুলি ছেড়ে দেন তবে উনি আর আমি তো বন্ধু। উনি তো আবার বিয়ে করবেন, ওঁর এমন কী ক্ষতি!"

জ্যোতিদা গম্ভীর হয়ে যায়। "না, ভাই, অত সহজ নয়। উনি ভয় দেখাতেন তা ঠিক, তা বলে সত্যি আবার বিয়ে করবেন না। ও'র যদি ছেলে কি মেয়ে হয় তাকে তার সৎমার হাতে সঁপে দেবেন না। ওঁকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। উনি চেয়েছিলেন সন্তান। ওঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হতে চলেছে। এখন আর উনি বিয়ে করবেন কেন, বৌ ছেড়ে গেছে বলে?"

"কেন, সন্তান ছাড়া কি স্ত্রীতে আর কোনো প্রয়োজন নেই?" রঞ্জু মুখ ফুটে বলে না কী প্রয়োজন? তার ইঙ্গিতটা কি স্পষ্ট নয়?

"জমিদার নন্দনের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রয়োজন হয় না। ওসব বরং গোরী চলে গেলে আরো নির্বিঘ্নে চলবে।" জ্যোতিদাও ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বোঝায়।

"শুনেছি সুধা—" রঞ্জু লজ্জায় থেমে যায়।

"নেহাৎ ভুল শোনোনি।" জ্যোতিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "সুধা আছে বলেই রক্ষা। সুধা ওঁকে সত্যি ভালোবাসে। উনিও ওকে। গোরী আসলে প্রক্ষিপ্ত। ও যদি বিদায় নেয় দুদিন একটু শূন্যতা হবে। তারপরে জীবনযাত্রা যথারীতি চলবে?"

"কিন্তু ওর বেবী তো প্রক্ষিপ্ত হবে না। যদি বাপের কাছে থাকে।" রঞ্জুর যুক্তি।

"না, বেবী প্রক্ষিপ্ত হবে না। সুধার হৃদয়টি মাতৃহৃদয়। দুদিনেই আপনার করে নেবে। তবে সব নির্ভর করছে গোরীর নিজের উপর। এখন পর্যন্ত ও আভাস দেয়নি যে বেবীকে স্বামীর হাতে দিয়ে তোমার সঙ্গে যাবে। ধরে নাও যে বেবী যাচ্ছে মার সঙ্গে, যেখানেই যাক। বেগমপুরে বা বোম্বাই শহরে। ফিফটি ফিফটি।" জ্যোতির উত্তর।

মাস কয়েক আগেও জ্যোতিদার মুখে শোনা যায়নি যে বেগমপুরে গোরীর ফিরে যাবার সম্ভাবনা আছে। কথাটা রঞ্জুর মনে বিঁধল। কিন্তু ও নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না। ফিফটি ফিফটি যখন, তখন বোম্বাই যাবার সম্ভাবনাও সমান।

গোরীর চিঠি নিয়মিত আসে। কিন্তু তার সুর আর আগের মতো কড়া নয়।

বেগমপুরের সেই অশান্ত বন্দিনী তার অসহ্য বন্ধনের কথা আর বলে না। তার মালিকের বিরুদ্ধে তার আর কোনো অভিযোগ নেই। কৃষ্ণনগর তাকে তার দুঃস্বপ্নের হাত থেকে ত্রাণ করেছে। এখানে তার মা বাবার কাছে শান্তিতে আছে। লোকটা ওদিকে কার সঙ্গে কীভাবে রাত কাটাচ্ছে তা নিয়ে ওর মাথা-ব্যথা নেই। সুধার উল্লেখ একবারও করে না।

তবে মাঝে মাঝে মাধবের জন্যে ওর মন কেমন করে। কে জানে কে ও'র নিত্য সেবা করে। ও'র জন্যে মালা গাঁথে। ফুলের মুকুট গড়ে। ফুলের সাজ পরায়। না, কৃষ্ণনগরের গৃহদেবতার জন্যে তার তেমন মমত্ববোধ নেই। কখনো নাম করে না।

মাতৃত্ব নিয়েও তার কোনো নালিশ নেই। এখন একরকম মানিয়ে নিয়েছে। একটু বেশী বয়সে প্রথম সন্তান হলে অতিরিক্ত উদ্বেগের কারণ থাকে। কী জানি কেমন করে সে উদ্বেগ ও কাটিয়ে উঠেছে। আগে ওর সন্তান কামনা ছিল না। ইদানীং ওর চিঠি পড়ে মনে হয়, আছে। স্বাভাবিক-রূপেই আছে। ওর সন্তান কামনা পূর্ণ হতে চলেছে বলে ও মনে মনে সুখী। যদিও বাইরে একথা স্বীকার করবে না। তা যদি করে তবে ওর স্বামীই জিতে যাবেন। ও হেরে যাবে। না কিছুতেই নয়।

কৃষ্ণনগরের বাড়িতে ও একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছে। যত রাজ্যের বাংলা ইংরেজী মাসিকপত্রের পুরাতন বাঁধানো সেট। ওর ছেলেবেলায় ও এর মূল্য বুঝত না। নতুন পত্রিকা পেলে পড়ত। পুরোনোর ধার দিয়ে যেত না। এখন নতুন পুরোনো বিচার করে না। হাতের কাছে যা-ই পায় তাই পড়ে। তেমনি ইংরেজী বাংলা বাছবিচার নেই। ইংরেজী চর্চা তো করতেই হবে। নইলে রঞ্জুর উপযুক্ত সঙ্গিনী হবে কী করে? ইংরেজী চর্চায় এই যে সুযোগ এমনটি আর কবে পাচ্ছে? গত শতাব্দীর "কেবভাগ" থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িক কাল অবধি "স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন"এর সম্পূর্ণ সেট আর কোথায়ই বা মিলবে?

খবরটা রঞ্জুকে প্রলুব্ধ করে। ত্রিশ বত্রিশ বছরের "স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন" এক সঙ্গে পড়তে পাওয়া একটি দুর্লভ সৌভাগ্য। তার জন্যে সে বিলেত যেতে পারত। কে জানে বিলেতযাত্রা এ জীবনে জুটে উঠবে কিনা! পরীক্ষা মানেই তো সিদ্ধি নয়। আপাতত কৃষ্ণনগর গেলেই যদি মিষ্টান্ন ভোগ হয় তবে সেই ভালো নয় কি? হাঁ, বিলিতী মাসিক-পত্রও একপ্রকার মিষ্টান্ন।

পরীক্ষার পড়া যেন কুইনিন গেলা। কী করবে, নিরুপায়। কিন্তু বেছে নিতে

বললে বিলিতী মাসিকপত্রই একশোবার বেছে নেবে। ফলাফল যাই থাক কপালে।

আঠারো

গোরীর মা সুমতি দেবীও এককালে লেখিকা ছিলেন। লিখতেন ছোট গল্প আর মাসিকপত্রে পাঠাতেন। ছাপাও হয়েছিল গোটা কয়েক। রঞ্জুর অত কথা জানা ছিল না। কৃষ্ণনগরে গিয়ে বাঁধানো মাসিকপত্রের সেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ে।

"মাসিমা, আপনিই সেই সুমতি দেবী?" রঞ্জু জিজ্ঞাসা করে।

"হাঁ, বাবা, আমিই সেই। ওসব বাজে লেখা পড়ে সময় নষ্ট করে কী হবে? একালের লেখিকারা আমার চেয়ে শতগুণ ভালো লেখেন।" সুমতি দেবী উত্তর দেন।

"না, না, আমার তা মনে হয় না।" রঞ্জু প্রতিবাদ করে। "কিন্তু আপনি অমন করে হঠাৎ থেমে গেলেন কেন? আরো লিখতে পারতেন।"

"ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কার না লেখা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয় না কেবল তাঁদের যাঁদের কাছে ওটা একটা সাধনা কিংবা ওটা একটা পেশা। কিংবা যাঁদের একটা ঘরোয়া পত্রিকা আছে। আমার বেলা কোনোটাই খাটে না। তাই একদিন দেখলুম লেখা কোথায় ফেরার হয়েছে। সম্পাদকের হুকুমেও সে আর ধরা দেয় না। কী করি, বল? ঘরসংসার করব, না বুনো হাঁস তাড়াব?" সুমতি দেবী দুঃখ করেন।

"তা হলেও লেখা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত হয়নি, মাসিমা। মাঝে মাঝে একটা আধটা লিখতে পারতেন।" রঞ্জু তার অভিমত জানায়।

"চেষ্টা করেছি। মনের মতো ওতরায়নি। অভ্যাস একবার ছেড়ে দিলে যেমন গান বাজনা হয় না, তেমনি লেখালেখিও হয় না। সম্পাদকরা এখনো শারদীয় সংখ্যার জন্যে গল্প চেয়ে পাঠান। বিলিতী পত্রিকা থেকে চুরি করে কত লোক লেখা জোগাচ্ছে, আমিও কি পারতুম না? আমার মজা লাগে ও'দের রচনা পড়তে। ও'রা জানেন না যে আমার বাড়িতেই রয়েছে সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার যার থেকে ও'রা চুরি করে নিজের বলে চালান। তোমার যদি সময় থাকে মিলিয়ে দেখতে পারো ওইসব বিলিতী পত্রিকা আর এইসব বাংলা। কিন্তু ফাঁস করে দিয়ো না, বাবা।" মাসিমা হাসেন।

সখের ডিটেকটিভ হয়ে রঞ্জু আবিষ্কার করে যে "স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন" হচ্ছে বাংলা ছোট গল্পের স্বীকৃতিহীন আকর। যে পারে সেই একমুঠো সোনা সরায়। কিন্তু ওস্তাদ স্বর্ণকারের মতো তা দিয়ে যে অলঙ্কার গড়ে তা স্বকীয়তামণ্ডিত। এইসব অলঙ্কারশিল্পীকে চৌর্যাপরাধ

দেওয়া যায় না। তবে কে কোন্‌খান থেকে নিয়েছেন তা ধরে ফেলা শুক্ত নয়। রক্তর মুখে ডিটেকটিভের মতো হাসি।

গৌরীর মাকে যেমন বয়সের তুলনায় ছোট দেখায় বাবাকে তেমনি বয়সের অনুপাতে বড়ো। মাথার চুল কাঁচাপাকা। গোঁফ জোড়াটা পাকা। বিষম ব্যস্ত মানুষ দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটে আদালতে বা মিউনিসিপাল অফিসে। হাঁ, চেয়ারম্যান। বাড়িতেও মক্কেলের বা উমেদারের ভিড়। অবসর পেলে মদের গ্লাস নিয়ে বসেন, সঙ্গে এক গেলাসের ইয়ার। উকিল মোক্তার মিউনিসিপাল কমিশনার। জজি গড়ে ফেলো অশেষপ্রতাপ সিংহরায়।

সরকার ওঁকে পাবলিক প্রোসিকিউটর করতে চেয়েছিল। উনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, পলিটিকাল কেস তাঁর হাত দিয়ে হবার নয়, কারণ তাঁর সহানুভূতি আসামীদের দিকে। তবে তিনি রাজনীতিতে যোগ দিতেও রাজী নন। দেশবন্ধুর প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন আর একটা মিউটিনির জন্যে অপেক্ষা করবেন, তার আগে ঝাঁপিয়ে পড়া নিরর্থক। কে একজন হিমালয়বাসী যোগী নাকি তাঁর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে সিপাহী-বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্ণ হলে আবার মিউটিনি বাধবে ও এ বারে সফল হবে। ততদিন যদি বেঁচে থাকতে পারেন তবে স্বচক্ষে দেখে যাবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন।

রক্তর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয় রাতের বেলা খেতে বসে। জানতে চান ওর পড়াশুনো কেমন চলছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, কবে পরীক্ষার দিন পড়েছে। দু'একটা প্র্যাকটিকাল পরামর্শও দেন।

"আমার ছেলেকে আমি বিজনেসে দিয়েছি। চাকরিতে দিলুম না ইচ্ছে করেই।" তিনি খেতে খেতে বলে যান, "সেখানে প্রতিদিন বিবেকের প্রশ্ন উঠত। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত কি উচিত নয়। এই জায়গায় আমি মহাত্মার সঙ্গে একমত।"

"আর অহিংসার ক্ষেত্রে?" রক্ত জেরা করে।

"অহিংসা পরমো ধর্ম। তা কি আমি অস্বীকার করতে পারি? শাস্ত্রে আছে যে। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কতটুকু সম্বন্ধ? রাজনীতিতে ছল বল কৌশল সব কিছুর প্রয়োজন আছে। ইংরেজদের দিকেই চেয়ে দেখ। যেমন ওদের বল তেমনি ওদের ছল আর তেমনি ওদের কৌশল। আমরাও তো একদিন রাজার জাত ছিলুম। তখন আমরাও কি ছল বল কৌশলের আশ্রয় নিইনি? আবারও তো একদিন রাজত্ব করব। ওটা ঘটবে ১৯৫৭-৫৮ সালে। তখন কি ছল বল কৌশল অনাবশ্যক হবে?" তিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসেন।

রক্ত কী বলতে যাচ্ছিল, গৌরী ওকে ইশারায় নিরস্ত করে।

আঁচাবার সময় গঙ্গাজল আসে কর্তার জন্যে। গঙ্গাজল না হলে মুখ ধোওয়া হয় না। রক্ত অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকায়।

'ওঃ তুমি বুঝতে পারছ না কেন গঙ্গাজলে মুখ ধুচ্ছি?" তিনি অনুমান করে বলেন, "উকিলকে আদালতে কত মিথ্যা কথা বলতে হয়। মক্কেলকে বাঁচিয়ে দিতে বা জিতিয়ে দিতে। সে পাপের স্খালন হবে কী করে? রোজ তাই শুতে যাবার আগে গঙ্গাজলে মুখ ধুতে হয়। তাতেও কি ঘুম আসে? শুয়ে শুয়ে গীতার শ্লোক মুখস্থ বলি। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

রক্ত আবার কী বলতে চাইছিল, গৌরী ওকে থামিয়ে দেয়।

পরে এই নিয়ে গৌরীর সঙ্গে কথা হয়। গৌরী বলে, "বাবার যেদিন মন মেজাজ ভালো থাকবে সেদিন উনি তোর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবেন। শুধু তাই নয়, তোর পক্ষেই ওকালতী করবেন। আজ ওঁর দিনটা খারাপ গেছে। মামলায় হেরে এসেছেন।"

"মদটাও কি সেইজন্যে?" রক্ত আন্দাজ করে।

"না। মদটা আভিজাত্যের লক্ষণ। ওটা আমাদের ঘরানা।" গৌরী সগর্বে বলে। "আমরা মেয়েরা অবশ্য খাইনে।"

"আমাদের বংশেও আভিজাত্যের লক্ষণ ছিল, গৌরী। আমার বাবা বৈষ্ণব দীক্ষা নিয়ে অনভিজাত হন। আমি যদি আবার অভিজাত হই তো কেমন হয়? আমার মা শুনলে মূর্ছা যেতেন। এখন তো মা নেই যে বাধা দেবেন।" রক্ত বলে।

"মা নেই কেন বলছিস? আমার মা কি তোরও মা নন? ব্যবহারে কোনো রকম তারতম্য দেখছিস?" গৌরী অনুযোগ করে।

"সে কথা ঠিক। এমন মাতৃহৃদয় আমার জীবনে এই দ্বিতীয়বার পাচ্ছি।" রক্ত অভিভূত হয়ে বলে।

গৌরীর মা ওকে দিনে দশবার করে এটা ওটা খেতে দেন। সেইসূত্রে লাইব্রেরী ঘরে আসেন। দু'টি একটি কথা বলে আবার চলে যান। রক্ত জানত না যে ওটা ছিল ডিটেকটিভের উপর ডিটেকটিভগিরি। গৌরীও সেই ঘরেই রক্তর সঙ্গে বসে ডিটেকটিভের কাজে নিযুক্ত ছিল কিনা। একজন পড়ত ইংরেজী মূল রচনা। আরেকজন বাংলা ভাষানুসরণ। তারই ফাঁকে ফাঁকে গল্প করত নিজেদের ব্যাপার নিয়ে।

"মাঝে মাঝে আমি তোকে স্বপ্ন দেখি।" গৌরী বলে। "আর ওকে।"

"কাকে?" রক্ত শুনতে উন্মুখ হয়।

"যেটি আসছে। অবিকল তোর মতো দেখতে।" গৌরী ফিস ফিস করে বলে।

"দূর! তা কি কখনো হয়!" রক্ত লজ্জায় শিউরে ওঠে।

"হয়, যদি কেউ এক মনে ধ্যান করে। আমার কাছে একখানা বই আছে, ওতে লিখেছে। সত্য মিথ্যা আর মাস দুয়েকের মধ্যেই বোঝা যাবে।" গৌরী বলে।

"ওঃ! আমার খেয়াল ছিল না যে এত শীগগির। হাঁ, এখন মনে পড়ছে জ্যোতিষী বলছিল বটে ডিসেম্বর মাসে প্রত্যাশা করা যায়।" রক্ত অন্যমনস্ক হয়।

"জ্যোতিষী আর কী বলছিল?" গৌরী আগ্রহ প্রকাশ করে।

"বলছিল ফেব্রুয়ারি মাসেই—" রক্তর কথাটুকু উচ্চারণ করতে সাহস হয় না। ওদিকে মাতৃচরণের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"সরস্বতী পূজা এবার ফেব্রুয়ারি মাসে বুঝি?" গৌরী কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

"সরস্বতী পূজার সভায় রক্তনকে আসতে বলেছিস তো? রতন, তোকে আসা চাই। হয়তো সে সভায় আসবে।" সুনীতি দেবী দু'প্লাস কমলালেবুর রস দিয়ে যান।

ইতিমধ্যে রক্তর নোটবই ভরে উঠেছে। ও বলে, "বসে বসে এই করছি মাসিমা। এর জন্যে কেউ আমাকে পয়সা দেবে না।"

"ওটা বরঞ্চ সরস্বতী পূজার ছুটিতে করিস। ততদিনে তোর পরীক্ষার চাপ থাকবে না। এখন তো শুধু শুধু সময় নষ্ট।" উনি মন্তব্য করেন।

"সময় নষ্ট কেন বলছ, মা? সাহিত্যের নামে কে কী চালিয়ে দিচ্ছে, আর আমরা ভাবছি এরই নাম প্রগতি! আমরা একদিন ফাঁস করে দেব। আমরা একটা প্রবন্ধের খসড়া করছি। তবে তিন চার মাস সবুর সইলেও চলবে।" গৌরী জানিয়ে বলে।

"কেন মিছিমিছি ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়তে যাবি? ওদের হাতেই কাগজ। ওরা এমন গালাগাল দেবে যে তারপরে আর তোদের কারো লেখা ছাপা হবে না। তাছাড়া সব সাহিত্যের গোড়ায় দিকটা অনুবাদের বা অনুকরণের। কিংবা স্রেফ চুরির। আমার দাদা ইংরেজীর অধ্যাপক, তাঁর কাছে শুনেছি। ইংরেজরাও ইটালিয়ানদের ভাঁড়ার ঘরে সিঁদ কেটেছে।" সুনীতি দেবী সকৌতুকে হাসেন।

তিনিই জের টেনে বলেন, "তাতে কিন্তু কোনো পক্ষের ক্ষতি হয়নি। বরং বৃদ্ধি হয়েছে ইংরেজী সাহিত্যের। তোরা ও মতলব ছেড়ে দে। পারিস তো নতুন কিছু সৃষ্টি কর। তবে মেয়েদের সে পথেও বিস্তর প্রতিবন্ধক।" (ক্রমশ)

শাদ্ নাঙ্ক্রেম্

আরতি দাস

তুমি মঙ্গলময়। আমার জীবন তোমার সুন্দর হাতের এক আশ্চর্য অবদান। একদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে যাব। সেদিন যেন বলতে পারি আমার জীবন ব্যর্থ হয়নি, আমি সুন্দর ও সৎভাবে আয়ুষ্কাল উপভোগ করেছি।

খাসি পাহাড়ের আদিবাসীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার সময় মনে মনে এই কথাগুলিই বলতে চায়। মুক্তিকামী বৈরাগীর সাধনা তার নয়। মানুষ হয়ে জন্মেছে বলে সে আনন্দিত। এই আনন্দ নৃত্যের মাধ্যমে সে ঈশ্বরকে জানায়। তাই তার ধর্মানুষ্ঠানে সে নেচে ওঠে। সৎ ও সুন্দর ভাবে জীবনকে উপভোগ করলে ঈশ্বর প্রসন্ন হন, এ বিশ্বাস এদের আন্তরিক কিন্তু বাস্তবে প্রচুর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয় জীবনে। মেঘ জল ঝড়ের সাথে নিরন্তর লড়াই করে বাঁচতে হয়। রোগ আছে, শোক আছে, দুঃখ অভাব অনটনের বিরাম নেই। এমন সব দুর্দিনে আদিবাসী খাসি আপন আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের ডেকে আনে। একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়, তুমি কল্যাণময়, আমাদের কল্যাণ কর। সংকটে সহায় হও। আবার সুখের দিনে, সমৃদ্ধির কালে গানের তালে নাচে। উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় বলে, তুমি আমাদের অনেক দিয়েছো। তোমার পর্যাপ্ত দানে আমরা আনন্দিত।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে স্মরণ করে খাসি পাহাড়ের মানুষ। সামাজিক সব অনুষ্ঠানের মত, রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারেও এরা ঈশ্বরকে দূরে রাখেনি। অতি দূর অতীতে রাজ্যের শাসক আর জনসাধারণ ঈশ্বরের নামে একত্রিত হয়েছে রাজদরবারে। রাজা, মন্ত্রী সর্দার এবং জনসাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধির আশীর্বাদ চেয়ে নিয়েছে। ঈশ্বরের পরেই পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে এরা। সব উৎসবেই পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে বলি দিয়ে অথবা সুরা উৎসর্গ করে তাঁদের প্রসন্নতা কামনা করে। এদের দৃঢ় ধারণা, ঈশ্বর যদি সহায় হন, স্বর্গত পিতৃপুরুষ যদি প্রসন্ন থাকেন, তবে সকলের একান্ত চেষ্টায় সমাজ, রাষ্ট্র ও আর্থিক সকল ক্ষেত্রেই সফলতা আসবে।

শাদ্ নঙ্ক্রেম খাসি পাহাড়ের একটি সাড়া জাগানো উৎসব। স্মরণের অতীত কাল থেকে নাচ, গান, পূজা, বলি ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই উৎসব একইভাবে পালন করে আসছে আদিবাসী খাসিরা। ইতিহাসে জানা যায়, উ শিবলঙ ছিলেন খাইরিম্ ও মাইলিয়েম্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এখন শুধু খাইরিম্ বংশের রাজদরবারেই শাদ্ নঙ্ক্রেম উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। খাসিরা চিরকাল গণতান্ত্রিক। অতীতেও এদের রাজ্য এক মন্ত্রীমণ্ডলী দ্বারা শাসিত হত। জনগণের নির্বাচিত এই মন্ত্রীরা রাজ্যের প্রধান বা সিয়েম্‌কে নির্বাচন করে। সিয়েম্ কথাটির অর্থ রাজা। প্রত্যেক রাজ্য কয়েকটি রাইদ্‌-এ ভাগ করা হয়। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি রাইদ। দরবারের নির্বাচিত লোকই এক একটি রাইদের শাসক। এই শাসকের অধীনে প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। নঙ্ক্রেম্ উৎসবে রাজা মন্ত্রী থেকে শুরু করে সামান্য জন-মজুর বা চাষী পর্যন্ত রাইদের সকলেই অংশ গ্রহণ করে। এতে রাজ্যের শাসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আনুগত্য ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হয় বলে মনে করে এরা।

(২)

শাদ্ নঙ্ক্রেমের অন্য নাম পম্‌ব্লাঙ্। খাসি ভাষায় পম্ কথাটির অর্থ হনন করা এবং ব্লাঙ্ মানে ছাগ। প্রচুর ছাগবলির সাথে এ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে বলেই শাদ্ নঙ্ক্রেমকে স্থানীয় লোকেরা বলে পম্‌ব্লাঙ্। অতীতে সিয়েমের তহবিল থেকে এবং বিভিন্ন রাইদের দেওয়া ছাগলের সংখ্যা পঞ্চাশের কম হত না। বর্তমানে আর্থিক অনটনের জন্য সংখ্যা অনেক কমানো হয়েছে। বৎসরে একবার এই উৎসব পাঁচ দিন ধরে চলে। মে জুন মাসে অথবা দরবারের সুবিধে মত জুলাই কিম্বা অন্য কোন মাসেও শাদ্ নঙ্ক্রেমের তারিখ পড়ে। পর পর এই পাঁচদিনকে, পান্‌ডিয়া, উম্‌নি, ইয়োহ, কিঙ্কা ও শিন্সিঙ বলা হয়। সিয়েম্ এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর অনুমোদিত তারিখ সমস্ত গ্রামগুলিতে জানিয়ে দেওয়া হয়। বেতের তৈরি এক ধরনের দোলা দিয়ে বানিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠানো হয়। ঐ জিনিসটি দেখেই গ্রামবাসীরা তারিখের সংকেত বুঝতে পারে। অনুষ্ঠানের বলির জন্য ছাগল বা অন্য যে সব উপহার দেবার নিয়ম আছে, সে সব নিয়ে যাবার জন্য

নাচের পোশাকে রাজবাড়ির মেয়েরা

নওক্রেম নাচে পুরুষের দল

প্রস্তুত হয় গ্রামের লোক। সিয়েমের বড় বোনের বাড়িকে বলা হয় ইয়েঙ্সাদ্। সাদ্ কথাটির অর্থ নাচ এবং ইয়েঙ্ মানে বাড়ি। ইয়েঙ্ সাদ্ থেকেও ঢোল কাঁসি বাজিয়ে তারিখ জানানোর রেওয়াজ আছে।

(৩)

উৎসবের দিন এলে, ভোর না হতেই ঢুলিয়ারা ঢোল বাজাতে শুরু করে। সারাদিন, সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই বাজনা চলে। এ থেকে সকলে বুঝতে পারে সেদিন রাত থেকেই উৎসব শুরু হবে। সাদ্ নওক্রেমের প্রথম দিন পাম্তিয়া। পাম্তিয়ার রাত্রে প্রধান পুরোহিত ইয়েঙ্ সাদ্ ঘরে প্রবেশ করে আগুনের চুল্লীর কাছে এসে বসেন। তখন সিয়েম্ সাদ্ বা রাজার বড়বোন একটি লাউয়ের খোল ভর্তি চালের তৈরি মদ পুরোহিতের হাতে তুলে দেন। পুরোহিত পাত্রটি সম্পূর্ণ উপুড় করে ঢেলে দেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবতা উ শিবলঙের উদ্দেশে। সেই সঙ্গে প্রার্থনাও করেন, দেবতা শিবলঙ যেন রাজবংশের প্রত্যেককে এবং রাজ্যের সমস্ত লোককে আশীর্বাদ করেন। সামাজিক এবং নৈতিক সমস্ত দিকেই এ রাজ্যের উন্নতি হোক। দেশের সুখ সমৃদ্ধি সততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক। দ্বিতীয় আর একটি লাউয়ের খোলভর্তি মদ ঢেলে দেওয়া হয় রাজবংশের প্রথম মাতুলের আত্মার উদ্দেশে। এর পর সিয়েম্, মন্ত্রীরা এবং অন্য সকলে ইয়েঙ্ সাদ্য়ের বড় হলঘরে চলে আসেন। তখন ঢুলিয়ারা উ বিস্কুরমের উদ্দেশে মদ উৎসর্গ করে। উ বিস্কুরম্ আমাদের যন্ত্রশিল্পের দেবতা, বিশ্বকর্মা। জয়ন্তীয়া পাহাড়ে বিশ্বকর্মার পুজা সুপ্রচলিত। সাদ্ নওক্রেম্ উৎসবেও বিস্কুরম্কে আহ্বান করে শক্তি, কৌশল এবং জ্ঞানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। তিনি যেন রাজবংশের ধর্ম ও সম্মান রক্ষা করেন। রাজবাড়ির কো[illegible] কোন ক্ষতি না হয় এ প্রার্থনাও জানানো হয়। এ সব অনুষ্ঠানের পরে ঢোল বাঁশীর ঐকতানের সঙ্গে নির্দিষ্ট গানের সুরগুলি বেজে ওঠে। ইয়েঙ্ সাদ্য়ের পবিত্র স্তম্ভ বা 'রিসোত্ ব্লেই'য়ের সামনে নাচ শুরু হয়। শুকনো মাছ ও দিশী মদ বিতরণ করে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ উম্নির দিন অন্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে নাচগান চলতে থাকে। উম্নির দিন 'কা ব্লেই সিন্সার' বা ন্যায়ের দেবীকে পুজো করা হয়। রাজ্যের ন্যায় ও ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকুক। অন্যায় ও অসত্য যেন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্ভ্রম না নষ্ট করে, কা ব্লেই সিন্সারের কাছে সেই আবেদন জানায় খাসিয়া। দ্বিতীয় দিনে ইয়েঙ্ সাদ্ থেকে যে পাহাড়ে শিবলঙ্ দেবতাকে ছাগবলি দেওয়া হয় সে পর্যন্ত পথ পরিষ্কার করে রাখে গ্রামবাসীরা।

(৪)

ইয়েদু অর্থাৎ তৃতীয় দিন সূর্য মাঝ আকাশে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সিয়েম্, মন্ত্রীরা এবং জনসাধারণ ইয়েঙ্ সাদ্ থেকে ঐ পাহাড়ের দিকে চলতে শুরু করেন। সমস্ত পথটা নর্তকেরা নেচে পার হয়। নর্তকদের পরে থাকে ঢুলিয়ারা, তার পর প্রধান পুরোহিত, রাজবাড়ির মেয়েরা, সিয়েম্, মন্ত্রীর দল এবং সবশেষে জনসাধারণ। জনসাধারণ সোল্লাস চীৎকারধ্বনির সঙ্গে পাহাড়ে যাবার পথ অতিক্রম করে। বাদকের দল পাহাড়ের চূড়ায় বেদীর চারপাশ চক্রাকারে তিনবার ঘুরে বাজাতে থাকে। প্রধান পুরোহিত বেদীর ওপরে আসীন হন। সিয়েম্, রাজবাড়ির মেয়েরা, মন্ত্রী-মণ্ডলীর সকলে পূর্বদিকে মুখ করে যথা-নির্দিষ্ট জায়গায় বসেন। প্রধান পুরোহিত উত্তরাস্য হয়ে একটি লালরঙের মুরগী ডান হাতে ধরে দেবতা উ শিবলঙের কাছে প্রার্থনা করেন। তারপর মুরগীটিকে বলি দিয়ে একটি লাউয়ের খোলের মধ্যে তার রক্ত ভরে নেন এবং অন্ত্রগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করে রূপোর থালায় রেখে দেন। এর পরে প্রধান পুরোহিত একমুঠো চাল তাঁর নিজের পায়ে ও সামনে রাখা ছাগলের ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে দেবতা শিবলঙের উদ্দেশে প্রার্থনা জানান। তাঁর হাতে ধারালো একটি দা থাকে। সেই দা তিনি সিয়েমের হাতে তুলে দেন। সিয়েম্ দেবতা শিবলঙকে প্রার্থনা জানিয়ে দা-খানা একটি লোকের হাতে দিলে সেই লোকটি ছাগবলি দেয়। বলির পরে ছাগলের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ন' টুকরো মাংস নিয়ে পুরোহিতকে দেওয়া হয়। এই মাংস পাঁচভাগে ভাগ করে পাঁচজন পূর্বপুরুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন পুরোহিত। তারপর প্রধান পুরোহিত ঢুলীর সঙ্গে নাচ শুরু করেন। এ নাচের নাম 'মাস্তিয়ে'। জনসাধারণ তখন যোগ দেয় নৃত্যে।

'মাস্তিয়ে' এক ধরনের যুদ্ধনৃত্য। এ নৃত্যে কোন স্ত্রীলোক যোগ দিতে পারে না। পুরুষ নর্তকদের এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে চামর থাকে। অতীতে যুদ্ধে জয়ী সৈনিকরা 'মাস্তিয়ে' নৃত্যে যোগ দিয়ে জয়ের আনন্দ উপভোগ করত। সবশেষে শাসক রাজা (সিয়েম্) অথবা তার ভাগ্নে এবং মন্ত্রী নৃত্য করেন এবং এর পরে জনসাধারণ আবার একত্রে নাচে।

ইয়েদুর রাত্রে বিভিন্ন গ্রাম ও রাইদ্ থেকে আনা ছাগলগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে সিয়েম্কে উপহার দেওয়া হয়। ইয়েঙ্ সাদ্য়ের প্রশস্ত চাতালে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশে প্রধান বাদক দাঁড়িয়ে থাকে। সিয়েম্ আসন গ্রহণ করলে, প্রধান বাদক একের পর এক রাইদদের নাম উল্লেখ করে তাদের আনীত ছাগগুলি সিয়েমকে উপহার দেবার জন্য আহ্বান করে। সব চেয়ে প্রবীণ রাইদ্য়ের উপহার সর্বাগ্রে গ্রহণ করেন সিয়েম্। সিয়েমের উপহার গ্রহণ শেষ হলে, সম্মুখের প্রাঙ্গণে সমবেত প্রজাসাধারণ প্রথানুসারে তিনবার হর্ষধ্বনি করে ওঠে।

(৫)

চতুর্থ দিন অর্থাৎ 'কিঙ্কাম্' দিন সূর্যোদয়ের সময় রাজবংশের মেয়েদের সঙ্গে মন্ত্রীদের একত্রিত নাচের সঙ্গে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে ইয়েঙ্ সাদ্য়ের চুল্লীর চারপাশ ঘুরে চক্রাকারে, তারপর বাইরের মুক্ত অঙ্গনে এই নৃত্য চলতে থাকে। বেলা যত বাড়তে থাকে অন্য সব গ্রামের পুরুষ ও তরুণীরা একে একে ইয়েঙ্ সাদ্য়ের অঙ্গনে এসে নাচে যোগ দেয়। তরুণীর দল এ উপলক্ষে প্রচুর সোনারূপোর আভরণ এবং মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদে সেজে আসে।

[illegible]

দর দামী পোশাক। প্রচুর স্বর্ণ অলঙ্কারে প্রায় আপাদমস্তক আবৃত থাকে মেয়েদের। তবে একমাত্র রাজবংশের মেয়েরা ছাড়া মাথার সোনার মুকুট ব্যবহার করতে পারে না অন্য কোন মেয়ে। চতুর্থ দিনের এই নাচ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য। নঙক্রেমের সন্ধ্যায় প্রজাসাধারণ রাজপরিবারের সকলকে পান, সুপারি দিয়ে তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে। ইয়েঙ্ সাদ্যেয়র তালে প্রধান পুরোহিত আসন গ্রহণ করেন। তাঁর সহকারী আরও দশজন পুরোহিত উত্তরাস্য হয়ে বসেন। দেবতা শিলঙ এবং কা ব্লেই সিন্সারের উপাসনা করেন প্রধান পুরোহিত। সিয়েমের উপহার পাওয়া ছাগগুলিকে সিয়েমের ভাগ্নে বলি দেয়। সে সময় পুরোহিত স্বর্গত পূর্বপুরুষদের আহ্বান করে বলতে থাকেন— হে পিতৃপিতামহদের প্রধানগণ, এগুলি আপনাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি। আপনারা সিয়েম্, তাঁর পরিবারের লোকদের এবং রাজ্যের সমস্ত জনগণকে আশীর্বাদ করুন। আবার এক বৎসর পরে আমি আপনাদের আবাহন করব। আপনারা স্বর্গে থেকে মেঘ সৃষ্টি করেন। অনুকূল হাওয়া এবং বৃষ্টি আপনাদেরই আশীর্বাদ। আমরা যেন আপনাদের কৃপায় প্রচুর শস্যসফলতা লাভ করি। আমাদের জীবন সুখী ও সমৃদ্ধ করুন।

(৬)

সবশেষের দিনকে বলা হয় নঙক্রেমের দিন। ঐদিন মাওরো বংশের একজন লোক একটি শূকরকে লোহার শলাকা বিদ্ধ করে হত্যা করে। শূকরের শরীরের নানা অংশ থেকে নয় টুকরো মাংস নিয়ে আগের মতই পূর্বপুরুষকে উৎসর্গ করা হয়। বাকি মাংস নির্দিষ্ট রাইদুয়ের প্রধানদের মধ্যে দেওয়া হয়। তারা এই মাংস রান্না করে মস্ত বড় ভোজের আয়োজন করে। এভাবে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে নঙক্রেমের দিনটি অতিবাহিত হয়।

পঞ্চম দিনের রাত্রেই নঙক্রেম উৎসব শেষ হয়। এ রাত্রে ঈশ্বরের কাছে শুধু প্রার্থনা করে এরা। বলি বা পূজা এসব পূর্বপুরুষের স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে করা হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া আর কোন বাইরের অনুষ্ঠান নেই। রাত্রে ইয়েঙ্ সাদ্যেয়র বড় হল ঘরে সিয়েম্ এবং জনসাধারণ সকলে নিঃশব্দে উপস্থিত হন। এ রাতে যাতে কোনরকম গোলমাল না হয় সেজন্য দিনের বেলা লোক দিয়ে গ্রামে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। উঁচু বেদীতে পূর্বমুখ হয়ে সিয়েম্ বসেন। অন্য সকল বয়োজ্যেষ্ঠ বসেন উত্তরাস্য হয়ে। সকলে সিয়েমকে সম্মুখে রেখে বসতে হয়। তখন জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রার্থনার সময় যেন কেউ আসর থেকে বাইরে যাওয়া আসা না করে। কেউ যেন কথা না বলে এবং ঘুমিয়ে না পড়ে। তারপর সবাইকে নীরব প্রার্থনা শুরু করতে বলা হয়।

এই নীরব প্রার্থনা শেষ হবার পর সিয়েম্ মাথা থেকে পাগড়ি খুলে রেখে নতজানু প্রার্থনা করেন ঈশ্বরের কাছে। প্রার্থনার কথাগুলি তিনি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন। ঈশ্বর তাঁকে মন্ত্রীদের এবং দরবারের সকলকে আশীর্বাদ করুন। তিনি যেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তি দেন যাতে রাজা ও মন্ত্রীরা রাজ্যশাসনের কাজ ন্যায় ও দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র ক্ষমতাবান দুর্বল, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে কখনো যেন কারুর পরে অবিচার বা পক্ষপাত না করা হয়। রাজ্যের সুখ শান্তি সমৃদ্ধি বজায় থাকুক। সিয়েমের পরে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরের কাছে রাজ মন্ত্রী, রাজ্য ও জনগণের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

এই রাত্রিশেষে নঙক্রেম্ উৎসব শেষ হয়ে যায়।

* পাম্‌তিয়া—শিলঙ ছোটবাজারের দিন। খাসিদের নিয়মে আট দিনে এক সপ্তাহ। পাম্‌তিয়া সপ্তম দিন। ইমনি মাইরাঙ্ বড়বাজারের দিন; এটি সপ্তাহের অষ্টম দিন। ইয়োদ্—শিলঙ বড়বাজারের দিন; এটি সপ্তাহের প্রথম দিন। লিঙকা শিবলঙ বড়বাজারের পরের দিন; এটি সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন পিন্সিঙ্-নঙক্রেম বড়বাজারের দিন; এটি সপ্তাহের তৃতীয় দিন।

* আমাদের দেশের হাটবারের মত এদের বাজারের দিনের হিসেবে সপ্তাহ হয়। অন্য দিনগুলির নাম মাওলঙ্, রিংহেপ্ ও শিবলঙ্।

॥ ছয় ॥

একেবারে পোড়ো বাড়ি ঠিক না হলেও প্রায় পড়ো পড়োই ছিল বটে বাড়িটা। আড়াই ধার তার পড়েই গেছল, দেড়টা দিক খাড়া ছিল কোনো গতিকে।

তাহলেও নামডাকে রাজবাড়ি। পুরোনো রাজবাটী। চাঁচোরের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র একদা মহাসমারোহে বাস করতেন সেই প্রাসাদে।

বিরাট চার মহলা লম্বা চওড়া ছিল যে বাড়িটা তা তার চার ধারের ধ্বংসাবশেষ দেখলেই বোঝা যায়। অন্দর মহল, রাণীরা থাকতেন যে ধারটায়, পশ্চিমদিকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন ভগ্নদশায় দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ ধারটারও ভাঙাচোরা চেহারা, তার একটা দিকের খানকয় পরিত্যক্ত ঘর তো আমার চোখের ওপরই ভেঙে পড়ল একদিন।

একশ বছরের ওপর নাকি বাড়িটার বয়স, তখন সেই পড়ন্ত অবস্থায় মনে হত পড়তে পড়তে পুরোপুরি খেতে আরও একশ বছর লেগে যাবে বাড়িটার। সেকেলে শক্ত গাঁথনির পোক্ত বাড়ি তো! রীতিমতন বনেদী।

দোতলা বাড়ি। আমরা থাকতাম রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সাবেক তোষাখানায়। পূর্ব-ধারের দিকটায়। তার বাঁ দিক ঘেঁষে স্নান-করার গোসলঘর। এখন সংক্ষিপ্ত হয়ে গোলঘর, সেটা পেরিয়ে গেলে শীসমহল রঙমহল ইত্যাদি—হলগুলো থাকলেও সে সবের রঙ-চঙের ছিটে ফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না আর।

দস্তুর মতন প্রশস্ত তোষাখানার ঘরটায় পর পর আটখানা খাট আঁটত। সেটাই ছিল আমাদের শোবার ঘর। বাবার নিজের ছিল তিনখানা খাট, যখন যেটাতে খুশি তাঁর দেহভার রাখতেন, তার ভেতরে একটা ছিল আবার পেল্লায়। আমার নিজের এলাকায় ছিল একখানা, বায়না করে বাগানো, আর আমার ভাই আর মার খাট দুখানা জুড়ে এক-করা, একটা বড় মশারির মধ্যে বিছানা ছিল সেইখাটে। আমি নিজের খাটে তো শুতামই, আবার ইচ্ছে **হলে, ইচ্ছেটা প্রায়ই হত আমার, পাশের** সেই জোড়া খাটে গিয়ে মাঝখানে সেঁধিয়ে মায়ের পাশটিতে শুয়ে পড়তাম এক এক সময়। বাবার পাশেও গিয়ে শুতাম কখনো সখনো।

আর অষ্টম, বাড়তি খাটখানা ছিল মামা-টামা বা সম্পর্কিত দিদি-টিদি কেউ কখনো সখনো এলে তার জন্যে।

রঙমহল শীসমহল ইত্যাদির মানে কী, আমার জানা নেই। মুঘল যুগের ইতিহাসে যাদের দখল আছে তাঁরা বলতে পারেন। আমার মোগলাই অভিজ্ঞতার দৌড় ঐ পরোটা পর্যন্ত। আমার মনে হয় ওখানে বসে রাণী আর বেগমরা হয়ত মুখে হাতে নখে মেহেদির রঙ লাগাতেন আর রাজা কি রাজকুমাররা শীস দিয়ে ইশারা করতেন তাঁদের কিম্বা সাড়া দিতেন তাঁদের ইশারার।

আর, তোষাখানাটা আমার ধারণায় ছিল খোসামোদের আখড়া। মোসাহেবদের তোষামোদে রাজাবাহাদুর এখানে আমোদিত হতেন, আমোদ পেত সভাসজ্জন সবাই।

গোলঘরটার উত্তর দিকে আরো অনেক ঘর ছিল, সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ খাড়া ছিল তখন। তারই ভেতর যে দু একখানা তখনো পড়ে যায়নি তারই একটাতে ছিল আমাদের ভাঁড়ার ঘর আর তার পাশে রান্নাঘর।

ঐ পর্যন্তই আমাদের এলাকা। তার ওধারটায়, সাবেক মহাফেজখানা ছিল যেটা সেখানে থাকতেন এক ডাক্তার, সপরিবারে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। রাজ এস্টেটের দাতব্য চিকিৎসার ভার ছিল তাঁর ওপর।

কলকাতার থেকে এসেছিলেন তাঁরা। আমার মাও শহুরে মেয়ে। তাই দুই বাড়ির গিন্নীর ভেতর ভাব জমাতে বিশেষ দেরি হয় নি। আমার বাবা প্রথম পরিচয়েই ডাক্তারবাবুর বৌকে একটা হীরের আংটি উপহার দিয়েছিলেন আমার মনে আছে। কিন্তু সেহেতু মার কোনো রাগ হতে দেখিনি।

ডাক্তারবাবুর ছিল চার মেয়ে আর এক ছেলে। রাণু ফেনি অনু রিনি। প্রায় আমার বয়সী, দশ বারোর মধ্যে সবাই, তবে ছেলেটা আমার চেয়ে একটু বড়ই হবে বোধ করি।

আমার বেশ মনে আছে আমরা দু ভাই রাম লক্ষ্মণ সাজতাম আর সেই ছেলেটা পান্তু কি তানু কী ছিল যেন তার নাম সে হত রাবণ। ঘোড়ার কাঠি ভেঙে তীর ধনুক নিয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হত আমাদের—যেটাকে ন্যায়যুদ্ধ বলা যায় না কিছুতেই। কেন না, রাবণ হারতে চাইত না কোনোমতেই, সব শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে গায়ের জোরে হারিয়ে দিতো আমাদের। তীর ধনুক সব ফেলে দিয়ে পিটতে এমন শুরু করত আমাকে—স্বভাবত রাবণের রামের প্রতি আক্রোশ বেশি হবার কথা—অন্যায় কিছু নয়, কিন্তু আমারই পাশ বালিশ বাগিয়ে দুমদাম লাগানোটা কি ঠিক? যতই বলি যে গদাযুদ্ধ রাবণোচিত না, দুর্যোধনের শোভা পায়, সেকথায় কান না দিয়ে সে বালিশ আর আমাকে একসঙ্গে ফাঁসিয়ে দিত। চোখে নাকে মুখে তুলো ঢুকে

গদাযুদ্ধ রাবণোচিত নয়...

হাঁটতে হাঁটতে পালাবার পথ পেতাম না আমি। সে তখন লক্ষ্মণের সঙ্গে সন্ধি করে মার্বেল খেলতে বসে যেত বারান্দায়।

নীচের ডাক্তারখানা থেকে আমি একবার একটা কাচের পিচকিরি চুরি করে এনেছিলাম, বিশেষ কোনো কারণে না, এমনিই। ভালো লেগেছিল তাই। তাই না দেখে ভারী রাগ করেছিলেন বাবা, কাঁদতে কাঁদতে সেই পিচকিরিটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হয়েছিল আমায়। কম্পাউন্ডারবাবু পিচকিরিটা নিয়ে সিরাপ খাইয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন আমাকে, মনে আছে বেশ।

তোষাখানা আর মহাফেজখানা মাথা উঁচু করে থাকলেও উত্তর দক্ষিণের মালখানা আর বালাখানার সবটাই প্রায় পড়ে গেছল। এই চারখানার মাঝখানে অনেকখানি শান বাঁধানো ফাঁকা জায়গা ছিল—সেই বিরাট চত্বরে ম্যাজিক বা যাত্রার আসর জমত, পাঁচ জনা পাড়ার লোক জড়ো হত দেখতে। আর সেই চৌহদ্দিতেই ওরা পাঁচ ভাইবোন আর আমরা দুভাই মিলে কসে বাতাবি নেবুর বল পিটিয়ে ফুটবল খেলতুম।

আমাকে সঙ্গী করে রাণু মাঝে মাঝে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরুতো। মেয়েটা ছিল দারুণ ডানপিটে। গায়ে জোরও ছিল বেশ। তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পারতুম না আমি কখনোই।

রত্নহারের সন্ধানে বেরুতাম আমরা একেকদিন। মহারাণীর রত্নহার। চারধারেই তো প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। সে বলত এরই আনাচে কানাচে কোথাও না কোথাও

থামের আড়াল থেকে ইশারা করল আমাকে

মোহরের ঘড়ার সন্ধান পাওয়া যাবে সেকালে তো ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক ছিল না। ধনরত্ন সব মাটির তলাতেই লুকিয়ে রাখত সবাই।

আমাদের বাড়িটার পশ্চিম দিকে রাণী ভুতেশ্বরীর অন্দর মহলের ভগ্নাবশেষে হানা দিতাম—যদি মহারাণীর হীরে মাণিকের খোঁজ মিলে যায় দৈবাৎ।

একদিন এঘরে সেঘরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা সুড়ঙ্গের মতন দেখা গেল। রাণু বলল, আয়, নেমে যাই, এর ভেতরটায় কী আছে দেখে আসি।

'না বাবা।' আমি ঘাড় নাড়লাম। সাপখোপ থাকতে পারে। কামড়ে দেবে।'

'বাবার কাছে সাপের ওষুধ আছে।' সে বলল। ডাক্তারের মেয়ে সাপের ভয় রাখে না সে।

'তেমন তেমন সাপে কামড়ালে টের পাবি তখন। তোর বাবা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে না। ঢলে পড়বি এখানেই।'

'বয়ে নিয়ে যাবি তুই।'

আমি? আমি তোকে তুলতে পারি?' তখুনি পরীক্ষা করে দেখা যায়—'না বাবা। তুই যা ভারী। সুড়ঙ্গে সেঁধিয়ে কাজ নেই।' এমন সময় সাজগোজ করা একটা মেয়ে থামের আড়াল থেকে ইশারা করল আমাদের।

থমকে দাঁড়ালাম আমরা। —'এখানে মেয়ে এল কোথা থেকে রে?' আমি রাণুর কানে ফুস ফুস করি।

'রাণী ভুতেশ্বরী হবে বোধহয়। তোকে ডাকছে। হ্যাঁ, তোকেই। যা না।'

'না বাবা।'

'গুপ্তধনের সন্ধান পেতে পারিস। কি মোহরের ঘড়ার খবর। যা না রে। ভয় কীসের। আমি তো রয়েছি এখানে?'

'না বাবা।'

'গলার হারখানা দেখেছিস? হীরের মত ঝকমক করছে। রত্নহারটা তোকে দিতে পারে—চাস যদি। চা না গিয়ে।'

রত্নহার আমার মাথায় থাক। ও নিয়ে আমি কী করব?

আমায় দিক। পরব আমি আমার গলায়। আমায় দিক রে!'

'না বাবা।'

সেখান থেকে ফিরে সেদিনকার রাণী ভুতেশ্বরীর সঙ্গে মোলাকাতের কথা মাকে বললাম। মা শুনে ভারী রাগ করলেন। কড়ে আঙুলটা কামড়ে দিলেন আমার। মনে মনে কী যেন আউড়ে সারা গায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

'জানো-মা, রাণী আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছিলেন।' জানো মা, রাণু বলছিল, ওর গলার হারটা দেবার জন্যই ডাকছিল আমাকে। আমরা নাকি ওর নিকটাত্মীয় হই?'

'খবর্দার, ওই সব পোড়ো বাড়ির দিকে পা বাড়াসনে আর।' পুনঃ পুনঃ মা সাবধান করে দিলেন আমায়।

সেদিন রাত্তিরে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটেছিল নাকি। মার মুখে শুনেছি।

রাত নটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়তাম আমরা। মার রান্নার কোনো ঝামেলা ছিল না। লুচি, আলুর

তরকারি, আর ক্ষীর—এই ছিল রাত্রের খাবার।

বাবা খেতেন অনেক রাত্তিরে—তাঁর জপ-টপ সেরে সব। তাঁর খাবার ঢাকা দেওয়া থাকত গোলঘরটায়।

শুতে না শুতেই সেদিন হাড় কাঁপিয়ে আমার জ্বর এসেছিল বুঝি।

দেখতে না দেখতে সে জ্বর চড়ে গিয়েছিল বেজায়। রাত দুপুরে ঘোর বিকারে দাঁড়িয়ে গেল। সান্নিপাতিক সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল নাকি।

আর সেই সময়েই শুরু হয়েছিল দারুণ ভুতুড়ে উপদ্রব। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যে রকমটা বর্ণনা রয়েছে—হুম্ হাম দুম দাম অট্ট অট্ট হাসিছে।—অবিকল সেই ধরণের।

আর মা আমার পাশটিতে শুয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে মা কালীকে ডাকছেন।

ওকে ছেড়ে দে, ওকে ছেড়ে দে। ওকে আমি নিয়ে যাব। খোনা গলায় বলছিল কে যেন।

না মা, তোমায় গড় করি। ওকে তুমি নিয়ো না। ওকে ছেড়ে দিয়ে যাও তোমার দোহাই।' মিনতি করেছিলেন মা।

'না। তা হয় না। ও আমাকে ভেংচি কেটেছে কেন। ছাড়ব না, ওকে নিয়ে যাবই। নিয়ে যেতেই আমি এসেছি। তুই ছেড়ে দে।'

'মা, তোমার পায়ে পড়ি। তোমাদের বাড়ির বউ আমি। ওর হয়ে আমি মাপ চাইছি—অবোধ বালক, ওকে মাপ করো। এবারটির মত ছেড়ে দাও। ওর ঘাট হয়েছে মা।'

'ওকে না নিয়ে আমি যাব না। আজ রাত না পোয়াতেই নেব।'

তখন মা আর কী করেন, আর কোনো উপায় না দেখে কালীঘাটের মা কালীর কাছে তাঁর ডান হাত বাঁধা রাখলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভুতুড়ে উৎপাত শান্ত হল, আমার জ্বর ছেড়ে গেল, সকাল বেলা যেন দুঃস্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠলাম। সম্পূর্ণ বহালতবিয়তে।

রাতে যে আমাকে নিয়ে অত টানাপোড়েন চলেছিল তার বিন্দুমাত্রও আমি টের পাইনি।

টের পেলাম সেদিন দুপুরে খেতে বসে।

আমি, মা আর আমার ভাই সত্য একসঙ্গে খেতে বসতাম সকাল সকাল। স্নান আহ্নিক সেরে বাবার খেতে বসতে দুপুর গড়িয়ে যেত রোজই।

মা বসেছেন আমার সামনেই। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে শুধিয়েছি—'মা, তুমি ডান হাতে না খেয়ে বাঁ হাতে ভাত খাচ্ছ কেন আজ?'

বেই না বলা, অমনি মা হাত গুটিয়ে নিয়েছেন।

সেদিন আর মার খাওয়াই হল না। সারাদিনটা উপোস গেল। খেলেন সেই রাত্তিরে। ভাত আর মার পেটে পড়ল না সেদিন।

তখন জানলাম রাত্তিরের ব্যাপারটা। মার ডান হাত বাঁধা রাখার কথা। মা এখন থেকে বরাবর বাঁ হাতেই খাবেন—যদ্দিন না সেই কালীঘাটে মার মানতের পুজো দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছেন।

মার খাওয়া পন্ড প্রথম আমার থেকেই হয়েছিল। অনেকদিন তিনি অমনি উপোস করে কাটিয়েছেন।

প্রথম পান্ডা আমি হলেও তার পরে আরো অনেকের হাতেই তাঁর খাওয়া পন্ড হয়েছিল।

শেষটায়, পাড়াপড়শীরা কেউ এলে খেতেই বসতেন না মা। বাঁ হাতে খাওয়া দেখলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগত তাদের মনে, আর তার জবাবে সেদিনকার সে বেলার মতন খাওয়া বন্ধ হয়ে যেত মার।

তারপর থেকে সাবধান হয়ে গেছেন মা। বাড়ির অতিথ অভ্যাগতরা নিজ গৃহে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন তিনি। খেতেই বসতেন না। অনেকদিন পরে কলকাতায় এসে কালীঘাটে পুজো দিয়ে তারপর হাত খালাস করতে পেরেছিলেন মা।

মা ডান হাতে খাচ্ছেন এখন সে আবার আমাদের কাছে আরেক অবাক করা দৃশ্য।...

একটা রহস্যের আজও আমি ঠিক থই পাইনি। মার সেই দিব্যদর্শন আর আমার ওই ভূত দেখাটার।

মনের ইচ্ছাপূরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে হয়ত বা তার কিছু হদিশ মেলে। যেরকমটা স্বপ্নে দেখে থাকি সেইরূপ চোখ মেলেও স্বপ্ন দেখা যায়—অবচেতনের প্রার্থিত বস্তু হাতে হাতে পাই তখন।

মনই ত বাঞ্ছা কল্পতরু—বাঞ্ছিত বস্তু মিলিয়ে দেয় আমাদের। সব কিছুর তত্ত্ব অনেক গুহাতেই নিহিত। মনের গুণেই ধন মেলে, কখনো বা কল্পনার কল্পলোকে।

কখনো অকল্পনীয় ভাবে জীবনের এই বাস্তবে।

মা রাত্রিদিন মাকালীর কথাই ভাবতেন তো। তারপর নর নারায়ণে জবা ফুলটি দেখে তার অবচেতন মনের ভাবনা ঐ ভাব মূর্তি ধারণ করেছিল। এক রকমের আত্ম সম্মোহন আর কি?

আর আমার ব্যাপারটাও প্রায় তাই। ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িতে ভুতপেত্নীর দর্শন মিলেই থাকে নানান লোকের মুখে শুনে গল্প মাথায় পড়ে জানা। তাই সালংকরা ভুতেশ্বরীকে দেখেছিলাম। কিন্তু রাত্তিরে সেই হঠাৎ জ্বর বিকার হওয়া আর মার মানত করার সাথে সাথেই তার বেপাত্তা হয়ে যাওয়া—এর মানে? এই জিজ্ঞাসার জবাব আমি পাইনে।

অবশ্য, শেষ পর্যন্ত মহামতি শেক্সপীয়রের মত ভাবৎ প্রশ্ন ভুয়োদর্শী উক্ত হোরাশিওর ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় বইকি!

যদিও মাঝে মাঝে আমার মনে হয় জীবনের যত ভুয়োদর্শনের সবটাই হয়ত ভুয়ো নয়।

(ক্রমশ)

ইয়া ইয়া হিপ্পি হিপ্পি

প্রতুলবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়ির মালিক প্রতুলবাবু। ভদ্রলোকের এক ছেলে আছে (দশ বছরের কাচা পুংসন্তান) নাম তার বাবলু। আর বাবলুই আজ প্রতুলবাবুর দুর্ভাবনার মূলে। শ্রীমান নাকি গতকাল সন্ধ্যায় স্কুল থেকে ফিরে এসে ঘোষণা করেছে : "জান, বাপি, বড় হলে আমি হিপ্পি হব..." সঙ্গে কোমর-ঝাঁকানো টুইস্ট নাচ।

হিপ্পিদের সঙ্গে বাবলুর পরিচয় আছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বাপির কাছে বোঝাল সে : ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড় জেঠুর মতো দাড়ি, রঙচটা বেঢপ ট্রাউজার্সের উপর আধ-ময়লা পাঞ্জাবি—আর সঙ্গে দারুণ ফর্সা, ছোট পিসির চেয়েও ফর্সা, অদ্ভুত এক মেম...। ওরা সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়ায়, যেখানে যখন ইচ্ছে যায়, দাড়ি পর্যন্ত কামায় না, আর হোটেলে ফিরে খালি টুইস্ট নাচে আর গান গায়...। "জান, বাপি, বড় হলে আমি হিপ্পি হব।"

পাপির চোখ কপালে ওঠে। বাবলু তাঁর সবেধন নীলমণি—আর বাংলাদেশের কোন্ বাবা-মা না চান, বলুন, ওঁদের নীল-মণিটি, বড় হলে, হবে নীলরতন সরকার কিংবা রাজেন মুখার্জি। বাপি তো বাবলুকে এই একরত্তি বয়স থেকেই পাখি-পড়া করে শিখিয়েছেন, বড় হলে বাবলু-সোনা ডাক্তার হবে, চৌষট্টি টাকার ডাক্তার।

এদিকে ছেলে তাঁর চোখের উপরই মাচতে নাচতে গাইছে পুজোর মাইকে শুনে-শেখা হিন্দী গান : "ছোটী কি মুলাকাৎ প্যার বন গয়ী...ইয়া ইয়া হিপ্পি হিপ্পি...।"

ছেলের হিপ্পিদের সঙ্গে এই ছোটী-সি-মুলাকাৎ প্রতুলবাবুকে ভারি দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছেন।

ডাক্তার হিপ্পি

ফরাসী জেরার বর্গ [জন্ম প্যারিসে ১৯২৬-এ] বড় হয়ে ডাক্তারই হয়েছিলেন—সাইকলজিস্ট। আর তবু হিপ্পিদের মধ্যে হিপ্পি সেজে তিনি দুবছর ধরে ঘুরে-ছিলেন, উনিশটি দেশে। বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন 'মাদক-উদ্দেশী যাত্রা' নামক সদ্য-প্রকাশিত এক গ্রন্থে।

প্রাচ্যে তাঁর ভ্রমণসূচী দীর্ঘ : ইস্তাম্বুল থেকে কাঠমাণ্ডু। পথে তেহেরান, কাবুল, করাচী, কলকাতা, কাশী, লঙ্কা। মাদকের মানচিত্রে আরও আছে : ব্যাঙ্কক, হংকং, কিয়োতো...। সবাই অবশ্য এত দূর পৌঁছোয় না : "ফি-বছর মে থেকে অগাস্ট তক্ হাজার দশেক যুবক-যুবতী প্রাচী-র বাঁশি শুনে ঘর ছাড়ে। তাদের এক-শতাংশের বেশি গঙ্গাতীরে পৌঁছোয় না। ওপারে পঞ্চাশজনও পৌঁছোয় কি না সন্দেহ।" কেউ কেউ স্বদেশে ফেরে না মরে যায় ভিনদেশী জেলখানায়—কিংবা সর্বাধিক্ষেত্রে।

ঠিক ভুঁইফোঁড় নয় হিপ্পিরা; যাকে বলে 'বংশের ঠিক' তা এদের আছে : ১৯৪২-এ—যুদ্ধের আমলে—পশ্চিম-য়ুরোপে আবির্ভূত লম্বা-চুলো জাজু-রা এদের নানামশাই, পাঁচের দশকে প্রাদুর্ভূত মার্কিনী বীট্‌নিকেরা এদের বাপ-খুড়ো। "পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে দেখেছি—এগোবার পথ আমাদের কাছে তিনটি : রাজনীতি, মরমীমার্গ [mysticism] আত্মহনন...।" এরা বেছে নিয়েছে দ্বিতীয় পথটিকে, আর তাই প্রাচ্য এদের এমনভাবে টানে।

কিন্তু প্রাণের গরজে ঘর ছাড়লেই চলার পথ সহজ হয় না। কাঁটা আছে পদে পদে। আছে দস্যু, আছে ছিন্‌তাই, "প্রতি বছর অন্তত একবার ক'রে ওদের কারও হাতে আমাদের পড়তে হয়।" মেয়েদের উপর লাঞ্ছনা হয়, স্রেফ এক জোড়া

নুতোর জন্য জান্ পর্যন্ত যেতে পারে। অভিযোগ পেশ করতে যাবে ওরা পুলিসের কাছে? মস্ত ঝুঁকি তাতে: পুলিস হয়তো ওদেরই ধরে হাজতে পুরবে। এদিকে অনুসরণ মসৃণভাবে হয় না সর্বত্র: পাকিস্তান পর্যন্ত হিচ্-হাইকিং চলে বেশ, ভারতে ও ফিকির অচল; আর হ্যাঁ, মুসলমানী দেশ যতগুলো আছে, তার মধ্যে পাকিস্তান-ই আতিথেয়তায় উদারতম। কোনো কোনো দেশের সীমান্তে পৌঁছে আরেক প্রতিবন্ধক: আপনাকে দেখাতে হবে আপনি জংলি নন, সভ্যতার আলোক-প্রাপ্ত; কোথাও দেখাতে হবে স্যুট, কোথাও দেখাতে হবে [যেমন থাইল্যাণ্ডে] স্যুটকেস, ব্যাগ সম্বল করে গেলে প্রবেশ নিষেধ। আবার কোথাও বা দেখাতে হবে তারা কপর্দকশূন্য নয়, নিজের খরচ চালাবার ক্ষমতা রাখে; তা-ও ওরা দেখায়, চোখে ধুলো দিয়ে দেখায় তাবিজ ইত্যাদির মুদ্রার কাঁড়ি, অথবা ডলার আর জুয়া ট্র্যাভেলার্স-চেক্—দলের মধ্যে পরস্পরের হাতে ওগুলো চালাচালি করে ওরা কাজ হাসিল করে নেয়...।

ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে—অর্থাৎ শিখ গুরুদ্বারে কিংবা ওয়াই এম সি এ-ভবনে। ভোজ্যবস্তু ওরা ঠিক জুটিয়ে নেয়; অনাহারে হিপিরা মরে না। ক্ষুধার্তের সামনে আহার কদাপি করে না, একাসনে বসে ভাগাভাগি করে খায়; দলে—দলের মতো আয়োজন থাকলে দশজনের জন্যও তা যথেষ্ট। ভাগাভাগি করে নেওয়া হয় সব কিছুই [মেয়েদেরও?...তা, দশ-খানেক পুরুষের জন্য পনেরো জন মেয়ে আছে]; পথ-নির্দেশ, পথের বাধা আর সেই বাধা টপ্‌কানোর অভিসন্ধি নবাগন্তুককে বাৎলে দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন লেখক: জনৈক হিপি হাতে পেল কয়েক প্যাক্ সিগারেট। সারা দলকে সঙ্গে সঙ্গে ধূমসেবনের রসদ বিলিয়ে দিল সে—নিজের কাছে খানকতক প্যাকেট লুকিয়ে রেখে। নিজের জন্য?...না, গোপনে লেখককে সে বলে, "বড়দিনের জন্য পাঁচটি প্যাকেট জমিয়ে রেখে দিলাম, বুঝলেন? বের করব যখন, ওদের মুখের খুশির ছবিটা একবার দেখবেন।"

ভারতে

ভারতে পৌঁছোনোর আগেই ভারত-ফেরৎ স্টীফেনের কথা তাঁর কানে পৌঁছেছিল। তাই একটু একপেশে মন নিয়েই এ-দেশে তিনি পা দেন হয়তো। স্টীফেন বলেছিল, দিল্লিতে হিপিদের উপর অগাপাস্তলা আক্রোশ চালায় পুলিস: এক তিল গাঁজা মিললেই এক তাল লজ্জা। তবে না শোনা যায়, ভারতে সাধু-সন্ন্যাসীরা গাঁজার কল্কেতে টান দেন নিয়মিত? তা দেন, এক কোটি, দেড় কোটি সাধু আছেন ভারতে, প্রকাশ্যে পথেঘাটেই তাঁরা গঞ্জিকা-সেবনে বুঁদ হয়ে থাকেন—তাতে অবশ্য কসুর নেই কোনো, "শাস্ত্রে অনুমোদিত এর সেবনবিধি, নিষিদ্ধ করার উপায় নেই; নিছক গঞ্জিকা-ভক্ষণের জন্যই কাউকে গ্রেপ্তার করা চলে না; সীমান্ত-শুল্ক এড়িয়ে বিদেশী সামগ্রী দেশের সীমানার মধ্যে নিয়ে আসার অপরাধেই হিপিদের অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়।' সাজার প্রণালী: প্রথমে নিরোধ-আইনে মাসখানেক গরাদের ওপারে; তারপর আদালতে-উকিল কিংবা কোর্ট-ক্লার্কের সাহায্য ব্যতিরেকেই—জজসাহেব রায় দেন: দুমাস কিংবা চার মাস কারাদণ্ড, অথবা সঙ্গে-সঙ্গে খালাস... যদি অবশ্য হাতে হাতে জরিমানাস্বরূপ

গুনে দিতে পারেন চারশো টাকা। স্টীফেন্স নিজে একবার ধরা পড়েছিল। কপালগুণে তার সঙ্গীসাথীরা হাজির ছিল শুনানির দিন। প্রত্যেকের পকেট উপুড় করে অর্থ সংগ্রহ করা হল। সব মিলিয়েও দুশো টাকা ঘাটতি থাকায় ঝটপট পথে পথে ছড়িয়ে পড়ল সকলে, ট্যুরিস্টদের কাছে ভিক্ষে করে মুক্তিমূল্য পূরণ করা হল।

ভারতে উপনীত হয়ে স্বয়ং বর্গ্-এর প্রথম অনুভূতি ঃ "কোটি কোটি মানুষের মাথার উপর চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে কোটি কোটি কাক। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মানুষের চেয়ে কাককেই সচ্ছল বলে মনে হল। ইঁদুর, মাছি, উকুন, ছারপোকা, আরশোলা—পর্যন্ত আহারে সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট; কেবল গরুগুলোকেই মনে হল অপুষ্টিপীড়িত, ধনবিজ্ঞানের বিচারে মানুষের যোগ্য দোসর।"

আর কলকাতা? "আগে থেকেই তার কথা হাজার মুখে শুনতে শুনতে শুনবার মতো আর কিছু বাকি ছিল না। আর তবু...। দানবিক আয়তনের এক শহর, সত্তর থেকে আশি লাখ লোক পিলপিল করছে—১৯৮০ নাগাদ যা নাকি কোটি পেরিয়ে কুড়ি থেকে চল্লিশ লাখে গিয়ে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে কমসে কম এক-তৃতীয়াংশ লোক বেকার। লাখে লাখে প্রেতশীর্ণ চেহারার মানুষ ফুটপাতে ছড়িয়ে। প্রেত-রমণীর কোলে প্রেত-শিশুর ঝাঁক।" রাস্তা দিয়ে হাঁটা পর্যন্ত দুরূহ ঃ ভিখিরিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি প্রতিটি পদক্ষেপে; তারা আঁকড়ে ধরে থাকে গাত্রবাস, ফোঁপায়, চেঁচায়, গড়াগড়ি যায় ফুটপাতে...।

"হাওড়া ব্রিজের কাছে যে-দৃশ্য দেখলাম, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। হাড্ডিসার একটি মেয়ে [ওজন পঁচিশ কিলোর বেশি কিছুতেই হবে না] আবর্জনা-ভরা আস্তাকুঁড়ের মাঝখানটিতে বসে—পুরোপুরি নগ্ন। হয়তো বছরের পর বছর ধরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে ঐভাবে। আমি একটা কম্বল, এক টুকরো কাপড়, কিছু রুটি আর ফল কিনে আনলাম ওর জন্য।" কিন্তু এক ডক-শ্রমিকের কাছে তিনি শুনলেন, বৃথা অপচয়; যে-মুহূর্তে তিনি পিছন ফিরবেন, কিছু লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্বলটা আর কাপড়টা ছিনিয়ে নেবে, তারপর বেচে দেবে ফের বিক্রেতারই কাছে... ব্যাবসায়ীটি, সত্যি বলতে তার অপেক্ষাতেই আছে। "স্পষ্টই দেখছেন, কাপড়ের দরকার ওর ফুরিয়েছে।"

গা ঘুলিয়ে ওঠে বিবমিষা জাগে ঃ "না, এ-দেশে সুবর্ণযুক্ত মলমূত্রের পূতিগন্ধের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমের দুই হাপ্পীর তো তিরমিই লেগে গেল। তারা এখানে, বাঁচার উপায় শিখতে এসেছে, মরার উপায় নয়...। য় প্রতিহেত করে তাদের, অ

হিপি

সেই কুড়ি কোটি কি পঁচিশ কোটি 'পবিত্র গাভী' নয়, অথবা নয় ঐ পাঁচ কোটি বানর [পবিত্রতার মানদণ্ডে যারা গাভীদের চেয়ে এক ফোঁটাও ন্যূন নয়], এমনকি ঐ আড়াই কোটি ঘুষখোর, দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারেরা পর্যন্ত নয়, দেশটাকে যারা উচ্ছন্নে দিচ্ছে। বিতৃষ্ণার আকর ঐ হিন্দুদের সঙ্গে দৈনন্দিনকার সান্নিধ্য ও মেলামেশা ঃ অমোচ্য ঘৃণায় ভরপুর, অপরিমেয় দম্ভে স্ফীত, সারা বিশ্বের বাকি সবার চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে প্রশ্নাতীতভাবে নিঃসংশয়, তারা যে এক অভূতপূর্ব জাতি, সত্যের সর্বস্বত্ব যে তাদেরই হাতে রক্ষিত, আর মানবজাতির গোটা অবশিষ্টাংশটা-ই যে ম্লেচ্ছ-অচ্ছুৎ-তথা-অজ্ঞের এক স্তূপী-করণ মাত্র, তা বিনা তর্কে, বিনা বিচারে স্বতঃসিদ্ধ ওদের মনে। যদি দেখিয়েও দেন, হিন্দুরা অধিকাংশই নিরক্ষর, তাতে তাদের প্রত্যয়ের ভিৎ একচুল টলবে না..." ১৮৪৫ সাল থেকে তত্ত্ববোধিনী শুনিয়ে আসছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শনের অবিলম্ব ভারতীয়-করণই বৈজ্ঞানিক স্থবিরতা এবং অজ্ঞতা থেকে য়ুরোপ-আমেরিকাকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায়।

কেউ কেউ অবশ্য ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখে: হিন্দুধর্মে দীক্ষিত এক য়ুরোপীয়ের মুখে অন্য সুর বাজে ঃ "একবার যদি ওদের ধর্মশাস্ত্র শুচিতা-রক্ষার বিষয়ে কি বলে তা শোনেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, বাস-কন্ডাক্টরটির পক্ষে আমাদের—য়ুরোপীয়দের—তার বাসে তুলতে রাজি হওয়া-ই তার মহৎ ঔদার্যের পরিচয়।" ঐ একই ব্যক্তির মতে জেনারেল হনুমান নাকি হিমালয় থেকে (!) লঙ্কা পর্যন্ত ঘণ্টায় আড়াইশো কিলোমিটার বেগে আকাশপথে উড়েছিলেন, প্রতিদিন নাকি মন্দিরে মন্দিরে জগতের তাবৎ অ্যান্টি-বায়োটিক ঔষধের দরুন নিহত সকল রোগ-জীবাণুর উত্তম পুনর্জন্মের জন্য মিনতি-নিবেদন উৎসর্গ করা হচ্ছে... "অ্যান্টি-বায়োটিকের উৎপাদন বিশ্ববিধানের পরিপন্থী।

অন্যান্য সাক্ষ্য

কেউ কেউ হিন্দুধর্ম বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে। একজনের জবানিতে খেদোক্তি ঃ

"সর্বশেষ সুমারিতে আট কোটি ষাট লক্ষ দেবতার হিসেব পাওয়া গিয়েছে—অর্ধ-দেবতা আর জ্যান্ত-দেবতাদের না ধ'রে। ছ-মাসে পাঁচ-ছক্কা তিরিশটা অমন দেবতা আমি দেখেছি. আশ আমার মিটে গেছে। জ্যান্ত দেবতারা কিন্তু বেশ নাদুস-নুদুস... চাকরিটা পয়মন্ত বলতে হবে : কেউ কেউ নব্বুইয়েও তাজা আছেন।" বিশেষ ক'রে পণ্ডিচেরীর আর হৃষীকেশের কথা বলে সে; বলে...না, থাক, যাচ্ছেতাই বলে।

ভারতীয় তরুণ-সমাজ সম্পর্কেও হতাশ অনেকে—যেমন এই মেয়েটি, ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে বোম্বাইয়ে পুরো এক রাত আলাপ-আলোচনার পর সে উপলব্ধি করে : "ভারতে হিপ্পিদের করার মতো কিছু নেই। গোড়াতেই একটা ভুল বোঝাবুঝি ঘটে গেছে যা মৌলিক ও সম্পূর্ণ।" সে শুনে এসেছিল, এই ছাত্রেরা নাকি ভারতের 'ক্রুদ্ধ' তরুণ দল; সে এসে দেখল, নিছক কতিপয় নৈরাশ্য-নিষ্ক্রিয় হতভাগ্য। গত শতকে যে সদ্যোশিভগ্নযৌবনারা, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের চাপে, শিশু সন্তানদের পিছনে রেখে স্বামীর চিতায় আরোহণ করতে বাধ্য হত, তাদের অন্তিম ভাবনাদি বিষয়ে জিগ্যেস করাতে ছাত্রেরা জন্মান্তর ঘটিত কথাবার্তা শুনিয়ে দিল। সংসারের কাছে ঐ আত্মসমর্পণ, ঐ প্রতিরোধহীন মেনে নেওয়াটা মেয়েটি মেনে নিতে পারেনি, মর্মাহত হয়েছে।

একটি হিপ্পি ছেলের অভিমত আরো তীব্র : ভারতে আদি-হিপ্পি-তরঙ্গ ভেঙে পড়েছিল অধরা-কে ধরার আশায়; আজকাল বেশির ভাগ হিপ্পিই ঘরকুনো হয়ে পড়ে থাকে—সারাৎসার যেটুকু, তা মিলে গেছে ঐ গাঁজার পুরিয়ায়। আশায় ভরপুর হয়ে এসে নেশায় চুর হয়ে গেছে সব—প্রাক্তন নিষ্ঠিক গঙ্গাতীরে গাঁজাখোরে পরিণত। "এই আমিও তাই...ঐ জন্তু-জন্তা পুতুলে-নজ্ঞা হাবাগোবা-ছেলে-ভুলানো আচার-বিচারে বিশ্বাসের খেলা আর কতদিন খেলব বলুন। আর তাছাড়া ব্যাপারগুলো হিন্দুই নয়, ভারতীয় : ক্যাথলিকেরা পর্যন্ত ওতে মজেছে। প্রতিমা আর পুত্তলির অর্চনায় ভারতীয়দের দিন কেটে যায়। ঐ সব আধ্যাত্মিক bric-a-brac থেকে বেরিয়ে আসবে সত্যের চাই, বেরিয়ে আসবে এমন কিছু যা য়ুরোপের আর্তির উপশম ঘটাবে, তাকে যোগাবে বিশ্বাসের, আশার, বাঁচার সার্থকতা এও আমাদের মেনে নিতে হবে?...সত্যিকার হিপ্পিরা উৎস-তীর্থ-সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আজ প্রতারিত পতিত যেন...। যেখান থেকে যাত্রা করেছিলাম আমরা, সেখানেই ফিরে এসেছি—বীতমোহ।"

হিপ্পি-তত্ত্ব

কি করে হিপ্পিরা সারাদিন? "আমরা সমীক্ষা করি, সন্ধান করি, চিন্তা করি, ধ্যান করি—যা বর্তমানে আর কেউ প্রায় করেই না। প্রতিটি মানুষ যদি প্রতিটি হপ্তায় দু ঘণ্টা সময় দিত ধ্যানের জন্য জগতের চেহারাটাই পালটে যেত...। না, 'কাজ' আমরা করি না। করতে যাব কোন্ দুঃখে? ...অর্থলোভে? কিন্তু টাকা ছাড়াই মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। আর ঐ বাঁচাটাই আমাদের আকর্ষণ করে, টাকাটা নয়। আর ও-দুটো যতটা ভাবা হয়, ততটা অবিচ্ছেদ্য নয়।

কিন্তু শুধু তত্ত্বে তো আর চিঁড়ে ভেজে না, অর্থ লাগেই। সে টাকা ওরা কিভাবে যোগাড় করে?...নানা উপায়ে। পারলে সদুপায়েই...

আর নইলে? [ক্রমশ]
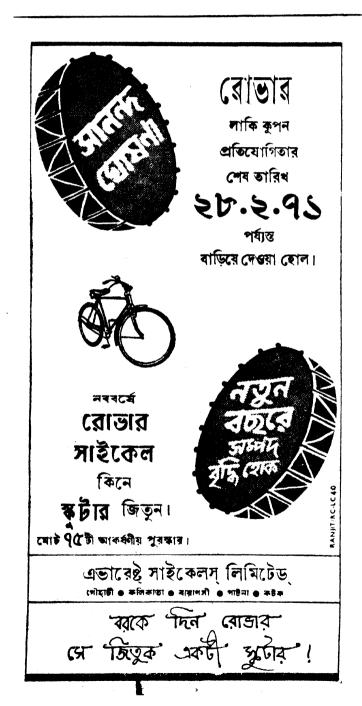
.ক্সমূলার ভবন কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি তাঁদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শিল্পী ...ম মুন্সীর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন ...ন। ম্যাক্সমূলার ভবনের একতলা ও ...লে শিল্পীর আঁকা কয়েকটি ছবি ... যায়। ছবিগুলি মসৃণ কাগজের ... স্বচ্ছ জলরঙে আঁকা।

...রিচিতি-লিপি থেকে জানা যায় যে ...পীর জীবনে শিল্পচেতনা বংশানুক্রম। ...পীর রচনাবলী অ্যাকশন পেন্টিং

—কুমকুম মুন্সী

...ীর, দেখে জ্যাকসন পোলকের রচনা-...ত্র কথা মনে পড়ে। শিল্পীও মনে হয় ... পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। জলরঙ ...ক্ষা তেলরঙে এই জাতীয় শিল্পসৃষ্টি ... সহজ। কারণ, সেক্ষেত্রে একটি রঙের ...র পরীক্ষামূলকভাবে অন্য রঙ ব্যবহার চলে, এবং মনোমত না হলে আবার কোনও রঙের আশ্রয় নেওয়া যায়—ফলে ...স্প্রে করে, ছড়িয়ে বা গড়িয়ে দিয়ে ইমেজারী রচনা করা চলে। জলরঙে ... আদৌ সম্ভবপর নয়। জলরঙে এ ...ীর শিল্পকর্ম করতে হলে গভীর ...তা, পরিকল্পনা ও সেই সঙ্গে আত্ম-...াসের প্রয়োজন এবং তার ওপর চাই ...জন মত রঙ নির্বাচন করার ক্ষমতা।

বাহুল্য, শিল্পীর কাজগুলি দেখে ...া যায় যে প্রত্যেকটি রচনা বিষয়ে তাঁর ...াধারা সুনির্দিষ্ট এবং সেই ধারা ...যায়ী তিনি রঙ নির্বাচন ও ব্যবহার ...ছেন। শুধু তাই নয়, তুলির বলিষ্ঠ ...র মধ্য দিয়ে ছবির মধ্যে গতিবেগ সঞ্চার করেছেন। ফলে জলরঙের মাধ্যমেই শিল্পী কয়েকটি চমৎকার ইমেজারী সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে দু একটি রঙ গভীরভাবে মিশ্রিত করে তুলির মোটা টানের ভিতর দিয়ে রচনায় একটি বিপুল গতিবেগের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাদা রঙের বৃত্ত বা খণ্ড বৃত্তের আভাষ দিয়ে ছবিতে সম্পূর্ণ নতুন রূপদান করেছেন। ইমেজারীগুলি অধিকাংশ স্থলেই বিমূর্ত, আবার কয়েকটিতে স্বাভাবিকভাবেই হয়ত কোনও পরিচিত আকারের প্রতীক ফুটে উঠেছে। ছবিগুলি একান্তই অনুভূতি সাপেক্ষ—যেমন ওনং ছবি। রঙের সুকৌশল ব্যবহার গুণে কয়েক ক্ষেত্রে বিপুল জলোচ্ছ্বাস থেকে উৎক্ষিপ্ত ছোট ছোট জলকণার মত সাদা রঙের অর্ধবৃত্ত বা মালার আকার প্রকাশিত হয়েছে। মিশ্ররঙের পটভূমির ওপর কেবল সাদা রঙের সাহায্যে শিল্পী যেন মায়াজাল তৈরী করেছেন, আবার নানারঙ বিভিন্ন ছোট ছোট আকারে সংস্থাপন করার জন্য কয়েকটিতে রঙীন কাচের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। শিল্পী জলরঙ ব্যবহারে সুপটু। একটি ছবিতে যেন জ্বলন্ত তুবড়ীর তীব্র রঙবৈচিত্র্য ও গতিবেগ ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে শিল্পীর প্যানেলে রচিত ছবিগুলিও উল্লেখযোগ্য। মাধ্যম হিসাবে স্বচ্ছ জল-রঙের সম্ভাবনা কত অধিক এবং জলরঙ প্রয়োগ পদ্ধতির দিগন্ত যে কত ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে পারে, শিল্পী এ যুগেও তা প্রমাণ করলেন।

*

সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্ট-এর সভ্য শিল্পীবৃন্দ বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। প্রদর্শনীতে ১২ জন শিল্পীর ৪৬টি রচনা দেখা যায়, তাদের মধ্যে পাঁচটি গ্রাফিক প্রিন্ট ও তিনটি ভাস্কর্য নিদর্শন।

কলকাতার বর্তমান বিভিন্ন শিল্পী সংস্থার মধ্যে সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস অন্যতম। সংস্থার শিল্পীগণ তরুণ, উৎসাহী ও প্রগতিবাদী। প্রায় সকলেই আজ শিল্পী হিসাবে পরিচিত, দুএকজন খ্যাতিলাভও করেছেন। এঁরা সকলেই নিয়মিতভাবে শিল্পচর্চা করেন। শুধু তাই নয়, গত কয়েক বছর যাবৎ এই সংস্থা কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন করে দেশের শিল্প সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

এবারের প্রদর্শনীর অধিকাংশই অঙ্কন নিদর্শন এবং তেলরঙে আঁকা, যদিও টেম্পারায় কাজও ছিল। প্রদর্শনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক শিল্পীই আপন

বিগাইলিং হ্যান্ডস —বিকাশ ভট্টাচার্য

আপন চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করেছেন। সব নিদর্শনই যে শিল্প বিচারে শ্রেষ্ঠ তা নয়, তবে সংস্থার নির্বাচন প্রথা রুচিসম্মত। কাজগুলি পরিচ্ছন্ন ও অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা-মূলক। বিমূর্ত রচনা দেখা গেলেও প্রাচীন লোক ও দেওয়ালচিত্র থেকে প্রেরণা লাভ করে কয়েকজন আধুনিক রীতিতে রচনা করেছেন। তবে প্রদর্শনীতে, দু'একটি ছাড়া সমকালীন কোনও ছবি চোখে পড়েনি।

বিকাশ ভট্টাচার্য ও গণেশ পাইনের রচনা সকলের নজরে পড়ে। বৃহদাকার, সুররিয়ালিস্টিক রচনার জন্য বিকাশ

ভট্টাচার্য সুপরিচিত, তবে এবারে রঙ ও কোলাজ সমন্বয়ে আঁকা ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিগাইলিং হ্যান্ডস একটি নিদর্শন। ইচ্ছা থাকলেও পুরুষ যে নারী ও শিশুর মায়াজাল থেকে নিষ্কৃতি পান না শিল্পী সেই কথাই শিশু ও নারীর হস্তশৃংখলে আবদ্ধ পুরুষের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। রচনা ও প্রকাশভঙ্গীমায় স্বাতন্ত্র্য আছে। দি ভিজিটরস-এ অপ আর্ট ও নিওরিয়ালিজমের প্রাধান্য লক্ষনীয়। জলরঙ ও টেম্পারায় কারুকার্য সৃষ্টির জন্য গণেশ পাইন সুনাম অর্জন করেছেন। পরিকল্পনা ও সরলতার দিক থেকে আন্ডার দি ক্লাউড উল্লেখ্য। মা ও শিশুর চিরন্তন বিষয়বস্তুটি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড-এর একটি গ্রাম্য, সরল কম্পোজিশন, বিশেষ করে হলুদ ও নীল রঙের সুন্দর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। শৈলেন মিত্রের তিনটি নিদর্শনের মধ্যে পেন্টিং-১ চোখে পড়ে যায়। রাত্রে শহরের আলোকিত দু'তিনটি রাস্তার সংযোগস্থলে ট্রাফিক সিগন্যালের লাল হলুদ ও সবুজ রঙ কিভাবে ধাবমান যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, শিল্পী রঙ ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। গ্রাফিক প্রিণ্টে বৃত্তাকার সূক্ষ্ম খোদাই কাজ লক্ষনীয়। শ্যামল দত্তরায়ের জলরঙ ছবিতে পুরানো লোক ও দেওয়াল চিত্রের আভাষ মেলে, যেমন জার্নি। মধ্যস্থলে মূর্তি ও দক্ষিণে প্রতীক হিসাবে একটি জাহাজের আকার অবতারণা করে শিল্পী বক্তব্য বুঝিয়েছেন। চাপা, গ্রে রঙ প্রধান পেপার বোটের সূক্ষ্ম রেখা কাজে গ্রাফিকের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।
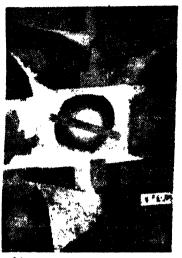
পেণ্টিং-১ —শৈলেন মিত্র

সুনীল দাসের তিনটি ছবিই তন্ত্রশাস্ত্রের নানা প্রতীক ও চিহ্ন অবলম্বনে রচিত। একখানি চোখে পড়ে, ৪১নং। সুহাস রায়ের রচনায় গাঢ় রঙের স্তরভেদ দ্রষ্টব্য। প্রতীকরূপে ব্যবহৃত একটি সঙ্গীহীন গাছকে কেন্দ্র করে কমপোজিশনটি গড়ে উঠেছে। সনত করের তিনটি গ্রাফিক প্রিণ্টের মধ্যে ইণ্টালিও-১ উল্লেখযোগ্য। চাপা সবুজ রঙের প্রাধান্যে প্রিণ্টটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ধীরাজ চৌধুরীর কাজে প্রাচীন চিত্রের বিশেষত্ব দেখা যেত। এবারে শূন্যস্থান প্যানেলে ভাগ করে পাতলা নীল ও সবুজ জলরঙে ভরে দিয়ে তিনি বিমূর্ত রচনা সৃষ্টি করেছেন— নেচার মাই ইমপ্রেশন (১২নং) মন্দ লাগেনি। লালু প্রসাদ শা-র তিনটি ড্রয়িংই বলিষ্ঠ, বিশেষ করে সূক্ষ্ম রেখার মধ্য দিয়ে বিমূর্ত আকার সৃষ্টি করেছেন (২১নং)। কাতায়ুন শাকলাতের ট্রায়ো অনেকের চোখে পড়ে, তিনটি মূর্তির মুখের ওপর উল্কি জাতীয় রঙরেখা ব্যবহারের জন্য। ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত হিন্দু শাস্ত্র ও পূজাপদ্ধতির নানা উপাদান প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে বিমূর্ত কমপোজিশন সৃষ্টি করেছেন (কমপোজিশন—২)। শিল্পীর নামাবলী ও দশাবতার মূর্তি অবলম্বনে রচিত ছবিও অনেকের মন্দ লাগেনি। মানু পারেখের শিল্পকর্মে নতুন রীতি চোখে পড়ল। নানা ছোট ছোট বিমূর্ত ক্ষেত্র বা আকারে রচনাক্ষেত্রটি ভরে ফেলে তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচনায় একটি সামগ্রিক রূপদান করার চেষ্টা করেছেন (পেণ্টিং ২)। মনে হয় এটি পরীক্ষামূলক। মানু রাথোড়ও বিমূর্ত রচনা করেছেন তবে উচ্চাঙ্গের নয়। দীপক ব্যানার্জির গ্রাফিক প্রিণ্টে সূক্ষ্ম রেখাজাল ও পরিকল্পনা চোখে পড়ে। অনিলবরণ সাহার জলরঙের ছবিতে লোকচিত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে—যেমন ওয়াটার কলার—৩। রঘুনাথ সিংহের তিনটি সিরামিক ভাস্কর্যের নিদর্শন ছিল। আকার ও গঠন সৌকর্যের দিক থেকে কয়েকটি মন্দ লাগেনি।

*

শিল্পী নৃপেন ঘোষ পার্ক স্ট্রীটে একটি পথপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন, যদিও নির্দিষ্ট শেষ দিন পর্যন্ত প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়নি।

—চিত্রপ্রিয়

৭
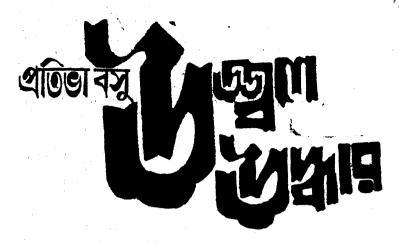
পুরন্দরের হাত ধ'রে একই ভঙ্গিতে বসেছিলেন ডক্টর রায়, অঞ্জলির দুঃখ তাঁর কাছে অভিন্ন ছিলো না, তাঁর বুকের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে নিজের দুঃখের সমুদ্রও উথলে উঠছিলো।

আর কেউ না জানুক তিনি তো জানেন, সমস্ত জীবন ভরে ওই একটি মেয়েকেই ভালোবেসে এসেছেন তিনি, আর তার বিচ্ছেদ তাঁকে আজ পর্যন্তও কোন্ অতলে তলিয়ে রেখেছে? সারাটা রাত পথে পার্কে মাঠে ময়দানে ঘুরে, পুলিসের তাড়া খেয়ে, শরতের হিমে ঠাণ্ডা লাগিয়ে যখন একটা ঝড়ে বিধ্বস্ত গাছের মতো ফিরে এসেছিলেন সকাল বেলা, তখন তাঁর মন যুক্তিতর্কের অধীন ছিলো, তিনি ভেবে দেখেছিলেন শুধু পৌরুষের অহংকারই সব নয়, কিছু শিক্ষা-সংস্কৃতির অহংকারও তাঁর থাকা উচিত ছিলো।

সত্যি, পুরুষ পুরুষই। যতো আধুনিকই হোক, যতো শিক্ষিত মার্জিতই হোক, তার অধিকারবোধের উগ্রতা জন্তুর মতো। অথচ কোনো কারণ নেই। সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় সুযোগ ছাড়া একে আর কী বলা যেতে পারে?

প্রথম যৌবনে একবার তিনিও বেশ্যা-বাড়ি গিয়েছিলেন, এবং সেটা স্বেচ্ছায়। বিলেতবাসের ষোলো মাসে তাঁর নারী-সংসর্গও ঘটেছিলো। ঘটেছিলো বলাই উচিত। তার কারণ, বাড়িউলির সদাব্রতী মেয়েটি বড়ো গায়ে পড়া ছিলো। যখন তখন এসে টোকা দিত দরজায়, যেমন তেমন বেশে এসে হাজির হ'তো। নির্জন ঘরে পায়ের উপর পা তুলে বসে সিগারেট খেতে খেতে বলতো, 'দোষ কী? এ হচ্ছে ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। ঈশ্বরের অভিপ্রেত ব্যাপার। তুমি এতো পিউরিটান কেন?'

মেয়েটি সুন্দরী ছিলো, স্বভাবটিও ভারি উচ্ছল। যে ছেলেটির সঙ্গে তার ভালোবাসা ছিলো, দু' বছর মেলামেশা করার পরে সে অন্য একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। বস্তুত সেই বিরহ অথবা বিরক্তির সময়টাতেই তিনি গিয়ে ওদের ঘরে ভাড়াটে হয়েছিলেন। পাশাপাশি ঘর, ঘরটি মন্দ ছিলোনা, সাজানো গুছোনোও ছিলো বেশ কিন্তু একই বাথরুম, একই সিঁড়ি আর একই রান্নাঘর। মেয়েটি তাঁকে অনেকদিন রান্না ক'রে দিত, প্রায়ই ঘর ঝেড়ে মুছে ফিটফাট ক'রে রাখতো, কাপড় জামা গুছিয়ে দিত ক্লসেটে। অলস বাঙালী ছেলে হ'য়ে তিনি নির্বিবাদে সেই সাহায্য গ্রহণ করতেন। এই করতে করতেই সাহস বেড়ে গেল ওর, সময় অসময়ে ঘরে আসবার ছাড়পত্র পেয়ে গেল।

একটা পার্টি ছিলো একদিন, ভারতীয় বন্ধুরাই তার উদ্যোক্তা ছিলো, খুব খাওয়া দাওয়া হ'লো, মদ্যপানও কম হ'লোনা। যখন ঘরে ফিরলেন, রাত হয়েছে অনেক, তার উপরে ছিপ ছিপ বৃষ্টি পড়ে জমে যাচ্ছিলেন ঠাণ্ডায়। কোট, ওভারকোট, ওভারশু, দস্তানা, সমস্ত ভেদ ক'রে শীতের সৈন্যরা তলোয়ারের খোঁচা মারছিলো দেহে, বেশী পান ক'রে অনভ্যস্ত পাও খুব সঠিক ছিলো না। এই অবস্থায় যখন দরজার ফুটোয় চাবি লাগাতে গলদ-ঘর্ম হচ্ছিলেন, খুট ক'রে পাশের ঘর থেকে বোধ হয় এলো মেয়েটি, হাসতে হাসতে বললো, 'যা অবস্থা দেখছি, সারারাতেও তালার ফুটো তুমি খুঁজে পাবেনা, সরো, আমি খুলে দিচ্ছি।'

মেয়েটির গায়ে টুকটুকে রংয়ের আজানু ঝালরের মতো পা পর্যন্ত একটা ড্রেসিং [illegible] মতো [illegible] দিয়ে, [illegible] জামা সুন্দর [illegible], [illegible] গায়ের [illegible] [illegible] খুলে দিল [illegible], কিছু [illegible], [illegible] উজ্জ্বল [illegible] [illegible] তলায় তার [illegible] যাচ্ছিলো স্পষ্ট। তিনি [illegible] মেয়েটি [illegible] ঘরে নিয়ে এলো, বললো, আজ [illegible] এক বন্ধু আমাকে খুব ভালো এক [illegible] ফরাসী ওয়াইন দিয়ে গেছে, খাবে নাকি? যা দেখছি, শীতে তো জমে গেছ, [illegible] ফ্যালো, আগুন করি, [illegible] ওয়াইন নিয়ে আসি, গরম হও।'

নেশার বস্তুরই তাই, খেলেই খাবার ইচ্ছে দুর্নিবার হ'য়ে ওঠে। [illegible] বললেন, 'না, না, ওসব ওয়াইন-টোয়াইন হবে না, জিন থাকে তো নিয়ে এসো।'

'অলরাইট।' ঢিমে আগুনে কাঠ গুঁজে জিন নিয়ে এলো সে। খানিক বাদে বললো, 'গা গরম ক'রে দেব নাকি? একা বিছানায় আমার ঘুম আসছে না, পড়লে ফিরলেই বরফ।'

'হ্যাঁ দাও।' নেশা তখন তাঁর মাথায় চড়ে গিয়েছে, তিনি নিজেই ওর গাউনটা খুলে দিলেন। সুগঠিত সাদা পুতুলটিকে নিয়ে চলে এলেন বিছানায়।

অবশ্য ঐ একদিনই। অঞ্জলির কথা ভেবে পরের দিন তাঁর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর চেষ্টাচরিত্র ক'রে সাতদিনের মধ্যে বাড়ি বদলে ফেললেন। কেননা তিনি বুঝেছিলেন, মেয়েটির ভাষায় এই ক্ষুধা প্রকৃতই একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, এবং হাতের কাছে খাদ্য থাকলে তিনি অবশ্যই প্রলুব্ধ হবেন। এবং মেয়েটি যে রকম বেপরোয়া, একটা বিপদে ফেলতেই বা বাধা কী?

এর পরে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, সেই ময়লা, (যদি তাকে ময়লা বলা যায়) ভুলেও গিয়েছিলেন। মনে পড়লো হঠাৎ। মাঠে বাটে রাত কাটিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে পড়লো। আর সেই সময়েই তিনি স্থির করলেন, ভালো ক'রে কথা বলবেন অঞ্জলির সঙ্গে, কী সে বলতে চায়, শুনবেন।

ভোরের গন্ধ মেখে বাড়িটা একা একা দাঁড়িয়েছিলো, দরজায় দুধের বোতল বসানো ছিলো, বারান্দায় খবরের কাগজ পড়েছিলো। সবই রোজের মতো। তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত বিব্রত বিধ্বস্ত দেহে মনে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিলেন, বসার ঘরের সোফার উপর বসেছিলেন হাতের

তাতে মাথা রেখে। অনেক পরে ভাঙা ভাঙা গলায় ডেকেছিলেন, 'অঞ্জলি।'

কেউ জবাব দেয়নি। তিনি আবার ডেকেছিলেন, আবার ডেকেছিলেন, আবার ডেকেছিলেন। তারপর চেঁচিয়ে প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন।

অঞ্জলির অনলস নিপুণ হাতের সাজানো ঘরগুলো আসবাবগুলো হাঁ হাঁ করছিলো। তার পরিত্যক্ত সমস্ত জিনিসগুলো একটা হৃদয়-বিদারক ঠাট্টার মতো তাকিয়েছিলো তাঁর দিকে। তিনি শাড়ি জামা জুতো প্রসাধন সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিলেন। তারপর ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি কোথায়? কোথায় গেলে? কোথায় গেলে?'

দিল্লী শহরে খুঁজতে বাকী রাখেননি কোথাও। তারপর চলে গেলেন কলকাতা। কলকাতাতেও ছিলো না অঞ্জলি। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে সবাই বলেছিলো, 'ব্যাপার কী?'

ব্যাপার যে কী, তাই বা তিনি এদের কেমন ক'রে বোঝাবেন? পাগলের মতো আবার ফিরে গিয়েছিলেন দিল্লী। বম্বেতেও চলে এসেছিলেন। ওর মামা মামী ছিলেন,
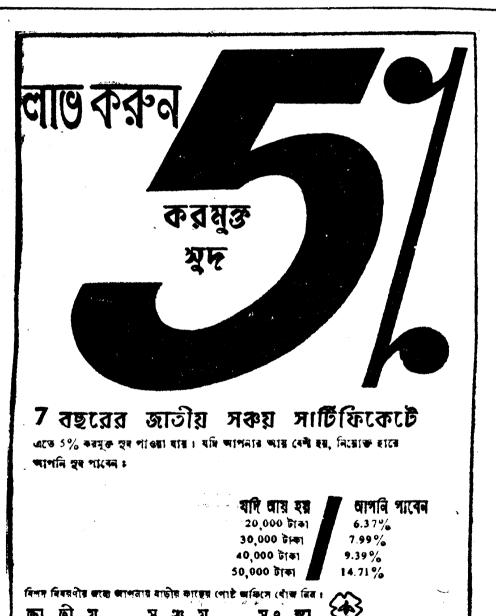
মনে হ'য়েছিলো সেখানেও পাওয়া যেতে পারে।

মামা মামী অনেক কথা বললেন, তার মধ্যে প্রধান তাঁদের ভাবী পুত্রবধূর কথা, বিলেত যাবার আগে যে সে দু'সপ্তাহ থেকে গেছে তাঁদের সঙ্গে, সে যে কতো ভালো, কতো মিষ্টি সে সব শুনতে শুনতে ঝিম ধরে গেল তাঁর। এবং সেখানেই প্রথম শুনলেন, সতীশ খুব ভালো একটা চাকরি পেয়েছে লণ্ডনে, চার বছরের চুক্তিতে, আর সেজন্যই সে তার ভাবী বধূকে নিয়ে যাচ্ছে, অথবা এঁরাই গরজ ক'রে পাঠাচ্ছিলেন।

বললেন, 'তিন বছর তো সোজা সময় নয়, একা একা থাকবে কী ক'রে?'

তিনি বলেছিলেন, 'আপনাদেরও কষ্ট হবে খুব।'

ও'রা বললেন, 'জীবন তো এখন ওদেরই, ভবিষ্যতের লম্বা রাস্তা এখন ওদেরই সামনে। যা ওদের ভালো, আমাদেরও তাই ভালো।'

তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'তা তো বটেই, আর চার বছর সময় এমনিই বা কী?'

সতীশের বাবা বললেন, 'মাইনে খুবই বেশী, খুবই ভালো কাজ, চার বছরে সমস্ত অভাব অনটনের আসান করে ফিরতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা তো খুব বৃদ্ধ নই, নিশ্চয়ই চার বছর টি'কে থাকতে পারবো।'

তিনি বলেছিলেন 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

সতীশের মা যত্ন ক'রে আদর ক'রে খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, 'আমি জানি, তোমার চেয়ে বড়ো বন্ধু কেউ নেই সতীশের, আর এখন তো আমাদের জামাই, আমাদের পরম স্নেহের ধন। কতো যে ভালো লাগছে তোমাকে দেখে। কেবলি মনে হচ্ছে, যদি অঞ্জলিকে নিয়ে আসতে, এই আনন্দ আজ সম্পূর্ণ হ'তে পারতো।'

অঞ্জলিকে যে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেকথা কেমন করে বলবেন? মাথা নিচু ক'রে জবাব দিয়েছিলেন 'আবার আসবো একসঙ্গে।'

জানতেন আর তা কখনোই সম্ভব হবেনা, তবু বলেছিলেন। কিছু বলতে হবে ব'লেই শুধু নয়, বলতে তাঁর ভালো লেগেছিলো। দোষ-গুণে ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ সবকিছুর বিনিময়েই তখন তাঁর মন অঞ্জলিকে ফিরে পাওয়ার জন্য শিশুর মতো কাঁদছিলো।

যুগপৎ সেই হাহাকারের বেদনা এবং লজ্জা শেষে তাঁকে একদিন দেশান্তরী করলো। তাঁর মনে হ'লো এখান থেকে, এই পরিচিত দেশ পরিবেশ থেকে পালাতে পারলে তিনি বাঁচেন।

বয়স্ক নির্বান্ধব ভাবার জন্য কষ্ট হচ্ছিলো তাঁর। বিদেশে যাবার সময় দেখা ক'রে যাননি, অঞ্জলির চলে যাবার ব্যাপারটা তখনো কিছু জানতেন না এবং পাছে জেনে ফেলেন সেই ভয়েই লুকিয়ে পালিয়ে বিদায় না নিয়ে চ'লে গেলেন।

গিয়ে অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে কাছে নিয়ে যেতে, তিনি যাননি। এই ছেলেটির মতো তিনিও লোক পরম্পরায় শুনেছিলেন, 'পত্নীকে' ত্যাগ ক'রে তিনি 'বিদেশী পেত্নীর' কণ্ঠ লগ্ন হ'য়েছেন। যাবা এই ভাষাতেই চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে। আর তার অনতিকাল পরেই খবর পেয়েছিলো 'হার্ট অ্যাটাকে' তাঁর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছে।

'জন্মেছিলাম দার্জিলিং শহরের এক নেপালি বস্তিতে।'

পুরন্দরের গাঢ় গলা আবার আঘাত করলো তাঁর স্নায়ুকে, সেই বস্তিবাসীরাই ছিলো আমাদের স্বজন, দশ বছর বয়সে আমাকে উচ্চশিক্ষা দিতে কলকাতা নিয়ে এলেন মা। নিয়ে এলেন না ব'লে অকূলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন বলাই উচিত। কিন্তু তিনি জানতেন না হাওড়ার বস্তি আর কাঞ্চনজঙ্ঘার নেপালি বস্তির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। সস্তা ভাড়ার জন্যে সেখানেই একটি ঘর নিয়ে একটি রাতও তিনি দুই চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। আমার মায়ের তখন কতো বয়স বলুন? আশে পাশে হাঙর কুমীরে থিক থিক করতো রাত হ'লে। দশ বছরের বালক আমি, আমিও ভয়ে কাঁপতাম, আমিও বুঝতে পারতাম এমন একটা কিছু হ'তে যাচ্ছে যার মতো ভয়ঙ্কর আর কিছুই ঘটতে পারেনা একজন মেয়ের জীবনে। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে সেখানে এলাম, সেই ভদ্রপাড়ায় একখানা ভদ্রকমের ঘরে থাকার জন্য মা'কে যে অন্তহীন কাজের চাকায় ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে যেতে হ'য়েছে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'পুরন্দর', অস্থির ভাবে উঠে রেলিংয়ের ধারে গিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন ডক্টর রায়, ভেজা ভেজা গলায় বললেন, 'আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, এখন তিনি কোথায়?'

'আমাকে জাহাজে তুলে দিয়ে যেতে আমার সঙ্গে এসেছেন।'

'শান্তিনিবাসেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি জানেন, তুমি এখানে এসেছ?'

'না, তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না আমি কোথায়, এসে কার সঙ্গে মুখোমুখি বসে আছি।'

'কী বলেছ তাঁকে?'

'বলেছি বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।'

'ভালোই বলেছ, এখন তো আমরা বন্ধুই, কী বলো?'

একটু হাসলো পুরন্দর, 'কল্পনায় কিন্তু আমার বাবা এরকমই বন্ধু ছিলো আমার।'

ডক্টর রায় হাসলেন, 'আমার কল্পনায়ও এরকম ছেলেই আমার আকাঙ্ক্ষিত ছিলো। তোমাকে দেখে আমার নিজের এই বয়েসটা মনে পড়ে যাচ্ছে। তোমার একজন মামার সঙ্গে তখন আমি একাত্ম ছিলাম।'

'আমার মামা?'

'তোমার মারও সে একমাত্র বন্ধু ছিলো।'

'কী নাম?'

'সতীশ, সতীশ মজুমদার। ইশ! কীভাবে মারা গেল!'

'সতীশ! হ্যাঁ আমি শুনেছি তাঁর কথা। তিনিও তো ইংল্যাণ্ডে ছিলেন।'

'পাঁচ বছর বাদে ফিরে এসে, নিজের মা বাবার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সে যথার্থই সুখী হয়েছিলো। আমি সেই সময়ে বিদেশে। তোমার মাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসতো। আমাদের এই বিচ্ছেদে সে অত্যন্ত মর্মাহত হ'য়েছিলো এবং একমাত্র তার কাছেই আমি আমাকে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করতে পেরেছিলাম। বম্বে থেকে স্ত্রীকে নিয়ে সে কলকাতা যাচ্ছিলো প্রধান উদ্দেশ্য, তার বোনকে খুঁজে বার করা, অবশ্য চাকরির ব্যাপারও ছিলো। কিন্তু গিয়ে আর পৌঁছতে পারেনি।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, 'আর সেই খবর শুনে বম্বেতে তার মা শোক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলেন। নিঃসঙ্গ বুড়ো পঙ্গু বাবা শেষে মারা গেলেন হাসপাতালে।' আমি ফিরে এসে ওদের বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলুম, শুনলুম সেই বাড়িটা দিদি দান ক'রে দিয়েছেন অনাথ শিশুদের জন্য।

'ও'র দিদি ছিলেন একজন?'

'এখনও আছেন, নিশ্চয়ই, ঠিক কোথায় আমি জানি না। আচ্ছা, তুমি একটু বসবে? আমি আসছি।'

ডক্টর রায় পর্দা সরিয়ে শোবার ঘরে এলেন। বিছানার পাশে টেলিফোনটার দিকে তাকালেন। তারপর গাইডটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টোতে লাগলেন। নিচু হয়ে রিসিভারটা কানে তুললেন, কিন্তু একটা জায়গায় এসে তাঁর পাতা উল্টোনো বন্ধ হ'লো, নির্দিষ্ট নম্বরটা বোধহয় পেলেন তিনি। ডায়েল করতে তাঁর আঙুল কাঁপছিল, ছাপ্পান্ন বছরের শান্ত হয়ে আসা নিস্তেজ হৃৎপিণ্ডটা, এতো জোরে লাফাচ্ছিলো যে, মনে হ'লো ফেটে যাবে। (ক্রমশ)

॥ ১০ ॥

চিঠি দুখানি পাশাপাশি পড়লে মনে হয় যেন দুই ওস্তাদের তুজা শুনেছি। স্টার্জ মূর খুবই ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ কিন্তু য়েট্সের চিঠি পড়ে যে তাঁর ধৈর্য-চ্যুতি হয়েছিল এবং চিঠিতে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর যে অতিমাত্রায় রূক্ষ এবং রুষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটাও খুবই সহজবোধ্য। সংক্ষেপে তিনি য়েট্সকে তাঁর Compliment ফিরিয়ে দিয়েছেন :

'it is too late to convert your blindness' সেই সঙ্গে 'the version you call "yours"' এই কথাকটির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আভাস আছে সেটাও ভেবে দেখার মতো। কিন্তু 'flits' কথাটির সম্বন্ধে তাঁর আপত্তির প্রসঙ্গে তিনি যে রবীন্দ্রনাথকে দলে টানছেন ('what Tagore and I so object to . . . . is the use of "flits"') সেটা বিস্ময়কর এবং বিভ্রান্তিকর। কারণ কথাটি য়েট্সের নয়, রবীন্দ্রনাথেরই এবং এটি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি থেকেই অপরিবর্তিত আকারে চলে আসছে। ইংরেজি ভাষার চর্চা যাঁরা করেছেন তাঁরাই বুঝবেন, ইংরেজি গীতাঞ্জলির ৬১নং কবিতায় ব্যবহৃত এই 'flits' কথাটি যে শুধু নির্ভুল তা ই নয়, কথাটির একটি নিপুণ ব্যবহারেরও দৃষ্টান্ত এটি এবং স্টার্জ মূরের আপত্তি সত্ত্বেও দেখা যায় কথাটি 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর অন্তর্গত 'The Source' নামক কবিতায় তার স্বস্থানে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। শব্দটি সম্বন্ধে স্টার্জ মূরের আপত্তিকে বাতিক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না (শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে এই রকম বিশেষ বাতিক অনেক কবির মধ্যেই দেখা যায়) এবং তিনি যে dislocated sentence'-এর কথা বলছেন (উক্ত কবিতাটিরই প্রথম বাক্যটির কথাই বলছেন মনে হয়) তার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলতে হয়। দুই কবির মধ্যে এই যে মত-বিরোধ, এটার অনেকটাই হল এক বাতিকের সঙ্গে আর এক বাতিকের দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে যে উষ্মার সঞ্চার হয়েছিল চিঠিতে তার প্রকাশটা উপভোগ্যই বলতে হবে। কিন্তু 'flits' কথাটি সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল এটা স্টার্জ মূর কিসের থেকে ধরে নিলেন? নাকি এটাও তাঁর সেই স্বঘোষিত "general thoughtlessness and dreamyness (sic)" এরই আর একটি নিদর্শন? য়েট্সের একটি স্বীকারোক্তি আরো চমৎকার। লেডী গ্রেগরীর নিকট তুড়া খেয়ে তিনি বলছেন :
'I do not want to alter anything now when I have forgotten the reasons I had when working over these poems' য়েট্স চিঠিতেই কবিতা দুটি সম্বন্ধে বলেছেন, 'I took a great deal of trouble with these poems' কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় তার প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে যখন লেডী গ্রেগরী তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি এবং সেই জন্যেই কারণগুলি ভুলে গেছেন বলে এই strategic retreat। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংস্কার-প্রস্তাব নিয়ে দুই কবির মধ্যে এই যে মতবিরোধ এবং কথা কাটাকাটি যা কিনা প্রায় সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছিল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তা সমস্তই যাকে বলে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া! আমেরিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরলে দুই কবি তাঁদের প্রস্তাবগুলি তাঁর নিকট পেশ করলেন এবং স্পষ্টই দেখা যায় তিনি সবগুলিই বাতিল করে দিলেন। 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় য়েট্সের সেই 'poppy buds' অথবা 'poppy', স্টার্জ-মূরের সেই 'Coyly Open'—এগুলির একটিও গৃহীত হয়নি। স্টার্জ মূর 'flits' কথাটিকে ভুল এবং নিরর্থক বলেছিলেন অথচ কথাটি সসম্মানে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত এবং যে বাক্যটিকে তিনি dislocated এবং un.English বলেছিলেন, সেটিও অবিকৃত অবস্থায় ক্রেসেণ্ট মুন-এ বর্তমান। এর থেকেই একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, যে কেউ যে কোনো পরিবর্তনের প্রস্তাব করলেই যে রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করেছেন তা নয়। এইখানে ১৯১৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল রোটেনস্টাইনকে লিখিত কবির যে চিঠিখানি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি তারই একটি উক্তির প্রতি পুনর্বার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কবি লিখেছিলেন :

'I have unfortunately allowed the revised typed pages to get lost to which Yeats pencilled his corrections'. য়েট্স খুব অল্পসংখ্যক প্রস্তাবই সেই টাইপকপির মার্জিনে পেনসিলে লিখেছিলেন (*'I think Yeats was sparing in his suggestions'*). কিন্তু তার মধ্যেও অনেকগুলি যে কবি গ্রহণ করেন নি, এবং সেই কথাটাই যে ইঙ্গিতে তিনি বলতে চেয়েছেন, এখানে তারই পরোক্ষ প্রমাণ আমরা দেখছি। 'On the Seashore' সংক্রান্ত কারো কোনো প্রস্তাবই তিনি নেন নি, গীতাঞ্জলির পাঠটিই সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এ স্থান পেয়েছে। গীতাঞ্জলির পাঠের সঙ্গে 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর অন্তর্ভুক্ত 'The Source' নামক কবিতার একটিমাত্র প্রভেদ দেখা যায় : 'timid buds of enchantment'-এর স্থলে 'shy buds of enchantment.'। এই পরিবর্তনটি কার প্রস্তাব মতো করা হয়েছে বলা কঠিন। কবির নিজেরও হতে পারে, আবার য়েট্সের চিঠিতে কপির ১৯ পৃষ্ঠায় যে অনির্দিষ্ট একটি পরিবর্তনের অস্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেটাও হতে পারে। কিন্তু যাঁরই হোক, এটি একটা improvement এমন দাবি হাস্যকর। গীতাঞ্জলির যে দ্বিতীয় কবিতাটি (৬২নং) When and Why' এই শিরোনামে 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার মূল পাঠের সঙ্গে মেলালে দেখা যায় শেষ স্তবকটিতে মাত্র দুটি সামান্য পরিবর্তন হয়েছে : গীতাঞ্জলির 'I surely understand what the pleasure is that streams ইত্যাদি এবং 'what delight that is which the summer breeze brings ইত্যাদি', 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এ পাঠান্তরিত হল যথাক্রমে 'I surely understand what pleasure streams' এবং 'what delight the summer breeze brings'

এই পরিবর্তনের ফলে অর্থের সামান্য এবং সূক্ষ্ম প্রভেদ ঘটেছে বলা যায় কিন্তু সেটা কি improvement? তেমনি 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর 'The Last Bargain' নামক শেষ কবিতাটির

সঙ্গে সেমুর-ফাইলের অন্তর্গত আদি পাঠের তুলনা করলে দেখা যায় 'come and buy me' স্থলে 'come and hire me' বসানো হয়েছে। 'কে নিবি গো কিনে আমায়', এই মূল কবিতাটির অন্তর্নিহিত যে রূপকটি আছে তার প্রসঙ্গে 'buy' এবং 'hire' সমার্থক। কাজেই, পরিবর্তনটিকে কোনো-ভাবেই অপরিহার্য বলা চলে না। শেষ লাইনটিতেও যে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায় তাকেও কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য বলা যায় না। যেমন: 'That day my burden was hightened and the bargain was made in a child's play' -এর স্থলে From thence forward that bargain struck in child's play made me a free man'. অতএব timid-এর জায়গায় 'shy', 'buy'-এর জায়গায় 'hire'—এই জাতীয় সামান্য কিছু পরিবর্তনে স্টার্জ মূরের হাত ছিল সেটা ধরে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু এই রকম পরিবর্তন 'ক্রেসেণ্ট মুন'-ছাড়াও 'চিত্রা' (ইংরেজি) 'ফ্রুট-গ্যাদারিং' প্রভৃতি বইতেও যে আছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই পরিবর্তনের মূল্যটা কী সেটাই বিবেচ্য। এ-বিষয়ে রোটেনস্টাইন নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথকে ১৯১৪ সালের ২০শে মার্চ তারিখের এক পত্রে :

'I went carefully through Chitra and the children poems and felt more and more how much better your own version is than after its amendment by Sturge Moore. Here and there (as when he alters tank into pond) he fails to understand your own images. I don't think you need have any doubt as to your own power of saying what you mean in your own way in the case of the songs' 'tank into pond'—এই হ'ল রোটেনস্টাইনের মতে স্টার্জ মূরে-প্রবর্তিত সংস্কারের যথার্থ বর্ণনা এবং মূল্যায়ন। কিন্তু মনে রাখতে হবে স্টার্জ মূরে স্বয়ং এর চেয়ে বেশী কিছু কোনো সময়েই দাবী করেন নি। তাছাড়া পূর্বেই বলেছি, যে কোনো সংস্কার-প্রস্তাবেরই গ্রহণ-বর্জন শেষ পর্যন্ত কবির নিজের একক বিচারের উপরই নির্ভর করেছে। বিশেষ করে 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর বেলাতেও যে তাই ঘটেছিল চিঠিপত্রে তার নজির আছে। ১৯১৩ সালের ১৭ই আগস্ট কবি রোটেনস্টাইনকে লিখছেন :

"The difference is very great for me . . . . between the time when I was translating my "children" series of poems one by one and reading them to you and the time when I am getting the ms. ready for publication. Now it is a mere business and it tires me. This cold-blooded literary craftsmanship, this weighing of words and expressions is utterly tiresome'.

লক্ষ করতে হবে যে এই 'weighing of words and expresions' এর ব্যাপারে কোনো সহযোগীর উল্লেখ নেই। আরো একটি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় রোটেনস্টাইনকে লিখিত চিঠিটির চার দিন পরে স্টার্জ মূরেকেই লিখিত একটি পত্রে : 'The ms. of childen's poems that Macmillans sent to you can be of no use now as the revised copies have already been sent to the press'.

স্টার্জ মূরের নিকট যে কপিটি ছিল এবং যেটার উপর তিনি তাঁর কারিকুরি করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়, কবি বলছেন সেটার আর প্রয়োজন নেই। কবি তাঁকে 'খবর' দিচ্ছেন যে পাণ্ডুলিপিটি ইতিমধ্যে সংশোধিত হয়ে প্রেসে চলে গিয়েছে। এর তাৎপর্যটা খুবই স্পষ্ট।

(ক্রমশ)

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্রজমণ্ডলের সঙ্গীতধারা

কৃষ্ণলীলার স্মৃতিবিজড়িত ব্রজধাম। এই পথে কৃষ্ণ নিকুঞ্জবিহারী, বংশীধারী। তাঁর বংশীধ্বনিতে পরিপূরিত হয়েছে ব্রজমণ্ডলের আকাশ বাতাস। সেই সুরধারায় ব্রজনারীর নিত্য অবগাহন।

দ্বাপরের কৃষ্ণের বাঁশী। ব্রজলোকে সংগীতের প্রতীক যেন তাঁর বাঁশী। স্মরণাতীত পৌরাণিক যুগ ব্রজমণ্ডলে সংগীতের ঐতিহ্য।

কালচক্রে দ্বাপরের শেষে কলিযুগ এসেছে। [illegible] সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে সে মথুরাপুরী! কোথায় সে বৃন্দাবন! কিন্তু স্মৃতির সৌরভে আকুল হয়ে আছে পুণ্য ব্রজভূমি। কৃষ্ণ-বিষ্ণু ভক্তের পরম তীর্থ। ভূলোকে গোলোক। কালের করাল গ্রাস কিংবা বিধর্মীর কুঠারাঘাত কিছুই তার অন্তর্লীন রূপটিকে আমূল ছিন্ন করতে পারেনি। বৈষ্ণবীয় মনোলোকে অক্ষয় অম্লান হয়ে আছে ব্রজমাধুরী।......

ভারতীয় সংগীতের এক বরণীয় পীঠস্থান ব্রজমণ্ডল। ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির অঙ্গরূপে যে সংগীতের সাধনা যুগ যুগান্ত ধরে প্রবহমান রয়েছে, কৃষ্ণ-কিশোরের এই লীলাঞ্চলও তার এক মহান দৃষ্টান্ত। পরম্পরাগত সেই সংগীতধারার বিবরণ অবশ্য আনুপূর্বিক উদ্ধার পায়নি। কোন্ কালে বৃন্দাবনের হোলি উৎসব থেকে এক অভিনব প্রবন্ধ সংগীত হোরি ধামারের উৎপত্তি, কোন পর্বে প্রথম রূপায়িত হয় বৃন্দাবনী সারঙ্গের মধুর রাগরীতি সেসব সমাচারও এ যাবৎ অপ্রকাশিত। কিন্তু মধ্য যুগের যে পর্যায় থেকে স্থানীয় সংগীতের ক্রমিক পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে ধর্মসাধন ও সংগীত সেবা অঙ্গাঙ্গীরূপে প্রকটিত। ভজন ও পূজন একাত্ম এই ব্রজধামে। এখানে সে যুগের সব নেতৃস্থানীয় কলাবন্তই সাধু সন্ত!...

ব্রজমণ্ডলের পরিধি নির্ধারণ পুরাকালে [illegible]

২০ যোজন। বায়ু : ৪০ যোজন। [illegible] : ১২ যোজন। পশ্চ : [illegible] থেকে শোকরী বটেশ্বর পর্যন্ত ২০ যোজন। সাধারণ ব্রজবাসীর মতে, ৮৪ ক্রোশ।

চারটি সংগীতকেন্দ্র এই মণ্ডলের মধ্যে নির্দিষ্ট করা যায় : বৃন্দাবন, মথুরা ও গোকুল। চারটি [illegible] বৈষ্ণবতীর্থই একাধারে কৃষ্ণ আরাধনা ও সংগীতসাধনার বেদীতল। সংগীতের চর্চা [illegible] এক সাধকের পূজা উদ্বোধিত, নিবেদিত হয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণ-উপাসনা ও বিগ্রহ সেবার পাশাপাশি সংগীতচর্চার ধারা। সেই মন্দিরের আশ্রয়ে ও প্রেরণায় [illegible] সংগীত সম্পদ প্রবর্তিত, বর্ধিত। বৃন্দাবন, যতিপুরা, মথুরা ও গোকুলের [illegible] গায়ককুল ভজনমন্দিরেই তাঁদের সংগীতেরও সাধন করেছেন।

গোকুলে বাল্যলীলা। যতিপুরায় নন্দলালের লীলা। বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস। মথুরায় অত্যাচারী শাসকের ধ্বংসকর্তা রাজা। এই ক্ষেত্রে [illegible] গোবর্ধন পর্বত, তারই অন্তর্গত যতিপুরা। এখানে কৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন ধারণ করেন। তাই অন্নকূট উৎসব, গোবর্ধন পূজা। সেই প্রাচীন অন্নকূট উৎসবের স্মৃতি বহন করে বর্তমান আনিওর গ্রাম। এখনো গোবর্ধন পূজোর সময় এখানে [illegible] হয়ে থাকে।

যমুনার পূর্বদিকে গোকুল। যতিপুরা পশ্চিমে; মথুরা থেকেও পশ্চিমে। গোকুল মথুরার দক্ষিণ পূর্বে, যমুনার অপর পারে। মথুরা থেকে মাত্র তিন ক্রোশ দূরত্ব গোকুলের। তেমনি মথুরা থেকে কিছু কম ১১ ক্রোশ পশ্চিমে যতিপুরা। বৃন্দাবন থেকে মথুরাও তিন ক্রোশ—মাঝে দুটি গ্রাম : অটলাগঞ্জ ও জয়সিংহপুরা। বৃন্দাবনের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর তিন দিকেই যমুনার ধারা।

এত সান্নিধ্য হলেও ব্রজমণ্ডলের চারটি ধামের [illegible] সংগীতক্ষেত্র [illegible]

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের দুই শ্রেষ্ঠ তীর্থ—যতিপুরা ও মথুরা। এই সম্প্রদায়ে গোকুলের স্থান তার পরে। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় অর্থাৎ বাংলার বৈষ্ণবদের প্রাধান্য।

সংগীত চর্চার পীঠস্থানরূপে চারটির মধ্যে প্রথমে বৃন্দাবন ও যতিপুরা। মথুরা পরে সংগীতে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। বৈষ্ণব সাধক বল্লভাচার্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের কল্যাণে সংগীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধি হয় যতিপুরায়। সংগীত জগতে বিখ্যাত অষ্টছাপ বল্লভ সম্প্রদায়ের দান এবং যতিপুরা তার প্রধান কেন্দ্র। বৃন্দাবনের সংগীতচর্চা তারও পূর্ববর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বৃন্দাবন ও যতিপুরার দুই ধারাই জয়দেবের গীতগোবিন্দকে আদি প্রেরণার উৎসরূপে স্বীকার করে।

বৃন্দাবন ও যতিপুরা দুটি স্থানই ধ্রুপদ ও ধামার গানের কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। তবে বৃন্দাবনে ধামারের তুলনায় ধ্রুপদ চর্চা সমধিক। যতিপুরা ধ্রুপদ ও ধামারের চর্চায় ধামারে বিশেষভাবে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। সেখানে বল্লভ সম্প্রদায়ের অষ্ট শিষ্য প্রত্যেকেই ধ্রুপদের সঙ্গে গাইতেন স্বরচিত ধামার গান। বৃন্দাবনের সংগীতাচার্যদের সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। বৃন্দাবনের সংগীত অনুষ্ঠানে বিশেষ করে হোলির সময় ৫।৭ দিন ধামার। অন্য সময়ে অনুষ্ঠিত হয় ধ্রুপদ। কিন্তু যতিপুরায় (ও গোকুলে) ৪০ দিনব্যাপী বসন্তকালীন উৎসবে শুধুই ধামার গান পরিবেশিত হয়ে থাকে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গের আগে বৃন্দাবনের কথা। রাধার সখী বৃন্দা এই বনে তপস্যা করেন বলে বৃন্দাবন নাম। তা ছাড়া, রাধারও এক নাম বৃন্দা। তাই বৃন্দার বন বা বৃন্দাবন। রাধা বা সখী ভাব বৃন্দাবনে প্রধান। (কৃষ্ণের রাজধানী মথুরায় সখ্য-ভাবের প্রাধান্য।)

তবে সে বৃন্দাবন বহুকাল আগেই লুপ্ত-কীর্তি হয়ে যায়। [illegible] পর তাকে নতুন করে ভারতবাসীর তীর্থরূপে পরিচিত করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ।

কৃষ্ণপ্রেমে [illegible] চৈতন্যদেব। কৃষ্ণলীলাধন্য ব্রজভূমির আকর্ষণে তিনি এখানে তীর্থে এসেছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমে যেমন যাত্রা করেছিলেন 'জগন্নাথস্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে' মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করে, তেমনি আকুলতা নিয়ে তিনি উপনীত হন শ্রীবৃন্দাবনে। তেমনি একান্ত আবেগে তিনি এখানে কৃষ্ণলীলার স্থানগুলি সন্ধান করেছিলেন। কোথায় [illegible] তমালতল, নীল যমুনার [illegible]

সে ১৫১৬ খৃঃ কথা। কিন্তু তখন কোন প্রাচীন মন্দির, দেবস্থান, বিগ্রহ, কৃষ্ণসেবা প্রচার কিছুই দেখতে পাননি। ঐতিহ্যমণ্ডিত সব চিহ্নই ধ্বংস হয়ে যায় যুগ যুগ ব্যাপী বর্বর বিধর্মীর আক্রমণে ও কালের প্রকোপে। পরে তাই রূপ গোস্বামী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী!'

চৈতন্যদেবের আদেশে তাঁর শিষ্যরা বৃন্দাবনের তীর্থস্থানগুলি উদ্ধারে ও কৃষ্ণসেবা প্রচারে ব্রতী হন। প্রথমে লোকনাথ ও পরে রূপ, সনাতন প্রমুখ গোস্বামীরা বৃন্দাবনবাসী হয়ে অনুসন্ধান করেন কৃষ্ণলীলার সব ক্ষেত্র। ভাগবত, আদি বরাহ, স্কন্দ ও পদ্মপুরাণ, মথুরা মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে তাঁরা প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে বৃন্দাবনে দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও কৃষ্ণ উপাসনা প্রচারেও শ্রীচৈতন্যের প্রধান ছয় শিষ্য বা ষড় গোস্বামীর দান সর্বাধিক। দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে তখন বাবরের সংঘর্ষ বেঁধেছে। উত্তর ভারতে লুণ্ঠন, আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডে পাঠান মোগলের সেই তাণ্ডব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে বৃন্দাবনাদি লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধারে হিন্দুরা কিছু সুবিধা পেয়ে যান। সেই ৮৪ ক্রোশ বিস্তীর্ণ ব্রজমণ্ডলে তখন ছিল মাত্র ১২টি দেব বিগ্রহ। বৃন্দাবনে একটিও না। শুধু ক'টি ধ্বংসস্তূপ, টিলা ও ঘাটের নাম মাত্র অবশিষ্ট ছিল। চৈতন্য-শিষ্যদের পুনরুদ্ধার কার্যের ফলে ক্রমে তীর্থযাত্রীদের আধিক্য দেখা যায় কৃষ্ণসেবা ও তীর্থ মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উদযোগেই মথুরা অপেক্ষা বৃন্দাবনে দেবমন্দির বেশি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পরে রূপ গোস্বামীর প্রভাবে রাজা মানসিংহ স্থাপিত গোবিন্দজীর মন্দির এ বিষয়ে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

শ্রীচৈতন্যের শিষ্যবৃন্দ ছাড়া যাঁরা বৃন্দাবনে দেবমূর্তি স্থাপন ও গ্রন্থ প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন—বল্লভাচার্য, তাঁর পুত্রদ্বয় বিঠ্ঠলনাথ ও গোপীনাথ, হিত হরিবংশ, স্বামী হরিদাস, হরিদাস ব্যাসজী, সুরদাস মদনমোহন প্রভৃতি।

বৃন্দাবন তীর্থের পুনরুদ্ধারে শুধু নয়, সেখানকার সঙ্গীত চর্চার সঙ্গেও বাংলার সংযোগ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। ভারতীয় প্রবন্ধ সঙ্গীতের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র তৎকালীন বৃন্দাবন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৃন্দাবন বাস উপলক্ষে সঙ্গীত চর্চাও কেউ কেউ করেন ধর্ম জীবনের অঙ্গস্বরূপ। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মাধ্যমে সেই ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা বাংলা দেশেও আসে। কখনো তা নব রূপ ধারণ করে বাংলায়। যথা—রাজশাহী অঞ্চলের নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩৪—১৬১৫) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় বৃন্দাবনবাসী হন ও লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে দীক্ষিত সন্ন্যাসী হন। বৃন্দাবনে নিবাসী হয়ে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত চর্চাও বিশেষভাবে করেন বিদগ্ধ সঙ্গীতগুরুর শিক্ষাধীনে। নরোত্তমই পরে সেই পদ্ধতিগত সঙ্গীতের ভিত্তিতে বাংলার পদাবলী কীর্তন গানের প্রবর্তন করেন। ১৫৮২ খৃঃ রাজশাহীর খেতুরিতে সেই বিখ্যাত বৈষ্ণব মহোৎসবে তিনি প্রথম অনুষ্ঠান করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শে লীলাকীর্তন। ক্রম নির্দিষ্ট রাগালাপ ও গৌরচন্দ্রিকা সমন্বিত সেই পদাবলী সংকীর্তন রীতি পরে গড়েরহাটি বা গরাণহাটি কীর্তন নামে সুপরিচিত হয়। তারই আদর্শে বাংলায় প্রবর্তিত হয় কীর্তন সঙ্গীতের দূরপ্রসারী। ধারা। সুতরাং বাংলা দেশের এই বিপুল প্রবাহ সঙ্গীতের উৎসমূলে অছে বৃন্দাবন থেকে লব্ধ সঙ্গীতের ঐতিহ্য।......

চৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগেই বৃন্দাবনের সঙ্গীতাচার্যরূপে স্বামী হরিদাসকে পাওয়া যায়। সন্ত সঙ্গীতজ্ঞ হরিদাসের গুরু ছিলেন আশু ধীর। নিধুবনে তাঁদের উভয়েরই সমাধি। হরিদাস স্বামী সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি এই যে, গন্ধর্ব কৃষ্ণদত্ত নামক সন্ন্যাসীর নিকটে মান সরোবরে অবস্থানের সময় তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন।

হরিদাস নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। তাঁর পূজিত বাঁকেবিহারী বা কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণের মূর্তি বৃন্দাবনেই আছে। ২৫ বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে তিনি বাস করতেন মান সরোবরে, বৃন্দাবনের অপর পারে। সেখানে কুণ্ডের তীরে কুটির বেঁধে একাকী সাধন ভজনে মগ্ন থাকতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বৃন্দাবনে বাস করতে এলে তিনিও চলে আসেন এখানে। তারপর নিধুবনের বিশাখা কুণ্ড থেকে বাঁকে বিহারীর বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। যেমন সাধক রূপে, তেমনি গায়ক রূপেও তিনি যশস্বী হয়ে ওঠেন লোকমুখে। কৃষ্ণলীলার উদ্দেশেই নিবেদিত ছিল তাঁর সঙ্গীতাঞ্জলি।

হরিদাস স্বামী যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সাধক ছিলেন সে সম্পর্কে এত জীবন্ত শ্রুতিস্মৃতি বৃন্দাবনে আজো বর্তমান যে সেসব কদাপি নস্যাৎ করা যায় না। তানসেন তাঁর সঙ্গীত-শিষ্য যদি নাও হয়ে থাকেন, তবু তাঁর পুণ্য নাম স্বমহিমায় স্বাধিষ্ঠিত থাকবে সঙ্গীতক্ষেত্রে। স্বামী হরিদাস অধ্যাত্মমার্গের পথিক ছিলেন, তাঁর সঙ্গীত চর্চার কথা অলীক কিংবদন্তী মাত্র—ইত্যাকার যাঁদের 'গবেষণা', তাঁরা যেমন পল্লবগ্রাহী তেমনি ইতিহাসবোধ বর্জিত। মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয়দের সঙ্গীতসাধনা অধ্যাত্ম-জীবনের সঙ্গে কতখানি সম্পৃক্ত ছিল তা তাঁদের ধারণার অতীত। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই যে, সেকালের সঙ্গীতাচার্যদের ধারায় স্বামী হরিদাসও ছিলেন একাধারে গান রচয়িতা, গায়ক ও সুরকার। উত্তর ভারতে সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে তাঁর স্মৃতি অন্যতম সঙ্গীতাচার্যরূপেই আজো সসম্মানে রক্ষিত আছে। ভাদ্র মাসের রাধাষ্টমী তিথিতে তাঁর স্মরণে বার্ষিক মেলা বসে মৌনীদাস বৈষ্ণব স্থাপিত মন্দির চত্বরে। আশাবরী রাগে গঠিত স্বামী হরিদাসের একটি মনোরম পদ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল :

সোহেরি তেরে চার চান্দ চুরি করণ,
কণ্ঠশ্রী দুলরি তিলরি নাসা মুক্তা চরণ॥
তেসরি নয়নন ফবরয়ো কাজরা,
দেখত কানহ ভরণ॥
শ্রীহরিদাসকে স্বামী শ্যাম কুঞ্জবিহারী
রিঝ রিঝ পগ পরণ॥

হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত সম্পদ আংশিকভাবে রক্ষা পেয়েছে শিষ্য পরম্পরায়, যদিও ক্রমপর্যায়ে সকল সঙ্গীতসাধকের নাম পাওয়া যায় না। মথুরার অনেক সঙ্গীতজ্ঞও লাভ করেন বৃন্দাবনের সঙ্গীতধারা। বিভিন্ন সময়ে গোয়ালিয়র পর্যন্তও তার যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে অসামান্য কণ্ঠ সম্পদের অধিকারী ধ্রুপদী ছিলেন চন্দন চৌবে। তিনি মথুরার সন্তান এবং বল্লভ সম্প্রদায়ের শিষ্য হলেও হরিদাস স্বামীর সঙ্গীতধারার অনুবর্তী। গোয়ালিয়রের গুণী লক্ষ্মণদাস (তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণরাও-ও উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন) মথুরায় বাস কালে চন্দন চৌবেকে ধ্রুপদ শিক্ষা দেন, যা বৃন্দাবনী ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে যুগের সঙ্গীত সম্মেলন ও আসরে বিপুল সমাদর ছিল চন্দন চৌবের। কিন্তু তিনি মথুরায় যখনই অবস্থান করতেন, সন্ধ্যার পর শিবতালাওতে দেবতার উদ্দেশে উদাত্ত সুমিষ্ট কণ্ঠে সঙ্গীত নিবেদন করতেন। নিস্তব্ধ রাতের আকাশ বাতাস বহুদূর পর্যন্ত পূর্ণ করে রাখত তাঁর সুরলহরী। তাঁর সমসাময়িক বৃন্দাবননিবাসী সাধু গোয়ারিয়া বাবাও একজন গুণী গায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।...

বৃন্দাবন ও বল্লভপুরের মানসলোক ও উপাসনা বৈশিষ্ট্য দুই ধারার সঙ্গীতচর্চায় অনেকাংশে প্রতিফলিত। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা। পিয়া প্রীতম্ বিলাস, নিরন্তর মিলন। কিন্তু বল্লভপুরায় নন্দলালের লীলা। বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তক বল্লভাচার্যের এখানে অবস্থান ও শিষ্যগঠনের ফলে বল্লভপুরার তীর্থমাহাত্ম্য নতুন করে স্থাপিত ও প্রচারিত হয়। সেই একই সূত্রে এই পর্বের বল্লভপুরার সঙ্গীতচর্চারও পত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে যে ধারা অষ্টছাপ নামে সুপরিচিত, তা সম্পূর্ণই বল্লভ সম্প্রদায়ের দান এবং তার প্রধান কেন্দ্র হল বল্লভপুরা। বল্লভাচার্যের চার শিষ্য ও তাঁর পুত্র বিঠ্ঠলনাথের চার

শিষ্য এই সম্প্রদায়ে অষ্ট প্রধানরূপে গুরুদেব পর্যায়ই মান্য। সেই প্রধান আট শিষ্য বা অষ্ট সখার হিন্দী কাব্যসাহিত্যেও বিশেষ সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট আছে। তাঁদের রচিত সংগীতাবলীই অষ্ট ছাপ নামে সংগীতজগতে সুপরিচিত এবং হিন্দী কাব্যসাহিত্যে সমাদৃত। তাঁরা যেমন ধর্মসাধক ছিলেন, তেমনি উচ্চশ্রেণীর সংগীতজ্ঞ, গায়ক ও রচয়িতাও। সংগীতজ্ঞরূপে তাঁরা সেকালের ধারানুযায়ী একাধারে সুরকার, গায়ক ও গান রচনাকার। অষ্ট শিষ্যের রচিত সংগীত-সম্পদ সম্মিলিতভাবে অষ্ট ছাপ নামে প্রচলিত হয়ে যায়। তার উৎসস্থান যতিপুরায় ধর্মসাধনার সঙ্গে একাত্মরূপে গড়ে উঠেছে অষ্ট ছাপ সংগীতের ধারা। কারণ, বল্লভ-সম্প্রদায় একান্তভাবে সংগীতনির্ভর। সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে মন্দিরে ভক্তিনিষ্ঠ সংগীতের অনুষ্ঠান। পূজিত বিগ্রহের সামনে প্রতিদিন প্রভাত থেকে রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত নিয়মিত সংগীতের অঞ্জলি নিবেদন করা হয়। মৃদঙ্গ, তম্বুরা, ঝাঁঝ প্রভৃতি যন্ত্র-সহযোগে রীতিমত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সংগীত। হোলি উৎসব সংগীতের মহোৎসবের রূপ গ্রহণ করে।...

১৪৭৮ খৃঃ মধ্যপ্রদেশের চম্পারণে বল্লভাচার্যের জন্ম। বারাণসীতে তাঁর প্রথম জীবন ও শিক্ষালাভ ঘটে। তারপর তিনি আরও কিছুকাল শিক্ষা পান প্রয়াগের গঙ্গাপারে আড়েল নামক স্থানে। ধর্মের প্রেরণায় তিনি ভারতের যাবৎ আশ্রমের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। ব্রজমণ্ডলে গোবর্ধন পর্বতের যতিপুরায় শ্রীনাথ (শ্রীকৃষ্ণ) বিগ্রহ প্রকট হওয়ায় তিনি অবস্থিত হন এখানে। তাঁকে কেন্দ্র করে শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হয়। যতিপুরায় তিনি প্রবর্তন করেন একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, যা পরে বিপুল প্রসারলাভ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভারত-বর্ষে। তিনি ও তাঁর পুত্র সন্ন্যাস না নিয়েও সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও নেতারূপে কীর্তিত হন।

কুম্ভনদাস, কৃষ্ণদাস, সুরদাস ও পরমানন্দ হলেন বল্লভাচার্যের স্মরণীয় চার শিষ্য। তাঁরা প্রত্যেকে গায়ক, রচনাকার, সুরকার এবং ধর্মসাধক। গুরুর নির্দেশে যতিপুরায় তাঁরা বাস করায় ফলে তীর্থস্থানটি সংগীত-কেন্দ্ররূপেও খ্যাতি লাভ করে। বল্লভ-শিষ্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং সংগীতজ্ঞরূপে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কুম্ভনদাস। গোবর্ধনের নিকটস্থ যমুনাবত গ্রামে তাঁর জন্ম ও প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। বল্লভাচার্যের শিষ্য হবার পর যতিপুরায় বাস ও দৈনন্দিন সংগীতানুষ্ঠান আরম্ভ করেন গুরুর আদেশে। রীতিমত শিক্ষালাভ করে তিনি ধ্রুপদ-ধামারের কৃতী গায়ক হয়েছিলেন, যদিও তাঁর সংগীতগুরুর নাম জানা যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে, বল্লভাচার্য সংগীতজ্ঞ ছিলেন না, তবে সংগীতের মরমী ও পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন ঐকান্তিকভাবে। এই পর্ব থেকে যতিপুরার সংগীতধারার আদি আচার্যরূপে কুম্ভনদাসের নামই গণনীয়। মহাগুণী গায়ক ও একনিষ্ঠ সাধকরূপে তিনি এমন যশস্বী ছিলেন যে, তাঁর বিষয়ে নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে। যথা—তাঁর সংগীতখ্যাতির কথা শুনে আকবর তাঁকে আমন্ত্রণ জানান ফতেপুর সিক্রিতে। সেখানে উপস্থিত হলে তাঁকে বাদশা দরবারী গায়করূপে অবস্থান করতে বলেন। ত্যাগব্রত সন্ন্যাসী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাৎক্ষণিক রচনা এই গান-খানি শুনিয়ে :

> সন্তন কো সিক্রি সোঁ কাম॥
> আবত যাত পনহীঁয়া টুটি,
> বিসর গয়ো হরিনাম॥
> যাকো মুখ দেখে দুখ উপজে,
> তাকো করনে পড়ি সেলাম॥
> কুম্ভনদাস লাল গিরিধর বিন,
> ঔর না দুজো নাম॥...

বল্লভাচার্যের দ্বিতীয় শিষ্য ছিলেন সৌরাষ্ট্রের কৃষ্ণদাস। সেখানে বল্লভ দ্বারকা-তীর্থে উপস্থিত হলে কৃষ্ণদাস তাঁর সংস্পর্শে এসে শিষ্য হন এবং গুরুর সঙ্গে যতিপুরায় বাস করতে আসেন। কুম্ভনদাসের যেমন গায়করূপে মুখ্য পরিচয়, রচনাকাররূপে গৌণ—কৃষ্ণদাস তেমনি সংগীতরচয়িতা-রূপেই বিশেষ কৃতী ছিলেন, গায়করূপে নন। শ্রীনাথ দেবস্থান তত্ত্বাবধানের ভার পান কৃষ্ণদাস।

বল্লভাচার্যের তৃতীয় শিষ্য সুরদাস রচনাকার ও গায়করূপে যুগপৎ প্রসিদ্ধ। তিনি জন্মান্ধরূপে কথিত আছেন। দিল্লীর নিকটে সিহি গ্রামে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল থেকেই তিনি স্বভাব-গায়ক ও স্বভাব-কবি। পরে আগ্রার কাছে রুণুকতা তীর্থে বাস করতে আসেন। স্বরচিত গান গেয়ে সেখানে জীবনযাপন করতেন তিনি। ঈশ্বরের উদ্দেশে রচিত সেই সব গানে দীনতা এবং আশ্রয়ের জন্যে প্রার্থনা প্রকাশ পেত। একদিন তিনি যমুনাতীরে বসে তেমনি ভাবের একটি গান গাইছেন গৌঘাটে, এমন সময় বল্লভাচার্য তা শুনলেন তীর্থস্নানে এসে।

গান শেষ হলে সুরদাসকে তিনি বললেন, 'তোমার এমন মনোহর কণ্ঠ, এমন সুন্দর রচনা—কিন্তু এ তোমার কি দুঃখী ভাব? কেবল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে কান্না করছ? কোন উন্নত ভাব নেই কেন?'

সুরদাস বললেন, 'কৃপানাথ, আমি ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছু জানি না। এই আমার সম্বল। আমি পাপী। আমি দীন হীন।'

'না।' আচার্য তাঁকে উপযুক্ত মন্ত্র দীক্ষায় ত্রাণ করলেন। তারপর বললেন, 'যমুনায় স্নান করে এস।'

সুরদাস স্নানান্তে এলে বল্লভ তাঁকে দিলেন অভয় মন্ত্র। মন্ত্রশক্তিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সুরদাস এক অপূর্ব চেতনা লাভ করলেন। অকস্মাৎ বিলুপ্ত হল তাঁর এত-কালের হীনমন্যতা বোধ। এক অভূতপূর্ব প্রেরণায়, অতি মহৎ ভাবের উদ্দীপনায় তাঁর অন্তর আপ্লুত হল। আত্মভাব প্রকাশ করতে বরাভয় কণ্ঠে সুরদাস গেয়ে উঠলেন (দেব গান্ধার রাগে) :

> বজ্র ভয়ো মেহোর কে পুত, জব যে বাত সুনী।
> সুনকে আনন্দ লোগ, গোকুল গণত গুণী॥
> অতি পুরণ পুরে পুর, রোপী অচল থুনি।
> গ্রহ নক্ষত্র, গগন সব সোধ, কীনহী বেদ-ধ্বনি॥
> সুনকে ধায়ে ব্রজ-নর-নারী, সৈহৈজ সিঙ্গার কিয়ে।
> তৈক-পৈহরে নৌতন চীর, কাজর নৈন দিয়ে।...

সেইদিন থেকে সুরদাসের নব জন্ম হল। সেই যে উচ্চ ভাবের সংগীত রচনা তাঁর অন্তঃস্তল থেকে উৎসারিত হতে লাগল, আর তার ব্যত্যয় হয়নি কখনো। হীনতা-বোধের ভাবে আর তিনি কোনদিন রচনা করেননি। তারপর থেকে আমৃত্যু অসংখ্য পদ রচনা করে যান সুরদাস। তার মধ্যে বহু উৎকৃষ্ট কাব্যসংগীত হিন্দী কাব্য সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে।

রুণুকতা থেকে তিনি যতিপুরায় আসেন গুরুর সঙ্গে। বল্লভাচার্য তাঁকে বলেন, 'দেবতাকে গান শোনাও; থাকো।'

সুরদাস যতিপুরায় জীবনের শেষ পর্যন্ত বাস করেছিলেন। গুরুভক্তিতেও কারো চেয়ে ন্যূন ছিলেন না তিনি, যদিও তা তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি তেমনভাবে। তাই অন্তিমকালে তাঁকে বিঠ্ঠল-শিষ্য গোবিন্দস্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি গুরুবন্দনায় কোন গীত রচনা করেননি?'

উত্তরে সুরদাস গাইলেন বেহাগে—

> ভরোসা দৃঢ় ইন চরণন কের।
> শ্রীবল্লভ নখচন্দ্র ছটা বিন
> সব জগ মাহে আন্ধের॥
> সাধন ঔর নাহে ইয়া কলু মে
> যা সো হোয় নিবের॥
> সুর কহা কহে দ্বিবিধ আঁধর
> বিনা মোলকো চের॥

বল্লভাচার্যের চতুর্থ শিষ্য পরমানন্দ কনৌজের সন্তান। গুরুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় প্রয়াগ পারে আড়েলে। শিষ্য হয়ে তিনিও বল্লভাচার্যের সঙ্গে যতিপুরায় চলে আসেন ও সেবসেবায় নিযুক্ত হন। তিন সতীর্থের মতন তিনিও বহু সংগীতের রচয়িতা এবং তাদের সুরকার ও গায়ক।

এইভাবে তাঁর সংগীতজ্ঞ শিষ্য চতুষ্টয় যতিপুরা নিবাসী হয়েছিলেন বল্লভাচার্যের ধর্মভাবের প্রেরণায়। সেখানে শ্রীনাথ বিগ্রহকে

নিবেদন করবার জন্যে নিত্য নতুন গান রচনা করে গাইতেন। ফলে, সেই সঙ্গীতধারা ক্রমে অপরাপর কণ্ঠেও আশ্রয় নেয় তাঁদের দৃষ্টান্তে। তাঁরা আমৃত্যু যতিপুরায় অবস্থান করায় স্থানটি বিশিষ্ট সঙ্গীত-কেন্দ্রে পরিণত হয়। সম্প্রদায় প্রবর্তক ও সঙ্গীতপ্রেমী বল্লভাচার্য অন্তিমকাল পর্যন্ত যতিপুরাতেই ছিলেন এবং তাঁর দেহত্যাগের পর সম্প্রদায়ের নেতা হন তাঁর পুত্র বিঠ্ঠলনাথ। তাঁর চার শিষ্যও সঙ্গীতজ্ঞ এবং রচনাকার।

গোঁসাইজী নামে আখ্যাত বিঠ্ঠলনাথ কিন্তু গোকুলনিবাসী ছিলেন। তাঁর প্রভাবে নতুন করে প্রচারিত হয় গোকুলের তীর্থ-মাহাত্ম্য। সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও সম্প্রদায়ের সংগঠকরূপে গোঁসাইজীর দানও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর উদ্যোগে শ্রীনাথ মন্দিরের নির্দিষ্টমতে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়—শুধু পূজা-পার্বণ, বিগ্রহসেবা নয়, সঙ্গীত অনুষ্ঠানেরও। এসবের তত্ত্বাবধান করতে তিনি গোকুল থেকে প্রতিদিন যতিপুরায় উপস্থিত হতেন।

বিঠ্ঠলনাথের চার শিষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক হলেন নন্দদাস। রচনা বিষয়ে চিৎস্বামী সর্বাপেক্ষা কৃতী। তৃতীয় শিষ্য চতুর্ভুজদাস। অপর শিষ্য গোবিন্দস্বামী সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি গোয়া কিংবদন্তীর সন্তান। তাঁরা চারজনই যেমনভাবে সাজে নির্দিষ্ট সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশন করতেন মন্দিরে।...

বল্লভাচার্যের শিষ্য চতুষ্টয়ের পরিণত বয়সে গোঁসাইজীর উক্ত চারজন শিষ্য তাঁদের সঙ্গে যতিপুরানিবাসী হয়েছিলেন। তাঁদের আটজনের মিলিত অবস্থানের সুফলস্বরূপে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয় অষ্ট ছাপ সঙ্গীত এবং স্থানীয় সঙ্গীত কেন্দ্র। তীর্থমাহাত্ম্যের সঙ্গে সেই সঙ্গীত ধারাও বিস্তারিত হয়।

সম্প্রদায়ের অষ্ট প্রধান শিষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন কুম্ভনদাস। তাঁর কাছে অন্য সাতজন সঙ্গীত বিষয়ে কিছু না কিছু শিক্ষা করেছেন। অষ্ট শিষ্যের অনেক সঙ্গীতশিষ্যও গঠিত হয়ে আরো প্রসার লাভ করে অষ্ট ছাপ সঙ্গীত।

গোঁসাইজীর ব্যবস্থাপনায় শ্রীনাথ মন্দিরে বিগ্রহের ভজন পূজনের সঙ্গে সঙ্গীতচর্চার সুপরিকল্পিত সমন্বয় সাধন ঘটে। গানের সময়াদির নিয়ম পদ্ধতি স্থির করেন তিনি। গায়ক না হলেও ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহ যথেষ্ট ছিল। সঙ্গীত সংগ্রহ সম্পর্কেও প্রথম সচেতন ও সচেষ্ট হন তিনি।

একদিন শিষ্যদের বলেন, 'কতদিন কণ্ঠে স্মরণ করে রাখবে এত সব গান? শেষে বিস্মৃত হবে, লোপ পেয়ে যাবে।'

তারপরই তাঁরই উপদেশে ও প্রেরণায় গায়করা সংকলন করতে আরম্ভ করেন গান। গোঁসাইজীর কালেই পদাবলী রচনা ও গায়ন রীতি 'বর্ষোৎসব' ও 'নিত্যকীর্তন' গ্রন্থদ্বয়ে সংগৃহীত হয়। পরে 'বর্ষোৎসব' থেকে আর একটি শাখা-পুস্তক গ্রথিত হয়েছিল : বসন্ত ধামার সংগ্রহ। তাই নিয়ে সাকুল্যে তিন খণ্ডে যতিপুরার অষ্ট ছাপ সঙ্গীত সংকলিত হয়। মোট গানের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। সে গ্রন্থাবলীর ১৪শ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় তাদের প্রচারের বিষয়েও ধারণা করা যায়।...

মন্দিরে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান কালে কোন রাগ কখন পরিবেশিত হবে বিঠ্ঠলনাথের সময়েই সেসব নির্দিষ্ট হয় এবং সে প্রথা এ যাবৎ প্রচলিত। বল্লভ সম্প্রদায়ে বিনা রাগে কোন গান অনুষ্ঠিত হয় না। শুধু যতিপুরায় নয়, এই সম্প্রদায় পরিচালিত অন্যান্য স্থানের মঠ মন্দিরেও অষ্ট যামে সঙ্গীতের দ্বারা বিগ্রহ পূজা সম্পন্ন হবার বিধি। ধর্মানুষ্ঠান ও পূজানুষ্ঠান এই সম্প্রদায়ে পরস্পর-নির্ভর, পরস্পরের পরিপূরক। এখানে উল্লেখ করে রাখা যায় যে, বল্লভকুলের মন্দিরে শুধু অষ্ট ছাপ সঙ্গীত নয় হরিদাস স্বামী প্রভৃতির পদরচনাধারার গীতও পরিবেশিত হয়ে থাকে।

সম্প্রদায়ের প্রভাবে গোকুলেও ধ্রুপদ সঙ্গীত চর্চার একটি ধারা প্রবর্তিত হয়। যতিপুরার তুল্য ধামারের শ্রীবৃদ্ধি গোকুলে হয়নি। সম্প্রদায় স্থাপিত এখানকার গোকুলনাথজীর মন্দিরে বলরামের পূজা হয় বাৎসল্যভাবে। বলা বাহুল্য, সে পূজানুষ্ঠান সঙ্গীতময়। বৃন্দাবনে বল্লভ মন্দির নেই, আছে বল্লভাচার্যের বৈঠক, সেখানে বিশেষভাবে ধ্রুপদ গান হয়। হোলির সময়ে ধামার।

বিঠ্ঠলনাথের বংশধরদের সময়ে যতিপুরার সঙ্গীতধারা অর্থাৎ অষ্ট ছাপ রাজস্থানেও বিস্তারলাভ করে। তাঁর সাত পুত্রের স্থাপিত সাত বিগ্রহের পূজা যথাবিধি সাধিত হত যতিপুরায়। কিন্তু পরে আওরঙ্গজেবের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পাঁচটি বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়। বিকানীর, কোটা, কাঁকরোলি, নাথদ্বার ও কামাকবনে। শেষোক্ত স্থানটি আদি-বৃন্দাবন নামে কথিত, গোবর্ধন থেকে ১১ ক্রোশ দূরে। বাকি চারটিই রাজস্থানে। সেসব জায়গায় বল্লভসম্প্রদায়ের নব প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজা উপলক্ষে যতিপুরার সঙ্গীতধারার নিয়মিত চর্চা হতে থাকে। যেমন, শ্রীনাথ বিগ্রহ মেবারের নাথদ্বার মন্দিরে আনীত হওয়ার কালে অষ্ট ছাপ গানের সূত্রপাত ঘটে নাথদ্বারে। রাজপুত পাল রণছোড়নাথজীর মূর্তি পূজিত, চত্বরসহ বিরাট মন্দিরের জন্যেই নাথদ্বারের প্রসিদ্ধি হয়। ভক্তদের তার অন্যতম আকর্ষণ হয় শিক্ষিত পটুকণ্ঠে প্রভুগুণগান।

যে মথুরেশ বিগ্রহ কোটায় স্থানান্তরিত হয়েছিল, তা পুনরায় যতিপুরায় নীত হয়। তবে গিরিগোবর্ধনে স্থাপিত না করে প্রতিষ্ঠিত করা হয় পর্বতের নিম্নস্থ মন্দিরে। এখানেই বিঠ্ঠলনাথের সাত পুত্রের সাত মন্দির। তার প্রতিটিতেই বিধিবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান।

সমগ্র বৎসর ব্যাপী ঋতুতে ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবে সঙ্গীতেরও উৎসব পালিত হয়ে থাকে। মধু ঋতুকালে ৪০ দিন যাবৎ হোলি বা বসন্ত উৎসব। শুধু ধামার গান এই সময়ে পরিবেশন করা হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উৎসব পালন। অনুষ্ঠান সূচীতে থাকে বসন্ত, বাহার ইত্যাদি রাগ ও নানা পর্যায়ের রাগমালা। হোলি উৎসবে ধ্রুপদ আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না।

বর্ষা সমাগমে আষাঢ় শ্রাবণ মাসেও সারাদিন আর এক উৎসব। তার সব অনুষ্ঠানেই সঙ্গীত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধ্রুপদ ও ধামার উভয় রীতির গান এ সময় পরিবেশন করা হয়। বিশেষভাবে মল্লার গোষ্ঠীর রাগ গাওয়াই প্রথা।

ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ ও রাধিকার জন্মলীলার স্মারক উৎসব। জন্ম, পালন ও দানের স্মরণী উদ্‌যাপন করা হয়। এই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে শুধু বিলাবল ঠাটের ধ্রুপদ সঙ্গীত।

আশ্বিন মাসে তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি অবলম্বনে ১০ দিন যাবৎ অনুষ্ঠান—দেবী পূজা, সাঁঝি ও কড়খা (রাম রাবণের যুদ্ধ)। এ সময়েও শুধু বিলাবল ঠাটের ধ্রুপদ গীত হয়।

শরৎ পূর্ণিমা উপলক্ষে ৮ দিনব্যাপী রাস উৎসব পালিত হয়ে থাকে। তখন কল্যাণ, শ্রী, গৌরী, কেদারা, রামকেলি প্রভৃতি রাগে ধ্রুপদ গানের বিধি।

কার্তিক মাসে তিন সপ্তাহ যাবৎ দেওয়ালী হয়, অন্নকূটের পরে। সে পর্যায়ে কল্যাণ, বেহাগ, জয়জয়ন্তী, ধনাশ্রী, কেদারা ইত্যাদি রাগের ধ্রুপদ গীত হয়ে থাকে।

অগ্রহায়ণে সমগ্র মাস ব্যাপী আরাধনা। গোপিনীরা যমুনায় স্নান করে কাত্যায়নী দেবীর পূজায় রত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে দিন রাত্রির সময়োচিত রাগ অবলম্বনে পরিবেশিত হয়ে থাকে শুধু ধ্রুপদ গান। স্নানের পরে রামকেলী দিয়ে আরম্ভ; তারপর বিলাবল ইত্যাদি রাগের গান কালানুসারে হয়।

পৌষ মাসে পনঘট অর্থাৎ জল ভরাণের লীলা স্মারক উৎসব। তখন সমগ্র মাস যাবৎ সময়ানুগ রাগে সকাল থেকে রাত্রির প্রহর পর্যন্ত ধ্রুপদ গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মাঘ মাসে সংক্রান্তি উপলক্ষে তিল দান ইত্যাদি পালনের সঙ্গে সঙ্গীতেরও উৎসব

হয়। তিন রাতের সময়সম্মত রাগে গীত হয়ে থাকে।

সমগ্র বৎসর যাবৎ সাধারণ্যে পালিত উৎসবাদির সঙ্গে মন্দিরে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতের প্রসঙ্গও স্মরণীয়। দেবস্থানে বিগ্রহের নিত্য সেবা ও ভক্তদের দর্শন উপলক্ষে প্রহরে প্রহরে রীতিমত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। প্রভাতে মঙ্গলাচরণ ও প্রভুগুণগান। শঙ্খধ্বনির পর, দর্শনার্থী-দের প্রবেশ করবার আগে এবং দর্শনের সময়ে গায়ক স্তুতিপ্রকরণ গান আরম্ভ করেন। এই পর্যায়ে ললিত, বিভাস, ভৈরব, তোড়ি, রামকেলি প্রভৃতি রাগের গান গীত হবার বিধি। তার পরের পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় বিলাবল—বিগ্রহের শৃঙ্গার থেকে জলপান পর্যন্ত। তারপর রাজভোগ—তখন সারঙ্গের গান পরিবেশিত হয়। দ্বিপ্রহরে সঙ্গীত বন্ধ থাকে বিশ্রামের জন্যে। বিকালে উত্থাপন হবার পর জয়ৎশ্রী, ধনাশ্রী প্রভৃতি রাগের গান হয়ে থাকে। তারপর সন্ধ্যারতি। এই পর্যায়ে শ্রী প্রভৃতি রাগ। তার পরে ভোগ আরতির শেষে শয়ন—তখন বেহাগ রাগের গান শোনানো হয়। তা ছাড়া, কোন কোন ভাব উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ রাগ গীত হয়ে থাকে—যথা, মান ও মিলন কল্পনায় কেদারা, কল্যাণ, মালকোষ ইত্যাদি...।

এমনিভাবে বল্লভ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ও পোষকতায় যতিপুরা প্রভৃতি কেন্দ্রে নিরন্তর চর্চায় সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। লক্ষ করবার বিষয় এই যে, এ সব গানই ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি অনুসারী এবং আদ্যোপান্ত রাগভিত্তিক ও রাগাশ্রয়ী।

সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এইভাবে মন্দির কেন্দ্রিক সঙ্গীত সেবার ফলে সঙ্গীতজগতে যতিপুরার বিশেষ গৌরবের স্থান ছিল। তারপর আওরঙ্গজেবের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্যে শ্রীনাথ বিগ্রহ মেবারের নাথদ্বারে স্থানান্তরিত হয়, যোধপুরের রানী গঙ্গাবাইয়ের উদ্যোগে। তখন থেকে মন্দির-নির্ভর প্রাণবন্ত সঙ্গীতধারা জীবনী-শক্তি হারাতে থাকে যতিপুরায়। কারণ, যতিপুরার সঙ্গীতাচার্যেরা অনেকেই নাথদ্বার প্রভৃতি কেন্দ্রে চলে যান। তবে যতিপুরার ঐতিহ্য যে কোনদিন একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি তার সাক্ষ্য—বর্তমান শতকের প্রথম পাদকের বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য গোপাললালজী ও তাঁর গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় বালকৃষ্ণলালজী ও ঘনশ্যামলালজী। তাঁরা মথুরানিবাসী হলেও যতিপুরার সঙ্গীত-সম্পদের ধারক-বাহক ছিলেন এবং চন্দন চৌবের সমসাময়িক।

বৃন্দাবন ও যতিপুরার সঙ্গীতধারায় মথুরায় সঙ্গীতকেন্দ্র বর্ধিত হয়েছিল। মথুরার গায়কী পদ্ধতি স্বামী হরিদাস প্রমুখ বৃন্দাবনের সঙ্গীতাচার্যদের ধারার অনুগামী। কারণ, দেখা যায়, মথুরার নানা শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গুরুপর্যায়ে আছেন বৃন্দাবনের সঙ্গীতসাধক। এমন কি মথুরার পরবর্তীকালের পেশাদার গায়কদেরও বৃন্দাবনী ধারার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। সেই সঙ্গে লক্ষণীয়, বল্লভ সম্প্রদায়ের তাবৎ মন্দির-কেন্দ্রিক সঙ্গীতচর্চার মতন মথুরা সঙ্গীতপীঠকেও যতিপুরার ধারা গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেছে।

ব্রজমণ্ডলের সঙ্গীতধারায় যতিপুরার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবার পর অর্থাৎ সপ্তদশ শতক থেকে আরম্ভ হয় গোকুলের শ্রীবৃদ্ধি। এই পর্ব থেকে ধ্রুপদ, ধামার গানের চর্চা গোকুলে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হয়। ভারত-বর্ষের প্রথম সঙ্গীতের মহাকোষ (তিন খণ্ডে ১৮৪২—১৯৪০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত) 'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম' প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর বৃন্দাবনে সঙ্গীত-শিক্ষাপ্রাপ্ত, যদিও তিনি রাজস্থানের উদয়-পুরের সন্তান। গোকুলের সঙ্গীতাচার্য দামোদর গোস্বামী, গিরিধর গোস্বামী ও কল্যাণ রায় কৃষ্ণানন্দকে 'রাগসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন, একথাও স্মরণীয়। গোকুলে নানা বিশিষ্ট গুণী আত্মপ্রকাশ করেন বিভিন্ন সময়ে। এই ধারায় বর্তমান শতকেও প্রখ্যাতনামা গায়ক কানহাইয়ালালকে পাওয়া যায়, যিনি চন্দন চৌবের সমসাময়িক।

বৃন্দাবনী ধারার ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন দিকপাল সঙ্গীত গুণী বংশীধরজী। তিনি মথুরানিবাসী হলেও বৃন্দাবন-ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তিনি প্রধানত সারঙ্গ-বাদক, কিন্তু উৎকৃষ্ট গায়কও ছিলেন এবং নানা প্রকার কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করে সঙ্গীতজগতে আচার্যের সম্মানে বিদ্যমান থাকেন। তিনি ছিলেন মথুরার কৃষ্ণগঙ্গা মহল্লা নিবাসী। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মথুরার প্রধান দেউল দ্বারকাধীশ মন্দিরে বিগ্রহের সামনে সারঙ্গ বাদন করতেন। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন—অযোধ্যাপ্রসাদ (সর্বজ্যেষ্ঠ; সেতারী), মুকুন্দীলাল (সেতারী), লালনজী চৌবে (এস্রাজী; মথুরায় তাঁর ধারা এখনো বর্তমান। শিষ্য: অওঘড় চৌবে, গোবিন্দরাম প্রভৃতি), গণেশী-লাল চৌবে (ধ্রুপদী, বীণকারও; সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য), বড়ে লালা ও ছোটে লালা (কৃষ্ণ-গঙ্গা নিবাসী সেতারী ভ্রাতৃদ্বয়), হোরিলাল (হারমোনিয়মবাদক), অখণ্ড চৌবে (ধ্রুপদী ও বাঁশির বাদক) প্রভৃতি।

বংশীধরের সমসাময়িক ঘনশ্যামলালজী ছিলেন হারমোনিয়ম-গুণী। তাঁর অসাধারণত্ব এই যে, তন্ত্রবাদনের কিছু কলাকৌশল হারমোনিয়মে রূপায়িত করতেন, তিনি ছিলেন জলতরঙ্গেতেও সিদ্ধ। মথুরানিবাসী ঘনশ্যামলালজীর গুরু অজ্ঞাত হলেও তাঁর সঙ্গীতশৈলীতে বৃন্দাবন ধারার অনুসরণ ঘটেছে। তাঁর অন্যতম শিষ্য দ্বারকেশলালও ছিলেন কৃতী হারমোনিয়মবাদক। দ্বারকেশ-লালের হারমোনিয়ম-শিল্পী পুত্র রসিক-লাল আধুনিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হারমোনিয়ম বাদনের চর্চা উচ্চাঙ্গের ও ব্যাপকভাবে দেখা

যায় মথুরায়। গণপৎ রাওয়ের শিষ্য এবং কলকাতানিবাসী হারমোনিয়ম-শিল্পী শ্যামলাল ক্ষেত্রীও মথুরার সন্তান ছিলেন।...

মথুরার গণেশীলাল চৌবের তুল্য দিকপাল ধ্রুপদী বিরল ছিলেন উনিশ শতকের শেষ ও বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে। একাধিক ভারতপ্রসিদ্ধ কলাবন্তের গুরুরূপে সমকালীন সঙ্গীতজগতে নেতৃস্থানীয়রূপে বিরাজ করেন। অন্যান্যের সঙ্গে বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকর, ফৈয়াজ খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ (সরদ-গুণী; বহু ধ্রুপদ সংগ্রহ ও শিক্ষা) প্রভৃতিও গণেশীলালের শিষ্যরূপে গণনীয়। চৌবেজীর অনন্য রাগবিদ্যাজ্ঞান, স্বরবোধ, কণ্ঠসম্পদ ও শ্রোতাদের ওপরে মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রভাব বিস্তারের কত দৃষ্টান্তই সংগীত-জগতের শ্রুতিস্মৃতিতে রক্ষিত আছে। সে সব বিবরণ উল্লেখ করবার এখানে স্থানাভাব। তবে আগ্রার 'রঙ্গিলে' ঘরাণার স্বনামধন্য গায়ক, 'সঙ্গীতের সূর্য' (আফ্‌তব্‌-এ-মুসিকী) ফৈয়াজ খাঁ কিংবা দিকপাল সরদগুণী হাফিজ আলী খাঁ তাঁদের 'ঘরের' অতিরিক্তভাবে যখন গণেশীলালের নিকটে ধ্রুপদের শিক্ষার্থীরূপে আসেন, তখন ধারণা করা যায় যে সংগীত জগতে তাঁর স্থান কোথায় ছিল। তাঁর আসরের কথা ত সব বলা যাবে না, গল্প কথার মতন শোনাবে। তবু শিল্পীরূপে তাঁর কণ্ঠমাধুর্য কেমন ছিল তা অনুমান করা যাবে বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর একদিনের অভিজ্ঞতা থেকে। সেদিন এই বিদেশী শাসক (এবং ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ) পাঁচ মিনিটের জন্যে গণেশীজীর গান শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শুনলেন তাঁর আলাপ সমেত ধ্রুপদ দেড় ঘণ্টা যাবৎ। তারপর গান শেষ হবার পরও স্থাণুবৎ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। চৌবেজীর সম্পর্কে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্য হল—'Not a musician, but a magician.'

গণেশীলালের সুরবোধ ও শ্রুতিশক্তি আন্দাজ করা যাবে আর একটি আসরের ঘটনা থেকে। এটি তাঁর নিজের কোন অনুষ্ঠানের কথা নয় অবশ্য। তখন তাঁর প্রায় শেষ বয়স। বাগ বাহাদুর নামে তাঁর বাগান-ঘেরা বাড়িতে সেদিন বিরাট জলসা। গোয়ালিয়রের স্বনামধন্য গুণী গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব), তাঁর ভ্রাতা বলবন্ত রাও, গণপৎ-শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রী প্রমুখ উপস্থিত হয়েছেন। আসরে শ্রোতাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে গণপৎ রাও ও শ্যামলাল ক্ষেত্রী যুগলবন্দী হারমোনিয়ম বাজালেন। যে অপরূপ সুষমামণ্ডিত 'কচাও ঠুংরি' প্রবর্তনার জন্যে গণপৎ রাওয়ের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে, তিনি স্বকণ্ঠে আসরে তা পরিবেশন করতেন না। আসরে তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম কারুশোভন হারমোনিয়ম শিল্পী। বাগ বাহাদুরেও তিনি সেদিন প্রিয় শিষ্য এবং এই যন্ত্রে গুরুর যোগ্য শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সহযোগিতায় হারমোনিয়ম বাজান। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করলেন প্রসিদ্ধ ভোলা তবলচী। গণপৎ রাও কামোদের যে চিত্তাকর্ষক রূপায়ণ করলেন, তা এক কথায় তাঁরই উপযুক্ত। গুরু শিষ্য হারমোনিয়মে শেষে যে লহরা বাজালেন তাতে আসরে ধন্য ধন্য রব উঠল। বাজনার পরে কয়েকজন গণেশীলালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গুরুজী কেমন শুনলেন?'

তিনি শুধু বললেন, 'বেশ, ভাল।'

'না! আপনি বোধহয় মনের কথা বলছেন না। আরো কিছু বলবার আছে কিনা ঠিক করে বলুন।' তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

তখন তিনি বললেন, 'দুটো হারমোনিয়মের সুর ঠিক ঠিক মেলেনি! একটু ফারাক আছে।'

এমন উচ্চাঙ্গের বাজনার শেষে তাঁর এই মন্তব্য অনেকের মনঃপূত হল না—বিশেষ শিল্পী দুজনের। কিন্তু স্বয়ং চৌবেজীর কথা! অগত্যা হারমোনিয়ম দুটি পুনরায় বাজানো হল। কিন্তু গণপৎ রাও সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, শ্যামলালের হারমোনিয়মের পর্দার সঙ্গে তাঁর যন্ত্র হুবহু মিলছে না, সত্যই। গণপৎ রাও তখনি নতুন হারমোনিয়ম ফরমাস করে আবার বাজনা আরম্ভ করলেন।...

মায়াবী সংগীতকণ্ঠ ছিল গণেশীলালের। তাঁর সঙ্গীত জীবনের যখন স্বর্ণশিখর, তখন তিনি উপার্জনও করেছিলেন চূড়ান্ত। মাত্র চারটি দরবারে মুজরো করেই তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন নিশ্চিন্তে সঙ্গীত সাধনায় অবসর লাভ করেন।

নেপাল, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়র ও বাংলার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের দরবারে অনুষ্ঠান করেই তিনি কয়েক লক্ষ টাকা সম্মান মূল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর সংগীত জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত হয় মথুরায়। সেখানে মাণিকচক মহল্লায় বাগ বাহাদুর নামে তাঁর উদ্যান গৃহটি সঙ্গীততীর্থে পরিণত হয়েছিল। বহিরাগত কত গুণী সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, কত শিক্ষার্থী রাগবিদ্যা লাভ করেছেন তাঁর পদতলে বসে। নেপাল ও গোয়ালিয়র থেকে উপহৃত মণিমুক্তা খচিত তাঁর বীণা ও তানপুরা সহযোগে কত স্মরণীয় আসর তিনি স্বয়ং করে গেছেন বাগ বাহাদুরে। যে রাগে যখন গাইতেন, মনে হত তাইতেই সিদ্ধ। তাঁর সংগীত জীবনের আর একটি কৃতিত্ব ছিল রাগের ভিত্তিতে সামবেদ ও রামায়ণ গানের অনুষ্ঠান। মথুরায় সঙ্গীত জগতের এই বিরাট পুরুষ ৯০ বছর বয়সে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পরলোকগত হন। তাঁর বংশ নেই। সেই বাগ বাহাদুরও নিশ্চিহ্ন। তবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের ধারায় ধ্রুপদ ধামার গানের চর্চা আজো লুপ্ত হয়নি।...

প্রায় আধুনিককাল পর্যন্ত মথুরার বাইশ্রেণীর মধ্যেও বর্তমান দেখা যায় মথুরার ঐতিহ্যমণ্ডিত সঙ্গীতের চর্চা। ধ্রুপদ, ধামার গায়িকা নাকটি পান্নাবাঈ (নাসিকা গৌরবের জন্যে এইভাবে আখ্যাত) এ বিষয়ে এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।...

প্রাক-সাম্প্রতিক কালের উক্ত গণেশীলাল চৌবে কিংবা বংশীধর প্রমুখ দিকপাল কলাবন্ত প্রদর্শন করে গেছেন ব্রজমণ্ডলের সঙ্গীতধারার ঐশ্বর্য। ভজনে পূজনে দেবস্থানে ধর্মাচরণের অঙ্গীভূত হয়ে কৃষ্ণ তীর্থে যে সঙ্গীত সম্পদ যুগ যুগ ধরে বিকশিত হয়েছিল, তাঁরা তার শেষ পর্যায়ের প্রবক্তা। এ যুগের সঙ্গীতকৃতি থেকে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায়, ব্রজধামের গৌরবোজ্জ্বল পর্বের সংগীতসাধনা আরো কত প্রাণবন্ত ছিল।

ভ্রম সংশোধন

গত ১২ ডিসেম্বর ৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'তানসেনের বীণা' ছবিটি সংশোধিতরূপে হবে 'তানসেনের তানপুরা'।

ক্লান্ত?
গ্ল্যাক্সোজ-ডি
আপনাকে কয়েক মিনিটেই শক্তি দেয়
ক্লান্ত বোধ করলেই রোজ
আমি গ্ল্যাক্সোজ-ডি খাই
আজই, ক্লান্ত
বোধ করলেই
গ্ল্যাক্সোজ-ডি খান—
অল্প খরচে
শক্তিদায়ক
আহার!

মিশরীয় ধর্মে পশু-দেহধারী দেবতা

সুধীন দে

প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হিসাবে আশীর্বাদস্বরূপে মানুষ পেল যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, অপর দিকে তার জীবনের অভিশাপ হলো ভীতি-সংশয়। এই ভীতি ও সংশয় তার নিত্যসঙ্গী। কেননা, ক্ষয়িষ্ণু তার উৎস শক্তিতে তার জন্ম। অভিজ্ঞান, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতায় তাকে করেছে সৃষ্টির ক্ষেত্রে যোগ্যতম এবং বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব তাকে উন্নততর সমাজ জীবন গড়তে সহায়তা করেছে। এই সমাজ জীবনে ধর্ম বিশ্বাস হলো তার আর এক প্রকাশ। ক্রমশ আত্ম-সচেতনতার বিকাশের সাথে, প্রাকৃতিক এক একটি অনিষ্টকারী শক্তির কাছে সে নতি স্বীকার করলো, এবং এই শক্তিগুলি এক একটি দেব-দেবীর মূর্তিতে তার ধর্মে ঠাঁই পেল।

কেবলমাত্র মিশরে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দেব-পূজার প্রচলন ইতিহাসের এক সুদীর্ঘ ধারা পথ বেয়ে চলে এসেছে এবং পরবর্তীকালে সমাজ জীবনে ও জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে উন্নততর অবস্থায় দেশে দেশে বিভিন্ন রূপে তার প্রকাশ ঘটেছে। মিশর-বাসীরা যে দেব পূজায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিল, তার প্রমাণ হেরোডোটাসের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে দেব পূজা মিশরবাসীদের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলেও, প্রত্যেকটি উপজাতির মধ্যে এবং শহরাঞ্চলেও এই দেবতাদের প্রকাশভঙ্গীমা ছিল বিভিন্ন। বিভিন্ন উপজাতি এবং গোষ্ঠীগুলির পরস্পর সংমিশ্রণের ফলে 'বহু দেবতা' এই ধারণার শুরু হয় এবং এই সময় থেকেই পুরাণের সৃষ্টি—বিভিন্ন উৎস থেকে সম্ভূত দেবতারা পরস্পর সম্মিলিত হন। তবুও এ কথা সত্য যে একজন মিশরবাসীর কাছে 'সর্বময় দেবতা' হলেন তার 'নগর দেবতা'।

মিশরের সর্বপ্রাচীন জনসাধারণের দৈহিক গঠন, তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং প্রচলিত প্রথার এক সুদীর্ঘ ধারা, বিশেষ করে মৃত সম্বন্ধে ধারণা বা মৃতের ব্যবস্থা, প্রভৃতির সংগে বর্তমান মধ্য আফ্রিকায় প্রচলিত রীতির এক ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়। সভ্যতার এই স্তরে, বিশেষ করে খৃঃ পূঃ দশ হাজার বছর আগেও সাধারণভাবে জীবজন্তু পূজার প্রচলন ছিল। এই ধরনের অভ্যাসের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, কেননা আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে রোমান যুগ পর্যন্ত জীব-জন্তু পূজার প্রচলন দেখা যায়। অভ্যাসের এই অদ্ভুত ধারার উৎস হলো মানুষ এবং প্রাণী জগতের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা। প্রত্যেকটি উপজাতির মধ্যে প্রাণীর একটা পবিত্র প্র-জাতি নির্দিষ্ট করা ছিল, এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এদের জীবন রক্ষা করা হতো। তবে এর

শিয়াল বা কুকুর মাথাযুক্ত দেবতা 'অনুবিস' মৃতাত্মার অনন্তকালের সাথী এবং মৃতের পথ প্রদর্শক। শেষ বিচারের সময়েও ইনি উপস্থিত থাকেন

জল দেবতা 'সেবেক' হলেন কুমীরের মাথা যুক্ত, স্ট্রাবো ক্যাম্যুস্রে অবস্থিত 'সেবেক' দেবতার এক মন্দিরের কথা উল্লেখ করেন

ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন, পূজার জন্য নির্দিষ্ট প্রাণীকে পূজার ক্রিয়াকর্মাদি মেটার পর হত্যা করা হতো হয় সংস্কারের বশে, না হয় ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার জন্য এবং সেই প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা হতো।

যে সমস্ত প্রাণীদের ওপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল তারা হলো বেবুন, সিংহী এবং বিড়াল। এই সমস্ত প্রাণীর পূজা আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে হতো এবং সেই স্থানগুলি হলো হারমপোলিস (Hermopolis), বেনি হাসানের কাছে বুবাস্তিস প্রভৃতি। অনেক শহরে ষাঁড়কে পবিত্র বলে গণ্য করা হতো এবং স্থান বিশেষে তাদের আকার বা

জলহস্তী, শিয়াল এবং নকুল বা বেজী প্রভৃতি প্রাণী পবিত্র বলে মনে করা হতো। পাখিদের মধ্যে বাজপাখি ছিল অত্যন্ত পবিত্র। কেননা, বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে, বাজপাখিকে রাজ-আত্মার প্রতিনিধি বলে মনে করা হতো। শকুনির অপত্য স্নেহ জগৎ বিখ্যাত, সে জন্য সে হলো দেবী মাতৃকার প্রতীক। মিশরবাসীদের কাছে ভীতিজনক প্রাণীদের মধ্যে কুমীর ছিল অন্যতম, সে যাতে প্র-জাতিদের কোন অনিষ্ট না করে সে জন্য তার সাথে সদ্ভাব রাখার জন্য তাদের খাবার দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা হতো। কেউটে জাতের সাপ ছিল রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক। মহাদেশের মধ্যভাগে কৃষির জন্য আবার সাপের পূজোর প্রচলন ছিল। মনুষ্য গৃহে অবাধে বসবাস করার পক্ষে সাপেদের কোন বাধা ছিল না, তাদের মঙ্গলকামী হিসাবে গণ্য করা হতো। আমাদের দেশে, বিশেষ করে, বনেদী বাড়িতে পঞ্চাশ বা এক শ বা তারও বেশী বছরের পুরান বাড়িতে প্রায়ই বিষধর সাপেদের আড্ডা দেখা যায়। কেননা পুরান বাড়ির ইঁটের ফাটলে বা গর্তে, সময়ের ব্যবধানে সাপের বসবাস গড়ে ওঠে। এদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে এরা হলো 'বাস্তু সাপ' অর্থাৎ পবিত্র, এদের বিনাশ করার অর্থ বংশের অমঙ্গল ডেকে আনা। কোথাও বা এদের জন্য বাড়ির কোন নির্দিষ্ট নির্জন জায়গায় দুধ কলার ব্যবস্থা থাকে। মিশরীয় জীবনে সাপ পূজোর আর একটা বাস্তব দিক হলো সাপেরা ইঁদুর তাড়ায়, যে ইঁদুর প্লেগ রোগের বাহন।

পরবর্তীকালে মিশরে অন্য উপজাতিদের অনুপ্রবেশ ঘটল। এরা মানবীয় দেবতার পূজারী। কিন্তু নতুন জায়গায় এসে তারা দেখল এখানে প্রাণী দেবতার পূজোর প্রচলন রয়েছে। সুতরাং কৃষ্টিগত বা ধর্মীয় বিশ্বাসের আদান-প্রদানের ফলে মানবীয় দেবতারা প্রাণী দেবতাদের সাথে একাত্মীভূত হয়ে গেলেন এবং সৃষ্টি হলো মিশরের বিস্ময়কর পশু দেহধারী দেবতাদের। শিল্প কৌশলের চরম উৎকর্ষ সেখানেই, যেখানে দেখা যায় পশু ও মনুষ্যদেহের সুসমঞ্জস মিলন। অস্বাভাবিক বলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কোন কোন জাতির মধ্যে এমনি প্রমাণও বর্তমানে পায় পূজারী পূজোর সময় প্রাণীর মাথা ধারণ করে দেবতার প্রতিনিধিত্ব করে।

সাপের মাথাযুক্ত দেবতা হলেন 'নেহেবকা', ইনি সর্প দেবতা—মৃতের জন্য বহু কাজ করেন

গাভীর মাথাযুক্ত দেব হলেন 'আইসিস', 'ওসিরিস' দেবতার স্ত্রী এবং 'হোরাস' দেবতার মাতা। তাঁর পূজো মিশরের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত এবং তিনি হলেন এক রহস্য-ময়ী মঙ্গলদায়িনী দেবী

জাতির ভিন্নতা স্পষ্টতই লক্ষ্যণীয়। হেলিওপোলিস, মেমফিস, হারমনথিস এবং থীবসের দক্ষিণ ভাগে, আলেকজান্দ্রিয়ার নিকট কনোবস-এ এবং মহাদেশের অন্তঃস্থল প্রভৃতি স্থানে ষাঁড়ের পূজোর প্রচলন ছিল। আবার ফায়ুমের অপর দিকে অর্থাৎ আটফিস্তে গাভী পূজিতা হতো। এ ছাড়া

ব্রত এবং পূজো নিয়েই হলো আমাদের ধর্মীয় জীবন। এই ব্রত এবং পূজো নিয়ে যে শিল্প, প্রথমটির ক্ষেত্রে তা হলো মিশ্রশিল্প বা পশু-মানব সংমিশ্রণে যে শিল্প গঠিত, আর শেষেরটি হলো সম্পূর্ণ মানব শিল্প। প্রথম শিল্পটি পরিচিত পশু-পক্ষীর জগত থেকে অনুপ্রাণিত, আর দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে উদ্ভূত। মিশরের পশুদেহধারী মূর্তির সাথে প্রাচীন ভারতীয় ঐরূপ মূর্তির মিল আছে। কিন্তু ভারতে রাজনৈতিক ও

কৃষ্টিগত অগ্রগতির ফলে মনুষ্যাকৃতি মূর্তি পশু আকৃতি মূর্তির স্থানান্তরকরণে সাহায্য করে। হিন্দু সংস্কৃতির সময় বিচারে 'নরসিংহ অবতার' (অর্ধ সিংহ ও অর্ধ মনুষ্যরূপী অবতার)-এর আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কেননা ধর্মে ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের দ্বন্দ্বে নৈতিক বিকাশের একটা দিক আছে। সত্য কথা বলতে কি, ভারতীয় লৌকিক ধর্ম সনাতন ধর্মের উৎস হলো—সেই লৌকিক ধর্মের সূত্রপাত পশুমূর্তি কল্পনা থেকে।

মিশরের পশু-মাথাযুক্ত দেবতাদের মধ্যে দেখি আমমন বা আমেন (Ammon or Amen), ইনি হলেন থীবসের আত্মগোপনকারী দেবতা; আমমনরা হলেন মিশরের সূর্য দেবতা বা জাতীয় দেবতা। ইনি হলেন ভেড়ার মাথা যুক্ত, কখনও বা শিরশোভায় দুটি বৃহৎ পালকও দেখা যায়।

হ্যাথর বা আইসিস—এ'দের মাথা হলো গাভীর। হ্যাথর দেবী হলেন দেব-মাতা, তিনি দেব-পিতা মিন (Min) দেবতার সাথে সংযুক্তা। তাঁরা হলেন মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের প্রতীক অর্থাৎ বাস্তব ধর্মী দেবতা। সমস্ত দেশব্যাপী প্রচলিত দেবীদের সাথে 'হ্যাথর' দেবী সমভবেই পরিচিতা। বিশেষ করে তিনি 'আইসিস' দেবীর সাথে সংযুক্তা এবং তাঁরা দু'জনেই হলেন মাতৃদেবী। 'হ্যাথর' দেবীর সাথে আবার চাঁদের সংযুক্তিও দেখা যায়। 'হ্যাথর' নামের উৎপত্তি হলো 'ইসতা'র. 'আসতারথ' (Astarth), অথবা 'আসতারত্' অর্থাৎ যিনি হলেন এশিয়া-উদ্ভূত দেবী-মাতা। 'আইসিসের' মূর্তি হলো গরুর মাথা বা দেহযুক্ত। পূর্বে তিনি ছিলেন কুমারী দেবী এবং পরবর্তীকালে তাঁর স্বামী হলেন 'ওসিরিস' এবং তাঁদের শিশুপুত্র 'হোরাস'। উপজাতিদের পরস্পরের সংমিশ্রণের ফলে এইভাবে এক-একটা দেব-পরিবার বা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। 'আইসিস' হলেন মহাদেশের দেবী, তাঁর পূজা রোম, এবং গ্রীস পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি এবং তাঁর স্বামী একমাত্র দেবতা যাঁরা মিশরের সর্বত্র পূজিত হন। তাঁরা হলেন সূর্য এবং চাঁদের প্রতি-মূর্তি। 'প্লুটার্ক' তাঁদের নামে প্রচলিত কিম্বদন্তীর উল্লেখ করেন—যে কাহিনী আজও মিশরের ঘরে ঘরে প্রচলিত তা হলো : 'সেত' দেবতা 'ওসিরিসকে হত্যা করেন এবং স্বামীর মৃত্যুতে দারুণ শোকে 'আইসিসে'র উম্মত্ত কান্না অর্থাৎ অশ্রু জলই হলো নীল-নদের বাৎসরিক বন্যার হেতু। প্রকৃতপক্ষে 'আইসিস' ছিলেন [illegible] এবং তার পূজাও এককভাবে। এই কারণেই ইটালিতে বা পশ্চিম জগতে যেখানে [illegible] তাঁর মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে সর্বত্রই তিনি একা। [illegible] থেকে তিনি তাঁর শিশুপুত্র 'হোরাসের' সাথে সংযুক্তা। রোমান জগতে তিনি হলেন নাবিকদের উপাস্যদেবী। এবং [illegible] প্রকৃতিতে তিনি হলেন [illegible] এক [illegible] দেবী।

'হোরাস' এবং 'মেন্থ' দেবতার মাথা হলো বাজপাখির। 'হোরাস' ছিলেন প্রশস্ত বক্ষ এবং আইসিস ছিলেন কুমারী দেবী। যখন উপজাতিদের মধ্যে পরস্পর মিলন ঘটল অর্থাৎ 'আইসিস উপজাতি' হোরাস উপ-জাতিদের গ্রহণ করলো, তখন থেকে 'হোরাস' 'আইসিসের' শিশুপুত্র হিসাবে গণ্য হতে থাকেন। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যতার পূর্ণ হলেন এই 'হোরাস দেবতা'। [illegible]

মিশরের বহুখ্যাত বাজপাখি মাথাযুক্ত দেবতা 'হোরাস', ইনি 'ওসিরিস ও 'আইসিসের' পুত্র, অনেক সময় এ'কে রাজা হিসাবেও গণ্য করা হয়। বাজপাখি হলো রাজকীয় পাখি, শির শোভায়, কেউটে জাতের সাপ হলো রাজশক্তির প্রতীক

পাখি দেবতার সাথে এবং এতজন্যে সূর্য দেবতার সাথে মিলিত হয়েছেন—সেজন্য প্রায়শই তাঁর মাথা বাজপাখির। [illegible]

[illegible] রাজকীয় পাখি, [illegible] হিসেবেই [illegible] করা হতো [illegible] হিসেবেই তাঁর পরিচয়। [illegible] উদীয়মান সূর্যের দেবতা। [illegible] পিতৃ-হন্তারক 'সেত' দেবতাকে তিনি পরাজিত করেন, সেজন্য তিনি হলেন প্রতিহিংসার দেবতা এবং [illegible] হলো তাঁর অস্ত্র। [illegible] গ্রহের সঙ্গে তিনি [illegible] যেমন তিনি হলেন আকাশের দেবতা এবং সূর্য ও চাঁদ হলো তাঁর দুটি চোখ। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রথম দিকে তিনি যীশু খ্রীষ্টের অনুরূপ হিসাবে গণ্য হতেন। কেননা তিনি দেবপুত্র। পরবর্তী সময়ে বাজপাখি মাথাযুক্ত তাঁর এই সমস্ত রূপ দেখা যায়।

সিংহী বা বিড়ালের মাথাযুক্ত দেবী হলেন 'সেখেত'। বা 'সেখমেত'। তিনি হলেন 'প্তা' (Ptah) দেবতার স্ত্রী বা সূর্যের আগ্নেয় শক্তি দেবী। সৌরচক্র এবং পবিত্র কেউটে সাপ (রাজ শক্তির প্রতীক) হলো তাঁর চিহ্ন। 'প্তা' দেবতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি হলো "বিশ্বকর্মা" (great commander of workmen) 'মেমফিসে' (Memphis) যাঁর পূজার প্রবর্তন করেন তিনি এবং খ্রীষ্ট পূর্ব প্রায় দু হাজার বছর আগে মিশরে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ দেবতা।

কুমীরের শরীর বা মাথা যুক্ত দেবতা হলেন 'সেবেক'। ইনি হলেন জল দেবতা। [illegible] [illegible] [illegible] মন্দিরের কথা উল্লেখ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উপজাতিদের কুমীরের প্রতি ভক্তি থেকেই সেবেক দেবতার উৎপত্তি।

[illegible]

'নেহেবকু'। ইনি হলেন সর্পদেবতা, যিনি মৃতের জন্য অনেক কাজ করেন। মিশরের পক্ষী বিশেষ 'ইবিস' (Ibis) বা সারসের মাথা যুক্ত দেবতা হলেন 'থত'। আর শিয়াল বা কুকুরের মাথাযুক্ত দেবতা হলেন 'অনুবিস'। এই দুই দেবতা অর্থাৎ 'থত' এবং 'অনুবিস' মৃত্যুর পর অন্য জগতে মৃত ব্যক্তির কৃতকর্মের বিচার কাজে সহায়তা করেন। বিড়ালের মাথা যুক্ত দেবতা হলেন 'বাস্তেত'। এ ছাড়া হিপোপটেমাসের মাথা যুক্ত দেবী হলেন 'তুয়াত'। ইনি 'সেত' দেবতার স্ত্রী, শিশু জন্মের দেবী অর্থাৎ আমাদের দেবী 'ষষ্ঠির' মত। থীবসে মার্বেল পাথরের একটা মন্দির থেকে গ্রীন ব্যাসাল্ট পাথরের দেবী 'তুয়াতের' একটা মূর্তি পাওয়া গেছে। দেবীর সম্মানার্থে রানী 'নিটোক্রিস' এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

শিয়াল বা কুকুরের মাথাযুক্ত 'অনুবিস' হলেন এক বিচিত্র দেবতা। এইরূপে মূর্তি কল্পনার কারণ হলো মিশরবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, জীবিত কালের মত, মৃত্যুর পর মানুষের একজন সর্বক্ষেত্রে বিশ্বস্ত অনুচরের প্রয়োজন। কুকুর হলো তার অনন্তকালের দেহরক্ষী ও পথ

প্রদর্শক। শিয়াল কুকুরের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এবং কুকুর হলো গৃহ-পালিত প্রাণীদের মধ্যে প্রথম যার ওপর মানুষ দেবত্ব আরোপ করে। হেরোডো-টাসের মতে মিশরবাসীদের মধ্যে এমনও অভ্যাস বর্তমান ছিল যে পোষা কুকুর মারা গেলে সেই কুকুরের মালিক বা পরিবারের সকলে সারা দেহে ক্ষৌর কর্ম চালাত এবং শোক পালন করত। কুকুরের জন্য একটা পবিত্র সমাধি স্থান নির্দিষ্ট করা থাকত। ভারতীয়দের কাছে এ ঘটনা অপরিচিত নয়। দিল্লীতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সৌধের কাছে আর একটা সমাধি চোখে পড়ে। কথিত আছে ঐ সমাধি সৌধটি হুমায়ুন তাঁর প্রিয় পোষা কুকুরের উদ্দেশে নির্মাণ করান। শিয়ালেরা সাধারণত খাবার অন্বেষণে কবর স্থানে ঘুরে বেড়ায় এর থেকে মিশরবাসীদের বিশ্বাস জন্মায় যে "এরাই মৃতের কুকুর", এবং সেই হিসাবে শিয়ালের ওপর দেবত্ব আরোপ করে 'অনুবিস' দেবতার সৃষ্টি। গ্রামের সাধারণ বিশ্বাস যা অতীতেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে যে রাত্রে কুকুর তার ডাকের মধ্য দিয়ে মৃত্যু দেবতার নিঃশব্দ অথচ আকস্মিক আগমন বার্তা ঘোষণা করে। প্রকৃত পক্ষে মৃতের পথ প্রদর্শক 'অনুবিস' হলো মিশরের বন্য কুকুর। আপ-উয়াতের মত 'অনুবিস' দেবতা হলেন তিনি অর্থাৎ 'অনুবিস' দেবতা হলেন সমস্ত পথের অধিকর্তা।' মৃতকে অন্ধকার এবং নির্জন পথ দিয়ে রহস্যময় মৃত্যুর রাজ্যে নিয়ে যান। কিন্তু ফারাও 'তুতেন খামেনের' সময় 'অনুবিস' দেবতার বৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটে। তাঁর দ্ব্যর্থ চরিত্রের পরিচয় এই সময় থেকে। সমাধি সৌধে তিনি হলেন প্রহরী, অর্থাৎ পাশে হয় অর্ধশায়িত অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর অবস্থান। মৃত্যু সম্পর্কিত শাস্ত্রে এইভাবে তাঁর ঘোষণা লিপিবদ্ধ আছে: 'আমি ওসিরিসের (মৃত ফারাও) জন্য অর্থাৎ তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এসেছি।' মিশরবাসীর ধারণা 'অনুবিসের' সাথে কুকুরের সাদৃশ্য বোধের মধ্যে নিহিত সত্য হলো শিয়াল বা কুকুর দিনে বা রাতে সমানভাবে সতর্ক। সেজন্য 'অনুবিসের' কুকুরের মাথাযুক্ত হওয়ার কারণ—সে স্বর্গ এবং নরকের বার্তা-বাহক এবং পর্যায়ক্রমে তার মুখ একবার রাত্রির মত কাল এবং একবার দিনের মত স্বর্ণোজ্জ্বল দেখায়।

'অনুবিসের' চরিত্রের দ্ব্যর্থতার কারণ হলো প্রাচীন মিশরীয় দুই সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ: একটি হলো 'ওসিরিস' যারা পশ্চিম দিকে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে

'সেখমেত' বা 'সেখেত' দেবী বিড়াল অথবা সিংহীর মাথাযুক্ত। ইনি 'তা' দেবতার স্ত্রী, বা সূর্যের শক্তির আরাধ্য দেবী। ইনি 'ইমহোতেপের' মাতা হিসাবেও পূজিতা হন

বিশ্বাসী, এবং অপর সম্প্রদায় যারা পূর্ব দিকের শান্তিময় স্বর্গের অবস্থিতিতে বিশ্বাসী "আকাশের পূর্ব দিকে" যেমন পিরামিডে রক্ষিত গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

'বা' হলো মানব মাথাযুক্ত বাজপাখি মানবাত্মার রূপ এই মনুষ্য মাথাযুক্ত পাখির মূর্তিতে দেখান হয়। মাতৃদেবী 'নুত' অনেক সময় হাথর দেবীর সাথে সমভাবে উল্লিখিত হন। 'নুত' দেবী এক হাতে মৃত ফারাওয়ের প্রসারিত হাতে, অপর হাত দিয়ে 'বা'র মুখে 'জীবন জল' ঢালেন।

মিশরে ষাট শতাব্দী ধরে ইতিহাসের এক প্রবহমান ধারা বয়ে চলেছে এবং এই ধারার প্রবাহ পথে যে ধারণার জন্ম হচ্ছে, দুষ্কৃতিকারী বা "আইন" ভঙ্গকারী কখনও স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে না। কর্মই হলো মুক্তির একমাত্র পথ। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বিচার কক্ষে; এখানে সমস্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতায় ভূষিত হয়ে 'ওসিরিস' সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁর দুই পাশে রয়েছেন দেবীদ্বয়, 'আইসিস' ও 'নেফ্থিস', আর কক্ষের চারদিকে রয়েছেন অন্যান্য দেব-দেবী, যাঁদের নাম বিভিন্ন স্থানের নামের সাথে জড়িত। কাঠিন্য ভরা তাঁদের মুখ। সেই কক্ষের মাঝখানে খুব আলতোভাবে রক্ষিত এক তুলা দণ্ড, যার সাহায্যে মৃতের হৃদয় (মন এবং বিবেক) মাপা হয়। এই মাপের চিহ্ন হলো সত্যের পালকের মাপক। এই পরিমাপের কাজ করেন বাজ-পাখি মাথাযুক্ত 'হোরাস', তাঁকে সহায়তা করেন শিয়াল মাথাযুক্ত দেবতা 'অনুবিস'। সারস মাথাযুক্ত দেবতা 'থত' হলেন এই সমস্ত কাজের বিবরণ লেখক। শেষের এই দেবতার কাজ অনেকটা আমাদের মৃত্যু দেবতা যম রাজার অনুচর 'চিত্রগুপ্তের' মত। এই তুলা দণ্ডের পাশে ওৎ পেতে রয়েছেন হিংসাপরায়ণা এক দানবী—কুমীরের মাথা, জলহস্তীর দেহ আর সিংহীর পা, এই নিয়ে এক বীভৎস মূর্তি এই নারীর। তিনি অযোগ্য অপদার্থকে ভক্ষণ করেন। মৃতের বিচারের পর সে যোগ্য বা সাধু বলে ঘোষিত হলে তার স্থান হয় স্বর্গে, আর দুষ্কৃতিকারী বা অপদার্থ বলে ঘোষিত হলে এই দানবীর দ্বারা ভক্ষিত হয়। অথবা, তাকে কাল শুয়োরে রূপান্তরিত করা হয়। এই কাল শুয়োর মিশরবাসীর কাছে ঘৃণ্য জীব বলে বিবেচিত এবং শাস্তি প্রাপ্তির স্থানে বা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সেই কাল শুয়োরকে (অপদার্থ ব্যক্তির রূপান্তর) নিশ্চিহ্ন করা হয়।

মিশরবাসীর জন জীবনে, বিভিন্ন উপ-জাতি ও জাতির মধ্যে আবহমান কাল ধরে (কয়েক শতাব্দী অন্তর) সংমিশ্রণের ফলে তার দেব-দেবীর মূর্তিতে, ধর্ম বিশ্বাসে এবং পূজা পদ্ধতিতে এসেছে নতুন চিন্তা, আর সেই ধারার সঙ্গে এসেছে তাদের প্রচলিত প্রবাদ কাহিনী. সেগুলি আবার এখানে স্থান, সময় ও রুচির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হয়েছে। অনুভূতি হলো যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে এবং মনের আদিম বৃত্তিগুলি আজও অবচেতনতার মধ্যে আমাদের বর্তমান ধারণাগুলিকে শাসন করে চলেছে।*

* চিত্রগুলি কমলকুমার দে ও লেখক কর্তৃক অংকিত।

একমাত্র মল্টটনিক যাতে আছে ৬টি ভিটামিন—ভিটামিন বি-১২ সমেত
সুস্বাদু
অস্টোমল্ট
বিশুদ্ধ কমলার রসে ভরা
যোগায় বাড়তি উৎসাহ
যোগায় বেশী ক্ষিদে
যোগায় সুস্থ রক্ত
অস্টোমল্টে আছে ভিটামিন-এ উজ্জ্বল চোখের জন্য (ওর উজ্জ্বল চোখ এখন দুষ্টুমিতে ভরা)
অস্টোমল্টে আছে আয়রণ,— যা সুস্থ রক্ত গ'ড়ে তোলে (ওর গাল এখন আর আগের মত পাংশুটে নয়)
অস্টোমল্টে আছে রিবোফ্লাবাইন আর বি-১২—যা ক্ষিদে বাড়ায়: বি-১ হজমে সাহায্য করে (ইদানিং ও দু'বার ক'রে চেয়ে খাচ্ছে)
অস্টোমল্টে আছে মল্ট উৎসাহ আর শক্তি বাড়াতে (ও এখন কত বেশী প্রাণবন্ত, আগের চেয়ে ওর ঘুমও ভাল হয়)
Ostomalt
র
অস্টোমল্ট
পুষ্টি আর শক্তির জন্য সত্যি অতুলনীয়!
র তৈরী

ভারতের খাদ্যসমস্যার বর্তমান অবস্থা

ভারতে জমি থেকে ধান সংগ্রহ করার পালা শেষ হয়েছে। খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সব রাজ্যে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এ বছর পশ্চিমবঙ্গে আশাতিরিক্ত ধান উৎপাদিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বন্যা এবং ঝড়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গত বছরের অনুপাতে এই মরসুমে খাদ্য-সামগ্রীর উৎপাদন শতকরা একভাগ কমেছে। তবুও সমগ্র ভারতে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন যে সামগ্রিকভাবে ১০০ মিলিয়ন টনের উপর আছে, এবং পর পর তিনবছর ধরে যে খাদ্য-সামগ্রীর উৎপাদন মোটামুটিভাবে একটি পর্যায়ে অবস্থিত আছে, এটা খুবই আশার কথা। কিন্তু খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে হলে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। ১৯৭১-৭২ সাল থেকে যদি পাব্লিক ল' ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রীর আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে খাদ্য-সামগ্রীর ক্ষেত্রে যে ঘাটতির সৃষ্টি হবে তা পূরণ করার ব্যবস্থা করা দরকার। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চ-ফলনশীল বীজ সরবরাহ করে উৎপাদন বাড়াবার প্রকল্প (High yielding variety programme) গৃহীত হয়েছে। যদি এই সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ এবং জলসেচের ব্যবস্থা থাকে তবে ভারতের পক্ষে "সবুজ বিপ্লবের" পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। যেদিন ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে এবং খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করে, ভাল অর্থ রোজগার করতে পারবে সেদিনই "সবুজ বিপ্লবের" সার্থকতা বোঝা যাবে; তার আগে নয়।

খাদ্য সমস্যার একটি বিশেষ দিক হল সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা। ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া নিজের ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ করছে, কারণ খাদ্য সামগ্রীর সংগ্রহ-দাম বাড়িয়ে দিয়ে রেশনিং ব্যবস্থায় চালের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে খোলা বাজারেও চালের দাম যথেষ্ট বেড়েছে। কৃষকদের আর্থিক অবস্থা এজন্য ভাল হওয়ার কথা। কিন্তু সরকার যদি বড় বড় কৃষকদের বাড়তি আয়ের উপর কিছু লেভি ধার্য করে সংগৃহীত অর্থ কৃষির উন্নতির

জন্যই খরচ করতে পারতেন তবে হয়ত অবস্থার আরও উন্নতি হত। দেশে খাদ্য-শস্যের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা এখনও সর্বাংশে সফল হয়নি। খাদ্য সামগ্রীর দাম যে বেড়ে যাচ্ছে, এটা তারই একটি পরিণতি। কৃষির উন্নতির জন্য, বিশেষ করে মাঠে চাষের উন্নতি করার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি উদারহস্তে ঋণ দিতে শুরু করেছে বটে, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধের সম্ভাব্যতা নিয়ে আশংকার সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি ক্ষেত্র-বিশেষে ফুড কর্পোরেশনের মাধ্যমে এবং গ্রামীণ সমবায় ব্যাংকগুলির মাধ্যমেও তাদের ঋণ-দান নীতি প্রয়োগ করতে পারে।

খাদ্য সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য এখন প্রয়োজন জমিতে ভাল বীজ এবং উপযুক্ত পরিমানে সার প্রয়োগ করা যাতে উৎপাদনের হার আরও বর্ধিত হয়। তাছাড়া পতিত জমি উদ্ধারের কাজে ও ট্র্যাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ করার ব্যাপারে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে ফুড কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি, উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। ফুড কর্পোরেশনের দায়িত্ব যেন শুধু খাদ্য সংগ্রহের মধ্যেই শেষ না হয়।

ইটালী ও ভারত—দুই অর্থনীতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে অন্যান্য দেশের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করলে আমাদের দেশের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে আরও ভাল করা যায় কিনা চিন্তা করা যেতে পারে। পশ্চিমে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ইটালী অন্যান্য দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম উন্নত, যদিও এই দেশকে অনগ্রসর দেশ কোন অবস্থাতেই বলা যায় না। ইটালীর সঙ্গে ভারতের কাঠামোগত সাদৃশ্য হচ্ছে—উভয় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দ্বিধাবিভক্ত (Dualistic Economy)। ইটালীর উত্তর অংশ শিল্পোন্নত এবং দক্ষিণ অংশের তুলনায় অনেক অগ্রসর, আবার দক্ষিণ অংশ প্রধানত কৃষি-প্রধান। উত্তর ইটালীর জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ভারতীয় মুদ্রায় ৯০০ টাকা (বর্তমান মূল্যান্তর অনুযায়ী); দক্ষিণ ইটালীর জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ভারতীয় মুদ্রায় ৫০০ টাকা (বর্তমান মূল্যান্তর অনুযায়ী) ভারতের জনপ্রতি জাতীয় আয় বর্তমান মূল্যান্তর অনুযায়ী দক্ষিণ ইটালীর কাছাকাছি। ভারতেও আমরা অর্থনৈতিক কাঠামোর দুইটি অংশ দেখতে পাই,— একটি হচ্ছে সুসংগঠিত উন্নত কাঠামো, যেমন, বোম্বে, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী, কানপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহর অথবা এই শহরগুলি ছাড়া অপেক্ষাকৃত উন্নত শহর অঞ্চল; আরেকটি হল গ্রামাঞ্চল, যেখানে মানুষ কোনপ্রকারে বেঁচে আছে, যেখানে কোন শিল্প নেই, শুধু কৃষির উপর নির্ভর করেই গ্রামবাসীদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এই দুই দেশের মধ্যে আরেকটি সাদৃশ্য হল, উভয় দেশেই মিশ্র-অর্থনীতি (Mixed Economy) চালু হয়েছে। কিন্তু এই দুই দেশের মিশ্র-অর্থনীতির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ইটালীর সরকার দেশের শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। চেম্বার অফ কমার্সও সরকারী-ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। প্রতি প্রদেশে বিদেশী টুরিস্টদের আগমন এই দেশের অন্যতম শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই শিল্পের উপরেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ, পুরো মাত্রায় আছে। ইটালীর সরকারী ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হল Institute for Industrial Reconstraction বা শিল্প পুনর্গঠন সংস্থা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই দেশ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই দেশের সামনে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় তা হল শিল্প পুনর্গঠনের এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সমস্যা। তখনই সরকারী মালিকানায় এই সংস্থা গঠন করা হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যেও এই সংস্থা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে থাকে। ইটালীর ষ্টক এক্সচেঞ্জেও এই সংস্থা অংশগ্রহণ করে থাকে। সমগ্র ইটালীয় অর্থনীতির একটি বড় অংশ এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন। দেশের লোহা ও ইস্পাত শিল্পের শতকরা ৬০ ভাগ সরকারের মালিকানাধীন। গৃহ-নির্মাণের কাজও সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ভারতের ক্ষেত্রে সমস্যাটি একটু স্বতন্ত্র। ভারতের সমস্যা যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির পুনর্গঠন করা নয়; ভারতের সমস্যা হল দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা এবং দেশের মূলধন-সৃষ্টির হার (Rate of Capital formation) দ্রুত বৃদ্ধি করা। ভারতের লোহা ও ইস্পাত শিল্পের অধিকাংশই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। বেসরকারী ক্ষেত্রের ইস্পাত কারখানাগুলিও সাধারণভাবে সরকারী নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; তাছাড়া বিদেশী সরকারের সহায়তায় সরকারী মালিকানায় চারটি ইস্পাত কারখানা আছে। ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নে অর্থ সাহায্য করার জন্য যে অর্থ সরবরাহ সংস্থাগুলি (Financial Institutions) স্থাপিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে শুধু একটি ব্যতীত (শিল্প-ঋণ ও বিনিয়োগ সংস্থা বা Industrial Credit and Investment Corporation) অন্যগুলিতে সরকার নিজেও অংশীদার। শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাংকও সম্পূর্ণভাবে সরকারের মালিকানাধীন। তাছাড়া ১৪টি বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। ইটালীর কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের মালিকানাধীন। অন্যান্য ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত নয় বটে,—কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির লক্ষ্য অনুসরণ করে তাদের কাজ করতে হয়। কৃষিক্ষেত্রে ভারতের পুনঃ ঋণ সরবরাহ সংস্থা (Agricultural Re-finance Corporation) রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইটালীর কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির দায়িত্ব, অর্থ সরবরাহ থেকে শুরু করে কৃষি-সামগ্রী বিক্রয়করণ ব্যবস্থা পর্যন্ত সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ভারতের স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু, ইটালীতে রপ্তানি-বাণিজ্য সাধারণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের (European Common Market) সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে ইটালীর সরকারই বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করেন।

দেখা যাচ্ছে, দেশের অর্থনীতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইটালীতেও যথেষ্ট আছে। সে দেশেও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়েছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। যদিও চোরা-কারবারের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য ইটালীর সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। এই ব্যবসায় ইটালীতে দারুণভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বেসরকারী ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েও জাতীয় অর্থনীতির উপর বেসরকারী ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়া যাতে প্রতিকূল না হয় সেজন্য ইটালীতে সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা দেখা যায়। ভারতের পক্ষে এ জিনিসটা থেকে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। যদিও ভারতের শিল্প-নীতিতে (১৯৫৬ সালের নীতি) সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে, তবুও ভারতে এই সহযোগিতার দৃষ্টান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। সবদিক বিবেচনা করে বলা যায়, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পদ্ধতি বহু উন্নতিকামী দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পদ্ধতি থেকে উন্নত। শুধু দুঃখ এই, ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় সাফল্য থেকে ব্যর্থতার বোঝা বেশি। ভারতকে যেভাবে জনসংখ্যার চাপে থাকতে হচ্ছে, তাতে বেকার সমস্যা ও খাদ্য-ঘাটতি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে দেশ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে পারে ভারতে তার অভাব যথেষ্ট বেদনা-দায়ক।

সুব্রত গুপ্ত

দরবার নটী কলাবন্ত

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের তানসেন সম্পর্কিত উক্ত প্রবন্ধটিতে সম্রাট আকবরের চরিত্র ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে লেখক যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস তা স্বীকার করে না। এ বিষয়ে শ্রীঅসিত-কুমার দলুই-এর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক-মত। মোগল সম্রাটদের মধ্যে শুধু কৃতিত্ব ও কীর্তিতে নয়, উদার সর্বভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং অকুণ্ঠ ও বলিষ্ঠ শিল্পোৎ-সাহিতায় তিনি ছিলেন একেবারে অনন্য। এমন কী অসিতবাবু যে Vincent Smith-এর সপ্রশংস উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, অনেকের মতে সেই Smith সাহেবও এই মহান মোগল সম্রাটের প্রতি সুবিচার করেননি। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক Lawrence Binyon যথার্থই বলেছেন Smith-এর Akbar the Great Mogul—'is sometimes curiously unjust to its hero.'

দিলীপবাবু তাঁর প্রবন্ধটিতে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, এর মধ্যে কয়েকটি ভ্রমাত্মক।

তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, ১৮ বছর বয়সে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে আগ্রা থেকে আকবর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছেন ফতেপুর সিক্রীতে (১৫৬০)। মোগল যুগের ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে ফতেপুর সিক্রিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় যুবরাজ সেলিমের জন্মের পর—১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে।

অন্যত্র দিলীপবাবু লিখেছেন—আকবর ঘাতকের সাহায্যে বৈরাম খাঁর মৃত্যুসাধন করেন। প্রকৃত ঘটনা হলো—মুবারক খাঁ নামে একজন পাঠান মাছিওয়ারার যুদ্ধে নিহত তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই বৈরামকে হত্যা করে। মুবারক যে আকবরের নিয়োজিত ছিল এই তথ্য মুখোপাধ্যায়মশাই কোথা থেকে পেলেন বুঝতে পারছি না।

দিলীপবাবু বদায়ুনীকে আকবরের দরবারী ইতিবৃত্ত লেখক বলে অভিহিত করেছেন। আবুল ফজল বা নিজামুদ্দিনকে দরবারী ইতিবৃত্ত লেখক (Court historian) আখ্যা দেওয়া যেতে পারে বদায়ুনীকে এই পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ বদায়ুনী ছিলেন আকবরের রাষ্ট্র-নীতির এক কঠোর সমালোচক এবং সেই কারণেই তাঁর ইতিহাস প্রকাশ করা হয়েছিল সম্রাটের মৃত্যুর পর।

তানসেন ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করে-ছিলেন কী না দিলীপবাবু তার বিশদ আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে Smith-এর এই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য: The professional artists as a Muhammedan court often found it convenient and profitable to conform to Islam.

দিলীপবাবু তাঁর প্রবন্ধে তানসেনের একটি তৈলচিত্র সন্নিবেশিত করেছেন। সম্ভবত এটি তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বেকার ছবি। ভিনসেন্ট স্মিথের Akbar the Great Mogul-এর ৪২২ পৃষ্ঠায় তানসেনের একটি ছবি রয়েছে। মনে হয় এটি তাঁর উত্তরজীবনের।

তানসেন-মেয়ের উপাখ্যান প্রসঙ্গটি কোনও সমসাময়িক ইতিবৃত্তে উল্লিখিত হয়নি এ কারণে এটির সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। এটির উৎস সম্বন্ধে দিলীপবাবু যে তথ্য উপস্থাপিত করেছেন তা খুব উৎসাহোদ্দীপক নয়। তবে মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজলের তানসেন প্রশস্তির আন্তরিকতা ও সত্যতা সর্বজনগ্রাহ্য। আবুল ফজলের অভিমতের ইংরাজী অনুবাদ হলো এই—A singer like him has not been in India for the last thousand years. সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁর আত্ম-জীবনীতে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
বারাসত

॥ ২ ॥

গত ২৬।৭।৭৭ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

অনন্যসাধারণ ও তথ্যমূলক 'দরবার নটী কলাবন্ত' শীর্ষক রচনার জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ-করে দরবারী কানাড়া রাগ প্রসঙ্গ—এই রাগটি রাজারাম বাঘেলার দরবারে সৃষ্ট (মুঘল দরবারে নয়) এ তথ্য ইতিপূর্বে কোথায়ও প্রকাশ পায়নি, বরং তানসেন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরাও এই শ্রেষ্ঠ রাগটিকে আকবর বাদশার দরবারের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে প্রচার করে এসেছেন। তাছাড়া তানসেন যে হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে পুরো-পুরি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি—এটাও আমাদের কাছে একটি নতুন সংবাদ এবং ইতিহাসের পক্ষেও তাৎপর্যপূর্ণ।

এইরূপ সুন্দর এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা প্রকাশের জন্য দেশ পত্রিকার গ্রাহক এবং পাঠক হিসেবে সত্যিই আমরা গর্বিত।

নির্মল বিশ্বাস
মধ্যমগ্রাম

পূবের আকাশে সূর্য

স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পূবের আকাশে সূর্য' শীর্ষক সুলিখিত রচনাটি প্রকাশ করার জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। শেখ মুজিবর পাকিস্তানের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আজ মহানায়করূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কোটি কোটি জনতার হৃদয়ের রাজা আজ তিনি। তাঁর সম্পর্কে দৈনিক পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে আলোচনা হয়েছে কম নয়। আওয়ামী লীগ তাঁদের ছয়-দফা দাবি এবং জয় বাংলা আন্দোলন সম্পর্কে সকল ভাষ্যকারই অল্প বিস্তর আলোচনা করেছেন। সেদিক দিয়ে স্মৃতিময়বাবুর রচনাটি কিছুটা ভিন্ন রসের। শেখ মুজিবরের একটি ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে বিধৃত। সেই সঙ্গে এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে '৫২ সাল থেকে '৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বঞ্চিত ও হতাশাচ্ছন্ন সমাজ-জীবনের কথা, সুবিধাবাদী এবং আপস-কামী নেতৃত্বের কথা এবং সর্বোপরি দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী।

আমরা, যারা জন্মভূমি সূত্রে পূর্ব-বাঙলার সন্তান তাদের কাছে শেখ মুজিবর আজ একটি অতি প্রিয় নাম। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু উচ্ছ্বাস আর আনন্দ প্রকাশ করতে বড় ভয় হয় পাছে রাজনীতি-ময়দানের ধুরন্ধর খেলুড়েরা এই সরল আবেগ প্রকাশের মধ্যে 'অন্য কিছু' আবিষ্কার করে ফেলেন। তার ওপর আর এক আশঙ্কা সম্প্রতি যোগ হয়েছে। পূর্ববঙ্গের একজন বন্দী বিপ্লবী জননেতা, বোঝা গেল না কেন হঠাৎ পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ-নৈতিক মিলনের আগাম ডাক দিয়ে রেখেছেন।

পূর্ববঙ্গে যা' ফেলে এসেছি তা' ফিরে পাবো, এমন অলীক আশা হৃদয়ে নেই। দুই বাঙলা আবার এক হয়ে সোনার বাঙলায় রূপান্তরিত হবে এমন সুখ-ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে যারা কাল গুণছেন তাঁদের বিশ্বাসের শক্তির উৎস কোথায় তাঁরাই জানেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি খুঁজে পায় না এমন দুঃসাহসিক আকাঙ্ক্ষা উচ্চারণের সার্থকতা কোথায়। ভুলের মাশুল অনেক গুণেছি, আর নয়। স্বাধীনতার বেদীমূলে সবচেয়ে বেশি রক্ত ঢেলেছে যে পূর্ব বাঙলা সেই পূর্ব বাঙলার মা বোনেরা আজও শেয়ালদা স্টেশনে লক্ষ দৃষ্টির করুণার কাছে আবরুর বেড়াহীন আকাশতলে রাত্রি যাপন করছেন। যখন দেশ ভাগ হয়েছিল তখন কোথায় লুকিয়ে-ছিলেন এইসব কল্পনা বিলাসী শৌখীন বুদ্ধিজীবির দল? দেশ ভাগ রুখতে তাঁদের বিপ্লবী মগজকে কাজে লাগিয়েছিলেন কি?

তবু কেন পূর্ববঙ্গ নিয়ে আমাদের মধ্যে এতটা উৎসাহের প্লাবন আর শেখ মুজিবরের বিপুল সাফল্যে আমাদের গর্ব? কারণ বোধ হয় একটাই—উগ্র ধর্মান্ধতার আবরণটুকু বাদ দিলে এপারে ওপারে আমরা সবাই অভিন্ন, আমরা বাঙালী। আমাদের মুখের ভাষায়, সামাজিকতায়, কৃষ্টি-সভ্যতায়, আহার বিহারে পার্থক্য কোথায়? আর মন, তাও কি এক তারে বাঁধা নয়? পদ্মাপারের তরুণ কবি নিয়ামত হোসেনের ভাষায় বলতে পারি :
'রাম ও রহিমকে কেটে কুচি কুচি করলেও
দেখবে তুমি, বাঙলা ভাষা—'

আর কিছু নয়, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াতের পথটুকু উন্মুক্ত হলেই আমরা কৃতজ্ঞ হবো। দু' বছর চার বছর অন্তর একবার হারানো জন্মভূমির ধুলো মাটি গায়ে মাখতে পারবো, এও কি কম সৌভাগ্যের কথা? পদ্মা-মেঘনা-শীতলক্ষ্যার বুকে জ্যোৎস্নারাতে অপরূপ স্টীমার যাত্রা, গোয়ালন্দ স্টেশনঘাটের পাইস-হোটেলের লোকজনের আকুল আহ্বান, পদ্মানদীর মাঝি আর তিতাসের মালো, সারি-জারি-ভাওয়াইয়া, জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র শতেক ছবি : স্বপ্নের দৃশ্য হয়ে বার বার হাতছানি দেয়। শেখ মুজিবর যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে, এমনটা আশা করা হচ্ছে। আমরা আশাবাদী। কিন্তু শেখ মুজিবই কি শেষ কথা? জনাব জুলফিকার অলী ভুট্টোর দিকেও তাকাতে হবে বইকি। তাঁর ভারত-প্রীতিও বিশ্বখ্যাত। রাষ্ট্রসংঘের বৈঠক চলা-কালে ভারতের প্রতিনিধিগণের প্রতি তাঁর 'বিশেষণ' প্রয়োগের কথা এত সহজে ভুলতে পারি না যে। তাই, ধীরে বন্ধু, ধীরে। যবনিকা উত্তোলনের পূর্বেই হাততালি নয়।

অবশেষে প্রবন্ধের দু' একটি ক্ষুদ্র প্রমাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্মৃতিময়বাবু লিখেছেন, জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ অজিতকুমার গুহ। সম্প্রতি লোকান্তরিত পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজের অতি-প্রিয় সংগ্রামী বন্ধু অধ্যাপক গুহ জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, অধ্যক্ষ হননি। পরবর্তী কালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। অন্যত্র তিনি লিখেছেন চাঁদপুরের সিহানুর রহমান চৌধুরী। ঐ নামটি হবে মিজানুর রহমান চৌধুরী। মিজানুর রহমান হচ্ছেন শেখ মুজিবের অন্যতম প্রিয় সাথী এবং নির্ভীক জননেতা। বহুবার তিনি পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন।

স্মৃতিময়বাবু শেখ মুজিবরের কথাগুলো বলিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ভাষায়, যা তিনি কখনো বলেন না। প্রবন্ধকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্যই কি এই প্রয়াস? পূর্ব বাঙলার জননেতার মুখে পূর্ব বাঙলার চলতি ভাষাটাই কি অধিকতর স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য হতো না? যাই হোক, এই সামান্য ত্রুটিটুকু বাদ দিলে সমগ্র প্রবন্ধটি প্রকৃতই একটি উজ্জ্বল রচনা, যা সকল সচেতন পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

মনোজ সাহা
মধ্যমগ্রাম।

॥ ২ ॥

গত ২৬ ডিসেম্বরের সংখ্যায় শ্রীস্মৃতি-ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পূবের আকাশে সূর্য' সময়োপযোগী রচনাটি পড়ে ভাল লাগল। নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ মুজিবর বিপ্লব আনতে চলেছেন। ছয়-দফার অন্তত দু-তিনটি দফা শাসনতন্ত্রে ঠাঁই পেলেই পূর্ব-বাঙলার মানুষ দীর্ঘদিনের শোষণের হাত থেকে রেহাই পাবেন। শেখ মুজিবরের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পিছনে কী-রহস্য রয়েছে এই প্রশ্ন মনে জাগে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করেছেন; মুজিবর রহমানের সত্যিকার পরিচয় তুলে ধরেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে সবিনয়ে আর কয়েকটি কথা যোগ করতে চাই। শেখ মুজিবর রহমানের সত্যিকার পরিচয়, তিনি 'বঙলার বন্ধু'। ছয় দফা তো বটেই, আমার মনে হয়, ছয় দফার থেকেও বেশি-'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' এবং 'জয় বাংলা' স্লোগান তাঁকে এতখানি জনপ্রিয় করে তুলেছে। শেখ মুজিবর রহমান ছাত্র মহলে বরাবরই প্রিয়, কিন্তু এমন জনপ্রিয় আগে তিনি ছিলেন না। এর আগেও তিনি এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ অনেক বেশী দফা নিয়ে নির্বাচনে নেমেছিলেন, জয়ীও হয়ে-ছিলেন। তবে এবারকার মতো নন। এবারে পূর্ব-বাঙলার মানুষ এমন বিপুলভাবে তাঁকে সমর্থন করেছেন, এই জন্যেই যে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' এবং 'জয় বাংলা' ধ্বনি তাদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে

পেরেছে, হ্যাঁ, শেখ মুজিবর সত্যিই বাংলার বন্ধু।'

পরিশেষে স্থানে স্থানে কয়েকটি নির্ভীক ভাষণের জন্য শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৪০

বিশ্ববিজ্ঞান

১০ পৌষ, ১৩৭৭ সংখ্যার দেশে ৮০৩ পৃষ্ঠায় বিশ্ববিজ্ঞান প্রবন্ধের অন্তর্গত 'লুনোখোদ-১ গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে' ছবিটিকে এ পি এন রেডিও ফটো বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ঐ একই ছবি ১৯৭০/১লা ডিসেম্বরের ৫৪-সংখ্যক 'সোভিয়েত সমীক্ষা'র মলাটের পেছনের পৃষ্ঠায় রয়েছে—যেখানে ছবির পরিচিতিতে বলা হয়েছে 'চাঁদের বর্ষণসমুদ্র এলাকায় ধীর অবতরণের পর লুনা-১৭ থেকে লুনোখোদ-১ গড়িয়ে নীচে নামছে (একজন শিল্পীর কল্পনায়)'।

দেশের প্রদত্ত চিত্র-পরিচয়ে কিন্তু ছবিটি যে বাস্তব অবস্থার ফটোচিত্র নয় সে বিষয়ে ভুল বুঝবার অবকাশ রয়েছে।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বহরমপুর

॥ ২ ॥

গত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের 'দেশ'-এ বিশ্ববিজ্ঞান প্রসঙ্গে 'অনু-জীববিদ্যা' কথাটি (৬৮৬ পৃঃ) Microbiology'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনুমান করি। Microbe-এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে জীবাণু এবং তদনুসারে Microbiology'র প্রতিশব্দ হিসেবে জীবাণুবিদ্যা কথাটি অসার্থক নয়। আশা করি বিশ্ববিজ্ঞান প্রসঙ্গের লেখক এই বিষয়ে একমত হবেন।

উল্লিখিত নিবন্ধে অ্যান্টিবাইওটিক-এর কোনও বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়নি। উক্ত শব্দটির কোনও বাংলা পরিভাষা সংকলিত হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে ঐ শব্দটির পরিভাষা হিসেবে জীবঘ্ন কথাটি ব্যবহার করা যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

দিলীপকুমার দাস
সোদপুর।

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা

১০ই পৌষ, ১৩৭৭-এর 'দেশ' পত্রিকায় বন্ধুবর শিবরাম চক্রবর্তীর 'ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা' অভিধাযুক্ত স্মৃতিকথায় তাঁর 'বংশধারার বিবরণ' (পৃ ৭৯৩-৯৪) পড়ে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। অধুনালুপ্ত ভারতজ্যোতি পত্রিকার সঙ্গে একদা শিবরামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নিয়মিতভাবে ঐ পত্রিকায় দুটি হাস্যরসাত্মক ফিচার লিখতেন শিবরাম। প্রায়ই তখন তিনি আসতেন ভারতজ্যোতি কার্যালয়ে। আমি তখন ভারতজ্যোতির অন্যতম সম্পাদক।

ভারতজ্যোতির প্রধান সম্পাদক শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় তখন গৌড়ের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছিলেন। বাংলা দেশের বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির ইতিহাস, কুলজী গ্রন্থ ইত্যাদিও ছিল তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। একদিন শিবরাম মুখোমুখি বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করছেন হঠাৎ শৈলেনবাবু বললেন, "আচ্ছা, শিবরামবাবু, বলুন তো, আপনাদের বংশের আদিপুরুষ কে? আপনি কার বংশধর।"

শিবরাম কথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে আছেন। নীরবতা ভঙ্গ করে শৈলেনবাবু বললেন—"নিজের বংশপরিচয় সম্বন্ধে আপনাদের কি কোনো কৌতূহল আছে? আমি তথ্যান্বেষণ করতে গিয়ে আপনাদের বংশের আদিপুরুষের নাম জানতে পেরেছি। আপনি হচ্ছেন ধরাধরের বংশধর।"

চটপট জবাব দিলেন শিবরাম—"তা ঠিকই বলেছেন। সেই জন্যেই তো ধরাধরি করেই জীবনটা গেল।"

নলিনীকুমার ভদ্র
কলকাতা-৯

বর্তমান কলকাতা

একটা গল্পের মাধ্যমে লেখক শ্রীঘোষ বর্তমান কলকাতায় জনজীবনের নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন।

বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসে, বর্তমান কলকাতার তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন-জীবনের যে রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, একি আমাদের কাম্য?

আজ আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়েছি। অন্যায় কাজের প্রতিবাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। বিবেক হারিয়ে গেছে হৃদয়ের কোন অন্ধকার কোনে। শ্রীঘোষের লেখনী যে অতি বাস্তব, তার জন্যে একটা সত্য ঘটনায় অবতারণা করছি।

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে, কোন এক বাসে বাসভর্তি মানুষের মধ্যে, দুটি যুবক একটি মেয়েকে অনর্থক অসম্মানজনক কথা বলতে দেখে, আমি বিস্মিত হয়ে যাই।

এই বিংশ শতাব্দীর এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আলোকউজ্জ্বল সমাজ চেতনার মধ্যে, প্রকাশ্য দিবালোকে, বাস ভর্তি মানুষের মধ্যে, দুটি যুবকের একটি তরুণীকে উপযুক্ত কারণ ছাড়া অসম্মানজনক উক্তি আমাকে বিস্মিত করে দেয়।

আরও বিস্মিত হই, বাসভর্তি মানুষ এই অসম্মানজনক উক্তির প্রতিবাদ না করে—

উক্তির শব্দের শব্দালংকার ও অর্থালংকার নিয়ে রঙ্গমঞ্চের কোন নাটকের হাস্যরস উপভোগ করবার মত, মুখের বত্রিশটা দাঁত বের করে হাসছেন, দেখে!...

শুধু কলকাতায় নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে, জন-জীবনে নৈতিকতার অবলুপ্তি ঘটেছে। মানুষে মানুষে মিল নেই। কারও বিপক্ষে কেউ এগিয়ে যায় না। বাঙালীর ঐতিহ্যের একটা চিরন্তন প্রথা একান্নবর্তিতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বুদ্ধিজীবিরা উদাসীন।

অবক্ষয়ের করাল গ্রাস ধসিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জন-জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিত।

এর থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রীতিপূর্ণ মমতায় গড়ে তোলা দরকার।

সমকালীন জন-জীবনের বাস্তব চিত্রের জন্য, লেখক এবং 'দেশ' পত্রিকার পরিচালক মন্ডলীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অতুলচন্দ্র মৈত্র
কিরিষুরু, বিহার।

হিন্দু বিবাহ

গত ৩রা পৌষ ১৩৭৭ তারিখে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় ফাদার দাঁতিয়েন তাঁহার ডায়েরীর ছেঁড়া পাতায় প্রশ্ন করেছেন 'বাংলা দেশের বহু হিন্দু বিয়ে দেখেছি... জানতে চাই ঠিক কোন পুণ্য মুহূর্তে, কোন মন্ত্রের উচ্চারণে হিন্দু বিবাহ সম্পাদিত হয়।'

এই প্রশ্ন অনেক হিন্দুও করেন।

The Right Honourable Sir Dinshah Fardunji Mulla Kt. C.I.E. M.A. L.L.D. তাঁহার সর্বজন স্বীকৃত Principles of Hindu Law গ্রন্থে লিখেছেন,—

There are two ceremonies essential to the validity of a marriage, whether the marriage be in the Brahma form or Asura form, namely—

(1) invocation before the sacred fire, and

(2) Saptapadi, that is, the taken of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire.

The marriage becomes completed when the seventh step is taken, till then it is imperfect and revocable.

[See. Brindaban vs. Chundra (1886) 12. Cal. 140,143]

সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়
দত্তপুকুর।

কেন এই অস্থিরতা

৩রা পৌষ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় 'কেন এই অস্থিরতা' সম্বন্ধে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের আলোচনার সারমর্ম পড়লাম। মনে হল বুদ্ধিজীবীরা এই বহুমুখী সমস্যাটির অন্যতম কেন্দ্র-বিন্দুটিকে সজ্ঞানে উপেক্ষা করেছেন। কেবলমাত্র অধ্যাপক অম্লান দত্ত এ বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের এই অস্থিরতার অন্যতম মূল কেন্দ্রবিন্দু দেশের অস্থির তরুণ সম্প্রদায়। সব দেশের সব কালের তরুণরাই স্বভাবত আদর্শবাদী, জীবনে তাদের মনোমত আদর্শ অনুসরণ করবার জন্য উন্মুখ। চিন্তা করতে হবে, আমরা বিগত তিন দশক ধরে আমাদের তরুণদের জন্যে কি আদর্শ স্থাপন করেছি? স্বাধীনতার পর যে অনাগতের প্রত্যাশায় সারা দেশ অধীর হয়ে ছিল, সে প্রত্যাশা আমরা কতটা পূর্ণ করেছি। কংগ্রেসী শাসনের একটা দীর্ঘ বন্ধ্যা যুগ কেটে গেছে। কংগ্রেসের পতনের পর বামপন্থী দলগুলির প্রতি যে আস্থা স্থাপন করা হয়েছিল দলগুলি সে আস্থার সম্মান কতখানি রক্ষা করেছেন? আজকের যারা অতি-বিপ্লবী তরুণ, তারা এই বামপন্থী দলগুলিরই আশাহত প্রাক্তন সদস্য বা কর্মী।

শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রই বা ধরি কেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কি আদর্শ স্থাপন করেছি? সব চেয়ে বড় কথা কয়জন সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্‌ বা রাজনৈতিক নেতা সর্বত্যাগের আদর্শ নিজের জীবনে আচরণ করে বলেছেন, "আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ।" মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথাও খুঁজে বার করা কঠিন।

স্বাধীনতার পর যাদের জন্ম, বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের পরই তারা আদর্শের ক্ষেত্রে সামনে পেয়েছে এক বিরাট শূন্যতা। ফলত ধারে কাছে আমদানি করা যা পেয়েছে অন্ধের মত তাই আঁকড়ে ধরেছে। তাদের দোষত্রুটি ধরার আগে আমাদের আত্মসমীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন সব থেকে বেশী। মনুসংহিতায় একটা শ্লোক আছে:—

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্‌ পৃথিব্যাং
সর্বমানবাঃ॥

অর্থাৎ এই দেশের প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধেরা পৃথিবীর সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞানের অছি (Trustee)। তাঁদের আচরণ দেখে পৃথিবীর সমস্ত মানব-সমাজ আদর্শ শিক্ষা করবে। আমাদের দেশের প্রবীণরা, যাঁরা শতমুখে তরুণদের নিন্দায় মুখর, তাঁরা কি নিজেদের আচরণের মধ্যে এই শাস্ত্রনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেছেন?

রেবা চক্রবর্তী
বার্নপুর

জীবন্মুক্ত গুরুদয়াল

গত ২৬শে ডিসেম্বর 'দেশ' পত্রিকাতে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লিখিত "জীবন্মুক্ত গুরুদয়াল" প্রবন্ধটি সত্যি সুন্দর এবং অভিনব। একজন মহাপুরুষের জীবনী এমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হওয়ায় অনেক অমূল্য তত্ত্ব জানতে পারলাম। তবে শ্রীরায়ের শেষ অধ্যায়ে লিখিত "দয়ালদা এক ফোঁটা ওষুধ খাননি—হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতেন শুধু ডাক্তারের মান রাখতে, কারণ কে না জানে হোমিওপ্যাথি বটিকায় ক্যান্সার সারে না"—এই অংশটি পড়ে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। তাঁর মতন ঋষিতুল্য জ্ঞানী কি করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। কেননা বর্তমানে ক্যান্সার চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। ক্যান্সার রোগের কারণ সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক দর্শন যে নিগূঢ় তত্ত্ব পোষণ করেছে আজ বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ ঐদিকে অনুপ্রাণিত হ'য়ে গবেষণা করছেন। বহু ক্যান্সার রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করেছেন এমন অনেক নজির আমার কাছে আছে। তাই মাননীয় লেখককে অনুরোধ করি তিনি যেন ঐ উক্তিটি তুলে নেন এবং অযথা কোন শাস্ত্র সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ না করেন।

ডাঃ এস আর সাহা
[illegible]

বিদেশী বই

'দেশ' পত্রিকার ১০ই পৌষ, ১৩৭৭ সংখ্যাতে 'বিদেশী বই'-নির্বাচিত বিভাগে জ্যোতির্ময় বসুরায় পাবলো পিকাসোর একটি নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আলোচনাটিতে একটি সামান্য ভুল চোখে পড়লো। এটা মুদ্রাকর প্রমাদ হতে পারে। তিনি পিকাসোকে 'ফরাসী চিত্র-শিল্পী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত-পক্ষে পিকাসো স্প্যানিশ। তিনি স্পেনের মালাগাতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য বহুবার ফরাসী দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পাকাপাকি-ভাবে প্যারিসে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পিতাও চিত্রশিল্পী ছিলেন এবং স্পেনের বার্সিলোনা একাডেমীতে অধ্যাপকও ছিলেন।

সুপ্রিয় রায়
হুগলী

আজকাল 'জেনারেশন গ্যাপ' কথাটি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। শুধু বিদগ্ধ আলোচকদের আলোচনাতেই নয়, আমাদের মত সাধারণ মানুষরাও এই বিষয় সম্বন্ধে আজকাল বিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছেন, তাই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা আজকাল প্রায়ই হয়ে থাকে। অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। নবীনের দল সাধারণত তাঁদের পূর্ববর্তী প্রবীণের দলকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলার চোখে দেখে থাকেন। সমাজের ইতিহাসে এই ব্যাপারটা আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করে থাকি। বাংলা দেশের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেংগলের দল, আর যুদ্ধোত্তর যুগের 'অ্যাংরী ইয়ং মেন' এবং সমকালীন হিপি ও বীট জেনারেশনের কথা আমাদের মনে পড়তে পারে। তবে একটু ভাবলেই একথা বোঝা যায় যে, 'জেনারেশন গ্যাপের' পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্বে, নবীন শ্রেণীর মধ্যে অল্পসংখ্যকই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক যুবকের কণ্ঠেই সোচ্চার হতে পেরেছিল। স্বভাবতই তাঁদের প্রতিবাদ সমাজের কাঠামোকে নাড়িয়ে দেবার মত জোরদার প্রায়শই হতে পারেনি। তাঁরা হয়তো কিছু সময়ের জন্যে তাঁদের পূর্ববর্তী জেনারেশনকে চিন্তান্বিত করতে পেরেছিলেন, সন্দেহ আর দ্বিধার দোলায় দোলাতেও পেরেছিলেন, কিছুক্ষেত্রে হয়তো তাঁদের চিন্তাধারাকে নাড়া দিতেও সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু সমাজের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়ে সকলের জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে তাঁদের মনের মধ্যে এক অসহায় বিপন্নতার ভাব সৃষ্টি করতে পারেননি। কিন্তু আজকাল আমাদের পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি যে এখন এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, নবীন জেনারেশনের সঙ্গে তাদের পূর্ববর্তীদের যোগসূত্রই যে সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়েছে শুধু তা নয়, তার ফলে দুই জেনারেশনের মধ্যে এক দুস্তর প্রস্তর-কঠিন বাধাই সৃষ্টি হয়েছে। তাও শুধু নয়, সমাজের সর্বত্র এক অসহায়তার ভাব দেখা দিয়েছে। যেন মনে হয় যে বর্তমান যুগের 'জেনারেশন গ্যাপ' দূর করার কোন উপায়ই আর নেই। পৃথিবীর মানচিত্রে কোন একটা বিশেষ দেশ নয়, বস্তুত পৃথিবীর সর্বত্রই এই সমস্যা এক বৃহৎ এবং ব্যাপক সমস্যার রূপ ধারণ করেছে।

ব্রায়ান উইলসন রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Youth Culture and Universities পড়লে এই সমস্যার ব্যাপক রূপটির সম্বন্ধে আমরা যেন নতুন করে অবহিত হতে পারি। এই বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদের এই সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামতের সঙ্গে আমরা একমত নাও হতে পারি, কিন্তু লেখক যে অপূর্ব সংযম, নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই সমস্যাটির বিভিন্ন দিকের সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী আলোচনা করেছেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

The Youth Culture and Universities.
by Bryan Wilson.
Faber and Faber, London, 1970.
Price 45 sh.

লেখকের এই গ্রন্থে একটা নিরাশার সুর ধ্বনিত হয়েছে। আমার মনে হয় এই পরাজয় এবং নিরাশার সুর কেবলমাত্র যে আমাদের হৃদয়ই স্পর্শ করে তা নয়, আমরা সহজেই তাঁর বেদনাবোধের অংশীদার হয়ে উঠি। তাঁর আলোচনার মাধ্যমে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে নব্য-যুবকদের কৃষ্টি, মানসিকতা, ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট হলেও এই দ্রুত পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের দুনিয়াতে ঐগুলিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। কারণ আমরা অনন্যোপায়। অবশ্যই তিনি বিশেষ করে ব্রিটেনের কথা মনে রেখেই তাঁর আলোচনা করেছেন, তবুও তাঁর বক্তব্য যে পৃথিবীর যে কোন দেশের যুবসমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাতে সন্দেহ নেই। লেখক মন্তব্য করেছেন :

We still benefit from the relative humaneness of our police force, and from the extensive exercise of self-control and personal restraint which—although British decency, reserve, sense of propriety and fair play, appear to be very much under strain—are still considerable when Britain is compared with some societies. These things are largely the inheritance of the past. It is by no means sure how long we shall be able to rely on these moral reserves in the future.

বলা বাহুল্য, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর এই নিরাশার অংশীদার হবেন পৃথিবীর সব দেশেরই চিন্তাশীল জনসমুদয়।

ব্রিটেনের নবযুবকদের নৈতিক অধোগতির কারণ দর্শাতে গিয়ে লেখক কিন্তু একটি অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করেছেন। আমার বিশ্বাস বহু পাঠকই তাঁর এই যুক্তিতর্কের সঙ্গে একমত হবেন না। তাঁর মতে এতদিনকার সভ্যতা আর কৃষ্টির মধ্যে একটা শঠতার ভাব বিদ্যমান ছিল। আমরা এতদিন এক সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে এবং এক উচ্চমানের নৈতিক আদর্শকে আমাদের আদর্শ বলে গ্রহণ করলেও আমাদের চিন্তাধারা এবং কর্মধারার মধ্যে একটা বিরাট ফারাকের সৃষ্টি হয়েছিল। আজকের যুব অসন্তোষ, সমাজব্যবস্থাকে ভেঙেচুরে ফেলার জীবনের পুরনো মূল্যবোধকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা, আসলে আমাদের উপর্যুক্ত শঠতারই প্রতিক্রিয়া, বলে লেখকের ধারণা।

এই বক্তব্য যে একেবারে যুক্তিহীন তা নয়। স্বাধীনোত্তর ভারতের নাগরিক আমরা—আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেই অনেকেরই উপযুক্ত ধরনের শঠতার কথা জানি এবং তার ভয়াবহ পরিণামও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তবুও একথা সত্যি যে মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতাদের উদাহরণ দিয়ে সমগ্র সমাজের বিচার করা অযৌক্তিক হবে। আমরা বলতে অভ্যস্ত যে আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শঠতা, অর্থগৃধ্নুতার রাহু প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে সমাজের বৃহত্তর অংশের মানসিকতা এখনও এই দুর্দিনেও প্রাচীন মূল্যবোধের
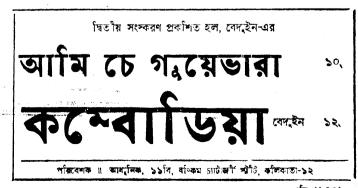
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত এবং সুষ্ঠুভাবে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হলে এখনও আমাদের দেশের বৃহত্তর জনমত সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর শঠতা আর বেইমানীর মুখোশ খুলে ধরতে অপারগ হয়তো নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি এই উল্লেখযোগ্য কার্যে যোগদান করেনি, কিংবা হয়তো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের পরে একটা দীর্ঘ সময়ের অতিক্রান্তির পরেই হয়তো এ ব্যাপারটা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এই বিরাট ট্রানজিশনের সময়টা ধৈর্য ধরে থাকাও তো মুশকিল।

এ ছাড়াও কিন্তু আরেকটা কথা আছে। লেখক যে শঠতার কথা বলেছেন, তারও একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের আদর্শ যদি উচ্চমানের হয়, তাতে বিরোধের কোন কারণ থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছনো হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, আমাদের পরাজয়ের মধ্যে দিয়েও সমাজের মূল্যবোধের কাঠামোকে আমরা জোরদার করে যেতে সক্ষম হব। ভক্তিশ্রদ্ধা, দয়া, প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি প্রাচীন এবং সার্বজনীন মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস রেখে আমাদের আদর্শের দিকে যাত্রারও তো একটা বিরাট সার্থকতা আছে। এই যাত্রা যদি আমাদের সফল না হয় তাতে পরিতাপের কিছু নেই। আমাদের প্রচেষ্টার মধ্যেই আমাদের সার্থকতা নিহিত থাকবে।

আর সমাজের এবং জীবনের যে মূল্যবোধ এখন নিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে, তাকে যদি শঠতাপূর্ণ অথবা hypocritical বলা হয়, তবে নব্য জীবনমানকে আমরা কি নামে অভিহিত করব? অমানুষিক হিংসা, নৈতিক অধঃপতন, নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান, নেশার জগতে বাস্তবিক দুনিয়াকে ভুলে থাকার চেষ্টায় নিরত, এই জীবনমান সম্বন্ধে কোন্ বিশেষণের প্রয়োগ করব আমরা?

A E Dyson এই গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে এই উল্লেখযোগ্য সত্যটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :

What are we to make of a whole ethos which surrounds the young with every incitement to eroticism and violence, with every stress and strains of pills, promiscuities, swinging youth and similar debasements, while it produces a literature which spells out the despairs, squalors, loneliness, alienations, cross-purposes, violences of unregulated sex with unprecedented frankness? The hypocrisies of our own period are far deadlier than any previous ones precisely because they are uniquely dishonourable. Instead of repenting our degradations and inculcating high ideals, we pretend that the degradations are perfection itself. At least, we are in the state of Camus's victim :

And they, so perfect, in their misery.
Not once perceive their
foul disfigurement,
But boast themselves more comely
than before . . . .

বর্তমান সমাজব্যবস্থা, নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তীব্র অনাস্থা, এ সবেরই পেছনে আছে একটা নির্দিষ্ট অনুশাসনের পদ্ধতিতে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখাবার বাসনা। অথচ মজা এই যে এই ইচ্ছা অনেকক্ষেত্রেই অনেক দেশের (বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলির) যুব সম্প্রদায়কে এমন পথে নিয়ে যাচ্ছে যে পথের প্রান্তে বাধ্য হয়েই অল্পসংখ্যক বিবেকহীন ব্যক্তিবর্গের অনুশাসনকে মেনে নিতে হবে, নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বাকস্বাধীনতা, মনোমত পেশা নির্বাচনের ক্ষমতা, এক কথায় নিজেদের সমগ্র ব্যক্তিত্বকেই সেই মুষ্টিমেয় শাসকবর্গের ইচ্ছের কাছে বিসর্জন দিতে হবে। আর তা না দিলে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে, প্রাণ দিতে হবে, কিংবা নিজ দেশেই পরবাসী হয়ে অপমান এবং উপেক্ষার বোঝা কাঁধে নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুবসম্প্রদায়, তাঁদের 'ক্ষুরধার বুদ্ধি' দিয়ে এই সহজ সত্যের বীভৎসতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন না।

সমাজের ও নৈতিক মূল্যবোধের কাঠামোকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে এবং কর্মোপযোগী রাখার জন্যে কিঞ্চিৎ Conformism প্রয়োজন। প্রাচীন মূল্যবোধ, সময়ের কষ্ঠিপাথরে যার প্রয়োজনীয়তা যাচাই হয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে অন্তত কিঞ্চিৎ আস্থা রাখতে হবে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আস্থার ভাব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ঐরূপ অবস্থায় কী করা যায়? লণ্ডনের টাইমস পত্রিকায় Max Beloff একটি প্রস্তাব দিয়েছেন যে এখনকার এই দুর্দিনে মানুষের সুষ্ঠু এবং পরিচ্ছন্ন জীবনবোধকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বড় বড় শহরের স্বার্থবুদ্ধি, বিবেকহীনতা ইত্যাদির আওতা থেকে দূরে ছোট ছোট আশ্রম স্থাপন করা। প্রাচীন মূল্যবোধের দীপশিখাটি আজকের হিংসা আর বিচারবোধহীনতার তীব্র ঝঞ্ঝাবাত্যা থেকে সেখানেই হয়তো বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

হয়তো অচির ভবিষ্যতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি এদেশেও হতে পারে। কিন্তু এখনও হয়তো সে অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। তাই এখন বিবেকশীল ব্যক্তির কর্তব্য, তাঁদের সীমিত ক্ষমতা দিয়েও দেশের যুব সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা। বলা বাহুল্য, এ কাজ সহজ নয় এবং এ কাজে ছোট বড় সকলেরই সাহচর্যের প্রয়োজন আছে।

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক দেশেরই, সে দেশ যত উন্নত কিংবা অনুন্নতই হোক না কেন, সমাজব্যবস্থায় এবং চিন্তাধারায় অনেক গলদ থাকে। যে কোন বিষয়কেই নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়াও নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়। চিন্তাশীল এবং বিশ্লেষণধর্মী মনোভাব থাকাও নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কেবল ভেঙেচুরে ফেলার অসহিষ্ণু মনোবৃত্তি, অন্যের চিন্তাধারা দিয়ে নিজের চিত্তবৃত্তিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলা, এরও কোন যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই নেই। প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকার প্রয়োজন নেই, যুগধর্মের সঙ্গে মানসিকতার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য, কিন্তু কেবলমাত্র নতুনত্বের দোহাই দিয়ে সে বিষয়ে কোন কিছু বিচার না করে পুরোনোকে বিসর্জন দেওয়ার ও কোন যৌক্তিকতা নেই। সমাজের নির্দিষ্ট ব্যবস্থার আওতার মধ্যে থেকেও সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন করা সম্ভব, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে তার নজির আছে। দেশের চঞ্চল, ক্রমক্ষীয়মাণ যুবমানসকে এই কথাগুলি, যত সাধারণ কথাই এগুলি হোক না কেন, বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন এখন খুবই বেশী হয়ে পড়েছে।

ব্রিটেনে যুবসম্প্রদায়ের রুচি এবং চিন্তাধারার অধোগতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এ বিষয়টি হল যুবসম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষার বিসদৃশ বিকৃতি। ভাষাই মানুষের মানসিকতার পরিচায়ক। স্ল্যাংমিশ্রিত ভাষা সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়। এই বক্তব্যের সত্যতা আমরা নিজেদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে আরও ভাল করে বুঝতে পারি। আজকের বাঙালী যুবসম্প্রদায়ের ভাষায় স্ল্যাং-এর ছড়াছড়ি। হিন্দী, উর্দু, ইংরেজীর অনেক বিশ্রী শব্দ রূপান্তরিত হয়ে এই কথোপকথনের ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। এই মিশ্র ভাষা আমাদের ক্রমক্ষীয়মাণ মূল্যবোধের 'রেলিক' হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করছে। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই ভাষায় পরিশোধন এবং পরিমার্জন বিশেষ প্রয়োজন। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করে এ কাজ সম্ভব হবে না। সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর সকলকে তাঁদের কথাবার্তার মাধ্যমেই নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে এ কাজ করতে হবে।

আধুনিক বিক্ষিপ্ত যুবমানসের সম্বন্ধে বহু আলোচনাই আজকাল চোখে পড়ে। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে।

দিলীপ চক্রবর্তী

ভারতীয় উপন্যাস

বোম্বাইয়ের ম্যাক্সমূলার ভবন গত মাসে ভারতীয় উপন্যাস বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সিমপোসিয়ামের ব্যবস্থা করেছিলেন। বক্তা ছিলেন, শ্রীযুক্ত খুসবন্ত সিং, শ্রীযুক্ত দিলীপ চিত্রী ও শ্রীমতী গৌরী দেশপাণ্ডে। এঁরা তিনজনেই সমস্বরে রায় দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত কোনো সার্থক নভেল লেখা হয়নি। এটা এঁদের রায় না বলে তিনজনেরই এক রা—এ-রকমভাবেও বলা যেতে পারে।

সিমপোসিয়ামে আমি উপস্থিত ছিলাম না। টাইমস অফ ইণ্ডিয়ায় রিপোর্ট পড়লাম। রিপোর্টটি নাতিদীর্ঘ, তবে দেখে মনে হয়, স্টাফ রিপোর্টারও এই সিদ্ধান্তটি বেশ রসিয়ে লিখেছেন। অন্তত, ঐ সিমপোসিয়ামে একটিও বিরুদ্ধ মত বা একটিও যুক্তিপূর্ণ বাক্য কেউ ব্যবহার করেছেন কি না, তার কোনো উল্লেখ নেই।

বলাই বাহুল্য, বোম্বাইয়ের সিমপোসিয়ামে কোন্ তিন ব্যক্তি কি নিয়ে বলাবলি করলো তা নিয়ে আমাদের পাতা খরচ করার কোনো মানে নেই, তবে ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা যায়।

খুসবন্ত সিং-এর নামটি আমাদের কাছে পরিচিত, ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় লেখক এবং 'ট্রেন টু পাকিস্তান' নামে কিছু সময়ের জন্য আলোচিত একটি বইয়ের রচনাকার হিসেবেই নয় শুধু, ভদ্রলোকের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বেশ একটু ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে, মাঝে মাঝেই কারণে অকারণে বাঙালী লেখকদের সম্পর্কে কটূক্তি করেন। কিন্তু এবার তিনি ফতোয়া দিয়েছেন গোটা ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে। ভদ্রলোককে খুব জ্ঞানী বলতে হবে, কারণ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য তো ওঁর নখদর্পণে বটেই, এছাড়াও ভারতীয় ভাষার সাহিত্য সম্পর্কেও খুব ওয়াকিবহাল।

দিলীপ চিত্রী জাতে মারাঠী, তবে মারাঠী ভাষায় কিছু লেখেন কি না জানি না, ইংরেজিতে কবিতা লেখেন, ওঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজীতে মারাঠী কবিতার একটি সংকলন আমার চোখে পড়েছিল।

গৌরী দেশপাণ্ডের কোনো রচনার সঙ্গে আমি পরিচিত নই। তবে, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া যেহেতু তাঁকে টপ অথরসদের অন্যতমা বলেছেন, সেইহেতু তিনিও নিশ্চয়ই বড় লেখিকা। বোম্বাইয়ের ম্যাক্সমূলার ভবন ভারতীয় উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এঁদের তিনজনকেই ডেকেছেন কেন—সেটা তাঁদের ব্যাপার। আশা করা যায়, এঁরা তিনজনেই ইংরেজীতে চোখা চোখা বাক্য বলতে পারেন—এবং আজকাল সেটাই জ্ঞানের বকধার্মিক বৃত্তি।

খুসবন্ত সিং মশায় বলেছেন যে, মহৎ উপন্যাস বা মহৎ ঔপন্যাসিকের এখনও জন্ম হয়নি ভারতে। বাংলা বা মারাঠী ভাষায় মহৎ উপন্যাস সম্পর্কে যে-সব দাবি করা হয়, তা সবই ডাহা মিথ্যে। অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই, সিং মশায়ের মতে, অন্তঃসারশূন্য। এবং রবীন্দ্রনাথ, "তাঁর তো সামান্যতম ধারণাও ছিল না, কি করে উপন্যাস লিখতে হয়।" পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক সার্থক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি নাম করেছেন, জয়েস কেরি, লরেন্স ডারেল, গুন্টার গ্রাস, নর্মান মেলর প্রভৃতির।

দিলীপ চিত্রীও সিং মশায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছেন, ভারতে উপন্যাসের কোনো ঐতিহ্য নেই—যেমন আছে কবিতা বা ছোট গল্পের। সাহিত্য রূপ হিসেবে উপন্যাস বস্তুটিই সাহেবদের কাছ থেকে ধার করা।

গৌরী দেশপাণ্ডে আবার বলেছেন যে, ভারতে যে উপন্যাস লেখা হয় না সেটা ঠিক ঐতিহ্যের অভাবে নয়, বিষয়বস্তুর অভাবে। "সম্ভবত আমাদের ঔপন্যাসিকাদের কিছুই বলার নেই।"

আগেই বলে রাখি, গৌরী দেশপাণ্ডের বক্তব্য বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করবো না। শিবপ্রসাদের একজাত দোষের মতন রমণীদেরও এক সহস্র দোষ অনায়াসে ক্ষমা করা যায়, অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি। দিলীপ চিত্রীকে একজন আধুনিক [illegible] সম্পন্ন লেখক হিসেবেই আমার জানা ছিল। কিন্তু উপন্যাসের ঐতিহ্য [illegible] সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তা একেবারে [illegible], যে-কোনো ইস্কুল পাঠ্য বইতেও [illegible] যায়। মুশকিল হচ্ছে এই, [illegible] অনেকেই যে-রকম [illegible] [illegible] আমাদের বাড়িতে এলেই [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] নিজেদের লেখা বিষয়ে খুব [illegible] কথা বলে বটে কিন্তু সাহিত্য [illegible] বিষয়ে আলোচনায় এলেই [illegible] হতে হয়। অর্থাৎ উপন্যাসের [illegible] বিষয়ে ওয়াল্টার পেটার যা [illegible] [illegible] লেখকরা যা বলে গেছেন, [illegible] ধরে আছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য [illegible] [illegible] যায়, খুসবন্ত সিং-এর পুরোনো [illegible] [illegible] মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে খুসবন্ত সিং এমনই [illegible] [illegible] যে এ সম্পর্কে আর কোনো কথা বলাই উচিত নয়।

কোন্‌টি উপন্যাস এবং কোন্‌টি উপন্যাস নয়, এ সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত যুক্তি ও বিচারবোধ থাকতে পারে। সেই বিচারের মানদণ্ডে কেউ যদি বলে যে, ভারতীয় ভাষার কোনো উপন্যাসই তার উপন্যাস বলে

মনে হয় না—সে সম্পর্কে বলার কিছু নেই। কিন্তু গোলমাল বাঁধে, যখনই সে সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে জয়েস কেরি, লরেন্স ডারেল, গুন্টার গ্রাস বা নরমান মেলর-এর নাম করে। তখনই মনে হয়, এও সেই টাইপের, যে দেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুরের পা চাটতেও রাজী। এই চারজন ঔপন্যাসিকের গুণপনা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহই নেই, গুন্টার গ্রাস তো সাহিত্যকারের ক্ষমতার পরিচয়ই দিয়েছেন, কিন্তু ওঁদের চারজন এমনই ভিন্ন ধরনের লেখক যে ওঁদের এক পংক্তিতে যে বসায় তার বিচারবোধ সম্পর্কে সন্দেহ জাগেই।

উপন্যাস সম্পর্কে কোনো ভাষারই কোনো ঐতিহ্য নেই। মাত্র দেড়শো দুশো বছরের পুরোনো এই সাহিত্যরূপ, প্রতিটি উন্নত ভাষাতেই প্রায় এক সঙ্গে শুরু হয়েছে। গলসওয়ার্দি আর একশো দুশো বছর আগে জন্মালে ফোরসাইট সাগাও অপরাপর সাগার মতন কবিতায় লেখা হতো, যেমন বেদব্যাস গত শতাব্দীতে জন্মালে গোটা মহাভারতটাই বোধ হয় ধারাবাহিক উপন্যাস হিসেবে প্রকাশ করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উপন্যাস ব্যাপারটাকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তখন উপন্যাসের সংজ্ঞা বিষয়ে অনেক গাল-ভারি সূত্র স্থাপিত হয়েছিল। হায় হায়, আমাদের দেশের ফরাসী ইংরেজী জানা আধুনিক লেখকদের বিদ্যেও সেখানেই থেমে আছে। তাঁরা কি খবর রাখেন না যে, উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান বাহন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেইসব সংজ্ঞা কবে ছিঁড়ে খুঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। নরমান মেলার যদি ঔপন্যাসিক হন তবে ওরকম ঔপন্যাসিক অনেক দেশেই গণ্ডায় গণ্ডায় আছে।

মুশকিল হচ্ছে এই, ভারতীয় সাহিত্য ব্যাপারটাই বড্ড গোলমেলে। এতগুলো ভাষা, কোথায় কি ঘটছে, কে তার সব খবর রাখে? তামিলের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, সে সম্পর্কে আমরা কতটা জানি? হিন্দী ভাষা পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল অনগ্রসর, এখন সে ধাঁ ধাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন হিন্দীর অনেক আধুনিক লেখা ঝকঝকে রৌদ্রের মতন দীপ্যমান। মারাঠী এবং গুজরাটী ভাষার অনেকগুলো সার্থক রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। সাহিত্যে অনুকরণের প্রশ্নটি অবান্তর, কোন ভাষা কখন এগিয়ে যায়, কিছুই বলা যায় না। ভারতীয় সাহিত্যের সমগ্র চেহারাটা কোনোদিন ফুটে ওঠেনি—এ সম্পর্কে সাহিত্য আকাদেমির ব্যর্থতাও পাহাড় প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' যদি উপন্যাস না হয়, তা হলে বলতে হবে, টমাস হার্ডি বা টুর্গেনিয়েভও কোনো উপন্যাস লেখেননি। চার্লস ডিকেন্স বা ডস্টয়েভস্কির মতন উপন্যাস হয়তো ভারতবর্ষে লেখা হয়নি। হয়তো বলছি এইজন্য যে, অন্যান্য ভাষার খবর ঠিক জানি না, বাংলায় অন্তত লেখা হয়নি। কিন্তু অন্যরকম লেখা হয়েছে। জয়েস কেরি, লরেন্স ডারেল, নরমান মেলার-এর সঙ্গে প্রীতি তুলনা। বেচারা খুসবন্ত সিং! কি মুখের নরকেই রয়েছেন তিনি।

ঐ আলোচনায় আধুনিক পাশ্চাত্য লেখকদের নাম করে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের নাম করা হলো কেন? আধুনিক কোনো ভারতীয় লেখকের নাম নস্যাৎ করার জন্যও মনে পড়লো না? তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন জীবিত গরিষ্ঠ লেখক, তাঁর সম্পর্কে সিং মশায়ের আকচা-আকচি থাকতে পারে, (অন্যায্য কারণে), কিন্তু তিনি কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনেন নি? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' এবং প্রেমচন্দের 'গো দান' তো ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে অনেক প্রশংসা পেয়েছে, সেগুলোও সিং মশায়ের চোখে পড়েনি? এই তিনখানা বইয়ের যে-কোনো একটার সমতুল্য বই তিনি আগে লিখুন, তারপর তো ওঁর কথা শুনবো।
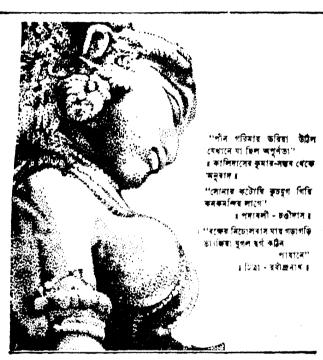
সনাতন পাঠক

কবিতা

॥ থামো, সুন্দর মুহূর্ত ॥ শান্তিকুমার ঘোষ। বিশাখা, ২৮/১ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-১৯। দু টাকা॥

একালের কবি সম্প্রদায়ের ভেতর শান্তিকুমার ঘোষের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। কবিতারচনার ব্যাপারে তিনি ততটা উত্তেজিত নন, যে-কারণে তার কাব্যরচনার প্রয়াস তুলনামূলক বিচারে প্রতুল নয়। বস্তুত, কবি হিসেবে তার বিশিষ্টতা সৃষ্টি-প্রাচুর্য নয়, স্বল্পসংখ্যক অথচ সুলিখিত কবিতা রচনায়। যে-কোন বিশিষ্ট কবির কাছেই আমরা এই নিমগ্নতা আশা করি। এ বিষয়ে বরাবরই শ্রীঘোষ আমাদের প্রত্যাশাপূরণ করে আসছেন। সম্ভবত, 'থামো, সুন্দর মুহূর্ত' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম কবিতার বইয়ের প্রকাশ-কাল থেকে এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের ব্যবধান প্রায় একদশকের। গ্রন্থখানি আকারে ছোট হলেও প্রকারে এবং প্রকরণ-বৈচিত্র্যে হালআমলে প্রকাশিত বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে অবশ্যই কাব্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কবিতা লেখার ব্যাপারে শ্রীঘোষ আত্মমগ্ন, ঈষৎ সলজ্জ এবং সতর্ক হলেও 'থামো, সুন্দর মুহূর্তে'র স্বল্পসংখ্যক কবিতার ভেতরেই তার কাব্যবীক্ষার বৈচিত্র্য এবং ব্যাপকতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিতার বিষয় এবং প্রয়োগে কবি অক্লান্ত। মূলত, আত্মমগ্ন কবিতার ক্ষেত্রে যে দুর্লভ গুণটি স্বয়ংপ্রকাশ হয়ে ওঠে,—চিত্রকল্পবহুল, নমনীয়, স্বপ্নবন্ধ, সূক্ষ্ম এবং স্পর্শকাতর সংবেদনার প্রচ্ছন্ন বিস্তার—তার সবটুকুই শ্রীঘোষের কবিতার অভিজ্ঞান উদ্দীপিত। অত্যন্ত উচ্চকিত কাব্যভাষণও এই মগ্নতায় স্নিগ্ধ এবং মনোরম হয়ে ওঠে। কাব্যপাঠক সহজেই শ্রীঘোষের কবিতার বিষয়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে উঠতে পারেন। 'মন উচাটন করে দ্রবময়ী চলে গেল ওই বিশদ জ্যোৎস্নায়'/'একটি নক্ষত্র জাগে আকাশরেখায়—নতুন বছর'/'বীণকার ক্রুশ-বিদ্ধ তার স্তব্ধ বীনার উপরে'/'ফেরিঘাট ভরে গেল পাহাড়ের গল্প আর সমুদ্র-গাথায়'—এমনি অজস্র চিত্রকল্পে শ্রীঘোষের কবিতাবলী সমৃদ্ধ। ১৫১/৭০

উপন্যাস

প্রভাত সাইকেল স্টোর্স। বিমল মুখোপাধ্যায়। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—তিন টাকা।

বাস্তবের রুক্ষদীর্ণ মাটিতে ভর করে যে লেখক সংগ্রামী জীবনের পোড় খাওয়া, দুমড়ে যাওয়া চেহারাটিকে তুলে ধরতে অধিকতর প্রয়াসী, সেখানে রোমান্টিক মনন ও বিশ্লেষণ বোধ হয় স্বচ্ছন্দে ডানা মেলে দিতে ঈষৎ কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু বহিরঙ্গের বিচার, রিয়ালিজম্ ও রোমান্টিসিজম্-এর সেই চিরাচরিত আপাত বিরোধ। প্রভাত সাইকেল স্টোর্সে লেখক বিমল মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাভাবিক সংযত বাক্‌ভঙ্গির প্রয়াসে এ বিরোধের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন। পরিণত লেখকের মতো নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত অবস্থায় পেছন ফিরে তাকিয়েছেন—কিশোরী শোভা প্রেমের স্বপ্ন দেখেছে অথবা "কোথায় কনকের সেই হৃদয় যা আগে পল্লবিত হয়ে উঠত রোজ নব নব বেশে নব নব শাখায়। কোথায় কনকের সেই মন যা আকাশের অনন্ত নীলিমার সাথে বিস্তারিত করে দিয়েছিল নিজেকে?" ৮

শুধু পাঠককে কনকের সেই স্বপ্নময় অতীত সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়াই নয়, এ যেন আরো কিছু। এ হচ্ছে কনক চরিত্রের সেই মূল সমস্যা—যেখানে তার অতীত আর বর্তমানের বিরাট ফাঁকটাকে সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। অতীত কনককে স্মরণ করতে বাধ্য করছে তার বর্তমানের নিরানন্দ, নিষ্প্রাণ জীবন। বর্তমান কনককে ঠেলে দিচ্ছে সেই ফেলে আসা অতীতের দিকে। কনক চরিত্র ক্রমাগত ধাক্কা খাচ্ছে। "আইসোলেটেড" হয়ে পড়ছে। তাই দেয়াল ঘেরা বন্দী জীবনের প্রতিটি কোণায় একটি কথাই বার বার মাথা খুঁড়ে মরছে—কোথায় কনকের সেই হৃদয়? লেখকের ভঙ্গী মিতবাক্, তাই মাত্র কয়েকটি অর্থবহ বাক্যের মধ্য দিয়ে বাস্তবের প্রত্যন্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীন ভাষায় উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি এই মূল প্রশ্নটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ষোল বছর বয়সের কোন তরুণ লেখকের কলম থেকে এমন পরিণত চিন্তাধারা এ যেন আশা করা যায় না। মাত্র বাইশ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর অকাল মৃত্যু না ঘটলে আমরা তাঁর কাছে থেকে হয়ত এমন কিছু পেতাম, যা শাশ্বত হয়ে উঠতে পারত বাংলা সাহিত্যের পাতায়।

৩০২।৬১

প্রাপ্তি স্বীকার

ফ্রীডরিখ এঙ্গেলস। অনুবাদ : শান্তি-শেখর সিংহ। ভারত-গণতান্ত্রিক মৈত্রী সমিতি : ২৭-জি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ০·২৫ পয়সা।

অবিস্মরণীয় পঞ্চাশ বছর। গোপাল ঘোষ। লোক ইতিহাস প্রকাশন : ১১৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য : ০·৭০ পয়সা।

খেয়ালী মন। সম্পাদনা : প্রণবকুমার নাথ। সাহিত্যরূপা প্রকাশন : ২৬-সি, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য : ৭·০০।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক : পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১। মূল্য : ৬·৫০।

পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী, বিদ্যাসাগর ও নেতাজীর গান্তব্য বাণী। ইন্দ্রনীল। মূল্য : ০·২৫ পয়সা।

দুটি প্রণয় শতক। ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। পুস্তকশ্রী : ৩০১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৮·০০।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (জীবন ও বাণী)। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স : ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ২·০০।

পুষ্পেন সরকার

অক্টোবরে আগরতলায় অনুষ্ঠিত এবারকার জাতীয় স্কুল গেমসের শরৎকালীন খেলাধুলোয় পশ্চিমবাংলার ছাত্রছাত্রীরা প্রশংসনীয় ফলাফল দেখিয়েছে। জাতীয় স্কুল গেমসের শরৎকালীন আসরে ৬টি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতা হয়। ফুটবল (ছাত্রদের), বাস্কেটবল (ছাত্র ও ছাত্রীদের), সাঁতার (ছাত্র ও ছাত্রীদের), কবাডি (ছাত্রদের), খোখো (ছাত্রীদের) এবং টেবল টেনিস (ছাত্র ও ছাত্রীদের) এই ৬টি বিষয়ের মধ্যে পশ্চিমবাংলার ছাত্ররা সাঁতার ও ফুটবলে পেয়েছে স্বর্ণপদক এবং বাস্কেট বল ও টেবল টেনিসে পেয়েছে রৌপ্যপদক। ছাত্রীরা টেবল টেনিস এবং বাস্কেটবলে স্বর্ণপদক ছাড়া সাঁতারে রৌপ্যপদকের অধিকারী হয়েছে। ভারতের অন্য যে কোন রাজ্য থেকে পশ্চিমবংলার কৃতিত্ব সর্বাধিক।

পশ্চিমবাংলার ছাত্ররা সাঁতারে স্বর্ণপদক জয় করেছে বললে তাদের কৃতিত্বের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। ১৬টি স্বর্ণপদকের অধিকারী পশ্চিমবাংলার ছাত্রদের অর্জিত ৭০ পয়েন্টের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ত্রিপুরার ২৪ পয়েন্ট ব্যবধানের দূরত্বের সীমারেখা নির্দেশ করে। এ ছাড়া ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে শান্তনু পুরকাইত, ৪০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সুধীর দাস, ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে ও ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইতে সঞ্জীব সাহা এবং ৪×১০০ মিটার মিডলে রিলেতে রেকরড করে পশ্চিমবাংলার ছাত্ররা শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্য নজির সৃষ্টি করে। ছাত্রীদের বিভাগে কৃতী অনন্যা জেনের অনুপস্থিতিতে পশ্চিমবাংলা ত্রিপুরার পরে স্থান পেয়েছে সত্য, তবে ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে পশ্চিমবাংলার কল্পনা মল্লিকের রেকরড রাজ্যের সুনাম কিছুটা বজায় রেখেছে।

জাতীয় স্কুল গেমসের সাঁতারে পশ্চিমবাংলার ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য এই প্রথম নয়। ১৯৬২ সাল অর্থাৎ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী বছর থেকেই এই বছর পর্যন্ত যে ৮টি অনুষ্ঠান হয়েছে তার কোন অনুষ্ঠানেই পশ্চিমবাংলার ছাত্রদের অন্য কোন রাজ্য একচেটিয়া স্বর্ণপদকের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি। প্রথম পাঁচ বছর উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়নশিপের পর গত তিন বছর রৌপ্যপদকের অধিকারী হয়েছে ছাত্রীরা।

ফুটবলে নতুন প্রতিভা প্রসবিনী বলে বাংলার যে ঐতিহ্য আছে, সে ঐতিহ্যের

কল্পনা মল্লিক

ধারাকে ছাত্ররা মলিন করেনি। এবারের স্বর্ণপদক ছাড়াও ১৯৬২ সাল ও ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫-তেও ছাত্ররা বিজয়ীর পুরস্কার নিয়ে আসে। ১৯৬৬ সালে মণিপুরের কাছে এবং ১৯৬৯ সালে আসামের কাছে ফাইনালে পরাজয়ও খুব একটা অগৌরবের বলা চলে না।

জাতীয় স্কুল গেমসের ফুটবল ছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলির মধ্যে যে 'সুব্রত কাপ' ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রচলিত আছে সেখানেও কলকাতার রাণী রাসমণি এবং কুমার আশুতোষ ও বাটানগর স্কুল তিন বছর বিজয়ী হয়ে বাংলায় তরুণ প্রতিভার সম্ভাবনার সাক্ষ্য রেখেছে।

টেবল টেনিসে ৯ বছরের জাতীয় স্কুল গেমসের ইতিহাসে পশ্চিমবাংলার ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে। ছাত্রদের তিন বারের সোনা একবারের রুপোর পাল্লাকে আরও ভারী করেছে ছাত্রীরা ৪ বারের সোনা ও একবারের রুপোর পদক দিয়ে।

জাতীয় স্কুল গেমসের বাস্কেটবলে অবশ্য ছাত্রদের এতদিন তেমন কোন কৃতিত্ব ছিল না। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য বাস্কেটবলে বাংলা থেকে এগিয়ে আছে। এবারের রানার্সের সম্মান আগামী দিনে প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়েছে। বাস্কেটবলে ছাত্রীরা ছাত্রদের টেক্কা দিয়েছে অনেক আগেই। ১৯৬৮ সালে শক্তিশালী মহারাষ্ট্রকে ফাইনালে হারিয়ে ছাত্রীরা প্রথম যে সাফল্যের সূচনা করেছিল একবছর ব্যবধানে পুনরায় বিজয়ীর সম্মান তাদের বাস্কেটবলে প্রতিষ্ঠার বনিয়াদকে সুদৃঢ় করেছে সন্দেহ নেই।

শরৎকালীন খেলাধুলোর অবশিষ্ট দুটি প্রতিযোগিতা ছাত্রদের কবাডি এবং ছাত্রীদের খো-খোতে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য পশ্চিমবাংলা থেকে অনেক এগিয়ে আছে। এই খেলাগুলি মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এবং অনিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় পশ্চিমবাংলার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তেমন কোন আলোড়ন বা আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি।

শরৎকালীন খেলাধুলো ছাড়া জাতীয় স্কুল গেমসে শীতকালীন আর একটি খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ১। অ্যাথলেটিক্স (ছাত্র ও ছাত্রীদের), ২। ব্যাডমিন্টন (ছাত্র ও ছাত্রীদের), ৩। ভলিবল (ছাত্র ও ছাত্রীদের), ৪। জিমন্যাসটিক্স (ছাত্র ও ছাত্রীদের), ৫। হকি (ছাত্রদের) এবং ৬। কুস্তি (ছাত্রদের) অন্তর্ভুক্ত থাকে।

শীতকালীন খেলাধুলোয় পশ্চিমবাংলার ছাত্রছাত্রীদের শরৎকালীন খেলা-

ধুলোর মত কৃতিত্ব নেই। একমাত্র জিমন্যাস্টিকসে কিছু সুনাম এবং অ্যাথলেটিকসে মাঝে মাঝে দু চারজনের একক কৃতিত্ব লাভ পরবর্তী প্রতিযোগিতায় যোগদানে অনুপ্রাণিত করে মাত্র।

শরৎকালীন এবং শীতকালীন খেলাধুলা ছাড়া স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া ক্রিকেটে 'সি কে নাইডু' ট্রফি নামে আন্তঃ রাজ্য ক্রিকেটের এক প্রতিযোগিতা ১৯৬৭-৬৮ সালে চালু করেছেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী বছরে যোগদান না করলেও দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রথম যোগদানে বিজয়ীর সম্মান লাভের পর গত বছর ফাইনালে দিল্লির কাছে হার স্বীকার করে রানারসের সম্মান স্কুল ক্রিকেটে পশ্চিমবাংলার উন্নত শক্তির পরিচয় রেখেছে।

পশ্চিমবাংলার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলোর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এটা জাতীয় স্কুল গেমসের ইতিহাস থেকেই প্রমাণিত হয়। যে খেলাগুলিতে শিক্ষার সুযোগ শৈশব থেকে তারা পেয়ে থাকে সে খেলাগুলিতে অন্য যে কোন রাজ্যের ছেলেমেয়েদের থেকে পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েরা যে বেশী নৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম জাতীয় স্কুল গেমসে শরৎকালীন খেলাধুলা তার সাক্ষ্য। শীতকালীন খেলাধুলোয় প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়ও ঐ একই সূত্রে সমাধান করা যায়।

উত্তরকালে এই প্রতিভার সযত্ন লালন-পালনে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে পশ্চিম বাংলার সুনামকে যে বাড়িয়ে তোলে তার প্রমাণ ফুটবলে শান্ত মিত্র, কাজল মুখার্জি, অশোক চ্যাটার্জি, সুনীল ভট্টাচার্য, প্রণব গাঙ্গুলী, সুভাষ ভৌমিক ও সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার। ক্রিকেটে অম্বর রায়, রাজা মুখারজি ও দীপঙ্কর সরকার। সাঁতারে সন্ধ্যা চন্দ্র ও বৈদ্যনাথ দাশ। টেবল টেনিসে রুপা মুখার্জি, ইন্দু পুরী, অমৃত খোসলা, দীপক চ্যাটার্জি প্রভৃতি। বিভিন্ন খেলাধুলোর ইতিহাস ওল্টালে আরও এমনি অনেক নাম পাওয়া যাবে, যাদের আত্মপ্রকাশের বা সম্ভাবনার ইঙ্গিত স্কুল অঙ্গনেই প্রথম দেখা দিয়েছিল।

স্বভাবত এ প্রশ্ন এসে পড়েঃ পশ্চিম বাংলার ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর প্রসার ও উন্নতির জন্য সরকার, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কতখানি সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন?

প্রথমে সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। পশ্চিম বাংলায় চার হাজারের কিছু বেশি উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া প্রাইমারি, জুনিয়র বেসিক, সিনিয়র

সুধীর দাস

বেসিক প্রভৃতি স্কুলের সংখ্যাও আরও কয়েক সহস্র। এই বিরাট সংখ্যক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য সরকার 'রেকারিং গ্র্যান্ট' অর্থাৎ আবর্ত খাতে যে অর্থের বরাদ্দ রাখেন, তার অঙ্ক বোধ হয় এক লাখ দশ পনেরো হাজারের বেশি হবে না। লখ টাকার এই সামুল্য অংশের সবটাই দৈনন্দিন খেলাধুলোর উন্নতির জন্য ব্যয় করার ব্যবস্থা আছে ভাবলে কিন্তু ভুল করা হবে।

শরৎকালীন এবং শীতকালীন জাতীয় স্কুল গেমস, সুব্রত কাপ এবং সি কে নাইডু ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলার ছাত্রছাত্রীদের যোগদানের জন্য উপরোক্ত বরাদ্দ অর্থ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়। অবশিষ্ট অর্থের ঝাঁপি থেকে স্বল্পকালীন শারীর শিক্ষা, প্রদর্শনীমূলক ভ্রমণ প্রভৃতিতে আরও প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় হয়। ফলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত খেলাধুলোর শিক্ষার সুযোগ হিসাবে খেলাধুলোর সরঞ্জাম, খেলার মাঠ ও জিমনাসিয়াম প্রভৃতির উন্নতির জন্য যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, হিসাবমত তার আনুমানিক অঙ্ক বোধ হয় ত্রিশ হাজারের বেশি হবে না। প্রাইমারি, সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক প্রভৃতি স্কুলগুলির প্রয়োজনকে নস্যাৎ করে শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক ও স্কুল ফাইন্যাল চার হাজার স্কুলের সংখ্যায় যদি ধরা হয়, তাহলে স্কুল প্রতি ঐ বরাদ্দ অর্থ থেকে খেলাধুলোর উন্নতির জন্য দশ টাকাও পাওয়া সম্ভব নয়।

আর্থিক ঐ নামমাত্র অঙ্কের সাহায্য ছাড়া পশ্চিম বাংলা সরকার সরাসরিভাবে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য আর কি কি সাহায্য করেন, এ প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া কষ্টকর। পশ্চিম বাংলার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলির মধ্যে বিভিন্ন খেলাধুলোর যে আন্তঃ জেলা বা রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনায় সরকারের সরাসরি কোন দায়িত্ব নেই। ১৯১০ সালে ডাঃ এস চ্যাটার্জী প্রতিষ্ঠিত ওয়েসট বেঙ্গল স্কুল স্পোরটস অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন আন্তঃ জেলা বা রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করে আসছে। ২৬ জন কার্যকরী সমিতির সদস্যবিশিষ্ট এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি পদটি শিক্ষামন্ত্রী বা শিক্ষা উপদেষ্টার জন্য নির্দিষ্ট। চেয়ারম্যানের পদটি ডি পি আই-এর।

স্কুলের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৮টি জেলা, অ্যাথলেটিকসে ১৪টি জেলা, সাঁতারে ১১টি জেলা, হকি, ভলিবল এবং কবাডিতে ৮টি জেলা, ক্রিকেটে ৬টি জেলা এবং জিমন্যাসটিকসে ৫টি জেলা যোগদান করে থাকে। এই সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বেশি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তো দূরের কথা, সাহায্য হিসাবে ওয়েসট বেঙ্গল স্কুল স্পোরটস অ্যাসোসিয়েশনকে দু হাজার ও বিশেষ সাহায্য হিসাবে আট হাজার, মোট দশ হাজার টাকা দেওয়া হয় মাত্র।

রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপগুলি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় বাইরের জেলাগুলি থেকে যে সব প্রতিযোগী আসে, তাদের আহার, বাসস্থান, যানবাহন প্রভৃতির খরচ ওয়েসট বেঙ্গল স্কুল স্পোরটস অ্যাসোসিয়েশন বহন করেন। এ ছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ভাড়া, আনুসঙ্গিক খরচ-পত্র প্রভৃতির জন্য আরও বাড়তি খরচ আছে। আটটি বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য এবং আন্তঃজেলা চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যয়ভার ঐ দশ হাজার টাকার অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে গিয়ে অ্যাসোসিয়েশন সহযোগিতার হাত আশমতো বাড়িয়ে দিতে পারেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি জেলাতে একজন জেলা শারীর শিক্ষক ও যুবকল্যাণ অফিসার নিয়োগ করেছেন। শিক্ষা দফতরের অধীনে জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের এই সব সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্য দেবার ক্ষমতা এতই সীমিত যে, সে অর্থ নিয়ে স্কুলের কোন খেলাধুলোর উন্নতি সম্ভব নয়। জেলার বিভিন্ন স্কুলের খেলাধুলোর উন্নতির ব্যাপারে স্কুল থেকে

আশানুরূপ সহযোগিতা না পাওয়ায় ঐ সব কর্মচারীর গঠনমূলক কাজে এগিয়ে যাওয়া বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে জেলার ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা রুটিন মাফিক কাজ করেই দিনগত পাপক্ষয় করেন।

১৯৫৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ সৃষ্টির আগে পর্যন্ত খেলাধুলো ও শারীর শিক্ষা স্কুলের পাঠ্যক্রমের (ক্যারিকুলা) অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্কুলের রুটিনে খেলাধুলোর জন্য কিছু সময় নির্দিষ্ট থাকতো। প্রায় প্রতিটি স্কুলে একজন করে খেলাধুলো শিক্ষককে নিয়োগ করা হত। ১৯৫৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ স্কুলগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করেই খেলাধুলো ও শারীর শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের বাইরে ঠেলে দিলেন। আর্থিক অনুমোদন না থাকায় বেসরকারী স্কুলে শুধুমাত্র ক্রীড়া বা শারীর শিক্ষক নিয়োগের পথ বন্ধ হয়ে গেল।

পর্ষদের এই নববিধানে খেলাধুলো বা শারীর শিক্ষা দেখাশোনার জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকরা আজ সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপত্র পান। আর পাঁচ জন সাধারণ শিক্ষকের মতই সপ্তাহে ২৯টি ক্লাস (বিভিন্ন বিষয়ে), আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে পালন করে ঐ শিক্ষকের বিশেষ শিক্ষা প্রয়োগ করার উৎসাহ কিছুদিনের মধ্যেই মাঠ ছেড়ে স্কুলঘরে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। স্কুলের বাৎসরিক স্পোর্টসে বিচারক বা আন্তঃ ক্লাস ফুটবলে রেফারির দায়িত্ব পালন ছাড়া স্কুলের খেলাধুলোর অন্য কোন গঠনমূলক কাজে হাত দেওয়ার উৎসাহ ধীরে ধীরে তাঁর মন থেকে মুছে যাওয়া স্বাভাবিক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাণীপুরে এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কল্যাণীতে শারীর শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের দুটি কেন্দ্র আছে। কল্যাণীতে 'ডিগ্রি কোর্স' এবং বাণীপুরে 'ডিপ্লোমা কোর্স' শিক্ষা দেওয়া হয়। বাণীপুরে প্রতি বছর ৮০ জন বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলের নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক এবং ৪০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সরাসরি প্রতি বছর যোগদান করার সুযোগ পান। কল্যাণীর শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে আসনের সংখ্যা ৫০টি। প্রতি বছর উপরোক্ত কলেজ দুটি থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই বিশেষ শিক্ষা শেষে চাকুরি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকলেও সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের শারীর শিক্ষার শিক্ষকতা পাবার কোনরূপ নিশ্চয়তা নেই। প্রতি বছর এই সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বেকারের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য যে সব উৎসাহী যুবক-যুবতীরা এই পথে এগিয়ে এসেছিলেন, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাঁদের ক্রমেই অন্য পথে পা বাড়াতে বাধ্য করছে।

অর্জন সিং-এর কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছে সঞ্জীব সাহা

এ তো গেল সরকার, শিক্ষা পর্ষদ ও স্কুলগুলির পরিচালকমণ্ডলীর কথা। বিভিন্ন রাজ্য ও সর্বভারতীয় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলি স্কুলের ছাত্রদের খেলাধুলোর উন্নতি বা প্রতিষ্ঠার পথে কিভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন, সে সম্বন্ধেও সংক্ষেপে দু চার কথা না বললে ভারতের এবং বাংলার ক্রীড়া পরিচালকদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সার্বিক অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

ফুটবলে সুব্রত কাপ বা 'জুনিয়র ডুরানড' নামে যে সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবলের প্রচলন আছে, সেই প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইনডিয়ার হাতে রাখেননি। এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য যে কমিটি হয়, সেখানে স্কুলের খেলাধুলোর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা পদমর্যাদাই যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি। ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি

মামকা ওয়াস্তে ঐ কমিটিতে শোভা বৃদ্ধি করেন মাত্র। অথচ রাজ্য স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের হাতেই এই প্রতিযোগিতার বনিয়াদ তৈরির ভার। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ফুটবল শক্তিসম্পন্ন স্কুল নির্বাচনের প্রতিযোগিতার যাবতীয় ঝামেলা এই রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনই বহন করে থাকেন। পরবর্তী পর্বে তাঁরা দর্শক মাত্র। 'চাষ করে চাষী, গুড় খায় দারোগা'র মত ভারতীয় স্কুল ফুটবল দল গঠনের ব্যাপারেও ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সুপ্রিম কোরট। ফেডারেশনের নাক গলানো সেখানে অমার্জনীয় অপরাধ।

ক্রিকেটের চিত্রও অনুরূপ। আন্তঃআঞ্চলিক স্কুল ক্রিকেট কোচবিহার ট্রফি পরিচালনা ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড স্বহস্তেই করে থাকেন। স্কুল গেমস ফেডারেশনের ঐ বনেদী ঘরে প্রবেশ নিষেধ। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল নির্বাচনেও বোরড সর্বদ্রষ্টা। রাজ্যের ক্রিকেটেও ঐ একই প্রতিচ্ছবি। বাংলার স্কুল ক্রিকেট দল নির্বাচন করেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। ওয়েসট বেঙ্গল স্কুল স্পোরটস অ্যাসোসিয়েশন দূর থেকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মাত্র। প্রাতঃকালীন আন্তঃস্কুল ক্রিকেটের পরিচালক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে স্কুলের প্রতিনিধির জন্য কোন আসন নির্ধারিত নেই। মাঠের অভাবে আন্তঃজেলা স্কুল ক্রিকেট একরূপ বন্ধ হওয়ার পথে। স্কুলের ছাত্রদের ক্রিকেট খেলার কিছু সুযোগসুবিধা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সামান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় দাবি স্কুল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন সি এ বি'র দরবারে রাখার চেষ্টা করে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন বারে বারে।

ফুটবল ও ক্রিকেট ভারতের এই প্রধান দুটি খেলার কর্তৃত্ব স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইনডিয়ার হাত থেকে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোরড দখল করে রাখলেও অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, বাসকেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিনটন, টেবল টেনিস প্রভৃতি খেলাগুলি এখনও ফেডারেশনের হাতেই আছে। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন, টেবল টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল প্রভৃতির পরিচালকমণ্ডলী জাতীয় অনুষ্ঠানে জুনিয়র বিভাগের প্রবর্তন করেছেন সত্য, কিন্তু স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা দখল করাকে ন্যায় বলে মেনে নিতে পারেননি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য দরদী মনোভাব নিয়ে ঐসব পরিচালক আশামত গঠনমূলক কাজ করে চলেছেন, একথাও নিশ্চয়ই তাঁরা বলতে পারেন না।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য সরকার, পর্ষদ, স্কুল পরিচালক, শিক্ষক, বিভিন্ন সর্বভারতীয় বা রাজ্য ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মযজ্ঞের আরও এমনি অনেক দৃষ্টান্ত হাজির করা যায়। কিন্তু আমি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর সুযোগসুবিধার মোটামুটি একটি চিত্র পাঠকদের কাছে হাজির করতে চেয়েছি মাত্র।

অনন্যা সেন

পশ্চিম বাংলার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর খবরাখবর যাঁরা বিশেষভাবে রাখেন, তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে এ কথা স্বীকার করবেন যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে স্কটল্যাণ্ডের এক দরদী শারীর শিক্ষক জেমস বোকানন স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য কিছু কাজ করেছিলেন। একটা গঠনমূলক পরিকল্পনা তাঁর ছিল। ছিল নিজের প্রজ্ঞাকে রূপায়িত করার আন্তরিক প্রয়াস। 'ডাইরেকটর অফ ফিজিকাল এডুকেশন' হিসাবে তাঁর আরব্ধ কাজ আজ স্বাধীনতার ২২ বছর পরেও এক পাও এগিয়ে যেতে পারেনি। আন্তরিকভাবে সে পথে এগিয়ে যাবার কোন প্রচেষ্টাও হয়নি বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হবে না।

মানুষ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই খেলতে শুরু করে। খেলাধুলো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। খেলাধুলোর কষ্ঠিপাথরে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সমস্ত মলিনতাকে ঝেড়ে ফেলে সবল, সাহসী ও দরদী মানুষ হিসাবে জাতীয় সম্মানকে কদম কদম বাড়িয়ে চলে। খেলাধুলোর প্রয়োজনীয়তা তাই সর্বদেশে স্বীকৃত। উন্নত দেশগুলিতে খেলাধুলো শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গৃহীত। নতুন নতুন গবেষণায় রত অগ্রণী রাষ্ট্রগুলির খেলাধুলোর অঙ্গন আজ আলোকোজ্জ্বল। ছোট ছোট অনেক নগণ্য রাষ্ট্রও খেলাধুলোর হোমানলে শুচিশুভ্র। সোনা রুপো দিয়ে খোদাই করা তাদের নামগুলি আজ বিশ্বের অগণিত মনুষের কাছে বিস্ময়।

যে কোন খেলাই হোক না, তার প্রথম পাঠ নেবার একটা বয়স আছে। প্রতিভা ও শিক্ষার যুগপৎ ঘর্ষণে তা থেকে যে স্ফুলিঙ্গের রেখা জাগে, সেই সম্ভাবনাকে সযত্ন লালন-পালনে অনেক বিরাট ও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রমাণিত এ সত্যের খবরাখবর যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা রাখেন না একথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। অন্য দেশের কথা থাক। আজ পাঞ্জাব, দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এমন কি ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য যে কত প্রচেষ্টা চলছে, তার খবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাখেন কি?

পাঠক্রমের তালিকা থেকে খেলাধুলোকে মুছে দিয়ে আজ পশ্চিম বাংলার স্কুলের ছাত্রদের কোন পথে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সংবাদপত্রের প্রথম পাতার খবরগুলি তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। এন সি সির জুনিয়র ডিভিসনের জন্য ১৬টি জেলায় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থের অভাব হয় না। অথচ অতি প্রয়োজনীয় খেলাধুলোর সরঞ্জাম, মাঠ প্রভৃতির কাজে মাত্র কয়েক হাজার টাকা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কলকাতার বড় বড় ক্লাবগুলিতে একমাত্র ফুটবল খেলার জন্য যে খরচ হয়, পশ্চিম বাংলার চার হাজার স্কুলের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য বোধ হয় তার এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় হয় না।

সরকারের গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার বড় বড় পরিকল্পনা, বিশেষজ্ঞদের আবেগজড়িত ভাষণ এবং খেলাধুলোর কর্মকর্তাদের কর্মযজ্ঞের বড় বড় ফিরিস্তি যতই ঢাক পিটিয়ে প্রচারের চেষ্টা হোক, পশ্চিম বাংলা সরকার যতদিন খেলাধুলোকে আবশ্যিক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত না করছেন, যতদিন খেলার সরঞ্জাম, খেলার মাঠ এবং খেলার উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা স্কুলগুলিতে না হচ্ছে, ততদিন পশ্চিম বাংলার খেলার মান উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে না—যেতে পারে না।

বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা যোগ করে ইংরাজী ১৯৭০ সাল বিদায় নিল।

১৯৭০-এর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ

বিগত বছরের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা মেক্সিকোয় বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার সব চেয়ে চমকপ্রদ আসর এবং তিনবার জয়ের সুবাদে ব্রাজিলের চিরতরে জুলে রিমে কাপ লাভ। ব্রাজিলের বিজয় বৈজয়ন্তীর সঙ্গে ফুটবলের রাজকুমার পেলের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যও উল্লেখের দাবি রাখে। যে খেলার ফলে পেলে ৩১টি দেশের ক্রীড়া সাংবাদিকদের ভোটে ১৯৭০ সালের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের সম্মান পেয়েছেন। এডসন আরান্টেস ডো না নাসিমেন্টো অর্থাৎ পেলেই পৃথিবীর প্রথম ফুটবল খেলোয়াড় যিনি এই সম্মান পেলেন। এর আগে কোন ফুটবলারের পক্ষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের সম্মান লাভ সম্ভব হয়নি।

মহিলাদের মধ্যে ১৯৭০ এর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া পটিয়সীর সম্মান পেয়েছেন তাইওয়ানের বিস্ময় বালিকা চি চেঙ — ব্যাংকক এশিয়ান গেমস-এর পর যিনি তাঁর আমেরিকান কোচ ভিনস রির সঙ্গে সদ্য পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে পায়ের মাংসপেশীতে টান ধরায় চি চেঙ অবশ্য একটির বেশী স্বর্ণপদক পাননি। তাঁর বিশ্ব রেকর্ডও উন্নত করতে পারেননি। কিন্তু সম্ভবত দৌড়ের চারটি ইভেন্টে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী বলেই চি চেঙ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া পটিয়সী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। চি চেঙের ১০০ মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ড ১১ সেকেন্ড, ২০০ মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ড ২২·৪ সেকেন্ড, ১০০ গজ দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ড ১০·১ সেকেন্ড এবং ২২০ গজ দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ড ২২·৬ সেকেন্ড। চি চেঙ ছাড়া পৃথিবীর কোন মেয়ের অধিকারে এখন চারটি বিশ্ব রেকর্ড নেই।

ক্লে কাহিনী

হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা কেসিয়াস ক্লে, যিনি এখন মহম্মদ আলী নামে পরিচিত, তার কীর্তিকেও ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা বড় করে

বিগত বছরে রাগবী খেলার শতবার্ষিকী উৎসব হয়ে গেল গ্রেট ব্রিটেনে। শিল্পীর তুলিতে রাগবী খেলার প্রাথমিক অবস্থার এক ছবি

দেখেছেন। আমেরিকার সৈন্য বাহিনীতে কাজ করতে অস্বীকার করায় ১৯৬৭ সালে কেসিয়াস ক্লের কাছ থেকে বিশ্ববিজয়ীর সম্মান ছিনিয়ে নেওয়া হয়। দীর্ঘ ৩ বছর মুষ্টিযুদ্ধের রিং থেকে দূরে সরে থাকাই শুধু নয়, মামলা মোকদ্দমা, জরিমানা এবং জেলের আদেশ ক্লের মনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে। তবু কিন্তু তার উদ্যম নষ্ট হয়নি, মনোবল ভাঙেনি। পর্যায়ক্রমে লড়াইয়ের মাধ্যমে বিশ্ব বিজয়ীর খেতাব পুনরুদ্ধারের সুযোগ পেয়ে গত অক্টোবর মাসে জর্জিয়ার আটলান্টায় তিনি সহজেই জেরি কোয়ারিকে পরাজিত করেছেন। দুই মাস পরে নিউইয়র্কে পরাজিত করেছেন আর্জেন্টিনার মুষ্টিযোদ্ধা অস্কার বোনাভেনাকে। এবার তাঁর বিশ্ব জয়ীর খেতাব পুনরুদ্ধারের লড়াই বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জো ফ্রেজিয়ারের সঙ্গে।

জীবনে অপরাজিত অসম সাহসী মুষ্টিযোদ্ধা কেসিয়াস ক্লেকে বোনাভেনা যথেষ্টই বেগ দিয়েছেন। তাই অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছে ক্লে ফ্রেজিয়ারকে পরাজিত করতে পারবেন কিনা।

ক্লে-ফ্রেজিয়ারের লড়াইয়ের দিন তারিখ এখনও ঠিক হয়নি। সম্ভবত আগামী ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে নিউইয়র্ক কিংবা হিউস্টনে লড়াই হবে। সে তারিখে এবং যেখানেই হক এ লড়াইকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। মাল্টি মিলিয়ন ডলার ফাইট নামে এ লড়াইকে ইতিমধ্যেই অভিহিত করা হয়েছে। কেউ বা বলছেন 'ফাইট অফ দি সেঞ্চুরি'।

কত টাকা সংগৃহীত হবে এ লড়াই

থেকে? এখনও আন্দাজ করা যাচ্ছে না। কত দর্শক টেলিভিশনে এ লড়াই দেখবেন? বিশ্ব কাপের ফাইনাল খেলা দেখেছিলেন পৃথিবীর ৮০ কোটি মানুষ। তার চেয়েও বেশী কি? সে উত্তর মিলবে ফেব্রুয়ারি কি মার্চের পরে।

টাকার খেলা

মুষ্টিযুদ্ধ টাকার খেলা। একটি আকর্ষণীয় মুষ্টিযুদ্ধ থেকে যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় এবং যে বিপুল অর্থ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পকেটে যায় তা পৃথিবীর ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরও ঈর্ষার বস্তু। ফুটবল খেলাও অবশ্য এখন বড় ব্যবসা এবং কোটি কোটি টাকা দামের খেলোয়াড়ের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সম্প্রতি টেনিস খেলাও টাকার খেলা হয়ে উঠেছে। প্রোফেশনাল টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই স্বর্ণ-খনির উপর বসে আছেন। ১৯৭০-এ সব চেয়ে বেশী অর্থ উপার্জন করেছেন কে? না অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার। বিগত বছরে তাঁর আয় ২১ লক্ষ ডলারেরও উপরে। লেভারের পরের ফিগার কেন রোজওয়ালের, ১৪ লক্ষ ৪ শো ৫৫ ডলার। রয় এমার্সন আয় করেছেন ৯৬ হাজার ডলার, নিউকোম্ব ৭৮ হাজার ডলার। এর পর রয়েছেন পাঞ্চো গঞ্জালেস, টনি রোচ, টম ওকার, ফ্রেড স্টোলে, রজার টেলর, আন্দ্রে জিমিনো প্রভৃতি খেলোয়াড়রা। প্রোফেশনালের গোষ্ঠীভুক্ত নয় অথচ ব্যক্তিগতভাবে প্রোফেশনালদের মধ্যে আয় সবচেয়ে বেশী আমেরিকার ক্লিফ রিচের। পরিমাণ এক লাখ ডলার।

তবে খেলোয়াড়দের আয়ের দিক দিয়ে ১৯৭০-এর বড় খবর বোধ করি টেক্সাসের গলফ খেলোয়াড় লী ট্রেভিনোর ১৫৭০৩৭ ডলার উপার্জন। এই কারণেই বড় খবর যে, ট্রেভিনো এক সময় ছিল রাস্তার ছেলে। ১০ সেন্টের বিনিময়ে আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় জুতো পালিশ করত। গলফ খেলার দৌলতে তার ভাগ্য খুলে গিয়েছে।

হ্যাঁ, টেনিসের কথায় অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট কোর্টের কথা বলা হয়নি। আমেরিকার মৌরীন কনোলীর পর মার্গারেট কোর্টই একমাত্র মহিলা যিনি গত বছর ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, উইম্বলডন ও ফরেস্ট হিলস জয় করে গ্রান্ড স্লামের অধিকারিণী হয়েছেন।

অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার

বিগত বছরে অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার ক্ষেত্রে অনেকের কৃতিত্বই ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। সাঁতারে কম করে ২০টি বিষয়ে এবং অ্যাথলেটিকসে ১২টি বিষয়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অ্যাথলেটিকসে এশিয়ার মাত্র দু'জন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। একজন মেয়ে, একজন ছেলে। মেয়ে অর্থ তাইওয়ানের ওই চি চেঙ্গ। ছেলে চীনের নি-চিন-চিন। নি-চিন-চিন হাই জাম্পে লাফিয়েছেন ৭ ফুট ৬ই ইঞ্চি। সারা এশিয়ার কোন ছেলে বা মেয়ে বিশ্ব রেকর্ড করতে পারেননি। তবে সদ্য সমাপ্ত ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে জাপানের সন্তরণশিল্পী যোশিমি নিশিগাওয়ার ৫টি স্বর্ণ-পদক লাভ উল্লেখের দাবী রাখে।

বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারীদের মধ্যে কার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী? আমার মনে হয় গ্রীসের ক্রিস্টোস পাপানিকোলাউ-এর। পাপানিকোলাউই পৃথিবীর প্রথম অ্যাথলীট যিনি পোল ভল্টে ১৮ ফুটের বেড়া ভেঙেছেন। গত অক্টোবরে এথেন্সে পাপানিকোলাউ লাফিয়েছেন ১৮ ফুট ই ইঞ্চি। আমেরিকার ইলিনয়েসের ১৭ বছর বয়সী ছাত্র সাঁতারু জন কিনসেলার কৃতিত্বও কম নয়। গত আগস্ট মাসে লস অ্যাঞ্জেলেসে আমেরিকার সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপের বহু বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে কিনসেলার ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের রেকর্ড খুবই উল্লেখযোগ্য। কেননা কিনসেলা ১৬ মিনিটের বেড়া ভেঙে সময় কমিয়ে এনেছেন ১৫ মিনিট ৫৭·১ সেকেণ্ডে। ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে মার্ক স্পিৎজের ৫১·৯ সেকেণ্ড-এর বিশ্ব রেকর্ডও কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

ভারতের ভূমিকা

১৯৬৬-র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর টেবল টেনিস ক্ষেত্রে চীনের পুনরাগমন এবং প্রায় সব রকমের খেলাধূলা থেকে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার বহিষ্কার ১৯৭০-এর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর একটি উল্লেখ করার মত ঘটনা গ্রেট ব্রিটেনে রাগবী খেলার শতবার্ষিকী উৎসব।

ভারতের খেলাধূলার ক্ষেত্রেও উল্লেখ করবার মত ঘটনা আছে। তার মধ্যে প্রধান হল আই এফ এ শীল্ডে সর্বপ্রথম দুটি বিদেশী দলের যোগদান। আর বিদেশের খেলাধূলার অঙ্গন থেকে ব্যক্তিগতভাবে একটি ভারতীয় মেয়ের সর্বপ্রথম স্বর্ণপদক লাভ। পাঠকরা বুঝতেই পারছেন আমি আই এফ এ শীল্ডে ইরানের পাস ক্লাব এবং পশ্চিম জার্মানির লীডেরসাখেনের অংশ গ্রহণের কথা আর ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে ৪০০ মিটার দৌড়ে কমলজিৎ সাঁধুর স্বর্ণ-পদক প্রাপ্তির কথা বলছি। এডমণ্ডের মল্লযুদ্ধ এবং ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে সামগ্রিকভাবে ভারতের বিগত বছরের ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু হকিতে ভারত যেন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে অলিম্পিক বিজয়ীর সম্মান হাতছাড়া হবার সঙ্গে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মানও হাতছাড়া হওয়ায়। ম্যারাডকায় এবং ব্যাংককে তৃতীয় স্থান লাভ করায় হকিতে যে দৈন্যের পরিচয় দিয়েছে তা আগেই বলেছি।

১৯৭১-এর আকর্ষণ

১৯৭০-এর খেলাধূলা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কিছু আলোকপাত করা হল। এখন ১৯৭১ সম্বন্ধে কিছু পূর্বাভাষ।

১৯৭১-এ বিশ্ব পর্যায়ের খেলাধূলোর আসর বসতে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য। প্রথম বিশ্ব হকির আসর এবং জাপানে বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ। লাহোরে প্রথম বিশ্ব হকি কাপের খেলা ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত। আর জাপানের নাগোয়ায় ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে টেবল টেনিসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। এ ছাড়া [illegible] হিসাবে অল ইংলণ্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ান-শিপ (মার্চের ২৯ থেকে ২৭) বা উইম্বলডন (২১ জুন থেকে ৩ জুলাই) চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের আগ্রহ কম নয়। তবে টেনিসে এবার সব চেয়ে জমকালো আসর হবে কলকাতার সাউথ ক্লাবে মার্চের প্রথম সপ্তাহে। ভারতের মাটিতে প্রথম [illegible] এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের এই খেলায় পৃথিবীর প্রথম সারির টেনিস খেলোয়াড়-দের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

১৯৭১-এ বিদেশের মাটিতে ভারতের ৮টি টেস্ট খেলার দিন স্থির করা হয়েছে আছে। তার উপর যদি এম সি সি-র ভারত সফর ব্যবস্থা পাকা হয় তবে ১৯৭১-৭২ মরসুমে ভারতকে আরও পাঁচটি টেস্ট খেলতে হবে দেশের মাটিতে। নীচে ভারতের টেস্ট খেলার তালিকাগুলি দেওয়া হচ্ছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারত। প্রথম টেস্ট (কিংসটন ফেব্রুয়ারির ১৮ থেকে ২৩), দ্বিতীয় টেস্ট পোর্ট অফ স্পেন মার্চের ৬ থেকে ১০), তৃতীয় টেস্ট (বৌরড়া, গায়ানা মার্চের ১৯ থেকে ২৪), চতুর্থ টেস্ট (ব্রিজটাউন এপ্রিলের ১ থেকে ৫) পঞ্চম টেস্ট (পোর্ট অফ স্পেন এপ্রিলের ১৩ থেকে ১৭)।

ইংলণ্ড বনাম ভারত। প্রথম টেস্ট (লর্ডস জুলাইয়ের ২২ থেকে ২৭), দ্বিতীয় টেস্ট (ওল্ড ট্রাফোর্ড আগস্টের ৫ থেকে ১০), তৃতীয় টেস্ট (আগস্টের ১৯ থেকে ২৪)।

অস্ট্রেলিয়ায় ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার আরব্ধ টেস্ট সিরিজে এখনো চারটি টেস্ট বাকি। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার মুখে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গেও ইংলণ্ডের দুটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে।

একলব্য

টেবল টেনিসের আইন কানুন

টেবল টেনিসের ডাবলসের খেলায় পর্যায়ক্রমে এবং পালাক্রমে বল মারতে হয় সে কথা এর আগে লিখেছি। বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার করা যাক।

ধরুন 'এ' ও 'বি' একটি জুটি এবং 'এক্স' ও 'ওয়াই' আর এক জুটি। 'এ' যদি ডান দিক থেকে সার্ভিস করে তবে 'এক্স'কে সেই বল ফিরিয়ে দিতে হবে। আবার 'এক্স' এর মারা বল ফিরিয়ে দেবে 'বি' এবং 'বি'-র মারা বল ফেরাবে 'ওয়াই', 'ওয়াই'-এর মারা বল 'এ'। এইভাবে পর্যায়ক্রমে ও পালাক্রমে মারতে হবে। তার ব্যতিক্রম কেউ করতে পারবে না।

সার্ভিস এর সময়ও প্রতি ৫টি সার্ভিস অন্তর একই ধরনের পালা প্রথা। ডাবলসে সব সময় ডান দিক থেকে সার্ভিস করতে হয়। সুতরাং পাঁচটি সার্ভিস হয়ে গেলেই সার্ভিসকে বাঁ দিকে সরে এসে পার্টনারকে ডান দিকে দাঁড়াতে দিলে পর্যায়ে কোন গোলমাল হবে না।

তবে সব সময়ই মনে রাখতে হবে 'এক্স' যদি প্রথম গেমে প্রথমে 'এ'র কাছ থেকে বল রিসিভ করে, তবে পরের গেমে অবশ্যই 'এক্স'-কে 'বি'-র কাছ থেকে বল রিসিভ করতে হবে।

আইন ১৪ : পাশ পরিবর্তন ও সার্ভিস পরিবর্তন

যে খেলোয়াড় বা যে জুটি টেবল-এর এক পাশে দাঁড়িয়ে খেলা আরম্ভ করবে সেই খেলোয়াড় বা সেই জুটি পরের গেমে টেবল-এর অপর পাশে দাঁড়িয়ে খেলবে। ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি গেমের শেষে এইভাবে পাশ পরিবর্তন হবে। মীমাংসাসূচক শেষ গেমে খেলোয়াড় বা জুটিকে পাশ পরিবর্তন করতে হবে যখনই কোন খেলোয়াড় বা কোন জুটি ১০ পয়েন্ট করবে।

সিঙ্গলস-এর খেলায় পাঁচ পয়েন্ট হবার পর রিসিভার সার্ভার হবে এবং সার্ভার হবে রিসিভার। প্রতি পাঁচ পয়েন্টের পর গেম শেষ না হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ২০-২০ পয়েন্টে স্কোর সমান না হওয়া পর্যন্ত অথবা তাড়াতাড়ি (এক্সপিডাইট সিস্টেম) গেম শেষ করার বিধান প্রয়োগ না করা পর্যন্ত এইভাবেই সার্ভিস বদল চলতে থাকবে।

ডাবলস-এর খেলায় প্রথম সার্ভিস করার অধিকারপ্রাপ্ত জুটির নির্দিষ্ট একজন প্রথম পাঁচটি সার্ভিস করবে এবং প্রতিপক্ষ জুটির নির্দিষ্ট একজন সেই পাঁচটি সার্ভিস রিসিভ করবে। দ্বিতীয় পাঁচটি সার্ভিস করবে প্রথম পাঁচটি সার্ভিসের রিসিভার এবং এই পাঁচটি সার্ভিস রিসিভ করবে যে প্রথম পাঁচটি সার্ভিস করেছে তার পার্টনার অর্থাৎ সহ খেলোয়াড়। তৃতীয় পাঁচটি সার্ভিস করবে যে প্রথম পাঁচটি সার্ভিস করেছে তার পার্টনার এবং এই পাঁচটি সার্ভিস রিসিভ করবে যে প্রথম পাঁচটি সার্ভিস রিসিভ করেছে তার পার্টনার। চতুর্থ পাঁচটি সার্ভিস করবে যে প্রথম পাঁচটি সার্ভিস রিসিভ করেছে তার পার্টনার এবং এই পাঁচটি সার্ভিস রিসিভ করবে যে প্রথম পাঁচটি সার্ভিস রিসিভ করেছে সেই খেলোয়াড়। পঞ্চম পাঁচটি সার্ভিস করবে সেই খেলোয়াড় যে প্রথম পাঁচটি সার্ভিস করেছিল। যতক্ষণ গেম শেষ না হবে, অথবা ২০-২০ পয়েন্টে 'ডিউস' না হবে কিংবা তাড়া তাড়াতাড়ি (এক্সপেডাইট সিস্টেম) গেম শেষ করার বিধান প্রয়োগ না হবে ততক্ষণ এইভাবেই পর্যায়ক্রমে এবং পালাক্রমে সার্ভিস ও রিসিভ চলতে থাকবে।

প্রথম ৫টি সার্ভিস A – X

দ্বিতীয় ৫টি সার্ভিস X – B

তৃতীয় ৫টি সার্ভিস B – Y

চতুর্থ ৫টি সার্ভিস Y – A

২০-২০ পয়েন্ট হলে অথবা তাড়াতাড়ি গেম শেষ করার বিধান প্রয়োগ করা হলে সার্ভিস ও রিসিভ-এর পর্যায় ও পালা একই রকম থাকবে কিন্তু প্রতি খেলোয়াড় পাঁচটির বদলে পর্যায়ক্রমে একটি করে সার্ভিস করবে গেম শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

যে খেলোয়াড় বা যে জুটি একটি গেমে প্রথম সার্ভিস করবে পরবর্তী গেমে সেই খেলোয়াড় বা সেই জুটি প্রথম রিসিভ করবে। ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি গেমের পর এইভাবেই সার্ভিস ও রিসিভ করার অধিকার বদল হবে। ডাবলসের খেলার মীমাংসাসূচক শেষ গেমে যখনই কোন পক্ষ ১০ পয়েন্ট করবে তখনই রিসিভিং পেয়ার অর্থাৎ যে জুটি ওই গেমে প্রথম রিসিভ করেছে তারা রিসিভিং-এর পালা বদল করবে।

ডাবলসের খেলায় ম্যাচের প্রথম সার্ভিস রিসিভিংয়ে পালা হবে আগের গেমের বিপরীত।

জ্ঞাতব্য—

ডাবলসের খেলায় যাদের প্রথম সার্ভিস করার কথা, প্রতি গেমে তাদের জুটির যে কোন একজন সার্ভিস আরম্ভ করতে পারে। সুতরাং পর্যায় এবং পালা অনুযায়ী রিসিভিং পেয়ারকে দাঁড়াতে হবে।

একটি গেমে ম্যাচ হলে কোন পক্ষ ১০ পয়েন্টে পৌঁছালেই পাশ বদল হবে এবং ডাবলসের খেলা হলে রিসিভিং পেয়ার পরস্পর স্থান বদল করবে। ৩টি গেমে ম্যাচ হলে এবং তৃতীয় গেম খেলার প্রয়োজন হলে একইভাবে পাশ বদল ও রিসিভিং পেয়ারের স্থান বদল হবে। ৫টি গেমে ম্যাচ হলে এবং পঞ্চম গেম খেলা হলে ওই গেমে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

—মুকুল

দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম
আরাম—এই অভিপ্রায়ে বাটার খেলার জুতোর
বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করুন। কুশন আর্চ ও ইনসোল আকস্মিক আঘাত থেকে রক্ষা করে। ক্ষয়শীল
সন্ধিস্থলে টেকসই বন্ধনী। ভারী বাম্পার টোগার্ড। ঢালাই সোল আর হিল এমন
কৌশলে তৈরি যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। সব মিলিয়ে
আশ্চর্য সমাবেশ।

Bata

"নবরাগ" (পরিচালনা ঃ বিজয় বসু) ছবিতে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

চিত্র-সমালোচনা

মেরা নাম জোকার

(আর কে ফিল্মস)

রাজ কাপুরের "শোম্যানশিপ"-এর কথা সুবিদিত। তিনি বড় ছবি করেন। টেকনিকালারে রঞ্জিত "মেরা নাম জোকার"-ও বড় ছবি, তবে কেবল বাইরের জাঁকজমকের দিক থেকেই নয়। এই প্রথম সম্ভবত রাজ কাপুরের ছবিতে বাহ্যিক বৈভবের উপরেও বড় কিছু পেলাম, যাকে শুধুই প্রমোদ-উপকরণ বললে খাটো করা হয়। "মেরা নাম জোকার" ছবির তিনটি ভাগ, তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টি দেখার কালে মনে হয়েছে একজন খাঁটি শিল্পী চলচ্চিত্রকারের ছবি দেখছি। অবশ্যই ছবিতে প্রতি পর্বে দু-একটি দোষ-ত্রুটি দেখানো যেতে পারে। কিছু বা বেমানান। রাজুর মতো গরীব ছেলে ওই রকম স্কুলে পড়তে পারে কিনা সে প্রশ্ন তো উঠতেই পারে। কিন্তু গোটা ছবিটির বিন্যাস এত উচ্চাঙ্গের—কী আঙ্গিকে কী বিষয়বস্তুতে—যে ওই সব খুঁত ধরতে ইচ্ছা করে না।

প্রথম ভাগে দেখানো হয়েছে রাজুর ছোট-বেলা, ছাত্রজীবন। বয়স তখন তার ষোল। ষোল বয়সের ছেলের মধ্যে বুঝি অর্ধেক যৌবন, অর্ধেক কৈশোর। রাজু হঠাৎ একদিন দেখে ফেলে তার চাইতে পাঁচ বছরের বড় শিক্ষিকা মেরিকে (সিমি) ঝোপের আড়ালে গায়ের জামা খুলে ফেলতে। মেরি স্কুলের ছেলেদের নিয়ে বেরিয়েছিল, সেখানে আচমকা সে জলের মধ্যে পড়ে যায়। ভেজা কাপড়ে মেরি তাড়াতাড়ি চলে আসে ঝোপের মধ্যে, ছেলেদের দৃষ্টির বাইরে। কিন্তু মেরিকে চোখের আড়াল করতে চায় না রাজু। মেরি রাজুকে প্রথম দিন থেকেই ভালবেসে ফেলেছে, সেটা নিষ্পাপ স্নেহ। রাজুরও গভীর আকর্ষণ মেরির প্রতি। যেদিন রাজু মেরিকে প্রায়-নগ্নদেহে দেখতে পেয়েছে সেদিন থেকেই রাজুর মধ্যে কী এক অস্পষ্ট যন্ত্রণা বা অস্বস্তি। নাকি এক অস্ফুট সুখাবেশ?

পরিচালক রাজ কাপুর রাজুর ওই মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন চমৎকারভাবে। ষোল বছর বয়সের ছেলের হঠাৎ করে একদিন পুরুষ হয়ে ওঠা, পূর্ব-সংস্কারের সঙ্গে তার নবলব্ধ অনুভূতির দ্বন্দ্ব এবং তার অপরাধবোধ আমরা দেখতে পেয়েছি রাজু-বেশী ঋষি কাপুরের (রাজ কাপুরের ছেলে) সাবলীল অভিনয়ে। এবং তার চেয়েও বেশি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর সুচিন্তিত বিন্যাসে। রাজুর মনের অবস্থা ও সমস্যার কথা মেরি জানতে পারে তার প্রেমিক ডেভিডের (মনোজকুমার) কাছ থেকে। মেরি ও ডেভিডের বিয়ে হয়েছে। রাজু সহজভাবে মেনে নিয়েছে ডেভিড ও মেরির মিলন। তখন থেকেই রাজুর জীবনের লক্ষ সে জোকার হবে। তার বাবাও ছিলেন সার্কাসের জোকার, সার্কাসই ছিল যাঁর বাঁচার ও মরবার জায়গা। রাজু যেদিন তার মায়ের কাছে বাবার সব কথা জেনেছে সেদিন থেকেই রাজুর জীবনের লক্ষ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার জীবনদর্শন। নিজের জীবনে যত দুঃখই থাক, মুখের হাসি ও গান সে বাঁচিয়ে রাখবে চিরদিন। লোককে আনন্দ দিয়ে যাবে সারাজীবন ধরে।

জোকারের জীবন নিয়ে রাজ কাপুর তাঁর এই দীর্ঘ ছবিতে তিন অধ্যায় ধরে রীতিমত এক ভাবদর্শনের অবতারণা করেছেন। মূলত "মেরা নাম জোকার" ওই ভাবনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে তাঁকে চার্লি চ্যাপলিনের "লাইমলাইট" সুনির্দিষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছে। এবং জোকারের জীবন নিয়ে রাজ কাপুর যা ভেবেছেন তা বার বার তিনি দর্শককে বিশেষভাবে জানিয়েছেন। একটি ভাব বা তত্ত্ব বার বার জানাবার এই ঝোঁকটি শিল্পবিরুদ্ধ। তবুও প্রযোজক-পরিচালক-চিত্রসম্পাদক রাজ কাপুরকে প্রশংসা করতে হয় এই কারণে যে, তিনি যা-ই কিছু দেখাতে বা বলতে চেয়েছেন তা কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সার্কাসের স্টেজের পিছনে মায়ের মৃতদেহ, স্টেজে জোকার দর্শককে গানে ও অভিনয়ে হাসিয়ে চলেছে। রাজুর মা যখন জানলেন, তার নিষেধ সত্ত্বেও রাজু সার্কাসে যোগ দিয়েছে তখন অসুস্থ শরীরেও তিনি সার্কাসে নিজে না এসে থাকতে পারলেন না। ট্র্যাপিজের সময় রাজুর সম্ভাব্য বিপদের দৃশ্য দেখেই তিনি জ্ঞান হারান, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মায়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে রাজু। তখন তার ডাক পড়ে স্টেজে যাবার। দূর থেকে ঘোষণা শোনা যাচ্ছিল। তার পর আবার সার্কাসের ম্যানেজারের (ধর্মেন্দ্র) রাজুর মায়ের মৃত-দেহের পাশ থেকে মাইকে জোকার রাজুর স্টেজে যাওয়ার কথা ঘোষণা করার মধ্যে অনেকটা আতিশয্য দেখা গেছে। এই আতিশয্য দেখানো হয়েছে জোকারের জীবনের ট্রাজেডি—নিজের কান্না চেপে রেখে মানুষকে হাসানো—অতিরিক্তভাবে বলার জন্য। যাই হোক, সাজানো মেলোড্রামা সত্ত্বেও ওই সময়ে স্টেজে রাজুর জোকারের কাজের দৃশ্য আবেগমণ্ডিত।

মেরা নাম জোকার-এর প্রথম অধ্যায়টির মত দ্বিতীয় অধ্যায়টিও উঁচুস্তরের। এই অধ্যায়ে প্রধানত দেখানো হয়েছে রাশিয়ার মেয়ে মারিনার (মস্কোর বলশয় ব্যালের রাবিয়ানকিনা) সঙ্গে রাজুর প্রেমের সম্পর্ক। সরল ও আপনভোলা রাজুকে ভালবেসে ফেলেছে মারিনা। এই প্রেম মিলনের কিংবা বুকফাটা বিরহের গতানুগতিক পথে পর্যবসিত হয়নি। দূরে থেকেও অনেকে প্রেমকে সার্থক করে তোলে। মারিনা ও রাজুর প্রেমও তাই। বিদেশিনীর সঙ্গে রাজুর মিলন হল না, দু' দিনের জন্য সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাতে এসে মারিনা নিজের দেশে চলে গেল। তার আগে মারিনার সঙ্গে রাজুর মায়ের সাক্ষাত

"এখানে পিঞ্জর" (পরিচালনা: যাত্রিক) ছবিতে দোলনচাঁপা, গৌর শী, অপর্ণা দেবী ও উত্তমকুমার

দেখানো হয়েছে। চমৎকার ওই মুহূর্তটি, যখন মারিনা জেনেছে "বহু" কথার অর্থ কী। রাজুর মা চেয়েছিলেন মারিনাকে "বহু" করতে। "বহু" কথার অর্থ কী? মারিনা জিজ্ঞাসা করেছে রাজুকে। রাজু বলেছে, দেশে গিয়ে জেনে নিও। মারিনা জেনেছে সঙ্গে সঙ্গেই, তখন তার মনে গভীর দ্বন্দ্ব। কী করবে সে এখন? পরিচালক রাজু ও মারিনার সম্পর্কটি একান্ত সহজ, স্বাভাবিক ও বাস্তবরূপে দেখিয়েছেন। এমন প্রেমের ঘটনা হিন্দীচিত্রে তো দূরের কথা ভারতীয় চিত্রেও কি আগে দেখা গেছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চমৎকারিত্ব রাজু ও মারিনার ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার মধ্যে। একের ভাষা অপরে বোঝে না। দুজনের কাছেই ছোট অভিধান, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশব্দ বের করে তারা একে অপরের কথা বুঝে নেয়। এর মধ্যে হিউমার আছে, আরও বেশি রয়েছে বন্ধুত্ব ও প্রণয়ের সূত্রপাত। মারিনা নিজের দেশে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি।

"মেরা নাম জোকার"-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দর্শকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নতুন ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য তো বটেই, রাজ কাপুরের চিত্রপরিচালনার গুণেও এই দুই অধ্যয়ে অজস্র। প্রথম অধ্যায়টি দেখে মনে হয় যেন একটি বিদেশী ছবি। যেমন পটভূমি তেমনি এর অসামান্য টেকনিক্যাল কাজ। রাধু কর্মকারের ফটোগ্রাফিও আন্তর্জাতিক মানের। তা ছাড়া, সব মিলিয়ে গল্পবিষয়ের গভীরতা ও বিন্যাসে, প্রথম ভাগ একটি আর্ট ফিল্মের পর্যায়ভুক্ত। অংশটি স্বচ্ছন্দে পাঠাতে পারেন। দ্বিতীয় ভাগের গল্প ও ট্রিটমেন্টও দর্শককে নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দ দেবে। এই অধ্যায়ে রাশিয়ার সুন্দরী শিল্পী রাবিয়ানাবিনাকেও দর্শকের খুব ভাল লাগবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তির আগে এয়ারপোর্টে রাশিয়ান টিমকে বিদায় জানাতে এসে, রাজুর মনে পড়েছে আগের একটি গান—"আওয়ারা" ছবির গান। তখন আশঙ্কা হয়েছিল হয়ত তৃতীয় অধ্যায়ে শেষ পর্যন্ত বোম্বাইয়ের হিন্দী ছবিই দেখতে পাব। আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্য হয়নি। তৃতীয় অধ্যায়ের কাহিনী কিছুটা মামুলি হলেও এর বিন্যাসভঙ্গি সংযত ও পরিশীলিত—অন্তত বোম্বাইয়ের তথাকথিত "কমার্শিয়াল" ছবির মত নয় মোটেই। রাজু সার্কাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ভ্রাম্যমানের জীবন-যাপন করতে। জায়গায় জায়গায় ঘুরে সে মানুষকে আনন্দ দেবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজ কাপুরের স্বাভাবিক অভিনয় মুগ্ধ করে রেখেছিল। রাজু "আওয়ারা"-ব্রত নেবার পরই রাজ কাপুরের অভিনয়ে আগের ম্যানারিজম-ও কিছুটা এসে গিয়েছে। সাজানো গল্প যেমন হয়, সেরকম ভাবেই আওয়ারা-জীবনে রাজুর সঙ্গে পরিচয় মিনু বলে আর এক বিপথগামী আওয়ারা ছেলের। দর্শক বুঝতে পেরেছিলেন আগেই, রাজু পরে বুঝতে পারে এই মিনু আসলে পুরুষবেশিনী মীনা (পদ্মিনী)। মীনা কেন পুরুষ সেজে থাকত? সেটা তার "মজবুরিয়া", মীনা নিজের মুখেই সে-কথা বলেছে। তৃতীয় ভাগ রাজু-মীনার প্রেম নয়, সংগীতশিল্পী। থিয়েটারের শিল্পী হিসাবে রাজু ও মীনা সুনাম অর্জন করে। মীনার কাছে প্রেমের চেয়ে উচ্চাশা বড়, সে এক নামকরা ফিল্ম স্টার-প্রডিউসারের কৃপাদৃষ্টিতে পড়ে। শেষ পর্যন্ত রাজুকেই আত্মত্যাগের পথ বেছে নিতে হয়।

এই অধ্যায়ে রাজ কাপুর দর্শকের চিত্ত-বিনোদনের জন্য কিছু উপকরণ রেখেছেন। পদ্মিনীর নাচ ছাড়াও অন্যান্য উপাদান আছে। যৌন উপাদানও বাদ যায়নি। প্রথম ভাগেও সেক্স-উপকরণ আছে। কিন্তু মনে হয় না সেটা সেক্স-উপকরণ। এখানে কাহিনী ও শিল্পের প্রয়োজনেই সেক্স এসেছে। এ দেশের ছবিতে সেক্স-উপাদানের এমন যুক্তি-সঙ্গত ব্যবহার কমই দেখা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে সেক্স সেক্সই। তবু, আগেই বলেছি, মামুলী গল্পের বিন্যাসেও রাজ কাপুর পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তিনটি অধ্যায়েই রাজুর জীবনের ট্র্যাজেডি, দ্বিতীয়টিতে মেলোড্রামার লক্ষণ থাকলেও কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। তৃতীয় সম্পর্কেও সে-কথা খাটে। এমন কী, প্রথম দুটি অধ্যায়ে গানের ব্যবহারও সংযত। শংকর-জয়কিষণের সুরে মুকেশ, মান্না দে, রফি, আশা ভোঁসলে প্রমুখ শিল্পীরা যে গানগুলি গেয়েছেন সেগুলি শুনতে খুবই ভাল লাগে। তবু সেসব গানের প্রয়োগে রাজ কাপুর সংযত—এমন কী রাজুর মা মারা যাবার পরের ওই চমৎকার গানটিও (মান্না দে গীত) অল্প-ক্ষণের জন্য শোনানো হয়েছে। প্রতি অধ্যায়েই নামকরা শিল্পীরা রয়েছেন—রাজেন্দ্রকুমার, ধর্মেন্দ্র, মনোজকুমার, অচলা সচদেব, সিমি, পদ্মিনী। এঁদের অভিনয়ও আর সব ছবির মত নয়, অত্যন্ত মার্জিত এবং চরিত্রোপ-যোগী।

তৃতীয় অধ্যায়টি তুলনায় আগের দুটি অধ্যায়ের চাইতে নীরস হলেও সামগ্রিকভাবে "মেরা নাম জোকার" রাজ কাপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র। চিত্রসম্পাদক হিসাবেও রাজ কাপুর এ ছবিতে বিশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এত বড় ছবি, কিন্তু দেখতে ক্লান্তি আসে না। আর শোম্যানশিপ? সেক্ষেত্রেও "মেরা নাম জোকার" রাজ কাপুরের চিত্রতালিকায় অতুলনীয়।

ভ্রম সংশোধন

বিনোদন সংখ্যা "দেশ"-এ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ রচিত "রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধের ২৪নং পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে শান্তিনিকেতনে যাঁরা নাচের শিক্ষকতা করেছেন তাঁদের তালিকায় ২০ ও ২১ নম্বরের নাম দুটি ভ্রমবশত বাদ পড়ে গেছে। ওই দুটি নাম যথাক্রমে সুজাতা দেবী ও অনিতা দেবীর। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য

বোম্বাই বিচিত্রা

গত বছর মোটামুটি এই সময়ে হিন্দী চিত্র জগতে কিছু নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল, কিছু নতুন আশা প্রায় ঝকঝক করছিল। গত বছর এমন সময়ে 'ভুবন সোম' তৈরী হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে 'আধে অধুরে', 'সারা আকাশ', 'উসকী রোটি'। তখন আমরা আশা করছিলাম উনিশ শো সত্তর বুঝি হিন্দী চিত্র জগতে একটা বিপ্লব এনেই ফেললো। কিন্তু শেষ অবধি শুধু 'ভুবন সোম' ভেনিসের তিলক কপালে নিয়ে জাতীয় পুরস্কারের মুকুট মাথায় এ'টে এবং প্রভূত প্রশস্তির নামাবলী গায়ে জড়িয়ে জনসমক্ষে হাজির হোল মর্নিং শো-এ। 'আধে অধুরে' শেষ হওয়া সত্ত্বেও আভ্যন্তরীন কারণে 'আধে অধুরে', 'সারা আকাশ' এখনো মাটির পৃথিবীতে থিয়েটারের মুখ চেয়ে হা-পিত্যেস করছে, 'উসকী রোটি' কবে জনতার পাতে পরিবেশিত হবে কেউ জানে না। গত বছরের আশা-আকাংখার হিসেব এ বছরে পাওয়া গেল না, তাই নতুন বছরের জন্যে নতুন করে আশা আকাংখা করতেও ভরসা হচ্ছে না।

এ বছরের শেষ বড় ছবি 'মেরা নাম জোকার'। রাজ কাপুরের 'ম্যাগনাম অপাস' 'মেরা নাম জোকারের' ব্যবসায়িক সাফল্যের ওপরও আগামী বছরের অনেক কিছু নির্ভর করছে। শোনা যাচ্ছে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের এই চলচ্চিত্র জগৎ নাকি আর চরমপন্থীদের জন্য নয়। শুধু গ্ল্যামার আর কোটি কোটি টাকার খেলা দেখাবার দিন আর নাকি নেই। আবার তেমনি 'উসকী রোটি' জাতীয় আর্ট ফিলিমের দিনও নাকি এখনো আসেনি। এখানে বড় জোর 'ভুবন সোম', 'সফর', 'খামোসী'। বোম্বাই, ভৌগোলিক দৃষ্টিতে ভারতের এক চরম প্রান্তে অবস্থিত হলেও এ রাজ্যের সোজা পথ হল মধ্যপথ। এ পথও নয়, ওপথও নয়। দু পথেরই গা ঘেঁস্য মধ্যপথ। রাজেশ খান্নাও থাকবে বক্তব্যও থাকবে। খল নায়কও থাকবে শুভ বুদ্ধিও থাকবে। এখানকার ছবি তৈরীর বর্তমান হিসেবটা মোটামুটি এই রকম (মানে ঐ মধ্যপন্থী ভাল ছবি তৈরীর), পনের রীলের যদি ছবি হয় তাহলে তার বারো রীলের মোটামুটি ভাগ্যবিধাতা ধরুন নায়ক। ঐ বারো রীলের অন্তত তিন রীল নায়ক নায়িকা এবং সঙ্গীত পরিচালক অধ্যুষিত। নায়িকারও আলাদাভাবে অন্তত রীল তিন চার চাই, যেখানে তিনি তাঁর 'খেল' দেখাবেন। নামকরা ডায়লগ রাইটার তো ছবির প্রতি ফ্রেমেই উপস্থিত। এইবার খলনায়ক বা পার্শ্ব নায়ক বা কৌতুক অভিনেতা বা বিশেষ চরিত্র অভিনেতার জন্যও দু/এক রীল ছাড়তে হয়। একা পরিচালকের কপালে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরো একটা রীলও জোটে না। তাই তিনি নায়ক, নায়িকা, ডায়লগ রাইটার, সঙ্গীত পরিচালক এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নানান কায়দায় সমঝোতা করে, মানে কাউকে ইনস্পায়ার করে, কাউকে হিউমার করে, কাউকে তেলিয়ে, কাউকে তোষামোদ করে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অধীনস্থ টেকনিশিয়ানদের ওপর চোখ রাঙিয়ে এবং পরিচালনার মাহাত্ম্যটা তাঁদের বুঝিয়ে সারা ছবিময় ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকার অ-প্রাণ চেষ্টায় সর্বদা সচেষ্ট। অভিনেতা-নায়ককে তিনি 'হিউম্যান' হতে বলেন, নায়িকাকে বলেন সাদাসিধে হতে, ফিনান্সিয়ারকে বলেন চরিত্রবান হতে, দর্শককে অনুরোধ করেন মন দিয়ে শুনতে, সমালোচককে বলেন শ্রদ্ধেয় হতে আর নিজে ছবি বানান পরার্থে, অর্থাৎ অধীনস্থ টেকনিশিয়ানদের অনাহারের হাত থেকে বাঁচাতে। উনিশ শো একাত্তর সম্ভবত এইসব পরোপকারী চিত্র নির্মাতা-দের বছর। যাঁরা নিজের জন্য ছবি বানান না, যাঁরা ছবি বানান, হয় জনককল্যাণে, নয় তাঁবেদার কল্যাণে, নয় চলচ্চিত্র জগতের কল্যাণে। উনিশ শো একাত্তরে এ'দের কল্যাণ হোক। বাকি যাঁরা রইলেন তাঁদের জন্য রইলো শুভেচ্ছা। কোটি কোটি টাকার খেলা যাঁরা দেখাবেন তাঁদের প্রাণ ভরে ভরসা দিতে পারছি না, আর যাঁরা আর্ট ফিলিম করবেন তাঁদের জন্যে যে নিদেন-পক্ষে মর্নিং শোরও বন্দোবস্ত করে দেব তেমন অঙ্গীকারও করা খুব কঠিন ব্যাপার। তবু বলব, চালিয়ে যান। কথায় বলে না 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ'। ছাড়তে নেই।

সরল শর্মা

'জয়-জয়ন্তী' (পরিচালনা : এস মল্লিক) ছবিতে অপর্ণা সেন

"অর্চনা"-র শুভ সূচনা

নবগঠিত সাহা ফিল্মস তাঁদের প্রথম প্রয়াস হিরণ্ময় সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে "অর্চনা"-র প্রাথমিক কাজ শেষ করেছেন। সুখেন দাসের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন পীযূষ গাঙ্গুলী ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অজয় দাস।

বিভিন্ন চরিত্রে পর্যন্ত যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল ও সুধীর সাহার নাম উল্লেখযোগ্য।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী আউটডোর শুটিংয়ের জন্য ভুটানের সামচী অঞ্চলে রওনা হবেন।

ধন্যি মেয়ে

শ্রী প্রোডাকসন্সের "ধন্যি মেয়ে" ছবির পরিচালনা করছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু, অনুভা ঘোষ, জহর রায়, রবি ঘোষ, হরিধন, পার্থ মুখোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, তরুণ-কুমার, সুখেন দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায় ও জয়া ভাদুড়ী।

সদারঙ্গ আয়োজিত ঘরোয়া আসর

সদারঙ্গ সংগীত সংসদ সম্প্রতি একটি চিত্তাকর্ষক সংগীতসভার আয়োজন করেছিলেন। শিল্পী, শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক। গাইলেন স্বসৃষ্ট রাগ সুবর্ণ-মুখী এবং দুটি ভজন। দরদ দিয়ে গাওয়া গান শ্রোতাদের অনাবিল আনন্দ দিয়েছে। পূর্বেকার সম্মেলনে পরিবেশিত সুবর্ণ-মুখী-র চেয়েও এদিনকার খেয়াল অনেক উজ্জ্বল ঠেকল। ভজন গান দুটি তুলনাহীন। ভক্তিরসের স্পর্শে শ্রোতারা আবিষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু এদিনে গানের চেয়েও বড় আকর্ষণ ছিল একটি আলোচনা, যার মুখ্য প্রবক্তা শ্রীমতী পট্টনায়ক। কিন্তু যার সূত্রপাত করান সংসদের সম্পাদক শ্রীকালিদাস সান্যাল। তিনি বলেন, "শিল্পী ও শ্রোতার যে সম্পর্ক তা নিকটতর হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অনেক শিল্পীই আমাকে বলেছেন যে তাঁদের অনেক কথা শুধু গান গেয়ে বা বাজিয়েই জানানো যায় না। তাই আমরা এরকম অনুষ্ঠান আরও করব, যেখানে গান বাজনা ছাড়াও শিল্পীরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন। ইচ্ছে হলে শ্রোতাদের আলোচনায় ডাকবেন। প্রশ্নের উত্তর দেবেন।"

শ্রীমতী পট্টনায়ক তাঁর সংগীতদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন যে, নন্দনরস, সৌন্দর্যসাধনা হল তাঁর সংগীতের মৌল প্রেরণা। স্বরচিত রাগগুলি কীভাবে তাঁর চিন্তায় এল তার পশ্চাদ্ভূমি বিবৃত করে তিনি জানান যে অদূরভবিষ্যতেই তিনি এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবেন। নানাভাবে আলোচনাটিকে সরস করে তোলেন সৈয়দ ফারুক সঈদ, সেতারী ইমরৎ খাঁ ও শ্রীবিমান ঘোষ।

ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনী

ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনীর উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী গানের আসর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল যথারীতি এদের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে। প্রথম সন্ধ্যার সূচনায় ছিল গম্ভীর রাগে আলাপ ও ধ্রুপদ। শিল্পী, শ্রী বি এস ঠাকুর (দিল্লী)। সুন্দর অনুষ্ঠান শ্রীনন্দন পালের পাখোয়াজ সংগত সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর সেতারে হেমবেহাগ বাজিয়ে শোনান শ্রীমতী জয়া বিশ্বাস। বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর বাজনা। সংগে তবলা সঙ্গত করেন শ্রীঅমর দে।

দ্বিতীয় আসরে এলেন নবাবজাদী বেগম আকবর। বাজালেন সুরবাহার ও সেতার (মিশ্র)। এদিনের প্রধান আকর্ষণ শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। বোম্বাইতে কয়েকটি উচ্চ প্রশংসিত অনুষ্ঠান সেরে তিনি সম্প্রতি ফিরেছেন। এদিন সন্ধ্যায় প্রথম তিনি গাইলেন বেহাগ। রাগের মাধুর্য ও সৌন্দর্য সুন্দর ফুটে ওঠে। কিন্তু পরের রাগ দরবারী গাইবার সময় শিল্পীর প্রতিভার সম্যক রূপটি নজরে এল। দৃপ্ত ভঙ্গীতে ও পরিচ্ছন্ন গলায় রাগটির ঐশ্বর্য ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে ওঠে। মন কানায় কানায় ভরে

"অন্য মাটি অন্য রঙ" (পরিচালনা : রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী) ছবিতে অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবানী বসু

বায়। কিন্তু খেদ রয়ে গেল এই, সংগীত-সূচীকে সম্পূর্ণ করে একটি ঠুংরীও তিনি গাইলেন না। সময়াভাব? সংগতে ছিলেন কুশলী তবলিয়া শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

—সংগীত সমালোচক

মল্লার-এর দ্বাদশ বার্ষিকী

অন্যান্যবারের মত এবারও মল্লার গোষ্ঠী তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন গত ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে। প্রারম্ভে সুজিত নাথের পরিচালনায় সমবেত গীটার অনুষ্ঠান খুবই হৃদয়গ্রাহী। পিয়ানোয় সুজিত নাথের নিপুণতা আজও অনস্বীকার্য। পরের অনুষ্ঠান মল্লার-এর ক্ষুদে শিল্পীদের নিয়ে "চলো যাই ছড়ার দেশে" নৃত্যগীতালেখ্য। জ্যোতিভূষণ চাকীর রচনা ও পরিচালনা, রুবী দত্তর নৃত্য-নির্দেশনা ও রুবী রায়ের সংগীত পরিচালনা খুব উচ্চাঙ্গের কিছু না হলেও ছোটদের নিয়ে কোন অনুষ্ঠানে এমনিতেই অনেক মজা থাকে। তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলিও চমৎকার লাগে।

মূল আকর্ষণ মহাকবি ভাসের সংস্কৃত নাটকের নৃত্যনাট্য রূপান্তর "স্বপ্নবাসবদত্তা" ছিল অনুষ্ঠানের শিরোভাগে। উজ্জয়িনীর রাজকন্যা বাসবদত্তার সঙ্গে বৎসরাজ উদয়নের প্রেম-পরিণয়-বিরহ ও পুনর্মিলনের কাহিনী এ নৃত্যনাট্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত। তবে গতিবেগ কিছু মন্থর; কিছু কিছু এলোমেলো ব্যাপার আছে নানা স্তরে। মূল দুটি চরিত্রের নৃত্যাংশে রুবী দত্ত (উদয়ন) ও ইন্দ্রানী সেন (বাসবদত্তা) এবং সংগীতাংশে যথাক্রমে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতাংশেও দিলীপ চক্রবর্তীর কথা উল্লেখযোগ্য। পদ্মাবতী চরিত্রে নৃত্যে ঊর্মিলা রায় ও সংগীতে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নেপথ্যে নৃত্যনাট্যরূপকার ও পরিচালক জ্যোতিভূষণ চাকী, নৃত্য-নির্দেশক রুবী দত্ত, সংগীত পরিচালক অনুপতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলোক-নিয়ন্ত্রণে কণিষ্ক সেন মোটামুটি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে আবহ-সংগীত রচনায় ভাস্কর মিত্র ও দিনেশ চন্দ্র সমবেতভাবে বিস্ময়কর কাজের পরিচয় দিয়েছেন। আবহ-সংগীত "স্বপ্ন-বাসবদত্তা"-র এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

—দিবাকর বর্মা

ফরিয়াদ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "ফরিয়াদ" চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সমরেশ বসু। ডাক্তার দেবনাথ রায় এ ছবির প্রযোজক এবং বিজয় বসু পরিচালক। প্রধান তিনটি চরিত্রের শিল্পী : সুচিত্রা সেন, উৎপল দত্ত ও পার্থ মুখোপাধ্যায়। নচিকেতা ঘোষ সংগীত পরিচালক।

"ইম্পিরিয়াল ভেনাস" ছবিতে জিনা লোলো ব্রিজিডা ও স্টিফেন বয়েড

সুরঙ্গনার গানের আসর

সম্প্রতি 'সৌরভ' সংগীতশিক্ষাকেন্দ্রের কক্ষে 'সুরঙ্গনার' আয়োজনে একটি সংগীতের অধিবেশন সম্পন্ন হল। এই আসরের প্রধান শিল্পী ছিলেন বোম্বাই-প্রবাসিনী শ্রীমতী অণিমা রায়। ইনি পণ্ডিত লছমীপ্রসাদের শিষ্যা। সেদিনকার অধিবেশনে যাঁরা শিল্পীর খেয়াল এবং ঠুংরী শুনেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁর মেজাজ এবং মুন্সিয়ানা—দুয়েরই প্রশংসা করবেন। বিশেষত একতালের ছন্দে বিলম্বিত লয়ে পূরিয়া কল্যাণের ভাবাভিব্যক্তি অণিমা রায়ের সুগ্রথিত এবং সুসংযত স্বরবিন্যাসে সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। পূরিয়ার বর্তমান প্রচলিত রূপটি মারবা মেলে এবং তা পঞ্চম-বর্জিত একটি ষাড়বজাতীয় রাগ। কিন্তু এক সময়ে এই রাগটি কল্যাণ মেলের অন্তর্গত ছিল। পূরিয়া কল্যাণের পঞ্চমের প্রয়োগে যে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, শিল্পী সেটুকুও বেশ নিপুণ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। তবে মধ্যসপ্তকের মধ্যে বিশেষত তার পূর্বাংগের বিস্তার আর একটু বৈচিত্র্যমণ্ডিত হতে পারত। ছন্দের ক্ষেত্রেও শিল্পী মোটামুটি গতানুগতিক ধারাটুকু বজায় রাখার বেশি কিছু করেন নি। ও'র ঠুংরীর মেজাজটি কিন্তু খুবই ভালো। সামগ্রিক বিচারে অণিমা রায়ের এই অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে সুন্দর মনোগ্রাহী। ও'র সঙ্গে তবলায় সংগত করেছেন সুধেন্দু কর্মকার।

অণিমা রায়ের কণ্ঠ সংগীতের আগে যন্ত্র সংগীতের একটি অনুষ্ঠানে সেতার বাজিয়ে শোনান শ্রীলা মৈত্র। শিল্পীর 'হংসধ্বনি' রাগের পরিবেশনায় নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। সংগতে ছিলেন মাণিক দাস।

আনন্দবর্ধন

লোকায়নের নাট্যোৎসব

লোকায়ন সংস্থা অবন মহলে এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। উৎসবে নৃত্যনাট্য "শ্যামা"-ও (পরিচালনা : শান্তি নাগ) মঞ্চস্থ হবে। তা ছাড়া অভিনীত হবে "দ্বীপের রাজা" এবং 'গন্ধরাজের হাততালি' (পরিচালনা : অরুণ রায়)। ১৮, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্ঠান।

"নিমন্ত্রণ" ছবিতে অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়

সংগীতানুষ্ঠান

যাদবপুর বাঘা যতীন কলোনিতে সম্প্রতি ভবতোষ মজুমদারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে একক শিল্পী ছিলেন আশীষ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র সংগীত ও আধুনিক মিলিয়ে প্রায় কুড়িটি গান তিনি গেয়েছেন। "আনমনা আনমনা", "প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়", "ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে" প্রভৃতি গান শ্রোতাদের প্রশংসা পায়। তবলায় সহযোগিতা করেন রত্নেশ্বর রায়।

পাঠকের চোখে

কানাই দত্তর সঙ্গত

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত দেশ পত্রিকার ১৭ই পৌষ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের ৯ম সংখ্যার রঙ্গজগৎ বিভাগের 'সুরের মেজাজে আমজাদ' —এই শিরোনামায় প্রকাশিত সংগীত বিষয়ক আলোচনাটি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত-বিমর্ষ হলাম। সুস্পষ্টভাবে বিস্ময়ের কারণটি এই যে, ঐ আলোচনার একটি বিশেষ স্থানে লেখক দিবাকর বর্মা এমন একটি কথা লিখেছেন যাকে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। এ-রূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাঁর (লেখকের) সংগীতজ্ঞানের মান এমন পর্যায়ের নয় যেখান হতে তিনি সংগীতের যথাযথ, নির্ভুল সমালোচনা করতে পারেন। আলোচনায় যে অনুষ্ঠানটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি প্রথম হতে শেষ অবধি কয়েকশত শ্রোতা মনোযোগের সহিত শুনেছেন। আমিও তাঁদেরই মধ্যে একজন। অনুষ্ঠানটি শুনে লেখকের ন্যায় আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি,—"দু' দুবার কানাই দত্তকে তিনি (ওস্তাদ আমজাদ আলি) বুদ্ধির খেলায় পরাজিত করলেন, দর্শকের সহাস্য উপভোগের সঙ্গে কানাই দত্তও মিশিয়ে দিলেন তাঁর পরিতৃপ্ত পরাজিত হাসি।"

লেখক দিবাকর বর্মার নিকট আমার কয়েকটি বক্তব্য (১) গান-বাজনা জিনিসটা আর যাই হোক লড়াইয়ের বস্তু নয়। সুতরাং জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন আসে না। (২) কোনও শিল্পীর সংগীত-পরিবেশনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে নিয়ে তাঁর সহযোগী কোনও জনপ্রিয় তবলাশিল্পীকে অকারণে হাস্যাস্পদ করবার অধিকার কোনও দায়িত্বশীল লেখকের থাকতে পারে না। (৩) উপরে উদ্ধৃত অংশে লেখক যে সত্যের অপলাপ ঘটান একথা প্রমাণ করবার সৎসাহস নিয়ে যদি জনসমক্ষে কোনও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়, তবে ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার বাসনা পোষণ করি। (৪) একজন শিল্পীকে প্রশংসা করতে গিয়ে যে শিল্পীটিকে পাঠক সাধারণের নিকট ছোট করা হয়েছে তাঁর শিল্পীজীবন কিন্তু অন্যূন চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ; কয়েক সহস্র সংগীত সম্মেলনে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন যন্ত্রশিল্পীর সহিত সহযোগী শিল্পী ও একক তবলাশিল্পী হিসাবে স্বীয় যোগ্যতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি সঞ্চয় করেছেন তা বিরাট ও সুসমৃদ্ধ। লেখক যে কথা লিখেছেন সামান্যতম লয়-বোধসম্পন্ন কোনও ব্যক্তির পক্ষেও ঐরূপ বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব হত কিনা তা ভাববার বিষয়।

উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে ভুলবশত যদি এরূপ হয়ে থাকে তবে আপনার পত্রিকা মাধ্যমে যথোপযুক্তভাবে ভ্রম-সংশোধনের ব্যবস্থা হলে তা সত্যের প্রতি নিষ্ঠার পরিচায়ক হবে।

ইতি

পি কে রায়

কলকাতা-৯

লেখকের বক্তব্য

শ্রীযুক্ত পি কে রায় মহাশয়ের চিঠিখানি পড়লাম। সম্ভবত "পরাজয়" শব্দটিই এই বিভ্রান্তি ঘটিয়ে থাকবে। "পরাজয়" শব্দটির অপপ্রয়োগে আমি দুঃখিত। আমি এক্ষেত্রে আমার ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি এবং একজন সংগীতপ্রেমীর অন্তরে আঘাত দিয়েছি জেনে সত্যিই দুঃখ বোধ করছি।

দিবাকর বর্মা

ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন সম্পর্কে

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'রঙ্গজগৎ' বিভাগে ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের অভিমত পড়লাম। শ্রী রায়ের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত। সদস্যদের ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করবার জন্য যে ভাবে শ্রী রায় সেন্সরশিপবিধি সংশোধন করতে বলেছেন তাও সম্পূর্ণভাবে অন্তত কিছুদিনের জন্য গ্রহণযোগ্য।

ফিল্ম সোসায়েটি সম্পর্কে দু একটি কথা আছে। ঠিক যেদিন শ্রী রায় কলকাতা থেকে বাঙ্গালোর রওয়ানা হয়েছিলেন, সেদিনই সায়ান্স ফিকশান সিনে ক্লাবের (সংক্ষেপে এস এফ সিনে ক্লাব) বাৎসরিক সম্মেলন ছিল। এই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, এই সিনে ক্লাবটিকে চালু রাখা সম্পর্কে। এমনকি এই ক্লাবটিকে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে এমন ইঙ্গিতও কর্মসূচীতে ছিল।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকা সত্ত্বেও ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন (কর্মকর্তাদের নিয়ে)। ঠিক কতজন সদস্য আছেন আমি জানি না, তবে শ' পাঁচেক নিশ্চয়ই।

এই যদি বাংলা দেশের সিনে ক্লাব বা ফিল্ম সোসায়েটির সদস্যদের মনোভাব হয় তবে ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের মাধ্যমে এখানকার চলচ্চিত্রের উন্নতি হবে কী করে? এইসব ক্লাব বা সোসায়েটি আন্-সেন্সরড্ বিদেশী চলচ্চিত্র দেখার এক একটি গোষ্ঠী মাত্র। বাংলা দেশের চলচ্চিত্রের উন্নয়ন সম্পর্কে, আমার মনে হয়, এদের কোন ভূমিকা নেই, থাকবেও না।

এস এফ সিনে ক্লাবের বিষয়টি সম্পর্কে শ্রী রায়কে হস্তক্ষেপ করতে এবং এই ক্লাবটি যাতে উঠে না যায় সেই সম্পর্কে তাঁকে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করি। ইতি—

অরূপ দস্তিদার

কলিকাতা—৯

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

দাঁড়াও, ব্যাপারটা আগে ভাল করে বোঝ। শুশুকরা যদি খাঁড়ির ওদিকে যায় তো তুমি নেমে পড়বি।
ছেড়ে দাও!
আমরা নিজেরাই যেতে পারব, ওয়াকার কাকা*। ছেড়ে দাও।
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-কাকা

সাবধানে থাকবি। খাঁড়ির ওদিকে যাবিনে।

অরণ্যদেব নির্দেশ দিতেই শুশুকরা সাচ্ছন্দে এগোতে লাগল!
যা!

পড়ে গেলি তো? ফিরে আয়। আবার নতুন করে শুরু কর।

ব্যাপারটা ওরা চটপট শিখে নিয়েছে।
আবার বলছি, খাঁড়ির ওদিকে যাবিনে।
কী মজা!
5/17

কিন্তু খাঁড়ির দরজাটা হঠাৎ খুলে গেছে, আর মাছেরাও দরজা খোলা পেয়ে পালাচ্ছে......

সলোমন তক্ষুনি মাছগুলোকে তাড়া করল, ওদের সে আবার খাঁড়িতে ফিরিয়ে আনতে চায়—

রাজা, খাঁড়িতে ফিরে আয় ফিরে আয়!
কিন্তু তরঙ্গের গর্জনে অরণ্যদেবের গলা শুনতে পেল না রাজা!

কী করে থামাই সলোমনকে?
ওগুলো কী?
ওগুলো হাঙর!
৭

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হত্যা বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিষয়। ৩০ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর কোয়ারটার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে আততায়ীর ধারাল অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন। উপাচার্য হিসাবে এদিনই ছিল তার অস্থায়ী কার্যকালের শেষ দিন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা আছে। ৩১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের মরদেহ বহন করে হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষক ও সাধারণ লোকের স্বতঃস্ফূর্ত যে শোক-মিছিল কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গেল তার কোন তুলনা নেই। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় ছিল অধ্যাপক সেনের বাড়ি। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। পরে আমেরিকার মিসিগান বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এম এস উপাধি লাভ করেন। আজীবন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন।

দেশী সংবাদ

২৮ ডিসেম্বর—মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা সাময়িকভাবে স্থির করেছেন আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি বা ১ মার্চ লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন শুরু হতে পারে। নির্বাচন কমিশন আজ পর্যন্ত সরকার বা রাষ্ট্রপতি ভবনের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও মণিপুরে একই সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কোন অনুরোধ পাননি।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের মুখ্যমন্ত্রীদের কমিটি চিনি, তামাক ও বস্ত্র শিল্পের উপর আগামী ২।৩ বছরের মধ্যে গড়পড়তা অতিরিক্ত শতকরা ১০·৮ ভাগ উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধির যে সুপারিশ করেন ভারত সরকার তা গ্রহণ করেছেন।

২৯ ডিসেম্বর—লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলা বিধানসভারও নির্বাচন হবে কিনা সে কথা আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সুস্পষ্টভাবে বলতে অসম্মত হন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, আমরা এই বিষয়টি বিচার বিবেচনা করে দেখছি।

আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সম্ভবত [illegible] দুই কোটি তরুণ এই প্রথম ভোট দেবেন। এই বছরের গোড়ার দিকে সংশোধিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটার সংখ্যা ২৭,১৪,৭৬২৯১। নতুন ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ২,০৮,৫৫,১৮৫। পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধির হার ৬·২৮ শতাংশ।

৩০ ডিসেম্বর—সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, সংসদের অন্তর্বর্তী নির্বাচন ২৮ ফেব্রুয়ারি বা ১ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে ১৯৭১ সালের আদম সুমারির কার্যসূচী দশদিন এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত কর্মসূচী অনুযায়ী লোকগণনা শুরু হবে ১ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। গৃহহীন জনসংখ্যা গণনা করা হবে ১৯ ফেব্রুয়ারির রাত্রে।

প্রাক্তন দেশীয় নৃপতিদের অবিলম্বে আবার রাজন্য ভাতা দেওয়া শুরু হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র বলেন: এই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবার রাজন্য ভাতা দেওয়ার জন্য ট্রেজারি অফিসগুলোকে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে রাজন্যবর্গের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশ অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

৩১ ডিসেম্বর—ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন সিংদেও সাংবাদিকদের কাছে বলেন, [illegible] পরিচালিত কোয়ালিশন সরকার ও রাজ্য

বিধানমণ্ডলী ভাঙ্গার কোন সিদ্ধান্ত এখনই নেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, স্বতন্ত্র দল যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত আছেন।

আজ দুপুরে একদল যুবক কলকাতার শ্যামপুকুর থানার অন্তর্গত [illegible] স্ট্রীটের একটি বাড়িতে চড়াও হয়ে পাঁচ হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে চলে যায়। এই বাড়িতে [illegible] কয়েক যুবক চড়াও হয়। তাদের কারো হাতে ছিল রিভলবার কারো হাতে পাইপগান। তখন গৃহস্বামী বাড়িতে ছিলেন না। ছিলেন তাঁর দুজন কর্মচারী ও একজন আত্মীয়।

১ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এপ্রিলে বা মে মাসের কোন এক সময় পশ্চিম বঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন করার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। এর ফলে তাঁর দল লোকসভার নির্বাচন থেকে বিধানসভার নির্বাচনকে আলাদা করা সম্ভব হবে। লোকসভার নির্বাচন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ১ মার্চ।

আজ সকালে হাওড়ার [illegible] কলকাতা পুলিসের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেকটরকে একদল যুবক আচমকা ছোরাছুরি দিয়ে আক্রমণ করে খুন করার চেষ্টা করে। গুরুতর আহত হয়েও সেই পুলিস অফিসার নাটকীয়ভাবে তাঁর রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়লে পলায়নরত আততায়ীদের একজন নিহত হয়।

২ জানুয়ারি—কলকাতায় চুঙ্গিকর চালু হবার পর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। ১৬ নভেম্বর এই কর চালু হয়। বর্তমানে ৯৬টি চেক পোস্টের মাধ্যমে এই কর আদায় করা হচ্ছে। তার মধ্যে রাস্তায় চেক পোস্টের সংখ্যা ৩৮টি।

আট পার্টির জোট ভেঙে গেলেও ওই জোটের কোন দলের সঙ্গে রফা করায় সি পি এম উৎসাহী নন। কারণ তাঁরা মনে করেন, ওই আট পার্টির মধ্যে সত্যিকারের কংগ্রেস বিরোধী কোন পার্টি নেই। আট পার্টি জোটের শরিকদের ব্যাপারে সি পি এম-এর মনোভাব কত ঠিক। তা এখন পরিষ্কার বোঝা গেল।

৩ জানুয়ারি—লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নব কংগ্রেসকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠনের কথা আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করা হয়েছে। ওই ফ্রন্টে স্বতন্ত্র দল যোগ দেয়নি।

আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ স্থির করেছেন প্রধানমন্ত্রী যাতে লোকসভার আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র নিজের দলের স্বার্থে না লাগাতে পারেন তার জন্য তাঁরা রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

বিদেশী সংবাদ

২৮ ডিসেম্বর—ওয়াশিংটনস্থ ক্রেমলিন পর্যবেক্ষকদের মতে রাশিয়ায় এখন জোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে। তার ফলে পার্টির প্রধান শ্রীব্রেজনেভের পতন ঘটতে পারে। মস্কোতে নাকি এমন শক্তিধর ব্যক্তি আছেন যাঁরা ব্রেজনেভকে প্রকাশ্যে অমান্য করতে সক্ষম।

২৯ ডিসেম্বর—সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনায় জাতিকে প্রস্তুত হতে বলেন। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, শান্তি আলোচনার কোন অগ্রগতি না ঘটলে আরব প্রজাতন্ত্র যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির আর কোন প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। তিনি বলেন কোন অবস্থাতেই আমরা আত্মসমর্পণ করব না।

৩০ ডিসেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানে ঝড় বিধ্বস্ত এলাকার জনগণের সর্বাঙ্গীণ পরিস্থিতির জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট খাদ্য সাহায্য চেয়ে নতুন একটি জরুরী আবেদন জানিয়েছেন। উ থান্ট বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং আধা-সরকারী সংস্থার কাছে এই আবেদন জানিয়েছেন।

৩১ ডিসেম্বর—নির্বাচনের ফলাফল ও [illegible] করে বাড়ায় সবুজ পূর্ব পাকিস্তানে হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেল। পাবনায় গতকাল দুজন ছাত্র ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। আহত হন লীগ সমর্থক একজন চিকিৎসক। ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের মধ্যে মারামারি চলছে।

১ জানুয়ারি—পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীজেড এ ভুট্টো কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে দলের ভিতর এবং বাইরে থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। ভুট্টোর দলের বেশ কিছু লোক আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীমুজিবর রহমানকে কাজ করে যেতে দেওয়ার পক্ষপাতী। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের এঁর সঙ্গে জড়াতে চান না।

২ জানুয়ারি—বহিরাগতদের সম্পর্কে বিলেতের পরিকল্পিত নতুন আইনে সব কমনওয়েলথ দেশের নাগরিকদেরই ভবিষ্যতে অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের মত বিদেশী বলে গণ্য করার যে প্রস্তাব রয়েছে তাতে আসন্ন কমনওয়েলথ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীহীথকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হবে বলে আশঙ্কা করা হয়। ১৪ জানুয়ারি সিঙ্গাপুরে এই সম্মেলন হবার কথা।

৩ জানুয়ারি—শ্রীভুট্টো গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তিনি তার দলের সম্পাদককে গতকাল ঢাকায় পাঠিয়েছেন। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্যই ওই সম্পাদককে পাঠানো হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ লেখক ।। শ্রেষ্ঠ রচনা

বাংলা পকেট বই

শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা নূতন উপন্যাস সওয়াশ পৃষ্ঠার বই সুন্দর ছাপা মোহন প্রচ্ছদ মূল্য মাত্র দুই টাকা।

গ্রাহকদের কমিশন এজেন্টদের বিশেষ সুবিধা। পত্র লিখিয়া যোগাযোগ করুন।

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম বাংলা অ[illegible]

একাল সেকাল অন্যকাল

সুধীরঞ্জনের
মক্ষারাণী ৫।।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
লগ্ন ৪, একই পথের দুই প্রান্তে ৪,

কমলা মিশ্রের
কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ৭,

শঙ্কু মহারাজের
গঙ্গাসাগর ৮,

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ ৫.

ডঃ ভবতারণ দত্তের সংকলন
বাংলাদেশের ছড়া ১০,

নজরুল ইসলামের
সন্ধ্যামালতী ৪,

সাহানা দেবীর
চিত্তরঞ্জনের অমর স্মৃতিকথা

মৃত্যুহীন প্রাণ ৪।।

বিভূতি রচনাবলী

চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যন্ত্রস্থ

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

প্রথম খণ্ড নূতন মুদ্রণ ২০,

কুমারী ব্রত ৭, কলকাতা থেকে বলছি ৬,

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
মণিমহেশ ৬।। গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী ৩।।

প্রবোধকুমার সান্যালের

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সেই মরুপ্রান্তে ১১,

মহাশ্বেতা দেবীর
আঁধারমানিক ১২।।

প্রফুল্ল রায়ের
বাতাসে প্রতিধ্বনি ৭।।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের
ঈশ্বরের আবাস ৬,

মানসী মুখোপাধ্যায়ের
গ্রীণরুম ৪,

প্রমথনাথ বিশীর
শাহী শিরোপা ৩।৹

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামা চরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

সূচীপত্র

স্বাদে ভরা - পুষ্টির জন্যে !

প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

অ্যান ফ্রেঞ্চ
ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক দিয়ে
আপনার রূপের আড়াল
সরিয়ে দিন

Brooke Bond Tea
Brooke Bond Tea
Brooke Bond Tea
Red Label

কমল আননকে কোমল ক'রে তুলুন...
রূপচর্যার দুর্লভ তেলের সমন্বয়,—
ল্যাক্মে কোল্ড ক্রীম দিয়ে
Lakmé
COLD CREAM
ল্যাক্মে কোল্ড ক্রীম
ASP/L-74

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১১
শনিবার ২ মাঘ ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	..	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 16 Jan. 1971

নির্বাচনের বাজনা

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচনের দিনক্ষণ প্রায় স্থির হয়ে যাবার পর আমাদের রাজনৈতিক রঙ্গালয়ের বন্ধ দরজা আবার নবপর্যায়ে খোলার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মাস দশেক এমন একটি রঙ্গালয় বন্ধ থাকার দরুন ধুলো-ময়লা আবর্জনা, দুর্গন্ধ কিছু কম জমে নি; তাই এখন ঝাঁটপাট, চুনকামের কাজটা নানা হাতে শুরু হয়ে গিয়েছে। কোন্ পালা দিয়ে নব পর্যায়ে উদ্বোধন হচ্ছে তা অবশ্য আমরা জানি না; তবে কেউ কেউ বলছেন, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে কবর দেওয়া এর বিষয়বস্তু হতে পারে। আবার অন্য দল বলছেন : শুধু সি. পি. এম কেন, দুই কংগ্রেসকেই বাংলা দেশ থেকে হটিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা স্পষ্টই বলছেন, ধৈর্য ধরো, নাটকের পালা শুরু হোক, দেখতেই পাবে—কোন পালা হচ্ছে। আমরা স্বীকার করব, দর্শকের কাছে আগামী পালার একটা বড় আকর্ষণ রয়েছে, সেটা শেষ মুহূর্তে জানার কথা, তার আগে গবেষণা ও অনুমান হতে আপত্তি নেই! তবে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

মানুষের কৌতূহল-বোধ তার মজ্জায় মিশে আছে, কার সাধ্য তাকে রোধ করে। এরই মধ্যে পথে-ঘাটে, আড্ডাখানায়, চায়ের দোকানে নানা রকম আলোচনা : এই খুনোখুনির মধ্যে কী করে নির্বাচন হবে? যদি হয়, সেটা 'ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার' কেমন করে হবে? নকশালরা কী ইলেকশান্ করতে দেবে? যে রকম জোর জবরদস্তি দেখছি, মগের মুলুক যেমন চলছে—তাতে যে যেখানে থাকে—সেই পাড়ায় কার হোলড সেই বুঝে তো ভোট দিতে হবে, নয়ত বিপদ অনিবার্য। আচ্ছা মশাই, সি. পি. এম যত গর্জাচ্ছে তত কি বর্ষাবে? নব আর বাংলা কংগ্রেসে মিল হতে হতে আবার যে কী বাগড়া লাগল? অজয়বাবুর পরের ব্যাপারটা কী হবে? আট পার্টি তেমন একটা লড়াই কী লড়তে পারবে? এই ধরনের প্রশ্ন এখন মুখে মুখে। তবে একটা জিনিস লক্ষ করার মতন। যাঁরা পুরোপুরি বা বারো আনা রাজনীতি করেন তাঁরা ছাড়া নির্বাচনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আগ্রহ এখন পর্যন্ত কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কৌতূহল আছে অথচ উৎসাহ বা আগ্রহ নেই—এটাই লক্ষণীয়। কেন নেই তা ভাবতে গেলে একটা কথা মনে হয়। এই ভোটপর্ব, হারজিত, সরকার গঠন, আবার বছর পোরার আগেই তার পতন—এ-সবের ওপর সাধারণ মানুষের কোনো আস্থা নেই আর। এক আধবার এই ধরনের কান্ড ঘটলে তবু হয়ত আস্থা থাকত, কিন্তু এই কান্ড হরদম, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, অন্যান্য রাজ্যেও। নিজেদের অভিজ্ঞতায় ও চারদিক দেখে-শুনে যদি আজ সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হয়েই থাকে তবে তাদের তেমন কিছু দোষ দেওয়া যায় না।

ভোটের কাগজ যে নেহাতই কাগজ নয়, সেই কাগজের সঙ্গে মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, আশা, ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকে—এ-কথাটা অনেকে বুঝতে শিখেছিল। এমনই দুর্ভাগ্য তার যে, বোঝার পর দেখল এই আস্থা অকারণ, বিশ্বাস অহেতুক, আশা—সে তো আরও মূর্খতা। রাজদন্ড একবার তুলে দিলে ক্ষুদে রাজাদের প্রতাপেও কম্প জাগে। পশ্চিম বাংলার দু দফার জনপ্রিয় সরকারের শাসনই তার প্রমাণ। শাসন করতে এসে এই সরকার বাংলা দেশের কোন চেহারা রেখে গেছে তা কে না দেখছে? কংগ্রেস সরকার অন্তত এইভাবে পাইকারী দাঙ্গা ও খুনোখুনির কারবার করে নি।

তবু রাজনীতির এমনই কৌশল যে, যথাসময়ে দেখা যাবে—আমরা সকলেই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ভোট মন্ডপে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। পাঁচ সাত গুণ পুলিস আমদানি করে আমাদের ফ্রি ও ফেয়ার ইলেকসান সম্পন্ন হচ্ছে। কে বলতে পারে, নির্বাচন-যজ্ঞ সমাধা করতে গিয়ে পঞ্চাশ, একশো, পাঁচশো লোক হতাহত হবে না! তার সম্ভাবনা রয়েছে। তবু, খুবই মজার ব্যাপার, চোদ্দটি বা ষোলোটি দল ভোট ভোট রব তুলে নাচতে শুরু করেছে। ভোটের সময় ওরা খুবই নিরাসক্ত। আগামী নির্বাচনে যে প্রচুর অর্থব্যয় হবে, রাশি রাশি পুলিস আসবে অন্য রাজ্য থেকে, খুনোখুনিও হতে পারে—একথা কিন্তু কেউই বলছেন না। বরং উদ্বাহু হয়ে নাচছেন। এই নিত্য হানাহানি, খুন-জখম, হাঙ্গামার সময় এঁরা কোন মহৎ কর্ম-সাধনে ব্যস্ত থাকেন তা কী আপনি আমি জানি! জানি না! কিন্তু নির্বাচনের বাজনা বাজতেই সবাই কেমন বেরিয়ে পড়েছেন দেখুন!

ভোট
পশ্চিম বঙ্গ
আমাদের একে নিবি ভাই
সঁাপিতে চাই
আপনারে!

একটি হিতকারী সালসার হ্যান্ডবিল

আপনাদের বহু পরিচিত **ত্রিগুণা বচন সুধা** কোম্পানীর ইংরাজি নববর্ষের অভিবাদন গ্রহণ করুন। সেই সঙ্গে আপনাদের জ্ঞাতার্থে ইহাও জানানো হইতেছে যে বহু ব্যবহৃত **ত্রিগুণা বচন সুধার** কার্যক্ষমতা বহু গুণে বৃদ্ধির জন্য কোম্পানী দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদিগকে নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের গবেষণালব্ধ ট্রিপল অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা আপনাদের বহু পরিচিত আদি ও অকৃত্রিম **ত্রিগুণা বচন সুধার** সহিত এই বৎসর পয়লা জানুয়ারি হইতে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য! বিশেষ দ্রষ্টব্য!!

আপনাদের বহু ব্যবহৃত **ত্রিগুণা বচন সুধার** বোতলের ত্রিকোণ আকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই। শুধু উহার ত্রিবর্ণরঞ্জিত মোড়কের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। ত্রিবর্ণে মুদ্রিত মোড়কের গৈরিক রঙটির পরিবর্তে বর্তমানে মোলায়েম লাল রঙ ব্যবহার করা হইতেছে। কেননা লাল রঙই অ্যাকশনের দ্যোতক।

জাল হইতে সাবধান

ক্রেতাদিগের নিকট অনুরোধ, তাঁহারা যাহাতে না ঠকেন সেই কারণ ত্রিগুণা বচন সুধা কিনিবার প্রাক্কালে বোতলের মোড়কটি যেন উত্তমরূপে যাচাই করিয়া লহেন। এবং উপরোক্ত বর্ণ পরিবর্তন যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। এবং আরও একটি জিনিসের প্রতি তাঁহাদিগকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে। যথা : **ত্রিগুণা বচন সুধা** এই নামটির ঠিক নিচে বন্ধনীর মধ্যে "ট্রিপল্ অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা যুক্ত" কথাটি লেখা থাকিবে। উহাই আমাদের 'ট্রেড মার্ক'। অর্থাৎ মোড়কের উপর এইরূপ লেখা থাকিবে :

ত্রিগুণা বচন সুধা
(ট্রিপল্ অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা যুক্ত)

এইবার এই নূতন সালসার গুণাগুণ। **ত্রিগুণা বচন সুধা** আপনাদের এতই সুপরিচিত যে উহার সম্পর্কে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। আপনারা সকলেই জানেন যে দীর্ঘদিন ধরিয়া **ত্রিগুণা বচন সুধা** অত্যন্ত সুনামের সহিত বাজারে চলিতেছে। পতিপরায়ণা কত অভাগিনী সতী **ত্রিগুণা বচন সুধা** পর পর মাত্র তিন বোতল (লার্জ) ব্যবহারেই অব্যর্থ ফল পাইয়াছে, উদাসীন স্বামীকে বশ করিয়াছে! কত দুর্ভাগা স্বামী মুখরা স্ত্রীর দাপটে জীবন অতিষ্ঠ জ্ঞান করিয়া হতাশ হইয়া হয়

সন্ন্যাস নয় জীবন নাশ, এইরূপ সংকটে পড়িয়া যখনই **ত্রিগুণা বচন সুধার** শরণ লইয়াছেন তখনই ম্যাজিকের মত ফল পাইয়াছেন। ডাকযোগে **ত্রিগুণা বচন সুধা** সংগ্রহ করিয়া নিয়মিত ব্যবহার করিতে না করিতেই সংসার কণ্টকে সুগন্ধী পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। মুখরা স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর বশীভূতা হইয়া স্বামীর মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য এখন

অহোরাত্র সুমিষ্ট স্বরে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছেন।

কোনও এক বিখ্যাত পরিবারে অভাগিনী ননদিনী অকালে স্বামী হারাইয়া পুত্রকন্যা লইয়া ভ্রাতৃবধূর গলগ্রহ হইয়াছেন, ভ্রাতৃবধূর গঞ্জনায় তিনি যখন হতাশায় কূলকিনারা দেখিতে পান নাই, সেই মুহূর্তে হিতৈষিণী এক প্রতিবেশিনীর সংপরামর্শে **ত্রিগুণা বচন সুধা** ব্যবহার করিতে শুরু করেন। এখন তিনি পরিবারস্থ সকলেরই আদরিণী। বিশেষত ভ্রাতৃজায়া এবং ননদিনী যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল।

এইরূপ অত্যাশ্চর্য সব দৃষ্টান্ত শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ হাজির করা যায়। নিতান্ত পুঁথি বাড়িয়া যায়, এই কারণে আমরা কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিলাম।

ট্রিপ্‌ল্ অ্যাক্‌শন ভাইটো-ভিটা কী ও কেন ?

এতদিন কোম্পানী **ত্রিগুণা বচন সুধার** কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ যখন ঘোর দুর্দশায় পতিত, জাতি গভীর সংকটে হাবুডুবু খাইতেছে, তখন দেশপ্রেমিক কোন মানুষই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ দেশের এই দুর্দিনে বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন স্বপ্নাদ্য **ত্রিগুণা বচন সুধা** ব্যক্তির জীবনে যদি এইরূপ অলৌকিক ফল দেখাইতে পারে, তবে ইহার সহিত দেশের বৈজ্ঞানিকদিগের মেধা ও কর্মশক্তি যোগ করিয়া দিলে কি তদ্দ্বারা দেশ ও জাতির সংকট মোচন করা যায় না? যেমন ভাবা তেমন কাজ। কোম্পানীর প্রত্যক্ষ উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ দীর্ঘ গবেষণায় **ত্রিগুণা বচন সুধার** সহিত ট্রিপল্ অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা যুক্ত করিয়া উহাকে দেশের কালোপযোগী প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন।

তাহারই ফলশ্রুতি **ত্রিগুণা বচন সুধা** (ট্রিপল্ অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা যুক্ত)। ব্যবহারে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে ট্রিপল্ অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা যুক্ত **ত্রিগুণা বচন সুধা** আরও তেজস্কর এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে নিদারুণ ক্রিয়াশীল। বর্তমানে রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অস্থায়ী ও স্থায়ী রাজ্যপাল, উপাচার্য, অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, পার্টির নেতৃবৃন্দ, বহু এম পি ও এম এল এ দিগের উপর বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে **ত্রিগুণা বচন সুধা** (ট্রিপল্ অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা যুক্ত) সকল ক্ষেত্রেই অব্যর্থ ফল দিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখা গিয়াছে অশান্ত ছাত্র ও শ্রমিকদিগকে বশীভূত করিতে ট্রিপল্ অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা যুক্ত **ত্রিগুণা বচন সুধা** অব্যর্থ ফল দিতেছে।

জনৈক প্রাক্তন উপাচার্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানাইয়াছেন, "আপনাদের ট্রিপল্ অ্যাকশন যুক্ত **ত্রিগুণা বচন সুধা** সত্যই জাদু জানে। আমি ১ জানুয়ারি উক্ত **ত্রিগুণা বচন সুধা** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিহত উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনের শোকসভায় ভাষণদানকালে ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য ফল পাইয়াছি। যে সকল ছাত্র আমার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল **ত্রিগুণা বচন সুধার** (ট্রিপল্ অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা যুক্ত) গুণে তাহারাও আমার বশীভূত হইয়াছে। জনপ্রিয় হইতে গেলে ট্রিপল অ্যাকশন ভাইটো-ভিটা যুক্ত **ত্রিগুণা বচন সুধাই** যে একমাত্র কাণ্ডারী, ইহা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করিতেছি।"

বিলম্বে হতাশ হইবেন, এখনই সংগ্রহ করুন।

সি পি আইয়ের গোড়া থেকেই ইচ্ছা, এই জোট নব কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গেও একটা সমঝোতা করুক। কিন্তু ফরওয়ারড ব্লক এবং এস ইউ সির জন্যে সে ব্যাপারে আপত্তি। তাই সি পি আই আট পার্টি জোটকে কিছুতেই নব কংগ্রেসের কাছে নিয়ে যেতে পারলেন না। ফরওয়ারড ব্লক এবং এস ইউ সি আবার বলেছেন, বাংলা কংগ্রেস যদি নব কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও ভাবে সম্পর্ক রাখে তাহলে আমরা ওদের ছোঁব না। তাই, সি পি আই মহা বিপদে পড়েছে।

কিন্তু বিপদে পড়লেই হতাশ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে দেওয়ার পার্টি সি পি আই নয়। তাঁরা তাই এখনও নানাভাবে দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টায় আছেন। (এক) তাঁরা এখনও আট পার্টির সঙ্গে নব কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেসের একটা গোপন সমঝোতার চেষ্টায় আছেন। (দুই) তা যদি নাই হয় তাহলে নিজেরা কয়টা আসনে নব ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে পারেন তাও আলাপ আলোচনা করে দেখছেন। (তিন) তাঁরা গোপনে নানা পর্যায়ের নব কংগ্রেসী এবং বাংলা কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগও রেখে চলেছেন। এবং (চার) নব, আদি এবং বাংলা কংগ্রেস যাতে কোনও রকমে পশ্চিমবঙ্গে কোনও নির্বাচনী সমঝোতা না করতে পারে সেইদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

*

তিন কংগ্রেসের জোটের জন্য আবার সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করছেন বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়া এবং পি এস পির সমর গুহ। তাঁদের মোটামুটি ইচ্ছা, তিন কংগ্রেস পি এস পি, এস এস পির একটা অংশ, গোর্খা লীগ প্রভৃতিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটা জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট গঠন। যাতে এই জোট সব কমিউনিস্ট পার্টিকে পরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গে একটা জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করতে পারে।

কিন্তু সুশীল ধাড়া এ ব্যাপারে যতটা উৎসাহী অজয়বাবু ততটা আগ্রহী নন। আবার, আদি কংগ্রেসের প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি এই রকম একটা নির্বাচনী সমঝোতার জন্য গোড়ায় বেশ কিছুটা আগ্রহী থাকলেও অতুল্য ঘোষ বরাবরই এটাকে উদ্ভট এবং অবাস্তব পরিকল্পনা বলে মনে করেছেন। নব কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশংকর রায় সর্বদাই এর ঘোরতর বিরোধী। তিনি বরাবরই বলেছেন, এটা একটা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত। কিন্তু বিজয় সিং নাহারের এজন্য প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, এমনকি প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গেও কথা বলতে আপত্তি ছিল না।

তিন কংগ্রেসের নীচু তলার কর্মী এবং সমর্থকদেরও অনেকেই এই রকম একটা জোট চান। কারণ, তাঁরা মনে করেন, বামপন্থীদের হাত থেকে বাঁচার এইটাই একমাত্র পথ। নেতাদের সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক তা না হলেও তিন কংগ্রেসেরই বহু কর্মীর কাছে বামপন্থীরা, বিশেষ করে কমিউনিস্টরা জীবন মরণ সমস্যা।

এখন অবশ্য নব কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেসের সমঝোতার আলোচনাটাই ভেঙে গিয়েছে। দু পক্ষই অধিকাংশ আসন চেয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসকে অধিকাংশ লোকসভা আসন ছেড়ে দিতে রাজী। কিন্তু বিধানসভা আসনের অধিকাংশটা তাঁরা চেয়েছেন। নব কংগ্রেস কিছুতেই তা দিতে রাজী নন। তাঁরা বিধানসভা আসনেরও অধিকাংশ চান। আর বাংলা কংগ্রেস যাতে কোনও ভাবে আদি কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও নির্বাচনী সমঝোতার চেষ্টা করতে না এগোতে পারেন নব কংগ্রেস তেমন ব্যবস্থা করে রাখতে চান।

কিন্তু প্রথম পর্যায়ের আলোচনা ভেঙে গিয়েছে বলেই মনে করার কোনও কারণ নেই যে নব কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেসে কোনও সমঝোতাই হবে না। দু দলের নেতারাই এজন্য চেষ্টা করছেন খুব। এবং শেষ পর্যন্তও চেষ্টা করেও যাবেন।

এজন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেও চাপ আসবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা আসনের অধিকাংশ প্রধানমন্ত্রীর চাই। আদি কংগ্রেস বা সি পি এম পশ্চিমবঙ্গ থেকে যত বেশি এম পি পাবেন প্রধানমন্ত্রীর তত ক্ষতি। তিনি জানেন, হিন্দী এলাকায় মহাজোট বেশ কিছু আসন পাবেনই। পশ্চিমবঙ্গ সেইসব রাজ্যের একটি যেখানে মহাজোটের বেশী আসন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখানে যদি সি পি এম লোকসভার ভাল আসন পায় সেটাও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর। তাই সি পি এমকে প্রতিরোধ করার চেষ্টাও তাঁকে করতেই হবে। এবং সেজন্য বাংলা কংগ্রেস, নব কংগ্রেস এবং সি পি আইর গোপন হোক, প্রকাশ্যে হোক একটা সমঝোতা চাই-ই। এই তিন দলের এম পি-রাই সরকার গঠনে ইন্দিরা গান্ধীকে সাহায্য করবেন। তাই, ইন্দিরা গান্ধী এদের সমঝোতার চেষ্টা করবেনই।

শুধু দেখার কীভাবে তিনি এগোন। কীভাবে অজয়বাবু এবং সুশীল ধাড়া এগোন। এবং সি পি আই কী করে।

*

ছয় পার্টি জোটের পার্টিগুলি ছাড়া আর সব দলের স্থানীয় নেতারাই কিন্তু মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের সবচেয়ে বড় শত্রু সি পি এম। তাঁরা জানেন, সি পি এম যদি কোনওভাবে ক্ষমতায় আসতে পারে তাহলে সব সি পি এম-বিরোধী দলকে নির্বিচারে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিতে আসবে। সি পি এম সম্পর্কে, সি পি এম সরকার করতে পারলে তার পরিণতি অনুমানে প্রায় সব দলই একমত। কিন্তু কীভাবে সি পি এমকে পরাজিত করা সে বিষয়ে তাঁরা একমত নন।

সবাই কিন্তু একটা জিনিস ধরে নিয়েছেন, সবাই মনে করছেন পশ্চিমবাংলার ভোটদাতারা এত বেশী সি পি এম বিরোধী হয়ে গিয়েছেন যে সি পি এমকে তাঁরা এবার পরাজিত করবেনই। এবং সেই অনুমানের ভিত্তিতে সবাই "কৌশল করে" যত বেশী সম্ভব আসন বের করে নিয়ে আসতে চান। সেজন্য প্রকাশ্য জোট বাঁধার আপত্তি থাকলেও গোপনে কিন্তু সবাই আঞ্চলিক সমঝোতার চেষ্টা করছেন। এবং, এই চেষ্টা ভোট গ্রহণের তিন চার দিন আগে পর্যন্ত চলবে।

১০-১-৭১ নবারুণ গুপ্ত

বাঁয়ে চলো

গেল বছরের ৩০ ডিসেম্বর এক হুকুম জারি করে চিলির প্রেসিডেন্ট ডাঃ সালভাডর আলেন্দি গসেন্স্ দেশের সব দেশী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলো আপাতত রেহাই পেয়েছে সে হুকুমের আওতা থেকে। তবে তারাও যে চিরদিন ছাড় পাবে এমন মনে হচ্ছে না। কেন না নির্বাচনের আগে তো বটেই পরেও প্রেসিডেন্ট আলেন্দি খোলাখুলিই বলেছেন, দেশী বিদেশীদের মধুচক্র তিনি ভেঙে ছাড়বেন তা সে শিল্পে হোক, বাণিজ্যে হোক কিংবা ব্যাঙ্ক-বীমায় হোক। দেশের জমিদার আর লাখপতিদেরও তিনি ছেড়ে কথা কইবেন না, তাদেরও বিষদাঁত ভেঙে ঢোঁড়া সাপ বানিয়ে দেবেন এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট আলেন্দির যে কথা সেই কাজ। গোড়া পত্তন করেছেন তিনি ব্যাঙ্কগুলোকে সরকারের দখলে এনে। তবে চিলির সংবিধান তিনি অমান্য করবেন না—তার বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ব্যাঙ্কের মালিকদের দেওয়া হবে। এর পর খনিগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা প্রেসিডেন্টের ইচ্ছে। কিন্তু তার জন্যে সংবিধানের রদবদল দরকার। প্রেসিডেন্ট আলেন্দি বসে নেই। সংবিধান পালটাবার আইনের খসড়া দেশের সংসদে ইতিমধ্যেই তিনি পেশ করেছেন।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্য দেশগুলোর থেকে চিলি বেশ কিছুটা আলাদা। হামেশা বিপ্লব এখানে হয় না, গণতন্ত্রের ভিত এখানে পাকা। কোনও দলই এখানে বে-আইনী নয়, কম্যুনিস্ট দল চিলিতে আছে তো বটেই, তার প্রতিপত্তিও খুব। অকম্যুনিস্ট দেশের কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে এটি তিন নম্বর। ইটালি আর ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট দলের পরই এর জায়গা। দলটি মাওবাদী নয়, মস্কোপন্থী। নির্বাচনে অবিশ্বাস তার নেই। তবে তার জোর যতই থাকুক না কেন এখনও পর্যন্ত তার এমন ক্ষমতা হয়নি যে একা নির্বাচনে জেতে। ভোটের আসরে কম্যুনিস্টরা নামে আরও পাঁচটা বামপন্থী দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। কিছু আসন তারা চিলির কংগ্রেস অর্থাৎ সংসদে পায় বটে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা কখনও হতে পারেনি। অবশ্য পেলেও তেমন লাভ হতো না, কেন না চিলিতে তো আর বিলিতী ধাঁচে সংসদীয় গণতন্ত্র নেই, আছে মার্কিনী ধাঁচে রাষ্ট্রপতির শাসন। আমেরিকার মতো রাষ্ট্রপতিই সেখানে সর্বেসর্বা, সে দেশে বিলেতের মতো প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রিসভা নেই। ছ' বছর অন্তর রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়। সব নাগরিকই সরাসরি সে নির্বাচনে ভোট দেয়। রাষ্ট্রপতি যে দলের বা জোটের প্রার্থী সেই দল কিংবা জোট রাজত্ব চালায় ছ' বছর।

দেবরাজ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন চিলিতে হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। আসরে নেমেছিলেন তিনজন। কিন্তু মোট ভোটের অর্ধেকের বেশী কারুর বাক্সেই পড়েনি। সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছিলেন ডঃ সালভাডর আলেন্দি গসেন্স। ৩৬·৩ শতাংশ ভোট তাঁর বাক্সে পড়েছিল। তাঁর কাছাকাছি এসেছিলেন জোর্গে আলেস্সান্দ্রি রড্রিগেজ। তিনি পেয়েছিলেন ৩৪·৯ শতাংশ ভোট। তিন নম্বর প্রার্থী রাডোমিরো টোমিক রোমেরোর মিলেছিল ২৭·৮ শতাংশ ভোট। চিলির সংবিধানের নিয়ম হচ্ছে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে মোট ভোটের অর্ধেকের বেশী যদি কোনও প্রার্থী পান তা হলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির গদি পাবেন। নইলে সংসদ ঠিক করে দেবে প্রার্থীদের মধ্যে কে রাষ্ট্রপতি হবেন। সেখানে যিনি ভোটাভুটিতে জিতবেন রাষ্ট্রপতির আসনে তিনিই বসবেন গণভোটে সবচেয়ে বেশী ভোট না পেলেও। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে কেউই অর্ধেকের বেশী ভোট পাননি এমন অনেকবারই হয়েছে এবারের মতো। কি বারই কিন্তু গণভোটে যিনি পয়লা নম্বর প্রার্থী তাঁকেই রাজপাটে বসিয়েছে কংগ্রেস, ভোটারদের রায় তারা প্রতিবারই মেনে নিয়েছে।

অমনিই হয়েছিল আগেরবারের নির্বাচনে—অর্থাৎ ১৯৬৪ সনে। প্রেসিডেন্ট এডুয়ার্ডো ফ্রেই মন্টালভা, যাঁর মেয়াদ ফুরিয়েছে ৫ নভেম্বর, ১৯৭০ সনে, তিনিও গণভোটে অর্ধেকের কম ভোট পেয়েছিলেন। যদিও তিনিই পেয়েছিলেন তিন প্রার্থীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভোট রাষ্ট্রপতির পদ তিনি পেয়েছিলেন কংগ্রেসের রায়ে। এবারে কিন্তু অন্যরকম একটা হলেও হতে পারতো যদিও তা হয়নি শেষ পর্যন্ত। এবারের ভোটে তিন প্রার্থীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছিলেন ডাঃ আলেন্দি। তিনি কম্যুনিস্ট দলের সদস্য না হলেও মার্ক্সিস্ট অর্থাৎ মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টই। কথা উঠেছিল একজন কম্যুনিজমে বিশ্বাসী লোকের হাতে দেশের ভাগ্য সঁপে দেওয়া কি ঠিক হবে? ডাঃ আলেন্দিকে দাঁড় করিয়েছিল পাঁচ দলের এক বামপন্থী জোট, তার নাম পপুলার ইউনিটি অর্থাৎ জনগণের ঐক্য। ওই পাঁচ দলের মধ্যে ছিল অ্যাকসান মুভমেন্ট অব পপুলার ইউনিটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পপুলার অ্যাকসান, কম্যুনিস্ট দল, সোস্যালিস্ট দল (তারই নেতা ডাঃ আলেন্দি), আর র‍্যাডিকাল দলের বামপন্থী শাখা। পাঁচ পার্টির ভোট কুড়িয়েও কিন্তু ৩৬·৩ শতকের বেশী একারের নির্বাচনে ওঠেনি।

হিসেব করে দেখা গেল কংগ্রেসে ভোটাভুটি হলে ৮১টার বেশী ভোট আলেন্দির পাবার কথা নয়, অথচ তাঁর চাই অন্তত ১০১টা। দুটো সভা মিলিয়ে চিলির কংগ্রেসের মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ২০০। আলেন্দি ছাড়া এবার যাঁরা নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছিলেন তাঁদের মধ্যে জোর্গে আলেক্সান্দ্রি ছিলেন দক্ষিণপন্থী জাতীয় দল অর্থাৎ ন্যাশনাল পার্টির প্রার্থী আর রাডোমিরো টোমিক দাঁড়িয়েছিলেন খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটদের তরফ থেকে। দেশটাকে কম্যুনিস্টদের হাতে তুলে না দেবার অনুরোধ জানিয়ে খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটদের কাছে আর্জি পেশ করলেন আলেস্সান্দ্রি তাঁকেই সংসদে ভোট দেবার জন্যে। দিলে কাজটা অবৈধ হতো না। দিলে তিনি ছ' বছরের জন্যে গদিতে বসতে পারতেন। খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটদের ভোট পাবার জন্যে আলেন্দিও কবুল করলেন, যদিও সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থাই তিনি দেশে চান সংবিধান তিনি মেনে চলবেন, গণতন্ত্র উচ্ছেদের কোনও চেষ্টাই তিনি করবেন না। সংস্কার যা কিছু করার তা করবেন সংবিধানের মান বাঁচিয়ে, দরকার হলে তার হেরফের করে। কিন্তু স্বৈরাচারী পথে তিনি পা দেবেন না, দেশের সংস্কৃতি বিরোধী কিছু করার বাসনাও তাঁর নেই।

খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটরা কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্যে অপেক্ষা করেনি। তাদের বামপন্থী শাখা তো আলেন্দির পাঁচ পার্টি জোটেই ছিল, বাকীদের নেতা টোমিক আর যাই হোন দক্ষিণপন্থী তাঁকে বলা চলে না। তিনিও নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলেন ব্যাঙ্ক আর খনি রাষ্ট্রায়ত্ত করবেন ক্ষমতা হাতে পেলে। আলেন্দি সবচেয়ে বেশী ভোট পাবার পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন টোমিক। এর পর যখন ২৪ অক্টোবর ভোটাভুটি হলো সংসদে সহজেই জিতে গেলেন, আলেন্দি। তাঁর পক্ষে পড়লো ১৫৩ ভোট, বিপক্ষে মোটে ৩৫। এই প্রথম একজন মার্ক্সিস্ট দক্ষিণ আমেরিকায় নির্বাচনী দরিয়া পেরিয়ে পৌঁছুলেন ক্ষমতার তীরে। দক্ষিণ আমেরিকা কেন আর কোনও দেশে আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সরকারী শাসনতন্ত্র নিজেদের হাতে আনতে পারেনি কম্যুনিস্টরা। ব্যাপার দেখে প্রমাদ গণেছে আমেরিকানরা যত ততটা চিলির জমিদার কিংবা লাখপতিরাও নয়। সাড়ে সাতশো কোটি টাকা আমেরিকার খাটছে চিলির খনিতে, শিল্পে, এমন কি চাষেও। তাদের সুখের দিন চিলিতে শেষ হতে চলেছে এ বিশ্বাস আমেরিকার সরকারেরও হয়েছে, লগ্নীকারদেরও। কিন্তু তারা করে কী?

সত্যবন্ধ অভিমান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি?
শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু?
তখন সে যুবতীকে খুকী বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়
আমি ডান হাত তুলি, পুরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি,
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো...
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে বিষম জরুরী
কথাটাই বলা হয়নি
লঘু মরালীর মত নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে......
ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ—
সত্যবন্ধ অভিমান, চোখ জ্বালা করে ওঠে,
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?

মোটা লোক

সাধনা মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক মোটা লোকের মনে
একটা করে গোপন সুখ আছে
যা সে উন্মোচন করতে চায় না
কৃপাপ্রার্থী কৃশাঙ্গী বা এমন কি আত্মজেরও কাছে
এদিকে বাইরে তার বহুবিধ দুঃখের কারণ
আর্থিক অনটন প্রিয়জন বিচ্ছেদের শোক
অথচ অনিবার্য এক তৃপ্তিময় রহস্যের চাবি
পৃথিবীর স্থূলকায় লোক
বহন করছে তার মনের স্তম্ভের মধ্যে
ভোমরার গোপন কৌটোয়
—স্বাদ যার শর্করা মিঠা
আপাত-অদৃশ্য যার তালা খোলে
যখনই স্বহস্তে সে ঘোরায় চাবিটা

যতই দুঃখী হোক
পৃথিবীর প্রতি মোটা লোক
গোপন তৃপ্তির এক সুমিষ্ট বাদাম
বুকেতে লালন করে
অলক্ষ্যেই লুকিয়ে চিবোয়
বাইরে শুধু দৃশ্যমান কঠোর আলোয়
কাঠের কঠিন নির্মোক

বজ্রযোগী

পিনাকেশ সরকার

রৌদ্রের ভিতরে যায় বজ্রযোগী
অমল জ্যোৎস্নার ছোপ তাজা রসকলি সর্বাঙ্গে মেখে
শাণিত শ্মশান থেকে ফিরে আসে
কমণ্ডলুর জল ঢেলে দেয় উঠোনের কৃষ্ণচূড়ামূলে
গভীর পাতার মতো হাতে দড়িছেঁড়া নতুন গাভীর
গলায় বুলোয় হাত
বহু দিন বাদে গৃহিণীর পাশে বসে দোতারার তার পালটায়
গল্প করে শরবতের মতো ভিজে মধুর গলায়।

নিমপাতা ঝরে সারা দিন
শুদ্ধ সরল চোখে গৃহিণী প্রশ্ন করে
'আর কতকাল? এবার ঠাকুর, তুমি মন দাও জমিজমাখেতে
এবার সহজ হও, চালা বাঁধো ফুটোমাথা ঘরে'...

হঠাৎ চমকে উঠে বিপন্ন স্বভাবে
মানুষটি ফের সোজা হয়, দোতারাযন্ত্র ফেলে
ঝোলার ভিতর থেকে বের করে
রক্তাক্ত ত্রিশূলে
তারপর শব্দ করে গোধূলির মাঠে নেমে যায়
যাবজ্জীবন॥

আজকাল আমি অনেক কিছুই আর অবিশ্বাস করতে পারি না। ছেলেবেলায় আমার বিশ্বাসের অভাব ছিল না: ঠাকুর-দেবতা, মা-বাবার পায়ের ধুলো, মাথার ওপর আকাশে স্বর্গ, পেল্লায় চেহারার যমরাজ— এ সবই বিশ্বাস করতাম। মাঝ রাতে ডোম পাড়ায় নিশি ডাকে, বিসর্জনের দিন মা দুর্গা কাঁদে—এইরকম আরও কত কী বিশ্বাস করেছি। ছেলেবেলাটা বোধ হয় ওই রকমই, সব কিছুই সহজে বিশ্বাস করা যায়। যৌবনে এসে দেখলাম, বিশ্বাস বলে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, অবিশ্বাসটাই বড়। আবার এখন, যখন পঞ্চাশ ছাড়িয়ে খানিকটা চলে এসেছি তখন যেন এতটা বয়সের দেখাশোনা থেকে কেমন এক অদ্ভুত দ্বিধা এসেছে: সংসারে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা অবিশ্বাস্য তা ঠিক করতে পারছি না। কোনো কোনো জিনিস এখন আমার কাছে ভীষণ রহস্যময় মনে হয়। যেমন আজ সকাল থেকেই হচ্ছে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর, চোখের পাতা খোলবার আগেই আমার মনে হল, আমি কী হাসপাতালে? মনে হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোথাও যেন একটু আশা জাগল: যাক্, তা হলে এখনও বেঁচে আছি, মরি নি। এর পর, কী আশ্চর্য, আমার শরীর থেকে কতটা রক্তপাত হয়েছে, বিছানায় ঠিক কতটা রক্ত শুকিয়ে গিয়েছে—ভাবতে ভাবতে চোখ খুললাম। আমার ঘর, আমারই বিছানা। তবু, লেপের তলা থেকে খুব সাবধানে যেন ক্ষত-বিক্ষত ডান হাতটা বের করছি—হাতটা বের করে নিলাম। আমার চোখে ঘুমের রেশ, বা মনের মধ্যে অস্বচ্ছ চেতনা তখন আর থাকার কথা নয়। ছিলও না। তা সত্ত্বেও আমার ডান হাতটা চোখের কাছে রেখে প্রথমে হাতের তালু, পরে উলটো পিঠ ভাল করে লক্ষ করলাম। কোথাও কোনো কাটাকুটি, আঘাত, আঁচড় দেখতে পেলাম না। একবার আমার এমনও মনে হল, হাতের তালুতে অন্তত রক্ত জমে যাবার মতন নীল দাগ কিছু থাকা উচিত ছিল। অথচ তেমন কিছু নেই: রোজ যেমন দেখি—আমার গোটা হাতটা অবিকল সেই রকম রয়েছে। এর পর আমি অনেক সহজে আমার বাঁ হাত বের করে নজর করে দেখলাম। একেবারে পরিষ্কার হাত; সারা রাত লেপের তলায় থাকার দরুন দুটি হাতই বেশ গরম।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিতান্ত যেন অভ্যাসবশে পা নেড়ে, মুখের ওপর হাত বুলিয়ে, আমার সর্বাঙ্গ অক্ষত—এটা অনুভব করে উঠে বসলাম। অথচ, আমার মনে হচ্ছিল যে-অবস্থায় আমি ঘুম থেকে উঠে বসলাম—এই অবস্থায় আমার উঠে বসার কথা নয়। কেননা, কাল একটা ঘটনা

ঘটে যাবার কথা। তা হলে কী সেটা ঘটে নি?

বাথরুম থেকে আমি ফিরে এলে ইন্দু চা নিয়ে এল। ইন্দু আমার স্ত্রী।

চা ঢেলে দিতে দিতে ইন্দু বলল, "আজ সকাল থেকেই খুব হাওয়া দিয়েছে।"

ইন্দুর মাথায় আলগা কাপড়, তার সাবেকী কালো রঙের শালটায় মাথা, গা-বুক জড়ানো। চায়ের কাপ এগিয়ে দেবার পর ইন্দু তার হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপালের কাছে কয়েকটা অগোছালো চুল সরালো। সিঁথির কাছে বাসী সিঁদুর বেশ ফিকে দেখাচ্ছিল, যেন খুব তাড়াতাড়ি সাদা হয়ে আসছে।

"মিনু ভবানীপুরে যাচ্ছে", ইন্দু বলল।

"ভবানীপুরে!"

"বকুলের বাড়ি থেকে সব দলবেঁধে কোথায় বেড়াতে যাবে—স্টীমারে।"

বকুল ইন্দুর মামাতো বোন। মিনু আজকাল প্রায়ই মাসির বাড়ি বেড়াতে যায়। বকুলের ওপর এতটা টান মিনুর থাকার কথা নয়। ব্যাপারটা অন্য রকম, মেয়ে খোলাখুলি করে না বললেও আমরা তা বুঝতে পারি।

আচমকা আমার কিছু যেন মনে পড়ে গেল। "আচ্ছা, ওই ছেলেটির কী যেন নাম?"

"বকুলদের বাড়ির? রঞ্জন।"

"আরে না না, বকুলদের বাড়ির নয়, আমাদের বাড়ির কথা বলছি। সত্যর বন্ধু।"

"সত্যর অনেক বন্ধু। তুমি কার কথা বলছ?"

আমি কার কথা বলছি আমার ভাল মনে পড়ছিল না। তার নাম আমার মনে আসছে না। চেহারাটাও একেবারে ঝাপসা।

"সেদিন আমাদের বিয়ে বাড়িতে দেখেছ বোধ হয়—" অন্যমনস্কভাবে বললাম, "ছেলেটি তাই তো বলল। সত্যর বন্ধু। বড় বড় জুলফিটুলফি আছে।"

ইন্দু আমার মুখের দিকে সামান্য তাকিয়ে থেকে হালকা গলায় বলল, "আজকাল সব ছেলেরই জুলফি থাকে, তোমার নিজেরটিরও। কার কথা বলছ কী করে বুঝব! তোমার ভাগ্নের বন্ধু যখন ভাগ্নেকেই জিজ্ঞেস কর। তা হঠাৎ..."

"না, এমনি—; কিছু নয় তেমন।" ইন্দুর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেবার সময় আমার কেমন অস্বস্তি হল।

ইন্দু আর দাঁড়াল না। সকালে তার নানান কাজ, ব্যস্ততা বেশি। মেয়ে ভবানীপুরে যাচ্ছে, ছেলে সম্ভবত ময়দানে যাবে, ছোটটা ছাদে কুকুর নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে বোধ হয়। ঠাকুর, চাকর, ঝি—সংসার এখন ইন্দুকে বসতে দাঁড়াতে অবসর দেবে না।

চা খাবার সময় আমার কয়েকবার হাই উঠল। ঠাণ্ডায় কি না জানি না মাথার মধ্যে সামান্য ভার হয়ে আছে। চোখ কখনো কখনো ছলছল করে উঠছিল। সর্দিটর্দি হতে পারে।

বাতাসের গতিগতি সত্যি আজ ভাল নয়; পৌষ মাস, সকাল থেকেই উত্তরের বাতাস হা-হা করে ছুটে বেড়াচ্ছে। ঠাণ্ডায় কি-না জানি না আমার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, যেন জড়তা আমায় হাত পা নাড়তে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্বাভাবিকভাবে অনুভব করতে দিচ্ছিল না। কিছু একটা—সেটা কী আমি জানি না, আমাকে কেমন বিমনস্ক করে রেখেছিল। অনেক সময় জ্বর-জ্বালা হবার মুখে এই রকম হয়; কিংবা শরীর থেকে পুরুষের ক্ষয় শুরু হলে এই রকম লাগে। হতে পারে, আমার মধ্যে কোনো রকমের অসুস্থতা ছড়িয়ে পড়ছে। আমার ভাল লাগছিল না।

ততক্ষণে মুখের সামনে অনেকটা রোদ এসে গেছে আমার। এই জায়গাটুকুতে আমি সকাল-সন্ধ্যে বসি, সকালের দিকটাতেই বেশী: চা খাওয়া, কাগজ পড়া, দাড়ি কামানো সব এখানে বসে বসেই সেরে ফেলা যায়। আমার শোবার ঘরের গায়ে এই জায়গাটুকু, ঠিক যে ঘর তা নয়, ঘরের মতনই। এধারের টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে ইঁটের পাতলা দেওয়াল তুলে, খড়খড়ি আর কাচ দিয়ে অনেককাল আগে এটা করা হয়েছিল। এক সময় সংসারের নানা কাজে ব্যবহার হত, আজকাল আমার বিশ্রাম, বসাটসার জায়গা। আসবাবপত্র এখানে খুবই কম: একটা ছোট মতন গোল টেবিল, পাথর বসানো; গোটা দুয়েক সাবেকী চেয়ার। ইন্দু অবশ্য এরই মধ্যে তার বিয়ের আমলের একটা সরু দেরাজ ঢুকিয়ে রেখেছে।

চা শেষ করার পর হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে বাণ্ডটা সরাবার সময় আচমকা আমার মনে পড়ল, কাল ঠিক সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেবার পর ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি যখন নীচু হয়ে, পিঠ নুইয়ে বসার ঘরের সেন্টার টেবিল থেকে প্যাকেটটা তুলে নিচ্ছিলাম তখন বুঝতেই পারি নি তার পর-মুহূর্তেই সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই ঘাড় পিঠ নুইয়ে টেবিল থেকে প্যাকেটটা তুলে নেবার পর আমি পিঠ সোজা করতেই দেখলাম, আমার মুখের সামনে তখনও সে দাঁড়িয়ে। কিন্তু একেবারে অন্যভাবে। নিজের চোখকে আমার বিশ্বাস হয় নি। অথচ বিশ্বাস না করার মতন কিছু ছিল না।

পলকের জন্যে দৃশ্যটা এখন আমার মনের ওপর দিয়ে টপকে গেল। অবিকল সেই রকমভাবে, সিনেমায় যেমন দেখেছিলাম একবার, একটা মস্ত ঘোড়া অন্ধকার থেকে এসে বিরাট লাফ দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, তার সামনের দুটো পা আমাদের মাথার দিকে লাফ মেরে উঠল, তারপর তার গলা এবং বুকের তলার অন্ধকার আমাদের ভীত করে কোথায় যেন মিশে গেল।

এমন আচমকা, এত দ্রুত কালকের দৃশ্যটি আমার মনের ওপর দিয়ে লাফ মেরে চলে গেল যে, আমি ছেলেটিকে নজর করতে পারলাম না। সত্যর সে কেমন বন্ধু, কী নাম, তার মুখের চেহারাটি কেমন—এ সব যেন মনে করে নেওয়া খুবই জরুরী ছিল আমার পক্ষে। অথচ কিছুই মনে করা গেল না।

অন্যমনস্কভাবে, যেন সেই ছেলেটিকে—সত্যর বন্ধুকে—প্রাণপণে খুঁজছি, সিগারেটের প্যাকেটটা লক্ষ করতে করতে হঠাৎ আমার মনে হল, আজ সকালে আমার সিগারেট আসে নি; কাল এই প্যাকেটটা সন্ধ্যে থেকে আমার হাতে রয়েছে। তা হলে, কাল এই প্যাকেটটাই হাতে থাকার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল।

সচরাচর ব্যবহার-করা প্যাকেট যেমন হয় সেই রকম মামুলীই মনে হল প্যাকেটটা; চমকে ওঠার মতন কিছু নেই। এক ফোঁটা রক্তের দাগও কোথাও লাগেনি। অথচ এরকম হতে পারে না। খুবই আশ্চর্য!

ধীরে ধীরে খানিকটা বেলা হয়ে গেল শীত চনচন করে উঠছে। মিনু এইমাত্র চলে গেল। ছেলে চেঁচামেচি করতে করতে নীচে নেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ, তার স্কুটার খারাপ হয়ে গিয়েছে। ছোটটা নিশ্চয় এতক্ষণে দলবল সমেত পার্কে চলে গেছে ক্রিকেট খেলতে। বাড়িটা অনেকখানি চুপচাপ। কোথাও একটা প্লেন কিছুক্ষণ যাবৎ পাক খাচ্ছে আকাশের তলায়, তার শব্দ কাছে দূরে, দূরে কাছে, গোল হয়ে ঘুরছে যেন। রাস্তার একঘেয়ে হল্লা আর তেমন আলাদা করে কানে পড়ে না।

টেবিলে সব কিছু সাজানো, দাড়ি কামাবার যাবতীয় উপকরণ: আয়না, সাবান, গরম জল, ব্রাশ, লোসান, খুর। আমি অনেকদিন থেকে সাবেকী হাতলঅলা খুরে দাড়ি কামাই। নিজের হাতে। মানুষের নানা রকম শখ কিংবা ছোটখাটো বিলাসিতা থাকে। দাড়ি কামানোয় আমার সেই ধরনের বিলাসিতা বরাবর। সব রকম উপকরণ সাজিয়ে, আস্তে আস্তে, আয়েশ করে, নিজের হাতে লম্বা খুর দিয়ে দাড়ি কামাতে আমার ভাল লাগে। দাড়ি কামাবার সময় একটু আধটু থেমে সিগারেট খাওয়া, সকালের কাগজের ওপর আবার এক আধবার চোখ বোলানো, অকারণে সামনে তাকিয়ে থাকা, কিংবা আয়নায় নিজের মুখ দেখায় আমার খুব আরাম। মানুষ বেশির ভাগ সময় নিজের মুখ দেখে না, দেখতে পায় না। আয়নার সামনে মুখ রাখলে নিজেকে দেখতে পায়। তখন একই মানুষ মুখোমুখি বসে যেন পরস্পরকে

পেয়েছে এইভাবে মনে মনে কথা বলতে পারে, হাসতে পারে, তার ক'টা চুল সাদা হল, চোখের তলায় কোন ভাঁজটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দাঁত কি বলছে—এ-সবই দেখাতে পারে।

দাড়ি কামাবার আগে সকালের শেষ চা আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন গালে সাবান মাখাও শেষ। শেভিং ক্রীমে ভাল ফেনা হয়েছে। টাটকা প্যাকেটের সিগারেট একটিকে খেয়ে ছাইদানে রেখে খুরটা তুলে নিয়েছিলাম। হাতলগুলো স্ট্র্যাপে খুরের ফলাটা ধার করেক বার দিয়ে নিয়ে আমি ডান গালে খুর তুললাম।

আর সামান্য পরেই সেই সাংঘাতিক মুহূর্তটি এল, যে-মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যেতে পারত।

কী যে হল, আমি বুঝতে পারলাম না। ডান গালে আমার খুর-সমেত হাতটা হঠাৎ থেমে গেল। সমস্ত হাত অবশ, আড়ষ্ট, অনুভূতিহীন। আমার সাধ্য নেই হাত সরিয়ে নিই, বা একটু নাড়া-চাড়া করি; আঙুলগুলো কোনো রকমে খুরের হাতলটা ধরে আছে, ধারালো খুরের ফলা গালের ওপর, কানের পাশে। সেই মুহূর্তে স্পন্দনহীন। আর তখনই অদ্ভুত এক ব্যথা বুকের ভেতর থেকে তীরের ফলার মতন বেরিয়ে কাঁধ বুক বেড় দিয়ে হাত বেয়ে একেবারে আঙুলের ডগা পর্যন্ত ছুটে গেল। ব্যথাটা আমায় অস্ফুট শব্দ করতেও দিল না, আমাকে অসাড়, অথর্ব, পঙ্গু করে দিল যেন। পলকের জন্যে আমার বোধ হয় মনে হয়েছিল, এই আমার শেষ, আমার হাতে অত্যন্ত ধারালো খুর, আমার আঙুলে সাড় নেই; এখন এই মুহূর্তে সবকিছু ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য রকম হয়ে গেল। সেই ব্যথার জন্যে হোক, অথবা ভয়ের কোনো অদ্ভুত নাড়া খেয়েই হোক, আমার হাতে আবার শক্তি ফিরে পেল; যেন আচমকা তড়িৎ-হীন হয়ে যে বাতি নিবে গিয়েছিল, আবার আশ্চর্যভাবে তা দপ্ করে জ্বলে উঠল। হয়ত ব্যথার বোধই আমার অসাড় আঙুলে আবার সাড় এনে দিয়েছিল। কোনো রকমে, আস্তে আস্তে, খুরটাকে নামিয়ে আমি টেবিলে রেখে দিলাম। এটা প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে ঘটে গেল। আঙুল থেকে ব্যথাটা তখন ফিরে আসছে।

যদিও আমার হাতে আর খুর ছিল না, তবু আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি বিহ্বল হয়ে বসেছিলাম। ডান গালের অর্ধেকটাও কামানো হয়নি, বাকী অন্য গাল সাবানে সাদা হয়ে আছে, শেষ যে জায়গায় খুরের ফলাটা ছিল—সেখানে যেন এখনও খুরের চিহ্নটা থেকে গেছে। আর একটু যদি হাতটা থেমে থাকত, বা ওই সময় অবশ, অসাড় আঙুল থেকে খুর ফসকে যেত কী হত বলা যায় না।

ব্যথাটা ততক্ষণে গুটিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে আবার বুকের তলায় আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল। কেন এ-রকম হল আচমকা আমি বুঝতে পারছিলাম না। সন্দেহ নেই, এই বিশ্রী অবস্থার পর আমার ভয় এবং উৎকণ্ঠা হচ্ছিল। ডান হাতটা নজর করলাম। কাঁপছে কী? না, তেমন কিছু নয়; বুড়ো আঙুলের কাছে—কব্জি বরাবর একটা শিরা বোধ হয় দপদপ করছে। সামান্য ঘাম হয়েছে হাতের তালুতে, ঠাণ্ডা লাগছিল। কপালেও হয়ত কয়েক বিন্দু ঘাম জমল।

কাছাকাছি কে যেন এসেছিল, আমি ইন্দুকে ডেকে দিতে বললাম।

আজ পর্যন্ত এ-রকম কখনও হয়নি আমার। কেন আজ হল, কিসের ব্যথা, কেনই বা এই পঙ্গুতা কে জানে!

সামান্য পরে ইন্দু এল। "আমায় ডাকছ কেন?"

মোটামুটিভাবে নিজেকে তখন সামলে নিয়েছি। তবু সরাসরি ইন্দুকে কিছু বলতে সংকোচ হল।

"তোমার বিন্দু কী করছে?"

"দোকানে পাঠিয়েছিলাম, ফিরেছে। কেন?"

বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল, তবু বললাম, "নীচে আমাদের পাড়ায় একটা নাপিত ঘোরাঘুরি করে না?"

ইন্দু কিছু বুঝতে পারল না। "নাপিত? কেন?"

বিব্রত বোধ করছিলাম। এলোমেলো করে বললাম, "না, একবার ডেকে আনত। দাড়িটা কামিয়ে নিতাম।"

ইন্দু যে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছে আমার বুঝতে কষ্ট হল না। কিছুক্ষণ থমকে থেকে অবাক গলায় ইন্দু বলল, "নাপিত এসে তোমার দাড়ি কামিয়ে দিয়ে যাবে! কেন? কি হয়েছে?" বলতে বলতে ইন্দু আমার সামনে মেলা দাড়ি কামাবার সাজ-সরঞ্জাম, আমার গালে শুকিয়ে আসা সাবানের ফেনা—সবই সবিস্ময়ে লক্ষ করছিল। খুবই স্বাভাবিক। আজ পাঁচ সাত বছর কিংবা তারও বেশী সে আমাকে অন্যের হাতে দাড়ি কামাতে দেখেনি। আমার এই বিশেষ বিলাসিতাটুকু যে তার স্বামীর স্বভাবের অঙ্গ সে ভালো করেই জানে। তাহলে আজ হঠাৎ এ-রকম কেন? কেন আমি রাস্তা থেকে নাপিত ধরে আনতে বলছি?

কোনো রকমে সামলে নেবার জন্যে ইতস্তত করে বললাম, "না, সে-রকম কিছু নয়। দাড়ি কামাতেই বসেছিলুম...; কী

রকম একটা ফিক ব্যথা লাগছে ডান হাতটায়। ভাবলাম—"

"ব্যথা?" ইন্দু আমার দিকে আরও ঝুঁকে দাঁড়াল।

"শিরাটিরায় টান ধরেছে বোধ হয়।"

"ঠাণ্ডাতেও হতে পারে। বেকায়দা কোথাও লাগিয়েছিলে?"

"না; মনে পড়ছে না।"

"না হলে নিশ্চয় ঘুমোবার সময় বালিশের ওপর হাত তুলে মাথা দিয়ে শুয়েছ। ওই এক খারাপ অভ্যেস তোমার।" ইন্দু কথা বলতে বলতে আমার কাঁধ এবং হাতের ওপর একটু হাত বুলিয়ে দিল।

"ওই রকম কিছু হবে, তেমন মারাত্মক কিছু নয়।"

"আমি শিবুকে পাঠিয়ে নাপিত ডাকিয়ে আনছি। তুমি বাপু গালের সাবানটা মুছে নাও; শুকিয়ে চড়চড় করছে।"

ইন্দু চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ডাকলাম, "শোনো।"

কাছে এল ইন্দু।

আমার ডান হাতটা আস্তে করে তুলে ধরে বললাম, "আচ্ছা, দেখো তো, কোনো দাগটাগ দেখতে পাও কি না?"

"দাগ! কিসের দাগ?"

"এমনি বলছি। কোথাও হয়ত কোনো চোট লেগেছে, খেয়াল করিনি। শিরাটিরাও অনেক সময় ফুলে যায়...।"

ইন্দু আমার হাতের তালু, উলটো পিঠ, কব্জি-টব্জি দেখল ভাল করে। মাথা নেড়ে বলল, "না, কিছু দেখছি না।" বলে একটু থেমে আমার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার কী শরীরটা ভাল নয়?"

"ভালই; তবে আজ তেমন ভাল লাগছে না।"

"কাল তোমার ভাল ঘুম হয়নি; বার দুই উঠেছ।"

"হ্যাঁ, কালকে..."

"ক'দিন ধরে তোমার শরীরটাও কেমন দেখছি।"

"আমারও মনে হচ্ছে; কেমন লাগছে যেন, বুক পিঠে ব্যথা ব্যথাও মনে হয়।"

"আজ একবার অফিস থেকে ফেরার সময় তোমার বন্ধু নরেন-ডাক্তারকে দেখিয়ে এস। এখন বয়েস হচ্ছে..., গাফিলতি করা উচিত নয়। সেদিনও আমি তোমায় বলেছি। বুঝলে?"

"দেখি।"

"দেখি নয়, আজ নিশ্চয় করে ডাক্তার দেখিয়ে আসবে।...আমি শিবুকে পাঠিয়ে নাপিত ডাকিয়ে দিচ্ছি।"

ইন্দু চলে গেল। গালের সাবান মুছে আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। সত্যি, আমার ভাল লাগছিল না। কী রকম এক অবসাদ, মনমরা ভাব, অন্যমনস্কতা, বিষণ্ণতা যেন আমার আরও শূন্য করে তুলছিল।

রোদ আরও অনেকটা এগিয়ে আমার মাথা ডিঙিয়ে গিয়েছিল। বাতাসের গতি-প্রকৃতিতে বা-খুশি বেকাড়া ভাব আরও বেড়েছে।

শিবু নাপিত ডেকে আনল।

অফিসে আমার কাজকর্ম প্রায় কিছুই হয় না। সকালের সেই ব্যথাটা যদিও আর ফিরে আসেনি, তবু সব সময় আমার ভয় হচ্ছিল আবার যে কোনো সময়ে ওটা দেখা দিতে পারে, আর যদি দেখা দেয় হয়ত এবার আমি সঠিক করে সেটা চিনে নিতে পারব। ব্যথাটা কিসের, কোথা থেকে আসছে, কিভাবে ছড়াচ্ছে—এটা আমার ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। নরেনকে অফিস থেকে ফোন করেছি, ছ'টা নাগাদ সে ধর্মতলার চেম্বারে থাকবে, তাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব। আমার ডান হাত অবশ্য এখন আর দুর্বল, অবশ লাগছিল না। তবু আমি অনুভব করতে পারছিলাম, বেশ স্বাভাবিকভাবে আমি হাতটা নাড়া-চাড়া করতে ভয় পাচ্ছি। ফলে হয়ত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে খানিকটা। বাঁ হাতের ব্যাপারেও আমি লক্ষ করলাম, আমার হাতটা মুঠো হয়ে থাকছে বার বার, ফলে তালু ভিজে যাচ্ছে; রুমাল দিয়ে বেশ কয়েকবারই হাত মুছতে হল। দুপুরে চায়ের সময় পারচেজ অফিসার দত্তগুপ্ত এল। দত্তগুপ্তর বয়েস এখনও চল্লিশে পৌঁছোয় নি, খুব চটপটে, ফিটফাট ছোকরা। আমাদের অফিসে বছর পাঁচেকের মধ্যে অনেক উন্নতি করে ফেলেছে।

"স্যার—" দত্তগুপ্ত টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি চলে যাব ভাবছি।"

"এখনই?"

"না, আর একটু পরে। আমাদের ওদিকে খুব গোলমাল চলছে কাল বিকেল থেকে। দুটো মারা গেছে; আর-একটা মারা যায় যায় করছে। কাগজে দেখেছেন বোধ হয় আজ?"

"ও!...না, আজ ভাল করে কাগজ দেখা হয়নি।"

"আমাদের ওদিকে কারফুর পাসিবিলিটি রয়েছে আজ। সকাল থেকে বনধ্ চলছে।"

"কারা মারা গেল?"

"একজন শুনছি বেশ বুড়ো, ষাটের ওপর হবে; রাবার ফ্যাক্টরির ম্যানেজার। এক কোপেই সাবাড় করে দিয়েছে, কসাইয়ের দোকান থেকে চপার এনে মেরেছে শুনলাম। হরিবল্। অন্যটা গিয়েছে ডিরেক্ট বোমার হিটে। বুকের ওপর হিট হয়েছিল; এ বোধ হয় পলিটিকস করত...বেশি বয়স নয়। একজন এ এস আই হাসপাতালে পড়ে আছে, বোমা খেয়েছে।"

আমি কোনো কথা বলছিলাম না, এমন কি দত্তগুপ্তর দিকে আর তাকাচ্ছিলাম না।

আরও দু-একটা কথা বলে দত্তগুপ্ত একটা খাম আমার টেবিলে—প্রায় আমার হাতের কাছে রেখে চলে গেল।

কিছুই ভাল লাগছিল না; কিছু না-কিছুই নয়। বাঁ হাতের মুঠো আর-একবার রুমালে মুছে নিলাম। কপালটা ক্রমে ভারী হয়ে আসছে। প্রেশার, না ঠাণ্ডা চোখের গোলমাল বাড়ছে নাকি?

বেল টিপতেই বেয়ারা এল।

"আমার দুটো সারিডন এনে দাও।"

পয়সা নিয়ে বেয়ারা চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি আশাকে ফোন করলাম। ওদিকে রিং হতে লাগল।

"হ্যালো!" ওপার থেকে।

"কে, বিবি! আমি মামা বলছি, তোর মাকে একবার ডেকে দে।"

"দিচ্ছি। মামা, ফুলদাকে তুমি বড়দিনে পাঠিয়ে দেবে, আমরা ক্রিসমাস ট্রি সাজাচ্ছি। অত ট্রি আনতে যাব।...মা, ওমা, মামা ডাকছে—।"

আশা এসে ফোন ধরল ওদিকে। "দাদা!"

"তোদের কী খবর?"

"এই তো। তুমি ফোন করে ভালই করলে। বাড়িতে তোমাদের কী হয়েছে? ফোন পাচ্ছি না।"

"লাইনটা গোলমাল করছে। সারাবার [illegible] দিয়েছি।"

"[illegible] বলো!...ফোনে, বউদিকে বলো— [illegible] পাঁচ [illegible] যেতে পারে।"

"কী জিনিস?"

আশা যেন হাসল একটু। "ও তুমি বুঝবে না, মেয়েদের ব্যাপার। বউদিকে বললেই বুঝতে পারবে। তবে একটু [illegible] হয়, তুমি [illegible]। দেরী করলে [illegible] না। বউদি কী বলে আমায় জানিও।"

"[illegible] সত্য আছে?"

"সত্য! সত্যর তো এখন অফিস। কোনো দরকার আছে? তাহলে অফিসে একটা ফোন করতে পারো। নম্বরটা দেব?"

"থাক।...একটা কথা তোকেই জিজ্ঞেস করি। সেদিন তোর ছোট ননদের বিয়েতে [illegible] ছেলেকে দেখেছিলাম যেন সত্যর [illegible] [illegible] লম্বাটা..."

"সত্যর ভাগনের তো দেড় হাজার বন্ধু, দাদা তুমি কার কথা বলছ?"

"নামটা আমার মনে পড়ছে না।"

"কেমন দেখতে?"

"কেমন দেখতে!...মানে, আমি তো তেমন করে খুঁটিয়ে দেখি নি; জুলফি-টুলফি আছে...।"

আশা হেসে উঠল। "ছেলেগুলোর কার যে জুলফি আর কার যে দাড়ি আমি বুঝতে পারি না। সব কটাই সমান। তুমি এখন বিয়ের দিন ভিড়ে কাকে দেখেছ কি করে বলব!" বলে আশা একটু থেমে শুধলো, "তুমি নিজে দেখেছ তো? কী দরকার?"

অগত্যা আমায় চুপ করে যেতে হল, বোকার মতন।

"সত্য আসুক, বলব।" আশা বলল। "থাক। তোদের খবরটবর তাহলে ভালই। মনোরঞ্জন ভাল আছে?"

"হ্যাঁ, আমরা মোটামুটি। আজকাল যা হচ্ছে! আমাদের এদিকে কী কাণ্ড হয়ে গেল পরশু! বন্ধুদের কলেজে অ্যাসিড ঢেলে একজনের চোখমুখ পুড়িয়ে দিয়েছে, তারপর আগুন। কী আগুন! এত ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।...যা দিনকাল একটু সাবধানে থেকো বাপু।"

ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

সুইং ডোর ঠেলে মুখার্জি এল। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, "শুনেছেন মশাই, যোশীসাহেব ছুটি নিয়ে পালাচ্ছে।"

"না, শুনিনি। কেন?"

"টেনরাইজড হয়ে গিয়েছে। বলছে আর এখানে থাকবে না—নট ইন ক্যালকাটা।" মুখার্জি তার সিগারেটের ছাই অ্যাশট্রেতে আলতো করে ফেলে দিয়ে খানিকটা যেন [illegible] গলায় বলল, "বেটাকে ভাল কথা বললে শুনত না, খালি পয়সা বাঁচাবার তাল। অনেকবার বলেছি, তোমার ওই পাড়াটা ছাড়ো। দমদমের দিকে কেউ থাকে? ওটা একটা ভিয়েৎনাম। কথা শুনবে না। কম ভাড়ায় বেশী ঘর নিয়ে থাকবে; বাসে, শেয়ারের ট্যাক্সিতে অফিস আসবে। এখন মজাটি বোঝো।"

বোম্বাই থাকিত মুখার্জি চা-টা খেতে গল্প করতে এসেছে। লোকটা একটু খোশ মেজাজ গল্পবাগীশ। কথাবার্তায় ঝকঝকে মুখে তেমন কিছু আটকায় না। চেহারাটা ভালই, মাথার চুলে অ্যালবার্ট কাটে, পোশাক-আশাকে শৌখিনতা আছে।

বেয়ারা স্যারিডন নিয়ে এল।

"স্যারিডন?" মুখার্জি জিজ্ঞেস করল।

"মাথাটা ধরেছে মনে হচ্ছে।"

"মাথার আর কী দোষ—'

"কী হয়েছে যোশীর ?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা খতম' দেখেছে।"

"খতম দেখেছে ?"

"মার্ডার। ক্লীন মার্ডার। একেবারে ওর বাড়ির কাছেই। কটা ছেলে মিলে আর-একটা ছেলেকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল। ছেলেটার হাতে দুধের বোতল, দুধ নিয়ে ফিরছিল। বেচারী শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়েছে, বাট নান টু হেলপ। সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ।"

স্যারিডনটা খেয়ে ফেললাম।

মুখার্জি বলল, "যোশী কাঁপতে কাঁপতে অফিসে এসেছে। দেরীতে। পাড়ায় পুলিস ঢোকার পর বেরিয়েছে আর কি। চোখ মুখের চেহারা পালটে গেছে বাবাজীর। বাড়িতে বউ বাচ্চা রাখে নি, বড়বাজারে কার কাছে পাঠিয়ে তবে এসেছে। কাল পরশুই পালাবে বলছে।"

আরও একবার বাঁ হাতের ঘাম মুছতে হল। মাথাটা দপদপ করছিল।

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে মুখার্জি বলল, "যোশী ট্রান্সফার নেবার জন্যে ছটফট করছে। আমি বললুম, তুমি নর্থ ক্যালকাটা ছেড়ে আমাদের দিকে চলে এসো, অনেক সেফ।"

"আপনাদের দিকটা ভাল আছে এখনও।"

"অনেক। চারদিকে যা হচ্ছে মশাই তার চেয়ে ফার বেটার, দু' পাঁচটা বোমার শব্দ,

পটকাফটকা তো নরম্যাল ব্যাপার। পুলিসের ভ্যান কী আর না দেখবেন—তবে ব্যাস্তফাস্ত প্রায় নেই বলে আমরা হাঙ্গামা-হুজ্জুত থেকে বেঁচে গিয়েছি অনেকটা।" মুখার্জি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছল। ওর রুমালে সেন্ট মাখানো থাকে, গন্ধ এল ফিকে।

"আজকাল কোনো জায়গাই সেফ নয়, বুঝলেন পালিতসাহেব—" মুখার্জি বলল, "ইভন দিস অফিস। এই অফিসের তারক-বাবুর ছেলে পুলিস কাস্টডিতে রয়েছে আপনি জানেন?"

"তারকবাবু! আমাদের বিল সেকসানের!"

"তবে আর বলছি কি!...ওই যে নতুন ড্রাইভার ছোকরা—সেটা তো শুনেছি খুব অ্যাকটিভ।" মুখার্জি তার অ্যালবার্ট-কাটা টেরিতে হালকা করে হাত বুলিয়ে নিল। "সময় যা পড়েছে পালিতসাহেব, তাতে চারপাশ দেখেশুনে চলতে না পারলে বাঁচা যাবে না। ইউ মাস্ট বি ভেরী ট্যাকট্‌ফুল, রাগটাগ কক্ষনো করবেন না। পাড়ায় চাঁদাফাদা চাইতে এলে পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দেবেন, নেভার আস্ক অ্যানি কোশ্চেন, টাকা নিয়ে তোরা বোমাই বানাগে যা আর পাইপগান তৈরী করগে যা। গো টু দি হেল, আমার কী! আপনি নিজেই পাইপগান দেখেছেন?"

"না।"

"আমি সেদিন কাগজে দেখলাম।...আমার শালা বলছিল তাদের কলেজে প্রায় রোজই এখন পাইপগান আর বোমা নিয়ে দু' দলে ওয়ার অফ অকুপেশান চলায়, মানে কলেজটা দখলে আনার লড়াই। এই যুদ্ধে সেদিন একটা মেয়ের হাত গিয়েছে—বেচারী এক বিল্ডিং থেকে কলেজের আরেক বিল্ডিংয়ে যাচ্ছিল— অ্যান্ড ইট হ্যাপেনড।"

মিনুর কথা আমার মনে পড়ছিল। মিনুরা টাঁসার করে কোথায় গেছে আমি জানি না; তবে আজকাল এত ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। অন্তত মেয়েদের পক্ষে। ইন্দুর এসব ব্যাপারে আরও নজর দেওয়া উচিত।

এমন সময় মিসেস বাগচী এল। মিসেস বাগচী আমাদের পুরোনো টাইপিস্ট। কোনো সময়ে দেখতে যথেষ্ট সুন্দরী ছিল, এখন বয়সটাকে নিয়ে রীতিমত উৎকণ্ঠা ভোগ করে। স্বামী নেই, মানে স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন হল; বাড়িতে একটি মেয়ে আছে।

কয়েকটা জরুরী চিঠি রেখে দিয়ে মিসেস বাগচী চলে যাচ্ছিল। মুখার্জি বলল, "আপনি পার্কসার্কাসে থাকেন না?"

মাথা নুইয়ে সামান্য নাড়ল মিসেস বাগচী।

"ওদিকের অবস্থা কেমন? খুনোখুনি হচ্ছে?"

"আমাদের দিকটায় এখনও হয়নি।"

"অ্যাংলো পাড়া বলে অনেকটা সেফ্।"

"কাল একটা বাস জ্বালিয়েছিল।"

"ওনলি ওআন?" মুখার্জি হাসল, "তা হলে তো খুবই ভাল পাড়া।"

কী ভেবে মিসেস বাগচী বলল, "আজ অফিস আসার সময় আমাদের আগের ট্রামের ওপর বোমা ছুঁড়েছিল।"

"কোথায়?"

"ওয়েলিংটনের একটু আগে।"

"মরেছে ফরেছে?"

"কী জানি! ট্রামটা আর দাঁড়াল না, প্রাণ-পণে বেরিয়ে গেল সোজা। দাঁড়ালে আগুন ধরিয়ে দিত।"

মিসেস বাগচী চলে গেল। মুখার্জি এক-বার ঘাড় ফিরিয়ে দরজার পাল্লাটা বন্ধ হতে দেখল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বাঁ চোখটা সামান্য ছোট করে হেসে বলল, "বুঝলেন পালিতসাহেব, বাগচীবিবি আমার হিপি-তত্ত্ব অস্টিন অফ ইংল্যান্ডের মতন, এখনও বেশ চলছে।"

নিজের রসিকতায় নিজেই যেন মুগ্ধ হয়ে মুখার্জি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আপনাদের আর কী, গিন্নীফিন্নি নিয়ে দিব্যি আছেন। আমাদের মতন উইডোআরের অবস্থাটা বুঝতে পারবেন না। ক্লাবে তাস খেলে, আর মদ গিলে কাঁহাতক বেঁচে থাকা যায়। ছেলেটাকে বেনারসে পড়তে পাঠিয়ে আরও ফাঁকা লাগছে। সিচুয়েসান ইমপ্রুভ করলে ছেলেটাকে আনিয়ে নেব ভাবছি।"

মুখার্জি চলে গেল। আরও একটু জল খেলাম। স্যারিডনের স্বাদ যেন গলার কাছে লেগে আছে। ঘড়িতে তিনটে বাজল। স্লিপ প্যাডে অকারণে লাল-নীল পেন্সিলটা

বোলাতে বোলাতে এমন একটা বিচিত্র ছবি হল যে আমার মনে হচ্ছিল, কিম্ভূত কোনো জীবকে আগুনের মধ্যে রেখে ঝলসানো হচ্ছে।

সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরলে ইন্দু আমার শরীর সম্পর্কে জানতে চাইল। আমার বন্ধু নরেনের কাছে গিয়েছিলাম। নরেন কিছু ধরতে পারেনি, ব্লাড প্রেসার সামান্য বেড়েছে, ওটুকু কিছু নয়। ব্যথাটা অ্যানজিনার কী না—সে বুঝতে পারছে না, তার লক্ষণ খানিকটা আলাদা। তবে বয়স হচ্ছে, চারপাশে যেরকম অবস্থা—অশান্তি, উদ্বেগ, আপদ-বিপদ, টেনসান তাতে হার্ট কার একটা কিছু হয়ে গেলেও অবাক হবার নেই রে ভাই। যাই হোক, পরে একটা ই সি জি করে নেব। আপাতত একটা টনিক খাও, ঠেক সাম মালটিভিটামিন ট্যাবলেটস। মনে হচ্ছে, ভেগাস্ পেইন্। টায়ার্ডনেস, ফেটিগ কেটে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

"নরেন বলল, তেমন কিছু নয়, কাজকর্মের চাপ থেকে হয়েছে। বিশ্রাম নিতে বলল।"

"তা হলে ছুটি নাও অফিস থেকে", ইন্দু বলল, "কদিন কোথাও বেড়িয়ে এসো; শীতের সময় ভালই হবে।"

"দেখা যাক্।"

আজ শীতটা বোধ হয় মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বাতাস এখন যেন আরও বেপরোয়া, সারা দিনের ধুলো জমে গিয়েছে শুনো ধোঁয়া প্রায় স্থির হয়ে আছে, কুয়াশা জমছিল, জমে এমন একটা বুনন তৈরী করে ফেলেছিল যে কোনো কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না।

মিনু ফিরে এসেছে। মনে হল, তার দিন ভালই কেটেছে, গুনগুন করে গান গাইতে শুনলাম এক আধবার। আমার বড় ছেলে তার ঘরে রেডিও খুলে খবর শুনছিল, এখন বোধ হয় বইপত্র খুলে বসল, ম্যানেজমেন্টের শেষ পরীক্ষাটা বাকি। ছোটটা এমন শীতে লেপের তলায় ঢুকে ইন্দ্রজাল কমিকস-এর বই পড়ছে হয়ত।

শোবার ঘরে বসে বসে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল। ইন্দু মাঝে মাঝে আসছিল। তার মুখে সব সময়ই সংসারের কথা : বাড়ির প্ল্যানটা অদলবদল করাতে এত দেরী হচ্ছে কেন? মিনুর যেরকম মন পড়ে গিয়েছে ওদিকে তাতে এবার তাড়াতাড়ি বকুলের সঙ্গে বসে কথা বলতে হয়। ঠাকুরঝিকে বলে দেখো যদি দু' দশ টাকা কম করলে ভরি দশ পনের নিতে পারি, তা ও যখন খবর দিয়েছে, টাকাটা পাঠিয়ে দিতে হয়। মুর্শিদাবাদটা কী ভালো, [illegible] স্যাকরারা পর্যন্ত সোনা [illegible] কিনতে ভয় পায়, ঠক খাবার ভয় রয়েছে। তবে ঠাকুরঝি যেমন চালাকচতুর, ওকে কে ঠকাবে!

আমার কিছুই ভাল লাগছিল না। ইন্দুর কথা আমি মন দিয়ে শুনছিলাম যে তাও নয়। মানুষের মনের মধ্যে অনেক সময় যেমন একটা ঘোলাটে ভাব হয়ে আসে, তখন সবই এক অপরিষ্কার এলোমেলো যে কিছুই ভাবা যায় না, ভাবতে ভাল লাগে না। আমি কোনো কথাতেই উৎসাহ পাচ্ছিলাম না।

ক্রমে রাত হল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যে যার ঘরে। সংসারের শেষ কাজটুকু চুকিয়ে ইন্দুও তার ঘরে গেল। আমার শোবার ঘরের পাশে ইন্দু আর ছোট ছেলেটা শোয়, তার পাশের ঘরে মিনু। বড় ছেলে একেবারে শেষের দিকের ঘরটা নিয়েছে। সিঁড়ির একপাশে তার ঘর, অন্য পাশে বাইরের লোকজন এসে বসার ঘর। নীচে রান্নাঘর, ঠাকুর-চাকরের থাকা।

বাড়িটা সাড়া শব্দহীন হল; কোথাও যে বাতি জ্বলছে তাও মনে হল না। পাড়াটাও একেবারে নিস্তব্ধ, কদাচিৎ শীতের মধ্যে এক আধটা গাড়ি কিংবা রিকশার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শেষে অনেকক্ষণ তাও আর শোনা গেল না।

আমার ঘুম আসছিল না। লেপের তলায় শুয়ে শুয়ে শেষ পর্যন্ত আমি এমন একটা ক্লান্তি এবং বিরক্তি বোধ করলাম যে ছেলেমানুষের মতন পা দিয়ে লেপ সরিয়ে হাত দুটো ঠাণ্ডায় মেলে রাখলাম। সামান্য পরেই হাত-পা কনকন করে উঠল। অন্ধকারে ছুঁচ খোঁজার মতন আমি যে অন্ধ হয়ে কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছি এটা তো বোঝাই যায়।

কিন্তু কী? কাকে খুঁজছি? সত্যর বন্ধুকে?

সারা দিন যাকে খুঁজে পেলাম না, এখন আর যে তাকে খুঁজে পাব এমন আশা প্রায় যখন ছেড়ে দিয়েছি, আচমকা তার নাম আমার মনে পড়ে গেল। আদিত্য। হ্যাঁ, নাম বলেছিল আদিত্য।

নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার পর পর সবই আশ্চর্যভাবে মনে পড়ে গেল।

কাল সন্ধেবেলায় সে এসেছিল। অফিস থেকে ফিরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে আমি তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। চা-টা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কে যেন এসে বলল, একটি ছেলে দেখা করতে এসেছে। বাইরের বসার ঘরে আছে।

বসার ঘরে এসে দেখলাম ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। ছিপছিপে চেহারা, মাথায় সামান্য লম্বা, কোঁকড়ানো বড় বড় চুল, রুক্ষ, গালে লম্বা জুলফি, দাড়িগোঁফ দু' চারদিন বোধ হয় কামায় নি। আজকাল ছেলেরা যে ধরনের প্যান্ট পরে সেই রকম প্যান্ট, গায়ে ঢোলা হাতা কালো সোয়েটার, গলায় একটা স্কার্ফ মাফলারের মতন করে জড়ানো।

ছেলেটি তার পরিচয় দিল। "সত্য আমার বন্ধু। আমার নাম আদিত্য।"

"ও! সত্যর বন্ধু—! বসো, বসো।"

আদিত্য বসল।

"তোমায় আগে দেখেছি কী!" বসতে বসতে আমি বললাম।

"বিয়েবাড়িতে হয়ত।"

"ও! আচ্ছা!...তা কি ব্যাপার বলো?"

আদিত্য আমার দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ছেলেটিকে দেখতে আমার মন্দ লাগছিল না: নাকটি বেশ ধারালো, লম্বা, থুতনি শক্ত, চওড়া কপাল। তবে, ওর চোখ মুখ যেমন স্বাভাবিক, সজীব মনে হচ্ছিল না। কেমন যেন রুক্ষ, দুর্বল। চোখ দুটি অবশ্য সামান্য উজ্জ্বল, নিষ্প্রাণ, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। দেখলাম, আদিত্য তার দুটি হাতই প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে। এটা আমার পছন্দ হল না; আমার ভাগ্নের বন্ধু, আমার সামনে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসে থাকবে—আমার চোখে এটা অশালীন মনে হল। তবে, যেরকম শীত, হয়ত তার হাত দুটো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বলেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে।

"কি ব্যাপার বলো?" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ছেলেটি সত্যর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আমার কাছে চাকরি-বাকরির খোঁজে এসেছে। এ রকম অনেকেই আসে।

আদিত্য কোনো কথা বলল না, আমার দিকে তাকাবার চেষ্টা করে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

ছেলেটি লাজুক। হয়ত খানিকটা আত্ম-সম্মান বোধ করছে চাকরির উমেদারি করতে।

অগত্যা আমিই অন্যভাবে কথাটা পাড়লাম। "তোমার বয়েস কত?"

ঘাড় ফিরিয়ে আদিত্য তাকাল। "চব্বিশ-টব্বিশ।"

"সত্যর সঙ্গে পড়তে?"

"না।"

"তা হলে ইউনিভার্সিটি..."

"যাই নি।"

আমার মনে হল, কথাটায় আদিত্য বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হল। ভদ্রতা করে বললাম, "ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া অবশ্য এখন মীনিংলেস, কিছুই হয় না ওখানে; অযথা সময় আর পয়সা নষ্ট। বছরের মধ্যে আট-দশ মাস তো বন্ধই থাকে। খুললেই গণ্ডগোল।" আদিত্যকে যেন আমি সান্ত্বনা দেবার মতন করে একটু হাসার ভান করলাম। "প্র্যাকটিক্যালি এখন তো মনে হয় একটা পুরোনো ঠাট দাঁড়িয়ে আছে। খুবই খারাপ লাগে বুঝলে আদিত্য, আমাদের খুব দুঃখ হয়। সে একটা সময় গেছে—গোল্ডেন ডেজ। কত ভাল ছেলে, ব্রিলিয়ান্ট বয়েজ, স্কলারস, প্রফেসারস—কী রেপুটেশান্ ছিল; তারপর দেখতে দেখতে সব গেল। এখন হাট-বাজার; অ্যাডমিনিস্ট্রেশান নেই, ডিসিপ্লিন নেই, পড়াশোনার পাট তো চুকেই গেছে। এক-একটা পরীক্ষা নিয়ে দেখো না কত কেলেঙ্কারী হয়, কাগজে বেরোয়। আমাদের কী ট্র্যাডিসন ছিল—স্যার আশুতোষ, রাধা-কৃষ্ণণ, রমন, মেঘনাদ সাহা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ...। আর আজ? ছি ছি! ভাবতেই আমাদের মত আধ-বুড়োদেরও বাস্তবিকই কষ্ট হয়।"

"আপনাদের ইউনিভার্সিটি।" আদিত্য চাপা গলায় বলল, অন্য দিকে তাকিয়ে, যেন আমায় বিদ্রূপ করতে চাইল। অথচ তার বিদ্রূপের ভঙ্গি এতই অস্পষ্ট যে আমার অসন্তুষ্ট হবার উপায় নেই।

"তুমি নিশ্চয় কলেজে পড়েছ?" ইতস্তত করে বললাম।

আদিত্য অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল।

"বি-এ না বি এস-সি?"

"বি এস-সি হলে?"

"ভালই তো! তা চাকরিবাকরি?"

ঘাড় নাড়ল আদিত্য। চাকরি করে না।

আমার অনুমান মোটামুটি তাহলে ঠিক, আদিত্য বেকার, সত্যর কাছ থেকে খবরটবর নিয়ে চাকরির জন্যে আমার কাছে এসেছে। যারা চাকরিবাকরির জন্যে ধরনা দিতে আসে তাদের সঙ্গে অবশ্য এই ছেলেটির ব্যবহারে মিল নেই। ওর কোনো রকম কাকুতি-মিনতি, অনুনয়, হাত পাতার ভাব নেই। একটা চাকরি চাইতে এসে অন্যরা যেরকম করে, কথা বলে, দুঃখকষ্ট জানায়, ব্যাকুলতা প্রকাশ করে—আদিত্যর মধ্যে সেসব কিছুই দেখছিলাম না। বাস্তবিকপক্ষে এটাই আমার ভাল লাগছিল। কেউ এসে কাঁদাকাটা করলে প্রথমে খারাপ পরে বিরক্তি লাগে। কথাবার্তাও নিজের থেকে বলছে না ও, যেটুকু নিতান্ত না বললে নয় মাত্র সেইটুকু বলছে—তাও আমার কথার জবাবে। অথচ ছেলেটিকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না, একটু বেশি রকম অন্যমনস্ক, খানিকটা যেন অস্বস্তিতে রয়েছে। আমার মনে হল, আমার কাছে—এই সাজানো-গোছানো বাইরের ঘরে আদিত্য বেশ আড়ষ্ট, সংকোচ, এবং খানিকটা ভয় ভয় ভাব নিয়ে বসে আছে। হয়ত এই জন্যেই কথাবার্তা বলতে পারছে না।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। ধরিয়ে প্যাকেট আর দেশলাইটা সামনের নীচু সেন্টার টেবিলে রেখে দিলাম। এপাশের বড় সোফায় আমি, সেন্টার টেবিলের ও-পাশে ছোট সোফায় আদিত্য, আমরা মুখোমুখি বসে।

"চাকরিবাকরির অবস্থা খুব খারাপ—" আমার গলা থেকে কথার সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া আস্তে আস্তে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এল। "আনএমপ্লয়মেন্ট এখন একটা মেজর প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ন্যাশনাল প্রবলেম। কাগজে একটা ফিগার দেখছিলাম সেদিন, আই ডোন্ট রিমেমবার এক্জ্যাক্টলি, বাট ইট মাস্ট বি সাম মিলিয়ান্স। ফোর্থ প্ল্যানের আগেই সাম থ্রি পয়েন্ট সামথিং। কত লক্ষ
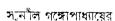
হল যেন : ২ লাখ পঁয়ত্রিশ হবে। বাংলা দেশেই দেখো না, সাত আট লক্ষ। আমাদের ছেলেবেলায়, তিরিশ-বত্রিশ সাল নাগাদ এ রকম একবার দেখেছি—মাথা খুঁড়েও চাকরি জুটত না, আই-এ বি-এ পাশ করে ছেলেরা ফ্যাফ্যা করত। অবশ্য তখন এরকম চোখে লাগত না, আজকাল যেমন লাগে. পপুলেসান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকারের ভল্যুমটাও তো বেড়ে যাচ্ছে, না কী বল হে? তাছাড়া তখন লেখাপড়া জানা ছেলের নাম্বারটাও কম ছিল, এখন স্কুল ফাইন্যাল আর হায়ার সেকেন্ডারীতেই তো হাজার পঞ্চাশ করে বেরুচ্ছে বছরে। সে টুকে-ফুকে যেমন করেই হোক। তা তুমি স্কুলে চেষ্টা করলে না কেন? শুনেছি সাইন্স টিচারদের ডিম্যান্ড আছে। মাইনেপত্রও এখন ভদ্রলোকের মতন হয়েছে।"

আদিত্য ছোট্ট করে একবার কাশল। কাশল না হাসল! মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। এই যে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাকরির বাজারের কথা বললাম, তাতে ওর বোঝা উচিত ছিল, আমি বাস্তবিক তাকে হতাশ করছি। ছেলেটা বাস্তবিকই অদ্ভুত। কিংবা এমন হতে পারে, সে খুব একটা আশা নিয়ে এখানে আসে নি।

"স্কুল তোমার পছন্দ নয়?" সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আমি শুধোলাম।

আদিত্য যেন ম্লান একটু হাসল।

"তোমার পছন্দ নয়? ধরা করার লোক পাচ্ছ না?" আদিত্যর চোখে চোখে তাকাবার চেষ্টা করলাম। "স্কুলের ব্যাপার হলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি; আমার এক বন্ধু কোন্ স্কুলের যেন সেক্রেটারি। তবে, ইস্কুলটিস্কুল কী আর থাকবে হে, তোমরা তো সব তুলেই দিচ্ছ—" বলে একটু হাসলাম, পাছে আদিত্য ক্ষুন্ন হয় সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আমি তোমাকে মিন্ করছি না। যা দেখছি আজকাল—তাই বলছি। কী যে ব্যাপারটা হচ্ছে—আমাদের বাপু মাথায় ঢোকে না। সব পুড়িয়ে দিলেই কী ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে! আমি স্বীকার করছি, মোর দ্যান্ নাইন্টি পার্সেন্ট স্কুল একেবারে রটন্, গোয়াল, কিছু হয় না। মাস্টাররা পান চিবোয়, চা খায়, পে-স্কেল করে, স্কুল থেকে বেরিয়ে হিন্দী সিনেমা দেখে, ইভন্ কিছু মাস্টারফাস্টার আজকাল দেশী মদের দোকানেও ঢোকে। খুবই খারাপ। আরে, আমার পাশের বাড়িতে জগদীশ মাস্টার থাকে; সে আর তার বউ দুজনেই মাস্টারি করে; তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, গত বছর জগা-মাস্টার একটা স্ক্যান্ডাল করেছিল, কাগজে বেরিয়েছিল, সেই থেকে শুনেছি এগজামিনারশিপ গিয়েছে।" সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলাম।

আদিত্য আবার কাশল। গলার স্বরটা ভাঙা। ঠান্ডা লেগেছে বোধ হয়।

"একটু চা খাও।"

"না না।"

"খাও। খুব ঠান্ডা। তুমি আমার ভাগ্নের বন্ধু—ভাগ্নেরই মতন। চা খাও একটু। আবার তো ঠান্ডায় যেতে হবে।"

চায়ের কথা বলতে আমি ভেতরে গেলাম। আদিত্য বসে থাকল।

ফিরে এসে দেখি আদিত্য সেই একইভাবে বসে আছে, সামান্য কাত হয়েছে এই মাত্র; তার হাত দুটো তখনও প্যান্টের পকেটের মধ্যে।

"তুমি কোথায় থাক আদিত্য?"

"তা একটু দূরে।"

"সত্যদের পাড়ায়?"

"না।"

"আমি ভেবেছিলাম সত্যদের ওদিকেই থাকো।"

"পাকা রাস্তা নেই। হেঁটে যেতে হয়।"

"হাঁটাই আজকাল ভাল; কলকাতার ট্রাম-বাসের যা অবস্থা। প্রত্যেকদিন পাঁচ দশটা করে লোক মরছে। এ—তো লোক, এ—তো ভিড়; আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের গলা বুজে গিয়েছে। কলকাতার জন্যে কিছু হচ্ছে না। কী করেই বা হবে বলো, আমরা কিছু হতেই দেব না: হবার চেষ্টা হলেই বানচাল করার মতলব করছি। ধর, এই স্টেট বাস—বিধানবাবু তো ভালই চেয়েছিলেন—কিন্তু অবস্থাটা দেখ, এখন স্টেট বাস আর মোষের গাড়ি সমান। হাউ ডার্টি, আগ্‌লি। ভেঙেচুরে, পুড়িয়ে শ্লোগান লিখে লিখে কী চেহারা করেছে গাড়িগুলোর। কোনো ভদ্র শহরে এরকম দেখা যায় না। আমরা যে কী হয়ে যাচ্ছি—"

"গিয়েছি—" আদিত্য যেন বলল।

"বলতে কি, আমাদের তো মাথা গোলমাল হয়ে যায়। কিছু বুঝতে পারি না। সামথিং হ্যাজ্ হ্যাপেন্ড্। বাট হোয়াট? তুমি ইয়ং ম্যান। আমার ছেলে, ভাগ্নে সত্য তুমি—তোমরা মোটামুটি সমবয়েসী। আমাদের পরের জেনারেশান। ওয়েল, টেল মী, এটা কী হচ্ছে?"

আদিত্য তার পা জড়াজড়ি করে বসে ছিল; এবার পা সরাল। তার মুখ দেখে মনে হল, সে আগের চেয়ে স্পষ্ট করে হাসল একটু।

"আমি দেখছি গ্র্যাজুয়েলি সব কিছু ডিগ্রেড করে যাচ্ছে। ডিসেন্সি নেই, অনেস্টি নেই, লেবার নেই, ধৈর্য নেই। কী যে আছে, ভাগবান জানেন। আমি তোমাকে একটু আগে স্কুলকলেজের কথা বলছিলাম। নিন্দে করছিলাম। বাট স্টিল এগুলো একটা সিস্টেম, মানে এই প্রসেস আমরা স্বীকার করে নিয়েছি অনেকদিন ধরে। হাজার দোষ আছে এর, কিন্তু সত্যি বলো, এর অলটারনেটিভ কী! শুধু পুড়িয়ে দিলেই চলবে। ক্ষেত কুপিয়ে দিলেই ফসল হয়? ডোণ্ট টেল মী টু বিলিভ ইট্! মানুষ পাগল হয়ে গেছে। নয়ত এ রকম হয়। সারাটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন মারামারি, খুনোখুনি, আগুন জ্বালানো, লুঠতরাজ, সকালে কাগজ ছুঁতেই ভয় হয়। রোজই দেখো মার্ডার, ডেথ, কিলিং।"

চা এসে গিয়েছিল। শিবু ট্রে থেকে দু কাপ চা নামিয়ে রাখল, একটা ডিশে কিছু স্ন্যাকস্।

"নাও চা খাও", আমি বললাম; বলে আমার কাপটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম।

আদিত্য সামান্য পরে তার বাঁ হাতটা বের করল।

"চার পাশ দেখে শুনে এখন তো রীতিমত বুক কাঁপে, বুঝলে—" চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, "যে কোনো দিন আমরা রাস্তায়, পার্কে, অফিসের সিঁড়িতে গড়াগড়ি যেতে পারি। কোনো সিকিউরিটি নেই লাইফের। নাইদার এজ্ নর্ প্রফেসন্ কোনো রকম কনসিডেরাসন দেখছি না। মেয়েটিয়েদেরও বা ছাড়ছে কোথায়!"

আদিত্য বাঁ হাতে চায়ের কাপ তুলে আস্তে করে চুমুক দিল। তার হাত বেশ কাঁপছিল। কেন কাঁপছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না। ঠান্ডায়? ওর কী কোনো অসুখ আছে? এই ঘরে এত ঠান্ডা নিশ্চয় নেই যে ওর হাত কাঁপাতে পারে। ছেলেটির যা বয়েস তাতে ওর হাত কাঁপার রোগ থাকারও কথা নয়। খুব সম্ভব আদিত্য খানিকটা নার্ভাস ধরনের ছেলে; তার হাবভাব আচার আচরণ থেকে সেই রকমই মনে হয়।

"ওকি, তুমি কিছু মুখে দিলে না?"

আদিত্য সামান্য মাথা নাড়ল, ও কিছু খাবে না। আমার দৃষ্টি লক্ষ করেই কী না কে জানে চায়ের কাপটা ও আর তুলছিল না। অন্যের দুর্বলতা এভাবে লক্ষ করা অনুচিত, আমারই কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

"তোমার দেশ কোথায়, আদিত্য?"

"দেশ!"

"পূর্ব বাংলায় না এদিকে?"

আদিত্য সাড়া দিল না।

"আমার আদি বাড়ি কুমিল্লা। অবশ্য, ওই বাড়িই। ছেলেবেলায় এক আধবার গিয়েছি; আমার আর মনেও নেই। এদিকেই মানুষ। বাবা নন্‌কোঅপারেশানে ছিল, মাও চরকা কাটত। তারপর একটা দেশী ব্যাঙ্ক নিয়ে পড়ল বাবা। উদয়-অস্ত খাটত। খাটতে খাটতেই মারা গেল। আমাদের একটা সময় বেশ খারাপ গেছে। মানুষের জীবনে ব্যাড ডেজ্ আসেই। তা যেমন করেই হোক সে সব তো আমরা পেরিয়ে এসেছি। বেটার টু ফরগেট দোজ্ স্যাড্ মোমেন্টস। এখন আর কী বলো, আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, দু পাঁচ বছর আর বড়জোর বাঁচতে পারি। তার আগেও যে মরছি না—কে বলতে পারে, যা দিনকাল। আরে, সেদিন দেখি কটা বাচ্চা নীচে টিনের পিস্তল নিয়ে খেলা করছে

করতে চেঁচাচ্ছে 'হেড়ুর মুণ্ডু চাই'; মানে হেড্ মাস্টারের মুণ্ডু। জাস্ট ইমাজিন..." বলতে বলতে আমি হেসে উঠলাম।

আদিত্য কোনো কথা বলছে না। আমার মনে হল, এবার উঠে পড়তে হয়। খানিকটা রাতও হয়েছে।

আদিত্যর দিকে তাকিয়ে সামান্য বসে থাকলাম। "আজ তা হলে—।"

আদিত্য পিঠ সোজা করল।

"তুমি তো দূরেই যাবে খানিকটা। বেশ শীত। আর-একদিন বরং এসো—" বলতে বলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

আদিত্যও উঠে দাঁড়াল।

যদিও আমি বুঝেছি, তবু আদিত্য মুখ ফুটে কিছু বলে নি বলেই যেন বললাম, "তুমি কেন এসেছিলে বললে না? তুমি একটু বেশি লাজুক হে। ঠিক আছে—পরে একদিন..." বলতে বলতে আমি পিঠ নুইয়ে সেন্টার টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই তুলে নিচ্ছিলাম। পিঠ সোজা করতেই দেখি আদিত্য আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তার ডান হাতটা আর পকেটের মধ্যে নেই।

একটি কি দুটি মুহূর্ত আমি যেন কিছুই বুঝতে পারলাম না, তার পরেই বুঝতে পারলাম, আদিত্য তার ডান হাতে একটা লম্বাটে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল ও যেন স্প্রিং টেপার পর ছুরির ফলাটা লাফ মেরে খাপ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, অথচ অবিশ্বাসের কিছু ছিল না।

অদ্ভুত একটা আতঙ্ক, বিহ্বলতা, অবিশ্বাস আমায় পাথর করে দিল। আদিত্যও ডান হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

"তুমি...তুমি..." আমার গলা ভয়ে কাঁপছিল, হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে কণ্ঠনালীর কাছে চলে এসেছে। "তুমি কী পাগল নাকি! তোমার মাথা খারাপ! ছুরিটুরি নিয়ে আমার বাড়িতে ঢুকেছো!"

আদিত্য আমার দিকে একটা পা বাড়িয়ে দিল। ওর হাত যেন আঘাত করার আগে হঠাৎ ওপরে উঠল।

"কী সাংঘাতিক! তুমি আমার ভাগ্নের বন্ধু বলে এ বাড়িতে ঢুকে আমায় ছোরা মারতে এসেছ।" বলতে বলতে আমি পাশে সরে যাবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না, কেননা ছোরাটার দিকে আমার দৃষ্টি, চোখ সরাবার উপায় নেই।

আদিত্যর হাত কাঁপছিল, বেশ কাঁপছিল। আমার কেন যেন মনে হল, সে ঠিক মতন ছোরা ধরতে পারছে না।

"আশ্চর্য! আমি বুঝতে পারছি না তুমি এটা কী করছ!...উন্মাদ নাকি! ইট ইজ এ ক্রাইম।...কী চাও তুমি? আমার কাছে কেন এসেছ?"

আদিত্য যেন তার কাঁপা হাতটাকে স্থির করার জন্যে দু দণ্ড সময় নিল, তারপর হাত তুলল।

কী আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে আদিত্যর চোখের দিকে আমার নজর পড়ল। ঘৃণায় দুটি চোখ জ্বলে যাচ্ছে। এমন ঘৃণা আমি আর কখনো দেখি নি। অকৃত্রিম, পৈশাচিক ঘৃণা। এই ঘৃণার যেন শেষ নেই। কত কাল ধরে জমে জমে যেন পাথরের মতন কঠিন হয়ে গিয়েছে। তার ঘাড় এবং কাঁধ কী শক্ত, বেয়াড়া ঘোড়ার ঔদ্ধত্যের মতন দেখাচ্ছিল। আদিত্যর ঠোঁট খুলে দাঁত বেরিয়ে এসেছে, ভীষণ নির্মম নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। তার চোখ থেকে আমি দৃষ্টি সরিয়ে ওর হাতের ছোরার দিকে তাকালাম। ভগবান জানেন, এই রকম এক বিপজ্জনক মুহূর্তেও আমার কেন যেন মনে হল, আদিত্যর চোখ ওর হাতের ছোরার চেয়েও অনেক বেশী ভয়ংকর, ধারালো। ওর ঘৃণায় কোনো দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই, যেন আজন্মকাল নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতন ওটা ওর রয়েছে এবং দিন দিন বেড়ে উঠেছে। অথচ হাতের ছোরাটা হয় কিনে না-হয় কুড়িয়ে এনেছে, তেমন একটা নিশ্চিতভাবে ধরতে পারছে না।

তৎক্ষণে আদিত্য আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রথম আঘাত হানল। আমি ডান হাত বাড়িয়ে বাঁচাতে গেলাম। ছোরার ফলা আমার হাতের আঙুলে লাগল। হয়ত আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। আদিত্য আবার মারল। এবারও ডান হাতের তালুতে লাগল। অসহায়ের মতন পিছু সরতে গিয়ে আমি সোফার ওপর বসে পড়লাম। আদিত্য পাগলের মতন তৃতীয় বার মারল। এবার বাঁ হাতে আটকাবার চেষ্টা করলাম। আমার হাত চিরে গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। শেষবারের মতন যখন সে মারছে তখন আমি মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম।

বোধ হয় আমি তখন আর্তনাদ করে বাড়ির লোকেদের ডাকছিলাম। গলা উঠেছিল কি না জানি না। আদিত্য কী একটা বলল, হয়ত গালাগাল দিল : কাওয়ার্ড, বাস্টার্ড, শালা—কী বলল কে জানে, আমার দিকে আর তাকাল না, পেছন ফিরে দ্রুত চলে গেল। তার পিঠ আমি দেখতে পেলাম।

আদিত্য চলে যাবার পর দু'-এক মুহূর্ত আমার কোনো চেতনা ছিল না। তারপর ওই অবস্থায় প্রায় ছুটে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। জানলার এক দিকের শার্সি খোলা ছিল।

আমি যেন দেখছিলাম আদিত্য কোথায় যায় :

ধোঁয়া, কুয়াশা, খানিক অন্ধকার, খানিকটা টিমটিমে আলোর মধ্যে আদিত্য রাস্তা দিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে মাথা নীচু করে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। রাস্তার আবর্জনা টপকে, একটা কুকুরকে ডিঙিয়ে যেতে যেতে মোড়ের মাথায় সে একটা প্রাইভেট বাসকে থামতে দেখল। বাসটায় ভিড় ছিল। ঠিক বাসটা ছেড়েছে, আদিত্য লাফ মেরে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল। তারপর ঝুলতে ঝুলতে আড়ালে চলে গেল।

ভগবান জানেন, আমার তখন কী হয়েছিল, আমি কেন বার বার তাকে ডাকতে চাইছিলাম : আদিত্য, আদিত্য, আদিত্য।

সারাদিন যা আমায় অস্থির, ভীত, ব্যাকুল করে রেখেছিল এখন তা খুঁজে পাওয়া গেল। ছেলেটিকে আমার মনে পড়েছে : আদিত্য। তার চেহারাও আমার কাছে আর অস্পষ্ট নয়। অবশ্য এখন আমার মনে হচ্ছে, সে সত্যর বন্ধু নাও হতে পারে—সুবিধের জন্যে একটা পরিচয় দিয়েছিল। এমন কি তার নামও হয়ত আদিত্য নয়, ওটা মিথ্যেও হতে পারে।

ওর নাম আদিত্য না হয় না হোক, ও সত্যর বন্ধু যদি নাই হল তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কিছু তাতে আসে যায় না। কিন্তু ও যে সত্য—এ আমি অনুভব করতে পারছি। আশাদের বিয়ে বাড়িতে গিয়ে সত্যর ওই ধরনের কোনো মুখ হয়ত দেখেছি, হয়ত নয়। তাতেও কি যায় আসে!

খুবই আশ্চর্য যে, আদিত্য আমায় আহত করে চলে যাবার পর আমি জানলায় গিয়ে

দাঁড়িয়েই তাকে দেখবার এবং ডাকবার চেষ্টা করছিলাম। কেন? আমি কি তাকে ডেকে, বা তার নাম ধরে চেঁচিয়ে পাড়া জাগাবার চেষ্টা করছিলাম? তাকে ধরে ফেলে পুলিসের হাতে দেবার চেষ্টা করছিলাম? আমার মনে হল না, আমি সে-চেষ্টা করেছি। আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না।

তা হলে? তা হলে কেন আমি ডাকছিলাম আদিতাকে?

কেন? কেন? আজ সারা দিন যেন এই কেনর জন্যে আমি মাথা খ্ঁড়েছি। সারা দিন আদিতাকে মনে মনে কত খ্ঁজেছি।

উঁকি দেবার একটা সরু তীক্ষ্ণ ছুঁচ যেন আমার মাথার মধ্যে, তারপর বুকের মধ্যে, শেষে অস্তিত্বের মধ্যে বার বার—বার বার ফুটতে লাগল: কেন? কেন? কেন?

অন্ধকারের কোথাও একটু আলোড়ন আসছিল না। কোথাও কিছু দপ্ করে ফুটে উঠছিল না। হায় ভগবান!

শেষে খুবই আচমকা, প্রায় যেন আদিতার ছুরি খাওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্যে যে-ভাবে আর্তনাদ করে উঠেছিল, অনেকটা সেইভাবে বললাম: হ্যাঁ, আমি তোমায় ডাকছিলাম। পুলিসে ধরিয়ে দেবার জন্যে নয়, পাড়ার লোক তোমায় তাড়া করে ধরুক—তার জন্যেও নয়। আমি তোমায় একেবারে অন্য কারণে ডাকছিলাম। আমি তোমায় বলতে চাইছিলাম,—আমি তোমার চোখ দেখে বুঝেছি আদিতা, তোমার ঘৃণায় খাদ নেই, একেবারে খাঁটি, বোধ হয় তার পরিমাপও নেই। তুমি আমায় কাওয়ার্ড বলেছ না? ইউ হ্যাভ কলড্ মী এ বাস্টার্ড, সান অফ এ বীচ। ইট ইজ অল রাইট; আই অ্যাম এভরিথিং। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর হেট্রেড। জানো আদিতা, আমি আমার হিসেবপত্র জানি; বাইরের খাতা নয়, ভেতরের খাতার কথা বলছি: আমি বাইরে যা দেখে যার তাতে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কষ্ট হবার কথা নয়। আমার নতুন বাড়ি হবে শীঘ্র রিজেন্ট পার্কে, মিনুর বিয়েতে হাজার পঁচিশ খরচ করব ইচ্ছে আছে, সোনাদানা বাদ দিয়ে হাজার দশ। ইন্দু থেপে থেপে সোনা কিনছে, চোরাই সোনাও। মিনু এর আগে একটা কেরানী ছোকরার সঙ্গে মেলামেশা করার পর বুঝেছিল প্রেমট্রেম নিয়ে থাকলে তার কপালে পঁচিশ হাজার নেই। এখন তাই মুখ ঘুরিয়ে বকুলদের দিকে আসা-যাওয়া করছে; রঞ্জন ছেলেটির কেরিয়ার আছে। আমার বড় ছেলে সুহাসকে আমি ভাল জায়গায় দিয়ে যাব। আর ছোটটা—তার কথা আপাতত ভাবছি না। আমার রোজগারপাতি যে খারাপ নয়—বুঝতেই পারছ, মোটামুটি তিরিশ হাজার, ইনকামট্যাক্স রিটার্নে অবশ্য অত থাকতেই পারে না, থাকা উচিত নয়। ধরো, পারচেজিং অফিসার নরেনবাবু সপ্তাহে একবার করে যে খামটা আমার হাতের পাশে রেখে যায় সেটার হিসেব নিশ্চয় আমি দেব না। আমি বাস্তবিক কতটুকু আর বাইরে কাগজে-কলমে দেখাতে পারি বলো? সেটা সম্ভব নয়। ধরো, মিসেস বাগচীর কথা। মুখার্জি যখন মিসেস বাগচীকে নিয়ে রসিকতা করে তখন আমার খারাপ লাগে, মানে আমার খানিকটা ঈর্ষা হয়। আসলে বাগচীর চেহারা-টেহারা নিয়ে যেটুকু সুখ সে আমিই আড়ালে চোখে চোখে অনুভব করতে জানি। আমাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্টান্ডিং রয়েছে। না না, খারাপ কিছু নয়। যাই হোক, এটা সত্যি যে ইন্দুর জন্যে আমার ভালবাসার অভাব নেই।

আমি তোমায় কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম আদিতা। হ্যাঁ—বলতে চাইছিলাম যে—আমি [illegible] কবর খ্ঁড়ে [illegible] নেই। ইউ হ্যাভ এভরি [illegible]। কিন্তু তোমায় আমি বলছি আদিতা, তুমি একেবারে আনাড়ি। তুমি [illegible] কোন জায়গায় [illegible]। [illegible] এলোপাথাড়ি [illegible]। ফলে, অনর্থক। এভাবে কী আমাদের মারা যায়?

কী জানি আমি জানি না। আমার মনে হয়—তুমি আমার হাত পা কেটে দিতে পারবে, [illegible] মাথা ফাটিয়ে [illegible] পারবে। হয়ত বুকের তলায় এক বিঘত ছুরি ঢুকিয়ে দিতেও পারবে। কিন্তু তুমি একটা জিনিস পারবে না।

সেটা যে কী, তুমি জানো না।

আমি ঠিক জানি না, কেন যেন এক বিশ্রী কান্না আজ আমার আটচল্লিশ বছর বয়সে এসে আমার সমস্ত বুক জুড়ে দিল। হ্যাঁ, আমি ছেলেমানুষের মতন কাঁদছিলাম। ইন্দু, মিনু, সুহাস—ওরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

আদিতার জন্যে না আমার জন্যে—কার জন্যে অন্ধকারে এই কান্না এল কে বলবে!

আলোর চেয়ে দ্রুতগতি ?

হ্যাঁ, এ প্রশ্ন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল উনবিংশ শতকের শেষার্ধে। কিন্তু উত্তরকালে, সেটা ১৯০৫, প্রকাশিত হয় আলবার্ট আইনস্টাইন-এর স্পেসিয়াল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা বিশেষ আপেক্ষিকবাদ-এর মূল গবেষণা পত্র। যুগান্তকারী এই তত্ত্বে বলা হল, 'velocities greater than that of light . . . . have no possibility of existence': সেই প্রথম পড়ল কুঠারাঘাত। পুরনো ওই ধারনার উপর আইনস্টাইন যেন যবনিকা টেনে দিলেন। তারও পর, বলা যেতে পারে অর্ধ শতাব্দীরও কিছু বেশি সময় পরে রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন বিজ্ঞানী ও. বিলানিউক, ভি দেশপাণ্ডে এবং ই. সি. জি সুদর্শন সমবেতভাবে ঘোষণা করলেন, আলোর চেয়েও দ্রুততর গতি সম্পন্ন কণার অস্তিত্ব হয়ত অসম্ভব নয়। কোন কোন পদার্থ-বিজ্ঞানী এ সম্পর্কে এখনও সন্দিহান। তবে ইদানিং কেউ কেউ আশাবাদীও হয়ে উঠছেন।...... পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজও চলছে।

আলোর চেয়েও দ্রুততর গতিসম্পন্ন কণিকা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা দীর্ঘকালের। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেই জে জে টমসন, ও. হেভিসাইড এবং এ. সোমারফিল্ডের মত বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরাও অভিনব এই বিষয়টি নিয়ে নানারকম মতের অবতারণা করেছিলেন। সেই সঙ্গে কিছু কিছু তত্ত্বও। কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটালেন আলবার্ট আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে 'বিশেষ আপেক্ষিকবাদ' তত্ত্বে বলা হল, কোন বস্তু, তা সাধারণ মৌলিক পদার্থই হোক, অথবা ফোটনের মত কোয়ান্টা বা অখণ্ড কণিকাই হোক—কোন মতেই তাদের গতিবেগ কখনই আলোর গতির বেশি হতে পারে না। আলো, উত্তাপ, প্রভৃতি বিকিরণ শক্তি, বিদ্যুৎশক্তি অথবা শব্দ। এদের সকলেরই সর্বোচ্চ গতিবেগের

সঙ্গীত শুধু শব্দ-বৈচিত্র্যেরই অনুরণন নয়. সঙ্গীত—যে সঙ্গীত চিরায়ত, মানুষের কল্পলোকে চিরদিন সে এক অনির্বাচনীয় স্বপ্নজাল সৃষ্টি করে। কেউ কেউ বলেন, তানসেনের সঙ্গীত নাকি পৃথিবীর বুকে বর্ষা নামাতে পারত, পৃথিবীর বুকে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করতে পারত। স্থূল বাস্তবতার দিক দিয়ে সে কথা কতটা সত্য, জানি না। তবে অতিবাস্তব অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গীত মনের জগতে নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব আবেশের সৃষ্টি করেছে। আধুনিক ব্যস্তজীবনের যান্ত্রিকতায় সে সুর গ্রহণ করার ক্ষমতা দিন দিন আমরা হারিয়ে ফেলছি—ফেলেছিও। সম্প্রতি এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বৃটিশ কারিগরী ও প্রযুক্তি উন্নয়ন সংস্থার বিজ্ঞানীরা। ও'রা টেপরেকর্ডে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের সুর তুলে নিচ্ছেন। সেই সুর মনোজগতে কী ধরনের ছবি এঁকে চলে সেটা কল্পনা করে নিয়ে তাদের রঙবেরঙী ছবি ফিল্ম করছেন। তারপর ঐ ফিল্ম এবং রেকর্ডের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে এমন ব্যবস্থা করেছেন, যে মুহূর্তে রেকর্ডটি বাজবে, সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রজেকটার ঐ সঙ্গীতের অর্থ-বহুল ছবি প্রক্ষেপ করবে শ্রোতার সামনে রাখা একটি পর্দায়। কখনও কখনও শব্দ থামিয়ে দিয়েও ইচ্ছে করলে বিভিন্ন রকমের আলোর ভাস্কর্য চোখের সামনে মেলে ধরা যাবে। উদ্দেশ্য, বাস্তসমস্ত শ্রোতার মনে সঙ্গীতের প্রভাব দ্রুত এবং প্রত্যক্ষভাবে পুনির্বন্ধ করা। ছবিতে দেখুন, জনৈক শ্রোতা টেপরেকর্ডে মোজার্ট-এর একটি ঐক্যবাদন শুনছেন। পাশের পর্দায় সেই বাদনের প্রতিটি মুহূর্তের অনুভূতি আলোর ভাস্কর্যে কেমন ফুটে উঠেছে

মাত্রা ঐ একই—অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

বিশেষ আপেক্ষিকবাদ-এর সমস্ত যুক্তিই অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এবং পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে তা অখণ্ডনীয় বলেই মনে হয়। ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী বলা হয়, কোন বস্তুর গতিবেগ যত বৃদ্ধি পায়, তার ভরও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। এবং সেই গতিবেগের পরিমাণ
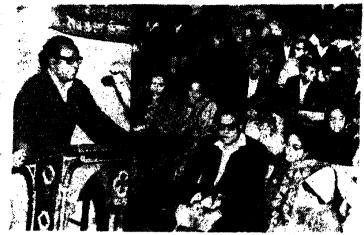
'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা' আয়োজিত বার্ষিক বিজ্ঞান বিষয়ক সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন ডাঃ কালীময় ভট্টাচার্য (সংবাদ ১০৯২ পৃষ্ঠায়)

যখন আলোর গতির সমান হয় তখন সেই ভরের পরিমাণও গিয়ে দাঁড়ায় অসীম অবস্থায়। এর অর্থ হল, বাড়াতে বাড়াতে কোন বস্তুর গতি যদি আলোর গতিবেগের সমান করতে হয়, তাহলে যতটা শক্তির প্রয়োজন হবে তারও পরিমাণ হবে অসীম। অতএব আপেক্ষিকবাদ-পদার্থবিদ্যায় দু' ধরনের কণিকার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হল। এক, যে ধরনের কণিকা সব সময় আলোর চেয়ে মন্থর গতিতে অগ্রসর হয় তারা। দুই, আর এক ধরনের কণিকা, যাদের 'রেস্ট মাস' অর্থাৎ যাদের স্থিতিশীল অবস্থায় ভর শূন্য, যেমন ফোটন প্রভৃতি। এদের গতিবেগ সব সময় আলোর গতির সমান। এই ফোটনকেই বলা হয় অখণ্ড-কণিকা বা কোয়ান্টা। সম্প্রতি 'ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স' (খণ্ড ২৪, পৃঃ ১২৯৫)-এ ব্রাজিলিয়ান ইনস্টিটিউটে টেকনোলজিকা দা এরোনোটিকার অধ্যাপক সেলোসো আই বেন-আব্রাহাম দু' ধরনের এই কণিকা সাংকেতিক নামকরণ করেছেন টারডনস এবং লাকজোনস।

তবু আলোক-গতির এই সীমা সম্পর্কে যাবতীয় মতবাদ যত বলিষ্ঠই হোক না কেন, কোন কোন পদার্থবিজ্ঞানী গত কয়েক দশক ধরেই আলোকত্তর গতিবেগের উপর নানা রকম তর্ক-বিতর্কের সূচনা করেছিলেন। ১৯৬২ সালে ও. বিলানিউক, ভি. দেশপাণ্ডে এবং ই সি জি সুদর্শন যুগ্মভাবে তত্ত্ব খাড়া করিয়ে দেখালেন, দুটি নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আরও এক ধরনের কণিকার সাক্ষাৎ পাওয়াটা হয়ত অসম্ভব নয়। এদের বলা হল, তৃতীয় শ্রেণীর কণিকা। এবং এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এ যাবত যে সমস্ত বিরুদ্ধ মত পোষণ করা হয়েছিল তাদের ও'রা খণ্ডনও করে ফেলালেন। ও'রা বললেন, বিশেষ আপেক্ষিকবাদ-এর সমীকরণের কথাই ধরুন। ওই সমীকরণ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, কোন কণিকার গতিবেগ যদি আলোর গতিবেগের বেশি হয়, তাহলে তার শক্তি এবং ভরবেগ অর্থাৎ তার ভর এবং গতিবেগের গুণফল কাল্পনিক রাশিতে গিয়ে দাঁড়াবে। আর এ ব্যাপারটা সহজেই স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে, যদি ধরে নেয়া যায় আলোকোত্তর গতিসম্পন্ন কণিকার রেস্ট মাস বা স্থানিক-ভর শূন্য। এবং যেহেতু অতিগতিসম্পন্ন এই কণিকা প্রত্যক্ষভাবে অদৃশ্য, ঐ ধরনের কল্পনা করাটা অযৌক্তিক হবে না।

প্রথম দিকে ও'দের এ ধরনের মতবাদ তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। অতঃপর ১৯৬৭ সালে এগিয়ে এলেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ জেরালড ফায়েনবার্গ। বিষয়টির উপর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি কাজ শুরু করলেন। তাঁর গবেষণার ফলে পুরনো তত্ত্বগুলি অনেকটা সংশোধিত হয়। তত্ত্বগতভাবে তিনিও প্রমাণ করলেন, না, অসম্ভব নয়। আলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে পারে—এমন ধরনের কণিকার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয় শ্রেণীর এই কণার নাম রাখলেন তিনি 'ত্যেচাইওন'। গ্রীক ভাষায় 'ত্যেচইস' অর্থ দ্রুতগামী—এ থেকেই এ ধরনের নামকরণ করা হল।

কিন্তু অদ্ভুত এই ভৌতিক কণিকার চরিত্রই বা কেমন হবে? ভৌতিক কথাটা এখানে ব্যবহার করাটা হয়ত অযৌক্তিক হবে না। যাকে দেখাই গেল না—তাকে এ ছাড়া আর কী বলা যায়? হ্যাঁ, চরিত্র এরও আছে বইকি? ফায়েনবার্গের উত্তর: ত্যেচাইওন-এর গতিবেগ যখন আলোর গতির সমান থাকবে, তখন তার শক্তির পরিমাণ হবে অফুরন্ত—অসীম। এই শক্তি যতই কমতে থাকবে, তার সঙ্গে তাল রেখে এর গতিবেগও যাবে বেড়ে। এবং অবশেষে যখন সমস্ত নিঃশেষিত হয়ে যাবে তখন গতিবেগের মান গিয়ে দাঁড়াবে অসীমে। যে কোন শক্তি-অবস্থায় ত্যেচাইওন ফোটন অথবা নিউট্রিনের মত ভরহীন কণিকা নির্গত করতে পারে। এবং ক্ষেত্র বিশেষে হয়ত বা স্বাভাবিক ভরবিশিষ্ট কণিকাও। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাধারণ বস্তুকণাও কিন্তু প্রচণ্ড পারমাণবিক আঘাতে নানারকম কণিকা নির্গত করে। বস্তুত, ফায়েনবার্গের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব, রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ত্রয়ী-বিজ্ঞানীর তত্ত্বকেই প্রবৃদ্ধ করে, তিনি তাঁকে আরও স্পষ্ট ভাষায় এবং সুদৃঢ় যুক্তির সোপানে তুলে দিয়ে ত্যেচাইগুনের অস্তিত্বকে স্বীকৃতিদানে সহায়তা করেছেন।

সমালোচনার সম্মুখে পড়লেন ফায়েনবার্গ। প্রতিপক্ষের যুক্তি, বেশ ধরেই নেয়া গেল, ত্যেচাইওন না হয় আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে। তাহলে আপেক্ষিকতার দিক দিয়ে বিচার করলে ঐ ধরনের কণিকার শক্তি তো ঋণাত্মকও হতে পারে? এমন কি সময় প্রবাহেরও দিক পালটিয়ে উলটো দিকে অগ্রসর হওয়াটা সম্ভব নয়? আরও একটু খোলসা করে বললে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে। ধরুন ক থেকে ধনাত্মক শক্তিসম্পন্ন ত্যেচাইওন নির্গত হল। একজন দর্শক কোন একস্থানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল খ তাকে শোষণ করে নিল। উত্তাপের ক্ষেত্রে যেমনটি হয় আর কি। কোন একটি উষ্ণ বস্তু তাপ বিকিরণ করল, অদূরে অপর কোন বস্তুর গায়ে সেই বিকিরণ পড়ে তাকে উত্তপ্ত করে তুলল। এখন, আপেক্ষিকবাদ অনুযায়ী প্রমাণ করা যায়, কোন দর্শক বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে এমন অভিজ্ঞতাও পেতে পারে, ক ত্যেচাইওন নির্গত করার আগেই খ যেন তাকে শোষণ করে নিচ্ছে। এবং সে ক্ষেত্রে অবশ্য তার শক্তি ঋণাত্মক হবে?

ও'দের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে ফায়েনবার্গ বললেন, গাণিতিক দিয়ে ধনাত্মক কণা শোষণ করা বা ঋণাত্মক কণা নির্গত করা—এদের মধ্যে বাস্তব কোন ব্যবধান নেই। আসলে শক্তির পরিমাণটা ধরলেই হল, সেটা ঋণাত্মক কি ধনাত্মক এ ক্ষেত্রে তা বিচার করার অর্থ নেই। ত্যেচাইওন-এর অভিমুখ পরিবর্তন করে এবং ঐ সঙ্গে নির্গতকরণ এবং শোষণের অভিমুখ পরস্পর পালটিয়ে নিলে ঋণাত্মক শক্তির ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া চলে। তবে ফলাফলস্বরূপে এমনও সম্ভব একই পরিবেশে বিভিন্ন দর্শকের কাছে চলমান ত্যেচাইওন কণার সংখ্যা ভিন্নতররূপে প্রতীয়মান হতে পারে?

এসব তত্ত্বের কথা। কাগজের উপর আঁক কষে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সত্যিই কি সে রকম কণিকার সন্ধান পাওয়া সম্ভব? কোন অবস্থা বা পরিবেশে অমন ভৌতিক কণারা

ঘুরে ফিরে বেড়ায়? তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতাটা? না। ও'রা কেউই থেমে নেই। গত দশক থেকেই তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয় ঘটিয়ে বেশ সতর্কতার সঙ্গে কেউ কেউ অনুসন্ধানেও হাত দিয়েছেন।

তবে ঐ সমস্ত অনুসন্ধান করতে গিয়ে কী কী ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব, সেটাও একবার দেখে নেয়া দরকার। বিলানিউক, দেশপাণ্ডে, সুদর্শন এবং ফায়েনবার্গ এ সম্পর্কে কিছু কিছু মতামতও প্রকাশ করেছেন। আর এ ব্যাপারে অনেক ব্যাপার কল্পনাও করে নিতে হয়েছে তাঁদের। যেমন, পরীক্ষার সময় কত সংখ্যক কণিকার উৎপত্তি ঘটতে পারে, কতটা শক্তি ব্যয় হতে পারে অথবা পদার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটার ফলে প্রতিক্রিয়াই বা কেমন দাঁড়াবে, ইত্যাদি। এমন কি, এখনও পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি, এই ধরনের কণিকারা কোন বিদ্যুৎ আধান থাকবে কিনা অথবা তারা বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। বিলানিউক এবং তাঁর সহকর্মীরা বলছেন, ধরে নেওয়া হোক তারা বিদ্যুৎ আধানযুক্ত কণিকা। তাহলে ওই কণিকাদের তৈরি সেরেনকভ-বিকিরণ পরীক্ষা করে ওদের অস্তিত্ব অবশ্য ধরতে পারব। স্মরণ করা যেতে পারে, বিদ্যুৎ আহিত কণিকা আলোর চেয়েও দ্রুত গতিবেগ নিয়ে কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যখন অগ্রসর হয়, তখন তারা এক ধরনের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ নির্গত করে —এরই নাম সেরেনকভ-এর বিকিরণ। এই বিকিরণ কতকটা ফোটনের অনুরূপ। এবং তেচাইওন যেহেতু আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে গমন করতে পারে, শূন্য মাধ্যমের মধ্যেও তার সেরেনকভ-বিকিরণ সৃষ্টি করা উচিত। কিন্তু মুশকিল হল, সেটা দেখা যাবে কী করে? কারণ নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই তারা তাদের প্রায় সমস্ত শক্তি পরিত্যাগ করবে?

১৯৬৮ সালে আলভাজার এবং মাইকেল ক্যাভেন্ডার নামে দুজন বিজ্ঞানী প্রিন্সটোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তেচাইওন অনুসন্ধানের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। অনেকেই জানেন, কোন বস্তুখণ্ডের উপর যখন গামা রশ্মি আঘাত করে, তখন সেই আহত স্থান থেকে জোড় মিলিয়ে নানা রকম বিদ্যুৎ আহিত কণিকা নির্গত হয়। অতএব ও'রা ধরে নিলেন ঐ একই পদ্ধতিতে তাঁরা তেচাইওনও সৃষ্টি করতে পারবেন। এর জন্যে সিসের তৈরি বৃত্তাকার একটি আংটার মধ্যে তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম-১৩৪-এর একটি উৎস স্থাপন করলেন। ধরে নেয়া হয়, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত গামা রশ্মি পরস্পর প্রতিক্রিয়া করে যদি সত্যি সত্যিই তেচাইওনের আবির্ভাব ঘটায়, বায়ুশূন্য কক্ষের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় নিশ্চয় সেই তেচাইওন সেরেনকভ বিকিরণ সৃষ্টি করে বসবে। সাধারণ কণিকারা কিন্তু বায়ুশূন্য মাধ্যমে সেরেনকভ বিকিরণ দেয় না। আগেই বলেছি, তেচাইওন শুধু আড়াআড়ি-ভাবে শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই হৃত প্রাপ্ত শক্তি পূরণ করার জন্যে তাদের সমান্তরাল করে রাখা দুটি ধাতব পাতের মধ্যবর্তী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যেতে দেওয়া হয়। সেরেনকভ রশ্মি ধরার জন্যে একটি ফটোমালটি প্লায়ারও রাখা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেরেনকভ রশ্মির কোন অস্তিত্বই ধরা পড়ল না।

প্রিন্সটনে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা কার্যের সমালোচনা করে কেউ কেউ বললেন, তেচাইওন কীভাবে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া করে অথবা শক্তি হারায়, সে রহস্য এখনও অজ্ঞাত। এমনও হতে পারে, হয়ত সত্যি সত্যিই ঐ পদ্ধতিতে সেরেনকভ বিকিরণ সৃষ্ট হয়, কিন্তু অজ্ঞাত কোন কারণে তাকে কেউ অপহরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিমাণ এত কমে যায় যে, ফটো মালটিপ্লায়ারের সাহায্যে তার অস্তিত্ব বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ফায়েনবার্গও ভিন্ন একটি পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালান (missingmass method)। কিন্তু সে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়েছে।

অতএব তেচাইওন-এর অস্তিত্বও এখনও পর্যন্ত তত্ত্বের মধ্যেই রয়ে গেল। এবং আপাতত কোন যুক্তি দেখিয়েও সে তত্ত্বকে উড়িয়ে দেওয়ার মত অবস্থা দাঁড়ায়নি। যতদিন তা না করা যায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ নিশ্চয় চলবে।

তবে ইতিমধ্যে জে এ রুডম্যান এবং এম এ রুডারম্যান নামে দুজন পদার্থবিজ্ঞানী একটি অভিনব চিন্তার খোরাক যুগিয়েছেন। ও'দের ধারণা, তেচাইওন-এর সঙ্গে হয়ত অতি-ভারী পদার্থের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে, ইউরেনিয়াম তাদের মধ্যে সবচাইতে ভারী। আধুনিক জ্যোতিপদার্থবিদরা মনে করেন, সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলে 'কোয়াজার'-এর মধ্যে এমন অনেক মৌলিক পদার্থের হয়ত সন্ধান পাওয়া যাবে যারা ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি ভারী। অনেকের ধারণা ঐ সমস্ত পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রে একাধিক নিউট্রন কল্পনাতীত আকর্ষণ বলের সাহায্যে পরস্পর জুড়ে থেকে সৃষ্টি করে এক একটি অতিকায় নিউট্রন। অবশ্য কোয়াজার বা নিউট্রন-নক্ষত্র সম্পর্কেও আমাদের অভিজ্ঞতা এখনও সীমিত।

মানুষ আন্তর্নক্ষত্র জগতে মহাকাশ গবেষণাগার স্থাপন করছে। চাঁদেও। কে জানে, যে রহস্য তারা উদ্ঘাটন করবে, তেচাইওনের অস্তিত্ব তারও মধ্যে ধরা পড়বে কী না?

পেঁয়াজ

রসিকতা নয়, আপনার শারীরিক প্রয়োজনে খবরটা জেনে রাখা ভাল। এর প্রবক্তা সায়েন্স অভ ইউক্রেইন-এর অধ্যাপক নিকোলাই খারচেঙ্কো। সম্প্রতি জনৈক সাংবাদিককে তিনি বলেন, গত দশ বছর নিয়মিত পরীক্ষা চালিয়ে খারকোভ মেডিকেল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মানবশরীরের বিভিন্ন রোগের নিরাময় এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে পেঁয়াজের যেন তুলনাই হয় না। পেঁয়াজের মধ্যে আপনি পাবেন ভিটামিন সি, বি-২, প্রোভিটামিন-'এ'. ফাইটনসাইড নামে এক ধরনের পদার্থ যা জীবাণু ধ্বংসের ব্যাপারে যথেষ্ট কার্যকর এবং আরও অনেক—অনেক প্রকারের মূল্যবান সামগ্রী। ও'রা পেঁয়াজ থেকে অ্যালিলসেপাস নামে এক ধরনের বস্তু তৈরি করেছেন। পরিপাক ক্রিয়া এবং হৃদরোগের এটি একটি চমৎকার ওষুধ। যাঁরা বিশেষ করে হৃৎপিণ্ডের দৌর্বল্য রোগে ভুগছেন, তাঁরা এতে যথেষ্ট উপকার পাবেন। পেঁয়াজ শুকিয়ে ও'রা আর এক ধরনের বস্তু তৈরি

করেছেন। ঐ বস্তুটি রক্তে কোলেস্টারিনের মাত্রাধিক্য কমিয়ে আনতে পারে, ধমনীর নমনিয়তা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে পারে। পেঁয়াজের রস পেকে ওঠা ঘা, সংক্রামক-ক্ষত, ডিপথেরিয়া এবং যক্ষার জীবাণু-নাশক। কণ্ঠনালীর স্ফীতিজনক রোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা-জ্বর এবং ফুসফুসের ক্ষতে পুঁজ জমলেও পেঁয়াজ খেয়ে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। ধমনীতে রক্ত-সংবহনক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে অথবা যাঁরা রক্তের উচ্চচাপ এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের অভ্যন্তরে জারক-রস নিঃসরণের ব্যাঘাত-জনিত রোগে ভুগছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও পেঁয়াজ প্রচণ্ড রকমের উপকারী বন্ধু এবং স্ত্রী অথবা পুরুষ শিশু, যুবা অথবা বয়স্কা—সকলের পক্ষেই বস্তুটি সমান উপকারী। আর সব-চাইতে সুবিধে হল, ঘরে তুলে রাখলেও পেঁয়াজের ভেষজগুণ দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে।

খারচেঙ্কোর বক্তব্য : এসব কথা ভেবে এখনই পেঁয়াজকে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় বিশিষ্ট ভোজ্য-বস্তুরূপে গণ্য করা উচিত।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার বর্ষপূর্তি

আজ থেকে এক বছর আগে কাগজটি যখন প্রথম প্রকাশলাভ করে, অনেকেই একটা 'খেয়াল' বলে লঘু করার চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে বড় হট্টগোলের শহর কলকাতার কাছে সেটা কোন খবরের মতই মনে হয় নি। কলকাতার গর্ব, সে যা করে সেটাই একমাত্র কার্য, সে যা ভাবে সেটাই একমাত্র ভাবনা। কিন্তু এবার বহরমপুরে গিয়ে একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কা খেতে হল। 'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা'—সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা। সজ্জায় সাধারণ দৈনিক পত্র, সহজ, সরল মেজাজ, কোন রকম কুণ্ঠা না করে বিজ্ঞানের লঘু-গুরু সমস্ত বিষয়কে ... মাতৃভাষায় ওঁরা, সহজ সুরে সকল প্রকার পাঠকের কাছেই পৌঁছে দিচ্ছেন। এর পাঠকপাঠিকা স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র, আনাগোনা সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে বিদগ্ধের টেবিলেও। ওঁরা লেজার নিয়ে আলোচনা করেছেন, মহাশূন্যের সীমাহীন ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন, সেই সঙ্গে স্থানীয় কৃষিকথা, সাধারণ রোগ—অনেক অনেক বিষয়। এই এক বছরের মধ্যেই ওঁদের পাঠকসংখ্যা বেড়েছে, স্থানীয় অঞ্চলে যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। আর তেউ কলকাতায় বসেও কয়েক মাস আগেই পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, পরিষ্কার বলতে পারি, এবার বহরমপুরে গিয়ে যা দেখলাম—কলকাতার কেউ কোন দিন দেখেছেন কিনা জানি না। বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার গোষ্ঠী গেছে নিরপেক্ষভাবে ডিসেম্বর ২৫ এবং ২৬ বহরমপুরে দু দিনের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এতে যে বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল তাতে বাংলা ভাষায় রচিত নতুন এবং পুরনো মিলিয়ে প্রায় দু'শ বই চোখে পড়ল। কিছু নতুন-পুরোন কাগজও। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮১৮ সালে প্রকাশিত '**দিক-দর্শন**', ১৮৩৫-এ প্রকাশিত **বিজ্ঞানবাদ, কৃষিকথা, তত্ত্ববোধিনী, চিকিৎসা সংগ্রহ** প্রভৃতি। এ ছাড়াও ছিল উনিশ শতকের কিছু বিজ্ঞান রচনা, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্র-সুন্দর, জগদানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ, সত্যেন বোস প্রভৃতির বিজ্ঞান গ্রন্থও। তবে সব চাইতে চমকপ্রদ আকর্ষণ ছিল '**রেশম বিজ্ঞান**'। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত। এই বইটি সম্ভবত বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম রেশম বিষয়ক গ্রন্থ। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত জেলা-শাসক।

প্রদর্শনী ছাড়াও স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ভবনে দু দিন ধরে বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়। জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করেন ডঃ জয়ন্ত বসু। বললেন, পদার্থবিদ্যার আধুনিক অগ্রগতির উপর। ডঃ কালীময় ভট্টাচার্য বললেন, যক্ষ্মা রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে মানব দেহে হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন সম্পর্কে বললেন ডাঃ ... শারীর বিজ্ঞানে দার্শনিক অভিঘাত—শ্রীঅসিত সিংহ, বিজ্ঞানে ভারতীয়দের অবদানের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসমীরকুমার ঘোষ। আলোচিত হল মহাকাশ বিজ্ঞান। দু দিনের অনুষ্ঠানেই সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল শ্রীশংকর চক্রবর্তীর বিজ্ঞান বিষয়ক ছবির প্রদর্শনী। ছাত্র-ছাত্রী, গৃহবধূ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শ্রোতা এবং দর্শকের অমন ভিড় বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানে—বর্তমান ... সত্যিই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। জেলা প্রশাসন সর্বতভাবে ওঁদের জন্য সাহায্য করেছেন।

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে **বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার** সম্পাদক শ্রীঅলোক সেন বললেন, পত্রিকাটি বহরমপুরে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছে এবং ইতিমধ্যে সাধারণের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে পত্রিকাটি আরও বেশি কিছু বিজ্ঞাপন পেলে হয়ত অনুরূপভাবে এর প্রচারসংখ্যাও বাড়তে পারে।

প্রশ্ন: আপনাদের পত্রিকায় লিখছেন কারা?

শ্রীসেন: মূলত স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী। তবে মাঝে মাঝে বাইরের রচনাও আমরা প্রকাশ করছি।

প্রঃ কী ভাবে আপনারা কাজ শুরু করেন?

শ্রীসেন: প্রথমে আমরা তিনজনই ছিলাম প্রধান উদ্যোক্তা—শ্রীঅশোকরঞ্জন সেন, শ্রীবিমল বসু এবং আমি। নিজেদের পুঁজি নিয়েই কাজ শুরু করি।

প্রঃ আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

শ্রীসেন: বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে জনপ্রিয় করা এবং স্থানীয় কৃষি, রেশম, সেচ, নগর পরিকল্পনা প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জনগণকে অবহিত করা। আসল কথা, আমরা চাই, আমাদের কাছেকোলের 'বিজ্ঞান' সম্পর্কে মানুষ কিছু জানুন।

সমরজিৎ কর

ওঁদের বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকার প্রদর্শনীতে ভীড় করেছিল বড়-ছোট অনেক দর্শক। ছবিতে ফেস্টুনের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে সম্পাদক অলোক সেন, ওঁর বাঁপাশে প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীঅশোক রঞ্জন দে, ডান পাশে শ্রীবিমল বসু

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা

শিবরাম চক্রবর্তী

॥ সাত ॥

রিনিকে নিয়ে আমি প্রায় দিনই বেরিয়ে পড়তাম বিকেলে বেড়াতে। ইস্কুলের থেকে ফিরে দু'পয়সার চিঁড়ে আর খেজুর গুড়ের পোঁটলা ভরে নিয়ে কুকুর ডিঘির পাশ দিয়ে পাহাড়পুরের পথ ধরে চলে যেতাম একেকদিন। দুজনে মিলে চিঁড়ে গুড় খেতে খেতে মজা করে। কোনোদিন বা আবার চষা ক্ষেতের আল পথ দিয়ে আলগোছে হাঁটতাম আমরা। আবার কোনোদিন নদী দিঘির পাড়ে বসে থাকতাম, বসে বসে গল্প করতাম দুজনে।

মাঠের মাঝখানে সেই ঝাঁউ গাছটার তলায় গিয়ে বসতাম একেকদিন। ঝাঁউ ফুল ছড়ানো কেমন গন্ধ জড়ানো জায়গাটা। সেখানে গেলে রিনির সব গল্প ফুরিয়ে যেত হঠাৎ। আমার কোলের উপর মাথা রেখে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে কী ভাবত সে কে জানে! তার মুখের ওপর চোখ নামিয়ে কী দেখতাম আমি কী জানি!

সারা আকাশ রঙে ভাসিয়ে দূরে দিগন্তে সূর্য অস্ত যেত, আর যে সূর্যমুখী মুখ ফুল আমি চিনিনে, দেখিনি কখনো, কি রকম দেখতে কে জানে, আমার মনে হত তাই যেন ফুটে রয়েছে আমার কোলের উপরে।

কোনোদিন বিকেলে আমি ডাকতে যেতাম রিনিকে ওদের বাড়িতে। কোনোদিন বা সে আসত আমাদের এধারে। দুজনে খেতে খেতে হাঁটতাম, আর আসবার সময় হাতধরাধরি করে ফিরতাম আমরা।

সেদিন রিনি ফেরার কালে আমার হাত না ধরে আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে এল—ঠিক ছেলেদের মতই। ছেলেবন্ধুরা যেমন পাশা-পাশি গলা জড়িয়ে যায় সেইরকমই প্রায়। সত্যি বলতে এই জর্জর অবস্থাটা কেমন কেমন ঠেকলেও তেমন আমার মন্দ লাগছিল না।

রিনির মধ্যে ছেলেমানুষি তো ছিলই, ছেলেদের মতও খানিকটা থেকে গেছল। এই কারণেই তাকে আমার ভালো লাগত আরো। ওর চেহারাটাও ছিল যেমন ছেলে ছেলে, ওর অনেক আচরণেও তেমনি ছেলেমি প্রকাশ পেত। ছেলেদের ছেলেমিপনা অসহ্য বোধ হলেও মেয়েদের মধ্যে ছেলেসুলভ স্বাভাবিক ব্যবহার নিয়ে, এই ছেলে ছেলে ভাবটা অনাকোরা এক আকর্ষণ যেন।

ছেলেদের সঙ্গে ছেলেরা যেমন সহজে মেশে রিনির সঙ্গে তেমনি অবলীলায় আমি মিশতে পারতাম। কোন কুণ্ঠা সংকোচ ছিল না কোথাও।

সেদিন সারাটা পথ ওর এই গলা জড়িয়ে আসাটা আকণ্ঠ আমায় যেন অমৃতে ভরে দিল...মধু ঝরতে ঝরতে এল সারাক্ষণ। এমন কি, বাড়ি ফিরেও অনেকক্ষণ খালি কাঁধটাই আমার কাছে কাঁচাকাঁদের মতন মিঠে ঠেকছিল খালি।

বেড়িয়ে ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা হয়ে যেত, এই মোড়ে সে তার বাড়িতে চলে যেত আর আমি উপরে উঠে আসতাম।

সেদিন সে নিজের এলাকায় না গিয়ে আমার সঙ্গে উপরে এল।

এসব কি লিখে রেখেছ?

'তোমার পড়বার ঘরটা দেখব।'

'পড়ার ঘর বলে কিছু নেই আমার। কয়েকটা বড় বড় হল্ তো। ঘর কোথায় আমাদের? ঘর আছে তোমাদের দিকটায়। ছোটখাট বেশ কয়েকখানা ঘর।'

'তাহলে তুমি পড়ো কোথায়?'

'শোবার ঘরেই পড়ি, আবার কোথায়? বাবার টেবিলে প্রকাণ্ড আয়নাটার সামনে গোল একটা কেদারা আছে, বেশ বড়ো কিন্তু বেজায় সেকেলে, সেইটেয় বসে টেবিলে বই-পত্তর রেখে পড়াশুনো করি। দেখবে চল।'
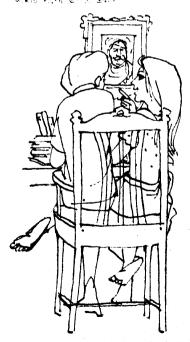
টেবিলের সামনে সেই একটিমাত্র বড় কেদারায় আমরা ঘেঁষাঘেঁষি বসলাম। সে আমার বইখাতা হাঁটকাতে লাগল।

'ওমা! একী! কী লিখে রেখেছ সব?'

'কী লিখেছি!' ওর সবিস্ময় শব্দে আমি চমকিত হই।

'খাতা ভর্তি কী লিখেছ এ? এ সব কী!'

'কী জানি!' উদাসীনের মত বলি: 'হাতে কোনো কাজ থাকে না তখন কী করি, যা মনে আসে তাই লিখি।'

'তাই বলে পাতার পর পাতা জুড়ে খালি রিনি রিনি রিনি রিনি! এ কী! আমার নাম কেন?' সে অবাক হয়।

'কে জানে কেন!'

'বারে! আর কী কোনো নাম নেই পৃথিবীতে? ঠাকুর দেবতার নাম লিখতে হয়। বাবা রোজ সকালে একপাতা করে দুর্গা নাম লেখেন। মা দুর্গার নাম। শ্রীশ্রী দুর্গা সহায় শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়। তার মানে বোঝা যায়। তোমার এ কী?'

আমি তার কী জবাব দেব? চুপ করে থাকি।

'এ রকম লিখো না আর। কারো চোখে পড়লে কী ভাববে বল তো?'

'কী ভাববে আবার? ভাববার কী আছে!'

'ক্ষ্যাপা ভাববে তোমাকে।'

এক মাঘে যেমন শীত যায় না তেমনি এক ক্ষেপেও মানুষ পাগল হয় না—কিন্তু তার কথার ঠিক জবাবটি আমি জানতুম কি তখন! খানিক চুপ থেকে বলি—'ভাবুক গে। আমার বয়ে গেল।'

সে আর কিছু বলে না।

'কেন, তুই কি রাগ করলি আমার ওপর?'

আমি শুধাই : 'কালী দুর্গা না লিখে তোর নাম লিখে রেখেছি বলে?'

সে কোনো জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

একটা অদ্ভুত নীরবতা যেন দেখা দেয় অকস্মাৎ।

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে আমি স্তব্ধতাটা ভাঙি—'দেখি তো তোমার ইংরেজি হাতের লেখা কেমন? লেখো তো।'

আমার খাতায় আমারই কপিং পেনসিলটা দিয়ে সে লেখে— ইউ আর এ ভেরী গুড্ বয়।

'বাংলা লেখা দেখি তো।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দেয়।

লিখে সে তার বড় বড় চোখ মেলে তাকায় আমার দিকে। আমিও তাকিয়ে থাকি।

চুপ করে তাকিয়ে থাকি পরস্পর অনেকক্ষণ।

আমার কপিং পেন্সিলটা তার মুঠোর মধ্যে তখনো।

'আমার পেনসিলটা তোকে প্রেজেন্ট দিলাম। ফর এভার।'

সে কিছু না বলে পেনসিলটা মুঠোয় করে চলে গেল তারপরে।

একদিন বিকেলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার দেখা না পেয়ে তার বাড়িতে তাকে ডাকতে গেছি। দেখি তার মা তখন প্রকাণ্ড একখানা তোয়ালেয় দেহ জড়িয়ে কুয়ো তলায় বিকেলের গা ধোয়ায় লেগেছেন।

'রিনি নেই মাসিমা?'

'কোথায় যেন বেড়াতে গেল তার দাদার সঙ্গে। পান্তু, তানু সবাই গেছে। তোমাদের ইস্কুলে কী ফাংশন হচ্ছে না আজ? ম্যাজিক না কী হচ্ছে যে বলল। তুমি যাওনি যে? যাওনি কেন?'

রিনিকে নিয়ে একসঙ্গে মাঠঘাট চষে বেড়ানোর যে ম্যাজিক আমি রোজ দেখি তার কাছে কোনো ভেল্কিই কিছু নয়! কিন্তু সে কথা কি বলা যায়।

'এমনি যাইনি। ওকে নিয়ে যাব ভাবছিলাম। পান্তুর সঙ্গে চলে গেল?' আমার গলায় দুঃখের সুর বোজ উঠল বুঝি।

'ও বোধ হয় ভেবেছে ওখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে।......'

'আমি তাহলে যাই মাসিমা।'

'যাবে কেন? বোসো না। উনিও বাড়ি নেই, কোথায় রুগী দেখতে বেরিয়েছেন গাঁয়ে। বোসো ঐখেনে। নাইতে নাইতে গল্প করা যাবে তোমার সঙ্গে।'

শিশির থেকে নিজের মাথায় তেলের মতন কী একটা জিনিস তিনি ঢাললেন ভিজে চুলের ওপর—'এখানে বসে বসেই একটা ম্যাজিক দ্যাখো। কেমন? এই দ্যাখো না। এই তেলটা মাথায় দিলাম তো। দেখছো তো তেল? দেখতে না দেখতে এক্ষুনি সাবান বানিয়ে দিচ্ছি এটাকে—মন্ত্রের চোটে—চেয়ে দ্যাখো তুমি!'

ওমা! সত্যিই ত! মাথায় একটুখানি ঘষতে না ঘষতেই সেটা সাবানের ফেনায় ফেনায় বদলে গেল—অবাক কাণ্ড! বিস্ময়ে থই পাই না।

'একে বলে শাম্পু। শুনেছ এর নাম?'

'না তো!'

মাথায় সাবান দিলে—তার ভেতরে ক্ষার আছে তো? তার জন্যে চুল উঠে যায়। শাম্পু দিতে হয়। তুমি মাখবে?'

'না।' ঘাড় নাড়ি আমি।—'কি হবে মেখে?'

'মাথা হালকা হবে। চুল পরিষ্কার

থাকবে। খুস্কি টুস্কি হবে না মাথায়।'

'আমার নেই ওসব।'

'হলে নিয়ো। কেমন?'

'আচ্ছা।' ঘাড় নাড়লাম আবার।

মাথায় শাম্পুর পর তিনি মুখে সাবান মাখলেন, তারপরে বললেন আমায়—'পিঠের দিকটায় মাখিয়ে দাও তো আমার।'

সাবানটা নিয়ে আমি তাঁর পিঠে মাখাতে লাগলাম।

'ভালো করে মাখাও।'

আমি জোরে জোরে ঘষতে লাগলাম।

'এবার এদিকটায়।'

আমি ইতস্তত করছি দেখে তিনি বুকের দিকে তোয়ালেটা সরিয়ে দিলেন—'এবার।'

তবু আমি হাত বাড়াই না দেখে তিনি একটু হেসে বললেন—'তোমার মনে পাপ ঢুকেছে দেখছি।'

পাপের কথায় রাগ হয়ে গেল আমার। আমি চোখ কান বুজে জোরে জোরে সাবান ঘষতে লাগলাম।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন তারপর। 'পায়ে মাখাও এবার।'

মাখাতে লাগলাম। কী সুন্দর সুগঠিত পা! অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার মতই। বড়রা বলতেন দেবীদের অন্তরে পা থেকে বন্দনা শুরু করতে হয়। সরস্বতীর বেলায় কে যেন তা করেনি তাই তাঁর কোপে সে নাকি গাধা বনে গেছল। আমি তার মর্মটা তখন বুঝতে পারি।

'এ কি! থামছ কেন? ওপর পর্যন্ত বোলাও। থেমে যাচ্ছ যে?'

আমি তখন ওঁর কোমর অবধি সাবান মাখাতে লাগি। হাঁটুর ওপরে আরো কী সুষমার রহস্য রয়েছে, দেখার কৌতূহল যে না জেগেছিল তা নয়। তবুও কেমন একটা বাধ বাধ ঠেকছিল বইকি।

'আরো ওপরে। আরো।'

আরো উপরে মাখাতে গিয়ে তাঁর পরনের তোয়ালে খসে পড়ে। তা তিনি সামলাতে যান না।

আমি ঘাড় হেঁট করে থাকি।

'থামলে কেন? মাখাবে তো।'

ঘাড় গুঁজে ঘষতে থাকি সাবান।

'সব জায়গায় লাগছে না যে। বাদ দিয়ে যাচ্ছ তুমি।'

তারপর আমি আর কোনো বাদবিসম্বাদ রাখি না। ঘাড় হেঁট করে চালিয়ে যাই।

'মাথা নীচু করে কেন? কোথায় মাখাচ্ছ দেখছ না? ওপরে তাকাও।'

নিজেই তিনি দু হাত দিয়ে মাথাটা আমার তুলে ধরেন। প্রাণপণে আমি সাবান মাখাই। সামনে পিছনে সব জায়গাতেই।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন তারপর।—'পা থেকে গলা অব্দি বেশ করে রগড়ে দাও তো দেখি। ময়লা কেটে যাক।'

তোমার মনে পাপ ঢুকেছে

রগড়াই বেশ করে। তলার থেকে, গলা অব্দি। দেবীর বন্দনায় কোনো অংশই বাদ যায় না।

ক্রমশই ভালো লাগতে থাকে।

'এবার কুয়োর থেকে বালতি বালতি জল তুলে ঢালতে পারবে? কুয়োর ভেতর পড়ে যাবে না তো তুলতে গিয়ে?'

'পড়ব কেন? এসব কাজ আমি খুব পারি।' হাতে হাতে প্রমাণ দিয়ে দি।

কয়েক বালতি ঢালার পর তিনি শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে বলেন—

'এসো, এবার সাবান মাখিয়ে তোমার গা ধুইয়ে দিই বেশ করে। কেমন? জামা কাপড় খুলে রাখো ঐখানটায়।'

'না।'

'না কেন? গা ধোও না বিকেলে?'

'না।'

বিকেলেই তো নাইবার আরাম গো! নাও, জামা টামা খোলো।...নাকি, লজ্জা করছে খালি গা হতে?'

'না।'

'আমি এত বড় মেয়ে খালি গা হয়ে নাইতে পারলাম আর তুমি এইটুকুন ছেলে! তোমার লজ্জা। এসো, লজ্জা কিসের? ভালো লাগবে তোমার।'

'না।'

তখন তিনি গাটা মুছে শুকনো কাপড় পরতে লেগেছেন।

'আমি এবার যাই মাসিমা।...দেখিগে, কী হচ্ছে ইস্কুলে।'

'আচ্ছা এসো।' তারপর কী ভেবে বললেন ফের—'কাল বিকেলে এসো আবার। কেমন?'

তারপর কদিনের বাড়ি যাইনি আমি। কোনো বিকেলেই যাইনি আর। ওর মত নাইবার সময় কখনই না।

বাধ বাধ ঠেকত বলে যে, তা না। তাঁর দেহসুষমায় অভিভূত হলেও আমি তেমন কোনো আকর্ষণ বোধ করতাম না। কেমন যেন লাগত আমার।

সেই বয়েসেই নগ্ন নারীদেহের মাধুরি দেখেছিলাম অনেক। আমাদের বাড়ি বিলিতি মাস্টারদের আঁকা রঙীন ছবির অ্যালবাম ছিল বাবার—আমি দেখতাম। লুকিয়ে নয়, খোলাখুলিই। কোনো বাধা ছিল না। মা বাবা কিছু বলতেন না সেজন্যে। ভালোই লাগত দেখতে।

আমাদের বাড়ি ভারতী, সাহিত্য, প্রবাসী, ভারতবর্ষ আর মাসিক বসুমতী আসত। তার কোন কোনটায় বাঙালী মেয়ের নগ্ন

ইংরেজি রচনার স্টাইল এবং য়েট্সের এবং স্টার্জ ম্যুরের তৎকালীন স্টাইলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করেই সরাসরি রায় দিতে পারেন যে য়েট্সের দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রকম রায় মূল্যহীন নয়। তার কারণ ভেজাল জিনিসটা আর যেখানেই চলুক স্টাইলে চলে না। সরল গদ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিতে স্টাইলের যে 'spontaneity', 'simplicity' এবং 'abundance'-এর ভূয়সী প্রশংসা য়েট্স গীতাঞ্জলির ভূমিকায় এবং অন্যত্র নানাস্থানে করেছেন তার সঙ্গে বেমালুম ভেজাল মিশিয়ে দিতে পারেন এমন স্টাইলের অধিকারী সে সময় ইংরেজি লেখকদের মধ্যে একজনও ছিলেন না। য়েট্স নিজেও যে গীতাঞ্জলির ঐ স্টাইলের দ্বারা যথেষ্ট অভিভূত এবং প্রভাবিত হয়েছিলেন তার অনেক নজিরের মধ্যে রোটেনস্টাইনকে লেখা চিঠিতে এই উক্তিটি একটি : 'I find Tagore and you are a great inspiration in my own art' (**Men and Memories,** ২য় খণ্ড উদ্ধৃত)। গীতাঞ্জলির ঐ স্টাইলের প্রভাব যে য়েট্সের উপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল তার অনেক নিদর্শন আছে। একটির উল্লেখ করি। য়েট্সের 'A Coat' নামক কবিতাটির উৎস যে গীতাঞ্জলির ৭নং কবিতাটির ('My song has put off her adornments' ইত্যাদি), অর্থাৎ গীতাঞ্জলির ঐ কবিতাটির মূল বক্তব্যটিকেই যে য়েট্স তাঁর নিজের কবিতায় নিজস্ব idiom-এ নতুন করে লিখেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই (এ বিষয়ে ১৯৬৫ সালের অক্টোবর সংখ্যা **The Modern Language Review**—পত্রিকায় আর জনসন্-লিখিত বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। য়েট্সের সমগ্র কবিতাটি, বিশেষ করে শেষ দুটি melodramatic লাইন 'For there's more enterprise/In walking naked' ('enterprise' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়), গীতাঞ্জলির ৭নং কবিতাটির সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে বাকি থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথের স্টাইলের 'simplicity', 'spontaneity' ইত্যাদি য়েট্সকে যতই মুগ্ধ অথবা প্রভাবিত করুক, সেই মিতবাক, সরল, নিরাভরণ লাবণ্য ছিল তাঁর নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। য়েট্সের কবিতায় আছে স্বচ্ছতা এবং সরলতার বদলে স্পষ্টতা এবং ঋজুতা কিন্তু সেই সঙ্গে আছে শান্ত সুরের বদলে একটি চিৎকার। গীতাঞ্জলির স্টাইলে যে সরলতা, সংযম এবং প্রশান্তির পরিচয় আছে য়েট্স তা কোনোদিনই আয়ত্ত করতে পারেননি। তার কারণ স্টাইল জিনিসটা তো শুধুমাত্র শব্দের বা ছন্দের বিন্যাস-নিপুণতা নয়, ওটা ভিতরের জিনিস, অন্তর্লোকের গভীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার মধ্যে নানা জটিল মূল্য-উপমূল্যের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের সমগ্র জীবনটিই বিধৃত। সেইজন্যই অপরের স্টাইলের অনুকরণ অথবা তার মধ্যে ভিন্ন স্টাইলের প্রক্ষেপ বিড়ম্বনা মাত্র এবং তার সংশোধন-প্রচেষ্টা মারাত্মক। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কবিতায় এমনি একটা বিশিষ্ট স্টাইলের প্রকাশ আছে যার সঙ্গে য়েট্সের অথবা অপর যে কোনো ব্যক্তির স্টাইলের মিশ্রণ ঘটলে কবিতাগুলির সর্বনাশই হতো। এখানে-ওখানে দুএকটি শব্দে যে কানে খটকা লাগে তাতেই অনুমান করা হয় যে য়েট্স ও স্টার্জ ম্যুরের হস্তক্ষেপ যদি সত্যিই ব্যাপকতর হতো তাহলে য়েট্স তাঁর নিজের গোড়ার দিককার কয়েকটি কবিতা 'সংশোধন' করতে গিয়ে যেমন নষ্ট করেছিলেন, 'গীতাঞ্জলি', 'গার্ডেনার' এবং 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর পরিণতিও তাই হতো। সৌভাগ্যক্রমে তা হতে পারেনি, তার কারণ রবীন্দ্ররচনায় য়েট্স ও স্টার্জ ম্যুরের হস্তক্ষেপ ছিল নিতান্তই নগণ্য এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সকলেই এই হস্তক্ষেপকে স্বীকৃতির অযোগ্য বলেই সাব্যস্ত করেছিলেন।

ক্রমশ

উনিশ

ললিতের কাছে সুমতি দেবী সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনের আধুনিক উপাখ্যান শুনেছিলেন। শুনে সুখীই হয়েছিলেন। এসব বিষয়ে তিনি আশ্চর্যভাবে সংস্কারমুক্ত বাঙালী মহিলা। বোধ হয় তাঁর পিতৃকুলের গুণে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছিলেন সেকালের পক্ষে উদার ভাবে।

সাত ভাই চম্পার মধ্যে রত্নই ছিল পারুল বোনের সঙ্গে সব চেয়ে অগ্রসর। গৌরীর সঙ্গে রত্নর চিঠি লেখালেখি সেই জন্যে সুমতি দেবীর চোখে বিসদৃশ ঠেকেনি। তিনি নিজেও তো এককালে সাহিত্যিকদের চিঠিপত্র পেয়েছেন ও তাঁদের লিখেছেন। কেউ কেউ তাঁর বাড়ী পদার্পণও করেছেন। দু'একবার অতিথি হয়েছেন। তাঁর স্বামী এতে অন্যায় কিছু দেখেননি। বরং আফসোস করেছেন যে আজকাল আর কেউ আসেন না। কেন, সুবর্ণেই বা আসবেন! সুমতি দেবী তো আর লেখেন না।

তাই রত্নকে পেয়ে তিনি পুলকিত হন। আদর আপ্যায়নের চূড়ান্ত করেন। তাঁর ধারণা ছিল গৌরীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ললিতের সঙ্গে সম্পর্কের মতো অনবদ্য। গৌরী যে একটু আধটু লিখছে ও তার লেখা যে ছাপার অক্ষরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এর পেছনে রত্নর হাত আছে বলে তিনি ওর উপর আরো বেশী প্রসন্ন।

তা বলে তো তিনি চোখ বুজে থাকতে পারেন না। সারাদিন একজোড়া তরুণ-তরুণী নিভৃত কক্ষে বসে বইপত্র পড়ে এইটেই কি সব কথা না শেষ কথা? ওদের চাউনি, ওদের ফিস ফিস করে আলাপ, ওদের একজনের মুখের কাছে আরেকজনের কান পাতা—ম্যাজিস্ট্রেট কন্যা এসব ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে পারেন কি? উকিলপত্নীও কি পারেন? তাই নানা ছলে পদক্ষেপ করেন।

একবার তাঁর মনে হল তিনি স্বচক্ষে দেখতে পেলেন যে ওরা মাসিকপত্র তুলে ধরে তার আড়ালে হাসাহাসি করছে। কিছু একটা পড়ে হাসি পাচ্ছে বলেই কি হাসাহাসি? না অন্য কোনো কারণে? তিনি অন্তরালে থেকে তাঁরতর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে আবিষ্কার করলেন যে একজন আরেকজনের গালে ঠোনা মারতে মারতে—ঐ যাঃ—দিল ঠোঁট ছুঁইয়ে! অপরজনও তার শোধ না দিয়ে ছাড়বে না।

হরি! হরি! এ কী দৃশ্য! এও চোখে দেখতে হলো! সুমতি দেবী তখনকার মতো চেপে যান। শুধু জানান দিয়ে যান যে তিনি ঘোরাফেরা করছেন। রাতের বেলা গৌরীর পাশে শুয়ে সমস্ত বার করে নেন তার কাছ থেকে। আদি অন্ত। অনুভূতিভরে।

ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, "বাছা রে, তোর বিয়ে সুখের হয়নি সে কি আমি জানিনে! তুই যাতে শান্তি পাস তাতে জীবন উৎসর্গ কর। সাহিত্য রয়েছে। রাজনীতি রয়েছে। শিক্ষা রয়েছে। ইচ্ছে করলে প্রাইভেট ম্যাট্রিক, প্রাইভেট আই এ, প্রাইভেট বি এ দেওয়া যায়। একদিন তুই এম এ দিতেও পারিস। বাধা দিচ্ছে কে? দেশ কি তোর সাহিত্যচর্চায় বাধা দিচ্ছে, না রাজনীতিচর্চায়? শিক্ষায় যদি বাধা দেয় আমরা তো আছি। আমরা ওকে বলে কয়ে ওর মা বাপকে বলে কয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করব। তোর একটি গভর্নেস চাই। দরকার হলে আমরাই ওর মাইনের টাকা যোগাব।"

গৌরী শুনে যায়, কথাটি বলে না। মা বলতে থাকেন, "কিন্তু ও পথে না গিয়ে এ কোন্ পথে তুই যাচ্ছিস? মেয়েমানুষের পক্ষে এর মতো বিপথ আর কী আছে? স্বামীর ঘর ছেড়ে গেলে স্বামী তো পরমহংস হবে না। ও আবার বিয়ে থা করে সংসারী হবে। ফিরে যেতে চাইলে ফিরে যাবার দুয়ার বন্ধ। মাঝখান থেকে বাচ্চাটি হাত-ছাড়া হবে। হ্যাঁ, দেশের আইন তাই বলে। শুধোস গে তোর বাপকে। বাপ অত বড়ো উকিল, ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করলে খাঁটি পরামর্শই পাবি। তুই যদি মনে করে থাকিস যে, তুই যে মুলুকে যাবি তোর বাচ্চাও যাবে তোর সঙ্গে তবে ওটা তোর ভুল ধারণা। যাবে বরং ওর ঘরণীকে

ছাড়বে, তবু ওর বংশধরকে ছাড়বে না। ওর মহত্ত্বের উপর অত বেশী ভরসা রাখিসনে।'

গৌরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মা বলে যান, "বাছা রে, তোর বেদনা আমি বুঝি। এমন হবে জানলে কি তোর ও বাড়িতে বিয়ে দিতে যাই? কিন্তু যে বাড়িতেই দিই না কেন কোনো মতে নিশ্চিত হবার জো নেই যে বিয়ে সুখের হবেই। এই যে তুই রঞ্জুকে মনে মনে বরণ করেছিস এ বিয়ে যদি সম্ভব হয়—হবে না বলেই আমার বিশ্বাস—তা হলেও সুখের হবে কেমন করে জানলি? এখন মনে হচ্ছে সুখের হবে, কিন্তু দু'বছর পরে হয়তো সব উত্তাপ জুড়িয়ে হিম হয়ে যাবে। বন্ধুতা অনেকদিন স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু প্রেম কখনো বেশী দিন থাকে না। ওটা কবিদের কল্পনা। কবিরাও কি সকলে একমত? প্রেমে পড়েছিস তার জন্যে তোকে দুষব না। যার প্রেমে পড়েছিস সেও কিছু মন্দ লোক নয়। তারও দোষ দেব না। মানুষের হৃদয়ের উপর কি মানুষের জোর জুলুম খাটে? কিন্তু ওইখানেই দাঁড়ি টানতে হয়। তোরা যদি ভালোবেসেই ক্ষান্ত হতিস আমি হস্তক্ষেপ করতুম না। কিন্তু পরপুরুষের বা পরস্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়া কি সহ্য হয়? ওর চেয়ে আগুনে হাত দেওয়া কম বিপজ্জনক। ভাগ্যিস আর কেউ দেখতে পায়নি। তোর বাপের কানে উঠলে রক্ষা থাকত না। তোদের দুজনকেই উনি ঘোড়ার কোড়া দিয়ে চাবকাতেন। ছি ছি! তুই কি পরিবারের মুখ হাসাবি? যদি আর কারো চোখে পড়ত! শেষকালে আমাকেই বিষ খেয়ে মরতে হতো! আর ওই কি তোর উপযুক্ত সাথী?"

গৌরী থরথর করে কাঁপে। ওর মা ওকে কোলে জড়িয়ে ধরে বলেন, "না, না, আগুন নিয়ে খেলা চলবে না। চলতে দেওয়া যায় না। আমি আর সব সইতে পারি। ওইটি পারব না। তোরা যখন এতদূর গেছিস তখন আরো কতদূর যাবি কে জানে! না, না, সে ঝুঁকি আমি নেব না। রঞ্জুকে কালকেই এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। আমরা অপমান করে তাড়াব না। মানে মানেই সরে যেতে বলব। ইচ্ছে করলে তুই ওকে আভাস দিতে পারিস। প্রস্থানের প্রস্তাবটা ওর দিক থেকেই আসতে পারে। সত্যি ওর এখানে এমন কী কাজ আছে যে ও কলকাতার পড়াশুনোয় অমনোযোগী হবে? পরের চুরি ধরতে গিয়ে তোরা নিজেরাই ধরা পড়ে গেছিস। এর পরে তোরা কী আশা করিস? ক্ষমা করতে রাজী আছি, কিন্তু প্রশ্রয় দিতে নারাজ। রঞ্জুকে আমার আর একটি ছেলে বলেই দুধকলা খাইয়েছি, জানতুম না যে কালসাপ পুষেছি। ভুল সবাই একবার করে, কিন্তু দ্বিতীয়বার কেউ জেনেশুনে করে না। যা হবার তা হয়ে গেছে, গৌরী। তোকে আমি বকব না। রঞ্জুকেও না। তোর বাপকেও সব কথা বলব না। যেমন রাগী মানুষ। তা বলে একেবারে গোপন করতেও পারব না। পরমেশ্বর কাছে গৃহিণীর কিছু গোপন করা উচিত নয়।"

গৌরী এতক্ষণ মুখ বুজে সহ্য করছিল। এবার ওর আত্মসম্মানে বাধে। ও ফণা তোলে। বলে, "কী দেখেছ তুমি যে বাবাকে বলবে? যা দেখেছ সেটা তোমার চোখের মায়া। একটা অলীক ধারণার উপর রং চড়িয়ে তুমি যা করেছ তা তোমারই মনের রচনা। রঞ্জু কালকেই যাচ্ছে। আমিই ওর হয়ে তোমাকে নোটিস দিচ্ছি। আমিও যে থাকছি তা নয়। আমিও কলকাতা চললুম। গয়না বেচে চালাব। কোনোমতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা। তারপরে আর একটা দিনও না। যাদের বস্তু তারা চায় তো নিয়ে যেতে পারে। আমি এতদূর এগিয়েছি যে আর পিছু হটতে পারিনে, মা। হটলে রঞ্জুর কাছে বিশ্বাসঘাতকী হব। ও যে আমার জন্যেই প্রতিযোগিতায় নামছে। নইলে নিজের জন্যে এমন কী দরকার ছিল! ওর জীবনের লক্ষ্য থেকে যে ও সরে যাচ্ছে। কেন? কার জন্যে? আমাকে ওর মতো ভালোবাসে কে? তুমি? তুমি যদি ভালোবাসতে তা হলে চোখ বুজে বেগমপুরের নবাবনন্দনের হাতে সঁপে দিতে না। কী দেখলুম ওদের ওখানে গিয়ে? মনে আছে না আবার শুনতে চাও? পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিয়েছে কে প্রথমে? সুধা কি পরস্ত্রী নয়? বিধবা হয়েছে বলে কি আপনার স্ত্রী হয়েছে? দেশের আইন কি দেওরকে অমন কোনো অধিকার দেয়? আইন তো বিধবাকে বিয়ে

করার সুযোগই দিয়েছে। সুধাকে বিয়ে না করে আমাকে বিয়ে করার কারণটা কী ছিল? ফলে এখন দুজনকেই অসুখী করা হলো। সুধাও কি সুখী হয়েছে নাকি?"

সুমতি দেবী মেয়েকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। বলেন, "যা হবার তা তো হয়ে গেছে, মা। একই লেবু হাজারবার কচলিয়ে কী হবে? শ্বশুরবাড়ি ফিরে গিয়ে তোর প্রথম কাজ হবে সুধাকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া। সেখানে বসে ও মাসে মাসে মাসোহারা পাবে। ওকে সুখী করা কারো সাধ্য নয়। বিধবার বিয়ে! দূর! ওসব নাটক নভেলেই শোভা পায়। তাই বা কেমন করে বলি? শরৎবাবু অতি সাবধানী লেখক। ওঁর বিধবা নায়িকারা ভালোবাসে, ভালোবাসা পায়, কিন্তু বিয়ে একজনেরও হয় না।"

সুধার হয়ে গৌরী ঝগড়া করে। বলে, "কেন ওকে বেগমপুর থেকে তাড়াবে? আমার যে অধিকার ওরও সেই অধিকার। ওর অধিকার বলতে গেলে আমার চেয়েও বেশী। ওর স্বামী ছিলেন বংশের বড় ছেলে। ওই তো ও বাড়ির বড় বউ। তা ছাড়া আমার স্বামীর সম্পত্তির উপরও যে ওরই অগ্রাধিকার।"

"চুপ, চুপ! ওসব কথা মুখে আনতে নেই। এমন কোন্ পরিবার আছে যেখানে একটা না একটা কেচ্ছা নেই। ওর চেয়েও কুৎসিত কেচ্ছা আমার জানা। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দে যে বেগমপুরের কেচ্ছাটা লালপুরের মতো জঘন্য নয়। ওখানে তো ভাসুরে ভাদ্রবউতে।" সুমতি দেবী হেসে গড়িয়ে পড়েন।

"ভয়ানক অন্যায়! ভয়ানক অন্যায়!" গৌরী গর্জে ওঠে। "আবার বিয়ে দেয় না কেন বিধবা ভাদ্রবউয়ের? কেন অমন করে ওর চরিত্র নষ্ট করে? কুমার বাহাদুরকে আমি হলে শুট করতুম। শয়তান, ভিলেন, ডেভিল, স্কাউন্ড্রেল কোথাকার! তোমরা আমাকে লালপুরে দাওনি তাই রক্ষা। এতদিনে আমারও ফাঁসি হয়ে যেত। অত বড় উকিল বাপও আমাকে বাঁচাতে পারতেন না।"

"চুপ, চুপ। তোর বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। ওঘর থেকে ওঁর নাকের গর্জন আর এঘর থেকে তোর মুখের গর্জন। বল, মা গৌরী, দাঁড়াই কোথা!" সুমতি দেবী নিজেই চুপ করেন।

কুঁড়ি

রত্ন ও বাড়িতে এমন আদরযত্নে ছিল যে তিনদিনের জায়গায় সাতদিন থাকার স্বপ্ন দেখছিল। গৌরীর সঙ্গ পাচ্ছে এটা ওর পরম ভাগ্য, তার চেয়ে কম ভাগ্য নয় ওর পিতামাতার স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ লাভ। ভালোবাসা তখনি সর্বাঙ্গীণ হয় যখন প্রিয়জনের প্রিয়জনকেও ভালোবাসা যায় ও তাঁদের ভালোবাসা পাওয়া যায়। গৌরীর মা বাবাকে রত্ন অকপটে ভালোবাসত। ও'রা শুধু গৌরীর মা বাবা বলে নয়, এমনিতেই ভক্তিযোগ্য।

"তোর তো মা নেই, আমিই তোর মা।" প্রথমদিনেই বলেছিলেন সুমতি দেবী। আর অশেষবাবু কথায় না জানালেও ব্যবহার করেছিলেন পিতৃব্যের মতো।

চারদিনের দিন রত্ন লক্ষ্য করে সকলের মুখভাব সুগম্ভীর। সকলেই যেন মৌনব্রত পালন করছেন। হয়তো অনশনব্রত। কারণ জল খাবারের সময় কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। রত্নকে একা একা সারতে হলো।

লাইব্রেরী ঘরে যথারীতি মাসিকপত্রের সেট নিয়ে বসেছে এমন সময় গৌরী এসে কথা নেই বার্তা নেই ঝরঝর করে কাঁদে। রত্ন তো অবাক।

গৌরীই প্রথম কথা বলে। "তখন আমি তোর সেঁকোবিষ খেয়ে মরিনি। এখন মরতে চাইলেও মরতে পারছিনে, সেই দুঃখে জ্বলে পুড়ে মরছি, মানিক। কেন তুই আমাকে বাঁচালি! শত্রু না হলে কেউ এমন কাজ করে?"

ফোঁপানিকান্নার মধ্যে ও যা বলে তার মর্ম ওর মা ওকে অপমানের একশেষ করেছেন। অন্য সময় হলে ও গলায় দড়ি দিত। কিন্তু বড়োই দুঃসময়। ওর মা-ই এখন ওর সংকটতারিণী হবেন। মার সঙ্গে ঝগড়া মানে নিশ্চিত মরণ।

"কিন্তু কেন অপমান? কোন্ অপরাধে?" রত্ন ব্যাকুল কণ্ঠে শুধায়।

"মান্ধাতার আমলের ওই ভদ্রমহিলার ধারণা আমি বিবাহিতা মেয়ে, আমার কাছে তুই হলি পরপুরুষ আর তোর কাছে আমি হলুম পরস্ত্রী। তাই যখন হলো তখন বইয়ের আড়ালে অমন কান্টিনেন্টি কেন?" গৌরী রত্নকে হকচকিয়ে দেয়।

"ওঃ! দেখতে পেয়েছেন বুঝি!" রত্ন রেঙে ওঠে।

"হাঁ, গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল আমার মা ওসবের ঊর্ধ্বে। সত্যি আমাকে উনি অসাধারণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বালিকাবয়সে। অমন উদারতা আমি আর কোনো বাড়িতে দেখিনি। কিন্তু সেই মা আমার আজ এমন বিরূপ হয়েছেন যে লেশমাত্র স্বাধীনতা সহ্য করতে পারেন না।" গৌরী বলে।

রত্ন মর্মাহত হয়ে স্তব্ধ হয়েছিল। কী বলবে ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

"কাল সারারাত আমার চোখের দুটি পাতা এক করতে পারিনি। কেঁদেছি আর ভেবেছি। শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে লোকচক্ষে আমি বিবাহিতা মেয়ে, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে আমি কুমারী। তাই যদি হয় তবে আমি পরস্ত্রী হই কী করে? আর তুই কেন হবি পরপুরুষ? আমাদের দিক থেকে আমরাই ঠিক। কেন তবে দুঃখপ্রকাশ করব বা মার্জনাভিক্ষা করব? মাকে স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়েছি তোমার বাড়িতে যতদিন আমি আছি, তোমার উপর নির্ভর করছি ততদিন তুমি আমার সঙ্গে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু পরে এমন দিনও আসবে যখন আমি সবাইকে দেখিয়ে শুনিয়ে রত্নর সঙ্গে থাকব। এটুকু কান্টিনেন্টি তো কিছুই নয়। এর পরে দেখবে কী না করি।" গৌরী বলতে বলতে জ্বলে ওঠে।

রত্ন তো ভয়ে কাঠ। "বললি তুই মাকে ওকথা?"

"হ্যাঁ। এতদিনে সব সাফ হয়ে গেছে। আপাতত মার হাতেই ঝাঁটা। উনি আমাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারেন। আমাকে না করলে তোকে। কিন্তু আসুক তো ফেব্রুয়ারি মাস। তখন দেখব কার কতদূর দৌড়" গৌরী হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হাত পা ছোঁড়ে আর অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়।

রঞ্জু চিন্তিত হয়। বলে, "মাকে খবরদার আমাদের পরিকল্পনার কথা বলিসনে। পরীক্ষায় ভালো করব না মন্দ করব জানিনে। মন্দ করলে ফেব্রুয়ারি নয়, আরো দেরি হবে। তারপর জ্যোতিদা যদি চাকরি জোটাতে না পারে বম্বে গিয়ে আমরা তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেব। মাকে তুই আমার সঙ্গে থাকার কথা না বললেই ভালো করতিস। এখন তো আমি ওঁকে মুখ দেখাতেও পারব না। আজকেই সরে পড়ব। আজ কেন, এখনি। নয়তো অপমানের একশেষ হতে হবে আমাকেও।"

সুমতি দেবী বোধ হয় আড়ি পেতে শুনছিলেন। হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলেন, "ছি, বাবা! তোমাকে কি আমি অপমান করতে পারি! তুই আমার পেটের ছেলের চেয়ে কম কিসে! আমি জানি গৌরীর উপর তোর অসীম প্রভাব। তুই যা বলবি ও তাই করবে। দোহাই, বাবা, ওকে কুপরামর্শ দিসনে। ওতে ওর সর্বনাশ হবে। হিন্দুর মেয়ের কি সাত পাকের বাঁধন থেকে মুক্তি আছে? ডিভোর্স কখনো এ সমাজে চলবে না। একশো বছর পরেও না। তুই কত বড়ো হবি! তোর কি বউয়ের অভাব হবে! গৌরীকে তুই রেহাই দে।"

গৌরী রঞ্জুর দিকে একদৃষ্টে তাকায়। শোনা যাক ও কী বলে।

রঞ্জু তাঁকে অভয় দেয় যে গৌরী সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবে রঞ্জু সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। নিজের সিদ্ধান্ত খাটাবে না। পরামর্শ যখন যা দিয়েছে ভালোর জন্যেই দিয়েছে। পরে যদি কখনো দেয় ভালোর জন্যেই দেবে। অনাহূতভাবে দেয়নি ও দেবে না। প্রভাব যদি কিছু থাকে সেটা একতরফা নয়। গৌরীর যেমন প্রখর ব্যক্তিত্ব, ওকে প্রভাবিত করতে পারে কে?

"তোরা দুটি ভাইবোন হয়ে চিরকাল থাক, এই আমার মনস্কামনা।" বলে সুমতি-দেবী দু' জনের দিকে সস্নেহে তাকান।

"সেইভাবেই তো শুরু হয়েছিল মাসিমা। কে জানত তার এই পরিণতি হবে! কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, গৌরী না চাইলে আমি কিছু চাইব না।" বলে রঞ্জু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

"ঘরের ঢেঁকি কুমীর।" সুমতি দেবী মন্তব্য করেন। কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে তা ঠিক মালুম হয় না। গৌরীকে না রঞ্জুকে।

"কাকে লক্ষ্য করে বলছ, মা?" গৌরী কৈফিয়ত চায়।

"তোকে লো, তোকে।" তিনি ফেটে পড়েন। "পরের ছেলের কাছে বলা হচ্ছে কি না, আমি কুমারী! তুই কুমারী যদি তো অমন গোলগাল চেহারা হয়েছে কেন?"

"তুমি ভিকটোরিয়ার আমলের মহিলা, তুমি এ তত্ত্ব বুঝবে কী করে? বিলেতে আজকাল বিবাহিতা মেয়েরাও নামের আগে কুমারী লেখে। লোকেও তাদের কুমারী বলে ডাকে। ছেলেমেয়ে হয়েছে যার সেও কুমারী বলে পরিচিত। এইটেই আধুনিক ধারা। এ ধারা ভারতবর্ষেও আসছে। জ্যোতিই তার ভগীরথ।" গৌরী জ্যোতির নামটাও ফাঁস করে দেয়।

"জ্যোতি!" তিনি আকাশ থেকে পড়েন। "জ্যোতি আছে এর পেছনে! ও যে দেশের একটি রত্ন!"

"কেন, রঞ্জুও কি তাই নয়?" গৌরী দ্বন্দ্বে নামে।

"হতে পারে। দীপনারায়ণ সিংহও তো ছিলেন একটি রত্ন। লিলিয়ান পালিতের প্রেমে পড়ে কী হাল হয়েছে তাঁর!" সুমতি দেবী পরিতাপ করেন।

ওই মধুর কেলেঙ্কারির কাহিনী গৌরীর অজানা ছিল না। বলে, "প্রেমের জন্যে দুঃখ পেতে হয়, মূল্য দিতে হয়, তুমিই তো কতবার বলেছ, মা।"

"হাঁ, কিন্তু সে প্রেম বিবাহান্ত হওয়া চাই। বিবাহ যেখানে সম্ভব নয় সেখানে প্রেমে পড়ে কাজ নেই, বাছা। আর বিবাহ-বিচ্ছেদপূর্বক বিবাহ, যেটা ওদেশে আজকাল চলছে, সেটা আমার দু' চক্ষের বিষ।" তিনি ভিকটোরিয়ার মতো ফারমান জারী করেন।

গৌরী ওর মাকে বোঝায়। "আমি কি এক বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি চাই আরেক বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে। না, মা? আমি চাই বন্ধনহীন স্বাধীনতা। রঞ্জুও বিয়ের কথা ভাবছে না। বিয়ের কথা উঠলে তো বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা উঠবে। না, বিবাহবিচ্ছেদে আমার রুচি নেই। ওটা আমার কাছে নীতি-বিরুদ্ধ নয়, রুচিবিরুদ্ধ।"

তিনি আরো ভয় পান। বিবাহবিচ্ছেদও নয়, বিবাহও নয়, তা হলে কী? নিষ্কাম প্রেম? তার নমুনা কি ওই কাল বিকেলের ঘটনা?

"তোর মনের তল পাওয়া ভার। বন্ধন এড়াবি, অথচ সঙ্গ চাইবি। জানিসনে কী ওর পরিণাম! আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পোড়ে, মুখ পোড়ে, ঘর তো পোড়েই, সংসার পুড়ে ছাই হয়। তুই এখন মা হতে চললি। তোর আরো সাবধান হওয়া উচিত। সন্তানের মুখ চেয়ে।" তিনি হিতোপদেশ দেন।

"ওকে তো আমি কাছে রাখতেই চাই। ওকে কি আমি ছেড়ে দিচ্ছি নাকি? আমি যেখানে যাব ও সেখানে যাবে। বাপের কাছে যাবে না।" গৌরী আবদার ধরে।

"শোন কথা!" সুমতি দেবী রুষ্ট হয়ে বলেন, "দুনিয়া তোর ওই আবদার শুনবে! সবাই রায় দেবে বাপের পক্ষে। ওরই তো ফসল।"

"কী! ওরই ফসল! আমার নয়! আমি যে দশ মাস গর্ভে ধরছি। তার বেলা? আমি যদি না ধরতুম তো ওর হাল কী হতো? দুনিয়া আমাকে বাধ্য করত? করতে পারত?" গৌরী আগুন হয়ে ওঠে। "এই জন্যেই পাশ্চাত্ত্যের মেয়েরা বিদ্রোহ করছে। যেখানেই অন্যায় সেখানেই বিদ্রোহ। পিতার অংশ অতি তুচ্ছ। মাতার অংশই সাড়ে পনেরো আনা। দুনিয়া একদিন মানবে এ তত্ত্ব। আমরাই মানাব।"

"সব সত্যি, কিন্তু ভুলে যাচ্ছিস যে সম্পত্তির বেলা বাপের অংশই সাড়ে পনেরো আনা। সেই জন্যেই তো বিয়ে লো।" মা মেয়েকে মনে করিয়ে দেন। "আমি এ বাড়িতে কতটুকু এনেছি? সারাজীবন খাচ্ছি। তোদেরও খাওয়াচ্ছি।"

রঞ্জু ওদিকে ওর যৎসামান্য তল্পিতল্পা গুটিয়ে গাড়ি ডাকতে যাবে ভাবছে। সময় থাকতে সরে না পড়লে তার কপালেও হয়তো প্রহারেণ ধনঞ্জয়।

গৌরী তা দেখে অসহায় বোধ করে। বাড়িটা তো ওর নয়, ওর মা বাপের। মাকে বলে, "রঞ্জু চলে যাচ্ছে, মা। ও কি আর কোনো দিন আসবে?"

মা মনে মনে কঠিন হন। কিন্তু মুখে মিষ্টি হাসি। "ও কী! তুই ভাত না খেয়েই চলে যাবি? গৃহস্থের অকল্যাণ হবে না? এবেলাটা থাক। ওবেলা উনি ফিরলে পরে বাড়ির গাড়িতে করে আমরা সবাই তোর সঙ্গে স্টেশনে যাব। কেমন?"

(ক্রমশ)

মেদিনীপুরের সুপরিচিত ব্যবসায়ী এবং প্রবীণ সেতারী শ্রীশচীন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় অনেক আগ্রহ নিয়ে একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটল। সাধারণত এই সব প্রতিষ্ঠান যে অসুবিধার দরুণ স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না সে অসুবিধা তাঁর নেই। অর্থ এবং সামর্থ্য দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে তিনি কাতর নন, কিন্তু যে অভাব তিনি বোধ করছেন সে হচ্ছে উপযুক্ত উৎসাহী এবং কর্মীর। এই উৎসাহ এবং কর্মোদ্যম যদি সহযোগীদের মধ্যে সমানভাবে সঞ্চারিত না হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। একটা "মরাল ফোর্স"-এর যেন অভাব থেকে যায়। ফলে এমন একটা সন্দেহ তাঁর মনে হয়েছে যে হয়ত কলকাতায় এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারলে তিনি অধিকতর সার্থকতা লাভ করতে পারতেন। মেদিনীপুরে আয়োজিত তাঁর প্রতিষ্ঠানের একটি সভায় তিনি এইরকম একটি পরিকল্পনার কথাই প্রকাশ করলেন। কিন্তু কলকাতার অবস্থাও যে তদনুরূপ এটা বোধ করি তাঁর জানা নেই। কলকাতার সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি ছাড়া অন্যগুলির অবস্থা আশানুরূপ নয়। তার কারণও ঐ একই—উপযুক্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার অভাব। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি সমস্যা আছে, যথা বর্তমান সামাজিক অবস্থা, যুবসমাজের চিন্তাধারা, জীবনযাত্রার কঠিন সমস্যা, শিক্ষার্থীদের সময় ও অভিভাবকদের উৎসাহের অভাব, সাধারণ নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি। এমতাবস্থায় কোনও স্থানেই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান যে অনুকূল অবস্থায় চলবে এমন আশা কম। অতএব শচীনবাবুর পক্ষে মেদিনীপুরেই তাঁর প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা সবচেয়ে শ্রেয় এবং তাঁর মত যাঁরা মফস্বলে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদেরও সেখানে উদ্যোগী হওয়াই ভাল বলে মনে হয়। এর কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের তাঁরা চেনেন। সেখানকার মনোভাব তাঁদের পরিজ্ঞাত এবং সেখানকার সঙ্গে তাঁদের এমন একটা আন্তরিক যোগ আছে যা তাঁদের নিরন্তর সেখানকার হিতার্থেই প্রেরণা প্রদান করবে। কলকাতা এ যাবৎ বাংলার সব প্রচেষ্টারই কেন্দ্রস্থল হয়ে এসেছে কিন্তু এখন বোধ হয় ভিন্নমুখী প্রচেষ্টা হওয়া দরকার। বাংলার শহরগুলি ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে, সেখানকার অধিবাসীরা যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্ত, এমন কি বহু সুধীসজ্জন ব্যক্তি আজকাল নানা কারণে কলকাতার বাইরে বাস করতে উৎসুক, অতএব এসব শহরে যদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে তাহলে সমগ্র বাংলার উন্নতি অবধারিত। কলকাতায় অনেককেই নানা কারণে আসতে হবে কেননা কতকগুলি সুবিধা একমাত্র কলকাতাতেই আছে, কিন্তু তাই বলে সব ব্যাপারেই কলকাতার প্রতি অসামান্য গুরুত্ব প্রদান করবার কারণ নেই। বাইরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রমাণ করুন যে তাঁরা চিন্তার দিক দিয়ে পেছিয়ে নেই। গড়ে তোলাটাই কষ্ট, কিন্তু একবার গড়ে তুলতে পারলে কলকাতার সমাদর তাঁরা লাভ করতে পারবেন এবং যে উদাহরণ তাঁরা স্থাপন করতে পারবেন তা অপর শহরগুলির প্রেরণাস্থল হয়ে থাকবে।

শচীনবাবুর সব ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়নি, কিন্তু যাঁদের বাজনা শুনলুম তাঁদের অনুষ্ঠান ভালই লাগল। শচীনবাবু নিজেই তাঁদের শিখিয়েছেন। তাঁরা ভবিষ্যতে কিরকম বাজাবেন বা খ্যাতিলাভ করবেন সেটা পরের কথা, কিন্তু বর্তমানে আশার কথা হল এই যে, তাঁরা যথানিয়মে সুষ্ঠুভাবে শিখে সঙ্গীতের একটি ভিত্তি স্থাপন করছেন। আমাদের দেশে অনেক গায়ক বাদক আছেন যাঁরা স্বনামধন্য নন কিন্তু ছাত্রদের তৈরি করে দিতে তাঁদের মত উপযুক্ত ব্যক্তি নেই। এঁরা নীরব কর্মী এবং এই যথার্থ শিক্ষিত ও বিদগ্ধ শিক্ষকদেরই এখন আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

শচীনবাবুর আসরে দেখলুম স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক, সাহিত্য পরিষদের সদস্য থেকে বহু বিদগ্ধজন ও সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। একটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এই যে একটি চমৎকার বিদগ্ধ গোষ্ঠী রচিত হল—এ কি কলকাতায় সম্ভব ছিল? এখানে এই ধরনের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ত একটি কালচারেল ইউনিট প্রতিষ্ঠা করবেন যার মেম্বারদের নিয়মিত চাঁদা দিতে হবে। তাঁরা মাসে একবার সযত্নে আয়োজিত আসরে এসে নিজ নিজ গাম্ভীর্য বজায় রেখে গান, বাজনা শুনে যাবেন। একজন আর একজনের গা টিপে মৃদু কণ্ঠে বলবেন—"দেখেছেন অমুক এসেছেন।" অনুষ্ঠান সারা হলে যে যাঁর গন্তব্যস্থলে ফিরে যাবেন। কোনও দিক থেকে কোনও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে না। অথচ বাইরে এই ধরনের গোষ্ঠী একত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে বহু আলোচনা করেন যা সবাইকার পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ। সকলেই সকলের খবর নিয়ে গেলেন এবং শিক্ষার্থীরাও যথেষ্ট উৎসাহ পেলেন, এই যে মনোরম পরিবেশ তা কলকাতায় একান্তই দুর্লভ।

এ ছাড়া বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলিতে একটি চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখেছি। কলকাতায় গলির ভিতর প্রায়ান্ধকার ঘরে যে ক্লাশ নেওয়া হয় তার গুরুত্ব হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে খোলা জায়গায় আলো, হাওয়া, স্নিগ্ধ, মুক্ত অঞ্চলে যখন শিক্ষায়তনের অধ্যাপনা চলে তখন যে মধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয় তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। শিক্ষার দিক থেকে পরোক্ষভাবে (এবং কখনও কখনও প্রত্যক্ষভাবে) এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর প্রভাব নেহাৎ কম নয়।

অতএব শচীনবাবুর নিরুদ্যম হবার কারণ নেই। তাঁর ছাত্রছাত্রীরা বেরুতে থাকুন। দেখাই যাক না ভবিষ্যৎ তাঁকে বঞ্চিত করে কিনা।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করব। শচীনবাবুর বাড়িতেই আলাপ হল তাঁর স্কচ ছাত্র ক্লিমেণ্টস আলফোর্ড-এর সঙ্গে। এই তরুণ বিদেশী তাঁর বাড়িতে আছেন প্রায় বছর দেড়েক কিন্তু এরই মধ্যে প্রশংসনীয়ভাবে সেতারটি আয়ত্ত করেছেন। শচীনবাবুর কন্যা শ্রীমতী জয়শ্রী দেবী এডিনবরা ফেস্টিভেলে সেতার বাজিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এই তরুণটি সেখান থেকেই সেতার শেখবার ব্যবস্থা

প্রাচীন ভারতের রবাব জাতীয় বাদ্য

পাকা করে সোজা মেদিনীপুরে শচীনবাবুর বাড়িতে এসে ওঠেন। সেই থেকে গুরুগৃহে বাস করেই সেতার শিখছেন অশেষ নিষ্ঠা এবং ধৈর্যের সঙ্গে। আমি যেদিন যাই সেদিন দেখি তাঁর ডান হাতে বেশ খানিকটা প্লাস্টার করা। অতিরিক্ত সাধনা করার ফলে আঙুলগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। দিনকতক যাতে বাজানো বন্ধ থাকে তাই একেবারে নড়ন-চড়ন বন্ধ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ডাক্তার। ক্লিমেন্টস অনেকদিন ধরেই লণ্ডনে সেতার শেখবার চেষ্টা করছিলেন এবং কয়েকজন ভারতীয় বাদকের সাহায্যেও এসেছিলেন কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি। অবশেষে তাঁকে ভারতে এসে শিক্ষা গ্রহণ করতে হল।

কি কারণে তিনি লণ্ডনে সেতার শিক্ষার সুযোগ করতে পারলেন না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে যাঁর কাছেই তিনি গেছেন তিনিই শিক্ষা প্রদানের চেয়ে ফি-র প্রতিই অধিক মনোযোগ দিয়েছেন। জানা গেল একজন সুবিখ্যাত সেতার বাদকের কাছে ইনি শিক্ষার জন্য দেখা করেছিলেন লণ্ডনে, কিন্তু তিনি মিনিট পাঁচেক সা-রে-গা-মা বাজাবার প্রণালীটা দেখিয়েই আশী টাকা পকেটস্থ করেন এবং আবার মাসখানেক পরে তাঁকে আসতে বলেন। এইভাবে কয়েকজন সেতারবাদক নাকি বেশ উপার্জন করে চলেছেন এবং শিক্ষার্থীদের তাঁরা প্রায় কিছুই শেখান না। দামী মোটর-গাড়ি কি করে কেনা যায় বা অপরাপর দুর্লভ দ্রব্য কি করে সংগ্রহ করা যায় সেদিকেই নাকি তাঁদের আগ্রহ সর্বাধিক। এরই মধ্যে সামান্য শিক্ষিত কয়েকজন ইংরেজ তরুণও নাকি ওখানকার কতিপয় বিদ্যালয়ে ভারতীয় সঙ্গীতে শিক্ষকতা করতে আরম্ভ করেছেন। এই চমকপ্রদ বিবরণ শুনে আমি প্রশ্ন করলুম ইংরেজদের মত এরকম চতুর ও শিক্ষিত জাতিকে এইভাবে কতিপয় ভারতীয় [illegible] করছেন কি করে? উত্তরে তিনি বললেন ওদেশের লোকেদের একটা বাজনা শিখতে কদিন লাগে এবং কিভাবে শেখা যায় সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই। তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই শিখতে যায় এবং যথেষ্ট খরচ করতেও দ্বিধা করে না। [illegible] তারা এই নকল শিক্ষাটুকুই পেয়ে আসছে। এইসব ব্যাপারে ওখানকার কাগজে চিঠি লিখে কেন প্রকাশ করা হয় না এই প্রশ্ন করলে জানা গেল বিশেষজ্ঞ কেউ না লিখলে ওখানকার পত্রপত্রিকা কোনও পত্রই প্রকাশ করে না। এঁদের প্রভাব নাকি ওদেশে এত বেশী যে এঁদের সম্বন্ধে কোনও বিরূপ সমালোচনা সহজে প্রকাশ করাও সম্ভব হয় না। ক্লিমেন্টস বললেন এখানকার কাগজে আপনারা যদি এ বিষয়ে কিছু লেখেন তাহলে ভাল হয় এবং লেখাটি অত্যাবশ্যক। আমি বললুম যে এখানেও কিছু লেখা [illegible] কারণ এখানকার ছাত্রেরা যদি [illegible] কিছু পাচ্ছে না কোনও খরচ করে তাহলে কার কি বলবার থাকতে পারে। তবে বিদেশী ভারতীয়দের পক্ষে অতিশয় অগৌরবের এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাঁরা শিল্পী এবং এদেশের সংস্কৃতি প্রচার করতে গেছেন (অন্তত যাবার আগে এরকম বিবৃতি দিয়ে গেছেন এবং ফিরেও অনুরূপ উক্তি করেছেন) তাঁদের পক্ষে এরকম প্রবঞ্চক মনোভাব অতিশয় পরিতাপজনক। কিছুদিন হয়ত এভাবে চলতে পারে, তারপর যখন ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবে তখন আমাদের সঙ্গীতশিল্পীদের অবস্থাটা মোটেই সম্মানজনক হবে না। এই অপমানকর অবস্থা যাতে না আসে সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার।

ক্লিমেন্টস বললেন এখানে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন মাঝে একবার লণ্ডনে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে তা বাজিয়ে শুনিয়েছেন। তাঁর যে কত [illegible] গেছেন সেটি তাঁরা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু কি অজ্ঞাত কারণে জানা যায় না তাঁর বন্ধুরা তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন। আমার মনে হয় এর পেছনে একটু পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপার আছে। শোনা যায় ওদেশে [illegible] ইস্টার্ন স্টাডিজ নামক একটি [illegible] মাথাচাড়া দিয়েছে। একটু [illegible] নাকি এই বিষয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পাওয়া যায়। এদেশের তথাকথিত কিছু পণ্ডিতজ্ঞ ওদেশে গিয়ে কিছুকাল এইসব [illegible] করে থাকেন এবং অনুরূপ জ্ঞান অর্জন করে ওদেশেরও কেউ কেউ এই কার্যে ব্রতী হতে শুরু করেছেন। অতএব এদের ঘাঁটি ভাঙতে কেউই প্রস্তুত নন। কিন্তু একদিন এই অঘটনটি ঘটবে।

যাক, আমি যা শুনেছি বা জেনেছি তাই লিখলুম। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ কিছু নেই [illegible] একজন বিদেশী আমার কাছে [illegible] জানিয়েছেন আমি সেটি রক্ষা করছি মাত্র।

[illegible]

একটি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র

চিত্রজগতের সুপরিচিত পরিচালক শ্রীমান জয়ন্ত ভট্টাচার্য সম্প্রতি এলাহাবাদ মিউজিয়ামে রক্ষিত অহিচ্ছত্র নামক স্থান থেকে পাওয়া একটি বাদ্যযন্ত্রের ফটো লেখককে প্রদান করেছেন। যন্ত্রটি রবাব জাতীয়। প্রাচীন গান্ধার, চীন, খোটান, এবং ভারতের অমরাবতী ও অজন্তাতেও বোধ হয় এই ধরনের বাদ্য দেখা যায়। তবে রবাব যেভাবে সোজা রেখে বাজানো হয় এ যন্ত্রটি সেভাবে বাজানো হত না। বর্তমানে সরোদ যেভাবে বাজানো হয় এই যন্ত্রটির বাজাবার কায়দা সেইরকম। সরোদকে অনেকে আফগানিস্থানী রবাব বলে থাকেন। এই বাদ্য প্রাচীন ভারতে প্রচলিত থাকলেও সুপরিচিত বীণার মত জনপ্রিয় ছিল না এবং হয়ত কোনও এক সময় অপ্রচলিতই হয়ে গিয়েছিল। জয়ন্তবাবু জানিয়েছেন যে এলাহাবাদ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বলেছেন যে যন্ত্রটি পঞ্চম শতাব্দীর হতে পারে।

শার্ঙ্গদেব

৮

উষ্টর রায় হাতোক্ষণ কেন বললেন, বারান্দায় চুপচাপ বসে রইলো পুরন্দর। তার মনটা সুখে ছলছল করছিলো। মা বাবার বিচ্ছেদের কারণটা না জানলেও তারা দু'জনেই যে একেবারে না জনের প্রতি আসক্ত সেটা অনুমান করে সন্তান হিসেবে তাঁর মনের সমস্ত সংশয় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিলো। সে ভাবছিলো বাবাকে সে কাল সকালে তাদের হোটেলে ব্রেকফাস্ট করতে ডাকবে কিনা এবং সেজন্য তার মার অনুমতি নেয়া উচিত কিনা, অথবা একটা সারপ্রাইজ দেবে।

হঠাৎ এই প্রসঙ্গে যে কেন তার অতসীকে মনে পড়ে গেল কে জানে। দেওঘরের অতসী। সে তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, নাকের তলায় সবে ছুঁচোলো গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে মাত্র, মাথার চুল [illegible], কোনো মেয়ে দেখলে ভুরুনি তা টেনে এনে কপালে ফেলে। এই অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে সে দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলো। সেখানে গিয়েই প্রথমে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো, পরিচয় হতেই জানা গেল তিনি তার মায়ের বাবার বন্ধুও বটে, এবং বাবার দ্বিতীয় বিবাহের দ্বারা সম্পর্কে শ্যালক। নাম তাপস খাস্তগীর। অনেক আদর আপ্যায়ন করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন তিনি, সুন্দর বাড়ি, অনেক ঘর, তিনি পুরন্দরের সব বন্ধুকেই সেখানে অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, বন্ধুরা থাকলো না, কিন্তু পুরন্দরকে তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না।

চমৎকার মানুষ। তাঁর স্ত্রীও চমৎকার। কিন্তু শোকার্ত। একটি মাত্র মেয়ে ছিলো তাঁদের, বছর কয়েক আগে মারা গেছেন। অতসী তাঁদের সেই মেয়ের ঘরের একমাত্র নাতনী। তাঁদের কাছেই থাকে। চোদ্দ বছরের ডাকাবুকো এক দুর্দান্ত মেয়ে। অতসী ফুলের মতোই সুন্দর, অন্তত উনিশ বছর বয়সের পুরন্দরের সেই উপমাটাই মনে হয়েছিলো।

দেখা গেল মেয়েটির দাপট শুধু তার দিদিমা দাদামশায়ের উপরই আবদ্ধ নয়, পাড়ার নেত্রী সে। যাকে বলে সর্দারনী, আশেপাশের সব ছেলেমেয়ের উপর অবাধ কর্তৃত্ব। চালচলনেও অভাব নেই। পুরন্দরকে দেখে ভ্রূকুটি করে ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে সে পাশের মস্ত আম বাগানে চলে গিয়েছিলো।

'এই শোন, শোন—' তাপসদাদু ডাকলেন তাকে, বললেন, 'তোর দাদা।'

'সে শুনলো না। বললো, দাদা না হাতি।'

কলেজে পড়ুয়া সদ্য যুবক পুরন্দর বেশ অপমানিত হয়েছিলো এই ব্যবহারে। সত্যি বলতে, বন্ধুদের ছেড়ে এখানে থাকতে যে সে রাজী হয়েছিলো তার কারণও সম্ভবত সেই অপমানেরই প্রতিশোধ স্পৃহা। তার মনে হয়েছিলো, এই অভদ্র অমার্জিত গ্রাম্য মেয়েটাকে যে-কোনো ভাবে হোক জব্দ করতে হবেই, জানিয়ে দিতেই হবে তার মতো সে ঘোড়ার ঘাস কাটে না, পাড়ার সর্দারি করে ঘুরে বেড়ায় না। সে রীতিমতো কলেজে পড়ে এবং অনেক মেয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। আলাপ করতে পারলে বর্তে যায়।

এ কথা ভেবে তার সদ্য গোঁফের ফাঁকে হাসি চমকাচ্ছিলো, ঐ দলবদ্ধ ছেলেমেয়েগুলি, যারা ঐ খুদে রমণীটির কথায় উঠছে আর বসছে, তুড়ি মেরে তাদের তাড়িয়ে দিতে আসতে তার এক মিনিটের বেশী খরচ হবে না। হাজার হোক সে কলকাতার ছেলে।

পরের দিন সকালে সেই দম্ভেই সে পাশের আমবাগানে গিয়ে গোঁফ চুমড়োচ্ছিলো। দেখলো কী বিষয়ে যেন বক্তৃতা দিচ্ছে অতসী, আর চার থেকে চোদ্দো-পনেরো বছরের সব ছেলেমেয়েগুলি হাঁ করে শুনছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। এগিয়ে গিয়ে বললো, 'কী করছো খুকি?'

নেত্রীটিকে তার ভক্তদের কাছে কিঞ্চিৎ হেয় করবার জন্যই অবহেলা অথবা স্নেহ-ভাবে এই 'খুকি' সম্বোধন।

বক্তৃতা থামিয়ে চোদ্দ বছরের টুকটুকে খুকিটি ঝট করে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলো তাকে, তারপরেই মুখ ঘুরিয়ে ভুরু কুঁচকে একটা ছেলেকে বললো, 'দ্যাখ তো পটলা, ছেলেটা কাকে খুকি খুকি করছে?'

পটলা দেখবার আগেই পুরন্দর হাস্য বিস্তার করলো, বললো, 'আমি তোমাকেই বলছি।'

'ও, আমাকে?' গাল ভরে খুকিও হাসলো, গলে গিয়ে বললো, 'কেন খোকা?'

বলতেই হি হি করে হেসে উঠলো সাঙ্গো-পাঙ্গরা। পুরন্দরের সরু প্যান্ট, বুশ শার্ট, পাতলা পাতলা ছুঁচোলো গোঁফ, বি-এ ফার্স্ট ইয়ারে উঠে নতুন কেনা রিস্টওয়াচ, লুকিয়ে কেনা বুক পকেটের লাইটার, সব একযোগে কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। রাগে

ঝিঁঝিঁ করতে করতে সে চলে গেল সেখান থেকে।

খুব ঢ্যাঁড়া পিটানো হচ্ছিলো রাস্তায় যাত্রার বিজ্ঞাপন। 'এবার পুজোয় নট্ট কোম্পানীর দল, আসুন, দেখুন, দ্রৌপদী সাজবে যুবতী বাঁচিরাণী, আর কুন্তীর ভূমিকায় স্বয়ং ন্যাসপাতি মঞ্জরী দাসী।'

বাঁচিরাণী আর ন্যাসপাতি মঞ্জরী নাম শুনে হাসতে হাসতে মরে গিয়েছিলো পুরন্দর। সব রাগ ভুলে গিয়েছিলো।

পরের দিন তাপসদাদু বললেন, 'নাম শুনেই যখন এতো মোহিত তখন যাও একবার দেখেও এসো গিয়ে। দিদিমাকে নিয়ে যাও। শহরের ছেলে, যাত্রা তো আর দেখনি?'

অতসীও সেজেগুজে প্রস্তুত।

সকলের অভিভাবক হয়ে নিয়ে যেতে বেশ ভালোই লাগছিলো পুরন্দরের। অন্তত এখানে তো অতসীকে এক হাত নিতে পেরেছে? পথে যেতে যেতে অনেক কর্তা-গিরিও ফলিয়েছিলো 'উঁহু, অত আগে আগে যেয়ো না, আলের উপর দিয়ে নয়, সাপ থাকতে পারে, ঢিল কুড়োচ্ছ কেন? আবার কুকুরটাকে চুক চুক করছো?' অনবরত এই

ধরনের টিকটিক করছিলো সে। অতসী তেরিয়া হয়ে উঠলেই দিদিমা বলছিলেন, কথা না শুনলে কিন্তু এক্ষুনি ফিরে যাবো আমি. কেবল দুষ্টুমি।' সাপের মাথায় ধুলো পড়ছিলো, অমনি বিরস মুখে নির্দেশ মান্য করছিলো সে। পুরন্দর ভিতরে ভিতরে বলছিলো. খুব হয়েছে।'

কিন্তু তার জন্য যে আরো সম্মান পাওনা ছিলো তা কি তখন জানতো?

বসে থেকে থেকে যাত্রা শুরুই হলো প্রায় দশটায়। আর এগারোটা বাজতেই অতসী ঝিমতে শুরু করলো. ক্রমে সে ঢুলে ঢুলে এর ওর গায়ে পড়ে যাচ্ছিলো. সবাই বিরক্তি-সূচক শব্দ করছিলো। দিদিমা এক ফাঁকে তাকে নিয়ে চিকের বাইরে এসে বললেন, 'পুরন্দর ভাই, তুমি ওকে বাড়ি নিয়ে আসতে পারবে?'

'কেন পারবো না?' পুরন্দরও এই দায়িত্ব নিতে এক কথাতেই রাজী।

'ঘরে নিয়ে এসো, লক্ষ্মী ছেলে। পিছনের মাঠ দিয়ে চলে যাও, যেতে আসতে কুড়ি মিনিটের বেশী লাগবে না।'

হঠাৎ ধড়ফড় করে চোখ কচলাতে কচলাতে অতসী বলে উঠলো, 'আমি যাবো না।'

'যাবি না মানে?' দিদিমা বললেন, 'কেবল তো সকলের ঘাড়ের উপর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পড়ছিস, বিরক্ত হচ্ছে লোকেরা. তার চেয়ে বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক। দাদামণি আছে বাড়িতে।'

অতসীর এই দশায় খুব আমোদ পাচ্ছিলো পুরন্দর। পথে আসতে আসতে বললো, 'বাচ্চা মেয়ে, বাচ্চা মেয়ের মতো থাকবে. পাকামী করে, বড়োদের মতো রাত জেগে আবার যাত্রা দেখতে এসেছিলে কেন?'

ঘুম ভুলে অতসী বললো, 'তুমি এসেছিলে কেন?'

পুরন্দর বললো, 'আমি এসেছি দেখতে।'

'আমিও তাই।'

'শুধু একটু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে না? একটা চশমা পরে ঘুমুলে না কেন? আরো ভালো দেখতে পেতে।'

'কিনে দিয়ো।'

'আমি কেন কিনে দেব?'

'বিনা পয়সায় পরামর্শ দিতে যার এতো ভালো লাগে, কিনে দেওয়াটাও তারই উচিত।'

'কথার সাগর। যা সত্যি তাই বলেছি। তোমার যন্ত্রণায় কতোটা পথ বেকার হাঁটতে হলো বক্তো সব কুচোকাচার কাণ্ড।'

'ও রকম যা তা বলবে না বলে দিচ্ছি।'

'কী করবে?'

মাঠের মধ্য দিয়ে টর্চ ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছিলো তারা। এই পথটা ভালো জানা ছিলো না পুরন্দরের। মাঝে-মাঝে বড়ো বড়ো গাছের ছায়া একটা গা ছমছম করা আবহাওয়া তৈরী করছিলো। পুরন্দরের এই সাংঘাতিক নিরালা নির্জন অবস্থাটা ভালো লাগছিলো না। হঠাৎ অতসী হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে এক ছুট। সে যে কোথায় মিলিয়ে গেল, কিছুই ঠিক করতে পারলো না পুরন্দর। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একা হয়ে একদিকে সাপের ভয় অন্য দিকে, ভূতের ভয়ে সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো, 'অতসী, অতসী।'

সাড়া নেই শব্দ নেই, শুধু নিজের নিঃশ্বাসে নিজে চমকে ওঠার নীরবতা।

'শোনো, আমি পথ চিনি না. আমি অন্ধকারে হারিয়ে যাবো।'

লজ্জা, সরম ভুলে প্রাণের দায়ে সে এসব কথা বলছিলো চিৎকার করে।

অনতিদূরেই হিহি করে হেসে উঠলো মেয়েটা সমান তালে চিৎকার করে বললো, 'সাবধান. ওখানটায় একটা মস্ত গোখরো আছে।'

'ওরে মারে বাবারে—'

'শাল গাছটার নাম ফাঁসিশাল. ছ'জন লোক এক সঙ্গে একবার ফাঁসি ঝুলেছিলো ওখানে—'

'ওরে বাবা—'

'হি হি হি, হা হা হা—' হাসতে হাসতে নম্র ফোটা টর্চ জেলে এগিয়ে এলো অতসী. 'কী বীরপুরুষ, তিনি আবার আমার চলনদার হয়েছেন! থাক। কাল থেকে শাড়ি পোরো, চুড়ি পোরো। নাও চলো, এ পথে এসো।'

পুরন্দরের মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই। সে কিন্তু নিজেও জানতো না, এতো ভীতু সে।

বাড়ি এসে অতসী বললো, 'এবার একা একা ফিরবে কী করে?'

ভুরু কুঁচকে পুরন্দর বললো, 'সে আমি দেখবো, তুমি টর্চটা দাও।'

'দাঁড়াও দাদাকে ডাকছি—' ঠেলেঠুলে সে তাপসদাদুকে তুলে দিল, বললো, দিদার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ওকে করেছে চলনদার, ভয়ে ঠক ঠক করছে দ্যাখো না, যাও সঙ্গে গিয়ে শিবতলায় দিয়ে এসো।'

'কী অন্যায়।' চটে গেল পুরন্দর। কিন্তু মনে মনে একথাও না ভেবে পারলো না, একা একা পথ চিনে নির্ভয়ে সত্যিই কি সে ফিরে যেতে পারতো?

১

মাত্রই সাত দিনের ভ্রমণ. পলকে কেটে গেল দিন ক'টা। আসবার সময় মুখভার করে আড়ালে অতসী বললো, জানি, গিয়েই ভুলে যাবে।'

পুরন্দর বললো, 'গিয়েই চিঠি লিখবো, জবাব দিও।'

'কী লিখবে?'

'লিখবো, তোমার জন্য আমার মন কেমন করছে।'

'ধেৎ।'

'ধেৎ কী!' এরপরে পুরন্দর আচমকা তাকে ভীষণভাবে চুমু খেয়েছিলো।

প্রথম প্রেমের মতো কিছুই না। কদিন হয়ে গেল তারপর, তারপর আরো কতো কিছু হলো. তবু সেই স্বাদ অম্লান হয়ে রইলো স্মৃতিতে।

অবশ্য দেখা হলো আবার। এই তো মাস কয়েক আগে। ওর দাদা দিদা ওকে নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে। দেওঘরে পুরন্দরকে ও'রা এতো আদর যত্ন করেছিলেন, এতো আপন করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন যে, তার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন মা. খবর পেয়েই বললেন, 'যা, দেখা করে আয়, আমাদের বাড়িতে নিয়ে আয়।'

উঠেছিলেন, মার বাবার বাড়িতে, খুব কিছু দূরে নয়, মার কথা শুনে আপন গরজেই দৌড়ে গিয়েছিলো। নিয়ে এসেছিলো তক্ষুনি।

অতসী ঠিক তেমনিই অতসী, একটুও বদলায়নি। বি-এ পাশ করে প্রস্তুত হয়েছে এম-এ পড়ার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করবার অছিলাতেই ওর দাদামশায় আর দিদিমা, নিয়ে এসেছেন কলকাতা, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য বিয়ে। সেটা ওকে জানানো হয়নি, কেননা তাঁদের আশঙ্কা, জানলেই চ্যাঁচামেচির হাট বসাবে।

মা বললেন, 'কেন, বিয়েতে ওর মত নেই?'

ও'রা বললেন, 'পাকে প্রকারে এসব বিষয়ে কথা বলে যতোদূর বুঝেছি, একেবারেই না।'

'তা হলে জোর করছেন কেন?'

'উপায় কী? ও তো আমাদের মেয়ে না, নাতনী। বয়সের তফাতটা বুঝতে পারছো তো? মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের তো যে কোনো দিন দেখা হয়ে যেতে পারে, তখন? বাপ তো আবার বিয়ে করে সংসার পেতেছে, ওর জায়গা কোথায়?'
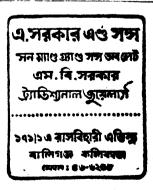
মা চুপ করে থাকলেন। বোধ হয় নিজের কথা মনে পড়ছিলো। অনেক পরে বললেন, 'বরং এম এ-টাতে ভর্তি করে দিন, নিজের পা শক্ত হলে সব অবস্থাতেই মাটি পাবে।'

'হ্যাঁ, তাতো তোমাকে দেখেই আমাদের শেখা উচিত।'

যে সম্বন্ধটির জন্য ও'রা ছুটে এসেছিলেন, সেটি ফস্কে গেল। মেয়ে দেখাতে কিছুতেই রাজী করানো গেলো না অতসীকে। তার বদলে পুরন্দরের সঙ্গে গিয়ে এম এ-তে ভর্তি হয়ে এলো।

ওর দাদামশায় দিদিমা দেওঘরে ফিরে যাবার আগে মা বললেন, 'ওকে কিন্তু আমার কাছে রেখেও পড়াতে পারেন। আমি তো কিছু দিনের মধ্যেই একা হয়ে যাব। পুরন্দর চলে গেলে, ওর ঘরটা ভরা থাকবে।'

ও'রা বললেন, 'এর চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত আর কী হতে পারে? তবে আমরা ভাবছি আমরাই দেওঘরের বাড়িটা বন্ধ রেখে আবার চলে আসবো দীর্ঘ দিনের জন্য। সে ক'টা দিন তোমার বাবার বাড়িতেই থাক, নইলে উনি অসন্তুষ্ট হবেন।'

এর পরে হঠাৎ মা বললেন, 'আপনার সঙ্গে কিন্তু আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই—তাপসমামা।'

তাপসমামা বললেন, 'না, তা নেই বটে। তবে কথাটা তোমার মনে হলো কেন?'

'অতসীকে আমার খুব ভালো লাগে।'

'ও।'

তাপসমামার স্ত্রী বললেন, 'দু' জনকে বড়ো সুন্দর মানায়।'

একথা কানে গিয়েছিলো তাদের।

জনান্তিকে পুরন্দর অতসীকে বলেছিলো, 'শুনেলে তো সব?'

'শুনলাম।'

'কী শুনলে?'

'তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই।'

'তারপর?'

'আর কিছু শুনিনি।'

'হ্যাঁ শুনেছ।'

'না।'

'তার মানে সে কথাটা তোমার পছন্দ নয়?'

'বোধ হয় নয়।'

'তার মানে তুমি রাজী নও?'

'কী বিষয়ে?'

'তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই, হলো?'

'কখন?'

'ইয়ার্কি, না?'

'বাঃ, ইয়ার্কি কেন? এমন একটা সিরিয়াস বিষয়।'

'আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।'

'তা আর বলতে।'

'ঠাট্টা নয়।'

'পাগল।'

'তোমার দাদু তো দেখছি রোজই পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখছেন। ওসব কিন্তু চলবে না।'

'কক্ষনো না।' অতসী হাসতে থাকে। পুরন্দর রেগে গিয়ে টেবিলে ঘুষি মারে।

আসবার দিন কিন্তু সে হাসছিলো না। স্টেশনে তুলে দিতে এসে স্বভাব অনুযায়ী হয়তোবার হাসতে চেষ্টা করছিলো, তবেবার মুখের নীল শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিলো।

গাড়ি ছাড়ার আগে চোখে চোখ রেখে পুরন্দর বললো, 'আসি।'

অতসী বললো, 'এসো।'

পুরন্দর বললো, 'তিন বছর আর এমন কী ব্যাপার? দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

অতসী বললো, 'তাতো ঠিকই। তিন বছর আগে আরো তো ছ' বছর অপেক্ষা করেছি? আমার অভ্যেস আছে?'

অবাক হয়ে পুরন্দর বললো, 'ছ' বছর? কিসের ছ' বছর?'

'চোদ্দ থেকে কুড়ি।' হঠাৎ কেঁদে ফেলে বললো, 'আমি তারপর একদিনের জন্যও তোমাকে ভুলিনি।'

(ক্রমশ)

হয়েছে। কান্নাকাটি করবেন না, ওতে কোনো লাভ নেই। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনার হাজার ডলার রিফান্ড পাবেন। টাকাটা নিয়ে ঋণদাতার ঋণ শোধ করে দিন। খানিক পরে, এবার, ঐ চেকটি কাউকে বেচে দিন। কাউকে মানে, যে-কাউকে নয়; নীতিরক্ষার খাতিরে অর্থগৃধ্নু ভারতীয় মহাজনদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিন—বছরে ৭৫% সুদ আদায় করে যে-নরপিশাচেরা ভারতীয় সর্বহারাদের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত শোষণ করে চলেছে। মহাজন মানুষটি অতি ধূর্ত: কালো বাজারে ডলারের বিনিময়-মূল্য যে বারো টাকা, তা সে জানে; আপনাকে কিন্তু সে অফার করবে সরকারী মূল্যের কিঞ্চিদধিক মাত্র—ধরুন আট কি নয় টাকা হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে ডগমগ হয়ে হাত বাড়িয়ে বসবেন না যেন, দর-কষাকষির ভান চালিয়ে যান অন্যূন-অনধিক ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক। তারপর টাকাটা গুনে নিন, থলিটাকে বুকে আঁকড়ে পয়লা যে চলন্ত ট্রেনটা পাবেন, লাফিয়ে উঠুন। ঐদিনই ঐ চেকটি বিমান-ডাকে প্রেরিত হবে সিঙ্গাপুর, হংকং কিংবা জেনেভায় খাস মহাজনের সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে, এক কোপে দুগুণ আড়াইগুণ লাভের আশায়। সে-গুড়ে বালি ছিটিয়ে আমেরিকান এক্সপ্রেসও অচিরেই জানাবে—অমুক নম্বর চেকটি একটি হারানো চেক, আর টাকাও ইতিপূর্বেই প্রত্যর্পিত হয়ে গেছে—দুঃখিত।

হিপ্পিদের কৈফিয়ৎ

সহানুভূতিহীন, অবুঝ-অবিশ্বাসীদের মুখে হিপ্পিদের কত শুনতে হয়: পয়সা-কড়ি কোত্থেকে হাতাও বাপু, বল দিকি... "কেউ, হায়, আমাদের শুধোয় না: আহা বাছারা, তোমাদের পেট চলে কি করে? নিত্য পিত্তিরক্ষার ব্যবস্থাটা কেমন করে করে ওঠ?"

কেউ বলে: তোমাদের যুক্তি-টুক্তি আসলে কুযুক্তি। এমনিতে তো বারফট্টাই করে সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখাও... বিপাকে পড়লে আবার তারই করুণাছায়ায় মাথা গুঁজতে আস; ডাক্তার-হাসপাতাল সবেরই সুযোগ নাও।

ওরা জবাব দেয়: সমাজের সঙ্গে আমরা তো যুদ্ধ ঘোষণা করিনি, করেছি সন্ধি-স্থাপন। বোমা আমরা ছুঁড়ি না, ব্যারিকেড তুলি না, লুঠ করি না ব্যাংক। আলাদা থাকি শুধু, বাস্।

অবিশ্বাসী আপত্তির জাল বুনে চলে: কিন্তু তোমাদের নিঃশর্ত শান্তিবাদটুকু বাদ দিলে, হিপ্পি-নীতি বলতে আর থাকে কি? মারিহুয়ানা, কিছু গান-বাজনা, গোটাকতক ছবি-টবি... বড়জোর দু-একজন ভাবুক, তাও আবার তাঁরা মুকোদীপ মুকে...।

"আমরা খুঁজে চলেছি কিছু একটা। আর, খুঁজছি যখন, এর মানে এই যে, আমরা জানি, আমরা এখনও তা পাইনি—আর সেটাই মস্ত বড় এক লাভ। ভুলবেন না সেই সব মানুষের কথা, জগতের ইতিহাসে যাঁরা নতুন খাত কেটেছেন। তাঁরা বাঁধা গৎ-এর বেড়া ভেঙেছেন, অনেকে সংস্কারকে বিদ্ধ করেছেন, অনেকে রীতি-পদ্ধতির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, মানি না। যা কিছু হয়েছে, সংশয় থেকেই সে সবের উদ্ভব। না, সেই শৃঙ্খলিত সংশয়বাদের কথা বলছি না (ওটাও বিশ্বাসহন্তারই আরেক পিঠ), বলছি সেই মজ্জাগত সংশয়ের কথা, বিবেকের পীড়নে যার স্ফুরণ...। ঠিকই বলেছেন, এক্ষুনি উচ্চারণের মতো কোনো প্রস্তাব নিয়ে আমরা প্রস্তুত নই, কিন্তু তা বলেই কি আপনাদের রঙ্গভূমি থেকে পিঠটান দিতে অনুমতি পাব না?...আর, ধরুন—ও-পথে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, এমন কিছু যা নাস্তিকও নয়, ঈশ্বরও নয়, চলতি কোনো মতবাদও নয়? যদি সেই মনোজগৎ, বিশ্ব-জগতের মতোই, হয় সীমাহীন? আর সেই অসীমকে আমাদের হাতের নাগালে সত্যিই যদি আনা যায়, তা হলে?"

অবিশ্বাসী তখন ব্রহ্মাস্ত্রটি ছাড়ে: কিন্তু হিপ্পিমশাই, এ তো তুমি মানবেই, ঐ মাদকদ্রব্যগুলি ডেঞ্জারাস!

ডেঞ্জারাস বৈ কি, মারাত্মক ডেঞ্জারাস—হিপ্পিও ছোঁড়ে হুলফোটানো উত্তর—কিন্তু আমাদের জন্য নয়, আপনাদেরই জন্য, সেই সব কর্তাব্যক্তির জন্য, ক্ষমতার সিংহাসনে যাঁরা বসে আছেন, প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধানের মস্ত অথর্ব অচলায়তনী জাদুঘরের পান্ডা-পুরুত হয়ে। আমরা মাদকসেবী, আর তার ক্ষতির বোঝা বহন করেন আপনারাই। গাঁজার উপর আপনারা খড়্গহস্ত, তার কারণ—আপনাদের মতে—গঞ্জিকার নেশা মানুষকে নিরুদ্যম আর নিস্তেজ করে ফেলে, ফলে

দুর্বল হয়ে পড়ে দেশ। দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করেন মুসলমান দেশগুলির কথা। ওরা কিন্তু নিরুদ্যম গঞ্জিকা সেবনের জন্য নয়, জৈবিক ও ধর্মীয় কারণে; ওদের মধ্যে গাঁজা যারা কস্মিনকালে ছোঁয় না—আর ওদের নারীসমাজও—নিরুদ্যম প্রকৃতির। আসলে আমাদের নিয়ে আপনাদের প্রকৃত আতঙ্কের কারণ এই : আপনারা যুদ্ধবাজ, আর আমরা সর্বতোভাবে শান্তিবাদী। হিপ্পি-ধর্ম পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লে আপনাদের যুদ্ধ যুঝবে কে?

মাদক সংহিতা

লেখক নিজের জবানিতে কথা বলেন এবার। মাদকমাত্র সর্বনাশা নয় এ-কথাটা সত্য; কড়া আর মৃদু, মাদকের মধ্যে পার্থক্য আছে বটে। কড়া মাদক বলতে বোঝায় ধসাড়কারী নার্কোটিকগুলি — রাসায়নিক (যেমন amphetamines) আর উদ্ভিজ্জ (কোকেন, আফিং...)। মৃদুতমগুলো মাদকতা আনে এরা, প্রকৃত নেশায় দাঁড়িয়ে যায়, অভ্যাসে পরিণত হয়, এমন কি প্রয়োজনে। কিন্তু কাঁড়ির পাশে কোমলের মতো এদের পাশে আছে ভাঙ; আমেরিকার মারিহুয়ানা এবং—মারিহুয়ানার চেয়ে ছয় গুণ প্রবল—প্রাচ্যের গাঁজা একই বংশজাত। সারা দুনিয়ায় ত্রিশ কোটি মানুষ এর সেবনে রত। আর আছে 'অ্যাসিড', ওরফে এল এস ডি ২৫। ভাঙ কিংবা অ্যাসিড—কোনোটি অভ্যাসে কিংবা প্রয়োজনের পর্যায়ে নেমে আসে না : তিন বছর ধরে স্বেচ্ছাক্রমে ভাঙ-ভক্ষণ করার পর বিনা কষ্টে একেবারে ত্যাগ করেছেন—এমন উদাহরণ লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। ভাঙ কিংবা অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া শারীরিক নয়, মানসিক। কোনো কোনো উগ্রবুদ্ধি দেখিয়ে দিয়েছেন, কোহল ও তামাকের তুলনায় এরা কম ক্ষতিকর। হিপ্পিরা কোহল স্পর্শ করে না কখনো (তামাকেও বিতৃষ্ণ অনেকে); তারা জানে কোহল চেতনাকে আচ্ছন্ন করে, স্তিমিত করে, ভাঙ কিন্তু চেতনাকে শাণিত করে। কোনো কোনো চিকিৎসক অবশ্য ভাঙ ও অ্যাসিডের সম্ভাব্য শারীরিক কুফলের কথা বলেছেন, কিন্তু নির্ধারণ করে উঠতে পারেন নি—সেটা কি।

সাচ্চা হিপ্পিরা কড়া মাদকের ধার দিয়েও যায় না। যারা যায়, তাদের ওরা দলচ্যুত করে নাম দেয় 'জাঙ্কি'। হিপ্পিদের চোখে জাঙ্কিরা ব্রাত্য, দলগত মনোভাবহীন নিছক নেশাখোর, তুরস্ক অবধি এসে তারা খোঁয়াড়িতে মজে, পাদমেকং আর নড়ানো ভার। প্রশ্ন তোলা হয়েছে : ভাঙ-সেবী হিপ্পিরা কি শেষ পর্যন্ত আফিম-সেবীতে পরিণত হয়ে যায় না? উত্তর : শতকরা নব্বইজন যায় না।

মাদকের এই জাতিভেদের কথাটা মনে না রাখাটা বিপজ্জনক। অনেকেই কিন্তু তা রাখে না; বহু দেশে নার্কোটিক যা অ্যাসিডও তাই : অ্যাসিড সুদ্ধ ধরা পড়লে খুনে-গুন্ডাদের সঙ্গে কারাবাসের দণ্ডাদেশ অবধারিত। এমন কি সদিচ্ছা-প্রণোদিত ব্যক্তিও আছে যারা বাছবিচার না ক'রে সব শ্রেণীর মাদককেই সমান বিষাক্ত ঘোষণা করে ভাবে, কড়া মাদকের ভয়ঙ্কর দুষ্প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে হিপ্পির ঝাড়ের ভাঙের মোহও কেটে যাবে। ফল কিন্তু হবে উল্টো : ভাঙের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই—এটা বুঝে ফেলার পর আফিং-ও যে নিরাপদ—সেটা ধ'রে নেওয়ার প্রমাদে প'ড়ে যাবে যুবক-যুবতীরা। এই ভুলটা মারাত্মক।

মাদকের নিষিদ্ধীকরণে কি কোনো লাভ আছে?...ওরা যদি এমন এক বিকল্প বের করে যা আরো বেশি ক্ষতিকর? চীনের কথা ভাবুন : সারা দেশটায় আফিং যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল তামাকের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা। বস্তুতপক্ষে বাজার নিয়ন্ত্রিত করে লোকের নেশা ছোটানোর চেষ্টা সফল হবার নয়। এই তো সম্প্রতি অদ্ভুত এক মাদকের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে : আদি-অকৃত্রিম কলার খোসা। এই মাদক খরতরঙ্গ রোধিবে কে?...নিষিদ্ধ করলে বাড়বে আদম-সন্তানের নিষিদ্ধ-ফলের প্রতি আকর্ষণ। বরং ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন মৃদু মাদকের জন্য খোলা বাজার খুলে দেওয়া হয়, লোকে মদ খাবে কম, আর আফিং-চালানকারীদের আকাশচুম্বী মুনাফা বানচাল হয়ে যাবে।

তাছাড়া এই যে দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ কাঁড়ি কাঁড়ি ঘুমের বড়ি, ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশমক ওষুধ, আর সকাল-বিকাল অ্যান্টিবায়োটিক গিলছে—স্রেফ অভ্যাসের বশে, সত্যিকার প্রয়োজন বিনাই—ওগুলো গাঁজার কল্কের চেয়ে কি কম অনিষ্টকারী? মদ আর তামাকের কথা ছেড়েই দিলাম, সে তো অধিকাংশ আধুনিক মানুষের ডালভাত। এইসব প্রাণশক্তিঘাতী বাঘা বাঘা নেশার হাতে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে কত অসংখ্য লোক! জনস্বাস্থ্যের কি বিপুল ক্ষতিসাধন, পারিবারিক ও জাতীয় অর্থের কি প্রচুর অপচয়। রেডিও আর টেলিভিসন-কেও কি নেশার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে না? বিবেকের অবনমন ও স্বেচ্ছানির্ভর নির্বাচনবুদ্ধির বিনাশের জন্য ওদের প্রচারিত প্রোপাগান্ডা কি কোনো অংশে দায়ী নয়?...আরও নেশা আছে, পর্নোগ্রফীর নেশা, চলতি ও সর্বশেষ ফ্যাশনের নেশা, ঘোড়ার রেসের নেশা, মোটর-গাড়ির নেশা!...গাঁজাখোর হিপ্পিরা, জানেন, এ-সব নেশাকে রাখে শতহস্ত দূরে।

হিসেব-নিকেশ

মাদক-সেবন গোড়ার দিকে থাকে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণার একটি প্রকরণ। আমাদের ছেলেবেলাতেও—লেখক বলেন—আমরা লক্ষ্য করেছি সেই বিদ্রোহ : স্কুলের ছেলেরা টয়লেটে ঢুকে ধূমপান করত, কলেজের ছাত্রেরা লুকিয়ে চুরিয়ে নিষিদ্ধ-পল্লীতে গমন করত : বাড়ি থেকে পালিয়ে আফ্রিকায় ভাগ্যানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ার আগে সেটা ছিল তাদের পক্ষে দুঃসাহসিকতায় হাতে-খড়ি!

গুণাগুণের হিসেব-নিকেশ করতে গেলে বলতেই হবে ভাঙেরও একটা বিপদ আছে : যে মানুষ স্বভাবতই নিউরটিক, ভাঙ তার সামনে সেই নিউরসিসের স্বরূপ উন্মোচন ক'রে দেয়—এবং সেক্ষেত্রে অবশ্য থাকে আসক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে যে কখনও কোনো বাঁচার অর্থ কিংবা বাঁচার তাগিদের সন্ধান পায়নি, ভাঙের মধ্যে যদি সে তা খুঁজতে যায়, তবে সে নিরাশ হতে বাধ্য। মানসিক অর্থে যারা সুস্থ, শুধু তাদের পক্ষে ভাঙ নির্দোষ।

এদিকে অ্যাসিড মূঢ়কে নিয়ে যায় তার মূঢ়তার চূড়ান্তে, নিউরটিককে তার নিউরসিসের চরমে সীমায়...। সামান্য দুর্ঘটনায় যারা উদ্বেজিত, মাস-শেষের অর্থ সমস্যায় যারা শংকাগ্রস্ত, আকস্মিক দন্তশূলে যারা কাতর—অ্যাসিড-ঘটিত আত্ম-লঙ্ঘনকারী বিচিত্র সম্ভাবনাময় অভিযানের অভিসারে নামতে গেলে তো বিপদ হবেই তাদের! তাদের সাক্ষ্য তাই অ্যাসিডকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। দুরূহ বৈকি এই অভিযান : নিজেকে এমন ছাল ছাড়িয়ে উলঙ্গ ক'রে ছিঁড়েখুঁড়ে দেখাটা কি সহজ কথা? ছ-ঘণ্টা ধ'রে যে ভীষণ আবিষ্কারের সম্মুখীন হতে হয়—সাতে বিধৃত থাকে পাঁচ-পাঁচটা বছরের মনঃসমীক্ষণের সারাৎসার—তাকে সহ্য করতে

পারে সত্যি সত্যি কজন? লেখকের পরামর্শ : মাত্রা-পরিমাপ সুনির্দিষ্ট রাখুন; একা একা এই আত্মভেজ্যরে কদাপি নামবেন না, পাশে রাখুন আপনার চিকিৎসক কিংবা অভিজ্ঞ আধ্যাত্মিক উপদেষ্টাকে; মাসে দুবারের বেশি সেবন অবিধেয়। লেখক নিজে সাকুল্যে ৫৭ বার সফলভাবে সেই মাদক সেবন করার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন : "ঠিক যেন এক লটারি—যাতে প্রতি মাত্র কয়েকটি লোকসানের শিকার হবারবাকি অসংখ্য।

মুমূর্ষুর কাছেও আসিড আনে এক ধরনের সান্ত্বনা। ডাক্তারেরা এমন বহু ক্যানসার-রোগীর কথা বলেছেন, যারা নিজেদের আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে নিরাসক্তভাবে কথাবার্তা বলে—যা পাশ্চাত্ত্য জগতে সচরাচর বিরলদৃষ্ট।"

শেষ যেন একটা কথা স্পষ্টভাবে বলা দরকার : ড্রাগ—কিংবা আসিড দুবাটি কোনো সমস্যায় সত্যকার সমাধান নয়। ড্রাগ নির্দোষ—কিন্তু নির্জীবও বটে। "যারা এর সুবিবেচিত যথাযোগ্য ব্যবহারের তাগিদ রাখে তারা এমনিতেই বাঁচার ও ভালো-বাসার অর্থ খুঁজে পাবার উপযুক্ত, তারা এমনিতেই এই বিষণ্ণ জগতের বিষ দমবন্ধতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম।"

সমাধান তাই অন্যত্র। "চাই এমন এক প্রতিষেধক ঘরছাড়া সন্ধানীদের যা দেবে বেদনার উপশম, মানসিক ভারসাম্য, আত্মার স্বাধীনতা, অথবা স্বয়ং ঈশ্বরেরই খোঁজ...।"

অমরাবতীর অমর কথা

অরুণ সোম

জমিদারের বাড়ি তৈরি হবে। অমরেশ্বরের মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক নতুন নগরের পত্তন হবে। পাথর চাই, চুন চাই। পাথরের জন্য পাবেন [illegible] এক উঁচু ঢিবিতে। ঢিবিটাকে ওরা বলত দীপালদিন্নে। [illegible] ১৭৯৬ সালে।

অমরাবতীর বৌদ্ধস্তূপ ও তার অপূর্ব কারুকার্য নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিস্মৃত হয়ে যেত যদি না একজন ভারত প্রেমিক সেখানে ছুটে আসতেন। নাম তার কলিন ম্যাকেঞ্জি। পরবর্তীকালে তিনি ভারতের সার্ভেয়র জেনারেল হয়েছিলেন। ম্যাকেঞ্জি অমরাবতীতে এসেছিলেন ১৭৯৭ সালে। তখনও জমিদারের লোক বিপুল উৎসাহে কাজ চালাচ্ছিল। ম্যাকেঞ্জি পুরাতত্ত্বের নিদর্শন সংগ্রাহক। দীপালদিন্নে দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি বিরাট বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংস হয়ে চলেছে। কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না। জরীপের কাজে তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মন চলে যেত অমরাবতীতে।

ম্যাকেঞ্জি অমরাবতীতে আবার এলেন প্রায় উনিশ বছর পরে, মার্চ, ১৮১৬ সাল। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কয়েকজন ড্রাফটসম্যান ও সহকারী। আগস্ট মাসে তাঁকে যেতে হল কার্যস্থলে। কিন্তু তাঁর সহকারীরা রয়ে গেলেন দু বছর, মার্চ ১৮১৮ সাল। তাঁরা স্তূপের বিভিন্ন অংশের মাপ নিয়ে নকশা তৈরি করলেন। ততদিনে ঢিবি আরও অনেক ধ্বসেছে। তার মাথায় পুকুর তৈরি করার জন্য খোঁড়া হচ্ছে।

ম্যাকেঞ্জি দুটি প্রবন্ধে অমরাবতী স্তূপ সম্পর্কে তাঁর গৃহীত তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে কমনওয়েলথ রিলেশনস অফিসের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তাতে ৭ই এপ্রিল, ১৮১৭ তারিখের এক নোটে ম্যাকেঞ্জি লেখেন, "পাণ্ডুলিপি সমেত দীপালদিন্নার এগারোটি পাথর মসুলিপট্টমের মেজর কটগ্রেভকে দেওয়া হয়, তার মধ্যে সাতটি কলকাতায় পাঠান হয়েছে। বাকী চারটি—যার মধ্যে দুটোতে সিংহ বিশিষ্ট স্তম্ভ ও বিভিন্ন মূর্তি খোদাই আছে—আমার [illegible] নম্বর ৩ ও ৪ খোলা পাথরগুলির মধ্যে সুন্দর ভাস্কর্যবিশিষ্ট গোলাকার পাথর, ৫নং একটি বড় শিলালিপি যার ক্ষুদ্র সংস্করণ গত বছর পাঠান হয়েছে।" অসম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে নোটটি। ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ তারিখে কটগ্রেভকে লিখিত এক চিঠিতে কলকাতায় প্রস্তর-গুলির প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়েছে। চিঠিটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে। এগারোটি ভাস্কর্যের মধ্যে দুটি ম্যাকেঞ্জি এসিয়াটিক সোসাইটিকে দান করেন। পরে সে দুটি কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়। সম্ভবত ম্যাকেঞ্জির মৃত্যুর পর বাকী নটি লণ্ডনে পাঠান হয়। লেডেন হল স্ট্রীটস্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যাদুঘরে সেগুলি রাখা হয়। আরও কতগুলি কারুকার্য বিশিষ্ট পাথর ম্যাকেঞ্জি মসুলিপট্টমে পাঠিয়েছিলেন। রবার্টসন নামে জনৈক ইংরেজ বাজারের মধ্যে একটি পার্কে সেগুলি সাজিয়ে রাখেন। ১৮৩৫ সালে ডাঃ বেজা এরকম তেত্রিশটি প্রস্তর ফলক দেখেছিলেন। সেগুলি পরে আলেকজাণ্ডার নামে একজন ইংরেজের বাগানে স্থানান্তরিত হয়।

১৮৪৫ সালে অমরাবতীর স্তূপ পরিদর্শনে এলেন, স্যার ওয়াল্টার এলিয়ট। তখন স্তূপের অবস্থার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা হল—"একটি গোলাকার ঢিবি, শীর্ষভাগে গহ্বর কিন্তু এখানে যে এককালে কোন সৌধ ছিল তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, পূর্ববর্তী খননের ফলে ভাস্কর্যের নিদর্শন-বিশিষ্ট যেসব প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়েছিল সে সমস্ত পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হয়েছে।"

এলিয়ট ঢিবিটার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খনন শুরু করলেন। স্তূপের ভগ্নাবশেষ তখনও ছিল মাটির আড়ালে। ভাস্কর্য-বিশিষ্ট বহু প্রস্তরখণ্ড এলিয়ট সংগ্রহ করলেন। তিনি সেগুলি মাদ্রাজে পাঠান। সেখানে অযত্নে অবহেলায় সেগুলি নষ্ট হতে লাগল। মাদ্রাজের সরকারী যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত অফিসার এডওয়ার্ড বালফোর রেভারেণ্ড উইলিয়ম টেলরকে অনুরোধ করেন অমরাবতী স্তূপের প্রস্তর খণ্ডগুলির একটি বিবরণ দেওয়ার জন্য। রেভারেণ্ড টেলর ৭৯টি প্রস্তরখণ্ডের তালিকা দেন তার মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে মসুলিপট্টম থেকে আরও ৩৭টি প্রস্তরখণ্ড আসে। টেলর

অমরাবতী স্তূপের নকশা

স্তূপের প্রতিকৃতি (ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ফেরত পাওয়া)

সেগুলিও নিজের তালিকায় যোগ করেন। এলিয়ট নিজও এদিক ওদিক ৪৯টি প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করেন।

১৮৫৯ সালে ১২১টি প্রস্তরখণ্ড লণ্ডনে পাঠান হয়। এগুলির নামকরণ হয় 'এলিয়ট মার্বেল'। ১৮৬০ সালে লণ্ডনে সেগুলি পৌঁছায় এবং প্রায় একবছর জাহাজঘাটায় পড়ে থাকে। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে, ইণ্ডিয়া অফিস সবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া অফিস ইতিমধ্যে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। অতএব অমরাবতী স্তূপের প্রস্তরখণ্ডগুলি রাখার স্থান হল না কোথাও। ১৮৬১ সনে সেগুলি হোয়াইট হলের ফিফে হাউসে স্থানান্তরিত করা হয়। বাহারের জন্য দু-তিনটি সুন্দর ভাস্কর্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড ফটকে লাগান হয়েছিল। লণ্ডনের আবহাওয়ায় সেগুলি নষ্ট হতে বেশী দেরি হয় নি।

লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে ছিল পাথরগুলো প্রায় দুবছর। আরও কতকাল পড়ে থাকত কে জানে! তাদের আলোয় টেনে আনলেন যিনি তাঁর নাম জেমস ফার্গুসন। ভারতে তাঁর পরিচিত একটা নাম।

ফার্গুসন ছিলেন ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃত অনুরাগী। অমরাবতীর ভাস্কর্য তাঁর নজরে পড়ল ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। সেই বছরই অমরাবতী স্তূপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন। পরের বছর প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "ট্রি অ্যাণ্ড সারপেণ্ট ওয়রশিপ" (বৃক্ষ ও সর্পপূজা)। লণ্ডনে অমরাবতী ভাস্কর্যের নিদর্শনের পূর্ণ বিবরণ ছাড়াও এই পুস্তকে অমরাবতী স্তূপ কেমন দেখতে ছিল তার আভাস ফার্গুসন দিয়েছিলেন। ১৮৬৯ সালে ভারতীয় যাদুঘরটি নবনির্মিত ইণ্ডিয়া অফিসে স্থানান্তরিত হল। অমরাবতী ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি স্থান পেল সম্ভবত। ল্যাম্বেথে ইণ্ডিয়া স্টোরস-এ। সেখানেও বেশীদিন থাকা হল না। ১৮৭৪ সালে ডিসেম্বর মাসে সাউথ কেনসিংটনস্থিত ইস্টার্ন গ্যালারিজ লীজ পাওয়া গেল ভারতীয় যাদুঘরের জন্য।

এই নতুন জায়গায় ভারতীয় যাদুঘরের উদ্বোধন করা হয় ১৮৭৫ সালে। সম্ভবত ফার্গুসন স্বয়ং অমরাবতীর পাথরগুলোকে সাজিয়ে রাখেন। এই প্রথম ব্রিটিশ রসজ্ঞদের সামনে অমরাবতীর ভাস্কর্য আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে সেগুলি ছিল চার বছর। ১৮৭৯ সালে নভেম্বর মাসে ভারতীয় যাদুঘর তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়। এর সমস্ত জিনিস ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামের নবগঠিত ভারতীয় শাখার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

এইভাবে নানা দুর্যোগ পেরিয়ে অমরাবতীর ভাস্কর্য ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাকাপাকিভাবে স্থান পেল। সেখানে পাথরগুলিকে এমনভাবে সাজান হয়েছে যে, অমরাবতী স্তূপের মোটামুটি আভাস তাতে পাওয়া যায়। কয়েক মাস আগে ব্রিটিশ মিউজিয়াম অমরাবতীর স্তূপের চারটি পাথর নিউ দিল্লিস্থ জাতীয় যাদুঘরকে দান করেছে।

স্তূপের রেলিংয়ের একাংশ—মালা ও মালা বাহক। (ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ফেরত পাওয়া)

মহান অমরাবতী স্তূপের অধিকাংশ পাথর আজ সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। আর স্তূপটি যেখানে নির্মিত হয়েছিল সেই স্থানটিও তার ইতিহাসের সমান করে। ১৮৭৭ সালে রবার্ট সিওয়েল অমরাবতীর সেই ঢিবিটার উত্তর-পশ্চিম অংশ খুঁড়ে অমরাবতী স্তূপের টুকরো টুকরো অংশ পেয়েছিলেন। তিনি সেগুলির বিশদ বিবরণ দিয়ে গেছেন। ঠিক তিন বছর পরে মাদ্রাজের তদানীন্তন গভর্নর ডিউক অব বাকিংহাম অমরাবতী স্তূপ খননের ঢালাও হুকুম দিলেন। ফলে সব কিছু পরিষ্কার। এখন অমরাবতীতে গেলে যাদুঘরে স্তূপের ভাস্কর্য দেখতে হবে।

অমরাবতী স্তূপের পুনরাবিষ্কারের বিশদ ও মনোজ্ঞ বিবরণ ব্যারেট তাঁর "স্কালপচার ফ্রম অমরাবতী ইন ব্রিটিশ মিউজিয়াম" বইতে দিয়েছেন। এবার স্তূপের অতীত ইতিহাস তুলে ধরা যাক।

অমরাবতীর জন্মলগ্ন খৃষ্ট জন্মের প্রায় দু'শ বছর আগে। শতবাহন রাজবংশের সৃষ্টি। অন্ধ্রদেশ শতবাহনদের কুক্ষিগত হওয়ার পর শিল্পকলার বিকাশের দিকে শতবাহন নৃপতিদের নজর পড়ে। অমরাবতীর স্তূপ তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তখন অমরাবতীর অদূরে ধান্যকটক ছিল তাঁদের রাজধানী। এই ধান্যকটক ছিল বৌদ্ধদের তীর্থস্থান। স্তূপের কারুকার্যের মধ্যে ক্রমবিবর্তনের সুস্পষ্ট ছাপ আছে। খৃষ্ট জন্মের দু'শ বছর আগে এর নির্মাণ শুরু হয়ে চারটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে স্তূপটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্যায় হল খৃষ্ট জন্মের প্রায় একশ বছর পরে। স্তূপের ভিত্তিপাথরগুলি যাতে বুদ্ধের জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনা—বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, প্রথম উপদেশ দান ও নির্বাণ—প্রতীকের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। শাক্যসিংহের প্রতীক স্বরূপ সারি সারি সিংহ ও এই পর্যায়ের সপ্তখোদিত বিরাট পাথরগুলিও এই পর্যায়ের। তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ২০০ খৃষ্টাব্দে। অপূর্ব কারুকার্য-বিশিষ্ট রেলিংটি এই পর্বের সৃষ্টি। চতুর্থ পর্বের হল স্তূপের প্রতিকৃতি খোদাই করা পাথরগুলি।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষাশেষি অন্ধ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের অধিপত্যের অবসান ঘটে। একটানা রাজা ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেও কোন কোন রাজা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। তিনি ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থানের বিবরণ দিতে গিয়ে ধান্যকটকের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাঁর কাছে ধান্যকটক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তে-না-কা-চে-ক। আশ্চর্যের বিষয় হিউয়েন সাঙ স্তূপের কোন উল্লেখ করেন নি। ধান্যকটকে বৌদ্ধ প্রভাব যে বেশ কিছুকাল অক্ষুন্ন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আবিষ্কৃত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের কতকগুলি ব্রোঞ্জ মূর্তিতে। এগুলি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে একাদশ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল।

অমরাবতী স্তূপটি যে রীতিমত মেরামত করা হচ্ছিল তা সেখানের অমরেশ্বর মন্দিরে একটি স্তম্ভে খোদিত বিবরণে "মহান স্তূপের" উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। এই বিবরণটি ১১৮২ খৃষ্টাব্দে খোদাই করা হয়েছিল। সেই স্তম্ভের আর একটি লিপিতে শ্রীবুদ্ধের—"যিনি শ্রীধান্যকটকে অবস্থান করছেন"—উল্লেখ করা হয়েছে। এই লিপিটির রচনাকাল ১২৩৪ খৃষ্টাব্দ। অমরাবতীর বৌদ্ধ স্তূপের সর্বশেষ বিবরণ পাওয়া গিয়েছে (১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে) সিংহলের

শাক্যগণ কর্তৃক বুদ্ধের পূজা। বুদ্ধের প্রতীক। (ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ফেরত পাওয়া)

কাণ্ডী জেলায় গাদালাদেনিয়ার শিলালিপিতে। এই শিলালিপি অনুযায়ী বিখ্যাত সিংহলী সন্ত ধর্মকীর্তি ধান্যকটকে দোতলা মন্দির তৈরি করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অমরাবতীর উল্লেখ নানা স্থানে পাওয়া গেলেও ধান্যকটকের বৌদ্ধ স্তূপ সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। তার পরের ইতিহাস আগেই বলা হয়েছে।

নানা হিসাব করে স্তূপটির মোটামুটি যে বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে তাতে এটি যে ভারতের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্তূপ ছিল সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ। অমরাবতীর স্তূপ বিশেষজ্ঞ শ্রীশিবরামমূর্তি বলেন, "অমরাবতীর ভাস্কর্য শতবাহন শিল্পকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। স্তূপকে বেষ্টন করে যে রেলিং তৈরি করা হয়েছিল তাতে বিভিন্ন জাতক কাহিনী, অবদান ও বুদ্ধজীবনের নানা ঘটনা অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে খোদাই করা হয়েছিল। তা দেখে শিল্পানুরাগীরা ঠিকই বলেন যে, কৃষ্ণা উপত্যকার বৌদ্ধ শিল্পকলার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবশেষ হল এই। সাঁচীর সরল রূপটির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এখানে। ভরহুত, বৌদ্ধগয়া ও মথুরার পদ্মাকৃতি অমরাবতীর পদ্মাকৃতিগুলির পাশে দাঁড়াতে পারে না। তেমনি গান্ধার বা মথুরা শৈলীর মালা বা মালাবাহক অমরাবতী স্তূপের মালা বা মালাবাহকের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। এই মালা বাহকের নকশা অমরাবতীতে নিখুঁৎ রূপ নেয়। এই শিল্পরীতি পল্লব যুগেও অব্যাহত ছিল। ভারতের বাইরেও তা ছড়িয়ে পড়ে এবং জাভার শিল্পে একটি বিশিষ্ট স্থান পায়।"

অমরাবতীর স্তূপকে বেষ্টন করে ছিল বেদিকা বা রেলিং। এটির ব্যাস ছিল একশ বিরানব্বই ফুট। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিম কোণে চারটি ফটক ছিল। রেলিংয়ের দুদিকে অপূর্ব কারুকার্য ছিল। বাইরে ছিল একটানা মালা এবং সেটি বহন করছে তরুণের দল। এটি ভারতীয় ভাস্কর্যে গ্রীক প্রভাবের নিদর্শন। মালার ভেতরে ভেতরে নানা নকশা। তার মধ্যে প্রধান হল বৃক্ষ, চক্র ও স্তূপ—তথাগতের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, প্রথম উপদেশ ও নির্বাণের প্রতীক।

রেলিংয়ের ভেতর দিকে ছিল তের ফুট চওড়া প্রদক্ষিণ পথ। পথটি ধূসর রংয়ের চুনাপাথরে ঢাকা। স্তূপের ভিত্তির ব্যাস ছিল ১৬২ ফুট ৫ ইঞ্চি। চার ফুট চওড়া দেওয়ালের ওপরে সারি সারি বড় বড় পাথর বসান ছিল, তাতে স্তূপের আকৃতি খোদাই করা হয়েছিল। নানা ধরনের স্তূপের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়।

স্তূপের গম্বুজের ব্যাস ছিল ১৩৮ ফুট। গম্বুজের ওপরে ছিল হর্মিকা। চব্বিশ ফুট লম্বা রেলিং দিয়ে একটা স্কোয়ার তৈরি করা হয়েছিল। এই রেলিংয়ের কারুকার্য নীচের রেলিংয়ের অনুরূপ। গম্বুজের গা প্লাস্টার করা ছিল তাতে পদ্ম, পূর্ণ ঘট, মালাবাহক বাহন ও মালা আঁকা ছিল।

স্তূপের কোথায় বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত ছিল তা জানা যায় নি। যে জমিদার ঢিবিটা খুঁড়িয়েছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একটি পাথরের বাক্স ও স্ফটিকের কৌটা পাওয়া গিয়েছে। এ দুটি এখন মাদ্রাজের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

জাতক কাহিনী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ফেরত পাওয়া)

হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে তোমাকে চিঠি, অরূপ

প্রিয় অরূপ,

তোমাদের বালিগঞ্জের বাড়ি তুমি ছেড়েছ তোমার উনিশ বছর বয়সে, এখন তুমি একুশ। তোমার বাবা আমার বহুদিনের বন্ধু, ছুটির দিনে তোমাদের বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে মাঝে মাঝে তোমার সাথে দেখা হতো, তুমি লাজুক হাসতে। তখন তোমার বয়স উনিশ, তুমি প্রেসিডেন্সিতে পড়তে, তোমাকে দেখে আমার নিজের লাজুক গরীব উত্তেজিত কলেজ বয়সের কথা মনে পড়তো।

তোমার নাম তোমাদের বাড়িতে এখন আর কেউ উচ্চারণ করেন না। রাগে নয়, দুঃখে, আমাদের অভ্যাস বেশি দুঃখের ব্যাপারগুলি যেমন আমরা বাইরের লোকের সামনে বলতে চাই না। তুমি বাড়ির ছোটো ছেলে, আজ দু'বছর তোমার কোনো খোঁজ নেই, নিশ্চয় তোমার বাবা মার খুব দুঃখ। তোমার মাকে বিশেষ দেখি না, তোমার বাবাকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই, ঝপ করে খানিকটা বেশি অথর্ব হয়ে গেছেন।

অবশ্য এই দুঃখের কোনো মূল্য তোমার কাছে নেই, খুব স্বাভাবিকভাবেই। আমরা খুব কম লোকই কোনো মৃত্যুস্পর্শী খোঁজে যাই, কিন্তু আমাদের সকলেরই দরকার ঘর ভেঙে বেরিয়ে জীবনকে নিজের মতো করে অধিকার করার চেষ্টার। এই চেষ্টা বাবা-মাকে ক্রুদ্ধ করে, দুঃখ দেয় সব দেশে। সাহেবদের দেশে দুটো যুদ্ধে অগণিত ছেলেদের মৃত্যু সবাইকে রক্তে-মাংসে বুঝিয়ে দিয়েছে জীবন জিনিসটা কী ভীষণ অটেকসই, কী নিরুপায়ভাবে শুধুমাত্র একবারের। তাই বাবা-মা দুঃখ পেলেও, চটলেও মেনে নেন যে ছেলেরা মেয়েরা শাসন ভেঙে নিজেদের মতো বাঁচতে বেরিয়ে যাবেই। আমাদের দেশে সাধারণত বেঁচে থাকা হয় এই প্রিন্সিপল-এর উপর যে জীবন অনন্ত। এইজন্য আমাদের ছেলেরা মেয়েরা বাবা-মার পছন্দমতো পথে না চললে রাগ বা দুঃখ একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে ঘটে।

কানাঘুষোয় শুনতে পাই, তোমার এলাকা আগে ছিল মেদিনীপুর অঞ্চল, এখন কলকাতারই শহরতলিতে কোথাও আছ। তোমার বিরুদ্ধে দুটো খুনের চার্জ, তুমি

তরুণ দত্ত

•

নকশালপন্থী আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য কর্মী।

আমার মনে আছে বছর তিনেক আগে তোমার সাথে দুয়েকদিন আমার এইসব ব্যাপারে ভাসাভাসা আলোচনা হয়েছিল। সেই সময়েই প্রেসিডেন্সি কলেজ হঠাৎ নকশাল আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। তোমার মুখে তোমাদের কলেজের বর্ণনা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, কেননা ঐ কলেজেই বছর বারো আগে, আমি মোটামুটি আনন্দের সাথে কয়েক বছর পড়াশুনো করার ভান করেছিলাম। তুমি বলেছিলে তোমাদের কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছিল একটা চিৎকারময় শ্রেণীভেদ—একদিকে ইংরেজি বলিয়ে, বহুমূল্য আধুনিকতম পোশাকে সজ্জিত উজ্জ্বল মুখের সুদর্শন বড়োলোকের ছেলেরা এবং তাদেরই দিকে যাদের বাঁকা লক্ষ্য, সেইসব, মহার্ঘ যৌন পুতুলের মতো, বড়োলোকের মেয়েরা এবং অন্যদিকে ম্লান কুণ্ঠিত অপরিচ্ছন্ন নিজেদের সম্পর্কে অতি সচেতন গরীব ছেলেরা। তুমি ঠিক গরীব ছিলে না; কিন্তু বেতনভুক ইংরেজিনবিশ শ্রেণী যে চাকচিক্যটুকু যোগাড় করে সেটা তোমাদের ছাপোষা বাঙালী বাড়িতে সম্ভব ছিল না, তাই তুমি ছিলে দ্বিতীয় দলে। তোমাদের কলেজের ক্যান্টিনে দু' টাকার কম কোনো খাবার পাওয়া যেত না, তাই তোমাদের শ্রেণীর ছেলেরা সেখানে ঢুকতে সাহস পেত না, সেখানটা আলো করে থাকতো বড়োলোকের ছেলেরা মেয়েরা। তোমরা জটলা করতে ঘুপচি চায়ের দোকানে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

তোমার কথা শুনে কষ্টের সাথে মনে হয়েছিল গত কয়েক বছরে সমাজের শ্রেণী বিভাগের প্রান্তগুলি এত নিদারুণ শাণিত হয়ে উঠেছে যে, উনিশ কুড়ি বছরের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জগতেও অবজ্ঞা ও আক্রোশের আলো লেগে ধারগুলি চমকাচ্ছে, ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই রক্তপাত ঘটে।

তুমি আমাকে বলেছিলে ঠিক এই সময়েই কলেজে একটি-দুটি ছেলে—যাদের পেছনে ছিল দুর্দান্ত রেজাল্টের গ্ল্যামার—নকশাল বিপ্লবের ডাক আনে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘিরে জড়ো হয় লাজুক কুণ্ঠিত ছেলেরা, যাদেরও অনেকেরই পরীক্ষার ফল ছিল চাঞ্চল্যকর এবং যারা, এই সমাজের এমনকি শিক্ষার জগতেও হাজারবার ফার্স্ট হওয়া সত্ত্বেও চিরদিন হেরে যাওয়ার লস্ট বেঞ্চিতে তাদের বসে থাকতে হবে, এই তথ্য আবিষ্কার করে নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি ঘৃণায় ফুঁসছিল। আমরা এই সমাজের সবচেয়ে মেধাবী অংশ এবং আমরাই এই সমাজকে প্রাণদণ্ড দিলাম, আমরাই বিপ্লব আনবো—এই গভীর বিশ্বাসী স্লোগান তখন সমস্ত গ্লানি ক্ষোভ ছাপিয়ে চিৎকার করে ওঠে। তুমি অবশ্য এতকথা বলোনি

আমাকে কখনো স্পষ্ট করে বলোনি যে, তুমিও এই আন্দোলনের অংশীদার। আমি বুঝতাম তোমার শান্ত চোয়ালের কঠিন ভঙ্গী দেখে, তোমার নিশ্চল জগদ্দলের মতো আত্মবিশ্বাস দেখে।

তারপর অনেকদিন হয়ে গেল। রক্তপাতকে তোমরা মনে করো বৈপ্লবিকতার অ্যাসিড-পরীক্ষা. তারপর তুমি সেই পরীক্ষার পাশ হয়েছ. বিপ্লব যে চিত্রাঙ্কন নয়. মার্জিত বক্তৃতা নয় এই কথা শুধু শহরের দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে লেখনি. সত্যি সত্যি মানুষ খুন করে ফেরারী হয়ে নিজেদের ডুবিয়েছ।

এক সময় তোমার সাথে আমার একটু আধটু কথাবার্তা হতো এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে। আমার মত তুমি গ্রহণযোগ্য মনে করতে না কিন্তু তুমি যেহেতু আমাকে নির্বোধ বা ঠগ ভাবতে না. সেইজন্য তর্ক করতে. অনেক সময় চুপ করে শুনতে বিচলিত মুখে। আমি জানি এখন তুমি আমাকে নির্বোধ বা ঠগ ভাবছো তবু তোমাকে কিছু কথা আমার বলতেই হয়।

যুদ্ধপরবর্তী জার্মানী নিয়ে লেখা সার্তরের একটা নাটক আছে, একজন জার্মান যুবক যার নায়ক. যে রাশিয়ায় প্রেরিত জার্মান এস এস বাহিনীর দ্বারা অকথ্য অত্যাচারে উৎসাহী অংশ নিয়েছিল. যুদ্ধের শেষ থেকেই সে বহুদিন ধরে পশ্চিম জার্মানীর কোনো শহরে একটি অন্ধকূপের মতো ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী, তার বোন তাকে লুকিয়ে রাতের বেলা খাবার দিয়ে যায়, এসে জানায়, জার্মানী শ্মশানের মতো খালি, শিশুরা না খেতে পেয়ে পথে পথে মরছে. মেয়েরা পয়সার অভাবে বেশ্যা হয়ে যাচ্ছে রাজপথগুলি জনশূন্য, ঘাসের অধিকারে, নিস্তব্ধ কলকারখানায় অশ্বত্থ গাছের বাসা। বন্ধ অন্ধকার ঘরে বসে যুবকটি বারবার এই কথা শুনতে চায়—যদিও জানলা খুললেই দেখতে পেত যুদ্ধপরবর্তী ইওরোপের সবচেয়ে দ্রুত-বর্ধিষ্ণু দেশ পশ্চিম জার্মানীতে কলহাস্যময় ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি—কেননা যদি জার্মানী আজ যুদ্ধে হারার ফলে বিজয়ী রাশিয়ান সৈন্যার প্রতিহিংসার আগুনে শ্মশান না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যুদ্ধে জেতার জন্য রাশিয়ায় যেসব ভীষণ পাপাচার করা হয়েছিল. তার কোনো যাথার্থ্য থাকে না, নিজের দেশকে ভালোবাসার অজুহাতটুকুও নয়. শুধু থাকে প্রত্যেকটি অর্থহীন অপরকারী খুনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব একমাত্র পালন হয় আত্মহত্যায়। 'জয় আমাদের হবেই—কেননা হিটলার আমাদের নেতা এবং জয় আমাদের হতেই হবে কেনন তা না হলে জার্মানী শ্মশান হয়ে যাবে' এই বিশ্বাসের ভরে জার্মান সৈন্যরা রাশিয়ায় গণহত্যা করেছিল। জয় যেহেতু শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোরে হয় না তাই জয় যখন হলো না এবং হেরে গেলেই জার্মানী শ্মশান হয়ে যাবে বিশ্বাসের এই অংশটুকুও ভুল প্রমাণিত হলো তখন পড়ে থাকলো রাশি রাশি নরহত্যার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। যে নিজেকে দেশ-প্রেমিক ভেবেছিল, সে জানলো সে ছিল নিছক খুনী, সমাজবিরোধী অপরাধীমাত্র।

অনুরূপ. তুমি নিশ্চয়ই জানো হাড়কাটার গলিতে যে এক দালাল টাকার ভাগ নিয়ে আরেক দালালকে খুন করে এবং তুমি যে খুন করেছো এ দুই খুনের একমাত্র তফাত এই বিবেকী দায়িত্ববোধে। কী সেই দায়িত্ববোধের রূপ?

বিপ্লবের পথে মানুষ সর্বদায়েই নামে জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধে সেই সমাজই বাঁচবার অধিকার হারিয়েছে যেখানে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমশই হ্রাসমান। যে সমাজে ফুটপাতে সারি সারি লোক রাতে শীতে জমে থাকে ও তাদের ডিঙিয়ে একদল সুসজ্জিত লোক প্রমোদালয়ে যায়, সম্পূর্ণ বোধহীন অকর্মণ্যতায় দিন কাটায়, যে সমাজে কোটি কোটি লোক মৃত্যুর পথে এগুতে থাকলেও যাদের হাতে ক্ষমতা তাদের ফাইল নিয়ে. প্রমোশন নিয়ে ট্রান্সফার নিয়ে খেয়োখেয়ি. রাজনৈতিক ছেনালি অবিকল চলতে থাকে. সেখানে বুঝতে হবে সেই চরম তামসিকতা এসেছে যখন জীবন সম্পর্কেই শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ চলে গেছে। এই ধরনের সমাজে বিপ্লবের চেষ্টা হয় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং সেই শ্রদ্ধা ও মমতা কার্যকরী করবার জন্য। সমাজে সকলেরই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে—বেঁচে থাকার প্রতি ভালোবাসার এই দীপ্ত স্বরেই বিপ্লবচিন্তার জন্ম।

অথচ দ্যাখো, এই বিপ্লব সমাধা করবার জন্যই জীবনের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে মমতাবিহীনভাবে খুন অনিবার্য হয়।

প্রশ্ন, অধিকাংশ লোক যাতে বেঁচে

বেঁচে থাকা ধ্বংস করে দেওয়া যায় কিনা। আমিও বিশ্বাস করি বহুলোকের স্বার্থে কিছু লোককে, কোনো কোনো অবস্থায়, মারা যায়—যেমন ধরো, জার্মান জাতির, সমস্ত ইওরোপের জনসাধারণের স্বার্থে হিটলার ও তাঁর উন্মাদ দলবলকে গুলি করে মারলে অত্যন্ত কল্যাণ হোতো। কল্যাণ, কেননা আমাদের শিক্ষাজ্ঞান আমাদের অতি স্পষ্ট করে বোঝায় যে, হিটলার ও তাঁর নাৎসি জোটটিকে সময়ে খুন করতে পারলে অগণিত লোক খুন হওয়ার হাত থেকে নিস্তার পেতে। অর্থাৎ জীবনের প্রতি যে শ্রদ্ধা আমার আদর্শ তার উপর প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ আঘাত এসেছে ওই পক্ষ থেকে।

এখানে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে বোঝার, স্পষ্ট করে জানার। তাই যে জার্মান যুবক সেনাপতি হিটলারের চেয়ারের পাশে বোমা রেখে আসার অপরাধে প্রাণ-দণ্ডিত হন তিনি আমাদের চোখে শ্রদ্ধেয়, আর জন বুথ নামক সুদর্শন তরুণ অভিনেতাটি, যে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে মনে করে আব্রাহাম লিংকনকে গুলি করে মেরেছিল, একজন উন্মাদ ক্রিমিনাল।

তারপর, মনে রেখো, 'আমার আদর্শ মহৎ' এটা কোনো অজুহাত নয়। সার্ত্রের নাটকের খুনী জার্মান যুবকটি এই দেশপ্রেমিক আদর্শবোধের উত্তাপেই রাশিয়ার শীতে উদ্দীপিত বোধ করছিল। তোমরা অরূপ বিশ্বাসের উপর ভীষণ জোর দাও, আমি দিতে পারি না—কেননা আমি দেখি, আমরা তাই বিশ্বাস করি যা আমাদের বিশ্বাস করতে ভালো লাগে, অর্থাৎ যা আমি বিশ্বাস করি তার প্রাথমিক লক্ষণ এই নয় যে সে সত্য; তার প্রাথমিক লক্ষণ সে প্রিয়, আরামদায়ক। প্রিয়তা ও [illegible] একাকার করে বেঁচে থাকা আমার মনে হয় বেঁচে থাকার উন্মাদনা থেকেই প্রবঞ্চিত হওয়া। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা বলতেন 'ধর্মের জয় হবেই', কেননা তাঁদের জীবনে অধর্মের হাত থেকে তাঁরা নীরবে এত কষ্ট পেতেন যে এই সান্ত্বনাটুকু না পেলে তাঁদের গণ্ডিতে-বাঁধা জীবনে কষ্ট আরো বাড়তো। আমরা জানি ধর্মের, ন্যায়ের জয় না হতেই পারে, কেননা আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস অপসৃত, এবং ঈশ্বরকৃত শৃঙ্খলা নেই বলেই জানি, যা ভালো, ন্যায়, ধর্ম তার জোর ততটুকুই যতটুকু বাস্তব জোর আমরা তার পেছনে যোগাতে পারি। ন্যায়ের জয় নানা প্র্যাকটিক্যাল কারণে না হতেই পারে—যেমন স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারে হয়নি, যেমন যে ষাট লাখ ইহুদী পচে পচে মরেছিল জার্মানদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তাদের জন্যও হয়নি, যেমন ইতিহাসের গোড়া থেকে শুরু হাজার হাজার অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাহসের

ক্ষেত্রে হয়নি, যেমন যে হাজার হাজার উত্তর ভিয়েতনামের ছেলে এ পর্যন্ত মারা গেছে তাদের জীবনে হয়নি—তবু ন্যায়ের জন্য আমাদের লড়তেই হয়। 'সর্বহারা তোমরা জোট বাঁধো, শৃঙ্খল ছাড়া তোমাদের কিছুই হারাবার নেই' এ একটা বিদ্রোহী স্লোগানের চিৎকার, কেননা সবচেয়ে নিদারুণতম সত্য এই যে কেউই সর্বহারা নয়, রাস্তার যে ভিখারি সেও নিজেকে সম্পদশালী মনে করে অন্য এক পা কাটা ভিখারিকে দেখে। মানুষের ক্ষতি, হারাবার মতো সম্পত্তি সীমাহীন, এবং সবচেয়ে অনির্বচনীয় সম্পদ বেঁচে থাকা এই পৃথিবীতে, যেহেতু আমরা পরলোকে বিশ্বাস করি না। সর্বহারার কাছেও একেবারে মরে যাওয়ার চেয়ে শৃঙ্খলসুদ্ধ বেঁচে থাকা মরে যাওয়ার মুহূর্তে, নিশ্চয়ই অনেক বেশি শ্রেয়তর, তবু সব ক্ষেত্রেও জীবন এমনই জটিল—আমাদের মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও শেকল ভাঙার লড়াইতে নামতেই হয়।

জয় না হতেই পারে, বিপ্লবী তবু লড়াইতে নামবেই, জয় না হতেই পারে এই সম্ভাবনা পুরো মনে রেখে। জয় না হতেই পারে সুতরাং 'জয় আমাদের হবেই' এই চিৎকারে কোনো বর্তমান কাজের দায়িত্ব দূরে ভবিষ্যতের ঘাড়ে ঠেলে দেওয়া যায় না। এবং যে জয়ের উপাসনা বিপ্লবী করে, সে হলো জীবনের জয়, বেঁচে থাকার জয়, ক্ষমতাধিকার যাকে কায়েম করার অস্ত্রমাত্র। তাই জীবনহানি করার আগে বিপ্লবী দেখতে বাধ্য, যে জীবননাশ করা হচ্ছে সে আর সকলের বেঁচে থাকার শত্রু কোথায়, আর সকলের বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে তার প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ অপরাধ কী। যেমন সভ্য সমাজের বিচার প্রতিষ্ঠানে সমাজ এমন এক ব্যবস্থা খাড়া করেছে যা তার নিজেরই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, তেমনি বিপ্লবীরও ব্যক্তিগত সন্দেহ নিজেকেই, নিজের ভেতরকার আবেগী অযৌক্তিক বদলালোভী প্রবৃত্তিকে।

এই সন্দেহ এই টানাপোড়েনের উৎস একটি ধারণা—যা সব বিপ্লব প্রচেষ্টারও উৎস বটে—যা মানবী সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ধ্রুবতারার মতো দিকনির্দেশক ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে : জীবন প্রকৃতির একটি অমূল্য দান, যেহেতু তাকে আর ফেরানো যায় না তাই তাকে নষ্ট করা এক অক্ষমণীয় অপরাধ, এবং যতবার মনুষ্য-চরিত্রে নিহিত পাপের প্রতিকারের জন্য মানুষ প্রকৃতির এই মৌলিকতম নিয়ম ভাঙতে বাধ্য হয় ততবার সে নিজের চোখেই অপরাধী সাব্যস্ত হতে বাধ্য। অদূরে, তুমি সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দেখবে, সভ্যতার উত্তরোত্তর উন্নতি মানেই এই ধারণার বিকাশ, যে-সমাজকেই তুমি বিদ্যুতের সঙ্গে বলতে ইচ্ছুক তার প্রকৃষ্টতম লক্ষণ দেখবে, প্রকৃতির প্রথমতম নিয়মের প্রতি এই শ্রদ্ধাবান বিনয়। এর থেকেই আসে সমাজের সুসংগঠিত মানুষের রক্ষা, চিন্তার নিরাপদ মুক্ত অনীহা, সাহিত্য শিল্প, শিক্ষা, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। এইজন্যই রাশিয়ার বলশেভিক নেতাদের অন্যতম প্রথম আইন ছিল প্রাণদণ্ডবিলোপ, এইজন্যই সব সভ্যতারই আদর্শ যুদ্ধবিলোপ।

বিপ্লবী যেহেতু সভ্যতার এই জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবনত মৌল বৃত্তিকেই রাহুগ্রাস থেকে উদ্ধার করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাই জীবননাশে নামার আগে তার দায়িত্ব অপরিসীম। তার হাঁটা ক্ষুরধার নীতির উপর দিয়ে এপাশে-ওপাশে হায়েনাকুকুরের সাথে তুলনীয় নেহাত রক্তলিপ্সা।

আদর্শের নামে যখন প্রাণহানির একটা প্রোগ্রাম বাঁধা হয় তখন উদ্দেশ্যকে উৎসর্গ করে প্রাণহানিই আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে, এই ভয় বারবার বাস্তব হতে দেখা গেছে। বলা হয়ে থাকে, বিপ্লব প্রথমেই তার নিজের সন্তানদের আহার করে এবং দেখাও গেছে ফরাসি বিপ্লবের ছিন্নমস্তা নাচে স্টালিনের যুগে, রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের পরে বিপ্লবে যারা অগ্রণী অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের এক বিরাট অংশ বিপ্লবী রাষ্ট্রের হাতেই খুন হন। কেন? তোমরা ত স্বীকার করো স্টালিনের কিছু সামান্য ভুলভ্রান্তি হয়েছিল, যার অর্থ কিছু নিরপরাধ লোকের মৃত্যু, আমরা অসাম্যবাদীরা বলি ভুল ভ্রান্তি-গুলোই বেশি হয়েছিল, যার অর্থ লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ লোকের মৃত্যু, কিন্তু অরূপ, ভেবে দ্যাখো, একজন নিরপরাধ লোকও বিপ্লবী রাষ্ট্রের প্রতিকারবিহীন অবিচারে খুন হয়ে যায় কী করে? আদর্শের অনিচ্ছাকৃত ভুল প্রয়োগের জন্য নয়, আদর্শ-

বিপ্লবকে বাঁচানো যাবে না, সুতরাং যে যতো নিষ্ঠুর সে ততো বিপ্লবী। যার ফলে যা নিছক স্যাডিজম, নিষ্ঠুরতার জন্যই নিষ্ঠুরতা, যাকে সভ্যসমাজে চাপা দিয়ে রাখা হয়, সেই মনোবিকারও যখন ঘাড়ে বিপ্লবের লাল রুমাল বেঁধে নিরীহের প্রাণ নিতে লাগলো, তখন কেউ প্রতিবাদ করতে পারলো না। পারলো না শুধু প্রাণভয়ে নয়—সমস্ত জাতি কখনো ব্যতিক্রম-হীন কাপুরুষ হয় না—এই অজ্ঞানতার দরুণও বটে যে যেহেতু বিপ্লবে নির্মম রক্তপাত অনিবার্য সুতরাং নির্মম রক্তপাত-মাত্রই বিপ্লব।

বিপ্লবের জন্য শ্রেণীশত্রু বিনাশ, শ্রেণীশত্রু বিনাশের জন্য পুলিস, জোতদার, সহ-বিপ্লবী খুন। এর পরের ধাপ পুলিস ইত্যাদি খুনের মানেই বিপ্লব, খুনেই বিপ্লব। রক্তপাতে উৎসাহ মনোবিকলনের এই বিখ্যাত সিঁড়িকে এমন পরিচ্ছন্ন করে রাখে যে অসতর্ক বিপ্লবী [illegible] অবধারিতভাবে এই নরকে বারবার নেমে আসে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় [illegible] আমরা এখনো হাতড়ে হাতড়ে জানিনি [illegible] একেবারেই আশ্চর্য নয় যে রক্তপাতের নামে অন্যায়ের সমাজে একটা প্রায় [illegible] উত্তেজনা দেখা দেয়: নিষ্ঠুরতা [illegible] ও প্রকাশ্য সমাজে এই নির্বুদ্ধিজীবী সমাজের পক্ষে একই ধরনের উন্মাদক [illegible] এই সমাজের জীবনে না ঘটা স্বাভাবিক তার রক্তিম প্রান্তে এদের [illegible] উপস্থিতি। জানি না বাঁচা [illegible] সমাজ হয়তো কখনো দেখে শেখে না, তাকে হয়তো নিদারুণ ঠেকে শিখতেই হয়, আমরাও দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়েই প্রতি পরিবারের দুটো করে মুখ পোড়ানো হয়ে গেলে পর একদিন সন্ধান করতে শিখবো বেঁচে থাকা নামক বিশাল ভাণ্ডারের রহস্যকে। তবু যদি দেখে কিছু শেখা যায়, অরূপ, তুমি দেখবে ইতিহাসের সব সমাজের চরম দুশ্চরিত্রতার লক্ষণ রক্তপাতে নিরবচ্ছিন্ন সম্মতি ও স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ। তৈমুরলঙের যুগের তুলনায় আমরা যে কিছুটা সভ্য হয়েছি তার প্রমাণ ভেরী বাজলেই আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বল্লমের জন্য হাত বাড়াবো না, ওই ভেরীর যাথার্থ্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে আমরা আগে বিচার করবো। প্রথম মহাযুদ্ধের আগের ইতিহাস তোমরা যদি পড়ো দেখবে রক্তপাত সম্পর্কে যেসব বাগাড়ম্বর কথা একালে একেলে শোনা যাচ্ছে—[illegible] করে [illegible] হবে [illegible] ইত্যাদি—অবিকল এই ধরনের উপমা দেওয়া চিৎকারগুলি তখন করতো বাবুমহলে, বড়লোকেরা, সেনাপতিরা, যাদের নপুংসক জীবনে দামামা বাজিয়ে রক্তস্রোত না বওয়ালে শিহরণ আসতো না। আর যারা বলতো বেঁচে থাকার চেয়ে প্রিয় মানুষের কাছে কিছু নেই, যুদ্ধ বর্বরতা, তারা ছিল সেই সমাজের উপহাসের, অত্যাচারের লক্ষ্য, মার্ক্সিস্ট বিপ্লবীরা। চিরকালই দেখা গেছে সমাজে সুস্থতার যারা শত্রু তাদের গলায় রক্তপাতের জন্য অন্ধ অস্থির ডাক এবং তাদের যারা বিরোধী সেইসব বুদ্ধিজীবী বা শ্রমিকনেতাদের আখ্যা দেওয়া হতো ক্লীব, দেশদ্রোহী ইত্যাদি। ইতিহাস এমনই পরিহাসপ্রবণ যে, আজ বড়োলোকেরা কিছু মুখস্থ শিক্ষার বশে কিছু নিজেদের সুবিধা বজায় রাখার জন্য বলে, যুদ্ধ খারাপ, রক্তপাত বর্বরতা এবং তাদের পুরাতনী বিকার আত্মসাৎ করে রক্তপাতের নামে জয়ধ্বনি করছে বিপ্লবীরা।

মানুষ একটি পশু, তার হিংসা স্বভাবী, স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ততা বজায় থাকে বিরোধী শিক্ষার অনুপস্থিতিতে, শিক্ষার অভাবের সাথে যুক্ত পয়সার অভাব, দেশের [illegible] পয়সার অভাবে ভোগে এবং স্বতঃস্ফূর্ত হিংসা এই কারণে সমাজের একটি বৃহৎ নিপীড়িত অংশের অদমিত প্রবৃত্তি—এই কার্যকারণমালা উপেক্ষা করে হিংসা সম্পর্কে একালে যে পূজারী প্রচার করা হচ্ছে তার মধ্যে মিশে আছে একটি পরম প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট-অ্যানার্কিস্ট ধারণা —যা স্বতঃস্ফূর্ত তাই ঠিক—এবং একটি অপগণতন্ত্রী ভাবাকুলতা : যেহেতু এই প্রবৃত্তি সমাজের দুঃখী অধিকাংশের, সুতরাং তা উপাস্য।

বৈপ্লবিক হিংসার মধ্যে যে উচিতপন্থ নৈতিকতা থাকতে বাধ্য তাকে যে তোমরা রাস্তায় নামবার আগেই চিৎকার করে ফেলে এসেছ তা আজ খুব পরিষ্কার। তোমরা গত কয়মাসে খুন কম করোনি, হয়েওছ কম না। খুনগুলির প্রত্যক্ষ ফল দেখছি পি ডি আক্ট, পাল্টা খুন। অবশ্য নিপীড়ন যে হবে সেটা তোমাদের জানা ছিলই, সুতরাং তোমাদের তক অনুযায়ী এইসব নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা কাগুজে বাঘের আস্ফালন মাত্র। এই ফল বাদ দিলেও দেখি কিছু [illegible] পুলিস, কয়েকজন সরকারী কর্মচারী, কিছু বড়লোক,

কিছু অন্য প্রতিহিংসক রাজনৈতিক দলের কর্মী ইত্যাদি খুন করে তোমাদের 'বিপ্লব খানিকটা এগিয়ে দিয়েছে। এইটুকু এগিয়ে গেছে যে খুন সম্পর্কে তোমাদের মনে যে শিক্ষাগত ভয় ও দ্বিধা ছিল সেটা তোমরা মুছে ফেলতে পেরেছ। খুন করা যায়; এই দ্যাখো, খুন করলাম।

এবং এইটাই তোমাদের নেতাদের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার শান্তিপূর্ণ পথ খুলে রাখা আছে এরকম কোনো দেশে আজ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লব ঘটেনি। ঘটেনি, কেননা এরকম দেশে বিপ্লব সবসময়েই মুষ্টিমেয়র আন্দোলন হতে বাধ্য; যদি অধিকাংশ লোকের সমর্থনই বিপ্লবীদের পেছনে থাকে তাহলে তাদের ভোটে জিতে সংবিধান বদলে আমলা তাড়িয়ে নিজেদের ইচ্ছামত সরকার কায়েম করাতে বাধা কিসের? তোমরা বলো, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন জেতা বড়ো অর্থ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাছাড়া নির্বাচন ভোজবাজি এই দেখনহাসি সমাজে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতান্তরে স্থিত স্বার্থের চূড়োগুলো ঠিকই অটুট থেকে যায়, যার ফলে কিছুই করা যায় না। চীন, ভিয়েতনাম,

কিউবা যেদিকে তুমি তাকাও দেখবে গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীদের জয়ের বৃহত্তম কারণ ছিল জনতার সমর্থন, জনতা ছিল আশ্রয়ী জলের মতো, গেরিলা বিপ্লবী যার মধ্যে স্বচ্ছন্দ সাঁতারু মাছ। বিপ্লবীদের খাবার যুগিয়ে, লুকিয়ে রেখে, বিশাল ভাণ্ডারের মতো পেছনে, পাশাপাশি, ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন যোগাড় করতে টাকার দরকার হয়নি, শত শত বছর লাগেনি। লাগেনি, কেন না বিপ্লবীকে মদত দেওয়া ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সামনে নিজের ভাগ্য পাল্টানোর কোনো স্বতন্ত্র পথ বিন্দুমাত্র খোলা ছিল না। বিপ্লব সমাধা করতে গেলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠের অপ্রত্যক্ষ সমর্থনও তোমার তাই আবশ্যিক. অথচ তুমি বলতে চাইছো, তোমার আদর্শের পক্ষে একজন কৃষককে ভোট দিতে রাজি করানো যতো সময়সাপেক্ষ হবে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে ও পরিশ্রমে তুমি তাকে তোমার আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে উৎসাহী করতে পারবে। তুমি বলবে নির্বাচনে জিতে কিছু হয় না কেননা, আমূলে কিছু করতে গেলেই স্থিত স্বার্থগুলি, যারা পুরানো ব্যবস্থার ঘরজামাই ছিল, রুখে দাঁড়াবে, তাদের দাস ও রক্ষক হিসেবে আর্মি তোমাকে আক্রমণ করবে। যদি করে, তাহলেই সমাজে রাজনৈতিক মুক্তির পথগুলি বন্ধ হলো, সশস্ত্র বিপ্লবের পথ খুললো, যে ভোট দিয়েছিল সেই কৃষকের কাছে তুমি ফিরে যেতে পারো গেরিলাযুদ্ধের পথ দেখাতে, বলতে পারো, আর সব পথ বন্ধ। অসামান্য বৈপ্লবিক যুদ্ধের যে উদাহরণ আজ ভিয়েতনাম, তার পেছনে রয়েছে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ভিয়েতনাম একীকরণের জন্য সমস্ত গণভোট অনুষ্ঠিত হতে না দেওয়া, পাছে হো জিতে যান এই ভয়ে। ভিয়েতনামের ছেলেরা মরতে মরতে লড়ে যাচ্ছে এই দেখে তোমরা যারা শিহরিত হও ভুলো না ভিয়েতনামের জনসাধারণের কাছে ওই লড়া, ওই মরা পরম দুঃখেরও বটে, কেননা তারা জানে, শান্তিপূর্ণ পথে তাদের জয়ী হবার সম্ভাবনা জোর করে নষ্ট করা হয়েছিল; ওই সুযোগ তারা ঠেলে সরিয়ে দেয়নি, অস্ত্র তারা ধরেছে ওই সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বলেই। ব্যাপক গণসমর্থন ছাড়া বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধ রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। যে সমাজে ব্যাপক গণ সমর্থন রক্তপাত না করেই রাষ্ট্রক্ষমতা বিপ্লবীর হাতে তুলে দিতে পারে সেখানে হিংস্র বিপ্লবের চেষ্টা হয় সেই সংখ্যালঘুর দ্বারা যাদের গণসমর্থন যোগাড়ে ইচ্ছা ও উৎসাহ কিছুই নেই। এবং যেহেতু অধিকাংশ লোকের সমর্থন নেই তাই বিপ্লব চেষ্টা নেমে আসতে বাধ্য সেই বিকারে যাকে বলা হয় রেভোলিউশন বাই অ্যাসাসিনেশন, বিক্ষিপ্ত কতকগুলো খুনের দ্বারা বিপ্লব। এই হচ্ছে তোমাদের বন্দুকের—বা পাইপগানের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা টেনে বার করবার ছক। এই ছক যারা আঁকছেন সেই তোমাদের নেতাদের উদ্দেশ্যের স্পষ্ট আঁচ পাওয়া যায় এইসব খুন খারাপি দেখে। যতো বেশি এই ধরনের খুন হবে ততো তোমাদের সমাজে ফিরবার পথ বন্ধ হবে, এবং তোমরা বাধ্যত যে পথে গেছ সেই পথ আঁকড়ে ধরবে। দাঙ্গার সময় শুনেছি গুণ্ডা নেতারা সতর্কতা নেয় যাতে দলের অন্তর্ভুক্ততম সদস্যও অন্তত একটা পেটে ছুরি চালায়, একটি মেয়েকে বলাৎকার করে; রক্তপাতের দায়ে যখন সকলেই জড়িয়ে যায়, তখন দলের প্রতি সত্যিকারের আনুগত্য জন্মায়, কেন না ফেরার পথে ফাঁসিকাঠ। ফলে ফেরারী গুপ্তঘাতক দলের স্বার্থই প্রতিটি সদস্যের নিজেরও রক্তমাংসের স্বার্থ। এই কারণেই কি তোমাদের কোনো কোনো নেতা তোমাদের বন্দুকে ব্যবহারে এতো নারাজ. এই কারণেই তাঁরা চান যে তোমরা খুন করো লোহার রড দিয়ে, ছুরি চালিয়ে, সামনা সামনি, যাতে তুমি যে খুনী, তুমি যে আর স্বাভাবিক নও, সমাজের নও, এই সত্য তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে?

খুন হচ্ছে, তোমরা করছো বা তোমাদের দ্বারা করানো হচ্ছে শুধুমাত্র রক্তে তোমাদের হাত চুবিয়ে দেওয়ার জন্য, একদিকে যাতে খুন জিনিসটা তোমাদের গা-সওয়া হয়ে যায় এবং আরেকদিকে, পুলিসের তাড়া খেয়ে তোমরা হয়ে ওঠো কোণে ঠাসা বেড়ালের দল সমাজের চোখে যারা ক্রিমিনাল, যেদিকেই যাক মরতে বাধ্য, সুতরাং যারা বাধ্যত, মারার জন্য মরিয়া। মাওবাদ-মার্ক্সবাদ সব মাথায় তুলে তাই এখন তোমরা ছুটছো অলিতে, গলিতে, মাঠে জঙ্গলে পাইপগান চাকু লোহার রড হাতে বদলার সন্ধানে।

এইটাই প্ল্যান, তবে মনুষ্যচরিত্র যেহেতু প্ল্যানের বাইরে, এর একটা ফল তোমাদের নেতারাও হয়তো ভেবে দেখেন নি। রক্তপাতময়তার প্রতি লোভ যখন একবার জাগে, সে ক্রমশই অবিভাজ্য ও বিবেচনাবিরহিত হয়ে ওঠে। ক্রমশই এই আচ্ছন্ন মনোভাবের জন্ম, নেয় যেখানে রক্তপাতমাত্রই—ভিন্নমতাবলম্বীকে খুন থেকে ভিন্নধর্মাবলম্বীকে খুন পর্যন্ত—মনোবিকার হ্রেষাধ্বনি করে পা ঠুকতে থাকে। শুরুতে লোভের তেষ্টা মিটতো লেবেল-আঁটা শ্রেণীশত্রু খুন করে—জোতদার, মহাজন ইত্যাদি। যেহেতু এই লোভ উদ্দিশ্বণনতাহীন তাই ক্রমবিস্তারমান এবং সেই কারণেই শ্রেণীশত্রুর সংজ্ঞাও লোভের সাথে তাল রেখে ক্রমশ চওড়া হতে থাকে। প্রথমে জোতদার শ্রেণীশত্রু, তারপর পুলিস শ্রেণীশত্রু, তারপর সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ সনাক্ত করা যায় এমন স্পষ্ট ভাবে যারা সমাজের সদস্য, তারপর কালকের বন্ধু, সহবিপ্লবী, ক্রমশই যে কেউ, প্রত্যেকেই, সকলেই, শ্রেণীশত্রু। খালি আমিই ঠিক, এবং আর কিছু পারি না পারি আমি মানুষ খুন করে যাবো।

তোমাদের আন্দোলন এইখানে এগিয়ে এসে এখন থেমেছে - কিছু না পারলেও আমরা মানুষ খুন করতে পারি। সমাজের মধ্যে তোমরা ছড়িয়ে পড়েছ একরাশ হন্যে ঘাতক, শ্রেণীহীন সমাজ গঠনফঠন পরের ব্যাপার, হাতের পাঁচ যে বিপ্লব সেটা এর তলপেটে ছুরি চালিয়ে দেওয়া, ওর মাথা রড দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া, তাকে দা দিয়ে কুপিয়ে মারা।

সার্ত্রের নাটকের জার্মান যুবকের মতো আত্মহত্যা ছাড়া এই রক্তলোভের কোনো ক্ষালন নেই। অরূপ, কিন্তু সেই শাস্তিও তোমার প্রাপ্য নয়, কেন না তোমার পাপী জীবনের শেষ অন্য নষ্ট জীবনগুলিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। ওই জার্মান যুবকটি যেমন, তুমিও তেমনি, আত্মহত্যায় গেলেও, জেনে যেও, এই পাপ কিছুমাত্র ক্ষালন হলো না।

অরূপ, তুমি জানো আমি মনে করি মার্ক্সবাদ আরো কিছু যুগান্তকারী মতবাদের মতোই একপেশে ও অর্ধসত্যে ভরা। তোমরা বিশ্বাস করো তোমাদের যে আদর্শ সেই হলো মনুষ্য সমাজের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। আমি, প্রথম কথা, তোমাদের আদর্শের ফলিত রূপগুলি দেখে ভয় পাই কেননা আদর্শ সমাজের অর্থ আমার কাছে অসম্ভব বেশি ইস্পাত উৎপাদন নয়, রকেট তৈরি নয়, আদর্শ সমাজ বলতে ভাবি সেই সমাজের কথা মানুষ যেখানে সমাজের অবিচার থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে-থাকার মুখোমুখি হবার অবসর পেয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, গান অর্থাৎ মানুষের সৃজনক্ষমতা মানুষের বিকাশ সম্ভাবনা অবশেষে অবাধ-

ভাবে উৎসাহিত। দ্বিতীয়ত আমার সব-সময়েই মনে হয় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার যে নীল নকশা পৃথিবীর ইতিহাসকে গত একশ বছর উত্তেজিত করে রেখেছে এটা আরো অনেক প্রস্তাবের মতো, নিতান্তই সাময়িক। এথেন্স ও স্পার্টার, রোম ও কার্থেজের পরস্পরবিনাশী ঝগড়া, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের একশ বছরব্যাপী মারপিট আজ আমরা যেমন উদাসীনভাবে ইতিহাসে পড়ি, মাত্র দুয়েক শ' বছর পরের মানুষেই ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজের এই মরণপণ লড়াইয়ের গল্প সামান্য ভুরু তুলে পড়বে।

তোমরা বলো জয় তোমাদের হবেই কেননা তোমরা মার্ক্সবাদী, বা চীনের চেয়ারম্যান তোমাদের চেয়ারম্যান। আমি জানি জয় না হতেই পারে তবু মানুষ এমনই জীব তাকে চেষ্টা করতেই হয় জীবনকে শুভতর করবার জন্য। তোমরা হিংসার, না-পড়াশুনোর, অচিন্তার রুদ্ধস্বর জয়গান করো; এই অচিন্তিত স্বতঃস্ফূর্ত ভায়োলেন্সপ্রীতিকেই আমি ফ্যাসিজমের অবধারিত লক্ষণ বলে চিনি। কেননা, ফ্যাসিজমের উৎস মানুষের সুপ্ত লুকোনো আদিম হিংস্রতা, যা যতো পড়াশুনো করে ততো দুর্বল, যতো চিন্তা করে ততো ম্লান হয়। যে যতো চিন্তা করে সে ততো মূর্খ হয় এই কথা মাও হয়তো বলেন নিছক বুদ্ধিজীবীর প্রতি ক্ষমতা ব্যবহারকারীর অবজ্ঞায়. চারু মজুমদার বলেন, ফ্যাসিস্টদের প্রতিধ্বনি করে, কেননা ফ্যাসিস্ট জানে তলিয়ে ভাবতে বসলেই স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়, বিরোধী দ্বিধা ঘুণের মতো ঢোকে ফ্যাসিস্ট হিংসা তার জোর হারায়। তাই ফ্যাসিজম দ্বিধা চায় না, দায়িত্ববোধ চায় না। এবং সৎ বিপ্লব মাত্রেরই লক্ষণ জীবননাশ সম্পর্কে গভীর আমর্মমূল দায়িত্ববোধ, কেননা জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকেই উদ্ভূত যে জীবনহানি তার সাথে জড়িত উৎসাহ নয়, গভীর উদ্বিগ্নতা, চিন্তা, বারবার বিশ্লেষণ, নিজেকেই সন্দেহ। সেইজন্যই বিপ্লব পরবর্তী সমাজে যাই ঘটুক, ইতিহাসের বিপ্লবগুলি যাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তারা কেউ খুশি জল্লাদ ছিল না।

ছিল না, কেননা তারা সমকালীন সমাজের শিকার ছিল না, প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই নষ্ট ভ্রষ্ট সমাজ চায় হয় আমরা তার পা-চাটা মুটে, অনুগত কেরানি, নিরেট আমলা হবো অথবা তার অত্যাচারে এমনি বিহ্বল হব যে জ্ঞানবুদ্ধি সব হারিয়ে অমি আক্রোশী চিৎকার করতে থাকবো; হয় তার [illegible] নয় তার শিকার আমাকে হতেই হবে। বিপ্লব অর্থাৎ আমূল পরিবর্তন তাদের দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে যারা এই নির্ধারিত পথকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ যারা সমাজের নানা কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়, যারা প্রবলতরভাবে নিজেদের দ্বারা নির্মিত, সমাজের বহির্ভূত ও স্বাধীন, যারা সমাজের সাথে মোকাবেলা করার সমাজ নির্ধারিত মনোবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করে। এবং সমাজের নষ্টামির বিরুদ্ধে যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করে সেই অচেনা অভূতপূর্ব অস্ত্র: বুদ্ধি ও নৈতিকতায় প্রজ্বলিত জীবনের প্রতি ভালোবাসা। নাজি [illegible] ও ওয়ার্কার্স সোভিয়েতের মধ্যে তফাৎ এই।

তোমরা যারা নকশাল[illegible] কয়েক হাজার মাইল ও বছর [illegible] দূরে থেকে ধার করে অন্য অর্জিত রক্তপাতের লোভকে সিংহাসনে বসিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে জঙ্গলে ঘুরছো, তোমাদের জন্য অবশ্যই কোনো নিউরেমবার্গ বিচারালয়ের দরকার হবে না। 'কতকগুলো খুনে' এই রায় যখন ইতিহাস দেবে তখন তোমাদের তথাকথিত আদর্শবাদের কথা একবারও ভাববে না। কোনো অনুভূতিশীল ঐতিহাসিক হয়তো আরো পরে লিখবেন, এক নষ্ট সমাজের উন্মাদ ভাঁড় ছিলে তোমরা, ব্যাভিচারী সমাজ যে কতো নিষ্ঠুরভাবে বুদ্ধিহীন লোকেদের তার অজ্ঞান শিকার ও দাস করে রাখে তার উদাহরণ। সেই দূরে থেকে যারা মুসলমান মারে, তরুণী দেখলে অ্যাসিড ছোঁড়ে, বেশ্যাপাড়ায় মারপিট করে, বিপ্লবের স্বার্থে পাড়ায় পাড়ায় খুন করে ঘোরে এবং তাদের যারা বিনাবিচারে খুন করে সব একদলের একপাল গৃধিনী মনে হবে।

কেন এই মুদ্রাস্ফীতি?
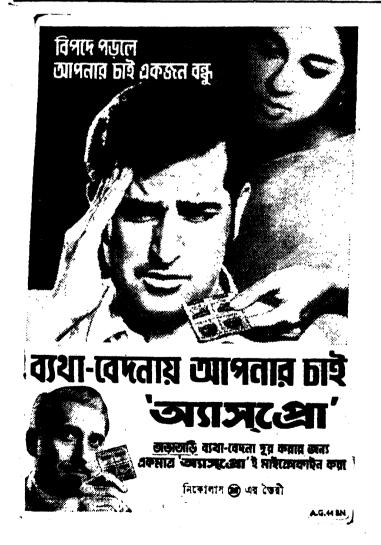
চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হবার পর থেকেই জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধমুখী হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। এখন জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ এক বছর নয় মাস সময়ের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম তো কমেইনি,—বরং আরও বেড়েছে। সর্বশেষ তথ্যে জানা যায় ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসের তুলনায় ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে সাধারণ ভোগ-সামগ্রী এবং কাঁচামালের গড় মূল্যসূচী ছয় শতাংশ বেশি; তার মধ্যে খাদ্য-সামগ্রী এবং অত্যাবশ্যক ভোগ-সামগ্রীর দাম অনেক বেশি হয়ে বেড়েছে। চাল, ডাল, তেল, তরিতরকারী প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দাম কেন এত বেড়েছে সে সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। কেন দেশের মুদ্রাস্ফীতির কারণ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে তার অনেকগুলি কারণ দেখতে পাই; প্রথমত, চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা, এবং এই চাহিদা বেড়ে যাবার কারণ হিসাবে বাধ্য আর্থিক আয় মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করতে পারে। সরকার যদি বাজেটে ঘাটতি পূরণ করবার জন্য অতিরিক্ত মুদ্রার সৃষ্টি করেন এবং এই বর্ধিত মুদ্রা যদি শুধু জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়িয়ে দেয়, অথচ সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের কাজে লাগতে পারে এ ধরনের সম্পদের সদ্ব্যবহারে ব্যবহৃত না হয়, তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। ভারতের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সামগ্রিকভাবে

৮৫০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থানের কর্মসূচী গৃহীত হলেও প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থান হচ্ছে এবং এই অর্থসংস্থানের পরিণতি হিসাবে নতুন মুদ্রারও সৃষ্টি হচ্ছে। গত চার বছর যাবৎ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন আশানুরূপ বেড়েছে—শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অথচ যে হারে চাহিদা বাড়ছে, যোগান বৃদ্ধির হার তার কাছাকাছি আসতে পারছে না কেন? তাহলে নিশ্চয়ই এমন কোন কারণ আছে যার দরুণ চাহিদা বৃদ্ধির হার যোগান বৃদ্ধির হারের চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত এগিয়ে আছে। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, জনসাধারণের আর্থিক আয় সম্পর্কে সরকারী হিসাব ঠিক নয়। কালো টাকা এক শ্রেণীর লোকের হাতে ক্রমেই জমছে এবং সরকারের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই কালো টাকা উচ্চ-আয় বিশিষ্ট এক বিশেষ শ্রেণীর চাহিদা ক্রমেই বাড়িয়ে দিচ্ছে; তার ফলে শুরু হয়েছে কালোবাজারি কারবার, কৃত্রিম সঞ্চয় ও ফাটকা কারবার। সুতরাং "সবুজ বিপ্লবই" হোক আর শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতাই হোক, চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা থেকেই যাচ্ছে। আশঙ্কা হয়, যোগান বাড়িয়েও চাহিদার সম-পরিমাণ করা যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ, চাহিদা বৃদ্ধির উপাদান কালো টাকার মধ্যেই নিহিত এবং তা সরকারের নাগালের বাইরে। তবে সরকার যদি ঘাটতি অর্থ সংস্থানের পরিমাণ কমাতে পারেন অথবা নতুন মুদ্রা উৎপাদনমূলক কাজে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন যাতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, তবে সমস্যার কিঞ্চিৎ মোকাবিলা করা সম্ভব হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন অতিরিক্ত করভার জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। কথাটার মধ্যে কিছুটা যুক্তি নিশ্চয় আছে। কর ফাঁকি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না কর-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য; আবার অতিরিক্ত পরোক্ষ করের পরিণতি হিসাবে জিনিসপত্রের দামও কিছুটা বাড়ছে। কর ফাঁকি যেমন কালো টাকার সৃষ্টি করে, তেমনি সুউচ্চ কর-হার অর্থাৎ করের অতিরিক্ত উঁচু প্রান্তিক হার (marginal rate) উৎপাদন বাড়াবার অনুপ্রেরণাকেও নষ্ট করতে পারে। শিল্পক্ষেত্রে যে নতুন বিনিয়োগ আশানুরূপ হচ্ছে না, প্রত্যক্ষ করের অতিরিক্ত উঁচু প্রান্তিক হার তার একটি কারণ। করব্যবস্থার ত্রুটির জন্য জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং সঞ্চয়-আয় অনুপাত (Saving-Income ratio) আশানুরূপ বাড়ছে না। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়লে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা কমে। আবার পরোক্ষ করের বোঝাও আমাদের দেশে অতিরিক্ত বেশি। রাজ্য সরকারগুলিকে সর্বদাই পরোক্ষ করের উপর নির্ভর করতে হয়। অধিকাংশ নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের

উপরও কেন্দ্রীয় সরকার আবগারী শুল্ক ধার্য করে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট এবং সবগুলি রাজ্য সরকারের বাজেট একত্রিত করলে দেখা যায় ভারতে মোট রাজস্বের শতকরা ৭৪ ভাগ আসে পরোক্ষ কর থেকে। পরোক্ষ করের পরিণতি যে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি তা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। জিনিসপত্রের দাম যে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে তার অন্যতম কারণ হল কর-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির নতুন ঋণদান নীতিও কিছু পরিমাণে জিনিসপত্রের দাম বাড়াবার সহায়ক হয়েছে। ১৪টি বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর নতুন উৎসাহে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঋণ দিতে শুরু করেছে। কিন্তু ঋণের টাকা সবটাই যে উৎপাদনের কাজে অথবা লাভজনক ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। এমন রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে কৃষক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সব টাকা খামারের উন্নতির জন্য অথবা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যয় করেননি। তাহলে ঋণের টাকা কিছু পরিমাণে তাঁর ক্রয়শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে; অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচী আশানুরূপ রূপায়িত হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে যে ভোগ-সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে এটাও তার একটা কারণ। আবার ফুড কর্পোরেশন খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ বাড়াবার জন্য কৃষকদের কাছ থেকে বর্ধিত মূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করছে; সময়মত ফুড কর্পোরেশনের কাছে খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয় করলে কৃষকরা বোনাসও পেয়ে থাকেন। অথচ কৃষক সমাজের এক শ্রেণীর লোকের আয় যে হারে বাড়ছে, সে হারে তাদের উপর কর ধার্য করা হচ্ছে না। আয়ের অনুপাতে করের হার কৃষিক্ষেত্রে খুবই কম। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, এ ব্যবস্থায় কৃষকদের ক্রয়শক্তি বেড়ে যাচ্ছে; কৃষি-সামগ্রীর বাইরে যে সকল ভোগ-সমাগ্রী আছে, (যেমন, বিলাস সামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী) সেগুলি কেনার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে এ-দিকটি উপেক্ষা করলে চলবে না। চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতির কারণ বর্ণনা করতে গেলে আরও অনেক বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯৬৬ সালে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর থেকেই আমাদের বহু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে বেশি দামে আমদানি করতে হচ্ছে। উৎপাদন-খরচ বেড়ে যাওয়ার পিছনে এটাও একটা কারণ। আবার সরকারী কর্মচারী, ব্যাংক কর্মচারী, জীবনবীমা কর্পোরেশনের কর্মচারী,—সবারই বেতন বেড়েছে। মজার বিষয় হচ্ছে, যে হারে তাঁদের বেতন বেড়েছে, জিনিসপত্রের দাম তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বেড়েছে। কালোবাজার একদিকে ফেঁপে উঠছে, অপরদিকে উৎপাদন প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। শিল্প-বিরোধ অনেক ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়েছে; আবার স্থান বিশেষে বন্যা, অনাবৃষ্টি, প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায় হয়েছে।

বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির যা-ই কারণ হোক না কেন, সরকারের দিক থেকে একটা যুক্তি হল,—উন্নতিকামী দেশে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা চলাকালে কিছু মুদ্রাস্ফীতি হবেই; উন্নয়নের জন্য সব অনগ্রসর দেশকেই কিছু দাম দিতে হয়,—এবং মুদ্রাস্ফীতি হল এরূপ একটি দাম। কথাটার যুক্তি নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা কি একটু বেশি হয়ে যায়নি? চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় "স্থিতিশীলতার সঙ্গে উন্নয়ন" ("Growth with Stability") অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম দুই বছর শেষ হতে যাচ্ছে; অথচ স্থিতিশীলতার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বজায় রাখতে হলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দ্রুত প্রতিষ্ঠা করার দিকে সরকারের আরও যত্নবান হওয়া দরকার।

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন

ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে Indian Economic Association এর ৫৩তম অধিবেশন হয়ে গেল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এম এল দাঁতওয়ালা। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল (১) ভারতের সরকারী উদ্যোগের ক্রিয়াকলাপ (Performance of Public Enterprises), (২) সবুজ বিপ্লবের অর্থনীতি (Economics of Green Revolution) এবং (৩) উন্নতিকামী দেশে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব (Quantity Theory of Money in a Developing Economy)। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য বিষয়গুলি এক বছর আগেই স্থির করা ছিল। কিন্তু গত এক বছরে উপরোক্ত তিনটি বিষয়েরই গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। সরকারী উদ্যোগগুলির ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়; অধিকাংশ সরকারী উদ্যোগে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। অবশ্য কয়েকটি উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে,—যেমন, লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন, ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশন, আকাশবাণী প্রভৃতি। কিন্তু হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড, হেভি ইলেকট্রিক্যালস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, মাইনিং এণ্ড অ্যালাইড মেশিনারি কর্পোরেশন, প্রভৃতি বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হচ্ছে।

সবুজ বিপ্লবের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। তবে পর পর চার বছর সন্তোষজনক কৃষি-উৎপাদনকে আদৌ "সবুজ বিপ্লব" আখ্যা দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একমাত্র পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় উচ্চ ফলনশীল বীজ রোপণ করে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত সমগ্র ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ভারতে সবুজ বিপ্লব সার্থক হবে না।

উন্নতিশীল দেশে অর্থের যোগান বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূল্যান্তরকে প্রভাবিত করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ টাকার যোগান বাড়লেই যে দেশের অব্যবহৃত সম্পদকে সব সময়ে উৎপাদনের কাজে লাগানো সম্ভব হবে অথবা শিল্পগুলির উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। উন্নতিশীল দেশে উন্নয়ন প্রচেষ্টার অর্থ সংস্থানের জন্য টাকার পরিমাণ বাড়বেই, আবার জিনিসপত্রের দামও বাড়বে, কিন্তু এ জন্য ক্লাসিক্যাল অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব (Classical Quantity Theory of Money) অনুযায়ী টাকার পরিমাণ এবং জিনিসপত্রের দামের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক থাকবে তা নয়। জিনিসপত্রের দাম অনেক কারণেই বাড়তে পারে; টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়তো তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ক্ষেত্র বিশেষে টাকার পরিমাণ এবং জিনিসপত্রের দামের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকতে পারে, —এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা যথেষ্ট হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সুনিশ্চিতভাবে উন্নতিশীল দেশে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন, যদিও ভারতের মত দেশে এই তত্ত্বের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে অনেকে মনে করেন।

সুব্রত গুপ্ত

সদরঘাট, জিয়াগঞ্জ —ইন্দ্র দুগার

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি আকাডেমি অব ফাইন আর্টস আয়োজিত ৩৫তম বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। আকাডেমি পরিচালিত এই প্রদর্শনীটি স্বল্প কয়েকটি নিখিল ভারত প্রদর্শনীর অন্যতম এবং পূর্ব ভারতের প্রদর্শনীগুলির মধ্যে বৃহত্তম। গত ৩৬ বৎসর যাবৎ এই জাতীয় বিরাট শিল্পমেলার অনুষ্ঠান করে অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনসাধারণ ও চিত্ররসিকবর্গকে দেশের সমকালীন শিল্পসম্ভার দেখার ও উপভোগ করার সুযোগ দিয়ে আসছেন, সেজন্য কর্তৃপক্ষ সকলেরই ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নেই।

এই বার্ষিক প্রদর্শনীটি যে সমগ্র দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত চিত্রসংখ্যা দেখে বোঝা যায়। তবে প্রদর্শনী বিষয়ে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। প্রথমত প্রতিবারের মত এ বছরেও কলকাতার সুপরিচিত কয়েকজন তরুণ শিল্পী প্রদর্শনীতে যোগদান করেন নি। বলা বাহুল্য এঁদের মধ্যে অনেকেই শিল্পকলা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁরা যোগদান করলে এই বার্ষিক প্রদর্শনীর মান উন্নততর হত, এবং, ফলে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারাদিও হয়ত যোগ্যতর ক্ষেত্রে বিতরিত হত। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ছবি থাকলেও বাইরের খ্যাতনামা শিল্পীদের সন্ধান খুব কমই পেলাম। তৃতীয়ত বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে দুজন নতুন শিল্পীর সহযোগিতা গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। (প্রদর্শনীর গুরুত্ব বিচার করে গত বছর আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে লিখেছিলাম)। চতুর্থত এই বার্ষিক প্রদর্শনীটি আকারে বৃহৎ এবং নির্বাচন তথা বিচার ও সঙ্কাপর্ব খুবই দুরূহ সন্দেহ নেই, কর্তৃপক্ষের অসুবিধার কথাও বুঝি। তবুও প্রত্যেকটি বিশেষ করে উত্তর ও মধ্যস্থলের গ্যালারী দুটিতে আয়তনের অতিরিক্ত সংখ্যক ছবি রাখার জন্য দর্শকদৃষ্টি ব্যাহত হয়। ছবি দেখে, বিচার করে দর্শকবৃন্দ আনন্দলাভ করতে চান। ঠাসাঠাসিভাবে ছবি টাঙ্গাবার ফলে দর্শকবৃন্দ দেখে ঠিক রস উপলব্ধি করতে পারেন না।

প্রদর্শনীতে ছবি ও ভাস্কর্যের মোট ৩১১টি নিদর্শন দেখা যায়। প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে এবারে কয়েকজন নতুন ও স্বল্পপরিচিত শিল্পীর প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেল, বাংলা দেশের প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে ধীরেন্দ্র দেববর্মণ, রাধাচরণ বাগচি এবং মধ্যবয়স্কদের মধ্যে ইন্দ্র দুগার, রথীন মৈত্র গোপাল ঘোষ ও সুনীলমাধব সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তরুণ, পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে নির্মল দত্ত, অমল চাকলাদার, গণেশ হালুই, সেলিম মুন্সী, অমরেন্দ্র চৌধুরী, অভিতাভ ব্যানার্জী, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর ভৌমিক, কুনাল কর, পরিতু নন্দী, অনন্ত পাণ্ডা, বি আর পানেসর কার্তিক পাইন, কে রাজিয়া, সন্তোষ রোহাতগী, অনীতা রায় চৌধুরী ও জীবেন সেন-এর সাক্ষাৎ মেলে। অধিকাংশ শিল্পীই বিমূর্ত, সমবিমূর্ত, সুররিয়ালিস্টিক ও আধুনিক রীতিতে কাজ করেছেন। অবশ্য ভারতীয় প্রথায় আঁকা ছবিও ছিল, এবং সেই সঙ্গে ছিল কোলাজ ও গ্রাফিক-প্রিন্টের সুন্দর নিদর্শন। স্টিল লাইফ, প্রতিকৃতি বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংখ্যা অল্প। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারুকার্য বৈচিত্র্য চোখে পড়ে, তবে রীতিমুখর রচনার অল্প নিদর্শনও মেলে। কয়েকটি অল্পপরিচিত শিল্পীকে উৎসাহদান করে কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ভাস্কর্য ক্ষেত্রে সমকালীন গঠনরীতির আভাষ পাওয়া গেলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নমুনা চোখে পড়েনি।

উত্তর দিকের গ্যালারীতে প্রথমেই কানাই চক্রবর্তীর দুটি আধুনিকধর্মী রীতিমুখর রচনা চোখে পড়ে—চাইল্ড আণ্ডার অ্যাফেকশন ও লর্ড কৃষ্ণ অ্যাণ্ড রাধা। সাংকেতিক রেখা ছোট বড় নানা আকারের চতুষ্কোণ ও সেই সঙ্গে চাপা লাল, হলুদ ও বেগুনী রঙের সুকৌশল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রথমটিতে শিল্পী একটি নিছক কাব্যরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, দ্বিতীয়টির রঙের স্তরভেদ লক্ষণীয়। এর পরে কতকগুলি ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে: অমিতাভ ব্যানার্জীর বার্ড—চাপা রঙ, রেখা, কারুকার্য ও আক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শিল্পী পাখির নব রূপায়ণ করেছেন। সমর ভৌমিকের এ কমরেডস ডেথ পরিকল্পনা ও কারুকার্যের দিক থেকে উল্লেখ্য। ব্রোকন চ্যারিয়টে রথীন মৈত্র অঙ্কন চাতুর্য তথা রঙের কারুকার্যমূলক ব্যঞ্জনা করেছেন। পৃষ্ঠভূমির গভীর লালরঙ অর্থবহ। সুকৌশল রঙ ব্যবহার স্তরভেদসৃষ্টি ও প্রধানত রচনাক্ষেত্রের কারুকার্যের মধ্য দিয়ে নির্মল দত্ত ডেকাডেন্সে প্রতীকমূলকভাবে অবক্ষয়ের ক্রমধ্বংসমান রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। গণেশ হালুইয়ের রচনা কাব্যধর্মী। অধিকাংশ স্থান শূন্য রেখে একপাশে গাছ, বেড়া ও অবশিষ্ট অংশটুকু আঁকাবাঁকা অথচ সুকম্পিত, তুলির কয়েকটি মোটা টানের মধ্য দিয়ে ট্রীজ অ্যাণ্ড দি ফেন্সেস-এর বক্তব্য কাব্যের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সুনীলমাধব সেন সম্প্রতি স্কুল-জাতীয় রচনা শুরু করেছেন, এবং প্রদর্শনীতে কালিকলমে রচিত দীর্ঘ ঠিকুজীর মত অক্ষর ও সংকেতমূলক রচনার নতুনত্বের দিকে কয়েকজনের দৃষ্টি পড়ে। বিভিন্ন উপাদান সাহায্যে রচনা তৈরী করে সরিত নন্দী সুনাম অর্জন করেছেন, এবং 'কমপোজিশন'-এ সুনির্বাচিত নানা উপাদান সংস্থাপন করে তিনি তাঁর সুনাম বজায় রেখেছেন। বিমূর্ত রচনায় রঙ বিন্যাস ও [illegible]

সুবল পাল সিদ্ধহস্ত—বিশেষ করে সবুজ রঙের পরিপ্রেক্ষিতে ও মাত্র রঙবিন্যাসের মধ্য দিয়ে বিমূর্ত আকার সৃষ্টির জন্য 'পেন্টিং' অনেকের ভাল লাগে। সেলিম মুন্সী অ্যাটম অ্যান্ড দি গ্লুন-এ আধুনিক রীতি ও গম্ভীর রঙের স্তরভেদের মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। উৎপল চক্রবর্তী নতুন পরীক্ষা করে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। ম্যাসোনাইট বোর্ডের ওপর কাপড়ের জালি এ'টে তিনি প্রাচীন, সরল রীতিতে শিকারীর ছবি এ'কেছেন (হান্টার)। তাঁর আরও একটি রচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—রাবণ। প্রাচীন দেওয়াল চিত্র অবলম্বনে রচিত সরল ও সুন্দর রীতিমুখর রচনাটিতে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই সংগে পরিতোষ ব্যানার্জীর নাম করা চলে। কেবলমাত্র তীব্র লাল ও হলুদ রঙ প্রধানত নানাভাবে ছিটিয়ে দিয়ে গাছ ও আকাশকে কেন্দ্র করে তিনি 'বসন্ত' ছবিটিতে বসন্তের আবাহন করেছেন। এই গ্যালারীর অন্যান্য ছবির মধ্যে রঙের স্তরভেদের জন্য আফটার ফ্লাড (বিনোদ কর্মকার), সাররিয়ালিস্টিক রচনা নাইট ড্রামা (কার্তিক পাইন), নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমুখর 'মিউজিক' (কুণাল কর), গভীর বেগুনী রঙের পৃষ্ঠভূমিতে রঙের কারুকার্য ও প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (বরেন বসু), হলুদ, নীল ও লাল রঙপ্রধান গতিশীল ও প্রতীকমূলক সমসাময়িক ছবি 'আপরাইজ ১৯৭০' (হিরণ মিত্র) ও পরিকল্পনা ও ড্রয়িং-এর জন্য মাই ইনসানিটি, ইওর লাভ কার্স (লক্ষর গুহ) উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম দিকের গ্যালারীতে জলরঙে আঁকা ছবি দেখা যায়। এখান থেকে দু' একটি ছাত্রসুলভ রচনা অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত। বলা বাহুল্য, এখানে এম এম যোশীই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর নিজস্ব রীতিতে আঁকা দুখানি বহির্দৃশ্যের জন্য (মারওয়া ফিচ ও মহালক্ষ্মী টেম্পল)। তারপরেই চোখে পড়ে যায় অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর দুটি অনবদ্য, সরল ড্রয়িং নিদর্শন (অ্যামুর ও দি উওম্যান)। গোপাল ঘোষের দুটি রঙীন স্কেচ অনেকের ভাল লাগে (ল্যান্ডস্কেপ ১৪৫, ১৪৫ এ), যদিও তাঁর অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ছবিও নির্বাচিত করা যেত। রিয়ালিস্টিক হলেও ইন্দু দুগারের সদর ঘাট, কিষাণগঞ্জ-এ শিল্পী পরিবেশ অনুযায়ী শান্ত ও সুন্দর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। পুরোভাগে সমুদ্র তরঙ্গগুলি যথাযথরূপে রূপায়িত করতে পারলে সুনীলমাধব চক্রবর্তীর দি সী অ্যান্ড ফিশারমেন ছবিটি আরও স্বাভাবিক হতে পারত। পানেসরের কমপোজিশন-১ একটি সহজ ও সরলভাবে আঁকা বহির্দৃশ্যের উপভোগ্য নিদর্শন। আর

হিংসা বনাম অহিংসা —রামচন্দ্র প্রধান

করে—অমল চাকলাদারের চাইল্ড উইথ বার্ডস। স্পষ্ট অথচ সাবলীল রেখা সাহায্যে আঁকা খিলান, শিশু ও পাখীর মূর্তির অবতারণা ও সেই সঙ্গে হালকা রঙ ব্যবহার করে শিল্পী রচনায় একটি অতিরিক্ত আয়তনিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। অপরাপর ছবির মধ্যে সুনিপুণ রঙ ব্যবহার প্রণালীর জন্য সোনার তরী (নিতাই ঘোষ)-এর নাম করা চলে।

মধ্যস্থলের গ্যালারীর নিদর্শনগুলি মিশ্র জাতীয়, অর্থাৎ এখানে কোলাজ, আধুনিক বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত ছবি ও সেই সঙ্গে কয়েকটি, বিশেষ করে শান্তিনিকেতন ও দিল্লী থেকে আগত, সুন্দর গ্রাফিক প্রিন্ট দেখা যায়, যদিও এই ক্ষেত্রে স্থানীয় কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত গ্রাফিক শিল্পীর অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এখানে প্রথমেই টি এস অর্ধনারী-র কোলাজ-১ চোখে পড়ে। রঙবাহার নানা কাগজ ও ছবির টুকরা রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে ও বসিয়ে শিল্পী একটি সুসম্বদ্ধ কমপোজিশন তৈরি করেছেন। প্রবীর সেনগুপ্তের আকাশও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এর পরে দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করে শিবশঙ্কর কুণ্ডুর এ প্লেজ্যান্ট নাইট। জ্যোৎস্না আলোকিত মায়াবী রাত্রি, আকাশের বুকে চাঁদ, পুরোভাগে গৃহকোণের একাংশে রেখাপ্রধান বিলীয়মান সিঁড়ির ধাপ, পাশে, আকাশের দিকে চেয়ে

মোটা কালো রেখা ও বিশেষত রঙের স্তরভেদের মধ্য দিয়ে শিল্পী মলিন ও উজ্জ্বল রাত্রে বিরহিণী নারীর মর্মবেদনা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বিমূর্ত চিত্র হিসাবে লাল ও বেগুনী রঙের কয়েকটি সুকল্পিত বুরুশের টানের মধ্য দিয়ে রচিত বীণা [illegible] কমপোজিশন-৬ উল্লেখযোগ্য। রীতিমুখরতার নিদর্শন হিসাবে রাখাল দাসের প্যাস্টেলে আঁকা ডিমান্ড-এর নাম করা চলে। ১২১, ১৬৩ ও ২৪১ নং ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। খ্যাতনামা গ্রাফিক শিল্পী সোমনাথ হোড়ের শিক্ষাগুণে শান্তিনিকেতন থেকে আগত কয়েকটি প্রিন্টে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পরিকল্পনা ও খোদাইয়ের জন্য ২৯ নং (লুই গনজাগ বেলপ্রেম), লিথোগ্রাফ—২ (১১ নং)—এচ কে নাগ-এর নাম করা উচিত। দিল্লি থেকে আগত কয়েকটি প্রিন্টও প্রশংসনীয়, যেমন রেখা ও আকার প্রধান প্রিন্ট (অনুপম সুদ) ও আকার ভিত্তিক ও ভাস্কর্য জাতীয় (Sculpteresque) রঙীন প্রিন্ট (সন্তোষ মিটল)। লিথোগ্রাফের দুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ৩১০ ও ৩১১ নং প্রিন্ট (কিশোরওয়ালা)।

দক্ষিণ দিকের গ্যালারীতে প্রধানত বহিরাগত শিল্পীদের কাজ দেখা যায়। অধিকাংশই বিমূর্ত, সমবিমূর্ত বা আধুনিকধর্মী। এখানে লক্ষ্মণ বিশ্বনাথ পেনস্করের দুটি ইমপ্রেশনিস্টিক বহির্দৃশ্য প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে (স্ট্রীট সিন ও হোলি বেনারস)। ভগবান কপুরের সানসেট ভিউ অনেককে মুগ্ধ করে রঙ ব্যঞ্জনার জন্য। উচ্চ অট্টালিকার আকারগুলি প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে ইমপ্রেশনিস্টিক রীতিতে শিল্পী সমুদ্র বেষ্টিত শহরের রূপ প্রকাশ করেছেন। বিমূর্ত রচনা হিসাবে প্রেম চৌধুরীর হলুদ রঙের পরিপ্রেক্ষিতে সূক্ষ্ম রেখাজাল ও নীলরঙের প্রলেপ ভিত্তিক ল্যান্ডস্কেপ মন্দ লাগে না। এই প্রসঙ্গে জি কে পণ্ডিতের গ্রীন ল্যান্ডস্কেপ ও জি আর সন্তোষের কমপোজিশন উল্লেখযোগ্য। নীলরঙের স্তরভেদ মাধ্যমে ইমেজারি সৃষ্টি করে অমরনাথ শর্মাও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (অ্যাজিওর)। কয়েকজন শিল্পী বিভিন্ন রীতির সমন্বয়ে রচনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন, যেমন দীননাথ পাথি। তাঁর ফরবিডন ফ্রুট-এর রঙ-ব্যঞ্জনা দ্রষ্টব্য। অপরাপর ছবির মধ্যে নন্দদুলাল কুণ্ডুর রেড রোব, এন খান্নার ড্রিম অব এ পেজ্যান্ট, এম এ করিমের সমবিমূর্ত পেন্টিং ১২ ও বসন্ত পণ্ডিতের গ্লো অ্যান্ড কালার, ভি ডোরাইস্বামীর ফ্যামিলি ডাইনিং ও এস সেনাপতির সিমবল-এর নাম করা চলে।

পশ্চিম দিকের নতুন গ্যালারীতে

দি বার্ড —অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় রীতিতে আঁকা শিল্প নিদর্শন চোখে পড়ে। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই দর্শক দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর নীলিমারঙা ছবিটির জন্য। এটি ইতিপূর্বে অনেকেই দেখেছেন। প্রাচীন রেখাচিত্র ভিত্তিক এই ছবির একটি নিজস্ব সরলতা ও স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রবীণ শিল্পী ধীরেন দেববর্মণ ও রামচরণ দাসের শিল্প নিদর্শন অনেকের ভাল লাগে ইন্ট্রুডার ও কুমারী। বলিষ্ঠ স্কেচ হিসাবে রবীন্দ্র দাসের স্কেচটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরলতার দিক থেকে শ্যামলী দত্তের ইয়েলো হর্সম্যান ও লক্ষ্মী ধরের ছাপচিত্রের নাম করা যায়। আর একটি সুন্দর ছবি, অক্ষয় দাসের টু পিকক্স। প্রত্যেকের অভিব্যক্তি দীর্ঘাকার, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নানা নরনারীর মূর্তির অবয়ব ও সরলতাকে রঙ ব্যবহার করে শিল্পী এই ছবিখানির মধ্যে ছন্দোবদ্ধ রূপে প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সোমনাথ ... পাপেট-শো উল্লেখ্য।

ভাস্কর্য বিভাগে ৩৮টি নিদর্শন দেখা যায়, তাদের মধ্যে ১৭টি এসেছে শান্তিনিকেতন থেকে। সবগুলিই রুচি-সম্মতভাবে রেখে কর্তৃপক্ষ দর্শকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। অধিকাংশই কাঠ, পাথর ও কংক্রীট গঠিত। খোদাই কাজের নিদর্শনই অধিক। গঠনরীতি মিশ্র অর্থাৎ প্রথাগত ও সমকালীন দুই রীতিতেই ভাস্করগণ কাজ করেছেন। দুঃখের বিষয় এখানেও কয়েকটি পরিচিত ভাস্করের সন্ধান পেলাম না। সুতরাং তাঁদের উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ নজরে পড়েনি। পরিকল্পনার দিক থেকে সোমনাথ ... লোটাস অ্যান্ড দি ফিশ অনেকের চোখে পড়ে। খোদাই কাজ ও আঙ্গিক সমতার জন্য নরেন পালের কম্পোজিশন-এর নাম করা যায়। শিবাশিস ... ফাউন্টেন আলংকারিক কারুকার্য ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় দেখা যায়। তারক গড়াই পথক-

ভাবে তিনটি বিভিন্ন আকার খোদাই করে পাশাপাশি স্থাপন করে বস্তু ও পরিবেশের মধ্যে সামগ্রিক সম্বন্ধ ও রূপ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন (কমপোজিশন ইন থ্রি)। ফুলচাঁদ পাইনের গল্পী অব দি ফিশ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিশেষত আয়তনিক আকার গঠন ও নেগেটিভ ফর্মের ওপর প্রাধান্যদান ক'রে তিনি এটিতে একটি বিশিষ্ট রূপদান করেছেন। দু-একটি কাজে সাবলীল ছন্দের মাধুর্য ফুটে উঠেছে, যেমন সালেহা আহমদের ঊর্মিলমিক। সত্যেন মজুমদারের টরসো গঠনরীতি ও আয়তনিক সমতার দিক থেকে উল্লেখ্য। ভাস্কর হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন অতুলচন্দ্র বড়ুয়া তাঁর নব পরিকল্পিত ও কঠিন কাজ, অ্যান ওভ্যাল, ইনার অ্যান্ড আউটার ফর্ম-এ। অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে রঘুনাথ মহাপাত্রের সূক্ষ্ম খোদাইকার্য প্রধান সান গড অব কোনারক ও পার্শ্ববর্তী সুরেন্দ্র-র ফিউচার এজ ও রামচন্দ্র প্রধানের ভায়লেন্স ভার্সাস ননভায়লেন্স-এর নাম করা চলে।

-চিত্রপ্রিয়

বিশ্বদেব বিশ্বাস

ধস্‌—ধস্‌—ধস্‌—"। —তাপস,—আভালান্স,—আভালান্স।

গড়ু গড়ু করে আওয়াজ হচ্ছে। হুড়ু হুড়ু করে ধস নামছে। আমি চীৎকার করে উঠছি, "—তাপস,—আভালান্স, আভালান্স—"।

বিরাট আওয়াজ। এক একবার আওয়াজ হয় আর যেন বুকের ভিতর কাঁপিয়ে দেয়। আমি আর্তনাদ করে উঠি। স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে বসি এয়ার ম্যাট্রেসের উপর। চীৎকার করতে থাকি,—"তাপস আভালান্স,—আভালান্স"—। আওয়াজ একেবারে মাথার উপরে। বুঝি পড়ল, এই ঘাড়ের উপর। সব শেষ, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই মুহূর্তে। পাঁচটা জীবন্ত প্রাণ প্রকৃতির রুদ্র রোষের কবলে পড়ে এক নিমেষে,—। আমরা সম্পূর্ণ অসহায়, নিরুপায়। ভগবানের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কাল গুনছি,—গড়ু গড়ু আওয়াজ হচ্ছে, হুড়ু হুড়ু করে ধস নামছে,—আমি আবার লাফিয়ে উঠছি। আবার আচমকা চীৎকার করছি,—"তাপস, আভালান্স,—আভালান্স"। "—ধস,—ধস নামছে", মাথার উপরে—তাঁবুর উপরে। ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে অন্তিম মুহূর্তের কাল গুনছি,—মহাকাল। যেন গঙ্গাযাত্রায় এসে শেষ সময়ের অধীর অপেক্ষা। কি অনিশ্চিত অবস্থা,—কি মানসিক যন্ত্রণা—আমি তা বোঝাতে পারব না।

এই কাল রাত্রে তাপসই আমার একমাত্র তাঁবু-সঙ্গী। অপর এক তাঁবুতে তিন শেরপা,—পাশাং ফুটার, শেরিং লাকপা, গ্যালজেন। ১৯৬৬ সালে "মানা" অভিযানের শেষ পর্যায়। ২২,৫০০ ফুট উঁচু ৫ নং ক্যাম্প ছেড়ে যাত্রা করে শীর্ষা-রোহণের পথে ২২,৮০০ ফুটে অন্তর্বর্তী ক্যাম্প করে আস্তানা গেড়েছি। এক রাতের আশ্রয়। 'মানা' শীর্ষের কাছে এগিয়ে আছি। কাল প্রত্যুষেই পাড়ি দেব,—সরাসরি 'মানা'র শীর্ষে। আমাদের প্রাণনাশী সংগ্রামের শেষ। জানি না সে প্রত্যুষ আর হবে কিনা। যদি আমরা বেঁচে থাকি,—জানব ভগবানের অশেষ করুণা,—মানার অনেক ঔদার্য।

আমি গোড়াতেই কি রকম যেন দুর্ঘটনার গন্ধ পেয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে অবস্থা ভাল নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা আমরা বোধহয় কোন মতেই এড়াতে পারি না। বড় বেশী ঝুঁকি নিয়েছি। রোমহর্ষক পর্বতারোহণ—সবটাই ঝুঁকি। এই প্রাণের ঝুঁকি না থাকলে পর্বতারোহণ স্পোর্টসটা নিছক একটা পাসটাইম মনে হোত। অভিযানে প্রাণের ঝুঁকি নিশ্চয় নেব। তবে সঙ্গত ও সমীচীন কারণে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়,—সেই কবে উনিশ শতকের শেষ শতাব্দীতে পর্বতারোহণ [illegible] শুরু। তারপর থেকে পূর্বসূরীদের বহু শত অমূল্য প্রাণ উৎসর্গ হয়েছে। বিনিময়ে আহরণ করে এনেছে উত্তরসূরীদের জন্য অমূল্য সব সম্পদ,—অভিজ্ঞতার রত্ন সম্ভার যা আমাদের আজকের প্রধান পাথেয়।

বেশ ভেবে দেখেছি আমাদের বর্তমানের ঝুঁকি নেওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত। জানি না, 'মানা' আর কোনও দিন এতটা আসতে দেবে কি না। ১৯৬১ সাল। তারপর আবার ১৯৬৬ সাল। এই দু বছরের প্রস্তুতির যে লড়াই করে আজ এখানে এসে পৌঁছেছি সে লড়াই করার সুযোগও আর কোনদিন পাব কিনা, তাও জানি না। তবুও অবস্থা বলছে দুর্ঘটনা বোধহয় এড়াতে পারব না। পৃথিবীতে মিরাকল্‌ আজও ঘটে,—তাই এখন ভরসা শুধু ভগবান—সেই কাল্পনিক শক্তি। আমাদের মানবিক শৌর্য, বীর্য, মনীষা সব অকেজো হয়ে গেছে। তাই অসহায় হয়ে নীরবে শুধু ভগবান স্মরণ করে রুদ্ধশ্বাসে কাল গুনছি। গড়ু গড়ু করে আওয়াজ হচ্ছে,—হুড়ু হুড়ু করে ধস্‌ নামছে। আমরা

সচকিত হয়ে দমবন্ধ করে প্রস্তুত হয়েই এক দৃষ্টে লক্ষ রাখছি,—কোথায় সে ধস পড়ছে।

একেবারে মাথার উপরে। খাড়া উঠে গেছে হাজার ফুটের এক পাথরের দেওয়াল। 'মানা' শীর্ষের উত্তর গাত্র। তারই মাথায় সাজান রয়েছে যেন মানার বিধ্বংসী কামানগুলো। ঝুলন্ত বরফের কার্নিশগুলো, মানার বহির্দুর্গের দ্বার রক্ষী। মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে। কার্নিশগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। গুড় গুড় করে আওয়াজ হচ্ছে। চমকে উঠছি আর মন্ত্রমুগ্ধের মত যন্ত্রবৎ চীৎকার করছি "—হাপস, — আভালান্স, — আভালান্স"। তারপর উৎকর্ণ হয়ে রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ রাখছি হুড় হুড় করে 'মানা'র গা বেয়ে নামা বরফ ধস কোথায় পড়ে, কোন্‌দিকে তার গতি নেয়। দণ্ড গুনছি, পল গুনছি, মুহূর্ত গুনছি,—এই বুঝি ঐ ধস ঘাড়ে এসে পড়ে। তারপর—? অপর ক্যাম্পে শেরপাগুলোকে চীৎকার করে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি,—সবাই 'সজাগ থাক'। আসন্ন বিপদ যদি ঘাড়ে পড়ে যাতে মুহূর্তে ছিটকে প্রাণ নিয়ে সকলে পালাতে পারে।

কিন্তু পালাব কোথায়? চতুর্দিকে মেঘে ঢাকা নিশুতি রাতের ঘন অন্ধকার। সারা আকাশ পাহাড় যেন অতিকায় এক জীব, সব তার সর্বগ্রাসী পেটের ভিতর গিলে নিয়েছে। এক হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। তাঁবুর চতুর্দিকে অসংখ্য ছোটবড় ফাটল,—যেন মৃত্যুর এক একটা কাল গহ্বর, আমাদের সম্ভাব্য পরিণতির উদ্দেশ্যে প্রকৃতির পূর্ব-প্রস্তুত সমাধিক্ষেত্র। এর উপর ধু ধু করছে নরম বরফরাশি—কোথাও কোমর, কোথাও বা বুক-ডোবা। এর মধ্যে দিয়ে পালাব কোথায়? পালাব কি করে? তবু সজাগ থাকি, বাঁচার চেষ্টায় মরব,—শুধু মরতে হবে বলেই মরব না। কিন্তু সম্পূর্ণ ফাঁদে পড়েছি। দিনের আলো ফোটার আগে আমাদের মুক্তি নেই। জানি না—মাথার উপরে ধস, আমাদের চোখে সে আলো ফোটার সুযোগ আর দেবে কিনা!

সর্বদিকের অনুসন্ধানী দল এসে সন্ধান দিয়েছে 'মানা'র এই ৫ নং ক্যাম্প থেকে সরাসরি শীর্ষারোহণ দুরূহ, দুষ্কর। ক্যাম্পের সামনেই বিরাট এক পাহাড়ী সমতল,—সুবিস্তৃত। পর্বতারোহণের ভাষায় আমরা যাকে বলেছি, 'বেসিন'। সে বেসিন আঠাল নরম বরফে ভর্তি। চলতে গিয়ে কোথাও কোমর ডুবে যায়, কোথাও বুক অবধি ডুবে যায়। এই কোমর-ডোবা, বুক-ডোবা বেসিনের বরফ ভেঙে যেতে যে পরিমাণ শক্তি, সামর্থ্য ও সময় ক্ষয় হবে, তারপর 'মানা'র উত্তর গাত্রের ঐ খাড়া প্রাচীরের প্রতিটি ফুট দড়ি বেঁধে বেয়ে বেয়ে ওঠার মত আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে কিনা! এর উপর আছে প্রকৃতির

খাড়া প্রাচীরের প্রতিটি ফুট দড়ি বেঁধে বেয়ে বেয়ে ওঠা...

করুণা,—আবহাওয়ার প্রকৃতি। আবহাওয়ার প্রকৃতি হিমালয়ে সব সময়ই অনিশ্চিত,—সম্পূর্ণটাই অনিশ্চিত। এক ঘণ্টা আগের পরিষ্কার আবহাওয়া এক ঘণ্টা পরে ম্যাজিকের মত পালটে গিয়ে রুদ্র মূর্তিতে রূপ বদলাচ্ছে। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৫নং থেকে সরাসরি শীর্ষারোহণ,—অনিশ্চিত,—সম্পূর্ণটাই বরাত। পর্বতারোহীরা বরাতের দাস হয় বটে, কিন্তু বরাতকে একমাত্র নিয়ামক মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে না। আমরাও থাকব না। এবার 'মানা'য় সাফল্য চাই, যে কোন প্রকারে,—মানুষের যতখানি সাধ্য তার সবকিছুর বিনিময়ে।

স্থির করেছি,—বেসিনটুকু পার হয়ে থাকব একদিন, পরেরদিন প্রত্যূষে সতেজ পূর্ণ উদ্যমে শীর্ষের সংগ্রাম। সংগ্রাম,—সংগ্রাম,—সংগ্রাম। 'মানা'র সারাটা পথই সংগ্রাম করতে করতে এসেছি। বিরামহীন সংগ্রাম করতে করতে আমরা শ্রান্ত, ক্লান্ত। শুধু মানার শীর্ষের দিকে তাকিয়ে আমাদের শক্তির শেষটুকু যাই যাই করেও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।—বেসিন পেরিয়ে একটা সামিট ক্যাম্প লাগাব।

আধঘণ্টা অগ্রবর্তী হয়ে পাশাং ফুটার সামিট ক্যাম্পের তাঁবু দুটি লাগিয়েছে। আধ ঘণ্টা পরে আমি সেখানে পৌঁছেই চীৎকার করে উঠেছিলাম। ভয়াবহ অবস্থা দেখে রীতিমত শঙ্কিতই হয়েছি। "এ কোথায় ক্যাম্প লাগিয়েছ?" এখানে নিস্তার নেই। আমার সমগ্র মাউন্টেনিয়ারিং সত্তা এর অসম্মতিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 'মানা'-শীর্ষ প্রাচীরের ঠিক পাদদেশে একটা 'লেজ'-এর উপর ক্যাম্প। তার দক্ষিণে ফাটল, উত্তরে ফাটল, পশ্চিমে অবিন্যস্ত হিমপ্রপাত, আর পূর্বে—একটু গিয়েই উপচে পড়েছে একেবারে তিন হাজার ফুট নিচে,—পূর্ব-কামেট হিমবাহের 'বেড'-এ—আমাদের ৩নং ক্যাম্পের কাছে সমউচ্চতায়। দক্ষিণের ফাটলের পাশ থেকেই উঠে গেছে সোজা 'মানা' শীর্ষের সেই রোমহর্ষক পাথরের দেওয়াল। দেওয়ালের মাথায় ঝুলছে,—'ঝুলন্ত গ্লেসিয়ার'—কার্নিশগুলো। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে, পড়বেই। সোজা এসে ক্যাম্পে পড়বে। হয়ত আমরা থাকব তখন অবসর রত,—হয়ত নিদ্রিত। —তখন?

'না'। পাশাং আমায় অনেক বুঝিয়েছে। 'বড়া সাব, ঘাবড়ো মত্‌।' বলেছে, আমারও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। ধস নামবে ঠিকই। তবে সে ধস সোজা এসে,—না,—ক্যাম্পে পড়বে না। ফাটলের গর্তে ঢুকে যাবে। এক রাতের জন্যে এটুকু ঝুঁকি যদি না নিলে তাহলে আর মাউন্টেনিয়ারিং কি হোল! আমার অসম্মতি ওখানেই। আমার আপত্তি ঐ বিপত্তির ব্যাপারে। ঝুঁকি নেব সংগত কারণে। জীবনটাকে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়াই অ্যাড্‌ভেঞ্চার নয়।

ভীষণ বরফ পড়ছে। কার্নিশের উপর তা জমছে। তারই ভারে কার্নিশগুলো ভেঙে ভেঙে পড়বে। ধস নামবে। যেন তেন প্রকারেণ আরোহণ করাই পর্বতারোহণ অভিযান নয়।

কিন্তু আজ আর কোন উপায় নেই। এই মুহূর্তে কোনও বিকল্প নেই। গত্যন্তর নেই। সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। বরফপাতের সঙ্গে হাওয়া বইছে। গতি তার তীব্র। সে হাওয়ায় উড়ে আসা বরফ গুঁড়ো মুখের অনাবৃত অংশটুকুতে লেগে বরফ জমান ঠাণ্ডার মধ্যে সূচের মত বিঁধছে। এমত অবস্থায় স্থানান্তরে ক্যাম্প লাগান,—সেও এক প্রাণান্তকর। তাছাড়া আমরা তখন সকলেই সাফল্যের জন্য মরীয়া, অন্ধ। শুধু আসন্ন দুর্যোগের কি রকম এক দুর্ভাবনা আপন অনিচ্ছাতেও মনকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছে। তাই আশঙ্কিত, অবসাদগ্রস্ত।

*

'মানা'—২৩,৮৬০ ফুট। উত্তর গাড়োয়ালের এক পর্বতশীর্ষ। অসাধারণ সুন্দর। আপন সৌষ্ঠবের আড়ম্বরে উদ্ধত, গর্বোন্নত। দূরে থেকেও দেখা যায় সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল, দীপ্তিমান। লাল গ্রানাইট্‌ পাথরের যেন এক পিরামিড। বর্ণনায় বর্ণাঢ্য। প্রত্যক্ষে ভয়ংকর। 'মানা'—নামের মধ্যেই যেন নিষেধের এক আদেশ জারী করা। অভিযাত্রী মন কোন নিষেধ মানে না। যেখানেই নিষেধ, তাদের সেখানেই চ্যালেঞ্জ।

২৩,৮৬০ ফুট শৃঙ্গ হাতছানি দিয়ে ডাকছে

ভয়ংকর আওয়াজ। দেখা গেল সমগ্র প্রাচীরটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত। —ধস নামছে। হাজার হাজার টন বরফ। উদ্বেলিত সমুদ্রের মত আছড়ে আছড়ে পড়ছে। প্রচণ্ড গর্জন, প্রলয়ংকর। সব শান্ত হলে দেখা গেল চেতান নিখোঁজ। তারপর অগাধ বরফ স্তূপের তলা থেকে খুঁজে চেতানের চাপা পড়া দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। নিস্পন্দ, নিঃসাড়, দলা পাকান পিণ্ড—বীভৎস মূর্তি হয়ে গেছে। বরফের আঘাতে মাথা মুখ ছেঁচে বিকৃত হয়ে গেছে।

১৯৩৭ সালে এক জার্মান দল নাঙ্গা পর্বত অভিযানে এসে রাখিয়ৎ হিমবাহে দ্বিতীয় শিবির স্থাপন করেছিল। অনেকদিন হয়ে গেল উপরের সে শিবির থেকে কোন খবর মূল শিবিরে এসে পৌঁছাল না। নিচে থেকে এক সাহেব পর্বতারোহণের ইতিহাসে সব চাইতে বড় খবর সংগ্রহ করল। দ্বিতীয় শিবির নেই। যেখানে দ্বিতীয় শিবির ছিল সেখানে তখন পাহাড়ের খাড় তুষার ঢাল। বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে একটি তুষার ধসে দ্বিতীয় শিবির সমেত ১৫ জন চাপা পড়েছে। কয়েক বছর পরে বরফ খুঁড়ে সে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে জানা গেছে,—কারও ঘড়ির কাঁটা বারটা বেজে বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ তখন ঘুমচ্ছিল,—কেউ ডায়েরি লিখছিল, কেউ বা চিঠি, সুদূর জার্মানীতে আপন প্রিয় পরিজনদের কাছে।

১৯৬১ সালে আমাদের মানা অভিযানে এক শেরপা লাকপা শেরিং। সেও বরফ ধস চাপা পড়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। ঐ বছরই গ্রীষ্মকালে এক জাপানী দলের সঙ্গে নেপালের ক্যাংটেং গিরিশৃঙ্গের অভিযানে গিয়েছিল। প্রায় ২৩ হাজার ফুট উঁচুতে ৪নং শিবিরে অভিযাত্রীরা ঘুমচ্ছিল। রাত তখন কত তা লাকপার হুঁশ নেই। এক তাঁবুতে সে আর তার মামা ছিল। ভয়ংকর এক বিকট শব্দে চমকে জেগে উঠতেই কিসের এক প্রচণ্ড আঘাতে তার মুখ গুঁজড়ে গেল। হঠাৎ মনে হল তাঁবুর ভিতর থেকেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। উল্টে পাল্টে গড়াতে গড়াতে তাঁবুর কাপড় আর বরফে জড়িয়ে গেল। লাকপা বুঝতে পারল ধস নেমেছে। চাপা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া হয়ে তাঁবুর কাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে উঠে দাঁড়াল। তখন নিশুতি রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বিহ্বল হতভম্ব লাকপা অন্ধকারের মধ্যে শুধু শুনতে পেল,—আর্তনাদ আর হাহাকার। —সে রাত্রে অনেক খোঁজাখুঁজি করে, অনেককে পাওয়া গেল, আবার কয়েকজনকে পাওয়া গেল না। যাদের পাওয়া গেল তাদের কেউ আহত, কেউ মুমূর্ষু, কেউ মৃত। লাকপার মামাকে পাওয়া গেল না।—তার কোন চিহ্নই নেই।

*

'গুড় গুড়', করে আবার আওয়াজ মাথার উপরে। তবে এবার আওয়াজের গুরুভার অনেক কম। রাত আরও গভীর হয়েছে। ঠান্ডা আরও বেড়েছে। ঘন ঘন ধস নামা অনেক কমেছে। বরফপাত যা হচ্ছে সবই ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে উপরে।

অবশেষে কালরাত্রি কেটে গেল। আলো ফুটল,—দি লাইট অব স্যালভেশন,—মুক্তির আলো। পূবে আকাশের রক্তিম আভার আবছা আলোয় সারা আকাশ পাহাড় আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমরা বেঁচে গেলাম। আমরা বোধহয় মুক্তি পেলাম। কী আনন্দ! শীর্ষে ওঠার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। শেরপারা স্টোভ জ্বালল। তার আওয়াজ হচ্ছে। স্টোভে বরফ চাপাল। সে বরফ গলবে ঘণ্টাখানেক পরে। আরও পরে ফুটবে। তাতে চা হবে। দুধ গুলবে। খাব। তারপর,—শীর্ষারোহণে সদলে রওনা হব। সাফল্য প্রায় আমাদের পকেটস্থ। ভরসায় আমাদের মন তখন একান্ত নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত, স্নিগ্ধ। মনে আবার সাহস এল। নতুন উদ্যম, অফুরন্ত প্রাণচঞ্চল। স্মাইথের অসম্ভবের সম্ভাবনার প্রাণে আবার নতুন আলো জ্বলে উঠল। আবার মরীয়া। শেরপাদের তাঁবুতে স্টোভ জ্বলছে। তাপস বুটের ফিতে বাঁধছে। আমি ক্যামেরায় ফিল্ম ভরছি। নতুন ফিল্ম। শীর্ষে ওঠার সবকটি মুহূর্ত এতে ধরে রাখব। হারমান বুলের কথা মনে আছে। নাঙ্গায় তার অলৌকিক একক সাফল্যের পর তার দল,—তার দলনেতা সন্দেহ করেছিল। হারমানের তোলা ছবি সব সন্দেহ নস্যাৎ করে দিয়েছে।—

মাথার উপরে। যেন কোন ফাটান বিস্ফোরণের—বিরাট এক ব্লাস্টিং। মনে হল 'মানা'র পুরো প্রাচীরটাই বোধকরি উপড়ে দেবার উপক্রম। চমকে উঠলাম। হাত থেকে ক্যামেরা ছিটকে পড়ে গেল। যন্ত্রবৎ মুগ্ধ-মন্ত্রের মত পাশাং বলে চীৎকার করতে গিয়ে, কথা সম্পূর্ণ করার আগেই পড়াম, দুম, হুড় হুড় করে ভারি ভারি আঘাত পিঠে এসে পড়ল।—কোলের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে গেল। কিছু বুঝতে পারার আগেই তাঁবুর কাপড় ছিঁড়ে হুড় হুড় করে যেন বরফের বন্যা ঢুকে পড়ল। কিছু মাত্র বুঝতে বাকি থাকল না,—ধস এবার,—প্রকৃতই আমাদের ঘাড়ে পড়েছে। বিরাট ধস। আমরা নিশ্চিত মরেছি। তারপর,—সজ্ঞানে যা করেছি—পরে বুঝেছি, পুরোটাই সম্মোহিতের মত মোহাবিষ্ট হয়ে, যন্ত্র-চালিতের মত অবচেতন মনে।

ক্ষণিকের বিহ্বলতা। চীৎকার করে উঠলাম,—"পাশাং,—পাশাং" বলে। কোন সাড়া নেই। তারপর "লাক্‌পা, লাকপা" বলে। কোন সাড়া নেই। স্টোভ জ্বলছিল, তারও কোন আওয়াজ নেই। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব। মন্ত্রমুগ্ধের মত ছিটকে বেরিয়ে পড়লাম তাঁবু থেকে। তারপর যা দেখলাম,—আমার জীবনে তা আর কখনও দেখিনি।

শেরপাদের তাঁবু নেই। পরিবর্তে বিরাট উঁচু এক বরফের ঢিবি। বুঝতে বিলম্ব হয়নি,—ওদের তাঁবু ঐ বরফ ঢিবির নিচে সম্পূর্ণ চাপা পড়েছে। এক পলক। "ভাপস ওরা চাপা পড়েছে",—বলে চীৎকার করে উন্মত্তপ্রায় হয়ে খোলা হাতে দুহাত দিয়ে ঐ বরফ ঢিবি খুঁড়তে লাগলাম। সব ভুলে গেলাম,—নিজের অবস্থা, নিজের সাবধানতা, নিজের আঘাত। ভুলে গেলাম ২৩ হাজার ফুট উঁচুতে খোলা হাতে বরফ ঘাঁটলে সে হাত বেশীক্ষণ জ্যান্ত থাকে না। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তুষার ক্ষত। মুক্তি অ্যাম্‌পুটেশন।

তাঁবু খুঁড়তে খুঁড়তেই ওরা হাঁক্‌-পাক্‌ করে বেরিয়ে এসে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। তারপর—,পাশাং ও লাক্‌পা মাথা চেপে ধরে ধপ করে বরফের উপর বসে পড়ল,—'সাব খতম হো গয়া।'

বিঃ দ্রঃ—উপরের ঘটনার একদিন পরেই ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬, প্রাণেশ চক্রবর্তী ও তিনজন শেরপা মানা (২৩,৮৬০ ফুট) শীর্ষ আরোহণ করে। মানায় আমাদের সাফল্য সারা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। তারপরই ২০শে সেপ্টেম্বর বিরাট এক দুর্ঘটনায় চারজন শেরপার জীবন সংশয় হওয়ার বিবরণ যেমন বীভৎস, তেমনই করুণ।—লেখক।

পানামা
সিগারেট

'চুনাও' চুটকি

নির্বাচনী আসরের মজার খবরের টুকরো

প্রথম নির্বাচনে মহিলা নির্বাচক বা ভোটদাতাদের বেলায় বেশ একটা গোল বেধেছিল। তাঁরা অনেকে স্বামীর নাম নিতে নারাজ ছিলেন আবার নিজের নামের বেলায়ও কোন এক সংস্কারে বাধতো আত্ম-পরিচয়ে আপন নাম জাহির করতে। সে কারও মা বা কারও স্ত্রী। সংসারে তাই তার পরিচিতি। নাম সংগ্রহ যাঁরা করেছিলেন তাঁরাও ঐভাবেই তাদের ভোটার তালিকাভুক্ত করেছিলেন। ফলে ২৮ লক্ষ মহিলা ভোটারকে ভোটদানের অধিকার বঞ্চিত হতে হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই মেয়েরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। নানাভাবে তাঁদের এই অর্থহীন সংস্কারমুক্ত হবার জন্য প্রচারকার্যও চলেছিল কিছুদিন, ফলে দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা ৯৫ জনের নাম তালিকাভুক্ত করতে রেজিস্ট্রেশন দফতরের কোন ঝামেলাই হয়নি।

এখন আমাদের মহিলা ভোটার বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু দুএকটা অভিজ্ঞতার অভাব বা সমান কোনও সংস্কার দিয়ে সেদিনের ভোট-দাত্রীকেও বুদ্ধির বিচারে খাটো বলা যায় না। তাঁরাও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ভাল বা মন্দ সম্বন্ধে নিজের স্বার্থ দিয়ে বিচার করবার শক্তি রাখতেন। সে সময়কার দুএকটি ঘটনার কথা সেজন্য উল্লেখ করছি।

উত্তর প্রদেশের একটি কেন্দ্রে একজন প্রার্থীর দুই পত্নী ছিল। যখন ভোট যাচ্ঞা করে ফিরছেন, মেয়েরা তাঁকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করে নাজেহাল করে তুলছেন। যে স্বামী তাঁর প্রথম স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে তার আবার কর্তব্যনিষ্ঠার ভরসা কি? এমনভাবে জনমত তাঁরা গড়ে তুললেন যে বেচারার ভোটভাগ্য ভেঙ্গে গেল!

মাদ্রাজে এক মহিলা ভোটার পার্টিশন করা ভোটদানের কামরা থেকে আর বাইরে আসেন না। চিন্তিত কর্মচারীরা ভিতরে চেয়ে দেখলেন মহিলা বিড় বিড় করে বলছেন "হে ঈশ্বর, আজ এই বাক্সই রাজদণ্ডের প্রতীক। বাক্সের বিবেচনায় শাসনের কর্ণধার মন্ত্রীদল গঠিত হবে। এমন কর যাতে সেই সেকালের মত সস্তায় প্রচুর চাল পাই!" করজোড়ে যে প্রার্থনা বৃদ্ধা সেদিন জানাচ্ছিলেন আপাতদৃষ্টিতে মজার মনে হলেও তাঁর কামনাই কিন্তু ভোটদাতার চিরদিনের কামনা। এখনও ইলেকশন কমিশনের কর্তারা বলেন দূরে পল্লী অঞ্চলের প্রত্যেক ভোটদাতার ঐ এক কথা—যে খেতে দিতে পারবে ভোট তার।

রাজস্থানের একটি অন্ধ মহিলা ভোটদান কেন্দ্রের কর্মচারীকে বললেন, আমার কাগজ-খানা মহিষ মার্কা বাক্সে ফেল। কর্মচারী যতই চেষ্টা করেন বোঝাতে মহিলা ততই তেতে ওঠেন। স্বামী দিয়ে গেছেন উট মার্কা বাক্সে ভোট, বাকী থাকে মোষ। এই দুটি হলেই কোনরকমে তাঁদের দিন গুজরে যাবে। ঐ একই কথার হেরফের মাত্র নয় কি!

দক্ষিণ ভারতে মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা সেকালেও বেশী ছিল। পরদার তেমন প্রচলন না থাকায় স্বাধীনভাবে ভোটদান তাঁরা চিরকালই করেছেন। মাদ্রাজ অর্থাৎ আধুনিক তামিলনাড়ুর কোনও এক নির্বাচন কেন্দ্রে আসন্নপ্রসবা মহিলা ভোট-দানের কাগজখানা ভোট বাক্সে ফেলেই সন্তান প্রসব করেন।

ভোটকেন্দ্রে মহিলা অফিসারও একবার সন্তান প্রসব করেছিলেন! মহিলা ভোট-দাতাদের সুবিধার জন্য মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অফিসার থাকেন। সাধারণত পুরুষ ও মহিলা একই কেন্দ্র থেকে ভোট দেন। তবে যেখানে পরদার প্রচলন সেখানে মেয়ে-দের ভিন্ন কেন্দ্র হয়। দ্বিতীয় নির্বাচনে ২৭,০৮৬ মেয়েদের কেন্দ্র স্থাপনা হয়। ক্রমশ পরদা সমস্যাও কমে আসছে।

কেবলমাত্র মহিলারাই যে এমন একটু-আধটু মজার খবরের কারণ হয়েছিলেন তাও নয়। আমাদের আলোচনা মেয়েদের নিয়ে। তাই তাদের কথাই বেশী লিখলাম। প্রায় সমগ্র পৃথিবীর সপ্তমাংশ মানুষের বাস যেখানে, যেখানে শিক্ষার মান তেমন নয়, যেখানে দরিদ্র অজ্ঞ মানুষ প্রাপ্তবয়স্কের মস্ত এক অংশ, সেখানে অনভিজ্ঞতার ব্যাপারে পুরুষ মেয়েতে তফাৎ কি?

ওই মাদ্রাজেই এক ভোটদাতা সেবার খুব বিরক্তভাবে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হলেন। রাজনীতির মারপ্যাঁচে যত সব প্রার্থী তাঁকে কুলিয়েছে সবাইকে জব্দ করতে হবে। শ্রীসুকুমার সেন তখন চীফ ইলেকশন কমিশনার। তাঁকে ভোট দেবেন। কারও বা ভোটবাক্সের মার্কার উপর নজর বেশী। প্রার্থীর ব্যাপারে তাঁদের মাথা ব্যথা কম। উত্তরপ্রদেশের একদল মাঝি কেন্দ্রে এলেন ভোট দিতে। তার মধ্যে একজন ভোটের বাক্স দেখেই বাইরে এলেন। 'কি ব্যাপার? নৌকো মার্কা বাক্সে ভোট দেবে' বলে তারা এসেছিল। নেই কেন? দিল্লীতে তো ঐ মার্কা মঞ্জুর হয়েছে। এ নিশ্চয় স্থানীয় অফিসারদের শয়তানি। সদর্পে দলসুদ্ধ বেরিয়ে গেল। নৌকো তাঁদের জীবিকা। তার অপমান অসহ্য!!

আরও মজা হয়েছে মাদ্রাজ, মহীশূর ও উড়িষ্যাতে। কয়েকটি ব্যালট বাক্সে ব্যালট

কাগজের ছোট ছোট কুচি পাওয়া গেল। পরে দেখা গেল কিছু ভোটদাতা নিজের কাগজখানা টুকরো টুকরো করে এক এক টুকরো এক এক বাক্সে ফেলেছেন। দিও কিঞ্চিৎ না করো বঞ্চিত আর কি।

ভোটবাসরে আসর জাঁকাতে বন্য জন্তু পর্যন্ত জমা হয়েছে শোনা গেছে। কে জানে তাদেরও কোনও আকর্ষণ ছিল কিনা। মধ্যপ্রদেশের কোন এক জঙ্গলঘেঁষা কেন্দ্রে দুপুর রাত্রে চিতাবাঘ এসে উপস্থিত। পরদিন ভোরে ভোট গ্রহণ। যাক, অল্প পরে চিতা তো চলে গেল ফিরে কিন্তু পরদিন মহাবিভ্রাট। ভোটের বাক্সপত্র গুটিয়ে যখন সবাই ফিরে যাচ্ছেন, পথে বিরাট দশ ফুট লম্বা বাঘপ্রবর পথ জুড়ে দাঁড়াল। মানুষের কাজের এ মহড়া তাকে বোধ হয় বিচলিত করেছে। জীপে বসে সবাই ভয়ে মৃতপ্রায় কিন্তু ভাগ্য ভাল ছিল। একটু হুমকি দিয়ে বাঘ আবার জঙ্গলের পথ ধরলো।

টুকিটাকি

এবার শীতে আমাদের বাংলাদেশেও ঠাণ্ডায় মৃত্যু ঘটেছে। ঠাণ্ডাটাই বেশী না মানুষের শরীর সহ্য শক্তির শেষ সীমায়, বলতে পারি না। তবে যাঁদের সময় আছে আর সুযোগ আছে তাঁরা শীতের হাওয়াকে সামলে নিয়ে শরীরকে চাঙ্গা করতে পারেন। চাই কি রূপকে জলুস দিতে পারেন।

যাঁদের খুব ঠোঁট ফাটে, আর কারই বা না ফাটে, তাঁরা নাভিতে তেল দেবেন। একটু দুধের সর পেলে ঠোঁটে মেখে নেবেন। দুকুচি পেটে গেলেও মন্দ হবে না। অনেকে ফাটা ঠোঁটের অস্বস্তিতে বার বার ঠোঁট চাটেন অথবা দাঁত দিয়ে ঠোঁটের শুকনো চামড়া টানেন। তাতে ক্ষতি বেশী হয়। বরং রাত্রে কোল্ড ক্রীম বেশ করে মাখবেন।

জলের কাজ বা কচাকুচিতে হাত রুক্ষ হয়। কিছু সময় গরম জলে হাত ডুবিয়ে, মুছে একটু তৈলাক্ত কিছু ঘষে দেখবেন রুক্ষতা কমে যাবে। সিদ্ধ আলু দু হাতে চটকে মাখলে হাত নরম হবে।

মুখেও ঐভাবে সকাল সন্ধ্যা গরম জলে ধুয়ে অল্প তৈলাক্ত কিছু মাখলে ত্বক হবে তকতকে। রুক্ষ ত্বকে পাউডার বেশী লাগাবেন না।

আসলে সিবাম নামে যে তৈলাক্ত পদার্থ ত্বককে সুন্দর রাখে শীতে সে sebum জমে যায়। তখন ত্বকের উপর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে না। সে জন্য ত্বক রুক্ষ হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে স্নেহ পদার্থ চায়। সে সময় যথেষ্ট স্নেহ দিতে পারলে আর বিবর্ণ ম্লান হয় না ত্বক। তৈলাক্ত জিনিসের মধ্যে স্বাভাবিক জিনিস যেমন দুধের সর, টাটকা মাখন ইত্যাদি বেশী উপকারী।

শ্রীমতী

সমর মুখোপাধ্যায়

দাবা হল অর্ধাঙ্গিনী
থাকে কাছে কাছে
চারদিকে চায়, ঘর নষ্ট হয় পাছে।
দুই দিকে দুই বোকা
সাদা কালো গজ
কোনাকুনি চলে এরা
পথ খোলসা রাখে।
একপক্ষ এক বোকা
ভাল নাহি খেলে
দুই পক্ষ দাবার মাত
খেলাতে পারিলে।
ভাগিনা দৌহিত্র দুই
ঘোড়া পাশে তার,
রুপটি মোর মারে কিস্তি
রোকসাহে বাঁচা ভার।
আড়াই পদে বাড়ায় পা
কে জানে কোথায়
গাঁরে মানে না আপনি মোড়ল,
বেড়ায় পায়ে পায়ে।
মাতাপিতা দুই নৌকা
দুইদিকে প্রহরী
সোজাসুজি চলে এরা
নাহি লুকোচুরি।
দুই নৌকা বর্তমানে কেবল হারায়,
নাহিবা রহিলে দাবা কি ভয় তাহার?
সম্মুখে বটিকা শিশু
সন্তান সকল
সোজাসুজি চলে এরা
কোনা পেলেই মারে।
বড়ের মায়া ভীষণ মায়া
তাই তো হয় ভয়।
এই বড়ে অষ্টম ঘরে হইলে উত্তীর্ণ,

আপনি যদি আন্তর্জাতিক মতে দাবা খেলতে চান তবে এই নিয়ম অনুসারেই খেলতে হবে। যদিও এই সূত্রটি ইংরেজি মতের, তবু এদেশের বহু প্রবীণ খেলোয়াড়ের মতে এইটি সঠিক। বাংলা রীতিতে খেলাও চালু আছে। তবে বেশীর ভাগ দাবাড়ুই এই রীতিতে খেলতে চান না। কারণ এই নিয়মেও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে খেলা হয়ে থাকে।

যদিও বর্তমান দাবা জগতে রুশ দাবাড়ুরাই শ্রেষ্ঠ, তবুও প্রাচীন যুগের মত বর্তমানেও ভারতে এ খেলা কম জনপ্রিয় নয়। অনেকে মনে করেন ভারতই দাবার জন্মস্থান। লণ্ডনে কিংস কলেজের প্রাচ্যভাষায় অধ্যাপক ফরবস, এল এল ডি, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর একটি বইতে প্রমাণ করেছেন, পাণ্ডু রাজার সময় থেকে ভারতে দাবা খেলা চলে আসছে। তাঁর বইতে এও প্রমাণিত যে ভারতবর্ষই এই খেলার জন্মস্থান। অধ্যাপক ফরবস-এর কথা অনুযায়ী দাবা খেলা এদেশে প্রায় পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে চলে আসছে। ভারতীয় পুরাণেও এর কিছু কিছু প্রমাণ আছে।

দাবা বুদ্ধিমানদের খেলা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলে এ খেলা আয়ত্ত করা অসম্ভব। দাবার ছকের উপর সব সময় কড়া নজর রাখতে হবে। একটু অন্যমনস্ক হলে খেলায় হার অবধারিত। কিস্তি মাৎ!

তাই, খেলার পত্তন থেকেই তীক্ষ্ণধী রাজা মহারাজা, কূটনীতিবিদ, জমিদার-শ্রেণী প্রভৃতি ধনী লোকের পৃষ্ঠপোষকতা এই খেলা পেয়ে আসছে। অবসর সময়ে দাবাই ছিল তাঁদের একমাত্র নেশা। আকবর, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কদের দাবা-প্রীতির কথা সুবিদিত। সেই সময় তাঁদের আগ্রহ না থাকলে এতদিন দাবা খেলা চলত কিনা সন্দেহ। ভারতে হিন্দু রাজত্ব এবং তারপরে মোগল যুগেও এই খেলা বেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও তদানীন্তন শাসকরাও দাবায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। মিঃ আর স্টীল, স্যার হেনরি হ্যারিসন, স্যার হেনরি কটন প্রভৃতি ইংরেজদের সহায়তায় সেই সময় কলকাতায় দাবাড়ুদের উৎসাহ অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

সেই সময় ও তার পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির মধ্যে বাঙালী দাবাড়ুরাই বেশ নাম করেছিল। তখনকার নামকরা দাবাড়ুদের মধ্যে শ্যামাচরণ ঘটক, রামমোহন চক্রবর্তী, রামচন্দ্র কর্মকার, পুঁটে গোঁসাই, কালী বসাক, দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ ঘোষ, হরিধন দত্ত, বিধুভূষণ ঘোষ প্রভৃতির নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। কলকাতার পাথুরিয়াঘাটের জমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুরও একজন ভাল দাবাড়ু ছিলেন। আর তাঁর সময় এর উন্নতিও হয়েছিল যথেষ্ট।

চলতি শতাব্দীর যে কয়জন দাবাড়ু কিংবদন্তী হয়ে এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডু অন্যতম।

এই ত' সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দূর থেকে বাড়ির রকে বসা এক বৃদ্ধকে চোখে পড়ল। হঠাৎ কেন জানি না মনে হলো ইনি নিশ্চয়ই প্রাণকৃষ্ণবাবু। আমার ভুল হয়নি। কাছে গিয়ে পরিচয় দিতে খুব আগ্রহের সঙ্গে ডেকে বসালেন। চেহারা দেখে মনে হলো এক কালে খুব শক্ত-সমর্থ ছিলেন। এখনও বেশ শক্ত রয়েছেন। ৭৭ বছর বয়স হলেও লাঠির প্রয়োজন এখনও হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই হেঁটে চলে বেড়ান। তবে বছর দশেক আগে একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। বাকিটিও ভাল নেই। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ-মণ্ডল দেখলে এখনও সহজে বোঝা যায় বুদ্ধির জোরেই তিনি এককালে ব্লাইণ্ড ফোল্ড খেলায় দেশজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন। থাকেন উত্তর কলকাতায় ১।৬এ ভুবন চ্যাটার্জি লেনে (কলকাতা-৬)।

প্রাণকৃষ্ণবাবুর যখন মাত্র ছ'বছর বয়স তখন তাঁর বাবার (নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু) আগ্রহেই দাবা খেলা শুরু। নারায়ণবাবু খুব ভালবাসতেন দাবা। তখন ১৮৯৯ সাল। জেলেপাড়ার মোড়ে একটা রকে দাবার আড্ডায় শশীভূষণ ঘোষ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি তখনকার দিনের দিকপাল দাবাড়ুরা আসতেন। ওইটুকু ছেলে প্রাণকৃষ্ণ, তার দাবার চাল ধরার কায়দা দেখে শশীবাবু একদিন তার সঙ্গেই খেলতে বসলেন। স্বাভাবিক ভাবেই সেদিন হেরে গিয়েছিলেন, কিন্তু পেয়েছিলেন শশীবাবুর অকুণ্ঠ প্রশংসা। সাধনার সেই শুরু, এই ৭৭ বছর বয়সেও সাধনায় ছেদ পড়েনি।

কিন্তু শুরুতেই ছিল বাধা। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। সংসারের সব দায়িত্ব বালক প্রাণকৃষ্ণর ওপর এসে পড়ায় চাকরি নিতে হলো বড়বাজারে মেটাল মার্কেটে। সুতরাং খেলায় সাময়িক বিরতি। কিন্তু যে ছেলে তার জন্মলগ্নেই দাবা খেলায় একটা সহজাত প্রতিভা নিয়ে এসেছে, তার পক্ষে কি খেলা ভুলে থাকা সম্ভব? প্রায় দশ বছর পরে সমকালীন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আবার খেলা শুরু। প্রথম খেলাতেই পরাজয় হলেও এই পরাজয়ই পরবর্তীকালে তাকে কঠিন সাধনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জয়ের নিশানায়।

বন্ধুরা মিলে একজন গুরু যোগাড় করলেন। তালিম শুরু হলো। কিন্তু মাত্র একমাস পরেই প্রাণকৃষ্ণর হাতে ঐ গুরু মশাইয়ের হার। সেই সময় মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে এক দাবার আড্ডায় বিখ্যাত দাবাড়ু হরিধন দত্ত খেলতেন। হরিধনবাবুর মত পাকা দাবাড়ু প্রাণকৃষ্ণবাবু আর দেখেননি। এই হরিধনবাবুর উৎসাহেই প্রাণকৃষ্ণ তাঁর জীবনে প্রথম ব্লাইণ্ডফোল্ড খেলেন। একজন চোখ বাঁধা অবস্থায় খেলে অন্যজনের সাহায্যে ঘুঁটি এগিয়ে দেন আর বিপক্ষ দেখে দেখে চাল দেন। পরবর্তীকালে এই খেলায় তাঁর সমতুল্য আর কেউ ছিলেন না। তিনি এক সময় চারটি ছকে এক সাথে 'ব্লাইণ্ড' খেলতে পারতেন।

সব মিলিয়ে তিনি প্রায় ২৫টি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। তার ১৬টি প্রতিযোগিতায় জিতেছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সারা জীবনে মাত্র ২৫টি খেলা? হাঁ, তখন দাবা প্রতিযোগিতার সংখ্যা ভীষণ কম ছিল যে!

প্রাণকৃষ্ণবাবুদের সময় দাবা খেলার প্রতিযোগিতার সংখ্যা কম থাকলেও ভাল দাবাড়ুদের সংখ্যা এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। এখন ঠিক উল্টো চেহারা। প্রতিযোগিতা ও সাধারণ খেলার সংখ্যা প্রচুর কিন্তু ভাল দাবাড়ুদের দেখা পাওয়া দুষ্কর।

বন্ধুরা চাইত কি করে প্রাণকৃষ্ণকে হারান যায়। বুদ্ধি দিয়ে না পারলে চালাকি করে? একবার ব্লাইণ্ড খেলছেন প্রাণকৃষ্ণ, বিপক্ষে দুজন নামকরা খেলোয়াড়ঃ দেবেন শীল ও চণ্ডী চক্রবর্তী। যুক্তি করে ওঁরা প্রাণকৃষ্ণর চালা একটি ঘুঁটি সরিয়ে ফেলে তাঁদের 'মাৎ' নিশ্চিত করে নিলেন। প্রাণকৃষ্ণ চাল দিতে গিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে সহজেই বলেছিলেন, কোনখানেই বা তাঁর কোন কোন্ ঘুঁটিগুলি ছিল আর কোন্ ঘুঁটিটাই বা সরান হয়েছে। বন্ধুরা বিস্ময়ে হতবাক।

এই খেলার পর চণ্ডীবাবু প্রাণকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে নানান আড্ডায় খেলতে যেতেন। এই রকমই একবার তিনি পার্কসার্কাসে এক ইংরেজ দাবাড়ুর সঙ্গে খেলতে প্রাণ-কৃষ্ণকে নিয়ে গেলেন। ব্লাইণ্ডফোল্ডে খেলায় প্রাণকৃষ্ণবাবু তখন প্রায় অজেয়। তাই সাহেবের সহজ হার। সাহেব প্রশংসা করার পর জিজ্ঞাসা করলেন, সারাদিন কতক্ষণ খেলেন? প্রাণকৃষ্ণর উত্তর প্রায় ১৫।১৬ ঘণ্টা। সাহেব হতভম্ব হবার জো। তিনিই প্রাণকৃষ্ণকে খেলার সময় কমিয়ে আনার পরামর্শ দেন। কারণ এর ফলে চোখ ও মস্তিষ্কের চাপ বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। হয়েছিলও তাই। পরবর্তীকালে হয়ত এই কারণেই একটি চোখ হারাতে হয়েছিল।

সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী প্রাণকৃষ্ণ খেলার সময় অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। তবে নিয়মিত রাজেন্দ্রনাথ সেন লেনের দাবার আড্ডায় যাওয়া তিনি বন্ধ করতে পারেননি। ১৯৬০ সালে একটি চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁকে [illegible] ছাড়তে হয়েছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন্ প্রতিযোগিতাটি আপনাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দিয়েছিল? বললেন, ২০।২২ বছর বয়সে পাথুরিয়াঘাটা জমিদার বাড়িতে আয়োজিত প্রতিযোগিতার একটি খেলাতেই তিনি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পান। তাতে তখনকার দুজন নামকরা দাবাড়ুকে হারিয়ে কাইক টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন। ১৯৬৫ সালেও তিনি বালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ খেলায় এক-সাথে ২৫টি বোর্ডে খেলে জিতেছিলেন।

এখন প্রাণকৃষ্ণবাবু ওয়েস্ট বেঙ্গল চেস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। নিজে খেলা প্রায় ছেড়ে দিলেও অ্যাসোসিয়েশনের ছোট বড় সব কাজেই তিনি উপস্থিত।

এইটিই বাংলাদেশের একমাত্র প্রধান সংস্থা। শিয়ালদহে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট সমিতিকে একটা জায়গা দিয়েছেন। রোজ সন্ধ্যাতে খেলাও বসে।

কিন্তু আগের তুলনায় এখন এই খেলায় কোন স্টাডি বা কালচার নেই।

কেন এই অস্থিরতা

গত সপ্তম সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় সমরজিৎ করের 'কেন এ অস্থিরতা' প্রসঙ্গে দুচারটে কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে আয়োজিত সভায় বর্তমান সমাজনৈতিক অস্থিরতা প্রসঙ্গে কোন ছাত্র, বেকার যুবক অথবা কোন মহিলার বক্তব্য না থাকায় খুবই আশ্চর্য লাগলো। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের এই অবক্ষয়িত সমাজকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার এক প্রাণপণ চেষ্টা চলছে যার ফলে যুবমানসের ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত আসছে একের পর এক। আজ আমরা বাঙালী বলে বাংলার বাইরে পাত্তা পাচ্ছি না অথচ একথা আজও সর্বজনবিদিত যে বাঙালীর বুদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষ এক পাও চলতে পারে না।

আমি একজন কলেজের ছাত্রী। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে বড় হবার এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কলেজে এসেছি কিছু জানতে, কিছু শিখতে, কিন্তু এই কয়েক মাসের কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি তিক্ত বিরক্ত হয়েছি। ট্রেন চলাচলে অস্বাভাবিক অনিয়ম দেখা দেওয়ায় আমাদের অধিকাংশ অধ্যাপক বাইরে থেকে আসতে পারেন না, ফলে কত ক্লাস যে নষ্ট হল তার ইয়ত্তা নেই। পরীক্ষার কথা নাই বা তুললাম। শুধু বাঙালীকে ভালবাসা, বাংলার লোক সংস্কৃতিকে জানবার যে প্রয়াস ছিল, আমার ছিল তার নিদারুণ অপমৃত্যু ঘটেছে সন্দেহ নেই। আমাদের মনে আজও অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা আছে সেগুলো পূরণ করবার দায়িত্ব আমাদের ওপরেই কিন্তু এদের সহযোগিতায় সেগুলো পরিপূর্ণ রূপ পাবে আজ এই মুহূর্তে জানতে ইচ্ছা করছে।

কুমারী জ্যোৎস্না সান্যাল
শান্তিপুর কলেজ

॥ ২ ॥

গত ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখের 'দেশ' পত্রিকাতে বর্তমান সমাজের অস্থিরতা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনাটি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পড়লাম। মানব-বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসাবে আরও উৎসাহিত হয়েছি যখন জেনেছি অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীবিক্রমকেশরী রায়বর্মণ (কুমারটা বোধ হয় ঠিক নয়) এবং শ্রীসুরজিৎ সিংহ এঁরা দুজন অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিলেন। বলা বাহুল্য, দুজন সমাজ-বিজ্ঞানীই বিষয়বস্তুটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিন্যস্ত আলোচনা করেছেন। সমগ্র প্রবন্ধটি পড়ে আমার সামান্য দু একটি কথা নিবেদন করার ইচ্ছা হচ্ছে।

প্রথমত আমাদের নিজেদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা যা নাকি গোষ্ঠী বা সমাজের প্রকৃত ইতিহাস এবং ঐতিহ্য জানলে জানা যায়—না থাকার জন্যই অনেক অসামাজিক এবং অস্বস্তিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। এই জ্ঞান বা উপলব্ধি না থাকার কারণ হয়ত কিছুটা আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত অসামাজিক যা আমরা যে নামেই বলি—কাজের মুখ্য কারণ আমাদের চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থা নয় কি? আমার মনে হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করলে অনেক প্রায়-অজানা নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। পূর্বসূরীদের হাতে এই কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি।

পরিশেষে এই ধরনের আলোচনা বর্তমান অবস্থায় যার বিশেষ অর্থ আছে আয়োজন করার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শক্তি গড়াই
আসানসোল

শিশু সাহিত্য শরদিন্দু

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রয়াণের পর তাঁর সাহিত্যকৃতি এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় এখনও বাখ্যাত হয়নি।

বহুদিন আগে "চীকিমেঘ" রচনা করে শরদিন্দুবাবু প্রথম শিশুসাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন। মরণোত্তর কালে প্রকাশিত "ভূমিকম্পের পরে" পড়বার এখনও সুযোগ হয়নি। শিশুসাহিত্যে এগুলি তাঁর রচনা গুণে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু পরিণত বয়সে লেখা তাঁর তিনটি শিশু উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত। ঐতিহাসিক কল্পনায় শরদিন্দু আধুনিক সাহিত্যিকদের অগ্রগণ্য। এই শিশু উপন্যাস তিনটিতে ইতিহাসাশ্রিত কল্পনার সূক্ষ্মতম বিকাশ ঘটেছে।

"ব্যোমকেশ" ও "বরদা"কে বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি বলে সমালোচকরা অভিনন্দিত করেছেন। শিশু উপন্যাস তিনটির নায়ক "সদাশিব"কেও এই অবিস্মরণীয় চরিত্রগুলির সমগোত্রীয় বলে স্বীকার করতে হবে। "সদাশিবের তিন কাণ্ড", "সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড" এবং "সদাশিবের ঘোড়া ঘোড়া কাণ্ড" তিনটি উপন্যাসই শিবাজীর সমসময়ের পটভূমিকায় রচিত। শরদিন্দুবাবুর সরস বর্ণনায় সে যুগটি শিশুচিত্তের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সদাশিবের নানা কাণ্ডগুলি শিবাজীর অভিযানের সঙ্গে সমন্বিত করে শরদিন্দু গভীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বহুদিন পূর্বে "চুয়াচন্দন" গ্রন্থে শরদিন্দু শিবাজীকে নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলেন। তার মধ্যে সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চাদপটে শিবাজীর কিশোর অভিযানের প্রথম অঙ্কটি অঙ্কিত হয়েছিল। শিশু উপন্যাস তিনটির অধিরাজ শিবাজী যৌবনে উপনীত হয়েছেন। ক্রমে ক্রমে পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত দুর্গগুলি কূট কৌশলে অধিকার করছেন। খুব অল্প কয়েকটি রেখায় তাঁর চরিত্রের প্রধান বিশেষত্বগুলি ফুটে উঠেছে। কূটকঠিন অথচ কোমল হৃদয়, গম্ভীর অথচ সদালাপী শিবাজীর এমন একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় ভারতের আর কোনো সাহিত্যে অঙ্কিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সংকল্প সিদ্ধির জন্য তিনি অবলীলাক্রমে হত্যাকাণ্ডের মন্ত্রণা করেন কিন্তু আহত সঙ্গীকে মায়ের মতো করে সেবা করেন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্গীদের দুরূহ কাজে নিযুক্ত করতে তাঁর দ্বিধা নেই কিন্তু অন্তরঙ্গ সুহৃদের মতো তাঁদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেন। জীজাবাঈয়ের সঙ্গে খেলতে বসে মার কাছে হেরে গেলে তাঁকে একটি নূতন দুর্গ অধিকার করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু জিতলে শুধু দুধি-হালুয়া খেতে চান। কৌশলী শিবাজীর বালকোচিত অথচ মহত্তম রূপ এই গ্রন্থ তিনটিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পটভূমি, অধিবাসীদের আচার ব্যবহারও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শরদিন্দুবাবু নূতন করে সৃষ্টি করেছেন। এ বর্ণনাও সাহিত্যের চিরন্তন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে রইল।

ঐতিহাসিক ছোটোখাটো অনেক চরিত্র শরদিন্দু স্বল্পতম ঘটনা বিন্যাসে উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত করেছেন। তার মধ্যে শিবাজীর মায়ের চরিত্রটি অনবদ্য। তিনি রাজসম্মান পুত্রের দুর্গের ঘর কটি নিজ হাতে ঝাঁট দিয়ে গুছিয়ে রাখেন। দুর্গে সকলের নিত্য প্রয়োজনের প্রতি সমান নজর। শিবাজীর পিতা শাহজীর চরিত্রও শুধু একটি দৃশ্যের অবতারণা করেই উজ্জ্বলতম বর্ণে চিত্রিত হয়েছে।

'সেবন্তী' নামে কল্পিত চরিত্রটিও সুন্দর। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে সদাশিব ও কুঙ্কুর কিশোর প্রেমের অভূত-পূর্ব বর্ণনা। কোথাও সংযমের অভাব ঘটেনি। অথচ শেষ দৃশ্যে সদাশিবের কাছেও অজ্ঞাত অভিলাষটিকে পূর্ণতায় সীমান্তে এনে আখ্যানটি শেষ হয়েছে।

এই তিনটি

মাথায় শরদিন্দুবাবুকে চিরস্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে আমার বিশ্বাস।

পুণা, প্রবাসী শরদিন্দুর দ্বিতীয় মাতৃভূমি। সে পুণার বীরশ্রেষ্ঠ সন্তানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে শরদিন্দুবাবু মাতৃঋণ শোধ করেছেন।

অমিয়কুমার সেন
শান্তিনিকেতন

গোপালচন্দ্র সেন

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে সকলের মত এবং বিশেষ করে তাঁর ছাত্র হিসেবে আমি নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়েছি। যদি তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হতো, এমনকি কোন দুর্ঘটনায়ও নিহত হতেন তাহলে হয়তো এমনভাবে সান্ত্বনাহীন বেদনায় আমাকে দগ্ধ হতে হতো না। তাঁর মত একটি অজাতশত্রু ব্যক্তিত্বের এই শোচনীয় সমাপ্তিতে আমি হতবাক হয়েছি।

চার বছর ধরে তাঁর কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। শিক্ষা ও ছাত্রমঙ্গলের জন্যে এমন আর একজন সমর্পিতপ্রাণ অধ্যাপক আজও আমার নজরে পড়লো না। অনেক বড় বড় অধ্যাপক সম্বন্ধে যাদবপুরের অনেক ছাত্রকে কটূক্তি করতে শুনেছি। কিন্তু 'গোপালবাবু' নামটা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে এসেছেন।

প্রায় দশ বছর হতে চললো যাদবপুর ছেড়ে এসেছি। এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেক বছরের পাশকরা কিছু কিছু ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে, নিজেও বেশ কয়েকবার যাদবপুরে ঘুরে এসেছি, কোন কোনবার গোপালবাবুর সঙ্গে দেখাও হয়েছে। কখনো কাউকে তো তাঁর সম্বন্ধে সামান্যতম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে দেখিনি। কয়েক বছর ধরে যাদবপুরে বিশৃংখলা চলছে, সত্যি কথা। কিন্তু তাই বলে হঠাৎ কী এমন ঘটলো যে-জন্যে যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক ত্রিশ বছরেরও বেশী, যাঁর মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিঃস্বার্থ অধ্যাপকের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে, মেকানিকাল এঞ্জিনীয়ারিং তথা অন্যান্য বিভাগের ছাত্রসমাজের কাছে যিনি বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয়, সেই গোপালবাবুর মত একজন ছাত্রদরদী প্রবীণ অধ্যাপককে নৃশংসভাবে নিহত হতে হলো।

অনেককে বলতে শুনেছি, হয়তো ভাইস চ্যানসেলর হিসেবেই তিনি দুষ্কৃতকারীর নজরে পড়ে থাকবেন। তাঁকে হত্যা করে কার কি লাভ হলো জানি না। কিন্তু আমি যেমন অনুভব করছি তেমনি তাঁর কাছে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সকলেই—হ্যাঁ আমার স্থির বিশ্বাস—তাঁদের মধ্যে এমন একজনও বাদ

বার্তা চালচলন এলোমেলো হয়ে যায়নি, চোখে যদি জল নাও আসে বুকের মধ্যে নিদারুণ একটা হতাশার পাষাণভার চেপে বসেনি, জীবনের স্বাভাবিক আনন্দের মুহূর্তগুলো লজ্জায় ছুটে পালায়নি।

মনোজ ঘোষ
নাসিক রোড, মহারাষ্ট্র

বাঙ্গালী পল্টনের স্বপ্ন

'দেশ'-এর গত ১৭ই পৌষ, ১৩৭৭ সংখ্যায় শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়ের ""বাঙালী পল্টনের স্বপ্ন ও জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী" প্রসঙ্গে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। গোড়াতেই বলি, শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য বিষয় বয়সে বেশ বুড়িয়ে গেছে। সাধারণ পাঠক মহলে এর সম্ভাব্য আবেদন, আমার কাছে অন্তত নৈরাশ্যজনক ঠেকছে। এন সি সি সর্বজনধন্য কোনদিনই হয়নি—বাংলা মুল্লুকে ত একশবার বলব। ও একটু যা কদর পেয়েছিল তা সেই 'ন্যাশানাল ইমার্জেন্সী' থাকাকালীন সময়ে। যেদিন ইমার্জেন্সী গুটিয়ে নেওয়া হল, বলতে গেলে সেদিন থেকেই এখানে এন সি সির পাট চুকলো। ছাত্রেরা একে নির্দ্বিধায় বলব, মূলধন করে চাকরির ধান্দা করেছিল—চাকরি হয়নি। স্বভাবতই তাদের আজ অনুৎসাহ। ঘরের খেয়ে আর কতদিন বনের মোষ তারা তাড়াবে। শ্রীমুখোপাধ্যায় ভালই বলেছেন: "প্রথম শ্রেণীর টার্ন আউট অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য প্রতি প্যারেড-ডেতে ধোবী খরচ অন্তত এক টাকা দিতে হবে।" কিন্তু ছাত্ররা কেন নিজেদের পয়সায় ইউনিফর্ম মেকটু অর্ডার করতে যাবে? দু নম্বর কথা কেন ছাত্রদের জন্য মিলিটারী সায়েন্স পড়ানোর ব্যবস্থা কলেজে কলেজে থাকবে না—অন্তত যেখানে আজও এন সি সি ধুকপুক করে বেঁচে আছে? সেক্ষেত্রে কলেজের কয় কম্যান্ডার আর জে সি ও বা এন সি ওরা ছেলেদের থিয়োরেটিক্যাল ক্লাসগুলো সহজেই নিতে পারতেন।

এত গেল ছাত্র প্রসঙ্গ। ইমার্জেন্সী ডামাডোলের মরসুমে কাম্পটি-পুরন্দরে এন সি সি অফিসার জন্ম নিয়েছিল প্রচুর। তারা আজ অধিকাংশই Supernumerary হয়ে ঝুলে আছেন—মঞ্চে মূক সৈনিকের ভূমিকা তাদের এখন। কেন এরকম হল! এটা কোন্ প্রহসন? তারা Discharged নন কিন্তু তারা Actors without speaking parts ধরনের।

নিজের কথা বলি। পুরন্দরে প্রি-কমিশন ট্রেনিং নিয়েছিলাম। Rockclimbing সেবার সিলেবাসে ছিল আমাদের। 'Second Best Officer Cadet' আর Best Bayonet Fighter of the [illegible] স্বীকৃতি ও পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরি। স্থানীয় Battalion Order-এ আমাকে Compliments জানান হয় (Authy: N. C. C. W. B. & A. C. R. O. No 52/65)। সব হল। কিন্তু দু বছর মাত্র এন সি সিতে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। কলেজ বদলে Company হারালাম। তারপর ত এন সি সিও আবশ্যিক রইল না আর। ফলে আমি Supernumerary। আমাদের মত ট্রেন্ড অফিসারদের প্রয়োজন সত্যিই কি ফুরিয়ে গেছে সরকারের কাছে?

শ্রীমুখোপাধ্যায় অনেক অন্ধকারে আলো ফেলেছেন। প্রশংসনীয় তাঁর বক্তব্য। তবু বলছি তিনি আরও অনেক বেশী ধন্যবাদার্হ হতেন যদি আমাদের মত ট্রেন্ড অফিসারদের উপর কিছু শব্দ ব্যবহার করতেন। নিজেদের কথা যে আমরা নিজেরা বলতে পারি না। কারণ তা করলেই ত অভিযোগ হানতে হবে কারুর না কারুর বিরুদ্ধে। আমরা না 'Discipline', 'Obediece' শিখতে শেখাতে এন সি সির খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম। আমরা না Officer. Commissioned Officer-ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার কেন্দ্রীয় সরকারের! ও কাজ তাই আমাদের নয়। সরকার এটা অনেক আগেই বুঝেছেন—আমরা কখনও প্রশ্নতর্ক করব না, আমরা সব মেনেই নেব।

অধিপ ঘোষ
সেন্টপলস্ কলেজ

আমাকে নির্বাসন দিও না

১৯ ডিসেম্বর ১৯৭০-এর প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় সতী চক্রবর্তী লিখিত "আমাকে নির্বাসন দিও না" কবিতাটি পড়ে বিস্মিত হলাম। ১৩৭৬-এর ১লা চৈত্র-এ প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা' পত্রিকায় 'সম্রাজ্ঞী, আমাকে তুমি' নামে আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়ে ছিল। কবিতাটির 'সম্রাজ্ঞী' শব্দের পরিবর্তে 'সম্রাট' শব্দের প্রয়োগ করে এবং আর কয়েকটি সামান্য পরিবর্তন করে সেটি 'আমাকে নির্বাসন দিও না' এই নাম দিয়ে আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আপনার এবং পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্র দিলাম।

রমা ঘোষ
শ্রীরামপুর, হুগলী।

বিনোদন সংখ্যা

এ বছর বিনোদন সংখ্যা 'দেশে' প্রকাশিত "আসল শার্লক হোমস্" প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছে। কিন্তু রচনাটিতে দুটি ত্রুটি রয়ে গেছে।

(১) ৩৮ পৃষ্ঠার ২য় কলমের শেষে ছাপা হয়েছে—"ডাঃ বেলের মৃত্যুর তেরো [illegible] পরে ১৯০৪ সনে ডয়েল বেল

সম্বন্ধে আবার বলেছেন—" ১৯৩৪ সনে ডয়েলের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ ১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। যতদূর মনে হয় এটা ছাপার ভুল। আসল বছরটা হবে ১৯২৪।

(২) ৪১ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের মাঝামাঝি জায়গায় লেখা হয়েছে—"অপরিসর স্যাতসেঁতে অন্ধকার আবাসে হোমসের সঙ্গী ছিল মরিয়ার্টি এবং ওয়াটসন্।" এটি সম্পূর্ণ ভুল। মরিয়ার্টি বা প্রফেসর মরিয়ার্টি যাকে কোনান ডয়েল হোমসের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন 'নেপোলিয়ন অব ক্রাইম' শার্লক হোমসের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। শার্লক হোমসের সঙ্গে তার থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র 'দি ফাইনাল প্রবলেম' গল্পে আমরা দেখতে পাই যে, প্রফেসর মরিয়ার্টি হোমসের বাড়িতে এসে তাঁকে আপন পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলছে। তারপরের আর কোনো গল্পে মরিয়ার্টি হোমসের বাড়িতে আসেনি।

প্রবোধ সিংহ
শ্রীরামপুর।

ছাপার ভুল

আপনাদের 'দেশ পত্রিকা' বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৭ দেখিলাম। উহাতে ১০৫ পৃষ্ঠায় যে দুইখানা ছবি ছাপা হইয়াছে তাহার নামের ভুল হইয়াছে মনে হয়।

উপরের ছবিখানা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নীচের ছবি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফির হইবে। অর্ধেন্দু মুস্তফি মহাশয়ের মাথায় স্বাভাবিক লম্বা চুল ছিল।

শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৩।

[এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। স: দেশ]

ত্রুটি স্বীকার

বিনোদন সংখ্যা 'দেশ' (১৩৭৭) পত্রিকায় 'কোমল গান্ধার মাগো ও অবাহত নিষাদ' নিবন্ধের শেষদিকে (পৃষ্ঠা ১০২, দ্বিতীয় স্তম্ভ, ৫২তম পংক্তি) একটা তথ্যগত ভুল থেকে গেছে। ভুলটা আমার অসতর্কতার ঘটেছে। আমি লজ্জিত। ভৈঁরোর রাগের আরোহণে সুর থেকে ধৈবতে যেতে হয়, কিন্তু সেটা শুদ্ধ বা তীব্র ধৈবত, কোমল ধৈবত নয়।

জহুরী সদাগর

ভ্রম সংশোধন

২৬ ডিসেম্বরের দেশ পত্রিকার ৮২৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা বিভাগে "সমাজতন্ত্র না সমাজকল্যাণ" নিবন্ধটির পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি "এই অবস্থাকে 'সামাজিক সাম্যকরণ' আখ্যা দেওয়া সংগত নয়"-এর স্থলে "আখ্যা দেওয়া অসংগত নয়" হবে।

কয়েকটি পত্রপত্রিকা

রণজিৎ দেব সম্পাদিত কুচবিহারের 'আধুনিক সাহিত্য' পত্রিকার একটি সংখ্যা 'অমিয়ভূষণ সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনেরই লেখক, সুতরাং একটি লিটল ম্যাগাজিনই যে তাঁকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে, এটা খুবই শ্লাঘার বিষয়।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের জন্ম ১৯১৮ সালে. থাকেন উত্তরবঙ্গে, কুচবিহারের ডাক বিভাগে চাকরি করেন। গড় শ্রীখণ্ড নামে প্রথম উপন্যাসেই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। চতুরঙ্গ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'নীল ভুঁইয়া' উপন্যাসও সমস্ত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর পর তাঁর আরও কয়েকটি উপন্যাস ও অনেক ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' তাঁর একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ।

মনে হয়, অমিয়ভূষণ মজুমদার কলকাতার সাহিত্য আবহাওয়া থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসেন। এ ব্যাপারে তাঁর লেখক চরিত্রের সঙ্গে জগদীশ গুপ্ত বা সতীনাথ ভাদুড়ির মিল আছে। কঠিন ও মননশীল রচনাশৈলীর জন্য এঁর রচনা সাধারণ পাঠকের চেয়ে অন্যান্য লেখক বা লেখক হতে ইচ্ছুক পাঠকদেরই বেশি ভাল লাগে। অমিয়ভূষণ সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল-কুমার নন্দী, নীরজ বিশ্বাস, অরুণ ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকের রচনা এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে।

'আমাদের গ্রাম' একটি অভিনব জাতের পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় খাস কল-কাতা থেকে, কিন্তু এতে থাকে শুধু গ্রাম বিষয়ক গল্প, কবিতা, নিবন্ধ। বোঝা যায়, কাগজটি প্রকাশের পেছনে এক প্রকার উৎকণ্ঠ হৃদয়াবেগ কাজ করছে। যাঁরা চিরকালের জন্য গ্রাম ছেড়ে এসেছেন (পূর্ববাংলার মানুষ), কিংবা যাঁরা কার্যকারণে গ্রাম ছেড়ে শহরে বসতি নিয়েছেন—তাঁদের অনেকেরই গ্রাম সম্পর্কে একটা মমতা থেকে যায়। সেই স্মৃতি ও দীর্ঘশ্বাস এখানে ভাষায় রূপ পেয়েছে। এতে আছে ২৪ পরগণার সুন্দর গ্রামের কথা, মুর্শিদাবাদের সেকর্ণ গ্রাম, বাখরগঞ্জের কথা। লিখেছেন পরিমল গোস্বামী, হিমানীশ গোস্বামী, কৃত্তি দত্ত, আনন্দ বাগচী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অমিতা রায়, হাসিরাশি দেবী প্রভৃতি।

পীযূষ রাউত সম্পাদিত 'জোনাকি' পত্রিকাটি বেরোয় ত্রিপুরার কৈলাশহর থেকে। কাছাড় ও ত্রিপুরা নিবাসী কয়েকজন কবির কবিতা ও কবিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মতামত পাশাপাশি ছাপা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন সম্পাদনা। লিখেছেন শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, রণজিৎ দাস, মনোতোষ চক্রবর্তী, জিতেন নাগ, শীতাংশু পাল, স্বপন সেনগুপ্ত, প্রদীপবিকাশ রায়, বিমল দেব, মানিক চক্রবর্তী ও পীযূষ রাউত।

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বেলা অবেলা' পত্রিকাটি এর মধ্যেই সাহিত্য পত্রিকা জগতে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত কবিদের আত্মপরিচয়, কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং আনকোরা নতুন কবিদের রচনা এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। এ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে: 'দল-গোষ্ঠী সৃষ্টি করে আর আর যা হোক না কেন কবিতা/শিল্প হয় না। অমুক গোষ্ঠীর কবিতা পত্র তমুক গোষ্ঠীর সংকলন অথবা মফঃস্বল লেখক/কাগজ ইত্যাদি ইত্যাদি বারোয়ারি পুজোর মতন মনে হয় যেন। আমরা চাই সত্যকারের শিল্প সৃষ্টির একটা আবহাওয়া তৈরী হোক।'

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকাটি বেরোয় কাছাড়ের হাইলাকান্দি থেকে। এতে চারটি প্রবন্ধ লিখেছেন বীরেন্দ্র রক্ষিত—অসমীয়া ও বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য ও ঐক্য; গুণময় দাশ—সাম্প্রতিক কালের সোভিয়েট কবি, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী—কবিতা সম্পর্কে কিছু হেম তেন; বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য—সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার সংকলন বিষয়ে। কবিতা লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তনু ঘোষ, দিলীপকান্তি লস্কর, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, মৃণাল বসু চৌধুরী, শুদ্ধেন্দ্র গুহ, রুচিরা শ্যাম, উদয়ন ঘোষ, রণজিৎ দাশ ও আরো অনেকে। মারাঠী কবিতার অনুবাদ করেছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটি বার বার পাতা উল্টে পড়ার মতন, মাথার কাছে রেখেও দেওয়া যায় অনেকদিন। তবে, এই পত্রিকার পরিচয় দেবার 'অভিজাত' শব্দটি কানে লাগে। সাহিত্য পত্রিকা আবার অভিজাত কি?

রমানাথ ভট্টাচার্য ও পীযূষকান্তি দাসের সম্পাদনায় শিলং থেকে একটি কবিতার পত্রিকা বেরোয়, নাম শিলং-এর কবিতা। তাতে আছে কাছাড়ের কবিরা আছেন।

এর পর হাতের কাছে যে পত্রিকাটি রয়েছে, তার নাম মন্থন। সম্পাদক পরিমল দে এবং এটিও বেরোয় উত্তরবঙ্গ থেকে। উত্তরবঙ্গ ও আসাম থেকে অনেক কবিতার পত্রিকা বেরোয়। আগে লিখেছি 'পাহাড়-তলীর' কথা। তা ছাড়া বিজ্ঞাপন দেখছি, 'পাগলা হাতী আর রাগী গণ্ডারের দেশ' থেকে সটান জোরালো পত্রিকা 'তরাইয়ের কল্লোল'। দেখতে বেশ ভালো লাগে কবিতার জগতে এই সব নবীন বিপ্লবীদের বেশ বন্ধু বলে মনে হবে পাঠকের কাছে।

'একজন' পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় একজন মাত্র লেখকের গল্প বা নাটক বা কবিতা বের হয়। এই সংখ্যায় বেরিয়েছে সমীরণ দাশ-গুপ্তের গল্প, অপূর্ব। আজকাল ছোট গল্পের বই প্রকাশকরা বার করতে চান না, পাঠক কিনতে চায় না। সেদিক থেকে এই চেষ্টাটি বেশ ভালো। মাত্র পঁচিশ পয়সায় পাঠক একজন নতুন লেখকের মনপ্রাণ দিয়ে লেখা গল্প সংগ্রহ করে নিতে পারেন। এবং নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য গল্প।

রচনা দত্ত ও নন্দিতা ঘোষ সম্পাদিত চন্দ্রবিন্দু একটি ছোটখাট্টো পত্রিকা। এর অনেক রচনাই মনে রাখার মতন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চার লাইনের কবিতাটি মনে রাখার মতন। তা ছাড়া লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, নন্দিতা ঘোষ, অতনু মিত্র, মহুয়া পাল চৌধুরী, রচনা দত্তের কংক্রীট কবিতা ও আরো অনেক কিছু।

সনাতন পাঠক

ধাঁওয়া মোষের কর্ণে ডাকের সংগে আশ্চর্য-ভাবে মিলে যায়।

অধিকাংশ পাঠকের প্রাত্যহিক জীবন থেকে উপন্যাসটির পটভূমি খুব দূরে। তার ফলে পাতায় পাতায় বৈচিত্র্যের স্বাদ। তথাপি কোনো ঘটনার অথবা চরিত্রায়ণের সম্ভাব্যতা বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে না। পুরো পটভূমিটা চোখের সামনে তৈরি হয়ে গেলে পাত্রপাত্রীরা সবাই কেমন মানিয়ে যায়।

নানাবিধ গৃহপালিত ও বন্য জন্তু, বিষাক্ত ও নির্বিষ সরীসৃপ, পাখি, ঝড়, শীত সব এই উপন্যাসে মানুষের প্রত্যক্ষ চরিত্র। এই সব চরিত্রের কোনোটির সংগে... এমন কি কেন্দ্রীয় চরিত্রের সংগেও লেখকের একাত্মতা না থাকলেও, ঘনিষ্ঠতার কল্পনায় বিন্দুমাত্র খাদ নেই। মনে হয়, বইটি সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতা নির্ভর।

উপকথার ভঙ্গিতে লেখা হলেও জাঁ জিয়োনোর চোখ একালের। মিতভাষিতা তাঁর লেখার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। চিত্রকল্প প্রায়শই নতুন, প্রতীকেরও ব্যবহার রয়েছে, তবে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রবণতা নেই। জিয়োনো নিজের দেশে অনেক দিন থেকেই খ্যাতিমান, গোঁকুর আকাদেমির সদস্য, তবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন সম্প্রতি। লেখক প্রবীণ, প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন. তথাপি মানতেই হবে তাঁর মেজাজ আশ্চর্য তাজা।

সুধাংশু ঘোষ

জীবন স্মৃতি

রূপনারানের কূলে। প্রথম খণ্ড। গোপাল হালদার। মনীষা গ্রন্থালয়। বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ৬·০০ টাকা।

বাংলা দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে গোপাল হালদার একটি বিশিষ্ট নাম। 'রূপনারানের কূলে' তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা। প্রকাশিত এই প্রথম খণ্ডের তিনি নামকরণ করেছেন 'কৈশোরক'। অর্থাৎ যৌবনের প্রারম্ভে এসে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা শেষ করেছেন। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে তাঁর যে পরিচয়, অধ্যাপক ও সাংবাদিক হিসেবে জীবনের যে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা তা সাধারণভাবে এই খণ্ডের পরিধির বাইরে পড়েছে।

লেখকের জন্ম এই শতকের একেবারে গোড়ায়, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। জন্মসূত্রে তিনি ঢাকার মানুষ কিন্তু বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে নোয়াখালি শহরে। পূর্ব-বঙ্গের সেই সুদূর শহরে উনিশ শতকের আদর্শবাদী জীবনযাত্রাকে হটিয়ে দিয়ে তখনো পর্যন্ত কর্মব্যস্ত বিশ শতকের বস্তুবাদী প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ দেশের বিশাল যৌথ পরিবার, স্নেহ ভালবাসা, দায়িত্ব, কুটুম্বিতার শত সহস্র বন্ধনে বাঁধা গার্হস্থ্য জীবন তখনো মহিমান্বিত। স্মৃতিচারণের সূত্রে গ্রন্থমধ্যে লেখক সেই হারানো দেশ ও কালকে যেন জীবন্ত করে তুলেছেন।

এক অর্থে, দেশ বিভাগের দুর্বিপাকের সংগে লেখকের স্বদেশ হারানোর দুর্ভাগ্য জড়িত হয়নি। তিনি সত্যিই জাত প্রোলেতারিয়েত। কারণ, তাঁর পৈতৃক আবাস এবং কৈশোরের ধাত্রী ভূখণ্ড দুইই আজ পদ্মা ও মেঘনার রুদ্র তাণ্ডবে নদীগর্ভে বিলীন। কিন্তু যে দেশ ও কালের মধ্যে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন তা রাজনৈতিক বিভাগ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও অনেকের কাছে আজ বিস্মৃতপ্রায়। লেখক প্রদত্ত তাঁর পারিবারিক স্মৃতি আলেখ্য, কৈশোরের অনুভূতিপ্রবণ দিনালাপ,

প্রকৃতির স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্যে উজ্জ্বল বাংলা দেশের মমতামুগ্ধ বর্ণনা হয়ত তাকেই আবার নতুন করে মনে পড়িয়ে দেবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত বলেছেন গোপাল হালদার, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর রূপনারানের দুই কূলে ছাপিয়ে যে আশ্চর্য নস্টালজিয়ার স্রোত বয়ে গেছে, তার দুর্বার আকর্ষণে অন্তত মুহূর্তের জন্যেও এক্যা হবেন না এমন পাঠক হয়তো দুর্লভ।

সাহিত্যে আত্মজীবনীকারের পক্ষে সোহংবাদী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আত্ম অভিমানের ঝুঁকি নিয়েও তাঁকে নিজের কথাই বলতে হয় প্রধানত। অথচ নিরপেক্ষ-ভাবে আত্মচরিত বর্ণনার চেয়ে কঠিন কাজও খুব অল্পই আছে। এ রকম কোন প্রয়াসের দিকে তাই পাঠক বা সমালোচক একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেই তাকান। ক্যাসেলু-এর সাহিত্যকোষে স্বয়ং আন্দ্রে মোরোয়ার মত লেখক এ ধরনের লেখায় প্রায়শই তিলকে তাল করে তুলবার (mountains out of molehills) প্রবণতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই আশংকার ঠিক উল্টো পিঠেও যে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকগুলি রয়েছে—যারা লেখকের সহজ স্বীকারোক্তির পথ রুদ্ধ করতে পারে—তারাও কম গুরুত্ব-পূর্ণ নয়। যেমন আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক কুণ্ঠা বা বিনয়বশত ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে নগণ্য করে দেখাবার বাসনাও আত্মজীবনী-কারের দায়িত্বকে দুরূহ করে তুলতে পারে। এই দ্বিতীয় বিপত্তি থেকে লেখক নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। লক্ষণীয়, যে পরিচ্ছেদে, তিনি তাঁর জীবনে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিস্পর্শের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার নাম দিয়েছেন—'পুঁটি মাছের কথা'। কিন্তু কেন? প্রতিটি পরিচ্ছেদেরই ত দেখি ~~কাজে কুশল~~ নাম—'গৃহচ্ছায়ার স্মৃতি', 'একটি শিশির বিন্দু' বা 'আলোকের ঝর্ণা-ধারায়'। বলা বাহুল্য, নিজের সম্পর্কে এই অতি বিনীত নগণ্য মনোভাব শুধু একটি শিরোনামেই নয়, বিচ্ছিন্ন অনেক মন্তব্যের মধ্যেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতিফলিত।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা, সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসেবে লেখকের যে পরিচয় স্বীকৃত তা আর নতুন কোন ভূমিকার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্তরতম একটি দ্বিধা ও সংকটের সংগে পরিচয় নিঃসন্দেহে এই রচনার পাঠক-দের বিস্মিত করবে। আশ্চর্য সেই অকপট স্বীকারোক্তিঃ 'তাই মাঝে মাঝে দোটানায় পড়তাম। আসলে এটা একই বিশিষ্ট প্রবৃত্তির দুমুখী টান—স্বদেশীর টান ও সাহিত্যের টান। আমরা তার মাঝখানের জায়গাটায় দাঁড়াতে চাইতাম।...আরও একটা দুমুখী টানও তার সংগে ছিল—তা সূক্ষ্মতর। এক-দিকে ভাবালুতার টান, অন্য দিকে শিল্প রুচির টান, এ দু-টানের মধ্যে তাল রাখা চুয়ান্ন বছরেও কঠিন—চৌদ্দতে তো দূরের কথা।'—এই-ই হয়ত গোপাল হালদারের যথার্থ পরিচয়। রাজনীতি ও শিল্প,—কখনো সমার্থক কখনো বা পরস্পর বিরোধী—আর তার সংগে নিজেকে মেলাবার নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। এবং এ থেকে তিনি আজও পরিত্রাণ পেয়েছেন কি না সন্দেহ। না হলে তাঁর কাছে বাংলা সাহিত্যের আরও কিছু প্রাপ্য ছিল।

লেখকের উক্ত স্বীকারোক্তির সূত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে তাঁর অসামান্য রবীন্দ্রানুরাগের কাহিনী। সাহিত্য শিল্পের প্রতি আসক্তি তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার, যা বর্ধিত হয়েছিল পিতা ও অগ্রজের আনুকূল্যে। রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে সেই অনুরাগ তাঁর সমগ্র সত্তায় সঞ্চারিত হয়ে একটি বিশেষ চরিত্রের আকার পায়।

লাভের দিক অবশ্য আরো কিছু আছে। বিভিন্ন প্রসংগে এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ে এমন কয়েকটি মূল্যবান ও সুচিন্তিত মন্তব্য এখানে প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলি যে কোন সমালোচনা গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে।

১৭।৭০

পুস্তক প্রকাশন

ছাপা হরফের হাট। শ্যামল চক্রবর্তী। সাহিত্যসদন, ৬৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

'ছাপা হরফের হাট' গ্রন্থটিতে মুখ্যত কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে যে পুস্তক প্রকাশের বিপুল উদ্যম চলেছে আজ বিগত দেড় শো বছর ধরে—রচয়িতা তারই একটি মনোজ্ঞ চলচ্চিত্র রচনায় যত্নবান হয়েছেন। বাংলা দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলেজ স্কোয়ারের সুদীর্ঘকালের ভূমিকা অনেকখানি, এবং এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগী হলে মূল্যবান ইতিহাসভিত্তিক রচনা সম্পূর্ণ করবার সুযোগও রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যত, সেই পরিমাণ নিষ্ঠার অভাবে গ্রন্থখানি সুপরিকল্পিত রচনা হয়ে উঠতে পারেনি। সব প্রসঙ্গই ছাড়া ছাড়া, অবিন্যস্ত; একটি বিষয়ের সঙ্গে অপরটি নিবিড়ভাবে অন্বিত নয়। হয়ত রচয়িতার উদ্দেশ্য তেমন অতন্দ্র ছিল না। এবং ছিল না বলেই কিছু লঘু তথ্য মাত্র হালকা চালে পরিবেশিত হয়েছে গ্রন্থখানিতে। বইয়ের শুরুতে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর কিংবা স্কুল বুক সোসাইটির আলোচনা যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে, গ্রন্থের পরবর্তী অংশের আলোচনায় সে সিরিয়াসনেস কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। দু' চারটি গ্রন্থের প্রকাশ, পুস্তকের বিজ্ঞাপনের নমুনা, বিভিন্ন প্রকাশকদের উদ্যম ইত্যাদির আলোচনাও কিছু সাধারণ তথ্যের লঘু জরিপমাত্র। তবে, 'অ্যালবার্ট হল' এবং কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে পুরোন বইয়ের মেলা এবং এ বিষয়ে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের অবতারণা কোন কোন পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় বলে বোধ হতে পারে। বইখানিতে এমন কিছু উক্তি ছড়িয়ে আছে যা রীতিমত বিতর্কমূলক। যেমন, 'রামমোহনের কলকাতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত দেশে মুদ্রণযন্ত্রের কোন ব্যবস্থা ছিল না', 'বটতলা ছিল বর্তমান কলকাতা শহরের বিগত শতাব্দীর বাবু-কালচারের এক করুণ সৃষ্টি', 'শরৎচন্দ্রই বাংলা দেশের প্রথম লেখক যিনি জনৈক প্রকাশকের নিকট ন্যায্য প্রাপ্য টাকা পাননি' ইত্যাদি। গ্রন্থস্থ কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

১৬৬।৭০

পত্রিকা

জাগরণী : ১ম বর্ষ, ২য় সংকলন। সম্পাদক—দেবকুমার বসু। পরিবেশক—জাগরণী সাহিত্য সংস্থা। ৬ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬। দাম—২৫ পয়সা।

আলোচ্য ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটির এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। তরুণ লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, স্কেচ ইত্যাদি আছে সূচীপত্রে। চন্দন ভট্টাচার্যের লেখা 'জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম এবং রক্তকরবী' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মনোচিকিৎসক সেন' গল্পটিও সুখপাঠ্য।

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীম দর্শন (ষষ্ঠ ভাগ)। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স : ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ৫·০০।

হিমালয়ের টানে। অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। বাক্ সাহিত্য : ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৫·০০।

ঊষর মাটি। যতীন দাশ। শ্রীমতী প্রতিমা দাশ : ১৪৮/৫৬, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৪০। মূল্য : ৫·০০।

ব্রহ্মোপাসনা। রামমোহন রায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ : ২১১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য : ১·৫০।

পারাণী। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈজ্ঞানিক প্রকাশনী : ৪, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য : ৩·০০।

ছায়ার সৈকতে। অরুণ মৈত্র। অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস : ৫৫-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৩·২৫।

ধর্মপথিক রবীন্দ্রনাথ। বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড : ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য : ১০·০০।

A Study of women of Bengal—Sankar Sen Gupta. Indian Publications : 3 British Indian Street, Calcutta-1. Price Rs. 50.

একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল। সত্য গুহ। অধুনা : ১৭/১-ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ১৫·০০।

দিগ্‌ভ্রান্ত। রাজদূত। কার্তিক ম্যাণ্ডেল : পোঃ শিমুলপুর, ভায়া দক্ষিণ চাতরা, ২৪ পরগণা। মূল্য ১২·০০।

বিষণ্ণ বন্দর। মনিরুল ইসলাম। সবুজ-অবুঝ প্রকাশনী, আমিনপুর, পোঃ দেগঙ্গা, ২৪ পরগণা। মূল্য ১·০০।

উপফাল্গুনী। নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবিজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ৬৫ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

কার্পেট। বলরাম বসাক। অবায় : ৪২ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

পুষ্পিত বাগান। বুদ্ধদেব ঘটক। অনুক্রম : ৩৩।৪ দীনু লেন, হাওড়া-১। মূল্য ১·০০।

অনামিকা সূর্যমুখী—শ্রীদিলীপকুমার রায়। অধ্যয়ন : ২০এ গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ১২·০০।

টেবল টেনিসের আইন কানুন
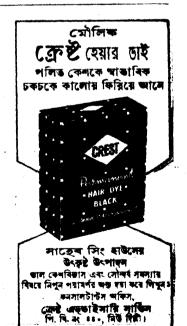
টেবল টেনিসের ডাবলস-এর খেলায় একটি গেমে এক একজন খেলোয়াড়কে নির্দিষ্ট এক একজনের মারা বলই ফেরত পাঠাতে হয় বলে প্রতি গেমে বিপরীতভাবে পালা বদলের ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং সব খেলোয়াড় সব খেলোয়াড়ের মারা বল ফেরত পাঠাবার সমান সুযোগ পাচ্ছেন। এমন কি একটি মাত্র গেমে জয় পরাজয়ের ব্যবস্থা থাকলেও। কেননা সেখানে কোনো জুটির ১০ পয়েন্ট হয়ে গেলেই টেবল-এর পাশ বদল হচ্ছে এবং বল রিসিভিংয়েরও বিপরীত ব্যবস্থা চালু হচ্ছে।

ডাবলসের খেলায় পর্যায়ক্রমে এবং পালাক্রমে কিভাবে বল মারতে হয় তা ভালভাবে বুঝবার জন্য এবারের ডায়গ্রাম দেওয়া হল।

ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসের খেলায় ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর দিয়ে দেখানো হচ্ছে পর্যায়ক্রমে এবং পালাক্রমে বল মারার নিয়ম

আইন ১৫। পাশ বদল, সার্ভিং ও রিসিভিংয়ের ব্যতিক্রম ও নিয়ম

যখন খেলোয়াড়দের পাশ বদল করার কথা, ভুলবশত তখন যদি পাশ বদল না হয় তবে ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়রা পাশ বদল করবে যদি গেম শেষ হয়ে না থাকে। গেম শেষ হলে ভুলের ঘটনা উপেক্ষা করতে হবে। আর গেম শেষ না হলে ভুল ধরা পড়লেও পয়েন্ট বাতিল হবে না। অর্থাৎ ভুল থেকে আরম্ভ করে ভুল ধরা পড়া পর্যন্ত যত পয়েন্ট হবে সব পয়েন্টই গণ্য হবে।

যখন কোনো খেলোয়াড়ের সার্ভিস বা রিসিভ করার কথা নয় তখন যদি ভুলবশত কোনো খেলোয়াড় সার্ভিস বা রিসিভ করে তবে ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করে পর্যায় অনুযায়ী সার্ভিং এবং রিসিভিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ খেলার সূচনার পর্যায় অনুযায়ী সংগৃহীত পয়েন্ট পর্যন্ত যার সার্ভিস ও রিসিভ করবার কথা তখন সেই খেলোয়াড় সার্ভিস করবে এবং সেই খেলোয়াড় রিসিভ করবে। এ ক্ষেত্রেও ভুল ধরা না পড়া পর্যন্ত ভুল পর্যায়ে যত পয়েন্ট সংগৃহীত হয়েছে সব গ্রাহ্য হবে।

জ্ঞাতব্য

ডাবলসে বা মিক্সড ডাবলসের খেলায় যে খেলোয়াড়ের বল মারার কথা নয় সে খেলোয়াড় বল মারলে প্রতিপক্ষ পয়েন্ট পায়। কিন্তু ভুল ধরা না পড়লে খেলা চলতে থাকে। পয়েন্ট সংক্রান্ত ১০ নম্বর আইনে এটাই ব্যতিক্রম। তাই ১০ নম্বর আইনের 'এইচ' সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : ১৫ নম্বর আইনের ব্যতিক্রম ছাড়া যার বল মারার পালা নয় সে বল মারলে পয়েন্ট হারাবে।
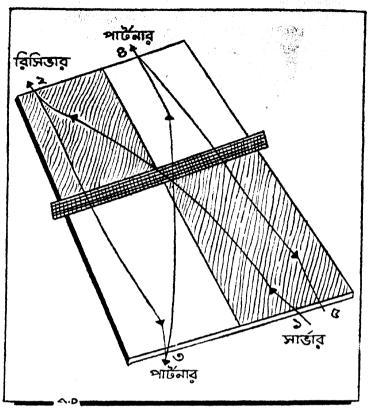
যার বল মারার পালা নয় সে বল মারলে টেবল টেনিসের পরিভাষায় বলে 'স্ট্রাইক আউট অফ সিকোয়েন্স'। আউট অফ সিকোয়েন্স সচরাচর স্ট্রাইক করা হয় না। কেননা কার মারা বল কাকে ফেরত পাঠাতে হবে আগে থেকেই তা জানা থাকে এবং সেই ভাবেই যে যার প্রস্তুতি ঠিক করে রাখে। তবু সময় সময় ভুল হয় বইকি।

যার যখন সার্ভিস করার কথা সার্ভিসের সময়ও তাঁরা সার্ভিস করে থাকেন। এক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা আরও কম। কেননা আম্পায়ার স্কোর বলার সঙ্গে সঙ্গে সার্ভিস বদলও ঘোষণা করে থাকেন। এবং যে যখন সার্ভিস করে তাঁর পয়েন্টই আগে বলেন। যেমন 'এ'-র সঙ্গে 'বি'র খেলা হচ্ছে। 'এ' ৪—১ পয়েন্টে এগিয়ে আছে। এবার সার্ভিস বদল হবে। আম্পায়ার তখনই 'চেঞ্জ সার্ভিস' বলে স্কোর বলবেন '১—৪'। ডাবলস ও সিঙ্গলসে একই প্রথায় এবং নিয়মে সার্ভিস বদল ঘোষণা করা হয়।

সুতরাং আউট অফ সিকোয়েন্স স্ট্রাইক করা চললেও আউট অফ টার্ন সার্ভিস কদাচিৎ ঘটে থাকে।

আইন ১৬। ত্বরান্বিত প্রথা

এক্সপেডাইট সিস্টেম অর্থাৎ ত্বরান্বিত প্রথার ১৬ নম্বর আইনে বলা হয়েছে : যদি কোন গেম আরম্ভ হবার পর ১৫ মিনিটের মধ্যে গেম শেষ না হয় তবে গেমের বাকি অংশ এবং ম্যাচের পরবর্তী সমস্ত গেমে 'এক্সপেডাইট সিস্টেম' অর্থাৎ ত্বরান্বিত প্রথা প্রয়োগ করা হবে। ১৫ মিনিটে গেম শেষ না হলে প্রতি খেলোয়াড় পর্যায়ক্রমে একটি করে সার্ভিস করবে। যদি সার্ভিস এবং সার্ভিং খেলোয়াড় বা সার্ভিং জুটির পরবর্তী ১২টি মার রিসিভিং খেলোয়াড় বা রিসিভিং জুটি যথাযথভাবে ফেরৎ পাঠাতে পারে তবে সার্ভিং খেলোয়াড় বা সার্ভিং জুটি পয়েন্ট হারাবে।

মুকুল

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

ভারতে একমাত্র মহিলা পোলো খেলোয়াড় অ্যানি রাইট বেশি প্রশ্নের অপেক্ষা না রেখে গড়গড় করে বলে চললেন, "বর্ষার সময়টা বাদ দিলে সারা বছরই আমাদের এই খেলা হয়। তবে বড় টুর্নামেন্টগুলি শুরু শীতের সময়—ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। একটানা ম্যাচ খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে উঠি। এ খেলার মেহনত অনেক। শুনেছি এবার অস্ট্রেলিয়া আসবে। ওদের কথায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা—ফুটবল, ক্রিকেটের মত পোলো খেলোয়াড়দেরও নিত্য অনুশীলন করতে হয়। শুধু কি তাই, বিপদের ঝুঁকিও কম নয়। দু' দবার যেভাবে পড়ে গিয়েছিলাম, তাতে প্রাণটা ফিরে পেয়েছি—এই না কত! কব্জীর ব্যথা সারতে অনেকদিন লাগল। ঘোড়ার নিচে পড়ে গিয়েছিলাম।"

"গিয়েছিলাম" কথাটি শেষ না হতেই মস মস জুতোর আওয়াজ করে ঘরে ঢুকলেন আধা বয়সী লম্বা চেহারার এক সায়েব। শ্রীমতী রাইট ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসিখুশি মুখে—"আমার স্বামী।" পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "ইনি এসেছেন আমার খেলার খুঁটিনাটি জানতে। কাগজে ছাপবেন। আর ইনিও স্পোর্টসম্যান।" মিস্টার রাইট আড়চোখে একবার দেখলেন। ভারী ঠোঁটটা উল্টে মৃদু হেসে বললেন, "তাই নাকি! খুব ভাল কথা।" চওড়া কাঁধের ঝাকুনি দিয়ে করমর্দন করে জানিয়ে দিয়ে গেলেন খেলাধুলোয় হাত তাঁর অনেক, অনেকের চেয়ে বেশী। ব্যস্ত মানুষ কাজে বাধা না দিয়ে ড্রয়িং রুম ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন। বলে রাখি পোলো খেলায় মিঃ রাইট একেবারে সিদ্ধহস্ত।

কলকাতায় বালিগঞ্জ পার্ক রোডের উপরই রাইট দম্পতীর বাড়ি। সাজানো গোছানো বেশ বড়। ছিমছাম পরিবেশ। দেখেশুনে মনে হল এঁদের বেশ রুচিবোধ। আর সেটা যদি মিসেস রাইটের হাতের ছোঁয়াচের গুণে হয় তাহলে অবাক হব না। মনে পড়ল একশো গজ দূরে বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের কথা। খাস ইউরোপীয়ানদের সমাবেশ। চাপা চাপা কথা, মাপা মাপা হাসি, ক্রিকেট খেলার মধ্যেও ভদ্রতার মাপকাঠি কখনও খেই হারিয়ে ফেলতো না। তাই রাইট দম্পতীর আদব কায়দা দেখে অতি চেনা মানুষেরই মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু ক্রিকেট রাইট দম্পতীরা খেলেন না। না খেলুন, তবে পোলো খেলার মানুষদের সঙ্গে ক্রিকেটারদের অনেক মিল। তাই রাজরাজড়ারা এই দুটি খেলাতেই বিশেষ আগ্রহী। পোলোও তাই তাদের কাছে ক্রিকেটের মত 'লর্ডস গেম'।

মিসেস রাইট আবার শুরু করলেন, "ছোট বয়স থেকেই ঘোড়ায় চড়তাম। বাবা ছিলেন মধ্যপ্রদেশের ডেপুটি কমিশনার। ছেলেবেলা সেইখানেই কেটেছে। তখন কি আর পোলোর কথা ভেবেছিলাম!" কথাটা সংক্ষেপেই সারবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু পারলেন না। আনমনা হয়ে বলে চললেন, "বাবার সঙ্গে হ্যাম্পশায়ারে নিজের ভিটের ফিরে যাই। কিন্তু বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে আবার ভারতেই আসতে হলো। এখানে ইকোয়েটিবিল কোল্ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার তিনি। পোলো খেলাতেও তাঁর হাতযশ খুব। আমি একদিন অ্যালেনবেরো রেস কোর্সের সীমানায় ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছি। তাই দেখে মহারাজ প্রেমসিং উপযাচক হয়ে বললেন, "এত ভাল ঘোড়ায় যখন চড়তে পারেন, তখন পোলো খেলার বাজীমাৎ করতে অসুবিধে কি! দেখছেন না, বাংলাদেশে খেলোয়াড়দের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।" আমিও আপত্তি করিনি। এই হেন পোলো খেলার সর্ববিশারদ মহারাজ প্রেমসিং তখন কলকাতায় খেলার আসর গড়তে খুব ব্যস্ত। উদ্দেশ্য : এখানে খেলাটাকে জনপ্রিয় করে তোলা। আসামের সীমাবদ্ধ আওতা থেকে কলকাতায় জনবহুল ক্রীড়ামঞ্চে খেলার আসর সরিয়ে এনে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সার্থক করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে নিষ্ফল হয়নি তা

জয় মা কালী দলের রঞ্জিত গুপ্ত, অ্যানিরাইট, পি কে সেন, রোহনা গুপ্ত, বিজয় সিং ও জোনস্।

আজকের মাঠে গেলেই বুঝতে পারবেন। সার্জেণ্ট পিটার জন, বিজয় সিং ও ক্যাপটেন মজুর মত প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের সঙ্গে পুলিস কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত, এস জালান, প্রাক্তন পুলিস কমিশনার পি কে সেন, তাঁর ছেলে আশিস সেন, সার্জেণ্ট ডরজি, বি এম ক্লারক, বাহাদুর সিং ও আর এইচ রাইটের কোনও তফাৎ খুঁজে পাবেন না। ভোলা যায় না রসিক জাথিয়াকেও।

পোলো খেলায় একজন মহিলার অনুপ্রবেশ দেখে সবাই বেশ অবাক বনে যাবে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বুঝি মহারাজ প্রেমসিং অ্যানি রাইটকে পোলো খেলায় তালিম দিতে শুরু করেন। এবং তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টার ফলে অ্যানি রাইট এখন একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। নিজের সম্বন্ধে অ্যানি রাইট কিন্তু খুব বেশী সচেতন। কথা প্রসঙ্গে আগে ভাগেই তাই তিনি বলে রাখলেন—"পোলো খেলায় আমি তেমন কিন্তু সিদ্ধহস্ত নই। এমনকি এখানে যাঁরা খেলেন তাঁদের সমতুল্যও নই।" পাল্টা জবাবে বললাম, "আপনি যে ভারতের একমাত্র মহিলা খেলোয়াড় এইটাই আমাদের কাছে মস্ত কথা।" চাপা দিয়ে অ্যানি রাইট বললেন, "এখানে নেই বটে, তবে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বহু মহিলা পোলো খেলেন। এই তো গত বছরই কেনিয়া পোলো টিম এখানে খেলতে এলে; তাঁদের সকলের স্ত্রীরা খেলোয়াড়।"

বিরাট ড্রয়িং রুমের আশে পাশে র‍্যাকের ওপর সাজানো গোছানো ছোট ছোট চকচকে কাপ ট্রফিগুলোর কথা উল্লেখ করতেই মিসেস অ্যানি রাইট ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "সবগুলো কিন্তু আমার নয়, আমার স্বামীরও আছে।" একটার পর একটা কাপ তুলে তিনি সে খেলার বৃত্তান্তগুলো বলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সবগুলো আবার মনে নেই। স্যুভেনিরের তাড়া ঘেঁটে হদিশ খুঁজতে বসে গেলেন। কিন্তু খেই হারিয়ে বসলেন। বেলা বাড়ছে, লাঞ্চের সময়ও বয়ে গেছে। কে জানে হয়তো মিঃ রাইট তাঁরই জন্যে অধীর অপেক্ষায় বসে আছেন। কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে নেবার জন্যে কতকগুলো বাছাই খেলার কথা জানতে চাইলাম। অ্যানি রাইট যেন স্বস্তি অনুভব করলেন। হাঁফ ছেড়ে বললেন, "সেই ভাল।" নিজেই তুলে নিলেন যে কাপটি সেটি মনস্তন কাপ। খেলাটি হয় ১৯৫৯ সালে। সেবার তিনি খেলেন বালিগঞ্জ দলে। পরের কাপটিও মনস্তন পোলো টুর্নামেন্টের। কাপটি আকারে বড়। কাপের তলায় লেখা 'নাইনটিন সিকসটি ফাইভ'। মিসেস রাইটের মুখে হাসির রেখা দেখে বলে উঠলাম—"এ খেলার মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে নাকি?" মিষ্টি হেসে "হ্যাঁ! এটায় আমি খেলি 'জয় মা কালী' টিমে।" চমক খেয়ে না বোঝার ভাণ করে বললাম, '[illegible] বললেন।" টেনে টেনে গোটা উচ্চারণ করে বললেন, 'জ্যোয় ম্যা কোলী' টিম। আওয়ার অপোনেণ্ট ওয়াজ ফোর স্টার।" হাতের কাছেই ছবিটি ছিল, তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিলেন। 'জয় মা কালী' দলে আরও যে ক'জন খেলোয়াড় ছিলেন তাঁরা হলেন পি কে সেন, বিজয় সিং, সার্জেণ্ট জোনস। এবার মিসেস রাইট কিছুটা জোর গলায় বললেন, "আই থিঙ্ক ইউ নো মিঃ পি কে সেন।" উৎসাহিত হয়ে বললাম, "বিলক্ষণ, ওঁকে চিনব না!" হাত থেকে ছবিটি ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, "জানেন ঐ খেলা পরিচালনার ভার ছিল আমার স্বামীর।" এবার রসিকতা না করে পারলাম না। বেশ গম্ভীর চালে বললাম, "ও: সেই জন্যেই ম্যাচ জিতেছেন।" রসিকতায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। প্রথমে কিছুটা লজ্জা, পরে আবদারি সুরে বলে উঠলেন, "এই কি যে বলেন! ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না। হি ইজ ভেরী স্ট্রিক্ট।"

অ্যানি অনেকগুলি সেরা খেলা দেখেছেন। কাউড্রে গোল্ড কাপের খেলা। মিড্‌হার্স্টে লর্ড কাউড্রের নিজস্ব মাঠেই খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এবং সে খেলার নাকি তুলনা পাওয়া ভার।

এবার মিসেস রাইট একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। ঘটনাটি জয়পুরের মহারাজ রাও রাজা হনুত সিংকে কেন্দ্র করে। অ্যানি রাইটের মতে এই হনুত সিংই ছিলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। গত বছরের আগের তিন বছর ওঁরই হাতে ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ভার ছিল। আর ওঁর একান্ত প্রচেষ্টার ফলেই ভারত বহুবার বিশ্বের সেরা সেরা দলগুলিকে হারাতে পেরেছে। তিনিই ভারতীয় দলের পোলোর পথ-প্রদর্শক। নইলে ভারতীয় দলের সাধ্য কি যে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনার দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দলটিকে হারায়। এই জয়ের কৃতিত্বের মূলে ছিলেন কর্নেল সিং ও কুমার বিজয় সিং (হনুত সিংয়ের ছেলে)। বলার কথা বুঝি এইটেই যে এই হেন বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় রাও রাজা হনুত সিংকে ভেল্কি দেখিয়ে ম্যাচ জিতে নিয়েছিলেন জয়পুরের প্রেমসিং—অ্যানি রাইটের শিক্ষাগুরু। ক্যালকাটা পোলো ক্লাবের শতবার্ষিকী উৎসবে ১৯৬২ সালে দুর্ধর্ষ দল রাতানপুর সঙ্গে যে খেলাটি হয় তাতে প্রেমসিং প্রায় একক প্রচেষ্টায় হনুত সিংয়ের সব চাতুরীকে ঠেকিয়ে ৮-৬ গোলে হারাতে সক্ষম হন। মিসেস রাইট প্রেম সিংয়ের সে নৈপুণ্যের কথা কোনদিন ভুলতে পারবেন না।

অকালে প্রাণ হারানো মহাবলী মুষ্টিযোদ্ধা সোনি লিস্টন

টেস্ট খেলা জয়ের জন্য পাতৌদির নবাব মনসুর আলী খাঁ যেদিন নতুন সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন সেদিনই জেনেছিলাম ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অধিনায়কের সিংহাসন টলটলায়মান। পাতৌদির মতে সূত্রটি ছিল অতি সহজ। 'কিছুই করতে হবে না। শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অধিনায়ক করে দিলে তিনি হারা খেলাও জিতিয়ে দিতে পারবেন'।

সবারই জানা আছে, রাজন্যভাতা বিলোপে রাষ্ট্রপতির সম্মতি স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে পাতৌদি ওই বক্রোক্তি করেছিলেন। যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজন্যভাতা বিলোপের সরকারী সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে, তবু সম্ভবত ওই বক্রোক্তিতেই পাতৌদি ক্রিকেট সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। অদৃষ্টের পরিহাসই বলতে হবে। ১৯৬৩—৬৪ সনে মাইক স্মিথের এম সি সি দলের ভারত সফরের সময় ইন্দিরা জনক নেহরুর ইচ্ছায় এবং চেয়ারম্যানের কাস্টিং ভোটে যিনি ভারতের ক্রিকেট গদি পেয়েছিলেন, ১৯৭১-এ চেয়ারম্যানের কাস্টিং ভোটেই তিনি গদিচ্যুত হলেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে বহুদূর ক্রিকেটে পাতৌদির এখানেই ইতি। সাধারণ খেলোয়াড় হিসাবে দলে স্থান পেলেও তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যাবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া রাজনীতিতেও প্রবেশ করছেন। আসন্ন নির্বাচনে তিনি লোকসভা আসনেরও প্রার্থী। খবরে প্রকাশ দুই অধিনায়কের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ খেলাও জমবে ভাল। হরিয়ানার গুরগাঁও কেন্দ্রে পাতৌদির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে লোকসভা আসনে নাকি দাঁড়াচ্ছেন আর একজন প্রাক্তন অধিনায়ক লালা অমরনাথ। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে জেতে কে হারে।

নতুন অধিনায়ক

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য ভারতের নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বোম্বাইয়ের ৩০ বছর বয়সী নাটা খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার। আভাষ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। পাতৌদির পরিবর্ত হিসাবে নাম উঠেছিল চাঁদু বোরদে ও অজিত ওয়াদেকারের। ৩৭ বছর বয়সী বোরদের গৌরবের দিন অস্তমিত। সুতরাং বাই এলিমিনেশন ওয়াদেকারই দলের নেতৃত্বের সম্মান পেয়েছেন। ক্রি-কণ্ট্রোল বোর্ডের কয়েকজন হোমরা-চোমরা, বিশেষ করে দিল্লি কেন্দ্রের কর্মকর্তারা অবশ্য বিষেন সিং বেদীকে অধিনায়ক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে বেদীর নাম বাতিল হয়েছে। ভালই হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় দলের হাল ধরার পক্ষে ওয়াদেকারই যোগ্যতম খেলোয়াড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ক্রিকেট ক্ষেত্রে ওয়াদেকারের আবির্ভাব ধূমকেতুর মত। স্কুল জীবনে ক্রিকেট খেলেননি। কলেজেও প্রথম বছরে না। দ্বিতীয় বছর থেকে ক্রিকেট ব্যাট হাতে ওঠে এবং ওই বছর থেকে অন্তঃ কলেজ এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলতে আরম্ভ করেন। ক্রিকেট গুরু ভারতের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় মাধব মন্ত্রী যিনি রুইয়া কলেজের ক্রিকেট কোচ ছিলেন। ১৯৫৮-৫৯ সনে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে ওয়াদেকারের ক্রিকেট জীবনের দ্বিতীয় বছরেই এক স্মরণীয় কীর্তি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ৩২৪ রান। যেটা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের প্রথম তিন শতাধিক রান এবং এতদিন রেকর্ড হিসাবে পরিগণিত ছিল। (গত ৫ জানুয়ারি পুণাতে দক্ষিণ গুজরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ৩২৭ রান করে বোম্বাইয়েরই আর একজন ছাত্র সুনীল গাভাসকার ওই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন) এর পর আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে এবং বোম্বাইয়ের পক্ষে রণজি ট্রফিতে অনেকবার বড় রানের উল্লেখযোগ্য ইনিংস খেললেও বহুদিন ওয়াদেকারের যোগ্যতা উপেক্ষিত হয়েছে টেস্ট খেলায় দল গড়ার ব্যাপারে। টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগ ১৯৬৬ থেকে। এ পর্যন্ত ২১টি টেস্টে রান করেছেন ১৩৬৬; গড় ৩৪·১৫। সেঞ্চুরি মাত্র একটি, ১৯৬৭-৬৮তে ওয়েলিংটনে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

শুধু প্রতিভাবান ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবেই নয়, মেধাবী ছাত্র হিসাবেও ওয়াদেকার চিরদিন শিক্ষক অধ্যাপক-দের প্রিয়পাত্র ছিলেন। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় কোন বিষয়ে ৮০র কম নম্বর

পারেননি। সায়েন্সে মাস্টার ডিগ্রীর অধিকারী অজিত লক্ষণ ওয়াদেকার এখন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার সদর কার্যালয়ে ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের একজন অফিসার। আশা করব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ওয়াদেকারের সফল নেতৃত্বে ভারত ক্রিকেটের নষ্ট সুনাম পুনরুদ্ধার করবে।

মুষ্টিযোদ্ধার অকাল মৃত্যু

হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নিগ্রো মুষ্টিক সোনি লিস্টনের অকাল মৃত্যু ক্রীড়া বিশ্বের বড় রকমের দুঃসংবাদ। সোনি লিস্টন মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন। তাছাড়া যেভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেটাও কম দুঃখের কথা নয়। যাঁর মুষ্টিযুদ্ধ দেখার জন্য সারা পৃথিবীতে আলোড়ন জেগেছে, যাঁকে দেখার জন্য মানুষ পাগল হয়েছে সেই মহাবলী মুষ্টিযোদ্ধা মৃত্যু সময়ে কাউকে কাছে দেখতে পাননি, পাননি শেষ সময়ে কোন প্রিয়জনের কোমল স্পর্শ। সন্দেহ করা হচ্ছে আমেরিকার লাস ভেগাসে নিজের বাড়িতে তিনি মরে পড়ে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না। কয়েকদিনের জন্য শহরের বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন স্বামীর দেহে আর প্রাণের স্পন্দন নেই। সপ্তাহ-খানেক আগেই তা চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত কিছুদিন আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর বুকে স্টিয়ারিং হুইলের চোট লাগে। কিছুকাল তাঁকে হাসপাতালেও কাটাতে হয়। সেই দুর্ঘটনাই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ কিনা কে জানে।

গরীব মা-বাবার ২৫টি সন্তানের মধ্যে ২৪তম ছিলেন লিস্টন। বাবা ছিলেন তুলো চাষের সামান্য শ্রমিক। তাই রুটির জন্য লিস্টনকে লড়াই করতে হয়েছে, অর্থের জন্য হতে হয়েছে সমাজ বিদ্রোহী। এমনকি দস্যুবৃত্তি, দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য দু' দুবার তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে চরিত্র সংশোধনের জন্য লিস্টনকে রাখা হয় এক রিফরমাটরি স্কুলে। ওখানে থাকাকালে এক ক্যাথলিক ধর্মযাজকের কাছে তাঁর মুষ্টি-যুদ্ধের আর্ট শেখা এবং পরবর্তীকালে ওই মুষ্টিযুদ্ধকে মূলধন করে তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠা। মুষ্টিযুদ্ধ জগতে লিস্টন 'বিগ বিয়ার' নামে পরিচিত ছিলেন।

৬ ফুট ১ ইঞ্চি মাথায় উঁচু ১৫ স্টোন ২ পাউণ্ড ওজনের বিরাট পুরুষ সোনি লিস্টন ছিলেন শালপ্রাংশু দুই বাহুর অধিকারে। বাঁ হাতের মুষ্টাঘাতে ছিল ডিনামাইটের শক্তি। ১৯৫২ সালে অ্যামেচার মুষ্টিযুদ্ধে হেভিওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন-শিপ লাভের পর পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা। জীবনের ৫২টি লড়াইয়ের মধ্যে ৩৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূতলশায়ী করে বিজয়ী হয়েছেন। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৯৬২ ও ১৯৬৩তে ফ্লয়েড প্যাটার্সনের সঙ্গে তাঁর দুটি বিশ্ব চ্যাম্পি-য়নশিপ লড়াই। দুবারই তিনি বিজয়ী হন, প্রথমবার মাত্র এক মিনিটের মধ্যে ভূতল-শায়ী করেন প্যাটার্সনকে। ১৯৬২-র সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোতে আয়োজিত লিস্টন প্যাটার্সনের ওই লড়াইকে ফাইট অফ দি সেঞ্চুরি নামে অভিহিত করা হয়ে-ছিল। লড়াই দেখার জন্য দর্শকদের ১০ ডলার থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত দর্শনী দিতে হয়েছিল। ওই লড়াইতে পরাজিত প্যাটার্সনই পেয়েছিলেন এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশী অর্থ। লিস্টন পেয়ে-ছিলেন অনেক বেশী। তাঁর ভাগ্য খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও মোড় ঘুরে যায়। যদিও বেপরোয়া মোটর চালনার অপরাধে পরবর্তী কালে লিস্টন দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন তবু ১৯৬২-র পর মুষ্টিযুদ্ধের মহাবীরকে শান্ত সুবোধ ছেলে হিসাবেই সবাই গ্রহণ করেছিল। ১৯৬৪ সনে কেসিয়াস ক্লের কাছে পরাজয়ের ফলে লিস্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব হারালেও অনেকে মনে করেন ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে লিস্টনই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী।

মিউনিখের পথ কি সত্যিই পিচ্ছিল?

অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার গ্রুপিং এবং প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার দিন তারিখ সম্প্রতি এথেন্সে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের সভায় ঠিক হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে ঠিক হয়েছে আগামী বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার কাঠামো বদলের এক পরিকল্পনা।

সকলেরই জানা আছে অলিম্পিক এবং বিশ্ব ফুটবল দুই প্রতিযোগিতাই হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীর মিউনিখে। ১৯৭২ সনে অলিম্পিক এবং ১৯৭৪ সনে বিশ্ব ফুটবল।

বিশ্ব ফুটবল নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। কেননা বিশ্ব ফুটবলে ভারতের অংশ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। প্রথম কারণ ভারতে এখনো ফুটবলে প্রোফেশনালিজম চালু হয়নি। বিশ্ব ফুটবল পেশাদার খেলোয়াড়-দের প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় কারণ ভারতে পেশাদার প্রথা অদূর ভবিষ্যতে চালু হলেও বিশ্ব ফুটবলের মান এত উঁচু যে সেখানে পৌঁছনো কল্পনাতীত।

কিন্তু অলিম্পিক ফুটবলে? ভারত অতীতে অংশ গ্রহণ করেছে, ভবিষ্যতেও অংশ গ্রহণের আশা রাখে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে ভারত লণ্ডন, হেলসিংকি, মেলবোর্ন এবং রোম অলিম্পিকে খেলেছে—শুধু খেলেছেই নয়, মেলবোর্নে চতুর্থ স্থান পেয়েছে এবং রোমে দিয়েছে প্রশংসনীয় ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় সেই ভারত টোকিও এবং মেক্সিকো অলিম্পিকের প্রাথমিক পর্যায় পার হতে পারল না কেন?

উত্তর সহজ। ভারত এশিয়ায় ফুটবলেই পিছিয়ে পড়েছে। প্রাথমিক পর্যায় বলতে এশিয়ান অঞ্চলের খেলা তাও সারা এশিয়ার দেশের সঙ্গে খেলা নয়। এখানেও তিনটি জোন বা অঞ্চল। প্রতি জোন থেকে একটি করে দল মিউনিখ যাবে। দেখা যাক এবার তিনটি জোনে কোন কোন দেশ রয়েছে।

সেণ্ট্রাল এশিয়ান জোনে রয়েছে ভারত, বরমা, তাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও ইজরাইল।

ইস্ট এশিয়ান জোনে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান, ফিলিপিনস ও মালয়েশিয়া।

উত্তর কোরিয়া, ইরাণ, ইরাক, কোয়ায়েৎ, লেবানন ও সিরিয়াকে নিয়ে তৈরী হয়েছে ওয়েস্ট এশিয়ান জোন।

সেণ্ট্রাল এশিয়ান জোনে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির মধ্যে বরমা, ইজরাইল এবং ইন্দোনেশিয়া অবশ্যই ফুটবলে শক্তি-শালী। বরমার কাছে ভারত মারডেকা ফুটবলে এবং ব্যাংককে এশিয়ান গেমসে পরাজিত হয়েছে। বরমা মারডেকার রানার্স এবং ব্যাংককের যুগ্ম বিজয়ী। কিন্তু কি কুয়ালালামপুরে, কি ব্যাংককে দুই জায়গাতেই ভারতের খেলোয়াড়রা বরমার সঙ্গে প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয় স্বীকার করেছে। ব্যাংককে অপর শক্তিশালী দেশ ইন্দোনেশিয়াকে ভারতের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে ৩—০ গোলে। যদিও ভারতের জোনে নেই তবু দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়ার পরম শক্তিশালী ফুটবল দল, মারডেকা চ্যাম্পিয়ন এবং এশিয়ান গেমসের যুগ্ম বিজয়ী। কিন্তু মারডেকার সেমি ফাইনালে এই দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ভারত খুবই ভাল খেলে ৩—২ গোলে হেরে গিয়েছিল। ভাগ্য একটু সহায় থাকলে এবং ভারতের দুই তিনজন খেলোয়াড় চোট আঘাতের ফলে মাঠের পাশে বসে না থাকলে ওই খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করা ভারতের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। অবশ্য ইজরাইলের বর্তমান শক্তি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। তবু আপাত দৃষ্টিতে মিউনিখের পথ পিচ্ছিল বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু অতটা পিচ্ছিল নয়। মেক্সিকো অলিম্পিকের তৃতীয় স্থানাধিকারী জাপানকে হারিয়ে ভারত যদি ব্যাংকক থেকে ব্রোঞ্জ পদক আনতে পেরে থাকে তবে এশিয়াম জোন পার হয়ে মিউনিখ পৌঁছতে পারবে না কেন?

একলব্য

সম্রাটের মৃত্যু

মাত্র ৫৮ বছর বয়সে যাদুসম্রাট পি সি সরকার মারা গেলেন।

এইতো কিছুদিন আগে যে মানুষটি দমদম বিমানবন্দরে তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতায় সবাইকে হাসিয়ে, নিজেও হাসিমাখা মুখে, বিদায় জানিয়েছিলেন বন্ধু-বান্ধব প্রিয় পরিজনদের, কটি দিনের ব্যবধানে ৯ জানুয়ারীর হিমেল রাতে তাঁর শবাধারটি এসে পৌঁছল সেই বিমানবন্দরেই। সেটি সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রফুল্ল সরকার।

৬ জানুয়ারী বুধবার সকালে জাপানের হোককাইডো শহরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন। উত্তর জাপানের প্রবল শীত তাঁর দেহের সব উত্তাপ কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু উত্তপ্ত অশ্রু রেখে গেছে তাঁর দেশবাসীর জন্য।

১৬ জনের একটি দল নিয়ে তিনি ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জাপান গিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বখ্যাত যাদুর খেলা দেখাতে। কথা ছিল দুশোটি অনুষ্ঠান প্রদর্শন করবেন ওদেশে। কিন্তু মাত্র সাতটি প্রদর্শনীর পরই তাঁর জীবনান্ত ঘটল। পিতার অসমাপ্ত কর্তব্য সমাপনের দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর মধ্যম পুত্র প্রদীপ সরকার। যে ম্যাজিক ছিল পি সি সরকারের জীবন, তাঁর জীবনান্তে তাঁরই আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করে শ্রীমান প্রদীপ পিতৃকৃত্য সমাধা করবেন।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অশোকপুর গ্রামের ভগবানচন্দ্র সরকারের পুত্র প্রতুলচন্দ্রের জন্ম ১৯১৩ সনে। ১৯৩০ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাস করে যাদুবিদ্যার সাধনাতে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করেন। গুরু হিসাবে বেছে নেন যাদুকর গণপতি চক্রবর্তীকে। তারপর একটানা সাধনা ও কৃচ্ছসাধনের ইতিহাস। প্রতুলচন্দ্র থেকে যাদুসম্রাট পি সি সরকারে উপনীত হতে অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। অনেক চোখের জলে সিক্ত সেই পথ।

ভানুমতীর দেশ ভারতবর্ষে ভোজবিদ্যা নিতান্তই অপাংক্তেয় ছিল। শ্রীসরকার অসীম সাধনায় সেই লুপ্তবিদ্যার অনুশীলন করে শ্রেষ্ঠত্বের জয়মাল্য এনে দিয়েছেন ভারতকে। যাদুবিদ্যা আজ এদেশে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তা অনেকাংশে শ্রীসরকারেরই অবদান। ভারতের বাইরে অনেকগুলি দেশের মানুষকে তিনি তাঁর যাদুর চমকে মুগ্ধ করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ স্টেজ ম্যাজিকের জন্য নিউ ইয়র্ক থেকে যাদুবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম সম্মান "দি ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড" পেয়েছেন তিনি দু-দুবার। জার্মানি ও রাশিয়া থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন তিনি।

ভারতের বাইরে থেকে অজস্র সম্মান লাভ করলেও তাঁর মনে অথবা চরিত্রে কোন পরিবর্তনই আসেনি। খাঁটি বাঙালী মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। সদালাপী, মিষ্টভাষী, রসিক মানুষটি পরিচিত ও বন্ধু মহলে খুবই প্রিয় ছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে অবলীলায় আড্ডা দেওয়া চলত। আমাদের এই অফিসেই কতবার এসেছেন, ছোট ছোট ম্যাজিকে অজস্রবার বোকা বানিয়েছেন অনেকে, পরম কৌতুকে সবাই তা উপভোগ করেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর একটি নিকটতম বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

দেশাত্মবোধের ব্যাপারটি তাঁর অত্যন্ত প্রবল ছিল। নিজের দেশে কিছু কিছু বিদেশীয়ানার ব্যাপারে প্রশ্রয় দিলেও বিদেশে গিয়ে তিনি খাঁটি ভারতীয়ের মতই আচরণ করতেন। ম্যাজিকের পোশাক ছিল ভারতীয় মহারাজার মত, প্রচারপত্রে 'প্রিনটেড ইন ইণ্ডিয়া' কথাটি উজ্জ্বল ও বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত থাকত। ম্যাজিকের উপকরণের লেবেলগুলিতেও 'ইণ্ডিয়া' শব্দটির প্রাধান্য লক্ষ করা যেত।

এবং তাঁর একটি প্রিয় খেলার নাম : ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া। এক একটি খেলা, তারপর একবার করে অন্তত ভারতের নাম উচ্চারণ—শ্রীসরকার বলতেন—ভারতমাতার বন্দনার মতই একটা ব্যাপার ছিল তাঁর কাছে।

যাদুকর মঞ্চের সেই মহারাজা আজ জীবনের মঞ্চ থেকে অদৃশ্য। বার বার তিনি মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়েছেন, আর শেষ পর্যন্ত সবাইকে বিস্মিত বিমূঢ় করে ঊর্ধ্বলোক থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে : বন্ধুগণ, আমি এখানে।

আজ তিনি আরও অনেক ঊর্ধ্বলোকে। সেখান থেকে তাঁর সেই কণ্ঠস্বর আর কোনদিনই শুনতে পাওয়া যাবে না।

তাঁর পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী সরকার ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রভাস সরকার এবং দুই কন্যা ও জামাতাদের সান্ত্বনা জানাতে পারি এমন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

সম্রাট মৃত। যাদুসম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।

চিত্র-সমালোচনা

জনি মেরা নাম

(ত্রিমূর্তি ফিল্মস)

হিন্দীচিত্রে ক্রাইমের ধরনটিও আলাদা, বাস্তবের সঙ্গে এর যোগ নেই বললেই চলে। তেমনি অবাস্তব এর ভিলেনদের আচার-আচরণ ও কাজকর্ম। হিরোর অপরিসীম সাহসিকতা, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মধুর গান, সুন্দরীর অনুরাগ, অর্জনের ক্ষমতা ইত্যাদিও সমপরিমাণে অবিশ্বাস্য। হিন্দী ছবির ক্রাইম প্লটে পুলিসের ভূমিকাও বেশ মজার। "জনি মেরা নাম"—এই সব গতানুগতিক লক্ষণাক্রান্ত। আসলে এই ক্রাইম ছবিটি বণ্ড ফিল্মের ধাঁচে তৈরি। জনি (দেব আনন্দ) যেন বণ্ড। নেপাল মুখাত ভিলেনদের কর্মকেন্দ্র, সেখানে জনির আগমন সুন্দরী রেখার (হেমা মালিনী) সঙ্গে। নিয়ম অনুযায়ী, ওই সুন্দরী অর্থাৎ হেমা মালিনী ভিলেনদের হাতের পুতুল। তার বাবা প্রধান খলনায়কের (প্রেমনাথ) হাতে বন্দী। অবশ্য এই তত্ত্ব দর্শক জেনেছেন পরে, হেমা মালিনীও।

দুর্বৃত্ত দলের নেতার চরিত্র পরিচালক বিজয় আনন্দের একটি অদ্ভুত কল্পনা। তাকে কখনো মধ্যযুগীয় অত্যাচারী গ্রীক রাজার মত মনে হবে, কখনো আবার একালের ছবির ভিলেন। সর্বক্ষণ বন্দুক উঁচিয়ে সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় রয়েছে রায়-সাহেব ভূপেন্দ্র সিং—সেটা খলনেতার ছদ্ম পরিচয়। আসল ভূপেন্দ্র সিং অর্থাৎ হেমা মালিনীর বাবা তার হাতে বন্দী।

খলনেতার চক্রান্তেই একদা জনির বাবা (পুলিস অফিসার) নিহত হন। জনিও পুলিসে যোগ দিয়েছে। তার প্রতিজ্ঞা সে দুষ্টদমন করবেই। এই খলনায়কের প্রধান সহচর মতি (প্রাণ)।

ছবি যখন শেষের দিকে তখন মতির মনে জনির আসল পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। তখন দুজনের মারামারির তথা বক্সিং শুরু। ওই বক্সিংয়ের সময়েই তারা জানতে পারে পরস্পরের সঠিক পরিচয়। ওরা দুই ভাই—সোহন ও মোহন। ছোট-বেলায় তারা এমনিভাবেই বক্সিং খেলেছিল। সোহন এতদিন খুঁজে বেড়িয়েছে তার ভাইকে, যে ছোটবেলায় নিরুদ্দেশ হয়েছিল। বাবা খুন হওয়ার দিনই মোহন নিরুদ্দেশ। সে তার বাবার আততায়ীকে বাঁচতে দেয়নি। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার পর ফিরেও আসতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সে ভিলেনদের দলেই থেকে গেল।

"দাবি" (পরিচালনা : কনক মুখোপাধ্যায়) : মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ

ফটো—দেশ

ছবির শেষে মোহনের চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা গেছে। দুই ভাইয়ের মিলনের মধ্য দিয়ে ছবির সুখ পরিণতি। সোহন ওরফে জনির প্রেমও সার্থক। এই ধরনের ছবি দেখার একটা তাৎক্ষণিক উত্তেজনা আছে। যদিও কয়েকটি রোমহর্ষক দৃশ্য সহ্য করা যায় না তবুও আমোদ-উপাদানের ছড়াছড়ি ছবিতে। দর্শকের সময় কাটে ভাল। নাচ-গান তো আছেই, গানগুলিও কল্যাণজী আনন্দজী সুরারোপিত) শুনতে ভাল। সব কিছুর উপর রয়েছেন দেব আনন্দ ও হেমা মালিনী। এঁরা কোনোদিক থেকেই দর্শকদের নিরাশ করেননি, ফ্যানদের প্রায় সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করেছেন।

"জনতার আদালত" প্রায় শেষ

জনতা ফিল্মস কর্পোরেশন-এর প্রথম ছবি "জনতার আদালতে" ছবির চিত্রগ্রহণ "মধুকর ইউনিট"-এর পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এই ছবির বহির্দৃশ্য নেওয়া হয়েছে ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে এবং পরের অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ চলছে। অনিলকুমার রচিত ও প্রযোজিত এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল, বঙ্কিম ঘোষ, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, রসরাজ চক্রবর্তী, নির্মল ঘোষ, সুখেন দাস, অশোক মৈত্র, হরিধন, লেনিন-খ্যাত সুধীর দে, ভারতী রায়, অনিল কুমার ও মাস্টার নিশীথ কুমার।

বোম্বাই বিচিত্রা

"জীবন প্রভাত" (পরিচালনা : অজয় বিশ্বাস) ছবিতে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

প্রভাত, নিউ থিয়েটার্স, বম্বে টকিজের পতনের পর এই সব প্রতিষ্ঠানের ইট-পাটকেল, জানলা-দরজা, পিলার খিলান প্রভৃতির ভিত্তিতে আজকের দেশী চলচ্চিত্র জগৎ গড়ে উঠেছে। সম্ভবত সেই জন্যেই বর্তমান চলচ্চিত্র ব্যবসায় ভয়ংকরভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রতিষ্ঠানের নামে চলছে না আজকের চলচ্চিত্র ব্যবসায়, এখন নামের প্রতিষ্ঠায় সব কিছুর কাটতি বাজারে। নিত্য নতুন নাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। চলচ্চিত্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি চলচ্চিত্রকে মুখে ব্যবসায় বা ইনডাস্ট্রি বলে আখ্যাত করছেন তবু ব্যবসায়ের পেছনে যে সুপরিকল্পিত ব্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, সে প্রয়োজন কেউই মেটাতে পারছেন না। বাড়তে ব্যবসায়ের সঙ্গে রিসার্চের সম্পর্ক [illegible]। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে কোনো রিসার্চ নেই। বিভিন্ন [illegible] কেউ কেউ ক্ষীণ স্বরে [illegible] আমি অনেক বার এই কাজের কথা বলেছি কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমার ধারণা চলচ্চিত্র কলাকুশলী প্রত্যেক দেশেই সে দেশের দেশী শিল্প বলে গণ্য হবে। এমনকি আমাদের দেশেও। কিন্তু আমাদের দেশে চলচ্চিত্র শিল্প যে-সব বিধি ব্যবস্থার ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান (?) তা যে পথের পরিপন্থী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশে প্রতিভার সংকট তেমন কিছু প্রকট নয়। কিন্তু এদেশে প্রতিভা এবং প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠানহীনতার চক্রব্যূহে প্রতিষ্ঠা অর্জনের উন্মাদনায় অভিমন্যুর মত দিশাহারা। যে প্রতিষ্ঠিত নয়, সে প্রতিষ্ঠা পেতে প্রাণ পাত করছে আর যে প্রতিষ্ঠিত, সে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে এবং তাকে বাড়াতে উন্মাদ। ফলে লক্ষ্য হয়ে গেছে উপলক্ষ। সৃষ্টির চেয়ে সার্থকতা হয়ে গেছে বড়। তাই স্বতন্ত্রতার থেকে স্বার্থ বেশী রক্ষণশীল। যোদ্ধার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তার হাতে যদি বিজয় পতাকা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার দ্বারা আর যুদ্ধ সম্ভব নয়। বিজয় পতাকা বইবার লোভে সুসজ্জিত রথে বসে থাকার আগ্রহে সে সন্ধি করতে উন্মুখ, শান্তির নামে সংকীর্ণ হতে বাধ্য, শিল্প সৃষ্টির চেয়ে 'শিল্পী' নাম বজায় রাখতে শঠতার সঙ্গে প্রার্থনা তার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার!

চলচ্চিত্র জগতের হাঁড়ির খবর যাঁরা সত্যি সত্যি জানেন, এবং দেশী চলচ্চিত্র জগতের গতি-প্রগতির প্রতি যাঁরা স্নেহশীল তাঁদের কাছে হয়তো আমার বক্তব্য তেমন অপরিষ্কার নয়—তবু নিজেকে একটু পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করার লোভ সামলাতে পারছি না।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্র জগৎ যাদের কাঁধে ভর করে এগুচ্ছে তাদের কাঁধগুলো উচ্চতায় এমন অসমান যে চলচ্চিত্র আপ্রাণ চেষ্টা করেও সত্যি সত্যি এগুতে পারছে না। এদেশের চলচ্চিত্র জগতে যাঁরা সত্যি সত্যি নামকরা লোক (সাফল্যের মাপকাঠিতেই আর শিল্প বিচারেই হোক) তাঁদের প্রায় অধিকাংশেরই প্রতিষ্ঠার ইমেজ সেই সব ব্যক্তির চেয়ে বড়। ফলে চলচ্চিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল [illegible] করতে গিয়েও বার বার তাঁরা বিপর্যস্ত হন ঐ ইমেজ রক্ষার বিড়ম্বনায়। পুরোজিত নাম, পুরোজিত সফলতা, পুরোজিত স্ট্যাটাস, এরা কিছুতেই এদেশী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পিছু ছাড়ে না। এক শিল্পসৃষ্টির তাড়না এঁদের হাত ধরে টানাটানি করে, টেনে নিয়ে যেতে চায় অগ্রগতির পথে কিন্তু প্রতিষ্ঠার পিছুটান আর ইমেজ রক্ষার আলিঙ্গনে কিছুতেই এঁদের মুক্ত বিহঙ্গ হতে দেয় না। প্রভাত থেকে বেরিয়ে এসে শান্তারাম যদি সার্থক হয়েও থাকেন তবু 'আদমী', 'পড়োসী' এসব আর হয় না!

চলচ্চিত্রের সাফল্য আমার ধারণা সব সময়েই এক-একটি ইনসপায়ারড ইউনিটের সাফল্য, কিন্তু কার্যত এ সাফল্যের সকল ফসল গিয়ে জমা হতে থাকে একজনের গুদামে। সেখান থেকে তার বণ্টন রাজ-কাপুরের মত উদার হস্তে হলেও সে ফসলের বীজগুণ নষ্ট হয়ে যায়, তাই সে ফসল খাওয়া চলে কিন্তু নতুন উৎপাদন তাতে হয় না! ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার ছত্রতলে যারা তারা চিরকালই ছত্রধার, কোন কালেই ছত্রপতি নয়, তাই তারা নিরুপায় অনুগত। ফলে ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠা শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু ছিটিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। মেহবুবের মৃত্যুর পরে মেহবুব প্রডাকশন বন্ধ হয়ে যায়। বিমল রায়ের অনুপস্থিতিতেও সেই একই অবস্থা। কাপুর বংশ এদিক থেকে ভাগ্যবানের বংশ, পৃথ্বীরাজের রাজত্বে সূর্য প্রায় মধ্যগগনে থাকতেই রাজ কাপুরের আবির্ভাব, রাজ-কাপুরেও শিখর শিখি থাকতে থাকতেই রণধীর অর্থাৎ ডাব্বু মঞ্চে উপস্থিত। কিন্তু এমন ঘটনা তো সব জায়গায় ঘটে না। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে (বা শিল্পে) এর সাফল্য বা অসাফল্য দুয়েরই ভার যে কোন শিল্পীর পক্ষে দুর্বিষহ। তাই মনে হয় প্রতিষ্ঠান হলে তবেই বুঝি চলচ্চিত্র আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। যা চলছে তাই যদি চলে তাহলে এই উত্থান পতনের তাল ফেরতায় আমাদের যার যার কাছ থেকে যা যা প্রাপ্য তা বোধহয় আমরা কোনদিনই পাব না। প্রতিষ্ঠান থাকলে যে স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে তার নমুনা আমরা নিউ থিয়েটার্সের কাছ থেকেই পেয়েছি। কত বিভিন্ন স্বাদের এবং ঢঙের ছবি দিয়েছে নিউ থিয়েটার্স। কত অভিনেতা, অভিনেত্রী, কত কলাকুশলী, কত পরিচালক!

সরল শর্মা

"জল বিন মছলী" ছবির মুক্তি আসন্ন

ভি শান্তারামের ইস্টম্যান কলার ছবি "জল বিন মছলী নৃত্য বিন বিজলী" হিন্দীচিত্রের মুক্তি আসন্ন। সন্ধ্যা ও নবাগত অভিজিৎ ছবির দুই বিশিষ্ট শিল্পী। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সঙ্গীত পরিচালক।

'সুবহ কাহি শাম কাহি' (পরিচালনা : দিলীপ বসু) হিন্দী ছবিতে রূপক মজুমদার ও কল্যাণী ঘোষ

শিশু রংমহলের উৎসব

চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার (সি এল টি) ওরফে শিশু রংমহল কুড়ি বছরে পা দিয়েছে। এই উপলক্ষে ১৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত একটানা কুড়িদিন শিশুরা সবাই উৎসব করল ওদের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে অবন মহলে।

দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট রোডের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা "অবন মহল" এর দিকে তাকালে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। রিদমস অ্যান্ড রাইমস থেকে সি এল টি কিংবা দেশপ্রিয় পার্কের পিছন থেকে অবন মহল পর্যন্ত পৌঁছুবার ইতিহাস একটা বিরাট অগ্রগতির ইতিহাস। ভাবতে অবাক লাগে এবং গর্ব হয়, আজ যখন আমাদের দেশের সব কিছুই ক্রমে ক্রমে ভাঙতে বসেছে তখন সি এল টি দিনে দিনে কত শক্ত হচ্ছে, জমাট বাঁধছে। শিশু রংমহলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়কে অজস্র ধন্যবাদ। খোকা-খুকুদের নিয়ে তিনি যে কি অসাধ্য সাধন করেছেন তা দেখে শেখা উচিত আমাদের দেশের বুড়ো-খোকাদের।

১৮ ডিসেম্বর উৎসব শুরু শিশু রংমহলের বিখ্যাত "অবন পটুয়া" দিয়ে। ৬ জানুয়ারি উৎসব শেষ "আণ্ডার দি সী" দিয়ে। মাঝখানের দিনগুলিতে "জজো" "পিকনিক", "ভীম বধ", "সাত ভাই চম্পা", "রামায়ণ", "ভুলো কাঠবেড়ালী", "সন্তুস অব ইণ্ডিয়া", "সাধু", "হর্বোলা-মাউস", "তাসের দেশ", পুতুল নাচ, কথাকলি, মণিপুরী, কথক, ভরত নাট্যম ইত্যাদি নাচ, নানারকম বাজনা এবং মায়া চ্যাটার্জী ও সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর একক নাচ।

ছোটদের কিংবা ছোটদের জন্য বড়দের এইসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন রকম সমালোচনা করতে ইচ্ছে করে না। উল্টো বরং মনে হয়, বড়রা দলে দলে এদের এই অনুষ্ঠানগুলি এসে দেখুক, দেখে কিছু শিখুক। তাতে বড়দের মনের অন্ধকার অনেকখানি কেটে যাবে। তার দেশের ও দশের মঙ্গল যে হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

—দিবাকর বর্মা

ভেনিসে "দুটি মন"

আগামী ভেনিস ফেস্টিভ্যালে অপর্ণা ফিল্মসের "দুটি মন" (পরিচালনা : পার্থপ্রতিম বসু) ছবিটি দেখানো হবে। এই নির্বাচন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দফতরের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভেনিস ফেস্টিভ্যাল এখন প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নয়।

সুবর্ণ জয়ন্তী সপ্তাহে "ব্লো হট, ব্লো কোল্ড"

ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ইতালীয় ছবি "ব্লো হট, ব্লো কোল্ড" এ সপ্তাহে নিউ এম্পায়ার চিত্রগৃহে সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। তরুণ চিত্র-পরিচালক ফ্লোরেস্টানো ভানসিনি পরিচালিত এই মনস্তত্ত্বমূলক প্রণয় কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইতালীর জিনা লোলোব্রিজিদা... ইতালীর গিউলিয়ানো জেম্মা, সুইডেনের বিবি অ্যাণ্ডারসন ও গ্যাসের ব্রজোরমস্ট্যাণ্ড এবং ব্রিটেনের রোজমেরী ডেক্সটার।

শোনালেন ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য। আলাপ, জোড়, ঝালা বাজিয়ে পুরিয়া কল্যাণে গৎ পরিবেশন করেন। ইন্দ্রনীলও একজন দক্ষ শিল্পী, বন্দেশটিও ধরেছিলেন ভাল। মাঝে মাঝে সুরসৃষ্টির মধ্যে তাঁর অর্জিত দক্ষতার পরিচয় থাকলেও, অনুষ্ঠানটি নিরবচ্ছিন্নভাবে খুব স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হতে পারেনি। এটি নিশ্চয়ই তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলাপের অংশে এবং কিছু তানের ঝংকারে পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর শিল্প চাতুর্যের নিদর্শন ছিল। ওঁর সঙ্গে সঙ্গত করেছেন শংকর ঘোষ।

—আনন্দ বর্ধন

রবীন্দ্র সদনে অর্কেস্ট্রা

প্রবীণ সুরকার শ্রীতিমিরবরণ ও নবীন শিল্পী শ্রীভাস্কর মিত্রের পরিচালনায় আগামী ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদন মঞ্চে ভারতীয় সাম্মেলক যন্ত্রসংগীতের (অর্কেস্ট্রা) এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন রবীন্দ্র সদন সমিতি। ইতিপূর্বে সমিতি সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, যাত্রা ইত্যাদি সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এবারের এই অনুষ্ঠানটি উক্ত কর্মসূচীর অঙ্গ। দীর্ঘকাল পূর্বে শ্রীতিমিরবরণ অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করে যে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এযুগের শ্রোতা আবার তা শোনবার সুযোগ পাবেন এই অনুষ্ঠানে। তাঁর নবতম সৃষ্টিরও পরিচয় পাবেন তাঁরা। তাঁর পাশে নবীন শিল্পী শ্রীভাস্কর মিত্রও নতুন কিছু দিতে পারবেন বলে আশা করছেন সমিতির কর্তৃপক্ষ।

অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থের বেশির ভাগই ওই দুই শিল্পীকে প্রদান করা হবে। এছাড়া যন্ত্রশিল্পীদের টাকা রবীন্দ্র-সদন সমিতিই দেবেন। হলের ভাড়া ও বিজ্ঞাপনের খরচও তাঁরা নিচ্ছেন না। এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য জানানো হয়।

দক্ষিণীর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান

আগামী ২৪ জানুয়ারী, রবিবার, সকাল সাড়ে দশটায় 'কলামন্দিরে' দক্ষিণীর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে। অনুষ্ঠানে দক্ষিণীর পঞ্চাশজনের অধিক শিল্পী যোগ দেবেন।

সংগীত সংসদের অনুষ্ঠান

মূলত নতুন প্রতিভার আবিষ্কার এবং সঙ্গীতরসিকদের কাছে তাঁদের তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীত সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংসদের এই মূল লক্ষ্যের কথা সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে উল্লেখ করেন শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত সংসদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, রাগপ্রধান ও আধুনিক সংগীতের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে নতুন শিল্পীদের আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করা সংসদের অন্যতম কর্মসূচী। শ্রীচট্টোপাধ্যায় পরিশেষে জানান, সঙ্গীত সংসদ বালীগঞ্জ শিক্ষা সদনে ২৩ জানুয়ারি থেকে তিনদিনব্যাপী সঙ্গীত-আসরের আয়োজন করেছেন। প্রথম দিন আধুনিক গান, দ্বিতীয় দিন (২৪ জানুয়ারি) রাগ-প্রধান এবং শেষদিন (২৫ জানুয়ারি) সারা রাত্রিব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসবে। যোগদানকারী শিল্পীরা সকলেই নতুন।

হায়দরাবাদে 'তাসের দেশ' অভিনয়

স্থানীয় রবীন্দ্র ভারতী ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেন মাসাব ট্যাঙ্ক অঞ্চলের-বাঙালী অধিবাসীবৃন্দ। নাটকটি পরিচালনা করেন পুষ্প গুপ্ত। স্থানীয় দর্শকরা অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত এবং দলগত অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অভিনয়ে ছিলেন অমরেশ গঙ্গোপাধ্যায়, পুষ্প গুপ্ত, সমীর ঘোষ, শিবশঙ্কর ঘোষ, নমী দাশগুপ্ত, শম্ভু সিনহা, তমসা মিত্র, অলোক মণ্ডল, মদন দত্ত, আত্রেয়ী দেব, তৃপ্তি মিত্র, উত্তমা দাশ, স্বপ্না দাশগুপ্তা, বীথি ঘোষ, রুণা গাঙ্গুলী, তৃপ্তি মিত্র (বড়) সন্ধ্যা বেগ এবং পাপিয়া তলাপাত্র। সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিচালনা করেন অমরেশ গঙ্গোপাধ্যায়, আত্রেয়ী দেব এবং উত্তমা দাস। তাসের দলের পোষাকগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন সর্বশ্রী ডি কে ভাওয়াল এবং বি বি সেনগুপ্ত।

মুক্তি পথে "প্রথম বসন্ত"

ছন্দরূপা নিবেদিত প্রতিভা বসুর প্রেমোপাখ্যান "প্রথম বসন্ত" ছবিটি আসন্ন মুক্তির অপেক্ষায় আছে।

স্ব-রচিত চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে চিত্র-পরিচালনা করেছেন নির্মল মিত্র। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন মাধবী চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কলি চক্রবর্তী, অজয় গাঙ্গুলী, অঞ্জনা ভৌমিক, নমিতা দেবী, ভারতী দেবী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, ইরা চ্যাটার্জী, আশা দেবী ও সুরুচি সেনগুপ্তা।

নবরাগ

এস এম ফিল্মসের 'নবরাগ' ছবির মুক্তি আসন্ন। এ ছবির প্রযোজক 'দেবেন্দ্র সিংহ। কাহিনী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। পরিচালক বিজয় বসু। উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন বিকাশ রায়, বিজন ভট্টাচার্য, তরুণ রায়, বিনু ভৌমিক, মণ্টু, রাজলক্ষ্মী দেবী নিরোদী প্রভৃতি শিল্পী বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

মলয় গীত বীথির "গুপী গাইন বাঘা বাইন"

প্রায় একশত শিশুকিশোর নিয়ে মলয় গীত বীথি "গুপী গাইন বাঘা বাইন" নৃত্যনাট্যরূপে পরিবেশন করলেন গত ২০ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সদনে। এটি ছিল তাঁদের পুনরভিনয় অনুষ্ঠান। উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর লেখা এই মন-মাতানো কাহিনীটির নৃত্যনাট্যরূপে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী করেই গড়ে তোলা হয়েছিল। নৃত্য এবং অভিনয়ে সকলেই দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। বিশেষ করে গুপী ও বাঘা অতুলনীয়। সংগীত এই নৃত্যনাট্যের প্রধান সম্পদ। সংগীত ও নৃত্য পরিচালনায় শ্যামলেশ ঘোষ ও স্মৃতিরঞ্জন ঘোষ বিশেষ প্রশংসার অধিকারী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির প্রযোজনায়

অরণ্যদেব
লী ফক

জলের মধ্যে ওগুলো কী?
ফিরে আয়, রাজা!
টম আমাদের ডাক শুনতে পাচ্ছে না। সমুদ্রের গর্জনে আমাদের গলা ডুবে যাচ্ছে।

ওগুলো হাঙর!
ওয়াকার-কাকা*, হাঙর!
কী যেন বলছে রাজা!
কিন্তু কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না।
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার কাকা

ওই দ্যাখ, ওগুলো হাঙরের পাখনা। নিশ্চয় ওই দেখেই রাজা চ্যাঁচাচ্ছে!
রাজা, ফিরে আয়! ফিরে আয়!

ফিরতেই হবে! এই যা!
5/24

জলের মধ্যে পড়ে গেছে!
সর্বনাশ --
নেফারতিতি

চল্, নেফারতিতি

তাড়াতাড়ি চল্!
জল কেটে নেফারতিতি ছুটছে!
ওদিকে রাজাকে ঘিরে ধরেছে এক ঝাঁক হাঙর!
চলে যা, চলে যা তোরা!

শেখ আবদুল্লার কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ নিষেধের আদেশ জারি এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ৯ জানুয়ারি শেখ আবদুল্লার কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যে ঢোকা নিষিদ্ধ করে এই আদেশ জারি করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে দিল্লিতে আছেন। সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় তল্লাসী চালিয়ে গণভোট ফ্রন্টের প্রায় ৪০০ কর্মকর্তা ও কর্মীকে আটক আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। উপত্যকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। গণফ্রন্টের সভাপতি মিরজা আবজল বেগ এবং ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক শেখজীর জামাই শ্রীজি এস শাহর উপরও কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করা হয়েছে। কাশ্মীরের চীফ সেকরেটারি শ্রীপি কে দাভে বলেন : তিনি খবর পেয়েছেন যে, শীঘ্রই ফ্রন্ট কর্মীদের সভা ডাকা হবে। গণভোট ফ্রন্ট ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই সভার ফ্রন্ট-সভ্যদের অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত হবার নির্দেশ দেওয়া হবে। এ ছাড়া দিল্লিতে বিদেশী মিশনগুলির সঙ্গে শেখ আবদুল্লা ও শ্রীবেগের বৈঠকের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার আরও অবগত আছেন যে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ কাশ্মীরে আসছে। রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাকর্মীদের ক্রমবর্ধমান ওইসব কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

দেশী সংবাদ

৪ জানুয়ারি—আজ নয়াদিল্লিতে কমনওয়েলথ প্রধান বিচারপতিদের তৃতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি বলেন : সংবিধান অনড় দলিল হয়ে থাকুক—তা অভিপ্রেত নয়। উন্নতিশীল সমাজে সদাই পরিবর্তনশীল অবস্থায় সংবিধানের ধারাগুলি কাজে আসুক তাই কাম্য।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা আজ ঘোষণা করেন যে, আগামী ২৬ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ১, ২, ৩ ও ৪ মারচ সারা দেশে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গ্রহণ রাজ্যভেদে ১ দিন থেকে ৪ দিনে শেষ হবে। ভোট গণনা শুরু হবে ৫ মারচ আর শেষ হবে ৮ মারচ।

৫ জানুয়ারি—বড়বাজারের এক বড় ব্যবসায়ী সমেত কলকাতা ও শহরতলিতে আজ তিনজন খুন হন। ওই ব্যবসায়ীকে নিয়ে দু' মাসে এ শহরে ছয়জন ব্যবসায়ী খুন হলেন। নিহত ব্যবসায়ীর নাম শ্রীশিবপ্রসাদ বাগড়ি। বয়স ৬০ বৎসর।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হবে কিনা এবং হলে কবে হবে, এ বিষয়ে কেন্দ্র এবং বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী এখনও চূড়ান্তভাবে মনস্থির করতে পারেননি। হয়তো এমনও হতে পারে যে, অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচনের পালা চুকে গেলে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হতে গেলে সেখানে অন্যান্য রাজ্য থেকে প্রচুর পুলিস পাঠানো নিরতিশয় প্রয়োজন।

৬ জানুয়ারি—আজ জাপানের আশাহি-কাওয়া শহরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিশ্ব-বন্দিত যাদুকর পি সি সরকার পরলোকগমন করেছেন। ষোল জনের একটি দল নিয়ে তিনি ছ' মাসের জন্য জাপানে খেলা দেখাতে গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এ সংবাদ ফোন করে তাঁর বাড়িতে জানান হয়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র পিতার মৃতদেহ বিমানযোগে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করার জন্য জাপানে চলে যান।

আজ ভোরে দমদমের কাছে দুটি লোক্যাল ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন আহত হন। এর পর ট্রেন চলাচলে বিলম্ব, তারই জের হিসাবে বিক্ষুব্ধ একশ্রেণীর যাত্রীর হাতে শিয়ালদহ সাউথ সেকসনের সহকারী স্টেশন মাস্টারের লাঞ্ছনা : প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ রেল কর্মীদের সারাদিন কর্মবিরতি।

৭ জানুয়ারি—চিত্তরঞ্জনে আজ সিনদপুরে

স্টেট ব্যাংক থেকে ২১ লক্ষ টাকা ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। ওই টাকা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ারকসের কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য তিনটি সীলকরা বাকসে রাখা হয়েছিল। বাধা দিতে গিয়ে লোকো ওয়ারকসের একজন রক্ষী রিভলবারের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। ডাকাত দল একটি অ্যামবেসেডর গাড়িতে চম্পট দেয়।

আজ নয়াদিল্লিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে : পশ্চিমবঙ্গে একই সঙ্গে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কবে ওই নির্বাচন হবে তা অবশ্য এখনো স্থির হয়নি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দিন ঠিক করবেন। আজই সর্বোচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৮ জানুয়ারি—চিত্তরঞ্জন পুলিস পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে মাইথনের জঙ্গল এলাকা থেকে গত রাতে একটি ভাঙ্গা বাকস ও ৩০০০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছেন। চিত্তরঞ্জনে গতকাল ডাকাতির ব্যাপারে ব্যবহৃত মোটর গাড়ির মালিককে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মোটরের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৯ জানুয়ারি—ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন সিংদেও আজ পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয়েছে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী উড়িশার বিধানসভা ভেঙে দিয়েছেন। শ্রীসিংদেও-র পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিন বছর দশ মাস ধরে স্বতন্ত্র-জনকংগ্রেস দলের কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটলো।

আসন্ন নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার শ্রী বি এম রাঘবন আগামী ১৩ মহাকরণে ৩১টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি-দের সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হবেন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি এই বৈঠক ডেকেছেন।

১০ জানুয়ারি—ওড়িশায় সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের জন্য রাজ্যপাল ডঃ এস এস আনসারির সুপারিশটি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেবেন বলে জানা গিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন যে, রাজ্যপালের প্রতিবেদনে বিধানসভা স্থগিত রাখার যে সুপারিশ করা হয়েছে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির তাই একমাত্র সুরাহা।

চিত্তরঞ্জন ব্যাংক ডাকাতি সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিস আজ বারনপুর ও দুর্গাপুরে দুটি জায়গায় হানা দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে মোট ২ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা উদ্ধার করে। ডাকাতির ব্যাপারে এ পর্যন্ত আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তল্লাসীর ফলে পুলিস ২টি মাসকেট, একটি দোনলা পিস্তল ও একটি পাকিস্তানী রিভলবার উদ্ধার করেছে।

বিদেশী সংবাদ

৪ জানুয়ারি—গতকাল ঢাকায় প্রায় দশ লক্ষ লোকের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ দলের নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান ভারতবর্ষ সমেত তার সমস্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহ-অবস্থান করতে চায়। আওয়ামী লীগ দলের নীতি বর্ণনা করে তিনি বলেন : আমরা ব্যাংক, বীমা এবং পাটের ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করব।

৫ জানুয়ারি—অসলোর এক খবরে প্রকাশ : —সম্প্রতি জনৈকা মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাবার পর রক্ত জমাট বেঁধে মারা যান। উক্ত ভদ্রমহিলার স্বামী মিউনিসিপ্যাল কোরটে ওই বড়ির জারমান উৎপাদকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের এক মামলা দায়ের করেছেন। পশ্চিম ইয়োরোপে এই ধরনের মামলা এই প্রথম।

৬ জানুয়ারি—গতকাল রাতে প্রাক্তন বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ান সনি লিসটনকে তাঁর বাসগৃহে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় শেরিফের দফতরের একজন মুখপাত্র বলেন যে, লিসটন প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মরে পড়ে আছেন। তাঁর স্ত্রী কয়েকদিনের জন্য বাইরে যান এবং ফিরে এসে স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

৭ জানুয়ারি—গতকাল প্রায় এক হাজার বিক্ষোভকারী ছাত্র লাহোরের বৃটিশ কাউন্সিল দূতাবাস, সেন্ট জন অ্যামবুলেন্স হল ও খ্রিস্টান হল আক্রমণ ও তছনছ করেন। বাণিজ্য দূতাবাসে আগুন লাগানো হয়। একটি মদের দোকানও লুঠ হয়। রাওয়ালপিন্ডিতেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। টারকিশ আরট অব লাভ নামক একখানা বই ব্রিটেনে প্রকাশ এই বিক্ষোভের কারণ।

৮ জানুয়ারি—লেনিনগ্রাদ বিমান দস্যুতা সম্পর্কীয় ষড়যন্ত্রে অংশ নেবার জন্য একটি রুশ সামরিক আদালত আজ মেজর উজিক আলেকজান্ডারকে দশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। মসকো থেকে এ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

৯ জানুয়ারি—পাক আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার অভিযোগে আজ ঢাকায় পুলিস এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। ধৃত যুবকটি স্বীকার করেছে যে, শেখ মুজিবরকে হত্যা করার জন্যই সে ছুরি নিয়ে তাঁর বাসভবনে ঢোকার চেষ্টা করে।

১০ জানুয়ারি—মসকোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েটের স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক গবেষক লুনোখোদ-১ চাঁদের বর্ষণ সাগর এলাকায় এলুমিনিয়াম, লোহ, সিলিকন, টাইটেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের আকর খুঁজে পেয়েছে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবোধ শিশু

কিন্তু আপনি মা!
আপনি তো জানেন,
সর্দি বসে গেলে
বাড়াবাড়ি হতে পারে!

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি-কিছু আর বাকি থাকবে না-অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না— বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়-যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,-যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,
— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে —

১)

বাইরে থেকে গায়ে

২)

ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সবচেয়ে সুফল যদি তাড়াতাড়ি পেতে চান তো ভিক্স ভেপোরাব যথেষ্ট পরিমাণে লাগান—১৯ গ্রামের পুরো এক শিশি, -বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৭ থেকে ৮ বার আর বড়দের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪ বার লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব— নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে প্রলেপ ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

নতুন ১২ গ্রামের বড় টিন

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

580C

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১২
শনিবার ৯ মাঘ ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮০৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়
বার্ষিক ... ২৫.০০
ষান্মাসিক ... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক ... ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষান্মাসিক ,, ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,, ... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ... ৩০.০০
ষান্মাসিক ,, ... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,, ... ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক ... ৫২.০০
ষান্মাসিক ,, ... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,, ... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... ৩৯.০০
ষান্মাসিক ... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক ... ১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 23 Jan. 1971

তেইশে ও ছাব্বিশে জানুয়ারি

আজ তেইশে জানুআরি; সুভাষচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী। দুটি মাত্র দিনের ব্যবধান, তার পরই ছাব্বিশে জানুআরি, আমাদের প্রজাতন্ত্র-দিবস। আমাদের কাছে এই দুটি দিনেরই একটি মূল্য আছে; তেমন করে ভাবলে এর একটি তাৎপর্যও রয়েছে। মানুষের ইতিহাসে, জাতির ইতিহাসে এমন দিন মাঝে মাঝে আসে যা কোনো না কোনো কারণে বিশেষ হয়ে ওঠে, আর ভবিষ্যত কাল তাকে মূল্য দিয়ে, স্মৃতি দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করতে চায়।

সুভাষচন্দ্র আমাদের কাছে কোন রূপে বিরাজ করছেন—সে-কথা নতুন করে বলা বোধ হয় বাহুল্য হবে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মহৎ নেতাদের অভাব একদা বিশেষ ছিল না; বাঙলা দেশেও অতি উচ্চশ্রেণীর এবং সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতার আবির্ভাবও ঘটেছে; তবু আমরা জানি সুভাষচন্দ্র তাঁদের অন্যতম হয়েও যেন এমনই এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব—যাঁর কর্মজীবন আমাদের কাছে নক্ষত্রের মতন জ্বলছে। মনে রাখতে হবে, সুভাষচন্দ্র যখন ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠ নেতাদের অন্যতম-রূপে বিরাজ করছেন তখন তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুরাও কেউ বিশেষ কম নন, সর্বোপরি রয়েছেন মহাত্মাজী, তবু তাঁর দীপ্তি সর্বদাই তাঁকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। এর একটা কারণ নিশ্চয় এই যে, তাঁর হৃদয়ের আবেগ, আকুলতা, দুঃসাহস ও সততার অন্ত ছিল না; তিনি এদেশের রাজনৈতিক জীবনে অবিশ্বাস্য এক তারুণ্যের স্পর্শ এনেছিলেন। ভিক্ষা নয়, অনুনয় নয়, দুর্বলের মিনতি নয়—স্বাধীনতার জন্যে সর্বতোভাবে তিনি মুখোমুখি সংগ্রাম ও সর্বস্ব বিসর্জনের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর এই বিদ্রোহের রূপটি আমাদের হৃদয়-মন অধিকার করেছিল। সেই রূপেই তাঁকে আমরা দেখেছি, আজও দেখি। আমাদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ তাই 'নেতাজী' বলে।

আজ সারা ভারতের যে দুর্দিন, বিশেষ করে এই পশ্চিমবঙ্গের তাতে মনে হয়, এমন এক ব্যক্তিত্বময়, আদর্শপ্রাণ, সজীব ও স্বপ্নময় কোনো নেতা যদি আমাদের মধ্যে থাকতেন, তিনি হতেন আমাদের কাণ্ডারী, আমরা রক্ষা পেতাম। সে সৌভাগ্য থেকে আমরা আজ বঞ্চিত। সুভাষচন্দ্রের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি আমাদের প্রণাম নিবেদন করি, আর প্রার্থনা করি—তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন অনুভব করার মতন কয়েকটি মানুষ আবার যেন জন্ম নেয়।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসের একুশ বছর পূর্ণ হতে চলল। ভারতের ইতিহাসে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এর ঐতিহাসিক মূল্য যেমন অসীম, তেমনই এর গুরুত্ব আমাদের জীবনে। রাজতন্ত্রের ছত্রছায়া থেকে আমরা এসে দাঁড়ালাম প্রজাতন্ত্রে—অর্থাৎ স্বীকৃত হল মানবাধিকার। রাষ্ট্রাধিকার আজ কারোও একার নয়; এর পরিচালনাভার প্রজাপুঞ্জের, অর্থাৎ নৈতিকভাবে জনসাধারণই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা। বেশীর ভাগ সময় আমরা এই কথাটি ভুলে যাই। ভুলে যাই যে, কাগজেকলমে রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র হলেই তা যথার্থ প্রজাতন্ত্র নয়। প্রজাতন্ত্রে জনসাধারণের হাতে যে ক্ষমতা ও অধিকার তুলে দেওয়া আছে তার সংগত ও সুবিবেচনা-প্রসূত ব্যবহার না হলে বিপদ অনিবার্য। বস্তুত, এই অধিকার লাভ করায় যেমন গৌরব আছে তার চেয়েও বেশী আছে এর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তাকে কার্যকর করে তোলা। ভারতের যা কিছু ভবিষ্যৎ—সে তার রাজনীতিক জীবনের হোক, কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক—তার দায়-দায়িত্ব নির্ভর করছে আমাদের ওপর। আমরা যদি মনেপ্রাণে চাই আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলব—আমরা তা করতে পারি, তবে, নিছক প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করে নয়, দীর্ঘকালের শ্রম ও সাধনা দিয়ে। ভারতবাসী কী সে দুঃখ, দায়িত্ব, শ্রমের ভার বহন করতে সম্মত? যদি সে-দায়িত্ব পালনে আমরা আগ্রহী হই তবে আমাদের প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিশ্চয় উজ্জ্বল। নচেৎ নয়। প্রজাতন্ত্রের উৎসবের মধ্যে এই সামান্য কথাটুকু মনে রাখাই বোধ হয় সংগত। স্মরণ রাখতে হবে, আমরা যে পরম আদর্শের অভিযাত্রী তার সাফল্য নির্ভর করছে আমাদের সমবেত উদ্যম, নিষ্ঠা, কর্ম ও দেশের কল্যাণসাধনার ইচ্ছার ওপর।

গুপ্ত ঘাতকের ছুরিকাঘাতে নিহত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল চন্দ্র সেনের চিতার আগুন নিবতে না নিবতেই বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দিরের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী খুন হলেন তাঁর ক্লাস ঘরের মধ্যেই, দিনের বেলায় এক ঘর ছাত্রের চোখের সামনে। চার পাঁচটি ছেলে এল, তাঁকে মারল, তারপর অনায়াসে বেরিয়ে চলে গেল। এবং তারপর শোকের প্লাবনে দেশ ভেসে যাবার উপক্রম হল। যেমন হয়েছিল উপাচার্য সেনের মৃত্যুতে। উপাচার্য সেন খুন হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার ভিতরেই, তাঁর বাসভবনের অদূরে। অধ্যাপক চক্রবর্তীকে খুন করা হল ক্লাসে যখন তিনি পড়াচ্ছিলেন তখন।

সি পি এম-এর ছাত্র ফ্রন্ট গত দু বছর ধরে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অত্যধিক ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। এবং স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ল্যাবরেটরি ভাঙা হচ্ছে, আগুন জ্বালানো হচ্ছে, উচ্ছৃংখল ছাত্ররা সামান্য কারণে আসবাবপত্র তচনচ করে দিচ্ছে, শিক্ষক অধ্যাপক উপাচার্যকে ঘেরাও করে লাঞ্ছিত করে চলেছে, তখনও যাতে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করা যায় শিক্ষক অধ্যাপক উপাচার্যদের রক্ষার ব্যবস্থা না করা যায়, তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার ধুয়ো তুলে সর্বপ্রকার শিক্ষায়তনকে অরক্ষিত রাখতে সি পি এম ছাত্রগোষ্ঠী নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছাত্র ফ্রন্টগুলিও সি পি এম অপেক্ষাও বিপ্লবী সাজবার ঝোঁকে তাদের চাইতেও জোর গলায় ধ্বনি তুলেছিলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, ল্যাবরেটরি, পাঠাগার, রেকর্ড, শিক্ষক অধ্যাপক উপাচার্য প্রভৃতির নিরাপত্তার জন্যও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পুলিস মোতায়েন করা চলবে না। এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণও ছাত্রদের এই অযৌক্তিক আবদার মেনে নিয়ে যে পাপ করলেন, তার ফলশ্রুতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই উপাচার্য হত্যা, অধ্যাপক হত্যা শিক্ষিকার বুকে ছুরিকাঘাত, ছাত্রকে পিটিয়ে পিটিয়ে খুন। দুর্গাপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে শুরু করে পর পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে-সব জঘন্য নৃশংসতা ঘটেছে তারপর এমন কোন নির্লজ্জ ছাত্র বাংলা দেশে আছেন, যিনি বলবেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বড় পূত পবিত্র আছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সি পি এম ছাত্রদের তো বেজায় প্রতাপ। তাঁরা না অঙ্গীকার করেছিলেন উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনের কাছে, সি আর পি সরিয়ে নিলে

বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব তাঁরা নেবেন! উপাচার্য সেন জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গেলেন, রাজনৈতিক বাকসর্বস্বতা কত শূন্যগর্ভ।

সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টির দ্বারা জীবনযাত্রা অচল করে দেবার যে গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন, সি পি এম-এর শিক্ষক ও ছাত্র ফ্রন্ট অতীব দক্ষতার সঙ্গে সেই রণকৌশল অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁদের সম্পর্কে বলার কিছু নেই। কিন্তু অন্য দলের ছাত্রেরাও কী করে যে সি পি এম ছাত্র ফ্রন্টের ফাঁদে পা দিয়ে নিরন্তর খানায় পড়ছে, সেটা বোঝা সত্যই কষ্টসাধ্য।

যে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়ে পুলিসের চাকরী নেয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ও শিক্ষক অধ্যাপক উপাচার্যের জান মান বাঁচাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলে তার পবিত্রতা নষ্ট হয় কী করে? এই বিচারে কেউ কোনদিন বসবেন না। পুলিসের যদি এতই স্পর্শদোষ, তবে সি পি এম-এর দুই প্রধান নেতা পুলিস পাহারায় থেকে নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করছেন কি করে? সি পি এম সমর্থকেরা দলে দলে পুলিসের সঙ্গে যোগসাজসে নেমে পাড়ায় পাড়ায় নকশাল এবং তৎসহ নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের ক্যাডারদের উৎখাত অভিযানে নেমেও নিজেদের পবিত্রতা বজায় রাখছেন কোন কৌশলে?

অতএব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই শিক্ষায়তনের ভিতরে পুলিস চাই না, এ দাবী একেবারে ধোপে টেঁকে না। তবে হ্যাঁ, পুলিস ধারে কাছে না থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক সহজে ধ্বংস করা যায় বটে! নকশালী বালখিল্যরা আজ তা দেখিয়ে ছাড়ছে। এককালে বাংলা দেশের ছাত্রদের শিক্ষার গৌরব ছিল। এবং ভারতের সর্বত্র তা স্বীকৃতও ছিল। আজ সবাই জানে, বাংলা দেশের ছাত্ররা টুকে পাশ করার অধিকার কায়েম করার জন্যই বিপ্লবী হুংকার ছাড়ে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি, পাঠাগার ধ্বংস করে, শিক্ষক শিক্ষিকা অধ্যাপক উপাচার্য [illegible] করে।

ফলে, পশ্চিমবঙ্গের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই আজ বাইরে তেজপাতার [illegible] মূল্য পায় না। শিল্প কারখানা, অচল করে দিয়ে একদিকে বাংলার অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে গতিহীন করে দেওয়া হয়েছে ফলে বেকারদের সংখ্যা হু হু করে ফেঁপে উঠছে। অন্যদিকে শিক্ষা জগতকে কমরেড সত্যপ্রিয় রায় অ্যান্ড কোং-এর অশেষ কৃপায় সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। বাংলার তরুণ বাংলার বাইরে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নেবে, সে সম্ভাবনাও নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা দাঁড়াবো কোথায়?

এখন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা হয়তো এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, স্কুলে প্রধান শিক্ষক, কলেজে অধ্যক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদ খালি থাকবেই শহীদ হবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে না।

ছাত্র বন্ধুগণ! আপনারা তো পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন চান। তবে রাজনৈতিক দিক থেকে আপাতত কিছুদিন মুখ ফিরিয়ে শিক্ষা সংস্কারের দিকে মন এবং চিন্তা দিন না। অরাজকতায় মহত্তর কোনও সিদ্ধিই পাওয়া যায় না।

মুসলমান ভোটের জন্য

মুসলমান ভোট লাভের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এবার একটা জোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। সি পি এম থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় মুসলিম লীগ পর্যন্ত সবাই এখন এই ভোট লাভের জন্য সচেষ্ট। এই ভোটটা যোগাড় করার জন্য নানা দল নানা পথে এগোচ্ছেন।

মোটামুটি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আশী লক্ষ মুসলমান আছেন। অর্থাৎ রাজ্যের প্রায় সওয়া দু কোটি ভোটদাতার মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষই হলেন মুসলমান। রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই এই ভোটদাতারা ছড়িয়ে। তবে সবচেয়ে বেশী আছেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। ধর্মের ভিত্তিতে হিসাব ধরলে ওই জেলায় মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ ছাড়া চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, দিনাজপুর, মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি জেলায়ও মুসলমান ভোটের আনুপাতিক হার যথেষ্ট। কলকাতা এবং শহরতলীর কয়েকগুলি অঞ্চলেও শতকরা ৩০ ভাগ মুসলমান ভোটদাতা রয়েছেন।

এককভাবে অবশ্য মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী বিধানসভা কেন্দ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ নন। তবে ভোটের রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, প্রায় আশীটি বিধানসভা কেন্দ্র আছে যেখানে মুসলমান ভোট মোট ভোটের শতকরা বিশ ভাগের বেশী। তাঁদের হিসাব, ওইসব কেন্দ্রে যে দল এই ভোটটা সংগ্রহ করতে পারবেন তাঁর প্রার্থীই জিতবেন। তাই এই ভোটটা সংগ্রহ করার জন্য সব দলই উঠে পড়ে লেগেছেন।

সকলেরই চেষ্টা কীভাবে অধিকাংশ মুসলমান ভোটটা সংগ্রহ করা যায়। সকলেই প্রধানত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে মুসলমান ভোটদাতাদের দেখেন এবং সেইভাবেই তাঁদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। সকলেরই মনোগত বাসনা, মুসলমানরা যেন তাঁর দিকেই ভোট দিতে আসেন। সকলেই মনে করেন, মুসলমানরা জোটবদ্ধভাবে ভোট দেন; তাই সবাই মুসলমান ভোটদাতাদের কাছে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এগিয়ে যান। একজন মুসলমান ভোটদাতাকে তাঁরা সাধারণ ভোটদাতা হিসাবে দেখেন না। গরীব বড়লোকের ভাগাভাগিও সেখানে প্রাধান্য পায় না। সেখানে প্রাধান্য পায় ধর্মের প্রশ্ন। তাঁকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা চলে তিনি মুসলমান এবং সেই হিসাবেই তাঁর একটা বিশেষ কর্তব্য আছে। কারণ মুসলমান বলেই এখানে তাঁর কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে।

গোড়া থেকেই পশ্চিম বাঙলার মুসলমান ভোটদাতাদের এইভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমন একটা বিষাক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেই রেখেছিল। তাই নানা সময় নানা জন অতি সহজেই মুসলমানদের শুধু মুসলমান হিসাবে ভাবতেই "উদ্বুদ্ধ" করতে পেরেছেন।

দেশ বিভাগের পর যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেন তখন পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মুসলিম লীগ পান্ডা কংগ্রেসে ঢুকে গেলেন। নির্বাচনেও তাঁরা অনেকে টিকিট পেলেন। তাঁরা অনেকে জিতলেনও এবং কেউ কেউ মন্ত্রীও হলেন। সেইসব প্রাক্তন লীগ পান্ডা এবং কেক পার্টি মুসলমান কংগ্রেসী নেতা সাধারণ মুসলমানদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে কংগ্রেসের অর্থাৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের সঙ্গে থাকাই মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল। তাঁর তাতে অনেকটা সফলও হলেন। ১৯৫২, ৫৭ এবং ৬২ সনের পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচনে সাধারণভাবে রাজ্যের মুসলমান ভোটদাতারা কংগ্রেসকেই সমর্থন করলেন।

তারপরই এল পরিবর্তন। ৬৭ সনের নির্বাচনে মুসলমান ভোটদাতারা অনেকেই কংগ্রেসের দিক থেকে সরে গেলেন। ভারত-পাক সীমান্ত সংঘর্ষের সময় ভারতরক্ষা আইনে ব্যাপক গ্রেপ্তার এবং চব্বিশ পরগণার কতকগুলি দাঙ্গার পটভূমিকায় কিছু কংগ্রেসত্যাগী অকংগ্রেসী মুসলমান নেতা সাধারণ মুসলমান ভোটদাতাদের অতি সহজেই বোঝাতে পারলেন যে কংগ্রেস ঘোরতর মুসলমান বিরোধী, তাই ওই দলকে আর ভোট দেওয়া উচিত নয়। চলল প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক প্রচার। বলা হল, অ-কংগ্রেসী সরকার এলেই মুসলমানদের লাভ হবে, তাদের ওপর সুবিচার হবে। সেই প্রচার সফলও হল। মুসলমানরা সেবার অধিকাংশই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন।

১৯৬৯ সনের নির্বাচনটা হল একেবারে সরাসরি নির্বাচন—একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে যুক্তফ্রণ্ট। যুক্তফ্রণ্ট নেতারা নানা মুসলমান নেতার সহযোগিতায় সাধারণ মুসলমান ভোটদাতাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার নানাভাবে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করেছে। সুতরাং তাদেরই ভোট দেওয়া উচিত। এই প্রচারও বহুলাংশে সফল হল।

কিন্তু ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছে নতুন রাজনীতি। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনে অ-কংগ্রেসী নেতাদের প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক প্রচার একটা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক দলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছিল। সেই ভিত্তি প্রস্তরের ওপরই ১৯৬৮ সনে গড়ে উঠল প্রোগ্রেসিভ মোসলেম লীগ। ১৯৬৯ সনেই তাঁরা নির্বাচনে নামলেন।

নির্বাচনে অন[illegible] ... নবজাতকও সেই "সম্পূর্ণ পোলারিজেশনের নির্বাচনে" যুক্তফ্রণ্ট এবং কংগ্রেস প্রার্থীদের হারিয়ে তিনটি কেন্দ্রে জিতলেন। হুমায়ুন কবির, জাহাঙ্গীর কবির ভেসে গেলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত নেতা সেকেন্দার আলি মোল্লার দল অন্তত তিনটি আসনে তো জিতলেন।

*

এবার সেই প্রোগ্রেসিভ মোসলেম লীগ সর্বভারতীয় মোসলেম লীগে মিশে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে তাঁরাই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মোসলেম লীগের শাখা। তাঁরা এবার ব্যাপকভাবে আসরে অবতীর্ণ হতে চাইছেন।

বিভিন্ন দল তাঁদের সম্পর্কে আগ্রহী। এর মধ্যে আবার আট পারটি জোটের নেতারা তাঁদের সঙ্গে জোট বাঁধার এবং নির্বাচনী সমঝোতা করার আলোচনাও শুরু করে দিয়েছেন। জোটের ছোট ছোট দু একটি দল অবশ্য এই বলে আপত্তি জানিয়েছেন যে, লীগের মত সাম্প্রদায়িক দলকে সঙ্গে নেওয়া অত্যন্ত অন্যায় ও ভুল হবে। কিন্তু বড় তিন পারটি অর্থাৎ সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি এই সমঝোতায় অত্যন্ত আগ্রহী। কারণ তাঁরা মনে করছেন তাহলে মুসলমান ভোটের একটা বড় অংশ তাঁদের সঙ্গে আসবে।

লীগও এই সমঝোতায় আগ্রহী। কারণ তাহলে তাঁরা কৌলিন্য অর্জন করতে পারবেন। দেখাতে পারবেন যে তাঁরা অচ্ছুৎ সাম্প্রদায়িক দল নন।

কী বিচিত্র রাজনীতি দেখুন। যে সি পি আই গোটা দেশে "সাম্প্রদায়িকতাকে ঠেকাবো" বলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরাই লীগের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী। তাঁরা কেরলেও তাই করেছেন। যে সব ওয়ার্ড ব্লকের প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং প্রগতি নিয়ে এত বিচার, যাঁরা নব কংগ্রেসকেও অচ্ছুৎ বলে মনে করেন তাঁরাও ভোটের লোভে মোসলেম লীগকে সঙ্গী করতে চান! যে এস ইউ সি সব কিছু মার্কসবাদের কষ্ঠি-পাথরে ঘষে নিতে চান তাঁরাও ভোট পাওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে হাত মেলাতে উৎসাহী।

এ তো গেল একদিকের রাজনীতি। অন্যদিকে দেখুন সি পি এম এবং নব কংগ্রেসে বদরুদ্দোজা সাহেবের দলকে নিয়ে কি প্রচণ্ড কাড়াকাড়ি। এই দুই দল এখনও ঠিক মোসলেম লীগ নামধারী দলকে প্রকাশ্যে সঙ্গে নিতে সাহস পাচ্ছেন না। কিন্তু মুসলমান ভোটকে উত্তেজিত করার জন্য মুসলমান ভোটদাতাদের মুসলমানত্বে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য মাইনরিটি লীগকে এবং তার নেতা বদরুদ্দোজা সাহেবকে চাইই। তাঁদের নিজ নিজ দলে যে দু পাঁচজন মুসলমান নেতা নেই তেমন নয়, কিন্তু তাতে হবে না। বদরুদ্দোজাকে

চাই। কারণ তাঁরা মনে করেন বদরুদ্দোজা সাহেবই মুসলমান ভোটদাতাদের মুসলমানত্বে সুড়সুড়ি দিতে পারবেন।

সেইজন্যই বেশ কিছুদিন থেকেই বদরুদ্দোজাকে নিয়ে নব কংগ্রেসের এবং সি পি এমের মধ্যে একটা রেস চলছে। বদরুদ্দোজা সাহেব প্রথম প্রথম নব কংগ্রেসের দিকেই বেশী ঝুঁকেছিলেন। তাঁদের নেতাদের সঙ্গে অনেকগুলি বৈঠকও করেছিলেন। কথাবার্তাও অনেকটা এগিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নব কংগ্রেস সি পি এমের কাছে হেরে গেলেন। সি পি এমের দিল্লি অপারেটিভরা জিতে গিয়েছেন। বদরুদ্দোজা সাহেব প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, তিনি সি পি এমের সঙ্গেই চলবেন। আরও জানা গেল, তিনি সি পি এম এবং আর এস পির মধ্যে একটা সমঝোতারও চেষ্টা করবেন।

*

যাঁরা এইভাবে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক ভোটা-ভুটির পথে এগোচ্ছেন তাঁরা সবাই ভুলে যাচ্ছেন এর পরিণতি কী হতে পারে। ভুলে যাচ্ছেন, এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও পশ্চিমবঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই। আজ হয়ত সেটা তাঁরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন না, একদিন দেখতে পাবেন। এবং যেদিন দেখতে পাবেন সেদিন শত চিৎকার করেও সামলাতে পারবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ দেশ বিভাগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। পশ্চিম-বঙ্গকে পাকিস্তান সৃষ্টির মাশুল সবচেয়ে বেশী দিতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আশী লক্ষেরও বেশী উদ্বাস্তু আছেন। এখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তা ভয়াবহ রূপ নিতে বাধ্য।

এবং সেটা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরও স্বার্থের বিরুদ্ধেই যাবে। সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে সেটা রাজ্যের সকলেরই ক্ষতি করবে। কিন্তু মুসলমানদেরই ক্ষতি হবে বেশী। কারণ তখন অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের শুধু মুসলমান হিসাবেই দেখবেন।

হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়—মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখা উচিত। সব সমস্যাকে মানুষের সমস্যা হিসাবেই বিচার করা উচিত। সব ভোটদাতাকে স্রেফ ভোটদাতা হিসাবে দেখাই সেফ। তা না করে ভোটলোভাতুর রাজনৈতিক দল-গুলি যতই সাম্প্রদায়িকতায় সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট সংগ্রহ করতে যাবেন ততই রাজ্যের এবং রাজ্যের অধিবাসীদের বিপদ ডেকে আনবেন।

১৬-১-৭১।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

ভাল্লুকের ভয়ে

গদিতে এসেই বিলেতের টোরি অর্থাৎ রক্ষণশীল সরকার যে ঠিক করলেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে যুদ্ধের সামগ্রী বিক্রী করবেন, তার কারণ হিসেবে তাঁরা দেখিয়েছেন রুশী নৌবহরের ভারত মহাসাগরে আবির্ভাব। যে সব সামরিক জিনিসপত্র বিলেত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানি করা হবে তাদের মধ্যে আছে ডুবোজাহাজ খুঁজে বের করতে পারে এমন ধরনের বিমান আর জলের ওপরে ভেসে যাওয়া জাহাজ। ডুবোজাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকাকে দেওয়ার কোনও ইচ্ছে নাকি ব্রিটিশ সরকারের নেই—যেটুকু না হলে নয় সেটুকুই নাকি তাঁরা দিচ্ছেন—এ কথাই বলা হয়েছে তাঁদের পক্ষ থেকে। আসল কারণ অবশ্য ডুবোজাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকাকে বেচা হচ্ছে না দরকার নেই বলে। ডুবোজাহাজ সে দেশ পাচ্ছে ফ্রান্সের কাছ থেকে, বোমারু বিমান কেনার কথাবার্তাও ফ্রান্সের সঙ্গেই চলছে। ওসব জিনিস ফরাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে সরবরাহ যদি না করতো কিংবা না করে তা হলে ব্রিটেন তাদের চাহিদা মেটাতে দ্বিধা করতো বলে মনে হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবিদ্বেষী বলে আর সকলে যত ঘেন্নাই তাকে করুক ব্রিটেন করে না।

হীথ সরকারের কাল হয়েছে তাঁদের ভাল্লুকের ভয়। রুশ ভাল্লুক দুনিয়ার দরিয়াতে কখন কোথায় কী করে বসে সেই আতঙ্কেই তাঁরা অস্থির। তাই তাকে ঠেকাবার জন্যে দ্বারস্থ হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার। সুয়েজ এখন বন্ধ। ইউরোপ থেকে জলপথে এশিয়ায় আসতে হলে পাড়ি দিতে হচ্ছে ঘুরপথে, উত্তমাশা অন্তরীপের পাশ দিয়ে। রুশ জাহাজেরও ভারত মহাসাগরের আসার সোজা পথ ওইটেই। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যদি চুক্তি করা যায় তা হলে অনায়াসে সে দেশ থেকে গোয়েন্দাগিরি করা চলবে রুশ জাহাজের ওপর। সে ব্যবস্থাই হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। দু পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া যদি হয়ে যায় তা হলে দক্ষিণ আফ্রিকার তিনচার জায়গা থেকে খুব উঁচু দরের রেডার ব্যবহার করে দক্ষিণ আটলান্টিক আর ভারত মহাসাগরের প্রত্যেকটি জাহাজের ওপর নজর রাখা চলবে। তবে খালি নজর রাখলেই তো হবে না, দরকার হলে শত্রু জাহাজকে বাধা দেওয়াও তো চাই। তার জন্যে যুদ্ধের সরঞ্জামের বদলে ব্রিটেনকে একটা নৌঘাঁটি গড়তে দেবে দক্ষিণ আফ্রিকার সাইমনস্-টাউনে।

কিন্তু রুশ ভাল্লুককে ব্রিটিশ সিংহের এত ভয় কেন? আগে তো রুশদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতো না ইংরেজরা দুনিয়ার কোনও দরিয়ায়। সেদিনও ছিল বিশ্বের সেরা নৌশক্তি ব্রিটেন। এখনও তো নৌবাহিনীতে সে বিশেষ কমতি যায় না। তার বিশাল সাম্রাজ্য আজ আর নেই, দেশে দেশে জমিদারী পাহারা দেওয়ার জন্যে জঙ্গী জাহাজের এ মহাসমুদ্র থেকে ও মহাসমুদ্রে টহল দেওয়ার দরকারও ফুরিয়েছে। তামাম দুনিয়া জুড়ে ঘাঁটি রাখার আর কোনও মানে হয় না। তাই আস্তে আস্তে সে সব ঘাঁটি গুটিয়ে নিতে হচ্ছে ব্রিটেনকে। একালে অত সব ঘাঁটি রাখার ঝক্কিও ঢের। খরচপত্র তো আছেই, আর আছে বিস্তর ঝামেলা। নিজেদের দেশে অন্য রাষ্ট্রের ঘাঁটি রাখতে দিতে ছোটো বড়ো কোনও জাতই আর রাজী নয়। ব্রিটিশ সিংহকে দায়ে পড়েই লেজ গুটিয়ে সরে পড়তে হচ্ছে নিজের আস্তানায়। তবুও ব্যবসা-বাণিজ্যে তার তো পসার একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। জাহাজ তার আজও বিস্তর আছে, তাদের সবগুলো তো আর সদাগরী জাহাজ নয়।

নেই নেই করেও যে নৌবহর ব্রিটেনের আছে তার ধারে কাছেও বেশীর ভাগ দেশই এখনও পৌঁছুতে পারেনি। ইংরেজদের আছে পাঁচটা বিরাট এয়ারক্রাফট কেরিয়ার, ৬৫টা ডুবোজাহাজ, তিনটে ক্রুজার, ১৫টা ডেস্ট্রয়ার আর ৬৪টা ফ্রিগেট। এ ছাড়া আছে অগুনতি ছোটোখাটো নানা ধরনের টহলদারি আর হানাদার জাহাজ। পারমাণবিক ডুবোজাহাজও ওদের রয়েছে। দেখা যাচ্ছে নৌবহর ব্রিটেনের এখনও ফেলনা নয়। অনেক ঘাঁটি তার হাতছাড়া হয়ে গেলেও যা আছে তা বেশ বেশীই। এদিকে রুশিয়ার নৌবহরও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তার আছে দুটো হেলিকপ্টার কেরিয়ার, গোটা ষোলো ক্রুজার, ৬৫টা পারমাণবিক ডুবো জাহাজ, ৩২০টা মামুলি ডুবোজাহাজ, ৯টা হালকা ক্রুজার, ১০০টা ডেস্ট্রয়ার, ১০০টা এসকর্ট অর্থাৎ পাহারাদার জাহাজ, ৩৫০ মাইনসুইপার, ১৩০টা টহলদার জাহাজ যেগুলো থেকে মিসাইল অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া যায়। আর ছোটোখাটো নানা ধাঁচের জাহাজের তো কথাই নেই। রুশী নৌবহরের শক্তির উৎস হচ্ছে তার ডুবোজাহাজ। তাদের অনেকগুলোই চলে পারমাণবিক শক্তিতে, পারমাণবিক রকেট তাদের প্রধান হাতিয়ার।

আগে রুশীদের এত জাহাজ-ডুবোজাহাজ ছিল না। আর যা ছিল তা রুশ দরিয়ার বাইরে বড় একটা যেত না। ইউরোপে উত্তর মহাসাগর বালটিক সাগর আর কৃষ্ণ সাগরের ঘাঁটিগুলোতে, আর এশিয়াতে দক্ষিণ অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরের ঘাঁটিগুলোতে তাদের ছিল আস্তানা। এখন তারা গণ্ডি কাটিয়ে বাইরে চলে এসেছে আর তাতেই ভয় ঢুকেছে ব্রিটেন আর আমেরিকার মনে। উত্তরে ঠাণ্ডা জল ছেড়ে রুশ নৌবহর এসেছে পূবে-পশ্চিমে-দক্ষিণে গরম জলে। সাত বছর আগে তারা প্রথম ভূমধ্যসাগরে ঢোকে দুদিক থেকে—বালটিক উপকূল থেকে ব্রিটেন পেরিয়ে জিব্রালটার দিয়ে, আর ওডেসা থেকে কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে বসফোরাস দিয়ে। ২৬টা রুশ জাহাজ আর ১২টা ডুবোজাহাজ সেখানে নাকি টহল দিচ্ছে। এর চার বছর পরে ১৯৬৮ সনের মার্চে তারা পৌঁছেছে ভারত মহাসাগরে গোটা আফ্রিকার পশ্চিম পারকে প্রদক্ষিণ করে আটলান্টিক পেরিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। ২১টা জাহাজ ও এলাকায় তাদের টহল দিচ্ছে, সঙ্গে আছে ডুবোজাহাজও। ভ্লাডিভস্টকে রুশীদের যে নৌবহরের ঘাঁটি আছে তাতে রয়েছে ৮০টা মামুলি আর ২৫টা পারমাণবিক ডুবোজাহাজ, বড়ো জাহাজ নানা জাতের আছে ৮৬টা। এ ছাড়া গোটা চার জাহাজ আর গোটা দুই ডুবোজাহাজ আছে আটলান্টিকে কিউবার দরিয়ায়।

রুশী নৌবহরের বাড়বাড়ন্ত দেখে ভয় পেয়েছে একা ব্রিটেন নয়, আমেরিকাও। তার নাগাল পেতে রুশিয়ার ঢের দেরি। কিন্তু মামুলি ডুবোজাহাজ রুশীদেরই বেশী (আমেরিকার ৮৯, রুশীদের ৩২০)। যদিও পারমাণবিক ডুবোজাহাজে আমেরিকা তাদের ওপর টেক্কা দিয়েছে—আমেরিকার ৮৭, রুশীদের ৬৫। কিন্তু যে হারে রুশীরা এগোচ্ছে তাতে আমেরিকানদের ধরে ফেলতে তাদের আর কদ্দিন? সেই জন্যেই কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে ইংরেজদের। সে জ্বর ভাল্লুকের ভয়ে হলেও ভাল্লুক জ্বর ঠিক নয়। কেননা তাড়াতাড়ি সে জ্বর ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। এদ্দিন যে কাজ করে এসেছে এশিয়া-আফ্রিকায় ইংরেজরা ঠিক তেমনই করার সামর্থ্য হয়েছে রুশীদের। যাকে বলা হয় গানবোট ডিপ্লোম্যাসি অর্থাৎ রণতরীর কূটনীতি তা ইচ্ছে করলে রুশীরা দেখাতে পারে। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে কোথাও দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের ঝগড়া [illegible] নিয়ে লড়াই বাধলে সেখানে কাছাকাছি দরিয়ায় গোটা দুই যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে নিজের পেয়ারের দলকে মদত দিতে পারে রুশিয়া—যা ইংরেজ-আমেরিকানরা অনেকবারই করেছে। সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের বৈঠকের সময় রুশ নৌবহর যে সেখানে টহল দিয়ে গেল তা কি নেহাৎ "কারণহীন সুখ"?

কিংকর্তব্য

বনফুল

তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি?
ভাবছ সব বদলে গেছে
এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে
কি করবে ভেবে পাচ্ছ না?
কিন্তু শোন,
চেয়ে দেখ ভাল করে'
বদলায়নি কিচ্ছুই।
রাহাজানি, ছিনতাই
খুন, চুরি-ডাকাতি
আগে যেমন ছিল
এখনও তেমনি আছে।
আগে ছিল ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, বর্গি,
ছিল নীলকর সাহেব
ছিল লালমুখ গোরা
এখনও তারা আছে
চেহারাটা বদলেছে শুধু।
সেকালের কালাপাহাড়রা
দেব-দেবীদের মূর্তি ভেঙেছিল
একালের কালাপাহাড়রা
ভাঙছে প্রণম্যদের মূর্তি।
দেব-দেবীরা লুপ্ত হননি
প্রণম্যরাও হবেন না।
ভয় পাচ্ছ কেন
আমরা যা ছিলাম
ঠিক তাই আছি
বাইরের পোশাকটা বদলেছে খালি।
সেকালে যাদের গায়ে নামাবলী দেখতাম
একালে তাদেরই গায়ে
হয় খদ্দর-গান্ধিটুপি
না হয় হাফশার্ট চোং প্যান্ট,
ভিতরের মাল কিন্তু এক
একটুও বদলায়নি।

কিন্তু এদের নিয়েই তো চলতে হবে
এদের মধ্যেই কাজ করতে হবে
এদের যদি ভয় পাও
বনে যাও তাহলে।
সেকালে আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা
(যাদের অনেকে 'এসকেপিস্ট' বলেন)
তাঁরা বনেই থাকতেন
বনে বসেই প্রস্তুত করতেন সংস্কৃতির পরমান্ন।
বনে যেতে যদি না চাও
কিম্বা যদি বল
বন কোথায়, সবই তো শহর হয়ে গেছে
কিম্বা যাবে,
তাহলে আর এক কাজ করতে পার
এ মহৎ কাজ অনেকে করছেনও।
ঐতিহ্যের আমসত্ত্ব চুষতে চুষতে
তারস্বরে চীৎকার কর
আমরা কি কম?
আমরা হেন ছিলাম,
আমরা তেন ছিলাম,
কি বিরাট আমাদের উত্তরাধিকার।
তা করতে যদি লজ্জা পাও
(বস্তুত লজ্জা পাওয়াই উচিত)
তাহলে সবাই যা করছে তাই কর।
সভা মিছিল আর রাজনীতি!
চেষ্টা কর সংবাদপত্রের শিরোনামায় উঠতে
আর প্রকাশ্যে গলাবাজি করে' যাও
দেশের দুঃখে বুক ফেটে গেল
আর গোপনে গোপনে ঝোল টান
নিজের কোলের দিকে।
কাজের কি অভাব আছে?
ভেবে মরছ কেন!

'আমাদের সমাজেই আমাদের এক মহাশত্রু আছে—landed and commercial aristocracy, বিশেষতঃ landed aristocracy।...... যত দিন যাবে ততই দেখিবে এই "ঘরে শত্রু বিভীষণ" কি ভীষণ অনর্থ ঘটাইবে।"

[সুভাষচন্দ্রের এক অপ্রকাশিত পত্র]

শিবব্রত ঘোষ

এ কথা কোন নকশালপন্থী বা ডান, বাম অথবা বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টির কোন নেতার নয়। এখন যাঁরা বিভিন্ন মার্কায় সর্বহারাদের নেতা বলে পরিচিতি লাভ করেছেন, তাঁদের অনেকেরই এ ধরাধামে আবির্ভাবের পূর্বে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, মাত্র তেইশ বছর বয়সে, তরুণ সুভাষচন্দ্র উপরোক্ত কথাগুলি জানিয়েছিলেন তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে—চিঠিতে। ১৯২০ সালের ১২ই মে তারিখে কেম্ব্রিজ থেকে লেখা প্রবাসী ছাত্রের এ চিঠি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এতে শরৎ-সাহিত্য, সমাজবাদ (Socialism) এবং রাশিয়া সম্পর্কে তরুণ ছাত্র সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত চিন্তার পরিচয় মেলে।

গুরু-বাদ-এরই আরেক রূপ নিয়ে এদেশের রাজনীতিতে গজিয়ে উঠেছিল 'দাদা-বাদ'। তরুণ ও যুবকদের কাছে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দাদারূপে গণ্য হতেন এবং কার্য-কারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ না করে স্বীয় বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে 'দাদাদের' নির্দেশে চলাই ছিল সকল বিপ্লবী সংস্থার কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। হয়তো গোপনীয়তা এবং কঠোর ডিসিপ্লিন্ রক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সে সময়। কিন্তু পরবর্তীকালেও লক্ষ করা যায় যে কোন দলভুক্তির পর থেকেই ছাত্র, তরুণ এবং যুবকদের নিজস্ব সত্তা আর কিছুই থাকে না প্রায়। ভাবনা-চিন্তা, শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষণ সবই হয়ে থাকে কোন না কমিটির নেতাদের কথা মতো। তাঁদের নির্দেশে হয় চলা-ফেরা, মিছিল, সভা, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট। সুভাষচন্দ্রও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র থাকাকালীন কয়েকজন "দাদা" স্থানীয় ছাত্র নেতার সংস্পর্শে যে আসেন নি, অল্প দিনের মধ্যে তাঁদের সংগঠনের একজন বিশিষ্ট কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 'দাদাদের' প্রভাবে তিনি আর সকল কর্মীদের মত মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন নি।

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় এদেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবেই ছিল স্বামী বিবেকানন্দ, জাতীয় কংগ্রেস, মহাত্মা গান্ধী এবং গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব। তরুণ সুভাষচন্দ্র যে সংগঠনের সদস্য ছিলেন, দেশ উদ্ধার ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে তারও ছিল সুনির্দিষ্ট ভাবনা ও পথ। আর ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন স্বামীজীর ভাবশিষ্য। তবুও তিনি একচক্ষু বিশিষ্ট হয়ে পড়েন নি। নিজের দলের এবং নেতাদের আদর্শ ও মত যাই হোক্ না কেন, তরুণ বয়সেই একদিকে যেমন তিনি জগতের অন্য সমস্ত মতবাদ ও চিন্তাধারাগুলো গভীর-দিকে তেমনি ভারতের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের নামে যে ভণ্ডামি ও অনাচার-অবিচার চলে আসছে সেসব নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন তন্ন তন্ন অনুসন্ধান। আগামী দিনের নিরপেক্ষ ইতিহাস অবশ্যই স্বীকার করবে যে, ভারতের কি মতে কি জাতিতে কোন নেতারই উত্তরকালের প্রস্তুতিপর্ব এত অল্প বয়সে শুরু হয়নি।

জ্ঞান ও কর্মের প্রসারে দেশ সেবায় ব্রতী হয়ে এগিয়েছিলেন ছাত্র সুভাষচন্দ্র। যে কোন উপায়ে অন্যায় থেকে জাতিকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর পণ। তা সে অন্যায় বিদেশী আমলাতন্ত্রেরই হোক্, বা রাজা, মহারাজা, জমিদার, ধনিক, বণিক, প্রেমহীন সমাজ বা প্রাণহীন ধর্মেরই হোক্। সেই কারণেই—খোলা মনে পড়াশোনার পর, সমাজবাদ (Socialism) তরুণ সুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন,—'Socialism জিনিসটা জনসাধারণকে শিখাইয়া দেয় তাদের দাবি (rights) কি কি আছে এবং সমাজ কি করিয়া সেই সব দাবি হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করেছে।"

কেম্ব্রিজ।
১২ই মে, ১৯২০

প্রিয়,

কয়েক মেল হইল তোমাকে পত্র দেওয়া হয় নাই—আশা করি আমার অবস্থা বুঝিয়া ক্ষমা করিবে।

তুমি আমার বিবাহের (?) সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছ তজ্জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। এ বিষয়ে একটু কান পাতলা রাখিবে এবং খবর পাইলে আমাকে জানাইবে। অবশ্য বাড়ীতে তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহাতে আমার কিছু এসে যায় না এবং তাহার দ্বারা আমি আবদ্ধ হইব না—তবুও যাহারা শুনিবে তাহাদের উপর খারাপ Effect হইবে, একে ত আমার I.C.S. -এর পড়ার দরুণ আমার উপর কেহ কেহ হয়ত বিশ্বাস হারাইয়াছেন।

যাক্—রাসিয়ান চিন্তা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ—তাহা অনুমোদন করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্স যেরূপ তাহার আদর্শ, চিন্তা এবং কার্যের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিল—সেইরূপ বিংশতি শতাব্দীতে রাসিয়া জগৎকে শিক্ষা দিবে। তবে কথা হচ্ছে এই যে Economics এবং Politics না জানা থাকলে কোন modern problem বুঝিতে পারা যায় না। শরৎ চাটুয্যের বইগুলি অনেক বিষয়ে খুব masterpiece যেমন—মনুষ্য চরিত্রের বিশ্লেষণ, পারিবারিক এবং সাংসারিক জীবনের চিত্র ইত্যাদি। কিন্তু Ibsen -এর নাটক পড়লে যেমন সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়—শরৎবাবুর বইতে তেমন কিছু বোধ হয় নাই। যে বয়য় তাঁর যদি Economics এবং Politics পড়া থাকত—তাহা হইলে তাঁহার Breadth of Vision-টাও বড় হইত—এবং তাঁর বইতে ... Socialism সম্বন্ধে কোন বই লিখিতে পার? বোধ হয় Peoples Book Series-তে একখানা ঐ বিষয়ে আছে। Home Univ. Library Series-এতে ত আছেই—Ramsay Macdonald- এর লেখা। আমার মনে হয় ভারতের উন্নতি জন-

ভাবলে অবাক হতে হয়,—অক্টোবর বিপ্লবের পর তিন বছর পার না হতেই সুভাষচন্দ্র কিভাবে উপলব্ধি করেছিলেন,—"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্স যেরূপ তাহার আদর্শ, চিন্তা এবং কার্যের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিল—সেইরূপ বিংশতি শতাব্দীতে রাশিয়া জগৎকে শিক্ষা দিবে।" আর কিভাবেই বা এত অল্প বয়সে তাঁর মনে হয়েছিল,—"ভারতের উন্নতি জনসাধারণের পরেই ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে কারা; ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও সমাজ বিপ্লবে সেই সব রাজা, জমিদার ও বণিক শ্রেণীর ভূমিকা কি ছিল এবং তাদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল, সব কিছুই অল্প কথায় চমৎকারভাবে বন্ধুর কাছে বিশ্লেষণ করেছিলেন তরুণ ছাত্র।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আজ কোন কোন ...

কিন্তু যে মার্কসবাদ তামাম দুনিয়ার তরুণ ছাত্র ও যুবকদের সর্বাগ্রে আকৃষ্ট করে থাকে, তা তরুণ সুভাষের মনকে দোলা দিতে পারেনি। তাই বন্ধুকে সোসিয়ালিজম্ সম্বন্ধে বলতে গিয়েও মার্কস, এঙ্গেলস, হেগেল বা কম্যুনিজম্ এর কোন উল্লেখ করেন নি এ চিঠিতে।

ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্র যে কেবলমাত্র রাজনীতি চর্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন তা নয়। তিনি স্বদেশ দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের
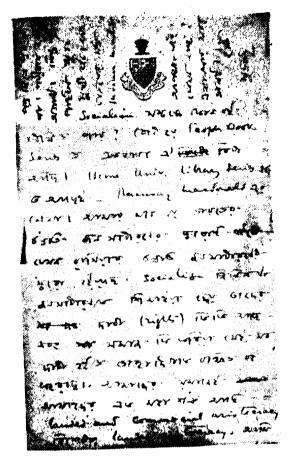
সাধারণের দ্বারাই হইবে যেমন রাসিয়ার উন্নতি জনসাধারণের দ্বারা হইয়াছে। Socialism জিনিসটা জনসাধারণকে শিখাইয়া দেয় তাদের দাবী (rights) কি কি আছে—এবং সমাজ কি করিয়া সেই সব দাবী হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করেছে। আমাদের সমাজেই আমাদের এক মহা শত্রু আছে—landed and commercial aristocracy বিশেষত landed aristocracy। আমি পৃথিবীর কয়েক দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখিলাম তারা সব দেশেই উন্নতির পথে বাধা দিয়েছে। তারা যদি বাধা না দিত তাহা হইলে France-এ French Revolution হইত না কিংবা রাসিয়াতে বলসেভিজম হইত না। ইংলণ্ডে landed aristocracyরা উন্নতির পথে বেশী বাধা দেয় নাই বলে তাহারা আজ পর্যন্ত টেঁকে আছে (France বা রাসিয়াতে নাই) এবং ওদেশের মধ্যে কোন বিপ্লব হয় নাই। যত দিন যাবে তত দেখিবে এই "ঘরে শত্রু বিভীষণ" কী ভীষণ অনর্থ ঘটাইবে। আমাদের এর জন্য প্রস্তুত হইতে হবে। আর এখানকার labour party-র নিকট হইতে কিছু আশা করা বৃথা। ইংলণ্ডে সব partyই সমান—ইতর বিশেষ তফাৎ। "nations by themselves are made"—ইহাই আমাদের একমাত্র motto হইতে পারে।

আজ এই পর্যন্ত থাক। অনেক........পত্র দিতে পারিব না। পরীক্ষা ২রা আগস্ট। কিন্তু পত্র পাইলে খুবই সুখী হইব। আমরা চাতকের মত Indian Mail-এর অপেক্ষা করি। কেমন আছ? এখানকার খবর ভালই। ইতি

সুভাষ

পুনঃ—হেমেন্দ্রকে বলিও যে যুগলদা লণ্ডনে এসেছেন। আমার সংগে এখনও দেখা হয় নাই। আমি জুলাই মাসের গোড়া থেকে লণ্ডনে থাকিব। ওখানকার ঠিকানা— C/o Thos Cook & Son. ইত্যাদি—

সুভাষ

অনুরাগ। পাঠক বললে ভুল হবে—সাহিত্যের রীতিমত গভীরে প্রবেশ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। আর সেজন্যই সম্ভব হয়েছিল শরৎচন্দ্র ও ইবসেনের সাহিত্য নিয়ে তুলনামূলক উদাহরণ স্থাপন করা। আজ শরৎ সাহিত্য নিয়ে অনেক সমালোচক মোটা মোটা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু ১৯২০ সালে যখন শরৎচন্দ্রের যুগান্তকারী উপন্যাসগুলো এদেশের ...... পাচ্ছেন না—আরও কিছু পেতে চাইছেন। তাই একটু সমালোচনার সুরেই লিখেছিলেন,—"শরৎ চাটুয্যের বইগুলি অনেক বিষয়ে mastirpiece যেমন মনুষ্য চরিত্রের বিশ্লেষণ, পারিবারিক এবং সাংসারিক জীবনের চিত্র ইত্যাদি। কিন্তু Ibsen-এর নাটক পড়িলে যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় শরৎ- ... আলোচ্য চিঠিতে* সেকথা জানাতে দ্বিধা করেন নি, কারণ তরুণ হলেও নিজস্ব চিন্তাশক্তি ও যুক্তিতর্কের ওপর তাঁর সেই বয়সেই সম্পূর্ণ আস্থা জন্মে গিয়েছিল।
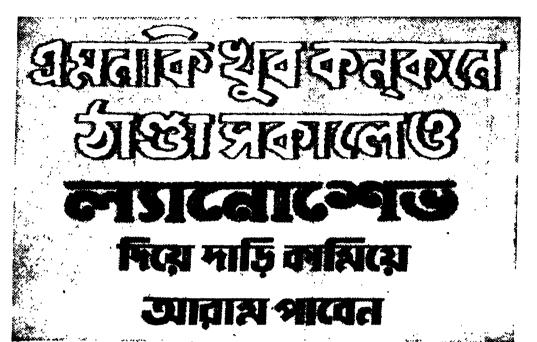
কারণ...
ল্যানোশেভের মধ্যে
জলবিহীন ল্যানোলিন
আপনার ত্বক খুব
স্বাভাবিকভাবে নরম রাখে—
এর প্রচুর ঘন ফেনা
শুকিয়ে যায় না !
আর অ্যান্টিসেপ্টিক
বেঞ্জেথল
থাকায় ল্যানোশেভ
দিয়ে প্রত্যেকবার
আপনি একেবারে
নিরাপদে নিশ্চিন্তে
দাড়ি কামাতে পারবেন।

Lanoshave

Lanoshave
LATHER
SHAVE
CREAM
with antiseptic BENZETHOL

পরিবেশনায়:
র‍্যালিজ ইণ্ডিয়া
লিমিটেড

বিলাসিতার সঙ্গে নিশ্চিন্তে দাড়ি কামাতে **ল্যানোশেভ**

FONSA-CL 6 BN

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ

ঠাকুর-পাহাড়ে

রাঁচির মোরাবাদি পাহাড়ের নাম সকলেই শুনেছেন। স্থানীয় লোকেরা বলেন ঠাকুর-পাহাড়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ বিখ্যাত সুরস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে থাকতেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সন্ন্যাসীর মতো মানুষ। ঠাকুর-পাহাড়ের বাড়ির এক কোণে ছিল তাঁর পিয়ানো আর সেতার। সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে তিনি সেই পিয়ানো বা সেতার বাজাতেন। রবীন্দ্রনাথ যুগিয়েছেন কথা, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দিয়েছেন সুর। এইভাবে অনেক গান একদা তৈরি হয়েছিল।

গত ১৯৬৮ সনের ২রা অক্টোবরের [illegible] রাত্রিশেষে ঠাকুর-পাহাড়ে বসে, এই কথা আমার মনে পড়ল। চেয়ে দেখছি, পূবাকাশে অরুণ আলো; সেই আলোর মধ্যে পশ্চিমাকাশের চাঁদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। বিশ্ব-চরাচর আশ্চর্য এক উজ্জ্বল [illegible] ভোরের মধ্যে জেগে উঠছে।

॥ ২ ॥

পাহাড়-চূড়ায় মন্দির। আমি সেই মন্দিরের দিকে চলেছি। মনে হচ্ছে যেন মেরু-প্রদেশের অরোরা বোরিয়ালিসের রক্ত-রাগের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি আমি। প্রতিটি [illegible] পথের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি গাছ, [illegible] চারপাশের প্রতিটি পাহাড় যেন [illegible] আভায় আপ্লুত হয়ে এক স্বর্গীয় [illegible] লাভ করেছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখছি। কোথাও কোনো কদর্যতা কিংবা [illegible] লেশ নেই।

সূর্যের প্রথম রশ্মি এসে মন্দির-শীর্ষের পতাকাটিকে স্পর্শ করল। তারপর সেই [illegible]

দাঁড়িয়েই সুভাষ এক আদিবাসী জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

আমার এক বন্ধু তখন স্বেচ্ছাসেবক। তাঁর কাছে শুনেছি, আদিবাসীরা সেবারে সুভাষকে একটি লাঠি উপহার দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ওই লাঠি দিয়ে ইংরেজকে

> ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের এই লেখায় একদিকে যেমন দুই বিরাট পুরুষের অন্তরঙ্গ কয়েকটি ছবি পাওয়া যাবে, অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যাবে এমন কিছু তথ্য, যাকে চমকপ্রদ বললেও খুব কমই বলা হয়। সর্বোপরি, এই লেখাটিতে নতুন করে আবার নেতাজী - রহস্যের উপরে আলো ফেলা হয়েছে। লেখাটি মোট চারটি কিস্তিতে সমাপ্ত হবে।

এদেশ থেকে তাড়াতে হবে। আমার 'নেতাজী রহস্য' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরে বন্ধুটি আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, "তোমার কি মনে হয় না যে, নেতাজী আজও জীবিত?"

উত্তরে বলেছি, "কী জানি। আমি নিজে কিছুটা খোঁজখবর করে দেখেছি বটে, কিন্তু খুব বেশী দূর এগোতে পারিনি।"

॥ ৩ ॥

আজ তাঁকে দেখলুম না। মন্দির-

স্মৃতির ঢাকনাটা হঠাৎ কে যেন সরিয়ে দিল; আর শৈশবদিনের ছবিগুলি একে-একে ফুটে উঠতে লাগল আমার চোখের সামনে। যেন একটা প্রপাতের মুখে কেউ পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল। সেই পাথরটা সরে যেতে এখন তোড়ে জল বেরিয়ে আসছে।

১৯২৫-২৬ সনের কথা। শীতকাল। আমার বয়স তখন বছর বারো। মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে আছি, রাত চারটের প্রার্থনানুষ্ঠান শেষ হয়েছে, এমন সময় একদিন ঘুম থেকে জাগিয়ে আমাকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। গম্ভীর গলায় গান্ধীজী জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি প্রার্থনায় যোগ দাও না কেন?"

"ঘুম থেকে উঠতে পারি না যে।"

"এত জোরে ঘণ্টা বাজে, তবু তোমার ঘুম ভাঙে না?"

"ঘণ্টা শুনতে ঝিঁঝিঁর লাগে তখন।"

"কিন্তু প্রার্থনা তো তোমাকে করতেই হবে।"

"কার কাছে প্রার্থনা করব?"

"ভগবানের কাছে।"

"তাঁর চেহারা তো আমি দেখতেই পাইনে। চোখ বুজলেই ঘুম পেয়ে যায়।"

"আমি যেমন করি, তোমাকেও সেইভাবে সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রার্থনা করতে হবে।"

"বাপু, আমি বুঝতে পারছি, আপনার বয়স হয়েছে, তাই ঘুম হয় না।"

"প্রার্থনায় যোগ দেওয়াটা জরুরী ব্যাপার। তা যদি তুমি না দাও, তাহলে এই আশ্রমে থাকা তোমার উচিত হবে না।"

আমার অসন্তোষ গেল না। বাধ্য হয়ে আমাকে শেষ রাত্রির সেই প্রার্থনা-সভায় আসতে হত। ফলে, আমি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলুম।

সৌভাগ্যবশত খুব শিগগিরই সেখান থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনে পালাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলুম আমি। শান্তিনিকেতনেও ছেলে-মেয়েরা খুব ভোরে জাগে। সূর্যোদয়ের আগে গান গেয়ে গেয়ে আশ্রম-পরিক্রমা করে। তাতে কিন্তু আমি রোজই যোগ দিয়েছি, একদিনও আমি অনুপস্থিত থাকিনি।

রবীন্দ্রনাথের ভক্তি-সংগীতের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। সেই গান আমাকে যতটা নাড়া দেয়, ততটা নাড়া অদ্যাবধি আর কিছুই আমাকে দিতে পারেনি।

॥ ৪ ॥

১৯২৮ সাল। ——

উত্তোলনের সময়, একটি রবীন্দ্রসংগীতও গাওয়া হয়েছিল। সুভাষবাবুর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি। তাঁর পরনে দেখলুম স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়কের ইউনিফর্ম। ঘোড়ার উপরে বসে ছিলেন। সেই অবস্থায়, লাগামটাকে খুব শক্ত হাতে ধরে রেখে, ডান হাত তুলে তিনি জাতীয়-পতাকাকে স্যালুট করলেন।

আমার খুব ইচ্ছে হল, আমিও ঠিক ওই-রকম করব। তা আমার দাদা ছিলেন সুভাষ-বাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দাদা গিয়ে সুভাষ-বাবুকে আমার মনের কথা খুলে বলতে তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের শিবিরে যাই। তাই গেলুম। সেখানে তিনি ঘোড়ার থেকে নেমে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। তারপর আমাকে ঘোড়ার উপরে তুলে দিয়ে একটা ঠেলা মেরে বললেন, "এইবারে...গ্যালপ..."

শিবিরের চারদিকে চক্কর দিতে-দিতে দেখতে পেলুম যে, জনতার এক বিশাল দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অমন অভিজ্ঞতা আর কখনও আমার হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের স্যালুট আর রবীন্দ্র-সংগীতের মূর্ছনা, এই দুয়ের সমন্বয়ই আমার কাছে সবচাইতে পবিত্র ও আন্তরিক প্রার্থনার অভিব্যক্তি হয়ে রইল।

॥ ৫ ॥

স্মৃতির অতল থেকে একটার-পর-একটা ছবি সেদিন ভেসে উঠছিল। সেই ছবি-গুলিকে অবশ্য আমার জীবনের ইতিহাস বলে গণ্য করা যায় না। গুরুদেব আমাদের যা শিখিয়েছিলেন, সে-বিষয়ে আমি সচেতন। তিনি বলেছিলেন, "স্মৃতি হচ্ছে এক অদৃশ্য শিল্পীর মৌলিক রচনা। স্মৃতিচিত্রকে তো প্রমাণ হিসেবে কোনো আদালতে পেশ করা যাব না।"

তা না-ই যাক, আমার স্মৃতি সেদিন যে-সব ছবি ফুটিয়েছিল, তার দিকে চোখ রেখে আমি সেদিন বুঝতে পারছিলুম যে, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের কাছে আমরা কতটা ঋণী। আমাদের জীবনকে তাঁরা সুখী করে তুলতে চেয়েছিলেন; আমাদের সংগ্রামকে তাঁরা তাৎপর্য দিয়েছিলেন।

॥ ৬ ॥

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষ সম্পর্কে আমার প্রকৃত অনুভূতি যাতে অন্যের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হয়, তার জন্যে সেটা পরিষ্কার-ভাবে বিবৃত করা দরকার। পকেট থেকে তাই কাগজ আর পেনসিল বার করলুম। কিন্তু লিখতে শুরু করতে-না-করতেই দেখি, আমার সেই আদিবাসী বন্ধুটি এসে হাজির। এসেই সে আমাকে জেরা করতে শুরু করল।

"রবীন্দ্রনাথ আর সুভাষকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, তাই না?"

এবারে আর তার প্রশ্নে আমি বিরক্ত হলুম না। আমার চিত্ত তখন এক আশ্চর্য আনন্দে আপ্লুত হয়ে রয়েছে। বললুম, "আরে এসো, এসো! হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ আর সুভাষ, দুজনের কথাই আজ বলব। তুমি ঠিক বলেছ। দুজনকেই আমি চিনতুম। তার জন্যে আমার গর্বের শেষ নেই।"

আমি যে আলোচনায় উৎসাহী, সেটা বুঝতে পেরে সে বলল, "সুভাষের জীবন তো আশ্চর্য সব অ্যাডভেনচার দিয়ে ভরা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে তেমন কোনও স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল বলে আমার মনে হয় না।"

"তাই কি? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, শিলাইদহে থাকার সময় ভরা-পদ্মা তিনি সাঁতরে পার হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, কলকাতায় আমরা যে গঙ্গা দেখি, পদ্মা তার চাইতে অনেক চওড়া। গঙ্গা পার হবার চাইতে পদ্মা পার হওয়া অনেক বেশী কঠিন। সুভাষ সে-ক্ষেত্রে কিন্তু হাওড়া-ব্রিজের কাছে গঙ্গাও কখনো সাঁতরে পার হননি।"

"রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই পাল্মা পাড়ি দিয়েছিলেন নাকি?"

"শিলাইদহের গ্রামবাসীদের কাছে তিনি নিজেই এ-গল্প অনেকবার করেছেন। গ্রামের মানুষরা অবাক বিস্ময়ে তাঁর গল্প শুনত। রবীন্দ্রনাথের সাহস সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধার কোনো সীমা ছিল না।"

শুনে আমার আদিবাসী বন্ধুটি চুপ করে রইল। বুঝলুম, সে খুব ভাবনায় পড়ে গেছে। ইচ্ছে করেই তাকে আমি বললাম না যে, এই পাল্মা পাড়ি দেবার ব্যাপারটা স্থূল অর্থে সত্য নয়, আসলে এটা 'কল্পনায় পাড়ি', এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে-কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছেন। আদিবাসী বন্ধুটিকে আমি বললুম, "কী জানো, সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে যে-বিপদ থাকে, সেই বিপদ কে কতটা বরণ করেছেন, শুধু সেইটে দিয়ে সবকিছুর বিচার চলে না। নিজের চিত্তের মধ্যে কে কতটা সত্যভাবে, গভীরভাবে ও নিবিড় করে অ্যাডভেঞ্চারকে অনুভব করছেন, এবং সেই অনুভূতিকে অন্যের কাছে বোধগম্য করে তুলতে পারছেন, তাও বিচার করে দেখা চাই। এই দ্বিতীয় ব্যাপারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুভাষকে অতিক্রম করে গেছেন।"

"কিন্তু ওটা তো কল্পনার ব্যাপার। ওর উপরে নির্ভর করে বাস্তব জীবনে আর কতটা এগোনো যায়?"

"ব্যাপারটাকে তুমি কীভাবে দেখছ কিংবা নিচ্ছ, তারই উপরে সেটা নির্ভর করছে। এ-দেশের সংগ্রামী সত্তাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অথবা সুভাষ, কারও ভূমিকারই সঠিক তৎপর্য আজও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। গান্ধীজী আর জওহরলালকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তিপুজোর উন্মাদনা চলে, রবীন্দ্রনাথ আর সুভাষের ভূমিকাকে তা আড়াল করে রেখেছে।"

"রবীন্দ্রনাথ আর সুভাষ যা করেছিলেন, তার তাৎপর্য কি আমাদের চাইতে বেশী মাত্রায় আর-কাউকে অনুপ্রাণিত করেছে?"

"করেছে বই কী। ইউরোপে, বিশেষ করে জার্মানিতে তাই তারা অনেক বেশী সমাদৃত হয়েছিলেন।"

"কই, এমন কথা তো কেউ কখনো বলেনি।"

"সে-দেশে রবীন্দ্রনাথ কিংবা সুভাষের নয়। আসল কথাটা কী জানো, পৃথিবীতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের চাইতে অকৃতজ্ঞ জাতি আর নেই।"

॥ ৩ ॥

খিদে পেয়েছিল। দুজনে তাই বাড়ির পথ ধরলুম। আদিবাসী বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন, "আবার কবে আপনি প্লেনে উঠে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন?"

"নিজের একটা প্লেন, কিংবা প্লেনের একটা টিকিট যোগাড় করতে পারলেই পাড়ি দেব।"

"এবারে যখন দেশে ফিরবেন, তখন নেতাজীকে সঙ্গে নিয়ে ফেরা চাই।"

"নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথ যে অজানা রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছিলেন, তাও নিয়ে আসব। আর তিব্বতের মাটিতে আমি যে বিপুল সোনা পুঁতে রেখেছিলুম, তাও আনব।"

সুভাষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী

আমার উত্তরে যে একটা পরিহাসের ছোঁয়া ছিল, আদিবাসী বন্ধু দিলীপ তাতে দমে গেল। নিজের উক্তির সমর্থনে আমি বললুম, "দ্যাখো ভাই, আমি হচ্ছি মার্কো পোলোর চেলা। তাঁর ঘরানার অভিযাত্রীরা শুধু গল্পই বলতে পারে। তাও আবার কখন পারে জানো? যখন তাদের জেলে পোরা হয়, তখন।"

"কিন্তু সেদিন আপনি যা বললেন, আমাদের কাছে তার গুরুত্ব মোটেই কম নয়।"

"তা হোক্, ব্যাপারটাকে আমি গুছিয়ে বলতে পারব না যে।"

"দাঁড়ান, আপনাকে কোণঠাসা করবার ব্যবস্থা করছি।" এই বলে, একটা বাংলা পত্রিকা খুলে, পত্রিকাটি আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে উত্তেজিত গলায় দিলীপ বলল, "সুধাংশুবাবু, তো দীর্ঘ দিন ধরে গুরুদেবের সেক্রেটারি ছিলেন, তা এই দেখুন, তিনি এখানে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন।"

"প্রবন্ধের বিষয়টা কী?"

"সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। ঠিক এই নামেই আপনার একটা বই লেখা উচিত।"

প্রবন্ধের যে-জায়গায় দিলীপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার উপরে চোখ বোলালুম। লেখা রয়েছে : "সুভাষচন্দ্র বললেন, 'দেখুন সুধাংশুবাবু, আপনি যদি কখনও পাশ্চাত্যে যান, তাহলে বুঝবেন যে, সেখানকার দেশগুলোর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সমাজে রবীন্দ্রনাথের আসন কত উঁচুতে। ও-সব দেশের দু-এক জায়গায় তো আমি সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছি, তখন বুঝতে পেরেছি যে, আমাকে যে বিপুল শ্রদ্ধা দেখানো হচ্ছে, তার সবটাই আমার নিজের কৃতিত্বের গুণে আমি পাচ্ছি না। সেই সবকিছুর পটভূমিকায় যে-সত্যটি পরিস্ফুট হয়েছিল, তা এই যে, মিঃ বোস্ হচ্ছেন কবি টাগোরের স্বদেশবাসী। আমার প্রতি প্রদর্শিত শ্রদ্ধার সেটাও একটা মস্ত কারণ। এর থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, ও-সব দেশে রবীন্দ্রনাথের যে সম্মান, আমার মতো মানুষরাও তার ভাগ পেয়ে যায়।' *

*

প্রবন্ধটির শেষে রবীন্দ্রনাথের আপন

ঘর রঙ করাবেন?
ডুলাক্স পেণ্ট ব্যবহার করুন। ডুলাক্স পেণ্ট অনেক দিন নতুনের মত থাকে। ফিনিশ হয় বেশ ভালো, ধুয়ে পরিষ্কার রাখাও সোজা।
DULUX
SYNTHETIC ENAMEL
CHEMICAL CORPORATION
LIMITED
ICI
DULUX
অল্প রঙে ভালো ফিনিশ
লাগবে কম, খরচও হবে কম।
৯২ রকম রঙের বাহার
অনেক দিন নতুনের মত থাকে।
আপনার কণ্ট্রাক্টরের পরামর্শ নিন
আপনার কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন—এ-ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ। তাঁর পরামর্শ নিন এবং ডুলাক্স শেড কার্ড দেখাতে বলুন।
বছরের পর বছর রঙের বাহার বজায় রাখতে হ'লে চাই— ICI ডুলাক্স পেণ্ট
ডুলাক্স প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা: দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।
ডুলাক্স—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, লণ্ডন-এর ট্রেড মার্ক।
রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী: দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।
ACCI (P) 6220

শুনিয়েছিলেন। হাইনের কথাটা হচ্ছে এই যে, একমাত্র জার্মানরাই কখনও ভারতবর্ষের বাহিঃ-সম্পদ দখল করবার চেষ্টা করেনি; তার বদলে তারা শুধুই ভারতবর্ষের আত্মিক ঐশ্বর্যের সন্ধান করেছে।"

"১৯২১ সন? এতো প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের ঠিক পরের কথা। তাই না?"

"ঠিক বলেছ। আর রবীন্দ্রনাথের বাণী তো আশা জাগায়, তাঁর গান তো মানবিক মিলনের পথের সন্ধান দেয়, তাই পরাজিত, অবমানিত জার্মানি সেবার তাঁর বাণী আর গান শুনে পরম সান্ত্বনা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাদের বলেছিলেন যে, তাঁর পরিবার এক সময় চরম আর্থিক সংকটে পড়েছিল, কিন্তু সেই সংকটই তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তার উন্মোধন ঘটায়। একথা শুনবার পর তাঁর সম্পর্কে জার্মানদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে, পরাজয় ও ক্ষতি তো আর কিছুই নয়, মস্ত একটা পরীক্ষা। মানবাত্মার পরীক্ষা। দৈনন্দিনতার গ্লানি থেকে উর্ধ্বে উঠবার জন্যে মানবাত্মাকে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তবেই সে না বিশ্ব-ইতিহাসকে আপন প্রজ্ঞার দীপ্ত করে তুলতে পারে।"

"জার্মানদের উদ্দেশে আপনি তাঁকে কখনো বক্তৃতা দিতে শুনেছেন?"

"তা শুনেছি বই কী। ১৯৩০ সনের গ্রীষ্মে তিনি ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন সদ্য সেখানে ভর্তি হয়েছি। তিনি সেখানে বক্তৃতা দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তো একটি ইন্দো-জার্মান সেমিনার ছিলই; এবারে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনবার পরে জার্মানরা সেই সেমিনারের বাড়িতে 'ভারতবন্ধু সমিতি' প্রতিষ্ঠা করলেন। তার অনেক বছর বাদে এই 'ভারতবন্ধু সমিতি' থেকেই বেশ-কিছু জার্মান সুভাষচন্দ্র বসুকে অভ্যর্থনা জানান। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার ব্যাপারে নিঃস্বার্থভাবে এবং সর্বপ্রকারে তাঁরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন।

॥ ৩ ॥

কাগজ আর পেনসিল বার করে আবার আমি আমার শৈশব-চিত্রের দিকে তাকিয়ে আছি।

ছেলেবেলার কথা ভাবতে গেলে যে ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এককথায় তা দুঃসহ দারিদ্র্য, হতাশা আর আতঙ্কের ছবি। পান থেকে চুন খসলেই তখন আমাকে মার খেতে হত। এমন কী, একটু যে খেলাধুলো করব, তারও উপায় ছিল না। তৎক্ষণাৎ চাবুক পড়ত আমার পিঠের উপরে। সত্যি বলতে কী, আমার এক-এক সময়ে ভয় হত যে, এইটুকু শরীরে অত মার আমি সইতে পারব না, শৈশবেই আমি বুড়িয়ে যাব। আমাকে রক্ষা করবার মত কেউ ছিল না। দিদি আর মায়ের মৃত্যুর পরে আমি একেবারে ষোল-আনা অসহায় হয়ে পড়লুম।

তার কিছুদিন পরেই মজঃফরপুরের একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মেয়েটির নাম রেবতী। তার মুখেই আমি রবীন্দ্রনাথের গান শুনি। মনে হল এই গান যেন আমার সমস্ত অন্ধকারের উপরে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগিয়ে দিচ্ছে। যেন চারপাশের নিষ্ঠুরতা থেকে এই গানই আমাকে ত্রাণ করল। রেবতী আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, "দ্যাখ, দুঃখ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এক ঋষি থাকেন। মায়ের হাত থেকে ছেলেদের তিনি বাঁচান। তুই যখন আর একটু বড় হবি, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করিস।"

॥ ৪ ॥

আমার বয়স তখনও অল্প। সেই সময়ে আমার এক দাদা আমাকে গয়া-কংগ্রেসে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর একজন ক্যাপটেন। গয়ার কাছেই বুদ্ধগয়া। মাঝখানের কয়েক মাইল পথ হেঁটে পাড়ি দিয়ে আমি বুদ্ধগয়ায় পৌঁছলুম। সেখানে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানালুম যে, দুষ্টু অভিভাবকদের হাত থেকে তিনি যেন আমাকে রক্ষা করেন।

সেদিন সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাসেবক-শিবিরে ফিরে মনে হল, ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত হইনি।

দাদা আমার হাতে একটা ফলের টুকরি তুলে দিয়ে বললেন, কংগ্রেস-সভাপতির শিবিরে সেটা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ছোট্ট সেই টুকরিটার মধ্যে ছিল আঙুর আর আপেল।

কংগ্রেস সভাপতির শিবিরে পৌঁছে একজন হাসিখুশী যুবাপুরুষের দেখা পেলুম। মুখে সস্নেহ হাসি। তাঁর হাতে ফলের টুকরিটা তুলে দিয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় তিনি আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ভাগটা তুমি এর থেকে নিয়ে নিয়েছ তো?"

"না।"

"কেন নাওনি"

"এসব দামী ফল শুধু বড়লোকরাই খেতে পারেন।"

শুনে তিনি সেই ফল দিয়ে আমার পকেটগুলো ভরে দিলেন। তারপর আগের মতই সস্নেহ হেসে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এবারে আমি যেতে পারি।

সেই যুবাপুরুষই হচ্ছেন সুভাষবাবু। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সুভাষবাবু তখন দেশবন্ধুর সেক্রেটারি।

পরবর্তীকালে আমি এলাহাবাদের আনন্দভবনে এবং সবরমতীতে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহাশ্রমে গিয়েছি। জওহরলালজী যে শিশুদের মন খুব ভালই বুঝতেন এবং তাদের খুশী করবার কৌশল জানতেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জওহরলালজীর নিজের এসব দিকে কোনও নজর ছিল না। আর গান্ধীজীর আশ্রমের লোকেরা ছিলেন তেমনই কিপ্টে। বিশেষ করে খাবার ব্যাপারে এই কিপ্টেমি সবাই চোখে পড়ত। গান্ধীজীর জন্য ঝুড়ি-ঝুড়ি কমলালেবু আসত আর আশ্রমের কর্তাব্যক্তিরা সেই কমলালেবুগুলোকে জমিয়ে রাখতেন। শেষ পর্যন্ত তার অনেকটাই হয়ত পচে উঠত, এবং সেগুলোকে তখন ফেলে না-দিয়ে উপায় থাকত না।

এইসব কারণেই মহাত্মাজীর চাইতে গুরুদেবকে আমার বেশী ভাল লাগত। অন্যদিকে সেই কিশোর বয়সে জওহরলালজীর চাইতে সুভাষচন্দ্রের দিকে আমি অনেক বেশী আকৃষ্ট হয়েছি। (ক্রমশ)

• সুধাকান্তবাবুর লেখা বাংলা প্রবন্ধটির খোঁজ আমরা পাইনি। তাই, সংশ্লিষ্ট অংশের মূল বাংলা এখানে দেওয়া গেল না। ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহকৃত ইংরেজী তর্জমাকেই পুনশ্চ বাংলায় অনুবাদ করে দিতে হল। —সম্পাদক, দেশ।

অতুলনীয় পি.সি.সরকার

অজিতকৃষ্ণ বসু

পি সি সরকারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছিল ১৯৪৮ সালে একদিন। সাক্ষাৎ এবং অন্তরঙ্গতা অবশ্য তার অনেক আগেই হয়েছিল, কিন্তু সাক্ষাৎকার সেই প্রথম, এবং কলকাতার ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সচিত্র সাপ্তাহিক 'ওরিয়েণ্ট'-এর জন্য। আমার অগ্রজোপম বন্ধু নারায়ণ আয়ার তখন ওই সাপ্তাহিকটির সম্পাদক, এবং আমি তার নিয়মিত লেখক। আমি আয়ারকে বলেছিলাম, "আমার বন্ধু পি সি সরকার অসাধারণ ম্যাজিশিয়ান। বাংলা দেশে এখন পি সি সরকার বললেই ম্যাজিক বোঝায়, আর ম্যাজিক বললেই পি সি সরকার বোঝায়। আপনার সাপ্তাহিকের একটি সংখ্যার মলাটে সরকারের ছবি ছাপাতে হবে।"

আয়ার তখনও সরকারের ম্যাজিক দেখেন নি, নাম শুনেছেন মাত্র, এবং পরের মুখে ঝাল খাবার পক্ষপাতী তিনি নন। অযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁর সম্পাদিত কাগজে আত্মপ্রচারের সুযোগ দিতেও তিনি রাজি নন। তিনি বললেন, "বন্ধুকে একদিন নিয়ে আসুন, ওঁর ম্যাজিক দেখি, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।"

দিনক্ষণ ঠিক করে সরকারকে নিয়ে গেলাম সম্পাদকের দপ্তরে। দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা সবাই বাঙালী, পি সি সরকারকে এত কাছে পেয়ে তাঁরা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। এক প্যাকেট তাস দিয়ে সরকার অভিমন্যুর মতো সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হয়ে যে অদ্ভুত ম্যাজিক দেখালেন, তা দেখে সবারই তাক লেগে গেল। আমার তাক লাগল সবচেয়ে বেশী, কারণ তিনি যে সব খেলা দেখালেন, তাদের প্রত্যেকটির কৌশল আমার জানা। আমার জানা কৌশলগুলিই সরকার কীভাবে প্রয়োগ করেন, তা লক্ষ করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সরকারের বহু অভ্যাসে অর্জিত অনায়াস দক্ষতা আমার তীক্ষ্ন দৃষ্টিকে বার বার অবলীলাক্রমে পরাজিত করল। যখন আমিই দর্শক তখন নারায়ণ আয়ার আর অন্যান্য দর্শকদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ম্যাজিকের কলাকৌশল সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না। আয়ার তাসগুলো আরেকবার একটি একটি করে পরীক্ষা করলেন, সরকারের হাত দুটি উল্টে পাল্টে দেখলেন, এতগুলি অসম্ভব কি করে সম্ভব হল তার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না।

আয়ার বললেন, "আপনি কি আমাদের এতক্ষণ হিপ্‌নোটাইজ করে চোখে ভুল দেখালেন, মিস্টার সরকার?"

সরকার হেসে বললেন, "না, হিপ্‌নোটাইজ আমি করি নি। তবে একটা কিছুর সাহায্য তো নিশ্চয়ই নিয়েছিলাম। সেটা হিপ্‌নোটিজম নয়, মিসডিরেকশন, যার অর্থ আপনাদের দৃষ্টিকে, মনকে, বুদ্ধিকে বিপথে চালিত করা, বিভ্রান্ত করা। এর ভেতর ভুতুড়ে বা অলৌকিক কিছুই নেই।"

নারায়ণ আয়ার বললেন, "তা জানি বলেই তো আরো বেশী বিস্মিত হচ্ছি। যদি জানি ভূত বা অলৌকিক শক্তিই এই অদ্ভুত ব্যাপারগুলো ঘটাচ্ছে, তা হলে তো আর রহস্য রইল না, ব্যাখ্যা পেয়েই গেলাম। মাথা ঘামাবার পালাও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু যখন নিঃসন্দেহে জানি ফাঁকি কোথাও নিশ্চয়ই আছে, অথচ কোন্ ফাঁকে আপনি আমাদের ফাঁকি দিচ্ছেন, সেটা হাজার চেষ্টা করেও আন্দাজ করতে পারছি না, বিস্ময়ের চমক তো তখনই লাগে।"

সরকার বললেন, "এখানেই আধুনিক ম্যাজিকের মজা। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ, তারা আমাদের কত ভুল ধারণা দিতে পারে, ম্যাজিক তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

ম্যাজিককে 'আর্ট অব ডিসেপ্‌শন' বা ঠকাবার বিদ্যা বলা উচিত নয়; এর শিক্ষাপ্রদ দিকটাই প্রধান।"

আয়ার এককালে কলেজে শিক্ষকগিরি করেছেন, তাই এ কথাটা তাঁর ভাল লাগল। তিনি বললেন, "তা ঠিক। আপনার ম্যাজিক দেখে এটা খুব ভালভাবেই শিখলাম যে, যে তাসটাকে 'নিঃসন্দেহে' হরতনের বিবি দেখলাম, সেটা আসলে ইস্কাপনের টেক্কাও হতে পারে।"

একটু আগেই সরকার একটি তাস আয়ারকে দেখিয়ে তাঁর ঠিক সামনেই টেবিলের ওপর উপুড় করে ফেলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি তাস রাখলাম?"

আয়ার বলেছিলেন—আমরাও হলফ করে তাই বলতাম—তাসটি হরতনের বিবি। কিন্তু তিনি সরকারের অনুরোধে নিজের হাতে তাসটা তুলতেই দেখা গিয়েছিল সেটি ইস্কাপনের টেক্কা!

ম্যাজিক দেখে অভিভূত আয়ার বললেন, "মিস্টার বসু, আপনি ম্যাজিক সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে একটি 'সাক্ষাৎকার' লিখে দিন। আর সেই সঙ্গে দিন সরকারের বিভিন্ন খেলার ফোটোগ্রাফ। কোনো একটি সংখ্যার ঠিক মাঝখানে পাশাপাশি দু পৃষ্ঠা জুড়ে সেই 'সাক্ষাৎকার' আর ছবিগুলো ছাপা হবে।"

পরদিনই আমার আমন্ত্রণে সরকার আমার বাড়িতে এসে একটি ছোট্ট ঘরোয়া বৈঠকে বাড়ির সবাইকে ঘরোয়া ম্যাজিক দেখালেন। ম্যাজিক দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে আর ফাঁকে

অতুলনীয় পি সি সরকার

ফাঁকে সরকার যে সব চমৎকার কথা বললেন, এবং তারপর ম্যাজিক সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে যে আলোচনা হল, তাই থেকে মালমশলা নিয়ে একটি 'সাক্ষাৎকার' লিখে ফেললাম। সরকার সম্বন্ধে ইংরাজীতে সেই আমার প্রথম লেখা।

তার আগে সরকার সম্বন্ধে দুবার লিখেছিলাম বাংলায়, ১৯৪৬ সালে 'দেশ' সাপ্তাহিকে আমার 'লঘু-গুরু' শিরোনাম-যুক্ত সাপ্তাহিক ফীচারে, সংক্ষেপে।

'সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার' লিখে নিয়ে গেলাম সম্পাদক নারায়ণ আয়ারের কাছে। সেটি পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, "আপনার বন্ধু শুধু আশ্চর্য ম্যাজিশিয়ানই নন, তিনি কবি আর দার্শনিকও বটেন। এ ধরনের চিন্তা আমি একজন ম্যাজিশিয়ানের কাছ থেকে আশা করি নি।"

সেই সাক্ষাৎকারে যাদুকর পি সি সরকার নিতান্ত ঘরোয়া ভঙ্গীতে ম্যাজিক দেখাবার সময় খেলাগুলির সঙ্গে বাইবেলের 'জেনেসিস' বা সৃষ্টি-প্রকরণ থেকে কিছু কিছু কাহিনী সুন্দরভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। বাইবেলের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত এক একটি ঘটনা নিয়ে তার সঙ্গে নিজের মন্তব্য যোগ দিয়ে সরকার যা বলেছিলেন, তার শুরু এইরকম:

"সৃষ্টির আদিতে ছিল অন্ধকার, ঘন অন্ধকার। ঈশ্বর আদেশ করলেন আলোর আবির্ভাব হোক। সেই আদেশের যাদুতে সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের বুকে আলো ফুটে উঠল। বিশ্বের সেই হল প্রথম যাদু, আর ঈশ্বরই বিশ্বের প্রথম যাদুকর।"

তারপর একটু ধুলো নিয়ে তা থেকে প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করলেন সেই আদি যাদুকর। (পি সি সরকারের শূন্য হাতে কাল্পনিক ধুলো থেকে আবির্ভূত হয়ে আদমের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল একটি দিয়াশলাই কাঠি!)

কিন্তু ঈশ্বর দেখলেন বেচারা আদম বেজার হয়ে আছে। একা একা তার আর ভালো লাগছে না। তখন করলেন কি? আদমকে তিনি হিপ্‌নোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। সেই হল বিশ্বের প্রথম হিপ্‌নোটিজম্‌, আর ঈশ্বরই হলেন বিশ্বের সর্বপ্রথম হিপ্‌নোটিস্ট।

আদমের সেই ঘুমের সুযোগে তার ওপর বিশ্বের প্রথম সার্জারি করলেন বিশ্বের প্রথম সার্জন ঈশ্বর। তিনি অচেতন আদমের বুক থেকে পাঁজরের একটি হাড় বার করে নিয়ে সেই হাড়টিকেই আদি মানবী ইভ বানিয়ে দিলেন। (ইভের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল আরেকটি দিয়াশলাই কাঠি। একটি কাঠি কি কৌশলে দুটিতে পরিণত করেছিলেন, সেটাই পি সি সরকারের ম্যাজিক।)

'সাক্ষাৎকার'টি ছেপে খুশী হয়ে সম্পাদক নারায়ণ আয়ার বলেছিলেন:

"সরকারের ম্যাজিকে দক্ষতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু শুধুই দক্ষতা থাকলে তো মহৎ শিল্পী হওয়া যায় না। পি সি সরকার শুধু দক্ষ ম্যাজিশিয়ান নন, তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি কবি ও দার্শনিক,

একটি আশ্চর্য সৃজনশীল কল্পনাশক্তি (ক্রিয়েটিভ ইম্যাজিনেশন)। ঐ ছোট্ট খেলাগুলির সঙ্গে উনি কি সুন্দরভাবে বাইবেলের কাহিনীর যোগাযোগ ঘটিয়েছেন! আমাকে তা মুগ্ধ করেছে। উনি কি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন?"

"না। উনি বি এ পড়েছিলেন অঙ্কে অনার্স নিয়ে।" বলেছিলাম আমি। "কিন্তু শুধু সাহিত্য নয়, বহু বিষয়ে উনি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়াশোনা করেন, যদিও তা শুধু ম্যাজিকের জন্যে, ম্যাজিকের কাজে লাগবে বলে। ম্যাজিকই ও'র ধ্যানজ্ঞান, ও'র জীবনের ধ্রুবতারা, উঠতে বসতে খেতে শুতে ম্যাজিকের কথা ভাবেন, হয়তো ঘুমিয়েও ম্যাজিকের স্বপ্ন দেখেন।"

আয়ারকে আরো জানালাম, সরকার ১৯৩৪ সালে বার্মা, শ্যাম (থাইল্যান্ড), সিঙ্গাপুর আর চীন ঘুরে এসেছেন; ১৯৩৭ সালে জাপানে গিয়ে কোবে, ওসাকা আর টোকিও শহরে তাঁর বিখ্যাত এক্স-রে চক্ষু এবং অন্যান্য খেলা দেখিয়ে যাদুকর হিসেবে নাম কিনে এসেছেন; এবার আমেরিকায় ম্যাজিক দেখতে যাবার ইচ্ছা।

ভূতপূর্ব ইংরাজী সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং তৎকালীন বিশিষ্ট সাংবাদিক সম্পাদক নারায়ণ আয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণভাবেই বললেন:

"আই হ্যাভ ফেল্ট হিজ ক্যারিজম্যাটিক পার্সোনালিটি। হি ইজ বর্ন টু বি গ্রেট।" ("আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের অপ্রতিরোধ্য যাদু অনুভব করেছি। ইনি বিরাট পুরুষ হবার জন্যই জন্মেছেন।")

তখন আয়ারের এই ধারণা জেনে খুবই খুশী হয়েছিলাম, কিন্তু পি সি সরকার তখন আমাদের এত বেশী অন্তরঙ্গ, 'কাছের মানুষ', এত বেশী সরল, সহজ, সাদাসিধে, দম্ভহীন, যে তখন বুঝতেই পারিনি তিনি অনতিদূর ভবিষ্যতে যাদুজগতের দিগ্বিজয়ী সম্রাট হবেন।

সেই সালেই (১৯৪৮) ভারতে প্রথম এসেছিলেন আমেরিকার বিশিষ্ট ভূপর্যটক যাদুকর এবং গ্রন্থকার জন বুথ, যিনি পরে লিখেছিলেন, "আমাকে সব চেয়ে বেশী অভিভূত করেছেন তিনজন ভারতীয় পণ্ডিত নেহরু, দেবদাস গান্ধী, এবং যাদুকর পি সি সরকার।"

ভারতীয় যাদুকরদের—বিশেষ করে বোম্বাইতে এ ডি জোসেফ ('দ্য গ্রেট জোসেফ') এবং কলকাতায় পি সি সরকারের কাছ থেকে তিনি যে আতিথেয়তা পেয়েছিলেন তার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ভারতের সেরা ম্যাজিশিয়ানদের ম্যাজিক দেখে তিনি লিখেছিলেন:

"Never have people been kinder in their hospitality. But they were Western-minded, Western-acting magicians. Purely Indian miracles were lacking. I saw no indigenous magic other than the few centuries-old works with which we are all familiar."

(Fabulous Destinations—
MacMillan Co., N.Y.)

ভাবার্থ: "এ'দের আতিথেয়তার তুলনা ছিল না। কিন্তু এ'দের ভাবধারা, ম্যাজিক দেখাবার ভঙ্গী, সবই পাশ্চাত্য। খাঁটি ভারতীয় ভঙ্গীর যাদুক্রীড়ার বড় অভাব দেখলাম। দেখলাম বহু শতাব্দীর পুরোনো বহু পরিচিত কয়েকটি খেলা। ভারতের নিজস্ব যাদু বিশেষ কিছুই দেখলাম না।"

বুথ ভয় করেছিলেন এরূপ অপ্রিয় সত্য বলে তিনি হয়তো তিক্ততার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর ভয় ভেঙে দিয়েছিলেন পি সি সরকার। এ বিষয়ে পরে একটি প্রবন্ধে বুথ লিখেছেন:

"Sorcar proved that he is a big man. One has only to look at the recent history of Indian Magic!"

ভাবার্থ: "সরকার দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষ হিসেবে কত বড়। ভারতীয় যাদুর সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই তা বোঝা যাবে।"

এর পর ভারতীয় যাদুর ইতিহাসে এক প্রত্যাশ্চর্য যুগান্তর এনে দিলেন পি সি সরকার। তাঁর যাদু প্রদর্শনীর রূপ বদলে ফেললেন তিনি; তাতে এমন কিছু রাখলেন না যা ইউরোপ বা আমেরিকার ম্যাজিশিয়ানদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ এক কথায় প্রদর্শনীটিকে ভাবে, ভঙ্গীতে,

১৯৫৪ সনে জাপান ম্যাজিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে পি সি সরকার

চেহারায়, সর্বতোভাবে ভারতীয় করে ফেললেন। পাশ্চাত্ত্য পোশাক ছেড়ে গিয়ে যাদুমঞ্চের জন্য ধরলেন ভারতীয় মহারাজার পোশাক, শিরে মহারাজকীয় উষ্ণীষ, পায়ে নাগরাই। দৃশ্যপট আর পরিবেশ কল্পনা করলেন সম্পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি অনুযায়ী। প্রদর্শনীর নাম দিলেন 'ইন্দ্রজাল'।

বিদেশী বড় বড় খেলা (যাদের ইংরাজী নাম 'ইলিউশন') না রাখলে বৃহদায়তন যাদু প্রদর্শনী অসম্ভব। বিশুদ্ধ ভারতীয় খেলাগুলি বেশীর ভাগই ছোট খেলা, তা দিয়ে বিদেশী যাদুকরদের বৃহৎ প্রদর্শনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো যাবে না। তাই বিদেশী 'ইলিউশন'গুলি তাঁকে 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনীতে রাখতেই হল, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির প্রদর্শনভঙ্গীতে আর পরিবেশে যোগ করে দিলেন নিজস্ব ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, যেন বিদেশী খেলাগুলিই ইন্দ্রজালে ভারতের পি সি সরকারের পরিবেশনে বিদেশীদের চোখে নতুন রূপে ফুটে ওঠে। পূর্ব ও পশ্চিমের অনবদ্য মিলন ঘটল পি সি সরকারের ইন্দ্রজালে। ভারতের যাদু চর্চার ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয়, যুগান্তকারী ঘটনা, কারণ পি সি সরকারের আগে ভারতীয় যাদুকরদের আদর্শ ছিল পাশ্চাত্ত্য বেশে, পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গীতে ম্যাজিক দেখানো। (অবশ্য এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় যাদু-চর্চার প্রাক্-সরকার যুগে ভারত স্বাধীন হয় নি।)

জন যুদ্ধের আগে, ১৯৪৬ সালে আমেরিকার যাদুজগতের তীর্থ শিকাগো শহর থেকে ভারতে এসেছিলেন সেখানকার প্রথম সারির যাদুকর জ্যাক গুইন। তিনি এখানে পি সি সরকারের ম্যাজিক দেখে গিয়ে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত যাদু-পত্রিকা 'স্ফিংক্স'-এ সরকারের প্রশংসা করে তাঁর প্রতি আমেরিকার যাদুজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আন্তর্জাতিক যাদুকর সংঘ (ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিশিয়ান্স) এবং আমেরিকান যাদুকর সমিতির (সোসাইটি অব আমেরিকান ম্যাজিশিয়ান্স) সর্বপ্রথম যৌথ উদ্যোগে শিকাগো শহরে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক যাদুকর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে। বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে সেই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের পি সি সরকার। তার পর কি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত যাদু-সাপ্তাহিক 'আব্রাকাডাব্রা'র সম্পাদক যাদুকর গুডলিফ লিখেছেন :

"I took a party of magicians to the most magic-minded city in the world: Chicago. Hit of the contion, publicity-wise, was the Great

Sorcar, resplendent in his white robes, a striking, distinctive figure who, I recall, made a great impression on me when we appeared together on a TV programme. He did a close-up item."

সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকরবৃন্দ যেখানে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, সেখানে সবার সেরা আকর্ষণ হয়েছিলেন ভারতের পি সি সরকার। গুডলিফ আরো লিখেছেন:

"বর্তমানকালের যাদুজগতের অধিকাংশ দিকপালদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা হয়েছে। সরকারের চইতে মিষ্টি মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। বৃহদায়তন যাদুর ক্ষেত্রে জোরালো বিজ্ঞাপনের ঢাক পিটানো অপরিহার্য। বিজ্ঞাপনের জয়ঢাক ছাড়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীর পক্ষেও সাফল্য অসম্ভব। সরকারের বিজ্ঞাপন দেখলে কারো কারো মনে হতে পারে তিনি ভীষণ দাম্ভিক। কিন্তু আমি দেখেছি মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত সহজ, সরল অমায়িক, নিজেকে যাদুবিদ্যার অন্যতম সেবক মাত্র বলেই মনে করেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর বলে নয়।"

শিকাগো শহরে ১৯৫০ সালে বিশ্বের যাদুকরদের মহাসম্মেলনে জয়মাল্য অর্জন করে ফিরেছিলেন ভারতের যাদুকর পি সি সরকার। সেই থেকেই তাঁর আন্তর্জাতিক জয়যাত্রা শুরু।

শিকাগোতে সরকারকে ভারতীয় মহারাজার বেশে দেখে তাঁকে একজন কৌতুক করে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কোথাকার মহারাজা?" সরকার সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে জবাব দিয়েছিলেন তিনি ম্যাজিকের মহারাজা—মহারাজা অভ ম্যাজিক।

তারপর ১৯৫৭ সালে আমেরিকার হার্টফোর্ড শহরে, আর ১৯৬০ সালে লন্ডন শহরে এবং ১৯৬৪ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে বিশ্ব যাদু সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন পি সি সরকার। আমেরিকার যাদুকর সমাজ সরকারকে ম্যাজিকের মহারাজা বলেই বরণ করে নিয়েছিল, তাঁকে সানন্দ স্বীকৃতি দিয়েছিল 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর' বলে।

কিন্তু এত বড় সম্মানকেও নিজের ব্যক্তিগত সম্মান বলে মনে করেননি পি সি সরকার। তিনি সর্বদাই বলতেন এই জয় এই সম্মান আমার নয়, ভারতীয় যাদুর, ভারতীয় ঐতিহ্যের, ভারতীয় সংস্কৃতির, আমি যার দীন সেবক মাত্র।

ভারতের যাদুকর পি সি সরকার ভারতের বাইরে যেসব দেশে যাদু প্রদর্শন করে ভারতীয় যাদুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এসেছেন তাদের মধ্যে আছে: আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ব্রহ্মদেশ, ইরান, জার্মানী, ফ্রান্স, আফ্রিকা। এদের ভেতর কোনো কোনো দেশে তিনি বহুবার গেছেন এবং সাফল্যের রেকর্ড সৃষ্টি করে এসেছেন।

টোকিওতে বিশিষ্ট যাদুকর, লেখক ও সাংবাদিক গাশো ইশিকাওয়ার সঙ্গে

ভারতীয় যাদুকে তিনি যে উচ্চস্তরে তুলেছেন এবং আন্তর্জাতিক সম্মান এনে দিয়েছেন তার জন্য ভারত সরকার তাঁকে ১৯৬৪ সালে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করে 'পদ্মশ্রী' উপাধিটিকেই সম্মানিত করেছেন।

শুধু যাদু প্রদর্শনে নয়, সাহিত্য রচনাতেও সরকার যে আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার সম্মানে গত বছর একটি বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে অভিনন্দনপত্র দিয়েছেন রবিবাসরের সভ্যবৃন্দ।

১৯৩৭ সালে যৌবনে যে দেশে যাদু দেখিয়ে ভারতের বাইরে প্রথম খ্যাতিমান হয়েছিলেন, সেই জাপানেই পরিণত বয়সে ব্যাধিজর্জর দেহ নিয়ে যাদু দেখাতে গিয়ে আর ভারতে ফিরলেন না বর্তমান পৃথিবীর যাদুসম্রাট। শুধু যাদুকর সমাজেরই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা আছে তাঁদের সবারই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন অতুলনীয় পি সি সরকার। যাদুসম্রাটকে প্রণাম জানিয়ে যাদু সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করে এই স্মৃতি-তর্পণ শেষ করছি:

"ম্যাজিকের আবেদন বিশ্বজনীন, এর বেলায় পূবে পশ্চিমে ভেদ নেই। ম্যাজিক চোখ দিয়ে দেখার ব্যাপার, ভূগোলের বা ভাষার ব্যবধানে কিছু আটকায় না। এক দেশের সংগীত, সাহিত্য, নাটক অন্য দেশে ভাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু ম্যাজিক ভালো হলে তা পৃথিবীর সর্বত্র ভাল লাগবে। করাত দিয়ে কেটে দুই টুকরো

করে একটি মেয়েকে আবার আস্ত বানিয়ে দিলে তা দেখে বোম্বাই বা বস্টনের মানুষ যেমন অবাক হবে, হনলুলু বা নাগাসাকির মানুষও তেমনি।...

'ম্যাজিক মানুষকে এত আকর্ষণ করে কেন? মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে চায় বলে। নিজে তা না করতে পারলেও অন্য কেউ তা করতে পেরেছে দেখলে সে খুশী হয়। মানুষ নানা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন; এই অধীনতার বন্ধন তার ভালো লাগে না, এ থেকে সে মুক্ত হতে চায়, কিন্তু পারে না। যেমন ধরুন মাধ্যাকর্ষণ থেকে আপনার রেহাই নেই। আপনি শূন্যে ভাসবার চেষ্টা করতে গেলেই পড়ে যাবেন। তাই আপনি যখন আমার ইন্দ্রজাল দেখতে এসে দেখবেন আমি একটি মেয়েকে একটি লাঠির ডগায় হাত ঠেকিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে রেখেছি, তখন পি সি সরকার মাধ্যাকর্ষণকে জব্দ করেছে ভেবে আপনি খুশী হবেন। হাওয়া থেকে টাকার পর টাকা ধরতে কে না চায়? কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই যাদুকরকে ওভাবে টাকা ধরে ধরে টিনের পাত্র ভরে ফেলতে দেখে দর্শকরা খুশী হয়, কল্পনায় তার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে।..."

একুশ

গৌরীর যেমন জীবনমরণ সমস্যা রত্নরও তেমনি। প্রতিযোগিতায় বিফল হলে সে কি আর গৌরীর দায়িত্ব বহন করতে পারবে? যদি না জ্যোতিদা সহায় হন। শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় জ্যোতিদার নিজের পায়ের জোর কত।

গৌরীর পরীক্ষা ডিসেম্বরে রত্নর পরীক্ষা জানুয়ারিতে। যে যার পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে থাকে। চিঠিপত্র আপনি কমে আসে। তা ছাড়া রত্ন চায় না যে ওর চিঠির জন্যে গৌরীর মা আবার বিরূপ হন।

"মা আমার একটুও [illegible]" গৌরী আশ্বাস দেয়। "ছেলের উপর ওঁর দৃষ্টি। মায়া পড়ে গেছে। আমার উপরে তো অপার স্নেহ। ব্যাপারটা উনি বাবার কানে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তোলেননি। সেটা আমাদের মুখ চেয়ে। ওঁর হৃদয়টা মাখনের মতো নরম। ওঁর বিবেক কিন্তু ঈশ্বরের মতো নির্মম। উনি বলেন, ভালোবাসায় পাপ নেই, আমরা যদি ভালোবাসি উনি কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমরা যদি নিরাকার প্রেমকে সাকার করতে যাই তা হলে উনি প্রাণপণে বাধা দেবেন, সে বাধা আমাদেরই মঙ্গলের জন্যে।"

ওর মানে প্লেটোনিক প্রেম। রত্ন যে প্রেম মালাদিকে অর্পণ করেছিল। তখন তার ওতে বিশ্বাস ছিল। এখন নেই। এখন ওর আদর্শ বৈষ্ণব প্রেম। "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ মোর।" গৌরী যতদিন অপরের বিবাহিতা স্ত্রী ততদিন রত্ন প্লেটোনিক প্রেমে রাজী। কিন্তু যেদিন সে বন্ধন ছিন্ন হবে সেদিন আর প্লেটোনিক প্রেম নয়। সেদিন বৈষ্ণব প্রেম। তার আগেই একটুখানি ব্যত্যয় ঘটেছে বলে সে লজ্জিত।

"কই, আর কেউ তো লজ্জিত নয়। আমার প্রোপ্রাইটরের কথা বলছি।" গৌরী ওর উত্তরে লেখে। "সুধার সঙ্গে সে ভদ্র-লোক—ভদ্রলোক? —যা করে আসছেন তা কি নিরাকার না [illegible]? তাকে আমি কিছু না হোক একেবারে বলেছি। তার বেলা ওঁর বিবেক অসাড়। জ্যোতি ব্যাখ্যা দেন মাতালদের বিবেক সম্পূর্ণ ভাবে বাঁধা। বাঁকেমাধব যাই করুন সেটা ধর্তব্য নয়। কারণ তাঁর সম্পত্তি আছে ও সে সম্পত্তি স্ত্রীই তো ভোগ করছে ও করবে। সম্পত্তি তাঁর না হয়ে তাঁর স্ত্রীর যদি হতো তাহলে তাঁকে জবাবদিহি করতে হতো বৈকি। ঘরজামাইকে সুরাপান করতে দেখলে কি ক্ষমা করত কেউ? সুরার নেশার মতো সুধার নেশাও ছাড়িয়ে দিত ভাত বন্ধ করে।"

রত্নর অনেক সময় মনে হয় যে গৌরী ওর স্বামীর সঙ্গে সমান সমান হতে চায় বলেই রত্নকে ওর দরকার। যশোবাবুর যেমন সুধা গৌরীর তেমনি রত্ন। তাই যদি হয়ে থাকে তবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটা আসলে স্বামীর মতো স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, স্বামীর হাত থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নয়। একটার সঙ্গে আরেকটার আসমান জমিন ফারাক। গৌরী যদি ওর স্বামীর মতো স্বাধীন হয় তবে রত্নর কাছে ও হবে চিরদিন পরকীয়া। আর যদি স্বামীর হাত থেকে স্বাধীন হয়ে তবে একদিন রত্নর স্বকীয়া।

রত্ন বৈষ্ণব প্রেমে বিশ্বাস করলেও পরকীয়া তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। বৈষ্ণবরা শিউরে ওঠেন যদি কেউ বলে, রাধা হচ্ছেন কৃষ্ণের স্ত্রী। বা কৃষ্ণ হচ্ছেন রাধার স্বামী। রত্ন খুশি হয় যদি কেউ ভাবে, গৌরী আর রত্ন লোকচক্ষে না হলেও ভগবানের চোখে পতি আর পত্নী। পরোক্ষে গৌরীও তো সেটা স্বীকার করছে। যেটি আসছে সেটি নাকি রত্নর মতো দেখতে। এর তাৎপর্য কি এই নয় যে, কল্পলোকে ওরা পতিপত্নী হয়ে গেছে। বাস্তবেও একদিন হবে। ওদের প্রেম তা হলে স্বকীয়ার সঙ্গে স্বকীয়র প্রেম। সাকার প্রেম। সর্বাঙ্গীণ প্রেম। এর নাম পরকীয়া তত্ত্ব নয়, স্বকীয়া তত্ত্ব।

গৌরীর সঙ্গে এই নিয়ে একসময় বোঝাপড়া হবে। এখন নয়। এখন ও বেচারি জঠরযন্ত্রণায় জর্জর। রত্ন যে ঘরে শুত তার পাশের ঘরেই শুত গৌরী। ওর মা শুতেন ওর সঙ্গে। মাঝে মাঝে কান্নার স্বর শোনা যেত। গৌরী কাঁদছে জঠর-যন্ত্রণায় বা তার ভয়ে। মেয়েদের জীবনে ওর মতো সংকট আর নেই। গৌরীকে ও সংকট পার করিয়ে দিতে হবে। তার আগে একটিও কথা না। আর রত্ন নিজেও তো

সঙ্কটারূঢ়। কোথায় একমনে পড়াশুনো করবে! তা নয় গোরীর সঙ্গে বোঝাপড়া। বোঝাপড়া কি তর্কবিতর্ক বিনা হয়? চিঠি-পত্রে তর্কবিতর্ক করবে, না পরীক্ষার সম্ভবপর প্রশ্নপত্রের উত্তর তৈরি করবে? আর পাঁচজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করবে?

কলকাতায় ফিরে গিয়ে রত্ন পরীক্ষাটাকে আর একটু সীরিয়াসভাবে নেয়। পরীক্ষা মানেই বলপরীক্ষা। বলটা শারীরিক নয়, মানসিক। পালোয়ান যেমন কুস্তির দিন বাহুবলের পরীক্ষা দেয় পরীক্ষার্থী তেমনি লেখনীবলের। তার জন্যে প্রস্তুত হতে হয় অতি যত্নে। রত্নর তো রাত্রে ঘুম ভালো হয় না। শুয়ে শুয়েও সে পরীক্ষা দেয়, মনে মনে। তার ফলে দিনের বেলা ঘুম পায়। কিন্তু তা বলে তো সে বিশ্ববিদ্যালয় কামাই করতে পারে না। সেখানে গিয়েও তাকে নিয়মিত ক্লাস করতে হয়। বোঝার উপর শাকের আঁটি। শরীর কতদিন সহ্য করতে পারে!

"ভেবেছিলুম মার মতো শত্রু আর নেই। কেন তিনি আমার হাত পা বেঁধে আমাকে রাক্ষসের কবলে সঁপে দিয়েছিলেন। এখন দেখছি মার মতো মিত্র আর নেই। রাক্ষস তো আমাকে যমের হাতেই তুলে দিচ্ছিল। মা এসে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। এমন মাকে কি ভালো না বেসে পারা যায়? আমার মনে রাগ ছিল, অভিমান ছিল। সেসব কবে জল হয়ে গেছে। দেখছি মার সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব। কত কথা বিশ্বাস করে উনি আমাকে বলেন। তেমনি কত কথা আমিও বলি বিশ্বাস করে। সেদিন তোর উপর অবিচার করতে যাচ্ছিলুম, মানিক। কলকাতা থেকে কেউ একজন আমাকে লিখেছে তুই নাকি মালাদির সঙ্গে ঘন ঘন সিনেমায় যাচ্ছিস। মাকে বলতেই উনি কী বললেন, শুনবি? বললেন, রত্ন কখনো অবিশ্বাসী হবে না। তেমন চেহারাই ওর নয়। আমার মেয়েকে যে ভালোবেসেছে সে কি কখনো আর কারো মেয়েকে ভালো-বাসতে পারে? মালার সঙ্গে ওর সিনেমায় যাওয়া তো ভালোবাসার থেকে নয়। এত পরিশ্রম করছে যে ছেলে তার তো একটু চিত্তবিনোদন চাই। তেমনি মালাও চায় বাড়ির পাঁচিলের বাইরে একটুখানি বেরোনো। ওর মাকে তো আমি চিনি। বিষম সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। তবে রত্ন হলো ওদের আপনার লোক। ওর সঙ্গে যাওয়া সমাজের চোখে পড়বার মতো নয়। বয়সেও ছোট। সম্পর্কেও বাধে।" গোরী লেখে রত্নকে।

মালাদিদের সঙ্গে সুমতি দেবীর চেনা-শোনা অনেকদিনের। এটা জানা ছিল না রত্নর। নইলে গোরী কি ও ব্যাপারটাকে সহজ মনে নিত নাকি? নিজেই সন্দিগ্ধ হতো। রত্ন লেখে, "খবরটা যখন শুনেছিস তখন পুরো খবরটাই বা শুনিস নি কেন? মালাদিকে নিয়ে যখন সিনেমায় যাই তখন প্রত্যেকবারই আরো একজন বা দুজন থাকে। কখনো ওদের বাড়ির। কখনো আমার বান্ধবীগোষ্ঠীর। তা নইলে অনুমতি মেলে না। মালাদি নিজেও কম খুঁতখুঁতে নয়। ও যে আরেকজনের প্রেমে ডুবুডুবু এটা আমাকে জানিয়েছে। কাজেই ওর দিক থেকে আমার বা আমার দিক থেকে ওর লেশমাত্র ভয় নেই। থাকলে ও কখনো আমার সঙ্গে বেরোত না। ওই পচা ডোবাটাতেই পচত।"

রত্নর "বান্ধবীগোষ্ঠী" কথাটা গোরীর গায়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। আসলে ও বলতে চেয়েছিল সহপাঠিনীগোষ্ঠী। কিংবা আলাপিনীগোষ্ঠী। কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে? কারা ওরা? কী কী ওদের নাম? কী পড়ে? কেমন ছাত্রী?

"বিনোদন চাই বলে কি বিনোদিনীও চাই?" খোঁচা দেয় গোরী। "তোর বিনোদিনীরা আমার ননদিনী হবে না, আশা করি।"

কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোরীর অসোয়াস্তি বেড়ে যাচ্ছিল। আর রাগটা গিয়ে পড়ছিল যেমন স্বামীর উপরে একবার তেমনি রত্নর উপরে একবার। তার এই দুর্ভোগের জন্যে যত দোষ যদিও নন্দ ঘোষের অর্থাৎ যশোধরের তবু রত্নও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। গোরী যখন ঘরের কোণে একলাটি কষ্ট পাচ্ছে তখন ও ছেলে কোন মুখে বিনোদিনীদের নিয়ে বিনোদনে বার হয়? এই কি ওর প্রেমের পরিচয়?

মালাদিকে রত্ন বুঝিয়ে বলে যে পরীক্ষার জন্যে ওকে আরো বেশী খাটতে হবে, পড়াশুনায় আরো বেশী মনোনিবেশ করতে হবে। সাত দিনে একবারও সিনেমায় যাওয়া হয়ে উঠবে না। ওর এখন চাই কিছু আদা আর কিছু নুন, তাই খেয়ে লেগে পড়বে। নয়তো নির্ঘাত ব্যর্থ হবে। মালাদি যেন কিছু না মনে করে।

তা না হয় হলো। গোরী কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নয়। ও চায় সঙ্গ। নারীমাত্রই চায় যে তার আসন্ন মাতৃত্বের সময় তার স্বামী তার কাছে থেকে সঙ্গ দেয়, সাহস দেয়, সহানুভূতি যোগায়। যশোধরকে তো ও কাছে ঘেঁষতে দেবে না। তা হলে তার স্থান নেবে কে? কে আবার? ওই যে পরীক্ষা দিচ্ছে, ওই রত্ন। কী করে সেটা সম্ভব! মানুষ কি একই কালে দুই স্থানে উপস্থিত হতে পারে?

গোরী যে বোঝে না তা নয়। কিন্তু ওই সময়টাতে মেয়েরা যুক্তিতর্কের ধার ধারে বলে মনে হয় না। যেটা সম্ভব নয় সেটা কেন সম্ভব হয় না বলে নালিশ করে। গোরীর মা-বাবার সঙ্গে সদ্ভাব থাকলে রত্ন হয়তো রবিবারে রবিবারে ওঁদের ওখানে গিয়ে গোরীর সঙ্গে দেখা করে আসত। সেই হতো তার পক্ষে যথেষ্ট বিনোদন। কিন্তু আর ওমুখো হবে না বলে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওঁদেরও তেমনি কঠিন প্রতিজ্ঞা যে গোরীকে আর ওর সঙ্গে মিশতে দেওয়া হবে না, যদি না ওদের সম্পর্কটা কথায় ও কাজে ভাই-বোনের সম্পর্ক হয়।

গোরীও হাল ছেড়ে দিয়েছে। কোনো পক্ষের মন বদলাবার এতটুকুও আশা নেই।

হরেনবাবুও তাঁর ছেলেকে ভালোবাসছিলেন, সে ভালোবাসাও গৌরীর কাছে পৌঁছেছিল। গৌরীর দিকে প্রসারিত হচ্ছিল। ওঁরাও একটি ত্রয়ী। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান।

রঞ্জর হুঁশ ছিল না যে শিশুর স্বার্থে পরিকল্পনায় ইতরবিশেষ হতে পারে। ফেব্রুয়ারির সেই নির্দিষ্ট তারিখটির জন্যে সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। তার আগে জ্যোতিদার বম্বে যাত্রা। একটির সঙ্গে আরেকটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

জ্যোতিদা কিন্তু নীরব। না লেখে চিঠিপত্র, না করে দেখাসাক্ষাৎ। মাঝে মাঝে কলকাতা বেড়িয়ে যায়। কিন্তু রঞ্জকে খবর করতে চায় না। ওর যে সামনেই পরীক্ষা।

পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসতে লাগল রঞ্জর উত্তেজনাও ততই বাড়তে থাকল। পরীক্ষা তো নয়, টুর্নামেন্ট। নানা প্রান্ত থেকে আগত শ দুয়েক নাইট। তাদের হাতে তলোয়ার নেই, তার বদলে আছে কলম। সেও কম ধারালো নয়। মসীযুদ্ধে কে যে কাকে হারায় তা আগে থেকে বোঝা যায় না। কাউকে দেখে চেনা যায় না যে এর সঙ্গেই বলপরীক্ষা। দুপক্ষেরও একটা উন্মাদনা আছে। তা সত্ত্বেও পরে কারো সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। ভালো লাগে সম্ভবপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কারো উপর বিদ্বেষ নেই রঞ্জর।

ওদের সঙ্গে তফাত এইখানে যে রঞ্জ হচ্ছে শ্রীমতী পক্ষে একটি লেডীর নাইট। যেমন রানী গুইনেভারের নাইট ছিলেন স্যার ল্যান্সেলট। নাইটকে সংগ্রামের প্রেরণা যোগাতেন তাঁর লেডী। রঞ্জকে প্রেরণা জোগায় তার গৌরী।

একই তত্ত্ব বৈষ্ণবরাও মানে। "শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল। শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল। নইলে পারবে কেন?"

গৌরীও তেমনি শক্তি সঞ্চার করবে। নইলে রঞ্জ তা বইতে পারবে কেন? সমবেত দুশো মুখের দিকে চেয়ে রঞ্জর মুখ শুকিয়ে যায়, বুক দুরু দুরু করে। সে কি এদের সঙ্গে পারবে? না, যদি নিজের শক্তিই সম্বল হয়। হাঁ, যদি গৌরীর শক্তি যোগ দেয়। গৌরীর শক্তি হচ্ছে রাধাশক্তি। সে না থাকলে কৃষ্ণশক্তি যথেষ্ট নয়।

পরীক্ষাকে দূর থেকে যত ভীষণ মনে হয়েছিল আসলে তত ভীষণ নয়। উপরের দিকে যারা স্থান পাবে তারাই একটা সীমা পর্যন্ত নির্বাচিত হবে। তাদের একজন হওয়ার যোগ্যতা কার আছে তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। কারণ দুনম্বর এক নম্বর এদিক ওদিক হলেই পোজিশন ওঠা নামা করে। ক'জন নেওয়া হবে তাও আগে থেকে ঘোষণা করা হয়নি। সংখ্যায় কম হলে আশাও কম, সংখ্যায় বেশী হলে আশাও বেশী। সেইজন্যে এর মধ্যে কতকটা জুয়া খেলার ভাব আছে। তুমি হাজার যোগ্য হলেও তোমার আশা কম যদি মাত্র কয়েকটি চাকরি খালি থাকে।

"কতদূর আশা তা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু সবাই আশা রাখে। এটা ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মতো নয় যে কার কতদূর দৌড় তা আগে থেকেই আন্দাজ করা যায়। বিদ্বানরাই সবচেয়ে বেশী নম্বর পায় তাও নয়। লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটা মৌখিক পরীক্ষাও আছে যাতে পাঁচজন পরীক্ষক যার যা খুশি প্রশ্ন করেন। বিদ্যার পরিমাপ নেবার জন্যে নয়, উপস্থিত-বুদ্ধির, বিচারশক্তির, কাণ্ডজ্ঞান-বোধের, লোকের সঙ্গে ব্যবহারে কৌশলের, আদব কায়দার, চেহারার, চৌকস চরিত্রের পরিচয় নেবার জন্যে। ইচ্ছা করলে একজন পরম বিদ্বানকেও ওঁরা ফেল করিয়ে দিতে পারেন, একজন চালাক চতুর ও স্মার্ট ছেলেকে উপরে তুলে দিতে পারেন। আমি এমন বেপরোয়াভাবে নিজের মতামত জাহির করেছি যে একজন কি দুজন পরীক্ষক আমার উপর চটে গিয়ে থাকবেন। আমি ওঁদের তেমন খাতির করিনি, গৌরী। যা মুখে আসে তাই বলে এসেছি। একটুও ইতস্তত করিনি। আমি যেন একটি নচিকেতা। আমার এক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওঁরা শুধু উত্তর চান না, ওঁরা চান তোমার নিজস্ব উত্তর। তোমার নিজস্ব চিন্তা। এখন ফলাফল আমার হাতে নয়। আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। আরো ভালো করতে পারতুম তা ঠিক। তেমনি আরো খারাপও তো করতে পারতুম। হায় হায় করছি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলে গেছি বলে। জানা উত্তর। দিলে আরো উপরে স্থান পেতে পারতুম। এমনি করেই মানুষের বরাত নির্দিষ্ট হয়ে যায়। একটু ভুলচুকের জন্যেও তাকে বিফল হতে হয়। তা বলে পশ্চাত্তাপ করা চলে না।" রঞ্জ লেখে গৌরীকে।

পশ্চাত্তাপ করা বৃথা। রঞ্জর জীবনদর্শনে পশ্চাত্তাপের ঠাঁই নেই। কিন্তু যেখানে আরেকটি মানুষের বন্ধন মুক্তি সমস্যা সেখানে পশ্চাত্তাপ না করে পারে কি? গৌরী যদি মুক্তি না পায় তবে রঞ্জর ব্যর্থতা কেবল তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, যেমন আর সব পরীক্ষার্থীর বেলা। এর উপর নির্ভর করছে একটি নারীর ভবিষ্যৎ। যে নারী অসহায়ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

তার আর জ্যোতিদার। মাস দুয়েক হলো ওর কোনো চিঠিপত্র নেই। কথা ছিল সাতুই পৌষের পর শান্তিনিকেতন ছেড়ে বম্বে রওনা হবে। সে সময় কলকাতায় দেখা হবে। এলাহাবাদ থেকে কলকাতা ফিরে রঞ্জ জ্যোতিদার অপেক্ষা করে। তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে কুষ্ঠিয়ায় চলে যায়। বিশ্রামের জন্যে।

হঠাৎ একদিন জ্যোতিদার টেলিগ্রাম। কলকাতায় দেখা করতে বলেছে। চিঠি লিখলেই পারত। টেলিগ্রাম কেন? রঞ্জ সাতপাঁচ ভাবে। তৎক্ষণাৎ কলকাতা যাত্রা করে।

"কি হে, মান্ডারিন। পরীক্ষা কেমন দিলে?" জ্যোতিদার জিজ্ঞাসা।

"ভালোই। তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।" রত্নর উত্তর।

"যাক, তোমার কাজ তুমি করেছ। এখন আমার কাজ।" জ্যোতিদা গম্ভীর মুখে বলে। "আমি কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেছি।"

"কী রকম?" রত্ন অবাক হয়।

"কখনো ভাবতেই পারিনি যে কেউ আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে। আমার মতো লোককে। যার কোনো ডিগ্রী নেই, চাকরি নেই, সম্পত্তি যদি থাকে তবে তা পারিবারিক সম্পত্তি। যে জেলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে। দেশের স্বাধীনতাই যার কাছে বড়ো। যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। যে চাষা বললেও চলে। যাকে মজুর বললেও ভুল হয় না।" জ্যোতিদা গদ্‌গদভাবে বলে যায়।

রত্ন সুখী হয়ে বলে, "এর মতো আনন্দের কথা আর কী হতে পারে, তুমি নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। সবাই মিলে বম্বেতে বাস করা যাবে।"

"সেই কথাই তো তোমাকে বলতে এসেছি।" জ্যোতিদা আরো গম্ভীর হয়।

(ক্রমশ)

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের প্রবেশের নতুন প্রয়াস.— ভারতের উপর তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে (European Common Market) বৃটেনের প্রবেশ নিয়ে আবার জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বৃটেনের ইউরোপ সম্পর্কিত মন্ত্রী (Minister for Europe) মিঃ রিপন (Mr. Rippon) ডিসেম্বর মাসে বেলজিয়ামে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অারও ছয়টি সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এই বোঝাপড়ায় আসেন যে আগামী গ্রীষ্মের মধ্যেই বৃটেন সাধারণ বাজারের সদস্য হবে। কিছুদিন আগে লন্ডনে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ইটালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে যে বৈঠক হয়েছে তাতেও আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের যোগদান করা উচিত বলে স্বীকৃত হয়েছে। বৃটেন প্রথমে চেয়েছিল পাঁচ বছরের জন্য বৃটেনকে সময় দেওয়া হবে যাতে বৃটেন তার কৃষি-সামগ্রী এবং শিল্প-জাত সামগ্রীর দাম ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে প্রচলিত দামের পর্যায়ে আনতে পারে এবং সাধারণ বাজারের যৌথ বাজেটে (Common Budget) তার দেয় অর্থ প্রদান করতে পারে; বৃটেন আরও চেয়েছিল যে সাধারণ বাজারের যৌথ বাজেটে বৃটেনের দেয় অংশ শতকরা ১৫ ভাগের বেশি হবে না। সম্প্রতি বৃটেন চেয়েছে যে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে তার দেয় অর্থ প্রদান করতে পাঁচ বছরের জায়গায় আট বছর সময় দিতে হবে। কিন্তু জটিলতার সৃষ্টি করেছে ফ্রান্স। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ফ্রান্সের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্য গলের অনমনীয় দৃঢ়তার ফলে বৃটেনের পক্ষে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। আগে দুইবার বৃটেনের সাধারণ বাজারে প্রবেশের চেষ্টা ফ্রান্স ভেটো (Veto) প্রয়োগ করে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। এবার ফ্রান্স চেয়েছে যে বৃটেন ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে সাধারণ বাজারে প্রবেশ করতে পারে এবং পাঁচ বছরের মধ্যেই বৃটেনকে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের যৌথ তহবিলে তার প্রদেয় অর্থ দিতে শুরু করতে হবে। তাছাড়া ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের কার্যকরী সমিতি স্থির করেছেন যে বৃটেনের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ হবে যৌথ বাজেটের ২১·৫ শতাংশ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত হয়ত তা ২০ শতাংশে দাঁড়াবে। বৃটেন জানিয়েছে যে বৃটেনের প্রদেয় অর্থ যদি ২০ শতাংশই হয় তবে তা পশ্চিম জার্মানীর প্রদেয় অংশ থেকে বেশি হবে; পশ্চিম জার্মানী

এখন সবচেয়ে ধনী দেশ। সুতরাং বৃটেনের দাবি হল, তার প্রদেয় অংশ ২০ শতাংশের এবং জার্মানীর প্রদেয় অংশের কম হওয়া উচিত। পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম এবং ইটালী বৃটেনের প্রদেয় অংশের পরিমাণ আরও একটু কমাতে রাজী হবে বলে মনে হচ্ছে। বৃটেন সাধারণ বাজারের যৌথ তহবিলে যে অর্থ প্রদান করবে তা আসবে ইউরোপের বাইরে অন্যান্য দেশ থেকে সস্তায় খাদ্য আমদানির উপর ধার্য করা শুল্ক থেকে, শিল্প-সামগ্রীর উপর বাণিজ্য শুল্ক থেকে এবং Added Value Tax অনুযায়ী প্রাপ্ত রাজস্বের কিছু অংশ থেকে। ফ্রান্সের দাবি স্বভাবতই বৃটেনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। বৃটেনের গত সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল যে পরাজিত হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের যোগদান করতে সক্ষম না হওয়া। বৃটেনের মন্ত্রী মিঃ রিপন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে এই প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন যে বৃটেনের পক্ষে দেয় অর্থের পরিমাণ যদি তার বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের (Balance of Payments) অনুপাতে বেশি হয় তবে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে বৃটেনের পক্ষে সাধারণ বাজারের যৌথ তহবিলে দেয় অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দিতে রাজী থাকতে হবে। কিন্তু ফ্রান্স তা মেনে নেবে বলে মনে হয় না।

ভারত এবং কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশ বরাবরই ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের যোগদানে আপত্তি জানিয়েছে। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশ স্টার্লিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত। কানাডার কথা স্বতন্ত্র। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বহু দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি বিরাট অংশ এখনও বৃটেনের সঙ্গেই চলছে। বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সদস্য হওয়া মাত্র নিম্নলিখিত দুইটি ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। প্রথমত, যে-সব জিনিস বৃটেন এখন ইউরোপের বাইরে থেকে আমদানি করে সেগুলি যতটা সম্ভব কমিয়ে দিয়ে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের অন্তর্ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলি থেকে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। দ্বিতীয়ত, যে আমদানি ইউরোপের বাইরে থেকে না করলেই নয়, তার উপর শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। তার ফলে উন্নতি-কামী দেশগুলি (যারা বৃটেনে কাঁচামাল অথবা বিভিন্ন সামগ্রী রপ্তানি করে থাকে) বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং রপ্তানি বাজার হারাবে। বৃটেন থেকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আমদানি করতে গেলেও বেশি শুল্ক দিতে হবে। আজ হোক আর কালই হোক,—একদিন বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করবেই। ভারত এবং কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশ আপত্তি করলেও বৃটেনের তা মেনে চলার কোন কারণ নেই। সুতরাং ভারতকে এখন থেকেই এমন কয়েকটি ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয়। অবশ্য ক্ষতি কিছু হবেই,—আর তার পরিমাণ যতটা সম্ভব কমাবার চেষ্টা ভারতকে করতে হবে। ভারতের পক্ষে একটি সন্তোষজনক অবস্থা হল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে বৃটেন ছাড়া অন্যান্য দেশের অংশ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। বৃটেনে ভারতীয় সামগ্রীর রপ্তানি দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় কিছু কম হয়েছে; তৃতীয় পরিকল্পনার পরে তা আরও একটু কম হয়েছে। অপর-দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশ, পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য-প্রাচ্যে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ও ইরাক, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ভারতের রপ্তানি বাড়ছে। তৃতীয়

পরিকল্পনাকালে ভারতের মোট আমদানির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ২৮·৭ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়েছিল; পূর্ব ইউরোপের অংশ বেড়েছিল ৩·৯ শতাংশ থেকে ১১·১ শতাংশ। বৃটেন থেকে ভারত এখন যে-সব সামগ্রী আমদানি করে সেগুলি অন্যান্য দেশ থেকেও আমদানি করা যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, রপ্তানি নিয়ে। চা-রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত এবং সিংহলের সমস্যা অনেকটা একই প্রকার হবে যদি বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করাতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে ভারত এবং সিংহল চা-রপ্তানির ক্ষেত্রে দাম কতটা বাড়াবে সে সম্পর্কে একটি সমঝোতায় আসতে পারে। পাটজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত এখনও পাকিস্তান থেকে অনেক এগিয়ে আছে। তবুও অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তান এক্ষেত্রে ভারতের বড় প্রতিযোগী হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে বৃটেনে পাট রপ্তানি করা সম্পর্কে কোন সমঝোতায় আসা সম্ভব নয়। ভারতকে এখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির রপ্তানি-বাজার সম্প্রসারিত করতে হবে, বৃটেনের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে এবং একটি (পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে) আফ্রো-এশীয় সাধারণ বাজার গড়ে তোলা যায় কিনা সে চেষ্টা করতে হবে।

পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ

সম্প্রতি পোল্যাণ্ডে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ এবং ছাত্রদের একাংশের যে বিদ্রোহ হয়ে গেল, তার রাজনৈতিক কারণ যাই হোক না কেন, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার গুরুত্ব খুব বেশি। গত ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পোল্যাণ্ডে মূল্যস্তরের পুনর্বিন্যাস করা হয়। তার ফলে রেডিও, টেলিভিশন, ও অন্যান্য সরঞ্জামের দাম কমিয়ে দেওয়া হয়,—অপরদিকে বহু প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে আছে খাদ্য-সামগ্রী, জ্বালানি সামগ্রী প্রভৃতি। এক সপ্তাহের মধ্যেই মাংসের দাম গড়ে শতকরা ১৭·৬ ভাগ বেড়ে যায়; দুধের দাম বেড়ে যায় শতকরা ৮ ভাগ। কয়লার দামও শতকরা ১০ ভাগ বেড়ে যায়। তার ফলে জীবন-ধারণের খরচ অসম্ভব বেড়ে যায়। পোল্যাণ্ডের প্রধান অর্থনৈতিক সচিব (Chief of Economic Affairs) Mr. Boleslaw Jaszczuk-এর হিসাব অনুযায়ী ৩২ মিলিয়ন লোকের প্রত্যেকের জীবন-ধারণের খরচ ১·৫০ ডলার করে বেড়ে যাবে; অর্থাৎ, জীবনধারণের মোট খরচ বেড়ে দাঁড়াবে বাড়তি ৩৬ কোটি [illegible] পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির [illegible] থেকে বলা হয়েছে—[illegible] জিনিসগুলির দাম বেড়ে [illegible] সাধারণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার [illegible] একমাত্র হেতু নয়। [illegible] প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে গেছে [illegible] ভারত সরকার এ বিষয়টির উপর [illegible] দেওয়া উচিত, [illegible] আগামী বছরের বাজেট [illegible] আগে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং বাজেটে কি কি ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয় সেদিকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে অনেকেই তাকিয়ে আছেন। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ না করতে পারলে এবং বেকার সমস্যার মোকাবিলা না করতে পারলে ভারত সরকারের পক্ষেও সাধারণ মানুষের মন থেকে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর করা সম্ভব হবে না।

সুব্রত গুপ্ত

১০

এ[illegible]

[illegible]

'[illegible] খেতে বলেছে?'

'ভদ্রলোক মানুষ, কারো সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেই ওটা খেতে বলে। ওটা ভদ্রতার কথা। বিলিতি নিয়ম।'

'তবে যাচ্ছিস কেন?'

'দরকার আছে।'

তবু তিনি বললেন 'সারাদিন তো [illegible] পরিশ্রম, কাল আবার [illegible]'

'সে তুমি ভেবো না।' ঘন চুল [illegible] আঁচড়ে [illegible] হয়ে বেরিয়ে গেল।

কোথায় গেল? কে ওর [illegible] আজ সারাক্ষণই যেন কেমন উন্মন, [illegible] করলে ভালো করে জবাব দিচ্ছিল না।

বই ভাঁজ করে অঞ্জলি দেবী জানালায় এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। তাঁর কপাল ভালো না, দুঃখের জন্যই জন্মেছেন তিনি, [illegible] এক কোটি লেখা, কে জানে কখন মুছে যায়।

বিচলিত হয়ে তিনি যুক্তকর কপালে ঠেকালেন। ভগবানকে ডাকলেন, বললেন, 'ঈশ্বর, তুমি ওকে নিরাপদে রাখো।'

নেপাল ডাক্তারকে মনে পড়ল, তিনি বলতেন, 'সব বিষয়ে এত শক্ত মন তোমার, শুধু ছেলের বিষয়ে এত বিচলিত কেন?'

অস্বীকার করে কী লাভ, সত্যিই তিনি পুরন্দর বিষয়ে বড় বেশী দুর্বল। কিছুই [illegible] পারেন নি, ওকেও [illegible] এমন বল তাঁর বুকে কোথায়?

দার্জিলিং থাকতে একবার ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়েছিল পুরন্দরের, নেপাল ডাক্তারই চিকিৎসা করেছিলেন, বলেছিলেন, 'এ তুমি কোথায় শুনেছ যে উপোস করলে ভগবান সন্তুষ্ট হন? নিজেকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে তুমি তোমার আত্মাকে বিনষ্ট করছ, অথচ আত্মাই ভগবান।'

সেই সময় পুরো ছত্রিশ ঘণ্টা তিনি জল খেয়ে ছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল, পুরন্দরের জ্বর না ছাড়লে এই অনশনেই প্রাণত্যাগ করবেন।

ডাক্তার হিসেবে হাতযশ ছিল নেপাল সেনের, নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল, শুধু খ্যাপা ছিলেন একটু। আজ এখানে, কাল সেখানে, উপার্জনের যেন কোন তাগিদই ছিল না। কলকাতা থেকেও যে সমস্ত পাট তুলে ছেলেদের সঙ্গে বচসা করে চলে এসেছিলেন দার্জিলিংয়ে, তাও তাঁর খ্যাপামিরই ফল। নিজেই গল্প করতেন, 'স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আমার আর কিছুই ভালো লাগত না। এই দার্জিলিং শহর আমার স্ত্রীর শৈশবের লীলাভূমি, এই শহরেই তিনি বড় হয়েছিলেন, বিয়ে হয়েছিল, মারা গিয়েছিলেন, সেজন্যই এই শহর আমার মন টানলো, আমিও এখানেই মারা যেতে এসেছি। ছেলেদের সঙ্গে তাই নিয়েই মনকষাকষি। তারা আমায় একা থাকতে দিতে চায় না।'

পুরন্দরকে আপ্রাণ যত্নে নেপাল ডাক্তারই সারিয়ে তুলেছিলেন সেবার। ভালোবাসতেন খুব, কত আদর করতেন। এই ডাক্তারের সাহায্যেই পুরন্দর ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই অঞ্জলি দেবীর।

দার্জিলিং যাবার অল্প দিনের মধ্যেই একদিন পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল এঁর সঙ্গে, যেতে যেতে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আরে, দ্বিজেনবাবুর মেয়ে না? তোমার নাম অঞ্জলি না?'

তিনি দোকান থেকে খাবার কিনে ফিরছিলেন, পরিচিত লোক দেখে থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁর আত্মগোপন যে এইভাবে ধরা পড়ে যাবে কে জানত? আর এমন মানুষের কাছে, যিনি তাঁদের নাড়িনক্ষত্র জানেন, বাড়ির উল্টো দিকে যাঁর ডাক্তারখানা, অসুখে বিসুখে সব সময়েই যাঁর গতিবিধি। তাঁর সেই অসুখের সময়ও তো এই ডাক্তারই চিকিৎসা করেছিলেন।

'তুমি এখানে কোথায়?'

'একটা স্কুলে পড়াই, কাকঝোরাতে থাকি।' অঞ্জলি দেবী ঢোক গিললেন।

'তোমার স্বামী এখানে? কী আশ্চর্য! আর আমি জানি না? লোকের মুখে মুখে কত গল্প শুনলাম বিয়ের।'

অঞ্জলি দেবী এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি এবার যাই কাকাবাবু, ইস্কুল আছে।'

'আমিও তো কাকঝোরা যাচ্ছি, আমার রোগী আছে সেখানে। চলো, আলাপ করে আসি জামাইয়ের সঙ্গে। বিয়েতে তো ছিলুম না, জামাই আমার দেখা হয়নি। তার বাপ হল ডাক্তার কুলের মুকুটমণি, আর জামাইও তো দারুণ উপযুক্ত ছেলে—' আপন মনেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। অঞ্জলি চুপ করে থেকে বললো, 'আমার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কী!'

'আপনি চলুন, আমার ঘর দেখে আসবেন আমি একাই আছি।'

এ কথা শুনে এত দমে গেলেন যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বাকস্ফূর্তি হল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন ধীরে ধীরে। পরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, 'ভালো মানুষের ভালো কপাল সহ্য হয় না।'

মানুষটি সত্যি বড় হৃদয়বান ছিলেন সত্যিই উঁচু দরের। দার্জিলিং ত্যাগ করার সময়ে কিন্তু দেখা হল না, খেয়ালি মানুষ, কোথায় চলে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝেই এরকম যেতেন। সাধুসঙ্গ ধরেছিলেন শেষের দিকে।

কিন্তু পুরন্দর আসছে না কেন? ভারি অন্যায়।' এভাবে বিদেশে বিভুঁয়ে—

যদি সেই সময়ে নেপাল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না হত, সারাটা জীবন এক ভুলের বোঝা বয়ে বয়ে কেটে যেত দিন। কী ভয়ঙ্কর! কী ভয়ংকর হত সেই বোঝা।

অথচ সেই ভুলের জনাই তো একদিন সব হারাতে হল? ঘর, সংসার, সম্মান, প্রতিপত্তি —সব, সব।

কিন্তু না, এসব কিছুই তিনি চাননি, তিনি শুধু সুদর্শনকেই চেয়েছিলেন, যার প্রার্থনায় তিনি সত্যই ঐকান্তিক ছিলেন। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত যার জন্য তাঁর

কোনোদিকে তাকাবার সময় ছিল না।

দোষ দেবেন কাকে? সবই অদৃষ্ট! প্রথম থেকেই তাঁর দুরদৃষ্ট তাঁকে শনি হয়ে তাড়া করেছে। নইলে মা-ই বা অকালে মারা যাবে কেন? এবং একথা আজ তিনি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন, ছেলেরা কখনো নিঃস্বার্থ হয়ে ভালবাসতে জানে না। হয়তো বা ভালবাসতেই জানে না। নিজেকে ছাড়া কারো কথাই তারা ভাবে না। ভাবতে শেখে নি। মেয়েদের মত সেই সহজাত সূক্ষ্ম আত্মত্যাগের বৃত্তি দিয়ে তাদের মর্ত্যধামে পাঠাননি বিধাতা। অথবা চিরদিন মেয়েদের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অভ্যাসে ভুলে গেছে সেই ভালবাসা। মায়ের মৃত্যুর পরে নিজের সুখসন্ধানে তাই বাবার ভালবাসাও টুটে পড়েছিল।

সাবর্ণি, তুমিও তোমাকেই ভালবাসতে, শুধু সেই ভালবাসায় ইন্ধন যোগাবার জন্যই তোমার প্রেমিকার প্রয়োজন হয়েছিল, বিয়ে করে স্ত্রীর প্রয়োজন হয়েছিল, যে সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকবে তোমার সুখ-সুবিধের জন্য, সেবাশুশ্রূষার জন্য, সঙ্গ দেবার জন্য, দৈহিক বাসনা মেটাবার জন্য। সব পুরুষের মত, তোমার ভালবাসাও [illegible] ছিল না, মানুষী ছিল না। অন্য পাঁচজনের মত তুমিও মেয়েটিকে [illegible] ভেবেছিলে। অথচ একটি মেয়ে [illegible] ভিন্ন আছে, তোমার [illegible] মেয়েরা বহু [illegible] বেশী উঁচু আসনে বসিয়ে [illegible] শুধু শারীরিক বলে বলীয়ান ছাড়া [illegible] আর কী গুণ আছে পুরুষের?

অথচ পুরুষ ত্যাগী, পুরুষ কর্মী, পুরুষ মহৎ এই চিৎকারের কোনো বিরাম নেই মানুষের সমাজে। কবে কোন্ এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে কার সঙ্গে যেন বেড়াতে গিয়েছিলেন, দরজায় লেখা দেখেছিলেন স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ। সন্ন্যাসীটির জন্য রীতিমত অনুকম্পা বোধ করেছিলেন তিনি। বেচারা! বিড়ালের মৎস্যত্যাগের মত অবস্থা। সন্ন্যাসী হলে হবে কী! স্ত্রীলোক দেখলেই যে খেতে ইচ্ছে করবে?

এই নিয়ে একদিন তর্কও হয়েছিল সতীশদার সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন, চোর আর সাধুর তফাৎটা তো এইখানেই যে, সামনে লোভনীয় জিনিস দেখলেও সাধু নির্লোভ, কিন্তু যে চোর সে চুরি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। যদি কোনো পুরুষ কামিনী ত্যাগ করাটাকেই তার জীবনের মহৎ কর্ম হিসেবে গণ্য করে, তা হলে তার প্রথম শর্ত কি এই হবে না যে, স্ত্রী এবং পুরুষ তার চোখে শুধু মানুষ হিসেবেই গণ্য, স্ত্রী পুরুষ হিসেবে নয়? 'স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ' লিখে কি তিনি এটাই প্রমাণ করেননি যে, দেখলে কিন্তু আমি থাকতে পারব না?'

সতীশদা হেসেছিল, বলেছিল, 'পুরুষের বিরুদ্ধে তোমার আর কী যুক্তি আছে শুনি?'

তিনি বলেছিলেন, 'যুক্তি কেন? আমার তো কোনো বিরোধিতা নেই? যা মনে হল তাই বললাম। তবে পুরুষের কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ নিয়ে এত প্রচারের অর্থটা একটু ভেবে দেখো। যে সত্য কথা বলে তার কি চেঁচিয়ে জানাবার দরকার থাকে কোনো? যার লোভ নেই সে সংসারের মধ্যে বাস করেও লোভহীন। আর যে সচ্চরিত্র সে সহস্র স্ত্রীলোকের সংস্রবেও অবিচলিত। তাই এই সব মার্কা-মারা ত্যাগী পুরুষদের আমি সন্দেহের চোখে দেখি।

'প্রবন্ধ লেখ, প্রবন্ধ লেখ।' সতীশদা ঠাট্টা করে সেই তর্ক সেখানেই শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু তবু তিনি এ কথা না ভেবে পারেন নি, মানুষ তো একদিন স্ত্রীলোকের শরীর বেয়েই জগতে এসেছে? প্রথম নিঃশ্বাস প্রথম খাদ্য সবই তো শিশুর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া, প্রথম নিবাসও মায়ের কোল, প্রথম ভালবাসাও মা। তবে

কেন 'নারী নরকের দ্বার' এই গর্জনে পুরুষকণ্ঠ এমন চিৎকৃত?

সুদর্শন তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমি বুঝিনি তুমিও সেই পুরুষ নামক মনুষ্যের ব্যতিক্রম নও। হ্যাঁ, সেটাই আমার ভুল হয়েছিল।

অবশ্য ভুল না হলেও বা কী হত? জেনে শুনে তিনি কেমন করে প্রবঞ্চনা করতেন তাকে? এটা তো ভুলের কথা নয়, বিবেকের কথা, সততার কথা, মনুষ্যত্বের কথা। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ? ছি।

অঞ্জলি দেবীর চোখ আবার ঘড়ির দিকে গেল, সাড়ে দশ। কী কাণ্ড! এ কি কলকাতা যে যখনই ফিরুক, জানা আছে সে কোথায় আড্ডা দিতে যায় কে তার প্রিয় বন্ধু। সাড়ে দশটা রাত, কিছু রাতও নয় সেখানে। তা বলে এই অচেনা শহর বম্বেতে? এখানে এই তো সে প্রথম এল, পথঘাটও তো চেনে না ভাল করে। তবে সে কোথায় গেল?

ঘরের দরজা খুলে পর্দা সরিয়ে তিনি বাইরে তাকালেন, বাইরে নয়, দু পাশের সারি সারি বন্ধ ঘরের মাঝখানে। আলো-জ্বলা লম্বা গলি চলে গেছে সোজা, তারই এমাথা ওমাথা দেখলেন তিনি, তাঁর চিন্তা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছিল।

এই ছেলে পরশু দিন জাহাজে ভাসবে। ভাবতেই চোখের কোল বেয়ে জল আসে। এই হচ্ছে আজকাল। কিছুতেই সামলাতে পারছেন না নিজেকে। তাঁর পঁচিশ বছর আট মাসের ছেলে, যে ছেলেকে অবলম্বন করে দুঃখের সমুদ্র পার হচ্ছিলেন ধীরে ধীরে, বুক ফেটে যায় তার জন্য। যেদিন ও জন্মাল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেছিলেন, এই আমি তাঁর দেখতে পেলুম। নেপালী ডাক্তার বলেছিলেন, 'আর ভাবনা নেই, তোমার দুঃখহরণ এসে গেছে।'

প্রসব করিয়ে তিনি হাত ধরেছিলেন তখন, মনবাহাদুরের স্ত্রী তাঁকে সাহায্য করছিল, আর মনবাহাদুর ছুটোছুটি করছিল এটা-ওটা আনতে।

সেদিন ওদের ভূতপুজো ছিল, গাঢ় অমাবস্যার রাত, ব্যথা উঠেছিল সকাল থেকেই। তিনি বুঝতে পারেন নি। প্রায় দিন দশেক বাদে কোথা থেকে নেপালী ডাক্তার এসে হাজির। বললেন, 'ভুটান গিয়েছিলুম এক মস্ত বড় সাধু এসেছে সেখানে, একশো তিপ্পান্ন বছর বয়েস।' তারপরই তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী? শরীর খারাপ নাকি? মাথাটাথা ঘোরেনি তো? শুয়ে পড় শুয়ে পড়, এদের ভূতপুজোর ভূত বোধ হয় আজই এসে যাচ্ছে। কী কাণ্ড; সব ছেড়ে ছুড়ে চলে এলাম হিমালয়ে, তা ভগবান এখানেও গেরো পাকিয়ে রাখবেন? তুমি শুয়ে পড়, আমি একটা রুগী দেখার কাজ সেরে আসছি।'

অঞ্জলি দেবী ভয় পেলেন, শুয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি মনবাহাদুরের বউ এসে গেল হাতের কাজ সেরে, হেসে বললো, 'বহুৎ আচ্ছা লেড়কা হোবে তোমহার, আজ দেওতার পুজো আছে।'

সেই দেওতার পুজোর দেওতা তাঁর এই পুরন্দর।

তখন কিন্তু ব্যথায় কাতর হতে হতে তিনি সেই দেওতার কথা ভাবছিলেন না, ভাবছিলেন সুদর্শনকে। বিয়ের মাস তিনেক পরে একদিন সে বলেছিল, 'এই, কোনো ঝামেলার কিন্তু একটু সাবধান হওয়া দরকার।'

না বুঝে তাকিয়ে থেকে অঞ্জলি বলেছিলেন, 'সাবধান! কিসের সাবধান?'

'কিছুর একটুনি ছেলেমেয়ে চাও না?'

'ওমা!' তিনি আরক্ত হয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়েছিলেন, তারপর ভীষণ বোকার মত একটা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, বাচ্চা পেটে এলে মাস গোনে কী করে?'

হো হো করে হেসে উঠেছিল সুদর্শন। অঞ্জলি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

'খুকু, তোমার বয়েস কত?' সুদর্শন গালে গাল ঘষেছিল।

বয়েস যাই থাক, সত্যিই অঞ্জলি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাঁর বিমাতার বছর বছর বাচ্চা হয়েছে বটে—কিন্তু কী করে তিনি মাস গুনে ঠিক রেখেছেন এটা তখন ভাবেননি, যদিও ভাবা উচিত ছিল। এ কৌতূহল একজন মেয়ে হিসেবে তাঁর স্বাভাবিক ছিল।

বোধ হয় যে বয়েসে কৌতূহল সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, সর্বত্রগামী হতে চায়, সেই বয়েসটা দুঃখের ভারে এমন নিপীড়িত ছিল [illegible] মনগত পাপক্ষয় ছাড়া তাঁর চেষ্টা [illegible] কোনোদিকে ধাবিত হয়নি। মেয়ে বন্ধুদের মধ্যেও এমন কেউ ঘনিষ্ঠ ছিল না যার সঙ্গে এই ধরনের কোনো আলোচনার প্রশ্ন ওঠে। তাছাড়া এই শিশু জন্মানো ব্যাপারটার উপরই হয়ত মনের অবচেতনে একটা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছিল। [illegible] গর্ভে বাবা কী ভাবে বীজ [illegible] করছেন, এটা জেনে থেকে [illegible] অবস্থাকর একটা বিতৃষ্ণার ভুগছিলেন।

তাই হয়ত এই দরজাটা একেবারে বন্ধ রেখেছিলেন।

যে কারণেই হোক, তার এই [illegible] সারল্য সুদর্শনের কাছে তখন খুবই [illegible] মনে হয়েছিল, আদরে প্রেমে ভরে দিয়ে [illegible] ছড়া বানাল 'খুকুরানী [illegible]—[illegible] কথা কী? যে শুনবে সেই [illegible] নাকানি, দুই চোখে সে [illegible] গালে আঙুলিয়ে ধরল, কেন? ভালো হয় [illegible] কথাটা?'

'বাজে।'

'বাজে? তা হোক গে, [illegible] মুখ ডুবিয়ে সে বাঁচিয়েছিল। [illegible] তিনি শিহরিত হয়ে বললেন, [illegible] আছে হ্যাঁ এ ভাবেই মাস গুনতে হয় [illegible] মেয়ে। এর চল্লিশ সপ্তাহের মধ্যে [illegible] জন্ম হয়। স্ত্রীকে শিক্ষিত করে [illegible] হাসতে লাগল সুদর্শন, অঞ্জলি লজ্জা [illegible] গেলেন। তাঁর মুখে কোনো কথা সরে [illegible] চেষ্টা করেও স্বামীর আদরের কোনো [illegible] দিতে পারলেন না। ভিতরটা এমন [illegible] করছিল যে মনে হচ্ছিল [illegible] সুদর্শন। তার আলিঙ্গন থেকে [illegible] প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বাথরুমে চলে [illegible] দুই হাতে মুখ ঢেকে কেঁপে কেঁপে [illegible] লাগলেন।

তাঁর এই অদ্ভুত ব্যবহারে অবাক [illegible] সুদর্শন দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বলল, [illegible] কী হল তোমার? অঞ্জু, খোলো [illegible] খোলো। রাগ করলে নাকি? অঞ্জু, অঞ্জু—'

ক্রমশ

'তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না তো? ছোঁবে না তো আমায়?'

'কক্ষনো না। তুই সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকিস। খালি এক মিনিটের জন্যে কেবল। খুলেই আবার পরবি।'

সে ফ্রকটা খোলে। খুলে একটু—'হল ত এবার?'

'বারে! কোথায় হোলো?'

তখন সে ইজেরটাও খুলল আস্তে আস্তে।

কয়েক মুহূর্ত না যেতেই লাজুক চোখে তাকিয়ে বলল—'পরি এবার?'

'পর। সত্যি, তুই ভারী সুন্দর। তোর মতন সুন্দর মেয়ে আর হয় না। আমি ত কখনো দেখিনি।'

'কটা মেয়ে তুমি দেখেছ!' সে হেসে বলে—'জীবনে কতো সুন্দর সুন্দর মেয়ে দেখতে পাবে। আমার চেয়েও ঢের ঢের।... তখন তো ভুলে যাবে আমাকে।'

'কক্ষনো না। আর কোনো সুন্দর মেয়েকে আমি দেখব না। দেখতেই চাইব না আমি। তুই-ই আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর। তুই একলাই।'

ফ্রকটা পরে সে এক দৌড়ে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল আবার।

'কোথায় গেছলি?'

'[illegible]। ঘুঙুর।'

তারপর সে দু পায়ে ঘুঙুর জোড়া বাঁধল, ইজেরটা খুলে ফেলল আবার, [illegible]। আপন মনেই নাচতে শুরু করে দিল তারপর।

ঘরময় ঘুরে ঘুরে নাচল।

'তুই এমন নাচতে শিখলি কোথা থেকে রে?'

'শান্তিনিকেতন থেকে। মার সঙ্গে বেড়াতে গেছলাম সেখানে। দেখে দেখে শিখেছি। শান্তিনিকেতনের মেয়েরা নাচে সবাই।'

'তাই নাকি?' আমি বললাম, 'বাঃ বেশ ত!'

'আর তুমরা কেমনতর নাচে জানো? ঠ্যাং তুলে তুলে এমনিধারা। কলকাতার সিনেমায় দেখেছি।' কেন যে তার অমন ফূর্তি কে জানে, আনন্দে খানিক ছুটোছুটি করে কার্নিশের ধার ঘেঁষে এমন করে সে দৌড়ে এল যে আমার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল হঠাৎ—আচম্‌কা নীচে পড়ে যায় যদি?

দৌড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে কোলের ওপর বসে পড়ল সে। আমার মুখের মধ্যে তার মুখ গুঁজে রাখল।

'তোর এত ফূর্তি যে হঠাৎ!' আমি শুধাই—'কেন রে?'

'এমনিই।' তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে—'ভালো লাগল নাচতে তাই।'

'গান গাইতে পারিস নাকি?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় নাড়ল সে—'গাইব?' বলে গুন গুন সুরে শুরু করল সে—'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে—' একটু

খানি গেয়েই চুপ। বসে রইল চুপটি করে।

'একদিন তোর পা থেকে মাথা অব্দি আমি চুমু খাব—বুঝলি?'

'খেয়ো।'

'হাজার হাজার।'

'পা থেকে কেন? পা কি চুমু খাবার জায়গা নাকি?'

'দেবতাদের পাদবন্দনা করে আরম্ভ হয় কিনা?'

'আমি দেবতা নাকি?'

'আমার কাছে তো।'

'আমিও তোমার পায়ে খাব তাহলে।'

'না। তা আমি খেতে দেব না।' একটুখানি থেমে বলি, 'ছেলেরা কেউ দেবতার মতন হলেও তাদের পাদবন্দনা করে শুরু করার নিয়ম নেই। তাদের মুখে খেলেই হয়।'

'খাবে পায়ে?' সে তার ডান পা খানা তুলল একটুখানি। পাখির ডানার মত!

আমি হাতে ধরে তার পায়ের পাতার ওপরে আমার চুমু রাখলাম।

তার পর কী হল যে, সে কান্নায় ভেঙে পড়ল কেন কে জানে। কোলের উপর বসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

'কী হল রে তোর? কাঁদছিস কেন?'

কিছুতেই সে ঠান্ডা হয় না। কত আদর করলাম ঠোঁট দিয়ে চোখ মুখ মুছিয়ে দিলাম ওর—তবুও না।

একটু বাদে কান্না থামলে সে চোখ তুলে তাকালো উত্তর আকাশে—'দেখা গেছল কাঞ্চনজঙ্ঘা? দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ।' আমি মাথা নাড়লাম।

'আমি দেখতে পেলাম না।' দুঃখের সুর বাজল তার স্বরে—'দেখলে তো বললে না যে আমায়?'

'আকাশে দেখিনি। এই ছাদেই দেখেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা।...' আমি বলি—'এখনো দেখছি।'

অবাক চোখে তাকায় সে আমার দিকে—'এখনো দেখছ?'

আমি বলি: 'কাঞ্চনজঙ্ঘার ছটা এই বসেই দেখছি এখন।'

'দুষ্টু!' আলতো মুখে একটুখানি আদর করে উঠে পড়ল সে কোলের থেকে। ফ্রক-টক পরে লাজুক হেসে চলে গেল তার পরে।

তারপরেও আমি বসে রইলাম অনেকক্ষণ সেই ছাদেই। অন্ধকার নামল, তারা উঠল। চার দিকে। সারা আকাশ যেন তারায় তারায় ঝিনি ঝিনি করতে লাগল।

বিকেলে কিছু খাইনি তো, খিদে পেয়েছিল বেশ। লুচি আর বেগুন ভাজার গন্ধ আসছিল রান্নাঘর থেকে। ভাবলাম মার রান্নার একটুখানি বউনি করা যাক গিয়ে!

সন্ট নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল মা আর মাসিমার মধ্যে। দোর গোড়াতেই থমকে দাঁড়াতে হল।

'আসছে মাসেই দিদি আমরা চলে যাচ্ছি

মেয়েটিকে দেবে আমায়

এখান থেকে।' বলছিলেন রিনির মা।

'কেন দিদি, এখানকার জলহাওয়া কি সইছে না তোমাদের?' মা বললেন।

'তা নয়।' মেয়েদের পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না। কোনো মেয়ে ইস্কুল নেই এখেনে। এখনকার কালে মুখ্যু মেয়ে কি বিয়ের বাজারে চলে দিদি?'

'ইস্কুলের কোনো মাস্টারকে প্রাইভেট টিউটর রেখে দাও না কেন! বাড়িতে এসে পড়িয়ে যাবে মেয়েদের, ফাইনালের জন্যে তৈরি হোক বাড়ি বসে। তারপর কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা দেবেখন।' তারপর মা অনুযোগ করলেন আবার: 'আর তাছাড়া, তোমার মেয়েরা তো দেখতে ভালোই। তেমন কিছু লেখাপড়া না জানলেও বেশ ভালো ঘরে বিয়ে হবে দেখো।'

'সেই বিয়ের কথাটাই ভাবছি দিদি। মেয়েরা সব ডাগর হয়েছে। রাণু তো বলতে গেলে বিয়ের যুগ্যিই, ষোলো পেরুলো। ফেনিও পনেরয় পড়েছে, রিনিও চোদ্দয় পা দিল। কলকাতায় আমাদের বাড়িঘর ইষ্টিকুটুম সবাই—এখানে বসে কি বিয়ের সম্বন্ধ করা যাবে।'

এটা ভাবনার বিষয় ছিল বোধহয়, কেননা মাকেও একটু ভাবিত দেখা গেল।—তা বটে। রাণুর বিয়েটা দিতেই হবে এবার। কিন্তু তোমার এই মেজ মেয়েটিকে আমার পছন্দ, ভারী ঠান্ডা মেয়েটি। বেশ লক্ষ্মীশ্রী।...'

ফেনি দাঁড়িয়েছিল সেখানেই, মায়ের পাশটিতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। কথাটায় মাথা নীচু করল দেখলাম।

মা তার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন—'বেশ মেয়েটি। রামের সঙ্গে বেশ মানাবে। এটিকে তুমি দেবে আমায়?'

'তা নিয়ো না হয়। কিন্তু রামের প্রায় সমবয়সী হবে না? অবশ্যি আজকাল কেউ বয়স নিয়ে মাথা ঘামায় না আর। জাত কুল নিয়েই বাছ বিচার করে না শুনেছি।'

'তা তোমরা কি আসছে মাসেই যাচ্ছ শুনলে? সব ঠিক।'

'প্রায় ঠিক। কর্তা এক মাসের নোটিশ দিয়েছেন—এখান থেকে এখন ছাড়ান পেলেই হয়। কর্তা এর পরে বাড়ি বসে প্র্যাকটিস করবেন ঠিক করেছেন। তোমরা কলকাতায় কখনো এলে আমাদের বাড়ি এসো কিন্তু দিদি?'

'হ্যাঁ, একবার তো যেতেই হবে—এই হাতের মানতটা ছাড়াতে আমায়।...'

'আচ্ছা আসি দিদি হ্যাঁ, যেজন্যে এসেছিলাম। কাল সকালে দশটার মধ্যে রাম সত্যকে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো মনে করে, কেমন?'

'কেন দিদি?'

'কাল ভাই ফোঁটার দিন না? আহা, ওদের কোনো বোন নেই, কী দুঃখু! পান্টুদের সঙ্গে ওদেরকেও ফোঁটা দেবে রাণুরা। ভাই-ই তো ওরা।'

'আচ্ছা, দেব পাঠিয়ে।' হাসিমুখে মা বললেন।

আমাদের রান্নার আর ভাঁড়ার ঘরটাই ছিল দু তরফের সীমান্ত প্রদেশ।

মাঝখানের একটা দরজার খিল খুলে যাতায়াত করা যেত। দু বাড়ির গিন্নিরাই ঐ পথে যেতেন আসতেন—আমরা ও-পথ কোনোদিন ব্যবহার করতাম না।

রান্নাঘর দিয়ে রিনির মা মধ্যপ্রদেশ

থেকে তা আমরা পূর্বেই জেনেছি, এবং পৌঁছলে (রোটেনস্টাইনের মতে) নাকি য়েট্‌সই সবার আগে প্রতিবাদ করতেন। অতএব দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে যোগফল যেমন চার হয়, তেমনি অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে পড়বে যে ১৯১৪ সালের গোড়াতেই চিরোলের অপপ্রচার সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের দুখানি চিঠি পড়েই য়েট্‌স বিষয়টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে গিয়েছিলেন। অন্তত রোটেনস্টাইন, যে তাঁকে লেখা কবির চিঠিটি বন্ধু গোষ্ঠীর সবাইকেই দেখিয়েছিলেন এবং সকলের সঙ্গেই আলোচনাও করেছিলেন তার নজির পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ চিরোল যেমন তাঁর পরিবেশিত সংবাদটি এ দেশের মাটিতেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তেমনি য়েট্‌সও যে সংবাদটিকে তাঁর গোপন এবং বিচিত্র দাবীর সমর্থনে একটি বিশেষ সাফাই হিসেবে প্রকাশকের নিকট নিবেদন করেন সেটিকে তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই চিঠি থেকে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ভূমিকার দিক থেকে চিরোলের সঙ্গে য়েট্‌সের বিশেষ পার্থক্য নেই। উদ্দেশ্যটা অন্তত একই : অপযশকীর্তন। তফাতের মধ্যে এই যে, চিরোলের অপপ্রচারের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লাভ যাই হয়ে থাকুক, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কোনো লাভ ছিল না, য়েট্‌সের বেলায় ব্যক্তিগত লাভের অন্তত প্রত্যাশাটা যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এইবার য়েট্‌সের সেই 'অযাচিত' সমালোচনা এবং উপদেশের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। 'সমালোচনার' নাম করে য়েট্‌স যে কথা বলতে চেয়েছেন তা হল সংক্ষেপে এই যে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজির যথেষ্ট উন্নতি হয়ে থাকলেও, তাঁর তৎকালীন রচনা কাব্যগুণবর্জিত, এবং আদ্যোপান্ত পরিমার্জন না করলে সেগুলির কাব্যপদবাচ্য বলে বিবেচিত হবার সম্ভাবনা নেই। **Fruit Gathering** নামক বইটিকে তিনি বলেছেন 'a mere shadow', তার কারণ এটির পরিমার্জনে নাকি তিনি বিশেষ উৎসাহ বা গরজ বোধ করেন নি। **Lover's Gift** সম্বন্ধে বলেছেন **'It is rather an embarrassment'**, কেননা বইটির আমূল পরিবর্তন করে আদ্যোপান্ত ঘষে-মেজে দিলে হয়তো এটি একরকম দাঁড়াতে পারতো কিন্তু তিনি তা পারছেন না কেননা প্রকাশক তাঁকে 'ordinany press revision' করবার জন্যই নির্দেশ দিয়েছেন।

যে-কোনো কাব্যগ্রন্থেরই বিরূপ সমালোচনা করবার অধিকার পাঠকমাত্রেরই আছে, যদি সেই সমালোচনা আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া, রীতিমতো সমালোচনার মধ্যে না গিয়েও কেউ যদি যে কোনো কবি বা কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত পোষণ [illegible] পরে মত পরিবর্তন করেন, তাহলেই তাঁর সেই মতকে যে অভিসন্ধিমূলক বলতেই হবে এমন কথা নেই। রিল্‌কের মতো কবি জার্মান ভাষার মহত্তম কবি গ্যয়টের কাব্যের রসাস্বাদনে অক্ষম ছিলেন, তিনি বলতেন, **'I lack the receptive organ for Goethe'.**

আবার ঐ রিল্‌কের সম্বন্ধেই অডেন বলেছিলেন,

'I still think Rilke a great poet though I cannot read him any more'

একে প্রতিকূল সমালোচনা বলা যায় না, এমন কি, এ সমালোচনাই নয়। উক্তি দুটিতে গ্যয়টে অথবা রিলকের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে যথাক্রমে রিল্‌কে ও অডেন সম্বন্ধেই আমরা কিছু জানতে পারি। অর্থাৎ উক্তি দুটি বক্তার আত্মসমীক্ষার অঙ্গ হিসেবেই মূল্যবান। য়েট্‌সও যদি ক্রেসেণ্ট মুন-এর পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনাকে শুধুমাত্র তাঁর নিজের পক্ষে অরুচিকর বলতেন অথবা শুধুমাত্র নিকৃষ্ট বলেই ক্ষান্ত হতেন তাহলে সেটাকে অন্তত তাঁর ব্যক্তিগত মত বলে ধরে নেওয়া যেতো এবং তা নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন হ'তো না। কিন্তু ম্যাকমিলানকে লিখিত য়েট্‌সের চিঠিখানিতে তাঁর বক্তব্যগুলি লক্ষ করলে এই 'অযাচিত' সমালোচনার মধ্যে এমন কিছু জটিলতার এবং উত্তেজনার আভাস পাওয়া যায় যার ফলে একে ঠিক নিরপেক্ষ সমালোচনা অথবা বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত মত বলেও ধরা চলে না। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি এই জটিলতার উপর আলোকসম্পাত করছে। ১৯১৫ সালের ২০শে আগস্ট রোটেনস্টাইনকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

'I have got ready two of my mss. of poems for publication. One of the type of the Gitanjali', I have named 'Fruit gathering', and the **other of 'The Gardener', 'Lover's** Gift'. **I shall send typed copies to you next** mail **for your** opinion. **This time I shall have to brave the risk of publishing them with all their imperfections** unaltered, **except** errors of grammar and idiom'.

চিঠিটি যে চিরোলের অপপ্রচার এবং গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় পাঠ পরিবর্তনে ব্রিজেসের নাছোড়বান্দা জেদেরই অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথমেই লক্ষ করতে হবে যে ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসেই **Fruit Gathering** এবং **Lover's Gift** এই বই দুটির নামাকরণ হয়ে গিয়েছিল, অতএব ১৯১৭ সালের জানুয়ারীতে য়েট্‌স যে **A Lover's Knot**-এর উল্লেখ করছেন, সেটা যদি তাঁর অনবধানের পরিচয় হয়ে থাকে তাহলে 'ordinary press revision'-এর ব্যাপারেও তাঁর মনোযোগ কতখানি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রমাণ অবশ্য আমরা পূর্বেও দেখেছি

('I have forgotten the reasons I had when working over those poems'.!)

আর যদি এই নাম পরিবর্তনটি ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে তাহলে এই নাম বিকৃতির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ভাবটি আছে (lover's knot' কথাটির প্রচলিত অর্থই এখানে বিবেচ্য) সেটাও লক্ষণীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে যে উক্তিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে নিছক ব্যাকরণের ত্রুটি ছাড়া অপরের কোনোরকম suggestion-ই যে কবি আর গ্রহণ করবেন না তার সুস্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি। কবি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ১৯১৫ সালের আগস্টে, অর্থাৎ **Fruit Gathering** প্রকাশেরও বহুপূর্বে। এই সিদ্ধান্তটি তিনি যে শুধু রোটেনস্টাইনকেই জানিয়েছিলেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। ১৯১৫ সাল থেকে ম্যাকমিলানরাই ছিলেন কবির এজেন্ট, সুতরাং তাঁদেরও যে কবি তাঁর ঐ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তদনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। [illegible] জন্যই ম্যাকমিলান **Lovers Gift** সম্বন্ধে য়েট্‌সকে ঐ পরিষ্কার নির্দেশটি দিয়েছিলেন যে, তাঁর উপর ভার শুধু 'ordinary press revision' এর, তদতিরিক্ত পাঠ-পরিবর্তনের নয়। এবং সেই সঙ্গেই, **Fruit Gathering** সম্বন্ধেও যে য়েট্‌স লিখছেন **'I had no great heart in my** [illegible]**sion of his last work Fruit Gathering'**, তার প্রকৃত তাৎপর্যটিও সহজবোধ্য হয়। এই বইটি সম্বন্ধেও ম্যাকমিলানের অনুরূপ নির্দেশ ছিল সেটা অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। অন্তত ১৯১৫ সালের আগস্ট থেকেই রবীন্দ্রনাথ যে আর অপর কারো কোনোরকম সাহায্য নেবেন না বলে স্থির করেছিলেন সেটা রোটেনস্টাইন মারফৎ য়েট্‌সের না-জানার কথা নয়। অতএব তিনি যে চিঠিতে এমন একটি ইঙ্গিত করেছিলেন যে, **Lovers Gift** বইটিকে তিনি আদ্যোপান্ত পরিমার্জন না করে দিলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং খুবই নিরাশ হবেন **('I would not like tell Tagore so')** সেটাকে একটা bluff ছাড়া আর কী বলা যায়? যাই হোক, এর ফলে তাঁর 'অহং' যে খুব গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল ম্যাকমিলানকে লেখা তাঁর চিঠিতে তার বিচিত্র সাক্ষ্য রয়েছে। এবং সকলেই জানেন যে 'অহং' যখন এইভাবে আহত এবং উত্তেজিত হয়, তখন মানুষ এমন অনেক কাজ করতে পারে এবং এমন অনেক কথা বলতে পারে যার সঙ্গে সত্যের, সুরুচির অথবা সুনীতির সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

(ক্রমশঃ)

বাঙলা দেশ

মিহির মুখোপাধ্যায়

কোন সকালে উঠে [illegible] গীতা। স্টোভ [illegible]। চায়ের কাপ সুবলের শিয়রের কাছে [illegible] উপরে রেখে মশারী তুলে [illegible]—এই ওঠো, চা এনেছি, উঠে পড়ো এবার—

এখনো রোদ ওঠেনি। অঘ্রানের আকাশ [illegible] অল্প ফর্সা হয়েছিল।

সুবলের চোখে ঘুম। তার-ওপর [illegible]ছিল—তুমি এত সকালে উঠলে কেন—

—বাঃ, আজ আমরা যাবো না—

—সেতো যাব বেলা আড়াইটেয় [illegible] টেবিল-ঘড়িটার দিকে এক নজর [illegible] বললো—এখন সাড়ে পাঁচটাও [illegible], তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, আমি এখন উঠবো না—গায়ের চাদরটা ভাল [illegible] পাশ ফিরতেই পিঠে খোঁচা দিয়ে[illegible] গীতা—এই ওঠো, নয়তো আমি জল ছিটিয়ে দেব, ওঠো বলছি, ওঠো শিগগির—

[illegible] উঠতে হয়েছিল। বাজার মুখে [illegible] মন্তব্য করেছিল সুবল—বিয়ে করে [illegible] হল দেখছি, স্বাধীনভাবে একটু ঘুমোতেও পারবো না. একা একা বেশ ছিলাম, এরকম হবে জানলে কোন শালা—

—এই মুখ খারাপ করবে না, হাসিমুখেই [illegible] বাজে কথা শুরু করলে—

—বাজে কথা আর কি বললুম, ওটা হল [illegible]—চায়ের কাপটা তুলে নিল সুবল—[illegible] ভাল ঘুমোতে দাওনি, সকাল বেলা যে একটু আরাম করে শুয়ে থাকবো—

—এই অসভ্য চুপ করো—চোখ পাকাল গীতা—আমি তোমাকে ঘুমোতে দিইনি, তুমিই তো—বলতে বলতে হেসে ফেলেছিল।

তারপর সকালের সূর্য দুপুরের আকাশে উঠে এসেছে। এখন এই শেষ দুপুরে শেয়ালদা স্টেশনের দিশেহারা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললো সুবল—অবস্থা দেখেছ—

সুবলের এক হাতে সন্দেশের বাকস, আরেক হাতে ফলের ঠোঙা। গীতা কিন্তু ভিড়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই বললো—ওই দ্যাখো, কেমন বড় বড় আপেল—

স্টেশনের গেটের পাশে ফলের দোকান। এপাশে পানের দোকান থেকে সুগন্ধি জর্দা দেওয়া পান কিনছিল সুবল। আপেলগুলির দিকে এক পলক তাকিয়ে বললো—আপেল তো কিনলাম তখন—যাদবপুর স্টেশন থেকে

আড়াইটের গাড়ি ধরার মুখে তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা আপেল, কমলা লেবু কেনা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি তেমন পছন্দ হয়নি গীতার। দেখেশুনে বাছাবাছি করে কেনার মত সময় ছিল না। সেই কথাই বললো—ওগুলো দেখেশুনে নিলে না, খেতে কেমন হবে, কে জানে—

কোন জবাব না দিয়ে পানের খিলি মুখে দিল সুবল। সুগন্ধি জর্দা দেওয়া পান। গন্ধে ভুরভুর করছে। এই একটি মাত্র বিলাসিতা সুবলের। গীতাকে লক্ষ করে বললো—তুমিও নাও—পান খাওয়ার তেমন অভ্যাস না থাকলেও মিষ্টি মশলা দেয়া মিঠে পান খেতে আপত্তি নেই গীতার। কিন্তু এখন শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় একগাল পান মুখে দিয়ে ঠোঁট লাল করে যেতে ভরসা পেল না। এই প্রথম দেখা হবে। কেমন মানুষ কিছুই জানে না গীতা। যদি কিছু মনে করেন। আগের দিন সুবলের মুখে যখন শুনেছে, মা আসবেন, মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। তখন থেকেই উদ্বেগে উত্তেজনায় মনে মনে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল।

সুবল বলেছিল—তুমি যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছ, আরে আমার মা সাদাসিধে ভাল মানুষ, তাকে খুশি করা খুব সোজা, তোমার কোন ভয় নেই—

—কি জানি, আমি তো সুন্দরী নই, যদি আমাকে পছন্দ না করেন—

—কে বলেছে সুন্দরী নও, তুমি তো আমার চোখে বিশ্ব-শ্রী—

—যাও, ফাজলামি করতে হবে না। এই অসভ্য, সব সময় খালি—একটু সরে বসেছিল গীতা, সুবলের অবাধ্য হাত দুখানি সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মন থেকে [illegible] ভয় ভাবটা পুরোপুরি সরাতে পারেনি। ভরসা দিয়ে বলেছিল সুবল—আরে, আমি যে নিজে পছন্দমত বিয়ে করে সংসারী হয়েছি, এতেই দেখবে মা মহাখুশি, আমার মাকে [illegible] আমি চিনি—

এখন আবার সেইরকম কথাই বললো—তুমি যে এত ফল মিষ্টি কিনছ, মা [illegible] কিছু মুখে দেবেন না, আমার মাকে [illegible] আমি চিনি—

—কেন মুখে দেবেন না কেন? [illegible] যেন হতাশ হল।

[illegible] পথে বেরোলে কিছু খেতে [illegible] না। এই যে চন্দনপুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিন [illegible] মধ্যে এক [illegible] জল ছাড়া আর কিছুই মুখে দেবেন না। উপোস দিয়ে [illegible] [illegible] বলছে একটু [illegible] —আজকাল যে কথায় কথায় [illegible] ধুমধাম চলে, মাকে এনে এদের সঙ্গে [illegible] দিলে অনায়াসে মা [illegible] [illegible] চাম্পিয়ন হতে পারেন—

গীতাও হাসল—তা হলে কি করব [illegible] না, আপেলগুলি কিন্তু বেশ বড় বড় [illegible]

—নাও কিনে, তোমার যখন [illegible] তা ছাড়া আমার কথা আছে, যদি [illegible] পারবে—এক জোড়া আপেল কেনা [illegible] সুবলের দুই হাতে আর [illegible] গীতার হাতে একটা প্লাস্টিকের [illegible] ব্যাগ ছিল। তার মধ্যে মায়ের জন্য [illegible] কাপড়, [illegible] থান। তাছাড়া এক [illegible] গঙ্গাজল, খানিকটা গঙ্গামাটি, [illegible] পট, শালপাতায় মোড়া আশীর্বাদী [illegible] বেলপাতা, প্রসাদ। এগুলি সব [illegible] ফরমাস।

সুবল বললো—ওই ব্যাগটা দাও, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি—

আপত্তি করলো গীতা—নোংরা [illegible]

ঠোঙার সঙ্গে কালীবাড়ির প্রসাদ রেখো না—

—আরে ফলের আবার নোংরা কি, ঠোঙার কাগজটা ফেলে দিচ্ছি, এত জিনিস হাতে নেয়া যায় নাকি—বলতে বলতে ব্যাগের মধ্যে আপেল কটা সাজিয়ে রাখল সুবল। সন্দেশের বাকসটা পাঞ্জাবির পকেটে নিল। পানওয়ালা আরেক খিলি পান মোড়া ফেলেছে। গীতা কিন্তু রাজি হল না। অগত্যা সুবলকেই নিতে হল। নেবার আগে বললো—মিষ্টি মশলা সব বাদ দাও, শুধু সুপুরির একটু জর্দা—

—তুমি খুব জর্দা খাচ্ছ আজকাল, দাঁতগুলি সব কালো হয়ে গেল—গীতার অনুযোগের উত্তরে বললো—আমার তো আর কোন নেশা নেই, বিড়ি সিগারেট নস্যি কিছুর উপর লোভ নেই, এই একটি মধুর শখ, তবে হ্যাঁ আর একটি জিনিসের উপর লোভ আছে বলতে পারো—চোখের ইশারা করে হাসল।

একটু লাল হল গীতা—এই অসভ্য চুপ করো—

প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি ঢুকল দুজনে। সুবলের বাঁ হাতে সাইড-ব্যাগ, ডান হাতে পানের কৌটায় চুন। সাদা পায়জামা গেরুয়া পাঞ্জাবির কাঁধে ভাঁজ করা একটা চাদর। গীতার হাতে বাটিকের কাজ করা চামড়ার ব্যাগ, ছিমছাম ছাপা শাড়ি। মাথার আঁটো-সাঁটো মস্ত একটা খোঁপা আছে বটে কিন্তু আঁচলটা সেখানে থাকছে না। খসে খসে পড়ছে। মাস তিনেক আগেও বেণী দুলিয়ে কলেজে যেতো। মাথায় আঁচল রাখার অভ্যাসটা এখনো তেমন রপ্ত হয়নি।

কাল রাত্তিরে বলেছিল সুবল—তুমি মাথায় আঁচলটা রেখো, পায়ে আলতাটাও দিও, আর দেখো লক্ষ্মী মেয়েটি পেলেই মা খুব খুশি হয়ে যাবে, কলকাতার কলেজে পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণা বদলে যাবে—

—মায়ের বুঝি কলেজে পড়া মেয়েদের সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই—

—ভাল-মন্দ কোন ধারণাই নেই, তবে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব থাকাটা অসম্ভব নয়, চিরটাকাল গ্রামের বাড়িতে কেটেছে, আমার বউদিরা কেউ কলেজে পড়েনি, তা ছাড়া ভালবেসে বিয়ে আমাদের বংশে আমিই প্রথম করলুম কিনা—সুবলের চোখেমুখে চাপা গর্বের হাসি।

গীতা কিন্তু স্বস্তিবোধ করেনি। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে আবার বলেছিল সুবল—তোমার ভাবনার কিছু নেই কারো চালচলনে খুঁত ধরার অভ্যাস নেই মায়ের, তাছাড়া মা-তো আর আমাদের সঙ্গে থাকতে আসছেন না, তোমার মুখ দেখে এখান থেকেই ফিরে যাবেন।

এই অদ্ভুত খবরটা শুনে অবাক হয়েছিল গীতা—সে কি উনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না, এখানে এসে থাকবেন না?

—আমাদের দেশের বাড়িতে তিন পুরুষের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে, তুমি তো শুনেছো, রাধামাধবের যুগল মূর্তি, তার নিত্যপূজোর ভার মায়ের উপর, রোজ মা নিজের হাতে ঠাকুরের ভোগ রান্না করবেন, তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না, ঠিক মানুষের মত সেবা করেন মা, সকালবেলা ঠাকুরের মুখ ধোয়ানো থেকে শুরু করে রাত্তিরে পরিপাটি বিছানায় পাখার বাতাস দিয়ে মশারি ফেলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ মা নিজের হাতে নিখুঁতভাবে করবেন, এ আমার জ্ঞান-বয়স থেকে দেখে আসছি, ওই ঠাকুর ছেড়ে মা কোথাও গিয়ে একটা দিনও থাকতে পারেন না, থাকতে চানও না, ছোটবেলায় দেখেছি জন্মাষ্টমীতে, রাস পূর্ণিমায় আমাদের বাড়িতে খুব ধুমধাম হত, এখন অবশ্য তেমন কিছু হয় না—

এখন শেয়ালদা' স্টেশনে অসম্ভব ভিড়ের সামনে প্রায় অসহায় সুবল। গীতাও বিমূঢ়। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে বনগাঁ লোকাল দাঁড়িয়ে আছে। ছাড়বে তিনটে সতেরোয়। স্টেশনের মস্ত ঘড়িটায় তিনটে বেজে পাঁচ। সুবলের হাত ঘড়ি মিনিট তিনেক এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভিড় ঠেলে কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারছে না সুবল। এইমাত্র একটা গাড়ি এসে দু নম্বরে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গেই একরাশ মানুষ যেন উগরে দিল। পিল পিল করে মানুষ ছুটছে। একদল আসছে, একদল যাচ্ছে। একটু একটু করে যেতে যেতে বললো সুবল—অবস্থা দেখছো। আজ যে শনিবার আমার খেয়াল ছিল না, অন্যদিন এ গাড়িটায় এত ভিড় থাকে না। বনগাঁ লোকালের প্রতিটি কামরায় ঠাসাঠাসি লোক, প্রতিটি দরজার মুখে দলা পাকানো মানুষের জটলা। সুবল জিজ্ঞেস করলো—এই ভিড়ে উঠতে পারবে—

—অসম্ভব—মাথা নাড়লো গীতা।

—চলো তোমাকে বরং মেয়েদের কামরায় তুলে দিই, ওখানে অন্তত দাঁড়াবার জায়গা পাবে—

—আর তুমি—

—আমি দেখি দরজার মুখে পা রাখার জায়গা যদি পাই, দমদম জংশনে হয়তো ভেতরে ঢুকতে পারব—

—না, ওভাবে ঝুলে যেতে হবে না—

—তা হলে কি করবো?

—পরের গাড়িতে চলো—

—পরের গাড়ি এক ঘণ্টা পরে, তখন আরো ভিড় হবে—

—আমি কিন্তু মেয়েদের গাড়িতে উঠবো না, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো—

—কি করে থাকবে, অবস্থা দেখেছো না—সুবলের গলায় বেশ ঝাঁঝ।

—ফার্স্ট ক্লাসে চলো, ওখানে ভিড় কম—অম্লান মুখেই বললো গীতা।

—ফার্স্ট ক্লাস!—নাকমুখ কুঁচকে তাকাল সুবল—তিন গুণ ভাড়া, তোমার তো বলতে আর গায়ে লাগলো না—

মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল গীতা। হাসিমুখে বললো—তুমি আজকাল এত খিটখিট করো কেন, বিয়ের আগে তো এমন করতে না, তখন দেখতুম ট্যাকসি করে নিয়ে যাবার জন্য কত সাধাসাধি, তখন তো এত টাকার হিসেব করতে না—

অপ্রতিভ মুখে সামান্য হাসল সুবল, নিরুপায়ের মত বললো—চলো ফার্স্ট ক্লাসেই উঠি—

ফার্স্ট ক্লাসের দরজার সামনে কালো কোট, কাঁচা পাকা চুল, চশমা চোখে গোলগাল গম্ভীর মুখ চেকারবাবু অনধিকারীদের ভিড় ঠেকাচ্ছেন—আগে যান, আগে যান, এটা ফার্স্ট ক্লাস—

বাড়তি ভাড়া দিয়ে রসিদ নিল সুবল। মোটামুটি ফাঁকা কামরা। দু চারজন বসে আছেন এদিক-ওদিক। জানালার পাশে বসার জায়গা পেল গীতা। বসতে বসতে বললো—এমা, গদি ছেঁড়া—

—গদি যে আছে এই যথেষ্ট, মাথার উপর তাকিয়ে দ্যাখো একটাও পাখা নেই—সুবলের কথামত উপরে একবার তাকাল গীতা। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে বললো—ছিঃ, কি সব লেখা—

কাঠ কয়লার আঁকাবাঁকা অক্ষরে কয়েকটি অশ্লীল শব্দ। তার পাশেই আবার লাল হরফে বিপ্লবের বুলি। জয় আমাদের হবেই, বিপ্লব জিন্দাবাদ, লাল সেলাম—ইত্যাদি।

সুবল মন্তব্য করল—এ আর কি দেখলে, এর চেয়েও কত খারাপ কথা লেখা থাকে, এর নাম দেয়াল-সাহিত্য, ইদানীং আবার পাশাপাশি বিপ্লবের বাণীও লেখা হচ্ছে, স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে কলকাতার বড় রাস্তার পাশে কোন বাড়ির নতুন চুনকাম করা দেয়াল আর পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় নেই, দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লব হচ্ছে—

ততক্ষণে গদি ছেঁড়া আসন সব ভর্তি হয়ে গেছে। দু চারজন জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

—জানালার ধারে গীতা, পাশে সুবল। বালতি-ব্যাগটা মাথার উপর তুলে রেখেছে।

টঙটঙ করে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বাজল। বাঁশির শব্দ হল। চশমা চোখে কালো কোট গম্ভীর মুখে কয়েক পা যেতে না যেতেই হুড়মুড় করে একদল ছেলে উঠে পড়ল। কাছাকাছি এদিক-ওদিক দাঁড়িয়েছিল ছেলেগুলি। এখন ছুটে ছুটে এসে উঠতে লাগল। টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছিল।

—এই উঠিস না, এটা ফার্স্ট ক্লাস, মামা দেখছে—

—দেখুক, তুই উঠে আয়—

—মামা ধরবে—

—আসুক না শালা, টেঙরি খুলে নেব—

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। শেষ মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে আরো অনেকে উঠল। দেখতে দেখতে ঠাসাঠাসি ভিড় দাঁড়িয়ে গেল। চাপা গলায় জানতে চাইল গীতা—ছেলেগুলি মামা বলছে, কাকে?

—টিকিট চেকার, এ লাইনের সরকারী মামা, ছেলেরা ওই নামে ডাকে—সুবলের জবাব শুনে মুখ টিপে একটু হাসল গীতা। আবার জিজ্ঞেস করল—এদের কি টিকিট আছে?

ভিড়ের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আস্তে আস্তে বললো সুবল—ওসব কথা আর জিজ্ঞেস করো না, আমরা যে টিকিট কেটে বসে যেতে পারছি, এই আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য—

গাড়ির চাকায় চাকায় তখন নানা শব্দের ছন্দ। নারকেলডাঙ্গা শেড, বেলেঘাটার খাল পেরোবার পর গতি বাড়ল। উল্টোডাঙ্গার কাছাকাছি উঁচু উঁচু বাড়িগুলির মাথায় শেষ বেলার রোদ।

বাইরের দিকে তাকিয়েছিল গীতা। সামান্য সময় চুপচাপ থেকে আবার বললো সুবল—কি বলছিলে তখন, আমি আজকাল টাকা পয়সার খুব হিসেব করি, খরচপত্তর নিয়ে খিচখিচ করি—

—তাতো করই—হাসিমুখে এক পলক তাকাল গীতা। তারপর জানালায় চোখ রাখল।

—সে কি আর এমনি করি, কাল টিউবওয়েলের মিস্ত্রি আসবে, টাকা দিতে হবে, এদিকে রান্নাঘরটা বর্ষার আগেই পাকা না করলে তোমারই অসুবিধে হবে, এখনো অনেক কাজ বাকি, অথচ চতুর্দিকে ধার জমে যাচ্ছে। নতুন বাড়ি তুলছে সুবল। যাদব-পুরের এক বাস্তুহারা কলোনীর একপাশে কাঠা তিনেক জমির উপর একতলা ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি। গত এক বছর ধরে আস্তে আস্তে বাড়ি উঠছে। এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। এর জন্য কম ঝামেলা পোয়াতে হয় না। কোথায় ইট, কোথায় চুন, কোথায় সুরকি, কোথায় কাঠের মিস্ত্রি। স্কুলের চাকরি বজায় রেখে দু বেলা টিউশনি করে সবদিকে ছুটে ছুটে একা একা এসব সামলাতে হয় সুবলের। মুখ টিপে হেসে বললো গীতা—বাড়ির ভাবনায় তোমার মাথার চুল সব উঠে গেল, কদিন পরে চক-

চকে টাক পড়ে যাবে—

—বাড়ির ভাবনায় নয়, তোমাকে তো বলেছি, এখানকার জলটা আমার সহ্য হচ্ছে না, পেটের গণ্ডগোল লেগেই আছে, চাঁদপুরে গিয়ে তিনটি মাস থাকতে পারলে আমার শরীর ভাল হয়ে যেত, কিন্তু তাতো হবার উপায় নেই—যেন একটা বিষণ্ণ স্মৃতির মধ্যে থেমে গেল সুবল।

গাড়ি দমদম জংশন ছাড়াল। হঠাৎ ঘটাং ঘটাং শব্দে লাইন বদল করতে করতে এবার ডানদিকে মোড় নিল। গীতা জিজ্ঞেস করল—ওই লাইনটা কোনদিকে গেছে—

—ওটা মেন লাইন—জবাব দিল সুবল—নৈহাটি-রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর হয়ে একেবারে বহরমপুরে লালগোলা আর আমরা যাচ্ছি বনগাঁর দিকে, আগে এই লাইনে সোজা খুলনা যাওয়া যেত, এখন শুধু বনগাঁ পর্যন্ত—

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর যেন স্মৃতির ভেতর থেকে কথা বললো সুবল—পাঁচ বছর আগে যখন পাকাপাকি এদেশে চলে এলুম, তখনও এই পথে এসেছিলুম, তারপর সেই হঠাৎ যুদ্ধের সময় থেকে এই পথটা বন্ধ হয়ে গেছে, ভেবেছিলুম দেশের জমি-জায়গা বিক্রি করে, বিনিময় করে আস্তে আস্তে সবাইকে নিয়ে আসব, দাদা আমাদের ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে এখানে এসে নতুন করে শুরু করবেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি তুলবেন, আমার এসব ঝামেলা পোয়াতে হবে না, কিন্তু হঠাৎ সেই বাইশ দিনের যুদ্ধে সব বানচাল হয়ে গেল, তারপর ভেবে দেখ গীতু, এই পাঁচটা বছর এখানে আমি সম্পূর্ণ একা, কাউকে চিনি না, কোন আত্মীয় নেই, বান্ধব নেই, একটা পরিচিত মুখ চোখে পড়ে না, কলকাতার পথঘাটও ভাল জানা নেই, কার কাছে যাব, কোথায় দাঁড়াব কিছুই ঠিক নেই, আমার সঙ্গে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকখানা সার্টিফিকেট ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। কোন পরিচয়পত্র নেই, তারপর তোমাদের বাড়িতে টিউশনি পেলুম, তোমার সঙ্গে আলাপ হল, আমি যেন একটা আশ্রয় পেলুম, তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা হল, আমার সহায় সম্বল বাড়ল—বলতে বলতে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল সুবল।

গাড়ি ছুটেছে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি ছাড়িয়ে গেল। ভিড়ের চেহারা কিছু বদল হয়েছে। তখনো যেন একটা গভীর স্মৃতির মধ্যে ডুবে রয়েছে সুবল। বেশীক্ষণ কিন্তু চুপচাপ গম্ভীর থাকা গীতার স্বভাবে নেই। সহজ হবার জন্য ঠাট্টার সুরে বললো—তোমাদের বন্ধু জীবনবাবু বলেন, তোমার ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের কোন দাম নেই, তোমার নাকি উচিত, আবার স্কুল ফাইনাল থেকে শুরু করা।

আরে জীবন বোসের কথা বন্ধ দাও—হাত নেড়ে জবাব দিল সুবল—আমরা ডক্টর শহীদুল্লার ছাত্র ছিলুম, ওরকম একজন অধ্যাপকের কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয় কজনের, বাজে কথা বললে তো হবে না, ঢাকার সিলেবাসে বাংলায় এম এ পরীক্ষা দিতে হলে জীবনের ইয়ে ফেটে যেত। এই মুখ খারাপ করবে না—সুবলের হাতে চিমটি কাটল গীতা। তারপর চাপা হাসির সুরে বললো—তুমি নাকি কিছু জানো না, কিছুই পড়াতে পারো না—

—জীবন বুঝি বলেছে—সুবল গজগজ করে জবাব দিল—পড়াতে না পারলে অতবড় স্কুলে চাকরি পেয়েছি এমনি—

—চাকরি পেয়েছো খাতিরের জোরে, তোমাদের রাখালদা'র খোশামোদ করেছো, সেক্রেটারী মন্টুবাবুর বাড়িতে দু বেলা ধর্ণা দিয়েছ—বলতে বলতে মুখে আঁচল তুলে হাসি চাপলো গীতা।

—জীবন বুঝি বলেছে এই সব কথা, ওকে আর আমি বাড়িতেই ঢুকতে দেবো না—হাত নেড়ে বললো সুবল—জীবনের আর বলতে অসুবিধেটা কি, মামাবাড়ির তিনতলায় তোফা আরামে থাকে, গায়ে আঁচড়টি লাগে না, কাজের মধ্যে দেখি টিচার্সরুমে বসে যত রাজ্যের রাজনীতি নিয়ে কুতর্ক করে, আমার মত স্ট্রাগল করতে হলে বাবাজীবনের লাল সুতো বেরিয়ে যেত—

মুখে আঁচল তুলে খুকখুক করে হাসল গীতা। হাসি চাপার চেষ্টায় ফর্সা মুখশ্রী রক্তিম হয়ে উঠল। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি লুকোতে হল। আশেপাশের লোকেরা কি ভাবছে কে জানে।

সুবল হঠাৎ ডাক দিল—এই পান এদিকে—

ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। হরেকরকম ফেরিওয়ালার ডাকাডাকি। কাঁচম ওষুধ থেকে সুগন্ধি চন্দন ধূপ কিংবা দাঁতের মাজন থেকে শনির পাঁচালি পর্যন্ত গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সব নিত্যযাত্রীদের সুবিধার্থে নামমাত্র মূল্যে বিকিয়ে যাচ্ছে। বিচিত্র কণ্ঠে বিভিন্ন দ্রব্যের গুণকীর্তন শুনতে শুনতে আবার হাসি পাচ্ছিল গীতার।

প্রায় বালক বয়সের এক পানওয়ালা এসে সামনে দাঁড়াল। বুকের সামনে ঝোলানো একটা টিনের বাক্স। খোপে খোপে নানা মসলা, মৌরী, সুপুরী, চুন, খয়ের ভেজা ন্যাকড়ায় পান পাতা, সিগারেটের প্যাকেট বিড়ির বান্ডিল, দেশলাইয়ের বাক্স। ওইটুকু জায়গার মধ্যে কেমন নিপুণভাবে গুছিয়ে নিয়েছে। পরিপাটি সাজানো গোছানো কিছু দেখলেই ভাল লাগে গীতার। সারাদিন একা-একা সে নিজেও ওই করে। সব সময় দুজনের সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চায়। আলনা গোছায়, টেবিল সাজায়। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বসবার আর শোবার ঘর দুখানি, সামনে পিছনের বারান্দা দিনের মধ্যে দু তিনবার ধোয়ামোছা করে। সুবল ফরমায়েশ করল—সুপুরি এলাচ দিয়ে জর্দা পান লাগাও—

—তুমি আবার পান খাচ্ছ, এই তো খেলে একটু আগে—

—বাজে কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, এখন এক খিলি না খেলে আর চলবে না—

—এটা কোন্ স্টেশন—

হৃদয়পুর, এর পর বারাসাত—

—বেশ সুন্দর নাম তো, হৃদয়পুর, বারকয়েক বিড়বিড় করে নামটি আওড়াল গীতা। জানালায় মুখ ঠেকিয়ে পরিপূর্ণ চোখে বাইরে তাকাল। প্লাটফর্মের উলটো দিকে লাইনের কাছেই একটা পুকুর। তালগাছের গুঁড়ি ফেলা ঘাট। ঘাটের পাশে একজোড়া পাতিহাঁস মধ্যে মধ্যে জলে মুখ ডুবিয়ে কি যেন খুঁজে খুঁজে ঘুরছে। লাইনের ধারে এক রাশ আকন্দের ঝোপ। পুকুরের পাশে গেরস্থ বাড়ির মাটির ঘর। ওপারে মস্ত একটা বাঁশঝাড় ঘিরে নিবিড় বন। বাঁশঝাড়ের মাথায় শেষ বেলার নরম রোদ। পুকুরের ঢালু জমিতে জলের কিনারা ঘেঁষে একটা সাদা বক পা টিপে টিপে চলা ফেরা করছিল।

কয়েক মুহূর্তের বেশী দেখার সুযোগ হল না। গাড়ি আবার ছুটল। বাইরের চলমান দৃশ্যাবলী প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছিল। এরপরেই মস্ত মাঠ। মাঠের মধ্যে খাপছাড়াভাবে ছোট ছোট পাকাবাড়ি উঠছে। একদল লোক বোধ হয় এই ট্রেন থেকেই নেমেছে, ওই বিশাল মাঠের উপর দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। লোকগুলির মাথার উপর অনেকদূর পর্যন্ত অপরাহ্নের আকাশে কমলা রঙের রোদ। বিকেলের সূর্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

গীতা জিজ্ঞেস করল—আমরা কখন পৌঁছব—

—সাড়ে পাঁচটা হবে বোধ হয়—হাতঘড়ি দেখে জবাব দিল সুবল।

—চাঁদপুর থেকে মা আসবেন কার সঙ্গে ?

—আমার বন্ধু জিয়াউল নিয়ে আসবে—যেন একটা তৃপ্তি আর স্বস্তির সঙ্গে বললো সুবল, জিয়াউল ইসলাম আমার ছোটবেলার বন্ধু, ক্লাস ওয়ান থেকে এম এ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি, ও পড়েছে ইতিহাস নিয়ে আর আমার বাংলা, ও থাকত সলিমুল্লা হলে, আমি ছিলুম জগন্নাথ হলে, তোমাকে বোঝাতে পারবো না গীতু, সে সব দিনগুলি কি চমৎকার কাটিয়েছি—

—সলিমুল্লা হল, জগন্নাথ হল কি ? গীতার কথার জবাবে বললো সুবল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বোর্ডিং-এর নাম, হিন্দু

ছেলেদের জগন্নাথ হল, মুসলমানদের সলিমুল্লা হল, আর মেয়েদের উইমেনস্ হল—

গাড়ি বারাসাত জংশন ছাড়ল। আবার শুরু করল সুবল—জিয়াউলের খুব ইচ্ছে ছিল আমার বিয়েতে বরযাত্রী যায়, ওর বিয়েতে আমি গিয়েছিলুম, কলেজে পড়তে পড়তেই ওর বিয়ে হয়েছিল, আমরা নৌকো করে গিয়েছিলুম, চাঁদপুরের পাশে মেঘনা—যেন একটা দূরের দৃশ্য দেখতে দেখতে কথা বলছে সুবল—কতদিন, কত রাত মেঘনায় নৌকো নিয়ে ঘুরেছি, আমি আর জিয়াউল দুজনেই ভাল নৌকো বাইতে পারি, জ্যোৎস্না রাত্রে মেঘনার বুকে, সে যে কি অপূর্ব তোমাকে বোঝাতে পারবো না—

—তুমি আবার নৌকো বাইতে পারো নাকি, বিশ্বাস করি না—মুখটিপে হাসল গীতা।

—তুমি তো আমার কোন কথাই বিশ্বাস করো না, তোমার কাছে সব সত্যি কথা বলে এক জীবন বোস। আবার কুলকুল করে হেসে উঠল গীতা। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ সুবল।

বামনগাছি, দত্তপুকুর চলে গেল। ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। এখন বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়। কাছাকাছি কেউ নেই। গীতার কানের কাছে মুখ নিয়ে গুনগুন করে বললো সুবল—জিয়াউলের খুব ইচ্ছে ছিল তোমাকে দেখতে আসে—

—উনিও আসবেন নাকি?—সামান্য মুখ ফিরিয়ে সুবলের চোখে চোখ রাখল গীতা।

—আসবে কি করে, যাতায়াতে এক কাঁড়ি টাকা খরচ, আমার ইচ্ছে ছিল টাকাটা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু এখন হাত টানাটানি, এই যে মা আর অপু আসবে, এর জন্যে সামন্ত মশাইর হাতে দুশোটি টাকা ধরে দিতে হবে—

—সামন্তমশাইকে—

—পারাপারের দালাল, উনি মাকে নিয়ে আসবেন, আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার ওপারে জিয়াউলের জিম্মায় পৌঁছে দেবেন—প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছিল সুবল—স্টেশনে সামন্তমশাই আমাদের নিতে আসবেন—

বনগাঁ প্ল্যাটফর্মে যখন গাড়ি দাঁড়াল, তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচ। হেমন্তের ছোট দিন ফুরিয়ে যাচ্ছিল।

মোটাসোটা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বললেন—এই যে মাস্টারমশাই, এসে গেছেন, বউমা বুঝি, বেশ বেশ, নমস্কার, নমস্কার—

আধময়লা সাদা হাফশার্ট রুপোর বোতাম। ধুতি, পাম্পশু, বাদামী রঙের মাফলার। গলার আওয়াজ ভারী ভাঙা-ভাঙা। কাঁচা পাকা চুলের মাঝ বরাবর লম্বা সিঁথি। ভদ্রলোকের গায়ের রঙটি দেখবার মত। দেখেই মনে হল গীতার, ট্রেনের সিটের কভারের মত কালো এবং উপমাটি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক হাসি পেল। মাথায় আঁচল তুলে মুখ নিচু করে সামলে নিল।

সুবল বললো—এই যে গীতা, উনি সামন্তমশাই—

ছোট একটা নমস্কার করল গীতা। আবার চোখ নামাল। চকচকে করে পান চিবুচ্ছেন ভদ্রলোক।

পকেট থেকে ডিবে বার করে সুবলকে লক্ষ্য করে বললেন—চলবে নাকি এক খিলি—

একটু ইতি-উতি করে একটা খিলি নিল সুবল। বউ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু-কিন্তু ভাবে হাসল। সামান্য ভুরু কোঁচকাল গীতা। অন্যেক পকেট থেকে সোনালী রঙের চকচকে সিগারেট কেস বার করলেন সামন্ত মশাই। গীতা অবাক হয়ে দেখল তার ভেতরে পরিপাটি সাজানো এক বান্ডিল বিড়ি। সুবলের সামনে ধরে বললেন—এ জিনিস চলবে—

আবার হাসি পেল গীতার। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

হাত জোড় করে বললো সুবল—না দাদা, আমার ওসব চলে না—

একটি বিড়ি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন সামন্তমশাই—আপনারা হলেন কলকাতার বাবু, এসব বিড়ি-টিড়ি কি আপনাদের পোষায়—

—আজ্ঞে না দাদা, বিড়ি সিগারেট কোন নেশাই নেই আমার, শুধু এই জর্দা পান—

—তা জর্দা নেবেন নাকি, নিন না—এবার পকেট থেকে বেরোল জর্দার কৌটো।

গীতা ভাবছিল, ভদ্রলোকের দুই পকেটে আরো কি কি আছে, কে জানে। বুক পকেটে ভারী একটা নোট বই, দুটি কলম। যে রকম উঁচু হয়ে আছে, তাতে মনে হয় ভেতরের পকেটে নিশ্চয়ই কিছু কাগজপত্তর রয়েছে। বোধ হয় পাঁচ দশ টাকার নোটের তাড়া।

আগে আগে যেতে যেতে বললেন সামন্ত-মশাই—আসুন, রিকশা ঠিক করে রেখেছি—

প্লাটফর্মের বাইরে এসে হাঁক দিলেন—এই হরেরাম হরেরাম, এদিকে আয়—

সাইকেল রিকশা ঠুন ঠুন করে সামনে এলো। হরেরাম। বাইশ-তেইশ বছরের পাকানো শরীর, মুখময় বসন্তের দাগ। সুবলকে লক্ষ্য করে বললেন সামন্তমশাই—একে তিনটে টাকা দেবেন—

টাকা বার করতে যাচ্ছিল সুবল। বাধা দিয়ে আবার বললেন সামন্তমশাই—এখন নয় ও আপনাদের ফেরার ট্রেন ধরিয়ে দেবে, তখন দেবেন, খুব বিশ্বাসী লোক আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না—

ওরা দুজনেই এবার হরেরামের আপাদ-মস্তক দেখে নিল। কাঁধের [illegible] সাদা হাড় পর্যন্ত সবুজ রঙের জোব্বা। খাকি হাফ প্যান্ট। ছাই-ছাই রঙের একটা সুতির কোটের [illegible] ওপরে চাপানো। মাথায় মাংকি ক্যাপ। হরেরামের রিকশার চাকা [illegible] পাশে পাশে সাইকেলের [illegible] সামন্তমশাই। শহরের লোকজন পেছনে পড়ে রইল। [illegible] টিন, টালি আর মাটির ঘরের [illegible] বাড়ি। বাঁদিকে চালাঘরের মাথায় মাথায় ধোঁয়ার [illegible]। এদিকটায় বেশ শীত শীত লাগছে। কিন্তু কলকাতায় এখনো তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি।

সুবল জিজ্ঞেস করল—এই রাস্তাটার নাম জানো—

মাথা নাড়ল গীতা।

—যশোর রোড—সুবলের কথা শুনে সামনের দিকে তাকাল গীতা। কালো পিচের রাস্তাটা সোজা সামনে যেতে যেতে সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। দুই পাশে বড় বড় গাছ—শিমুল, শিরীষ, জেগুন, মেহগিনি। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল গীতা—এই রাস্তাটা কি যশোর পর্যন্ত গেছে? হাঁ বউমা—এবার জবাব দিলেন সামন্ত মশাই। পাশে পাশে যাচ্ছিলেন তিনি—শুধু যশোর নয় একেবারে খুলনা পর্যন্ত, আমাদের দেশেও এই পথে যাওয়া যেত স্টেশনের নাম ফুলতলা, দৌলতপুরের কাছে, ইংরেজ আমলে যুদ্ধের সময় আমি যখন মিলিটারী কনট্রাক্টের কাজ করতুম তখন এই পথে হরদম যাওয়া আসা করেছি এখন আর সোজাসুজি যাবার উপায় নেই, মাইলখানেক দূরেই বর্ডারের চেক-পোস্ট আমরা এবার ডানদিকে যাব—

বলতে বলতে জোরে প্যাডেল করে সামান্য সামনে গেলেন সামন্তমশাই। তারপর ডানদিকে ঘুরে একটা মাটির রাস্তা ধরলেন। পেছন পেছন, হরেরামের রিকশাও ঘুরল। এবার দুপাশে খোলা মাঠ, ফসলের ক্ষেত। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাড়সার কাঁকড়া মাথা খেজুর গাছ। রাস্তার পাশে আকন্দের ঝোপ, দু একটা রোগা চেহারার বাবলা গাছ, পুণ গাছ। মেটে মেটে জ্যোৎস্না ফুটেছে। দূরে দূরে দু একটা আলো। গীতার কেমন গা ছমছম করে উঠল। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—আমরা কোথায় যাচ্ছি—

—আমিও ঠিক জানি না, বোধ হয় সামন্ত-মশাইর বাড়ি, তোমার ভয় করছে নাকি—বলতে বলতে গীতার হাতখানি ধরল সুবল—ভয় কি, আমি তো সংগে রয়েছি—

সুবলের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল গীতা। মাটির রাস্তায় দুলতে দুলতে যাচ্ছিল রিকশাটা।

এক মুহূর্তে মনে হল গীতার, যেন পালকি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে।

পরক্ষণেই সুবলের গলা শুনল—ওই দ্যাখো—

মুখ তুলে তাকাল গীতা। হাত দিয়ে বাঁ দিকটা দেখিয়ে বললো সুবল—ওই মাঠের ওপারে পাকিস্তান, এখান থেকে বোধ হয় সিকি মাইলও হবে না।—

অল্প অল্প কুয়াশাময় আবছায়া অন্ধকার মাঠের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল গীতা।

ওই মাঠের ওপারে, দিগন্তহীন অন্ধকারের ওপারে আরেকটা বাঙলা দেশ। সেখান থেকে না আসলে। মাটির রাস্তায় মিনিট দশেক চলার পর একটা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকল হরেরাম। আগে আগে সামন্তমশাই। তেমন বড় গ্রাম নয়। কয়েক ঘর মানুষের বসতি। দু'চারটে দোকান। পুকুর বাঁশবাগান, বটগাছ।

রাস্তার পাশে একটা টিনের ঘরের সামনে দাঁড়াল রিকশা।

সামন্তমশাই ঘরের তালা খুলে ডাক দিলেন—আসুন সুবলবাবু—তারপর কাকে যেন উঁচু গলায় ডাকলেন—ওরে ও ফুলি এ-ঘরে একটা আলোটালো কিছু দিয়ে যা—

টিনের ঘর হলেও মেঝেটা পাকা। বেশ চওড়া বারান্দা। বারান্দায় এসে উঠল গীতা।

হরেরাম রিকশা ঘুরিয়ে খানিকদূরের একটা চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে পড়ল।

বারান্দা থেকেই আবার হাঁক দিলেন সামন্তমশাই—ওরে হরেরাম, নিকুঞ্জকে বল, দু কাপ চা পাঠিয়ে দিতে—

—আরে না না—অপত্তির সুরে বললে সুবল—আবার এসব করছেন কেন—

—একটু চা খান, কতক্ষণ বসতে হবে, কে জানে, তাছাড়া ঠাণ্ডাটাও পড়েছে বেশ—

—দাদা, ফেরার ট্রেন পাব তো, এই শীতের রাতে সংগে নতুন বউ, ডোবাবেন না—

—না, না, ট্রেন ঠিক পেয়ে যাবেন—আশ্বাসের সুরে সামন্তমশাই—নিতান্ত না পেলে, আমরা আছি কি জন্যে, না হয় গরীবের ঘরে একটা রাত—

—না দাদা, বাড়ি খালি রেখে থাকতে পারবো না, আমাদের ফিরতেই হবে, মাঠের পাশে নতুন বাড়ি তুলেছি, চোরে সব ফাঁক করে দেবে—

ততক্ষণে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ফ্রক পরা মেয়ে, নাম বোধ হয় ফুলি, একটা লণ্ঠন নিয়ে এল।

ঘরের ভেতর দু'খানি কাঠের চেয়ার, একটা টেবিল, মাদুর-পাতা তক্তাপোশ।

একখানা চেয়ার টেনে বসল গীতা। টেবিলের উপর লণ্ঠন জ্বলছে। বিষণ্ণ হলুদ আলো। টেবিলের নিচে, তক্তপোশের তলায়, আনাচে-কানাচে অন্ধকার। ওপাশে একটা কাঠের আলমারি। পাল্লার কাঁচ ভাঙা।

ভেতরে কিছু পুরনো বই, খবরের কাগজ। চায়ের দোকানের একটা ছেলে এক কাপ চা রেখে গেল।

এক চুমুক মুখে নিয়েই প্রায় আঁতকে উঠল গীতা। কেমন সোঁদা সোঁদা বিটকেল গন্ধ।

আরেক কাপ চা হাতে নিয়ে ভেতরে এল সুবল। হাসি হাসি মুখে বললো—চা খাও—

চোখ বড় বড় করে বললো গীতা—তুমি এই চা মুখে দিতে পারলে, বাড়িতে হলে তো ছুড়ে ফেলে দিতে—

—আরে অসময়ে যা পেয়েছি, বুঝলে না, এই ঠাণ্ডার মধ্যে পেটে যে গরম কিছু যাচ্ছে—

—কতক্ষণ বসে থাকতে হবে—

—ঠিক বলতে পারছি না, সামন্তমশাই তো গেলেন খোঁজ নিতে—

শেষ কালে ট্রেন ফেল হলে এখানে থাকতে হবে নাকি—

—অসম্ভব নয়, সামন্তমশাই তো বললেন, একটা রাত থাকতে—

—রক্ষে করো এদের এই নোংরা বিছানায়, ম্যাগো—নাকমুখ কোঁচকাল গীতা—আমি বরং এই চেয়ারে বসে থাকবো সারারাত—

—আহা, আস্তে বলো, ওই সামন্তমশাই আসছেন বোধ হয়—আবার বাইরে গেল সুবল।

তারপর সামন্তমশাইর সংগে গুজগুজ করে কথা বলতে বলতে রাস্তায় নামল। কিছু সময় পরে দোকানের ছেলেটি এসে চায়ের কাপ নিয়ে গেল। আর এক চুমুকও মুখে দেয়নি গীতা। ঠায় বসে আছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে একটা খড় বোঝাই গরুর গাড়ি চলে গেল। চার পাশ ক্রমশ কেমন চুপচাপ মনে হচ্ছিল। সারাদিনের ক্লান্তির পর বসে থাকতে থাকতে ঘুম পাচ্ছিল গীতার। পায়ের কাছে দু'একটা মশা পিন্‌পিন্ করছে। বার কয়েক হাই তুলল। কিছুতেই আর চোখ খোলা রাখতে পারছে না। কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল। একটা পেঁচা ঘরের উপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

টেবিলের উপর মাথা রেখে কতক্ষণ তন্দ্রার মধ্যে ছিল খেয়াল নেই গীতার। হঠাৎ

বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনে সোজা হয়ে বসল। পরক্ষণেই ভেতরে এসে হাসি মুখে খবর দিল সুবল—এই যে, মা এসে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল গীতা। সুবলের পেছনে ঘরে ঢুকলেন মা। পাতলা চেহারার ছোট্ট খাটো মানুষটি। পরনে আধময়লা সাদা থান। অনেকটা পথ মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে হয়েছে।

খালি পায়ে, পায়ের কাছে মাঠের ধুলো। মায়ের মুখে বয়সের রেখা, দীর্ঘ পথের ক্লান্তি।

হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি। টেবিলের উপর রাখলেন।

মাথায় আঁচল তুলে হাঁটু গেড়ে বসে পায়ের ধুলো নিল গীতা। পায়ের কাছে প্রণামীর জন্য নতুন থান ধুতিখানা রাখল। এই পরিপাটি প্রণামের ভঙ্গী দেখে আশ্বস্ত হল সুবল। মনে মনে তারিফও করল।

বেশ বুদ্ধিমতী, মাকে খুশি করতে পারবে। ততক্ষণে পুঁটুলি খুলে কয়েকটি ধান আর শুকনো দুর্বা বার করে গীতার মাথায় দিলেন মা। আক্ষেপের সুরে বিড়বিড় করে বললেন—আমার এমন কপাল, এইভাবে বউমার মুখ দেখতে হল, না একটা শাঁখের

শব্দ, না একটু উলু—
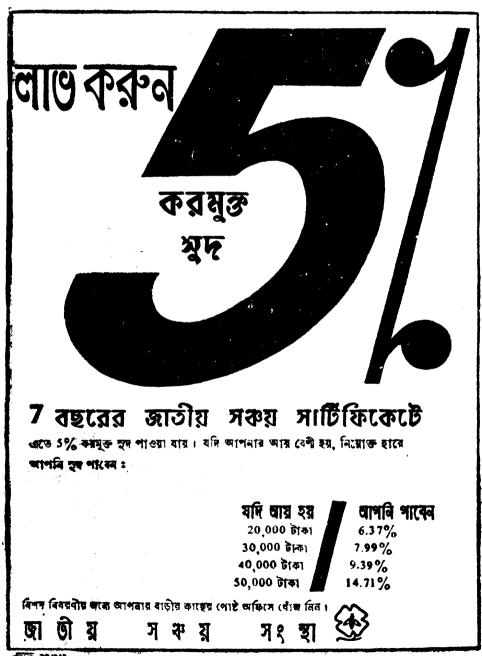
—ওসব কথা ভুলে যাও—বললো সুবল—তোমাকে যে এনে দেখাতে পারলুম, এই আমার ভাগ্য, ওকি তুমি কাঁদছ কেন, এত কষ্ট করে এখানে এলে কি কান্নাকাটি করার জন্যে?

মায়ের চোখে জল। সেকেলে গড়নের এক জোড়া মকরমুখী বালা বউ-এর হাতে পরিয়ে দিলেন।

গীতারও চোখ দুটি জ্বালা করে উঠল। চোখের জলে মায়ের মুখখানি ঝাপসা দেখাচ্ছে।

একহাতে ডাব আরেক হাতে ঝকঝকে একটা কাঁসার গেলাস নিয়ে দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন সামন্ত মশাই।

সুবল জিজ্ঞেস করল—দাদা, আপনি উলু দিতে পারেন—

গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ের মতন [illegible] শব্দ করে হাসলেন সামন্তমশাই—আগে বলে রাখলে, তেমন ব্যবস্থাও করা যেত—

গীতা তখন আঁচল দিয়ে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে। একটা রূপোর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে বউ-এর কপালে সিঁথিতে দিতে দিতে মা বললেন—রাধামাধবের পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুর, এটা তুমি যত্ন করে রেখো—

আবার মাকে প্রণাম করে হাত দুটি ধরে বললো গীতা—আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন—

—আমার তো খুব ইচ্ছে বউমা, কিন্তু রাধামাধবকে ছেড়ে আমার কোথাও গিয়ে দু'দিন থাকার উপায় নেই, তাছাড়া তোমার ভাসুর রয়েছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে এতবড় সংসার বড় বউমা একা সামলাতে পারবে না। ইচ্ছে তো ছিল সবাইকে নিয়ে আসবো, রাধামাধবকে ভুলে এসে [illegible] বললো, কিন্তু সে কথা কিছু [illegible] এখনো বলা গেল না, দেখি ঠাকুরের যা ইচ্ছে—একটু সময় চুপ থেকে আবার বললেন—এ যাত্রা শুধু অঞ্জনকে তোমার কাছে রেখে যাবো, এখানে স্কুলে পড়বে, তুমি ওকে দেখো, অঞ্জু কোথায়—

মায়ের কথা শুনে যেন খেয়াল হল সুবলের—আরে সত্যিই তো, এই অঞ্জন এদিকে আয় ও বড় মামাকে ডেকে। বারান্দা থেকে সাত-আট বছরের রোগামত অঞ্জনের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল সুবল। হাফ-প্যান্ট হাফ শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল একমাথা কোঁকড়া চুল। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল।

—কাকিমাকে প্রণাম কর—ঠাকুমার কথা শুনে, সামনে ঝুঁকল অঞ্জন। গীতা তাড়াতাড়ি কোলের কাছে টেনে নিল। একটা [illegible]

সুবল বললো—মা, তুমি ডাবের জলটা খেয়ে নাও, তোমার জন্য সন্দেশ, আপেল, কমলা এনেছি—

—আমি এখন ওসব কিছু খাবো না—

—তাহলে এসব আনলুম কেন, এখন না খাও, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে, এই ব্যাগের মধ্যে গঙ্গাজল, গঙ্গামাটি, কালীঘাটের প্রসাদ, সব রয়েছে—

—আচ্ছা, তুই থাম—সুবলকে থামিয়ে দিলেন মা। তারপর অঞ্জুকে লক্ষ্য করে বললেন—দাদুভাই, তোমার কাকিমাকে একটা কবিতা শুনিয়ে দাও তো, সেই যে মুখস্থ করেছিলে—

ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাল অঞ্জন। তারপর একপলক কাকীমার দিকে, শেষে মুখ নিচু করে লাজুক হাসি মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—

আসমানীরে তোমরা সবাই
দেখতে যদি চাও—
রহিমুদ্দির ছোট্ট গ্রামে তোমরা সবে যাও,
আসমানীর নয় পাখির বাসা,
ভেন্নাপাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি,
একটুখানি হাওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে
তারই তলে আসমানীরা থাকে বছর ভরে—

তারপর একটু থেমে—আর মনে নেই—বলে ঠাকুমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ লুকুলো।

—ওরে ছাড়, ছাড়, আমি কি তোকে আর সামলাতে পারি, নতুন কাকীমার কাছে ভাল হয়ে থাকবি, মন দিয়ে পড়াশোনা করবি—

বাইরের বারান্দা থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন সামন্তমশাই—সুবলবাবু, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আটটা বাজল। কেউ কোন কথা বললো না। ঘড়ির কাঁটা যেন অবুঝের মত দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে।

কাপড়ের পুঁটলিটা খুলে একখানা ঢাকাই শাড়ি বার করে গীতার হাতে দিলেন মা। চমৎকার তাঁতের শাড়ি।

সুবল বললো— তুমি আবার শাড়ি আনতে গেলে কেন, নিজেরই হেঁটে আসতে কষ্ট হয়—

—আমি আনিনি, জিয়াউল দিয়েছে, কিছুতেই শুনলো না, জোর করে দিল, তোর বিয়েতে আসতে পারেনি বলে কি আপসোস—

সহসা কোন কথা বলতে পারল না সুবল। একটু সময় নেড়েচেড়ে শাড়িখানা দেখল। শেষে ভারি গলায় আস্তে আস্তে বললো—জিয়াউলকে বলো আমার বাড়ির কাজ হয়ে গেলে পর ওকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো, কয়েকটা দিন এসে থেকে যাবে—

—জিয়াউল এখন মস্ত কাজের মানুষ, ওর কি আসার সময় হবে, আমাকে খুলনা থেকে জিপগাড়িতে করে নিয়ে এল, একটুও কষ্ট হতে দেয়নি—

তারপর বালতি ব্যাগের মধ্যে আপেল, কমলা, সন্দেশের বাক্স, প্রণামীর কাপড়, গঙ্গাজলের বোতল, গঙ্গামাটি, কালীঘাটের পট, প্রসাদী ফুল বেলপাতা, সব গুছিয়ে সামন্ত মশাই-এর হাতে দিল সুবল।

এক হাতে ব্যাগ, আরেক হাতে একটা টর্চবাতি। মাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন সামন্তমশাই।

আবার সেই হরেরামের রিকশা। এবার তিনজন। গীতা, সুবল আর দুজনের কোলের সামনে অঞ্জন।

একবার শুধু জিজ্ঞেস করলো অঞ্জু—ঠাকুমা আবার কবে আসবে—

গীতা জানতে চাইল—কিভাবে যাবেন, এই অন্ধকারে অসুবিধে হবে না?

—সামান্য কিছুটা দূরে হাঁটতে হবে—জবাব দিল সুবল—ওপারে গিয়ে আবার যশোর রোড ধরবে, সামন্তমশাই পাকা লোক, ঠিক পৌঁছে দেবেন—

মাঠের ওপারে ওই অন্ধকারের মধ্যে আরেকটা বাঙলা দেশের সীমানায় যশোর রোডের কাছাকাছি কোথাও জীপ গাড়িতে অপেক্ষা করছে জিয়াউল। অল্প অল্প কুয়াশার মধ্যে ম্লান জ্যোৎস্নায় মায়ের সাদা থানের মূর্তি ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে। সামন্তমশাই-এর টর্চের আলো এক একবার দেখা যাচ্ছিল। এদিকে দুলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে হরেরামের রিকশা। ডানপাশে মাঠের দিকে মায়ের আবছায়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে সুবল। তাকিয়ে রয়েছে গীতা। মুখ উঁচু করে দেখছে অঞ্জন। ওই যে সামন্তমশাইর টর্চের আলো এক একবার চোখে পড়ছে। আস্তে আস্তে বললো সুবল—আমার কি ইচ্ছে করছে জানো গীতা, মায়ের পেছন পেছন দেশে ফিরে যাই, তুমি না থাকলে ঠিক চলে যেতুম।

পৃথিবীতে যে সমস্ত মৌলিক পদার্থের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্যের সেটাই সব কথা নয়। মৌলিক পদার্থের শুরু হাইড্রোজেন নিয়ে। তারপর একের পর এক ভারী, আরও ভারী—সবচাইতে ভারী ইউরেনিয়াম-এ পৌঁছান গেল। কিন্তু তারপর? জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানীরা এই 'তারপর'-এর উত্তর খুঁজছেন মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে। ওঁদের ধারণা মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে হয়ত এমন কিছু কিছু পদার্থের সন্ধান পাওয়া যাবে—যাদের বলা হয় সুপার হেভী বা অতি ভারী পদার্থ।......

এবারকার বিশ্ববিজ্ঞান পর্যায়ে অতি আধুনিক এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন ডঃ প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিকেল ইনসটিটিউটের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। কাজ করছেন পারমাণবিক কণা, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতির উপর। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল রচনাটি পরিবেশিত হল।

মহাজাগতিক রশ্মিতে কি সুপার-হেভী নিউক্লিয়াস থাকা সম্ভব?

এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু সামগ্রীর বিচার বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। এই ৯২তম মৌলিক পদার্থটির নাম ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়ামের [illegible] পাওয়া [illegible] $_{92}U^{238}$ ও $_{92}U^{235}$ অর্থাৎ [illegible] ৯২টি প্রোটন এবং যথাক্রমে ২৩৮−৯২=১৪৬টি এবং ২৩৫−৯২=১৪৩টি নিউট্রন। এখন [illegible] একটি ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস $_{92}U^{238}$ একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় একটি [illegible] নিলো। তাহলে আমরা পাবো [illegible] আর একটি আইসোটোপ $_{92}U^{239}$ অর্থাৎ এর মধ্যে প্রোটনের [illegible] ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যার সমান কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা এক্ষেত্রে মূল ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসের নিউট্রনের সংখ্যা থেকে এক বেশী। এই অতিরিক্ত নিউট্রনটি থাকার জন্য এই আইসোটোপটি বিটা তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে [illegible] একটি পরমাণু তৈরি করতে সক্ষম হবে কারণ বিটা তেজস্ক্রিয়তায় একটি নিউট্রন দুর্বল প্রতিক্রিয়ার (weak Interaction) সাহায্যে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন এবং একটি অ্যান্টিনিউট্রিনো সৃষ্টি করবে। তাহলে আমরা পাবো একটি নতুন নিউক্লিয়াস যেখানে প্রোটনের সংখ্যা হবে ৯৩, অর্থাৎ মূল ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যা থেকে এক বেশী। এই নতুন নিউক্লিয়াসটি আবার আর একটি নিউট্রন গ্রহণের মাধ্যমে অনুরূপভাবে [illegible] একটি নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করতে পারে যেখানে প্রোটনের সংখ্যা মূল নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যা থেকে এক বেশী। এই শেষোক্ত পরমাণু দুটির নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে নেপচুনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম।

বলা প্রয়োজন নেপচুনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম প্রাকৃতিক কোন বস্তুর মৌলিক পদার্থকণা হিসাবে পাওয়া যায়নি। এগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে গবেষণাগারে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কি আমরা একই উপায়ে আরো নতুন নতুন পরমাণু সৃষ্টি করে যেতে পারি। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট রয়েছেন এবং অতি সম্প্রতি আমরা কৃত্রিম উপায়ে নির্মিত যে মৌলিক পদার্থ কণাটির কথা জানতে পেরেছি তার নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা ১০৫। এটির নামকরণ করা হয়েছে হানিয়াম। এর চেয়ে বেশী প্রোটন সংখ্যা বিশিষ্ট কোন পরমাণু এখনো পর্যন্ত গবেষণাগারে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

সাধারণত কোন নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব (stability) নির্ভর করে বিভিন্ন shell-এ নিউট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যার উপর। যখনই একটি shell-এ যতগুলি প্রোটন বা নিউট্রন থাকা সম্ভব তা পূর্ণ হয়ে যায় তখনই নিউক্লিয়াসটি সবচেয়ে বেশী stable হয়। এই হিসাবে প্রথমে ধারণা হয়েছিল যে ৮২টি প্রোটনবিশিষ্ট প্রোটন—shell-এর পরবর্তী ধাপ ১২৬টি প্রোটনবিশিষ্ট প্রোটন shell পূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু প্রোটনগুলির নিজেদের মধ্যে বিকর্ষণ এক্ষেত্রে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করবে। এই

১নং চিত্র

বিকর্ষণের প্রভাবে প্রোটন shell-এর যে তারতম্য ঘটবে, তার হিসাব করে এইচ, মেলডনার (H Meldner) এবং পি রোপার (P. Roper) সর্বপ্রথম দেখান যে ১১৪টি প্রোটন বিশিষ্ট প্রোটন shell-টি পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং এটি হবে আশ্চর্য স্থিতিশীল একটি নিউক্লিয়াস।

১ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে যে নিউট্রন সংখ্যা ২৮, ৫০, ৮২ এবং অনুরূপ প্রোটন সংখ্যায় shell গুলি পূর্ণ হয় এবং নিউক্লিয়াসটি বিটা-তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে আশ্চর্য রকমের স্থিতিশীল (stable) হয়। এই সংখ্যাগুলিকে ম্যাজিক সংখ্যা বলে। উপরোক্ত চিত্রে দেখানো হয়েছে নিউট্রন সংখ্যা ১৮৪ এবং প্রোটনসংখ্যা ১১৪ একটি স্থিতিশীল নিউক্লিয়াসের নির্দেশনা দেয় এবং এই অঞ্চলটিকে একটি স্থিতিশীল দ্বীপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি প্রোটন সংখ্যা ১০৫-এর বেশী কোন নিউক্লিয়াস এখনো পর্যন্ত গবেষণাগারে তৈরি করা যায়নি এবং পার্থিব কোন বস্তুতেও এর কোন অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও কী এই সব Super heavy নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব সম্ভব? যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এইসব নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল নিউক্লিয়াসগুলিকে নিশ্চয়ই মহাজাগতিক রশ্মিতে (Cosmic Ray) ধরা যাবে। সম্প্রতি বৃটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক পি এইচ ফাওলার (P. H. Fowler) বলেছেন যে তিনি মহাজাগতিক রশ্মিতে কিছু নিউক্লিয়াসের সন্ধান পেয়েছেন যাদের প্রোটন সংখ্যা ১১০-এর বেশী হতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠছে মহাজাগতিক রশ্মিতে যদি Super heavy নিউক্লিয়াস, পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায় এবং কীভাবে এগুলো সৃষ্ট হচ্ছে। বলা প্রয়োজন, এইসব Super heavy নিউক্লিয়াস তৈরি হতে পারে একমাত্র দ্রুত নিউট্রন গ্রহণের মাধ্যমে (rapid neutron capture process বা r-process)। রাশিয়ার দুজন বিজ্ঞানী, বার্কোভিচ এবং নভিকভ দেখিয়েছেন যে কোন নক্ষত্রের পক্ষে

r-process-এর মাধ্যমে এইসব super-heavy নিউক্লিয়াস তৈরি করতে হলে তার নিউট্রন ঘনত্ব হতে হবে অন্তত এক কিউবিক সেন্টিমিটারে $১০^{২৭}$ টি নিউট্রন এবং তার তাপমাত্রা হবে প্রায় ২×১০^{৯} ডিগ্রী কেলভিন। এখন ভাবা যেতে পারে এই শর্ত দুটি আমাদের গ্যালাক্সিতে কোন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিউট্রন সংখ্যার ঘনত্ব থেকে যা সহজেই অনুমান করা যায় তা হলো একমাত্র নিউট্রন ক্ষেত্রের পক্ষেই এইসব সুপারহেভী নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে। কারণ আমরা জানি অনেক নক্ষত্র তাদের বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে গিয়ে সঙ্কুচিত হবার ফলে একটি নিউট্রন নক্ষত্র সৃষ্টি করতে পারে এবং এই জাতীয় নক্ষত্রকে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের অবশেষে হিসাবে পাওয়া যায়। একটি নিউট্রন ক্ষেত্রে নিউট্রনের ঘনত্ব এক কিউবিক সেন্টিমিটারে $১০^{৩৯}$ নিউট্রন পর্যন্ত হতে পারে বলে প্রয়োজন, সম্প্রতি আবিষ্কৃত বিভিন্ন পাল্সারকে এখন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন নিউট্রন নক্ষত্র হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন।

একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের সময় নিউট্রন নক্ষত্রের তাপমাত্রা প্রায় $১০^{১২}$ ডিগ্রী কেলভিন পর্যন্ত উঠতে পারে। কিন্তু তার পরেই তা ক্রমশ ঠান্ডা হতে থাকবে। কিন্তু কীভাবে? এইসব নক্ষত্র থেকে যদি শক্তিকণার (ফোটন) চেয়ে বেশী পরিমাণে নিউট্রিনো বেরিয়ে আসে তাহলে তা নক্ষত্রটিকে ঠান্ডা করে দেবে। কারণ, নিউট্রিনো হীনবল প্রতিক্রিয়া (Weak Interaction) ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই একটি নক্ষত্রের কেন্দ্রে যদি কোন নিয়মে নিউট্রিনো সৃষ্টি হয়, তাহলে তা নক্ষত্রটি থেকে বেরিয়ে আসার পথে অন্য কোন বস্তুকণার সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে না। ফলে, এই নিউট্রিনো নক্ষত্রের অপর কোন অংশে কোন বস্তুকণা কর্তৃক গৃহীত (absorbed) হতে পারবে না এবং যে শক্তি নিয়ে এর সৃষ্টি হয়েছিল, সেই শক্তি নিয়েই তা নক্ষত্রটি থেকে সোজা বেরিয়ে আসবে। তাই যে সব নক্ষত্রে Nuclear bearing বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই সব নক্ষত্র থেকে বেশী পরিমাণে নিউট্রিনো বেরিয়ে এলে তা নক্ষত্রটিকে ঠান্ডা করতে সাহায্য করবে। তাই একটি নক্ষত্রের বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রা সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো যদি আমরা সঠিকভাবে নিউট্রিনো নিষ্ক্রমণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারি।

বর্তমান লেখক ১৯৬৮ সালে বিভিন্ন নিউট্রিনো প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন। এই তত্ত্বানুযায়ী একটি শক্তি কণিকা (Photon), যাকে আমরা জানি বৈদ্যুতিক আধান বিহীন বস্তুকণার মত তড়িৎ-চৌম্বক (Electromagnetic) প্রতিক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রতিক্রিয়ার অংশ নিতে পারে না, নিউট্রিনোর সঙ্গে হীনবল প্রতিক্রিয়ায় (Weak Interaction) অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। একটু বিশদভাবে বলা যেতে পারে যে যেমন একটি ইলেকট্রন তার বৈদ্যুতিক আধানের (charge) জন্য একটি ফোটনকে তড়িৎ-চৌম্বক প্রতিক্রিয়ায় (Electromagnetic Interaction) গ্রহণ বা বিকীরণ করতে সক্ষম, তেমনি বলা যেতে পারে যে একটি নিউট্রিনো হীনবল প্রতিক্রিয়ায় (Weak Interaction) একটি ফোটনকে গ্রহণ বা বিকীরণ করতে সক্ষম হবে।
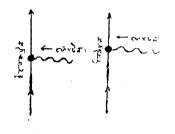
(ক) একটি ইলেকট্রন কর্তৃক তড়িৎ-চৌম্বক প্রতিক্রিয়ায় একটি ফোটন গ্রহণ; (খ) একটি নিউট্রিনো কর্তৃক হীনবল প্রতিক্রিয়ায় একটি ফোটন গ্রহণ।

যদিও গবেষণাগারের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব (Photonneutrino Weak Coupling) এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি, জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা এবং মহাজাগতিক রশ্মির বিভিন্ন বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে এতে অশেষ সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। এই তত্ত্বানুযায়ী বর্তমান লেখকের সহযোগী কর্মী শ্রীপ্রভাস রায়চৌধুরী হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, একটি নিউট্রন নক্ষত্র তার চৌম্বক ক্ষেত্রের সংঘর্ষে (Synchrotron Radiation মারফৎ) যে হারে নিউট্রিনো সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, তাতে সুপারনোভা বিস্ফোরণের ১০০০ বছর পরে তার তাপমাত্রা দাঁড়াবে ২×১০^{৯} ডিগ্রী কেলভিন। কারণ একটি নিউট্রন নক্ষত্রে প্রায় $১০^{১২}$ Gauss পর্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র থাকতে পারে।

নিউট্রন নক্ষত্র সম্পর্কে উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান লেখক এবং শ্রীপ্রভাস রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন যে আমাদের গ্যালাক্সিতে crab nebula-এর অভ্যন্তরে যে নিউট্রন নক্ষত্রটি (crab pulsar) রয়েছে এবং যার বয়স বর্তমানে ৯১৬ বছর (১০৫৪ খৃষ্টাব্দে চৈনিক জ্যোতির্বিদগণ এই সুপারনোভা বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন), তার থেকে [illegible] সময়েও সুপার হেভী নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। উপরন্তু, আমাদের ধারণা প্রায় ১০০ বছর পর পর একটি করে সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটে থাকে, তাই এক হাজার বছর যদি একটি নিউট্রন নক্ষত্রের তাপমাত্রা ২×১০^{৯} ডিগ্রী দাঁড়ায় (সুপারহেভী নিউক্লিয়াস তৈরি করতে যে তাপমাত্রার প্রয়োজন), তাহলে আমাদের গ্যালাক্সিতে অন্তত ১০টি নিউট্রন নক্ষত্র থেকে এই সুপারহেভী নিউক্লিয়াস পাওয়া সম্ভব হবে। এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা সম্ভব হয়েছে যে, মহাজাগতিক রশ্মিতে আমরা সব সময়েই একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ (steady flux) সুপারহেভী নিউক্লিয়াস পেতে পারি। অবশ্য হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে এর পরিমাণ [illegible] মহাজাগতিক রশ্মির মাত্র $৬/১০^{৪}$ অংশ।

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] অধ্যাপক P H Fowler এবং তাঁর সহকর্মীরা বর্তমানে আমেরিকায় মহাজাগতিক রশ্মিতে এই সুপারহেভী নিউক্লিয়াসের সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন, অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানীর মত আমরাও এই পরীক্ষার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

শিশু দেহের পটাশিয়াম

প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষের শরীরেও কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়। [illegible] তেজস্ক্রিয় পদার্থের মত মানবদেহের তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মি বিকিরণ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছে এ ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ বিকিরণের প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে মানুষের রোগ এবং শারীরিক বৈকল্য সম্পর্কে অনেক তথ্য তাঁরা যোগাতে পারেন।

সম্প্রতি ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের স্বাস্থ্য-পদার্থ বিভাগ সদ্যোজাত কোন শিশুর সারাদেহ থেকে নির্গত বিকিরণের মাত্রা মাপার একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন। শিশু দেহে মোট কী পরিমাণ পটাশিয়াম আছে, যন্ত্রটির সাহায্যে তা জানা যাবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বলতে পরমাণু থেকে নির্গত কণিকাদেরই বোঝায়। সাধারণ আলোকরশ্মির মতই তারা কোন একটি বা একাধিক উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়ে। অতএব ঐ কণিকার সংখ্যাই বিকিরণের মাত্রা পরিমাণ।

ভাবা পারমাণবিক কেন্দ্রের ঐ যন্ত্রটিতে কণিকাগুলির সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য দুটি ডিটেকটার বা সন্ধানী-যন্ত্র রয়েছে। প্রত্যেকটি সন্ধানী-যন্ত্র চোঙের মত দেখতে। উপবৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদ উচ্চতা ১০.৮ সেন্টিমিটার।...দুটিকে পরস্পর ৩৮ সেন্টিমিটার দূরে রাখা হয়েছে। তাদের মাঝে

বরাবর রয়েছে প্লেকসিগ্লাস-এর তৈরি শয্যা। শয্যার নিচে বল-বিয়ারিং, যাতে করে সেটিকে পরিমাপক কক্ষের মধ্যে সহজে নেয়ানেয়া করা যায়। এবং সমস্ত রকমের যন্ত্রপাতি সহ ঐ শয্যাটি ২০ সেন্টিমিটার পুরু ইস্পাতের আবরণে ঢাকা। যে শিশুটির দেহ নির্গত পটাশিয়াম-এর তেজষ্ক্রিয়তা মাপা হবে তাকে ঐ শয্যার উপর শুইয়ে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করান হয়। তার শরীরের উপরে এবং নীচে থাকে শিশুদেহ দেহ থেকে নির্গত পটাশিয়াম-৪০-এর বিকিরণ পরিমাপক ঐ দুটি যন্ত্র। বলা হয়েছে, ওদের তৈরি এই যন্ত্রটির কার্যক্ষমতা অনেক বেশি।

শিশুদেহের মোট পটাশিয়াম সংক্রান্ত বিকিরণের মাত্রা জেনে নিয়ে শিশু-রোগ বিশেষজ্ঞরা শিশুর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অনেকটা অবহিত হতে পারবেন। কোন শিশু কেন অত দুর্বল, তাদের বুদ্ধির হারই বা কম কেন, কী কী ধরনের রোগ তাদের দেহে দানা বেঁধে রয়েছে অথবা যথেষ্ট পরিমাণ সুষম খাদ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন কোন শিশু কেন অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে—সে সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য যোগাতে যন্ত্রটি সাহায্য করবে।

ইতিমধ্যে বোম্বাই-এর কে ই এম হাসপাতালের শিশু-রোগ বিভাগের চিকিৎসকরা পরীক্ষামূলক ভাবে যন্ত্রটি নিয়ে কাজও শুরু করেছেন। শিশুদের প্রোটিন এবং ক্যালোরি সম্পর্কিত অপুষ্টিজনিত রোগ নিবারণের ব্যাপারেই আপাতত ওঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন বেশি। এ ধরনের রোগের চিকিৎসার আগে এবং পরে শরীরের পটাশিয়ামে কতটা পরিবর্তন ঘটে বর্তমানে তার উপর অনুসন্ধান চলছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে এতে করে অনেকটা সাহায্য পাওয়া যাবে। ওঁদের সঙ্গে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরাও সহযোগিতা করছেন। ইতিমধ্যে বারোটি শিশুর উপর পর্যবেক্ষণও চালান হয়েছে।

এ ছাড়াও ঐ গবেষণা কেন্দ্র আর এক ধরনের বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্র তৈরি করেছেন। যা সুস্থ অথবা রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির শরীর কী পরিমাণ ভিটামিন বি-১২ শোষণ করছে, তা জানতে সাহায্য করবে। এর জন্যে ওঁরা কোবল্ট-৫৮ মিশ্রিত ভিটামিন বি-১২কে কাজে লাগাবেন।

মদ্যপান জনিত রোগ/প্রতিকার

অতিরিক্ত মদ্যপানের সবচাইতে শোচনীয় দিক হল, মানুষ মদকে নয়, মদই শেষ পর্যন্ত মানুষকে অধিকার করে নেয়। দৈহিক পরিশ্রম অথবা সাময়িকভাবে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা তখন বৃথা। নিয়মিত মদ্যপান তখন কারুর
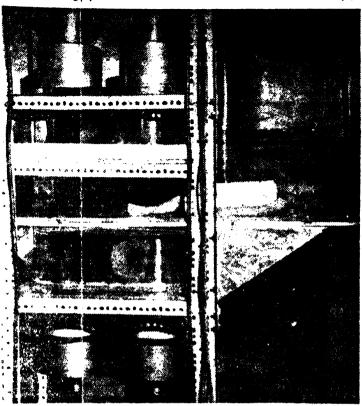
একটি শিশুর শরীরের তেজষ্ক্রিয়তা পরিমাপ করা হচ্ছে

ইচ্ছের উপর আর নির্ভর করে না। মদ তখন নেশা নয় খাদ্যদ্রব্যের মত যেন এক শারীরিক প্রয়োজন। এর নিয়মিত অনুপস্থিতে তখন নানা রকম উপসর্গের সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকের ভাষায় এরই নাম অ্যালকোহলিজম বা অধিক মদ্যপানজনিত রোগ। মানসিকতার উপর এ রোগের চাপ প্রচণ্ড। এর ফলে কখনও বারণে অবসাদভাব কাবু করে দেহ এবং মনকে গ্রাস করে ফেলে। কখনওবা অদ্ভুত স্বপ্নবিলাস। কেউ কেউ মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যান। কারুর বা মনে হয় রাজ্যের যত ভয় একমাত্র তাকেই যেন গ্রাস করতে চলেছে। আর এ সমস্ত লক্ষণ ধরা পড়ে তখন যখন কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকটি দিন মদের সান্নিধ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়।

কিন্তু মানুষ একবার মদে অভ্যস্থ হয়ে পড়লে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কি কোন পথ নেই? সম্প্রতি নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসিক-রোগ চিকিৎসক ডঃ ব্রুস রিটসন এর উত্তর খোঁজার জন্যে কতকগুলি ইঁদুরের উপর গবেষণা চালিয়েছিলেন। এবং এ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে অধিক মদ্যপানজনিত রোগ পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

ডঃ রিটসন-এর গবেষণা পদ্ধতি এই রকম ঃ

কতকগুলি ইঁদুরকে নিয়মিত তীব্র অধিকমাত্রায় অ্যালকোহল খাওয়াতে শুরু করেন। ছয় সপ্তাহ পর ইঁদুরগুলির মস্তিষ্কের রাসায়নিক কাজকর্মে বেশ বড় রকমের একটা পরিবর্তন ধরা পড়ল। মস্তিষ্কে সেরোটোনিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়। দেখা গেল, এই বস্তুটির মাত্রা সেখানে দারুণভাবে বেড়ে গেছে। আর সবচাইতে মজার ব্যাপার, ইঁদুরগুলিকে ঐ সময়ে যদি মদ্যপান থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাদের অনেকেই তখন হাত-পা খিঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কখনও বা ভীত এবং অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাব। কিন্তু মস্তিষ্কে সেরোটোনিন-এর মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার আগে যদি তাদের মদ্যপান থেকে বিরত করা যায় তাহলে ঐ ধরনের লক্ষণ আর প্রকাশ পায় না। মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মস্তিষ্কে সেরোটোনিন-এর মাত্রা বেড়ে গেলে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে উচ্ছ্বাস বা উদ্দামতার ভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মাত্রা কমে গেলে অত্যধিক শান্ত এবং আবেগপ্রবণতার অভাব ধরা পড়ে। একটা অদ্ভুত অবসাদভাব মানুষকে তখন গ্রাস করে। এবং ঐ অবস্থায় তার পক্ষে আত্মহত্যা করাটাও আশ্চর্যের কিছু নয়।

লেখকের ব্যর্থতা

আমাকে কি না শুনতে হয়! এই সেদিন সত্যেনবাবু লিখছিলেন, '[illegible] [illegible] করে দিন চালাচ্ছেন, বলুন…'

[illegible] বেশ [illegible] [illegible] লেখা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখা, [illegible] বাঁধা, ফুচকা বেচা…।

সত্যেনবাবুর জিজ্ঞাসা কিন্তু অন্য: সত্যেনবাবু জানতে চান, আমি কবে [illegible], [illegible] প্রভৃতি 'প্রকৃত সাহিত্য' [illegible] [illegible] সুযোগ [illegible] নিবেদন করার মনস্থির করব।

সে এক প্রশ্ন বটে, অর্থপূর্ণ এক প্রশ্ন। একদিকে মানতে হয় (যতদূর জানা যায়) উপন্যাস না লিখেই শেক্সপিয়ার, কবিতা না লিখেই [illegible] নাম করেছেন [illegible]। তবে বলুন, উপন্যাস আমার নাগালের বাইরে। আর কবিতা? সে আর এক কাহিনী। চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি, শপথ করলাম — আর না।

কাহিনী এই: একদিন, কি যেন [illegible] উপলক্ষে [illegible] বাড়িতে [illegible] [illegible] সঙ্গে দেখা হয়। [illegible] প্রোটোটাইপ। [illegible] [illegible] আছে; সেবারই ফ্রেঞ্চ শিখছে, ফরাসী কবিতার অনুবাদে ভর্তি করেছে [illegible] কাগজে বাঁধা ইয়া মোটা এক খাতা। ব্যক্তিটির [illegible] খাতাটা দেখার সৌভাগ্য [illegible] [illegible]। সেই সৌভাগ্য থেকে প্রলোভন, প্রলোভন থেকে সর্বনাশ। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে ভাবছিলাম, ফরাসী ছন্দ রেখে [illegible]…বাড়ি ফিরে স্থির করলাম, নিজেই [illegible] করলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি ছিল। প্রথমে কিন্তু তা বুঝিনি। প্রথমে পর পর দুজন সাহেবকে স্বরচিত অনুবাদ শুনিয়ে চমৎকৃত করলাম: ওরা রায় দিল ওই বাংলা অনুবাদটিতে ফরাসী ছন্দ পদে পদে বাজছে…। সেদিন এক স্বপ্ন দেখলাম: যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে উজাড় করে দিচ্ছিলাম কলকাতা নগরীর শ্রীবর্ধনের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট নোবেল পুরস্কারে প্রাপ্ত টাকার থলি। সগর্বে ভাবছিলাম, আমারই জন্য কলকাতার রাস্তাঘাট বিলিয়ার্ড বোর্ডের মতো মসৃণ, আমারই জন্য কলকাতার রাস্তা-ঘাট [illegible] [illegible] ফেটে যাওয়ার [illegible] থেকে মুক্ত, আমারই জন্য ট্রামগাড়ীর [illegible] [illegible] মুদিখানায় আর প্রবেশ করে না। আমার নামে সাদা পাথরের এক ফলক উন্মোচিত হচ্ছে (হাঁ, শুধু [illegible] [illegible] চাইনে, আমি আর চাই না [illegible]) খচিত হচ্ছে শুধু [illegible] সংরক্ষণার্থে'।

পরের দিন সকালে তাকে বলে বুঝতে [illegible] [illegible] এখনও ভালো মতো ওঠে নি, সবে মাত্র আড়ামোড়া ভাঙছে, সোজা গেলাম অনুবাদটা পকেটে নিয়ে আমার এক হিতাকাঙ্ক্ষী বাঙালী বন্ধুর ওখানে। এমন একজন, জানেন, আমি যাঁকে কোনো দিনই কটু কথা শোনাই নি (ও'র বউ ডাইনী-স্বভাবা, তবুও কিছু বলি নি; ও'র তিনটে সন্তান রাবণের অনুচর এক-একটা, তবুও মুখ সামলে থেকেছি) আর উনিই কি না অনুবাদটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়তে লাগলেন ওই মুর্গি পোষা, বিড়ি বাঁধা, ফুচকা বেচার প্রসংগটা।

ভদ্রলোকটি বললেন, টুথব্রাশটা টেবিলের এক কোণে রেখে: "ফরাসী ছন্দ একান্ত রাখতে চান, ফরাসীতেই লেখেন না কেন? আর বাংলারই চর্চা করেন যদি তবে মনে রাখবেন বাংলা ছন্দের এক বৈশিষ্ট্য আছে— আর সেটা আপনার মতো নির্ভেজাল বিদেশী কোনো জন্মে বুঝবেন কি না সন্দেহ।"

কেউ এবার যেন আর জিগ্যেস না করে কবিতা আমি লিখি না কেন।

তবে 'প্রকৃত সাহিত্যের' পর্যায়ে জীবনী নামক বস্তুটি যদি স্থান পায়, তা হলে প্রকৃত সাহিত্যের লেখকের মর্যাদার আমি আকাঙ্ক্ষী। যীশুর এক জীবনী আমি লিখতে চাই। সমস্যা কিন্তু আছে। ঐতিহাসিক তথ্য যোগাড় করে এক প্রামাণিক গ্রন্থ লেখা যায় বটে। যীশু দু' হাজার বছরের আগেকার ইস্রায়েল দেশের এক ইহুদী ছিলেন: তিনি কি অন্ন খেতেন, বস্ত্র পরতেন, গ্রন্থ পড়তেন,

মনে রাখবেন বাংলা ছন্দের এক বৈশিষ্ট্য আছে

থেকে কোথাও। এমন ক'জন মেলে যারা হতে পারে?"

সাধারণ মারীয়ার অসাধারণত্ব তাঁর আপন পিতামাতার চোখে না-ও পড়তে পারে, পড়েছে কিন্তু স্বয়ং পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে।

কথিক আছে, দূতসংবাদের সময়ে মারীয়া নাকি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছিলেন। আমি কিন্তু লিখেছি: কুটনো কুটছিলেন, 'সাধারণ মেয়ে' মারীয়া বঁটিতে কুটনো কুটছিলেন আর-পাঁচজনের মতো—আর আমার এই ব্যাখ্যাটা ঠিক। এদিকে কিন্তু মারীয়ার ঠোঁটের কোণে সেই মৃদু হাসির কল্পিত ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। মারীয়া যোসেফের অপেক্ষায় ছিলেন না, অপেক্ষায় ছিলেন মুক্তিদাতারই আগমনের। কাজ করতে করতে তিনি সত্যি সত্যি প্রার্থনা করছিলেন মনে মনে ভগবানের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন: মারীয়ার জীবনের প্রতিটি কর্মই ছিল প্রার্থনা...।

তিনি জানেন, আদমের পতনের পর থেকেই স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, তিনি জানেন, ঐশ জীবনে যাঁরা উজ্জীবিত না হয়ে মারা যায় স্বর্গে তাঁদের প্রবেশাধিকার নেই—আর আদি পিতার পাপের জন্য মানুষ মাত্রেরই সেই অবস্থা। অনেকে নরকে যান। কেউ কেউ অবশ্য গুরুতর পাপে লিপ্ত নয় বলে শয়তানের কবলেও পড়ে না, তবে—তাদের আত্মা উত্তরাধিকারসূত্রে-প্রাপ্ত আদিপাপে দূষিত হওয়াতে—স্বর্গের সেই রুদ্ধ দ্বারের সামনে তারা বসে আছে, ত্রাণকর্তার প্রতীক্ষায়।

কুটনো কুটতে কুটতে মারীয়া পরমেশ্বরকে বলছিলেন, 'তোমার রাজ্য-প্রতিষ্ঠা হোক, ত্রাণকর্তাকে প্রেরণ কর...' আর এই প্রার্থনা করতে করতে আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা উপভোগ করছিলেন বলেই তাঁর ওষ্ঠধরের কোণে সেই অনির্বচনীয় মৃদু হাসি।

মারীয়ার এই একান্ত আকাঙ্ক্ষা পরমেশ্বর শুনলেন; শুনে অপ্রত্যাশিতভাবে পূরণ করলেন: অবমানিত গালিলেয়া প্রদেশের অবজ্ঞাত সেই নাজারেথ গ্রামে তিনি দেবদূত গাব্রিয়েলকে প্রেরণ করলেন, সেই সাধারণ মেয়ের কাছে এক আশ্চর্য সংবাদ ঘোষণা করলেন—মুক্তিদাতার আগমনের শুভ সমাচার।

দেবদূতের অভিনন্দনে বিমূঢ় হওয়ার কোনো কারণ ছিল না, আর মারীয়াও বিমূঢ় হননি। এতে কিন্তু গাব্রিয়েল থামলেন না, বললেন, "পরম-অনুগৃহীতা"। 'মারীয়া' নামটা ব্যবহার না করে তাঁকে ডাকলেন "পরম-অনুগৃহীতা" বলে।

পরম-অনুগৃহীতা

। বাংলা ভাষায় সুহাসিনী, সুভাষিণী প্রভৃতি কত-না নাম আছে—সুমধুর আর অর্থপূর্ণ। মারীয়াকে প্রদত্ত নামটা কিন্তু অভিনব, মারীয়ার নাম "পরম-অনুগৃহীত"। নামটা বড় সার্থক—মারীয়া পরমেশ্বরের কাছে একান্তভাবে, অতুলনীয়ভাবে অনুগ্রহ লাভ করেছেন। শাস্ত্রে আছে, আব্রাহাম প্রভৃতি কুলপতি, দাউদ প্রভৃতি মহর্ষি 'প্রাচীন বিধানের' মহাপুরুষ ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু কেউই তো পরমেশ্বরের পরম-অনুগৃহীত হননি, অবমানিত প্রদেশের অবজ্ঞাত গ্রামের এই চোদ্দ বছরের সাধারণ মেয়েটির মতো।

দেবদূত বললেন, "ভয় করো না মারীয়া, তুমি পরমেশ্বরের সামনে অনুগ্রহ লাভ করেছ। গর্ভধারণ করে একটি পুত্রের জন্ম দেবে। তাঁর নাম রাখবে যীশু। তিনি মহান হয়ে উঠবেন, পরমেশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন: তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী হবে।"

গাব্রিয়েলের দৌত্যের তাৎপর্য বুঝতে মারীয়ার দেরি হল না। প্রবক্তা ইসায়া এক বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীতে ঘোষণা করেছিলেন, অল্পবয়স্ক এক কুমারীই ত্রাণকর্তাকে জন্ম দেবেন। মারীয়া বুঝলেন তাঁর কাছে পরম-পিতার প্রস্তাব, বুঝলেন দীর্ঘ-অপেক্ষিত ত্রাণকর্তা—যিনি হবেন, হায়, ইস্রায়েলের বহু-উপেক্ষিত ত্রাণকর্তা—ও'র সন্তান হয়ে জন্মাবেন, উনি তাঁকে খোকা বলবেন, তিনি এ'কে ডাকবেন 'মা' বলে মধুর সম্বোধনে।

দেবদূত বললেন, "পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন। তুমি আচ্ছাদিত হবে পরমেশ্বরের শক্তিতে। তোমার পবিত্র শিশুটি তাই পরমেশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন।"

মারীয়া বিশ্বাস করলেন সহজ সরল শিশুর মত, বিশ্বাস করলেন, অন্যদের কৌতূহলী প্রশ্ন না করে। কবে কখন কোথায় হবে মুক্তিদাতার জন্ম? তিনি কি রাজাধিরাজের বেশে আসবেন? আমি কি তাঁর গৌরবের অংশীদার হব?' এই ধরনের কোনো প্রশ্নই তিনি করলেন না। নম্রতার ভান করে বললেন না, 'আমি যে অত্যন্ত অযোগ্য'; বললেন না, 'একটু ধরে আসুন, আমাকে ভাবতে দিন'। শুধু বললেন, "আমি প্রভুর দাসী; আমার তাই হোক—তোমার কথা মতো।"

আর সেই সময়েই পরমপিতার অনন্য পুত্র অবতীর্ণ হলেন—অবমানিত এক প্রদেশের অবজ্ঞাত এক গ্রামের এক সাধারণ মেয়ের গর্ভে। আর সেই সময় থেকেই ঐ মেয়েটি হলেন পরম-অনুগৃহীতা ঈশ্বর-জননী মারীয়া।

দু হাতে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন দেবদূত।

লেখাটা আর এগুল না। যশোমতী ও শচীমাতার জন্যই এগুল না। বঙ্গ সাহিত্যের তাতে যে বিশেষ ক্ষতি হল, তা অবশ্য জোর গলায় বলতে পারি না।

ধূমপানের আনন্দের জন্যে পানামা...
একটি পানামা ধরিয়ে দেখুন। একেবারে প্রথম টানেই বুঝতে পারবেন ওর বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাকের চমৎকার টাটকা স্বাদগন্ধ। তারপর টানের পর টান আমেজের সঙ্গে টেনে চলুন। একেবারে শেষ টান পর্যন্ত পানামা আপনাকে দেবে ধূমপানের অপূর্ব আনন্দ।
Panama
20
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ,
বোম্বাই–৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম।

স্কাল্পটরস্ গিল্ডের উদ্যোগে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে সম্প্রতি একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে সাতজন তরুণ ভাস্কর শিল্পীর ১৪টি ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়। সেই সঙ্গে অধ্যক্ষ চিন্তামণি করেরও দুটি ভাস্কর্য সৃষ্টি চোখে পড়ে।

ছবির প্রদর্শনী নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—কয়েকটি বড় প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য কাজও হয়ত রাখা হয়। কিন্তু একমাত্র ভাস্কর্যশিল্পের খাতিরে ভাস্কর্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এখানে প্রতি বছর একবারই মাত্র হয়ে থাকে। সে কারণ এটির জন্য অনেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। বলা বাহুল্য, প্রতিবার এই প্রদর্শনী সরকারী আর্ট কলেজ প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, এবারে বিশেষ কারণে উদ্যোক্তাগণ তথ্য কেন্দ্রে আয়োজন করেছেন।

প্রদর্শনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ ভাস্কর্যশিল্পীদের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রগতিবাদী ও ভাস্কর্যশিল্পের সমকালীন বিভিন্ন রীতিতে শিল্পসৃষ্টি করেছেন। কাঠ, পাথর, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টার, কংক্রীট মাধ্যমেই অধিকাংশ ভাস্কর কাজ করেছেন—পোড়ামাটির একটি উদাহরণও দেখা যায়। কয়েকটি নিদর্শনে খ্যাতনামা পাশ্চাত্ত্য ভাস্করদের গঠন-কৌশলের প্রভাব দেখা গেলেও নিদর্শনগুলি দেখে বোঝা যায় যে নিছক অনুকরণ করার চেষ্টা তাঁরা করেননি। সব চেয়ে বড় কথা, কাজগুলি দেখে মনে হয় বিভিন্ন মাধ্যমরূপ তাঁরা আয়ত্ত করেছেন এবং তাঁদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য মত সকলেই সেগুলিকে নানা প্রকারে ও গঠন বৈচিত্র্যে বিভিন্ন বিশিষ্ট আকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। নিরঞ্জন প্রধানের দুটি কাজই কাঠ থেকে তৈরী। নর্থ উইন্ড ও সাউথ উইন্ডে ভাস্কর বিপরীত ধর্মী দুটি শক্তির রূপ খোদিত আকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নায়িকার কলাপ্রধান গঠনরীতি, বিশেষ করে সাবলীলতা অনেকের চোখে পড়ে। দিলীপ সাহা একটি কাজে নেগেটিভ ফর্মের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, যেমন টেনসন। ইনটিগ্রেটেড আকার ও দানা (grain) বজায় রেখে, শাখাটি খোদাই করে নতুন রূপ ও আকার দান করার চেষ্টা করেছেন—ফলে একটি স্বাভাবিক অথচ নতুনতর আকার তথা আবেদন ফুটে উঠেছে। অ্যালুমিনিয়মে কাজ করেছেন দু'জন—করবী ঘোষ ও অনীত ঘোষ। গঠন কৌশলের জন্য প্রথমজনের রেডি ফর ব্যাটল-এ একটি গতিবেগ

নায়িকা (কাঠ) —নিরঞ্জন প্রধান

সঞ্চারিত হয়েছে। দ্বিতীয়জন অ্যালুমিনিয়ম পাত সাহায্যে প্রতীকমূলক আকার সৃষ্টি করেছেন। করবী ঘোষের কমপোজিশন (কাঠ) ও উড়ন্ত—বিশেষত পরস্পর সংলগ্ন দুটি আকার খোদাই করে তিনি প্রশংসা দাবি করেন। দেবব্রত চক্রবর্তী ও অশেষ মিত্র উভয়েই কংক্রীট ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি মূর্তি সুসমন্বিতভাবে গঠন ও সুসংস্থাপিত করে দেবব্রত চক্রবর্তী হারমনি অব লাইফ-এ মানবজীবনের সামঞ্জস্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। ওয়াইল্ড ফর্ম ছোট নিদর্শন। ওপরে ছোট একটি গোলাকার গর্ত করে ফেলে ভাস্কর এটিতে একটি বিশেষ রূপ আরোপ করেছেন। মধুসূদন চক্রবর্তী প্লাস্টার ও পোড়ামাটির পক্ষপাতী। অনেকের কমপোজিশন চোখে, পড়ে। প্রতীকরূপী দুটি পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ রূপ এটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। খ্যাতনামা ভাস্করশিল্পী চিন্তামণি করের ওডালিস্ক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি কাষ্ঠখণ্ডকে খোদাই করে তিনি সাবলীল আকারের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতপ্রধান রূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন। গঠন পদ্ধতি, আকার ও আয়তনিক সমতার এটি একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নারীদেহের কমনীয়তা, বিশেষ করে আয়তনিক সৌন্দর্য তথা আবেদনের জন্য সিবিল অনেকের চোখে পড়ে।

*

শিল্পী দুলু রায় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে জলরঙ ও টেম্পারায় আঁকা ২৩টি ছবি দেখা যায়। শিল্পী বিজ্ঞানের ছাত্র, বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রনিকস্ বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন। সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি কোনওদিন শিল্প শিক্ষা করেননি, তবে কাজ দেখে মনে হয় ছবি আঁকার দিকে তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের কাজ আশা করা নিরর্থক। কয়েক স্থলে তাঁর রচনা যে শিক্ষার্থীসুলভ হবে সেটা

মেসেঞ্জারস অব লাইট —দুলু রায়

স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও প্রয়াস হিসাবে দু'একটি চোখে পড়ে। যে ক্ষেত্রে তিনি পৃষ্ঠভূমিটুকু কারুকার্যবহুল করার জন্য নানারঙ ব্যবহার করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি কিছু সাফল্যলাভ করেছেন—অর্থাৎ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সেখানে কয়েকটি ইমেজারির সৃষ্টি হয়েছে, যেমন মেসেঞ্জারস অব লাইট। এই প্রসঙ্গে অ্যাফেকশন ও দি স্ট্রাগল-এর নাম করা যায়। কারুকার্যের জন্য দু-একটি মন্দ লাগে না, যেমন বার্ডস অব সরো। কয়েকটিতে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কনরীতির প্রভাব দেখা যায়—বিশেষ করে কমপ্যানিয়ন ও দি ইটারনাল সুইং-এ।

*

নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থার উদ্যোগে কলকাতার ডিজাইন কেন্দ্রে বিহার প্রদেশের হস্তশিল্পের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প প্রদর্শনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, অনেক ক্ষেত্রে কোনও হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করেই বিশেষ কোনও গ্রাম বা স্থান পরিচিতি লাভ করে। এই প্রদর্শনীতেও তা দেখা গেল। বিশেষ একটি শিল্পের মধ্য দিয়ে একটি স্থান সুপরিচিত হয়ে উঠল—যেমন মধুবাণী। দ্বারভাঙ্গা জেলার এই স্থানটি আজ রসিকজনের সুপরিচিত। বলা বাহুল্য প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল মধুবাণীর চিত্রাবলী। পূর্বকালে মধুবাণীর বিধবা নারীবৃন্দ নববিবাহিতার বাসরঘরের দেওয়ালের ওপর নানা লোকচিত্র আঁকতেন। সরলতাই ছিল এই জাতীয় ছবির প্রধান আকর্ষণ। সম্প্রতি কয়েক বছর পাটনার ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন কর্তৃপক্ষ মধুবাণী চিত্রের প্রসার-কল্পে মধুবাণীর মহিলাদের হাতে তৈরী কাগজ দেন ও অর্থের বিনিময়ে এ জাতীয় ছবি সংগ্রহ করেন। সাধারণ কঞ্চির কলম, দেশী নানা রঙের পুরিয়া ও তুলির পরিবর্তে কঞ্চির কলমের মধ্যে রাখা তুলার গুঁজি বা সলতে—মধুবাণী চিত্র আঁকার জন্য এইমাত্র সরঞ্জাম। মধুবাণী চিত্র দুই শ্রেণীর—কালির, রেখা প্রধান ও রঙীন। রঙ ও রেখার স্বতঃস্ফূর্ত কারুকার্য, বিশেষ করে প্রাচীন লোকচিত্রমূলক নানা প্রতীক ও চিহ্ন ব্যবহারের জন্য মধুবাণী চিত্র রসিকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাস্তবিকই রঙ বাঞ্জনা ও রেখার সূক্ষ্মতা দেখে অনেক সময়ে এগুলিকে গ্রাফিক প্রিন্ট বলে ভুল হয়। গত বছর তাঁর অপূর্ব ছবির জন্য অশীতিবর্ষীয়া শ্রীমতী জগদম্বা দেবী (মধুবাণী) জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। আর একটি কথা—এগুলি সস্তা—মাত্র ৮।১০ টাকায় একটি মধুবাণী চিত্র নিদর্শন সংগ্রহ করা যায়।

প্রদর্শনীটি রুচিসম্মতভাবে সাজানো [illegible] এবং বিহারের বিভিন্ন স্থানে তৈরী [illegible] বস্তু সেখানে দেখা যায়। ওবায় [illegible] তৈরী কার্পেট, নালপুরের কাঠের সূক্ষ্ম কাজ করা নানা বাক্স, দ্বারভাঙ্গার সিকি ঘাসের তৈরী ঝাঁপি, পুতুল ডালা, মুঞ্জ ঘাসের তৈরী বড় ঝাঁপি, রাঁচি ও হাজারিবাগের পিতলের প্রদীপ ও দীপাধার, গালার কাজ করা সিঁদুর কৌটো, সেরাই-কেল্লার ছউ নৃত্যে ব্যবহৃত কাগজমণ্ডের মুখোশ, গয়ার পাথরের নানা বাসন, রাঁচি, পাটনা ও জামশেদপুরের তৈরী বাঁশের রঙীন নানা পুতুল ও কাশিদার নিদর্শনও প্রদর্শনীতে দেখা যায়।

—চিত্রপ্রিয়

নর্তকী (মধুবাণী চিত্র)

সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

[অধ্যক্ষ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়]

এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে সামগ্রিক আর্থিক উন্নতি কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিশেষ করে উন্নতিকামী দেশে যেখানে এখনও শতকরা ৭০—৮০ ভাগ লোক পল্লী অঞ্চলে, এবং জাতীয় আয়ের অর্ধেকের উপর কৃষির উপর নির্ভরশীল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাবার জন্য ও পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করবার জন্য কৃষি উৎপাদন বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। তা সম্ভবপর না হলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয় এবং কৃষিজ পণ্যের উপর নির্ভরশীল শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করাও যাবে না এবং অর্থনৈতিক কাঠামো বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের ভেঙে পড়বে। কৃষির উন্নতি সাধন করতে হলে যেমন ভূমি সংস্কার প্রভৃতির প্রয়োজন আছে—তেমনি তার সঙ্গে কৃষি পদ্ধতিকে আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক করতে হবে। গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও উন্নত কারিগরি নৈপুণ্য প্রয়োগ করতে হবে—যার ফলে কৃষক নিজের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল বাজারে বিক্রয় করতে পারবে ও খামারগুলি ক্রমশ ব্যবসায় ভিত্তিক (commercial) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবে। এই পরিবর্তনসাধনে [illegible] দেশে চাই যথোপযুক্ত ফলিত গবেষণা (applied research) যা খামারভিত্তিক (farm oriented) হবে এবং কৃষকের বা কৃষির সমস্যার সমাধান করতে পারবে। সেইসঙ্গে প্রশিক্ষণ ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সম্প্রসারণ (extension) করতে হবে যাতে করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি কৃষকের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কৃষির আমূল পরিবর্তন—যা বর্তমানে আমাদের দেশে একান্ত কাম্য, তার জন্য উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গেলে কৃষি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যথোপযুক্ত কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করা সম্ভব বলে মনে হয় না। মোটামুটিভাবে [illegible] করতে গেলে তিন জাতীয় লোককে প্রযুক্তি বিদ্যায় যথোপযুক্ত জ্ঞান ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা দেওয়াই কৃষিশিক্ষার লক্ষ্য। প্রথমতঃ কৃষক ও খামারে বা কৃষিক্ষেত্রে লিপ্ত কর্মী বা শ্রমিক, দ্বিতীয়তঃ সম্প্রসারণের বা প্রশিক্ষণের কাজে লিপ্ত হবেন এরকম কর্মী ও তৃতীয়তঃ যাঁরা গবেষণা, কৃষিপ্রশাসন বা কৃষিভিত্তিক শিল্পের সঙ্গে লিপ্ত থাকবেন—এই তিন শ্রেণীর লোকের কথা ভেবেই কৃষিশিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

কৃষক এবং কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের এবং তাদের পরিবারের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তাঁরা শিক্ষালাভের ফলে কৃষিতে নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিগুলির সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারবেন ও সেগুলি গ্রহণ ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন। এছাড়া এঁরা খামারের পরিচালনা ও বিপণন সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন এবং সামাজিক দায়িত্ব নিতে পারবেন। উন্নত দেশে সাধারণত প্রায় সকলেই মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন বা সহজেই করতে পারেন ও কৃষি খুবই অগ্রসর এবং খামারগুলি ভালভাবে পরিচালিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই সব দেশে যাঁরা ক্ষেত্রের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের প্রশিক্ষণ সহজ ও কমসংখ্যক লোককে প্রশিক্ষণ দিলেই চলে। এই শিক্ষা সাধারণত বিশেষ কোন উন্নত পদ্ধতি বা কোন কারিগরি বৃত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অনেক দেশে বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় আছে যেখানে শিক্ষার্থী এই বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করে খামারের কাজে দক্ষতা অর্জন করে। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর লক্ষ্য নয়—তারা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে নিজের খামারে কাজ করে বা নিজ তত্ত্বাবধানে নতুন খামার খোলে। (School for Vocational agriculture)।

উন্নতিকামী দেশগুলিতে এখনও অনেক লোক, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে, যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করেনি। বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তনও অনেক দেশে এখনও হয়নি। সেজন্য বহুলাংশে নিরক্ষর বা খানিকটা লেখাপড়া জানা কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষি কারিগরি শিক্ষার বিকিরণ বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে। পুঁথিগত বিদ্যা, বিশেষ করে বয়স্ক লোকদের মধ্যে খুবই কম উপকার করতে পারে—এদের জন্য বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষাও নিরর্থক বলেই মনে হয়। বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, বিশেষ কোন কাজে দক্ষতা বা জ্ঞান কৃষক বা কৃষিকাজে নিজেকে নিয়োগ করবেন এমন কোন ব্যক্তি, লাভ করতে চান যেমন ধরুন বাগান, সবজির চাষ বা মুরগী পালন—কিন্তু বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবাংলায় এমন কোন ব্যবস্থা নেই যাতে করে তিনি সহজে

করতে পারে না। এবং তার সুযোগ ও পরিবেশ কোনটাই নেই।

সরকারী কৃষিবিভাগ মধ্যে মধ্যে কৃষকদের কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন সন্দেহ নেই—কিন্তু তা অত্যন্ত সাময়িক ও অনিয়মিত। সুষ্ঠু, পরিকল্পনা মাফিক কোন ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেই সব ব্যবস্থাতে কৃষিকর্মের শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা লাভের সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন) এর স্তরে কৃষি বিষয়ে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একান্ত অপ্রতুলতা ও [illegible] উপলব্ধি করে বিশেষ সুপারিশ করেছেন কৃষিবিষয়ক বিদ্যালয় (agricultural polytechnic) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিল্পক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (Industrial Training Institute বা Polytechnic) যেমন বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তেমনি কৃষিতেও সেই রকম শিক্ষাকেন্দ্রের আবশ্যকতা আছে। তামিলনাড়ুতে এই রকম শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশে 'মানুফেরী' (manufery) বিদ্যালয় আছে যেখানে এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেন কোনও ব্যবস্থা এখনও নেওয়া হয়নি। [illegible] ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (I.C.A.R.) [illegible] দক্ষতা লাভের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন লাভের জন্য সর্বার্থসাধক বহুমুখী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দরকার। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত [illegible] এই বিষয়ে সরকারী কৃষিবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বলে জানা যায়। কৃষকদের সক্রিয় সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করতে গেলে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাকেন্দ্র বা এগ্রিকালচারাল পলিটেকনিকের কথা ভাববার সময় এসে গিয়েছে বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের কয়েকটি গ্রামসেবক শিক্ষাকেন্দ্র আছে—যেখানে গ্রামসেবকের কাজে যাঁরা নিযুক্ত আছেন বা নিযুক্ত হবেন তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পুঁথিগত ও কারিগরি বৃত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই রকম হরিণঘাটা দুগ্ধ কেন্দ্রে দুগ্ধ বিষয় বা পশুপালন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এগ্রিকালচারাল পলিটেকনিকের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর বলে মনে হয়। কেননা এখানে সব রকম সুযোগ রয়েছে। যেসব ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার আছে, বা পলিটেকনিক আছে, সেখানেও কৃষি বিষয়ক বিশেষ করে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামতি সম্বন্ধে কার্যকরী শিক্ষা প্রবর্তন করা যেতে পারে বলে মনে হয়। বর্তমানে কৃষিকে উন্নত করতে গেলে বহুলাংশে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা কৃষিকে 'যান্ত্রিক' (mechanized) করতে হবে। তাছাড়া সেচের জন্যও পাম্পের ব্যবহারও করতে হবে। সেই যন্ত্র বিষয়ক শিক্ষা, বা পূর্তবিষয়ক শিক্ষা সহজেই দেওয়া যেতে পারে পলিটেকনিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে। যে সব দেশে কৃষিতে খুব কম সংখ্যক লোক নিযুক্ত আছেন ও কৃষি পদ্ধতি যান্ত্রিক ও উন্নত সে দেশেও কৃষিতে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা যেরূপ আছে বা যে চিন্তা করা হয়, আমাদের দেশে বা এখনও বহুলাংশে কৃষিপ্রধান, সেরূপ ব্যবস্থা নাই। দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের সাপেক্ষে বিশেষ কোন তথ্যমূলক গবেষণা বা প্রচেষ্টা হয়েছে বলেও মনে হয় না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কৃষি শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে দেওয়া হ'য়ে থাকে। প্রসঙ্গত এখানে কথা উঠতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা দু'টি বিভিন্ন স্তরে বিচার করা হয় কেন। এর সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, সাধারণত কৃষি বিশেষজ্ঞকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথমত, যাঁরা কৃষি কার্যে দক্ষতা ও প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং মূলত সম্প্রসারণ কার্যে বা খামার পরিচালনা বা
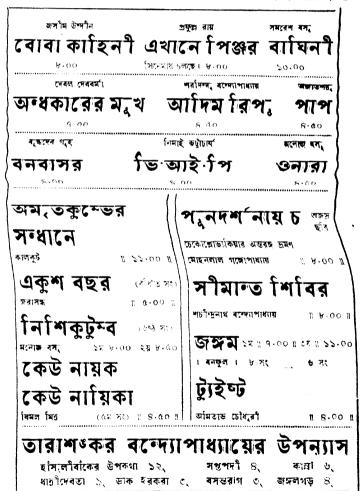
ঐ ধরনের কার্যে লিপ্ত থাকেন—যাঁদের আমরা কৃষি বিশেষজ্ঞ (agriculturist বা agriculture specialist) বলি, আর এক শ্রেণীর লোক কৃষি বিষয়ে প্রযুক্ত বৈজ্ঞানিক (agricultural scientist) বা কৃষি প্রশাসনিক (agricultural administrator) বা কৃষি পরিকল্পনাকারক (agricultural planner) বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। এই দুই স্তরে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতির পার্থক্য আছে এবং সমন্বয় সাধন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে বা কোনও বিশেষ শাখায় সম্ভবপর হ'তে পারে, কিন্তু ব্যাপকভাবে এই প্রচেষ্টা সময়সাপেক্ষ ও অর্থবহুল। হল্যাণ্ডে ওয়াগিনগেনজেন (Wagingengen) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে সাত বৎসরের পাঠক্রমে এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে যার ফলে কৃতী স্নাতক একাধারে কৃষিকার্যে পারদর্শী ও কৃষি বৈজ্ঞানিক হতে পারেন, কিন্তু অন্যত্র আলাদাভাবে দেখা হয়। কৃষি বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক ও পরিকল্পনিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন স্নাতকোত্তর স্তরে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে (F A O) কৃষিস্নাতক যাঁরা কৃষিকার্যে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং সম্প্রসারণের কার্য বা কৃষিক্ষেত্র পরিচালনা বা কৃষককে শিক্ষণের কার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁদের শিক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কৃষি মহাবিদ্যালয়ে প্রধান লক্ষ হওয়া উচিত। এঁরাই হচ্ছেন কৃষি গবেষক ও কৃষি প্রশাসকের এবং কৃষকের মধ্যে সেতু। এঁদের পারদর্শিতা, কর্মদক্ষতার উপর কৃষি পরিকল্পনা কার্যে রূপায়ণের সাফল্য নির্ভর করে।

কৃষি তথা গ্রামীণ উন্নতির দিকে লক্ষ রেখে প্রথম শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯—রাধাকৃষ্ণ কমিশন) "গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়" (Rural University)-এর প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিলেন। প্রথম যুক্ত ভারত-মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দল (First Joint Indo U. S. Agricultural Team—১৯৫৪-৫৫) এই সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই কতকগুলি বাস্তব উপদেশ দেন কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাঁদের বিবরণীতে (report) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার কথা উল্লেখ করেন। সেই সুপারিশকে কেন্দ্র করেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা শুরু হয়। ভারতে প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় উত্তর প্রদেশ তরাই অঞ্চলে, পান্তনগরে (নৈনিতালের কাছে)—যা এখন উত্তর প্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রূপে (U. P. Agricultural University) প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ক্রমশ অনেক রাজ্যেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন—১৯৬৪-৬৬) প্রত্যেক প্রদেশেই একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার সুপারিশ করেছেন। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কমিশন সুস্পষ্টভাবে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণের সম্মিলিত বা সংযুক্ত একটি কার্যক্রম নিতে হবে (integrated programme of teaching, research and extension) কেননা কৃষিশিক্ষায় সার্থক হতে হ'লে গবেষণাকেও সম্প্রসারণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হতে হবে। গবেষণা কার্যকরী করতে হলে সম্প্রসারণের সাথে যুক্ত হতে হবে যাতে করে কৃষকের সমস্যা গবেষকের পক্ষে জানা সম্ভব হবে এবং কৃষি উন্নতির বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি অসুবিধা হচ্ছে সে তথ্যও গবেষকের গোচরীভূত হবে। উপযুক্ত ও সার্থক গবেষণা ছাড়া সম্প্রসারণ কার্যে সফলতা লাভ করা যায় না এবং সুযোগ্য শিক্ষিত কর্মী ছাড়া সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়। সাবেকপন্থী চিন্তাধারা অনুযায়ী শুধু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কৃষি মহাবিদ্যালয় কোনদিন সার্থকতা লাভ করতে পারে না। এছাড়াও কমিশন নির্দেশ দিয়েছেন যে, গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধান যাতে প্রত্যক্ষভাবে অল্প সময়ের মধ্যে হতে পারে সেইদিকে লক্ষ রাখতে হবে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে। গ্রামীণ অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতাকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে ও সেজন্য বহুবিধ ফলিত-বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। শুধু স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শিক্ষা ও গবেষণার মধ্যেই কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, পরন্তু যাঁরা ডিগ্রী বা উপাধি লাভে আগ্রহী বা শিক্ষার্থী নন তাঁদেরও কৃষি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদেরও শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। যেহেতু কৃষির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি পদ্ধতি পরিবর্তনশীল, সেহেতু মধ্যে মধ্যে কৃষকদের বা কৃষিতে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মোটকথা কৃষির, কৃষকের, কৃষকসমাজের ও গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার দিকে সদা জাগ্রত লক্ষ রাখতে হবে ও তাদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে—তা না হলে সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর হবে না। সেবা ও ত্যাগের আদর্শে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাণ্ড গ্রাণ্ট (Land grant) বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও কাঠামো লক্ষ রেখেই এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মনীতি নির্ধারণে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা কমিশন। তবে ল্যাণ্ড গ্রাণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিষয়ক কর্মসূচির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও অনেক পার্থক্য আছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার জন্য ও স্বকীয় স্বাধীনতা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচুর পরিমাণ ভূমিদান করা হয়েছে যা পরিচালনা করে বা বিক্রয় করে বা যে কোন সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্থায়ী অর্থ ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে এবং সর্বদাই সরকারের উপর মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না আর্থিক সাহায্যের জন্য। অর্থনৈতিক সুযোগ ও স্বকীয় স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয় গঠন ও সম্প্রসারণের পক্ষে যে অপরিহার্য তা সকলেই স্বীকার করবেন। তাছাড়া এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেওয়া আছে—যা অনেক জায়গায় সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালকরাও নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতবর্ষে পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) বহুলাংশে সার্থক হয়েছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় কৃষির বর্তমান উন্নতির ক্ষেত্রে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান যথেষ্ট। তাছাড়া উত্তর প্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, অন্ধ্র প্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজ নিজ প্রদেশে ও ভারতবর্ষের কৃষি উন্নতির যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। ক্রমশ প্রত্যেক প্রদেশেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে বা হতে চলেছে।

অনেকের ধারণা আছে যে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞানের শিক্ষা বা গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে না এবং কলা ও বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত বিকাশ হওয়া সম্ভবপর নয়। এই ধারণা ঠিক নয়। শিক্ষা কমিশন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞানের শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থার কথা বলেছেন, কেননা কৃষির উন্নতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ফলিত বিজ্ঞানের বিকাশের দ্বারাই সম্ভব। অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কৃষিতে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় না একথা সকলেই জানেন। শিক্ষা কমিশনের মতে বিষয়বস্তু শিক্ষা ও গবেষণা কৃষিকেন্দ্রিক (polarization round agriculture) ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উন্নতির সঙ্গে জড়িত থাকাই বাঞ্ছনীয়। যুক্তরাষ্ট্রে ল্যাণ্ড গ্রাণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিষয়েই শিক্ষার ও গবেষণার সুযোগ আছে। M. I. T. (Masachussets Institute of Technology)তে অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা ও গবেষণা অত্যন্ত উচ্চমানের। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ নরম্যান বোরলাগের উচ্চ ফলনশীল মেক্সিকান গমের আবিষ্কারের কৃতিত্ব বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের

চেয়ে নিম্নমানের বলে মনে হবে না। বিচার বা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের দেশে বর্তমান অর্থনৈতিক ও গ্রামীণ উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

এবার পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষার ব্যাপারে আসা যাক। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, অতীতে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শিক্ষার ইতিহাস খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে যদিও বঙ্গদেশ মূলত কৃষিপ্রধান ছিল তবু ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা কৃষি শিক্ষার উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয় শিবপুরে——কিন্তু প্রথম কৃষি বিষয়ক মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ভাগলপুরের সন্নিকটে সাবোরে (তখন অবিভক্ত বাংলায় তদানীন্তন সংযুক্ত বাংলা বিহারে)। শিবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অবশ্য কৃষিগঠনের সুযোগ সুবিধা ছিল—কিন্তু তার সদ্ব্যবহার কতখানি হয়েছে বা ঐ পরিবেশে কৃষিশিক্ষা কতখানি বিকাশ লাভ করেছিল তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে এটুকু অনুমান করা কষ্ট হবে না যে, সেই কৃষিশিক্ষার ক্ষেত্র খুবই সীমিত ছিল ও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবলুপ্তির মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে। সেখানে যে কৃষি শিক্ষা হতো তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না একমাত্র কলেজের ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে ছাড়া।

সাবোরের কৃষি মহাবিদ্যালয় ক্রমশ সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয় ও ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের কৃষি শিক্ষার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। বিহার সরকারের সরকারী কৃষি গবেষণাগারও এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু বিশ দশকের শেষের দিকে কৃষি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীর অভাবে বা অর্থনৈতিক কারণে এই মহাবিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, তদানীন্তন পাঞ্জাবে লায়ালপুর কৃষি মহাবিদ্যালয়, বোম্বাই প্রদেশে পুণা কৃষি মহাবিদ্যালয়, মধ্য প্রদেশে নাগপুর কৃষি মহাবিদ্যালয়, মাদ্রাজে কয়েম্বাটুর কৃষি মহাবিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশে এলাহাবাদ ও কানপুর কৃষি মহাবিদ্যালয় যথারীতি চলতে থাকে—সেগুলি কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। পরন্তু ঐসব মহাবিদ্যালয়ে গবেষণা ও শিক্ষা উচ্চমানের হওয়ার দরুণ ঐসব প্রদেশে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়। প্রথম শিক্ষা কমিশন পুণা, লায়ালপুর, কয়েম্বাটুরস্থিত কৃষি মহাবিদ্যালয়ের সার্থকতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই সব প্রদেশে মহাবিদ্যালয় বন্ধ না হয়ে যাওয়ার দরুণ কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা অব্যাহত থাকে, তার ফলেই ঐসব প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বহুলাংশে কৃষি উৎপাদনে উন্নত হতে পেরেছে। ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলায় সরকারী কৃষি বিভাগ ঢাকাতে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনা করেন। কিন্তু [illegible] উদ্যোক্তার মনে কৃষি শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল সেজন্য ইন্টারমিডিয়েট ইন সায়েন্সের পর তিন বৎসরের পাঠক্রম না করে চার বৎসরের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা হয়। প্রথম দুই বৎসর বি এস সি কোর্স ও পরে দুই বৎসর বি এ জি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কৃষি বিভাগের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মনে করেছিলেন যে, শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃষি শিক্ষা যথেষ্ট সমাদর না পেলে বা কৃষি স্নাতকের চাহিদা না থাকলে পর বি এস-সি পাশ করার পর ছাত্ররা এম এস-সি পড়ার সুযোগ পাবে। এইভাবে ঢাকাস্থিত কৃষি মহাবিদ্যালয় আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ দেশ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে এই মহাবিদ্যালয় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ কৃষি শিক্ষার জন্য কোন মহাবিদ্যালয়ই থাকে না।

দেশ স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনার কথা স্বভাবত **সকলের মনের মধ্যে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি**

মহাবিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারী মহলে অনেকেই সন্দিহান হন। তাঁরা এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ মূলত শিল্পপ্রধান হবে। ভবিষ্যতে কৃষি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুবই সীমিত কেননা কৃষি উন্নতিও সীমাবদ্ধ থাকবে। অল্পসংখ্যক কৃষি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে—সেজন্য বৃত্তি দিয়ে বাংলা দেশের বাইরে কোন কৃষি মহাবিদ্যালয়ে পাঠালেই চলবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু সংখ্যক ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে এলাহাবাদ, পুণা, কয়ম্বাটুর প্রভৃতি জায়গায় কৃষি শিক্ষার জন্য পাঠান হয়। এখানে বোধকরি এটা বলা প্রয়োজন যে, পাঞ্জাবও কৃষি মহাবিদ্যালয় হারায়, কেননা লায়ালপুর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। কিন্তু পাঞ্জাব অল্পদিনের মধ্যে হোসিয়ারপুরে কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনা করে, পরে লুধিয়ানাতে স্থায়ীভাবে মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়—যা বর্তমানে পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠার মূলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান খয়রা অধ্যাপক পবিত্রকুমার সেনের অবদান যথেষ্ট। তিনিই প্রথম আগ্রহশীল হয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ঝাড়গ্রামে প্রথম কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনা করেন ১৯৫০-৫১ সালে। ঝাড়গ্রামের রাজার অর্থ সাহায্য ও জমি দানের ফলে তাঁর পক্ষে এই কার্যে ব্রতী হওয়া সম্ভবপর হয়। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপনায় আগ্রহশীল হন। টালিগঞ্জে রাণীকুঠীতে এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালে ঝাড়গ্রামে স্নাতক ছাত্র ভর্তি বন্ধ হয়ে যায় এবং পশ্চিমবঙ্গে তখন একটি মহাবিদ্যালয় থাকে। টালিগঞ্জে কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সকলেই অনুভব করেন যে, শহরের মধ্যে কৃষি মহাবিদ্যালয় তথা কৃষি গবেষণা ঠিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য হরিণঘাটাতে স্থায়ী ভবন নির্মাণের পর মহাবিদ্যালয়কে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটা সকলে বিবেচনা করেছিলেন যে, হরিণঘাটার কৃষি পরিবেশে ও বিরাট কৃষি ও পশুপালন ক্ষেত্রের মধ্যে মহাবিদ্যালয় অবস্থিত হওয়ার ফলে কৃষি ও পশু শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা শিক্ষার্থীরা পাবে ও যোগ্য কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষি কর্মী গঠনের সম্ভাবনা থাকবে। ১৯৫৪ সালে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করেন। ১৯৫৮ সালে কৃষি মহাবিদ্যালয় টালিগঞ্জ থেকে হরিণঘাটায় স্থানান্তরিত হয়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, হরিণঘাটায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগেই টালিগঞ্জে থাকাকালেই কৃষি মহাবিদ্যালয় তার স্থায়ী সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়। সীমিত সুযোগ সুবিধার মধ্যেই এই মহাবিদ্যালয় ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর কৃষি মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নিতে পারে। এর মূলে একাধারে শিক্ষকমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের তদানীন্তন সচিব ও বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করুণাকেতন সেনের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনুকূল্য ছিল।

১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কৃষিকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনায় আগ্রহশীল হন। তিনি স্বয়ং শিক্ষা ও কৃষি বিভাগের সচিবদ্বয়ের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ল্যান্ড গ্র্যান্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তাঁর ইচ্ছা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে বাস্তবে রূপান্তরিত হয় ১৯৬০ সালে। কৃষি মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসন ১৯৬১ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কৃষি মহাবিদ্যালয়কে হরিণঘাটা থেকে কল্যাণীতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শিক্ষাকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ও আংশিকভাবে কার্যকরী করা হয়েছে। বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বিশ্বভারতীর অধীনে শ্রীনিকেতনে পল্লী শিক্ষাসদনে স্নাতক বা বি এস সি এ জি ডিগ্রী কোর্সে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পল্লী শিক্ষা সদনে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। স্নাতক বিভাগে ছাত্র সংখ্যা সীমিত।

স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রথমে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিভাগে ১৯৫৪ সালে প্রবর্তিত হয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার পর ১৯৬১ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ কর্তৃক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে ও ক্রমশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের শিক্ষামূলক কাজগুলি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমশ স্থানান্তরিত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার মধ্যে আসবে। ১৮ বৎসরের মধ্যে কৃষি মহাবিদ্যালয় দুই জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের জন্য কৃষি-শিক্ষা বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আশা করা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শিক্ষা স্থায়ীভাবে দৃঢ় আসন লাভ করতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে কৃষি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্রদের ব্যাপক বেকারত্বের কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। অনেকের ধারণা যে, যখন শিক্ষালাভের পরও যথেষ্ট পরিমাণ ছাত্র উপযুক্ত বৃত্তি বা চাকুরী লাভে সমর্থ হচ্ছে না তখন কৃষি শিক্ষার সঙ্কোচনের আবশ্যকীয়তা আছে। অনেকেরই মন এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পরস্পর বিপরীতধর্মী অবস্থার সম্মুখীন হতে চলেছে কৃষি শিক্ষার চাহিদা। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশে বর্তমান অবস্থা থেকে কৃষিকে উন্নত করতে হ'লে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কৃষির ব্যবস্থা করতে হ'লে প্রচুর পরিমাণ শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষে প্রতি হাজার কৃষকের জন্য একটি কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক (Agricultural Extension Officer) আছে। নিবিড় চাষের পরিকল্পনা (Package district intensive Agricultural Development Programme) যেসব জেলাতে আছে সেখানে গড়ে ৩০০—৪০০ কৃষকের জন্য একজন সম্প্রসারণ আধিকারিক কাজ করেন। জাপানে প্রতি ২০০ জন কৃষকের জন্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮০টি কৃষকের জন্য একজন এরূপ কর্মী আছেন। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় আমাদের কৃষি অনেক অনগ্রসর ও কৃষক সেরূপ শিক্ষিত নয় —সুতরাং এটা বলা বাহুল্য যে, কৃষি সম্প্রসারণের কাজের জন্য আমাদের আরও বেশী পরিমাণে শিক্ষিত দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। সাবেকী পন্থা থেকে আধুনিকী-করণের সাহায্যের জন্য সম্প্রসারণের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হ'বে, কেননা ক্রমশ নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হ'বে—গবেষণালব্ধ নূতন জ্ঞান প্রয়োগ করতে হ'বে কৃষিক্ষেত্রে। অথচ কৃষি স্নাতকরা তাদের শিক্ষার উপযুক্ত বা যোগ্য কাজ পাচ্ছেন না—তার ফলে কৃষি শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। কৃষি উন্নতির পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য যেমন সার, জল, অর্থ প্রভৃতির প্রয়োজন, তেমনি দক্ষ কর্মীরও আবশ্যক। কৃষি যেভাবে ক্রমশ বিজ্ঞানভিত্তিক ও জটিল হচ্ছে তাতে উপযুক্তভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী সঙ্কোচন করে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

দ্বিতীয়ত কৃষিভিত্তিক শিল্পবাণিজ্য গড়ে উঠছে দেশে। কৃষি যতই উন্নত হচ্ছে ততই কৃষির সঙ্গে জড়িত শিল্প রসায়ন (সার, কীটনাশক দ্রব্য) বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিপণন, গুদামজাত করণ প্রভৃতি কাজেও জটিলতা আসছে। সেইদিক থেকে বিচার করলে কৃষি শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর আবশ্যক আছে। ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা ও বর্তমানের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও শিল্পবাণিজ্যে মন্দাই দেশব্যাপী শিক্ষিত বেকার বৃদ্ধির কারণ। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কট, বিশেষ করে খাদ্য সমস্যার সমাধান কৃষি শিক্ষাকে ব্যাহত করে সম্ভবপর নয়। তা হ'লে ভবিষ্যতে আরও বেশী সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হ'বে।

নয়? স্থানীয় সমস্যার সমাধানে মহিলা সমাজ তৎপর হবেন। বিশেষ নির্বাচনের আগে আগুন কোথাও জ্বলে ওঠা অসম্ভব নয়।

অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন জাতীয় সংসদ। এ দুটির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবার সুযোগ আমরা হয়তো আরও অনেক পাবো। আন্তর্জাতিক ভাবে উইমেন্স ইণ্টারন্যাশনাল লীগ ফর পিস্ অ্যান্ড ফ্রিডম কি আলোচনা করেছিলেন তার আন্তর্জাতিক সভাপতি শ্রীমতী এলিস বোল্ডিং-এর ভাষণে কিছু বুঝবো। পঞ্চাশ বছর আগে এই সংস্থার পত্তন হয়। এশিয়াতে এই প্রথম অধিবেশন।

অধিবেশনের প্রসঙ্গ ছিল, "Economic and social justice: Prerequisite to Peace and Freedom.

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার শান্তি ও স্বাধীনতার পূর্বে প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কিশোর ও যুবকের মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে চলেছে তার জন্য দায়ী অর্থহীন এ যুগের পরম ভণ্ডামি। যুগের জঞ্জাল জমেছে কাগজে, খাতায়, ফাইলে, টেলিফোনে শান্তির বুলি আর সাম্যের সংবাদ ছড়িয়ে। সাম্য কি সত্যি আমরা চেয়েছি? চেয়েছি কি শিক্ষায়, সৌভাগ্যে, সুযোগে, স্পষ্ট ভাষায় নিজের দুঃখ নিবেদনে যারা দুর্বল তাদের আপন করতে? তাদের দুর্বলতার উপরে বক্তৃতার বোঝা চেপেছে মাত্র। আজকের যুবজন জেনেছে এই অজ্ঞ অক্ষম মানুষগুলির সবটাই দুর্বলতা নয়। কোথায় যেন তার লুকিয়ে আছে অসীম শক্তি। তাই তারা আগের দিনের প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। হয়েছে বেপরোয়া। সত্য রোষ সর্বনাশা নয়। সর্বনাশা হয় ব্যক্তিগত জীবনে যখন তারা পায় মেকি মুখের উদ্বেগ মাত্র, ভালবাসা নয়, দেখে ছলনা কপটাচার আর যান্ত্রিক সভ্যতায় মুগ্ধ মানুষ ভেবেছিল বিজ্ঞান দিয়ে বুঝি আরাম কেদারায় বসে সুখ শান্তি আর স্বস্তিকে আহ্বান করা যায়। সে ভুলের আশঙ্কা আজ থেকে দু'শ বছর আগে অপেক্ষাকৃত অল্প-জানা অর্থনৈতিক অ্যাডাম স্মিথ তার "Wealth of Nations"এ করেছিলেন। শহর গড়বে কলকারখানা হবে কিন্তু civic competence হারিয়ে যাবে অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকের স্বচ্ছন্দ জীবন ব্যাহত হবে।

সব সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীমতী বোল্ডিং তার সমাধানের পথ কি দিলেন? সকল দেশের সকল স্তরের মহিলা শক্তি সংযুক্ত হক। "Nonelite sectors of society" তথাকথিত সমাজের সেরা মানুষের বাইরে যাঁরা তাঁদের বাদ দিলে চলবে না। শান্তি আর অগ্রগতিতে তাঁদের সহায়তা না নিলে সার্থক অভিযান অসম্ভব। বেসরকারী মহিলা সংসদগুলির দায়িত্ব এখানে খুব বেশী। ভারতে বে-সরকারী মহিলা প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০টি। তার মধ্যে ২৩টি ডবলিউ আই এল্ পি এফ এর সঙ্গে যুক্ত। সংখ্যা শুনতে বেশী মনে হলেও ভারতের মত বিরাট উপ মহাদেশের পক্ষে এমন কিছু নয়।

একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ আগত প্রায়। এখন প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের তরে এক যোগে অগ্রগতি বরণ করতে পারলেই সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীমতী বোল্ডিং-এর বক্তৃতা ভালই লাগলো। তবে এ ধরনের অধিবেশন কেন্দ্রীভূত "elite" এ সন্নিবদ্ধ না থেকে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আয়োজিত হলে সেই দলিত মূক মহিলারা এগিয়ে আসবেন যাঁদের না হলে অগ্রগতি বিফল হবে। ন্যাশনাল ফেডারেশন এবার তাঁদের সম্মেলনের বড় অধিবেশনের আগে নানাস্থানে ছোট ছোট মিটিং করেছিলেন। Women's International League for Peace and Freedom এর মিটিং দিল্লিতে হয়েছে বটে কিন্তু তার অন্তর্ভুক্ত সংসদগুলির কোন কোন মিটিং এদিকে ওদিকে হয়েছে।

Associated Country women of the world-এর বৈঠক বসেছিল কলকাতায়। বৈঠকগুলি মন্দ হয়নি। কিন্তু আনাচে কানাচে ঘুরে একটি তথ্য সংগ্রহ করেছি যে গৃহ ও তার গৌরব যেন তার মাহাত্ম্য হারাতে বসেছে। ঘর এখন বহু দেশে Night Shelter—রাতের আশ্রয় মাত্র। এ কথা মুখ ফুটে বেশী বলতে প্রগতি-পন্থায়ী মেয়েরা ভয় পান। তাঁরা পুরুষের সঙ্গে সমান হবার লড়াইতে নেমেছেন। পুরুষ যেমন অফিস-জীবন সম্বল করে, সান্ধ্য আসরে মন মাতিয়ে রাতের আশ্রয়ে ফেরেন, মেয়েরা তা না করলে যদি স্বাধীনতার দাবিতে তাঁরা খাটো হয়ে যান তবে কি হবে? আমাদের দেশে সমাজের এক স্তরে সে সমস্যা একেবারে আসেনি বলতে পারি না। আপনারাই বলুন গৃহমুচাতে যে গৃহিণী সে কি করে দু কূল সামলাবে? একটা কনফারেন্সেও কেউ তা বললো না। বললো চুপি চুপি চায়ের আসরে, ভোজের টেবিলে। ভরসা করে একবার বলেছিলাম এর সমাধান কি "পার্ট টাইম" কাজ করে মেয়েরা করতে পারবেন? তাতে কি ছেলেমেয়ে পাবে গৃহের অনাবিল স্নেহ আর নিশ্চিন্ত আশ্রয়? প্রগতিশালিনীরা এতক্ষণ অনেকেই কথা তুলেছিলেন কিন্তু পার্ট টাইম অফিস? সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন। নৈ নৈব চ। ছি ছি এত দূরে এগিয়ে শেষে পার্ট টাইম পুরুষের ভূমিকা?

শ্রীমতী

আলোচনা

এই বিস্ফোরণ : আমার চোখে

॥ ১ ॥

১৭ পৌষ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকাতে অশোককুমার চক্রবর্তীর ছাত্র বিদ্রোহ নিয়ে লেখাটি যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ। কারণ-গুলো স্বীকার না করে উপায় নেই। ছাত্র বিদ্রোহ নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে বহুমুখী আলোচনা নানান পত্র-পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে। এত আলোচনা হচ্ছে অথচ সমাধানের একটা পথও বেরিয়ে আসছে না। বস্তুতপক্ষে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি চারিদিকে সমস্যা আর সমস্যা। কোথাও কিছু নেই আমাদের জন্য। তারপর বর্তমানে সমস্যার পাহাড় থেকে লাভার কীটাণু কুরে খাচ্ছে প্রাণের সমস্ত নির্যাস। জানি না, এত সমস্যার সমাধান কি করে হবে কিংবা আদৌ হবে কি না।

সমস্ত ছাত্র সমাজের কাছে একটি আবেদন রাখছি। একজন ছাত্র কোন অবস্থাতেই আরেক ছাত্রের রক্তে হাত কলঙ্কিত করবে না। তুমি ছাত্র—আমিও তাই। তোমার আমার একই সমস্যা। একই অস্তিত্বের জ্বালা। একই যন্ত্রণায় উভয়ে ক্ষতবিক্ষত। আমাদের মধ্যে সত্যি অর্থে কোন বিরোধ নেই। তবে কেন আমরা বিপ্লবের নামে সুযোগ সন্ধানীদের স্বার্থ-সিদ্ধির শিকার হবো? ছাত্র-সমাজ এক বৃহত্তম তরুণশক্তির মিলিত শক্তি। রাজ-নীতির দলাদলি এসে কেন তাদের আত্ম-হননের পথে নিয়ে যাবে?

সমস্ত ছাত্র সমাজ অন্তত এই ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হোক, কোন ছাত্র কখনও অন্য ছাত্রকে খুন করবে না। বিপ্লব এক বৃহত্তম সংঘশক্তির মহত্তম ফসল। অতএব সেই বিপ্লবকে সাধনায় কার্যকরী করতে হলে তার প্রথম চেষ্টাই হবে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না রাখা। সেখানে ছাত্র সংগঠন তো আরম্ভের প্রথম ধাপ মাত্র। এছাড়া বিপ্লব এক অলীক স্বপ্ন মাত্র।

কমলা ঘোষ
জামশেদপুর।

॥ ২ ॥

শ্রীঅশোক চক্রবর্তীর লেখা "এই বিস্ফোরণ—আমার চোখে" শীর্ষক রচনাটি পড়লাম ২রা জানুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায়। রচনাটির প্রথমাংশে বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তিনি ছাত্রদের সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় বাতলাতে গিয়ে তিনি এক সস্তা শ্লোগানের গোলক-ধাঁধায় পথ হারিয়েছেন। তিনি বিপ্লব চান। বিপ্লব নাকি সেই সর্বরোগহর ঔষধ যা দিয়ে যাবতীয় রোগ নাশ ঘটবে। এটা তোতা পাখীর শেখা বুলীর মতো শোনায়। নিজস্ব প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত এক মননশীল ছাত্রকে তোতা-পাখী বা গড্ডলিকা প্রবাহের অংশীদার বলে মেনে নিতে বাধে। আমিও একজন ছাত্র—তবে চাকরী করে পড়ি—স্বাধীনতার এক বছর আগে আমার জন্ম (বৃদ্ধ বা প্রতিক্রিয়াশীলরূপে চিহ্নিত না হই যাতে তারই জন্যে এই আত্মপরিচয় দান) আমার ধারণা বেকার সমস্যাই প্রধানতম সমস্যা যার জন্যে শুধু ছাত্র নয় অবশিষ্ট জন-সমাজের মধ্যেও এক প্রবল আলোড়ন এনেছে—যারা বিপ্লব চায় না—কাজ চায়। আমাদের জাতীয় অর্থনীতি আজ এক কানা গলির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে—এবং তারই জন্যে এই বেকার সমস্যা এবং জন-আলোড়ন। প্রতিদিন বর্ধিত চাহিদার এক বিশাল আভ্যন্তরীন বাজার, সমৃদ্ধ জনশক্তি এবং অশেষ প্রাকৃতিক সম্পদের এই দেশে অর্থনৈতিক জ্ঞান রহিত শাসকমণ্ডলী চালিত অর্থনীতি এক অচল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ মজুদ থাকা সত্ত্বেও নতুন বিনিয়োগে পড়েছে ভাটা। সরকারী সংস্থাগুলি মুমূর্ষু রোগীর মতো ধুঁকছে। তথাকথিত বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নিস্টরাও কম যান না। শ্রমিকদের দাবীকে বল্গাহীন করতে তাঁরা ওস্তাদ কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব সঠিক-ভাবে পালন করতে উৎসাহ তাঁরা শ্রমিকদের কখনো দেন না। ব্রিটিশ শাসনের লিগ্যাসি হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে

চাকরী-মনস্কতা। তার সঙ্গে সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্যে জাতীয়করণের প্রচেষ্টা যুক্ত হওয়ায় তরুণ সমাজের মধ্যে বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার কোন আকাঙ্খা জাগেনি বা জাগতে পারে না। ফলে দিনের পর দিন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে—সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় গাইডের ক্যাপিটালিজমই বর্তমান ভারতে সৃষ্টি করতে পারে দেশব্যাপী সফল কর্মোদ্যোগ। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সম্প্রসারিত হোক ক্ষতি নেই—প্রয়োজন তাদের বর্তমানের বন্ধ্যা দশা থেকে মুক্ত করা। ছোট ছোট শিল্পের লাইসেন্সিং প্রথা তুলে দেওয়া, ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়ার সহজ ব্যবস্থা করা এবং ছাত্র ও তরুণদের নিজস্ব উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়া আজকের প্রয়োজনীয় কাজ। প্রাথমিক শর্ত অবশ্যই আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি। গুজরাটে এবং পাঞ্জাবে এই কাঠামোর মধ্যেও অনেক কিছু করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং তাদের আদর্শও যদি আজ বাংলার তরুণ সম্প্রদায় গ্রহণ করে তাহলে বেকার সমস্যার এই করুণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। দুর্গাপুর-আসানসোল বেল্টে এখনও অনেক সুযোগ আছে। নবনির্মিত হলদিয়া তো অর্থ-নীতির দিক থেকে এক নতুন ঊষার স্বর্ণ-দুয়ার। কাঁচামালে সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গ আজো অহল্যা। তরুণ বাঙালীর পদস্পর্শে সে জাগবার অপেক্ষায় রয়েছে। নতুন উদ্যোগ-গুলির নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হবে ইঞ্জিনীয়ারদের। পাস করেই চাকরী পাবার দিন আর নেই। বাস্তবের কঠিন মাটিতে আজ শপথ নেবার দিন সমাগত। ব্যাংকগুলি ঋণ দিতে প্রস্তুত—হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের অপেক্ষায় বসে, তাকে কাজে লাগানো ও লক্ষ বেকারের চাকরীর সংস্থান করার মধ্যে দিয়েই শুরু হোক না বিপ্লব।

গণতন্ত্র আমরা পেয়েছি খুব সস্তায় অর্থাৎ আমাদের জেনারেশনের কাউকেই এই স্বাধীন গণতন্ত্রের জন্যে কোন প্রত্যক্ষ মূল্য দিতে হয়নি। তাই এই গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার এক সহজ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে। অবশ্য একথা ঠিক এই গণতন্ত্রের মন্দিরটির পুরোহিত বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন তাঁরা ভয়ঙ্করভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ এবং অপদার্থ। মুখে সমাজ-তন্ত্রের জয়গান অন্যদিকে নিজের পুত্রটিকে পুঁজিরপতি বানাবার গোপন ইচ্ছা এই গণতন্ত্রের কোন কোন নেতা বা নেত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই হয়ত ঘৃণা হয়, হয়ত মনে হয় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এর পরিবর্তন সম্ভব নয়, তাই মাঝে মাঝে বিপ্লবের রোমাঞ্চকর চাগিয়ে ওঠে তরুণদের পক্ষে এই রোমাঞ্চ হয়ত স্বাভাবিক—তার উপর যখন রয়েছে নিরন্তর প্ররোচনা—পেশাদার রাজনীতিক-দের রুজী-রোজগারের প্রশ্ন। আজকের অপরিণামদর্শী কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বপ্নদর্শীরা বিপ্লবের পরে (যদি সত্যিই তা রূপ পরিগ্রহ করে) হয়ত দেখবেন—এক নয়া শোষনযন্ত্র কায়েম হয়ে বসেছে—তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন পথ নেই। পোল্যান্ডের ঘটনাবলী দেখিয়ে দিয়েছে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের বিপ্লবী শাসনব্যবস্থা জনদুঃখ মোচনে সমর্থ নয়—প্রতিবাদ জানাতে গেলেই ছুটে আসে সামরিক ট্যাংক বাহিনী। অন্য পথ আছে—তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। নতুন সজীব ভারতকে গড়তে হলে প্রয়োজন সারা ভারতব্যাপী কর্মউদ্যোগ সৃষ্টি। আমলাতন্ত্রকে সচল করতে হবে, প্রয়োজন হলে বিধিবিধান সংশোধন করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ নিয়ে গিয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে এবং জমিগুলোকে তিনফসলা করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চাই। তাতেই আছে বেকার সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি। প্রতিদিনের বর্ধিত চাহিদার মোকাবিলায় চাই বর্ধিত জাতীয় আয়। তা

না হলে বিপ্লবের আদর্শ সমবণ্টন নিছক দারিদ্র্য বণ্টনে পর্যবসিত হবে। আসল কথা হোল সাদা চোখে বিচার করার ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন। গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে কোন জাত ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে না।

প্রদীপকুমার দত্ত
সুরেন্দ্রনাথ অ ইন কলেজ
কলিকাতা-৯

॥ ৩ ॥

শ্রীঅশোককুমার চক্রবর্তীর লেখা পড়লাম। মধ্যবিত্ত বাঙালী হিসাবে আমি আমার কিছু বক্তব্য এই প্রসঙ্গে রাখলাম। শ্রীচক্রবর্তী তাঁর আলোচনার এক জায়গায় লিখেছেন—"কিন্তু বাংলার বাইরে বাংলা দেশের তরুণদের জন্য আজ আর কোন কাজ নেই। একমাত্র বাঙালী হওয়ার অপরাধেই তাদের এই শাস্তি।" আমার বক্তব্যটুকু এই প্রসঙ্গেই। আমরা সবচেয়ে ভালবাসি নিজেকেই, আর এই সত্যটিকে গোড়া থেকেই আমরা গ্রহণ করিনি—এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। স্বাধীনতার সময় এবং তার পরে আমাদের যে ছেলেরা দেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছে, তাদের মনে আমরা এই বোধটাই জাগিয়ে তুলতে পারিনি যে এই বাংলা দেশ, এর গ্রাম-শহর, গাছ-পালা, জল-জমি, এর প্রাচুর্য এবং দারিদ্র্য সব কিছু নিয়ে তাদের নিজেদের। যে মাটিতে তারা জন্ম নিয়েছে সেই মাটির উপর অধিকার বোধ তাদের জন্মায় নি। আমাদের ছেলেরা নতুন ভারতবর্ষ গড়ার কথা শুনেছে কিন্তু আমরা কি তাদের কোনোদিন বাংলা দেশকে গড়ে তোলার কথা বলেছি। আজ দেশের সমস্যার কথা উঠেছে। কিন্তু কোনো নেতা কি আমাদের ছেলেদের এ কথা বলেছেন এসো আমরা হাতে হাত রেখে কাজ করি, আমাদের গ্রাম-শহরের যোগাযোগের সড়ক তৈরী করি, নিজের খেটে হসপিটাল-স্কুল তৈরী করি, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে যাই?

আমরা বাংলাদেশের লোকেরা নিজেদের দেশকে ভালবাসতে শিখিনি, শিশু ও কিশোরদের ভালবাসতে শেখাইনি। নিজের মাকে অভুক্ত রেখে পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার আলোকসজ্জা করার মতো নির্বুদ্ধিতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায়।

তাই যা নিজের নয় তার উপর মমত্ববোধ থাকা কি স্বাভাবিক, বিশেষত তাদের কাছ থেকে, যাদের নিজেদের কিছুই নেই, না বর্তমান, না ভবিষ্যৎ।

শ্রীচক্রবর্তী সুন্দর-সজীব ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কথা বলেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন সবাইকে। তার এই সময়োচিত আহ্বানের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করে নিয়েও আমি একটি করুণ নিবেদন জানাই, সব কিছু গড়ে তোলার আগে, আমরা আমাদের লক্ষ লক্ষ বলিষ্ঠ বাহুর শক্তি দিয়ে, একেবারে নিঃশেষ হওয়ার আগে শেষ চেষ্টা করে দেখব না যে, আমাদের বাংলাকে আমরা মৃত্যুর রাত্রি থেকে নতুন সূর্যের দিকে আনতে পারি কিনা?

তপনকুমার ভট্টাচার্য
হাওড়া-৪

॥ ৪ ॥

শ্রীঅশোককুমার চক্রবর্তীর 'এই বিস্ফোরণ' আমার চোখের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু তবু আমার মনে হয় রচনাটি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। অশোকবাবুর সমস্ত বক্তব্য মেনে নিলেও এই কথাটাকে মানতে পারলাম না—"বিনা রক্তপাতে আসুক সেই বিপ্লব।" আমার মতে রক্তপাতহীন 'বিপ্লব' কখনও ঘটে না (ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাত ঘটানো 'বিপ্লব' নয়) মার্কস লেনিন হো-চি-মিন প্রভৃতি বড় বড় বিপ্লবী নেতাদের কেউই রক্তপাতহীন অহিংস বিপ্লবে গঠিত সুন্দর, শ্রেণীহীন, সমাজব্যবস্থার কোন দৃষ্টান্তই আমার কাছে নেই, তাই আমার মনে হয় শ্রীঅশোকবাবুর বলিষ্ঠ রচনার শেষোক্ত অংশটি তাঁর রচনার মানহানি ঘটিয়েছে।

বহ্নি চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া-৪

॥ ৫ ॥

দেশ-এর আলোচনা সম্পর্কে স্নেহাস্পদ 'জনৈক ছাত্রের' লেখাটি পড়ে ব্যথা অনুভব করছি। সত্যি আজ ছাত্রসমাজ কাণ্ডারী-

হীন তরণীতে ঘূর্ণাবর্তে ভেসে যাচ্ছে। তারা পথপ্রদর্শকও পাচ্ছেন না, পথের সন্ধানও পাচ্ছে না। কিন্তু আমার স্নেহের ভাইয়েদের বলি, তারা যে মানুষ একথা তারা ভুলে যাচ্ছে কেমন করে?

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে একটি প্রকাণ্ড সম্পদ যে ভগবান দিয়ে দিয়েছেন। যা দ্বারা অন্য সমস্ত প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে মানুষ প্রমাণিত, জন্মগত অধিকারেই আমরা তা লাভ করেছি। জন্মেই কেউ বিশ্বগুরু কবি, বৈজ্ঞানিক, নেতা প্রভৃতি হয় না। চরিত্রবলেই সেটা লাভ করে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ই ছাত্রজীবন, ঐ বয়সেই সে রূপে-গুণে সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হয়। সেই ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা চরিত্র গঠন। চরিত্রের বুনিয়াদ শক্ত না হলে কোন সৌধই দাঁড়াবে না। নিজেকে নিজে যত বিশ্লেষণ করতে পারে তত আর কেউ পারে না। অন্যায় যে অপরাধ আমাকে পীড়া দেয়, সে অন্যায়কে আরো না বাড়িয়ে সংশোধন করে ন্যায়ের পথে আনতে হবে। পুড়িয়ে, ভেঙে বা খুন করে সংশোধন হয় না। মনুষ্যত্ব দিয়েই সেটা সম্ভব। মানুষের অন্তরে যে সবল, সুন্দর, সত্যবাদী জীবন আছে তাকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়। শত্রুতাতে শান্তি নাই, মিত্রতাই শান্তির আকর। ভুলের বদলে আরো ভুল লিখলে নম্বর পাওয়া যায় না, সংশোধন করে লিখলেই নম্বর মেলে।

নিজেই নিজের পরিচালক হয়ে জীবনকে সুখী ও সুন্দরতর করা যায়। অন্যে আমার মুখে গ্রাস তুলে দেবে এ আশা নিরাশারই প্রতীক। সৎ-চরিত্রবান মানুষেরাই মনীষী ও অমর হয়ে থাকে। কবির উক্তিতে বলতে হয়, "রাজাকে মারিয়া রাজ্য পাওয়া যায় না। পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজ্য পাইতে হয়।" ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা পেতে হয়। যাকে শ্রদ্ধা করলে মনের কলুষ ধুয়ে যায়। ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি, তাকে সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করা ও সুন্দর করা আমাদের প্রধান কর্তব্য, এসব ভুলে অনুকরণ রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি এবং নিজেদের সর্বনাশের রাস্তা খুলে দিচ্ছি। ছাত্রসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। তারা মানুষের মন নিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে দেশের এবং দশের কল্যাণ-চিন্তা করুক, এই আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

প্রতিভা মুখোপাধ্যায়
বালিগঞ্জ

॥ ৬ ॥

গত কয়েক সংখ্যা ধরে আপনারা ছাত্রদের সমস্যাগুলোকে যেভাবে 'দেশ'-এর পাতায় স্থান দিয়েছেন তা ছাত্রসমাজের মধ্যে নূতন সাড়া জাগিয়েছে। তাই কলকাতা থেকে এত-দূরে থেকেও ছাত্রবন্ধু শ্রীঅশোককুমারের প্রবন্ধটি আমাকে আত্মসমালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং জনৈক সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমার গুটিকয়েক বক্তব্য আপনার কাছে পেশ করছি।

যুগসন্ধিক্ষণই আজকের এই বিস্ফোরণের প্রধান কারণ। অভিভাবকদের মতিগতি আমাদের ধারণার বাইরে, ও'রাও আমাদের বুঝতে চান না। কারণ আমাদের মধ্যে কোন 'কমন প্ল্যাটফরম' নেই। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা এখনও আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে রাজী নন। সম্ভবত সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে ও'রা ছেলেদের কাছে পরামর্শ চাইতে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত নন। কিন্তু পারস্পরিক বোঝাপড়া ছাড়া আজ বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজকে ঠাণ্ডা করা সম্ভব নয়। বড়রা যদি 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেকস' ছেড়ে ছাত্র ও তরুণ সমাজের সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন তবে বর্তমানের এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের অনেক কারণই দূর হয়ে যাবে।

ছাত্রবন্ধু শ্রীঅশোককুমার ঠিকই বলেছেন যে, আস্থাশীল চরিত্রের দুর্লভতাই ছাত্রদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। শৈশবে ও কৈশোরে সকল পিতামাতাই আমাদের বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের মত হবার জন্যে অনেক গালভরা বুলি শোনান। কিন্তু ওগুলো শীঘ্রই বাতাসে মিলিয়ে যায়। সেই আদর্শবাদী পিতারাই যখন আমাদের বলেন—'একটু কালোবাজারে খোঁজ করিস নে কেন? তবেই তো পাই।' তখন বিবেকানন্দ ও নেতাজীর আদর্শ যে কত অবাস্তব তা একটি শিশুরও বুঝতে বাকী থাকে না। আদর্শের এই অপমৃত্যু ছাত্রদের অবচেতন মনে কাজ করতে থাকে ও কালক্রমে বিষক্রিয়া শুরু হয়।

ছাত্র-বিক্ষোভ এক ধরনের সংক্রামক রোগ। এবং এই সংক্রামক ধর্মিতা ছাত্র-সমাজকে বিষবাষ্পের মত কলুষিত করছে। আমাদের এই জেলা কলকাতার মত অশান্ত নয়। কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি ওরা কলকাতা তথা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ছাত্র-অশান্তিকে পরোক্ষভাবে অনুভব করে নিজেদের অস্থির করে তুলেছে—অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে। আমার বিশ্বাস এটা শুধু এখানকার ছাত্রদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়—সমগ্র ভারতের ছাত্রসমাজের পশ্চাতে বিক্ষোভের মূলে আমেরিকা ও ইউরোপের ছাত্র-বিদ্রোহ পরোক্ষভাবে কাজ করছে। ছাত্রসমাজকে আজ এই সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে বাঁচাতে হবে—প্রয়োজন-বোধে নিতে হবে উপযুক্ত প্রতিষেধক।

"এই বিস্ফোরণ : আমার চোখে" পড়া আরম্ভ করেছিলাম অনেক আশা নিয়ে, কিন্তু শেষের দিকে হতাশ হতে হল। প্রবন্ধটির শেষাংশে লেখক আবেগপ্রবণ হয়ে কোন এক বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর রাজনৈতিক নেতাতে পরিণত হয়েছেন। বিপ্লব বা পরিবর্তন সকল ছাত্রেরই কাম্য। কিন্তু সেটা কি শুধু কথার ফুলঝুরিতেই আসবে. লেখক বলেছেন এই সমাজব্যবস্থায় আজ আর ভালো জিনিস চোখে পড়ে না। কিন্তু ভালো জিনিস চোখে পড়ার জন্যে আমরা ছাত্রসমাজ কি-ই বা করছি? শুধু আমি বিক্ষুব্ধ ও বঞ্চিত, আমি অসুস্থ ও অবহেলিত বললেই অবস্থার পরিবর্তন হয় না, বরং তার ফলে জীবনে নেমে আসে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স—যা ছাত্রসমাজের এক নম্বর শত্রু।

পার্থসারথি মিশ্র
শিলচর ॥ কাছাড়

॥ ৭ ॥

শ্রীঅশোককুমার চক্রবর্তীর লেখা অশেষ আগ্রহসহকারে পড়লাম। লেখকের নির্ভীক, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা রচনাটি নিঃসন্দেহে এ যুগের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল। 'দেশ'-এর আলোচনা আসরে 'ছাত্র-অসন্তোষ' নিয়ে যে তুমুল ঝড় উঠেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের একটি বিশেষ রচনার খুবই প্রয়োজন ছিল।

দেশের তরুণ সমাজের নৈতিক অধঃপতনের কারণগুলি অশোক যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা খুবই যুক্তিনিষ্ঠ এবং হৃদয়গ্রাহী। বলতে গেলে, অশোক বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর মনের ভাবনাকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিটি স্তরের মানুষকে লেখক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তরুণ সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্বপালনের ব্যর্থতার জন্য যেভাবে জেরা করেছেন তা লেখকের সাহসিকতা ও স্পষ্টবাদিতারই পরিচয় দেয়।

আলোচ্য রচনাটিকে কেন্দ্র করে যাঁরা চুলচেরা বিচারে নামতে চান তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা আগে লেখকের সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ দিন, পরে ভুল-ত্রুটি নিয়ে বিতর্কে নামুন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এভাবে এমনি খোলাখুলিভাবে কিছু বলতে পারাটা দুঃসাহস ছাড়া আর কি? লেখককে ও সম্পাদককে অশেষ ধন্যবাদ।

শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-২৫

'ইণ্ডিয়ান জার্নাল

অ্যালেন গীন্‌সবার্গ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু পীটার অরলভস্কি। সব মিলিয়ে এ দেশে ছিলেন এক বছর দু'মাস, বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন কলকাতা এবং কাশীতে, ঘুরেছেন প্রায় গোটা ভারতবর্ষ।

কলকাতার পথে ঘাটে সেই সন্ন্যাসীপ্রায় সাহেবটির চেহারা অনেকের স্মরণ থাকতে পারে। সেই সময় হিপি শব্দটিই কেউ শোনেনি, হিপিদের পূর্বপুরুষ বিটনিকদের কথা কাগজপত্রে পড়া গেছে অবশ্য, তবে তাদের জলজ্যান্ত উদাহরণ অ্যালেন গীনসবার্গই প্রথম। শুধু বিটনিক নয়, তাদের প্রধান পাণ্ডা। অ্যালেনের মুখ ভর্তি দাড়ি, বাবরি চুল, বেশ রোগা চেহারা, লাল রঙের পাঞ্জাবি ও ময়লা পাজামা—রবারের চটি, কোনো সময়ে খালি পা—এই চেহারার সাহেব এখন জলভাতের মতন, কিন্তু সেই সময় অভাবিত। রাস্তায় লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। সাহেব হিসেবে ওঁর চেহারায় বৈশিষ্ট্য কিছু নেই, তবে কেউ কেউ বলতো, ওঁর চোখদুটি যীশুখৃষ্টের মতন করুণাময়।

বিটনিকদের নেতা আলেন গীনসবার্গ এবং কবি অ্যালেন গীনসবার্গ—এই দুই চরিত্রের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। কবি হিসেবে মানুষটিকে মনে হয় খুবই নিঃসঙ্গ ও দুঃখী, অনেকটা সাধকের মতন। ভারতবর্ষে থাকবার সময় তিনি দিনলিপি রাখতেন, এতকাল পরে তার থেকে বেছেটেছে 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল' বেরিয়েছে।

অ্যালেন গীনসবার্গ ভারতবর্ষে এসেছিলেন গুরুর সন্ধানে। এই জন্য তিনি ঘুরেছেন নানান সাধু সন্যাসীর আশ্রমে, রাতের পর রাত জেগেছেন শ্মশানঘাটে, সাধুদের পাশে বসে গঞ্জিকা সেবন করে ব্যোম হয়েছেন, দুরন্ত শীতের রাতে শুয়ে থেকেছেন গঙ্গার পারে খালি গায়ে। পরস্পরের ভাষা জানা নেই, তবু অচেনা সাধুর সঙ্গে কথা বলে জানতে চেয়েছেন, কি করে অনন্ত দর্শন হয়। গুরুর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন কি না জানি না। কলকাতার স্বামী সত্যানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, "Be a Sweet Poet of the Lord." কালীপদ গুহরায় বলেছিলেন, Poetry is also a Sadhana & Yoga also drops before the void." কালিম্পং-এর দুদযুম রিমপোচে নিইংয়ম্পা লামা বলেছিলেন:

If you see anything horrible don't cling to it, if you see anything beautiful don't cling to it."

কাশীর সীতারাম ওংকারদাস ঠাকুর বলেছিলেন, গুরু পেতে হলে তিন সপ্তাহ ধরে অবিরাম গুরু গুরু গুরু গুরু বলে যেতে হবে।...আমরা যারা গুরুর সন্ধানে নির্গত হইনি, আমাদের কাছে এসব মন্তব্যগুলোই অবশ্য আকাঙ্ক্ষিতকর মনে হয়।

শুধু সাধু সন্ন্যাসী নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিতা লেখকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন তিনি। এই বইতে অবশ্য কলকাতার দু' একজন কবির সম্পর্কে কিছু উল্লেখ থাকলেও মোটামুটি সেই সব প্রসঙ্গের থেকে সাধু-সন্ধানের প্রসঙ্গই বেশী স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি লম্বা লম্বা স্বপ্ন ও নেশার ঘোরে লেখা কবিতা। এ ছাড়া, কোনো কোনো অঞ্চলের দারিদ্র্যের নগ্ন বর্ণনাও রয়েছে, যাতে কেউ কেউ তাঁকে লুই মালঘটিত গণ্ডগোলের বিষয়ের পাশে স্থান দিতে পারে—কিন্তু তা হলে আবার এই ঘটনাটাও জানানো দরকার যে গীনসবার্গ নিজেও সেই অসহনীয় দারিদ্র্যের স্পর্শ ভোগ করেছেন এ দেশে এসে, কুষ্ঠরোগীকে নিয়ে গেছেন নিজের ঘরে, বোবা ভিখারীকে শুশ্রূষা করার পর জানতে পেরেছেন সে নিজের জিভ কেটে ফেলেছে এবং সে বাঁচতে চায় না।

এই জার্নালের কিছু কিছু অংশ গীনসবার্গ ভারতে থাকবার সময়ই ভারতের কাগজে বেরিয়েছিল। কলকাতার একটি পত্রিকায় জার্নালের সঙ্গে তাঁর একটি ছোট্ট ভূমিকাও ছাপা হয়। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে সাহিত্য রচনার কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এই সব নোট লিখছেন না। তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলিকে অবিকৃতভাবে ধরে রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য। পাছে, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগুলো সাহিত্যের মতন হয়ে যায়, সেই জন্য তিনি খাতা থেকে একবারও কলম না তুলে, কমা ফুলস্টপ না বসিয়ে যা মনে এসেছে লিখে গেছেন। তবে, অবিকল সত্য কেউ কোনোদিন লিখতে পারে না। দু' একটি ঘটনার সময় গীনসবার্গের যারা সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা বলেন, লেখার সময় তিনি বেশ বদলেছেন, বদলাতেই হয়।

শুধু তাই নয়, তাঁর লেখার কোনো কোনো অংশ দেখে মনে হয়, এইসব রচনা কি আর কোনো সাহেবের বোধগম্য হবে? যেমন, **Fireflys blinking in the trees—Victory to Ramakrishna, victory to Chaitanya! Victory to Gouranga! Victory to Ram! Victory to — ma People singing Hari Bol....now the lamp light, the pipe goes ar —A mosquito-net bede king d in the cubicle—Boom Boom Mahamaya!!!**

দৈনিক কবিতা

বিমল রায় চৌধুরী সম্পাদিত দৈনিক কবিতার নতুন সংখ্যা যথারীতি খুব শোভন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এবারে কবিতা ও প্রবন্ধের ওপর প্রায় সমান সমান জোর দেওয়া হয়েছে। তবে, প্রবন্ধগুলিতে নিন্দামন্দের ভাগ বেশী। সাহিত্যে যে-টুকু নিন্দনীয় তার প্রতি আলোচনার ঝোঁকই বেশী দেখা যায় চিরকাল, এর থেকে কঠিন এবং শ্লাঘনীয় কাজ—যা প্রশংসনীয় সেইটুকু খুঁজে বার করে সমাদর করা।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখেছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্রনাথ দাশ, রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, ফনিভূষণ আচার্য, মানস রায় চৌধুরী, দিব্যেন্দু পালিত প্রভৃতি। কবিতায় বহু চেনা ও অচেনা কবিকে দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম লেখিকা পরমেশ্বরী রায় চৌধুরীর লেখাটি অনবদ্য বাঁধিয়ে রাখার মতন। এই লেখিকার সোনার দোয়াত কলম হোক।

সনাতন পাঠক

বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের নেতা খোদ আমেরিকাতে বিপ্লব চলেছে। বিপ্লবের নেতারা কম্যুনিস্ট নন। তাঁরা কম্যুনিজমকে পরিত্যাগ করেছেন কারণ কম্যুনিজম হলো শুধু কথা। পরিবর্তন কথায় আসে না। পরিবর্তন আসে মানুষ যখন মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে নামে। তাই কম্যুনিজম বলতে বিপ্লবীরা বোঝেন ফিডেল কাস্ট্রো, চে গুয়েভারা এবং ভিয়েতকং গেরিলা। অন্যরা শুধু কথার ঝুড়ি। বিপ্লব শুরু হয়েছে তরুণদের সঙ্গে প্রবীণদের লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে। এ বিপ্লব সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা বা উৎপাদনের যন্ত্র দখল করতে চায় না। এর উদ্দেশ্য প্রচলিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অকেজো করে দেওয়া। এবং সে পথেই আজ বিপ্লব চলেছে। চালাচ্ছেন Youth International Party সংক্ষেপে যাঁদের বলা হয় ঈ পি। ঈপিরা বেশভূষায় হিপিদের মতোই তবে হিপিরা যেখানে সমাজ-ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন ঈপিরা সেখানে সমাজ-ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে সক্রিয়ভাবে চেষ্টিত। আলোচ্য বইটি সেই প্রচেষ্টার একাধারে বিবরণী আর ইস্তাহার। বইটির লেখক জেরি রুবিন। জেরি জন্মসূত্রে ইহুদী এবং শ্বেতকায়। আমেরিকার অঙ্গরাজ্য ও ওহায়োর সিনসিনাটি শহরে তাঁর জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা এবং প্রথম কর্মস্থল। রুবিন সেটাকে তাঁর আগের জন্ম বলেন। সে সময় তিনি রোজ দাড়ি কামাতেন, বো-টাই পরে খবরের কাগজের অফিসে যেতেন এবং ওহায়ো রাজ্যের সবচেয়ে নামকরা স্পোর্টস রিপোর্টার হবার স্বপ্ন দেখতেন। এই সময়ে (১৯৬৪) বার্কলেতে ফ্রী স্পীচ মুভমেন্ট শুরু হলো। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় তখন সংবাদপত্রের শিরোনামে। রুবিন আকৃষ্ট হলেন এই আন্দোলনের দিকে। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন বার্কলেতে। পুরাতন রুবিন মারা গেলেন। জন্ম হলো নতুন রুবিনের। আজ তাঁর বয়স ৬।

বার্কলেতেই জন্ম হলো Youth International Party-র। এখানে পুরো তিন বছর ধরে লড়াই চললো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং দানা বাঁধলো ঈপিদের ধারণাগুলি।

আগেই বলেছি যে, এই নয়া বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা। এটা কিভাবে সম্ভব হবে? এটাকে সম্ভব করতে হবে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে। যেমন ধরুন বিশ্ববিদ্যালয়। ঈপিদের মতে বিশ্ববিদ্যালয় একটা ডিগ্রী দেবার কারখানা। তাই তাঁরা চান যে ছাত্ররা দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এসে ঈপি দলে যোগ দিক। এঁরা এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে যেসব ছেলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে তাদের জিজ্ঞাসা করেন —বাইরে এখন কি সুন্দর রোদ উঠেছে জান? তবে কেন ক্লাসে যাচ্ছ। এরা বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আসলে ক্ষমতাবাদীদের জায়গা সেখানে মানুষকে মানুষ বলে মনে হয় না। সেখানে যা কিছু পড়ানো হয় তার বেশীর ভাগই জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন। এঁরা ক্লাসে ঢুকে পড়েন এবং ক্লাস চলার সময়ে চণ্ডু চরস খাওয়া শুরু করেন। তাতেও যদি ক্লাস না ভাঙে তখন ছেলে-মেয়েরা সবাই জামাকাপড় খুলে ফেলেন এবং মার্কিনীরা যাকে "প্রেম

DO IT! Scenarios of the Revolution, by Jerry Rubin, Simon & Schuster, New York, $2.45.
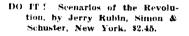
করা" বলে সে কার্যে লিপ্ত হন। এর পরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। ঈপিরা কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেয়ে মানুষকে চমকিয়ে দেওয়ায় অনেক বেশী উৎসাহী। তাঁদের লক্ষ্যই হলো টিভিতে তাঁদের কাণ্ডকারখানা প্রচার হোক লোকে ভীষণ রকম রেগে যাক। তাই ঈপিদের বিপ্লবের সঙ্গে চণ্ডু চরস, গাঁজা, মারিহুয়ানা এবং যথেচ্ছ যৌনাচার অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে গেছে। Do It বইটিও এই একই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকাশিত হয়েছে। তাই বইটির পাতায় পাতায় ছবি এবং তার একটা অংশ জামাকাপড় ছাড়া লোকের ছবি দিয়ে ভর্তি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে চার অক্ষরের ইংরাজী শব্দটি ছাপা বই-এ থাকতো না সেই শব্দটি এর প্রায় প্রতি ছত্রে। এক জায়গায় প্রায় নামাবলী হিসেবে ছাপা। এ ছাড়াও অর্থহীন প্রলাপও প্রচুর জায়গায় আছে তবু তারই মাঝে মাঝে অত্যন্ত গভীর সত্যও খুব সহজ করে বলা রয়েছে বইটিতে। যে কথা আপনাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই যে জিনিসটা ঈপিদের সবচেয়ে অপছন্দ তা হলো মার্কিনী সরকার এবং তার পুলিশ। মার্কিনী পুলিশকে বোঝাতে গেলে রুবিন সর্বদা "শুয়োর" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মার্কিন সরকারের ভিয়েতনাম নীতি অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত এবং রুবিন ভিয়েতকং পতাকাকে নিজেদের পতাকা বলে গ্রহণ

গ্রন্থ প্রচ্ছদ
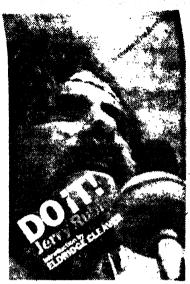
করেছেন। মার্কিন সরকার অবশ্য রুবিনকে সহজে ছেড়ে দেন নি। রুবিন এবং সাঙ্গ-পাঙ্গদের আন-আমেরিকান এ্যাকটিভিটিস কমিটি ডেকে পাঠিয়েছে। ঈপিরা সেটাকে একটা বিরাট সুযোগ বলে গ্রহণ করেছেন এবং অদ্ভুত পোশাকে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। এতে তাঁদের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে কারণ সারা আমেরিকায় তাঁদের কীর্তিকাহিনী প্রচারিত হয়েছে।

১৯৬৮ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছিল ঈপিদের সবচাইতে ভাল সময়। এ সময় তাঁরা ঠিক করলেন যে, ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রার্থী নির্বাচন সম্মেলন তাঁরা বানচাল করবেন। চিঠি লিখলেন শিকাগোর মেয়র ডেলীকে যে, আমরা আসছি তোমাদের খাবার জলে এল এস ডি মেশাবো। সাজ সাজ পড়ে গেল শিকাগো শহরে। সম্মেলনের স্থানে রইলো কড়া পুলিশ পাহারা। ঈপিরা দলে দলে গিয়ে হাজির হলেন শিকাগোতে। পুলিশের সঙ্গে চললো যুদ্ধ, রুবিনের ভাষায় গেরিলা যুদ্ধ। বহু পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগলো। টি ভি কোম্পানীকে ঈপিরা আগে বলে দিতেন ঠিক কোন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে লড়াই বাধবে। ক্যামেরাম্যানরা হাজির থাকতেন এবং ডেমোক্রাটদের সম্মেলনের চেয়েও বড় খবর হয়ে গেল ঈপিরা। এত করেও যখন সম্মেলন ভাঙা গেল না তখন তাঁরা অন্য পন্থা ধরলেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য আলাদা একটা সম্মেলন ডাকলেন এবং তাতে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য নিয়ে এলেন সবচেয়ে কুদর্শন একটি শুকরের শাবক। এই শাবকটিকে সমস্ত রকম বিধিনিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদের

প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানো হল। লক্ষ্য সেই এক প্রচলিত ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করা।

মার্কিন সরকার রুবিন এবং অন্যান্য ৬ জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনলে রুবিন বললেন, আমরা সবাই ষড়যন্ত্রী। ষড়যন্ত্রের ল্যাটিন উৎপত্তি আলোচনা করে রুবিন বলেন Conspiracy মানে এক সংগে নিশ্বাস নেওয়া এবং আমরা তাই চাই। আমরা সবাই আবার এক সংগে বাঁচতে চাই—ভালবাসতে চাই। আমরা এমন সমাজ ব্যবস্থা চাই যেখানে টাকা থাকাটা সমাজে ব্যক্তির স্থান নির্ণয় করে দেবে না, যুদ্ধ থাকবে না, শোষণ থাকবে না, মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকবে না। চুরি থাকবে না, পুলিশ থাকবে না। সমস্ত "করো না" আদেশ উঠিয়ে দিয়ে ইচ্ছামতো বাঁচবার ডাক ঈপিরা দিচ্ছেন।

এই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রুবিন এবং তাঁর ঈপি দল কাজ করছেন। এই কাজে তাঁরা নিগ্রোদের সংগে নিচ্ছেন। Black Panthers এবং ঈপিরা ভাই ভাই। নিগ্রোরা মার্কিন সমাজে শোষণের প্রতীক তাই ঈপিরা তাঁদের পাশে। এই বইটির ভূমিকা তাই লিখেছেন Eldrige Cleaver। বইটি পড়লে রাগ হতে পারে ঘেন্না হতে পারে, উদ্দীপনা আসতে পারে, কিন্তু কিছুতেই বইটি উপেক্ষা করা যায় না।

প্রিয় শর্মা

নাট্যসংকলন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলিকাতা। মূল্য ১৪·০০ টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে বলেছেন : হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ-প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরব কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনা এই আত্ম অনুভূতি ও যুগ চাহিদার শিল্প-রূপায়ণ। হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত রচনা বা বঙ্কিমের মৃণালিনী উপন্যাসও বলতে গেলে এই একই বাসনার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। আসলে অতীত যুগের বীরত্বের উজ্জীবন এই যুগের সাহিত্যের একটি অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছিল। জাতীয় গৌরব চরিতার্থ করবার জন্যে শেকস্‌পীয়র তাকিয়ে ছিলেন স্প্যানিশ আর্মাডার বিজয় অভিযানের দিকে। আর আমাদের দেশের নবজাগ্রত বাঙ্গালী মনীষা প্রেরণা সন্ধান করছিলেন ভারতের অতীত গৌরব গাথায়, টডের রাজস্থানের মধ্যে। যার সূত্র ধরে প্রকাশিত হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরু বিক্রম, সরোজিনী প্রভৃতি নাটক।

প্রসংগত স্মরণ, ঢাকা অ্যাকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের যে সমালোচনা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের অবতারণা থাকলেও

অধ্যাপক চৌধুরী কিন্তু নাট্যকারের এই বিশেষ যুগ প্রেরণাটিকে উপলব্ধি করতে পারেননি। ফলে সরোজিনী নাটকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার বা এটিকে রাসিনের ইফিজিনিয়া নাটকের হুবহু অনুবাদ বলে তিনি যে রায় দিয়েছেন তা সর্বাংশে মানা যায় না। কারণ যে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে নেমেছিলেন, বাঙ্গালী তরুণদের বন্দুক চালনা শিক্ষাদানে উদ্যোগী হয়েছিলেন বা সরোজিনী স্টীমার চালিয়েছিলেন তারই একটি ভিন্নতর প্রকাশ তাঁর পুরুবিক্রম বা সরোজিনী নাটক। তাঁর নাট্যচর্চার ভাবগত উপাদানের জন্যে অন্তত তাঁর বিদেশের স্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

বিদেশী সাহিত্য ভান্ডার থেকে তিনি অনেক কিছু আহরণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেও দেশীয় সাহিত্যকে ঐশ্বর্য-মন্ডিত করার গৌরব বোধে। মলিয়েরের প্রহসন বা গোতিয়ের-এর উপন্যাস অনুবাদের দ্বারা তিনি বাংলা ভাষায় ফরাসী চর্চার এক গৌরবময় সূচনা করেছিলেন নিঃসন্দেহে। ফরাসী প্রহসনের অনুবাদের পূর্বেও মৌলিক প্রহসন রচনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ, অলীকবাবু প্রভৃতির বাষ্প ও কৌতুকরস দীর্ঘকাল ধরে সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেছে। ফরাসী ছাড়াও সংস্কৃত ও ইংরেজী অনুবাদের দিকেও ভাষাবিদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়েছিল। উভয় ভাষা থেকেই অনুবাদে উল্লেখযোগ্য সার্থকতার পরিচয় তিনি রেখেছেন। নাটক রচনা, নাট্যানুবাদ, প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি ছাড়াও সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অনুজ রবীন্দ্রনাথকেও যে তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন একথাও স্বীকার্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বহুবার তাঁর জ্যোতিদাদার প্রেরণার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-চর্চার এই গৌরবময় ভূমিকা সত্ত্বেও বহুদিন যাবৎ তাঁর নাটকগুলি দুষ্প্রাপ্য ছিল। বসুমতী সংস্করণের আশ্রয়ে মাত্র কয়েকটি রচনা টিঁকে থাকলেও তাঁর সমস্ত নাটকগুলির এই একত্র প্রকাশে নাট্যানুরাগী, গবেষক ও সাহিত্যপ্রেমিক ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দিত হবেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ এবং সংকলক ডঃ সুশীল রায় এজন্যে ধন্যবাদার্হ। আলোচ্য সংকলনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দশটি মৌলিক নাটক—কিঞ্চিৎ জলযোগ, পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অলীকবাবু, অশ্রুমতী, মানময়ী, স্বপ্নময়ী, হিতে বিপরীত, বসন্তলীলা, ধ্যানভঙ্গ, কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। পরিশিষ্টে প্রতিটি নাটকের প্রকাশের তারিখও উল্লিখিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যাবলীও এখন প্রায় দুর্লভ। তাঁর জীবন স্মৃতিটিও এখন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকায়। সংকলক স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর যে গবেষণা গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন তার পরিধিও সাহিত্য চর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়নি। এমত অবস্থায় আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত প্রসঙ্গ-কথা নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের আলোচনাপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

তবে ঢাকা সাহিত্য আকাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকায় মুনীর চৌধুরী সরোজিনী নাটকের উপর যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন তা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। কিছু ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যা মুনীর চৌধুরীই প্রথম জানিয়েছেন। প্রসঙ্গ - কথার মধ্যে প্রবন্ধটির উল্লেখ এবং এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

প্রবন্ধ

তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত—প্রথম খণ্ড। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। দশ টাকা।

ভারতীয় ধর্মচেতনার ক্রমবিকাশে তন্ত্রমত এবং তান্ত্রিক সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে বহু পণ্ডিতজন নানাবিধ আলোচনার সূত্রপাত করলেও মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' শীর্ষক বিপুল প্রসর গ্রন্থখানির সাম্প্রতিক আত্মপ্রকাশ সংশ্লিষ্ট পাঠক সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তন্ত্রসাধনার সুপ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সুধী মহলে দ্বৈমত্যের অবকাশ নেই। ধর্মমত এবং আচরণবিধির দিক থেকে তান্ত্রিক সাধনা রীতিমত জটিল এবং দুরূহ। এই সাধনার ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন বহু শাখাশ্রয়ী বলে তার সূত্র সন্ধানও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শ্রদ্ধেয় কবিরাজ এই রহস্যজটিল ধর্মমতের সারবস্তুর মর্মোদ্ধার এবং চর্যাবিধির বিস্তৃত ব্যাখ্যায় প্রচেষ্টিত হয়েছেন। বলাই বাহুল্য, মহামহোপাধ্যায়ের সুগভীর পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা এবং ধীশক্তির প্রাখর্যে তাঁর যাবতীয় আলোচনা এক দুর্লভ মহিমা পেয়েছে। প্রাবন্ধিক কোথাও ভক্তির প্রাবল্যে কিংবা উপলব্ধিবিহীন নীরস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে রচনাকে প্রান্তশায়ী করে তোলেননি। সহিষ্ণুতা, সংযম এবং প্রজ্ঞায় আলোচনাসমগ্রকে বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অনুধাবনক্ষম রেখেছেন। তান্ত্রিক সাধনার উদ্ভব, বিকাশ, বিচিত্র প্রসার,—এক কথায় তন্ত্রমতের বিবর্তনধারাকে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মোটামুটিভাবে ইতিহাসের প্রবাহক্রমের সঙ্গে সংলগ্ন রেখে আলোচনাকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। এর ফলে শুধু তন্ত্রমতই নয়, সেই সূত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মেতিহাসের রূপরেখাটিও পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ধর্মসাধনার মূলে দুটি স্রোত,—বেদের ধর্ম ও তন্ত্র সাধনা পাশাপাশি কালপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করে বেড়ে উঠেছে তার একটি মূল্যবান চালচিত্র সংযোজিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

তন্ত্রসাধনা গুহ্যসাধনা। এবং স্বরূপত তত্ত্বাশ্রয়ী। এই তত্ত্ব জটিল এবং সংকেতময়। ফলে, তন্ত্রসাধনার স্বরূপোলব্ধি সহজসাধ্য নয়। প্রাবন্ধিকের গূঢ়ৈষণা এই জটিলতাকে অনেকাংশেই সুস্পষ্ট করে তুলতে সমর্থ হয়েছে। তন্ত্রসাধনায় গুরু, মন্ত্র, দীক্ষা, কুণ্ডলিনী, নাদ—ইত্যাদি দুর্বোধ্য বিষয়সমূহকেও লেখক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় সাধারণবোধ্য করে তুলেছেন। তান্ত্রিক-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় প্রাবন্ধিক যুক্তি-তথ্য নির্ভর থাকায় আলোচনা পাঠকের দৃষ্টিকে সোৎসুক রেখেছে। তন্ত্র শাস্ত্রে বর্ণমালার সবিশেষ ভূমিকা এবং বিকল্পাত্মক শব্দমালার প্রয়োজনীয়তা অসাধারণ। এতদ্বিষয়ে শ্রদ্ধেয় কবিরাজের ভাষ্য-ব্যাখ্যা পাঠককে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। ভূমিকা থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় খণ্ডে বৌদ্ধতন্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রের আন্তরসম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হবে। আমরা ঐ খণ্ডের আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় রইলাম।

৭/৭/৭০

পত্রিকা

শিক্ষামূলক শিশু-চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৭০ স্মরণী পত্রিকা)। সম্পাদক: শৈল চক্রবর্তী, সুনীল ঘোষ, ভোলানাথ ভট্টাচার্য। ৫-বি, ৮ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

শিশু-চলচ্চিত্র পর্ষৎ গঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই অভিনন্দনের যোগ্য। সম্প্রতি এঁরা যে শিক্ষামূলক শিশু-চলচ্চিত্রের উৎসব করেছিলেন দেশ-বিদেশের নানান ছবি সেখানে প্রদর্শিত হয়। আলোচ্য পুস্তিকাটি সেই উৎসবেরই স্মারক-পত্রিকা। সুন্দর ছাপা ও পরিচ্ছন্ন সম্পাদনার চিহ্ন এর সর্বত্র। শিশু-চলচ্চিত্রের নানান দিক নিয়ে একটি মূল্যবান আলোচনা-চক্র রয়েছে, লীলা মজুমদার, সুষমা সেনগুপ্ত, শৈল চক্রবর্তী প্রমুখ সেই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এ-ছাড়া নানান দেশের ছোটদের ছায়াছবির কিছু গল্প সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে; সেটিও খুব আকর্ষণীয়।

প্রাপ্তি স্বীকার

বাসনার মৃত্যু। জগমোহন মজুমদার। নব-নাট্যম প্রকাশনী: ৪।৩।১ প্রিয়নাথ ঘোষ লেন, হাওড়া-৪। মূল্য ১·৫০।

ভুল সুকোমল। সুকোমল রায়চৌধুরী। সত্তরের কবিতা প্রকাশনী: ১৮/১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য ২·০০।

অঞ্জলি। শোভা চট্টোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরী: ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২/০০

আনন্দের মর্মরিত অন্ধকার। বার্ণিক রায়। পিটার অ্যান্ড হ্যারিস (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড: ৪০বি বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ৩·৫০।

অন্ধকারে একা। কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়। মৌলিক প্রকাশনী: ৩২ জি এম মিত্র লেন, পার্কাস রোড, বর্ধমান। মূল্য ২·০০।

বাবুই। বার্ণিক রায়। নর্থ ক্যালকাটা বুক হাউস: বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক-ডবল্যু, ফ্ল্যাট-১, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ৪·০০।

সাপুড়ের বাঁশী। জগমোহন মজুমদার। আশাবরী পাবলিকেশন: ২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া। মূল্য ২·০০।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার। শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ডি এম লাইব্রেরী: ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৪·০০।

From Marx to Mao. D. N. Das Gupta. India International: 28 Biplobi Anukul Chandra Street, Calcutta-13. Price Rs. 20.00.

টেবল টেনিসের আইন কানুন

এক্সপেডাইট 'সিস্টেম' অর্থাৎ ত্বরান্বিত প্রথা কি ভাবে প্রবর্তন করতে হবে?

একজন টাইমকিপার নিয়োজিত হবেন। আম্পায়ারের নির্দেশমত টাইমকিপার তার কাজ করে যাবেন। প্রথম সার্ভিস হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সময় গণনা করতে আরম্ভ করবেন এবং যখনই ঘড়িতে দেখবেন ১৫ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে তখনই সেটা জানাবেন। অবশ্য সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ থাকলে বা খেলার সময় নষ্ট হলে সে সময় বাদ দিয়েই সময় গণনা করতে হবে। যেমন খেলার বাইরে বল চলে যাওয়ায় সময় নষ্ট হয়েছে, মীমাংসাসূচক শেষ গেমে পাশ বদলের জন্য সময় নষ্ট হয়েছে, পরিশ্রান্ত খেলোয়াড়রা তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছবার জন্য সময় নষ্ট করেছেন কিংবা পোশাক পরিচ্ছদ বা জুতো পরার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য সময় নষ্ট হয়েছে, অথবা অন্য কারণে খেলা বন্ধ রাখা হয়েছে। এই সব নষ্ট সময় ওই ১৫ মিনিটের মধ্যে যোগ হবে না। সাময়িকভাবে খেলা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে টাইমকিপার তার ঘড়ি বন্ধ করবেন এবং আবার খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি চালু করবেন। তা হলে সময়ের হিসাব রাখতে অসুবিধা হবে না।

১৫ মিনিটের মধ্যে গেম শেষ না হলে ১৫ মিনিটের মাথায় টাইমকিপার 'স্টপ' বলে ঘোষণা করবেন। ওই 'স্টপ' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আম্পায়ার 'লেট' ডেকে খেলা থামাবেন এবং খেলোয়াড়দের জানিয়ে দেবেন ম্যাচের বাকি অংশ এক্সপেডাইট সিস্টেম-এর আওতায় পড়ছে। তারপর কোনরকম বিশ্রামের সময় না দিয়েই আবার খেলা আরম্ভ হবে।

যদি কোন র‍্যালের মধ্যে এক্সপেডাইট সিস্টেম প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ র‍্যালে বন্ধ করে এক্সপেডাইট সিস্টেমে আবার খেলা আরম্ভ হয় তবে যে র‍্যালে বন্ধ হয়েছে সেই র‍্যালেতে যে সার্ভিস করেছিল তার সার্ভিস দিয়ে খেলা আরম্ভ হবে। যদি র‍্যালে শেষ হয়ে যাবার পর এক্সপেডাইট সিস্টেম চালু হয় তবে শেষ হওয়া র‍্যালেতে যে রিসিভ করেছিল তার সার্ভিসে আবার খেলা চালু হবে।

এক্সপেডাইট সিস্টেমে যেহেতু সার্ভিস এবং পরের ১২টি স্ট্রাইক প্রতিপক্ষ ফিরিয়ে দিতে পারলে সার্ভার পয়েন্ট হারাচ্ছে সেহেতু স্ট্রাইক গণনা করার প্রশ্ন রয়েছে। কে স্ট্রাইক গণনা করবে? আম্পায়ারও নয়, টাইমকিপারও নয়। 'স্ট্রোক কাউন্টার' হিসাবে নির্বাচিত আর একজন কর্মকর্তা। রিসিভিং প্লেয়ার, ডাবলস বা মিক্সড ডাবলসের খেলা হলে রিসিভিং পেয়ার কতগুলি স্ট্রাইক ফিরিয়ে দিচ্ছেন সেই হিসাব রাখলেই স্ট্রোক কাউন্টারের কাজ সহজ হবে।

কার কত পয়েন্ট হচ্ছে তা পরিস্কারভাবে এবং স্পষ্টভাবে ঘোষিত হওয়া উচিত। তবে জোরে চেঁচিয়ে ঘোষণা করা ঠিক নয়। যে দেশে খেলা হয় সেই দেশের ভাষাতেই স্কোর ঘোষণা করা ভাল। যদি সার্ভিস সমেত রিসিভিং প্লেয়ার বা পেয়ার ১৩টি বল ফিরিয়ে দেন তবে আম্পায়ার 'স্টপ' বলে খেলা বন্ধ করবেন। পয়েন্ট পাবে রিসিভিং প্লেয়ার বা রিসিভিং পেয়ার।

স্কোর বলার প্রথা বা নিয়ম টেবল টেনিস খেলার আইনের ধারার মধ্যে পড়ে না। তবে আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ এবং আম্পায়ারের করণীয়র মধ্যে এ সম্পর্কে নির্দেশ আছে।

একের ভুল মারে বা অক্ষমতায় যখন অপরে পয়েন্ট পাচ্ছে তখন প্রতি সার্ভিসেই পয়েন্ট হচ্ছে। হয় পয়েন্ট পাচ্ছে সার্ভার, না হয় রিসিভার।

প্রথম যার সার্ভিস সে যদি পয়েন্ট হারায় তবে বলতে হবে ০—১ বা লাভ-ওয়ান। পরের সার্ভিসে সার্ভার পয়েন্ট পেলে ১—১ বা ওয়ান-অল। তার পরেরটি পেলে ২—১ বা টু-ওয়ান। তার পরেরটিও সার্ভার পেলে ৩—১ অর্থাৎ থ্রি-ওয়ান। তার পরেরটি রিসিভার পেলে হবে ৩—২ বা থ্রি-টু। কিন্তু ওই সময় সার্ভিস বদল হচ্ছে। সুতরাং থ্রি-টু না বলে বলতে হয় টু-থ্রি এবং সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ সার্ভিস।

২০—২০ পয়েন্টে 'ডিউস' হয়। কিন্তু টেবল টেনিস খেলায় 'ডিউস' বলার রেওয়াজ নেই। ২০—২০ পয়েন্ট হলে ৫টির বদলে প্রতি খেলোয়াড়কে পর্যায়ক্রমে একটি করে সার্ভিস করতে হয় এবং আম্পায়ারকেও স্কোর বলতে হয় সার্ভারের পয়েন্ট প্রথম উল্লেখ করে। ডাবলস বা মিক্সড ডাবলসের খেলা হলে পর্যায় ও পালার তাল ঠিক রেখে।

মীমাংসাসূচক শেষ গেমে কোন পক্ষের ১০ পয়েন্ট হলেই আম্পায়ার র‍্যালে শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পয়েন্ট ঘোষণা করে বলবেন 'চেঞ্জ এন্ড প্লিজ'।

আম্পায়ারের স্কোর বলার সময় কোনো খেলোয়াড় সার্ভিস করলে রিসিভার প্রস্তুত নাও থাকতে পারেন। আম্পায়ার যদি নিশ্চিত হন যে রিসিভার প্রস্তুত ছিলেন না তাহলে তিনি 'লেট' ডাকবেন এবং কেন 'লেট' ডেকেছেন সার্ভারকে সে কথা জানিয়ে দেবেন।

দর্শকদের হাততালি বা আনন্দের অভিব্যক্তির রেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আম্পায়ারের স্কোর ঘোষণা করা উচিত নয়। এবং আম্পায়ারকে এ বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, র‍্যালের শেষে হাততালি বা আনন্দধ্বনি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো খেলোয়াড় যেন খেলা আরম্ভ না করে। যখন আনন্দধ্বনির মধ্যে স্কোর বলার প্রয়োজন হয়, তখন গলার স্বর একটু উচ্চগ্রামে তুলে স্কোর বলা প্রয়োজন। দর্শকদের হাততালি বা উল্লাস-ধ্বনি যখন দীর্ঘ সময় ধরে চলে তখন পরিস্কারভাবে এবং যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে "কোয়ায়েট প্লিজ" বলে আম্পায়ারের দর্শকদের কাছে অনুরোধ জানানো উচিত। কোনরকম উষ্মার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। হলের কোনো কোণের কোনো গোলমাল বা ঘটনা যদি খেলোয়াড়দের মনঃসংযোগ নষ্টের কারণ হয় তবে আম্পায়ার বিনয়সহকারে একই ধরনের অনুরোধ করতে পারেন।

স্কোর বলার জন্য যেখানে মাইক্রোফোন বা অ্যাম্পিলিফায়ারের ব্যবস্থা থাকে সেখানে খেলা আরম্ভের আগে সেই মাইক্রোফোন বা অ্যাম্পিলিফায়ার পরীক্ষা করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেখানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত খেলোয়াড় এবং দর্শক আম্পায়ারের ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন সেখানে স্কোর ইন্ডিকেটরের ব্যবস্থা থাকা ভাল। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খেলায় স্কোর ইন্ডিকেটর রাখতে বলা হয়েছে। স্কোর ইন্ডিকেটর এমন যায়গায় রাখা দরকার যেখানে সমস্ত দর্শকের দৃষ্টি যায়।

মুকুল

খুব বেশী দিনের কথা নয়। অগ্নিযুগের মহাবিপ্লবী নায়ক মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী দিল্লিতে হঠাৎ মারা যাবার কয়েক-দিন আগের কথা।

পাকিস্তান থেকে মহারাজ সবে কলকাতায় এসেছেন। নানা জায়গায় তাকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। প্রতি সংবর্ধনা সভায় মহারাজ পাক-ভারত মৈত্রীর কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। ময়দানে ক্রীড়া সাংবাদিক-একটি ডেরা নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ওই সময় মহাজাতি সদনে বিনয়-বাদল-দীনেশ যাত্রাভিনয়ের এক চ্যারিটি শোর বন্দোবস্ত হয়। ওই আসরে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবার জন্য কয়েকজন ক্রীড়া সাংবাদিক গেলেন মহারাজের কাছে অনুরোধ জানাতে। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সাংবাদিক বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলেন পাক-ভারত মৈত্রীর প্রশ্নে মহারাজ খেলাধুলোর গুরুত্ব স্বীকার করেন কি না!

'নিশ্চয়ই'—মহারাজের চটপট উত্তর। তিনি বললেন, 'দুই দেশের মধ্যে ভাব বিনিময়, পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক স্থাপন এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের গুমোট আবহাওয়া দূর করার ব্যাপারে খেলাধুলোর চেয়ে ভাল মাধ্যম আর কিছু হতে পারে নাকি? খেলার ডাকে দুই দেশের মানুষ যত কাছে আসবে দেশের মানুষের মনের কালিমা, সন্দেহ, অবিশ্বাস তত দূরে সরে যাবে।'

মহারাজা আরও জানালেন, খুব বেশী দেরী করতে হবে না। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পরই তোমরা দেখতে পাবে দুই দেশের সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে এসেছে। পাসপোর্ট ব্যবস্থা সহজ হবে। তোমরা ওপারে গিয়ে খোলা মনে খেলাধুলো করতে পারবে। ওরা এপারে এসে খুশি হয়ে খেলা-ধুলো করতে পারবে।

কিন্তু হায়! পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর পূর্ব আকাশে ভবিষ্যৎবাণীর অরুণ আভা, পশ্চিম আকাশে তখন দুর্যোগের ঘন অন্ধকার। অদৃষ্টের পরিহাসই বলতে হবে।

আগে কাশ্মীর পরে হকি

পশ্চিমে জিগির উঠেছে 'আগে কাশ্মীর পরে হকি।' শুধু জিগিরই ওঠেনি, লাহোরে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের যোগদানের প্রশ্নে আন্দোলনও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য লাহোরে আরম্ভ হয়েছে সৈন্যবাহিনীর টহল।

'আগে কাশ্মীর পরে হকি' জিগিরের জনক কে? না, একজন বিশ্বখ্যাত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আব্দুল হাফিজ কারদার, যিনি আগে ভারতের পক্ষে টেস্ট খেলেছেন, পরে খেলেছেন পাকিস্তানের পক্ষে এবং পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়কের সম্মানও পেয়েছেন। কারদার ক্রিকেট খেলা ছেড়ে এখন রাজনীতির খেলায় মেতেছেন। রাজনীতির দীক্ষা নিয়েছেন পিপলস পার্টির নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছ থেকে—যিনি ভারতের মাটি জুনাগড়ে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই বড় হয়ে উঠেছেন—এখন হয়েছেন কট্টর ভারত বিদ্বেষী।

ভুট্টোর পিপলস পার্টির টিকিটেই কারদার পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এখন উজির হবার খোয়াব দেখছেন। না হলে গত মার্চ মাসে যে পাকিস্তান দল পাটনায় এসে ডেভিস কাপের খেলায় ভারতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারল, এই সেদিনও ব্যাংকক এশিয়াডে ভারতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে, জয় পরাজয়ের কথা ভুলে দেশের মানুষ হাতে হাত মিলাল, প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলিঙ্গন করল—বিশ্ব কাপে সেই ভারতের অংশ গ্রহণের প্রশ্নে কারদারের এই জেহাদ ঘোষণা কেন?

ভারত বিদ্বেষের ধুয়ো তুলে সম্ভবত তিনি মন্ত্রি মাৎ করতে চান। গুরু ভুট্টোর সমর্থন তো রয়েছেই। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কারদার ঘোষণা করেছেন, কাশ্মীর এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান না হলে পাকিস্তানের মাটিতে তারা ভারতীয় খেলোয়াড়দের পা ফেলতে দেবেন না। শুধু তাই নয়, যদি ভারত খেলতে আসে তবে তারা লাহোর স্টেডিয়াম দখল করে নেবেন এবং মাঠের মাটি খুঁড়ে ফেলবেন। হ্যাঁ, একেই না বলে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট!

স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গির অধিকারী প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা এবং হালফিল রাজনৈতিক পাণ্ডার মতবাদের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। আমি ত্রৈলোক্য মহারাজ এবং কারদারের কথা বলছি। একজন পাকিস্তান ছেড়ে চলে এলে ভারতে হয়তো উজির হতে পারতেন, প্রকৃত মহারাজার সম্মান পেতেন। আসেননি। পাকিস্তানকেই মাতৃভূমি হিসাবে স্বীকার করে নানা নির্যাতন সহ্য করেছেন। তবু সেখানকার জনগণের মঙ্গল কামনা করেছেন। ভারতের সঙ্গে তাদের মৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছেন। আর একজন? মৈত্রীর পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে ভারত বিদ্বেষের বিষ উদ্গীরণ করছেন।

তবে হ্যাঁ, প্রকৃত স্পোর্টসম্যানের মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিও পাকিস্তানে অনেক আছেন। আজ বিশেষভাবেই আমার মনে পড়ছে আর একজন টেস্ট খেলোয়াড়, ডঃ জাহাঙ্গীর খাঁর কথা। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভারত সফরে ডঃ জাহাঙ্গীর খাঁই ছিলেন পাক দলের ম্যানেজার। ওই সিরিজেও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়া ছিল। বিশেষ করে বেরুবাড়ির প্রশ্নে আবহাওয়া উত্তপ্তই ছিল বলা যায়। বৃষ্টির জন্য কলকাতার টেস্ট খেলায় ব্যাঘাত, আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন কষাকষি এবং আরও কতগুলি ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে মধুর

দুই উইকেট কিপারের পাল্লা। সিডনীতে সর্বপ্রথম একদিনের বে-সরকারী টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের উইকেট কিপার অ্যালান নট অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার রডান্ড মার্শ-এর হাতে আউট হতে হতে বেঁচে যাচ্ছেন

সম্পর্ক ও বজায় ছিল না। সফর শেষে ডঃ জাহাঙ্গীর খাঁ পাকিস্তানের তখনকার প্রেসিডেন্ট এবং ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি আইয়ুব খাঁর কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন ওই ধরনের নিরপেক্ষ রিপোর্ট কদাচিত দেখা গিয়েছে। 'ডঃ জাহাঙ্গীরের সওয়াল' শিরোনামায় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত ওই রিপোর্ট যারা পড়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, ডঃ জাহাঙ্গীর কোন ব্যাপারেই নিজেদের দোষ ত্রুটির কথা চেপে যাননি। আবার ভারতীয়দের আচরণে যে ত্রুটি তাঁর চোখে পড়েছে বা যা তিনি অনুভব করেছেন তাও উল্লেখ করতে দ্বিধা করেননি। ডঃ জাহাঙ্গীরের কথা থাক। আজ পাকিস্তানেও এমন বহু শান্তিকামী ও খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবসম্পন্ন মানুষ আছেন যাঁরা কারদারের মনোভাব সমর্থন করতে পারছেন না। এবং আন্তরিকভাবেই বিশ্ব হকিতে ভারতের অংশগ্রহণ কামনা করছেন।

আন্তর্জাতিক প্রশ্ন

আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের অনুমোদন ক্রমেই বিশ্ব হকি কাপের সর্বপ্রথম আসর বসছে পাকিস্তানে। প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি দেশ অংশ গ্রহণের অধিকার অর্জন করেছে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন সেই দশটি দেশকে আমন্ত্রণ জানাতেও বাধ্য। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েই ভারতীয় হকি ফেডারেশন লাহোর যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারত সরকারেরও অনুমোদন মিলেছে। এখন পাকিস্তানের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা যাঁরা পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ উজির নাজির তাঁরা বলছেন, আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নাও। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে পাক সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি না পেলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে লাহোরের মাটিতে পা ফেলা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থারও দায়িত্ব রয়েছে। পাকিস্তান সরকার যদি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না দেন তবে বিশ্ব হকি সংস্থার কর্তব্য হবে অন্য কোনো দেশে প্রথম বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। ভারতেও এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করার দাবিদার ছিল। এখনো বোধ হয় ভারতের তরফ থেকে আপত্তি উঠবে না এবং পাকিস্তানকে সাদরে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাবে।

মোহন বাগানের রোভার্স জয়

রোভার্স কাপ আবার কলকাতায় এসেছে। গতবারের কাপ বিজয়ী এবং কলকাতার চ্যাম্পিয়ন ইস্ট বেঙ্গলকে সেমি ফাইনালে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্রর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলেও কলকাতার লীগ রানার্স মোহন বাগান ফাইনালে মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্রকে ১—০ গোলে পরাজিত করে রোভার্স বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে।

মোহন বাগান এবং মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্র দুই দলই বাই পেয়ে চতুর্থ রাউন্ড থেকে খেলা শুরু করে। ফাইনালে যাবার পথে মোহন বাগান পরাজিত করে বিকানীরের আর্মড কনস্টাবলারিকে ৪—৩ গোলে, বাঙ্গালোরের এল আর ডি-ই দলকে ৫—০ গোলে এবং গোয়ার সালগাওকার স্পোর্টস ক্লাবকে ৩—০ গোলে। অপরদিকে গোরখা ব্রিগেডকে ৩—১ গোলে, গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবকে ২—১ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে পরম শক্তিশালী ইস্ট বেঙ্গলকে ০—০ ও ১—০ গোলে হারিয়ে মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্র সর্বপ্রথম রোভার্স ফাইনাল খেলার অধিকার অর্জন করে। এবার নিয়ে রোভার্স ফাইনাল খেলেছে মোহন বাগান ১২ বার, তার মধ্যে একটানাই ৭ বার। মোহনবাগানের শক্তি এবং সুনামের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য রোভার্সের ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ১২ বার ফাইনালের মধ্যে জয় মাত্র ৪ বার। তবু এবারকার জয়ের ক্ষেত্রে মোহন বাগান অবশ্যই কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্র যে কড়া টিম, ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে দুই দিনের দৃঢ়তাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শেষ পর্যন্ত জয় থেকেই তার প্রমাণ মেলে। ফাইনালে মোহন বাগানের সঙ্গেও দুইদিন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে তারা হেরে গেছে দ্বিতীয়ার্ধে সুভাষ ভৌমিকের করা একটি মাত্র গোলে।

বহু খ্যাতনামা দলের সমাবেশে রোভার্সের খেলা এবার ভালই জমেছিল। এখন ফুটবল অনুরাগীদের দৃষ্টি দিল্লির ডুরাণ্ডের দিকে।

রোভার্সে ইস্ট বেঙ্গলের পরাজয়ের পর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে, এ বছরও কোন দল প্রকৃত 'ট্রিপল ক্রাউনের' অধিকারী হতে পারল না। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স এবং ডুরাণ্ড জয়ের সূত্রেই 'ট্রিপল ক্রাউনের' অলিখিত সম্মান। আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো দল এই সম্মান লাভ করতে পারেনি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী দল

অধিনায়ক নির্বাচনের পর দল গড়ার পর্ব ও শেষ। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাত্রা করছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে যে দল গড়া হয়েছে তাকে বলা হয়েছে 'ব্লেন্ড অব ইউথ অ্যাণ্ড এক্সপিরিয়েন্স।'

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন আসে, বিদেশ সফরের সময় কোন্ দলটি তরুণ ও অভিজ্ঞের সংমিশ্রণে গড়া হয়নি? ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড সবার ক্ষেত্রেই এক কথা। সম্ভবত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং পাকিস্তানই দল গড়ার সময় তারুণ্যের উপর কিছু বেশী জোর দেয়।

যাই হক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দলকে সর্বাঙ্গসুন্দর দল বলে অভিহিত করতে পারছি না। বিশেষ করে কয়েকটি সিরিজে বাতিল খেলোয়াড়দের মধ্যে দুই-একজনকে দলে দেখে। বাতিল খেলোয়াড়দের আবার দলে স্থান দেওয়া অবশ্যই অযৌক্তিক নয় যদি তারা ফর্ম ফিরে পেয়ে থাকেন। তবে উঠতি তরুণদের উপেক্ষা করে তাদের আহ্বান করা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। ক্রিকেটে ভাল রান করা বা উইকেট পাওয়া কিছুটা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। দল গড়ার মাপকাঠি হচ্ছে ব্যাটসম্যান কিভাবে বোলারকে ফেস করছেন, আর বোলারই বা কিভাবে ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে সমীহ আদায় করছেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা। একজন খেলোয়াড়ের একটি খেলার ব্যর্থতা বা একটি খেলার সাফল্য নয়। এমন কি ধারাবাহিক ব্যর্থতার পরও কোন ব্যাটসম্যান বা বোলারকে দলে স্থান দেওয়া যেতে পারে যদি তার টেকনিক নিখুঁত হয়, যদি তার আন্তরিকতায় কোন খাদ না থাকে। তার সঙ্গে তারুণ্যের প্রশ্ন তো থাকবেই। ব্যক্তিগত আচরণে যারা অতীতে ক্রিকেট দরবারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে দুই-একজন দলে স্থান পাওয়ায় আন্তরিকতার প্রশ্ন ঠিক ঠিক বিবেচিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

রনজি, দলীপ বা ইরানী ট্রফির খেলায় গুণাগুণের ভিত্তিতে যদি দল গড়া হয়ে থাকে তবে বলব অনেকের দাবীই উপেক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের। রমেশ সাক্সেনা, গোপাল বসু, পি সি পোদ্দার, দিলীপ দোশী এ বছর সত্যিই ভাল খেলেছেন। তাদের যোগ্যতা উপেক্ষা করে পূর্বাঞ্চল থেকে উইকেট কিপার হিসাবে নেওয়া হয়েছে একমাত্র জিজ্ঞিবয়কে যিনি ইস্ট জোন টিমেও উইকেট রক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হননি। অনেকের ধারণা, মহারাষ্ট্রের তরুণ উইকেট কিপার কানিৎকারের দলে আসা উচিত ছিল। অমরনাথ ভ্রাতৃদ্বয়ের যোগ্যতা উপেক্ষা করে নির্ধারক সমিতি বাতিল খেলোয়াড় দিলীপ সরদেশাইকে দলে স্থান দিলেন কোন যুক্তিতে তাও বাঝা ভার। যাই হক, যে দল গড়া হয়েছে, আশা করব ওয়েস্ট ইণ্ডিজে তারা ভাল খেলবেন, প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ আচরণের দ্বারা জাতির সুনাম বাড়াবেন।

একলব্য

সত্যাজিৎ রায়ের নতুন সম্মান

শ্রীসত্যজিৎ রায় আবার আন্তর্জাতিক সম্মান পেলেন। এটা যুগোস্লোভিয়ার রাষ্ট্রীয় সম্মান। একই সঙ্গে আর যে দুজন সম্মানিত হয়েছেন তাঁরা হলেন চার্লি চ্যাপলিন ও স্যর লরেন্স ওলিভিয়ার। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ প্রতিভা, চলচ্চিত্রের উন্নতিতে অবদান এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট টিটো গত ১৬ জানুয়ারী তাঁদের রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন। সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শেষে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

অন্য যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রেনে ক্লেয়ার (ফ্রান্স), মার্ক ডনস্কয় (রাশিয়া), আকিরা কুরোসাওয়া (জাপান) ফ্রিৎজ ল্যাং (জার্মানী) এবং ইঙ্গমার বার্গম্যান (সুইডেন)।

তপন সিংহ পরিচালিত হিন্দী ছবি "সাগিনা মাহাতো"-র নায়ক-নায়িকা দিলীপকুমার ও সায়রা বানু ফটো—দেশ

"সাগিনা মাহাতো"-র সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব

"সাগিনা মাহাতো" যত বড় ছবি এর সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন কিন্তু তেমন বড় ছিল না। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর (দুই নম্বর) ফ্লোরে অনধিক এক ঘণ্টার অনুষ্ঠান, অনাড়ম্বর হলেও আন্তরিকতায় পূর্ণ। প্রযোজকের তরফ থেকে শ্রীহেমেন গাঙ্গুলি প্রথমে ছবির সাফল্যের জন্য জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। ছবির নায়ক শ্রীদিলীপকুমারও সংক্ষিপ্ত ভাষণে পরিচালক, প্রযোজক ও কলাকুশলীদের সাধুবাদ দিলেন। পরিচালক শ্রীতপন সিংহ জানালেন কী নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পী ও কলাকুশলীরা এ ছবিতে কাজ করেছেন। শ্রীমতী রমা গাঙ্গুলি ও শ্রীমতী নিনি কাপুরের হাত থেকে শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীরা উপহারদ্রব্য নিলেন। পরিচালক এবং দুই প্রযোজক শ্রীহেমেন গাঙ্গুলি ও শ্রী জে কে কাপুরের জন্যও স্মারক উপহার নির্দিষ্ট ছিল। কাহিনীকার রূপদর্শী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। পরিশেষে শ্রীগাঙ্গুলি জানালেন, রূপশ্রী ইন্টার-

"সাগিনা মাহাতো"-র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে শ্রীমতী রমা গাঙ্গুলির হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন দিলীপকুমার, সায়রা বানু, তপন সিংহ ও কণ্ঠশিল্পী পিণ্টু ভট্টাচার্য ফটো—দেশ

ন্যাশনাল ও ইস্টার্ন সার্কিটের কর্মীদের বোনাস দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানের আগে ছবির নেপথ্য কণ্ঠ-শিল্পীরা গান করেন। শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅনুপ ঘোষাল গেয়ে শোনান দ্বৈতসংগীত। শ্রীপিন্টু ভট্টাচার্য ও শ্রীমৃণাল মুখোপাধ্যায়ও একটি করে গান করেন।

হিন্দী "সাগিনা মাহাতো"-র শুটিং শুরু

কলকাতায় হিন্দী "সাগিনা মাহাতো"-র শুটিং আরম্ভ হয়েছে গত সপ্তাহে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। প্রথম দিনের শিল্পী ছিলেন দিলীপকুমার ও সায়রা বানু। ইস্টম্যান কালারে ছবিটি তৈরি হচ্ছে। তপন সিংহ ছবিটি পরিচালনা করছেন, তবে হিন্দী "সাগিনা মাহাতো"-র সংগীত পরিচালক হলেন শচীন দেববর্মণ। রূপদর্শীর কাহিনীর হিন্দী সংস্করণে বাংলা চিত্ররূপের প্রায় সব শিল্পীই থাকছেন। বোম্বাইয়ের শিল্পীদের মধ্যে ওম প্রকাশকে ছবিতে দেখা যেতে পারে।

নেতাজী ইন অ্যাকশন ১৯৩৯—৪৪

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত তথ্য-চিত্র "নেতাজী ইন অ্যাকশন ১৯৩৯-৪৪" দেশবাসীকে উপহার দিচ্ছেন নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো। নেতাজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে এই চিত্রটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। ২৩, ২৪ ও ২৬ জানুয়ারী রবীন্দ্র-সদনে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছবিটি দেখানো হবে।

'নেতাজী ইন অ্যাকশন' তথ্যচিত্রের একটি দৃশ্য

মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরির বাংলা ভাষার ছবি 'হরপার্বতী'-তে জেমিনী গণেশন ও পদ্মিনী

মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উৎসব ছবিটির আরম্ভেই দেখা যাবে। ওই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীকে দেখতে পাবেন দর্শকরা, শুনতে পাবেন কবির কণ্ঠস্বর। এই ছবিতে নেতাজী হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজি এই তিন ভাষাতেই কথা বলেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু ঘটনা এবং রাসবিহারী বসুর হাত থেকে নেতাজীর আজাদ হিন্দ আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ ছবিটির অন্তর্ভুক্ত।

হরপার্বতী

"হরপার্বতী" (মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরি) পৌরাণিক চিত্রটি এই মাসেই মুক্তি পাচ্ছে। উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত এ ছবির দুই প্রধান শিল্পী জেমিনি গণেশন ও পদ্মিনী। সন্তোষ মুখোপাধ্যায় সুরসংযোজনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

"খুঁজে বেড়াই" শেষ

সলিল দত্ত পরিচালিত গীতাঞ্জলি ফিল্মসের "খুঁজে বেড়াই" ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ। চিত্রকাহিনী পরিচালকেরই রচনা। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, দিলীপ রায়, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুনীলেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

নাট্য-সমালোচনা

বল্লভপুরের রূপকথা
(শতাব্দী)

বাদল সরকারের নাটক মাত্রই সমস্যার নাটক নয়। নিছক আমোদ বিতরণের জন্যও যে তিনি নাটক লিখতে পারেন এবং সেটাও যে তাঁর আর সব সীরিয়স নাটকের চাইতে কম মূল্যবান নয় সে প্রমাণ পাওয়া গেল "বল্লভপুরের রূপকথা"-তে। কমেডি সৃষ্টির যে একটা বিশেষ শক্তি শ্রী সরকারের আছে তা আমরা তাঁর আগের নাটকগুলিতেও দেখেছি। এবার এ নাটকে নাট্যকারের সে স্বচ্ছন্দ ক্ষমতার পুরো পরিচয়। তবে নাটকের প্রধান বস্তু হাস্যরসের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট ভিন্ন স্বাদও মিশে গিয়েছে। রূপকথার নায়ক ভূপতির সমস্যা এবং আশা আকাঙ্ক্ষাতে তার আভাস। ভূপতি বল্লভপুরের চারশো বছরের পুরনো রাজবাড়ির অধীশ্বর। বাড়ি বেচতে না পারলে ভূপতি সুখের সন্ধান পাবে না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রাজসম্পত্তির যে প্রায় কোন মূল্যই আজকের দিনে নেই সেটাও ভূপতি জানে। তবু আশার কথা এই যে মিঃ হালদারের মত ব্যক্তিও আছেন যিনি আকবরের আমলের বাড়ি কিনতে পেলে হাতে স্বর্গ পান। আর বাড়িটা যে-হেতু ভুতুড়ে—ভূপতির পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা-অধ্যুষিত—তাই মিঃ হালদারের আগ্রহ আরও বেশি। বাড়িটা যাতে মিঃ হালদার কেনেন তার জন্য ভূপতির কত না চেষ্টা। সে তো রঘুদার কথা চেপেই গিয়েছিল। রঘুদা সেই প্রেতাত্মা। চারশো বছর ধরে পিতার অভিশাপে ওই বাড়িতে বন্দী। রাত এগারোটায় রঘুদার ছায়ামূর্তি ওই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, কালিদাসের কাব্য আবৃত্তি করে, কখনো বা বিকটভাবে হাসে। এই রঘুদার কথা শেষ পর্যন্ত গোপন রাখতে পারেনি ভূপতি। রঘুদার ভৌতিক অস্তিত্বের কথা ফাঁস হয়ে যায় মিঃ হালদারের কাছে।

এত পুরনো বাড়ি তার উপর ভূত—মিঃ হালদারের বাড়িটা চাই-ই। বাদ সাধেন তাঁর স্ত্রী। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁর মেয়ের কাছে রাজবেশ পরে সংস্কৃত কাব্য আওড়ে ভূপতিকে প্রেম নিবেদন করতে। রঘুদার চেহারা ভূপতির মত। ভূপতি যে নির্দোষ এটা প্রমাণ করতে যা-কিছু তাকে করতে হয় তা-নিয়ে নাটকের শেষ পর্বের কৌতুক।

এই রঙ্গ-কাণ্ডের প্রতিটি ঘটনা দেখে দর্শক হাসিতে ভেঙে পড়েন। ভূপতিকে পদে পদে বিপন্ন দেখেও তার প্রতি দর্শকের

"এখানে পিঞ্জর" (পরিচালনাঃ যাত্রিক) ছবিতে উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন ও অন্যান্য দুই শিল্পী

মায়া হয়। বাড়ি বেচার প্রাণান্তকর চেষ্টার মধ্যে ভূপতি যেন একটি ট্র্যাজিক চরিত্র। এখানেই কমেডি নাটকটির ভিন্নতর স্বাদ।

নাটকের গঠন চমৎকার, তেমনি সুন্দর বাদল সরকারের নাট্যপরিচালনা। নাটকের আগে ও পরে পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে সূত্রধারের মত জনৈক বক্তার পূর্বকথন ও পরিণতি ঘোষণা বাদ গেলেই ভাল হত।

বিশেষ করে শেষের কথাগুলির কোন প্রয়োজনই ছিল না। ভূপতি যখন প্রমাণ করে দিল সে দোষী নয়, ছন্দাকে যখন বলল সে কাপুরুষ নয়, ছন্দা যখন মিষ্টি রসিকতার সুরে বলল তবু রঘুদা ভাল আবৃত্তি করে, তখনই নাটক শেষ হলে বেশ হত। নাটক খুব জমে ওঠে মিঃ হালদারের আগমনের পর। তার প্রতিটি কথায় দর্শক হাসেন। মিঃ হালদারের চরিত্রে নাট্যকার-পরিচালক বাদল সরকারের অসামান্য কমিক অভিনয়ের জন্যই দর্শক এত আনন্দ পেয়েছেন। শিল্পীর কথা বলার ধরন, থেকে থেকে উল্লাসে ১৫৬১ বলে ওঠা, মুখের অভিব্যক্তি ইত্যাদি দর্শককে মাতিয়ে রেখেছে। অভিনয় সকলেরই প্রশংসনীয়। এক কথায় টিম-ওয়ার্ক খুব ভাল। তবু এর মধ্যে দেবেন গঙ্গোপাধ্যায় (ভূপতি), ও পঙ্কজ মুন্সীর (ভূপতির বন্ধু) বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। অন্যান্য চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন পুতুল সরকার, ভারতী সরকার, আদিত্য মিত্র ও সমর ভৌমিক। অপূর্ব বসুর পবনকে দর্শকদের মনে থাকবে।

অভিনেতার পত্নী-বিয়োগ

জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীসুখেন দাসের স্ত্রী শ্রীমতী প্রণতি দাস (২৭) গত ১১ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুত্র, দুই কন্যা ও স্বামীকে রেখে গেছেন।

"প্রতিবাদ"-এর মুক্তি আসন্ন

আর্ট মুভিজ-এর "প্রতিবাদ" ছবিটি অবিলম্বেই মুক্তি পাচ্ছে। তপেশ্বর প্রসাদ ছবিটি চরিচালনা করেছেন, সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন শ্যামল মিত্র। বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ছবির নায়ক-নায়িকা। সহ-নায়িকা চরিত্রে আছেন জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্ধ অতীত

উষা প্রোডাকসন্সের "অন্ধ অতীত" ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই রহস্য-চিত্রটির প্রযোজক অসীম সরকার ও পরিচালক হীরেন নাগ। বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, গীতা দে, বঙ্কিম ঘোষ ও নবাগত বলন হাজরা। সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র।

জয়-জয়ন্তী

এমকেজি প্রোডাকসন্সের 'জয়-জয়ন্তী' ছবির মুক্তি আসন্ন। মণি বর্মা রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন এস মল্লিক। নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : চন্দ্রাবতী দেবী, লোলিতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার মণ্টু ব্যানার্জী এবং পাঁচটি কিশোর-কিশোরী —সুচেতা, মধুমিতা, সম্রাট, পাপিয়া ও টিংকু। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ ছবির সংগীত পরিচালক।

নিমন্ত্রণ

'বালিকা বধূ'র পরে পরিচালক তরুণ মজুমদারের পরবর্তী ছবি হল "নিমন্ত্রণ"। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাহিনীর চিত্ররূপে সন্ধ্যা রায় ও অনুপকুমার (পলাতক'এর জুটি) দুই প্রধান শিল্পী। অপর একটি প্রধান নারী চরিত্রে আছেন নন্দিনী মালিয়া। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, জহর রায়, পাহাড়ী সান্যাল, শিবানী বসু, কল্যাণী মণ্ডল, শিউলি মুখোপাধ্যায়, সুরুচি সেনগুপ্তা, রায় চৌধুরী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলেন্দু পাল ও অন্যান্য বহু শিল্পী। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁকে সহযোগিতা করছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সংবর্ধনা

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন গত রবিবার (১০ জানুয়ারি) হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল-এ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন বি এফ জে এ-র সভাপতি শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ

তাঁর সাংবাদিক-জীবনের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীঘোষ বেশ কয়েক বছর বি-এফ-জে-এ'এর সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি সংস্থার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

বি-এফ-জে-এ প্রদত্ত মানপত্রে এই সংস্থার উন্নতিকল্পে শ্রীঘোষের ভূমিকার উল্লেখ করা হয়। বি-এফ-জে-এ'এর বর্তমান সভাপতি শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ মানপত্রটি পাঠ করেন এবং পরে সেটি শ্রীঘোষের হাতে তুলে দেন। এ ছাড়া সভ্যদের পক্ষ থেকে আরও কিছু উপহার দ্রব্য শ্রীঘোষকে দেওয়া হয়। শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে বি-এফ-জে-এ'এর বিশেষ ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, সভাপতি হিসাবে যদি তিনি

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই আসরে।

আসরের প্রথম শিল্পী ছিলেন ধীরেন বসু। পরিবেশিত ১২ খানি গানে তিনি নজরুলের গানের বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে পেরেছেন। গানগুলির নির্বাচনও ভাল। বিশেষ করে মনে রাখার মত 'মুসাফির মোছরে আঁখিজল', 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়', 'জয় বিবেকানন্দ' এবং 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি'। শেষ গানটি যতবারই শোনা যায় ততবারই মনের মধ্যে একটি ব্যথা গুমরে ওঠে জীবন্মৃত নজরুলের কথা ভেবে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০ খানি রবীন্দ্র সংগীত। যেহেতু এটি প্রভাতী আসর, তাই অশোকতরু অধিকাংশ গানই বেছে নিয়েছিলেন প্রভাতী রাগের। ফলে অনুষ্ঠানে রাগ-বৈচিত্র্য হয়তো ছিল না, কিন্তু রস-বৈচিত্র্য অনেকখানিই ছিল। সর্বোপরি ছিল শিল্পীর গায়ন-বৈশিষ্ট্য। 'সখি আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি', 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল', 'আমায় বোল না গাহিতে', 'ফিরে ফিরে আমায় মিছে ডাকো', 'আজ তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' প্রভৃতি গান অশোকতরুর কণ্ঠে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এ-ছাড়া 'মা একবার দাঁড়াগো হেরি' গানটি শুনতে শুনতে চোখে জল এসে যায়নি এমন শ্রোতাই বা কজন ছিলেন সেদিনের আসরে।

নজরুলের গানের অনুষ্ঠানে প্রদীপ ঘোষ এবং রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠানে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া সংগীত-পরিচয় অনুষ্ঠানের রস গ্রহণে সাতাই সাহায্য করেছে। উভয় অনুষ্ঠানে যন্ত্র-সংগীত সহযোগিতায় দীনেশ চন্দ্র, বীরেন্দ্র-নারায়ণ, রবীন গাঙ্গুলী, রমেশ চন্দ্র, জহর দে ও রাধাকান্ত নন্দীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে নজরুলের গজল গানের সঙ্গে রাধাকান্তর তবলার কথা ভোলা যায় না।

—দিবাকর শর্মা

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী অবলম্বনে তৈরি "মহাবিপ্লবী অরবিন্দ" ছবির কাজ শেষ। শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী জীবনের ঘটনা এবং ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার চিত্রনাট্যে বিশেষ স্থান পেয়েছে। শ্রীকমলা ফিল্মস প্রযোজিত এ ছবির নাম ভূমিকার শিল্পী দিলীপ রায়। দীপক গুপ্ত ছবিটি পরিচালনা করেছেন। চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কিরাণার ঘরোয়া আসর

৩ জানুয়ারি, রবিবার সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী রোডের মল্লিক বাড়ির দোতলায় সাবেক আমলের ঝাড়লণ্ঠন আর ভিকটোরিয়ান আসবাবের বনেদী আওতায় "কিরাণা সংগীত সমাজ"-এর মাসিক অধিবেশন বসেছিল।

কিরাণা ঘরানার অন্যতম প্রবর্তক ওস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ খান (বহরে) মরহুমের বিশিষ্ট শিষ্য, রাজস্থানের পণ্ডিত জয়চন্দ ভাট এই আসরের প্রথম শিল্পী। শুরুতে ইমন রাগে সূক্ষ্ম করে সুর ছোঁয়ালেন ভাটজী। বরতে-বিস্তারে-সরগমের যাদুমন্ত্রে কয়েক যুগ আগের নির্বাপিত ঝাড়লণ্ঠনগুলোয় যেন সাতরঙা আলোর ঢেউ বইতে লাগল। পণ্ডিতজী নিখাদ থেকে গান্ধারে গেলেন...ধৈবত থেকে নিখাদ ছুঁয়ে পঞ্চমে এলেন...শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ। বিরলকেশ শীর্ণদেহী দৃষ্টিহীন এই রাজস্থানী সংগীতজ্ঞ সেদিন তাঁর ঘরানার ইমনে যে দক্ষতা দেখালেন তা

পণ্ডিত জয়চন্দ ভাট

দীর্ঘদিন মনে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে দেবে। জয়চাঁদজী এরপর আভোগী কানাড়া রাগে একখানি ছোটো খেয়াল পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে ছিল আকাশবাণীর শিল্পী ওস্তাদ আলি আমেদের সানাই। আলিসাহেব প্রথমে বাজান মারু বেহাগ, পরে একটি ধুন, সবশেষে ভৈরবী ঠুমরী। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, তারুণ্যের প্রতাপে নিষ্ঠ এমন মেজাজী সানাই বড় একটা শোনা যায় না।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন কলারসিক পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী গোপাললাল মল্লিক।

নন্দনবিহারী

কালো রাস্তা শাদা বাড়ি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "কালো রাস্তা শাদা বাড়ি" কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি প্রযোজনা করছেন চিত্রলিপি ফিল্মস। অজয় কর ছবিটি পরিচালনা করছেন। "প্রতিদ্বন্দ্বী"-র অন্যতম অভিনেতা দেবরাজ রায় এ-ছবিতে নায়ক চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন। ছবির বেশির ভাগ দৃশ্য তোলা হবে বিহারের রামগড়, টিটাগড় প্রভৃতি অঞ্চলে। সলিল সেন ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

হাঙরগুলো ক্রমেই এগিয়ে আসছে -----
শিগগির এসো ওয়াকার-বাবা, শিগগির!

জানি না, ওকে বাঁচাতে পারব কিনা।

হঠাৎ একটা মস্ত শুশুক এসে রাজার পাশে ভুস্ করে ভেসে উঠল! সলোমন!
সলোমন!

সরাসরি একটা হাঙরকে আক্রমণ করল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নেফারতিতির পিঠে অরণ্যদেবও সেখানে পৌঁছে গেছেন।
ওয়াকার-বাবা!
নড়িসনে রাজা!

রক্তের স্বাদে পাগল হয়ে গিয়ে হাঙরগুলো হঠাৎ স্রোতে-হাঙরটাকেই আক্রমণ করল ---

অরণ্যদেব এগিয়ে গেলেন রাজার দিকে, আর নেফারতিতি আক্রমণ করল আর একটা হাঙরকে -----
5/31

দুই শুশুক মিলে হাঙর-স্রোতকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে -----

একটা হঠাৎ রাজার দিকে এগিয়ে এল।
কিন্তু তার সামনে।

ওড়িশায় রাষ্ট্রপতির শাসন এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ১১ জানুয়ারী ওড়িশায় রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওড়িশার রাজ্যপাল ডঃ আনসারির প্রতিবেদনটি বিবেচনা করেই রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি সাময়িকভাবে অকেজো রাখা হয়েছে। রাজ্যে নতুন সরকার গঠন সম্ভব কিনা তা রাজ্যপাল ভেবে দেখবেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিংদেও'র পদত্যাগের পর ওড়িশার রাজনীতি যে গতি নিয়েছে এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দল যে মনোভাব দেখাচ্ছেন তাতে রাজ্যে নতুন সরকার গঠন অসম্ভব বলেই মনে হয়। ওড়িশার অনেকগুলি রাজনৈতিক দল লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের যে দাবি জানান এখনকার মত তা মেনে নেওয়া হয়নি। রাজ্যপালের ঘোষণার মেয়াদ দু মাসের বেশী বজায় রাখতে হলে সাংবিধানিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইতি মধ্যে রাজ্যসভার অনুমোদন না পেলে ওড়িশা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ঘোষণাটি ১১ মারচ তামাদি হয়ে যাবে। এখন ওড়িশায় যদি নতুন সরকার গঠিত না হয় তা হলে এখানে বিধানসভা নির্বাচন না করে উপায় নেই। এবং লোকসভা নির্বাচনের সময়েই তা করতে হবে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বিধানসভা সাসপেনড করে রাখা এবং রাজ্যপালকে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা সন্ধানের সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী নয়।

দেশী সংবাদ

১১ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে টেলিফোন করেছিলেন। তাঁর বিশেষ দূতেরাও কলকাতায় এসেছিলেন অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে। অনুরোধ একটাই—পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেস এবং নব কংগ্রেসে নির্বাচনী সমঝোতা করার জন্য অজয়বাবু যেন উদ্যোগী হন।

দুর্গাপুর ইসপাত কারখানার অফিসার সমিতি নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলি বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন—(১) কারখানা কর্তৃপক্ষের নির্বিচার আত্মীয় পোষণ এবং নীতি বর্জিত প্রমোশন দান, (২) কারিগরি ও প্রশাসনিক দুর্নীতি। বার্তায় বলা হয়েছে যে, এই আবেদনে কাজ না হলে তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে বাধ্য হবেন।

১২ জানুয়ারি—বেআইনী কার্যকলাপ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার আজ জম্মু ও কাশ্মীরের গণভোট ফ্রন্টকে 'বেআইনী সঙ্ঘ' বলে ঘোষণা করেছেন। এই আদেশ এখন থেকেই কার্যকর হবে বলে গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচনী জোট বাঁধার প্রশ্নে বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের আলোচনা গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল। আবার ঠিক তেমনি করেই হঠাৎ মঙ্গলবার এই দুই দল এক সঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৩ জানুয়ারি—কলকাতার পাতাল রেল সম্পর্কে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা রেলমন্ত্রী শ্রী জি এল নন্দ-র কাছে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন। পাতাল রেলের জন্য খরচ পড়বে ১২০ কোটি টাকা। এই রেল দৈর্ঘে হবে সাড়ে ১৬ কিলোমিটার।

যেসব স্কুল এ পর্যন্ত টেস্ট পরীক্ষা হয়নি পারেনি, তাদের ছাত্রছাত্রীরা এবার টেস্টে না বসেই স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা বলে এই বিশেষ অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা যায়।

১৪ জানুয়ারি—আগামী লোকসভা নির্বাচনে সব রাজ্যের প্রত্যেক প্রার্থী সর্বোচ্চ ব্যয় করতে পারবেন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। নির্বাচন

কমিশন সরকার সমীপে এই সুপারিশ করেছেন। এতদিন এই অঙ্ক ছিল পঁচিশ হাজার টাকা।

চিত্তরঞ্জন ব্যাংক ডাকাতির প্রধান আসামী হিসাবে সন্দেহভাজন ছোটো মুন্না ওরফে রেওয়াজুদ্দিনকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিস গ্রেফতার করেছে। ছোটো মুন্না একজন পশ্চিমা মুসলিম যুবক। তার প্রধান সহযোগী মণ্টু নামে এক বাঙালী যুবক। অভিযোগ, সে ডাকাতির বারো লক্ষ টাকা নিয়ে এখনও ফেরার।

১৫ জানুয়ারি—বিবদমান অঞ্চল বশুনিয়া, বেরুবাড়ি এবং দইগ্রামে পাকিস্তানী ছিট-মহলের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য স্থলপথে যাতায়াত বিধি চুক্তি অনুযায়ী আগামী সপ্তাহে কোচবিহারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে এক বৈঠক হবে। কোচবিহারের ভারতের ডেপুটি কমিশনার এবং রংপুরের ডেপুটি কমিশনার এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ এস এইচ এফ জে মানেকশ আজ এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, যদি কোন দেশ ভারতের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায় তাহলে তাকে এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যে, সে আর মাথা তুলতে পারবে না। স্পষ্টই বোঝা যায় পাকিস্তানের উদ্দেশ্যেই এই সতর্কবাণী।

১৬ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গ এলাকায় নির্বাচনে ১ লক্ষ ৮০ হাজার প্রিসাইডিং এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। বাইরের রাজ্য থেকেও এবার কয়েক হাজার সরকারী কর্মচারীকে নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এখানে আনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

১৭ জানুয়ারি—কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন অঞ্চলে শনিবার রাত থেকে রবিবার রাত্রি পর্যন্ত দলীয় সংঘর্ষ এবং অন্যান্য হাঙ্গামায় ১৭ জন নিহত হয়। এদের মধ্যে এগারজন যুবক। আহতের সংখ্যা অন্তত কুড়ি। দমদমের কোন কোন এলাকায় এদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে এগার ঘণ্টার জন্য কারফু জারি করা হয়। তা ছাড়া সমগ্র দমদম এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এইবারের নির্বাচনে শান্তিরক্ষার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার পুলিস চেয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় সামরিক বাহিনীও নিয়োগ করা হবে। তবে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সৈন্য মোতায়েনের কোন কথা এখনও হয়নি।

আজ সকালে বর্ধমানের ভাতার থানার মহাচাঁদা গ্রামে নব কংগ্রেস এবং সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন খুন হন। নিহত তিনজনের মধ্যে একজন নব কংগ্রেস সমর্থক এবং বাকি দুজন সি পি এম সমর্থক।

বিদেশী সংবাদ

১১ জানুয়ারি—পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আওয়ামি পার্টির নেতা মৌলানা ভাসানী গতকাল ঢাকায় বলেন : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি পাকিস্তানের ভাবী সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানান।

১২ জানুয়ারি—লাহোরে ভারতবিরোধী হাঙ্গামা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লাহোরের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। হাঙ্গামাকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেট ক্যাপটেন আবদুল হাফেজ কারদার।

১৩ জানুয়ারি—পাকিস্তান এয়ার লাইনসের দশ হাজার কর্মচারীর ধর্মঘট দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত আছে। পাকিস্তান সরকার ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করার পরেই এয়ারলাইন কর্মচারী ইউনিয়নের দুজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

১৪ জানুয়ারি—আজ ঢাকা থেকে করাচি রওনা হবার আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামি লীগ নেতা মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। পাক প্রেসিডেন্ট জানান, মুজিবরের হাতে শীঘ্রই ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হবে।

১৫ জানুয়ারি—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডওয়ার্ড হিথ আজ সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথ সম্মেলনে বিভিন্ন কমনওয়েলথ দেশের নেতাদের লক্ষ্য করে বলেন, কমনওয়েলথ-এর মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, ভুল বোঝাবুঝির ফলে তা যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, কমনওয়েলথ আপিল আদালত নয়।

১৬ জানুয়ারি—জানুয়ারি—মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কয়েকজন সদস্য দল থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা খবর দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, মৌলানা ভাসানীর উগ্রপন্থী মনোভাবের জন্য তাঁরা দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

১৭ জানুয়ারি—পেনাং থেকে ১২০ মাইল দক্ষিণে একটি রাস্তার পাশে এক জলাভূমিতে আজ দুই জাতের হাজার হাজার ব্যাং পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে। লড়াই থেমে যাবার পর দেখা যায় এই এলাকায় শত শত মরা ব্যাং ছড়িয়ে রয়েছে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

আপনি জানেন রূপের আধার হল স্বাস্থ্য। আর তা নির্ভর করে আপনার হাসিখুশিভাব, আপনার গায়ের রঙের উজ্জ্বলতা ও চুলের বাহারের ওপর।

এসব সঠিকভাবে রক্ষা করতে হলে আপনার সুষম খাদ্যের দরকার তা অধিকাংশ লোকই খান না। আর তাছাড়া, জলবায়ুর প্রভাবেও শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

তবে চিন্তার কিছুই নেই। 'ভিটামিনেটস' ফর্টে-তে আপনার একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপকরণগুলি পাবেন। এর প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে ১১ রকমের ভিটামিন, ৫ রকমের খনিজ লবণ। আপনার কেমিস্টের দোকান থেকে আজই কিনে আনুন শক্তিতে ভরপুর এই লাল চকচকে ট্যাবলেট। দিনে একটি খেলেই আপনার শক্তি ও রূপ লাবণ্য অক্ষুন্ন থাকবে।

'ভিটামিনেটস' ফর্টে

ট্রেডমার্ক

'রোশ' এর তৈরী

মনে রাখবেন, দিনে ১৫ পয়সার কম খরচ করেই পাচ্ছেন স্বাস্থ্য ও শক্তি

রোশ এর উৎপাদন একমাত্র পরিবেশক: ভোল্টাস লিমিটেড

সূচীপত্র

ঘর রঙ করাবেন?
ডুলাক্স পেণ্ট ব্যবহার করুন। ডুলাক্স পেণ্ট অনেক দিন নতুনের মত থাকে। ফিনিশ হয় বেশ ভালো, ধুয়ে পরিষ্কার রাখাও সোজা।
DULUX
THETIC ENAMEL
CHEMICAL CORPORATION
IA LIMITED
ICI
DULUX
ACRYLIC EMULSION
অল্প রঙে ভালো ফিনিশ
ডুলাক্স পেণ্ট এমন ভাবে তৈরী যে কয়েক পোঁচেই ভালো রঙ হয়। লাগবে কম।
৯২ রকম রঙের
রকমারি শেড ডুলাক্সের — তৈরী হয় আরও অনেক রকম রঙ। চটে যায় না, ফিকে হয় না। অনেক দিন নতুনের মত থাকে।
আপনার কণ্ট্রাক্টরের পরামর্শ নিন
আপনার কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন—এ-ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ। তাঁর পরামর্শ নিন এবং ডুলাক্স শেড কার্ড দেখাতে বলুন।
বছরের পর বছর রঙের বাহার বজায় রাখতে হ'লে চাই— ICI ডুলাক্স পেণ্ট
ডুলাক্স প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা : দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।
ডুলাক্স—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড, লণ্ডন-এর ট্রেড মার্ক।
রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী : দি অ্যালক্যালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।
ACCI (P) 6220

প্রচ্ছদ : শ্রীবিপুল সেনগুপ্ত

everest/1073e/AM Beng
লক্ষ লক্ষ গৃহিণীরা
পোস্টম্যান খাঁটি তেলে
যাবতীয় মুখরোচক রান্নাবান্না
করছেন বাড়তি পুষ্টির জন্যে
৪০ বছর যাবৎ তাঁরা তাই করছেন—
কারণ পোস্টম্যান হচ্ছেঃ
• স্ফটিকের মত স্বচ্ছ গন্ধবিহীন, ১০০% পরিশুদ্ধ বাদাম তেল • হাইড্রোজেন মিশিয়ে ঘন করা নয়
• ভিটামিন এ ও ডি যুক্ত • সস্তা পড়ে—রান্নার পর তেল বেঁচে গেলে আবার ব্যবহার করা যায়।
উৎকর্ষের প্রতীকস্বরূপ পোস্টম্যান'এ থাকে সরকারী আগমার্ক ছাপ।
স্বাস্থ্য-স্বাদ-সাশ্রয়ের খাতিরে এটিকে আপনার রান্নার একমাত্র মাধ্যম ক'রে নিন!
POSTMAN
REFINED GROUNDNUT OIL
আহমেদ মিলস
বোম্বাই ৮
পোস্টম্যানঃ ভারতের বিশ্বস্ত সর্বাধিক-কাটতি রান্নার তেল

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৩
শনিবার ১৬ মাঘ ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 30 Jan. 1971.

শীতের অবসানে

শীত প্রায় যায়-যায়; মাঝে মাঝে গায়ে কাঁপুনি ধরলেও বাতাসের ধার ক্রমশই কমে আসছে, সরস্বতী পুজোর পালা কেটে যাবার পর শীতও ফুরিয়ে যাবে। তারপর? তারপর কী বসন্ত? প্রকৃতির নিয়মে অন্তত তাই; কিন্তু আমাদের মন বলে, তারপরের কথাটা আমরা জানি না। শীতের দিনে এত পাতা ঝরে যাবার পর আবার কী নতুন করে কয়েকটি পাতা ফুটবে। কে জানে! এমন কথা আজ কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে ভাবাই মুশকিল যে, কাছাকাছি কোথাও কোনো আশা ভরসা দাঁড়িয়ে আছে!

যাঁরা মনে করছেন, কোনো রকমে মার্চ মাসে নির্বাচন পর্বটা ঘটে গেলে একটা কিছু ঘটবে তাঁরা হয়ত আশাবাদী, কিন্তু কেউই সত্যি জানেন না—কী ঘটবে! বা যে ঘটনা ঘটবে তাতে বাংলা দেশের ভাল মন্দ কী হতে পারে! অনুমানে অনেক কিছুই ধরে নেওয়া যায়, কিন্তু তা বিশ্বাস করা বোধ হয় যায় না।

আজ বাংলা দেশের মানুষের মনে যেটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা হল আমাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক চেহারা আবার কী দেখা যাবে? অথবা যাবে না? কিংবা আরও অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে? মনে হয় না, এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আজ আর কেউ দিতে পারেন।

আমাদের বর্তমান জীবন-যাপনের চেহারাটা নতুন করে দেখার কিছু নেই। যেমন চলছিল কিছুকাল ধরে—সেই রকমই চলছে, বরং কোথাও কোথাও আরও খারাপ হয়েছে। অফিস কাছারী খোলা আছে বটে কিন্তু কোনো রকমে ঠাট বজায় রাখার বেশি সেখানে আর কিছু হচ্ছে না। সরকারী কাজকর্মের অপযশ বরাবরই, এখন তো লোকের ধারণা, দায় বা গরজ বলে সেখানে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কোনো গতিকে সময় কাটাতে পারলেই হল। চারদিক থেকে কেমন এক অনুৎসাহ, নিস্পৃহতা, বিরক্তি আমাদের জড়িয়ে ধরেছে। কোনো কিছুই করার উদ্যম নেই। একটা সামান্য উদাহরণ নেওয়া যাক। কলকাতায় কয়েকটি সরকারী স্কুল কলেজ আছে। এই স্কুল কলেজগুলি সবই প্রায় বন্ধ। সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। হাঙ্গামা হওয়ার চেয়ে না-হওয়া নিশ্চয় সকলেরই অভিপ্রেত কিন্তু এই যুক্তি যদি সর্বত্র খাটাতে হয় তবে সবই আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিতে হবে। সরকারী এই নীতি এখন বেসরকারীভাবেও চালু হয়ে গেছে, স্কুল বন্ধ হয়ে থাকছে মাসের পর মাস, কলেজ বন্ধ করে রাখা হচ্ছে, আরও কত কী। কোনো কিছু বন্ধ রাখতেই আমাদের আপত্তি নেই সে ট্রেন হোক, বাস হোক, দুধ হোক কিংবা অন্য যাই হোক না কেন। সমস্যা সমাধানের এটা কত বড় উপায় তা আমরা জানি না।

কলকাতা শহরটার দিকে তাকালে আজ একে যত প্রাণহীন মনে হয়, এক বছর আগেও এতটা হত না। ব্যাপক ভয়ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা এর সবচেয়ে বড় কারণ। যে কলকাতা তার দীনদরিদ্র দশা নিয়েও মধ্যরাত্র পর্যন্ত মুখর ও চঞ্চল হয়ে থাকত সেই কলকাতা আজকাল রাত আটটার আগেই প্রায় জনহীন হয়ে পড়ে। কারও মনে এই বিশ্বাসটুকু নেই যে নিরাপদে রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারব।

এই অবস্থায় আমরা রয়েছি। অবস্থাটা যুদ্ধের কলকাতা, দাঙ্গার কলকাতাকেই যেন মনে পড়িয়ে দেয়। এইভাবে থাকতে থাকতে কেমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। এবং সবাই ভাবছি—এমন একটা কিছু হোক যাতে মানুষ তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায়। অর্থাৎ মোটামুটি আমরা যা চাইছি সেটা হল—শান্তি ও শৃঙ্খলা। সব মানুষেরই আজ এটা প্রাথমিক কামা। নির্বাচনের ডুগডুগি যতই বলুক : জনপ্রিয় সরকার হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না; এমন কি যাঁরা সক্রিয় রাজনীতি করেন তাঁরাও নয়। বলতে দুঃখ হয়, কিন্তু এটা বোধ হয় সত্যি কথা, নির্বাচনের জন্যে সাধারণ মানুষ বিন্দুমাত্র উন্মুখ নয়। কী হবে নির্বাচনে, যদি দেখা যায় নির্বাচনের পরও ব্যাপক সন্ত্রাস, অশান্তি, জীবনহানি, নির্যাতন থেকেই যায়! কার জন্যে তবে এই নির্বাচন! যাঁরা রাজনীতি করেন, নিজ নিজ দলের স্বার্থ দেখেন, গদির স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের আজকের অসহায় অবস্থাটা অনুভব করতে সত্যিই চান না। যদি চাইতেন তাহলে কখনই এমন করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হতে পারত না। একথা কী বিশ্বাসযোগ্য যে, সব দলই সামাজিক জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা চাইছেন, শুধুমাত্র নকশালদের জন্যে তা হচ্ছে না! এই যুক্তি এখন বাস্তবিক কেউ আর বিশ্বাস করে না। বরং বিশ্বাস করে, বাংলা দেশের এই ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্যে দলীয় সঙ্কীর্ণ, হিংস্র রাজনীতিই দায়ী। কোনো নেতাই বাংলা দেশের কথা ভাবেন না, অনুভবও করেন না, যা করেন সেটা বিধানসভার কথা, মন্ত্রিত্বের

কং পন্থা!

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে আর প্রায় পাঁচ সপ্তাহ বাকি। মোরচা বা ফ্রন্ট বা জোট গঠন নিয়ে এর মধ্যেই প্রকাশ্যে যে কেলেঙ্কারি শুরু হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে, নেতাদের আক্কেল দাঁত এখনও গজায়নি। তাই মূল সমস্যার প্রতি চোখ বুজে কোন্ দল কটা আসন বেশি বাগাবেন তাই নিয়ে ভাঁড়ামি শুরু করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে আবার অরাজকতা হবে? না কি স্থায়ী উদ্যমশীল এক সরকার গঠনের মারফৎ বাংলা দেশের অগণিত লোকের যে ভবিষ্যৎ ফোঁপরা রাজনীতির চোরাবালিতে ঠেকে ভরাডুবি হতে বসেছে, তা থেকে তাকে উদ্ধার করা হবে? আজকের বাঙালীর সামনে এই দুটি প্রশ্ন ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও প্রশ্ন নেই।

নির্বাচন ব্যাপারে প্রকাশ্যে যেসব রাজনৈতিক দল ভীষণ পাঁয়তাড়া কষতে লেগেছেন, তাঁদের কাছে প্রাথমিক সব ছেড়ে দিয়ে এই প্রশ্নই অপরিহার্য মনে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর জন্য কী বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তাঁদের আছে।

এ বিষয়ে আমার অন্ততঃ কোনও সন্দেহ নেই, নির্বাচনের পর এই রাজ্যে যদি এক-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং সে সরকার যদি জনগণকে ক্ষমতা দিয়ে অন্তত পাঁচ বছর কাজ করে একটা উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপ দিয়ে এগোতে না যায়, তবে বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শুধু সরকারের অধিষ্ঠিত একটি মাত্র দলের পক্ষেই এই পুঞ্জীভূত, জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় যদি না বিরোধী দলগুলি সৃজনাত্মক সমালোচনা এবং সহযোগিতার দ্বারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। বস্তুত বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ আজ যে-সংকটে এসে পড়েছে, তার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মুখের দিকে চেয়ে থাকলেই চলবে না, রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সমস্ত প্রতিভা একত্র করে বাংলা দেশকে বাঁচাবার জন্য শেষ চেষ্টা করতে হবে। নির্বাচিত সরকার এই প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেবেন।

এইদিকে চোখ রেখেই আজ নির্বাচনী ভাবনা ভাবা উচিত। গদী দখলের জন্য জোট বাঁধার ইয়ার্কি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখাই ভাল।

এখন প্রশ্ন, এই ধরনের সৃজনধর্মী পরিকল্পনার ভিত্তিতে কোনও দল কি পশ্চিমবঙ্গে এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবেন? না কি কোনও কোয়ালিশন সরকার পরিত্রাণের পথ বলে দেবে? এই প্রশ্নের উত্তরে কোয়ালিশন বা যুক্তফ্রন্ট সরকার নয় কেন, তারও ফয়শালা করে নেওয়া ভাল।

কোয়ালিশন বা যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠন করলে কোনও দায়িত্বই পালন করা যায় না, বিশেষ করে পুনর্গঠন পরিকল্পনা রূপায়ণের মত দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং যাতে সাময়িকভাবে অপ্রিয়ভাজন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। (ডঃ বিধান রায় জনপ্রিয়তার পরোয়া বিশেষ করেন নি বলেই যা

কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করে যেতে পেরেছিলেন।)
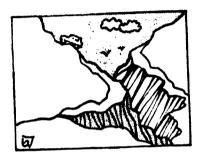
এবং সত্যি বলতে কি, আজকের বাংলা দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে এবং জনজীবনে শৃঙ্খলা এনে প্রায় অচল জীবনস্রোতে সুনির্দিষ্ট গতি সঞ্চার যদি করাতে হয়, তবে অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে উপায় নেই। সুবিধাবাদের লালা দিয়ে জোড় লাগানো কোয়ালিশন বা যুক্ত ফ্রন্ট বা কোনও মোরচা এসব ক্ষেত্রে খেপে টিকতে পারে না। সেই কারণেই কোয়ালিশন বা যুক্ত ফ্রন্ট বা মোরচার মোহ ত্যাগ করাই ভাল।

বাংলা দেশের পুনর্গঠন বলতে কি বুঝব? এই বুঝব: (এক) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার জন্য একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে জমির পুনর্বিন্যাস, অন্যদিকে সেচ, সার ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকার্যের প্রসার, (দুই) শস্য ও খাদ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত ছোট শিল্পের প্রসার, (তিন) মৎস্য চাষ, পোলট্রি ও গবাদি পশু প্রজননকল্পে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবসায়ের পত্তন, (চার) কৃষিভিত্তিক শিল্পের পত্তন, (পাঁচ) মালিকদের সঙ্গে ন্যায্য চুক্তি সম্পাদনের (প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করেও) দ্বারা সমস্ত কারখানা খোলা, (ছয়) যে মালিক বা ইউনিয়ন চুক্তি ভঙ্গ করবে তার সাজা দান, (সাত) রাজ্যস্তরে বিভিন্ন শিল্প এবং কর্মের জন্য ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ, (আট) শিল্প-বিরোধের জন্য এমন ট্রাইব্যুনাল গঠন যা দ্রুতগতি বিরোধের নিষ্পত্তি করতে সমর্থ, এবং শ্রমিক ও কর্মী যাতে কাজে ফাঁকি দিয়ে উৎপাদন ব্যাহত না করে তার কড়া ব্যবস্থা প্রবর্তন, (নয়) ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগে নূতন শিল্প পত্তনের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য, প্রয়োজনে কেন্দ্রের উপর সমবেতভাবে চাপ সৃষ্টি, (দশ) প্রতিটি কারখানা এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে পরিচালনা কমিটি গঠন, (এগার) শিক্ষা কমিশন বসিয়ে শিক্ষার যুগোপযোগী সংস্কার, (বার) শিক্ষার ক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা কঠোর হাতে দমন, (তের) ট্রাম বাস ট্রেন পোড়ান বা ক্ষতি করা বা ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি বা যে কোনও সাধারণ সম্পত্তি বিনষ্ট বা যোগাযোগ ব্যবস্থার বা বিজলী সরবরাহের ক্ষতি যারা করবে তাদের চরম দণ্ড দেবার মত উপযুক্ত আইন পাস ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই রকম বা এর চাইতেও উন্নত এবং স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি বা ঘোষণা নিয়েই আজ রাজনৈতিক দলগুলির ভোটারদের কাছে এগিয়ে আসা উচিত। সাধারণ লোকেদের এবং সংবাদপত্রেও উচিত আজ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা কী আমরা চাই। তবেই গণতন্ত্র সার্থক হবে। গণতন্ত্রে কখনোই এক হাতে তালি বাজে না। সব সময়েই এখানে দুটো পক্ষ। ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতা। সরকার ও বিরোধী দল। জনপ্রতিনিধির যেমন তার নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কে দায়িত্ব আছে, তেমনি নির্বাচকমণ্ডলীরও দায়িত্ব তাঁদের প্রতিনিধিকে জানিয়ে দেওয়া কী তাঁরা চান।

বাংলা দেশের পেশাদার রাজনীতিবিদগণ! শুনুন! দলের লেবেল ছেড়ে দিয়ে, এই মহাসংকট সময়ে আপনারা কর্মসূচীর ভিত্তিতে জোট বা ফ্রন্ট বা মোরচা গড়তে এগিয়ে আসুন। তবে হয়ত কূল পাবেন। দলের লেবেল গায়ে সেঁটে এগুতে গিয়ে তো দেখছেন, হয় পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছে আর না হয় দলের হয়ে এক কথা বলছেন, আবার তলে তলে নিজের আখেরটি গোছাবার তালে অন্য ফিকির আঁটছেন। ওসব চালাকি করে বাঁচবার দিন আর নেই, গালভরা ফাঁকা বা ধোঁয়াটে বুলি উদ্গীরণ করেও পার পাবেন না।

পরিষ্কার করে বলুন বাংলার এই সংকটে আপনার ত্রাণের বার্তা কী? তা যদি বলতে না পারেন, তাহলে হিংসা বা অহিংসা যাই প্রয়োগ করুন, নির্বাচনে মার্কসবাদ, সমাজবাদ কি গান্ধীবাদের নাম নিয়ে যত ধোঁয়াই উদ্গার করুন, ফল সেই অরাজকতা। অর্থাৎ বাংলার সর্বনাশ।

এ্যার-ইণ্ডিয়া (১)

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রাত দুপুরেই হোক আর দিন দুপুরেই হোক চট করে বলতে পারবেন না, আপনি যে হোটেলে শুয়ে আছেন সেটা কোন্ শহরে। টোকিও, ব্যাংকক, কলকাতা, কাবুল, রোম, কোপেনহাগেন যে কোনো শহর হতে পারে। আসবাবপত্র, জানলার পর্দা, টেবিল ল্যাম্প যাবতীয় বস্তু এমনই এক ছাঁচে ঢালা যে স্বয়ং শার্লক্ হোমস্‌কে পর্যন্ত তাঁরা সবকটা পুরো পুরো আতশী কাচ মায় তার জোরদার মাইক্রোস্কোপ্‌টি বের করে, ওয়াটসনকে কার্পেটের উপর ঘোড়া বানিয়ে, নিজে তাঁর পিঠে দাঁড়িয়ে, ছাতের উপর তাঁর স্বহস্তে নির্মিত আ লা হোমস্ স্প্রে ছড়িয়ে—বাকিটা থাক্, ব্যোমকেশ ফেলুদার কল্যাণে আজ 'ইস্কুল বয়'ও সেগুলো জানে—তবে বলবেন, "হয় মস্কো কার্লের রেজিনা হোটেল নয় যোহানেসবের্গের অল হোয়াইট হোটেল।" দূর-পাল্লার এ্যারোপ্লেনের বেলাও আজকের দিনে তাই। একবার তার পেটে ঢুকলে ঠাহর করতে পারবেন না, এটা সুইস এয়ার, লুফ্‌টহানজা, এয়ার ইণ্ডিয়া না কে এল এম। তিমির পেটে ঢুকে নোয়া কি আর আমেজ-অন্বেষণ করতে পেরেছিলেন এটা কোন জাতের কোন্ মুলুকের তিমি?

ইণ্ডিয়ান মানেই নেটিভ, মানে রদ্দী। আস্তে আস্তে এ ধারণা কমছে। নইলে জরমানি এ-দেশের সেলাইয়ের কল, রুশ কলকাতার জুতো কিনবে কেন?

অতএব এ্যার ইণ্ডিয়া কোম্পানির এ্যারোপ্লেনকে একটা চান্‌স্ দিতেই বা আপত্তিটা কি? অন্য কোম্পানিগুলো তো প্রায় সব চেনা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আরেকটা কথা আছে। ঐ কোম্পানির এক ভদ্রলোক বুদ্ধি খাটিয়ে, তদ্বির-তদারক করে আমার সুখ-সুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থা না করে দিলে হয়তো আমার যাওয়াই হত না। তাঁর নাম বলবো না। উপরওলা খবর পেলে

একজন ভি আই পি-কে সাহায্য না করে একটা থাড্ডো কেলাস "নেটিভ" রাইটারের পিছনে তিনি আপিসের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করলেন কেন? তবে কি না তাঁর এক ভি আই পি মিত্রও আমাকে প্রচুরতম সাহায্য

> **নতুন উপন্যাস**
>
> শক্তিমান কথাসাহিত্যিক **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী** চিরকালই জীবনের অন্তরঙ্গ রূপটিকে গভীরতর ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করার পক্ষপাতী। তাঁর লেখা উপন্যাস **"এই তার পুরস্কার"** আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

করেছিলেন। তাঁকে না হয় শিখণ্ডীরূপে খাড়া করবেন।

ভেবেছিলুম চুঙ্গী ঘরের (কাস্টম্‌সের) উৎপাত থেকে এই দুই দোস্তো কর্তা বাঁচাতে পারবেন। ইতিমধ্যে এক কাস্টমিয়া আমার কাগজপত্র পড়ে আমার দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়ে শুধোলে "আপনিই তো আপনার বইয়ে চুঙ্গীঘরের কর্মচারীদের এক হাত নিয়েছেন, না?"

খাইছে। এ যাত্রায় আমি হাজতে বাস না করে মানে মানে কলকাতা ফিরতে পারলে নিতান্তই পঞ্চপিতার আশীর্বাদেই সম্ভবে। কে জানে, এই কাস্টমিয়াই হয়তো হালে কয়েকজন ডাঙর ডাঙর ভি আই পি-কাম্-সরকারী কর্মচারীকে বেআইনীতে মাল আনার জন্য নাজেহাল করেছিলেন।...একদিন জলের কল খুললে যে-রকম জল না বেরিয়ে

পেপারের লাইনিংওলা গলা দিয়ে কথা না বেরিয়ে বেরল ঘস ঘস খস খস চোঁ ধরনের কি যেন একটা।

নাঃ। এ-লোকটির রসবোধ আছে। কখনো এঁর বাড়িতে যাবে। একদিন জল আসে বলে ঐ ভাষা বোঝাতে তিনি সুনীতি চাটুয্যে মশাইকে ডাক লাগিয়ে উত্তম ধ্বনিতত্ত্ববাবদে কেতাব লিখতে পারবেন। বললেন, "নিশ্চিন্তমনে ঐ আরাম চেয়ারটায় বসুন। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" তারপর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে কী এক অশ্রুত টরে টক্কার সংকেত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে জনা চারেক বাঙালী কাস্টমিয়া আমাকে ঘিরে যা আদর আপ্যায়ন আরম্ভ করলেন যে হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেবীর প্রসাদে মূক যে-রকম বাচাল হয়, আমি কেন, হরবোলাও মূক হতে পারে।

প্রতিজ্ঞা করলুম, চুঙ্গীঘর লেখাটা আমিই ব্যান্ করে দেব। কার যেন দু'শ টাকা ফাইন হয়েছে।

কিন্তু এত সব বাখানিয়া বলছি কেন?

শুনুন। জীবনে ঐ একদিন উপলব্ধি করলুম, সাহিত্যিক—তা সে আমার আটপৌরে সাহিত্যিক হওয়ার মধ্যেও একটা মর্যাদা আছে।

*

এসব যে বাখানিয়া বলছি তার আরো একটা কারণ আছে।

আমার নিজের বিশ্বাস, প্লেনের পেটের ভিতরকার তুলনায় এ্যারপোর্টে আজব আজব তাজ্জব চিড়িয়া দেখতে পাওয়া যায় ঢের বেশী। পাসপোর্ট, কাস্টমস, হেলথ অফিসে, রেস্তরাঁয় তাদের আচরণ কেউ ঘন সংকোচের বিহ্বলতায় অতীব ম্রিয়মাণ, কেউ বা গড্ ড্যাম্ ডোণ্টো কেয়ার ভাব—ওদিকে একটি বিগতযৌবনা মার্কিন মহিলা, এ্যারোপ্লেনে অর্ধনিদ্র যামিনী কাটিয়ে আলুথালু কেশ, হাত-পাউডার-রুজ,—এঞ্জিনের পিস্টন বেগে পলস্তরা পলস্তরা ক্রীম-পাউডার-রুজ মাখছেন, এদিকে তাঁর কর্তা প্লেনে সস্তায় কেনা স্কচ সাঁটে সাঁটে করছেন; আর ঐ সুদূরতম প্রান্তে দেখুন,—দেখুন বললুম বটে, কিন্তু দেখার উপায় নেই—কালো বোরকাপরা জড়োসড়ো গণ্ডা দুই মক্কাতীর্থে হজ যাত্রিনীর গোঠ। এঁরা নিশ্চয়ই চলতি ফ্যাশানের ধার ধারেন না। বেশীর ভাগ আঁকড়ে ধরে আছেন পুঁটুলি—হ্যাঁ বেনের পুঁটুলি। গোরুর গাড়িতে গয়নার নৌকোয় ওঠার সময় যে-পুঁটুলি সঙ্গে নেন। ওঁরা ভাড়া বাবদ কয়েক হাজার টাকা দিয়েছেন নিশ্চয়ই। অনায়াসে হাল্কা সুটকেস কিনতে পারতেন। দু'একজনের ছিলও বটে। কিন্তু ওঁদের কাছে, গোরুর গাড়ি যা, হাওয়াই জাহাজও তা—এদের মক্কা পৌঁছালেই হল। হায়, এঁরা

কোম্পানিই হোক না কেন—গোরুর গাড়িতে মুসাফিরী করার তুলনায় ঢের বেশী তকলীফ দেয়। এমন কি প্লেনে এ'দের পক্ষে হায়া-শরম বাঁচিয়ে চলাও কঠিন। কলকাতার বস্তিতে কি হয় জানিনে, কিন্তু এ'দের যখন প্লেনে করে যাবার রেস্ত আছে তখন এ'রা সেখানকার নন। আর গ্রামাঞ্চলে কেউ কখনো প্রাতঃকৃত্যের জন্য কিউ দেয় না। অথচ প্লেনে প্রাতঃকৃত্যের জন্য এ'দের কিউয়ে দাঁড়াতে হবে—মেয়েমদ্দে লাইন বেঁধে। সে-কথা পরে হবে। তবে হজ যাত্রীদের জন্য স্পেশাল প্লেনে যদি স্পেশাল ব্যবস্থা থাকে তবে তার তথ্য জানিনে; কোনো কোম্পানি অপরাধ নেবেন না।

*

"শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি প্লেন দিল ছাড়ি
দাঁড়ায়ে রহিল পোর্টে সব বেরাদরি
শুষ্ক চোখে।"

পূর্বেই নিবেদন করেছি, প্লেনের ভিতরে দেখবার কিচ্ছুটি নেই। থার্ড ক্লাশ ট্রেনে যা দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়েও কম। আর সর্বক্ষণ আপনার চোখের তিন ফুট সামনে, সম্মুখের দুটো সীটে দুটো লোকের ঘাড়। তারো সামনে সারি সারি ঘাড়। দেখত আমার এ-প্লেনের 'মালিক'। অতএব আমার জন্য উইণ্ডো সীটের ব্যবস্থা করেছেন—অর্থাৎ বাঁদিকে তাকালে বাইরের আকাশ দেখা যায়। বলতে গেলে পৃথিবীর কিছুই না। একে রাত্রি, তদুপরি অল্লায় মালুম, বিশ হাজার না পঁচিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছেন। কিছু দেখতে চাইলে ত্রিনয়নের প্রয়োজন। উপরেরটা হয়তো কিছু বা দেখতে পায়। তবে ভারতীয় প্লেনে একটা বড় আরাম আছে। যদিও অধিকাংশ যাত্রী ভারতীয় নয়। বিদেশী এবং প্রধানতঃ ইয়োরোপীয়। তারা জানে, ইণ্ডিয়ানরা বেলেল্লাপনা পছন্দ করে না। কাজেই অতিরিক্ত কলরোল, এবং মাঝে মধ্যে তদতিরিক্ত কলহরোল থেকে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

এ-বাবদে এখানেই থাক। কারণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত তারাশঙ্কর, সম্মানীয় শ্রীযুত বুদ্ধদেব, ভদ্র প্রবোধ ও অন্যান্য অনেকেই প্লেনের ভিতরকার হাল সবিস্তর লিখেছেন।

জাগরণ, তন্দ্রা, ঘুম সবই ভালো। কিন্তু তিনটেতে যখন গুবলেট পাকিয়ে যায় তখনই চিত্তির। এ-যেন জ্বরের ঘোরে দু দিন না তিনদিন কেটে গেল বোঝবার কোনো উপায় নেই।

চিৎকার চেঁচামেচি। রোম! রোম!! রোম!!!

ক্যাথলিকদের তো কথাই নেই। প্রটেসটান্টদের চিত্তেও সমান কৌতূহল। বিশেষ করে মার্কিনদের। [illegible] নড়ফাটাই করতে হবে, [illegible] কিছু না, তবে কি না, হ্যাঁ, [illegible] ছবিগুলো ভালো। [illegible] দিকে তাকিয়ে। মাইকেল-[illegible] না। [illegible] বুঝি [illegible]।"

বললে পেত্যয় যাবেন না, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, ভ্যাকানের সামনে বসে একটি বোঞ্চ-বসা এক মার্কিনকে তার মিসিসের উদ্দেশে শুধোতে শুনেছি, "কিন্তু ডার্লিং, এই ইণ্ডিয়ানরা এ-সব তৈরী করলো কি করে—ফরেন সাহায্য বিনা, অর্থাৎ আমাদের সাহায্য না নিয়ে।"

রোমে নামতেই হল। সেখানে আমার এক বন্ধু বাস করেন। কিন্তু তাঁর কোন নম্বর জানা ছিল না বলে যোগসূত্র স্থাপনা করা গেল না। একখানা পত্রাঘাত, তদভাবে স্ট্যাম্প জোগাড় করতে না করতেই এয়ার কোম্পানির লোক রাখাল ছেলে যে-রকম গোরু খেদিয়ে খেদিয়ে জড়ো করে গোয়ালে তোলে সেই কায়দায় প্যাসেঞ্জারদের প্লেনের গর্ভে ঢোকালে। প্যাসেঞ্জারদের গরুর সঙ্গে তুলনা করাটা কিছুমাত্র বেয়াদবী নয়। মোটা, পালটা ঠিক বয়স্ক গরুরই মত লাউঞ্জের মধ্যিখানে একজোট হয়ে বসেছে বটে কিন্তু বাছুরের পাল, অর্থাৎ চ্যাংড়া চিংড়িরা যে কে কোনদিকে ছিটকে পড়েছে তার জন্য হুলিয়া শমন বের করেও রত্তিভর ফায়দা নেই। কেউ গেছেন কিওরিওর দোকানে। কাইরোর মত এখানেও খাঁটি ভেজাল দুই বস্তুই সুলভ—এন্তের পাওয়া আছে—কিন্তু দুর্লভ, কলকাতার মাছের [illegible]। কেউ বা গেছেন [illegible] (টাক্স ফ্রী) [illegible] A utomobile T urino [illegible] Fiat [illegible] [illegible] Fiat [illegible]। [illegible]

প্লেনে ঢুকে দেখি, সত্যি সেটা গোয়ালঘর। [illegible] চাচার [illegible] মত এখানেও সেই প্রতিষ্ঠান। তবে হ্যাঁ, এটা বিজ্ঞানের যুগ। নানা প্রকারের ডিসইনফেকটেন্ট, ডিঅডরেন্ট স্প্রে করা হয়েছে প্রেমসে। সায়েবদের যা বী ও—বডি ওডার—গায়ের বোটকা দুর্গন্ধ।

সকাল বেলার আলো দিব্য ফুটে উঠেছে। ইতিমধ্যে প্লেনে পাক্কা সাড়ে পনরো ঘণ্টা কেটেছে। দমদমা ছেড়েছি রাত ন'টায়; এখন সকাল আটটা। হওয়ার কথা তো এগারো ঘণ্টা! কি করে হল? ঘড়ির কাঁটাকাঁটাদের

ক্লিংফড

জগন্নাথ লালা

অথবা শুধুই ধুলো বালি ধোঁয়া ধোঁয়া উড়ে যাওয়া ধুলো
বালি থেকে
দৌড়ে বাঁচতে গিয়ে শব্দসন্ধ এক দেহের অলৌকিক আবিষ্কার
ক্লিংফড শব্দ মাত্র সম্মুখে দেগে ওঠে আধগলা নারীর মূর্তি
বুকে নেই চোখ আছে ঘেঁটি নেই মুণ্ডু নেই পেট কিংবা
দাঁত আছে
অথবা নারী তো নারী না নারী তো নারী হয় নারী তো
দেখতে ভালো লাগে
সম্ভবত এতক্ষণ ক্লিংফড পুরুলিয়া পুরুলিয়া শালবনী পার
হয়ে গেছে

পাঁচিশটা রাত্রি জেগে প্রায় দুশোখান ডিকশনারি ঘেঁটে
ক্লিংফড তোমার কোনো মানে জানা হয়নি, ঝাঁকেটে শব্দ, গোখা
মোমে গলা মোম মোম একটা পাঁচটা অশরীরী নারীর শরীর
চোখে ভাসে দূরে যায় কাছে আসে চলে যায়, কেমন গভীর
গভীর চোখ
ক্লিংফড এই ফাঁকে চৌপাটি সুইমিং পোলের নিচে কুলকুচা
করে ফিরে আসে

সম্ভবত ক্লিংফড এক জোড়া খটকা শব্দের ঝনঝনানি
ক্লিংফড ক্লিংফড এক হাজারবার উচ্চারণ করলে ফেস্টো ছাড়া
আর কিছু থাকে না
অথচ বাতাসে ফেস্টো ওড়ে, উড়ে উড়ে ইতস্তত ফেস্টোগুলো
উড়ে যায়
ক্লিংফড বেঁচে ওঠে গলাগলা মোম গলে, চোখে চায়
ক্লিংফড ক্লিংফড ক্লিংফড ক্লিংফড দীর্ঘ এক লাইন চাঁচালো,
ক্লিংফড মৃদু হাসে, ধীরে ধীরে মিশে যায় [illegible] অরণ্য ও
পাহাড়ের দিকে

প্রতিবাদ

উদয়ন ভট্টাচার্য

যে বালক নিঃশব্দে খুলে দেখায়
তার অহংকার তরবারি
প্রকাশ্যে বলো না কিছু
খুলে রাখে গোপন প্রকোষ্ঠ,

খোলা দরজায় সে দাঁড়ালে
তুমি তাকে বলতে পারো না
এই সব প্রদীপের দম্ভ
যে-কোনদিন নিবে যাবে দমকা হাওয়ায়।

সে তো নিঃশব্দে দেখায় তার অহংকার,
তুমি তো বহন করতে পারো সে দম্ভ,
তবে কেন সে খোলা দরজায় দাঁড়ালে
তুমি তাকে উপহাস করো—

সে তো চেনে না চোরাপথ
ফিরতে হলে তাকে প্রকাশ্য পথে ফিরতে হয়
তাকে তুমি বলতে পারো না
আকাশ-ছোঁয়া ঔদ্ধত্য নামিয়ে নিতে
মাঝখানে কোন শিবির যদি সে না গড়তে চায়
শৃঙ্খলা নিষ্কামনে আমার বিপক্ষে
অপ্রয়োজনীয় জানলা খোলায় অনাগ্রহী
মহত্ত্ব দেখিয়ে তাকে তুমি প্রাসাদ ফিরিয়ে দিও।

যে বালক নিঃশব্দে খুলে রাখে
গোপন প্রকোষ্ঠ
তার দুঃখের সপক্ষে প্রধানত [illegible] চাইলে,
সে তার গোপন অহংকার প্রকাশ্য করে
প্রতিবাদ জানায় ;

আমি যখন রাজা ছিলুম

তুলসী মুখোপাধ্যায়

বালককালে আমি যখন রাজা ছিলুম
গাছের ছায়ায় সিংহাসন বিছিয়ে বসতুম সকালবিকাল
ভূমিহীন প্রজাকে করতুম হাজার হাজার ভূমিদান
রাজভাণ্ডার তুলে দিতুম ভিখিরীর ঝুলিতে
আমি যখন রাজা ছিলুম বালককালে
দৈত্যদানো ধরে ধরে শূলে চাপিয়ে দিতুম
কোমরের অসি খুলে অত্যাচারীর করতুম মুণ্ডচ্ছেদ—
বালককালে আমি যখন রাজা ছিলুম!

এখন আমি রাজ্যবিহীন চরম বাউণ্ডুলে
পথেঘাটে ভিখিরীর মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াই
দৈত্য দেখলে পাশের গলিতে নেমে যাই সুড়ুৎ করে
এবং দুঃখ-ক্রোধ-ভালবাসার টুঁটি চেপে
রেসের মাঠে গিয়ে জোড়াপাঁঠা মানত করি
এখন আমি পুরো হাড়হাভাতে বাউণ্ডুলে
সুযোগ পেলেই
কুঁড়েঘরের শীতের কাঁথা অব্দি চুরি করি!

মরশুমি ফুলের একটা অভিজাত অংশ পৌষেই ফোটে। পৌষের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তাদের চাই। মাঘ নয়। মাঘ মনুষ্যের গা থেকে শীতের কাঁটা তুলে ফেলে বাঘের গায়ে। আমাদের দেশের আপন ফুল এবং যা আমরা আত্মস্থ করে নিয়েছি—তারা সাধারণত ফোটে গ্রীষ্ম-বর্ষায়। শীতের মাঠে তারা যে কেউ কেউ পা বাড়ায় না, এমন নয়; বাড়ায়। বেড়াতে আসে, পাড়া-বেড়ানির মতন। গেরস্তের বাগানে তাদের জন্যে ফুল-তোলা আসন পড়ে না। [illegible] বাইরে মায়া-কাটাতে-না-পারা ভিখারির তারা যেন। যাই-যাই করেও যায় না।

ওদের কথা থাক। আমরা পৌষ পুষ্পের রাণী চন্দ্রমল্লিকাকে নিয়ে কথা বলি। কলকাতা শহরে প্রায় এমন কোনো পুষ্পবিলাসী নেই, যিনি চন্দ্র ফোটাতে উৎসুক নন। এক চিলতে বাগান আর কটা ঘরের সঙ্গে জোড়া! অনেকেই টবে ফোটান। এবং যাঁরা পুষ্পবিজ্ঞানী তাঁরা বলেন, 'টবেই ভালো চন্দ্র ফোটে।' তবে চন্দ্র তো আর আপনি ফোটে না, তাকে ফোটাতে হয়। সে কি সব ফুলের ব্যাপারে নয়? সব ফুলেরই ব্যাপার। তবে চন্দ্র কিছু বেশি আদর চায়, আদর কাড়ে। চন্দ্রমল্লিকার প্রদর্শনীও হয় শহরে দু তিন জায়গায়। হর্টিকালচার বাগান, বিধানসভা ভবন, আর মেটেবুরুজে। আলিপুরের বাগানে চন্দ্রর সঙ্গে এবার ছিল ডালিয়া গোলাপ আর গ্লাডিওলাস। অন্যান্যবারের চেয়ে এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। মোট ১০৫ জনের মতো। গোলাপে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছেন শ্রী এস কে মিত্র আর শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসুর তত্ত্বাবধানে ব্যারাকপুরের জওহরকুঞ্জ। এবারের প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ গোলাপ ডি বি-র গোলাপ-বাগান থেকে। আলিপুরে বাগানের গোলাপবাগে প্রায় ৫০০ গাছ, তাতে একশ রকমের গোলাপ বাগান আলো করে আছে। অধ্যক্ষ ডঃ তরুণ বসু আমাদের বাগানের চতুর্দিক ঘুরে ফিরে দেখলেন, তাঁর নানা ব্যস্ততার ফাঁকেও। টবের গোলাপ ফুটিয়েছেন পশ্চিম পুটিয়ারির শ্রীবীরেন বসুও। তাতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি এবার। চন্দ্রমল্লিকায় তিনি অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। সর্বসাকুল্যে বারো। তিনি ছাড়া শিবপুরের শ্রীদেবী মুখার্জি, সুভাষ গুহনিয়োগী, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ চন্দ্রমল্লিকা প্রদর্শনীতে এবার অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন।

বীরেন বসু ও তাঁর চন্দ্রমল্লিকা

ডালিয়ার কাল এখনো ঠিকমতো শুরু হয়নি। তবু প্রদর্শনীতে শ্রীজ্ঞান সাঁতরার তত্ত্বাবধানে ইডেন উদ্যান অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছে। তবে সবার ওপর টেক্কা দিয়েছে কলকাতা সশস্ত্র পুলিসের শ্রীঅনিল সেনগুপ্তের ডালিয়া। তাঁর তিনটি ডালিয়া-গ্রুপ সত্যিই দ্রষ্টব্য ছিলো।

প্রদর্শনীতে আলাপের সূত্র ধরে শ্রীবীরেন বসুর পশ্চিম পুটিয়ারির বাড়ি গেলাম একদিন। গেটের কাছ থেকেই বাগানের শুরু। মূলত গোলাপের শয্যা। তার পাশেই ক্রোটন। পুকুরের পাড় ঘেঁষে গাঁদা। বিস্ময় সেখানে নয়, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে, ছাদে উঠে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ছাদের বাঁদিক ভর্তি রাশীকৃত ডালিয়ার টব—ফুটে-ওঠার পারম্পর্যে লাগানো। ডানদিকে এবং সামনে চন্দ্রমল্লিকার সারবন্দী টব। তিন ধরনের—অ্যানিমোন, পম্পন আর ক্যাসকেড। খুব দুষ্প্রাপ্য চন্দ্র দেখলাম তাঁর ওখানে। তার মধ্যে 'সবুজ সুন্দরী' প্রধান।

চন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন শ্রীবসু। কী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অঞ্জলি যে এদের সেবা পরিচর্যা করেন, তা শুনে বিমূঢ় হয়ে পড়ি। কাজ সেরে বাড়ি ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত চন্দ্রের বাগানে ঘুরঘুর করা—তাদের অভাব অনটনের খোঁজ নেওয়ার গল্প যে-কোনো উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর ও মনোমুগ্ধকারী। প্রকৃতপক্ষে, বলতে গেলে, সেদিন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আর রোমাঞ্চ নিয়ে ফিরেছি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অপহরণ
শিশির লাহিড়ী

গ্রাস কেড়ে নেবার অধিকার কেউ আমাকে দেয়নি।

নরেন্দু উঠে দাঁড়াল। সকলের দিকে চেয়ে হাসির মুখ করল।—আমি ভাই অশ্বত্থামার মত চিরকাল পিটুলিগোলা খেয়েই মানুষ, আমার কি আর অতো আত্ম-সম্মানটম্মান থাকলে চলে!

নরেন্দু চলে যেতে ঘর নিস্তব্ধ হয়ে এলো। দেওয়ালে পেট মোটা টিকটিকিটা হঠাৎ টিক্‌ টিক্‌ করে ডেকে উঠল। বাদল আঙুলে তুড়ি দিয়ে হাই তুলল। মৃগাঙ্ক নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসতে বসতে বলল,—নরেন্দু গিয়েছে ভালই হয়েছে। একে ও ভীতু মানুষ তার ওপর আরও ভয় পেলে খারাপ হ'ত।—একবার ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখল মৃগাঙ্ক, তারপর আচমকা প্রশ্ন করল—আচ্ছা মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলে, মানুষ কি নৃশংস হয়ে ওঠে অবনী?

আমি উত্তর দিলাম না। মৃগাঙ্কর মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হাসির মুখ করলাম। বাদল বলল,—হতে পারে। অন্তত প্রেমের ক্ষেত্রে তা বলেই শুনেছি।

মৃগাঙ্ক আনমনে একটা সিগারেট বার করে ধরাতে ধরাতে কি যেন ভাবছিল। অল্প পরে বলল,—শুধু প্রেমের ক্ষেত্রে কেন বাদল, হয়তো যে কোন বিশ্বাসভাঙ্গের ক্ষেত্রেই তাই হয়। অন্তত আমার বেলা তাই-ই হয়েছে। আমার এক এক সময় মনে হয় আমার স্ত্রী-পুত্রকে আমি গলা টিপে মারতে পারি।

অকস্মাৎ আঘাত পেলে লোকে যেমন চমকে ওঠে, আমরাও বোধহয় তেমন চমকে উঠেছি। মৃগাঙ্ক ভারি গলায় বলল,—চমকে গেলে না? কিন্তু কথাটা সত্যি। একটা গল্প বলি শোন, তাহলে হয়তো বিশ্বাস হবে।

তোমরা আমার বাড়ি অনেকবার গিয়েছ। দুদিকে বাড়ি, মাঝে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর রাস্তা। একটা জিনিস তোমরা লক্ষ করেছ কিনা জানিনা, রাস্তাটা অনেকটা ইংরেজি "এস" অক্ষরের মতন। পুব দিক থেকে বেঁকে উত্তরে আর পশ্চিম দিক থেকে বেঁকে দক্ষিণে চলে গিয়েছে। পাড়া খুব নির্জনও নয়, আবার খুব হই-হল্লার নয়। সাধারণ গেরস্ত পাড়া যেমন হয় তেমন আর কি। তবে রাস্তার এমাথা ওমাথার দুটো চায়ের দোকানে হই-হল্লা লেগেই থাকে।

সব পাড়ার দুচারটে চ্যাংড়া ছোঁড়া থাকে যারা ঘরেরও নয়, ঘাটেরও নয়। কোন দলেই তারা নেই আবার সব দলেই তারা আছে। তারা সময় অসময় অল্পস্বল্প ফষ্টিনষ্টি করে, মেয়ে দেখলে শিস দেয়, কি বড়জোর দুচারটে ব্যাড-কমেন্টস্‌ করে। —কি মজে ...

আমরাও, কি বলো অবনী, এককালে ছেলে-বেলায় পুকুরঘাটে একটু আধটু করেছি।

মৃগাঙ্ক সিগারেটে টান দিল, ধোঁয়া ছাড়ল।—কিন্তু এসব দঙ্গালে বাইরের ছেলে জুটলেই গণ্ডগোল। তা আমাদের পাড়ায় কিন্তু বাইরের লোকের ছেলের তো অভাব নেই। এইরকম একটা দঙ্গালের উপদ্রব থেকে এ-গল্পের সৃষ্টি।

আমার গল্পের মুখ্য চরিত্র একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়স বছর চব্বিশ, সুশ্রী ছিপছিপে, ফর্সার ধার ঘেঁষাই চেহারা। চোখে চশমা, কোনো স্কুলের টিচার হবে বোধ হয়।

এরা অবশ্য আগে এ পাড়ায় থাকতো না, মাস ছয়েক আগে এসেছিল। এককি কোথায় গিয়েছে জানিনা। পূর্বকথা বলতে পারব না, তবে মাস তিনেক আগের কেম

ছোকরা আমাকে ঘিরে ধরল। সকলেরই নাকে রুমাল চাপা, কাউকেই বিশেষ পরিচিত বলে বোধ হল না।—তারই মধ্যে একজন একটু চড়াকো গোছের, সে হঠাৎ বলে বসল—মেসোমশাই, আপনার বাড়িতে সুদাম আসে?

আমি কি উত্তর দেবো বুঝতে পারছিলাম না। উত্তর দেবার দায়ও আমার নেই—কি জন্যে, কেন জিজ্ঞাসা করছে তা জানতে চাইতে পারতাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার চেয়ে উত্তর দেওয়াই সহজ বোধ হল আমি বললাম,—হ্যাঁ! মাঝে মাঝে আসে।

খুব অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের গলায় ছেলেটা বলল,—ওকে আসতে দেবেন না, ছেলেটা ভাল নয় বুঝলেন।

এই অযাচিত উপদেশে আমি [illegible]

বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। এরই মধ্যে [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] যাই হোক, [illegible] ব্যাপারটা একটু যেন [illegible] হয়ে দাঁড়াল। একদিন মৃন্ময়ী রাতে গল্প করতে করতে আজকালকার [illegible] নিয়ে দুঃখ করছিলেন।—কি দিনই হল? সন্ধ্যেবেলা হাঁটাই যায় না, মৃন্ময়ী বললেন, সুদাম আসছিল বড় রাস্তার মোড়ে কারা যেন তাড়া করেছিল সুদামকে। আর একটু অসতর্ক হলেই পার্স, রিস্টওয়াচ, আংটিটাংটি যেতে পারত সুদামের।

ব্যাপারটা ওখানেই ইতি হয়ে যেতে পারত, যদি না একটা উড়ো চিঠি দেখতাম। খবরের কাগজের অক্ষর কেটে জুড়ে জুড়ে লেখা।—মানা করেছিলাম শোনেন নি দেখছি। তা শুনবেন কেন। সুদাম হেনাকে জোর কদম দিচ্ছে তো! যদি নিজের ভাল চান, সুদামের থেকে দূরে থাকবেন।

নাম নেই, ঠিকানা নেই, পোস্ট অফিসের ছাপটাও অস্পষ্ট। চিঠিটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। সুদাম নয়, হেনার জন্যেই ভাবনা। রাতে মৃন্ময়ীকে একা পেয়ে আদ্যোপান্ত সব বললাম, চিঠিটা দেখালাম। মৃন্ময়ী মুখ বুজে শুনলেন, চিঠি পড়লেন। পড়া শেষ হলে চিঠিটা দুমড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন,—তোমরা আজকালকার মানুষের, [illegible] ইতর।

এরপর আর কি বলা যায় বল? আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকলাম। ভেতরে ভেতরে আমি দুর্বল হয়ে আসছিলাম। একটা অনির্দিষ্ট ভয় আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সুদাম এলে বিরক্ত হই, না এলেও কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। এরই মধ্যে একদিন পাড়ায় পাড়ায় জোর মারপিট শুরু হয়ে গেল। সেদিন আমার বাড়িতেও বোমা পড়ল দু'একটা।

অবশ্য জিনিসপত্রের তেমন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হল মনের দিকে। আমাদের জোরটা ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকল, অকারণে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি, অকারণে সন্দেহ হয়। নিজের

জেনে মৃণ্ময়ী আর হেনার ভালোই—আমার ভাবনা।

মারামারিটা কমতির দিকে গেল না, বরং বেড়েই চলল। এ পক্ষের একটা গেলে, ও পক্ষের দুটো। প্রতিশোধ, বদলা নেওয়ার ব্যাপার আর কি! আমি মৃণ্ময়ী হেনাকে দু'চারদিনের জন্যে দাদার বাড়ি পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করলাম।

মৃণ্ময়ী প্রথমে যেতে রাজী হলেন না। আমার শরীর, বাড়ি—এইসব সাতপাঁচ ভেবে মনস্থির করতে পারছিলেন না। কিন্তু হেনা এক কথাতেই রাজী। নিত্য গোলমালে ও বোধ হয় হাঁপিয়ে উঠেছিল। শেষ অবধি হেনার আগ্রহেই মৃণ্ময়ীকে যেতে হল।

দিন দুই কোনোরকমে কেটে গেল। এই বয়সে স্ত্রীপুত্রকন্যা কাছে না থাকলে বড় একা লাগে। সেদিন বোধহয় শনিবার, অফিস নেই। সারাদিন বাড়ি বসে বসে, দুপুরে ঘুমিয়েছি। তোমাদেরও কোন পাত্তা নেই। বিকেলটা একটু পায়চারি করে এসেই সন্ধ্যের মধ্যে খোঁয়াড়ে ঢোকা। সন্ধ্যে হলেই, আলো নিবছে, কারফিউ। তার ওপর তিথিটাও বোধহয় অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার। একা এই ঘরে হাতের মুঠোয় একটা বই ধরে আমি হেনাদের কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, কাল রবিবার ওদের নিয়ে আসতে হবে।—এভাবে একা থাকা, এও এক বিষম যন্ত্রণা।

রাত একটু গভীর হতেই চোরপুলিস খেলা শুরু হয়ে গেছে। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের পদশব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। চুপ করে বসে বসে ক্লান্ত লাগছিল, অথচ শুতেও ইচ্ছে করছিল না। ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সামান্য একটা নীল আলো জেলে এই ইজিচেয়ারে শুয়ে আছি। শুয়ে কখন বোধ হয় দুচোখ লেগে গেছে। ঝিকিমিকি স্বপ্ন দেখছি, মাছ কুটতে গিয়ে আঙুলটা কেটে ফেলেছি, দর দর করে রক্ত পড়ছে।

রাত কত হবে ঠিক বলতে পারব না। আচমকা চাপা একটা অস্পষ্ট ডাক শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল, খুব চাপা গলায় কেউ যেন হেনার নাম ধরে ডাকছে। আমি আচ্ছন্নের মত জিজ্ঞেস করলাম,

—কে?

খুব চাপা গলায় শব্দটা কানে এল। —কিশোরীর দেখ খুলুন। আমি সুদাম।

সুদাম? এই রাতে, —এত রাতে! বড় অসহায় ভীত স্বর সুদামের। আমি দ্রুত উঠে দরজা খুললাম। সুদাম ফিসফিস করল, —আলোটা নিবিয়ে দিন। কিন্তু আলো নেবাবার আগেই কারা যেন সন্তর্পণে অন্ধকারে ঘরে ঢুকল, দরজা বন্ধ করল।

দরজা একপাল্লা খোলা। আমার বাঁ-হাত আলোর সুইচের দিকে ওঠানো। সুদামের এক পা দরজার ভেতরে, এক পা বাইরে। বিপর্যস্ত রুক্ষ চেহারা, মাথার চুল উস্কখুস্কো, জামাকাপড় ছেঁড়া, ময়লা।

—দরজা বন্ধ করে দিন। ওর সঙ্গে আজ আমাদের শেষ বোঝাপড়া আছে।

আমি তাদের মুখ দেখিনি। অন্ধকারে অনেকগুলো মুখ একসঙ্গে জড়াজড়ি-করা গাছের মত দাঁড়িয়ে। সুদামের মুখ সাদা ফ্যাকাসে চোখ, একবার যেন জিব দিয়ে ঠোঁট চাটল সুদাম।

আমার স্থির শান্ত স্বর উত্তেজিত হাতে হাতে দপ করে মোমবাতির মত জ্বলে উঠল। বললাম,—বাদল, মৃগাঙ্ক তোমাদের কথা তবু লোকের কাছে বলা যায়, আমার কথা বলা যায় না। ভয় আমার মনুষ্যত্ব হরণ করে নিল। আমি সুদামের মুখের ওপর ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ

॥ দুই ॥

তীর্থযাত্রা

[illegible] বেরিয়ে পড়লুম।

[illegible] এই অবস্থায় [illegible] নৌকোয় [illegible] সবাই কাশীর [illegible] প্রকৃতির [illegible]

[illegible] আমার [illegible] সতর্ক নজর [illegible]

[illegible] বর্ষা এসে গেল। মনে হল, প্রকৃতির [illegible] মানুষের চিত্তের [illegible] ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে। [illegible] আমাদের নৌকো [illegible] খায়। আমার চমৎকার লাগে।

একদিনের কথা বলি। বৃষ্টি নেমেছে। ঘাটের পাথরের উপরে তার শব্দ হচ্ছে। শব্দ হচ্ছে আমাদের নৌকোর ছইয়ের উপরেও। এই রকমের বাদলা দিনে তো আর কেউ নৌকোয় করে হাওয়া খেতে বেরোবে না, তাই নিশ্চিন্ত মনে বন্ধ-জানালায় হেলান দিয়ে আমি বসে ছিলুম।

কাশীর ঘাটের উপরে যে মস্ত-মস্ত ছাতা থাকে, আজ আর তার নীচেও কেউ নেই। গঙ্গার ধারে যারা হাওয়া খেতে এসেছিল, উপরে উঠে গিয়ে তারা দোকানের [illegible] নিয়েছে। এদিকে জলের তোড়ে আমাদের নৌকোয় প্রতিমুহূর্তে টান পড়ছে। মনে হচ্ছে, কাছির বাঁধন ছিঁড়ে সে বেরিয়ে যাবে। কাছিটাকে আরও শক্ত করে বাঁধবার জন্য আমাকে তাই ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে হল। সেই সময়ে ঘাটের দিকে চোখ পড়ল আমার। দেখি, একটি মেয়ে খুব শক্ত করে তার মাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে বলে উঠল, "ইচ্ছে করছে, এই বৃষ্টির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাই।"

"বেশ তো, গাও।"

"নৌকোটা কীরকম দুলছে দ্যাখো। নৌকোয় উঠে আমি গান গাইব।"

শুনে আমি বললুম, "আসুন আপনারা।" নৌকোর ঝাঁপ আমি সরিয়ে দিলুম।

॥ ২ ॥

মেয়েটি সেদিন পরপর অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিল। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে..." এবং এই রকমের আরও অনেক বর্ষার গান। এর গলা অনেকটা আমার ছেলেবেলার বন্ধু রেবতীর মতো। আমার খুব ভাল লাগছিল।

গান থামিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল, "দ্যাখো, মা, চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির বেগও বেড়ে যাচ্ছে। আমি তো ভিজে নেয়ে উঠেছি। এখন বাড়ি ফিরব কী করে?"

জিজ্ঞেস করলুম, "আপনারা কি অনেক দূরে থাকেন?"

"না, ভাদাইনি ঘাটের কাছেই আমাদের বাড়ি।"

"তবে আর চিন্তা কিসের। জায়গাটা তো খুব কাছেই। আপনি গান গাইতে থাকুন, আমি নৌকোয় করে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

"আমার গান শুনতে তোমার খুব ভাল লাগছে বুঝি? তা বাপু, ভালই যদি লাগছে, তবে দাঁড়ের জল দিয়ে আমাকে আরও ভিজিয়ে দিচ্ছ কেন?" বলে, হাসিমুখে মেয়েটি আবার গান করতে লাগল।

যে-ঘাটে ওদের বাড়ি, সেইখানে গিয়ে আস্তে আমার নৌকো ভেড়ালুম। নীচে নেমে মেয়েটি বলল, "এতটাই যখন এলে, তখন উপরের রাস্তা পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দাও। দেখছ তো, কী অন্ধকার। আমার বড্ড ভয় করছে।"

বাড়ি পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গেলুম। মেয়েটির মা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি আরও কিছুক্ষণ কথা বলল আমার সঙ্গে। কথায়-কথায় বলল, "আমরা এখানকার লোক নই। মা এখানে তীর্থ করতে এসেছেন। আমি সঙ্গে এসেছি।"

"আপনাদের বাড়ি তাহলে কোথায়?"

"কলকাতায়। আমরা হাজরা রোডে থাকি। এখন অবশ্য আমি শান্তিনিকেতনের ইস্কুলে পড়ছি।"

"ভাল ইস্কুল?"

"গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ইস্কুল। সেখানে আমরা নাচগানও শিখি।"

॥ ৩ ॥

পরদিন আমি কাশীবিদ্যাপীঠে ভর্তি হলুম। তারপরে আমার বয়স যখন পনের, সেই সময়ে একদিন একখানা সাইকেল ধার করে আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম আমি। পকেটে আমার মোটে বারো টাকা। ওই বারো টাকা সম্বল করে আমি শান্তিনিকেতন চলেছি। ইচ্ছে আছে, সেখান থেকে যাব কলকাতায়। সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করব। এক বর্ষার সন্ধ্যায় তার গান শুনে আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলুম। তাকে আমি ভুলিনি।

বারাণসী থেকে সাইকেল চালিয়ে পাঁচ দিনের দিন আমি শান্তিনিকেতনে পৌঁছলুম। পরদিন সকালে, প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের পরে, গিয়ে হাজির হলুম গুরুদেবের সামনে। তাঁর পরনে সেই পরিচিত জোব্বা। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর দারুণ উৎসাহ। তার উপরে আবার সেদিন কী একটা উৎসব ছিল। আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলুম তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

॥ ৪ ॥

কিন্তু শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশুনো করবার জন্যে তো টাকা চাই। আমি কোথায় টাকা পাব? তার উপরে আবার মশার কামড়ে সে-রাত্রে আমার ঘুমই হল না। সঙ্গে যা-কিছু পয়সাকড়ি ছিল, তা দিয়ে অবশ্য একটা মশারি কেনা যেত, কিন্তু ফেরার পথে তা হলে আর কিছুই থাকত না। গুরুদেবের আশীর্বাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

সাইকেল চালিয়ে চলে এলুম কলকাতায়। [illegible] গেলুম ঠিকই, কিন্তু সেই মেয়েটির [illegible] পাওয়া গেল না। ক্ষুণ্ণ চিত্তে বারাণসীতে ফিরলুম।

মানুষ মহান

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] আপনাকে নিয়ে [illegible] দেখালুম, হিন্দুস্থান হাউস একটা [illegible] তার সেই [illegible] ড্রাইভার তখন [illegible] একটা [illegible] আমাকে তুলে দিল।

টিকিটের জন্যে বিশ্রী দেখা, পকেটে একখানা দশ-মার্কের নোট আর কিছু খুচরো মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নেই। দশ মার্কের দাম তখন ছ টাকার মতো। এদিকে ল্যান্ডলেডি আমার জন্যে চমৎকার ব্রেকফাস্টের আয়োজন করে রেখেছেন। মধু দিয়েছেন, আপেল দিয়েছেন, মস্ত

গৃহমুচ্যতে

আমরা গতবার তিনটি মহিলা কনফারেন্সের কথা আলোচনা করেছি। তার মধ্যে অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যে সেমিনার হয়েছিল তাতে কয়েকটি গ্রহণযোগ্য কর্মপন্থা বা recommendation-এর তালিকা তৈরি হয়। সেমিনারটি তিনভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে আলোচিত হয় জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতিতে মহিলা ভূমিকা। দ্বিতীয় দফায় আলোচ্য ছিল শাসনকার্যে নারীর অংশগ্রহণ। তৃতীয় বিষয়টি ছিল মেয়েদের পারিবারিক জীবন ও উপজীবিকা। সেটাই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বর্তমান সমস্যাবহুল জীবনে পারিবারিক জীবন এবং উপজীবিকার সামঞ্জস্য সন্ধান নারীকে এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছে দিয়েছে। যুগ সন্ধিক্ষণের মত এও জীবন পথের নূতন মোড় ফেরা। বিদেশ থেকে প্রতিনিধি আসবেন ঠিক ছিল। কোন কারণে তাঁরা এসে পৌঁছতে পারেননি। সমবেত সভ্যামণ্ডলীকে আলোচনা করবার অধিকার দেওয়া হয়। তার ফল স্বরূপ যে recommendation বা উপযোগী কর্ম পন্থার খসড়া হয়েছে তাতে দেশের শিক্ষিত মহিলা সমাজ ঘর সংসার ও চাকরির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে কি মনে করেন তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কোথাও তাঁরা একক বাদ দিয়ে অন্যকে বরণ করতে বলেন না। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বর্তমান পরিস্থিতিতে আর তা সম্ভবও নয়। কাজেই সন্ধান করতে হবে বিরোধ মীমাংসা করার, সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করার।

তাঁরা যা বলেন মোটামুটি তাতে কর্মী মেয়ের কর্মজীবনকে ঘিরে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য দানের কথাই বেশী।

১। অফিস ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মেয়ের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তাদের সুবিধা সুযোগ যাতে যথেষ্ট থাকে এজন্য দরকার;

(ক) মাতৃমঙ্গল ব্যবস্থা। শিশু জন্মের আগে ও পরে ছুটি যথেষ্ট হওয়া চাই;

(খ) ক্রেশ অর্থাৎ শিশুর দিবা ভাগে তত্ত্বাবধান করার প্রতিষ্ঠান প্রচুর প্রয়োজন। তিন বছর বয়স পর্যন্ত মা শিশুকে নিশ্চিন্ত ভাবে রেখে যেতে পারলে মায়ের ঘরের বাইরে কর্মজীবন সম্ভব হবে;

(গ) নার্সারি স্কুল, যাতে ৩—৫ বছর বয়স্ক শিশু কিছু খাবারও পাবে—এরকম অনেক চাই।

২। বর্তমানে নাইট শিফটে মেয়েরা কাজ করেন না বা করতে দেওয়া হয় না। এ বাধা দূর করতে হবে।

৩। অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের মত সব প্রতিষ্ঠান কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে মেয়েদের হাতের কাজের বিক্রয় ব্যবস্থা করবেন।

৪। এ আই ডব্লু সি র সব শাখা ক্যানটিন ও বেকারি খুলে কর্মী মেয়েদের পরিবারকে পুষ্টিকর অথচ স্বল্পমূল্যে খাদ্য যোগান দেবেন।

৫। সরকারী বা বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে সমান যোগ্যতায় মেয়েদের উচ্চপদে পৌঁছোনো সম্ভব করতে হবে।

৬। মেয়েদের জন্য শাসন সংক্রান্ত শিক্ষালাভের জন্য ইনস্টিটিউট গড়তে হবে।

৭। পল্লীবাসিনীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগানো দরকার। তারা সতর্ক-দৃষ্টি হবে এবং পঞ্চায়েৎ পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে

৮। নূতন প্রতিষ্ঠানের পত্তন হবে যাতে পুরোনো প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে একযোগে ভোটদানের বিবেচনাবুদ্ধি মেয়েদের মধ্যে ক্রমশঃ বাড়ে। এ আই ডব্লু সি পথ দেখাবেন।

৯। পার্টটাইম কাজের সংখ্যা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় সমানে বাড়াতে হবে। যোগ্য এবং উপযুক্ত মহিলারা সংসার সামলিয়ে তাতে কিছু সময় উপার্জনের সন্ধান করতে পারবেন। শাসনব্যবস্থায় এমন চাকরী প্রবর্তন করা অসম্ভব নয়।

ম্যানিফেস্টোর যুগে মতামতের এমন প্রকাশ্য ঘোষণা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কাজে পরিণত করা কঠিন কাজ। সম্প্রতি ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী ত্রুদো সাহেব শ্রীমতী গান্ধীকে আমাদের দেশের স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মহিলা ও মহিলা জগতের শ্রেষ্ঠ গৌরব। দেশে ও বিদেশে তাই অনেক প্রশ্ন ওঠে ভারতীয় মহিলার সমাজে কি আসন তাই নিয়ে। শ্রীমতী গান্ধী ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন, আমাদের দেশের মুক্ত নারী পুরুষে কোন দ্বন্দ্ব নেই। তাতে বিদেশী অতিথি বিস্ময় প্রকাশ করেন, কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীমতী গান্ধী বললেন, হয়তো মেয়ে পুরুষে পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমেছিলেন বলে নারী পুরুষের সহমর্মী, পুরুষও নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে চান না। ঠিক তাই, বললেন ত্রুদো সাহেব। পাশ্চাত্য জগতে হামলা করে অধিকার নিতে হয়েছে কিন্তু pshychology বা মনস্তত্ত্ব তার জন্য প্রস্তুত নয়। মেয়েরা তাই মুক্তির নামে আজও বেপরোয়া আন্দোলনে মত্ত। শুনেছিলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন রাষ্ট্রসংঘের উৎসবে এবার নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন মহিলা মুক্তি দল বা Women's Liberation Front ঐ একই প্রশ্ন করেছিলেন। ভারতীয় মহিলারা কি পুরোপুরি মুক্ত? উত্তর দিলেন শ্রীমতী গান্ধী, "পুরোপুরি।"

পুরোপুরি মুক্ত আমরা মনের দিক থেকে সত্য। কিন্তু আধুনিক সমাজে মেয়েরা যেখানে ধাক্কা খাচ্ছেন তা ভিন্ন রকমের সমস্যা। মুক্তির প্রশ্ন নয়। ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে কঠিন পরিস্থিতি আসছে তার সমাধান। কোন কোন সমস্যা বিশ্বজনীন। গৃহ এবং কর্মক্ষেত্র এ

একই হৃদযন্ত্রের দুই ক্রীড়াযন্ত্রী

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

সবুর কর, কান পেতে রাখ, খ'টিয়ে দেখ, ইংরেজ যখন এদেশের উপর থেকে হাত উঠিয়ে চলে গেল তখন যারা খেলার চর্চা করেন এবং মাঠ যাদের জীবন-সর্বস্ব-তাদের মুখে এই কথাগুলোই বারবার শোনা গেছে। তেইশ বছর পরে আজ এ কথা শুনে যে কেউ বলতে পারেন এত চোখ ঢেকে কথা বলা কেন? আসলে ইংরেজরা তাদের স্বার্থে ছড়িয়ে দেওয়া খেলাগুলোকে এদেশের খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রশিক্ষকরা কতটা নিজের করে নেয় এটাই ছিল তাকিয়ে দেখার সুযোগ।

তেইশ বছর ধরে অপেক্ষা করার অবসানে খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকদের গলায় একই সুরের আটপৌরে আলাপ শুনে আসছি। এই উপমহাদেশের অন্য রাজ্যের মতই এ রাজ্যের শতকরা ৯৯ জন খেলোয়াড় ইনিয়ে বিনিয়ে জানায়, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাব তাদেরকে দরাজ হাতে কখনই সাহায্য করে না। এ ছাড়াও পারিবারিক সমস্যায় তারা নাস্তানাবুদ। আর্থিক সঙ্গতি এত আর নাই যে, সেকালে প্রথম জীবনে খেলার মাঠে যে উদ্দীপনা নিয়ে সাগ্রহে পা দিয়েছিল আজ তার নামমাত্র নেই। খেলার প্রশিক্ষকদের মতামত, তাঁরা যে বিদেশী পাঠ নিয়েছেন তা কাজে অনুবাদ করা সম্ভব নয়, কারণ অর্থাভাব, সময়াভাব ও সংগঠনাভাব। ওই দু পক্ষের কথা ও কীর্তি প্রচারের আমরা যারা অন্যতম মাধ্যম তারা ওদের হতাশার জের টেনে বাষ্প ভর্তি চোখে ফুটনোট লিখি—অ্যামেচারিজমের নিদারুণ অভিশাপে ওরা জর্জরিত।

অ্যামেচারিজমের অভিশাপের চিন্তার লাইন থেকে সরে গিয়ে উল্টো দিকে আলো ফেলে এক উপলব্ধিতে পৌঁছি ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ হতাশবাহিনীকে পরগাছা ভাবতে বাধ্য হই। ওদের হা হুতাশই বলছে, কেউ যদি করুণা করে হাত বাড়ায়, অঢেল সুযোগ এগিয়ে দেয় তবে ওরা পারে খেলার স্বর্গ গড়তে। এ যুক্তি নির্ঘাত বেমানান। দারিদ্র্যের হাহাকার তো এদেশের সর্বত্র ঘুণ ধরাচ্ছে। খেলাতেও যে থাকবে সে কথাই কিবাস্য। অতএব যে পাথেয় চারপাশে ছড়ানো আছে তাকে দেশজ চিন্তার সঙ্গে মিশ খাইয়ে ক্রীড়া-মণ্ডলের কথা ভাবতে ওরা কেন সময় পায় না। জীবনের সঙ্গে খেলা ও খেলোয়াড়কে মেশাতে ওদের যত ভয়। খেলাকে ভালবাসার কথাটাও ওই দুই গোষ্ঠীর কারো কাছেই আমল পায় না। অথচ জায়গা মত জাহির করে আমি খেলোয়াড়, আমি প্রশিক্ষক। খেলোয়াড় যে খেলা ভাঙিয়ে চাকরি জোগাড় করে শেষে সে খেলাই ভুলে যায়। কোচও খেলার বিদ্যা বিতরণের সুযোগ নিয়ে বড় ক্লাব অথবা বৃহত্তর সংস্থার ছত্রছায়ায় সুখ ভোগ করে। এই তো এ রাজ্যের চলমান ক্রীড়াচর্চা।

অ্যাথলেটিক্স্ কোচ সুজিত সিংহ উপদে
ছবিতে দৌড়ের প্রথম মুহূর্তে: ডান দিকে
উপরে: হার্ডলার ছাত্র মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জীকে
দৌড়ের স্টার্টিং ব্লকে সঠিক ভাবে পা-জোড়া
শরীর ঠিক রাখার কায়দা বোঝাচ্ছে
নিচে: ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্র-সরো

এখন থেকে পাঁচ বছর আগে পূর্ব রেলওয়ে অ্যাথলেটিকস কোচ সুজিত সিংহকে আনন্দবাজার পত্রিকায় ক্রীড়া দপ্তরে বসে ওই ব্যর্থকাম চরিত্রগোষ্ঠীর একজন ভেবেছিলাম। সেদিন সুজিত সিংহ তাঁর সামনে বসা সাংবাদিকের কাছে তখন কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে সদ্য গজিয়ে ওঠা অ্যাথলেটিক ট্রেনিং সেন্টারের (এ টি সি) কথা বলছিলেন। বিস্তারিতভাবে জানালেন, তাঁর এক বছরের শিক্ষার ফলে ক'টি ছেলে ও মেয়ে অ্যাথলীট কিভাবে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ সাংবাদিকটি প্রশ্ন রাখলেন—সুজিতবাবু, আপনার লক্ষ্য? প্রসঙ্গটিতে গভীর গুরুত্ব পেয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। চলে গেলেন প্রসঙ্গান্তরে। আলোচনা পৌঁছল শেষের মুখে। আসন ছেড়ে ওঠার আগে নরম গলায় জানালেন, 'একমাত্র আশা অন্ততপক্ষে আমার একটি ছাত্র বা ছাত্রী অ্যাথলেটিকসের এশীয় মান ছুঁয়ে আসুক,' ভাল লাগল, ওয়ারলড রেকর্ডের বড়-কথা উনি ফাঁদলেন না। তবু নৈরাশ্যে ফিরলাম—ভদ্রলোক দিনের বেলায় চোখ বুজলেই বুঝি স্বপ্ন দেখেন।

চার বছরে তফাৎ। হুবহু একই পরিবেশে সুজিতবাবুকে একই সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম। তার কিছুক্ষণ আগেই সুজিতবাবুর তালিম পাওয়া জাতীয় অ্যাথলেটিকসে সুনাম অর্জনকারিণী দুজন মেয়ে অ্যাথলীট এসেছিল ওই ক্রীড়া দপ্তরে। সুজিতবাবু ওদের বিভিন্ন কৃতিত্বের আলোচনা থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সমালোচনায়। দুম করে বললেন "ওদের ঢের হয়েছে। আর বেশি আশা করা বৃথা।" আক্ষেপের আওয়াজ পেলাম ওর গলায়—"ছেলেমেয়ে মোটামুটি কম ঘাঁটলাম না তবু মনের মত একজনকেও পেলাম না। চৌখশ ছেলে মেয়ের নমুনা কোথায়? যা শেখাই তার কেউ শেখে অর্ধেক কেউবা সিকি। পুরোপুরির শেখার যদিও কেউ কচিৎ কাছাকাছি যায় তাও আবার স্মার্টনেস নেই। আর বেশির ভাগেরই একান্ত ইচ্ছা নাম হক, কাগজে ছবি বেরুক, চাকরি হক। তার মানে একটুতেই ডানা গজায়।" ওই কথাগুলো বলার সময় সুজিতবাবু বার কয়েক হাত নেড়েছেন। চোখের পাতা ফেলেছেন ঘন ঘন—আর মুখ থেকে বাড়তি কাতরতা সূচক আওয়াজ করে নিজের আত্মবিশ্বাসকে ধরকাচ্ছিলেন। এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নিজের বসার চেয়ারটা গোড়ালি দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে পা দুটো টান করে রেখে হাতের মধ্যে কল্পনায় লোহার বলটি রেখে দেখাতে লাগলেন—শটপুটের পোজ ওর মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না। এখনো বল ছোড়ার ঠিক মুহূর্তে ওর পুরনো দোষ বডি কুঁকড়ে যাবেই।" সেকেন্ডের মধ্যে উনি নিজেকে পরিবর্তিত করলেন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে সিনডার ট্র্যাকের উপর হার্ডলার ছাত্রদের দেখানোর সময় যে সনিষ্ঠ নিখুঁত দেহ ভঙ্গিতে উনি মূর্ত হন। "এই পোজটা অমুক হার্ডলার যদি অবিকল তুলতে পারত তবে ভাল টাইম না হওয়ার কোন কারণ থাকত কি?" পরপর সুজিতবাবু, তাঁর মনের মত ঢঙগুলি দেখাতে লাগলেন ঘরে উপস্থিত ক'জনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। সেদিন সম্ভবত বিষণ্ণ মনেই বিদায় নিলেন। শ্রোতাদের কাছে একটা কথা তিনি না জানিয়েই চলে গেলেন—এত হতাশায়ও উনি নিজেরই হাতে গড়া এ টি সির ঘানি আর টানতে পারছেন না, তা একবারও ভুলেও উচ্চারণ করলেন না।

ওই দিনটির কথা দূরে থাক। আজও চিলুয়া ওয়ার্কশপের সিনিয়র চার্জম্যান সুজিত সিংহ সমানভাবে খেটে চলেছেন যেমনভাবে ১৯৬৩তে পাতিয়ালাস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস থেকে কোচ হয়ে বাংলায় ফিরে কাজ শুরু করেছিলেন তাজা উৎসাহে। এর আগে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ষাট থেকে তেষট্টি পর্যন্ত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের যে ক্যাম্প চালু ছিল তার দরজা হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় কিশোর-যুবক সব অনুশীলনকারী সুজিত সিংহের কাছে প্রশ্ন রাখে, এবার আমাদের কী উপায় হবে? এ সময়ে সুজিত সিংহ ওঁর বিবাহিত জীবন, চিলুয়া ওয়ার্কশপের চাকরির সব কিছুর প্রতি সমান দায়িত্ব জেনেও মত দিলেন তিনি নিজেই এক ক্যাম্প খুলবেন; যার নামকরণ হয়েছে অ্যাথলেটিক ট্রেনিং সেন্টার। আশ্চর্য : এই দায়ভার নেওয়ার জন্য কেউই সেদিন এগিয়ে আসেনি ওঁর পাশে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ক্যাম্পের কার্যপ্রণালী বদলে প্রতি সপ্তাহে শনি বা রবিবার ওখানে শেখানোর ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে বাকি পাঁচদিন অন্য খেলায় ভিড় থাকায় সপ্তাহের এই দুদিনকেই মহামূল্যবান করে ভেবেছে সুজিত সিংহের ছাত্রছাত্রীরা।

আজ বুঝি, সুজিত সিংহ তখন ওই ট্রেনিং সেন্টার খুলে কী বিরাট চ্যালেঞ্জই না নিয়েছিলেন। যদিও একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁর ছাত্র-ছাত্রীকে কিভাবে কত কম সময়ে ছোটানো যায়, কত উঁচুতে লাফ দেওয়ানো যায় বা কোন ওজনকে অনায়াসে দূরে ছোড়া সম্ভব।

কাজটা যে সহজ নয় তা সহজেই অনুমেয়। কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারা চালিত হওয়া অপরিহার্য। সেদিকে আওতায় যা সম্ভব তার জন্যে চিন্তাটা প্রবাহিত হয়েছে সেদিকে। যথাযথ হার্ডলের অভাব মেটানোর জন্যে কঞ্চি দিয়ে হার্ডল তৈরি করেছেন। ওজন নিয়ে দৌড় অভ্যাসের জন্য বস্তার ভিতরে বালি পুরে গানি-ব্যাগ তৈরি করিয়েছেন। হাইজাম্প দিতে গিয়ে উঁচু থেকে পড়ার সময় গায়ে আঘাত যাতে না লাগে সেজন্যে স্পঞ্জের গদীর বদলে দুটি বাঘার বস্তার জোগাড় করে ভিতরে ঘাস-বিচালি পুরে অভিনব গদী তৈরি করেছেন। সাইকেলের পুরনো টিউব ছিঁড়ে রেজিসট্যান্স ওয়ার্কআউটের ব্যবস্থা হয়েছে। মেডিসিন বল বানানো হয়েছে ফুটবলের পরিত্যক্ত চামড়ার খোলসের মধ্যে বালি পুরে। আর বার বেল ও অন্যান্য ওজন তোলার জিনিসপত্র জোগাড় করার ব্যাপারটাও রীতিমত কৌতূহলকর।

মাঠের কাছে যা পাওয়া যায়, সামান্য সঙ্গতিতে কাজ চালানোর মত যা করা সম্ভব এই উদ্দেশ্য ব্যবস্থাটির মধ্যে উদ্যোগী। বছর [illegible] সুজিত সিংহের অ্যাথলেটিকস চর্চা [illegible] গভীরতা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু অ্যাথলেটিকসে সর্বাংশে প্রাণ সুজিত সিংহের খেলার জীবনে সহায়সম্বলের [illegible] মেট্রোপলিটান স্কুলের [illegible] ফুটবল, হকি ও ক্রিকেটের প্রাধান্য খাটছে খুব বেশি রকমের। এমনকি সুজিত সিংহ [illegible] যোগ দিতে [illegible] ফুটবল ও হকিতে কলকাতা [illegible] ক্লাবের হয়ে প্রথম ডিভিশনে খেলেছেন। [illegible] সৌভাগ্য সুজিত সিংহের [illegible] ১৯৫৩তে শুধু জোরে দৌড়বার [illegible] স্পোর্টসে একদিন [illegible] মিটার দৌড়ে হঠাৎ নেমে প্রথম হওয়ার [illegible] কতবড় সাফল্যে জড়িয়ে পড়লাম। এই জড়িয়ে পড়া, প্রথম প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত হল যখন সামান্য একটু দৌড়েই কাঁপিয়ে দিলেন, স্প্রিন্টারদের হারানোর কৃতিত্ব পাওয়া গেল সুজিত সিংহকে। এর পরই আজকের জীবনে আসার প্রথম কারণটি প্রতিভাত হল সুজিত সিংহের নির্দেশে [illegible]—বিনা ওয়ার্ম আপে দৌড়তে যাওয়ার মুখোমুখিতে সুজিত সিংহের বাঁ পায়ের জঙ্ঘার শিরা ছিঁড়ে যায়। এই শারীরিক বিপদই ওঁর কাল হয়েছে। অ্যাথলীট সুজিত সিংহের ওইখানেই অপমৃত্যু। অ্যাথলেটিকসে প্রতিশ্রুতিতে সুজিত সিংহ দলনায়কত্ব করেছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। প্রতিনিধিত্ব করেছেন বাংলার ও রেলওয়েজের। সুজিত সিংহের প্রথম ডিভিশনে ফুটবল হকি খেললেও সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হয়নি। অ্যাথলীট হিসাবে বাংলা দেশের হয়ে জাতীয়

— [illegible] কি ফলা,

নামজাদা ক্লাবের পক্ষে 'রোভার্স কাপ' জেতা সম্ভব হয়েছে এ খবর কার অজানা? স্যর দুখীরাম মজুমদারের এরিয়ান ক্লাবের মতই এ টি সি'র একই অবস্থা। যেই না অ্যাথলীট একটু ছুটতে লাফাতে শেখে অমনি ক্লাব কর্তাদের ওদের ওপর চোখ পড়ে। তাকে নিজেদের দলে টানে। সুজিত সিংহের কাছে এমন ব্যাপার খারাপ লাগে না। ওঁর মতে—ট্রেনিং সেনটারে আমরা আর কিছু না দিতে পারি তার চেয়ে ক্লাবের আট-চালায় গেলে রানিং শ্যু, ট্র্যাক স্যুট বা ট্রাম-বাস ভাড়া তো ওরা পাবে। যা হোক করে আবার বড় রকমের হিরো হয়েও যায়।'

কিভাবে এই ছ' বছর কাটালেন? সুজিত সিংহ জানান—এখন ছেলে-মেয়ে বাড়ানোর দিকে বেশি ঝোঁক নেই। কোয়ানটিটি নয় কোয়ালিটি চাই। আগে তো ছুটি পেলেই আমার দৌড়-লাফের দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম কলকাতার রাস্তা ছাড়িয়ে আশ-পাশের গ্রামে। এদিকে বারুইপুর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, ওদিকে কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটি, টিটাগড় সব জায়গায়ই ঘুরেছি ছেলে-মেয়ে ধরার খোঁজে। এমনকি রেল লাইনে ব্যাণ্ডেল পর্যন্তও এক একদিন ধাওয়া করেছি। নানান জায়গা থেকে ভিড় করা ছেলেমেয়েদের সকলেই স্বভাবত আলাদা হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে বহুবার। এর মধ্যে রাগ দুঃখ তো ছিলই। ছাত্র-ছাত্রী ও আমার মধ্যে টান থাকায় যেমন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে আবার আমিই সব একাকার করে দিয়েছি। তবে একটা আশ্চর্য ব্যাপার, আমাদের ক্যাম্পের শত-করা নব্বই ভাগ ছেলে এসেছে কলকাতার বাইরে থেকে। প্রশ্ন করলাম এরা কেন আসে? ওদের প্রথম দিকে মোহ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিশ করার গর্ব। যে যার নিজের ইভেণ্টে একটু ভাটো হলেই কাপ-মেডেলের সঙ্গে বাহবা জোটে, তার উপরে খবরের কাগজে নাম বেরোলে ওরা হয় আহ্লাদিত। পরে চাকরি জোগাড় হলে আসল দিকটাতেই ভাটা পড়ে।

চক্রবৎ এই পরিণতি বছরের পর বছর ঘটলেও সুজিত সিংহ তার কাজে বিরত হননি। সুজিত সিংহের ধাতে এমন কর্তব্য সয়ে যাওয়ার হেতু উনি নিজের জীবনে যা ভুল শিখেছেন সেগুলো যাতে পরবর্তীদের মধ্যে পুনরনুষ্ঠিত না হয় তার দিকেই ওঁর লক্ষ্য। সুজিত সিংহের প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেই বাংলা দেশের অনামী ছেলে-মেয়েকে ভারতের অ্যাথলেটিকস আঙিনায় প্রতি-বিম্বিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

অথচ এই ছেলে-মেয়ের দলে অন্ন বস্ত্রের সংস্থানে অপারগ হওয়া দুর্ভাগাদের আধিক্যই বেশি। এই অসুবিধা সুজিত সিংহকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে একাধিকবার। পাঁচ হাজার ক্যালোরি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের নির্দেশও থাকে। কিন্তু এর অর্ধেকও ভোজ্য গ্রহণের ক্ষমতা ওদের নেই এ কথাও শ্রীসিংহের অজ্ঞাত নয়।

হামেশা এই ধরনের অভাবের ফাঁদ থেকে অ্যাথলীট প্রতিভার যাতে অপমৃত্যু না ঘটে সেজন্যে উনি চেয়েছিলেন বাংলা-দেশে সত্যিকারের অ্যাথলেটিকস ইনস্টিটিউট গড়ে উঠুক, সেখানে উনি নিজের পদ বজায় রাখার জন্যে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। কারণ উনি জানেন তাহলেই বাংলাদেশের নিন্দুক সমাজ ফিসফিসিয়ে উঠবে ওঁর চরিত্র হননের চেষ্টায়। তাই চেয়ে-ছিলেন সম্পূর্ণ নেপথ্য ভূমিকায় নিজেকে বেঁধে রাখতে। কিন্তু আসল প্রস্তাবই চেহারা পায়নি রাজ্য সরকারের অনিচ্ছায়।

ভাল কথা, বিশ্বের অ্যাথলেটিকস মানচিত্রে ভারতের তো কোন স্থানই নেই। এর উপর বাংলাদেশের কথা আসেই না, কিন্তু ওই বিদেশী উপাদান থেকে প্রচুর গবেষণা করে উনিই বার করেছেন কোন ক্রীনিসটা বাঙালী অ্যাথলীটের ধাতে সইবে। এই জ্ঞানের গভীরতা যাতে বোদ্ধাদের উর্বর মৃত্তিকায় আরও শিকড় ছড়াতে পারে সেজন্যে ওঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল কিছুদিনের জন্য অন্তত বিদেশ ঘুরে আসি। সমস্ত প্রয়াসেই দুই লক্ষ্য : বাঙালীর অ্যাথলেটিকস, বাঙালী অ্যাথলীট।

সুজিত সিংহ অ্যাথলীট গড়ার কাজে শুধু সাধারণ ইভেণ্ট নিয়ে নাড়া-চাড়া করার চেয়ে স্কিলড বিষয়ের দিকে ঝোঁক পেয়েছেন। কিন্তু যে অ্যাথলীটদের ঘিরে এত উন্নত চিন্তা তাদের বেশির ভাগই নিজেদেরকে স্কিলড ইভেণ্টের জন্য তৈরি করায় মনোযোগী নয়। আসল কথা বছর পাঁচেক শরীরকে তৈরি করার মত নিরলস সাধনায় ওরা রসকষ পায় না। সুজিত সিংহের শুধু হা-হুতাশই সার হয়।

তবে যে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীকে কেন্দ্র করে সুজিত সিংহের এ টি সি'র সংসার চলে তাদের মধ্যেই নিজের আদর্শের অবিকল অনুবাদ চান, কিন্তু পেয়েছেনও তবে প্রাপ্তিটা চড়চড়ে হয়নি। এটাই এদেশের স্বাভাবিক নিয়ম। দিনের শিক্ষা শেষে সুজিত সিংহের আদর্শ বিদ্যালয়ে পা দিয়ে অ্যাথলীটদের ওঁকে প্রণাম করার উপমা বাংলাদেশের কোন আদর্শ বিদ্যালয়েও ঘটে কিনা আমার সন্দেহ।

এ টি সি'র শিক্ষার্থীরা যদি সপ্তাহে একদিনের বদলে চার-পাঁচদিন অনুশীলন করত তবে ফলাফলে আরো আলোড়ন আসত —এ হল সুজিত সিংহের আক্ষেপসহ অভি-মত। এই আক্ষেপ সত্ত্বেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ টি সি'র ক্লাব সংগঠনের স্বার্থ বহির্ভূত মহৎ কার্যাবলীর পরিমাপ করা মেরুদণ্ড সুজিত সিংহের আশ্চর্য প্রচেষ্টা বাংলার অ্যাথলেটিকসের প্রথম অভিধান বলা চলে। আর ওঁর একলা প্রয়াস অনেকের মতই ব্যক্তিগতভাবে হৃদয়ে ঝাঁকুনি দেয়। এই চরিত্রটিকে জানার আগে আমার সামনে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাথলেটিকস কোচ পার্সি কেরুটি ও ভারতের অ্যাথলীটদের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ জার্মান অ্যাথলেটিকস পণ্ডিত অটো পেলজারই ছিল দুই অনুকরণীয় জীবন জ্যোতিষ্ক। এর পাশেই স্থাপন করলাম সুজিত সিংহের অবয়ব। এর পরে অপেক্ষায় থাকব সুজিত সিংহের জীবন মশাল থেকে কোন পরবর্তী অ্যাথলীট নিজের মশাল জ্বালায়।

*

সুজিত সিংহের মতই একমাত্র খেলা ছাড়া জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মাথা না ঘামিয়ে চলার এক অব্যর্থ উপমা ভারোত্তোলক লক্ষ্মীকান্ত দাস। সুজিত সিংহের মতই লক্ষ্মীকান্ত দাসও চাকরি সূত্রে পূর্ব রেলওয়ের কর্মী। সুজিত সিংহ যেমন চার্জম্যান কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত দাস কাজেন গার্ডের কাজ। দুজনের চেহারার রূপ ক্ষেত্রেও ফারাক। যেমন সুজিত সিংহের ৬৫ ইঞ্চি উচ্চতা, দেহের ১৫০ পাউণ্ড ওজন এবং ৩৮ ইঞ্চি পরিধির বুকের পাশে লক্ষ্মীকান্ত দাসের আপন আকৃতির বৃত্তান্ত হল ৬৪ ইঞ্চি ৩৮ ইঞ্চি ও ১৪২ পাউণ্ড। দুজনেই বাংলাদেশের দুই জেলার লোক। সুজিত সিংহের মুর্শিদাবাদ লক্ষ্মীকান্ত দাসের হাওড়া। আরও বলার, দুজনেরই স্পোর্টস ইভেণ্ট আলাদা। একজনের ধ্যানজ্ঞান ছোটানো, ছোড়ানো ও লাফানো আর অপরজনের শুধু ওজন তোলা আর ওজন নামানো। কিন্তু ওঁরা দুজন লক্ষ্যের দিক থেকে একই পথের পথিক। যথাক্রমে অ্যাথলেটিকস ও ওয়েট-লিফটিং এমন দুটো বিষয়কে ওঁরা জনপ্রিয়তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যেখানে ফুটবল-ক্রিকেটের মত আবালবৃদ্ধবনিতা সমন্বয়ে দর্শক সাধারণের আগ্রহ নেই। নিষ্ঠুর সত্য কথা : দুজনেই ক্রীড়া ধর্মের এক মতে বিশ্বাসী : যে খেলা খেলাব তাকে জীবনভর বয়ে বেড়াবে।

এই বয়ে বেড়ানোর কাজে সহস্র সম্মান ও অজস্র স্তুতিবাদ জুটলেও লক্ষ্মীকান্ত দাসের মনে গর্বের গাজলা জমেনি। তাই উনি পিছন ফিরে ফেলে আসা দিনগুলিকে উন্মোচনের সঙ্গে কবি সুকান্তের ঢঙে বলে চলেন—আমাকে ভিখারী বলাই ভাল। ইজ্জতের খাতিরে নিম্নমধ্যবিত্ত বলা হয়। যেভাবে জীবনের পথে চলেছি তাতে বিপদ আমায় রোজ চোখ রাঙালেও আমিও ওর তোয়াক্কা করি না। এরই মাঝে আমরা ক্রিশ্চানকে বাঁচিয়ে রেখেছি। পারিবারিক

পবিত্র লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল এবং গুণ্ডাবাহিনীর মৃত্যুবাণকে উপেক্ষা করে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে?

এই সব বাদ দিয়ে তার লেখায় আরো অনেক মন্তব্য আছে যা যুক্তি এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। পাঠককে বিভ্রান্ত করে।

স্বদেশকুমার ভট্টাচার্য
চাকদহ

॥ ৪ ॥

অশোককুমার চক্রবর্তীর লেখা ছাত্রবিদ্রোহ সম্পর্কিত প্রবন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান ও সময়োপযোগী। এই লেখাটি প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই দেশ কর্তৃপক্ষকে আর আন্তরিক অভিনন্দন জানাই লেখককে।

ছাত্র-বিদ্রোহ সম্পর্কিত লেখা প্রবন্ধ 'দেশে'র পাতায় পূর্বেও পড়েছি। কিন্তু অশোককুমার চক্রবর্তীর নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আমি নিজেও একজন কলেজের ছাত্র। আমিও কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক নই তবু দলমত নির্বিশেষে অনেক ছাত্রের সাথে ঘনিষ্ট হয়েছি, নিজে একজন ছাত্র হয়ে অন্যান্য ছাত্র-বন্ধুদের সমস্যা দেখেছি, শুনেছি ও উপলব্ধি করেছি। মফস্বলের স্কুলের বেড়া ডিঙিয়ে যখন কলকাতার কলেজে ভর্তি হতে যাই তখন নতুন কলেজ সম্পর্কে মনে মনে অনেক আশা পোষণ করেছিলাম কিন্তু কলেজে প্রবেশ করে সে সব আশা মিলিয়ে গেল. দেখলাম এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। দেখলাম ছাত্র ইউনিয়নের নাম করে রাজনৈতিক দলাদলি, রাজনৈতিক কলহেরে। ছাত্র-ইউনিয়ন যা ছাত্রদের কল্যাণ সাধনের নাম করে গঠিত হয় সেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক দলাদলি, মতাদর্শের বিরোধ এবং তার বিষময় পরিণতি হিসাবে সংঘটিত হয় একদল ছাত্রের সাথে আরেক দল ছাত্রের মারামারি ও ছাত্র খুন। প্রথম প্রথম ভাবতাম এই সব কাজের জন্য বোধ হয় ছাত্ররাই দায়ী. কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারলাম যে এইসব হিংসাত্মক কার্যকলাপগুলি ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত হলেও এর পেছনে কাজ করছে কিছু বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতা। এরা নিজেদের স্বার্থে রাজনীতির নাম করে এক ছাত্রকে দিয়ে অপর ছাত্র হত্যা করাচ্ছে আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক হতাশাগ্রস্ত ছাত্ররা এতেই বিপ্লবের কাজ এগোচ্ছে বা শ্রেণীশত্রু খতম হচ্ছে ভেবে একের পর এক ছাত্র হত্যা করে চলেছে। কিন্তু এতে সত্যিই কি বিপ্লবের কাজ এগুচ্ছে? কিংবা তাদের সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে? নাকি ঐ সব রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রদের যারা উস্কে দিচ্ছেন তারা তাদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন? আর এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারা বাংলা দেশ ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে, ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

এই ঘুণধরা, পঙ্কিল সমাজ ব্যবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন দরকার। এই পচা, গলা শিক্ষা-ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন দরকার। পরিবর্তন দরকার সমাজের প্রতিটি স্তরে। সত্যিই এক বিষাক্ত ধোঁয়ায় সারা দেশ আজ ছেয়ে গেছে। এর জন্য দরকার বিপ্লব, যে বিপ্লব বিনা রক্তপাতে, বিনা হিংসায়, দেশের প্রতিটি মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, প্রতিটি মানুষের স্বার্থে সম্পন্ন হবে। গঠিত হবে নতুন এক ভারতবর্ষ যে ভারতবর্ষে প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষকে ভাই বলে কাছে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। প্রিয় ভাবতে পারবে।'

পরিশেষে লেখককে আবার আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তার সময়োপযোগী মূল্যবান লেখাটির জন্য।

শ্রীনারায়ণ দাস চৌধুরী
মধ্যমগ্রাম

'সাদনাং ক্রেম'

২৪ পৌষের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমতী আরতি দাসের 'সাদ নাং ক্রেম' প্রবন্ধটিতে খাসিয়া (খাসী নয়) ভাষার কতকগুলি শব্দের বিকৃত রূপ নজরে পড়ল। শিরোনামার 'নাংক্রেম' কথাটি অবশ্য প্রবন্ধের ভিতরে প্রকৃত 'নং ক্রেম' রূপেই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু 'সাদ' শব্দটা বিভ্রান্তিকর। বুঝতে পারছি খাসিয়া ভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় লেখিকার এই বিভ্রম ঘটেছে। আমি প্রথম যৌবনে (প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে) দীর্ঘকাল খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ে অবস্থান করেছি এবং গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি। শিলং থেকে পায়ে হেঁটে নংক্রেম এসে সেখানে গিয়ে 'নংক্রেম নাচ' উপভোগ করবার সুযোগও তখন আমার হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা তখন এই নৃত্যকে 'কা শাড় নংক্রেম অথবা কা শাড় কন্‌থেই' (মেয়েদের নৃত্য) বলে উল্লেখ করেছে। নৃত্য কথাটির খাসিয়া প্রতিশব্দ 'সাদ' নয়, 'কা শাড়'। খাসিয়া ভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এর প্রায় প্রত্যেকটি বিশেষ্য পদই (অবশ্য স্থানের নাম ছাড়া) হয় পুংলিঙ্গ, নয় তো স্ত্রীলিঙ্গ। বিশেষ্যের আগে ব্যবহৃত উ প্রত্যয় পুংলিঙ্গ এবং কা প্রত্যয় স্ত্রীলিঙ্গের নির্দেশক। এদের লিঙ্গ প্রকরণও অদ্ভুত। যেমন সূর্য (কা স্নি) স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু চন্দ্র (উ ব্লাই, পুংলিঙ্গ) 'শাড়' (নৃত্য) কথাটি স্ত্রীলিঙ্গ। কাজেই 'সাদ নংক্রেম' না লিখে কা শাড় নংক্রেম লেখাই সমীচীন। কেননা শেষোক্ত অভিধাতেই খাসিয়া পাহাড়ে নৃত্যটির পরিচিতি।

খাসিয়াদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনায় শুধুমাত্র ইংরেজ লেখকদের বইয়ের উপর নির্ভর করলে উচ্চারণ বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে 'উ বিসকুরম' এবং 'কা ব্লেই সিনসার' এই দুটি শব্দ বার কয়েক ব্যবহৃত হয়েছে। এই চেহারায় শব্দ দুটিতে আমাদের অচেনা মনে হয়। আসলে দুটি শব্দই কিন্তু বাংলা ভাষা থেকে ধার করা। প্রথমটির প্রকৃত খাসিয়া রূপ উ বিশ্‌করম এবং দ্বিতীয়টির 'কা ব্লেই সনসার'। সেল বিভাগের পূর্বে কাজ-কারবার উপলক্ষে শ্রীহট্টের বাঙালীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হত খাসিয়াদের। ফলে এদের মাতৃভাষায় প্রায় ছয় সাত শত বাংলা শব্দ প্রায় অবিকৃতভাবেই ঢুকেছে যেমন (উ) খবর, (উ) মহাজন ইত্যাদি। বিশকরম কথাটি শ্রীহট্টের প্রান্তিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত শব্দ বিশ্বকর্মার অপভ্রংশ এটি। শব্দটি হুবহু এই রূপেই খাসিয়া ভাষায় স্থান পেয়েছে আর সনসার শব্দটি নিয়েছে খাসিয়ারা 'সংসার' থেকে। কিন্তু মেজর গর্ডন প্রমুখ ইংরেজ লেখকদের বইয়ে বিশকরম হয়েছেন Biskuram এবং সংসার হয়েছে Synsar—এই বানানের প্রভাবে লেখিকার হাতে শব্দ দুটির এমন বিকৃতি ঘটেছে যে, এরা যে আমাদের বাংলা ভাষা থেকেই ধার-করা দুটি শব্দ তা বোঝবার জো নেই।

এমনি ভুল আরো কিছু কিছু আছে। বহুবার উল্লিখিত 'সিয়েম' (রাজা) কথাটি আসলে 'সিম'। 'ইয়েং মানে বাড়ি' কথাটা ঠিক নয়, খাসিয়ারা বাড়িকে বলে 'ইং'।

'পম ব্লাং' প্রভৃতি কোনো কোনো উৎসবে নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হলেও খাসিয়াদের উৎকৃষ্ট ও নিপুণ নৃত্যকলার কোনো গৌরবময় ঐতিহ্য নেই। নংক্রেমে অনুষ্ঠিত 'কা শাড় কন্‌থেই' বা মেয়েদের নাচ আসলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পা টিপে টিপে একটু একটু করে এগোনো। কেউ কেউ একে বলেছেন—"Ant Killing dance" বা পিঁপড়ে মারা নাচ।

নলিনীকুমার ভদ্র
কলকাতা-৯

ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা

আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার এ দীনতা মাফ করবেন। আপনি আমার প্রাণাধিক লেখকের এবং আপনার কথায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বাউণ্ডুলে লেখক শিব্রামকে তাঁর শুক্ত আরামের তক্তাপোশ থেকে তুলে এনে (বোধ হয় খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে) 'দেশের' (শব্দার্থে ও রূপকার্থে) পাঠকদের কাছে জবানবন্দি দিতে বাধ্য করেছেন। আপনার এলেম আছে বলতে হবে। শিব্রামের সঙ্গে আমার পরিচয় স্কুল জীবনে "নিখরচায় জলযোগ" ও বাড়ি থেকে পালিয়ের মধ্য

দিয়ে আর তারপর থেকে আজ স্কুল শিক্ষক হয়েও শিব্রামের নেশা কাটল না। শিব্রামের কথাতেই বলা যায়—"আমি (বড়) হইনি ঠিক, আমার পাঠকরা হয়েছে, বেড়ে উঠেছে, তারা দিকপাল হয়েছে একেকটা। তারা আমায় টেনে তুলতে চেয়েছে বলেই আমার এই বাড় বাড়ন্ত।" শিব্রাম আমায় নেশাগ্রস্ত করে তুলেছেন, তাঁর লেখা দেখলেই উন্মত্তের মত Pun শালায় ধাওয়া করেছি।

শিব্রামের সার্থকতার কথাও তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন—"ছেলেমেয়েদের আমি ভোলাতে চাইনি, ঠকাতে চাইনি। সজাগ করে দিতে চেয়েছি তাদের চোখ কান মন ফুটিয়ে দিয়ে...আজকের পৃথিবীর এখনকার জীবনের একেবারে মুখোমুখি করে দিতে চেয়েছি।" একথা যে কত বড় সত্য তা আমি নিজে উপলব্ধি করছি, আমার মত আরও অনেক শিব্রামসক্তও বুঝেছেন।

সবশেষে ঈশ্বরের কাছে দাবি জানাই শিব্রাম চক্রবর্তীকে আরও অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে অন্তত আমার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।

দেবশঙ্কর দত্ত
আটপুর উঃ মাঃ বিদ্যালয়।
হুগলী।

দরবার নটী কলাবন্ত

গত ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় লিখিত "দরবার নটী কলাবন্ত" প্রবন্ধ পাঠ করে বিশেষ আনন্দিত হলাম। মিঞা তানসেনের রহস্যাবৃত জীবনের সঠিক ইতিহাস বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আজও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি। এর প্রধান কারণ এই যে, ভারতীয় পণ্ডিতেরা ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোযোগী ছিলেন না; তাঁরা আদর্শের দর্শনে বিশেষ বিশেষ মনোনিবেশ করে এসেছেন এবং অন্তরের আদর্শের বাহ্যপ্রকাশরূপে কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁর নিজ আদর্শের প্রতিমূর্তি কল্পনা করে সন্তুষ্ট থাকতেন।

যদিও মুসলিম ঐতিহাসিকরা বহু পরিমাণে বাস্তব দৃষ্টিতে কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে উৎসাহী ছিলেন, তবুও রাজনীতির মূল্য তাঁরা যতটা দিতেন, সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যার প্রতি তাঁদের লক্ষ্য সে পরিমাণে ছিল না। আকবরের দরবারের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুলফজল বাদশার সংগীতগুরুরূপে তানসেনের অশেষ প্রশংসা করলেও তানসেনের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করেননি। পরবর্তী যুগে তানসেনের দুই পুত্র ও জামাতার বংশধরগণ নানা বহুমূল্য ঐতিহ্য বহন করে এসেছেন; সংগীতরসিক অভিজাত হিন্দু ও মুসলিম ওস্তাদবর্গেরা তাঁদের গ্রন্থে অনেক কাহিনীর উল্লেখ করেন, কিন্তু তাদের উক্তির মধ্যে পরস্পর বৈষম্য কিছু কিছু রয়েছে। দিলীপবাবুর লিখিত মত অনুযায়ী তানসেনের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার প্রণয় সম্বন্ধ অনেকের কাছেই নতুন; তবে সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুপদী (তানসেনের পুত্র বংশীয়) তাজ খান এবং মাতুল গঙ্গাধর মিশ্রের বংশধর লছমন দাস এই চিত্তাকর্ষক ঘটনা সম্বন্ধে একমত এবং ইহা নেপাল রাজ্যে সুবিদিত। আমরা বিলাস খানের শেষ বংশধর মহম্মদ আলী খান, নবাৎ খান বংশীয় উজির খান এবং রামপুর ও লক্ষ্ণৌ দরবার, কলকাতার ঠাকুরবাড়ীতে এই জীবনবৃত্তের সমর্থন পেয়েছি। এঁরা সবাই বলতেন যে, তানসেন দুহিতা (নবাৎ খানের পত্নী) সরস্বতী এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খান উভয়েই তানসেনের প্রথমা পত্নী হোসেনী ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত। হোসেনীর পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা মুসলমান ছিলেন। তানসেন ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও প্রথম বিবাহের পর থেকেই হিন্দু আচারের সঙ্গে খানিকটা মুসলমান আচার মিশিয়ে চলতেন। সরস্বতী ও বিলাস খানের বংশধরদের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ খুবই সুস্পষ্ট ও নিবিড়; এর শেষ উদাহরণ স্বরং উজির খান। ইনি একদিকে নবাৎ খানবংশীয় আমীর খানের পুত্র এবং অপরদিকে বিলাস খান বংশীয় কাশিম আলীর ভাগিনেয়।

পক্ষান্তরে তানতরঙ্গ খান ও তাঁর বংশধরগণের সঙ্গে পূর্বোক্ত দুই ঘটনার কোনও সামাজিক সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় না। মহম্মদ আলী ও উজির খান বলেছেন যে, তানতরঙ্গ খানের মাতা বৃন্দাবনের এক গোয়ালিনী ছিলেন। তানসেনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথা কিন্তু গোপনেই রাখা হয়। মেহেরউন্নিসার কাহিনী পাঠে মনে হয় তিনি তানসেনের তৃতীয় নায়িকা ছিলেন। এ সম্বন্ধে দিলীপবাবু ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ আরো অনুসন্ধান করলে সুখী হবো।

পরিশেষে মিশ্রী সিং সম্বন্ধে তাঁর মতামতের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য রয়েছে, কারণ এ সম্বন্ধে কিছুই কোথাও দেখিনি।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
কলকাতা-১৯।

'ইংরেজি গীতাঞ্জলি'

আমার 'ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু বি য়েট্‌স' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের যে অংশটি গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে একটি ভুলের প্রতি নাসিরুদ্দিন আহম্মদ সাহেব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঐ অংশে বিশেষ প্রসঙ্গে ইংরেজি গীতাঞ্জলির '৬৭নং কবিতার প্রথম স্তবকের' উল্লেখ আছে। এটা অবশ্যই ভুল ; এটা হবে '৬৯নং কবিতার প্রথম স্তবক'। পত্রলেখক অনুমান করেছেন যে ওটা '৬৭নং কবিতার প্রথম স্তবক না হয়ে হবে '৬৬নং কবিতার শেষ স্তবক।' তাঁর এই অনুমান সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না, যেহেতু ৬৬নং কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। অতএব প্রবন্ধের পূর্বোক্ত অংশটিতে ঐ ৬৭ সংখ্যাটিই শুধু ভুল। তাহলেও নিঃসন্দেহে এটা একটা ভুল এবং এই ভুলটি দেখিয়ে দেওয়ায় সংশোধনের সুযোগ পাওয়া গেল। সে জন্য নাসিরুদ্দিন আহম্মদ সাহেবকে ধন্যবাদ।

সৌরীন্দ্র মিত্র
শান্তিনিকেতন।

রামন-এফেক্ট

গত ২৬ ডিসেম্বর ৮ সংখ্যার দেশ-এ 'রামন-এফেক্ট' প্রবন্ধটির জন্য লেখক এবং 'দেশ' সম্পাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 'দেশ'-এর মতো জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে শুধু ও মূল বিজ্ঞানের উপর এই ধরনের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রতি বিজ্ঞানীদের আগ্রহই শুধু বাড়বে না, বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ মানুষও কৌতূহলী হয়ে উঠবে। 'দেশ' সম্পাদকের কাছে তাই আমাদের অনুরোধ, এই ধরনের আরও বহু রচনা নিয়মিতভাবে না হলেও অন্তত মাঝে মাঝে প্রকাশ করুন।

এখন "রামন এফেক্ট" প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 'দেশ' পুরোপুরি বিজ্ঞানের কাগজ নয়। সুতরাং দেশ-এ প্রকাশিত বিজ্ঞানের কোনো প্রবন্ধ যে মোটামুটি সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে—এ রকম আশা করা স্বাভাবিক। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, বিজ্ঞানের তথ্যকে অতি সরল করতে গিয়ে মূল বিষয় থেকে সরে আসতে হবে। বিশেষ করে বিষয়বস্তুটি যদি রামন-এফেক্টের মতো অতি জটিল হয় তাহলে একেবারে বিজ্ঞান-না-জানা লোককে সে সম্পর্কে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ধারণা দেওয়া সত্যিই কঠিন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমীকরণ, সূত্র প্রভৃতি আঙ্গিক জটিলতা কিছুটা বর্জন করে লেখাটিকে মোটামুটি সহজবোধ্য করে তোলা সম্ভব। 'রামন-এফেক্ট'-এর লেখকের কাছে আমরা সেই জিনিসটিই আশা করেছিলাম।

অণুর স্থির কম্পন, অণুর সাথে আলোর সংঘর্ষের ফলে স্থির কম্পনের পরিবর্তন এবং তার ফলে রামন বিকিরণের উদ্ভব—এই ব্যাপারগুলি আরও একটু সহজ এবং বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে দিলে বোধকরি বোঝার সুবিধে হত। প্রবন্ধটিতে অনেকগুলি ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু

সব জায়গায় উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলিও সবক্ষেত্রে তেমন সহজ-বোধ্য নয়। অণু থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর পরিমাপ বোঝাতে গিয়ে লেখক একটি সমীকরণ ব্যবহার করেছেন। এই সমী-করণটিকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেত। সমীকরণের জন্য ব্যবহৃত ব্লকে ইংরিজী Z অক্ষরটি দেখা গেল না, অথচ পরে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে এইরকম দুরূহ একটি বিষয়-বস্তুকে লেখক যে আন্তরিকতার সঙ্গে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন তার জন্য তাঁকে এবং নিয়মিত বিভাগ 'বিশ্ববিজ্ঞান' ছাড়াও শুধু বিজ্ঞানের জন্য এতখানি জায়গা দিয়েছেন বলে 'দেশ' সম্পাদককে আর এক-বার ধন্যবাদ জানাই।

অলোক সেন
সম্পাদক, বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা,
বহরমপুর।

বিনোদন সংখ্যা

'দেশ' বিনোদন সংখ্যা সর্বাঙ্গসুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আঙুরবালা দেবীর 'মনে পড়ে' একটি সার্থক রচনা। প্রকাশের ভঙ্গী এবং রচনাতে মুনশীয়ানা আছে। আঙুরবালা দেবীর আত্মজীবনী যদি সম্পূর্ণ হত তবে মনে হয় অনেক পাঠকই আনন্দিত হতেন। একটু চেষ্টা করে দেখবেন না যদি তিনি এ বয়সেও আমাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করে তাঁর আত্ম-জীবনীটি শেষ করতে পারেন এবং 'দেশ' এর পাতায় যদি তা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা যায়! ও রকম পাকা হাতের রচনার সাহিত্যিক মূল্যও কম নয়।

দুলাল চক্রবর্তী
একলেহরা (মধ্যপ্রদেশ)

॥ ২ ॥

এ আপনারা করেছেন কি? এ যে বাংলা ললিতকলার কোষগ্রন্থ। কার সঙ্গে তুলনা করি? আর দামেও এত সস্তা! কেবল একটা অনুরোধ করব, প্রচ্ছদে যদি এমন সুন্দর ছবি দেন (যে বিষয়েও আপনারা তুলনারহিত) তবে এই ধরণের বিশেষ সংখ্যাগুলো বোর্ড বাঁধাই অথবা রেক্সিন বাঁধাই করে ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন অনুগ্রহ করে। হয়ত দাম বেশী পড়বে (আগে থেকে পাঠকদের কাছ থেকে ভোট নিতে পারেন অথবা দু-রকম সংস্করণ করতে পারেন) তবু প্রচ্ছদপটগুলোর আয়ু বাড়বে। বইগুলোও পাঠশেষে সংগ্রহে রাখা যাবে। শেষে, এই ধরণের সংখ্যা বার করার প্রচেষ্টাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

'দেশ' পত্রিকায় বিনোদন সংখ্যা সম্বন্ধে এই মতটি প্রকাশ করলে বাধিত হব।

জয়ন্ত চক্রবর্তী
দুর্গাপুর-৭।

হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে

॥ ১ ॥

গত একাদশ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীতরুণ দত্তের লেখা "হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে তোমাকে চিঠি, অরূপ" রচনাটি পড়ে বিস্মিত, মুগ্ধ এবং চিন্তিত হ'লাম। বাংলা ভাষায় এই ধরনের লেখার সাথে পরিচয় আমার এই প্রথম। এই রচনার ভাষার ঐশ্বর্য যে কোন পাঠক যে কোন অংশ বিশেষ পড়লেই উপলব্ধি করবেন। চিন্তা-ধারার স্বকীয়তা, যুক্তির যাথার্থ্যতা ও শাণিত বুদ্ধির চমক রচনাটির প্রতি ছত্রে। শ্রীদত্তের সৎসাহসের দৃষ্টান্ত আমাদের মত অনেক মূককে বাচাল করবে।

ছাত্রাবস্থায় আমাকে কিছুদিন অস্তিত্ববাদ এবং মার্কস ও হেগেলীয় চিন্তাধারা নিয়ে পড়াশুনো করতে হয়েছিল। তখন থেকেই কয়েকটি প্রশ্ন আমাকে বিচলিত করেছিল— আজও কোন সদুত্তর পেলেনি। সঠিকভাবে বলতে গেলে এই দুই বিপরীতধর্মী চিন্তাধারা জীবনের কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর দিয়েছে তার মধ্যে কোন একটিকে গ্রহণ করা আমার মনে হয়েছে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন। আমার চিন্তাশক্তি এই সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেনি। আজ দীর্ঘদিন পরে শ্রীদত্তর রচনাটি পড়ে আবার প্রশ্নগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

শ্রীদত্তর লেখা পড়ে মনে হ'ল তিনি অস্তিত্ববাদের মূল বক্তব্য-গুলি মেনে নিয়েছেন। বোধ হয় তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন, তার প্রতিটি কাজের জন্য তার নিজস্ব দায়িত্ব রয়েছে, সামাজিক লক্ষ্য বা সমষ্টিগত পরিণতি ছাড়া তার নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র একটি বিশেষ নিয়তির কথাও বোধহয় তিনি মেনে নিয়েছেন। তাঁর এই বিশ্বাসের সত্যতার বিচার আমি করছি না। আমার প্রশ্ন এই মূল বক্তব্যগুলিতে যারা বিশ্বাস করে না তাদের তিনি কি যুক্তি দিয়ে বোঝাবেন যে তারা আজ যে পথে নেমেছে সেটা বুদ্ধিহীনতার পথ।

মনে করা যাক এমন এক অরূপের কথা যে ব্যক্তিবিশেষের একক সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বাধীনতা অথবা সমাজ বহির্ভূত নিয়তিতে বিশ্বাস করে না। সে হয়ত বিশ্বাস করে মানুষের প্রতিটি কাজ তার পারিপার্শ্বিকের সাথে দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত—সে হয়ত বিশ্বাস করে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাত থেকে।

অরূপ এই সমাজের উপেক্ষিত, বঞ্চিত এবং অসহায় ভাবে সর্বহারাদের প্রতিনিধি। যদিও যোগ্যতায় সে হয়ত কারো চেয়ে কম নয়। যে জীবনদর্শনে সে বিশ্বাসী তা মেনে চললে তার সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা। প্রথম, এই নির্মম সমাজের সব অত্যাচার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়া। এই সমাজের

মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে সুবিধাভোগীদের দলে ভিড়ে যাবার চেষ্টা করা। দ্বিতীয় এই সমাজকে আঘাত হানা। জ্ঞানবুদ্ধি সব হারিয়ে নয়—সুপরিকল্পিতভাবে।

শ্রীদত্ত তৃতীয় একটি পথের কথা লিখেছেন। তাঁর মতে এ পথ তাদের যারা "সমাজের নানা কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়, যারা প্রবলতরভাবে নিজেদের দ্বারা নির্মিত, সমাজের বহির্ভূত ও ...হীন। যারা সমাজের সাথে মোকাবেলা করে সমাজ নির্ধারিত মনোবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করে। এবং সমাজের নষ্টামির বিরুদ্ধে যারা ব্যবহার করে সেই অচেনা ও অভূতপূর্ব অস্ত্র : বুদ্ধি ও নৈতিকতায় প্রজ্জ্বলিত জীবনের প্রতি ভালোবাসা। শ্রীদত্তর মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথের অনুগামীদের মধ্যে যে তফাৎ, নাজি স্টর্মট্রুপার্স ও ওয়ার্কার্স সোভিয়েটের মধ্যে সেই তফাৎ।

শ্রীদত্ত বুদ্ধি ও নৈতিকতায় প্রজ্জ্বলিত জীবনের প্রতি ভালোবাসাকে অচেনা ও অভূতপূর্ব কেন বলেছেন তা আমি বুঝিনি। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা অরূপের জীবনদর্শনের মূল তত্ত্বগুলির বিরোধী। ওয়ার্কার্স সোভিয়েটকে এই শ্রেণীভুক্ত করা তার কাছে নিছক ভাববিলাস। অরূপের পক্ষে এ পথ বেছে নেওয়া সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন, মানুষ কি সত্যিই স্বাধীন? তার কি নিজস্ব সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ও মৌলিক কোন অস্তিত্ব আছে? সমাজ বহির্ভূত একান্তভাবে ব্যক্তিগত কোন নিয়তি কি তার আছে? পারিপার্শ্বিকের নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম করে এই নিয়তি কি পথ করে নিতে পারে? শ্রীদত্ত হয়ত বলবেন 'হ্যাঁ'—অরূপ বলবে 'না'। শ্রীদত্ত যখন তৃতীয় পথের স্বপ্ন দেখবেন অরূপ অনিবার্যভাবে এগোবে অন্য পথে। তাকে ফেরাবার কি আর কোন রাস্তা নেই?

ঋতা রায়
কলকাতা

॥ ২ ॥

শ্রীযুক্ত তরুণ দত্তর মূল্যবান ও সময়োপযোগী রচনাটির জন্য আপনাদের এবং লেখককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা না বলে থাকতে পারছি না।

বর্তমানে আমাদের সমাজের দেহ যে রাজনৈতিক জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, সেখানে নকশাল উপদ্রব ঐ জ্বরেরই উপসর্গ মাথার যন্ত্রণাবিশেষ. এখানে ঐ উপসর্গের চিকিৎসা সম্বন্ধে মাথা না ঘামিয়ে আসল রোগ সম্বন্ধে চিন্তা করাটাই বোধ হয় সমীচীন। রোগ যদি দীর্ঘদিন দেহে পুষে রাখা যায় তবে, উপসর্গের রূপ পাল্টায়। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যেমন হঠাৎই নকশালপন্থীদের আবির্ভাব, আবার তা জন-সমর্থন না পেয়ে একদিন নিশ্চিহ্ন হবেই; কিন্তু আবার কোন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিপ্লববাদী তরুণ গোষ্ঠী আমাদের সাধারণ নাগরিক জীবনে অশান্তি ডেকে আনবে। নকশালপন্থীদের সৃষ্টি হল কেন? বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিই তার জন্য ...য়ী। ওরা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে. ও... অনিবার্য ছিল। আর তাছাড়া অনেক র... ...তিক দল, প্রায় সব দলগুলিই বলা চলে ... প্রকাশ্যে কখনো বা গোপনে আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত। অবশ্য তাদের বক্তব্য—"অনেক সময় আত্মরক্ষার্থে আমরা হিংসাত্মক কার্যকলাপে বাধ্য হই।"

এখানে গোর্কী ও টলস্টয়ের সংলাপের উদ্ধৃতি বোধ করি অপ্রাসংগিক হবে না। গোর্কী বলেছিলেন, "যে সব সক্রিয় লোক জীবনের অন্যায়কে যে কোন উপায়ে, এমন কি হিংসার দ্বারাও প্রতিরোধ করতে চান, তাঁদের আমি পছন্দ করি।" টলস্টয় উত্তরে বলেছেন—"কিন্তু হিংসাটাই যে সব চেয়ে বড় অন্যায়। তুমি এই স্বতঃ-বিরোধিতার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পাবে?"

মঞ্জুশ্রী ঘোষ
বারুইপুর

অঘটন ঘটন পটিয়সী

দেশ ...দন সংখ্যায় শ্রীচিরঞ্জীব-এর লেখা অঘটন ঘটন পটিয়সী পড়লাম। শ্রীচিরঞ্জীব শ্রীমতী শান্তি ঘোষ সম্বন্ধে লিখেছেন। লিখতে গিয়ে ঢাকুরিয়ার অন্যতম প্রাচীন সঙ্ঘ অগ্রদূত সম্বন্ধে কিছু ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন।

শ্রীমতী শান্তি ঘোষের খেলা শেখার আগ্রহের জন্য সঙ্ঘে মহিলা সদস্য নেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন পরিচালক সমিতি তাঁকে সদস্য করে নেন। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়রা তাঁকে দিনের পর দিন practice দিয়েছেন। এরকম বহুদিন গিয়েছে যখন তিনি Board-এর একদিকে Bat ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন (ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে নয়) ঘন্টার পর ঘন্টা অন্যদিকের খেলোয়াড় খালি বদল হয়েছে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন পরিচালক সমিতি অনেক সদস্যের মতামত উপেক্ষা করে সঙ্ঘের নিয়মাবলী পরিবর্তন করে তাঁকে খেলার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন, যেমন সকালে খেলার, ছুটির দিনে সারাদিন খেলার। যার ফলে সঙ্ঘের বহু সদস্য সঙ্ঘ ছেড়ে চলে যায়—এই অভিযোগ রেখে যে পরিচালক সমিতি পক্ষপাতদুষ্ট, অন্যান্য সদস্যদের উপেক্ষা করে মহিলা সদস্যকে favour করছেন। এই অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সেটা face করতে হয়েছে পরিচালক সমিতিকে—শ্রীমতী শান্তি দেবীকে নয়। শ্রীমতী শান্তি দেবীর খেলার উন্নতির মূলে অগ্রদূত সঙ্ঘের দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। "অগ্রদূতে" খেলার এই অপর্যাপ্ত সুযোগ না থাকলে বাংলাদেশের বহু সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের মত তাঁরও প্রতিভার অঙ্কুরেই বিনাশ হত।

সাধারণত দেখা যায় যখনই কেউ কোন কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, তখনই তাঁর জবানীতে জানা যায় যে, অতীতে বহু কৃচ্ছ্র সাধন তাঁকে করতে হয়েছে।

শ্রীমতী শান্তি ঘোষের কাছে আজ আমাদের সঙ্ঘ নিন্দা ও উপেক্ষার পাত্র হলেও আমরা আনন্দিত এই জন্য যে, আমাদের সঙ্ঘের একজন প্রাক্তন সদস্যা আজ বাংলাদেশের অন্যতম নামী মহিলা টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। তাঁর খেলার আরও উন্নতি হোক আমরা এই কামনা করি।

সুনীল দত্ত
সম্পাদক—অগ্রদূত

লেখকের বক্তব্য

শ্রীমতী শান্তি ঘোষ আমার সঙ্গে আলোচনাকালে কখনও 'অগ্রদূত'কে হেয় করেননি, ওই ক্লাবের পরিচালকবর্গকে... নয়। বলেছিলেন একজন মহিলার ... অনুকূল পরিবেশ ছিল না।

চির...

ভারতীয় উপন্যাস

২৪শে পৌষ ১৩৭৭ সংখ্যার 'দেশ'-এ 'সাহিত্য-সংবাদ' বিভাগে 'ভারতীয়-উপন্যাস' শীর্ষক সমালোচনাটির তৃতীয় কলমের প্রথম পংক্তিটির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

তাঁর তৃতীয় কলমে প্রথম পংক্তি—"শিশুপালের একশত দোষের মতন রমণীদেরও এক সহস্র দোষ অনায়াসে ক্ষমা করা যায়, অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি।" ......এ আবার কেমনতর বিশ্বাস?...... "Weaker sex is the stranger sex now-a-days." প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কি সেই একই বিশ্বাস (নাকি complex)! প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে?

বিংশশতাব্দীর এই সমানাধিকারের যুগে যেখানে 'রমণী' এগিয়ে চলেছে দুর্বারগতিতে নানাক্ষেত্রে, সেই রমণী শাসিত দেশেরই নাগরিক এবং অত্যাধুনিক ও উদারপন্থী সমালোচক এখন পর্যন্ত সপ্তদশ শতাব্দীর পুরুষদের মতন রমণীদের সহস্রদোষ ক্ষমা করবার মনোবৃত্তিই ছাড়তে পারলেন না?

কথা হচ্ছিল 'রমণী'—সেই রমণী যাঁকে নাকি 'দেবা ন জানন্তি'? তাঁর

সম্পর্কে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যতই সুদৃঢ় সংকল্পে পৌঁছে যান না কেন, কোন্ এক অখ্যাত—অপরিচিত গোষ্ঠী দেশ পাঠের বিবেচনাহীন মন্তব্যে সমালোচক হিসেবে তিনি গোটা রমণী জগতের সকর্ণ-আকর্ষণ করে কোন সুবিবেচনার পরিচয় দিলেন? 'খবরে পড়া' সমালোচকের ধারণায় যখন বোম্বাই-এ অধিবেশিত 'ভারতীয় উপন্যাস' বৈঠকীর 'সিম্-পোসিয়ামের তিন ব্যক্তিরই এক 'রা' ছিল; তিনের মধ্যে একটি তথাকথিত 'রমণী'! মেজরিটির পুরুষজাতকে শক্তে বোলবার স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা করে দিয়ে শিশুপালের পাল্লায় তিনি শিশুসুলভ অনায়াসেই পাঠালেন রমণীটিকে? ক্ষমা করায় কি এতই আত্মতৃপ্তি আর মাহাত্ম্য? আহা!

এমন 'মাহাত্ম্য' যদি বা আইনশাস্ত্রে ঠাঁই পেত। মনে রাখা উচিৎ যে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দেওয়াটা মারাত্মক অন্যায়, আর সে অন্যায়ের আবার ক্ষমা হয় না।

যাইহোক, পুরুষের এমন অযথা ক্ষমার প্রত্যাশী না হতে পারার দুর্ভাগ্যে না হয় জননীদেরকে বাদ—যে বৃহৎ পাঠক জগৎ তাঁর লেখার প্রতি আস্থাবান, সে জগতের অর্ধেকের প্রতি তিনি এ হেন অনাস্থা স্থাপন করলে তাঁদের, উভয়পক্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ 'একে অন্যের পারস্পরিক' সম্বন্ধটা কেমন করে বজায় থাকবে?

তাঁর গুণমুগ্ধ অতএব শুভার্থী হিসেবে সকুণ্ঠ একটি প্রশ্ন রাখি—খ্যাতিমান শ্রীসনাতন পাঠকের এ জাতীয় সংকীর্ণতা আর পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব জাহির করে সমালোচকের ধর্মনিষ্ঠার পদস্খলন কি শোভা পায়?... খ্যাতি অর্জন তো [illegible] লেখকীয় খ্যাতিকে ধরে রাখা।

সর্বশেষে জানাই, আমার নিজেরই খুব আশ্চর্য লাগছে—এক শক্তিশালী লেখনীর বিরুদ্ধে (নাকি স্বপক্ষে?) আমার দুর্বল লেখনী আজ দাঁড়াতে সক্ষম হল বলে! কোনদিন তা ভাবিনি। ওঁর লেখা আর সমালোচনা পড়ে নিজেকেই ভালো লাগায় পুলকিত হয়ে চেয়েছি—অভিনন্দন জানাতে মন চেয়েছে তবু হাত সরেনি। হয়তো 'দেশের' উন্মুক্ত পরিবেশে আপন অস্তিত্ব জানান দিতে রুচি হয়নি অথবা, সাহসে কুলোয়নি। কিন্তু শক্তিমান-ধৃতিমানের এইসব অনায়াস ভঙ্গির দুর্বল রুচি-বিচ্যুতিতে যে দুঃখ—সেই অপরিমেয় দুঃখই হয়তো আমাকে অজান্তে আজ লেখনী ধরতে সাহস দিল।

......এই প্রতিবাদকে নিছক রমণী-কুলের অপবাদে 'আঁতে-ঘা-লাগা' আখ্যা দেওয়া হয়তো ঠিক হবে না—কেননা, রাম-শ্যাম, যদু-মধুও তো আকছারই করে থাকে, কিন্তু তা বলে সনাতন পাঠক?

শ্রীমতী নিবেদিতা পট্টনায়ক-
বম্বে

একটি প্রকাশিত কবিতা

৯।১।৭১ তারিখের দেশে প্রকাশিত শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'মুখপুড়ী ও গিয়াসুদ্দিন' কবিতাটি ইতিপূর্বে শিলচরের ব্রহ্মস্পর্শের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উড়ো-পাখী' নামক মিনি পত্রিকায় বেরিয়েছে। এই কবিতার পুনর্মুদ্রণ দেশ পত্রিকার পক্ষে অসম্মানজনক হল না কি? আমরাই বা পয়সা খরচ করে পত্রিকা কিনে পুরনো লেখা পড়বো কেন?

মীরা দেবরায়
কাছাড়

নাম বিভ্রাট

দেশ পত্রিকায় একজন লেখক হিসেবে আমি এই বিভাগের মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকা-দের কাছে একটি কথা জানাতে চাই। চিঠি পত্রে বা মৌখিকভাবে আমাকে প্রায়ই এমন দু' একটি বই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যেগুলি আমার লেখা নয়। লেখকের নাম প্রায় একই রকম হওয়ার জন্য বিভ্রান্তি ঘটে। আমি পুনরায় এ কথাটি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে আমি নামের আগে কোনোদিন শ্রী লিখিনা কিংবা মাঝখানে কুমার বসাই না। অর্থাৎ শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আমার নাম নয়। নিজের লেখার নানান অক্ষমতা নিয়েই আমি লজ্জিত, অপর কারুর লেখার নিন্দা বা প্রশংসা আমার একেবারেই প্রাপ্য নয়।

বিনীত
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত্য সমালোচনার ধারা বাংলায় হঠাৎ কেন বন্ধ হয়ে গেল কে জানে? সমালোচনা সাহিত্যে যেহেতু নিষ্ঠা, সমদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য ঠিক ঠিক পরিমাণে থাকা দরকার এবং ব্যাপারটি অনুশীলন সাপেক্ষ, সেই হেতু আশা করা যায় যে সাহিত্যের কিছুটা অগ্রগতি হলেই তবে সাহিত্যের এই শাখাটি শক্তিমান হয়ে ওঠে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্য খুব উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখের কথা পুনর্বার বলে লাভ নেই।

আজকাল কোনো কোনো পত্র পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার একটা বিভাগ থাকে বটে, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধ বা সাম্প্রতিক সাহিত্যের বিশ্লেষণ তো চোখেই পড়ে না। অথচ সাহিত্য বিষয়ে উদ্দীপনার তো অভাব নেই। আজকাল সাহিত্যের নামে অনেকগুলো পুরস্কার আছে, কিন্তু লেখকের সাহিত্যকর্মের শিরোপা তো বিদগ্ধ সমালোচকের স্বীকৃতি। অবশ্য পাঠকের চিত্ত জয় করাও এক প্রকারের সম্মান বটে, কিন্তু একথাও সবাই জানে যে পাঠকের চিত্তজয়কারী উপন্যাস সবসময় সুসাহিত্য নয়।

মোটামুটিভাবে এখনকার সাহিত্যের আবহাওয়াটা খুব স্বাস্থ্যকর নয়। বড় বেশী চাঁচামেচি, বড় বেশী বিজ্ঞাপন—অসাড় বইয়েরই আধিক্য বেশী এবং পাঠকের রুচিও যে খানিকটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে লেখকরাই পাঠকদের রুচি তৈরি করবে, না পাঠকের রুচি অনুযায়ীই সাহিত্য রচিত হবে—সেও এক জটিল প্রশ্ন। মনে হয়, দুটোই কিছু কিছু সত্য। যে লেখা পাঠকেরা পড়তে চায় না, সে রকম লেখা কি কোনো লেখক অনবরত লিখে যেতে পারে? উদাহরণ হিসেবে আমি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' বইটির কথা বলি। সতীনাথ ভাদুড়ীর এই গ্রন্থটিকে আমি বাংলা ভাষায় এক বিস্ময়কর রচনা বলে মনে করি। দুটি খণ্ডে বইটি লেখা। এটি সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রিয় গ্রন্থ এবং এর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। এতেও তিনি খুশী হননি, ইচ্ছে ছিল পরবর্তী সংস্করণে বইটির আদ্যোপান্ত সংস্কার করবেন এবং আর একটি খণ্ড লিখবেন। তা কিছুই হয়নি। কেন? অমন একটা মহৎ বই পাঠকরা সমাদর করেনি। সতীনাথ ভাদুড়ী অন্যত্র দুঃখ করে বলেছিলেন, কি আর হবে ও নিয়ে লিখে! প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী কোনোদিন টাকা পয়সা উপার্জনের জন্য লেখেননি।

ছোটখাটো পত্র পত্রিকায়, এবং নানা ধরনের কাগজে মাঝে মাঝে কিছু কিছু সাহিত্য সমালোচনা চোখে পড়ে। সেগুলোর কয়েকটি বাঁধাধরা বৈশিষ্ট্য কিছুতেই নজর এড়ায় না। যেমন এক পত্রিকার লেখক অন্য পত্রিকাকে হেয় করবেন। এক দল অন্য দলকে নস্যাৎ করবেন। পুরো বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কারুরই নজর নেই, সকলেই শুধু একটি বা দুটি খোপের দিকে পক্ষপাতদুষ্ট।

আমরা আশা করি না যে, সমালোচক হবেন নিরপেক্ষ, কিন্তু প্রকৃত নিরপেক্ষ সমালোচক সত্যিই দুর্লভ। আমরা আরও আশা করি যে সমালোচক কোনো লেখকের ব্যক্তিগত দোষগুণের কথা না তুলে তাঁর সাহিত্যের কথাই শুধু বলবেন—কিন্তু সেরকম তাও প্রায়ই হয় না। সমালোচকের নিজস্ব রুচি-অরুচির প্রশ্ন থাকবেই। কিন্তু একটি সাধারণ মানদণ্ড থাকা দরকার—সেটি এই, সমালোচনার নামে [illegible] লেখা হবে না। [illegible] মধ্যখান থেকে একটু তুলে বা উপন্যাসের সংলাপের দু'একটি লাইন উদ্ধৃত করে লেখকের সমগ্র জীবন দর্শন প্রমাণ করার চেষ্টা প্রায়ই চোখে পড়ে।

আর এক রকমের অনাচার আছে। কোনো একজন লেখককে খারাপ প্রমাণ করার জন্য এক ধরনের কৌশল নেওয়া হয়। ধরা যাক একজন লেখক ছ'খানা বই লিখেছেন। তার মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অন্যগুলি তাঁর যথার্থ পরিচয় বহন করে। সেই লেখককে হেয় করার জন্য তার অন্য সব বই সম্পর্কে নীরব থেকে শুধু ঐ দুর্বল বইটি নিয়েই সাড়ম্বরে আলোচনা।

আর একরকমের সমালোচনা আছে, যার মধ্যে ভাতের চেয়ে কাঁকড়ের পরিমাণ বেশী। অর্থাৎ সেই লেখকের রচনা বিশ্লেষণের চেয়ে তিনি কোথায় চাকরি করেন, তিনি জীবনে কখনো কামস্কাটকায় গিয়েছিলেন কিনা এই সব তথ্যের ওপর তাঁর চরিত্র নির্ধারিত হয়। এ ছাড়া আছে রচনার উদ্দেশ্য আবিষ্কার। লেখক কোন মতলবে বইটি লিখেছেন, তাঁকে কেউ নির্দেশ দিয়েছে কিনা তাই নিয়ে অবান্তর কথা। অনেকে সব কিছুর পেছনেই ষড়যন্ত্র দেখেন—সরকার, এস্টাব্লিশমেন্ট, কালোবাজারী ইত্যাদিরা লেখককে নিয়ে যেন ষড়যন্ত্র করছে।

প্রগতিবাদী সমালোচকদের একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে। তাঁদের চোখে যে লেখক পার্টি মেম্বার নন, তিনি কখনো ভালো লেখক হতে পারেন না। মানবতাবাদী সাহিত্যও তাদের কাছে যথেষ্ট নয়, দরকার সুস্পষ্ট পার্টি লাইন। এমন কি যে লেখক কোনো রাজনৈতিক দলেরই সদস্য নন, যিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চান, যাঁর রচনায় কোনো রাজনৈতিক মতবাদকেই আক্রমণ করা হয়নি—যিনি সাধারণভাবে মানুষের দুঃখ দুর্দশার থেকে মুক্তির কথা লেখেন, তিনিও স্বীকৃতি পাবেন না কারণ প্রত্যক্ষভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সমর্থক না হলেই প্রতিক্রিয়াশীল হলো। পার্টির বাইরের এইসব লেখক যদি জনপ্রিয় হন, যদি পাঠকদের মধ্যে তাঁর একটা প্রভাব দেখা যায়, তখন পত্রিকাগুলিতে প্রচার চালানো হয় সেই লেখকের বিরুদ্ধে।

আর এক রকমের একদেশদর্শিতা আছে। অনেকে হা-হুতাশ করেন যে গ্রামের মানুষদের নিয়ে আজকাল ভালো লেখা হয় না। এবং বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর মানিকের প্রশংসা করে বলেন, [illegible] পাদপ্রদীপের [illegible] লেখকরা শহুরে মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা [illegible] লেখেন না কেন? ব্যাপারটি ভারী মজার! যাঁরা ঐ বিষয়ে লেখেন না, তাঁদেরই আক্রমণ। কিন্তু কেউ কেউ তো ঐ সব বিষয় নিয়েও লেখেন, তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা থাকে না কেন? অনেক ছোটখাটো পত্র পত্রিকায়, রাজনৈতিক দলের পত্রিকায় তো এরকম রচনা থাকে, সেগুলো কেন জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছচ্ছে না, তার বিশ্লেষণ কি থাকা উচিত নয়?

কোনো একটি রচনা ভালোমন্দ এবং কেন ভালো বা কেন মন্দ—তার বিশ্লেষণ বিবরণের নামই সাহিত্য সমালোচনা। এখনকার সমালোচনায় শুধু সেইটুকুই থাকে না, এ ছাড়া অনেক কিছু থাকে।

সনাতন পাঠক

প্রয়াসী। রাশিয়ার জাতীয় জীবনের কথাই এই কবিতায় তথা প্রায় সমগ্র সোভিয়েত কাব্যে অভিব্যক্ত।

উল্লেখযোগ্য, ইংরেজী সাহিত্যে স্পেণ্ডার, অডেন কিংবা ডিলান টমাস যে অর্থে সমাজ সচেতন, রুশ কবিরা সেই অর্থে নন—পরবর্তীরা নতুন সমাজ-রাষ্ট্র-পৃথিবী গড়ে তুলতে সচেষ্ট। কবিত্বের চেয়ে সমাজ-সংস্কার ও জাতীয় কর্তব্য পালনের দিকেই তাঁদের ঝোঁক। তাই এঁদের মধ্যে সহজ উপায়ে কবি-নামধারী অনেক অকবিকে আবিষ্কার করাও কঠিন নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মুক্তির মন্ত্র গেয়ে শোষণহীন সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার আশায় জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করার মত শ্রদ্ধেয়-পবিত্র-মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কবিতার মত সূক্ষ্ম ব্যাপারকে এঁরা ভর করলেন কেন? এতে তো দুয়েরই হানি অবশ্যম্ভাবী!

এখানে সোভিয়েত কবিতার বিশদ আলোচনা বা সাহিত্যিক বিচার-বিশ্লেষণ আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামান্য বাদ সাধতে বাধ্য হচ্ছি আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকায় সংকলকের নির্ধারিত কবিতার সংজ্ঞা পাঠ করে: "Poetry means hope"—আমি বলি, কবিতা যদি হয় জীবনের শৈল্পিক রূপ, এবং যেহেতু আশা-হতাশার সংঘাতেই জীবন প্রবহমান, তখন আশা-হতাশা দুই-ই কবিতার উপজীব্য হতে পারে, যদিও শৈল্পিক উত্তরণ উভয়েরই প্রাথমিক জরুরী শর্ত। আর আপেক্ষিক বিচারে, হতাশা-ব্যর্থতা-নৈরাশ্যসঞ্জাত ব্যথা-যন্ত্রণা-আর্তনাদ মানব অন্তরে যে গৌণতা ও অকিঞ্চিৎকরত্বের বোধ সৃষ্টি করে, সে তো জীবনের কঠোরতর বাস্তব অভিজ্ঞতা!—বরং আশা ব্যাপারটাই কী খানিকটা বিলাস ও অলীক নয়, যার ফল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার—অজ্ঞাত গর্ভে নিহিত? স্বপ্নাধিত স্বপ্নে বা আত্মপ্রবঞ্চনায় আশা দেখা ও দেখানোর মধ্যে যে বাহাদুরি আছে তা, কিন্তু ভয়-ভাবনাহীন বেপরোয়া খেয়ালী জীবন কী হতে সম্পূর্ণই দ্রুকুটিও বিহীনভাবে উদাসীন নয়? পাওয়া-না-পাওয়া, পারা-না-পারার নিরন্তর দংশন-জ্বালা কী চিরকালীন সত্য নয়? অনেক আশার তুলনায় পাওয়া ও পারার পরিণামটুকু কী জীবনপ্রান্তে এসে নিতান্তই নগণ্য মনে হয় না?—এ-সব প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ সত্যকে, বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, জীবনকে ফাঁকি দেওয়া, সব কিছুর ঊর্ধ্বে আত্মপ্রবঞ্চনা!!—সব সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে আশার গান গেয়ে জনসমর্থন পাওয়ার জন্য কবিতা-সাহিত্য লেখা যেতে পারে, কিন্তু জনসমর্থন পাওয়ার জন্য রচিত সাহিত্য অন্তর-বাইরে অসত্য হয়ে ওঠে, হতে বাধ্য!

পরিশেষে বলা যায়, কবিতার অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার কাছে আলোচ্য গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে মূল্যবান উপহার। অনুবাদের মাধ্যমে কয়েকজন শক্তিমান সোভিয়েত কবির রচনার সাথে পরিচয় লাভ করে পাঠক যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করবেন।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

প্রবন্ধ

ধূর্জটিপ্রসাদ। শ্রীঅলোক রায়। বাগর্থ, ১/৩, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলকাতা-চার। পাঁচ টাকা।

বিশ শতকের প্রথমার্ধের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই একটি স্মরণীয় নাম। আজীবন সারস্বত সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ থেকেও ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যক্তিজীবন এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে সাধারণ বাঙালী পাঠকের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। শ্রীঅলোক রায়ের 'ধূর্জটিপ্রসাদ' গ্রন্থখানি এদিক থেকে আমাদের কৌতূহল নিরসনে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। গ্রন্থখানি মুখ্যত জীবনীমূলক রচনা হলেও এ বইয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যকর্মের নানা দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদের বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন, চাকুরীজীবন, সবুজপত্র-উত্তরা-পরিচয় প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, সঙ্গীত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, কর্মজীবনের নানা সাফল্য, রবীন্দ্রনাথ—ধূর্জটিপ্রসাদ প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর তথ্যের সাহায্য নিয়ে শ্রীরায় গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এ সব তথ্য কেবল ধূর্জটিপ্রসাদের জীবন ও কৃতিত্বের পরিচায়ক হিসেবেই নয়, সমকালিক বঙ্গ-সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবেও যথেষ্ট মূল্যবান। গ্রন্থে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সাহিত্য সংবাদও বিন্যস্ত হয়েছে। 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ এবং এই প্রসঙ্গে 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত নিরুপমা দেবী চৌধুরাণীর পত্র সমালোচনা এবং ধূর্জটিপ্রসাদের আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক রচনা,—এ দুয়ের পুনর্মুদ্রণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এ ছাড়া গ্রন্থশেষে ধূর্জটিপ্রসাদের রচিত গ্রন্থের তালিকা, অসংকলিত রচনাপঞ্জী, ধূর্জটিপ্রসাদবিষয়ক রচনাদি সাহিত্য-গবেষকদের কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। সমকালিক সংস্কৃতি-সেবীর জীবনালোচনার প্রচেষ্টা বর্তমানে ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছে। এদিক থেকে শ্রীরায়ের প্রয়াস সাধুবাদের যোগ্য। তবে আফসোসের কথা হল এই যে, আলোচনাধারা যতটা তথ্য-নির্ভর ততটা সমালোচনামূলক নয়। ফলে পাঠকের প্রত্যাশা গ্রন্থপাঠে ষোল আনা পূরণ হয়নি।

৩/১১/৭০

উপন্যাস

গ্রীষ্ম শীতে অনেক ঋতু। শৌনক গুপ্ত। লেখন, ৩৪।১ বণ্ডেল রোড, কলকাতা-১৯। আট টাকা।

প্রেমের রং মধুরকণ্ঠী। অমিয়া চক্রবর্তী।

রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

উপন্যাসে যাঁরা শুধুই গল্প খোঁজেন তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য, সুখের বিষয়, প্রতিদিনই কিছু না কিছু বই বেরোয়। এই সব উপন্যাসে লেখকের একটাই উদ্দেশ্য থাকে : বেশ জুৎসই একটা গল্প বানানো, তা কতটা সাহিত্য পদবাচ্য হল, আদৌ হল কিনা, সে দিকে নজর দেন না। আলোচ্য উপন্যাস দুটিই সেই রকম মোটা আঁচড়ে আঁকা জীবনের ছবি।

শৌনক গুপ্তের উপন্যাসের নায়ক, মৃণাল, আদর্শবাদী সাংবাদিক। বাবা-মা-বোন নিয়ে তার জীবনে সংঘাত বাধালো বহুকাল পরে ফিরে আসা নিরুদ্দিষ্ট ভাই কুনাল। কুনালের কাঁচা পয়সার উৎস তার পাপ ব্যবসা—একথা জানার পর তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করল, ত্যাগ করল বাবা-মা-বোন এবং মৃণালও। মৃণালের নিজের প্রেমিকার শেষ মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়াতে ভোলেনি। পাপের পথ পরিত্যাজ্য—এ রকম একটা কথা লেখক বলতে চেয়েছিলেন। বলতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। তবে বহু পাতা লেগেছে।

অমিয়া চক্রবর্তীর নায়িকা সুরঙ্গমা স্বামী শুভেন্দুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির দুঃখ ভুলতে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। বিদেশে একা মেয়ে, ফলে বহু জল ঘোলা হয়েছে। এদিকে শুভেন্দু কি সত্যি ভুলতে পেরেছে স্ত্রীকে? তাও কি হয়! শেষ অধ্যায়ে তাই দেখা গেল জেনেভার হাসপাতালে মানসিক বিপর্যস্ত সুরঙ্গমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শুভেন্দু।

অমিয়া চক্রবর্তীও বেশ সহজে লিখে গেছেন তাঁর গল্প। পড়তে পড়তে মনে হয় সিনেমার গল্প। এত সহজে এত বড় বড় সমস্যার সমাধান জীবনে তো অন্তত দেখি না। ২২১।৭০ ৮২।৭০

শিল্পকথা

বাঘ ও অজন্তা। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। ৬·৫০ টাকা।

মধ্যভারতের তথা সমগ্র ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুহা : বাঘ ও অজন্তা। বাঘ গুহা সাধারণের কাছে অজন্তার মত অতি পরিচিত শিল্পপীঠ নয়; অজন্তা বিষয়ে ইতস্তত আলোচনা দেখা যায় বটে কিন্তু তা অজন্তার শিল্পকর্মের রসাস্বাদনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় এই অভাব লক্ষ করেছিলেন, বছর পনের আগে 'বাঘ ও অজন্তা' নামে তাঁর রচিত ছোট পুস্তিকাটি এই অভাব মোচনের ছিল প্রথম ধাপ। বর্তমান গ্রন্থটি সেই পুস্তিকাটির পরিমার্জিত পরিবর্ধিত ও প্রায়-নতুন রূপ।

লেখকের শিল্পদৃষ্টি একদিকে যেমন বাঘ গুহার শিল্পকর্মকে বিশ্লেষণী আলোয় উজ্জ্বল করে তুলেছে, অন্য দিকে শিল্পী লেখকের সাবলীল তুলি ও কলমে অজন্তার গুহাচিত্র চমৎকার ধরা পড়েছে। এই গ্রন্থটি একদিক থেকে সুন্দর একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণকাহিনীও বলা যায়। ১৩৭।৭০

সঙ্গীত

ভজনমালা। শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার। গ্রন্থ প্রচার—২০-এ গোবিন্দ সেন লেন, কলকাতা-১২। ৪·০০ টাকা।

গান্ধীজীর জন্মদিবসে গাইবার উপযোগী দু-একটি গান ও তাঁর প্রিয় বেশ কয়েকটি রামধুন এবং চরখা-প্রণাম বিষয়ে একটি ভজন এই গ্রন্থে সংকলিত। স্বরলিপি শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদারেরই কৃত। শ্রীমতী ঘোষ দস্তিদার সঙ্গীতজগতে সুপরিচিতা। এমন একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে সঙ্গীত-প্রেমিকদের প্রশংসা ও সমাদর পাবেন। ৩১৯।৬৯

প্রাপ্তি স্বীকার

আহত উড়ন্ত বলাকা। সূর্যসারথী। শ্রীনন্দী গুহ : ১৬৬ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

রাজনৈতিক প্রস্তাব। বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি : ৪৪/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ০·২৫ পয়সা।

দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর। মনোজ দত্ত। সেকাল একাল : ১৮বি টেমার লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০।

সজনে নির্জনে অর্গস। অরুণাভ দাশগুপ্ত। কবিপত্র প্রকাশভবন : ২২বি প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ২·০০।

সাহেবের বউ। উমা গঙ্গোপাধ্যায়। মণ্ডল প্রেস : ২৩ ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৪·০০।

বৈজ্ঞবীয় নিবন্ধ। শ্রীসুকুমার সেন। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৫·০০।

টেবল টেনিসের আইন কানুন

রেফারি, আম্পায়ার, লাইনজাজ এবং স্ট্রোক কাউন্টার-এর নিজ নিজ কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন আগের সপ্তাহের জের টেনে স্কোর বলার প্রথা ও রীতি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

কোন ত্রুটির জন্য আম্পায়ার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন সাধারণত তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। এবং একটি র‍্যালি শেষ হবার পর স্কোর ঘোষণা করা ছাড়া কোন কথা বলারও দরকার করে না। তবে নীচের লেখা কারণে পয়েন্ট হলে আম্পায়ার প্রথমে কারণ উল্লেখ করে পরে স্কোর ঘোষণা করবেন। যেমন :—

১। ঠিকভাবে সার্ভিস করা হয়নি অর্থাৎ সার্ভিসে ত্রুটি হয়েছে— **ফল্ট**

২। খেলোয়াড় নেট স্পর্শ করেছেন বা তার পোশাক পরিচ্ছদ কিংবা র‍্যাকেট নেট স্পর্শ করেছে— **'টাচড নেট'**

৩। প্লেয়িং সারফেসে নাড়া লেগেছে— **মুভড টেবল**

৪। যে হাতে র‍্যাকেট ধরা নেই—(ফ্রি হ্যান্ড) সেই হাত টেবল স্পর্শ করেছে— **'হ্যান্ড অন টেবল'**

৫। বল অপর কোর্টে না পড়েও খেলোয়াড়ের সংস্পর্শে এসেছে— **'ওভার টেবল'**

৬। বল ভলি মারা হয়েছে— **'ভলি'**

৭। একই কোর্টে বল দুইবার বাউন্স করেছে— **'নট আপ' অথবা 'ডাবল বাউন্স'**

৮। কোনো খেলোয়াড় দুইবার বল স্ট্রাইক করেছেন— **'ডাবল হিট'**

৯। ডাবলস বা মিক্সড ডাবলসের খেলায় যে খেলোয়াড়ের বল মারার পালা নয় সেই খেলোয়াড় বল মেরেছেন— **'রং প্লেয়ার'**

যদি কোনো খেলোয়াড় আম্পায়ারের কোনো সিদ্ধান্তে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন তবে আম্পায়ার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা আইন লঙ্ঘনের কারণ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে পারেন।

'লেট' ডাকার পর প্রতি ক্ষেত্রে তখনকার স্কোর ঘোষণা করা দরকার। যদিও প্রতি

ফ্রি হ্যান্ড টেবলে লাগলে বলতে হবে 'হ্যান্ড অন টেবল' আর হাত দিয়ে টেবল নাড়ালে 'মুভড টেবল'

র‍্যালির পর স্কোর ঘোষণা করা হয় তবু 'লেট' ডাকার পর এই জন্যই আবার স্কোর বলতে হয় যে, খেলোয়াড় তথা দর্শক বুঝতে পারেন কোনো পয়েন্ট যোগ হয়নি। তাছাড়া র‍্যালির পরে ঘোষণা করা স্কোর কেউ যদি শুনতে না পেয়ে থাকেন 'লেট'-এর পরের ঘোষণা তাদের খেলার অবস্থা জানার পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

প্রাক-ঘোষণা

খেলা আরম্ভের আগে খেলোয়াড়দের দর্শক সমক্ষে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সাধারণ রীতি। প্রতি খেলা আরম্ভের আগে আম্পায়ার খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করবেন। তারা কোন্ প্রতিযোগিতার কোন্ রাউন্ডে খেলছেন এবং কটি গেমে ম্যাচের মীমাংসা হবে তাও ঘোষণা করবেন। দর্শকদের বোঝার সুবিধার জন্য প্রয়োজন বোধ করলে আম্পায়ার খেলোয়াড়দের বিশেষত্বও বলে দেবেন। অর্থাৎ কেউ যদি বাঁ হাতের খেলোয়াড় হন এবং কারো যদি বিশেষ পরিচয় থাকে তাও জানিয়ে দেবেন। দুই-জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বা ডাবলসের খেলায় ৪ জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এটা জানা থাকলে দর্শকদের পক্ষে পার্থক্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। গেম আরম্ভের আগে কে প্রথম সার্ভিস করেছেন তাও ঘোষণা করা দরকার। গেম আরম্ভের সময় স্কোর বলতে হবে 'জীরো-জীরো' কিংবা 'লাভ-অল'। প্রতি গেমের শেষে স্কোর বলতে হবে। অর্থাৎ কত পয়েন্টে কে গেম জিতলে তা ঘোষণা করতে হবে এবং ম্যাচের শেষে ঘোষণা করতে হবে সামগ্রিক ফলাফল।

দলগত প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় ও জুটির নাম ঘোষণার আগে দলের নাম ঘোষণা করা উচিত। খেলোয়াড়দের নাম পরে ঘোষিত হবে। দলগত প্রতিযোগিতার অবস্থা বোঝাবার ব্যাপারে যেখানে ত কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে প্রতি খেলার আগে ও পরে আম্পায়ার অবস্থাটা দর্শকদের বুঝিয়ে দেবেন। অর্থাৎ কোন দল কটি খেলায় হেরেছে এবং জিতেছে এবং বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে তা ঘোষণা করবেন।

—মুকুল

প্রায় তিন মাস ধরে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সফরের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ক্রিকেট দল ১ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই থেকে জামাইকা যাত্রা করছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতের এটি তৃতীয় ক্রিকেট সফর। আর টেস্ট খেলার হিসাবে দুই দেশের ষষ্ঠ টেস্ট সিরিজ। কেননা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট দলও এর আগে তিনবার ভারত সফর করে গেছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল প্রথম ভারতে এসেছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে জন গডার্ডের নেতৃত্বে। দ্বিতীয়বার ১৯৫৮-৫৯ সালে। এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ছিলেন ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডার। গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে তৃতীয় এবং শেষবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারত সফর করে গেছে ১৯৬৬-৬৭ সালে। ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করেছে ১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৬২ সালে। প্রথমবার ভারতের অধিনায়ক ছিলেন পলি উমরিগর, দ্বিতীয়বার নরী কণ্ট্রাক্টর। কণ্ট্রাক্টর অবশ্য আহত হওয়ায় মাত্র দুটি টেস্টের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। তারপর বাকি ৩টি টেস্ট ভারতের নেতৃত্বের ভার পড়েছিল সহ-অধিনায়ক পাতৌদির নবাব মনসুর আলী খাঁয়ের উপর। পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক হিসাবে পাতৌদি তখন থেকে ভারতের ক্রিকেট-তরণীর যে হাল ধরেছিলেন এবার সেই হাল ছাড়লেন। কিংবা বলা যেতে পারে, তাঁর হাত থেকে হাল কেড়ে নেওয়া হল।

১৯৬২ সালে নরী কণ্ট্রাক্টরের আহত হবার ঘটনা ক্রিকেটের এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুটি টেস্ট খেলায় পরাজয়ের পর বারবাডোজের সঙ্গে খেলার সময় ফাস্ট বোলার চার্লি গ্রিফিথের বলের আঘাতে কণ্ট্রাক্টরের মাথার খুলি ফেটে যায়। জীবন-সংশয় অবস্থায় তাঁকে তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অপারেশনের পর কণ্ট্রাক্টরকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলে। শেষ পর্যন্ত কণ্ট্রাক্টর জীবনে বেঁচে গেলেও ওখানেই তাঁর ক্রিকেট-জীবনের মৃত্যু ঘটে।

যাই হোক, দীর্ঘ ৮ বছর পরে ভারত আবার ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সফর করতে যাচ্ছে— যে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের খেলোয়াড়রা আধুনিক ক্রিকেটের প্রাণহীন পাষণগাত্রে এনেছিল ঘুম-ভাঙ্গা ঝরনার গান। শ্মশানগামী মৃতকল্প ক্রিকেটকে যারা স্পন্দিত করেছিল তাদের দুর্বার জীবনের গতিময় ছন্দে। সত্য বটে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় আজ আগের বর্ণালীসুষমা নেই। তবু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হচ্ছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। খেলার মাঠ যাদের কাছে রণক্ষেত্র নয়— আনন্দের অঙ্গন। তাদের ক্রিকেট স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার পাথায় নিরন্তর আবর্তিত, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

জয়ের ঘরে শূন্য

তবু প্রশ্ন জাগে, বেশির ভাগ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া ভারতের ক্রিকেট দল পারবে নাকি অন্তত একটি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করতে? দুই দেশের টেস্ট ফলাফলের হিসাবের অঙ্ক থেকে জয়ের ঘরের শূন্য মুছে দিতে?

ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-নিউজিল্যাণ্ড-পাকিস্তান-ভারত—এই ছয় দেশকে

নিয়ে ক্রিকেট টেস্ট-চক্রের যে ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ তার মধ্যে 'ভারতনাট্যের' গৌরব কম নয়। ব্যাট-বলের বড় মঞ্চে বিজয়মুহূর্তের নাটকীয় সংঘাতও অনস্বীকার্য। অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান—চারটি দেশকেই টেস্ট-মঞ্চে ভারতের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। শেষের তিনটি দেশের বিরুদ্ধে রাবার লাভেরও গৌরব আছে। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে আজও ভারত কোন টেস্ট জিততে পারেনি। যদিও টেস্ট খেলার সামগ্রিক ফলাফলে সাফল্যের তুলনায় ভারতের ব্যর্থতার গ্লানিই বেশী, তবু সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার বোঝা ওই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে টেস্ট খেলায়। পাঁচটি সিরিজে অনুষ্ঠিত ২৩টি টেস্ট খেলার মধ্যে একটি খেলাতেও ভারত জিততে পারেনি, ১২টিতে হার স্বীকার করেছে, ১১টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। ১২টি পরাজয়ের মধ্যে বিগত সফরে পরাজয় পাঁচটি টেস্টেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন উঠেছে, স্বদেশের মাটিতে অধিনায়ক হিসাবে লালা অমরনাথ, পলি উমরিগর, গোলাম আমেদ, বিনু মানকড়, হেমু অধিকারী এবং পাতৌদি যে সাফল্য অর্জন করতে পারেননি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে যে সাফল্য অর্জন করতে পারেননি বিজয় হাজারে, নরী কণ্ট্রাক্টর বা পাতৌদির নবাব মনসুর আলী, তরুণ অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকর কি পারবেন সেই সাফল্য অর্জন করতে? নাকি এবারও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের ঘরে শূন্যের কলঙ্ক-চিহ্নই বজায় থাকবে?

কত শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ?

আগেই বলেছি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের উদ্দাম গতিতে এখন ভাটার টান। কল্লোল-তোলা কালিপসো সুরে আজ বেশ কিছুটা বিষাদরাগিণীর সংমিশ্রণ। ওরেল-উইকস, ওয়ালকট, রামাধীন, ভ্যালেন্টাইন, ক্রিশ্চিয়ানী প্রভৃতি খেলোয়াড়, যাঁরা ক্রিকেটের সবুজ প্রান্তরে বিস্ময়ের শিহরন জাগিয়েছিলেন তাঁদের কথা বলব না। অনেক আগেই তাঁরা ক্রিকেট-রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে গিয়েছেন। কিন্তু এই সেদিনও যাঁরা ছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম সারির খেলোয়াড় তাঁরাও আস্তে আস্তে সরে গেছেন। কনরড হাণ্ট, বেসিল বুচার, সেমুর নার্সের মত ব্যাটসম্যান অবসর নিয়েছেন। ডেভিড হলফোর্ড সম্পর্কেও উচ্চবাচ্য নেই। সম্ভবত তাঁকেও টেস্ট টিমে দেখা যাবে না। স্পিন বোলিং-এর যাদুকর ল্যান্স গিবসেরও গৌরবের দিন অস্তমিত। পরম নির্ভরযোগ্য উইকেট কিপার এবং বিপদকাণ্ডারী ব্যাটসম্যান জ্যাকি হেনড্রিকসও ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। দ্বিতীয় উইকেট কিপার ডেরিক মারেরও বিশেষ নাম শোনা যাচ্ছে না। তা ছাড়া হল, গ্রিফিথ বা গিলক্রিস্টের মত ফাস্ট বোলার তো নেই-ই। এই অবস্থায় বহু নতুন খেলোয়াড় নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে টেস্ট-যুদ্ধে ভারতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। অন্য কোনো দেশের সামনে এ সমস্যা খুব বড় হয়েই ফুটে উঠত। কিন্তু আগেই বলেছি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট প্রতিভার পাথায় নিরন্তর আবর্তিত। সেখানে নিত্য নতুনের আবির্ভাব।

১৯৫২-৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতের ৪টি টেস্ট ড্র হবার পর অনেকেই মনে করেছিলেন ওদের ক্রিকেট এবার ভাটার টান দেবে। কেননা উইকস, ওয়ালকট, স্টলমেয়ার, রামাধীন, ভ্যালেন্টাইন, গেরি গোমেজ, রবার্ট ক্রিশ্চিয়ানীর মত প্রথম সারির খেলোয়াড়রা তখন অবসর নিয়ে-ছিলেন। কিন্তু নতুন মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন হাণ্ট, হোল্ট, সোবার্স, কানহাই, আলেকজাণ্ডার, বুচার, গিবস, হল, গিলক্রিস্ট, সলোমন, হেনড্রিকসের মত সব

খেলোয়াড়। এবার কাঁরা দেখা দেবেন?

খ্যাতনামাদের মধ্যে সোবার্স, কানহাই ও লয়েড তো আছেনই। নতুনদের মধ্যে দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান ন্যাটা রয় ফ্রেডারিক এবং স্টেড কামাচো ইংলন্ডে টেস্ট খেলেছেন। দুজনেই গায়নার খেলোয়াড়। ত্রিনিদাদের অসকার ডিউরুটি এবং গায়ানার চাইবার্ট অ্যাডামস এবং জামাইকার লরেন্স রো'র ব্যাটসম্যান হিসাবে উঠতি নাম। ভারতীয় বংশসম্ভূত 'পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জের' অধিবাসী কানহাই, রামাধীন এবং চারণ সিং-এর মতই গায়নার আলভিন কালীচরণ খ্যাতিমান উঠতি খেলোয়াড়। ত্রিনিদাদের জো কারু ও টেস্ট-অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন ব্যাটের বিক্রমে। ১৯৬৯-৭০-এর মরসুমে ত্রিনিদাদের পক্ষে ৪৭·১৬ রানের অ্যাভারেজে ৬ ইনিংসে ক্যারু করেছেন ৫২৩ রান। প্রয়োজনে ডেভিড হলফোর্ড এবং ইস্টন ম্যাকমরিসের ডাক পড়তে পারে।

ওয়েসলি হল বা রয় গিলক্রিস্টের বলের গতিবেগ না থাকলেও বারবাডোজের কীথ বয়েস এবং ভানবার্ন হোল্ডার ভাল সীম বোলার হিসাবেই পরিচিত। জন শেফার্ড এবং গ্রেসন শিলিংফোর্ডেরও ইংলন্ডে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। স্পিন বোলার হিসাবে সোবার্সের সঙ্গে রয়েছেন জামাইকার আর্থার ব্যারেট। আর সোবার্স একাই তো এক শ'। সুতরাং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বর্তমান শক্তিও মোটেই উপেক্ষা করবার নয়।

ভারতীয় দল সম্পর্কে

তবু আমি বলব, ভারতের পক্ষে এই দলকেও পরাজিত করা সম্ভব যদি ভারতের খেলোয়াড়রা অহেতুক ভয় কাটিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে একমন একপ্রাণ হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভয় পাবারও কোনো কারণ নেই। কেননা, যে ফাস্ট-বোলার-ভীতি ভারতীয় ক্রিকেটের চিরদিনের দুর্বলতা, এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজে তেমন 'অগ্নিবর্ষী' বোলারের অভাব।

এর আগে ভারতীয় দল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এ সপ্তাহে আর একটু খতিয়ে দেখা যাক। ভারতীয় দলে রয়েছেন—অজিত ওয়াদেকার (অধিনায়ক, বোম্বাই), এস ভেঙ্কটরাঘবন (সহ-অধিনায়ক, তামিলনাড়ু), এম এল জয়সীমা (হায়দরাবাদ), সেলিম ডুরানি (রাজস্থান), দিলীপ সারদেশাই (বোম্বাই), আবিদ আলী (হায়দরাবাদ), বিষেন সিং বেদী (দিল্লি), ই এ এস প্রসন্ন (মহীশূর), অশোক মানকড় (বোম্বাই), কে জয়ন্তীলাল (হায়দরাবাদ), সুনীল গাভাসকার (বোম্বাই), জি আর বিশ্বনাথ (মহীশূর), ডি গোবিন্দরাজ (হায়দরাবাদ), একনাথ সোলকার (বোম্বাই), রুসি, জিজিবয় (বাংলা—উইকেটকিপার) ও পি কৃষ্ণমূর্তি (হায়দরাবাদ—উইকেটকিপার)।

এঁদের মধ্যে চারজন—সারদেশাই, ডুরানি, জয়সীমা ও প্রসন্ন-এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর করেছেন। ওয়াদেকার, ভেঙ্কটরাঘবন, মানকড় এবং বেদীরও বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সোলকার, বিশ্বনাথ এবং আবিদ আলী টেস্ট খেলেছেন দেশের মাটিতে। দলে নতুন খেলোয়াড় বলতে পাঁচজন—জয়ন্তীলাল, গাভাসকার, গোবিন্দরাজ, কৃষ্ণমূর্তি এবং জিজিবয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চারজনের মধ্যে অফ স্পিনার প্রসন্ন ১৯৬২-তে খেলেছিলেন মাত্র একটি টেস্ট। বল করার সুযোগ পেয়েছিলেন এক ইনিংসে। কারণ, কিংসটনের ওই দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস ও ১৮ রানে ভারতকে পরাজিত করেছিল। প্রসন্ন ১২২ রানে পেয়েছিলেন ৩টি উইকেট। সারদেশাইয়ের তিনটি টেস্টে রান—১৬ : ২; ৩১ : ৬০ ও ০ : ০। চারটি টেস্টে জয়সীমার রান—২৮ : ১১; ৪১ : ০; ১০ : ১৫ ও ৬ : ৬। সেলিম ডুরানি পাঁচটি টেস্টে করেছিলেন ৫৬ : ৭; ১৭ : ০; ৪৮ নঃ আঃ : ৫; ১২ : ১০৪ ও ৬ : ৪ রান। উল্লেখ্য, ওই সফরে ভারতীয়দের মধ্যে দুজন মাত্র একটি করে সেঞ্চুরি করেছিলেন। ডুরানি ১০৪ এবং উমরিগর নট আউট ১৭২। দুটি সেঞ্চুরিই চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে।

যাই হোক, ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও কেউই খুব ভাল খেলতে পারেননি। অবশ্য পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান ফর্ম বিবেচনা করেই এঁদের দলে নেওয়া হয়েছে। অফ স্পিনার প্রসন্ন সম্পর্কে তো প্রশ্নই ওঠে না। এখন পৃথিবীর একজন প্রথম সারির স্পিনার হিসাবেই তাঁর সুনাম। ন্যাটা স্পিনার বিষেন সিং বেদী সম্পর্কেও একই কথা।

যেভাবে দল গড়া হয়েছে তাতে তারুণ্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গাভাসকার, জয়ন্তীলাল, গোবিন্দরাজ, কৃষ্ণমূর্তি—সবাই আগামী দিনের আশা। অশোক মানকড়, গাভাসকার এবং জয়ন্তীলাল তিনজনই ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে সুনামের অধিকারী। ওপেনিং বোলার হিসাবে কাজ চালাতে হবে গোবিন্দরাজ, আবিদ আলী এবং সম্ভবত জয়সীমাকে।

অলরাউন্ডার হিসাবে ডুরানি, সোলকার, আবিদ আলী এবং ভেঙ্কটরাঘবনকে নির্ভরশীল বলা চলে।

শুশুনিয়ার শিক্ষা-শিবির

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কলকাতার হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সপ্তম বার্ষিক শৈলারোহণ শিক্ষা-শিবির এবারও বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে অনুষ্ঠিত হল।

১৯৬৫ সালে সমস্ত পূর্ব ভারতের মধ্যে হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনই প্রথম এই ধরনের শিক্ষাক্রম চালু করে। কলকাতার অদূরে অল্প খরচে ও অল্প সময়ে একেবারে অনভিজ্ঞদের পর্বতারোহণের প্রাথমিক কলাকৌশলে অবহিত করা, পর্বতারোহণকে সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করা ও সেই সঙ্গে দেশের যুবসমাজকে শৃঙ্খলা ও অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করাই এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য। পর্বতারোহণের দুই ভাগ হচ্ছে রক্ ক্লাইম্বিং বা শৈলারোহণ এবং আইস্ ক্রাফ্টিং বা বরফের উপর কারিগরী। এই শিক্ষাক্রমের রক্ ক্লাইম্বিং-এর খুঁটিনাটি প্রায় সব কিছুই শিক্ষার্থীদের শেখান হয়।

প্রতিদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চলে যেত পাহাড়ের ওপর প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং-এর জন্য। ওখানে প্রথমে সহজ ও আস্তে আস্তে কঠিনতর শিলায় আরোহণ শেখান হত। তারপর অধিকতর কঠিন শিলায় বিভিন্ন সাজসরঞ্জামের সাহায্যে ওঠা ও নামা শেখান হত। শেখান হত প্রধানত দড়ির সাহায্যে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসা। যাকে বলে র‍্যাপেলিং। দুপুর অবধি চলত প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং। এতে আরও শেখান হত কিভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে পাহাড়ের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় স্থানান্তরিত করতে হয় বা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামিয়ে আনতে হয়। এ ছাড়াও শেখান হত হিমবাহে চলতে গিয়ে বরফের ফাটলে পড়ে গেলে কিভাবে উদ্ধার পেতে হয়।

এবারের শিক্ষাক্রমে ৭ জন মহিলা সমেত মোট ৪৪ জন যোগদান করলেও শেষ পর্যন্ত ৪১ জন এই শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেন। শিক্ষক হিসাবে ছিলেন দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শেরপা শ্রীদোরজী লাটু, শ্রীফুদোরজী এবং বাংলা দেশের প্রখ্যাত পর্বতারোহী শ্রীচঞ্চল মিত্র, শ্রীমানিক ব্যানার্জী, শ্রীপ্রবীর লাহিড়ী ও শ্রীমতী দীপালী সিংহ।

এবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, গত জুন মাসে পর্বতারোহণ দুর্ঘটনার পরলোকগত এভারেস্ট বিজয়ী শ্রীআঙ্ কামীর স্মৃতির উদ্দেশে শুশুনিয়ার একটি শিলার নামকরণ। আঙ্ কামী রক্। ১৯৬৭ সালে এই হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরই তৃতীয় বার্ষিক শৈলারোহণ শিক্ষা-শিবিরে অন্যতম শিক্ষকরূপে এসে শ্রীআঙ্ কামীই ওই শিলার দুরূহতম জায়গা দিয়ে প্রথম আরোহণ করে পথ বার করেন। তাঁর নামেই ওই শিলার নামকরণ করা হয়েছে আঙ্ কামী রক্।

একলব্য

বুলগেরীয় চলচ্চিত্র উৎসব

কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গত সপ্তাহে বুলগেরীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। মোট সাতটি কাহিনীচিত্রের এই উৎসব দর্শকমহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। টাইগার সিনেমায় উৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসব উপলক্ষে এক প্রতিনিধি দল বুলগেরিয়া থেকে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পরিচালক শ্রীঅইভান অইভানভ, অভিনেতা শ্রীজর্জি জর্জিয়েভগেটস এবং অভিনেত্রী শ্রীমতী মিসলেনা করালামবোভা। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে (২২ জানুয়ারি) তাঁরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মাল্যভূষিত করেন কলকাতার অভিনেত্রী শ্রীমতী সুমিত্রা সান্যাল। অনুষ্ঠানে শ্রী পি এস মাথুর চীফ সেক্রেটারি শ্রী এন সি সেনগুপ্তের ভাষণটি পড়ে শোনান। শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায় বুলগেরীয় ডেলিগেশনকে স্বাগত জানান।

বুলগেরিয়ার ছবি "দি এইটথ"-এর একটি দৃশ্য

"প্রথম প্রতিশ্রুতি" (পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত) ছবিতে অনুভা ঘোষ

রিজিওনাল সেন্সর অফিসার শ্রী এ কে সরকার প্রারম্ভে সময়োচিত ভাষণ দেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বুলগেরিয়ার কলকাতাস্থ ট্রেড কমিশনার শ্রীক্রিস্টো স্টানকেভ।

প্রথম দিন দেখানো হয় **"দি এইটথ"**। অ্যাকশন-প্রধান ছবি, তবে এই অ্যাকশন রাজনৈতিক আদর্শ-সঞ্জাত। জার্মানদের কবলে তখন বুলগেরিয়া। রাত্রির অন্ধকারে প্যারাশুটে যারা নেমেছিল বুলগেরিয়ায় তাদের মধ্যে মাত্র দুজন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পেরেছিল। একজন ভ্যাসো, অপরজন অষ্টম ব্যক্তি দি এইটথ। কীভাবে তারা গোপন সংগঠন ও সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে তোলে তা নিয়েই এই আডভেঞ্চারপূর্ণ ছবি। অষ্টম ব্যক্তির নেতৃত্বে বিপ্লবী দল কখনও কৌশলে কখনও বীরত্বের ভিতর দিয়ে মাঠে-জঙ্গলে পদে পদে পুলিসদের অপদস্থ ও পরাস্ত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী কর্নেলকে বন্দী করেছে। ছবির কাহিনী বলতে তেমন কিছু নেই, তবে দেশবাসীর কাছে বিপ্লবীরা যে সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছে তার মধ্যে মানবিক উপকরণ আছে। সিনেমাটিক গুণের দিক থেকে **দি এইটথ** (পরিচালনা : জাকো হেসকিয়া) তেমন উল্লেখযোগ্য ছবি নয়। তবে ক্যামেরার কাজ অনেক অংশেই প্রশংসনীয়।

আগামী সপ্তাহে "নবরাগ"

উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত এস এম ফিল্মসের "নবরাগ" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। বিজয় বসু ছবিটির পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

এখানে পিঞ্জর

(কলামন্দির)

নায়ক-নায়িকা যেখানে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন সেখানে একটা পরিচিত ও প্রথাসিদ্ধ ছক আশা করা হয়ত অন্যায় হত না—যেমন রোমান্টিক হিরোর ম্যানারিজম ও দায়-দায়িত্ব পালনে উত্তমকুমার অথবা গ্ল্যামার রোলে অপর্ণা সেন। যাত্রিক গোষ্ঠী কিন্তু সে নিয়মে প্রলুব্ধ হননি। লোক-রঞ্জনের কথা তাঁরা অবশ্যই ভেবেছেন, এবং ছবি দেখে মনে হয়, এমন ভীরুতাও তাঁদের নেই যে তাঁরা একটি বড় আর্টের এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। কিন্তু উত্তমকুমারকে যে তাঁরা একজন সাহিত্যিকের "সোবার" চরিত্রে এবং অপর্ণা সেনকে আটপৌরে শাড়িতে উপস্থিত করেছেন তাতে রীতিভঙ্গের সাহস অবশ্যই আছে। যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠী সেখানে কোন পিঞ্জরে আবদ্ধ হননি।

ভিন্ন ধরনের রোলে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেনকে—বিশেষ করে দ্বিতীয় জনকে উপস্থিত করার পরিকল্পনা ও বিশেষ প্লট নির্বাচন (মূল কাহিনী : প্রফুল্ল রায়) সুফল দিয়েছে নিশ্চয়ই। দর্শক নতুন এণ্টারটেনমেণ্ট পাবেন। তবে সেটা নতুনই, নতুন এক উপকরণ মাত্র, কিন্তু বাস্তব কি? মফস্বলের গরীবের ঘরের মেয়ে লীলার (অপর্ণা সেন) যেহেতু চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা নেই সে-কারণেই তাকে স্যাণ্ডলার হতে হবে এটা ভাবতে একটু অসুবিধা হয় বৈকি। মাঠে-জঙ্গলে পুলিসের নজর

এড়িয়ে, কখনও বা তাড়া খেয়ে ওইরকম ঘরের মেয়ে দুর্বৃত্তদের দলে মিশে মাল পাচার করে। নীলা এবং তার দুই ভাই-ই পথভ্রষ্ট। মন্দ পথে যাওয়ার যুক্তি ও কৈফিয়ত সেই চিরাচরিত—সিনেমায় ধা বহুবার শোনা গেছে। তবে নীলার দা

'জয়-জয়ন্তী' (পরিচালনা : এস মল্লিক) ছবিতে লোলিতা চ্যাটার্জী, সুচেতা, টিংকু, মধুমিতা, পাপিয়া ও সম্রাট

নবেন্দু (দিলীপ মুখোপাধ্যায়) যে সত্যিই ভাল হতে চেষ্টা করেছিল সেটা দর্শক মোটামুটি বিশ্বাস করে নিয়েছেন। সে-কারণে নবেন্দুর প্রতি স্বভাবতই সহানুভূতি জাগে। এবং ওয়াগন-ব্রেকার নবেন্দু পুলিসের গুলিতে মারা যাওয়ায় দর্শকের মনও বিষণ্ণ হয়।

নবেন্দুর জন্য সাহিত্যিক অমল বসুর (উত্তমকুমার) কেমন যেন একটা মমতা জাগে। অমল চেষ্টা করেছে যাতে নবেন্দু সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে। সে চেষ্টা সফল হবার আগেই নবেন্দু মারা যায়। নবেন্দুর প্রতি অমলের আচরণ বা অ্যাটিচুড খুব স্বাভাবিক বাস্তবসম্মত মনে হয়েছে। দরদ আছে, কিন্তু বাড়াবাড়ি বা উচ্ছ্বাস নেই। নবেন্দুর জন্য কিছু করবার আন্তরিকতা অমলের আছে কিন্তু সেটা খুব সংযত। সিনেমায় যেমন এক্ষেত্রে একটা বড় রকমের মহত্ত্ব বা হৃদয়বত্তা দেখানো হয়ে থাকে, যাত্রিক সেক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সংযম ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। অথচ এই সাহিত্যিক অমল, যার নিরাসক্ত দ্রষ্টার চরিত্রে থাকাই স্বাভাবিক নবেন্দুর মৃত্যুর নিদারুণ দুঃসংবাদ দিতে গিয়ে তাদের সংসারে যেভাবে জড়িয়ে পড়ে—ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে "ইমোশানালি ইনভলভড"—সেটা অদ্ভুত লাগে। বিশেষ করে নবেন্দুর কাছে যেখানে অমলের এমন কিছু মৌখিক বা নৈতিক প্রতিশ্রুতি বা কমিটমেনট ছিল না। তবে কি শুধুমাত্র দরদ? তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ির মর্টগেজ ছাড়িয়ে আনা এবং এত কিছু? সিনেমার খাতিরে কিংবা বিনোদনের প্রয়োজনে এ-সব কিছুই মেনে নিতে হবে। মেনে নিতে হবে ওই মামুলী চরিত্রটিকে—বড়লোক শয়তান অবিনাশ মিত্রকে, যে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ভদ্রঘরের মেয়েদের সর্বনাশ করে।

কাহিনীর দুর্বলতা এমানতর কিছু আছে। কিন্তু যেখানে দর্শকের চিত্ত-বিনোদনের প্রশ্ন সেখানে ছবিটি বহু বাধা কাটিয়ে উঠেছে। ছবিটি যে গতিসম্পন্ন এবং নাটকের রসে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তার মূলে যাত্রিকের পরিচালনার শক্তি যথেষ্ট। প্রথম থেকে শেষ অবধি সমান আগ্রহে ছবিটি দেখতে হয়। এতে হৃদয়াবেগের উপাদান, অস্পষ্ট প্রেম, দুষ্টলোকের খলতা, আকশন প্রভৃতি সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে রাখা হয়েছে। চিত্রনাট্যের গঠন ও সংলাপও (প্রশান্ত দেব-কৃত) ভাল। পরিচালকরা যে-ভাবে অমল ও নীলার প্রেমের সম্পর্ক শেষ সময়ে এনে ব্যক্ত করে তুলেছেন সেটা খুবই মনোগ্রাহী। জেলে শেষ দৃশ্যে অমল-নীলার সাক্ষাতের দৃশ্যটিও চমৎকার। মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার মত মুহূর্ত ছবিতে কয়েকটি

আছে। তার মধ্যে একটি হল যেখানে নীলা তার পঙ্গু বাবার বিছানার পাশে বসে অতুলপ্রসাদের "একা মোর গানের তরী" গাইছে। (গানটি খুব সুন্দর গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়)। গানের সঙ্গে বাড়িতে বিভিন্ন জনের মনের প্রতিক্রিয়াও দেখানো হয়েছে সুন্দরভাবে।

ছবিটির অপর একটি বিশেষ গুণ অভিনয়। অমলের ভূমিকায় উত্তমকুমারকে মানিয়েছে ভাল—অবিবাহিত, একেবারে ইয়ং নয়। একজন সাহিত্যিকের চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও শালীনতাবোধ, কথা বলার ধরন এবং অস্ফুট মমতা অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন উত্তমকুমার। তাঁর সংলাপ বলার ধরনটিও এ-ছবিতে বেশ চিত্তাকর্ষক। নীলার চরিত্রে অপর্ণা সেনের চরিত্রচিত্রণও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। চরিত্রটি কিছু অংশে অবিশ্বাস্য হলেও শ্রীমতী সেনের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য তা অনেকটা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রর ভূমিকা ছবিতে সামান্য, তারই মধ্যে এই চরিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায় অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। নরেন্দুর পঙ্গু পিতার চরিত্রে গৌর শী, মায়ের ভূমিকায় অপর্ণা দেবী এবং কুচক্রী বড়লোকের বেশে গঙ্গাপদ বসু টাইপ চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে জহর রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত, নীলোৎপল দে প্রভৃতি অল্প অবকাশে সুঅভিনয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য।

সংগীত পরিচালনা করেছেন ভূপেন হাজারিকা। দু-একটি দৃশ্যে আবহসুর মর্মস্পর্শী। কলাকৌশলের কাজের মধ্যে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহার ফটোগ্রাফি প্রশংসনীয়।

"প্রতিবাদ" (পরিচালনা ঃ তপেশ্বর প্রসাদ) ছবিতে বিশ্বজিৎ, রবি ঘোষ ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

নাট্য-সমালোচনা

যদুবংশ

(থিয়েটার গিল্ড)

সমকালীন অবক্ষয়ী সমাজের রূপটি বিমল করের "যদুবংশ" উপন্যাসে যে রূপে প্রতিভাত, সেই রূপটির সার্থক ও অবিকৃত উপস্থাপনা ঘটেছে থিয়েটার গিল্ড প্রযোজিত "যদুবংশ" নাটকে (২১ জানুয়ারি মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনীত)। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধ কেমন করে বদলে যাচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও, সব কিছু হারিয়ে ফেলার মুহূর্তেও, একটি অমোঘ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নতুন করে আবার জীবনকে উপলব্ধি—এ নাটকের বক্তব্যকে সমকালীনতার গণ্ডী ছাড়িয়ে জীবনের মহত্তর ভূমিকার সন্ধান দেয়। এ যেন আধুনিক মানুষের আত্মসমীক্ষা। বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া। কাল নয়, সমাজ নয়, ঈশ্বর নয়, মানুষ এখানে নিজেই নিজের বিচারক।

সরযূ দেবীর সম্মানলাভ

সংগীত-নাটক-আকাদামির বার্ষিক পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। এবার অভিনয়ের পুরস্কার পেয়েছেন বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের যশস্বিনী শিল্পী **শ্রীমতী সরযূবালা দেবী।**

এই উপলব্ধি যেদিন ঘটে, সেদিন যদুবংশ ধ্বংসের মুখ থেকেও ফিরে আসতে পারে।

আগেই বলেছি, উপন্যাসের মূল বক্তব্য নাটকেও অবিকৃত (নাট্যরূপ ঃ সমীর লাহিড়ী)। ঔপন্যাসিক চরিত্রের যত গভীরে গিয়ে পাঠকের সামনে তা বিশ্লেষণ করতে পারেন, নাটকে তা দুরূহ। এবং দৃশ্য-কাব্যের প্রয়োজনে কিছু অদল-বদল, সংযোজন-বিয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। উপন্যাসের কিছু ঘটনা নাটকে বাদ দেওয়ায় ফলটি ভালই হয়েছে, মূল বক্তব্যের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তবে শেষ দৃশ্যে আরও কিছুটা ইমপ্যাক্টের যেন প্রয়োজন ছিল। দর্শক তাহলে পরিপূর্ণ রসের আস্বাদ পেতে পারতেন। নতুবা ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা, চরিত্র বিশ্লেষণে মুন্সীয়ানা, নতুন প্রকাশে সংযম ইত্যাদি নানা গুণের সমাহারে যদুবংশের নাট্যরূপ লক্ষণীয়।

আর লক্ষণীয় শ্যামল সেনের নির্দেশনা। প্রতিটি দৃশ্যের কম্পোজিশন এতই সুন্দর যে সত্যিই অবাক হতে হয়। নাটকের গতিবেগের সঙ্গে সমতা রেখে প্রায় প্রতিটি শিল্পীর অভিনয় সাবলীল। কোন্ চরিত্র কখন কোন্ মুহূর্তে কতটা অন্তর্মুখী হবেন আর কতটাই বা তাঁকে বহির্মুখী হতে হবে তার নির্দেশে এমন নিপুণতা বিস্ময়কর।

বিস্ময়কর শিল্পীদের অভিনয়ও। বিশেষ করে শ্যামল সেনের (সূর্য) নিখুঁত অভিনয়। এটা যে অভিনয় তা তিনি বার বার ভুলিয়ে দিচ্ছিলেন। ওঁর সঙ্গে সমান তালে ভাল অভিনয় করেছেন বিমল দেব (চারুবাবু), চিত্রা সেন (নয়না), সমর নাগ (অভয়), তপন হাজরা (কৃপাময়)। মুলালির চরিত্রে কমল

দেবকে একটু বেমানান লাগলেও তাঁর অভিনয় ভালই। সমীর লাহিড়ীর (গগনাথ) শেষাংশে খুবই ভাল, তবে প্রথম দিকে তাঁর আরও ভাল অভিনয় আশা করেছিলাম। ও'দের পাশে সুলেখা ভট্টাচার্য (সুর্যর দিদি) ও আশিস রায়কে (ছকুন) ম্লান মনে হল।

প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীউদয়শঙ্কর "শঙ্করস্কোপ"-এর আগামী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তাঁর বাঁ পাশে প্রযোজক শ্রীরঞ্জিতমল কাংকারিয়া।

ফটো— দেশ

এ নাটকের আঙ্গিকের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ভাল। বিশেষ করে আলোক সম্পাতে স্বরূপ মুখার্জীর কৃতিত্ব অস্বীকার করবার নয়। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি এ নাটকে যে নেই তা নয়, তবে পরবর্তী অভিনয়ে সেগুলি সংশোধিত হবে—এ আশা রাখি।

—দিবাকর বর্মা

শঙ্করস্কোপ-এর নিয়মিত প্রদর্শনীর প্রয়াস

উদয়শঙ্করের "শঙ্করস্কোপ" বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শঙ্করস্কোপের প্রযোজক শ্রীরঞ্জিতমল কাংকারিয়া গত সপ্তাহে এক সংবাদিক বৈঠকে জানান যে উদয়শঙ্করের এই অভিনব সৃষ্টি যাতে মাসের পর মাস ধরে জনসাধারণকে দেখানোর ব্যবস্থা হয় সে বিষয়ে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। এই জন্য চাই প্রেক্ষাগৃহে। শ্রীকাংকরিয়া বলেন যে, লিজ নিয়ে হোক কিংবা কিনেই হোক যদি কোন প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যায় তবে "শঙ্করস্কোপ" সহ শ্রীউদয়শঙ্করের অন্যান্য বিশিষ্ট প্রযোজনাগুলিও শিল্পরসিক জনসাধারণকে দেখানো যেতে পারে।

প্রসঙ্গত শ্রীকাংকরিয়া জানান, ৫ ফেব্রুয়ারির পর শঙ্করস্কোপ চালানো যাচ্ছে না, অথচ এটি দেখবার আগ্রহ এখনও জনসাধারণের মধ্যে অপরিসীম। ভবিষ্যতে শঙ্করস্কোপ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার এবং বিদেশের কলারসিকদের সামনে উপস্থিত করার পরিকল্পনাও প্রযোজকের রয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীউদয়শঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমার অনেকদিনের স্বপ্ন সার্থক রয়েছে। তবে এই নতুন টেকনিকে নানা বিষয়বস্তু উপস্থিত করার ইচ্ছে রয়েছে।

শিশির একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা

মুক্তঅঙ্গনে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের তৃতীয় বার্ষিক শিশির একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন ফিল্ম অ্যাণ্ড থিয়েটার আরকাইভস অব ইণ্ডিয়া। ফলাফল নিম্নরূপ :

১ম শ্রেষ্ঠ দল—"কুশীলব"—নাটক 'শতাব্দীর স্বপ্ন' নৈহাটি। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দল—"ইয়ংমেনস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন" নাটক 'বাদক' নৈহাটি। তৃতীয় শ্রেষ্ঠ দল—"মন্দিরা"—নাটক 'দ্বিতীয় বিশ্ব' বারাকপুর। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি—"এক ঝাঁক বুনো হাঁস"—নাট্যকার শেখর সরকার, "বিনয় মাধবী কুঞ্জ"—কলিকাতা। প্রথম অভিনীত শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি—"শপথ নিয়ে যাই" নাট্যকার অর্ধেন্দুবিকাশ দাস। বলাকা। বারাকপুর। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—সুনীল চট্টোপাধ্যায়, নাটক—এক ঝাঁক বুনো হাঁস 'বিনয়-মাধবী কুঞ্জ' কলিকাতা। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—শ্রীজিৎ দাস (যজ্ঞনাথ), নাটক—"সম্পত্তি সমর্পণ", পাণ্ডুজন্য, কলিকাতা-৭। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নাটক "বাদক"। 'ইয়ংমেনস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন' নৈহাটি। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—বুকে